শ্রীমদ্ভাগবত

সরল অনুবাদ, বিস্তৃত পাদটীকা, পরিচিতিপঞ্জী ও নির্দেশপঞ্জী সহ

ভূমিকা :

ত্রিপুরাশংকর সেনশাস্ত্রী

কাশনী। এ-১২৬ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট। কলকাতা-৭০০০০৭

সনাতন ধর্ম

যে পরিমাণ ধনে জীবিকা নির্বাহ হয়, উদর পূর্ণ হয় তাতেই ব্যক্তির অধিকার। তার বেশি ভোগ ও সঞ্চয় করলে তাকে চোর বলা যায়; সে ধর্মত দণ্ডনীয়। —যুধিষ্ঠিরের প্রতি নারদের উপদেশ, পৃষ্ঠা ৩৮৭ (৭।১৪।৮)।

*

হে দেব, দেখতে পাই মুনিরা প্রায়ই নিজ নিজ মুক্তি কামনায় নির্জনে মৌনব্রত আচরণ করে ভ্রমণ করেন; পরার্থে তাঁরা তা করেন না। আমার কিন্তু সঙ্গী এই দীন অসুরবালকদের পরিত্যাগ করে একাকী মুক্তি লাভ করার ইচ্ছা হয় না। —ভগবানের নিকট প্রহ্লাদের প্রার্থনা, পৃষ্ঠা ৩৭৫-৭৬ (৭।৯।৪৪)।

*

আমি পরমেশ্বরের কাছে অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি বা মুক্তি কামনা করি না। প্রার্থনা করি, আমি যেন জগতের প্রাণীদের অন্তরে থেকে তাদের দুঃখ অনুভব করি আর সকল দেহীর দুঃখ যেন দূর করতে পারি।—রন্তিদেবের প্রার্থনা, পৃষ্ঠা ৪৯৩ (৯।২১।১২)।

*

শত্রুর প্রতি তিতিক্ষা, অধমজনের প্রতি করুণা, সমান ব্যক্তির সঙ্গে মিত্রতা ও সর্বজীবে সমদর্শন, এ সকল আচরণ দ্বারা সর্বাত্মা ভগবান প্রসন্ন হয়ে থাকেন।—ধ্রুবের প্রতি মনুর উপদেশ, পৃষ্ঠা ১৮৫ (৪।১১।১৩)

*

বিপন্ন দীনদের রক্ষাই শক্তিমান পুরুষের একমাত্র কাজ। নিজের মায়ায় মোহিত সাধারণ প্রাণী পরস্পর শত্রুতা করলে সাধুরা নিজেদের ক্ষণভঙ্গুর জীবন দিয়ে প্রাণীদের রক্ষা করেন।—নীলকণ্ঠ মহাদেবের উক্তি, পৃ ৪১৫ (৮।৭।৩৯)।

*

জীবে দয়া ক'রে যে ব্যক্তি এই অনিত্য দেহের বিনিময়ে ধর্ম বা যশ অর্জন করবার চেষ্টা না করেন, অচেতন বস্তুও তাঁর জন্য দুঃখ করে থাকে। যিনি অপরের শোকে শোক অনুভব করেন এবং অপরের আনন্দে আনন্দিত হন তাঁর ধর্মকেই পুণ্যশ্লোক মহাজনেরা সনাতন আখ্যা দিয়েছেন।—দধীচি মুনির উক্তি, পৃষ্ঠা ৩২৭ (৬।১০।৮-৯)।

অনুবাদকমণ্ডলী ঃ

ত্রিপুরাশংকর সেনশাস্ত্রী	সন্তোষকুমার চট্টোপাধ্যায়
মিহির গুপ্ত	রাধু গোস্বামী
সোমনাথ ভাদুড়ী	অবনীকান্ত আচার্য
ভূমিকা গোস্বামী	দীপশিখা সেন

সম্পাদনা ঃ

রণব্রত সেন

সম্পাদকের নিবেদন

ভাগবতের ন্যায় জনপ্রিয় পুরাণ গ্রন্থের যে ক'খানি গদ্য অনুবাদ এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে তাদের মধ্যে সব কটিরই ভাষা ও রচনাভঙ্গী দুরূহ ও সংস্কৃত-ঘেঁষা। ফলে, সংস্কৃতে অনভিজ্ঞ আধুনিক বাঙ্গালী পাঠকের পক্ষে সেগুলির একখানিও উপযুক্ত নয় বলেই আমাদের ধারণা। সেদিক থেকে ভাগবতের একখানি সহজ ও সুপাঠ্য অনুবাদের যে খুবই প্রয়োজন ছিল তা নিঃসন্দেহে বলা চলে। এ অবস্থায় হরফ প্রকাশনীর কর্ণধার আবদুল আজীজ আল্-আমান শ্রীমদ্ভাগবতের একখানি আধুনিক সরল বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করে বহুদিনের একটি অভাব পূরণ করলেন।

উপনিষদ, গীতা ও ভাগবত এই তিনটি মহাগ্রন্থ পাঠ করলে হিন্দুধর্মের ক্রমবিকাশের একটি ধারাবাহিক চিত্র পাঠকের কাছে উন্মুক্ত হবে। উপনিষদের নিরীশ্বর ব্রহ্মবাদের পরে গীতায় যে ঈশ্বরবাদ ও ভক্তিধর্মের সূচনা হয়েছে, ভাগবতে আমরা তারই পরিসমাপ্তি দেখতে পাই।

ভাগবত রচনাকারের উদ্দেশ্য ছিল বিভিন্ন রূপক ও গল্পাদির মাধ্যমে হিন্দুধর্মের প্রতিপাদ্য বিষয়গুলির মধ্যে জ্ঞান ও ভক্তিযোগের শ্রেষ্ঠত্ব আপামর জনসাধারণের কাছে বিবৃত করা। সেই উদ্দেশ্যেরই সার্থক রূপায়ণকল্পে আমরা এ গ্রন্থের ভাষা ও প্রকাশভঙ্গি যথাসাধ্য সরল ও আধুনিক করার চেষ্টা করেছি। দুরূহ শব্দ ও অপ্রচলিত বাগ্‌রীতি যথাসম্ভব বর্জন করে এতে সর্বত্র চলিত ভাষা এবং আধুনিক বানান ও বাগ্‌রীতি ব্যবহার করা হয়েছে। ফলে, স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে সাধারণ বাঙ্গালী পাঠক এই গ্রন্থ পাঠ করে অনায়াসে এর মর্মগ্রহণে সমর্থ হবেন বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

অনুবাদকমণ্ডলীর মধ্যে স্বর্গত ত্রিপুরাশঙ্কর সেনশাস্ত্রী গ্রন্থের একাদশ স্কন্ধ, অধ্যাপক সন্তোষকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রথম থেকে তৃতীয় স্কন্ধ, শ্রীমিহির গুপ্ত পঞ্চম ও ষষ্ঠ স্কন্ধ, শ্রীরাধু গোস্বামী দশম স্কন্ধ, শ্রীসোমনাথ ভাদুড়ি নবম স্কন্ধ, শ্রীমতী ভূমিকা গোস্বামী চতুর্থ ও সপ্তম স্কন্ধ, কুমারী দীপশিখা সেন অষ্টম ও দ্বাদশ স্কন্ধের অনুবাদকার্য সম্পন্ন করেছেন। এই গ্রন্থের ভাষা সরল ও সাবলীল করার উদ্দেশ্যে তাঁদের প্রয়াস কতটা সফল হয়েছে একমাত্র সুধী পাঠকবৃন্দ তা বলতে পারবেন।

পুস্তকের প্রথম সংস্করণ প্রকাশনার অনতিকাল মধ্যে সমস্ত কপি নিঃশেষিত হওয়ায় ভাগবতের এই প্রাঞ্জল বঙ্গানুবাদটির জনপ্রিয়তার নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায়। গ্রন্থের বর্তমান সংস্করণের সম্পাদনা কাজে সাহায্যের জন্য বন্ধুবর শ্রীমিহির গুপ্তের ঋণ অপরিশোধ্য। তাঁর সাহায্য ব্যতীত এই পরিমার্জিত সংস্করণখানির প্রকাশ আদৌ সম্ভব হত কিনা সন্দেহ। শ্রীপ্রফুল্লকান্ত বসু, শ্রীশীতাংশু চট্টোপাধ্যায় ও কল্যাণীয়া শর্মিলা ভট্টাচার্য আমাদের নানাভাবে সাহায্য করেছেন। এই পুস্তক মুদ্রণকার্যে বর্ণমালা প্রেসের কর্মিবৃন্দের সহযোগিতা উল্লেখযোগ্য। টীকা ও শব্দার্থের পরিশিষ্টটি স্বর্গত গুণদাচরণ সেন সম্পাদিত শ্রীমদ্ভাগবত (সংক্ষিপ্ত আখ্যানভাগ) গ্রন্থটির পরিশিষ্ট থেকে গৃহীত হয়েছে। এটি প্রকাশের অনুমতি-

দানের জন্য তাঁর পুত্র শ্রীঅমলেন্দু সেন ও প্রকাশক শ্রীশ্রীশকুমার কুণ্ড সহোদয়গণের নিকট আমরা কৃতজ্ঞ।

এই গ্রন্থ সম্পাদনাকার্যের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত আচার্য ত্রিপুরাশঙ্কর সেনশাস্ত্রী আজ পরলোকগত। আমাদের অশেষ দুঃখ যে তিনি এই গ্রন্থের নতুন সংস্করণটি দেখে যেতে পারলেন না। ভাগবত গ্রন্থ প্রকাশনে তাঁর ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধার স্বীকৃতিস্বরূপ আমরা এই পরিবর্ধিত সংস্করণটি তাঁরই পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে উৎসর্গ করলাম।

গ্রন্থখানি নির্ভুল ও সর্বাঙ্গসুন্দর করবার সকল রকম চেষ্টা করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও হয়তো কিছু ভুলত্রুটি থেকে গেছে। এবিষয়ে আমরা পাঠকবর্গের সহযোগিতা কামনা করি। যে উদ্দেশ্যে এই গ্রন্থখানি প্রকাশিত হল তা যদি সফল হয় তবেই আমাদের শ্রম সার্থক বলে বিবেচনা করব।

রণব্রত সেন

সূচীপত্র

বিষয়সূচী

প্রথম স্কন্ধ

অধ্যায় ১৯ ঃ পৃষ্ঠা ১-৫০

দ্বিতীয় স্কন্ধ

অধ্যায় ১০ ঃ পৃষ্ঠা ৫১-৭৪

তৃতীয় স্কন্ধ

অধ্যায় ৩৩ ঃ পৃষ্ঠা ৭৫-১৫৫

চতুর্থ স্কন্ধ

অধ্যায় ৩১ ঃ পৃষ্ঠা ১৫৬-২৪২

পঞ্চম স্কন্ধ

অধ্যায় ২৬ ঃ পৃষ্ঠা ২৪৩-৩০১

ষষ্ঠ স্কন্ধ

অধ্যায় ১৯ ঃ পৃষ্ঠা ৩০২-৩৪৯

সপ্তম স্কন্ধ

অধ্যায় ১৫ ঃ পৃষ্ঠা ৩৫০-৩৯৪

একাদশ স্কন্ধ

অধ্যায় ৩১ ঃ পৃষ্ঠা ৭২৯-৮১৮

দ্বাদশ স্কন্ধ

অধ্যায় ১৩ ঃ পৃষ্ঠা ৮১৯-৮৪৭

ভাগবতেও সংক্ষিপ্ত বিষয়সূচী দেওয়া হয়েছে। গ্রন্থের ১২শ স্কন্ধের ১২শ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

ভূমিকা

আমরা যাকে ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতি বলি, তার ভেতর বৈদিক ও ঔপনিষদিক সংস্কৃতি, পৌরাণিক সংস্কৃতি ও তান্ত্রিক সংস্কৃতির ধারা ত্রিবেণী-সঙ্গমের মত অবিরোধে মিলিত হয়েছে। ভারতের ধর্মসাধনার ক্রম-বিকাশের ইতিহাস আলোচনা করতে গেলে শুধু প্রস্থান-ত্রয়ীর (উপনিষদ্, ভগবদ্‌গীতা ও বেদান্তের) আলোচনাই যথেষ্ট নয়, পুরাণ ও তন্ত্রসমূহের আলোচনাও অপরিহার্য। বিশেষত অষ্টাদশ পুরাণ অক্ষয় জ্ঞানের ভাণ্ডার—ভগবান বেদব্যাস এই পুরাণসমূহে নানা কাহিনীর ভেতর দিয়ে এক দিকে যেমন নানা ঐতিহাসিক তথ্য বিবৃত করেছেন, তেমনি অন্য দিকে ভারতের বিচিত্র ধর্মসাধনার সম্পর্কেও আলোকপাত করেছেন। মনস্বী ভূদেব তাঁর 'সামাজিক প্রবন্ধে' পুরাণসমূহকে 'কাব্যেতিহাস' বলেছেন। তাঁর মতে পুরাণকার ঐতিহাসিক কাহিনীকেও কল্পনা-মিশ্রিত করে এমনভাবে রূপান্তরিত করেছেন যাতে সত্য ঘটনাও গল্পের মতো মনে হতে পারে; কারণ, পুরাণকারের উদ্দেশ্য ছিল লোকশিক্ষার দ্বারা সমাজের কল্যাণসাধন, ঐতিহাসিক তথ্য বিবৃত করা নয়। তবে, এ কথা সত্য যে পুরাণকার সর্বত্র ঐতিহাসিক কাহিনীর বিকৃতি ঘটাননি।

প্রকৃতপক্ষে পুরাণসমূহ ভারতের সাধনা ও সংস্কৃতির ধ্যান ও ধারণার ইতিহাস। এই পুরাণসমূহের মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবত ভাষার ঐশ্বর্যে ছন্দের বৈচিত্র্যে ও কবিত্বসম্পদে, গভীর দার্শনিকতায় ও রসতত্ত্বের বিশ্লেষণে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে রয়েছে। স্বয়ং শ্রীমন্মহাপ্রভু বলেছেন, শ্রীমদ্ভাগবতই বেদান্ত দর্শনের অকৃত্রিম ভাষ্য। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের মতে 'অচিন্ত্যভেদাভেদ'ই শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাদ্য। ভক্তিশাস্ত্রে বলা হয়েছে—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নাম ও লীলাকীর্তন ও লীলাশ্রবণ ভক্তিলাভের উপায়। শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধে উত্তমশ্লোকের গুণানুবাদ ও তাঁর ঐশ্বর্য ও মাধুর্যলীলা কীর্তিত হয়েছে। ভগবান অজ বা জন্মরহিত হয়েও ভক্তের প্রতি অনুগ্রহ-প্রদর্শনার্থ ও ধর্মসংস্থাপনের জন্যে নররূপে লীলা করেছেন এবং এই লীলার প্রয়োজনে যোগমায়ার দ্বারা আপন স্বরূপ আচ্ছাদন করেছেন। ভগবান অখিলরসামৃত-সিন্ধু—তাঁকে শ্রীদাম-সুদাম-বসুদাম সখ্য-ভাবে, নন্দ-যশোদা বাৎসল্যভাবে ও গোপিকাগণ মধুরভাবে ভজনা করেছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের মতে মধুরভাবে শ্রীভগবানের ভজনা করাই শ্রেষ্ঠ ভজনা। বিষ্ণুপুরাণ, হরিবংশ, শ্রীমদ্ভাগবত ও ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে[1] এই মধুর রতির চরম উৎকর্ষ বর্ণিত হয়েছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামীকে বলেছেন ঃ

কৃষ্ণের যতেক খেলা সর্বোত্তম নরলীলা
নরবপু তাহার স্বরূপ।
গোপবেশ বেণুকর নবকিশোর নটবর
নরলীলার হয় অনুরূপ ॥

কৃষ্ণের মধুর রূপ শুন সনাতন।
যে রূপের এক কণ ডুবায় সব ত্রিভুবন
সর্ব প্রাণী করে আকর্ষণ ॥

---

১ ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণেই প্রথম শ্রীমতী রাধার নামের স্পষ্ট উল্লেখ দেখা যায়। এই পুরাণের মতে শ্রীমতী রাধিকা শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়া অর্থাৎ বিবাহিতা পত্নী। দুগ্ধ ও তার ধবলতা, অগ্নি ও তার দাহিকাশক্তি যেমন অভিন্ন, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীমতী রাধা তেমনি অভিন্ন।

ভাগবতে শ্রীভগবানের বিবিধ ঐশ্বর্য-লীলাও বর্ণিত হয়েছে—যেমন পূতনাবধ, মাতৃক্রোড়ে বিশ্বম্ভর মূর্তিধারণ ও জননী যশোদাকে বিশ্বরূপ-প্রদর্শন, মৃত্তিকাভক্ষণ ও ব্যাদিত আননমধ্যে বিশ্বরূপ প্রদর্শন, বৎসাসুর, বকাসুর ও অঘাসুর-বধ, কালীয়দমন, প্রভৃতি। শ্রীভগবানের এই সকল ঐশ্বর্যলীলাও ভক্তগণের পরম আস্বাদনের বস্তু। যাঁরা যুক্তি-তর্কের দ্বারা এই সমস্ত লীলার সত্যাসত্য নির্ণয়ের চেষ্টা করেন, তাঁরা দুর্ভাগ্য। যাঁরা অনন্যা ভক্তির সঙ্গে এই সব লীলার অনুধ্যান করেন, তাঁদের অন্তরেই এই লীলার গভীর তাৎপর্য স্ফুরিত হয়। আবার আমাদের বিশেষ সৌভাগ্য এই যে, আমরা শ্রীমন্মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদ-লীলার আলোকে শ্রীভগবানের মাধুর্য-লীলা গভীরতরভাবে আস্বাদন করতে পারি। আমরা যথাস্থানে এ বিষয়ের আলোচনা করব।

ভগবান বাসুদেবের চরিত-কথা আঠারোখানি পুরাণের ভেতর নয়খানি পুরাণে পাওয়া যায়। সেই নয়খানা পুরাণ হচ্ছে—(১) ব্রহ্মপুরাণ, (২) পদ্মপুরাণ, (৩) বিষ্ণুপুরাণ, (৪) বায়ুপুরাণ, (৫) শ্রীমদ্ভাগবত, (৬) ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, (৭) স্কন্দপুরাণ, (৮) বামনপুরাণ, (৯) কূর্মপুরাণ (বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণচরিত্র দ্রষ্টব্য)। এই সকল পুরাণের মধ্যে যে শ্রীমদ্ভাগবত ছন্দোবৈচিত্র্যে, শব্দচয়ন-নৈপুণ্যে, নানা অলংকারের সুষ্ঠু প্রয়োগে অন্য সকল পুরাণের চাইতে স্বতন্ত্র, সে কথা আমরা পূর্বেই বলেছি। আমরা এ-কথাও বলেছি যে, বেদব্যাস বা ব্যাসদেব এই পুরাণসমূহের রচয়িতা। কিন্তু নানা কারণে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, ব্যাসদেব কোন ব্যক্তিবিশেষের নাম নয়, ইংরাজিতে বলতে গেলে বলতে হয়, শংকরাচার্যের মত এও একটি generic। যিনি মহাভারতের রচয়িতা, তিনি হচ্ছেন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস। তা ছাড়া ব্রহ্মসূত্রের রচয়িতা, পাতঞ্জল দর্শনের ভাষ্যকার, অষ্টাদশ পুরাণ ও অষ্টাদশ উপপুরাণের প্রণেতা সকলেই ব্যাস নামে পরিচিত ছিলেন। আর যে মহর্ষি বেদের অর্থকে বিস্তৃত করেছেন, তিনি বেদব্যাস নামে অভিহিত হয়েছেন। অবশ্য, আমাদের দেশের ভক্তমণ্ডলীর বিশ্বাস যে, ব্যাসদেব নামে একজন মহর্ষি বহু শাস্ত্রের রচয়িতা এবং শ্রীমদ্ভাগবত তাঁর সর্বশেষ রচনা, এই বৃহৎ গ্রন্থে তিনি ভাগবত-ধর্মের মাহাত্ম্য ও শ্রীভগবানের লীলা বর্ণনা করে শান্তি লাভ করেন। একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচার করলে এই ভক্তমণ্ডলীর বিশ্বাসকেও অমূলক বলা চলে না।

কোন কোন পুরাণে ঋষির ভবিষ্যদ্বাণীরূপে ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ আছে। আবার পুরাণসমূহের কোন কোন স্থানে উচ্চাঙ্গের কবিত্ব-শক্তি, গভীর দার্শনিকতা, প্রগাঢ় ধর্মচিন্তা ও সমাজ-চেতনারও নিদর্শন আছে। ভারতবর্ষে যে প্রাচীনকালে ও মধ্যযুগে লোকশিক্ষার বিপুল আয়োজন হয়েছিল, বিভিন্ন যুগে রচিত পুরাণসমূহ তার প্রমাণ। বঙ্কিমচন্দ্র 'কৃষ্ণচরিত্র'-এ লিখেছেন—'পুরাণ অর্থে আদৌ পুরাতন, পশ্চাৎ পুরাতন ঘটনার বিবৃতি। সকল সময়েই পুরাতন ঘটনা ছিল, এই জন্য সকল সময়েই পুরাণ ছিল। বেদেও পুরাণ আছে। শতপথ ব্রাহ্মণে, গোপথ ব্রাহ্মণে, অশ্বলায়ন সূত্রে, অথর্ব সংহিতায়, বৃহদারণ্যকে, ছান্দোগ্যোপনিষদে, মহাভারতে, রামায়ণে, মানবধর্ম-শাস্ত্রে সর্বত্রই পুরাণ প্রচলিত থাকার কথা আছে। কিন্তু ঐ সকল কোন গ্রন্থেই বর্তমান কোনও পুরাণের নাম নাই।' অতএব, কোন কোন পৌরাণিক কাহিনীর বীজ বৈদিক সাহিত্যে থাকলেও পুরাণসমূহ পরবর্তীকালে রচিত হয়েছে, বহু প্রাচ্য পণ্ডিত এরূপ সিদ্ধান্ত করেছেন। তবে, এ-দেশীয়

অনেক পণ্ডিতের দৃঢ় বিশ্বাস, বৈদিক ধর্মের সঙ্গে পৌরাণিক ধর্মের কোন বিরোধ নেই। শাশ্বত অনাদি অনন্ত জ্ঞানরাশিই হচ্ছে বেদ ; বেদের যা প্রতিপাদ্য, তাই পুরাণসমূহে নানা কাহিনীর মধ্য দিয়ে বিবৃত হয়েছে, আর এইজন্যে পুরাণ-সমূহও আমাদের দেশে বেদের মর্যাদা লাভ করেছে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবান অর্জুনকে কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ধ্যানযোগ ও ভক্তিযোগের উপদেশ দিয়েছেন। ভগবদ্গীতার বিভিন্ন ভাষ্যকারগণের কারো মতে গীতায় নিষ্কাম কর্মযোগের, কারো মতে জ্ঞানযোগের, কারো মতে বা ভক্তিযোগের প্রাধান্য। আমাদের মনে হয়, শ্রীভগবান গীতায় বিভিন্ন যোগের মধ্যে সমন্বয়ের আদর্শ স্থাপন করেও ভক্তিযোগেরই প্রাধান্য খ্যাপন করেছেন। গীতার শেষ কথা— শরণাগতি, 'মামেকং শরণং ব্রজ'। আবার ভগবদ্গীতায় যেমন শ্রীভগবান অর্জুনকে উপলক্ষ করে বিশ্বমানবকে কল্যাণের পথ প্রদর্শন করেছেন, তেমনি শ্রীমদ্ভাগবতে তিনি তিরোভাবের পূর্বে জিজ্ঞাসু উদ্ধবকে উপলক্ষ করে আমাদিগকে শ্রেয়ের পথের নির্দেশ দিয়েছেন। অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হয়ে বলেছিলেন, শিষ্য-স্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্—'আমি তোমার শিষ্য, আমি তোমার শরণাগত, তুমি আমায় শিক্ষা দাও', তাই তিনি গুরুরূপে অর্জুনকে শিক্ষা দিয়েছিলেন। কিন্তু উদ্ধব ছিলেন অর্জুনের চেয়েও উচ্চতর অধিকারী, তাই আমরা দেখতে পাই, ভগবদ্গীতায় যা আছে, শ্রীকৃষ্ণ-উদ্ধব-সংবাদে তা সকলই আছে, আবার গীতায় যা নেই, সেই রসের সাধনার কথাও এখানে রয়েছে। গীতায় (৯।২৭ শ্লোকে) শ্রীভগবান অর্জুনকে বলেছেন ঃ

> যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
> যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্ ॥

শ্রীভগবানের শরণাগতি এবং সকল কর্মের ফল তাঁর চরণে সমর্পণ— ইহাই গীতার শেষ কথা, আর এখান থেকেই রসের সাধনার আরম্ভ। শ্রীমদ্ভাগবতে এই রসের সাধনার চরম উৎকর্ষ প্রদর্শিত হয়েছে। তাই আমরা বলতে পারি— গীতার যেখানে পরিসমাপ্তি, সেখানেই শ্রীমদ্ভাগবতের আরম্ভ।

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন, জ্ঞানীর নিকট যিনি ব্রহ্ম, যোগীর নিকট যিনি পরমাত্মা, ভক্তের নিকট তিনি ভগবান। যিনি অদ্বয় জ্ঞান এবং ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান এই ত্রিবিধ শব্দে কথিত হন, তত্ত্ববিদ্গণ তাঁকেই তত্ত্ব বলেন। জ্ঞানীর নিকট তিনি ব্রহ্ম বা ভূমা অর্থাৎ তাঁর চাইতে বৃহত্তর কিছু নেই বা হতে পারে না। তিনি নির্গুণ, নিরাকার, বিভু বা সর্বব্যাপী, বাক্য ও মনের অগোচর, অর্থাৎ বাক্য তাঁকে প্রকাশ করতে পারে না এবং মন তাঁকে মনন করতে পারে না। 'তৈত্তিরীয়' ও 'কেন' উপনিষদে বলা হয়েছে ঃ

> যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ। তৈত্তিরীয়, ২।৪
> ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্ গচ্ছতি নো মনঃ ॥ কেন, ১।৩

যোগী জানেন, তিনি পরমাত্মা-রূপে সকলের হৃদয়ে অবস্থান করেন এবং সবার জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করেন। গীতায় (১৮।১৬ শ্লোকে) বলা হয়েছে ঃ

> ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি।
> ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥

'হে অর্জুন, ঈশ্বর সর্বভূতের হৃদয়ে অবস্থান করেই তাদের যন্ত্রারূঢ় পুত্তলিকার মত ভ্রমণ করাচ্ছেন।' কিন্তু ভক্তের নিকট তিনি রসময়, লীলাময়,

নিখিল কল্যাণগুণের আকর, মাধুর্যঘন, প্রেমঘন ভগবান। শ্রীমদ্ভাগবতে তাঁর যশোগান সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

তদেব রম্যং রুচিরং নবং নবং
তদেব শশ্বন্মনসো মহোৎসবং।
তদেব শোকার্ণবশোষণং নৃণাম্
যদুত্তমশ্লোক যশোঽনুগীয়তে ॥

উত্তমশ্লোক ভগবানের মহিমাসংকীর্তনই মনোরম—উহা রম্য, রুচির, নিত্যই নূতন, উহা নিত্যকাল মানব-মনের মহোৎসব, উহা মনুষ্যগণের শোকার্ণবশোষণ বা শোকনাশন।

শ্রীমদ্‌ভাগবতে ফলকামনাবর্জিত হয়ে অব্যবধানে ভগবানের ভজনাই নির্গুণ ভক্তিযোগের লক্ষণ বলে কথিত হয়ে থাকে। অবশ্য হৈতুকী ভক্তিও যে অহৈতুকী ভক্তিতে পরিণতি লাভ করতে পারে, ধ্রুবচরিত্রে তার দৃষ্টান্ত আছে। কিন্তু যথার্থ ভক্ত অহৈতুকী ভক্তিই প্রার্থনা করেন। শিক্ষাষ্টকে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলেছেন ঃ 'আমি ধন চাই না, জন চাই না, মনোহারিণী কবিতাও চাই না (অথবা সুন্দরী চাই না, কবিপ্রতিভাও চাই না)। হে জগদীশ্বর, জন্মে জন্মে তোমার প্রতি যেন আমার অহৈতুকী ভক্তি থাকে।' শ্রীমদ্ভাগবতের প্রহ্লাদচরিত্রে আমরা এই অহৈতুকী ভক্তিরই দৃষ্টান্ত পাই। ভগবদ্‌গীতায় যে বলা হয়েছে, 'ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি', আমার ভক্ত কখনও বিনাশপ্রাপ্ত হন না, শ্রীভগবান যে তাঁর শরণাগত ভক্তগণকে সহস্র সহস্র বিপদ থেকে রক্ষা করেন—প্রহ্লাদ, অম্বরীষ প্রভৃতি মহাত্মাদের পুণ্য চরিত-কথা তার নিদর্শন।

মনুষ্যগণের একমাত্র পরম ধর্ম কি? তার উত্তরে শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—'ভগবানের নামগ্রহণের দ্বারা ও অন্যান্য উপায়ে তাঁতে ভক্তিযোগই মানুষের পরম ধর্ম।' এ-ভক্তি জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃত—তাই কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ধ্যানযোগের পথ পরিত্যাগ করে একমাত্র ভক্তিযোগে তাঁর ভজনা করতে হয়, কেননা, শ্রীভগবান একমাত্র ভক্তিরই বশীভূত। সনাতন শিক্ষায় শ্রীমন্মহাপ্রভুও ভক্তিযোগেরই অসাধারণ মাহাত্ম্য কীর্তন করেছেন।

শ্রীভগবান যে ভক্তের অধীন, ভক্তগণকে কখনও পরিত্যাগ করার শক্তি যে তাঁর নেই, শ্রীমদ্ভাগবতে অম্বরীষের উপাখ্যানে সে কথা বলা হয়েছে। স্বয়ং ভগবান তাঁর শ্রীমুখে বলেছেন, 'হে দ্বিজ, পরাধীন ব্যক্তির মতো আমি ভক্তের অধীন। সাধু ভক্তগণ আমার হৃদয়কে একেবারে অধিকার করে রয়েছেন। আমিও ভক্তগণের প্রিয়, ভক্তগণও আমার প্রিয়।' আবার বলেছেন ঃ 'যাঁরা স্ত্রী, পুত্র, গৃহ, আত্মীয়, প্রাণ, ধনসম্পদ, ইহলোক, পরলোক সকল পরিত্যাগ করে একমাত্র আমারই শরণ গ্রহণ করেছেন, তাঁদের আমি কেমন করে পরিত্যাগ করব?'

আবার 'যে সকল সমদর্শী সাধু আমাতে হৃদয় নিবদ্ধ করেছেন, তাঁরা আমাকে ভক্তির দ্বারা বশীভূত করেন, যেমন সতী স্ত্রী সৎপতিকে বশীভূত করেন।' এবং 'সাধুগণ আমার হৃদয়-সদৃশ; আমিও তাঁদের হৃদয়স্বরূপ, আমা ভিন্ন তাঁরা আর কাউকে জানেন না, আমিও তাঁদের ছাড়া আর কিছু জানি না।' এইজন্যে 'আমার পূজার চাইতে আমার ভক্তগণের পূজা শ্রেষ্ঠ।' ভাগবতে শ্রীভগবান বলছেন ঃ

নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগীনাং হৃদয়ে ন চ।
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র বসামি নারদ ॥

শ্রীভগবানে রতি প্রগাঢ় হয়েই ক্রমে উহা প্রেমে পরিণত হয়। তখন ভক্তের জীবনে ঘটে দিব্য রূপান্তর। বাইবেলের Jeremiah-তেও এই রূপান্তরের কথা বলা হয়েছে : 'The Lord hath appeared of late unto me, saying,— yea, I have loved thee with everlasting love, therefore, with loving kindness have I drawn thee.'

শ্রীভগবানের প্রতি যাঁদের অহৈতুকী ভক্তি জন্মে, যাঁরা প্রিয়তমের নিকট পরিপূর্ণ রূপে আত্মসমর্পণ করেন এবং যাঁদের সকল কর্মের মূলে থাকে প্রেমাস্পদের প্রীতি-বাঞ্ছা, তাঁদের আচরণ হয় কখনো মূকবৎ, কখনো বালকবৎ, কখনো পিশাচবৎ, কখনো বা উন্মাদবৎ। শ্রীমদ্‌ভাগবতকার বলছেন : 'সেই অবিনশ্বর শ্রীভগবানের চিন্তায় কখনো তাঁরা ক্রন্দন করেন, কখনো হাস্য করেন, কখনো আনন্দসাগরে মগ্ন হন; কখনো অলৌকিক বাক্য বলেন, কখনো নৃত্য করেন, কখনো তাঁর লীলাকথার অনুশীলন করেন, কখনো বা অন্তরে তাঁকে প্রাপ্ত হয়ে আনন্দের আতিশয্যে মৌন ভাব অবলম্বন করেন।' তিনি আরো বলেছেন : 'সূর্য যেমন অন্ধকারকে দূর করে, প্রলয়বায়ু যেমন মেঘকে অপসারিত করে, তেমনি ভগবান অনন্তের নাম-কীর্তন এবং তাঁর লীলাকথা শ্রবণ করতে করতে তিনি হৃদয়ে প্রবেশ করেন এবং মানুষের অশেষ দুর্গতি দূর করেন।'

অতএব তাঁর প্রতি ভক্তিলাভের উপায়—তাঁর নাম-কীর্তন ও তাঁর লীলাকথা শ্রবণ। শ্রীমন্মহাপ্রভু যে পঞ্চ সাধনের শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলেছেন, তার ভেতরেও রয়েছে নাম-কীর্তন ও ভাগবত-শ্রবণের কথা :

সাধুসঙ্গ, নামকীর্তন, ভাগবত-শ্রবণ।
মথুরাবাস, শ্রদ্ধায় শ্রীমূর্তির সেবন ॥
সকল সাধনশ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পাঁচের অল্প সঙ্গ ॥

শ্রীমদ্‌ভাগবতে যথার্থ সাধুর লক্ষণও বলা হয়েছে—'যিনি কৃপালু, অকৃতদ্রোহ (অর্থাৎ কারো অনিষ্টচিন্তা করেন না), যিনি সকলের প্রতি ক্ষমাশীল, যিনি সত্য বাক্য বলেন, যিনি অনবদ্যাত্মা (যিনি সকল দোষ থেকে নির্মুক্ত), যিনি সুখে-দুঃখে সমবুদ্ধি এবং যিনি যথাশক্তি সকলের উপকার করেন, তিনিই সাধু।' এবং 'সাধু ব্যক্তি অপ্রমত্ত, গম্ভীরাত্মা, ধৈর্যশীল, ষড়্‌রিপু তাঁর বশীভূত অর্থাৎ ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শোক, মোহ, জরা ও মৃত্যু তাঁর বশীভূত। তিনি অমানী অথচ অপরকে সম্মান দান করেন, তিনি সকলের প্রতি মৈত্রীভাবাপন্ন, করুণহৃদয়, দয়ালু ও জ্ঞানবান।'

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলার দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদেও শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রভু সনাতনের নিকট বৈষ্ণবের লক্ষণ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, 'কৃষ্ণভক্তে কৃষ্ণের গুণসকল সঞ্চারে।' সংক্ষেপে বলতে গেলে কৃষ্ণভক্ত হবেন :

কৃপালু, অকৃতদ্রোহ, সত্যসার, সম।
নির্দোষ, বদান্য, মৃদু, শুচি, অকিঞ্চন ॥
সর্বোপকারক, শান্ত, কৃষ্ণৈকশরণ।
অকাম, নিরীহ, স্থির, বিজিতষড়্‌গুণ ॥
মিতভুক্, অপ্রমত্ত, মানদ, অমানী।
গম্ভীর, করুণ, মৈত্র, কবি, দক্ষ, মৌনী ॥

সুতরাং যথার্থ কৃষ্ণভক্ত সংসারে অতিবিরল। যিনি তৃণের চাইতেও সুনীচ ও তরুর চাইতেও সহিষ্ণু হয়ে, স্বয়ং অমানী হয়েও অপরকে মান দান করে শ্রীহরির নাম কীর্তন করেন, তিনিই যথার্থ ভক্ত।

শ্রীমদ্ভাগবতে অবধূতের উপাখ্যানে বলা হয়েছে, যথার্থ সাধু ব্যক্তি মানুষ, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, পর্বত প্রভৃতি সকলেরই শিষ্যত্ব স্বীকার করবেন। তিনি সকল শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাবান হবেন ঃ

অণুভ্যশ্চ মহদ্ভ্যশ্চ শাস্ত্রেভ্যঃ কুশলো নরঃ।
সর্বতঃ সারমাদদ্যাৎ পুষ্পেভ্য ইব ষট্‌পদঃ॥

'মধুকর যেমন সকল পুষ্প থেকে সার গ্রহণ করে, তেমনি শাস্ত্রকুশল ব্যক্তি ক্ষুদ্র ও মহৎ সকল শাস্ত্র থেকে সার গ্রহণ করবেন।' এই অবধূতেব চব্বিশজন গুরু ছিলেন। অবধূতের কাহিনী পড়তে পড়তে আমাদের বাউলের গান মনে পড়ে যায়। গানটি হচ্ছে ঃ

গুরু বলে কারে প্রণাম করবি মন।
ও তোর অথিক গুরু পথিক গুরু
ও তোর গুরু সর্বজন,
ও তোর গুরু অগণন।
গুরু রে তোর বরণ-ডালা,
গুরু রে তোর মরণ-জ্বালা,
গুরু রে তোব হিয়ার ব্যথা
ও যে ঝরায় দু' নয়ন।

শ্রীভগবান অর্জুনের মত উদ্ধবেরও সকল সমস্যার সমাধান করেছেন এবং তাঁকে পরা শান্তিলাভের উপায় নির্দেশ করেছেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবান যে ভাগবত ধর্মের উপদেশ দিয়েছেন, তাঁর প্রধান কথাই রসস্বরূপ ভগবানের উপাসনা। এই উপাসনার দ্বারা মানুষ ত্রিগুণাতীত হতে পারে, প্রকৃতির বন্ধনকে অতিক্রম করতে পারে। ব্রহ্ম সম্পর্কে উপনিষদে বলা হয়েছে, 'তাঁকে না পেয়ে বাক্য মনের সঙ্গে ফিরে আসে ; চক্ষু, বাক্য বা মন সেখানে গমন করে না।' অন্যত্র বলা হয়েছে, 'তাঁব হস্ত নেই, তবু তিনি গ্রহণ করেন; চরণ নেই, তবু তিনি গমন করেন, চক্ষু নেই, তবু তিনি দর্শন করেন, 'কর্ণ নেই, তবু তিনি শ্রবণ করেন, তিনিই একমাত্র বেদ্য, অথচ তাঁর বেত্তা কেউ নেই, তিনি মহান পুরুষ বলে কথিত হন।' কিন্তু আবার তৈত্তিরীয় উপনিষদে (২।৭ শ্লোকে) বলা হয়েছে, ব্রহ্ম রসস্বরূপ। 'রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বা আনন্দী ভবতি'॥

বৃহদারণ্যক উপনিষদে (১।৪।৮ মন্ত্র) বলা হয়েছে—'তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্বস্মাৎ অন্তরতরং যদয়মাত্মা॥'

এই পরমাত্মা সর্বাপেক্ষা অন্তরতম। পুত্রের চাইতে প্রিয় ইনি, বিত্তের চাইতে প্রিয় ইনি, অন্যান্য সকল বস্তু অপেক্ষা প্রিয় ইনি ঃ

আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত।
স য আত্মানমেব প্রিয়মুপাস্তে।
ন হাস্য প্রিয়ং প্রমায়ুকং ভবতি॥ বৃহদারণ্যক, ১।৪।৮

পরমাত্মাকেই প্রিয়রূপে উপাসনা করবে। যিনি তাঁকে প্রিয় বলে উপাসনা করেন, তাঁর প্রিয় কখনো বিনষ্ট হয় না।

ঐ উপনিষদে আবার বলা হয়েছে, 'ইনিই আত্মার পরম গতি। ইনিই আত্মার পরম সম্পদ, ইনিই আত্মার পরম লোক, ইনি আত্মার পরম আনন্দ। এই আনন্দ-স্বরূপ পরমেশ্বরের কণামাত্র আনন্দ সমুদয় জীব উপভোগ করছে।'

রসস্বরূপ শ্রীভগবানের উপাসনা শুধু ভারতবর্ষে নয়, ভারতের বাইরে পারস্যের সূফী সাধকদের মধ্যে এবং খ্রীস্টীয় অলোকপন্থী বা 'মিস্টিক' সাধকদের মধ্যে প্রচলিত আছে। কিন্তু ভারতবর্ষে এই অপ্রাকৃত রসের সাধনা বা প্রেমের সাধনা অবলম্বন করে যে রসশাস্ত্র[১] রচিত হয়েছে, পৃথিবীর কোথাও তার তুলনা মেলেনি। এই ভক্তি-যোগ বা প্রেমধর্মকে আশ্রয় করেই সাধক দিব্য রূপান্তর লাভ করেন। শ্রীমদ্ভাগবতে ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বলা হয়েছে, যিনি ভাগবত ধর্মে দীক্ষিত, তাঁর চক্ষু শুধু শ্রীকৃষ্ণের রূপদর্শন করে, তাঁর কর্ণ শুধু তাঁর গুণগানই শ্রবণ করে, তাঁর নাসিকা তাঁর চরণ-কমলের সৌরভ আঘ্রাণ করে, তাঁর জিহ্বা তাঁরই গুণ বর্ণন করে, তাঁর ত্বক তাঁরই অঙ্গের স্পর্শ অনুভব করে। এটাই হচ্ছে 'হৃষীকেশ-সেবনং', এরই নামান্তর ভক্তি। এই ভক্তিযোগ কার পক্ষে সিদ্ধিপ্রদ, সে সম্পর্কে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলছেন: 'যিনি আমার কথা ও কীর্তনাদিতে জাতশ্রদ্ধ, সংসারের প্রতি যিনি একান্ত উদাসীন বা অতিমাত্রায় আসক্ত নন, ভক্তিযোগ তাঁর পক্ষেই সিদ্ধপ্রদ হয়ে থাকে।'[২] উক্তিটি যে মনস্তত্ত্ব-সম্মত, একটু চিন্তা করলেই তা বোঝা যায়।

রসিক ভক্তগণ ভক্তিকে দুশ্রেণীতে ভাগ করেছেন—বৈধী ও রাগানুগা। যাঁর অন্তরে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুরাগ নেই, অথচ যিনি শাস্ত্রের বিধি অনুসারে শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করেন, তাঁর অন্তরে ধীরে ধীরে ভক্তির সঞ্চার হয়। এরূপ ভক্তির নাম বৈধী ভক্তি। অভীষ্ট বস্তুতে গভীর তৃষ্ণা ও পরম আবিষ্টতার নাম রাগ, আর যে ভক্তিতে এই রাগেরই প্রাবল্য, তাকে বলে রাগাত্মিকা ভক্তি, যেমন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রজবাসী জনের অনুরাগ, আর যাঁরা এই ব্রজবাসিগণের (যেমন বৃন্দাবনের গোপিকা-গণের) অনুগত হয়ে শ্রীভগবানের ভজনা করেন, তাঁদের ভক্তি রাগানুগা। শ্রীমদ্ভাগবতে বৈধী ভক্তির কথা আছে, রাগানুগা ও রাগাত্মিকা ভক্তির কথাও আছে; হৈতুকী ভক্তির কথা আছে, আবার অহৈতুকী ভক্তির কথাও আছে। আবার অখিল রসামৃত-সিন্ধু শ্রীভগবানের প্রতি পঞ্চ প্রকার রতিভেদে পঞ্চ রসের সাধনার কথাও আছে। মহাবীর দাস্যভাব আশ্রয় করে, শ্রীদাম-সুদামাদি সখ্যভাব অবলম্বন করে, নন্দ-যশোদা বাৎসল্যভাব আশ্রয় করে এবং বৃন্দাবনের গোপীকাগণ মধুরভাব অবলম্বন করে শ্রীভগবানের ভজনা করেছেন। গীতায় শ্রীভগবান বলেছেন, 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।' 'যে যৈছে ভজে কৃষ্ণ তারে ভজে তৈছে।'[৩] ভাগবত ধর্মের সিদ্ধান্ত হচ্ছে—পূর্ব পূর্ব রসের গুণ পরবর্তী রসে বর্তমান, তাই 'গুণাধিক্যে স্বাদাধিক্য বাড়ে প্রতি রসে।' শান্তরসের গুণ শ্রীভগবানে নিষ্ঠা; দাস্যরসের গুণ শ্রীভগবানে নিষ্ঠা ও সেবা; সখ্যরসের গুণ কৃষ্ণনিষ্ঠা, কৃষ্ণসেবা ও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আত্মবৎ ব্যবহার; বাৎসল্য-রসের গুণ কৃষ্ণনিষ্ঠা, কৃষ্ণসেবা, কৃষ্ণের প্রতি আত্মবৎ ব্যবহার ও মমতাধিক্য; আর মধুর-রসের গুণ কৃষ্ণনিষ্ঠা, কৃষ্ণসেবা, কৃষ্ণের

---

১ শ্রীরূপ গোস্বামি প্রণীত 'উজ্জ্বল নীলমণি' প্রভৃতি পুস্তক।

২ ভাগবত, ১১।২০।৮ শ্লোক।

৩ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, অষ্টম পরিচ্ছেদ।

প্রতি অসংকোচ ভাব, মমতাধিক্য, কৃষ্ণে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ ও নিজ অঙ্গের দ্বারা তাঁর সেবন। এই মধুর রসের সাধনার চরম উৎকর্ষ রাসলীলায়। বিষ্ণুপুরাণ, হরিবংশ ও শ্রীমদ্‌ভাগবতে এই অপ্রাকৃত রাসলীলার বর্ণনা আছে, অবশ্য হরিবংশে 'রাস' কথাটির পরিবর্তে 'হল্লীসক্রীড়নম্‌' কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে। তবে বঙ্কিমচন্দ্র হেমচন্দ্রের অভিধান ও বাচস্পত্যে তারানাথের উক্তি উদ্ধৃত করে দেখিয়েছেন যে 'হল্লীস' ও 'রাস' সমার্থক শব্দ। রাস যে স্ত্রী এবং পুরুষের মণ্ডালাকার নৃত্যবিশেষ, 'রাস' কথাটির সংজ্ঞায় সে কথা বলা হয়েছে। যথা—'অন্যোন্যব্যতিষক্ত হস্তানাং স্ত্রীপুংসাং গায়তাং মণ্ডলীরূপেণ ভ্রমতাং নৃত্যবিনোদঃ রাসো নাম।'[১] বিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবতে এই রাসলীলার যে বর্ণনা আছে, তা শুধু কবিত্ব-সম্পদেই অতুলনীয় নয়, তা ভাগবতগণের নিত্যকালের আস্বাদনের বস্তু। বিশেষত, শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের পাঁচটি অধ্যায়ে (ঊনত্রিশ থেকে তেত্রিশ) রাসলীলার যে বর্ণনা আছে, তা চিরদিন ভক্তগণের আদরণীয়। তবে একথাও স্মরণ রাখতে হবে যে ব্রজগোপীগণের প্রেম অপ্রাকৃত, তাদের আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-বাঞ্ছা ছিল না। রাস-পঞ্চাধ্যায়ের প্রথম শ্লোকটি এই ঃ

ভগবানপি তা রাত্রীঃ শারদোৎফুল্লমল্লিকাঃ।
বীক্ষ্য রন্তুঃ মনশ্চক্রে যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ ॥

শ্রীভগবান দেখলেন, সেই শারদ পূর্ণিমা রজনীতে মল্লিকা-কুসুম বিকশিত হয়েছে, তাই তিনি যোগমায়াকে আশ্রয় করে ব্রজগোপীদের সঙ্গে ক্রীড়া করতে অভিলাষী হলেন।

শ্লোকটির তাৎপর্য অতি গভীর, আর এই তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম না করলে রাস-লীলার মর্মে অনুপ্রবিষ্ট হওয়া যায় না। তন্ত্রাচার্য শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব ও দার্শনিক-প্রবর হীরেন্দ্রনাথ দত্ত উভয়েই 'রাসলীলা' নামক গ্রন্থে রাসলীলার গভীর তাৎপর্য সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তবে বিদ্যার্ণব মহাশয়ের গ্রন্থখানি এখন দুষ্প্রাপ্য। হীরেন্দ্রনাথ রাসলীলার রূপক ব্যাখ্যা করেছেন, তিনি এই রাসলীলার ভেতর দেখেছেন—yearning of the individual souls after the Infinite. কিন্তু যে মহাভাবময়ী রাধা নায়িকা-শিরোমণি, যিনি কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্যময়ী, গোপিকাগণের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠা, যাঁর অপ্রাকৃত প্রেমলীলা অবলম্বন করেই জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতি পদকর্তাগণ অজস্র মধুর-কোমল-কান্ত পদাবলী রচনা করেছেন, গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের মতে যাঁর ভাব-কান্তি অবলম্বন করেই স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তাঁর নামের স্পষ্ট উল্লেখ কোথাও শ্রীমদ্‌ভাগবতে নেই। অবশ্য, রসিক ভক্তজনের সিদ্ধান্ত এই যে, ভাগবতে ইঙ্গিতে এমন একজন গোপিকার কথা বলা হয়েছে, যিনি গুণসমূহের দ্বারা গোপিকাগণের মধ্যে বরিষ্ঠা। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন গোপিকাগণের সংগে নৃত্য করতে করতে রাসমণ্ডল থেকে অন্তর্হিত হন, তখন ব্রজসুন্দরীগণ একজন সৌভাগ্যবতী নারীর পদচিহ্ন আবিষ্কার করে বলেন ঃ

অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্‌ হরিরীশ্বরঃ।
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ ॥ ১০।৩০।২৮

এঁর দ্বারাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চিতরূপে আরাধিত হয়েছেন, যেহেতু শ্রীগোবিন্দ প্রীত হয়ে আমাদিগকে ত্যাগ করে এঁকে নির্জনে নিয়ে এসেছেন। মনে রাখতে হবে, যিনি শ্রীকৃষ্ণের আরাধিকা, তিনিই রাধিকা।

১ বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণচরিত্র', দ্বিতীয় খণ্ড, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও নবম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য

শ্রীকৃষ্ণের বিরহে গোপীগণের যে মর্মস্পর্শী বিলাপ আমরা শ্রীমদ্‌ভাগবতে দেখতে পাই, কাব্যাংশে তা অনবদ্য। বৃন্দাবনের তরুলতাগণকে সম্বোধন করে গোপিকাগণ বলেছিলেন, 'যাঁর স্নিগ্ধ হাসিতে মানিনীর মানভঙ্গ হয়, তেমনি স্মিত হাস্য করে নন্দ-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ কোথায় গেছেন, তোমরা দেখেছ কি? তোমরা তো অপরের উপকারের জন্যেই জন্মগ্রহণ করেছ, তোমরা এই দুঃখিনীদের প্রাণ রক্ষা কর।' যা হোক, ব্রজগোপীগণ জ্যোৎস্নাময়ী শারদ নিশিতে শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শ্রবণ করে তাঁর সঙ্গে মিলিত হবার জন্যে ব্যাকুল হলেন। পতিগণ, পিতৃগণ ও ভ্রাতৃগণের দ্বারা নিবারিত হয়েও তাঁরা কৃষ্ণদর্শনে ধাবিত হলেন। শ্রীভগবানের সান্নিধ্যলাভের জন্যে তাঁরা সংসারের আকর্ষণ ছিন্ন করে গৃহত্যাগিনী হলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের প্রেমের নিষ্ঠা পরীক্ষা করার জন্যে তাদের গৃহে প্রত্যাগমন করে পতিসেবা, সন্তান-পালন ও অন্যান্য গৃহকর্ম সম্পাদনের নির্দেশ দিলেন। কিন্তু গোপিকাগণ শ্রীকৃষ্ণের জন্যেই সর্বত্যাগিনী হয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের বচন শুনে তাঁরা রোদন করতে আরম্ভ করলেন। ভগবানের বংশীধ্বনি যাঁদের কানের ভেতর দিয়ে মরমে প্রবেশ করেছে, তাঁরা কেমন করে গৃহে ফিরে যাবেন? তখন গোপীগণের অকপট প্রেমের পরিচয় পেয়ে শ্রীভগবান তাঁদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করলেন।

শ্রীমদ্‌ভাগবতে ব্রাহ্মণ-কন্যাগণেরও উপাখ্যান আছে। এই ব্রাহ্মণ-কন্যাগণ শ্রীকৃষ্ণের গোচারণের সময় ক্ষুধার্ত গোপালগণকে আহার্য প্রদান করেছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুরাগিণী হয়ে কৃষ্ণদর্শনে গিয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাদেরও গৃহে প্রত্যাগমন করার আদেশ দিয়েছিলেন। তাঁরা বৃন্দাবনের গোপিকাগণের মত শ্রীভগবানে সর্বস্ব অর্পণ করতে পারেননি, তাঁদের ভেতর 'আত্মেন্দ্রিয়-বাঞ্ছা' ছিল। তাই ভাগবতকার বলেছেন, শ্রীকৃষ্ণের বাক্য শ্রবণ করে তাঁরা গৃহে ফিরে গিয়েছিলেন। ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক গোপীদের যে বস্ত্রহরণ-লীলা বর্ণিত হয়েছে, তারও মূল তাৎপর্য হচ্ছে—শ্রীভগবানে সর্বস্ব অর্পণ না করলে কেউ দুর্লভ কৃষ্ণপ্রেমের অধিকারিণী হতে পারে না। মনস্বী বঙ্কিমচন্দ্রও এ-কথা স্বীকার করেছেন। তাই বস্ত্রহরণ-লীলা উপলক্ষে তিনি ভগবদ্‌গীতার একটি শ্লোক (৯।২৭) উদ্ধৃত করে বলেছেন, 'হে অর্জুন, তুমি যে কোন কর্ম কর, যা কিছু ভোজন কর, যে কোন হোমক্রিয়া কর, যা কিছু দান কর, যে তপস্যা কর, সকলই আমাতে অর্পণ করবে।' গীতায় শ্রীভগবান বলেছেন:

> চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জুন।
> আর্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ॥ ৭।১৬

'হে ভরতর্ষভ, আর্ত অর্থাৎ রোগে-শোকে ক্লিষ্ট, জিজ্ঞাসু অর্থাৎ জ্ঞানলাভে ইচ্ছুক, অর্থার্থী বা ইহ-পরলোকের সুখাকাঙ্ক্ষী ও জ্ঞানী—এই চার প্রকার ব্যক্তি আমার ভজনা করে।' এঁদের ভেতর আর্ত ও অর্থার্থী হচ্ছে সকাম ভক্ত। যাঁরা স্বর্গকামনা, মোক্ষকামনা বা যোগ-সিদ্ধির জন্যে শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করেন, তাঁরাও সকাম ভক্তের মধ্যে পরিগণিত। এঁদের ভক্তিকে হৈতুকী ভক্তি বলা যায়। কিন্তু যাঁরা বিষয়-কামনা করে শ্রীভগবানের ভজনা করেন, তাঁরাও যদি একবার তাঁর নামের মাধুর্য আস্বাদন করেন, তাহলে শ্রীভগবানের নামে তাঁদের রুচি জন্মে এবং তাঁদের রতি গাঢ় হয়ে ধীরে ধীরে প্রেমে পরিণত হয়। তাই আমরা দেখেছি, ধ্রুব রাজ্য কামনা করেই তপস্যা আরম্ভ করেছিলেন, কিন্তু শ্রীভগবান যখন তাঁর সম্মুখে

আবিভূ'ত হয়ে তাঁকে বলেছিলেন, 'বৎস, বর লও', তখন ধ্রুব বললেন, 'তোমায় পেয়ে আমি কৃতার্থ হয়েছি। আমার বরের প্রয়োজন নেই।'

এই অন্যাভিলাষশূন্য ভক্তিই জীবের পঞ্চম পুরুষার্থ। এর নিকট ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ সকলই তুচ্ছ। শ্রীমদ্ভাগবতে এই জন্যেই শৌনকাদি ঋষিগণের প্রতি সূত বলছেন,. যাঁরা কামগ্রন্থিহীন হয়েও আত্মজ্ঞানসম্পন্ন, এরূপ মুনিগণও অজিত শ্রীকৃষ্ণে নিষ্কাম বা অহৈতুকী ভক্তি করে থাকেন, শ্রীহরির গুণরাশি এমনই সর্বচিত্তাকর্ষক।

শ্রীমদ্ভাগবতে নববিধা ভক্তির লক্ষণও বলা হয়েছে। শ্রীভগবানের চরিত-কথা ও গুণানুবাদ শ্রবণ, তাঁর নাম-সংকীর্তন, তাঁকে স্মরণ, তাঁর পাদসেবন, তাঁকে অর্চন ও বন্দনা, তাঁকে প্রভু জেনে নিজেকে দাসজ্ঞান, সর্বাবস্থায় তিনিই একমাত্র বন্ধু, এরূপ বিশ্বাস ও তাঁতে আত্মসমর্পণ —এই নয়টি হচ্ছে ভগবদুপাসনার অংগ।

ভাগবতে আরও বলা হয়েছে, ঈশ্বর মনুষ্যাদিগকে প্রার্থিত বিষয় দান করেন, এ কথা সত্যি, কিন্তু ভক্তগণকে তিনি সামান্য বিষয় দান করেন না; কারণ, সামান্য বিষয় পেলে মানুষের প্রার্থনার নিবৃত্তি হয় না। যাঁরা কামনারহিত হয়ে তাঁকে ভজনা করেন তাঁদের তিনি নিজের পাদ-পল্লব দান করে থাকেন। এই পাদ-পল্লব লাভ করলে তাঁদের সমুদয় ইচ্ছার নিবৃত্তি ঘটে।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (মধ্যলীলা), ২২শ পরিচ্ছেদে বলা হয়েছেঃ

> অন্যকামী যদি করে কৃষ্ণের ভজন।
> না মাগিতেও কৃষ্ণ তারে দেন স্বচরণ ॥
> কৃষ্ণ কহে, আমা ভজে মাগে বিষয়-সুখ।
> অমৃত ছাড়ি' বিষ মাগে এই বড় মূর্খ ॥
> আমি বিজ্ঞ, এই মূর্খে বিষয় কেনে দিব।
> স্বচরণামৃত দিয়া বিষয় ভুলাইব ॥

আমরা বলেছি, অনন্যা বা অব্যভিচারিণী ভক্তিযোগে শ্রীভগবানের আরাধনা করাই ভাগবত ধর্ম। এই ভাগবত ধর্মে বিদ্যা, বয়স, ধনসম্পদ, জাতি, কুল প্রভৃতির বিচার নেই। ভাগবতে (৭।৯।১০ শ্লোকে) বলা হয়েছে— দ্বাদশগুণবিশিষ্ট (সত্য, ধর্ম ইত্যাদি) ব্রাহ্মণ যদি পদ্মনাভ শ্রীকৃষ্ণের পাদারবিন্দ থেকে বিমুখ হয়, তবে তার চাইতে যে চণ্ডাল শ্রীকৃষ্ণে মন, বাক্য, চেষ্টা, অর্থ ও প্রাণ সমর্পণ করেছেন, সেই চণ্ডালই শ্রেষ্ঠ। সেই চণ্ডালই কুলকে পবিত্র করে, অতিসম্মানিত ব্রাহ্মণ নয়।

ভাগবত বলেন, শ্রীকৃষ্ণ অখিল আত্মার আত্মা হয়েও, পরমপুরুষ হয়েও যোগমায়া আশ্রয় করে নরবপু ধারণ করেন। ভাগবতে যুগধর্মের কথা এবং কলি-যুগের একটি মহান গুণের কথাও বলা হয়েছে। ভাগবত বলছেন, সত্যযুগে বিষ্ণুকে ধ্যান করে, ত্রেতায় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে এবং দ্বাপরযুগে পরিচর্যা করে যে ফল লাভ করা যায়, কলিযুগে একমাত্র হরি-কীর্তন করেই সেই ফল পাওয়া যায়। এটাই সর্ব দোষের আকর কলিযুগের একটি মহৎ গুণ।

আমরা বলেছি, গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের সিদ্ধান্ত অনুসারে শ্রীমদ্ভাগবতই ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্তসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য। এ-বিষয়ে হরিভক্তিবিলাসে গরুড়পুরাণের বচন উদ্ধৃত হয়েছে। গরুড়পুরাণে বলা হয়েছে, এই শ্রীমদ্ভাগবত বেদান্তসূত্র বা

ব্রহ্মসূত্রের অর্থস্বরূপ। ইহার দ্বারা মহাভারতের মর্ম নির্ণয় করা যায়। ইহা গায়ত্রীর ভাষ্যস্বরূপ। বেদার্থের ব্যাখ্যানের দ্বারা ইহা পরিপুষ্ট। পুরাণ-সমূহের মধ্যে ইহা সামবেদস্বরূপ। সাক্ষাৎ ভগবান কর্তৃক ইহা কথিত হয়েছে। এতে দ্বাদশ স্কন্ধ, তিনশ পঁয়ষট্টি অধ্যায় ও আঠার হাজার শ্লোক আছে।

শ্রীমন্মহাপ্রভুও বলেছেন, ভাগবতেই ব্রহ্মসূত্রের যথার্থ তাৎপর্য বিবৃত হয়েছে। মায়াবাদী আচার্য শংকর ব্রহ্মসূত্রের মুখ্য অর্থ আচ্ছাদন করে গৌণ অর্থ প্রকাশ করেছেন।[১] আচার্য শংকরের মতে বেদান্তসূত্রের প্রতিপাদ্য হচ্ছেঃ (১) ব্রহ্মই একমাত্র সত্য বস্তু, (২) নামরূপাত্মক জগৎ মিথ্যা বা মায়াকল্পিত এবং (৩) জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন। ব্রহ্ম শুধু নিরাকার নন, তিনি নির্গুণ বা গুণাতীত, অবাঙ্-মনসোঽগোচরঃ। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলেন, শ্রুতি যেখানে ব্রহ্মকে নিরাকার বলেছেন, সেখানে শুধু তাঁর প্রাকৃত দেহকেই অস্বীকার করা হয়েছে। ব্রহ্ম বা ভগবানের দেহ অপ্রাকৃত, চিদানন্দময়, তাঁর মধ্যে সকল বিরুদ্ধ গুণ অবিরোধে মিলিত হয়েছে। আবার জীব ও ব্রহ্ম সম্পূর্ণ ভিন্ন নয়, সম্পূর্ণ অভিন্নও নয়; কারণ, জীব হচ্ছে অণুচৈতন্য, আর ব্রহ্ম হচ্ছেন বিভুচৈতন্য।—'জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস'। বহির্মুখ মানুষ অনাদি কাল থেকে শ্রীকৃষ্ণকে বিস্মৃত হয়ে রয়েছে বলেই মায়া বা দেহাত্মবুদ্ধি তাদের ত্রিতাপ-জ্বালায় জর্জরিত করছে। মানুষের পক্ষে শ্রেয়ের পথ হচ্ছে কর্ম, জ্ঞান ও যোগের পথ পরিত্যাগ করে অনন্যা ভক্তি আশ্রয় করে শ্রীভগবানের ভজনা করা। শ্রীমন্মহাপ্রভুর মতে ইহাই ভাগবতের নির্গলিতার্থ।

বাংলা সাহিত্য ও বাঙ্গালীর জীবনের ওপর ভাগবতের প্রভাব অল্প নয়। ভাগবতের ওপর নূতন আলোক সম্পাত করেছে মহাপ্রভুর দিব্য জীবন। অবশ্য মধ্যযুগেও বাংলাদেশে রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণসমূহের পঠন-পাঠনের প্রচলন ছিল এবং এইসকল গ্রন্থের ভেতর দিয়েই বাংলার জনসাধারণ জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে সনাতন ভারতের ধ্যান-ধারণা ও ভাবাদর্শের সংগে পরিচিত হতেন। প্রস্থানত্রয়ী অর্থাৎ উপনিষদ, গীতা ও বেদান্ত ছিল পণ্ডিতগণের আলোচনার বিষয়, কিন্তু লোকশিক্ষার বিকিরণ ঘটেছিল রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণাদির কথকতার ভেতর দিয়ে। স্বয়ং মহাপ্রভু একজন পরম ভাগবত পণ্ডিতের ভাগবত-ব্যাখ্যান শুনে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে 'ভাগবতাচার্য' উপাধি প্রদান করেছিলেন। ভক্ত-প্রবর মালাধর বসু ভাগবত অবলম্বনেই 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্য রচনা করেছিলেন। এই কাব্যের প্রারম্ভে তিনি লিখেছেন—'নন্দ-নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ।' (পাঠান্তরে —বসুদেব-সুত কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ)। মালাধর বসুর এই উক্তি শ্রীমন্মহাপ্রভুকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করেছিল। তাই তিনি 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্যের রচয়িতার এবং তাঁর জন্মভূমি 'কুলীনগ্রামের' উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। একটি কথা এখানে উল্লেখযোগ্য। মালাধর বসু লোকশিক্ষার জন্যেই গ্রন্থ রচনা করেছিলেন এবং লোক-কল্যাণের দিকে তাঁর তীক্ষ্ণ ও সজাগ দৃষ্টি ছিল। তাই তিনি বলেছেন, কোন প্রাকৃত জন যেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা বা রাসলীলার অনুসরণ করে সমাজ-বিরুদ্ধ কর্মে প্রবৃত্ত না হয়, তা হলে তাকে নিরয়গামী হতে হবে। স্বামী বিবেকানন্দও বলেছেন, যাদের অন্তঃকরণ সম্পূর্ণ নিষ্কাম হয়নি, গোপী-প্রেমের

১ উপনিষদ সহিত সূত্র কহে যেই তত্ত্ব।
মুখ্যাবৃত্তে সেই অর্থ পরম মহত্ত্ব।
গৌণাবৃত্তে যে ব্যাখ্যা করিলা আচার্য।

নিগূঢ় তাৎপর্য তারা উপলব্ধি করতে পারবে না, তাই শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা আলোচনায় তাদের কোন অধিকার নেই। শ্রীমন্মহাপ্রভুর জীবনেও আমরা দেখি ঃ

বহিরঙ্গ লৈয়া করে নাম-সংকীর্তন।
অন্তরঙ্গ লৈয়া করে রস-আস্বাদন॥

তবে এ কথাও সত্যি যে শ্রীভগবানের ভজনা এবং তাঁর নাম-কীর্তনের মধ্য দিয়ে আমাদের অন্তঃকরণ যখন শুদ্ধ হয়, তখন তাঁর মাধুর্যলীলা আস্বাদনে আমাদের অধিকার জন্মে। বাস্তবিক শ্রীভগবানের কথামৃত পাপনাশক ও শ্রবণ-মঙ্গল, তাই উত্তম পুরুষের গুণানুবাদ যারা করেন, তাঁরা ভূরিদাতা। শ্রীমদ্ভাগবতে (১।১।৩) সত্যই বলা হয়েছে, 'হে রসিক ও ভাবুকগণ, শুকমুখ থেকে পৃথিবীতে পতিত, অমৃতরসপূর্ণ, বেদরূপ কল্পতরুর রসস্বরূপ ফল এই শ্রীমদ্ভাগবত আপনারা মোক্ষ বা কল্পান্ত পর্যন্ত পান করতে থাকুন।' আবার, ঐ অধ্যায়ের উনিশ শ্লোকে বলা হয়েছে, 'আমরা শৌনকাদি মুনিগণ তো শ্রীকৃষ্ণের চরিত-শ্রবণে তৃপ্তিলাভ করি না। শ্রবণকারী রসিকজনের নিকট কৃষ্ণের এই চরিত-কথা প্রতি পদেই স্বাদু থেকে স্বাদুতর হয়ে ওঠে।'

বাস্তবিক, ভাগবত আমাদের নিত্য আস্বাদনের বস্তু। ভাগবত অত্যন্ত বিষয়াসক্ত ও কঠিনচিত্ত লোকের হৃদয়কেও পবিত্র ও প্রেমে আর্দ্র করে। ভাগবতেই বলা হয়েছে ঃ 'শ্রীভগবানের পাদসলিল যেমন ত্রিধারায় প্রবাহিত হয়ে ত্রিভুবনকে অর্থাৎ স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতালকে পবিত্র করে, তেমনি ভগবান বাসুদেবের কথা-প্রসংগ তিন পুরুষকে পবিত্র করে। এই তিন পুরুষ কারা? যাঁরা সে বিষয়ে বলেন, যাঁরা সে বিষয়ে প্রশ্ন করেন এবং যাঁরা তা শ্রবণ করেন।'

শ্রীত্রিপুরাশংকর সেনশাস্ত্রী

ঋণ স্বীকার

১. শ্রীমদ্ভাগবত-মহাপুরাণম্—গীতা প্রেস, গোরখপুর

২. শ্রীমদ্ভাগবত — আর্যশাস্ত্র সম্পাদিত

৩. ঐ —শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ

৪. ঐ - তারাকান্ত ভট্টাচার্য

৫. ঐ (গৌড়ীয় ভাষ্যসহ)—শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী

৬. শ্রীমদ্ভাগবত (সংক্ষিপ্তসার)—গুণদাচরণ সেন

৭. ঐ (দশম স্কন্ধ) - মহানামব্রত ব্রহ্মচারী

৮. শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত— কৃষ্ণদাস কবিরাজ

৯. উজ্জ্বল নীলমণি —শ্রীরূপ গোস্বামী

১০. উপনিষদ (অখণ্ড)—অতুলচন্দ্র সেন, সীতানাথ তত্ত্বভূষণ ও মহেশচন্দ্র ঘোষ

১১. ভগবদ্গীতা—অতুলচন্দ্র সেন

১২. শতাব্দীর সাধনা—অতুলচন্দ্র সেন

১৩. রামায়ণ—রাজশেখর বসু

১৪. মহাভারত—ঐ

১৫. ঋগ্বেদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

১৬. বাইবেল—কলিন্স

১৭. ধম্মপদ—মিহির গুপ্ত ও [illegible]ণব্রত সেন

১৮. ধর্মশাস্ত্র সমন্বয়—ভাই মহিমচন্দ্র সেন

শ্রীমদ্‌ভাগবত

প্রথম খণ্ড

প্রথম স্কন্ধ

প্রথম অধ্যায়

সূতের নিকট শৌনক প্রমুখ মুনিদের প্রশ্ন

যাঁর থেকে বিশ্বের সৃষ্টি, যাঁতে বিশ্বের স্থিতি ও লয়, যাঁর সঙ্গে সবকিছুই অন্বয়-ব্যতিরেক[১] সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট, যিনি সকল জ্ঞানে পরিপূর্ণ ও স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানবান[২], যে বেদ-বিষয়ে পণ্ডিতেরাও বিভ্রান্ত সেই বেদজ্ঞান যিনি আদি কবি ব্রহ্মার মানসপটে উদ্ভাসিত করেছিলেন, অগ্নি-জল-মাটিতে যেরূপ বিনিময় (ভ্রম)[৩] জ্ঞান হয় সেরূপ যাঁর মধ্যে সত্ত্ব-রজ-তমোগুণের সৃষ্ট বস্তু সত্যবৎ[৪] প্রতিভাত হয়, আবার যিনি স্বীয় তেজোরাশি দ্বারা সর্বদা মায়াজাল ছিন্ন-ভিন্ন করেন সেই সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরকে আমরা ধ্যান করি। ১

মহামুনি বেদব্যাস-কৃত এই শ্রীমদ্‌ভাগবত গ্রন্থে নিরহংকার সাধুপুরুষদের উপযোগী ফলাকাঙ্ক্ষারহিত পরমধর্মের কথা বলা হয়েছে। এই গ্রন্থের মধ্যেই ত্রিতাপনাশক পরমসুখকর বস্তুর জ্ঞান নিবদ্ধ রয়েছে। প্রশ্ন হতে পারে, অন্য শাস্ত্রের সাহায্যে কি ভগবানকে সদ্য সদ্য হৃদয়মধ্যে ধারণ করতে পারা যায়? অবশ্যই তা নয়। সজ্জন ব্যক্তিরা শ্রীমদ্‌ভাগবতে মনোনিবেশ করলে শ্রীভগবান তাঁদের নিকট সহজেই ধরা দেন। ২

ওগো পৃথিবীর রসিক-ভাবুক মানুষেরা, বেদ যেন এক কল্পতরু; তা থেকে উদ্ভূত এই ভাগবত-ফল শুকদেবের শ্রীমুখে পড়ে অমৃতরসে সিক্ত হয়ে ওঠে। তারপর সেই মুখ থেকে বেরিয়ে আসা এই শ্রীমদ্‌ভাগবত-রস তোমরা ব্রহ্মে লীন না হওয়া পর্যন্ত অবিরাম আস্বাদন কর। ৩

অনেকদিন আগে শৌনক প্রমুখ ঋষিরা স্বর্গলোকে যাওয়ার অভিলাষে বিষ্ণুক্ষেত্র নৈমিষারণ্যে 'সহস্রসমা' নামে এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করছিলেন। সেই সময়ে একদিন মুনিরা যখন সকালবেলার নিত্যনৈমিত্তিক হোমের কাজ সেরে বসে আছেন, তখন রোমহর্ষণের পুত্র সূত সেখানে উপস্থিত হলেন। সকলে তাঁকে পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়ে সৎকার করে বসতে আসন দিলেন। তিনি স্থির হয়ে বসলে মুনিরা সমাদর করে তাঁকে বললেন। ৪-৫

সূত, আপনি নিষ্পাপ। আপনি যে শুধু রাশিরাশি ইতিহাসের সঙ্গে নানা পুরাণ আর ধর্মশাস্ত্র পড়েছেন তাই নয়, সে সব ব্যাখ্যাও করেছেন। সে সব শাস্ত্র বেদজ্ঞ-শ্রেষ্ঠ ভগবান বাদরায়ণ আর অন্য সগুণ নির্গুণ ব্রহ্মজ্ঞরাও জানেন। তাঁদের কৃপায়

---

১ অন্বয় পদ্ধতি—এটি ব্রহ্ম, সুতরাং এটি সৎ, শাশ্বত ও নিত্য।
ব্যতিরেক পদ্ধতি—এটি ব্রহ্ম নয়, সুতরাং অসৎ, অশাশ্বত ও অনিত্য। জগতের সৎ-অসৎ বস্তুরাজি ব্রহ্ম সম্বন্ধেই ধারণা করা হয়ে থাকে।

২ মূলে আছে 'স্বরাট্' অর্থাৎ নিজেই নিজের রাজা, যাঁর কোন প্রভু নেই।

৩ বিনিময়=ভ্রম। তেজে জল ভ্রম, জলে মাটির ভ্রম ইত্যাদি।

৪ চরাচর সৃষ্টি তিন গুণেরই মায়ার খেলা। মায়াময় এই জগৎ সত্যস্বরূপ ব্রহ্মে বিধৃত বলে সত্য বলে ভ্রম হয়।

আপনারও সেই সব শাস্ত্রে সম্যক জ্ঞান হয়েছে। কারণ গুরুরা স্নেহাস্পদ শিষ্যকে গুহ্যতম বিষয়েও শিক্ষা দিয়ে থাকেন। এখন সেই সব শাস্ত্র মন্থন করে আপনি লোকের পক্ষে যা একান্ত শ্রেয়স্কর বলে জেনেছেন তা আমাদের কাছে সবিস্তারে বর্ণনা করুন। আপনি বিশিষ্ট পুরুষ ; আপনি জানেন এই কলিযুগে একে মানুষের আয়ু অল্প, তাতে আবার তারা অলস ও স্বল্পবুদ্ধি। তাদের ভাগ্যও প্রসন্ন নয়, কেননা সর্বদাই তারা রোগ, শোক ইত্যাদি নানা দুঃখ-কষ্টে জর্জরিত। আর শাস্ত্রে এত বেশী অনুষ্ঠেয় কর্মের কথা বলা আছে যে তা শুধু শুনতেও বহু দিন লাগবে। তাই, সুধী, আপনার মনীষা-বলে শাস্ত্রের সার কথা উদ্ধার করে সর্বজীবের মঙ্গলের জন্য ব্যক্ত করুন। ৬-১১

সূত, আপনার মঙ্গল হোক। ভক্তজনের প্রতিপালক ভগবান যে কাজ করার জন্য বসুদেবের পুত্ররূপে দেবকীর গর্ভে জন্ম নিয়েছিলেন তা আপনি নিশ্চয়ই জানেন। আপনার মত প্রিয়জনের মুখে আমরা সেইসব কথা শুনতে অভিলাষী। আপনি দয়া করে তা আনুপূর্বিক বর্ণনা করুন। ১২-১৩

দুস্তর সংসার প্রবাহে পড়ে মানুষ অবসন্নতার চরম মুহূর্তেও তাঁর নাম উচ্চারণ করলেই সংসার থেকে মুক্তি লাভ করে, কারণ ভয়ও তাঁর নাম ভয়ে উচ্চারণ করে। সুরধুনী গঙ্গা বিষ্ণুর চরণ-কমল থেকে বেরিয়েছেন, শান্তচিত্ত মুনিরাও তাঁর চরণাশ্রিত। কিন্তু পার্থক্য এই যে গঙ্গায় স্নান করলে তবেই মানুষ নির্মল হয়, আর ঐ মুনিদের কাছে এলেই লোকে পবিত্র হয়। সুতরাং এই সংসারে এমন কে আছেন যিনি সেই পুণ্যশ্লোক প্রশস্তকীর্তি ভগবানের কলিকলুষ-নাশক যশোগাথা শুনতে চাইবেন না ? সেই ভগবান স্বেচ্ছায় অবতার রূপে এসে যে সব লীলা করে গিয়েছেন নারদাদি ঋষিরা তা কীর্তন করেছেন। আমরা সশ্রদ্ধ চিত্তে সেইসব কাহিনী শুনতে আগ্রহী ; আপনি অনুগ্রহ করে বলতে আরম্ভ করুন। লীলাচ্ছলে ভগবান আপন অভিলাষ অনুযায়ী নিজ মায়ায় যে যে রূপে পৃথিবীতে এসেছিলেন সে সব আমাদের সম্পূর্ণ বলুন। ১৪-১৮

তাঁর লীলাকাহিনী শুনে কিছুতেই আমাদের তৃপ্তি হয় না, কারণ রসজ্ঞ মানুষ যত তাঁর কাহিনী শোনেন ততই তা ক্রমশ মধুরতর হয়ে ওঠে। ভগবান কেশব তাঁর বিশ্বরূপ গোপন করে মানুষের রূপে বলরামের সঙ্গে অলৌকিক লীলা করেছেন। কলিকাল আসন্ন জেনে এই বৈষ্ণবক্ষেত্রে এক দীর্ঘস্থায়ী যজ্ঞের শেষে আমরা সকলে স্থির হয়ে বসেছি। এখনই তো হরিকথা শোনার প্রকৃষ্ট অবসর। ১৯-২১

সত্ত্বগুণনাশী এই ঘোর কলিরূপ মহাসাগর উত্তীর্ণ হওয়ার আশায় যখন আমরা বসে আছি, তখন কর্ণধারের মত আপনার এখানে আসা ঈশ্বর-নির্দিষ্ট বলেই মনে হচ্ছে। তাই সূত, আমাদের প্রশ্ন— ধর্মরক্ষক, ব্রাহ্মণের প্রতিপালক, যোগেশ্বর কৃষ্ণ তো এখন তাঁর নিজ রাজ্যে ফিরে গিয়েছেন। তাহলে এই মুহূর্তে ধর্ম কার শরণাগত হয়েছে ? ২২-২৩

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভগবৎকথা ও ভগবদ্ভক্তির মাহাত্ম্য

ব্যাসদেব বললেন, ঋষিদের এই প্রশ্নে সূত খুব আনন্দ পেলেন। তাঁদের বাক্যকে স্বাগত জানিয়ে তিনি বলতে শুরু করলেন। ১

সূত বললেন, কর্মশূন্য হয়ে শুকদেব সন্ন্যাস নেবার উদ্দেশ্যে সংসার ছেড়ে বেরিয়ে পড়লে পিতা ব্যাসদেব 'হা পুত্র, হা পুত্র' বলে কেঁদে উঠেছিলেন। আর সমস্ত গাছপালা তাঁর বিলাপে সাড়া দিয়েছিল। সবার অন্তরদেবতা সেই মহামুনি শুকদেবকে আমি প্রণাম জানাই। ২

অবিবেকরূপ গাঢ় অন্ধকারময় সংসার-সাগর পার হতে ইচ্ছুক সংসারী জীবদের প্রতি করুণা করে শুকদেব সমস্ত বেদের সারভূত, আত্মজ্ঞানের প্রকাশক অনুপম ভাগবত পুরাণ-কথা ব্যক্ত করেছিলেন। মুনিদের গুরু সেই মহান শুকদেবের শরণ নিই। ৩

নারায়ণ,নরোত্তম, নর, দেবী সরস্বতী এবং মহামতি বেদব্যাসকে প্রণাম জানিয়ে 'জয়' উচ্চারণ করুন। জয় নামে এই গ্রন্থই সংসার-জয়ের সহায়ক হবে। ৪

মুনিগণ, লোকহিতের জন্য আপনারা আমাকে প্রশ্নই করেছেন ; কারণ আপনারা সেই চিত্তের অভিরাম কৃষ্ণকথা শুনতে চেয়েছেন। যা থেকে শ্রীকৃষ্ণে অহেতুক[১] অপ্রতিহত[২] ভক্তি জন্মে তাই হল সংসারী মানুষদের শ্রেষ্ঠ ধর্ম। এই ভক্তি থেকেই চিত্ত প্রসন্ন হয়। ভগবান বাসুদেবে ভক্তি হলে মানুষের অহেতুক জ্ঞান ও বৈরাগ্য খুব শীঘ্রই লাভ হয়। ধর্মাচরণ যত সুষ্ঠুই হোক, কৃষ্ণকথা শুনে যদি মানুষের অন্তরে আনন্দ না আসে তাহলে সেই ধর্মাচরণের পরিশ্রমই সার, প্রকৃত সারবস্তু কিছুই লাভ হয় না। ৫-৮

মোক্ষের জন্য যে ধর্ম আচরণ করা হয় অর্থ তার ফল হতে পারে না ; আর যে অর্থ ধর্মের সঙ্গে নিত্যযুক্ত, তার ফল কাম[৩] কখনই হতে পারে না। ৯

কামের ফল ইন্দ্রিয়সুখও নয়। কারণ, যতদিন জীবনধারণ ততদিনই কাম বা বিষয়ভোগ। জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য তত্ত্বজিজ্ঞাসা, কর্মের দ্বারা বিষয়ভোগাদি যা লাভ হয় তা নয়। তত্ত্ববিদেরা অদ্বৈত জ্ঞানকেই 'তত্ত্ব' বলেন। তাকেই বেদান্তে ব্রহ্ম, যোগশাস্ত্রে পরমাত্মা আর ভক্তিশাস্ত্রে ভগবান বলা হয়। শ্রদ্ধাশীল মুনিরা বেদান্ত থেকে সংগৃহীত জ্ঞান ও বৈরাগ্যযুক্ত ভক্তি দিয়ে আপন আত্মার মধ্যে পরমাত্মাকে, ভগবানকে দেখতে পান। বিপ্রগণ, এইজন্যই বর্ণাশ্রম বিভাগ অনুযায়ী ধর্মের সুষ্ঠু অনুষ্ঠানের ফলই ভগবৎপ্রীতি। ভক্তবল্লভ ভগবানের কথা একাগ্রমনে নিত্য শোনা উচিত, কীর্তন করা উচিত, তাঁর ধ্যান ও পূজা করা উচিত। কারণ, যাঁর ধ্যানরূপ খড়্গ দিয়ে কর্মের অহংকার-গ্রন্থি ছিন্ন করা যায় তাঁর কথা শুনতে কার না অভিরুচি হয়? ১০-১৫

ব্রাহ্মণগণ, পুণ্যতীর্থে বাস করলে মানুষ মহাজনদের সেবা করতে পারে এবং শ্রদ্ধাশীল হয়। শ্রদ্ধার ফলে তত্ত্বকথা শুনবার আগ্রহ জন্মে, আর তা থেকেই বাসুদেবের কাহিনীতে রুচি আসে। যাঁর নাম শুনলে ও বললে সমস্ত অশুভ দূর হয় সেই সজ্জন-বন্ধু হলেন শ্রীকৃষ্ণ। যাঁরা তাঁর কথা শোনেন তাঁদের হৃদয়মন্দিরে অধিষ্ঠিত হয়ে তিনি সমস্ত অমঙ্গল দূর করেন। ১৬-১৭

ভগবানের নিত্যসেবায় যাবতীয় অমঙ্গল ক্ষয় হয়ে এলে উত্তমশ্লোক[৪] ভগবানে নৈষ্ঠিকী[৫] ভক্তি আসে। তখন রজোভাব, তমোভাব এবং ষড়্‌রিপুর আক্রমণে অবিচল থেকে চিত্ত সত্ত্বগুণে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ঈশ্বরলাভের যোগ্য হয়। এইভাবে ভগবানের প্রতি ভক্তিযুক্ত হয়ে মানুষ যখন তাঁকে পাবার যোগ্যতা অর্জন করে তখনই বিষয়-বিরক্ত মানুষের নিকট ভগবত্তত্ত্ব উদ্ভাসিত হয়। নিজের আত্মায় পরমাত্মার

১ নিষ্কাম। ২ অচলা, বিঘ্নবিপত্তিশূন্য। ৩ বিষয়ভোগ।

৪ যাঁর উত্তম কীর্তিপুঞ্জ কাব্যে গীত হবার উপযুক্ত। ৫ অচলা।

জ্ঞান হলে ভক্তের হৃদয়গ্রন্থি[১] এবং সমস্ত সংশয় ছিন্ন হয়ে যায়, কর্মেরও ক্ষয় ঘটে। এই জন্যই মনীষীরা পরম আনন্দের সঙ্গে সর্বদা চিত্তশুদ্ধিকর ভক্তি ভগবান বাসুদেবকে অর্পণ করে থাকেন। ১৮-২২

প্রকৃতির তিনটি গুণ—সত্ত্ব, রজ ও তম। পরমেশ্বর এক হলেও এই তিন গুণের প্রভাবে বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের জন্য ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর রূপ ধারণ করেন। এই তিনের মধ্যে বিশুদ্ধ-সত্ত্বমূর্তি ভগবান বাসুদেবই মানুষের শ্রেয়োবিধান করেন। কাঠ স্থাবর, তার গতি ও প্রকাশ নেই। সুতরাং তার থেকে ধূম উন্নততর, কেননা তার গতি আছে। আবার ধূমের চেয়ে আগুন শ্রেয়, কারণ তার স্থিতি, গতি আর প্রকাশ তিন গুণই রয়েছে। এই ভাবেই তমোগুণের থেকে রজোগুণ বড়, আর রজোগুণের চেয়ে সত্ত্বগুণ বড়। এই সত্ত্বগুণ থেকেই ব্রহ্মলাভ হয়। সেইজন্যই সেকালে মুনিরা বিশুদ্ধ সত্ত্বাত্মক বাক্-মনের অতীত ভগবানকে ভজনা করতেন। এই সংসারে যাঁরা সেই মুনিদের অনুসরণ করেন তাঁরা মোক্ষলাভের যোগ্য। ২৩-২৫

যাঁরা মুমুক্ষু তাঁরা ঘোররূপ লোকপালদের পরিত্যাগ করেন, কিন্তু অনসূয় হয়েই শান্তরূপ নারায়ণের অবতার-রূপগুলির প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করে থাকেন। আর যারা রাজসিক ও তামসিক প্রকৃতি-বিশিষ্ট তারা নিজেদেরই মত প্রকৃতিবিশিষ্ট পিতৃ-ভূত-লোকপালাদিকে শ্রী, ঐশ্বর্য, সন্তান ইত্যাদি আকাঙ্ক্ষা করে ভজনা করে থাকে। ২৬-২৭

সংসারে বেদ, যজ্ঞ, যোগ, ক্রিয়াকাণ্ড, জ্ঞান, তপস্যা, ধর্ম ইত্যাদি যত গতি আছে সবই বাসুদেব-পর অর্থাৎ বাসুদেবকে লাভ করাতেই তাদের সার্থকতা। ২৮-২৯

সেই নির্গুণ বিভু পরমাত্মা নিজের সৎ-অসদ্‌রূপা গুণময়ী মায়ার দ্বারা এই চরাচর বিশ্বকে সৃষ্টি করেন। বিশুদ্ধ চিৎস্বরূপ সেই ভগবান মায়ানির্মিত তিনগুণের আধার প্রকৃতিতে লীন হয়ে আছেন বলে সকলে তাঁকে গুণবিশিষ্ট মনে করেন। ৩০-৩১

নানা রকম কাঠে নানা রকমে দেখা গেলেও আগুন যেমন মূলত একই, তেমনি নানা ভূতে নানা রকম বলে মনে হলেও ঈশ্বর একই। ৩২

নিজগুণে সৃষ্ট চার ভূতকে[২] আশ্রয় করে লীলাময় পরব্রহ্ম পঞ্চতন্মাত্র, মন ও ইন্দ্রিয়ের সহযোগে আপন ইচ্ছায় বিষয়াদি ভোগ করেন। ৩৩

সৃষ্টিকর্তা ভগবানই লীলাচ্ছলে দেব-তির্যক-মানুষ যোনিতে অবতীর্ণ হয়ে সমস্ত লোককে সত্ত্বগুণ দিয়ে প্রতিপালন করেন। ৩৪

তৃতীয় অধ্যায়

শ্রীভগবানের চব্বিশটি অবতারের কাহিনী

সূত বললেন, লোক সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ভগবান প্রথমে মহৎ, অহংকার, পঞ্চতন্মাত্র দিয়ে নির্মিত আর একাদশ ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চমহাভূত—এই ষোড়শকলা বিশিষ্ট (বিরাট) পুরুষরূপ ধারণ করেন। ১

১ অহঙ্কার। তুলনীয়: 'ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ' ইত্যাদি, মুণ্ডক উপনিষৎ, ২।২।৯ শ্লোক। ২ জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ আর উদ্ভিজ্জ।

তিনি যখন মহাসমুদ্রে যোগনিদ্রায় নিদ্রিত ছিলেন তখন তাঁর নাভিকুণ্ড থেকে পদ্মফুল বেরিয়ে আসে, যা থেকে বিশ্বস্রষ্টাদের অধিপতি ব্রহ্মার জন্ম হয়। ২

যাঁর বিভিন্ন অবয়ব-সংস্থান দ্বারা এই জগৎ-প্রপঞ্চের উৎপত্তি[১] হয়েছে আত্যন্তিক সত্ত্বগুণই সেই ভগবানের বিশুদ্ধ প্রকাশ। ৩

জ্ঞানচক্ষু দিয়ে মুনিরা সেই সহস্র[২] পা-উরু-হাত-মুখ বিশিষ্ট, সহস্র মাথা-চোখ-কান-নাক সম্বলিত, সহস্র মুকুট-বস্ত্র-কুণ্ডল শোভিত আদি ও বিরাট পুরুষের রূপ দেখতে পান। ভগবানের এই আদি বিরাট রূপই বিষ্ণুর নানা অবতারের উৎসস্থল,, অক্ষয় কারণ। এই রূপের অংশের অংশ[৩] থেকে দেবতির্যক-নরাদির সৃষ্টি। ৪-৫

ভগবানের প্রথম অবতার হলেন সেই দেবতাত্মা ব্রাহ্মণরূপে যিনি কৌমার নামক সৃষ্টি-প্রক্রিয়া অবলম্বন করে আবির্ভূত হন এবং দুশ্চর, অখণ্ড ব্রহ্মচর্য পালন করেন। দ্বিতীয় অবতার হলেন বরাহ। এই বিশ্বের উৎপত্তির জন্য যজ্ঞেশ্বর ভগবান শূকরের রূপ ধরে ধরণীকে রসাতল থেকে উদ্ধার করেন। তৃতীয় হল ঋষি-সৃষ্টি। দেবর্ষি নারদের রূপ ধরে ভগবান নারায়ণ সেই বৈষ্ণবতন্ত্রের[৪] ব্যাখ্যা করেন যা মানুষকে কর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত করে। চতুর্থ হল ধর্মকলা সৃষ্টি[৫]। এই অবতারে ভগবান নর ও নারায়ণ এই দুই ঋষিরূপে আবির্ভূত হন এবং চিত্তবৃত্তি নিরোধ করে দুশ্চর তপস্যা করেন। পঞ্চম অবতারে সিদ্ধেশ্বর কপিলরূপে আবির্ভূত হয়ে আসুরি নামক ঋষিকে কালগতিতে নষ্টপ্রায় চতুর্বিংশতি তত্ত্ব নির্ণায়ক সাংখ্যদর্শন বলেছিলেন। ষষ্ঠ অবতারে অনসূয়ার প্রার্থনায় তাঁর গর্ভে অত্রিমুনির পুত্র দত্তাত্রেয় রূপে জন্ম নিয়ে তিনি অলর্ক ও প্রহ্লাদাদিকে আত্ম-বিদ্যার উপদেশ দেন। তারপর সপ্তম অবতার। এবার রুচির ঔরসে আকূতির গর্ভে 'যজ্ঞ' নাম নিয়ে তিনি আত্মপ্রকাশ করেন। যাম প্রমুখ দেবতারা তাঁর সন্তান। তখন স্বায়ম্ভুব মনুর[৬] কাল এবং তিনি হলেন ইন্দ্র। অষ্টম অবতারে রাজা নাভির ঔরসে মরুদেবীর গর্ভে ঋষভ নাম নিয়ে ভগবান বিষ্ণু জন্মগ্রহণ করেন। সমস্ত আশ্রমের শ্রেষ্ঠ পরমহংস আশ্রমের তত্ত্ব পণ্ডিতদের কাছে ব্যক্ত করে তিনি বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। ৬-১৩

তারপর, আবার যখন ঋষিরা তাঁকে অনুরোধ করলেন, তিনি নবম অবতার রূপে পরিগ্রহ করলেন। এবার তিনি রাজা। ঋষিরা তাঁকে প্রার্থনা করেছিলেন বলে তাঁর নাম হল পৃথু। ধরণী থেকে তিনি দোহন করার মতই ওষধিসকল আহরণ করেছিলেন। তাঁর থেকেই এই পৃথিবীর নাম। আর পৃথিবী-দোহনের জন্য এই অবতার কমনীয় আখ্যা পেয়েছে। দশম অবতারে তিনি মৎস্যরূপ ধারণ করলেন। চাক্ষুষ-মন্বন্তরে যে বিরাট জলপ্লাবন এল তাতে তিনি পৃথিবীরূপ নৌকাতে স্থাপন করে বৈবস্বত মনুকে রক্ষা করেন। ১৪-১৫

একাদশ অবতারে বিভু কূর্ম-রূপে নিজের পিঠের ওপর মন্দার পর্বতকে ধারণ

---

১ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বিশ্বরূপদর্শন যোগ দ্রষ্টব্য। ২ অসংখ্য অর্থে।

৩ বিরাট পুরুষের অংশ ব্রহ্মা, ব্রহ্মার অংশ হলেন মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, দক্ষ, বশিষ্ঠ, ভৃগু অ ব নারদ। এই দশজন সৃষ্টিকর্তা প্রজাপতি; ব্রহ্মার মানসপুত্র বলে এঁদের খ্যাতি।

৪ পঞ্চরাত্র-আগম। ৫ এই সৃষ্টিতে পবিত্র-রীতির প্রতিষ্ঠা হয়। নারী ধর্মকলা অর্থাৎ ধর্মপত্নীরূপে মর্যাদা পান। ধর্মপত্নীর গর্ভে জাত হয়ে নারায়ণের এই অবতার সুষ্ঠু সমাজ-স্থিতির প্রবর্তন করেন। ৬ প্রথম মনু।

করেন। এই মন্দারকে দিয়ে দেব ও অসুরে মিলে সমুদ্রকে মন্থন করে। সেই সাগর-মন্থন থেকে সুধাভাণ্ড নিয়ে যে বৈদ্যশাস্ত্রগুরু ধন্বন্তরি বেরিয়ে আসেন তিনি হলেন শ্রীভগবানের দ্বাদশাবতার। আর ত্রয়োদশ অবতার হলেন সমুদ্র মন্থন থেকে উৎপন্ন মোহিনী যিনি ললনারূপে অসুরদের মুগ্ধ করে দেবতাদের অমৃত পান করিয়েছিলেন। ১৬-১৭

চতুর্দশে শ্রীভগবান নরসিংহরূপে অবতীর্ণ হয়ে দৈত্যরাজ মহাগর্বী হিরণ্যকশিপুকে বধ করেন। মাদুরশিল্পী যেভাবে গ্রন্থিহীন এরকা তৃণ চিরে ফেলে সেইভাবে শ্রীহরি হিরণ্যকশিপুকে নখ দিয়ে বিদীর্ণ করেন। আর পঞ্চদশ অবতারে বলিকে স্বর্গ থেকে বঞ্চিত করার উদ্দেশে শ্রীভগবান তিন পাদ মাত্র ভূমি চাইবার ছলে যজ্ঞস্থলে যান। যখন তিনি দেখলেন যে রাজারা ব্রাহ্মণদ্বেষী হয়ে উঠেছেন, তখন ষোড়শ অবতারে পরশুরামরূপে ভূতলে অবতীর্ণ হয়ে মহাক্রোধে তিনি একুশবার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করেন। তারপর পরাশরের ঔরসে সত্যবতীর গর্ভে সপ্তদশ অবতারের জন্ম হয়। পৃথিবীর মানুষ তখন মেধাশক্তিতে ক্ষীণ হয়ে এসেছে; তাই তিনি বেদরূপ মহীরুহকে খণ্ড খণ্ড করলেন। [বেদকে চার ভাগে ভাগ করেন বেদব্যাস।] ১৮-২১

তারও পর এলেন রামচন্দ্র, শ্রীভগবানের অষ্টাদশ অবতার। দেবতাদের কার্যসাধনের জন্য এই জন্মে তিনি সেতুবন্ধনাদি নানা বীরত্বের কাজ করেছিলেন। বৃষ্ণিবংশে (যদুবংশ) একোনবিংশ ও বিংশ অবতার ক্রমে শ্রীবলরাম ও শ্রীকৃষ্ণরূপে জন্ম নিয়ে ভগবান পৃথিবীর ভার হরণ করেন। ২২-২৩

তারপর. কলিকালে অসুরদের মোহিত করতে আসবেন বুদ্ধ অবতার। অঞ্জনের পুত্ররূপে তিনি গয়াধামে অবতীর্ণ হবেন। কলিযুগের শেষে রাজারা সবাই প্রায় দস্যু হয়ে উঠলে শ্রীভগবান ব্রাহ্মণ বিষ্ণুযশার ঔরসে কল্কি নামে জন্ম নেবেন। ২৪-২৫

দ্বিজগণ, যেমন অক্ষয় জলাধার থেকে হাজার হাজার ছোট ধারা বেরিয়ে আসে, তেমনি সত্ত্বগুণনিধি হরির থেকে অসংখ্য অবতারই এসেছেন। আপনারা একথা জানবেন যে প্রজাপতিসহ ঋষিরা, মনুগণ, দেবতারা, মনুর মহাশক্তিধর সন্তানেরা, সবাই হরিরই অংশ। এঁরা সকলেই বিরাট্ পুরুষের অংশ[১] কলা[২] প্রভৃতি, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ হলেন স্বয়ং ভগবান। ইনি যুগে যুগে অবতীর্ণ হয়ে দৈত্যপীড়িত সর্বলোককে রক্ষা করেন। ২৬-২৮

যিনি ভগবানের এই গুহ্য জন্মকথা পরম ভক্তিভরে সকাল-সন্ধ্যা কীর্তন করেন তিনি দুঃখবহুল এ-সংসার থেকে পরিত্রাণ লাভ করেন। ২৯

অরূপ[৩], চিদাত্মা[৪] ভগবানের স্থূলরূপ তাঁর নিজের মায়াগুণেই মহৎ প্রভৃতি উপাদানের দ্বারা সৃষ্ট হয়েছে। অজ্ঞ লোকে যেমন মনে করে মেঘ আকাশে আর ধূলিকণা বাতাসে আছে, তেমনি বিবেকহীন লোকে দেহকেই আত্মা বলে ভুল করে।

অংশ=অনেক রকমে-অংশের প্রকাশ হয়; যেমন, (ক) সাক্ষাৎ অংশ, (খ) অংশের অংশ, অংশের প্রভাব পাওয়া অংশ। ২ কলা=যেখানে বিভূতি উপস্থিত; দ্রষ্টব্য, গীতা (১০।৪১) শ্লোক। পূর্বের শ্লোকেও বলা হয়েছে—মনুর সন্তানরা যাঁরা মহাশক্তিধর (প্রতিভাধর ব্যক্তিরা) সবাই হরিরই অংশ।

রূপহীন। ৪ চিৎ-স্বরূপ আত্মা।

জীবের এই স্থূল দেহের অতিরিক্ত লিঙ্গশরীর[1] দৃষ্টি বা শ্রুতির গোচর না হলেও তার অস্তিত্ব অস্বীকারে করা যায় না। এরই সাহায্যে জীবের দেহান্তর-প্রাপ্তি ঘটে। সৎ ও অসৎরূপ এই দুই স্থূল ও সূক্ষ্মদেহকে অবিদ্যাপ্রভাবে আত্মা বলে ভ্রম হয়। আত্মজ্ঞানের সাহায্যে ঐ ভ্রম দূর হলে তখনই ব্রহ্মদর্শন হয়। ৩০-৩৩

সংসার-চক্রকে যে চালাচ্ছে সেই ঐশ্বরীয় মায়া জীবকে আচ্ছন্ন ও অজ্ঞান করে রাখে। অজ্ঞান বা অবিদ্যা দূর হয়ে যখন জ্ঞানের আবির্ভাব হয় তখনই জীব ভগবানের সঙ্গে মিশে গিয়ে স্ব-মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়। তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা এই সত্যটি ভাল করে জানেন। যিনি অ-কর্তা এবং জন্মরহিত সেই অন্তর্যামী ভগবানের অবতার-রূপে আবির্ভাব এবং জীবের মত কর্মানুষ্ঠান তাঁর মায়ারই লীলা লীলার ছলেই তিনি এ পরিদৃশ্যমান জগতের সৃষ্টি, পালন ও সংহার করছেন। কিন্তু তিনি এসব কোন কিছুতেই আসক্ত নন। মন প্রভৃতি ছয় ইন্দ্রিয়ের তিনিই নিয়ন্তা, কারণ তিনি স্বাধীন। তবে লোকে যেমন ফুলের গন্ধ গ্রহণ করে তিনি সেইভাবে জীবগণের অন্তর্বর্তী হয়ে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ষড়ৈশ্বর্যের[2] আঘ্রাণ নেন। ৩৪-৩৬

কুবুদ্ধি মানুষ সুচতুর তর্ক-কৌশলেও ভগবানের লীলাখেলা বুঝতে পারে না। নাট্যকার যেমন মন এবং কথা দিয়ে[3] কল্পিত নামরূপের নাটক বিস্তার করেন সৃষ্টিকর্তাও এই সৃষ্টিলীলা সেভাবেই প্রকাশ করেন। এর মর্ম উদ্ধার করা অজ্ঞ লোকের পক্ষে সম্ভব নয়। যিনি অকপটচিত্তে নিরন্তর ভক্তি সহকারে তাঁর পাদপদ্মের সুগন্ধকে ভজনা করেন একমাত্র তিনিই মহাশক্তিধর, রথচক্রধারী, পরমপুরুষ শ্রীভগবানের সৃষ্টিরহস্য বুঝতে পারেন। অতএব এই জন্ম-মৃত্যুর ধারা বিশিষ্ট সংসারে আপনারাই ভাগ্যবান; কারণ আপনাদের প্রশ্নের দ্বারা এটাই আপনারা জানিয়েছেন যে অখিল লোকপতি বাসুদেবকে আপনারা ঐকান্তিক ভালবাসেন। ভগবানে এই প্রেম থাকলে মহাকষ্টকর পুনর্জন্ম আর হয় না। মহান বেদব্যাস, যাঁকে সর্বজ্ঞ বলা হয়, তিনি মানুষের মুক্তির জন্য বেদতুল্য এই ভাগবত পুরাণ রচনা করেছেন। এই গ্রন্থ সর্বার্থ-সিদ্ধিকর, সর্বপ্রকার মঙ্গলবিধায়ক এবং এক মহৎ বস্তু। ব্যাসকৃত নিখিল বেদ ও ইতিহাসের সার, সবকিছুরই সারস্বরূপ সেই গ্রন্থের কথা এখন আমি আপনাদের বললাম। পণ্ডিতাগ্রগণ্য শুকদেব পরমভক্তিতে এই ভাগবত গ্রহণ করেছিলেন এবং শিক্ষা দিয়েছিলেন। গঙ্গাতীরে মহর্ষিদের দ্বারা বেষ্টিত মহারাজ পরীক্ষিৎ যখন আমৃত্যু অনশনে উপবিষ্ট ছিলেন, তখন তাঁকে শুকদেব এই গ্রন্থ শুনিয়েছিলেন। সেই সভায় থেকে তাঁরই অনুগ্রহে এই ভাগবত কথা আমি গ্রহণ করি। আমি যেভাবে এই পুরাণ পড়েছি আর বুঝেছি সেই ভাবেই আপনাদের এখন শোনাব। ধর্ম, জ্ঞান, ঐশ্বর্য প্রভৃতির সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ স্বধামে ফিরে এলে কলিতে জ্ঞানচক্ষুহীন জীবগণের নিকট সম্প্রতি ভাগবত গ্রন্থ সূর্যের ন্যায় উদ্ভাসিত হয়েছে। ৩৭-৪৪

১ লিঙ্গশরীরের উপাদান সম্বন্ধে মতবিরোধ রয়েছে। সাংখ্য বলে, প্রাণাদি পাঁচ, ইন্দ্রিয় পাঁচ (স্থূল), ইন্দ্রিয় পাঁচ (সূক্ষ্ম), মন ও বুদ্ধি—এই সতেরটি উপাদানে লিঙ্গশরীর গঠিত। বেদান্ত মাত্র তিনটির কথা বলে—ক্ষিতি, অপ্‌ ও তেজের সূক্ষ্ম অংশ দিয়ে লিঙ্গশরীর উৎপন্ন।

২ ষড়্‌বর্গ—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য থেকে উদ্ভূত ভোগ।

৩ গ্রীক মনীষী এরিস্টটলের 'পোয়েটিক্স' গ্রন্থে নাটকের অন্যতম দুটি উপাদান, মন ও কথা, বলা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়

বেদব্যাসের নিকট নারদের আগমন

সূত এই কথা বলার পর দীর্ঘস্থায়ী যজ্ঞে দীক্ষিত মুনিদের মধ্যে যিনি প্রাচীনতম সেই ঋগ্‌বেদী কুলপতি শৌনক বললেন, মহাভাগ সূত, আপনি সদ্‌বক্তা। ভগবান শুক যে পুণ্য ভাগবতকথা কীর্তন করেছিলেন এবার তাই আপনি আমাদের বলুন। আর বলুন, কোন্ যুগে, কোন্ স্থানে বা কি কারণে এই ভাগবত কথা আরম্ভ হয়? কার আদেশেই বা ব্যাসদেব ভাগবত রচনায় নিযুক্ত হন? ১-৩

ব্যাসদেবের পুত্র শুক ছিলেন মহাযোগী। তিনি ব্রহ্মজ্ঞ, ভেদবুদ্ধি রহিত; তাঁর আত্মপর জ্ঞান ছিল না। তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ এবং নিদ্রামুক্ত—মায়ার ঘোর তিনি কাটিয়ে উঠেছিলেন। নিজেকে প্রকাশ করতেন না বলে লোকে তাঁকে অজ্ঞান মূর্খ মনে করত। ব্যাসদেব যখন উলঙ্গ শুকদেবকে অনুসরণ করেছিলেন তখন স্নানরত অপ্সরারা তাঁকে দেখেই লজ্জায় কাপড় পরে নিয়েছিল, কিন্তু নগ্ন শুকদেবকে দেখে তারা কিছুমাত্র লজ্জাবোধ করেনি। এতে আশ্চর্য হয়ে ব্যাসদেব সেই অপ্সরাদের প্রশ্ন করলে তারা বলেছিল, আপনার স্ত্রী-পুরুষ ভেদজ্ঞান আছে, কিন্তু আপনার ব্রহ্মজ্ঞানী পুত্রের তো তা নেই। সুতরাং তিনি যুবক হলেও তাঁর কাছে আমাদের কোন লজ্জা নেই। কিন্তু আপনি বৃদ্ধ হলেও আপনার কাছে লজ্জা আছে। ৪-৫

বোবা আর জড়বুদ্ধি বলে পরিচিত এমন যে শুকদেব তিনি কি করে প্রথমে কুরু-জাঙ্গলের নগরবাসীদের কাছে আসেন এবং তারপরে হস্তিনাপুরে গিয়ে উপস্থিত হন? নগরবাসীরাই বা কি করে তাঁকে চিনল আর কিভাবেই বা তাঁর সঙ্গে পাণ্ডব-বংশীয় রাজর্ষি পরীক্ষিতের আলাপ-আলোচনা হয়, যা থেকে এই ভাগবত সংহিতার সৃষ্টি হল? তিনি সংসারবিরক্ত মহাপুরুষ। গৃহস্থদের গৃহে উপস্থিত হলে তা তীর্থে পরিণত হত বটে, কিন্তু সেখানে তিনি থাকতেন খুবই অল্পক্ষণ—একটি গাভী দোহন করতে যতটুকু সময় লাগে মাত্র ততক্ষণই। সূত, অভিমন্যুর পুত্র পরীক্ষিৎকে তিনি এই ভাগবত পুরাণকথা বলেছিলেন। সুতরাং তাঁর জন্ম ও কর্মবৃত্তান্তও নিশ্চয়ই খুব আশ্চর্যজনক; সে সবই আপনি আমাদের বলুন। পাণ্ডব-বংশের যশোবর্ধন সেই রাজচক্রবর্তী পরীক্ষিৎ কিসের জন্য রাজৈশ্বর্য উপেক্ষা করে গঙ্গাতীরে গিয়ে আমরণ অনশনে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন? শত্রুরাও নিজেদের মঙ্গলের জন্য রাশি রাশি ধনরত্ন উপঢৌকন এনে যাঁকে প্রণাম করত সেই বীর কি জন্য যৌবনেই প্রাণের সঙ্গে রাজশ্রীকে বিসর্জন দিতে উৎসুক হয়েছিলেন? যাঁরা হরিভক্ত তাঁরা নিজেদের জন্য জীবন ধারণ করেন না, লোকহিত আর পৃথিবীর কল্যাণের জন্যই বেঁচে থাকেন। তবে পরের আশ্রয়স্বরূপ এই রাজা পরীক্ষিৎ সংসার ছেড়ে কেন দেহত্যাগ করেন? আমরা যা যা প্রশ্ন করলাম সেইসব প্রশ্নের উত্তর আপনি বিশদ-ভাবে বলুন। বেদ ছাড়া অন্য সব শাস্ত্রেই আপনি পারদর্শী বলে আমরা মনে করি। ৬-১৩

[শৌনকের কথা শুনে] তখন সূত বললেন, যুগ-পরিবর্তন-ক্রমে যখন তৃতীয় যুগ দ্বাপর এল তখন পরাশরের ঔরসে বসুকন্যা সত্যবতীর গর্ভে হরির অংশে যোগীবর ব্যাসদেব জন্মগ্রহণ করেন। একদিন তিনি সকালবেলায় সরস্বতী নদীর

পবিত্র জলে স্নানাদি সেরে এক নির্জন জায়গায় গিয়ে বসলেন। সেই ঋষি দিব্য-চোখে দেখলেন যে কালের অলক্ষ্য গতিতে যুগের পরিবর্তন ঘটছে আর যুগধর্মেরও বিপর্যয় ঘটছে। এর ফলে ভৌতিক শরীরের শক্তি হ্রাস পাচ্ছে, মনের উন্নতভাবও নষ্টপ্রায় হয়ে গিয়ে ঈশ্বরে অশ্রদ্ধা আসছে, ধৈর্যের অভাব ঘটছে, নানারকম কুবুদ্ধির উদয় হচ্ছে আর পরমায়ু কমে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে লোকের দুর্ভাগ্যও বৃদ্ধি পাচ্ছে। তখন মহর্ষি ভাবতে লাগলেন, কিসে সব বর্ণের এবং সকল আশ্রমের মানুষের মঙ্গল হতে পারে। ১৪-১৮

চার জন ঋত্বিকে[১] সম্পাদিত হলে বৈদিক কর্ম মানুষের শুদ্ধতা আনতে পারে এই মনে করে যজ্ঞবিস্তারের উদ্দেশ্যে ব্যাসদেব এক বেদকে[২] চারভাগে ভাগ করলেন। এই চার বেদের নাম হল ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব। আর, ইতিহাস ও পুরাণের নাম হল পঞ্চম বেদ। ঋগ্বেদে মুনি পৈল, সামবেদে পণ্ডিত জৈমিনি আর যজুর্বেদে একা বৈশম্পায়ন পারঙ্গম হয়েছিলেন। অভিচারাদি[৩] কর্মে দক্ষ মুনি সুমন্ত অথর্ববেদে পারদর্শী হন। আর ইতিহাস ও পুরাণবেত্তা হলেন আমার পিতা রোমহর্ষণ। এইসব ঋষিরা নিজের নিজের বেদ অনেকাংশে ভাগ করে নেন; তারপর তাঁদের শিষ্যেরা শিষ্যপরম্পরায় সেই বেদকে আরও অনেক শাখায় ভাগ করে ফেলেন। পূর্বে বিশিষ্ট মেধাবীরাই বেদাধিকারী ছিলেন। যাতে স্বল্পমেধা লোকেরাও বেদ গ্রহণ করতে পারে বেদব্যাস সেই ভাবেই বেদকে নতুন করে সাজান। ১৯-২৪

নারী, শূদ্র আর অধম ব্রাহ্মণের পক্ষে বেদ শোনা অনুচিত। তাদের হিতের জন্য বেদব্যাস দয়াপরবশ হয়ে মহাভারত রচনা করেন। বিপ্রগণ, কিন্তু এইভাবে সর্ব-ভূতের হিতের জন্য চেষ্টা করেও মহান বাদরায়ণ অন্তরে তৃপ্তিলাভ করতে পারলেন না। তাই তিনি অপ্রসন্ন মনে সরস্বতীর তীরে নির্জনে বসে মনে মনে অনেক বিতর্ক করে শেষকালে বললেন, আমি ব্রহ্মচর্য পালন করেছি, গুরুদের[৪], অগ্নিদের[৫] আমি আরাধনা করেছি। অকপটচিত্তে ওঁদের অনুশাসনও পালন করেছি। মহাভারত রচনা করতে গিয়ে সর্বজীবের জন্য বেদের অর্থই ব্যাখ্যা করেছি। স্ত্রীলোক আর শূদ্রেরাও কোন্ ধর্মের অনুষ্ঠান করবে ঐ মহাভারত-গ্রন্থে তা বিশেষ করে বলা আছে। কিন্তু হায়, তবুও আমার শরীরস্থ আত্মা তো কৈ ব্রহ্মতেজে উদ্ভাসিত হচ্ছে না! নিজেকে যেন আত্মস্থই মনে হচ্ছে না। তবে কি পরমহংসদের প্রিয়, সেইজন্য অচ্যুতদেবেরও প্রিয় ভাগবত ধর্মের কথা আমি অনেক করে বলি নি? তাই যেন কোথায় একটা শূন্যতা রয়েছে। ২৫-৩১

এইভাবে নিজেকে অপূর্ণ মনে করে যখন বেদব্যাস দুঃখ করছিলেন তখন তাঁর

---

১ যজ্ঞের মুখ্য পুরোহিত চারজন—হোতা, অধ্বর্যু, ব্রহ্মা ও উদ্গাতা। এঁদের অধীনে তিন জন করে আরও বারজন ঋত্বিক থাকেন।

২ বেদ সম্বন্ধে অনেক মত আছে। বিষ্ণুপুরাণের মতে আদিতে যজুঃ নামে একটি মাত্র বেদ ছিল, পরে দ্বাপর যুগে ব্রহ্মার আদেশে ব্যাস তাকে ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব এই চারভাগে ভাগ করেন।

৩ লোকের অনিষ্টের জন্য ছয় রকমের ক্রিয়া—মারণ, মোহন, স্তম্ভন, বিদ্বেষণ, উচাটন ও বশীকরণ।

৪ মাতাপিতা প্রধান গুরু; তারপর দীক্ষাগুরু, শিক্ষাগুরু, ধর্মগুরু প্রভৃতি।

৫ প্রকারভেদে অগ্নি তিন রকমের—গার্হপত্য, আহবনীয়, দক্ষিণাবর্ত। গার্হপত্য—সাগ্নিক গৃহীর যজ্ঞাগ্নি। আহবনীয়—হোমের অগ্নি। দক্ষিণাবর্ত—দক্ষিণদিকে রাখবার যজ্ঞের আগুন।

সেই সরস্বতী তীরস্থ[1] আশ্রমে দেবর্ষি নারদ এসে উপস্থিত হলেন। দেবতাদেরও অর্চিত নারদই যে হঠাৎ তাঁর আশ্রমে এসেছেন এ কথা বুঝতে পেরে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন তাঁর আসন ছেড়ে উঠে তাঁকে অভ্যর্থনা করলেন এবং তাঁর সৎকার যথাবিহিত করলেন। ৩২-৩৩

পঞ্চম অধ্যায়

নারদ ও ব্যাসের আলোচনা

তারপর সূত বললেন, দেবর্ষি নারদ বীণাহস্তে সুখে বসে ঈষৎ হেসে পার্শ্বস্থ ব্যাসদেবকে বললেন, পরাশরসন্তান, আপনার দেহ-মন সব ভাল তো? দেহ-মন সবই তো পরমাত্মার বস্তু। লোকে যে সব ধর্ম-কর্মের কথা জানতে চায়, সবই আপনার জানা আর করাও বটে! একথা বলার কারণও রয়েছে। আপনি যে বিরাট অদ্ভুত মহাভারত রচনা করেছেন তাকে সর্বার্থসার বলেও ধরা যেতে পারে। তাছাড়া আপনি সনাতন ব্রহ্মকে বিচার করে তাঁকে লাভও করেছেন। তবু আপনি নিজেকে অপূর্ণ মনে করে শোক করছেন কেন? ১-৪

তখন ব্যাসদেব বললেন, আপনি যা যা বললেন সে সব আমার আছে ঠিকই, কিন্তু তবু আমার আত্মা তৃপ্তি পাচ্ছে না। এর কারণও বুঝতে পারছি না। আপনি ব্রহ্মপুত্র, আপনার ধীশক্তি অগাধ। সেই প্রজ্ঞাবলেই আপনি আমার অসন্তোষের মূল উদ্‌ঘাটন করতে পারবেন। নির্লিপ্ত, মোক্ষ ও মায়ার প্রভু, আদি পুরুষ, ইচ্ছামাত্রই[2] ত্রিগুণের (সত্ত্ব, রজ ও তম) সাহায্যে বিশ্বের সৃষ্টি, পালন ও সংহারকর্তা—এমন ব্রহ্মের আপনি ভজনা করেন। সেই জন্যই আপনি সমস্ত গূঢ় ব্যাপারও নিশ্চয়ই অবগত আছেন। আপনি ত্রিলোকবিহারী সূর্যের মত, অন্তশ্চর বাতাসের মত আপনি সকলের আত্মা পর্যন্ত দর্শন করেন। সুতরাং আপনি বলুন, কেন আমার এই অপূর্ণতা আর অতৃপ্তিবোধ। আমি তো যোগবলে এবং বিদ্যাচর্চা দ্বারা ব্রহ্মবিদ্যায় অভিজ্ঞ হয়েছি। ৫-৭

ব্যাসের কথা শুনে নারদ বললেন, আপনি আপনার রচিত গ্রন্থাদিতে ভগবানের অমল যশের কথা প্রায় বলেনই নি। শুধু ধর্মের জ্ঞানে ভগবান তুষ্ট হন না। আর যে জ্ঞানে তিনি তুষ্ট হন না আমার মনে হয় সেই জ্ঞান ব্যর্থ। মুনিশ্রেষ্ঠ, আপনি যেভাবে ধর্ম বা অনুষ্ঠানাদির কথা কীর্তন করেছেন সেভাবে বাসুদেবের মহিমা বর্ণনা করেন নি। ৮-৯

অতিসুন্দর পদ বিশিষ্ট গ্রন্থও যদি শ্রীভগবানের অমল জগৎকারণ যশের কথা ধারণ না করে, তাহলে তা কোন কাকের তুল্য সকাম নীচ ব্যক্তির কাছে প্রিয় হয়। রাজহংস যেমন শুধু মানস সরোবরেই বিহার করে, পরমহংসগণও তেমনি ঐ সব গ্রন্থকে অনাদর করে শুধু হরিপাদপদ্মেই পরমানন্দে লগ্ন থাকেন। কিন্তু যে গ্রন্থে

১ কুরুক্ষেত্রের কাছে সরস্বতী ও দৃষদ্বতী নদীর মধ্যবর্তী দেশ ব্রহ্মাবর্ত বলে পরিচিত। সুপ্রাচীন কালে এই অঞ্চলেই বৈদিক ধর্মের বিকাশ হয়। ভারতের প্রথম আর্য উপনিবেশ স্থাপনের সময়ে পাঞ্জাব প্রদেশে সরস্বতী নদীর তীর বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে।

২ ঐতরেয়োপনিষদে (১।১।১) রয়েছে—তিনি (আত্মা) চিন্তা করলেন, 'আমি লোকসকল সৃষ্টি করব।'

অনন্তকীর্তি ভগবানের যশ-কথা কীর্তিত হয়েছে তা অপভাষায় রচিত হলেও তার বাক্য সজ্জনেরা শোনেন, গান করেন আর অন্তরে ধারণ করেন। সেই গ্রন্থই মানুষের পাপনাশে সমর্থ হয়। নিরুপাধি ব্রহ্মজ্ঞান পর্যন্ত কৃষ্ণভাব বর্জিত হলে শোভা পায় না। এই বস্তুও যদি ঈশ্বরে সমর্পিত না হওয়ার জন্য ব্যর্থ হয় তবে যে সব দুঃখময় কাম্য ও অকাম্য কর্ম রয়েছে সেগুলি ঈশ্বরে অর্পিত না হলে যে নিষ্ফল হবে তা তো বলাই বাহুল্য। আপনার জ্ঞান অমোঘ, আপনার কথা শোনাও পুণ্যের কাজ। আপনি সত্যনিষ্ঠ ও ব্রতচারী[১]। সুতরাং মহাভাগ, আপনিই সকল লোকের বন্ধনমুক্তির জন্য সমাধিযোগে মহাপরাক্রম শ্রীকৃষ্ণের লীলা স্মরণ করুন, তারপর তা বর্ণনা করুন। ভগবানের কীর্তি ছাড়া অন্য কিছু বলতে গেলে নিজের সৃষ্ট নাম-রূপের জালে জড়িয়ে আপনার মন এমন চঞ্চল হয়ে উঠবে যে বায়ুর দ্বারা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত নৌকার মত কোনও কালে কোথাও তার আশ্রয় মিলবে না। ১০-১৪

আপনার একটা বিরাট ভুল এই হয়েছে যে স্বভাবতই যারা বিষয়ভোগে আসক্ত তাদের কাছে আপনি নিন্দনীয় কাম্যকর্মকে মোক্ষ ও ধর্মপ্রদ বলে বর্ণনা করেছেন। আপনার কথা থেকে লোকে একবার যাকে ধর্ম বলে স্থির করে নেবে তারপর আর তা থেকে কোন অনুশাসনই তাদের নিবৃত্ত করতে পারবে না। বিচক্ষণ লোকে জানেন যে অনন্তপার ভগবানের স্বরূপ উপলব্ধির পথ হল নিবৃত্তি-মার্গ[২]। সুতরাং তাঁদের কিছু বলার দরকার নেই। কিন্তু যারা আত্মজ্ঞানশূন্য, ত্রিগুণে আচ্ছন্ন হয়ে সংসারধর্মে ব্যস্ত তাদের জন্য আপনি ভগবানের লীলা প্রচার করুন। প্রশ্ন হতে পারে, বর্ণাশ্রমধর্ম ত্যাগ করে শুধুমাত্র হরির ভজনা করে কেউ যদি সিদ্ধিলাভ না করে বা মারা যায় তাহলে স্বধর্ম[৩] ত্যাগ জনিত কোনও অমঙ্গল কি তার হবে? এর উত্তর হল—না, তা হবে না। কেন না, ভগবানকে ত্যাগ করে শুধু স্বধর্মাচরণ করলেই কি পুরুষার্থ লাভ হয়? সেই জন্যই পরমসুখের আকর ভগবদ্ভক্তি লাভের জন্য বিবেকী মানুষ সর্বদা সচেষ্ট থাকেন। ঊর্ধ্বে ব্রহ্মলোক থেকে নিম্নে পৃথিবী পর্যন্ত বারবার ভ্রমণ করলেও লোকে ভগবদ্ভক্তি লাভ করতে পারে না। কিন্তু বিষয়-সুখ, যা আসলে বিরাট দুঃখ, পূর্বজন্মের কর্মফলে আর দুর্জ্ঞেয় কাল-গতিতে বিনা চেষ্টাতেই সহজে মানুষের ওপর এসে পড়ে। বিষ্ণুভক্ত লোক একবার তাঁর প্রেমরসে বিভোর হলে বিষয়াসক্ত অন্য জীবের মত কখনও সংসার করে না। কারণ, হরিপদ রূপ পদ্মের মধু একবার যিনি আস্বাদ করেছেন তিনি আর তা ভুলতে পারেন না। এই বিশ্ব ভগবানের প্রকাশ হলেও তাঁর থেকে ভিন্ন, কারণ তিনি নিজ মায়াপ্রভাবে এই বিশ্বের সৃষ্টি, পালন ও সংহার করে থাকেন। এসব কথা আপনি নিজেও জানেন, তবুও সে সম্বন্ধে আমি সামান্য কিছু বললাম। আপনি সত্যদর্শী। নিজ আত্মাকে আপনি পরমপুরুষের অংশ বলে নিশ্চিত জানেন। আর এও জানেন যে অজ[৪] (জন্মরহিত) হরিই জগতের মঙ্গলের জন্য জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এইবার আপনি বিশদভাবে অবতারশিরোমণি শ্রীকৃষ্ণের লীলা-কীর্তন করুন। পণ্ডিতেরা বলেন যে সংসারী মানুষ অনেক তপস্যা, শাস্ত্রপাঠ, সৎকর্মাদি, অধ্যয়ন, জ্ঞান আর দানের ফলেই এই পুণ্যশ্লোক পুরুষের গুণকীর্তন করতে পারে। ১৫-২২

মুনি, পূর্বকল্পে আগের জন্মে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদের এক দাসীর গর্ভে আমার জন্ম

---

১ শম, দমাদি ব্রতসম্পন্ন। ২ নিষ্কাম ধর্মাচরণ। ৩ স্বধর্ম=বর্ণাশ্রম ধর্ম। হরিতে সমর্পিতপ্রাণ হলে বর্ণাশ্রম বিভাগ অনুযায়ী কোনও কৃত্য থাকে না।

৪ ব্রহ্মই অজ। দ্রষ্টব্য, কঠ উপনিষদ ১।২।১৮ ও গীতা ২।২০ শ্লোক।

হয়।[১] আমি তখন ছোট। একবার বর্ষাকালে যোগীরা যখন একসঙ্গে অবস্থান করছিলেন তখন তাঁদের শুশ্রূষাকার্যে আমি নিযুক্ত ছিলাম। যদিও ঋষিরা সর্বজীবে সমদর্শী, তাহলেও তাঁরা আমার প্রতি একটু বেশী কৃপাপরবশ ছিলেন। আমাকে তাঁরা অন্য বালকদের থেকে কিছুটা আলাদা দৃষ্টিতে দেখতেন। কারণ আমার মধ্যে কোনরকম বালসুলভ চপলতা ও বাচালতা ছিল না। তখনই আমি ইন্দ্রিয় জয় করেছিলাম, আর খেলাধুলো ছেড়ে নিরন্তর তাঁদের শুশ্রূষায় নিজেকে নিযুক্ত রেখেছিলাম। সেই ব্রাহ্মণদের অনুমতি নিয়ে তাঁদের পাতের উচ্ছিষ্ট একবার মাত্র আমি খেয়েছিলাম, আর তাতেই আমার সমস্ত পাপ দূর হয়ে চিত্তশুদ্ধি হয়। তখন তাঁদের ধর্মের প্রতি আমার প্রবল আসক্তি জন্মাল। রোজই সেখানে ব্রাহ্মণরা কৃষ্ণগানের ব্যবস্থা করতেন। ওঁদের অনুমতি নিয়েই আমি সুন্দর কৃষ্ণকথা শুনতে লাগলাম। তখন থেকেই শ্রুতিপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণে আমার অবিচল ভক্তি গড়ে উঠল। অতি শ্রদ্ধায় কৃষ্ণচরিতের প্রত্যেকটি কথা শুনে শুনে আমি অন্তরে গেঁথে নিয়েছিলাম। তাই থেকেই আমি বুঝতে পারলাম যে আমিই সেই পরমব্রহ্ম[২]। শুধু যোগমায়ার ফলেই নিজেকে শরীরী বলে কল্পনা করছি। এইভাবে বর্ষা আর শরৎ এই দুই ঋতুর প্রতিটি দিন মহাত্মা ঋষিদের মুখে শ্রীহরির অমল যশ-সঙ্কীর্তন শুনে আমার মনে রজ আর তমোগুণ নাশক শক্তিধারা নদীর স্রোতের মত প্রবল থেকে প্রবলতর হতে লাগল। আমাকে এরকম শক্তিমান, বিনয়ী, পাপশূন্য, সশ্রদ্ধ, জিতেন্দ্রিয় ও অনুগত দেখে সেই পরম কারুণিক মুনিরা যাবার সময় কৃপা করে সাক্ষাৎ নারায়ণের দেওয়া গুহ্যতম জ্ঞান আমাকে দিয়ে গেলেন। ২৩-৩০

এই ভাবেই আমি বিশ্ববিধাতা ভগবান বাসুদেবের এই মায়া-প্রপঞ্চের কথা জানতে পেরেছিলাম। এই জ্ঞান হলে লোকে ভগবানের শ্রীচরণে আশ্রয় পায় আর পরমব্রহ্মে সমস্ত কর্ম সমর্পিত হলেই ত্রিতাপ[৩] দূর হয়। সুব্রত, এর কারণ এই যে, যে বস্তু থেকে যে রোগ হয় সেই বস্তুই অন্য বস্তুর সঙ্গে মিশিয়ে ঔষধে পরিণত করলে তা দিয়ে রোগের চিকিৎসা হয়, তাতেই রোগশান্তি হয়। এই জন্যই কাম্যকর্ম বন্ধনের হেতু হলেও তা পরমব্রহ্মে সমর্পিত হলে তাতে কর্মবন্ধন নিবারিত হয় এবং আত্মার মুক্তি ঘটে। ৩১-৩৪

ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য সংসারের যে কাজ করা হয় তাই ভক্তি-যোগসমন্বিত মোক্ষদায়ক জ্ঞান। যখন সবাই ভগবানের নির্দেশেই সংসারের কাজকর্ম করে তখন তারা শ্রীকৃষ্ণের গুণ ও নামই কীর্তন ও স্মরণ করে। তার পদ্ধতি এইরকম—হে ভগবান বাসুদেব, তোমাকে নমস্কার। তোমাকে আমি ধ্যান করি। সংকর্ষণ, অনিরুদ্ধ ও প্রদ্যুম্নকেও নমস্কার। ৩৫-৩৭

এই সব রূপের অভিধা দিয়ে সত্যিকারের মূর্তিহীন অথচ মন্ত্রে মূর্তিমান ভগবানকে, যজ্ঞপুরুষকে[৪] যিনি পূজা করেন তাঁকেই আমি সম্যগ্‌দৃষ্টিসম্পন্ন পুরুষ বলব। ব্রাহ্মণ, আমাকে তাঁরই নির্দেশ[৫] পালন করতে দেখে কৃপালু কেশব

১ ব্রাহ্মণের ঔরসে দাসীর গর্ভে সন্তানোৎপাদনের একটি বিখ্যাত উদাহরণ আমরা পাই ছান্দোগ্য উপনিষদে সত্যকামের কাহিনীতে। (দ্রঃ ছান্দোগ্য ৪।৪।৪ মন্ত্র)।

২ উপনিষদের 'যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি ॥ ঈশ-১৬

৩ আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক আর আধিভৌতিক—এই ত্রিতাপ।

৪ কর্মরূপ যজ্ঞের অধিষ্টি পুরুষ বলে ভগবান যজ্ঞপুরুষ। যজ্ঞেশ্বরও সমার্থবাচক।

৫ ভগবদ্‌গীতা, ৯।২৭ ও ১১।৫৫ শ্লোকদ্বয় দ্রষ্টব্য।

আমাকে মোক্ষরূপ জ্ঞানৈশ্বর্যে ভূষিত করেন, আর আমাকে কৃষ্ণভাবও অর্পণ করেন। অতএব, বেদব্যাস, আপনিও পরমাত্মার বিশ্রুত কীর্তির কথা প্রচার করুন। ভগবানের কীর্তির কথা শুনলে মুমুক্ষুর জ্ঞানপিপাসা তৃপ্ত হয়। তা না হলে তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতেরা এই কথাই বলে থাকেন যে, অবিরাম দুঃখের জ্বালায় সর্বদা যারা জ্বলে-পুড়ে মরছে তাদের যন্ত্রণা নিবারণের অন্য কোনও উপায় নেই। ৩৮-৪০

ষষ্ঠ অধ্যায়

নারদের পূর্বজন্মের সৌভাগ্যের কথা

সূত বললেন, দেবর্ষি নারদের জন্ম-কর্মের এই কাহিনী শুনে সত্যবতীপুত্র ব্যাসদেব আবার তাঁকে প্রশ্ন করলেন। ব্যাস বললেন, নারদ, আপনাকে ব্রহ্মজ্ঞান দিয়ে সেই ঋষিরা চলে যাবার পর আপনি কি করলেন? বয়স বাড়লে আপনি কোন কাজে নিযুক্ত হয়েছিলেন? কি ভাবে সেই দাসীপুত্ররূপ দেহ ত্যাগ করলেন? এবং কি করেই বা সেই পূর্বকল্পের স্মৃতি এখনও আপনার মনে অবিকৃত আছে? আমরা তো জানি দুর্বার কাল সব কিছুই নষ্ট করে। ১-৪

নারদ বললেন, ঋষিরা আমাকে দিব্যজ্ঞান দিয়ে চলে গেলে আমি কি করেছিলাম তা শুনুন। আমার মায়ের আমি একমাত্র সন্তান। তিনি নির্বোধ ছিলেন। তার ওপর দাসীবৃত্তিই ছিল তাঁর জীবিকা। মা ছাড়া আমার অন্য গতি ছিল না বলে তিনি আমাকে স্নেহডোরে বাঁধতে চাইলেন। তিনি পরাধীন ছিলেন, এজন্য ইচ্ছা থাকলেও তাঁর পক্ষে আমার লালন-পালনের ভার নেওয়া সম্ভব হয় নি। কাঠের পুতুল যেমন খেলোয়াড়ের খেয়াল-খুশীর অধীন, সংসারের মানুষও তেমনি ভগবানের ইচ্ছার দাস। আমি তখন পাঁচ বছরের বালক মাত্র—সংসার সম্বন্ধে একেবারে অনভিজ্ঞ। তাই আমি সেই ব্রাহ্মণের বাড়ীতে থেকেই বড় হতে লাগলাম। সেই সময় একদিন যখন রাত থাকতে মা গরু দোহনে বেরিয়েছেন, তখন অন্ধকারে এক সাপের গায়ে তাঁর পা পড়ে। কালপ্রেরিত সাপ মাকে দংশন করল এবং তাতেই তাঁর মৃত্যু হল। মায়ের মৃত্যুকে আমি ভক্তের কল্যাণের জন্য ভগবানের অনুগ্রহ স্বরূপ মনে করলাম এবং সবকিছু পরিত্যাগ করে উত্তর দিকে বেরিয়ে পড়লাম। ৫-১০

আমি নানা সমৃদ্ধ নগর ও গ্রাম পার হয়ে চলতে লাগলাম। পথে কত সোনা রূপার খনি, কত কৃষকপল্লী, পাহাড়ের গাত্রস্থিত জনপদ আর উপবন দেখলাম তার সংখ্যা নেই। তারপর নানা রঙে রঞ্জিত পাহাড়, বিশাল বনস্পতি যাদের ডালাপালা বন্য হাতীর দল ভেঙে দিয়েছে, ফুলে শোভিত পথ, বিচিত্র গায়ক পাখির ডাকে মুখরিত সুন্দর জলাশয়ে স্নানরত দেবগণ, ফুলে ফুলে উড়ন্ত ভ্রমরকুল—এই সবই আমি দেখতে দেখতে চললাম। এভাবে একা যেতে যেতে একদিন এক গভীর ভয়ঙ্কর বন দেখতে পেলাম। এল, বেণু, শরের ঝাড়, কুশ আর বাঁশ জড়াজড়ি করে তাকে দুর্ভেদ্য করে রেখেছে। সেই প্রকাণ্ড বন নানা হিংস্র জন্তু আর সাপ, পেচক ও শৃগালের বাসস্থান। তখন আমার সর্বেন্দ্রিয় অবসন্ন, আমি ক্ষুধায় কাতর, তাই একটা হ্রদে স্নান করে তার জল পান করলাম এবং আচমন সেরে শ্রান্তি দূর করলাম। তারপর সেই নির্জন বনে এক অশ্বত্থ গাছের তলায় বসে অন্তর্যামী ভগবানের ধ্যান

করতে লাগলাম। ভক্তিতে বিহ্বল হয়ে ধ্যান করতে করতে প্রেমাশ্রুতে আমার চক্ষু পূর্ণ হল। ধীরে ধীরে আমার অন্তরাকাশে শ্রীহরি উদিত হলেন। ১১-১৭

মুনি, প্রেমভরে আমার অঙ্গ রোমাঞ্চিত হল। একটা তীব্র সুখ আমি অনুভব করলাম। আনন্দে এতই মুগ্ধ হলাম যে সেই মুহূর্তে নিজেকে পরমাত্মা থেকে পৃথক বলে বোধ হল না। সবই তখন একাকার। হঠাৎ সেই সুকান্তি, শোকতাপনাশী ভগবৎ-রূপ অদৃশ্য হল; দারুণ উৎকণ্ঠায় উদ্‌ভ্রান্তের মত উঠে পড়লাম। সেই রূপ আবার দেখবার জন্য মনকে অন্তরে স্থির করলাম। কিন্তু চেষ্টা করেও দেখতে পেলাম না। উৎকণ্ঠা এবং অস্থিরতাবশত তখন আমার অবস্থা অসুস্থ লোকের মতই। ১৮-২০

এইভাবে যখন সেই বিজন বনে ঈশ্বরকে দেখবার জন্য প্রাণপাত করছি তখন আমাকে উদ্দেশ করে বাক্যাতীত ভগবান আকাশবাণী রূপে গম্ভীর অথচ সুমিষ্ট স্বরে আমার দুঃখকে লাঘব করবার জন্যই যেন বলে উঠলেন, নারদ, বড় দুঃখের কথা, কিন্তু এ জন্মে তুমি আর আমাকে দেখতে পাবে না। যাদের চিত্ত-মালিন্য দূর হয় নি সেই সব অসিদ্ধ যোগী আমাকে দেখতে পায় না। তবে যদি বল আমার রূপ তোমাকে একবারই বা দেখান হল কেন, তাহলে আমি বলব সে আমার প্রতি তোমার অনুরাগ বাড়িয়ে তোলার জন্য। হে অনঘ, সাধু-সজ্জনেরা আমাতে আসক্ত হলে অন্তরের সমস্ত বাসনাই ক্রমে ক্রমে ত্যাগ করেন। অল্প সময়ের জন্য হলেও সাধুজনের সেবা করে তুমি আমাতে প্রবলভাবে অনুরক্ত হয়েছ। ফলে নিন্দনীয় ইহলোক ছেড়ে তুমি আমার পার্ষদ হবে, আর প্রলয়কালেও তোমার স্মৃতি অক্ষুণ্ন থাকবে। ২১-২৫

এই পর্যন্ত বলেই আকাশবাণী স্তব্ধ হয়ে গেল। আমিও তাঁর এই অনুকম্পায় বিগলিত হয়ে সবার শ্রেষ্ঠ সেই ভগবানের উদ্দেশে অবনতমস্তকে প্রণাম জানালাম। তখন আমার লজ্জা দূর হল। তাই সংসারে বীতস্পৃহ হয়ে মাৎসর্যশূন্য মনে অনন্ত ভগবানের গূঢ় মঙ্গলময় চরিতকথা স্মরণ ও কীর্তন করে পৃথিবীময় ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। কবে তিনি কৃপা করে আমাকে তুলে নেবেন শুধু তার জন্যই দিন গুনছিলাম। যখন এইভাবে প্রাণ কৃষ্ণে অর্পণ করে নির্মলচিত্ত হয়ে কালযাপন করছি তখনই হঠাৎ বিদ্যুৎ-চমকের মত আমার জীবনদীপ নিবে গেল। তখন শ্রীভগবানের প্রতিশ্রুতি মত আমি তাঁর পার্ষদ হলাম। প্রারব্ধ কর্মের অবসান হওয়ায় পঞ্চভূতের দেহও খসে পড়ল। আমার ভগবৎ-প্রদত্ত তনু লাভ হল। তার-পর প্রলয়ের সময় সমস্ত বিশ্ব সংহার করে ভগবান যখন মহাসমুদ্রে নিদ্রা গেলেন তখন তাঁর নিঃশ্বাসের সঙ্গে আমি তাঁর অন্তরে ঢুকে পড়লাম। সহস্র যুগ পরে নতুন কল্পের শুরুতে ভগবান নিদ্রা থেকে উঠলেন। সৃষ্টির উদ্দেশে নিজের প্রাণ থেকে মরীচি প্রমুখ ঋষিদের সঙ্গে আমাকেও জন্ম দিলেন। ২৬-৩১

সেই আমিই মহাবিষ্ণুর দয়ায় ভগবানে অচলা ভক্তি নিয়ে বৈকুণ্ঠাদি লোকে অবাধ ভ্রমণের অধিকার পেলাম। স্বর্গ-মর্ত-পাতালের সর্বত্রই অবাধ বিচরণ করতে লাগলাম। স্বরব্রহ্ম অধিষ্ঠিত এই দেবদত্ত বীণাটি নিয়ে তার ঝংকারে হরিরই গুণকীর্তন ও গান করে আমি বিশ্বময় ঘুরে থাকি।[১] ভগবানের নাম সবারই

১ যেথা, আলোড়ি চন্দ্রালোক শারদ,
করি হরিগুণ-গান নারদ,
মন্ত্রমুগ্ধ করিত ভুবন
টলাইত ভগবান।—রজনীকান্ত সেন।

শুনতে ভাল লাগে। তাঁর চরণসেবা তীর্থসেবার মতই। সেই ভগবানের নাম যখন এই বীণার তারে ঝঙ্কৃত হয়, তাঁর বীর্যবান কীর্তির কথা যখন গানের সুরে মন্দ্রিত হয়ে ওঠে, তখনই যেন আকুতিভরা প্রাণের ডাক শুনে তিনি আমার চিত্তাকাশে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠেন। বিষয়ভোগ বাসনার আক্রমণে অবসন্নচিত্ত সংসারীদের পক্ষে হরিভজনই সংসার-রূপ সাগর পার হবার একমাত্র তরণী। সর্বদা কামলোভে আসক্ত মনও হরি-সেবা করে যে পরিমাণ শান্তি লাভ করে, যমাদি[১] যোগের পথ অনুসরণ করে সে পরিমাণ শান্তিলাভ হয় না। ৩২-৩৬

অনঘ, আপনি আমাকে যে প্রশ্ন করেছিলেন তার উত্তরে এই সবই আপনাকে আমি বললাম। আমার জন্ম-কর্মের এই রহস্যকাহিনী নিশ্চয়ই আপনার তৃপ্তিবিধান করবে। সূত বললেন, সত্যবতীপুত্র ব্যাসকে এইভাবে সব কথা বলে দেবর্ষি নারদ উঠে পড়লেন। তারপর বীণা বাজাতে বাজাতে যথেচ্ছ স্থানে চলে গেলেন। এই দেবর্ষি নারদ ধন্য। তিনি বীণা বাজিয়ে পার্থসারথি শ্রীকৃষ্ণের কীর্তিকথা গান করে নিজেকেও তৃপ্তি দেন আর ত্রিতাপপীড়িত এই জগৎকেও আনন্দ দান করেন। ৩৭-৩৯

সপ্তম অধ্যায়

অশ্বত্থামার শাস্তি

শৌনক বললেন, সূত, নারদ তো চলে গেলেন, কিন্তু মহর্ষি বাদরায়ণ তাঁর অভিপ্রায় জানার পর কি করলেন এবার সেই কথা বলুন। তখন সূত বললেন, ব্রহ্মনদী সরস্বতীর পশ্চিমতীরে ঋষিদের যজ্ঞবর্ধক শম্যাপ্রাস নামে একটি আশ্রম আছে। আশ্রমের চারদিকে অনেক বদরী গাছ। সেই আশ্রমে ব্যাসদেব আচমন সেরে একাগ্র-মনা হয়ে ধ্যানে বসলেন। শুদ্ধ ভক্তিযোগ হেতু তাঁর মন যখন নির্মলতা লাভ করল তখন তিনি আদিপুরুষ ভগবানকে আর তাঁর অধীন মায়াকে দেখতে পেলেন। এই মায়ার প্রভাবেই সমস্ত জীব মুগ্ধ হয়, গুণাতীত পরমাত্মাকে ত্রিগুণাত্মক জড় বস্তু বলে ভ্রম হয়, আর এই মায়ার প্রভাবে জীবের অন্তরে কর্তৃত্বাভিমান এসে অনর্থের সৃষ্টি করে। ভক্তিযোগের পথ ধরে ভগবদ্দর্শন হলে সংসারের যাবতীয় অনর্থ অচিরে দূর হয়; কারণ ভগবান হতেই ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের উৎপত্তি। সংসারী লোক মূঢ়, তাদের এ খবর জানা নেই। তাই তাদেরই মঙ্গলের জন্য পণ্ডিতপ্রবর ব্যাসদেব এই ভাগবতসংহিতা রচনা করলেন। ভাগবতে বর্ণিত পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের গুণকীর্তন শুনলে মানুষের মনে যে ভগবদ্ভক্তি জন্মে তাতে শোক, মোহ ও ভয় দূর হয়। ভাগবতসংহিতা রচিত হলে ব্যাসদেব তাকে ভাল করে সংশোধন করলেন। তারপর তিনি তা তাঁর পুত্র ব্রহ্মভাবময় শুককে শিখিয়ে দিলেন। ১-৮

সূতের কথা শেষ হলে শৌনক আবার বললেন, আপনি তো বললেন শুকদেব আত্মারাম—আত্মাতেই সর্বদা ডুবে থেকে আনন্দ পান। তিনি নিবৃত্তিমার্গের পথিক—সংসারের সব কিছুতেই তাঁর অনীহা। তাহলে, কিসের জন্য তিনি এই বিশাল ভাগবত অভ্যাস করলেন? তখন সূত বললেন, হরির গুণই এই রকম।

১ যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা, সমাধি—অষ্টাঙ্গ যোগের এই আটটি প্রকার। পাতঞ্জল যোগ-দর্শনে অষ্টাঙ্গ যোগের বিশদ আলোচনা হয়েছে।

মুনিদের আত্মাতেই রতি, আর তাঁরা সাংসারিক বিধিনিষেধের উর্ধ্বে, সবই ঠিক কথা; কিন্তু তাঁরা কীর্তিশালী ভগবানকে অহেতুক ভক্তি করেন, এটিও সত্যি কথা। চিরপূজনীয় ব্যাসপুত্র শুকদেব সর্বদাই হরির গুণে আকৃষ্ট। সেইজন্যই তিনি সাগ্রহে এই বিরাট ভাগবতসংহিতা অধ্যয়ন করেছিলেন। ৯-১১

শৌনক, এবার তাহলে কৃষ্ণকথার প্রসঙ্গে মহারাজ পরীক্ষিতের জন্ম-কর্ম-মুক্তির কথা আর পাণ্ডবদের মহাপ্রস্থানে যাত্রার কথা আপনাদের নিকট বলতে শুরু করি। কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধে কৌরব-সৃঞ্জয়[১] বংশের অগণ্য বীর মারা গেলেন। সর্বশেষ দ্বৈরথ যুদ্ধে ভীম গদা নিক্ষেপ করে প্রচণ্ড আঘাতে দুর্যোধনের উরু ভেঙে দিলেন। 'প্রভু কুরুপতি দুর্যোধনের প্রিয়ভাজন হব', এই কথা ভেবে দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা রাত্রিকালে দ্রৌপদীর ঘুমন্ত পাঁচ পুত্রের মাথা কেটে নিয়ে ভগ্ন-উরু দুর্যোধনকে উপহার দিলেন। কিন্তু এর ফলে তিনি কুরুসম্রাটের অপ্রিয়ভাজনই হলেন, কারণ ঘৃণিত কাজকে সকলেই নিন্দা করে। মাতা দ্রৌপদী আপন সন্তানদের হত্যার সংবাদ শুনে গভীর শোকে অভিভূত হলেন। তিনি যখন উচ্চস্বরে বিলাপ করছিলেন তখন অর্জুন তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, প্রিয়ে, আমার গাণ্ডীব থেকে নির্গত তীরে ঐ আততায়ী ব্রাহ্মণাধম অশ্বত্থামার মুণ্ড ছিন্ন করে তোমাকে উপহার দেব। পুত্রদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পর ঐ মুণ্ডে পা রেখে যখন তুমি স্নান করবে, তখনই তোমার চোখের জল আমি মুছাতে পারব। এই রকম প্রিয় বাক্যে স্ত্রীকে সান্ত্বনা দিয়ে মহাধনুর্ধর অর্জুন কবচ পরে নিয়ে কপিধ্বজ রথে উঠে বসলেন এবং গুরুপুত্র অশ্বত্থামার অনুসরণ করলেন। দূর থেকেই অর্জুনকে প্রচণ্ড বেগে তাঁর দিকে আসতে দেখে ভয়ে অশ্বত্থামার প্রাণ উড়ে গেল। তিনি তখনই একটা রথে চড়ে প্রাণ রক্ষার জন্য দ্রুত পালাতে লাগলেন—রুদ্রের ভয়ে ব্রহ্মা একবার যেমন পালিয়েছিলেন। অশ্বত্থামার ঘোড়াগুলো কিন্তু ক্লান্ত হয়ে পড়ল। তিনি বুঝতে পারলেন আর কোথাও পালিয়ে আশ্রয় নেওয়া যাবে না। তখন তিনি ঠিক করলেন এবার ব্রহ্মশির অস্ত্র প্রয়োগ করে আত্মরক্ষা করবেন। ১২-১৯

অস্ত্র ফিরিয়ে নেবার উপায় না জানলেও প্রাণ-সংশয় দেখে অশ্বত্থামা আচমন করে ধ্যানে বসলেন। তারপর ব্রহ্মশির অস্ত্রের সন্ধান করলেন। তখন চারদিক প্রচণ্ড তেজে পূর্ণ করে সেই ভয়ঙ্কর অস্ত্র ঝলসে উঠল। বিপদ দেখে অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বললেন, কৃষ্ণ, তুমি তো ভক্তের প্রতি কখনও ভয়ঙ্কর হও না, সংসারে দুঃখকষ্টে যারা সর্বদা জ্বলছে তাদের মুক্তির একমাত্র ভরসা তুমিই। তুমিই আদি পুরুষ, সাক্ষাৎ ভগবান এবং প্রকৃতিরও উর্ধ্বে। চিৎশক্তির দ্বারা মায়াকে দূর করে নিজ স্বরূপে আত্মাতে তুমি প্রতিষ্ঠিত। তুমিই নিজপ্রভাবে সংসারের মায়াবদ্ধ মানুষকে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ দান কর। পৃথিবীর ভারহরণের জন্য তোমার এই কৃষ্ণরূপে আবির্ভাব। তোমার ওপর যাদের অনন্যা ভক্তি আর যারা তোমার নিজের লোক তারা তোমাকে অনুক্ষণ ভজনা করে। দেবাদিদেব, এই ভয়ঙ্কর তেজোরাশি কোথা থেকে এল তা আমি বুঝতে পারছি না। সর্বদিক ব্যাপ্ত করে জ্বলন্ত তেজ এগিয়ে আসছে। ২০-২৬

তখন শ্রীকৃষ্ণ বললেন, সখা, এটি ব্রহ্মাস্ত্র। ফিরিয়ে নেবার উপায় না জেনেও অশ্বত্থামা প্রাণভয়ে ভীত হয়ে এই অস্ত্র প্রয়োগ করেছে। এই ব্রহ্মাস্ত্র নিবারণের অন্য কোনও অস্ত্র নেই। তুমি তো অস্ত্রজ্ঞ, তোমার নিজের ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করেই অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্রকে রোধ কর। ২৭-২৮

১ জনৈক রাজা, পাণ্ডবদের আদিপুরুষ।

সূত বললেন, বীরঘাতী ফাল্গুনি শ্রীকৃষ্ণের এই কথা শুনে জল নিয়ে আচমন করলেন এবং শ্রীকৃষ্ণকে প্রদক্ষিণ করে অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্রকে নিবারণ করবার জন্য নিজের ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করলেন। তখন দুই ব্রহ্মাস্ত্রের তেজ পরস্পর মিশে গিয়ে আকাশ পৃথিবী জুড়ে সূর্যের বহ্নি-বলয়ের মত সাংঘাতিক ভাবে জ্বলতে লাগল। ও'দের দুজনের অস্ত্রের ত্রিলোকদাহী তেজে পুড়তে পুড়তে সকলে মনে করল বুঝি প্রলয়কাল উপস্থিত (কারণ কল্পান্তে একসঙ্গে দ্বাদশ আদিত্যের উদয়ে সব জ্বলে পুড়ে ছারখার হয়ে যায়)। জগতের নানা ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে বুঝে এবং সৃষ্টিনাশের আশংকা দেখে অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের অভিমত নিয়ে উভয় অস্ত্রই সংবরণ করলেন। তারপর ক্রোধে রক্তচক্ষু অর্জুন দৌড়ে গিয়ে গোতমীর পুত্র দুর্দান্ত অশ্বত্থামাকে ধরে যজ্ঞীয় পশুর ন্যায় দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেললেন। তারপর অর্জুন যখন তাকে পাণ্ডবশিবিরে নিয়ে যেতে উদ্যত হলেন তখন পদ্মলোচন কৃষ্ণ সক্রোধে বললেন, পার্থ, এই নীচ ব্যক্তি রাত্রে ঘুমন্ত নিষ্পাপ বালকদের হত্যা করেছে। তোমার পক্ষে এই ব্রাহ্মণাধমকে আর এক মুহূর্তও বাঁচিয়ে রাখা উচিত হবে না। তুমি ওকে বধই কর। যাঁরা বীর এবং ধার্মিক তাঁরা মত্ত, প্রমত্ত, উন্মত্ত, ঘুমন্ত, বালক, স্ত্রীলোক, জড়বুদ্ধি, রথহীন, সন্ত্রস্ত ও শরণাগত শত্রুকে কখনও হত্যা করেন না। কিন্তু যে লোক নিষ্ঠুর, খলস্বভাব, পরের হিংসা করে নিজের শ্রীবৃদ্ধি করতে চায় তাকে হত্যা করাই শ্রেয়; কারণ মৃত্যুই তার প্রায়শ্চিত্ত। তা না হলে পাপের ফলে তাকে নরকে যেতে হয়। এর উপরেও কথা আছে। আমি শুনেছি তুমি পাঞ্চালীর কাছে প্রতিজ্ঞা করেছ যে, যে তার ছেলেদের হত্যা করেছে তার মুণ্ড এনে তাকে উপহার দেবে। সুতরাং এই আত্মীয়-বন্ধুঘাতী মহাপাতককে তুমি হত্যা কর। এই কুলাঙ্গার নিজের পাপকাজের দ্বারা শুধু যে আমাদের অনিষ্ট করেছে তা নয়, তার প্রভু দুর্যোধনেরও অপ্রিয়সাধন করেছে। ২৯-৩৯

সূত বললেন, এ কথাগুলো শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে তাঁর ধর্মজ্ঞান পরীক্ষা করবার জন্যই বলেছিলেন। কিন্তু অর্জুন গুরুপুত্রকে হত্যা আর আত্মহত্যা করা একই মনে করে অশ্বত্থামাকে হত্যা করতে চাইলেন না। তারপর কৃষ্ণচালিত রথে করে অর্জুন অশ্বত্থামাকে নিয়ে পাণ্ডবশিবিরে এসে রোরুদ্যমানা দ্রৌপদীর নিকট অশ্বত্থামাকে সমর্পণ করলেন। জন্তুর ন্যায় রজ্জুবদ্ধ, লজ্জায় নতশির, মহা-ক্ষতিকারক গুরুপুত্রকে দেখে দ্রৌপদীও নারীসুলভ দয়ার বশবর্তী হয়ে অশ্বত্থামাকে প্রণাম করলেন। অশ্বত্থামার রজ্জুবন্ধন সহ্য করতে না পেরে কৃষ্ণা অর্জুনকে বললেন, এই ব্রাহ্মণ আমাদের পূজ্য, এ'কে ছেড়ে দেওয়া হোক। যাঁর কৃপায় তুমি গূঢ় মন্ত্র এবং তৎসহ ধনুর্বেদ ও অন্যান্য অস্ত্রের প্রয়োগ ও উপসংহার বিষয়ে জ্ঞানলাভ করেছ, সেই দ্রোণাচার্যই পুত্ররূপে এখানে এসেছেন। তাছাড়া, তাঁর অর্ধাঙ্গিনী কৃপীও জীবিত, তিনি বীরপুত্র-জননী বলেই সহমরণে যান নি। তাই আপনাদের পরম পূজ্য এই গুরুবংশের কোনরূপ ক্ষতি করা অনুচিত। আপনি ধর্মজ্ঞ, আপনাকে অধিক বলার কিছু নেই। প্রভু, পুত্রহারা হয়ে আমি তো কাঁদছিই, এ-দুঃখ যেন আর এ'র জননী পতিব্রতা গোতমীকে ভোগ করতে না হয়! যে ক্ষত্রিয়রাজ আত্মজয়ী না হয়ে ব্রাহ্মণদের ক্রুদ্ধ করেন, কুপিত ব্রাহ্মণকুলের অভিশাপে সেই রাজকুল শীঘ্রই সপরিবারে দুঃখানলে জ্বলতে থাকে। সূত বললেন, দ্বিজগণ, ধর্মপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির রানী দ্রৌপদীর এই ন্যায়সঙ্গত ধর্মজ্ঞানপূর্ণ, সকরুণ, অকপট, উদার ও মহৎ উক্তিকে সানন্দে অভিনন্দন জানালেন। ৪০-৪৮

নকুল, সহদেব, সাত্যকি, অর্জুন, শ্রীকৃষ্ণ প্রমুখ পুরুষেরা এবং অন্যান্য যে সব স্ত্রীলোকেরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন তাঁরা সকলেই দ্রৌপদীকে প্রশংসা করলেন।

কিন্তু ভীম রেগে গিয়ে বললেন, যে দুরাত্মা তার প্রভু দুর্যোধনকে সন্তুষ্ট করার জন্য বিনা দোষে ও বিনা কারণে ঘুমন্ত শিশুদের বধ করল, তাকে হত্যা করাই তো মঙ্গল। চতুর্ভুজ শ্রীকৃষ্ণ ভীম এবং দ্রৌপদীর কথা শুনে বন্ধু অর্জুনের মুখের দিকে চেয়ে একটু হেসে বললেন, অর্জুন, ব্রাহ্মণ অবধ্য, কিন্তু আততায়ী বধের যোগ্য, এই উভয় বিধানই আমি দিয়েছি। এখন তুমি এই দুটো নির্দেশই পালন কর। প্রিয়তমা দ্রৌপদীকে সান্ত্বনা দিতে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছ তা রক্ষা কর; আর ভীমসেন, পাঞ্চালী এবং আমারও যাতে সন্তুষ্টি হয় তাও কর। ৪৯-৫৪

সূত বললেন, তখন অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের আন্তরিক ইচ্ছা বুঝতে পেরে অশ্বত্থামার চুলশুদ্ধ তার মাথার মণিটা খড়্গ দিয়ে কেটে নিলেন। আগেই শিশু পাণ্ডবদের হত্যা করার জন্য অশ্বত্থামা লজ্জায় ম্লান হয়ে গিয়েছিল, এখন মাথার মণি হারিয়ে তার সমস্ত তেজ নষ্ট হয়ে গেল। তখন পাণ্ডবরা তার বাঁধন খুলে তাকে ওখান থেকে দূর করে দিলেন। মস্তক মুণ্ডন, সম্পত্তি অধিকার আর নির্বাসনই ব্রাহ্মণাধমদের পক্ষে প্রাণদণ্ডের মত। তাই এই তিন প্রকার শাস্তি ছাড়া ব্রাহ্মণদের দৈহিক বধদণ্ড নেই। এবার দ্রৌপদীর সঙ্গে শোকাতুর পাণ্ডবেরা মৃত আত্মীয়বর্গের ঔর্ধ্বদেহিক ক্রিয়া সম্পন্ন করলেন। ৫৫-৫৮

অষ্টম অধ্যায়

উত্তরার গর্ভরক্ষা

সূত বললেন, মৃত আত্মীয়-স্বজনদের জলদান এবং তাঁদের তৃপ্তির উদ্দেশ্যে তর্পণ করবার জন্য মহিলাদের সামনে নিয়ে পাণ্ডবরা দ্রৌপদীর সঙ্গে গঙ্গার দিকে চললেন। সেখানে স্নান তর্পণ শেষ হলে সকলেই খুব বিলাপ করলেন। তারপর সবাই ভগবানের চরণপদ্মের পরাগে পবিত্র গঙ্গার জলে আবার উত্তমরূপে স্নান সেরে জল থেকে উঠে এলেন। সেই গঙ্গাতীরে ভ্রাতাদের সঙ্গে কুরুরাজ যুধিষ্ঠির, ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, কুন্তী আর দ্রৌপদী শোকার্ত হৃদয়ে এসেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ মুনিদের সঙ্গে একত্রিত হয়ে এইসব বন্ধুহারা শোকসন্তপ্ত ব্যক্তিদের এই বলে সান্ত্বনা দিলেন যে, কালের করালগ্রাস কেউই রোধ করতে সমর্থ নয়। ১-৪

ধূর্ত দুর্যোধনাদি যে রাজ্য হরণ করেছিল শ্রীকৃষ্ণ এইভাবে তা অজাতশত্রু যুধিষ্ঠিরকে ফিরিয়ে দিলেন। দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণে যে দুষ্টরাজাদের আয়ুক্ষয় হয়েছিল তাদের হত্যা করালেন। তারপর যুধিষ্ঠিরকে দিয়ে তিনটি উৎকৃষ্ট অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রের মতন যুধিষ্ঠিরের পবিত্র যশ দিকে দিকে ছড়িয়ে দিলেন। ৫-৬

তারপর একদিন বিদায়ের পালা এল। সাত্যকি ও উদ্ধবের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ বেদব্যাস প্রভৃতি ব্রাহ্মণদের প্রণাম জানালেন। তাঁরাও এঁদের যথেষ্ট প্রতিসম্মান করলেন। সবশেষে পাণ্ডবদের আমন্ত্রণ জানিয়ে শ্রীকৃষ্ণ সবে রথে বসেছেন এমন সময় তিনি দেখতে পেলেন যে ভয়বিহ্বলা উত্তরা ওঁর দিকে ছুটে আসছেন। ছুটতে ছুটতেই উত্তরা বলছিলেন, হে মহাযোগী দেবাদিদেব জগৎপ্রভু, বাঁচান। আপনাকে ছাড়া এ সংসারে অন্য কাউকে নিরাপদ আশ্রয় বলে আমি ভরসা করতে পারি না। এখানে প্রত্যেকেই অন্যের মৃত্যুর কারণ।[১] প্রভু, জ্বলন্ত লোহার মত এক তীর আমার

১ মানুষে মানুষে হানাহানি জগৎ-সংসারের বৈশিষ্ট্য।

দিকে ছুটে আসছে। নাথ, ঐ তীর আমাকে যথেচ্ছ দগ্ধ করুক, কিন্তু আমার গর্ভ যেন নাশ না করে। ৭-১০

সূত বললেন, উত্তরার এই কথা শুনে ভক্তবৎসল ভগবান বুঝতে পারলেন যে অশ্বত্থামা এই ব্রহ্মাস্ত্রে পৃথিবীকে নিষ্পাণ্ডব করতে চাইছে। মুনিশ্রেষ্ঠ, পাণ্ডবরা যখন দেখলেন যে পাঁচটি জ্বলন্ত তীর তাঁদের দিকে ছুটে আসছে তাঁরাও সেই মুহূর্তে অস্ত্র ধারণ করলেন। তাঁর একান্ত ভক্ত পাণ্ডবদের বিপদ দেখে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সুদর্শন চক্র দিয়ে তাঁদের রক্ষা করলেন। তারপর সর্বভূতাত্মা যোগেশ্বর হরি কুরুবংশের সন্তান রক্ষার জন্য নিজের মায়া বিস্তার করে উত্তরার গর্ভে প্রবেশ করে তাকে আবৃত করলেন। যদিও ব্রহ্মশির অস্ত্রটি অমোঘ এবং অপ্রতিরোধ্য, তবুও বিষ্ণুতেজে তা শান্ত হয়ে গেল। এ ব্যাপারটা আপনারা আশ্চর্যের বলে মনে করবেন না। সকল আশ্চর্যের আকরই তো ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। তিনিই মায়ার সাহায্যে এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় ঘটাচ্ছেন। তিনি নিজে কিন্তু অজ, নিত্য আর শাশ্বত। ১১-১৬

এইভাবে ব্রহ্মতেজে সন্তানরা রক্ষা পেলে তাঁদের ও দ্রৌপদীকে সঙ্গে নিয়ে কুন্তী এগিয়ে এসে প্রস্থানোন্মুখ শ্রীকৃষ্ণকে বললেন, ভগবান, আপনাকে আমি প্রণাম করি। আপনি সেই আদি পুরুষ, আপনি প্রকৃতির থেকে শ্রেষ্ঠ, আপনিই ঈশ্বর। সকল প্রাণীর ভিতরে ও বাইরে থেকেও আপনি সবার অদৃষ্ট। মায়া-যবনিকায় আচ্ছন্ন অজ্ঞ প্রাণীরা আপনাকে দেখতে পায় না। আপনার ক্ষয় নেই, আপনি বাক্য ও মনের অতীত। লোকেরা দেহকে পরমাত্মা মনে করে বলে আপনি সবার অলক্ষিত। তাদের এই ভাব অজ্ঞের পক্ষে কুশলী নটকে না বুঝতে পারার মত। জ্ঞানী শুদ্ধচিত্ত যোগীরাও আপনাকে দেখতে পান না। আমরা স্ত্রীলোক হয়ে কি করেই বা আপনাকে দেখব? অতএব কৃষ্ণ, বাসুদেব, আপনাকে নমস্কার। দেবকীনন্দন, নন্দগোপের পুত্র, গোবিন্দ, আপনাকে প্রণাম। আপনি পদ্মনাভ, আপনার গলায় সুন্দর পদ্মের মালা শোভমান, আপনাকে নমস্কার। পদ্মলোচন, আপনার পাদপদ্মে বারংবার নমস্কার। ১৭-২২

হে হৃষীকেশ, দুরাত্মা কংস অনেকদিন ধরে দেবকীকে কারাগারে আটকে রেখে দুঃখ দিয়েছিল। সেই দেবকীকে আপনি মুক্তি দিয়েছিলেন। কিন্তু সে তো একবার। আমার আর আমার ছেলেদের রাশিরাশি বিপদ থেকে কতবারই তো আপনি রক্ষা করলেন। হে হরি, বিষ থেকে[১], আগুনের কুণ্ড থেকে[২], রাক্ষসের হাত থেকে[৩], অসৎসভা থেকে[৪], বনবাসের কষ্ট থেকে[৫], কত যুদ্ধে মহারথীদের কত সাংঘাতিক অস্ত্র থেকে[৬], আর এই মাত্র অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্র থেকে আপনি আমাদের রক্ষা করেছেন। হে জগদ্‌গুরু, এই জন্যই তো বলি যে সুখের সময়ও আমাদের ঐ সব বিপদ নিয়তই হোক, কেননা তাহলেই বারবার আপনার দর্শন পেয়ে আমাদের পুনর্জন্ম নাশ হবে। কৌলীন্য-ঐশ্বর্য-পাণ্ডিত্য-শ্রীগর্বে অহংকারী লোকেরা আপনাকে ডাকতেও পারে না। আপনি যে অকিঞ্চনের ধন, যার কিছু নেই তাকেই কোলে নেন। তাই, অকিঞ্চনের ঐশ্বর্য, আপনাকে প্রণাম করি। আপনাতেই ত্রিগুণের নিবৃত্তি, আপনি পরমাত্মস্বরূপ, শান্ত মোক্ষাধিপতি, আপনাকে বারংবার নমস্কার। ২৩-২৭

---

১ বালক ভীমকে বিষ খাওয়ান। ২ জতুগৃহদাহ। ৩ বকরাক্ষসের উৎপাত। ৪ সভার ভেতর দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ। ৫ পাশাখেলায় হেরে চোদ্দ বছরের বনবাস। ৬ কর্ণের একাঘ্নি বাণের প্রয়োগ, আর এরকম অন্য ঘটনা।

কৃষ্ণ, আপনি মহাকাল, আপনি ঈশান, অনাদিনিধন পরমব্রহ্ম—এইরূপেই আপনাকে আমি চিনি। ভগবান, আপনি যে কি উদ্দেশ্যে মনুষ্যরূপ ধারণ করে তাদের অনুকরণ করেন তা কেউ জানে না। আপনি কাউকে ভালবাসেন না, বা কাউকে দ্বেষ করেন না, অথচ লোকে বলে কেউ কেউ আপনার অনুগ্রহভাজন, আর কেউ কেউ আপনার নিগ্রহভাজন। পরমাত্মা অকর্তা, কিন্তু সেই জন্মরহিত বিশ্বাত্মার তির্যগ্‌যোনিতে, নরকুলে এবং জলজন্তু মধ্যে যে জন্ম এবং কর্ম তার অর্থ বোঝা আমাদের পক্ষে দুঃসাধ্য। স্বয়ং ভয়ও আপনাকে দেখে ভয় পায়। কিন্তু সেই আপনি, দধিভাণ্ড ভাঙাতে গোপভার্যা যশোদা যখন আপনাকে বাঁধার জন্য রজ্জুহস্তে এলেন, তখন অঞ্জনধৌত সাশ্রুনয়নে ভয়-ভাবনায় মুখ নিচু করে রইলেন। সেই সময় আপনার সেই রূপের কথা চিন্তা করে আমি বিমুগ্ধ হই। কেউ কেউ বলেন, চন্দন যেমন মলয়াদির সুযশের জন্য উৎপন্ন হয়, তেমনি পুণ্যশ্লোক, প্রিয় যুধিষ্ঠিরের যশোবিস্তারের জন্য আপনি জন্মরহিত হলেও যদুবংশে জন্ম নিয়েছেন। ২৮-৩২

আবার কেউ কেউ বলেন, পূর্বজন্মে সুতপা ও পৃশ্নিরূপে বসুদেব আর দেবকী আপনাকে চেয়েছিলেন বলে ও'দের মঙ্গলের জন্য, আর দেবশত্রু অসুরদের ধ্বংসের জন্য আপনি জন্ম নেন। অপরেরা বলেন, পৃথিবী যখন সমুদ্রে নৌকার মত ভয়ানকভাবে টলমল করছিল তখন ব্রহ্মার প্রার্থনায় সেই ভার মোচনের জন্যই আপনি জন্মগ্রহণ করেন। আবার কেউ কেউ বলেন, এই সংসারে অবিদ্যা[১], কামনা, কর্ম প্রভৃতিতে সর্বদা পীড়িত মানুষেরা আপনার কীর্তির কথা শুনে আর স্মরণ করে উদ্ধার পাবে, সেইজন্য সেই কীর্তি-কর্ম সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যেই আপনি জন্ম নেন। যে সব লোক বারবার আপনার চরিতকথা শোনে, গান করে, পাঠ করে, আপনাকে স্মরণ করে, আর প্রশংসা করে তারা শীঘ্রই আপনার চরণপদ্ম লাভ করে সংসার-সাগর থেকে উদ্ধার পায়। প্রভু, আপনি নিজেই নিজের কর্ম সৃষ্টি করেন। আমরা অন্যান্য রাজাদের দুঃখ দিয়েছি, আমাদের তো আপনার শ্রীচরণ ছাড়া গতি নেই; আজ কেন আপনার সুহৃদ ও শরণাগতদের ছেড়ে চলে যাচ্ছেন? ৩৩-৩৭

জীবাত্মা না থাকলে ইন্দ্রিয়গ্রামের যেমন কোনও অর্থ হয় না, কারণ তাদের কাজ দেখাবার কেউ থাকে না, তেমনি আপনি চলে গেলে খ্যাতি আর সমৃদ্ধির অধিকারী যদুবংশীয় বন্ধুদের এবং পাণ্ডবদের কথা কে জিজ্ঞাসা করবে? তারা অতি হীন ও তুচ্ছ হয়ে পড়বে। গদাধর, আমাদের এখানকার মাটি ধ্বজ, বজ্র, অংকুশ খচিত আপনার পায়ের চিহ্নে শোভিত। আপনি চলে গেলে সেই শোভা আর থাকবে না। ৩৮-৩৯

আপনি এখানে বিরাজ করছেন বলেই এখানকার ওষধি, লতা-গুল্ম, বন-পাহাড়, নদ-নদী প্রভৃতি যত কিছু এই দেশকে সমৃদ্ধিশালী করছে তাদের সম্যক বৃদ্ধি ও পুষ্টি হচ্ছে। তাই, হে বিশ্বেশ্বর, বিশ্বাত্মা, বিশ্বমূর্তি শ্রীকৃষ্ণ, যে দৃঢ় স্নেহপাশ পাণ্ডু আর বৃষ্ণিবংশকে (যদুবং[illegible] [illegible] বেঁধেছে তাকে ছিন্ন করেই আপনাকে যেতে হবে। মধুমতি, গঙ্গার জল যেমন [illegible] গতিতে সমুদ্রে গিয়ে পড়ে তেমনই আমার অনন্যা ভক্তি নিরবচ্ছিন্ন ধারায় আপনারই প্রতি ধাবিত হোক। হে বৃষ্ণি-কুলপ্রদীপ অর্জুনসখা শ্রীকৃষ্ণ, আপনি পৃথিবীর ক্ষতিকারক রাজন্যবর্গের ধ্বংসবিধান

১ অজ্ঞান, মায়া।

করেও অক্ষয়বীর্য। হে গোবিন্দ, দেবদ্বিজের দুঃখমোচনের জন্যই আপনি অবতাররূপে ধারণ করেন। হে যোগেশ্বর, বিশ্বগুরু, ভগবান, আপনাকে নমস্কার। ৪০-৪৩

সূত বললেন, কুন্তী এরকম মধুর বাক্যে মহিমা-কীর্তন করলে পরম করুণায় সকলকে মুগ্ধ করেই যেন শ্রীকৃষ্ণ মৃদু হাসলেন। তারপর কুন্তীর প্রার্থনা স্বীকার করে যাদবনন্দন হস্তিনাপুরে প্রবেশ করলেন। সেখানে অন্তঃপুরের মহিলাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে শ্রীকৃষ্ণ যাত্রার উদ্যোগ করলেন। এমন সময় রাজা যুধিষ্ঠির এসে ভক্তিভরে তাঁকে নিবারণ করে আরো কিছুদিন থেকে যাবার জন্য অনুরোধ করলেন। ব্যাস প্রভৃতি মুনিরা ইতিহাস থেকে উদাহরণ দিয়ে ভাল করে বোঝান সত্ত্বেও শোকসন্তপ্ত যুধিষ্ঠির কিছুতেই যেন সান্ত্বনা পাচ্ছিলেন না। এমন কি কৃষ্ণের বাক্যও বিফল হল। অবিবেকের[১] প্রভাবে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের আত্মা তখন স্নেহ-মোহে বশীভূত। তাই স্বজনদের হত্যার কথা স্মরণ করে তিনি বললেন, আমি কি দুরাত্মা! অজ্ঞান আমাকে অধিকার করে রেখেছে। শৃগাল কুকুরের খাদ্য এই দেহের জন্য কিনা আমি এত অক্ষৌহিণী সৈন্য হত্যা করলাম। আরও কত বালক-ব্রাহ্মণ-সুহৃদ-মিত্র-পিতৃব্য-ভাই-গুরুকে আমি বধ করেছি। এই পাপে লক্ষ বছর নরক ভোগ করেও আমার মুক্তি হবে না। ধর্মযুদ্ধে শত্রুদের হত্যা করলে পাপ হয় না, শাস্ত্রের এই নির্দেশ প্রজাপালক রাজাদের পক্ষেই খাটে, আমার মত রাজ্যলোলুপের পক্ষে নয়। যুক্তিতর্ক অনুসরণ করলে এই সিদ্ধান্তেই আসতে হয়। আমি আমার চার পাশে সেই সব লোকদের দেখছি যাদের বন্ধুদের আমি হত্যা করেছি, সেইসব স্ত্রীলোকদের দেখছি যাদের স্বামীকে আমি বধ করেছি। এই পাপ দূর করার জন্য গার্হস্থ্যাশ্রমের যে সব কাজের বিধি রয়েছে তা পালন করার সামর্থ্যও আমার নেই। পঙ্কিল জলকে যেমন পাঁক দিয়ে পরিষ্কার করা যায় না বা সুরা-স্পর্শে যা অশুচি তাকে সুরা দিয়ে শুদ্ধ করা যায় না, তেমনি যে যজ্ঞে বহু প্রাণীকে হত্যা করতে হয় তা দিয়ে এত সব নরহত্যার পাপ থেকে মুক্ত হওয়া অসম্ভব। ৪৪-৫২

নবম অধ্যায়

ভীষ্ম সমীপে পাণ্ডবগণ

সূত বললেন, এইভাবে নরহত্যার পাপবোধে অত্যন্ত পীড়িত হয়ে যুধিষ্ঠির প্রকৃত ধর্মের জ্ঞানলাভের জন্য কুরুক্ষেত্রের যেখানে মহাবীর দেবব্রত শয়ান ছিলেন সেখানেই গিয়ে উপস্থিত হলেন। তাঁর ভ্রাতারা সকলে, ব্যাস, ধৌম্য প্রমুখ ব্রাহ্মণেরাও উত্তম অশ্বযুক্ত স্বর্ণখচিত রথে চড়ে যুধিষ্ঠিরকে অনুসরণ করলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণও চললেন অর্জুনকে সঙ্গে নিয়ে। সবাই যখন এভাবে যুধিষ্ঠিরকে ঘিরে চললেন তখন তাঁকে দেখে মনে হল যেন গুহ্যক[২] পরিবেষ্টিত ধনরাজ কুবের চলেছেন অমরাবতীর পথে। সেখানে এসে তাঁরা দেখলেন, মহান কুরুবৃদ্ধ পিতামহ স্বর্গভ্রষ্ট দেবতার মতই ধূলিশয্যায় শায়িত রয়েছেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সবান্ধব পাণ্ডবেরা তাঁকে প্রণাম করলেন। ১-৪

হে সজ্জনোত্তম, ভরতবংশের গৌরব মহাবীর ভীষ্মকে দেখবার জন্য ব্রহ্মর্ষি,

১ সদসদ্ বিবেচনার অভাবজনিত।

২ এক ধরনের দেবযোনি। এঁরা থাকেন পিশাচলোকের উঁচুতে, আর গন্ধর্বলোকের নিচে।

দেবর্ষি আর রাজর্ষিরাও সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন। পর্বত, নারদ, ধৌম্য, ব্যাস, বৃহদশ্ব, ভরদ্বাজ, সশিষ্য পরশুরাম, বশিষ্ঠ, ইন্দ্রপ্রমদ, ত্রিত গৃৎসমদ, অসিত, কাক্ষীবান, গৌতম, অত্রি, কৌশিক, সুদর্শন —এঁরা সব তো ছিলেনই, আরও ছিলেন শুকদেব প্রমুখ অন্যান্য শুদ্ধাত্মা মুনিরা। কাশ্যপ, আঙ্গিরস আর অন্যান্য ঋষিরাও তাঁদের শিষ্যদের সঙ্গে নিয়ে ভীষ্মকে দেখবার জন্য সেখানে গিয়েছিলেন। ধর্ম ও দেশকালের বিভাগ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ বসুদের[১] মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহাত্মা ভীষ্ম সেইসব বিশিষ্ট অতিথিদের উপস্থিত দেখে তাঁদের উপযুক্ত সমাদর জানালেন। সর্বদা ভক্তদের হৃদ্‌গত নিজ মায়ায় দেহধারী জগদীশ্বর কৃষ্ণ বসলে দেবব্রত তাঁকেও স্বাগত জানালেন। কৃষ্ণের মহিমার কথা তিনি জানতেন। ৫-১০

ভীষ্মের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তিবশত পাণ্ডবেরা তাঁর খুব নিকটে সবিনয়ে বসলেন। তাঁদের প্রতি স্নেহবশে ভীষ্মের চোখে জল এসে গেল। তিনি আর তখন কিছু দেখতে পাচ্ছিলেন না। তারপর তিনি তাঁদের বললেন, এটা খুবই কষ্টের কথা আর অন্যায়ও বটে যে তোমরা ব্রাহ্মণ্যধর্ম এবং শ্রীকৃষ্ণকে আশ্রয় করেও এত দুঃখ পাচ্ছ। এভাবে বেঁচে থাকা অর্থহীন। মহাবীর পাণ্ডু যখন মারা গেলেন তোমরা তখন খুবই ছোট। বধূ কুন্তী তখন তোমাদের জন্য বারবার অনেক দুঃখ ভোগ করেছেন। তোমাদের এই সব দুঃখ কালবশেই এসেছে বলে মনে করি। মেঘরাশি যেমন বায়ুর নিয়ন্ত্রণাধীন, প্রাণীরাও তেমনি মহাকালের অধীন। কালই সব কিছুর কারণ। আমার আশ্চর্য বোধ হয় এই ভেবে যে যেখানে রাজা হলেন ধর্মরাজ, আর তাঁর সঙ্গে রয়েছে গদাধারী ভীম, অর্জুনের মত ধনুর্ধর, গাণ্ডীবের মত ধনুক, কৃষ্ণের মত বন্ধু—সেখানেও কিনা বিপদ! ১১-১৫

মহারাজ যুধিষ্ঠির, শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রায় বোঝা কারও সাধ্য নয়। পণ্ডিতেরা অনেক বিচার করেও তাঁর মনোগত ইচ্ছার কোনও কূলকিনারা পান না। তাই সংসারের সুখ-দুঃখ সবই ভগবানের অধীন ধরে নিয়ে, শ্রীকৃষ্ণকেই অনুসরণ করে অনাথ প্রজাদের পালন কর। কৃষ্ণই সাক্ষাৎ ভগবান, আদিপুরুষ নারায়ণ বিরাট সৃষ্টিযজ্ঞের হোতা। কিন্তু তিনি মায়া দ্বারা সকলকে মুগ্ধ করে গূঢ়ভাবে যদুবংশে বিরাজ করছেন। শ্রীকৃষ্ণের গোপনীয়তম অভিলাষ শুধু মহেশ্বর শিব, দেবর্ষি নারদ আর সাক্ষাৎ ভগবান কপিলই জানেন। এঁকেই তুমি মাতুলপুত্র, প্রীতির পাত্র, মিত্র, শ্রেষ্ঠ বন্ধু বলে মনে কর, আর সেই জন্যই প্রীতিবশত তুমি এঁকে সচিব, দূত, আবার সারথিও করেছ। শ্রীকৃষ্ণ সকলের মধ্যেই রয়েছেন, সকলের ওপরই তাঁর সমান দৃষ্টি। ইনি অদ্বিতীয়, অহংকার-রাগ-দ্বেষশূন্য, উৎকর্ষ ও অপকর্ষ বিচারে কোনও বৈষম্য সৃষ্টি করেন না। এই রকম হয়েও আমার মত একান্ত ভক্তের ওপর তাঁর কত দয়া একবার দেখ। আমার এই দেহত্যাগের মুহূর্তে সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ কৃষ্ণ আমাকে দর্শন দিতে এসেছেন। ভক্তিভরা মন নিয়ে তাঁর নাম কীর্তন করে যে যোগী দেহত্যাগ করেন তাঁর সংসারের বাঁধন চিরকালের মত কেটে যায়। প্রসন্নবদন পদ্মপলাশলোচন চতুর্ভুজ কৃষ্ণ যোগীদের ধ্যানের মধ্যেই আবির্ভূত হন। সেই দেবাদিদেব ভগবান আজ আমার চোখের সম্মুখে উপস্থিত। আমি যতক্ষণ না দেহত্যাগ করি ততক্ষণ তিনি যেন অপেক্ষা করেন। ১৬-২৪

সূত বললেন, এই কথা শুনে যুধিষ্ঠির শরশয্যায় শায়িত ভীষ্মকে নানা ধর্মকথা

---

[১] বসুরা আটজন—ধ্রুব, আপ, সোম, বিষ্ণু (ধব), অনল, অনিল, প্রত্যূষ, প্রভাস। ভীষ্ম হলেন অষ্টম বসু। বসুরা এক ধরনের গণদেবতা।

জিজ্ঞাসা করলেন। ঋষিরা সেইসব কথা শুনতে লাগলেন। বৈরাগ্যযুক্ত নিবৃত্তিলক্ষণ, আসক্তিযুক্ত প্রবৃত্তিলক্ষণ, সাংসারিক মানুষের বর্ণানুক্রমিক[১] আশ্রমধর্মের[২] কথা, দানধর্ম, রাজধর্ম, স্ত্রীধর্ম, মোক্ষধর্ম, ভগবদ্ধর্ম[৩] —সংক্ষেপে ও বিশদভাবে এবং নানা উপায় সহযোগে ধর্মার্থকামমোক্ষের কথা সর্বতত্ত্ববিৎ ভীষ্ম নানা আখ্যান আর ইতিহাসের উদাহরণ দিয়ে যথাযথ বলে গেলেন। এই সব নানা ধর্মের কথা বলতে বলতে যোগীদের ইচ্ছামৃত্যুর বাঞ্ছিত সময় উত্তরায়ণ কাল এসে গেল। তখন সহস্র-রথিনায়ক মহাবীর ভীষ্ম তাঁর কথা বন্ধ করলেন। যোগাবলম্বন করে তিনি চোখ বুজলেন। সম্মুখে আসীন পীতাম্বর, চতুর্ভুজ, আদিপুরুষ শ্রীকৃষ্ণে তিনি তাঁর আসক্তিহীন মন সমর্পণ করলেন। এইভাবে বিশুদ্ধ ধারণায় কৃষ্ণরূপে চিত্ত তন্ময় হয়ে গেলে তাঁর মায়ামোহ দূর হল। ভগবানের কৃপায় তাঁর শরশয্যার উপশম হল; সমস্ত ইন্দ্রিয়ের কাজ স্তব্ধ হয়ে গেল। তখন দেহ-বিসর্জনের নিমিত্ত তিনি শ্রীকৃষ্ণের স্তব করতে আরম্ভ করলেন। ২৫-৩১

ভীষ্ম বললেন, যে ভগবান নিষ্ক্রিয় স্বরূপেই সর্বদা বিরাজ করেন, অথচ কখনও কখনও ক্রীড়াচ্ছলে প্রকৃতিকে অবলম্বন করেন, আর তা থেকে বেরিয়ে আসে বিরাট সৃষ্টিপ্রবাহ, সেই মহাবৈষ্ণব, পূর্ণরূপ ভগবানে আমার সংসারবিতৃষ্ণ মন নিবেদন করলাম। ত্রিভুবনসুন্দর, তমালবর্ণ, পীতাম্বরধারী, কুন্তলশোভিত পদ্মমুখ, দেহ-ধারী অর্জুনসারথি শ্রীকৃষ্ণে ফলাকাঙ্ক্ষারহিত আমার মন নিবিষ্ট হোক। মহাযুদ্ধের সময় আমার তীক্ষ্ণ তীরে শ্রীকৃষ্ণের বর্মাবৃত দেহও ক্ষতবিক্ষত হয়েছিল। যুদ্ধক্ষেত্রে ঘোড়ার খুরের আঘাতে যে রাশি রাশি ধূলি উড়ত, সেই ধূলিতে ওঁর কেশকলাপ ধূসর বর্ণে রঞ্জিত হত। ওঁর সুন্দর মুখে জমে উঠত বিন্দু বিন্দু ঘাম। শ্রীকৃষ্ণের সেই সুপরিচিত রূপেই আমার মন নিবন্ধ থাক। বন্ধু অর্জুনের কথা শুনেই শ্রীকৃষ্ণ তাঁর রথ কুরুপাণ্ডব সৈন্যদের মাঝখানে নিয়ে গিয়ে রেখেছিলেন।[৪] দৃষ্টি দ্বারাই তিনি যেন শত্রুসৈন্যদের আয়ু হরণ করেছিলেন। পার্থের এমন বন্ধু গোবিন্দে আমার প্রীতি চিরকাল নিবন্ধ থাক। সুসজ্জিত সৈন্যবাহিনীর নেতাদের দেখে এবং আত্মীয়-স্বজন হত্যা করা মহাপাপ একথা ভেবে অর্জুন যখন যুদ্ধ করতে চাইলেন না তখন শ্রীকৃষ্ণ আত্মার স্বরূপ বুঝিয়ে ধনঞ্জয়ের অজ্ঞান দূর করেছিলেন। এমন পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের চরণে চিরকাল আমার প্রীতি থাক। ৩২-৩৬

অর্জুনের রথের সারথিরূপে শ্রীকৃষ্ণ অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁর প্রতিজ্ঞা ছিল যুদ্ধে তিনি সাক্ষাৎ অংশগ্রহণ করবেন না, আমারও প্রতিজ্ঞা ছিল ওঁকে আমি যুদ্ধে প্রবৃত্ত করাব। আমার প্রতিজ্ঞাকেই সত্য করবার জন্য তিনি রথের চাকা হাতে নিয়ে, সিংহ যেমন হাতীকে মারবার জন্য ছুটে আসে, সেই ভাবে আমার দিকে ছুটে এসেছিলেন। তাঁর পায়ের ভারে পৃথিবী সেদিন কেঁপে উঠেছিল। তাঁর গায়ের উত্তরীয়ও খুলে পড়েছিল। সেই যুদ্ধে আমি তাঁর শত্রু ছিলাম। আমার সুতীক্ষ্ণ তীরের আঘাতে জর্জরিত হওয়াতে তাঁর সর্বাঙ্গ দিয়ে রক্ত ঝরছিল। মহাক্রোধে তিনি আমাকে হত্যা করতে ছুটে আসছিলেন, অর্জুনের কোন নিষেধই তিনি মানছিলেন

১ চার বর্ণ—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ক্রমে। গীতায় আছে—'চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম-বিভাগশঃ।' ৪।১৩

২ আশ্রম চারটি—ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। এই সকল আশ্রমে করণীয় আচার-আচরণাদি আশ্রমধর্ম নামে অভিহিত।

৩ ব্রত প্রভৃতি।

৪ দ্রষ্টব্য, ভগবদ্গীতা, ১।২১-২৫ শ্লোক।

না। এই মুকুন্দরূপ ভগবানই আমার গতি হোন। অর্জুনের রথের সারথি রূপে দুহাতে ঘোড়ার রাশ ধরে শ্রীকৃষ্ণ অপূর্ব শ্রী ধারণ করেছিলেন। তাঁর সেই রূপ দেখতে দেখতে যুদ্ধক্ষেত্রে যারা নিহত হয়েছিল তারা মোক্ষ লাভ করেছিল। আমার ওই রূপেই অচলা প্রীতি হোক। রসরাজ কৃষ্ণ ললিতগতি, মিষ্টহাসি আর সপ্রেম দৃষ্টি দিয়ে গোপবনিতাদের মান বৃদ্ধি করেছিলেন। তাঁরই গর্বে গর্বিতা হয়ে তাঁরাও তাঁর গিরি-গোবর্ধন ধারণাদি বহু অলৌকিক ক্রিয়া অনুসরণ করে কৃষ্ণসারূপ্য পেয়েছিলেন। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে বহু তেজস্বী মুনি আর রাজারা এসেছিলেন। সেই সভায় উপস্থিত থেকে শ্রীকৃষ্ণের কি শোভাই না দেখেছিলাম। এই সব অভ্যাগতদের সসম্মান অর্ঘ্য শ্রীকৃষ্ণ গ্রহণ করেছিলেন। সেই পরমাত্মা গোবিন্দ আজ আমার সম্মুখে উপস্থিত। এই জগদাত্মা বাসুদেব জন্মরহিত। প্রত্যেক মানুষের অন্তরে ইনি অন্তর্যামীরূপে অভিহিত। সূর্যদেব যেমন প্রত্যেকেরই চোখে প্রতিভাত হয়েও এক, সেইরূপ বহু অথচ এক এবং অদ্বিতীয় ভগবান, জন্মরহিত হয়েও স্বেচ্ছায় দেহধারণ করে শ্রীকৃষ্ণরূপে আমাব সম্মুখে রয়েছেন। আজ আমার অজ্ঞানের অন্ধকার দূর হয়ে গেছে। আজ আমি শ্রীকৃষ্ণকে বিশেষরূপেই পেয়েছি। ৩৭-৪২

এইভাবে ভীষ্মদেব মন ও ইন্দ্রিয়াদি সহযোগে নিজের আত্মাকে পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণে ন্যস্ত করলেন। এবার তাঁর প্রাণ দেহবিমুক্ত হল। ভীষ্ম নিরবয়ব পরমব্রহ্মে বিলীন হয়ে গেলেন বুঝতে পেরে, দিনান্তে পাখীরা যেমন নীরব হয়ে যায়, ঋষিরা সেইভাবেই স্তব্ধ হয়ে গেলেন। তখন দেবলোকে, মানবলোকে দুন্দুভির ধ্বনি হতে লাগল। অসূয়াশূন্য রাজন্যবর্গ ভীষ্মের প্রশংসা করতে লাগলেন। আকাশ থেকে পুষ্পবৃষ্টি হতে লাগল। যুধিষ্ঠির তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষ করে ক্ষণকাল শোকপ্রকাশ করলেন। মুনিরা গুহ্যনামের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের স্তবগান করতে লাগলেন। তারপর শ্রীকৃষ্ণকে অন্তরে ধারণ করে তাঁরা নিজ নিজ আশ্রমে ফিরে গেলেন। যুধিষ্ঠিরও কৃষ্ণকে সঙ্গে নিয়ে হস্তিনাপুরে ফিরে এসে ধৃতরাষ্ট্র এবং শোকসন্তপ্ত তপস্বিনী গান্ধারীকে সান্ত্বনা দিলেন। তারপর ধৃতরাষ্ট্রের অনুমতি নিয়ে, শ্রীকৃষ্ণের সম্মতিক্রমে মহারাজ যুধিষ্ঠির উত্তরাধিকার-সূত্রে পাওয়া পিতৃ-পিতামহের রাজ্য শাসন করতে লাগলেন। ৪৩-৪৯

দশম অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকায় গমন

শৌনক বললেন, ধার্মিকশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির ধনাপহারী শত্রুদের হত্যা করে কি রকম সংযত জীবন যাপন করছিলেন, ভাইদের নিয়ে কি ভাবে রাজ্যশাসন করলেন, আরও কি কি কাজ করলেন, সে সব কথা বলুন। সূত বললেন, সংসারপালক শ্রীহরি সর্বশক্তিমান। স্বজনবিরোধে নিহত কুরুবংশ-প্রদীপ পরীক্ষিতের প্রাণদান করে এবং যুধিষ্ঠিরকে নিজ রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করে তিনি খুব আনন্দ পেলেন। ভীষ্ম আর শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে যে ধর্মোপদেশ দিয়েছিলেন সে সব যুধিষ্ঠির মন দিয়ে শুনেছিলেন; তাতে তাঁর বিশুদ্ধ সত্ত্বজ্ঞান প্রকাশিত হয়েছিল। কৃষ্ণের আশ্রয় আর ভাইদের আনুকূল্য পেয়ে ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির সসাগরা পৃথিবীকে ইন্দ্রের মত পালন করতে লাগলেন। চাষীরা মেঘ থেকে ইচ্ছানুরূপ জল পেল, ধরিত্রী তাদের সব বাসনা পূর্ণ করল। গোঠে গোঠে দুগ্ধবতী

গাভীরা দুধ দিতে লাগল। নদী, সমুদ্র ভূমিকে সিক্ত করল, গিরিপর্বত উদ্ভিদে আবৃত হল। বনস্পতি, বৃক্ষরাজি, ওষধি প্রত্যেক ঋতুতেই ইচ্ছামত ফল দিতে লাগল। অজাতশত্রু যুধিষ্ঠির যেখানে রাজা সেখানে প্রজাদের আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক, এই তিন প্রকার দুঃখকষ্টই দূর হল। পাণ্ডবদের শোক দূর করবার জন্য আর ভগ্নী সুভদ্রাকে আনন্দ দেবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ হস্তিনাপুরে কয়েক মাস কাটিয়েছিলেন। তারপর তিনি যুধিষ্ঠিরের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তাঁকে অভিবাদন ও আলিঙ্গন করলেন; অন্য পাণ্ডবেরাও তাঁকে আলিঙ্গন করে অভিবাদন জানালেন। তারপর তিনি প্রস্থানোদ্দেশ্যে রথে গিয়ে বসলেন। গান্ধারী, ধৃতরাষ্ট্র, যুযুৎসু কৃপাচার্য, ভীষ্ম, ধৌম্য এবং সুভদ্রা, দ্রৌপদী, কুন্তী, উত্তরা, সত্যবতী প্রমুখ স্ত্রীলোকেরা আর নকুল ও সহদেব সবাই শার্ঙ্গপাণি শ্রীকৃষ্ণের বিরহ-বেদনা সহ্য না করতে পেরে মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। যাঁর সুন্দর যশোগান একবার শুনলেই সংসারাসক্তি এক মুহূর্তে দূর হয় সেই সজ্জনের সঙ্গ ত্যাগ করতে জ্ঞানী লোকেদের কোনও দিনই ইচ্ছা হয় না। যে পাণ্ডবরা শ্রীকৃষ্ণকে সর্বদা দেখেছে, তাঁকে মনপ্রাণ সমর্পণ করে একসঙ্গে থেকেছে, শুয়েছে, স্পর্শ করেছে, তাঁর সঙ্গে কথা বলেছে, আহার করেছে, তারা তাঁর বিরহ কি করেই বা সহ্য করবে? তাই শ্রীকৃষ্ণ যেদিকেই যেতে থাকলেন বিষণ্ণ পাণ্ডবরা নিমেষ-হীন দৃষ্টিতে দেখতে দেখতে সেই দিকেই যেতে লাগলেন। শ্রীকৃষ্ণ বাড়ি থেকে বের হলে কুলকামিনীগণ বহু কষ্টে অশ্রু সংবরণ করলেন যাতে তাঁর অমঙ্গল না হয়। ১-১৪

তখন চারদিকে মৃদঙ্গ শঙ্খ, ভেরী, দুন্দুভি, বীণা, ঢাক, শিঙা ও ধুধুরী বাজতে লাগল। অন্তঃপুরবাসী কুরু-মহিলারা শ্রীকৃষ্ণকে দেখবার জন্য বাড়ির ছাদে উঠে-ছিলেন। তাঁরা সপ্রেম সলজ্জ দৃষ্টিতে কৃষ্ণের উপর পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেন। কৃষ্ণপ্রিয় জিতনিদ্র অর্জুন প্রিয়তম বাসুদেবের মাথায় মুক্তার মালায় শোভিত শ্বেত-ছত্র ধরলেন, ছত্রের দণ্ড ছিল রত্নখচিত। উদ্ধব আর সাত্যকি সুন্দর একজোড়া চামর দিয়ে ব্যজন করছিলেন। পথে ছড়ান ছিল রাশি রাশি ফুল। সব মিলিয়ে যদু-পতি কৃষ্ণ মধুপতি বসন্তের মত দেখাচ্ছিলেন। যেখানে যেখানে কৃষ্ণ যেতে লাগলেন সেখানে সেখানে ব্রাহ্মণেরা তাঁকে আশীর্বাদ করতে লাগলেন। তিনি পরমানন্দস্বরূপ নির্গুণ ব্রহ্ম, তাই ঐ আশীর্বাদ তাঁর পক্ষে অনুপযুক্ত। আবার তিনি সগুণ মনুষ্যরূপ ধরেছিলেন বলে সেই আশীর্বাদ তাঁর উপর প্রযোজ্যও বটে। ১৫-১৯

শ্রীকৃষ্ণগতপ্রাণ কুল-ললনারা পরস্পর কৃষ্ণ সম্বন্ধে মনোরম আলোচনা করছিলেন। তাঁরা বলছিলেন, কৃষ্ণই তো সাক্ষাৎ ভগবান। ইনি ত্রিগুণ সৃষ্টির পূর্বেও ছিলেন বলে লোকে এঁকেই পুরাণপুরুষ বলে। আবার মহাপ্রলয়ের সময় তাঁতেই আদ্যাশক্তি মহামায়া লীন হয়ে যান, এই প্রপঞ্চময় জগৎ তাঁতেই সংহৃত হয়। আদিতে আর অন্তে ইনি এক ও অদ্বিতীয়, ইনিই আবার জীবের নাম রূপ উপাধি প্রকাশ করার জন্য মোহিনী প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। ইনিই নানা শাস্ত্র প্রণয়নের কারণ। সূক্ষ্মদর্শী ঋষিরা প্রাণায়াম-সংযম দ্বারা জিতেন্দ্রিয় হয়ে ভক্তিব্যাকুল পরিশুদ্ধ মন দিয়ে পরমপুরুষ বাসুদেবকেই দেখে থাকেন। তিনিই একমাত্র ঈশ্বর, যিনি লীলা-চ্ছলে এই জগৎকে সৃষ্টি, পালন আর ধ্বংস করেন। কিন্তু কিছুতেই আসক্ত হন না। বেদের গভীর তত্ত্বের মধ্যে গূঢ়তত্ত্বজ্ঞ ঋষিরা তাঁরই গুণগান করেছেন। যখনই রাজারা তমোগুণের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে অধর্ম পথে নিজেদের পোষণ করেন, তখনই জগতের মঙ্গলের জন্য বাসুদেব সত্ত্বগুণসম্পন্ন দেহ ধারণ করে যুগে যুগে নিজের ঐশ্বর্য, সত্য, সত্য-উপদেশ, দয়া আর অমল কীর্তি প্রকাশ করেন। আহা! পুণ্য দ্বারকা স্বর্গের গৌরবকেও ম্লান করেছে। ওখানকার লোকেরা ওঁর রাজ-

অনুগ্রহে পুষ্ট হয়ে নিত্য ওঁর প্রফুল্ল বদন দেখতে পায়। এঁর স্ত্রীরা নিশ্চয়ই ব্রত, দান ও যজ্ঞ দ্বারা ভগবানের আরাধনা করেছিলেন; তা না হলে এত ভগ্যবতী হ’ন কি করে? কারণ ওঁরা শ্রীকৃষ্ণের অধরসুধা বারংবার পান করেন। ব্রজের গোপিনীরা এঁর জন্যই পাগলের মত হয়ে উঠেছিলেন। এই শ্রীকৃষ্ণই নানা স্বয়ংবর সভায় চেদিরাজ প্রমুখ বলবান রাজাদের হারিয়ে দিয়ে নিজের বীর্যে যেসব রমণীদের বিবাহ করেন তাঁরা পরে প্রদ্যুম্ন, সাম্ব, অম্বসুতো প্রভৃতি সন্তানদের জননী হয়েছিলেন। পৃথিবী-পুত্র নরকাসুরকেও বধ করে ইনি কয়েক সহস্র নারীর পাণিগ্রহণ করেন। এই মহিলারাই স্বাতন্ত্র্যহীন, অপবিত্র নারীত্বকে মর্যাদা দিয়েছেন। পদ্মলোচন বাসুদেব কখনও এঁদের গৃহ থেকে চলে যান না, বরং নানা উপঢৌকন দিয়ে সর্বদাই এঁদের হৃদয় জয় করে থাকেন। ২০-৩০

সূত বললেন, মহিলারা যখন এসব কথা বলছিলেন তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের দিকে স্মিতহাস্যে দৃষ্টিপাত করছিলেন বলে তাঁদের খুব আনন্দ হচ্ছিল। যাতে পথে কোন বিপদ না ঘটে এই জন্য যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণের রক্ষার জন্য তাঁর সঙ্গে চতুরঙ্গ সেনা সাজিয়ে দিলেন। বিরহকাতর পাণ্ডবেরা তাঁর সঙ্গে সঙ্গে অনেক দূর পর্যন্ত এলেন। তারপর শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের ফিরে যেতে বলে উদ্ধবাদির সঙ্গে স্বধাম দ্বারকায় যাত্রা করলেন। ঘোড়াগুলো সামান্য পরিশ্রান্ত হয়েই কৃষ্ণকে কুরুজাঙ্গল[১], পাঞ্চাল, শূরসেন[২], যমুনা-বিধৌত অঞ্চল, ব্রহ্মাবর্ত, কুরুক্ষেত্র, মৎস্যদেশ[৩], সরস্বতীর তীরবর্তী অঞ্চল, মরুভূমি পার করে সৌবীর[৪] ও আভীর[৫] রাজ্যের পার্শ্ববর্তী দ্বারকায় নিয়ে এল। শ্রীকৃষ্ণ যখন ঐ সব দেশের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন সেখানকার লোকেরা পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়ে তাঁকে স্বাগত জানাচ্ছিল। শ্রীকৃষ্ণ যখন দ্বারকায় পৌঁছালেন তখন অপরাহ্নকালে সমুদ্রের পারে সূর্যদেব পাটে বসছিলেন। ৩১-৩৬

একাদশ অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকায় প্রবেশ

সূত বললেন, যখন শ্রীকৃষ্ণ নিজের দেশ সমৃদ্ধিশালী দ্বারকায় ঢুকলেন তখন সেখানকার অধিবাসীদের দীর্ঘদিনের বিরহজনিত দুঃখকে দূর করবার জন্যই যেন তাঁর পাঞ্চজন্য শঙ্খ উচ্চরবে ধ্বনিত করলেন। বীরকর্মা শ্রীকৃষ্ণের পদ্মকোরকের মত হাতে সাদা শঙ্খটি ধরা ছিল। তিনি যখন সেটি মুখে তুলে ধরলেন তখন তাঁর ওষ্ঠের রক্তিম আভায় সাদা শঙ্খটিও রক্তিম হয়ে ওঠল। এভাবে তিনি যখন শঙ্খ বাজাচ্ছিলেন তখন মনে হচ্ছিল যেন লালপদ্মের বনে রাজহংসরা কল-ধ্বনিতে মুখর হয়ে উঠেছে। এই শঙ্খের শব্দেই সংসারের ভয় দূরে চলে যায়। এই ধ্বনি শুনতে পেয়েই রাজ্যের লোকেরা তাদের রাজাকে দেখবার জন্য ঔৎসুক্যের বশে ছুটে এলো। সূর্যকে প্রদীপ দেওয়ার মত ওরা আত্মারাম ও নিজের আনন্দে পরিপূর্ণ শ্রীকৃষ্ণকে নানা উপহার এনে দিল। তারপর বালকপুত্রেরা যেমন পিতাকে উৎফুল্লমুখে আনন্দ-গদ্‌গদ ভাষায় অনেক কিছু বলতে যায়, ওরাও সেইভাবেই তাদের রাজা আনন্দময় পূর্ণকাম সকলের বন্ধু শ্রীকৃষ্ণকে বলল, প্রভু, আপনার যে পাদপদ্মে ব্রহ্মা, সনকাদি ঋষিরা আর দেবতারা প্রণাম নিবেদন করেন সেখানেই

---

১ গঙ্গা-যমুনার অন্তর্বর্তী অঞ্চলের উত্তরাংশ। ২ শূরসেন—মথুরা অঞ্চল। [৩] বিরাটদেশ। ৪ সিন্ধুনদের নিকটবর্তী এলাকা। ৫ শ্রীকোঙ্কনের নীচ বিন্ধ্যপর্বতের অঞ্চল।

আমাদের প্রণতি জানাচ্ছি। পৃথিবীর মানুষেরা ইহকাল ও পরকালের মঙ্গল চেয়ে আপনাকেই তাদের শরণ বলে মনে করেছে। আপনার শ্রীচরণ মহাকালেরও প্রভাবমুক্ত। হে বিশ্বভাবন, এই জগতে আপনিই আমাদের মঙ্গলবিধান করেন। আপনিই আমাদের মাতা, বন্ধু, পতি আর পিতা। আপনিই আমাদের সদ্গুরু, পরমদেবতা। আপনার অনুজ্ঞা পালন করেই আমরা সংসারে সফলকাম হব। বড় আনন্দের কথা যে আপনাকে পেয়ে আমরা আর অনাথ নই। আপনার যে রূপ দেবতাদের কাছেও দুর্লভ তা নিয়তই আমাদের সম্মুখে উপস্থিত। প্রেমময় হাসি আর স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে আপনার সুন্দর মুখ সকলকে ঐশ্বর্য্যই দেয়। ঐ মুখ আমরা সর্বদাই দেখছি। হে পদ্মপলাশলোচন, আমাদের ছেড়ে আপনি যখন বন্ধুদের দেখবার জন্য হাস্তিনাপুরে কিংবা মথুরাপুরে গিয়েছিলেন তখন আমাদের অবস্থা অন্ধদের মতই হয়েছিল। হে অচ্যুত, তখন এক একটি মুহূর্ত মনে হত যেন কোটি কোটি বছর। হে নাথ, আপনি অনেকদিন ধরে প্রবাসে থাকলে আপনার নিখিল-তাপ-হরণকারী প্রসন্ন দৃষ্টি আর সুন্দর হাসিতে ভরা মনোহর মুখ না দেখে আমরা কি করে দিন কাটাব? ১-১০

প্রজাদের এইসব কথা শুনতে শুনতে এবং তাদের অনুগ্রহ-দৃষ্টি বিতরণ করতে করতে ভক্তবৎসল কৃষ্ণ দ্বারকাপুরীতে প্রবেশ করলেন। নাগেরা যেমন পাতালের রক্ষাণাবেক্ষণ করে সেইভাবেই কৃষ্ণের মত শক্তিসম্পন্ন মধু, ভোজ, দশার্হ, কুকুর, অন্ধক আর যাদব-বংশের লোকেরা দ্বারকাপুরীকে রক্ষা করছিল। স্থানটি অতি মনোরম; সব ঋতুর উপযুক্ত ফল-ফুলে ভরা, লতায় আর গাছে এখানকার পবিত্র ঘরবাড়িগুলো শোভিত। পুষ্করিণীগুলো পদ্মফুলে ভরা। তার তীরে তীরে রয়েছে সুন্দর সুন্দর বাগান, উপবন ইত্যাদি। বাইরের সিংহদরজায়, বাড়ির দরজায়, পথে অনেক উৎসবসূচক তোরণ নির্মিত হয়েছে। তোরণগুলির উপর বিচিত্র সব ধ্বজা ও পতাকা সূর্যের তাপ অনেকখানি আটকে দিয়েছে। মহামার্গ, অপ্রধান মার্গ, বিপণি আর চত্বরগুলো পরিষ্কৃত, সুগন্ধ জলে সিক্ত করা হয়েছিল, ফল, ফুল আর যবের অঙ্কুর চতুর্দিকে বিকীর্ণ ছিল। সব ঘরের দরজায় পূর্ণকুম্ভ, দই, আতপচাল, আখ, ধূপ-দীপ ও মাঙ্গলিক শোভা পাচ্ছিল। ১১-১৬

প্রিয়তম কৃষ্ণ এসেছেন শুনে মহান বসুদেব, অক্রূর, উগ্রসেন, অদ্ভুতবিক্রম পরশুরাম, প্রদ্যুম্ন, চারুদেষ্ণ, জাম্ববতীপুত্র সাম্ব—সবাই শয়ন, আসন ও ভোজন ছেড়ে উঠে পড়লেন। প্রচণ্ড হর্ষাবেগে তাঁদের শ্বাসরুদ্ধ হয়ে এসেছিল। ১৭-১৮

বিরাট হাতী এবং পত্রপুষ্পধারী ব্রাহ্মণদের আগে রেখে তাঁরা শ্রীকৃষ্ণকে প্রত্যুদ্গমন করতে গেলেন। শঙ্খ ও তূর্যের ধ্বনিতে, বেদগানের সুঘোষে তাঁরা চারিদিক ভরিয়ে তুলেছিলেন। মহানন্দে তাঁরা রথে চড়ে যাচ্ছিলেন। প্রেমভরে সকলের চিত্ত উদ্ভ্রান্ত। নানা প্রকার যানে করে শত শত বারাঙ্গনারাও প্রচণ্ড ঔৎসুক্য নিয়ে কৃষ্ণসন্দর্শনে গিয়েছিলেন। দোদুল্যমান কর্ণভরণের দ্যুতিতে তাদের মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত হয়েছিল। নট, নর্তক, গন্ধর্ব[১], সূত[২], মাগধ[৩] ও বন্দীরা[৪] শ্রীকৃষ্ণের অদ্ভুত চরিতকথা গান করছিল। ১৯-২১

১ যাঁরা মার্গী ও দেশী দুই ঘরানারই সঙ্গীত অন্যকে শেখাতে পারতেন, কিন্তু বিশেষ ওস্তাদ ছিলেন না তাঁদেরই গন্ধর্ব শ্রেণীর গায়ক বলা হত।

২ একশ্রেণীর স্তুতিপাঠক। ৩ যে স্তুতিপাঠকরা রাজাদের আর সৈন্যদের আগে আগে যায়।

৪ রাজাদের গুণ ও বীর্যাদির স্তুতিপাঠক।

সমাগত আত্মীয়-পরিজন, আর পুরবাসীদের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবান কৃষ্ণ প্রণাম, কুশল-প্রশ্ন, আলিঙ্গন, হস্তধারণ ও সহাস্য দৃষ্টি দ্বারা সকলকেই যথাযোগ্য সম্মান জানালেন, আচণ্ডাল সবাইকে অভয় ও বাঞ্ছিত বর দিলেন। তারপর গুরুজনদের, সস্ত্রীক ব্রাহ্মণদের, মহাবৃদ্ধদের আশীর্বাদ শিরোধার্য করে এবং বন্দীদের দ্বারা সম্মানিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকাপুরীতে প্রবেশ করলেন। শ্রীকৃষ্ণ যখন রাজপথে এলেন তখন তাঁর দর্শনে অতি আহ্লাদিত দ্বারকার কুলবধূরা সৌধশিখরে উঠে পড়লেন। সুন্দর, সুঠাম অঙ্গশ্রীযুক্ত অচ্যুতকে বারবার দেখেও দ্বারকাবাসীদের নয়ন তৃপ্ত হত না। তাঁর বক্ষস্থল লক্ষ্মীর নিবাস, তাঁর মুখশ্রী যেন সর্বপ্রাণীর জন্য সৌন্দর্যসুধার আধার। তাঁর দু-বাহু কিন্তু লোকপালদের আশ্রয় এবং তাঁর চরণপদ্ম সকল ভক্তের পরম নির্ভরস্থল। ২২-২৭

আকাশের মেঘে একসঙ্গে সূর্য, চন্দ্র, তারা, ইন্দ্রধনু ও বিদ্যুতের আলো পড়লে যে শোভা হয় রাজপথের ওপর পীতবসনধারী বনমালীর শোভাও সেরকমই হয়েছিল। তাঁর মাথার ওপর ধরা ছিল শ্বেত ছত্র, দুপাশে সাদা চামর দিয়ে ব্যজন করা হচ্ছিল, আর রাশি রাশি পুষ্পবৃষ্টি হচ্ছিল চারদিক থেকে। ২৮

এইভাবে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর পিতৃগৃহে প্রবেশ করলেন। তাঁর সাত জননী তাঁকে আনন্দে জড়িয়ে ধরলেন। তিনিও অবনতমস্তকে দেবকী প্রমুখ গুরুজনদের প্রণাম করলেন। আনন্দবিহ্বল চিত্তে মায়েরা তাঁকে কোলে তুলে নিলেন। পুত্রস্নেহে তাঁদের স্তন থেকে দুগ্ধধারা নির্গত হতে লাগল। আনন্দাশ্রুতে তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের সর্বাঙ্গ ভরিয়ে তুললেন। তারপর তিনি তাঁর ষোল হাজার রানীর প্রাসাদ সম্বলিত সকল কামের নিলয় অনুপম নিজ পুরীতে প্রবেশ করলেন। পত্নীরা দূর থেকেই তাঁদের এতদিনের প্রবাসী স্বামীকে গৃহে ফিরতে দেখলেন। তাঁদের মনে উৎসবের সুর বেজে উঠল। তাঁদের চোখমুখ লজ্জায় নত হল। তাঁরা নিয়ম মত প্রোষিত-ভর্তৃকার ব্রত পালন করছিলেন এতদিন। শ্রীকৃষ্ণ ফিরে আসায় আনমনা হয়ে তাঁরা সেই ব্রতাসন থেকে উঠে পড়লেন। স্বামীর বুকে নিজেদের সন্তানদের তুলে দিয়ে তাঁরা তাদের দিয়ে, নিজেদের চোখ দিয়ে, আর শেষে নিজেদের অন্তরাত্মা দিয়ে তাঁকে আলিঙ্গন করলেন। তাঁদের মনে ভাবরাশি তখন উদ্বেল হয়ে উঠেছিল ; সেই ভাবাবেগে অবশ হয়ে যাওয়ায় তাঁদের চোখ থেকে অশ্রু বেরিয়ে আসতে কোনও বাধাই মানল না। শ্রীকৃষ্ণ সর্বদাই তাঁদের পাশে থাকলেও, সর্বদাই তাঁকে একান্তে পেলেও তাঁর চরণযুগল এঁদের কাছে নিত্য নতুন মনে হত। এতে আশ্চর্য কি! 'মহালক্ষ্মীও তো এঁর পদযুগল কখনও পরিত্যাগ করেন না। বাতাস যেমন গাছে গাছে ঘর্ষণ সৃষ্টি করে দাবানলের সাহায্যে গাছগুলোকেই ভস্ম করে তবে নিবৃত্ত হয়, সেরূপ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং নিরস্ত্র থেকেও পৃথিবীর ভারস্বরূপ, মহাতেজস্বী, অগণিত সৈন্য পরিবৃত রাজাদের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি করে তাদের পারস্পরিক হননের দ্বারা ধ্বংস করে তবে ক্ষান্ত হয়েছিলেন। ভগবান কৃষ্ণ নিজের মায়াদ্বারা এই নরলোকে অবতীর্ণ হয়ে শ্রেষ্ঠ রমণীদের সঙ্গে সাধারণ লোকের ন্যায় ক্রীড়া করতে আরম্ভ করলেন। এইসব রমণীদের উদ্দাম কামনা, বিমলমধুর হাসি আর ক্রীড়াবঙ্কিম দৃষ্টিতে বিমুগ্ধ হয়ে কন্দর্পদেবও তাঁর ফুলধনু ফেলে নিজের কাজ ভুলে যেতেন। কিন্তু এঁরা কোন মায়াতেই কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়বিভ্রম ঘটাতে পারেন নি। এই মহান পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃতির গুণে অনাসক্ত হলেও তত্ত্বজ্ঞানহীন সাধারণ লোকেরা তাঁকে সংসারে জড়িয়ে-পড়া মানুষের মত দেখে এবং নিজেদের মতই কামুক মনে করে। এটাই ভগবানের ঐশ্বর্য যে তিনি প্রকৃতির মধ্যে থেকেও তার গুণে আচ্ছন্ন হন না,

যেমন বুদ্ধি আত্মাকে আশ্রয় করে থাকলেও তার গুণ আনন্দ[১] প্রভৃতির সঙ্গে সংপৃক্ত হয় না। ২৯-৩৯

কৃষ্ণপত্নীদের সাধারণ নারীদের মতই মতি। তাঁদের স্বামীর ঐ পরমৈশ্বর্যের সংবাদ তাঁরা রাখতেন না, তাঁরা ভাবতেন কৃষ্ণ তাঁদের নারীত্বে মুগ্ধ, স্ত্রৈণ এবং তাঁদের প্রতি একান্ত অনুরক্ত। ৪০

দ্বাদশ অধ্যায়

পরীক্ষিতের জন্মোৎসব

শৌনক বললেন, সূত, অশ্বত্থামার নিক্ষিপ্ত ব্রহ্মশির অস্ত্রে উত্তরার গর্ভস্থ সন্তান নিহত হলে ভগবান বাসুদেব তার জীবন দান করেন। সেই মহাবুদ্ধি, মহাত্মা পরীক্ষিতের জন্ম, কর্ম, মৃত্যু, মৃত্যুর পর যে গতি তিনি লাভ করেছিলেন সে সবই আমরা সবিস্তারে শুনতে চাই। মহাত্মা শুকদেব তাঁকে ভাগবদ্‌জ্ঞান দিয়েছিলেন। যদি এসব কথা বলা উপযুক্ত মনে করেন, বলুন; আমরা শ্রদ্ধাসহকারে শুনতে আগ্রহী। ১-৩

তখন সূত বলতে আরম্ভ করলেন, কৃষ্ণচরণ সেবার বাসনা নিয়েই সর্বকামে নিরাসক্ত হয়ে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির স্নেহশীল পিতার ন্যায় প্রজাদের পালন করেছিলেন। কৃষ্ণগতপ্রাণ রাজা যুধিষ্ঠিরের সম্পদ, যাগযজ্ঞ, পুণ্যার্জিত লোকসকল, মহিষী, ভ্রাতাগণ, পৃথিবী, জম্বুদ্বীপের ওপর আধিপত্য এবং স্বর্গ পর্যন্ত বিস্তৃত যশোগাথা দেবতাদেরও ঈর্ষার বস্তু। কিন্তু এই সব পেয়ে তিনি কি খুব আনন্দ পেয়েছিলেন? ক্ষুধার্ত লোক যেমন খাদ্য ছাড়া অন্য কিছু নিয়ে আনন্দ পায় না তেমনি তিনিও পান নি। ৪-৬

বীর পরীক্ষিৎ যখন মাতৃগর্ভে থেকে ব্রহ্মাস্ত্রের তেজে দগ্ধ হচ্ছিলেন তখন তিনি এক পুরুষমূর্তি দেখতে পান। ইনি হলেন অঙ্গুষ্ঠমাত্রবপু[২] ভগবান অচ্যুত। তাঁর মাথায় ছিল সোনার উজ্জ্বল কিরীট, রঙ ছিল সুন্দর শ্যামল আভাময় এবং পরনে ছিল বিদ্যুৎবর্ণের বসন। অতি সুন্দর তাঁর মূর্তি। ৭-৮

তাঁর চারটি হাত দীর্ঘ ও শ্রীমণ্ডিত ছিল। তপ্তকাঞ্চন বর্ণ, কুণ্ডলযুক্ত, আরক্তনেত্র সেই পুরুষ চতুর্দিকে উল্কার মত ঘুরছিলেন। তাঁর হাতে যে গদা ছিল তা মুহুর্মুহু আন্দোলিত হচ্ছিল। সূর্য যেমন নীহারকণা ধ্বংস করে সেভাবেই তিনি ব্রহ্মাস্ত্রের তেজ ক্ষয় করছিলেন। সেই মহাপুরুষ যখন তাঁর কাছে থেকে এই কাজে ব্যাপৃত ছিলেন তখন পরীক্ষিৎ ভাবছিলেন, ইনি কে? বাক্য মনের অতীত, ধর্মরক্ষক, সর্বশক্তিমান ভগবান শ্রীহরি এইভাবে গদা সঞ্চালনে অস্ত্রের তেজ সংহার করে দশ মাসের শিশু পরীক্ষিতের চোখের সম্মুখে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। ৯-১১

তারপর অনুকূল লগ্নে সর্বগুণযুক্ত পাণ্ডব-বংশধর পরীক্ষিৎ জন্মগ্রহণ করলেন। তাঁর তেজ দেখে মনে হচ্ছিল যেন পাণ্ডু আবার ফিরে এলেন। রাজা যুধিষ্ঠির

১ দ্রষ্টব্য, তৈত্তিরীয় উপনিষৎ, ২।৫ মন্ত্র। ২ অঙ্গুষ্ঠমাত্র বলায় ভগবৎ-স্বরূপ সিদ্ধ হচ্ছে। দ্রষ্টব্য, কঠ উপনিষৎ, ২।১।১৩ ও ১৪ শ্লোক।

হৃষ্টচিত্তে ধৌম্য-কৃপাদি ব্রাহ্মণদের দিয়ে স্বস্তিবাচন করিয়ে নবজাতকের জাতকর্ম করালেন। দানের উপযুক্ত সময় বুঝে রাজা পৌত্রের পুণ্য জন্মক্ষণে ব্রাহ্মণদের সোনা, গো-ধন, ভূমি, সুন্দর সুন্দর হাতী, ঘোড়া আর মিষ্টান্ন বিতরণ করলেন। ব্রাহ্মণরা মহা সন্তুষ্ট হয়ে বিনয়নম্র রাজাকে বললেন, কুরুবংশশ্রেষ্ঠ মহারাজ, দুর্বার দৈবের হাতে যখন কুরুবংশের এই শুভ কুলতিলক বিনষ্ট হতে যাচ্ছিল তখন মহাবিষ্ণু কৃপা করে একে রক্ষা করেছেন। অতএব শিশুটি পৃথিবীতে 'বিষ্ণুরাত'[১] নামে খ্যাত হবে। এই বালক ভগবৎপরায়ণ, ধর্মশীল ও বহুগুণে শ্রেষ্ঠ হবে। মহারাজ যুধিষ্ঠির বললেন, বিপ্রগণ, এই শিশু যশে, কীর্তিতে এই বংশের পুণ্যাত্মা, শ্রেষ্ঠ রাজর্ষিদের অনুসরণ করতে পারবে তো? ব্রাহ্মণরা বললেন, পার্থ, এই শিশু সাক্ষাৎ মনুপুত্র ইক্ষ্বাকুর[২] মতই প্রজাপালক হবে, দাশরথি রামের মতই ব্রাহ্মণ-হিতৈষী এবং সত্যসন্ধ হবে। এ শিবির মত দাতা ও শরণাগত-পালক হবে, দুষ্মন্তপুত্র ভরতের মত জ্ঞানী ও কীর্তিমান হবে। পরীক্ষিৎ দুই অর্জুনের[৩] তুল্য ধনুর্ধর হবে। সে হবে অগ্নির মত দুর্ধর্ষ, সাগরের মত দুস্তর, সিংহের মত পরাক্রান্ত, হিমালয়ের মত আশ্রয়ণীয়; সে হবে ব্রহ্মার মত সমজ্ঞানী, শিবের মত প্রসন্ন। রমাপতি বিষ্ণু যেমন সর্বভূতের আশ্রয় সেও তেমনি হবে। এই পুত্র গুণ-মাহাত্ম্যে কৃষ্ণের মত, ঔদার্যে রন্তিদেবের[৪] মত আর ধর্মজ্ঞানে যযাতির মত হবে। সে হবে ধৈর্যে বলির মত, কৃষ্ণমতিতে প্রহ্লাদের মত। সে অনেক অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করবে, বৃদ্ধদের সম্মান বর্ধন করে তাদের সেবা করবে, অনেক রাজর্ষির পিতা হবে, উন্মার্গগামীদের শাসন করবে, আর পৃথিবীকে রক্ষা করার জন্য কলিকে নিগৃহীত করবে। ব্রাহ্মণের অভিশাপে তক্ষকের দংশনে তার মৃত্যু হবে, এই কথা জেনে সে আসক্তিশূন্য হয়ে হরিভক্তিপরায়ণ হবে। মহারাজ, অবশেষে শুকদেবের কাছ থেকে আত্মজ্ঞান লাভ করে ভয়মুক্ত[৫] পরীক্ষিৎ গঙ্গায় দেহত্যাগ করবে এবং সাক্ষাৎ হরি-দর্শন করবে। জ্যোতির্বিদ ব্রাহ্মণেরা এই সব ভবিষ্যদ্বাণী করে যুধিষ্ঠিরের কাছ থেকে উপঢৌকনাদি নিয়ে নিজ নিজ গৃহে ফিরে গেলেন। ১২-২৯

এই শিশুটি গর্ভে থাকতে যে পুরুষকে দেখেছিলেন পরে তাঁর কথা স্মরণ করে মানুষ দেখলেই পরীক্ষা করতেন, এই কি তিনি? তাই তিনি জগতে 'পরীক্ষিৎ' নামে বিখ্যাত হন। রাজপুত্র যুধিষ্ঠিরাদির দ্বারা প্রতিপালিত হয়ে এবং চৌষট্টি কলায় পূর্ণ হয়ে বেড়ে উঠতে লাগলেন। বাল্যকালেই পরীক্ষিৎ শ্রীকৃষ্ণের স্বভাব-ভক্ত হয়ে উঠলেন। এই মহাবুদ্ধিমান ও ধর্মাত্মা রাজপুত্র সকলেরই প্রীতিভাজন হলেন। ৩০-৩২

যুধিষ্ঠির ঠিক করলেন যে জ্ঞাতিহত্যার পাপ থেকে মুক্ত হবার জন্য অশ্বমেধ যজ্ঞ করবেন। কিন্তু যেহেতু বার্ষিক কর আর দণ্ডাদি থেকে প্রাপ্ত অর্থ ছাড়া তাঁর আয়ের অন্য কোনও উৎস ছিল না, তাই এই মহাব্যয়সাধ্য যজ্ঞ কিভাবে করা যায় ভেবে তিনি বিশেষ চিন্তান্বিত হলেন। যুধিষ্ঠিরের অভিলাষ বুঝতে পেরে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ভাইদের উত্তরদিকে পাঠিয়ে দিলেন। সেখানে মরুত্ত[৬] রাজার যজ্ঞশেষে রাশি রাশি

---

১ বিষ্ণু কর্তৃক রক্ষিত। ২ সত্যযুগে সূর্যবংশীয় প্রথম রাজা, বৈবস্বত মনুর পুত্রের অন্যতম। ৩ ধনঞ্জয় অর্জুন ও কার্তবীর্যার্জুন। ৪ চন্দ্রবংশীয় রাজা। এঁর আত্মোৎসর্গের কাহিনী নবম স্কন্ধের ২১শ অধ্যায়ে আছে। ৫ 'ভয়মুক্তি' সম্বন্ধে উপনিষদে বারংবার উল্লেখ আছে, এসম্পর্কে তৈত্তিরীয় ২।৪, ছান্দোগ্য ৮।৮।৩, বৃহদারণ্যক ৪।৪।২৫ মন্ত্রগুলি দ্রষ্টব্য। কিসের ভয়? ভয় হল অনৃত, মৃত্যু, অন্ধকার। সেই আদি ভয়—অবিদ্যারূপ সংসারের বিষয় হওয়া যা থেকে সর্বভয়ের উদ্ভব। ৬ চন্দ্রবংশীয় রাজা। শৌর্য-বীর্যের জন্য পুরাণপ্রসিদ্ধ। বহু যজ্ঞ সমাধা করেতিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

সোনার পাত্র পড়েছিল। চার পাণ্ডব সেই সব ধনরত্ন হস্তিনাপুরে নিয়ে এলেন। জ্ঞাতি-হত্যার পাপভয়ে ভীত যুধিষ্ঠির সেই সংগৃহীত ঐশ্বর্য দিয়ে যজ্ঞীয় সামগ্রী আহরণ করলেন। তাঁর মনস্কামনা পূর্ণ হল। এবার তিনি তিনটি অশ্বমেধ যজ্ঞে যজ্ঞেশ্বর হরির অর্চনা করলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের আহ্বান পেয়ে দ্বারকা থেকে এলেন এবং ব্রাহ্মণদের দিয়ে রাজার যজ্ঞকার্য সমাধা করলেন। তারপর বন্ধুদের প্রিয়কামনায় কৃষ্ণ হস্তিনাপুরে কয়েক মাস কাটালেন। অবশেষে যুধিষ্ঠির ও দ্রৌপদীর অনুমতি নিয়ে অর্জুন এবং অন্যান্য বন্ধুদের সঙ্গে করে তিনি দ্বারকায় ফিরে এলেন। ৩৩-৩৭

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ধৃতরাষ্ট্রের বানপ্রস্থ

সূত বললেন, বিদুর তীর্থযাত্রায় বেরিয়ে মৈত্রেয় মুনির কাছ থেকে আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞানার্জন করে হস্তিনাপুরে ফিরে আসেন। তিনি মৈত্রেয়কে প্রথমে কয়েকটি প্রশ্ন করেছিলেন, কিন্তু চারটি প্রশ্নের উত্তর পাবার পরই তিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি একান্ত ভক্তিমান হয়ে পড়েন ও আর প্রশ্ন করার প্রয়োজন নেই বোধে থেমে যান। সেই বন্ধুরূপী বিদুরকে আসতে দেখে ভ্রাতাদের সহ যুধিষ্ঠির, ধৃতরাষ্ট্র, যুযুৎসু সূত, সঞ্জয়, শারদ্বত, কুন্তী, গান্ধারী, দ্রৌপদী, সুভদ্রা, উত্তরা, কৃপী এবং পাণ্ডুর অন্যান্য জ্ঞাতিরা, তাঁদের স্ত্রীগণ, তাঁদের পুত্রেরা সবাই অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে তাঁকে স্বাগত জানাতে এগিয়ে গেলেন। তিনি ফিরে আসতে সবার দেহে যেন প্রাণ এল। আলিঙ্গন ও সম্ভাষণের মধ্যে সকলে মিলিত হলেন। সকলেরই চোখে আনন্দাশ্রু। এত দিনের বিরহজনিত উৎকণ্ঠা দূর হল। উপবিষ্ট বিদুরকে যুধিষ্ঠির অর্চনা করলেন। তারপর বিদুরের জলযোগাদি শেষ হলে তিনি যখন আরামে আসনে বসে শ্রান্তি দূর করছেন, তখন সকলের সামনে যুধিষ্ঠির নম্রভাবে বললেন, আপনার কি মনে পড়ে যে আপনার স্নেহে বেড়ে ওঠার জন্যই বিষপ্রয়োগ, জতুগৃহদাহ প্রভৃতি রাশি রাশি বিপদ থেকে আমরা মুক্ত হতে পেরেছিলাম? পৃথিবীময় ঘুরতে ঘুরতে কিভাবে আপনি জীবনধারণ করেছেন? কোন্ কোন্ প্রধান তীর্থই বা দেখে এলেন? বিভু, আপনার মত মহাভক্ত লোকই তো সাক্ষাৎ তীর্থ। অন্তশ্চারী গদাধারী বিষ্ণুকে অন্তরে রেখে আপনিই সব তীর্থ পবিত্র করেছেন। পিতা, আমাদের পবিত্র সুহৃদ, কৃষ্ণের আশ্রিত যাদবরা তাঁদের নগরে সুখে-শান্তিতে বসবাস করছেন তো? ১-১১

যুধিষ্ঠিরের এই প্রশ্নের উত্তরে বিদুর যদুবংশ ধ্বংসের বিষয় ছাড়া আর সব কিছুই আপন অভিজ্ঞতায় আনুপূর্বিক বর্ণনা করলেন। সেই দুর্বিষহ দুঃখের সংবাদ বিদুর আর নিজে থেকে দিলেন না। সেই সংবাদ শুনে পাণ্ডবেরা যে ভয়ঙ্কর দুঃখ পাবেন তা দয়ার্দ্রচিত্ত বিদুরের পক্ষে সহ্য করা সম্ভব ছিল না। যাই হোক, ধৃতরাষ্ট্রকে নানা হিতোপদেশ দিয়ে, তাঁর মঙ্গলসাধন করে, পাণ্ডবদের নিকট থেকে প্রভূত সেবা পেয়ে, আর সকলের আনন্দবর্ধন করে বিদুর কিছুকাল ওখানেই রইলেন। মাণ্ডব্য ঋষির অভিশাপে যমরাজকে শতবর্ষ কাল শূদ্রত্ব ধারণ করতে হয়েছিল। শাপগ্রস্ত যম বিদুররূপে পৃথিবীতে জন্ম নেন। তখন সূর্যদেব যমপুরে পাপীদের যথাযথ শাস্তিবিধান করে যমরাজের কার্যনির্বাহ করেছিলেন। কারণ একাজ তো আর বন্ধ থাকতে পারে না! ১২-১৫

এদিকে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির রাজ্য পেয়ে, কুলগৌরব পৌত্রমুখ দেখে, ইন্দ্রাদি দশ দিক্‌পালের মত ভাইদের নিয়ে, পরমা শ্রী লাভ করে সুখে কাল কাটাতে লাগলেন। এবার সংসারাসক্ত, বিষয়ভোগে মত্ত পাণ্ডবদের অজ্ঞাতসারেই মহাকাল এসে উপস্থিত হল। বিদুর তা বুঝতে পেরে ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন, মহারাজ, দেখুন সেই মহাভয় এসে গেছে। এবার গৃহত্যাগ করে বেরিয়ে পড়ুন। জগতের কোথাও কোনও কালে যার থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া সম্ভব নয়, আমাদের সকলেরই ভগবান সেই কালপুরুষ[১] এসে গেছেন। এই মৃত্যুরূপ কালের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে সব লোককেই প্রিয়তম প্রাণ হতে বিচ্ছিন্ন হতে হয়, ধনসম্পদ তো দূরের কথা। আপনার পিতা, ভ্রাতা, বন্ধু, পুত্র সকলেই নিহত; আপনারও বয়স অতিক্রম হয়েছে, দেহও জরাতুর। আপনি পরগৃহবাসী, আগে থেকেই অন্ধ, আর সম্প্রতি বধির হয়ে গেছেন। আপনার বুদ্ধি ক্ষীণ হয়েছে, দাঁত পড়ে গেছে। আপনি অগ্নিমান্দ্য রোগেও ভুগছেন, কফ-বমন করছেন, তবু আপনাকে ঘোরতর বিষয়াসক্ত দেখছি। সত্যিই, মানুষের বেঁচে থাকার আশা কি প্রবল! ঐ আশাতেই বশীভূত হয়ে পুত্রহন্তা ভীমের দেওয়া পিণ্ড গৃহপালিত জন্তুর মত গলাধঃকরণ করতে আপনার বাধছে না! আচ্ছা, বলতে পারেন যাদের আগুনে ফেলেছিলেন, বিষ দিয়েছিলেন, যাদের স্ত্রীকে অপমান করেছেন, রাজ্য ও ধনরত্ন কেড়ে নিয়েছিলেন তাদের দেওয়া এই প্রাণ নিয়ে আপনার কোন্ প্রয়োজন সিদ্ধ হবে? এত দীনতা নিয়েও বেঁচে থাকার ইচ্ছেটা যেন পরিধানের জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ[২] না করার মোহের ন্যায়। কিন্তু তবুও তো দেহটা জরায় জীর্ণ হবেই। তাঁকেই তো আমরা ধীর ব্যক্তি বলব যিনি অনাসক্ত, বন্ধনমুক্ত আর অজ্ঞাতচারী হয়ে শোক-মোহ-জরায় ব্যতিব্যস্ত অপদার্থ দেহটাকে ছুঁড়ে ফেলে দেন। তিনিই পুরুষশ্রেষ্ঠ যিনি স্বেচ্ছায় অপরের কাছ থেকে শিক্ষা নিয়ে আত্মজ্ঞান লাভ করে বৈরাগ্যযুক্ত হন, আর অন্তরে শ্রীহরিকে ধারণ করে গার্হস্থ্যাশ্রম বর্জন করেন। অতএব আত্মীয়দের অজ্ঞাতসারে বাড়ি ছেড়ে উত্তরদিকে বেরিয়ে পড়ুন, কারণ এর পরই মানুষের সর্বগুণনাশকারী কাল এখানে এসে পড়বে। ১৬-২৮

ছোটভাই বিদুরের কথা শুনে অজমীঢ়বংশোদ্ভব[৩] ধৃতরাষ্ট্রের প্রজ্ঞাচক্ষু উন্মীলিত হল। তখন চিত্তের দৃঢ়তা দিয়ে আত্মীয়দের স্নেহবন্ধন তিনি ছিন্ন করলেন আর ভ্রাতৃ-প্রদর্শিত পথে গৃহত্যাগ করলেন। সুবলরাজকন্যা পতিব্রতা সাধ্বী গান্ধারী তাঁর অনুগমন করলেন। যেমন যুদ্ধ দুঃখাবহ হলেও বীরগণের পক্ষে উৎসাহব্যঞ্জক, সেরূপ হিমালয় দুঃখকর হলেও সন্ন্যাসীদের কাছে তা আনন্দনিবাস। ২৯-৩০

পরের দিন যথারীতি সন্ধ্যাবন্দনাদি সেরে, হোম করে, দ্বিজপ্রদের তিল, গাভী, ভূমি ও স্বর্ণদান সহ প্রণামাদি সমাপন করে অজাতশত্রু যুধিষ্ঠির যখন পদধূলি নেবার জন্য গুরুজনদের ঘরে এলেন, তখন তিনি ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর ও গান্ধারীকে কোথাও দেখতে পেলেন না। সেখানে সঞ্জয়কে দেখে তিনি উদ্বিগ্নচিত্তে প্রশ্ন করলেন, সঞ্জয়, আমাদের পিতৃতুল্য বৃদ্ধ ও অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র, মাতৃতুল্যা পুত্রশোকার্তা গান্ধারী এবং বন্ধুতুল্য বিদুর কোথায় গেলেন? আমার মত মন্দমতির কোন অপরাধ স্মরণ করেই কি হতপুত্র ধৃতরাষ্ট্র দুঃখিতচিত্তে সস্ত্রীক গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়েছেন? পিতার মৃত্যুর পর যে দুই পিতৃব্য আমাদের বালক বয়সে আপদ-বিপদ থেকে রক্ষা করেছিলেন, এখান থেকে কোথায় গেলেন তাঁরা? ৩১-৩৪

১ 'কালোঽস্মি' লোকক্ষয়কৃৎ—গীতা, ১১।৩২

২ দেহকে বসনের সঙ্গে তুলনা গীতাতেও রয়েছে, ২।২২ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

৩ চন্দ্রবংশীয় রাজাদের এক পূর্বপুরুষ হলেন অজমীঢ়।

সূত বললেন, নিজের প্রভু ধৃতরাষ্ট্রের অদর্শনে সঞ্জয় বড়ই অধীর হয়ে পড়েছিলেন। তাঁকে তিনি অত্যন্ত ভালবাসতেন, সেই জন্যই তাঁর বিরহে অতি কাতর হয়ে পড়েছিলেন। যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নে তাই তিনি প্রথমে কোনও উত্তর দিতে পারলেন না। পরে হাত দিয়ে চোখের জল মুছে, বুদ্ধি দিয়ে মনকে স্থির করে, ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর চরণ ধ্যান করে সঞ্জয় যুধিষ্ঠিরকে বললেন, কুলনন্দন, আপনার দুই পিতৃব্য আর গান্ধারী যে কি করছেন তা আমার অজানা। ঐ মহাত্মারা আমাকে বঞ্চনা করেছেন। ঠিক এই সময়ে ভগবান নারদ তাঁর বীণা নিয়ে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। ভাইদের সঙ্গে যুধিষ্ঠির উঠে তাঁকে অভ্যর্থনা করলেন। তারপর অভিবাদন জানিয়ে শোকের মধ্যেই যথাযোগ্য অর্চনা করে বললেন, ভগবান, আমাদের পিতৃতুল্য গুরুজনরা এখান থেকে কোথায় গেলেন তা বুঝতে পারছি না। হতপুত্রের শোকে তপস্বিনী জননীতুল্য গান্ধারীই বা কোথায় গেলেন তাও জানি না। ভগবান, অপার শোকসাগরে আপনিই কর্ণধার ; তাই আমাকে এই শোকসাগর থেকে উদ্ধার করুন। ৩৫-৩৯

তখন মুনি ও সজ্জনগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভগবান নারদ বললেন, যুধিষ্ঠির, তুমি কারো জন্য শোক কোরো না। এ জগৎ ঈশ্বরের অধীন। সেই ঈশ্বরেরই পূজার উপহার নিয়ে দিকপালদের সঙ্গে এই বিশ্বলোক অবস্থান করছে। তিনিই সকলকে সংযুক্ত করছেন, আবার বিযুক্তও করছেন। যেমন নাকে-দড়ি-বাঁধা গরুরা আবার একটি লম্বা দড়িতে আবদ্ধ হয়ে কাজ করে, সেইভাবেই বিধিনিষেধের ডোরে আবদ্ধ মানুষ আবার গৃহী, ব্রহ্মচারী প্রভৃতি নাম-রূপের নাসিকারজ্জুতে আবদ্ধ হয়ে ঈশ্বরের পূজোপহার বহন করছে। খেলোয়াড়ের ইচ্ছাতেই যেমন খেলার পুতুলেরা পরস্পরের সঙ্গে মেলে আবার বিচ্ছিন্ন হয়, তেমনি মানুষের মিলন-বিচ্ছেদও ভগবানের ইচ্ছাতেই সম্পন্ন হয়। আর লোককে ধ্রুবই বল, অধ্রুবই বল, বা দুটোর কোনটিই নয় এমনও যদি বল, তাহলেও শোকের কিছু নেই। কারণ মোহজাত স্নেহবোধ থেকেই তো আসলে শোকের উদ্ভব। স্নেহ যেখানে নেই সেখানে শোকও নেই। অতএব অজ্ঞান থেকে তোমার যে কাতরতা জন্মেছে তা ত্যাগ কর। তোমাকে ছাড়া অনাথ হয়ে ওরা কি করে বাঁচবে এরূপ চিন্তা অর্থহীন। অজগর যাকে গ্রাস করছে সে যেমন অন্যকে রক্ষা করতে পারে না, তেমনি কাল, কর্ম ও ত্রিগুণের অধীন পাঞ্চভৌতিক এই দেহের পক্ষে অন্য কাউকে রক্ষা করা সম্ভব নয়। ভগবানই সকলের উপযুক্ত জীবিকা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। হাতযুক্ত মানুষ হাত-নেই এমন প্রাণীদের খায়, পা-যুক্ত পশুরা পা-নেই এমন খাদ্য অর্থাৎ ঘাস-লতাপাতা খায়। এভাবে বড় প্রাণীরা ছোট প্রাণীদের হত্যা করে। জীবই জীবের জীবিকা—এই-ই নিয়ম। এই জগৎ ভগবানই। তিনিই সর্বজীবের আত্মা, অথচ অদ্বিতীয়, ঐভাবে স্বপ্রকাশ। তিনিই অন্তরস্থ, তিনিই বহিঃস্থ। এক ঈশ্বরকে মায়াপ্রভাবে দেব, মানুষ প্রভৃতি ভিন্ন. ভিন্ন রূপে উপস্থিত দেখ। এই মহামায়াবী, কালরূপ, ভূত-ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আজ দেবতাবিদ্বেষী অসুরদের নাশের জন্য ভূতলে অবতীর্ণ হয়েছেন। তাঁর দ্বারা দেবগণের কাজ সুসম্পন্ন হয়েছে। অতএব যতক্ষণ তিনি এই সংসারে রয়েছেন, ততক্ষণ তোমরাও এখানে থাক। ভাই বিদুর ও নিজের স্ত্রী গান্ধারীকে নিয়ে ধৃতরাষ্ট্র হিমালয়ের দক্ষিণে ঋষিদের আশ্রমে গিয়েছেন। ঐখানে সুরধনী গঙ্গা সাতজন ঋষির প্রীতির জন্য নিজেকে পৃথক সাতটি ধারায় বিভক্ত করেছেন। এই জন্যই এই তীর্থের নাম হয়েছে সপ্তস্রোত। এই তীর্থস্থানে সকাল-দুপুর-সন্ধ্যা স্নান করে, অগ্নিতে যথাবিধি আহুতি দিয়ে, জলমাত্র পান করে তাঁর আত্মা এখন শান্ত, বিগতস্পৃহ। যোগের

সব আসন তাঁর অধিগত, প্রাণায়ামও তাঁর অধিগত। তাঁর ছয় ইন্দ্রিয়ই বিষয় থেকে প্রত্যাহৃত। শ্রীহরির ধ্যান-মাহাত্ম্যে তাঁর ত্রিগুণের মালিন্য দূর হয়েছে। মনকে তিনি বুদ্ধিতে লয় করেন, পরে বুদ্ধিকে দ্রষ্টা জীবাত্মায় মিলিয়ে দেন। তারপর ঘটাকাশ[১] যেমন মহাকাশে বিলীন হয় সেইরূপ তিনি জীবাত্মাকে পরমব্রহ্মের আধারে সমর্পণ করেছেন। তাঁর বাসনাগুলি আজ নিবৃত্ত, ইন্দ্রিয় এবং মনের ব্যাপারও নিরুদ্ধ। সর্ববিধ আহার তিনি পরিত্যাগ করেছেন। এখন তিনি স্থাণুর মত বিরাজ করছেন। ৪০-৫৬

তাই বলি, মহারাজ, যিনি সমস্ত কর্ম পরিত্যাগ করে অবস্থান করছেন তাঁর সাধনার অন্তরায় হবেন না। আজ থেকে পঞ্চম দিনে তিনি দেহত্যাগ করবেন, তারপর সেই দেহ ভস্মীভূত হবে। নিজেদের পর্ণকুটীরটির সঙ্গে পতির দেহ দগ্ধ হতে দেখে সাধ্বী স্ত্রী গান্ধারী সেই অগ্নিতে প্রবেশ করবেন। বিদুরও সেই আশ্চর্যজনক ব্যাপার দেখে হর্ষ-শোকে অভিভূত হয়ে সেখান থেকে তীর্থসেবার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়বেন। ৫৭-৫৯

এই সব কথা বলা শেষ করে নারদ তাঁর বীণাটি নিয়ে স্বর্গরাজ্যে প্রস্থান করলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠিরও তাঁর সমস্ত কথা অন্তরে ধারণ করে শোক ত্যাগ করলেন। ৬০

চতুর্দশ অধ্যায়

কৃষ্ণ-তিরোধানের ভূমিকা

সূত বললেন, প্রিয় বন্ধুকে দেখা আর পুণ্যশ্লোক শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রায় বোঝার উদ্দেশ্যে অর্জুন দ্বারকায় চলে গিয়েছিলেন। কয়েক মাস কেটে গেল, অথচ অর্জুন ফিরলেন না। আবার এই সময় যুধিষ্ঠির দেশের মধ্যে ভয়ংকর সব দুর্লক্ষণ দেখতে লাগলেন। তিনি বিভীষিকাময় কালের গতির চিহ্ন দেখতে পেলেন। ঋতুচক্রে বিপর্যয় দেখা দিল। ক্রোধ, লোভ আর মিথ্যার বলে মানুষের জীবন পাপপূর্ণ হয়ে উঠল। তাদের ব্যবহার মহাকপট হল, বন্ধুতার মধ্যে শাঠ্য দেখা দিল এবং পিতামাতা-বন্ধু-ভাই-দম্পতির মধ্যে অন্তঃকলহ শুরু হল। লোকের লোভাদি, অধর্মে আকৃষ্ট চিত্ত আর ভয়ংকর সব দুর্নিমিত্ত দেখে যুধিষ্ঠির ভীমকে বললেন, অর্জুনকে দ্বারকায় পাঠান হয়েছে প্রিয়বন্ধু শ্রীকৃষ্ণকে দেখার এবং তাঁর অভিপ্রায় জানার জন্য। কিন্তু আজ পর্যন্ত সাত মাস কেটে গেলেও সে কেন ফিরে আসছে না আমি বুঝতে পারছি না। তবে কি ভগবান তাঁর লীলাসাধনের উপকরণস্বরূপ নিজের দেহ পরিত্যাগ করতে ইচ্ছা করছেন? দেবর্ষি নারদের বর্ণিত সেই সময় কি সত্যসত্যই এখন এসে গেল? শ্রীকৃষ্ণের আনুকূল্যেই আমাদের সম্পদ, রাজ্যশ্রী, স্ত্রী, প্রাণ, কুল, প্রজাবর্গ এই সব হয়েছে। আবার তাঁরই অনুগ্রহে সকলের শত্রু নিপাত হয়েছে। ভৌম, দিব্য, পার্থিব আর দৈহিক যে সব দারুণ উৎপাত আরম্ভ হয়েছে তা দেখ। এগুলি যে আসন্ন মহাভয়ের সূচনা তাতে আমাদের বুদ্ধি মোহিত হচ্ছে। আমার বাম উরু, চোখ আর বাহু নিরত কাঁপছে, বুকের ভেতরও কম্পন অনুভূত হচ্ছে; এ সব লক্ষণ খুব শীঘ্রই অমঙ্গল নিয়ে আসবে। আগুন উদ্গার করতে করতে শৃগালী সূর্যের দিকে

১ ঘটের মধ্যকার শূন্যতা। ঘট ভেঙে গেলে এই ঘটাকাশ মহাব্যোমে মিশে যায়।

মুখ করে কাঁদছে। এই কুকুরটাও আমাকে লক্ষ করে নির্ভয়ে প্রচণ্ড চীৎকার করছে। শুভ পশু গরু আমাকে বাঁ দিকে রেখে চলে, অশুভ প্রাণী গর্দভাদি আমাকে ডান দিকে রাখে। মনে হয় আমার ঘোড়াগুলোও কাঁদছে। এই পায়রাটাকে মৃত্যুদূত বলে মনে হয়, আর এই পেঁচা আর কাকও যেন পৃথিবীটাকে জনশূন্য কল্পনা করেই কুৎসিত শব্দে মুখর। সূর্যের চার পাশ ধোঁয়াটে হয়ে উঠেছে, মাটি-পাহাড় কেঁপে কেঁপে ওঠে। মেঘের সঙ্গে ভয়ংকর বজ্রপাতও হচ্ছে। প্রবল বায়ুর সাহায্যে ধুলো উড়ে অন্ধকার সৃষ্টি হচ্ছে। মেঘ থেকে চারদিকেই ভয়াবহ রক্তবৃষ্টি হচ্ছে। সূর্য অন্তরীক্ষে হতপ্রভ, অন্য গ্রহরা পরস্পরকে পীড়ন করছে ; আকাশ ও পৃথিবী সকল প্রাণীদের সঙ্গে রুদ্রানুচর প্রমথদের সংঘর্ষে যেন দাউ দাউ করে জ্বলছে। নদ-নদী সংক্ষুব্ধ ; পুষ্করিণীর জল আর মানুষের মনও আলোড়িত। ঘৃতাহুতিতেও আগুন আজ জ্বলে না। এই সময়ে কি অমঙ্গলের উদ্ভব হবে আমি জানিনা। ছোট শিশুরা মায়ের স্তন পান করে না, মায়েদের স্তনেও দুধ আসছে না। গোঠে গোঠে গরুরা অশ্রুমুখী, ক্রন্দনরত। বলীবর্দগুলোর মধ্যেও কোন স্ফূর্তি নেই। দেবপ্রতিমাগুলো দেখলে মনে হয় তারা যেন কাঁদছে, ঘামছে আর কাঁপছে। চারপাশের শ্রীভ্রষ্ট জনপদ, গ্রাম, নগর উদ্যান, খনি, আশ্রম কি যে দুঃখ আনবে ভগবান জানেন ! এইসব মহাদুর্লক্ষণ দেখে আমার মনে হচ্ছে যে দুর্ভাগা ধরিত্রী নিশ্চয়ই ভগবান কৃষ্ণের শ্রীচরণযুগলের আশ্রয় থেকে নির্বাসিত হয়েছে। ১-২১

রাজা যুধিষ্ঠির যখন নানা অমঙ্গল দেখে এইরকম চিন্তা করছিলেন, ঠিক তখনই কপিধ্বজ অর্জুন দ্বারকাপুরী থেকে ফিরে এলেন। অর্জুন এসেই যুধিষ্ঠিরের চরণে প্রণাম করে মুখ নীচু করে বসে রইলেন। তাঁর সুন্দর দুটি চোখ থেকে বিন্দু বিন্দু অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিল, তাঁর সর্বাঙ্গে যেন কিসের ছায়া পড়েছে। তাঁর এই মূর্তি দেখে যুধিষ্ঠির বিচলিত হলেন। নারদের কথাগুলো তাঁর মনে ভেসে উঠল। সভার মধ্যে তখন তিনি অর্জুনকে বলতে লাগলেন, আমাদের আত্মীয়েরা দ্বারকায় সুখে আছেন তো ? মধুভোজ, দশার্হ, সাত্বত, অন্ধক, বৃষ্ণি-বংশের সবাই কুশলে আছেন তো ? মাননীয় মাতামহ শূর কি ভাল আছেন ? মাতুল আনকদুন্দুভি আর তাঁর ভাইদের সংবাদ কুশল তো ? আর বসুদেব স্বয়ং ও তাঁর পত্নীগণ—দেবকীপ্রমুখ পরস্পর ভগিনীতুল্যা আমাদের সাত মাতুলানী—তাঁদের পুত্রদের আর পুত্রবধূদের নিয়ে কুশলে রয়েছেন তো ? রাজা উগ্রসেন, যাঁর কংস নামে একটি অসৎপুত্র হয়েছিল, ভাল আছেন তো ? তাঁর ছোটভাই দেবক এবং হৃদীক ও অক্রূর আর তাঁদের সন্তানেরা, জয়ন্ত, গদ, সরণ, শত্রুজিৎ প্রমুখ কৃষ্ণের ভাইয়েরা—এঁরা সবাই কুশলে তো ? সাত্বতদের প্রভু ভগবান পরশুরাম সুখে আছেন ? বৃষ্ণিদের মধ্যে মহারথ বলে প্রসিদ্ধ প্রদ্যুম্নের কুশল তো ? যুদ্ধে মহাবেগসম্পন্ন অনিরুদ্ধের শ্রীবৃদ্ধি হচ্ছে তো ? সুষেণ, চারুদেষ্ণ, জাম্ববতী-পুত্র সাম্ব এবং কৃষ্ণের অন্যান্য প্রধান পুত্রদের সংবাদ ভাল তো ? ঋষভ প্রমুখ ওঁরা, ওঁদের ছেলেরা, শ্রুতদেব ও উদ্ধব সহ শ্রীকৃষ্ণের অনুচরেরা, সাত্বত-বংশের খ্যাতিমান সুনন্দ-নন্দশীর্ষণা প্রভৃতি সবার সুখ-শান্তি বজায় আছে তো ? পরশুরাম ও শ্রীকৃষ্ণের আশ্রিত সকলে স্বস্তিতে আছেন তো ? আমাদের সঙ্গে গভীর সখ্য-সূত্রে আবদ্ধ ওঁরা আমাদের কুশল চিন্তা করেন তো ? আর ব্রাহ্মণদের হিতকারী, ভক্তবৎসল ভগবান গোবিন্দ আত্মীয়-বন্ধু পরিবৃত হয়ে দ্বারকাপুরীতে সুখে বিরাজ করছেন তো ? অনন্তসখা বলরামের সঙ্গে সেই আদিপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ লোকহিতে আর সবার শ্রীবৃদ্ধিতে ব্যস্ত হয়ে যদুকুলরূপ মহাসাগরে সুখশয়ানে রয়েছেন তো ? কারণ

যদুবংশীয়েরা শ্রীকৃষ্ণের বাহুদণ্ডের আশ্রয়ে সুরক্ষিত হয়ে সকলের কাছ থেকে পূজা পেয়ে পরমানন্দে সেই ভাবেই অবস্থান করেন, যেভাবে মহাপুরুষ গোবিন্দের অনুগৃহীত অনুচরেরা বৈকুণ্ঠে বিরাজ করেন। সত্যভামাদি ষোল হাজার মহিষী শ্রীকৃষ্ণের চরণসেবাকেই মুখ্য কর্ম করেন। সেই যদুপতি যুদ্ধে দেবতাদের হারিয়ে ইন্দ্রপ্রিয়া শচীদেবীর উপভোগ্য পারিজাত প্রভৃতি হরণ করে এনেছিলেন।[১] যে শ্রীকৃষ্ণের বাহুবলে যদুবংশীয় বীরেরা স্বর্গ থেকে বলপূর্বক আনীত ও দেবতাদের উপযুক্ত সুধর্মা-সভায় নির্ভয়ে পদচারণা করেন সেই মহাবলী শ্রীকৃষ্ণ ভাল আছেন তো? অর্জুন, তোমার শরীর সুস্থ তো? তোমাকে দীপ্তিহীন বলে মনে হচ্ছে। অনেকদিন ওখানে থাকার জন্য তুমি কি ওদের দ্বারা অবমানিত হয়েছ? তোমাকে কটু বা অশুভ বাক্যে কেউ সম্ভাষণ করেনি তো? কাউকে কিছু দেবার অঙ্গীকার করে কি পরে তা দিতে পারনি? তুমি আশ্রিতপালক; তাই কোনও ব্রাহ্মণ, বালক, গো-ধন, বৃদ্ধ, রোগী, স্ত্রীলোক বা অন্য কেউ তোমার আশ্রয়ভিক্ষা করার পর তাদের তুমি পরিত্যাগ করো নি তো? তুমি কোনও অগম্যা[২] স্ত্রীলোকে উপগত হওনি তো? অথবা, গম্যা[৩] অথচ মলিনা বলে কোনও স্ত্রীলোকে উপরত হও নি? পথে কোনও অধম, বিসদৃশ শত্রুর হাতে পরাজিত হওনি তো? কিংবা, এও কি হতে পারে যে বৃদ্ধ এবং বালক যাদের প্রথমে আহার করা উচিত তাদের উল্লংঘন করে তুমিই সর্বাগ্রে ভোজ্য গ্রহণ করেছ? কোনও ঘৃণ্য ও অনুচিত কাজ করোনি তো? তবে কি হৃদয়তুল্য, শ্রেষ্ঠতম নিজবন্ধু শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে 'চিরকালের মত বিদায় নিলাম' ভেবে শূন্যমনা হয়ে পড়েছ? অন্য কোনও কারণে তো তোমার মনে এত কষ্ট হতে পারে না। ২২-৪৪

পঞ্চদশ অধ্যায়

যদুবংশ ধ্বংসের কথা ও পাণ্ডবদের মহাপ্রস্থান

সূত বললেন, রাজা যুধিষ্ঠির কৃষ্ণবিচ্ছেদে কাতর কৃষ্ণসখা অর্জুনকে এইভাবে নানা আশঙ্কার কথা কল্পনা করে প্রশ্ন করতে লাগলেন। অর্জুন অনেকক্ষণ কোন কথা বলতে পারেন নি; শোকাবেগে তাঁর মুখ ও হৃদয় শুকিয়ে গিয়েছিল। তাঁর প্রভাও ম্লান হয়ে পড়েছিল। অনুক্ষণ সেই পরমেশ্বরের চিন্তাতেই তিনি মগ্ন ছিলেন। শেষে অনেক কষ্টে তিনি শোক দমন করলেন, হাত দিয়ে চোখের জল মুছলেন। কিন্তু তবু শ্রীকৃষ্ণকে আর দেখতে পাবেন না ভেবেই নিদারুণ প্রণয়োৎকণ্ঠায় কাতর হয়ে রইলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সারথি হওয়া থেকে তাঁর সঙ্গে যে বন্ধুত্ব ধীরে ধীরে প্রগাঢ় হয়ে উঠেছিল সে কথা ভেবে তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে উঠল। অবশেষে বাষ্প-গদ্গদ কণ্ঠেই অগ্রজ যুধিষ্ঠিরকে বলতে আরম্ভ করলেন, মহারাজ, বন্ধুরূপী কৃষ্ণের দ্বারা আমি বঞ্চিত। আমার যে তেজ দেবতাদেরও বিস্ময় সৃষ্টি করে তা তিনি হরণ করেছেন। দেহটা প্রাণশূন্য হলে যেমন তাকে মৃত বলা হয়, সেরূপ শ্রীকৃষ্ণের ক্ষণবিরহে এই সুন্দর জগৎও কুৎসিতদর্শন হয়ে ওঠে। ১-৬

১ সত্যভামার বাসনা পূরণ করবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধে ইন্দ্রকে হারিয়ে স্বর্গ থেকে পারিজাত (স্বর্গীয় বৃক্ষ ও তার পুষ্প) এনেছিলেন।

২ যে রমণীর সঙ্গে সংসর্গে পাপ হয় তাকে অগম্যা বলে। শাস্ত্রে অগম্যা রমণীর তালিকা দেওয়া আছে। ৩ নিজের বিবাহিতা স্ত্রী।

শ্রীকৃষ্ণকেই আশ্রয় করে আমি দ্রুপদরাজার গৃহে উপস্থিত কামোম্মত্ত রাজাদের তেজ হরণ করতে সক্ষম হয়েছিলাম। স্বয়ংবরের আগে ধনুকে গুণ যোজনা করে মৎস্যরূপ লক্ষ্যভেদ করে দ্রৌপদীকে লাভ করেছিলাম। ও'রই সান্নিধ্যে বলবান হয়ে দেবগণের সঙ্গে ইন্দ্রকে হারিয়ে ইন্দ্রের খাণ্ডব বন অগ্নিকে দিয়েছিলাম। সেই খাণ্ডব-দহনে ময়দানবকে রক্ষা করে তার রচিত অদ্ভুত শিল্পকীর্তির নিদর্শন সভা লাভ করেছিলাম। সেই সভায় অনুষ্ঠিত রাজসূয় যজ্ঞে বহু দেশ থেকে রাজারা নানা উপহার এনেছিলেন। আপনার অনুজ অমিততেজা ভীমসেন ঐ যজ্ঞ সুসম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে নৃপ-শিরোমণি জরাসন্ধকে হত্যা করেন। জরাসন্ধ মহাভৈরব যজ্ঞে বলি দেবার জন্যে যে সব নৃপতিদের ধরে এনেছিলেন তাঁদের মুক্তি দেওয়াতে তাঁরা নানা উপহার আপনার যজ্ঞে এনে দেন। এ সবই তাঁর কৃপায় হয়েছিল। তারপর আপনার স্ত্রীর সুন্দর কবরী, যা যজ্ঞের মহাভিষেকের জন্য আয়োজিত হয়েছিল— যখন ধূর্ত দুঃশাসনাদি টেনে খুলে দিল আর তা আকর্ষণ করে তাঁকে জোর করে সভায় নিয়ে গেল; তিনি সেই চুল ছড়িয়ে অশ্রুমুখী হয়ে কৃষ্ণের পদপ্রান্তে প্রণত হলেন। তখন তাঁরই কৃপায় এ ঘটনার প্রতিশোধে ভীম সেই দুর্বৃত্তদের হত্যা করে বৈধব্যের নিদর্শনস্বরূপ তাদের স্ত্রীদের কবরী খুলে দিতে পেরেছিলেন। যেদিন শত্রুর প্ররোচনায় অযুত শিষ্য নিয়ে দুর্বাসা হঠাৎ আমাদের কাছে এসে পড়েছিলেন, এই কৃষ্ণই সেদিন বনে এসে আমাদের মহাবিপদ থেকে রক্ষা করেন। কৃষ্ণ এসে পাত্রের গায়ে লেগে-থাকা শাকান্ন মাত্র উপযোগ করাতেই স্নানরত ঋষিরা 'ত্রিলোক পরিতুষ্ট হয়ে গেছে' বলে মনে করেছিলেন। তারপর তাঁরই তেজে বলীয়ান হয়ে আমি দেবী দুর্গার সঙ্গে আবির্ভূত শূলপাণি শম্ভুকে যুদ্ধে বিস্মিত করেছিলাম, আর সেইজন্যই তিনি আমাকে নিজের পাশুপত অস্ত্র দান করেছিলেন। অন্যান্য লোকপালেরাও তাঁদের নানা অস্ত্র আমাকে দিয়েছিলেন। তারপর এই মর্ত্য শরীরেই মহেন্দ্র-ভবনে গিয়ে ইন্দ্রের সঙ্গে স্বর্গের মহান সিংহাসনের অর্ধভাগ অধিকার করতে পেরেছিলাম। ৭-১২

হে আজমীঢ়, তারপর স্বর্গে থাকতে কৃষ্ণের শক্তিতে বলীয়ান এই গাণ্ডীবধারী ভুজদণ্ডকেই আশ্রয় করেছিলেন ইন্দ্র প্রমুখ দেবতারা তাঁদের শত্রুনিধনের জন্য। আজ সেই মহান পুরুষের সঙ্গ থেকে আমি বঞ্চিত। কৃষ্ণ-মৈত্রীর বলেই অজেয় ভীষ্মাদি রক্ষিত দুস্তর কুরুসৈন্য-সাগর আমি একটি রথের দ্বারাই পার হয়েছিলাম। ও'রই প্রভাবে বিরাট-রাজের অপহৃত গোধন আমি কেড়ে আনতে পেরেছিলাম এবং শত্রুদের মাথা থেকে উজ্জ্বল মণিগুলো ছিনিয়ে এনেছিলাম। এই মহান কৃষ্ণই অগণ্য শ্রেষ্ঠ নৃপতিদের দ্বারা গঠিত ভীষ্ম-দ্রোণ-কর্ণ-শল্য পরিচালিত সেনাবাহিনীর মধ্যে সারথি হয়ে আমার সামনে থেকে সেনাপতিদের আয়ু, মন, উৎসাহ, সামর্থ্য সবই তাঁর দৃষ্টি দিয়েই হরণ করে নিয়েছিলেন। যেমন আসুর অস্ত্রগুলো প্রহ্লাদকে স্পর্শই করতে পারেনি সেইরকম তাঁরই ভুজাশ্রিত থাকার ফলে ভীষ্ম-দ্রোণ-কর্ণ-ভূরিশ্রবা-সুশর্মা-শল্য-জয়দ্রথ-বাহ্লীক প্রমুখ বীরদের নিক্ষিপ্ত অব্যর্থ অস্ত্রগুলো আমাকে স্পর্শ করতে পারে নি। শ্রেষ্ঠ ভক্তগণ মুক্তির জন্য যাঁর পাদপদ্ম ভজনা করেন সেই পরমার্থদাতা ভগবানকে আমি দুর্বুদ্ধিবশত সারথি-পদে বরণ করেছিলাম। কিন্তু তবু তাঁরই কৃপায় শত্রুরথীদের চিত্ত মোহাবিষ্ট হওয়ায় যুদ্ধের মধ্যে যখন আমি মাটিতে দাঁড়িয়ে রথের শ্রান্ত ঘোড়াগুলোকে জল দান করতাম তখন আমার উপর কোনও আক্রমণ হত না। মহারাজ, মাধবের সেই উদার, সুন্দর, স্মিত হাসির সঙ্গে পরিহাসের কথাগুলো এবং তাঁর সেই 'পার্থ', 'অর্জুন', 'সখা', 'কুরুনন্দন' প্রভৃতি ডাকগুলো মনে পড়ে গিয়ে আমার বুক যেন ভেঙে যাচ্ছে। সর্বদা এক সঙ্গে শোয়া-বসা, বেড়ান, গল্পগুজব, আহার প্রভৃতি

কথার জন্য আমাদের অতিশয় ঘনিষ্ঠতা থাকত। তবুও কদাচিৎ কোন ব্যত্যয় ঘটলে আমি তাঁকে তিরস্কার করে বলেছি, সখা, তুমি খুবই সত্যবাদী। এই বক্রোক্তি সত্ত্বেও বন্ধু যেমন বন্ধুর অপরাধ সহ্য করে, পিতা যেমন পুত্রের অপরাধ সহ্য করেন, তেমনি সেই মহাপুরুষ আমার সমস্ত অপরাধই ক্ষমা করতেন। সেই পুরুষোত্তম, প্রিয় সুহৃদ, বন্ধু আজ আর আমার নেই। আজ আমি শূন্যহৃদয়। আর এই জন্যই তাঁর ষোল হাজার পত্নীকে নিয়ে আসবার সময় পথে দুষ্ট গোপেদের দ্বারা আমি অবলা নারীর মতই পরাজিত হয়েছি। সেই গাণ্ডীব ধনুক, সেই তীর, সেই রথ, সেই ঘোড়া, আর আমিও সেই রথী—যাকে দেখলে রাজন্যবর্গ মাথা নামিয়ে প্রণতি জানাত—সবই ঠিক ছিল। কিন্তু কৃষ্ণহীন হওয়ায় সেই মুহূর্তেই সব ভস্মে ঘৃতাহুতির মত, ইন্দ্রজাল-লব্ধ অর্থের মত, অনুর্বর জমিতে বীজ বপনের মত অলীক বস্তুতে পরিণত হল। মহারাজ, আপনি যাঁদের কুশল-প্রশ্ন করেছেন তাঁরা সবাই বিপ্রশাপে মোহগ্রস্ত হয়ে বারুণী-মদ খেয়ে উন্মত্তাবস্থায় পরস্পর পরস্পরকে যেন চেনেন না এভাবে মুষ্টিযুদ্ধ করে নিহত হয়েছেন। চার পাঁচ জন মাত্র বেঁচে আছেন সেই বন্ধুপুরীতে। প্রাণিগণ যে পরস্পরকে হনন ও পালন করে তা ঈশ্বরেচ্ছা। জলে যেমন বড় মাছ ছোট মাছদের খেয়ে ফেলে, শক্তিমান যেমন দুর্বলকে হত্যা করে, তেমনি মহাশক্তিধরেরা পরস্পরকে হিংসা করে। এই ভাবেই ভগবান কৃষ্ণ বলবান যদুবংশীয়দের আর মহান পাণ্ডবদের দ্বারা অন্য দুর্বলদের সংহার করার পর এখন যাদবদেরই মধ্যে পরস্পর যুদ্ধ বাধিয়ে তাঁদের হত্যা করে ভূ-ভার হরণ করলেন। বাসুদেবের সেই স্থান-কালের উপযুক্ত, অর্থযুক্ত, মনের সন্তাপহারী কথাগুলি মনে করে আমার চিত্ত অভিভূত হচ্ছে। ১৩-২৭

এভাবে প্রগাঢ় ভালবাসার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম ধ্যান করে অর্জুনের চিত্ত শান্ত ও নির্মল হল গভীর ভক্তিতে তা বিষয়-বিরক্ত হয়ে উঠল। তখন সেই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রারম্ভে ভগবানের শ্রীমুখ নির্গত যে গীতার উপদেশ তিনি শুনেছিলেন, আর যা কালগতিতে নানা ভোগের মধ্যে বিস্মৃতপ্রায় হয়েছিল, এখন আবার তা-ই তাঁর মনের মধ্যে আবর্তিত হল। তখন 'আমি ব্রহ্ম' এই জ্ঞান হওয়ায় তাঁর অবিদ্যা দূর হল। অবিদ্যা দূর হলে গুণসমূহ এবং তাদের কারণভূত লিঙ্গশরীরের নাশ হল। অবশেষে স্থূলদেহের সংস্কারও আর রইল না। এভাবে দ্বৈত সংশয় ছিন্ন করে তিনি সম্পূর্ণরূপে শোকমুক্ত হতে পেরেছিলেন। ২৮-৩১

ভগবান কৃষ্ণের মহাগতির কথা আর যদুবংশ ধ্বংসের কাহিনী শুনে যুধিষ্ঠির স্তব্ধ হয়ে গেলেন। মনে মনে তিনি স্বর্গযাত্রার পরিকল্পনা ঠিক করলেন। কুন্তীও অর্জুনের মুখ থেকে যদুকুলনাশের ও শ্রীকৃষ্ণের মহাপ্রয়াণের সংবাদ পেয়ে ইন্দ্রিয়াতীত ভগবানে একান্ত আসক্ত হলেন এবং জীবন্মুক্তি লাভ করলেন। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলে লোকে যেমন দুটোকেই ছুঁড়ে ফেলে দেয়, তেমনি জন্মরহিত পরমাত্মা যে শরীর দিয়ে ভূ-ভার হরণ করেছিলেন সেটিকেও শেষে পরিত্যাগ করলেন। ঈশ্বরের কাছে অবতার মূর্তি আর ভূ-ভার মূর্তি দুই-ই এক। অভিনেতা যেমন অন্যের রূপ ধারণ করে আবার তা ত্যাগ করে, ভগবানও তেমনি মৎস্যাদিরূপ ধারণ করে আবার তা পরিত্যাগ করেন। সে জন্যই যে তনু দিয়ে ভূ-ভার দূর হয়েছিল তাও কৃষ্ণ পরিত্যাগ করলেন। যাঁর পবিত্রকীর্তি মন সর্বদাই শুনতে চায় সেই ভগবান মুকুন্দ যে মুহূর্তে এই পৃথিবী থেকে নিজের দেহ সরিয়ে নিলেন, তখনই অজ্ঞানীদের অশুভের জন্য কলিকাল এসে উপস্থিত হল। ৩২-৩৬

যুধিষ্ঠির জ্ঞানী ছিলেন। অতএব তিনি নগরে, রাষ্ট্রে, গৃহে, এমন কি নিজের মধ্যেও লোভ, অসত্য, কুটিলতা, হিংসা প্রভৃতি অধর্মচক্রের প্রবর্তনে কলির প্রভাব

বেশ বুঝতে পারলেন। মহাপ্রস্থানের সিদ্ধান্ত নিয়ে তিনি উপযুক্ত বেশভূষাদি গ্রহণ করলেন। সম্রাট যুধিষ্ঠির নিজের মতই গুণবান পরীক্ষিৎকে হস্তিনাপুরে সসাগরা ধরণীর অধীশ্বররূপে অভিষিক্ত করলেন। তারপর যুধিষ্ঠির অনিরুদ্ধ-পুত্র বজ্রকে শূরসেন দেশের অধিপতিরূপে মথুরায় স্থাপন করলেন। এবার প্রাজাপত্য যজ্ঞের[১] অনুষ্ঠান করে গার্হপত্যাদি তিন অগ্নিকেই নিজের আত্মায় সমর্পণ করলেন। তারপর সেখানেই তিনি সম্রাটের বসনভূষণ খুলে রাখলেন। মমতাহীন, অহংকারশূন্য হয়ে সংসারের অশেষ বন্ধন সমস্তই তিনি ছিন্ন করলেন। ৩৭-৪০

তিনি ইন্দ্রিয়গ্রামকে মনে সমর্পণ করলেন, মনকে প্রাণে আর প্রাণকে অপানে অর্পণ করলেন। উৎসর্জন কার্যাদির সঙ্গে আপনাকে মৃত্যুতে, আর মৃত্যুকে পাঞ্চভৌতিক দেহে বিলোপ করে দিলেন; কারণ আত্মা তো মৃত্যুহীন। তারপর পাঞ্চভৌতিক দেহকে ত্রিগুণে সমর্পণ করলেন। পরে সত্ত্ব, রজ ও তম এই ত্রিগুণকে একত্র করে অবিদ্যাতে বিসর্জন দিলেন। সৃষ্টির হেতুভূত অবিদ্যাকে জীবাত্মায় অর্পণ করে তাকে আবার অব্যয় ব্রহ্মে বিলীন করিয়ে দিলেন। ৪১-৪২

যুধিষ্ঠির কৌপীনধারী হলেন। আহার বন্ধ করে মৌনব্রত অবলম্বন করলেন। চুল খুলে দিয়ে তিনি জড়, উন্মত্ত আর পিশাচের মত রূপ ধারণ করলেন। তারপর বধিরের মত কারো কথা না শুনে গৃহত্যাগ করলেন। হৃদয়ে পরমব্রহ্মের ধ্যান করতে করতে তিনি চলতে লাগলেন সেই উত্তর দিকে যে দিকে ইতিপূর্বে মহাত্মারা সবাই গিয়েছিলেন। এই দিকে গেলে আর কেউ ফিরে আসে না। ৪৩-৪৪

পৃথিবীর প্রজাবৃন্দ অধর্মমিত্র কলির দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে দেখে যুধিষ্ঠিরের সকল ভ্রাতাগণ কৃষ্ণলাভে তদ্‌গত হয়ে তাঁর মতই গৃহত্যাগ করলেন। ধর্মার্থ-কাম-মোক্ষ সবই তাঁদের বশীভূত হয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণের চরণপদ্মই তাঁদের আত্যন্তিক আশ্রয় এই কথা স্মরণ করে তা মনের মধ্যে তাঁরা ধারণ করে রইলেন। কৃষ্ণধ্যান-প্রবুদ্ধ ভক্তিতে তাঁদের বুদ্ধি পবিত্র হল। পরাৎপর কৃষ্ণপদে তাঁদের মতি একনিষ্ঠ হল। পরমগতি ত্রিগুণাতীত ভগবানের যে নিলয় বিষয়মগ্ন দুর্জন লোকের পক্ষে তা নিতান্তই দুর্লভ; পাণ্ডবেরা সে স্থানেই পবিত্রমূর্তিতে উপনীত হলেন। ৪৫-৪৮

মহাত্মা বিদুরও প্রভাসতীর্থে নিজের দেহ বিসর্জন করলেন। তাঁর চিত্ত কৃষ্ণাবেশে তদ্‌গত হয়েই ছিল। পিতৃগণের সঙ্গে তিনি স্বাধিকারে যমলোকে প্রস্থান করলেন। দ্রৌপদীও নিজের প্রতি স্বামীদের নিস্পৃহতা লক্ষ করে ভগবান বাসুদেবে একান্তমতি হলেন এবং তাঁরও কৃষ্ণপ্রাপ্তি ঘটল। যিনিই ভগবৎপ্রিয় পাণ্ডুপুত্রদের এই মহান শ্রেয়স্কর ও অতীব পবিত্র মহাপ্রস্থানের কাহিনী শ্রদ্ধার সঙ্গে শোনেন তিনিই হরিভক্তি লাভ করে মহাসিদ্ধিতে উপনীত হন। ৪৯-৫১

ষোড়শ অধ্যায়

পরীক্ষিতের কাহিনী

সূত বললেন, পুত্র জন্ম নিলে পর লোকে যেমন জাতকর্মবিদ্‌দের পরামর্শ নিয়ে নবজাতকের সংস্কারাদি সম্পন্ন করে সেই ভাবেই বিপ্রশ্রেষ্ঠদের মন্ত্রণা নিয়ে হরিভক্ত পরীক্ষিৎ রাজ্যশাসন করতে লাগলেন। তিনি উত্তরের কন্যা ইরাবতীর

---

১ বারোদিন ব্যাপী ব্রত ও যজ্ঞ।

পাণিগ্রহণ করেন এবং তাঁদের জনমেজয় প্রমুখ চারটি পুত্র হয়। মহারাজ পরীক্ষিৎ গঙ্গাতীরে তিনটি অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। তাঁর গুরু হয়েছিলেন শারদ্বত[১] কৃপাচার্য; যজ্ঞে প্রভূত দক্ষিণার ব্যবস্থাও হয়েছিল। এই যজ্ঞগুলিতে দেবতাদের আগমন সবাই স্বচক্ষে দেখেছিলেন। একবার তিনি দিগ্বিজয়ে বেরিয়েছিলেন। এক স্থানে শূদ্ররূপী কলিকে দেখতে পান। সে রাজার বেশ ধরে এক গো-মিথুনকে লাথি মারছিল। তখন মহারাজ পরীক্ষিৎ নিজ বীর্যেই কলিকে যথেষ্ট নিগ্রহ করেন। ১-৪

এ কথা শুনে শৌনক বললেন, সূত, রাজবেশী শূদ্ররূপী কলিকে এইভাবে গোমাতার অঙ্গে পদাঘাত করতে দেখেও মহারাজ পরীক্ষিৎ তাকে শুধুই নিগৃহীত করলেন, তাঁর প্রাণদণ্ড দিলেন না, এ কেমন কথা? এর কারণ কি? পরীক্ষিতের কলিনিগ্রহ যদি বিষ্ণুকথাশ্রিত হয়, কিংবা তা যদি বিষ্ণুপাদপদ্মের মধুপায়ী সজ্জনদের কথাশ্রিত হয়, তবেই সেই কাহিনী আমাদের বলুন। অন্যথায় প্রয়োজন নেই। কেননা অসৎ কথা আলোচনা করলে শুধু আয়ুর অপব্যয়ই হয়। আমাদের এই যজ্ঞে অল্পায়ু অথচ মুমুক্ষু মর্ত্য মানুষদের মৃত্যুস্বরূপ ভগবান যমকে আমরা শামিত্র কর্মের[২] জন্য আহ্বান করেছি। তিনি যতক্ষণ এই যজ্ঞস্থলে বিরাজ করবেন ততক্ষণ কেউ কাল-কবলিত হবে না। এই জন্যই কিন্তু মহর্ষিরা তাঁকে এখানে ডেকে এনেছেন। সুতরাং এই তো হরিলীলারূপ অমৃত পান করবার প্রকৃষ্ট অবসর। অল্পায়ু, মন্দমতি, অলস লোকের জীবনই রাতে নিদ্রায় আর দিনে বৃথা কর্মে নষ্ট হয়। ৫-৯

সূত বললেন, রণদুর্মদ পরীক্ষিৎ যখন কুরুজাঙ্গল প্রদেশে বাস করছিলেন তখন একদিন শুনতে পেলেন যে তাঁর রাজ্যে কলির অনুপ্রবেশ ঘটেছে। এই দুঃসংবাদ শুনে তিনি তখনই অস্ত্রসজ্জিত হয়ে তাঁর সিংহধ্বজ রথে বসলেন। রথে শ্যামবর্ণের[৩] অশ্ব সংযোজিত ছিল। চতুরঙ্গ সেনা নিয়ে তিনি তাঁর রাজধানী থেকে দিগ্বিজয়ের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লেন। একে একে তিনি ভদ্রাশ্ব, কেতুমাল, ভারত, উত্তরকুরু, কিম্পুরুষ প্রমুখ নানা বর্ষ[৪] জয় করলেন। এ সব জায়গা থেকে তিনি করও গ্রহণ করলেন। এই সব বর্ষে লোকের মুখে কৃষ্ণমাহাত্ম্যসূচক তাঁর পূর্বপুরুষগণের যশোগাথা শুনতে পেলেন। তিনি আরও শুনতে পেলেন কি করে অশ্বত্থামার অস্ত্র-তেজের থেকে তিনি পরিত্রাণ পান, পাণ্ডব আর যাদবদের মধ্যে কিরকম প্রীতি ছিল আর ভগবান কেশবে পাণ্ডবদের কি প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। এই সব কীর্তিগাথা শুনে তাঁর খুব আনন্দ হল, প্রেমভক্তিতে চোখ উৎফুল্ল হয়ে উঠল। তিনি সেই সব লোকদের প্রচুর ধনরত্ন, স্বর্ণহার এবং মূল্যবান বস্ত্রাদি দান করলেন। প্রিয় পাণ্ডবদের জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সারথ্য, সভাপতিত্ব, সেবা, সখ্য, দৌত্য, প্রতিরক্ষা, অনুসরণ, স্তব ও প্রণতির কাহিনী শুনে মহারাজ পরীক্ষিৎ কৃষ্ণচরণারবিন্দে বিশেষ ভক্তিমান হয়ে পড়লেন। ১০-১৬

এইভাবে তিনি যখন নিয়তই তাঁর পূর্বপুরুষদের আচরণ অনুসরণ করে

---

১ শরস্তম্বে জন্ম হয়েছিল বলে এই নাম। মহারাজ শান্তনুর কৃপায় লালিত বলে নাম কৃপ। ২ পশুবলির। ৩ মূলে 'শ্যাম' কথাটি আছে। এর অর্থ 'বর্ণবিশেষ', ঘোড়াদের বিশেষ গতিও বোঝায়। পরীক্ষিতের রথের ঘোড়া 'শ্যাম' নামক বিশিষ্ট গতিকুশল ছিল—এ অর্থও হতে পারে। ৪ পৃথিবীকে সপ্তদ্বীপা বলা হয়। এই সাতটি 'দ্বীপ' হল—জম্বু, প্লক্ষ, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক, পুষ্কর ও শাল্মলী। এক একটি দ্বীপ আবার কয়েকটি অংশে ভাগ করা। ঐ সকল অংশকে 'বর্ষ' বলে।

চলছিলেন তখন যে একটি আশ্চর্য ঘটনা ঘটল এবার তার কথাই আপনারা আমার মুখ থেকে শুনুন। ১৭

বৃষরূপী ধর্ম[১] এক পায়ে ঘুরতে ঘুরতে একদিন পুত্রহীন মায়ের মত নিষ্প্রভ রোরুদ্যমানা গাভীরূপী পৃথিবীকে দেখে প্রশ্ন করলেন, ভদ্রে, তোমার শারীরিক মঙ্গল তো? আমি দেখতে পাচ্ছি যে তোমার দেহে কোনও জ্যোতি নেই, আর মুখও তোমার ম্লান। মা, তুমি কি দূরস্থ প্রবাসী কোন বন্ধুর কথা ভাবছ, না আমার একটি মাত্র পা দেখে তুমি দুঃখ করছ? এও কি ভাবছ যে এর পর থেকে শূদ্র রাজারা তোমাকে ভোগ করবে? অথবা তোমার শোকের কারণ কি এই যে অসুরেরা যজ্ঞভাগ হরণ করায় দেবতারা হীন হয়ে পড়েছেন? তোমার দুশ্চিন্তা কি এ জন্যও হতে পারে যে ইন্দ্রদেব বৃষ্টি না দেওয়ায় প্রজাদের কি দুরবস্থা হবে? পৃথিবী, তুমি কি ভাবছ যে এই কি অবস্থা হল যখন স্বামীরা স্ত্রীদের পিতারা শিশুপুত্রদের দেখাশোনা তো করেই না, বরং রাক্ষসের মত তাদের ওপর উৎপীড়ন করে? তুমি কি এই ভেবে দুঃখ করছ যে আজ কুকর্মে আসক্ত ব্রাহ্মণকুলেই দেবী সরস্বতীর অধিষ্ঠান হয়েছে, আর শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ বিদ্রোহী রাজকুলের সেবক হয়েছে? কলিগ্রস্ত ক্ষত্রিয়াধমদের কথা ভেবে বা তাদের দ্বারা উপদ্রুত রাজ্যসকলের কথা চিন্তা করেই কি তুমি কাতর হয়েছ? পৃথিবীর লোকেরা নির্বিচারে যত্র তত্র স্নান-পান-আহার-বসবাস-মৈথুন করছে দেখে কি তুমি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়েছ? মা, তোমার বিষম ভার লাঘব করবার জন্য আবির্ভূত কৃষ্ণাবতার তাঁর কাজ শেষ করে চলে গেছেন, এখন তাঁর সেই সব মোক্ষসাধক কর্মের কথা স্মরণ করেই কি শোকার্ত হয়েছ? বলবানেরও বলবান যে কাল, তার দ্বারা দেবার্চিত সৌভাগ্য কি অপহৃত হয়েছে? যে মনঃকষ্টে তোমার এই যন্ত্রণা তার কথা তুমি আমায় খুলে বল। ১৮-২৪

তখন গোমাতারূপিণী পৃথিবী বললেন, ধর্ম, আপনি আমাকে যে প্রশ্নগুলি করলেন তার সব উত্তরই তো জানা আপনার। পূর্বে যাঁর প্রভাবে আপনি চারপদে অবস্থিত হয়ে সর্বজনের সুখ বিধান করতেন সেই গুণাকর শ্রীনিবাস হরিতে নিয়ত বিরাজ করছে এই সব মহদ্গুণ—সত্য, শুচিতা, দয়া, ক্ষমা, ত্যাগ[২], সন্তোষ, ঋজুতা, শম[৩], দম[৪], তপস্যা[৫], সাম্য[৬], তিতিক্ষা[৭], উপরতি[৮], শাস্ত্রজ্ঞান, আত্মজ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য[৯], শৌর্য, তেজ, বল[১০], স্মৃতিশক্তি, স্বাতন্ত্র্য, কৌশল[১১], কান্তি, ধৈর্য চিত্তের কোমলতা, প্রাগল্ভ্য[১২], প্রশয়[১৩], শীল[১৪], মনোবল, প্রজ্ঞাবল, শারীরিক বল, যত্ন, গাম্ভীর্য, স্থৈর্য, আস্তিক্য[১৫], কীর্তি, মান, অহংবোধশূন্যতা[১৬]। এগুলি ছাড়াও

১ এখানে একটি রূপক আছে। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি—ধর্মের এই চারি পদ। কলিকালে ধর্ম মাত্র একপদ। ধর্মকে প্রায়ই বৃষরূপে কল্পনা করা হয়। 'গো' শব্দের অর্থ 'পৃথিবী'ও হয়। সুতরাং এখানে পৃথিবী ও ধর্মের মধ্যে সমকালীন অবস্থা নিয়ে আলোচনা সূচিত হচ্ছে।

২ কর্মফলত্যাগ। ৩ অন্তরিন্দ্রিয়ের নিগ্রহ। ৪ বাহ্যেন্দ্রিয়ের নিগ্রহ। ৫ তপস্যা তিন রকম—স্বাধ্যায়, সময় এবং একাগ্রতা। স্বাধ্যায় হল বেদাদি-পাঠ, সময় নিয়মাদি পালন, আর একাগ্রতা ইন্দ্রিয়গণের স্থিরত্ব। যাঁর একাধারে বশিত্ব, নিয়মিত্ব ও বৈদিকত্ব, এই তিন গুণ আছে তিনিই প্রকৃত তপস্যা-গুণ সম্পন্ন। ৬ মিত্রামিত্র অভেদজ্ঞান। ৭ শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ব সহিষ্ণুতা। ৮ বাসনাত্যাগ। ৯ ঈশ্বর-ধর্ম; এটি দুটি পর্যায়ের—বিভূতি ও ভূতি। ১০ যা দিয়ে জড় বস্তুর গতি উৎপাদিত বা পরিবর্তিত হতে পারে। ১১ দক্ষতা। ১২ তেজস্বিতা। ১৩ বিনয়। ১৪ সচ্চরিত্রতা। ১৫ সনাতন ধর্মে শ্রদ্ধা। ১৬ 'আমি এই' এই ধরনের অভিমানই অহংবোধ। 'আমি কর্তা', 'আমার পুত্র', আমি জ্ঞানী', 'আমি পণ্ডিত'—এ জাতীয় অভিমানকে অহংবোধ বা অহংকার বলে। সাংখ্যমতে অহংবোধ মহত্তত্ত্ব থেকে উদ্ভূত। এর তিন প্রকার: সাত্ত্বিক, রাজসিক, এবং তামসিক।

আরও অনেক গুণ নিত্য তাঁতে অধিষ্ঠিত। সর্ববিধ্বংসী মহাপ্রলয়েও এইসব মহদ্‌গুণের অপহ্নব ঘটে না। জগতে যাঁরা মহত্ত্ব লাভে ইচ্ছুক তাঁরা এই গুণাবলীই প্রার্থনা করেন। সম্প্রতি এই সর্বগুণধাম বাসুদেবকে আমি হারিয়েছি, জগৎকে ক্রূরদৃষ্টি কলির নজরে পড়তে দেখছি এই আমার দুঃখ। দেবোত্তম, নিজের জন্য আর আপনার জন্য আমার অনুশোচনা। আমার দুঃখ দেব, ঋষি, পিতৃগণ, সজ্জন, সর্ববর্ণ ও সর্বাশ্রমের সকলের জন্যই। ঐশ্বর্যবানদের মহাশরণ ব্রহ্মাদি দেবতারাও দেবী লক্ষ্মীর কৃপাদৃষ্টি কামনা করে দীর্ঘকালব্যাপী তপস্যায় রত হন। সেই মহালক্ষ্মীও নিজের আবাস পর্যন্ত পরিত্যাগ করে পরম অনুরাগে ভগবান কৃষ্ণের যে শ্রীচরণদুটির সেবা করেন, পদ্ম-বজ্র-অংকুশ-ধ্বজাচিহ্নধারী সেই সুন্দর পদযুগলের দ্বারা আমার সর্বাঙ্গ অলংকৃত হয়েছিল। সেই ভগবানের কাছে সৌভাগ্যরূপ সম্পদ পেয়ে আমার সৌন্দর্য তিন লোককেই ছাড়িয়ে যাওয়ার গর্বে আমি গর্বিত হয়েছিলাম। সে জন্যই বোধ হয় আমার সে সম্পদ নষ্ট হয়ে গেল এবং তিনিও আমাকে পরিত্যাগ করলেন। হরি আমার মহাভারস্বরূপ অসুর-রাজাদের শত শত অক্ষৌহিণী সৈন্য সংহার করেন। আপনাকে ভগ্নপদে অবস্থিত, দুঃখার্ত দেখে নিজের পৌরুষে আপনাকে সুস্থ করেন। তিনিই রমণীয় বিগ্রহ ধারণ করে যদুকুলে জন্মগ্রহণ করেন। সেই পুরুষোত্তম ভগবান তাঁর প্রেমপূর্ণ দৃষ্টি, মধুর হাসি আর মিষ্টি কথা দিয়ে গম্ভীর ও সুন্দরী মানিনীদেরও গর্ব ভেঙে দিতে পারতেন। কোন স্ত্রী তাঁর বিরহ সহ্য করতে পারেন? তাঁর শুভ চিহ্নযুক্ত চরণস্পর্শে আমার রোমহর্ষণ হত। তাঁর বিরহ আমিই বা সহ্য করি কি করে? ২৫-৩৫

যখন পৃথিবী এবং ধর্ম এইরকম আলোচনা করছিলেন তখনই রাজর্ষি পরীক্ষিৎ পূর্ববাহিনী সরস্বতী নদীর নিকট এসে পৌঁছালেন। ৩৬

সপ্তদশ অধ্যায়

কলি নিগ্রহ

সূত বললেন, রাজা পরীক্ষিৎ এসেই দেখতে পেলেন যে রাজচিহ্নধারী এক শূদ্র সেই গাভী ও বৃষকে অসহায়ের মত প্রহার করছে। বৃষটির বর্ণ মৃণালের মত শুভ্র। শূদ্রের প্রহারে একপায়ে দাঁড়িয়েই সে কাঁপছে ও ভয়ে মূত্রত্যাগ করছে। গাভীটি যজ্ঞের জন্য দুগ্ধদান করে। শূদ্রের গদাঘাতে আহত সেই বৎসহীন গোমাতাকে অত্যন্ত দীন দেখাচ্ছিল, তার চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছিল। অতি দুর্বল হয়ে পরায় ক্ষুধার জ্বালায় সে তখন ঘাস খাবার চেষ্টা করছিল। ১-৩

এই ব্যাপার দেখে ধনুকে বাণ যোজনা করে পরীক্ষিৎ রথের মধ্য থেকেই মেঘমন্দ্রস্বরে সেই স্বর্ণখচিত পরিচ্ছদধারী লোকটিকে প্রশ্ন করলেন, ওহে, কে তুমি বলবান যে আমার রাজ্যে অবলার ওপর বলপূর্বক আঘাত হানছ? বেশভূষায় তো দেখছি মঞ্চের নটের মত! কিন্তু কাজে অব্রাহ্মণ দেখছি! গাণ্ডীবধারী অর্জুনের সঙ্গে কৃষ্ণ অন্তর্হিত হওয়াতেই সাহস পেয়ে তুমি নির্জনে এই নিরপরাধদের ওপর অত্যাচার করছ। তোমার এই গর্হিত আচরণের জন্য তোমাকে বধ করাই উচিত। ৪-৬

তারপর বৃষকে লক্ষ করে তিনি বললেন, পদ্মের মত শ্বেতাঙ্গ একপদ-

বিশিষ্ট তুমিই বা কে? আমাদের বিড়ম্বিত করবার জন্য তুমি কি আসলে কোন ছদ্মবেশী দেবতা? কারণ, পাণ্ডবদের দোর্দণ্ড প্রতাপে এবং সুখে প্রতিপালিত এই ভূমিতে তোমার ছাড়া অন্য কোন প্রাণীর চোখের জল কখনও পড়েনি। সুরভিপুত্র[১], তুমি আর দুঃখ করো না। শূদ্রের থেকে তোমার ভয় দূর হোক। তারপর তিনি গাভীটিকে বললেন, দুষ্টের শাসক হিসাবে আমি বেঁচে থাকতে অবশ্যই তোমার মঙ্গল হবে, সুতরাং তুমি কেঁদো না। যে প্রমত্ত রাজার রাজত্বে দুষ্টেরা প্রজাদের ত্রাস সৃষ্টি করে, তার কীর্তি, আয়ু, সৌভাগ্য, পরলোক সবই নষ্ট হয়। আর্তের আর্তিনাশই রাজাদের পরম ধর্ম। এই জন্যই এই হিংসক দুর্বৃত্তকে আমি বধ করব। আর হে চতুষ্পদ, সুরভি-নন্দন, কার হাতে তোমার তিনটি পা কাটা গেল? কৃষ্ণভক্ত রাজাদের রাজ্যে আর কেউ তোমার মত দুঃখে পড়েনি। হে বৃষ, নিরপরাধ তোমাদের দুজনের শুভ হোক। তোমার অংগহানি করে পাণ্ডবদের যশকে কলংকিত করল, সেই ব্যক্তি কে তা বল। নিরপরাধের ওপর যে অত্যাচার করে আমি তার নিকট আতঙ্কস্বরূপ। যে স্বজনেরা অসাধুদের দমন করেন তাঁদের মঙ্গলই হয়ে থাকে। ক্ষমতার মদে মত্ত হয়ে যে সাধুব্যক্তিদের ওপর অত্যাচার করে সে সাক্ষাৎ দেবতা হলেও তার বলয়শোভিত হাত আমি উৎপাটন করব। ধর্মে যার নিষ্ঠা আছে তাকে প্রতিপালন করা আর বিপদে না পড়েও যে বিপথে বা অধর্মের পথে যায় তাকে শাসন করা—এই তো রাজার পরম ধর্ম। ৭-১৬

তখন ধর্ম বললেন, আর্তকে অভয় দিয়ে আপনি যা বললেন তা পাণ্ডুর বংশধর আপনার পক্ষেই উপযুক্ত। এই পাণ্ডবদের নানা গুণে আকৃষ্ট হয়েই তো ভগবান কৃষ্ণ তাঁদের দৌত্যাদি সমস্ত কাজ করেছিলেন। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, যাঁর থেকে প্রাণীদের যত দুঃখ উৎপন্ন হয়েছে তাঁকে আমরা জানিনা। পাণ্ডবদের নানা বিতর্কে আমরা বিমূঢ়। ভেদবুদ্ধিবাদী কেউ কেউ আত্মাকেই আত্মার প্রভু বলে ঘোষণা করে, কেউ দৈবকে, কেউ বা কর্মকে, আবার অন্যেরা স্বভাবকে প্রভু বলে। আবার এমনও লোক আছেন যাঁরা বাক্ ও মনের অতীত পরমেশ্বরের থেকেই সুখ-দুঃখ এসব এসে থাকে, এই কথা বলেন। অতএব রাজর্ষি, এ-বিষয়ের সিদ্ধান্ত আপনি আপনার নিজের মনীষা দ্বারা নির্ণয় করুন। ১৭-২০

ধর্ম এই কথা বললে সম্রাট পরীক্ষিতের মোহবুদ্ধি দূর হল। তিনি বললেন, ধর্মজ্ঞ, আপনি ধর্মকথাই বললেন। বুঝতে পারছি বৃষরূপ ধারণ করে আপনি ধর্মরাজই এখানে উপস্থিত। এ-কথা ঠিক যে পাপীর যে গতি হয় তার উল্লেখকারীরও সেই গতিই হয়। এই জন্যই আপনি আপনার লাঞ্ছনাকারীর নাম বলতে অনিচ্ছুক। কিংবা এও হতে পারে যে ঈশ্বরের মায়ার কার্য প্রাণীদের বাক্য ও মনের অতীত, তাই ঘাতকের নাম জানেন না বলেই বলছেন না। সত্যযুগে আপনার তপস্যা, শুচিতা, দয়া ও সত্য—এই চারটি পদ ছিল। অধর্মের অংশ অহঙ্কার, বিষয়াসক্তি ও মত্ততার দ্বারা তার তিনটি পদ ভেঙে গিয়েছে, সত্য নামে একটিই অবশিষ্ট রয়েছে। কিন্তু মিথ্যাচারে পরিপুষ্ট অধর্মাত্মক কলি সেটিকেও নেবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। ভগবান কৃষ্ণ ধরিত্রীর গুরুভার অপসরণ করেছিলেন। তাঁরই শ্রীচরণের চিহ্ন ধারণ করে এই মাটি সর্বপ্রকার সুমঙ্গলা হয়েছিল। কৃষ্ণ চলে যাওয়াতে সাধ্বী ধরিত্রী দুর্ভাগা রমণীর

১ সুরভি হলেন কামধেনু।

মত দ্বিজে ভক্তিহীন শূদ্রেরা রাজবেশ ধরে আমাকে ভোগ করবে'—একথা ভেবে দুশ্চিন্তায় চোখের জল ফেলছেন। ২১-২৭

মহারথ পরীক্ষিৎ এইভাবে ধর্ম ও পৃথিবীকে সান্ত্বনা দিয়ে অধর্মের সহায় কলিকে হত্যা করবার জন্য তীক্ষ্ণ অসি হাতে নিলেন। রাজা তাকে মারতে আসছেন বুঝতে পেরে কলি তার রাজচিহ্নগুলো ফেলে দিয়ে মহাভয়ে পরীক্ষিতের পায়ে পড়ল। তাই দেখে কীর্তিমান, আশ্রিতবৎসল রাজা পরীক্ষিৎ শরণাগত কলিকে দয়া করে বধ করলেন না। তিনি সহাস্যে বললেন, আমরা অর্জুনের খ্যাতি রক্ষা করতে চাই, তাই আমার কাছে যখন হাতজোড় করে পড়েছ তখন আর তোমার ভয়ের কিছু নেই। তবে আমার রাজ্যের কোন জায়গাতেই তুমি থাকতে পারবে না। তুমি তো অধর্মেরই সঙ্গী। তুমি রাজদেহে বর্তমান থাকলে তোমাকে অনুসরণ করেই লোভ, মিথ্যাভাষণ, চৌর্য, দুর্জনতা, স্বধর্মত্যাগ, অলক্ষ্মী, কপটতা, কলহ, দম্ভ প্রভৃতি অধর্মরাজিতে চারদিক ছেয়ে যাবে। অতএব অধর্মমিত্র, এই ব্রহ্মাবর্ত যা শুধু ধর্মাশ্রয়ী ও সত্যাশ্রয়ী লোকদেরই আবাসযোগ্য সেখানে তোমার স্থান হবে না। এখানে বড় বড় যজ্ঞকার্যে অভিজ্ঞ লোকেরা নিয়ত নানা যজ্ঞে যজ্ঞেশ্বর হরির অর্চনা করে থাকেন। এই দেশে যজ্ঞমূর্তি ভগবান হরি বিরাজ করেন। বায়ুর মত স্থাবর জঙ্গমের অন্তরে ও বাইরে মহান আত্মারূপে বিরাজিত যজ্ঞমূর্তি শ্রীহরি যাজ্ঞিকদের ঐহিক মঙ্গল এবং পারত্রিক সুখ বিধান করেন। ২৮-৩৪

সূত বললেন, পরীক্ষিৎ এই আদেশ দিলে কলি কাঁপতে লাগল। তার সামনে তাকে মারবার জন্য উদ্যত তরবারি হাতে রাজা পরীক্ষিৎ দণ্ডপাণি যমের মত দাঁড়িয়েছিলেন। কলি তাঁকে বলল, মহারাজ, আপনার আজ্ঞায় যেখানেই গিয়ে আমি থাকি না কেন সেখানেই তো আপনার ধনুর্বাণধারী মূর্তি আমি দেখতে পাব। তাই আপনিই আমার থাকবার জায়গা নির্দিষ্ট করে দিন। সেখানেই আমি আপনার আজ্ঞানুসারে নিশ্চল হয়ে বসবাস করব। ৩৫-৩৭

সূত বললেন, কলি এইভাবে প্রার্থনা জানালে মহারাজ পরীক্ষিৎ নির্দেশ দিলেন যে যেখানে জুয়াখেলা, মদ্যপান, পরস্ত্রীসঙ্গ ও প্রাণিহিংসা হবে সেখানে কলি বাস করবে। এই চারটিই অসত্য, মত্ততা, আসক্তি আর হিংসারূপ অধর্মের ক্ষেত্র। কলি আবার প্রার্থনা করলে পরীক্ষিৎ তাকে সোনা দান করলেন। এর ফলে মিথ্যা, মদ, কাম এবং রজোমূল হিংসার সঙ্গে পঞ্চম অধর্ম 'শত্রুতা'ও যুক্ত হয়ে কলির বাসস্থান হল পাঁচটি। উত্তরা-পুত্র পরীক্ষিতের কাছে থেকে পাওয়া এই পাঁচটি জায়গাতেই সে তাঁর আদেশানুসারে থাকতে লাগল। অতএব যাঁরা নিজেদের মঙ্গল চান তাঁরা এই পাঁচটির আশ্রয় নেবেন না, বিশেষ করে ধর্মশীল, গুরুস্বরূপ, লোকপালক রাজা কখনই এদের সেবা করবেন না। তপস্যা, শুচিতা ও দয়া – বৃষটির এই নষ্ট তিন পা তিনি আবার জুড়ে দিলেন। পৃথিবীকেও আশ্বাস দিয়ে সমৃদ্ধ করলেন। ৩৮-৪২

তাঁর পিতামহ অরণ্যযাত্রার প্রাক্কালে যে সিংহাসন তাঁকে দিয়ে গিয়েছিলেন পরীক্ষিৎ তাতে রাজার মতই সমাসীন ছিলেন। মহাভাগ, চক্রবর্তী, বিস্তৃতযশা, রাজর্ষি পরীক্ষিৎ কৌরব রাজলক্ষ্মীর শ্রীবৃদ্ধি করেছিলেন হস্তিনাপুরে থেকেই। অভিমন্যুপুত্র পরীক্ষিৎ এমন পরাক্রমের সঙ্গে পৃথিবী পালন করেছিলেন বলেই আপনারা এই যজ্ঞে দীক্ষিত হতে পেরেছেন। ৪৩-৪৫

অষ্টাদশ অধ্যায়

মুনিকুমারের অভিশাপ

সূত বললেন, পরীক্ষিৎ মায়ের গর্ভে অশ্বত্থামার অস্ত্রে দগ্ধ হলেও ভগবান কৃষ্ণের অনুগ্রহে তাঁর মৃত্যু ঘটেনি। আর ব্রহ্মশাপের ফলে তক্ষকের দংশনে মৃত্যুরূপ মহাভয়ের সম্মুখীন হয়েও কৃষ্ণে সমর্পিতচিত্ত পরীক্ষিৎ কিছুমাত্র হতবুদ্ধি হন নি। শুকদেব-শিষ্য পরীক্ষিৎ সকল আসক্তি বিসর্জন দিয়ে, ভগবত্তত্ত্ব লাভ করে গঙ্গাতেই তাঁর দেহ বিসর্জন দেন। যাঁরা হরির লীলারসজ্ঞ তাঁরা সর্বদা হরিকথামৃত পান করেন, তাঁর চরণপদ্ম স্মরণ করেন। তাই মৃত্যুকালে তাঁদের বুদ্ধিভ্রংশ হয় না। যতকাল এই পৃথিবীতে অভিমন্যুপুত্র পরীক্ষিৎ মহান রাজচক্রবর্তী সম্রাটরূপে ছিলেন, ততকাল কলি সর্বত্র অনুপ্রবেশ করলেও তার প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। যখনই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পৃথিবীকে ত্যাগ করেন সেই মুহূর্তেই অধর্মের সহায় কলি পৃথিবীতে ঢুকে পড়েছিল। ভ্রমরের মত সারগ্রাহী পরীক্ষিৎ কলিকে হত্যা করেন নি এই জন্যে যে কলিকালে পুণ্য কর্মগুলি সংকল্পমাত্রেই ফল দেয়, কিন্তু পাপকর্মের অনুষ্ঠান করলে তবে তার ফল হয়। তাছাড়া, প্রমত্ত লোকদের আক্রমণ করার জন্যই কলি সতর্ক নেকড়ের মত ঘুরে বেড়ায়। তার বীরত্ব কেবলমাত্র চপলমতি লোকের কাছে, ধীর ব্যক্তিদের সে ভয় করে। সুতরাং এই কলির নিকট থেকে কি অনিষ্টই বা আসতে পারে? ১-৮

আপনারা কৃষ্ণ-চরিতকথার সঙ্গে পরীক্ষিতের যে পুণ্য আখ্যান শুনতে চেয়েছিলেন এ পর্যন্ত তাই আপনাদের কাছে বললাম। পবিত্রযশ ভগবান কৃষ্ণের গুণ ও কর্ম বিষয়ে যে যে কাহিনী আছে মঙ্গলেচ্ছু মানুষদের সেগুলি সর্বদা শোনা কর্তব্য। সূত এই বলে থামলে ঋষিরা বললেন, সূত, আপনি এই জীবলোকে চিরকাল বেঁচে থাকুন। আপনি আমাদের মত মরণশীল মানুষের কাছে শ্রীকৃষ্ণের অমৃত যশকাহিনী বিস্তৃতভাবে কীর্তন করেছেন। আশ্বাসহীন[১] এই যজ্ঞাদি কার্যে এসে আপনি আমাদের গোবিন্দপাদপদ্মের সুমিষ্ট মধু পান করিয়েছেন। আমরা ভগবদ্ভক্তদের সংসর্গের কণিকামাত্র পেলেও স্বর্গ বা মোক্ষকে তুচ্ছ জ্ঞান করি; মানুষের অভীষ্ট রাজ্যপদাদির প্রশ্ন তো এক্ষেত্রে একেবারেই অবান্তর। ব্রহ্মা-মহেশ্বরাদি যোগেশ্বরেরা যে সর্বাশ্রয় নির্গুণ ভগবানের বিভূতিসমূহের অন্ত পান নি তাঁর কথা শুনতে কোন রসবেত্তাই কখনও তৃপ্ত হন না। এইজন্যই আপনি ভগবানের প্রধান সেবক। আপনি আমাদের সেই মায়াতীত, সজ্জনাশ্রয় শ্রীহরির উদার চরিতকথা সবিস্তারে আরও বলুন। আমরা তা শুনতে ইচ্ছুক। স্থিরমতি, মহাভাগবত পরীক্ষিৎ শুকের কাছ থেকে জ্ঞান লাভ করে তাঁর সাহায্যে মোক্ষনামযুক্ত হরির শ্রীপদ লাভ করেছিলেন। এই ভাগবত কাহিনীতে অদ্ভুত সব যোগের কথা বলা হয়েছে। পরীক্ষিৎ ভক্তদের প্রিয়; অনন্ত ভগবানের চরিতকথা শুনে তাঁর মহাপুণ্য লাভ হয়েছিল। সেইসব কাহিনী আপনি সুস্পষ্টভাবে আমাদের বলুন। ৯-১৭

সূত বললেন, কি আনন্দের কথা যে আমরা বর্ণসংকর হলেও আজ সফলজন্মা হতে পারলাম এইজন্য যে জ্ঞানবৃদ্ধ ঋষিরা আমাদের সমাদর করছেন। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির সম্ভাষণ পেলে নীচকুলে জন্মাবার দোষ, মনঃকষ্ট সবই দূর হয়ে যায়। মহতের আশ্রয় হরির নাম-কীর্তনকারী মানুষের কোন স্থান থেকেই কোন দুঃখ আসে না।

---

১ কারণ যজ্ঞাদিতে মুক্তি আসে না।

অনন্তশক্তি ভগবান অনন্ত; মহান গুণাকর বলে তাঁকে অনন্ত বলা হয়। গুণ-রাশিতে অতুলনীয় হরির সম্বন্ধে এইটুকু বললেই যথেষ্ট বলা হবে যে, অন্যান্য দেবতারা তাঁকে প্রার্থনা করলেও লক্ষ্মীদেবী সবাইকে পরিত্যাগ করে, যে গোবিন্দ তাঁকে চাননি, তাঁরই চরণরেণুর সেবা করতে লাগলেন। ব্রহ্মা শিবের উদ্দেশে যে অর্ঘ্যজল দিয়েছিলেন, যার স্পর্শে শিবসহ সমস্ত জগৎ পবিত্র হচ্ছে, তা বিষ্ণুর চরণ-কমল থেকেই উৎসারিত হচ্ছে। সেই বিষ্ণু ছাড়া এই লোকে অন্য ভগবৎ-পদার্থ আর কি আছে? সাধু ব্যক্তিদের শ্রীহরিতে আসক্তি হলে দেহাদিতে আসক্তি মুহূর্তে মধ্যেই লোপ পায়। তাঁরা তখন পরমহংস নামক আশ্রমের পরাকাষ্ঠা লাভ করেন। পরমহংস আশ্রমে অহিংসার দ্বারা উপার্জিত শান্তিই স্বধর্ম। ১৮-২২

মুনিগণ, আপনারা আমাকে পরীক্ষিৎকে কথিত ভাগবতের কথা জিজ্ঞাসা করেছেন। এই বিষয়ে আমার যতটা জ্ঞান আছে সেই মতই আমি আপনাদের বলব। পাখীরা নিজেদের শক্তিতেই আকাশে যতদূর পারে ওড়ে, পণ্ডিতেরাও যথাজ্ঞান বিষ্ণুর লীলা বর্ণনা করেন। ২৩-২৪

একবার শরাসনে শরসন্ধান করে মহারাজ পরীক্ষিৎ মৃগয়ার উদ্দেশ্যে বনে বিচরণ করছিলেন। কতকগুলো মৃগের অনুসরণ করতে গিয়ে তিনি খুবই ক্লান্ত, ক্ষুধিত ও তৃষিত হলেন। জলাশয়ের সন্ধান করতে করতে তিনি এক মুনির আশ্রমে ঢুকলেন। তিনি দেখলেন, মুনি নিমীলিতনেত্রে ধ্যানে বসে রয়েছেন। মুনি-বরের প্রাণ-মন-বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়ের কাজ স্তব্ধ; তাঁর অবস্থা তখন জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি—এই তিনের ঊর্ধ্বে তুরীয় অবস্থায় নিবদ্ধ। তিনি তখন ব্রহ্মভূত, বিকাররহিত। তাঁর মাথার জটা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত; দেহ মৃগচর্মে আচ্ছাদিত। মুনিকে এই অবস্থায় দেখেও রাজা তাঁর কাছে জল চাইলেন, কারণ তাঁর তালু তখন তৃষ্ণায় শুকিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বসবার জন্য আসনাদি এবং যথাবিহিত মর্যাদা সহকারে অভ্যর্থনা না পেয়ে রাজা অপমানিত বোধ করলেন আর ভীষণ ক্রুদ্ধ হলেন। ক্ষুৎ-পিপাসা-পীড়িত রাজা ক্রোধ ও দ্বেষের বশবর্তী হয়ে আশ্রম থেকে বেরোবার সময়ে একটা মরা সাপ ধনুকের মাথায় তুলে নিয়ে সেটাকে মুনিবরের কাঁধে রাখলেন। তারপর তিনি এই ভাবতে ভাবতে নিজের রাজধানীতে ফিরে এলেন—ইনি কি সত্য সত্যই ইন্দ্রিয়গ্রাম নিরুদ্ধ করে চক্ষু মুদে ধ্যান করছিলেন, না এই ক্ষত্রিয়াধম উচ্ছন্নে যাক্ এই স্থির করে ধ্যানের অভিনয় করছিলেন? ২৫-৩১

এদিকে মুনিবরের মহাতেজস্বী বালকপুত্র অন্যান্য ছেলেদের সঙ্গে খেলায় মত্ত ছিল। তার পিতার ওপর রাজার এই অত্যাচারের সংবাদ শুনে সে বলল, প্রজাদের রক্ষকমাত্র হয়ে রাজাদের এ কি অধর্ম! ব্রাহ্মণের দাস হয়ে তারা প্রভুকে অপমান করছে। উচ্ছিষ্টভোজী কাক আর প্রভুর অন্নে পালিত দ্বাররক্ষক কুকুরের মতো এদের প্রভেদ কোথায়? ব্রাহ্মণেরা ক্ষত্রিয়দের গৃহরক্ষক বলে নির্দেশ করেছেন। সুতরাং দ্বাররক্ষক-স্বরূপ ক্ষত্রিয়াধম ঘরের অভ্যন্তরে অবস্থিত পাত্রে রাখা ঘি খেতে সাহসী হয় কি করে? উচ্ছৃঙ্খলদের শাসক কৃষ্ণ আজ আর নেই; তাই আজ আমিই আমাদের মর্যাদালঙ্ঘনকারী এই রাজাকে শাস্তি দেব। তোমরা সবাই আমার প্রতাপ দেখ! ৩২-৩৫

বন্ধুদের এই কথা বলে ক্রোধে রক্তচক্ষু ঋষিবালক শৃঙ্গী কৌশিকী নদীর জলে আচমন করে বজ্রতুল্য অভিশাপ দিয়ে বলল, যে কুলাঙ্গার আমার পিতার মর্যাদালঙ্ঘন করে তাঁকে অপমান করেছে আমার কথায় আজ থেকে সপ্তম দিনে তক্ষক তাকে দংশন করবে। ৩৬-৩৭

তারপর মুনিপুত্র আশ্রমে ফিরে এসে পিতার গলায় সাপটি দেখে দুঃখাভিভূত হয়ে উচ্চস্বরে কাঁদতে লাগল। আঙ্গিরস-কুলোদ্ভব মুনিবর শমীক পুত্রের বিলাপ শুনে আস্তে আস্তে চোখ খুললেন। নিজের কাঁধে মরা সাপ দেখে সেটাকে ফেলে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, বৎস, তুমি কাঁদছ কেন? কেউ কি তোমার কোন ক্ষতি করেছে? শৃঙ্গী সমস্ত কথা তাঁকে বলল। কিন্তু শমীক ঋষি সেই শাপের অযোগ্য নৃপতিকে শাপ দেওয়ার কথা শুনে নিজের পুত্রকে প্রশংসা করলেন না, বরং বললেন, হায়! হায়! তুমি আজ মহা অন্যায় করেছ। সামান্য অপরাধে তুমি গুরু দণ্ড দিয়েছ। ওরে নির্বোধ, বিষ্ণুস্বরূপ রাজাদের সাধারণ মানুষের মত দেখা উচিত নয়। তাঁদের দুর্বিষহ তেজে রক্ষিত হয়েই প্রজারা নির্ভয়ে নিজেদের মঙ্গল লাভ করতে পারে। রাজা-নামধারী চক্রপাণি যদি না থাকেন দেশ চোর-দস্যুতে পূর্ণ হবে আর প্রজারা অরক্ষিত হয়ে মেষপালের মত এক মুহূর্তে ধ্বংস হয়ে যাবে। রাজা মারা গেলে ধন-নাশরূপ যে মহাপাপ ঘটবে তার সঙ্গে তুমি সাক্ষাৎ সংশ্লিষ্ট না হলেও সেই পাপ আমাদের ওপরই এসে পড়বে। ঐসময়ে দেশে দস্যুদের সংখ্যা বেড়ে যাবে, তারা পরস্পর হানাহানি করবে, দুর্বাক্য বলবে আর স্ত্রীলোক, পশু, ধনরত্ন সব অপহরণ করবে। তখন বেদ-প্রতিপাদ্য বর্ণাশ্রম আচারযুক্ত আর্যধর্ম বিলুপ্ত হবে। অর্থকামাদি ব্যাপারে মানুষেরা কুকুর আর বানরের স্বভাবযুক্ত হওয়ায় দেশে কেবল বর্ণসংকরই বৃদ্ধি পাবে। ৩৮-৪৫

মহারাজ পরীক্ষিৎ মহাযশস্বী, সাক্ষাৎ মহাভাগবত। তিনি রাজর্ষি ও অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা। ক্ষুধা, তৃষ্ণা আর পরিশ্রমে অবসন্ন হয়েই তিনি এই দুঃখজনক কাজ করে ফেলেছিলেন। সেজন্য তিনি কখনই আমাদের কাছ থেকে অভিশাপ পাবার যোগ্য নন। এখন আমি সর্বাত্মা ভগবানের কাছে এই প্রার্থনাই করি যে তরলমতি বালক জনসেবক নিষ্পাপ রাজার প্রতি যে অপরাধ করে ফেলেছে, তিনি যেন তা ক্ষমা করেন। এটা জেনে রাখ যে সমর্থ হলেও বিষ্ণুভক্তেরা তিরস্কৃত, বঞ্চিত, অবজ্ঞাত বা তাড়িত হলে তার কোন প্রতিকার করেন না। ৪৬-৪৮

এইভাবে সেই মহামুনি রাজার দ্বারা অপমানিত হয়েও তাঁর অপরাধ নেননি, বরং পুত্রকৃত অপরাধের জন্য অনুতপ্তই হয়েছিলেন। এ জগতে যাঁরা আত্মাশ্রয়ী সাধু-পুরুষ তাঁরা সুখলাভ করলে তাতে সন্তুষ্ট হন না, দুঃখ পেলেও কষ্টবোধ করেন না। কারণ আত্মা নির্গুণ, সুতরাং তার সুখ-দুঃখ কিছুই নেই। ৪৯-৫০

ঊনবিংশ অধ্যায়

পরীক্ষিতের প্রায়োপবেশন

সূত বললেন, এদিকে পরীক্ষিৎও নিজের গর্হিত কাজের কথা চিন্তা করে খুবই অনুতপ্ত হলেন। তিনি ভাবলেন, মূর্খের মতই আমি নিরপরাধ ব্রাহ্মণের ওপর পাপাচরণ করেছি। সুতরাং ঈশ্বরকে অবজ্ঞা করার জন্য খুব শীঘ্রই এবং নিশ্চিতভাবে দুঃসহ দুঃখভার এসে পড়বে। আমার পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য ঐ দুঃখ আসুক। আমার শিক্ষা হোক, যাতে অমন কাজ আর কখনও না করি। ঐ ব্রাহ্মণের ক্রোধাগ্নি আজই আমার মত পাপাত্মার সমৃদ্ধিশালী রাজ্য দহন করুক।

তাহলেই আর কোন দিন দেব-দ্বিজ-গোকুলের অনিষ্ট করার মত দুর্মতি আমার হবে না। ১-৩

এইভাবে চিন্তা করে রাজা যখন অধীর হচ্ছিলেন তখন তিনি সংবাদ পেলেন যে শৃঙ্গীর দেওয়া অভিশাপে তক্ষকের হাতে তাঁর মৃত্যু হবে। তিনি বিচার করলেন যে তক্ষকের বিষানলই কাম্য, কারণ তা বিষয়ে অনাসক্তির কারণ হবে। শাপের সংবাদ শোনার আগে থেকেই তিনি আত্মধিক্কারে বিমর্ষ হয়ে ইহলোক ও পরলোক উভয়কেই ত্যাগ করে কৃষ্ণপদ সেবাই শ্রেয় বলে মনে করেছিলেন। এবার তিনি সেই কর্মসাধনের জন্যই গঙ্গাতীরে গিয়ে অনশন আরম্ভ করলেন। নারায়ণের চরণার্পিত তুলসী আর তাঁর পদরেণুতে পবিত্র গঙ্গা লোকপালদের সঙ্গে ইহকাল ও পরকাল শুদ্ধ করেন। কোন মুমূর্ষু ব্যক্তি কি এই গঙ্গার সেবা না করে থাকতে পারে? এই সব চিন্তা করেই পাণ্ডুবংশধর পরীক্ষিৎ গঙ্গার তীরে গিয়ে অনশনে রত হওয়ার সংকল্প করেছিলেন। মুনিব্রত ধারণ করে সমস্ত আসক্তি থেকে মুক্ত হয়ে তিনি একাগ্রচিত্তে নারায়ণের চরণধ্যানে নিমগ্ন হলেন। ৪-৭

তখন সশিষ্য ভুবনপাবন মহানুভব মুনিগণ সেখানে উপস্থিত হলেন। তীর্থযাত্রার ছলে সাধু ব্যক্তিরা প্রায়ই লোক-সমাগমে কলুষিত তীর্থগুলোতে এসে নিজেরাই আবার তাদের শুদ্ধ করে দেন। তাঁর কাছে এলেন—অত্রি, বশিষ্ঠ, চ্যবন, শরদ্বান, অরিষ্টনেমি, ভৃগু, অঙ্গিরা, পরাশর, বিশ্বামিত্র, পরশুরাম, উতথ্য, ইন্দ্রপ্রমদ, সুবাহু, মেধাতিথি, দেবল, আর্ষ্টিষেণ, ভরদ্বাজ, গৌতম, পিপ্পলাদ, মৈত্রেয়, ঔর্ব, কবষ, কুম্ভযোনি, অগস্ত্য, দ্বৈপায়ন ব্যাস এবং ভগবান নারদ। এছাড়া আরো অনেক দেবর্ষিরা, বড় বড় মহর্ষিরা, অরুণ প্রমুখ শ্রেষ্ঠ রাজর্ষিবৃন্দও এলেন। সমবেত মুনিসংঘকে রাজা মাথা নত করে প্রণাম জানালেন। তাঁরা সবাই সুস্থির হয়ে বসলে রাজা তাঁদের সামনে এসে আবার প্রণাম করলেন। শুদ্ধজ্ঞানসম্পন্ন মহারাজ কৃতাঞ্জলি হয়ে তাঁর সংকল্পের কথা (প্রায়োপবেশন) তাঁদের জানালেন। ৮-১২

রাজা বললেন, যে রাজকুলে এরকম গর্হিত কাজের অনুষ্ঠান হয়, তার পক্ষে ব্রাহ্মণদের পা-ধোওয়া জল যেখানে ফেলা হয় সেখান থেকেও দূরে থাকা বিধেয়। কিন্তু তবুও আমার কি সৌভাগ্য যে আমি শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের অনুগ্রহভাজন হয়েছি। তাই রাজকুলে আমার ন্যায় ধন্য কে আছে? আমি পাপী, তার উপর সংসারে একান্ত আসক্ত। মনে হয় শ্রীভগবানই ব্রহ্মশাপের রূপ নিয়ে আমাকে বৈরাগ্য দান করলেন। এমন হলেই তো সংসারাসক্ত মানুষ ভয় থেকে শীঘ্র মুক্ত হয়। ব্রাহ্মণগণ, আমার চিত্ত কৃষ্ণচরণেই নিবিষ্ট রইল; আপনারা আমাকে আপনাদের শরণাগত বলে মনে করুন, দেবী গঙ্গাও আমাকে তাঁর চরণাশ্রিত বলে জেনে রাখুন। ব্রাহ্মণের কথামত মায়া বা তক্ষক আমাকে দংশন করুক, আমার কোন ভয় নেই। আপনারা হরিগুণগান করুন। এর পর আমি যে যে জন্ম লাভ করব সেই সেই জন্মেও যেন অনন্ত ভগবান হরিতে আমার অনুরাগ অব্যাহত থাকে; তাঁর সব মহাভক্তদের সঙ্গে আমার যেন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হয়, আর সর্বজীবে আমার মৈত্রবন্ধন যেন অটুট থাকে। আপনাদের, সমস্ত ব্রাহ্মণদের আমি প্রণতি জানাই। ১৩-১৬

এইভাবেই ধীর রাজা পরীক্ষিৎ নিজ সিদ্ধান্তে অবিচল ছিলেন। নিজ পুত্র জনমেজয়ের ওপর তিনি রাজ্যভার দিয়ে এসেছিলেন। তাই তিনি নিশ্চিন্তমনে সমুদ্রপত্নী গঙ্গার দক্ষিণকূলে কুশাসন বিছিয়ে উত্তরমুখ হয়ে বসলেন। ১৭

মহারাজ পরীক্ষিৎ এইভাবে প্রায়োবেশন করলে স্বর্গে দেবতারা আনন্দিত হলেন। প্রশস্তি জানাবার উদ্দেশ্যে তাঁরা পৃথিবীতে পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেন। দুন্দুভিও

ঘন ঘন বাজতে লাগল। যে সব মহর্ষি সেখানে এসেছিলেন তাঁরাও সাধুবাদ দিয়ে তাঁদের অনুমোদন জানালেন। এইসব ঋষিরা সর্বদাই লোকানুগ্রহে তৎপর। তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের গুণরাশিতে সুদর্শন রাজাকে বললেন, রাজর্ষি, আপনি কৃষ্ণপরায়ণ, তাই এ-কাজ আপনার পক্ষে আশ্চর্যের নয়। ভগবানের সান্নিধ্য লাভের আশায় যুধিষ্ঠিরাদি অবিলম্বে রাজমুকুটের সঙ্গে সিংহাসন ত্যাগ করলেন। যতদিন না মহাভাগবত পরীক্ষিৎ কলেবর পরিত্যাগ করে সর্বশ্রেষ্ঠ শোকহীন লোকে প্রয়াণ করেন ততক্ষণ আমরা সবাই এই গঙ্গাতীরে থাকব। ১৮-২১

পরীক্ষিৎ ঋষিদের এই অমৃতময় গভীর সত্যভাষণ শুনে একাগ্রচিত্ত হলেন। হরিলীলা শোনার আকাঙ্ক্ষায় তিনি তাঁদের বন্দনা করে বললেন, সত্যলোকে বেদ যেমন মূর্তিপরিগ্রহ করে অবস্থান করে, তেমনি আপনারা সব জায়গা থেকে এসে এখানে সমবেত হয়েছেন। অন্যকে অনুগ্রহ করা ব্যতীত ইহলোকে এবং পরলোকে আপনাদের আর কোন প্রয়োজন নেই। বিপ্রগণ, এই জন্যই আপনাদের আমি এই প্রশ্ন করতে চাই, সকল অবস্থাতে, বিশেষ করে মরণোন্মুখ লোকের পক্ষে, কোন্ কোন্ বিশুদ্ধ কাজ করণীয়? ২২-২৪

এই সময়ে ব্যাসপুত্র ভগবান শুকদেব যদৃচ্ছাক্রমে পৃথিবী ভ্রমণ করতে করতে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। কোন আশ্রমের লক্ষণই তাঁতে প্রকাশিত হয় নি। নিজেকে পেয়েই তাঁর অপার সন্তুষ্টি। শিশুরা তাঁকে ঘিরে ছিল, কারণ তাঁর ছিল অবধূতের মত বেশ। তাঁর বয়স তখন ষোল বছর মাত্র, হাত-পা-উরু-বাহু-কাঁধ-দেহ অত্যন্ত কোমল। দেহাবয়ব অতি সুন্দর, আয়ত দুটি চোখও অনুপম। উন্নত নাসা সুবর্ণ ও সুন্দর, ভ্রূযুগল-শোভিত মুখ। তাঁর গ্রীবা শঙ্খের মত, বক্ষ প্রশস্ত, কণ্ঠাস্থিভাগ মাংসবহুল, নাভিস্থল আবর্তের ন্যায়। তাঁর সুগভীর উদর চক্ররেখায় সুশোভিত, পরনে কোন বসন নেই, কুঞ্চিত কেশগুচ্ছ, আজানুলম্বিত বাহু, শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় শ্যামবর্ণ দেহকান্তি, যৌবনের দ্যুতিতে আর সুন্দর মিষ্টি হাসিতে কামিনী-মনোহর। এসব লক্ষণযুক্ত তেজোগুণসম্পন্ন শুকদেবকে দেখে উপস্থিত মুনিরা তাঁদের আসন ছেড়ে উঠে তাঁকে স্বাগত জানালেন। বিষ্ণুভক্ত পরীক্ষিৎও সমাগত অতিথিকে মাথা নত করে অর্চনা করলেন। অনুসরণকারী নির্বোধ স্ত্রীলোক আর বালকেরা তখন ফিরে গেল। তিনিও অভ্যর্থনা পেয়ে একটি বড় আসনে বসলেন। ২৫-২৯

সেই মহাপুরুষ ব্রহ্মর্ষি, দেবর্ষি, রাজর্ষিদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে রাশি রাশি গ্রহ-নক্ষত্র-তারায় শোভিত চন্দ্রের মত শোভা ধারণ করলেন। কৃষ্ণভক্তিপরায়ণ রাজা সেই সমাহিতচিত্ত, সর্বজ্ঞ, সুখাসীন মুনিবরের নিকট এসে অবহিত হয়ে, পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করলেন। তারপর হাতজোড় করে আবার নমস্কার করে মিষ্ট কথায় বললেন, ব্রহ্মজ্ঞ, আমার মত ক্ষত্রিয়াধমের আজ কি সৌভাগ্য যে আপনাদের মত মহামানবেরা দয়া করে আমার অতিথি হয়ে আমাকে সজ্জনদের সেবা করার সুযোগ দিলেন। আপনাদের স্মরণ করলেই তো মানুষের গৃহ সঙ্গে সঙ্গে পবিত্র হয়ে ওঠে! আর, আপনাদের দর্শন করে, স্পর্শ করে, পা ধুইয়ে দিয়ে, আসনে বসতে দিয়ে যে কি আনন্দ হয় তা ভাষায় ব্যক্ত করা দুঃসাধ্য। হে মহাযোগী, বিষ্ণুর সান্নিধ্য অসুরেরা যেমন ধ্বংস হয় তেমনি আপনাদের সংস্পর্শে মানুষের মহাপাপও সঙ্গে সঙ্গে নষ্ট হয়। পাণ্ডবদের প্রিয় শ্রীকৃষ্ণ তার পিসির পুত্রদের তুষ্টির জন্যই বোধ হয় আমার ওপর প্রসন্ন হয়ে আমার বন্ধুত্ব গ্রহণ করেছেন। তা না হলে এমন মৃত্যুকালে আমি কি করে আপনার দর্শন পেতে পারি? আপনি জীবন্মুক্ত। আপনি যেন আমাকে এই প্রবৃত্তি দিচ্ছেন, 'তুমি প্রার্থনা কর'। এজন্য যোগীদের পরমগুরু আপনাকে

জিজ্ঞাসা করি, আসন্নমৃত্যু ব্যক্তির পক্ষে সর্বোত্তম উপকার কিসে এবং সেজন্য কি করা উচিত? প্রভু, আপনি আমাকে বলুন, কি শোনার উপযুক্ত, কি জপ করা উচিত, কি কর্তব্য, কি স্মরণ করা উচিত, কি-ই বা ভজন করা প্রয়োজন? আর মানুষের কি করা উচিত নয় তাও বলুন। ভগবান, আমি জানি, একটি গরু দোহন করতে যেটুকু সময় লাগে আপনি সেটুকু সময়ও গৃহীদের ঘরে অবস্থান করেন না। সূত বললেন, ধর্মজ্ঞ ব্যাসপুত্র ভগবান শুকদেবকে মহারাজ পরীক্ষিৎ এইভাবে স্নিগ্ধবাক্যে প্রশ্ন করলে তিনি এবার উত্তরে বলতে শুরু করলেন। ৩০-৪০

দ্বিতীয় স্কন্ধ

প্রথম অধ্যায়

ভগবানের বিরাটরূপের বর্ণনা

শুক বললেন, মহারাজ, আপনি আমাকে যে প্রশ্ন করেছেন তা সত্যি শ্রেষ্ঠ, আত্মজ্ঞেরা এর সমর্থন করেন ; মানুষের পক্ষে যা শ্রবণীয় তার মধ্যে একথা শ্রেষ্ঠ এবং লোকহিতকর। যারা আত্মতত্ত্বজ্ঞ নয় সেরকম গৃহে আবদ্ধ মানুষের শোনবার বিষয় বহু আছে। এসব লোকদের রাত্রি কাটে নিদ্রা কিংবা নারীসহবাসে, আর দিবাভাগ কাটে অর্থচিন্তায় কিংবা আত্মীয় প্রতিপালনে মানুষের নিজের শরীর আর স্ত্রী, পুত্র ইত্যাদি সবই অলীক, অথচ এসবেই প্রমত্ত হয়ে লোকে মৃত্যুকে দেখেও দেখে না। অতএব, হে ভারত, যাঁরা অভয় চান তাঁদের সর্বাত্মা ভগবান শ্রীহরিকেই শ্রবণ-মনন-কীর্তন করা কর্তব্য। স্বধর্মনিষ্ঠ ও বর্ণাশ্রমবিহিত কর্মে নিযুক্ত থেকে যোগসাধনের মাধ্যমে সতত নারায়ণ স্মরণে মানবজন্মের সার্থকতা, আর অন্তকালে নারায়ণ স্মরণে তাব পরম লাভ। মুনিরা বিশেষভাবে বিধিনিষেধের অতীত এবং নির্গুণ ব্রহ্মে অবস্থিত হলেও তাঁরা হরির গুণকীর্তনে আনন্দ পান। বেদসমূহের সমকক্ষ এই ভাগবত নামক পুরাণ আমি পিতা দ্বৈপায়নের কাছ থেকে দ্বাপরের শেষে শিক্ষা করেছিলাম। আমি নির্গুণ ব্রহ্মে নিশ্চিতভাবে প্রতিষ্ঠিত হলেও উত্তমশ্লোক শ্রীকৃষ্ণের লীলাকাহিনীতে আকৃষ্ট হয়েছিলাম। তাই ভাগবত পুরাণ অধ্যয়ন করেছি। আপনি বিষ্ণুর কৃপাপাত্র, তাই আপনাকে এই উপাখ্যান বলব। যে ব্যক্তি শ্রদ্ধার সঙ্গে এই গ্রন্থ শোনে তার শ্রীকৃষ্ণে অহৈতুকী মতি জন্মে। যে ব্যক্তি মোক্ষলাভেচ্ছু বা নিরঙ্কুশ ভয়শূন্যতার আকাঙ্ক্ষী, কৃষ্ণের নামকীর্তনই তার পথ। ১-১১

এ জগতে বিষয়প্রমত্ত মানুষের অনেকটা সময়ই কেটে যায় তার অলক্ষ্যে। এর মধ্যে যদি সে একমুহূর্তও কর্মফল চিন্তা করে তাহলে তা থেকেই তার মঙ্গল হয়। কারণ তা থেকেই পরমার্থ চিন্তার উদয় হতে পারে। এর প্রমাণ খট্বাঙ্গ[১] নামক রাজর্ষি। তিনি তাঁর আয়ুর স্বল্পতা জানা মাত্রই সব ছেড়ে অভয়রূপ হরিকে আশ্রয় করেন। কৌরব্য, আপনার আয়ুষ্কালও সপ্তাহ মাত্র অবশিষ্ট আছে। সুতরাং পরলোকের জন্য যা কিছু করা তা এ সময়ের মধ্যে করে ফেলুন। যে সব বিষয়স্পৃহা দেহকে আশ্রয় করে রয়েছে মৃত্যুকাল এসে গেলে মৃত্যুভয়-শূন্য হয়ে সেগুলিকে নিরাসক্তির খড়্গ দিয়ে ছিন্ন করা কর্তব্য। ব্রহ্মচর্যাদি দ্বারা সংযতচিত্ত পুরুষ গৃহত্যাগ করে গিয়ে পুণ্যতীর্থের জলে স্নান করে নির্জনে পবিত্র আসনে বিধিমত বসে একমনে বিশুদ্ধ ওঁকার মন্ত্র (যা সকল মন্ত্রের শ্রেষ্ঠ) জপ করবে। এই ব্রহ্মবীজ প্রণব জপ করতে করতে প্রাণায়াম অভ্যস্ত হলে মন স্থির হবে। তখন বুদ্ধিকে সারথি করে মনের শক্তি দিয়ে বিষয় থেকে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়কে সরিয়ে আনবে। নানা কর্মে প্রক্ষিপ্ত মনকে বুদ্ধির শক্তি দিয়ে সরিয়ে এনে ঈশ্বরচিন্তায় নিয়োজিত করবে। ভগবানের সমগ্ররূপ থেকে বিচ্ছিন্ন না করেও তাঁর এক এক অবয়ব মনে মনে চিন্তা করবে। বিষয়স্পর্শরহিত মন

---

১ সূর্যবংশীয় এক রাজা ; ইনি দিলীপ নামেও পরিচিত।

যোগযুক্ত হলে চিন্তামুক্ত হয়। এর ফলে মন পূর্ণ প্রসন্নতা লাভ করে, আর এই অবস্থাই ভগবান বিষ্ণুর পরমপদ। ১২-১৯

যোগীরা নিজের রজ ও তমোগুণে বিক্ষিপ্ত, বিমূঢ় মনকে সম্পূর্ণরূপে নিরোধ করেন ; ফলে মন ঐ দুই গুণের মালিন্য থেকে মুক্ত হয়। মনোবৃত্তি নিরুদ্ধ হলে যোগীরা সুখাত্মক পরমাশ্রয়কে দেখতে পান এবং শীঘ্রই ভক্তিযোগ-সম্পন্ন হন। ২০-২১

শুকদেব এই বলে থামলে পরীক্ষিৎ বললেন, মুনিবর, কি ভাবে সুষ্ঠু নিবৃত্তি সম্ভব, আর কিভাবেই বা মনের মলিনতা শীঘ্র দূর হয়, সে সব কথা বলুন। ২২

শুকদেব বললেন, আসন ও প্রাণায়ামসিদ্ধ হয়ে জিতেন্দ্রিয়, বিষয়বিরক্ত মানুষ ধী-শক্তি প্রয়োগে মনকে শ্রীভগবানের স্থূলরূপে সংযোজন করবেন। ভগবানের এই স্থূল বিরাট দেহ সংসারে যা কিছু অতি-স্থূল আছে তাদের মধ্যে স্থূলতম ; কারণ এই বিরাট দেহেই ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমানমূলক কার্যরূপ এই বিশ্বভুবন প্রকাশমান। ঐ দেহ পঞ্চভূত, অহংকার আর মহৎ-তত্ত্বের সাতটি আবরণে মোড়া। তাতে যে পুরুষ বাস করেন তিনিই যোগধারণার একমাত্র বিষয়। এই অন্তর্যামী পুরুষের পদতলে স্থাপিত রয়েছে পাতাল, পদাঙ্গুলি আর গোড়ালিতে রসাতল। এই বিশ্বস্রষ্টার গুল্‌ফে রয়েছে মহাতল ; জঙ্ঘায় ন্যস্ত আছে তলাতল। বিশ্বমূর্তি বিরাট পুরুষের জানুদ্বয়ে নিহিত সুতল, আর এঁর ঊরুদ্বয়ে রয়েছে বিতল ও অতল। মহীতল (পৃথিবী) তাঁর জঘনে, নভস্তল (আকাশ) তাঁর নাভি-সরোবরে। যোগীরা বিশ্বরূপের অর্থোপধার এই ভাবেই করে থাকেন। ২৩-২৭

এই বিরাট পুরুষের বুক হল জ্যোতির্মণ্ডলে সমাবৃত স্বর্লোক, আর এঁর গ্রীবা মহর্লোক। জনলোক এঁর মুখ ; আদিপুরুষ হিরণ্যগর্ভের ললাট হল তপোলোক আর সহস্রশীর্ষ পুরুষের মস্তক সত্যলোক বলে পণ্ডিতদের কাছে বিদিত[১]। ইন্দ্রপ্রমুখ দেবতারা এঁর বাহু বলে প্রকীর্তিত, দিক্‌সমূহ এঁর কান, শব্দ এঁর কর্ণপটহ। অশ্বিনীকুমারেরা পরম পুরুষের নাসারন্ধ্র, গন্ধ এঁর ঘ্রাণেন্দ্রিয়, আর প্রদীপ্ত অগ্নিকে এর মুখ[২] বলা হয়। আকাশ হল অক্ষিকোটর আর সূর্য দর্শনেন্দ্রিয়। রাত্রি ও দিন বিষ্ণুর চোখের পক্ষ্মদ্বয়। ব্রহ্মপদ তাঁর ভ্রূশোভা, জল হল তালু আর স্বাদ জিহ্বা। বেদসকল আদি পুরুষের ব্রহ্মরন্ধ্র, যম দন্তপংক্তি, স্নেহগুণ হল দাঁত। লোকসমূহকে-মোহিত-করা মায়া তাঁর হাসি, আর অপার সংসার তাঁর কটাক্ষ। লজ্জা হল ওষ্ঠ, লোভ অধর। ধর্ম এঁর স্তন, অধর্মের পথ পৃষ্ঠদেশ। প্রজাপতি হল লিঙ্গ, মিত্র ও বরুণ কোষদ্বয়। সমুদ্র এঁর কুক্ষিদেশ আর পাহাড়-পর্বত অস্থি। মহারাজ, নদীগুলি এই বিরাট পুরুষের নাড়ি, বৃক্ষরাজি এঁর দেহের রোম। বায়ু হল তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাস, কাল এঁর গতি, সংসারের ধারা তাঁর খেলা। হে কুরুশ্রেষ্ঠ, মেঘসমূহ এঁর কেশরাশি বলে সকলে জানেন, আর সন্ধ্যাকে বলা হয় বিশ্বরূপের বস্ত্র। অব্যক্ত-প্রকৃতি তাঁর হৃদয়,

১ সমগ্র ভুবনকে দুভাগে ভাগ করা হয়—অধোভুবন এবং ঊর্ধ্বভুবন। অধোভুবনের অন্তর্গত পাতালের সাতটি ভাগ, যথা : অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল ও পাতাল। ঊর্ধ্বভুবনে সপ্তস্বর্গ—ভূলোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক, মহর্লোক, জনলোক, তপোলোক ও সত্যলোক।

২ গীতায় আছে 'দীপ্তহুতাশবক্ত্রম্'—১১।১৯ শ্লোক।

আর প্রসিদ্ধ চন্দ্র যা সমস্ত বিকারের আশ্রয় তা তাঁর মন। বিজ্ঞান-শক্তিকে মহৎতত্ত্ব আখ্যা দেওয়া হয়; রুদ্র হলেন এই সর্বাত্মার অহংকার। অশ্ব, অশ্বতর, উট আর হাতি তাঁর নখ, আর যাবতীয় মৃগ-পশুরাজি তাঁর শ্রোণিদেশ। পক্ষীকুল তাঁর বিচিত্র শিল্প-নৈপুণ্যের নিদর্শন। মনীষা তাঁর বুদ্ধি, মানুষই তাঁর নিবাস। গন্ধর্ব, বিদ্যাধর, চারণ, অপ্সরাকুল[১] তাঁর সঙ্গীতের স্বরগ্রাম; তাঁর সৃষ্টির অসুরসমূহ তাঁর বীর্য। মুখ হল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বাহু, বৈশ্য উরু, আর শূদ্র তাঁর পদাশ্রিত। তিনি নানা নামধারী দেবতাদের দ্বারা পরিবৃত; ঘৃতসহযোগে যজ্ঞীয় অনুষ্ঠানাদি তাঁর অভিপ্রেত কার্য।[২] ২৮-৩৭

ঈশ্বর-শরীরের অবয়ব-সংস্থানের কথা আপনাকে আমি বললাম। এই অতিস্থূল শরীরে নিজের বুদ্ধি দিয়ে মনকে দৃঢ়ভাবে নিবদ্ধ করতে হবে। এছাড়া অন্য বস্তু কিছু নেই। একজন লোক যেমন স্বপ্নে অনেক লোকজন দেখে, সেরকম মহান আত্মা সকলের ধীবৃত্তিকে আশ্রয় করে সবকিছু অনুভব করেন। সেই সত্য এবং আনন্দনিধিকে ভজনা করা উচিত, অন্য কোথাও আসক্ত হওয়া অনুচিত, তাতে অধঃপতন হয়। ৩৮-৩৯

দ্বিতীয় অধ্যায়

যোগের ক্রমবিকাশ

শুকদেব বললেন, পুরাকালে এইভাবে ধারণা দ্বারা স্থিরবুদ্ধিসম্পন্ন হয়ে আত্মযোনি ব্রহ্মা বিষ্ণুকে তুষ্ট করে প্রণষ্ট সৃষ্টির স্মৃতি জাগিয়ে তোলেন এবং অমোঘ দৃষ্টি লাভ করে এই সৃষ্টিকে ঠিক প্রলয়ের আগের মত করে রচনা করেন। সাধকের বুদ্ধি নিরর্থক স্বর্গাদি নামবিশিষ্ট নানা বস্তু পেতে ইচ্ছা করে। শব্দ-ব্রহ্ম অর্থাৎ বেদের কর্মরাজি কর্মফলের আকাঙ্ক্ষাকে উদ্বুদ্ধ করে। কিন্তু সুখের বাসনা নিয়ে শয়ন করলে লোকে যেমন সুখের স্বপ্নই দেখে, বাস্তবে কিছু পায় না, তেমনি মায়ায় ভরা পথে বিচরণ করে মানুষ মায়াময় অর্থই লাভ করে। অতএব অপ্রমত্ত, নিশ্চিতবুদ্ধি বিশিষ্ট মানুষ নামমাত্র-সার ভোগ্যবস্তুর যতটুকু দিয়ে শরীরক্রিয়ামাত্র নির্বাহ হয় ততটুকুই উপযোগ করেন। দেহধারণের জন্য যদি অন্য পন্থা থাকে তাহলে আর বিষয়ভোগে প্রযত্ন করার দরকার নেই, কারণ তা নিরর্থক পরিশ্রম। বুদ্ধিমান মানুষের দৃষ্টি এইভাবে পরিচালিত হয়—যথা, মাটি থাকলে আর বিছানার প্রয়াস কেন? জন্মলব্ধ হাত থাকতে আলাদা করে বালিশের খোঁজে লাভ কি? করপুটেই যখন কাজ হয়, তখন রাশীকৃত ভোজন-পাত্রের দরকার কি? দিক্ বা বল্কল থাকতে পট্টাম্বরের প্রয়োজনীয়তা কোথায়? সুধীব্যক্তির ধনী তথা মদান্ধ লোকের ভজনা করার কি দরকার? রাস্তায় কি কাপড়ের টুকরো মেলে না? ফল ও ছায়া দিয়ে যে বৃক্ষ অন্যকে প্রতিপালন করে ভিক্ষা চাইলে সে কি তা দেবে না? নদী-নালা কি শুকিয়ে গেছে? পাহাড়ের গুহাগুলো কি বন্ধ হয়ে গেছে? শ্রীকৃষ্ণ কি শরণাগতদের আর রক্ষা করছেন না? এইভাবে হৃদয়ে আত্মা স্বতঃসিদ্ধ সত্যস্বরূপ বিরাজ করছেন; তিনি ভগবান, অনন্ত।

১ গন্ধর্ব, বিদ্যাধর, চারণ এবং অপ্সরারা বিশেষ ধরনের দেবযোনি।
২ গীতার বিশ্বরূপ বর্ণনার থেকে এখানে স্পষ্টতর ও বিশদ বর্ণনা রয়েছে।

বৈরাগ্যে স্থিরমতি হয়ে তাঁকে ভজনা করবে ; তাতেই অবিদ্যা নাশ হবে। পশুরা ছাড়া এমন কে আছে যে বৈতরণীতুল্য সংসারে পতিত জীবসমূহকে নিজের কর্মফলজাত ক্লেশভোগ করতে দেখেও ঈশ্বরধারণা পরিত্যাগ করে অসৎ বিষয় চিন্তা করবে ? ১-৭

কেউ কেউ আছেন যাঁরা হৃদ্-আকাশে অবস্থিত শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী, প্রাদেশ-পরিমিত পুরুষকে[১] ধারণা দ্বারা চিন্তা করেন। এই পুরুষের মুখে প্রসন্ন হাসি, তাঁর চোখ পদ্মের মত, কটিতে কদম্বকেশরের মত পীতাভ বস্ত্র। তাঁর কর্ণ অঙ্গদ উজ্জ্বল রত্নে খচিত, মাথায় এবং কানে রত্ন শোভিত কিরীট, তাঁর বিকশিত হৃৎপদ্মে যোগেশ্বর স্থাপিত পদপল্লব[২]। কণ্ঠে শ্রীলক্ষণযুক্ত কৌস্তুভ মণি আর অম্লানশ্রী বনমালা শোভা পাচ্ছে। মেখলা এবং অঙ্গুরীয়তে তিনি ভূষিত, মহামূল্য নূপুর-কঙ্কণে সুসজ্জিত। তাঁর মাথায় কোঁকড়ানো চিক্কণ কালো চুলে সুন্দর হাসিভরা মুখের অপূর্ব শোভা হয়েছে। তাঁর উদার লীলাময় হাসিতে ভরা, সুন্দর ভ্রূযুক্ত চোখের দৃষ্টিতে ভক্তের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ পাচ্ছে। যতক্ষণ না মন ধারণায় নিবদ্ধ হয় ততক্ষণ এই চিন্তামণি ঈশ্বরকে চিন্তা করবেন। ৮-১২

গদাধারী কৃষ্ণের পা থেকে মুখের হাসি পর্যন্ত একটি একটি করে অংগগুলিকে ধ্যান করবেন। যেমন যেমন বুদ্ধি শুদ্ধ হতে থাকে তেমন তেমন এক একটি অংগে স্থিরীভূত মনকে সরিয়ে ক্রমশ অন্যান্য অংগে ধ্যানে নিবদ্ধ করতে হবে। পরাপর-দ্রষ্টা, সর্বসাক্ষীভূত বিশ্বেশ্বরে যতক্ষণ না ভক্তিযোগ সিদ্ধ হয় ততক্ষণ নিত্যকর্তব্য অনুষ্ঠানের পর মন দিয়ে বিরাট পুরুষের স্থূলতম রূপটিকে চিন্তা করবেন। মহারাজ, যোগী যেমন ইহলোক পরিত্যাগে অভিলাষী হন তখন দেশ-কালের[৩] কথা চিন্তা না করে স্থিরভাবে সুখকর যোগাসনে[৪] বসে প্রাণায়ামান্তে ইন্দ্রিয়গুলিকে মন দ্বারা বিলোপ করবেন। মনকে নির্মল বুদ্ধি দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করে সেই বুদ্ধিকে ক্ষেত্রজ্ঞে[৫] বিলীন করবেন। তারপর ক্ষেত্রজ্ঞকে জীবাত্মায় ন্যাস করবেন এবং জীবাত্মাকে পরমাত্মাতে লয় করবেন। এইভাবে পরম শান্তি লাভ করে ধীর ব্যক্তি যোগকার্য থেকে বিরত হন। এই অবস্থায় দেবতাদের নিয়ামক মহাকালও তাঁর প্রভুত্ব প্রকাশ করতে অপারগ হন, কাজেই দেবতাদের প্রভাবের কথা তো ওঠেই না। তখন সত্ত্ব, রজ, তম আদি গুণের কিছুই থাকে না। অহংকারতত্ত্ব, মহৎ-তত্ত্ব বা সৃষ্টির আদিকারণভূত প্রধানেরও অস্তিত্ব থাকে না। অনাত্মবস্তুকে যোগীপুরুষ 'এ আত্মা নয়' এইভাবে বিসর্জন দিয়ে একমাত্র ভগবানেই নিজেকে অর্পণ করে শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম সতত হৃদয়ে ধারণ করেন। এই বৈষ্ণবী অবস্থাই শ্রেষ্ঠ। ১৩-১৮

যোগী জ্ঞানবলে বিষয়-বাসনাকে নষ্ট করবেন এবং তা থেকে নিরত হবেন। দু'পায়ের গোড়ালি দিয়ে মূলাধার অবরোধ করে জিতেন্দ্রিয় হয়ে প্রাণবায়ুকে ছ'টি চক্রের মধ্য দিয়ে উত্তোলিত করবেন। নাড়িস্থিত মণিপুরচক্র থেকে প্রাণকে হৃদয়স্থ

উপনিষদুক্ত অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ। ২ মহামুনি ভৃগু একবার ব্রহ্মা, শিব ও বিষ্ণুর প্রকৃতি পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হন। বিষ্ণুলোকে গিয়ে নিদ্রিত বিষ্ণুর বুকে পদাঘাত করলে তিনি ওঁর পায়ে লেগেছে বলে পা টিপে দেন। তারপর থেকে ভগবান সেই পদচিহ্ন চিরদিন বুকে ধরে আছেন। ৩ দেশ, তীর্থ প্রভৃতি পবিত্র ভূমি ; কাল হল শুভতিথি সংক্রান্ত্যাদি। রামকৃষ্ণদেব বলেছিলেন, যে সন্ন্যাসী হবার জন্য লোটা-কম্বল যোগাড় করতে যায় তার আর সংসারত্যাগ করা ঘটে ওঠে না। ৪ পাতঞ্জল যোগসূত্রে আছে : স্থিরসুখমাসনম্—যে উপবেশন পদ্ধতিতে স্থির সুখ লাভ হয় তার নাম আসন। পদ্মাসন প্রভৃতি অনেক রকম আসন আছে। ৫ ক্ষেত্রজ্ঞবোধ ব্রহ্মবোধের আদিসোপান ; দ্রষ্টব্য, গীতা, ১৩।১ ও ১৩।২ শ্লোকদ্বয়।

অনাহত চক্রে নিয়ে যাবেন। সেখান থেকে উদানবায়ুর পথে প্রাণবায়ুকে গলদেশে বিশুদ্ধচক্রে নিয়ে যাবেন। তারপর চিত্তজয়ী মুনি প্রাণকে বুদ্ধির সঙ্গে সংযুক্ত করে আস্তে আস্তে নিজের তালুমূলে নিয়ে আসবেন। চোখ, কান প্রভৃতি প্রাণের সাতটি নির্গম-পথ (দুই চোখ, দুই কান, দুই নাসারন্ধ্র আর মুখ) রুদ্ধ করে সম্পূর্ণরূপে আকাঙ্ক্ষাশূন্য হয়ে প্রাণবায়ুকে তালুমূল থেকে সরিয়ে দুই ভ্রূর মধ্যবর্তী আজ্ঞাচক্রে নিয়ে যাবেন। অর্ধমুহূর্ত পরিমাণ সময় তাকে সেখানে রাখবেন। এই সময় যোগীর যদি অন্য কামনা না থাকে তবে প্রাণ ব্রহ্মকে লাভ করে ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করে দেহ এবং ইন্দ্রিয়গণকে পরিত্যাগ করবে। ১৯-২১

মহারাজ, তবে যদি কেউ ব্রহ্মলোকে কিংবা সিদ্ধদের বিহারভূমিতে যেতে চায় অথবা অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি কিংবা ব্রহ্মাণ্ডের আধিপত্য পেতে চায়, তাহলে তাকে মন আর ইন্দ্রিয়গ্রামকে পরিত্যাগ না করে সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে। সমাধিশালী মহাযোগীরা ত্রিলোকের ভিতরে ও বাইরে অবাধগতিসম্পন্ন। বিদ্যা-তপস্যা-যোগাভ্যাস-সমাধিবিশিষ্ট যোগীরা এই যে গতি লাভ করেন তা কর্মের দ্বারা লাভ করা যায় না। ব্রহ্মপথ অবলম্বনে জ্যোতির্ময়ী সুষুম্নানাড়ির সাহায্যে যোগীরা আকাশপথে অগ্নিলোকে যান। এই অগ্নিলোকে মালিন্য ভস্মসাৎ হয়ে যাওয়ায় তাঁরা নির্মল হন। তারপর তাঁরা আরও ঊর্ধ্বে বিষ্ণুসম্বন্ধীয় শিশুমার রূপ জ্যোতিশ্চক্রে[১] প্রয়াণ করেন। তারপর বিষ্ণুর এই বিশ্বনাভি-চক্র অতিক্রম করে যোগীপুরুষ লিঙ্গশরীর নিয়ে সবার পূজ্য ব্রহ্মবিদ্‌দের অধিষ্ঠান মহৎ-লোকে গমন করেন। এই লোকে কল্পজীবী মহাপুরুষরা আনন্দে বিহার করেন। কল্পান্তে যখন যোগী দেখেন যে অনন্তপুরুষের মুখনিঃসৃত আগুনে বিশ্ব ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে তখন তিনি মহৎলোক ছেড়ে দ্বিপরার্ধকালস্থায়ী সত্যলোকে চলে যান। সেখানে সিদ্ধগণের বিমানসকল রয়েছে ; এটিই পরমেষ্ঠী স্থান। ২২-২৬

যোগজ্ঞানহীন মানুষ বিষম দুর্গতি ভোগ করে। তা দেখে ব্রহ্মলোকের অধিবাসী মহাপুরুষরা মানসিক দুঃখ পান। এই দুঃখ ছাড়া কোন শোক, জরা, মৃত্যু, বেদনা, উদ্বেগ সেখানে নেই। এরপর যোগী বিশেষ ধরনের লিঙ্গদেহ পেয়ে নির্ভয় হন এবং ক্রমশ পৃথিবী, জল ও অনলমূর্তি ধারণ করেন। তারপর তিনি জ্যোতির্ময় বায়ুমূর্তি পেয়ে তা থেকে আকাশমূর্তি পান। যোগী ঘ্রাণ দিয়ে গন্ধ, জিহ্বা দিয়ে রস, চোখ দিয়ে রূপ, ত্বক দিয়ে স্পর্শ আর কান দিয়ে শব্দ আয়ত্ত করে কর্মেন্দ্রিয়গুলি দিয়ে তাদের ক্রিয়াসমূহকে লাভ করেন। তারপর তিনি সূক্ষ্মভূত ও ইন্দ্রিয়দের লয়স্থান মনোময় ও দেবময় অহংকারতত্ত্ব প্রাপ্ত হন। এখনও তাঁর গতি সূক্ষ্ম অব্যাহত থাকে এবং তিনি অহংকারের সঙ্গে মহৎতত্ত্বকে লাভ করে ত্রিগুণের লয়স্থান-ভূত প্রকৃতিকে লাভ করেন। প্রকৃতিতে প্রবেশ করে তিনি আনন্দস্বরূপ হন। উপাধিজ্ঞান লোপ পাওয়ায় তিনি শান্ত আনন্দস্বরূপ পরমাত্মাকে লাভ করেন। যে ব্যক্তি এই ভাগবতী গতি পেয়েছে সে আর এই সংসারে ফিরে আসে না। ২৭-৩১

মহারাজ, আপনি জানতে চেয়েছিলেন বলে বেদোক্ত, সনাতন ব্রহ্মপ্রাপ্তির পথের কথা আপনাকে বললাম। পুরাকালে ব্রহ্মার আরাধনায় সন্তুষ্ট হয়ে ভগবান বাসুদেব তাঁকে এই কথাই বলেছিলেন। সংসারে প্রবিষ্ট মানুষের পক্ষে এর চেয়ে মঙ্গলময় পথ আর নেই। কারণ এই পথেই ভগবান বাসুদেবে পরা ভক্তি জন্মায়। ব্রহ্মা একাগ্রচিত্ত হয়ে তিনবার বেদকে সমগ্রভাবে বিচার করে ভক্তির এই পথ নির্ণয় করেন। ভক্তি থেকেই শ্রীহরিতে প্রেম জন্মে। দৃশ্যমান বুদ্ধি প্রভৃতির লক্ষণ দেখে সহজেই অনুমান

---

১ পঞ্চম স্কন্ধে ২৩শ অধ্যায়ে শিশুমার তারকাপুঞ্জের বিশদ বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

করা যায় যে দ্রষ্টারূপে ভগবান সকল জীবেই অবস্থিত আছেন। সুতরাং সমস্ত মানুষের পক্ষে সর্বত্র সর্বদা হরিকথা শ্রবণ, স্মরণ ও কীর্তন করা কর্তব্য। যাঁরা শ্রীহরির কথামৃত কর্ণদ্বারা পান করেন তাঁরা বিষয়ভোগে কলুষিত হলেও নিজ নিজ অন্তঃকরণকে শুদ্ধ করে নেন। তাঁরাই বিষ্ণুপাদ-পদ্মের নিকট গিয়ে থাকেন। ৩২-৩৭

তৃতীয় অধ্যায়

কাম্যলাভে দেবোপাসনা

শুকদেব বললেন, আপনার জিজ্ঞাসার উত্তরে মানুষের মধ্যে মনস্বী ব্যক্তিদের, বিশেষত মৃত্যুপথযাত্রীদের, যা যা কৃত্য তা বললাম। যারা ব্রহ্মতেজ কামনা করে তারা বেদপতি ব্রহ্মাকে উপাসনা করবে। ইন্দ্রিয়কামীরা ইন্দ্রের আর পুত্রকামীরা দক্ষাদি প্রজাপতিদের ভজনা করবে। এইরকম সৌভাগ্যকামীরা দেবী দুর্গার উপাসনা করবে, তেজঃপ্রার্থীরা অগ্নির, ধনকামীরা অষ্টবসুর, বীর্যকামীবা একাদশ রুদ্রের[১], অন্নাদি খাদ্যবস্তুর অভিলাষীরা অদিতির[২], স্বর্গকামীরা দ্বাদশ আদিত্যের[৩], রাজ্য-কামীরা বিশ্বদেবদের[৪], কৃষি-বাণিজ্যাদির সাধকেরা সাধ্যদের[৫], দীর্ঘায়ুকামীরা অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের[৬], পুষ্টিকামীবা পৃথিবীর, প্রতিষ্ঠাকামী পুরুষেরা লোক-জননী দ্যাবা-পৃথিবীর[৭], সৌন্দর্যাভিলাষীরা গন্ধর্বদের, নারী কামনা করলে অপ্সরা উর্বশীর, সকলের ওপর আধিপত্য প্রয়াসীরা ব্রহ্মার, যশোলিপ্সুরা যজ্ঞের, অর্থকামীরা বরুণের, বিদ্যাকামীরা গিরিশের, দাম্পত্যজীবনে সুখ-শান্তির জন্য মহাসতী উমার, ধর্মকামীরা উত্তমশ্লোক বিষ্ণুর, বংশবৃদ্ধির জন্য পিতৃগণের, বিঘ্ননাশার্থীরা যক্ষ-গণের আর ওজঃপ্রার্থীরা ঊনপঞ্চাশ বায়ুর[৮] উপাসনা করবে। রাজ্যবাসীরা মনুগণের, শত্রু নিপাতকামীরা নিঋতির[৯], বিষয়লিপ্সুরা সোমের, বৈরাগ্যকামীরা পরমপুরুষের অর্চনা করবে। আর যে নিষ্কাম বা সর্বকাম অথবা মোক্ষকাম সেই উদারবুদ্ধি মানুষ তীব্র ভক্তিযোগ সহকারে পূর্ণরূপ নারায়ণের সাধনা করবে। এইভাবে যাঁরা উপাসনা করেন তাঁরা উপাসনাকালে যে সৎসঙ্গ লাভ করেন তার ফলে যদি শ্রীভগবানে অচলা ভক্তি জন্মায় তবেই পরমপুরুষার্থ লাভ, নতুবা সব তুচ্ছ। যাতে ত্রিগুণের তরঙ্গস্বরূপ রাগদ্বেষাদি নষ্ট হয়, বিষয়ে নিরাসক্তি আসে, মুক্তিপ্রদ ভক্তি জন্মায় সেই হরিকথামৃত ভক্তিসুখে মগ্ন কোন্ মানুষ তাতে অনুরক্ত না হবে? ১-১২

১ এগার রকমের বিশিষ্ট গণদেবতা আছে—অজৈকপাৎ, অহির্বুধ্ন্য, বিরূপাক্ষ, সুরেশ্বর, জয়ন্ত, বহুরূপ, ত্র্যম্বক, অপরাজিত, বৈবস্বত, সাবিত্র ও হর।

২ দক্ষপ্রজাপতির কন্যা এবং কশ্যপের পত্নী; ইনি দেবমাতা। ৩ ধাতৃ, মিত্র, অর্যমা, রুদ্র, বরুণ, সূর্য, ভগ, বিবস্বান, পুষা, সবিতা, ত্বষ্টা ও বিষ্ণু। ভাগবত মতে এঁরা স্বর্গদাতা এবং বৈবস্বত মন্বন্তরের দেবতা। ৪ এঁরাও গণদেবতা বিশেষ; এঁদের সংখ্যা দশ। ৫ আর একরকমের গণদেবতা, সংখ্যায় বার। ৬ কারণ এঁরা স্ববৈদ্য। সূর্যপত্নী সংজ্ঞা অশ্বিনীরূপ নিয়ে থাকার সময় সূর্যের ঔরসে যে যমজ ভূমিষ্ঠ হয় তারাই অশ্বিনীকুমার নাম পেয়েছিল। ৭ পৃথিবী ও আকাশের সংযোগস্থলের দেবতা।

৮ পবনদেব মাতৃগর্ভে থাকাকালে ঈর্ষান্বিত ইন্দ্রের বজ্রপ্রহারে ঊনপঞ্চাশ অংশে খণ্ডিত হন। পিতা কশ্যপ প্রতিটি খণ্ডকেই জীবিত করে দেন।

৯ নৈঋত-কোণের অধিপতি ও রাক্ষসগণের অধীশ্বর। অলক্ষ্মীকেও নিঋতি বলা হয়।

তখন শৌনক জিজ্ঞাসা করলেন, পরীক্ষিৎ এই কথা শুনে শুকদেবকে আবার কি প্রশ্ন করেছিলেন, আমরা তাই শুনতে চাই। ভক্তদের সভায় সবকিছুই শেষ পর্যন্ত হরিকথায় পর্যবসিত হয়। হরিপূজাই ছিল মহারথ ভাগবত পরীক্ষিতের বালককালের খেলা। ভগবান শুকদেবও কৃষ্ণপরায়ণ। সুতরাং এঁদের মত সাধু-সম্মেলনে কৃষ্ণলীলাবিষয়ক অনেক কথাই নিশ্চয় হয়েছিল। সূর্যের উদয় থেকে অস্ত গমনের মধ্যে যে ক্ষণটুকু শ্রীকৃষ্ণের কথায় ব্যয়িত হয় সেইটুকু ছাড়া পুরুষের আয়ুর বাকী অংশ বৃথাই ব্যয় হয়। যদি বেঁচে থাকাটাই আয়ুর ফল বলে গণ্য হয় তা হলে বলব গাছেরা কি বেঁচে নেই? কামারের হাপর কি শ্বাস-প্রশ্বাসের মত বায়ু গ্রহণ ও ত্যাগ করে না? পশুরা কি খায় না, না রতিকার্যে ব্যাপৃত হয় না? শ্রীকৃষ্ণের নাম কখনো যার কর্ণগোচর হয় নি সে লোক তো পশুর তুল্য। যে লোকের কানে কৃষ্ণকথা ঢোকেনি তার কান শুধুই এক গর্ত মাত্র। তেমনি যার জিহ্বায় কৃষ্ণ কথা উচ্চারিত হয় নি সে জিহ্বা ব্যাঙেরই জিহ্বা। যে মাথা মুক্তিদাতা মুকুন্দের চরণে আনত না হয় তাতে রেশমের শিরস্ত্রাণ বা রাজমুকুট থাকলেও তা বোঝার মতই। যে হাতে হরির সেবা না করা হয় তাতে সোনার কঙ্কণ পরালেও তাকে মড়ার হাতই বলব। যে চোখে হরির রূপ না দেখা হয় ময়ূর-পুচ্ছের চোখের মত তা বৃথা শোভামাত্র। যে পা হরিতীর্থে কখনও গেল না তা গাছের মতই চলৎশক্তি-হীন। যে মানুষ ভক্ত সাধকের চরণধূলি গায়ে মাখল না সে বেঁচে থেকেও মৃতবৎ। আর যে মানুষ বিষ্ণুচরণে দেওয়া তুলসীর ঘ্রাণ না নেয় সে শ্বাস-প্রশ্বাস নিলেও শব-মাত্র। হরিসংকীর্তনে যে হৃদয় দ্রবীভূত হয় না তা পাষাণে গঠিত। দ্রবীভূত হওয়ার লক্ষণ হল অশ্রুনির্গম এবং রোমহর্ষণ। অংগ, আপনি অতি সুন্দর কথাই বলছেন; তাই মহারাজ পরীক্ষিতের জিজ্ঞাসার উত্তরে আত্মবিদ্যাবিশারদ ব্যাস-তনয় শুক তাঁকে যা যা বলেছিলেন সেই সবই আমাদের বলুন। ১৫-২৫

চতুর্থ অধ্যায়

কথারম্ভ

সূত বললেন, উত্তরানন্দন পরীক্ষিৎ শুকদেবের আত্মতত্ত্বসাধক এইসব কথা শুনে তাঁর শুদ্ধা মতি শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণ করলেন। স্ত্রী, পুত্র, দেহ, গৃহ, ধন, সমৃদ্ধ রাজ্য প্রভৃতিতে যে আসক্তি ছিল তা বিসর্জন দিলেন এবং মৃত্যু সন্নিকট জানতে পেরে ধর্মার্থকামসাধক কর্ম পরিত্যাগ করে ভগবান কৃষ্ণের গভীর প্রেমে নিমগ্ন হলেন। তিনি শুককে বললেন, ব্রহ্মন্, আপনার কথা সমীচীন। আপনি হরিকথা বলছেন, তাতেই আমার অজ্ঞানান্ধকার কেটে গেছে। আমি কিন্তু আবার শুনতে চাইছি কি ভাবে পরমেশ্বর নিজ মায়ায় এই বিশ্ব সৃষ্টি করেন, পালন করেন, আবার ধ্বংস করেন যা লোকপালদেরও বুদ্ধিগম্য নয়। সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর যে যে শক্তিকে অবলম্বন করে বিবিধ ক্রীড়া করান বা স্বয়ং ক্রীড়া করেন সে সবই আমি আবার জানতে চাই। অদ্ভুতকর্মা হরির কার্যাবলী বেদবিদ্দেরও অজ্ঞেয়। অধিকন্তু এক পরমাত্মা পুরুষরূপে যুগপৎ[1] কিংবা ক্রমে ক্রমে নানা রূপ ধরে বিভিন্ন জন্মের মধ্য দিয়ে কর্ম করতে করতে[2] বহুরূপ হয়ে প্রকৃতির গুণগুলি ধারণ করেন, এ

১ সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি পুরুষ সংযোগে সৃষ্টির কথা বলা হচ্ছে।

২ পুরাণোক্ত ত্রিমূর্তি সহযোগে সৃষ্টির ও অবতারবাদের কথা বলা হচ্ছে।

ব্যাপারে আমার সন্দেহ রয়েছে। আপনি ভগবান কৃষ্ণের ভক্ত, বিচারে বেদতত্ত্বজ্ঞ এবং অনুভবে ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ। আপনিই সন্দেহের নিরসন করতে পারেন, আর পারেন স্বয়ং কৃষ্ণ। ১-১০

রাজার কাছ থেকে কৃষ্ণের গুণকীর্তন করবার এই আমন্ত্রণ পেয়ে শুকদেব হৃষীকেশকে স্মরণ করে বলতে আরম্ভ করলেন, যিনি জগৎ সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারের লীলার জন্য ত্রিগুণ আশ্রয় করেছেন, দেহীদের অন্তরস্থ হয়েছেন, যাঁর গতি কারও লক্ষীভূত নয়, সেই মহামহিম পরমপুরুষকে বারংবার নমস্কার। আবার তাঁকে নমস্কার করি যিনি সাধুদের দুঃখহন্তা, পাপীদের পাপধ্বংসকারী, সর্বসত্ত্বরূপী এবং পারমহংস্যাশ্রমে অবস্থিত পুরুষদের প্রার্থিত ব্রহ্মানন্দদাতা। যাদবদের সংকটনাশক, কুযোগীদের একান্ত দুজ্ঞেয়, অতিশয়াদি দোষশূন্য, ঐশ্বর্য সম্পৃক্ত, নিজধামে স্বরূপে অবস্থিত ভগবানকে অজস্র নমস্কার জানাই। যাঁর কীর্তন, স্মরণ, ঈক্ষণ, প্রতিমা-সন্দর্শন, বন্দন, শ্রবণ, পূজন সবার পাপ সদ্য দূর করে, সেই মঙ্গলময় কীর্তিশালী ভগবানকে নমস্কার। বিবেকী মানুষ যাঁর পদবন্দনা করে মনের বাহ্য ও আন্তর এই উভয়বিধ আসক্তি বিনষ্ট করে, নিষ্কর্ম হয়ে ব্রহ্মগতি লাভ করে সেই সুমঙ্গলকীর্তি ভগবানকে নমস্কার। যাঁর কাছে আত্মসমর্পণ না করলে তপস্বী, কর্মী, যশস্বী, মনস্বী, মন্ত্রজ্ঞ, সদাচারী মানুষের নিঃশ্রেয়স লাভ অসম্ভব সেই শ্রবণ-মনোরম পুরুষকে নমস্কার। কিরাত, হূণ, অন্ধ্র, পুক্কশ, আভীর, শুহ্ম, যবন, খশ প্রভৃতি অন্যান্য যে সব পাপীরা ভগবদ্ভক্তদের আশ্রয় লাভ করে পাপমুক্ত হয়, সেই অনন্ত প্রভাবশালী বিষ্ণুকে আমি নমস্কার করি। এই ভগবান আত্মবান, ধীর ব্যক্তিদের অধীশ্বর। ইনিই ত্রিমূর্তি[১], ইনি ধর্মময়, তপোময় ; এঁকে ব্রহ্মা, মহেশ্বর প্রভৃতিও সম্যক অবধারণ করতে পারেন না। এই ভগবান প্রসন্ন হোন। যে ভগবান লক্ষ্মীপতি, যজ্ঞপতি, প্রজাপতি, ধী-সকলের পতি, লোকপতি, ধরাপতি, অন্ধক-বৃষ্ণি-যাদবদের অধীশ্বর এবং রক্ষক তিনি আমার প্রতি প্রসন্ন হোন। যাঁর চরণ-ধ্যানরূপ সমাধি দ্বারা ধীশক্তির মালিন্য দূর হয়, বিবেকী ব্যক্তিরা আত্মতত্ত্ব লাভ করেন, তারপর নিজ নিজ রুচি অনুসারে সগুণ বা নিগুর্ণ ব্রহ্মের ব্যাখ্যা করেন সেই মকুন্দ আমার প্রতি প্রসন্ন হোন। কল্পের প্রারম্ভে শ্রীভগবান ব্রহ্মার হৃদয়ে থেকে সৃষ্টির স্মৃতি প্রকাশ করেন। তাঁরই আজ্ঞায় ঐশ্বর্যপূর্ণ বেদবাণী ব্রহ্মার মুখ থেকে উচ্চারিত হয়। সেই ঋষিশ্রেষ্ঠ ভগবান আমার প্রতি প্রসন্ন হোন। যে বিভু পঞ্চভূত দিয়ে এই দেহ সৃষ্টি করে তার মধ্যে অন্তর্যামীরূপে শয়ান হন এবং ষোড়শাত্মকরূপে[২] ষোড়শগুণ ভোগ করেন, তিনিই অখিলবেত্তা ; তিনি আমার ভাষণকে অলংকৃত করুন। অমিত-তেজা ভগবান ব্যাসদেবকে নমস্কার জানাই। তাঁর পদ্মমুখ থেকে নিঃসৃত জ্ঞানময় মধু ভক্তেরা পান করে থাকেন। মহারাজ, বেদগর্ভ হরি নিজের সম্বন্ধে সাক্ষাৎ ব্রহ্মাকে যা বলেছিলেন, ব্রহ্মা জিজ্ঞাসিত হয়ে নারদকে সেই কথাই বলেছিলেন ; আর এবার আমি আপনার কাছে তারই বিবরণ দেব। ১১-২৫

---

১ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর। ২ পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় (চোখ, কান, নাক, জিহ্বা ও চর্ম), পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয় (বাক্‌যন্ত্র, হাত, পা, পায়ু ও উপস্থ) এবং অন্তরিন্দ্রিয় মন দ্বারা গঠিত পাঞ্চভৌতিক দেহরূপ।

পঞ্চম অধ্যায়

ব্রহ্মাণ্ডসৃষ্টির বিবরণ

সেই ব্রহ্মা-নারদ সংবাদ থেকে শুক আরম্ভ করলেন। নারদ ব্রহ্মার কাছে এসে তাঁকে সম্বোধন করে বলেছিলেন, হে ভূতভাবন, সর্বাগ্রজ দেবদেব, আপনাকে নমস্কার। আপনি জীব ও পরমাত্মার তত্ত্বজ্ঞাপক যে জ্ঞান তাই বলুন। এই বিশ্ব যাঁর দ্বারা রূপবান হয়েছে, যাঁকে আশ্রয় করে রয়েছে, যাঁর থেকে সৃষ্ট হয়েছে, যাঁর মধ্যে অবস্থিত, যাঁর মধ্যে বিলীন হবে, আপনি তাঁর তত্ত্ব এবং এই বিশ্বের স্বরূপ ব্যাখ্যা করুন। হাতের তালুতে ধরা আমলকী ফলের মত এই বিশ্ব আপনার জ্ঞানায়ত্ত। আপনি ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমানের প্রভু। সুতরাং এ সবই আপনার জানা। আপনি যাঁর কাছ থেকে জ্ঞান পেয়েছেন, যাঁকে আশ্রয় করে আছেন, যাঁর অধীন আর যাঁর স্বরূপ পেয়েছেন সে কথা বলুন। আমি এটুকু জানি যে আপনি এক হলেও নিজের মায়া দিয়ে পঞ্চভূত সহযোগে প্রাণীদের সৃষ্টি করেছেন। মাকড়সার মতই অনায়াসে আপনি স্বীয় শক্তিকে আশ্রয় করে এবং অভিভূত না হয়ে সৃষ্টিকে নিজের মধ্যে প্রতিপালন করছেন। এই ব্রহ্মাণ্ডে আপনার থেকে উত্তম বা অধম অথবা আপনার সমানও আমি কাউকে দেখিনা। আমি এও মনে করিনা যে আপনি ছাড়া অন্য কারো থেকে এই নামরূপ গুণে সাধ্য, সদসদ্রূপ ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হয়েছে। কিন্তু আপনি সুসমাহিত হয়ে যে ঘোর তপস্যা করেছিলেন তার সংবাদ পেয়ে আমরা বিমূঢ় হয়েছি। অনুমান হয়, আপনার ওপরও কেউ আছেন। হে সর্বজ্ঞ, সর্বেশ্বর, আপনি সমস্ত ব্যাখ্যা করে বলুন যাতে আপনার দ্বারা অনুশাসিত হয়ে আমিও সব ঠিকমত বুঝতে পারি। ১-৮

ব্রহ্মা বললেন, তোমার সন্দেহ সমীচীন। এর দ্বারা আমি ভগবানের শক্তি প্রকাশে উদ্বুদ্ধ হচ্ছি। আমার থেকে শ্রেষ্ঠতর ঈশ্বরের অস্তিত্ব না জানার জন্য আমার ওপর যে ঈশ্বরত্ব আরোপ করেছ সেটাও একেবারে মিথ্যে নয়। নিজের তেজে তিনি যেমন বিশ্বকে প্রকাশ করেছেন, সূর্য, অগ্নি, সোম, গ্রহ, তারকাদের প্রকাশ করেছেন, আমিও তেমনি সৃষ্টিকে প্রকাশ করেছি। তোমরা সবাই যাঁর দুর্জয় মায়ায় মোহিত হয়ে আমাকেই জগৎস্রষ্টা বল আমি সেই ভগবান বাসুদেবকেই নমস্কার করি, তাঁকেই চিন্তা করি। ভগবানের দৃষ্টিপথে থাকতে যে মায়া সংকুচিত হয় তারই প্রভাবে বিমোহিত হয়ে প্রজ্ঞাশূন্য ব্যক্তি 'আমি' 'আমার' বলে গর্ব বোধ করে, কিন্তু বাসুদেব ছাড়া অন্য দ্রব্য, কর্ম, কাল, স্বভাব, জীব এদের কোন অর্থ নেই। বেদসমূহ নারায়ণাশ্রয়, দেবগণ নারায়ণের অঙ্গ থেকে উৎপন্ন, ত্রিলোক নারায়ণে স্থিত। যজ্ঞসকল নারায়ণপর, যোগ নারায়ণাশ্রিত, তপস্যা নারায়ণে রয়েছে। নারায়ণকে অবলম্বন করেই জ্ঞান আর গতি। সেই দ্রষ্টা, কূটস্থ, নিখিলের আত্মস্বরূপ ঈশ্বরের চোখের ইঙ্গিতেই প্রবৃত্ত হয়ে আমি জন্ম পাবার পর তাঁর সৃজ্য সংসারকে পুনর্বার সৃষ্টি করেছি। ৯-১৭

নির্গুণ ব্রহ্মের সত্ত্ব, রজ ও তম নামে তিনটি গুণ। ভগবান এদের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় সাধনের জন্য নিজের মায়াবলেই গ্রহণ করেছিলেন। দ্রব্য-জ্ঞান-ক্রিয়াশ্রয়ী[১]

---

১ দ্রব্য=পঞ্চভূত, জ্ঞান=দেবতা, ক্রিয়া=ইন্দ্রিয়। সত্ত্ব, রজ এবং তমোগুণ এদেরই আশ্রয় করে রয়েছে। সত্ত্বগুণ জ্ঞানে (দেবতা), রজোগুণ ক্রিয়াতে (ইন্দ্রিয়), আর তমোগুণ দ্রব্যে (পঞ্চ মহাভূতে)—Knowledge, Activity এবং Matter.

গুণগুলি নিত্য মুক্ত পুরুষকেও মায়ায় লিপ্ত করে, কার্য-কারণ-কর্তৃত্বে[১] বন্ধন করে। এই ভগবান তাঁর গতি নিজেই বোঝেন, অন্যের পক্ষে তা অনধিগম্য। তিনি আমার এবং সবার ঈশ্বর। নিজের মায়া দিয়েই বহুরূপ হতে ইচ্ছুক মায়াধীশ পরমেশ্বর নিজের মধ্যে লীন থেকেই সৃষ্টির উদ্দেশ্যে যদৃচ্ছাক্রমে কাল-কর্ম-স্বভাব[২] ধারণ করেন। পুরুষবিধৃত কাল থেকে গুণগুলির বিক্ষোভ সৃষ্টি হয়; স্বভাব বা প্রকৃতি থেকে রূপান্তরের উৎপত্তি আর কর্ম থেকে মহৎ-তত্ত্বের উদ্ভব হয়। সত্ত্ব-রজ দ্বারা আলোড়িত হয়ে মহৎ-তত্ত্ব বিকার প্রাপ্ত হলে তম-প্রধান দ্রব্যগুণক্রিয়াত্মক অহঙ্কার-তত্ত্ব প্রকাশ পায়। এর ভেদ আবার তিন রকমের—সত্ত্বপ্রধান বৈকারিক, রজঃপ্রধান তৈজস এবং তমঃপ্রধান তামস[৩]। এদের প্রকারভেদ যথাক্রমে জ্ঞানশক্তি, ও দ্রব্যশক্তি অর্থাৎ দেবতা-উৎপাদন শক্তি, ইন্দ্রিয়-উৎপাদন শক্তি আর মহাভূত-উৎপাদন শক্তি। পঞ্চভূতের আদিকারণ তামস-অহঙ্কার বিকার প্রাপ্ত হলে আকাশের উৎপত্তি হয়। তার মাত্রা (সূক্ষ্মরূপ) আর গুণ (অসাধারণ ধর্ম) হল শব্দ, যা দ্রষ্টা ও দৃশ্যের লিঙ্গ-জ্ঞাপক [অর্থাৎ আকাশ-তন্মাত্র এবং আকাশের বিশেষ ধর্ম বা গুণ হল শব্দ। শব্দ দ্রষ্টা ও দৃশ্য সূচিত করে; কেউ 'ফুল' বললে সে নিজেকে ফুলের দ্রষ্টা হিসেবে ঘোষণা করে, আবার ফুল নামক দৃশ্য বস্তুরও নির্দেশ দেয়]। ১৮-২৫

আকাশের বিকার থেকে স্পর্শগুণ বিশিষ্ট বায়ুর উৎপত্তি। আকাশের সঙ্গে সম্বন্ধ আছে বলে বায়ুতে শব্দ ও তার সঙ্গে প্রাণ, ওজঃ, সহ্য ও বল বিরাজমান। কাল, কর্ম ও স্বভাবের প্রভাবে বায়ুর বিকার হলে তা থেকে রূপ-ধর্ম বিশিষ্ট তেজের অভ্যুদয় হয়। এই তেজ পূর্বসৃষ্ট শব্দ ও স্পর্শের সঙ্গেও অন্বিত বলে তাদের গুণও এর মধ্যে রয়েছে। অর্থাৎ তেজ-ভূতের রূপ, স্পর্শ এবং শব্দ-গুণ রয়েছে। তেজের বিকার থেকে রসাত্মক জলের সৃষ্টি; আগের গুলির সঙ্গে সম্বন্ধ থাকায় জলে রয়েছে রস, রূপ, স্পর্শ আর শব্দ-গুণ। জলের বিকারে গন্ধবান পৃথিবী বা ক্ষিতির উৎপত্তি। জল, তেজ, বায়ু ও আকাশের সঙ্গে সম্বন্ধ আছে বলে ক্ষিতিতে গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দ—এই পাঁচটি গুণই রয়েছে। ২৬-২৯

বিকারবিশিষ্ট সাত্ত্বিক অহংকার থেকে মন আর চন্দ্র এবং ইন্দ্রিয়াধিপতি দশ দেবতা—দিক্, বায়ু, সূর্য, বরুণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, অগ্নি, ইন্দ্র, উপেন্দ্র, মিত্র এবং প্রজাপতি সৃষ্ট হলেন। [প্রথম পাঁচ জনকে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা বলা হয় এবং বাকী পাঁচজনকে কর্মেন্দ্রিয়ের। এই ভাবে দশ ইন্দ্রিয়ের দশাধিপতি[৪]]। তৈজস বা

১ ভ্রম-দেহ-জীব সহযোগে যে ভোগ। ভ্রমের কার্যত্ব, দেহের কারণত্ব আর জীবের কর্তৃত্ব রয়েছে; ভোগের স্বরূপ এই ভাবে ত্র্যাশ্রয়ী।

২ অনন্ত (Eternity) থেকে সীমিত কাল (Periodic Time) ধারণা এলে গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা বিক্ষুব্ধ হয়; বিকার (অসাম্য) এসে পড়ে। এর ফলে কর্মের উদ্ভব সৃষ্টির উপক্রম। স্বভাব বা প্রকৃতির দ্বারা এই সৃষ্টি নিয়ন্ত্রিত। স্বভাব থেকে নানা রূপান্তর সিদ্ধ হয়। কর্মের ধারণা থেকে মহৎ-তত্ত্বের সমুদ্ভব। তারপর এই মহৎ থেকে অহঙ্কারাদির ক্রমবিকাশ। ত্রিগুণের নানাবিধ অসাম্য বা বিকার থেকেই প্রপঞ্চের সৃষ্টি।

৩ বৈকারিক=জ্ঞানশক্তি=দেবতা; তৈজস=ক্রিয়াশক্তি=ইন্দ্রিয়; তামস=দ্রব্যশক্তি÷মহাভূত।

৪ মনের অধিষ্ঠাতা চন্দ্র; দিক্, বায়ু, সূর্য, বরুণ ও অশ্বিনীকুমারদ্বয় যথাক্রমে কান, ত্বক্, চোখ, জিহ্বা ও ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের অধিপতি। অগ্নি, ইন্দ্র, উপেন্দ্র, মিত্র ও প্রজাপতি যথাক্রমে বাক, পাণি, পায়ু এবং উপস্থের অধিষ্ঠাতা দেবতা; উপেন্দ্র হলেন আদিত্যরূপ বিষ্ণু, আর মিত্রও একজন আদিত্য।

রাজস অহংকারের বিকারের ফলে দশ ইন্দ্রিয়ের [পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং পাঁচ কর্মেন্দ্রিয়] সৃষ্টি। এই তৈজস অহংকার থেকেই জ্ঞানশক্তি-যুক্ত বুদ্ধি এবং ক্রিয়াশক্তি-যুক্ত প্রাণও হয়েছে। [অর্থাৎ জ্ঞানশক্তি বুদ্ধির দ্বারা জ্ঞানেন্দ্রিয় বোঝান হচ্ছে, আর কর্মশক্তি প্রাণ দ্বারা কর্মেন্দ্রিয় বোঝান হচ্ছে। এইভাবে তৈজস অহংকার দ্বিবিধ]। দশ ইন্দ্রিয় হল বুদ্ধি ও প্রাণ ভেদে যথাক্রমে শ্রোত্র, ত্বক্, ঘ্রাণ, জিহ্বা, দৃক্, বাক্, বাহু, পদ, পায়ু ও উপস্থ। পঞ্চভূত, ইন্দ্রিয়গণ, মন আর গুণভাবগুলি মিলিত না হওয়া পর্যন্ত তারা দেহরূপ আয়তন নির্মাণে সমর্থ হয়নি। ভগবৎ-শক্তির প্রেরণা লাভ করে তারা পরস্পর মিলিত হল আর সমষ্টি ও ব্যষ্টি শরীররূপ ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হল। হাজার হাজার বছর ধরে এই অণ্ডটি জলে শায়িত রইল। তারপর কাল, কর্ম ও স্বভাবে অধিষ্ঠিত হয়ে হিরণ্যগর্ভ পুরুষ এই অচেতন অণ্ডকে সঞ্জীবিত করলেন। সহস্র সহস্র উরু, পা, হাত, বুক, মুখ আর মাথা বিশিষ্ট সেই পুরুষই অণ্ডটি ভেঙে বেরিয়ে এলেন। মনীষীরা কল্পনা করেন এই পুরুষের কোমর থেকে নীচের দিকের সর্ব অঙ্গের দ্বারা সাতটি আর জঘন থেকে ওপরের দিকের সাতটি অঙ্গের দ্বারা সাতটি, এই চোদ্দটি ভুবনের সৃষ্টি হয়েছে। এই পুরুষের মুখ থেকে ব্রাহ্মণ, বাহু থেকে ক্ষত্রিয়, উরু থেকে বৈশ্য এবং পা থেকে শূদ্রের উদ্ভব হয়েছে। এই মহাত্মার পা থেকে ভূর্লোক, নাভি থেকে ভুবর্লোক, হৃদয় থেকে স্বর্লোক, বুক থেকে মহর্লোক, গ্রীবা থেকে জনলোক এবং স্তন থেকে তপোলোক সৃষ্টি হয়েছে। এঁর মাথায় সত্যলোকরূপ সনাতন ব্রহ্মলোক কল্পিত হয়েছে। এই মহান বিভুর কটিদেশে অতল, উরুতে বিতল, জানুতে শুদ্ধ সুতল, জঙ্ঘাদেশে তলাতল বিস্তৃত রয়েছে। গুল্ফেতে মহাতল, পায়ের অগ্রভাগে রসাতল এবং পদতলে পাতাল পরিব্যাপ্ত। এই লোকময় পুরুষই উপাস্য। ত্রিলোক কল্পনায় পা-দুটি দিয়ে ভূর্লোক, নাভির চারিদিকে ভুবর্লোক আর মাথা দিয়ে স্বর্লোক নির্ধারিত হয়। ৩০-৪২

ষষ্ঠ অধ্যায়

ভগবানের বিরাটরূপ ব্যাখ্যা

ব্রহ্মা বললেন, বিরাট-রূপ ভগবানের মুখ থেকে বাগিন্দ্রিয়গুলি এবং আগুন নিঃসৃত হয়েছে। তাঁর দেহের সপ্ত ধাতু[১] সপ্ত ছন্দে বিরচিত বেদের[২] উৎপত্তিস্থল; তাঁর জিহ্বা হব্য-কব্য-অমৃতে এই ত্রিবিধ অন্নের[৩], সমস্ত রসের[৪] এবং বরুণের ক্ষেত্র। তাঁর দুই নাসারন্ধ্র সমস্ত প্রাণের[৫] এবং বায়ুর অতি উত্তম ক্ষেত্র। তাঁর ঘ্রাণেন্দ্রিয় অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের, ওষধিসকলের এবং দুরকমের গন্ধ মোদ ও প্রমোদের ক্ষেত্র। তাঁর চোখ রূপ ও তেজসকলের প্রকাশস্থান, অক্ষিগোলক দুটি সূর্য ও স্বর্গের স্থান, কান দুটি দিক ও নানা তীর্থের, শ্রবণেন্দ্রিয় আকাশ ও শব্দের। তাঁর গাত্র বস্তুসমূহের আর সৌভাগ্যের আধার। এঁর ত্বক্ বায়ু, স্পর্শ এবং সমস্ত যজ্ঞের উৎপত্তিস্থান।

---

১ রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র। ২ বেদের সংহিতাভাগ সমুদয়ই ছন্দে রচিত। বেদে সাতটি ছন্দ আছে—গায়ত্রী, উষ্ণিক, অনুষ্টুভ্, বৃহতী, পংক্তি, ত্রিষ্টুভ্ ও জগতী। এই সাতটিই ছন্দ। এদের থেকে অসংখ্য ছন্দ সৃষ্টি হয়েছে পরে। ৩ হব্য,—দেবগণের অন্ন; কব্য—পিতৃগণের অন্ন। এই দুরকমের অন্নের অবশিষ্টাংশ অমৃত নামে কথিত। ৪ রস ছয়রকম যথা: কটু, তিক্ত, কষায়, লবণ, অম্ল ও মধুর। ৫ পাঁচটি প্রাণবায়ু, যথা: প্রাণ অপান, সমান, উদান ও ব্যান।

এঁর রোমগুলি যাবতীয় উদ্ভিদের উৎপত্তিস্থল। এঁর চুল, শ্মশ্রু ও নখসমূহ মেঘ-বিদ্যুৎ-পাথর-লোহার ক্ষেত্র। ভগবানের বাহু লোকপালদের আর অগণিত শাসক-পালক শ্রেণীর উদ্ভবস্থান। তাঁর পদক্ষেপ ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ এবং ক্ষেমংকর ও শরণীয় স্থানসমূহ। ভগবানের শ্রীচরণই সব কামনার সব বরের উৎস। এই পুরুষের শিশ্নই জলের, শুক্রের, লোকসৃষ্টির, পর্জন্যের এবং প্রজাপতির উৎস। তাঁর উপস্থ সন্তানার্থ সম্ভোগের তাপনিবৃত্তির স্থান। তাঁর পায়ু যমের, মিত্রের এবং মলত্যাগের ক্ষেত্র। তাঁর গুহ্যদেশ হিংসা, নির্ঋতি নামক অলক্ষ্মী, মৃত্যু ও নরকের স্থান। পরাভব, অধর্ম এবং অজ্ঞানের উৎপত্তিস্থল এঁর পৃষ্ঠদেশ, নদ-নদীরা এঁর নাড়ি, আর এঁর অস্থিরাশি থেকে পাহাড়সকলের উদ্ভব। বিরাট পুরুষের উদর প্রকৃতি, বিবিধ রস, সমুদ্ররাজি এবং প্রাণিগণের প্রলয়ের স্থান, আর এঁর হৃদয় লিঙ্গদেহের আশ্রয়। শ্রীহরির মন ধর্মের, আমার, তোমার, ব্রহ্মকুমার, সনকাদির[১], তত্ত্ববিজ্ঞানের এবং সত্ত্বগুণের পরম আশ্রয়। ১-১২

আমি, তুমি, শিব, তোমার অগ্রজ এই সব মরীচি[২] প্রমুখ মুনিরা, সুর, অসুর, মানুষ, নাগ, পাখী, মৃগ, সরীসৃপ, গন্ধর্ব, অপ্সরা, যক্ষ, রক্ষ, ভূতেরা, সাপ, পশু, পিতৃগণ, সিদ্ধগণ, বিদ্যাধর, চারণ, গাছপালা, জলচর-নভশ্চর নানা রকমের জীবগণ, গ্রহ, তারা, কেতু, রাশিগণ, তড়িৎ মেঘপুঞ্জ, ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান যত বস্তুরাশি—সবই তিনি। এই বিশ্বকে ব্যাপ্ত করে এবং তাকে ছাড়িয়েও তিনি বিরাজ করছেন। এই মহাপ্রাণ আদিত্য যেমন নিজের মণ্ডলকে প্রকাশ করে আবার তার বাইরের বস্তুকেও প্রকাশ করে, তেমনি সেই পরমপুরুষ অন্তর্যামীরূপে অন্তর্লোক উদ্ভাসিত করে বহিঃস্থ ব্রহ্মাণ্ডকেও প্রকাশ করেন। এই পরমেশ্বরই অমৃতের এবং অভয়ের প্রভু, কারণ ইনি মরণ-ধর্মাত্মক বিষয়সুখ বিসর্জন করেছেন। এই জন্যই এঁর মহিমা অপার। ভুবনের আশ্রয়ভূত এই পুরুষের চরণে সর্বভূতগণ অবস্থিত—পণ্ডিতেরা এ কথা বলেন ত্রিলোকের ঊর্ধ্বস্থিত লোকগুলিতে ইনি অমৃত, মঙ্গল এবং অভয় ধারণ করেন। মায়া-প্রপঞ্চের বাইরে ঈশ্বরের যে তিনটি পাদ তা ব্রহ্মচারী-বানপ্রস্থ-যতিদের আশ্রম। ত্রিলোকের অন্তর্বর্তী অপর পাদটিতে ব্রহ্মচর্যরহিত গৃহস্থের বাস। সর্বব্যাপী পুরুষোত্তম ভোগ আর ত্যাগের দুটি গতিই অবলম্বন করে চলেন। বিদ্যা ও অবিদ্যা দুইই পরম পুরুষের আশ্রয়। যেহেতু বিরাট পুরুষ ভূতেন্দ্রিয়-গুণাত্মক বিরাট দেহ সৃষ্টি করেন—সেই কারণেই সূর্য যেমন বিশ্বকে পরিতপ্ত করে, কিন্তু বিশ্বকেও অতিক্রম করে স্বমণ্ডলে অবস্থান করে, সেরূপ পরমেশ্বর এই বিশ্ব এবং বিরাট দেহ ধারণ করেও সমস্ত কিছু অতিক্রম করে অবস্থান করেন। ১৩-২২

যখন আমি এই মহান আত্মার নাভিদেশে উৎপন্ন পদ্ম থেকে বেরিয়ে এলাম, তখন সেই পুরুষের অবয়ব ছাড়া অন্য কোন যজ্ঞসম্ভার দেখলাম না। তখন তাঁরই অবয়ব দিয়ে আমি এইসব যজ্ঞীয় উপকরণ সংগ্রহ করলাম—যূপকাষ্ঠ সহিত পশু, কুশ, যজ্ঞভূমি, বসন্তাদি কাল, ওষধি ঘৃতাদি রসসমূহ, লৌহাদি ধাতু, মাটি, জল, ঋক্, যজুঃ ও সাম, চাতুর্হোত্র[৩], জ্যোতিষ্টোমাদি নাম, মন্ত্র, দক্ষিণা, ব্রত, দেবতাদের

১ ব্রহ্মা প্রথমে চার মানসপুত্রের সৃষ্টি করেন—সনক, সনন্দ, সনাতন ও সনৎকুমার। এঁরা কিন্তু ব্রহ্মার নির্দেশে সৃষ্টিকার্যে ব্যস্ত হতে চাইলেন না। ২ মরীচ্যাদি ব্রহ্মার দশ মানসপুত্র যাঁরা প্রজাপতি নামে খ্যাত; এঁদের মধ্যে নারদ সর্বকনিষ্ঠ। ৩ হোতৃ-চতুষ্টয়ের কর্ম। যজ্ঞে চারজন ঋত্বিক (মুখ্য পুরোহিত) থাকেন—হোতা, অধ্বর্যু, ব্রহ্মা আর উদ্গাতা। হোতা হলেন ঋগ্বেদবেত্তা, অধ্বর্যু যজুর্বেদবেত্তা, উদ্গাতা সামবেদবেত্তা, আর ব্রহ্মা হলেন ব্রহ্মার প্রতিভূরূপে কল্পিত ঋত্বিক।

নামানুক্রম, কল্প নামক পদ্ধতিগ্রন্থ, সংকল্প, তন্ত্র, গতি[1], মতি, উপযুক্ত বাদ্য, ধ্যান, প্রায়শ্চিত্ত ও সমর্পণ। এইভাবে সেই পুরুষের দেহ থেকেই যজ্ঞসম্ভার আহরণ করে তাঁকে যজ্ঞে তৃপ্ত করলাম। এরপর তোমার ভাই নয় প্রজাপতি ধ্যাননিষ্ঠ হয়ে ইন্দ্রাদিরূপে ব্যক্ত এবং স্বয়ং অব্যক্ত – এমন পরমেশ্বরের আরাধনা করলেন। পরে যথাকালে মনুরা, অন্যান্য ঋষিরা, পিতৃগণ, দেবতারা, দৈত্যকুল আর মানুষেরা যজ্ঞ-সহযোগে ঈশ্বরের আরাধনা করলেন। অতএব এই বিশ্ব শ্রীনারায়ণে অধিষ্ঠিত, যিনি স্বয়ং নির্গুণ হলেও সৃষ্টিকার্যে মায়া অবলম্বন করে সগুণ হয়েছেন। তাঁর দ্বারা নিযুক্ত হয়ে আমি সৃষ্টি করি, মহেশ্বর তাঁরই অধীনে সংহার করেন আর তিনি বিষ্ণু-রূপে সব পালন করেন। তিনিই এই তিন শক্তির ধারক[2]। ২৩-৩২

নারদ, তোমার প্রশ্নের উত্তরে এই সমস্ত বললাম। সদসৎরূপ সৃষ্ট কোনও বস্তুই নারায়ণ থেকে ভিন্ন নয়। আমি গভীর অনুধ্যানের সঙ্গে হরিকে অন্তরে ধারণ করে রেখেছি বলে আমার বাক্য এবং মনের গতি কদাপি মিথ্যা হয় না। আমার ইন্দ্রিয়-গুলিও কখনও কুপথে যায় না। এইভাবেই আমি বেদময় ও জ্ঞানময় এবং প্রভুরূপে প্রজাপতিদের বন্দনা পাচ্ছি। কিন্তু আমিও যোগাভ্যাস করে আমার জন্মকারণ সেই পরমেশ্বরকে আজ পর্যন্ত জানতে পারলাম না। আকাশ যেমন নিজের অন্ত জানে না তিনিও তেমনি নিজ মায়াবৈভবের অবধি জানতে পারেন না, অন্যান্যদের তো কথাই নেই। আমি তাঁর শ্রীচরণে প্রণাম জানাই। ঐ চরণে শরণাগত ভক্তগণ সংসারবন্ধন হতে মুক্তিলাভ করে। তোমরা, রুদ্র বা আমিই যখন তাঁর স্বরূপ বুঝতে পারিনি তখন দেবতাদের কথা তো আসেই না। আমাদের বুদ্ধি তাঁরই মায়া দ্বারা মোহিত। সেই বুদ্ধি দিয়েই আমরা তাঁকে বিচার করে ব্যাখ্যা করি। সুতরাং সে ব্যাখ্যা তো তাঁর যথার্থ ব্যাখ্যা নয়। যাঁকে আমরা ঠিকমত বুঝতে পারি না, সেই ভগবানকে নমস্কার। ৩৩-৩৮

তিনি জন্মরহিত আদিপুরুষ, অথচ কল্পে কল্পে তিনি নিজে নিজের মধ্যে নিজেকে দিয়ে নিজেকেই সৃষ্টি করেন, পালন করেন আর সংহার করেন। এই ভগবত্তত্ত্ব বিশুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ, সত্যপূর্ণ, অনাদি, অনন্ত, নির্গুণ এবং নিত্য অব্যয়; কারণ দ্বৈত-বিকাশ মায়ামাত্র। যে সব মুনিদের দেহ-মন-ইন্দ্রিয় নির্মল হয়েছে তাঁরাই তাঁর স্বরূপ ধারণা করতে পারেন, কিন্তু কু-তর্কে আসক্ত হলে ঐ রূপের অন্তর্ধান ঘটে। প্রকৃতির প্রবর্তক যে পুরুষ তিনিই এই ভূমাস্বরূপ পরমব্রহ্মের আদি অবতার। কাল, স্বভাব, সদসৎরূপ প্রকৃতি, মন, পঞ্চমহাভূত, অহংকারাদি বিকার, ত্রিগুণ, ইন্দ্রিয়সকল, বিরাট রূপ, বৈরাজ পুরুষ, স্থাবর, জঙ্গম—এ সব তাঁর কার্য। আমি, শিব এবং বিষ্ণু তাঁর গুণাবতার। প্রজাপতিরা, তুমি, স্বর্লোকপালেরা, খগলোকপালেরা, মনুষ্যলোকপালেরা, তললোকপালেরা, গন্ধর্ব-বিদ্যাধর-চারণগণের অধিপতিরা, যক্ষ-রক্ষ-উরগ-নাগপ্রভুরা, ঋষিপ্রধানেরা, পিতৃপ্রধানেরা, দৈত্য-সিদ্ধ-দানব প্রধানেরা, প্রেতভূত-কুষ্মাণ্ড[3] ও জলচর-মৃগ-পক্ষী অধীপেরা—এছাড়াও যা কিছু ঐশ্বর্যশালী, তেজোময়, বলশালী, ওজঃশক্তিবিশিষ্ট, ইন্দ্রিয়-মন-শক্তিসম্পন্ন, ক্ষমাশীল, শোভাময়, সম্পত্তিশালী, লজ্জাশীল, বুদ্ধিমান, অদ্ভুতবর্ণবিশিষ্ট, রূপবান, বিকৃতি-সম্পন্ন সবই ভগবানের বিভূতি। এবার জ্ঞানীরা সেই পুরুষের আরও যেসব লীলাবতারসমূহের কীর্তন করে থাকেন, সে সব কথা তোমাকে সংক্ষেপে বলছি। এই কাহিনী শুনলে অন্য কিছু শোনার আকাঙ্ক্ষা থাকে না। এবার তুমি সেই অতি সুন্দর বিবরণ তোমার কর্ণদ্বারা পান কর। ৩৯-৪৬

১ বিষ্ণুলোক, ধ্রুবলোক প্রভৃতি গম্যস্থান।

২ সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের শক্তি বা মায়া। ৩ শিবের অনুচরবিশেষ।

সপ্তম অধ্যায়

অবতার কাহিনী

ব্রহ্মা বললেন, পৃথিবীকে রসাতল থেকে তোলবার জন্য অনন্তপুরুষ নিখিল যজ্ঞময় বরাহ-তনু ধারণ করলেন। ইন্দ্র যেমন বজ্র ধারণ করে পর্বত বিদীর্ণ করেন তিনি সেইভাবে দাঁত দিয়ে সাগরগর্ভে আদিদৈত্য হিরণ্যাক্ষকে[১] চিরে ফেলেন। প্রজাপতি রুচির ঔরসে আকূতির গর্ভে সুযজ্ঞ নামক পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করে তিনি পত্নী দক্ষিণার গর্ভে সুষমা এবং অন্য দেবতাদের সৃষ্টি করেন। তারপর ইন্দ্র হয়ে তিনি যখন ত্রিলোকের মহতী আর্তি হরণ করেন তখন স্বায়ম্ভুব মনু তাঁকে 'হরি'—এই আখ্যা দেন। কর্দম-প্রজাপতির গৃহে দেবহূতির গর্ভে তিনি ন'টি ভগিনীর সঙ্গে কপিল নামে জন্মগ্রহণ করেন। নিজের মাকে তিনি ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দিয়েছিলেন। এর ফলে তিনি গুণসঙ্গরূপ পঙ্ক এই জন্মেই দূর করতে পেরে কপিল-কথিত মুক্তি লাভ করেন। অত্রি তাঁকে পুত্ররূপে প্রার্থনা করলে তিনি 'আমি আমাকেই তোমাকে দিলাম', এই কথা বলে অত্রি-পুত্র হয়ে জন্মালেন। তখন তাঁর নাম হল 'দত্তাত্রেয়'। তাঁরই পাদপদ্মের পরাগ মেখে যদু-হৈহয়াদি রাজপুরুষেরা পুণ্যশরীর লাভ করে ঐহিক ভোগ এবং পারত্রিক মুক্তি পেয়েছিলেন। আদিতে আমি যখন সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তপস্যা করেছিলাম তখন সেই তপস্যা তাঁকে 'সন' অর্থাৎ সমর্পণ করায় তিনি সনক-সনন্দ-সনাতন-সনৎকুমার—এই চারটি 'সন' হয়ে জন্ম নিলেন এবং পূর্বকল্পের প্রলয়ে বিনষ্ট আত্মতত্ত্ব বর্তমান কালে এমন অবিকল ব্যক্ত করলেন যে শ্রবণমাত্র ঋষিগণ তা হৃদয়ে সাক্ষাৎ দর্শন করলেন। তারপর ধর্মের স্ত্রী দক্ষ-কন্যা মূর্তির গর্ভে তিনি নর-নারায়ণ হয়ে জন্ম নিলেন। নিজের প্রভাবে তিনি অসাধারণ প্রভাবসম্পন্ন ছিলেন। অনঙ্গসেনা অপ্সরারা তাঁর ধ্যান ভাঙাতে এলে তাঁর দেহ থেকে তাদেরই মত অপ্সরাদের নির্গত হতে দেখে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে যায় এবং তাঁর তপস্যাও ভাঙ্গতে সক্ষম হয় না। রুদ্রাদি যোগীরা ক্রোধ-পূর্ণ দৃষ্টি দিয়ে কামকে দগ্ধ করেন, কিন্তু ক্রোধকে দগ্ধ করতে পারেন না। বরং ক্রোধই তাঁদের অসহ্য তাপে দগ্ধ করে। সেই ক্রোধই যখন হরির নির্মল অন্তঃকরণে প্রবেশ করতে ভয় পায়, কামের প্রবেশের তো কথাই ওঠে না। ১-৭

নিজ পিতা উত্তানপাদের সামনেই বিমাতার বাক্যবাণে বিদ্ধ হয়ে বালক ধ্রুব তপস্যা করবার জন্য বনে চলে যান। ধ্রুবও এক অবতার। এঁর প্রার্থনায় প্রসন্ন হয়ে ভগবান তাঁকে ধ্রুবলোক দান করেন। উর্ধ্বলোকের ভৃগু প্রমুখ দিব্যদেহধারিগণ আর মনুষ্যলোকের মুনিগণ ধ্রুবলোকের স্তব করে থাকেন। উন্মার্গগামী বেণ রাজার পৌরুষ ও ঐশ্বর্য ব্রহ্মশাপে দগ্ধ হলে তিনি নরকেই যেতেন। তখন ঋষিগণের প্রার্থনায় ভগবান তাঁর পুত্র পৃথুরূপে জন্মগ্রহণ করে তাঁকে রক্ষা করেন। সেই থেকে নিজ ঔরসজাত সন্তান পুৎ-নামক নরক হতে ত্রাণকারী পুত্র নাম লাভ করল। ইনি বসুধা থেকে সমস্ত বসু (অন্নাদি দ্রব্য) দোহন করেছিলেন। নারায়ণ নাভিরাজার ঔরসে সুদেবীর পুত্র ঋষভরূপে অবতীর্ণ হন। ইনি নিজ স্বরূপে অবস্থিত, জিতেন্দ্রিয়, সমদর্শী, বিষয়াসক্তিশূন্য হয়ে জড়বৎ নিত্য সমাহিত অবস্থায় থেকে যে যোগচর্যা করেছিলেন তাকেই ঋষিরা পারমহংস্য পদ বলে থাকেন। আমার যজ্ঞে

---

১ কশ্যপ-দিতির পুত্র হিরণ্যাক্ষ পৃথিবীকে নিয়ে পাতালে চলে গিয়েছিল।

ইনি হয়গ্রীব-অবতার[১] হয়ে কাঞ্চনবর্ণ, বেদময়, যজ্ঞময়, সর্বদেবময়, সাক্ষাৎ যজ্ঞপুরুষরূপে আবির্ভূত হন। শ্বাস-প্রশ্বাস ত্যাগ কালে এঁর স্ফুরিত নাসাপুট থেকে কমনীয়, বেদলক্ষণ-বাণী নির্গত হয়েছিল। যুগান্ত সময়ে মনু তাঁকেই ক্ষৌণীময়, সর্বজীবাশ্রয় মৎস্য-রূপে উপলব্ধি করেছিলেন। আমার মুখ থেকে স্খলিত বেদসকল উনিই ধারণ করে মহানন্দে সেই ভয়ংকর জলরাশিতে ক্রীড়া করেছিলেন। অমৃতলাভের জন্য দেবাসুর যখন ক্ষীরোদসাগর মন্থন করতে যায় তখন মন্থনের দণ্ড মন্দারগিরিকে নিজের পিঠে ধারণ করবার জন্য ভগবান কূর্ম-মূর্তি গ্রহণ করেন। এই বিরাট মন্থনদণ্ডের ঘূর্ণনে বিরাট পুরুষের ঘর্ষণ-সুখে নিদ্রাবেশ হয়েছিল। দেবভয়হারী বিষ্ণু নৃসিংহরূপ ধারণ করে গদাহস্তে ধাবমান দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুকে[২] নিজের উরুর ওপর ফেলে নখ দিয়ে নিমেষে চিরে ফেলেন। যখন এক বলশালী কুমীর এক গজরাজের পা ধরে জলের মধ্যে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল তখন সে শুঁড়ে পদ্মফুল নিয়ে আর্তভাবে ডাকতে থাকে, হে আদি-পুরুষ, হে অখিল লোকনাথ, হে শ্রবণমঙ্গল নামধারী। তখন অপ্রমেয় শক্তিমান চক্রায়ুধ হরি সেই গজের ডাক শুনে গরুড়ের পিঠে চড়ে সেখানে এলেন এবং চক্র দিয়ে কুমীরের মুখ বিদীর্ণ করলেন। তারপর গজের শুঁড় ধরে তাকে কুমীরের মুখ থেকে উদ্ধার করেন। বামনাবতারে তিনি তিন-পদ ভূমি গ্রহণের ছলে ত্রিভুবনই অধিকার করেন। এর কারণ এই যে যিনি ধর্মপথে থাকেন, না চাইলে তাঁকে অন্য কিছু দিয়ে ঐশ্বর্যভ্রষ্ট করা যায় না বলেই বলির কাছে তিনি ভিক্ষা চেয়েছিলেন। গুরু শুক্রাচার্য বারণ করলেও বলিরাজ প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করেননি, অধিকন্তু তৃতীয় পদ জমি দিতে গিয়ে নিজের দেহও মনে মনে হরিকে দান করেন। সুতরাং বলিরাজের পক্ষে স্বর্গলোকের আধিপত্য তো কিছুই নয়! ৮-১৮

. নারদ, ভগবান পরম পরিতুষ্ট হয়ে হংসাবতারে তোমাদের এবং আমাদের মঙ্গলের জন্য জ্ঞান, ভক্তি, কর্মযোগ ও আত্মতত্ত্ব-প্রকাশক জ্ঞান দিয়েছিলেন। যাঁরা বাসুদেবের আশ্রিত তাঁরা অনায়সেই এই জ্ঞান লাভ করেন। চতুর্দশ মন্বন্তরে জন্ম নিয়ে ভগবান ত্রিলোকের উর্ধ্বে সত্যলোক পর্যন্ত অপ্রতিহতপ্রভব সুদর্শন চক্ররূপে নিজ তেজ বিকীরণ করেন। তিনি দুষ্ট রাজাদের দমন করেন। কীর্তিস্বরূপ ভগবান এরপর জগতে ধন্বন্তরিরূপে আবির্ভূত হন। তাঁর নাম শুনলেই দুরন্ত রোগগ্রস্ত লোকদের রোগ সত্বর উপশম হয়। দৈত্যরা যজ্ঞে অমরজীবন প্রতিরোধ করলে ইনি আয়ুদানকারী আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের শিক্ষা দেন। উগ্রবীর্য হরি পরশুরাম অবতারে তীক্ষ্ণধার পরশু দিয়ে বেদব্রাহ্মণদ্বেষী, নরকযন্ত্রণা ভোগেচ্ছু, পৃথিবীর কণ্টকস্বরূপ ক্ষত্রকুলকে—যা বোধ হয় ধ্বংসের জন্যই বিধাতা দ্বারা বর্ধিত হয়েছিল -একুশবার বিনষ্ট করেন। ইক্ষ্বাকুবংশে শ্রীরাম অবতাররূপে লক্ষ্মণাদি ভ্রাতাদের সঙ্গে তিনি আসেন এবং পিতার নির্দেশে পত্নী এবং ভ্রাতাকে নিয়ে বনে যান। এই রামের বিরুদ্ধতা করে দশমুণ্ড রাবণ বিনষ্ট হয়। রাবণ সীতাকে হরণ করায় ক্রুদ্ধ এবং লঙ্কাপুরীকে ভস্ম করতে উদ্যত শ্রীরামের রক্তবর্ণ চোখের দীপ্তিতে যখন সমুদ্রের মকর, কুমীর, সাপ প্রভৃতি জলচর প্রাণীসকল দগ্ধ হচ্ছিল তখন ভয়ে কম্পিত হয়ে সমুদ্র ত্রিপুরে[৩] ধ্বংসকালে উত্তেজিত রুদ্রের ন্যায় রামচন্দ্রকে পথ করে দিয়েছিল। রাবণের বুকের আঘাতে ইন্দ্রের ঐরাবতের দাঁত চূর্ণ হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। তখন রাবণ নিজেকে বিজয়ী মনে করে দু-দলের সৈন্যদের মাঝখানে

---

১ মধুকৈটভ বেদ অপহরণ করলে শুভ্রবাজীমুখ হয়ে ভগবান অবতীর্ণ হন তার উদ্ধারের জন্য।
২ ইনি হিরণ্যাক্ষের ভাই। ৩ ময়দানব নির্মিত সোনা, রূপা আর লোহায় গড়া তিনটি নগর।

আস্ফালন করে গর্বোদ্ধত হাসি হেসেছিল। কিন্তু ধনুকের টংকার দিয়েই রাম অনায়াসে এই দারাপহারীর গর্বোদ্ধত হাসিকে তার প্রাণের সঙ্গেই বিনাশ করেন। শ্রীহরির মার্গ আমাদেরও অলক্ষ্য। শ্রীকৃষ্ণরূপে তিনি কলাবতার বলরামের সঙ্গে এসে অসুর সেনাদ্বারা নিপীড়িত পৃথিবীর কষ্ট দূর করার জন্য নিজের মহিমাদ্যোতক অনেক কাজ করলেন। ও'রা দুজন ছিলেন যেন অনন্ত পুরুষের সিতকৃষ্ণ কেশরাশি। কৃষ্ণই তো ঈশ্বর! তা না হলে শিশু কৃষ্ণের দ্বারা কি করে পূতনার জীবননাশ হল? তিন মাসের শিশু কি করে পা দিয়ে শকটাসুরকে[১] নিপাত করবে বা হামাগুড়ি দিয়ে গিয়ে আকাশ-ছোঁয়া যুগল অর্জুনগাছ সমূলে উৎপাটন করবে? ব্রজের গাভী এবং গোপালগণ যমুনার বিষাক্ত জলপান করে মূর্ছিত হলে শ্রীকৃষ্ণ নিজের কৃপাদৃষ্টিরূপ অমৃত দিয়েই তাদের পুনরুজ্জীবিত করেন। তিনি ঈশ্বর বলেই যমুনার জল শোধন করবার জন্য ভয়ানক বিষধর স্ফুরিতজিহ্বা কালিয়নাগকে দমন করেন। আবার কালিয়দমনের রাতেই শুষ্কবনে দাবাগ্নির লেলিহান শিখায় নিদ্রামগ্ন ব্রজবাসীদের প্রাণসংশয় ঘটলে তিনি বলরামের সঙ্গে তাদের উদ্ধার করেন। আবার মা যশোদা যখন কৃষ্ণকে বাঁধতে যেতেন, তিনি যতই দড়ি নিতেন কিছুতেই তা ওঁকে বাঁধবার পক্ষে যথেষ্ট হত না। যখন শিশু কৃষ্ণ হাই তুলতেন তখন তাঁর মুখবিবরে ত্রিভুবনদর্শন করে যশোদা শঙ্কিত হয়ে পড়তেন। এ সবই শ্রীকৃষ্ণের মহান ঐশ্বর্য-প্রকাশক। ১৯-৩০

কৃষ্ণ নন্দকে বরুণের পাশ-ভয় থেকে মুক্ত করেন, ময়দানবের পুত্র কর্তৃক পর্বতগুহায় আবদ্ধ গোপ বালকদের উদ্ধার করেন, আর দিনমানে নানাকাজে ব্যস্ত ব্রজবাসীরা প্রচণ্ড শ্রমের পর যখন রাত্রিতে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন তখন তাঁদের বৈকুণ্ঠে নিয়ে গিয়েছেন। ব্রজের গোপেরা ইন্দ্রযজ্ঞ বন্ধ করে দিলে ইন্দ্র ক্রোধভরে ব্রজকুল ধ্বংসের জন্য প্রচণ্ড বর্ষণ শুরু করলেন। তখন গো-মহিষাদি পশুদের রক্ষার জন্য সপ্তমবর্ষীয় শ্রীকৃষ্ণ অবলীলাক্রমে গিরি গোবর্ধনকে সাতদিন ধরে রাখলেন। রাসলীলার সময় পূর্ণিমার চাঁদের আলোয়-ভরা বনে শ্রীকৃষ্ণ খেলতে খেলতে সুললিত সুরে বাঁশী বাজাতেন। তাতে কামাতুর হয়ে ব্রজগোপীরা বাইরে এলে কুবেরের অনুচর শংখচূড় তাদের হরণ করে। শ্রীকৃষ্ণ তখন তার শিরশ্ছেদ করেন। প্রলম্ব, খর, দর্দুর, কেশী, অরিষ্ট, মল্লেভ, কংস, কালযবন, কপি, পৌণ্ড্রক প্রমুখ, আবার শাম্ব, কুজ, বল্কল, দন্তবক্র, সপ্তোক্ষ, শম্বর, বিদুরথ, রুক্মি প্রভৃতি, এ ছাড়াও কাম্বোজ, মৎস্য, কুরু, সৃঞ্জয় প্রভৃতি বংশোদ্ভূত পুরুষেরা যে কেউই অস্ত্রধারণ করে যুদ্ধে দর্প করেছে তারা সকলেই সেই কৃষ্ণদ্বারা নিহত হয়ে তাঁরই আলয় বৈকুণ্ঠে আনীত হয়েছে। তারপর কালক্রমে সংকুচিতবুদ্ধি, অল্পায়ু মানুষদের পক্ষে তাঁর সৃষ্ট বেদরাশি আয়ত্ত করা দুঃসাধ্য দেখে শ্রীভগবান যুগানুসারে সত্যবতীর পুত্ররূপে আবির্ভূত হন এবং বেদরূপী বৃক্ষকে শাখা-প্রশাখায় ভাগ করে দেন। অসুররাই বেদবিহিত মার্গে থেকে যখন ময়দানবের নির্মিত দুর্লক্ষ্য বেগসম্পন্ন পুরী দ্বারা মানুষদের ধ্বংস সাধন করে, তখন তিনি তাদের লোভ জন্মানোর জন্য এবং বুদ্ধিনাশ করবার জন্য ধরাতলে বুদ্ধরূপে অবতীর্ণ হয়ে নানা উপধর্মের প্রচার করেন। তারপর যখন সাধু-সজ্জনদের বাড়িতেও আর হরি-সংকীর্তন হবে না, দ্বিজাতিরা পাষণ্ড হবে, শূদ্রেরা রাজা হবে, স্বাহা-স্বধা-বষট্ এইসব শব্দ অশ্রুত হবে, তখন যুগান্ত সময়ে ভগবান কলির শাসনকারী কল্কিরূপে দেখা দেবেন। ৩১-৩৮

জগৎসৃষ্টিতে তপস্যা, আমি ব্রহ্মা আর ন'জন প্রজাপতি ঋষি; স্থিতিতে ধর্ম,

---

১ শকটাকারে এই অসুর শ্রীকৃষ্ণকে চাপা দিয়ে মারতে গেলে তিনি এক পদাঘাতে তাকে শেষ করেন।

যজ্ঞ, মনুরা, দেবতারা, রাজারা আর প্রলয়ে অধর্ম, রুদ্র, ক্রোধী প্রাণিগণ, অসুরেরা —এ সবই সর্বশক্তিমান ভগবানের মায়া-বিভূতি। নারদ, যদি পৃথিবীর ধূলিকণা গণনা করবার মত ক্রান্তদর্শী কেউ থাকেন তাহলেও এমন কি কেউ আছেন যিনি মহাবিষ্ণুর বিভূতিলক্ষণ মাহাত্ম্য সমস্তই যথাযথ গণনা করতে পারেন ? বিষ্ণুই নিজের শক্তিতে সত্যলোক পর্যন্ত ধারণ করে আছেন। এই মায়াবল পুরুষের অন্ত আমি জানি না। তোমার অগ্রজ ঐ মুনিরাও তা জানেন না। সহস্রানন শেষনাগ, যিনি আদিদেব, তিনিও হাজার মুখে তাঁর গুণগান করে আজ পর্যন্ত তার পার দেখতে পাননি। অনন্ত ভগবান যাঁদের দয়া করেন তাঁরা যদি অকপটে সর্বান্তঃকরণে তাঁর চরণকে আশ্রয় করেন, তাহলে এই দুস্তর মহামায়া অতিক্রম করতে সমর্থ হন। তখন আর কুকুর-শৃগালের খাদ্য এই দেহে 'আমি' 'আমার'—এ জাতীয় অভিমান থাকে না। তাঁরই কৃপায় অবশ্য আমি যোগমায়াকে জেনেছি। তাছাড়া সনকাদি তোমরা, ভগবান মহাদেব, দৈত্যকুলের শ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদ, মনুর স্ত্রী শতরূপা, স্বায়ম্ভুব মনু নিজে, তাঁর পুত্র প্রিয়ব্রত, উত্তানপাদ আর দেবহূতি, প্রাচীনবর্হি, ঋভু, অঙ্গ, ধ্রুব, ইক্ষ্বাকু, ঐল, মুচুকুন্দ, জনক, গাধি, রঘু, অম্বরীষ, গয়, নাহুষ প্রমুখ, মান্ধাতা, অলর্ক, শতধন্বা, অনু, রন্তিদেব, ভীষ্ম, বলি, অমূর্তরয়, দিলীপ, সৌভরি, উতঙ্ক, শিবি, দেবল, পিপ্পলাদ, সারস্বত, উদ্ধব, পরাশর, ভূরিষেণ—তারপর আরও অন্যরা রয়েছেন, যেমন হনুমান, বিভীষণ, শুক, পার্থ, আর্ষ্টিষেণ, বিদুর প্রভৃতি যাঁদের দেবশ্রেষ্ঠ বলে কীর্তন করা হয়—এঁরা সবাই যোগমায়াকে অবগত আছেন এবং তাঁর কৃপায় তাঁকে অতিক্রমও করেছেন। স্ত্রীজাতি, শূদ্র-হূণ-শবর প্রভৃতি নীচ জনেরাও যদি অমিতবীর্য ভগবানের একান্ত ভক্তদের জীবন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে তাহলে তারাও তাঁর মায়াকে জানতে পারে। মুনিরা যাকে সৎ-অসতের উর্ধ্বে, শাশ্বত, প্রশান্ত, অভয়, জ্ঞানস্বরূপ, শুদ্ধ, নির্মল পরমার্থতত্ত্ব বলে থাকেন, কোন শব্দ দিয়ে যাঁকে জানা যায় না মায়া যাঁর সামনে লজ্জিতা হয়ে অপসৃতা হয়—তাই পরমপুরুষ শ্রীভগবানের নিলয় এঁকেই সকলে ব্রহ্ম বলে জানেন। এই পদ অশোক এবং অজস্র সুখের। স্বপ্রভু ইন্দ্র যেমন কূপখননের জন্য যন্ত্র ধারণ করেন না তেমনিই যে যোগীরা তাঁর প্রতি নিজেদের মনকে পূর্ণভাবে নিয়োগ করতে পেরেছেন তাঁরা আর প্রাণায়ামাদি সাধনের আশ্রয় নেন না। এই ভগবান স্বর্গমোক্ষাদিরও দাতা, কারণ এঁরই ভাবের প্রকাশ স্বভাববিহিত সৎ এই কথা বলা হয়ে থাকে। দেহস্থ ধাতু বিগত হয়ে দেহের অবক্ষয়ে দেহমধ্যস্থ আকাশ নষ্ট হয় না। তত্রস্থ পুরুষও বিনষ্ট হয় না ; কারণ তিনি জন্মরহিত, তাই মৃত্যুরহিতও বটে। যার জন্ম আছে, তারই তো শুধু মৃত্যু আছে। ৩৯-৪৯

নারদ, বিশ্বভাবন ভগবানের কথা এই তোমাকে সংক্ষেপে বললাম। হরি ব্যতিরেকে সৎ-অসৎ বলে অন্য কিছু নেই। তোমাকে আমি যা বললাম তারই নাম 'ভাগবত'। এটি সমস্ত বিভূতির সংগ্রহ। তুমি এর বিস্তার কর। সর্বাত্মা, অখিলাধার ভগবানের কথা শুনে যাতে হরিতে সমস্ত মানুষের ভক্তি আসে এমনভাবে ভাল করে চিন্তা করে সব কথা ব্যক্ত কর। এই ঈশ্বরের মায়ার কথা যারাই শ্রদ্ধার সঙ্গে নিয়ত ব্যাখ্যা করে অথবা শোনে তাদের আত্মা কখনই মায়াতে বিমুগ্ধ হয় না। ৫০-৫৩

অষ্টম অধ্যায়

মহারাজ পরীক্ষিতের প্রশ্ন

রাজা বললেন, ব্রহ্মন্, গুণাতীত ঈশ্বরের লীলাকথনের জন্য প্রেরিত হয়ে নারদ যাদের যাদের যেমন বললেন, আপনি সেই সব কথা বলুন, আমি তা শুনতে চাই। মহাভাগ, যে ভাবে আমি অখিলের আত্মা শ্রীকৃষ্ণে ভোগবিলাসশূন্য মনকে সমর্পণ করে এই দেহটা ত্যাগ করতে পারি, সে সব কথা বলুন। যাঁরা নিত্য শ্রীকৃষ্ণের চরিতামৃত কথা শ্রদ্ধা সহকারে শোনেন আর কীর্তন করেন তাঁদের অন্তরে তিনি অচিরেই প্রবেশ করেন। শরৎ যেমন জলের আবিলতা দূর করে, কৃষ্ণ তেমনি নিজ ভক্তবৃন্দের কর্ণরন্ধ্র-পথে প্রবেশ করে হৃৎকমলে সমাবিষ্ট হন আর সেখান থেকে কামক্রোধাদি রিপুবর্গের অপসরণ করেন। প্রবাস থেকে ফিরে পান্থ যেমন নিজ ঘর ছেড়ে আর যেতে চান না, শুদ্ধান্তঃকরণ পুরুষও তেমনি কৃষ্ণপাদমূল পরিত্যাগ করতে চান না। ১-৬

প্রকৃতির অতীত এই যে দেহী, তার পাঞ্চভৌতিক দেহসম্বন্ধ, এই ব্যাপারটা কি? বিনা কারণেই কি এর সৃষ্টি? এসব কথা নিশ্চয়ই আপনার জানা; সুতরাং সব পরিষ্কার করে বলুন। যাঁর নাভি থেকে জগৎরূপ পদ্ম উৎপন্ন হয়েছিল সেই পুরুষের অবয়ব-সংস্থান জীবের অবয়ব-সংস্থানের মতই, এ কথা আপনি বলেছেন। তাহলে জীব এবং পরমেশ্বরের পার্থক্য কি? পরমেশ্বরের কৃপায় তিনি তাঁর স্বরূপ দেখেছিলেন, সেই পুরুষের রূপটি কি? আর সেই পুরুষ, যিনি বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার-এর কর্তা, সর্বান্তর্যামী মায়াধীন তিনি স্ব-মায়া পরিত্যাগ করে যেখানে শয়ন করেন সে কথাও বলুন। এই পুরুষেরই অবয়ব থেকে ইন্দ্রাদি লোকপালের সঙ্গে বিভিন্ন লোকের সৃষ্টি। আবার এই ইন্দ্রাদি লোকপাল সহ লোকসমুদয় এঁরই অবয়ব এ-কথাও আমরা শুনি। সুতরাং কল্প (সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়) ও বিকল্প (মন্বন্তর) কি পরিমাণের, ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান বলতে কিভাবে কালের বিভাজন হয় এবং স্থূল দেহাভিমানী মানুষ, পিতৃগণ ও দেবতাদের আয়ুর যে পরিমাপ—সে সবই ব্যাখ্যা করে বলুন। হে দ্বিজসত্তম, ছোট-বড় ভেদে কালের প্রবৃত্তি, যে যে গতি সবই সবিস্তারে বলুন। গুণত্রয়ের পরিণামভূত দেবাদি শরীরলিপ্সু মানুষদের মধ্যে কে কি ধরনের কর্মসমুদয় আচরণ করলে তা লাভ করতে পারে, সে কথাও বলুন। পৃথিবী, পাতাল, দিক, আকাশ, গ্রহ, নক্ষত্র, নদী, সমুদ্র, দ্বীপ, পাহাড় প্রভৃতির আর ঐসব স্থলে যাদের বসবাস তাদের উৎপত্তি-কাহিনী আমাকে বলুন। বাহ্য-অন্তর ভেদে ব্রহ্মাণ্ডের পরিমাণ, মরীচি প্রমুখ মহাজনদের চরিতগাথা, বর্ণাশ্রমের বিবরণ, যুগসকল, যুগপরিমাণ, প্রত্যেক যুগের ধর্ম, হরির আশ্চর্যজনক অবতার-চরিত, মানুষের সাধারণ ধর্ম, বর্ণাশ্রম অনুযায়ী তাদের বিশেষ কৃত্য, রাজর্ষি প্রভৃতি শ্রেণী-দের ধর্ম, আপৎকালে সর্বজীবের যা আচরণীয়, তত্ত্বগুলির (প্রকৃত, মহৎ প্রভৃতির) পরিসংখ্যান এবং লক্ষণ, কার্য-কারণের লক্ষণ, দেবপূজার প্রকার, অধ্যাত্মশাস্ত্রোক্ত অষ্টাঙ্গযোগের বিধি, মহাযোগীদের ঐশ্বর্যগতি, যোগীদের লিঙ্গশরীর-লয়, বেদ-উপবেদ প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্রের এবং পুরাণ-ইতিহাসের স্বরূপ, সর্বভূতের অবান্তর প্রলয় (খণ্ড প্রলয়), স্থিতি ও মহাপ্রলয়, বৈদিক স্মার্তকর্মাদি, অগ্নিহোত্রাদি কাম্যকর্মসমূহ এবং ধর্মার্থকামের প্রকার ভেদ—এই সমস্ত যথাযথ কীর্তন করুন। প্রকৃতিতে যাদের উপাধি বিলীন হয়ে গেছে তাদের সৃষ্টি, পাষণ্ডদের উৎপত্তি আর আত্মার বন্ধন ও মোক্ষ-স্বরূপে অবস্থান—সবিশেষ পর্যালোচনা করুন। স্ব-তন্ত্র

ভগবান যেভাবে নিজ মায়া সহযোগে ক্রীড়া করেন, আবার সেই মায়ার উৎসর্জনে প্রলয়কালে যেভাবে তিনি সাক্ষীরূপে অবস্থান করেন - সবই আপনি বলুন। ভগবান, আপনার কাছে এইসব আমার প্রশ্ন। আমি আপনার শরণাগত। অতএব আপনি অনুগ্রহ করে এগুলির যথাযথ আনুপূর্বিক উত্তর দিন। আত্মভূ, পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা যেমন সর্বশাস্ত্র ব্যাপারে অভিজ্ঞ আপনিও এ-বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞাতা। পূর্বসূরী-দেরও পূর্ববর্তী মহাজনদের আচরণ অনুযায়ী অন্যে নিজেদের পরিচালন করে থাকে। প্রকৃত তত্ত্ব কে জানে? আপনার কথাসাগর থেকে নিঃসৃত কৃষ্ণামৃত পান করেছি বলে অনশন করে থাকা সত্ত্বেও আমার প্রাণ দেহত্যাগ করছে না। ৭-২৬

এবার সূত বললেন, সভামধ্যে বিষ্ণুরাত পরীক্ষিৎ এইভাবে ভক্তপালক শ্রীকৃষ্ণের কথা বলার জন্য অনুরোধ করলে ব্রহ্মরাত শুকদেব অত্যন্ত প্রীত হলেন। ব্রহ্মার জন্মলগ্নে শ্রীভগবান ব্রহ্মাকে যে বেদপ্রমাণক ভাগবত-শাস্ত্র দিয়েছিলেন শুকদেব এবার সেই পুরাণ ব্যাখ্যা করতে আরম্ভ করলেন। পরীক্ষিৎ তাঁকে যা যা প্রশ্ন করেছিলেন শুকদেব তার আনুপূর্বিক উত্তর দিতে প্রবৃত্ত হলেন। ২৭-২৯

নবম অধ্যায়

ভাগবত পুরাণের প্রারম্ভ ঃ ব্রহ্মার বৈকুণ্ঠদর্শন

শুকদেব বললেন, মহারাজ, হরির মায়া ছাড়া দেহাদির সঙ্গে আত্মার সম্পর্ক ঘটতে পারে না। বহুরূপী মায়া থেকেই বহু রূপের প্রকাশ, আর এই মায়ার জন্যই 'আমি, আমার' এইসব বোধ জন্মায়। যখনই তিনি পুরুষ-প্রকৃতি থেকে শ্রেষ্ঠ আপন মহিমায় বিহার করেন তখনই তাঁর অভিমান দূর হয়ে তিনি পূর্ণরূপে প্রকাশ পান। ১-৩

ব্রহ্মার অপকট তপস্যায় আরাধিত হয়ে শ্রীবিষ্ণু তাঁকে নিজের চিদ্‌ঘন রূপ দেখিয়ে তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ দিয়েছিলেন। সেই আদিদেব, জগতের পরমগুরু ব্রহ্মা ভগবানের নাভিপদ্মে আসীন হয়ে সৃষ্টির জন্য চিন্তা করতে লাগলেন।[১] কিন্তু যা দিয়ে প্রপঞ্চ সৃষ্টি হবে সেই জ্ঞান তাঁর লাভ হল না। তিনি যখন চিন্তা করছেন তখন দু অক্ষরের একটি শব্দ জলমধ্যে দুবার উচ্চারিত হতে শুনলেন। অক্ষর দুটি হল স্পর্শবর্ণের অন্তর্বর্তী ষোড়শ এবং একবিংশ অক্ষর 'ত' ও 'প'। এই 'তপ'ই হল নিষ্কাম ভক্তদের আরাধনার মহৎ ধন। ৪-৬

. শব্দটি শুনে ব্রহ্মা বক্তাকে দেখবার জন্য চারদিকে তাকালেন, কিন্তু কাউকেই দেখতে পেলেন না। তখন তপস্যাকেই মঙ্গলজনক বিবেচনা করে ব্রহ্মা পদ্মের উপর থেকেই তপস্যায় নিযুক্ত হলেন।[২] তখন মহাতপস্বী ব্রহ্মা মন, প্রাণ, কর্মেন্দ্রিয় এবং জ্ঞানেন্দ্রিয় জয় করে সহস্র দিব্য বৎসর ধরে সমাহিত থেকে তপস্যাচরণ করলেন। তপস্যায় প্রীত হয়ে শ্রীভগবান ব্রহ্মাকে শ্রেষ্ঠলোক নিজধাম বৈকুণ্ঠলোক দেখালেন। এই বৈকুণ্ঠে রজস্তম-মিশ্রিত সত্ত্বগুণের সংশ্লেষ নেই; ঐ দুই গুণের কোনও পৃথক

---

১ আত্মা (পরমেশ্বর) সংকল্প করলেন: 'লোকসকল সৃষ্টি করব।'—ঐতরেয় উপনিষদ, ১।১

২ তপের কথা উপনিষদে বারংবার উল্লিখিত হয়েছে। দ্রঃ মুণ্ডক, ১।১।৮ এবং তৈত্তিরীয় ভৃগুবল্লী।

অস্তিত্বও নেই। কালের বিক্রম এখানে পরাস্ত, মায়াও এখানে অস্তিত্বহীন। অতএব অন্য গুণবিকারের কোন প্রশ্নই ওঠে না। এই পরিষ্ঠলোকে দেবাসুর বন্দিত হরির পার্ষদরা বিরাজ করেন। শ্রীহরির এই পার্শ্বচরদের রূপ তাঁরই মত। তাঁদের কান্তি ইন্দ্রনীলের মত, চোখ পদ্মের মত, বস্ত্র পীতাভ, দেহবল্লরী অতি কমনীয় এবং সুকুমার, বাহু চারটি, বুকের উপর উজ্জ্বল মণিবিশিষ্ট পদক শোভা পাচ্ছে, আকৃতি মহাতেজস্বী। এঁদের দেহ থেকে প্রবাল-বৈদুর্য-মৃণালের আভা ছড়িয়ে পড়ছে, অঙ্গে শোভা পাচ্ছে উজ্জ্বল কিরীট, কুন্তল আর মালা। আকাশে মেঘদামে বিদ্যুৎ যেমন সুন্দর দেখায়, বৈকুণ্ঠলোকেও এই মহাত্মাদের ব্যোমযানের দীপ্তিতে আর স্বর্গীয় ললনাদের বিদ্যুতের মত উজ্জ্বল অঙ্গকান্তিতে মনোরম শোভা হয়েছে। এই সেই বৈকুণ্ঠ যেখানে মূর্তিমতী লক্ষ্মীদেবী নারায়ণের চরণযুগল বন্দনা করেন আর বসন্তসহচর মধুপের গুঞ্জনধ্বনির সঙ্গে দুলতে দুলতে তাঁর আরাধনা গান করেন। এইখানেই ব্রহ্মা দেখলেন সেই পরমেশ্বরকে যিনি নিখিল ভক্তজনের প্রতি-পালক, যিনি লক্ষ্মীকান্ত, যজ্ঞেশ্বর এবং জগৎপ্রভু। যাঁর সুনন্দ-নন্দ-প্রবল-অর্হণ প্রমুখ দ্বারীরা সর্বদা তাঁকে সেবা করছে, যাঁর চারদিকে ঘিরে রয়েছে অগণিত পার্ষদরা। এই মহাবিষ্ণুর দৃষ্টিসুধা সর্বদা ভক্তজনের অভিমুখ। প্রসন্নহাসিতে, অরুণাভ লোচনে শোভিত অপূর্ব তাঁর আনন-শ্রী। ইনি কিরীটী, কুন্তলধারী, চতুর্ভুজ এবং পীতাম্বর; বক্ষঃস্থলে সুবর্ণরেখা অঙ্কিত। তিনি সিংহাসনে অধিরূঢ়, পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব এবং অণিমাদি ঐশ্বর্যদ্বারা পরিবৃত। তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক, কিন্তু যোগীদের পক্ষে আয়াসলভ্য। তিনি স্বীয় জ্যোতিতে উদ্ভাসিত। ৭-১৭

এই দেখে বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মা আনন্দিতচিত্তে, প্রেমাশ্রুভরা চোখে ভগবানের চরণে প্রণাম নিবেদন করলেন। তখন ভগবান প্রসন্নমনে ব্রহ্মার দুখানি হাত ধরে অল্প হেসে মধুরবচনে বললেন, হে বেদগর্ভ ব্রহ্মা, যারা কপটযোগী তাদের তপস্যায় আমি কদাচ তুষ্ট হই না। কিন্তু তুমি যে সৃষ্টির উদ্দেশ্যে দীর্ঘকাল ধরে আমার তপস্যা করেছ তাতে আমি সন্তুষ্ট হয়েছি। তোমার মঙ্গল হউক। আমি বরদানের কর্তা, তোমার বাঞ্ছিত বর চেয়ে নাও। লোকের মঙ্গল লাভের জন্য যে পরিশ্রম আর যত্ন করে আমার দর্শনলাভেই তার চরম ফল। আমার ইচ্ছাতেই তোমার বৈকুণ্ঠ দেখা হল। এর কারণ এই যে আমার কথা শুনে তুমি নির্জনে গভীর তপস্যা করেছ। তুমি সৃষ্টিকর্মের ব্যাপারে যখন কর্তব্য স্থির করতে পারলে না আমিই তোমাকে প্রত্যাদেশ দিয়েছিলাম। কারণ তপই আমার সাক্ষাৎ হৃদয়, আর আমি তপের আত্মা। এসবই আমি তপের দ্বারা সৃষ্টি করি, পালন করি, আবার তপের দ্বারাই সব সংহার করি। তপই আমার বীর্য। ১৮-২৪

ব্রহ্মা বললেন, যেহেতু ভগবান সর্বভূতের অধিষ্ঠাতা এবং সকলের বুদ্ধিতে অবস্থিত তাই তিনি অব্যাহত প্রজ্ঞাবলে কার কি অভিলাষ তা জানতে পারেন। তবুও আপনার কাছে আমি যা চাই তা অনুগ্রহ করে দিন। যাতে আপনার অপ্রাকৃত ও প্রাকৃত (পরাবর) দুই রূপই আমি জানতে পারি তা আমাকে বলুন। যেমন মাকড়সা তার জাল দিয়ে নিজেকে ঢেকে ফেলে, সেইভাবেই আপনি জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার দ্বারা লীলা করেন। যে বুদ্ধিদ্বারা আমি সৃষ্টির বিষয়ে জ্ঞানলাভ করতে পারি আপনি তা আমাকে দিন। আমি অনলসভাবে আপনার উপদেশ অনুসারে কর্ম করব। আপনার অনুগ্রহ পেলে প্রজাসৃষ্টির কাজে আমি অহঙ্কারাদিতে আবদ্ধ হব না। হে ঈশ্বর, আপনি আমার প্রতি বন্ধুর মত আচরণ করেছেন। সুতরাং আমি প্রজাসৃষ্টিরূপ সেবাকার্যে রত হয়ে যখন উত্তম, মধ্যম,

অধমাদি ক্রমে বিভাগ সৃষ্টি করব তখন স্বাতন্ত্র্যের অভিমানে আমার মধ্যে যেন উৎকট গর্ব না জন্মে। ২৫-৩০

ভগবান বললেন, আমার বিষয় যে পরমগুহ্য জ্ঞান, বিজ্ঞান ও ভক্তি, তা সাধনের সঙ্গে তোমাকে বলছি, তুমি গ্রহণ কর। আমার কৃপায় আমার ভাব-রূপ-গুণ-কর্মের সম্বন্ধে তোমার উত্তম জ্ঞান হোক। সৃষ্টির পূর্বে আমিই ছিলাম; অন্য কিছু সৎ, অসৎ আর তাদের কারণভূত প্রধান তত্ত্ব, এসব কিছুই ছিল না। সৃষ্টির পরেও আমি আছি। এই যে বিশ্ব তাও আমি, প্রলয়ের পর যা থাকে তাও আমিই। যা বাস্তবিক বিদ্যমান তা নেই প্রতীত হওয়া যেমন মায়া, তেমনি যা নেই তা আছে প্রতীত হওয়াও মায়া। বস্তু থাকলেও যেমন অন্ধকার তাকে আড়াল করে, সেই ভাবেই আমার মায়া আমাকে আড়াল করে রাখে, আমার সম্বন্ধে ভ্রান্ত প্রতীতি জন্মায়। যেমন পঞ্চমহাভূত সৃষ্টির পর উত্তম-অধম ভূতবর্গে প্রবিষ্ট হয়েও অপ্রবিষ্ট থাকে, আমিও তেমনি ভূতবর্গে প্রবিষ্ট, আবার অপ্রবিষ্ট। (দেহাদি সবই পঞ্চভূতাত্মক, কিন্তু তারপরও পঞ্চমহাভূত ঠিকই রয়েছে)। আমার সম্বন্ধে তত্ত্ব-জিজ্ঞাসুদের এ পর্যন্তই জিজ্ঞাসা। আমি সর্বদা সর্বত্র অন্বয়-ব্যতিরেক দ্বারা অবস্থিত (অর্থাৎ একটি থাকলে অন্যটি থাকবে, একটি না থাকলে অন্যটি থাকবে না)। তুমি পরম সমাধি সহযোগে আমার এই তত্ত্বে সম্যক প্রতিষ্ঠিত হও। তাহলে তুমি কল্প-বিকল্পে কখনও মোহগ্রস্ত হবে না। ৩১-৩৭

শুক বললেন, জন্মরহিত হরি জনাধিপ ব্রহ্মাকে এই উপদেশ দিয়ে তাঁর চোখের সামনেই তিরোহিত হলেন। ভগবান তাঁর ইন্দ্রিয়ের অগোচর হতেই সর্বভূতময় ব্রহ্মা তাঁর উদ্দেশে যুক্তকরে প্রণাম জানিয়ে এই বিশ্বকে আবার পূর্বের মতই সৃষ্টি করলেন। তারপর একদা ধর্মপতি প্রজাপতি প্রজাদের মঙ্গলসাধনরূপ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য যম-নিয়ম পালন করে তপস্যা আরম্ভ করেন। ব্রহ্মার পুত্রদের মধ্যে প্রিয়তম, মহাভাগবত, মহামুনি নারদ মায়াধীশ বিষ্ণুর মায়াকে জানবার জন্য শীল-বিনয়-দম সহযোগে নিজ পিতা ব্রহ্মার শুশ্রূষা করে তাঁকে পরিতুষ্ট করেছিলেন। লোকপিতামহ পিতাকে তুষ্ট দেখে দেবর্ষি নারদ তাঁকে যে প্রশ্ন করেছিলেন আজ তুমিও আমাকে সেই প্রশ্নই করেছ। ভগবান ব্রহ্মার কাছে দশলক্ষণযুক্ত যে ভাগবত পুরাণ কীর্তন করেছিলেন, ব্রহ্মা প্রীত হয়ে পুত্র নারদকে তাই বর্ণনা করলেন। নারদ আবার সরস্বতী নদীর তীরে ব্রহ্মে ধ্যানমগ্ন অমিততেজা ব্যাসকে সেই ভাগবত বলেন। বিরাটপুরুষ থেকে এই বিশ্ব কি করে হয়েছিল সেই প্রশ্ন এবং অন্য প্রশ্নের উত্তরও বিশদ ব্যাখ্যা সহকারে এবার আমি বলছি। ৩৮-৪৬

দশম অধ্যায়

ভাগবতের দশলক্ষণ ব্যাখ্যা

শুক বললেন, এই ভাগবতে সৃষ্টি, বিসৃষ্টি, স্থান, পোষণ, ঊতি, মন্বন্তর, ঈশানুকথা, নিরোধ (প্রলয়), মুক্তি ও আশ্রয়—এই দশটি বিষয় আছে। এর মধ্যে ঋষিরা দশম বিষয়টির (আশ্রয়ের) বিশুদ্ধ অর্থ প্রকাশের জন্য বাকী নয়টির লক্ষণ কোথাও শ্রুতি সহযোগে, কোথাও সাক্ষাৎ এবং কোথাও বা তাৎপর্য উল্লেখে ব্যাখ্যা করে থাকেন। গুণত্রয়ের বৈষম্য হেতু পরমেশ্বর থেকেই পঞ্চভূত, পঞ্চতন্মাত্র,

ইন্দ্রিয়সকল, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কারতত্ত্ব—এদের যে জন্ম তার নাম সর্গ বা সৃষ্টি। ব্রহ্মকৃত সৃষ্টির নাম বিসর্গ বা বিসৃষ্টি। সৃষ্টির পরিপালনের নাম স্থান বা স্থিতি, ঈশ্বরের অনুগ্রহের নাম পোষণ। মন্বাদি কথিত ধর্মের নাম মন্বন্তর। কর্মবাসনা হল ঊতি। ঈশানুকথা হল অবতারদের আর হরিভক্তদের নানা উপাখ্যান-সমৃদ্ধ চরিতকথা যা জনসাধারণের কাছে কীর্তন করা হয়। সমস্ত উপাধি লয় করে শ্রীহরির নিজাত্মায় অবস্থিতির নাম নিরোধ বা প্রলয়। অন্যরূপ ত্যাগ করে আত্মার স্বরূপে ব্যবস্থিত হওয়াই মুক্তি। যাঁর থেকে সৃষ্টি আর প্রলয় হয়, যিনি পরমাত্মা এবং পরমব্রহ্ম তাঁরই নাম আশ্রয়। যিনি আধ্যাত্মিক পুরুষ তিনিই আধিদৈবিক পুরুষ। যাঁর জন্য এক জীবাত্মাতে দুই রকম ভেদজ্ঞান হয় তিনি আধিভৌতিক (দেহরূপ) পুরুষ। এই তিনটি পরস্পরাপেক্ষী হওয়ায় একটির অভাবে অন্যটিকে যখন আমরা বুঝতে পারি না, সেখানে যিনি সাক্ষীভাবে তিনটিকেই জানেন সেই আত্মাই হলেন অনন্যাশ্রয়। ১-৯

এই পুরুষ যখন অণ্ড ভেদ করে বেরিয়ে এলেন তখন তিনি নিজের আশ্রয়ের জন্য শুদ্ধ জল সৃষ্টি করলেন। নিজের সৃষ্ট জলে তিনি সহস্র বৎসর অবস্থান করলেন। পুরুষ (নর) থেকে উৎপন্ন বলে সেই জলকে নার বলা যায় এবং তিনি নারে আশ্রয় করায় নারায়ণ হলেন। এঁরই অনুগ্রহে দ্রব্য, কর্ম, কাল, স্বভাব এবং জীব অস্তিত্ববান হয় আর তিনি উপেক্ষা করলে তারা অস্তিত্বহীন হয়ে যায়। এক তিনি নানাত্ব ইচ্ছা করে যোগশয়ন থেকে উত্থিত হয়ে মায়া দিয়ে হিরণ্ময় সূক্ষ্মদেহকে তিন ভাগে ভাগ করলেন—যথা, অধিভূত, অধ্যাত্ম আর অধিদেব (ভূত, ইন্দ্রিয় আর দেবতা)। এখন সেই এক পুরুষশক্তি কিভাবে ত্রিধা বিভক্ত হল তার কথা শোন। বিবিধ চেষ্টাশীল পুরুষের হৃদয়স্থ আকাশ থেকে ইন্দ্রিয়শক্তি, মনঃশক্তি আর দেহশক্তি জন্মাল। তারপর হল সবার জীবনীশক্তি প্রাণ। প্রাণ সক্রিয় হলে ইন্দ্রিয়গুলি সচেষ্ট হয় আর প্রাণ ক্রিয়াত্যাগ করলে ওরাও নিশ্চেষ্ট হয়। প্রাণের দ্বারা সংক্ষুব্ধ বিভুর অন্তরে ক্ষুধা ও তৃষ্ণা সৃষ্ট হল। তখন পিপাসা এবং ক্ষুধার নিবৃত্তি ইচ্ছা করলে প্রথমে তাঁর মুখ বিদীর্ণ হয়ে প্রকাশিত হল। মুখ থেকে তালু ভিন্ন হল, তাঁর জিহ্বা উদ্ভূত হল। তারপর জিহ্বা দ্বারা যা অধিগত করা যায় সেই নানা রসের উদ্ভব হল। কথা বলার ইচ্ছা হলে এই বিরাট পুরুষের মুখ থেকে বহ্নিদেবতা, বাগিন্দ্রিয় আর এই দুয়েব অধীন বাক্যেব জন্ম হল। জলে ইনি সুদীর্ঘকাল নিরুদ্ধ ছিলেন। প্রাণবায়ু অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে উঠলে তিনি ঘ্রাণের জন্য ইচ্ছুক হলেন। তাঁর দুই নাসারন্ধ্র উৎপন্ন হল, তখন গন্ধবহ বাতাস (দেবতা) এবং ঘ্রাণেন্দ্রিয় সৃষ্টি হল। আদিতে জগৎ নিরালোক ছিল ; এখন নিজেকে আর অন্য বস্তুসমূহ দেখার ইচ্ছা হওয়াতে ভগবানের অক্ষিগোলক ফুটে বের হল আর জ্যোতি (আদিত্যদেবতা), চক্ষুরিন্দ্রিয় ও তদ্‌গ্রাহ্য রূপের উদ্ভব হল। ঋষিদের দ্বারা উদ্গীত নিজের বোধন শ্রবণ করার ইচ্ছায় তাঁব কানের আবির্ভাব হল, আর আবির্ভূত হল দিক্ (দেবতা), শ্রবণেন্দ্রিয় আর শব্দ। তিনি বস্তুসকলের কোমলতা, কাঠিন্য, লঘুতা, গুরুত্ব, উষ্ণতা এবং শৈত্য গ্রহণ করতে ইচ্ছুক হলে ত্বকের জন্ম হল, আর তাতে রোম জন্মাল। ত্বকের দ্বারা আবৃত হয়ে তার গুণযুক্ত হয়ে ত্বকের ভিতরে আর বাইরে রইল বাতাস। কর্ম করার ইচ্ছায় তাঁর দুই হাত আর ইন্দ্রিয়ের অধিপতি দেবতা বলবান ইন্দ্রের আবির্ভাব হল। হাতের কাজ হল আদান। অভীষ্ট স্থানে গতির ইচ্ছায় পদদ্বয়ের উৎপত্তি হল ; পায়ের অধিপতি দেবতা স্বয়ং যজ্ঞরূপী বিষ্ণু। মানুষ পায়ের গতিশক্তি দ্বারাই নানা কর্মসহযোগে হব্যক্রিয়ায় অনুষ্ঠান করে। তিনি পুত্র, আনন্দ আর স্বর্গাদি

ইচ্ছা করলে শিশ্ন আর তার অধিপতি দেবতা প্রজাপতি নির্গত হলেন ; উপস্থ এবং স্ত্রীসংসর্গ-সুখ ঐ দেবতার অধীন। খাদ্যের অসার অংশ পরিত্যাগ করতে ইচ্ছুক ভগবানের মলদ্বার সৃষ্ট হল। তারপর সৃষ্ট হল তার ইন্দ্রিয় পায়ু ও দেবতা মিত্র ; মলত্যাগক্রিয়া এই উভয়ের কাজ। দেহ থেকে দেহান্তর যাবার ইচ্ছায় নাভিদ্বার, অপান ও মৃত্যু আবির্ভূত হল। এই দুয়ের ক্রিয়া হল মরণ। অন্ন ও পানের ইচ্ছা থেকে কুক্ষি, অন্ত্র ও নাড়ির উদ্ভব হল। নদী অন্ত্রের আর সমুদ্র নাড়ীর দেবতা। আহারে তুষ্টি ও পুষ্টি তাদের অধীন। নিজের মায়াকে ধ্যান করতে চাইলে হৃদয় উদ্ভিন্ন হল, পরে মন ও মনের দেবতা চন্দ্র। তাদের আশ্রয়ে যথাক্রমে সংকল্প আর কাম উৎপন্ন হল। ত্বক্, চর্ম, মাংস, রুধির, মেদ, মজ্জা ও অস্থি — এই সাত ধাতু ভূমি, অপ্ ও তেজ থেকে সৃষ্ট হল ; আকাশ, জল আর বায়ু থেকে হল প্রাণ। ইন্দ্রিয়গুলি স্বভাবে গুণ বা বিষয়াভিমুখী। শব্দ, স্পর্শ প্রভৃতি বিষয় অহঙ্কার থেকে উৎপন্ন হল। মন শোক, হর্ষ প্রভৃতি সমস্ত বিকারের আধার আর বুদ্ধি বিজ্ঞানরূপিণী। ১০-৩৪

ভগবানের এই স্থূলরূপের কথা তোমাকে বললাম। এই বাহ্য রূপটি পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত, অহংতত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব আর প্রকৃতি এই আটটি আবরণে মোড়া। এ ছাড়া তাঁর বিশেষহীন, সূক্ষ্মতম অব্যক্ত শরীরও আছে। ইনি অনাদি, মধ্যহীন আর অন্তশূন্য (অর্থাৎ এর সৃষ্টি, স্থিতি এবং লয় নেই) নিত্যপুরুষ, বাঙ্মনসাতীত। কিন্তু তোমাকে ভগবানের রূপের এই যে দুটি ভেদের কথা বল্লাম, এদুটিই মায়ার সৃষ্টি ; তাই পণ্ডিতেরা এই দুই রূপকে পরমার্থ বলে স্বীকার করেন না। ৩৫

ব্রহ্মার মূর্তিতে বাচকরূপে দেবতা মানুষ ইত্যাদি নাম আর বাচ্যরূপে তাদের রূপ ধারণ করে ক্রিয়া হন। তিনি স্বয়ং নিষ্ক্রিয় হলেও মায়ার দ্বারা কর্মযুক্ত হন। এইভাবেই প্রজাপতিরা, মনুরা, দেবগণ, পিতৃগণ, সিদ্ধরা, চারণগণ, গন্ধর্বেরা, বিদ্যাধরেরা, অসুরেরা, গুহ্যকেরা, কিন্নরগণ, অপ্সরারা, নাগসমূহ, সর্পকুল, কিংপুরুষেরা[১], মানুষেরা, মাতৃগণ[২], রাক্ষসেরা, পিশাচেরা, প্রেতকুল, ভূতযোনিরা, বিনয়াকগণ, কুষ্মাণ্ডেরা, উন্মাদেরা, বেতালেরা[৩], যাতুধানেরা[৪], গ্রহগণ, মৃগকুল, পক্ষীকুল, পশুবংশ, বৃক্ষরাজি, পর্বতসমূহ, সরীসৃপকুল, এই ভূতবর্গ সৃষ্ট হল। প্রাণীরা আবার স্থাবর-জঙ্গম ভেদে দ্বিবিধ ; জলচর, খেচর ও নভশ্চর ভেদে ত্রিবিধ। এইসব প্রাণীই জরায়ুজ, অণ্ডজ, উদ্ভিজ্জ এবং স্বেদজ ভেদে চতুর্বিধ। কর্মের ত্রিবিধ গতি—উত্তম, অধম আর মিশ্র। সত্ত্ব, রজ আর তম অনুসারে দেব. মানুষ ও নারকী উৎপন্ন হয়। কর্মফলগুলো প্রত্যেকটা আবার সত্ত্ব-রজ-তম ভেদে ত্রিধা হওয়াতে কর্মের গতি মোট ন'টি। ঐ ভেদ ঘটে, যখন একটি গুণ অপর দুটি দ্বারা মিশ্রিত হয়। এই ভগবানই ধর্মরূপধারী জগদ্ধাতা (বিষ্ণু), তির্যকযোনি নরযোনি, এবং দেবযানিতে অবতীর্ণ হয়ে এই বিশ্বকে স্থিতি-পালনের দ্বারা পরিপোষণ করেন। ইনিই কালাগ্নি রুদ্ররূপে সময় হলে নিজের থেকে উদ্ভূত সৃষ্টিকে সংহার করেন। ভক্তযোগীরা ভগবানের এই রূপের কথাই বলে গেছেন। পণ্ডিতেরা কিন্তু পরমপুরুষকে এইভাবে দেখতে চান না। তাঁরা বলেন বিশ্বের সৃষ্ট্যাদি কর্মে পরমব্রহ্মের এই ধরনের কর্তৃত্ব হতে পারে না। ঈশ্বরের কর্তৃত্ব নিষেধ করবার

১ দেবযোনি বিশেষ। এরা কুবেরের অনুচর এবং সংগীত-কোবিদ। ২ ষোড়শ-মাতৃকা, যথা : পদ্মা, গৌরী, শচী, মেধা, বিজয়া, সাবিত্রী, জয়া, দেবসেনা, শান্তি, স্বাহা, স্বধা, সৃষ্টি, ধৃতি, তুষ্টি, আত্মদেবতা, কুলদেবতা ; এঁরা দেবী। ৩ শিবানুচর বিশেষ। ৪ নিশাচর ও রাক্ষসযোনি বিশেষ।

জন্যই ঐরূপ বর্ণিত হয়। কারণ মায়াদ্বারাই ঈশ্বরে কর্তৃত্ব কল্পনা করা যায়। তোমাকে ব্রহ্মের মহাকল্প এবং বিকল্পের কথা বললাম। প্রতি কল্পেই সৃষ্টির এটি সাধারণ নিয়ম। মহত্তত্ত্ব থেকে স্থূল সৃষ্টি পর্যন্ত এই পর্যায়েই হয়ে থাকে। এবার কালের স্থূল ও সূক্ষ্ম পরিমাণ কল্পলক্ষণ ও বিভাগ, আর পদ্মকল্পের[1] কথা (তৃতীয় স্কন্ধে) যা বলছি তা শোন। ৩৬-৪৭

সূতের মুখে এই পর্যন্ত শুনে শৌনক বললেন, সূত, আপনি আমাদের বলেছেন যে ভাগবতশ্রেষ্ঠ বিদুর পরিত্যাগ করা কঠিন এমন বন্ধুদেরও পরিত্যাগ করে পৃথিবীর সমস্ত তীর্থ পর্যটন করেন। সেই বিদুরের সঙ্গে মৈত্রেয় মুনির আলোচনা, বিদুরের প্রশ্নের উত্তরে ভগবান মৈত্রেয় বিদুরকে যে তত্ত্বকথা বলেছিলেন, বিদুরের বন্ধুত্যাগের চেষ্টা এবং তাঁর প্রত্যাগমন বিষয়ে আপনি আমাদের বিশদভাবে বলুন। ৪৮-৫০

সূত বললেন, রাজা পরীক্ষিৎ কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হয়ে মহামুনি শুক বিদুর-মৈত্রেয় সংবাদ যেমন যেমন বলেছিলেন, আমি সেগুলো বলে যাচ্ছি, আপনারা শুনুন। ৫১

---

১ যে কল্পে পদ্মযোনি ব্রহ্মার সৃষ্টি; এটি আদিকল্প।

তৃতীয় স্কন্ধ

প্রথম অধ্যায়

উদ্ধব-বিদুর সংবাদ

শুক বললেন, অনেকদিন আগে নিজের ঐশ্বর্যপূর্ণ গৃহ পরিত্যাগ করে বনে গিয়ে বিদুর ভগবান মৈত্রেয়কে একথাই জিজ্ঞাসা করেছিলেন। একসময় পাণ্ডবদের মন্ত্রণাদাতা অখিলেশ্বর ভগবান কৃষ্ণ দুর্যোধনের প্রাসাদ ত্যাগ করে বিদুরের এই গৃহকেই নিজের বাড়ি মনে করে সেখানে গিয়েছিলেন। ১-২

পরীক্ষিৎ বললেন, প্রভু, বিদুরের সঙ্গে ভগবান মৈত্রেয়ের কোথায় দেখা হয়েছিল, কখনই বা তাঁর সঙ্গে আলোচনা হয়েছিল এ সমস্তই আপনি বর্ণনা করুন। অমলাত্মা বিদুরের প্রশ্ন সজ্জনদের অনুমোদিত এবং তার নিশ্চয়ই অসামান্য তাৎপর্য আছে। ৩-৪

সূত বললেন, পরীক্ষিতের এই অনুরোধে প্রীত হয়ে শুকদেব তাঁকে বললেন, মহারাজ, তাহলে শুনুন। অন্ধ রাজা যখন নিজের অসাধু পুত্রদের অধর্মের দ্বারা পরিপোষণ করে কনিষ্ঠ ভ্রাতার পুত্রদের জতুগৃহে পুড়িয়ে মারার সম্মতি দিয়েছিলেন, বা যখন রাজা ধৃতরাষ্ট্র সভামধ্যে দুঃশাসন কর্তৃক দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ নিবারণ করেন নি, আবার মোহান্ধ রাজা যখন কপট পাশাক্রীড়ায় পরাজিত, সত্যাশ্রয়ী, অজাতশত্রু যুধিষ্ঠিরকে শর্তানুসারে দেয় রাজ্যভাগ দিলেন না, কিংবা যখন যুধিষ্ঠির কর্তৃক প্রেরিত হয়ে জগদ্‌গুরু কৃষ্ণ কুরুসভায় গিয়ে যা যা বলেছিলেন তা মান্য করলেন না, তখন প্রত্যেকবারেই বিদুর গৃহত্যাগ করা উচিত মনে করেছিলেন। ধৃতরাষ্ট্র বিদুরের কাছে পরামর্শ চাইলে বিদুর যে পরামর্শ দিয়েছিলেন তাকে মন্ত্রবিশারদরা এখনও বৈদুরিক বলে শ্রদ্ধা করেন। তার মর্ম হল—যুধিষ্ঠিরকে তাঁর প্রাপ্য ভাগ দিয়ে ঐসব অপরাধের ভয়ে আপনি কম্পান্বিত। আর কালসর্পসদৃশ ভীমও অন্য ভাইদের সঙ্গে ক্রোধে গর্জন করছে। দেবব্রাহ্মণ বেষ্টিত ভগবান মুকুন্দ পাণ্ডবদের আত্মীয় বলে গ্রহণ করেছেন। তিনি বহু রাজাকে পরাভূত করে নিজের পুরী দ্বারকায় অবস্থান করছেন। মহারাজ, পুত্রবোধে আপনি যাকে পোষণ করছেন সেই কৃষ্ণদ্বেষী দুর্যোধন সাক্ষাৎ পাপরূপে আপনার বাড়ীতে ঢুকেছে। তারই অনুরোধে কৃষ্ণ-বিমুখ হয়ে আপনিও হতশ্রী হয়েছেন। সুতরাং বংশের মঙ্গলের জন্য কালক্ষেপ না করে অশুভ পুত্রকে বিসর্জন দিন। ৫-১৩

বিদুর এ কথা বললে কর্ণ, দুঃশাসন আর শকুনি পরিবৃত দুর্যোধনের ঠোঁট প্রচণ্ড রাগে কাঁপতে লাগল। সে বিদুরকে যথেচ্ছ অপমান করে বলল, এই কুটিল দাসীপুত্রকে কে রাজসভায় ডেকে আনল? এ যার অন্নে পুষ্ট তারই প্রতিকূলতা করছে। এ তো শত্রুর মতই কাজ করছে। এর প্রাণটুকু শুধু রেখে একে এখনই পুরী থেকে নির্বাসিত কর। ১৪-১৫

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সামনেই এরকম কঠিন বাক্যবাণে বিদ্ধ হয়ে নিদারুণ মর্মব্যথা পেলেও বিদুর মায়ার শক্তিকে বড় মনে করে সামলে গেলেন। তারপর অস্ত্রশস্ত্র পুরীর দুয়ারে রেখে তিনি নিজেই সেখান থেকে বেরিয়ে পড়লেন। ১৬

হস্তিনাপুর থেকে বেরিয়ে বিদুর পুণ্য লাভের আকাঙ্ক্ষায় যে সব তীর্থে ভগবানের নানা মূর্তি অধিষ্ঠিত আছে সেই সব তীর্থে ভ্রমণ করতে লাগলেন। এইভাবে তিনি একাই অযোধ্যা প্রভৃতি নানা পুণ্য নগর, বন, উপবন, পর্বতকুঞ্জে, নির্মল নদী-সরোবরে আর শ্রীভগবানের মূর্তিতে শোভিত নানা তীর্থে ঘুরে বেড়ালেন। এই ভ্রমণের সময় তিনি পবিত্র, অসংকীর্ণ ভাবে জীবনধারণ করতেন। সব তীর্থে তিনি স্নান করতেন, মাটিতেই শুতেন; দেহের কোন পারিপাট্য বিধান করতেন না। নিজের আত্মীয়স্বজন কেউ তাঁকে চিনতে পারত না। এই ভাবেই তিনি হরির তুষ্টিসাধক নানা ব্রতের আচরণ করলেন। সারা ভারতবর্ষ ঘুরে যখন তিনি প্রভাস তীর্থে এলেন তখন শ্রীকৃষ্ণের সহায়তায় মহারাজ যুধিষ্ঠির সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র অধীশ্বর হয়ে পৃথিবী শাসন করছিলেন। বেণুসংঘর্ষে উদ্ভূত দাবানলে যেমন সমগ্র বন ধ্বংস হয় তেমনি সুহৃদ কুরুপাণ্ডবগণ আত্মকলহে ধ্বংস হয়েছে—প্রভাসে এসে বিদুর এই সংবাদ পেলেন। সংবাদ শুনে শোকতপ্ত হৃদয়ে এবং মৌন অবলম্বন করে তিনি সরস্বতীর তীর ধরে উত্তরমুখে যাত্রা করলেন। ১৭-২১

সেই পথে তিনি একে একে ত্রিত, উশনা, মনু, পৃথু, অগ্নি, অসিত, বায়ু, সুদাস, গো, গুহ আর শ্রাদ্ধদেবের একাদশ তীর্থ যথাবিহিত ভাবে দর্শন করলেন। এছাড়াও দেবতা-ঋষিদের দ্বারা স্থাপিত বিষ্ণুর নানা তীর্থ আর চক্রাঙ্কিত মন্দির তিনি দর্শন করলেন। এরপর মহাসমৃদ্ধ সুরাষ্ট্র, সৌবীর, মৎস্য আর কুরুজাঙ্গল দেশ অতিক্রম করে তিনি যখন যমুনায় এসে পৌঁছালেন সেখানে ভক্তশ্রেষ্ঠ উদ্ধবের সঙ্গে তাঁর দেখা হল। ২২-২৪

সৌম্যমূর্তি এই উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণের অনুচর, বৃহস্পতির বিখ্যাত পূর্বশিষ্য। প্রণয়ভরে বিদুর তাঁকে প্রগাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করলেন। তারপর কৃষ্ণের পোষ্যবর্গের এবং নিজের জ্ঞাতিদের কুশল জিজ্ঞাসা করলেন। বিদুর বললেন, উদ্ধব, ব্রহ্মার প্রার্থনায় পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়ে বলরাম শ্রীকৃষ্ণ পৃথিবীর ভার লাঘব করে এখন কুশলে আছেন তো? কুরুদের পরম সুহৃদ আমাদের পূজ্য বাসুদেব সুখে আছেন তো? ভগিনীপতিদের তিনি সন্তোষদান করেন, ভগিনীদের পিতার মত বরদান করে থাকেন। পূর্বজন্মে যিনি কন্দর্প ছিলেন এবং ব্রাহ্মণদের আরাধনা করে রুক্মিণী, শ্রীকৃষ্ণ থেকে যাঁকে পুত্ররূপে পেয়েছেন, যদুদের সেনাপতি সেই প্রদ্যুম্ন সুখে আছেন তো? সিংহাসনের আশা ত্যাগ করে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এলে শ্রীকৃষ্ণ যাঁকে রাজাসনে বসিয়েছেন সেই উগ্রসেন সাত্বত-বৃষ্ণি-ভোজ-দশার্হদের অধিপতিরূপে সুখে বিরাজ করছেন তো? যিনি পূর্বজন্মে অম্বিকা-গর্ভে জাত কার্তিকেয় ছিলেন এবং কৃষ্ণপত্নী জাম্ববতীর গর্ভে পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেছেন পিতা কৃষ্ণের তুল্য মহারথ সেই সাম্ব সুখে আছেন তো? ফাল্গুনির কাছ থেকে ধনুর্বিদ্যা আয়ত্ত করে সাত্যকি কৃষ্ণ-আরাধনা দ্বারা যতিদেরও দুর্লভ কৃষ্ণবৃত্তি লাভ করেন। তিনিও সুখে আছেন তো? ভগবানের আশ্রিত, পণ্ডিত এবং নিষ্পাপ শ্বফল্কপুত্র অক্রূর, যিনি কংস কর্তৃক কৃষ্ণকে আনার জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন এবং কৃষ্ণের চরণচিহ্ন-আঁকা পথের ধুলোর ওপর লুটিয়ে পড়ে সেই ধুলো সর্বাঙ্গে মেখে নিয়েছিলেন, তিনি ভাল আছেন তো? দেবমাতা অদিতির মত ভোজবংশের দেবকের কন্যা দেবকীর মঙ্গল তো? বেদত্রয় যেমন যজ্ঞসমূহের তাৎপর্যধারক উনিও তেমনি ভগবানকে গর্ভে ধারণ করেছেন। বেদ যাঁকে শব্দের কারণ বলে বর্ণনা করে, যিনি চার রকম (চিত্ত-বুদ্ধি-অহঙ্কার-মন) অন্তঃকরণের মধ্যে মনের অধিদেবতা সেই অনিরুদ্ধ সুখে আছেন তো? তারপর হৃদীক,

সত্যভামাপুত্র চারুদেষ্ণ, গদ প্রভৃতি যাঁরা নিজেদের আত্মার অধিপতি-দেবতা স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে সম্যক্ অনুসরণ করেন, তাঁর প্রতি একান্ত ভক্তি প্রদর্শন করেন, তাঁরা সুখে বিহার করছেন তো? ২৫-৩৫

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির নিজের দুইবাহু-স্বরূপ কৃষ্ণার্জুনের সহায়তায় ধর্মপথে ধর্ম-মর্যাদা রক্ষা করছেন তো? তাঁর রাজসভার দিগ্‌বিজয়লব্ধ সাম্রাজ্যের ঐশ্বর্য দেখে দুর্যোধন হিংসায় দগ্ধ হয়েছিল। গদাযুদ্ধের সময় বিবিধ বিচিত্র গতিতে ভ্রমণ করতে থাকলে ভীমসেনের পদভরে রণস্থল কাঁপতে থাকে। সাপের মত ক্রোধ-পরবশ সেই ভীমসেন অপরাধী কুরুদের ওপর তার বহুকালের রাগ ধরে রেখেছে না বিসর্জন দিয়েছে? কিরাতবেশী মহাদেব অর্জুনের শরজালে আচ্ছন্ন হয়ে পরম পরিতুষ্ট হন। রথী-সেনাপতিদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা যশস্বী এবং গাণ্ডীবধন্বা সেই অর্জুন সুখে আছেন তো? চোখের পাতা যেমন চোখকে রক্ষা করে তেমনি কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠিরাদির দ্বারা রক্ষিত মাদ্রীপুত্র নকুল-সহদেব ইন্দ্রের মুখ থেকে অমৃত আহরণকারী গরুড়ের মত[১] দুর্যোধনের গ্রাস থেকে স্ব-রাজ্য উদ্ধার করেন। তাঁরা সব সুখে বিরাজ করছেন তো? ধনুর্ধর বীরশ্রেষ্ঠ পাণ্ডু একলাই রথে করে চতুর্দিক জয় করেছিলেন। তাঁকে ছাড়া কুন্তী যে জীবন ধারণ করে রয়েছেন সে শুধু সন্তানদের জন্যই। পাণ্ডু মারা গেলে পাণ্ডুর সন্তানদের সঙ্গে ধৃতরাষ্ট্র অসহ্য অসদাচরণ করেন। আর তাঁর সন্তান দুর্যোধনাদিও তাঁরই অনুবর্তী হয়ে নিজগৃহ থেকে আমাকে তাড়িয়ে দিল। সেই অধঃপতিত ধৃতরাষ্ট্রের জন্য আমার অনুতাপ হচ্ছে। ৩৬-৪১

ভগবান শ্রীহরি জাগতিক বিড়ম্বনা দিয়ে মানুষের চিত্তবিভ্রম ঘটান। সুতরাং হরির কৃপাতেই এখন আমি বিস্ময়-বিরহিত হয়ে গূঢ়ভাবে পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াচ্ছি আর তাঁর মায়ার খেলা দেখছি। যেসব রাজারা বিদ্যা-ধন-আভিজাত্যমদে উন্মার্গগামী হয়ে সৈন্যবলে পৃথিবী কম্পিত করছে তাদের বধ করার এবং শরণাগত পাণ্ডবদের দুঃখনাশের জন্যই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কুরুদের অপরাধ প্রথমে উপেক্ষা করেছিলেন। জন্মরহিত ভগবানের যদুকুলে আবির্ভাব দুষ্ট-নিগ্রহের জন্য। আর কর্মরহিত ঈশ্বর কর্ম করেন লোককে কর্মপ্রবর্তনা শিক্ষা দেবার জন্য। গুণাতীত হয়েও কে কর্ম ও দেহসংযোগ স্বীকার করবেন? অতএব বন্ধু, শরণাগত দেবতাদের আর নিজ অনুশাসনে অবস্থিত জনগণের প্রয়োজনে যে শ্রীকৃষ্ণ যদুকুলে জন্মগ্রহণ করেছেন তাঁর কথা আমার কাছে কীর্তন কর। ৪২-৪৫

দ্বিতীয় অধ্যায়

উদ্ধবের বালক কৃষ্ণের কাহিনী বর্ণনা

শুক বললেন, ভক্ত উদ্ধব বিদুরের প্রশ্ন শুনে ভগবদ্ভাবে বিহ্বল হয়ে পড়লেন। প্রিয় কৃষ্ণের কাহিনী বলতে তাঁর যেন সামর্থ্য রইল না। উদ্ধব পাঁচ বছর বয়সেই বালসুলভ খেলার ছলে কৃষ্ণের পরিচর্যায় এমন ব্যস্ত থাকতেন যে প্রাতরাশের জন্য মা ডাকলেও খাবার স্পৃহা অনুভব করতেন না। তিনি কৃষ্ণের সেবা করে ক্রমে বার্ধক্যে পৌঁছে প্রভুর শ্রীচরণ স্মরণ করে কি করেই বা প্রশ্নের উত্তর

১ নিজের মাকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করবার জন্য গরুড় বিমাতা কদ্রুর আদেশে স্বর্গ থেকে অমৃত নিয়ে আসেন। ইন্দ্র বাধা দিতে গেলে পরাজিত হন।

দেবেন ? উদ্ধব কৃষ্ণচরণ-পদ্মসুধা পান করে আনন্দমগ্ন হয়ে এবং তীব্র ভক্তি-যোগের দ্বারা গভীর সুখলাভ করে মুহূর্তকাল নীরব রইলেন। পুলকে তাঁর রোমাঞ্চ হল, বন্ধ দুই চোখ থেকে বিগলিতধারে অশ্রু ঝরতে লাগল। তাঁকে কৃতার্থ পুরুষের মত দেখাচ্ছিল। তারপর তিনি আস্তে আস্তে ঈশ্বরলোক থেকে নরলোকে ফিরে এলেন এবং চোখের জল মুছে সানন্দে বিদুরকে বলতে আরম্ভ করলেন। ১-৬

উদ্ধব বললেন, কৃষ্ণ-সূর্য আজ অস্তমিত। কালগ্রস্ত গৃহগুলো বিগতশ্রী। নিজেদের কুশল আর কি করে বলব ! পৃথিবী ভাগ্যহীন ঠিকই, কিন্তু যাদবেরা আরো বেশী হতভাগ্য। কারণ মাছ যেমন সমুদ্রে বিম্বিত চাঁদকে দেখে না, তারাও সেই রকম কৃষ্ণকে চিনতে পারে নি। তারা অজ্ঞান ছিল না, তাদের যথেষ্ট নিপুণতাও ছিল, তবুও কৃষ্ণের সঙ্গে একত্র থেকেও তারা তাঁকে ঈশ্বর মনে না করে শুধু মহান যদুবংশীয় বলেই মনে করত। এইভাবে ঈশ্বর-মায়ায় মোহিত যাদবরা, যারা কৃষ্ণকে তাদের বন্ধু বলত বা অসদাশ্রয়ী বলে তাঁকে নিন্দা করত, তাদের কারো কথাতেই আমাদের মত শ্রীহরিতে সমর্পিত-চিত্ত ভক্তদের বুদ্ধি বিভ্রান্ত হয় না। ৭-১০

কৃষ্ণ ক্ষণকালের জন্য পাপাচারী মানুষদের নিজ দেহবিম্ব দেখিয়ে চিরকালের মত অন্তর্ধান করেছেন। তাঁর দেহ ভুবনকেও শোভমান করার মত অঙ্গসংযোগে গঠিত। সৌভাগ্য-ঋদ্ধির পরকাষ্ঠা মর্ত্যলীলার যোগ্য তাঁর নিজ মূর্তি দেখে স্বয়ং ভগবানও মোহিত হন। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে সেই নয়নানন্দকর মূর্তি দেখে ত্রিভুবন অবাক হয়ে ভেবেছিল, বিচিত্র সংসার নির্মাণে ব্রহ্মার শিল্প-চাতুর্যও বুঝি এর পাশে ম্লান হয়ে গেল। রাসলীলার সময় তাঁর অনুরাগভরা হাসিতে ধন্য হয়ে ব্রজবাসিনীরা চোখের সঙ্গে হৃদয় দিয়েও তার অনুগামী হত এবং নিজেদের সমস্ত কাজ বিস্মৃত হত। নিজের শান্তরূপ দেখিয়ে দেবতাদের প্রতি কৃষ্ণভগবান তাঁর অনুকম্পা দেখিয়েছিলেন ; আর ভয়ালরূপ দেখিয়ে দৈত্য প্রভৃতির ভীতি সৃষ্টি করেছিলেন। কাঠে যেমন অগ্নির আবির্ভাব হয়, সেই রকম নিজে জন্মরহিত হলেও ভগবান মহাভূতবপে জন্মগ্রহণ করেন। এই অজ ও নিত্য শ্রীহরি বসুদেবের ঘরে জন্মগ্রহণ, অনন্তবীর্যধারী হয়েও শত্রুভয়ে মথুরাপুরী থেকে পলায়ন — এ সবাই আমাকে বড় দুঃখ দেয়। দেবকী-বসুদেবের চরণবন্দনা করে শ্রীকৃষ্ণের উক্তি—কংসের ভয়ে মহাভীত হয়ে আমরা আপনাদের সেবা করতে পারি নি, আপনারা সেই দোষ মার্জনা করে আমাদের প্রতি প্রসন্ন হোন—স্মরণ করলেও আমার চিত্ত খেদে ভরে ওঠে। এমন কে আছে যে ভগবানের চরণপদ্মের রেণুর আঘ্রাণ একবার নিয়ে আবার তা ভুলে যেতে পারে? বিস্ফারিত বিশাল ভ্রূভঙ্গরূপ কৃতান্তের দ্বারা ইনি ভূভার হরণ করেছিলেন ! আপনারা তো নিশ্চয়ই দেখেছিলেন কৃষ্ণের দ্বেষ করে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের সময় শিশুপালের কোন সিদ্ধি লাভ হয়েছিল কি ? যোগীরাও যাঁকে পেতে অভিলাষ করেন সেই শ্রীকৃষ্ণের বিরহ কে সহ্য করতে পারে ? অন্য সব বীরপুরুষগণ যুদ্ধক্ষেত্রে নয়না-ভিরাম কৃষ্ণের মুখপদ্মের মধু চোখ দিয়ে যেন পান করে অর্জুনের অস্ত্রাঘাতে প্রাণ-ত্যাগপূর্বক পূত হয়ে সুন্দর বৈকুণ্ঠলোকে প্রয়াণ করে। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণকে গুণে অতিক্রম করে এমন কেউই নেই। তিনিই ত্রিভুবনপতি। চিদানন্দরূপ সম্পত্তি দ্বারা সর্বপ্রকার পূজার উপহার এনে ইন্দ্রাদি লোকপালগণ কিরীট-লাঞ্ছিত শিরে প্রণতিকালে এঁর পাদপীঠ অলঙ্কৃত করে। বিদুর, কৃষ্ণ যখন আজ্ঞাধীনের মত সিংহাসনে সমাসীন উগ্রসেনকে সম্বোধন করে বলতেন, মহারাজ, দয়া করে আমাদের করণীয় উপদেশ করুন, তখন আমার মত ভৃত্যজনেরও মনে বড় ব্যথা লাগত। কি আশ্চর্য, দুষ্ট পূতনা যখন বিষলিপ্ত স্তন পান করিয়ে শ্রীকৃষ্ণকে হত্যা করতে চাইল তখন সেও

কিনা ধাত্রীলভ্য গতি লাভ করল। অতএব বলুন, আমরা তাঁকে ছেড়ে অন্য কোন কৃপাসাগরের কাছে যাই? অতি ক্রোধবশে সংগ্রামের পথেই ত্রিলোকপতি ঈশ্বরের অনুরক্ত ছিল বলে অসুরকুলকেও আমি মহাভাগবত বলে মনে করি। যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুকালে তারা গরুড়বাহন চক্রপাণি ভগবানকে চাক্ষুষ দেখতে পেত। ১১-২৪

জন্মরহিত ব্রহ্মা প্রার্থনা জানালে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পৃথিবীর ভার-হরণের জন্য বসুদেবপত্নী দেবকীর উদরে কংসকারাগারে জন্ম নেন। তারপর কংসভয়ে ভীত বসুদেব তাঁকে নন্দের ব্রজপুরে নিয়ে গেলেন। সেখানে তিনি বলভদ্রের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে এগার বছর নিজের তেজ গোপন করে অবস্থান করেন। গোপবালকদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে ভগবান যমুনাতীরে পাখী-কলরব মুখরিত উপবনে বেড়াতেন, গরু চরাতেন আর খেলা করতেন। মুগ্ধ বালসিংহের ন্যায় তিনি কখনও হেসে, কখনও কেঁদে ব্রজবাসীদের মনোলোভা কৌমারলীলা দেখিয়েছিলেন। লক্ষ্মী-নিকেতন, শোভাময় তিনি গোধন চরিয়ে বেণু বাজিয়ে গোপালকদের কত আনন্দ দিতেন। বালক হলেও কৃষ্ণ ভোজরাজ কংস কর্তৃক তাঁর প্রাণনাশের জন্য প্রেরিত মায়াধারী কামরূপী অসুরদের খেলার পুতুলের মত ধ্বংস করেছিলেন। সর্প-প্রভু কালিয়ের বিষে বিষাক্ত যমুনার জলপানে গোপবালকদের আর গো-বৃষের মৃত্যু ঘটলে শ্রীকৃষ্ণ তাকে শাসন করেন, জল বিষমুক্ত করেন এবং তাদের প্রাণ দান করে ঐ বিশুদ্ধ জল পান করান। যাতে গোপরাজ নন্দের অর্থের সদ্ব্যয় হয় সেজন্য তিনি তাঁকে দিয়ে ভাল ভাল ব্রাহ্মণ আনিয়ে গো-যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়েছিলেন। অখন গর্ব খর্ব হওয়াতে ক্রুদ্ধ ইন্দ্র প্রচণ্ড বর্ষাব সৃষ্টি কবলে সারা ব্রজধাম ভয়ে বিহ্বল হয়ে উঠল। শ্রীকৃষ্ণ অনুগ্রহ করে অবলীলাক্রমে গোবর্ধন গিরিকে ছত্রের মত অঙ্গুলিতে ধারণ করে রাখাতে ব্রজপুরী রক্ষা পায়। শবচ্চন্দ্রেব জ্যোৎস্নার যখন সন্ধ্যা সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল তখন সুমিষ্ট গান গাইতে গাইতে ব্রজললনাদের মণ্ডলীতে ভূষণস্বরূপ বিরাজিত থেকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণই রাসলীলার অনুষ্ঠান করেছিলেন। ২৫-৩৪

তৃতীয় অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণের কংসবধ ও পিতামাতার উদ্ধার

উদ্ধব বললেন, তারপব শ্রীকৃষ্ণ মথুরাপুরে এলেন। সেখানে বসুদেব ও দেবকীর সুখবিধানের জন্য শত্রুকুলের চূড়ামণি কংসকে উঁচু রাজাসন থেকে টেনে মাটিতে ফেলে বধ করলেন। তাঁর গুরু সান্দীপনির কাছে একবার মাত্র শুনেই তিনি ষড়ঙ্গাদি সহ বেদে পারঙ্গম হয়ে গেলেন আর পঞ্চজন নামক দৈত্যের পেট চিরে তাঁর পুত্রকে বার করে এনে তার জীবন দিয়ে গুরুদক্ষিণা প্রদান করলেন। ভীষ্মক-কন্যা রুক্মিণীর রূপে আকৃষ্ট হয়ে যে সব রাজন্যবর্গ সমাগত হয়েছিলেন গরুড়ের অমৃত হরণের মত শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের মাথার ওপর পা দিয়ে তাঁদের সাক্ষাতেই স্বীয় অংশস্বরূপা রুক্মিণীকে গন্ধর্ব বৃত্তিতে অপহরণ করেছিলেন। তিনি অবিদ্ধনাসিক সাতটি বৃষকে দমন করে নাগ্নজিতীকে বিবাহ করেন। তখন হতমান, মূর্খ, বিবাহেচ্ছু রাজন্যবর্গ সশস্ত্রে প্রভুকে আক্রমণ করলে তিনি তাদের হত্যা করেন। প্রেয়সী সত্যভামা অদিতির কুণ্ডল চাইলে শ্রীকৃষ্ণ স্ত্রীপরতন্ত্র হয়ে তাঁর পরিতোষের জন্য স্বর্গে গিয়ে পারিজাত

গাছ আনেন। পত্নীদের ক্রীড়ামৃগস্বরূপ ইন্দ্র তাঁদের প্ররোচনায় সৈন্য সমভিব্যাহারে মহাক্রোধে শ্রীকৃষ্ণকে আক্রমণ করেন। নিজের বিরাট দেহদ্বারা আকাশ গ্রাস করতে গেলে নরকাসুর যখন সুদর্শন চক্রে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল, তখন তার জননী পৃথিবীর প্রার্থনায় কৃষ্ণ তার পুত্র ভগদত্তকে অবশিষ্ট রাজ্যের অধিপতিরূপে অভিষিক্ত করে তার অন্তঃপুরে প্রবেশ করেন। সেখানে নরকাসুরের দ্বারা অপহৃত রাজকন্যারা আর্তবন্ধু শ্রীকৃষ্ণকে দেখে তখনই প্রেমপূর্ণ সলজ্জ অপাঙ্গ দৃষ্টি দিয়ে তাকে স্বামিত্বে বরণ করলেন। সেই একই মুহূর্তে শ্রীকৃষ্ণ যোগমায়া বলে নিজের অনুরূপ বহু দেহ ধারণ করলেন এবং সেইসব নারীদের যথাবিধি পাণিগ্রহণ করলেন। মায়াবলে অনেক হবার ইচ্ছায় সেই রমণীদের প্রত্যেকের গর্ভে তিনি নিজের মত সর্বগুণান্বিত দশটি করে সন্তানের জন্ম দেন। কালযবন, জরাসন্ধ, শাল্ব প্রভৃতি দুষ্টদের দ্বারা মথুরাপুরী অবরুদ্ধ হলে তিনি স্বপক্ষের পুরুষদের দিব্য তেজে বলীয়ান করে স্বয়ংই যেন তাদের বধ করেন। শম্বর, দ্বিবিদ, বাণ, মুর, বল্কল এবং দন্তবক্রাদি অসুরদের তিনি স্বয়ং হত্যা করেন কিংবা অপরকে দিয়ে হত্যা করান। ১-১১

বিদুর, আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রদের দুই পক্ষ অবলম্বনকারী রাজন্যবর্গ তাঁরই প্রভাবে কুরুক্ষেত্রে নিহত হয়। তারপর কর্ণ-দুঃশাসন-শকুনির কুমন্ত্রণার প্রভাবে হতশ্রী এবং হতায়ু দুর্যোধন যখন তাঁর ভগ্ন উরু নিয়ে অনুচরদের সঙ্গে ভূতলশায়ী হয় কৃষ্ণ তখন তা দেখে আনন্দ পাননি। কারণ তিনি ভাবলেন, ভীষ্ম, দ্রোণ আর ভীমার্জুনের যুদ্ধে আঠার অক্ষৌহিণী সৈন্য ধ্বংস হলেও তাতে ধরাভার আর কতটুকুই বা লাঘব হয়েছে। আমার অংশে উপার্জিত যদুবংশের দুর্বিষহ ভার তো এখনও রয়েছে। সুরাপানের ফলে রক্তচক্ষু যদুদের মধ্যে যখন আত্মকলহ দেখা দেবে তখনই তাদের মৃত্যুর উপায় নিশ্চিত হবে, অন্য কোনও উপায়ে হবে না। তারা নিজেরা একাত্ম হলেও আমি অন্তর্ধান করতে উদ্যত হলে ওরা বিবাদ করে নিজেরাই নিজেদের মারবে। ১২-১৫

এইসব ভেবে শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে নিজরাজ্যে অভিষিক্ত করে সাধুজনোচিত নানা কাজে বন্ধুদের আনন্দবিধান করলেন। অভিমন্যুর ঔরসে উত্তরার গর্ভস্থ পুরুবংশধর যখন দ্রোণীর অস্ত্রে নিহত হয়, তখন কৃষ্ণই তাকে পুনর্জীবন দেন। তিনি যুধিষ্ঠিরকে দিয়ে তিনটি অশ্বমেধ যজ্ঞ করান। যুধিষ্ঠিরও কৃষ্ণানুব্রত হয়ে নিজের ভ্রাতাদের সাহায্যে পৃথিবী পালন করেন এবং মহাসুখে অবস্থান করেন। জনশিক্ষার্থে লোকাচার ও বেদাচার পরায়ণ হয়ে বিশ্বাত্মা শ্রীভগবানও সাংখ্যতত্ত্বে স্থিত হয়ে অনাসক্তভাবে দ্বারাবতীতে থেকে বিষয়ভোগ করলেন। স্মিতস্নিগ্ধ দৃষ্টি, সুধাক্ষরা বাণী, অনবদ্য চরিত্র আর কামনার আবাসস্বরূপ দেহ নিয়ে দ্যুলোক, ভূলোক এবং যদুকুলকে অত্যন্ত আনন্দিত করে তিনি সেখানে বিরাজ করলেন। রাত্রির অবসরে আগত কামিনীদিগের প্রতি সৌহার্দ প্রকাশ করে তিনি আনন্দদায়ক অবকাশ যাপন করতেন। ১৬-২১

এইরকম অনেক সুখকর বছর কেটে গেল। কামোপভোগ-সাধন এবং গার্হস্থ্য-জীবনে ধীরে ধীরে তাঁর নির্বেদ উপস্থিত হল। কামাধিপতি কৃষ্ণ যখন কামে উদাসীন হলেন তখন যাঁদের কামাদি দৈবাধীন তাঁদের আর কামে কি করে প্রীতি হবে? আর যোগের পথে কাম লাভ করলেও শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া অপরের তাতে প্রীতি হতে পারে না; কারণ শ্রীকৃষ্ণই যোগেশ্বর। এমন সময়ে দ্বারকায় যদু ও ভোজবংশীয় কুমারগণ খেলাচ্ছলে দুষ্ট আচরণে মুনিদের কুপিত করে; ফলে কৃষ্ণের অভিপ্রায়াভিজ্ঞ মুনিরা তাদের শাপ দিলেন। তার কয়েক মাস পরে দেবতাদের দ্বারা বিমোহিত হয়েই যেন

বৃষ্ণি, ভোজ, অন্ধক প্রভৃতি যদুবংশীয়ের হৃষ্টচিত্তে প্রভাসতীর্থের দিকে রথে করে চললেন। সেখানে স্নান সেরে তারা সেই জলে পিতৃগণের, দেবতাদের আর ঋষিদের তর্পণ করলেন, ব্রাহ্মণদের অনেক গরুদান করলেন। তাছাড়া প্রচুর স্বর্ণ, রজত, শয্যা, বস্ত্র, অজিন, কম্বল, হস্তী, রথ, কন্যা, শস্যশালী ভূমি এসবও তাঁরা দান করলেন। তাঁরা আরও দিলেন বহুরসযুক্ত অন্ন। এ সবই যেন তাঁদের ঈশ্বরাপর্ণ হল। তারপর সেই গো-বিপ্রগতপ্রাণ যাদবেরা মাথা নত করে সেই ব্রাহ্মণদের প্রণাম নিবেদন করলেন। ২২-২৮

চতুর্থ অধ্যায়

মৈত্রেয়ের নিকট বিদুরের গমন

উদ্ধব বললেন, এরপর যাদবগণ ব্রাহ্মণদের অনুমতি নিয়ে ভোজন করলেন এবং সুরাপানে মত্ত হয়ে পরস্পরকে কটুবাক্য দ্বারা আঘাত করতে লাগলেন। যেমন পরস্পরের ঘর্ষণে উৎপন্ন আগুনে বেণুসকল দগ্ধ হয় তেমনি সুরাপানে বুদ্ধির বিকার ঘটায় পরস্পর সংঘর্ষে সূর্যাস্তের সময়ে যাদবগণ ধ্বংস হয়ে গেল। ভগবান আপন মায়ার ঐ গতি দেখে সরস্বতীর জলে আচমন করে একটি গাছের তলায় গিয়ে বসলেন। ভগবান শরণাগতের দুঃখ দূর করেন ; আপনার কুল ধ্বংস করতে ইচ্ছুক হয়ে ইতিপূর্বেই তিনি একদিন দ্বারকায় আমাকে বলেছিলেন, উদ্ধব, তুমি বদরিকাশ্রমে যাও। কিন্তু আমি তাঁর কুলসংহারের অভিপ্রায় বুঝতে পেরেও তাঁর চরণ থেকে বিচ্ছিন্ন হবার ভয়ে তাঁকে অনুসরণ করলাম। ১-৫

তাঁর অন্বেষণে যেতে যেতে দেখলাম লক্ষ্মীর আশ্রয়, আমার প্রিয়তম প্রভু সরস্বতী-তীরে একা বসে আছেন। তাঁর অঙ্গ উজ্জ্বলশ্যাম, প্রশান্ত দুটি চক্ষু অরুণবর্ণ। ভুজচতুষ্টয় এবং পীত বসন দেখে আমি তাঁকে চিনতে পারলাম। বাম উরুর উপর দক্ষিণ পদ রেখে একটি কোমল অশ্বত্থ গাছে হেলান দিয়ে তিনি বসে ছিলেন। সমস্ত সুখভোগ ত্যাগ করলেও তাঁকে আনন্দে পূর্ণ বোধ হচ্ছিল। এমন সময় ব্যাসদেবের পরম সখা, পরাশরশিষ্য যোগসিদ্ধ ঋষি মৈত্রেয় নানাস্থান ভ্রমণ করতে করতে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। ভগবানে একান্ত অনুরক্ত মৈত্রেয় কৃষ্ণকে দেখামাত্র ভাবভরে এবং আনন্দে মাথা নত করলেন। তাঁর সামনেই অনুরাগ এবং হাসিমাখা দৃষ্টিতে তাকিয়ে আমার পরিশ্রম দূর করে কৃষ্ণ বললেন, উদ্ধব, তোমার ইচ্ছা আমি জানতে পেরেছি। পূর্বজন্মে তুমি ছিলে একজন বসু। তখন আমাকে পাবার জন্য তুমি লোকস্রষ্টা প্রজাপতির এবং বসুগণের যজ্ঞে আমার আরাধনা করছিলে। তাই আমাতে বিমুখ ব্যক্তি যা পায় না এমন সাধন আমি তোমাকে দান করছি। পৃথিবীতে এই তোমার শেষ জন্ম, কারণ এজন্মেই তুমি আমার কৃপা লাভ করলে। আমি নরলোক ছেড়ে যাচ্ছি। তাই এই নির্জনে তুমি যে ভক্তির সঙ্গে আমাকে দর্শন করলে এও তোমার পরম সৌভাগ্য এবং জন্ম তোমার সার্থক। সৃষ্টির আদিতে আমার নাভিপদ্মে আসীন ব্রহ্মাকে আমি যে পরমজ্ঞান উপদেশ করেছিলাম তাকেই জ্ঞানিগণ ভাগবত বলে থাকেন। ৬-১৩

বিদুর, আমাকে কৃপাদৃষ্টিতে অনুগৃহীত করে পরমপুরুষ অতি স্নেহে ঐকথা

বললে আবেগে আমার শরীরে রোমাঞ্চ হল, কণ্ঠ বাষ্পে রুদ্ধ হল। অশ্রুপাত করতে করতে জোড়করে আমি বললাম, প্রভু, যারা তোমার শ্রীচরণ ভজনা করে তাদের পক্ষে চতুর্বর্গের মধ্যে কোনটিই দুর্লভ নয়। তবুও আমি তার একটিও চাইনা। আমার আকাঙ্ক্ষা শুধু তোমার পাদপদ্ম সেবা করা। ভগবান, তুমি কর্মহীন হয়েও কর্ম কর, জন্মরহিত হয়েও দেহধারণ কর, নিজে কালরূপী হয়েও শত্রুভয়ে পলায়ন কর, আত্মরতি হয়েও বহুললনা পরিবৃত হয়ে গৃহাশ্রমে বাস কর—এসব দেখে জ্ঞানীদেরও সংশয় জন্মে। তুমি সদাত্মা, তোমার জ্ঞান অখণ্ড, সংশয়রহিত। তুমি সর্বজ্ঞ হয়েও মন্ত্রণাকালে কেন আমার কাছে পরামর্শ চাইতে তা চিন্তা করে আমি বিমূঢ় হচ্ছি। তুমি নিগূঢ় আত্মরহস্য প্রকাশক যে জ্ঞান ব্রহ্মাকে উপদেশ করেছিলে, যদি অযোগ্য মনে না কর তবে আমাকে তা বল, যাতে সংসার-দুঃখ থেকে ত্রাণ পেতে পারি। ১৪-১৮

এইভাবে আমি আমার ইচ্ছার কথা জানালে কমললোচন হরি আপন নিত্যস্বরূপ বিষয়ে উপদেশ দিলেন। তাঁর কাছে পরমাত্মজ্ঞানের পথ জেনে আমি তাঁর পায়ে প্রণাম করে ব্যথিতচিত্তে এখানে চলে এসেছি। বিদুর, শ্রীকৃষ্ণের দর্শনে আমি যেমন আনন্দ পেয়েছি, তাঁর বিরহে তেমনি কাতর হয়েছি। এখন আমি তাঁর প্রিয় স্থান বদরিকাশ্রমে যাচ্ছি। লোকসকলের অনুগ্রহের জন্য ভগবান ও নারায়ণ ঋষি কল্পান্তকাল অবধি কঠিন তপস্যা করছেন। ১৯-২২

শুকদেব বললেন, মহারাজ, উদ্ধবের কাছে ভীষণ আত্মীয়নাশের সংবাদ শুনে বিদুর গভীর শোক পেলেও বিবেকের শক্তিতে তা নিবারণ করলেন। শ্রীকৃষ্ণের পরমাত্মীয় উদ্ধব বদরিকাশ্রম যাচ্ছেন শুনে বিদুর তাঁর কাছে শ্রীকৃষ্ণ কথিত পরমজ্ঞান প্রার্থনা করলেন। ঐ তত্ত্ব লাভ করবার জন্য উদ্ধব বিদুরকে মৈত্রেয়ের আরাধনা করতে পরামর্শ দিলেন। কারণ ভগবান পৃথিবী ছাড়বার সময় মৈত্রেয় ঋষিকে বিদুরকে উপদেশ দেবার জন্য আদেশ করেন। এইভাবে বিদুরের সংগে শ্রীভগবানের গুণকীর্তন করে উদ্ধবের দুঃখ দূর হল। তিনি সেই রাত্রিতে ক্ষণকালের মত যমুনাতীরে কাটিয়ে ভোরবেলা সেখান থেকে চলে গেলেন। ২৩-২৭

পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করলেন, ব্রহ্মশাপে বৃষ্ণি ও ভোজবংশের সকলেই যখন ধ্বংস হল, এমন কি শ্রীহরিও মানবদেহ পরিত্যাগ করলেন, তখন যদুকুলের প্রধান উদ্ধব অবশিষ্ট থাকলেন কেন? শুকদেব বললেন, মহারাজ, ব্রহ্মশাপ একটা উপলক্ষমাত্র। সব কিছুর মূলেই ভগবানের ইচ্ছা। তিনি যখন ইচ্ছা করলেন যে অতিরিক্ত বেড়ে-যাওয়া যদুকুলকে নিজের কালশক্তি দ্বারা ধ্বংস করে দেহত্যাগ করবেন, তখন ভাবলেন যে তাঁর অন্তর্ধানের পর একমাত্র উদ্ধবই তাঁর জ্ঞান ধারণ করতে পারবেন, আর কেউ নয়। উদ্ধব তাঁর থেকে কিছুমাত্র কম নন, কেননা বিষয়সমূহ দ্বারা তিনি মোহিত হন না। তাই তিনি ইচ্ছা করলেন যে সকল লোককে তাঁর বিষয়ক জ্ঞান উপদেশ দেবার জন্য উদ্ধবই মর্ত্যলোকে থাকুন। এইভাবে বেদকর্তা ভগবানের আদেশ পেয়ে উদ্ধব বদরিকাশ্রমে এলেন এবং একাগ্রমনে শ্রীহরির পূজা করতে লাগলেন। ২৮-৩২

লীলাচ্ছলে দেহধারণ করে শ্রীকৃষ্ণ যেসব কর্ম করেন এবং যেভাবে তাঁর দেহত্যাগ হয় তা কৃষ্ণতত্ত্বজ্ঞদের ধৈর্য বৃদ্ধি করে, কিন্তু পশুর মত অজ্ঞ লোকের পক্ষে কষ্টকর। উদ্ধবের মুখে সব কথা শুনে এবং দেহত্যাগের সময় শ্রীকৃষ্ণ যে তাঁর কথা মনে করেছিলেন, একথা জেনে বিদুর প্রেমে বিহ্বল হয়ে কাঁদতে লাগলেন। তারপর তিনি

যমুনাতীর ছেড়ে কয়েকদিন ভ্রমণ করার পর গঙ্গাতীরে মহামুনি মৈত্রেয়ের নিকট এসে উপস্থিত হলেন।[১] ৩৩-৩৬

পঞ্চম অধ্যায়

মৈত্রেয় কর্তৃক শ্রীভগবানের লীলাবর্ণন

শুকদেব বললেন, কুরুশ্রেষ্ঠ বিদুর হরিদ্বারে মহামুনি মৈত্রেয়ের সাক্ষাৎ পেলেন এবং তাঁর সরলতা, দয়া ইত্যাদি গুণে তৃপ্তিলাভ করলেন। তারপর বিদুর মৈত্রেয়কে জিজ্ঞাসা করলেন, এই সংসারে মানুষ সুখের আশায় কর্ম করলেও সুখলাভ তো হয়ই না, বরঞ্চ বারবার সে শুধু দুঃখই ভোগ করে। এই যখন সংসারের রীতি তখন এখানে আমাদের কি কর্তব্য তা আপনি যথার্থ বলুন। পূর্বকৃত কাজের ফলস্বরূপ যে জীব ঈশ্বরবিমুখ হয় তার অধর্মে মন যায় এবং ফলে সে দুঃখভোগ করে। আপনাদের মত কৃষ্ণভক্ত পরিত্রাতারা তাদের দয়া করবার জন্যই পৃথিবীতে আছেন। যেভাবে ভগবানের আরাধনা করলে তিনি আমাদের ভক্তিশুদ্ধ হৃদয়ে আবির্ভূত হন এবং অনাদি বেদে যা উপদেশ করা আছে সেই আত্মসাক্ষাৎকার প্রদান করেন, আপনি সেই পথ আমাকে বলে দিন। আর ত্রিগুণের ঈশ্বর স্বতন্ত্র ভগবান অবতাররূপে যে সকল কর্ম করেন, নিষ্ক্রিয়, নিস্পৃহ হয়েও যে ভাবে এই জগৎ সৃষ্টি করেছেন এবং যেভাবে তাকে পালন করেন, তাও বর্ণনা করুন। ১-৫

আবার, তিনি যেভাবে প্রলয়ে জগৎকে আপন হৃদয়াকাশে লীন রেখে যোগমায়াতে নিশ্চেষ্টভাবে শায়িত থাকেন এবং সৃষ্টির সময় তার মধ্যে প্রবেশ করে ব্রহ্মা ইত্যাদি বহুরূপ হন, সে সবও প্রকাশ করে বলুন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অমৃতচরিত যতই শুনি কিছুতেই তৃপ্তি হয় না। তিনি বিভিন্ন অবতাররূপে আবির্ভূত হয়ে ব্রাহ্মণ, গো এবং দেবগণের মঙ্গলের জন্য যে কর্ম করেন, তাও বর্ণনা করুন। লোকপালগণ সমেত পাতাল ইত্যাদি লোক এবং বিভিন্ন প্রাণীর কর্ম ও ভোগের অধিকার অনুযায়ী বাসস্থান বলে প্রসিদ্ধ লোকালোক পর্বতের[২] বহির্ভাগ—এই সমস্ত কোন কোন উপাদানে নির্মাণ করলেন? অনাদি স্বয়ংসিদ্ধ নারায়ণ বিশ্বস্রষ্টা হয়ে যে ভাবে জীবগণের স্বভাব, কর্ম, রূপ, নাম ইত্যাদি ভাগ করেছেন সে সব বলুন। আমি ব্যাসদেবের কাছে ব্রাহ্মণ ও শূদ্রের আচরণীয় ধর্মের বিষয় অনেক শুনেছি এবং তাতে যে সব তুচ্ছ সুখের কথা আছে তা শুনে তৃপ্ত হয়েছি। কিন্তু যে যে স্থানে কৃষ্ণকথামৃত পান করবার অবসর ঘটেছে সেখানে পিপাসা নিবৃত্ত হয়নি। ৬-১০

'আপনাদের সমাজে নারদ ইত্যাদি মুনিগণ শ্রীকৃষ্ণের কথামৃতের অনেক গুণ-কীর্তন করেছেন। ঐ কথামৃত যার কানে প্রবেশ করে তারই সংসারের আসক্তি ছিন্ন হয়। আপনার সুহৃদ বেদব্যাসও শ্রীভগবানের গুণকীর্তন করবার জন্য মহাভারত রচনা করেছেন। তাতে তিনি অর্থ, কাম ইত্যাদির কথা বর্ণনা করলেও সাধারণ

১ ভাগবতের বিবরণের সঙ্গে ব্রহ্মপুরাণের উদ্ধব বিষয়ক কাহিনীর যথেষ্ট মিল দেখা যায়। তবে যদুবংশ ধ্বংসের পর কৃষ্ণ যে উদ্ধবকে আত্মতত্ত্ব শিক্ষা দেন তা ভাগবতেই আছে। আর ভাগবত থেকে মনে হয় উদ্ধব তাঁর জীবনের শেষভাগ বদরিকাশ্রমে কাটিয়েছিলেন।

২ লোকালোক পর্বত—একদিকে সূর্যের আলো পড়ায় আলোকিত, অন্যদিকে অন্ধকার বিরাজিত, এমন এক ব্রহ্মাণ্ড বেষ্টনকারী পর্বত।

মানুষের জন্য যে সুখবর্ণনা করেছেন তাতে তাদের চিত্ত আকৃষ্ট হয়ে হরিকথায় নিযুক্ত হয়েছে। ঈশ্বরে ভক্তি জন্মালে মন ক্রমশ প্রাকৃত সুখে বিরক্ত হয়; তারপর তাঁর চরণাশ্রয়ে আনন্দলাভ করে অচিরে সমস্ত দুঃখ থেকে মুক্তিলাভ করে। যারা হরিকথায় আনন্দ পায়না তারা মহাভারতের তাৎপর্য লাভ করতে পারেনা। তারা অধমেরও অধম; তাদের জন্য আমার দুঃখ হয়। তাদের আয়ু যেমন বৃথা ক্ষয় হচ্ছে, বাক্য, দেহ এবং মনও বৃথা কাজে নিযুক্ত থাকছে। আপনি সংসারক্লিষ্ট মানুষের বন্ধু, তাই মধুকর যেমন নানা ফুল থেকে মধু সংগ্রহ করে, আপনিও সেরকম নানা কথা থেকে সার কথা, পুণ্যকীর্তি শ্রীহরির গুণগাথা, সংগ্রহ করে বিশ্বের কল্যাণে তাই কীর্তন করুন। যে ঈশ্বর বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয় বিধানের জন্য ত্রিগুণ স্বীকার করেছিলেন তিনি অবতাররূপে পৃথিবীতে এসে যে সব অলৌকিক কর্ম করেছিলেন তাও সবিস্তারে বলুন। ১১-১৬

শুকদেব বললেন, মহারাজ, মানুষমাত্রের মঙ্গলের জন্য বিদুর ঐ প্রশ্ন করলে ভগবান মৈত্রেয় তাঁকে অনেক সমাদর করে বললেন, বিদুর, তুমি লোক-কল্যাণের জন্য যে প্রশ্ন করেছ তা অতি উত্তম প্রশ্ন। তোমার চিত্ত সর্বদা ভগবানে সমর্পিত, মাণ্ডব্য মুনির শাপে বিচিত্রবীর্যের পত্নীরূপে গৃহীত দাসীর গর্ভে ভগবান বেদব্যাসের ঔরসে তোমার জন্ম। তুমি যে একচিত্ত হয়ে শ্রীহরির চরণপদ্ম আশ্রয় করেছ তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। তুমি তাঁর অতি প্রিয়পাত্র এবং বৈকুণ্ঠে যাবার সময় তিনি তোমাকে জ্ঞান উপদেশ করবার জন্য আমাকে আদেশ দিয়ে গেছেন। যাহোক এখন আমি যোগমায়া দ্বারা বিস্তারিত সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় সম্বন্ধে ভগবানের লীলা প্রথম থেকে বর্ণনা করছি। ১৭-২২

সৃষ্টির আগে এই জগৎ ছিল না, কেবল জীবগণের আত্মস্বরূপ ও প্রভু পরমাত্মা ভগবান বিরাজিত ছিলেন। সে সময় বিশ্ব ভগবৎস্বরূপে লীন ছিল, তাই দ্রষ্টা বা দৃশ্যের ভেদজ্ঞান ছিল না। তখন একমাত্র ভগবানই প্রকাশিত ছিলেন, তাই তিনি দ্রষ্টা হলেও দৃশ্য কিছু দেখা সম্ভব ছিল না। মায়া ইত্যাদি শক্তি তাঁতে বিলীন থাকতে তিনি নিজেও যেন নেই এরূপ মনে করতেন। কিন্তু তাঁর চিৎশক্তি জাগ্রত থাকাতে তিনি নিজে একেবারে অস্তিত্বহীন এরূপও বোধ করেন নি। যে শক্তিবলে ঈশ্বর এই জগৎ সৃষ্টি করেছেন, যা কার্য এবং কারণ, যথা ঘট এবং মৃত্তিকা ইত্যাদি রূপে অবস্থিত এবং যা দিয়ে দ্রষ্টা থেকে দৃশ্য আলাদা এই বোধ জন্মায়, তাই হল মায়া। মায়া দ্বারাই ভগবান এই বিশ্ব নির্মাণ করেছেন। চিৎশক্তিযুক্ত ঈশ্বরের কালশক্তি দ্বারা মায়ার গুণসকল ক্ষুব্ধ হলে তিনি পুরুষরূপে মায়াকে চৈতন্যের বিকাশযুক্ত করেন। কালদ্বারা প্রেরণাপ্রাপ্ত ঐ মায়া থেকে মহত্তত্ত্বের সৃষ্টি হয়। অঙ্কুরে নিহিত বীজ যেমন বৃক্ষরূপে প্রকাশ পায়, তেমনি সত্ত্বপ্রধান মহত্তত্ত্ব বা বিজ্ঞানাত্মায় নিহিত তেজ এই জগৎকে প্রকাশ করল। তারপর সেই মহত্তত্ত্ব গুণ, চৈতন্য ও কালের অধীন এবং সর্বাধ্যক্ষ ভগবানের দৃষ্টিগোচর হলে এই বিশ্বের সৃষ্টির জন্য নিজেকে রূপান্তরিত করলেন। ২৩-২৮

ঐ রূপান্তরিত বা বিকারযুক্ত মহত্তত্ত্ব থেকে অহংকার-তত্ত্বের উদ্ভব হল। ভূত ইন্দ্রিয় এবং মন অর্থাৎ দেবতা—অহংকারের এই তিনটি বিকার বা রূপান্তর; তাই অহংকারকে কার্য, কারণ এবং কর্তা[১] এই তিনের আশ্রয় বলা যায়। অহংকার তিন রকম—সাত্ত্বিক, রাজস, এবং তামস। সাত্ত্বিক অহংকার বিকৃত হয়ে তার থেকে

১ কার্য—অধিভূত; কারণ—অধিদৈব; কর্তা—অধ্যাত্ম। এদের প্রকাশ যথাক্রমে—ভূতি, ইন্দ্রিয় ও মন।

মন বা দেবতাসকল উদ্ভূত হন এবং ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী ঐ দেবতাসকল থেকে শব্দ ইত্যাদি বিষয়সমূহ উৎপন্ন হয়। রাজস অহংকার থেকে জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং কর্মেন্দ্রিয়-সকল আর তামস অহঙ্কার থেকে শব্দতন্মাত্র[১] বা সূক্ষ্ম শব্দ উৎপন্ন হয়। সূক্ষ্ম শব্দ থেকে হয় আকাশ। এই আকাশই ব্রহ্মের বা আত্মার শরীর বা লিঙ্গ। এরপর ভগবান আকাশের দিকে তাকালে তাঁর মায়া চিদাভাস অর্থাৎ চৈতন্যশক্তি ও কালশক্তি বা ইচ্ছাশক্তির দ্বারা আকাশ থেকে স্পর্শতন্মাত্র বা সূক্ষ্ম স্পর্শগুণ প্রকাশিত হয়। ঐ সূক্ষ্ম স্পর্শগুণের বিকার হল বায়ু। আকাশের সঙ্গে যোগ ঘটায় অধিক বলশালী বায়ু বিকৃত হয়ে সূক্ষ্মরূপ সৃষ্টি হয়। আর সূক্ষ্মরূপ বা রূপতন্মাত্র থেকে হয় তেজ যা সকল লোককে প্রকাশ করে। ভগবান বায়ুর সহযোগে ঐ তেজের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে তাঁর ইচ্ছাদি শক্তির প্রভাবে ঐ তেজ বিকৃত হয়ে রসতন্মাত্র দ্বারা জল উৎপন্ন করে। তারপর ভগবান তেজোময় হয়ে ঐ জলের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে তাঁর ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে বিকৃত অর্থাৎ রূপান্তরিত হয়ে গন্ধতন্মাত্র দ্বারা ভূমির সৃষ্টি করে। ২৯-৩৫

বিদুর, আকাশ ইত্যাদি পঞ্চভূতের মধ্যে যে যে ভূত ক্রমে পরে উৎপন্ন হয়েছে তাদের সঙ্গে নিজ নিজ কারণের ক্রমশ সম্পর্ক থাকায় ক্রমেই তাদের গুণ বেশী হয়েছে অর্থাৎ পরে উৎপন্ন ভূত পূর্ববর্তী ভূতের গুণ পেয়েছে। যেমন আকাশ সর্বপ্রথম সৃষ্টি হয়েছে বলে তাতে একমাত্র শব্দগুণই আছে। কিন্তু বায়ু তার পরে উৎপন্ন হওয়াতে তাতে নিজের স্পর্শগুণ ছাড়াও আকাশের শব্দগুণও আছে। এইরকম তেজের শব্দ, স্পর্শ ও রূপ ; জলের শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস এবং ভূমির বা পৃথিবীর শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ, এই পাঁচটি গুণই রয়েছে। আগে যে মহত্তত্ত্ব ইত্যাদির কথা বলা হয়েছে সে সবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ বিষ্ণুর অংশ। তাঁদের কালশক্তির চিহ্ন বা বিকার, মায়াশক্তির চিহ্ন বা বিক্ষেপ এবং অংশশক্তির চিহ্ন বা চেতনা—এইসব গুণ আছে। কিন্তু তাঁরা একত্র না হয়ে পৃথক পৃথক থাকার ফলে ব্রহ্মাণ্ড রচনা করতে সমর্থ হলেন না এবং জোড়হস্তে পরমেশ্বরের স্তব করে বলতে লাগলেন, তোমার পাদপদ্ম ছত্রের মত শরণাগতকে পাপ থেকে রক্ষা করে। ঐ পদ আশ্রয় করে বিবেকিগণ সংসারজ্বালা দূরে পরিত্যাগ করেন। জীবগণ এ সংসারে ত্রিতাপে ক্লিষ্ট হয়ে হৃদয়ে শান্তি পায় না। আমরা তোমার চরণ আশ্রয় করলাম, এতেই আমাদের জ্ঞানের উদয় হয়ে শান্তিলাভ হবে। পাখি যেমন নিজ নিজ নীড় থেকে বেরিয়ে এদিক ওদিক ঘোরাফেরা করে আবার নীড়েই ফিরে আসে সেরকম বেদসকলও তোমার মুখপথ থেকে নিঃসৃত হয়ে আবার তাতেই প্রবেশ করে। তোমার চরণ পরমতীর্থের মত। নদীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পাপনাশিনী গঙ্গা ঐ চরণ থেকেই উদ্গত হয়েছেন। তাই গঙ্গার সেবা করেও অনেকে তোমার শ্রীচরণ লাভ করে থাকেন। শ্রদ্ধাসহকারে তোমার কথা যে শোনে তোমার পদে তার ভক্তি হয়, তার চিত্ত শুদ্ধ হয়। সেই শুদ্ধ হৃদয়ে বৈরাগ্যযুক্ত জ্ঞান উদ্ভূত হয়ে শান্তি আনে। তাই আমরা তোমার পাদপদ্মে আশ্রয় নিলাম। হে ঈশ্বর, এই বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারের জন্য তুমি অবতাররূপে আবির্ভূত হয়ে থাক। তোমার চরণপদ্ম স্মরণ করলে জীবগণ অভয় লাভ করে। তাই আমরাও ঐ পদাম্বুজের শরণ নিলাম। তুচ্ছ স্ত্রী-পুত্র-পরিবার নিয়ে যারা দেহরূপ গৃহে 'আমি' 'আমার' এইরকম জ্ঞানে বদ্ধ, অন্তর্যামীরূপে তুমি তাদের দেহে বাস করলেও তারা তোমার চরণলাভ করে না। আমরা তোমার সেই চরণপদ্মের ভজনা করি। হে পরমেশ্বর,

১ পঞ্চতন্মাত্র বা সূক্ষ্মভূত—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ। সাংখ্যমতে তন্মাত্র হল সূক্ষ্ম, অমিশ্র পঞ্চভূত।

অন্তর্যামী হয়ে সকলের হৃদয়েই তুমি বাস করছ। কিন্তু তবুও তোমার চরণ সবাই পায় না, কারণ যাদের ইন্দ্রিয়সকল বহির্মুখ, তাদের চিত্তকে ঐ ইন্দ্রিয়েরাই হরণ করে দূরে নিয়ে যায়। তাই ভক্তসঙ্গ করা তো দূরের কথা ভক্তদর্শনই তাদের অদৃষ্টে ঘটে না। আর সাধুসঙ্গ না করার জন্য হরিকথা শোনার সৌভাগ্যও তাদের হয় না। তোমার কথামৃত পান করে ভক্তিতে যাঁদের হৃদয় নির্মল হয়, তাঁরা বৈরাগ্যযুক্ত পরমজ্ঞানের ফলে বৈকুণ্ঠলাভ করেন। ৩৬-৪৬

যাঁরা সমাধিযোগ দ্বারা শক্তিমতী প্রকৃতিকে জয় করতে পারেন তাঁরাও তোমাতেই প্রবেশ করেন, কিন্তু অনায়াসে নয়। তোমার সেবার পথ অবলম্বন করলে অনায়াসে মুক্তিলাভ হয়। হে আদিপুরুষ, আমরা তোমারই দাস। লোকসৃষ্টির উদ্দেশ্যে তুমি আমাদের সত্ত্ব রজ ও তম এই তিন স্বভাব বিশিষ্ট করে সৃষ্টি করছ, কিন্তু আমাদের স্বভাব পরস্পর বিরুদ্ধ হওয়াতে তোমার লীলার বস্তু ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করে তোমাকে অর্পণ করতে পারলাম না। হে অজ, যাতে যথাসময়ে তোমাকে সমস্ত ভোগ্য সমর্পণ করে আপন অন্নভোজন করতে পারি এবং যাতে জীবগণ নির্বিঘ্নে তোমার এবং আমাদের ভোগ্যবস্তু সংগ্রহ করে নিজেদের অন্ন গ্রহণ করতে পারে, তার জন্য আমাদের শক্তি এবং জ্ঞান দাও। আমরা কেউ কারণরূপে এবং কেউ কার্যরূপে উৎপন্ন হয়েছি, কিন্তু তুমি আমাদের সকলের জনক। তাই তুমি আমাদের জীবিকা বা বৃত্তি নির্দেশ করে দাও। গুণ এবং জন্ম ইত্যাদি কর্মের কারণস্বরূপ মায়াশক্তিতে তুমিই মহত্তত্ত্বরূপ বীজ স্থাপন করেছ। তাই হে পরমাত্মা, মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি আমরা যে জন্য সৃষ্ট হলাম সে সম্বন্ধে কি কর্তব্য আমাদের বল। আমরা সৃষ্টি করব, এই যদি তোমার ইচ্ছা হয়, তবে আমাদের যথোচিত শক্তি এবং জ্ঞান দান কর। ৪৭-৫১

ষষ্ঠ অধ্যায়

বিরাট মূর্তি সৃষ্টি

মৈত্রেয় বললেন, মহত্তত্ত্ব ইত্যাদি শক্তিসমূহ পরস্পর আলাদা থাকতে তারা বিশ্বনির্মাণে সমর্থ হল না। তা দেখে ঈশ্বর কাল নামে নিজের শক্তিকে অবলম্বন করে মহৎ, অহঙ্কার, পঞ্চতন্মাত্র, একাদশ ইন্দ্রিয় আর পঞ্চমহাভূত—এই তেইশটি তত্ত্বে এককালে অন্তর্যামীরূপে প্রবেশ করলেন। প্রবেশ করে তিনি ক্রিয়াশক্তি দ্বারা ঐ তত্ত্বগুলির ক্রিয়া বিকাশ করে তাদের একসঙ্গে মিলিয়ে দিলেন।[১] ঐ তত্ত্বগুলির ক্রিয়া যেইমাত্র জাগরিত হল অমনি তারা ভগবানের প্রেরণায় আপন আপন অংশ দ্বারা অধিপুরুষ বা বিরাটদেহ রচনা করল। ঈশ্বর প্রবেশ করলে তত্ত্বসমূহের মধ্যে কোনটি প্রধান হল আবার কোনটি অধীন থেকে তার সঙ্গে মিলে গেল, কোনোটিরই পৃথকত্ব রইল না। এইভাবে তত্ত্বসমূহ নিজ নিজ অংশ দ্বারা চরাচর লোকের উপাদানরূপে পরিণত হল, কিন্তু এমন সম্পূর্ণভাবে পরিণত হল না যাতে আপন অস্তিত্বই লোপ পেয়ে যায়। ১-৫

সেই হিরণ্ময় অধিপুরুষ[২] জলমধ্যে স্থিত ব্রহ্মাণ্ডে প্রলয়ের সময় লীন জীব-

---

১ অর্থাৎ কর্মপ্রচেষ্টা দিয়ে তত্ত্বগুলোকে বেঁধে দিলেন। ফলে তারা উদ্দেশ্যসাধনে সক্রিয় হতে পারল। ২ অণ্ডটি হিরণের শোভাযুক্ত; তার অভ্যন্তর পুরুষ (আত্মা) বলে হিরণ্ময় পুরুষ।

সমূহের সঙ্গে সহস্র বৎসর বাস করলেন। তারপর মহত্তত্ত্ব ইত্যাদি উপাদানে রচিত সেই বিরাটপুরুষ নিজেকে চৈতন্যরূপে এক, প্রাণরূপে দশ এবং অধ্যাত্ম, অধিদৈব ও অধিভূত রূপে আরো তিন ভাগে ভাগ করলেন। এই পুরুষ পরমাত্মার অংশ এবং অশেষ প্রাণীর আত্মা। ইনিই আদি অবতার এবং দেবতা, মানুষ প্রভৃতি প্রাণিগণ এঁতেই প্রকাশ পায়। ইতি অধ্যাত্ম, অধিদৈব ও অধিভূত এই তিনরূপে, প্রাণ ইত্যাদি দশ রূপে[১] এবং হৃদয়স্থ চৈতন্য এই এক রূপে নিজেকে ভাগ করেন। পরে পরমেশ্বর মহত্তত্ত্ব ইত্যাদি তত্ত্বসমূহের পূর্বের অনুরোধ স্মরণ করে তাদের বৃত্তি নির্দেশ করবার জন্য নিজের চিৎশক্তি দ্বারা তপস্যা করলেন। অর্থাৎ আমি এইরকম সৃষ্টি করব, এই আলোচনা করলেন। পরমেশ্বর ঐ আলোচনা করলে পর দেবতাদের কত রকম স্থান ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশিত হল সে কথা শোন। ৬-১২

তাঁর মুখ আলাদা হলে লোকপাল অগ্নি নিজশক্তি বাক্যের সঙ্গে সেই মুখে প্রতিষ্ঠিত হলেন। তার জন্যই জীব শব্দ উচ্চারণ করতে পারছে। বিরাটপুরুষের তালু উৎপন্ন হলে রসনা-ইন্দ্রিয়রূপ নিজশক্তির সঙ্গে বরুণ তাতে প্রবেশ করলেন; এর ফলে জীব রসনা দ্বারা রস গ্রহণ করতে পারছে। তারপর নাসাযুগল উৎপন্ন হলে দুজন অশ্বিনীকুমার নিজশক্তি ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সঙ্গে তাতে অধিষ্ঠিত হলেন। ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা জীব গন্ধ গ্রহণ করে। ক্রমে দুই চক্ষু প্রকাশিত হল এবং লোকপাল আদিত্য তাতে প্রবেশ করলেন; সেই চক্ষু দ্বারা জীব রূপগ্রহণ করে। বিরাট পুরুষের চর্ম প্রকট হলে বায়ু নিজ শক্তিতে দেহব্যাপী ত্বক্-ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে তাতে প্রতিষ্ঠিত হলেন। ত্বক্ হল স্পর্শজ্ঞানের ইন্দ্রিয়। তারপর প্রকাশিত হল দুই কর্ণ। দিক্ দেবতারা নিজ শক্তি শ্রবণেন্দ্রিয়ের সঙ্গে তাতে প্রবেশ করলেন। কর্ণদ্বারা জীবের শব্দজ্ঞান হল। তাঁর ত্বক্ প্রকাশিত হলে ওষধিদেবতাগণ নিজ শক্তি রোমদ্বারা তাতে প্রবিষ্ট হলেন। এই সব রোমদ্বারা কণ্ডূতি (চুলকান) এবং স্পর্শসুখ অনুভব হয়। ১৩-১৮

তারপর যখন বিরাটপুরুষের উপস্থ প্রকাশ পেল তখন প্রজাপতি নিজ অংশ শুক্রের সঙ্গে তাতে প্রবেশ করলেন। জীব এর দ্বারা রতিসুখরূপ আনন্দ অনুভব করে। এর পরে তাঁর পায়ু প্রকাশ পেলে মিত্র তার অধিদেবতা রূপে তাতে প্রবিষ্ট হলেন। এই ইন্দ্রিয় দ্বারা মলত্যাগ ইত্যাদি কাজ হয়ে থাকে। তারপর বিরাট পুরুষের দুই হাত প্রকাশ হলে ইন্দ্র ক্রয়-বিক্রয় ইত্যাদি শক্তির সঙ্গে তাতে প্রবেশ করলেন। এই ইন্দ্রিয় দ্বারা জীব জীবিকা নির্বাহ করে। তারপর ঐ পুরুষের দুই পা প্রকাশ পেলে বিষ্ণু গতিশক্তির সঙ্গে তাতে প্রবেশ করলেন। এর দ্বারা জীব দেশান্তরে গমন করতে পারে। ১৯-২২

অতঃপর বিরাটপুরুষের বুদ্ধি উদ্গত হলে ব্রহ্মা নিজ শক্তি জ্ঞানের সঙ্গে তাতে প্রবেশ করলেন। এই ইন্দ্রিয় দিয়ে জীবের বুদ্ধিগম্য বিষয়ের জ্ঞান হয়ে থাকে। বিরাটপুরুষের হৃদয় প্রকাশ পেলে চন্দ্রমা মনের সঙ্গে তাতে প্রবেশ করলেন। সেই মন দ্বারা জীব সংকল্প ইত্যাদি বিকার পেয়ে থাকে। বিরাটপুরুষের অহঙ্কার প্রকট হলে রুদ্র নিজ শক্তি অহংবৃত্তির সঙ্গে সেখানে প্রবেশ করলেন। এর দ্বারা জীব তার কর্তব্য নির্ণয় করে। তাঁর চিত্ত প্রকাশিত হলে বিষ্ণু আপন অংশ চেতনার সঙ্গে তাতে প্রবিষ্ট হলেন। এর ফলে জীব বিজ্ঞান অনুভব করে। এরপর বিরাটপুরুষের মাথা থেকে স্বর্গ, দুই পা থেকে পৃথিবী আর নাভিদেশ থেকে

---

১ দেহস্থ বায়ু দুরকম—বাহ্য ও আন্তর। প্রাণ ইত্যাদি পাঁচটি বায়ু হল আন্তর বায়ু আর নাগাদি পঞ্চ-বায়ু বহির্বায়ু।

আকাশ উৎপন্ন হল। সত্ত্ব, রজ, তম—এই তিনগুণের পরিণাম দেবতা আর মানুষ ইত্যাদি প্রাণীরা এইসব লোকে অবস্থান করতে লাগল। দেবতারা সত্ত্বগুণের অধিকারী হওয়াতে স্বর্গ, মানুষ ও গরু প্রভৃতি প্রাণীরা রজোগুণ হেতু পৃথিবী আর তমোগুণযুক্ত রুদ্রের অনুচর ভূতগণ ঐ দুই লোকের মাঝখানেই আকাশ আশ্রয় করল। ২৩-২৮

বিদুর, এর পর এই বিরাটপুরুষের মুখ থেকে বেদ এবং ব্রাহ্মণ জন্মালেন। ঐ বেদ অধ্যাপনা ইত্যাদি দ্বারা ব্রাহ্মণগণের বৃত্তিস্বরূপ হল। বিরাটপুরুষের মুখ থেকে জন্ম হল বলে ব্রাহ্মণ সমস্ত বর্ণের মুখ্য এবং গুরু হলেন। তাঁর বাহু থেকে জন্মালেন ক্ষত্রিয়। এঁদের বৃত্তি হল পালন করা। তাই ক্ষত্রিয়রা চোর ইত্যাদির হাত থেকে সকলকে রক্ষা করে থাকেন। ঐ পুরুষের দুই উরু থেকে কৃষিকর্ম ইত্যাদি ব্যবসায়ের সঙ্গে বৈশ্যের উৎপত্তি হল। তাই বৈশ্যগণ কৃষি ইত্যাদি কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করেন। তারপর তাঁর পদদ্বয় থেকে বর্ণাশ্রম ধর্ম সিদ্ধির জন্য সেবাবৃত্তির সঙ্গে শূদ্র জন্মালেন। শূদ্রকে হেয় মনে করো না, কারণ সেবায় স্বয়ং ভগবান তুষ্ট হন। এই চারটি বর্ণ আপন বৃত্তির সঙ্গে ভগবানের অবয়ব থেকে উৎপন্ন হয়েছে বলে তিনি বর্ণসকলের গুরু এবং জনক। যাঁর দয়ায় তাদের জীবিকানির্বাহ হচ্ছে, তাঁর আরাধনা করাই পরম ধর্ম। কাল, কর্ম এবং স্বভাব-শক্তিমান ভগবানের ঐ বিরাটরূপ যোগমায়ায় দ্বারাই প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর ঐ রূপের সম্পূর্ণ বর্ণনা করবার কথা কেউ মনেও স্থান দিতে পারে না। তবু আমার গুরুর কাছে যেমন শুনেছি এবং তার অর্থ যেমন বুঝেছি সেই মতই শ্রীহরির কীর্তি বর্ণনা করছি আর বিদুর, আমি এ বিষয়ে কেন প্রবৃত্ত হয়েছি তাও শোন। নানা লোকের সঙ্গে কথাবার্তায় ঈশ্বরগণের আলোচনা ছেড়ে অনেক প্রাকৃত বিষয়ের আলাপ করেছি। তাতে আমার বাক্য মলিন হয়েছে। এখন ভগবানের গুণকীর্তন করে বাক্যকে পবিত্র করব। পুণ্যকীর্তি ভগবানের গুণ বর্ণনাই মানুষের বাক্যের পরম লাভ। আর সাধুগণ যখন শ্রীহরির লীলাবর্ণনা করতে থাকেন তখন যে কান সেই কথামৃত পানে নিযুক্ত হয় সেই কানই সার্থক। ভগবানের গুণকীর্তন করলে মানুষ নিশ্চয়ই মোক্ষলাভ করে। শুধু জ্ঞানেই মোক্ষলাভ হয় এমন ধারণা করা উচিত নয়। আদিকবি ব্রহ্মা সহস্র বছর ধ্যান করেও ভগবানের মহিমার অবধি পান নি। তাঁর মায়া অনন্ত। তিনি নিজেও তার পরিমাণ করতে পারেন না ; অন্যের আর কথা কি ? ঐ মায়া মায়াবীকেও মুগ্ধ করে। ভগবান দুর্জ্ঞেয়, তাই বাক্য এবং মনের অগোচর। অহঙ্কারের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা রুদ্র, ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা দেবগণ এবং অন্যান্য প্রাণিগণও তাঁর তত্ত্ব জানতে পারেন নি। তাঁকে জানবার চেষ্টা করাই নিষ্ফল। সেই ভগবানকে কেবল প্রণাম করি। ২৯-৩৯

সপ্তম অধ্যায়

বিদুরের প্রশ্ন

শুকদেব বললেন, মৈত্রেয় মুনির ঐসব কথা শুনে ব্যাসতনয় বিদুর আবার প্রশ্ন দ্বারা তাঁকে প্রীত করে বললেন, ব্রহ্মন্, ভগবান চৈতন্যস্বরূপ মাত্র এবং বিকারহীন। যিনি নির্বিকার এবং নির্গুণ তিনি লীলাদ্বারাও বা কি করে ক্রিয়া এবং গুণ সংযুক্ত হন ? যদি বলেন, এ তাঁর বালকের মত খেলা মাত্র, তাও সম্ভব

নয়। কারণ বালকের খেলবার ইচ্ছা থাকে এবং অন্য বালক বা কোন কিছু তাকে খেলায় প্রবৃত্ত করে। কিন্তু ঈশ্বর তো পূর্ণকাম, নিত্যতৃপ্ত। তাঁর খেলবার ইচ্ছা কি করে হবে? আবার তিনি অসঙ্গ, অদ্বিতীয়; তাই তাঁকে খেলাতে কে প্রবৃত্ত করবে? আপনি আগে বলেছেন, ভগবান গুণময়ী মায়া অর্থাৎ যার দ্বারা জীব মনে করে, 'আমি কর্তা', 'আমি ভোক্তা', তার দ্বারা এই বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন, একে পালন করছেন এবং প্রলয়কালে একে সংহার করবেন। কিন্তু ব্রহ্মস্বরূপ যে জীব তাঁর কি অবিদ্যাযুক্ত হওয়া সম্ভব? দীপের আলোক স্থানবিশেষে আবৃত হতে পারে, কিন্তু আত্মা সর্বগত, এমন স্থান নেই যেখানে তিনি নেই। বিদ্যুৎ যেমন নিমেষের জন্য দেখা দিয়ে মিলিয়ে যায়, আত্মার জ্ঞান সেরকম হতে পারে না, কারণ তিনি নিত্য বস্তু। নিদ্রিত অবস্থায় স্বপ্ন দেখার সময় যেমন জাগ্রত অবস্থার জ্ঞান থাকে না, আত্মার জ্ঞান সেরকম নষ্ট হতে পারে না; কারণ আত্মা সত্যস্বরূপ। ঘট যেমন পট থেকে আলাদা, আত্মার জ্ঞান সেরকম অন্য বস্তু থেকে আলাদা হতে পারে না, কারণ আত্মা অদ্বিতীয়। ভগবানই একমাত্র চিদ্‌বস্তু; সর্বদেহে তিনিই ভোক্তারূপে বিরাজ করছেন, সমস্ত জীব তাঁরই অংশ। ঐ জীবগণের সংহার কি করে সম্ভব? আর তাদের আনন্দ-নাশ বা কর্মের হেতু যে দুঃখভোগ তাই বা কোথা থেকে হয়? এসব নানা সংশয়ে আমার মন খেদযুক্ত হচ্ছে। আপনি দয়া করে আমার মনের মোহ দূর করুন। ১-৭

শুকদেব বললেন, বিদুরের সংশয়ের কথা শুনে মৈত্রেয় ভগবানে চিত্ত নিবিষ্ট করলেন। তারপর অন্তরে বিস্মিত না হলেও বাইরে বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন, ভগবানের এমনই মায়া যে জীব স্বভাবত মুক্ত হলেও তাঁর অবিদ্যা, বন্ধন (দেহাভিমান) এবং দীনদশা প্রাপ্তি ঘটে থাকে। এ তর্কের গোচর নয়। যেমন, যে লোক স্বপ্ন দেখছে সে মাথা কাটা না গেলেও মনে করে তার মাথা কাটা গিয়েছে, সেরকম জীব মুক্ত হওয়া সত্ত্বেও মায়াবশত নিজেকে বদ্ধ মনে করে। বন্ধন ইত্যাদি দেহধর্ম জীবেরই হয়, ঈশ্বরের হয় না। জলে যখন চাঁদের প্রতিবিম্ব পড়ে তখন জল কাঁপলে ঐ প্রতিবিম্বিত চাঁদই কাঁপে, আকাশের চাঁদ স্থির থাকে। সেইরকম আত্মার দেহধর্ম না থাকলেও, যেন দেহ আছে এই রকম অভিমানের জন্য জীব বন্ধন এবং সুখ-দুঃখ অনুভব করে। ঈশ্বরের দেহাভিমান নেই, তাই তাঁর ঐ মিথ্যা ধারণাও নেই। নিবৃত্তিধর্ম এবং ভগবান বাসুদেবের করুণা দ্বারা আর ভগবানের ভক্তির বলে ঐ দেহাভিমান ক্রমে দূর হয়। কখন সমস্ত অনর্থের অবসান হয় তাও বলছি শোন। শ্রীহরি হলেন দ্রষ্টা জীবাত্মারও অন্তর্যামী পুরুষ। ইন্দ্রিয়সকল যখন তাঁতে বিলীন হয়ে ঘুমন্ত ব্যক্তির ইন্দ্রিয়গণের মত সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় থাকে, তখনই সমস্ত কষ্টের শেষ হয়। মুরারির গুণকথা শুনলে এবং কীর্তন করলেও সীমাহীন ক্লেশের উপশম হয়। এমন কি মানুষ যদি ভগবানের শ্রীচরণে অনুরক্ত হয় তাহলেও তার সমস্ত কষ্ট দূর হয়। ৮-১৪

বিদুর বললেন, ভগবান, আমার সংশয় হচ্ছিল যে ঈশ্বর এবং জীব দুইই যখন চৈতন্যস্বরূপ তখন ঈশ্বরের জগৎকর্তৃত্ব এবং জীবের সংসারবন্ধন কি করে হয়। আপনার যুক্তিযুক্ত উপদেশ তরবারির মত সেই সংশয়কে ছিন্ন করল। ঈশ্বর কি ভাবে স্বতন্ত্র এবং জীব পরতন্ত্র এই দুটি বিষয়ই এখন আমি বুঝতে পেরেছি। আপনি যে বললেন, জীবের সংসারকষ্ট ভগবানের মায়াকে আশ্রয় করেই বিদ্যমান, আসলে তা স্বপ্নে-দেখা নিজের মাথা কাটা যাওয়ার মতই মিথ্যা এবং অমূলক, এটা খুবই সমীচীন। এই সংসারে যে ব্যক্তি দেহে অত্যন্ত আসক্ত এবং যিনি ঈশ্বরকে পেয়েছেন—এই উভয়েই সুখে আছেন, কারণ এঁদের কোন সংশয় নেই। কিন্তু যে

এই উভয়ের মাঝখানে আছে সে সংশয়ক্লিষ্ট হয়ে থাকে, কারণ সংসারের দুঃখকষ্ট দেখে সে সংসার ছাড়তে চাইলেও কিসে প্রকৃত আনন্দ তা না জানাতে ছাড়তে পারে না। যাহোক আপনার কথায় আমার সংশয় দূর হয়েছে, আমি কৃতার্থ হয়েছি। এই জগৎ যে মিথ্যা তা আমি বুঝেছি। তবুও যে আমরা তাকে দেখতে পাচ্ছি তা মায়া মাত্র। আপনাদের মত ভগবদ্‌ভক্তের চরণসেবা করলে মধুসূদনের চরণ-কমলে প্রগাঢ় ভালবাসা জন্মে, আর তাতেই সংসার-বাসনা নষ্ট হয়। আমি অতি দুর্লভ রত্ন লাভ করলাম—ভগবদ্‌ভক্তের আশ্রয় পেলাম। ভক্তেরা হচ্ছেন বিষ্ণু বা তাঁর লোক বৈকুণ্ঠ পাবার পথ। তাঁদের মুখে সর্বদা দেবদেব জনার্দনের গুণকীর্তন লেগে থাকে। সুতরাং তাঁদের সেবা করে হরিকথা শুনলে তাতে ভগবানের চরণে প্রেম উৎপন্ন হয়ে সংসার-বন্ধনের মূল উচ্ছেদ হয়। ১৫-২০

মুনি, আপনি বললেন, ভগবান প্রথমে ইন্দ্রিয় প্রভৃতি এবং তাদের সঙ্গে সঙ্গে মহৎ ইত্যাদি তত্ত্ব ক্রমে ক্রমে সৃষ্টি করে তাদের অংশ দিয়ে বিরাট শরীর সৃষ্টি করলেন এবং নিজে তার মধ্যে প্রবেশ করলেন। সেই বিরাটের সহস্র চরণ, সহস্র উরু এবং সহস্র বাহু। ইনিই আদিপুরুষ বলে অভিহিত। এঁরই বিরাট দেহে সমস্ত লোক অনায়াসে অবস্থিতি করছে। আপনি সেই বিরাট পুরুষের ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়দের বিষয় এবং দশবিধ প্রাণ যে মহঃ, ওজঃ এবং বল, এই তিন নামে এঁরই মধ্যে বাস করছে এবং ব্রাহ্মণ ইত্যাদি চার বর্ণ যে এঁরই থেকে উৎপন্ন হয়েছে সেকথা বললেন। এবার অনুগ্রহ করে এর বিভূতিসমূহ বর্ণনা করুন। ঐ বিভূতিতেই তো প্রজাসকল পুত্র, পৌত্র, দৌহিত্র এবং গোত্রজদের সঙ্গে বিচিত্র আকারে বাস করছে। ঐ বিভূতি দ্বারা সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত। প্রজাপতিগণের পতি ব্রহ্মা কোন কোন প্রজাপতি, কত রকম সর্গ এবং অনুসর্গ এবং কোন কোন মনু এবং মন্বন্তরের অধিপতিদের সৃষ্টি করলেন, সে সব এবং তাঁদের বংশ ও বংশধরদের চরিত্র, এসবও বর্ণনা করুন। ২১-২৫

এই পৃথিবীর উপরে এবং নীচে যে সব লোক আছে তাদের কিভাবে সন্নিবেশ করা হল, তাদের পরিমাণই বা কত? পৃথিবীর আকার এবং পরিমাণ কি রকম? সেই সঙ্গে দেবতা, মানুষ, সরীসৃপ, পাখী এবং উদ্ভিদ ইত্যাদির শ্রেণীবিভাগ, যিনি গুণাবতার হয়ে এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় এবং তাদের আশ্রয় প্রজাপতিগণকে সৃষ্টি করেছেন সেই ভগবানের কথা বলুন। চিহ্ন, আচার এবং স্বভাবহেতু বর্ণ এবং আশ্রমসমূহের বিভাগ, ঋষিদের জন্ম এবং কর্ম, বেদের বিভাগ, যজ্ঞের বিস্তার, যোগের পথ, জ্ঞান এবং তার উপায়, সাংখ্যের পথ, পঞ্চরাত্রতন্ত্র, পাষণ্ডদের প্রবৃত্তি, সূত প্রভৃতি অন্ত্যজ জাতির সংস্থাপন, গুণ ও কর্ম অনুসারে জীবের যে রকম এবং যত রকম গতি হয়, এইসব আমি শুনতে চাই। ২৬-৩১

পরস্পরের বিরোধ না ঘটিয়েও ধর্ম, অর্থ, কাম এবং ক্রোধ এই চারটি পুরুষার্থ কি ভাবে অনুষ্ঠান করা যায়, কৃষি-বাণিজ্য ইত্যাদি শাস্ত্র, দণ্ডনীতি এবং বেদশাস্ত্রের পৃথক পৃথক বিধি, শ্রাদ্ধের বিধি, পিতৃলোকের সৃষ্টি, গ্রহ-নক্ষত্র ও তারাসমূহের দিন, রাত্রি, মাস এবং বৎসরে সময় অনুযায়ী অবস্থিতি, দান তপস্যা যজ্ঞ পূর্ত প্রভৃতি কাজের ফল, যে বানপ্রস্থ অবলম্বন করেছে তার ধর্ম, আপৎকালের ধর্ম আর যে উপায় দ্বারা সর্বধর্মের আধার ভগবান জনার্দন প্রসন্ন হন, দয়া করে সে সব বর্ণনা করুন। আর আমি জিজ্ঞাসা না করে থাকলেও আরো যা যা আপনি বলা উচিত মনে করেন, দয়া করে তাও বলুন। ভগবান, আপনি যে সকল তত্ত্বের কথা বললেন তাদের লয় কত রকমের? প্রলয়ের সময় ভগবান যোগনিদ্রায় মগ্ন হলে কারা তাঁর সেবা করে আর কারাই বা লয় পায়? ৩২-৩৭

জীবের তত্ত্ব কি এবং ঈশ্বরের স্বরূপই বা কি? কি কি বিষয়ে ঐ দুয়ের ঐক্য আছে? গুরু এবং শিষ্যের নিজের নিজের প্রয়োজন কি? উপনিষদসমূহে কি জ্ঞান উপদেশ করা হয়েছে এবং তা লাভ করবার জন্য কিভাবে সাধন করতে হবে? গুরু ছাড়া জীবের জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ভক্তি লাভের কি অন্য উপায় নেই? আমি অজ্ঞ, আমার জ্ঞানচক্ষু অবিদ্যাহেতু নষ্ট হয়েছে। আপনি জীবগণের পরম বন্ধু। তাই শ্রীহরির লীলা জানবার জন্য যে সব প্রশ্ন করলাম কৃপা করে তার উত্তর দেবেন। গুরু তত্ত্ব-উপদেশ দিয়ে জীবকে যেমন অভয়দান করেন সমস্ত বেদ, যজ্ঞ, তপস্যা এবং দান তার একাংশও করতে পারে না। মহারাজ, কুরুশ্রেষ্ঠ বিদুর এই সব জিজ্ঞাসা করলে মহামুনি মৈত্রেয় ভগবানের কথা বলতে গিয়ে বিশেষ আনন্দিত হলেন এবং মৃদু হাসতে হাসতে বলতে আরম্ভ করলেন। ৩৮-৪২

অষ্টম অধ্যায়

ব্রহ্মার বিষ্ণুদর্শন

মৈত্রেয়মুনি বিদুরকে বললেন, কুরুবংশ অতি পবিত্র, সাধুদের বন্দনীয় হয়েছে, কারণ ভগবদ্ভক্ত লোকপাল তুমি ঐ বংশে জন্মগ্রহণ করেছ। তুমি প্রতিক্ষণ ভগবানের কীর্তিসমূহকে নূতন করে তুলছ। যে সব মানুষ সামান্য সুখের আশায় মহাদুঃখ ভোগ করে থাকে তাদের দুঃখ দূর করবার জন্য আমি ভাগবত পুরাণ বলতে আরম্ভ করছি। ভগবান নিজে এই পুরাণ সনৎকুমার ইত্যাদি ঋষিদের কাছে বলেছিলেন। একসময় ঐ ঋষিরা ভজন জানবার জন্য পাতালে আসীন আদিপুরুষ সংকর্ষণকে প্রশ্ন করেছিলেন। তখন সঙ্কর্ষণ পরমানন্দরূপ, নিজ আশ্রয়দেবতা বাসুদেবকে ধ্যানে অনুভব করে আরাধনা করছিলেন, তার-আঁখিপদ্ম অন্তর্মুখ ছিল। ঋষিরা আসতে তিনি চোখ একটু খুললেন। ঋষিরা সত্যলোক থেকে গঙ্গার মধ্য দিয়ে পাতালে নেমেছিলেন। তাই তাঁদের মাথার জটা গঙ্গাজলে সিক্ত হয়েছিল। সেই সিক্ত জটা দ্বারা তাঁরা ভগবানের শ্রীচরণ যে পদ্মের উপর স্থাপিত ছিল তাতে প্রণাম করলেন। পাতালের নাগরাজের কন্যারা তাঁকে পতিরূপে কামনা করে প্রেমভাবে নানা উপহার দিয়ে ঐ চরণকমলের পূজা করতেন। ১-৫

ঐ ঋষিরা ভগবানের মাহাত্ম্য জানতেন। তাঁরা তাঁকে প্রণাম করে অনুরাগের সঙ্গে তাঁর লীলা কীর্তন করতে লাগলেন। তাঁরা দেখলেন, ভগবানের সহস্র মুকুটে যে সব মহামূল্য রত্ন ছিল তার আলোকে সুবিশাল সহস্র ফণা উদ্ভাসিত হচ্ছে। তাঁরা সবিস্ময়ে তাঁকে প্রণাম করে সে বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলেন। বিদুর, সংকর্ষণদেব নিবৃত্তিধর্মে রত সনৎকুমারের কাছে এই ভাগবত বর্ণনা করেন। তিনি আবার ঋষি সাংখ্যায়নকে শোনান। সাংখ্যায়ন ভগবানের ঐশ্বর্য বর্ণনা করতে উৎসুক হয়ে তাঁর বিশেষ অনুগত পরাশর মুনিকে ভাগবত শোনান। দেবগুরু বৃহস্পতিও এই পরম পবিত্র পুরাণ পরমহংসশ্রেষ্ঠ সাংখ্যায়নের কাছেই শুনেছিলেন। তারপর পুলস্ত্যের আদেশে পরমদয়ালু পরাশর ঐ ভাগবত আমাকে উপদেশ করেন। তুমি অতি শ্রদ্ধাবান এবং সর্বদা আমার অনুগত; তাই আমি তোমাকে এ পুরাণ বলছি। ৬-৯

এই বিশ্ব যখন প্রলয়-জলধিতে মগ্ন ছিল তখন ভগবান নারায়ণ একা অনন্ত-শয্যায় শুয়েছিলেন। বাইরে নিদ্রিতের মত থাকলেও নিজ জ্ঞানশক্তিকে তিনি বিন্দুমাত্রও তিরোহিত করেন নি। তিনি মায়াবিনোদ ত্যাগ করে স্বরূপানন্দে মগ্ন এবং ক্রিয়াহীন অবস্থায় ছিলেন। কাঠে যেমন আগুন রুদ্ধশক্তি হয়ে থাকে সে রকম তিনিও প্রলয়সমুদ্রে বিরাজ করছিলেন। তাঁর বহির্বৃত্তি সব নিরুদ্ধ ছিল এবং দেব-মানব ইত্যাদির কারণ সূক্ষ্ম ভূতগণ তাঁর শরীরের মধ্যে বিলীন ছিল। সৃষ্টি করবার ইচ্ছায় আপন ইচ্ছাশক্তিকে তিনি জাগরিত করছিলেন। এইভাবে জলের মধ্যে যোগনিদ্রায় তাঁর সহস্র চতুর্যুগ কাটবার পর পূর্বে জাগরিত নিজ ইচ্ছাশক্তির দ্বারা সৃষ্টিকার্যে রত হয়ে আপন দেহে সূক্ষ্ম অবস্থায় লীন লোকসমূহকে দেখলেন। তিনি দৃষ্টিপাত করাতে কালশক্তির (ইচ্ছাশক্তির) প্রভাবে রজোগুণ দ্বারা আন্দোলিত হয়ে সেই সূক্ষ্মভূত তাঁর নাভিদেশ ভেদ করে উদ্গত হল। কাল প্রভাবে ঐ নাভি থেকে জাত বস্তু পদ্মকোষের আকারে পরিণত হল। তাঁর সূর্যের মত উজ্জ্বল ছটায় বিশাল জলরাশি আলোকিত হয়ে উঠল। এই পদ্মই জীবসকলের ভোগ্য সমস্ত গুণকে প্রকাশ করে। বিষ্ণু অন্তর্যামীরূপে এই পদ্মে প্রবেশ করলেন। তারপর বেদময় ব্রহ্মা আবির্ভূত হয়ে ঐ পদ্মের বীজকোষের আসীন হলেন। তিনি সেখানে কাউকে দেখতে না পেয়ে চারদিকে তাকালেন। তখন তাঁর চারটি মুখ হল। সে সময় প্রলয়কালের বাতাসে জলরাশি বিক্ষুব্ধ হয়ে ভীষণ ঢেউ উঠেছিল। তা দেখে ব্রহ্মা আগের কল্পের সৃষ্টির বিষয় ভুলে গেলেন। তিনি মনে মনে বিচার করতে লাগলেন, এই যে আমি পদ্মের উপর বসে আছি সেই আমি কে, আর এই জলের মধ্যে একটি মাত্র পদ্ম, তাই বা কোথা থেকে এল? যার থেকে এর উৎপত্তি তা নিশ্চয়ই জলের তলাতেই আছে। ১০-১৮

এই চিন্তা করে ব্রহ্মা সেই পদ্মনালের ছিদ্র দিয়ে জলের মধ্যে ঢুকলেন, কিন্তু অনেক খুঁজেও তার উৎপত্তি কোথায় বুঝতে পারলেন না। সেই সীমাহীন অন্ধকারে খুঁজতে খুঁজিতে তাঁর একশ বছর কাল কেটে গেল। তারপর ব্রহ্মা বিফল হয়ে খোঁজা বন্ধ করলেন এবং আপন আধার পদ্মে ফিরে এলেন। তারপর ক্রমশ নিশ্বাস জয় করে চিত্ত সংযত করে সমাধিযোগে বসলেন। আরও একশ বছর কাটলে তাঁর যোগ সুসম্পন্ন হল। আগে অনেক খুঁজেও যাঁর দর্শন হয় নি এমন তাঁকে নিজের অন্তরে বিরাজিত দেখলেন। তিনি দেখলেন, এক পুরুষ মৃণালের মত গৌরবর্ণ বিশাল শেষনাগের দেহপর্যঙ্কে শুয়ে আছেন, আর ঐ নাগের ফণাশিরের রত্নসকলের জ্যোতিতে জলরাশি আলোকিত হয়ে আছে। ১৯-২৩

ঐ পুরুষের রূপলাবণ্য মরকত মণির পর্বতের শোভাকেও হার মানিয়েছে। সন্ধ্যাবেলার মেঘ মরকত পর্বতের বসনের মত হয়ে তার সৌন্দর্য বাড়ায় ঠিকই, কিন্তু তাঁর পীত বসনের শোভা তাকেও ম্লান করেছিল। ঐ পর্বতের স্বর্ণচূড়ার শোভার থেকে ঐ পুরুষের মুকুটস্থ রত্নের শোভা অনেক বেশী। মরকত পর্বতের রত্ন, জলধারা, ওষধি এবং ফুল এই চারটিকে তার বনমালা, বেণুগণকে হাত আর বৃক্ষগণকে তার চরণ বলে মনে করলে তার যে শোভা হয় শ্রীহরির রত্ন, মুক্তা, তুলসী ও পুষ্পমালা এবং বাহু ও চরণের শোভার কাছে সে শোভা মলিন হয়ে যায়। তাঁর দেহের দৈর্ঘ্য এবং বিস্তার পরিমাণ করা যায় না, ত্রিলোক তাতে নিহিত। তিনি নিজেই অপরূপ শোভাময় হলেও বহুরকম দিব্য বসন-ভূষণে অলঙ্কৃত হওয়াতে তাঁকে আরও সুন্দর দেখাচ্ছিল। মনের ইচ্ছাপূরণের আকাঙ্ক্ষায় যাঁরা শুদ্ধ বেদের নির্দিষ্ট পথে তাঁর আরাধনা করেন, তিনি কৃপা করে তাঁদের নিজ চরণকমল প্রাপ্ত করান। চন্দ্রের

মত নখের কিরণে উজ্জ্বল হয়ে অঙ্গুলিসকল শ্রীচরণকমলের দলের মত শোভা পাচ্ছিল। মুখের হাসিতে পৃথিবীর দুঃখ দূর করে তিনি ভক্তগণের সম্বর্ধনা করছিলেন। কুণ্ডলের জ্যোতিতে তাঁর মুখমণ্ডল দীপ্যমান হয়েছিল এবং বিম্বাষ্ঠের প্রভায় তা শোণবর্ণ (রক্তাভ) দেখাচ্ছিল। সুন্দর নাসিকা এবং ভ্রূশোভা চারদিকে প্রকাশিত হচ্ছিল। কদম্ব-কেশরের মত পীতবস্ত্র এবং মেখলায় তাঁর নিতম্ব শোভিত, বক্ষ শ্রীবৎসচিহ্ন আর বহুমূল্যে হারে ভূষিত ছিল। ২৪-২৮

সেই পুরুষোত্তমকে চন্দনবৃক্ষের মত মনে হচ্ছিল। মহামূল্যে অলংকারে এবং শ্রেষ্ঠ মণি-মাণিক্যে তাঁর সহস্র হাত শাখার মত ছড়িয়ে ছিল। আবার চন্দনগাছের মূল কোথায় তা যেমন সহসা বোঝা যায় না, তেমনি সেই পুরুষের মূল অর্থাৎ নিম্নভাগ অব্যক্ত (প্রকৃতিস্বরূপ)। চন্দনগাছের স্কন্ধ যেমন সাপদ্বারা বেষ্টিত থাকে, তেমনি তাঁর স্কন্ধও অনন্তের ফণায় বেষ্টিত। আবার কখনও তাঁকে মহাপর্বতের মত মনে হচ্ছিল। পর্বত যেমন সকল চরাচরের আশ্রয় তেমনি তাঁর দেহও সমস্ত জগৎকে ধরে রেখেছে। পর্বত যেমন বহু সর্পের আবাস বলে অহিবন্ধু, তিনিও তেমনি অহীন্দ্র অনন্তনাগের বন্ধু। মৈনাক প্রভৃতি পর্বত যেমন সমুদ্রজলে ডুবে আছে তেমনি তিনিও প্রলয়-জলধিতে মগ্ন রয়েছেন। সুমেরু ইত্যাদি পর্বতের চূড়ার রঙ যেমন সোনার মত, তেমনি তাঁর হাজার মুকুট সোনার চূড়ার মত জ্বলছিল। কোন কোন পর্বতের স্থানে স্থানে যেমন রত্ন দেখা যায় তেমনি তাঁর মূর্তিতে দেখা যাচ্ছিল কৌস্তুভমণি। তাঁকে পর্বতের মত দেখে ব্রহ্মা বুঝলেন ইনিই শ্রীহরি। কীর্তি যেন বনমালা হয়ে তাঁর গলায় দুলছিল। চার বেদ মৌমাছির মত তাতে লগ্ন হয়ে চমৎকার শোভা হয়েছিল। সূর্য, ইন্দ্র, বায়ু এবং অগ্নি তাঁকে পায় না।[১] যে সব অস্ত্রের আভায় ত্রিভুবন আলো হয়ে ওঠে সেই সুদর্শন প্রভৃতি তাঁর রক্ষার জন্য চারদিকে ধাবিত হচ্ছে। এর জন্যই প্রাণিগণের পক্ষে তাঁকে পাওয়া কঠিন। ব্রহ্মা ভগবানকে ঐ রূপে দেখলেন। তারপর লোক সৃষ্টি করবার জন্য তাকিয়ে তিনি শ্রীহরির নাভিপদ্ম, নিজরূপ, জল, প্রলয়বাতাস আর আকাশ— এই পাঁচটি জিনিস দেখতে পেলেন এবং ঐ পাঁচটিকেই লোকসৃষ্টির কারণরূপেও দেখলেন। তারপর সৃষ্টির জন্য ঈশ্বরে মন নিবিষ্ট করে ব্রহ্মা তাঁর স্তব করতে লাগলেন। ২৯-৩৩

নবম অধ্যায়

ব্রহ্মা কর্তৃক ভগবানের স্তব

ব্রহ্মা বললেন, ভগবান, বহু আবাধনার ফলে আজ তোমাকে দর্শন করে কৃতার্থ হলাম। দেহীর মস্ত দোষ এই যে তারা তোমার তত্ত্ব জানে না। প্রভু, তুমি ছাড়া অন্য বস্তু কিছু নেই। যা আছে বলে মনে হয় তা মিথ্যা। মায়ার দ্বারা তুমিই অনেক রূপে প্রকাশ পাচ্ছ, চৈতন্যের উদয় হওয়ায় মায়া সম্পূর্ণ নিবৃত্ত হয়েছে। তুমি ভক্তদের অনুগ্রহ করে যে রূপ প্রকাশ করলে তা শত শত অবতারের মূল। এরই নাভিপদ্মরূপ গৃহ থেকে আমি আবির্ভূত হয়েছি। হে পরমেশ্বর, তোমার যে রূপের প্রকাশ কখনই ঢাকা পড়েনা, যার ভেদ বা ভ্রম নেই এবং যা আনন্দস্বরূপ,

১ তুলনীয়: কঠোপনিষদ, ২।২।১৫ শ্লোক।

তার থেকে তোমার এই রূপ ভিন্ন মনে হয় না। বরঞ্চ মনে হচ্ছে এই রূপ সেই রূপই। তোমার এই মূর্তি উপাস্য মূর্তির মধ্যে প্রধান। এ থেকে বিশ্ব সৃষ্টি হয়ে থাকে, তাই এ বিশ্ব থেকে আলাদা এবং ভূত ও ইন্দ্রিয়সকলের কারণ। আমি এর শরণ নিলাম। হে ত্রিলোকের মঙ্গলস্বরূপ, আমরা তোমার উপাসক, আমাদের মঙ্গলের জন্য ধ্যানের সময় তুমি এই মূর্তি দেখালে। আমরা বারবার তোমাকে নমস্কার করি। যারা তোমার এই মূর্তির আদর করে না তারা নরকে যাবার যোগ্য, নিরীশ্বর এবং কুতর্কপ্রিয়। বেদরূপ বায়ু তোমার পাদপদ্মের গন্ধ বহন করছে। যাঁরা কান দিয়ে সেই গন্ধ গ্রহণ করেন তাঁরা ধন্য, তাঁরা প্রকৃত ভক্তি দ্বারা তোমার চরণ গ্রহণ করেন। এ রকম ভক্তের হৃদয়পদ্ম থেকে তুমি কখনও সরে যেও না। লোকসকল যতকাল তোমার অভয় পদে শরণ না নেয় ততকাল তাদের ধন, দেহ, সন্তান ইত্যাদি নষ্ট হবার ভয়ে শোক, স্পৃহা, পরিভব এবং লোভ হয়ে থাকে। ১-৬

হে প্রভু, তোমার পাদপদ্মে শরণ নিলে ঐ ভয়, শোক ইত্যাদি কিছুই থাকে না। ঐ পাদপদ্মই সব সুখের মূল। তোমার নাম শুনলে এবং কীর্তন করলে সব তাপ দূর হয়। তোমার নামে যার রুচি নেই সে যেমন ভাগ্যহীন তেমনি বুদ্ধিহীন। জীবগণ ক্ষুধা-তৃষ্ণা, বাত, পিত্ত, কফ এই তিন ধাতু, শীত, গ্রীষ্ম, বায়ু, বর্ষা, ও স্ত্রীপুত্র ইত্যাদি স্বজন, দুর্বিষহ কামের জ্বালা এবং ক্রোধ দ্বারা সর্বদা পীড়িত হচ্ছে দেখে আমি মনে শান্তি পাচ্ছি না। ৭-৮

হে ভগবান, তোমার মায়ার প্রভাবেই দেহ ইত্যাদি জড় বস্তুকে আত্মা বলে ভুল হয়। তাই যতদিন প্রকৃত জ্ঞান না হবে ততদিন এই সংসার মিথ্যা হলেও তা থেকে জীব নিবৃত্ত হবে না; কর্মফল অনুসারে অশেষ ক্লেশ ভোগ করবে। ৯

শুধু বিবেকহীন ব্যক্তিই যে ঐ দুর্গতি ভোগ করে তাই নয়, তোমাকে ভক্তি না করলে জ্ঞানী ঋষিদেরও সংসার-তাপ ভোগ করতে হয়। সারাদিন তাঁদের ইন্দ্রিয়সকল নানা বিষয়ে ব্যাপৃত থাকায় ক্লান্ত হয়ে পড়ে; রাত্রিতেও কিছুমাত্র সুখ থাকে না। কারণ ঘুমিয়ে পড়লেও নানা রকম স্বপ্ন দেখে মাঝে মাঝেই ঘুম ভেঙে যায়। তারপরও ভাগ্যদোষে মনের ইচ্ছা পূরণ না হওয়াতে তাঁদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ে। যারা তোমার নাম শুনে, তোমার পথ ধরে তোমার আরাধনায় নিযুক্ত হয়, তুমি তাদের ভক্তিশুদ্ধ হৃৎপদ্মে অধিষ্ঠিত হও। এমন কি, শ্রবণ না করেও তোমার ভক্ত নিজের ইচ্ছামত তোমার মূর্তি কল্পনা করে ধ্যান করলে তুমি দয়া করে সেই রূপই ধারণ কর। ১০-১১

হে প্রভু, যে ভক্ত কামনাশূন্য সেই তোমাকে সহজে পাবে, যে ফলের কামনা করে সে কোনরকমেই তোমার কৃপা লাভ করতে পারে না। এমন কি, দেবতারাও যদি কোন কিছুর কামনায় নানা উপচারে তোমায় পূজা করেন তাঁদের প্রতিও তুমি প্রসন্ন হওনা। কিন্তু সর্বজীবে দয়া করলে তুমিও প্রীত হও। যার ভক্তি নেই সে সর্বভূতে দয়া প্রদর্শন করতে অক্ষম। হে ভগবান, তোমাকে প্রসন্ন করবার জন্য লোকে যজ্ঞ ইত্যাদি কর্ম, দান, কঠোর তপস্যা, সেবা প্রভৃতির অনুষ্ঠান করবে। কারণ তোমার প্রীতিসাধন করাই কর্মের শ্রেষ্ঠ ফল। কিছু পাওয়ার জন্য যে ধর্মানুষ্ঠান, কাম্যবস্তু পেলেই তার ফল নষ্ট হয়; কিন্তু যে ধর্ম তোমার চরণে অর্পণ করা হয়, তার নাশ নেই। তোমার আত্মস্বরূপ চৈতন্য সর্বদা মোহবুদ্ধি দূর করছে। তুমি পরমেশ্বর এবং গুণের আশ্রয়। যে মায়া বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় ঘটাচ্ছে তার ক্রিয়া তোমার খেলামাত্র। আমি তোমাকেই প্রণাম করি।

মৃত্যুকালে অবশ হয়েও যারা তোমার পবিত্র নাম স্মরণ কিংবা উচ্চারণ করে তারা বহু জন্মের পাপ থেকে তৎক্ষণাৎ মুক্ত হয়ে নিরাবরণ সত্যস্বরূপ ব্রহ্মকে পায়। তুমিই সেই ব্রহ্ম, আমি তোমার শরণ নিলাম। তুমি পৃথিবীরূপ বৃক্ষ এবং নিজেই তার মূল অর্থাৎ প্রকৃতির অধিষ্ঠান। মূলস্বরূপ এই প্রকৃতিকেই সত্ত্ব, রজ, তম তিন গুণে বিভক্ত করে সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়ের জন্য আমাকে, শিবকে এবং বিষ্ণুকে তিন পাদরূপে ধারণ করে তুমি জগৎ-আকারে বর্ধিত হয়েছ। হে ভগবান, তোমাকে প্রণাম। যতদিন লোকে তোমার অর্চনায় মন না দিয়ে নানা নিষিদ্ধ কর্মে আসক্ত থাকে ততদিন বলবান কাল তাঁদের জীবনের আশাকে তৎক্ষণাৎ ছিন্ন করে। তুমিই সেই কালস্বরূপ, তোমাকে নমস্কার করি। অন্যের কথা কি বলব, আমি নিজেই সকল লোকের প্রণম্য, এবং যা দুই পরার্ধকাল স্থায়ী সেই সত্যলোকে বাস করেও কালের ভয়ে ভীত। তাই তোমাকে পাবার জন্য বহু তপস্যা আর যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে থাকি। তুমি যজ্ঞেশ্বর, তোমাকে নমস্কার করি। ১২-১৮

তুমি বিষয়সুখে নির্লিপ্ত হলেও আনন্দ অনুভবের জন্য আপন ইচ্ছামত তির্যক, মানব ও দেব ইত্যাদি যোনিতে দেহধারণ কর এবং নিজের কৃত ধর্মের মর্যাদা পালনের জন্য লীলা করে থাক। হে পুরুষোত্তম, তোমায় নমস্কার। অবিদ্যা[১], অস্মিতা বা দেহাত্মজ্ঞান, রাগ বা বিষয়ে আসক্তি, দ্বেষ এবং অভিনিবেশ বা মৃত্যুভয়, এই পাঁচটি অবিদ্যার কারণ। অবিদ্যাই জীবের নিদ্রামোহের হেতু। সেই অবিদ্যা তোমাকে অভিভূত করতে পারে না। তবুও তুমি প্রলয়ের সময় ভীষণ ঢেউয়ের দ্বারা উত্তাল সমুদ্রে অনন্তশয্যায় শুয়ে সুখে ঘুমিয়েছিলে। তখন লোকসকল তোমার উদরে লীন ছিল। তুমি যেন দেখাচ্ছিলে বিবেচনাশূন্য পুরুষ ঘুমালে কিরকম নিদ্রা-সুখ উপভোগ করে। আমি সৃষ্টিকার্য দ্বারা ত্রিলোকের উপকার করবার জন্যই তোমার কৃপায় তোমার নাভিপদ্মের আধার থেকে উৎপন্ন হয়েছি। প্রলয়ের সময় সমস্ত সংসার তোমার উদরে ছিল, তখন তুমি ঘুমিয়েছিলে। এখন যোগনিদ্রার শেষ হলে তোমার চক্ষু বিকশিত হল। তোমাকে নমস্কার করি। এইভাবে স্তব শেষ করে ব্রহ্মা নিজে নিজেই প্রার্থনা করতে লাগলেন, এই ভগবান নিজের যে জ্ঞান এবং ঐশ্বর্য দ্বারা জগতের সুখবিধান করছেন সেই জ্ঞান এবং ঐশ্বর্য আমাকে দান করুন যাতে আমি আগের মতই সৃষ্টি করতে পারি। তিনি সমস্ত জগতের বন্ধু, তিনি অন্তর্যামী এবং সর্বময়। প্রণত জনকে তিনি স্নেহ করেন, শরণাগতকে বর দেন। আমি তাঁরই আজ্ঞায় তাঁর তেজে পরিপূর্ণ এই জগৎ সৃষ্টি করছি ঠিকই, তবুও তিনি নিজ শক্তি মায়ার সঙ্গে যে যে কাজ করবেন আমার চিত্তকে সেই কাজে নিযুক্ত করুন। তাতে আমার যেন আসক্তি না জন্মে! কার্যে আর সৃষ্টি কোনটা ভাল কোনটা বা মন্দ এই বৈষম্যের পাপ যেন আমাকে স্পর্শ না করে। তিনি যখন জলে শয়ান ছিলেন তখন তাঁর নাভিসরোবর থেকে বিজ্ঞানশক্তি[২] লাভ করে আমি উৎপন্ন হয়েছি। বিচিত্র বিশ্ব তাঁরই রূপ। এই বিশ্বই আমি বিস্তার করছি। তাঁর অনুগ্রহে আমার বেদ উচ্চারণরূপ ব্রহ্মতেজ যেন লোপ না পায়। পুরাণপুরুষ ভগবান অতি দয়ালু। তিনি গভীর প্রেমের সঙ্গে মৃদু হেসে তাঁর নয়নকমল বিকশিত করুন এবং শয্যাত্যাগ করে মিষ্ট কথায় আমার বিষাদ দূর করুন। ১৯-২৫

মৈত্রেয় বললেন, এইরকম তপস্যা, উপাসনা এবং সমাধি দ্বারা নিজের উৎপত্তিস্থল ভগবানকে দর্শন করে এবং যথাসাধ্য মন এবং বাক্যের দ্বারা তাঁর স্তব করে শ্রান্ত হয়ে

১ অবিদ্যা পঞ্চবৃত্তিবিশিষ্ট—তম, মোহ, মহামোহ, তামিস্র ও অন্ধতামিস্র।

২ মহত্তত্ত্বাভিমান।

ব্রহ্মা থামলেন। ভগবান দেখলেন যে প্রলয়ের জলরাশি দেখে ব্রহ্মার মন বিষণ্ণ হয়েছে এবং কি করে বিশ্ব নির্মাণ করবেন তা না জানাতে তিনি ক্ষুণ্ণ হয়েছেন। তখন ব্রহ্মার মনের ইচ্ছা জানতে পেরে তিনি বললেন, হে বেদগর্ভ, দুঃখিত হয়ো না। সৃষ্টির জন্য কোন চিন্তা নেই। তুমি আমার কাছে যা চাইছ আমি আগেই তা করে রেখেছি। তুমি আবার আমার তপস্যা এবং উপাসনা অভ্যাস কর। তা দিয়ে তুমি নিজের অন্তরে লোকসকলকে স্পষ্টভাবে দেখতে পাবে। তারপর ভক্তিযুক্ত হয়ে চিত্ত নিবেশ করলে দেখবে তোমার মধ্যে এবং সমস্ত লোকে আমিই পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছি। আবার ঐসব লোক এবং জীবগণ আমার মধ্যে রয়েছে। জীব যখন দেখে যে কাঠে আগুনের মত, আমিও সমস্ত জীবের মধ্যে আছি, তখন তার মোহ আর অজ্ঞান দূর হয়। ২৬-৩২

যখন জীব দেখবে যে তার আত্মা পৃথিবী প্রভৃতি ভুত, চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়, সত্ত্ব ইত্যাদি গুণ ও অন্তঃকরণ থেকে পৃথক এবং আত্মস্বরূপ আমার সঙ্গে এক, সেই মুহূর্তেই তার মোক্ষ লাভ হবে। ব্রহ্মা, তুমি নানা কর্ম বিস্তার করে বহু প্রজা সৃষ্টি করতে ইচ্ছা করেছ। আমার দয়ায় এ কাজে তোমার চিত্ত পরিশ্রান্ত হবে না। তুমি আদি ঋষি। তুমি প্রজা সৃষ্টি করলেও তোমার মন আমাতেই নিবিষ্ট আছে। তাই পাপ রজোগুণ তোমাকে বাঁধতে পারবে না। দেহিগণ আমাকে জানতে পারে না। কিন্তু তুমি আমার স্বরূপ জানলে, কারণ তুমি দেখলে যে আমি ভূত, ইন্দ্রিয়, গুণ এবং অহংকার এ-সবের সঙ্গে সংযুক্ত নই। মৃণালের মূল আছে কিনা সন্ধান করবার জন্য তার ছিদ্রপথ দিয়ে জলের মধ্যে ঢুকে যখন তোমার সন্দেহ হল তখন আমি তোমার হৃদয়ে আমার নিজরূপ দেখলাম। তুমি আমারই কৃপায় আমার মঙ্গল কথাযুক্ত সব স্তব করেছ। তুমি যে আমার প্রতি তপস্যায় নিষ্ঠা দেখালে তাও আমারই অনুগ্রহ বলে জানবে। আমার যে রূপ তুমি দেখলে তা গুণময় মনে হলেও তুমি আমাকে নিগুর্ণ বলে স্তব করলে। এতে আমি প্রীতিলাভ করেছি।' তোমার মঙ্গল হোক। ৩৩-৩৯

তোমার করা এই স্তোত্র দিয়ে নিত্য যে স্তুতি করে আমার উপাসনা করবে আমি তার প্রতি অচিরে প্রসন্ন হয়ে তার সমস্ত বাসনা পূরণ করব এবং তাকে সকল বর দেব। আমার প্রীতি উৎপাদনের থেকে ভাল ফল আর কিছুই নেই। ইষ্ট, পূর্ত, তপস্যা, দান, যোগ ও সমাধি এসব দ্বারা জীবের যে ফল লাভ হয় আমার প্রীতিসাধন তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ ফল। এ না হলে সবই বৃথা যায়। হে বিধাতা, আমিই জীবগণের আত্মা, কাজেই যা কিছু প্রিয় তার মধ্যে প্রিয়তম এবং দোষহীন। আত্মার জন্যই জীবের দেহ প্রিয় হয় তাই আত্মরূপ আমাতেই তার অনুরাগ হওয়া উচিত। হে ব্রহ্মা, তুমি আমার থেকেই উৎপন্ন হয়েছ তাই তুমি সর্ববেদময়, কৃতার্থ। অন্য কিছু তোমার চাইবার নেই। তুমি অন্য-নিরপেক্ষ হয়ে এই ত্রিলোক এবং প্রজাগণকে আগের মত সৃষ্টি কর। যাদের সৃষ্টি করতে হবে তারা আমার মধ্যেই শয়ন করে আছে; তুমি শুধু প্রকাশ করবে। মৈত্রেয় বললেন, প্রকৃতি এবং পুরুষের অধিপতি ভগবান পদ্মনাভ এইভাবে ব্রহ্মার কাছে কি কি সৃষ্টি করতে হবে তা প্রকাশ করে নারায়ণরূপেই অন্তর্ধান করলেন। ৪০-৪৪

দশম অধ্যায়

দশবিধ সৃষ্টি

বিদুর বললেন, মুনিবর, ভগবান অন্তর্ধান করলে লোকপিতামহ ব্রহ্মা দেহ এবং মন থেকে কতরকম প্রজা সৃষ্টি করলেন ? আপনাকে আমি আগে যে সব প্রশ্ন করেছি সে সবও এক এক করে উত্তর দিয়ে আমার সন্দেহ দূর করুন। তখন সূত বললেন, ভৃগুনন্দন, বিদুরের এই প্রার্থনা শুনে মৈত্রেয় খুব সন্তুষ্ট হলেন। বিদুরের আগেকার সব প্রশ্নই মৈত্রেয়ের মনে ছিল। তিনি একে একে সে সব প্রশ্নের উত্তর দিতে শুরু করলেন। তিনি বললেন, বিদুর, ভগবান যে যে উপদেশ দিয়ে গেলেন ব্রহ্মা সেই অনুসারে ভগবানে মন নিবিষ্ট করে দিব্য পরিমাণের একশ বছর তপস্যা করলেন। তারপর তিনি দেখলেন যে যে-পদ্মে তিনি বসেছিলেন সেই পদ্ম এবং জলরাশি প্রবল প্রলয-বাতাসে কাঁপতে শুরু করেছে। তা দেখে ব্রহ্মা দীর্ঘ-কালের তপস্যা আর নারায়ণের উপাসনায় বর্ধিত বিজ্ঞান এবং সামর্থ্যের দ্বারা ঐ স্ফুরিত জল এবং বাতাসকে পান করে ফেললেন। ১-৬

তারপর যে পদ্মের উপর ব্রহ্মা বসেছিলেন তাকে সমস্ত আকাশজোড়া দেখে তিনি ভাবলেন যে আগেকার তিন লোককে এই পদ্ম দিয়েই আবার সৃষ্টি করব। তখন তিনি ঐ পদ্মকোষে প্রবেশ করে এক পদ্মকে তিন লোকে ভাগ করলেন। ঐ পদ্ম এত বিরাট যে তাকে এমন কি চোদ্দ ভুবন এবং চন্দ্র, সূর্য ইত্যাদি রূপে বহু ভাগে ভাগ করা হেতে পারে। ত্রিলোক জীবগণের ভোগের স্থান। এ কাম্য কর্মের ফল বলে প্রত্যেক কল্পেই এর সৃষ্টি হয়। কিন্তু মহঃ, জন, তপঃ এবং সত্য এই চারটি লোক এবং সেখানে যাঁরা বাস করেন তাঁরা নিষ্কাম ধর্মের ফল। তাই, ব্রহ্মার আয়ু অর্থাৎ দুই পরার্ধকাল পর্যন্ত এদের বিনাশ হয় না। তারপরেও যাঁরা সেখানে থাকেন তাঁদের প্রায় সকলেরই মুক্তি হয়ে থাকে। ভিন্ন ভিন্ন কালে ভিন্ন সৃষ্টির কথা শুনে বিদুর বললেন, মুনি, বহুরূপী হরির 'কাল' নামে যে এক রূপ আছে বললেন তা কিভাবে কল্পনা করা হয়, আর তার স্থূল ও সূক্ষ্ম রূপই বা কি ? এ সব সঠিক আমাকে বলুন। ৭-১০

মৈত্রেয় বললেন, বিদুর, গুণসমূহের মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি যে রূপ পরিণামে প্রকাশ পায় তাই কাল। কালের আদি বা অন্ত নেই। ঈশ্বর এই কালকেই নিমিত্ত করে লীলাদ্বারা আপনাকে বিশ্বরূপে সৃষ্টি করেন। এই বিশ্ব বিষ্ণুর মায়াতে সংহৃত হয়ে ব্রহ্মরূপে হয়েছিল। পরে ঈশ্বর কালকে নিমিত্ত করে সেই আবার পৃথকরূপে বিশ্বকে প্রকাশ করেছেন। এই বিশ্ব এখন যা, পূর্বেও তাই ছিল, পরেও তাই হবে। এর সৃষ্টি নয় রকম। তা ছাড়াও একটি দশম সৃষ্টি আছে এবং তা আবার দু'রকম—প্রাকৃত[1] আর বৈকৃত। প্রলয়ও তিন রকম—নিত্য, নৈমিত্তিক আর প্রাকৃতিক। কালে যে প্রলয় ঘটে তা নিত্য প্রলয়। দ্রব্য দ্বারা যে প্রলয় ঘটে তা নৈমিত্তিক এবং সত্ত্ব প্রভৃতি গুণ দ্বারা কৃত প্রলয় হল প্রাকৃতিক প্রলয়। যে নয় প্রকারের সৃষ্টির কথা বললাম তা হল এই : প্রথম—মহত্তের সৃষ্টি ; ভগবানের থেকে গুণসমূহের বৈষম্যকে বলে মহৎ। দ্বিতীয়—অহঙ্কার সৃষ্টি ; যা দিয়ে দ্রব্য, জ্ঞান এবং ক্রিয়ার প্রকাশ হয় তার নাম অহঙ্কার। তৃতীয়—সূক্ষ্ম ভূতসমূহের সৃষ্টি ; সূক্ষ্ম ভূত থেকে আবার মহাভূত উৎপন্ন হয়। চতুর্থ—জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয়

১ প্রকৃতি থেকে উৎপন্ন।

সৃষ্টি। সাত্ত্বিক অহঙ্কার থেকে ইন্দ্রিয়গণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ও মন সৃষ্ট হয়—তাই পঞ্চম সৃষ্টি। অবিদ্যার সৃষ্টি হল ষষ্ঠ। এর দ্বারা জীবগণের অবুদ্ধি অর্থাৎ আবরণ ও বিক্ষোভ হয়ে থাকে। এই যে ছয় প্রকার সৃষ্টির কথা বলা হল তারা হল প্রাকৃত সৃষ্টি। এবার বৈকারিক সৃষ্টির কথা বলছি শোন। এসব স্থিরচিত্তে শুনতে হয়। যাঁতে মতি থাকলে সংসারমুক্তি ঘটে সে শ্রীহরি রজোগুণ অবলম্বন করে ব্রহ্মার রূপ ধরে এই লীলা করে থাকেন। ছয় প্রকার স্থাবর সৃষ্টি হল সপ্তম সৃষ্টি। অন্য সৃষ্টির আগে হয়েছিল বলে একে মুখ্য সৃষ্টি বলে। ছয় স্থাবরের বিবরণ বলছি ঃ যাদের ফুল না হয়ে ফল হয় তারা বনস্পতি; ফল পাকলে যারা বিনষ্ট হয় তারা ওষধি; যারা অন্য গাছকে আশ্রয় করে তারা লতা; বেণু প্রভৃতি ত্বকসার; যারা কঠিন বলে অন্য গাছে ওঠে না তারা বীরুধ এবং যাদের ফুল হয়ে ফল হয় তারা দ্রুম। এই স্থাবরেরা আহারের জন্য ওপর দিকে যায়। এদের সকলেরই অব্যক্ত চৈতন্য আছে এবং এরা অন্তরে স্পর্শ অনুভব করে, বাইরে নয়। এরা অনেক রকমের হয়। অষ্টম সৃষ্টি হল তির্যক-জাতির সৃষ্টি। এদের ভবিষ্যতের জ্ঞান নেই। এরা শুধু খাবার জন্য ব্যগ্র ও বিবেচনাহীন। কি দরকার, এরা ঘ্রাণদ্বারা তা বোঝে। এরা আটাশ রকমের, যথা ঃ গরু, অজ, মহিষ, কৃষ্ণমৃগ, শূকর, গবয়, রুরু, মেষ এবং উষ্ট্র—এই নয় রকম পশু দুই-খুর যুক্ত। গরু, অশ্ব, অশ্বতর, গৌরমৃগ, শরভ ও চমরী—এই ছয় রকম পশু একখুর বিশিষ্ট। এবার কোন্ কোন্ জন্তুকে পঞ্চনখ বলে তা শোন। ১১-২৩

কুকুর, শৃগাল, বৃক, ব্যাঘ্র, বিড়াল, শশক, শল্লক, সিংহ, বানর, হস্তী, কচ্ছপ এবং গোধা—এই বার রকম জন্তু হল পঞ্চনখ; এদের পাঁচটি নখ আছে। আব মকর প্রভৃতি জলচর জন্তু। কঙ্ক, গৃধ্র, বক, শ্যেন, ভাস, ভল্লুক, ময়ূর, হংস, সারস, চক্রবাক প্রভৃতি জন্তু খেচর। এর পর নবম সৃষ্টি হল মানুষ। মানুষ একই রকম। এরা তলার থেকে আহার সংগ্রহ করে। এই জাতীয় জীবে রজোগুণেই বেশী বলে এরা কাজে তৎপর এবং দুঃখকেও সুখ বলে মনে করে। আগে প্রাকৃত সৃষ্টির কথা বলবার সময় বৈকৃত সৃষ্টির কথা বলেছি ঐ তিন রকম জীব আর দেবতারা হলেন বৈকৃত সৃষ্টি। তবে সনৎকুমার প্রভৃতিকে প্রাকৃত বৈকৃত দুইই বলা যায় কারণ তাঁদের মধ্যে দেবত্ব ও মনুষ্যত্ব দুইই রয়েছে। বৈকারিক দেবসৃষ্টি আট রকমের, যেমন—দেব(১), পিতৃগণ(২), অসুর(৩), গন্ধর্ব, অপ্সরা(৪), যক্ষ, রাক্ষস(৫), সিদ্ধ, চারণ, বিদ্যাধর(৬), ভূত, প্রেত, পিশাচ(৭), এবং কিন্নর, কিম্পুরুষ প্রভৃতি(৮)। ব্রহ্মা আগে যে দশ রকমের সৃষ্টি করেন তা তোমার কাছে বললাম। এরপর বংশ মন্বন্তরের কথা বলব। স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা কল্পের আদিতে সৃষ্টিকর্তা হয়ে নিজের দ্বারা নিজেকেই নিজে সৃষ্টি করেন। তিনি যা সংকল্প করেন তা কখনই ব্যর্থ হয় না। ২৪-৩০

একাদশ অধ্যায়

কাল-পরিমাণ নিরূপণ

মৈত্রেয় বলতে লাগলেন, বিদুর, পৃথিবী ইত্যাদি যা কিছু সৃষ্টি হয়েছে তাদের বলে কার্য। ঐ কার্যের এমন অংশ, যাকে আর ভাগ করা যায় না, যা কার্য হয়ে ওঠে নি, যা আর কারো সঙ্গে মেশেনি অথচ সব সময়ই যার অস্তিত্ব আছে, তা হল পরমাণু। পরমাণু চোখে দেখা যায় না, অনুমানের সাহায্যে একে জানা যায়।

প্রত্যেক বস্তু অসংখ্য পরমাণুর সমষ্টি, কিন্তু মানুষ ভুল করে মনে করে যে সমস্ত বস্তুটা একটা জিনিসই। পরমাণু যে বস্তুর চরম অংশ তা যখন রূপান্তরিত না হয়ে সেই ভাবেই থাকে, তখন তাকে বলে পরম মহৎ। কার্যে (উৎপন্ন বস্তুতে) যখন নানারকম বিভিন্নতা আছে, একের সঙ্গে অপরের পার্থক্য আছে, তখন তারা কি করে এক হবে ? তার উত্তর হল—বুদ্ধি দিয়ে ঐসব পার্থক্য দূর করে গোটা বিশ্বকে একটাই বলে মনে করলে যে মাপ পরিমাণের ধারণা হবে তা হল পরম মহৎ পরিমাণ। এভাবে কালেরও সূক্ষ্ম আর স্থূল এই দুই রূপ অনুমান করা যেতে পারে। কাল হলেন ভগবান হরির শক্তি। তিনি নিজে অপ্রকাশ, কিন্তু সমস্ত প্রকাশিত বস্তু জুড়ে রয়েছেন, আর উৎপত্তি প্রভৃতি কাজে দক্ষ। যে কাল এই বিশ্বজগতের পরমাণু অবস্থায় আছে তা হল সূক্ষ্ম বা পরমাণু কাল। আর যে কাল তার সমষ্টি অবস্থায় আছে তা হল পরম মহৎ বা স্থূল কাল। (অথবা বলা যায়, সূর্য যে সময়ের মধ্যে এক পরমাণু পরিমাণ স্থান অতিক্রম করে তা হল সূক্ষ্ম বা পরমাণু কাল। আর যে সময়ে সূর্য পরমাণু সমষ্টি বারটি রাশিরূপ সমস্ত ভুবন অতিক্রম করে তা হল স্থূল কাল বা পরম মহান কাল।) দুটি পরমাণুর মিলনে হয় অণু বা দ্ব্যণুক, আর তিন অণুর সমষ্টি এক ত্রসরেণু। জানালা দিয়ে সূর্যের আলো ঘরে ঢুকলে তার মধ্যে ত্রসরেণু স্পষ্ট দেখা যায়। ১-৫

যেকাল তিন ত্রসরেণু ভোগ করে তার নাম ত্রুটি। একশ ত্রুটিতে হয় এক বেধ, তিন বেধে এক লব। তিন লবে আবার এক নিমেষ এবং তিন নিমেষে এক ক্ষণ হয়। পাঁচ ক্ষণে হল এক কাষ্ঠা, পনের কাষ্ঠায় এক লঘু। পনের লঘুতে এক নাড়ী বা দণ্ড ; দুই দণ্ডে এক মুহূর্ত এবং ছয় বা সাত দণ্ডে এক প্রহর বা যাম হয়। যদি ছয় পল[১] তামা দিয়ে এমন একটি পাত্র তৈরী করা যায় যাতে এক প্রস্থ জল ধরে, তবে চার মাষা সোনা দিয়ে তৈরী, চার আঙুল লম্বা শলাকা দিয়ে তাতে একটি ছিদ্র করলে যতক্ষণে একপ্রস্থ জল ঢুকে পাত্রটিকে ডুবিয়ে ফেলবে সেই সময়টুকুর মাপ হল এক দণ্ড। চার প্রহরে মানুষের এক দিন, আরো চার প্রহরে এক রাত্রি। এই রকম দিন রাত্রি মিলিয়ে এক অহোরাত্র। পনের অহোরাত্রে এক পক্ষ। পক্ষ আছে দুটি—শুক্ল আর কৃষ্ণ। দুই পক্ষে মানুষের এক মাস, কিন্তু পিতৃলোকের এক অহোরাত্র। মানুষের দুই মাসে এক ঋতু আর ছয় মাসে এক অয়ন। দুটি অয়ন হল উত্তরায়ণ আর দক্ষিণায়ন। উত্তরায়ণ দেবতাদের দিন, দক্ষিণায়ন তাঁদের রাত্রি। বারো মাসে মানুষের এক বৎসর। মানুষের আয়ু ঐরকম একশত বৎসর। ৬-১২

চন্দ্র ইত্যাদি গ্রহ, অশ্বিনী ইত্যাদি নক্ষত্র, আর অন্য সব তারা নিয়ে কালচক্রের দেহ তৈরী হয়েছে। কালের আত্মা বিভু বা সূর্য ঐ কালচক্রে অবস্থিত থেকে পরমাণু থেকে শুরু করে বারটি রাশিরূপ সারা ভুবনে অবিরাম ঘুরে বেড়াচ্ছেন। এতে তাঁর যে সময় লাগে তাই হল সম্বৎসর। ঐ চারটি রাশি ঘুরে আসতে বৃহস্পতি গ্রহের যে সময় লাগে তার নাম পরিবৎসর। সাতাশটি নক্ষত্রে চন্দ্রের যে স্থিতিকাল (ভোগকাল), সে অনুসারে বার মাস গুনলে হবে অনুবৎসর, ত্রিশ দিনে মাস হিসাবে বার মাসে এক ইড়াবৎসর এবং সাতাশ নক্ষত্র অনুসারে সাতাশ দিনে মাস ধরে গুনলে বার মাসে এক বৎসর হয়ে থাকে। হে বিদুর, অঙ্কুরের কার্যশক্তি বীজে লুকিয়ে আছে। মূর্তিমান তেজের গোলকের মত সূর্য নিজের কালশক্তি দিয়ে বীজে নিহিত শক্তিকে বহু প্রকারে কার্যে প্রবর্তিত করে আকাশে ঘুরছেন।

---

১ এক পল হল চার তোলা পরিমাণ ওজন।

মানুষের আয়ু ক্ষয় করে তিনি তার বিষয়মোহ দূরে করছেন এবং ফল কামনা করে যারা যজ্ঞ ইত্যাদি করতে চায় তাদের কাজের সঠিক সময়টি জানিয়ে দিয়ে স্বর্গ ইত্যাদি ফল লাভের পথ প্রশস্ত করছেন। তাই সেই পাঁচরকম বৎসরের প্রবর্তক দেবতার অর্চনা করা ধার্মিকদের কর্তব্য। এইসব শুনে বিদুর আবার জিজ্ঞাসা করলেন, ঋষিবর, পিতৃদেব আর মানুষদের নিজ নিজ গণনা অনুসারে একশত বৎসর করে আয়ুর কথা আপনি বললেন। এখন যে সব জ্ঞানীরা ত্রৈলোক্যের বাইরে অর্থাৎ মহঃ থেকে শুরু করে সত্য, এই সব লোকে আছেন তাঁদের আয়ুর কথা বলুন। ভগবান, কালের প্রকৃত রূপ আপনি নিশ্চয় জানেন, কারণ যোগীরা যোগসিদ্ধ চোখ দিয়ে সমস্ত বিশ্বকে দেখে থাকেন। ১৩-১৭

মৈত্রেয় বললেন, বিদুর, সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর আর কলি—এই চারটি যুগ আছে। যুগের প্রথম অংশকে বলে সন্ধ্যা আর শেষের অংশকে বলে সন্ধ্যাংশ। সন্ধ্যা এবং সন্ধ্যাংশ নিয়ে দেবতাদের বার হাজার বছর হল চার যুগের পরিমাণ। তার মধ্যে সত্য যুগের পরিমাণ চার হাজার বছর; তার সন্ধ্যা আর সন্ধ্যাংশ উভয়ই চারশ বছর করে। ত্রেতা যুগ তিন হাজার, দ্বাপর দু'হাজার আর কলিযুগ এক হাজার বছর। তাদের সন্ধ্যা এবং সন্ধ্যাংশ যথাক্রমে তিনশ, দু'শ আর একশ বছর। সন্ধ্যা এবং সন্ধ্যাংশের মাঝখানের সময়ের নাম যুগ। পণ্ডিতেরা বলেন, যে যুগে যে ধর্ম পালনীয় সে যুগের সন্ধ্যা এবং সন্ধ্যাংশেও সেই একই ধর্ম অনুষ্ঠান করা উচিত। সত্যযুগে মানুষের মধ্যে চতুষ্পাদ অর্থাৎ পুরোই ধর্ম ছিল। ত্রেতা, দ্বাপর আর কলিযুগে ক্রমে অধর্ম বাড়তে থাকায় ধর্ম এক এক পাদ করে কমতে থাকে। তাই ত্রেতা ইত্যাদি যুগে অধর্মের সঙ্গে যুদ্ধ করে পুরো ধর্ম পালন করবার চেষ্টা করা উচিত। বৎস বিদুর, ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ এই তিন লোকের বাইরে মহঃ, জন, তপঃ আর সত্য এই সব লোকে হাজারটি চারযুগ নিয়ে এক দিন হয়। তাই হল ব্রহ্মার একদিন, আবার ঐ পরিমাণ সময় নিয়ে তাঁর এক রাত্রি। ঐ রাত্রিতে ব্রহ্মা ঘুমিয়ে থাকেন, রাত্রি শেষ হলে সৃষ্টির কাজ আরম্ভ হয়। ব্রহ্মার এক দিনের মধ্যে ক্রমান্বয়ে চোদ্দ জন মনু রাজত্ব করেন। এক এক জন মনু একাত্তরটি চতুর্যুগের কিছু বেশী সময় অধিকার করে থাকেন। ১৮-২৪

মন্বন্তর অর্থাৎ এক মনু থেকে আর এক মনুর আবির্ভাবের মধ্যে মনু এবং মনুবংশের রাজারা একের পর এক উৎপন্ন হন। কিন্তু সপ্তর্ষিরা, দেবতারা, ইন্দ্রগণ এবং তাঁদের মতই আরো যাঁরা, যেমন গন্ধর্বরা, সকলে একই সময়ে উৎপন্ন হন। ব্রহ্মা প্রতিদিন এই ত্রিলোক সৃষ্টি করছেন। এতেই পশু, পাখী, মানুষ, পিতৃগণ, দেবতারা, যার যেমন কর্ম সেই রকম হয়ে জন্মায়। প্রতি মন্বন্তরে ভগবান সত্ত্বময় হয়ে পুরুষাকার অবতারমূর্তি ধরে মনুদের দ্বারা বিশ্বকে রক্ষা করেন। তারপর দিন শেষ হলে তিনি কিছুটা তমোগুণ ধরে ত্রিলোকের অন্ত ঘটান এবং জীবকে আপন দেহে প্রবিষ্ট করে নির্বিকার অবস্থায় থাকেন। রাত্রি আরম্ভ হলে তিনটি লোক চন্দ্র-সূর্যের সঙ্গে নিজে নিজেই ভগবানে প্রবেশ করে। ভগবানের শক্তিরূপ সঙ্কর্ষণ-মুখাগ্নিতে ত্রিলোক পুড়তে থাকলে ভৃগু প্রভৃতি ঋষিরা তার তাপ সহ্য করতে না পেরে মহর্লোক থেকে জনলোকে চলে যান। ২৫-৩০

তখন কল্প শেষ হবার সময় উপস্থিত হয়। সমস্ত সমুদ্র খুব বেড়ে ওঠে। প্রচণ্ড বাতাসে বিরাট বিরাট ঢেউ ওঠে আর তাতে দেখতে দেখতে ত্রিভুবন ভেসে যায়। ভগবান সে সময় সেই সমুদ্রের জলে অনন্ত শয্যায় শুয়ে যোগনিদ্রায় মগ্ন থাকেন এবং মহর্লোক আর জনলোক থেকে ভৃগু ইত্যাদি ঋষিরা এসে হাতজোড়

করে তাঁর স্তব করতে থাকেন। কালাত্মা সূর্যের গতির দ্বারা ঐরকম অহোরাত্রে যে একশ বছর হয় তা সব প্রাণীর পরমায়ু, কিন্তু কালের প্রভাবেই ঐ আয়ু ক্রমে কমে আসে এবং ব্রহ্মার যে শতবর্ষ পরমায়ু তাও প্রায় শেষ বলে মনে হয়। বিদুর, ব্রহ্মার আয়ুর অর্ধেক অংশকে বলে পরার্ধ। তার মধ্যে পূর্ব পরার্ধ শেষ হয়ে গিয়েছে, অপর পরার্ধ এখন চলছে। পূর্ব পরার্ধের প্রথমে মহান ব্রাহ্ম নামে যে কল্প হয়েছিল তাতেই ব্রহ্মা আবির্ভূত হয়েছিলেন। ঐ ব্রহ্মার নাম শব্দব্রহ্ম। ব্রাহ্মকল্পের শেষে যে কল্প তার নাম পাদ্মকল্প। কারণ এই কল্পে ভগবানের নাভি-সরোবর থেকে যে পদ্ম উৎপন্ন হয়েছিল তার থেকে ত্রিভুবন সৃষ্টি হয়। ৩১-৩৬

দ্বিতীয় পরার্ধের শুরুতে যে কল্পের কথা বলা হল অর্থাৎ পাদ্মকল্প, তাকে বরাহকল্পও বলা হয়, কারণ এই কল্পে ভগবান হরি শূকরের মূর্তি ধরেছিলেন। এই দুই পরার্ধকাল অনাদি অনন্ত ভগবানের এক নিমেষমাত্র। তবে ভগবানের আয়ুর পরিমাপ করতে ঐ নিমেষও ধরবার মত নয়। কারণ তিনি কালের অতীত। পরমাণু থেকে শুরু করে দ্বিপরার্ধ পর্যন্ত যে কাল তা বিষয়ী প্রাণীদের উপর প্রভুত্ব করতে পারলেও ভূমা অর্থাৎ পরিপূর্ণ ভগবানের উপর কিছুতেই আধিপত্য করতে পারে না। এই ব্রহ্মাণ্ড এগারটি ইন্দ্রিয় আর পাঁচটি মহাভূত এই ষোল রকম বিকার এবং প্রকৃতি, মহৎতত্ত্ব, অহংকারতত্ত্ব আর পাঁচ তন্মাত্র এই আটটি প্রকৃতি দিয়ে রচিত। ব্রহ্মাণ্ড ভিতরের দিকে পঞ্চাশ কোটি যোজন বিস্তৃত, তার বাইরে ক্ষিতি, অপ্‌, তেজ, মরুৎ, ব্যোম্‌, মহৎ এবং অহংকারতত্ত্ব—এই সাতটি আবরণে মোড়া। ব্রহ্মাণ্ডের যা পরিমাণ তার প্রথম আবরণ ক্ষিতির পরিমাণ তার দশগুণ। এইভাবে প্রত্যেকটি আবরণ তার আগের আবরণের থেকে দশগুণ করে বড়। এই ব্রহ্মাণ্ড এবং এরকম আরো কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড যাঁর মধ্যে ঢুকে পরমাণুর মত দেখতে হয়েছে তিনি সব কারণের কারণ অক্ষর ব্রহ্ম। তিনিই পরমপুরুষ বিষ্ণুর স্বরূপ। ৩৭-৪২

দ্বাদশ অধ্যায়

ব্রহ্ম-সৃষ্টি বর্ণন

মৈত্রেয় বললেন, বিদুর, কালস্বরূপ পরমাত্মার শক্তি তোমার কাছে বর্ণনা করলাম। এখন বেদগর্ভ ব্রহ্ম যেভাবে সৃষ্টি করেছিলেন সেই কথা বলি, শোন। তিনি প্রথমে তম (স্বরূপের অপ্রকাশ), মোহ (দেহ ইত্যাদিকে অহং বলে মনে করা), মহামোহ (ভোগ করবার ইচ্ছা), তামিস্র (ভোগ করবার ইচ্ছাতে বাধা ঘটলে যে রাগ হয়), অন্ধতামিস্র (ভোগের ইচ্ছা লোপ পেলে 'আমিও মরে গেলাম' এই রকম মনে হওয়া)—অবিদ্যার এই পাঁচটি বৃত্তি বা আকারান্তর সৃষ্টি করলেন। কিন্তু তমোময় এই সৃষ্টি দেখে তাঁর আনন্দ হল না। তিনি তাই ভগবানের ধ্যান করে মন পবিত্র করে আর সব সৃষ্টি করতে লাগলেন। এ-ভাবে সনক, সনন্দ, সনাতন আর সনৎকুমার এই চারজন মুনির সৃষ্টি হল, কিন্তু তাঁরা নিষ্ক্রিয় এবং ঊর্ধ্বরেতা হলেন। ব্রহ্মা তাঁদের বললেন, পুত্রগণ, তোমরা প্রজা সৃষ্টি কর। কিন্তু তাঁদের ধর্ম হল মোক্ষ আর তাঁরা বাসুদেবের একনিষ্ঠ ভক্ত, তাই তাঁরা সৃষ্টি করতে চাইলেন না। পুত্রেরা তাঁর আদেশ অমান্য করাতে ব্রহ্মার প্রচণ্ড ক্রোধ হলেও তিনি তা দমন করতে চেষ্টা করলেন। ১-৬

ব্রহ্মা বিবেকের দ্বারা সেই ক্রোধকে দমন করতে চেষ্টা করলে তা তাঁর দুই ভ্রূর মাঝখান থেকে বেরিয়ে এক নীললাল কুমার রূপে জন্ম নিল। ৭

সেই নীললোহিতই দেবতাদের আদিপুরুষ। তিনি জন্মগ্রহণ করেই কাঁদতে কাঁদতে বললেন, জগতের গুরু, হে বিধাতা, আমার কি নাম আর আমি কোথায় থাকব তা বলে দিন। তাঁর কথা শুনে ব্রহ্মা সস্নেহে বললেন, বৎস, তুমি কেঁদো না। আমি এখনই তোমার নাম আর ধাম বলে দিচ্ছি। দেবশ্রেষ্ঠ, তুমি ছোট ছেলের মত আকুল হয়ে 'রোদন' করলে, তাই লোকে তোমাকে রুদ্র বলে ডাকবে। হৃদয়, প্রাণ, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী, সূর্য, চন্দ্র আর তপস্যা—এ কটি স্থান আমি তোমার জন্যে আগেই ঠিক করে রেখেছি। মন্যু, মনু, মহিনস্, মহান্, শিব, ঋতধ্বজ, উগ্ররেতা, ভব, কাল, বামদেব আর ধৃতব্রত[১]—এই এগারটি হল তোমার নাম। ধী, ধৃতি, রসলা, উমা, নিযুৎ, সর্পি, ইলা, অম্বিকা, ইরাবতী, স্বধা আর দীক্ষা—এই এগারটি রুদ্রাণী তোমার স্ত্রী। তুমি ঐ সব নাম, স্থান আর স্ত্রীদের নাও এবং যেহেতু তুমি প্রজাপতি তাই ঐ সকল নিয়ে প্রজা সৃষ্টি কর। পিতা ঐ রকম আদেশ করলে নীললোহিত বল, আকৃতি আর স্বভাবে নিজের মত প্রচণ্ড সব প্রজা সৃষ্টি করতে লাগলেন। ৮-১৫

সেই রুদ্র থেকে যে সব অসংখ্য রুদ্র জন্মালেন তাঁরা দল বেঁধে সৃষ্টি গ্রাস করতে গেলেন। তাঁদের দেখে ভয় পেয়ে ব্রহ্মা রুদ্রকে বললেন, দেবশ্রেষ্ঠ, আর এরকম প্রজা সৃষ্টি করে কাজ নেই। তোমার সৃষ্ট প্রজারা ভয়ানক চোখের আগুনে দশদিকের সঙ্গে আমাকেও পোড়াবার উপক্রম করছে। কাজেই তুমি তপস্যা কর, তোমার মঙ্গল হোক। তপস্যার শক্তিতে তুমি এই বিশ্বকে আবার আগের মত করে সৃষ্টি করতে পারবে। তপস্যা দিয়েই জীব পরম জ্যোতিঃস্বরূপ সবার অন্তর্যামী ভগবান অধোক্ষজকে[২] জানতে পারে। ১৬-১৯

মৈত্রেয় বললেন, ব্রহ্মার এই আদেশ পেয়ে নীললোহিত রুদ্র তাঁকে প্রদক্ষিণ করে প্রণাম করলেন। তারপর 'বেশ তাই হবে', এই কথা বলে তপস্যার জন্য বনে চলে গেলেন। তখন ভগবানের শক্তিযুক্ত ব্রহ্মা আবার সৃষ্টি করবার জন্য ধ্যানে বসলেন। তাতে মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, ভৃগু, বশিষ্ঠ, দক্ষ এবং নারদ—এই দশটি পুত্র জন্মাল। নারদ ব্রহ্মার কোল থেকে, দক্ষ বুড়ো আঙ্গুল থেকে, বশিষ্ঠ প্রাণ থেকে, ভৃগু ত্বক্ থেকে, ক্রতু হাত থেকে, পুলহ নাভি থেকে, পুলস্ত্য দুই কান থেকে, অঙ্গিরা মুখ থেকে, অত্রি চোখ থেকে আর মরীচি ব্রহ্মার মন থেকে জন্মালেন। ২০-২৪

ধর্ম আবির্ভূত হলেন তাঁর দক্ষিণ স্তন থেকে। স্বয়ং নারায়ণ সেখানে ছিলেন। অধর্ম তাঁর পিঠ থেকে জন্মাল। এ অধর্ম থেকেই লোকের ভয়ংকর মৃত্যু ঘটে থাকে। তারপর ব্রহ্মার হৃদয় থেকে জন্মাল কাম, দুই ভ্রূ থেকে ক্রোধ, উপর আর নীচের দুই ঠোঁট থেকে লোভ, মুখ থেকে সরস্বতী, জননেন্দ্রিয় থেকে সমুদ্র এবং গুহ্যদ্বার থেকে পাপাশ্রয় রাক্ষস জন্মাল। আর দেবহূতির পতি কর্দম নামে এক মুনি তাঁর ছায়া থেকে উৎপন্ন হল। এইভাবে ব্রহ্মার দেহ আর মন থেকে এই জগতের উৎপত্তি হল। বাক্ নামে ব্রহ্মার একটি অতি সুন্দরী কন্যা হয়েছিল। সেই কন্যা নাকি ব্রহ্মার মন হরণ করেছিল। ব্রহ্মা মোহিত হয়ে তাকে কামনা

১ রুদ্রের এই নামগুলি সম্বন্ধে কিন্তু ঐকমত্য নেই।

২ বিষ্ণু যিনি কোন কল্পে মহাদেবের পাদদেশ থেকে জন্মেছিলেন।

করেছিলেন, কিন্তু পিতার প্রতি কন্যাটির ভাব বিশুদ্ধই ছিল। মরীচি প্রভৃতি ঋষিরা পিতার ঐরকম প্রবৃত্তি দেখে তাঁকে সবিনয়ে বুঝিয়ে বললেন, পিতা, আপনি যে কাজ করতে যাচ্ছেন তেমন কাজ আপনার আগে কেউ করেনি, আপনার পরেও কেউ করবে না। আপনি হলেন সবার প্রভু, আর আপনিই কিনা কাম দমন করতে না পেরে নিজের কন্যাকে কামনা করছেন! হে গুরু, আপনি তেজস্বী ঠিকই, কিন্তু যাতে আপনার চরিত্র অনুসরণ করে লোকে নিজের মঙ্গল করতে পারে সে রকম কাজই আপনার করা উচিত। কিন্তু একথাতেও ব্রহ্মার জ্ঞান হল না দেখে তাঁরা শ্রীভগবানকে স্মরণ করে বললেন, যিনি নিজের তেজদ্বারা নিজের মধ্যে স্থিত জগৎকে প্রকাশ করেছেন, তিনিই ধর্মকে রক্ষা করুন। আমরা সেই শ্রীভগবানের চরণে নমস্কার করি। ২৫-৩২

যখন প্রজাপতি ব্রহ্মা দেখলেন যে তাঁর ছেলেরা ঐ রকম বলছেন, তখন তিনি অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে তাঁদের সাক্ষাতেই তাঁর ঐ দেহ ত্যাগ করলেন। দিক্‌গণ তাঁর সেই দেহ ধারণ করল। সেই দেহই হল তমোময় নীহার। তারপর একদিন ব্রহ্মা ভাবলেন, এই সব লোক আগের কল্পে যেমন সুন্দর ছিল কিভাবে তাদের আবার সেই রকম করে সৃষ্টি করা যায়? যখন ব্রহ্মা এই চিন্তা করছিলেন তখন তাঁর চার মুখ থেকে চার বেদ আবির্ভূত হল। তারপর চার হোত্র (হোতা, উদ্গাতা, অধ্বর্যু আর ব্রহ্মা), ঐ চার যাজ্ঞিকের কর্ম, কর্মতন্ত্র বা যজ্ঞের বিস্তার, আয়ুর্বেদ প্রভৃতি উপবেদ, নীতিশাস্ত্র, ধর্মের চারপাদ, চার আশ্রম এবং তাদের বিধিসমূহ প্রকাশ পেল। ৩৩-৩৫

বিদুর জিজ্ঞাসা করলেন, মুনি, আপনি বললেন যে প্রজাপতিদের ঈশ্বর যে ব্রহ্মা তাঁরই মুখ থেকে বেদ ইত্যাদির সৃষ্টি হল। এবার বলুন, তাঁর কোন মুখ থেকে কোনটির সৃষ্টি হল। মৈত্রেয় বল্লেন, ব্রহ্মার পূর্ব মুখ থেকে শুরু করে যথাক্রমে ঋক্, যজুঃ, সাম, অথর্ব এই চার বেদ নির্গত হল। আবার ঐ ভাবেই যথাক্রমে হল আয়ুর্বেদ, ধনুর্বেদ, গন্ধর্ববেদ অর্থাৎ সঙ্গীতবিদ্যা এবং স্থাপত্য (নির্মাণ বিদ্যা)। তারপর ব্রহ্মা তাঁর সব মুখ থেকে ইতিহাস এবং পুরাণরূপ পঞ্চম বেদ সৃষ্টি করলেন। পূর্বমুখ থেকে আবির্ভূত হল ষোড়শী এবং উক্‌থ নামে দুটি যজ্ঞ, দক্ষিণমুখ থেকে পুরীষী আর অগ্নিষ্টোম[1] যজ্ঞ, পশ্চিম মুখ থেকে আপ্তোর্যাম আর অতিরাত্র[2] এবং উত্তর মুখ থেকে বাজপেয় আর গোসব[3] নামে যজ্ঞ। এই ভাবে তিনি বিদ্যা অর্থাৎ শৌচ, দান বা দয়া, তপস্যা এবং সত্য—ধর্মের এই চারিটি পদ এবং চার আশ্রম আর তাদের বিধিসমূহ সৃষ্টি করলেন। ঐ চার আশ্রমের কথা বলি শোন। ব্রহ্মচর্য চার রকমের আছে। উপনয়নের পরে সংযত হয়ে ব্রহ্মচারী যখন ত্রিরাত্র গায়ত্রী পাঠ করেন, সেই ব্রহ্মচর্যকে বলে সাবিত্র। যখন তিনি সংযমের সঙ্গে সারা বছর ব্রতপালন করেন, সেই ব্রহ্মচর্যকে প্রাজাপত্য বলে। ব্রহ্মচারী যতদিন সংযমপালন করে বেদ অধ্যয়ন করেন, তাঁর সেই ব্রহ্মচর্যের নাম ব্রাহ্ম ব্রহ্মচর্য আর যে ব্রহ্মচারী আমরণ সংযম পালন করেন তাঁর ব্রহ্মচর্যকে বলে বৃহৎ ব্রহ্মচর্য। সেরকম গৃহস্থের বৃত্তিও চার রকমের হতে পারে, যেমন, বার্তা অর্থাৎ অনিষিদ্ধ কৃষিকাজ ইত্যাদি, সঞ্চয় অর্থাৎ যাজন ইত্যাদি, কালীন অর্থাৎ অযাচিত বৃত্তি এবং শিল আর উঞ্ছ অর্থাৎ ক্ষেতে-পড়ে-থাকা শস্যের শীষ কুড়ান আর একটি একটি করে কণা কুড়ান। আবার বানপ্রস্থ আশ্রমবাসীর চারটি ভাগ—যাঁরা অকৃষ্টপচ্য বৃত্তি অর্থাৎ পতিত জমিতে উৎপন্ন হয়ে নিজে নিজেই পক্ক হয়েছে

১ অগ্নিচয়ন। ২ একরাত্রিসাধ্য যজ্ঞ। ৩ গোমেধ।

এমন ফল ইত্যাদি খেয়ে বেঁচে থাকেন তাঁরা বৈখানস; নতুন খাদ্য পেলে যাঁরা আগেকার জমান খাদ্য ফেলে দেন তাঁরা বালখিল্য; যাঁরা সকালে উঠে প্রথমে যে দিক দেখতে পান শুধু সে দিক থেকেই ফল ইত্যাদি সংগ্রহ করে তাই খেয়ে থাকেন তাঁরা ঔড়ুম্বর, আর যাঁরা কেবল ফেলে-দেওয়া ফেন ইত্যাদি খান তাঁরা ফেনপ। চার রকম সন্ন্যাসাশ্রমী হলেন—কুটীচক, যিনি প্রধানত নিজের আশ্রম-ধর্মের অনুষ্ঠান করেন, বহূদক, যিনি কাজকে গৌণ করে জ্ঞানাভ্যাসকে মুখ্য করেছেন; হংস, যিনি কেবল জ্ঞানাভ্যাসই করে থাকেন; নিষ্ক্রিয় বা পরমহংস, যিনি তত্ত্বলাভ করেছেন। ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ আর সন্ন্যাস এই চার আশ্রমীদের মধ্যে যাঁদের নাম পরে বলা হয়েছে তাঁরা পূর্বকথিত আশ্রমীদের থেকে শ্রেষ্ঠ। তারপর ব্রহ্মার চারমুখ থেকে যথাক্রমে আন্বীক্ষিকী বা মোক্ষবিদ্যা, ত্রয়ী অর্থাৎ যা দিয়ে স্বর্গ লাভ হয় সেই কর্মবিদ্যা, বার্তা (কৃষিবিদ্যা বা অর্থনীতি) এবং দণ্ডনীতির (রাজনীতি) উদয় হল। এই ভাবে তাঁর মুখ থেকে চারটি ব্যাহৃতি এবং তাঁর হৃদয়াকাশ থেকে প্রণব আবির্ভূত হন। ৩৬-৪৪

সেই বিভুর লোমসমূহ থেকে উষ্ণিক, ত্বক্ থেকে গায়ত্রী, মাংস থেকে ত্রিষ্টুপ্, স্নায়ু থেকে অনুষ্টুপ্, অস্থি থেকে জগতী, মজ্জা থেকে পঙ্‌ক্তি এবং প্রাণ থেকে বৃহতী ছন্দ উৎপন্ন হল। মহাকল্পে ব্রহ্মা শব্দব্রহ্মরূপে অর্থাৎ বেদময় ছিলেন। তাঁর ঐ রূপের বর্ণনা করছি, শোন। স্পর্শবর্ণসমূহ অর্থাৎ ক থেকে ম পর্যন্ত পঞ্চবর্গ হল তাঁর জীবন, স্বরবর্ণগুলি তাঁর দেহ, উষ্মবর্ণ অর্থাৎ শ ষ স হ তাঁর ইন্দ্রিয়, আর য র ল ব এই অন্তঃস্থ বর্ণসকল হল তাঁর বল। তাঁর খেলা থেকে সপ্তস্বরের জন্ম হল। শব্দের দুটি রূপ আছে—ব্যক্ত বা বৈখরী অর্থাৎ জিহ্বাদ্বারা যে শব্দ উচ্চারণ করা হয় তা, আর অব্যক্ত বা প্রণব। ব্রহ্মা শব্দব্রহ্মময়, তাই তিনি দুইই। তিনি যখন প্রণবস্বরূপ তখন তিনি অব্যক্ত নিত্য পরিপূর্ণ পরমেশ্বর। আর ব্যক্তরূপে তিনি হলেন নানা শক্তির অধিকারী ইন্দ্র ইত্যাদি। ব্রহ্মা আগে যে দেহ ধারণ করেছিলেন তা তমোময় নীহারে পরিণত হয়েছিল। তারপর তিনি আর একটি মূর্তি গ্রহণ করে সৃষ্টিতে মন দেন। হে কৌরব, তিনি দেখলেন যে মরীচি প্রভৃতি ঋষিরা মহা বীর্যশালী হলেও তাঁদের সৃষ্টি বাড়ছে না। তাই তিনি চিন্তা করলেন, কি আশ্চর্য! আমি সবসময়ই সৃষ্টিতে ব্যস্ত, অথচ আমার প্রজারা তো বাড়ছে না! আমার মনে হচ্ছে এ ব্যাপারে দৈব আমার প্রতিবন্ধক। ৪৫-৫০

এই চিন্তা করে ব্রহ্মা দৈবের দিকে দৃষ্টি রেখে সৃষ্টির কাজ করতে গেলে 'ক' অর্থাৎ ব্রহ্মার ঐ মূর্তি দুভাগে ভাগ হয়ে গেল। আর 'ক' থেকে উৎপন্ন বলে দেহের নাম হল কায়। সেই দুভাগ হয়ে যাওয়া মূর্তির এক অংশ হল পুরুষ আর অন্য অংশ হল স্ত্রী। পুরুষের নাম হল স্বায়ম্ভুব মনু আর স্ত্রীর নাম শতরূপা। শতরূপা মনুর মহিষী হলেন এবং সেই থেকে মিথুন অর্থাৎ স্ত্রী-পুরুষের সংযোগে প্রজাবৃদ্ধি হতে লাগল। শতরূপার গর্ভে মনু পাঁচটি সন্তান উৎপন্ন করেন—দুটি পুত্র আর তিনটি কন্যা। দুই পুত্রের নাম প্রিয়ব্রত এবং উত্তানপাদ; কন্যা তিনটির নাম আকূতি, দেবহূতি ও প্রসূতি। মনু রুচির সঙ্গে আকূতির, ঋষি কর্দমের সঙ্গে দেবহূতির আর প্রজাপতি দক্ষের সঙ্গে প্রসূতির বিবাহ দেন। এঁদের সন্তান সন্ততিতেই জগৎ পরিপূর্ণ হয়েছে। ৫১-৫৬

ত্রয়োদশ অধ্যায়

বরাহরূপী ভগবান কর্তৃক জলমগ্ন পৃথিবীর উদ্ধার

শুকদেব বল্লেন, মহারাজ, মৈত্রেয় মুনির মুখ থেকে এসব অতি পবিত্র বাক্য শুনে বিদুর ভগবান বাসুদেবের কথা শোনার জন্য আরও আগ্রহ প্রকাশ করতে লাগলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, মুনি, ব্রহ্মার প্রিয়পুত্র সম্রাট স্বায়ম্ভুব মনু প্রিয় স্ত্রী পেয়ে কি করলেন? সেই প্রথম রাজা এবং রাজর্ষির কথা শুনবার জন্য আমার খুব আগ্রহ হচ্ছে। তিনি ভগবান হরিরই আশ্রিত ছিলেন। আপনি তাঁর চরিত্র বর্ণনা করুন, আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে তা শুনব। মুকুন্দের পাদপদ্ম যাঁদের হৃদয়ে বিরাজিত তাঁদের গুণকীর্তন শোনাই মানুষের চিরকাল পরিশ্রম করে শাস্ত্র ইত্যাদি পাঠ করবার সার্থক ফল। শুকদেব বললেন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রেমবশে যে বিদুরের কোলে নিজের চরণ দুখানি রাখতেন, সেই বিদুর বিনয়ের সঙ্গে ঐ প্রশ্ন করলে মৈত্রেয় মুনি আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে বলতে লাগলেন, বিদুর, স্বায়ম্ভুব মনু পত্নী শতরূপার সঙ্গে জন্মগ্রহণ করে ব্রহ্মাকে প্রণাম করলেন। তারপর করজোড়ে বললেন, ব্রহ্মা, আপনিই সর্বভূতের জন্মদাতা পিতা, আপনিই তাদের পালনকর্তা। যদিও আপনাকে কারো উপর নির্ভর করতে হয় না, তবুও আমরা আপনার সন্তান, আপনার সেবা করাই আমাদের কর্তব্য। আমাদের সাধ্য অনুসারে কি কাজ করে আমরা আপনার সেবা করতে পারি এবং কিসে ইহলোকে যশ আর পরলোকে সদ্গতি লাভ করতে পারি তা আদেশ করুন। ১-৮

মনুর ঐকথা শুনে ব্রহ্মা বললেন, বৎস, তোমাদের দুজনের কল্যাণ হোক। তোমরা যে সরল মনে আমার কাছে উপদেশ প্রার্থনা করলে এতে আমি তোমাদের উপর খুব সন্তুষ্ট হলাম। পুত্র পিতাকে এরকম ভক্তি করবে, এটাই উচিত। পিতার আদেশ সাবধানে ক্ষমতানুযায়ী পালন করতে হয়। যাহোক, এখন তুমি এই স্ত্রীর গর্ভে নিজের মত সব পুত্র উৎপাদন কর এবং রাজধর্ম অনুসারে পৃথিবী পালন আর যজ্ঞের দ্বারা শ্রীহরির আরাধনা কর। তুমি ভালভাবে প্রজা পালন করলেই আমার সেবা করা হবে ভগবান হৃষীকেশ তোমার উপর সন্তুষ্ট হবেন। যজ্ঞস্বরূপ ভগবান জনার্দন যাদের উপর প্রসন্ন না হন তাদের সব পরিশ্রম বৃথা, কারণ যিনি সকলের আত্মা তাঁকেই তারা সমাদর করল না। ৯-১৩

মনু বললেন, পাপনাশন, আমি আপনার আদেশ পালন করব। কিন্তু আপনি আমার এবং আমাদের প্রজাদের থাকবার জন্য কিছু স্থান দিন। সর্বভূতের আবাস পৃথিবী তো প্রলয় জলধির জলে ডুবে আছে, তাকে উদ্ধার করতে যত্ন করুন। মনুর কথা শুনে এবং পৃথিবীকে জলমগ্ন দেখে ব্রহ্মা অনেকক্ষণ চিন্তা করলেন, আমি তো আগে একবার সব জল পান করে ফেলেছিলাম। আবার হঠাৎ কি করে এই জল উৎপন্ন হল? এই জলে-মগ্ন পৃথিবীকে এখন কি করে উদ্ধার করা যায়? আমি সৃষ্টি করছি আর এদিকে পৃথিবী জলে ডুবে রসাতলে গিয়েছে! যাহোক্, পরমেশ্বর তো আমাকে সৃষ্টির কাজেই নিযুক্ত করেছেন। এখন কি করা যায়? তবে আমার চিন্তা করারই বা কি দরকার। যে ভগবানের হৃদয় থেকে আমি উদ্ভূত হয়েছি তিনিই আমার কর্তব্য বলে দিন। ১৪-১৭

ব্রহ্মা যখন এই রকম চিন্তা করছেন, তখন তাঁর নাকের ছিদ্র থেকে এক আঙ্গুল পরিমাণ ক্ষুদ্র একটি বরাহ বেরিয়ে এল। দেখতে দেখতে সেই বরাহ ব্রহ্মার চোখের

সামনেই আকাশে গিয়ে হাতীর মত বিরাট আকার ধারণ করল। সেই বরাহরূপ দেখে আশ্চর্য হয়ে ব্রহ্মা, মরীচি, সনক ইত্যাদি এবং মনু এই সকলে মিলে বলাবলি করতে লাগলেন, বরাহের রূপ ধরে এ কি কোন স্বর্গীয় প্রাণী এসে আবির্ভূত হলেন না কি? এ তো বড় আশ্চর্য ব্যাপার! আমার নাকের ছিদ্র থেকে এই বরাহ বেরিয়ে এলো! প্রথমে একে দেখলাম আঙ্গুলের মত ছোট, আর মুহূর্তের মধ্যে এ বিশাল পাষাণখণ্ডের মত হয়ে গেল! ইনি কি ভগবান বিষ্ণু? তিনি কি নিজরূপ গোপন করে আমাদের মনে কষ্ট দিচ্ছেন? ব্রহ্মা পুত্রদের সঙ্গে যখন এইরকম বাদানুবাদ করছেন তখন সেই পর্বতের মত বিশালদেহ যজ্ঞপুরুষ ভগবান গর্জন করে উঠলেন। বরাহরূপী হরি গর্জনে সমস্ত দিক্ কাঁপিয়ে ব্রহ্মা এবং মরীচি প্রভৃতি ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠদের মনে আনন্দ সঞ্চার করলেন। সেই মায়া-বরাহের গর্জন অবিকল বরাহের মতই দেখে তাঁদের সংশয় দূর হল। তখন জন, তপ আর সত্যলোক-বাসী মুনিগণ ঋক্, যজুঃ এবং সাম, এই তিন বেদের মন্ত্রদ্বারা তাঁর স্তব করতে লাগলেন। ১৮-২৫

বেদসমূহ যাঁর মূর্তির স্তুতি করে, তিনি ঋষিদের মুখে বেদ শ্রবণ করে আবার গর্জন করলেন এবং গজরাজের মত জলের মধ্যে প্রবেশ করলেন। তাঁর আগে তিনি লেজ ওপরে তুলে লাফ দিয়ে আকাশে উঠলেন। তাঁর শরীর শক্ত হল, ঘাড়ের রোম কাঁপতে লাগল, খুর দিয়ে তিনি মেঘে আঘাত করলেন। তাঁর দৃষ্টির জ্যোতিতে চারদিক আলো হয়ে উঠল। তাঁর গায়ের লোম তীক্ষ্ন, দাঁত শ্বেতবর্ণ। তিনি নিজেই যজ্ঞস্বরূপ হলেও পশুর মতই গন্ধদ্বারা পৃথিবীকে খুঁজতে লাগলেন। তাঁর ভয়ানক দুই চোখ শান্ত করে উপরে স্তবরত বিপ্রদের দেখতে দেখতে তিনি জলের মধ্যে প্রবেশ করলেন। পর্বতের মত সেই দেহ জলে গিয়ে পড়লে সমুদ্রগর্ভ বিদীর্ণ হল। সমুদ্র কাতর হয়ে আর্তনাদ করলেন এবং ঢেউরূপ হাত তুলে বললেন, হে যজ্ঞেশ্বর, রক্ষা করুন। যজ্ঞমূর্তি শ্রীহরি তখন ক্ষুরশস্ত্রের (খুরাপির) মত খুর দিয়ে অপার সমুদ্রকে এমনভাবে চিরে ফেললেন যে তার পার দেখা যেতে লাগল। জলভেদ করে যেতে-যেতে রসাতলে গিয়ে সেখানে তিনি পৃথিবীকে দেখতে পেলেন। প্রলয়ের সময় যোগনিদ্রায় শুয়ে থেকে সর্বজীবাধার পৃথিবীকে যিনি নিজের মধ্যে ধারণ করেছিলেন তিনি এখন অনায়াসে পৃথিবীকে দাঁতে ধরে রসাতল থেকে উঠে এলে তাঁর অপূর্ব শোভা হল। সেই জলের মধ্যেও দৈত্য হিরণ্যাক্ষ গদা তুলে তাঁর রাস্তা আটকাল। সিংহ যেমন হাতীকে বধ করে, দারুণ ক্রোধে উদ্দীপ্ত হয়ে ভগবান তেমনি অনায়াসে সুদর্শন চক্রে তাকে সংহার করলেন। খেলাচ্ছলে মাটি খুঁড়বার সময় পর্বতের গৈরিক মাটির রং লেগে যেমন গজরাজের মুখ আর গাল রঞ্জিত হয়, বরাহরূপী ভগবানও দৈত্যের রক্ত গালে-মুখে মেখে সেই রকম রূপ ধারণ করলেন। ২৬-৩২

বিদুর, বরাহদেব যখন হস্তীর মত অবলীলাক্রমে তাঁর শুভ্র দাঁতের মাথায় পৃথিবীকে ধরে তুলছিলেন, তখন তাঁর দেহ তমালের মত নীলবর্ণ হয়েছিল। তা দেখে বিরিঞ্চি প্রভৃতি ঋষিগণ তাঁর স্বরূপ বুঝতে পেরে সামনে এসে করজোড়ে বৈদিক সূক্তের মত বাক্যে তাঁর স্তব করতে লাগলেন, জয় জয় হে অজিত, তুমি যজ্ঞমূর্তি, তোমার বেদময় দেহ কম্পিত হচ্ছে, তোমাকে প্রণাম করি। তুমি পৃথিবীর উদ্ধারের জন্য বরাহরূপে অবতীর্ণ হলে সমস্ত যজ্ঞ তোমার লোমকূপে লীন হয়ে আছে, তোমাকে নমস্কার করি। তুমি যজ্ঞময়। তোমার এইরূপ পাপিগণ দেখতে পারে না। তোমার ত্বকে গায়ত্রী ইত্যাদি ছন্দসকল রয়েছে, রোমে যজ্ঞের কুশ ইত্যাদি, চোখে ঘৃত আর চারখানি চরণে চতুর্হোত্র প্রকাশ পাচ্ছে। হে ঈশ্বর,

তোমার মুখে স্রুক[১], দুই নাসায় স্রুব[২], উদরে ইড়া[৩], কানের ছিদ্রে চমস[৪], মুখ-মণ্ডলে প্রাশিত্র[৫], মুখগহ্বরে গ্রহ[৬], তোমার ভক্ষণ-ই আমাদের অগ্নিহোত্র। ৩৩-৩৬

হে প্রভু, তোমার বারবার আবির্ভাবই হল দীক্ষা, তোমার গ্রীবা হল উপসদ নামে তিনটি যজ্ঞ, তোমার দাঁত প্রায়ণীয়া এবং উদয়নীয়া নামে দুই যজ্ঞ। তোমার জিহ্বা প্রবর্গ্য অর্থাৎ মহাবীর নামে যজ্ঞ, তোমার শির সভ্য ও আবসথ্য নামে দুই অগ্নি এবং তোমার পঞ্চপ্রাণ হল চিতি[৭]। হে দেব, সোম হল তোমার রেত, প্রাতঃবসন তোমার বালক অবস্থা। ত্বক, মাংস, স্নায়ু, অস্থি, মজ্জা, মেদ ও রক্ত এই সাতটি ধাতু যথাক্রমে অগ্নিষ্টোম, অত্যগ্নিষ্টোম, উক্থ, ষোড়শী, বাজপেয়, অতিরাত্র ও আপ্তোর্যাম এই সাত যজ্ঞ, আর তোমার শরীরের সন্ধিসকল হল দ্বাদশাহ প্রভৃতি যজ্ঞসমূহ। অসোম ও সসোম যজ্ঞ তোমার রূপ আর যজ্ঞের অনুষ্ঠানই তোমার বন্ধন। তুমিই সমস্ত মন্ত্র, সমস্ত দেবতা, যাবতীয় বস্তু, যজ্ঞ এবং ক্রিয়া। বৈরাগ্য এবং ভক্তি দিয়ে অন্তঃকরণ শুদ্ধ হলে যে জ্ঞান লাভ হয় তুমি সেই জ্ঞানস্বরূপ এবং জ্ঞানদাতা গুরু। তোমাকে বার বার নমস্কার করি। মত্ত হাতী পাতাশুদ্ধ পদ্মফুল দাঁতে ধরে জল থেকে বেরিয়ে এলে সেই পদ্মের যে শোভা হয়, হে ভূধর, তুমি পর্বতসহ এই পৃথিবীকে দাঁতে ধরে রাখায় তারও সেই শোভা হয়েছে। পর্বতের চূড়ায় মেঘ জমা হলে পর্বতের যে শোভা হয়, দাঁতের উপর পৃথিবী ধরে থাকায় তোমার বেদময় বরাহদেহেরও সেই শোভা হয়েছে। হে প্রভু, তুমি জগতের পিতা, আর তোমার পত্নী এই পৃথিবী জগতের মাতা। তুমি স্থাবর জঙ্গমের বাসের জন্য এই পৃথিবীকে এমন ভাবে রাখ যেন তাঁর উপরে থেকে তোমাকে নমস্কার করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁকেও নমস্কার করতে পারি। যজ্ঞকারী যেমন মন্ত্র উচ্চারণ করে কাঠে আগুনের সঞ্চার করে, সেরকম তুমিও এই পৃথিবীতে নিজ তেজ অর্থাৎ ধারণশক্তি নিহিত করে রেখেছ। ৩৭-৪২

হে প্রভু, তুমি ছাড়া আর কে এমন শক্তিমান আছে যে পৃথিবীকে রসাতল থেকে উদ্ধার করতে ইচ্ছা করবে? কিন্তু তোমার এই কাজে বিস্ময়ের কিছু নেই, কারণ তুমি সকল বিস্ময়ের আধার। মায়ার সাহায্যে তুমিই এই অতি আশ্চর্য জগৎ সৃষ্টি করেছ। হে ঈশ্বর, আমরা জন, তপ এবং সত্যলোকবাসী বটে, কিন্তু তোমার বেদময় দেহের কম্পনে কেশর থেকে বিক্ষিপ্ত যে পরম পবিত্র জলকণা আমাদের দেহ স্পর্শ করল তাতেই আমরা পবিত্র হলাম। হে ভগবান, সমস্ত বিশ্ব তোমার যোগমায়ার সঙ্গে গুণের যোগে মুগ্ধ হয়ে আছে। তোমার লীলা অপার। যে তার শেষ দেখতে চায় সে মতিভ্রষ্ট। তুমি এই বিশ্বের মঙ্গল কর। যাতে জীবগণ তোমার অনন্ত এবং অচিন্ত্য শক্তি জানতে পেরে তোমাকে ভজনা করে সেই অনুগ্রহ কর। ৪৩-৪৫

মৈত্রেয় মুনি বলিলেন, সেই ব্রহ্মবাদী মুনিরা এই রকম স্তব করলে বরাহরূপী হরি নিজের খুরের আঘাতে আলোড়িত জলের উপর পৃথিবীকে রাখলেন। এই ভাবে অবলীলাক্রমে পৃথিবীকে রসাতল থেকে তুলে এনে তাকে জলের উপর রেখে তিনি অদৃশ্য হলেন। বৎস, শোক দুঃখ যিনি দূর করেন সেই বরাহরূপী ভগবানের মায়াময় চরিত্র কীর্তন করা উচিত। তাঁর মঙ্গলময় কথা যে শোনে বা শোনায় তার হৃদয়ে বিরাজিত হরি তখনি তার উপর সন্তুষ্ট হন। সকল মঙ্গলের আধার সেই শ্রীহরি সন্তুষ্ট হলে কোন্ বস্তু দুর্লভ থাকে? তখন সবই তুচ্ছ বলে

১ যজ্ঞাগ্নিতে ঘৃত আহুতি দেবার কাঠের হাতা। ২ ঐ ছোট্ট কাঠের হাতা। ৩ ঘৃতপানের পাত্র। ৪ যজ্ঞপাত্র বিশেষ ৫ ব্রহ্মভাগ পাত্র। ৬ সোমপাত্র। ৭ যজ্ঞবেদী ইষ্টকচয়ন।

মনে হয়, সাধনাও বিফল হয় না। বিদুর, ফলের কামনা না করে যারা একচিত্ত হয়ে ভগবানের আরাধনা করে, সকলের অন্তর্যামী ভগবান তাদের মনের ভাব জানতে পেরে নিজের পরম পদ প্রদান করেন। এই পৃথিবীতে পশু ছাড়া এমন কে আছে যে পুরুষার্থের সার জেনেও সংসারের পাপনাশক ভগবানের কথামৃত একবার পান করে তা থেকে দূরে থাকতে পারে? ৪৬-৫০

চতুর্দশ অধ্যায়

দিতির গর্ভোৎপত্তি

শুকদেব বললেন, কুশারুপুত্র মৈত্রেয় শ্রীহরির বরাহরূপের কথা বললেন। কিন্তু কেবল ঐটুকু শুনে বিদুরের তৃপ্তি হল না। তিনি হাতজোড় করে আবার জিজ্ঞাসা করলেন, মুনিবর, বরাহরূপী হরি পৃথিবী উদ্ধার করেন একথা আপনার কাছে শুনলাম। কিন্তু তিনি যখন লীলাচ্ছলে দাঁতে ধরে পৃথিবীকে তুলে আনছিলেন তখন দৈত্যরাজ হিরণ্যাক্ষের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ হল কেন? ঋষি, আমার মনে তৃপ্তি আসছে না, বরং আরো শুনবার জন্য কৌতূহল হচ্ছে। আমি আপনার শ্রদ্ধাবান ভক্ত। তাঁর জন্মকথা বিস্তারিত করে আমায় বলুন। মৈত্রেয় বললেন, বীর, তুমি শ্রীহরির অবতারের কথা শুনতে চেয়ে খুবই ভাল কাজ করেছ। কারণ হরিকথা মানুষকে মৃত্যুর বন্ধন থেকে মুক্ত করে। মহারাজ উত্তানপাদের বালকপুত্র ধ্রুব নারদের মুখে এই হরিকথা শুনে মৃত্যুর মাথায় পদাঘাত করে বিষ্ণুলোকে চলে গিয়েছিলেন। ১-৬

বিদুর, বরাহদেবের সঙ্গে হিরণ্যাক্ষের যুদ্ধের কথা দেবতারা ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। ব্রহ্মা দেবতাদের তা বলেন। আমি সেকথা শুনেছি, এখন তোমায় বলছি শোন। দক্ষকন্যা দিতি একদিন সন্ধ্যাকালে কামার্ত হয়ে পুত্র কামনা করে তাঁর স্বামী মরীচিপুত্র কশ্যপের কাছে গেলেন। কশ্যপ যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর জিহ্বা-স্বরূপ আগুনে বিষ্ণুরই উদ্দেশ্যে হোম শেষ করে, সূর্য অস্ত গেলে সমাধিমগ্ন অবস্থায় বসে ছিলেন। দিতি তাঁকে বললেন, নাথ, মত্ত হাতী যেমন কদলীতরুকে দলিত করে, তেমনি কামদেব তার ধনু নিয়ে তোমার সঙ্গে মিলিত হবার জন্য আমাকে সবলে পীড়ন করছে। আমার সপত্নীদের সৌভাগ্য দেখে আমি সবসময়ই দগ্ধ হচ্ছি; এখন আমি পুত্র ইচ্ছা করছি। তুমি আমাকে অনুগ্রহ কর, তোমার মঙ্গল হবে। যে নারীর তোমার মত স্বামী আছে এবং সেই স্বামীর আদর যে যথেষ্ট পায়, তার খ্যাতি সারা জগতে বিস্তৃত হয়। আর স্বামীই তো পুত্র হয়ে স্ত্রীর গর্ভে জন্মায়। বিবাহের আগে আমাদের স্নেহময় পিতা দক্ষ আমাদের পৃথক পৃথক ভাবে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তোমরা কাকে স্বামীরূপে চাও? আমরা তেরোটি বোন। আমরা প্রত্যেকে তোমাকেই চাই জেনে তিনি আমাদের সকলকেই তোমার হাতে দিয়েছেন। আমরা সকলেই তোমাকে সমান ভালবাসি। তাই তোমার পক্ষেও আমাদের সঙ্গে আচরণে কোন প্রভেদ রাখা উচিত নয়। আমি কাতর হয়ে তোমার মত মহাপুরুষের কাছে চাইতে এসেছি। যাতে আমার প্রার্থনা নিষ্ফল না হয়, তুমি তাই কর। ৭-১৫

এইভাবে দিতি অনেক কথা বলে তাঁর আর্তি জানালেন। কশ্যপ তাঁকে

অতিশয় কামমোহিত দেখে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, প্রিয়ে, তুমি ভয় পেয়ো না। তোমার ইচ্ছা আমি নিশ্চয়ই পূর্ণ করব। যার থেকে ধর্ম, অর্থ, কাম এই ত্রিবর্গ লাভ হয় তেমন পত্নীর কামনা পূর্ণ করে না এমন কে আছে? নাবিক যেমন জলযানে অন্যান্যদের নিয়ে নিজে সমুদ্র পার হয় তেমনি যার গৃহিণী আছে এমন গৃহস্থ গার্হস্থ্য-আশ্রমে থেকে অন্ন ইত্যাদি দান করে অন্যান্য আশ্রমবাসীদের দুঃখ দূর করে এবং নিজেও দুঃখ-সমুদ্র পার হয়। মানিনী, যে পুরুষ শ্রেয় কামনা করে, পত্নী তার অর্ধাঙ্গিনীর মত; ধর্মপত্নীর উপর সকল কাজের ভার দিয়ে পুরুষ নিশ্চিন্ত থাকতে পারে। দুর্গের অধিপতি যেমন দুর্গের আশ্রয়ে থেকে দস্যুদের জয় করে তেমনি আমরা তাঁকে আশ্রয় করে অনায়াসে আমাদের পরম শত্রু প্রবল ইন্দ্রিয়সকলকে জয় করতে পারি। অন্য আশ্রমীদের ইন্দ্রিয় জয় করতে অনেক কষ্ট স্বীকার করতে হয়। গৃহেশ্বরী, তুমি অশেষ উপকারী গৃহিণী। আমি বা অন্য কেউ সারা জীবনে, এমনকি পরজন্মেও এতদূর প্রত্যুপকার করতে পারবে না। তা হলেও আমি তোমার পুত্রকামনা নিশ্চয়ই পূর্ণ করব। তবে লোকে যাতে আমার নিন্দা না করে সেজন্য মুহূর্তকাল অপেক্ষা কর। ১৬-২২

এই সন্ধ্যা অতি ভয়ংকর সময়। এই সময় রুদ্রের অনুচর ভূতপ্রেতেরা এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়ায়। সাধ্বী, এই সন্ধ্যাকালে স্বয়ং ভগবান ভূতনাথও তাঁর বৃষে চড়ে ভূতগণের সঙ্গে বেড়ান। সেই ভূতভাবনের উজ্জ্বল জটার রাশি শ্মশানের ঘূর্ণি হাওয়ায় উড়ে-আসা ধূলোয় ধূসর; তাঁর রজতশুভ্র দেহ ভস্মে ঢাকা। তিনি চন্দ্র, সূর্য আর অগ্নি এই তিনটি চোখ দিয়ে সব কিছুই দেখছেন। তিনি আবার তোমার দেবর, কারণ তিনি প্রজাপতি দক্ষের জামাতা বলে আমার ভাই হন। কাজেই তোমার লজ্জা পাওয়ার কথা। এ-জগতে কেউ তাঁর আত্মীয় বা পর নয়, বা কারো প্রতি তাঁর অনুরাগ বা বিরাগও নেই। যে মায়াময় বিভূতিকে তিনি নির্মাল্যের মত পা দিয়ে ঠেলে ফেলে দেন, আমরা তাকেই মহাপ্রসাদ মনে করে পাবার জন্য কত চেষ্টা করি। পণ্ডিতেরা অবিদ্যার আবরণ ছিন্ন করবার জন্য তাঁর অমল চরিত্র কীর্তন করে থাকেন। যারা মুক্তি চায় তাদের ত্যাগ শেখাবার জন্য তিনি নিজে সমস্ত ভোগ ত্যাগ করে পিশাচের মত আচরণ করেন। কুকুরের খাদ্য এই দেহকে আত্মা মনে করে যারা তাকে বস্ত্র, মালা, অলংকার এবং চন্দন ইত্যাদি দিয়ে সাজায় তারা আত্মরত শ্রীমহাদেবের লোকশিক্ষার ইচ্ছা বুঝতে না পেরে তাঁকে উপহাস করে। ২৩-২৮

ব্রহ্মা ইত্যাদি দেবতারা যাঁর ব্যবস্থা অনুসারে নিজের অধিকারে থেকে তাঁর আদেশ পালন করছেন, এই বিশ্ব যিনি সৃষ্টি করেছেন এবং মায়া যাঁর আজ্ঞাধীন তিনি যে পিশাচের মত ব্যবহার করছেন তা তর্কের দ্বারা বোঝাবার নয়, শুধু অনুকরণ করবার বস্তু। মৈত্রেয় বললেন, স্বামী এত রকমে প্রবোধ দিলেও দিতি লজ্জাহীন বেশ্যার মত স্বামীর বস্ত্র ধরে টানলেন। কাম তাঁর চিত্তকে দলিত করছিল। ঋষি যখন দেখলেন দিতি যা চাইছেন তা করবেনই তখন তিনি ঈশ্বরকে প্রণাম করে প্রিয় পত্নীর সঙ্গে নির্জন জায়গায় গেলেন। রমণ শেষ হলে কশ্যপ স্নান করে প্রাণায়াম করলেন। তারপর জ্যোতির্ময় পরব্রহ্মের ধ্যান করতে করতে প্রণব জপ করতে লাগলেন। দিতি নিজের নিন্দনীয় কাজের জন্য লজ্জা পেয়ে ঋষির কাছে এসে মুখ নীচু করে বললেন, ব্রহ্মা, ভূতগণের পতি রুদ্রের কাছে আমি মহা অপরাধ করেছি। আমার গর্ভের শিশুকে তিনি যেন নষ্ট না করেন দয়া করে তুমি তা কর। সেই মহাদেব অবহেলার পাত্র নন। ফলকামনা করে যাঁরা কাজ করেন তিনি তাঁদের ইচ্ছা পূর্ণ করেন, আর যাঁরা নিষ্কাম ভক্ত তাঁদেরও কল্যাণ

করেন। তিনি দণ্ডধারণ না করেও দুষ্টদের দণ্ড দেন। ক্রোধ-রূপে তিনিই সৃষ্টি নাশ করেন; তাঁকে আমি নমস্কার করি। তিনি আমার ভগ্নীপতি, অনেক তাঁর দয়া। তিনি সতীরও পতি, তাই নারীর চরিত্র জানেন। তিনি আমার প্রতি তুষ্ট হোন। ২৯-৩৬

মৈত্রেয় বললেন, সান্ধ্য আরাধনা শেষ করে কশ্যপ দেখলেন দিতি রুদ্রের ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে নিজ সন্তানের মঙ্গল প্রার্থনা করছেন। পত্নীর ঐ অবস্থা দেখে কশ্যপ বললেন, অভদ্রে, তোমার চিত্ত অপবিত্র, সন্ধ্যাকালের যে দোষ তাও তুমি গণ্য করলে না, আবার আমার কথা শুনলে না এবং মহাদেবকে অবহেলা করলে—এই চারটি কারণে তোমার গর্ভে দুটি অধম পুত্র জন্মগ্রহণ করবে এবং লোকপালদের আর ত্রিভুবনকে পীড়ন করবে। তারা যখন দীন, নির্দোষ প্রাণীদের হত্যা করবে এবং স্ত্রীলোকের উপর অত্যাচার করে সাধুদের ক্রোধের কারণ হবে, তখন বজ্রধর ইন্দ্র যেমন বজ্রের আঘাতে পর্বতসকলকে সংহার করেন, লোকস্রষ্টা ভগবান বিশ্বেশ্বর তেমনি ক্রুদ্ধ হয়ে অবতার রূপে আসবেন এবং তাদের ধ্বংস করবেন। ৩৭-৪১

দিতি বললেন, প্রভু, আমার পুত্রদুটি যদি নিতান্তই বধের যোগ্য হয় তবে আমার প্রার্থনা এই যে ভগবান যেন নিজ হাতে তাদের বধ করেন। ব্রহ্মশাপে যেন তাদের মৃত্যু না হয়। কারণ ব্রহ্মশাপে যারা মরে সকলেই তাদের ভয় করে। নরকের অধিবাসীরাও তাদের দয়া করে না; তারা যেখানেই জন্মগ্রহণ করুক, কোনখানেই কারো অনুগ্রহ পায় না। কশ্যপ বললেন, প্রিয়ে, তুমি নিজের অপরাধের জন্য দুঃখিত ও অনুতপ্ত হয়েছ এবং কোনটা উচিত কোনটা অনুচিত তা এখনি বিচার করে বুঝতে পেরেছ। তুমি আমাকে যেমন ভালবাস তেমনি ভগবান রুদ্রকেও যথেষ্ট ভক্তি কর। তাই তোমার দুই পুত্রের মধ্যে একজনের পুত্র তার সাধু চরিত্রের জন্য সাধুদের মধ্যেও বরেণ্য হবে। লোকে যেমন ভগবানের গুণগান করে তেমনি তারও গুণগান করবে। সোনা বিবর্ণ হলে যেমন আগুনে পুড়িয়ে তাকে শুদ্ধ করা হয়, তেমনি সাধুরা নির্বেদ প্রভৃতি যোগ দ্বারা নিজেদের হৃদয় শুদ্ধ করবেন, যাতে তাঁর স্বভাব পেতে পারেন। এই জগৎ তাঁরই স্বরূপ বলে যিনি প্রসন্ন হলে জগৎ প্রসন্ন হয়, সেই আত্মসাক্ষী ভগবান তাঁর একনিষ্ঠ ভক্তিতে পরম তুষ্ট হবেন। পরম ভাগবত, মহাত্মা এবং সজ্জনদের চূড়ামণি তোমার সেই পৌত্র ক্রমেই বর্ধমান ভক্তি দ্বারা শুদ্ধচিত্ত হয়ে শ্রীহরিতে নিবিষ্ট হবে এবং দেহের অভিমান ত্যাগ করবে। সে বিষয়ে অনাসক্ত, সচ্চরিত্র এবং নানা গুণের আধার হবে। অন্যের সুখে সে সুখী হবে, অন্যের দুঃখে দুঃখ পাবে। তার শত্রু থাকবে না। নক্ষত্রদের রাজা চন্দ্র যেমন গ্রীষ্মের তাপ দূর করে সেও তেমনি জগতের দুঃখ দূর করবে। প্রিয়তমে, অন্তরে এবং বাইরে যিনি কলুষহীন, পদ্মলোচন, ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূরণের জন্য বার বার যিনি রূপধারণ করেন, যিনি দেবী লক্ষ্মীর অলংকার এবং যাঁর মুখমণ্ডলে সর্বদা উজ্জ্বল কুণ্ডলে শোভা পাচ্ছে সেই ভগবানকে তোমার ঐ পৌত্র সবসময় দর্শন করবে। মৈত্রেয় বললেন, বিদুর, নিজের এক পৌত্র ভগবানের ভক্ত হবে একথা শুনে দিতি খুব আনন্দিত হলেন এবং কৃষ্ণেরই হাতে তাঁর দুই পুত্র নিহত হলে তাদের সদ্গতি হবে চিন্তা করে, তিনি হৃদয়ে যথেষ্ট উৎসাহ অনুভব করলেন। ৪২-৫১

পঞ্চদশ অধ্যায়

বৈকুণ্ঠস্থ দুই বিষ্ণুভক্তের প্রতি ব্রাহ্মণদের অভিশাপ

মৈত্রেয় বললেন, দিতি একশ বছর প্রজাপতি কশ্যপের বীর্য ধারণ করলেন। ঐ বীর্য এত উগ্র যে তাতে অন্য দেবতাদের তেজ নষ্ট হয়ে যায়। নিজের দুই পুত্র দেবতাদের পীড়ন করবে এই কথা চিন্তা করে দিতির মনে ভয় এবং দুঃখ দুইই হল। তাঁর গর্ভের তেজে সূর্য-চন্দ্রের জ্যোতি ম্লান হয়ে গেল, লোকপালগণ তাঁদের তেজ হারিয়ে ফেললেন। দশ দিক অন্ধকারে ভরে যেতে দেখে তাঁরা উদ্বিগ্ন হয়ে ব্রহ্মাকে গিয়ে নিবেদন করলেন, প্রভু, যে অন্ধকার দেখে আমরা ভয় পাচ্ছি তার কারণ আপনিই জানেন, কারণ আপনার ষড়ৈশ্বর্যময় জ্ঞানের পথ কাল কখনও লুপ্ত করতে পারে না। দেবদেব, আপনি জগতের বিধাতা, লোকপালদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ভালমন্দ কোন প্রাণীর ইচ্ছাই আপনার অজানা নয়। জ্ঞানই আপনার শক্তি, মায়ার দ্বারা রজোগুণ গ্রহণ করে আপনি এই ব্রহ্মদেহ ধারণ করেছেন। আপনিই জগৎকারণ, আপনাকে প্রণাম করি। চরাচর ত্রিভুবন আপনাতেই গ্রথিত রয়েছে, কেননা জগতের কারণ হয়েও আপনি তার থেকে আলাদা। সমস্ত জীব আপনারই সৃষ্টি। যে সব সিদ্ধযোগী প্রাণ, ইন্দ্রিয় এবং মনকে বশ করে নিষ্কাম ভাবে ভক্তিযুক্ত হয়ে আপনার ধ্যান করেন, তারা আপনার অনুগ্রহ পান, কোথাও তাঁদের পরাভব হয় না। গরু যেমন দড়ি দিয়ে বাঁধা থাকে, জীবগণ তেমনি আপনার বেদবাক্যরূপ রজ্জুতে থেকে নিজ নিজ বর্ণাশ্রমের বিধি অনুসারে কাজ করছে। আপনি সকলের চালক, আপনাকে নমস্কার। এখন চারদিক অন্ধকারে আচ্ছন্ন হওয়াতে দিনরাত্রির প্রভেদ বোঝা যাচ্ছে না। তাই বিধি অনুসারে যে সময়ে যা করবার কথা তা করা যাচ্ছে না। আমরা মহাবিপদে পড়েছি, আমাদের দিকে কৃপাদৃষ্টিতে তাকান। শুকনো কাঠ পেলে আগুন যেমন বেড়ে ওঠে, দিতির গর্ভস্থ কশ্যপের বীর্য তেমনি বেড়ে উঠে সমস্ত দিক অন্ধকারে পূর্ণ করছে। ১-১০

মৈত্রেয় বিদুরকে বললেন, বিদুর, দেবতাদের প্রার্থনা শুনে ব্রহ্মা দিতির কুকাজের কথা স্মরণ করে মৃদু হাসলেন এবং মধুর বাক্যে তাঁদের প্রীত করে বললেন, তোমাদের সৃষ্টি করবার আগে আমি সংকল্পের সাহায্যে সনক প্রভৃতি পুত্রদের সৃষ্টি করেছিলাম। একদিন তাঁরা জগতের সব কিছুতে নিস্পৃহ হয়ে আকাশপথে নানা লোকে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। বেড়াতে বেড়াতে একসময় তাঁরা সর্বলোকের পূজনীয় অমলাত্মা ভগবান বিষ্ণুর বৈকুণ্ঠধামে উপস্থিত হন। বৈকুণ্ঠলোকে যাঁরা বাস করেন তাঁরা সকলেই বিষ্ণুর মত মূর্তিধারী। নিষ্কাম ধর্মের দ্বারা শ্রীহরির আরাধনার ফলেই তাঁরা ভগবানের মত হয়ে বৈকুণ্ঠে বাস করছেন। ১১-১৪

এই বৈকুণ্ঠধামে বেদান্তের একমাত্র জ্ঞেয় ধর্মরূপী আদিপুরুষ ভগবান বিশুদ্ধ সত্ত্বমূর্তি ধারণ করে ভক্তদের সুখী করছেন। এখানে একটি অতি সুন্দর বন আছে, তার নাম নৈঃশ্রেয়স। সেই বনের সব তরুই কল্পতরু, আর ছয় ঋতুতে যত ফুল ফোটে তার সবই একই সঙ্গে সেখানে ফুটে আছে। এইসব কারণে সেই বনের এত অপূর্ব শোভা হয়েছে যে মনে হয় মোক্ষই কাননের রূপ ধরে বিরাজ করছে। সেখানে সরোবরে-ফোটা বসন্তের ফুলের মধুর সুগন্ধ বয়ে বাতাস প্রবাহিত হচ্ছে। যাঁরা আকাশপথে ঘুরে বেড়ান সেই গন্ধর্বরা নিজেদের পত্নীদের নিয়ে ঐ রমণীয় বনে

সবসময় ভগবানের গুণগান করছেন। সুগন্ধ বাতাস তাঁদের চিত্তকে চঞ্চল করলেও তাঁরা গান বন্ধ করেন না। শ্রীভগবানের বনমালায় যে সব ভ্রমর লগ্ন হয়ে আছে তাদের গুঞ্জনও হরিকথার মতই শোনায়; আর তা শুনে সেখানকার পায়রা, কোকিল, সারস, চক্রবাক, চাতক, হাঁস, শুক, তিতির আর ময়ূর প্রভৃতি পাখীরা কিছুক্ষণের জন্য তাদের কোলাহল থামায়। তুলসী হল শ্রীহরির ভূষণ। তিনি যখন বনে বিহার করেন তখন তুলসীর ঘ্রাণকে আদর করছেন দেখে মন্দার, পারিজাত, কুন্দ, কুরুবক, চাঁপা, পুন্নাগ, নাগকেশর, বকুল, নানারকম পদ্ম ইত্যাদি ফুলেরা তুলসীর তপস্যার (অর্থাৎ যার দ্বারা সে ঐরকম সৌভাগ্য লাভ করেছে তার) অনেক প্রশংসা করে থাকে। ১৫-১৯

ভগবানের ভক্তগণের অসংখ্য বৈদূর্য, মরকত আর স্বর্ণ নির্মিত আকাশযানে বৈকুণ্ঠ পূর্ণ। যেসব ভক্ত শ্রীহরির চরণে প্রণতি করেন তাঁরা কেবলমাত্র ভক্তিদ্বারা এইসব দেখে থাকেন। এইসব ভক্তগণ শ্রীহরির চরণে এত অনুরক্ত যে পরমা সুন্দরী নিতম্বিনী রমণীরা তাদের মৃদুহাসি বা পরিহাস ইত্যাদি দ্বারা তাদের মনে কামভাব জাগাতে পারে না। যাঁর অনুগ্রহ পাবার জন্য ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবতারা পর্যন্ত চেষ্টা করে থাকেন সেই লক্ষ্মী মনোহর মূর্তিতে ইতস্তত ঘুরে মধুর নূপুরধ্বনিতে চারদিক মুখরিত করছেন। স্বর্ণখচিত স্ফটিকের ভিত্তিতে তাঁর ছায়া দেখে মনে হয় যেন তিনি হাতের লীলাকমল দিয়ে নিজেই বৈকুণ্ঠে হরির মন্দির সম্মার্জন করছেন। দেবগণ, লক্ষ্মীদেবীর নিজের একটি বন আছে; তার নাম লক্ষ্মীবন। সেখানে সরোবরের ধারগুলো প্রবালে বাঁধান, আর তার জল অমৃতের মত। সেই সরোবরের তীরের কাছে উপবনে বসে লক্ষ্মীদেবী সখীদের সঙ্গে তুলসী দিয়ে ভগবানের পূজা করতে করতে যখন জলে নিজের ছায়া দেখেন, তখন নিজের কুঞ্চিত চারু কেশরাশি এবং সুন্দর নাসিকাযুক্ত মুখ দেখে মনে করেন স্বয়ং ভগবানই তাঁর মুখ চুম্বন করলেন। দেবগণ, যেসব মানুষ পাপহরণ শ্রীহরির সৃষ্টি ইত্যাদি লীলা কীর্তন না করে শুধু অর্থ আর কামনার বিষয়ের কথা শোনে, তাদের মতিচ্ছন্ন হয়, তারা কখনই বৈকুণ্ঠে যেতে পারে না। ঐসব কুকথা তাদের আগেকার সঞ্চিত পুণ্যকেও ক্ষয় করে তাদের ভীষণ নিরাশ্রয় নরকে নিয়ে যায়। মানুষের এই দেহেই ধর্মজ্ঞান ও তত্ত্বজ্ঞান দুইই লাভ হতে পারে। তোমরা এবং আমি যে মানবদেহ ধারণ করতে চাই, সেই মানবদেহ পেয়েও যারা ভগবানের আরাধনা না করে তারা ভগবানের মায়ায় একেবারেই মুগ্ধ। বৈকুণ্ঠলোক আমার ব্রহ্মলোকের থেকেও উচ্চে। যাঁরা অহঙ্কারশূন্য এবং আমাদের থেকেও বড় যোগী, তাঁরাই সেই পরম পবিত্র বৈকুণ্ঠলোকে যান। সব সময় হরির গুণগান করতে করতে তাঁদের অঙ্গকান্তি এমন উজ্জ্বল প্রভাময় হয়ে ওঠে যে যমও তাঁদের কাছে যেতে পারেন না। তাঁরা এত গভীর অনুরাগের সঙ্গে ভগবানের গুণকীর্তন করেন যে তাঁদের দেহ আনন্দে অবশ হয়, চোখ বাষ্পে পূর্ণ হয়ে জল পড়তে থাকে। ২০-২৫

দেবগণ, তারপর মুনিরা যোগমায়া দ্বারা সেই আশ্চর্য বৈকুণ্ঠলোকে এসে অতুল আনন্দ লাভ করলেন। তাঁরা বৈকুণ্ঠের ছয়টি দ্বার পার হলেন। ভগবানকে দর্শন করবার জন্য তাঁরা এত আকুল হয়েছিলেন যে বৈকুণ্ঠের নানা অদ্ভুত বস্তুতে তাঁরা মন দিলেন না। ক্রমে সপ্তম দ্বারে উপস্থিত হয়ে তাঁরা দুজন দ্বারপালকে দেখতে পেলেন। তাদের দুজনেরই এক বয়স, হাতে গদা। দুজনেই অতিসুন্দর কেয়ূর, কুণ্ডল, কিরীট ইত্যাদিতে সজ্জিত, দুজনের পরনে সুন্দর বেশ। তাদের গলার নীলবর্ণ বনমালা চার বাহুর মাঝখানে দুলছিল এবং তাতে অপূর্ব শোভা হচ্ছিল। মালায় ফুলে ভ্রমর উড়ে উড়ে পড়াতে তার সৌন্দর্য আরো বেড়ে যাচ্ছিল। কিন্তু

তাদের একটু ফুলে-ওঠা নাসা, অল্প লাল চোখ আর কুটিল ভ্রূ দেখে দুজনকেই একটু ক্রুদ্ধ মনে হচ্ছিল। সনক প্রভৃতিরা আগে যেমন স্বর্ণখচিত বজ্রময় ছ'টি দরজা পার হয়ে এসেছেন এখনও সেরকম ঐ দুই দ্বারপালকে জিজ্ঞাসা না করেই সপ্তম দরজা পার হয়ে ভেতরে ঢুকে পড়লেন। তাঁদের অবশ্য জিজ্ঞাসার প্রয়োজনও ছিল না, কারণ সব কিছুতেই তাঁদের সমান দৃষ্টি এবং তাঁরা নির্ভয়ে ও অবাধে সব জায়গায় গিয়ে থাকেন। ঐ মুনিদের আত্মতত্ত্বের জ্ঞান হওয়াতে তাঁরা বয়সে বৃদ্ধ হলেও স্বভাবে পাঁচ বছরের বালকের মত। কিন্তু ভগবান ভক্তবৎসল হলেও তাঁর ঐ দুই দ্বারপালের স্বভাব তাঁর স্বভাবের বিপরীত। তাই তারা যখন দেখল ক'জন উলঙ্গ বৃদ্ধ ভেতরে ঢুকছেন, তখন উপহাস বাক্যে এবং বেতহস্তে তাঁদের বারণ করল। বৈকুণ্ঠের দেবতারা দেখলেন যে তাঁদের সামনেই ঐ দুই দ্বারপাল অতি পূজনীয় মুনিদের পুরীতে ঢুকতে নিষেধ করল। তাঁরা শ্রীহরিকে দর্শনের জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল ছিলেন এবং হঠাৎ এভাবে বাধা পেয়ে খুবই ক্রুদ্ধ হলেন, তাঁদের দুই চোখ জ্বলে উঠল। মুনিরা দ্বারপালদের বললেন, বহু জন্ম যাঁরা শ্রীহরির সেবা করেছেন তাঁরাই এই বৈকুণ্ঠধামে আসতে পারেন। আর বৈকুণ্ঠে যাঁরা বাস করেন তাঁরা শ্রীভগবানের স্বভাবই পেয়ে থাকেন। তবে তোমাদের এমন বিপরীত স্বভাব দেখছি কেন? ভগবানের শত্রু কেউ নেই, আর ভক্ত ছাড়া বৈকুণ্ঠে অন্য কারো আসবার শক্তিও নেই। তবে তোমরা কি মনে করে আমাদের বাধা দিলে? আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারছি তোমরা নিজেরাই কপটস্বভাব এবং নিজেদের স্বভাব অনুসারে চিন্তা করছ যে কোন দুষ্ট লোক বুঝি বৈকুণ্ঠে প্রবেশ করছে। ভেদজ্ঞান থেকেই ভয় জন্মায়। সমস্ত জগৎ ভগবানের উদরে অবস্থিত। তাই পণ্ডিতেরা কখনই নিজের আত্মাকে ভগবানের থেকে ভিন্ন মনে করেন না। তোমাদের বেশবাস দেবতাঁর মত; অথচ তোমরা কোন্ বিষম বিপদের ভয়ে ভীত হয়ে আমাদের বারণ করলে, তা বল। তোমরা বৈকুণ্ঠনাথের ভৃত্য হয়েও মন্দবুদ্ধি হয়েছে। তাই তোমাদের মঙ্গলের জন্য যাতে এই অপরাধের প্রতিকার হয় সে কথা চিন্তা করছি। তোমাদের দৃষ্টিতে ভেদ রয়েছে। তাই তোমরা বৈকুণ্ঠলোক ত্যাগ করে যে লোক কাম, ক্রোধ আর লোভের আবাস সেখানে গিয়ে জন্মগ্রহণ কর। দ্বারপাল দু'জন মুনিদের কথা শুনে খুব ভীত হল। তারা বুঝতে পারল যে এ ব্রহ্মশাপ ছাড়া কিছু নয়, আর ব্রহ্মশাপ অস্ত্র দিয়ে নিবারণ করা যায় না। তারা যাঁর ভৃত্য সেই শ্রীহরি স্বয়ং তাদের চেয়ে ঐ মুনিদের বেশী ভয় করে থাকেন। তখন তারা অত্যন্ত কাতর হয়ে মুনিদের পায়ে পড়ে বিনয়ের সঙ্গে বলল, আমরা অপরাধী। আপনারা আমাদের জন্য যে শাস্তির ব্যবস্থা করলেন তাতে ঈশ্বরের আদেশ অবজ্ঞা করার পাপ থেকে আমরা মুক্ত হব। কাজেই তাই হোক। কিন্তু একটি প্রার্থনা এই যে আমরা যত নীচ যোনিতেই জন্মাই না কেন, আপনাদের কৃপায় আমাদের মনে যে অনুতাপের উদয় হয়েছে তার বলে মোহ এসে যেন ভগবানের স্মৃতিকে নষ্ট না করে। তখনই ভগবান পদ্মনাভ জানতে পারলেন যে তাঁর দুই ভৃত্য সাধুদের কাছে অপরাধী হয়েছে। তিনি অচিরে লক্ষ্মীদেবীর সঙ্গে পদব্রজে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। পদব্রজে এলেন, কারণ ভগবান বুঝেছিলেন যে তাঁর চরণ দর্শনের বাধা হওয়াতেই মুনিরা ক্রুদ্ধ হয়েছেন, চরণ দর্শন করলেই তাঁদের ক্রোধ দূর হবে। আর লক্ষ্মীকে সঙ্গে আনার অর্থ এই যে তিনি নিষ্কাম ব্যক্তিকেও ঐশ্বর্যে পূর্ণ করেন। ২৬-৩৭

মুনিরা দেখলেন শ্রীভগবান আগমন করছেন। যাঁকে তাঁরা সমাধি দ্বারা ব্রহ্মরূপে দেখেন, তাঁকে এখন চোখের সামনে দেখে তাঁরা অপলকনেত্রে তাকিয়ে রইলেন।

তাঁর দু'পাশে হাঁসের মত সাদা দুখানি চামর দুলছে, মাথায় ধরা শ্বেত ছত্র, ছত্রের চারপাশে মুক্তার হার ঝুলছে। বাতাসে মুক্তার মালায় শোভিত ছত্র এদিক ওদিক নড়ছিল এবং তা থেকে বিন্দু বিন্দু জল ঝরে ভগবানের গাত্র স্পর্শ করছিল। তাঁর শ্রীমুখ দ্বারপাল এবং মুনিদের প্রতি করুণায় প্রসন্ন। ভগবান সর্বগুণের আধার। তাঁর প্রেমপূর্ণ দৃষ্টিপাতে সকলের মনে সুখের উদয় হল। লক্ষ্মী তাঁর বিশাল বক্ষে শোভিতা। সত্যলোক পর্যন্ত সমস্ত স্বর্গের চূড়ামণি বৈকুণ্ঠধাম ভগবানের সৌন্দর্যে বহুগুণ সুন্দর হয়েছে। তাঁর নিতম্বদেশ পীতবসনের উপর উজ্জ্বল অলংকারে শোভা পাচ্ছে। বক্ষের বনমালায় ভ্রমর ঝংকার করছে। তাঁর মণিবন্ধে সুদৃশ্য বলয়। তিনি বাম হাত গরুড়ের কাঁধে রেখে দক্ষিণ হাতে লীলাকমল ঘূর্ণিত করছেন। ৩৮-৪০

তাঁর মকরের আকৃতি দুই কুণ্ডলের দীপ্তি বিদ্যুৎকে হার মানায়। সেই কুণ্ডল যেন তাঁর কপোলের সৌন্দর্যে আরো সুন্দর হয়ে উঠেছে; তাঁর নাসিকা তীক্ষ্ন এবং মাথায় মণিময় মুকুট। তাঁর চার বাহুর মাঝখানে মনোহর হার, গলায় কৌস্তুভমণি। ৪১

নানা সৌন্দর্যে পূর্ণ ভগবানের মূর্তি দেখে তাঁর ভক্তগণ ভাবলেন, সব সৌন্দর্যের আধার বলে কমলা লক্ষ্মীর যে গর্ব, তা আজ শ্রীহরির সৌন্দর্যে খর্ব হল। দেবগণ, আমার (ব্রহ্মার), মহাদেবের এবং তোমাদের জন্য ভগবান তাঁর আরাধ্য রূপ প্রকাশ করেন। মুনিগণ সেই রূপ দেখে আনন্দে মাথা নত করে প্রণাম করলেন। সেই রূপ দেখে দেখে তাঁদের আর তৃপ্তি হচ্ছিল না। ৪২

তখন কমলাক্ষ ভগবানের দুই চরণে জড়ান পদ্মকেশরের সঙ্গে মেশানো তুলসীর সুগন্ধে সুগন্ধি বাতাস নাসাপথে প্রবেশ করে ব্রহ্মানন্দসেবী মুনিদেরও মনে পরম আনন্দ আর দেহে রোমাঞ্চের সৃষ্টি করল। ভগবানের মুখমণ্ডল যেন নীলপদ্মের কুঁড়ি, তাঁর রক্তিম অধর এবং ওষ্ঠে কুন্দকুসুমের মত মধুর হাসি। তাঁর চরণের নখসমূহ যেন একসার রক্তরাগ মণি। এইভাবে মুনিরা প্রথমে উপরে তাকিয়ে ভগবানের শ্রীমুখ দেখলেন, তারপর নীচে তাকিয়ে তাঁর চরণশোভা দেখলেন। বার বার দেখেও ভগবানের সর্বাঙ্গের লাবণ্য একসঙ্গে অনুভব করতে না পেরে অবশেষে তাঁরা ধ্যানমগ্ন হলেন। ৪৩-৪৪

পরমগতি প্রার্থনা করে যে সব পুরুষ যোগের পথ অনুসরণ করেন, ভগবান তাঁদের ধ্যানের বস্তু এবং অতি আদরের ধন। তাঁর এই পুরুষমূর্তি অতি মনোহর, অসাধারণ এবং অণিমা, লঘিমা ইত্যাদি আটটি ঐশ্বর্যে সর্বদা পূর্ণ। ভগবান ঐ মূর্তি দেখালে মুনিগণ তাঁর স্তব আরম্ভ করলেন। ৪৫

তাঁরা বললেন, হে অনন্ত, তুমি সবার হৃদয়ে থেকেও দুরাত্মাদের কাছে অদৃশ্য। আজ কিন্তু তুমি আমাদের চোখে ধরা দিলে। আমাদের পিতা ব্রহ্মা যখন তোমার রহস্য আমাদের বলেছিলেন তখনই তুমি আমাদের কর্ণপথ দিয়ে হৃদয়ে প্রবেশ করেছ। হে ভগবান, যেসব মুনিদের অভিমান বা রাগ নেই তাঁরা দৃঢ় ভক্তিযোগের দ্বারা যে গূঢ় তত্ত্ব হৃদয়ে উপলব্ধি করেন, আমরা বুঝতে পারছি, তুমিই সেই আত্মস্বরূপ পরমতত্ত্ব। তুমি বিশুদ্ধসত্ত্ব শ্রীমূর্তি; ঐ রূপ দ্বারা তুমি প্রতিক্ষণ ভক্তদের প্রীতিসাধন করছ। ৪৬-৪৭

ভক্তেরা তোমার অতি রমণীয় এবং পবিত্র যশ কীর্তন করে থাকেন। যে সব বুদ্ধিমান ব্যক্তি তোমার শ্রীচরণের আশ্রয় নিয়েছে এবং তোমার কথার রস আস্বাদ করেছে তারা এমনকি মোক্ষকেও তুচ্ছ জ্ঞান করে। ইন্দ্রত্ব প্রভৃতি তো তাদের কাছে

কিছুই নয়, কেননা তোমার কটাক্ষরূপ কাল ইন্দ্রকেও গ্রাস করতে পারে। হে ভগবান, এর পূর্বে পাপ আমাদের স্পর্শ করেনি; আজ তোমার ভক্তদের শাপ দিয়ে আমরা পাপ করলাম। এই অপরাধে যদি কোন অধমলোকে আমাদের জন্ম নিতে হয় তাতে দুঃখ নেই। কিন্তু বার বার কাঁটা ফুটলেও ভ্রমর যেমন ফুলে ফুলেই ঘুরে বেড়ায়, তেমনি আমাদের মন যেন কোন বাধাকেই গণ্য না করে সবসময় তোমার চরণকমলে আসক্ত থাকে। তোমার চরণে আছে বলেই যেমন তুলসীর শোভা তেমনি আমাদের বাক্যও যেন তোমার শ্রীচরণের গুণকীর্তন করেই সুন্দর হয়। আমাদের কান যদি তোমার গুণকথায় সবসময় পূর্ণ থাকে তবে যতই নরকবাস হোক না কেন, তাতে আমাদের ক্ষতি নেই। হে বিপুলকীর্তি, তোমার যে রূপ তুমি আমাদের দেখালে তাতে আমাদের চোখ বড়ই তৃপ্ত পেল। যারা জিতেন্দ্রিয় নয় তাদের ভাগ্যে এ রূপ দর্শন হয় না। আজ এভাবে যে তুমি আমাদের দেখা দিলে তার জন্য আমরা বার বার তোমাকে নমস্কার করি। ৪৮-৫০

ষোড়শ অধ্যায়

জয় ও বিজয়ের বৈকুণ্ঠ থেকে অধঃপতন

ব্রহ্মা বললেন, ভগবান বিষ্ণু মুনিদের স্তব শুনে তাঁদের সন্তোষ বিধান করে বললেন, আমার এই দুটি পার্ষদের নাম জয় আর বিজয়। আমার প্রতি অবজ্ঞা দেখিয়েই ওরা তোমাদের মত মানীজনের ওপর অন্যায় আচরণ করেছে। তোমরা দেবতাদের মত পূজনীয়। তোমরা আমার অভিপ্রায় অনুসারেই চলে থাক। তোমরা যে দণ্ড দিয়েছ তাতে আমার সম্মতি আছে। ব্রাহ্মণই আমার পরম দেবতা। সুতরাং তোমাদের আমি ক্ষমা করলাম। আমার ভৃত্যেরা তোমাদের প্রতি যে দুর্ব্যবহার করেছে সেটা আমিই করেছি বলে আমি মনে করি। ভৃত্যেরা অপরাধ করলে লোকে তার প্রভুকেই দুর্নাম দেয়। রোগে যেমন চর্ম বিবর্ণ হয় সেরূপ কীর্তিমান প্রভুর কীর্তি ভৃত্যের আচরণে ম্লান হয়। যাঁর অমৃতের মত অমল যশোগাথা কানে প্রবেশ করলে আচণ্ডাল সমস্ত জগৎ সদ্য সদ্য পবিত্র হয়ে ওঠে আমিই সেই বিকুণ্ঠ, সর্বত্র আমার অপ্রতিহত গতি। তোমাদের কাছ থেকেই আমার সেই তীর্থতুল্য শোভন কীর্তি লব্ধ হয়েছে। তাই তোমাদের প্রতিকুল আচরণে যদি আমার নিজের বাহুও উদ্যত হয় তাহলে সেই বাহু তৎক্ষণাৎ ছেদন করি, অন্যদের কথা তো বহু দূরে। তোমাদের সেবা করেই আমার চরণপদ্মের রেণু পবিত্র ও পাপনাশক হয়েছে। আবার, তোমাদের সেবা করেই আমি এমন স্বভাব পেয়েছি যে, যে-লক্ষ্মীকে ক্ষণেক দেখবার জন্য ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবতারা পর্যন্ত নানা বিধিনিয়ম পালন করেন সেই লক্ষ্মী চঞ্চলা হলেও এবং আমি নিরাসক্ত হলেও আমাকে কখনও ছেড়ে যান না। ১-৭

দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ, আমি যজ্ঞে অগ্নিরূপ মুখদ্বারা যজমানের হবি (আহুত ঘৃত) আহার করি সত্য। কিন্তু যে সকল পরম জ্ঞানী ব্রাহ্মণ নিষ্কামভাবে আমাতেই কর্ম-ফল সমর্পণ করে প্রতি গ্রাসের রস আস্বাদ করে ঘৃতাক্ত পায়সাদি আহার করেন, তাঁদের মুখে আমার যেমন ভোজন হয়, যজ্ঞে অগ্নিমুখ দ্বারা তেমন হয় না। যাঁর পাদোদক-স্বরূপ গঙ্গা চন্দ্রচূড়ের সঙ্গে লোকপালদেরও পবিত্র করে, যাঁর যোগ-

মায়ার বিভূতি অখণ্ড এবং অপ্রতিহত, সেই আমি যে ব্রাহ্মণদের পদরেণু নিজের কিরীটে সসম্মানে ধারণ করে থাকি তাঁরা অপকার করলেও তা কে না সহ্য করবে ? আমারই শরীররূপ ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠদের, দুগ্ধবতী গাভীদের আর রক্ষকহীন প্রাণীদের যারা আমার থেকে ভিন্ন মনে করে, গৃধ্ররূপী যমদূতেরা তীক্ষ্ণ চঞ্চু দিয়ে তাদের দেহ মহারোষে ছিন্নভিন্ন করবে। যাঁরা ব্রাহ্মণদের দ্বারা তিরস্কৃত হয়েও আমাতেই চিত্ত সমর্পণ করে সন্তুষ্টহৃদয়ে, হাসিমুখে ও পুত্রবৎ স্নেহে সেই ব্রাহ্মণদের তুষ্টি-বিধান করেন, আমি তাঁদেরই বশীভূত। সুতরাং আমি প্রভু হলেও আমার অভিপ্রায় না জেনেই জয় ও বিজয় তোমাদের প্রতি যে অপরাধ করেছে তার প্রতিফল ভোগ করে তারা আবার শীঘ্রই আমার কাছে ফিরে আসুক। ঋষিগণ, এই দুই অপরাধী ব্যক্তি তাদের প্রবাস শীঘ্র সমাপ্ত করে দিয়ে এলে তাই আমি যথেষ্ট দয়ার কারণ বলে মনে করব। ৮-১২

ব্রহ্মা বললেন, ভগবানের এই মনোহর কথা শুনে রোষাবিষ্ট মুনিদের যেন আর তৃপ্তি হচ্ছিল না। তাঁরা কর্ণ বিস্ফারিত করে শুনলেও সেই সংক্ষিপ্ত অথচ গভীর অর্থবহ বাণীসমুদ্রে অবগাহন করে তার সম্পূর্ণ তাৎপর্য যেন ধরতে পারলেন না। তাঁদের রোমহর্ষণ উপস্থিত হল। তাঁরা কৃতাঞ্জলি হয়ে সেই পরমেষ্ঠী মহাপুরুষকে বললেন, ভগবান, আপনি সর্বনিয়ন্তা; তবুও আপনি যে বললেন (আপনার অনুচরদের) ঐ কাজ যেন আপনারই করা হয়েছে, তাদের প্রবাস শীঘ্র সমাপ্ত হলে আপনি অনুগ্রহ বোধ করবেন, এর যথার্থ অভিপ্রায় আমরা বুঝলাম না। আপনি বেদ-ব্রাহ্মণের হিতকারী। ব্রাহ্মণেরা আপনার কাছে শ্রেষ্ঠ দেবস্বরূপ। কিন্তু তবু দেবতাদেরও পূজ্য বিপ্রদের পক্ষে আপনি পরমদেবতাস্বরূপ। সনাতন ধর্ম আপনা থেকেই প্রবর্তিত হয়েছে, আর আপনারই অবতারদের দ্বারা তা রক্ষিত হয়েছে। আপনিই ধর্মের পরমগুহ্য বিষয় এবং বিকার রহিত। আপনার অনুগ্রহেই নিবৃত্তিধর্মনিষ্ঠ যোগীরা জন্মমরণময় সংসারে দুঃখ অনায়াসে অতিক্রম করেন। সুতরাং আপনি যে অপরের অনুগ্রহের অপেক্ষা রাখেন এ কথার কোনও অর্থ হয় না। অর্থার্থী মানুষ লক্ষ্মীর পদধূলি সম্মানের সঙ্গে নিজের মাথায় ধারণ করে। কিন্তু লক্ষ্মীদেবীও কৃতার্থ ভক্তবৃন্দের প্রদত্ত নবীন তুলসীমালায় পরিশোভিত আপনার চরণযুগলই নিরন্তর কামনা ও সেবা করে থাকেন। মহালক্ষ্মীর দ্বারা সেবিত হয়েও কিন্তু ভক্তদের প্রতিই আপনার অনুগ্রহ বেশী, তাঁকে অত সমাদর করেন না। আপনি স্বরূপেই পূজ্য; ব্রাহ্মণদের পদরেণু বা শ্রীবৎস-চিহ্ন আপনাকে আর কি পবিত্র করবে! আপনি সমস্ত ঐশ্বর্যেরই আধার। আপনি ত্রিযুগের অবতার, আমাদের অভীষ্টপূরণের জন্য সত্ত্বময়ী মূর্তি ধারণ করেন। আপনি ধর্মের গ্লানি অপনোদন করেন, তার কারণভূত রজ-তমোগুণ নিবৃত্তি করেন। এই বিশ্বকে আপনি পরিপালন করে থাকেন আপনার তপ-দান-দয়াত্মক তিন পাদ দ্বারা। আপনি ব্রাহ্মণ ও দেবতাদের মঙ্গলের জন্য নিয়ত নিজেকে ব্যস্ত রেখেছেন। একথা সত্য যে পরমাত্মা আপনিই; ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠদের রক্ষক আপনি শ্রেষ্ঠ পুরুষ। প্রিয় সত্য বচনের দ্বারা ব্রাহ্মণদের অর্চনা করে আপনিই তাদের পালন করছেন। এ কাজ যদি আপনি না করেন তাহলে আপনার মঙ্গলময় বেদমার্গ ধ্বংস হবে। কারণ লোকে মহাজনদের পন্থাই অনুসরণ করে থাকে, তাকেই গ্রহণীয় বলে মনে করে। আপনি নিজ শক্তিবলে শত্রু নিপাত করেন; আপনি সত্ত্বগুণনিধি, লোকের মঙ্গলসাধন আপনার অভিপ্রায়। সুতরাং বেদমার্গ বিনষ্ট হোক তা আপনার অভীষ্ট হতে পারে না। বিশ্বপালক ত্রিগুণপতি আপনি ধর্মরক্ষার্থেই বিনত হন বলে আপনার প্রকৃষ্ট তেজের কোনও পরাভব হয় না। আমরা চমৎকৃত! আপনার নম্রতা আপনারই লীলা! হে প্রভু,

আপনি আপনার ভৃত্যদের যে দণ্ড দেবেন বা তাদের জীবিকার যে বিধান করবেন কিংবা আমরা যদি নিরপরাধ ভৃত্যদের বৃথা অভিশাপ দিয়ে অপরাধ করে থাকি তবে আমাদের যে দণ্ড দেবেন—সবই আমরা সশ্রদ্ধ চিত্তে অনুমোদন করছি। ১৩-২৫

তখন ভগবান বললেন, বিপ্রগণ, তোমরা এটা জেনে রাখ যে আমার ভৃত্যদের যে তোমরা অভিশাপ দিয়েছ তা আমারই বিধান বলে জানবে। ওরা অসুরযোনি প্রাপ্ত হয়ে ক্রোধের ফলেই আবও দৃঢ়চিত্ত হযে আবার শীঘ্রই আমার কাছে ফিরে আসবে; ভগবানের এই উক্তির কথা বলে ব্রহ্মা আবার বললেন, এরপর মুনিরা নয়নতৃপ্তি-বিধায়ক ভগবান বৈকুণ্ঠকে এবং তাঁর অধিষ্ঠান স্বপ্রভায় দেদীপ্যমান বৈকুণ্ঠ-পুরী দর্শন করলেন। তারপর তাঁরা ভগবানকে প্রদক্ষিণ ও প্রণিপাত করে তাঁর অনুমতি নিয়ে প্রস্থান করলেন। তাঁদের তখন অত্যন্ত আনন্দ হল। তাঁরা শতমুখে বৈষ্ণবী শ্রীর প্রশংসা করতে লাগলেন। ২৬-২৮

এবার ভগবান ভৃত্যদ্বয়কে বললেন, তোমরা মনুষ্যলোকে চলে যাও, ভয় করো না। তোমাদের মঙ্গল হোক। আমার ব্রহ্মশাপ নিবারণের ক্ষমতা থাকলেও তা প্রয়োগ করার অভিরুচি নেই। কারণ ঐ শাপে আমার সম্মতি আছে। অনেকদিন আগে আমি যখন যোগনিদ্রায় অভিভূত ছিলাম তখন একবার লক্ষ্মীদেবী বাইরে থেকে ভিতরে আসতে চাইলে তোমরা দ্বাররক্ষকরূপে তাঁকে নিবারণ করেছিলে। তখনি তিনি ক্রুদ্ধা হয়ে অভিশাপ দিয়ে আগে থেকেই তোমাদের বৈকুণ্ঠ থেকে বিদায়ের পথ প্রশস্ত করে দিয়েছিলেন। আমার প্রতি অনবরত ক্রোধ প্রকাশ করার জন্য ব্রাহ্মণদের অবহেলা করার পাপ তোমাদের ক্ষয় হয়ে যাবে, আর তোমরা অচিরেই আমার কাছে ফিরে আসতে পারবে। জয় ও বিজয়কে এই আজ্ঞা দিয়ে বিমানশ্রেণীতে সুসজ্জিত, সর্বসম্পদে পরিপূর্ণ স্বকীয় ধামে তিনি প্রবেশ করলেন। সেই দুই দেবশ্রেষ্ঠ দুস্তর ব্রহ্মশাপে হতশ্রী ও হতগর্ব হয়ে বিষ্ণুপুরী থেকে স্খলিত হল। তারা যখন বিষ্ণুপুরী থেকে পড়ে যাচ্ছিল তখন মহা হাহাকার উঠেছিল। ঐ দুই হরি-পার্ষদই এখন কশ্যপ-বীর্যে নিষিদ্ধকালে উৎপন্ন দিতির গর্ভে ভয়ংকর অসুররূপে উপস্থিত হয়েছে। ঐ দুই যমজ অসুরের তেজেই আজ তোমাদের তেজ অভিভূত। এর প্রতিকারে আমি অসমর্থ, কারণ ভগবানের এই অভিলাষ। যিনি আদিভূত, বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের হেতু, ত্রিগুণের নিয়ন্তা, মহাযোগীদেরও দুরধিগম্য যোগমায়ার অধিকর্তা সেই ভগবানই আমাদের সকলের মঙ্গল বিধান করবেন। সুতরাং এই সংকটে আমাদের আর বিচার-বিবেচনা করে কি ফল লাভ হবে? ২৯-৩৭

সপ্তদশ অধ্যায়

হিরণ্যাক্ষের দিগ্বিজয়

মৈত্রেয় বললেন, ব্রহ্মার মুখ থেকে দিতির গর্ভকারণ শুনে দেবতাদের শংকা দূর হল। তাঁরা স্বর্গে ফিরে এলেন। দিতিও স্বামীর কথায় নিজের সন্তানদের সম্বন্ধে খুবই চিন্তিত হলেন। তারপর শতবর্ষ পূর্ণ হলে সাধ্বী দিতি যমজ সন্তান প্রসব করলেন। তাদের জন্মের সময় চারদিকে নানা উৎপাত দেখা দিল।

স্বর্গ, পৃথিবী এবং অন্তরীক্ষে সকলে ভয়ে ব্যাকুল হল। ভূধর সহ পৃথিবী কম্পিত হল, দিকসকল অগ্নিময় হয়ে উঠল। উল্কাপাত, বজ্রপাত হতে লাগল; নানাবিধ দুঃখের হেতু ধূমকেতুর উদয় হল। ঝড়ের মত বাতাস বইতে লাগল; তার গর্জনে সকল দিক ভরে উঠল। সেই ঘূর্ণিবায়ুতে গগনচুম্বী ধূলার ধ্বজ তৈরী হয়েছিল। বনস্পতিসমূহ সমূলে উৎপাটিত হয়ে মাটিতে পড়ে যেতে থাকল। বিরাট হাসির মত ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুৎ প্রকাশিত হতে লাগল। ঘন মেঘে আকাশ ভরে গেল। সূর্যরশ্মিকে ঢেকে দিয়ে এমন গাঢ় অন্ধকার সর্বদিক ছেয়ে ফেলল যে কোথাও কিছু দেখা গেল না। বাত্যাবিক্ষুব্ধ সমুদ্র যেন মহাক্ষোভে আন্দোলিত হচ্ছিল। জলবাসী মকরাদি প্রাণিকুল অস্থির হয়ে উঠল, তরঙ্গাকুল প্রবলবেগে উৎক্ষিপ্ত হল। সরোবর, পুষ্করিণী, নদী প্রভৃতিও আলোড়িত হতে লাগল, জলজপুষ্পাদি শুকিয়ে গেল। রাহুগ্রস্ত চন্দ্রসূর্য ঘিরে বারবার মণ্ডল রচিত হতে লাগল। বিনা মেঘে মেঘগর্জন শোনা গেল এবং গিরিগুহাদি থেকে রথধ্বনির মত ধ্বনি নির্গত হতে লাগল। ১-৮

গ্রামের মধ্যে ভয়ংকর অগ্নিময় শৃগালেরা পেচকদের সঙ্গে অমঙ্গল-ধ্বনি শুরু করল। গ্রাম্য কুকুরগুলি তাদের গলা উঁচু করে কখনও সঙ্গীতের মত কখনও বা কান্নার মত নানারকম রব করতে লাগল। গাধাগুলো খুর তাড়নায় মাটি তুলে ঘোর রব করতে করতে দল বেঁধে পাগলের মত ঘুরতে লাগল। সেই ধ্বনিতে বিভ্রান্ত পাখীরা সরবে ব্যস্ত হয়ে তাদের নীড় পরিত্যাগ করল। গাভীগুলি ত্রস্ত হয়ে রক্তময় দুধ দিতে লাগল। ঘোষপল্লীতে এবং অরণ্যে ভীত পশুকুল মূত্র ও পুরীষ ত্যাগ করতে লাগল। মেঘ থেকে পুঁযবৃষ্টি হতে লাগল। দেবমূর্তি অশ্রুত্যাগ করছিল। বিনা বাতাসে বৃক্ষসকল আন্দোলিত হতে লাগল। বুধ, শুক্রাদি শুভগ্রহ এবং অন্যান্য নক্ষত্রেরা ক্রুর গ্রহদের দীপ্তিতে আচ্ছন্ন হয়ে গেল। বক্রগতির ফলে গ্রহে গ্রহে যুদ্ধ বেধে গেল। ৯-১৪

এইসব এবং আরও অন্যান্য উৎপাত দেখে সনকাদি ঋষিরা চারজন ছাড়া পূর্ব-ইতিহাসে অজ্ঞ অন্য লোকেরা মহাভীত হয়ে পড়ল এবং মনে করল যে মহাপ্রলয় উপস্থিত। এদিকে সেই দুই সদ্যোজাত আদিদৈত্য লোহার মত দেহ নিয়ে পৌরুষ বিকাশ করে দিনে দিনে বিশাল পর্বতের মত বেড়ে উঠতে লাগল। তাদের মাথার স্বর্ণ-কিরীটের চূড়া আকাশ স্পর্শ করল ; তার ফলে সকল দিক ঢাকা পড়ে গেল। তাদের বাহু উজ্জ্বল অঙ্গদে প্রভাময় হল। পদভরে পৃথিবী কাঁপতে লাগল। তাদের সুন্দর মেখলার দ্যুতিতে সূর্যও পরাস্ত হলেন। যমজদের মধ্যে যেটি প্রথমে জন্মেছিল প্রজাপতি কশ্যপ তার নাম দিলেন হিরণ্যাক্ষ, আর যেটি পরে জন্মেছিল তার নাম দিলেন হিরণ্যকশিপু। কিন্তু গর্ভে হিরণ্যকশিপুর ভ্রূণই প্রথমে সৃষ্ট হয়েছিল। ১৫-১৮

স্বভুজবলে উদ্ধত, ব্রহ্মবরে মৃত্যুঞ্জিৎ হিরণ্যকশিপু ত্রিলোককে বশে এনেছিল। এরই প্রিয় অনুজ হিরণ্যাক্ষ। তাই হিরণ্যাক্ষও জ্যেষ্ঠের প্রিয়কার্য সাধনে তৎপর ছিল। জ্যেষ্ঠের প্রীতি উৎপাদনের জন্য সেও যুদ্ধাভিলাষী হয়ে গদাহাতে একবার স্বর্গে গিয়ে উপস্থিত হল। তার গতি ছিল দুঃসহ। তার পায়ের সোনার নূপুর ঝুন ঝুন শব্দে বাজছিল। অঙ্গ বৈজয়ন্তী মালায় সুশোভিত ছিল। কাঁধে ছিল এক মহাগদা। শৌর্যে বীর্যে এবং ব্রহ্মাবরে গর্বিত, নিরংকুশ, অকুতোভয় এই হিরণ্যাক্ষকে দেখে দেবতারা, গরুড়কে দেখে ভীত অহিকুলের মত, কে কোথায় পলায়ন করলেন বোঝা গেল না। কিন্তু দৈত্যরাজ হিরণ্যাক্ষ ইন্দ্র সহ দেবতাদের

অদর্শনে বুঝতে পারল যে ও'রা পৌরুষহীন, তাই তার তেজের মহিমায় পরাভূত হয়ে পলায়ন করেছেন। তখন সে বারবার ভীষণ গর্জন করতে লাগল। তারপর সে স্বর্গ থেকে ফিরে এল এবং ক্রীড়ারত মত্ত হাতীর মত ভীমগর্জনে সমুদ্রে প্রবেশ করল। বরুণদেবের জলচর সৈন্যগণ দৈত্য মারবার আগেই তার তেজে অভিভূত হয়ে, বুদ্ধিবিবেচনা হারিয়ে মহাভয়ে ইতস্তত পলায়ন করল। মহাবল হিরণ্যাক্ষ তার শ্বাস-প্রশ্বাসে সংক্ষুব্ধ মহাসাগরকে লৌহনির্মিত গদা দিয়ে আঘাত করতে লাগল। এইভাবে অনেক বৎসর ঘুরতে ঘুরতে সে বরুণপুরী বিভাবরীতে এসে উপস্থিত হল। সেই অসুর লোকপাল, জলচরগণের প্রভু বরুণকে দেখে, ঈষৎ হেসে তাঁকে উপহাস করবার জন্যই যেন প্রণিপাত করে বলল, অধিরাজ, আপনি আমাকে যুদ্ধদান করুন। আপনি তো মহাশক্তিধর, দুর্মদ বীরাভিমানীদের বীর্য আপনি অপহরণ করেন। মহাযশস্বী লোকপাল আপনি। সেকালে তো দৈত্য-দানবদের পরাজিত করে আপনি রাজসূয় যজ্ঞ সম্পন্ন করেছিলেন। ১৯-২৮

বিদ্বেষপরায়ণ, মদোন্মত্ত শত্রুর এই সম্ভাষণ শুনে এবং এইভাবে নিদারুণ উপহসিত হয়ে বরুণদেব যৎপরোনাস্তি রেগে গেলেন। কিন্তু বিচারবুদ্ধি প্রয়োগে তা দমন করে তিনি বললেন, দৈত্যরাজ, আমরা এখন যুদ্ধ ইত্যাদি থেকে অবসর নিয়েছি। তুমি তো অসুরকুলের ঋষভ সদৃশ। তোমার মত রণকুশল ব্যক্তিকে যুদ্ধদ্বারা সন্তুষ্ট করতে পারেন একমাত্র আদি পুরুষ ; আর কাউকে তো উপযুক্ত দেখি না। অতএব তুমি সেই বিষ্ণুর কাছেই যাও। তোমার মত মহাবীরেরা বিষ্ণুর যথেষ্ট প্রশংসা করে থাকেন। তাঁর সম্মুখীন তুমি হলে শীঘ্রই হতদর্প হয়ে রণভূমিতে শয্যা গ্রহণ করবে ; তোমাকে ঘিরে কুক্কুরাদি শোভা পাবে। স্বয়ং ভগবানই ভক্তদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন এবং তোমার মত দুষ্টদের দমন করবার জন্য শরীররূপ ধারণ করেন। ২৯-৩১

অষ্টাদশ অধ্যায়

বরাহাবতার বিষ্ণুর সঙ্গে হিরণ্যাক্ষের যুদ্ধ

মৈত্রেয় বললেন, বরুণদেবের এই কথা শুনে কিন্তু হিরণ্যাক্ষের কোন চেতনার উদয় হল না। সবকিছু উপেক্ষা করে দুর্মদ হিরণ্যাক্ষ হৃষ্টচিত্তে নারদের কাছ থেকে শ্রীহরির অবস্থানের সংবাদ নিয়ে দ্রুতবেগে রসাতলে প্রবেশ করল। সেখানে সে অভিজিৎ বরাহমূর্তির সাক্ষাৎ লাভ করল। ঐ রূপে ভগবান দংষ্ট্রাগ্রে পৃথিবীকে তুলে ধরেছিলেন। তাঁর অরুণাভ নেত্রের দ্যুতিতে হিরণ্যাক্ষের সমস্ত তেজ পর্যুদস্ত হল। কিন্তু হিরণ্যাক্ষ ভাবল, খুব আশ্চর্য তো! আমি একজন প্রতিযোদ্ধা খুঁজছি, কিন্তু এ তো একটা বন্য জন্তুমাত্র! এই বলে সে হেসে উঠল। তারপর সে ভগবানকে বলল, ওরে মূর্খ, পৃথিবীটাকে ছেড়ে দে। আমাদের মত রসাতলবাসীদের জন্যই পৃথিবী সৃষ্টি করে ব্রহ্মা ওটাকে আমাদের দিয়েছেন। সুতরাং আয়, যুদ্ধ করবি আয়। ওরে সুরাধম, শূকরাবয়ব জীব! আমি যতই দেখছি ততই তোর আর পৃথিবীর কারও মঙ্গল নেই। তোকেই কি আমাদের বিনাশের জন্য আমাদের শত্রু দেবতারা আশ্রয় করেছে? তুই মায়াবলেই আমাদের অসাক্ষাতে শত্রু জয় করে থাকিস। ওরে মূঢ়, যোগমায়াই তোর বল, কিন্তু পৌরুষ নামমাত্র।

তোকে হত্যা করে আমার বন্ধুদের চোখের জল মুছাব। আমি গদা ছুঁড়ে তোর মাথা চুর্ণ করলে তুই যখন মারা যাবি তখন দেবতা, ঋষি আর অন্যেরা তোকে যে পূজোপহার নিবেদন করে, নিরালম্ব হয়ে সেগুলোর কি গতি হবে বল্‌তো ? ১-৫

শত্রুর সেই তোমর-সদৃশ দুর্বচনে ব্যথিত হয়েও বরাহরূপী ভগবান যখন দেখলেন যে তাঁর দন্তাগ্রে বিধৃত ধরণী ভীতা ও সন্ত্রস্তা, তখন তিনি সেই অপমান-ব্যথা সহ্য করে, মকরের দ্বারা আহত হস্তী যেমন হস্তিনীকে নিয়ে জল থেকে উঠে আসে, সেইভাবে জল থেকে বেরিয়ে এলেন। আর করালদংষ্ট্রা-বিশিষ্ট, অশনির মত ধ্বনিবিশিষ্ট হিরণ্যাক্ষও জল থেকে বেরিয়ে কুম্ভীর যেমন সেই আহত হস্তীর অনুসরণ করে সেরূপ বরাহ-ভগবানের পশ্চাদ্ধাবন করে বেরিয়ে এল। সে বলল, তোদের মত নির্লজ্জ দুষ্টদের কোন কাজই গর্হিত নয়। ৬-৭

জলের ওপরে ব্যবহারযোগ্য স্থানে ধরণীকে তিনি স্থাপন করে তারই মধ্যে নিজের শক্তিকে তিনি রক্ষা করলেন। ভগবানের এই কার্য দেখে ব্রহ্মা স্তব শুরু করলেন, আর দেবতারা আকাশ হতে পুষ্পবৃষ্টি করে চারিদিক পরিব্যাপ্ত করলেন। ভগবান তখন সোনার কবচে আবৃত, গদাধারী, কটুভাষণ-তৎপর হিরণ্যাক্ষকে সক্রোধে অথচ সহাস্যে বললেন, ওরে অভদ্র অসুর, তুই যে আমাকে জলবাসী বন্য জন্তু বলেছিস তা খুবই সত্য। তাই তো তোদের মত গ্রাম্য কুকুরের সন্ধানে ঘুরে বেড়াই। তুই মৃত্যুপাশে আবদ্ধ। তোর গর্বিত বচন আমার মত বীরেরা গ্রাহ্য করে না। ব্রহ্মার দেওয়া রসাতলবাসীদের পৃথিবীকে আমি কি অপহরণ করেছি ? আর সেই জন্যই বুঝি তোর গদায় আহত করে আমাকে অপমানিত করতে চাস। তবে আমাকে যুদ্ধ যখন করতেই হবে তখন আমার তো এখানে থাকতেই হবে; তোদের মত মহাবলশালীদের সঙ্গে বিরোধ করে যাবই বা কোথায়! পদাতিকদের সেনাপতিদেরও সেনাপতি তুই। সত্বর আমাকে পরাভূত করবার জন্য নিঃশঙ্কচিত্তে চেষ্টা কর্; আমাকে হত্যা করে আত্মীয়বর্গের চোখের জল মুছিয়ে দে। ঠিকই তো, যে নিজের প্রতিজ্ঞা পালন না করে সে তো মহা অসভ্য! ৮-১২

মৈত্রেয় বললেন, ক্রুদ্ধ ভগবান কর্তৃক এইভাবে হিরণ্যাক্ষ উপহসিত ও তিরস্কৃত হল। মহাসর্পকে নিয়ে খেলা করলে তার যেরকম ক্রোধ প্রজ্বলিত হয় সেইরকম মরণান্তিক ক্রোধে সে অস্থির হয়ে উঠল। ক্রোধে তার ইন্দ্রিয়গ্রাম বিচলিত হয়ে ঘনঘন শ্বাস-প্রশ্বাস নির্গত হচ্ছিল। সে ভগবানের কাছে এসে প্রচণ্ড বেগে তাঁর ওপর আঘাত হানল। ভগবানও ঈষৎ বেঁকে যোগারূঢ় হয়ে, যোগী যেমন মৃত্যুকে এড়িয়ে যায়, সেভাবে শত্রুনিক্ষিপ্ত গদার বেগ এড়িয়ে গেলেন। নিজের গদাটা আবার নিয়ে বারবার সেটিকে ঘুরিয়ে ক্রুদ্ধ হিরণ্যাক্ষ প্রস্তুত হতে লাগল। মহাক্রোধে সে তার দাঁত দিয়ে নিজের ঠোঁট কামড়ে ধরেছিল। ভগবানও মহাক্রোধ হননের জন্য তার দিকে ধাবিত হলেন। মহাবলবান ভগবান নিজের গদা দিয়ে শত্রুর দক্ষিণ ভ্রূতে আঘাত করলেন, গদাযুদ্ধে দক্ষ অসুরও নিজের গদা দিয়ে ভগবানের গদার আঘাত নিবারণ করল। কিছুক্ষণ ধরে ক্রোধী হিরণ্যাক্ষ আর শ্রীহরি জয়াভিলাষে পরস্পর ঐভাবে আঘাত হানলেন। উভয়েরই অঙ্গসকল তীক্ষ্ন গদাঘাতে জর্জরিত হল। ক্ষরিত রক্তের ঘ্রাণে উভয়েরই ক্রোধ বর্ধিত হল। পরস্পর জিগীষায় তাঁরা মাটির ওপর বিচিত্রগতিতে ঘুরছিলেন। সেই সংগ্রামে দুই স্পর্ধমান মত্ত বৃষভের মত তখন এঁদের শোভা হয়েছিল। মাটির ওপর হিরণ্যাক্ষ আর মায়াবরাহ, যজ্ঞতনু ভগবানের যুদ্ধ দেখবার জন্য মুনিদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে প্রজাপতি ব্রহ্মা সেখানে উপস্থিত হলেন। ঋষিসহস্রনেতা ব্রহ্মা অকুতোভয়, প্রহারনিপুণ এবং বিক্রমে অপ্রতিরোধ

হিরণ্যাক্ষকে দেখলেন। তখন তিনি আদি বরাহমূর্তি নারায়ণকে সম্বোধন করে বললেন, দেব, এই অসুরটি আমার কাছ থেকে বরলাভ করে অপ্রতিপক্ষ হয়েছে। এ সম্মার্গের কণ্টকস্বরূপ। নিজের প্রতিপক্ষ খুঁজে এ বিশ্বভ্রমণ করে বেড়াচ্ছে, আপনার চরণমাত্র-শরণ দেব-দ্বিজ-গোজাতির এবং অন্য নিরপরাধ প্রাণীর ওপর অত্যাচার করছে, ভীত প্রাণীদের ওপর পীড়ন করছে এবং অর্থ-প্রাণাদি অপহরণ করছে। অর্বাচীন বালক যেমন উদ্যতফণা সর্পের সঙ্গে ক্রীড়া করতে গেলে অনর্থ ঘটায়, সেরূপ আপনিও এই মায়াবী, অচিন্ত্যপদার্থ রচনাশক্তিসম্পন্ন, গর্বিত, অপ্রতিরোধ্য, অসত্তম, মহাদুষ্ট অসুরকে নিয়ে ক্রীড়া করতে গেলে অনর্থ লাভ করবেন। হে অচ্যুত, এই দারুণ দৈত্যটা আসুরী বেলা এসে গেলে ভয়ানক রকম বেড়ে উঠবে। তার আগেই এই মহাপাপস্বরূপকে স্বমায়া অবলম্বন করে হত্যা করুন। লোক বিনাশকারী ঘোরসন্ধ্যা অগ্রসর হচ্ছে; সত্বর দেবতাদের জয়বিধান করুন। এখন অভিজিৎ নামক মধ্যাহ্নকাল অপগতপ্রায়, মুহূর্তমাত্র অবশিষ্ট রয়েছে। এই সুযোগ, আমাদের মত আপনার ভক্তদেরও মঙ্গলের জন্য দুর্জয় এই অসুরকে সত্বর সংহার করুন। আপনিই পূর্ব থেকে এর মৃত্যুরূপে নির্দিষ্ট হয়েছেন। সৌভাগ্য যে ও নিজেই আপনার কাছে এসে পড়েছে। সুতরাং স্ববিক্রম প্রকাশ করে ওকে যুদ্ধে হত্যা করে ত্রিভুবনের মঙ্গলবিধান করুন। ১৩-২৮

ঊনবিংশ অধ্যায়

হিরণ্যাক্ষবধ

মৈত্রেয় বললেন, ব্রহ্মার সেই নিষ্কপট, অমৃতময়ী বাণী শুনে ভগবান হাসলেন। প্রেমপূর্ণ অপাঙ্গ-কটাক্ষে তিনি ব্রহ্মার বচন অনুমোদন করলেন। তারপর তিনি লাফ দিয়ে সেই অকুতোভয় অসুরের হনুতে গদা দিয়ে আঘাত করলেন। সেও নিজের গদা দ্বারা সেই আঘাত রোধ করতে গেল। তার আঘাতে ভগবানের হাত থেকে গদা স্খলিত হয়ে ঘুরতে ঘুরতে মাটিতে পড়ল। অত্যন্ত অদ্ভুত ব্যাপারই সংঘটিত হল। সেই অসুর কিন্তু এমন অবকাশ পেয়েও ভগবানকে প্রত্যাঘাত করল না। তাঁর হাত থেকে গদা পড়ে গেল দেখে ব্রহ্মা প্রভৃতিরা হাহাকার করে উঠলে ভগবান তাঁদের নিঃশঙ্ক হতে বললেন। তারপর তিনি যুদ্ধের নিয়ম মানার জন্য অসুরের প্রশংসা করলেন। এবার তিনি সুদর্শন চক্রকে স্মরণ করলেন। ১-৫

তখন সেখানে উপস্থিত যে সব আকাশচারীরা ভগবানের প্রভাব সম্বন্ধে অজ্ঞ তাঁরা উদগ্র-চক্রধৃত ভগবানকে, 'আপনার মঙ্গল হোক', 'এই অসুরটাকে হত্যা করুন' ইত্যাদি নানা কথা বলে কোলাহল করতে লাগল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দৈত্যাধমরূপী নিজের মুখ্য পার্ষদ দিতির পুত্রের সঙ্গে মিলিত হবার জন্যই শ্রীভগবানের এটি লীলাখেলা। সেই হিরণ্যাক্ষ যখন দেখল যে ভগবান তাকে মারবার জন্য বরাহমূর্তি ধরে চক্র ধারণ করেছেন, পদ্মপলাশনেত্র নিয়ে তার সম্মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, তখন মহাক্রোধে তার সমস্ত ইন্দ্রিয় আচ্ছন্ন হয়ে গেল। ক্রোধে সে সশব্দে শ্বাস-প্রশ্বাস ত্যাগ করতে লাগল, ওষ্ঠ দংশন করতে লাগল। করালদংষ্ট্রাধারী অসুরের চোখ দুটো যেন জ্বলতে লাগল। সেই জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে 'এবার তুই মরলি' এই

কথা বলে সে অতি শীঘ্র ভগবানের কাছে এগিয়ে গদার আঘাত করল। যজ্ঞ-বরাহ ভগবান বায়ুবেগে আগত সেই গদাটিকে নিরীক্ষণ করে হিরণ্যাক্ষের সামনেই বাঁ পায়ের আঘাতে সেটিকে অনায়াসে মাটিতে ফেলে দিলেন। তারপর বললেন, অস্ত্র ধারণ কর্‌, যত্নবান হ্‌, তোর জেতবার ইচ্ছা আছে তো? তখন অসুর তার গদা আবার তুলে নিল এবং ভগবানকে পুনর্বার আঘাত করে মুহুর্মুহু গর্জন করতে লাগল। তার নিক্ষিপ্ত গদাটিকে পড়তে দেখে ভগবান ঠিক হয়ে দাঁড়ালেন; আর গরুড় যেমন দ্রুত আগমনকারিণী সর্পিণীকে গ্রহণ করে সেইভাবে অবলীলাক্রমে সেটিকে ধারণ করলেন। নিজের পৌরুষ ব্যাহত হল দেখে দৈত্যের আত্মসম্মান আহত হল। তাই যখন শ্রীহরি তাকে গদাটি প্রত্যর্পণ করতে চাইলেন তখন নষ্টপ্রভ হিরণ্যাক্ষ আর কোন্‌ লজ্জায় সেটিকে নেবে! তবু নিজের অনর্থ হবে জেনেও যেমন লোকে ব্রাহ্মণের বিরুদ্ধে অভিচার-ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করে তেমনি হিরণ্যাক্ষও প্রজ্বলিত আগুনের লোলুপ শিখার মত একটি ত্রিশূল তুলে নিয়ে অবার ভগবানের দিকে ছুঁড়ল। দৈত্যবংশের মহাসুর কর্তৃক সবলে নিক্ষিপ্ত সেই শূলটি প্রদীপ্ত হয়ে আকাশে শোভার বিকীরণ করে যখন তাঁর দিকে পড়তে লাগল, তখন গরুড়ের ফেলে-দেওয়া পক্ষটিকে ইন্দ্র যেভাবে ছেদন করেছিলেন সেইভাবেই ভগবান শূলটিকে তাঁর তীক্ষ্ণধার সুদর্শনচক্র দিয়ে ছেদন করলেন। নিজের শূলটি চক্রের দ্বারা অসংখ্য খণ্ডে খণ্ডিত হতে দেখে হিরণ্যাক্ষ ভীম মূর্তিতে লক্ষ্মীর আশ্রয়ভূত ভগবদ্‌বক্ষে আঘাত করল। তারপর সে হঠাৎ অন্তর্ধান করল। ৬-১৫

তার দ্বারা এভাবে আঘাত পেয়েও, পুষ্পমালায় আহত নগেন্দ্র যেমন কম্পিত হয় না, আদিবরাহও তেমনি বিন্দুমাত্র বিচলিত হলেন না। অন্তর্হিত হয়ে দৈত্য হরির ওপর নানাবিধ মায়ার প্রয়োগ করতে লাগল। সেই মায়ার খেলা দেখে লোকসকল ত্রস্ত হয়ে চিন্তা করল, মহাপ্রলয় সমুপস্থিত। প্রচণ্ড বায়ু প্রবাহিত হল, গাঢ় অন্ধকার সব আচ্ছন্ন করল, যন্ত্রদ্বারা নিক্ষিপ্তের মত বিশাল প্রস্তরখণ্ড চারিদিকে পড়তে লাগল। গর্জনশীল বিদ্যুৎশিখা-বিশিষ্ট পুঁয, রক্ত, বিষ্ঠা, মূত্র, অস্থি, কেশ বর্ষণকারী মেঘপুঞ্জে নক্ষত্ররাজি আবৃত হয়ে গেল। মনে হল যেন পর্বত-শ্রেণী বিবিধ অস্ত্র মোচন করছে। উলঙ্গিনী, শূলধারিণী রাক্ষসীরা আলুলায়িত-কেশে পরিভ্রমণ করতে লাগল। হস্তী, অশ্ব, পত্তি, যক্ষ, রক্ষ সবাই আততায়ীর আকারে 'মার, ধর, কাট' প্রভৃতি ক্রুর বাক্যে দিঙ্‌মণ্ডল ভরিয়ে তুলল। যজ্ঞমূর্তি শ্রীহরি তখন সেই আসুরী মায়া ছেদন করবার জন্য তাঁর অতিপ্রিয় সুদর্শন চক্র প্রয়োগ করলেন। সেই সময় কশ্যপের বাণী সহসা দিতির স্মৃতিপথে আবির্ভূত হয়ে তাঁর সর্বাঙ্গ কাঁপতে লাগল। তার স্তন থেকে রক্ত নির্গত হল। এদিকে নিজের মায়া বিনষ্ট হতে হিরণ্যাক্ষ আবার ভগবানের সম্মুখে আবির্ভূত হল। মহাক্রোধে সে হরিকে নিজের দু'বাহুর মধ্যে ধারণ করতে গিয়ে দেখে তিনি মুক্ত অবস্থাতেই দণ্ডায়মান। অসুর তখন বজ্রমুষ্টিতে শ্রীহরিকে তাড়না করল। তবু কিন্তু ভগবান তার কর্ণমূলে প্রচণ্ড আঘাত হানলেন যেমন ইন্দ্র বৃত্রকে মেরেছিলেন। ভগবানের এই আঘাতে হিরণ্যাক্ষের সর্বাঙ্গ ঘুরতে লাগল, চোখ ঠেলে বেরিয়ে এল, হাত-পা অবসন্ন হয়ে গেল, মাথার চুল ঝুলে পড়ল, আর শেষ পর্যন্ত সেই দৈত্য ঝঞ্ঝা-উৎপাটিত মহাবৃক্ষের মত মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। ভূতলশায়ী, করালদংষ্ট্রা সেই দৈত্যের তেজ তখনও অম্লান দেখে সমাগত ব্রহ্মাদি দেব-ঋষিদের খুব আশ্চর্য বোধ হল। তাঁরা ভাবলেন, এমন মৃত্যু কে না চায়! অসৎলিঙ্গশরীর থেকে মুক্তির অভীপ্সায় লোকে সমাধি সহযোগে একান্তে যে ভগবানকে ধ্যান করে তাঁরই পদাঘাতে নিহত দৈত্য-ঋষভ তাঁর মুখ দেখতে দেখতে দেহত্যাগ করল। এই ভাবেই ভগবানের

পার্ষদযুগল জয়-বিজয় ঋষিশাপে আসুরযোনি পেয়েছিল। তিন জন্ম পরে ওরা আবার স্বস্থান বৈকুণ্ঠ লাভ করল। ১৬-২৯

এবার দেবতারা বললেন, হে অখিলযজ্ঞপ্রবর্তক, আপনি জগৎ রক্ষার জন্য অমল সত্ত্ব-মূর্তি ধারণ করেছেন, আপনাকে নমস্কার। এই অসুর জগতের প্রাণীদের মর্মভেদ করে, নিজ কর্মদোষেই গতায়ু হয়েছে। আপনার পদসেবা করে আজ আমরা মুক্তিলাভ করেছি। মৈত্রেয় বললেন, আদিবরাহ শ্রীভগবান এইভাবে দুর্ধর্ষ হিরণ্যাক্ষকে হত্যা করেছিলেন। কমলাসন ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবতাদের দ্বারা স্তুত হয়ে তিনি ফিরে গেলেন তাঁর পূর্ণানন্দময় বৈকুণ্ঠধামে। বিদুর, গুরুকথিত কাহিনীর কিছুমাত্র ব্যতিক্রম না ঘটিয়ে মহাযুদ্ধে শ্রীহরি বরাহরূপ ধারণ করে মহাবলপরাক্রান্ত হিরণ্যাক্ষকে লীলাচ্ছলে কিভাবে বিনাশ করেছিলেন সেই হরিচরিত এই আমি তোমায় বললাম। সূত এবার বললেন, দ্বিজ, মৈত্রেয়কথিত বরাহকাহিনী শ্রবণ করে পরমভক্ত বিদুর পরমানন্দ লাভ করলেন। যাঁরা পুণ্যশ্লোক, যাঁদের যশোগাথা লোকপ্রসারী, যাঁরা তাঁর ভক্ত তাঁদের কথা শুনলেই আনন্দ হয়। সুতরাং শ্রীবৎসাঙ্ক ভগবানের কাহিনী শুনলে যে পরমানন্দ হবে এ আর অধিক কথা কি? রোদনশীল হস্তিনীদের সামনে কুমীরে আক্রান্ত গজেন্দ্র যখন ভগবানের চরণপদ্ম ধ্যান করেছিল তখন ইনিই দ্রুত তাকে বিপদ থেকে রক্ষা করেছিলেন। অনন্যশরণ, নিষ্কপট মানুষ সহজেই ঈশ্বরারাধনায় সিদ্ধিলাভ করে। আর অসাধুদের পক্ষে ঈশ্বরারাধনা দুঃসাধ্য, সুতরাং কৃতজ্ঞচিত্তে সবারই ঈশ্বরসেবা করা উচিত। শৌনক, জগৎকারণ-ভূত বরাহরূপী ভগবানের লীলাভূত আশ্চর্য হিরণ্যাক্ষবধ কাহিনী যে শ্রবণ করে, গান করে, কিংবা অনুমোদন করে সে অনায়াসেই ব্রহ্মহত্যার পাপ থেকেও মুক্তিলাভ করে। এই ভগবৎ-কথা অতিশয় পবিত্র। এই কথা শ্রবণ করলে মানুষেরা পুণ্য-লাভ করে, তাদের ধন-যশ-আয়ু লাভ হয়, মনোরথ সিদ্ধি হয়, যুদ্ধক্ষেত্রে শৌর্য ও সামর্থ্যের বৃদ্ধি হয় এবং অন্তকালে নারায়ণ-গতি লাভ হয়। ৩০-৩৮

বিংশ অধ্যায়

সৃষ্টি-প্রকরণ

শৌনক বললেন, সূত, স্বায়ম্ভুব মনু পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে কি করে পরবর্তী-কালের প্রাণিগণের সৃষ্টি করেছিলেন? বিদুর ছিলেন কৃষ্ণের স্নেহধন্য মিত্র এবং মহাভাগবত। কৃষ্ণের প্রতি অন্যায় আচরণের জন্য তিনি সপুত্র অগ্রজ ধৃতরাষ্ট্রকে বর্জন করেছিলেন। তিনি মহিমায় বেদব্যাস থেকে কোন অংশে কম নন; কারণ তিনি তাঁরই পুত্র, সর্বতোভাবে কৃষ্ণাশ্রিত এবং কৃষ্ণভক্তদেরও শুশ্রূষাকারী। তীর্থ-পর্যটন করে রজ, তম প্রভৃতি গুণ বিবর্জিত হয়ে সেই বিদুর গঙ্গাতীরে উপবিষ্ট মহাতত্ত্বজ্ঞ মৈত্রেয়কে কি কি প্রশ্ন করেছিলেন? তাঁরা যখন পরস্পর আলোচনায় ব্যস্ত ছিলেন তখন পবিত্র গঙ্গাধারার মত হরির অমল কথাই নিশ্চয় তাঁরা আলোচনা করেছিলেন। সূত, আপনি সেই কীর্তনীয় উদার কর্ম আবার আমাদের কাছে বর্ণনা করুন। আপনার মঙ্গল হোক। এ-সংসারে এমন কেউ নেই যার হরিকথা শ্রবণে সম্পূর্ণ পরিতৃপ্তি এসে গেছে। ১-৬

নৈমিষারণ্যবাসী ঋষি এই রকম প্রশ্ন করলে উগ্রশ্রবা (সূত), যাঁর আত্মা নিত্য

নারায়ণে সমর্পিত; 'তাহলে শুনুন', বলে আরম্ভ করলেন। তিনি বললেন, নিজ মায়াবলে বরাহরূপ ধরে রসাতল থেকে পৃথিবী উদ্ধার, তারপর অবহেলায় হিরণ্যাক্ষবধ, শ্রীভগবানের এইসব লীলার কথা শুনে বিদুর পরম আনন্দ লাভ করলেন। তিনি তখন মৈত্রেয়কে বললেন, ব্রহ্মা প্রজাসৃষ্টির জন্য মরীচি প্রভৃতি সৃষ্টির পর স্বয়ং কি করেন, এবার সে কথা বলুন। মরীচি আদি বিপ্রগণ, ক্ষত্রিয় স্বায়ম্ভুব মনু, এঁরা ব্রহ্মার আদেশে কি ভাবে জগৎ সৃষ্টি করলেন? ওঁরা কি সস্ত্রীক এই সৃষ্টি করেন কিংবা সৃষ্টির বিষয়ে ভার্যা-নিরপেক্ষই ছিলেন? এইসব দেখে আমার অদ্ভুত বলে মনে হচ্ছে। তখন মৈত্রেয় উত্তরে বললেন, অদৃষ্ট, পরমপুরুষ আর সদাজাগ্রত কাল ত্রিগুণাত্মক প্রধান বা প্রকৃতিকে সংক্ষুব্ধ করলে মহত্তত্ত্বের সৃষ্ট হয়। রজোগুণ-প্রধান মহৎ থেকে ভগবানের ইচ্ছায় রজোগুণ-প্রধান অহংকার উৎপন্ন হয়। মহত্তত্ত্ব স্বতঃ সত্ত্বগুণপ্রধান; কিন্তু অহংকার উৎপত্তিকালে রজোগুণ-সম্পন্ন হয়। ত্রিগুণাত্মক সেই অহংকার আবার পাঁচ পাঁচটি করিয়া ভূত সৃষ্টি করে, যেমন পঞ্চতন্মাত্র, আকাশাদি পঞ্চ মহাভূত, চক্ষুরাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, তারপর বাগাদি কর্মেন্দ্রিয় এবং তাদের প্রত্যেকের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এই সমস্ত সৃষ্টি হল। এইসব আকাশাদি সৃষ্টিগুলি এককভাবে ভৌতিক সৃষ্টিতে অসমর্থ। কিন্তু দৈবযোগে এরা সংহত হল এবং একটি সুবর্ণ ডিম্ব সৃষ্টি হল। নিরাত্মক অণ্ডকোষটি সহস্রবর্ষেরও কিছু অধিককাল প্রলয়জলে শয়ান ছিল। তারপর ভগবান নারায়ণরূপে ওতে অধিষ্ঠান করেন। নারায়ণের নাভি থেকে সহস্রসূর্যের থেকে অধিক দীপ্তিমান, সর্বজীবের আশ্রয় এক পদ্ম উৎপন্ন হল। এই পদ্মে ব্রহ্মা জন্মালেন। সলিলশায়ী নারায়ণ কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে ব্রহ্মা স্বীয় নামরূপগুণাদি ব্যবস্থা সহযোগে যথাপূর্ব লোকসৃষ্টি করেন। ব্রহ্মা প্রথমে ছায়া-সহযোগে তামিস্র, অন্ধ-তামিস্র, তম, মোহ এবং মহাতম এই পঞ্চপর্ব অবিদ্যা সৃষ্টি করেন। সেই তমোময় শরীর ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করল না। তাই তিনি সেটিকে বিসর্জন দিলেন। তাঁর পরিত্যক্ত ক্ষুধাতৃষ্ণাবিশিষ্ট রাত্রিময় তনুটি যক্ষ ও রক্ষেরা অধিকার করে। ক্ষুধাতৃষ্ণায় অভিভূত এইসব যক্ষ ও রাক্ষসেরা ব্রহ্মাকেই ভক্ষণ করবার জন্য ধাবিত হল। তারা বলল, ইনিই আমাদেব ক্ষুধাতৃষ্ণায় পীড়ন করছেন, এঁকে রক্ষা করার প্রয়োজন নেই। ব্রহ্মা সন্ত্রস্ত হয়ে বললেন, যক্ষ ও রাক্ষসগণ, তোমরা তো আমারই পুত্ররূপে জন্মলাভ করেছ, তাই আমাকে ভক্ষণ না করে রক্ষা কর। ৮-২১

ব্রহ্মা যেসব প্রচণ্ড দ্যুতিমান দেবতা প্রথমে সৃষ্টি করেছিলেন তাঁরাই তাঁর বিসৃষ্ট তেজে ক্রীড়া করতে করতে ব্রহ্মার পরিত্যক্ত দিবসরূপ তনুপ্রভা গ্রহণ করলেন। ব্রহ্মা তাঁর জঘন থেকে অসুর সৃষ্টি করেন। এরা লম্পট; ব্রহ্মাকেই মিথুনের উদ্দেশে গ্রহণ করল। ব্রহ্মা প্রথমে হাসলেন। তারপর নির্লজ্জ অসুরদের দ্বারা অসদাভিপ্রায়ে ধৃত হওয়ার জন্য ক্রুদ্ধ হলেন। তাতেও যখন ওরা নিবৃত্ত হল না, তখন তিনি ভয় পেয়ে দ্রুত পলায়ন করলেন। ব্রহ্মা গেলেন বরদা শ্রীহরির কাছে যিনি ভক্তদের প্রতি অনুগ্রহবশত তাদের ইচ্ছানুরূপ তনু ধারণ করেন, শরণাগতের দুঃখ দূর করেন। তিনি বললেন, হে পরমাত্মা, আপনার আদেশে আমি যে প্রজা সৃষ্টি করলাম তারা পাপিষ্ঠ হয়েছে। আমাকেই ধর্ষণের জন্য আমার পশ্চাৎ তারা ধাবমান। আপনিই একমাত্র ক্লিষ্ট লোকসকলের দুঃখহর্তা। আপনার প্রতি যারা বিমুখ আপনি তাদেরই ক্লেশ দিয়ে থাকেন। শ্রীভগবান বিবেকীদের অধ্যাত্মদর্শন করিয়ে থাকেন। তিনি ব্রহ্মার দুঃখ দেখে বললেন, তোমার এই ঘোর কামকলুষিত দেহটি পরিত্যাগ কর। ব্রহ্মা তখন সেই দেহ বিসর্জন দিলে সায়ন্তনী সন্ধ্যা হল। ঐ সন্ধ্যা কামভাব উদয়ের সময়। তাই তাকে স্ত্রীরূপে কল্পনা করে মুগ্ধ অসুরেরা

বলল, এই সুন্দরীর চরণপদ্মে সুবর্ণ নূপুরের কিঙ্কিণী, মদভরা লোচন, কাঞ্চীকলাপে শোভিত পরিধেয় বসন। এর পীনোন্নত পয়োধরযুগল ঘন সন্নদ্ধ, নাসিকা ও দন্তরাজি সুন্দর, হাসি স্নিগ্ধ, দৃষ্টি বিলোল। ব্রীড়াভরে সে তার দেহ বস্ত্রাঞ্চলের আবরণে রাখতে ব্যস্ত। ঘন কৃষ্ণ কুন্তলের কবরী তার শিরে। তার এই রূপে মোহিত হয়ে তারা ভাবল, স্ত্রীলোকটির আশ্চর্য রূপ, চমৎকার নবীন বয়স, অসীম এর ধৈর্য ; কারণ আমরা ওর প্রতি কামাসক্ত হলেও ও নিষ্কামভাবে চলাফেরা করছে। তারপর তারা তাকে কুশল-প্রশ্নাদি করে সমুচিত সৎকার করল এবং প্রণয় সহকারে প্রশ্ন করল, রম্ভোরু, তুমি কে? কোন প্রয়োজনে তুমি এখানে এসেছ? তোমার এই মহার্ঘ রূপ-পণ্যের মূল্য প্রদান করতে কি আমরা অক্ষম? তবে কেন আমাদের কামভারে পীড়িত করছ? তুমি যেই হও না কেন তোমার দর্শন-লাভ আমাদের মহাভাগ্যের কথা। কিন্তু আমরা তোমাকে দেখছি আর তুমি যেন আমাদের মন নিয়ে কন্দুক-ক্রীড়ায় মত্ত হয়েছ। করতল দিয়ে পতনশীল কন্দুককে আঘাত করতে ব্যস্ত থাকার জন্য তোমার চরণপদ্ম সুস্থির হচ্ছে না। বৃহৎ স্তন-ভারের ভয়েই যেন তোমার ক্ষীণ কটীদেশ শ্রান্ত হয়ে পড়ছে। তোমার স্বচ্ছ দৃষ্টিতে যেন আলস্যের ভার। তোমার কেশকলাপ বড় সুন্দর দেখাচ্ছে। এই বলে মূঢ়মতি অসুরগণ সেই নারীবৎ আচরণশীলা সায়ন্তনী সন্ধ্যাকে নারীভ্রমেই গ্রহণ করল। ২২-৩৭

সেই স্ত্রীমূর্তি এক ভাবগম্ভীর হাসি হেসে আপনা আপনি অন্তর্হিত হল ; তখন ব্রহ্মা তার সৌন্দর্য থেকে গন্ধর্ব ও অপ্সরাদের সৃষ্টি করলেন। সেই সৌন্দর্যময়ী জ্যোৎস্না-তনুও ব্রহ্মা পরিত্যাগ করলেন। বিশ্বাবসু প্রমুখ গন্ধর্বেরা সেই তনু আদরের সঙ্গে গ্রহণ করল। এরপর ব্রহ্মা নিজের আলস্য থেকে ভূত, পিশাচ প্রভৃতি সৃষ্টি করলেন। কিন্তু তাদের মুক্ত কেশপাশ আর উলঙ্গ তনু দেখে তিনি চোখ বুজলেন। ব্রহ্মা সেই জৃম্ভা নামিকা তনুও পরিত্যাগ করায় ওরা সেটা ধারণ করল। ঐ দেহের জন্যই প্রাণিগণের মধ্যে নিদ্রা নামক ইন্দ্রিয়-বিকলতা দেখা যায়, আর ইন্দ্রিয়বিকলতা থেকে যে ভ্রান্তি আসে তাকেই জ্ঞানীরা উন্মাদ বলেন। এই দোষে প্রাণীরা উচ্ছিষ্টভোজী হয় আর সর্বাঙ্গ মলমূত্রে লিপ্ত করে। তারপর অজ ব্রহ্মা নিজেকে যথেষ্ট শক্তিমান মনে করলেন এবং এক অদৃশ্য রূপ সহযোগে সাধ্য, গণদেবতা আর পিতৃগণকে সৃষ্টি করলেন। সাধ্যগণ এবং পিতৃগণ হল আত্মসর্গ ; এরা ব্রহ্মার ঐ তনু লাভ করল। এই জন্যই কর্মকাণ্ডে প্রবীণ ঋষিগণ শ্রাদ্ধাদি কার্যে এদের হব্য-কব্য দান করেন। এরপর ব্রহ্মা তাঁর দৃশ্য অথচ তিরোহিত দেহ সহযোগে সিদ্ধ-বিদ্যাধরদের সৃষ্টি করলেন এবং এদের সেই অন্তর্ধান নামক দেহ দান করলেন। ৩৮-৪৪

এরপর ব্রহ্মা নিজের প্রতিবিম্ব দর্শন করে তার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। এই প্রতিবিম্ব-মূর্তিতে তিনি কিন্নর ও কিম্পুরুষদের সৃষ্টি করলেন। এরা আবার সেই পরিত্যক্ত প্রতিবিম্ব-মূর্তিটি ধারণ করল। তারা স্ত্রীপুরুষে মিলে ঊষাকালে ব্রহ্মার পরাক্রম ও মাহাত্ম্য কীর্তন করে। কিন্তু তনু সৃষ্টি বিস্তৃত হচ্ছে না দেখে ব্রহ্মা তাঁর ভোগবিশিষ্ট স্থূলদেহে শয়ান হলেন এবং অনেক চিন্তা করলেন। পরে ক্রোধাবিষ্ট হয়ে সেই ক্রোধযুক্ত দেহ বিসর্জন দিলেন। এই দেহ থেকে যে সব কেশ বিচ্যুত হয়েছিল তা থেকেই অহিকুল সৃষ্টি হয়। আর তাঁর হস্তপদাদি সঞ্চালনের ফলে নাগেদের সৃষ্টি হয়। এরা বিস্তৃত ফণাবিশিষ্ট, মহাবেগবান এবং ক্রূর। এখন ব্রহ্মা নিজেকে কৃতকৃত্য মনে করলেন। এরপর ধর্মাদি প্রবর্তনের নিমিত্ত নিজের মন থেকে তিনি মনুদের সৃষ্টি করলেন। এদের তিনি নিজের পুরুষাকার পূর্ণ দেহটি দান

করলেন ; কারণ তিনি সকল জীবের স্বামী। মনুদের সৃষ্ট হতে দেখে পূর্বসৃষ্ট দেব প্রভৃতিরা প্রজাপতির বন্দনাগান করলেন, হে জগৎস্রষ্টা, আপনার এই বিস্ময়কর মনুষ্যাকার সৃষ্টি এক বিরাট সুকৃতি। এই পুরুষশরীরে স্বর্গাপবর্গাদি পুরুষার্থ-সাধনকারী ক্রিয়াসমূহ প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং এই পুরুষশরীরের সঙ্গে যজ্ঞ প্রভৃতি ক্রিয়াকর্মের দ্বারা আমরা অন্নাদি গ্রহণে সক্ষম হব। তারপর ব্রহ্মা তপস্যা, বিদ্যা, যোগ ও সমাধি যুক্ত হয়ে জিতেন্দ্রিয় হলেন এবং ঋষিস্বরূপ হয়ে মনের মত ঋষিদের সৃষ্টি করলেন। এদের তিনি একাদিক্রমে নিজ দেহের অংশগুলি দান করলেন। সেই অংশগুলি হল—সমাধি, যোগ, ঋদ্ধি, তপ, বিদ্যা এবং বৈরাগ্য। ৪৫-৫৩

একবিংশ অধ্যায়

দেবহূতির সঙ্গে ঋষি কর্দমের বিবাহ সম্বন্ধ

বিদুর বললেন, ভগবান্, স্বায়ম্ভুব মনুর বংশকথা বিদ্বজ্জনের শোনার মত। তাঁর কথা আপনি বলুন। এই বংশে মৈথুন সহযোগে বংশবৃদ্ধি হয়। স্বায়ম্ভুবের দুই প্রথিতযশা পুত্র ছিল, প্রিয়ব্রত এবং উত্তানপাদ। এঁরা ধর্মদ্বারা সপ্তদ্বীপা মহীকে রক্ষা করেছিলেন, এই স্বায়ম্ভুব মনুর কন্যার নাম দেবহূতি। আপনি বলেছেন যে এঁর সঙ্গে মহর্ষি কর্দমের বিবাহ হয়েছিল। যম, নিয়মাদি সংযুক্তা দেবহূতির সংসর্গে মহাযোগী কর্দমের যে সব সন্তানাদি জন্মলাভ করে আমি তাঁদের কথা শুনতে অভিলাষী। সেই কাহিনী আপনি বলুন। মহর্ষি রুচি আকূতিকে এবং ব্রহ্মার পুত্র দক্ষ প্রসূতিকে ভার্যারূপে লাভ করেন। ১-৫

মৈত্রেয় বললেন, 'প্রজা সৃষ্টি কর', ব্রহ্মা এই কথা বললে মহর্ষি কর্দম সরস্বতী নদীর তীরে দশ সহস্র বৎসর ধরে তপস্যা করেন। সমাধিযুক্ত ক্রিয়াযোগে, ভক্তি সহকারে তিনি শ্রীহরির সেবা করেন, কারণ তিনি শরণাগতের বরদাতা। তারপর সত্যযুগ এল। কমললোচন ভগবান প্রসন্ন হলেন। কর্দমকে তিনি তাঁর বেদপ্রতিপাদ্য সচ্চিদানন্দরূপ দর্শন করালেন। আকাশপথে মহর্ষি কর্দম সেই নির্মল, সূর্যবৎ দীপ্তিমান, শ্বেতপদ্ম ও উৎপলের মালায় সুশোভিত, স্নিগ্ধ নীল অলকে মুখপদ্ম সমুদ্ভাসিত, নির্মলাম্বর পরিহিত, কিরীট-কুণ্ডল-শঙ্খ-চক্র-গদাধারী, একহস্তে শ্বেতপদ্ম নিয়ে ক্রীড়াশীল, মনোমুগ্ধকর, সহাস্যবদন, গরুড়পৃষ্ঠে আরূঢ়, বক্ষস্থলে লক্ষ্মী শোভমানা এবং কণ্ঠে কৌস্তুভ দীপ্যমান মহান রূপ দেখলেন। কর্দমের অভীষ্ট সিদ্ধ হল। তিনি খুব আনন্দিত হলেন, কারণ ভগবানে প্রীতি তাঁর স্বতঃসিদ্ধ। তিনি ভূমিতে দণ্ডবৎ হয়ে ঈশ্বরকে প্রণাম জানালেন। তারপর কৃতাঞ্জলি হয়ে স্তব করলেন, হে স্তুতিযোগ্য মহাপুরুষ, কি আনন্দ ! যোগীরা যে রূপ প্রকৃষ্ট জন্মে যোগসিদ্ধিতে অভিলাষ করেন সেই অখিলসত্ত্বরাশি-রূপ আজ দেখতে পেয়ে আমার জীবন সফল হল। নরকতুল্য শূকরাদি যোনিতে যে সব বিষয়-সুখ রয়েছে তারই লেশমাত্র পাবার জন্য যারা আপনার পাদপদ্মের সেবা করে তারা মূঢ়। আপনিও তাদের কামনা পূর্ণ করে দেন। তাদের নিন্দা করলেও আমার মধ্যেও সেই দুষ্ট আশা রয়েছে। আমিও গৃহস্থাশ্রমের কামধেনু সদৃশা, আমার মত শীলবিশিষ্টা ভার্যা লাভের উদ্দেশ্যে কল্পবৃক্ষতুল্য ব্রহ্মাদি দেবগণের উৎস আপনার শ্রীচরণে শরণাপন্ন হয়েছি। আপনার

বাক্যেই কামহত লোকসকল রজ্জুতে বদ্ধ রয়েছে। আমিও সবার মতই। আমিও কালস্বরূপ আপনাকে কামসিদ্ধির জন্য পূজোপহার প্রদান করি। কামাভিভূত লোকসকলকে পরিত্যাগ করে যারা আপনার শ্রীচরণে আশ্রয় নিয়েছে তারাই আপনার গুণকথারূপ মধুর অমৃত পান করে ক্ষুধা-তৃষ্ণা, জরা-মরণ, সুখ-দুঃখাদি জয় করতে সক্ষম হয়েছে। যে কালচক্র বিস্তৃত জগৎকে আকর্ষণ করে সর্বদা ধাবিত সেই কালচক্র আপনার ভক্তদের ওপর কোনও প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। এই কালচক্র ব্রহ্মরূপ অক্ষের উপর পরিভ্রমণশীল। এটি তেরটি অরাবিশিষ্ট (শলাকা), তিনশত ষাটটি পর্বযুক্ত। ছয় ঋতু এর ছয়টি নেমি, অসংখ্য ক্ষণ-লবাদি এর পত্রাকার ধারা এবং তিন চাতুর্মাস্য এর নাভিস্বরূপ। এই কালচক্রের গতি অতি তীব্র। আপনি এক হয়েও জগৎসৃষ্টির অভীপ্সায় অদ্বিতীয়া মায়া অবলম্বনে সৃষ্টি-স্থিতি-ধ্বংস বিধান করেন, যেমন মাকড়সা নিজ শক্তি বলেই তার তন্তু নির্মাণ, বিস্তার এবং সংহার করে। আপনার ভক্তদের জন্য কৃপা করে আপনি যেসব শব্দাদি বিষয়-সুখ বিস্তৃত রেখেছেন সেগুলি কিন্তু সত্যই আপনার অভিলষিত নয়। যখন কৃপা করে তুলসীবিভূষিত তনু নিয়ে আপনি আবির্ভূত হয়েছেন তখন আমাদের প্রতি করুণা করুন। আত্মানন্দে পরিপূর্ণ বলে কর্মফলে আপনার অনীহা, নিজ মায়ায় আপনি লোকতন্ত্র বিস্তার করেছেন, অল্প আরাধনাতেই তুষ্ট হয়ে আপনি কাম্যফল প্রদান করেন। আপনার নমনীয় পাদপদ্মে বারংবার প্রণাম নিবেদন করি। ৬-২১

মৈত্রেয় বললেন, এ ভাবে অকপটচিত্তে স্তব সমাপ্ত করলে স্বয়ং ভগবান মহর্ষি কর্দমকে পরম তৃপ্তিদায়ক বাণীতে সম্বোধন করলেন। তিনি তখন গরুড়ের পিঠে আরূঢ় ছিলেন, প্রেমহাস্যে তাঁর ভ্রূ সঞ্চালিত হয়েছিল। তিনি বললেন, যেজন্য তুমি নিয়ম পালন করে আমার আরাধনা করেছ তা আমার অজ্ঞাত নয়। তাই আমি তোমার অভিপ্রায় জেনে পূর্ব থেকেই তার ব্যবস্থা করে রেখেছি। তোমার মত যারা আমাতে সমর্পিতচিত্ত, তাদের আরাধনা যাতে ব্যর্থ না হয় তা আমাকে দেখতেই হবে। শুভ কর্মানুষ্ঠানে প্রসিদ্ধ ব্রহ্মপুত্র স্বায়ম্ভুব মনু চক্রবর্তী সম্রাট ; তিনি ব্রহ্মাবর্তে অধিষ্ঠান করে সপ্তসমুদ্রবর্তী পৃথিবীকে শাসন করেছেন। এই ধর্মজ্ঞ রাজর্ষি মহিষী শতরূপা সমভিব্যাহারে আগামী পরশ্ব তোমাকে দেখতে আসবে। তারা তাদের সুনীলনয়না পতিপ্রার্থিনী কন্যাকে তোমার হাতে সমর্পণ করবে। দশ সহস্র বৎসর এই পত্নী তোমার হৃদয়ে সমাহিত থাকবে। এই রাজকন্যা শীঘ্রই তোমার কামনা অনুসারে তোমারই নির্দিষ্ট পথবর্তিনী হবে। তোমার ভার্যা তোমার বীর্য থেকে ন'টি কন্যার জন্ম দেবে। মরীচি প্রভৃতি ঋষিগণ এঁদের গর্ভে আত্মসদৃশ পুত্র উৎপাদন করবেন। তুমিও আমার নির্দেশ যথাযথ পালন করে ত্রিবিধ ঋণ থেকে মুক্তি লাভ করে সর্বকর্মফল আমাতে সমর্পণ করে নিবৃত্তি লাভ করবে। সর্বভূতে দয়াবিধান করে, অভয় দান করে তুমি আত্মজ্ঞানে সম্পন্ন হবে। এর ফলে তুমি আমাতে জীবাত্মাসহ জগৎকে একীভূত দেখবে এবং পরে নিজের মধ্যেই আমাকে দেখতে পাবে। দেবহূতির গর্ভে তোমার বীর্যে আমার অংশের অংশ নিয়ে আমিই অবতীর্ণ হব এবং তত্ত্বসংহিতা প্রণয়ন করব। ২২-৩২

মৈত্রেয় বললেন, কর্দমকে এই কথা বলে ভগবান সরস্বতী নদীবেষ্টিত বিন্দুসরোবর তীরস্থ কর্দমাশ্রম পরিত্যাগ করে চলে গেলেন। কর্দম দেখলেন অগণ্য সিদ্ধেশ্বর পরিষেবিত, সিদ্ধগণের অভিলষিত শ্রীভগবান গরুড়ের পক্ষভরে করে সাম এবং ঋক্ স্তোত্র কীর্তন করতে করতে অন্তর্হিত হলেন। ভগবান প্রস্থান করলে মহর্ষি কর্দম ঈশ্বর-নির্দিষ্ট কালের অপেক্ষায় বিন্দুসরোবরের তীরে

আসীন রইলেন। এদিকে মনু সুবর্ণময় বস্ত্রালংকারে ভূষিত হয়ে সস্ত্রীক সকন্যা রথে করে পৃথিবী পর্যটনে নিষ্ক্রান্ত হয়েছিলেন। তিনিও ঈশ্বর-নির্দিষ্ট কালেই শান্তব্রত কর্দম মুনির আশ্রমে উপনীত হলেন। কর্দমের নিকটস্থ হয়ে অত্যন্ত কৃপাবশে ভগবানের বিশাল নয়নযুগল হতে আনন্দাশ্রু নির্গত হয়ে বিন্দুসরোবর সৃষ্টি করেছিল। এর মধ্যে সরস্বতী নদীর জল এসে তাকে পবিত্র করে। এই জল সুস্বাদু ও আরোগ্যকর; মহর্ষিগণ এই জল ব্যবহার করেন। এই আশ্রমের শ্রী অপূর্ব। এস্থান বহু পুণ্যবৃক্ষ ও লতায় আচ্ছাদিত। বৃক্ষ-শাখায় পক্ষিগণ এবং নীচে মৃগকুলের শব্দে এই স্থানটি পরিপূর্ণ। সর্বঋতুর ফলপুষ্পে শোভিত বনরাজি চতুর্দিকে শোভা বিস্তার করে রয়েছে। প্রমত্ত পক্ষীকুল সর্বদা কূজনে ব্যস্ত, মত্ত ভ্রমরবৃন্দ সর্বদা গুঞ্জনে রত, মত্ত কেকাশ্রেণী নৃত্যতৎপর আর মত্ত কোকিলের ডাকে দিঙ্‌মণ্ডল মুখরিত। কদম্ব, চম্পক, অশোক, করঞ্জ, বকুল, অসন, কুন্দ, মন্দার, কুটজ, আম্র প্রমুখ বৃক্ষশ্রেণীতে এই আশ্রমের কতই না শোভা বেড়েছে। কারণ্ডব, প্লব, হংস, কুরর, জলকুক্কুট, সারস, চক্রবাক, চকোর এখানে মধুর রব সৃষ্টি করে। আরও, বিবিধ হরিণ, শূকর, শল্লক, গবয়, কুঞ্জর, গোপুচ্ছ বানর, মর্কট, সিংহ, নকুল, কস্তুরীমৃগ প্রভৃতিতে এই অঞ্চল পরিপূর্ণ। ১৩-৪৪

পরিচরদের সঙ্গে সেই মহান তীর্থে উপনীত হয়ে আদিরাজ মনু দেখলেন যে মহর্ষি হোমক্রিয়া সম্পন্ন করে আসীন রয়েছেন। তাঁর দেহে উগ্রযোগের তেজ। ভগবানের স্নিগ্ধ কটাক্ষ লাভে ধন্য বলে এবং তাঁর অমৃতময়ী বাণী শ্রবণ করার ফলে মহর্ষির দেহ অতিকৃশ হয়নি। তিনি ছিলেন দীর্ঘদেহী পুরুষ, পদ্মপলাশনেত্র, জটাধারী এবং চীরবাস পরিহিত। বেশবাসাদি সংস্কৃত না হওয়ায় তাঁকে মলিন মহামূল্য রত্নের মত বোধ হচ্ছিল। কর্দমের পর্ণশালায় উপনীত হয়ে মনু তাঁর চরণবন্দনা করলে মহর্ষি তাঁকে আশীর্বাদ করলেন। যথাযোগ্য সৎকার প্রদর্শিত হলে এবং তা গ্রহণ করে মনু সুখাসীন হয়ে মৌনভাবে থাকলে কর্দম স্নিগ্ধ কথায় ভগবানের আদেশ স্মরণ করে বললেন, মহারাজ, আপনার পৃথিবী-পরিক্রমা সাধুদের রক্ষণ এবং দুরাচারদের হননের জন্য, কারণ ভগবানের পালন-শক্তি তো আপনিই। আপনিই জগৎ পালনের জন্য সূর্য, চন্দ্র, অগ্নি, বায়ু, যম, ধর্ম, বরুণ প্রভৃতির রূপ ধারণ করেছেন। আপনি নির্মল ভগবৎস্বরূপ, আপনাকে নমস্কার। আপনি যদি জয়প্রদ মনিরত্নাদিতে ভূষিত রথারোহণে গম্ভীরনাদ সহকারে প্রচণ্ড ধনু উদ্যত করে দুষ্টদের ত্রাস সৃষ্টি করে নিজ সৈন্যদের পদভরে পৃথিবী কাঁপিয়ে বিশাল সৈন্য সমভিব্যাহারে সূর্যের মত ভূমণ্ডল প্রদক্ষিণ না করতেন, তাহলে ভগবৎ-বিরচিত বর্ণাশ্রমনিবন্ধন সমস্ত ধর্মমর্যাদা দুরাচারদের দ্বারা বিনষ্ট হত। আপনি দণ্ডধারণ করে জাগরূক না থাকলে প্রতিপক্ষপূজ্য লোভী মানুষেরা প্রবল হয়ে উঠবে; তাতে অধর্ম বেড়ে গিয়ে লোক দস্যুগ্রস্ত হয়ে মারা যাবে। যাই হোক, আপনি এখানে কেন এসেছেন তা প্রকাশ করুন। আপনি যা বলবেন, তাই আমি হৃষ্টচিত্তে স্বীকার করব। ৪৫-৫৬

দ্বাবিংশ অধ্যায়

মহর্ষি কর্দমের সঙ্গে দেবহূতির বিবাহ

মৈত্রেয় বললেন, এভাবে মনুর অশেষ গুণের কথা কীর্তিত হলে সম্রাট একটু লজ্জা পেলেন। কর্দম বিরত হলে তিনি বললেন, বেদপ্রবক্তা ব্রহ্মা বৈদিক বিধি পরিপালনের জন্য তপোবিদ্যাযুক্ত, বিষয়বিরক্ত ব্রাহ্মণদের সৃষ্টি করেন। আর সেই ব্রাহ্মণদের রক্ষণের জন্য সহস্রপাৎ ভগবান তাঁর সহস্র বাহু থেকে ক্ষত্রিয়দের সৃষ্টি করেন। এই জন্যই ব্রাহ্মণদের বলা হয় ভগবানের হৃদয়, আর ক্ষত্রিয়দের তাঁর অঙ্গ। আর এই জন্যই ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় পরস্পরকে রক্ষণ করেই কিন্তু আসলে সেই সদসদাত্মক অচ্যুত ব্রহ্মের দ্বারাই পরিরক্ষিত রয়েছে। আপনাকে দর্শন করে আমার সমস্ত সন্দেহের নিরসন হয়েছে। প্রীতিবশে, বিনা প্রশ্নেই আপনি আমার আচরণীয় ধর্মের কথা সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। যাদের চিত্ত কলুষিত তারা আপনার দর্শন পায় না। মহাসৌভাগ্যেই আমি আপনার দর্শন লাভে সমর্থ হয়েছি। মহাভাগ্যের ফলেই আপনার সুমঙ্গল পদরজ আমার শিরে ধারণ করতে পেরেছি। আর ভাগ্যবশেই আপনার অনুগ্রহ-উপদেশ লাভ করেছি। এও বড় ভাগ্যের কথা যে আপনার বাক্যরাশি অনর্গলভাবে কর্ণকুহরে প্রবেশ করে তাকে পবিত্র করেছে। অতএব, মহামুনি, আপনি কৃপাপূর্বক কন্যাস্নেহে দুর্বল ও দীন আমার কথা শ্রবণ করুন। প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদের ভগিনী আমার এই কন্যাটি যথোপযুক্ত বয়স, শীল ও গুণ সমৃদ্ধ পতি গ্রহণে আগ্রহশীলা। এরূপ অবস্থায় নারদ সকাশে আপনার শীল, পাণ্ডিত্য, রূপ, বয়স ও গুণের কথা জানতে পেরে সে আপনাকেই পতিরূপে নির্বাচন করেছে। সুতরাং দ্বিজশ্রেষ্ঠ, আমি সশ্রদ্ধচিত্তে এই কন্যাটিকে আপনার হাতে সমর্পন করছি, আপনি একে গ্রহণ করুন। সমস্ত গৃহকর্মের দিক থেকে আমাব কন্যা সম্পূর্ণভাবে আপনার উপযুক্ত। যদি অভিলষিত বিষয় স্বয়ং উপস্থিত হয় তবে তা প্রত্যাখান করা সংসারবিরাগী মানুষের পক্ষেও শোভন নয়; যারা সংসারে আসক্ত তাদের তো কথাই নেই। আরো দেখুন, উপস্থিত বিষয়ে উপেক্ষা করে যে ব্যক্তি পরে কৃপণের নিকট যাচ্ঞা করে, মহাযশস্বী হলেও সে ক্রমশ যশোহীন হয় এবং তার মান-সম্ভ্রমও অবজ্ঞা দ্বারা বিনষ্ট হয়। আমি শুনেছি যে আপনি বিবাহে উৎসুক হয়েছেন। ব্রহ্মচর্যের পর আপনার নিকট গৃহস্থাশ্রম সমাগত। সুতরাং শ্রদ্ধার সঙ্গে দেওয়া আমার এই কন্যাকে আপনি গ্রহণ করুন। ১-১৪

কর্দম বললেন, মহারাজ, সত্যই আমি বিবাহে উদ্যত। আপনার কন্যা কারও নিকট দত্তা নয়। সুতরাং প্রথম বৈবাহিক ব্যাপার আমাদের মধ্যে উপযুক্তই হবে। আপনার কন্যার অভিলাষ বেদবিধিতে সিদ্ধ হোক। নিজের অঙ্গশোভাতেই এই কুমারীকে সালংকরা বলে মনে হয়। এই কন্যাকে সকলেই সমাদর করবে। আরও, চরণে নূপুরের ধ্বনি তুলে প্রাসাদের ওপর যখন একদিন এই কন্যাটি কন্দুক নিয়ে আপন মনে খেলা করছিল তখন বিমানযাত্রী বিশ্বাবসু তাকে দেখে সম্মোহিত হয়ে বিমান থেকে পড়ে যায়। আপনার কন্যা নারীকুলের মুকুটমণি। বিষ্ণুর চরণসেবী ভিন্ন কেউ ও'র দর্শনলাভে সমর্থ নয়। আপনিও আদিরাজ মনু, আপনার কন্যা উত্তানপাদের ভগিনী। আপনি যখন স্বয়ং এই বিবাহের জন্য উপস্থিত হয়েছেন, তখন আপনার কন্যাকে প্রত্যাখ্যান করার সাধ্য কার? তবে যতদিন না আমার বীর্যে এই কন্যা অন্তর্বর্তী হন ততদিন আমি এ'কে ভজনা

করব। তারপর ঈশ্বরপ্রোক্ত শ্রেষ্ঠ পারমহংস্য ধর্ম অবলম্বন করে হিংসাশূন্য চিত্তে আমি স্বধর্মে ব্রতী হব। কারণ দেব-তির্যক-মানুষ-স্থাবরাদি ভেদে বিচিত্র এই বিশ্ব যাঁর থেকে উদ্ভূত, যাঁতে এই সমস্ত বিলীন হয়ে যাবে এবং যাঁতে দৃশ্যমান জগৎ বিধৃত সেই পরমেশ্বরই আমার একান্ত ধ্যানের বস্তু। তিনি প্রজাপতিদের পতি। ১৫-২০

মৈত্রেয় বললেন, কর্দম এই কথাগুলি বলে পদ্মনাভ ভগবানের ধ্যানে মৌন হলেন। তাঁর পুষ্পিত মুখাবয়ব দেখে দেবহূতি আকৃষ্ট হলেন ; সম্রাট মনু বুঝলেন যে কর্দম সম্বন্ধে তাঁর মহিষী এবং কন্যার মনোভাব অনুকূল। তখন তিনি হৃষ্টচিত্তে কর্দমকে কন্যাদান করলেন। নানাগুণে বিভূষিতা দেবহূতি নিঃসন্দেহে কর্দমের যোগ্য ছিলেন। মহিষী শতরূপা যৌতুকস্বরূপ মহামূল্য বেশভূষা ও অন্যান্য সামগ্রী কন্যা-জামাতাকে সানন্দে দান করলেন। উপযুক্ত পাত্রে কন্যা সম্প্রদানের জন্য মহারাজ মনুর মনের উদ্বেগ দূর হল। তিনি কন্যাকে আলিঙ্গন করলেন। স্নেহাবেগে তাঁর চিত্ত ব্যথিত হল। তিনি কন্যাবিরহ সহ্য করতে না পেরে 'মা আমার! কন্যা আমার!' বলে অশ্রু বিসর্জন করেছিলেন। সেই অশ্রুধারায় দেবহূতির কেশকলাপ সিঞ্চিত হয়েছিল। তারপর কর্দমকে আমন্ত্রণ জানিয়ে তাঁর অনুজ্ঞা নিয়ে সম্রাট মনু সভার্যা মহর্ষির আশ্রম থেকে প্রস্থান করলেন। তাঁরা যেতে যেতে দেখলেন ঋষিগণের বাসোপযুক্ত সরস্বতী নদীর শোভাসমৃদ্ধ উভয় তীরে শান্ত ঋষিদের আশ্রমের সম্পদস্বরূপ ঈশ্বর আরাধনার উপযুক্ত তুলসী, পুষ্প, ফলাদি সুশোভিত রয়েছে। সম্রাট মনু আসছেন এই সংবাদ পেয়ে প্রজাবৃন্দ সহর্ষচিত্তে স্তব, গান ও বাদ্য সহযোগে তাঁকে নিয়ে যাবার জন্য ব্রহ্মাবর্ত থেকে নিষ্ক্রান্ত হল। সর্বসম্পদ সমন্বিত বর্হিষ্মতী নামক পুরী এই ব্রহ্মাবর্তেই রয়েছে। যজ্ঞাঙ্গ বরাহের দেহান্দোলনে বিক্ষিপ্ত রোমরাজি এখানেই পড়েছিল। সেই রোমরাজি থেকে চিরহরিৎ কুশ ও কাশ উৎপন্ন হয়। এই সব দিয়ে ঋষিরা, যজ্ঞবিঘ্নকারী রাক্ষসদের পরাভব করবার জন্য যজ্ঞ করেন। সুতরাং যে বরাহাবতারের অনুগ্রহে এই পৃথিবী অর্জিত হয়েছে সম্রাট মনুও ব্রহ্মাবর্তের ভূমিতে কুশাসন বিস্তৃত করে সেই যজ্ঞপুরুষের অর্চনা করেছিলেন। এই 'বর্হি' নামক কুশাসনে বসে অর্চনা করার জন্য এ স্থানের নাম হয় বর্হিষ্মতী। এই বর্হিষ্মতী পুরীতে প্রবেশ করে মনু ত্রিবিধ তাপ দূর করলেন। এখানে গন্ধর্বগণ তাঁদের স্ত্রীদের সঙ্গে প্রত্যূষে মনুর সৎকীর্তি কথা গান করেন। সম্রাট মনুও সস্ত্রীক, সপুত্র প্রেমানুবদ্ধ হৃদয়ে হরিকথা শ্রবণ করে পরস্পর সদ্ভাব সৃষ্টি দ্বারা ধর্মার্থ-কাম-মোক্ষের চর্চা করেন। যোগমায়াতে সুসিদ্ধ মুনিস্বরূপ স্বায়ম্ভুব মনুকে পার্থিব ভোগসমূহ বিচলিত করতে পারেনি। তিনি ছিলেন ঈশ্বরে সমর্পিতপ্রাণ। তিনি বিষ্ণুকথা শ্রবণ করতেন, বিষ্ণুর সেবা করতেন, তাঁর কীর্তি ব্যাখ্যা করতেন। এর ফলে মন্বন্তর-কালের এক মুহূর্তও তাঁর বৃথা ব্যয় হয়নি। বাসুদেব প্রসঙ্গে মনুর তাপত্রয় নিবারিত হয়েছিল। এই ভাবেই তিনি একাত্তর যুগ পরিমিত মন্বন্তর কাল অতিবাহিত করেন। শারীর, মানস, দিব্য, মানুষী এবং ভৌতিক কষ্টসকল হরিচরণাশ্রিত মনুর কোনও প্রকার ভাবান্তর ঘটাতে সক্ষম হয়নি। মুনিরা তাঁকে ধর্মবিষয়ক প্রশ্ন করলে তিনি সকলের মঙ্গলের জন্য বিবিধ শুভাবহ ধর্মের কথা, মানুষের সাধারণ ধর্মের কথা, বর্ণাশ্রম ধর্মের কথা প্রভৃতি বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেন। বিদুর, আমি আদিসম্রাট মনুর অদ্ভুত চরিত-কথা বর্ণনা করলাম। এবার তাঁর সন্তানের (দেবহূতির) কথা শোন। ২১-৩৯

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

বিমানে কর্দম ও দেবহূতির রতিক্রীড়া

মৈত্রেয় বললেন, মনু ও শতরূপা প্রস্থান করলে পতির অভিপ্রায় জেনে সাধ্বী দেবহূতি, পার্বতী যেমন শিবের সেবা করতেন, সেইভাবেই কর্দমের পরিচর্যা করেছিলেন। দেহ-মনের শুচিতা রক্ষা করে, পতির বিশ্বাস অর্জন করে, তাঁর গৌরব রক্ষা করে, সম্ভ্রমবোধের সঙ্গে, ইন্দ্রিয়সংযমের দ্বারা, শুশ্রূষা, সেবা, প্রেম এবং মিষ্টবচনে তিনি সংসার পরিপালনে যত্নবতী হলেন। তিনি কাম, দম্ভ, দ্বেষ, লোভ, পাপাচার, গর্ব এসব বিসর্জন দেন এবং সর্বদা অপ্রমত্তা থেকে কর্দমের তুষ্টিবিধান করেন। দেবহূতি দেবতাদের থেকেও অধিক-গৌরবশালী পতির পুত্র লাভ করবেন এই আশীর্বাদ কামনা করেছিলেন। এইজন্য তিনি সর্বপ্রকারে স্বামীর অনুবর্তিনী হয়েছিলেন। তার উপর দীর্ঘকাল ব্রতচর্যা করে তিনি অতিশয় কৃশ হয়েছিলেন। তখন মহর্ষি কর্দম কৃপা করে প্রেম-গদ্‌গদ বচনে বললেন তোমার পরম সেবা এবং ভক্তিতে আমি বিশেষ প্রীত হয়েছি। সংসারে দেহ সকলেরই অতি প্রিয়, কিন্তু সেই দেহকেই তুমি পীড়ন করেছ আমার জন্য স্বধর্মে নিয়ত থেকে তপ, সমাধি, বিদ্যা ও চিত্তের একাগ্রতা দ্বারা আমি ভগবানের যে সব প্রসাদ লাভ করেছি, আমাকে সেবা করার ফলে তুমি সে সবই আয়ত্ত করেছ। আমি তোমাকে দিব্য চক্ষু দিয়েছি, তুমি তাদের দেখতে পাবে। লীলাময় ভগবানের ভ্রূভঙ্গে যে ভোগাকাঙ্ক্ষা দূরে হয়। তাতে তোমার লোভ ও প্রয়োজন নেই। আমার সেবা করে তুমি সিদ্ধ হয়েছ। সার্বভৌম নরপতিরা যা কামনা করেন সাধারণ মানুষের পক্ষে দুর্লভ সেই সব বস্তু তুমি ভোগ কর। পাতিব্রত্য-ধর্ম পালন করে তুমি নিজেই ঐ সব দিব্য ভোগের অধিকারী হয়েছ। ১-৮

অখিল যোগমায়া-বিদ্যায় বিচক্ষণ কর্দম এই কথা বললে দেবহূতির মনঃকষ্ট দূর হল। তখন প্রশ্রয় ও প্রণয়ে বিহ্বল হয়ে তিনি গদ্‌গদ বাক্যে কর্দমকে সম্ভাষণ করলেন। তাঁর মুখে ব্রীড়ামধুর হাসি ফুটে উঠল। তিনি বললেন, স্বামী, আপনি সকল যোগশক্তিধরদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আপনি যা বলেছেন তা যে সার্থক একথা আমি জানি। কিন্তু বিবাহসময়ে আপনি যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে গর্ভোৎপত্তি পর্যন্ত সহবাস করবেন তা এখন পূর্ণ হোক। শ্রেষ্ঠ পতিসহযোগে পুত্রলাভ সতী স্ত্রীর একান্ত কাম্য। সহবাসে কৃতনিশ্চয় হয়ে কামশাস্ত্রোক্ত সাধন-উপায়গুলি সুসংহত করুন। আপনাকে দেখে কামবিকারে আমি কাতর হচ্ছি এবং রমণেচ্ছায় আমার দেহ বলহীন হয়ে পড়েছে। আমার দেহকে রতিসমর্থ করুন এবং উপযুক্ত স্থানের ব্যবস্থাও করুন। মৈত্রেয় বললেন, প্রিয়ার প্রিয়কার্য সাধনের জন্য কর্দম তখন যোগাসীন হলেন এবং সর্বত্র গমনের উপযোগী এক বিমান তখনই সেখানে এসে উপস্থিত হল। এই বিমান সকল কামনা পূর্ণ করতে সক্ষম। এই অলৌকিক যান যাবতীয় রত্নে বিভূষিত ছিল। মণিময় স্তম্ভে শোভিত এই বিমানে সমস্ত সম্পদ ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছিল। সেই সর্বকাল সুখাবহ বিমানে দিব্যসম্পদ সংগৃহীত ছিল। বিচিত্র পট্টিকায় এবং পট্টবস্ত্রের পতাকায় তা শোভিত। বিমানের অভ্যন্তরের বিচিত্র মালা ও পুষ্পসম্ভারের সুগন্ধে আকৃষ্ট ভ্রমরেরা মধুর গুঞ্জনে মত্ত ছিল। বিমানটির সর্বত্রই নানাবিধ কার্পাস ও ক্ষৌম বস্ত্র সুবিন্যস্ত ছিল। বিমানের ভিতর অনেক কক্ষ উপর্যুপরি সংগঠিত ছিল। এর মধ্যে পৃথক পৃথক ভাবে রাখা ছিল অজস্র শয্যা, পর্যঙ্ক, ব্যজন এবং আসন। সেইজন্য প্রতিটি কক্ষই অতি সুন্দর

দেখাচ্ছিল। তার স্থানে স্থানে নানা শিল্পকার্য উৎকীর্ণ ছিল। ইন্দ্রনীল মণি-খচিত চূড়ায় হেমকুম্ভ শোভা পাচ্ছিল। আবার কোথাও বা ছিল প্রবালরচিত সব বেদী। প্রবালের দ্বার-কপাটে হীরক গ্রথিত ছিল। নয়নাবাশষ্ট পদ্মরাগ মণি ভিত্তিসমূহে সন্নিবিষ্ট রয়েছে। বহু বিচিত্র চন্দ্রাতপ বিস্তৃত ছিল। এদের সম্মুখভাগে ছিল মহামূল্য সুবর্ণরচিত তোরণসমূহ। তোরণগুলিতে যে সব কৃত্রিম হংসাদি গ্রথিত ছিল তাদের প্রাণবন্ত মনে করে হংস-পারাবতসমূহ তোরণের উপরে এসে নানা কুজনে দিঙ্মণ্ডল মুখর করে তুলেছিল। যথোপযুক্ত বিহারস্থান, উপবেশনস্থান, শয়নগৃহ প্রাঙ্গণ এবং অঙ্গন প্রভৃতি সম্বলিত বিমানটি কর্দমেরও বিস্ময় সৃষ্টি করেছিল। ৯-২১

কিন্তু এমন আবাস দেখেও দেবহূতির অন্তর প্রফুল্ল হল না। বাঞ্ছাপূরণ কর্দম তখন তাঁকে বললেন, ভীরু, বিন্দুসরোবরে স্নান করে তুমি এই বিমানে আরোহণ কর। এই বিমান মানুষের সকল আকাঙ্ক্ষিত বস্তু প্রদানে সক্ষম। এটি ভগবানের আনন্দাশ্রু দিয়ে নির্মিত এবং সেইজন্য তীর্থস্বরূপ। কমলনয়না দেবহূতি স্বামীর কথা শুনে মলিন বসন, বেণীবদ্ধ কেশপাশ, মলাঙ্কিত দেহ, বিবর্ণ স্তন—সবশুদ্ধ সরোবরের নির্মলজলে প্রবেশ করলেন। জলে প্রবেশ করে তিনি দেখলেন সেখানে এক প্রাসাদে সহস্র তরুণী রয়েছে। তাদের সর্বাঙ্গে পদ্মগন্ধ। তারা দেবহূতিকে দেখেই কৃতাঞ্জলি হয়ে উঠে দাঁড়াল এবং সাবনয়ে নিবেদন করল, আমরা সবাই আপনার কিঙ্করী। আপনার কোন্ কর্ম করতে হবে তা আমাদের আজ্ঞা করুন। এই সকল মহিলারা দেবহূতিকে সম্মান প্রদর্শন করে নানাপ্রকার তৈলাদি মর্দন করে স্নান সমাপন করাল। তারপর তাঁকে নূতন, নির্মল, সূক্ষ্ম বস্ত্র এবং উত্তরীয় প্রদান করল। এবার তারা তাঁকে মহামূল্য উজ্জ্বল ভূষণরাশিতে সুসজ্জিত করে তাঁর জন্য নিয়ে এল ষড়্‌রস-সমন্বিত অন্ন, অমৃততুল্য স্বাদু আসব ও অন্যান্য পানীয়। তারপর তিনি মুকুরে তাঁর অপূর্ব তনুশোভা নিরীক্ষণ করলেন—তাঁর কণ্ঠে দোদুল্যমান পুষ্প-মাল্য, অঙ্গে নির্মল বস্ত্র, দেহ থেকে সকল মালিন্য দূরীভূত হয়ে তা নানা মঙ্গলাচরণে পূত এবং পরিচারিকাদের দ্বারা নানা পরিচর্যায় সুমার্জিত। তাঁর কেশপাশ সুন্দরভাবে প্রক্ষালিত, যাবতীয় বিভূষণে অঙ্গ সুশোভিত, গ্রীবাদেশে পদক, শ্রীহস্তে বলয় এবং চরণে স্বর্ণনূপুর ঝংকৃত। তাঁর নিতম্বে শোভা পাচ্ছিল বহুরত্ন-সজ্জিত কাঞ্চন মেখলা, এবং নানারঞ্জক পদার্থে রঞ্জিত মহামূল্য হারখণ্ডে তাঁর বক্ষস্থল অপূর্ব মহিমা ধারণ করেছিল। তাঁর দন্তপংক্তি সুন্দরভাবে বিন্যস্ত ছিল; সুভ্রূযুক্ত স্নিগ্ধমধুর অপাঙ্গ পরিমার্জিত, অক্ষিযুগল পদ্মকোরককেও হার মানিয়েছিল। সুস্নিগ্ধ দৃষ্টি এবং নীল অলকগুচ্ছে তাঁর মুখের শোভা হয়েছিল অপূর্ব। এবার তিনি স্মরণ করলেন তাঁর ঋষিশ্রেষ্ঠ স্বামীকে এবং তখনই তিনি পরিচারিকাবর্গসহ পতিসন্নিধানে উপস্থিত হলেন। কিন্তু তিনি যখন সহস্র পরিচারিকা পরিবৃত হয়ে স্বামীর সম্মুখে উপস্থিত হলেন, তখন যোগস্থ স্বামীর সম্বন্ধে তাঁর সংশয় উপস্থিত হল। তথাপি মুনির মধ্যে কামবাসনা উদ্দীপ্ত হল। কারণ তিনি দেখলেন স্নানে দেবহূতির সর্বাঙ্গ মালিন্যশূন্য হওয়ায় তাঁকে অপূর্ব দেখাচ্ছিল। তিনি যেন তাঁর বিবাহপূর্ব সৌন্দর্য ফিরে পেয়েছিলেন। তাঁর সুন্দর স্তনযুগল বসনাবরণে অপূর্ব আভামণ্ডিত হয়েছিল। মহর্ষি কর্দম সহস্র বিদ্যাধরী কর্তৃক সেব্যমানা, সুন্দর বস্ত্রে সুশোভিতা দেবহূতিকে নিয়ে বিমানে আরোহণ করলেন। ২২-৩৭

বিকশিত মহিমাযুক্ত, স্ত্রীর প্রতি বিশেষভাবে অনুরক্ত, বিদ্যাধরীদের দ্বারা সেবিত মহামুনি কর্দম সেই বিমানে, তারকাপতি চন্দ্র যেমন সুন্দর তারাগণে পরিবৃত

হয়ে নভঃস্থলে শোভা পান, সেইরকম শোভাই ধারণ করলেন। সেই বিমানে চড়ে মহর্ষি কর্দম ধনপতি কুবেরের মত দেবহূতির সঙ্গে রমণ করতে লাগলেন। মেরু অঞ্চলে কামবন্ধু অনিল সর্বদা মন্দ মন্দ প্রবাহিত হয়। সেখানে সুরধনী গঙ্গার মঙ্গলময় পতনধ্বনি সর্বদা শ্রুত হয়। এখানেই অষ্টলোকপাল নিয়ত বিহার করে থাকেন। সিদ্ধগণ স্ত্রীরত্নসমন্বিত হয়ে কর্দমের স্তব করতে লাগলেন। কর্দম সুন্দরী দেবহূতির সঙ্গে রতিক্রীড়ায় আসক্ত থেকে বৈশ্রম্ভক, সুরসেন, নন্দন, পুষ্পভদ্রক, মানস এবং চৈত্ররথে ভ্রমণ করলেন। সেই দ্যুতিমান, সর্বত্রগামী প্রচণ্ড শক্তি সমন্বিত বিমানে করে মহর্ষি কর্দম বায়ুবেগে ভ্রমণ করে অন্য সমস্ত বৈমানিকদের পরাজিত করলেন। যাঁরা তীর্থপাদ হরির ত্রিতাপ-নাশকারী শ্রীচরণে আশ্রিত সেই সত্যসংকল্প তাঁদের পক্ষে এ-সংসারে দুঃসাধ্য কিছুই নেই। ভূমণ্ডলের দ্বীপ, বর্ষ প্রভৃতি যাবতীয় বিবিধ আশ্চর্য স্থানসকল পত্নীকে প্রদর্শন করিয়ে কর্দম নিজের আশ্রমে ফিরে এলেন। সমুৎসুক মনুকন্যা দেবহূতিকে বিশেষ পদ্ধতিতে রমণ করে মহর্ষি কর্দম অনেক বৎসর মুহূর্তের মত অতিবাহিত করলেন। দেবহূতিও সেই উৎকৃষ্ট বিমানের উৎকৃষ্ট রতিবর্ধক শয্যায় স্বামীর সঙ্গলাভ করে কত বৎসর যে কাটিয়ে দিলেন তা তিনি জানতে পারলেন না। যোগপ্রভাবে কামব্রত এই দম্পতি শত বৎসর পরিমিত সময় সামান্য কালের মত অতিবাহিত করলেন। সর্বসঙ্কল্পবিদ্, সর্বসমর্থ, আত্মজ্ঞানী কর্দম নিজেকে নয়ভাগে বিভক্ত করে দেবহূতিকে অর্ধাঙ্গিনী কল্পনা করে তাঁর গর্ভে বীর্য আধান করলেন। দেবহূতিও খুব শীঘ্র সর্বাঙ্গসুন্দর রক্তপদ্মগন্ধ বিশিষ্ট কন্যাদের প্রসব করলেন। ৩৮-৪৮

অপত্যোৎপাদনের পর কর্দম সব কিছু পরিত্যাগ করে চলে যাচ্ছেন দেখে দেবহূতি বাইরে হাস্যমুখী হলেও অন্তরে কিন্তু বেদনায় বিহ্বল হলেন। কম্পিতহৃদয়ে, অধোমুখী হয়ে, পায়ের সুন্দর নখ দিয়ে ভূমিলিখন করতে করতে এবং ক্ষণে ক্ষণে চোখের জল ফেলে মৃদুকণ্ঠে তিনি বললেন, যদিও পরিণয়ের সময় আমার কাছে আপনি যে অঙ্গীকার করেছিলেন তা পালন করেছেন, তবুও আবার আমি আপনার শরণাপন্ন হলাম ; আপনি আমাকে অভয়দান করুন। বয়স, শীল প্রভৃতির দিক দিয়ে কন্যাদের উপযুক্ত পাত্র তো আপনাকেই অন্বেষণ করতে হবে। তাছাড়া আপনি প্রব্রজ্যায় চলে গেলে আমার সংসারদুঃখ নিবারণের তো আর কিছুই থাকবে না। পরমাত্মাকে পরিত্যাগ করে ইন্দ্রিয়ার্থপ্রসঙ্গে এই যে এতটা কাল অতিবাহিত হল, সবই তো আমার বিফলে গেল। ইন্দ্রিয়ার্থে আসক্ত থেকে মোক্ষসাধন উপদেশসামর্থ্য আমার অজ্ঞাতই রয়ে গেল। কিন্তু, যেহেতু আমি আপনাতে অনুরক্ত ছিলাম সেইজন্য আপনিই আমার সংসার-মুক্তির উপায় হোন। অজ্ঞান সহকারে অসৎ-বিষয়ে নিবিষ্ট হলে সংসার থেকে ভয় আসে, কিন্তু সাধুসঙ্গে বিষয়াসক্ত হলে তাই আবার সংসারের দুঃখ দূর করে, পরমানন্দ-প্রাপ্তির হেতু হয়। এই সংসারের যে কর্ম পুণ্য উৎপাদন করে না, বৈরাগ্য আনয়ন করে না বা ভগবৎ-সেবায় প্রবোচিত করে না, সেই কর্মের অনুষ্ঠানে জীব জীবিত হলেও মৃত। যেহেতু মুক্তিদাতা আপনাকে পেয়েও বন্ধন থেকে মুক্তি ইচ্ছা করিনি সেহেতু আমার দৃঢ় ধারণা যে ভগবানের মায়াতে আমি বঞ্চিত হয়েছি। ৪৯-৫৭

চতুর্বিংশ অধ্যায়

দেবহূতির গর্ভে কপিলের জন্ম

মৈত্রেয় বললেন, দেবহূতির এই নিবেদবাক্য শুনে কর্দম তাঁর প্রতি কৃপাবিষ্ট হলেন এবং ভগবানের বাক্য স্মরণ করে বললেন, রাজকন্যা, তুমি এভাবে দুঃখ করো না। আমি যাবার পূর্বেই অক্ষর ভগবান তোমার গর্ভে প্রবেশ করবেন। তুমি পূর্বজন্মে অনেক তপস্যা করেছিলে। এ জন্মেও দম-নিয়ম-তপ-দান সহযোগে শ্রদ্ধার সঙ্গে ঈশ্বর ভজনা কর। তোমার আরাধনার ফলে ভগবান আমারও যশ বিস্তার করে তোমার উদরে জন্ম নেবেন এবং তোমার অজ্ঞান দূর করবেন। দেবহূতি কর্দমের নির্দেশে আস্থা স্থাপন করলেন এবং পূর্ণ শ্রদ্ধায় মহান গুরুর ভজনা আরম্ভ করলেন। তারপর বহুকাল অতীত হল। অগ্নি যেমন কাষ্ঠ থেকে উৎপন্ন হয়, মধুসূদন ভগবান বিষ্ণু কর্দমবীর্য আশ্রয় করে তেমনি দেবহূতির গর্ভে জন্ম নিলেন। ভগবানের জন্মের সময় আকাশে মেঘগর্জনের মত নানা বাদ্যযন্ত্রের ধ্বনি উত্থিত হল। গন্ধর্বেরা শ্রীভগবানের গুণকীর্তন করতে লাগল। অপ্সরাগণ আনন্দে নৃত্য করতে লাগল। দেবতারা রাশি রাশি পুষ্পবর্ষণ করতে লাগলেন। সকল দিক্, জলাধারসমূহ, প্রাণিগণের মন প্রফুল্ল ও নির্মল হয়ে উঠল। মরীচি প্রভৃতি ঋষিদের সঙ্গে ব্রহ্মা সরস্বতী নদী বেষ্টিত কর্দমাশ্রমে এলেন। ব্রহ্মা বুঝতে পেরে-ছিলেন যে সত্ত্বগুণ অবলম্বন করে সাংখ্যজ্ঞান উপদেশ দেবার জন্য ভগবান আপন অংশে জন্ম নিয়েছেন। তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন। তাঁর সকল ইন্দ্রিয় সেই আনন্দের নিদর্শন বহন করছিল। বিশুদ্ধ চিত্ত দিয়ে তিনি ভগবানের আবি-র্ভাবকে সম্বর্ধনা জানালেন। মহর্ষি কর্দমকেও তিনি বললেন, তুমি অকপটে আমার পূজা করেছ। তুমি আমার বাক্যকে সম্মান দিয়েছ, কারণ তুমি তা সম্যক অবধারণ করেছ। পুত্রেরা এইভাবে পিতার শুশ্রূষা করবে। তারা গুরুবাক্য অবশ্যপালনীয় বলে মানবে। তোমার এই সুন্দরী কন্যাগুলি নিজেদের প্রভাবে এই সৃষ্টিকে অপত্যপরম্পরায় অনেক বাড়িয়ে তুলবে। সুতরাং তুমি তোমার কন্যা-গুলিকে শীল ও রুচি অনুযায়ী এই সব শ্রেষ্ঠ ঋষিদের সমর্পণ কর। এইভাবে তোমার যশ বিস্তার কর। আমি জানতে পেরেছি যে আদিপুরুষ প্রাণিবর্গের পরমপুরুষার্থ সাধনের জন্য নিজ মায়া অবলম্বন করে কপিলদেহ ধারণ করে তোমার গৃহে জন্মেছেন। তারপর তিনি দেবহূতিকে বললেন, তোমার গর্ভে প্রবেশ করেছেন সেই হিরণ্যকেশ, পদ্মলোচন, পদ্মরেখাঙ্কিত, পদ্মবেশধারী মহানপুরুষ, যিনি সাংখ্যোক্ত পরোক্ষ তত্ত্বজ্ঞান, অপরোক্ষদর্শন এবং অষ্টাঙ্গ-যোগ সহযোগে জীবগণের বহুজন্মসঞ্চিত সাংসারহেতুক বাসনাসমূহ দূর করবেন। ইনিই কৈটভমর্দন ভগবান ; তোমার অবিদ্যা-সংসারগ্রন্থি ছেদন করে ইনি ভূমণ্ডলে বিচরণ করবেন এবং সাংখ্যা-চার্যদের দ্বারা সম্মানিত হবেন। সিদ্ধগণ এঁকেই অধীপ বলে স্বীকার করবেন। তোমার কীর্তিবর্ধনকারী এই পুত্র কপিল নামে খ্যাতিলাভ করবেন। ১-১৯

মৈত্রেয় বললেন, এইভাবে কর্দম ও দেবহূতিকে আশ্বাস দিয়ে ব্রহ্মা নারদ ও চার কুমারকে সঙ্গে নিয়ে হংসযানে স্বর্গলোকে ছাড়িয়ে সত্যলোকে প্রস্থান করলেন। ব্রহ্মা চলে গেলে কর্দমও ব্রহ্মার নির্দেশ অনুযায়ী শীল, রুচি প্রভৃতি বিচার করে মরীচি প্রভৃতি ঋষিগণকে তাঁর কন্যাদের সম্প্রদান করলেন। মরীচিকে দিলেন কলা, অত্রিকে অনসূয়া, অঙ্গিরসকে শ্রদ্ধা, পুলস্ত্যকে হবির্ভূ, পুলহকে তাঁর যোগ্যকন্যা গতি, ক্রতুকে ক্রিয়া, ভৃগুকে খ্যাতি, বশিষ্ঠকে অরুন্ধতী, অথর্বকে শান্তি অর্পিত

হল। এই সব কন্যাদের দ্বারা যজ্ঞের বিস্তার হল। বিবাহিত এই সব সস্ত্রীক ঋষিদেরও সন্তোষবিধান করলেন মহর্ষি কর্দম। বিবাহের পর ঋষিগণ কর্দমের অনুজ্ঞা নিয়ে হৃষ্টচিত্তে নিজ নিজ আশ্রমে ফিরে গেলেন। তারপর মহর্ষি কর্দম দেবশ্রেষ্ঠ ত্রিযুগ ভগবানকে স্বগৃহে অবতীর্ণ জেনে তাঁর একান্ত সন্নিহিত হয়ে প্রণাম করে বললেন, নিজের দুষ্কৃতির ফলে এই নরকরূপ সংসারে দগ্ধ হয়ে বহুকালব্যাপী ধ্যানাদি অনুষ্ঠানের পরই দেবতাদের প্রীত করা যায়। এটিই সার কথা। বহু জন্ম ধরে অভ্যাসের পর, ভালোভাবে যোগসমাধির অনুষ্ঠান করে নির্জন স্থানে যতিরা আপনার স্বরূপ দর্শনের চেষ্টা করে থাকেন। আপনি আপনার ভক্তগণের প্রতি পক্ষপাত বিশিষ্ট। তাই জ্ঞানৈশ্বর্যপূর্ণ হয়েও আমাদের অজ্ঞানকে ধর্তব্যের মধ্যে না এনেই আপনি আমাদের মত প্রাকৃতজনের গৃহে জন্ম নিয়েছেন। আপনি আমাদের মত ভক্তদের জ্ঞানবর্ধন করে থাকেন। তাই সাংখ্যশাস্ত্র প্রকাশের ইচ্ছায়, নিজের বাক্যের সত্যতা প্রমাণের জন্য আপনি আমার গৃহে অবতীর্ণ হয়েছেন। হে অচিন্ত্য-শক্তিমান, আপনি রূপহীন। তবুও আপনি ভক্তদের আনন্দবর্ধক চতুর্ভুজ রূপ ধারণ করেন। এ রূপও আপনারই যোগ্য। মনস্বিগণ তত্ত্বজ্ঞানের অভিলাষে ঐশ্বর্য-বৈরাগ্য-যশ অববোধ-বীর্য-শ্রী পরিপূর্ণ কপিলের প্রণামযোগ্য পাদপীঠের অর্চনা করে থাকেন। আমি সেই কপিলের স্মরণ নিলাম যিনি প্রপঞ্চাতীত, প্রকৃতিরূপ, পুরুষ, মহত্তত্ত্ব, কাল, কবি (সূক্ষ্মতত্ত্ব), সত্ত্ব-রজ-তমোময়, প্রপঞ্চাবলীনায়ক লোকপাল এবং স্বাধীন শক্তিমান। আপনি প্রজাপতি। আপনাকে আমি কয়েকটি প্রশ্ন করতে চাই। আমার গৃহে আপনি পুত্ররূপে আগমন করায় আমি ঋণমুক্ত[১], পূর্ণমনোরথও বটে! এখনো আমি সন্ন্যাসমার্গে যাবার জন্য প্রস্তুত। আপনাকেই হৃদয়ে ধারণ করে আমি শোকহীন হয়ে পরিভ্রমণ করব। ২০-৩৪

শ্রীভগবান বললেন, আমিই তো বৈদিক এবং লৌকিক কর্মের প্রবক্তা। আমার কথিত ধর্মই সদাচারনিষ্ঠ মানুষের কাছে প্রমাণস্বরূপ। সেই জন্যই তোমাকে যা বলেছিলাম তা যাতে সত্য হয় সেই উদ্দেশ্যেই তো তোমার গৃহে পুত্র হয়ে জন্মেছি। এই লোকে আমি এই জন্য জন্মগ্রহণ করেছি যে, যে সকল মুক্তিকামী ব্যক্তি লিঙ্গদেহ থেকে মুক্তিলাভের আশা করেন তাঁদের আমি আত্মদর্শনের উপযুক্ত সাংখ্যতত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব। এই পরমাত্মা-প্রাপ্তি মার্গ দুর্জ্ঞেয়; দীর্ঘকাল অতিবাহিত হওয়ার ফলে বিনষ্টপ্রায়ও বটে। সেই জ্ঞান পুনরায় প্রবর্তনের জন্যই এই দেহধারণ এ কথা তুমি জানবে। আমার অনুজ্ঞা নিয়ে তুমি যথেচ্ছ গমন কর। আমাতে সমস্ত কর্ম সমর্পণ করে সুদুর্জয় মৃত্যুকে জয় করে পরমানন্দ প্রাপ্তির জন্য আমার আরাধনা কর। সবার অন্তর্যামী, স্বপ্রকাশ, জ্যোতিষ্মান আমাকে নিজের বিবেক-বুদ্ধি দ্বারা দর্শন করে তুমি সর্বতাপ রহিত হবে এবং মোক্ষলাভ করবে। আমার জননী দেবহূতিকে আমি সেই আত্মতত্ত্ব প্রকাশকারী বিদ্যা শিক্ষা দেব যাতে বাসনাদি সর্বকর্ম বিনষ্ট হয়। তার দ্বারাই মাতা মহাভয় অতিক্রম করবেন। ৩৫-৪০

মৈত্রেয় বললেন, কপিলের এই আজ্ঞা পেয়ে প্রজাপতি কর্দম প্রীত হলেন এবং তাঁকে প্রদক্ষিণ করে বনে প্রস্থান করলেন। তিনি মৌনাদি ব্রত অবলম্বন করে পরমাত্মার শরণাপন্ন হলেন। তিনি নিরগ্নি এবং অনিকেত হয়ে নিঃসঙ্গ বিচরণ করতে লাগলেন। সদসতের অতীত পরব্রহ্মে তিনি মনোনিবেশ করলেন। গুণপ্রকাশকারী অথচ নির্গুণ ব্রহ্মকে তিনি একনিষ্ঠ ভক্তিতে ভাবনা করলেন। তিনি

১ দেবঋণ, ঋষিঋণ ও পিতৃঋণ থেকে মুক্ত।

অহংকারশূন্য, মমত্ববোধহীন এবং দ্বন্দ্বরহিত হলেন। তাঁর ধীশক্তি প্রশান্ত হল তিনি সমদর্শী এবং আত্মদর্শী হলেন। তিনি নিস্তরঙ্গ সাগরের রূপ ধারণ করলেন। পরমাত্মস্বরূপে ভগবানের পরম ভক্তিভাব হওয়ায় তাঁর আত্মা সুস্থির হল। তাঁর বন্ধনমুক্তি ঘটল। তিনি সর্বভূতে ভগবানকে এবং ভগবানে সর্বজীবকে দেখলেন। ভগবদ্ভক্তি সমন্বিত হয়ে তিনি আসক্তি-দ্বেষবিহীন হলেন। সর্বত্র সমদর্শী হওয়াতে তিনি ভাগবতী গতি লাভ করলেন। ৪১-৪৭

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

মাতৃসমীপে কপিলমুনির ভক্তিলক্ষণ বর্ণনা

শৌনক বললেন, সূত, সাংখ্যশাস্ত্রপ্রবক্তা মহামান্য কপিল জন্মরহিত হয়েও লোক-শিক্ষার্থ নিজমায়া প্রভাবে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শ্রেষ্ঠ পুরুষ এবং মহান যোগী। তাঁর পুণ্যজীবনকথা আমরা অনেকবার শুনেছি, কিন্তু তবুও তৃপ্ত হয়নি। তিনি ভক্তবাঞ্ছারূপধারী। তাঁর আত্মমায়ায় অনুষ্ঠিত কীর্তিসমূহ সর্বথা কীর্তনযোগ্য। সে সবই আপনি আমাদের নিকট সবিস্তারে বলুন। আমরা শ্রদ্ধান্বিতচিত্তে তা শুনতে আগ্রহী। তখন সূত বললেন, দ্বিজশ্রেষ্ঠ, এই প্রশ্ন বিদুরও মৈত্রেয়কে করেছিলেন। সেইসব প্রশ্নের উত্তর মৈত্রেয় যেমন যেমন দিয়েছিলেন সেইভাবেই আমি আপনাদের নিকট বর্ণনা করব। ১-৪

মৈত্রেয় বললেন, পিতার অরণ্যযাত্রার পর মাতার প্রিয়সাধনে যত্নশীল কপিল বিন্দুসরোবরের আশ্রমেই অবস্থান করলেন। তিনি তত্ত্বদর্শী, তাই সর্বদা নিষ্ক্রিয়-ভাবে সমাসীন থাকতেন। একদিন দেবহূতি ব্রহ্মার বাক্য স্মরণ করে তাঁর কাছে গিয়ে বললেন, ব্রহ্মন্, বিপথগামী ইন্দ্রিয়দের তাড়নায় আমি পরিশ্রান্ত। বিষয়-কামনা বাড়তে বাড়তে আমাকে অন্ধতমস দ্বারা অভিভূত করছিল। তুমি কৃপা করে আমাকে সেই দুস্তর অজ্ঞান অন্ধকারের পারে নিয়ে যাবার জন্য সৎচক্ষুরূপে আমার কাছে এসেছ। তাই আর আমাকে অজ্ঞানরূপ অন্ধকারে বিভ্রান্ত হয়ে জন্মমরণের হেতুভূত ক্লেশরাশি ভোগ করতে হবে না। তুমিই আদি ভগবান, সকল পুরুষের প্রভু। মোহান্ধ মানুষের চক্ষুস্বরূপ উদিত সূর্যের মত তুমি বিরাজ করছ। দেহাত্মবোধ তোমারই সৃষ্টি, তুমিই এই মোহ দূর কর। শরণাগতের পরিত্রাতা তুমি তোমার বশীভূত ব্যক্তিবর্গের সংসার-মহীরূহ কুঠার দ্বারা বিনষ্ট কর। আমি প্রকৃতি ও পুরুষের ভেদতত্ত্ব জানতে অভিলাষী। আমি তোমার শরণাগত। তোমাকে আমার প্রণাম। তুমি শ্রেষ্ঠ ধর্মজ্ঞ; তুমি আমার বাসনা পূর্ণ কর। ৫-১১

মৈত্রেয় বললেন, মাতার এ সুন্দর প্রশ্ন শুনে কপিল চিন্তিত হলেন। আবার তিনি মাতাকে মোক্ষবিষয়ে আকৃষ্ট দেখে যথেষ্ট আনন্দিতও হলেন। সস্মিত বদনে তিনি জননীকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আত্মনিষ্ঠ যোগই সুখ-দুঃখ উভয়কে দমন করে। আমি বিশ্বাস করি যে সেই যোগই নিঃশ্রেয়সের কারণ। এই যোগের কথা আমি বিশদভাবে প্রকাশ করছি। পূর্বে আমার শুনবার ইচ্ছা দেখে ঋষিরা এই ব্যাখ্যা আমাকে দিয়েছিলেন। জীবসকলের বন্ধন ও মোক্ষের কারণ হল চিত্ত। চিত্ত বিষয়ে আসক্ত হলে আসে বন্ধন, আর পরমেশ্বরে নিবদ্ধ হলে

মুক্তি আনয়ন করে। অহংবোধ সমন্বিত কামক্রোধাদি মলশূন্য হলেই চিত্ত পবিত্র হয় এবং জ্ঞান-বৈরাগ্য-ভক্তি সহযোগে আত্মাকে প্রকৃতির অতীত, অভেদ, অদ্বিতীয়, স্বপ্রকাশ, সূক্ষ্ম, অখণ্ড এবং উদাসীন রূপে প্রকাশ করে ; প্রকৃতি তখন হীনতেজ হয়। নিখিলের আত্মা ভগবানে ভক্তিযোগে সিদ্ধ হলে যোগীরা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন। এইটিই মঙ্গলের পথ ; দ্বিতীয় পথ আর কিছু নেই। পণ্ডিত-গণের মতে আত্মার অমোঘ পাশস্বরূপে আসক্তি সজ্জনে সন্নিহিত হলে তাই মোক্ষের দ্বারস্বরূপ হয়। করুণাপূর্ণ, সহিষ্ণু, সর্বজনসুহৃদ, শান্তগুণসম্পন্ন ব্যক্তিই অজাতশত্রু। ইনি প্রকৃত সাধু। শাস্ত্রীয় শীল তাঁর অঙ্গভূষণ। তিনিই একাগ্রচিত্ত ও সুদৃঢ় ভক্তির সাধক। তিনি আমার জন্যই কর্মানুষ্ঠানে রত এবং প্রয়োজন অনুসারে স্বজন-বন্ধু-বান্ধব পরিত্যাগ করেন। তিনি অপ্রগল্‌ভচিত্তে আমার পূত চরিত্রকথা শ্রবণ ও কীর্তন করেন। তিনি আমাতে সমর্পিতপ্রাণ ; ফলে ত্রিবিধ তাপ[১] তাঁকে পীড়ন করতে পারে না। ১২-২৩

এইভাবে আসক্তি বিহীন জীবই প্রকৃত সাধু। সাধু ব্যক্তিই আসক্তি-দোষ দূর করেন। অতএব আপনি এ-প্রকার সজ্জনের সঙ্গই কামনা করবেন। সাধু সমাগমে হৃদয় ও কর্ণের সুখাবহ আমার বীর্যপ্রকাশ চরিতকথা কীর্তিত হয়। এই কীর্তন শ্রবণে মুক্তির পথস্বরূপ আমাতে শ্রদ্ধা, রতি ও ভক্তি জন্মে। তারপর আমার সৃষ্টি প্রভৃতি লীলাপ্রসঙ্গ চিন্তা করবে। এইভাবে বৈরাগ্য এলে ঐহিক ও পারত্রিক ইন্দ্রিয়লালসা অন্তর্হিত হয়। এমন অবস্থায় জীবসকল উদ্যোগ সহকারে ভক্তিযোগ-মার্গে চিত্ত-সংযমে যত্নবান হয়। মাতা, এইভাবেই লোকসকল ইন্দ্রিয়গণের সেবা-পরিত্যাগ, বৈরাগ্যসম্বন্ধ জ্ঞানযোগের পুষ্টি এবং ঈশ্বরে ভক্তি-অর্পণ প্রভৃতি ধর্মের দ্বারা মর্তদেহেই আমাকে লাভ করে। তখন দেবহূতি বললেন, কি ভাবে তোমাকে ভক্তি করা প্রয়োজন? স্ত্রীলোক আমি, আমি তোমাকে কি ভাবে ভক্তি করব? যাতে আমি অনায়াসেই ভক্তিসাধ্য মোক্ষপদ লাভ করতে পারি তার উপায় আমাকে বল। যে যোগের লক্ষ্য ভগবান এবং যাকে তুমি মুক্তির কারণ বললে তা সকল তত্ত্বে বোধ জন্মায়। এই যোগ কি? তার অঙ্গই বা কটি? আমি অবলা, বুদ্ধিহীনা। আমি যাতে সহজে এই দুর্বোধ তত্ত্বসমুদয় গ্রহণ করতে পারি, সেভাবেই তুমি আমাকে বল। ২৪-৩০

মৈত্রেয় বললেন, দেবহূতির তনু থেকেই মহামুনি কপিলের উদ্ভব। মাতার প্রশ্নে তাঁর হৃদয়ে স্নেহের সঞ্চার হল। মাতার ইচ্ছা জানতে পেরে কপিল সাংখ্য নামক শাস্ত্র ও ভগবৎভক্তি প্রসারে মহাশক্তির আধার পরমতত্ত্ব প্রচার করলেন। তিনি বললেন, যার প্রভাবে শব্দ, স্পর্শাদি বিষয়ের অনুভূতিগুলি সত্ত্বমূর্তি ভগবানের প্রতি ধাবিত হয়। এই হল ভক্তি। শুদ্ধসত্ত্বগুণবিশিষ্ট জীব এই ভক্তিকেই মুক্তি অপেক্ষা শ্রেয় মনে করে। বেদবিহিত কর্মে প্রবৃত্তি এলে তা থেকে ইন্দ্রিয়গুলিতে ভক্তির সঞ্চার হয়। এই ভক্তির প্রভাবে মুক্তিও আসে। জঠরানলে ভুক্ত দ্রব্য যেমন জীর্ণ হয়, তেমনি ভক্তিও লিঙ্গশরীরকে জীর্ণ করে। যাদের সমস্ত প্রচেষ্টার লক্ষ্য আমি, যারা আমার চরণাশ্রিত তারা মহানন্দে একত্রিত হয়ে আমার বর্ণনা বীর্য করে। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ আমার সঙ্গে একাত্মতায় অভিলাষী নন। এঁরা আমার দিব্য, বরদ, লোহিতাভ প্রসন্নমূর্তির দর্শনাভিলাষী। ঐ সব মূর্তির প্রতি তাঁরা স্পৃহণীয় বাক্যও প্রয়োগ করে থাকেন। সুন্দর অবয়ববিশিষ্ট ঐ মূর্তিগুলির লীলা-হাস্য দেখে এবং সুন্দর বাগ্‌বিস্তারে মুগ্ধ ঐ ভক্তরা মুমুক্ষু না হলেও আমার প্রতি ভক্তির

১ আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক তাপ বা বিঘ্ন।

জন্য তাঁরাও মুক্তি পেয়ে থাকেন। এ ভাবে মুক্তি লাভ করে তাঁরা অবিদ্যা জয় করতে সমর্থ হন। তারপর আমার মায়ায় নির্মিত সত্যলোকাদির নানা ভোগ্য বস্তু এবং ভক্তিকে অনুসরণ করে যে অষ্ট-ঐশ্বর্য, ভাগবতী শ্রী প্রভৃতি আসে তাতে যদি তাঁরা লুব্ধ না হন তাহলেও এগুলি তাঁরা বৈকুণ্ঠে অবশ্যই পেয়ে থাকেন। আমার প্রতি ভক্তিবশত মুক্তপুরুষ বৈকুণ্ঠে নানা সুখভোগ করেন। কালপ্রভাবে স্বর্গাদির ভোগ নিঃশেষ হয়, কিন্তু বৈকুণ্ঠে ভোক্তা ও ভোগ্যের বিনাশ নেই। যাঁরা আমারই একান্ত আশ্রিত তাঁদের ভোগ্যবস্তু কোন কালেই লুপ্ত হয় না। আমার অনিমিষ কালচক্র তাঁদের কাছে ব্যর্থ। তাঁরা আমার নিকট আত্মস্বরূপ তনয়ের মত স্নেহ-ভাজন। তাঁরা আমার বন্ধুতুল্য বিশ্বাসভাজন, গুরুতুল্য উপদেষ্টা, সুহৃদতুল্য মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, ইষ্টদেবতার মত পূজ্য। আমার ভজনায় একান্ত আসক্ত জীবগণের কালচক্র থেকে কোন আশংকার কারণ নেই। ৩১-৩৮

ইহ ও পর এই উভয় লোকগামী উপাধিবিশিষ্ট আত্মা, আত্মসম্বন্ধ যুক্ত স্ত্রীপুত্রাদি, ধন-পশু-গৃহাদি বিসর্জন দিয়ে যাঁরা একনিষ্ঠ ভক্তি সহযোগে একমাত্র আমারই ভজনা করেন তাঁদেরই আমি সংসার যন্ত্রণা থেকে পরিত্রাণ করে মুক্তি দিয়ে থাকি। হে মাতা, আমিই ভগবান, আমিই প্রকৃতি-পুরুষের ঈশ্বর, আমিই সর্ব-প্রাণীর আত্মা। আমি ছাড়া অন্য কেউই সংসারভয় নিবারণে সমর্থ নয়। আমার ভয়েই বাতাস প্রবাহিত হয়, সূর্য উত্তাপ প্রদান করে, ইন্দ্র বর্ষণ করে, অগ্নি দহন করে এবং মৃত্যু সকল প্রাণীর পশ্চাদ্ধাবন করে।[১] জ্ঞান-বৈরাগ্যযুক্ত ভক্তিযোগ অভ্যাসের দ্বারা যোগীরা আত্মিক মঙ্গলের জন্য আমার অভয় চরণ ভজনা করেন। জীবের মন অচলা ভক্তি প্রভাবে আমাতে অর্পিত হলে শান্ত হয়। এই চিত্তস্থৈর্যই পরম মঙ্গলের কারণ। ৩৯-৪৪

ষড়্‌বিংশ অধ্যায়

সাংখ্যযোগ বিস্তার

ভগবান কপিল বললেন, মাতা, যে জ্ঞানে পুরুষ-প্রকৃতি সম্বন্ধীয় গুণ থেকে মুক্ত হওয়া যায় তারই তত্ত্বসকল এবার পৃথক পৃথক বর্ণনা করছি। মুক্তি আসে আত্মদর্শন থেকে। তত্ত্বজ্ঞান থেকে উৎপন্ন এই আত্মদর্শন লাভ হলে অহঙ্কার দূর হয়। জীবগণের যা অন্তর্জ্যোতি তাই আত্মা, তাই পুরুষ, তিনি অনাদি ও প্রকৃতি থেকে স্বতন্ত্র। সেই স্বপ্রকাশ আত্মা থেকেই এই বিশ্ব প্রকাশিত। বিষ্ণুর শক্তিরূপী অব্যক্ত গুণময়ী প্রকৃতি আত্মার সন্নিধানে উপস্থিত হলে আত্মা তাঁকে গ্রহণ করেন। প্রকৃতির নিজের গুণের সাহায্যে নিজের মতই বিচিত্র প্রজা সৃষ্টি করেন। সৃষ্টিময়ী প্রকৃতির এই রূপ দেখে পুরুষ অবিদ্যা কর্তৃক বিমুগ্ধ হন। অবিদ্যাই জ্ঞানকে আবৃত করে রাখে। প্রকৃতির গুণেই কার্য সংঘটিত হয় এবং মায়াপ্রভাবে দেহেন্দ্রিয়াদিতে আত্মাভিমান বশত পুরুষের কর্তৃত্ববোধ জন্মে। আসলে পুরুষ সাক্ষী মাত্র, কর্তা নন। পুরুষ সুখস্বরূপ, কিন্তু কর্তৃত্বাভিমানে জন্ম-মৃত্যুধারা, কর্মপাশ এবং বন্ধনজনিত পরাধীনতার ফলে দুঃখভোগ করেন। কার্য, কারণ, কর্তৃত্ব অর্থাৎ

---

১ তুলনীয়: এঁর ভয়ে অগ্নি তাপ দেয়, এঁরই ভয়ে সূর্য উত্তাপ দেয়, এঁরই ভয়ে ইন্দ্র, বায়ু ও পঞ্চম মৃত্যু (যম) স্ব স্ব কার্যে প্রবৃত্ত হয়।—কঠ উপনিষদ, ২।৩।৩

দেহ, ইন্দ্রিয় ও দেবতাগণ—এই সবকিছুর কারণই প্রকৃতি। আর পুরুষ হলেন সুখ ও দুঃখ ভোগের কারণ। ১-৮

দেবহূতি বললেন, এই বিশ্বের স্থূল-সূক্ষ্ম কার্য যাঁদের স্বরূপ, সেই প্রকৃতি ও পুরুষই সৃষ্টির কারণ। সেই প্রকৃতি ও পুরুষের লক্ষণ কি বল। কপিল বললেন, 'প্রধান'ই প্রকৃতি। ইনি অবিশেষ হলেও স্থূল ও সূক্ষ্ম কার্যের আধার। প্রধান ত্রিগুণাত্মক, অতএব ব্রহ্ম নন। আবার ইনি অব্যক্ত বলে মহৎ থেকেও পৃথক। প্রধান কার্যকরণাত্মক, তাই তিনি কাল নন, আবার নিত্য বলে জীব-প্রকৃতিও নন। প্রধানের কার্যস্বরূপে পাঁচ, পাঁচ, দশ ও চার—এইভাবে চব্বিশটি তত্ত্ব আছে। পণ্ডিতেরা তাকেই ব্রহ্ম বলে থাকেন। পাঁচ মহাভূত—ভূমি, অপ্, তেজ, বায়ু এবং আকাশ। পাঁচটি তন্মাত্র—গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দ। দশেন্দ্রিয় হল কর্ণ, ত্বক, চক্ষু, জিহ্বা, ঘ্রাণ, বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ। মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত এরাই অন্তরিন্দ্রিয় গঠন করে। অন্তরিন্দ্রিয় বলতে অন্তঃকরণ বোঝালেও বৃত্তিভেদে এই বিভাগগুলি বর্ণিত হল। গণনা করলেই এই চতুর্বিংশতি তত্ত্ব পাওয়া যাবে। সগুণ ব্রহ্ম এরই মধ্যে সন্নিবিষ্ট। চতুর্বিংশতি তত্ত্বের অতিরিক্ত কাল হল পঞ্চবিংশ তত্ত্ব। ৯-১৫

এই কাল কি? কারও কারও মতে কাল হল ঈশ্বরের শক্তি। কাল থেকে প্রকৃতিরূপ দেহে অহংকার-বিমুগ্ধ জীবের ভয়ের সৃষ্টি হয়। অন্যেরা বলেন, যে শক্তিতে প্রকৃতি ত্রিগুণের সমতা আনতে সচেষ্ট হন তাই কাল। আত্মমায়া বশে যিনি ভূতসমূহের অন্তরে নিয়ন্তা হয়ে এবং বাইরে কালরূপে রয়েছেন তিনিই ভগবান। এই কাল পঞ্চবিংশতিতম তত্ত্ব। জীবের অদৃষ্টবশত প্রকৃতির গুণ বিক্ষুব্ধ হয়। তখন সেই প্রকৃতির যোনিতে পরম পুরুষ স্বীয় বীর্য নিষেক করেন। তখন মহৎতত্ত্ব সৃষ্টি হয়। মহৎ প্রকাশবহুল, কূটস্থ এবং জগৎ-কারণ স্বরূপ। এই মহৎই নিজের মধ্যে সূক্ষ্মরূপে অবস্থিত বিশ্বকে প্রকাশ করে এবং পরে স্বীয় তেজদ্বারা প্রলয়কালীন তম গ্রাস করে। আর বাসুদেব হলেন সত্ত্বগুণবিশিষ্ট, স্বচ্ছ, শান্ত, রাগাদিবিমুক্ত এবং উপলব্ধিস্থান-স্বরূপ চিত্ত। এই চিত্তই মহত্তত্ত্বের স্বরূপ। ১৬-২১

জলের প্রকৃতি যেমন ভূমিসংসর্গ ভেদে মধুর, স্বচ্ছ এবং শীতল হয়ে থাকে তেমনি বৃত্তিভেদে চিত্তেরও নানা লক্ষণ হয়। ভগবানের বীর্য থেকে উৎপন্ন মহৎ বিকৃত সৃষ্ট হলে ক্রিয়াশক্তি-প্রধান অহঙ্কারের উদ্ভব হয়। অহঙ্কার ত্রিবিধ—বৈকারিক, তৈজস ও তামস। অহংকার থেকেই মন, ইন্দ্রিয় ও মহাভূতগণ আসে। ভূত, ইন্দ্রিয় ও মনযুক্ত অহংকার সাক্ষাৎ সংকর্ষণ নামধেয় সহস্রশীর্ষ অনন্তদেব বলে পণ্ডিতগণের নিকট পরিচিত। অহংকার দেবতারূপে কর্তা, ইন্দ্রিয়রূপে কারণ এবং ভূতরূপে কার্য। শান্তত্ব, ঘোরত্ব ও বিমূঢ়ত্ব এই তিনগুণ ও কারণরূপে অহংকারের মধ্যে রয়েছে। বৈকারিক অহংকারের বিকার থেকে মনস্তত্ত্বের উৎপত্তি। সংকল্প বিকল্পাত্মক মন থেকে কামের সৃষ্টি হয়। ২২-২৭

তত্ত্বজ্ঞদের মতে ইন্দ্রিয়গণের অধীশ্বর হলেন অনিরুদ্ধ। শারদীয় নীলপদ্মের মত তিনি শ্যামবর্ণ। ইনি যোগীদের দ্বারা ক্রমশ অধিগত হন। তৈজস বিকার থেকেই বুদ্ধি যা দ্রব্যজ্ঞান উৎপত্তি ঘটায়। ইন্দ্রিয়াধীন বৃত্তিভেদে এর লক্ষণ হল—সংশয়, মিথ্যাজ্ঞান, প্রমাণবোধ, স্মৃতি ও সুপ্তি। ইন্দ্রিয় দ্বিবিধ—ক্রিয়ারূপ ও জ্ঞানরূপ অর্থাৎ কর্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়। উভয়ই তৈজস অহংকার থেকে সৃষ্ট প্রাণের শক্তি-ক্রিয়া এবং বুদ্ধির শক্তি-বিজ্ঞান। ভগবৎপ্রভাবে তামস অহঙ্কার

বিকারপ্রাপ্ত হয়ে শব্দতন্মাত্র সৃষ্টি করে, যা থেকে আকাশ ও শব্দগ্রাহক শ্রোত্রের সৃষ্টি হয়। শব্দের লক্ষণ তিন—তন্মাত্রত্ব (সূক্ষ্মত্ব), অর্থজ্ঞাপকত্ব এবং অন্তরালবর্তী উচ্চারণ-কর্তার সূচকত্ব। ২৮-৩৩

আকাশের বৃত্তিলক্ষণ বলতে আমরা বুঝি যে আকাশ সর্বভূতকে অবকাশ দেয়, অন্তরে বাইরে ব্যবহারাস্পদ হয় এবং তা প্রাণ, ইন্দ্রিয় ও মনের আধারভূত। শব্দতন্মাত্ররূপ আকাশের বিকার থেকে স্পর্শতন্মাত্র এবং বায়ু ও ত্বক্ সৃষ্টি হয়। ত্বক্ থেকে সম্যক স্পর্শজ্ঞান হয়; মৃদুভাব, কাঠিন্য, শৈত্য এবং উষ্ণতা স্পর্শত্ব বলে কথিত। এটিই বায়ুতন্মাত্র। বায়ুর কর্ম বৃক্ষাদির শাখা সঞ্চালন, তৃণাদির সংযোজন এবং গন্ধাদি বিষয়কে ঘ্রাণের প্রতি, শীতলাদি গুণময় বিষয়কে স্পর্শের প্রতি এবং শব্দগুণ বিশিষ্ট দ্রব্যকে শ্রোত্রের প্রতি আকৃষ্ট করা। এছাড়াও বায়ু সমস্ত ইন্দ্রিয়কে চালনা করে। স্পর্শতন্মাত্ররূপ বায়ু ঈশ্বরেচ্ছায় বিকারপ্রাপ্ত হলে তেজ, রূপ ও রূপগ্রাহক চক্ষু সৃষ্টি হয়। রূপের অসাধারণ লক্ষণগুলি হল, সে দ্রব্যের আকার প্রকাশ করে, তার বিশেষণ জ্ঞান সৃষ্টি করে এবং তার পরিমাণও বিজ্ঞাপন করে। তেজের কর্ম—প্রকাশ, পাক, ক্ষুৎপিপাসা, সৃষ্টি, শোষণ, হিমদ্রবণ প্রভৃতি। ৩৪-৩৯

ভগবানের অমোঘ ইচ্ছায় রূপতন্মাত্র তেজ বিকারপ্রাপ্ত হলে রসতন্মাত্র সৃষ্টি হয়। রস থেকে অপ্ ও রসনেন্দ্রিয় সৃষ্টি হয়; এর ফলে রসাস্বাদ হয়। রস এক। তবে দ্রব্যান্তর সংসর্গে বিকারপ্রাপ্ত হলে এর কটু, তিক্ত, অম্ল, মধুর, লবণ, কষায়াদি বহুবিধ রসলক্ষণ দেখা যায়। জলের বৃত্তি বিবিধ—আর্দ্রীকরণ, মৃত্তিকাদি পিণ্ডীকরণ, পরিতৃপ্তি বিধান, জীবনদান, তৃষ্ণাদি ক্লেশ নিবারণ, মৃদুকরণ, তাপনিবারণ এবং কূপাদি থেকে পুনঃ পুনঃ উত্তোলিত হলেও বার বার উদ্গত হওয়া। ঈশ্বরেচ্ছায় বিকারপ্রাপ্ত রসতন্মাত্র থেকে উদ্ভূত গন্ধতন্মাত্রের বিষয় ভূমি এবং গন্ধগ্রহণকারী ঘ্রাণ। এক গন্ধ দ্রব্যসংসর্গভেদে বহু হয়ে থাকে, যেমন মিশ্র গন্ধ, দুর্গন্ধ, কর্পূরাদির গন্ধ, হিংইত্যাদির গন্ধ। ভূমিরও বিভেদ হল—প্রতিমাদির আকারের যোগ্য ভূমি, পাত্রাদি তৈরীর যোগ্য ভূমি, আকাশাদি সহ সংযুক্ত হওয়ার যোগ্য ভূমি এবং জীবগণে ও তাদের গুণপ্রকাশ সমর্থ ভূমি। ৪০-৪৫

বিবিধ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিবিধ জ্ঞানই সেই সেই ইন্দ্রিয়ের লক্ষণ। তাই শ্রোত্রের বিষয় হল আকাশের বিশিষ্টগুণ শব্দ। অনুরূপভাবে বায়ুর বিশিষ্টগুণ স্পর্শন যার বিষয় তা হল ত্বক্; তেজের বিশিষ্ট গুণ রূপ যার বিষয় তা হল চক্ষু; জলের বিশিষ্টগুণ রস যার বিষয় তা হল রসনা এবং ভূমির বিশিষ্টগুণ গন্ধ যার বিষয় তা হল ঘ্রাণ। বায়ু প্রভৃতি নানা পদার্থে পরপর কারণ-সম্বন্ধে যুক্ত হয়ে কার্যরূপ প্রতিভাত হয়, যেমন আকাশাদি চার পদার্থই নিজ নিজ বিশেষগুণ ভূমিতে অর্পণ করেছে। মহদাদি যখন পৃথক পৃথক অবস্থিত ছিল তখন পরমেশ্বর গুণ-কর্ম-কালযুক্ত হয়ে উক্ত সাত পদার্থের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হন। ফলে সাতটিই বিক্ষুব্ধ হল এবং পরস্পর মিলিত হল। এর ফল এক অচেতন অণ্ডের সমুৎপত্তি, যা থেকে বিরাটপুরুষের উদ্ভব। এটি বহির্ভাগে দশগুণ বর্ধিত হল এবং উপরের আবরণাত্মক অংশ জলাদি দ্বারা পরিবৃত হল। এই অণ্ডই হরির মূর্তি যাতে লোকসমূহ বিস্তৃত। তিনি জলশায়িত হিরণ্ময় অণ্ড থেকে উত্থিত হলেন এবং ক্রিয়াশীল হলেন। অণ্ডেই অধিষ্ঠিত থেকে তিনি তাতে অনেকগুলি ছিদ্রের সৃষ্টি করলেন। এইভাবে প্রথমে তাঁর মুখ সৃষ্টি হল। পরে বাক্য, বাক্যসহ অগ্নি, নাসাদ্বয়, প্রাণবায়ু সম্পৃক্ত ঘ্রাণেন্দ্রিয়, প্রাণযুক্ত বায়ু, চক্ষুর্দ্বয়, সূর্য,

কর্ণদ্বয়, দিক্‌সকল, ত্বক্‌, রোম, শ্মশ্রু, কেশ, ওষধিসমূহ, শিশ্ন, শুক্র, জল, পায়ু, অপান, মৃত্যু, হস্ত, বল, ইন্দ্রিয়, চরণদ্বয়, গতি, বিষ্ণু, নাড়ীসমুদয়, রক্ত, নদ্যাদি, উদর, ক্ষুধা, পিপাসা, সমুদ্র, হৃদয়, মন, চন্দ্র, বুদ্ধি, বাক্‌পতি ব্রহ্মা, অহংবোধ, রুদ্র, চিত্ত এবং চৈত্ত্য বা ক্ষেত্রজ্ঞ—যথাযথ আবির্ভূত হল। এসবই সেই বিরাট পুরুষের অবয়ব। ৪৬-৬১

এপর্যন্ত আবির্ভাবের পরও বিরাটপুরুষ উত্থানশক্তি-রহিত ছিলেন। এইসব দেবতারা তখন নিজ নিজ ইন্দ্রিয়-রন্ধ্রে পুনঃপ্রবিষ্ট হলেন ঃ যথা, অগ্নি গেলেন বাগিন্দ্রিয় বদনে, বায়ু ঘ্রাণেন্দ্রিয় নাসায়, আদিত্য চক্ষুরিন্দ্রিয় অক্ষিগোলকে, দিক্‌-সকল শ্রবণেন্দ্রিয় কর্ণে, ওষধিসকল রোমসংযুক্ত ত্বকে, সর্বপ্রকার জল রেতের আধার শিশ্নে, মৃত্যু অপান-সংযুক্ত পায়ুতে, ইন্দ্র বলসহযোগে হস্তে, বিষ্ণু গতিসংযুক্ত পাদদ্বয়ে, রক্তপ্রবাহ অনুসরণে নদ্যাদি নাড়ীতে, ক্ষুধা ও তৃষ্ণার আশ্রয় উদরে সমুদ্র, মন-সন্নিবিষ্ট হৃদয়ে চন্দ্র, ব্রহ্মা বুদ্ধি-বিশিষ্ট হৃদয়ে এবং রুদ্র অভিমানাত্মক হৃদয়ে।[1] কিন্তু তা সত্ত্বেও সেই বিরাটপুরুষের উত্থান সম্ভব হল না। তখন ক্ষেত্রজ্ঞ চিত্ত দ্বারা হৃদয়ে অন্তর্লীন হলেন, আর সেই মুহূর্তেই মহাসলিল থেকে বিরাটপুরুষের অভ্যুত্থান সম্ভব হল। যেমন প্রাণ, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি সুষুপ্ত পুরুষকে জাগাতে সক্ষম হয় না, তেমনই ক্ষেত্রজ্ঞের অনুপস্থিতিতে অন্যান্য দেবতাগণ সেই বিরাটপুরুষকে জাগরুক করতে পারেন নি। অতএব পরমাত্মা জীবাত্মাতে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। যোগযুক্ত বুদ্ধি, ভক্তি, বৈরাগ্য আর জ্ঞান পরস্পর সংযুক্ত করে—এরূপ চিন্তাই একমাত্র কাম্য। ৬২-৭২

সপ্তবিংশ অধ্যায়

পুরুষ-প্রকৃতির ভেদজ্ঞান দ্বারা মোক্ষলাভের বর্ণনা

কপিল বললেন, পরমপুরুষ পরমাত্মা গুণহীন। তিনি অকর্তা এবং বিকার রহিত। সূর্যের প্রতিবিম্ব জলে পড়লে জল সূর্য হয় না। পুরুষ দেহস্থ হলেও প্রকৃতিনিবন্ধ সুখদুঃখাদিতে নির্লিপ্ত থাকে। প্রকৃতির গুণে যখন সুখদুঃখাদিতে সংশ্লেষ ঘটে তখন অহংকারবিমূঢ় আত্মায় কর্তৃত্বাভিমান সঞ্জাত হয়। এই জন্যই অবশ আত্মা প্রাসঙ্গিক কর্মদোষে সৎ, অসৎ, দেব-তির্যক্‌-নরাদি যোনিতে জন্মলাভ করে সংসার-পদবী গ্রহণ করে। সংসারের যাবতীয় অর্থই অলীক ; সে কারণে তারা না থাকলেও সংসার নিবৃত্তি হয় না। বিষয়চিন্তায় মত্ত পুরুষ স্বপ্নেও অলীক বস্তুনিচয়ের সমাগমই দেখে। এইভাবেই সংসার আত্যন্তিকভাবে অলীক হলেও বর্তমান থাকে। যেহেতু বিষয়চিন্তা থেকেই অনর্থ আসে সেহেতু সংসার-সমুদ্র উত্তরণে ইচ্ছুক ব্যক্তি দৃঢ় ভক্তি এবং তীব্র বৈরাগ্য প্রয়োগে ক্রমে ক্রমে বিষয়ে লিপ্ত চিত্তকে আকর্ষণ করে স্ববশে নিয়ে আসবে। এই রকম ব্যক্তি যম, নিয়মাদি দ্বারা একাগ্রচিত্ত ও সশ্রদ্ধ হয়ে অকপট ভক্তি সহকারে আমার কথা শোনেন। এঁরা সর্বভূতে সমদর্শী এবং একান্ত নির্বৈরিতা উদ্ভূত প্রসন্নতায় উদ্ভাসিত ব্রহ্মচর্য, মৌনব্রত বা ভগবদর্পিত চিত্ত দ্বারা সর্বদা স্বধর্মে রত। এঁরা যদৃচ্ছালব্ধ বস্তুতে পরিতৃপ্ত,

১ তুলনীয় : ঐতরেয় উপনিষদ, ১।২।৪ মন্ত্র।

পরিমিতভোজী, একান্তবাসী, শান্ত, সর্বজীবে মিত্রভাবাপন্ন, দয়াশীল এবং ধৈর্যশীল ; দেহ বা তৎসম্বন্ধীয় স্ত্রী, পুত্রাদিতে অহংবোধ স্বরূপ অসৎ আশ্রয়ে এঁরা আগ্রহান্বিত নন। যাঁর দ্বারা প্রকৃতি-পুরুষতত্ত্ব পূর্ণরূপে অধিগত হয় এঁরা সেই জ্ঞানেই সমাহিত। এঁদের জাগ্রৎ-স্বপ্নাদি অবস্থা তিরোহিত এবং বাহ্যজ্ঞানলুপ্ত। এবম্বিধ যোগী আত্মদর্শী। সূর্য দ্বারা উদ্বুদ্ধ চক্ষু যেমন আকাশে সূর্যকে দেখে এঁরাও সেরকম অহংবোধ বিশিষ্ট আত্মা দ্বারা বিশুদ্ধ আত্মাকে দর্শন করেন। এই ভাবে অবিদ্যা-উপাধি মুক্ত হয়ে, মিথ্যা-অহংকারে সৎস্বরূপে প্রতীয়মান সেই ব্রহ্মকে লাভ করেন। এই ব্রহ্ম শুদ্ধ জীবের স্বরূপ থেকে ভিন্ন। এই ব্রহ্ম কারণরূপে প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত এবং ইনি তাঁর কার্য প্রকাশ করেন। ইনি সমস্ত কার্য-কারণে সন্নদ্ধ, কিন্তু তবু স্বয়ংসম্পূর্ণ। সূর্য-প্রতিবিম্ব জল থেকে তার স্ফুরিতাভা ভিত্তিতে নিক্ষেপ করলে গৃহাভ্যন্তরস্থ পুরুষ জলস্থ সূর্যের ধারণা করতে পারে, সেই মতই দেহেন্দ্রিয়-মনে প্রতিষ্ঠিত আত্মপ্রতিবিম্ব থেকে ত্রিগুণবিশিষ্ট অহংবোধ সমন্বিত ব্রহ্মের ধারণা হয়ে থাকে। ঐ অহংকার থেকেই পরমার্থ জ্ঞান স্বরূপ ব্রহ্মের উপলব্ধি হয়। ১-১৩

সুষুপ্তিকালে সূক্ষ্মভূত, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি অসৎরূপ নিষ্ক্রিয় প্রকৃতিতে ন্যস্ত থাকে। তখন আত্মা দেহাভিমানশূন্য হয়ে সাক্ষীস্বরূপ জাগ্রত অবস্থায় থাকে। কিন্তু আত্মা এই অবস্থায় দ্রষ্টারূপে থাকলেও তার অহমিকাবোধ বিনষ্ট হওয়ায় স্বয়ং বিনাশরহিত হলেও নিজেকে নষ্ট বলেই বিবেচনা করে ; এর প্রমাণ ধন নষ্ট হলে নিজেকেই লোকে মৃতবৎ মনে করে। এই নষ্টজ্ঞানের সঙ্গে যে অহং-বোধ বিরাজিত তার ফলে তখন আত্মাকে অহংবোধশূন্য এরূপ মনে করা যেতে পারে না। আত্মা কার্যকারণ প্রকাশক এবং তারই আশ্রয়। এইভাবে অহংকার দৃশ্য হয় বলে অহংবোধের বাইরে যে অহংকারদ্রষ্টা আত্মা তাকে জানা যায়। ১৪-১৬

তখন দেবহূতি বললেন, পুরুষ ও প্রকৃতি আশ্রয় ও আশ্রিত ভাবে নিত্য-সংযুক্ত। প্রকৃতি পুরুষকে কখনও পরিত্যাগ করে না। তাহলে মুক্তি কি করে হতে পারে ? যেমন ভূমি নিত্য গন্ধসংযুক্ত, রস ও জলের সত্তা ভিন্ন থাকতে পারে না, তেমনি পুরুষ ও প্রকৃতির মধ্যে একজনকে বাদ দিয়ে অন্যের উপপত্তি হয় না। পুরুষ যদিও অকর্তা, তাহলেও কর্মবন্ধ প্রকৃতির গুণাবলী আশ্রয় করে থাকার জন্য প্রকৃতির সেই গুণগুলিও পুরুষে বর্তায়, সুতরাং পুরুষের মুক্তি কিরূপে সম্ভব ? তত্ত্ববিচারের কালে কেউ কেউ সংসারভয় নিরসনে সক্ষম হলেও আত্যন্তিকভাবে তাদের কারণ নিবৃত্ত হয় না ; সুতরাং সংসারভয় আবার ফিরে আসে। ১৭-২০

কপিল বললেন, কাঠ থেকে অগ্নির উত্থান হয়ে কাঠেরই বিনাশ হয়। প্রকৃতিও নিষ্কাম ধর্মানুষ্ঠান, নির্মল মন, ভগবৎ-কথা শ্রবণে সঞ্জাত তার ভগবদ্ভক্তিযোগ তত্ত্বজ্ঞান, সুতীব্র বৈরাগ্য, তপস্যা, দৃঢ় আত্মসমাধি প্রভৃতি দ্বারা বারংবার অভিভূতা হয়ে পুরুষকে বন্ধনমুক্তি দিতে পারে। এই অবস্থায় প্রকৃতি যথেষ্ট পরিমাণে ভোগ করেছে এই বিবেচনায় পুরুষ তার দোষ সন্ধানে নিযুক্ত থাকেন। প্রকৃতিত্যক্ত পুরুষ স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত। প্রকৃতি থেকে তখন আর তাঁর কোনও অমঙ্গলের আশংকা নেই। নিদ্রাবস্থায় স্বপ্নদৃষ্ট বিষয় নানা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করলেও জাগরিত হওয়া মাত্র পুরুষ স্বস্থ হয়, যদিও তার স্বপ্নের স্মৃতি বিলুপ্ত হয় না। এই ভাবে পুরুষ তত্ত্বজ্ঞ হলে ভগবানে মনঃসংযোগ করে আত্মারাম হয় ; প্রকৃতি তার কোন

ক্ষতি করতে পারে না। জন্ম-জন্মান্তরে অধ্যাত্মরত পুরুষ ব্রহ্মলোক পর্যন্ত যাবতীয় বিষয়ে সংসক্তিহীন। তিনি মুনি হয়ে ঈশ্বরভক্তিপরায়ণতা বশত ভগবৎ-কৃপায় আত্মতত্বে সুপণ্ডিত হন। কৈবল্য ধর্মস্থিত শ্রীভগবানই তাঁর আশ্রয়। এই জন্য তিনি নিরতিশয় আনন্দ লাভ করেন। এই সময়ে লিঙ্গশরীরও বিনষ্ট হয়। তিনি পুনর্জন্মরহিত হয়ে আত্মজ্ঞান দ্বারা সমস্ত মিথ্যাকে পরাস্ত করেন। এঁর কাছে তখন অণিমাদি ঐশ্বর্য বিঘ্নস্বরূপ। ঐ ঐশ্বর্যগুলি যোগলব্ধ, যোগ ব্যতীত তাদের অন্য কারণ নেই। অতএব এদের দ্বারা তাঁর চিত্ত আর প্রলুব্ধ হয় না। তখন এই বোধটুকুই থাকে—'সবকিছু অতিক্রম করে আত্মসম্বন্ধিনী গতিই আমার হোক। মৃত্যু আর আমাকে উপহাস করতে পারবে না।' ২১-৩০

অষ্টাবিংশ অধ্যায়

অষ্টাঙ্গ যোগের বিবরণ

কপিল বললেন, এবার স্বাবলম্বন যোগের কথা বলছি, শ্রবণ কর। এই যোগে মন প্রসন্ন হয়ে সৎপথাবলম্বী হয়। সাধ্যমত স্বধর্মানুষ্ঠান, বিরুদ্ধধর্ম বর্জন, যদৃচ্ছালব্ধ বস্তু দ্বারা তৃপ্তিবিধান, আত্মতত্ত্বজ্ঞদের সেবা, ধর্মার্থ-কামবিষয়ক কর্ম থেকে আত্মপ্রত্যাহার, মোক্ষধর্মে আসক্তি, পরিমিত শুদ্ধ, ভোজ্য গ্রহণ, সদা নির্বাত বিজন স্থানে অধিবাস, অহিংসা, সত্যভাষণ, অন্যায়পূর্বক পরস্বাপহরণে অনীহা, প্রয়োজনানুযায়ী বস্তুগ্রহণ, ব্রহ্মচর্য, তপস্যা, বাহ্যাভ্যন্তর শৌচ, স্বাধ্যায়, ভগবদর্চনা, মৌনাবলম্বন, জিতাসন হয়ে স্থিরভাবে অবস্থান, প্রাণবায়ু জয়, মনঃশক্তি প্রয়োগে ইন্দ্রিয়গ্রামকে বিষয় থেকে সরিয়ে এনে হৃদয়ে সংস্থাপন, মূলাধারাদির কোন স্থানে সপ্রাণ মনের অবস্থান, ভগবানের লীলা ধ্যান এবং মনের সমাধান করণ, এইসব এবং আরও বিবিধ ব্রতাদির দ্বারা দুর্দান্ত মনকে অসৎমার্গ থেকে বুদ্ধি দ্বারা আকর্ষণ করে যোগসাধনে নিয়োগ করবে। আলস্য জয় করে প্রাণ বায়ুকে জয় করবে। ১-৭

জিতাসন হয়ে পবিত্রস্থানে কুশ, অজীন, চেল ইত্যাদি যথাক্রমে বিন্যাস করে বসবে। এই আসনে স্বস্তিক কিংবা অন্য যে কোন প্রকার ভঙ্গীতে স্বাচ্ছন্দ্য আসে সেভাবেই বসবে এবং ঋজুদেহে প্রাণসংযম অভ্যাস করবে। প্রথমে পূরক (বাহ্য বায়ুর আকর্ষণ), পরে কুম্ভক (অন্তঃপ্রবিষ্ট বায়ু ধারণ) এবং তারও পর রেচক (নিরুদ্ধ বায়ু পরিত্যাগ) অনুলোমক্রমে বা প্রতিলোমক্রমে অভ্যাস করে চিত্তকে এমনভাবে পরিশুদ্ধ করতে হবে যে তা একবার স্থির হলে আর কখনও চঞ্চল হবে না। বায়ু ও অগ্নি সহযোগে যেমন সোনার ময়লা দূর হয় এবং তা চিরকাল সুদীপ্ত থাকে, শ্বাসজয়ী যোগীর চিত্ত সেই রকমই নির্মল হয়। এরপর প্রাণায়াম প্রভৃতি চাররকম প্রক্রিয়ার কথা শোন। প্রাণায়ামের দ্বারা বাতশ্লেষ্মাদি দোষ দূর হয়, ধারণা পাপ ধ্বংস করে, প্রত্যাহার দ্বারা বিষয়াসক্তি দূর হয় এবং ধ্যান দ্বারা রাগদ্বেষাদি বিলোপ করা সম্ভব। এইগুলি অভ্যাস করে মন যথেষ্ট নির্মল হলে যোগের সাহায্যে সমাহিত হবে। তারপর নাসাগ্রে দৃষ্টি স্থির করে ভগবানের রূপ ধ্যান করবে। ৮-১২

ভগবানের মূর্তিটি এইভাবে কল্পিত হবে—প্রসন্ন, পদ্মতুল্য আনন ; পদ্মগর্ভের ন্যায় অরুণাভ বা নীলোৎপলতুল্য শ্যামল অক্ষিদ্বয় ; চার হাতে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম ; পদ্মকেশরের মত কৌষেয় পীতবসন ; বক্ষে শ্রীবৎস চিহ্ন , কণ্ঠে কৌস্তুভমণি, গলায় বনমালা শোভিত ; তাতে মত্ত মধুকর মধুর ধ্বনি সহযোগে সঞ্চরণ করছে। মহামূল্য হার, বলয়, কিরীট, অঙ্গদ প্রভৃতি ভূষণে তিনি সমলংকৃত। তাঁর কটিদেশে উজ্জ্বল কাঞ্চী ; তিনি ভক্তগণের হৃদয়-পদ্মাসনে সমাসীন। এই মূর্তি অত্যন্ত নয়ন-সুখকর। ভক্তদের প্রতি তাঁর দৃষ্টি শান্ত সুন্দর। তিনি সর্বলোকের প্রণম্য। তিনি বয়সে কিশোর, ভৃত্যগণের প্রতি অনুগ্রহ বিতরণে সদাই তৎপর। তাঁর যশ কীর্তনীয়, পবিত্র তীর্থস্বরূপ। তিনি পুণ্যশ্লোক মহাত্মাদের যশ চারিদিকে বিস্তীর্ণ করে দেন। যতকাল মন আপনা থেকে শান্ত না হবে ততকাল ঈশ্বরের এই রূপের ধ্যানে মগ্ন থাকতে হবে। ১৩-১৮

অন্তর্যামী ভগবান এই রূপে উপবিষ্ট, গতিশীল বা শয়ান আছেন—ভাবশুদ্ধ চিত্তে এই রকম চিন্তা করা দরকার। তাঁর লীলা নিত্য দর্শনীয়। এই মূর্তির প্রতিটি অবয়ব যখন যথাযথভাবে চিত্তে অধিষ্ঠিত হবে, তখন এক এক অঙ্গে চিত্ত নিবিষ্ট করবে। প্রথমে তাঁর চরণপদ্ম ধ্যান করবে। এই চরণে ধ্বজ, বজ্র, অঙ্কুশ ও পদ্মচিহ্ন বিরাজমান। অঙ্গুলিসকলের অগ্রভাগ উত্তুঙ্গ, রক্তিম ও বিলাসযুক্ত নখরূপ চন্দ্রমণ্ডল দ্বারা সুশোভিত। নখচন্দ্র-জ্যোৎস্নায় ধ্যানপরায়ণ যোগীর হৃদয়ান্ধকার দূর হয়। তাঁর চরণ নিঃসৃত গঙ্গোদক সংসারতাপ নিবারণ করে। এই জল মস্তকে ধারণ করেই শিব শিব হয়েছেন। এই চরণ ধারণ করলে মনের পর্বতকঠিন পাপরাশি সমূলে বিনষ্ট হয়। এই চরণপদ্ম চিরকাল ধ্যানের বস্তু এবং সেইজন্যই ব্রহ্মাজননী দেববন্দিতা পদ্মনয়না লক্ষ্মী ভগবানের পদযুগল নিজ উরুতে স্থাপন করে সুকোমল হস্ত দিয়ে তাদের সেবা করেন। মুমুক্ষু ব্যক্তি ভগবানের শ্রীপদ নিজ হৃদয়ে ধ্যান করবে ভগবান গরুড়ের স্কন্ধে আরোহণ করে তার দুই পাশেই যে অতসীপুষ্প সদৃশ দীপ্তিমান ও বলশালী উরুদ্বয় বিন্যাস করেন ভক্ত তারও ধ্যান করবে। ভগবানের নিতম্বে আগুল্ফ লম্বিত পীতবসন এবং সুন্দর কাঞ্চীকলাপ বিরাজিত ; এটিও ভক্তের ধ্যানের বিষয়। ভগবানের নাভি ভুবনসমূহের অধিষ্ঠানভূত উদরে নিবিষ্ট। এখান থেকেই আত্মযোনি ব্রহ্মার আসনভূত পদ্ম উত্থিত হয়। এই নাভিও ধ্যান করবে। ভগবানের স্তনদুটি মূল্যবান মরকত মণির ন্যায় এবং এ-দুটি হাতের দ্যুতিতে গৌরবর্ণ ধারণ করে। এগুলিও ধ্যানের যোগ্য। আরও ধ্যান করবে ভগবানের সেই বক্ষঃস্থল যা মহালক্ষ্মীর আশ্রয়স্থান এবং যা কণ্ঠপ্রদেশ থেকে বিলম্বিত কৌস্তুভমণির দ্বারা সুশোভিত ; এই কণ্ঠও ধ্যানযোগ্য। নিখিলের প্রণম্য ভগবানের বক্ষ ও কণ্ঠদর্শনে এবং স্মরণে চক্ষু ও মন পুলকিত হয়। যে বাহুদ্বারা ভগবান মন্দারপর্বতকে সঞ্চালন করেছিলেন এবং যা লোকপালগণের আশ্রয়ভূত অঙ্গদজ্যোতিতে সমুজ্জ্বল তাও ধ্যান করবে। তাঁর হস্তস্থিত মহাশক্তিধর চক্র এবং রাজহংসবর্ণের শুভ্র শঙ্খও ভক্তের ধ্যানের বিষয়। ঈশ্বরের প্রিয় কৌমোদকী গদা যা শত্রুনিপাতজনিত শোণিতে আপ্লুত তাও চিন্তনীয়। মধুকর-গুঞ্জিত কণ্ঠস্থ বনমালা এবং জীবতত্ত্বস্বরূপ কৌস্তুভমণিও ধ্যান করবে। শ্রীহরির সমস্ত রূপই ধ্যেয়, কারণ প্রতি রূপেই তিনি ভক্তগণকে কৃপা বিতরণ করে থাকেন এবং এই জন্যই তিনি দেহধারণ করে থাকেন। অঙ্গাদি চিন্তার পর তাঁর মনোময় মুখপদ্ম ধ্যান করবে। এই মুখের বর্ণনা দিচ্ছি। দীপ্ত কুণ্ডল সঞ্চালনে কপোলদ্বয় আলোকিত এবং উন্নত নাসিকা সমুজ্জ্বল। এই শ্রীমুখ স্বীয় শোভা ও ভ্রমরকুলে সদা পরিষেবিত এবং কুঞ্চিত

কেশদামে মনোহর চোখদুটি মীনদ্বয়ের মত চঞ্চল। এই নয়নের শোভার কাছে মহালক্ষ্মীর পদ্মও ম্লান। তাঁর ভ্রূযুগল দ্যুতিমান। ১৯-৩০

ভক্তদের ত্রিতাপ নাশকারী ভগবানের সুস্নিগ্ধ দৃষ্টি ধ্যান করবে। তাতে তাঁর মহান প্রসাদ উপলব্ধ হবে। দুঃখের ভারে জীবগণ অবসন্ন। ভগবানের হাসিও ধ্যানের বস্তু; এই হাসি বিপুল শোকাশ্রুসাগর শোষণ করে থাকে। ভগবানের উদার ভ্রূমণ্ডলে মুনিগণের উপকারার্থ কন্দর্পকেও মুগ্ধ করে। নিজমায়ায় বিরচিত এই ভ্রূমণ্ডলও ধ্যান করবে। ভগবানের উচ্চহাস্য কালে যে বিকশিত দন্তপংক্তির প্রকাশ ঘটে সেই সুন্দর উচ্চহাস্যও ধ্যান করবে। ধ্যানের ফলে যখন হৃদয়াকাশে ভগবান জ্ঞানরূপে উদ্ভাসিত হবেন তখনই প্রেমভক্তিতে মন তাঁতে সমর্পিত হবে; ভগবান ছাড়া আর কিছুই দেখার ইচ্ছা থাকবে না তখন। এ ধরনের ধ্যানশক্তিতে শ্রীহরির প্রতি যোগীর প্রেমসঞ্চার হয়, ভক্তিতে তার হৃদয় বিগলিত হয় এবং প্রেমজনিত রোমহর্ষণ সৃষ্টি হয়। এ প্রকার ধ্যানশক্তিতে প্রেমের সঞ্চার হয়, ভক্তিতে হৃদয় গলে যায় এবং প্রেমে অঙ্গ পুলকিত হয়। এই ঔৎসুক্য জনিত অশ্রুকণা হৃদয়ের আনন্দ ব্যক্ত করে। এইভাবে দুর্গ্রহণীয় ভগবান গৃহীত হলে ধ্যেয় বস্তু থেকে বড়িশ-সদৃশ উপায়স্বরূপ চিত্ত নির্মুক্ত হয় এবং নিরাশ্রয় হয়, কারণ ধ্যেয় না থাকলে ধ্যাতার অস্তিত্ব কোথায়? পরমানন্দ লাভের পর বিষয়-বিরক্তি জন্মে। যেমন তৈল ও বর্তিকা অভাবে দীপশিখা অন্তর্হিত হয়, সেই-রূপ চিত্তও তখন বিলুপ্ত হয়। এ অবস্থায় দেহাদি উপাধিশূন্য হওয়ায় ধ্যাতৃ-ধ্যেয়ের ভেদশূন্য অখণ্ড ব্রহ্ম পরিদৃষ্ট হন। যোগ থেকে অবিদ্যাবিহীন মুক্তি এসে সুখদুঃখাতীত ব্রহ্মমহিমা সৃষ্টি করে। সুখ-দুঃখ আত্মধর্ম হলেও তখন ব্রহ্মের সঙ্গে আত্মার ঐক্য ঘটে না। সুখদুঃখের কারণভূত আত্মগত-ভোক্তৃত্ব আত্মতত্ত্ব প্রত্যক্ষ করে, কারণ তখন অহঙ্কার বিনষ্ট হয়ে যোগী তন্নিষ্ঠ হন। এই আত্মতত্ত্বেই যোগী তখন বিলীন হন। মদমত্ত হতচেতন লোকের কটিতটে বসন আছে কি নেই, এ জ্ঞান থাকে না। যোগীও দেহ আসনে আছে কি নেই এ সব কিছুই অবধারণ করেন না। তিনি তখন ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ করেন। অতএব দেহের উত্থান, উত্থিতাবস্থায় অবস্থান বা পরিভ্রমণ বা পুনরায় পূর্বস্থানে নিবর্তন, এর কোন কিছুই তাঁর চেতনায় উদ্ভাসিত হয় না। পূর্বসংস্কারবশত দেহ প্রারব্ধ কর্ম সম্পাদন করে সেই প্রারব্ধ পর্যন্তই ইন্দ্রিয় সহ জীবিত থাকে। ৩১-৩৮

যোগপথে সমাধিতে আরূঢ় হলে যোগী আর স্বপ্নবৎ পুত্রাদি-দেহে আসক্ত হন না। আত্মতত্ত্বজ্ঞ হওয়াতে দেহাত্মবোধের ভ্রান্তি দূর হয় এবং দেহস্থ দ্রষ্টা পুরুষ যে দেহের থেকে পৃথক সেই ধারণা হয়, যেমন লোকে পুত্র, বিত্ত প্রভৃতিকে আত্ম-স্বরূপ মনে করেও নিজে যে তা থেকে পৃথক এ জ্ঞানও রাখে। জ্বলন্ত কাঠ আর ধূম অগ্নিস্বরূপ মনে হলেও দাহক ও প্রকাশক অগ্নি বস্তুত ধূম এবং কাষ্ঠ থেকে পৃথক। এই ভাবেই ভূত, ইন্দ্রিয়, অন্তঃকরণ ও জীব অবশ্যই দ্রষ্টা-পুরুষ থেকে পৃথক। লোকে ভূতসমূহকে মহাভূত মনে করে। যোগীও সর্বভূতে আত্মাকে এবং আত্মাতে সর্বভূত দর্শন করেন। অগ্নি এক হলেও উৎপত্তিস্থান, কাষ্ঠাদির আকার ইত্যাদির জন্য নানাপ্রকার প্রতীয়মান হয়। দেহবদ্ধ আত্মাও দেহের গুণবৈষম্যে নানারূপ প্রতীয়মান হয়। জীবের বন্ধন-কারণ এবং বিষ্ণুশক্তিরূপা সৎ-অসৎরূপা দুর্জ্ঞেয়া প্রকৃতিকে আত্মপ্রসাদ দ্বারা জয় করে যোগী ব্রহ্মস্বরূপে বিলীন হন। ৩৯-৪৪

উনত্রিংশ অধ্যায়

কালপ্রভাব ও ঘোরসংসার বর্ণনা

দেবহূতি বললেন, সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত মহৎ ইত্যাদি তত্ত্ব এবং প্রকৃতি ও পুরুষের লক্ষণ তুমি বর্ণনা করলে, এবং বুঝলাম যে ঐ লক্ষণ দ্বারাই তত্ত্বগুলির বিভাগ জানা যায়। এর জন্য দরকার ভক্তিযোগ। সেই ভক্তিযোগ কি কি প্রকারের হয় তা আমাকে সবিস্তারে বল। এই সংসার অতি বিচিত্র। তার কাহিনী শুনলেই লোকের সংসার-স্পৃহা তিরোহিত হয়। ভগবানের অপর একটি রূপের নাম কাল। এটি শ্রেষ্ঠেরও শ্রেষ্ঠ এবং এর প্রভাব সর্বাধিক। কালের তাড়নায় লোকে পুণ্যকাজ করে। সেই কালের কথাও বল। যারা জ্ঞানহীন, মিথ্যা দেহাদিতে যাদের অহংবুদ্ধি আছে, কর্মের আসক্তিতে বিভ্রান্ত হয়ে যারা অপার সংসারে চির-নিদ্রায় মগ্ন তাদের উদ্বোধিত করবার জন্যই তুমি যোগপ্রকাশক মহাসূর্য রূপে আবির্ভূত হয়েছ। মৈত্রেয় বললেন, মায়ের এই কথায় কপিল খুবই আনন্দিত হলেন এবং করুণা সহকারে হৃষ্টচিত্তে উত্তর দিলেন, মাতা, ভক্তিযোগ নানারকম আর তার প্রকাশও নানা পথে। মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি অনুসারে তার ভক্তির প্রবৃত্তিও পৃথক হয়ে থাকে। হিংসা, দম্ভ বা মাৎসর্য যুক্ত ক্রোধী ব্যক্তি ভগবানে তামস ভক্তি প্রদর্শন করে। ভেদদর্শী পুরুষ বিষয়, যশ বা ঐশ্বর্য কামনা করে প্রতিমাতে যে ঈশ্বরভক্তি দেখায় তা হল রাজস ভক্তি। পাপক্ষয়ের উদ্দেশ্যে ভগবৎপ্রীতি উৎপাদনের জন্য ভগবানে কর্মফল সমর্পণ-পূর্বক যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান করে বা অন্য উদ্দেশ্যে ভেদ দর্শন করে যে ভক্তি করা হয় তাই সাত্ত্বিক ভক্তি। গঙ্গার জলরাশি যেমন দুর্নিবার বেগে সাগরাভিমুখে ধাবিত হয়, তেমনিভাবে জীবের মনোগতি যখন বিনা ফলাকাঙ্ক্ষায় ঈশ্বরকথা শোনামাত্রই ভেদদর্শন বিরহিত হয়ে সর্বান্তর্যামী পুরুষোত্তমে একান্তভাবে সন্নিহিত হয় তখনই নির্গুণভক্তির আবির্ভাব হয়েছে বুঝতে হবে। ১-১২

যাঁরা নির্গুণ ভক্তি কামনা করেন তাঁরা সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য ও সাযুজ্য মুক্তি প্রত্যাখ্যান করেন। তাঁরা শুধুমাত্র ভগবৎ-সেবা আকাঙ্ক্ষা করেন। এই ভক্তিযোগের মধ্যেই আত্যন্তিক ভক্তি রয়েছে। ত্রিগুণ অতিক্রম করে এই ভক্তিই ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তি ঘটায়। যাঁরা এইভাবে ভগবানের আরাধনা করেন তাঁরা চিত্তশুদ্ধির জন্য ফলানুসন্ধান ব্যতিরেকে নিত্যনৈমিত্তিক স্বধর্মানুষ্ঠান করে থাকেন, একান্ত শ্রদ্ধাযুক্ত চিত্তে নিষ্কামভাবে পঞ্চরাত্রাদি পূজার অনুষ্ঠান করেন। ভগবৎপ্রতিমা দর্শন, স্পর্শন, পূজা, স্তব, বন্দনা প্রভৃতি কর্ম করেন। সকল প্রাণীতে ঈশ্বরসত্তা চিন্তার ফলে তাঁরা ধৈর্য ও বৈরাগ্যভূষিত হন। মহাজনদের সম্মান প্রদর্শন, দীনজনে দয়া, আত্মতুল্য ব্যক্তিতে মিত্রতা, বাহ্যেন্দ্রিয় নিগ্রহ, অন্তরিন্দ্রিয় দমন, আত্মবিষয়ক কথা শ্রবণ, ভগবানের নাম সংকীর্তন, সরল আচরণ, সৎসঙ্গ ও অহঙ্কারশূন্যতা, এগুলিই ঈশ্বরলাভের সোপান। এই ভাবে ভগবানের গুণকীর্তন শুনেই তাঁরা অনায়াসে ঈশ্বর লাভ করেন। বায়ুর দ্বারা বাহিত হয়ে গন্ধ যেমন ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সংস্পর্শে আসে ভক্তিযুক্ত বিকারহীন চিত্তও সেরূপ ভগবানের দর্শন পায়। ভগবানই সর্বভূতে বর্তমান এবং সকল প্রাণীর আত্মা তথা অধীশ্বর। তাঁকে মূঢ়তাবশত পরিত্যাগ করে প্রতিমাপূজা করা ভস্মে ঘৃতাহুতি নিক্ষেপের মত বিফল। এ ধরনের লোক ঈশ্বরদ্বেষী এবং বৃথাভিমানী, ভিন্নদর্শী এবং সর্বভূতের জাতবৈর জীব। সে শান্তি পায় না। যে লোকবিদ্বেষী সে বিবিধ দ্রব্য ও দ্রব্যোৎপন্ন ক্রিয়াদ্বারা প্রতিমাপূজা করলেও ভগবান তার প্রতি প্রসন্ন হন না। সত্য বটে ভগবান সর্বভূতে অবস্থিত

কিন্তু তথাপি তাঁকে নিজ অন্তরে ধারণা করা কর্তব্য। সেইজন্য ঐ ধারণা যতক্ষণ না হয় ততক্ষণ স্বকার্যনিষ্ঠ পুরুষের পক্ষে প্রতিমাদি পূজা বিহিত। যারা বিন্দুমাত্রও আত্মপর ভেদবুদ্ধি বিশিষ্ট হয়, মৃত্যুরূপী ভগবান তাদের জন্য মহান আতংকের সৃষ্টি করেন। অতএব ঈশ্বর সর্বভূতাত্মা এবং সর্বজীবে অবস্থিত, এরূপ জ্ঞান সহকারে দান, মৈত্রী, মান ও সমদর্শিতা দ্বারা সকলের অর্চনা করাই সবার কাম্য। আর অচেতন বস্তুর থেকে সচেতন বস্তু শ্রেষ্ঠ। সচেতন বস্তুর মধ্যে প্রাণবিশিষ্ট বস্তু মহত্তর। প্রাণধারী অপেক্ষা জ্ঞানবান অধিকতর বরণীয়। জ্ঞানবান জীব থেকে ইন্দ্রিয়বৃত্তি সংযোজিত স্পর্শবেদী জীব বৃক্ষাদি শ্রেষ্ঠ। এদের থেকে আবার রসবেদী মৎস্যাদি শ্রেষ্ঠ। তাদের থেকে গন্ধজ্ঞানী ভ্রমরাদি উচ্চে অবস্থিত; আবার এদেরও উর্ধে রয়েছে শব্দবেদী সর্পাদি। সর্পাদি অপেক্ষা রূপভেদজ্ঞ কাকাদি শ্রেষ্ঠ। কিন্তু যে সব জীবের দুপাটি দন্ত রয়েছে তারা কাক প্রভৃতির থেকে উচ্চমানের। বহুপদ জীব আবার এদের থেকে শ্রেষ্ঠ। বহুপদের মধ্যে চতুষ্পদ প্রাণী মহত্তর। কিন্তু এদের থেকে দ্বিপদ জীব শ্রেষ্ঠ। দ্বিপদ মনুষ্যের মধ্যে চারি বর্ণ শ্রেষ্ঠ; আবার ব্রাহ্মণই শ্রেষ্ঠ বর্ণ। ব্রাহ্মণদের মধ্যে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ গুণবত্তর। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ অপেক্ষা অর্থজ্ঞ ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ। অর্থজ্ঞ অপেক্ষা মীমাংসক ব্রাহ্মণ উর্ধে অবস্থিত। মীমাংসকের চেয়ে স্বধর্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ। এদের চেয়ে কিন্তু সঙ্গত্যাগী ব্যক্তি অধিক বিজ্ঞেয়, কারণ সেই একমাত্র নিষ্কামধর্মী। এই ব্যক্তির কর্মসমুদয়, আত্মা এবং কর্মফল ভগবানেই ন্যস্ত। সে সর্বত্র সমদর্শী এবং কর্তৃত্বাভিমান বিবর্জিত। এঁর থেকে শ্রেয় কোন জীবই নেই। ১৩-৩৩

অন্তর্যামী ঈশ্বর সর্বভূতে প্রবিষ্ট, সুতরাং সকল প্রাণীকেই সসম্মানে অন্তরে প্রণাম জানান কর্তব্য। যোগ ও ভক্তিযোগের এই কথাগুলিই বললাম। উভয় পন্থা দ্বারাই পরমপুরুষকে লাভ করা যায়। সর্বনিয়ন্তা পরমাত্মা পরমব্রহ্মরূপী যে ভগবান তিনি প্রধান-পুরুষ স্বরূপ এবং প্রধান-পুরুষ থেকে অতিরিক্ত। ইনিই সেই দৈব যা থেকে নানা সংসাররূপ কর্মের বিবিধ চেষ্টা হয়। ভগবানের এই রূপই দ্রব্যসকলের ভিন্ন ভিন্ন রূপের আস্পদ ও আশ্রয় এবং এটিই অদ্ভুত কাল। কালই মহদাদি অভিমানী ভেদদর্শী জীবগণের ভয় বিধান করেন এবং অন্তঃপ্রবিষ্ট হয়ে ভূত দ্বারাই ভূতগণকে সংহার করেন। বিষ্ণুরই অপর নাম কাল এবং যজ্ঞের ফল ইনিই প্রদান করেন। প্রভুরও প্রভু ইনি এবং এঁর কাছে প্রিয়-অপ্রিয়-বান্ধব কিছুরই কোন অস্তিত্ব নেই। স্বয়ং অপ্রমত্ত কাল প্রমত্ত জনের অন্ত ঘটান। তাঁরই ভয়ে বায়ু প্রবহমান, সূর্য তাপদাতা, ইন্দ্র বর্ষণকারী এবং নক্ষত্রগণ দীপ্তিমান। তাঁর ভয়ে বৃক্ষসমূহ, লতাগুল্মরাশি এবং ওষধিসমূহ ফলপুষ্পাদি প্রদান করে, নদীসকল প্রবাহিত হয়। তাঁরই ভয়ে ভীত সমুদ্র নিজ কূল অতিক্রম করে না। অগ্নি তাঁরই ভয়ে জাজ্বল্যমান এবং তাঁরই ভয়ে পৃথিবী ও পর্বতাদি সলিলান্তর্গত হয় না। এই আকাশ যে জীবিত প্রাণিবর্গের শ্বাস-প্রশ্বাসের সুযোগ দিচ্ছে তাও তাঁরই আদেশে জানবে। তাঁর নির্দেশে সপ্তপদার্থে আবৃত মহৎ-তত্ত্ব অহঙ্কার তত্ত্বাত্মক নিজদেহকে লোকরূপে বিস্তার করে। গুণনিয়ন্তা ব্রহ্মাদি দেবগণ নিরন্তর সৃষ্টি ক্রিয়ায় ব্যাপৃত রয়েছেন তাঁরই ভয়ে।[১] চরাচর বিশ্ব ঐ সব দেবতাদের বশবর্তী। কালই পিতার থেকে পুত্রাদি সৃষ্টি করেন, আবার মৃত্যুদ্বারা যমরাজকেও বিনাশ করেন। কালই আদিকর্তা অন্তবিধানকারী, কিন্তু স্বয়ং অনাদি, অনন্ত ও অব্যয়। ৩৪-৪৫

১ তুলনীয় : কঠ উপনিষদ, ২।৩।৩ শ্লোক।

ত্রিংশ অধ্যায়

অধার্মিকদের তামসী গতি ব্যাখ্যা

কপিল বললেন, বায়ুচালিত মেঘসকল যেমন বায়ুর গতি সম্বন্ধে অজ্ঞ তেমনিই লোকসকল কালপ্রেরিত হয়েও কালের দুরতিক্রম বিক্রম সম্বন্ধে অচেতন। সুখাভিলাষী জীব মহাকষ্টে বিষয় উৎপাদন করলেও কাল সমস্তই নষ্ট করেন। তখন জীব শোকাভিভূত হয়। মূঢ়, দুর্মেধা জীব পত্নীপুত্রাদি সংশ্রিত দেহ, গৃহ, ক্ষেত্র, ধনাদি নিত্য বলেই মনে করে এবং সংসারে নিজ যোনি অনুযায়ী দেহাদিতে সুখলাভ করে। সুতরাং তার নিষ্কৃতি সুদূরপরাহত। নরকে থেকে দুঃখভোগের পরও মায়ামূঢ় জীব নিজদেহ বিসর্জন দিতে অনিচ্ছুক। সাধুসঙ্গহীন, বৃদ্ধসেবা-বিবর্জিত, কুটুম্বাতিরিক্ত জনে অশ্রদ্ধাবিশিষ্ট, ঈশ্বরারাধনায় পরাঙ্মুখ, দেহাদিতে আসক্তিবিশিষ্ট, বাসনাবদ্ধচিত্ত ব্যক্তি নিজেকে কৃতার্থ বলে মনে করে। কিন্তু পুত্রকন্যাদির ভরণপোষণের জন্য নানা দুশ্চিন্তায় সে দগ্ধ হয়। দুরাশায় বিমুগ্ধ হয়ে সে কুক্রিয়াসক্ত হয় এবং আত্মা ও ইন্দ্রিয়কে বিষয়ে নিযুক্ত করে। সে নির্জনে বায়নারীতে সম্ভোগযুক্ত হয় এবং মিষ্টভাষী শিশুদের মধুর ভাষায় পরমপ্রীতি লাভ করে নিজেকে সুখী মনে করে। বিত্ত ও কাপট্যবহুল দুঃখপ্রধান গৃহধর্মে আসক্ত হয়ে সে পরিশ্রম সহকারে দুঃখ দূর করার জন্য চেষ্টিত হয়। যাদের পোষণ করলে অধোগামী হতে হয় মূঢ় জীব হিংসা দ্বারা অর্থ আহরণ করে তাঁদেরই সেবা করে এবং তারা ভোজন করার পর স্বয়ং অন্নগ্রহণ করে। একটি জীবিকা নষ্ট হলে অন্য জীবিকা লাভের জন্য বারবার চেষ্টা করে যখন ব্যর্থ হয়, তখন সে পরস্ববিষয়ে লোলুপ হয়। দিন দিন সে নিজ ব্যর্থতায় শ্রীহীন এবং দীন হয়, কুটুম্বভরণে অক্ষমতার ফলে চিন্তাকুল হয় এবং কোনও উপায় না দেখতে পেয়ে দীর্ঘশ্বাস মোচন করে। বৃদ্ধ বলীবর্দকে যেমন নিষ্ঠুর ক্ষেত্রস্বামী অযত্ন করে, তেমনি পরিজন পোষণে অসমর্থ ব্যক্তিকে পোষ্যবর্গ আর স্নেহযত্ন করে না। তথাপি বিমূঢ় জীব সংসারবিরক্ত হয় না, অধিকন্তু পুত্রকলত্রাদির দ্বারা লাঞ্ছিত-লালিত হয়ে গৃহেই আবদ্ধ থাকে। কালক্রমে সে জরাবশে কুশ্রী হয় এবং মরণোপান্তে উপনীত হয়। পুত্রাদি তাকে গৃহকুকুরের মত অনাদর করে, হেলাফেলায় অন্নদান করে, কিন্তু সেই অন্ন গ্রহণ করেই সে তার ক্ষুন্নিবৃত্তি করে। মন্দ ক্ষুধার জন্য তার আহার অল্প হয় এবং ফলে দেহ শক্তিশূন্য হয়ে পরিণামে রোগগ্রস্ত হয়। তারপর যখন মৃত্যু এসে উপস্থিত হয় তখন প্রাণবায়ু নির্গমের তাড়নায় তার অক্ষিযুগল বিস্ফারিত হয়ে পড়ে এবং বায়ুর মার্গরূপ নাড়ীগুলি কফ দ্বারা অবরুদ্ধ হয়, শ্বাসকষ্ট উপনীত হয় এবং গলায় ঘড় ঘড় শব্দ হতে থাকে। ঐ অবস্থাতেই শয্যায় পড়ে থেকে বন্ধুবর্গের আহ্বানে উত্তর দেবার শক্তিও তার লোপ পায়। ১-১৭

ইন্দ্রিয়বিজয়ে অসমর্থ; আত্মীয়পোষণে ব্যতিব্যস্ত, তাদেরই ক্রন্দন ও আর্তনাদে নিদারুণ শোকগ্রস্ত ব্যক্তি পরিশেষে জ্ঞানশূন্য হয়ে প্রাণত্যাগ করে। ক্রুদ্ধনয়নে দুই যমদূতকে তার সন্নিধানে আসতে দেখে ঐ ব্যক্তি আতঙ্কে মলমূত্র ত্যাগ করে। তার স্থূলদেহ থেকে যাতনাদেহ যমদূতের খর্পরগত হয়। রাজপুরুষেরা অপরাধীকে যেভাবে বন্ধন করে সেইভাবে যমদূত এই সংসারী মানুষটির গলায় পাশবন্ধন পরায় এবং আকর্ষণ করে তাকে দীর্ঘপথ নিয়ে যায়। যমদূতের তর্জনে তার হৃদয় বিদীর্ণ এবং কম্পমান হয়। যখন কুকুরে তার দেহ ভক্ষণ করে সে স্বকৃত পাপ স্মরণ করে অস্থির হয়ে পড়ে। এ-অবস্থায় সে যখন ক্ষুৎপিপাসায় কাতর, তখন তার ওপর

প্রচণ্ড কশাঘাত নিপতিত হতে থাকে। সে আরো অনেক প্রকার শাস্তি ভোগ করে। তাকে তপ্তবালুকাময়, সূর্যতাপদগ্ধ, দাবানলে বেষ্টিত, তপ্ত বায়ুপ্রবাহে মথিত পথে সঞ্চরণ করতে হয়। এখানে আশ্রয় নেই, জল নেই; তথাপি তাকে চলতে হয়। তখন অশক্ত হলেও সে নিরুপায়। শ্রান্তিতে সে মূর্ছিত হয়ে পড়ে, তারপর মোহাপগত হলে যাত্রা শুরু করতে হয়। এইভাবে নানা যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে পথ শেষ হলে সে যমপুরীতে প্রবেশ করে। এই পথের দৈর্ঘ্য নিরানব্বই সহস্র যোজন। কিন্তু তাকে তিন মুহূর্তেই এই পথ অতিক্রম করতে হয়। যমালয়ে এবার নতুন করে পীড়ন আরম্ভ হয়। কোথাও সর্বাঙ্গে জ্বলন্ত কাঠ সংযোগ করে তাকে দগ্ধ করা হয়, কোথাও বা নিজের দ্বারা বা অপরের দ্বারা নিজের দেহমাংস ছিন্ন করে তাই উদরসাৎ করতে হয়। যমালয়ে তার জীবন্ত দেহ থেকেই কুকুর, শকুনি প্রভৃতি মাংসাশী প্রাণীরা তার অন্ত্র টেনে বার করে। কোথাও সর্প, বৃশ্চিক, দংশাদি প্রাণী নির্মমভাবে তাকে দংশন করে এবং তাকে এইভাবে অসহ্য যাতনা দেয়। কোথাও তার বিবিধ অঙ্গ কর্তিত হয়, কোথাও হস্তী প্রভৃতি বন্যপ্রাণী তার দেহ বিদীর্ণ করে; কোথাও পর্বতশৃঙ্গ থেকে তাকে নিম্নে নিক্ষেপ করা হয়; কোথাও জল ও গর্তের মধ্যে তাকে নিক্ষেপ করে শ্বাসরোধের যাতনা দেওয়া হয়। এইপ্রকার নানা যন্ত্রণায় তাকে পীড়ন করা হয়। পরস্পরসঙ্গ থেকে সঞ্জাত তামিস্র, অন্ধতামিস্র, রৌরব প্রভৃতি নরকে নরনারী নির্বিশেষে বিষয়াসক্ত জীবকে যাতনাভোগ করতে হয়। এখানেই স্বর্গ ও নরক অবস্থিত। নরকযাতনা বলে যা যা কথিত সবই এখানে ভোগ হয়ে থাকে। ১৮-২৯

জীব কুটুম্বপোষণে নিয়োজিত থাকুক বা উদরভরণের কাজেই নিযুক্ত থাকুক স্বদেহ ও কুটুম্বাদি পরিত্যাগপূর্বক পরলোকে স্বকৃত কর্মের ফল অবশ্যই তাকে ভোগ করতে হয়। জীবনিগ্রহে যে ব্যক্তি নিজের দেহশ্রী বর্ধন করে সে সেই দেহটি এবং অর্জিত ধনাদি সবই পৃথিবীতে ত্যাগ করে পাপকেই পাথেয় করে ঘোর অন্ধকারময় নরকে একাই প্রবেশ করে। এখানে তার সম্মুখে তার অনুষ্ঠিত পাপের দীর্ঘ বিবরণ উপস্থাপিত হয়। আর্ত পশুর মত হতজ্ঞান হলেও দুষ্কৃতির ফলভোগ থেকে তার নিস্তার নেই। অধর্মের দ্বারাই কুটুম্ব পরিপোষণে উৎসুক ব্যক্তি অন্ধতামিস্র নামক চরম নরকে নিপতিত হয়। এখানে কষ্টভোগ শেষ হলে কুকুরাদি নীচ যোনিতে সর্বপ্রকার যাতনা ভোগ করতে হয়। বিবিধ ভোগ পরম্পরায় পূর্বকৃত পাপ ক্রমশ ক্ষীণ হয় এবং তখন আবার এই সংসারে মনুষ্যযোনিতে তার পুনর্জন্ম হয়। ৩০-৩৪

একত্রিংশ অধ্যায়

নরযোনি-প্রাপ্তি-রূপ গতি বর্ণনা

কপিল বললেন, ভগবান জীবের পূর্বকৃত কর্মের প্রবর্তক। প্রারব্ধের ফলস্বরূপ জীব দেহধারণের উদ্দেশ্যে পুরুষ-বীর্য আশ্রয় করে নারীগর্ভে জন্ম নেয়। গর্ভস্থ বীর্য শোণিতের সঙ্গে মিশ্রিত হয়। পাঁচ রাত্রি অতীত হলে ওটি বুদ্বুদ আকারে পরিণত হয়। দশ দিন পরে ওটি বদরী ফলের ন্যায় কঠিন হয়। পরে মাংসপিণ্ডের ন্যায় হয় এবং এক মাস পরে মস্তক, দুই মাসে অঙ্গ-বিভাগ, নখ, লোম, অস্থি, ও চর্ম সৃষ্টি হয়। তিন মাসে লিঙ্গ ও ছিদ্র উৎপন্ন হয়। চার মাসে

সপ্ত ধাতু, পাঁচ মাসে ক্ষুৎ-পিপাসাবোধ এবং ছয় মাসে ভ্রূণটি জরায়ু আবৃত অবস্থায় মাতৃ-জঠরের দক্ষিণাংশে পরিভ্রমণ করে। এই অবস্থায় জননীর ভুক্ত অন্নাদি থেকে তার দেহস্থ ধাতুসকলের পরিপোষণ হয়। এখানে সে অনিচ্ছা সত্ত্বেও মল-মূত্রাদির কুণ্ডে পতিত থাকে। ক্ষুধার্ত কৃমিরা তার দেহ ভক্ষণ করে ক্ষতবিক্ষত করে তোলে। যাতনায় সে মুহুর্মুহু চেতনা হারায়। এই অবস্থায় জীব সর্বাঙ্গে বেদনা অনুভব করে, কারণ জননীর গৃহীত অন্নের কটু, তীক্ষ্ন, অম্ল, লবণ, ক্ষার প্রভৃতি তীব্র রসে তার দেহ জারিত হয়। পিঞ্জরস্থ পক্ষীর ন্যায় তখন তার অবস্থা। জরায়ু ও অন্ত্রে নিরুদ্ধ হয়ে সে অঙ্গসঞ্চালনও করতে পারে না। তার পৃষ্ঠ এবং গ্রীবা বক্র হয়ে থাকে, মস্তক থাকে কুক্ষিতে ন্যস্ত। জঠরেই তার পূর্বস্মৃতি উদিত হয়। শত শত জন্মের পাপকর্মের কথা মনোমুকুরে উদ্ভাসিত হয়। তাতেই তার সুখ অন্তর্হিত হয়। সপ্তম মাসে গর্ভস্থ বায়ু তাকে প্রসূত হওয়ার জন্য আবার সঞ্চালিত করে। উদরস্থিত বিষ্ঠা থেকে উদ্ভূত কৃমির মত ভ্রূণটি কখনও স্থির থাকে না। দেহাত্মদর্শী হয়ে গর্ভবাস ভয়ের জন্য যে ভগবান তাকে উদরে সমর্পণ করেছেন তাঁর কাছে কৃতাঞ্জলি হয়ে প্রার্থনা জানিয়ে ব্যাকুলভাবে স্তব করে—ভগবানের জগৎসঞ্চারী অভয় পাদপদ্ম আমি ধ্যান করি। সন্নিহিত জগৎ রক্ষার অভিপ্রায়ে তিনি স্বেচ্ছায় বিবিধ রূপ পরিগ্রহ করেন। আমি যেরূপ অসাধু ; আমার এই গতি উপযুক্তই হয়েছে। তাঁর কাছ থেকেই এই জ্ঞান আমি পেলাম। ১-১২

জননী-জঠরে জীব দেহরূপপ্রাপ্ত, মায়াসংযোগে কর্মপরিবৃত এবং আবদ্ধ। এরই অভ্যন্তরে অখণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন, শুদ্ধ, বিকার-রহিত পরমপুরুষেরও অধিষ্ঠান। আমার সন্তপ্তহৃদয়ে তিনিই অধিষ্ঠিত ; তাঁকে আমার প্রণাম। পঞ্চভূতাত্মক দেহ মিথ্যা, আমিও যে ইন্দ্রিয়বিষয়াসক্ত এবং চিদাভাসস্বরূপ[১] একথাও মিথ্যা। সেই প্রণম্য আত্মার মহিমা এই মিথ্যা দেহরূপে আবদ্ধ নয়। সেই সর্বজ্ঞ, প্রকৃতি-পুরুষ নিয়ন্তাকে আমি নমস্কার জানাই। সংসারমার্গে বন্ধনস্বরূপ, ত্রিগুণাত্মক, বিবিধ কর্মসংস্থিত, মায়াবদ্ধ জীব স্মৃতিবিভ্রম হেতু সংসারী। ভগবানের করুণা ভিন্ন জীব নিজের প্রকৃত রূপকে উপাসনা করতে পারে না। যে ঈশ্বর আমার মধ্যে ত্রিকাল-জ্ঞান বিধান করেছেন তিনিই প্রণম্য। জীবগণ কর্মপদবী অনুসরণ করে। স্থাবর-জঙ্গমে যিনি বর্তমান ত্রিতাপের অপনোদনের জন্য আমরা তাঁরই উপাসনা করি। মাতৃজঠরে শোণিত ও বিষ্ঠামূত্রের কুণ্ডে পতিত থেকে বিষ্ঠামূত্রজনিত কষ্ট ও জঠরজ্বালায় আমি নিদারুণ সন্তপ্ত। এখান থেকে নির্গমনের জন্য অত্যন্ত দীনভাবেই আমি কালগণনা করছি। সেই নির্গমনের কাল কবে আসবে ? হে ঈশ্বর, আপনি অসীম দয়াবান, দশমাস বয়স্ক এই দেহীকে আপনি এই ধরনের জ্ঞান দিয়েছেন। আপনি স্বকৃত কর্ম দ্বারাই পরিতুষ্ট হোন। একমাত্র কৃতাঞ্জলি হয়ে থাকা ছাড়া অন্যভাবে আপনার উপকারের প্রত্যুপকার করার সাধ্য আমার নেই। অনাদি পূর্ণপুরুষ জীবকে বিবেক-জ্ঞান অর্পণ করে শম-দমাদি শরীর দান করেন। তিনিই অন্তরে ও বাহিরে দ্রষ্টব্য। জ্ঞাত বিশ্বের অধিষ্ঠাতা হয়ে তিনি অন্তরালবর্তী। আমি জঠরে পীড়িত, কিন্তু বাইরে আসার ইচ্ছাবিরহিত। কেননা সেখানে অধিকতর অন্ধকূপ অপেক্ষা করছে। সেখানে জীবগণ মায়াচ্ছন্ন ; ঐ মায়াবশে দেহে অহংবোধ জন্মে এবং জীব সাংসারিক সম্বন্ধপাশে আবদ্ধ থেকে সংসারচক্রে আবর্তিত হয়। ব্যাকুলচিত্তে আমি সারথিরূপ বুদ্ধিকে আশ্রয় করে সংসার থেকে আত্মাকে উদ্ধার করব। নানা গর্ভে থাকার কষ্ট যেন আর আমাকে না পেতে হয়।

১ চিদাভাস—চৈতন্য বা জ্ঞানের প্রকাশ অর্থাৎ জীবাত্মা।

আমি বিষ্ণুপাদপদ্ম হৃদয়ে সংস্থাপন করেছি। দশমাসের ভ্রূণটি তার চিত্ত ঈশ্বরে অর্পণ করে এইভাবে প্রার্থনা করলে প্রসব-বায়ু তাকে অধোমুখ করে প্রসবের জন্য প্রেরণ করে। এই বায়ুর চাপে সে অতিশয় ক্লিষ্ট হয় এবং অতিকষ্টে নিম্নশির হয়ে নির্গত হয়। শ্বাসরুদ্ধ হওয়ায় তার স্মৃতিভ্রংশ ঘটে। রক্তাক্ত অবস্থায় ভ্রূণটি নির্গত হয়ে কৃমির মত হস্তপদাদি সঞ্চালন করে। পরে যখন জ্ঞান পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় তখন বিপরীত গতি পেয়ে ক্রন্দনরত হয়। ১৩-২৪

শিশুটির প্রতিপালকেরা কিন্তু তার অভিপ্রায় জানতে পারে না। সেও তার অনভিপ্রেত বস্তু পেলে তা প্রত্যাখ্যান করতে পারে না। কীট-পরিপূর্ণ অশুচি শয্যায় শায়িত থেকেও সে অঙ্গ কণ্ডূয়ন করতে বা উত্থান, উপবেশন প্রভৃতি কাজ করতে সক্ষম হয় না। কৃমি যেমন কৃমিকে দংশন করে সেইরূপ মশকাদি তার কোমল ত্বকে দংশন করে। জঠরে থাকাকালীন জ্ঞানোদয়ে তার ক্লেশ হলেও সেই যন্ত্রণা দূর করার সামর্থ্য তার থাকে না। পাঁচ বৎসর ধরে এইভাবে শিশুটির শৈশব-দুঃখভোগ চলে। এর পরে কৈশোর কাল ; এখন তার দুঃখ অধ্যয়নাদি নিবন্ধন। তারপর যৌবন কালে সে যখন হৃদ্‌গত অভিলাষাদি পূরণে ব্যর্থ হয়, তখন সে ক্লিষ্ট ও ক্রুদ্ধ হয়। দেহের সঙ্গেই তার অভিমান ও ক্রোধ বেড়ে ওঠে। অন্যান্য প্রতিযোগীদের সঙ্গে দ্বন্দ্বে সে বিনষ্ট হয়। প্রকৃত জ্ঞান না থাকার ফলে পাঞ্চভৌতিক দেহে আবদ্ধ জীব এটিকেই অহংজ্ঞানে গ্রহণ করতে অসৎ আগ্রহ প্রদর্শন করে। দেহাদিতে আত্মবুদ্ধিরূপ কুমতিই বার বার সংসারপ্রাপ্তির হেতু। দেহের জন্যই সে কর্মে অনুরক্ত হয়। অবিদ্যা ও কর্মের শৃঙ্খল তাকে কষ্ট দেয় এবং অবিরত তার পশ্চাদ্ধাবন করে। জীব সম্মার্গবর্তী হয়েও যদি শিশ্নোদরপরায়ণ অসদ্ব্যক্তির সংসর্গ করে তাহলেও সে নিরয়গামী হয়। অসৎসঙ্গ নিবন্ধন সত্য, শৌচ, দয়া, মৌন, বুদ্ধি, শ্রী, লজ্জা, যশ, ক্ষমা, শম, দম, ঐশ্বর্য প্রভৃতি সবই তার চলে যায়। এই অসৎসঙ্গ সর্বথা পরিহার করা কর্তব্য। জীবের নারীসঙ্গ জনিত মোহ ও বন্ধন অত্যন্ত দৃঢ়। অন্য কোন অসৎসঙ্গের মোহ এত গভীর নয়। এর প্রমাণ এই যে ব্রহ্মাও নিজ কন্যাকে দর্শন করে কামমুগ্ধ হয়েছিলেন এবং সেই কন্যাও তাঁর হাত থেকে পরিত্রাণের জন্য হরিণীরূপে পলায়ন করেন। ব্রহ্মা কিন্তু তথাপি নিবৃত্ত হন নি, পরন্তু লজ্জাহীনের মত স্বয়ং মৃগরূপ পরিগ্রহ করে তার পশ্চাৎ ধাবমান হয়েছিলেন। রমণীরূপে ব্রহ্মারও যখন এমন মতিভ্রম হয়েছিল তখন তাঁরই সৃষ্ট মরীচি প্রভৃতি, আবার তাঁদের সৃষ্ট কশ্যপাদি, তাঁদেরও সৃষ্ট দেব-মনুষ্যাদি, অবশ্য নারায়ণ-ঋষি ভিন্ন, কেন রমণীর রূপে বিমোহিত হবে না ? স্ত্রীরূপের মায়ার এমনিই শক্তি যে শুধুমাত্র ভ্রূসঞ্চালনে সে দিগ্বিজয়ী বীরদের নিজ পদাপিষ্ট করে। সুতরাং যোগের পরপারে যেতে ইচ্ছুক ব্যক্তির পক্ষে নারীসঙ্গ পরিহার অবশ্য কর্তব্য। এর কারণও এই যে যোগীরা বলেন, সৎসঙ্গে যাঁর আত্মরূপ লাভ হয় তাঁর পক্ষে রমণী নরকের দ্বারস্বরূপ। ভগবান মায়াকে রমণীরূপে সৃষ্টি করেন। এই রমণী শুশ্রূষাচ্ছলেই সন্নিকটবর্তী হয়। কিন্তু আত্মজ্ঞানী মহাজন তাকে তৃণাচ্ছাদিত কূপের ন্যায় সাক্ষাৎ যমরূপ মনে করবেন। স্ত্রীসহবাসে জীবের স্ত্রীত্ব উপার্জিত হয়। মোহবশেই সে পুরুষসদৃশ আচরণকারিণী মায়াকে বিত্ত, অপত্য ও পতিরূপে মান্য করে। ২৫-৪১

ব্যাধের সঙ্গীত মৃগের মৃত্যুর কারণ। স্ত্রীত্বপ্রাপ্ত মুমুক্ষু ব্যক্তিরও মৃত্যুস্বরূপ হল মায়া-বিরচিত পুত্রাদি। কোন জীব লোক থেকে লোকান্তরে যেতে পারে না। লিঙ্গশরীর জীবের উপাধিস্বরূপ এবং ঐ শরীর সহযোগে সে লোকান্তরে ভ্রমণ করে, ফলভোগ করে এবং কর্মানুষ্ঠান করে। এই স্থূলদেহ জীবের আত্মার অনুবর্তী

এবং স্থূলভূতাদির বিকাররূপ ভোগায়তন। এরই মধ্যে তার উপাধিভূত লিঙ্গদেহ অবস্থিত। এই দুটির কার্যযোগ্যতাই জীবের মরণ এবং এদের আবির্ভাবে তার জন্ম। 'আমার দেহ' এই জ্ঞানে শরীরের দর্শন হলে জীবের উৎপত্তি হল বলা যায়। অক্ষিগোলক কামলা রোগে আক্রান্ত হয়ে রূপদর্শনে অসমর্থ হলে চক্ষুরিন্দ্রিয়ের অযোগ্যতা এবং দ্রষ্টা জীবেরও দর্শনজ্ঞানের অভাব সূচিত হয়। অনুরূপভাবে স্থূলদেহে দ্রব্যোপলব্ধি বিনষ্ট হলে মৃত্যু আসে। সুতরাং মৃত্যুতে ভয় নেই; জীবনে কষ্টভোগ বা জীবনের জন্য যত্ন করা অর্থহীন। জ্ঞানী ব্যক্তি জীবের গতি-প্রকৃতি উপলব্ধি করে অসৎসঙ্গ ত্যাগ করে বা সম্যক্ বিচারপূর্বক বুদ্ধিকে যোগবৈরাগ্যে যুক্ত করে মায়ারচিত এই লোকে সর্ববিধ আসক্তিশূন্য হয়ে বিচরণ করে। ৪২-৪৮

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়

ঊর্ধ্বগতি ও পুনর্জন্মবিবরণ

কপিল বললেন, গৃহস্থ নিজের আশ্রমোচিত ধর্মানুষ্ঠান করে অর্থ ও কাম লাভ করে। ফলে অর্থ-কামের পূর্ণতার জন্য সে বারবার সচেষ্ট হয়। কাম-মুগ্ধ হওয়ার জন্য এরা ভগবদ্ধর্ম আচরণ করে না। শ্রদ্ধাসহকারে অনুষ্ঠিত নানা যজ্ঞদ্বারা তারা প্রাকৃত দেবদেবীর আরাধনা এবং পিতৃগণের অর্চনা করে। এদের প্রতি শ্রদ্ধাবশত আচ্ছন্ন বুদ্ধিতে একমাত্র তাদেরই উপাসনা, ব্রতাদি পালন করে এবং এরই ফলস্বরূপ চন্দ্রলোকে গিয়ে সোমপান করে। মুক্তি না পেয়ে এরা আবার সংসারেই ফিরে আসে। ভগবানের অনন্তশয়নের সময় এই গৃহস্থদের কর্ম অনুযায়ী প্রাপ্য লোকের (চন্দ্রলোকাদি) বিলয় ঘটে। ধীর ব্যক্তিরা অর্থ-কাম লালসায় স্বধর্ম পালন করেন না, ঈশ্বরেই সকল কর্ম অর্পণ করে তাঁরা প্রশান্ত, শুদ্ধচিত্ত, নিবৃত্তিধর্মাসক্ত, মমত্বশূন্য, নিরহঙ্কার এবং স্বধর্ম-লব্ধ-সত্ত্ব হন। এঁরা সূর্যরশ্মিকে অবলম্বন করে বিশ্ব-উপাদান, বিশ্বের নিমিত্তকারণ পরাবর[1] ও পূর্ণ পুরুষকে লাভ করেন। ভগবদ্‌বুদ্ধিতে হিরণ্যগর্ভের উপাসনা করলেও এই গতি ক্রমশ লাভ হয়। দ্বিপরার্ধের অবসানে ব্রহ্মার লয় না ঘটা পর্যন্ত তঁরা ব্রহ্মলোকে বাস করেন। জননী এই ব্রহ্মাণ্ড ভূতগণ, মন, ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়-বিষয় শব্দাদি এবং অহংকার প্রভৃতি দ্বারা বেষ্টিত। দ্বিপরার্ধকাল যাবৎ ত্রিগুণাত্মক ব্রহ্মা এটি ভোগ করেন। ভোগান্তে ব্রহ্মা তাঁর সকল সৃষ্টিসহ অব্যাকৃত ভগবান পরমব্রহ্মে প্রবিষ্ট হন। ব্রহ্মলোকে এসে যে সব যোগী হিরণ্যগর্ভে লীন হন তাঁরা মন ও প্রাণকে জয় করে পরমানন্দময় পুরাণপুরুষস্বরূপ ব্রহ্মত্ব লাভ করেন। এই সারূপ্য তাঁরা পূর্বাহ্নে পান না, কারণ তখনও তাঁদের অভিমান বিলুপ্ত হয় না। যাঁরা ঈশ্বরের ভক্ত তাঁরা সাক্ষাৎ ব্রহ্মলাভ করেন। অতএব সর্বান্তর্যামী, সর্বপ্রভব ভগবানের শরণ নেওয়া কর্তব্য। ত্রিগুণ সংযোজনে বিশ্বের আদিস্রষ্টা বেদপ্রবক্তা ব্রহ্মা, মরীচি প্রভৃতি ঋষিগণ, সনৎকুমার আদি মহাযোগিগণ, সিদ্ধ ও যোগপ্রবর্তকগণ নিষ্কাম কর্মযোগে স্বকৃত কর্মসৃষ্ট পারমেষ্ঠ্য ও ঐশ্বর্যাদি ভোগ করেন। পরে প্রলয়কাল এলে এঁরা গুণেশ্বর,

[1] পর (শ্রেষ্ঠ) ও অবর (নিকৃষ্ট), তার অধিপতি অর্থাৎ পরমেশ্বর

প্রথমাবতাররূপে ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। তবে ভেদদর্শী উপাসনার জন্য এঁরা ঈশ্বররূপী মহাকালের তাড়নায় পুনর্জন্ম পেয়ে থাকেন। ব্রহ্মাসহচর ঋষিরাও স্ব স্ব অধিকারে প্রত্যাবর্তন করেন। ১-১৫

আর যারা একপক্ষে কর্মাসক্ত, সশ্রদ্ধ, নিত্যকর্মের সম্যক্ অনুষ্ঠানকারী, আবার অন্যপক্ষে কামাত্মা এবং ইন্দ্রিয়পরবশ, রজোগুণ প্রভাবে আচ্ছন্ন, সম্পূর্ণরূপে গৃহাদিতে আসক্ত এবং পিতৃগণের অর্চনাকারী তাদের জন্যও পুনর্জন্মের ব্যবস্থা রয়েছে। যারা ধর্মার্থকামপরতন্ত্র, ভবভয়তারণ শ্রীহরির বিক্রমকাহিনী শ্রবণে অনিচ্ছুক এবং ক্ষীর পরিত্যাগ করে বিষ্ঠাগ্রহণে তৎপর শূকরের মত হরিকথামৃত বর্জন করে অসৎকথা শ্রবণে আগ্রহী তারাও নিশ্চয়ই দৈব কর্তৃক নিহত। এরা সূর্যের দক্ষিণায়ন পথে ধূমমার্গে পিতৃলোকে প্রয়াণ করে এবং সেখান থেকেই নিজ নিজ বংশে প্রত্যাবর্তন করে এবং জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যাবতীয় ক্রিয়াদি পূর্ববৎ-অনুষ্ঠান করে। এদের সুকৃতি কালক্রমে ক্ষীণ হয় এবং ভোগসাধন বিনষ্ট হওয়ায় দৈবযোগে বিবশ হয়ে পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হয়। ভগবৎকথা শ্রবণে যে ভক্তি হয় তার দ্বারা সর্বান্তঃকরণে ভগবানের অর্চনা কর্তব্য, কারণ ভগবৎ-পাদপদ্মই জীবের একমাত্র ভজনীয়। ভক্তিযোগের দ্বারা বাসুদেবে নিবিষ্ট হলেই বৈরাগ্য ও ব্রহ্মসাক্ষাৎকার জ্ঞান অবিলম্বে আয়ত্তে আসে। ভগবানের গুণানুরাগে ভক্তের চিত্ত যখন তাতেই নিশ্চল হয় এবং একভাবাপন্ন ইন্দ্রিয়-বিষয়েও প্রিয় বা অপ্রিয় এরূপ কোন বৈষম্যবোধ না থাকে, তখনই সে নিজ আত্মা দিয়ে স্বপ্রকাশ আত্মাকে সঙ্গহীন, হেয়োপাদেয়-রহিত, সর্বত্র সমজ্ঞান এবং শুদ্ধজ্ঞান স্বরূপ মনে করে নিজের পরমানন্দ স্বরূপ সম্বন্ধে অবহিত হয়। জ্ঞানস্বরূপ ভগবান হলেন পরব্রহ্ম। তিনিই পরমাত্মা, পরমেশ্বর প্রভৃতি নামে লোকসমূহে প্রসিদ্ধ। দ্রষ্টা-দৃশ্যরূপে পৃথক মনে হলেও জ্ঞানরূপে তিনি এক ও অদ্বিতীয়। একান্ত নিঃসঙ্গ আত্মাকে লাভ করাই যোগীর সমগ্র যোগের অভিমত অর্থাৎ যোগের ফল। প্রপঞ্চ-প্রতীতি একটি ভ্রান্তিজ্ঞান। নির্গুণ ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ, কিন্তু বহির্মুখী ইন্দ্রিয়েরা তাকে শব্দাদি ধর্মবিশিষ্ট বস্তুরূপে প্রকাশ করে, যা একটি ভ্রমমাত্র। প্রকৃতপক্ষে সংসারে পৃথকত্ব বলে আদৌ কিছু নেই। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে মহত্তত্ত্ব এক হলেও অহংকাররূপে ত্রিগুণাত্মক, ভূতরূপে পাঁচ প্রকার এবং ইন্দ্রিয়-গণনায় একাদশ। ঐ মহত্তত্ত্ব থেকেই স্বরাট্ জীব, জীবদেহ, ব্রহ্মাণ্ড ও জগৎ প্রকাশিত। এই প্রপঞ্চ পরব্রহ্মেও পদার্থরূপে প্রতীয়মান। নিত্যসংযত, সঙ্গবিবর্জিত এবং আসক্তিশূন্য হয়ে শ্রদ্ধা, ভক্তি ও যোগাভ্যাস সহকারে নিত্যব্রহ্ম দৃষ্ট হন। ১৬-৩০

মাতা, ব্রহ্মদর্শন-জ্ঞান এভাবেই ব্যাখ্যাত হল। প্রকৃতি-পুরুষতত্ত্ব এর সাহায্যেই জানা যায়। নির্গুণ জ্ঞানযোগ এবং ঈশ্বর-ভক্তিযোগ উভয়েরই তুল্যমূল্য ; কারণ উভয় পথেই ভগবৎলাভ হয়। রূপরসাদি বিবিধ গুণযুক্ত দুগ্ধ এক হলেও বিভিন্ন ইন্দ্রিয় বিভিন্ন প্রকাশপথে তাকে ভিন্ন ভিন্ন রূপে গ্রহণ করে। এই ভাবেই এক ভগবান বিভিন্ন শাস্ত্রে নানারূপে প্রতীয়মান হন। পূর্তকর্মাদি, যজ্ঞ, দান, তপস্যা, বেদাধ্যয়ন, বেদার্থ মীমাংসা, আত্মা, ইন্দ্রিয়-বিজয়, সন্ন্যাস, অষ্টাঙ্গযোগ, ভক্তিযোগ, প্রবৃত্তি নিবৃত্তি বিশিষ্ট নিষ্কাম সকাম ধর্ম, আত্মার জ্ঞান, দৃঢ়বৈরাগ্য প্রভৃতির দ্বারা স্বপ্রকাশ ব্রহ্ম সগুণ ও নির্গুণ-রূপে পরিগৃহীত হন। মহাকাল সকলের উৎপত্তি-সংহারের কারণ। এঁর গতি অব্যক্ত। এঁরই স্বরূপ এবং চতুর্বিধ ভক্তিযোগের কথা এখানে ব্যক্ত করলাম। অবিদ্যা-কর্মোদ্ভূত নানা সংসার আছে যার মধ্যে প্রবেশ করলে মন নিজের গতি সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকে। এ সকল গুহ্য কথা খল, অবিনীত ব্যক্তির নিকট কীর্তন করা অনুচিত। আর যারা দুরাচার, দাম্ভিক, লোভী, গৃহাসক্তচিত্ত, ঈশ্বরে ভক্তিশূন্য

অথবা ভগবদ্‌ভক্তবিদ্বেষী তাদের নিকট ব্যক্ত করাও অনুচিত। শ্রদ্ধাবান, ভক্ত, বিনীত, অসূয়াবর্জিত, সর্বমিত্র, শুশ্রূষারত, বাহ্যবিষয়ে আসক্তিহীন, মাৎসর্য-বিহীন, শান্ত ও শুচি ব্যক্তি ভগবানকেই প্রিয় অপেক্ষাও প্রিয় মনে করেন; তিনি এই গুহ্যকথার অধিকারী। সশ্রদ্ধচিত্তে একবার মাত্র এই কথা শ্রবণ করলে, ঈশ্বরে সমর্পিতচিত্ত হয়ে এই উপদেশ অনুসারে নিজেকে নিয়ন্ত্রিত করলে নিশ্চয়ই পরমেশ্বরলোকে অধিষ্ঠান করবে। ৩১-৪৩

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়

দেবহূতির জ্ঞানলাভ

মৈত্রেয় বললেন, কপিলের এই কথা শুনে জননীর মোহযবনিকা অন্তর্হিত হল। তিনি তত্ত্বজ্ঞানের আশ্রয়ভূত সিদ্ধ কপিলকে প্রণাম জানিয়ে তাঁকে তুষ্ট করলেন। দেবহূতি বললেন, তোমার এই দেহ ভূতেন্দ্রিয়-মন-আত্মা দ্বারা পরিব্যাপ্ত। এই দেহ অনন্ত কার্যের বীজস্বরূপ, এটি সর্বগুণাধার। ব্রহ্মা তোমারই নাভিপদ্ম থেকে উৎপন্ন হয়ে তোমারই সমুদ্রশায়ী বরতনু চিন্তা করেছিলেন, কিন্তু এর দর্শন পান নি। তুমি নিষ্ক্রিয় হলেও গুণপ্রবাহরূপে স্বশক্তিকে বিভাগ করে বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় বিধান করেছ। তুমি জীবসমূহের প্রভু এবং সত্যসংকল্প। তোমার প্রভূত শক্তি তর্কের অতীত। প্রলয়কালে তুমিই এই বিশ্বকে উদরে ধারণ করেছিলে। সেই তোমাকে যে আমি জঠরে ধারণ করেছিলাম একথা ভেবে আমার খুব আশ্চর্য বোধ হয়। শৈশবে তুমি অপূর্ব মায়া দেখিয়েছিলে—বটপত্রে শয়ান অবস্থায় তুমি পদাঙ্গুষ্ঠ লেহন করতে। তোমার এই শরীর ধারণ দুষ্টদের দমনের জন্য এবং অনুরক্ত ভক্তদের তোমার বিভূতি ও জ্ঞানমার্গ প্রদর্শনের জন্য। বরাহাদি অবতার তোমারই ইচ্ছানুসারে হয়। যে কোন সময়েই তোমার নাম শ্রবণ-কীর্তন করলে, তোমাকে প্রণাম নিবেদন করলে বা স্মরণ করলে চণ্ডালও পূজা-যোগ্য হয়ে উঠে। তোমার দর্শনে নিঃসন্দেহে লোকসকল পবিত্র হবে। চণ্ডালও যদি জিহ্বাগ্রে তোমার নাম উচ্চারণ করে তাহলে সে মহীয়ান হয়। তোমার নাম গ্রহণেই তপস্যা, হোমক্রিয়া, তীর্থস্নানের ফল হয়। যাঁরা তোমার নাম নেন তাঁরা সত্য-সদাচারী এবং তাঁদের বেদাধ্যয়ন সার্থক। পরব্রহ্ম পরমপুরুষ তুমিই। তোমাকেই চিত্তে প্রতিষ্ঠা করা কর্তব্য। ত্রিগুণ তোমার তেজেই দগ্ধ হয়। প্রলয়কালে তুমি নিজগর্ভে বেদসকল ধারণ করেছিলে। হে বিষ্ণুস্বরূপ কপিল, তোমাকে প্রণাম। ১-৮

মৈত্রেয় বললেন, পরমপুরুষ কপিল এইভাবে স্তুত হয়ে স্নেহ-গদ্‌গদ্ বচনে জননীকে সম্বোধন করে বললেন, মাতা, তোমাকে যে মার্গের কথা বললাম পরমসুখে আচরণীয় ধর্মের দ্বারা সেই মার্গে গমন করলে অচিরেই তুমি মুক্তি-লাভ করবে। আমার এই অভিমত তুমি শ্রদ্ধাসহকারে গ্রহণ কর। ব্রহ্মবাদী ব্যক্তিগণ এই পথই অনুসরণ করেন। তুমিও এই পথে গেলে অভয় লাভ করবে। যারা এ কথা জানে না তারাই বার বার সংসারে আসে। মৈত্রেয় আবার বললেন, এইভাবে কমনীয় আত্মতত্ত্বের কথা মাতাকে উপদেশ দিয়ে তাঁর অনুমতি নিয়ে ভগবান কপিল অন্তর্ধান করলেন। দেবহূতিও পুত্রকথিত জ্ঞানমার্গে সমাহিতা হলেন এবং সরস্বতীর পুষ্পমুকুটের মত 'বিন্দুসর' নামক আশ্রমে যোগযুক্তা হলেন। বার বার স্নান করে তাঁর কেশপাশ পিঙ্গল এবং কুটিল হয়ে উঠল। উগ্র

তপস্যায় তাঁর চীরধারী দেহ ক্ষীণ হল। কর্দমের আশ্রম দেবহূতির তপস্যা ও যোগ-ভ্যাসে অতি মনোরম শোভা ধারণ করল। আশ্রমের শয্যাগুলি দুগ্ধফেননিভ, পর্যঙ্কাদি গজদন্ত নির্মিত এবং স্বর্ণময় আস্তরণে আস্তৃত। আসনগুলি স্বর্ণময় তার উপরে কোমল আচ্ছাদন বিস্তৃত। নির্মল স্ফটিকে নির্মিত গৃহভিত্তিতে মরকতমণি সন্নিবিষ্ট। রত্নময় প্রদীপ সেখানে সর্বদা দীপ্যমান। রমণীরা নানা অলংকারে অলঙ্কৃতা। গৃহপার্শ্বের উদ্যানে প্রস্ফুটিত নানা কুসুম এবং বিবিধ বৃক্ষরাজি অপূর্ব শোভা ধারণ করছিল। সেখানে যুগলে যুগলে পক্ষীরা কূজনে মত্ত এবং মধুকর-গুঞ্জন সর্বজনের প্রীতিপ্রদ। দেবহূতি উদ্যানের পদ্মগন্ধ সরোবরে স্নানের জন্য গেলে দেবানুচর গন্ধর্বগণ তাঁর স্তুতিগান করত। কর্দমও তাঁর রক্ষণাবেক্ষণে সর্বদা নিযুক্ত থাকতেন। এই শোভাময় আশ্রম ইন্দ্রপত্নীদেরও কাম্য ছিল। দেবহূতি এই আশ্রমও অকাতরে পরিত্যাগ করলেন। কিন্তু কপিলের বিরহজনিত কাতরতা তিনি পরিত্যাগ করতে পারলেন না। শোকাবেশে তাঁর বদন মলিন হল। স্বামীও সন্ন্যাসধর্মের অনুরোধে বন থেকে বনান্তরে ভ্রমণশীল, আবার কপিলও নেই। সুতরাং তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেও দেবহূতি বৎসহারা ধেনুর মত বিবশ হলেন। তিনি কপিলকে ধ্যান করতে লাগলেন। এইজন্যই সেই সুন্দর আশ্রম থেকেও নিজ মনকে তিনি প্রত্যাহার করতে পেরেছিলেন। কপিলনির্দিষ্ট পথে তিনি ভগবানের সমগ্র মূর্তি এবং সেই মূর্তির বিভিন্ন অংশও ধ্যান করতে লাগলেন। নিরন্তর ভক্তিযোগ এবং প্রবল বৈরাগ্য, পরিমিত আহারাদি, সেবা এবং ব্রহ্মবোধক জ্ঞান দ্বারা মন বিশুদ্ধ হয় এবং মায়াগুণোদ্ভব দেহাত্মবুদ্ধি বিলুপ্ত হয়। এইভাবেই দেবহূতি সর্বব্যাপী পরমাত্মার ধ্যান করলেন। তিনি ধ্যানশক্তিতে জীবের আশ্রয়ভূত ব্রহ্মে বুদ্ধিকে স্থিরভাবে প্রতিষ্ঠিত করলেন। তাঁর জীবভাব নিবৃত্ত হল, ক্লেশ দূর হল এবং নির্বৃতি অধিগত হল। সমাধিতে সিদ্ধ হওয়ায় গুণাত্মক ভ্রান্তি অপসৃত হল। সুপ্তোত্থিত ব্যক্তি যেমন স্বপ্নদৃষ্ট বিষয় বিস্মৃত হয় দেবহূতিও সেইরূপ স্বদেহ বিস্মৃত হলেন। কিন্তু কর্দমসৃষ্ট বিদ্যাধরীরা তখনও সেই দেহের শুশ্রূষায় রত ছিল। এখন তাঁর মনে কোন গ্লানি নেই ; অতএব দেহ আর ক্ষীণ হল না। যদিও দেহে মল লিপ্ত হয়েছিল, তথাপি তা সধূম অগ্নির মতই শোভাময় ছিল। তপস্যাকালে যোগযুক্ত দেহ কখনও মুক্তবাস বা মুক্তকেশ হলেও তিনি তা কিছুই জানতেন না, কারণ তাঁর মন বাসুদেবেই বিলগ্ন ছিল। প্রারব্ধ কর্মবলেই তাঁর দেহ রক্ষিত হয়েছিল। এইভাবেই কপিলমার্গ অনুসরণ করে কপিলজননী নিত্যমুক্ত, পরমব্রহ্ম, আত্মস্বরূপে ভগবানকে লাভ করলেন। ৯-৩০

দেবহূতি যেখানে সিদ্ধিলাভ করেন সেই স্থানটি 'সিদ্ধিপদ' নামে ত্রিলোকে বিখ্যাত পুণ্যক্ষেত্র হয়েছে। যোগ দ্বারা তাঁর যে ধাতুমল বিধৌত হয়েছিল তা নদীধারা রূপে প্রবহমান। ঐ নদীগুলি সিদ্ধিপ্রদাত্রী এবং শ্রেষ্ঠ নদীর মধ্যে গণ্য। সিদ্ধপুরুষেরা তাদের বিশুদ্ধ জল ব্যবহার করেন। এদিকে কপিল জননীর নিকট বিদায় নিয়ে প্রথমে উত্তর দিকে যান। সিদ্ধ, চারণাদি সবাই তাঁর যাত্রাসময়ে স্তুতিগান করেছিল। সমুদ্র তাঁকে অর্ঘ্য ও আশ্রয় দেয়। আজ পর্যন্ত কপিল ত্রিলোকের শান্তি বিধানের জন্য তপস্যায় মগ্ন আছেন। সাংখ্যাচার্যগণ তাঁর স্তবগান এখনও করে থাকেন। বিদুর, তুমি যে প্রশ্ন করেছিলে তার উত্তরে এই সব কথা বললাম। কপিল-দেবহূতি সংবাদ অতি পবিত্র। যিনি কপিল কথিত পরমাত্ম যোগরহস্য শ্রবণ ও কীর্তন করেন তাঁর মন ভগবান গরুড়ধ্বজে দৃঢ় নিবদ্ধ হয় এবং অন্তিমে শ্রীভগবানের চরণপদ্মে তাঁর স্থান সংরক্ষিত থাকে। ৩১-৩৭

চতুর্থ স্কন্ধ

প্রথম অধ্যায়

মনু-কন্যাদের পৃথক্ পৃথক্ বংশের বর্ণনা

মৈত্রেয় বললেন, বিদুর, স্বায়ম্ভুব মনুর পত্নী হলেন শতরূপা। তাঁর গর্ভে মনুর তিনটি কন্যা জন্মে। তাদের নাম আকূতি, দেবহূতি ও প্রসূতি (অবশ্য এর আগেই তাঁদের দুটি পুত্রও জন্মেছিল)। মনু শতরূপার সম্মতি নিয়ে কন্যা আকূতিকে, তার ভাই থাকা সত্ত্বেও, পুত্রিকা-ধর্মানুসারে[১] মহর্ষি রুচির হাতে সমর্পণ করেন। পরে পরমেশ্বরের ঐকান্তিক ধ্যানের ফলে যোগৈশ্বর্যশালী প্রজাপতি রুচি ব্রহ্মতেজ-সম্পন্ন হন। এরূপ অবস্থায় পত্নী আকূতির গর্ভে তাঁর এক পুত্র ও এক কন্যার জন্ম হন। এ দুয়ের মধ্যে যিনি পুরুষ, তিনি যজ্ঞমূর্তি-ধারী সাক্ষাৎ বিষ্ণু; আর যিনি স্ত্রী, তিনি লক্ষ্মীর অংশভূতা মঙ্গল-স্বরূপা দক্ষিণা। স্বায়ম্ভুব মনু আনন্দিত হয়ে নিজের কন্যার সেই অত্যন্ত তেজস্বী পুত্রকে গৃহে নিয়ে এলেন, আর কন্যা দক্ষিণাকে গ্রহণ করলেন রুচি। ১-৫

কিছুকাল পরে সেই কন্যা (দক্ষিণা) যজ্ঞপতি ভগবান বিষ্ণুকেই পতিরূপে কামনা করলে তিনি (বিষ্ণু) তাঁকে বিবাহ করলেন।[২] এতে দক্ষিণা হৃষ্ট হলেন, বিষ্ণুও সন্তুষ্ট হলেন। দক্ষিণার গর্ভে ভগবান বিষ্ণুর বারটি পুত্রের জন্ম হয়। এই পুত্রদের নাম—তোষ, প্রতোষ, সন্তোষ, ভদ্র, শান্তি, ইড়স্পতি, ইধ্ম, কবি, বিভু, স্বাহ্ন, সুদেব ও রোচন। স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে ঐ বারটি পুত্রই তুষিত নামক দেবতা হয়েছিল। মরীচি প্রভৃতি সপ্তর্ষি, ভগবানের যজ্ঞনামক অংশাবতার, সুরপতি ইন্দ্র এবং মনুর দুই মহাতেজস্বী পুত্র প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ এবং তাঁদের পুত্র, পৌত্র, ও দৌহিত্র প্রভৃতি দ্বারাই এই মন্বন্তর প্রতিপালিত হয়[৩]। ৬-৯

মনু তাঁর অপর কন্যা দেবহূতিকে কর্দম ঋষির হাতে দিলেন। আমি তোমার কাছে তাঁদের কথা সবিস্তারে বলেছি, আর তুমিও তাঁদের কথা প্রায় সমস্তই শুনেছ। ভগবান মনু প্রসূতি নামে কন্যাকে ব্রহ্মার পুত্র প্রজাপতি দক্ষের হাতে দান করলেন। সেই দক্ষ ও প্রসূতির সন্তান-সন্ততিরাই সমস্ত ত্রিভুবন পরিব্যাপ্ত করেছিল। কর্দম ঋষির নয়টি কন্যা নয়জন ব্রহ্মর্ষির পত্নী হয়েছিলেন। এঁদের কথাও আমি আগে তোমাকে বলেছি। এখন ক্রমে ক্রমে তাদের পুত্র-পৌত্রাদির কথা বিস্তারিত ভাবে

---

[১] 'আমার এ-কন্যার ভাই নেই। সালঙ্কারে একে সম্প্রদান করছি। এর গর্ভে যে পুত্র হবে, সে আমার।'—এই কথা বলে কন্যা সম্প্রদানের নাম পুত্রিকাধর্ম। মনু আরও পুত্রলাভের জন্য এই পথ অবলম্বন করেন।

[২] এঁরা বিষ্ণু ও লক্ষ্মীদেবীর অংশাবতার ছিলেন বলে এঁদের বিবাহে কোন বাধা ছিল না।

[৩] প্রত্যেক মন্বন্তরেই মনু, দেবতা, মনুপুত্র, ইন্দ্র, সপ্তর্ষি ও বিষ্ণুর অংশাবতার—এই ছয় প্রকার হয়ে থাকে।

বলছি, শোন। কর্দম ঋষির কন্যা কলা মরীচির পত্নী হন। তিনি কশ্যপ ও পূর্ণিমা নামে দুই পুত্র প্রসব করেন। তাদের বংশধরদের দ্বারাই জগৎ পরিপূর্ণ হয়েছে। পূর্ণিমার বিরজ ও বিশ্বগ নামে দুই পুত্র এবং দেবকুল্যা নামে এক কন্যা হয়। এই দেবকুল্যা জন্মান্তরে শ্রীহরির পাদপ্রক্ষালন করেছিলেন। সেই পুণ্যের ফলে তিনি স্বর্গনদী গঙ্গারূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। আর অত্রিমুনির পত্নী অনসূয়া বিষ্ণু, রুদ্র ও ব্রহ্মার অংশসম্ভূত দত্ত, দুর্বাসা ও সোম নামে অতি তেজস্বী তিন পুত্র প্রসব করেন। ১০-১৫

তখন বিদুর বললেন, গুরু (মৈত্রেয়), সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কর্তা সেই তিন শ্রেষ্ঠ দেবতা ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর কি কি কাজ করার জন্য অত্রির গৃহে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তা আমাকে বলুন। ১৬

মৈত্রেয় বললেন, ভগবান ব্রহ্মা শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবিদ্ অত্রিমুনিকে প্রজাসৃষ্টির জন্য আদেশ করলেন। তখন তিনি পত্নী অনসূয়ার সঙ্গে ঋক্ষ নামে কুলপর্বতে গিয়ে তপস্যায় প্রবৃত্ত হলেন। সেই পর্বতের একাংশে এক মনোরম বন ছিল। সেখানে বহু পলাশ ও অশোক বৃক্ষ ছিল। প্রস্ফুটিত পুষ্পস্তবক ঐ বনের শোভাবর্ধন করেছিল, আর নির্বিন্ধ্যা নদীর জলস্রোতের শব্দে স্থানটি সর্বদা মুখরিত থাকত। মহর্ষি অত্রি সেই বনে প্রবেশ করে তপস্যায় মগ্ন হলেন। প্রাণায়াম দ্বারা মনকে সংযত করে তিনি চিন্তা করতে লাগলেন। যিনি এ-জগতের ঈশ্বর, আমি তাঁর শরণাগত হলাম, তিনি আমাকে আত্মতুল্য সন্তান প্রদান করুন। এ-সময়ে তিনি শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ব সহ্য করে বায়ুমাত্র ভক্ষণ করে এবং কেবল একপায়ে দাঁড়িয়ে থেকে একশত বছর তপস্যা করেছিলেন। অত্রি যখন এভাবে তপস্যা করছিলেন তখন তাঁর মস্তক হতে জ্বলন্ত আগুন নির্গত হল। সেই যোগাগ্নিতে তাঁর প্রাণায়ামরূপ ইন্ধন (কাষ্ঠ) প্রজ্বলিত হয়ে উঠল। ঐ অগ্নির তেজে ত্রিভুবন দগ্ধ হচ্ছে দেখে জগতের তিন প্রভু ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর মহামুনি অত্রির আশ্রমে এসে উপস্থিত হলেন। সে সময়ে অপ্সরা, মুনি, গন্ধর্ব, সিদ্ধ, বিদ্যাধর ও নাগগণ তাঁদের দেখে বন্দনা করতে লাগলেন। ঐ তিন শ্রেষ্ঠ দেবতাকে সমাগত দেখে মুনি অত্যন্ত আহ্লাদিত হলেন। তিনি এক পায়ে দাঁড়িয়ে থেকেই তাঁদের দেখতে লাগলেন। তারপর তিনি সাষ্টাঙ্গে প্রণামপূর্বক পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে তাঁদের পূজা করলেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর যথাক্রমে হংস, গরুড় ও বৃষে আরূঢ় ছিলেন এবং প্রত্যেকেই স্ব স্ব চিহ্ন কমণ্ডলু, চক্র ও ত্রিশূলে চিহ্নিত ছিলেন। তখন তাঁদের মুখ প্রসন্ন ও কৃপাদৃষ্টিতে হাস্যমধুর হয়ে উঠেছিল। মহর্ষি অত্রির চোখ দুটি ঐ তিন দেবতার দীপ্তিতে প্রতিহত হল। তিনি দুই চোখ বুজে একাগ্রভাবে তাঁদের প্রতি মনঃসংযোগ করে কৃতাঞ্জলিপুটে সুমধুর এবং গম্ভীর বাক্যে তাঁদের স্তব করতে লাগলেন। ১৭-২৫

অত্রি বললেন, হে শ্রেষ্ঠদেবত্রয়, কল্পে কল্পে বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের জন্য মায়ায় গুণবিভাগ করে অর্থাৎ সত্ত্ব, রজ ও তম—এ তিন ভাগে আপনারা ত্রিবিধ শরীর ধারণ করে থাকেন। আপনারাই সেই প্রসিদ্ধ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর। আমি আপনাদের প্রণাম করছি। কিন্তু আপনাদের এ তিনজনের মধ্যে একজনকে আমি সম্প্রতি উপাসনা করে এখানে আহ্বান করেছি। আপনাদের মধ্যে ঐ একজন কে, তা আপনারাই প্রকাশ করে বলুন। আমি প্রজাসৃষ্টির কামনায় নানা উপচারে আপনাদের মধ্যে ষড়ৈশ্বর্যময় একজনেরই আরাধনা করেছি। এখন জীবগণের মনেরও অগোচর আপনারা তিন জনেই কি জন্য উপস্থিত হলেন, বলুন। আমার

প্রতি আপনারা প্রসন্ন হোন। আপনাদের দেখে আমার খুবই আশ্চর্য লাগছে। ২৬-২৭

মৈত্রেয় বলেন, বিদুর, ঐ তিন দেবশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর মহর্ষি অত্রির কথা শুনে মৃদু হেসে মধুর বাক্যে তাঁকে বললেন, মুনিবর, তোমার সংকল্প অতি উত্তম। তা অবশ্যই সফল হবে। তুমি জগদীশ্বর বলে যে অদ্বিতীয় পরমতত্ত্বের ধ্যান করেছ, আমরা তিনজনই সেই একই পরমেশ্বর। আমাদের পরস্পর ভেদ নেই। মহর্ষি, তোমার মঙ্গল হোক। যেহেতু আমরা তিনজনই এক সঙ্গে এসেছি সেজন্য আমাদের তিন জনের অংশে তোমার তিন পুত্র হবে। ঐ পুত্রগণ সর্বলোকে বিখ্যাত হয়ে তোমার যশ বিস্তার করবে। ঐ তিন দেবশ্রেষ্ঠ অত্রিকে তাঁর অভীষ্ট বর দিলেন। তখন সেই দম্পতিও (অনসূয়া ও অত্রি) যথাবিধি তাঁদের পূজা করলেন। পূজাগ্রহণের পর তাঁরা মুনি ও মুনিপত্নীর সম্মুখেই অন্তর্হিত হলেন। ২৮-৩১

তারপর অত্রির পত্নী অনসূয়ার গর্ভে ব্রহ্মার অংশে সোম, বিষ্ণুর অংশে যোগশাস্ত্রবেত্তা দত্ত এবং মহেশ্বরের অংশে দুর্বাসা ঋষির জন্ম হয়। এখন আমি অঙ্গিরার বংশ বর্ণনা করছি, শোন। মহর্ষি অঙ্গিরার পত্নী শ্রদ্ধা চার কন্যা প্রসব করেন। তাঁদের নাম সিনীবালী, কুহূ, রাকা ও অনুমতি। পরে স্বারোচিষ মন্বন্তরে তাঁদের দুটি পুত্রও জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের একজনের নাম উতথ্য। তিনি ছিলেন সাক্ষাৎ ভগবানের অবতার। আর একজন শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মজ্ঞ বৃহস্পতি। উভয়েই সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন। ঋষিবর পুলস্ত্যের পত্নী হবির্ভূ। তাঁর গর্ভে অগস্ত্যের জন্ম হয়। ঐ অগস্ত্যই জন্মান্তরে জঠরাগ্নিরূপে উদ্ভূত হন। প্রজাপতি পুলস্ত্যের আর এক পুত্র ছিলেন মহাতপস্বী বিশ্রবা। ইলবিলানাম্নী পত্নীর গর্ভে বিশ্রবার এক পুত্রের জন্ম হয়; তিনি যক্ষপতি কুবের। বিশ্রবার আর এক পত্নী কেশিনীর গর্ভে রাবণ, কুম্ভকর্ণ ও বিভীষণ—এই তিন পুত্রের জন্ম হয়। পুলহের পত্নী গতি। সেই সাধ্বীর গর্ভে তিন পুত্র জন্মায়। এঁদের নাম কর্মশ্রেষ্ঠ, বরীয়ান্‌ ও সহিষ্ণু। মহর্ষি ক্রতুর পত্নীর নাম ক্রিয়া। তিনি ব্রহ্মতেজে দীপ্তিমান বালখিল্য নামক ষাট হাজার ঋষিকে প্রসব করেন। বশিষ্ঠের পত্নী উর্জার গর্ভে চিত্রকেতু প্রভৃতি সাত পুত্রের জন্ম হয়েছিল। তাঁরাই নির্মলস্বভাব সপ্তর্ষি-রূপে বিখ্যাত হন। বশিষ্ঠের ঐ সাত পুত্রের নাম চিত্রকেতু, সুরোচি, বিরজা, মিত্র, উল্বণ, বসুভৃদ্‌যান ও দ্যুমান। বশিষ্ঠের আর এক পত্নীর গর্ভে শক্তি প্রভৃতি আরও বহু পুত্রের জন্ম হয়েছিল। অথর্বা ঋষির ভার্যা চিত্তি তপোনিষ্ঠ দধীচি নামে এক পুত্র লাভ করেন। এঁর আর এক নাম অশ্বশিরা। এখন আমি মহর্ষি ভৃগুর বংশবর্ণনা করছি, শোন। মহাভাগ ভৃগুর পত্নী খ্যাতি ধাতা ও বিধাতা নামে দুই পুত্র এবং শ্রী নামে এক ভগবদ্‌ভক্তিপরায়ণা কন্যা লাভ করেন। মেরু ঋষি ধাতা ও বিধাতাকে নিজের দুই কন্যা আয়তি ও নিয়তিকে সম্প্রদান করেন। ঐ দুই কন্যার গর্ভে ধাতা ও বিধাতার মৃকণ্ড ও প্রাণ নামে দুই পুত্র জন্মে। মৃকণ্ডের পুত্র মার্কণ্ডেয় এবং প্রাণের পুত্র বেদশিরা মুনি। কবি নামে ভৃগুর আর এক পুত্র ছিল। কবির পুত্র ভগবান উশনা। বিদুর, এই সব মুনিরা সৃষ্টিকার্যে প্রবৃত্ত হয়ে বহু প্রজাবৃদ্ধি করেন। আমি তোমার কাছে প্রজাপতি কর্দমের দৌহিত্রবংশ বর্ণনা করলাম। বৎস, যে ব্যক্তি শ্রদ্ধার সঙ্গে এ-সকল বৃত্তান্ত শোনে তার সমস্ত পাপ অচিরে দূর হয়। ৩২-৪৫

ব্রহ্মার পুত্র দক্ষ প্রজাপতি মনুর কন্যা প্রসূতিকে বিবাহ করেন। প্রসূতির

গর্ভে দক্ষের ষোলটি সুনয়না কন্যার জন্ম হয়। মহাভাগ দক্ষ ঐ ষোলটি কন্যার মধ্যে তেরটি ধর্মকে, একটি অগ্নিকে, একটি সম্মিলিত পিতৃগণকে এবং অবশিষ্ট একটি সংসারবন্ধননাশন মহাদেবকে অর্পণ করেন। বিদুর, এখন তুমি এ-সকল কন্যার নাম শোন। শ্রদ্ধা, মৈত্রী, দয়া, শান্তি, তুষ্টি, পুষ্টি, ক্রিয়া, উন্নতি, বুদ্ধি, মেধা, তিতিক্ষা, হ্রী এবং মূর্তি—এই তেরটি ধর্মের পত্নী। এঁদের মধ্যে শ্রদ্ধা শুভ বা সত্যকে, মৈত্রী প্রসাদকে, দয়া অভয়কে, শান্তি সুখকে, তুষ্টি হর্ষকে, পুষ্টি গর্বকে, ক্রিয়া যোগকে, উন্নতি দর্পকে, বুদ্ধি অর্থকে, মেধা স্মৃতিকে তিতিক্ষা মঙ্গলকে এবং হ্রী (লজ্জা) বিনয়কে প্রসব করেন। আর সমস্ত গুণের জননী মূর্তি নর ও নারায়ণ নামে দুই ঋষিকে প্রসব করেন। ঐ দুই ঋষির জন্মগ্রহণে বিশ্বচরাচর নিরাপদ হয়ে আনন্দময় হয়ে উঠল। তখন সকল প্রাণীর মন, সকল দিক, বায়ু, নদী ও পর্বত প্রসন্ন হল। সে সময়ে স্বর্গে তূর্যধ্বনি হয় ও আকাশ থেকে পুষ্পবৃষ্টি হতে থাকে। তখন মুনিগণ আনন্দিত হয়ে স্তব করতে লাগলেন, গন্ধর্ব ও কিন্নরগণ আনন্দে গান করতে লাগল এবং দিব্যাঙ্গনাগণ উল্লাসে নৃত্য করতে লাগলেন। এ-ভাবে সর্বত্রই পরমানন্দের ঢেউ বইছিল। এমন কি ব্রহ্মাদি সকল দেবতা নানা স্তবস্তোত্র দ্বারা ঐ দুই বালকের পূজা করতে লাগলেন। দেবগণ বললেন, যে পরমাত্মাতে নিজের মায়া দ্বারা নিজেরই মত নির্মল, আকাশে গন্ধর্বলোকের মতই এই বিশ্ব রচিত হয়েছে, সেই আত্মার প্রকাশের জন্যই পরমপুরুষ ভগবান নারায়ণ ঋষি-মূর্তিরূপে নিজেকে প্রকাশিত করলেন। ঐ পরমপুরুষকে নমস্কার করি। শাস্ত্রবিচার বা সাধনার দ্বারা যাঁর মহিমা কিছুটা হৃদয়ঙ্গম হয় সেই সর্বসাক্ষী ভগবান এ-জগতের অধর্ম নিবারণের জন্য সত্ত্বগুণের দ্বারা আমাদের সৃষ্টি করেছেন। তাঁর নয়ন নির্মল পদ্মের অপেক্ষাও মনোহর। তিনি (ভগবান) সেই কৃপাকরুণ চোখে আমাদের দেখুন। এভাবে দেবগণ সেই নরনারায়ণের স্তব করলেন এবং তাঁদের দর্শন করে কৃতার্থ হলেন। এর পর দেবগণ তাঁদের পূজা করলে নর-নারায়ণ গন্ধমাদন পর্বতে চলে গেলেন। ভগবান শ্রীহরির অংশ ঐ নর-নারায়ণই পৃথিবীর ভার হরণের জন্য সম্প্রতি যদুকুলের শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণরূপে এবং কুরুকুলের শ্রেষ্ঠ অর্জুনরূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছেন। ৪৬-৫৮

এখন দক্ষের অপর তিন কন্যার নাম ও বংশের কথা বলা হচ্ছে। অগ্নির পত্নী স্বাহা পাবক, পবমান ও শুচি নামে তিন পুত্র প্রসব করেন। এঁরা তিনজনেই যজ্ঞীয় হুতভোজী দেবতা ছিলেন। এ তিনজন হতে পয়তাল্লিশটি অগ্নি উৎপন্ন হল। পিতা, পিতৃব্য ও পিতামহের সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে তারা মোট উনপঞ্চাশ অগ্নি হল। যজ্ঞে বৈদিক কর্ম সম্পাদন কালে ব্রহ্মজ্ঞ ঋষিগণ যাঁদের নাম নিয়ে অগ্নিদেবতাত্মক আহুতি প্রদান করেন, তাঁরাই এ সকল অগ্নি। বিদুর, অগ্নিষ্বাত্তা, বর্হিষদ, সৌম্য বা সোমপ ও আজ্যপ—এঁরা হলেন পিতৃগণ। এঁদের মধ্যে যাঁদের উদ্দেশ্যে অগ্নি হোম করা হয় তাঁরা সাগ্নিক, তা ছাড়া আর সকলেই নিরগ্নিক (অনগ্নি)। দক্ষকন্যা স্বধা এঁদের সকলেরই পত্নী। অগ্নিষ্বাত্তাদি পিতৃগণ দ্বারা স্বধাদেবী বয়ুনা ও ধারিণী নামে দুই কন্যা লাভ করেন। এঁরা দুজনেই বেদজ্ঞ ও সদসদ্‌-বিজ্ঞান-শালিনী হয়েছিলেন। মহাদেবের পত্নী দক্ষকন্যা সতী পতি মহাদেবের একান্ত অনুরক্তা হয়েও রূপে গুণে নিজের অনুরূপ পুত্রলাভ করেন নি। কারণ পিতা প্রজাপতি দক্ষ বিনা দোষে শঙ্করের নিন্দা করায় সতী ক্রোধের বশে যৌবনেই যোগ অবলম্বন করে দেহত্যাগ করেন। ৫৯-৬৫

দ্বিতীয় অধ্যায়

শিব ও দক্ষের বিদ্বেষের সূচনা

বিদুর বললেন, ভগবান্‌, প্রজাপতি দক্ষ কন্যার প্রতি স্নেহশীল ছিলেন। তবে কি কারণে তিনি কন্যা সতীকে অনাদর করলেন এবং সজ্জনদের শ্রেষ্ঠ মহাদেবের প্রতি বিদ্বেষ করলেন? মহাদেব চরাচর বিশ্বসংসারের গুরু, কারও সঙ্গে তাঁর শত্রুতা নেই। তিনি শান্তমূর্তি, আত্মারাম (আত্মাতেই যাঁর রতি অর্থাৎ আনন্দ) ও জগতের পরম পূজনীয় দেবতা। সেই ভবের প্রতি প্রজাপতি দক্ষ বৈরাচরণ করলেন কেন? জামাতা ও শ্বশুরের মধ্যে কি জন্য বিদ্বেষ ঘটেছিল যার ফলে সতী প্রাণত্যাগ করলেন, তা আমাকে বলুন। মৈত্রেয় বললেন, পূর্বকালে প্রজাপতি-গণের যজ্ঞে মহর্ষিগণ, দেবগণ, অনুচরদের সঙ্গে মুনিগণ এবং অগ্নিসকল একত্র সমবেত হয়েছিলেন। সে সময়ে প্রজাপতি দক্ষ তেজে সূর্যের ন্যায় দীপ্যমান হয়ে তাঁদের সভায় প্রবেশ করলেন। তাঁর অঙ্গপ্রভায় ঐ বিশাল সভার অন্ধকার দূর হল। ঋষি ও অগ্নিগণের সঙ্গে অন্য সকল সদস্য তাঁর তেজে অভিভূত হয়ে নিজ নিজ আসন থেকে উঠে দাঁড়ালেন, কেবল ব্রহ্মা ও শিব উঠলেন না। সভাবৃন্দ যোগৈশ্বর্যশালী দক্ষ প্রজাপতিকে যথাযোগ্য সম্মানের সঙ্গে অভ্যর্থনা করলে তিনি (দক্ষ) লোকগুরু ব্রহ্মাকে নমস্কার করে তাঁর অনুমতি নিয়ে আসন নিলেন। দক্ষের আসন গ্রহণের আগে পর্যন্ত শংকর নিজের আসনেই বসেছিলেন। শিবের এই অবহেলা সহ্য করতে না পেরে দক্ষ ক্রোধে প্রজ্বলিত চক্ষু দ্বারা যেন তাঁকে (শিবকে) দগ্ধ করতে করতেই বলতে লাগলেন, মহর্ষিগণ, দেবগণ, অগ্নিগণ, আমি সাধু-সজ্জনদের যথাযোগ্য আচরণের কথা বলছি; আপনারা আমার কথা শুনুন। আমি অজ্ঞান বা হিংসার বশে এ-সকল কথা বলছি না, যথার্থই বলছি। সভ্যগণ, এই শিব নির্লজ্জ; লোকপালদের কীর্তিনাশক, কারণ এ ব্যক্তি উচিত কাজ না করে সজ্জনদের চিরাচরিত আচার লঙ্ঘন করল। দেখুন, এই মর্কটলোচন শিব, ব্রাহ্মণ ও অগ্নি সাক্ষী করে আমার সাবিত্রীর তুল্য সুশীলা কন্যাকে বিবাহ করেছে। এজন্য এ আমার শিষ্যের তুল্য। অতএব এর উচিত ছিল আমাকে দেখে আসন ছেড়ে উঠে ও অভিবাদন জানিয়ে সম্মান দেখান। কিন্তু এ-মূঢ় মুখের একটি কথা দ্বারাও আমার প্রতি উচিত সম্মান দেখাল না। পরাধীন ব্রাহ্মণ যেমন শূদ্রকেও বেদবাক্য শিক্ষা দেয়, সেরূপ আমার ইচ্ছা না থাকলেও আমি ক্রিয়াকলাপ-বর্জিত, অশুচি, মান-অপমান বোধশূন্য শিবকে কন্যা সম্প্রদান করেছি। এ ব্যক্তি ভয়ংকর ভূতপ্রেত সঙ্গে নিয়ে উলঙ্গ হয়ে আলুলায়িতকেশে উন্মত্তের মত শ্মশানে শ্মশানে ঘুরে বেড়ায়। সে কখনও হাসে, কখনও কাঁদে। চিতাভস্মে এর স্নান, গলায় মৃতের মালা, মানুষের হাড় এর অলংকার। এর নাম শিব, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ অশিব (অমঙ্গল); এ সর্বদা মাদকদ্রব্য সেবনে মত্ত এবং উন্মত্ত জনেরাই এর প্রিয়। তমোগুণী প্রমথপতিদের ইনি অধ্যক্ষ। হায়! (বড় দুঃখের বিষয়) কেবল ব্রহ্মার বাক্যে বিশ্বাস করে আমি ভূতপ্রেতের অধিপতি, অপবিত্র ও দুষ্টস্বভাব শিবকে আমার সাধ্বী কন্যা সম্প্রদান করেছি। ১-১৬

মৈত্রেয় বললেন, বিদুর, শিব কিন্তু রুষ্ট হলেন না, শান্ত ও নির্বিকার ভাবে সভামধ্যে বসে থাকলেন। দক্ষ প্রজাপতি মহাদেবের নিন্দা করেই ক্ষান্ত হলেন না, তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে আচমন করে অভিশাপ দিতে প্রবৃত্ত হলেন। দক্ষ এই অভিশাপ দিলেন, দেবাধম এই শিব দেবতাদের যজ্ঞে ইন্দ্র, উপেন্দ্র প্রভৃতি দেবগণের

সঙ্গে যেন যজ্ঞভাগ না পায়। সভাস্থ প্রধান প্রধান সদস্যগণ নানা ভাবে নিষেধ করলেও দক্ষ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে শিবকে অভিশাপ দিয়ে সভা ছেড়ে চলে গেলেন। এদিকে মহাদেবের অনুচরগণের প্রধান নন্দীশ্বর দক্ষের ঐ শাপবাক্য শুনে ক্রোধে রক্তচক্ষু হয়ে দক্ষকে এবং যে সকল ব্রাহ্মণ ঐ শিবনিন্দার অনুমোদন করেছেন তাঁদের দারুণ অভিসম্পাত দিলেন। নন্দীশ্বর বললেন, ভগবান শিব কখনও কারো অনিষ্ট করেন না। কিন্তু যে ভেদদর্শী মূঢ় নিজের নশ্বর দেহকে শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করে মহাদেবের প্রতি অন্যায় আচরণ করবে, সে কখনও তত্ত্বজ্ঞান লাভ করতে পারবে না। বেদে যে সমস্ত অর্থবাদ আছে, তাতে আসক্ত হয়ে ঐ অজ্ঞ ব্যক্তির বুদ্ধি ভ্রষ্ট হয়েছে। অতএব সে অতি তুচ্ছ বিষয়সুখের অভিলাষে কূটধর্মযুক্ত ও প্রবঞ্চনাময় গৃহাশ্রমে আসক্ত হয়ে কর্মজালে আবদ্ধ হোক। দক্ষের বুদ্ধি দেহকে আত্মা বলে চিন্তা করে। ফলে সে আত্মতত্ত্ব বিস্মৃত হয়েছে। পশুতুল্য ঐ দক্ষ স্ত্রীকামী হোক এবং অচিরেই ছাগতুল্য মুখ লাভ করুক। আমি যে একে ছাগবদন হতে অভিশাপ দিয়েছি তা অন্যায় হয় নি। কর্মবহুল অবিদ্যা দ্বারা এর বুদ্ধি আচ্ছন্ন; অতএব এ-ব্যক্তি বাস্তবিকই ছাগ। আর যে সকল ব্রাহ্মণ শিবনিন্দুক দক্ষের কথার অনুমোদন করেছে, তারা বারংবার শরীর ধারণ করে সংসার-ক্লেশ ভোগ করুক। বেদোক্ত কর্মকাণ্ড অর্থবাদবহুল, পুষ্পের ন্যায় আপাত-মনোহর।[1] ঐ সকল শ্রুতিবাক্যের মধুগন্ধে মুগ্ধ হয়ে শিববিরোধী এ সকল ব্রাহ্মণ বিবেক-জ্ঞানশূন্য হোক, যথেচ্ছাহারী হোক। জীবিকার জন্য এরা বিদ্যা, তপস্যা ও ব্রত আচরণ করুক, এরা বিত্ত, দেহ ও ইন্দ্রিয়সুখে আসক্ত হোক এবং যাচকবেশে এ-পৃথিবীতে বিচরণ করুক। ১৭-২৬

নন্দীশ্বর ব্রাহ্মণদের এই অভিশাপ দিলে ভৃগুমুনি ব্রহ্মদণ্ডরূপ কঠোর অভিশাপ দিলেন। তিনি বললেন, যারা শিবের ব্রতধারী এবং যারা শিবভক্তদের অনুসরণ করে, তাঁরা শাস্ত্রবিরোধী ও পাষণ্ড হোক। ঐ সকল লোক অশুচি ও বুদ্ধিভ্রষ্ট। এরা জটা, ভস্ম, অস্থি প্রভৃতি ধারণ করে শৈবধর্মে প্রবিষ্ট হোক, যাতে গৌড়ী, মাধ্বী, পৈষ্টী প্রভৃতি সুরা এবং আসব তাদের কাছে দেবতার ন্যায় আদরণীয় হয়। তোমরা শিবভক্তরা বর্ণাশ্রমী আচারবিশিষ্ট ব্যক্তিদের ধারক বেদ ও বেদপ্রবর্তক ব্রাহ্মণ-গণকে অকারণে নিন্দা করছ। এ জন্য তোমরা পাষণ্ডের আশ্রিত হবে। প্রাচীন ঋষিগণ যে বেদকে অবলম্বন করেছেন এবং ভগবান নারায়ণ যে বেদের মূলস্বরূপ, সে বেদই জীবের চিরন্তন মঙ্গলময় পথ। তোমরা পরম পবিত্র, সাধুজনের অবলম্বন, সনাতন বেদের নিন্দা করেছ। অতএব, যেখানে তামস ভূতগণের অধিপতি তোমাদের প্রভু বাস করেন সেখানে গিয়ে পাষণ্ড দেবতাকে লাভ কর। ২৭-৩২

মৈত্রেয় বললেন, বিদুর, মহর্ষি ভৃগু এরূপ অভিশাপ দিতে থাকলে ভগবান শংকর পরস্পর শাপে উভয় পক্ষের বিনাশ আশংকা করে কিছুটা যেন ক্ষুণ্ণ হয়েই অনুচরগণের সঙ্গে সে স্থান ত্যাগ করলেন। তারপর সেই প্রজাপতি ঋষিগণও সর্বশ্রেষ্ঠ ভগবান শ্রীহরির উপলক্ষে সহস্র বৎসরব্যাপী যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমস্থলে (অর্থাৎ প্রয়াগধামে) যজ্ঞান্ত স্নান করলেন, এবং নির্মলচিত্তে নিজ নিজ গৃহে ফিরে গেলেন। ৩৩-৩৫

১ দ্রষ্টব্য : যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং (গীতা ২।৪২)।

তৃতীয় অধ্যায়

সতীর দক্ষালয়ে গমন-প্রার্থনা

মৈত্রেয় বললেন, এরূপে সর্বদা পরস্পর বিদ্বেষ করতে করতে শ্বশুর দক্ষ ও জামাতা শিবের বহুদিন কেটে গেল। তারপর পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা যখন দক্ষকে সকল প্রজাপতির অধিপতি ঘোষণা করলেন, তখন তাঁর (দক্ষের) অত্যন্ত অহংকার হল। গর্বশত দক্ষ শিবপক্ষীয় ব্রহ্মজ্ঞ দেবগণকে অগ্রাহ্য করে 'বাজপেয়' নামে যজ্ঞ সম্পন্ন করে সর্বশ্রেষ্ঠ 'বৃহস্পতিসব' নামক যজ্ঞ আরম্ভ করলেন। ঐ যজ্ঞে তিনি সমস্ত ব্রহ্মর্ষি, দেবর্ষি, পিতৃগণ ও দেবগণকে পূজা করলেন। তাঁদের পত্নীরাও নিজ নিজ পতিদের সঙ্গে যথাযোগ্য সম্মান লাভ করলেন। আকাশচারীরা যখন আকাশে বিচরণ করতে করতে ঐসব বিষয়ে আলোচনা করছিল তখন দাক্ষায়ণী সতী তাদের মুখে পিতার যজ্ঞ মহোৎসবের কথা শুনতে পেলেন। তিনি নিজেও দেখলেন যে নানাদিক থেকে গন্ধর্বমহিলারা নিজ নিজ পতির সঙ্গে বিমানে আরোহণ করে যাচ্ছেন। ঐ বরাঙ্গনাদের কণ্ঠে সোনার হার, পরিধানে সুন্দর বস্ত্র, নেত্রদ্বয় চঞ্চল, কর্ণে সমুজ্জ্বল কুণ্ডল। তাঁদের দেখে সতীর পিতার যজ্ঞোৎসব দেখার জন্য খুবই আগ্রহ হল। তিনি তখন পতি ভূতপতি ভগবান শিবকে বললেন, প্রভু মহাদেব, সম্প্রতি আপনার শ্বশুর প্রজাপতি দক্ষের যজ্ঞমহোৎসব আরম্ভ হয়েছে। যদি আপনার ইচ্ছা হয়, তবে চলুন, আমরাও সেখানে যাই ঐ দেখুন দেবতারা যাচ্ছেন। আমার ভগিনীগণ নিশ্চয়ই আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য তাঁদের স্বামীদের সঙ্গে আসবেন। আপনার সঙ্গে উপস্থিত হয়ে আমিও তাঁদের মত মাতা-পিতার প্রদত্ত বসনভূষণাদি গ্রহণ করতে চাই। শংকর, বহুদিন ধরে আত্মীয়-স্বজনদের দেখার জন্য আমি বড় উৎকণ্ঠিত। সেই যজ্ঞস্থলে ভগ্নীপতিদের সঙ্গে আমার ভগিনীদের, মাতৃস্বসাদের এবং আমার স্নেহময়ী জননীর দেখা পাব। আর মহর্ষিগণ পিতার ঐ যজ্ঞে যে যজ্ঞীয় ধ্বজা উত্তোলন করেছেন আমি তাও দেখব। হে অজ, এই আশ্চর্যজনক ত্রিগুণাত্মক বিশ্বসংসার আপনার নিজ মায়াদ্বারা বিরচিত হয়েছে (সুতরাং যজ্ঞদর্শনের জন্য আপনার কোন কৌতূহল না থাকতে পারে)। কিন্তু আমি স্ত্রীজাতি, আপনার তত্ত্ব আমি জানি না। আমার জন্মস্থান দেখার জন্য আমি বড় কাতর হয়েছি। হে মৃত্যুঞ্জয়, আত্মীয়-স্বজনদের দর্শনের জন্য আপনার ইচ্ছা না থাকতে পারে। কিন্তু আমাদের সঙ্গে যাঁদের কোন সম্বন্ধ নেই, তেমন স্ত্রীলোকেরাও নিজেদের স্বামীদের সঙ্গে বসন-ভূষণে সুসজ্জিত হয়ে দলে দলে আমার পিতার যজ্ঞস্থলে যাচ্ছেন। দেখুন, তাঁদের কলহংসের মত শুভ্র বিমানশ্রেণীতে আকাশ কি সুন্দর শোভা ধারণ করেছে। অন্যের প্রতি কৃপাবশত আপনি বিষও খেয়েছিলেন। তাই আপনি অনুগ্রহ করে আমাকে পিতৃযজ্ঞে যাবার অনুমতি দিন। হে সুরশ্রেষ্ঠ, পিতার গৃহে উৎসবের কথা শুনে সেখানে যাওয়ার জন্য কন্যা কি বিচলিত না হয়ে পারে? বন্ধুর গৃহে, স্বামীর গৃহে, গুরু ও জন্মদাতা পিতার গৃহে অনাহূত হয়েও যাওয়া যায়। মৃত্যুঞ্জয়, আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হোন এবং আমার এ-বাসনা পূর্ণ করুন। আপনি পরমজ্ঞানী হয়েও কৃপা করে আমাকে আপনার অর্ধাঙ্গিনী করেছেন। আমি মিনতি করছি অনুগ্রহ করে আমার প্রার্থনা পূর্ণ করুন। ১-১৪

মৈত্রেয় ঋষি বললেন, বিদুর, প্রিয়তমা সতী এরূপ বললে স্বজনবৎসল ভগবান শংকর ঈষৎ হাসলেন, এবং প্রজাপতিগণের সমক্ষে দক্ষ যে সকল মর্মভেদী কটুবাক্য

বলেছিলেন তা স্মরণ করে সতীকে বললেন, সুন্দরী, তুমি যে বললে আহূত না হয়েও বন্ধু ও গুরুজনের গৃহে যাওয়া যায়, তা তখনই হতে পারে যখন ঐ বন্ধুগণ দেহাদির বিষয়ে গর্বিত হয় না এবং ক্রোধবশত অযথা বন্ধুদের দোষ দেখে না। (যদি বল বিদ্যাদিগুণযুক্ত দক্ষ কেন এরূপ আচরণ করলেন ? তার উত্তরে বলছি) বিদ্যা, তপস্যা, বিত্ত, সুন্দর দেহ, নবীন বয়স ও উচ্চবংশ, এই ছয়টি সজ্জনেরই গুণ। কিন্তু এ সকল গুণই আবার অসাধু পুরুষদের বেলায় বিপরীত ফল দেয় অর্থাৎ দোষে পরিণত হয়। এ গুলিতে অসাধু ব্যক্তিদের অভিমান বৃদ্ধি পায় আর তাদের বিবেকবুদ্ধি বিনষ্ট হয়। এইসব ভ্রষ্টবুদ্ধি লোক দম্ভে মোহগ্রস্ত হয়ে মহতের মাহাত্ম্য কিছুই দেখতে পায় না। অতএব আত্মীয়জ্ঞানে এরূপ অব্যবস্থিতচিত্ত অসাধু লোকদের গৃহের প্রতি দৃক্‌পাত করাও উচিত নয়। কুটিলবুদ্ধি, আত্মীয়জনের কটুবাক্যে মর্মাহত হয়ে দিবারাত্র যেরূপ মানসিক দুঃখযন্ত্রণা ভোগ করতে হয়, শত্রু-দের তীক্ষ্ণ বাণে শরীর ক্ষতবিক্ষত হলেও ততটা কষ্ট হয় না। অতি মর্যাদাসম্পন্ন প্রজাপতি দক্ষের কন্যাদের মধ্যে তুমি সর্বাপেক্ষা আদরের, একথা আমার বিশেষভাবে জানা আছে। তবুও আমার সঙ্গে সম্বন্ধ আছে বলে তুমি পিতার নিকট সম্মান পাবে না, কারণ তিনি আমার আশ্রিতের প্রতিও ক্রুদ্ধ। নিরহংকার ব্যক্তিদের সমৃদ্ধি দেখে দক্ষের অন্তঃকরণ দগ্ধ হয়, তিনি বিকলেন্দ্রিয় হয়ে পড়েন। ঐ সকল নিরহংকার সর্বজ্ঞদের পুণ্যলব্ধ পরম পদলাভে অসমর্থ হয়ে অসুরগণ যেমন শ্রীহরির প্রতি দ্বেষ করে, তিনিও তেমনি আমার প্রতি বিদ্বেষমূলক আচরণ করেন। সুন্দরী, লোকে পরস্পর যে প্রত্যুত্থান, বিশ্বাস, নম্রভাব ও নমস্কারাদি করে, সেটি পবিত্র কাজ আমি স্বীকার করি। কিন্তু পণ্ডিতগণ ঐ নমস্কারাদি মানসিক দৃষ্টিতে সর্বান্তর্যামী আদিপুরুষ ভগবান বাসুদেবের উদ্দেশ্যেই করেন, দেহাভিমানী পুরুষের প্রতি করেন না। আমিও শুদ্ধদৃষ্টিতে মনে মনে বাসুদেবের উদ্দেশ্যে প্রত্যুত্থানাদি করেছি, এবং তাতেই প্রজাপতি দক্ষের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান করা হয়েছে তাঁকে আমি অবজ্ঞা করি নি। বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণের নাম বসুদেব। সেই নির্মল সত্ত্বগুণে যিনি নির্বিকারভাবে প্রকাশিত হন, তিনিই ভগবান আনন্দময় বাসুদেব বলে কথিত হন। আমি সর্বদা সত্ত্বস্বরূপ ইন্দ্রিয়ের অগোচর ভগবান বাসুদেবকে নমস্কারপূর্বক অর্চনা করি, বাহ্যিক দেহাভিমানীকে করি না। দেবী, বিশ্বস্রষ্টা প্রজাপতিগণের যজ্ঞস্থলে আমাকে যিনি বিনা অপরাধে কটুবাক্যে তিরস্কার করেছেন সেই দক্ষ আমার বিপক্ষ। তিনি তোমার জন্মদাতা পিতা হলেও তাঁর এবং তাঁর অনুগামীদের মুখদর্শন করাও তোমার উচিত নয়। যদি আমার কথা অগ্রাহ্য করে তুমি যাও, তবে তোমার মঙ্গল হবে না। সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি যদি স্বজনের কাছে অপমানিত হন তবে তা সদা তাঁর মৃত্যুর কারণ হয়ে থাকে। ১৫-২৫

চতুর্থ অধ্যায়

সতীর দেহত্যাগ

মৈত্রেয় বললেন, ভগবান শংকর একথা বলে নীরব হলেন। কিন্তু তাঁর মনে এরূপ চিন্তা হল যে পত্নীকে পিত্রালয়ে যাওয়ার অনুমতি দেন বা না দেন—দুদিকেই সতীর শরীরনাশের সম্ভাবনা রয়েছে। এদিকে সতীও আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে দেখা করার জন্য ব্যাকুল হয়ে আবার মহাদেবের ভয়ে ভীত হয়ে একবার ঘরের বাইরে আসেন,

আবার ঘরে প্রবেশ করেন। যাবেন কি থাকবেন এই চিন্তায় তিনি দ্বিধাগ্রস্ত হলেন। আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে দেখা করার সম্ভাবনা ব্যাহত হওয়ায় তিনি খুব আঘাত পেলেন। স্নেহবশত তার চোখে জল এল, তিনি কাঁদতে লাগলেন। অবিরল অশ্রুপাতে তিনি বিহ্বল হয়ে পড়লেন। আবার সঙ্গে সঙ্গে ক্রোধে তাঁর সর্বাঙ্গ কাঁপতে লাগল। মহাদেবকে যেন ভস্মসাৎ করে ফেলবেন, এরূপভাবে সতী তাঁর প্রতি তীব্র দৃষ্টিপাত করলেন। ইচ্ছা পূর্ণ করতে না পারায় শোকে ও ক্রোধে অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে সতী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলতে লাগলেন। তারপর স্ত্রী-স্বভাববশত তাঁর বুদ্ধি এতটা বিমূঢ় হয়ে পড়ল যে, যে শংকর সজ্জনগণের প্রিয়, যিনি গভীর প্রীতিবশত তাঁকে অর্ধাঙ্গিনী করেছেন, তাঁকে ফেলে স্বেচ্ছায় পিতৃগৃহে যাত্রা করলেন। সতী একাই দ্রুতবেগে চলতে থাকলে যক্ষাদির সঙ্গে মণিমান, মদ প্রভৃতি শিবের সহস্র সহস্র অনুচর বৃষরাজকে অগ্রে নিয়ে নিঃশঙ্কচিত্তে তাঁকে অনুসরণ করল। তারপর তারা দেবীর নিকটে উপস্থিত হয়ে তাঁকে ঐ বৃষরাজের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়ে সারিকা, কন্দুক, দর্পণ ও পদ্ম প্রভৃতি ক্রীড়ার উপকরণ, শ্বেতচ্ছত্র, ব্যজন ও মাল্যাদি রাজ পরিচ্ছদ এবং শঙ্খ, বেণু, দুন্দুভি প্রভৃতি বাদ্যোচিত দ্রব্যসামগ্রী দ্বারা সুসজ্জিত করে চলতে লাগল। পিত্রালয়ে উপস্থিত হয়ে সতী যজ্ঞস্থলে প্রবেশ করে দেখলেন যে চারিদিকে বেদপাঠের ধ্বনির সঙ্গে যজ্ঞীয় পশুবধের কোলাহল মিশ্রিত হয়ে যজ্ঞস্থল মুখরিত। ব্রহ্মর্ষিগণ ও দেবগণ সকলেই সেখানে উপস্থিত হয়েছেন যজ্ঞস্থলে মৃত্তিকা, কাষ্ঠ, লৌহ, স্বর্ণ, কুশ ও চর্ম নির্মিত নানাবিধ যজ্ঞীয় পাত্র সাজান রয়েছে। ১-৬

তারপর সতী সভামণ্ডপে গেলেন। কিন্তু দক্ষ তাঁকে আদর না করায় তাঁর ভয়ে জননী ও ভগ্নীগণ ছাড়া আর কোন ব্যক্তিই সতীকে সমাদর করলেন না। তাঁর মা ও বোনেরা প্রেমাশ্রুপাতে রুদ্ধকণ্ঠ হয়ে সাদরে তাঁকে আলিঙ্গন করলেন। কিন্তু পিতা কোনরূপ আদর না করায় সতী বোনদের প্রীতিপূর্ণ বাক্য ও কুশল-প্রশ্নাদির কোন উত্তর দিলেন না। মা ও মাসীরা সস্নেহে সমাদর দেখিয়ে যেসকল উৎকৃষ্ট আসন ও অলংকার দিলেন সেগুলিও তিনি গ্রহণ করলেন না। পরমেশ্বরী সতী দেখলেন—যজ্ঞে মহাদেবের কেন ভাগ নেই, পিতা দেবাদিদেব মহাদেবকে অবজ্ঞা করেছেন। যজ্ঞসভায় তিনি নিজেও অপমানিতা হয়েছেন। তখন তাঁর এমন ক্রোধ হল যে মনে হল তিনি যেন ক্রোধাগ্নিতে সমগ্র বিশ্ব দগ্ধ করে ফেলবেন। সে সময় ক্রুদ্ধা দেবীর তেজে দক্ষের বিনাশের জন্য কতগুলি ভূত-প্রেত সমুত্থিত হল। দেবী তাদের নিবারণ করে জগদ্বাসী সকলকে শুনিয়ে ক্রুদ্ধবাক্যে কর্মমার্গে আসক্ত ও গর্বিত শিববিদ্বেষী দক্ষের নিন্দা করতে লাগলেন। তিনি বললেন, পিতা, যিনি সকল প্রাণীর প্রিয়তম আত্মস্বরূপ, বিশ্বে যিনি সকলের প্রতি সমভাবাপন্ন, ইহলোকে যাঁর অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কেউ নেই, যিনি সকল জীবের জীবনস্বরূপ, কারও সঙ্গে যাঁর বিরোধ নেই, সেই শিবের প্রতি তুমি ভিন্ন আর কে প্রতিকূল আচরণ করতে পারে? সাধু লোকেরা পরের দোষকেও গুণে পরিণত করেন। কিন্তু তোমার মত অসাধু লোকেরা অন্যের বহুগুণ থাকলেও সে গুণগুলি বাদ দিয়ে কেবল দোষই দেখে। আর মহত্তম ব্যক্তিগণ অন্যের দোষ থাকলেও তার বিচার না করে অল্পমাত্র গুণেরও খুব বেশী প্রশংসা করেন। তুমি সেই মহাত্মাদের প্রতি দোষারোপ করলে? যে সকল মূর্খ জড় দেহকেই আত্মা বলে বিবেচনা করে, সে সকল অসাধু ব্যক্তিরা সর্বদাই মহাজনের নিন্দা করবে, এ আর আশ্চর্যের কি! যখন মহাপুরুষদের পদধূলিতেই দুর্জনদের তেজ নষ্ট হয়ে যায়, তখন তাদের সেই ঈর্ষাযুক্ত ভাবই শোভা পায়। ৭-১৩

সর্বকালপ্রসিদ্ধ 'শিব' এই দুই অক্ষরের নামটি প্রসঙ্গক্রমেও কেউ বাক্যে উচ্চারণ করলে তৎক্ষণাৎ তার সকল পাপ বিনষ্ট হয়ে যায়। তাঁর শাসন লঙ্ঘন করা যায় না হায়! তুমি স্বয়ং অমঙ্গলস্বরূপ হয়ে সেই পরমপবিত্র শিবের বিরুদ্ধাচরণ করছ। মহাজনদের মনরূপ ভ্রমর ব্রহ্মানন্দরূপ মধুপানে অভিলাষী হয়ে নিরন্তর যাঁর পাদপদ্ম সেবা করে এবং যাঁর পাদপদ্ম থেকে সকাম ব্যক্তিরা প্রার্থিত আশীর্বাদ লাভ করে, তুমি সেই বিশ্ববন্ধু শিবের বিরুদ্ধাচরণ করছ। যিনি জটাজাল বিস্তার করে শ্মশানের মালা, ভস্ম, মানুষের মাথার খুলি ধারণ করে পিশাচদের সঙ্গে শ্মশানে বাস করেন, সেই শিব যে অমঙ্গলবাহক, তুমি ছাড়া অন্য কোন দেবই তা জানেন না। তাঁরা বরং শিবের পাদোদক সাদরে নিজেদের মস্তকে ধারণ করেন। উন্মার্গগামী লোক ধর্মরক্ষক স্বামীর নিন্দা করলে সাধবী স্ত্রী যদি তার প্রতিকার করতে না পারে তবে দুই কান বন্ধ করে তার স্থান ত্যাগ করা উচিত। আর যদি শক্তি থাকে, তবে নিন্দুকের কুবাক্য উচ্চারণকারী জিভ কেটে নিজেও প্রাণত্যাগ করবে, এটাই পতিব্রতার ধর্ম। তুমি ভগবান শিবের নিন্দাকারী। সেজন্য তোমার দেহ থেকে উদ্ভূত আমার এই দেহ আর ধারণ করব না। কারণ অজ্ঞানবশত অখাদ্য খেলে বমি করে তা ফেলে দেওয়াই বিধেয়। আত্মাতেই যিনি রমণ করে পরিতৃপ্ত, যিনি সম্যক নিরাসক্ত পুরুষ, তিনি কখনও বেদের বিধিনিষেধের পক্ষপাতী নন। দেব ও মানুষের যেমন পৃথকগতি সেরূপ প্রবৃত্তি-মার্গ ও নিবৃত্তিমার্গের গতিও পৃথক। যাঁর যে ধর্ম তিনি তাতেই অবস্থান করবেন। স্বধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তি অন্য পুরুষ বা ধর্মের নিন্দা করবেন না। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি—এই দুপ্রকার কর্মই সত্য, কারণ অধিকারী ভেদে বিচারপূর্বক বেদে উভয় প্রকার কর্মই বিহিত হয়েছে। কিন্তু পরস্পর-বিরোধী বলে ঐ দুপ্রকার কর্ম একই কালে এক কর্তাতে থাকতে পারে না। আবার. পরমব্রহ্মস্বরূপ ভগবান শংকরে ঐ দ্বিবিধ কর্ম সম্ভব নয়, তিনি কর্মশূন্য ও আত্মারাম। পিতা, তুমি শিবকে দরিদ্র মনে করে ঘৃণা করলে। কিন্তু আমাদের যে সকল অণিমাদি ঐশ্বর্য আছে, তা তোমাদের নাই। তোমাদের সম্পদ যজ্ঞশালাতেই আবদ্ধ। ধূম্রপথ অর্থাৎ কাম্যকর্মের পথাশ্রিত ব্যক্তিগণই সে সম্পদ ভোগ করে এবং যজ্ঞের অন্নে পরিতৃপ্ত মানুষেরাই তার প্রশংসা করে থাকে। কিন্তু আমাদের ঐশ্বর্য সেরকম নয়। তা ইচ্ছামাত্রই উৎপন্ন হয়, তার কারণ অব্যক্ত। নিষ্কাম ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিগণই সেরূপ ঐশ্বর্য ভোগ করেন। তুমি ভগবান ভবের নিকট অপরাধী। তোমার দেহ থেকে উৎপন্ন এ কুৎসিত দেহের আর আমার প্রয়োজন নেই। তোমার মত নিকৃষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্কবশত আমি বড়ই লজ্জা বোধ করছি। যে ব্যক্তি মহতের অপ্রিয়কারী, তার দেহ হতে জন্মগ্রহণ করাকে আমি কলঙ্কজনক মনে করি। ভগবান বৃষধ্বজ শংকর যখন পরিহাসচ্ছলে আমাকে দাক্ষায়ণী বলে সম্বোধন করেন, তখন তোমার নাম শুনে আমার পরিহাসের হাসি দূর হয়ে যায়; আমি তখন অত্যন্ত দুঃখ অনুভব করি। অতএব তোমার অঙ্গ হতে উৎপন্ন মৃতদেহের তুল্য ঘৃণিত আমার দেহ নিশ্চয়ই আমি ত্যাগ করব। ১৪-২৩

মৈত্রেয় বললেন, বিদুর, সতী যজ্ঞসভাস্থলে পিতা দক্ষকে এভাবে নিন্দা করে নীরব হলেন এবং উত্তরমুখী হয়ে মাটিতেই বসলেন। তারপর তিনি পীতবস্ত্রে শরীর আবৃত করে আচমনপূর্বক নিমীলিত চক্ষে যোগপথ অবলম্বন করলেন। সর্বলোকের প্রশংসাভাজন সতী স্থিরভাবে উপবেশন করে প্রাণ ও অপান বায়ুকে নিরোধ করে নাভিচক্রে সমান (মিলিত) করলেন। তারপর তিনি নাভিচক্র থেকে উদান বায়ুকে অল্পে অল্পে উত্তোলন করে বুদ্ধির সঙ্গে হৃদয়ে স্থাপন করলেন। এর পর হৃদয়স্থিত ঐ বায়ুসমূহকে কণ্ঠনালী পথে ভ্রূযুগলের মধ্যস্থলে নিয়ে গেলেন।

মনস্বিনী জিতেন্দ্রিয় ভবানীর যে দেহ মহৎ লোকদেরও পূজ্য মহাদেব পরম সমাদরে বারংবার ক্রোড়ে স্থাপন করতেন, পিতা দক্ষের প্রতি ক্রোধবশত তিনি সেই দেহ পরিত্যাগের বাসনায় সর্বাঙ্গে বায়ু ও অগ্নির ধারণা করলেন। তারপর সতী জগদ্‌গুরু নিজ পতি শঙ্করের পাদপদ্ম চিন্তা করতে করতে মধুর আনন্দ অনুভব করতে লাগলেন। তখন আর অন্য কোন কিছুই তাঁর দৃষ্টিগোচর হল না। দক্ষকন্যা বলে তাঁর যে অভিমান ছিল, তা বিনষ্ট হয়ে গেল এবং সমাধি হতে উৎপন্ন অগ্নিতে ঐ নিষ্পাপ দেহ তৎক্ষণাৎ প্রজ্বলিত হয়ে উঠল। ২৪-২৮

তখন সেই অত্যাশ্চর্য ব্যাপার দেখে স্বর্গে ও মর্ত্যে সকলে উচ্চস্বরে হাহাকার করে উঠল। সকলে দুঃখ করে বলতে লাগল, হায়! হায়! দেবদেব মহাদেবের প্রিয়তমা পত্নী সতী দক্ষ কর্তৃক অপমানিতা হয়ে রোষে প্রাণ বিসর্জন দিলেন। হায়! হায়! দক্ষ প্রজাপতি, এ বিশ্ব-চরাচর সকলই তাঁর প্রজা, সকলের প্রতিই তাঁর স্নেহ থাকা উচিত। অথচ তাঁর কি নিষ্ঠুরতা, কি দুর্জনতা! দেখ সতী তাঁরই কন্যা। সেই মনস্বিনী সর্বত্রই সম্মানলাভের যোগ্যা; অথচ দক্ষ তাঁর অপমান করলেন। সে দুঃখেই দেবী ভবানী প্রাণত্যাগ করলেন। শিব-বিদ্বেষী দক্ষ অতি কঠিনহৃদয় ও ব্রহ্মদ্রোহী। এ ব্যক্তি ইহলোকে লোকসমাজে অসৎ কীর্তি ও পরলোকে নরক ভোগ করবে। কারণ অপমানিতা হয়ে তাঁর কন্যা দেহত্যাগ করতে উদ্যত হয়েছেন দেখেও তিনি তাঁকে বারণ করলেন না। সতীর এরূপ অদ্ভুত দেহত্যাগ দেখে লোকে যখন এসকল কথা বলতে লাগল, তখন সতীর অনুচরগণ অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে দক্ষকে হত্যা করতে উদ্যত হল। শিবানুচর ভূতপ্রেতগণ দ্রুতবেগে এগিয়ে আসছে শুনে ভৃগুমুনি যজ্ঞবিনাশক প্রেতগণকে বিনাশ করবার জন্য যজুর্বেদীয় মন্ত্রে দক্ষিণাগ্নিতে আহুতি দিলেন। ভৃগুমুনি অধ্বর্যু ছিলেন। তিনি আহুতি দেওয়ামাত্র তপস্যাদ্বারা সোমত্ব-প্রাপ্ত ঋভু নামক দেবগণ সহস্র সহস্র সংখ্যায় যজ্ঞকুণ্ড হতে সবেগে উত্থিত হলেন। ব্রহ্মতেজে দীপ্যমান এবং জ্বলন্ত কাষ্ঠরূপ অস্ত্রধারী সেই ঋভুগণ সতীর অনুচর গুহ্যক ও প্রমথগণকে আঘাত করতে থাকলে তারা চারদিকে পলায়ন করল। ২৯-৩৪

পঞ্চম অধ্যায়

বীরভদ্রের দক্ষবধ

মৈত্রেয় বললেন, বিদুর, ভগবান শংকর যখন শুনলেন যে দক্ষের অপমানে ভবানী দেহত্যাগ করেছেন এবং দক্ষের যজ্ঞ থেকে উৎপন্ন ঋভুগণ নিজ পার্ষদগণকে (শিবানুচর প্রমথগণকে) বিতাড়িত করেছে, তখন তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। ধূর্জটি দারুণ ক্রোধে ওষ্ঠ দংশন করতে লাগলেন। তারপর বিদ্যুৎ ও অগ্নিশিখার মত তীব্র দীপ্তিসম্পন্ন একটি জটা নিজের মাথা থেকে টেনে বের করে গম্ভীর কণ্ঠে অট্টহাস্য করে তা মাটিতে ছুঁড়ে ফেললেন। ঐ জটা থেকে মহাকায় বীরভদ্রের উৎপত্তি হল। তাঁর বিশাল শরীর স্বর্গলোক স্পর্শ করল। মেঘের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ ঐ বীরভদ্রের সহস্র বাহু ও সূর্যের ন্যায় প্রখর তেজঃসম্পন্ন তিনটি চোখ ছিল; আর ছিল করাল দন্তরাজি, জ্বলন্ত অগ্নির মত কেশকলাপ। তাঁর গলায় নরকঙ্কালের মালা এবং হস্তে উদ্যত বিবিধ অস্ত্রশস্ত্র। বীরভদ্র কৃতাঞ্জলিপুটে বললেন, প্রভু,

আমি কি করব, আদেশ করুন। ভগবান ভূতনাথ বললেন, বীরভদ্র, তুমি আমার অংশে উৎপন্ন হয়েছ, তোমাকে কেহ পরাজিত করতে পারবে না। তুমি আমার সৈন্যদের অগ্রণী হয়ে যজ্ঞের সঙ্গে দক্ষকে বিনষ্ট কর। বিদুর, ক্রুদ্ধ রুদ্রদেব দক্ষ বধের আদেশ দিলে বীরভদ্র দেবদেব মহাদেবকে প্রদক্ষিণ করলেন। তখন তাঁর মধ্যে এক অপ্রতিহত বেগের সঞ্চার হল। তিনি (বীরভদ্র) নিজকে মহাবীরগণেরও বল সহ্য করতে সমর্থ বলে মনে করলেন। তারপর সেই বীরভদ্র জগৎবিনাশক যমেরও যমস্বরূপ ত্রিশূল ধারণ করে ভীষণ রবে গর্জন করতে করতে তীব্র বেগে ছুটে চললেন। প্রচণ্ড গতির বেগে তাঁর চরণযুগলের নূপুরাদি অলঙ্কারের উচ্চধ্বনি উঠল। সে সময়ে রুদ্রের অনুচরগণও প্রচণ্ড শব্দ করতে করতে তাঁর (বীরভদ্রের) পিছনে ছুটতে লাগল। এদিকে উত্তর আকাশে ধূলিরাশি উড়তে দেখে দক্ষের সভাস্থ ঋত্বিক, যজমান ও পণ্ডিতগণ এবং অন্যান্য ব্রাহ্মণপত্নীরাও সবিস্ময়ে চিন্তা করতে লাগলেন, এই অন্ধকার-করা ধূলোর রাশি কোথা থেকে আসছে? সভাস্থিত সকলের মনে এরূপ সংশয় উপস্থিত হল—এখন তো বায়ু প্রবলবেগে বইছে না। প্রবল পরাক্রান্ত রাজা প্রাচীনবর্হি জীবিত আছেন, তাই দস্যুদলের উপদ্রব নেই, কেউ গাভীদের তাড়িয়ে নিয়ে আসছে না, তবে এ-ধূলি কোথা হতে আসছে? তবে কি জগতের প্রলয় উপস্থিত হয়েছে? দক্ষের পত্নী প্রসূতির সঙ্গে অপরাপর মহিলারা উদ্বিগ্নচিত্তে বলতে লাগলেন, আমাদের মনে হয় দক্ষ প্রজাপতি অন্যান্য কন্যাদের সামনেই নিরপরাধী সতীকে যে অপমান করেছেন, এ তার সে পাপেরই ফল। প্রলয়কালে রুদ্র জটাজাল বিস্তার করে নিজের ত্রিশূলের অগ্রভাগে দিগ্‌গজগণকে বিদ্ধ করে অত্যুচ্চ অট্টহাস্যরূপ মেঘগর্জনে সকল দিক মুখরিত করেন এবং উদ্যত অস্ত্রশস্ত্র সমন্বিত বাহুরূপ ধ্বজ উত্তোলন করে নৃত্য করেন। অধিক কি, যিনি স্বভাবত ক্রোধপরায়ণ, বিকট ভ্রূভঙ্গী করলে যাঁর দিকে তাকানো যায় না, যিনি বিকটাকার দন্তসমূহ দ্বারা নক্ষত্রমণ্ডল ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করতে পারেন, অসহনীয় তেজস্বী সেই রুদ্রদেবের ক্রোধের উদ্রেক করলে ব্রহ্মারও মঙ্গল হয় না. অন্যের কথা আর কি বলব? সভাস্থিত লোক ভীত ও উদ্বিগ্নহৃদয়ে নানাপ্রকার কথা বলতে লাগল। সে সময় অতি সাহসী দক্ষ প্রজাপতিরও ভীতিপ্রদ বহু প্রাকৃতিক বিপর্যয় বারংবার আকাশে ও পৃথিবীতে সর্বত্র উত্থিত হতে লাগল। ১-১২

ঠিক সে সময়েই নানাপ্রকার অস্ত্রশস্ত্রধারী রুদ্রের খর্বাকৃতি অনুচরগণ দ্রুতবেগে ধাবিত হয়ে বিশাল যজ্ঞস্থল অবরোধ করল। এদের কেউ পিঙ্গলবর্ণ, আবার কেউ পীতবর্ণ, কারো উদর মকরের মত, কারও কারও বা মকরের মত মুখ। বস্তুত সকলেই বিকটাকার। তাদের মধ্যে কেউ যজ্ঞশালার পূর্ব ও পশ্চিম স্তম্ভের উপরিস্থিত কড়িকাঠ ভেঙে ফেলল, আর এক দল যজমান-পত্নীদের অবস্থানগৃহ ভাঙল, কেউ সভামণ্ডপ, কেউ বা হোতৃদের গৃহ (যেখানে অগ্নিতে হোম করা হয় এবং ঘৃতাদি দ্রব্য রাখা হয়), যজমানদের গৃহ, পাকশালা প্রভৃতি চূর্ণবিচূর্ণ করে ফেলল। কেউ যজ্ঞপাত্রগুলি ভেঙে ফেলল, কেউ বা যজ্ঞাগ্নি নিবিয়ে দিল। এক দল যজ্ঞকুণ্ডে মূত্রত্যাগ করল, কেউ বা যজ্ঞবেদির সীমাসূত্র ছিঁড়ে ফেলল। আবার কেউ মুনিদের পশ্চাৎ ধাবিত হল, কেউ যজমান পত্নীদের লক্ষ্য করে তর্জন গর্জন করতে লাগল, আর এক দল পলায়নপর দেবগণকে ধরতে গেল। মণিমান নামে শিবানুচর ভৃগুমুনিকে বেঁধে ফেললেন। বীরভদ্র প্রজাপতি দক্ষকে, চণ্ডেশ সূর্যদেবকে এবং নন্দীশ্বর ভগদেবকে বেঁধে ফেললেন। অপরাপর সদস্যগণ, দেবগণ ও পুরোহিতগণ সকলে এ সকল ব্যাপার দেখে যিনি যে-ভাবে পারেন সে-ভাবে চারিদিকে পালাতে লাগলেন। কিন্তু তাঁরাও শিবানুচরদের নিক্ষিপ্ত পাথর-শিলায় আঘাতে জর্জরিত

হলেন। ভৃগুমুনি আহুতিপাত্র হাতে নিয়ে যজ্ঞাগ্নিতে হোম করছিলেন। শিবানুচর মহাপরাক্রম বীরভদ্র তাঁর দাড়ি টেনে ছিঁড়ে ফেললেন; কারণ তিনি (ভৃগুমুনি) যজ্ঞ-সভায় দাড়ি দেখিয়ে ভগবান শংকরকে উপহাস করেছিলেন। তারপর বীরভদ্র ক্রোধবশত ভগদেবকে মাটিতে ফেলে তাঁর চোখদুটি উপড়ে ফেললেন, কারণ যজ্ঞসভায় থেকে তিনি শিবনিন্দুক দক্ষকে চক্ষুসংকেতে উৎসাহিত করেছিলেন। তারপর বলভদ্র যেমন কলিঙ্গরাজ দন্তবক্রের দন্তসকল উৎপাটিত করেছিলেন, বীরভদ্রও সেরূপ পূষার (সূর্যদেবের) দন্তরাজি উপড়ে ভেঙে ফেললেন। কারণ, প্রজাপতি দক্ষ যখন ভগবান পরমপূজ্য শিবের নিন্দাবাদ করছিলেন, সে সময়ে তিনি (সূর্যদেব) দাঁত দেখিয়ে হেসেছিলেন। রুদ্রাংশ ত্রিনেত্র বীরভদ্র তারপর দক্ষের বুকের উপর চড়ে তীক্ষ্ণধার খড়্গে তাঁর মস্তক ছিন্ন করতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু বারংবার আঘাতেও সে কাজ করতে পারলেন না। নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্রের আঘাতেও যখন দক্ষের চর্মমাত্রও ছিন্ন করা গেল না, তখন শিবসদৃশ ঐ বীরভদ্র অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে বহুক্ষণ চিন্তা করলেন। পরে বীরভদ্র যজ্ঞস্থলে যূপকাষ্ঠ দেখে তাতে ফেলে পশুতুল্য যজমান দক্ষের শরীর থেকে মস্তক বিচ্ছিন্ন করে নিলেন। বীরভদ্রের সেই ভয়ংকর কাজ দেখে শিবানুচর ভূতপ্রেত পিশাচগণ উল্লাস-কোলাহলে মুখর হয়ে উঠল। তারা 'সাধু' 'সাধু' বলে হর্ষধ্বনি করতে লাগল, আর দক্ষের পক্ষে যারা ছিল তারা হাহাকার করে উঠল। এরপর ক্রুদ্ধ বীরভদ্র দক্ষের ছিন্ন শির প্রজ্বলিত দক্ষিণাগ্নিতে আহুতি দিয়ে যজ্ঞশালা দগ্ধ করার পর যক্ষপুরী কৈলাস পর্বতের দিকে প্রস্থান করলেন। ১৩-২৬

ষষ্ঠ অধ্যায়

শঙ্করের নিকট ব্রহ্মাদি দেবগণের দক্ষের পুনর্জীবন প্রার্থনা

মৈত্রেয় বললেন, বিদুর, রুদ্রের সৈন্যগণ শূল, পট্টিস, নিস্ত্রিংশ, গদা, পরিঘ এবং মুদ্গর প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা যজ্ঞের পুরোহিত ও সভ্যগণের সঙ্গে দেবগণকে পরাজিত ও সর্বাঙ্গে তাঁদের ক্ষতবিক্ষত করল। তখন তাঁরা সকলে ভয়ে ব্যাকুল হয়ে ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে প্রণাম করে আদ্যোপান্ত সব নিবেদন করলেন। ভগবান পদ্মযোনি ব্রহ্মা ও বিশ্বাত্মা শ্রীনারায়ণ আগে থেকেই এ সকল বিষয় জানতে পেরে দক্ষের যজ্ঞে যান নি। দেবগণের কথা শুনে ভগবান ব্রহ্মা বললেন, তেজস্বী পুরুষের প্রতি অন্যায় করে যারা জীবিত থাকতে চায়, তাদের পরিণাম প্রায়ই মঙ্গলকর হয় না। মহাদেব যজ্ঞের অংশভাগী। তোমরা তাঁকে যজ্ঞভাগ থেকে বঞ্চিত করে অপরাধ করেছ। এখন নির্মলচিত্তে আশুতোষের পদযুগল গ্রহণ করে তাঁকে প্রসন্ন কর। যিনি ক্রুদ্ধ হলে ইন্দ্রাদি লোক ধ্বংস হয়, তোমরা দুর্বাক্য দ্বারা তাঁকে মর্মাহত করেছ। এখন আবার তিনি প্রিয়া-বিরহে কাতর। যদি তোমাদের যজ্ঞ পুনরুদ্ধার করতে চাও তবে সত্বর সেই রুদ্রদেবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে তাঁকে শান্ত কর। সর্বপ্রকারে স্বতন্ত্র শিবের তত্ত্ব ও বলবীর্যের পরিমাণ আমি, যজ্ঞরূপী ইন্দ্র, তোমরা দেবগণ বা অন্য দেহধারী মুনিগণ কেউই জানেন না। সেই ভগবান শংকরের ক্রোধনিবৃত্তির উপায় কে বিধান করতে পারে? ১-৭

ব্রহ্মা এরূপ আদেশ করে দেবগণ, পিতৃগণ ও অন্যান্য প্রজাপতিগণকে সঙ্গে নিয়ে নিজেই আপন ধাম হতে প্রভু শিবের অতি প্রিয় বাসস্থান পর্বতশ্রেষ্ঠ কৈলাশ পর্বতে গেলেন। কৈলাস পর্বত জন্ম, ওষধি, তপস্যা, মন্ত্র ও যোগবিষয়ে সিদ্ধ দেবগণের নিত্য আবাসস্থল। তা ছাড়া কিন্নর, গন্ধর্ব ও অপ্সরাগণও সর্বদা সেখানে বিচরণ করে। ঐ পর্বতের শৃঙ্গ বিবিধ বিচিত্র মণিমণ্ডিত, নানা বর্ণের ধাতুদ্বারা তা চিত্রিত। বহু প্রকার বৃক্ষ, লতা, গুল্মাদি থাকায় কৈলাস পর্বতের শৃঙ্গ এক অপরূপ শোভা ধারণ করেছে। সেখানে বহুসংখ্যক হরিণ ও অন্যান্য পশু বিচরণ করছে। অনেক স্বচ্ছ জলের ঝর্ণাধারা, ছোট বড় অনেক গুহা, আবার স্থানে স্থানে সমতল প্রস্তরখণ্ডে রচিত সানুদেশ থাকায় সিদ্ধ রমণীদের কাছে স্থানটি বড়ই প্রিয় ছিল। তাঁরা পতিদের সঙ্গে সেখানে পরমানন্দে বিহার করে থাকেন। ময়ূরের কেকারবে এবং মধুর-কণ্ঠ কোকিলগণের কুহুধ্বনির সঙ্গে মিলিত অন্যান্য পাখিদের কলরবে ঐ পার্বত্য অঞ্চল মুখরিত থাকে। মদমত্ত ভ্রমরগণের গুন্ গুন্ স্বরে চারদিক প্রতিধ্বনিত হয়। অতি উচ্চ বহুসংখ্যক কল্পবৃক্ষ সেখানে রয়েছে। মনে হয় কৈলাশ পর্বত স্বয়ং যেন ঐ কল্পবৃক্ষসমূহের শাখা-প্রশাখারূপ হস্ত উত্তোলন করে দূরের পাখিদের আহ্বান করছে। বন্য হাতীরা বিচরণ করতে থাকায় বোধ হয় যেন পর্বতটি নিজেই হেঁটে চলছে। স্থানে স্থানে ঝর্ণার জলপতনের শব্দে মনে হচ্ছিল যেন কৈলাস পর্বত নিজেই কথা বলছে। অগণিত ও বিচিত্র বৃক্ষরাজিতে কৈলাশ পর্বতের শোভা পরম রমণীয় হয়েছিল। মন্দার, পারিজাত, সরল, শাল, তাল, তমাল, কোবিদার, আসন, অর্জুন প্রভৃতিতে তা সুশোভিত ছিল। তা ছাড়া আম্র, কদম্ব, নীপ, নাগকেশর, পুন্নাগ, চম্পক, পাটল (পারুল), অশোক, বকুল, কুন্দ, কুরুবক, স্বর্ণার্ণ, শতপত্র, করবী, এলা, প্রাতি, কুব্জক, মল্লিকা, মাধবী প্রভৃতি বৃক্ষলতাদিতে সে পর্বত চমৎকার শোভা ধারণ করেছিল। এখানেই শেষ নয়, কাঁঠাল, ডুমুর, অশ্বত্থ, ন্যগ্রোধ, হিঙ্গু, ভূর্জ, নানাপ্রকার ওষধি, সুপারী, গুবাক, জম্বু, খেজুর, আমড়া, আম, পিয়াল, মধুক, ইঙ্গুদ ও অন্য আরও নানারকম বৃক্ষে এবং বেণু ও কীচক (ছিদ্রযুক্ত বাঁশ) জাতীয় উদ্ভিদে কৈলাস গিরি মনোরম রূপ ধারণ করেছিল। সেখানে সরোবরে কুমুদ, উৎপল, কহ্লার, শতদল প্রভৃতির সমারোহ থাকায় সে সকল জলজ কুসুমের মধু ও গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে নানাপ্রকার পাখি ঝাঁকে ঝাঁকে এসে কলস্বরে কূজন করছিল। ফলে তার সৌন্দর্য আরও মনোমুগ্ধকর হয়ে উঠেছিল। পর্বত-গাত্রের বনাঞ্চল হরিণ, বানর, শূকর, সিংহ, হাতী, ভালুক, শল্যক (শজারু), গবয় (বনগরু), শরভ (বৃহদাকার হরিণ বিশেষ), ব্যাঘ্র, রুরু (মৃগবিশেষ), মহিষ প্রভৃতি বিবিধ পশুদের আবাস ছিল। এ ছাড়া কর্ণার্ণ, একপদ, অশ্বমুখ, বৃক (নেকড়ে বাঘ), কস্তুরীমৃগ প্রভৃতি পশু সেখানে বিচরণ করত। আবার বহু কলাগাছ দ্বারা সরোবরের তীর আবৃত থাকায় সে সকল স্থান অতি মনোরম দেখাচ্ছিল। ৮-২১

নন্দা নামে নদী মহাদেবের বাসস্থান কৈলাস পর্বত বেষ্টন করে প্রবাহিত হচ্ছে। সতী ঐ নদীর জলে স্নান করতেন। তাই সে জল সুগন্ধ ও নির্মল হয়েছিল। দেবগণ সেই পর্বত দেখে অত্যন্ত বিস্ময়ান্বিত হলেন এবং ঐ পর্বতের মধ্যে অলকা নামে রমণীয় পুরী দেখলেন। সেখানে সৌগন্ধিক নামক পদ্মফুলের বনও তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। ঐ পুরীর বহির্ভাগে শ্রীহরির পদধূলি স্পর্শে পবিত্র নন্দা ও অলকানন্দা নামে দুটি নদী প্রবাহিত হচ্ছে। বিদুর, স্বর্গের দেবীরা রতিক্লান্ত হয়ে স্ব স্ব স্থান হতে নেমে এসে ঐ দুই নদীর জলে স্নান করেন। তখন তাঁরা পুরুষদের গাত্রে জল সেচন করে জলক্রীড়া করেন। সুরস্ত্রীগণ স্নান

করায় তাঁদের গাত্রের নবকুংকুমে নদীর জল পীতবর্ণ হয়। তখন মত্ত হস্তীরা তৃষ্ণার্ত না হলেও হস্তিনীদিগকে ঐ জল পান করায় এবং নিজেরাও পান করে। রূপা, সোনা ও বিবিধ মহামূল্য রত্নদ্বারা নির্মিত শত শত বিমানে সে অলকাপুরী সর্বদা পরিব্যাপ্ত ছিল। বিদ্যুৎযুক্ত মেঘমালায় সুশোভিত যক্ষেশ্বর কুবেরের ঐ পুরীতে যক্ষরমণীরা বাস করে। দেবগণ অলকাপুরী অতিক্রম করে এসে সৌগন্ধিক কানন দেখতে পেলেন। সে বনের সৌন্দর্যের কোন তুলনা নেই। নানাবিধ পুষ্পমালা, ফুল ও পত্ররাজিতে কল্পবৃক্ষগুলি সুশোভিত ছিল; আর ঐ সকল বৃক্ষরাজি বনের শোভাকে অতি মনোরম করে তুলেছিল। মধুকণ্ঠ পাখিদের সুমধুর স্বরের গঙ্গে ভ্রমরকুলের গুঞ্জন-ধ্বনি মিলিত হয়ে এক বিচিত্র ভাবের সৃষ্টি করছিল। সেখানে জলাশয়গুলি কলহংসদের অতিপ্রিয় পদ্মফুলে পূর্ণ হয়ে অপূর্ব শোভা ধারণ করেছিল। ঐ বনের হরিচন্দন বৃক্ষে বন্যহাতীরা গা ঘষে। ফলে চন্দনবৃক্ষের ক্ষত অংশের গন্ধে সেখানকার বায়ু সুগন্ধ হয়ে প্রবাহিত হয় এবং তার স্নিগ্ধ স্পর্শে যক্ষরমণী ও কিন্নরীদের মন উতলা হয়ে ওঠে। সেখানে দেবগণ অনেক সরোবর দেখতে পেলেন। সরোবরে নামার বৈদূর্যমণি নির্মিত সিঁড়িগুলি আর জলে প্রস্ফুটিত পদ্মরাজি চমৎকার শোভার সৃষ্টি করেছে। ঐ অপরূপ বন ও সেখানকার নানা বিচিত্র শোভা দেখার পর একটি বটগাছ দেবগণের দৃষ্টিতে এল। ২২-৩১

সেই বটগাছটি একশত যোজন উঁচু। তার শাখাগুলি পঁচাত্তর যোজন-পরিমাণ বিস্তৃত হয়ে চারিদিকে অচল ছায়া রচনা করেছে। কিন্তু গাছে একটি পাখিরও বাসা নেই; সর্বত্র নিথর প্রশান্তি বিরাজিত। দেবগণ যোগক্রিয়ার অনুকূল এবং মোক্ষাভিলাষী মুনিগণের আশ্রয়স্বরূপ সেই বটগাছের তলায় ভগবান শংকরকে দেখতে পেলেন। সে সময়ে ক্রোধবিমুক্ত যমের ন্যায় উপবিষ্ট অবস্থায় ভগবান শিবকে বড়ই প্রশান্ত দেখাচ্ছিল। যোগসিদ্ধ সনক, সনাতন, সনন্দ প্রভৃতি প্রশান্তচিত্ত মহর্ষিগণ এবং যক্ষ-রক্ষগণের অধিপতি ও আপন বন্ধু কুবের তাঁর উপাসনায় রত। নিখিল বিশ্বের অধীশ্বর ও বিশ্ববন্ধু ভগবান শংকর তখন জগদ্বাসী জীবগণের প্রতি স্নেহবশত তাদের সকলের মঙ্গল সাধনের জন্য বিদ্যা, তপস্যা ও যোগ অবলম্বনে তপস্যা করছিলেন। তিনি তখন সন্ধ্যাকালীন মেঘের ন্যায় ঈষৎরক্ত গৌরবর্ণ দেহে শোভিত হয়ে তপস্বীদের অভীষ্ট ভস্ম, জটা ও ব্যাঘ্রচর্মাদি চিহ্ন এবং মস্তকে চন্দ্রকলা ধারণ করেছিলেন। ব্রতিগণের ব্যবহারের উপযোগী কুশাসনে বসে তিনি জিজ্ঞাসু নারদকে ব্রহ্মবিষয়ে উপদেশ দিচ্ছিলেন; সনন্দাদি শ্রোতারাও তা আগ্রহভরে শুনছিলেন। ৩২-৩৭

সে সময় তাঁর বাম পাদপদ্ম দক্ষিণ উরুতে ও বাম হস্ত বাম জানুতে বিন্যস্ত ছিল। তিনি ডান হাতের মণিবন্ধে অক্ষমালা ধারণ করছিলেন এবং তর্কমুদ্রা[১] ধারণ করে উপবিষ্ট ছিলেন। মননশীল মুনিগণের আদিদেব ভগবান শংকর ব্রহ্মানন্দে চিত্তের একাগ্রতা অবলম্বন করে যোগপট্ট আশ্রয় করেছিলেন। লোক-পালদিগের সঙ্গে মুনিগণ সকলে তথায় উপস্থিত হয়ে কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁকে প্রণাম করলেন। সকলের পূজনীয় বামনরূপী ভগবান বিষ্ণু যেমন মহামুনি কশ্যপের পায়ে নমস্কার জানিয়েছিলেন, সুরাসুরশ্রেষ্ঠ মহাদেবও আত্মযোনি ব্রহ্মা উপস্থিত হয়েছেন দেখতে পেয়ে দাঁড়িয়ে উঠে আনতমস্তকে তাঁকে অভিবাদন করলেন।

১ অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনীর অগ্রভাগ একত্র মিলিয়ে অপর তিন অঙ্গুলি প্রসারিত করার নাম তর্কমুদ্রা।

পরে নারদাদি যে সকল সিদ্ধগণ মহর্ষিদের সঙ্গে নীললোহিত শিবের অনুসরণ করেছিলেন, তাঁরাও ব্রহ্মাকে যথাবিধি নমস্কার করলেন। সকলের নমস্কার পেয়ে ব্রহ্মা ঈষৎ হেসে শিবকে বললেন, যদিও আপনি আমাকে নমস্কার করলেন, তবুও আপনিই যে বিশ্বের ঈশ্বর তা আমি জানি। আপনি জগতের যোনি ও বীজ, প্রকৃতি ও পুরুষ, যাকে শিব-শক্তি বলা হয় তার প্রধান কারণ, নির্বিকার পরম ব্রহ্ম—এ কথাও আমার অজানা নয়। ভগবান, আপনিই অবিভক্ত স্বরূপে জগতের প্রকৃতি ও পুরুষে অবস্থিত থেকে লীলাচ্ছলে মাকড়সার মত অখিল বিশ্বের সৃষ্টি, পালন ও সংহার করছেন। ৩৮-৪৩

ধর্মার্থপ্রসবিনী বেদত্রয়ের রক্ষার জন্য দক্ষকে উপলক্ষ করে আপনিই যজ্ঞের সৃষ্টি করেছিলেন, আবার ব্রতধারী ব্রাহ্মণগণ যে সকল ধর্ম শ্রদ্ধাপূর্বক অনুষ্ঠান করেন তাদের মর্যাদা নির্ণয় করেছেন। হে মঙ্গলময়, যে সকল ব্যক্তি শুভকর্মের অনুষ্ঠান করে তাদের অভীষ্ট স্বর্গলোক (মোক্ষ) আপনি বিধান করেন। আর যারা অশুভ কাজ করে তাদের জন্য ঘোর নরকও আপনি বিধান করেন। তবুও কোনও কোনও ব্যক্তির পক্ষে নিয়মের বিপর্যয় দেখতে পাই কেন? প্রভু, যে সকল সাধুপুরুষ আপনার চরণে আত্মসমর্পণ করে সকল প্রাণীর মধ্যে আপনাকে দেখেন এবং আপনার আত্মাতে সকল প্রাণীকে অভিন্নরূপে দেখে থাকেন, আপনার ক্রোধ যেমন দক্ষকে অভিভূত করল, সেরূপ তাঁদের কখনও অভিভূত করে না। আবার যে সকল ব্যক্তি ভেদদর্শী, যারা শুধুই কর্মাসক্ত, কুটিল, পরশ্রীকাতর ও অপরের অনিষ্টকারী এবং যারা কটূক্তি দ্বারা পরের দুঃখ জন্মায়—দৈবই তাদের দণ্ডবিধান করেন। আপনার ন্যায় নিরপেক্ষ সাধু ব্যক্তির পক্ষে তাঁদের বধের চেষ্টা করা অনুচিত। যে সকল মানুষ ভগবান বিষ্ণুর মায়ায় মোহিত হয়ে ভেদদর্শী হয়, সাধুব্যক্তি নিজের সহিষ্ণুতার গুণে তাদের কৃপাই করে থাকেন, তাদের উপর নিজের বল-বিক্রম প্রকাশ করেন না। কিন্তু আপনি সেই পরমপুরুষ বিষ্ণুর মায়ায় বিমুগ্ধ নন, সুতরাং সর্বজ্ঞ। অতএব মায়ায় মুগ্ধ এবং শুধুমাত্র কর্মানুষ্ঠানকারী মূঢ় লোকের প্রতি কৃপা করা আপনার উচিত নয় কি? ৪৪-৪৯

আপনি যজ্ঞফলদাতা ও যজ্ঞভাগী। কু-যাজ্ঞিকেরা আপনাকে যজ্ঞভাগ অর্পণ না করাতে প্রজাপতি দক্ষের যজ্ঞ আপনার দ্বারা বিনষ্ট ও অসমাপ্ত হয়েছে। আপনি দয়া করে যজ্ঞের পুনরুদ্ধার করুন। দক্ষ পুনর্বার জীবিত হয়ে উঠুক, ভগ ঋষি চক্ষু লাভ করুক এবং ভৃগুমুনির শ্মশ্রু ও পূষের দন্তসকল আবার সঞ্জাত হোক। আপনার অনুচর প্রমথগণ অস্ত্র ও শিলাপ্রহারে যে সকল দেবতা ও পুরোহিতের গাত্র ক্ষত-বিক্ষত করেছেন আপনার কৃপায় তাঁরা শীঘ্র সেরে উঠুন—আপনি এই বর দিন। যে পরিমাণ যজ্ঞাবশিষ্ট দ্রব্য থাকবে সে সকলই আপনার ভাগে পড়বে। অতএব হে যজ্ঞফলপ্রদ রুদ্র, এই আপনার ভাগ প্রদান করা হোল, প্রসন্নচিত্তে যজ্ঞ সম্পাদন করুন। ৫০-৫৩

সপ্তম অধ্যায়

বিষ্ণুর দক্ষযজ্ঞ সমাপন

মৈত্রেয় বললেন, বিদুর, পিতামহ ব্রহ্মা স্তব করে শিবের কাছে ঐ রকম প্রার্থনা করলে তিনি সন্তুষ্ট হয়ে হেসে বললেন, প্রজেশ, দক্ষের মত বালকদের অপরাধ আমি কখনো মুখেও আনি না। এমন কি, সে বিষয়ের চিন্তাও কখনো আমার

মনে ওঠেনি। যে সব লোক দেবমায়ায় বিমোহিত, আমি কেবল তাদেরই শাস্তি দিয়েছি। প্রজাপতি দক্ষের মুণ্ড দগ্ধ হয়েছে। এক্ষুণি ছাগলের মুণ্ড তার মুণ্ড হোক এবং এই ভগদেব মিত্র-নামক দেবতার চক্ষু দ্বারা স্বীয় যজ্ঞভাগ দর্শন করুন। পূষা স্বয়ং পিষ্টকভোজী হোন। ইনি অন্য দেব সহ যজমানের দাঁত দিয়ে যজ্ঞের দ্রব্য আহার করুন। যে সব দেবতা আমাকে যজ্ঞাবশিষ্ট ভাগ প্রদান করলেন, যাঁদের অঙ্গসমস্ত ভেঙ্গে গিয়েছিল, এখন তাঁদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আবার ফিরে আসুক। কিন্তু যাঁদের অঙ্গ একেবারে নষ্ট হয়ে গিয়েছে, তাঁরা অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের বাহুদ্বয় দ্বারা বাহুবিশিষ্ট এবং পূষার হস্তদ্বারা হস্তবান হোন। অন্যান্য ঋত্বিকরা এ রকম অঙ্গবিশিষ্ট হোক এবং ভৃগু ছাগদাড়ি লাভ করক। ১-৫

মৈত্রেয় বললেন, বৎস বিদুর, মহাদেবের ঐ সমস্ত কথা শুনে সকলের চিত্ত পরিতৃপ্ত হল। সকলেই হৃষ্টচিত্তে 'সাধু, সাধু' বলতে লাগলেন। তারপব দেবতারা শিবকে আমন্ত্রণ করলেন, প্রভু, স্বয়ং এসে যজ্ঞ সম্পাদন করুন। তখন শিবও ব্রহ্মার সঙ্গে মিলিত হয়ে ঋষিগণ সমভিব্যাহারে পুনর্বার যজ্ঞস্থলে গেলেন। যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হয়ে তাঁরা ভগবানের কথানুসারে হাত, পা প্রভৃতি অঙ্গ সব সম্পন্ন করে দক্ষের দেহে ছাগলের মুণ্ড যোজনা করে দিলেন। দক্ষের মস্তক সংলগ্ন হলে রুদ্র একবার তার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। রুদ্রের দর্শনমাত্র নিদ্রাশেষে তিনি যেন জেগে উঠলেন এবং সামনে ভগবান রুদ্রকে দেখতে পেলেন। দক্ষের আত্মা পূর্বে ভগবান শঙ্করের প্রতি দ্বেষবশত কলুষিত হয়েছিল ; এখন শিব-সন্দর্শনে শরৎকালীন পুষ্করিণীর মত সেই আত্মা নির্মল হল। তাঁর ইচ্ছা হল শ্রদ্ধান্বিত হয়ে কৈলাসপতির স্তব করেন ; কিন্তু নিজের মৃত কন্যার কথা স্মরণ হওয়াতে উৎকণ্ঠায় চিত্তবিহ্বল হয়ে তার কণ্ঠরোধ হতে লাগল ; তাই তাঁর বাসনা অপূর্ণ রইল। প্রেমবশত তাঁর মন বিহ্বল হয়ে উঠল। অবশেষে অনেকক্ষণ পরে অতিকষ্টে মন সুস্থির করে সরলভাবে এই রকম বলতে লাগলেন, ভগবান, আমি আপনাকে তিরস্কার করেছিলাম, কিন্তু আপনি আমাকে যে এই দণ্ড বিধান করলেন, এতে আমার প্রতি আপনার মহান অনুগ্রহ প্রকাশ পেয়েছে ; কেননা আপনি উপেক্ষা না করে আমাকে শিক্ষা দিলেন। আপনাদের পক্ষে এরূপ করাই যুক্তিযুক্ত। আপনার এবং স্বয়ং ভগবান শ্রীহরির অধম ব্রাহ্মণের প্রতিও অবজ্ঞা নেই। বিভু, আপনিই আত্মতত্ত্ব রক্ষার জন্য ব্রহ্মা হয়ে বিদ্যা, তপস্যা এবং ব্রতধারী বিপ্রদের নিজের মুখ থেকে প্রথমে সৃষ্টি করেছেন। পশুপালক যেমন দণ্ডহস্তে পশুদের রক্ষা করে, আপনি সেরূপ সর্ববিপদে ব্রাহ্মণদের রক্ষা করে থাকেন। আমি তত্ত্ব-জ্ঞানহীন বলেই যজ্ঞসভায় আপনার উপর দুর্বাক্য প্রয়োগ করেছিলাম। আপনি আমার জন্য তা ভুলে গেলেন। পূজ্যতমের নিন্দা করে আমার যে অধঃপতন হয়েছিল তা থেকে আপনি আমাকে রক্ষা করলেন। পরের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করতে পারলেই যাঁর সন্তোষ হয়, তাঁর কৃত উপকারের প্রত্যুপকার করা আমার সাধ্য কি ? আপনি আপনার কাজ দ্বারাই সন্তুষ্ট হোন। ৬-১৫

মৈত্রেয় বললেন, বিদুর, দক্ষ এইভাবে ভগবান ভূতপতির নিকট ক্ষমা পেয়ে ব্রহ্মার আজ্ঞায় উপাধ্যায় এবং ঋত্বিক প্রভৃতির সাহায্যে আবার যজ্ঞ শুরু করলেন। ব্রাহ্মণরা যজ্ঞ-বিস্তারের জন্য বিষ্ণু সম্বন্ধীয় ত্রি-কপাল হবি হোম করলেন এবং রুদ্র পারিষদ প্রথমাদির সংসর্গ-জনিত দোষশুদ্ধির জন্য পুরোডাশ[১] হুত হল। তখন যজমান দক্ষ যজুর্বেদজ্ঞ পুরোহিতের সঙ্গে যজ্ঞীয় হবি গ্রহণ করে বিশুদ্ধ বুদ্ধি

১ পিষ্টক বিশেষ।

দ্বারা ধ্যানস্থ হলেন। আর অমনি শ্রীহরির আবির্ভাব হল। নারায়ণ তাঁর দেহপ্রভায় দশদিক উজ্জ্বল করে ঐ সব ব্যক্তির তেজ হ্রাস করতে করতে এসে উপস্থিত হলেন। তাঁর বাহন গরুড়ের বৃহদ্রথন্তর[১] স্বরূপ দুটি পাখা। শ্রীহরির দেহ শ্যামবর্ণ, কটিদেশে স্বর্ণকিঙ্কিণী। তাঁর মাথায় সূর্যের মত উজ্জ্বল মুকুট শোভা পাচ্ছে এবং মুখমণ্ডল নীলবর্ণ অলকরূপ অলিকূলে অলঙ্কৃত। স্বর্ণময় বাহুগুলিতে ভক্তের রক্ষার জন্য শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, ধনুর্বাণ এবং খড়্গ চর্ম উদ্যত হওয়াতে তা প্রস্ফুটিত পুষ্পের ন্যায় পরম সৌন্দর্যে শোভমান। বক্ষস্থলে স্বয়ং লক্ষ্মী বিরাজিত। বৈকুণ্ঠনাথ বনমালাধারী হয়ে উদার হাস্য এবং কটাক্ষলেশ দ্বারা বিশ্বের পরম প্রীতির কারণ হয়েছিলেন। তাঁর দুই পাশে ব্যজন ও চামর রাজহংসের মত ব্যজন করছিল এবং মাথার উপর চন্দ্রতুল্য শ্বেতচ্ছত্র বিরাজ করছিল। ১৬-২১

বিষ্ণুকে আসতে দেখে ব্রহ্মা, ইন্দ্র, রুদ্র প্রভৃতি দেবতারা তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়িয়ে প্রণাম করলেন। ভগবান বিষ্ণুর তেজ দ্বারা দেবতাদের প্রভা তিরোহিত, ভয়ে চিত্ত ক্ষুভিত হল এবং জিহ্বা গেল জড়িয়ে তবুও তাঁরা নিজের নিজের মাথার উপর হাতজোড় করে যথাশক্তি তাঁর স্তব করতে লাগলেন। ব্রহ্মাদি যে সব দেবতা তাঁর থেকে ক্ষুদ্রবৃত্তি সম্পন্ন হওয়াতে তাঁর মহিমস্বরূপে গণ্য হন, তাঁরাও তাঁর স্তব করতে লাগলেন। কারণ, এই ভগবানই অনুগ্রহ করে ব্রহ্মাদি বিগ্রহ ধারণ করেছেন। অবশেষে প্রজাপতি দক্ষ উত্তম পাত্রে আসনাদি পূজার দ্রব্য গ্রহণ করে কৃতাঞ্জলিপুটে হৃষ্টচিত্তে স্তব করতে করতে যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর শরণাপন্ন হলেন। বিদুর, বিষ্ণু প্রজাপতিদেরও পরম গুরু। সেই সময় সুনন্দ-নন্দাদি অনুচরেরা তাঁকে ঘিরে রেখেছিল। প্রথমে দক্ষ তাঁকে বললেন, প্রভু, আপনি স্বরূপে অবস্থিত রয়েছেন, শুদ্ধ চৈতন্যঘনই আপনার স্বরূপ। আপনার বুদ্ধির সকল অবস্থা (বৃত্তি) নিবৃত্ত হয়েছে। অতএব আপনি এক, অদ্বিতীয় ভেদশূন্য অভয়। কিন্তু আপনি এরূপ হলেও জীবস্বরূপ নন, যেহেতু আপনি মায়াকে দূর করে স্বতন্ত্রভাবে অবস্থান করছেন। তবুও সেই মায়াযোগেই পুরুষলীলা স্বীকার করে সেই মায়াতেই অশুদ্ধের মত প্রতীয়মান হয়েছেন। তারপর ঋত্বিকরাও বললেন, হে নিরঞ্জন, নন্দীশ্বরের শাপে আমাদের বুদ্ধি কর্মেই ব্যস্ত রয়েছে। সেই জন্য আমরা আপনার তত্ত্ব জানি না সত্য, তবু ধর্মের উপলক্ষভূত বেদ-প্রতিপাদ্য আপনার যজ্ঞ-নামক মূর্তি বিশেষভাবে অবগত হলাম। আপনি যজ্ঞের জন্য ইন্দ্রাদি দেবতার রূপ বিশেষরূপে গ্রহণ করে থাকেন। ২২-২৭

সদস্যগণ এই বলে স্তব করতে লাগলেন, হে আশ্রয়পদ, এই সংসারপথ দুর্গম। এখানে বিশ্রামের স্থানমাত্র নেই। গুরুতর ক্লেশবহুল দুর্গম স্থানে এ সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। যমরূপ ভীষণ কৃষ্ণসর্প এখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সর্বদা এখানে মৃগতৃষ্ণারও অভাব নেই। বিষয়স্বরূপ অগণ্য মৃগতৃষ্ণা এর সর্বত্র রয়েছে। সুখ-দুঃখ দ্বন্দ্ব সবই এখানে অজস্র গর্তের মত বিরাজমান। খলরূপ বাঘের ভয় এ জায়গায় সর্বদাই বর্তমান। শোকরূপ দাবাগ্নি এখানে নিয়তই প্রজ্বলিত। এই সংসারপথে বর্তমান অজ্ঞ-ব্যক্তিরা কোন কালে আপনার চরণরূপ নিবাসস্থলে আশ্রয় নেবে? অহঙ্কারের আশ্রয় শরীর এবং মমতার পাত্র গৃহই তাদের গুরুতর ভার। তারা বাসনা-কামনার দ্বারা সর্বদাই পীড়িত। ভগবান রুদ্র বললেন, হে বরদ, আপনার শ্রেষ্ঠ চরণ পুরুষার্থের সাধক। নিষ্কাম মুনিরাও সাদরে ঐ চরণের অর্চনা করে থাকেন। ঐ চরণেই আমার মন নিবিষ্ট। সেইজন্য অজ্ঞলোক যদি আচারভ্রষ্ট বলে নিন্দা করে,

১ বেদে কথিত স্তোত্রদ্বয়।

করুক ; আমি তা গ্রাহ্য করব না। আপনার পরম অনুগ্রহে মানসিক শান্তি অবিচ্ছিন্ন থাকবে। তারপর মহর্ষি ভৃগু বলতে লাগলেন, প্রভু, আপনার মায়া দ্বারা ব্রহ্মাদি দেহধারীরাও আত্মজ্ঞানে বঞ্চিত হয়ে অজ্ঞানের অন্ধকারে ডুবে আছেন। আপনার তত্ত্ব তাঁদের আত্মাতে অনুস্যূত হলেও তাঁরা তা জানাতে পারছেন না। কিন্তু আপনি শরণাগত জনের আত্মা ও বন্ধু আমি আপনাকে প্রণাম করছি, আমার প্রতি প্রসন্ন হোন। ব্রহ্মা বলতে লাগলেন, বিভু, পদার্থসমূহের বিভিন্ন রূপ গ্রহণে সমর্থ ইন্দ্রিয়দ্বারা পুরুষ যা যা দেখে তাদের কিছুই আপনার স্বরূপ নয়। আপনি যদিও বিষয়, ইন্দ্রিয় এবং সমস্ত জ্ঞানের আশ্রয় সত্য, কিন্তু মায়াময় অসৎ পদার্থ থেকে আপনি স্বতন্ত্র। ইন্দ্র বলতে লাগলেন, অচ্যুত, আপনার এই শরীর মায়ার ন্যায় অনির্বচনীয় নয় ; এই শরীর প্রত্যক্ষ সিদ্ধ, এই থেকে কি বিশ্ব উৎপন্ন হয় ? ঐ মূর্তি মন ও চোখের কেমন প্রীতিদায়ক এবং দেবশত্রু অসুরদের বিনাশকারী আটটি বাহু কেমন শোভা পাচ্ছে ! ২৮-৩২

ঋত্বিকপত্নীরা স্তব করতে লাগলেন, হে পদ্মনাভ, পূর্বে ব্রহ্মা এই যজ্ঞকে তোমার অর্চনার জন্য সৃষ্টি করেন। পশুপতি দক্ষের প্রতি ক্রোধের বশে এর বিনাশ করেছেন। হে যজ্ঞমূর্তি, আমাদের যজ্ঞ শ্মশানতুল্য ও উৎসববিরহিত হয়েছে, আপনার পদ্মচক্ষু দিয়ে একবার দৃষ্টিপাত করে তা পবিত্র করুন। ঋষিগণ বলতে লাগলেন, ভগবান, আপনার চরিত অসঙ্গতিপূর্ণ, যেহেতু আপনি স্বয়ং কর্ম করেও কর্মে লিপ্ত হন না। আর আশ্চর্যের বিষয় এই যে, অন্য ব্যক্তিরা সম্পত্তির জন্য যে লক্ষ্মীর উপাসনা করেন, সেই লক্ষ্মী আপনার সেবার জন্য সদা উৎসুক, তবুও আপনি তাঁকে আদর করেন না। সিদ্ধরা ভগবানের কথামৃতে আনন্দ প্রকাশ করে স্তব করলেন, হে দেব, আমাদের মন ক্লেশে জর্জরিত এবং তৃষ্ণায় কাতর হয়েছে। এখন তা আপনার কথারূপ নির্মল অমৃত-নদীতে অবগাহন করে তৃপ্তি লাভ করে সংসারের দুঃখ-ক্লেশাদি থেকে মুক্তি পাবে। তখন তা যেন ব্রহ্মের সঙ্গে একাত্ম হয়ে তা থেকে আর বিযুক্ত না হয়। দক্ষপত্নী প্রসূতি বললেন, হে ঈশ, আপনার আগমন সুখময় হয়েছে তো ? হে শ্রীনিবাস, প্রসন্ন হোন, আপনাকে নমস্কার করি। মস্তকবিহীন কবন্ধ-পুরুষ যেমন সুন্দর হাত পা থাকা সত্ত্বেও শোভা পায় না, সেই রকম যজ্ঞ অঙ্গবিশিষ্ট হলেও আপনি ছাড়া কোন শোভা প্রকাশ করতে পারে না। অতএব আপনি স্বীয় কান্তা লক্ষ্মীর সঙ্গে আমাদের রক্ষা করুন। লোকপালরা বলতে লাগলেন, হে শ্রেষ্ঠ, আপনি বিশ্বসংসার দর্শন করেন, পদার্থপ্রকাশক ইন্দ্রিয়গুলি দ্বারা আপনি দৃষ্টিগোচর হয়ে থাকেন ; অতএব আপনি প্রত্যেক জীবের দ্রষ্টা। কিন্তু, প্রভু, আমাদের মলিন ইন্দ্রিয় দ্বারা আপনাকে কেমন করে জানতে পারব ? আমরা আপনার মহামায়ায় অভিভূত হয়ে থাকি, আপনি পঞ্চভূতের উচ্চে ষষ্ঠভূত রূপে প্রকাশ পান। যোগেশ্বরেরা বললেন, ভগবান, আপনি বিশ্বের আত্মা পরব্রহ্ম। যে ব্যক্তি আপনাকে এক ও অদ্বিতীয় রূপে দেখেন তিনি অপেক্ষা আপনার প্রিয়তম অন্য কেউ নেই। আপনার কাছে আমাদের এই মাত্র প্রার্থনা যে, যে সব ব্যক্তি অচলা ভক্তি দ্বারা আপনার ভজনা করেন, তাঁদের প্রতি যেন আপনার অনুগ্রহ থাকে। জগতের উৎপত্তি, স্থিতি, লয় প্রভৃতির জন্য আপনি জীবদের ভিতর স্বকীয় মায়াপ্রভাবে বিভিন্ন গুণের সৃষ্টি করেছেন। ফলে তাদের একত্বভাব নষ্ট হয়েছে এবং তারা অদৃষ্টবশত বহু প্রকারে বিভিন্নতা লাভ করেছে। সেই মায়া দ্বারা আপনি নিজেকে ব্রহ্মাদিরূপ বিভিন্ন বলে বোধ করেন। কিন্তু বস্তুত আপনি স্বরূপেই অবস্থান করছেন। আপনাতে ভেদ-ভ্রম বা কোন গুণ নেই। আপনাকে নমস্কার করি। ৩৩-৩৯

ব্রহ্মা বললেন, ভগবান, আপনি সত্ত্বগুণ অবলম্বন করেছেন, এই কারণে ধর্মাদি সৃষ্টি করে থাকেন; আপনাকে নমস্কার করি। আপনি আবার নির্গুণও, আপনাকে নমস্কার। একাধারে সত্ত্বগুণত্ব ও নির্গুণত্ব উভয়ই যদিও সম্ভব হয় না, তবুও আপনাতে কিছুই অসম্ভব নয়; যেহেতু আপনার তত্ত্ব আমি জানি না এবং রুদ্রাদি দেবরাও তা জানেন না। অগ্নি বললেন, যাঁর তেজ সম্যক্ প্রকাশ পেয়ে থাকে, যাঁর যজ্ঞে আমি ঘৃতযুক্ত হবি বহন করি, সেই যজ্ঞপালক যজ্ঞমূর্তিকে নমস্কার করি। তিনি অগ্নিহোত্র, দর্শপৌর্ণমাস, চাতুর্মাস্য এবং পশুযাগ ও সোমযাগ—এই পঞ্চবিধ যজ্ঞেরই স্বরূপ এবং পঞ্চবিধ যজ্ঞমন্ত্র দ্বারাই সুন্দর রূপে পূজিত হয়ে থাকেন। দেবগণ বললেন, আপনিই আদি পুরুষ, প্রলয়কালে আপনিই সমস্ত কর্ম উদরের মধ্যে লীন করে জলের ওপর অনন্তশয্যায় শয়ন করেন। সে সময় সিদ্ধরা হৃদয়মধ্যে সবিস্ময়ে আপনার জ্ঞানমার্গ চিন্তা করে থাকেন। প্রভু, আপনিই সেই পুরুষ, এখন আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়েছেন। আমরা আপনার ভৃত্য. আপনারই অনুগ্রহে জীবিত রয়েছি এবং সমস্ত বিপদে আপনিই আমাদের রক্ষা করছেন। গন্ধর্ব ও অপ্সরাবা বলতে লাগলেন, হে দেব, মরীচি প্রভৃতি এই সমস্ত প্রজাপতি এবং রুদ্র প্রমুখ ব্রহ্মা ও ইন্দ্রাদি দেবতারা যাঁর অংশ অথবা অংশের অংশ, এই ব্রহ্মাণ্ড যাঁর ক্রীড়াস্থল, আপনি সেই পরমপুরুষ। আপনাকে সর্বদা নমস্কার করি। বিদ্যাধরেরা বললেন, হে দেব, পুরুষার্থসাধক এই দেহ লাভ করে আপনার মায়াবশে 'আমি', 'আমার' ইত্যাদি মানসিকতা অবলম্বন করেও যে ব্যক্তি আপনার কথারূপ অমৃত পান করে, সেই শুধু এই মোহ থেকে মুক্তি পেতে সমর্থ, অন্য কারো সাধ্য নেই। উন্মার্গগামী পুত্রাদি দ্বারা তিরস্কৃত হলেও কোন কোন ব্যক্তির বিষম দুঃখ উপস্থিত হয়। কিন্তু তাতেও তাদের মোহ ঘোচে না; কারণ তাদের অনিত্য অসৎ বিষয়েই লালসা। ৪০-৪৪

ব্রাহ্মণরা বললেন, প্রভু, আপনিই যজ্ঞ, আপনিই হবি, আপনিই অগ্নি, আপনিই মন্ত্র, আপনিই যজ্ঞকাষ্ঠ, আপনিই কুশ, আপনিই যজ্ঞপাত্র, আপনিই সদস্য, আপনিই ঋত্বিক আপনিই যজমান এবং যজমানপত্নী স্বরূপ, আপনিই দেবতা, আপনিই অগ্নিহোত্র। আপনিই স্বধা, আপনিই সোমরস, আপনিই আজ্য. আপনিই যজ্ঞীয় পশু। হে যজ্ঞমূর্তি, এই বসুন্ধরা পূর্বে রসাতলে মগ্ন ছিল। গজেন্দ্র যেমন লীলাক্রমে পদ্মিনীর উদ্ধার করে, আপনিও সেই রকম মহাশূকর মূর্তিতে লীলা করে গর্জন করতে করতে দাঁতের অগ্রভাগ দ্বারা ধরিত্রীর উদ্ধার করেছেন। যজ্ঞই আপনার কর্ম; আপনার ঐ কাজ দেখে সেই সময় যোগীরা কতই না স্তব করেছিলেন। এখন আপনি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হোন। আমাদের যজ্ঞকর্ম ভ্রষ্ট হয়েছে, সেই জন্য আমরা আপনার দর্শন প্রার্থনা করছিলাম। আমাদের যজ্ঞ উদ্ধার করে দিন। হে যজ্ঞেশ্বর, আপনার নাম কীর্তন করলে যজ্ঞের যাবতীয় বিঘ্ন দূর হয়। আপনাকে আমরা নমস্কার করি। ৪৫-৪৭

মৈত্রেয় বললেন, বিদুর, এই ভাবে ভগবান হৃষীকেশের গুণকীর্তন করতে থাকলে যে যজ্ঞ রুদ্ররোষে বিনষ্ট হয়েছিল, প্রজাপতি দক্ষ পুনরায় তার অনুষ্ঠান শুরু করলেন। বিষ্ণু সকলের আত্মস্বরূপ। সুতরাং যদিও তিনি সকলের ভাগভোজী এবং আত্মানন্দে পরিতৃপ্ত, তবুও ঐ যজ্ঞে নিজের ভাগ পেয়ে যেন প্রীতিলাভ করলেন এবং দক্ষকে বললেন, দক্ষ, এই যে আমি জগতের কারণ আত্মা, ঈশ্বর-সাক্ষী, স্বপ্রকাশ এবং উপাধিশূন্য, এই আমিই ব্রহ্মা এবং আমিই শিব। আমিই গুণময়ী আত্মমায়াকে আশ্রয় করে এই বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-ধ্বংসের জন্য কাজ অনুসারে বিভিন্ন নাম ধারণ করে থাকি। আমি একমাত্র অদ্বিতীয় পরমব্রহ্মস্বরূপ।

অজ্ঞ ব্যক্তিরা আমাতে ব্রহ্ম, রুদ্র এবং ভূত, এইরকম বিভিন্নতা আরোপ করে থাকে, কিন্তু যে পুরুষ জ্ঞানী ও আমার ভক্ত, তিনি যেমন মস্তক, হস্তাদি অঙ্গসমূহকে নিজ থেকে বিচ্ছিন্ন মনে করেন না, সেই রকম আমার অনুরক্ত ব্যক্তি বিভিন্ন প্রাণীতে কোনরূপ ভেদজ্ঞান করেন না। আমাদের তিন জনের একই স্বরূপ এবং আমরা সর্বভূতের আত্মা। যে ব্যক্তি আমাদের তিনজনকে অভিন্নরূপে দেখেন, তিনিই শান্তি লাভ করতে সমর্থ হন। ৪৮-৫৪

মৈত্রেয় বললেন, বিদুর, বিষ্ণু এই রকম উপদেশ দিলে প্রজাপতি-শ্রেষ্ঠ দক্ষ 'ত্রিকপাল' নামক যজ্ঞ দ্বারা ভগবান হরির অর্চনা করলেন। পরে তিনি অঙ্গ এবং প্রধান এই উভয়বিধ দেবতাদের পূজা করলেন। শেষে সমাহিতচিত্তে রুদ্রকেও তাঁর ভাগ দিয়ে যজ্ঞ সমাপক কাজ দ্বারা সোমপায়ী ও অন্যান্য দেবতাদের পূজায় প্রবৃত্ত হলেন। কর্ম সমাপন হলে ঋত্বিকদের সঙ্গে তিনি যজ্ঞান্ত স্নান করলেন। বৎস বিদুর, যদিও দক্ষের স্বীয় মাহাত্ম্য দ্বারাই সিদ্ধিলাভ হল, তবুও তাঁকে ধর্মপ্রবৃত্তি দান করে দেবতারা যজ্ঞ সমাপনান্তে স্বর্গে গেলেন। আমরা এরকম শুনেছি, দক্ষনন্দিনী সতী এইভাবে নিজের পূর্বদেহ ত্যাগ করে হিমালয়ভার্যা মেনকার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু প্রলয়কালে সুপ্ত শক্তি যেমন ঈশ্বরকে আবার লাভ করে, সেই রকম অম্বিকা সেই প্রিয়তম পতিকেই পরে পেয়েছিলেন। কারণ অনন্যভাব ব্যক্তিদের মহাদেবই একমাত্র গতি। বিদুর, দক্ষযজ্ঞ বিনাশক ভগবান শিবের এই সমস্ত কাজ আমি বৃহস্পতিশিষ্য পরম ভাগবত উদ্ধবের মুখে শুনেছি। ভগবান মহেশ্বরের এই চরিত্র পরম পবিত্র ; এ যশস্কর, আয়ুবর্ধক এবং পাপবিনাশক। যে ব্যক্তি প্রতিদিন এই চরিত্রকথা শুনবেন ও ভক্তিভাবে কীর্তন করবেন তাঁর সংসার-দুঃখ অচিরেই দূর হবে। ৫৫-৬১

অষ্টম অধ্যায়

ধ্রুব-চরিত্র

মৈত্রেয় বিদুরকে বললেন, বৎস, সনকাদি ঋষিরা, নারদ, ঋভু, অরুণি, যতি—এঁরা সব ব্রহ্মার পুত্র। এঁরা ঊর্ধ্বরেতা[১], বিবাহাদি করেন নি, সুতরাং এঁদের বংশ নেই। আর অধর্মও ব্রহ্মার পুত্র, তাঁর ভার্যার নাম মিথ্যা। মিথ্যার গর্ভে দম্ভ নামে এক পুত্র এবং মায়া নামে এক কন্যার জন্ম হয়। যদিও তারা পরস্পর ভ্রাতা-ভগ্নী সম্পর্কিত তবুও অধর্মাংশ প্রবল হওয়াতে তারা পরস্পর স্ত্রী-পুরুষ হয়েছিল। নির্ঋতির পুত্র জন্মায়নি ; এই জন্য তিনি ঐ দুই পুত্র-কন্যাকে গ্রহণ করলেন। দম্ভের ঔরসে এবং মায়ার গর্ভে লোভ নামে এক পুত্র এবং শঠতা নামে এক কন্যা জন্মায় ; তাদেরও পরস্পর দাম্পত্যভাব হওয়াতে তাদের থেকে ক্রোধ ও হিংসা—এই মিথুন উৎপন্ন হল। তাদের থেকে কলি ও তার ভগ্নী দুরুক্তির জন্ম হয়। ঐ দুরুক্তির গর্ভে কলির ভীতি নামে একটি কন্যা ও মৃত্যু নামে একটি পুত্র হয়। তারাও পরস্পর দাম্পত্য-ভাবাপন্ন হওয়ায় তাদের দুই জনের যাতনা নামে কন্যা এবং নরক নামে পুত্র জন্মালো। আমি তোমার কাছে সংক্ষেপে

১ জিতেন্দ্রিয় পুরুষ—শুক্রক্ষয় করেন না যিনি এবং যাঁর শুক্র ঊর্ধ্বগামী।

প্রলয়ের কারণরূপ এই যে অধর্মবংশ বর্ণনা করলাম তা পুণ্যবাহক। কেননা অধর্ম বর্জন করলেই পুণ্য অর্জিত হয়ে থাকে। যে ব্যক্তি এই বৃত্তান্ত তিনবার শুনবে তার পাপক্ষয় নিশ্চিত জানবে। ১-৫

কুরুকুলশ্রেষ্ঠ বিদুর, এর পর স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্রের বংশবর্ণনা করব। মনুর কীর্তি পবিত্র, কারণ ব্রহ্মা ভগবান হরির অংশ, আর ব্রহ্মার অংশ থেকে মনুর জন্ম হয়। মনুর স্ত্রী শতরূপার প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামে দুই পুত্র জন্মায়। ভগবান বাসুদেবের অংশে তাঁদের জন্ম। এঁরা দুজনেই পৃথিবী পালনে নিযুক্ত ছিলেন। উত্তানপাদের দুই বিবাহ। দুই পত্নীর নাম সুনীতি ও সুরুচি। সুরুচি পতির অত্যন্ত প্রেয়সী হন, সুনীতি সেরকম হতে পারেন না। সুনীতির পুত্র ধ্রুব। একদিন রাজা উত্তানপাদ সুরুচির পুত্র উত্তমকে কোলে নিয়ে আদর করছিলেন, তা দেখে সুনীতির পুত্র ধ্রুবও পিতার কোলে উঠতে চাইলেন। কিন্তু রাজা কোলে নেওয়া দূরে থাক, মিষ্টি কথায়ও ধ্রুবকে আদর করলেন না। কারণ, সে সময় সুরুচি রাজাসনে উপবিষ্টা ছিলেন। গর্বোদ্ধত সপত্নী-তনয় ধ্রুবকে রাজার কোলে যেতে ইচ্ছুক দেখে রাজার সামনেই তিনি ঈর্ষা প্রকাশ করে বলতে লাগলেন, ওরে ধ্রুব, তুই রাজপুত্র সন্দেহ নেই, কিন্তু তুই রাজার আসনের যোগ্য নোস্। কারণ আমি তোকে গর্ভে ধারণ করিনি। তুই বালক, তুই অন্য স্ত্রীর গর্ভে জন্মেছিস্ একথা নিশ্চয়ই তুই জানিস্ না। তা জানলে তোর এত দুরাকাঙ্ক্ষা হতো না। যদি তোর রাজসিংহাসনে বসার বাসনা থাকে, তবে এক কাজ কর্; তপস্যার দ্বারা ভগবানের আরাধনা করে তাঁর অনুগ্রহে আমার গর্ভে এসে জন্মগ্রহণ কর্। ৬-১৩

মৈত্রেয় বললেন, বিদুর, বালক ধ্রুব বিমাতার এই রকম দুর্বাক্যবাণে বিদ্ধ হয়ে দণ্ডাহত সাপের মত দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করে কাঁদতে লাগলেন। পিতা তা দেখেও মুখ ফুটে কিছু বলতে পারলেন না; তাঁর যেন বাক্‌রোধ হল। ধ্রুব তখন পিতাকে ছেড়ে কাঁদতে কাঁদতে মায়ের কাছে গেলেন। বালক ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস ফেলছে, কান্নার আবেগে তার ঠোঁট বার বার কাঁপছে দেখে সুনীতি তাঁকে কোলে নিলেন। সপত্নী ধ্রুবকে যে সব দুর্বাক্য বলেছে সে সব যখন লোকের মুখে শুনতে পেলেন, তখন তিনি খুব দুঃখ পেলেন। সুনীতি শোকের দাবানলে দগ্ধ হয়ে দাবাগ্নিগতা বনলতার মত ম্লান হলেন এবং ধৈর্য হারিয়ে বিলাপ করতে লাগলেন। সপত্নীর কথা স্মরণ হওয়াতে তাঁর কমলতুল্য সুন্দর চোখ দুটি থেকে দরদর করে অশ্রু ঝরতে লাগল। তিনি ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস ফেলতে লাগলেন। দুঃখের পার দেখতে না পেয়ে তিনি সন্তানকে বললেন, বৎস, এবিষয়ে অন্যের অপরাধ মনে করো না। যে ব্যক্তি পরকে দুঃখ দেয় ভবিষ্যতে সে-ই দুঃখ ভোগ করে থাকে। সুরুচি সত্যি বলেছে। আমি নিতান্ত দুর্ভাগা। তুমি আমার গর্ভে জন্মেছ এবং আমার বুকের দুধ খেয়ে বড় হয়েছ, তুমি কি করে রাজাসনে বসবার যোগ্য হবে? বাছা, আমি এমন হতভাগিনী যে, আমাকে ভার্যা বলে স্বীকার করতেও রাজার লজ্জাবোধ হয়। তোমার বিমাতা যথার্থই বলেছেন যে তপস্যা দ্বারা ভগবানের আরাধনা কর। যদি তোমার ভ্রাতা উত্তমের মত রাজসিংহাসনে বসবার অভিলাষ থাকে তাহলে ঈশ্বরের পাদপদ্মই আরাধনা কর। বাছা, সেই ভগবান বিশ্বপালনের জন্য সত্ত্বগুণের অধিষ্ঠান স্বীকার করেছেন। ব্রহ্মা তাঁরই পাদপদ্ম আরাধনা করে পরমপদের অধিকারী হয়েছেন। মন-প্রাণ জয়কারী যোগীরা সেই চরণ সতত সেবা করেন এবং তোমার পিতামহ ভগবান মনুও তাঁকেই সর্বান্তর্যামী জেনে প্রচুর দক্ষিণা সহকারে যজ্ঞ দ্বারা অর্চনা করতেন। তাতে তাঁর দেবদুর্লভ

দিব্য ও ঐহিক সুখ এবং জীবনান্তে মোক্ষপ্রাপ্তি ঘটে। বৎস, তুমি তাঁরই শরণ নিও। তিনি ভক্তবৎসল ; মুমুক্ষু ব্যক্তিরা তাঁরই পাদপদ্ম কামনা করে থাকেন। অন্য চিন্তা পরিত্যাগ করে, স্বধর্ম দ্বারা শোধিত চিত্তে তাঁরই উপাসনা কর। সেই পদ্মপলাশলোচন ভগবান ব্যতীত অন্য কেউই তোমার দুঃখ দূর করতে পারবে না। কিন্তু তাঁর দেখা পাওয়া ভার। ব্রহ্মাদি দেবতাগণ যে কমলার আকাঙ্ক্ষা করেন, সেই কমলবাসিনী লক্ষ্মীই নিজের হাতে দীপতুল্য কমল নিয়ে সকল সময় তাঁর অন্বেষণ করে থাকেন। জননীর এই রকম বিলাপ এবং সার্থক কথা শুনে ধ্রুব সংযতমনে পিতৃগৃহ থেকে বের হলেন। ১৪-২৪

যখন এই বিষয় নারদ শুনলেন তখন তিনি ধ্যানযোগে ধ্রুবের মনের কথা জানতে পেরে তাঁর কাছে এলেন। যে হাতের স্পর্শে পাপরাশি ক্ষয় হয় নারদ সেই হাত দিয়ে তাঁর মাথা স্পর্শ করে বিস্ময়ে মনে মনে বলতে লাগলেন, ক্ষত্রিয়দের কি প্রভাব! এরা কিছুমাত্র অপমান সহ্য করতে পারে না। ধ্রুব বালক হয়েও বিমাতার সেই দুর্বাক্য এখনও হৃদয়ে ধারণ করছে! এরপর দেবর্ষি নারদ ধ্রুবকে বললেন, বৎস, এখন তুমি বালক, খেলায় আসক্ত। এ-অবস্থায় তোমার সম্মান বা অপমান কিছুই তো দেখি না। আর যদি মান-অপমান বিবেচনাই হয়ে থাকে তবুও মোহ ছাড়া অসন্তোষের অন্য কারণ দেখতে পাই না ; কারণ লোকের কর্মই তার সুখ-দুঃখের বীজ। অতএব, ঈশ্বরের আনুকূল্য ছাড়া কোন উদ্যমই ফলপ্রদ হয় না। এই বিবেচনা করে দৈব থেকে যা কিছু উপস্থিত হয় তাতেই পরিতুষ্ট হওয়া উচিত। বৎস, তোমার এই উদ্যম অতি দুষ্কর। তুমি জননীর উপদেশে যোগের সাহায্যে যাঁর প্রসাদ লাভ করতে ইচ্ছা করছ তাঁকে লাভ করা অতি দুঃসাধ্য। মুনিরা সঙ্গরহিত হয়ে তীব্র যোগ দ্বারা অনুসন্ধান করে বহু জন্মেও তাঁর পথ জানতে পারেন না। তাই তুমি এই নিষ্ফল উদ্যম পরিত্যাগ কর। যখন তোমার বার্ধক্য আসবে তখন এ বিষয়ে ভাবনা-চিন্তা করো। ২৫-৩২

বৎস, অদৃষ্টবশত সুখ উপস্থিত হলে মনে করা উচিত, আমার পুণ্য ক্ষয় হচ্ছে ; সেরূপ দুঃখ উপস্থিত হলে মনে করা উচিত আমার পাপক্ষয় হচ্ছে'। এই রকম বিবেচনা করলে আত্মাতে সন্তোষ লাভ হয় এবং দেহী মোক্ষ লাভ করতে পারে। আরো দেখ, অধিক গুণের পুরুষকে দেখে আনন্দিত হবে, অধর্ম গুণের পুরুষের প্রতি দয়া করবে এবং সমগুণ সম্পন্ন লোকের সঙ্গে মিত্রতা করবে। মানুষ তা হলে সন্তাপে অভিভূত হবে না। দেবর্ষি নারদের এই কথা শুনে ধ্রুব কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলতে লাগলেন, প্রভু, সুখ-দুঃখ দ্বারা অভিভূত মানুষের এই যে শান্তিপথ আপনি কৃপা করে দেখালেন, এ আমার ন্যায় ব্যক্তিরা দেখতে পায় না সত্যি, কিন্তু আমি ক্ষত্রিয়স্বভাব বশত দুর্বিনীত হয়েছি। এর পর সুরুচির দুর্বাক্যবাণে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়েছে। সেই বিদীর্ণ হৃদয়ে শান্তির কথা স্থান পাচ্ছে না। প্রভু, আমার পূর্বপুরুষগণ যে পদে কখনও অধিষ্ঠান করেন নি এবং যা উৎকৃষ্ট পদ, আমি সেই পদ লাভ করতে ইচ্ছা করি। আমাকে তার উপযোগী উত্তম পথ বলে দিন। আপনি ভগবান ব্রহ্মার অংশ। আপনি সূর্যের ন্যায় পৃথিবীর মঙ্গলার্থ বীণা বাজাতে বাজাতে সর্বত্র ঘুরে বেড়ান। ৩৩-৩৮

মৈত্রেয় বললেন, ধ্রুবের এই কথা শুনে দেবর্ষি নারদ খুব সন্তুষ্ট হলেন এবং দয়া করে তাঁকে এই সদ্বাক্য বললেন, বৎস, তোমার জননী যা বলেছেন তাই তোমার অভিলষিত সিদ্ধির লাভের পথ ; সেই পথই হল ভগবান বাসুদেব। তুমি ভক্তিভাবে একমনে তাঁরই ভজনা কর। যে ব্যক্তি ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষরূপ নিজের

মঙ্গল ইচ্ছা করেন তাঁর শ্রীহরির পাদপদ্মই একমাত্র ভরসা। অতএব যমুনার পবিত্র তটে মধুবন নামে যে পুণ্যতম বন আছে, সেখানে ভগবান শ্রীহরি নিত্য অবস্থান করেন। তুমি সেখানে যাও; তোমার মংগল হোক। বৎস, কালিন্দীর পুণ্যসলিলে ত্রিসন্ধ্যা স্নান করবে; নিজের কর্তব্য কাজ করে কুশ দ্বারা আসন তৈরি করে তাতে স্বস্তিকাদি আসন-নিয়মক্রমে উপবিষ্ট হবে। পরে পূরক-কুম্ভক-রেচকরূপে ত্রিবিধ প্রাণায়াম করে তার দ্বারা প্রাণ, ইন্দ্রিয় ও মনের চাঞ্চল্য দূর করে ধীরচিত্তে ভগবান শ্রীহরির ধ্যান করতে থাকবে। ৩৯-৪৪

ভগবান শ্রীহরি সকল দেবতাদের মধ্যে পরম সুন্দর। তাঁর নাসিকা এবং ভ্রূযুগল রমণীয়, কপোলদেশ মনোহর, মুখ-চোখ সদাপ্রসন্ন। তাঁকে দেখলে মনে হয় তিনি যেন প্রসাদ দানে উন্মুখ। তাঁর ওষ্ঠ এবং চক্ষু অরুণবর্ণ, তাঁর দেহ-কান্তি যৌবনসম্পন্ন। তিনি প্রণতজনের আশ্রয়দাতা ও ভক্তজনের সুখকর, শরণাগতের প্রতিপালক এবং দয়ার আধার। তিনি শ্রীবৎসলাঞ্ছন; নতুন ঘাসের ন্যায় তাঁর শ্যাম গাত্রবর্ণ। তিনি পুরুষ-লক্ষণযুক্ত এবং বনমালাধারী। তাঁর চতুর্বাহুতে শংখ, চক্র, গদা, পদ্ম বিরাজমান। তাঁর মস্তকে মণি, কানে কুণ্ডল, হাতে বাজু ও বলয়, গলায় কৌস্তুভমণি; পরনে পীতবসন, নিতম্বদেশ কাঞ্চীদামে পরিবেষ্টিত; পায়ে সোনার নূপুর। দর্শনযোগ্য যা কিছু সামগ্রী আছে, শ্রীহরি সকলেরই শ্রেষ্ঠ। বৎস, যে ব্যক্তি তাঁর অর্চনা করে, নখের মত মণিশ্রেণীতে দেদীপ্যমান চরণদু'টি দ্বারা তিনি সেই ভক্তের হৃদয়ে প্রবেশ করে তার মনের মধ্যে বিরাজ করেন। তারপর পূর্বোক্ত ধারণা দ্বারা স্থির ও একাগ্রচিত্তে বরদশ্রেষ্ঠ সেই ভগবানকে মৃদু হাস্যযুক্ত ও অনুরাগের সঙ্গে দর্শনকারীর ন্যায় ধ্যান করবে। এই প্রকার মঙ্গলরূপ ধ্যান করলে তোমার মন অচিরেই পরমশান্তি লাভ করবে; আর তা থেকে নিবৃত্ত হবে না। ৪৫-৫২

রাজনন্দন, পরম গুহ্য মন্ত্র তোমাকে বলছি, মন দিয়ে শোনো। সেই মন্ত্রের এরূপ মাহাত্ম্য যে সাত রাত পাঠ করলে তার প্রভাবে মানুষ দেবদর্শন লাভ করতে পারে। সে মন্ত্র এই—'ওঁ নমো ভাগবতে বাসুদেবায়'। বৎস ধ্রুব, দেশকাল বিবেচনায় পণ্ডিত ব্যক্তি এই মন্ত্র দ্বারা বিবিধ দ্রব্য প্রদান করে ভগবানের পুজো করবে। পবিত্র জল, মালা, বন্য ফল-মূল, প্রশস্ত দূর্বাংকুর, বন্য বসন ও হরিপ্রিয়া তুলসী—এই সব দ্রব্য দ্বারা তাঁর অর্চনা করবে। যদি শিলাদি নির্মিত প্রতিমা দেখতে পাও, তবে তাতেই পুজো করবে। সেই ভাবে জল, মাটি প্রভৃতিতেও অর্চনা করবে। কিন্তু অর্চনা করবার জন্য অর্চনাকারীকে সংযতচিত্ত, মননশীল, শান্ত, সংযতবাক্ এবং পরিমিত ফলমূল-আহারী হতে হবে। পবিত্রকীর্তি ভগবান স্বেচ্ছায় নিজের মায়াযোগে যা যা করেন, সে সমস্তই হৃদয়ের মধ্যে কল্পনা করে চিন্তা করবে। ভগবানের যত রকম পরিচর্যা আগে কর্তব্য বলে নির্দিষ্ট হয়েছে, উল্লিখিত দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র দ্বারা সেই সব মন্ত্রমূর্তি ভগবানের উদ্দেশ্যে পুজো করবে। ৫৩-৫৮

বৎস, পূর্বোক্ত রীতিক্রমে ভগবানকে কামনা করে কায়মনোবাক্যে ভক্তিভাবে পরিচর্যা দ্বারা তাঁর উপাসনা করলে উপাসকের অনুরাগবর্ধনকারী ভগবান শ্রীহরি মানুষকে ধর্মার্থকাম প্রদান করেন। যে ব্যক্তি সাক্ষাৎ মুক্তিলাভের বাসনা করে, তিনি ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ে বিরত থেকে ভক্তিযোগ দ্বারা একান্তভাবে ভগবানকে ভজনা করবেন। দেবর্ষি নারদ এই রকম উপদেশ দান করলে রাজপুত্র ধ্রুব তাঁকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করে শ্রীহরিচরণ-চিহ্নে বিভূষিত পুণ্যতম মধুবনে

গেলেন। ধ্রুব বনে গেলে দেবর্ষি নারদ রাজা উত্তানপাদের পুরীর মধ্যে প্রবেশ করলেন। সেখানে রাজা তাঁকে যথেষ্ট সমাদর করে অর্ঘ্যাদি দিয়ে উপবেশন করার জন্য আসন দিলেন। নারদ সুস্থিরভাবে বসে রাজাকে চিন্তাযুক্ত দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, মহারাজ, আপনি অন্যমনস্ক কেন? কি চিন্তা করছেন? মুখ ম্লান দেখছি কেন? অর্থের সঙ্গে ধর্ম নষ্ট হয়েছে কি? ৫৯-৬৪

রাজা বললেন, ব্রাহ্মণ, আমি পত্নীর বশবর্তী পুরুষ; আমার হৃদয়ে দয়ার লেশমাত্র নেই। আমি পাঁচ বছর বয়স্ক সুবোধ বালক ধ্রুবকে তার জননীর সঙ্গে নির্বাসিত করেছি। শ্রান্তিতে সেই বালকের চাঁদমুখ এতক্ষণে ম্লান হয়ে থাকবে। সে ক্ষুধার্ত হয়ে অনাথের মত বনের মধ্যে শয়ন করলে বাঘ প্রভৃতি হিংস্রজন্তু কি তাকে এতক্ষণে খেয়ে ফেলে নি? আহা! আমি স্ত্রীর বশীভূত! আমার দুর্বলতা দেখুন। আমি এমন নরাধম যে আমার সেই বালক পুত্রটি আমাকে পিতা বলে ভালবেসে আমার কোলে উঠতে চাইলে তাকে একবারও আদর করিনি। নারদ বললেন, প্রজানাথ, দেবতারা তোমার পুত্রকে রক্ষা করছেন। তার যশোগৌরবে জগৎ পূর্ণ হবে তুমি তার প্রভাব না জেনে দুঃখ কর কেন? মহারাজ, ধ্রুব লোকপালদের দুঃসাধ্য কর্ম সম্পাদন করে তোমার যশ চারদিকে ছড়িয়ে অল্পদিনের মধ্যেই ফিরে আসবে। ৬৫-৬৯

মৈত্রেয় বললেন, নারদের কথা শুনে উত্তানপাদের উদাসীন ভাব উপস্থিত হল। তখন তিনি রাজলক্ষ্মীর প্রতি অনাদর করে কেবল পুত্রকেই চিন্তা করতে লাগলেন। এদিকে ধ্রুব কালিন্দীতে স্নান করলেন এবং সংযত হয়ে সেই রাত্রে উপবাস করে থাকলেন। তারপর সমাহিত হয়ে দেবর্ষির উপদেশ অনুসারে ভগবানের সেবায় প্রবৃত্ত হলেন। প্রতি তৃতীয় দিবসে তিনি মাত্র কপিত্থ (কদ্‌বেল) এবং বদরীফল (কুল) আহার করতে লাগলেন। এভাবে দেহ-ধারণ করে ভগবানের সেবায় তাঁর প্রথম মাস অতিক্রান্ত হল। পাঁচদিন অন্তর অন্তর শীর্ণ তৃণ-পত্রাদি আহার করে ধ্রুব ভগবানের সেবা দ্বারা দ্বিতীয় মাস যাপন করলেন। তারপর তৃতীয় মাসে তিনি প্রতি নয়দিনে শুধুমাত্র জল পান করে সমাধি যোগদ্বারা পবিত্রকীর্তি ভগবানের উপাসনা করতে আরম্ভ করলেন। চোদ্দ দিন গত হলে পনের দিনের দিন বায়ু-মাত্র সেবন করে শ্বাসরোধসহ ধ্যানযোগে ভগবানের ধারণা করতে শুরু করলেন। এভাবে চতুর্থ মাস কেটে গেল। ৭০-৭৫

যখন পাঁচ মাস অতিবাহিত হয়ে গেল তখন রাজকুমার ধ্রুব শ্বাস জয় করে এক পায়ে দাঁড়িয়ে থেকে ব্রহ্মের ধ্যানে নিশ্চলভাবে অবস্থান করতে লাগলেন। শব্দাদি বিষয় ও চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়দের বিশ্রাম-স্থান মনকে সকল বস্তু থেকে সরিয়ে হৃদয়মধ্যে আকর্ষণ করে কেবল ভগবানের ধ্যানে প্রবৃত্ত হলেন, ভগবান ছাড়া আর কিছুই তিনি দেখতে পেলেন না। এভাবে ধ্রুব মহদাদি তত্ত্বের আধার এবং প্রকৃতি-পুরুষের নিয়ন্তা পরমব্রহ্মকে ধ্যান করলে ত্রিভুবন কাঁপতে আরম্ভ করল। বিশাল হাতী ছোট একটি নৌকায় আরোহণ করলে তার বাঁ ও ডান প্রত্যেক পায়ের ভরে নৌকা যেমন নেমে পড়ে, ধ্রুব একপায়ে দণ্ডায়মান হয়ে তপস্যা করতে থাকলে ধরণী তাঁর পদাঙ্গুষ্ঠের ভারে সেই রকম অর্ধাংশ নত হয়ে পড়লেন। যখন ধ্রুব প্রাণ ও প্রাণের দ্বার নিরোধ করে নিজের সঙ্গে অভিন্নরূপ চিন্তা করে বিশ্বমূর্তি ভগবানের ধ্যানপরায়ণ হলেন, তখন লোকপাল সহ যাবতীয় লোকের যেন নিঃশ্বাসরোধ উপস্থিত হল। তাঁরা সবাই তখন ভগবান হরির শরণ নিলেন। দেবগণ ভয়ার্ত চিত্তে ভগবানকে সম্বোধন করে বললেন, ভগবান, চরাচর সমস্ত প্রাণীর শরীরে

এই রকম শ্বাসরোধ কখনও দেখিনি। এই যন্ত্রণা থেকে শীঘ্র আমাদের মুক্ত করুন। আপনি শরণাগতের পালক, আমরা আপনারই শরণাগত। শ্রীহরি দেবতাদের কাতরোক্তি শুনে বললেন, দেবগণ, তোমরা ভয় পেয়ো না। যে বালক থেকে তোমাদের শ্বাসরোধ উপস্থিত, তাকে দুরূহ তপস্যা থেকে আমি নিবৃত্ত করছি। সেই বালক রাজা উত্তানপাদের পুত্র, এখন তিনি ধ্যানযোগে আমার সঙ্গে মিলিত হয়েছেন। ৭৬-৮২

নবম অধ্যায়

ধ্রুবের বরলাভ ও পিতৃদত্ত রাজ্যপালন

মৈত্রেয় বললেন, ভগবানের কথায় দেবতাদের ভয় দূর হল। তাঁকে প্রণাম করে তাঁরা সকলে স্বর্গে ফিরে গেলেন। এদিকে ভগবানও ধ্রুবকে দেখবার বাসনায় গরুড়ের পিঠে চড়ে মধুবনে উপস্থিত হলেন। সে সময় ধ্রুবর মন সুদৃঢ় ধ্যান-যোগের দ্বারা নিশ্চল ছিল। তিনি তার সাহায্যে হৃৎপদ্মকোষে স্ফুরিত বিদ্যুৎ-প্রভার ন্যায় ভগবানের রূপ দেখছিলেন। ভগবান যখন ধ্রুবের হৃদয়মধ্য থেকে অন্তঃস্থ রূপ আকর্ষণ করে নিলেন, তখন ধ্রুব সহসা সেই রূপের অবসান দেখে সমাধি ভঙ্গ করে উঠে পড়লেন। চোখ খোলামাত্র হৃদয়মধ্যে যেরূপ দেখছিলেন, বাইরে ঠিক সেই রূপই দেখতে পেলেন। ধ্রুবের হৃদয় তখন আনন্দ ও ভক্তিতে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। তিনি ভগবানের উদ্দেশ্যে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন। তিনি ভগবানকে যেন চোখ দিয়ে পান, মুখ দিয়ে চুম্বন এবং হাত দিয়ে আলিঙ্গন করতে লাগলেন। ভগবান শ্রীহরি তাঁর এবং সকলেরই অন্তর্যামী, সকলেরই হৃদয়ে বাস করছেন। তাই শ্রীহরি বুঝতে পারলেন যে ধ্রুবের হরিগুণ বর্ণন করতে অভিলাষ জন্মেছে। কিন্তু ধ্রুব বালক, স্তব-স্তুতি কিছুই জানে না, কেবল জোড়হাতে সামনে দাঁড়িয়ে আছে। শ্রীহরি তখন বালক ধ্রুবের প্রতি দয়া করে বেদময় শঙ্খ দিয়ে তাঁর গাল স্পর্শ করলেন। তখন ধ্রুব জীব ও ঈশ্বরের তত্ত্ব জানতে পারলেন এবং ঈশ্বরের কথা তাঁর বোধগম্য হল। ভক্তিযোগে ও সপ্রেমে রাজতনয় স্তব আরম্ভ করলেন। ভগবানের বিপুল কীর্তি বিখ্যাত ; ধ্রুব ধীরভাবে সেই কীর্তি স্মরণ করে সুষ্ঠুভাবে তাঁর স্তব করলেন। বৎস বিদুর, এতেই ধ্রুবের ধ্রুবলোক প্রাপ্তি হয়। ১-৫

ধ্রুব বললেন, সর্বশক্তিমান যিনি অন্তর্যামীরূপে আমার অন্তঃকরণে প্রবেশ করে আমার প্রসুপ্ত বাকশক্তিকে এবং হস্ত, পদ, কর্ণ, ত্বক প্রভৃতি অন্যান্য ইন্দ্রিয়দের সঞ্জীবিত করছেন, আপনি সেই পরমপুরুষ ভগবান, আপনাকে নমস্কার। ভগবান, আপনিই সকল দেবতা-স্বরূপে গুণময়ী মায়াশক্তি দ্বারা অশেষ পদার্থের সৃষ্টি করেন এবং আপনিই মায়ার অসদ্‌গুণ যে ইন্দ্রিয়াদি তাতে অবস্থিত হয়ে সেই সেই ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতৃ দেবতারূপ গ্রহণ করে থাকেন। যেমন অগ্নি এক হলেও কাঠের বিভিন্নতা হেতু নানারকমে প্রকাশ পায়, আপনিও সেইরকম এক হলেও বিবিধ প্রকারে প্রকাশ পেয়ে থাকেন। তাই আপনি ছাড়া জ্ঞান-ক্রিয়া শক্তিধারী অন্য কেউ নেই। নাথ, স্বয়ং ব্রহ্মা আপনার শরণাপন্ন হয়ে আপনার প্রদত্ত জ্ঞান দ্বারা নিদ্রোত্থিত পুরুষের ন্যায় এই বিশ্ব অবলোকন করেন।

আপনার পাদমূল মুক্তপুরুষেরও আশ্রয়। হে আর্তবন্ধু, সেই মুক্তব্যক্তি কি ভাবে ঐ পাদমূল স্মরণ না করে থাকতে পারে? প্রভু, আপনি জীবের জন্ম-মৃত্যু মোচনের কারণ। যে সব ব্যক্তি কামাদি পার্থিব বিষয়ের জন্য আপনার ভজনা করে, আপনার মায়ায় তাদের চিত্ত নিশ্চয়ই বঞ্চিত হয়েছে। আপনি কল্পতরু স্বরূপ, কিন্তু মায়ায় মুগ্ধ হয়ে মানুষ আপনার কাছে মোক্ষ চায় না, এই শবতুল্য দেহ দিয়ে যা কিছু উপভোগ করা যায়, মানুষ কেবল তারই প্রার্থনা করে থাকে। বিষয়সুখ অকিঞ্চিৎকর; ঐ সুখ তো নরকেও আছে। আপনার পাদপদ্ম ধ্যান অথবা আপনার ভক্তজনের কথা শুনে যে সুখ হয়, আত্মনন্দরূপ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারেও সে সুখ লাভ করা যায় না। দেবতা হয়ে আমি বেশি কি সুখ পাব? কালরূপ খড়্গ দ্বারা বিমান খণ্ডিত হলে দেবতারাও পতিত হন। হে অনন্ত, আমার এই প্রার্থনা যে, যে সব নির্মলচিত্ত সাধু পুরুষ আপনার প্রতি সর্বদা ভক্তিমান থাকেন, আপনার কথা শুনতে পাবার জন্য তাঁদের সাহচর্য যেন আমি লাভ করি। তাহলে আমি সেই সঙ্গলাভে আপনার গুণকথামৃত পানে মত্ত হয়ে এই দুঃখময়, দুস্তর, ভয়ঙ্কর ভবসাগর পার হতে পারব। ৬-১১

হে পদ্মনাভ, আপনার চরণকমলের সুগন্ধে যাঁদের হৃদয় আকৃষ্ট হয়েছে তাঁদের অনুষঙ্গী ব্যক্তিরা অতি প্রিয় এই নশ্বর দেহ, দেহের অনুবর্তী গৃহ, ধন, পুত্র, কলত্র কিছুই চিন্তা করেন না। হে অজ, আপনার এই বিরাটরূপ—পশু, পাখী, নগ, বিহগ, সরীসৃপ, দেব, দৈত্য, মানুষ দ্বারা ব্যাপ্ত। সৎ ও অসৎ অর্থাৎ স্থূল ও সূক্ষ্ম নিখিলবস্তু এবং মহৎ প্রভৃতি বহু সংখ্যক উপাদান এর কারণ—আমি কেবল এইরূপ মাত্রই জানি। এ ছাড়া আপনার যে সগুণ ঈশ্বরমূর্তি এবং নির্গুণ ব্রহ্ম স্বরূপ আছে তার সন্ধান আমি জানি না। যে পুরুষ কল্পান্তে অনন্তনাগকে সহায় করে অখিল বিশ্ব আত্মজঠরে গ্রহণ করে যোগনিদ্রা অবলম্বন করেন ও নিজের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে ঐ অনন্ত নাগের অঙ্করূপ পালঙ্কে শুয়ে ছিলেন, এবং যাঁর নাভিরূপ সমুদ্রে উৎপন্ন স্বর্ণময় লোকবৎ উজ্জ্বল পদ্মের গর্ভে তেজস্বী ব্রহ্মা উৎপন্ন হয়েছিলেন, আমি সেই ভগবানকে প্রণাম করি। প্রভু, আপনি জীব থেকে ভিন্ন। কারণ আপনি নিত্যমুক্ত, জীব সংসারাবদ্ধ; আপনি সর্বতোভাবে শুদ্ধ, জীব অত্যন্ত মলিন; আপনি সর্বজ্ঞ, জীব অজ্ঞ; আপনি আত্মা, জীব জড়; আপনি নির্বিকার, জীব বিকারী; আপনি আদিপুরুষ (জন্মরহিত), জীব আদিমান (জন্মযুক্ত); আপনি ঐশ্বর্যশালী, জীব ঐশ্বর্যহীন; আপনি গুণত্রয়ের অধীশ্বর, জীব ত্রিগুণের অধীন। যেহেতু আপনি অখণ্ড দৃষ্টি দ্বারা সমগ্র বুদ্ধির অধিকারী এবং বিশ্বপালনের জন্য যজ্ঞাধিষ্ঠাতা বিষ্ণু স্বরূপে বিদ্যমান আছেন, অতএব আপনি যে জীব থেকে সর্ব প্রকারে স্বতন্ত্র, তা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। পরস্পর বিরুদ্ধভাবাপন্ন বিদ্যা, অবিদ্যা প্রভৃতি নানাবিধ শক্তির যিনি আধার তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই এই বিশ্বের উৎপাদক, তিনিই অদ্বিতীয়, অনাদি, অনন্ত, অবিকার এবং আনন্দ মাত্র; আমি তাঁর শরণাগত হলাম। ভগবান, যে সব ব্যক্তি নিষ্কাম হয়ে পরমানন্দ স্বরূপ আপনার মূর্তিকে পুরুষার্থ জেনে ভজনা করেন, তাঁদের পক্ষে আপনার পাদপদ্মই পরম অর্থ। গাভী যেমন আপন ক্ষুদ্র বৎসকে প্রতিপালন করে এবং ব্যাঘ্রাদি থেকে রক্ষা করে, সেই রকম আপনি আমাদের সংসারভয় থেকে রক্ষা করে থাকেন। আপনি সর্বদাই লোকের মঙ্গলসাধনে তৎপর। ১২-১৭

ধ্রুব এই রকম স্তব করলে ভক্তানুরক্ত ভগবান বললেন, ক্ষত্রিয়বালক, তোমার সংকল্প জানতে পারলাম; তোমার মঙ্গল হোক। আমি এক দীপ্তিশালী,

নিত্যস্থায়ী এবং গ্রহনক্ষত্র সমন্বিত দুর্লভ স্থান তোমাকে দিচ্ছি। মেধিস্তম্ভে[১] নিবন্ধ বলদের ন্যায় সমস্ত গ্রহনক্ষত্রাদি যে ধ্রুবলোককে কেন্দ্র করে ভ্রমণ করে, সেখানে কেউ কখনই বাস করতে সমর্থ হয় নি। কল্পের শেষ পর্যন্ত যাঁরা সেখানে বাস করবেন, তাঁদের বিনাশ হলেও ঐ স্থান কখনও নষ্ট হবে না। ধর্ম, অগ্নি, কশ্যপ, ইন্দ্র এবং সপ্তর্ষিরা তারকাদির সঙ্গে নিরন্তর ঐ স্থানকে প্রদক্ষিণ করছেন। ঐ স্থানে তুমি রাজ্যভোগ করবে। সম্প্রতি তোমার পিতা ধর্ম অবলম্বন করে তোমাকে পৃথিবী শাসনের ভার দিয়ে বনে যাবেন, তুমি ছত্রিশ হাজার বছর পর্যন্ত রাজত্ব করবে। এই সময়ে তোমার ইন্দ্রিয়সকল অটুট থাকবে। তোমার ভ্রাতা উত্তম মৃগয়া করতে গিয়ে নিরুদ্দেশ হবে। তোমার বিমাতা সুরুচি তন্মনা হয়ে বনে বনে তার খোঁজ করতে গিয়ে দাবাগ্নির কবলে পড়বে। ১৮-২৩

বৎস, যজ্ঞই আমার প্রিয়; তুমি যদি প্রচুর দক্ষিণা প্রদান করে যজ্ঞ দ্বারা আমার অর্চনা কর, তা হলে ইহলোকে সমস্ত কাম ভোগ করে অন্তিমকালে আমাকে স্মরণ করবে। তখন আমার ধামে পৌঁছাতে পারবে। এই সর্বলোকপূজ্য স্থান ঋষিদের স্থানেরও ঊর্ধ্বে এবং যোগীদের গন্তব্যস্থান বলে কথিত। সেখানে গেলে আর কাউকে ফিরে আসতে হয় না। মৈত্রেয় বললেন, বিদুর. ভগবান এইভাবে অর্চিত হয়ে বালক ধ্রুবকে আপনার পরমপদ প্রদান করলেন এবং তাঁর সমক্ষে গরুড়ে আরোহণ করে নিজ ধামে প্রস্থান করলেন। ধ্রুব ভগবান বিষ্ণুর পদসেবা দ্বারা সংকল্পিত মনোরথ লাভ করেও অনতিপ্রীত চিত্তে পিতার ঘরে ফিরে গেলেন। ধ্রুব বালক ছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁর বাসনা অতি মহৎ। মুনিবর মৈত্রেয়কে বিদুর জিজ্ঞাসা করলেন, মুনিবর, শ্রীহরির পরমপদ সকাম পুরুষের অত্যন্ত দুর্লভ। ধ্রুব সামান্য ব্যক্তি নন; তিনি পুরুষার্থবেত্তা। শ্রীহরির সেই পরমপদ একজন্মে লাভ করেও তিনি আপনাকে কেন বিফলমনোরথ মনে করেছিলেন? তিনি যখন বিশেষ প্রীত না হয়ে পিতার ঘরে ফিরে এলেন তখন নিশ্চয়ই তাঁর বাসনা পূর্ণ হয়নি। ২৪-২৮

মৈত্রেয় উত্তর দিলেন, বিমাতার বাক্যরূপ বাণ ধ্রুবের হৃদয়ে বিঁধেছিল। তা মনে করে তিনি তখন শ্রীহরির কাছে মুক্তি প্রার্থনা করেননি, তাই পরে তাঁর মনস্তাপ উপস্থিত হয়েছিল। এই জন্য ধ্রুব দুঃখ করে বলেছিলেন, হায়, কি দুঃখের বিষয়! সনন্দ প্রভৃতি ঊর্ধ্বরেতা মুনিরা বহুজন্মের সাধনায় যে পদ জানতে পারেন আমি ছয় মাসের মধ্যে শ্রীহরির সেই চরণযুগলের ছায়ায় উপস্থিত হলেও ভেদদৃষ্টি বশত আমার অবনতি হল। আহা, আমি কি মন্দভাগ্য! আমার মূর্খতা দেখ, আমি ভবনাশন ভগবানের পাদমূলে উপস্থিত হয়ে নশ্বর বস্তু প্রার্থনা করেছি। আমার বোধ হয়, দেবগণ আমার থেকেও নিম্নস্থান পাওয়ার আশংকায় ঈর্ষাবশত অসহিষ্ণু হয়ে আমার বুদ্ধিকে বিকৃত করে দিয়ে থাকবেন। তা না হলে নারদের সেই হিতকর কথা অগ্রাহ্য করব কেন? আমি অসৎ; নিদ্রিত ব্যক্তি যেমন স্বপ্ন দেখে সেই রকম আমি দৈবী মায়া আশ্রয় করে দৃষ্টির বৈষম্যহেতু দ্বিতীয় ব্যক্তি বস্তুত না থাকলেও ভ্রাতাকে শত্রু বোধ করে মনস্তাপে জ্বলছি। জগতের আত্মা ভগবানকে প্রসন্ন করা দুঃসাধ্য; আমি তপস্যা দ্বারা তাঁকে প্রসন্ন করেও একি অকিঞ্চিৎকর প্রার্থনা করেছি? মৃতপ্রায় ব্যক্তিকে চিকিৎসা করলে যেমন তা নিষ্ফল হয়, আমার প্রার্থিত বিষয়ও সেরূপ অনর্থক হয়েছে। আমি এমন মন্দভাগ্য, শ্রীহরির কাছে সংসার-সুখ প্রার্থনা করেছি। তিনি আমাকে আত্মানন্দ দান করছিলেন।

১ ধান মাড়বার জন্য গো-মহিষাদি বন্ধনার্থ স্তম্ভবিশেষ

যেমন নির্ধন ব্যক্তি রাজার কাছে সতুষ তণ্ডুলকণা প্রার্থনা করে সেরূপ আমি এমন ক্ষীণপুণ্য ও মূঢ় যে মোহবশত তাঁর কাছে অভিমান ভিক্ষা চাইলাম। ২৯-৩৫

মৈত্রেয় বললেন, বিদুর, যে সব ব্যক্তি তোমার মত মুকুন্দের পাদপদ্ম ভজনা করেন, তাঁরা ভগবানের দাস্য ছাড়া অন্য কিছুই চান না। তোমার মত ব্যক্তির অন্য বিষয়ে বাসনা নেই, যা উপস্থিত হয়, তাতেই আত্মসন্তোষে লাভ করে থাকে। এদিকে রাজা উত্তানপাদ দূতমুখে শুনলেন যে পুত্র ধ্রুব ফিরে আসছেন। কিন্তু মৃত ব্যক্তি ফিরে আসছে বললে সে কথা যেমন কেউ বিশ্বাস করে না, সেরূপ এই কথায় রাজা কান দিলেন না। ক্রমে রাজার নারদের কথা স্মরণ হল, 'শীঘ্রই তোমার পুত্র ফিরে আসবেন'। সেই কথায় বিশ্বাস হওয়াতে রাজা আনন্দাতিশয্যে দূতকে মহামূল্য হার উপহার দিলেন। তখন সন্তানকে দেখার জন্য তিনি খুব অস্থির হয়ে উঠলেন। তখনি উত্তম অশ্বযুক্ত স্বর্ণমণ্ডিত রথ সুসজ্জিত করে তিনি তাতে আরোহণ করলেন এবং ব্রাহ্মণ কুলবৃদ্ধ, অমাত্য ও বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে করে শীঘ্রই প্রাসাদ থেকে যাত্রা করলেন। চারদিকে মঙ্গলশঙ্খ বাজতে লাগল এবং দুন্দুভি ও বংশীধ্বনি এবং বেদপাঠ শুরু হল। রত্নালংকারে বিভূষিতা সুনীতি ও সুরুচি দুই রাজমহিষী এক শিবিকায় আরোহণ করে উত্তমকে সঙ্গে নিয়ে নরপতির সঙ্গে চললেন। ৩৬-৪১

এরপর ধ্রুবকে উপবনের কাছে আসতে দেখে রাজা রথ থেকে তাড়াতাড়ি নেমে পায়ে হেঁটে তাঁর কাছে এলেন এবং আনন্দে গদ্‌গদ হয়ে দুই হাত বাড়িয়ে সন্তানকে আলিংগন করলেন। তখন রাজার ঘন ঘন নিশ্বাস বইতে লাগল। আজ রাজা যাকে আলিংগন করলেন, ভগবানের চরণস্পর্শে তাঁর পাপরাশি বিনষ্ট হয়েছে। রাজা বারবার পূর্ণমনোরথ সন্তানের মস্তক আঘ্রাণ করলেন এবং আনন্দাশ্রু দ্বারা তাঁকে অভিষিক্ত করলেন। পিতা আলিঙ্গন করে আশীর্বাদ করলে ধ্রুব তাঁর চরণ-যুগল বন্দনা করলেন। তারপরে মাতা ও বিমাতাকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলেন। সুরুচি নিজচরণে প্রণত সেই বালককে হাত ধরে তুলে আলিংগন করে বাষ্পগদ্‌গদ কণ্ঠে বললেন, বৎস, চিরজীবী হয়ে থাক। শ্রীহরি মৈত্রী প্রভৃতি[১] গুণে যার প্রতি প্রসন্ন হন, নিম্নগামী জলধারার ন্যায় সর্বলোক সেই ব্যক্তির প্রতি আপনা থেকেই প্রসন্ন হয়ে থাকে। ৪২-৪৭

এরপর উত্তম ও ধ্রুব উভয় ভ্রাতা প্রেমবিহ্বল হয়ে পরস্পর আলিংগনে পুলকিত হলেন। তখন উভয়ের চোখ দিয়েই অবিরত প্রেমাশ্রুধারা বইতে লাগল। ধ্রুবের মা সুনীতি প্রাণাপেক্ষা প্রিয় পুত্রকে কোলে নিয়ে নিজের মনের ক্ষোভ দূর করলেন। সন্তানের সুকোমল অংগস্পর্শে সুনীতির পরম সুখানুভব হল। বিদুর, সেই সময়ে বীরপ্রসবিনী সুনীতির আনন্দাশ্রুতে সিক্ত স্তনদ্বয় থেকে বারবার দুগ্ধক্ষরণ হতে লাগল। সর্বলোকে বলতে লাগল, আজ মহারাজ্ঞী আপন সৌভাগ্যের ফলে চিরকালের অনুদ্দিষ্ট সন্তানকে পুনরায় ফিরে পেলেন। এই সন্তানই সমগ্র ভূমণ্ডল পালন করবেন। রাজ্ঞী, আমাদের নিশ্চয়ই বোধ হচ্ছে যে আপনি বিপদভঞ্জন ভগবানের একান্ত আরাধনা করেছিলেন। শ্রীহরির ধ্যান করে যোগীরা দুর্জয় মৃত্যুকেও জয় করে থাকেন। পৌরবর্গ এইভাবে ধ্রুবের গুণকীর্তন করতে থাকলে রাজা উত্তানপাদ ধ্রুব ও উত্তমকে হাতীর ওপর চড়িয়ে নিজের সঙ্গে নিয়ে পুরীতে প্রবেশ করলেন। জনসাধারণ তাঁর স্তব করতে লাগল। ৪৮-৫৩

---

১ মৈত্রী প্রভৃতি— করুণা, তিতিক্ষা, মুদিতা।

পুরের প্রত্যেক দ্বারে ফলমঞ্জরীযুক্ত কদলীস্তম্ভ ও নবীন বৃক্ষস্তবক স্থাপিত, মকরাকৃতি তোরণের উপরিভাগ পুষ্পমাল্যে সুশোভিত এবং আম্রপল্লব, নববস্ত্র-বিলম্বিত ও মুক্তামালা শোভিত ; প্রদীপসহ পূর্ণকুম্ভ বহির্ভাগে সারি সারি স্থাপিত ; সেই পুরীর প্রাচীর, পুরদ্বার ও গৃহগুলি স্বর্ণ পরিচ্ছদে বিভূষিত হয়ে বিমানশিখরের মত শোভা পাচ্ছিল। সেখানকার অঙ্গন, রাজপথ এবং উচ্চ অট্টালিকার উপর নির্মিত রম্য ক্রীড়াস্থলগুলি সম্মার্জিত এবং চন্দন দ্বারা চর্চিত। সেস্থান খৈ, যব, ফুল, চাল ও নানারকম পূজার উপহারে সর্বদা সুসজ্জিত। ধ্রুবকে আসতে দেখে সাধ্বী কুলবধূরা হৃষ্টচিত্তে আশীর্বাদ করতে করতে শ্বেতসর্ষপ, যব, দই, দূর্বা, ফুল, ফল প্রভৃতি উপহার পাঠাতে লাগলেন এবং তারপরই তাঁরা মধুস্বরে ধ্রুবের গুণগান আরম্ভ করলেন। ধ্রুব সেই গান শুনতে শুনতে নিজের ঘরে প্রবেশ করলেন। সেখানে রাজা উত্তানপাদ পুত্রের বাসযোগ্য মহামণিখচিত উৎকৃষ্ট ভবন নির্দিষ্ট করে দিলেন। স্বর্গবাসী দেবতাদের ন্যায় তিনি পরমসুখে সেই গৃহে বাস করতে লাগলেন। ৫৪-৬০

সেই গৃহে গজদন্ত নির্মিত পালঙ্কে দুগ্ধফেননিভ শয্যা, স্বর্ণময় পরিচ্ছদ, মহামূল্য আসন ও স্বর্ণের সম্মার্জনী এবং স্ফটিক ও মরকতময় ভিত্তিতে মণিময় প্রদীপগুলি সুন্দরী রমণীদের হাতে রত্ন-অলংকারের সঙ্গে দীপ্তি পেতে লাগিল। গৃহের নিকট মনোহর উদ্যানগুলি বিচিত্র বৃক্ষরাজিতে বড়ই রমণীয় মনে হচ্ছিল। সেই সব বৃক্ষের ওপরে বিহঙ্গমিথুন মধুর স্বরে আলাপ এবং ভ্রমর গুন্ গুন্ রবে গান করতে লাগল। ঐ উদ্যানের জলাশয়গুলির সোপান বৈদূর্যমণি নির্মিত ছিল। জলের মধ্যে পদ্ম, উৎপল, কুমুদ পুষ্পাবলী পরম শোভা বিস্তার করল। সেখানে হাঁস, কারণ্ডব, চক্রবাক এবং সারসাদি জলচর জীবসমূহ জলকেলি করতে লাগল। রাজা উত্তানপদ পুত্রের অত্যাশ্চর্য প্রভাব দেখে ও শুনে বিস্ময়াপন্ন হলেন। তারপর পুত্র প্রাপ্তযৌবন হলে এবং প্রজাবর্গের তাঁর অনুরক্তি দেখে মন্ত্রী ও প্রজাবৃন্দের সম্মতি নিয়ে তিনি তাঁকে পৃথিবীর অধীশ্বর করলেন। বার্ধক্য হেতু নিজের মৃত্যু সমাগত জেনে উত্তানপাদ বিষয়ভোগে বীতস্পৃহ হলেন এবং শ্রীহরি লাভের উপায় চিন্তা করে বনে প্রস্থান করলেন। ৬১-৬৭

দশম অধ্যায়

যক্ষদের সঙ্গে ধ্রুবের যুদ্ধ

মৈত্রেয় বললেন, বৎস বিদুর, ধ্রুব রাজ্যে অভিষিক্ত হয়ে শিশুমারের কন্যা ভ্রমিকে বিবাহ করলেন। তাঁর গর্ভে কল্প ও বৎসর নামে দুই পুত্র জন্মাল। ভ্রমি ছাড়াও বায়ুকন্যা ইলা মহাবীর ধ্রুবের আর এক মহিষী ছিলেন। ইলার গর্ভে উৎকল নামে এক পুত্র এবং একটি সুশ্রী কন্যা জন্মলাভ করে। উত্তম বিবাহ করেন নি। একদিন মৃগয়ায় গিয়ে বনের মধ্যে তিনি এক বলবান যক্ষের দ্বারা নিহত হন। উত্তমের মাতা সুরুচিও পুত্রের অনুসন্ধানের জন্য বনে গিয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হন। পরে ধ্রুব যখন শুনতে পেলেন যে এক যক্ষ তাঁর ভাইয়ের প্রাণবধ করেছে, তখন তিনি ক্রোধে, ক্ষোভে ও শোকে অভিভূত হয়ে জয়শীল রথে চড়ে যক্ষালয়ে যাত্রা করলেন। উত্তরদিকে গিয়ে তিনি হিমালয়ের উপত্যকায় রুদ্রানুচরদের অধিষ্ঠিত

এবং গুহ্যকদের পরিপূর্ণ এক পুরী দেখতে পেলেন। মহাবাহু ধ্রুব সেই পুরীর নিকট উপস্থিত হয়ে শঙ্খধ্বনি করলেন। আকাশ ও সকল দিক থেকে তা ঘোররবে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। ঐ শঙ্খ-নিনাদে যক্ষরমণীগণ উদ্বিগ্ন হয়ে অত্যন্ত ভয় পেল। ১-৬

যক্ষসেনারা মহাবলপরাক্রান্ত। তারা ঐ শব্দ সহ্য করতে না পেরে বাইরে এল এবং নিজের নিজের অস্ত্র উদ্যত করে ধ্রুবর দিকে ছুটে এল। মহাবীর ধ্রুব তাদের আসতে দেখে এক এক জনকে তিনটি করে বাণে আঘাত করে ক্রমে সকলকেই বিদ্ধ করলেন। যক্ষসৈন্যরা ঐ সব বাণের আঘাতে নিজেদের পরাজিত বোধ করল এবং ধ্রুবের যুদ্ধনৈপুণ্যের প্রশংসা করতে লাগল। কিন্তু সাপেরা যেমন পদাঘাত সহ্য করতে পারে না, যক্ষসেনারাও সেই রকম ধ্রুবের বীরত্ব সহ্য করতে না পেরে দারুণ প্রতিহিংসায় প্রত্যেকে ছয় ছয়টা বাণ তাঁর ওপর নিক্ষেপ করল। তারপর তের অযুত সেনা একেবারে ক্রোধান্বিত হয়ে তাঁর সারথি ও রথের ওপর পরিঘ, খড়্গ, প্রাস, শূল, কুঠার, শক্তি, ঋষ্টি, ভুষণ্ডী ও বিচিত্রপক্ষবিশিষ্ট শরসমূহ নিক্ষেপ করতে লাগল। ধ্রুব ঐরকম অসংখ্য অস্ত্রবর্ষণে এরকম আচ্ছন্ন হলেন যে বারিধারা পতনে আচ্ছন্ন পর্বতের মত তাঁকে আর দেখতে পাওয়া গেল না। ৭-১৩

এই সময় সিদ্ধরা স্বর্গ থেকে যুদ্ধ দেখছিলেন। ধ্রুবকে যক্ষসেনা দ্বারা পরিবেষ্টিত দেখে তাঁরা এই বলে হাহাকার করতে লাগলেন, হায়! এই সূর্যের ন্যায় অমিততেজ ধ্রুব যক্ষসৈন্য-সাগরে বুঝি তলিয়ে গেলেন। তারপর যক্ষরা যুদ্ধ জয় করেছি, জয় করেছি' এই বলে সশব্দে আপনাদের জয় ঘোষণা করতে আরম্ভ করলে মেঘমধ্য থেকে সূর্য যেমন উদিত হন, সেই রকম ধ্রুবের রথ অস্ত্রজাল ভেদ করে বেরিয়ে এল। তিনি নিজের ভীষণ শরাসনে টংকার দিয়ে শত্রুদের হৃৎকম্প সৃষ্টি করলেন। পরে বায়ু যেমন মেঘজাল ছিন্নভিন্ন করে দেয়, সেইরকম তিনি নিজের বাণ দ্বারা বিপক্ষের অস্ত্রগুলি নিষ্ক্রিয় করে ফেললেন। বজ্র যেমন পাহাড় পর্যন্ত বিদীর্ণ করে, তাঁর ধনুর্মুক্ত বাণগুলি সেইরকম রাক্ষসদের (যক্ষদের) কবচ ভেদ করে তাদের দেহে প্রবেশ করতে লাগল। ভল্লাস্ত্র দ্বারা রাক্ষসরা ছিন্নভিন্ন হওয়াতে তাদের কুণ্ডলশোভিত মস্তক, তালবৃক্ষতুল্য বিশাল উরু, বলয়ভূষিত বাহু এবং মহামূল্য হার, কেয়ূর, মুকুট ও উষ্ণীষসমূহে সেই রণাঙ্গণ পরিপূর্ণ হয়ে অপরূপ শোভা ধারণ করিল। ১৪-১৯

এইভাবে ধ্রুবের শরাঘাতে অধিকাংশ যক্ষ ও রাক্ষস নিহত হল। অবশিষ্টদের দেহ বাণের আঘাতে ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে গেল। সিংহ কর্তৃক বিতাড়িত হয়ে গজেন্দ্র যেমন পলায়নপর হয়, সেই রকম তারাও ভয়ে পালাল। তখন একজনও শত্রু দেখতে না পেয়ে ধ্রুবের অলকাপুরী দেখতে ইচ্ছা হল। কিন্তু মায়াবী যক্ষরা পাছে কোন অনিষ্ট করে এই ভয়ে তিনি তাঁর সংকল্প প্রত্যাহার করলেন। পরে সারথিকে সম্বোধন করে বললেন, সারথি, মায়াবীরা কি করতে চায়, হঠাৎ তা লোকের বোধগম্য হয় না। তারপর তিনি মনে মনে এই আশংকা করতে লাগলেন—শত্রুপক্ষ কি আবার আক্রমণ শুরু করবে? যখন তিনি এই রকম চিন্তা করছিলেন তখনই সমুদ্র-গর্জনের ন্যায় গভীর শব্দ তাঁর কানে গেল। প্রচণ্ড বায়ুবেগে ধূলিরাশি আকাশে উড়ে সকল দিক আচ্ছন্ন করে ফেলল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সারা আকাশ মেঘে ঢেকে গেল। ঐ মেঘে বিদ্যুৎ চমকাতে শুরু করল এবং তৎসহ ভয়ংকর বজ্রাঘাতের ধ্বনি শোনা গেল। ২০-২৩

তাঁর সামনে আকাশ থেকে রক্ত, পূঁয, বিষ্ঠা, মূত্র, মেদ বৃষ্টি হতে লাগল।

তারপর আকাশে একটা পর্বত দেখা গেল এবং তা থেকে চতুর্দিকে শিলা, গদা, পরিঘ, খড়্গ ও মুষলবৃষ্টি হতে লাগল। ২৪-২৫

অসংখ্য সাপ বজ্রগর্জনের ন্যায় ভয়ংকর নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে ক্রোধপূর্ণ রক্তচক্ষু দ্বারা অগ্নিবর্ষণ করতে লাগল এবং সিংহ-বাঘ-হাতীরা সব মত্ত হয়ে দলে দলে বেগে তাঁর দিকে আসতে লাগল। ভীমমূর্তি সমুদ্র প্রবল তরঙ্গে ভয়ংকর রূপ ধারণ করল এবং বার বার উদ্বেল হয়ে পৃথিবীকে জলপ্লাবিত করে ধ্রুবের দিকে ছুটে আসল। গভীর নির্ঘাত শব্দ হতে লাগল, মনে হল যেন প্রলয় সমাসন্ন। বিদুর, যক্ষরা খলস্বভাব, তারা আসুরী মায়া দিয়ে বিবিধ উৎপাত সৃষ্টি করতে লাগল; ফলে দুর্বলচরিত্র লোকেরা ভয়ে সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল। যক্ষরা ধ্রুবের প্রতি ঐ রকম দুস্তর মায়া বিস্তার করেছে জানতে পেরে মুনিরা ধ্রুবের কাছে এলেন এবং মঙ্গল প্রার্থনা করতে করতে বললেন, উত্তানপাদ-পুত্র, ভগবান শার্ঙ্গধন্বা শ্রীহরি ভক্তদের দুঃখ দূর করেন, তিনিই তোমার শত্রুকুলকে নির্মূল করুন। সেই ভগবানের নাম শুনলে মৃত্যু-সংসার থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। ২৬-৩০

একাদশ অধ্যায়

স্বায়ম্ভুব মনুর তত্ত্বোপদেশ দান ও ধ্রুবের যুদ্ধবিরতি

মৈত্রেয় বললেন, বিদুর, ঋষিরা এরকম বলতে থাকলে ধ্রুব তাঁদের উপদেশ শুনে আচমন করে নিজের ধনুতে নারায়ণাস্ত্র সন্ধান করলেন। তিনি যখন ধনুতে শরসন্ধান করছিলেন, তখন জ্ঞানের উদয় হলে রাগাদি ক্লেশের যেমন বিনাশ হয় সেই রকম, গুহ্যক নির্মিত আসুরী মায়াগুলি তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়ে গেল। নারায়ণাস্ত্র থেকে অসংখ্য শর বের হয়ে সশব্দে বিপক্ষের সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করতে লাগল। তাতে মনে হল যেন ময়ূরযূথ কেকারব করতে করতে মহারণ্যে প্রবেশ করছে। ঐসব শর দেখতে চমৎকার। শরগুলির মুখের দুই প্রান্তভাগ স্বর্ণময় এবং পক্ষ কলহংসদের পক্ষের মতো মনোহর। ঐসব তীক্ষ্নধার শরে নিপীড়িত যক্ষরা যত্রতত্র পালাতে শুরু করল। অবশেষে সাপেরা যেমন ফণা তুলে গরুড়ের দিকে ধাবিত হয়, তারাও তেমনি ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে নিজ নিজ অস্ত্র উত্তোলন করে তাঁর দিকে প্রবল বেগে ছুটে আসতে লাগল। সশস্ত্র যক্ষদের মারমুখী হয়ে আসতে দেখে ধ্রুব বাণ-বৃষ্টি দ্বারা তাদের হাত, উরু, ঘাড় ও পেট ছিন্ন করে ফেললেন। ঊর্ধ্বরেতা মহর্ষিরা সূর্যমণ্ডল ভেদ করে যে লোকে গিয়ে থাকেন, যক্ষরাও মৃত্যুর পর সেই লোক পেল। ১-৫

মহাবীর ধ্রুব এইভাবে বহু নিরপরাধ যক্ষের প্রাণ বিনাশ করতে প্রবৃত্ত হলে পিতামহ মনুর হৃদয়ে দয়ার উদ্রেক হল। তিনি মহর্ষিদের সঙ্গে ধ্রুবের কাছে স্বয়ং এসে বললেন, বৎস, ক্রোধ মহাপাপ এবং নরকের সাক্ষাৎ দ্বারস্বরূপ। অতএব ক্রোধে প্রয়োজন নেই। তুমি ক্রোধের বশবর্তী হয়ে নিরাপরাধ যক্ষদের প্রাণ বধ করলে। তুমি যে এই অল্প অপরাধে যক্ষদের বধ করতে প্রবৃত্ত হয়েছ এ আমাদের কুলের উচিত কাজ নয়। সাধুরা এই কুকার্যের অত্যন্ত নিন্দা করেন।

তুমি ভাতৃবৎসল, তোমার ভ্রাতা এদের দ্বারা নিহত হয়েছেন সত্যি, কিন্তু এরা সকলেই তাঁকে বধ করেনি, এদের মধ্যে একজন হয়ত বধ করেছে। এক জনের অপরাধে কি ভাবে তুমি এত লোককে হত্যা করলে? এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান দেহকে আত্মা মনে করে পশুরা দেহাভিমান হেতু পরস্পর পরস্পরকে বধ করে। প্রাণীদের সেই হিংসাভাব ভগবান হৃষীকেশের শরণাগত সাধু পুরুষদের পথ নয়। অতএব যদিও যক্ষদের অপরাধ থাকে, তবুও তাদের বধ করা তোমার পক্ষে অনুচিত। বৎস, তুমি সর্বপ্রাণীতে আত্মভাব চিন্তা করে প্রাণীদের আবাসভূমি ভগবান শ্রীহরির আরাধনা করে তাঁর সেই দুরারাধ্য পরমপদ লাভ করেছ। আমরা জানি ভগবান শ্রীহরির হৃদয়ে তোমার নিবাস এবং হরিভক্তরা তোমাকে সাধু বলে প্রশংসা করে থাকেন। তুমি এ রকম হয়ে এবং সাধুপুরুষদের ব্রত শিক্ষা করে কি ভাবে এমন নিন্দনীয় কাজে প্রবৃত্ত হলে? ৬-১২

সাধু ব্যক্তির পক্ষে তিতিক্ষা, অধমজনের প্রতি কৃপা, সমান ব্যক্তির সঙ্গে মিত্রতা এবং সর্বজীবকে সমান চোখে দেখা উচিত। এই সব সৎকার্য দ্বারাই সর্বাত্মা ভগবান প্রসন্ন হয়ে থাকেন। ভগবানের প্রসন্নতা লাভ করতে পারলেই জীব কৃতার্থ হয়। তখন সে প্রাকৃত গুণসমূহ থেকে মুক্তিলাভ করে। সুতরাং সে গুণের কার্যস্বরূপ লিঙ্গশরীর থেকে বিমুক্ত হয়ে সুখস্বরূপ ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হয়ে থাকে। তুমি যদি আত্মতত্ত্ব বিচার কর, তা হলে বুঝতে পারবে যে তোমার ভাইও কেউ নেই এবং তাঁকে কেউ বধও করে নি। পঞ্চভূত দেহাকারে পরিণত হয়ে স্ত্রী এবং পুরুষে পরিণত হয়, একথা সুপ্রসিদ্ধ। স্ত্রী-পুরুষের পরস্পর সংযোগে এই সংসারে অন্য স্ত্রী-পুরুষ জন্মে থাকে। ভগবানের মায়ার দ্বারা গুণসমূহের বৈষম্য ঘটলে পূর্বোক্তরূপে সৃষ্টি, স্থিতি এবং লয় পর্যায়ক্রমে প্রবর্তিত হয়। যেরকম একখণ্ড লোহা অয়স্কান্ত মণি (চুম্বক) দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে ভ্রমণ করতে থাকে, সেই রকম কার্য-কারণময় এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যে ভগবানে অবস্থিত হয়ে ভ্রমণ করছেন, তিনি কেবল নিমিত্তমাত্র, নির্গুণ। কালশক্তি দ্বারা গুণগুলির বিক্ষোভ হয়, তাতেই ভগবানের সৃষ্ট্যাদি বিষয়ক শক্তি বিভক্ত হয়ে যায়; সুতরাং ক্রমশ সৃষ্ট্যাদি হয়ে থাকে। কালবশত যখন গুণবিক্ষোভ হয়, তখন স্বয়ং ভগবান অকর্তা হয়েও কর্ম করে থাকেন এবং হন্তা না হয়েও হনন করেন। ভগবানের কালশক্তি চিন্তায়, বাক্যে প্রকাশ করা অসম্ভব। ১৩-১৮

সেই ঈশ্বরই পিত্রাদি দ্বারা পুত্রদের জন্ম দেন এবং তিনিই অন্তক, তাঁর থেকেই সৃষ্টি ও সংহার হয়। ঈশ্বর সকলেরই নিয়ন্তা, তিনিই সকলের কারণ; কিন্তু তিনি স্বয়ং অনাদি অনন্ত, তিনি সর্বশক্তিমান। ঈশ্বরের স্বপক্ষ বা বিপক্ষ কেউ নেই; তিনি মৃত্যুরূপী, তিনি সমভাবে সর্বজীবে প্রবেশ করছেন। প্রাণিগণ স্ব স্ব কর্মের অধীন। যেমন ধূলিরাশি বাতাসের পিছন পিছন উড়তে থাকে, সে রকম জীব নিজ নিজ কাজের অধীন হয়ে ঈশ্বরের অনুগামী হয়ে থাকে। ঈশ্বর স্বয়ং স্বচ্ছ, সেইজন্য তিনি উপচয় ও অপচয় বিহীন হয়ে কর্মাধীন জীবদের মধ্যে কারও অকালমৃত্যু বিধান করছেন, কাউকে বা অকালমৃত্যু থেকে রক্ষা করছেন। বৎস, ঈশ্বর যে এরকম তা সকলেই মেনে থাকে। এ-বিষয়ে কেবল নামমাত্র মতবৈধ দেখতে পাওয়া যায়। কেউ তাঁকে কর্ম বলে থাকে, কেউ স্বভাব, কেউ কাল, কেউ দৈব, আবার কেউ বা তাঁকে পুরুষের কাম অর্থাৎ বাসনা বলে থাকে। ঈশ্বর অব্যক্ত, সুতরাং অপ্রমেয়; তা থেকে মহৎ-তত্ত্বাদি নানা শক্তির উদয় হচ্ছে। এই জন্য তিনি আছেন—এই মাত্র বলা যেতে পারে। দেখ, যিনি এরকম তাঁর কি করতে বাসনা, তা বলতে কে সমর্থ হয়? সুতরাং স্বয়ং ঈশ্বরকে

কোন্ ব্যক্তিই বা জানতে পারবে? ঐ কুবের-অনুচরেরা তোমার ভ্রাতৃহন্তা নয়। প্রাণীর সৃষ্টি ও সংহার এই দুই বিষয়ে এক ঈশ্বরই কারণ, ঈশ্বর ছাড়া অন্য কারো দ্বারা এই দুই কাজ কি সম্ভব? কিন্তু যদিও কেবল তিনিই এই বিশ্বের সৃষ্টি-সংহার করছেন, তবু তাঁর ঐ সব বিষয়ে অহংকার মাত্র নেই, তিনি গুণ ও কর্ম দ্বারা লিপ্ত নন। ১৯-২৫

ভগবান নিজের মায়া দ্বারা সর্বভূতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় করছেন, এতে তাঁর অহংকার কি ভাবেই বা সম্ভব হবে? তিনি সর্বজীবের প্রকাশক, তিনিই তাদের প্রভু এবং তিনিই তাদের আত্মা। তিনি অভক্তজনের মৃত্যুরূপী এবং ভক্তজনের পক্ষে অমৃতস্বরূপ। তিনি এই জগতের পরমস্থান; দাঁড়িবাঁধা বলদের মত প্রজাপতিরাও তাঁর জন্য পূজোপহার আহরণ করে থাকেন। বৎস, পাঁচ বৎসর বয়সের সময় বিমাতার দুর্বাক্যবাণে জর্জরিত হয়ে মাকে ত্যাগ করে তুমি বনে গিয়েছিলে। সে সময় যাঁর আরাধনা করে ত্রিলোকেরও উপরে স্থান লাভ করেছ, এখন আত্মদর্শী হয়ে সেই নির্গুণ অবিনশ্বর অদ্বিতীয় আত্মারই সন্ধান কর। তিনি নির্বোধ অন্তঃকরণে বাস করেন এবং সকল সময়ই বিমুক্তস্বরূপ। ভেদ-জ্ঞান কারণে তাঁতেই এই অসৎ বিশ্ব বাস্তব বলে প্রতীয়মান হয়। তিনি সর্বান্ত-রাত্মা, ভগবান, অনন্ত, সর্বশক্তি-সম্পন্ন এবং আনন্দময়। তাঁর প্রতি ভক্তি করলে 'আমি', 'আমার' ইত্যাদি অজ্ঞানগ্রন্থি ছিন্ন করতে সমর্থ হবে। বৎস, ক্রোধ সংবরণ কর, তোমার মঙ্গল হোক। লোকে ওষুধের সাহায্যে যেমন রোগ উপশম করে, সেই রকম শাস্ত্রজ্ঞান দ্বারা নিজের অকল্যাণকর বিষয়ের শান্তি কর। ২৬-৩১

ক্রোধ অহিতকর বিপু। যে ব্যক্তি ক্রোধে অভিভূত হয় তাকে লোকে ভয় পায়। যে ব্যক্তি নিজের মঙ্গল কামনা করে, তার পক্ষে ক্রোধবশবর্তী হওয়া একান্তই অসমীচীন। বৎস, ধনপতি কুবের ভগবান গিরিশের ভ্রাতা। তুমি অসংখ্য যক্ষকে ভ্রাতৃহন্তা মনে করে ক্রোধের বশে বধ করে তাঁর প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করেছ। মহতের তেজ অতি ভয়ংকর, আমাদের বংশকে সেই তেজ আক্রমণ করার পূর্বেই শীঘ্র গিয়ে প্রণাম ও মধুর বাক্যে তাঁর সন্তোষ বিধান কর। ৩২-৩৪

স্বায়ম্ভুব মনু এই ভাবে নিজের পৌত্র ধ্রুবকে উপদেশ দান করে ধ্রুব কর্তৃক সম্মানিত হলেন এবং ঋষিদের নিয়ে নিজ বাসস্থানে ফিরে গেলেন। ৩৫

দ্বাদশ অধ্যায়

ধ্রুবের বিষ্ণুধামে আরোহণ

মৈত্রেয় ঋষি বিদুরকে বললেন, বৎস, কুবের যখন শুনলেন যে ধ্রুব পিতামহের কথায় ক্রোধ পরিত্যাগ করে যক্ষ-সংহার কাজে ক্ষান্ত হয়েছেন, তখন তিনি চারণ, যক্ষ ও কিন্নরগণ কর্তৃক স্তুত হয়ে ধ্রুবের কাছে এলেন এবং জোড়হাতে দাঁড়িয়ে থেকে ধ্রুবকে বললেন, নিষ্পাপ ক্ষত্রিয়তনয়, আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হলাম, কেননা তুমি পিতামহের আজ্ঞায় বিষম শত্রুতা ত্যাগ করলে। যে সব যক্ষ বিনষ্ট হল, তুমি তাদের বধ করনি; কালই জীবের জন্ম-মরণের কারণ। বৎস,

মানুষের অজ্ঞান থেকে স্বপ্নকালীন জ্ঞানের মত 'আমি-তুমি' এই রকম মিথ্যা বুদ্ধি হয়ে থাকে ; সেই বুদ্ধি দ্বারা দেহে আত্মাভিমানী হওয়াতেই বন্ধন ও দুঃখাদির জন্ম হয়। এখন তুমি নিজের পুরীতে যাও। তোমার মঙ্গল হোক। রাজ্যে উপস্থিত থেকে মুক্তির জন্য সর্বপ্রযত্নে ভগবান অধোক্ষজের ভজনা করবে। তাঁর শরীর সর্বভূতময় ; তিনি কখনও শক্তিরূপ গুণময়ী আত্মমায়াতে যুক্ত হন, কখনও বা মায়া থেকে বিমুক্ত হয়ে থাকেন। যদি তোমার মনে অন্য কোন বাসনা থাকে, নিঃসংকোচে আমার কাছে সে বিষয়ের বর প্রার্থনা কর। তুমি বর পাবার উপযুক্ত পাত্র। আমরা শুনেছি যে পদ্মনাভের পাদপদ্মের নিকটেই তোমার স্থান। ১-৭

মৈত্রেয় বললেন, কুবের এইভাবে বরগ্রহণের জন্য বারংবার বললে মহাভাগবত মহামতি ধ্রুব বললেন, আমাকে এই বর দান করুন যেন ভগবান শ্রীহরির প্রতি আমার অচলা ভক্তি থাকে ; কারণ হরিভক্তি দ্বারাই অনায়াসে দুস্তর ভবসাগর পার হওয়া যায়। ধ্রুবের প্রার্থনা শুনে কুবের পরম সন্তোষে তৎক্ষণাৎ ঐ বর দান করে তাঁর সামনেই অন্তর্ধান করলেন। তখন ধ্রুবও নিজের রাজ্যে ফিরে এলেন। কিছুদিন রাজ্যপালন করে তিনি প্রচুর দক্ষিণাসহ বহু যজ্ঞ করে যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর অর্চনা করতে লাগলেন। ভগবান বিষ্ণু দ্রব্যাদি, ক্রিয়া এবং দেবতার কর্মের ফলস্বরূপ, তিনি কর্মফল প্রদান করে থাকেন। মহামতি ধ্রুব যে কেবল যজ্ঞ দ্বারা ভগবানের আরাধনা করতে লাগলেন এমন নয়, তিনি সকলের আত্মস্বরূপ সর্বোপাধিশূন্য ভগবানে একান্ত ভক্তি করে নিজের আত্মাতে ও যাবতীয় প্রাণীতে সেই ভগবানকে দেখতে লাগলেন। তিনি শীলসম্পন্ন, ব্রহ্মণ্য এবং দীনবৎসল হয়ে কেবল ধর্ম-মর্যাদা রক্ষার জন্য প্রজাপালনে যত্নবান হলেন। প্রজারা তাঁকেই নিজেদের পিতা বলে মনে করল। এইভাবে ধ্রুব ভোগ দ্বারা পুণ্যক্ষয় এবং অভোগ অর্থাৎ যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা পাপসকল ক্ষয় করে ছত্রিশ হাজার বছর পৃথিবী শাসন করলেন। ৮-১৩

এই ভাবে ইন্দ্রিয়সংযম দ্বারা তিনি বহুকাল ত্রিবর্গ (ধর্ম, অর্থ ও কাম) সাধন করে নিজের পুত্রকে রাজসিংহাসন দান করলেন। তখন তিনি এই ব্রহ্মাণ্ডকে অজ্ঞান-জনিত স্বপ্নদৃষ্ট গন্ধর্ব-নগরের মত আত্মাতে মায়াবিরচিত বলে বুঝতে সমর্থ হলেন। দেহ, পুত্র, কলত্র, মিত্র, সামর্থ্য, বুদ্ধি, শীল, ধনাগার, অন্তঃপুর, রমণীয় বিহারভূমি এবং আসমুদ্র ধরামণ্ডল—সমস্তই মায়াবিরচিত ও অনিত্য ভেবে বৈরাগ্যের কারণে তপস্যার জন্য বদরিকাশ্রমে গিয়ে অষ্টাঙ্গযোগ আরম্ভ করলেন। পুণ্যজলে স্নান করে তাঁর সকল ইন্দ্রিয় বিশুদ্ধ হল। আসন রচনা করে প্রাণায়ামাদি দ্বারা প্রাণ জয় করে মন দ্বারা ইন্দ্রিয়গুলিকে বিষয় থেকে আকর্ষণ করলেন। ধ্রুব ধ্যান করতে করতে 'আমি ধ্যানকারী এবং ঈশ্বর ধ্যেয়', এই রকম ভেদশূন্য হয়ে সমাধিস্থ হলেন। সুতরাং তাঁর সেই স্থূলরূপের ধ্যান পরিত্যাগ হল। এই ভাবে ভগবান শ্রীহরির প্রতি তাঁর উত্তরোত্তর ভক্তি বাড়তে লাগল। দু'চোখ থেকে বিগলিত অশ্রুধারায় তাঁর হৃদয় আনন্দে গলে গেল এবং সর্বাঙ্গ পুলকে পূর্ণ হল। তাঁর দেহাভিমান নষ্ট হল ; সুতরাং তিনি আর নিজেকে ধ্রুব বলে স্মরণ করতে পারলেন না। কিছুক্ষণ পরে ধ্রুব দেখতে পেলেন যে একটি উৎকৃষ্ট বিমান আকাশ থেকে নীচে নেমে আসছে। ঐ বিমান এমন জ্যোতির্ময় যে তার প্রভায় দশ দিক পূর্ণিমার চাঁদের মত আলোকিত হয়ে উঠল। ১৪-১৯

ঐ বিমানে তিনি দু'জন শ্রেষ্ঠ দেবতাকে দেখতে পেলেন। তাঁরা উভয়েই শ্যামবর্ণ, চতুর্ভুজ এবং নবীন। উভয়েই অরুণবর্ণ কমলের ন্যায় অতি সুশোভন বসন পরিহিত, চতুর্ভুজ, মনোহর কিরীট, হার, অঙ্গদ ও কুণ্ডলে ভূষিত হয়ে গদা

নিয়ে দণ্ডায়মান আছেন। ধ্রুব তাঁদের ভগবানের ভৃত্য ভেবে তৎক্ষণাৎ উঠলেন এবং তাঁরা মধুসূদনের প্রধান পারিষদ এই মনে করে কৃতাঞ্জলিপুটে ভগবানের নাম উচ্চারণ করতে করতে তাঁদের প্রণাম করলেন। ব্যস্ততাবশত তাঁদের যথাবিধি পূজো করতে তাঁর ভুল হল। ভগবানের যে দুই পার্ষদ বিমানে করে এলেন, তাঁদের নাম সুনন্দ ও নন্দ। দু'জনেই ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র। তাঁরা কাছে এসে দেখলেন যে ধ্রুবের চিত্ত শ্রীকৃষ্ণ-চরণারবিন্দেই একান্ত নিবিষ্ট। ধ্রুবকে তাঁদের অভ্যর্থনার জন্য কৃতাঞ্জলি ও বিনয়ে নতমস্তক অবস্থায় দণ্ডায়মান দেখে তাঁরা সস্নেহে বললেন, রাজা, তোমার অশেষ মঙ্গল হোক, কেননা তুমি সশরীরে বিষ্ণুপদে আরোহণ করবে। মনোযোগ দিয়ে আমাদের কথা শোন, তুমি পাঁচ বৎসর বয়সের সময় তপস্যায় যাঁকে তুষ্ট করেছিলে আমরা সেই অখিল জগতের ধারণকর্তা ভগবান বিষ্ণুর অনুচর। তোমাকে ভগবানের পাদপদ্মের কাছে নিয়ে যাবার জন্য এখানে এসেছি। অন্যের দুষ্প্রাপ্য বিষ্ণুপদ তুমি জয় করেছ। সপ্তর্ষিরা শুধু তাকে দর্শনই করে থাকেন, লাভ করতে পারেন না। চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র ও তারকামণ্ডল যাঁকে প্রদক্ষিণ করে থাকে সেই পরম ধামে তুমি অধিষ্ঠান করবে। ধ্রুব, তোমার পিতৃগণ ও অন্যান্য রাজর্ষিরাও যেখানে কখনো যেতে পারেন নি, সেই উৎকৃষ্ট স্থান বিষ্ণুপদে তুমি অবস্থান কর। হে আয়ুষ্মান সার্থকজন্মা ধ্রুব, সর্বদেব বন্দিত ভগবান শ্রীহরি তোমার জন্য এই সর্বোৎকৃষ্ট ব্যোমযান পাঠিয়েছেন, তুমি সানন্দে এতে আরোহণ কর। ২০-২৭

মৈত্রেয় বললেন, বিদুর, পরম ভাগবত ধ্রুব ভগবানের পার্ষদশ্রেষ্ঠ দুজনেরই মধুর বাক্য শুনে, সানন্দে স্নান ও মঙ্গলাচরণ প্রভৃতি কর্তব্য সম্পন্ন করে মুনিদের প্রণামপূর্বক তাঁকে আশীর্বাদ করতে বললেন। তারপর তিনি বিমান প্রদক্ষিণ ও বন্দনা করে সেই দুই কিংকরকে অভিবাদন করলেন এবং তেজোময় রূপ ধারণ করে বিমানে আরোহণ করতে উদ্যোগী হলেন। ঐ সময় মৃদঙ্গ, পণব, দুন্দুভিগুলি বাজতে লাগল, প্রধান প্রধান গন্ধর্বরা গান করতে লাগল আর আকাশ থেকে পুষ্পবৃষ্টি হতে লাগল। মহাত্মা ধ্রুব স্বর্গে আরোহণকালে 'হায়! অত্যন্ত কাতরা জননী সুনীতিকে ত্যাগ করে আমি দুর্লভ বিষ্ণুপদে যাচ্ছি, তাঁর কী হবে?'—এই চিন্তায় জননীকে স্মরণ করলেন। ২৮-৩১

ভগবানের পার্ষদশ্রেষ্ঠ সুনন্দ ও নন্দ ধ্রুবের এই মনের ভাব বুঝতে পেরে সামনের এক বিমানের আরোহিণী রাজমহিষী সুনীতিকে দেখিয়ে দিলেন। তারপর সেই স্বর্গীয় পথে যেতে যেতে বিমানচারী দেবতাদের দ্বারা পুষ্পে অর্চিত হয়ে ধ্রুব ক্রমশ গ্রহগুলি দেখতে পেলেন। তারপর সেই নিশ্চল অবিনশ্বর ধ্রুবলোকের অধিকারী ধ্রুব অল্পসময়ের মধ্যে ত্রিলোক এবং সপ্তর্ষিমণ্ডলকেও অতিক্রম করে বিষ্ণুলোকে গেলেন। বিষ্ণুপদ নিজ জ্যোতিতেই সর্বদা দীপ্তিমান, তার কিরণে এই ত্রিজগৎ আলোকিত। প্রাণীদের প্রতি যারা নির্দয় ব্যবহার করে তারা সেখানে যেতে পারে না, আর যাঁরা সব সময় মঙ্গলকর কাজ করেন তাঁরাই সেখানে বাসের অধিকারী। যাঁরা শান্ত, সমদর্শী, পবিত্র ও সর্বজীবের মনোরঞ্জক, ভগবান বিষ্ণু যাঁদের প্রিয়বান্ধব তাঁরাই ভগবানের আশ্রয় লাভ করেন। এইভাবে রাজা উত্তানপাদের পুত্র কৃষ্ণগতপ্রাণ ধ্রুব বিষ্ণুপদে উপস্থিত হয়ে ত্রিলোকের নির্মল চূড়ামণিস্বরূপ হলেন। ৩২-৩৭

মেধিতে[১] যেমন গোসকল আবদ্ধ থেকে ভ্রমণ করে সেরকম ঐ ধ্রুবলোকে

১ ধান মাড়াইয়ের বন্ধনস্তম্ভ।

জ্যোতিশ্চক্রগুলি যুক্ত থেকেই যেন নিরলসভাবে সর্বদা ভ্রমণ করছে। ঐশ্বর্যশালী ঋষি নারদ ধ্রুবের এই অপূর্ব মহিমা দর্শনে আনন্দিত হয়ে বীণা বাজিয়ে প্রচেতাদের ব্রহ্মযজ্ঞে এই শ্লোক তিনটি গান করলেন—পতিপরায়ণা সুনীতির পুত্র ধ্রুবের একি তপস্যার মহিমা! মনে হয়, বেদাধ্যয়নশীল ব্রহ্মর্ষিরা ভগবদ্ধর্ম দর্শন করেও ঐ তপঃপ্রভাবের ফল লাভ করতে পারেন না। তিনি পাঁচ বৎসর বয়সে বিমাতার বাক্যবাণে ব্যথিত হয়ে বিষণ্ণ ও ভগ্নমনে বনে গিয়ে অজিত ভগবানকে বশীভূত করেন। তাঁর এই প্রভাব দেখে আমার মনে হচ্ছে যে ভগবানের অন্যান্য ভক্তরা তাঁর নিকট পরাভূত হলেন। তিনি যে পদ লাভ করেছেন, পৃথিবীতে অন্য যে সব ক্ষত্রিয় আছে তারা কি তাঁর অনুগামী হয়ে বহু বছরেও সেই পদ পেতে সমর্থ হবে? তিনি পাঁচ কি ছয় বছর মাত্র বয়সে তপস্যায় প্রবৃত্ত হয়ে অতি অল্প দিনের মধ্যেই ভগবানকে তুষ্ট করে তাঁর পাদপদ্ম লাভ করেন। ৩৮-৪২

মৈত্রেয় বললেন, বিদুর, আমাকে যা জিজ্ঞেস করেছিলে তা সবই তোমায় বললাম। পরম-ভাগবত ধ্রুব মহাতপস্বী, তাঁর এই চরিত্র সাধু-সম্মত। এই ধ্রুবচরিত্র কীর্তিবর্ধক, আয়ুর্বর্ধক এবং ধনাদির হেতু, পবিত্র, পাপনাশক ও স্বস্ত্যয়নস্বরূপ। এতে স্বর্গ ও ধ্রুবস্থান প্রাপ্তি হয়, তাই এ প্রশংসনীয়। যে লোক শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে সর্বদা ধ্রুবের এই চরিত্র শ্রবণ করেন, ভগবানের প্রতি তাঁর অচলা ভক্তি জন্মে, সর্বক্লেশ নাশ হয়। শ্রোতার যদি মহত্ত্ব লাভের ইচ্ছা থাকে, তবে তিনি যেন ধ্রুবচরিত্র শ্রবণ করেন, তাঁর বাসনা পূর্ণ হবে। এই চরিত্র শ্রবণ করলে শীলাদি গুণ জন্মে। যে লোক তেজস্বী হতে চায়, সে তেজের অধিকারী হয় এবং যে ব্যক্তি মনস্বী হতে ইচ্ছা করে সে প্রশস্ত মন লাভ করে থাকে। পবিত্র হয়ে প্রাতঃকালে এবং সন্ধ্যায় ব্রাহ্মণসভায় পুণ্যকীর্তি ধ্রুবের এই সুমহৎ চরিত্র কীর্তন করবে। অমাবস্যা, পূর্ণিমা, দ্বাদশী, শ্রবণা নক্ষত্র, ত্র্যহস্পর্শ, ব্যতীপাত যোগ, সংক্রান্তি এবং রবিবারেও সংযত হয়ে এই পুণ্যশ্লোক মাহাত্মা ধ্রুবের চরিত্র কীর্তন করবে। ভগবানের প্রিয় ধ্রুবের প্রতি ভক্তিমান অথচ নিষ্কাম হয়ে এই পবিত্র কথা ভক্তদের শোনাবে। এই কথা শুনলে আত্মা আত্মার প্রতি সন্তুষ্ট হয় এবং শ্রবণকারীর সিদ্ধিলাভও সম্ভব। যে ব্যক্তি তত্ত্বজ্ঞানহীন লোককে ভগবদ্ভাবে অমৃতরূপ জ্ঞান দান করে, দয়াশীল দীনজনবন্ধু সেই উপদেষ্টার প্রতি দেবতারা সব সময় প্রসন্ন হয়ে তাঁর মঙ্গল বিধান করেন। বিদুর, যে ধ্রুব বাল্যবয়সে জননীর ক্রোড়, গৃহ ও বাল্যক্রীড়ার দ্রব্যাদি পরিত্যাগ করে একমাত্র ভগবান বিষ্ণুরই শরণাপন্ন হয়েছিলেন, সেই সর্বজনপ্রসিদ্ধ পুণ্যকীর্তি মহাত্মা ধ্রুবের পবিত্র চরিত্র তোমার কাছে কীর্তন করলাম। ৪৩-৫১

ত্রয়োদশ অধ্যায়

বেণ-পিতা অঙ্গের বৃত্তান্ত

সূত বললেন, মুনিগণ, মৈত্রেয়ের নিকট ধ্রুবের এই বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তির বর্ণনা শুনে ভগবান অধোক্ষজের প্রতি পরম ভক্তিভাব বিশিষ্ট মহাত্মা বিদুর আবার মৈত্রেয়কে প্রশ্ন করলেন, সুব্রত মৈত্রেয়, নারদ যে সব প্রচেতাদের কাছে ধ্রুবচরিত্র গান করলেন তাঁরা কে, কার সন্তান, কোন্ বংশজাত, কোথায় বা তাঁদের যজ্ঞ অনুষ্ঠান হয়েছিল? আমি জানি নারদ পরম ভগবদ্ভক্ত, তিনি দেবতুল্য, তাঁর মূর্তি পুণ্যপ্রদ,

'তিনি ভগবানের সেবা ও ক্রিয়াযোগ বর্ণনা করেছিলেন। আপনার কাছে শুনেছি যে ধার্মিক প্রচেতারা আপনাদের যজ্ঞে যজ্ঞমূর্তি ভগবান বিষ্ণুর অর্চনা করেছিলেন। তখন মহাত্মা নারদ ভগবানের স্তব করেন। দেবর্ষি নারদ যে ভাগবত কথা বর্ণনা করেন তার সবই আমার শুনতে ইচ্ছা হচ্ছে, তাই আপনি সেই সব বৃত্তান্ত আনুপূর্বিক বলুন। ১-৫

মৈত্রেয় বললেন, ধ্রুবের পুত্রের নাম উৎকল। পিতা বনে গেলে পিতার রাজ-সিংহাসন ও সাম্রাজ্য তার কিছুই উৎকল গ্রহণ করতে চাইলেন না। তিনি জন্মাবধি প্রশান্তচিত্ত, নিঃসঙ্গ ও সমদর্শী ছিলেন। ধ্রুবপুত্র উৎকল সমস্ত লোককে স্বীয় আত্মায় এবং নিজ আত্মাকেই সমস্ত লোকে অবস্থিত মনে করতেন। তাঁর প্রশান্ত আত্মজ্ঞান রূপে ও রসের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে এক হয়েছিল এবং তিনি অখণ্ড যোগাগ্নি দ্বারা নিজের বাসনাগুলি দগ্ধ করেছিলেন। তাই তিনি ঐ রকম আনন্দময় সর্বব্যাপী আত্মাকে পরমব্রহ্ম জ্ঞানে নিজ আত্মা থেকে অভিন্ন মনে করতেন না। তাঁকে বালকেরা জড়, অন্ধ, বধির, উন্মত্ত অথবা বোবা বলে মনে করত। আসলে তিনি সর্বগুণসম্পন্ন ছিলেন। তাঁর বুদ্ধি বালকদের মত ছিল না। অগ্নিশিখা প্রশান্ত হলে লোকে সেই অগ্নিকে অকর্মণ্য বলে মনে করে, তিনিও সেই রকম স্থিরবুদ্ধি হয়ে অকর্মণ্য বালক বলে পরিচিত হলেন। মন্ত্রিগণ ও কুলবৃদ্ধেরা মিলিত হয়ে পরামর্শ করলেন এবং তাঁকে কার্যে অক্ষম ও উন্মত্ত মনে করে রানী ভ্রমির পুত্র উৎকলের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বৎসরকে রাজা করলেন। ৬-১১

বৎসরের প্রিয় ভার্যা সুন্দরী সুবীথী পুষ্পার্ণ, তিগ্মকেতু, ইষ, উর্জ, বসু ও জয় নামক ছয়টি সন্তান প্রসব করেন। পুষ্পার্ণের দুই স্ত্রী, প্রভা ও দোষা। প্রভার তিন পুত্র প্রাতঃ, মধ্যন্দিন এবং সায়ং। দোষার গর্ভে তিন পুত্র প্রদোষ, নিশীথ ও ব্যুষ্ট জন্মগ্রহণ করলেন। ব্যুষ্টের পত্নীর নাম পুষ্করিণী, তাঁর গর্ভে সর্ব-তেজা নামে এক পুত্র হয় যাঁর নাম চক্ষু হিসাবে প্রসিদ্ধ। তাঁর পত্নী আকূতির গর্ভে যে পুত্র জন্মে তাঁর নাম মনু। নড্বলা মনুর মহিষী। তিনি পুরু, কুৎস্ন, ঋত, দ্যুম্ন, সত্যবান্, ধৃত, ব্রত, অগ্নিষ্টোম, অতীরাত্র, প্রদ্যুম্ন, শিবি ও উল্মুক এই দ্বাদশটি সর্বগুণসম্পন্ন সন্তান প্রসব করেন। আবার উল্মুক তাঁর পত্নী পুষ্করিণীর গর্ভে অঙ্গ, সুমনা, খ্যাতি ক্রতু, অঙ্গিরা ও গয় নামে ছয়টি পুত্রের জন্ম দেন। অঙ্গের স্ত্রী সুনীথা বেণ নামে অত্যন্ত উগ্রস্বভাব এক পুত্র প্রসব করেন। এই বেণের দৌরাত্ম্যে রাজর্ষি অঙ্গ বিষয়ে বিরাগী হয়ে গৃহ থেকে নির্গত হন। ১২-১৮

মুনিরা ক্রুদ্ধ হয়ে বজ্রতুল্য অমোঘ বাক্য দ্বারা বেণকে অভিশাপ দিয়েছিলেন এবং তাতে তার মৃত্যু হয়। মুনিরা মৃত বেণের ডান হাত মন্থন করতে লাগলেন। কারণ, প্রজারা রাজাহীন হওয়ায় দস্যুদের দ্বারা খুবই নিপীড়িত হত। বেণের ওই বাহু মন্থনেই নারায়ণের অংশে আদি রাজা পৃথু আবির্ভূত হন। বিদুর জিজ্ঞাসা করলেন, অত্যন্ত সুশীল, সাধু, ব্রাহ্মণদের শুশ্রূষাকারী, মহাত্মা সেই অঙ্গরাজার কুসন্তান জন্মাল কেন এবং সেই কুসন্তানের ব্যবহারে অতিষ্ঠ হয়ে কি ভাবে ক্ষুণ্নমনে তিনি গৃহত্যাগ করে বনে গেলেন সে কাহিনী বলুন। আবার বেণ নিজে রাজা হয়ে রাজ্যশাসনে ব্রতী হলে ধর্মতত্ত্বভিজ্ঞ মুনিরা তাঁর প্রতি কি অপরাধে ব্রহ্মশাপ দিলেন তা শুনতে ইচ্ছা হয়। রাজা পাপী হলেও প্রজাদের অবজ্ঞার পাত্র হতে পারেন না, কারণ ওই রাজা নিজের তপস্যার দ্বারা ইন্দ্র প্রভৃতি আটজন লোকপালের অংশে জন্মগ্রহণ করে থাকেন। ব্রাহ্মণ,

আপনি সৎ-অসৎ বিবেকীদের শ্রেষ্ঠ ; তাই আপনি সুনীথা-পুত্রদের চরিত্র সবিস্তারে বলুন, আমি শ্রদ্ধাভক্তি সহকারে তা শুনতে ইচ্ছুক। ১৯-২৪

মৈত্রেয় বললেন, বিদুর, রাজর্ষি অঙ্গ সর্বযোগ্য শ্রেষ্ঠ অশ্বমেধযজ্ঞের অনুষ্ঠান করলেন, কিন্তু বেদজ্ঞ পুরোহিতদের দ্বারা আহূত হলেও দেবগণ সেই যজ্ঞে উপস্থিত হলেন না। তখন পুরোহিতরা বিস্মিত হয়ে যজমান অঙ্গ রাজাকে বললেন, মহারাজ, যজ্ঞে যে সব হবি প্রভৃতি প্রদান করলাম সে সব কিছুই দেবতারা গ্রহণ করলেন না, এ বড়ই আশ্চর্য। যজ্ঞের হবিসকল অত্যন্ত পবিত্র, আপনিও শ্রদ্ধার সঙ্গে দ্রব্যগুলি আহরণ করেছেন, মন্ত্রসমূহও অতি পবিত্রভাবে বেদজ্ঞ ও সংযমী ব্রাহ্মণ দিয়ে পাঠ করিয়েছেন। অতএব এই যজ্ঞে আমরা এমন কোন কারণ দেখি না যার জন্য সর্বকর্ম সাক্ষী ও ফলদাতা দেবতারা এলেন না এবং নিজের নিজের মন্ত্রার্পিত ভাগগুলিও গ্রহণ করলেন না। ২৫-২৮

মৈত্রেয় বললেন, ব্রাহ্মণদের এই কথা শুনে অঙ্গরাজ অত্যন্ত দুর্ভাবনায় পড়লেন। যদিও তিনি যজ্ঞের জন্য মৌন অবলম্বন করেছিলেন, তবুও সদস্যদের অনুমতি নিয়ে বললেন, সদস্যগণ, দেবতারা আহূত হয়েও যে এই যজ্ঞে সোম-পাত্র গ্রহণ করছেন না, এর কারণ কি? আমি কি পাপ করেছি? সদস্যরা বললেন, নরদেব, এই জন্মে আপনার কিছুমাত্র পাপ নেই ; যা কিছু পাপ হয়েছিল, প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা তার ক্ষালন হয়ে গিয়েছে। কিন্তু পূর্বজন্মকৃত একটি পাপ আছে, সেই কারণেই আপনি ধর্মশীল হয়েও অপুত্রক হয়ে রইলেন। আপনার যাতে সৎপুত্র জন্মে সেই চেষ্টা আপনি করুন। আপনার মঙ্গল হোক। পুত্রবান হলেই দেবতারা আপনার যজ্ঞীয় হবি গ্রহণ করবেন। পুত্রকাম হয়ে যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ করলে তিনি আপনাকে অবশ্যই পুত্র দান করবেন। আর আপনি পুত্রের জন্য যজ্ঞপুরুষ শ্রীহরিকে সাক্ষাৎ বরণ করলে তাঁর সঙ্গে অন্যান্য দেবতারাও এসে নিজের নিজের ভাগ অবশ্যই গ্রহণ করবেন সন্দেহ নেই। মহারাজ, মানুষ যা কিছু কামনা করে, ভগবান শ্রীহরি তাই প্রদান করে থাকেন। যে পুরুষ যে ভাবে আরাধনা করে, ভগবান তার সেই রকম ফলই দান করে থাকেন। ব্রাহ্মণরা এই রকম স্থির করে অঙ্গরাজের পুত্রোৎপত্তির জন্য যজ্ঞ করে পশুদের অভ্যন্তরে যজ্ঞরূপে প্রবিষ্ট শ্রীহরির উদ্দেশ্যে পুরোডাশ দ্বারা হোম করলেন। তারপর সেই যজ্ঞের অগ্নি থেকে এক পুরুষ উঠে এলেন। তাঁর গলায় স্বর্ণমালা, পরিধানে নির্মল বসন, হাতে পরমান্ন। ২৯-৩৬

ব্রাহ্মণরা রাজাকে ঐ পায়েস গ্রহণ করতে অনুমতি করলে উদারবুদ্ধি রাজা অঞ্জলি দিয়ে পায়েস গ্রহণ করে আগে নিজে আঘ্রাণ করে পরে হৃষ্টচিত্তে পত্নীর হাতে দিলেন। ঐ পায়েস সন্তানোৎপাদক। সুতরাং তা খাওয়া মাত্র স্বামী-সহযোগে রানী অনপত্যা গর্ভ ধারণ করলেন এবং যথাকালে একটি পুত্র প্রসব করলেন। অঙ্গরাজের স্ত্রী সুনীথা মৃত্যুর কন্যা। তাঁর গর্ভজাত পুত্র বাল্যকালাবধি মাতা-মহের অনুগামী হল। মাতামহ মৃত্যু স্বয়ং অধর্মাংশ সম্ভূত। সুতরাং তাঁর অনুগামী হওয়াতে অঙ্গরাজ-পুত্র ক্রমে অধার্মিক হয়ে উঠল। পুত্রের নাম বেণ। সে মৃগয়ায় আসক্ত হয়ে ব্যাধের মত ধনুর্বাণ নিয়ে বনে যেত এবং অসতের মত নির্দয় হয়ে নিরাশ্রয় মৃগদের বধ করত। তার নিষ্ঠুরতায় প্রজারা এত সন্ত্রস্ত হয়েছিল যে, কদাচিৎ তাকে দেখতে পেলেই তারা 'ঐ বেণ আসছে' এই বলে চীৎকার করত। বেণের নির্দয়তার কথা আর কি বলব! বাল্যকালে সঙ্গীদের সঙ্গে খেলা করতে করতে সেই নির্দয়স্বভাব রাজকুমার তাদের পশুর মতো মেরে ফেলত। ৩৭-৪১

পুত্রের ঐ রকম খলস্বভাব দেখে অঙ্গরাজ নানাভাবে তাকে শাসন করলেন। কিন্তু যখন দেখলেন যে সে কিছুতেই শাসন মানছে না, তখন তিনি অত্যন্ত ক্ষুন্ন-মনে চিন্তা করলেন, কুসন্তানের জন্য যে কি রকম দুঃসহ দুঃখ সহ্য করতে হয়, তা যে সব নিঃসন্তান গৃহস্থ জানেন না তাঁরাই পুত্রকামনায় দেবতাকে পূজো করে থাকেন। যে সন্তান থেকে মানুষের ভীষণ দুর্নাম ও মহা অধর্ম হয়, যার দ্বারা সকলের সঙ্গে বিরোধ জন্মে এবং যে অশেষ প্রকার মানসিক কষ্টের কারণ হয়, সে নামে মাত্র পুত্র হলেও বস্তুত আত্মার বন্ধনস্বরূপ। এই রকম পুত্রকে কোন্ বুদ্ধিমান লোক ভালবেসে যত্ন করবেন? আবার একথাও মনে রাখা দরকার যে, যে সুপুত্র থেকে সংসারাসক্তি জন্মে সেই সুপুত্র অপেক্ষা কুপুত্রই বরং ভাল। কারণ কুপুত্রে সংসার-দুঃখের কারণ বলে মানুষ সংসারের প্রতি আসক্তিশূন্য হয়ে বৈরাগ্য অবলম্বন করে। এই রকম চিন্তা করতে করতে অঙ্গরাজের নির্বেদ জন্মাল। একদিন রাত্রে তিনি সুনীথার সঙ্গে নিদ্রিত ছিলেন; হঠাৎ জেগে উঠে নিদ্রিতা বেণ-জননী সুনীথাকে পরিত্যাগ করে অতুল ঐশ্বর্যপূর্ণ রাজগৃহ থেকে বের হয়ে গেলেন। তারপর কোন দিকে গেলেন কেউই দেখতে পেল না। রাজা বৈরাগ্য অবলম্বন করে গৃহ থেকে বের হয়ে গেছেন শুনে প্রজাবর্গ, অমাত্য, পুরোহিত এবং বন্ধু-বান্ধব সকলেই শোকে কাতর হল। কু-যোগীরা যেমন নিজের আত্মস্থ নিগূঢ় পুরুষকে অন্যত্র অন্বেষণ করে, সেই রকম তারা সকল স্থানে রাজার অনুসন্ধান করতে লাগল। প্রজারা রাজার কোন সন্ধান না পেয়ে হতাশচিত্তে নগরে ফিরে গেল এবং অশ্রুবিসর্জন করতে করতে ঋষিদের প্রণাম করে রাজার তিরোধানের বিষয় নিবেদন করল। ৪২-৪৯

চতুর্দশ অধ্যায়

বেণের রাজ্যাভিষেক ও তার মৃত্যু

মৈত্রেয় বললেন, বিদুর, রাজা রাজ্য ত্যাগ করে প্রব্রজ্যায় গেলে ভৃগু প্রভৃতি লোক-হিতাকাঙ্ক্ষী মুনিরা বিবেচনা করে দেখলেন যে, যেমন রক্ষকের অভাবে বৃক-শৃগালাদি দ্বারা মেষাদি পশুর নিধন সম্ভব, সেইরকম রাজার অভাবে প্রজাদের দস্যুদল থেকে বিনাশের সম্ভাবনা থাকবে। অতএব সেই ব্রাহ্মণেরা বীরপ্রসবিনী সুনীথাকে আহ্বান করে তাঁর কাছে বেণকে রাজ্যাভিষিক্ত করবার প্রস্তাব করলেন। যদিও তা প্রজাদের মনোমত হল না, তবুও তাঁরা বেণকে পৃথিবীর আধিপত্যে অভিষিক্ত করলেন। প্রচণ্ডশাসন বেণ নৃপাসনে আসীন হয়েছেন শুনে চোরেরা সর্পভয়ে ভীত ইঁদুরের মতো সব গর্তে লুকালো। বেণ রাজসিংহাসনে আরূঢ় হয়ে লোকপালগণের অষ্ট ঐশ্বর্যশক্তির প্রভাবে দিন দিন বড়ই উদ্ধত হতে লাগল। 'আমি শূর, আমিই পণ্ডিত'—এই রকম অহংকারবোধে সে উন্মত্ত হয়ে মহাভাগ ব্যক্তিদের অগ্রাহ্য করতে আরম্ভ করল। এই ভাবে ঐশ্বর্যমদে অন্ধ ও গর্বিত হয়ে সেই দুর্ধর্ষ রাজা মদমত্ত হস্তীর ন্যায় রথে আরোহণ করে সর্বত্র বিচরণ করতে লাগল। তার ভ্রমণে স্বর্গ-মর্ত্য কাঁপতে লাগল। তারপর বেণ সগর্বে ঘোষণা করে দিল—'ব্রাহ্মণ সব, সাবধান! কখনও যজ্ঞ, দান বা হোম কিছুই কোর না'। এইভাবে বেণ নিজ রাজ্যে ধর্ম-কর্ম একেবারে বন্ধ করে দিল। ১-৬

দুর্বৃত্ত বেণের এই রকম অসৎ আচরণ দেখে মুনিরা বুঝলেন লোকের মহাবিপদ

উপস্থিত। তারপর তাঁরা দয়াবশে মিলিত হয়ে বলতে লাগলেন, কাষ্ঠখণ্ডের মূলে ও মাথা আগুনে জ্বলতে থাকলে তাতে অবস্থিত পিপীলিকাদের যেমন উভয়দিক থেকে বিপদ উপস্থিত হয়, কোনদিকেই পরিত্রাণের পথ থাকে না, সেই রকম এখন তস্কর ও রাজা এই উভয়দিক থেকেই প্রজাসকলের মহাদুঃখ উপস্থিত হয়েছে। আমরা অরাজকতার ভয়ে বেণকে রাজা করেছিলাম; কিন্তু এর দ্বারাই প্রজাদের বিষম বিপদ উপস্থিত হল। এখন প্রজাদের কি উপায়ে মঙ্গল হবে? দুধ দিয়ে কালসাপকে প্রতিপালন করলে প্রতিপালকেরই অনর্থ ঘটে থাকে। বেণ দুগ্ধপালিত কালসাপের মতো আমাদের অনিষ্টসাধন করছে। সুনীথার গর্ভজাত বেণ স্বভাবত দুশ্চরিত্র, আমরা একে প্রজারক্ষকরূপে রাজা করেছিলাম, কিন্তু সে এখন প্রজাদের বিনাশ করতে উদ্যত। যা হোক, এখন তার পাপ যাতে আমাদের স্পর্শ না করে এই জন্য চল আমরা তাকে একবার সৎপরামর্শ দ্বারা শান্ত করার চেষ্টা করি। ঐ রাজার পাপ আমাদের স্পর্শ করতে পারে, কেননা দুর্বৃত্ত জেনেও ঐ দুরাত্মাকে আমরাই রাজা করেছি। তার কাছে গিয়ে প্রথমে তাকে নানাভাবে বোঝাব। তাতেও যদি সে আমাদের কথায় কর্ণপাত না করে তাহলে আবার আমরা নিজেদের তেজ দ্বারা তাকে দগ্ধ করব। মুনিরা এই সিদ্ধান্ত স্থির করে নিজেদের ক্রোধ সংবরণ করে বেণের কাছে গেলেন এবং মধুর বাক্যে শান্তভাবে তাকে বললেন, মহারাজ, আমরা তোমাকে যা নিবেদন করব তা মন দিয়ে শোন। আমাদের কথা শুনলে তোমার আয়ু, শ্রী, বল এবং কীর্তি দিন দিন বাড়বে। ৭-১৪

শুদ্ধ কায়, মন ও বাক্যে যে ধর্ম পালন করা হয়, তাতে পুরুষরা যে লোক লাভ করেন, সেখানে শোকের লেশমাত্র নেই। বেশী কি, নিষ্কাম মানুষদের ঐ ধর্ম থেকে মুক্তিলাভও হয়ে থাকে। হে বীর, প্রজাবর্গের কল্যাণস্বরূপ পরম পদার্থ ধর্ম যেন নষ্ট না হয়। ধর্ম নষ্ট হলে রাজ্যের রাজৈশ্বর্য বিনষ্ট হয়, দুষ্ট মন্ত্রী এবং চোর-ডাকাত থেকে প্রজাদের রক্ষা করে যে রাজা ন্যায্য কর গ্রহণ করেন, তিনি ইহকাল ও পরকালে পরম সুখ লাভ করেন। যাঁর রাজ্যে এবং পুরমধ্যে প্রজারা নিজ নিজ বর্ণাশ্রম ধর্ম অনুষ্ঠান করে যজ্ঞপুরুষের পূজা করেন, সেই রাজার প্রতি ভগবান পরিতুষ্ট হন। শ্রীহরি জগতের ঈশ্বর, লোকসকল পরম ভক্তি সহকারে তাঁর জন্য পূজোপহার আহরণ করে থাকেন; তিনি তুষ্ট হলে আর কি অপ্রাপ্য রইল? ১৫-২০

সেই ভগবান সকল লোক, লোকপাল এবং যজ্ঞের নিয়ামক; তিনি বেদময়, দ্রব্যময় ও তপোময়। তোমার স্বদেশবাসী যে সব ব্যক্তি নানারকম যজ্ঞ-দ্রব্যাদি দ্বারা ভগবানের অর্চনা করে থাকেন, তোমারও তাঁদের সেই কাজে উৎসাহ দেওয়া উচিত। ব্রাহ্মণেরা তোমার রাজ্যে যজ্ঞবিস্তার করে তার সাহায্যে শ্রীহরির অংশস্বরূপ যে সব দেবতার অর্চনা করেছেন, তাতে তাঁরা তুষ্ট হলে কাম্যফল প্রদান করবেন, অতএব তাঁদের প্রতি অবজ্ঞা করা তোমার একান্ত অনুচিত। বেণ ক্রোধে অধীর হয়ে উত্তর দিল, তোমরা বড়ই মূর্খ, অধর্মকে ধর্ম বলে মানছ। আমি সকলের অন্নদাতা স্বামী। আমাকে পরিত্যাগ করে যারা উপপতির তুল্য অন্য দেবতার উপাসনা করে, তারা অতি মূঢ়। আমাকে নৃপরূপী ঈশ্বর জেনেও তোমরা অবজ্ঞা করছ। কিন্তু ঐ অপরাধে ইহলোকে বা পরলোকে কোথাও তোমাদের মঙ্গল হবে না। যজ্ঞপুরুষ কে? যেমন কুলটা রমণী উপপতির প্রতি স্নেহবতী হয়, তোমরা সে রকম আপন প্রভুর প্রতি আস্থা না রেখে কার প্রতি এত ভক্তি করছ? ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, কুবের, যম, সূর্য, মেঘ, পৃথিবী ও জল—এইগুলি এবং অন্যান্য যে সব দেবতা বর ও শাপ প্রদানে সমর্থ তাঁরা সকলেই রাজদেহে বর্তমান।

রাজা সর্বদেব তুল্য, সুতরাং রাজাই ঈশ্বর। আমি সেই রাজা। তোমরা মাৎসর্য পরিত্যাগ করে আমারই উদ্দেশ্যে যজ্ঞ কর এবং আমার জন্য পূজোর সামগ্রী আহরণ কর। আমি ছাড়া আর কে পূজনীয় আছে? ২১-২৮

পাপাত্মা বেণ বিষম বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হয়ে এসব কথা বললে মুনিরা পুনর্বার নানা রকম বিনয়বাক্যে রাজাকে বোঝাতে লাগলেন। কিন্তু উৎপথগামী, দুরাত্মা ও বুদ্ধিভ্রষ্ট বেণ সমস্ত মঙ্গল কাজ থেকে দূরে সরে গিয়েছিল। সুতরাং মুনিদের প্রার্থনা সে শুনল না। পাণ্ডিত্যাভিমানী বেণ এই ভাবে বারংবার মুনিদের অপমান করল। তখন মুনিরা তার উপর ক্রুদ্ধ হয়ে একবাক্যে বলতে লাগল, এই পাপাত্মা অত্যন্ত দারুণপ্রকৃতি, শীঘ্র একে বধ কর! এ পাপটা জীবিত থাকলে নিশ্চয়ই জগৎকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারবে; এ অতি দুরাচার। এ এমন নির্লজ্জ যে, যজ্ঞাধিপতি পরমপুরুষ বিষ্ণুর নিন্দা করল; অতএব এ রাজসিংহাসনে বসবার অযোগ্য। এই অমঙ্গল-মূর্তি বেণ ছাড়া অন্য কারো মুখে কখনও বিষ্ণুর এরকম নিন্দাবাক্য আমরা শুনিনি। এই পাপাত্মা বড়ই কৃতঘ্ন; বিষ্ণুর অনুগ্রহে এরূপ ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়েও সে বিষ্ণুর নিন্দা করছে। মুনিদের ক্রোধ পূর্বে সুপ্ত ছিল, এখন তা প্রজ্বলিত হল। তখন তাঁরা তাকে হত্যা করতে কৃতসংকল্প হয়ে ভগবান অচ্যুতের নিন্দাকারী হতপ্রায় সেই দুরাত্মা বেণকে ভয়ংকর হুংকার শব্দেই বধ করলেন। ২৯-৩৪

ঋষিরা বেণের প্রাণ-সংহার করে নিজ নিজ আশ্রমে ফিরে গেলে শোকাতুরা বেণ-জননী সুনীথা মন্ত্রবিদ্যাযোগে পুত্রের দেহরক্ষা করতে লাগলেন। একদিন যখন ঐ সব মুনি সরস্বতীর জলে স্নান সেরে হোম সমাধা করে নদীতীরে বসে ভাগবৎপ্রসঙ্গে আলোচনা করছিলেন, সেই সময়ে চারদিকে ভয়ংকর দুর্লক্ষণসমূহ তাঁদের দৃষ্টিগোচর হল। তাঁরা চকিত হয়ে বলতে লাগলেন, এরকম কেন হচ্ছে? পৃথিবী কি অরক্ষক হয়ে দস্যুদের দ্বারা উৎপীড়িত হচ্ছে? ঋষিরা এরূপ বলাবলি করছেন, এমন সময়ে দেখতে পেলেন যে চারদিক থেকে ধুলার ঝড় তুলে ধনলুণ্ঠনকারী দস্যু-তস্করের আবির্ভাব হল। দস্যুরা রাজার মৃত্যুতে নির্ভয় হয়ে প্রজার ধনলুণ্ঠন করতে লাগল এবং লোকেরা পরস্পর পরস্পরের প্রাণ-সংহার করতে আরম্ভ করল। জনপদ তস্করবহুল, অরাজক ও দুর্বল দেখে প্রতিকারে সমর্থ ব্যক্তিরাও, হিংসাদি দোষের প্রাদুর্ভাব সত্ত্বেও, ঐ সব দস্যু ও হত্যাকারীদের নিবারণ করলেন না। ৩৫-৪০

সমদর্শী, শান্ত ব্রাহ্মণরাও যদি অনাথের ক্লেশ-মোচনে উপেক্ষা করেন তা হলে ছিদ্রযুক্ত পাত্র থেকে দুগ্ধক্ষরণের মতো তাদেরও ব্রহ্মতপ ক্ষয় হয়ে যায়। উপেক্ষা করলে পাছে পাপ হয়, এই ভেবে মুনিরা স্থির করলেন যে অঙ্গের বংশ একেবারে ধ্বংস হওয়া উচিত নয়, কারণ ঐ বংশে বহু বীর ও হরিপরায়ণ রাজা জন্মেছেন। মুনিরা ওই প্রকার চিন্তা করে রাজধানীতে গিয়ে মন্ত্রবলে রক্ষিত-দেহ মৃত বেণের উরুদেশ সবলে মন্থন করলেন; তাতে খর্বাকৃতি একটি বামনবৎ পুরুষ উৎপন্ন হল। সে কাকের মতো কৃষ্ণবর্ণ, তার অংগগুলি এবং বাহুদ্বয় ক্ষুদ্র। কপোলের দুই প্রান্তভাগ বৃহৎ, পাদদ্বয় খর্ব, নাসাগ্র নিম্ন, নয়ন রক্তবর্ণ এবং কেশ তাম্রবর্ণ। সে লোকটি বিনয় সহকারে নত হয়ে 'কি করব' বলতে লাগল। ঋষিরা ঐ কথায় 'নিষীদ' অর্থাৎ 'উপবেশন কর' এরূপ বললেন। মুনিরা 'নিষীদ' বলাতে ঐ ব্যক্তি নিষাদ নামে পরিচিত হল। তারপর তার বংশ নৈষাদ নামে অভিহিত হয়েছে। যেহেতু ঐ ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেই বেণের অতি বিষম পাপরাশি নিজের শরীরে গ্রহণ করেছিল, সেজন্য তার বংশধর নিষাদেরা বনে জংগলে বাস করতে লাগল। ৪১-৪৬

পঞ্চদশ অধ্যায়

পৃথুর উৎপত্তি ও রাজ্যাভিষেক

মৈত্রেয় বললেন; বিদুর, তারপর ব্রাহ্মণেরা সেই অপুত্রক বেণের বাহুদ্বয় পুনরায় মন্থন করলে তাতে এক স্ত্রী ও এক পুরুষ জন্মাল। স্ত্রী এবং পুরুষ দেখে ব্রাহ্মণেরা সন্তুষ্ট হলেন এবং সেই দুটিকে ভগবানের অংশ জ্ঞান করে বলতে লাগলেন, এই পুরুষ ভগবান বিষ্ণুর পবিত্র অংশ, এই স্ত্রীও লক্ষ্মীর পবিত্র অংশ। এই পুরুষ শ্রেষ্ঠ নৃপতিরূপে যশস্বী হবেন। এঁর নাম হোক পৃথু। ইনি রাজচক্রবর্তী হবেন। আর এই যে সুরূপা ও সর্বগুণালংকৃতা দেবী জন্ম নিলেন এঁর নাম অর্চি, ইনি পৃথুকেই বিবাহ করবেন। এই পুরুষ সাক্ষাৎ ভগবানের অংশ, কেবল লোকরক্ষা করবার বাসনায় জন্মগ্রহণ করলেন। এই অর্চি স্বয়ং লক্ষ্মী, ইনি ভগবান ছাড়া কোথাও অবস্থিতি করেন না ; সেজন্যই একসঙ্গে জন্মগ্রহণ করলেন। ১-৬

ভগবানের অংশরূপী পৃথু জন্ম নিলে ব্রাহ্মণরা তাঁর প্রশংসা করতে লাগলেন, গন্ধর্বেরা গান আরম্ভ করল, সিদ্ধরা আকাশ থেকে পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগল; অপ্সরারা নৃত্য আরম্ভ করল। স্বর্গে শঙ্খ, তূর্য, মৃদঙ্গ, দুন্দুভি প্রভৃতির বাদ্য আরম্ভ হল। অবশেষে সমস্ত দেব, ঋষি ও পিতৃগণ ঐ স্থানে এলেন। জগদ্‌গুরু ব্রহ্মা সমস্ত দেব ও দেবেশ্বরের সঙ্গে এসে দেখলেন যে পৃথুর দক্ষিণহস্তে চক্রচিহ্ন ও পদদ্বয়ে পদ্ম বিরাজমান রয়েছে। তাতে তিনি অনুমান করলেন যে এই ব্যক্তি নিশ্চয়ই ভগবানের অংশ। কারণ যাঁর চক্ররেখা অখণ্ডিত তিনি পরমপুরুষ ভগবানের অংশ। অতএব ব্রহ্মা ও ব্রাহ্মণেরা তাঁর অভিষেকের জন্য উদ্যোগ করলেন। তারপর পৃথুর অভিষেকের জন্য নানা লোক নানা স্থান থেকে অভিষেকের সামগ্রী আহরণের করতে লাগল। নদী, সাগর, পর্বত, পৃথিবী, আকাশ, নাগ, গরু, পক্ষী, মৃগ এবং অন্যান্য প্রাণী যথোপযুক্ত দ্রব্যসামগ্রী এনে উপস্থিত করল। ৭-১২

মহারাজ পৃথু সুন্দর বসন পরিধান করে ও সুন্দররূপে অলংকৃত হয়ে যথাবিধি রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত হলেন এবং সর্বালংকারে বিভূষিতা পত্নী অর্চির সঙ্গে দ্বিতীয় অগ্নির ন্যায় দীপ্তি পেতে লাগলেন। মহারাজ পৃথুর জন্য কুবের স্বর্ণময় আসন উপহার দিলেন এবং বরুণ চন্দ্রতুল্য শুভ্র ছত্র এনে দিলেন। বরুণের ঐ ছত্র হতে অনবরত জলধারা বর্ষণ হতে লাগল। বায়ু দুটি ব্যজন, ধর্ম কীর্তিময়ী মালা, ইন্দ্র উৎকৃষ্ট কিরীট, যম দমন-সাধন দণ্ড, ব্রহ্মা বেদময় কবচ, সরস্বতী মনোহর হার, শ্রীহরি সুদর্শন চক্র এবং লক্ষ্মী অক্ষয় সম্পদ প্রদান করলেন। অধিক কি বলব, ভগবান রুদ্র তাঁকে একখানি দশচন্দ্রাঙ্কিত অসি, পার্বতী শতচন্দ্রাঙ্কিত চর্ম, চন্দ্র অমিততেজা অশ্ব এবং বিশ্বকর্মা উৎকৃষ্ট একখানি রথ এনে দিলেন। অগ্নি ছাগ ও গোশৃঙ্গে নির্মিত ধনু, সূর্য রশ্মিময় বাণ এবং পৃথিবী যোগময়ী পাদুকা তাঁকে উপহার দিলেন। স্বর্গ হতে অনবরত পুষ্পবৃষ্টি হতে লাগল। ১৩-১৮

পাখীরা তাঁকে নাট্য, গীত, বাদ্য এবং অন্তর্ধান বিদ্যা দান করলেন। ঋষিরা আশীর্বাদ এবং সমুদ্র স্বীয় গর্ভজাত শঙ্খ দিলেন ; সিন্ধু, পর্বত ও নদীগুলি তাঁর রথ যাতায়াতের পথ করে দিলেন। এইভাবে অভিষেকের সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন হল। সূত, মাগধ এবং বন্দীরা স্তব করবার জন্য উপস্থিত হল। মহা প্রতাপশালী বেণপুত্র পৃথু যখন জানতে পারলেন যে ঐ সব ব্যক্তি স্তব করতে এসেছে,

তখন তিনি হাসতে হাসতে মেঘগর্জন তুল্য গম্ভীর বচনে বলতে লাগলেন, সূত, মাগধ, বন্দীরা, তোমরা আমাকে ছাড়া অন্য কারো স্তব করো। এখন আমার স্তব করলে সত্যের অপলাপ করা হবে। তোমরা সকলেই মধুরভাষী, এখন স্তব থাক। যখন আমার গুণসকল জগতে প্রচারিত হবে, তখন তোমরা ইচ্ছামত আমার গুণ গান করবে। তোমাদের কে এ স্থানে পাঠিয়েছে? সভ্যগণ কি তোমাদের এ কাজে নিযুক্ত করেছেন? পুণ্যকীর্তি ভগবানের গুণকীর্তন করাই তোমাদের উচিত। সভ্যরা কখনও আমার ন্যায় অর্বাচীনের স্তব করতে তোমাদের বলবেন না। অপ্রকাশিত ভবিষ্যৎ গুণাবলীর প্রকাশের সম্ভাবনায় কেই বা স্তাবক দ্বারা তার কীর্তন করিয়ে থাকে? যে ব্যক্তি মিথ্যা গুণস্তবে মোহিত হয়, সে নিতান্তই মূর্খ। সে এত বিমূঢ় যে 'শাস্ত্রাভ্যাস করলে তুমি পণ্ডিত হতে' এরকম বাক্যেও সে প্রশংসা বোধ করে, লোকের উপহাসও, বুঝতে পারে না। এই কারণে উদারচেতা, খ্যাতিসম্পন্ন গুণী ব্যক্তিরা আপনাদের স্তবে লজ্জাবোধ করে স্তাবকের নিন্দা করে থাকেন। সূত, আমরা তো কোন শ্রেষ্ঠ কর্মের দ্বারা খ্যাতি অর্জন করি নি, তবে কি ভাবে বালকের মতো আত্মপ্রচারে ব্রতী হব? ১৯-২৭

ষোড়শ অধ্যায়

সূতগণ কর্তৃক পৃথুর স্তব

মৈত্রেয় বললেন, বিদুর, পৃথুরাজ এই রকম বললেও পৃথুর অমৃতবাক্যে পরিতৃপ্ত হয়ে সূতাদি গায়কেরা মুনিদের কথানুসারে স্তব করতে আরম্ভ করল। তারা বলল, মহারাজ, আপনার মহিমাবর্ণনে আমাদের সামর্থ্য নেই। আপনি শ্রেষ্ঠ দেব, মায়া দ্বারা এই ধরাধামে এসেছেন। আপনি বেণের অঙ্গ থেকে উৎপন্ন হলেও আপনার পৌরুষ-বর্ণনায় আমরা অসমর্থ। আমরা কেন, এ বিষয়ে ব্রহ্মারও বুদ্ধিভ্রম হয়। মহাত্মা পৃথু উদারকীর্তি এবং শ্রীহরির অংশে অবতীর্ণ। তাঁর গুণসমূহ বর্ণনা করতে যদিও আমরা অসমর্থ, তবুও তাঁর কথামৃত আমাদের পরম উপভোগ্য। এইসব মুনি আমাদের এই বিষয়ে উৎসাহিত করছেন। যোগবল-সম্পন্ন মুনিদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই আমরা এই মহাত্মার প্রশংসনীয় কাজগুলি বর্ণনা করব। পৃথু ধর্মজ্ঞ লোকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হয়ে প্রজাসকলকে ধর্মে প্রবর্তিত করবেন, ধর্মের সেতু রক্ষা করবেন এবং ধর্মদ্রোহী উৎপথগামীদের শাস্তি দিবেন। পৃথু স্বদেহে লোকপাল সকলের মূর্তি এই ভাবে ধারণ করবেন যে তাতে প্রজাদের ইহকালে এবং পরকালে পৃথিবীমধ্যে মঙ্গল সাধিত হবে। ইনি সকল প্রাণীর প্রতি সমভাবে সূর্যতুল্য সমান প্রভাব বিস্তার করবেন। সূর্য যেমন আট মাস পৃথিবীর রস আকর্ষণ করে পুনরায় বর্ষাকালে সেই সব বর্ষণ করে থাকেন, ইনিও সেরূপ প্রজাদের কাছ থেকে উপযুক্ত সময়ে ধন গ্রহণ করবেন এবং দুর্ভিক্ষাদি কালে আবশ্যক হলে প্রজামধ্যে মুক্তহস্তে ধন বিতরণ করবেন। ১-৬

আর্তব্যক্তি তাঁর মস্তকোপরি চরণ দ্বারা আঘাত করলেও পৃথু তা সহ্য করবে। পৃথিবীর তুল্য এঁর দয়া এবং সহিষ্ণুতা সর্বত্র খ্যাত হবে। ইনি দেহধারী স্বয়ং শ্রীহরি। দেবতা বৃষ্টি না দিলে প্রজারা যদি কষ্টে পড়ে, তা হলে ইনি স্বয়ং ইন্দ্রের ন্যায় বর্ষণ করে প্রজাদের উদ্ধার সাধন করবেন। এঁর এই চন্দ্রবদনে কেমন সুন্দর অনুরাগপূর্ণ দৃষ্টি বিরাজ করছে এবং মনোহর হাসিতে তা

কেমন অপূর্ব শোভা পাচ্ছে! ইনি সমস্ত কাজ অতি গূঢ়ভাবে সম্পন্ন করবেন। এঁর ভাণ্ডার সুরক্ষিত হবে। অনন্ত মাহাত্ম্য সম্পন্ন সর্বগুণাধার ভগবান বিষ্ণু এঁতে নিত্য অধিষ্ঠিত থাকবেন। এঁর তেজ ভয়ংকর হবে; শত্রুদল কোনক্রমে তা সহ্য করতে পারবে না। আর আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ইনি শত্রুগণের কাছে থাকলেও শত্রুরা তাঁকে পরাস্ত করতে পারবে না। এঁর প্রতাপ দর্শনে বোধ হয় যেন বেণরূপ কাষ্ঠ থেকে স্বয়ং অগ্নি উত্থিত হয়েছে। ইনি গুপ্তচর দ্বারা প্রাণীসমূহের আন্তর ও বাহ্য কর্মসকল দেখেও প্রাণবায়ুর ন্যায় নির্লিপ্ত থেকে নিজের স্তুতি-নিন্দা উপেক্ষা করবেন। ৭-১২

এঁর কাজ ধর্মরাজের মতো হবে। শত্রুর সন্তানও দণ্ড পাবার অযোগ্য হলে ইনি কখনো তার দণ্ডবিধান করবেন না এবং নিজের পুত্র দণ্ডনীয় হলে তারও দণ্ডবিধান করবেন। এঁর রথচক্র কোথাও বাধা পাবে না। সূর্যের কিরণসমূহ জগতের যতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়, ততদূর পর্যন্ত এঁর রথচক্রের গতি অব্যাহত থাকবে। এই পৃথু সৎকর্ম দ্বারা লোকের মনোরঞ্জন করবেন। এই কারণে প্রজারা তাঁকে রাজা বলবে। ইনি দৃঢ়ব্রত, সত্যপ্রতিজ্ঞ, ব্রাহ্মণভক্ত, বৃদ্ধসেবী, সর্বপ্রাণীর রক্ষক, সকলের মানদাতা এবং দীনজনের প্রতি দয়ালু হবেন। পরস্ত্রীতে এঁর মাতৃভক্তি, আত্মপত্নীতে অর্ধাঙ্গতুল্য প্রীতি এবং প্রজাদের প্রতি এঁর পিতৃবৎ স্নেহ হবে। ইনি বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদের কাছে দাস হয়ে থাকবেন। ইনি প্রাণিমাত্রেরই আত্মার মত প্রিয় হবেন এবং বন্ধুদের আনন্দবর্ধন করবেন। যে সব ব্যক্তি সংসার পরিত্যাগী, তাদের সঙ্গে এঁর প্রগাঢ় সৌহার্দ হবে। ইনি অসাধুদের অপরাধ অনুসারে দণ্ড বিধান করতে ত্রুটি করবেন না। ১৩-১৮

ইনি গুণত্রয়ের অধীশ্বর, নির্বিকার আত্মস্বরূপ, সাক্ষাৎ ভগবানের অংশে অবতীর্ণ হয়েছেন। এঁতে মায়া দ্বারা নানাত্ব রচিত হয় সত্য, কিন্তু পণ্ডিতেরা তাঁকে অর্থশূন্য, অবস্তুস্বরূপ অবলোকন করেন। পৃথু অদ্বিতীয় বীর হয়ে উদয়াচল পর্যন্ত অখণ্ড ভূমণ্ডল শাসন করবেন এবং জয়শীল রথে চড়ে শরযুক্ত শরাসনে সূর্যের ন্যায় সর্বদা সকল স্থান প্রদক্ষিণ করে বেড়াবেন। সেই সেই প্রদেশের রাজারা লোকপালদের সঙ্গে উপস্থিত হয়ে এঁকে উপহার প্রদান করবেন এবং তাঁদের রাজমহিষীরা চক্র-অস্ত্র দেখে এঁর মহিমা কীর্তন করতে থাকবেন এবং চক্রধারী শ্রীহরি বলেই মনে করবেন। ইনি প্রজাপতির মতো গোরূপধারিণী পৃথিবীকে দোহন করে প্রজাগণের জীবিকার সংস্থান করবেন। ইনি ইন্দ্রের মতো অবলীলাক্রমে ধনুর অগ্রভাগ দ্বারা পর্বতসকল বিদীর্ণ করে পৃথিবীকে সমতল করে দেবেন। পশুরাজ সিংহ যেমন লাঙ্গুল উন্নত করে ভ্রমণ করে সেই রকম যখন ইনি ছাগশৃঙ্গ ও গোশৃঙ্গ নির্মিত ধনু বিস্ফারিত করে পৃথিবীময় ঘুরে বেড়াবেন, তখন দুষ্ট লোকেরা এঁর তেজ সহ্য করতে না পেরে চতুর্দিকে পালাতে শুরু করবে। এই রাজা শতসংখ্যক অশ্বমেধ যজ্ঞ করবেন। সেই যজ্ঞে সরস্বতীর প্রাদুর্ভাব হবে। শেষ যজ্ঞটি সমাপ্ত হতে না হতে দেবরাজ ইন্দ্র এঁর যজ্ঞীয় অশ্ব অপহরণ করবেন। তারপর ইনি নিজের গৃহে ফিরে এসে পরমভক্তিভরে ভগবান সনৎকুমারের আরাধনা করে ব্রহ্মপ্রাপক পরম জ্ঞান লাভ করবেন। এই মহীপতি পৃথুর বিক্রম সর্বত্র বিখ্যাত এবং পরাক্রম অতি বিপুল হবে। নানাস্থানে নিজের পরাক্রমের প্রশংসা ও আত্মগুণ-সম্বন্ধীয় কথা তাঁর কানে আসবে। এঁর রথচক্রের বেগ কোথাও রুদ্ধ হবে না। স্বীয় শক্তিবলে তিনি দিগ্‌বিজয়ী হয়ে পৃথিবীর কণ্টকতুল্য দুষ্টগণের বিনাশ করবেন। সুর ও অসুরগণ সকলেই এঁর গুণগান করবেন এবং তিনি সমগ্র পৃথিবীর অধীশ্বর হবেন। ১৯-২৭

সপ্তদশ অধ্যায়

পৃথিবী-সংহারে পৃথুর উদ্যোগ

মৈত্রেয় বললেন, কুরুনন্দন বিদুর, নিজের গুণ ও কর্মের ঐ রকম বর্ণনা শুনে পৃথু পরম সন্তোষ লাভ করলেন এবং সমুচিত পারিতোষিক দান করে গায়কদের সন্তুষ্ট করলেন। ব্রাহ্মণাদি চার বর্ণ, ভৃত্য, অমাত্য ও পুরোহিতগণ, পৌরজন ও দেশবাসী, তেল ও তাম্বুল ব্যবসায়ী এবং অন্যান্য কর্মচারীবৃন্দকে যথোচিত পুরস্কার দিলেন। বিদুর জিজ্ঞাসা করলেন, ঋষিবর, বহুরূপধারিণী পৃথিবী কি কারণে গোরূপ ধারণ করেছিলেন? আমরা শুনেছি যে মহারাজ পৃথু পৃথিবী দোহন করেন। সেই দোহনসময়ে কে বৎস হয়েছিল এবং কেই বা দোহনপাত্র হয়েছিল? এই ধরিত্রী স্বভাবত অসমতল। পৃথু এঁকে কি ভাবে সমতল করলেন? ইন্দ্র তাঁর যজ্ঞীয় অশ্ব কেন অপহরণ করেন? ঐ ব্রহ্মজ্ঞ-প্রধান রাজর্ষি সনৎকুমারের কাছে আত্মতত্ত্ববিষয়ক জ্ঞান লাভ করে কি রকম গতি লাভ করেছিলেন? ঐ সব বিষয় এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পৃথুরূপে অবতীর্ণ হওয়া প্রভৃতি যে যে পবিত্র কীর্তিকথা আছে, সেই সব কৃপা করে আমাকে বলুন। ব্রাহ্মণ, আমি আপনার এবং ভগবান অধোক্ষজের একান্ত ভক্ত ও অনুরক্ত শিষ্য। ভগবানই বেণ-পুত্ররূপে অবতীর্ণ হয়ে পৃথিবী দোহন করেছিলেন। তাঁর কথা শ্রদ্ধাসহকারে শুনতে আমি ইচ্ছুক। ১-৭

সূত বললেন, বিদুর এই প্রকার আগ্রহ প্রকাশ করে ভগবান বাসুদেবের কথা বলার জন্য অনুনয় করলে মুনিবর মৈত্রেয় সানন্দে তাঁর প্রশংসা করে বসুদেবলীলা বলতে আরম্ভ করলেন। মৈত্রেয় বললেন, বৎস, ব্রাহ্মণেরা পৃথুরাজকে আমন্ত্রণ জানিয়ে যখন রাজ্যে অভিষিক্ত করলেন সেই সময়ে ধরণী অন্নহীন হয়েছিলেন; প্রজাবর্গ ক্ষুধায় ক্ষীণকলেবর হয়ে তাঁর কাছে গেল এবং সকাতরে বলতে লাগল, মহারাজ, বৃক্ষগুলি যেমন কোটরস্থ অগ্নি দ্বারা দগ্ধ হয়, আমরাও সেই রকম জঠরানল দ্বারা সন্তাপিত হচ্ছি। আপনি অখিল বিশ্বের পালক এবং সকলের অন্নদাতা, সকলে আপনাকে অন্নদাতা-পতি বলে স্তব করছে। আপনি আমাদের শরণ্য, আপনার শরণাগত হলাম। আমরা ক্ষুধার তাড়নায় পীড়িত। যাতে অন্নাভাবে বিনষ্ট না হই, সেই উদ্দেশে আপনি অন্নদান করে আমাদের বাঁচান। মৈত্রেয় বললেন, বৎস বিদুর, তিনি প্রজাদের ঐ সকরুণ বিলাপ শুনে অনেকক্ষণ স্থিরভাবে চিন্তা করে প্রজাদের দুঃখের কারণ বুঝতে পারলেন। তিনি বুদ্ধিবলে এই সিদ্ধান্ত করলেন—পৃথিবী ধান্যাদি ওষধিসকলের বীজ গ্রাস করে থাকবে, তাতেই শস্যাদি উৎপন্ন হচ্ছে না, এইজন্য দুর্ভিক্ষবশত প্রজাদের ক্লেশ। এই কথা ভেবে মহাত্মা পৃথুর নিদারুণ ক্রোধ হল। তিনি রুষ্ট ত্রিপুরারির মতো পৃথিবীকে লক্ষ করে শরসন্ধান করলেন। ৮-১৩

তাঁকে অস্ত্র উদ্যত করতে দেখে পৃথিবীর হৃদয় কেঁপে উঠল। তিনি ভয় পেয়ে গোরূপ ধারণ করে ব্যাধবিতাড়িত হরিণীর ন্যায় পলায়নপর হলেন। পৃথুও ক্রোধে রক্তলোচন হয়ে ধনুতে শরযোজনা করে পৃথিবীর পিছনে ছুটলেন। তারপর পৃথিবী স্বর্গ, মর্ত্য, অন্তরীক্ষ যেখানেই যান সেখানেই পৃথুকে উদ্যতাস্ত্র দেখতে পান। সুতরাং প্রাণীরা যেমন মৃত্যু থেকে পরিত্রাণ পায় না, সে রকম পৃথিবী পৃথুর থেকে নিজের পরিত্রাণ না দেখে খুবই সন্ত্রস্ত হলেন এবং পলায়নে ক্ষান্ত হয়ে কাতরহৃদয়ে বিনম্রবচনে বলতে লাগলেন, মহাভাগ, আপনি ধর্মজ্ঞ এবং অনাথবন্ধু,

সকল প্রাণীর পালনের জন্য আপনি নিযুক্ত, আমাকে ক্ষমা করুন। লোকে আপনাকে ধর্মজ্ঞ বলে জানে, আপনি কেন এই দীন নিরপরাধ অবলার প্রাণ বধ করছেন? আপনার মত কোমলহৃদয় ও দীনবৎসল ব্যক্তির কথা কি, সামান্য ব্যক্তিরাও নারীর অপরাধ পেলে তাকে ক্ষমা করে। মহারাজ, আপনি প্রজাপালনের জন্য আমাকে নষ্ট করতে উদ্যত হয়েছেন; আমি এই বিশ্ব ধারণ করে আছি, কেন না আমার উপরেই বিশ্ব প্রতিষ্ঠিত আছে। আমাকে বিদীর্ণ করে জলরাশির ওপরে আপনি আমার আত্মাকে এবং সমস্ত প্রজাকে কিরূপে ধারণ করবেন? ১৪-২১

পৃথিবীর কাতর বচন শুনে পৃথু বললেন, বসুন্ধরা, তুমি আমার আদেশ পালন কর না, এই কারণে আমি তোমাকে সংহার করব। কি আশ্চর্য! তুমি যজ্ঞে দেবতারূপে যজ্ঞভাগ নিচ্ছ, অথচ ধান্যাদি দানে কিছুমাত্র মনোযোগ দাও না। যে স্ত্রী গোরূপা হয়ে নিত্য তৃণভোজন করে, কিছুমাত্র দুধ দেয় না, সেই দুষ্টার প্রতি দণ্ডবিধান করা কি উচিত নয়? ব্রহ্মা যে সব ওষধি-বীজের সৃষ্টি করেছেন, সেই সবই তুমি নিজের অভ্যন্তরে আবদ্ধ করে রেখেছ, আমাকে অবজ্ঞা করে সে সব প্রত্যর্পণ করছ না, তোমার বুদ্ধি বড় মন্দ। অতএব বাণ দ্বারা তোমার শরীর ছিন্ন-ভিন্ন করব। তখন আমি তোমার মাংসে এই ক্ষুধাতুর প্রজাদের করুণ বিলাপ শান্ত করতে পারব। যে ব্যক্তি প্রাণীমাত্রের প্রতি নির্দয় এবং আত্মম্ভরি, তার তুল্য অধম আর কে আছে? সে পুরুষই হোক, আর স্ত্রীই হোক, কিংবা ক্লীবই হোক, তাকে বধ করলে রাজার বধজনিত পাপ হয় না। তুমি অতি গর্বিত এবং দুর্মদ, তোমাকে এই বাণ দ্বারা ছেদন করে তিল তিল বিভাগ করব। অবশেষে যোগবলে আমি স্বয়ং এইসব প্রজার ভার বহন করব। ২২-২৭

পৃথুরাজ এই ভাবে যমের মত ক্রোধমূর্তি ধারণ করে এসকল কথা বললে পৃথিবীর শরীর ভয়ে কাঁপতে লাগল। তিনি প্রণত হয়ে কৃতাঞ্জলিপুটে বলতে লাগলেন, আমি এই পরম পুরুষকে নমস্কার করি। ইনি মায়া দ্বারা নানাদেহ রচনা করে গুণময়রূপে প্রতীয়মান হন, কিন্তু বস্তুত আপনার স্বরূপানুভব হেতু দ্রব্য, ক্রিয়া, কারক, অহংকার ও রাগদ্বেষাদি কিছুই নেই। যিনি আমাকে জীবসকলের বাসস্থান করে সৃষ্টি করাতে আমি চতুর্বিধ প্রাণী ধারণ করছি, তিনিই যদি অস্ত্র উত্তোলন করে এই মুহূর্তে আমাকে সংহার করতে উদ্যত হন, তবে আর কোন ব্যক্তির আশ্রয় নিই! একি আশ্চর্য! যিনি মায়া দ্বারা এই চরাচর বিশ্বের সৃষ্টি করেছেন, যিনি সেই মায়া দ্বারাই আবার সকলের রক্ষা করছেন, সেই ধর্মপরায়ণ পুরুষ আজ কিভাবে আমার প্রাণবধে উদ্যত হলেন? ঈশ্বরের অভিপ্রায় অতি দুর্জ্ঞেয়, তিনি স্বয়ং ব্রহ্মাকে উৎপাদন করে তাঁর দ্বারা এই চরাচর জগৎ সৃষ্টি করিয়েছেন। যিনি স্বতঃসিদ্ধ ও এক হয়েও মায়া দ্বারা অনেক হয়ে থাকেন, যিনি নিজের শক্তিস্বরূপ ইন্দ্রিয়, দেবতা, বুদ্ধি, অহংকার ইত্যাদি মহাভূত দ্বারা এই বিশ্বের সৃজন, পালন ও লয় করছেন, যাঁর ঐ শক্তি নিরন্তর বৃদ্ধিশীল এবং পরস্পর-বিরুদ্ধ সেই বিধাতাপুরুষকে আমি নমস্কার করি। যিনি এই বিশ্বের সৃষ্টি করছেন, আপনি সেই পুরুষ। আপনিই ভূত, ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ-স্বরূপ এই চরাচর জগৎকে আমার ওপরে সম্যক্‌রূপে স্থাপন করবার জন্য আদিশূকর মূর্তি ধারণ করে জলময় রসাতল থেকে আমাকে উদ্ধার করেছেন। আপনিই সেই ধরাধর বরাহ। দেব, আমি জলের উপরে নৌকাস্বরূপ হয়ে আছি, আমাতে অবস্থিত এই সমস্ত প্রজার পালনের জন্য আপনিই সম্প্রতি বীরমূর্তি পৃথুরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন। আপনি এখন ধান্যসমূহ রক্ষার জন্য তীক্ষ্ণশর দ্বারা আমাকে বধ করতে উদ্যত হচ্ছেন। প্রভু, ঈশ্বরের সত্ত্বাদি গুণ অর্থাৎ সংসার-সৃষ্টিকারিণী

মায়াদ্বারা আমাদের ন্যায় লোকদের চিত্ত মোহিত হয়েছে। সুতরাং ঈশ্বরের কথা দূরে থাক, আমরা ভগবদ্ভক্ত ব্যক্তিদের কার্য অনুধাবন করতেও অসমর্থ। অতএব পরমেশ্বরের মত তাঁদেরও প্রণাম করি। যেভাবে জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির যশ বাড়তে পারে, ঈশ্বরভক্ত ব্যক্তিরা সর্বদা সেই প্রকার কাজ করে থাকেন। ২৮-৩৬

অষ্টাদশ অধ্যায়

কামধেনুরূপা অবনীর দোহন

মৈত্রেয় বললেন, বৎস বিদুর, অবনী এই ভাবে স্তব করলেও রাজা পৃথুর রোষ শান্ত হল না। তাতে ধরণীর ভয় দ্বিগুণ বেড়ে গেল। তিনি নিজের চঞ্চল চিত্ত স্থির করে আবার বললেন, মহারাজ, ক্রোধ সংবরণ করুন। অবলার প্রতি রাগ করা কি উচিত? আমার নিবেদন মন দিয়ে শুনুন। আমার কথা অবজ্ঞা করবেন না। পণ্ডিত ব্যক্তিরা ভ্রমরের মত সব বস্তু থেকেই সার গ্রহণ করে থাকেন। তত্ত্বদর্শী মুনিরা ইহলোক এবং পরলোকে মানুষের পুরুষার্থ সিদ্ধির জন্য যথাকর্তব্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন। যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে পূর্বতন মুনিদের প্রদর্শিত সেইসব উপায় সম্যক অনুষ্ঠান করে, সে অর্বাচীন হলেও অনায়াসে মঙ্গল লাভে সমর্থ হয়। কিন্তু সেই সব উপায় অবজ্ঞা করে কাজ করলে পণ্ডিত ব্যক্তিও সফলকাম হন না। মহারাজ, পূর্বে ব্রহ্মা আমার পিঠে যে সমস্ত ধান্যাদিরূপ ওষধি সৃষ্টি করেছিলেন, আমি দেখলাম যে ব্রতধারী নয় এরূপ দুষ্ট লোকই সে সব ভোগ করছে এবং আপনার ন্যায় লোকপালেরাও চোর-দস্যু নিবারণ দ্বারা আমার পালন এবং যজ্ঞাদি প্রবর্তন দ্বারা আমার আদর করতেন না। সব লোকই চোর হয়ে উঠেছে, সেই জন্যই আমি যজ্ঞার্থ সেই সমস্ত ধান্য-যবাদি গ্রাস করে রেখেছি। ১-৭

যদি আমি এ রকম না করতাম, তবে দুষ্ট ব্যক্তিরা সবই খেয়ে ফেলতে এবং ফলে যজ্ঞাদি সিদ্ধিও হতে পারত না। সেই সব ধান্যাদি ওষধি আমার উদরস্থ হয়ে কালবশত জীর্ণ হয়েছে। আপনি উপায় উদ্ভাবন করে সেই সমস্ত উদ্ধার করুন; আমাকে বধ করলে কি হবে? আমি আপনার প্রতি অনুরক্ত। আপনি বৎস, দোহনপাত্র এবং দোগ্ধা এনে উপস্থিত করুন। আমি বাসনারূপ ক্ষীরময় সামগ্রীগুলি প্রদান করব। প্রাণীগুলির অভীপ্সিত এবং বলকর অন্নও নিঃসৃত করে সকলের বাসনা পূর্ণ করব। আগে আমাকে এইভাবে সমতল করুন, যাতে বর্ষা হলেও দেববৃষ্টি জল আমার সর্বস্থানে সমানরূপে বর্তমান থাকতে পারে; তা হলেই আপনার বাসনা পূর্ণ হবে। পৃথিবীর মুখে এই সমস্ত প্রিয় অথচ হিত বাক্য শুনে পৃথিবীপতি পৃথু সন্তুষ্ট হলেন। তিনি মনুকে বৎস করে নিজের হস্তরূপ পাত্রে ওষধিসকল দোহন করলেন। বৎস বিদুর, রাজা পৃথু যেমন দোহন করলেন, অন্যান্য ব্যক্তিরাও সেই রকম সর্বত্র দোহন করে পৃথিবী থেকে সার গ্রহণ করতে লাগলেন। ঋষি প্রভৃতি অন্যান্য গুণের জন ব্যক্তি নিজ নিজ অভিলাষ অনুসারে বশীভূতা পৃথিবীকে দোহন করতে আরম্ভ করলেন। ৮-১৩

ঋষিরা বৃহস্পতিকে বৎস কল্পনা করে নিজেদের বাক্য, মন ও শ্রবণ রূপ পাত্রে অমৃত, মানসিক শক্তি, ইন্দ্রিয়শক্তি এবং দেহশক্তিরূপ দুগ্ধ দোহন করলেন। তারপর দৈত্য ও দানবরা অসুরশ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদকে বৎস করে ক্ষীরময় পাত্রে সুরা ও আসবরূপ

দুগ্ধ দোহন করলেন। গন্ধর্ব ও অপ্সরাগণ বিশ্বাবসুকে বৎস করে পদ্মময় পাত্রে গান, বাদ্য ও নৃত্যরূপ সৌন্দর্য ও মাধুর্য দোহন করলেন। তারপর পিতৃগণ অর্যমাকে বৎস করে অপক্ব মাটির পাত্রে শ্রদ্ধার সঙ্গে কব্য[১] দোহন করলেন। তারপর সিদ্ধরা ভগবান কপিলকে বৎস করে আকাশ-পাত্রে অণিমাদি সিদ্ধি দোহন করলেন এবং বিদ্যাধর প্রভৃতি আকাশচারিগণও কপিলকেই বৎস কল্পনা করে আকাশরূপ পাত্রে বিদ্যা দোহন করে নিলেন। কিম্পুরুষাদি (কিন্নর প্রভৃতি) অন্যান্য মায়াবীরা ময় নামক দানবকে বৎস করে মায়া দোহন করে নিল। ১৪-২০

যক্ষ-রাক্ষস-পিশাচাদি মাংসাশীরা ভগবান রুদ্রকে বৎস করে কপাল-পাত্রে রুধির রূপ আসব দোহন করল। অহিসর্প-বৃশ্চিকাদি বিষাক্ত জীবনসকল তক্ষককে বৎস করে নিজ নিজ মুখরূপ পাত্রে বিষরূপ দুগ্ধ দোহন করল। পশুরা ধরণী দোহনের জন্য বৃষকে বৎস করে অরণ্য-পাত্রে তৃণময় ক্ষীর দোহন করল। এইরূপে বৃহৎ দন্ত-বিশিষ্ট মাংসভোজী জন্তুরা সিংহকে বৎস করে নিজ নিজ দেহরূপ পাত্রে মাংসরূপ দুগ্ধ দোহন করে নিল। পাখীরা গরুড়কে বৎস করে কীটপতঙ্গাদি চর এবং ফল-মূলাদি অচররূপ দুগ্ধ দোহন করল। বৃক্ষগণ বটগাছকে বৎস করে আপন আপন দেহরূপ পাত্রে রসরূপ দুগ্ধ আকর্ষণ করে নিল। পর্বতগুলি হিমালয়কে বৎস করে নিজের নিজের সানুপাত্রে নানারকম ধাতুময় দুগ্ধ দোহন করল। ২১-২৫

বিদুর, কত আর বলব! সকলেই স্ব স্ব জাতির প্রধান ব্যক্তিকে বৎস কল্পনা করে পৃথুর বশীভূত সর্বকাম প্রসবিনী পৃথিবী থেকে নিজের নিজের পাত্রে পৃথক পৃথক বস্তুরূপ দুগ্ধ দোহন করে নিয়েছিল। এইভাবে পৃথু প্রভৃতি অন্নভোজী জীবরা এই পৃথিবী থেকে বৎস-পাত্রাদি ভেদে স্ব স্ব অভীষ্ট অন্ন দোহন করে নিলেন দোহনকার্য শেষ হলে পৃথু পৃথিবীর প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে আপন কন্যাসম বাৎসল্য প্রদর্শন করে সস্নেহে তাকে দুহিতা বলে সম্বোধন করতে লাগলেন। প্রবল পরাক্রম বেণ-তনয় মহারাজ পৃথু স্বীয় ধনুর অগ্রভাগ দ্বারা পর্বতশৃঙ্গগুলি চূর্ণ করে পৃথিবীকে প্রায় সমীকৃত করলেন এবং তাকে দোহন করে প্রজাদের জীবনোপায় করে দিলেন। তিনি ধরিত্রীর ওপরে নানাস্থানে প্রজাদের যথোপযুক্ত পৃথক পৃথক স্থান নির্দিষ্ট করতে আরম্ভ করলেন; তাতে গ্রাম, শহর, পত্তন[২], বিবিধ দুর্গ, ঘোষপল্লী[৩], ব্রজ[৪], শিবির[৫], আকর[৬], খেট[৭], খর্বট[৮] সমুদয় নির্মিত হল। পৃথুর পূর্বে ধরণীমণ্ডলে এই প্রকার পুর, গ্রামাদি ছিল না। গৃহাদি বাসভূমি পেয়ে প্রজাসকল নির্ভয়ে নিজের নিজের স্থানে পরম সুখে বাস করতে লাগল। ২৬-৩২

উনবিংশ অধ্যায়

ইন্দ্রবধে উদ্যত পৃথুকে ব্রহ্মার নিবারণ

মৈত্রেয় বললেন, বিদুর, রাজর্ষি পৃথু যজ্ঞ করতে মনস্থ করলেন এবং মনুর রাজত্ব ব্রহ্মাবর্ত দেশে সরস্বতী নদীতীরে বেদী নির্মাণ করে শত অশ্বমেধের সংকল্প করে দীক্ষাগ্রহণ করলেন। ঐ ব্রহ্মাবর্তের পূর্বদিক দিয়ে সরস্বতী সদা প্রবাহিতা। ইন্দ্র

১ পিতৃগণের অন্ন ২ বৃহৎ পুরী। ৩ গোপজাতির নিবাসস্থল। ৪ গো নিবাসস্থল। ৫ সেনা-নিবাসস্থল। ৬ স্বর্ণাদি ধাতুর আকর; ৭ কৃষকপল্লী। ৮ পর্বতপ্রান্ত গ্রাম।

এই ব্যাপার জানতে পেরে ভাবলেন, আমিই একশত অশ্বমেধ করেছিলাম, তাই আমার নাম শতক্রতু হয়েছে। এই ব্যক্তি আমার থেকেও বেশী কর্ম করতে উদ্যত। সুতরাং পৃথুর ঐ শত যজ্ঞের উদ্যোগ তাঁর সহ্য হল না। বিষ্ণুকে সেই মহাযজ্ঞে সাক্ষাৎ যজ্ঞপতিরূপে দেখা গিয়েছিল। ব্রহ্মা এবং শিবও তাঁর সঙ্গে ছিলেন এবং মুনিরা, গন্ধর্বগণ ও অপ্সরাসকল স্ব স্ব অনুচরবর্গ ও লোকপালদের সঙ্গে সেই যজ্ঞে উপস্থিত হয়ে ভগবানের যশকীর্তন করেন। সিদ্ধ, বিদ্যাধর, দৈত্য, দানব ও গুহ্যকরা সুনন্দ নন্দ প্রভৃতি ভগবানের প্রধান প্রধান অনুচরগণ, কপিল, নারদ, দত্তাত্রেয়, সনকাদি যোগীশ্বরগণ এবং ভগবদ্ভক্ত সকলেই ঐ যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হলেন। ১-৬

সর্বকামদাত্রী যজ্ঞভূমি ধেনুরূপা হয়ে যজমান পৃথুকে সর্বপ্রকার অভিলষিত কাম্যবস্তু প্রদান করলেন। সেখানকার নদীগুলি ইক্ষু, দ্রাক্ষা প্রভৃতি সমস্ত রস এবং দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, অন্ন ও মধু বহন করল। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষগুলি মধুস্রাবী হয়ে নানা রকম ফল প্রসব করল। সমুদ্রগুলি রত্নরাজিতে পরিপূর্ণ ছিল এবং পর্বতগুলি চর্ব্য, চোষ্য, লেহ্য ও পেয়, এই চার রকম খাদ্যসামগ্রী আহরণ করে দিল। এমনকি লোকপালদের সঙ্গে জনসাধারণ নানা সামগ্রী উপহার এনে দিল। পৃথুরাজ অধোক্ষজকে নিজের নাথ বলে শরণ নিয়েছিলেন বলে ওই রকম আশ্চর্যজনকভাবে তাঁর যজ্ঞকর্মের বৃদ্ধি হয়েছিল। কিন্তু ইন্দ্র তা সহ্য করতে না পেরে যজ্ঞে বিঘ্ন সৃষ্টি করলেন। পৃথু যখন শেষ অশ্বমেধ দ্বারা বিষ্ণুর পূজা করেন, সেই সময়ে ইন্দ্র প্রচ্ছন্নবেশে ঈর্ষাবশত যজ্ঞপশুটি চুরি করে নিয়ে গেলেন। তিনি অশ্ব নিয়ে আকাশপথে পালিয়ে যাচ্ছেন, এমন সময়ে মহর্ষি অত্রি তাঁকে দেখতে পেলেন। ইন্দ্র পাষণ্ডবেশে অধর্মে ধর্মভ্রম জন্মাচ্ছেন দেখে অত্রি বিরক্ত হয়ে পৃথুপুত্রকে বললেন, অশ্বচোরকে বধ কর। পৃথুপুত্র 'থামো' 'থামো' বলতে বলতে সক্রোধে ইন্দ্রের পশ্চাৎ ধাবন করতে লাগলেন। ৭-১৩

ইন্দ্রের আকার দেখে রাজকুমার ভাবলেন এঁকে যেমন জটাযুক্ত ভস্মাচ্ছাদিত দেখছি, ইনি হয়তো মূর্তিমান ধর্ম। সেজন্য তিনি দেবরাজের দিকে বাণ নিক্ষেপ না করেই ক্ষান্ত হলেন। অত্রি দেখলেন, পৃথুপুত্র অশ্বচোরের প্রাণবধ না করেই ফিরে আসছেন, তাই তিনি আবার তাঁকে ইন্দ্রবধে উৎসাহিত করে চিৎকার করে বলতে লাগলেন, বৎস, দেবাধম ইন্দ্র তোমার পিতার যজ্ঞবিনাশকারী। তাই একে বধ কর। পক্ষীরাজ জটায়ু যেমন রাবণের পেছনে ধাবমান হয়েছিলেন, সেরকম পৃথুপুত্র মহর্ষি অত্রির কথা শুনে উৎকট ক্রোধে প্রজ্বলিত হয়ে অশ্বচোর দেবরাজ ইন্দ্রের সন্ধানে আবার ছুটলেন। সে সময় ইন্দ্র অশ্ব নিয়ে আকাশপথে তাড়াতাড়ি পালিয়ে যাচ্ছিলেন। পৃথুপুত্রকে ধনুর্বাণ হাতে ছুটে আসতে দেখে ইন্দ্র অশ্ব ছেড়ে দিয়ে নিজের ঐ পাষণ্ডরূপ ত্যাগ করে অন্তর্ধান করলেন। বীর রাজপুত্র ঐ অশ্ব গ্রহণ করে পিতার যজ্ঞস্থানে ফিরে এলেন। রাজপুত্রের ঐ অদ্ভুত কার্য দেখে ঋষিরা তাঁর প্রশংসা করতে লাগলেন এবং তুষ্ট হয়ে তাঁর নাম রাখলেন 'বিজিতাশ্ব'। ইন্দ্রের কিন্তু এখনও যজ্ঞবিনাশ করার বাসনা সম্পূর্ণ রয়ে গেল। সেই অশ্ব যূপকাষ্ঠে বদ্ধ হলে তিনি নিবিড় অন্ধকার সৃষ্টি করে ছদ্মবেশে যূপকাষ্ঠ থেকেই আবার অশ্বচুরি করে নিয়ে গেলেন। সেই অশ্ব সোনার শিকলে বাঁধা ছিল, ইন্দ্র তা খুলতে না পেরে শিকলসহ ঐ অশ্বটি নিয়ে গেলেন। ১৪-১৯

ইন্দ্র ঘোড়া নিয়ে আকাশপথে যেতে থাকলে অত্রি আবার তাঁকে দেখতে পেলেন এবং পৃথুতনয়কে পুনরায় অশ্ব ফিরিয়ে আনার জন্য পাঠালেন। ইন্দ্র নরকপাল ও খট্টাঙ্গ অস্ত্র নিয়ে দৌড়াচ্ছিলেন। এবার পৃথুপুত্র তাঁর পেছনে ধাবমান না

হয়ে অত্রি কর্তৃক প্রণোদিত হয়ে ক্রোধে ইন্দ্রের প্রতি তীক্ষ্ণ তীর শরাসনে যুক্ত করলেন। তখন দেবরাজ তাকে অশ্ব ফিরিয়ে দিয়ে নিজের ছদ্মবেশ ত্যাগ করে আবার অন্তর্হিত হলেন। মহাবীর পৃথুপুত্র অশ্ব নিয়ে পিতার যজ্ঞস্থানে ফিরে এলেন। ইন্দ্রের নিন্দনীয় পরিত্যক্ত রূপগুলি মন্দবুদ্ধি লোকেরা গ্রহণ করল। ইন্দ্র অশ্ব-চুরির ইচ্ছায় ঐ সব মূর্তি ধারণ করেছিলেন, তাই ঐসব মূর্তি পাপের প্রতীক স্বরূপ। পৃথুর যজ্ঞে বিঘ্ন জন্মানোর ইচ্ছায় ইন্দ্র অশ্ব অপহরণে যে যে বেশ গ্রহণ ও ত্যাগ করেন, তাতে পাষাণ্ডমতের[১] সৃষ্টি হয়েছে। যদিও ঐসব পথ ধর্মপথ নয়, তবু ভ্রমবশে ঐ উপধর্মগুলিকেই ধর্ম মনে করে মানুষ তাতে আসক্ত হয়ে থাকে। ঐ সব মত বাক্‌চাতুর্যপূর্ণ ও আপাতরমণীয়; তাই লোকের মন সাময়িক হরণ করে। ২০-২৫

এই সব ব্যাপার যখন বিপুল পরাক্রম পৃথুর গোচর হল তখন তিনি ইন্দ্রের প্রতি ক্রুদ্ধ হলেন এবং ধনুক উদ্যত করে শর-সন্ধানের উপক্রম করলেন। যজ্ঞস্থলে উপস্থিত যজ্ঞের ঋত্বিকরা পৃথুকে ইন্দ্রবধের জন্য কম্পমান দেখে নিবারণ করে বলতে লাগলেন, মহারাজ, এ সময় শাস্ত্রবিহিত পশুবধ ছাড়া অন্যকিছু বধ করা আপনার উচিত নয়। ইন্দ্র হিংসাবশে আপনার যজ্ঞ নষ্ট করতে প্রবৃত্ত হয়েছেন, এখন আপনার প্রতাপেই তিনি প্রভাহীন হয়েছেন। আমরা শক্তিশালী আহ্বানমন্ত্র দ্বারা তাঁকে যজ্ঞভূমিতে আনছি। তিনি এলে আমরাই অগ্নিতে আহুতি দিয়ে আপনার শত্রু ইন্দ্রকে বধ করব। তা হলে তিনি যেমন অমঙ্গল চেষ্টা করছেন, সেরকমই ফল পাবেন। বৎস বিদুর, ঋত্বিকরা পৃথুকে এই রকম বলে ক্রোধে ঋক্‌ (মন্ত্র) গ্রহণ করে হোম করতে আরম্ভ করলেন। এমন সময়ে ব্রহ্মা সেখানে উপস্থিত হয়ে নিষেধ করে বলতে লাগলেন, ঋত্বিকগণ, তোমরা যজ্ঞে আহুতি দিয়ে যাকে বধ করতে ইচ্ছা করছ, তিনি তোমাদের অবধ্য। যজ্ঞ দ্বারা পূজিত সমস্ত দেবতা তাঁর দেহ; তাঁর আর একটি নাম যজ্ঞ সেই যজ্ঞ। ভগবানের অবতার। তাই যজ্ঞ দ্বারা কি যজ্ঞের বিনাশ হয়? দ্বিজগণ, তিনি আবার পাষণ্ডপথের প্রবর্তন করতে পারেন। চেয়ে দেখ, তিনি রাজার যজ্ঞ বিনষ্ট করার বাসনায় এই একবার মাত্র অন্যায় করে কতদূর পর্যন্ত ধর্ম বিপর্যয় করলেন। অতএব, আর যজ্ঞ করো না, রাজার যে নিরানব্বইটি যজ্ঞ সম্পন্ন হয়েছে, তাই থাকুক। এই নিরানব্বইটি যজ্ঞ দ্বারাই এঁর কীর্তি ইন্দ্রের চেয়ে বেশি হবে। তারপর তিনি পৃথুকে বললেন, রাজা, তুমি তো মোক্ষধর্ম কী তা জান। তোমার এসব যজ্ঞ সর্বাঙ্গসুন্দর রূপে সম্পন্ন করার প্রয়োজন কী? ইন্দ্র তোমার আত্মস্বরূপ, তাই ইন্দ্রের প্রতি তোমার রাগ করা সাজে না। ইন্দ্র এবং তুমি দুজনেই ভগবানের দেহ, তাই তোমরা পরস্পর এক। মহারাজ, তুমি আর এই যজ্ঞের বিঘ্ন নিয়ে চিন্তা করো না। শ্রদ্ধার সঙ্গে আমার কথা শোন। দেব-বিঘ্নিত কর্ম পুনরায় সম্পন্ন করার জন্য যে ব্যক্তি সচেষ্ট হয়, সে রোষবশত বিষম মোহে অভিভূত হয়, কখনও শান্তিলাভে সমর্থ হয় না। ইন্দ্রকে নিবারণ করা দুঃসাধ্য, তা করলে দেবতাদের প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করা হবে। ইন্দ্রের দ্বারা যে সব পাষাণ্ডপথের সৃষ্টি হয়েছে তাতে ধর্মের গ্লানি হবে। অতএব, আর যজ্ঞ করো না। চেয়ে দেখ, যে ইন্দ্র অশ্ব চুরি করে তোমার যজ্ঞ-বিঘ্নকারী হয়েছিলেন, তাঁর সৃষ্ট বুদ্ধি-নাশক এই সব পাষণ্ডপথ কিভাবে সকল লোককে ধর্ম থেকে বিমুখ করে দিচ্ছে। মহারাজ, তুমি বিষ্ণুর অংশ, তুমি ধর্মের উদ্ধারের জন্য অবতীর্ণ হয়েছ। এই ধর্ম

১ অনেকের মতে পাষণ্ড অর্থে জৈন, বৌদ্ধ, কাপালিক প্রভৃতির আচরণীয় উপধর্ম।

তোমার পিতা বেণের অন্যায় আচরণে লুপ্ত হচ্ছিল। তাঁর পরিত্রাণের জন্য বেণ-দেহ থেকে তোমার উৎপত্তি হয়েছে। প্রজাপতি, এই বিশ্বের উৎপত্তি বিচার করে যে সব ঋষি দ্বারা তুমি উৎপন্ন হয়েছে, সেই সব ঋষির সংকল্প পূর্ণ কর। এই যে পাষণ্ড-মার্গ এ ইন্দ্রের মায়া, এ উপধর্মের প্রসূতি; একেও তুমি বিনাশ কর। ২৬-৩৮

মৈত্রেয় বললেন, লোকগুরু ব্রহ্মা এইভাবে আজ্ঞা করলে পৃথুরাজ যজ্ঞ পরিত্যাগ করলেন। তারপর ইন্দ্রের প্রতি স্নেহ প্রকাশ করাতে তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব হল। ভূরিকর্মা পৃথু যজ্ঞাস্নান করলে দেব ও ঋষিরা তাঁর যজ্ঞে পূজিত হয়ে পৃথুকে বর দিতে লাগলেন। যে সব ব্রাহ্মণের আশীর্বাদ অব্যর্থ, তারা সশ্রদ্ধ দক্ষিণা পেয়ে পরম পরিতুষ্ট হয়ে শুভাশীর্বাদ করে বললেন, মহারাজ, আপনি যে পিতৃগণ, দেবগণ, ঋষিগণ এবং মনুষ্যকুলকে আহ্বান করেছিলেন, দান ও সম্মানের সঙ্গে তাঁরা সকলেই পূজিত হয়েছেন। ৩৯-৪২

বিংশ অধ্যায়

পৃথুকে ভগবান বিষ্ণুর উপদেশ দান

মৈত্রেয় বললেন, বিদুর, ভগবান যজ্ঞপতিও পৃথুর যজ্ঞে ইন্দ্রের সঙ্গে উপস্থিত হয়ে সুন্দর রূপে পূজা পেলেন এবং ইন্দ্রকে অগ্রবর্তী করে পৃথুকে বলতে লাগলেন, মহারাজ, ইনি তোমার শত অশ্বমেধের বিঘ্ন করেছিলেন, এখন ক্ষমা চাইছেন। এঁকে তোমার ক্ষমা করা উচিত। এই জগতে যে সব ব্যক্তি সুবুদ্ধি, সাধু ও প্রধান তাঁরা প্রাণীহিংসা করেন না, কারণ তাঁরা জানেন যে শরীর আত্মা নয়। তোমাদের মত পুরুষেরাও যদি দেবমায়ায় মুগ্ধ হয়, তবে তোমাদের দীর্ঘকাল জ্ঞানিগণের সেবা করা কেবল পণ্ডশ্রম মাত্র। বিদ্বান ব্যক্তিরা দেহকে অবিদ্যা, কাম এবং আরব্ধ[১] কর্মের ফল বলে জানেন, সুতরাং জ্ঞানীদের দেহে আসক্তি হয় না। দেহের প্রতি আসক্তি দূর হলে তার দ্বারা উৎপন্ন গৃহ, সম্পদ এবং পুত্রের প্রতি কোন্ ব্যক্তির মমত্ববোধ থাকতে পারে? ১-৬

এই আত্মা দেহ থেকে ভিন্ন। আত্মা এক, শুদ্ধ, স্বপ্রকাশ, নির্গুণ অথচ অনন্ত গুণের আধার, সর্বব্যাপী ও সর্বান্তর্যামী এবং সর্বসাক্ষী। কিন্তু দেহ এরকম নয়। সেই দেহস্থিত আত্মাকে যিনি জানতে পারেন, তিনি দেহধারী হয়েও দেহের বিকার দ্বারা লিপ্ত হন না। কারণ তিনি আমাতেই অবস্থিত। যিনি নিষ্কাম ও শ্রদ্ধান্বিত হয়ে স্বধর্ম দ্বারা সর্বদা আমার ভজনা করেন, তাঁর মন অল্পে অল্পে প্রসন্ন হয়। চিত্ত প্রসন্ন হলেই গুণমুক্ত হয়ে মানুষ তত্ত্বদর্শী হয়। তখন সে আমাতে অবস্থান করে এবং ভগবদ্ভাব প্রাপ্তিরূপ মোক্ষলাভ করে পরম শান্তি অনুভব করতে থাকে। আত্মা কূটস্থ[২] এই আত্মাকে যাঁরা দেহ, জ্ঞান, কর্ম, ইন্দ্রিয় এবং মনের অধ্যক্ষ-স্বরূপে অবস্থিত বোধ করেন, তাঁদের সংসারভয়ে নিপীড়িত হতে হয় না। ঐ সব জ্ঞানী ব্যক্তিরা বুঝতে পারেন যে আত্মা থেকে ভিন্ন পঞ্চভূত, জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয় ও বুদ্ধির সমষ্টি লিঙ্গদেহেরই সংসারভোগ হয়ে থাকে।

---

১ শুভাশুভ সঞ্চিত কর্ম দ্বারা উৎপন্ন। ২ চিরস্থায়ী, নিত্য, নির্বিকার।

শোকাদি দ্বারা তাঁদের কোন বিকার হয় না ; কারণ তাঁরা আমাতেই একান্তভাবে চিত্ত সমর্পণ করে থাকেন বলে সম্পদে বা বিপদে বিচলিত হন না[১]। ৭-১২

মহারাজ, তুমি জ্ঞানী, সুখ-দুঃখে সমদর্শী[২] ও উত্তম-মধ্যমে সমবুদ্ধি হয়ে ইন্দ্রিয় এবং মন জয় করে প্রজাপালন কর। একাকী কি ভাবে সর্বপ্রজা পালন করব—এরকম আশংকা কোরো না। আমি তোমার রাজ্যাঙ্গ প্রস্তুত করে রেখেছি, মন্ত্রীদের সঙ্গে মিলিত হয়ে রাজ্যশাসনে প্রবৃত্ত হও। প্রজাপালনই রাজার প্রধান ধর্ম। প্রজারা যে সব পুণ্যানুষ্ঠান করে পরলোকে রাজা তার ষষ্ঠাংশ ভোগ করেন। যিনি রাজা হয়ে প্রজাপালন করেন না, প্রজারা তাঁর পুণ্য হরণ করে নেয়। তিনি প্রজাদের কাছে যে কর গ্রহণ করেন, তাতে কেবল তাঁর প্রজাবর্গের পাপই ভোজন করা হয়। তুমি যদি ব্রাহ্মণদের অনুমোদিত এই ধর্মকেই প্রধান ও অর্থ-কামকে প্রাসঙ্গিক বোধ কর এবং এই ধর্মে অনুরাগ প্রকাশ করে প্রজার পালন কর, তা হলে প্রজারা তোমার প্রতি অনুরক্ত হবে এবং অচিরে তুমি সিদ্ধ মহর্ষিদের নিজের গৃহে উপস্থিত দেখতে পাবে। মানবেন্দ্র, আমি তোমার সদ্গুণ ও সৎস্বভাব দ্বারা বশীভূত হয়েছি ; এখন আমার কাছে বর প্রার্থনা কর। যজ্ঞ, তপস্যা বা যোগ দ্বারাও আমি সুলভ নই ; যাঁদের ভেদজ্ঞান নেই কেবল তাঁদের মধ্যেই আমি বর্তমান থাকি। মৈত্রেয় বললেন, বিদুর, পৃথু লোকগুরু শ্রীহরির উপদেশ পেয়ে তাঁর আজ্ঞা মাথায় করে নিলেন। এই সময়ে ইন্দ্র নিজের অশ্বাপহরণ-রূপ কর্মে লজ্জিত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করে পৃথুর চরণদ্বয় স্পর্শ করতে লাগলেন। পৃথুও তাঁকে আলিঙ্গন করে তাঁর উপর বিদ্বেষভাব পরিত্যাগ করলেন। ১৩-১৮

তারপর ভগবান স্বস্থানে ফিরে যেতে ইচ্ছা করলেও পৃথুর প্রতি অনুগ্রহ করে বিলম্ব করতে লাগলেন। ঐ অবসরে পৃথু নানা উপহার আহরণ করে তাঁর পূজা করলেন এবং পরিবর্ধিত ভক্তির দ্বারা তাঁর চরণকমল ধারণ করলেন। শ্রীহরি সাধুজনের সুহৃদ। তিনি পৃথুর ঐ রকম ভক্তি দেখে পদ্মপলাশলোচন দিয়ে তাঁর দিকে করুণাদৃষ্টিতে চেয়ে দেখলেন। আদিরাজ পৃথু নারায়ণকে দর্শন ও স্তব করার জন্য কৃতাঞ্জলিপুট হলেন, কিন্তু তাঁর দুই চোখ অশ্রুপূর্ণ থাকায় তিনি তাঁকে দেখতে পেলেন না এবং প্রেমভরে কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হওয়ায় কথা বলার শক্তিও তাঁর রইল না। সুতরাং তিনি মৌনভাবে অবস্থিত হয়ে হৃদয় দ্বারা শ্রীহরিকে আলিঙ্গন করে রইলেন। তারপর পৃথু চোখের জল মুছে শ্রীহরিকে অতৃপ্তনেত্রে দেখতে লাগলেন। তখন শ্রীহরি নিজে মাটিতে নেমে গরুড়ের উন্নত স্কন্ধে হাত রাখলেন। পৃথু সে সময় ভগবানকে বলতে লাগলেন, বিভু, যে সব দেবতা বরপ্রদ, আপনি তাঁদেরও প্রভু। আপনার কাছে জ্ঞানী ব্যক্তি কি বিলাসভোগ্য বর প্রার্থনা করতে পারে ? ঐসব ভোগ্য বস্তু দেহীদের এমন কি নরকবাসীদেরও আছে। কৈবল্যপতি, ঐসব বরে আমার প্রয়োজন নেই।[৩] নাথ, আপনার চরণকমলের যে সুধা সাধুপুরুষদের হৃদয়ে সঞ্চিত থেকে তাঁদের মুখরূপ মধুকরের দ্বারা বিতরিত হয় তা যদি পাবার আশা না থাকে, তবে ঐ কৈবল্যপদও আমি কখনও প্রার্থনা করি না। আমার একমাত্র প্রার্থনা এই যে, আপনার কীর্তিরাশি যেন সর্বদা আমার কর্ণগোচর হয়। এজন্য আমাকে দশ সহস্র শ্রবণ প্রদান করুন। ১৯-২৪

হে দেব, মহৎ ব্যক্তিদের মুখনিঃসৃত আপনার চরণপদ্মের কণামাত্র মধু বহন করে যে বায়ু, তাই দিয়ে পুনর্বার কুযোগীদের[৪] তত্ত্বজ্ঞান বিতরণ করা যেতে পারে।

---

১ দ্রষ্টব্য, ভগবদ্গীতা ২।১৫ শ্লোক। ২ সমদর্শিতার অর্থ সম-বোধ। ৩ তুলনীয় : কঠ উপনিষদের যম-নচিকেতার কথোপকথন। ৪ তত্ত্বমার্গ-বিস্মৃত তথাকথিত যোগী।

আমি এ ছাড়া অন্য বর চাই না। হে মঙ্গলকীর্তি, আপনার যশ পরম মঙ্গলস্বরূপ। সাধুসঙ্গ দ্বারা যে একবার তা শোনে, সে গুণজ্ঞ ব্যক্তি হলে আর কি তা ভুলে থাকতে পারে? পশু ছাড়া আর কারুর তা থেকে বিরত হতে ইচ্ছা হয় না। স্বয়ং লক্ষ্মী সমস্ত গুণ লাভ করার বাসনায় ঐ যশ প্রার্থনা করেছিলেন। আমি লক্ষ্মীর মত উৎসুক হয়ে অন্য বর পরিত্যাগ করে কেবল আপনারই সেবা করব। সর্বপুরুষের মধ্যে আপনিই উত্তম। আপনি সর্বগুণের আধার। আপনার চরণকমলে লক্ষ্মীর অন্তঃকরণ সর্বদা আসক্ত। আমিও তাতে আত্মা ও মন সমর্পণ করছি। এক পতির জন্য আমরা উভয়েই অভিলাষী, সেজন্য আমাদের মধ্যে পরস্পর বিরোধের আশংকা নেই। জগদীশ, জগজ্জননী লক্ষ্মীর কাজ অনুকরণ করার জন্য আমার চেষ্টার অবধি নেই। আপনি দীনবৎসল, দীনের প্রতি দয়া করে সামান্য কাজকেও যথেষ্ট মনে করেন। সুতরাং আমার কাজ আপনি অবশ্যই গ্রহণ করবেন। প্রভু, আপনি স্বরূপেই সর্বদা অবস্থিত আছেন, লক্ষ্মীদেবীতে আপনার প্রয়োজন কি? ভগবান, আপনি দীনবৎসল, মায়ার প্রভাব আপনাতে নেই। এজন্য সাধুপুরুষরা জ্ঞানোদয়ের পরেও আপনার ভজনা করে থাকেন, কিন্তু আপনার শ্রীচরণকমলের ভজনা ব্যতীত তাঁদের আর কোন প্রয়োজন আছে বলে আমরা জানি না। আপনি যে 'বর, নাও' এই কথাটি বলেছেন তা জগতের মোহকারিণী। কারণ আপনার বাক্যরূপ রজ্জুতে জনগণ বদ্ধ না হলে কোন্ ফলের প্রত্যাশায় মুগ্ধ হয়ে বারবার তারা কর্ম করত? আপনার মায়া-কবলিত হয়ে সত্যস্বরূপ আপনা থেকে যারা দূরে থাকে তারা আপনাকে না-পেয়ে পুত্রাদি রূপ নানা কাম্যবস্তু প্রার্থনা করে থাকে। পিতা যেমন আপনা থেকেই পুত্রের হিতকামনা করেন, আপনারও সেইরকম স্বয়ং এদের হিত-কামনা করা উচিত। ২৩-৩১

মৈত্রেয় বললেন, পৃথু এইভাবে স্তব করলে ভগবান বললেন, রাজা, তুমি ভক্তিলাভে অত্যন্ত আগ্রহী হয়েছ; আমার প্রতি তোমার ভক্তি হবে। সৌভাগ্যবশত তোমার মনে যে শুভবুদ্ধির উদয় হয়েছে এরকম বুদ্ধি দ্বারাই পণ্ডিতেরা সুদুস্তর মায়া অতিক্রম করতে সমর্থ হন। তুমি সাবধানে আমার আদেশ পালন করো। যে ব্যক্তি আমার আজ্ঞা পালন করে, তার সকল বিষয়েই মঙ্গল হয়ে থাকে। ভগবান এইভাবে পৃথুর সার্থক বচনে আনন্দ প্রকাশ করলেন এবং পৃথু তাঁর উপযুক্ত পূজা করলে তিনি তাঁকে অনুগৃহীত করে প্রস্থান করতে উদ্যত হলেন। তারপর দেব, ঋষি, পিতৃগণ, গন্ধর্ব, সিদ্ধ, চারণ, পন্নগ, কিন্নর, অপ্সরা, মর্ত্য, খেচর ও অন্যান্য যে সব প্রাণী এবং ভগবানের যে সমস্ত অনুচর ও পর্ষদ যজ্ঞে উপস্থিত হলেন, পৃথু সম্ভাষণাদি দ্বারা সকলেরই যথাযোগ্য পূজা-অর্চনাদি করলেন। ভগবান শ্রীহরিও স্বধামে প্রস্থানের সময় পুরোহিতগণের সঙ্গে রাজর্ষি পৃথুর যেন মন হরণ করে নিয়ে গেলেন। ভগবান দৃষ্টির অন্তরালে গেলে, পৃথু সেই দেবদেব বাসুদেবকে প্রণাম করে আপন পুরীতে ফিরে গেলেন। ৩২-৩৮

একবিংশ অধ্যায়

প্রজাবর্গের প্রতি পৃথুর উপদেশ

মৈত্রেয় বললেন, বিদুর, পৃথুরাজ যখন নগরে প্রবেশ করেন, তখন তার তোরণগুলি অসংখ্য মুক্তা, পদ্মমালা, বস্ত্র ও সোনা দিয়ে সুশোভিত এবং সুগন্ধি ধূপে

সুবাসিত হতে লাগল। রাজপথ, ক্ষুদ্রপথ এবং চত্বরগুলি চন্দন ও অগুরু মিশ্রিত জলে সিক্ত হল। পুষ্প, ফল, আতপচাল, যবাঙ্কুর, খই এবং দীপ — এই সব দ্বারা নানাস্থান শোভিত হল। ঐ নগর ফল-পুষ্পযুক্ত কদলীবৃক্ষ এবং ছোট ছোট গুবাক বৃক্ষে পরিবেষ্টিত ছিল এবং নানারকম তরু, পল্লব ও মালা দ্বারা তার সর্বস্থান সজ্জিত হয়ে নগরের শোভা বর্ধন করতে লাগল। প্রজাবর্গ এবং সুন্দরী কন্যারা সমুজ্জ্বল মণি-কুণ্ডলে অলংকৃত হয়ে দীপমালা, দধি প্রভৃতি নানা মাঙ্গলিক উপহারসহ তাঁকে আনতে চললেন। মহাবীর পৃথু শঙ্খ-দুন্দুভি শব্দে এবং ঋত্বিকদের উচ্চারিত বেদধ্বনি দ্বারা স্তুত হয়ে অতি বিনীতভাবে গৃহে প্রবেশ করলেন। পুরবাসী ও জনপদবাসী সমস্ত ব্যক্তি মিলিত হয়ে পৃথুর পূজা করল। পৃথুও তাদের প্রিয়বর প্রদান করে সন্তুষ্ট করলেন। পৃথুর কাজ উৎকৃষ্ট; তিনি মহতেরও মহৎ, তিনি পূজ্যদেরও পূজ্যতম। তিনি বহু সৎকাজ দ্বারা আপন যশোবিস্তার করে পৃথিবী শাসন করলেন এবং অন্তিমে শ্রীহরির পরমপদ লাভ করেন। ১-৭

সূত বললেন, শৌনক, আদিরাজ পৃথুর যশ অশেষ গুণের দ্বারা বর্ধিত। গুণশালী ব্যক্তিরা সর্বদা সেই অশেষ গুণের সমাদর করে থাকেন। পরমভাগবত বিদুর মৈত্রেয়ের নিকট তা শুনে তাঁর অর্চনা করেছিলেন। যে পৃথু দুই হাতে ধেনুরূপিণী পৃথিবীকে দোহন করেন, দেবগণ দ্বারা যিনি সদা সম্মানিত, ব্রাহ্মণরা যাঁর অভিষেক করেন, যিনি স্বীয় বাহুতে বিষ্ণুতেজ ধারণ করেন, যে পৃথুর বিক্রমের উচ্ছিষ্টতুল্য নিজেদের অভীষ্ট উপভোগ করে যাবতীয় রাজা, লোক এবং লোকপালরা আজও জীবিত রয়েছেন, কোন্ ব্যক্তি সেই পৃথুর গুণ-কীর্তন শ্রবণে অনুরক্ত না হবে? তাঁর পবিত্র কীর্তিকথা আপনি বলুন। মৈত্রেয় বলতে লাগলেন, আদিরাজ পৃথু গঙ্গা এবং যমুনা এই নদীর মধ্যস্থিত ভূমিতে বাস করে ভোগ দ্বারা পুণ্যক্ষয় করবার বাসনায় প্রাক্তন কর্মানুযায়ী বিষয় ভোগ করতে লাগলেন। কিন্তু জন্মান্তরে ভোগ করতে হবে, এইজন্য কোন কর্ম করলেন না। একমাত্র তিনিই সপ্তদ্বীপের শাসনকর্তা ছিলেন। তাঁর আজ্ঞা সকলেই মেনে চলত। তিনি কখনও ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবদের দণ্ডাদান করেন নি। মহারাজ পৃথু একদা আর একটি মহাযজ্ঞে দীক্ষিত হলেন। সেই যজ্ঞে দেবতা, ব্রহ্মর্ষি এবং রাজর্ষি সকলেরই সমাগম হল। ৮-১৩

পূজনীয় ব্যক্তিগণের যথাযোগ্য পূজা করা হলে পৃথু নক্ষত্রপরিবৃত চন্দ্রের ন্যায় সভামধ্যে উঠে দাঁড়িয়ে চারদিক দেখতে লাগলেন। তাঁর সমুন্নত গৌরবর্ণ বাহুদ্বয় স্থূল অথচ দীর্ঘ, চোখ দুটি পদ্মের ন্যায় রক্তাভ, নাসিকা সুগঠিত, মুখ সুন্দর, প্রকৃতি ধীর, স্কন্ধদ্বয় উন্নত, দন্তরাজি ও হাসি মনোহর। তাঁর বক্ষস্থল বিশাল, কটিদেশ বিস্তৃত, উদর অশ্বত্থপত্রতুল্য এবং ত্রিবলী দ্বারা শোভিত, নাভিদেশ জলাবর্তের মতো গভীর, উরুদ্বয় স্বর্ণাভ উজ্জ্বল এবং চরণদ্বয় উন্নত। তাঁর মাথার চুল স্নিগ্ধ ও গূঢ় কৃষ্ণবর্ণ, গলদেশ শঙ্খের ন্যায় রেখাঙ্কিত, পরিধানে মহামূল্য পট্টবস্ত্র। যজ্ঞের নিয়মানুযায়ী তিনি নিরাবরণ থাকলেও তাঁর গায়ের স্বাভাবিক সৌন্দর্য ফুটে উঠেছিল। তিনি কৃষ্ণাজিনধারী ও কুশহস্ত হয়ে যজ্ঞের সমস্ত কাজ নিজে করেছিলেন। তিনি স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে চারদিকে চেয়ে মধুর বচনে বললেন, সভ্যগণ, সকল সাধু ব্যক্তির এখানে সমাগম হয়েছে। সকলে আমার কথা শুনুন, আপনাদের মঙ্গল হোক। সাধুব্যক্তিদের কাছে ধর্মজিজ্ঞাসু লোকের নিজ মনের অভিলাষ ব্যক্ত করা উচিত। ১৪-২১

আমি রাজ্যশাসন ব্যাপারে আপনাদের জিজ্ঞাসা করছি, মনোযোগ দিয়ে শুনুন। প্রজাবর্গের জীবিকা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ঈশ্বর আমাকে শাসনকার্যে নিযুক্ত

করেছেন। আপনাদের স্ব স্ব ধর্মে স্থাপন করাই আমার কর্তব্য কর্ম। প্রাক্তন কর্মের সাক্ষী ঈশ্বর যাঁদের প্রতি প্রসন্ন, পণ্ডিতেরা যাঁদের গুণকীর্তন করে থাকেন, তাঁরাই আমার কর্মানুষ্ঠানের লক্ষ্য হোন। যে রাজা প্রজাদের স্বধর্ম শিক্ষা না দিয়ে করগ্রহণ করেন, তিনি প্রজাবর্গের পাপের ভাগী হয়ে আপন ঐশ্বর্য থেকে বঞ্চিত হন। অতএব প্রজাগণ, আমি তোমাদের পালক। পিণ্ডদানের মত আমার পরলোক-হিতার্থ তোমরা ভগবান শ্রীহরির চরণকমলে মতি রেখে কেবল স্বধর্মেরই অনুষ্ঠান কর, তা হলেই আমাকে অনুগ্রহ করা হবে। শুদ্ধচিত্ত পিতৃগণ, দেবগণ ও ঋষিগণ, আপনারা আমার কথা অনুমোদন করুন। কর্মের কর্তা, শিক্ষাদাতা ও অনুমোদনকারীর পরলোকে যে ফল হয়, আপনাদেরও সেই রকম ফল লাভ হোক। সজ্জনগণ, দেখুন কারও মতে যজ্ঞেশ্বর নামে একজন পরমেশ্বর আছেন এবং কোন কোন মতে ইহকাল ও পরকাল উভয় কালেই ভোগভূমি শরীরসকলই আরাধ্য বস্তু। ২২-২৭

মনু, উত্তানপাদ, ধ্রুব, প্রিয়ব্রত এবং পিতামহ অঙ্গরাজ ও এরূপ অন্যান্য ব্যক্তিদের এবং অজ, ভব, প্রহ্লাদ, বলি এ'দের মতেও একজন কর্মফলদাতা পরমেশ্বর অবশ্য আছেন। কেবল মৃত্যুদৌহিত্র বেণ প্রভৃতি কিছু অধার্মিক লোকই তা স্বীকার করেন নি। আহা, তাঁদের অবস্থা সত্যি শোচনীয়! কর্ম জড়, পরক্ষণেই নষ্ট হয়ে যায়। তার এমন ক্ষমতা নেই যে ফল প্রদান করে, এমন কি দেবতারাও স্বতন্ত্রভাবে ফলদানে অক্ষম। আরও দেখুন কর্ম কোথাও সিদ্ধ হয়, কোথাও হয় না; কোথাও বা বিপরীত হয়ে থাকে। অতএব পরমেশ্বর অবশ্যই আছেন, তাঁর থেকেই কর্মফল লাভ হয়। একমাত্র পরমেশ্বরই জীবসকলের মোক্ষফলদাতা। তাঁকে ছাড়া অন্য কোন দেবতারই মুক্তি দেবার সাধ্য নেই। তাঁর পদযুগল সেবার ইচ্ছাই তাঁর পাদাঙ্গুষ্ঠ বিনিঃসৃত গঙ্গার মত জীবগণের বহুজন্ম সঞ্চিত অন্তঃকরণের মালিন্য ঘোচায় এবং তাঁর চরণমূলে আশ্রয় করলে পুরুষের অশেষ মানসিক ক্লেশ-তাপ দূর হয়ে বৈরাগ্য দ্বারা যে প্রকৃষ্ট জ্ঞানের উদয় হয় তার দ্বারা বারংবার সংসারপ্রাপ্তি রোধ হয়। তোমরা কপটতা ত্যাগ করে আত্মবৃত্তি অধ্যাপনাদি এবং মন, বাক্য, ধ্যান, স্তব ও পরিচর্যা দ্বারা নিত্য তাঁরই উপাসনা কর। তাঁর পাদপদ্ম থেকে সকল কাম্যবস্তুই তোমাদের লাভ হবে। তোমাদের অধিকার অনুযায়ী উপাসনা কর, তাতেই মনস্কামনা পূর্ণ হবে। ২৮-৩৩

সেই নির্গুণ ভগবান যদিও সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ ও নির্বিশেষ, তথাপি তিনি পৃথক পৃথক দ্রব্য, গুণ, ক্রিয়া, মন্ত্র, অর্থ, সংকল্প, লিঙ্গ, নাম এই সব দ্বারা নানা বিশেষণ বিশিষ্ট হয়ে কর্মমার্গে যজ্ঞরূপে প্রকাশ পেয়ে থাকেন। কাষ্ঠের মধ্যে অবস্থিত অগ্নি যেমন কাষ্ঠের ধর্ম ও আকার অনুযায়ী প্রকাশ পায়, ভগবানও সেই রকম পরমানন্দ-স্বরূপ হয়েও শরীরাভ্যন্তরে বিষয়াকার বুদ্ধি প্রাপ্ত হন। এই দেহ প্রকৃতি, কাল, সংকল্প ও ধর্ম এই সকলের সঙ্গে উৎপন্ন হয়েছে বলে এতে বিষয়াকার বুদ্ধির উদ্ভব হওয়া বিচিত্র নয়। যে সকল সাধুপুরুষ ভূমণ্ডলে দৃঢ়ব্রত হয়ে স্বধর্মযোগে সর্বগুরু ভগবান শ্রীহরির আরাধনা করে থাকেন তাঁরা আমার আপন লোক এবং আমাকে অনুগ্রহ করছেন। আমার প্রার্থনা যেন কোন রাজবংশের প্রভাব ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবকুলে কখনও বিস্তারলাভ না করে। কারণ এসব ভগবদ্ভক্তরা তিতিক্ষা, তপস্যা ও বিদ্যা দ্বারা সর্বদা দীপ্তি পেয়ে থাকেন। তারপর রাজা সভাসদদের বললেন, সভ্যগণ, শ্রীহরি মহত্তমদের অগ্রগণ্য সাক্ষাৎ ব্রহ্মণ্যদেব। শ্রীহরিই ব্রাহ্মণদের চরণ নিত্য বন্দনা করে অচলা লক্ষ্মী এবং পবিত্র যশ লাভ করেছেন; ব্রাহ্মণ-সেবায়

সেই সর্বান্তর্যামী পরমেশ্বরের পরম প্রীতি হয়। তোমরা ভগবদ্ধর্মে তৎপর হয়ে সেই ব্রাহ্মণকুলের সেবা কর। ৩৪-৩৯

ব্রাহ্মণকুলের সেবা করলে শীঘ্রই চিত্তশুদ্ধি হয়। তাতে পুরুষের পরম শান্তি লাভ হয়ে থাকে। দেবতাদের পক্ষেও ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কি আছে? তোমরা বিপ্রকুলেরই সেবা কর, তাহলেই যজ্ঞাদির ফল পাবে। ব্রাহ্মণ শ্রীহরিরও মুখ ; দেবতার নাম দ্বারা শ্রদ্ধার সঙ্গে ব্রাহ্মণদের মুখে হোম করলে শ্রীহরি যেমন সেই হবি ভোজন করেন, অচেতন হুতাশনে প্রক্ষেপ করলে তাঁর সেরকম ভোজন হয় না। আরও দেখ, আয়নায় প্রতিকৃতির মত বেদেও এই বিশ্বেরই প্রকাশ। ব্রাহ্মণগণ শ্রদ্ধা, তপস্যা, মঙ্গল, মৌন, ইন্দ্রিয়সংযম এবং সমাধি দ্বারা নিত্য সেই সনাতন নির্মল বেদের বিচার করে থাকেন। জ্ঞানই তো বিশ্বের প্রকাশক। বেদ জ্ঞানময় এবং ব্রাহ্মণরা সেই বেদের ধারক ও পোষক। আমি যেন যাবজ্জীবন ব্রাহ্মণদের পদধূলি নিজের মুকুটোপরি বহন করতে পারি। ব্রাহ্মণদের চরণধূলি যে পুরুষ নিত্য ধারণ করেন তাঁর পাপ দূর হয়ে যায় এবং সর্বপ্রকার গুণরাশি তাঁকে আশ্রয় করে। ব্রাহ্মণসেবী পুরুষ এইভাবে সকল গুণের আকর হয়ে আপনা থেকেই সুশীল, কৃতজ্ঞ ও বৃদ্ধজনের আশ্রয় হয়ে ওঠেন। তখন সকল সম্পদ গিয়ে তাঁদের বরণ করে। ব্রাহ্মণকুল, গোসকল ও সানুচর ভগবান যেন আমার প্রতি প্রসন্ন থাকেন। ৪০-৪৪

মৈত্রেয় বললেন, পৃথু ব্রাহ্মণদের প্রতি ভক্তি প্রকাশ করলে পিতৃগণ, দেবগণ ও বিপ্রগণ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন এবং তাঁকে সাধুবাদ করে হৃষ্টচিত্তে বললেন, লোকে যে বলে থাকে মানুষ সুপুত্র দ্বারা লোকসকল জয় করে, তা সত্য। পাপী বেণ ব্রহ্মশাপগ্রস্ত হয়েও আজ পুত্র দ্বারা নরক থেকে নিস্তার পেল। হিরণ্যকশিপু ভগবানের নিন্দা করে নরক প্রবেশোন্মুখ হয়েছিল। পুত্র প্রহ্লাদের প্রভাবে তার নরক থেকে পরিত্রাণ হয়েছে। মহারাজ, তুমি শ্রেষ্ঠ এবং পৃথিবীর পিতা। তুমি শত শত বছর জীবিত থাক। সর্বলোকের ভর্তা ভগবান অচ্যুতের প্রতি তোমার প্রগাঢ় ভক্তি, তোমার কীর্তি পবিত্র। তুমি আমাদের নাথ, তাই আমরা যেন মুকুন্দনাথ হলাম। আমরা তোমার সেবক। প্রজারঞ্জনই দয়াশীল মহৎ ব্যক্তিদের স্বভাব। আজ তোমার প্রসাদে আমাদের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার দূর হল। এতদিন দৈব নামক কর্মের বশে অন্ধের মত কেবল ঘুরে মরছিলাম। যিনি ব্রাহ্মণজাতিতে অধিষ্ঠান করেও ক্ষত্রিয়দের এবং ক্ষত্রিয়জাতিতে অধিষ্ঠিত হয়ে ব্রাহ্মণদের পালন করেন এবং ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় এই দুই জাতিতে অধিষ্ঠিত হয়ে নিজমায়ায় এই বিশ্বের রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকেন, এখন আমরা সেই বিশুদ্ধ সত্ত্বময় মহীয়ান পুরুষকে নমস্কার করি। ৪৫-৫২

দ্বাবিংশ অধ্যায়

পৃথুর প্রতি সনৎকুমারের উপদেশ

মৈত্রেয় বললেন, বিদুর, সভাসদ্‌গণ মহাপরাক্রান্ত পৃথুকে যখন ঐ সব বলছিলেন তখন সূর্যতুল্য তেজস্বী চারজন ব্রহ্মর্ষি সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। তাঁরা সর্ব-প্রাণীকে নিষ্পাপ করে আকাশ থেকে অবতীর্ণ হচ্ছিলেন। তাঁদের জ্যোতি দেখে

বোধ হল যে তাঁরা সনকাদি ঋষি। রাজা অনুচরদের সঙ্গে গাত্রোত্থান করে তাঁদের সাদর দৃষ্টিতে দেখতে লাগলেন। তাঁরা নেমে এসে অর্ঘ্য ও আসন গ্রহণ করলে রাজা সবিনয়ে অবনতমস্তকে যথাবিধি পূজা করলেন। রাজা তাঁদের পাদপ্রক্ষালন করে সেই জলে নিজের মাথার চুল ধুয়ে নিলেন। সেই চারজন ঋষি ভগবান ভবের অগ্রজ, সুতরাং মহামান্য। অগ্নির মত উজ্জ্বল হয়ে তাঁরা সোনার আসনে বসলে রাজা শ্রদ্ধা এবং সংযম সহকারে বলতে লাগলেন, মহোদয়গণ, আমি এমন কি মঙ্গল কাজ করেছিলাম যে আপনাদের দর্শন পেলাম? আপনারা যোগীদেরও দুর্লভ। যে ব্যক্তির প্রতি ব্রাহ্মণগণ এবং অনুচরবর্গসহ ভগবান শিব ও বিষ্ণু প্রসন্ন হন, তাঁর ইহলোক বা পরলোকে কোন বস্তুই দুর্লভ থাকে না। আপনারা সর্বদা সর্বভুবন ঘুরে বেড়ান, তবুও কোন ব্যক্তি আপনাদের দেখতে পায় না। আহা! যে সব গৃহস্থের গৃহে সাধুরা পূজাব্যক্তিদের গ্রহণযোগ্য জল, তৃণ, ভূমি এবং গৃহস্বামী ও ভৃত্যাদের সেবা পান, তাঁদের যদি পূর্বসঞ্চিত পুণ্য না থাকে, তা হলেও তাঁরা প্রশংসার যোগ্য। কিন্তু যে সব গৃহ সাধু-বৈষ্ণবদের চরণোদক-বর্জিত, সে সব আলয় যদিও সর্বসম্পদে পরিপূর্ণ থাকে, তবুও সেগুলি সর্পদের আবাস-বৃক্ষের মতো ভয়ংকর। দ্বিজোত্তমগণ, আপনাদের আগমন সুখের হল তো? আপনাদের অবশ্য এরকম জিজ্ঞাসা করা অর্থহীন। কারণ আপনারা ধীর, মুক্তির জন্য বাল্যকালাবধি মহাব্রতসকল পালন করছেন। এই সংসার দুঃখময় আমরা নিজের নিজের কর্মফলে পতিত হয়ে বিষয়-সুখকেই পরম পুরুষার্থ বলে বোধ করছি। এখানে কোন মঙ্গলের সম্ভাবনা আছে কি? আপনারা আত্মারাম, আত্মানন্দ সম্ভোগেই আপনারা সন্তুষ্ট রয়েছেন। কুশল অথবা অকুশল এরকম ভেদবুদ্ধি আপনাদের নেই; সুতরাং আপনাদের কুশল জিজ্ঞাসা করা বৃথা। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আপনারা সংসারতপ্ত ব্যক্তিদের পরম বন্ধু। আপনারা বলুন, সংসারে কি উপায়ে মানুষের মঙ্গল হতে পারে? ভগবানই ধীর ব্যক্তিদের আত্মা। তিনিই জনে জনে আত্মবৎ প্রকাশমান হয়ে ভক্তজনে অনুগ্রহ বিতরণের জন্য সিদ্ধরূপে পৃথিবীতে বিচরণ করে থাকেন। ১-১৬

পৃথুর ঐ রকম সংক্ষিপ্ত, গভীর অর্থব্যঞ্জক অথচ শ্রুতিমধুর ও সুসঙ্গত বাক্য শুনে সনৎকুমারের মুখমণ্ডল আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। তিনি পরম সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, মহারাজ, তুমি সর্বপ্রাণীর হিতে রত। তুমি বিদ্বান ও সাধু। সাধুদের এই ধরনের বুদ্ধিই হয়ে থাকে। তোমার সঙ্গে দেখা হওয়ায় আমার খুব আনন্দ হল। সাধুসঙ্গ বক্তা ও শ্রোতা উভয়েরই অভিলষিত, কারণ তাঁদের প্রশ্ন ও উত্তর শ্রবণে সকলেরই মঙ্গল হয়। শ্রীহরির পদারবিন্দের গুণকীর্তনে সত্যি তোমার একান্ত রতি আছে। এই অনুরাগ অন্তরাত্মার কামরূপ মলিনতা দূর করে। শাস্ত্র একথাই বলে যে আত্মা ভিন্ন অন্য পদার্থে বৈরাগ্য এবং নির্গুণ ব্রহ্মস্বরূপ আত্মাতে রতি —এই দুটি মানুষের যথার্থ মঙ্গলের কারণ। শ্রদ্ধা, ধর্মচর্যা, জিজ্ঞাসা, আধ্যাত্মিক যোগনিষ্ঠা, যোগেশ্বরদের উপাসনা, পুণ্যশ্লোক শ্রীহরির পবিত্র কথা আলোচনা, তামস ও রাজস ব্যক্তিদের সঙ্গে একত্রে বাস করার অনিচ্ছা, অর্থকাম পরিত্যাগ এবং আত্মার পরিতোষবর্ধক নির্জনস্থানে বাস করার অভিরুচি —এইসব দ্বারা অনায়াসেই আত্মরতি ও আত্মভিন্ন অন্য পদার্থে অনাসক্তি জন্মাতে পারে। অহিংসা, পারমহংস্যচর্যা, স্মৃতি, মুকুন্দচরিতামৃতের আস্বাদন, ইন্দ্রিয়দমন, কামাদি পরিত্যাগ, ব্রতাদি নিয়ম, ধর্মান্তরের অনিন্দা, যোগের কুশলতা, চেষ্টাশূন্যতা, শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বসহন, হরিভক্তদের কর্ণালংকারস্বরূপ হরিগুণ বারংবার উচ্চারণ এবং কার্য-কারণ-স্বরূপ

আত্মাতে ভক্তি—এইসব দ্বারাও ব্রহ্মরূপ পরমাত্মায় প্রকৃষ্ট অনুরাগ অনায়াসে জন্মাতে থাকে। ১৭-২৫

যখন ঐ আত্মরতি ব্রহ্মে নিষ্ঠা প্রাপ্ত হয়, তখন পুরুষ আচার্যবান হয়ে ওঠেন। জ্বলন্ত আগুন যেমন নিজের উৎপত্তিস্থান কাষ্ঠকে দগ্ধ করে, সেই রকম তিনি জ্ঞান ও বৈরাগ্যবলে বাসনাশূন্য অহংকারাত্মক লিঙ্গশরীরকে দগ্ধ করেন। অহংকাররূপ লিঙ্গশরীরই জীবের আবরণ এবং পঞ্চভূতে তার প্রধান অংশ। ঐ ভাবে জীবের লিঙ্গশরীর দগ্ধ হলে তিনি কর্তৃত্বাদি সমুদয় অহমিকা থেকে মুক্ত হন। তখন তিনি আত্মা ভিন্ন বাহ্য ও আন্তর কোন বিষয়ই দেখতে পান না। কারণ, দৃশ্য ও দ্রষ্টা এই উভয়ের মধ্যে যে ব্যবধান ছিল তা তখন নষ্ট হয়ে যায়। অতএব নিদ্রাভঙ্গ হলে পুরুষ যেমন স্বপ্ন-কল্পিত দৃশ্য ও দ্রষ্টাকে দেখতে পায় না, সেইরকম তাঁরও মোহনিদ্রা ভঙ্গ হলে ভেদবুদ্ধি লোপ পায়। অন্তঃকরণরূপ উপাধি থাকাতেই পুরুষ জাগ্রত ও স্বপ্নাবস্থাতে দ্রষ্টা, দৃশ্য এবং অহংকার—এই তিনকে দেখতে পায়। আত্মা বস্তুত এক; উপাধিবশতই তাতে নানা ভেদজ্ঞান হয়ে থাকে। প্রমাণ দেখ—জল, দর্পণ প্রভৃতি ভেদের কারণ থাকলেই পুরুষ নিজের এবং প্রতিবিম্বস্বরূপ অন্য একটির ভেদ দেখতে পায়। যে সব পুরুষ শুধু বিষয়ের চিন্তা করে, তাদের ইন্দ্রিয় অহর্নিশ বিষয়েই আকৃষ্ট থাকে। পরে সেই বিষয়াকৃষ্ট ইন্দ্রিয় মনকে বিষয়াসক্ত করে দেয়। তীরস্থ কুশ যেমন হ্রদ থেকে জল আকর্ষণ করে, মন বিষয়াসক্ত হলে সেইরকম বুদ্ধির কাছ থেকে বিচারসামর্থ্য হরণ করে নেয়। অবিবেকী পুরুষ এসব কিছুই দেখতে পায় না। চেতনা অপহৃত হলে স্মৃতি নষ্ট হয়, স্মৃতিনাশ হলে জ্ঞান নষ্ট হয়। পণ্ডিতেরা ঐ জ্ঞানভ্রংশকেই আত্মকৃত আত্মবিনাশ বলে থাকেন। ২৬-৩১

আত্মা দ্বারা আত্মনাশ অপেক্ষা গুরুতর ক্ষতি আর কি আছে ?[1] আত্মার জন্যই সর্ব বস্তু প্রিয় হয়।[2] বিষয় ও কাম এই দুই-এর চিন্তা দ্বারাই জ্ঞান ও বিজ্ঞান থেকে ভ্রষ্ট হয়ে মানুষ জড়তা লাভ করে থাকে। যে ব্যক্তি ঘোর সংসার-সাগর পার হতে ইচ্ছা করেন, তাঁর পক্ষে যে যে বস্তু ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের প্রতিবন্ধক, তাতে তাঁর আসক্ত হওয়া কখনো উচিত নয়। ধর্মাদি বর্গ চতুষ্টয়ই পুরুষের জন্য। তবুও মোক্ষই আত্যন্তিক পুরুষার্থ বলে গণ্য হয়ে থাকে। কারণ ধর্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গে কালভয় আছে। ব্রহ্মাদি দেবগণ ও আমরা সকলেই গুণ-ক্ষোভের পর উৎপন্ন হয়েছি। কাল তাদের সকলেরই মঙ্গল বিনষ্ট করেছে; সুতরাং তাদের মঙ্গল সম্ভাবনা নেই। যে ভগবান এই স্থাবর, জঙ্গম, দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, বুদ্ধি ও অহংকার সমাচ্ছন্ন সব পদার্থের হৃদয়মধ্যে প্রত্যক্ষস্বরূপ প্রকাশ পাচ্ছেন একমাত্র তাঁকেই উপলব্ধি কর। এক তিনিই নিত্য, অন্য সবই অনিত্য। সেই ভগবান প্রত্যক্ষ, তিনি প্রতি লোমকূপে প্রকাশ পান; তিনি সর্বব্যাপী। ৩২-৩৭

ভগবান সত্যস্বরূপ, পরিশুদ্ধ ও নিত্যমুক্ত। তিনি কর্মমলিন প্রকৃতিকে পরাভূত করেছেন। আমি সেই ভগবানের শরণ গ্রহণ করি। যেমন মালাতে সর্পভ্রম হয়, সেইরকম এই বিশ্ব কার্য-কারণ-ভাবে ভগবানেই প্রকাশ পাচ্ছে, কিন্তু বিবেকের উদয় হলে ঐ ভ্রম দূর হয়। কর্মমলিন প্রকৃতিকে যিনি অভিভূত করেন আমি সেই নিত্যমুক্ত বিশুদ্ধসত্ত্ব শ্রীভগবানের শরণ নিই। যাঁর পাদপদ্মের অঙ্গুলিদলের কান্তি স্মরণমাত্র সাধুপুরুষেরা কর্মদ্বারা গ্রথিত হৃদয়গ্রন্থি সহজেই

১ তুলনীয়: গীতা, ৬।৫-৬ ও ১৩।২৮ শ্লোকাবলী। ২ তুলনীয়: আত্মনস্তু কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবতি। বৃহদারণ্যক ২।৪।৫

ছেদন করে থাকেন, বিষয়নির্লিপ্ত যোগিগণও অত সহজে তা পারেন না। অতএব তুমি বাসুদেবকে ভজনা কর। ভবসমুদ্রে কামাদি ষড়্‌বর্গ কুম্ভীররূপে বর্তমান, তাঁরা সেই সমুদ্র কষ্টে উত্তীর্ণ হন ; কিন্তু তা মোটেই সুখের নয়। এই জন্য তুমি ভগবানের শ্রীচরণকেই ভেলা করে দুস্তর সংসার-সাগর পার হও। ৩৮-৪০

মৈত্রেয় বললেন, বিদুর, ব্রহ্মপুত্র সনৎকুমার এই ভাবে আত্মতত্ত্ব প্রকাশ করলে পৃথু তাঁর প্রশংসা করে বলতে লাগলেন, ভগবান, আর্তবৎসল শ্রীহরি আমার প্রতি পূর্বে যে অনুগ্রহ প্রকাশ করেন, তা পূর্ণ করার জন্যই দয়াপরবশ হয়ে আপনারা এসেছেন এবং সবই সম্পন্ন করলেন। এখন আমি আপনাদের কি গুরুদক্ষিণা দেব ? আমার রাজ্য ও দেহ ভৃগু প্রভৃতি সাধুপুরুষেরা যজ্ঞান্তে স্বীকার করে উচ্ছিষ্টবৎ আমাকে ফিরিয়ে দিয়েছেন। অতএব ঐ দুই বিষয়ে আমার স্বত্ব নেই। তবুও ভৃত্য যেমন প্রভুকে সেবারূপে তাম্বূলাদি সমর্পণ করে, সেই রকম আমি আমার প্রাণ, স্ত্রী, পুত্র, রাজ্য, পৃথিবী, স্বর্ণ, রাজকোষ—এ-সবই আপনাদের অর্পণ করলাম। সেনাপতিত্ব, রাজ্য এবং সর্বলোকে আধিপত্য—বেদশাস্ত্রবেত্তা ব্রাহ্মণই এসব পাবার যোগ্য। ব্রাহ্মণই কেবল নিজের দ্রব্য ভোগ, নিজের বসন পরিধান এবং নিজের ধন দান করে থাকেন। তাঁদের অনুগ্রহে ক্ষত্রিয়েরা অন্নভোজন মাত্র করে, দানে ক্ষত্রিয়ের কোন অধিকার নেই। যে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণরা অধ্যাত্ম বিচার দ্বারা ভগবানের পরমগতি নিশ্চয় করে আমাদের বুঝিয়ে দিলেন, তাঁদের দয়ার শেষ নেই। তাঁরা নিজেদের কর্ম দ্বারাই সন্তুষ্ট থাকেন। অঞ্জলিবন্ধন ছাড়া কোন্ ব্যক্তি তাঁদের প্রত্যুপকার করতে সমর্থ হবে ? ৪১-৪৭

তারপর আদিরাজ পৃথু সেই চারজন যোগীশ্বরের যথাবিধি পূজা করলে তাঁরা আনন্দিতচিত্তে পৃথুর গুণাবলীর প্রশংসা করতে করতে সমবেত দর্শকবৃন্দের সামনেই আকাশপথে উঠে গেলেন। অধ্যাত্মশিক্ষা দ্বারা সাধুদের অগ্রগণ্য পৃথুর চিত্তের একাগ্রতা জন্মালে তিনি আত্মাতেই অবস্থিত হয়ে নিজেকে মনস্কামসিদ্ধ মনে করলেন এবং দেশ, কাল, শক্তি ও সম্পত্তি অনুসারে ফলাফল ভগবানে সমর্পণ করে সমুদয় কর্ম করতে লাগলেন। যদিও তিনি গৃহাশ্রমে রইলেন এবং তাঁর সম্রাজ্যও বর্তমান থাকল, তবুও সঙ্গ ত্যাগ করে সমাহিতচিত্তে কর্মফল ভগবানে অর্পণ করাতে তাঁর চিত্ত অহংকারশূন্য ও সূর্যের মত নির্মল হল। ৪৮-৫২

এরূপভাবে কর্মানুষ্ঠান করতে করতে কালক্রমে পৃথুর অর্চি নামে স্ত্রীর গর্ভে আত্মতুল্য পঞ্চপুত্রের জন্ম হল। তাদের নাম—বিজিতাশ্ব, ধূম্রকেশ, হর্যক্ষ, দ্রবিণ ও বৃক। কৃষ্ণভক্ত পৃথু একাকী হয়েও জগৎ পালনের জন্য কালে কালে সব লোকপালের কর্তব্য সম্পাদন করতেন। সুন্দর মন, বাক্য, মূর্তি ও গুণ দ্বারা প্রজাদের মনোরঞ্জন করাতে দ্বিতীয় চন্দ্রের মতো তিনি 'রাজা' এই উপাধি পেয়েছিলেন। সূর্য যেমন রশ্মিযোগে পৃথিবীর রস আকর্ষণ করে পুনর্বার বর্ষণ দ্বারা তা ত্যাগ করে থাকেন, তিনিও সেইরকম প্রজাবর্গের কাছে কর-রূপে ধনগ্রহণ করে উপযুক্ত কালে পুনর্বার তা প্রত্যর্পণ করতেন। তাঁর প্রতাপে অন্যান্য রাজারা তাঁর আজ্ঞাধীন হয়েছিল। ৫৩-৫৬

যদিও তিনি তেজে স্বয়ং অগ্নিতুল্য দুর্ধর্ষ ও ইন্দ্রের ন্যায় অজেয়, তবু তিনি পৃথিবীর মত সহিষ্ণু এবং স্বর্গের মতো মানুষের অভীষ্টফলদাতা হয়ে মেঘের ন্যায় তৃপ্তি প্রদান করে সকলেরই অভিলষিত বস্তু বর্ষণ করতেন। তিনি ছিলেন সমুদ্রের ন্যায় দুর্বোধ্য, সুমেরুর তুল্য ধীর, শিক্ষায় ধর্মরাজতুল্য এবং হিমালয়-সদৃশ বিস্ময়কর। কুবেরের ন্যায় তাঁর ভাণ্ডার পূর্ণ ছিল, তিনি বরুণের মতো

অর্থ গোপন করতেন। তিনি বায়ুর তুল্য সর্বত্রগামী ও পরাক্রমশালী ছিলেন। তাঁর এমন উগ্রস্বভাব ছিল যে, তাঁকে সাক্ষাৎ ভগবান রুদ্র বলে বোধ হত। তিনি সৌন্দর্যে কন্দর্প সদৃশ এবং চিত্তের ঔদার্যে সিংহের ন্যায় ছিলেন। তিনি প্রজা-বাৎসল্যে মনুর তুল্য, প্রভুত্বে ব্রহ্মার সদৃশ, বেদবাদে বৃহস্পতির সমান এবং সাক্ষাৎ বিষ্ণুর মতো জিতেন্দ্রিয় ছিলেন। গো, ব্রাহ্মণ. গুরু এবং বিষ্ণুভক্তজনের প্রতি তাঁর ভক্তি, লজ্জা, বিনয় ও শীল ছিল এবং পরকার্যসাধনে তাঁর তুল্য কেউ ছিল না। ত্রিভুবনের সর্বত্র সব পুরুষই তাঁর কীর্তি গান করত। সীতাপতি রামচন্দ্র যেমন সাধুদের কর্ণবিবরে প্রবিষ্ট হয়েছেন, মহীপতি পৃথুও সেরূপ পুরুষ ও নারী উভয়ের নিকটই সুপরিচিত ছিলেন। ৫৭-৬৩

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

পৃথুর বৈকুণ্ঠগমন

মৈত্রেয় বললেন, ব্রহ্মতনয় যোগীশ্বর সনৎকুমারের মুখে আত্মতত্ত্বের কথা শুনে পৃথু সর্বদা আত্মনিষ্ঠ থাকতেন। তিনি অন্ন, পুর, গ্রাম প্রভৃতি দান করে এক সময় নিজের বার্ধক্যের কথা মনে হওয়ায় তপোবনে যাবার উদ্যোগ করলেন। তিনি ভাবলেন, পৃথিবীর স্থাবর-জঙ্গমের গ্রাসাচ্ছাদন নির্দিষ্ট করেছি, সাধুদের ধর্ম প্রতি-পালন করেছি। প্রজা প্রতিপালনের জন্য আমার জন্ম। সেকাজ যথাসাধ্য নির্বাহ করায় জগদীশ্বরের আজ্ঞাও পালন করা হয়েছে। এখন গৃহাশ্রমের আর কি প্রয়োজন? এইরকম চিন্তা করে পৃথু নিজ কন্যাস্বরূপা ধরিত্রীকে পুত্রহস্তে সমর্পণ করে তপস্যার জন্য স্ত্রীর সঙ্গে বনে গেলেন। এতে প্রজারা দুঃখে ব্যাকুল হল। পৃথু পূর্বে নিজরাজ্য রক্ষার জন্য যেমন যত্নবান ছিলেন, এখন সেই তপোবনেও বানপ্রস্থীর উপযোগী কঠোর তপস্যায় নিযুক্ত হলেন। কখনো ফলমূল খেয়ে, কখনো শুষ্ক পাতা গলাধঃকরণ করে, কখনো বা জলমাত্র পান করে কয়েকদিন কাটিয়ে শেষে বায়ু-মাত্র সেবন করে তপস্যা করতেন। গ্রীষ্মকালে চতুর্দিকে অগ্নি ও উপরে সূর্যের তাপ সহ্য করে পঞ্চতপা হয়ে থাকতেন। বর্ষায় অনাবৃত স্থানে বসে বৃষ্টিধারায় ভিজতেন, শীতকালে জলে আকণ্ঠ ডুবে থাকতেন। মৌনব্রত ও ভূমিশয্যা তো সবসময়ই ছিল। ক্ষমাশালী, মিতভাষী, দমগুণযুক্ত, স্থিরচিত্ত, স্থিরবীর্য মহারাজ পৃথু প্রাণবায়ু জয় করে শ্রীকৃষ্ণকে আরাধনার জন্য এরকম উত্তম তপস্যার অনুষ্ঠান করলেন। ১-৭

ক্রমান্বয় তপস্যা দ্বারা কর্মক্ষয় করে এবং প্রাণায়াম প্রভৃতি যোগানুষ্ঠান বলে ইন্দ্রিয়গণকে জয় করে তিনি বাসনাশূন্য হয়েছিলেন। যোগৈশ্বর্যশালী সনৎকুমার যে রকম যোগানুষ্ঠানের উপদেশ দিয়েছিলেন সেই অনুসারে তিনি শ্রীহরির আরাধনায় প্রবৃত্ত হলেন। শ্রদ্ধাবান ও পরমভাগবত পৃথুর শ্রীভগবানে ঐকান্তিকী ভক্তি জন্মাল। শীঘ্রই তাঁর বৈরাগ্যজ্ঞানের উদয় হল এবং তিনি তার সাহায্যে সংশয়ের আধার হৃদয়গ্রন্থিকে অনায়াসে ছেদন করলেন। দেহাত্মবুদ্ধিশূন্য, আত্মজ্ঞানবান পৃথু অপ্রাপ্য বস্তু পাবার জন্য এবং প্রাপ্ত যোগৈশ্বর্যের রক্ষার জন্য চেষ্টারহিত হয়ে

যে জ্ঞানবলে হৃদয়গ্রন্থি ছেদন করেছেন, সেই জ্ঞানকেও পরিত্যাগ করলেন। কারণ, যে পর্যন্ত জীবের শ্রীকৃষ্ণের লীলা কথামৃতে ভক্তি না জন্মে সে পর্যন্ত যোগসিদ্ধিদ্বারা সে মুক্তিলাভ করতে পারে না। এভাবে সেই বীরপ্রবর পৃথু পরমাত্মাতে জীবাত্মা লয় করে ব্রহ্মময় হয়ে এক সময় নিজ দেহ পরিত্যাগ করলেন। ৮-১৩

পৃথু চরণদ্বয়ের গুল্‌ফদ্বারা গুহ্যদ্বার নিপীড়িত করে[১] মূলাধার[২] থেকে ক্রমশ বায়ু আকর্ষণ করে প্রথমে স্বাধিষ্ঠান-চক্রে, পরে নাভিস্থলে ও তারপরে ঐ বায়ুকে ক্রমে হৃদয়ে, বক্ষে, কণ্ঠে ও ভ্রূমধ্যে আনলেন; পরে সেই বায়ুকে ব্রহ্মরন্ধ্রে ওঠালেন। তারপর বিভাগক্রমে দেহারম্ভক পঞ্চভূতের মধ্যে দেহের বায়ুকে বায়ুতে, ক্ষিতিকে ক্ষিতিতে, তেজকে তেজে, ইন্দ্রিয়ছিদ্রকে আকাশে ও দেহের জলীয় অংশকে জলে মিশিয়ে দিলেন। ঐ ভাবে দেহ লয় করে পরে অদ্বিতীয় আত্মা লাভ করার জন্য মহাভূতসকলের লয় করলেন। যথাক্রমে ক্ষিতিকে জলে, জলকে তেজে, তেজকে বায়ুতে এবং বায়ুকে আকাশে মিশিয়ে দিলেন। তারপর আকাশকে ইন্দ্রিয়পঞ্চকে এবং ঐ ইন্দ্রিয়কে তাদের উৎপত্তিক্রমে অপঞ্চীকৃত তন্মাত্রভূতে লয় করলেন। তারপর সমস্ত ভূতের আদি অহংকারের সঙ্গে সেই পূর্বাবশিষ্ট আকাশ ও ইন্দ্রিয়সমূহকে অহঙ্কারতত্ত্বে স্থাপন করে পরে ঐ অহঙ্কারের সঙ্গে সেই সমস্তই মহত্তত্ত্বে যুক্ত করলেন। পরে ঐ মহত্তত্ত্বকে মায়া উপাধির জীবাত্মাতেই যোজনা করলেন। এরূপভাবে যে পৃথু পূর্বে মায়াবদ্ধ জীব ছিলেন, তিনি জ্ঞান ও বৈরাগ্যবলে স্বরূপস্থ হয়ে সেই আত্মস্থ জীবোপাধি পরিত্যাগ করলেন। ১৪-১৮

পৃথুর স্ত্রী অর্চির দেহ অতি সুকুমার ছিল। বনভ্রমণে তিনি অনভ্যস্ত হলেও অনায়াসে বনে পদব্রজে পতির অনুগমন করলেন। স্বামীর ভূমিশয়ন ব্রতে তাঁর অত্যন্ত নিষ্ঠা ছিল। ঋষিদের মত তিনিও ফলমূল আহার দ্বারা জীবনধারণ করে স্বামীর সেবা করতেন। ক্লেশকর ব্যাপারেও তাঁর কষ্টবোধ হোত না, কেননা স্বামীর করস্পর্শ ও আদরেই তাঁর কষ্টবোধ দূর হত। পতিপ্রাণা অর্চি যখন দেখলেন যে স্বামীর দেহে চেতনাসমূহ বিনষ্ট হয়েছে, তখন তিনি কিছুক্ষণ বিলাপ করে পাহাড়ের নীচে চিতা রচনা করে তার উপরে স্বামীর দেহ স্থাপন করলেন এবং স্বর্গবাসী দেবতাদের নমস্কার করে স্বামীর শ্রীচরণ ধ্যান করতে করতে তিনবার প্রদক্ষিণ করে ঐ চিতাগ্নিতে প্রবেশ করলেন। ১৯-২২

পৃথুর সঙ্গে সতীসাধ্বী অর্চির সহমরণ দেখে আকাশে দেবপত্নীরা দেবতাদের সঙ্গে স্তব করতে লাগলেন। দেবলোকে তুরী, ভেরী প্রভৃতি বাদ্য বাজতে লাগল এবং দেবনারীরা ঐ পর্বতের সানুদেশে পুষ্পবৃষ্টি করতে করতে পরস্পর বলতে লাগলেন, এই বধূ অর্চি ধন্য। যজ্ঞেশ্বরবধূ লক্ষ্মীর মত ইনি নিজ স্বামীকে সর্বান্তঃকরণে সেবা করেছেন, এখন তিনি আত্মকর্ম দ্বারা আমাদের অতিক্রম করে ঊর্ধ্বলোকে স্বামীকে অনুসরণ করে চলেছেন — দেখুন, সবাই দেখুন। যারা চঞ্চল পরমায়ু পেয়েও, যা দিয়ে ভগবানকে লাভ করা যায়, এরকম জ্ঞান উপার্জন করতে পেরেছেন, তাঁদের অপ্রাপ্য আর কি আছে? তাই অতিকষ্টে বহু তপস্যার ফলে পৃথিবীতে মোক্ষসাধক মানুষজন্ম লাভ করেও যে ব্যক্তি বিষয়ে আসক্ত, সে নিজের অনিষ্ট নিজেই করে; তার জন্মলাভ অর্থহীন। ২৩-২৮

মৈত্রেয় বললেন, দেবপত্নীরা এরকম স্তব করতে থাকলে পৃথুপত্নী অর্চি পতির

১ মুক্তাসন। ২ গুহ্যদ্বার ও লিঙ্গমূলের মধ্যবর্তী স্থান।

অনুগমন করে পবিত্র বিষ্ণুলোকে চলে গেলেন। বিদুর, তোমার নিকট মহাভাগবত পুণ্যকীর্তি পৃথুর চরিত্র বর্ণনা করলাম। যিনি স্থিরচিত্তে শ্রদ্ধার সঙ্গে পৃথুর পুণ্য চরিত্রকথা পাঠ করেন, শ্রবণ করান ও নিজে শ্রবণ করেন নিঃসন্দেহে তাঁর পৃথুর গতি লাভ হয়। পৃথুর চরিত্র শ্রবণে ব্রাহ্মণ লাভ করেন ব্রহ্মতেজ, ক্ষত্রিয় রাজ্য, বৈশ্য ধনরত্ন পশু প্রভৃতি আর শূদ্র শ্রেষ্ঠত্ব। এমনকি শ্রদ্ধার সঙ্গে শ্রবণ করলে সন্তানহীন নারী ও পুরুষ সন্তান লাভ করে, নির্ধন লাভ করে ধন। যাঁর কীর্তি অপ্রকাশিত তিনি খ্যাতিলাভ করেন, মূর্খও পণ্ডিত হয় এবং পৃথুচরিত জীবের নানা রকম অমঙ্গল নিবারক মহাস্বস্ত্যয়ন স্বরূপ। আয়ু, ধন, যশ, স্বর্গপ্রদ ও কাল-মলনাশক এই পৃথুচরিত ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের সম্যক সিদ্ধিকামীরা শ্রদ্ধাব সঙ্গে সর্বদা শ্রবণ করবেন। বিজয়াভিলাষী রাজারা এই পুণ্যচরিত শ্রবণ করলে অপর রাজাদের বশীভূত করতে সমর্থ হবেন এবং তারা পূর্বে যেভাবে পৃথুকে কব ও উপহার দিত, তাঁকে সেভাবে তা প্রদান করবে। তাই অন্য বিষয়াসক্তি পরিত্যাগ করে শ্রীভগবানে নির্মল ভক্তি স্থাপন করে বেণপুত্র পৃথুর পুণ্যচরিত শুনবে, শোনাবে এবং স্বয়ং পাঠ করবে। এই চরিতকথা ভগবানের মাহাত্ম্যসূচক। এতে ভক্তিমান হলে পৃথুর মত উচ্চগতি লাভ করা যায়। মুক্তসঙ্গ মানুষ শ্রদ্ধার সঙ্গে এই পুণ্যকথা শ্রবণ ও কীর্তন করলে ভবসাগর পারের তরণীস্বরূপ শ্রীভগবানের পাদপদ্মে তাঁর আশ্রয় হবে। ২৯-৩৯

চতুর্বিংশ অধ্যায়

প্রচেতাদের জন্ম ও তাঁদের জন্য রুদ্রগীত

মৈত্রেয় বললেন, বৎস বিদুর, পৃথু দিব্যগতি লাভ কবলে তাঁর যশস্বী পুত্র বিজিতাশ্ব ধরার অধীশ্বর হয়ে কনিষ্ঠ চার ভাইকে চার দিক দান করলেন। তিনি হর্যক্ষকে পূর্বদিকের, ধূম্রকেশকে দক্ষিণ দিকের, বৃককে পশ্চিম দিকের এবং দ্রবিণকে উত্তর দিকের আধিপত্য দিলেন। বিজিতাশ্ব ইন্দ্রের কাছ থেকে অন্তর্ধান বিদ্যা লাভ করার দরুন তাঁর 'অন্তর্ধান' নাম হয়। তাঁর ভার্যা শিখণ্ডিনীর গর্ভে পাবক, পবমান ও শুচি নামে আপন গুণবিশিষ্ট তিনটি পুত্র জন্মে। ঐ তিন পুত্র পূর্বজন্মে তিন অগ্নি ছিলেন। তাঁরা বশিষ্ঠের শাপে মানবজন্ম গ্রহণ করেন, কিন্তু পরে তাঁরা পুনর্বার অগ্নিত্ব লাভ করেছিলেন। অন্তর্ধানের অন্য একটি ভার্যার নাম ছিল নভস্বতী। তাঁর গর্ভে তিনি হবির্ধান নামে এক পুত্র লাভ করেন। অন্তর্ধান ইন্দ্রকে পিতৃযজ্ঞের অশ্ব অপহরণকারী জেনেও বধ করেন নি; তাতেই ইন্দ্র তুষ্ট হয়ে তাঁকে অন্তর্ধান বিদ্যা প্রদান করেন। অন্তর্ধান কিছুদিন রাজকার্য নির্বাহ করার পর তাঁর মনে হল কর আদায়, দণ্ডবিধান ও শুল্কগ্রহণ—রাজাদের এই বৃত্তিগুলি নিদারুণ পীড়াদায়ক। অতএব দীর্ঘকাল-সাধ্য একটি যজ্ঞ আরম্ভ করে তিনি সেই ছলে ঐ পীড়াদায়ক বৃত্তিগুলি পরিত্যাগ করলেন। ১-৬

সে যজ্ঞে তিনি পরমাত্মদর্শী হয়ে ভক্তের ক্লেশহারী পরমাত্মার সেবা করতে লাগলেন। পুণ্যসমাধি দ্বারা শীঘ্র তাঁর বিষ্ণুলোক প্রাপ্তি হল। মহারাজ পৃথুর পৌত্র হবির্ধানের স্ত্রীর নাম হবির্ধানী। তাঁদের ছটি পুত্রের নাম—বর্হিষদ, গয়, শুক্ল, কৃষ্ণ, সত্য ও জিতব্রত। ঐ ছজনের মধ্যে বর্হিষদ অসাধারণ ভাগ্যবান ছিলেন।

তিনি ক্রিয়াকাণ্ডে ও যোগে সর্বদা নিরত থাকতেন। তিনি যে স্থানে একটি যজ্ঞ করতেন, তারই সামান্য দূরে পুনরায় আর একটি যজ্ঞ করে বসুধাতলকে যজ্ঞবেদিময় করে তুলেছিলেন এবং তার পূর্বাগ্র কুশদ্বারা ধরণীতল আচ্ছন্ন হয়েছিল। এজন্য লোকে এখনও তাঁকে প্রাচীনবর্হি বলে থাকে। মহাত্মা প্রাচীনবর্হি ব্রহ্মার আদেশে সমুদ্রকন্যা শতদ্রুতিকে বিবাহ করেন। সর্বাঙ্গসুন্দরী নবযৌবনসম্পন্না শতদ্রুতি বিবাহসাজে সজ্জিত হয়ে যখন অগ্নি প্রদক্ষিণ করছিলেন, তখন অগ্নি 'শুকী'র[১] প্রতি যে রকম কামভাব প্রকাশ করেন, শতদ্রুতিকেও সেরূপ ভাবে কামনা করেন। সেই নব বিবাহিতা বধূ নূপুর সহযোগে চরণধ্বনি করেই সুর, অসুর, গন্ধর্ব, মুনি, সিদ্ধ, উরগ এবং নরগণকে বশীভূত করলেন। কালক্রমে শতদ্রুতির গর্ভে প্রাচীনবর্হি'র দশ ছেলের জন্ম হল। তাদের সকলেরই নাম প্রচেতা এবং সবাই ব্রতধারী ও ধর্মে পারদর্শী ছিলেন। ৭-১৩

প্রাচীনবর্হি'র নিকট প্রজা সৃষ্টি করার আদেশ পেয়ে তাঁরা তপস্যা করতে সমুদ্রে প্রবেশ করলেন এবং দশ হাজার বছর তপস্যা করে ভগবানের অর্চনায় প্রবৃত্ত হলেন। পথের মধ্যে শিবের সঙ্গে তাদের সাক্ষাৎ হওয়ায় শিব প্রসন্ন হয়ে তাঁদের যা উপদেশ দিলেন, প্রচেতারা সংযত হয়ে কেবল তাঁরই ধ্যান, তাঁরই জপ এবং তাঁকেই পূজা করতে লাগলেন। বিদুর জিজ্ঞাসা করলেন, ব্রাহ্মণ, পথের মধ্যে শিবের সঙ্গে প্রচেতাদের যে-ভাবে সাক্ষাৎ হয় এবং শিব প্রসন্ন হয়ে তাদের যা বলেছিলেন, অনুগ্রহ করে তা বলুন। মুনিরা আসক্তিশূন্য হয়ে যে শিবের জন্য ধ্যান করেও দর্শন লাভ করতে পারেন না, সেই শিবের সঙ্গে দেহীদের সাক্ষাৎ লাভ কিভাবে সম্ভব হতে পারে? মহাদেব আত্মারাম হয়েও সৃষ্টি পালনের জন্য সংহারশক্তিযুক্ত হয়ে বিচরণ করেন। মৈত্রেয় বললেন, বৎস, পিতা প্রজাসৃষ্টি করতে আদেশ করলে প্রচেতারা তাঁর কথা শিরোধার্য করে প্রসন্নমনে তপস্যার জন্য পশ্চিমদিকে যাত্রা করলেন। ১৪-১৯

কিছুদূর গিয়ে তাঁরা একটি বড় সরোবর দেখতে পেলেন। ঐ সরোবর সমুদ্রের মতো বিশাল এবং মহৎ ব্যক্তির মনের মত নির্মল। তাতে নানারূপ মৎস্য ও জলজন্তু ক্রীড়া করছিল। বহু নীলোৎপল, রক্তোৎপল প্রভৃতি জলজ ফুলগুলি প্রস্ফুটিত হয়ে তাতে মনোহর শোভা ধারণ করছিল এবং হংস, সারস, চক্রবাক, কারণ্ডব প্রভৃতি জলচর পাখিরা সারাদিন কোলাহল করে খেলা করছিল। তার তীরে নানারকম লতা ও বৃক্ষ মত্ত মধুকরের মধুর স্বরে পুলকিত হয়ে রয়েছিল। সেখানে বায়ু পদ্মরাগ আকর্ষণ করে দিকে দিকে আনন্দপ্রবাহ বিস্তীর্ণ করছিল। প্রচেতারা সেই সরোবরের তীরে পৌঁছালে মৃদঙ্গ, পণবাদি বাদ্যের মনোহর গীত শুনতে পেলেন। তাতে তাঁরা সকলেই বিস্ময়ান্বিত হয়ে চার দিকে তাকাতে লাগলেন। সেই সময়ে তাঁরা দেখলেন যে ভগবান শিব অনুচরদের নিয়ে ঐ সরোবর থেকে উঠছেন। তাঁর কান্তি তপ্ত সোনার ন্যায় মনোহর, নীলকণ্ঠ এবং ললাটদেশ ত্রিলোচনে বিভূষিত। চারদিকে দেবগণ তাঁর স্তব করছেন। প্রচেতারা তাঁকে দেখে আশ্চর্যান্বিত হয়ে প্রণাম করলেন। ২০-২৫

ভগবান শিব শরণাগতের দুঃখহারী এবং অতি ধর্মবৎসল। প্রচেতাদের ভাবদর্শনে তাঁর মনে হল যে এ সব ব্যক্তি ধর্মজ্ঞ, সুশীল এবং প্রীতিমান। শিব আনন্দিত হয়ে তাঁদের বললেন, বৎসগণ, তোমরা বর্হিষদের পুত্র, তোমাদের সাধু সংকল্প আমি জানি; তোমাদের মঙ্গল হোক। তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশের জন্য আমি দর্শন দিলাম। যে ব্যক্তি

১ পূর্বে সপ্তর্ষিদের যজ্ঞে সপ্তর্ষিভার্যা

প্রকৃতি-পুরুষের নিয়ন্তা ভগবান বাসুদেবের শরণাপন্ন সে আমার অতিশয় প্রিয়। স্বধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তি বহুজন্মে ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হয় : তারা পরে আমাকে লাভ করে। কিন্তু যে ব্যক্তি ভগবদ্ভক্ত, তাঁর দেহান্তেই প্রপঞ্চাতীত বিষ্ণুপদ লাভ হয়ে থাকে। ব্রহ্মাদি দেবগণেরও আবার যখন অধিকার কাল শেষ হবে তখন ঐ বৈষ্ণবপদ লাভ হবে। তোমরা পরম ভাগবত, এজন্য ভগবানের মতো আমারও প্রিয়পাত্র। ভগবদ্ভক্তদের আমি ছাড়া অন্য কেউ প্রিয়তম নেই। অতএব তোমাদের পবিত্র, মঙ্গলসাধক ও পরম মোক্ষপ্রদ জপ বলছি, তোমরা তা শোন। ২৬-৩১

মৈত্রেয় বললেন, ভগবান রুদ্র এই এইভাবে দয়াদ্রহৃদয় হয়ে কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান সেই রাজপুত্রদের নারায়ণ বিষয়ক নানা উপদেশ দিলেন। রুদ্র নারায়ণের স্তব করতে করতে বললেন, ভগবান আত্মজ্ঞ ব্যক্তিদের স্বানন্দ লাভের জন্য তোমার উৎকর্ষ হয়েছে। তাই আমার স্বস্তি[১] হোক। তুমি প্রাচুর্যময় আনন্দরূপে সর্বদাই বর্তমান। তুমি পরমাত্মা, সর্বময়, সর্বস্বরূপ তোমাকে প্রণাম। সকল লোকের কারণরূপ পদ্ম যাঁর নাভিদেশে, প্রাণীদের পঞ্চভূত, সমস্ত ইন্দ্রিয় প্রভৃতির যিনি নিয়ন্তা তাঁকে প্রণাম করি। আর চিত্তের অধিষ্ঠাতা সর্বাধার যিনি বাসুদেব, যিনি শান্তিময়, নির্বিকার ও স্বয়ংপ্রকাশ তাঁকে প্রণাম করি। যিনি অহঙ্কারের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সংকর্ষণ, অব্যক্ত, অনন্ত ও অন্তক, যাঁর দ্বারা সারা বিশ্বের জ্ঞান উৎপন্ন হয়, যিনি বুদ্ধির অধিষ্ঠাতৃদেব, তাঁকে নমস্কার করি। হে অনিরুদ্ধ, আমার ইন্দ্রিয়সমূহের সঙ্গে ইন্দ্রিয়গুলির প্রধান মনস্বরূপ তুমিই, তোমাকে নমস্কার করি। হে ভগবান, তুমি সূর্যরূপী পরমহংস, পূর্ণ তুমি স্বকীয় তেজদ্বারা বিশ্বকে পরিব্যাপ্ত করেছ, তোমার ক্ষয়বৃদ্ধি নেই। তুমি স্বর্গ ও মোক্ষের দ্বারস্বরূপ, সর্বান্তর্যামী, তোমাকে নমস্কার করি। তুমি হিরণ্যবীর্য (অগ্নিস্বরূপ) এবং চতুর্হোত্র প্রভৃতি যজ্ঞের সম্পাদক। সে সব যজ্ঞের বিস্তারের জন্যও তোমাকে নমস্কার। তুমি পিতৃলোকের অন্ন, দেবলোকের অন্নময় যজ্ঞ সোমরূপে। তুমি ত্রয়ীপতি, একমাত্র সর্বেশ্বর, তোমাকে প্রণাম। হে ভগবান, সমস্ত প্রাণীদের তৃপ্তিদাতা জলরূপ যে তুমি, তোমাকে নমস্কার করি। পৃথিবীরূপে ও সমস্ত প্রাণীর যে সমস্ত আত্মা তার দেহরূপী বিরাট মূর্তি যে তুমি তোমাকে বার বার প্রণাম করি। হে ভগবান, মনশক্তি, দেহশক্তি ও ইন্দ্রিয়শক্তির সঙ্গে ত্রিভুবনের সমস্ত প্রাণীর প্রাণবায়ু স্বরূপ যে তুমি, তোমাকে প্রণাম। হে দেব, শব্দগুণযুক্ত অর্থসমূহের প্রকাশক আকাশরূপী তুমি, আন্তর ও বাহ্যিক ব্যবহারের অবলম্বনস্বরূপে তোমাকে প্রণাম করি। তুমি পুণ্যলোকস্বরূপ, আনন্দজনক স্বর্গলোকস্বরূপ। পিতৃলোক ও দেবলোক প্রাপ্তিসাধক প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি-লক্ষণ কর্মস্বরূপ তোমাকে বার বার প্রণাম করি। আর তুমিই অধর্মের পরিণতি অত্যন্ত দুঃখদায়ক মৃত্যুস্বরূপ। আবার তুমি সর্বকর্মের ফলদাতা ও সর্বমন্ত্র-স্বরূপ, তোমাকে বার বার প্রণাম। ৩২-৪১

হে ভগবান, তুমি সমস্ত অবতারের একমাত্র কারণ, পরমধর্মস্বরূপ। তুমিই শ্রীকৃষ্ণ, পুরাণপুরুষ, অমোঘ ধারণশক্তিশালী এবং কপিলাদি[২] অবতার ভেদে সাংখ্য ও যোগাদির প্রবর্তক। তোমাকে নমস্কার করি। কর্তা, করণ ও কর্ম—এই শক্তিত্রয় সমন্বিত অহংকারাত্মা তুমি রুদ্র, তোমাকে নমস্কার। আর নানারকম বাক্যের একমাত্র প্রবর্তক, তুমি জ্ঞান ও ক্রিয়া স্বরূপ ব্রহ্মা, তোমাকে নমস্কার করি। হে ভগবান, তোমাকে দেখতে ইচ্ছা করি। ভক্তদের অতিপ্রিয় এবং সকল ইন্দ্রিয়ের গুণ যে বিষয় শব্দ-স্পর্শাদি তার প্রকাশক (অথবা ইন্দ্রিয়দের

১ স্বস্তি—মঙ্গল, এখানে আনন্দসন্তানুভ   ২ দ্রষ্টব্য, গীতা, ১০।২৬ শ্লোক।

বিষয়াসক্তি বিনাশক, অত্যন্ত আনন্দদায়ক) তোমার সেই 'রূপ' আমাদের দেখিয়ে কৃতার্থ কর। তোমার শ্রীমূর্তি অতিস্নিগ্ধ নবজলধরের মত শ্যামবর্ণ এবং সকল সৌন্দর্যের আধারস্বরূপ। ঐ মূর্তি অতিসুচারু আজানুলম্বিত চতুর্বাহু সমন্বিত, তার সকল অবয়বই মনোহর এবং তা সুন্দর বদনকমলে সুশোভিত। তোমার চক্ষু পদ্মপাতার মত, ভ্রূযুগল সুন্দর, নাসিকা, দন্ত ও কপোলও সুন্দর। তাঁর কটাক্ষ অতি প্রীতিকর, কপোল কুন্তলে সুশোভিত। তাঁর কটিতে উজ্জ্বল পদ্মকেশরের মত পীত বসন, কর্ণদ্বয়ে অতি উজ্জ্বল কুণ্ডল। কিরীট, বলয়, হার, নূপুর, মেখলা, শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, মালা ও মণি প্রভৃতিতে তাঁর শ্রী আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। সিংহের স্কন্ধদেশে যেমন কেশর থাকে সেই রকম কৌস্তুভমণি তাঁর গ্রীবাদেশে সুন্দর কান্তি বিস্তার করেছে। বক্ষস্থলে লক্ষ্মীদেবী থাকায় ঐ বক্ষের শোভা সুবর্ণ রেখাঙ্কিত পাষাণকে যেন তিরস্কার করছে। তাঁর দেহের শ্বাসপ্রশ্বাস কালে ত্রিবলীসকল কম্পিত হয় এবং অশ্বত্থপাতার মত উদর প্রকাশ পায়। গভীর আবর্তযুক্ত নাভিরূপে এরকম স্ফুরিত হচ্ছে যেন তা থেকে এই বিশ্ব প্রকাশিত হয়ে আবার তাতেই প্রবেশ করবে। তাঁর শ্যাম শ্রোণীতে পীত বসনের উপর স্বর্ণময় মেখলা শোভা পাচ্ছে। চরণ দুটি সমান অথচ মনোহর, ঊরু সুশোভন এবং জানুদ্বয় অনুচ্চ। হে ভগবান, তুমিই তামসিক অজ্ঞ ব্যক্তিদের পথপ্রদর্শক গুরু-স্বরূপ। অতএব শরতে প্রস্ফুটিত পদ্মপলাশের মত তোমার চরণযুগলের নখদীপ্তি দ্বারা আমাদের অন্ধকার দূর কর। হে প্রভু, তোমার ঐ মূর্তি দেখে ভয় দূর হয়, তুমি সর্বপ্রাণীর রক্ষক। ঐ মূর্তিতে একবার দেখা দাও। তোমার ঐ ভুবনভয়হারী রূপ অতি দুর্লভ। যে সব ব্যক্তি আত্মশুদ্ধি লাভ করতে ইচ্ছা করেন, তাঁরা কেবল ধ্যানই করতে পারেন, কিন্তু তাঁরাও ঐ রূপ প্রত্যক্ষ দেখতে পান না। এই রূপে ভক্তি করলে জীবের অক্ষয় গতি লাভ হয়। যে ভক্তিমান, সেই তোমাকে লাভ করতে পারে। স্বর্গে যাঁর রাজ্য আছে, তিনিও তোমাকে পাবার বাসনা করে থাকেন। আর যে মানুষ আত্মতত্ত্বজ্ঞ তিনিও তোমাকে পেতে ইচ্ছুক। আমি তোমার পূজা ছাড়া অন্য কিছুই চাই না। সাধুপুরুষরাও তোমাকে সহজে আরাধনা করে পান না। ভক্তিদ্বারা আরাধনা করে কোন্ ব্যক্তি তোমার চরণ ছাড়া স্বর্গাদি সুখ প্রার্থনা করবে? যে কৃতান্ত নিজ শৌর্যবীর্য স্ফুরিত ভ্রূকুটি দ্বারা বিশ্বনাশ করতে সমর্থ, তিনিও তোমার চরণাশ্রিত। ৪২-৫৬

যে জন তোমার শরণাগত, তার উপর কৃতান্তের কোন আধিপত্য নেই। তোমার সহচরদের সঙ্গ এত দুর্লভ ও পবিত্র যে তার ক্ষণার্ধ মাত্রও স্বর্গ অথবা মোক্ষ—এই উভয়ের থেকে বেশী। তোমার চরণযুগল সর্বপাপ হরণ করে। অভ্যন্তরে তোমার কীর্তিতে ও বাইরে গঙ্গাজলে স্নান করে যাদের পাপরাশি ধুয়ে গেছে এবং যাদের চিত্ত ক্রোধহীন ও সরল তোমার অনুগ্রহে যেন তাদের সঙ্গে মিলতে পারি। যখন সাধুদের প্রতি ভক্তির দ্বারা পুরুষের চিত্ত এমন অনুগৃহীত ও বিশুদ্ধ হয় যে তা আর বাহ্য বিষয় দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে অজ্ঞান-গুহাতে লয় পায় না, তখনই সেই পুরুষ তোমার তত্ত্ব সম্যক জানতে পারেন। তোমার তত্ত্ব আশ্চর্য, তাতে এই পরিদৃশ্যমান বিশ্ব যেমন প্রকাশ পায়, তেমনি বিশ্বের মধ্যেও তার প্রকাশ হয়ে থাকে। সেই তত্ত্ব পরমব্রহ্ম ও পরমজ্যোতি স্বরূপ, আকাশের মত তা সর্বব্যাপী। হে ঈশ, তুমি নিজে নির্বিকার হয়েও বহুরূপিণী মায়া দ্বারা এই বিশ্বকে সৃজন, পালন ও ধ্বংস করছ। ঐ মায়া তোমাকে অভিভূত করতে পারে না, পরন্তু তার দ্বারা অন্যের ভেদজ্ঞান উপস্থিত হয়। তুমি মায়াক্ষোভ রহিত, সর্বথা স্বাধীন। আমরা যেন তোমাকে জানতে পারি। যে যোগীরা শ্রদ্ধান্বিত হয়ে সিদ্ধিলাভের জন্য তোমার পূর্বোক্ত

সাকার রূপের ভজনা করেন, বেদে ও তন্ত্রে তাঁরাই সুপণ্ডিত বলে গণ্য। যারা ঐ রূপ অগ্রাহ্য করে কেবল জ্ঞানে প্রবৃত্ত তারা বিজ্ঞ নয়। কারণ তুমি ভূত, ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণের নিয়ন্তা। ৫৭-৬২

প্রভু, তুমি একমাত্র আদিপুরুষ। তোমার মায়াশক্তি সুপ্ত থাকে সত্য, কিন্তু পরে তোমার ঐ মায়াশক্তি বলেই সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিন গুণ বিভিন্ন হয়। শেষে তা থেকেই মহৎতত্ত্ব, অহংকারতত্ত্ব, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী, দেব, ঋষি, ভূতগণ এবং বিশ্ব ক্রমশ উৎপন্ন হতে থাকে। যিনি নিজের শক্তি দ্বারা জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ এই চার রকমের শরীর সৃষ্টি করে নিজের অংশ দ্বারা ঐ সকলে প্রবিষ্ট হন, তিনি শরীরমধ্যে জ্ঞানাভাস স্বরূপ বাস করেন বলে পণ্ডিতেরা তাঁকেই পুরুষ বলে থাকেন। কিন্তু তুমি সংসারী জীব নও। যেমন পুরমধ্যে থেকেও মধুমক্ষিকারা নিজেদের সৃষ্টি-করা মধু পান করে থাকে, সেইরকম যিনি অবিদ্যায় মুগ্ধ হয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়সুখ ভোগ করেন, তিনিই সংসারী জীব। প্রভু, তোমার বেগ অতি প্রচণ্ড। বায়ু যেমন মেঘরাজিকে চালিত করে, সেই রকম ভূতদ্বারা ভূতসকলকে চালিত করে তুমি লোকসমূহকে আকর্ষণ করে কালরূপে সংহার কর। ৬৩-৬৫

কেউই তোমার স্বরূপ লক্ষ্য করতে সমর্থ নয়। বিষয়ের প্রতি লোভ মানুষের কখনই নিবৃত্ত হয় না, বরং ক্রমশই বেড়ে উঠতে থাকে। সুতরাং 'এ কর্ম এভাবে করব'—এই চিন্তায় মানুষ সর্বদা উন্মত্ত থাকে। যেমন ক্ষুধার্ত লেলিহান সাপ ইঁদুরকে আক্রমণ করে, তুমিও সেরূপ ঐসব ব্যক্তিকে আক্রমণ করে থাক। তোমার প্রমাদ নেই। তোমার প্রতি অনাদর করলে মনুষ্যদেহ ক্ষয় হয়। অতএব কোন্ পণ্ডিত তোমার পাদপদ্ম অনাদর করতে পারে? আমাদের গুরু ব্রহ্মাও তোমার চরণকমল পূজা করেন; চতুর্দশ মনুও বিনাশের আশংকায় দৃঢ় বিশ্বাসে তোমার চরণকমল অর্চনা করে থাকেন। হে ব্রহ্ম, এই বিশ্ব কালভয়ে বিলীন হচ্ছে। অতএব তুমি আমাদের গতি হও। তুমি আমাদের গতি হলে আমরা আর কাউকে ভয় করব না। ৬৬-৭০

ভগবান রুদ্র এইভাবে নারায়ণের স্তব করে প্রচেতাদের বললেন, তোমরা শুদ্ধমনে স্বধর্মের অনুষ্ঠান করে ভগবানে চিত্ত সমর্পণ করে এই স্তোত্র জপ কর। তোমাদের মঙ্গল হোক। আর যিনি আত্মা এবং সর্বপ্রাণীতে অবস্থিত, সেই হরিকে আত্মস্থ জেনে জপ ও আরাধনা কর। আমি যে স্তোত্র তোমাদের কাছে বললাম, ভগবান ব্রহ্মা সৃষ্টিকার্যে অভিলাষী হয়ে আমাদের এবং ভৃগু প্রভৃতি আত্মজদের কাছে তা বলেছিলেন। আমরা এই স্তোত্রবলে অজ্ঞান বিনাশ করে নানা রকম প্রজা সৃষ্টি করেছি। যে কৃষ্ণপরায়ণ ব্যক্তি একাগ্রচিত্ত হয়ে নিত্য এই স্তোত্র জপ করবেন, তাঁর মঙ্গল সুনিশ্চিত। ৭১-৭৪

যত রকম মঙ্গলকর বিষয় আছে, তার মধ্যে জ্ঞান সর্বাপেক্ষা প্রধান। এই জ্ঞানরূপ তরীর সাহায্যে দুষ্পার দুঃখসাগর সহজে পার হতে পারা যায়। আমি এই যে স্তোত্র কীর্তন করলাম যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে তা পাঠ করবে, তার তাতেই শ্রীহরির আরাধনা হবে। এই স্তোত্র দ্বারা ভগবান শ্রীহরি স্তুত হলে সুপ্রসন্ন হন। তিনি মঙ্গলের একমাত্র আশ্রয়। তাঁর তুষ্টি জন্মালে পুরুষ যা প্রার্থনা করেন, তাই পান। যে পুরুষ প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করে শ্রদ্ধায় কৃতাঞ্জলিপুটে এই স্তোত্র নিজে শুনবে এবং অপরকে শোনাবে তার কর্মবন্ধন মোচন হবে। রাজপুত্রগণ, আমাদের দ্বারা গীত পরম পুরুষ পরমাত্মার এই স্তব তোমরা একাগ্রচিত্তে জপ করতে করতে তপস্যাচরণ কর, তা হলে তপস্যার শেষে অভীপ্সিত বস্তু লাভে সমর্থ হবে। ৭৫-৭৯

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

পুরঞ্জনের উপাখ্যান ও দেহপুরের বর্ণনা

মৈত্রেয় বললেন, বিদুর, ভগবান রুদ্র এভাবে প্রচেতাদের উপদেশ দিয়ে ও তাঁদের দ্বারা পূজিত হয়ে সকলের সমক্ষেই অন্তর্হিত হলেন। তারপর সেই প্রচেতারা ভগবানের রুদ্রগীত জপ করে দশ হাজার বছর জলের মধ্যে থেকে তপস্যা করতে লাগলেন। এ সময়ে প্রাচীনবর্হি কর্মে আসক্ত হয়েছিলেন। অধ্যাত্মতত্ত্বজ্ঞ দয়ালু নারদ এসে তাঁকে জ্ঞানোপদেশ দিলেন। ১-৩

নারদ বললেন, মহারাজ, আপনি এই কর্মদ্বারা আত্মার কি পরিমাণ মঙ্গল কামনা করছেন? দুঃখ-নিবৃত্তি আর সুখ-প্রাপ্তি মানুষের জীবনের এই শ্রেষ্ঠ দু'টি লাভ তো এরকম কর্মদ্বারা হয় না। ৪

প্রাচীনবর্হি বললেন, মহর্ষি, আমার বুদ্ধি কর্মে আসক্ত, তাই কর্তব্য অকর্তব্য কিছুই আমি বুঝি না। আমাকে নির্মল জ্ঞান উপদেশ দিন যাতে আমি কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারি। কপটতাময় গৃহে থেকে মানুষ স্ত্রী, পুত্র, ধন প্রভৃতিকেই পরম পুরুষার্থ বলে জানে। সেই অজ্ঞ লোক ঘোরতম সংসারপথে ভ্রমণ করে বেড়ায়, কখনও প্রকৃত পরমার্থ লাভ করতে পারে না। ৫-৬

নারদ বললেন, প্রজাপতি, আপনি দয়াহীন হয়ে যজ্ঞকর্মে যে সব পশু বিনাশ করেছেন, তাদের দেখুন।[১] এরা আপনার মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছে। আপনার দেওয়া যন্ত্রণা চিন্তা করে এরা লৌহময় শৃঙ্গ দ্বারা আপনার দেহ ছিন্নভিন্ন করবে। এ বিষয়ে আপনার কাছে পুরঞ্জনের প্রাচীন ইতিহাস বলব, শুনুন। পুরঞ্জন নামে এক বিখ্যাত রাজা ছিলেন। তাঁর একটি মাত্র বন্ধু ছিল। তার নাম বা কর্ম কেউ জানত না। সেই পুরঞ্জন নিজের ভোগস্থান খুঁজতে খুঁজতে সমস্ত পৃথিবী ভ্রমণ করলেন, কিন্তু কোথাও উপযুক্ত আবাস পেলেন না। তখন তিনি ভাবতে লাগলেন যে এত পুর আছে তার কোনটিই তাঁর ভাল লাগল না, কোনটিই তাঁর বাসনাসিদ্ধির উপযুক্ত মনে হল না! তারপর পুরঞ্জন একদিন হিমালয়ের দক্ষিণাংশে কর্মক্ষেত্র ভারতবর্ষে নয়টি দ্বারযুক্ত একটি সুলক্ষণ পুরী[২] দেখলেন; তা প্রাচীর, উপবন, অট্টালিকা ও পরিখায় শোভিত। তার গবাক্ষ, দ্বার এবং স্বর্ণ, রৌপ্য ও লৌহময় শিখরযুক্ত গৃহগুলি সর্বতোভাবে বিভূষিত। নীলকান্ত, স্ফটিক, বৈদূর্য, মুক্তা, মরকত, মণি-মাণিক্য প্রভৃতিতে নির্মিত হর্ম্যস্থলী পাতালপুরীর মত উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল। আর সভাস্থল, চতুষ্পথ, রাজমার্গ, দ্যূতক্রীড়াস্থান, হাট, বিশ্রামস্থান, ধ্বজা, পতাকা এবং প্রবালময় বেদীতে ঐ পুরী চমৎকার শোভা পাচ্ছিল। তার বাইরের দিকে একটি মনোহর উপবন। সেই উদ্যান নানারকম দিব্য গাছ ও লতায় পরিপূর্ণ। জলাশয়গুলি নানা পাখির কূজনে ও ভ্রমরের গুঞ্জনে মুখরিত ছিল। মনে হচ্ছিল যেন স্বয়ং জলাশয়ই কোলাহল করছে। সরোবরগুলির তটবর্তী বৃক্ষ-শাখা ও পল্লব হিমকণাবাহী সুগন্ধ বাতাসে আন্দোলিত হওয়ায় সেখানকার সমৃদ্ধি আরো বেড়ে গিয়েছিল। ৭-১৪

১ নারদ যোগবলে সে সব পশু রাজার প্রত্যক্ষগোচর করলেন। ২ এই পুরীকে মনুষ্যদেহও বলা হয়। পুরীর ভিন্ন অংশগুলিকে দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঙ্গে সহজেই তুলনা করা চলে।

নানারকম বন্যজন্তু পরস্পর হিংসা ছেড়ে সেখানে বাস করছে ; কাজেই সকল পশু সেখানে নির্ভয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। গাছের উপর কোকিলরা কুহু কুহু রব করছে, যেন তারা পথিকদের ডেকে বলছে, এস, এস, একবার এই কাননে প্রবেশ কর। পুরঞ্জন ঐ উপবনে একটি কামচারিণী রমণীকে দেখতে পেলেন। সেই নবযুবতীর সঙ্গে দশটি ভৃত্য ছিল। তারা প্রত্যেকেই আবার শত শত নায়িকার প্রণয়ী। পাঁচমাথা যুক্ত এক সাপ দ্বারপাল হয়ে তাঁকে রক্ষা করছে। তিনি তাঁর স্বামীর খোঁজে সেখানে এসেছিলেন। ঐ নবীনার নাক ও দাঁত অতি সুন্দর, কপোলদুটি মনোহর, মুখমণ্ডল অপূর্ব শ্রীমণ্ডিত। তাঁর কান দুটি যেন কুণ্ডলের মত শোভাময়। তাঁর বর্ণ শ্যাম। তাঁর কটিবস্ত্র পিঙ্গলবর্ণ, নিতম্বদেশ সুন্দর ও কনকময় মেখলায় অলংকৃত। তিনি চঞ্চল চরণে নূপুরধ্বনি করে দেবাঙ্গনার মতো এদিক ওদিক ভ্রমণ করছেন। তাঁর কুচযুগল নবপ্রকাশিত হয়ে নবযৌবন সূচিত করছে। গজগামিনী লজ্জায় বস্ত্রাঞ্চল দ্বারা বারংবার ঐ স্তনদুটিকে আচ্ছাদন করে গোপন করছেন। ঐ লজ্জাবতী অথচ ঈষৎ হাস্যময়ী যুবতীর অপাঙ্গ যেন শাণিতবাণ তুল্য। তাঁর চোখের দুই প্রান্ত পুঙ্খের তুল্য; প্রেমভরে চঞ্চল ভ্রূযুগলই ধনু। পুরঞ্জন ঐ যুবতীর কটাক্ষশরে বিষম বিদ্ধ হয়ে সুললিত বাক্যে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, পদ্মপলাশলোচনে, তুমি কে? কার কন্যা? তুমি কোথা থেকে এসেছ? এই উপবনে কি করতেই বা এসেছ? আমাকে সব বল। সুন্দরি, তোমার অনুবর্তী এই একাদশ মহাবীর[১], এই অসংখ্য স্ত্রী[২] এরা কারা? আর এই সর্পই[৩] বা কে? তুমি লজ্জাবতী, না ভবানী, বাণী, না সাক্ষাৎ লক্ষ্মী, তা বল। মুনিরা যেরকম জগৎপতিকে অন্বেষণের জন্য নির্জন অরণ্য আশ্রয় করে; তুমিও কি সেরকম মনোমত পতির অন্বেষণ করছ? তোমার হাত থেকে লীলাকমলটি কোথায় পড়ল? সুন্দরি, লজ্জা প্রভৃতি দেবপত্নীদের মধ্যে তুমি কেউই নও, কারণ তুমি পৃথিবীকে স্পর্শ করে রয়েছ। দেবতারা কখনও পৃথিবীকে স্পর্শ করে থাকেন না। যেমন লক্ষ্মীদেবী বৈকুণ্ঠপুরী অলংকৃত করে যজ্ঞমূর্তি শ্রীবিষ্ণুর সঙ্গে মিলিত হয়েছেন, তুমিও সেরকম আমার সঙ্গে মিলিত হয়ে এই পুরীকে অলংকৃত কর। ১৯-২৯

সুন্দরি, সলজ্জ প্রেমহাসিযুক্ত ভ্রূযুগল দ্বারা তোমার প্রেরিত শক্তিমান কাম তোমারই কটাক্ষে ইন্দ্রিয় চঞ্চল করে আমাকে বড়ই কষ্ট দিচ্ছে। অতএব তুমি আমাকে বরণ করে আমার আশা পূর্ণ কর। শোভনে, সুন্দর তারাযুক্ত নেত্রদ্বয়ে অতি মনোহর, সুদীর্ঘ কেশ দ্বারা সমাচ্ছাদিত, মধুর বাক্যযুক্ত মুখ তুলে আমার দিকে একবার তাকাও। ৩০-৩১

পুরঞ্জন এভাবে প্রার্থনা করলে তাঁকে দেখে ঐ নারীও মুগ্ধ হয়ে সাদরে বলতে লাগলেন, হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, আপনি আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করছেন, সে বিষয় কি আমি বলব? যিনি আপনাকে বা আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি আমাদের গোত্র ও নাম দিয়েছেন আমরা কেউ তাঁকে সম্যক জানি না। হে বীরপ্রবর, এই যে আমি বর্তমান আছি তবু আমি আমাকে জানি না এবং আমার আশ্রয়স্বরূপ এই পুরী যিনি নির্মাণ করেছেন তাঁকেও জানিনা। হে মানদ, আপনি জিজ্ঞাসা করলেন, এরা তোমার কে? এই পুরুষরা আমার বন্ধু, এই স্ত্রীরা আমার সখী। আর এই যে পঞ্চশীর্ষ সর্প দেখছেন ইনি এই পুরীর রক্ষক। আমি নিদ্রিত হলেও ইনি জেগে থাকেন। হে শত্রুদমনকারী, আপনার মঙ্গল হোক। আমার পরম সৌভাগ্য যে আপনি উপস্থিত হলেন। আপনি যে গ্রাম্য ভোগবাসনা ইচ্ছা করছেন,

১ একাদশ বীর—ইন্দ্রিয়গণ। ২ স্ত্রীগণ—ইন্দ্রিয়বৃত্তি। ৩ সর্প—প্রাণ।

আমি আমার এই বন্ধুদের দ্বারা তা সম্পাদন করে দেব। কিন্তু, আপনি এই নবদ্বার বিশিষ্ট পুরীতে শত বৎসর পর্যন্ত আমার দেওয়া কাম্য সুখ ভোগ করে বাস করুন। আপনি ছাড়া রতিরসে অনভিজ্ঞ, অপ্রাজ্ঞ, ইহলোক-চিন্তাশূন্য, পশুতুল্য অন্য কোন্ পুরুষকে আমি বরণ করব? হে বীর, এই গৃহস্থাশ্রমে ধর্ম, অর্থ, কাম, পুত্রজনিত সুখ, মুক্তি ও শোকরহিত পুণ্যলোক সবই আছে, যতিরা এসকলের নাম জানেন না। গৃহস্থাশ্রম এই জগতে পিতৃলোকের, দেবলোকের, মুনি-ঋষিদের ও সকল মানুষের এমন কি নিখিল প্রাণীদের নিজেদের আনন্দের আশ্রয় বলে পণ্ডিতরা বলে থাকেন। হে বীর, আমার ন্যায় কোন্ নারী আপনার মতো সর্বজন-প্রসিদ্ধ, বদান্য, প্রিয়দর্শন পতি পেয়ে পরিত্যাগ করে? আমি অবশ্যই আপনাকে পতিত্বে বরণ করব। আপনার সাপের মত আজানুলম্বিত ভুজদ্বয়ে আসক্ত হয় না এমন নারী কে আছে? আপনি সদয় দৃষ্টি দ্বারা দুঃখীদের মনোব্যথা দূর করার জন্যই যেন ভবে বিচরণ করছেন। ৩২-৪২

নারদ বললেন, মহারাজ, তখন সেই স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ে পরস্পর সঙ্কেত করে সেই পুরীতে প্রবেশ করে শত বৎসর আনন্দে নিমগ্ন ছিলেন। সেখানে স্থানে স্থানে গায়করা পুরঞ্জনের স্তব করছিল। স্ত্রীগণ পরিবৃত হয়ে ক্রীড়া করতে করতে যখন গ্রীষ্মকাল উপস্থিত হল তখন পুরঞ্জন শীতল সরোবরে প্রবেশ করলেন। ঐ পুরীর যিনি অধীশ্বর তাঁর পৃথক পৃথক বিষয় ভোগের জন্য ঐ পুরীর নিম্নভাগে দুটি আর উপরের দিকে সাতটি দ্বার রচিত হয়েছিল। মহারাজ, ঐ সাতটি দ্বারের মধ্যে পাঁচটি পূর্বদিকে একটি দক্ষিণদিকে আর একটি উত্তরদিকে, আর নীচের দ্বার দুটি পশ্চিমদিকে অবস্থিত ছিল। তাদের নাম বলছি শুনুন। খদ্যোতোর মতো অল্পপ্রকাশ্য বামনেত্ররূপা, আর বহুপ্রকাশ্য দক্ষিণনেত্ররূপা, পূর্বদিগ্‌বর্তী দ্বারদ্বয় একত্র সংলগ্ন, চক্ষুর সঙ্গে এই দুই দ্বার দিয়ে যে রূপের প্রকাশ হয়, দ্যুমৎ (চক্ষু) নামক সখার সঙ্গে পুরঞ্জন তাই গ্রহণ করেন। এইরকম নলিনী ও নালিনী[১] নামে দুই দ্বার একত্র সংলগ্ন, বায়ু অধিষ্ঠিত জীব ঐ দ্বার দুটি দিয়ে গন্ধ গ্রহণ করে। ঐ পুরীর সামনে সর্বপ্রধান দ্বার মুখ। পুরীস্থিত জীব ঐ দ্বার দিয়ে বাগিন্দ্রিয় ও রসনেন্দ্রিয় যুক্ত হয়ে ভক্ষণ ও বহুবিধ অন্ন গ্রহণ করে থাকে। পুরীর দক্ষিণ দিকে একটি দ্বার আছে তার নাম পিতৃহূ[২]। জীব শ্রবণেন্দ্রিয় যুক্ত হয়ে ঐ দ্বার দ্বারা দক্ষিণ পঞ্চাল[৩] গ্রহণ করেন। আর উত্তর দিকে যে দ্বার আছে তার নাম দেবহূ[৪]। জীব শ্রবণেন্দ্রিয় যুক্ত হয়ে নিবৃত্তি-লক্ষণ বিষয়ে প্রপঞ্চক শাস্ত্রাদি ঐ ইন্দ্রিয় দ্বারা শুনে থাকে। ঐ পুরীর পশ্চিমদিকের দ্বারটির নাম আসুরী; জীব ঐ দুর্দম শিশ্ন ইন্দ্রিয় দ্বারা গ্রাম্যভোগ[৫] গ্রহণ করে। পিছন দিকে আর একটি দ্বার, তার নাম নির্ঋতি। জীব ঐ পায়ু ইন্দ্রিয় সমন্বিত হয়ে তার দ্বারা মলত্যাগ করে। মহারাজ, ঐ পুরীর মধ্যে যত রকম ইন্দ্রিয় দ্বারের কথা বলা হল, হাত ও পা এই ইন্দ্রিয় দুটি তাদের মধ্যে অন্ধ, এদের কোন ছিদ্র নেই। দেহাধিপতি জীব (পুরঞ্জন) ঐ ইন্দ্রিয়দ্বয় দ্বারা গ্রহণ ও গমন ক্রিয়া সম্পাদন করেন। ৪৩-৫৪

রাজা পুরঞ্জন যখন অন্তঃপুরে (হৃদয়ে) যেতেন, তখন সর্বতোমুখ মনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কখনো মোহ, কখনো প্রসন্নতা, কখনো বা আনন্দ পেতেন। এইভাবে কামাসক্ত পুরঞ্জন মূর্খের ন্যায় কর্মে আসক্ত হলেন। রানী যা যা ইচ্ছা করতেন অত্যন্ত স্ত্রী-পরবশ হয়ে তিনি তারই অনুসরণ করতেন। পত্নী সুরাপান করলে

১ নলিনী ও নালিনী—অন্ন ও ঘ্রাণক। ২ পিতৃহূ—দক্ষিণ কর্ণ। ৩ দক্ষিণ পঞ্চাল—পঞ্চ বিষয়ের প্রবৃত্তি। ৪ দেবহূ—বাম কর্ণ। ৫ গ্রাম্য ভোগ—স্ত্রীসম্ভোগাদি মৈথুন-সুখ।

স্বয়ং মদবিহ্বল হয়ে তিনিও তা পান করতেন, পত্নী অন্নভোজন করলে তিনিও তা করতেন। পত্নী কোথাও গেলে তিনিও সেখানে যেতেন, কাঁদলে তিনিও কাঁদতেন, হাসলে হাসতেন, কথা বললে কথা বলে থাকতেন। পত্নী দৌড়ালে, তিনিও পেছনে ধাবিত হতেন, দাঁড়ালে দাঁড়াতেন, বসলে বসতেন, শুলে পিছনে শুতেন। তিনি কখনো কিছু শুনলে তিনিও তা শুনতেন, দেখলে দেখতেন, আঘ্রাণ করলে আঘ্রাণ করতেন, স্পর্শ করলে স্পর্শ করতেন। আবার কখনো পত্নী শোক করলে নিজে অত্যন্ত কাতর হয়ে শোক করতেন, আনন্দ করলে আনন্দ করতেন, প্রফুল্ল হলে প্রফুল্ল হতেন। মহিষী কর্তৃক এইভাবে প্রতারিত হয়ে পুরঞ্জন নিজের স্বভাব থেকে বঞ্চিত হলেন এবং ক্রীড়া-মৃগের মত স্ত্রীর কার্যের অনুসরণ করতে থাকলেন। ৫৫-৬২

ষড়্‌বিংশ অধ্যায়

পুরঞ্জনের মৃগয়া—স্বপ্ন ও জাগরণ অবস্থা

নারদ বললেন, মহারাজ, মহাধনুর্ধর পুরঞ্জন একদিন রথে করে পাঁচটি অধিত্যকাযুক্ত এক বনে প্রবেশ করলেন। তাঁর ধনু অত্যন্ত শক্তিশালী ছিল। তাঁর অতি দ্রুতগামী রথের চক্র দুটি দণ্ডে নিবদ্ধ ছিল। আর ছিল তাতে একটি অক্ষ, তিনটি ধ্বজা, পাঁচটি বন্ধন, একগাছি রজ্জু, একজন সারথি, একটি নীড় ও দুটি যুগবন্ধন স্থান, যাতে পাঁচটি বিষয় প্রক্ষিপ্ত হয় রথটি এমন পাঁচটি অশ্বযুক্ত ছিল। তার চর্মময় সাতটি আবরণ আর গতি পাঁচ রকম। স্বর্ণালংকারে বিভূষিত সেই রথে পুরঞ্জন মৃগয়াবেশে আরূঢ় ছিলেন। তাঁর গায়ে স্বর্ণময় বর্ম ও পিঠে অক্ষয়তূণ ছিল। মন নামক সেনাপতি তাঁর সঙ্গে বনে গেলেন। পুরঞ্জন ধনুর্বাণ নিয়ে সগর্বে মৃগয়ার জন্য বনে ঘুরতে লাগলেন। তাঁর মন মৃগয়ায় এত মুগ্ধ ছিল যে নিজের অত্যাজ্য সহধর্মিণীকেও ছেড়ে এসেছিলেন আসুরী বৃত্তি অবলম্বন করে তিনি তীক্ষ্ণ বাণের সাহায্যে বনের পশুদের নির্মম ভাবে হত্যা করতে লাগলেন। ১-৫

শাস্ত্রে মৃগয়ার ব্যবস্থা আছে শ্রাদ্ধের জন্য। রাজা প্রসিদ্ধ তীর্থে পবিত্র পশুদের প্রয়োজনমত বধ করবেন। এরকম ভাবে কর্ম নির্দিষ্ট হওয়ায় পশুবধ কিছুটা সংযত হয়েছিল। কাজেই, যিনি ঐ বিধি মেনে কাজ করেন, এবং কখনও এরূপ ঘোর কর্মে লিপ্ত হন না তিনিই জ্ঞানী। পুরঞ্জনের বিচিত্র পক্ষযুক্ত বাণে বিদ্ধ মৃগরা কাতর হয়ে এমন করুণস্বরে বিলাপ করতে লাগল যে কোমলহৃদয় মানুষের পক্ষে তা দেখা সম্ভব হল না। তিনি খরগোশ, শজারু শূকর, মোষ, গবয়, মহাকৃষ্ণসার ও অন্যান্য নানা রকম পবিত্র পশু বিনষ্ট করে খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। তাঁর ক্ষুধা-তৃষ্ণার উদ্রেক হল। তিনি মৃগয়া থেকে ঘরে ফিরে এলেন ও স্নানাহার দ্বারা শ্রান্তি দূর করে শুতে গেলেন। ধূপ, চন্দন প্রভৃতি গন্ধানুলেপন, মালা ও বিভিন্ন সুন্দর অলংকার প্রভৃতি দেহের যথাযথ স্থানে পরে অলঙ্কৃত অবস্থায় মহিষীর সঙ্গ কামনা করলেন। দেহ ও মনের বলে পরিতৃপ্ত রাজা কন্দর্পের দ্বারা অভিভূত হয়েও নিজের সহধর্মিণীকে দেখতে পেলেন না। তাই তিনি উদ্বিগ্ন হয়ে অন্তঃপুরচারিণী সখীদের জিজ্ঞাসা করলেন, রামাগণ, তোমাদের এবং রাজমহিষীর কুশল তো? আমার গৃহের ধনসম্পত্তি আগে যেমন রুচিকর মনে

হত এখন তেমন মনে হচ্ছে না। ঘরে মা অথবা পতিব্রতা স্ত্রী না থাকলে কোন্ বিজ্ঞলোকের দুঃখ না হয়? চাকা-ছাড়া রথে কেই বা স্থির হয়ে বসে থাকতে পারে? বল, আমার সেই বুদ্ধিমতী স্ত্রী কোথায়? তিনি তো নিজের বিদ্যা দিয়ে আমাকে দুঃখসাগর থেকে উদ্ধার করে থাকেন। ৬-১৬

সখীরা উত্তরে বলল, মহারাজ, আপনার প্রেয়সী কি করতে চান, তা আমরা জানি না। ঐ দেখুন, তিনি অনাবৃত মেঝেয় শুয়ে আছেন। ১৭

পুরঞ্জন এই কথা শুনেই মহিষীর দিকে তাকিয়ে দেখলেন যে তাঁর প্রিয়তমা অযত্নে ধুলোয় লুণ্ঠিত হয়ে আছেন। তাঁর ব্যাকুল হৃদয় বিস্ময়াবিষ্ট হল। তিনি সুললিত মধুর বাক্যে মহিষীকে সান্ত্বনা দিতে গেলেন, কিন্তু প্রেয়সীর দিক থেকে কোন রকম প্রণয়কোপের লক্ষণ না দেখে তাঁর হৃদয় সন্তপ্ত হল। যাহোক অনুনয় বিষয়ে নিপুণ পুরঞ্জন বারবার কাতর কণ্ঠে নানা বিনয়ব্যঞ্জক কথা বললেন। এমন কি তিনি সুন্দরীর চরণযুগল পর্যন্ত স্পর্শ করলেন। শেষে তাঁকে কোলে নিয়ে গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করতে করতে বললেন, সুন্দরি, অপরাধ করলেও প্রভুরা যে সব ভৃত্যকে আপন ভেবে দণ্ড না দেন, আমার মনে হয় সে সব ভৃত্যের ভাগ্য খুব খারাপ। প্রভু ভৃত্যকে যে দণ্ড দেন, তা দণ্ড নয়, পরম অনুগ্রহ। কিন্তু বালকের মত মূঢ় ভৃত্যরাই তাতে ক্রুদ্ধ হয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করে। প্রিয়ে, আমি তোমার পরম আত্মীয়, আমাকে কৃপা করে একবার তোমার মুখটি দেখাও। তোমার মুখপদ্ম কি চমৎকার! প্রেমভরে লজ্জাবনত বদনে মন্দ মন্দ সহাস কটাক্ষ কেমন বিলাসিত! আহা, তোমার মুখকমলে কেশরাশি কেমন মক্ষিকার মত শোভা বিস্তার করছে! কত সুন্দর তোমার উন্নত নাসিকা, মোহন কোমল তোমার বাক্য। ১৮-২৩

আহা, মরি, মরি! হে বীরভার্যা, হে প্রাণপ্রিয়া, বল কে তোমার অপকার করেছে? সে যদি ব্রাহ্মণ বা শ্রীহরির সেবক না হয় তাহলে এখনই তাকে শাস্তি দেব। কিন্তু ত্রিলোকে বা এর বাইরেও তো ঐ রকম কোন দুঃসাহসী দেখতে পাই না যে এখনও নির্ভয়ে বেঁচে আছে। এখন তুমি কেন নিরানন্দ, তিলকহীন ভয়ঙ্করমূর্তি ও কান্তিশূন্যা? বল, তোমার রমণীয় কুচযুগল কেন শোকাশ্রু-প্লাবিত? বিম্বফলের মত লাল কুঙ্কুমতুল্য অধর তাম্বুলরাগে রঞ্জিত দেখছি না কেন? প্রিয়তমে, তোমাকে না বলে আমি নিজের খুশিমত মৃগয়ায় আকৃষ্ট হয়েছিলাম। এতে আমার দারুণ অপরাধ হয়েছে, স্বীকার করছি; ক্ষমা কর আমায়। প্রসন্ন হও আমার প্রাণাধিকা। আমি তোমার সুহৃদ। এরকম স্বামী যে মিলনে ধৈর্য-হারা ও একান্ত অনুগত তাকে মিলনসুখরতা কোন্ স্ত্রী না ভজনা করে? ২৪-২৬

সপ্তবিংশ অধ্যায়

পুরঞ্জনের আত্মবিস্মরণ

নারদ বললেন, মহারাজ প্রাচীনবর্হি, পুরঞ্জনী এইভাবে ভাব-ভঙ্গির দ্বারা পুরঞ্জনকে অত্যন্ত বশ করে পতিকে আনন্দদানে বিমুগ্ধ করে তাঁর সঙ্গে ক্রীড়া করতে লাগলেন। রাজা পুরঞ্জন সুস্নাতা সুন্দর বস্ত্রালঙ্কারে বিভূষিতা, চন্দন গন্ধদ্রব্যে অনুলিপ্তা, প্রফুল্লমুখী মহিষীকে নিকটে দেখতে পেয়ে সানন্দে গ্রহণ করলেন।

পুরঞ্জন পত্নী কর্তৃক আলিঙ্গিত এবং স্বয়ং পত্নীকে কণ্ঠধারণ করে আলিঙ্গন করে এমনই বিমুগ্ধ হলেন যে, পত্নীর সঙ্গে প্রিয় সম্ভাষণের জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন। তাঁর দিন-রাত্রি কিছুই খেয়াল হত না। এইভাবে যে আয়ু চলে যাচ্ছে, তা মনে হোল না। রাজা পুরঞ্জন এমন মোহিত হয়েছিলেন যে মহিষীকেই পরম পুরুষার্থ স্বরূপ মনে করতেন। এমনকি নিজের স্বরূপ যা যা পরব্রহ্মস্বরূপ তিনি তা একেবারে ভুলে গেলেন। এইভাবে মহিষীর সঙ্গে সর্বদা রমণক্রিয়ারত থাকায় পুরঞ্জনের যৌবনকাল ক্ষণার্ধের মত চলে গেল। মহারাজ পুরঞ্জন সেই পত্নীতে এগারো শত পুত্রের জন্ম দিলেন। এতে তাঁর পরমায়ুর অর্ধেক ক্ষয় হল। তাছাড়া পিতা এবং মাতার যশস্করী, সচ্চরিত্রা ও উদারগুণযুক্তা একশো দশটি কন্যাও জন্মাল। তারা পুরঞ্জনের কন্যা বলে পৌরঞ্জনী নামে খ্যাত হল। পঞ্চালাধিপতি রাজা পুরঞ্জন পিতৃবংশবর্ধক পুত্রদের উপযুক্ত কন্যার সঙ্গে এবং কন্যাদের উপযুক্ত পাত্রের সঙ্গে বিবাহ দিলেন। পুত্রদের এক এক জনের একশোটি করে ছেলে হল। তাদের দ্বারা পুরুঞ্জনের বংশ পঞ্চালদেশে অত্যন্ত বৃদ্ধি পেল। পুত্র-পৌত্রও গৃহৈশ্বর্যের প্রতি প্রগাঢ় মমতাহেতু পুরঞ্জন অত্যন্ত বিষয়াসক্ত হলেন। মহারাজ, আপনার মত অত্যন্ত কামনাপরবশ হয়ে পুরঞ্জন আপন কামনা সিদ্ধির জন্য ভয়ানক হিংসাত্মক যজ্ঞাদির দ্বারা দেবগণ, পিতৃগণ ও ভূতেগণকে অর্চনা করলেন। এইভাবে আত্মহিতে অনবধান, অত্যন্ত বিষয়াসক্ত পুরঞ্জনের হঠাৎ দুরন্ত কাল (বার্ধক্য) উপস্থিত হল, যে কালকে স্ত্রীপরতন্ত্র-ব্যক্তি অত্যন্ত ভয় করে। ১-১২ .

নারদ বললেন, মহারাজ, ঐ কাল গন্ধর্বদের[১] অধিপতি[২], সে চণ্ডবেগ নামে অভিহিত। তার তিনশো ষাটটি বলবান গন্ধর্ব ও তিনশো ষাটটি গন্ধর্বী[৩] আছে। তারা শুক্ল ও কৃষ্ণপক্ষ স্বরূপা এবং গন্ধর্বের সঙ্গে মিলিত হয়ে ভ্রমণ করে জীবের কামনালব্ধ পুরীকে[৪] অপহরণ করে। সেই চণ্ডবেগের অনুচরবা যখন পুরঞ্জনের পুরীকে অপহরণ করতে উদ্যোগী হল, তখন পুরীর প্রজাগর[৫] নামে সেনা তাকে বাধা দিল। সেই পুরঞ্জন-পুরীর অধ্যক্ষ মহাবলশালী প্রজাগর একা হয়েও সাতশো বিশজন গন্ধর্বের সঙ্গে একশো বছর যুদ্ধ করল। বহু গন্ধর্বের সঙ্গে নিজে একাকী বহুক্ষণ যুদ্ধ করে প্রজাগর দুর্বল হলে পুরঞ্জন বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে অত্যন্ত দুঃখে চিন্তা করতে লাগলেন। ক্ষুদ্রসুখে আসক্ত, স্ত্রীপরতন্ত্র সেই পুরঞ্জন পঞ্চাল দেশে নিজের পুরীতে ইন্দ্রিয়গণরূপ অনুচরদের আহৃত উপহার গ্রহণেই ব্যস্ত ছিলেন। সুতরাং কালভয় একবারও তাঁর মনে উদয় হয় নি। ১৩-১৮

হে প্রাচীনবর্হি, জরা নামে কালের একটি কন্যা আছে। সেই কন্যা পতির অন্বেষণে ত্রিভুবন ঘুরে বেড়াতে লাগল, কিন্তু কেউ তাকে গ্রহণ করতে ইচ্ছুক হল না। নিজের এই দুর্ভাগ্যহেতু ঐ কাল-দুহিতা ত্রিভুবনে 'দুর্ভগা' বলে বিখ্যাত হল। যযাতির জরা গ্রহণ করে পুরুরাজা যেমন বর পেয়েছিলেন, পুরঞ্জনও সেই রকম তাকে গ্রহণ করে রাজ্যলাভের বর পেলেন। মহারাজ, এক সময়ে ঐ জরা পতি পাবার জন্য ইতস্তত ভ্রমণ করতে করতে আমি যে ব্রহ্মচর্যাবলম্বী তা জেনেও কামমোহিত হয়ে আমাকে পতিরূপে বরণ করতে চাইল। আমি যখন তাকে গ্রহণ করতে অনিচ্ছুক হলাম, তখন আমার প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে সে আমাকে এই দুঃসহ অভিসম্পাত দিল, মুনি, যেহেতু তুমি আমার কথায় রাজি হলে না, তাই তোমাকে আমি অভিসম্পাত দিলাম, তুমি কোথাও বহুক্ষণ স্থিরভাবে থেকেতে পারবে না। তারপর ক্ষুণ্ণ হয়ে

১ গন্ধর্ব—দিন। ২ গন্ধর্বপতি—সংবৎসর। ৩ গন্ধর্বী—রাত্রি। ৪ পুরী—দেহ।
৫ প্রজাগর নামে সৈন্য—প্রাণ বায়ু।

আমার উপদেশ অনুসারে যবনের অধীশ্বর ভয়কে পতিত্বে বরণ করল। জরা ভয়কে বলতে লাগল, হে বীর, আপনি যবনদের মধ্যে সর্বপ্রধান, আপনার কাছে কারো প্রার্থনা ব্যর্থ হয় না। তাই আমি আপনাকে পতিরূপে বরণ করতে চাই। লোকে ও শাস্ত্রে যে বস্তু দেয় বা গ্রহণযোগ্য সেই বস্তু প্রার্থনা করলে যে তা না দেয় এবং কেউ দিলে যে তা গ্রহণ করে না, সেই দুই অজ্ঞ ব্যক্তি নিতান্ত অমানুষ। ভদ্র, কৃপা করে আমাকে ভজনা কর। আর্ত ব্যক্তির প্রতি দয়া করা পুরুষের ধর্ম। ১৯-২৬

কালকন্যার কথা শুনে যবনেশ্বর হেসে তাকে বললেন, দেখ, তোমার পতি কে হবেন তা আমি বুদ্ধিবলে আগেই স্থির করে রেখেছি। তুমি অমঙ্গলা এবং অপ্রিয়া। তুমি ভজনা করতে চাইলে তোমাকে কেউ ভজনা করবে না। অতএব যারা নিজেরাই দুষ্কর্ম করে জরা-ভাবাপন্ন হবে, তুমি অলক্ষিত গতি হয়ে তাদের ভজনা কর। তা হলে প্রায় সকলকেই তুমি পতিরূপে পাবে, তা ছাড়া আমার অনেক যবনসেনা আছে, তাদের তুমি সঙ্গে নিয়ে যাও। তুমি লোকের বিনাশ সাধন করবে, তোমাকে কেউ নষ্ট করতে পারবে না। দেখ, প্রজ্বার[১] আমার ভ্রাতা, তুমি (জরা) আমার ভগ্নি হও। তোমরা দুজনে সৈন্যাধ্যক্ষ হলে তোমাদের সঙ্গে এই উভয় লোকের ভয় উৎপাদন করে আমি স্বচ্ছন্দে বিচরণ করব। ২৭-৩০

অষ্টাবিংশ অধ্যায়

স্ত্রীচিন্তায় পুরঞ্জনের স্ত্রীত্বলাভ ও জ্ঞানোদয়

নারদ বললেন, ভয়নামা যবনাধিপতি[২] মৃত্যুর অনুবর্তিনী সেনারা 'প্রজ্বার' ও 'কালকন্যা'র সঙ্গে ত্রিভুবন ভ্রমণ করতে লাগল। তারা পুরঞ্জনের পুরীকে বিলাস-ভোগে পরিপূর্ণ দেখে তা আক্রমণ করে অবরুদ্ধ করল। ঐ পুরীর[৩] রক্ষক ছিল একটি জীর্ণ সাপ[৪]। ঐ কালকন্যা দ্বারা অভিভূত হলে পুরুষ তৎক্ষণাৎ বলহীন হয়। কালকন্যাও বলপূর্বক পুরঞ্জনপুরী ভোগ করতে লাগল। কালকন্যা পুরী অধিকার করেছে দেখে আক্রমণকারীরা চতুর্দিক দিয়ে প্রবেশ করে গৃহগুলি লুণ্ঠন করতে ও নানা অত্যাচার করতে লাগল। এভাবে সমগ্র পুরীকে প্রপীড়িত ও লুণ্ঠিত হতে দেখে পুরঞ্জন স্নেহ-মমতায় আকুল ও কাতর হলেন। কালকন্যার আলিঙ্গনে তিনি শ্রীহীন হয়ে অত্যন্ত দীন ও বুদ্ধিহীন হলেন। তাঁর উত্থানশক্তি রইল না। গন্ধর্ব ও যবনরা বাহুবলে তাঁর সমস্ত ঐশ্বর্য হরণ করে নিল। পুরঞ্জন দেখলেন যে তাঁর পুরী হতশ্রী হয়েছে। তাঁর পুত্র, পৌত্র, ভৃত্য ও মন্ত্রীরা প্রতিকূল হয়েছে। কেউ তাঁকে আদর করছে না। এমন কি, পত্নীরও আর আগের মত ভাব-ভালবাসা নেই। ১-৭

নিজেকে কালকন্যা জরার কবলিত ও পঞ্চালরাজ্য শত্রুদ্বারা লুণ্ঠিত হয়েছে দেখে তিনি ঘোর চিন্তায় মগ্ন হলেন। কিন্তু প্রতিকারের কোন উপায় দেখা গেল না,

১ প্রজ্বার—বৈষ্ণবজ্বর, 'বৈষ্ণব এলার্জি'ও বলা যায়।
২ ভয়নামা যবন—এখানে রোগ অর্থে ব্যবহৃত। যবন-এর প্রকৃত অর্থ বিধর্মী বা প্রাচীন গ্রীকজাতি। বৈষ্ণব গ্রন্থসমূহে 'কৃষ্ণচিন্তাহীন'। (স্বয়ং ভগবান সহায় না হলে ভয়ের কারণ ঘটে বৈকি)। ৩ পুরী—দেহ। ৪ সাপ—প্রাণ।

গন্ধর্ব ও যবন কর্তৃক পুরীর আক্রমণে ও কালকন্যার যন্ত্রণায়, ইচ্ছা না থাকলেও, তিনি পুরী পরিত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। ভয়-এর অগ্রজ প্রজ্বার এসে ভ্রাতার হিতকামনায় সেই পুরী সম্পূর্ণরূপে দগ্ধ করে ফেলল। দাউ দাউ করে পুরী জ্বলতে থাকলে পুরঞ্জনপুরবাসী ভৃত্যেরা সন্তান-সন্ততিসহ শোকসাগরে মগ্ন হল। কালকন্যা-আক্রান্ত পুরীর রক্ষকের আয়তনও বহিরাগতরা রুদ্ধ করল, আর প্রজ্বারের সংস্পর্শে রক্ষক খুবই সন্তপ্ত হতে লাগলেন। গাছের কোটরে আগুন লাগলে সাপ যেমন কোটর ছেড়ে অন্য জায়গায় চলে যায়, সেভাবে যন্ত্রণা-কাতর রক্ষক আর পুরী রক্ষা করতে পারল না (অর্থাৎ প্রাণ দেহরূপ আশ্রয়কে রক্ষা করতে পারল না)। ৮-১৪

গন্ধর্বরা পুরঞ্জনের পৌরুষ হরণ করল এবং যবনরা এসে গলা চেপে ধরল। তখন তাঁর গলায় ঘর্‌ঘর্‌ শব্দ হতে লাগল। তিনি সে সময় তাঁর কন্যা, পুত্র, পৌত্র, বধূ, জামাতা, পার্ষদবর্গ, গৃহ, ভাণ্ডার, পরিচ্ছদ প্রভৃতি যা কিছু অবশিষ্ট ছিল সব কিছুর প্রতি মায়া বাড়াতে লাগলেন। গৃহাসক্ত নির্বোধ গৃহী গৃহিণীর সঙ্গে বিচ্ছেদ আসন্ন দেখে ভাবতে লাগলেন, হায়, ইহলীলা শেষ হলে আমার এই স্ত্রী অনাথা হয়ে পুত্রকন্যাদের দুরবস্থা দেখে শোক করতে করতে কিভাবে কালযাপন করবেন। আমার অধীনা এই নারী আমি স্নান না করলে স্নান এবং আহার না করলে আহার করেন না। আমার বুদ্ধিভ্রম হলে ইনিই জ্ঞান-পরামর্শ দেন। ইনি বীর প্রসবিনী হয়েছেন। আমি পরলোকে গেলে বিরহকাতরা ইনি আর কি গৃহধর্ম পালন করবেন? হায়, সমুদ্রের মাঝখানে জাহাজ ভেঙ্গে গেলে আরোহীরা যেমন বিপদগ্রস্ত হয় সেরকম আমি চলে গেলে আমার এই পুত্রকন্যারা পরপ্রত্যাশী হয়ে কিভাবে জীবন-ধারণ করবে। ১৫-২১

মহারাজ, পুরঞ্জনের প্রকৃতি ব্রহ্মস্বরূপ, তাই তাঁর শোক করা উচিত ছিল না। তিনি ঐরকম শোক করলে 'ভয়'-এর সৈন্যরা তাঁকে আক্রমণ করে। শত্রুরা যখন তাঁকে বন্যপশুর মত বেঁধে নির্জনস্থানে নিয়ে যাচ্ছিল তখন তাঁর অনুচরেরা শোকাকুলচিত্তে তাঁর পেছন পেছন যেতে লাগল। পুরীর মধ্যে রুদ্ধ সাপও তাঁকে পরিত্যাগ করল, ফলে পুরী বিশীর্ণ অবস্থায় পূর্বের আকৃতি ফিরে পেল। পুরঞ্জন যখন ঘোর অন্ধকারে প্রবেশ করেন তখন যবনাদি সকলে তাঁকে টানছিল, তাই তিনি আগের সখাকে স্মরণ করতে পারেন নি। রাজা নির্দয় হয়ে যে সব পশু বধ করেছিলেন পরলোকে তারা তাঁর নিষ্ঠুরতা মনে রেখে ক্রোধে তাঁকে ছিন্নভিন্ন করতে লাগল। নারীসঙ্গজনিত দোষে অপার অন্ধকারে নিমগ্ন হয়ে তাঁর ব্রহ্মস্মৃতি নষ্ট হল। ঐ অবস্থায় তিনি শত বৎসর নরকযন্ত্রণা ভোগ করলেন। ২২-২৭

রাজা পুরঞ্জন স্ত্রীকে চিন্তা করতে করতে দেহত্যাগ করেছিলেন, সেইজন্য পরবর্তী জীবনে তিনি বিদর্ভরাজের গৃহে বরনারী রূপে জন্মলাভ করলেন। তাঁর বিবাহে পণ নির্দিষ্ট হয়েছিল 'পরাক্রম'। বিবাহের সময় পাণ্ড্যদেশীয় রাজা শত্রুজয়ী[১] মলয়ধ্বজ যুদ্ধে অন্যান্য রাজাদের পরাজিত করে ঐ বিদর্ভকন্যার পাণিগ্রহণ করলেন।[২] সেই পরমভক্ত মলয়ধ্বজ ও বিদর্ভকন্যার এক কৃষ্ণনয়না কন্যা ও সাত পুত্রের জন্ম হল। ঐ সাতপুত্র দ্রাবিড় দেশের অধীশ্বর হয়েছিল। তাদের পুত্র-কন্যা থেকে উৎপন্ন অর্বুদ সংখ্যক বংশধর এই পৃথিবী মন্বন্তরকাল ও তারপরেও ভোগ করবে। ২৮-৩১

১ এখানে জিতেন্দ্রিয় অর্থে ব্যবহৃত। ২ পুরঞ্জনের ভক্তসঙ্গ লাভ হল।

মহারাজা মলয়ধ্বজের ঐ ব্রতপরায়ণা প্রথম কন্যাটিকে মহর্ষি অগস্ত্য বিবাহ করেন। ঐ কন্যার গর্ভে ইধ্মবাহ মুনির পিতা দৃঢ়চ্যুতের জন্ম হয়। মহীপতি মলয়ধ্বজ পুত্র-পৌত্রাদির হাতে পৃথিবীর ভার অর্পণ করে কৃষ্ণসেবার জন্য কুলাচল পর্বতে চলে গেলেন। জ্যোৎস্না যেমন চন্দ্রের অনুগমন করে সেরকম পত্নী বৈদর্ভী বৈরাগ্য অবলম্বন করে পতির অনুসরণ করলেন। ৩২-৩৪

রাজা কুলাচলে উপস্থিত হয়ে চন্দ্রবসা, তাম্রপর্ণী ও বটোদকা নদীর পুণ্য সলিলে অবগাহন করে অন্তরের ও বাইরের মল দূর করেন। কন্দ, বীজ, ফল, মূল, পত্র, পুষ্প, তৃণ, জল প্রভৃতি দ্বারা জীবন রক্ষা করে কৃশ দেহমাত্র ধারণপূর্বক তিনি তপস্যা করতে লাগলেন। সর্বত্র সমদর্শী সেই মলয়ধ্বজ শীত-গ্রীষ্ম, বাত-বর্ষা, ক্ষুৎ-পিপাসা, প্রিয়-অপ্রিয়, সুখ-দুঃখ সমস্ত কিছু জয় করেছিলেন। তপস্যাবলে মলয়ধ্বজ কামনা-বাসনা সমস্ত কিছু ক্ষয় করেন এবং যম ও নিয়মের বলে সমস্ত ইন্দ্রিয়, প্রাণবায়ু ও চিত্ত জয় করে পরমাত্মাতে চিত্ত সমাহিত করলেন। তিনি স্থাণুর মত স্থির হয়ে দিব্য একশ বছর এক জায়গায় থেকে ভগবান বাসুদেবের প্রতি মনপ্রাণ সমর্পণ করলেন। পরমাত্মা দেহ প্রভৃতির প্রকাশক, কিন্তু দেহ থেকে স্বতন্ত্র—তাঁর এই জ্ঞান হল। মানুষ যেমন স্বপ্নে 'আমার মস্তক ছিন্ন হয়েছে' জানার সঙ্গে অন্য এক আত্মাকে জেনে থাকে, সেরকম তিনি আত্মাকে নিখিল পদার্থ থেকে পৃথক জেনে সংসার থেকে বিরত হলেন। সাক্ষাৎ ভগবান গুরু হয়ে তাঁকে যে জ্ঞান দিয়েছিলেন সেই জ্ঞানালোকে চতুর্দিক উদ্ভাসিত হচ্ছিল। তার দ্বারা তিনি পরব্রহ্মে ও পরব্রহ্মকে নিজের মধ্যে দর্শন করছিলেন। শেষে সেরকম অলৌকিক দর্শনও ত্যাগ করে তিনি সংসার থেকে বিদায় নিলেন। ৩৫-৪২

পতিব্রতা বৈধর্ভী সমস্ত ভোগবিলাস ত্যাগ করে প্রেমার্দ্রচিত্তে ধার্মিকশ্রেষ্ঠ স্বামী মলয়ধ্বজের সেবা করছিলেন। তিনি গাছের বল্কল পরে ও বিভিন্ন ব্রতের অনুষ্ঠান করে ক্ষীণশরীর হয়েছিলেন, চুলও জটাময় হয়ে ঝুলছিল। প্রশান্ত অগ্নির পাশে শিখার মত তিনি লোকান্তরিত স্বামীর পাশে শোভা পেতে লাগলেন। পতি যে পরলোকে যাত্রা করছেন তা তিনি জানতেন না, কেননা তিনিও নিজের আসনে স্থিরভাবে বসেছিলেন। তাই তিনি আগের মতই স্বামীর সেবা করতে লাগলেন। সেবা করতে করতে তাঁর চরণ স্পর্শ করে যখন উষ্ণতা অনুভব করতে পারলেন না, তখন যূথভ্রষ্টা হরিণীর মত ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। সেই বনে নিজের বৈধব্যদশার জন্য বিলাপ করে অশ্রুতে বক্ষ সিক্ত করলেন। তিনি বলতে লাগলেন, প্রাণনাথ, ওঠ, উঠে দেখ সাগর-পরিবৃতা এই ধরিত্রী অধার্মিক ভয়ে ভীতা হয়েছেন। এঁকে উদ্ধার করা তোমার কর্তব্য। ৪৩-৪৮

পতিপরায়ণা বিদর্ভকন্যা স্বামীর পাদপদ্মে পড়ে এভাবে সাশ্রুনয়নে বিলাপ করে শেষে নিজেই চিতা রচনা করলেন। তাতে স্বামীর দেহ স্থাপন করে অগ্নি সংযোগ করলেন এবং নিজেও পতির সহগামিনী হবার ইচ্ছা করলেন। সেই মুহূর্তে তাঁর পূর্বতন সখা এক মহাত্মা ব্রাহ্মণ সেখানে এলেন। তিনি তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে প্রশ্ন করলেন, তুমি কে এবং কার? তুমি যে এই পরলোকগত পুরুষের জন্য শোক করছ, ইনিই বা কে? আর তোমার সুহৃদ, যার সঙ্গে আগে তুমি সখ্যসুখ লাভ করেছিলে, সেই আমাকে চিনতে পারছ? যদি না পার, তাহলে কোনও কালে তোমার কোন বন্ধু ছিল এরকম কি স্মরণ হয়? বন্ধু, তুমি পার্থিব সুখে রত হয়ে আমাকে ছেড়ে নিজের স্থানের খোঁজে চলে এসেছিলে। আমরা দুজন, তুমি ও আমি, মানস সরোবরের দুটি হংস। গৃহে বাস না করেও আমরা শত বৎসর জীবন ধারণ করে

থাকি। বন্ধু, প্রাকৃতসুখে[১] রত হয়ে তুমি আমাকে ছেড়ে পৃথিবীতে এসেছিলে ও বাসস্থান খুঁজতে খুঁজতে মায়া নামের কোন নারীর সৃষ্ট একটি পুরী দেখেছিলে। ঐ পুরীর পাঁচটি উপবন, নয়টি দ্বার, একটি রক্ষক, তিনটি কোষ্ঠ, ছয়টি কুল ও পাঁচটি উপাদান। স্ত্রী তার অধীশ্বরী। পাঁচটি উপবন পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের বিষয় শব্দ, গন্ধ, রূপ, রস ও স্পর্শ; নয়টি প্রাণছিদ্র নয়টি দ্বার। প্রাণই রক্ষক; তেজ, জল ও অন্ন তিন কোষ্ঠ আর মন ও পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় এই ছয় কুল। পাঁচ ক্রিয়াশক্তি পাঁচ হাট ও পঞ্চ ভূত তাদের পাঁচ উপাদান। পুরুষ বুদ্ধিরূপা স্ত্রীর বশীভূত হয়ে এই দেহরূপ পুরীতে প্রবেশ করে আত্মাকে জানতে পারেন না। আগে তোমার ব্রহ্মকে মনে ছিল, কিন্তু সেই পুরীমধ্যে নারী স্পর্শ করে ক্রীড়া করায় নারীসঙ্গদোষে তোমার এই দুর্দশা হয়েছে। শোন, তুমি বিদর্ভরাজকন্যা নও, এই শায়িত বীরও তোমার স্বামী নন। যে পুরঞ্জনী তোমাকে নবদ্বার বিশিষ্ট পুরীমধ্যে রেখেছিল, তুমি তারও স্বামী নও। তুমি যে পূর্বজন্মে নিজেকে পুরুষ বলে অভিমান করেছ এবং ইহজন্মে সাধ্বী স্ত্রী বলে মনে করছ—এ সবই আমার মায়া জেনো। আসলে স্ত্রী-পুরুষ নেই; আমি ও তুমি আলাদা নই। বন্ধু, আমাকে তুমি বলেই জেনো। তত্ত্বজ্ঞরা আমাদের দুজনের মধ্যে বিন্দুমাত্রও ভেদ দেখতে পান না। যে রকম আয়নায় কেউ নিজেকে দুই দেখে সে রকমই আমাদের প্রভেদ জানবে। ৫৯-৬৩

নারদ বললেন, মহারাজ, ঈশ্বরবিরহে হংসের স্মৃতিভ্রম হয়েছিল। এখন সখার কাছে ঐ রকম জ্ঞান লাভ করে স্বরূপে অবস্থিত হয়ে আবার তা লাভ করলেন। আমি গল্পের আকারে অধ্যাত্মজ্ঞান উপদেশ দিলাম। বিশ্বভাজন শ্রীহরি এরূপ উপাখ্যানই ভালবাসেন। ৬৪-৬৫

ঊনত্রিংশ অধ্যায়

পুরঞ্জন-পুরের ব্যাখ্যা

প্রাচীনবর্হি বললেন, ভগবান, আপনার কথার মর্ম আমি বুঝতে পারছি না। যাঁরা আত্মতত্ত্বজ্ঞ তাঁরাই এর মর্ম জানেন। আমাদের মত কর্মাসক্ত লোকেরা এর অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। নারদ বললেন, মহারাজ, ঐ যে যাকে পুরঞ্জন বলা হচ্ছে তিনিই পুরুষ। কর্মবশত এক পা, দুই পা, তিন পা, চার পা, বহু পা বিশিষ্ট এবং পদহীন নানা রকম পুরী (দেহ) নিজেই প্রকটিত করেন বলেই পুরঞ্জন নাম। আমি যাকে 'অবিজ্ঞাত' শব্দে অভিহিত করেছি তিনি ঈশ্বর, ঐ পুরুষের সখা। পুরুষরা তাঁকে নাম, ক্রিয়া অথবা গুণ দ্বারা জানতে পারে না; সুতরাং তিনি অবিজ্ঞাত। ঐ পুরুষ যখন প্রকৃতির সমস্ত বিষয় সম্পূর্ণরূপে একাধারে গ্রহণ করতে ইচ্ছা করেন, তখন সমস্ত পুরীর মধ্যে মানুষ-দেহকেই শ্রেষ্ঠ বলে গ্রহণ করেন। পুরঞ্জনের যে স্ত্রীর কথা বলেছি তাকে বুদ্ধি বলে জানবে, যার দ্বারা 'আমি' 'আমার' এই অহংবোধ হয়ে থাকে এবং যাকে অবলম্বন করে জীব এই শরীরে প্রকৃতির গুণগুলি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ভোগ করে। আর ইন্দ্রিয়েরা পুরঞ্জনের সখা এবং

১ প্রাকৃত—গ্রাম্য, এখানে স্থূল।

ইন্দ্রিয়বৃত্তিগুলি সখী। তাদের দ্বারাই জ্ঞান ও কর্মের জন্ম হয়। যে পঞ্চশির সর্পের কথা বলেছি, সেটা পঞ্চবৃত্তিশালী প্রাণ। একাদশতম ব্যক্তিকে যে 'নায়ক' বলা হয়েছে তিনি হলেন জ্ঞান ও কর্মেন্দ্রিয়ের অধিনায়ক মন। 'পঞ্চাল' শব্দের অর্থ রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ ও গন্ধ এই পঞ্চ বিষয়। ঐ বিষয়গোচরে নবদ্বার-রূপ পুরী বর্তমান আছে। যে নয়টি দ্বারের কথা বলা হয়েছে তা হল দুই চোখ, দুই নাসারন্ধ্র, দুই কান, মুখ এবং শিশ্ন ও গুহ্যদ্বার। ইন্দ্রিয়াভিমানী জীব ঐ সব দ্বার দিয়ে বাইরের বিষয়সমূহ গ্রহণ করেন। এইসব দ্বারের মধ্যে দুই চোখ ও দুই নাক এবং মুখ এই পাঁচটি পূর্ববর্তী দ্বার। দক্ষিণ কর্ণ দক্ষিণ দ্বার, বামকর্ণ উত্তর দ্বার আর শিশ্ন ও গুহ্যদ্বার নিম্নদ্বার বলে কথিত হয়। 'খদ্যোতা' ও 'আবির্মুখী' বলে যার উল্লেখ হয়েছে তা এই মানুষ-শরীরে নেত্রদ্বয়, তা আবার একত্র অবস্থিত। রূপই 'বিভ্রাজিত' নামক জনপদ। 'পুরঞ্জন' নামক জীব চক্ষুর সাহায্যে ঐ রূপকে গ্রহণ করে। 'নলিনী' ও 'নালিনী' নামে যা বলেছি তা হল নাসিকাদ্বয় এবং গন্ধকে 'সৌরভদেশ' বলে জানবে। 'অবধূত' শব্দে ঘ্রাণেন্দ্রিয়, 'মুখ্যা' মুখ ও 'বিপণ'কে বাগিন্দ্রিয় বলে জানবে। 'আপণ'-এর অর্থ ব্যবহার; বিচিত্র অন্নের নাম চতুর্বিধ অন্ন। 'পিতৃহূ' অর্থে দক্ষিণ কান এবং 'দেবহূ' মানে বাম কান জানো। ১-১২

যে শাস্ত্রের কথা বলেছি, তা প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি বিষয়ক। দুই শাস্ত্রেরই নাম পঞ্চাল। এই শাস্ত্রদ্বয় যথাক্রমে 'দেবযান' ও 'পিতৃযান' অর্থাৎ শব্দগ্রাহক। পশ্চিম-দিক্‌বর্তী দ্বার মেঢ্র হল দুর্মদ উপস্থেন্দ্রিয়। নির্ঋতিকে মলদ্বার বলে জানবে। প্রচণ্ড নরক বলে যা বলেছি তা লুব্ধক পায়ু ইন্দ্রিয় বলে কথিত। অন্ধদ্বয়ের কথা শোন—হাত ও পা এই দুই অন্ধ। এই অন্ধদ্বয়কে অবলম্বন করে জীব গমন ও গ্রহণ কাজ করে। অন্তঃপুর হৃদয়, 'বিষূচিত' (সর্বতোগামী) শব্দে মনকে বলা হয়েছে, যেহেতু ঐ মনের গুণ সত্ত্ব, রজ, তম দ্বারা জীব ঐ পুরীতে মোহ-হর্ষ-প্রসন্নতাদি লাভ করে থাকে। পূর্বে যে মহিষীর কথা বলা হয়েছে সে হল বুদ্ধি। স্বপ্নে ও জাগ্রতাবস্থায় যে যেই রূপ দেখে, বুদ্ধির গুণে আসক্ত আত্মা দ্রষ্টারূপে দর্শন, স্পর্শনাদি বুদ্ধির বৃত্তিসকলকেই সেই সেই ভাবে অনুকরণ করে। মহারাজ, পুরঞ্জনের যে রথের কথা বলেছি, সেই রথ হল দেহ। ইন্দ্রিয়রা তার অশ্ব, সংবৎসর গতি অর্থাৎ নিরন্তর কালবশে সেই রথ গমনশীল। পুণ্য ও পাপরূপ কর্মদ্বয় তার চক্র, তিনটি ধ্বজা হল সত্ত্ব, রজ, তম—এই গুণত্রয়। পঞ্চপ্রাণ তার বন্ধন; মন রশ্মি, বুদ্ধি সারথি, হৃদয় নীড়[১], শোক ও মোহ যুগবন্ধনের স্থান। পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের বিষয় শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ ও প্রক্ষেপ। অস্থি, চর্ম প্রভৃতি সপ্ত ধাতুই কবচ। পুরুষ ঐ রথে চড়ে মৃগতৃষ্ণারূপে মৃগয়ায় যান। পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় তাঁর বিক্রম। একাদশ ইন্দ্রিয় হল ঐ পুরুষের সেনা। তার মধ্যে পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় দিয়ে তিনি বিষয়সেবা করে থাকেন। 'চণ্ডবেগ' নামে যে কালের কথা বলা হয়েছে তাই সংবৎসর। ওরই দিবসগুলি গন্ধর্ব ও রাত্রিগুলি গন্ধর্বী। ঐ তিনশো ষাট সংখ্যক সৈন্য মিলিত হয়ে জীবের আয়ু হরণ করে থাকে। 'কালকন্যা' যাকে বলেছি সে জরা, লোকে তাকে চায় না। যবনেশ্বর মৃত্যু লোকবিনাশের জন্য তাকে ভগ্নীরূপে গ্রহণ করল। আধি ও ব্যাধিগুলি সেই মৃত্যুর ঝটিতিসেনা। যে দুই-রকম জ্বরের বিষয় বর্ণনা করেছি, তার মধ্যে যেটি 'প্রজ্বার' তার বেগ অতি ভয়ানক, তা প্রজাদের শীঘ্র মৃত্যুর কারণ। দেহী অজ্ঞানে আবৃত হওয়ায় ঐ রূপে এই দেহে

১ নীড়—রথীর উপবেশন স্থান।

নানা রকম আধিদৈবিক, আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক দুঃখ দ্বারা পরিক্লিষ্ট হয়ে একশ বৎসর জীবিত থাকে। তার আত্মা নির্গুণ, তবুও মোহবশত প্রাণের ধর্ম ক্ষুৎ-পিপাসাদি, ইন্দ্রিয়-ধর্ম অন্ধত্বাদি এবং কাম, ক্রোধ প্রভৃতি মনের ধর্ম নির্গুণ পরমাত্মাতে আরোপ করে 'আমি', 'আমার' ইত্যাদি ভাবে সামান্য বিষয়সুখ চিন্তা করে কর্মরত অবস্থায় ঐ দেহে সে একশ বছর বর্তমান থাকে। জীব নিজে প্রকাশ-স্বরূপ পরমাত্মার অংশ হয়েও পরমগুরু ভগবানকে না জেনে প্রকৃতির গুণসকলে আসক্ত হয়ে কর্ম করতে থাকে। তাতে শুক্ল, কৃষ্ণ, লোহিত অর্থাৎ সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক এর যে কোন গুণ প্রধান কাজ করে সেই সেই গুণপ্রধান যোনিতে বার বার জন্মগ্রহণ করে। অতএব যাদের বৃত্তি সত্ত্বগুণপ্রধান তারা সত্ত্বগুণের ফলে প্রকাশ-বহুল পুণ্যলোক লাভ করে। যাদের রজোগুণ প্রবল তারা কষ্টসাধ্য কার্যোপজীবী যোনিতে জন্মায়, আর যাদের তমোগুণ প্রধান তারা নিরন্তর দুঃখ-শোক ভোগ করে। অত্যন্ত মন্দভাগ্য কর্মাসক্ত জীব কখনো পুরুষ, কখনো স্ত্রী, কখনো ক্লীব হয়ে দেবযোনি, মনুষ্যযোনি বা তীর্যকযোনি প্রাপ্ত হয়। আসল কথা, নিজের নিজের কর্মানুসারেই জীবের জন্ম হয়ে থাকে। ১৩-২৯

ক্ষুধায় কাতর কুকুর যেমন ঘরে ঘরে ঘুরে কোথাও অন্ন কোথাও বা প্রহার পায়, সেইরকম কামনা-পরবশ জীব নিজের অদৃষ্টবশত ভাল-মন্দ পথে ভ্রমণ করে উত্তম, মধ্যম বা নিকৃষ্ট যোনিতে দুঃখভোগ করে, কিন্তু নিবৃত্তি লাভ করতে পারে না। আধিদৈবিক, অধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক এই তিন দুঃখের মধ্যে জীব কোন না কোন একটি দ্বারা উদ্বেজিত থাকলেই দুঃখ। যদিও সেই সেই দুঃখের প্রতিকার আছে, কিন্তু প্রতিকারের চেষ্টা করাও দুঃখবহুল বলে জীবের শান্তি হয় না। যেমন কোন ব্যক্তি অতি গুরুভার মস্তকে বহন করে ক্লান্ত হলে স্কন্ধে বহন করে, কিন্তু তাতেও বিশ্রাম পায় না, সেই রকম দুঃখ লাঘবের জন্য প্রতিকারের চেষ্টা করে, কিন্তু শান্তি পায় না, কারণ প্রতিকারের চেষ্টাও দুঃখপ্রদ। সেইরকম সকাম কর্ম ও জ্ঞানরহিত কর্মজনিত দুঃখ কেবল কর্মের দ্বারা নিবৃত্ত হয় না। কারণ কাম্যকর্ম ও জ্ঞানরহিত কর্ম, এ দুটিই অজ্ঞানসম্ভূত। সুতরাং অজ্ঞান দ্বারা অজ্ঞানের নিবৃত্তি হয় না। নিদ্রিত ব্যক্তি যেমন স্বপ্নে উপভোগাশ্রয় মনদ্বারা সর্প-দংশনাদি দুঃখ অনুভব করে, সে রকম দুঃখাদির কারণ বাস্তবিক না থাকলেও অজ্ঞ জীব নিরন্তর সংসার-দুঃখ অনুভব করে এবং তা জ্ঞান ছাড়া নিবৃত্ত হয় না। অতএব পরমার্থস্বরূপ জীবাত্মার যে অজ্ঞান থেকে অনর্থপরম্পরারূপ সংসার হয়ে থাকে তা দূর হয় শ্রীগুরুরূপী পরমেশ্বরে ভক্তি দ্বারা। ৩০-৩৬

ভগবান বাসুদেবের প্রতি যদি নির্মল ভক্তিযোগ প্রযোজিত হয় তবে ঐ ভক্তিই পরম বৈরাগ্য এবং জ্ঞান এনে দেয়। সুতরাং ভক্তিই সর্বপ্রধান। যারা শ্রদ্ধার সঙ্গে ভগবানের বিষয় শ্রবণ করে বা পাঠ করে সেই শ্রদ্ধান্বিত ব্যক্তির সর্বদাই সেই ভক্তিভাব বর্তমান থাকে, এবং ভগবানের কথাকে অবলম্বন করেই ঐ ভক্তিযোগ জীবের হৃদয়ে শীঘ্র প্রকাশ পায়। যেখানে ভগবানের গুণকথা শ্রবণ ও কীর্তনে ভক্তরা ব্যাকুল হন, সেখানে শ্রীভগবানের চরিত্ররূপ অমৃতধারা সর্বদা প্রবাহিত হয়। সেখানে থেকে যাঁরা ঐ অমৃত-নদীর জল শ্রদ্ধার সঙ্গে কর্ণপুটে পান করেন, তৃষ্ণা, ভয়, মোহ, শোক কখনও তাঁদের স্পর্শ করতে পারে না। জীব স্বভাবত ক্ষুধা তৃষ্ণা দ্বারাই নিত্য অভিভূত হয় বলে হরি-কথামৃতে মনোযোগ দিতে পারে না। ৩৭-৪১

প্রজপতিদের গুরু সাক্ষাৎ ব্রহ্মা, ভগবান গিরিশ, মনু, দক্ষ প্রভৃতি প্রজাপতি,

সনকাদি নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, ভৃগু, বশিষ্ঠ এবং আমি, আমার মত অন্যান্য ব্রহ্মণাদিগণ। এঁরা সব বাচস্পতি হয়েও এবং তপস্যা, বিদ্যা, সমাধি প্রভৃতি উপায় দ্বারা সর্বদা অন্বেষণ করেও সর্বসাক্ষী পরমেশ্বরকে আজ পর্যন্ত জানতে পারেন নি। বেদের কর্মকাণ্ড আশ্রয় করে বজ্রপাণি শক্তিশালী ইন্দ্রাদি দেবগণকে ভজনা করে পরমেশ্বরকে জানা সম্ভব নয়। যখন ভগবান ভক্তের আত্মসমর্পণে প্রসন্ন হয়ে তাকে অনুগ্রহ করেন, তখন তার লোকব্যবহারে ও কর্মমার্গে পরিনিষ্ঠিতা বুদ্ধি দূর হয়ে যায়। অতএব মোহবশত কেবল ফলশ্রুতি-পরিপূর্ণ কাম্যকর্মে তুমি কখনো পরমার্থ বুদ্ধি আরোপ করো না। মহারাজ. অজ্ঞানে অন্ধ ব্যক্তিরা বেদকে কর্মপরতন্ত্র বলে ব্যাখ্যা করে, কিন্তু তারা প্রকৃত বেদজ্ঞ নয়। যেখানে বৈকুণ্ঠনাথ শ্রীজনার্দন সর্বদা বিরাজিত ঐ অবেদজ্ঞ লোকেরা নিজেদের প্রাপ্য সেই নিত্যধামের কথা জানে না। মহারাজ, তুমি অত্যন্ত অবিনীত ও মূর্খ। প্রাগগ্র কুশ দ্বারা মণ্ডল আস্তরণ করে বহু পশুবধ দ্বারা তুমি নিজেকে যজ্ঞকারী বলে অহঙ্কার করছ। কেবল কর্মকেই তুমি জেনেছ, কিন্তু বেদ প্রতিপাদ্য পরম বস্তু কি তা জান না। যে কর্ম দ্বারা শ্রীহরি সন্তুষ্ট হন, তাই কর্ম, যে জ্ঞানের দ্বারা শ্রীহরির প্রতি মতি হয়, তাই প্রকৃত জ্ঞান। শ্রীহরি দেহধারীর আত্মা, তিনি আদিকারণ। শ্রীহরির চরণপদ্মই একমাত্র আশ্রয়, যা থেকে জীবের মঙ্গল হয়। ভগবান শ্রীহরিই সকলের প্রিয়তম, তিনিই আত্মা তাঁর আরাধনা করলে কিছুমাত্র ভয়ের কারণ থাকে না। শ্রীহরিকে যে ব্যক্তি এই ভাবে জানে সেই প্রকৃত পণ্ডিত। যিনি পণ্ডিত তিনিই গুরু এবং যিনি গুরু তিনি শ্রীহরি থেকে অভিন্ন। ৪২-৫১

নারদ বললেন, পুরুষশ্রেষ্ঠ, তুমি সংশয়ে পড়ে যে প্রশ্ন করেছিলে, এই তার উত্তর দিলাম। এখন তোমাকে আর একটি গুহ্য বিষয় বলছি শোন। মহারাজ, পুষ্পবনে ঐ যে হরিণটি চরে বেড়াচ্ছে, ওর প্রতি দৃষ্টি দাও। হরিণী ওর সহচরী। মধুলুব্ধ মধুকরের গুনু গুনু গানে ওর মন আসক্ত, সুখ-চেষ্টায় বিভোর হয়ে নিজের বিপদের দিকে ওর দৃষ্টি নেই। ওর সামনে ভয়ংকর বাঘ প্রাণসংহারের উদ্দেশ্যে বিচরণ করছে, পিছনে মৃগয়ালুব্ধ ব্যাধ বাণ হাতে ওকে প্রহারে উদ্যত। হরিণ তবু স্বচ্ছন্দে সুখান্বেষণে ভ্রমণ করছে। মহারাজ, বিষয়-ভোগে প্রমত্ত আত্মাই মরণোন্মুখ ঐ হরিণ। পুষ্পের মত সমধর্মশালিনী (অর্থাৎ প্রথমে সুখদায়ক, কিন্তু পরিণামে দুঃখপ্রদ) সব কামিনীর সঙ্গে গৃহে পুষ্পমধু-গন্ধবৎ অতি তুচ্ছ এবং কাম্য-কর্মের পরিপাক-জনিত যা কিছু কামসুখ, তাই জিহ্বা ও উপস্থাদি দ্বারা সর্বদা সে অন্বেষণ করছে এবং স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হয়েও শুধু স্ত্রীর প্রতিই দৃষ্টি দিচ্ছে। ভ্রমরের সঙ্গীততুল্য স্ত্রী-পুত্রের অতি মনোহর আলাপ শোনার জন্যই ওর কান সদা উৎসুক। আগে বাঘের মত বিনাশপটু দিন-রাতরূপী কাল নিয়ত ওর আয়ু হরণ করছে, সে সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে ঘরের মধ্যে বিহার করে বেড়াচ্ছে। ব্যাধের মত কৃতান্ত ওর পিঠে অর্থাৎ পরোক্ষে থেকে দূর হতে গূঢ় শর-সন্ধান করে এখনি ওকে বাণবিদ্ধ করবে, আর বিলম্ব নেই। অতএব মহারাজ, তুমি নিজের হৃদয়ে আত্মার মৃগতুল্য চেষ্টার বিষয় বিচার করে হৃদয়ে চিত্তকে সংযত কর, নদীরূপ কর্ণযুগলকে চিত্তে সংযত কর। যেখানে সর্বদা কামনাপরবশ জীবের বিষয় আলোচনা হয় সেস্থান পরিত্যাগ কর। সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ কর। ক্রমাগত এইভাবে কামনা থেকে বিরত হও। ৫২-৫৫

রাজা বললেন, নারদ, আপনি আমাকে যা বললেন তা মন দিয়ে শুনলাম। আমার উপাধ্যায়গণ নিশ্চয়ই এসব জানেন না, যদি জানতেন তবে কেন আমায়

বলেন নি? দ্বিজ, আমার যে মহাসংশয় ছিল, আপনি তা দূর করে দিলেন। এখনও কিন্তু ঐ বিষয়ে আমার একটি সংশয় আছে, তাও সামান্য নয়। সে বিষয়ে ইন্দ্রিয়বৃত্তিগুলির অপ্রবৃত্তিহেতু ঋষিরা মোহিত হয়ে থাকেন। জীব এই পৃথিবীতে যে দেহ দ্বারা কর্ম করে সেই দেহকে এখানেই পরিত্যাগ করে যায়। তার এখানকার কর্ম দ্বারা পরলোকে অন্য এক দেহ হয়, সেই দেহ দ্বারা সে বারংবার ঐ সব কর্মের ফলভোগ করে থাকে। এ প্রসঙ্গে বেদজ্ঞানীদের এ রকম কথাই শোনা যায়। আরও দেখুন, লোকে বেদোক্ত যে যে কর্ম করে, তা পরক্ষণেই অদৃশ্য হয়, পরে আর প্রকাশ পায় না। এতে বোধ হয় যে ঐ কর্ম নষ্ট হয়ে গেল। তাহলে তার ফলভোগ কিভাবে ঘটবে? ৫৬-৫৯

নারদ বললেন, মহারাজ, জীব ইহলোকে যে দেহ দ্বারা কর্ম করে, পরলোকে কর্তা ভোক্তার বিচ্ছেদ না হতে হতেই সেই দেহ দ্বারা ফলভোগ করে থাকে। ফলে, যদিও স্থূলদেহের বিনাশ হয়ে যায়, তবুও লিঙ্গদেহের ধ্বংস না হওয়ায় তার দ্বারা ফলভোগ হয়ে থাকে। এতে সংশয়ের কিছু নেই। নিদ্রা গেলে যেমন জীব জাগ্রত দেহ পরিত্যাগ করে মনের মধ্যে স্বপ্নাবস্থায় কর্মভোগ করে, সেরূপ পশ্বাদি দেহ অথবা অন্য কোন দেহ দ্বারা সে লোকান্তরে ফলভোগ করবে এতে বিস্মিত হচ্ছ কেন? 'এই আমার', 'এই আমি' এই বলে জীব মন দ্বারা যে যে দেহ গ্রহণ করে, সেই সেই দেহ থেকে আবার সিদ্ধকর্ম পেয়ে থাকে। সেই সমস্ত কর্ম অহংবোধ দ্বারা পরিগৃহীত হওয়ায় তার দ্বারাই পুনর্জন্ম ঘটে। মনবিশিষ্ট অভিমানকারীই কর্তা; অভিমানের বিষয় দেহ দ্বার মাত্র। কর্মগুলি পরক্ষণেই নষ্ট হয়ে যায় বলে যে সংশয় প্রকাশ করলে সেই বিষয়ে আমার বক্তব্য এই যে, যেমন ইন্দ্রিয়সকলের জ্ঞান ও কর্মরূপ দ্বিবিধ প্রবৃত্তি দ্বারা চিত্তের অনুমান করা যায়, সেই রকম চিত্তবৃত্তি দ্বারা পূর্বদেহ-জনিত কর্মগুলির অনুমান করা হয়ে থাকে। এই স্থূলদেহ দ্বারা এ-জীবনে যা অনুভব ও ভোগ করা হয় নি এবং যা কখনো শ্রবণ বা দর্শন করা হয় নি, এরকম বস্তুও স্বপ্নে অথবা মনোরথাদিতে কখনো উপলব্ধি হতে দেখা যায়। সুতরাং পূর্বজন্মের সংস্কার স্বীকার করতে হবেই, কারণ যে বিষয় কদাচিৎ দৃষ্ট বা শ্রুত হয় নি, তা কখনও মনে উদয় হতে পারে না, যদি না পূর্বজন্মের স্মৃতি মনে জাগে। পূর্বজন্মে যা ভোগ করা হয়, পরজন্মে তারই ভাব স্ফুরণ হয়, এতে সন্দেহ নেই।[১] মহারাজ, আশীর্বাদ করি, তোমার মঙ্গল হোক। দেখ মানুষের মনই পূর্বজন্মের ভাব এবং পরে কি রকম ভাবে জন্মগ্রহণ করবে বা একেবারেই জন্মাবে না মুক্ত হয়ে যাবে তা বিশেষভাবে প্রকাশ করে দেয়। সমস্ত লোকই মন-বিশিষ্ট, অতএব মনের দ্বারা সমস্ত বিষয়ই কখনো কখনো ইন্দ্রিয়গোচর হয়ে ভোগ্যরূপে উপস্থিত হয়, আবার ক্রমানুসারে অদৃশ্য হয়; সুতরাং জীবের অননুভূত বস্তু কিছুই জগতে নেই। জন্মজন্মান্তরে প্রত্যেক বস্তুই প্রত্যেকের অনুভবগোচর হয়। রাহু যেমন চন্দ্রের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে প্রকাশ পায়, পরিদৃশ্যমান এই বিশ্বও সেরকম সত্ত্বগুণযুক্ত ও ধ্যানপরায়ণ সাধুদের মনে সংযুক্তরূপে প্রতিভাত হয়ে থাকে। ৬০-৬৯

আর যে পর্যন্ত বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয়-বিষয় ও গুণের পরিণাম থাকে, সে পর্যন্ত জীবের 'আমি, আমার' এই রকম অভিমান একেবারে যায় না, কর্তৃত্ব-

১ তুলনীয়: সুন্দর দৃশ্য দর্শন করে এবং মধুর শব্দ শুনে সুখী প্রাণীরও চিত্ত যে উৎসুক হয়ে থাকে, তার কারণ নিশ্চয়ই পূর্বজন্মের অস্পষ্ট কিন্তু ভাবস্থির কোন সৌহৃদ্যের কথা তার স্মৃতিপথে উদিত হয়। —শকুন্তলা (পঞ্চম অংক)।

ভাস্তুষের বিরহেও লিঙ্গশরীরে বিষয়গুলি আশ্রয়রূপে বর্তমান থাকে। সুষুপ্তি, মূর্ছা, ইষ্টবিয়োগজনিত দুঃখ ও উৎকট ব্যাধিগ্রস্ত অবস্থায় এবং মৃত্যু-সময়ে ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে প্রাণের ক্রিয়ার অভাববশত 'আমি, আমার' এরূপ অহংবোধ প্রকাশ পায় না বটে, কিন্তু সেই সেই অবস্থার অবসানে সেই অভিমানবোধ আবার ফিরে আসে। অমাবস্যার রাত্রে চন্দ্রকে দেখা যায় না, কিন্তু চন্দ্র ঠিকই বর্তমান থাকে। সেরূপ যুবা-পুরুষের দেহে একাদশ ইন্দ্রিয়ের বিকাশ প্রত্যক্ষ দেখা যায়। অসম্পূর্ণতার জন্য গর্ভস্থ জীবে এবং শিশুতে তা সম্যক্ দেখা যায় না, কিন্তু তা থাকে ঠিকই। ৭০-৭২

বিষয়-ধ্যানকারী পুরুষের যেমন স্বপ্নাবস্থায় বিষয় না থাকলেও বিষয় বিয়োগের দুঃখ হয়, সেরকম বিষয় বর্তমান না থাকলেও জীবের সংসার-নিবৃত্তি হয় না। মহারাজ, পঞ্চতন্মাত্র-স্বরূপ এবং ত্রিগুণ ও ষোড়শ বিকারে বিস্তৃত লিঙ্গদেহ এই ভাবে চেতনার সঙ্গে সংযুক্ত হলে তাকে জীব বলা যায়। লিঙ্গদেহ দ্বারাই পুরুষ স্থূলদেহগুলি গ্রহণ ও পরিহার করে এবং এর দ্বারাই শোক, হর্ষ, সুখ, দুঃখ ও ভয় অনুভব করে থাকে। যেমন জোঁক অন্য তৃণের আশ্রয় না পাওয়া পর্যন্ত পূর্বতৃণ একেবারে পরিত্যাগ করে না, সেই রকম পুরুষ মুমূর্ষু হলে পূর্বদেহের আরম্ভক কর্মগুলির সমাপন দ্বারা যতক্ষণ অন্যদেহ অবলম্বন না করে, ততক্ষণ পূর্ব দেহাভিমান পরিত্যাগ করে না। নরনাথ, বস্তুত মনই প্রাণীদের সংসারের কারণ। ইন্দ্রিয়গুলি দ্বারা যে সমস্ত বিষয় উপভোগ করা হয়, তার ধ্যান করেই পুরুষ বার বার কর্ম আরম্ভ করে থাকে। কারণ কর্ম থাকলেই অবিদ্যা থাকে, আবার অবিদ্যা থাকলে দেহাদি কর্মে নিবন্ধ হয়। অতএব ঐ অবিদ্যার বিনাশের জন্য সর্বান্তঃকরণে ভগবান শ্রীহরির ভজনা কর এবং সমগ্র বিশ্বে শ্রীহরিকে দেখ। তিনিই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় কর্তা। ৭৩-৭৯

মৈত্রেয় বললেন, বিদুর, এইভাবে মহাভাগবত নারদ জীব ও ঈশ্বরের গতি প্রদর্শন করে রাজাকে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে সিদ্ধলোকে ফিরে গেলেন। রাজর্ষি প্রাচীনবর্হি প্রজাদের সৃষ্টি রক্ষার জন্য মন্ত্রীদের সমক্ষে পুত্রদের আদেশ করে তপস্যার জন্য কপিলাশ্রমে গেলেন। সেই কপিলাশ্রমে ধীরপ্রকৃতি প্রাচীনবর্হি ঐকান্তিক ভক্তির সঙ্গে ভগবান গোবিন্দের শ্রীচরণ ধ্যান দ্বারা মুক্তসঙ্গ হয়ে বিষ্ণুর সারূপ্য-মুক্তি লাভ করলেন। হে অনঘ, দেবর্ষি নারদ কর্তৃক কথিত এই প্রকারের পরোক্ষ অধ্যাত্মতত্ত্ব অতি পবিত্র ও চিত্তশুদ্ধিকর। যে লোক নিজে তা শুনবে অথবা অপরকে শোনাবে সে লিঙ্গদেহ থেকে মুক্তি পাবে ; তাকে আর এই সংসারে ফিরে আসতে হবে না। এই অদ্ভুত অধ্যাত্মতত্ত্ব আমি জেনেছি, তাই তোমাকে বললাম। এ জানলে জীবের ইহকাল ও পরকালের বিষয়াত্মিকা বুদ্ধির সহবাসজনিত সব সংশয় দূর হয়। ৮০-৮৫

ত্রিংশ অধ্যায়

প্রাচীনবর্হির পুত্রদের বিষ্ণুর বরদান

বিদুর বললেন, ব্রাহ্মণ, আপনি প্রাচীনবর্হির যে সব পুত্রের বিষয় বর্ণনা করলেন, তাঁরা রুদ্রগীত জপের দ্বারা ভগবান শ্রীহরিকে তুষ্ট করে কি ভাবে সিদ্ধিলাভ

করেছিলেন? হে বৃহস্পতিশিষ্য, রাজপুত্রেরা তপস্যায় ভগবান শিবকে লাভ করে তাঁর অনুগ্রহে অবশ্যই মোক্ষলাভ করেছিলেন; কিন্তু তার আগে ইহলোক ও পরলোকে কি লাভ করেন? ১-২

মৈত্রেয় বললেন, প্রচেতারা পিতার আদেশে সমুদ্রগর্ভে রুদ্রগীত জপ, যজ্ঞ ও তপস্যা দ্বারা শ্রীহরিকে পরিতুষ্ট করলেন। দশ হাজার বছর শেষ হলে সনাতন বিষ্ণু সাক্ষাৎ আবির্ভূত হয়ে তাঁদের তপস্যার অবসান করেছিলেন। বৎস, মেঘ যেমন সুমেরু পর্বতশৃঙ্গে সংলগ্ন থাকে তিনিও সে রকম গরুড়ের পিঠে আরূঢ় ছিলেন। তাঁর পরনে পীতবস্ত্র, কণ্ঠে কৌস্তুভমণি আর তাঁর অঙ্গমহিমায় সকল দিক উদ্ভাসিত হচ্ছিল। স্বর্ণভূষণের ঔজ্জ্বল্যে তাঁর কপোল ও মুখমণ্ডল দীপ্ত হচ্ছিল, মস্তকে শোভা পাচ্ছিল কিরীট। তাঁর আট হাতে জীবরক্ষার প্রহরণগুলি শোভা পাচ্ছিল। মুনিরা ও সুরশ্রেষ্ঠরা অনুচরের ন্যায় তাঁর সেবা করছিলেন এবং গরুড়-কিন্নরের মত নিজেরা তাঁর কীর্তি গান করছিলেন। তাঁর কণ্ঠের বনমালা তাঁর স্থূল অথচ আয়ত অষ্ট বাহুর মধ্যে বিলম্বিত থেকে অতি মনোহর শোভা ধারণ করেছিল। আদিপুরুষ ভগবান শ্রীহরি সপ্রেম দৃষ্টিপাত করে মেঘ-গম্ভীর স্বরে প্রাচীনবর্হির পুত্রদের বলতে লাগলেন, রাজপুত্রগণ, তোমাদের মঙ্গল হোক, সৌহার্দবশে তোমরা সবাই এক ধর্মাবলম্বী। তোমরা আমার কাছে বর প্রার্থনা কর। আমি তোমাদের পরস্পর হৃদ্যতা দেখে তুষ্ট হয়েছি। তোমাদের আমি এই বর দিচ্ছি যে প্রতি সন্ধ্যায় যে তোমাদের স্মরণ করবে তার ভ্রাতাদের প্রতি আত্ম-তুল্য ভাব ও সারা বিশ্বের প্রাণীদের প্রতিও বন্ধুভাব জন্মাবে। যারা একাগ্রচিত্তে প্রতি সন্ধ্যায় ও সকালে রুদ্রগীত গানে আমার স্তব করে আমি তাদের অভিলষিত বর ও নির্মল প্রজ্ঞা দান করি। যেহেতু তোমরা আনন্দিত মনে পিতার আদেশ গ্রহণ করে আমার উপাসনা করেছ, তাই তোমাদের কীর্তি সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত হবে। তোমাদের ব্রহ্মার তুল্য গুণশালী একটি পুত্র জন্মাবে; সে আবার তার ঔরসজাত সন্তান দ্বারা সমস্ত পৃথিবী পূর্ণ করবে। ৩-১২

রাজপুত্রগণ, কণ্ডুমুনির তপস্যা ভঙ্গ করার জন্য ইন্দ্রের পাঠানো প্রম্লোচা নামক অপ্সরা ঐ মুনির তপোভঙ্গ করে একটি কন্যার জন্ম দেয়। আবার স্বর্গে ফিরে যাবার সময় সে ঐ কন্যা ফেলে যায়। তখন বৃক্ষরা তাকে আশ্রয় দেয়। অত্যন্ত ক্ষুধায় কাতর হয়ে একদিন যখন ঐ কন্যা কাঁদছিল তখন বনস্পতিদের রাজা সোম (চন্দ্র) তার মুখে অমৃতবর্ষী তর্জনী প্রদান করেন। তাতে কন্যাটি সুন্দরী ও দীর্ঘায়ু হয়। অতএব আমার পরম ভক্ত তোমাদের পিতা প্রাচীনবর্হির আদেশে বংশ-বৃদ্ধির জন্য ঐ কন্যার পাণিগ্রহণ কর, দেরী করো না। তোমরা পরস্পর সমধর্মী ও সমান স্বভাবশালী; এই সুন্দরীও ঐরূপ গুণসম্পন্ন। এই কন্যা তোমাদের সকলকে মন সমর্পণ করেছে, এ তোমদের সকলের ভার্যা হতে পারবে। আর আমার অনুগ্রহে তোমরা প্রভাবশালী হয়ে হাজার দিব্য বছর পর্যন্ত পার্থিব ও স্বর্গীয় সুখ লাভ করবে। তারপর আমার প্রতি নির্মল ভক্তি বশে কাম প্রভৃতি বিনষ্ট হবে ও তোমরা এই ভোগের জগৎ থেকে উদ্ধার লাভ করে আমার দিব্যধামে যাবে। গৃহ করলেই যে গৃহে আসক্তি হয় তা মনে করো না, ভগবানের কথায় যাদের সময় যায় এবং ভগবানেই সমস্ত কর্ম যারা অর্পণ করে সেই সব পুরুষ গৃহী হলেও তাদের বন্ধনের কোন কারণ হয় না। ব্রহ্মস্বরূপভূত আমার গুণ-কীর্তন যে ব্যক্তি শ্রবণ করে সেই আগ্রহী শ্রোতার হৃদয়ে প্রতিপদে সর্বজ্ঞ ও সর্বেশ্বর আমি নূতনের মত আবির্ভূত হই। আমাকে লাভ করলে শোক-মোহ হয় না, অন্য কিছুতেও মত্ততা আসে না। ১৩-২০

মৈত্রেয় বললেন, বৎস বিদুর, পুরুষার্থদাতা ভগবান জনার্দনের কথা শুনে প্রচেতারা কৃতাঞ্জলিপুটে গদ্‌গদভাবে ভগবানের স্তব করতে লাগলেন, হে বিশ্বনাথ ভগবান, বেদে বলা হয়েছে যে তোমার উদার গুণ ও নামে সকল বিষয়ের সাধন হয়। সর্বক্লেশনাশক তোমাকে নমস্কার। তুমি বাক্য ও মনের অগোচর, সমস্ত ইন্দ্রিয় দ্বারাও তোমার মহিমা জানা যায় না, সেই তোমাকে বারবার নমস্কার করি। হে বিভু, তুমি সর্বদাই স্বরূপে অবস্থিত, নির্মল ও শান্ত। তোমাকে পেলে নানা ভোগবিলাসে পূর্ণ এই জগৎও নিষ্প্রয়োজন মনে হয়। তুমি জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের জন্য সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণে ব্রহ্মা, রুদ্র প্রভৃতি বিভিন্ন মূর্তি ধারণ করে থাক, তোমায় নমস্কার। হে প্রভু, স্বভাবতই তুমি বিশুদ্ধসত্ত্ব, তোমার তত্ত্বজ্ঞানই জীবের সংসারবন্ধন নিবারণ করে, তোমাকে নমস্কার। তুমি বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ ভক্তজনের প্রভু, তোমাকে নমস্কার। তুমি কমলনাভ, কমলমালাধারী, কমললোচন, কমলচরণ, তোমাকে নমস্কার। তোমার পরিধেয় বস্ত্র পদ্মপরাগ তুল্য পিঙ্গল বর্ণের। তুমি সর্বভূতের আবাস এবং সর্বলোকের সাক্ষী, তোমাকে প্রণাম। হে ভগবান, তোমার রূপে সীমাহীন কষ্টের অবসান হয়। আমাদের কষ্টনাশের জন্য তুমি এই মূর্তি প্রকটিত করলে, এর চেয়ে বেশি করুণা আর কি হতে পারে? হে অমঙ্গলনাশন, দীনজনের প্রতি 'এরা আমার লোক' এরকম মনে করলেই যথেষ্ট অনুগ্রহ হয়। ঐরকম স্মরণেই সব লোকের পরম মঙ্গল হয়ে থাকে। হে ভগবান, তুমি অন্তর্যামী, তোমার উপাসক আমাদের কি ইচ্ছা ও কামনা তা কি তুমি জান না? তোমার প্রসন্নতাই আমাদের প্রার্থনা। মোক্ষদাতা ও স্বয়ং পুরুষার্থস্বরূপ তুমি আমাদের প্রতি প্রসন্ন আছ, তবু তোমার প্রসন্নতাই আমাদের একমাত্র প্রার্থনীয়। ২১-৩০

হে প্রভু, তুমি পরাৎপর পরমেশ্বর। তোমার বিভূতি অন্তহীন তাই তুমি অনন্ত। পারিজাত পেলে ভ্রমর যেমন অন্য বৃক্ষের প্রতি আর আগ্রহী হয় না, আমরাও তোমার পদপ্রান্ত লাভ করে অন্য আর কি প্রার্থনা করব? কিন্তু তুমি যখন আদেশ করছ তখন এই বর প্রার্থনা করি যে আমরা মায়াদ্বারা আচ্ছন্ন হওয়ায় কর্মবশে এ সংসারে যতকাল ঘুরে বেড়াব ততকাল যেন জন্মে জন্মে তোমার সহচরদের সঙ্গে আমাদের যোগ হয়। তোমার সহচরদের সাহচর্য মোক্ষলাভ বা স্বর্গলাভের সঙ্গেও তুল্য নয় অর্থাৎ তার চেয়েও শ্রেষ্ঠ, অন্য বিভবের কথা আর কি বলব? সর্বভূতে সমদর্শী তোমার সহচররা সর্বদা পবিত্র (কৃষ্ণ) কথায় রত তাঁদের কোনরকম উদ্বেগ নেই। তাঁরা মুক্তসঙ্গ হয়ে সর্বদা সৎ-আলোচনার মধ্যে যোগীদের আশ্রয়স্বরূপ নারায়ণের প্রসঙ্গ আলোচনা করেন। তাঁদের সঙ্গলাভে কার না ইচ্ছা হয়? ৩১-৩৫

হে প্রভু, তোমার সহচরগণ যখন ভ্রমণ করেন তখন তাঁদের পদরজ পৃথিবীকে পবিত্র করে। তাই তাঁরা সাক্ষাৎ তীর্থের মত। হে ভগবান, সৎসঙ্গের ফল আমরা প্রত্যক্ষ অনুভব করেছি। ক্ষণকাল তোমার প্রিয় সুহৃদ ভগবান শংকরের সঙ্গ লাভেই আমরা তোমাকে পেলাম। তুমিই আদ্য গতি, দুশ্চিকিৎস্য সংসার এবং মৃত্যুরোগের সুচিকিৎসক। হে প্রভু, আমরা যে মন দিয়ে বেদ পাঠ করেছি, অনুবৃত্তি দ্বারা গুরু, ব্রাহ্মণ ও বৃদ্ধদের প্রসন্ন করেছি, মানীলোক, সুহৃৎ ও ভ্রাতাদের যে নমস্কার করেছি, অসূয়াহীন হয়ে সমস্ত প্রাণীকে যে সন্তুষ্ট করেছি এবং অনাহারে দীর্ঘকাল জলের মধ্যে থেকে যে কঠিন তপস্যা করেছি—এসবে যেন তুমি প্রসন্ন হও। হে প্রভু, তুমি পরম পুরুষ। তোমার প্রসন্নতাই আমরা প্রার্থনা করি। আমরা অজ্ঞ হলেও তোমার স্তব করা অযৌক্তিক নয়। হে শ্রীহরি, মনু, ব্রহ্মা, শংকর এবং তপস্যা ও জ্ঞানে অন্যান্য বিশুদ্ধচেতা যোগীরা সবাই তোমার মহিমার পরিমাপ করতে না পেরে নিজ নিজ সাধ্যানুসারে স্তব করে থাকেন; আমরাও যথাসাধ্য স্তব করলাম। হে প্রভু,

সর্বত্র সমদর্শী ও পবিত্র বিশুদ্ধ তোমাকে প্রণাম। হে ভগবান, তুমি সত্ত্বরূপী বাসুদেব, তোমায় নমস্কার। ৩৬-৪২

মৈত্রেয় বললেন, প্রাচীনবর্হি'র পুত্র প্রচেতারা এ-রকমভাবে স্তব করলে ভক্তের ভগবান হৃষ্ট হয়ে বললেন, বৎসগণ, তোমাদের প্রার্থনা পূর্ণ হোক। এই বলে নরোয়ণ সকলের সামনেই অদৃশ্য হলেন। প্রচেতারা তাঁকে বারবার দেখেও তৃপ্ত হন নি। তাঁরা সমুদ্রগর্ভ থেকে উঠে এসে দেখলেন যে, ভূমণ্ডল নানা রকম বৃক্ষে আচ্ছন্ন হয়েছে। গাছগুলি উঁচু হয়ে যেন স্বর্গ রুদ্ধ করতে উদ্যত হয়েছে। এ দেখে তাঁদের ঐ গাছগুলির প্রতি ক্রোধ হল। তখন তাঁরা পৃথিবীকে বৃক্ষলতা-হীন করার জন্য মুখ থেকে প্রলয়কালের কালাগ্নির মত আগুন ও বাতাস ত্যাগ করলেন। পৃথিবীতলের সমস্ত গাছপালা ভস্মীভূত হচ্ছে দেখে পিতামহ ব্রহ্মা প্রচেতাদের কাছে ছুটে এসে যুক্তিপূর্ণ বাক্যে তাঁদের ক্রোধ শান্ত করলেন। অবশিষ্ট বৃক্ষরা ভয়ে ও ব্রহ্মার উপদেশে তাদের সেই কন্যাটি প্রচেতাদের সম্প্রদান করলেন। ব্রহ্মার আদেশে মারিষা নামে ঐ কন্যাকে তাঁরা যথাবিধি পত্নীত্বে বরণ করলেন। ব্রহ্মপুত্র দক্ষ পূর্বে একবার মহাদেবকে অবজ্ঞা করেছিলেন। সেই অপরাধে তিনি মারিষার গর্ভে ক্ষত্রিয়রূপে জন্মগ্রহণ করেন। চাক্ষুষ মন্বন্তরে পূর্বদেহ বিনষ্ট হলে যিনি ঈশ্বরপ্রেরিত হয়ে প্রজা সৃষ্টি করেন, ইনিই সেই দক্ষ। এঁর জন্ম হলে স্বকীয় তেজের প্রভায় সমস্ত তেজস্বীদের তেজ আচ্ছাদিত হয়। ইনি সমস্ত কাজে অত্যন্ত নিপুণ ছিলেন বলে পণ্ডিতেরা একে দক্ষ বলেছেন। পিতামহ ব্রহ্মা তাঁকে অভিষেক করে প্রজা সৃষ্টি ও পালনের জন্য নিযুক্ত করেন। এই দক্ষ আবার মরীচি প্রভৃতি প্রজাপতিদের প্রজা-সৃষ্টিতে প্রবৃত্ত করেন। ৪৩-৫১

একত্রিংশ অধ্যায়

প্রচেতাদের বনে গমন ও মুক্তিলাভ

মৈত্রেয় বললেন, বিদুর, প্রচেতারা এক হাজার দিব্য বছর রাজত্ব করার পর দিব্যজ্ঞান লাভ করেন। তখন তাঁরা ভাগবত বাক্য স্মরণ করে নিজ নিজ পত্নীগণের ভার পুত্রদের হাতে সমর্পণ করে সংসার-আশ্রম ছেড়ে প্রব্রজ্যায় গেলেন। সমুদ্রতটে যেখানে জাজলি মুনি তপস্যায় সিদ্ধ হয়েছিলেন তাঁরা সেখানেই আত্মতত্ত্ব লাভের জন্য তপস্যায় রত হলেন। তাঁরা প্রাণ, মন, বাক্য ও বাহ্য দৃষ্টি জয় করে ঋজুভাবে উপবিষ্ট ও বিষয় হতে উপরত হয়ে নির্মল পরব্রহ্মে চিত্ত সমর্পণ করে উপবিষ্ট ছিলেন। এমন সময়ে সুরাসুর-পূজিত দেবর্ষি নারদ সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। দেবর্ষি উপস্থিত হওয়া মাত্র প্রচেতারা গাত্রোত্থান করে অভিবাদন ও যথাবিধি পূজা করে তাঁকে বসার জন্য আসন দিলেন। তারপর তিনি সুখাসীন হলে প্রচেতারা জিজ্ঞাসা করলেন, ব্রাহ্মণ, পথে আপনার কোন কষ্ট হয়নি তো? আমাদের পরম সৌভাগ্য যে আপনার দেখা পেলাম। ভূমণ্ডলের হিতের জন্য আপনি সূর্যের মত সতত ভ্রমণ করেন। ভগবান শ্রীহরি এবং শিব আমাদের যে আত্মতত্ত্ব শিক্ষা দিয়েছেন এতদিন পর্যন্ত গৃহে অত্যন্ত আসক্তিবশত তা প্রায় ভুলে গেছি। তাই তত্ত্ব-জ্ঞান-প্রদীপে সেই অধ্যাত্ম-তত্ত্ব আপনি আবার উদ্দীপিত করে দিন, যাতে আমরা দুস্তর ভবসাগর পার হতে পারি। ১-৭

মৈত্রেয় বললেন, বিদুর, প্রচেতারা এরকম বললে দেবর্ষি নারদ ভগবান বিষ্ণুতে মনোনিবেশ করে নৃপতিদের বলতে লাগলেন, নৃপগণ, মানুষের সেই কর্মই কর্ম, সেই মনই মন, সেই বাক্যই বাক্য, সেই আয়ুই আয়ু যার দ্বারা শ্রীহরি আরাধিত হন। শ্রীহরির আরাধনা ছাড়া পিতা-মাতার বিশুদ্ধ শুক্র-শোণিতের সংযোগ, উপনয়ন, দীক্ষা এই তিন রকম জন্মেরই বা কি ফল? আর দেবতুল্য দীর্ঘায়ু লাভ করেই বা কি ফল? শ্রীহরির আরাধনা ছাড়া বেদ শ্রবণ, তপস্যা, বাগ্‌বিভূতি, স্থির চিত্তবৃত্তি এসবই ব্যর্থ। আর শ্রীহরির আরাধনা ছাড়া নিপুণ বুদ্ধি ও বল এবং ইন্দ্রিয়ের পটুতারই বা কি প্রয়োজন? যেখানে আত্মপ্রদ শ্রীহরি নেই সেখানে যোগ, সন্ন্যাস ও বেদাধ্যয়নে কি লাভ এবং অন্যান্য শ্রেয়ঃসাধক কর্মেই বা কি ফল? যত রকম প্রিয় বস্তু আছে তার মধ্যে আত্মাই সকলের থেকে উৎকৃষ্ট এবং শ্রীহরিই সকলের আত্মা। অতএব তিনি ছাড়া আর প্রিয় বস্তু কি থাকতে পারে? যেমন গাছের গোড়ায় জল দিলে তার স্কন্ধ, শাখা, উপশাখা প্রভৃতি সর্বাঙ্গ পুষ্ট হয়, ভোজন করলে যেমন সব ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি হয়, সেরকম ভগবান অচ্যুতের আরাধনা করলেই সব দেবতার আরাধনা করা হয়। জল যেমন সূর্য থেকে উৎপন্ন হয়ে সময়কালে আবার তাতেই প্রবেশ করে, স্থাবর-জঙ্গম ভূত-সমুদয় যেমন ক্ষিতি থেকে উৎপন্ন হয়ে শেষে তাতেই বিলীন হয়ে যায়, সেরকম চেতন ও অচেতন এই জগৎপ্রপঞ্চ ভগবান শ্রীহরি থেকে উৎপন্ন হয়ে তাতেই বিলীন হয়। রাজগণ, যেমন আকাশে মেঘ, অন্ধকার ও আলোকের পর্যায়ক্রমে উদয় ও লয় হয়, সেই রকম সত্ত্ব, রজঃ ও তমোরূপী শক্তিপ্রবাহ ভগবানে প্রকাশ ও লয় পেয়ে থাকে। অতএব তোমরাও আত্মার সঙ্গে অভিন্নরূপে তাঁকে ভজনা কর। তিনি সমস্ত দেহের আত্মা এবং এই জগতের নিমিত্তকারণ। তিনিই উপাদান-কারণ ও পরম পুরুষ। তিনি নিজের তেজ দ্বারা সত্ত্বাদি গুণপ্রবাহ বিনষ্ট করেন, অতএব তিনিই পরম ঈশ্বর। ৮-১৮

সর্বভূতে দয়া, সব অবস্থায় সন্তোষ এবং সমস্ত ইন্দ্রিয়ের দমন—এই কয়েকটি কর্মে শ্রীহরি সন্তুষ্ট হন। সাধুজনের নিষ্কাম নির্মল হৃদয়াকাশে ভগবান শ্রীহরি যেন বন্দী হয়ে সর্বদা বাস করছেন, কখনও তিনি সেখান থেকে অপসৃত হন না। কিন্তু যে সব কুজ্ঞানীরা অর্থ, বিদ্যা, কুল ও কর্মের অহংকারে মত্ত হয়ে অকিঞ্চন সাধুদের অপমান করে, ভগবান তাদের পূজা গ্রহণ করেন না। তিনি নিজেই নিজেতে পরিপূর্ণ এবং নিজের ভক্তজনেই অনুরক্ত। সম্পত্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবী শ্রী এবং সকল রাজগণ ও দেবগণেরও অনুবৃত্তি তিনি গ্রহণ করেন না। এরূপ ভগবানকে কোন ব্যক্তি কি অল্পক্ষণের জন্যও পরিত্যাগ করতে পারে? ১৯-২২

মৈত্রেয় বললেন, ব্রহ্মনন্দন নারদ এইসব এবং অন্যান্য ভগবৎতত্ত্ব কথা প্রচেতাদের শুনিয়ে ব্রহ্মলোকে চলে গেলেন। প্রচেতারাও তাঁর মুখনিঃসৃত সর্বলোকের পাপনাশক ভগবানের যশঃকীর্তি শ্রবণ করে তাঁর পাদপদ্ম ধ্যান করতে করতে তাঁরই গতি লাভ করলেন। বৎস বিদুর, তুমি আমাকে যা জিজ্ঞাসা করেছিলে এই সেই নারদ ও প্রচেতাদের হরি-সংকীর্তন-বিষয়ক সংবাদ বর্ণনা করলাম। ২৩-২৫

শুকদেব বললেন, মহারাজ পরীক্ষিৎ, মনুতনয় উত্তানপাদের বংশ বর্ণিত হল। এখন প্রিয়ব্রতের বংশকথা শোন। রাজা প্রিয়ব্রত নারদের কাছে আত্মবিদ্যা লাভ করে পুনরায় পৃথিবী ভোগ করেছিলেন এবং পরে নিজের পুত্রদের মধ্যে তা ভাগ করে দিয়ে পরমেশ্বরের পরমপদ লাভ করেন। ২৬-২৭

মৈত্রেয় কথিত এই সমস্ত ভগবৎ-কথা শুনে বিদুরের ভক্তিভাব উথলে উঠল। তিনি প্রেমাশ্রু-বিগলিত চোখে মুনির চরণ বন্দনা করে এবং হৃদয় দ্বারা ভগবানের

পদারবিন্দ ধারণ করে আনন্দ-গদ্‌গদ বাক্যে বললেন, তাত, করুণাত্মা আপনি আজ আমাকে অজ্ঞানের পরপার[1] ও অকিঞ্চন ভক্তজনের দর্শনীয় জনার্দন হরিকে দর্শন করালেন। ২৮-২৯

শুকদেব বললেন, এই ভাবে সেই ঋষিকে সম্ভাষণ ও প্রণাম করে জ্ঞাতি দর্শন বাসনায় বিদুর হস্তিনাপুরে প্রস্থান করলেন। হরিপরায়ণ প্রচেতাদের এই পবিত্র কথা যিনি শ্রবণ করেন, তিনি ঐশ্বর্য, আয়ু, ধন ও শ্রেয়োলাভ করে শেষে সদ্‌গতি লাভ করেন। ৩০-৩১

১ অজ্ঞানের অতীত, সূর্যের ন্যায় স্বপ্রকাশ মহান পুরুষকে আমি জানি। তাঁকে জেনেই সাধক মৃত্যুকে অতিক্রম করেন; পরমপদ প্রাপ্তির অন্য কোনও পথ নেই।—শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ, ৩।৮ শ্লোক।

পঞ্চম স্কন্ধ

প্রথম অধ্যায়

রাজর্ষি প্রিয়ব্রতের চরিতকথা

পরীক্ষিৎ বললেন, মুনিবর, পরম ভাগবত প্রিয়ব্রত আত্মজ্ঞ হয়েও কিভাবে গৃহস্থাশ্রমে আসক্ত হয়েছিলেন ? প্রিয়ব্রতের মত মুক্তসঙ্গ ভাগবত পুরুষদের তো কখনো গৃহে অভিনিবিষ্ট হবার কথা নয়। মহৎলোকের চিত্ত ভগবানের শ্রীচরণের ছায়াতে আশ্রয় নিয়েই কামাদি সন্তাপ থেকে মুক্ত হয়। তাঁদের স্ত্রী, পুত্র প্রভৃতিতে স্পৃহা হবার কথা নয়। প্রিয়ব্রত স্ত্রী, পুত্র, গৃহ প্রভৃতিতে আসক্ত হয়েও কিভাবে সিদ্ধিলাভ করেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতিই বা তাঁর কিভাবে অচলা ভক্তি হয় ? এ বিষয়ে আমার সংশয় দূর করুন। ১-৪

শুকদেব বললেন, সত্যি বলেছ, পুণ্যশ্লোক ভগবানের চরণকমলের মকরন্দরসে যাঁদের চিত্ত সর্বদা অভিনিবিষ্ট, তাঁরা ভগবৎ-কথাকেই নিজেদের পরম গতি মনে করে থাকেন। কোন রকম বিঘ্ন দ্বারা প্রতিহত হলেও সেই সব মহাত্মারা তা পরিত্যাগ করেন না। মহারাজ, প্রিয়ব্রত পরম ভগবদ্ভক্ত ছিলেন। দেবর্ষি নারদের চরণসেবার পুণ্যে তিনি অনায়াসেই পরমার্থ-তত্ত্ব অবগত হয়ে আত্মধ্যানে দীক্ষিত হতে মনস্থ করেছিলেন। তিনি আগেই একাগ্রচিত্তে নিজের ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াকলাপ ভগবান বাসুদেবের কাছে সমর্পণ করেন। তাঁর পিতা মনু তাঁকে রাজনীতি সংক্রান্ত গুণের আশ্রয় জেনে রাজ্যপালনে নিযুক্ত করেছিলেন। রাজ্য ইত্যাদি যে অলীক, রাজ্যমায়ায় যে পরাভব হতে পারে প্রিয়ব্রত এসব জানতেন। তাই পিতার আদেশ প্রত্যাখ্যান করা অনুচিত জেনেও তিনি রাজ্যভার গ্রহণ করেন নি। তাঁর রাজ্যগ্রহণের অসম্মতির একমাত্র কারণ এটাই। ৫-৬

ভগবান আদিদেব ব্রহ্মা একথা জানতে পেরে মূর্তিমান অখিল বেদ ও মরীচি প্রভৃতি পুত্রদের সঙ্গে নিয়ে নিজ ভবন সত্যলোক থেকে অবতীর্ণ হলেন। রাজারা যেমন চরের মাধ্যমে সামন্ত বা মণ্ডলেশ্বরদের মনোভাব জেনে থাকেন, সে রকম সৃষ্টির সমৃদ্ধির দ্বারা আত্মযোনি ব্রহ্মা সেইসব জগতের অভিপ্রায় জানতে পারেন। প্রিয়ব্রতের বৃত্তান্ত জেনে নারদের কাছে যাবার জন্য তিনি স্বস্থান থেকে ক্রমে ক্রমে অবতরণ করতে লাগলেন। সিদ্ধ, সাধ্য, গন্ধর্ব, চারণ ও মুনিরা দলে দলে তাঁর যশমহিমা গান করতে লাগলেন। তিনি চাঁদের মত প্রকাশমান হয়ে নিজের বিভায় গন্ধমাদন পর্বতের গুহা উজ্জ্বল করে সেখানে উপস্থিত হলেন। সে সময় সেই গন্ধমাদন পর্বতের একটি গহ্বরে নারদ প্রিয়ব্রতকে অন্য বিদ্যা দান করছিলেন। আর সে সময় মনুও প্রিয়ব্রতকে নিয়ে যাবার জন্য সেখানে এসেছিলেন। হংসযান দেখেই দেবর্ষি বুঝতে পারলেন যে পিতা ভগবান ব্রহ্মা এসেছেন। তৎক্ষণাৎ তাঁরা তিনজনে জোড়হাতে উঠে দাঁড়িয়ে পূজার উপহার হাতে স্তব করতে লাগলেন। তারপর দেবর্ষি নারদ পূজার সামগ্রী সামনে রেখে আবার মধুর বাক্যে তাঁর গুণ ও সর্বোৎকর্ষ বিষয় বর্ণনা করলেন। তখন আদিপুরুষ ভগবান ব্রহ্মা সহাস্য দৃষ্টিপাতে এবং সস্নেহ বাক্যে প্রিয়ব্রতকে বলতে লাগলেন—বাবা, আমার কথা

শোন ; সত্য, ও অপ্রমেয় পরমেশ্বরে দোষারোপ করা উচিত নয়। তুমি, তোমার পিতা, তোমার গুরু দেবর্ষি নারদ ও আমি—আমরা সকলেই বিবশ হয়ে তাঁর আজ্ঞা বহন করে থাকি। কেউই তপস্যা, বিদ্যা, সমাধি বা বুদ্ধিবল দ্বারা স্বতঃ বা পরতঃ[1] তাঁর সৃষ্টি-বিষয় অন্যথা করতে পারে না এবং অর্থ ও ধর্ম দ্বারাও তাঁর কাজ বিনষ্ট করতে পারে না। প্রিয়ব্রত, জীবেরা জন্ম, মৃত্যু, শোক, মোহ, ভয়, সুখ, দুঃখ প্রভৃতির অধীন হয়ে শুধু কর্ম করার জন্যই ঈশ্বরদত্ত দেহযোগ (জন্ম) সর্বদা ধারণ করে। কোন লোকই স্বাধীনভাবে কোন কাজ করতে পারে না। আমরা পরমেশ্বরের বাণীরূপ রজ্জুতে সত্ত্বাদি গুণ, কর্ম ও ব্রাহ্মণাদি শব্দ দ্বারা দৃঢ়রূপে বদ্ধ হয়ে সকলে তাঁকেই পুজোপহার প্রদান করি। বলীবর্দাদি চতুষ্পদ জন্তুরা যেমন নাসিকায় বদ্ধ হয়ে দ্বিপদ মানুষজাতির ইচ্ছামত তাদের জন্য কর্ম করে, তেমনি আমরা পরমেশ্বরের ইচ্ছামত তাঁরই জন্য কাজ করে থাকি। যেমন চক্ষুষ্মান লোকেরা নিজেদের ইচ্ছা অনুসারে অন্ধলোকদের ছায়াতে বা রৌদ্রে নিয়ে যায়, আমাদের প্রভুও সেরকম তাঁর ইচ্ছায় আমাদের পশু, পাখী প্রভৃতি যে কোন দেহে যুক্ত করেন। তিনি যাই করুন না কেন, আমরা তা-ই স্বীকার করে সুখদুঃখ ভোগ করে থাকি। যেমন ঘুম ভাঙলে লোকেরা স্বপ্নে দেখা বিষয় স্মরণ করে, সে রকম মুক্ত লোকেরা অভিমানশূন্য হয়ে আরব্ধ কর্মভোগ করে দেহধারণ করে থাকেন। তিনি তাঁর দেহান্তরের আরম্ভকারী গুণ, কর্ম বা বাসনা ভোগ করেন না। যে জিতেন্দ্রিয় না হয়ে সঙ্গভয়ে মনে মনে পর্যটন করে, মন ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এই ছয় রিপু তার সঙ্গে সর্বদা মিলিত হয়। তবে যে ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয় এবং আত্মরত, গৃহস্থাশ্রম তাঁর কোন অনিষ্টই করতে পারে না। ষড় রিপু জয়ে ইচ্ছুক ব্যক্তির প্রথমে গৃহে থেকে সংযতচিত্তে এসব রিপুকে জয় করতে যত্ন করা উচিত। প্রথমে শত্রুকুল ক্ষীণবল হলে পথে বা অন্য জায়গায় ভ্রমণ করা উচিত। দেখ না, দুর্গ আশ্রয় করেই বলবানরা শত্রু জয় করে থাকে, পরে তারা ইচ্ছানুসারে দুর্গে বা অন্য জায়গায় বাস করে। তুমি পদ্মনাভের[2] চরণপদ্ম দুর্গ আশ্রয় করেছ, এই জন্য ছয় রিপুকে দমন করেছ। তবু, যতদিন দেহ থাকে ততদিন ভগবানের দেওয়া ভোগসামগ্রীগুলি উপভোগ কর, পরে বিমুক্তসঙ্গ হয়ে নিজ স্বরূপের ভজনা কোরো। ৭-১৯

শুকদেব বললেন, মহাভাগবত প্রিয়ব্রত ত্রিভুবনের গুরু ব্রহ্মার কাছ থেকে এ রকম উপদেশ পেয়ে নিজের ক্ষুদ্রত্ব অনুভব করে অবনতশিরে 'তাই করব' বলে ব্রহ্মার সেই অনুশাসন গ্রহণ করলেন। মনু আনন্দিত মনে ব্রহ্মার যথাবিধি পুজো করলেন। ব্রহ্মাও সেই পুজোপহার গ্রহণ করে ব্যবহারমার্গের অতীত নিজের স্বরূপ চিন্তা করে বাক্য ও মনের অগোচর নিজধামে অন্তর্হিত হলেন। তাঁর প্রস্থানের সময় প্রিয়ব্রত ও নারদ সহজভাবে তাঁকে দেখলেন। ব্রহ্মা এভাবে মনুর মনোরথ সিদ্ধ করলে তিনিও নারদের আদেশ অনুসারে অখিল ভূমণ্ডলের স্থিতি ও পালনের জন্য পুত্রের হাতে রাজ্যভার সমর্পণ করে দুস্তর বিষম বিষ-জলাশয় স্বরূপ গৃহের ভোগকামনা থেকে বিরত হলেন। যাঁর অনুভবে অখিল জগতের কর্মবন্ধন অপনীত হয়, সেই আদিপুরুষ ভগবানের শ্রীচরণদ্বয় অনবরত ধ্যানে অনুভব করায় প্রিয়ব্রতের আসক্তি ইত্যাদি মল দগ্ধ হয়ে নিঃশেষিত হয়েছিল এবং চিত্ত শুদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু ব্রহ্মা প্রভৃতির মান বাড়ানোর জন্য তিনি তাঁদের আজ্ঞা পালন করে মহীপতি হয়ে মহীতল শাসন করতে লাগলেন। ভগবানেরই ইচ্ছায় আবার তিনি কর্মের অধিকার

১ স্বতঃ বা পরতঃ—স্বেচ্ছায় বা বাধ্যতামূলক ভাবে। ২ অনন্ত শয্যায় শায়িত নারায়ণের নাভিপদ্ম থেকে ব্রহ্মা উঠেছিলেন, তাই তাঁর নাম পদ্মনাভ।

পেলেন। তিনি এরপরে প্রজাপতি বিশ্বকর্মার কন্যা বর্হিষ্মতীকে বিবাহ করলেন। ঐ স্ত্রীর গর্ভে তাঁরই মত গুণবান এবং কর্ম, রূপ ও বীর্যসম্পন্ন দশটি পুত্র জন্মেছিল। তাঁর উর্জস্বতী নামে এক রূপবতী কন্যাও লাভ হয়েছিল। ঐ দশ পুত্রের নাম ছিল আগ্নীধ্র, ইধ্মজিহ্ব, যজ্ঞবাহু, মহাবীর, হিরণ্যরেতা, ঘৃতপৃষ্ঠ, সবন, মেধাতিথি, বীতিহোত্র ও কবি। অগ্নির নামে এঁদের নাম হয়েছিল। ২০-২৫

এঁদের মধ্যে কবি, মহাবীর ও সবন এই তিনজন উর্ধ্বরেতা। তাঁরা বাল্যকাল থেকে আত্মবিদ্যায় অভ্যস্ত হয়ে পরমহংসের আশ্রমে প্রবেশ করেন। ঐ আশ্রমে তাঁরা তিনজনেই উপশমশীল পরম ঋষি হন। এরকম অবস্থায় তাঁরা নিখিল জীব-নিবাস ভবভয়-ভঞ্জন ভগবান বাসুদেবের চরণকমল অনবরত স্মরণ করে অখণ্ডিত পরম ভক্তিযোগে নিজ নিজ অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ করলেন। তাতে তাঁদের অন্তরে সর্বভূতাত্মা ভগবান অধিষ্ঠিত হলেন। তাতেই তাঁরা সেই জীবাত্মাতে দেহ প্রভৃতি উপাধি বিসর্জন করে ভগবানের সঙ্গে মিলিত হলেন। প্রিয়ব্রতের অন্য এক স্ত্রীর গর্ভে উত্তম, তামস ও রৈবত নামে তিনটি পুত্র হয়। এঁরা তিনজনেই ছিলেন মন্বন্তরের অধিপতি। কবি প্রভৃতি তিন পুত্র সন্ন্যাস অবলম্বন করলে মহামতি প্রিয়ব্রত এগার অর্বুদ বৎসর পৃথিবী ভোগ করেন। তিনি অখন্ড বলশালী বাহুযুগলে ধনুকের গুণ আকর্ষণ করে টঙ্কার দিলে যুদ্ধ ছাড়াও ধর্মপালনের প্রতিকূলে শত্রুরা বিনাযুদ্ধে নিরস্ত হয়ে যেত। তিনি আপন প্রেয়সী বর্হিষ্মতীর সঙ্গে প্রত্যেকদিন আমোদ-প্রমোদ করতেন। এই আমোদ-প্রমোদ, বিহার, লজ্জা ও হাস্য-পরিহাস প্রভৃতির কাছে তাঁর বিজ্ঞান-বিবেক যেন পরাভব স্বীকার করেছিল। তিনি সে সময় আত্ম-বিস্মৃতের মত থাকতেন। ভগবান আদিত্য সুমেরু পর্বত প্রদক্ষিণ করে লোকালোক পর্বত পর্যন্ত প্রকাশ করায় ভূমন্ডলের অর্ধেক ভাগ অন্ধকারে ঢেকে যায়। এতে অসন্তুষ্ট হয়ে প্রিয়ব্রত প্রতিজ্ঞা করলেন যে নিজের তেজে রাতকেও দিন করবেন। তারপর তিনি সূর্যের মত বেগবান জ্যোতির্ময় রথে আরোহণ করে দ্বিতীয় ভাস্করের মত পর্যায়ক্রমে সাতবার মেরু প্রদক্ষিণ করলেন। তিনি ভগবানের উপাসনা করে অলৌকিক ও বিপুল বিক্রমের অধিকারী হয়েছিলেন। ২৬-৩০

তিনি যখন ঐ রকম করেছিলেন তখন চতুরানন ব্রহ্মা তাঁকে নিষেধ করে বললেন, বৎস, তোমার এরূপ অধিকার নেই। তাঁর রথের চাকায় সাতটি গর্ত হয়েছিল, সেগুলিই সাতটি সমুদ্রে পরিণত হয়েছে। এই সাত সাগরের দ্বারা জম্বু, প্লক্ষ, শাল্মলি, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক ও পুষ্কর নামে পৃথিবীর সাতটি দ্বীপ তৈরী হয়েছে। এগুলি পূর্ব পূর্ব দ্বীপগুলির চেয়ে আয়তনে দ্বিগুণ ও সমুদ্রের চারদিকে বিস্তৃত, যেন সমুদ্রগুলির বাইরে একটি করে দ্বীপ বা দ্বীপগুলির বাইরে একটি করে সমুদ্র। লবণজল, ইক্ষুরসজল, সুরাজল, ঘৃতজল, দধিজল, দুগ্ধজল ও শুদ্ধজল -এই সাত সমুদ্র ঐ সাত দ্বীপের পরিখার মতন। এই সব সাগরবেষ্টিত দ্বীপগুলির যে পরিমাণ, তাদের তুলনায় আগের পরিমাণমত এক একটি সাগর এক একটি দ্বীপের সমান। ঐ সব সাগর আলাদা আলাদা অসংকীর্ণ ভাবে বাইরেই বিস্তৃত, ভেতরে নয়। বর্হিষ্মতীপতি প্রিয়ব্রত ঐ জম্বু প্রভৃতি সপ্তদ্বীপে নিজের মত চরিত্রসম্পন্ন সাত পুত্র আগ্নীধ্র, ইধ্মজিহ্ব, যজ্ঞবাহু, হিরণ্যরেতা, ঘৃতপৃষ্ঠ, মেধাতিথি ও বীতিহোত্রকে এক একটি দ্বীপের অধিপতি করলেন। দৈত্যাচার্য শুক্রের সঙ্গে তাঁর কন্যা উর্জস্বতীর বিবাহ হয়। তাঁরই গর্ভে দেবযানী জন্মগ্রহণ করেন। যে সব পুরুষ ভগবানের চরণরেণু লাভ করে জিতেন্দ্রিয় হয়েছেন, তাঁদের এরকম পুরুষকার অসম্ভব কি? অন্ত্যজরাও একবার মাত্র ভগবানের নাম করে মুক্তি পেয়ে থাকে। ৩১-৩৫

শুকদেব বললেন, মহারাজ, দেবতার মত বুদ্ধিমান রাজা আগ্নীধ্র ললনাদের মনোহরণকারী বাক্‌বিলাসেও পটু ছিলেন। তিনি এই রকম হাব-ভাব ও বিলাসপূর্ণ নানারকম আলাপে অপ্সরা পূর্বচিত্তির সন্তোষ বিধান করতে লাগলেন। পূর্বচিত্তিও তাঁকে বীর-যূথপতি দেখে এবং তাঁর বিদ্যা, বুদ্ধি, বয়স, রূপ, শ্রী, উদারতা ও শীল বিচার করে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হল। সে অনেক অযুত বৎসর ধরে জম্বুদ্বীপের অধিপতি আগ্নীধ্রের সঙ্গে দিব্য ও ভৌম সুখ ভোগ করতে লাগল। কালক্রমে তার গর্ভে রাজর্ষি আগ্নীধ্রের নয়টি পুত্র জন্মগ্রহণ করেছিল। তারা যথাক্রমে নাভি, কিম্পুরুষ, হরিবর্ষ, ইলাবৃত, রম্যক, কুরু, হিরণ্ময়, ভদ্রাশ্ব ও কেতুমাল পরে ঐ সব পুত্রদের গৃহে রেখেই পূর্বচিত্তি সর্বত্যাগিনী হয়ে আবার ব্রহ্মার আরাধনার জন্য ব্রহ্মলোকে চলে গেল। অগ্নীধ্রের পুত্ররা মায়ের কৃপায় সুদৃঢ় অঙ্গ ও বলবীর্যসম্পন্ন হয়ে পিতার বিভাগ মতে নিজেদের নামে প্রসিদ্ধ জম্বুদ্বীপের এক এক বর্ষ পালন করতে লাগলেন। আর রাজা অগ্নীধ্র বিষয়সমূহ ভোগ করে পরিতৃপ্ত হননি। বিষয়সুখ পরতন্ত্র হয়ে তিনি ঐ অপ্সরার কথাই সর্বক্ষণ চিন্তা করতেন। বেদের কাম্য কর্মানুষ্ঠানের ফলে যেখানে সকাম কর্মকারী পিতৃগণ বাস করেন তাঁর সেই লোকপ্রাপ্তি হয়েছিল। তিনি পরলোকে গেলে তাঁর পুত্ররা যথাক্রমে মেরুদেবী, প্রতিরূপা, উগ্রদংষ্ট্রী, লতা, রম্যা, শ্যামা, নারী, ভদ্রা ও দেববীতি নামে মেরুর নয়টি কন্যার পাণিগ্রহণ করলেন। ১৭-২৩

তৃতীয় অধ্যায়

রাজা নাভির পুত্ররূপে ভগবানের অবতরণ

শুকদেব বললেন, মহারাজ, আগ্নীধ্র-পুত্র নাভি সন্তান কামনায় মেরুদেবীর সঙ্গে একাগ্রমনে যজ্ঞানুষ্ঠান করে ভগবান যজ্ঞপুরুষের পূজা করলেন। কিন্তু ভগবান বিষ্ণুকে দ্রব্য, দেশ, কাল, মন্ত্র, ঋত্বিক, দক্ষিণা ও বিধি এব সাতটি যজ্ঞীয় উপায় দ্বারাও সহজে পাওয়া যায় না। কিন্তু ভক্তজনের প্রতি বাৎসল্য বশে ভগবান স্বয়ং শোভন শরীরে নাভির 'প্রবর্গ্য' নামক কর্মনিচয়ের অনুষ্ঠানের সময় তাঁর সামনে আত্মপ্রকাশ করলেন। ভক্তের একান্ত অধীন তিনি ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূরণ করার জন্যই স্বরূপে আবির্ভূত হলেন। নাভির সামনে তাঁর যে মূর্তি প্রকাশিত হল তা স্বতন্ত্র, নয়ন-মনের আনন্দবর্ধক, সুন্দর ও সুখকর চতুর্ভুজ মূর্তি। সেই মূর্তি তেজোময়, পুরুষাকৃতি, কপিশবর্ণ। তাঁর পরনে কৌশেয় বস্ত্র এবং বক্ষে শ্রীবৎসচিহ্ন শোভিত ; শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মে তাঁর চার হাত এবং বনফুলের মালা ও কৌস্তুভ প্রভৃতি মণিতে তাঁর গলা ও বক্ষ সুশোভিত। মুকুট, কুণ্ডল, বলয়, কটিসূত্র, হার, কেয়ূর, নূপুর প্রভৃতিতে অলংকৃত তাঁর শরীর মনোহর প্রভায় দীপ্ত। ঋত্বিক, সদস্য এবং গৃহপতি সকলেই মূর্তি দেখে, দরিদ্রলোকদের মহাধন লাভের মত, অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে অবনতশিরে নানা রকম উপহার দিয়ে তাঁর পূজা করতে লাগলেন। ঋত্বিকরা বলতে লাগলেন, হে পূজ্যতম, আমরা তোমার ভৃত্য, তুমি পূর্ণ হলেও আমাদের পূজা নিরন্তর গ্রহণ করে থাক। আমরা তোমার স্তব করার অযোগ্য। সাধুদের কাছ থেকে আমরা শুধু তোমার উদ্দেশ্যে 'নমঃ নমঃ' এই মাত্র স্তবের উপদেশ পেয়েছি। প্রকৃতি-পুরুষ থেকে ভিন্ন ঈশ্বর। যার বুদ্ধি প্রকৃতিজাত এই প্রপঞ্চের মধ্যে সীমাবদ্ধ, সেরকম কোন অনীশ্বর পুরুষ তাঁর যে যে নাম, রূপ

ও আকার কল্পনা করে থাকে সে সব কখনই তোমাকে স্পর্শ করতে পারে না, কেউ তোমার স্বরূপ নির্ণয় করতে কখনো সমর্থ হয় না। তোমার যে সব মহা-মঙ্গলময় ও সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ লোকসমূহের অনন্ত পাপ হরণকারী, মানুষেরা তোমার সেই গুণের কীর্তন ছাড়া আর কি করতে পারে? হে পরম, ভৃত্যরা অনুরাগ ভরে গদ্‌গদাক্ষর বাক্যে তোমার যে স্তব করে এবং জল, তুলসী, দূর্বা, পবিত্র পল্লব প্রভৃতি দিয়ে তোমার যে পূজা করে তাতেই তুমি পরম সন্তোষ লাভ করে থাক।[১] আমরা বহু অঙ্গে সমৃদ্ধ এই যে যজ্ঞ করছি, এতে তোমার কোন প্রয়োজন দেখছি না। ১-৭

নাথ, এই যজ্ঞের পূজায় তোমার কোন উপকার নেই। কিন্তু আমরা ফলাকাঙ্ক্ষী পুরুষ, তাই এই যজ্ঞ প্রভৃতির অনুষ্ঠান আমাদের নিজেদের জন্যই হোক। প্রভু, মূর্খরা নিজেদের মঙ্গল-অমঙ্গলের বিষয় জানে না। তুমি অনপেক্ষ, কিন্তু তথাপি আমাদের মনোবাঞ্ছা পূরণ এবং মোক্ষ নামক নিজের মহিমা প্রকাশের জন্য অন্যান্য সাপেক্ষ লোকের মতই (অর্থাৎ তুমি পূজার অপেক্ষা রাখ এইভাবে) আমাদের স্বয়ং দেখা দিয়ে থাক। আমাদের এই পূজায় তোমার কোন উপকার নেই, এ দ্রব্যসম্ভার আমাদেরই উপযোগী হোক। হে পূজনীয়, তুমি বর দেবার জন্যই প্রকাশিত হয়েছ। আমাদের রাজর্ষির এই যজ্ঞে তুমি যখন আমাদের মত লোকদের দর্শন দিয়েছ, তখন এটাই আমাদের কাছে বর। প্রভু, তোমার দর্শন দুর্লভ। যে সব আত্মারাম মুনির বৈরাগ্য ও তীক্ষ্ণজ্ঞানের বলে অশেষ পাপ দূর হয়েছে, তাঁদের পক্ষেও শুধু তোমার গুণকীর্তন পরম মঙ্গলজনক। তাঁরা সব সময়ই তোমার গুণগুলির স্তব করেন। ভগবান, আমরা তোমাকে দেখেই কৃতার্থ হলাম। কিন্তু একটা বর ভিক্ষা চাই। ক্ষুধা-তৃষ্ণা, পতন, স্খলন, জৃম্ভণ[২] কিংবা দুর্দশার সময়ে যখন তোমাকে স্মরণ করতে অসমর্থ হব, এমন কি জরাবস্থা ও মৃত্যু-কালে যখন আমাদের ইন্দ্রিয়সকল বিকল হবে তখনও যেন আমরা তোমার পবিত্র নাম উচ্চারণ করতে পারি। তোমার নাম উচ্চারণ করলেই সমস্ত কলুষ বিনষ্ট হয়ে যায়। ৮-১২

হে নাথ, তুমি স্বর্গ ও মোক্ষপদের ঈশ্বর। নির্ধন যেমন ধনীর কাছে খুদ ভিক্ষা করে, সে রকম এই রাজর্ষি তোমার মতই গুণযুক্ত পুত্র কামনা করে তোমার শরণাগত হয়েছেন। প্রজাতেই এঁর পুরুষার্থ বোধ হওয়ায় ইনি ঐ রকম ঐহিক প্রার্থনা করছেন। তোমার মায়ার গতিপথ কেউ নির্ণয় করতে পারে না। তা অপরাজিত, তবে তার কাছে সবলেই পরাজিত। এমন কে আছে যার মতি মায়াচ্ছন্ন না হয়? আর মহাপুরুষদের চরণ উপাসনা না করলে লোকের প্রকৃতি বিষয়-রূপ বিষে আচ্ছন্ন হয়। হে বহুকার্যসাধক, আমরা মন্দবুদ্ধিবশত সামান্য কার্য সাধনের জন্য তোমাকে আহ্বান করেছি। না হলে পুত্রকেই পরম পুরুষার্থ মনে করব কেন? হে দেবদেব, তুমি সর্বত্র সমবুদ্ধি বলে তোমার প্রতি আমাদের এই অবজ্ঞাপ্রকাশ সহ্য করবে। ১৩-১৫

শুকদেব বললেন, মহারাজ, আগ্নীধ্রের পুত্র নাভিরাজের ঋত্বিকরা এই রকম গদ্যবাক্যে ভগবানের স্তব করলেন। তারপর ভারতবর্ষের অধিপতি মহারাজ নাভি যে সব লোকদের বন্দনা করার জন্য নিযুক্ত করেছিলেন, তাঁরা যখন ভগবানের পাদপদ্ম বন্দনা করতে লাগলেন, তখন ভগবান দয়া প্রকাশ করে বলতে লাগলেন,

১ তুলনীয় : যিনি পত্র, পুষ্প, ফল, জল, বা অন্য যা কিছু দ্রব্য ভক্তির সঙ্গে আমাকে দান করেন আমি সেই শুদ্ধচিত্ত উপাসকের উপহার প্রীতির সঙ্গে গ্রহণ করে থাকি। গীতা, ৯। ২৬ শ্লোক

২ হাই তোলা

ঋষিগণ, তোমাদের বাক্য অব্যর্থ। তোমরা আমার কাছে যে বর প্রার্থনা করেছ তা সুলভ নয়। এই রাজার আমার মত পুত্র হোক, তোমাদের এই প্রার্থনা বড়ই দুর্লভ। আমার তো দ্বিতীয় নেই, আমি আমার মত। তাহলে আমার মত পুত্র কি ভাবে হবে? যা হোক, ব্রাহ্মণের কথা বৃথা হতে পারে না। ব্রাহ্মণরা দেবতুল্য ও তাঁরা আমারই মুখ। যখন আমার মত ব্যক্তি নেই, তখন আমাকেই নাভির পুত্র হয়ে জন্মগ্রহণ করতে হবে। ১৬-১৮

শুকদেব বললেন, নাভির স্ত্রী মেরুদেবী ভগবানের এইসব কথা শুনেছিলেন, আর নাভিও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ভগবান এই কথা বলেই অন্তর্হিত হলেন। মহারাজ পরীক্ষিৎ, মহর্ষিরা যজ্ঞে এভাবে ভগবানকে প্রসন্ন করলেন, আর তাতে ভগবানও নাভির প্রিয়কার্য-সাধনে ইচ্ছুক হলেন। তিনি দিগম্বর তপস্বী, জ্ঞানী ও নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীদের ধর্মপথ দেখানোর জন্য নাভিরাজের অন্তঃপুরে তাঁর ভার্যা মেরুদেবীর গর্ভে শুক্লমূর্তি ঋষভদেব রূপে জন্মগ্রহণ করলেন। ১৯-২০

চতুর্থ অধ্যায়

নাভিপুত্র ঋষভের অলৌকিক চরিত্র

শুকদেব বললেন, মহারাজ, ভগবান ঋষভ জন্মগ্রহণ করলে তাঁর মধ্যে ভগবৎ-লক্ষণগুলি স্পষ্টই প্রকাশিত হল। সর্বত্র সমত্ব, উপশম, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য সহ তাঁর প্রভাব দিন দিন বাড়তে লাগল। তা দেখে ব্রাহ্মণ, দেবতা, প্রজা ও অমাত্যদের একান্ত আকাঙ্ক্ষা হল যে তিনি রাজা হয়ে পৃথিবী পালন করেন। কবিগণের বর্ণনার যোগ্য তাঁর দেহসৌষ্ঠব দেখে এবং তাঁকে প্রভাব, শক্তি, উৎসাহ, কান্তি, যশ প্রভৃতি গুণে সম্পন্ন দেখে পিতা তাঁর নাম রেখেছিলেন ঋষভ। এক সময় অমরদের রাজা ইন্দ্র স্পর্ধা সহকারে তাঁর রাজ্যে বারিবর্ষণ করেন নি। এতে যোগেশ্বর ভগবান ঋষভদেব আপন যোগবলের প্রভাবে হাসিমুখে নিজ রাজ্যমধ্যে 'অজনাভ' নামক বর্ষ বৃষ্টিপাতে প্লাবিত করেছিলেন। নাভিরাজ মনের মত পুত্র পেয়ে আনন্দে মগ্ন হয়েছিলেন। যে পুরাণপুরুষ ভগবান নিজের ইচ্ছায় মানুষের দেহধারণ করেছেন, তাঁকে নাভিরাজ 'বৎস', 'বাবা', ইত্যাদি সাদর সম্ভাষণে সানুরাগে লালন-পালন করে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। কয়েকদিন পর নাভিরাজ দেখলেন যে, পুত্র উপযুক্ত হয়েছে এবং পুরবাসীরা ও অমাত্যরা তাঁর প্রতি অনুরক্ত। তখন তিনি ধর্মের মর্যাদা রক্ষার জন্য পুত্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করে ব্রাহ্মণদের কোলে স্থাপন করলেন এবং মেরুদেবীর সঙ্গে বদরিকাশ্রম যাত্রা করলেন। সেখানে উদ্বেগহীন হয়ে তীব্র তপস্যা ও সমাধি যোগে নরনারায়ণ নামক ভগবান বাসুদেবের উপাসনা করে তাঁরা যথাসময়ে তাঁর মহিমা লাভ করলেন। হে পাণ্ডব, পণ্ডিতরা এ সম্বন্ধে দুটি শ্লোক আবৃত্তি করে থাকেন। রাজর্ষি নাভির কর্মের অনুকরণ করতে কোন্ পুরুষ সমর্থ? তাঁর পবিত্র কাজের জন্য ভগবান শ্রীহরি নিজে পুত্রত্ব স্বীকার করেছিলেন। সেই নাভি ছাড়া অন্য ব্রহ্মণ্য বা ব্রাহ্মণগুণশালী কে আছে? তাঁর যজ্ঞে ব্রাহ্মণরা দক্ষিণা দ্বারা পূজিত হয়ে মন্ত্রবলে ভগবান যজ্ঞপুরুষকে দেখিয়েছিলেন। ১-৭

ভগবান ঋষভদেব নিজের বর্ষকে[১] কর্মক্ষেত্র বলে মানতেন। কিন্তু অন্যলোকদের

১ পুরাণোক্ত জম্বুদ্বীপের নয়টি অংশ (এশিয়ার বিভিন্ন দেশ)।

উপদেশ দেবার জন্য তিনি কিছুদিন গুরুকুলে বাস করলেন এবং শিক্ষাশেষে গুরুদেবের অনুমতি নিয়ে ফিরে এলেন। পরে তিনি গৃহস্থগণকে ধর্মশিক্ষা দিতে শুরু করলেন এবং শ্রুতি ও স্মৃতি সম্মত উভয় কার্যবিধিই অনুষ্ঠান করলেন। ইন্দ্র তাঁর সঙ্গে জয়ন্তী নামে এক কন্যার বিবাহ দিয়েছিলেন। ভগবান ঋষভ সেই ভার্যার গর্ভে নিজের মত গুণযুক্ত এক শ' সন্তানের জন্ম দিলেন। তাঁদের জ্যেষ্ঠের নাম ভরত। তিনি মহাযোগী ও প্রকৃষ্ট গুণশালী ছিলেন। তাঁরই নামে এই বর্ষ 'ভারতবর্ষ'। ঋষভদেবের নিরানব্বইটি সন্তানের মধ্যে নয়টি প্রধান সন্তান কুশাবর্ত, ইলাবর্ত, ব্রহ্মাবর্ত, মলয়কেতু, ভদ্রসেন, ইন্দ্রস্পৃক, বিদর্ভ ও কীকট। এ'রা ভরতের অনুগত। পরের নয়জন কবি, হরি অন্তরীক্ষ, প্রবুদ্ধ, পিপ্পলায়ন, আবির্হোত্র, দ্রুমিল, চমস ও করভাজন ভাগবত ধর্ম প্রদর্শক ও মহাভাগবত। এ'দের চরিত্র ভগবানের মহিমায় সংবর্ধিত হয়েছিল। এসব বসুদেব-নারদ-সংবাদ প্রসঙ্গে বর্ণনা করব।[1] এ'দের অনুজ একাশিটি পুত্র সকলেই ব্রাহ্মণ হয়েছিলেন। এ'রা পিতৃআজ্ঞা পালনকারী, বিনয়ী, বেদজ্ঞ, যাজ্ঞিক ও বিশুদ্ধ কর্মী ছিলেন। ৮-১৩

ভগবান ঋষভ নিজেই নিজের প্রভু, তিনি অনর্থ কার্যবলীমুক্ত, বিশুদ্ধ, আনন্দ ও জ্ঞানস্বরূপ ঈশ্বর। তবুও তিনি নিজে সাধারণ লোকদের ধর্মশিক্ষা দেবার জন্য অনীশ্বরের মত গার্হস্থ্যধর্ম পালন করেছিলেন। তিনি নিজে সমস্ত গুণময়, তবু অপার করুণায় ধর্ম, অর্থ, যশ, প্রজা, ভোগ ও মোক্ষ দ্বারা গৃহীদের সুনিয়ন্ত্রিত করলেন। শ্রেষ্ঠরা যে সব কাজ করেন, অন্যেরা তারই অনুবর্তী হয়ে থাকে।[2] সর্বধর্ম প্রতিপাদক দেবরহস্য তিনি নিজে জানতেন। তবুও ব্রাহ্মণদের প্রদর্শিত পথের অনুগামী হয়ে সাম প্রভৃতি বেদের প্রয়োগে প্রজাপালনে নিযুক্ত হলেন। তিনি সব রকম যজ্ঞের দ্বারা একশ' বার যথানিয়মে যাগ করেছিলেন। তার সেইসব যজ্ঞ দ্রব্য, দেশ, কাল, বয়স, শ্রদ্ধা, ঋত্বিক ও নানা দেবতাদের উদ্দেশ্যে সংবর্ধিত হয়েছিল। ভগবান ঋষভের রক্ষণাবেক্ষণে এই ভারতবর্ষে কোন লোক অন্যের কাছে নিজের জন্য কিছুই ভিক্ষা করত না। প্রজারা আকাশ-কুসুমের মত অলীক কিছু প্রার্থনা করত না বা অপরের দ্রব্যের প্রতি কখনো লুব্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করত না। তারা নিজেদের রাজার কাছ থেকে সব সময় স্নেহ ছাড়া আর কিছুই কামনা করত না। ঋষভদেব এক সময় পর্যটন করতে করতে ব্রহ্মাবর্ত দেশে পৌঁছেন। সেখানে তিনি প্রধান প্রধান ব্রহ্মর্ষিদের সভায় ঢুকে দেখলেন যে তাঁর পুত্ররা সংযত রয়েছেন। যদিও সংযম, বিনয় ও ভালবাসা দ্বারা তাঁদের চরিত্র সুনিয়ন্ত্রিত ছিল, তবুও প্রজাপালনের জন্য ঋষভদেব সকলের সমক্ষে নানা শিক্ষামূলক উপদেশ দিতে শুরু করলেন। ১৪-১৯

পঞ্চম অধ্যায়

ঋষভের জ্ঞানোপদেশ

ঋষভদেব বললেন, পুত্রগণ, যারা মনুষ্যলোকে জন্ম নিয়ে মানবদেহ পেয়েছ, তাদের ঐ দেহ বিষ্ঠাভোজী শূকরের ভোগ্য। দুঃখদানকারী বিষয় ভোগ করা কর্তব্য নয়। তপস্যাই হল সার বস্তু। তপস্যায় চিত্ত পবিত্র হয়, তাতে অনন্ত

১ একাদশ স্কন্ধে বর্ণিত হয়েছে। ২ তুলনীয়ঃ গীতা, ৩।২১ শ্লোক।

ব্রহ্মসুখ লাভ হয়ে থাকে। মুক্তির দ্বার মহতের সেবা, সংসারের কারণ নারীসঙ্গ। যাঁরা সকলের সুহৃদ্‌, প্রশান্ত, অক্রোধ, সদাচারী এবং যাঁরা সর্ব প্রাণীকেই সমান দেখেন, তাঁরাই মহৎ। যাঁরা সর্বেশ্বর আমায় ভালবেসে আমাকেই পরম পুরুষার্থ জ্ঞান করেন, তাঁরাই মহৎ। যাঁরা বিষয়াসক্ত ব্যক্তি, স্ত্রী-পুত্র-বান্ধব-ধন-বিশিষ্ট গৃহে যথেষ্ট পরিতুষ্ট নন এবং যাঁরা পৃথিবীতে সামান্য দেহ নির্বাহের উপযোগী অর্থের চেয়ে বেশী অর্থের প্রয়াসী নন তাঁরাই মহৎ। ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করতে ব্যাপৃত মানুষেরা প্রায়ই প্রমত্ত হয়ে স্বাভাববিরুদ্ধ কাজ করে। একবার তো বিরুদ্ধ কাজ করে আত্মার এই কষ্টকর দেহপ্রাপ্তি হয়েছে, তাই আমি এ কাজকে ভাল বলতে পারি না। মানুষেরা যে পর্যন্ত না আত্মতত্ত্ব জানতে চায়, সে পর্যন্ত তাদের কাছে অজ্ঞানকৃত আত্মস্বরূপের প্রকাশ হয়। যে পর্যন্ত ক্রিয়া থাকে সে পর্যন্ত এই মনে কর্মস্বভাব দেখা যায়; এটাই দেহবন্ধনের কারণ। এই জন্য পূর্বকৃত কর্মই মনকে আবার কর্মে প্রবৃত্তি দেয় এবং আত্মা যতদিন অবিদ্যা উপাধিতে থাকে ততদিন মন পুরুষকে কর্মবশ করে রাখে। মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত আমাকে ভাল না বাসে, যতক্ষণ পর্যন্ত সে দেহযোগ থেকে মুক্ত হতে পারে না, কেননা আমি বাসুদেব। ১-৬

পুরুষ যতক্ষণ না বিবেকী হয়ে ইন্দ্রিয়কর্মকে অলীক বলে জানতে পারে, ততক্ষণ সে আপন স্বরূপ বিস্মৃত থাকে। তাই সেই মূঢ় মিথুন-সুখভোগীরা সংসার ভোগ করে থাকে। জন্ম থেকেই স্ত্রী ও পুরুষের একটা হৃদয়গ্রন্থি থাকে। স্ত্রী-পুরুষের মিলনে আরেকটি হৃদয়গ্রন্থি হয়। এই দুর্ভেদ্য হৃদয়গ্রন্থি থেকে পুত্র, মিত্র, ক্ষেত্র, ধন ইত্যাদিতে মোহ হয়। তাই এই পৃথিবীতে স্ত্রীর সঙ্গে মিলনে সুখ ছাড়া বরং অত্যধিক মোহ হয়ে দুঃখের কারণ হয়। কিন্তু কর্মানুবন্ধ মনরূপ দৃঢ় হৃদয়গ্রন্থি সেই মিথুনভাব থেকে শিথিল হয়ে আমার অভিমুখী হলে মানুষেরা সাংসারিক অহংবোধ ত্যাগ করে মুক্তি পেতে পারে তথা পরমগতি লাভ করতে পারে। ভক্তিসহকারে শুদ্ধ গুরুস্বরূপ আমার অনুসরণ, বিতৃষ্ণা, সুখ-দুঃখ-দ্বন্দ্ব-সহিষ্ণুতা, ইহ ও পরলোকের সর্বত্র সব প্রাণীর দুঃখদর্শন, তত্ত্বজিজ্ঞাসা, তপস্যা, কাম্য-কর্ম পরিত্যাগ, আমার নিমিত্ত কর্ম, আমার কথা কীর্তন, যাঁরা আমাকে পরমদেবতা জানেন তাঁদের সঙ্গে নিত্যসহবাস ও গুণকীর্তন, অবৈরিতা, সমত্ব, উপশম, আত্মদেহ ও অহংবুদ্ধির পরিত্যাগ-কামনা, অধ্যাত্মশাস্ত্রের অভ্যাস, নির্জনে বাস, প্রাণ-মন ও ইন্দ্রিয়ের জয়, সজ্জনের প্রতি শ্রদ্ধা, ব্রহ্মচর্য, কর্তব্যকর্মে নিষ্ঠা, বাক্‌সংযম, সর্বদা আমার চিন্তা এবং বিজ্ঞানযুক্ত জ্ঞান ও সমাধি দ্বারা ধৈর্য, যত্ন ও বিবেকবান হয়ে অহংকারাদি উপাধিকে বিলুপ্ত করবে। ৭-১৩

তারপর কর্মগুলির আধাররূপ যে হৃদয়গ্রন্থি-বন্ধন অবিদ্যা থেকে উৎপন্ন হয়েছে প্রমাদশূন্য হয়ে তারা এই উপায়ে আমার উপদেশানুসারে সে সব সম্যক্‌রূপে পরিহার করবে, আর শেষে ঐ উপায়ও বর্জন করবে। উৎকৃষ্ট লোক কামনায় আমার অনুগ্রহ লাভের উদ্দেশ্যে পিতা পুত্রদের, গুরু শিষ্যদের ও রাজা প্রজাদের ঐ রকম শিক্ষা দেবেন। উপদেশ পেয়েও যদি কেউ শিক্ষিত বিষয়ের অনুষ্ঠান না করে তাতে তাঁরা যেন ক্রুদ্ধ না হন। যারা তত্ত্বজ্ঞ নয়, কর্মকেই শুধু মঙ্গলকর ভেবে মুগ্ধ হয়, তাদের যেন আবার কাম্যকর্মে নিযুক্ত না করেন। কেন না, মূঢ় লোককে কাম্যকর্মে নিযুক্ত করে সংসার-কূপে নিক্ষেপ করে কী পুরুষার্থ লাভ হয়? যে অত্যন্ত কামবশ হয়ে নিজের মঙ্গলপথ না দেখে, শুধু অর্থচেষ্টাতেই তৎপর থাকে এবং সামান্য সুখ পাবার আশায় পরস্পর শত্রুতা করতে চায়, সেই মূঢ় যে পরে দুঃখসাগরে পড়বে, তা সে জানতে পারে না। অন্ধলোক বিপথে গেলে যেমন কোন বিজ্ঞলোক

অন্ধকে সে পথে যেতে উপদেশ দেয় না, সেইরকম অবিদ্যায় আচ্ছন্ন ব্যক্তিকে দেখে কোন দয়াশীল জ্ঞানী ব্যক্তি কি জ্ঞাতসারে ঐ বিষয়েই তাকে আবার প্রবৃত্ত করাবেন? ঐ লোককে ভক্তিমার্গের উপদেশ দিয়ে যে লোক তাকে মুক্ত না করেন, তিনি তার গুরু নন, পিতা নন, মাতা নন, দেবতা নন, এমনকি পতিও নন। আমার এই মানুষের রূপধারী শরীর বিতর্ক-নিরপেক্ষ, আমার ইচ্ছার বিলাসমাত্র। এই দেহ প্রাকৃত মানুষের তুল্য নয়, আমার হৃদয় সত্ত্বস্বরূপ, তাতে শুদ্ধসত্ত্ব গুণই বিরাজ করছে। আমি অধর্মকে দূর করেছি। সেইজন্য পণ্ডিতরা আমাকে ঋষভ বা শ্রেষ্ঠ বলেন। ১৪-১৯

তোমরা মাৎসর্য ত্যাগ করে স্থিরচিত্তে তোমাদের সহোদর মহত্তম এই ভরতের ভজনা কর। এঁর সেবাতেই তোমাদের প্রজাপালন কর্তব্যকর্ম সম্পন্ন হবে। চেতন অচেতন ভূতসমূহের মধ্যে স্থাবর বৃক্ষরা শ্রেষ্ঠ। স্থাবরের চেয়ে সরীসৃপ সর্প প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ, সরীসৃপ থেকে বুদ্ধিমান প্রাণী শ্রেষ্ঠ, প্রাণীদের মধ্যে মনুষ্য শ্রেষ্ঠ। মানুষের চেয়ে প্রমথরা শ্রেষ্ঠ, প্রমথদের চেয়ে গন্ধর্বরা শ্রেষ্ঠ, গন্ধর্বদের চেয়ে সিদ্ধরা শ্রেষ্ঠ। সিদ্ধদের চেয়ে দেবানুচর কিন্নররা শ্রেষ্ঠ, কিন্নরদের চেয়ে অসুররা শ্রেষ্ঠ। অসুরদের থেকে দেবতারা শ্রেষ্ঠ, দেবতাদের মধ্যে ইন্দ্র শ্রেষ্ঠ, ইন্দ্রের চেয়ে ব্রহ্মার পুত্র দক্ষ প্রভৃতি প্রজাপতিরা শ্রেষ্ঠ। দক্ষাদি থেকে রুদ্রদেব শ্রেষ্ঠ, ব্রহ্মা থেকে রুদ্রের বল, তাই ব্রহ্মা শ্রেষ্ঠ। ঐ ব্রহ্মা আমার প্রতি ভক্তিমান, সেইজন্য আমি শ্রেষ্ঠ। আবার আমি ব্রাহ্মণদের পূজা করি, তাই ব্রাহ্মণ সর্বশ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মণরা সর্বজনপূজ্য। তিনি উপস্থিত ব্রাহ্মণদের লক্ষ করে বললেন, বিপ্রগণ, জগতে ব্রাহ্মণের তুল্য কাউকে দেখি না, ব্রাহ্মণের চেয়ে শ্রেষ্ঠ প্রাণীর কথা আর কি বলব? ব্রাহ্মণদের শ্রদ্ধার সঙ্গে অন্নদানে করলে আমার যে প্রীতি হয় অগ্নিতে মন্ত্রসহ আহুতি দিলেও আমার তত তৃপ্তি হয় না। ব্রাহ্মণরা ইহলোকে আমার বেদময়ী পবিত্র মূর্তি ধারণ করেছেন। তাঁদেরই মধ্যে পরম পবিত্র সত্ত্বগুণ ও শম,[1] দম,[2] সত্য, পরোপকার, তপস্যা, তিতিক্ষা,[3] তত্ত্বজ্ঞান—এই সাতটি গুণ বিরাজমান। ব্রাহ্মণরা পরাৎপর পরমেশ্বর, স্বর্গ ও মোক্ষদাতা আমার কাছেও কিছু প্রার্থনা করেন না। ভক্তিমান নিস্পৃহ পবিত্রাত্মা তাঁদের কী আর কারো কাছে কিছু প্রার্থনীয় থাকতে পারে? পুত্রগণ, তোমরা স্থাবর, জঙ্গম প্রভৃতি সর্বভূতে আমার অধিষ্ঠান জেনে মৎসরতা[4] ত্যাগ করে তাদের পবিত্রদৃষ্টিতে সম্মান করবে। এতেই আমার পূজা করা হবে। আমার আরাধনা অর্থাৎ ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে সকল কর্মের সমর্পণই জীবের মন, বাক্য, দৃষ্টি ও অন্যান্য ইন্দ্রিয় ব্যাপারের সাক্ষাৎ ফল। আমাকে পূজা না করলে কোন জীব মোহজনক কালপাশ থেকে মুক্ত হতে পারে না। ২০-২৭

শুকদেব বললেন, মহারাজ, জীবের পরম বন্ধু মহানুভব ভগবান ঋষভ-দেবের পুত্ররা সুশিক্ষিত হলেও লোকশিক্ষার জন্য তিনি তাঁদের ঐ উপদেশ দিলেন। পরে তিনি নিজে বাসনাহীন কর্মত্যাগী মহামুনিদেরও ভক্তি-জ্ঞান-বৈরাগ্যরূপ পারমহংস্য ধর্ম শিক্ষা দেবার আকাঙ্ক্ষায় নিজে শত পুত্রের মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠ পরমভাগবত ভক্ত ভরতকে পৃথিবী পালনের জন্য রাজ্যে অভিষিক্ত করলেন। পরে তিনি শরীরমাত্র অবলম্বন করে উন্মত্তের মত উলঙ্গ ও আবিন্যস্তকেশে আহবনীয় নামক অগ্নিকার্য নিজের প্রতিই সমাধান করে ব্রহ্মাবর্ত দেশ থেকে প্রস্থান করলেন। ঋষভদেব অবধূতের মত বেশ ধারণ করে জড়, অন্ধ, বধির, মূক, পিশাচ বা উন্মত্তের

---

১ নিবৃত্তি, শান্তি, ২ দম—ইন্দ্রিয়জয়। ৩ তিতিক্ষা—ক্ষমা, সহিষ্ণুতা। চিত্তের স্থিরতা বা সংযম।
৪ মৎসরতা—দ্বেষ, হিংসা।

মত্ত থাকতেন, কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করলে মৌন হয়ে নিঃশব্দেই অবস্থান করতেন। তিনি ঐ ভাবে পুর, গ্রাম, খনি, কৃষিবল গ্রাম, পুষ্প-বাটিকা, সেনা-শিবির, গোচারণ স্থান, গোপ-পল্লী, যাত্রীদের পান্থশালা, পর্বত, বন ও আশ্রম যেখানেই গেছেন সেখানেই মক্ষিকারা যেমন বন্য হাতীকে বিরক্ত করে সেভাবে নিকৃষ্ট লোকেরা তাঁকে ভয় প্রদর্শন, তাড়ন, প্রস্রাব ও শ্লেষ্মাত্যাগ, প্রস্তর, বিষ্ঠা ও ধূলি নিক্ষেপ, সামনে অধোবায়ু ত্যাগ ও দুর্বাক্য দ্বারা বিরক্ত করেছে। তবু তিনি এই সংসারের অনিত্যতা, সৎ ও অসতের অনুভব, নিজের আত্মতত্ত্বজাত জ্ঞান ও বৈরাগ্য দ্বারা ঐ সব অপমান গায়ে না মেখে একাই পৃথিবী ভ্রমণ করতে লাগলেন। তিনি স্বভাবতই সুন্দর; তাঁর হাত, পা, বক্ষস্থল, দুই হাত, কাঁধ ও মুখমণ্ডল প্রভৃতি অবয়বগুলি অত্যন্ত সুকুমার ছিল। স্বভাবসিদ্ধ মৃদুহাসিতে তাঁর বদনমণ্ডল শোভমান; নাক, চোখ, গলা, কান সমস্ত অংগই অনুরূপ সুগঠিত ও সুন্দর ছিল। নব পলাশের মত ঈষৎ রক্ত ও আয়ত পক্ষযুক্ত নেত্র, সন্তাপহারী চক্ষুতারকা ইত্যাদি কামিনীদের মন-হরণকারী ছিল। তবু তাম্রবর্ণ কেশ ও জটাজাল এবং মলিন দেহে অবস্থান করায় তাঁকে ভূতগ্রস্তের মত মনে হত। যোগৈশ্বর্যশালী মহাভাগ যখন দেখলেন লোকের সঙ্গে সামাজিক আলাপ করাও যোগবিরুদ্ধ, আর ঐ বিপক্ষতা দূর করার চেষ্টাও ঘৃণিত, তখন তিনি অজগর ব্রত অবলম্বন করলেন। এই ব্রতে একই জায়গায় আহার, পান, চর্বণ, মলমূত্র পরিত্যাগ ক্রিয়া হতে লাগল। কখনো সর্বাঙ্গে বিষ্ঠা লিপ্ত করে বিষ্ঠার উপর লুণ্ঠিত হতেন। আর আশ্চর্যের বিষয়, তাঁর বিষ্ঠায় দুর্গন্ধ ছিল না, বরং তার সুগন্ধে বাতাস চতুর্দিকে বিস্তৃত হয়ে দশ যোজন ব্যাপী স্থান সুগন্ধে আমোদিত করত। এইভাবে তিনি গো-মৃগ-কাকের মত যাতায়াত, দাঁড়ানো, বসা, শোয়া, বিভিন্ন অবস্থায় থেকেই পান, ভোজন ও মলমূত্র ত্যাগ করতে লাগলেন মহারাজ, মুক্তিদাতা স্বয়ং ভগবান ঋষভদেব লোকশিক্ষার জন্য এভাবে নানারকম যোগচর্যা করে অবিরাম পরমানন্দে থাকতে লাগলেন। তাই নিখিল জীবের আত্মস্বরূপ বাসুদেব ও নিজ আত্মার মধ্যে অভেদ জ্ঞান করে নামরূপ উপাধি পরিত্যাগপূর্বক তিনি সকল পুরুষার্থ-ফলে পরিপূর্ণ ছিলেন। সুতরাং তিনি আকাশগতি মনের ন্যায় দেহের গতিশীলতা, অন্তর্ধান, পরদেহে প্রবেশ, দূরদৃষ্টি প্রভৃতি যোগৈশ্বর্যকে একান্ত মনে স্বীকার করতেন না। ২৮-৩৫

ষষ্ঠ অধ্যায়

ঋষভদেবের দেহত্যাগ

রাজা পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করলেন, ভগবান, যাঁরা আত্মারাম তাঁদের কর্মবীজ যোগপ্রভাবে উদ্দীপিত জ্ঞানানলে দগ্ধ হয়ে যায়। তাঁদের কাছে যথেচ্ছভাবে যোগৈশ্বর্যগুলি উপস্থিত হলেও তাঁদের কোন কষ্ট হয় না। ভগবান ঋষভদেব যদৃচ্ছাক্রমে উপস্থিত ঐসব যোগৈশ্বর্যকে সমাদর করলেন না কেন? ১

শুকদেব বললেন, মহারাজ, আপনি ঠিকই বলেছেন। যেমন ধূর্ত ব্যাধ মৃগ ধরা পড়লেও তা বিশ্বাস করতে চায় না, সে রকম এই পৃথিবীতে কোন কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি চঞ্চল মনকে কখনও সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করেন না। পণ্ডিতরা বলেন, মনের চাঞ্চল্য থাকলে কারো সঙ্গে কখনো বন্ধুত্ব করবে না। মনে এই রকম

বিশ্বাস করেছিলেন বলে মহাদেবেরও বহুকাল সঞ্চিত তপস্যা বিষ্ণুর মোহিনীরূপ দেখে বিনষ্ট হয়েছিল। যেমন বিশ্বস্ত পতির ভ্রষ্টা স্ত্রী উপপতিদের সুযোগ দিয়ে পতির প্রাণসংহার করায়, সে রকম যোগীরা চঞ্চল মনকে বিশ্বাস করলে ঐ মন কাম-রিপুদের ইচ্ছামত কাজ করার সুযোগ দেয়। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, শোক, মদ, ভয় ও কর্মবন্ধন এ সবকিছুর মূলে হল মন। কোন বুদ্ধিমান লোকই সেই মনকে নিজের অধীন বলে স্বীকার করতে পারে না। ভগবান ঋষভদেব পৃথিবীর লোকপালদের ভূষণস্বরূপ। কিন্তু তাঁর সঙ্গে একজন অনুচরও রইল না। অবধূতের মত বিচিত্র বেশ, বিচিত্র ভাষা ও বিচিত্র চরিত্র অবলম্বন করায় তাঁর মধ্যে ভগবৎ-প্রভাবও দৃষ্ট হল না। কিভাবে কলেবর ত্যাগ করতে হয়, তা শিক্ষা দেবার জন্য তিনি নিজের দেহত্যাগ করার ইচ্ছায় পরব্রহ্ম ও নিজ আত্মায় সম্পূর্ণ অভেদ-ভাব অনুভব করে নিখিল বাসনা ও কর্মক্ষয়ান্তে ভবলীলা সাংগ করলেন। ২-৬

যেমন কুলালচক্র (কুমোরের চাকা) স্বয়ং ঘুরতে থাকে, সে রকম মুক্তলিংগ হলেও যোগমায়ার বাসনা দ্বারা ভগবান ঋষভের দেহ সংস্কারবশে বারবার ভ্রমণ করতে করতে কোংক, বেংকট, কুটক এবং দক্ষিণ কর্ণাটক দেশে স্বেচ্ছায় গিয়ে উপস্থিত হল। সেখানে কুটকাচলের উপবনে তাঁর মুক্তকেশ নগ্নদেহ কতকগুলি প্রস্তরখণ্ড মুখের মধ্যে দিয়ে উন্মত্তের মত ইতস্তত বিচরণ করতে লাগল। সেই সময় বাতাসের বেগে সেই উপবনের বেণুগুলি কম্পিত হয়ে উঠল ; তাদের পরস্পর সংঘর্ষণে ঘোর দাবানল উৎপন্ন হয়ে লোলরসনায় ঐ বনকে সর্বতোভাবে গ্রাস করল। তাতে তাঁর দেহের সংগে সমস্তই পুড়ে ছাই হয়ে গেল। ভগবান ঋষভদেবের এরকম আচরণের কথা জানতে পেরে কোংক, বেংকট ও কুটক দেশের রাজা অর্হৎ স্বয়ং ঐ রকম শিক্ষা করবেন এবং নির্ভয়ে নিজ ধর্মপথ পরিত্যাগ করে আপন বুদ্ধিতে পাষণ্ডরূপ কুপথ প্রবর্তিত করাবেন। কারণ কলিযুগে অধর্মই উৎকর্ষ লাভ করবে ; প্রাণীদের পূর্বসঞ্চিত পাপের ফলে ঐ রাজার মতিভ্রম ঘটবে। এই অধর্মপ্রবর্তক রাজা থেকে কলিযুগের কুবুদ্ধি মানুষেরা দেবমায়ায় বিমোহিত হয়ে নিজ নিজ শৌচ আচার পরিত্যাগ করে দেবতাদের অবজ্ঞা করবে এবং স্নান, আচমন, শৌচ প্রভৃতি সদাচার লংঘন করে নিজ নিজ ইচ্ছায় দুষ্কর্মগুলি গ্রহণ করবে। লোকেরা অধর্মবন্ধু কলির দ্বারা অভিভূত ও কুব্রতী হয়ে বেদ, ব্রাহ্মণ ও ভগবানের নিন্দা করবে।[১] তারা অন্ধ পরম্পরাক্রমে অবেদমূলক ঐ রকম স্বেচ্ছাকৃত প্রবৃত্তিতে বিশ্বাস স্থাপন করে নিজ থেকেই অন্ধতমোময় নরকে নিপতিত হবে। মহারাজ, ভগবানের এই ঋষভাবতার ঐ রকম অনিষ্টকর হলেও রজোগুণ সম্পন্ন ব্যক্তির মোক্ষপথ শিক্ষার জন্য তা বিশেষ আবশ্যক। তাঁর গুণবর্ণনা করে অনেক শ্লোক গীত হয়ে থাকে। ৭-১২

সপ্তসমুদ্রবর্তী পৃথিবীর দ্বীপগুলির মধ্যে এই ভারতবর্ষ অত্যন্ত পুণ্যশালী। এদেশের লোকেরা ভগবান মুরারি ঋষভাবতারের মঙ্গলজনক লীলা, গুণাদি শ্রদ্ধার সঙ্গে কীর্তন করে। পুরাণপুরুষ ভগবান প্রিয়ব্রতের বংশে জন্মগ্রহণ করে মোক্ষজনক ধর্ম আচরণ করে গেছেন ; তাতেই প্রিয়ব্রতের বংশ যশোগৌরবে বিশুদ্ধ হয়েছে। তিনি অজ. কোন যোগী মনোরথেও তাঁর অনুগমন করতে পারেন না। তিনি অবস্তু বলে যেসব যোগমায়া উপেক্ষা করে গেছেন, অন্য যোগীরা তাই পাবার জন্য আগ্রহী হয়ে যত্ন করে থাকেন। ঋষভদেব বেদ, ব্রাহ্মণ, সকল লোক ও গোজাতির পরম গুরু। তাঁর যে পবিত্র চরিত্র বলা হোল, তাতে মানুষের সমস্ত দুশ্চরিত্রতার অবসান ঘটে, কারণ তা পরম মহৎ মঙ্গলের আধার। যারা সংযতচিত্তে শ্রদ্ধার সঙ্গে তা শোনে

১ মতান্তরে : ব্রহ্ম, যজ্ঞপুরুষ ও লোকদের উপহাস করবে

এবং অন্যকে শোনায় উভয়েরই ভগবান বাসুদেবের প্রতি ঐকান্তিকী ভক্তি জন্মে। পণ্ডিত ভক্তরা পরম পবিত্র ভক্তিরসে সংসারতাপে সন্তপ্ত হৃদয়কে সিঞ্চিত করে পরা নিবৃতি লাভ করেন এবং ভগবানের আপন জন হয়ে যান। চতুর্বর্গ ফল তাঁদের করতলগত, তবু নিজের থেকেই মোক্ষফল এসে উপস্থিত হলেও তাঁরা ভক্তিভাব ছেড়ে মোক্ষপদের আদর করেন না। মহারাজ, ভগবান মুকুন্দ তোমাদের এবং যদুদের পালক, গুরু, উপাস্য, সুহৃৎ, কুলনিয়ন্তা, এবং কোনও সময় দৌত্যকার্যে তিনি তোমাদের কিঙ্করও হয়েছেন। ভগবান তোমাদের প্রতি এই রকম ভাবাপন্ন হয়েছেন। আর অন্য যাঁরা নিত্য তাঁর ভজনা করেন, তাঁদের তিনি মুক্তিও দিয়ে থাকেন; অথচ তিনি কখনও কাউকে প্রেমভক্তি সহজে দান করেন না। ঋষভদেব নিজের স্বরূপ উপলব্ধি করে বাসনাশূন্য ছিলেন। দেহাদির জন্য সকল কল্যাণকর বিষয়ে যাদের বুদ্ধি চিরনিদ্রিত ছিল, তিনি তাদের কৃপা করে অভয়রূপ ভগবত্তত্ত্ব বোঝালেন। সেই পরমদয়ালু ঋষভরূপী শ্রীহরিকে বার বার প্রণাম করি। ১৩-১৯

সপ্তম অধ্যায়

রাজা ভরতের উপাখ্যান

শুকদেব বললেন, মহারাজ, এই ভাবে পরমভাগবত হরিপরায়ণ মহাত্মা ভরত পৃথিবীপালনের জন্য ভগবান ঋষভদেব কর্তৃক নিযুক্ত হয়ে বিশ্বরূপের কন্যা পঞ্চজনীকে বিবাহ করলেন। অহংকার থেকে যেমন শব্দ, স্পর্শ প্রভৃতি সূক্ষ্ম ভূতসমূহ জন্মায়, সেরকম ঐ পত্নীর গর্ভে সুমতি, রাষ্ট্রভৃৎ, সুদর্শন, আবরণ ও ধূম্রকেতু নামক তাঁরই মত গুণশালী পাঁচটি পুত্র জন্মেছিল। ভরত রাজা হলে এই 'অজনাভ' নামক বর্ষের নাম 'ভারতবর্ষ' বলে বিখ্যাত হয়েছে। তিনি পৃথিবীপতি হয়ে স্বধর্মের অনুবর্তী হয়েছিলেন এবং পিতৃ-পিতামহের মত নিজের প্রজাবাৎসল্য প্রকাশ করে নিজ নিজ কর্মের প্রতি অনুগত প্রজাদের উপযুক্ত ভাবে লালন করতে লাগলেন। তিনি প্রকৃত শ্রদ্ধাবান হয়ে অনেক ক্ষুদ্র ও মহৎ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছিলেন এবং সে সবের মাধ্যমে যজ্ঞ ও যজ্ঞমূর্তি ভগবান বিষ্ণুর অর্চনা করেছিলেন। চাতুর্হোত্র বিধি অনুসারে অগ্নিহোত্র, দর্শ, পূর্ণমাস, চাতুর্মাস্য, পশুযাগ, সোমযাগ প্রভৃতি যে অনুষ্ঠানে তিনি অধিকারী ছিলেন সে সব দ্বারা যজ্ঞরূপে ও ক্রতুরূপে[১] দুই ভাবেই তিনি ভগবানের আরাধনা করলেন। অগ্নিক্রিয়ার অনুষ্ঠানের পর নানা রকম যজ্ঞ হলেও ঋত্বিকরা আহুতি প্রদানের জন্য হবি গ্রহণ করলে ঐ যজমান রাজা তখন পরমব্রহ্ম ভগবান যজ্ঞপুরুষ বাসুদেবকেই সে সব অনুষ্ঠান-ক্রিয়াফলের সাক্ষাৎ ও মুখ্য কর্তা বলে মনে করতেন। সেজন্য তিনি যজ্ঞভাগাহারী সূর্য প্রভৃতি দেবতাদের বাসুদেবের চক্ষু ইত্যাদি অবয়ববোধে ধ্যান করতেন। রাজর্ষি ভরত ভাবতেন যে দেবতাপ্রকাশক মন্ত্রগুলির অর্থ ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতা; কিন্তু বাসুদেব এসবের নিয়ামক, তাই তিনিই পরম দেবতা। ভরতের ঐ রকম চিন্তাকৌশলে শীঘ্র রাগ, দ্বেষ গুণাদি ক্ষীণ হয়ে গেল আর ঐ সব বিশুদ্ধ কর্মের অনুষ্ঠানবশত তাঁর চিত্তশুদ্ধি হতে লাগল। ফলে হৃদয়ের অভ্যন্তরের আকাশ যাঁর শরীর, যিনি মহাপুরুষের সকল লক্ষণযুক্ত এবং যিনি শ্রীবৎস, কৌস্তুভ, বনমালা, শঙ্খ, চক্র,

১ যূপহীন যাগকে যজ্ঞ ও যূপযুক্ত যাগকে ক্রতু বলে।

গদা প্রভৃতি সহ বিরাজমান, আর যিনি নারদ প্রভৃতি ভক্তগণের হৃদয়ে চিত্রিত নিশ্চল পুরুষরূপে স্বতঃদেদীপ্যমান সেই পরমব্রহ্ম ভগবান বাসুদেবের প্রতি তাঁর ভক্তি জন্মাল ; ভক্তির আবেগও দিন দিন বাড়তে লাগল। ১-৭

মহারাজ, রাজর্ষি ভরত স্থির নিশ্চয় করেছিলেন যে সহস্র অযুত বৎসর পর তার রাজ্যভোগের অদৃষ্টকাল শেষ হবে। সেই কালের অবসানে তিনি পিতা-পিতামহের ধনসম্পদ শাস্ত্রানুসারে নিজের সন্তানদের মধ্যে ভাগ করে দিলেন। পরে তিনি সমস্ত সম্পত্তির নিকেতন থেকে বেরিয়ে হরিক্ষেত্র পুলহাশ্রমে গিয়ে সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করলেন। সেই ক্ষেত্রে ভগবান শ্রীহরি আজ অবধি নিজ ভক্তজনের বাৎসল্যে যুক্ত হয়ে আছেন। সেখানে স্রোতস্বিনী গণ্ডকী নদী শিলার মধ্যে চক্রদ্বারা আশ্রমটিকে পবিত্র করে তুলছে। এইসব শিলার প্রত্যেকটির উপরে ও নিচে এক একটি নাভি আছে। সেই পুলহাশ্রমের উপবনে মহাত্মা ভরত একা বাস করে নানা রকম ফুল, কিশলয়, তুলসী, ফলমূল ও জল দিয়ে ভগবানের আরাধনা করতে লাগলেন। তাঁর বিষয়ের অভিলাষ নির্মূল হয়ে শমগুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। এই ভাবে তিনি নিবৃত্তি প্রাপ্ত হয়ে সর্বসময় শুদ্ধাবস্থায় অবস্থান করতেন। ভরত এরকম সর্বক্ষণ পরম পুরুষের পরিচর্যায় রত হলেন। এতেই ভগবানের প্রতি তাঁর অনুরাগ দিন দিন আরও বাড়তে লাগল। সেই অনুরাগের আতিশয্যে তাঁর হৃদয় বিগলিত হয়ে গেল ; আর তাঁর উদ্যম রইল না। পুলকে তাঁর দেহ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল এবং উৎকণ্ঠাবশে প্রেমাশ্রু বিগলিত হয়ে চোখদুটি বন্ধ হয়ে এল। এ রকম চরম অবস্থা লাভ করে রাজর্ষি ভরত ভগবানের করুণামণ্ডিত শ্রীচরণকমল ধ্যান করতে লাগলেন। এতে তাঁর ভক্তিভাব আরও প্রগাঢ় হল ও হৃদয়-হ্রদে পরম আনন্দ ছড়িয়ে পড়ল। সেই আনন্দে তাঁর মন নিমগ্ন হল, তখন তিনি যে ভগবানের আরাধনা করছিলেন তাও ভুলে গেলেন। ৮-১২

ত্রিসন্ধ্যা স্নান সমাপনান্তে মৃগচর্ম পরিহিত, কুটিল ও কপিল বর্ণ জটাজালে তাঁর অপূর্ব শোভা বিকশিত হত। তিনি এভাবে নানা রকমে ভগবানের উপাসনা অবলম্বন করে উদীয়মান সূর্যমণ্ডলে সূর্য-প্রকাশক ঋক্‌মন্ত্র দ্বারা ভগবান হিরণ্ময় পুরুষের আরাধনা করতে করতে বললেন, প্রকৃতির পর ও শুদ্ধসত্ত্বরূপ সূর্যদেবের সেই আত্মস্বরূপ তেজ আমাদের কর্মফল দেয়। যিনি মন দ্বারা এই বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন, তিনি নিজসৃষ্ট বিশ্বের সর্বত্র সর্বান্তর্যামী রূপে প্রবেশ করে আপন চিৎশক্তি দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডের জীবসমুদয়ের পালন ও রক্ষা করছেন। বুদ্ধিবৃত্তি-প্রবর্তক সেই ভর্গদেবেরই শরণাপন্ন হই আমরা। ১৩-১৪

অষ্টম অধ্যায়

মৃগশিশুর মোহে ভরতের মৃগদেহ ধারণ

শুকদেব বললেন, মহারাজ, এক সময় ভরত গণ্ডকী নদীতে স্নান ও নিত্যকর্ম যথাযথ সেরে নদীতীরে বসে মুহূর্তকাল প্রণব জপ করছিলেন, এমন সময় এক হরিণী জল পান করার জন্য একা সেই নদীর কাছে এল। তৃষ্ণাতুরা হরিণী যখন জল পান করছিল সে সময় ত্রিলোক কাঁপিয়ে এক সিংহ খুব কাছ থেকে গর্জন করে উঠল। স্বাভাবিক ভীরুহৃদয়া হরিণীর তাতে মহাভয় হল। সে ব্যাকুলহৃদয়ে

বিভ্রান্ত ও চকিত দৃষ্টিপাত করে তৎক্ষণাৎ ভয়ে নদীর জলে লাফিয়ে পড়ল। ঐ হরিণী ছিল গর্ভবতী। নদী অতিক্রম করার সময়ে প্রচণ্ড ভয়ে তার গর্ভের শিশু গর্ভচ্যুত হয়ে যোনিদেশ দিয়ে নির্গত হয়ে নদীর স্রোতে পড়ে গেল। একে হরিণী সিংহের গর্জনে মহাভীতা, তার উপর গর্ভপাত হল এবং নদী পার হবার চেষ্টায় ক্লান্তিবশত তার মুমূর্ষু অবস্থা হল। সে দলচ্যুতা হয়ে একটি পর্বতের গুহায় প্রবেশ করা মাত্র প্রাণত্যাগ করল। ভরত নদীতীরে বসে সমস্ত ঘটনা দেখছিলেন। তিনি দেখলেন নিঃসহায় হরিণীর মৃত্যু হয়েছে ও মৃগশাবক নদীর স্রোতে ভাসছে। ভরতের অনুকম্পা হল; তিনি সদ্যোজাত হরিণশিশুকে জল থেকে তুলে নিজের আশ্রমে নিয়ে এলেন। সযত্নে প্রতিপালিত হরিণশিশুতে তাঁর 'এটি আমার' এরকম অভিমান হতে লাগল। সেই হরিণশিশুর প্রতি মমতা বৃদ্ধি পাওয়ায় দিন দিন তার আহার, রক্ষণ, পোষণ ও লালনে রাজর্ষি ভরতের অনেক সময় নষ্ট হতে লাগল, তাই তাঁর ভগবৎ-অর্চনা, নিয়ম, যম প্রভৃতি কাজ অল্প দিনের মধ্যেই একেবারে বিলুপ্ত হয়ে গেল। তিনি ভাবতেন, আহা, এই হরিণশাবক অত্যন্ত কাতর অবস্থায় কালের চক্রে পড়ে স্বজনহীন হয়েছে। আমাকেই পিতা, মাতা, ভ্রাতা, জ্ঞাতি ও যূথপতি বলে জানে। আমার প্রতি এর অত্যন্ত আস্থা। অতএব আমাকেই যখন আশ্রয় করেছে তখন আমার নিশ্চয়ই উচিত এর পোষণ, রক্ষণ ও পালন করা; না হলে বড়ই দোষের হবে। দীনবৎসল মাননীয় সাধু আচার্যেরা এরকমভাবে বিপন্ন মানুষের পালনের জন্য গুরুতর কর্মও পরিত্যাগ করে থাকেন। এভাবে রাজর্ষি ভরত আসন, শয়ন, ভ্রমণ, স্নান, ভোজন প্রভৃতি প্রত্যেক কাজেই মৃগশিশুর প্রেমে আবদ্ধ হয়ে তার সঙ্গেই থাকতেন। এত স্নেহ হয়েছিল যে, ভরত যখন কুশ, পুষ্প, যজ্ঞকাঠ, পাতা, ফলমূল, জল প্রভৃতি সংগ্রহ করতে যেতেন তখনই পাছে কোন শৃগাল বা কুকুর এসে হরিণশিশুর প্রাণনাশ করে এই আশংকায় তাকে সঙ্গে নিয়েই বনে প্রবেশ করতেন। ১-১২

পথে যেতে যেতে ঐ হরিণশিশুর প্রতি আসক্তচিত্ত, স্নেহবিহ্বল ভরত স্নেহের বশে কখনো তাকে কাঁধে বা কোলে, কখনো বা বুকের উপর নিয়ে পরম আনন্দ লাভ করতেন। নিজের কর্তব্যনিষ্ঠা শুরু করে শেষ হতে না হতেই মাঝে মাঝে এক একবার উঠে ঐ হরিণশিশুকে ব্যাকুল হয়ে দেখতেন আর আশ্বস্ত হয়ে—বৎস, তোমার সর্বপ্রকার মঙ্গল হোক—এই আশীর্বাদ করতেন। তাকে দেখতে না পেলে ধননাশে কৃপণের যে রকম বিকল অবস্থা হয়, সেভাবে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত ও ব্যাকুল হয়ে শোকের সঙ্গে বলতেন, আহা, বেচারার মা নেই; আমি অনার্য ও সুকৃতিহীন, শঠ কিরাতের মত বঞ্চক ও ক্রূরমতি। সে সুজনের মত আমাকে একান্ত বিশ্বাস করে এবং নিজের মনে করে আবার কি আমার কাছে ফিরে আসবে? হায়! আবার কি তাকে এই আশ্রমের উপবনে নির্ভয়ে কচি ঘাস (কোমল তৃণ) গ্রহণ করতে করতে বিচরণ করতে দেখতে পাব? অথবা তাকে কি কোন শৃগাল বা কুকুর বা শূকর প্রভৃতি অন্য কোন বন্য পশু ভক্ষণ করে ফেলেছে? জগতের মঙ্গলময় বেদস্বরূপ ভগবান দিবাকর অস্ত যাচ্ছেন, সেই মৃগবধূর গচ্ছিত মৃগশাবক তো এখনও এল না! আমি তাকে পালন করতে পারলাম না, ধিক্‌ আমাকে! ১৩-১৯

হায়! সেই হরিণ-রাজতনয় আবার এসে নানা রকম মধুর দর্শনীয় ক্রীড়া দ্বারা আমাদের অসন্তোষ দূর করে মহাপাপী আমাকে কি আবার সুখী করবে? আমি কোন সুকৃতি করি নি, আমার ভাগ্যে কি তা ঘটবে? আহা, সে যখন খেলত তখন আমি স্নেহকোপে তাকে ভর্ৎসনা করে মুদ্রিতনয়নে কপট সমাধিস্থ হলে সেই

হরিণ-বালক আমার চারদিকে ঘুরে বেড়াত এবং জলবিন্দুর মত শীতল ও কোমল শৃঙ্গের অগ্রভাগ দিয়ে ধীরে ধীরে আমাকে স্পর্শ করত। আবার কুশের উপরে হোমের ঘৃতপাত্র রাখলে লোভ করে সে যদি কুশ টেনে তা দূষিত করত, তখন রেগে আমি তাকে তিরস্কার করলে সে ভয়ে ঋষিবালকের মত ক্রীড়া ত্যাগ করে শান্ত হয়ে থাকত। ২০-২২

মহারাজ, রাজর্ষি ভরত এভাবে নানারকম বিলাপ করতে করতে মৃগশিশু খুঁজতে লাগলেন। তার পদচিহ্ন দেখতে পেয়ে বলতে লাগলেন, আহা! এই সৌভাগ্যবতী পৃথিবী না জানি কতই তপস্যা করেছেন, কেননা বিনয়নম্র কৃষ্ণসার শাবকের অতি কমনীয় খুরের অতি সুন্দর চিহ্ন দ্বারা নিজে অলঙ্কৃত হয়ে হরিণশিশুর বিরহে কাতর আমাকে তার পথ প্রদর্শন করছেন এবং ধর্মের জন্য স্বর্গ ও মোক্ষপদপ্রার্থী ব্রাহ্মণদের যজ্ঞস্থানরূপে পরিণত হয়েছেন। উদীয়মান চন্দ্রমণ্ডলে মৃগচিহ্ন দেখে তাকেই নিজের হরিণ ভেবে বলতে লাগলেন, হায়, মাতৃহীন মৃগশিশু আশ্রমভ্রষ্ট হয়ে অন্যত্র পড়ে থাকবে এই ভেবে দীনবৎসল ভগবান চন্দ্র কৃপা করে সিংহ প্রভৃতি থেকে রক্ষা করে তাকে নিজের কাছে রেখেছেন। পরে চন্দ্রের কিরণের স্পর্শ অনুভব করে বললেন, হায়! পুত্রতুল্য মৃগশিশুর বিরহানলের জ্বালায় আমার হৃদয়রূপ স্থলপদ্ম শুষ্ক হচ্ছে। মৃগশিশুর বিরহে কাতর আমার প্রতি দয়া করে চন্দ্র তার শীতল অমৃতময় কিরণে আমায় আশ্বস্ত করছেন। ২৩-২৫

সেই মহাতপা ভরত এইভাবে ব্যাকুল হয়ে ঐ মৃগশিশুরূপে প্রকাশিত নিজের আরব্ধ কর্মের দ্বারা যোগানুষ্ঠান ও ভগবানের আরাধনা থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়লেন। মহারাজ, নিশ্চয়ই তাঁর ঐ রকম প্রারব্ধ কর্ম ছিল, না হলে যে ব্যক্তি যোগের ও মুক্তির ব্যাঘাত হবে বলে নিজের আত্মজদেরও পরিত্যাগ করেছেন, ভিন্নজাতি এক মৃগশিশুর প্রতি তাঁর আত্মজতুল্য আসক্তি হবে কেন? এই ভাবে বিঘ্নদ্বারা যোগমার্গ থেকে ভ্রষ্ট, আত্মচিন্তা-বিমুখ হওয়ায় সাপ যেমন নির্ভয়ে ইঁদুরের গর্তে প্রবেশ করে, সে ভাবে দুর্জয় দুরন্ত মৃত্যুকাল রাজর্ষি ভরতকে তীব্রবেগে আক্রমণ করল। সেই আসন্ন মৃত্যুর সময়েও ধ্যানস্থ হয়ে তিনি দেখছিলেন সেই মৃগশিশু সন্তানের মত পাশে বসে কাঁদছে। এই দেখে তাতেই আকৃষ্ট হয়ে মূঢ়ের ন্যায় দুঃখ করতে করতে মৃগের সঙ্গে মনুষ্যদেহ ত্যাগ করে ভরত মৃগত্ব লাভ করলেন। কিন্তু তাঁর পূর্ব-জন্মের স্মৃতি লুপ্ত হল না। ২৬-২৭

নিজের মৃগদেহ ধারণের কারণ স্মরণ করে অনুতাপের সঙ্গে তিনি বলতে লাগলেন; হায়! হায়! আমার কি দুর্ভাগ্য যে আমি ধীর ব্যক্তিদের আচরিত যোগপথ থেকে ভ্রষ্ট হয়েছি। একেবারে নিঃসঙ্গ হয়ে জনশূন্য পুণ্যবনে বাস করতাম। সেখানে আত্মতত্ত্ব লাভ করে ধীরভাবে শ্রবণ, মনন, কীর্তন, আরাধনা, অনুস্মরণ প্রভৃতি দ্বারা ক্ষণমাত্র কালও বৃথা নষ্ট না করে আমি ভগবান বাসুদেবের প্রতি মনকে স্থির করেছিলাম। হায়! আমার মূর্খতার জন্য সেই মন তাঁর ভাব থেকে রহিত হয়ে এই মৃগশিশুর প্রতি আসক্ত হয়েছিল। মনে মনে এরকম চিন্তা করে তিনি তাঁর মৃগরূপে জন্মস্থান কালঞ্জর পর্বত থেকে শালগ্রাম নামক হরিক্ষেত্র পুলহাশ্রমে ফিরে এলেন। সঙ্গদোষে তাঁর এরকম সর্বনাশ হয়েছে ভেবে মৃগরূপী ভরত সঙ্গভয়ে উদ্বিগ্নমনে একাকী শুষ্কপত্র, তৃণ, লতা আহার করে মৃত্যুসময়ের প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। তারপর মৃত্যুসময় উপস্থিত হলে তীর্থজলে শরীর ডুবিয়ে মৃগদেহ ত্যাগ করলেন। ২৮-৩১

নবম অধ্যায়

ভরতের জড়-ব্রাহ্মণ জন্ম

শুকদেব বললেন, মহারাজ, আঙ্গিরস গোত্রের ব্রাহ্মণদের মধ্যে এক শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁর অনেক গুণ ছিল, যেমন শম, দম, তপস্যা, বেদ অধ্যয়ন, দান, সন্তোষ, সহিষ্ণুতা, বিনয়, বিদ্যা, অনসূয়া, আত্মজ্ঞান, ধর্ম আচরণের আনন্দ প্রভৃতি। তাঁর নটি ছেলেও বিদ্যা, শীল, আচার, রূপ এবং ঔদার্যে তাঁরই মত হয়েছিল। তাঁর কনিষ্ঠা স্ত্রীর গর্ভে একটি পুত্র আর একটি কন্যা জন্মায়। ঐ পুত্রটিই হলেন পরমভাগবত রাজর্ষি ভরত। তিনি হরিণের দেহ ছেড়ে অবশেষে ব্রাহ্মণ হয়ে জন্মালেন। ভগবানের দয়ায় তাঁর আগের সমস্ত জন্মের স্মৃতি লোপ পায় নি। তাই, আপনজনের সঙ্গে থাকলে পাছে আবার পতন হয় এই ভয়ে তিনি পাগল, জড়বুদ্ধি, অন্ধ আর কালা সেজে থাকতেন এবং যার নামে, স্মরণে আর গুণকীর্তনে কর্মের বন্ধন নষ্ট হয় ভগবানের সেই চরণপদ্ম দুটি সবসময় হৃদয়ে ধরে থাকতেন। যে জড়, গৃহস্থধর্মে তার অধিকার নেই। তবুও পুত্রস্নেহের বশে ব্রাহ্মণ ভাবলেন যে, সমাবর্তন পর্যন্ত ঐ পুত্রের সবকটি সংস্কার কর্মের অনুষ্ঠান করাবেন। তাই তিনি পুত্রের উপনয়ন করালেন এবং তার অনিচ্ছাতেই তাকে শৌচ, আচমন ইত্যাদি শেখালেন। ব্রাহ্মণের একান্ত ইচ্ছা ছিল যে, তাঁর পুত্র তাঁর কাছেই দীক্ষা নেবে। ভরত কিন্তু পিতার আগ্রহ নষ্ট করবার জন্য ইচ্ছে করে নিয়মের ব্যতিক্রম করতেন। পুত্রের উপনয়নের পর শ্রাবণমাস থেকে তাকে বেদ পড়াবেন এই ইচ্ছায় ব্রাহ্মণ তাঁকে বসন্ত আর গ্রীষ্মের চার মাসে প্রণব এবং ব্যাহৃতির[১] সংগে গায়ত্রী শেখাবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু পারলেন না। ভরতকে তিনি প্রাণের অধিক ভালবাসতেন। তাই পরম আগ্রহে ব্রহ্মচারীর নানা কর্তব্য, যেমন শৌচ, অধ্যয়ন, নিয়ম, গুরুশুশ্রূষা ইত্যাদি তাঁকে শেখাবার চেষ্টা করতেন। পুত্রের অবশ্য এসব শিখবার মোটেই আগ্রহ ছিল না। তাই তাঁকে পণ্ডিত করবার ইচ্ছা আর ব্রাহ্মণের পূর্ণ হল না। আশা করে করেই দিন যেতে লাগল। এই ভাবে মিথ্যা আশায় কাল কাটাতে কাটাতে একসময় দুরন্ত কাল তাঁকে কবলিত করল। ১-৬

ব্রাহ্মণের কনিষ্ঠা স্ত্রী নিজের গর্ভের ছেলে-মেয়েকে সতীনের হাতে দিয়ে স্বামীর সঙ্গে সহমরণে গেলেন। পিতা মারা গেলে ভরতের ভায়েরা তাঁকে জড়-বুদ্ধি মনে করে লেখাপড়া শেখাবার আগ্রহ দেখালেন না। তাঁদের বিদ্যা শুধু বেদের ক্রিয়াকাণ্ডের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। আত্মবিদ্যা লাভ করবার জন্য তাঁরা বিশেষ চেষ্টা করেন নি বলে তাঁরা ভরতের মহিমা জানতে পারলেন না। ইতর লোকেরা তাঁকে পাগল, বোকা, কালা বা বোবা মনে করে যেভাবে কথাবার্তা বলত তিনি সেরকম ভাবেই উত্তর দিতেন। তারা তাঁকে যা করতে বলত তিনি তাই করতেন। তারা তাঁকে দিয়ে কাজ করিয়ে নিয়ে কখনও কিছু খাদ্য, কখনও বা বেতন দিত। আবার কখনও তিনি নিজেই কিছু চাইতেন, বা না চাইতেও খাদ্য পেতেন। এভাবে ভাল-খারাপ যাই পেতেন তার থেকে শুধু বেঁচে থাকবার জন্য সামান্য যেটুকু দরকার সেটুকু খেতেন, ইন্দ্রিয়তৃপ্তির দিকে তাঁর কোন লক্ষ ছিল না। কারণ চৈতন্য এবং আনন্দময় আত্মাই যে তাঁর স্বরূপ তা তিনি বুঝতে পেরে-ছিলেন এবং তাঁর দেহাভিমান ছিল না বলে দ্বন্দ্ব[২] থেকে যে সুখ-দুঃখের সৃষ্টি

---

১ ভূর্ভুবঃ স্বঃ ইত্যাকার মন্ত্র। ২ দুই বিপরীত ভাব, যেমন শীত-উষ্ণ, রাগ-দ্বেষ ইত্যাদি।

হয় তা তাঁকে স্পর্শ করত না। তাঁর স্বাস্থ্য বেশ ভাল ছিল, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও দৃঢ় ছিল। এই জন্য তিনি শীতে-গ্রীষ্মে, বাতাসে-বৃষ্টিতে খালিগায়ে বৃষের মত ঘুরে বেড়াতেন। তিনি মাটিতে শুতেন, স্নান বা গা পরিষ্কার করতেন না বলে সর্বদাই দেহ ধুলো-ময়লায় ঢেকে থাকত এবং মহামণির মত তাঁর ব্রহ্মতেজ বাইরে থেকে বোঝা যেত না। অতি কুৎসিত ময়লা এক টুকরো কাপড়ে তাঁর লজ্জা নিবারণ হত; অজ্ঞ লোকে তাঁর মহিমা না জেনে তাঁকে সামান্য বা জাতিচ্যুত ব্রাহ্মণ বলে অপমান করত। কিন্তু তাতে তিনি ভ্রূক্ষেপ করতেন না। তাঁর ভায়েরা যখন দেখলেন যে ভরত খেতে পেলে অন্যের কাজ করে দেয়, তখন তাঁরা তাঁকে খাবার লোভ দেখিয়ে ধান-ক্ষেতে কাদামাটি ঘাটবার কাজে লাগালেন। ভরত তাও বিনা আপত্তিতে করতে লাগলেন। কিন্তু ক্ষেতের কোথায় মাটি ফেললে সমতল হবে, কোনখান থেকে মাটি তুললে অসমান হবে, ঐসব দিকে তাঁর লক্ষ্য ছিল না। ভায়েরা তাঁকে খুদ, খোল, তুষ, পোকায়-খাওয়া কলাই বা হাঁড়িতে-লেগে-থাকা পোড়া ভাত যা দিতেন তাই তিনি অমৃত মনে করে খেয়ে নিতেন। ৭-১১

একদিন শূদ্রদের এক দলপতি, সে আবার দস্যুদেরও সর্দার, সন্তান কামনা করে ভদ্রকালীর কাছে নরবলি দিতে যাচ্ছিল। সে যে মানুষটিকে বলি দেবার জন্য এনেছিল সে হঠাৎ বাঁধন খুলে পালিয়ে যাওয়াতে সর্দারের অনুচরেরা তাকে খুঁজতে বেরোলো। অন্ধকার রাত্রিতে অনেক খুঁজেও পালিয়ে-যাওয়া মানুষটাকে ধরতে না পেরে তারা এদিক ওদিক দেখছিল। দৈবক্রমে সে সময় জড়ভরত হরিণ, শূকর ইত্যাদি থেকে ধানক্ষেত রক্ষা করবার জন্য একটা উঁচু মাচায় বসে পাহারা দিচ্ছিলেন। অনুচরেরা তাঁকে দেখতে পেয়ে সুলক্ষণযুক্ত এবং বলির যোগ্য মনে করে দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলল এবং মহা উল্লাসে দেবীর কাছে নিয়ে এল। তারপর চোরেরা নিয়ম অনুসারে তাঁকে স্নান করিয়ে নূতন কাপড় পরাল এবং অলংকার, মালা, চন্দন, তিলক ইত্যাদি দিয়ে তাঁকে সাজাল। এসব হলে, তাঁকে খাইয়ে তাদের বলির প্রথা অনুসারে দেবীর সামনে ধূপ, দীপ, মালা, খই, কচিপাতা, অংকুর, এবং ফল উপহার সাজিয়ে উচ্চস্বরে গান আর স্তবস্তুতি করতে লাগল, ঢাক-ঢোল বাজাতে লাগল। তারপর (জড়ভরতরূপী) বলির পশুকে মুখ নীচের দিকে করিয়ে বসাল। দস্যুদের পুরোহিত নরপশুর রক্তে ভদ্রকালীর অর্চনা করবার জন্য মন্ত্র পড়ে তীক্ষ্ণধার ভয়ানক খড়্গ হাতে নিল। দেবী দেখলেন যে ঐ সব শূদ্রের চিত্ত রজ আর তমোভাবে পূর্ণ, ঐশ্বর্যের গর্বে তারা উচ্ছৃংখল। ভগবানের অংশস্বরূপ ব্রাহ্মণকুলকে তারা তুচ্ছ করে এবং হিংসা অবলম্বন করে কুপথে গিয়ে যা ইচ্ছা করে বেড়ায়। এখন তারা যাঁকে দেবীর সামনে বলি দিতে উদ্যত হয়েছে তিনি এক ব্রহ্মর্ষির সন্তান, নিজেও ব্রহ্মস্বরূপ, কারো সঙ্গে তাঁর শত্রুতা নেই, সমস্ত জীবের তিনি পরম বন্ধু। এমন কাজ কোন সময়েই বিধেয় নয়। তখন দেবীর প্রতিমা দুঃসহ ব্রহ্মতেজে দগ্ধ হতে লাগল, দেবী প্রতিমা ত্যাগ করে বেরিয়ে এলেন। দস্যুদের এই অপরাধ তিনি সহ্য করতে পারলেন না; তাঁর গাত্রদাহ থেকে তাঁর ক্রোধের উদয় হল। ক্রোধে তিনি ভ্রূকুটি করলেন; কুটিল দন্তপংক্তি আর রক্তবর্ণ চোখে তাঁর মুখ ভয়ানক হয়ে উঠল। তিনি যেন এই জগৎ ধ্বংস করবার জন্য অট্টহাসি হাসতে লাগলেন। তারপর দেবী লম্ফ দিয়ে সেই পাপিষ্ঠ দুষ্ট দস্যুদের উপর পড়লেন এবং খড়্গে তাদের মাথা কেটে ফেলে আপন সহচরদের সঙ্গে উষ্ণ রক্ত মদের মত পান করে মত্ত হলেন। কাটা মাথাগুলোকে নিয়ে তাঁরা কন্দুকের মত খেলা করতে লাগলেন, আর উচ্চস্বরে গান করতে করতে নেচে বেড়াতে লাগলেন। যারা মহাত্মা সাধুদের হত্যা করতে চেষ্টা করে তারা এই ভাবেই তাদের অপরাধের

সম্পূর্ণ ফল ভোগ করে। মহারাজ, নিজের মাথা কাটা যাবার উপক্রম হচ্ছে দেখেও যে মহাত্মা ভরত কিছুমাত্র বিচলিত হন নি বা আততায়ীদের প্রতি তাঁর রাগ হয় নি এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। কারণ যাঁরা 'দেহই আমি' এই বুদ্ধি পরিত্যাগ করে হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন করেছেন, যাঁরা সর্বভূতের আত্মা এবং বন্ধু, যাঁরা কারো শত্রুতা করেন না, স্বয়ং ভগবান কালচক্ররূপ অস্ত্রে এবং ভদ্রকালী ইত্যাদি রূপে সর্বদা তাঁদের রক্ষা করেন। ভগবানের অভয়-চরণে যাঁরা আশ্রয় নিয়েছেন সেইসব উপাসক পরমহংসদের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়। ১২-২০

দশম অধ্যায়

জড়ভরত ও রহূগণের কথা

শুকদেব বললেন, মহারাজ, একদিন সিন্ধু এবং সৌবীর দেশের রাজা রহূগণ ইক্ষুমতী নদীর ধার দিয়ে পাল্কী করে যাচ্ছিলেন। পাল্কীবাহকদের সর্দার আর একজন বাহক সংগ্রহ করবার জন্য খোঁজ করতে করতে দৈবক্রমে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ভরতকে দেখতে পেল। সে ভাবল যে এই লোকটি হৃষ্টপুষ্ট এবং শক্তিশালী আছে, এ গরু-গাধার মত বেশ ভার বইতে পারবে। তাই সে তাঁকে নিয়ে গিয়ে অন্য কয়েকজন বাহকের সঙ্গে পাল্কী বইবার কাজে লাগিয়ে দিলে মহাত্মা ভরত সেই নীচ কাজই করতে লাগলেন। পাল্কী নিয়ে চলার সময় যাতে প্রাণিহত্যা না হয় তার জন্য ভরত শর পরিমাণ জায়গা বাদ দিয়ে দিয়ে পা ফেলতে লাগলেন। অন্য বাহকেরা তাঁর সঙ্গে তাল রেখে চলতে না পারায় পাল্কী অসমান হতে লাগল। রহূগণ বাহকদের ডেকে বললেন, ওরে, তোরা একসঙ্গে চল না, পাল্কী যে অসমান হয়ে যাচ্ছে। রাজা তিরস্কার করাতে অন্য বাহকেরা শাস্তির ভয়ে ভীত হয়ে বলল, মহারাজ, আমরা ঠিকভাবেই চলছি, কিন্তু এই যে লোকটি নতুন এসেছে এ তাড়াতাড়ি চলতে পারছে না। এর সঙ্গে আমরা বইতে পারব না। তাদের কথা শুনে রাজা ভাবলেন, একজন দোষীর সংসর্গে অন্যেরাও দোষী হতে পারে, তা অসম্ভব নয়। তখন তাঁর একটু রাগ হল। রাজা সাধারণত গুরুজনদের শ্রদ্ধা করতেন। কিন্তু স্বভাবের রজোগুণ তাঁর চিত্তকে আচ্ছন্ন করল। ভস্মে-ঢাকা আগুনের মত ভরতের প্রচ্ছন্ন ব্রহ্মতেজ তিনি অনুভব করতে পারলেন না। তিনি ভরতকে বললেন, ভাই, তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে আমি বুঝতে পারছি। অনেক পথ একা পাল্কী বয়ে নিয়ে এসেছ তো, তাই খুব পরিশ্রমও হয়েছে। তোমার দেহটিও তেমন পুষ্ট নয়, হাত-পাও সবল নয়। তার উপর আবার তুমি বুড়ো হয়ে পড়েছ, আর এরা তো কেউ তোমার সঙ্গে পাল্কী বইছে না। রাজা এইরকম নানাভাবে উপহাস করলেও ভরত কিছু না বলে আগের মতই পাল্কী-কাঁধে চলতে লাগলেন। কারণ ভূত, ইন্দ্রিয়, কর্ম, অন্তঃকরণ দিয়ে অবিদ্যা যে দেহ তৈরী করেছে তাতে তাঁর 'আমি', 'আমরা' এই মিথ্যা জ্ঞান ছিল না, তিনি ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থান করছিলেন। ১-৬

এদিকে পাল্কী সেই অসমান ভাবেই চলছে দেখে রহূগণ রেগে বললেন, ওরে, তুই কি বেঁচে আছিস না মরে গিয়েছিস? তুই প্রভুর আদেশ অবহেলা করে তাঁর অপমান করছিস। দাঁড়া, যম যেমন প্রাণীদের শাস্তি দেয়, আমিও তেমনি তোর অবহেলার চিকিৎসা করছি। তা হলে ঠিক সাবধান হবি। রাজা এইরকমে ভরতকে অনেক অসঙ্গত তিরস্কার করলেন। রাজা এবং পণ্ডিত বলে রহূগণের অভিমান ছিল। অখিল প্রাণীর বন্ধু পরব্রহ্মস্বরূপ ভরত শুধু একটু হেসে রাজাকে বললেন,

মহারাজ, আমার পরিশ্রম হয় নি, আমি দীর্ঘপথ চলিনি, তা আপনি ব্যঙ্গ করে আমাকে বললেও কথাগুলি কিন্তু সত্যি তিরস্কার নয়। পাল্কীর যে ভার তা যদি আমি বহন করতাম, পাল্কীতে যিনি যাচ্ছেন তাঁর যদি কোন গন্তব্যস্থান থাকত অথবা পথ বলে যদি কোন বস্তু থাকত তা হলে আপনার কথাকে তিরস্কার মনে করতাম। আর আপনি যে আমার দেহকে স্থূল বললেন তাও ঠিকই। কারণ ভূতগণের সমষ্টি এই দেহকে জ্ঞানীরা স্থূলই বলে থাকেন, চৈতন্য সম্বন্ধে 'স্থূল' কথাটির ব্যবহার হয় না। দেহের অভিমান নিয়ে যে জন্মেছে তারই স্থূলতা, কৃশতা, ব্যাধি আধি (মনের দুঃখ), ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ভয়, কলহ, ইচ্ছা, জরা, নিদ্রা, রতি, ক্রোধ, অহঙ্কার, মত্ততা এবং শোক হয়; আমার ওসব নেই। যদি আমাকে দেহাভিমানী বলেই মনে করে থাকেন তা হলেও আমি একাই জীবন্মৃত নই। যে পদার্থেরই বিকার বা পরিণাম আছে তাই জীবন্মৃত, তাদের সকলেরই আদি এবং অন্ত, উৎপত্তি এবং বিনাশ আছে। আবার, এ প্রভু ও ভৃত্য, এই সম্পর্কগুলি যদি চিরকালের মত স্থির থাকত তবে একে অপরকে কাজে নিযুক্ত করতে পারত। আজ যদি আপনার রাজত্ব চলে যায়, আর সেখানে আমি রাজা হই, তবে আপনার আর আমার বর্তমান সম্বন্ধ উল্টে যাবে। তাই রাজা আর তার ভৃত্যদের মধ্যে যে ভেদ, বিচার করে দেখলে তার কিছুই থাকে না, তা শুধু ব্যবহারেই প্রচলিত। তাই যদি হয় তবে প্রভু কে আর কার উপরেই বা প্রভুত্ব? এর পরেও যদি প্রভু বলে আপনার অভিমান থাকে, তা হলে বলুন আপনার কোন কাজ করতে হবে। পাগল বা জড়ের মত ব্যবহার করলেও আমি ব্রহ্মভাব পেয়েছি। এখন আপনি আমার চিকিৎসাই করুন কি আমাকে শিক্ষা বা দণ্ডই দিন তাতে আর কি ফল হবে? আর আপনি যদি মনে করেন আমি মুক্ত নই বা আমি জড়স্বভাব তাহলেও আমাকে শিক্ষা দেবার চেষ্টা করে কোন লাভ নেই। জড়স্বভাব ব্যক্তিকে শিক্ষা দিয়ে পটু করে তোলা যাবে না। ৭-১৩

শুকদেব বললেন, মহারাজ, ভরত এইভাবে রাজার কথার উত্তর দিলেন, তারপর নিজের প্রারব্ধ কর্ম ভোগের দ্বারা ক্ষয় করবার জন্য আগের মতই পাল্কী বহন করতে লাগলেন। যে অবিদ্যা 'দেহই আমি' এই বুদ্ধির কারণ, তাঁর তা ছিল না;—তাই রাজার শিবিকা বহন করতে তাঁর কষ্ট বা অপমান বোধ হল না। হে পাণ্ডব, সিন্ধুসৌবীর-রাজ রহূগণের শ্রদ্ধা ছিল। যাতে হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হয় এবং বহু যোগগ্রন্থে যা বলা হয়েছে, ব্রাহ্মণের মুখে তেমন কথা শুনে তিনি সম্ভ্রমের সঙ্গে পাল্কী থেকে নেমে তাঁর পায়ে পড়ে প্রণাম করলেন। তারপর নিজের অপরাধের মার্জনার জন্য 'আমি রাজা' এই অহংকার ত্যাগ করে বলতে লাগলেন, প্রভু, আপনার কাঁধে উপবীত দেখতে পাচ্ছি। আপনি কি কোন ব্রাহ্মণ, না দত্তাত্রেয় ইত্যাদির মধ্যে কোন অবধূত? আপনি কার পুত্র, কোথা থেকে এখানে এসেছেন? আমাদের মঙ্গলের জন্য যদি এসে থাকেন তবে কি আপনি কপিলমুনি? আমি ব্রাহ্মণকে অপমান করার অপরাধকে যতদূর ভয় পাই, ইন্দ্রের বজ্র, শিবের ত্রিশূল, যমের দণ্ড অথবা অগ্নি, সূর্য, চন্দ্র, বায়ু এবং কুবেরের অস্ত্রকে তত ভয় পাই না। হে সাধু, তাই আপনি কে তা বলুন। আপনি নিঃসঙ্গ হয়ে জড়ের মত ঘুরে বেড়াচ্ছেন, তবুও আমাদের কাছে আপনার অপার মহিমা প্রকাশ পাচ্ছে। কারণ আপনি যোগশাস্ত্রের যে সব কথা বললেন আমার মন তার তাৎপর্য বুঝতে অক্ষম। আপনার ঐসব কথা শুনে আমার জ্ঞানলাভের আকাঙ্ক্ষা হয়েছে। যোগেশ্বর, আত্মজ্ঞ মুনিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সাক্ষাৎ শ্রীহরি কপিলদেব আমার গুরু। এই সংসারে কার আশ্রয় গ্রহণ করা উচিত সেকথা জিজ্ঞাসা করবার জন্য আমি তাঁর কাছে যাচ্ছি। ১৪-১৯

আপনি কি লোকের অবস্থা দেখবার জন্য ছদ্মবেশে ঘুরছেন? আমি ঘরে বন্দী, বুদ্ধিহীন, যোগেশ্বরদের তত্ত্ব কি করে বুঝব? আপনি বললেন, আপনার পরিশ্রম হয় না। কিন্তু তা কি করে সম্ভব? যে-ই কোন কর্মের কর্তা হোক, তার কর্ম এবং পরিশ্রম দুইই আছে। আমি নিজেই যখন যুদ্ধ ইত্যাদি কর্ম করি, আমার শ্রম হয়। তাই আপনি যখন ভার বহন করছেন, তখন অনুমান করা যায় আপনার শ্রম হচ্ছে। তারপর আপনি যে বললেন, প্রভু-ভৃত্য ভাব শুধু ব্যবহারেই আছে অন্য কোথাও নেই, তাই এ মিথ্যা—এও আমার ঠিক মনে হচ্ছে না। আমি তাকে সত্য বলেই মনে করি। কারণ সত্যি ঘটে করেই জল আনা যায়, মিথ্যা ঘটে করে আনা যায় না। রান্নার পাত্রে তাপ লাগলে পাত্রের জল উত্তপ্ত হয়। সেই তাপে প্রথমে চালের বাইরের দিকটা সিদ্ধ হয়, তারপর চালের ভিতরের অংশ সিদ্ধ হয়ে থাকে। এর মধ্যে তো কিছু মিথ্যা দেখছি না। তেমনি গ্রীষ্মকালে দেহে তাপ লাগলে ইন্দ্রিয়গুলি উত্তপ্ত হয়। তা থেকে ক্রমে প্রাণ এবং মন তাপ পেয়ে থাকে, অবশেষে আত্মা সন্তপ্ত হয়। দেহের সঙ্গে আত্মার এইরকম সম্বন্ধ আছে বলে আত্মার সংসার হয়ে থাকে। তাই আপনি যে বললেন, স্থূলতা দেহের ধর্ম, আপনার তা নেই—সে কি করে সম্ভব? আবার প্রভু-ভৃত্যের সম্বন্ধের পরিবর্তন ঘটতে পারে, তবুও যখন যিনি রাজা তখন তিনি প্রজাদের শাসনকর্তা এবং রক্ষা-কর্তা। শিক্ষা দিয়ে জড়বুদ্ধি ব্যক্তিকে হয়তো পটু করে তোলা যায় না, তবুও রাজা যদি তাকে শিক্ষা দেন তবে তা একেবারে বিফলে যায় না। কারণ রাজা ঈশ্বরের দাস, ঈশ্বরের আদেশ পালন করাতেই তাঁর সাফল্য। তিনি যে রাজধর্ম পালন করেন তাতেই ঈশ্বরের আরাধনা হচ্ছে, এবং তিনি সব পাপ থেকে মুক্ত হচ্ছেন। ব্রাহ্মণ, আপনি যা যা বললেন সে সবই আমার কাছে বিপরীত মনে হচ্ছে। আপনি দয়া করে আমার দিকে স্নেহের দৃষ্টিতে তাকান। 'আমি রাজা' এই অভিমানে আমি আপনার মত সাধুপুরুষকে অপমান করে মহাপাপ করেছি। সেই পাপ থেকে আপনি আমাকে রক্ষা করুন। প্রভু, আপনি জগৎ-সংসারের সখা, সবার প্রতি আপনার সমান স্নেহ, এবং দেহের অভিমান নেই বলে সকলকে আপনি সমান চোখে দেখেন। তাই আপনাকে আমি যে অপমান করেছি তাতে আপনার অবশ্য কোন বিকার ঘটে নি, কিন্তু মহাজনকে অপমান করবার অপরাধে শূলপাণি মহাদেবেরও বিনাশ ঘটে থাকে, আমার মত লোকের তো কথাই নেই। ২০-২৫

একাদশ অধ্যায়

রাজাকে ভরতের উপদেশ

রহূগণের কথা শুনে ভরত বললেন, মহারাজ, আপনি অবিদ্বান হয়েও বিদ্বান লোকের মত কথা বলছেন। তাই আপনি জ্ঞানীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ একথা বলতে পারছি না। আপনি যে প্রভু-ভৃত্যের সম্বন্ধকে সত্য বলছেন জ্ঞানীদের বিচারে তা প্রমাণ হয় না। তেমনি কর্মকাণ্ড বেদে যেসব উপদেশ আছে তা গৃহস্থের অনুষ্ঠেয় যজ্ঞের বিবরণে পূর্ণ। সেই অনুসারে ফল আকাঙ্ক্ষা করে কর্ম করলে স্বর্গ ইত্যাদি যে ফল লাভ হয় তা অসার। তবে নিষ্কাম কর্মের ফল সত্য হয়। তাই বেদে বর্ণিত বিষয়ের মধ্যে হিংসা এবং রাগ ইত্যাদি ছাড়া তত্ত্বকথা বিশেষ

নেই। যিনি বেদান্ত শুনেছেন তিনিও কর্মে প্রবৃত্ত হয়েছেন এমন দেখা যায়। তাই কর্ম মিথ্যা নয় একথা বলা যায় না। কর্মের ফল যে সুখ তা হল নশ্বর বিষয়-সুখ। স্বপ্নে যে সুখ-দুঃখের ভোগ হয় তা অল্পস্থায়ী। স্বপ্নও মুহূর্তেই নষ্ট হয়ে যায়, তাই মিথ্যা। বিষয়-সুখ স্বপ্নের মত মিথ্যা। সুতরাং তাকে ত্যাগ করতে হবে একথা যিনি চিন্তা না করেন, বেদান্তের বাক্য তাঁকে তত্ত্বের কোন জ্ঞানই দিতে পারবে না। পুরুষের মন যতদিন তিন গুণের বশ থাকে ততদিন সেই মন অনায়াসেই জ্ঞান এবং কর্মের ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তাকে ধর্ম, অধর্ম দুরকম কাজই করায়। ধর্ম-অধর্মের কামনা রয়েছে মনের মধ্যে। বিষয়ে আবদ্ধ ঐ মনই আত্মার উপাধি। গুণগুলি মনকে এদিক ওদিক চালিত করে এবং গুণ থেকে যে কামনা ইত্যাদি জন্মায় তার প্রকাশও মনেই হয়ে থাকে। ষোল রকম বিকার হল পঞ্চভূত, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় এবং মন ; এদের মধ্যে মনই প্রধান। সে-ই ভিন্ন ভিন্ন নাম নিয়ে পশু-পাখী ইত্যাদি নানা দেহ ধারণ করে, আর ঐ দেহ অনুযায়ী মনের উৎকৃষ্টত্ব বা নিকৃষ্টত্ব প্রকাশ পায়। সুখ, দুঃখ, দুর্বার মোহ ইত্যাদি যা কিছু কালক্রমে উপস্থিত হয়, সে সবই সম্পূর্ণভাবে মনের সৃষ্টি। মনকে আত্মার উপাধি করে সৃষ্টি করেছে মায়া। তাই মন যেন আত্মাকে জড়িয়ে আছে অর্থাৎ অচেতন হয়েও নিজেকে চেতন বলে বোধ করছে। এই কারণেই মন জড় হয়েও সংসারচক্রে বাহিত হয়ে নানা ছলে সুখ-দুঃখ প্রভৃতি ফল উৎপন্ন করছে। ১-৬

এই সংসার যে জাগরণে এবং স্বপ্নে জীবের চোখে প্রকাশ পাচ্ছে তার মূলেও আছে মন। তাই জ্ঞানীরা মনকে সংসার আর মোক্ষ, নিকৃষ্ট আর উৎকৃষ্ট—এই দুয়েরই কারণ বলে থাকেন। মন যদি গুণে আসক্ত হয় তবে তা সংসার-দুঃখ ঘটায়, নির্গুণ হলে মোক্ষের কারণ হয়। প্রদীপে যতক্ষণ ঘি থাকে ততক্ষণই সে সলতের মাথায় ধোঁয়াযুক্ত জ্বলন্ত শিখা ধারণ করে। কিন্তু ঘি শেষ হলে আর ঐ শিখা থাকে না, তখন শুধু শিখাশূন্য প্রদীপটিই থাকে। তেমনি মন যতক্ষণ গুণ এবং কর্মে আবদ্ধ থাকে ততক্ষণই সে সংসারের নানা প্রবৃত্তি ধারণ করে, কিন্তু ঐ উভয়ের আসক্তি থেকে মুক্ত হলে স্বরূপে অবস্থান করে অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানের কারণ হয়। মনের বৃত্তি এগারোটি পাঁচটি ক্রিয়া, পাঁচটি জ্ঞান আর একটি হল অভিমান বা অহংকার। এই এগারোটি বৃত্তির এগারোটি বিষয় আছে। গন্ধ, রূপ, স্পর্শ, রস, শব্দ এরা নাসিকা ইত্যাদি পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয়। মলোৎসর্গ, রতি, গমন, কথন ও গ্রহণ হল পাঁচ কর্মেন্দ্রিয়ের বিষয়। আর দেহ হল অভিমানের বিষয়। যে অর্থে গন্ধ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয় বা মলোৎসর্গ কর্মেন্দ্রিয়ের বিষয়, দেহ কিন্তু ঠিক সেই অর্থে অভিমানের বিষয় নয়। 'এই দেহ আমার, এ আমার ভোগ করবার স্থান' এই বোধের জন্য তা অভিমানের বিষয়। অভিমান আবার দু'রকম—'আমার' এবং 'আমি'। যাঁরা বিবেকী তাঁরা দেহকে বলেন 'আমার', কিন্তু যে অজ্ঞান সে বলে 'আমি'। মূঢ়দের এই বোধকে অহংকার বলা হয় এবং অহংকার হচ্ছে দ্বাদশ বৃত্তি। শরীরই শয্যা নাম নিয়ে অহংকারের বিষয় হয়। শরীরের নাম পুর। জীব ঐ পুরে অহংকারের দ্বারা অর্থাৎ 'শরীরই আমি' এই জ্ঞানে, শয়ন করে বলে তার নাম পুরুষ। মহারাজ, স্বভাব, সংস্কার, অদৃষ্ট এবং কালের প্রভাবে মনের ঐ এগারোটি বৃত্তি প্রথমে একশত, তারপর হাজার, তারও পরে কোটি রকমের হয়ে প্রকাশ পায়। কিন্তু নিজে থেকেই বা পরস্পরের সাহায্যে যে তারা এই অসংখ্য রকমের হয় তা নয়, কেবল ঈশ্বরের অনন্ত শক্তি দ্বারাই তারা প্রকাশ পায়। তাঁর সত্তা থেকে তারা সত্তা লাভ করে। মায়ার রচনা মন হল জীবের উপাধি। মন

অশুদ্ধ এবং তাঁর কর্তৃত্বের অভিমান আছে। জাগ্রত এবং স্বপ্নের অবস্থায় তার বৃত্তিগুলির প্রবাহ অবিচ্ছিন্ন থাকে, সুষুপ্তি অবস্থায় লোপ পায়। ঐ তিন অবস্থারই সাক্ষী একমাত্র ক্ষেত্রজ্ঞ বা আত্মা। কাজেই এই মিথ্যা সংসারে আত্মাই হলেন সত্যবস্তু বা তত্ত্ব। ৭-১২

মহারাজ, ক্ষেত্রজ্ঞ দু'রকমের—জীব আর ঈশ্বর। জীবের স্বরূপ আগেই জানা হয়েছে। এবার ঈশ্বরের স্বরূপের কথা বলছি। ঈশ্বর আত্মা অর্থাৎ সর্বব্যাপী, এই জগতের কারণ, পূর্ণ স্বপ্রকাশ। তাঁর জন্ম ইত্যাদি নেই এবং ব্রহ্মা প্রভৃতিরও তিনি প্রভু। তিনি নারায়ণ অর্থাৎ সর্বজীবের নিয়ন্তা, ভগবান অর্থাৎ ষড়ৈশ্বর্যশালী। সবপ্রাণী তাঁকে আশ্রয় করে আছে, তাই তিনি বাসুদেব। নিজের অধীন মায়া দ্বারা তিনি জীবের মধ্যে থেকেও তার নিয়ন্তা হয়ে রয়েছেন। বাতাস যেমন প্রাণরূপে স্থাবর জঙ্গম সব প্রাণীর শরীরে থেকে তাদের উপর প্রভুত্ব করছে, সেইরকম সর্বেশ্বর ভগবান; ক্ষেত্রজ্ঞ বাসুদেব এই বিশ্বের সবকিছুর মধ্যে থেকে তাকে নিয়ন্ত্রিত করছেন। দেহধারী জীব যতদিন পর্যন্ত জ্ঞান লাভ করে মায়া ত্যাগ না করে এবং নিঃসঙ্গ এবং রিপুজয়ী হয়ে আত্মতত্ত্ব না জানে, ততদিন সে সংসারে ঘুরে বেড়ায়। মন আত্মার উপাধি এবং সংসারের দুঃখের ক্ষেত্র। কারণ রোগ, শোক, মোহ, লোভ, রাগ, দ্বেষ—এইসবের সঙ্গে সম্পর্ক থাকাতে মনে মমতা জন্মায়। বিষয়ে আসক্ত মনই সমস্ত অনর্থের মূল—জীব যতদিন একথা বুঝতে না পারবে ততদিন সংসার থেকে তার মুক্তি নেই। মহারাজ, আপনি মনরূপ শত্রুকে উপেক্ষা করেছেন। তাই সে বেড়ে গিয়ে খুব শক্তিশালী হয়েছে। মন নিজে মিথ্যা হলেও সে আত্মস্বরূপকে বিলুপ্ত করেছে। আপনি সাবধান হয়ে শ্রীহরির চরণ উপাসনা-রূপ অস্ত্রে তাকে ধ্বংস করুন। ১৩-১৭

দ্বাদশ অধ্যায়

রাজা রহূগণের সন্দেহভঞ্জন

রহূগণ বললেন, যোগেশ্বর, লোকরক্ষার জন্য ঈশ্বরের মতই আপনি এই দেহ ধারণ করেছেন। পরম আনন্দের প্রকাশে দেহ আপনার কাছে তুচ্ছ হয়েছে, পতিত ব্রাহ্মণের বেশে আপনার ব্রহ্ম-অনুভব গোপন রয়েছে। আপনাকে আমি বার বার নমস্কার করি। ভগবান কুৎসিত দেহের অভিমানরূপ সাপ আমার বিবেককে দংশন করেছে। তাই জ্বরে কাতর ব্যক্তির কাছে সুস্বাদু ওষুধ আর গ্রীষ্মে কাতর ব্যক্তির কাছে শীতল জল যেমন সুখকর, আমার পক্ষে আপনার কথাও তেমনি অমৃতের কাজ করল। আমার সন্দেহের কথা আপনাকে পরে জিজ্ঞাসা করছি। এখন আপনি যা বললেন তা একটু ব্যাখ্যা করে বলুন, কারণ আপনার কথা সবই অধ্যাত্মযোগের বিষয় বলে তা বোঝা খুবই শক্ত। যোগেশ্বর, এই ভারবহনের কাজ এবং তার ফল পরিশ্রম, এ. যে সত্য তাতো চোখের দেখাতেই প্রমাণ হচ্ছে। স্বপ্ন ভেঙে গেলে যেমন হয় সেরকম কোন ছেদও এতে পড়ছে না। তবুও আপনি বললেন যে এগুলো কেবলই ব্যবহারিক সত্য, এবং এর সাহায্যে প্রকৃত তত্ত্ব জানা যায় না। আপনার এই কথায় আমার মনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হচ্ছে। ভরত বললেন, মহারাজ, আসলে যা মাটিরই একটা রূপান্তর সেরকম একটি বস্তু, যে কারণেই হোক, চলে বেড়াচ্ছে, আর তাকেই বলা হচ্ছে ভারবাহক। এক খণ্ড পাথরও

ঐ মাটিরই আর একটি রূপ বা বিকার, তবে তা চলে না, এই পার্থক্য। পাথর জড় পদার্থ, তাই তার ভার এবং পরিশ্রম নেই সেকথা বলা যায় না। কিন্তু এক্ষেত্রে শ্রমের আশ্রয় অর্থাৎ শ্রমবোধ যে করবে তাকে পাওয়া যাচ্ছে না। ঠিক তেমনি, মাটির যে বিকার চলে বেড়াচ্ছে, যাকে আমরা ভারবাহক নাম দিয়েছি, সেখানেও তো শ্রমের আশ্রয় বা শ্রম অনুভব করার মত কাউকে পাওয়া যাচ্ছে না। কারণ সেই বিকারের দুই পায়ের উপর ক্রমে গোড়ালি, জঙ্ঘা, হাঁটু, উরু, কোমর, বুক, গলা, কাঁধ, মাথা এইসব রয়েছে। এগুলো তো কতকগুলি অবয়ব মাত্র, কিন্তু যার ভার আর শ্রমবোধ হবে সেই অবয়বী কোথায় ? কয়েক টুকরো কাঠের বিকার এই পাল্কীটা সেই কাঁধের উপর রয়েছে। পাল্কীর মধ্যে মাটির বিকার যে বস্তুটি রয়েছে, মাত্র নামেই তা সৌবীর-রাজ। আপনি তাকেই 'আমি' মনে করছেন এবং 'আমি সিন্ধুদেশের রাজা' এই গর্বে অন্ধ হয়েছেন। ১-৬

'আমি অজ্ঞ হলেও প্রজাশাসন করা আমার রাজধর্ম' আপনার এই কথাও আপনার আচরণের বিপরীত। দুঃখে, দারিদ্র্যে ক্লিষ্ট এই যে হতভাগ্য লোকগুলোকে আপনি জোর করে ভার বহন করবার কাজে লাগিয়েছেন তাতে আপনার নিষ্ঠুরতাই প্রকাশ পাচ্ছে। তবু যে আপনি প্রজাপালক বলে গর্ব করছেন এই নির্লজ্জতার জন্য জ্ঞানীদের মধ্যে আপনার আদর হবে না। মহারাজ, যদি বলেন ক্রমে ক্রমে এক এক অবয়বের ভার তার আগের আগের অবয়বের উপর পড়ছে, সে কথাও খাটবে না, কারণ ঐ অবয়বগুলির প্রকৃত রূপ নির্ণয় করা যায় নি। যেসব অবয়বের কথা বলা হয়েছে সেগুলো সবই পৃথিবী (মাটি) থেকে জন্মেছে, আবার পৃথিবীতেই লয় পাবে। চর, অচর সব পদার্থেরই এই একই গতি, পার্থক্য শুধু নামে। কাজেই আমরা যা কিছু দেখছি সে সবেরই মূলে ঐ মিথ্যা নাম। এছাড়া যদি অন্য কোন যথার্থ মূলের কথা আপনার জানা থাকে, তবে বলুন। আবার পৃথিবী থেকে সব বিকারের (নানারূপের) সৃষ্টি বলে, পৃথিবীই যে সত্য তাও নয়। এক সময় পৃথিবী সূক্ষ্ম সব পরমাণুতে লীন হয়। তাই পরমাণু ছাড়া পৃথিবী বলে অন্য বস্তু নেই। কিন্তু পরমাণুকেও সত্য মনে করবেন না। পরমাণু ছাড়া পৃথিবীর উৎপত্তি সম্ভব নয়, এই যুক্তিতে পরমাণুর কল্পনা করে তাকে পৃথিবীর উপাদান বলা হয়েছে। যদি বলেন অবয়বী না থাকলেও পরমাণুর সমষ্টিকেই সত্য বলব, তা হলেও চলবে না। কারণ এই জগৎ ঈশ্বরের মায়াতে প্রকাশিত, তাই পরমাণুর কল্পনাও অবিদ্যা বা অজ্ঞান থেকেই হয়েছে। এইরকম হ্রস্ব-দীর্ঘ, ছোট-বড়, কার্য-কারণ, চেতন-অচেতন পদার্থ, স্বভাব, সংস্কার, কাল, অদৃষ্ট—যা কিছুই দ্বৈত বা স্বতন্ত্র বলে বোধ হয় সে সবই মায়ার রচনা, কতগুলো মিথ্যা নাম মাত্র। এখন সত্য কি তা বলি শুনুন। জ্ঞানই সত্য ; ব্যবহারিক বা প্রচলিত ধারণাতেই যে তা সত্য তাই নয়, তা পারমার্থিক সত্য। এই জ্ঞান বিশুদ্ধ, এক ; এ বাইরে এক-রকম ভিতরে আর একরকম নয়, এ ব্রহ্ম অর্থাৎ পরিপূর্ণ, নির্বিকার। এই জ্ঞান ছয় ঐশ্বর্যে মণ্ডিত বলে এর নাম ভগবান। জ্ঞানিগণ একে বাসুদেব বলে থাকেন। ৭-১১

রহূগণ, তপস্যা, বৈদিক কর্ম, অন্নদান, পরের উপকার, বেদ-শিক্ষা এবং বরুণ, অগ্নি, সূর্য ইত্যাদির উপাসনা দ্বারা এই জ্ঞান লাভ করা যায় না। মহাজনের পদধূলির অভিষেক ছাড়া অর্থাৎ মহতের সেবা ছাড়া এই জ্ঞান পাবার অন্য পথ নেই। সাধু মহাজনেরা সর্বদা ভগবানের পবিত্র গুণকীর্তন করেন, কোন নীচ বিষয়ের সঙ্গে তাঁরা সম্পর্ক রাখেন না। যিনি মুক্তি চান তিনি তাঁদের কাছে সবসময় ভগবানের গুণকীর্তন শুনে বাসুদেবে শুদ্ধা ভক্তি লাভ করেন। মহারাজ,

আমি আগে ভরত নামে রাজা ছিলাম, ইহলোক আর পরলোকের সব আসক্তি থেকে মুক্ত হয়ে আমি ভগবানের আরাধনা করতাম। দৈববশে একটি হরিণের উপর আমার মন এমনভাবে আসক্ত হয়ে পড়ে যে আমাকে হরিণ হয়ে জন্মাতে হয়। কিন্তু কৃষ্ণের অর্চনা করেছিলাম বলে ঐ হরিণের দেহেও আমার আগেকার স্মৃতি লোপ পায় নি। পাছে লোকের সংস্পর্শে এলে আবার ঐরকম মায়ায় আবদ্ধ হই, সেই ভয়ে আমি নিজেকে গোপন রেখে নিঃসঙ্গ অবস্থায় ঘুরে বেড়াচ্ছি। নিঃসঙ্গ মহাজনদের সঙ্গ থেকে যে জ্ঞান জন্মে, সেই জ্ঞানের খড়্গ দিয়ে মানুষ মোহ ছিন্ন করে। তারপর শ্রীহরির লীলা কীর্তন করে আর তা শুনে সে সংসার-সমুদ্র পার হয়ে শ্রীহরিকেই লাভ করে। ১২-১৬

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ভরতের সংসার-অরণ্য বর্ণনা

ভরত বললেন, সংসারের পথ অতি দুর্গম। অবিদ্যাই জীবকে এই পথে নিয়ে আসে। তাই সত্ত্ব, রজ আর তম এই তিন গুণের দ্বারা চালিত হয়েও সে কাম্য-কর্মে আসক্ত হয়। অর্থের সন্ধানে ঘুরতে ঘুরতে বণিক যেমন বনের মধ্যে গিয়ে ঢোকে, জীবও তেমনি সুখের খোঁজে ঘুরতে ঘুরতে সংসার-অরণ্যে ঢোকে বটে, কিন্তু সুখ পায় না। মহারাজ, এই অরণ্যে ছয়জন ভীষণ দস্যু আছে। তারা ঐ বণিকদের দলপতিকে অযোগ্য দেখলে জোর করে তাদের সর্বস্ব লুঠ করে। ঐ বনে শিয়ালও আছে বহু। নেকড়ে যেমন ভেড়া ধরে নিয়ে যায়, ঐ শিয়ালেরাও তেমনি বণিকদের দলের অসাবধান ব্যক্তিকে টেনে নিয়ে যায়। এই বনে ঘাস লতাপাতায় ঢাকা অনেক গহ্বর আছে। যারা ঐসব গহ্বরে গিয়ে পড়ে, দারুণ দংশ (ডাঁশ) আর মশার কামড়ে তারা অস্থির হয়। তারা কখনও গন্ধর্বপুর[১] দেখে কখনও বা দ্রুতগামী উল্মুকের[২] মত সব পিশাচকে পরম কাম্যবস্তু মনে করে তাদের দিকে তাকিয়ে থাকে। ধন, জন, বাসস্থান—এসবের জন্য আকুল হয়ে তারা বনের মধ্যে ছুটোছুটি করতে থাকে। কখনও ধুলোর ঝড়ে চারদিক ঢাকা পড়ে গেলে তারা কিছুই চোখে দেখতে পায় না। কখনও বা অদৃশ্য ঝিঁঝিঁর ডাক শূলের মত তাদের কানে এসে বেঁধে, কখনও উল্লুকের চীৎকারে অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে। ক্ষুধায় কাতর হয়ে তারা যেসব গাছকে আশ্রয় মনে করে তাদের ছায়া স্পর্শ করাও পাপ। কখনও তারা জল ভেবে মরীচিকার পেছনে ছোটে, কখনও বা শুকনো নদীতে পড়ে গিয়ে হাত পা ভাঙে, অথচ জল পায় না। খেতে না পেয়ে কখনও বা একে অপরের কাছে খাবার ভিক্ষা করে। কখনও দাবানলের কবলে পড়ে তাপে কষ্ট পায়, কখনও তাদের প্রাণের থেকে প্রিয় ধন যক্ষেরা চুরি করাতে শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়ে। ১-৬

মহারাজ, কখনো শক্তিমান শত্রু তাদের সর্বস্ব কেড়ে নিলে শোকে বিহ্বল হয়ে তারা জ্ঞান হারায়, কখনও গন্ধর্বনগরে ঢুকে হয়তো মুহূর্তে আনন্দে কাটায়,

---

১ মরীচিকা বা আকাশ-কুসুম জাতীয় অবাস্তব বস্তু। ২ জ্বলন্ত অঙ্গার; ঐরকম দেখতে কোন পিশাচ ইত্যাদি।

কোথাও পাহাড়ে চড়তে গিয়ে কাটায়, কাঁকরে পা ক্ষতবিক্ষত হওয়াতে অন্যদিকে আর মন থাকে না। কখনও বা পোষ্য-পরিজন খেতে না পেয়ে ক্ষুধার জ্বালায় তাদের গঞ্জনা দিতে থাকে। কোন সময় লোকে ঐ অরণ্যে মৃতদেহের মত পড়ে থাকে, এদিকে যে অজগর তাকে গিলে খাচ্ছে, জানতেও পারে না। আবার অন্য সময় হিংস্র জন্তুর কামড়ে জ্ঞান হারিয়ে, অন্ধকূপে গিয়ে পড়ে। কেউ বা পরস্ত্রী-সংসর্গের মধু খুঁজতে গিয়ে সেই নারীর রক্ষকরূপী মাছির কামড়ে জ্বালাতন হয়। যদি বহুকষ্টে ছিটেফোঁটা রস জোটেও তা ভোগে লাগে না, অন্য কেউ কেড়ে নেয়। কেউ কেউ শীত-গ্রীষ্ম বৃষ্টি-বাতাসের থেকে নিজেদের বাঁচাতে না পেরে কাতর হয়, কেউবা কেনা-বেচা করে ব্যবসা করতে গিয়ে লোক ঠকিয়ে লোকের বিরাগভাজন হয়। কোথাও বা লোকে অর্থের অভাবে শোওয়া, বসা, থাকার জায়গা না পেয়ে অন্যের কাছে চায়। না পেলে পরের ধনে লোভ করে তা নেবার চেষ্টায় অপমানিত হয়। ৭-১২

এই সংসার-অরণ্যে ঘুরতে ঘুরতে কোন কোন লোক পরস্পরের সংগে অর্থের লেনদেন করতে গিয়ে শত্রুতার সৃষ্টি করেও আবার তাদের সংগেই বিবাহ ইত্যাদির দ্বারা মিলিত হয়। কেউ কেউ বা অতিরিক্ত পরিশ্রম, অর্থনাশ, রোগ-শোক—এই সবের জন্য বিপন্ন হয় অর্থাৎ তাদের মৃত্যু হয়। লোকেরা ঐ মৃত ব্যক্তিদের সেখানেই ফেলে রেখে অন্য জায়গায় নূতন লোকের সংগে গিয়ে মেলে। কিন্তু তাদের মধ্যে কেউ আজও আগের জায়গায় ফিরে আসতে পারেনি বা ঐ পথের শেষে গিয়ে পৌছাতে পারে নি অর্থাৎ যোগসিদ্ধি লাভ করে নি। যে সব মহাবীর মত্ত হাতীকেও হারিয়েছে তারাও ভূসম্পত্তির জন্য, গৃহের জন্য অন্যের সংগে শত্রুতা করে মরে। কিন্তু সমস্ত কর্ম ভগবানে অর্পণ করে সন্ন্যাসীরা যে পরমপদ পেয়ে থাকেন ঐ বীরেরা তা পায় না। কোন জায়গায় লোকে পাখীর (অর্থাৎ শিশুদের) মধুর কলগুঞ্জন শোনার আগ্রহে নারীর বাহুরূপ লতার বাঁধনে বাঁধা পড়ে, কখনও বা তারা সিংহের ভয়ে বক, কংক, শকুনি (প্রতারক) ইত্যাদির সংগে বন্ধুত্ব করে। আবার ঐ পাখীদের কাছে প্রতারিত হয়ে তারা হাঁসেদের সংগে মিশতে যায়। কিন্তু তাদের আচার-ব্যবহার ভাল না লাগাতে বানরদের দলে মিশে তাদের সংগে খেলাধূলায় মগ্ন হয়ে যায়। পরস্পরের মুখ দেখতে দেখতে তারা এমন মুগ্ধ হয় যে আসন্ন মৃত্যুর কথাও মনে থাকে না। এইভাবে গাছে গাছে ঘুরতে ঘুরতে স্ত্রী-পুত্রের স্নেহের, প্রেমের বাঁধনে বাঁধা পড়ে এবং সম্ভোগের কামনায় আচ্ছন্ন হয়ে অতি দীন অবস্থার মধ্যে পড়ে। শত চেষ্টায়ও সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না। কখনও বা অসাবধান হয়ে পাহাড়ের গর্তে পড়তে পড়তে সাক্ষাৎ শমনরূপী হাতীর ভয়ে একটা লতা (সঞ্চিত কর্ম) ধরে ঝুলে থাকে। তারপর কালক্রমে বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়ে আবার দলে গিয়ে মেশে। অবিদ্যার বশে পুরুষ চিরকাল এই দুর্গম সংসারপথে ঘুরছে, কিন্তু আজ পর্যন্ত তার পার (পরমতত্ত্ব) খুঁজে পায় নি। মহারাজ রহূগণ, আপনি নিজে ঐ ভাবেই ঘুরছেন। তাই আপনি বিষয়-কামনা ত্যাগ করে সন্ন্যাস নিন, সমস্ত প্রাণীর প্রতি দয়াবান হোন। শ্রীহরির সেবা করতে করতে জ্ঞানের ক্ষুরধার তরবারি হাতে নিয়ে সংসারপথ পার হয়ে চলে যান। ১৩-২০

ঐসব কথা শুনে রাজা আনন্দিত হয়ে বললেন, পৃথিবীতে মানুষ হয়ে জন্মান পরম সৌভাগ্যের বিষয়। সমস্ত জন্মের থেকে মানুষজন্ম শ্রেষ্ঠ। দেবজন্ম হয়তো এর থেকেও ভাল, কিন্তু তাতে কি লাভ? ভগবানের পবিত্র লীলাকীর্তনে যাঁদের চিত্ত শুদ্ধ হয়েছে, সেই মহাজনেরা মর্ত্যে প্রায়ই এসে থাকেন, কিন্তু স্বর্গে তাঁদের দেখা মেলে কমই! এইসব সাধুদের পায়ের ধুলোয় যাদের পাপ দূর হয়েছে তাদের যে

শ্রীহরির প্রতি নির্মল ভক্তি জন্মাবে তাতে আর আশ্চর্য কি। এক মুহূর্ত আপনার কৃপা পেয়ে আমার মনের বদ্ধমূল অজ্ঞান নষ্ট হল। ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি কখন যে কি বেশে থাকেন তা বোঝা যায় না। তাই আমি ক্ষুদ্র শিশু থেকে শুরু করে বালক, যুবক প্রভৃতি সকলকেই বার বার নমস্কার করছি। অবধূতের বেশে যে ব্রাহ্মণরা পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াচ্ছেন রাজারা যেন তাঁদের আশীর্বাদ পান। শুকদেব বললেন, পরীক্ষিৎ; ভরত মহাকরুণাময় বলে সিন্ধুরাজ রহূগণ তাঁকে অপমান করলেও তিনি কিছু মনে করলেন না, বরঞ্চ তাঁকে আত্মতত্ত্বের উপদেশ দিলেন। রহূগণ অতি দীনের মত তাঁর চরণ বন্দনা করলেন। ইন্দ্রিয়ের সমস্ত ক্ষোভ প্রশমিত হওয়াতে ভরতের হৃদয়ে পরম প্রশান্তি বিরাজ করছিল। নিস্তরঙ্গ সমুদ্রের মত স্থিরচিত্তে আবার তিনি পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। সৌবীররাজ রহূগণ তাঁর কাছে পরম জ্ঞান লাভ করে তখনি দেহাত্মবোধ থেকে মুক্ত হলেন। শ্রীভগবানের পাদপদ্ম যিনি আশ্রয় করেছেন সেই ভক্তের যাঁরা সেবক তাঁদেরও কতখানি শক্তি দেখ। অনাদিকালের অজ্ঞান মুহূর্তে দূর হয়ে গেল। পরীক্ষিৎ বললেন, মহাভাগবত, আপনি সর্বজ্ঞ। বণিক এবং দস্যু ইত্যাদির রূপকের মধ্য দিয়ে আপনি যে আশ্চর্য সংসার-পথের বর্ণনা করলেন বিবেকী ব্যক্তি বুদ্ধি দিয়ে তার আসল অর্থ বুঝে নিতে পারবেন, কিন্তু সাধারণ অজ্ঞ লোক তো সহজে তা পারবে না। তাই এই কঠিন বিষয়টি একটু সহজ করে আমাকে বুঝিয়ে দিন এই প্রার্থনা করি। ২১-২৬

চতুর্দশ অধ্যায়

সংসার-অরণ্যের প্রকৃত অর্থ

শুকদেব বললেন, মহারাজ, বিষ্ণুর মায়া সমস্ত জীবকে অতি দুর্গম পথের তুল্য এই সংসারে টেনে এনেছে। ছটি ইন্দ্রিয় এই কাজে তাকে সাহায্য করছে। কেন না তারাই হল জন্ম আর মৃত্যুরূপ যে অনাদি সংসার তাকে ভোগ করবার উপায়। শুভ, অশুভ আর মিশ্র এই তিন রকম কর্ম অনুসারে বিভিন্ন জীবদেহ নির্মিত হয়। কর্ম যে ঐ তিন রকমের হয় তারও কারণ হল সত্ত্ব, রজ, তম এই তিন গুণ। বণিকেরা যেমন ধন উপার্জনের আশায় বনে গিয়ে ঢোকে তেমনি দেহাভিমানী জীব নিজের কৃতকর্মের ফল দেহের দ্বারা ভোগ করবার জন্যই এই অমঙ্গল সংসার-অরণ্যে প্রবেশ করে। কোনও কাজ করলে কখনও তা সফল হয়, কখনও নানা বাধা-বিঘ্নের জন্য বিফল হয়। বিফল হলে তার দুঃখ ভোগ করতে হয়। শ্রীহরিই হলেন গুরু, ভক্তেরা তাঁর চরণপদ্মের মধুকর। তাঁদের পথ হচ্ছে ভক্তির পথ, এই পথই সংসার-দুঃখের পারে নিয়ে যেতে পারে। কিন্তু জীব এই পথে আসছে না। ছয় ইন্দ্রিয় সংসার-অরণ্যে ছয় দস্যুর কাজ করছে। পরমপুরুষের আরাধনারূপ যে ধর্ম সে ধর্ম আচরণ করলে পরলোকে মঙ্গল হয়; কিন্তু দস্যুরা যেমন মানুষের বহুকষ্টে উপার্জন-করা ধন লুণ্ঠন করে নেয়, ঐ ইন্দ্রিয়গুলিও তেমনি ভগবানের আরাধনার জন্য মানুষ বৈরাগ্য ইত্যাদি যা কিছু ধন সঞ্চয় করে সে সবই কেড়ে নেয়। কুবুদ্ধি যাকে চালায়, আর মন যার বশে নেই, তার জ্ঞানের ইন্দ্রিয়গুলি দর্শন, স্পর্শন, শ্রবণ, আস্বাদন ইত্যাদি দ্বারা তাকে নানা তুচ্ছ সুখে আকৃষ্ট করে তার ধন চুরি করে। মহারাজ, এই অরণ্যে যে বাঘ, শিয়ালের কথা বলা হয়েছিল তারা হল স্ত্রী, পুত্র

প্রভৃতি আত্মীয়েরা। কারণ শিয়াল প্রভৃতি যেমন অনেক সাবধানে-রাখা ভেড়ার বাচ্চাকে চুরি করে নিয়ে পালায়, তেমনি ঐ আত্মীয়েরাও সংসারী ব্যক্তির অনেক যত্নের ধন ধর্মকে চুরি করে। সংসার-অরণ্যে ঘাস-লতা-পাতায় ঢাকা অনেক দুর্গম গহ্বর আছে, একথার অর্থ হল—প্রতিবছর ক্ষেত চাষ করলে কিছু কিছু বীজ সময়ে অঙ্কুরিত হয় না। সেগুলো থেকে পরে ঘাস, লতাপাতা ইত্যাদি জন্মে ক্ষেত ঢেকে ফেলে এবং গহ্বরের মত দেখায়। সেইরকম গৃহাশ্রম হল ক্ষেত। এখানে কর্ম কখনই একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায় না। গৃহ কাম্যকর্মের আধার। যেমন কর্পূরের পাত্রের কর্পূর নিঃশেষ হলেও তার গন্ধ থেকে যায়, তেমনি কর্ম ক্ষয় হলেও বাসনা থেকে যায় বলে একেবারে নির্মূল হয় না। এই গৃহাশ্রমে যে আসক্ত হয়েছে ডাঁস, মশা প্রভৃতির তুল্য নীচ ব্যক্তি এবং শলভ[১], শকুন্ত[২], মূষিক প্রভৃতির মত চোরেরা তার বহিঃপ্রাণ অর্থাৎ ধন-সম্পত্তি তাকে কষ্ট দিয়ে নিয়ে পালায়। তবুও কিন্তু সে তার পথ ছাড়ে না অর্থাৎ গৃহাশ্রমেই থেকে যায়। অবিদ্যা আর বাসনা-কামনায় তার দৃষ্টি অন্ধ হওয়াতে সে গন্ধর্বপুরীর মত অবাস্তব নরলোককে সত্য বলে মনে করে। আবার কোথাও পান, ভোজন, স্ত্রীসঙ্গ ইত্যাদির লোভে এমন উন্মত্ত হয় যে জলের আশায় মিথ্যা মরীচিকার পেছনে ছোটার মত সুখের আশায় বিষয়ের পেছনে ছোটে, কিন্তু শান্তি পায় না। ১-৬

কোন কোন স্থানে উল্মুক, পিশাচ দেখে সোনা মনে করে তার দিকে দৌড়ায় এর অর্থ হল—যেমন শীতে কাতর হলে লোকে জ্বলন্ত আলেয়া দেখলেও আগুনের প্রত্যাশায় তার দিকেই ছুটে যায়, তেমনি সোনার বর্ণ রজোগুণে যাদের চিত্ত পূর্ণ তারা অগ্নির বিষ্ঠাতুল্য সোনা পাবার জন্য পাগলের মতো ছোটে। সোনা কিন্তু অনেক দোষের আধার, তার জন্য জীব অনেক অধর্মের কাজ করে থাকে। নিবাস, জল, ধন এসবের কথা যা বলেছি তার অর্থ হল—বাসস্থান, ধন এবং পানের জল ইত্যাদি উপজীবিকার জন্য জীব ব্যাকুল হয়ে ছুটে বেড়ায়। কোথাও বা ধুলোয় পড়ে চোখ অন্ধ হয়ে কিছু দেখতে পায় না বলে যা বলেছি তার তাৎপর্য হল—সংসারে স্ত্রী হচ্ছে ঝড়রূপিণী। তার বশ হয়ে সঙ্গ করলে রজোগুণে চিত্ত পূর্ণ হয়, এবং জ্ঞানের শক্তি রুদ্ধ হয়। এই অবস্থায় মানুষ শাস্ত্রের মর্যাদা লংঘন করে চলে। রাত্রিতে ভূতগণ যেমন সব কাজের সাক্ষী, তেমনি দিক্‌দেবতারা যে সব কাজেরই সাক্ষী, মোহের বশে তা সে জানতে পারে না। পুরুষ কখনও কখনও ধারণা করে যে এই সংসারটা মিথ্যা, কিন্তু দেহাভিমানের জন্য আবার তা ভুলে যায়। তখন সে আবার জলের জন্য মরীচিকার দিকে ছোটার মত বিষয়ের পেছনে ছোটাছুটি করে। ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক শূলের মত কানে বেঁধে, এই কথার তাৎপর্য হল—প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে রাজপুরুষ বা শত্রুর কর্কশ তিরস্কার পুরুষের কানেও শূলের মত বিদ্ধ হয়, আবার মনেও ব্যথা দেয়। যেসব গাছের ছায়া স্পর্শ করাও পাপ, এই কথার অর্থ—সংসারে পুরুষের পূর্বে কৃত পুণ্যের ফলভোগ যখন শেষ হয়ে যায় তখন সে জীবন্মৃতের মত হয়ে এমন সব লোকের কাছে ধন ভিক্ষা করতে যায় যাদের জীবন বিষাক্ত গাছ, লতা আর বিষাক্ত জলে পূর্ণ কূপের মতই অসার্থক অর্থাৎ যাদের ধন ইহলোক বা পরলোকে কোন কাজে লাগে না। ৭-১২

বণিকগণ কখনও জলের আশায় জলশূন্য নদীগর্ভে গিয়ে পড়ে, একথার অর্থ—কখনও জীব অসৎসঙ্গে পড়ে বুদ্ধি হারায় এবং ইহকাল পরকালে অশেষ দুঃখ ভোগ,

---

২ শস্যনাশকারী পতঙ্গ; পঙ্গপাল। ২ শকুন।

করে। কখনও পরস্পরের কাছে খাদ্য ভিক্ষা করে, অর্থাৎ সংসারে পুরুষ যখন ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর হয়ে অন্ধের মত হয় তখন খাদ্যের জন্য পিতা পুত্রকে, পুত্র পিতাকে পীড়ন করে। দাবানলের কবলে পড়ে কষ্ট পায়, একথার অর্থ—গৃহ হচ্ছে দাবানলের মত আর প্রিয় বস্তু না পাওয়ার দুঃখ তার উত্তাপ। সংসারে সুখের লেশমাত্র নেই। পুরুষ এখানে শোকের আগুনে পুড়ে শুধু কষ্টই পায়। কখনও যক্ষেরা তাদের প্রাণের থেকে প্রিয় ধন চুরি করে ইত্যাদি যা বলেছি তার তাৎপর্য—কখনও রাজা বিরূপ হয়ে প্রাণের মত প্রিয় ধনসম্পত্তি কেড়ে নেয়, পুরুষ তার প্রতিকার করতে না পেরে দুঃখ পায় আর মৃতলোকের মত নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকে। গন্ধর্বনগরে মুহূর্ত আনন্দে কাটাবার অর্থ—পুরুষ কখন কখন পিতা পিতামহ ইত্যাদি যাঁরা আর জীবিত নেই চিন্তায় তাঁদের পেয়ে মনে করে যেন তাঁরা বেঁচে আছেন এবং তার ফলে স্বপ্ন দেখার মত ক্ষণিক সুখ অনুভব করে। গৃহাশ্রমে যে সব কর্মের বিধি আছে সেগুলি অতি বিস্তৃত এবং তাই পর্বতের মত দুর্গম। পুরুষ সেগুলো শেষ করবার সংকল্প নিয়ে কখনও কখনও তার দিকে যায়, কিন্তু আবার কাঁটা-কাঁকরে ঢাকা পথে চলতে যেমন কষ্ট পায় তেমনি কষ্টে কাতর হয়ে ফিরে আসে। ১৩-১৮

যেই পুরুষের আত্মীয় পরিজন অনেক, সে যথেষ্ট আহার না পেলে দারুণ ক্ষুধার জ্বালায় অধৈর্য হয়ে পড়ে এবং সবার উপর রাগ করতে থাকে। কখনও বা নিদ্রা তাকে অজগরের মত গ্রাস করে। তখন সে ঘোর অন্ধকারে ডুবে থাকে, কিছুই জানতে পারে না এবং তাকে দেখে মৃতদেহের মত মনে হয়। সংসারে পুরুষের গর্ব কখনো কখনো খর্ব হয়, সাপের মত দুর্জন ব্যক্তিরা অনেক সময় তার ঘুম কেড়ে নেয়। তখন দুঃখে জ্ঞানশূন্য হয়ে সে অন্ধকূপে পড়ে, অর্থাৎ নরকে যায়। কাম হচ্ছে কণা, কণা মধুর মত। তার সন্ধানে ঘুরে পুরুষ পরের স্ত্রী বা পরের ধন জোর করে নিতে চেষ্টা করলে ঐ স্ত্রীর স্বামী বা রাজপুরুষের হাতে নিহত হয়ে সে অনন্ত নরক লাভ করে। কর্ম অনুসারেই জীব এই নরক ভোগ করে। তাই পণ্ডিতেরা বলেন যে ইহলোকে এবং পরলোকে কর্ম থেকেই জীবের সংসার হয়ে থাকে। একজনের কাছ থেকে আর একজন যদি কোন বস্তু পায়ও তাহলেও আবার তার কাছ থেকে অন্য কেউ, যেমন ধরা যাক দেবদত্ত, কেড়ে নেয়। দেবদত্তের থেকে হয়তো নেয় বিষ্ণুমিত্র। এইরকম ক্রমাগত চলতে থাকায় সে বস্তু কারো ভোগেই আসে না। ১৯-২৪

সংসারে শীত-গ্রীষ্ম ইত্যাদি অনেক আধিদৈবিক, আধিভৌতিক এবং আধ্যাত্মিক দুঃখের প্রতিকার করতে না পেরে মানুষ বিষণ্ণ হয়। কোন কোন জায়গায় আবার পরস্পর ধন বিনিময় করে বা অন্যের সামান্যতম ধন এমন কি কাকিণিকা (কুড়িটি কড়া) মাত্র চুরি করে পরস্পরকে বঞ্চনা করে ঝগড়ার সৃষ্টি করে। মহারাজ, এ সংসারে ধনাভাবের কষ্ট ইত্যাদি তো আছেই ; তার উপরও আছে সুখ, দুঃখ, রাগ, দ্বেষ, ভয়, অভিমান, প্রমাদ, উন্মাদ, শোক, মোহ, লোভ, মাৎসর্য, ঈর্ষা, অপমান, ক্ষুধা, পিপাসা, আধি (মনের কষ্ট), ব্যাধি, জন্ম, জরা, মরণ ইত্যাদি নানা উপসর্গ। কোথাও বা দেবমায়ারূপিণী স্ত্রীর বাহুপাশে বদ্ধ হয়ে পুরুষ বিবেক এবং জ্ঞান হারিয়ে ফেলে এবং সেই নারীর খেলাঘর তৈরী করবার জন্য ব্যাকুল হয়। পুত্র-কন্যাদের দেখে, তাদের কথা শুনে সে এমন মোহিত হয়ে যায় যে আত্মাকে ঘোর অন্ধকারে বিসর্জন দেয়। হরিচক্রের অর্থ পরমেশ্বর বিষ্ণুর কালরূপ চক্র। ঐ চক্র বেগে ঘুরতে ঘুরতে তৃণ থেকে ব্রহ্ম পর্যন্ত সমস্ত প্রাণীকেই বাল্য, যৌবন ইত্যাদি-ক্রমে বয়স দ্বারা হরণ করছে। এর কোন প্রতিকার নেই। ঐ চক্রকে থামাবার

ক্ষমতা কারো নেই। পুরুষ ঐ চক্রের ভয়ে বেদাচারের বিরুদ্ধে গিয়ে পাষণ্ডমত অনুসারে কঙ্ক[১], বক, শকুনির মত উপদেবতাদের ভজনা করে, কিন্তু চক্র যাঁর অস্ত্র সেই ভগবান শ্রীহরিকেই অবহেলা করে। ঐ সমস্ত পাষণ্ড দেবতার ভজনা করে যখন সুখ পায় না তখন সে আবার ব্রাহ্মণকুলে গিয়ে আশ্রয় নেয়। কিন্তু শ্রুতি এবং স্মৃতি অনুযায়ী ব্রাহ্মণদের উপনয়ন ইত্যাদি সংস্কার, যজ্ঞেশ্বর শ্রীহরির আরাধনা এবং অন্য সব অনুষ্ঠেয় পবিত্র কাজ তাদের ভাল লাগে না বলে নানা কু-আচার পালন করে শূদ্রের মত হয়ে পড়ে। বানরেরা যা করে সেরকম কুটুম্ব পোষণ আর স্ত্রীসঙ্গই হল শূদ্রদের প্রধান কাজ। ২৫-৩০

ঐসব লোক যখন আচার-বিচারহীন শূদ্রের মত হয়ে অবাধে যা খুশী তাই করে বেড়ায় তখন তাদের বুদ্ধিও লোপ পাবার অবস্থা হয়। তখন স্ত্রীসঙ্গ করে, মুগ্ধভাবে পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে, আর নানা কুকাজে এমন মগ্ন হয়ে যায় যে আয়ু শেষ হয়ে মৃত্যু যে এগিয়ে আসছে তা বুঝতেই পারে না। বানরেরা যেমন গাছে গাছে খেলে বেড়ায় ঐসব পুরুষও তেমনি ঘর-সংসারের মত নানারকম বিষয়ের খেলায় মত্ত হয়। স্ত্রীর জন্য, সন্তানের জন্যই তার যত স্নেহ, আর তার কাছে স্ত্রীসঙ্গের থেকে বড় আনন্দের কাজ কিছু নেই। পুরুষ যখন সংসারের ফাঁদে আটকা পড়ে তখন মৃত্যুরূপে হাতীর ভয়ে পালাবার বৃথা চেষ্টায় পাহাড়ের গুহার মত বিষম অন্ধকারে গিয়ে পড়ে অর্থাৎ নানা বিপদ ডেকে আনে। কখনও শীত-গ্রীষ্ম ইত্যাদি নানা কষ্টের প্রতিকার করতে না পেরে দুঃখ পায়, বিষয়ের জ্বালায় জ্বলে মরে, কখনও বা লোককে ঠকিয়ে অল্প স্বল্প যা ধন লাভ করে তাতে সুখের পরিবর্তে দুঃখই পায়। কখনও তার অর্থ নষ্ট হওয়াতে সামান্য শোওয়া-বসার আরাম থেকেও সে বঞ্চিত হয়। তখন সৎপথে আকাঙ্ক্ষার বস্তু না পেলে অসৎপথেই পা বাড়ায়। পরিণামে লাভ হয় লোকের কাছে অপমান। এই রকম অর্থের আসক্তিতে পরস্পরের সঙ্গে শত্রুতা বেড়ে চলে, তবুও কর্মের ফলে পরস্পরের সঙ্গে বিবাহ ইত্যাদি সম্পর্কে আবদ্ধ হয়. আবার সে সম্পর্ক এক সময় ভেঙেও যায়। ৩১-৩৭

মহারাজ, এই সংসারের নানা দুঃখে কষ্টে বা অন্য কারণে যদি কেউ বিপদে পড়ে বা মারা যায় লোকে তাকে ত্যাগ করে আবার নূতন নূতন লোকের সঙ্গে খেলায় মেতে কখনও শোক পায়, কখনও মোহিত হয়, কখনও বা ভয় পায়, চীৎকার করে, বিবাহ করে, আনন্দে গান করে। এইভাবে জড়িয়ে থেকে এবং সাধুসঙ্গ না পেয়ে লোকে সংসার থেকে আর বেরিয়ে আসতে পারে না। সাধুরা কিন্তু সর্বদাই ওখান থেকে বেরিয়ে আসবার উপায় বলে দেন। কেবল যোগ অনুষ্ঠান করলেই সংসার-মার্গের পার পাওয়া যায় না। কারণ যে সব মুনিরা প্রতিহিংসা ছেড়েছেন, শান্ত সমাধির অবস্থায় রয়েছেন এবং সমস্ত ভোগ-বাসনা ত্যাগ করেছেন তাঁদের পক্ষেও এর পার পাওয়া সহজ নয়। যেসব বড় বড় রাজারা বহু যজ্ঞের অনুষ্ঠান এবং দিগ্বিজয় করেন, রাজ্যের অধিকার নিয়ে পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাঁদের অনেকে রণক্ষেত্রেই দেহত্যাগ করেন। কর্মের দ্বারা নরক থেকে মুক্তি পেয়ে লোক স্বর্গে যেতে পারে, কিন্তু কর্মফল বা পুণ্য শেষ হয়ে গেলে আবার তাকে সংসারে এসে মানুষের জন্ম নিতে হয়। রাজর্ষি ভরতের পবিত্র চরিত্র পণ্ডিতেরা সংক্ষেপে এইভাবে কীর্তন করেন—পিঁপড়া যেমন গরুড়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে উড়তে পারে না, তেমনি রাজর্ষি ভরতের পথে যাওয়া অন্য কোন রাজার পক্ষে সম্ভব নয়। মহাত্মা

১ কাক পাখী।

ভরত যৌবনেই ঈশ্বরের প্রেমে আপ্লুত হয়ে যাদের ত্যাগ করা খুবই কঠিন, সেই স্ত্রী, পুত্র, বন্ধু এবং রাজ্যকে মলের মত ত্যাগ করেছিলেন। তিনি রাজ্য, সন্তান, স্বজন, ধন, স্ত্রী এসব চাননি এবং দেবতারাও যে রাজ্যলক্ষ্মীকে কামনা করেন তাকে পর্যন্ত তিনি গ্রহণ করেন নি। এ কি কম আশ্চর্যের কথা ! যে সব মহাত্মারা একমনে শ্রীমধুসূদনের সেবা করেন মোক্ষও তাদের কাছে তুচ্ছ। যিনি যজ্ঞরূপী, যজ্ঞের ফলদাতা, কর্মের অনুষ্ঠানকর্তা, অষ্টাঙ্গ যোগরূপী, জ্ঞান যাঁর প্রধান ফলস্বরূপ, মায়াকে যিনি নিয়ন্ত্রণ করেন, সর্বজীবের যিনি আশ্রয় এবং সকল দুঃখ যিনি দূর করেন সেই শ্রীহরিকে আমি নমস্কার করি—রাজর্ষি ভরত তাঁর হরিণের দেহ ত্যাগ করবার সময় এই কথা বলেছিলেন। মহারাজ ভরতের চরিত্র এবং কর্মের কথা ভক্তেরা অতি সাদরে বর্ণনা করে থাকেন। এই চরিত্রকথা পরম মঙ্গল দেয়, আয়ু এবং ধন বাড়ায়, যশ, স্বর্গ এবং মোক্ষ দান করে। এই কথা যে শোনে বা পড়ে সে সব ঐশ্বর্য নিজেই লাভ করে, কোন কিছুর জন্যই তাকে অপরের কাছে চাইতে হয় না। ৩৮-৪৬

পঞ্চদশ অধ্যায়

ভরতবংশের রাজাদের কথা

শুকদেব বললেন, মহারাজ, ভরতের পুত্রের নাম ছিল সুমতি। তিনি ঋষভদেবের চরিত্র অনুকরণ করেছিলেন। তাই কলিকালে কিছু অধার্মিক পাষণ্ড তাঁর সেই জীবন্মুক্ত অবস্থার কথা শুনে তাঁকে দেবতা (সাক্ষাৎ বুদ্ধ) বলে কল্পনা করবে, যদিও বেদে তার কোন প্রমাণ পাওয়া যাবে না। সুমতির ঔরসে বৃদ্ধসেনার গর্ভে দেবতাজিৎ নামে এক পুত্র হয়। আসুরী নামে স্ত্রীর গর্ভে ঐ দেবতাজিতের দেবদ্যুম্ন নামে পুত্র জন্মে। ধেনুমতীর গর্ভে দেবদ্যুম্নের যে পুত্র হয় তার নাম পরমেষ্ঠি। পরমেষ্ঠির স্ত্রী সুবর্চলার গর্ভে প্রতীহ নামে পুত্র জন্মে। প্রতীহ বহুলোকের কাছে আত্মবিদ্যা ব্যাখ্যা করেন এবং তাতে ক্রমে তাঁর চিত্ত শুদ্ধ হলে তিনি শ্রীবিষ্ণুকে দর্শন করেন। প্রতীহের স্ত্রীর নামও ছিল সুবর্চলা এবং তাঁর গর্ভে প্রতিহর্তা, প্রস্তোতা আর উদ্গাতা নামে তিন যজ্ঞনিপুণ পুত্র জন্মে। প্রতিহর্তার ঔরসে স্তুতির গর্ভে অজ আর ভূমা এই দুই পুত্রের জন্ম হয়। ভূমার প্রথম স্ত্রী ঋষিকুল্যার পুত্র হল উদ্গীথ আর দ্বিতীয় স্ত্রী দেবকুল্যার পুত্র প্রস্তাব। প্রস্তাবের স্ত্রী নিযুৎসার গর্ভে বিভুর জন্ম হয়। বিভুর ঔরসে রতির গর্ভে পৃথুসেন, পৃথুসেনের ঔরসে আকূতির গর্ভে নক্ত, নক্ত থেকে দ্যুতির গর্ভে কীর্তিমান রাজর্ষি গয় জন্মগ্রহণ করেন ; সমস্ত লোক তাঁর কথা জানে। যেই ভগবান বিষ্ণু জগৎপালন করবার জন্য দেহ ধারণ করেছেন, গয় তাঁর অংশে জন্মগ্রহণ করেন। আত্মতত্ত্বজ্ঞ গয় মহাপুরুষ বলে প্রসিদ্ধ হন। রাজর্ষি গয় যেমন প্রজাদের পালন এবং শাসন করতেন তেমনি কিসে তারা সন্তুষ্ট হবে তাও দেখতেন। এইভাবে রাজধর্ম পালন এবং যজ্ঞ ইত্যাদি কর্মের অনুষ্ঠান করে তিনি সবকিছুই ভগবানের চরণে অর্পণ করেন। সর্বদা সাধুর সেবা করাতে ভগবানে তাঁর গভীর ভক্তি জন্মায় এবং চিত্ত নির্মল হয়। আত্মতত্ত্ব উপলব্ধি করেছিলেন বলে তাঁর দেহাভিমান ছিল না, তা সত্ত্বেও অহঙ্কারশূন্য ভাবে তিনি পৃথিবী পালন করেন। পণ্ডিতগণ গয়ের সম্বন্ধে এইসব গুণগাথা কীর্তন করে থাকেন। ১-৮

স্বয়ং ঈশ্বরের অংশ না হলে আর কোন রাজা গয়ের মত কাজ করতে পারবেন? গয় ছিলেন যজ্ঞরূপী, মনস্বী, জ্ঞানী, ধর্মের রক্ষক, লক্ষ্মীমান, সজ্জনদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সাধুদের সেবক এবং তাঁদের অতি স্নেহের পাত্র। শ্রদ্ধা, মৈত্রী, দয়া প্রভৃতি দক্ষের যে সব সতী কন্যাদের আশীর্বাদ কখনও ব্যর্থ হয় না, তাঁরা পরমানন্দে গয়-এর অভিষেক করেছিলেন। তাঁর নিজের কোন কামনা ছিল না, কিন্তু পৃথিবী তাঁর প্রজাদের জন্য সব বস্তুই দান করেছিলেন। গয়-এর গুণগুলি গোবৎসের মত গোমাতা পৃথিবীর কাছ থেকে সব কল্যাণ স্তন্যের মত দোহন করে নিত। তিনি নিষ্কাম হলেও বেদ (অর্থাৎ বেদবিহিত কর্ম) তাঁকে প্রয়োজনীয় ফল দিত। যুদ্ধে তাঁর কাছে পরাজয়ের সম্মান বরণ করে রাজারা তাঁকে কর দিতেন। তিনি ব্রাহ্মণদের পালন এবং ধর্ম রক্ষা করতেন বলে তাঁরা নিজ তপস্যার ছয় ভাগের এক ভাগ তাঁকে দান করতেন। তাঁর যজ্ঞে প্রচুর সোমপান করে ইন্দ্র আনন্দে মত্ত হতেন। তিনি শ্রদ্ধায় এবং ভক্তিতে যজ্ঞের ফল নিবেদন করলে যজ্ঞপুরুষ শ্রীহরি নিজেই তা গ্রহণ করতেন। যিনি তুষ্ট হলে তৃণ থেকে শুরু করে ব্রহ্মা পর্যন্ত দেবতা, মানুষ, অন্যান্য প্রাণী এবং গাছপালারা তৃপ্ত হয় অন্তর্যামী সেই ভগবান গয়-এর যজ্ঞে 'তৃপ্ত হলাম' বলে আনন্দ প্রকাশ করেছিলেন। এমন কাজ আর কার পক্ষে সম্ভব? ৯-১৩

গয়-এর ঔরসে গায়ত্রীর গর্ভে তিনটি পুত্র হয়েছিল। তাদের নাম চিত্ররথ, সুগতি আর অবিরোধন। চিত্ররথের ঔরসে উর্ণার গর্ভে সম্রাট নামে সন্তান জন্মে। সম্রাটের স্ত্রী উৎকলার পুত্র মরীচি। মরীচির পত্নী বিন্দুমতীর সন্তান বিন্দুমান, আর বিন্দুমানের পুত্র হল মধু নামে রাজর্ষি, সরমার গর্ভে তাঁর জন্ম। মধুর স্ত্রী ভার্যার গর্ভে বীরব্রত, বীরব্রতের স্ত্রী ভোজার গর্ভে মন্থু আর প্রমন্থুর জন্ম হয়। মন্থুর স্ত্রী সত্যা। তাঁর সন্তান ভৌবন। ভৌবনের পত্নী দূষণার গর্ভে ত্বষ্টা, ত্বষ্টার থেকে বিরোচনার গর্ভে বিরজের জন্ম হয়। বিরজের বিষূচী নামে স্ত্রীর গর্ভে একটি কন্যা আর একশত পুত্র জন্মে। তাদের মধ্যে শতজিৎ নামে পুত্র হল সর্বপ্রধান। একটি শ্লোকে বিরজের গুণকীর্তন করা হয়, তার অর্থ হল এই—বিষ্ণু যেমন দেবতাদের অলংকৃত করেন, বিরজ তাঁর কীর্তি দিয়ে রাজর্ষি প্রিয়ব্রতের বংশকে তেমনি ভূষিত করেছিলেন। ১৪-১৬

ষোড়শ অধ্যায়

ভুবনকোষের বর্ণনা

রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, ভগবান, আপনি বলেছেন যে সূর্যদেব নিজের আলোতে যে পর্যন্ত প্রকাশ করেন এবং গ্রহদের সঙ্গে চন্দ্রকে যেখানে দেখা যায়, ঐ পর্যন্তই ভূমণ্ডল। সেখানেই প্রিয়ব্রতের রথের চাকার সাতটি খাতকে সাতটি সমুদ্র বলে কল্পনা করা হয়েছে। আবার ঐ সাত সমুদ্র থেকেই পৃথিবীর সাতটি দ্বীপ কল্পিত হয়েছে তাও বলেছেন। এদের পরিমাণ এবং অন্যান্য বিবরণ জানতে ইচ্ছা হচ্ছে। ভগবানের গুণময় স্থূলরূপে মন নিবিষ্ট হলে তাঁর সূক্ষ্মতম রূপকেও জানা যায়। সর্বশক্তির আধার ঐ রূপের নাম বাসুদেব। শুকদেব বললেন, মহারাজ, মানুষ যদি দেবতাদের মত দীর্ঘ আয়ুও পায়, তবুও শরীর, মন বা বাক্য দ্বারা ভগবানের মায়া বা বিভূতির অন্ত পাবে না। তাই প্রধান দ্বীপগুলির নাম, অবস্থিতি আর লক্ষণ বর্ণনা করে তোমাকে ভূমণ্ডলের বিষয়

বলছি। ভূমণ্ডল এক বিশাল পদ্মের মত, সাতটি দ্বীপ তার সাতটি কোষ। তার মধ্যে প্রথম কোষ জম্বুদ্বীপের পরিমাণ একলক্ষ যোজন, আর তার আকৃতি পদ্মের পাতার মত গোল। এই দ্বীপে নয় হাজার যোজন বিস্তৃত নটি বর্ষ আছে, আটটি সীমান্ত-পর্বত তাদের একটিকে অন্যটির থেকে আলাদা করে রেখেছে। ১-৬

ঐ বর্ষগুলির মধ্যে ইলাবৃত নামে বর্ষ হল মাঝের দিকে। তার মাঝখানে অবস্থিত কুলপর্বতদের রাজা সুমেরু পর্বত সম্পূর্ণ সোনার। সুমেরুর উচ্চতা জম্বুদ্বীপের মত লক্ষ যোজন। মাথার দিকে ঐ পর্বত বত্রিশ হাজার যোজন, গোড়ার দিকে ষোল হাজার যোজন আর মাটির মধ্যেও ততখানি। এইভাবে সুমেরু বিশাল ভূমণ্ডল-কমলের বীজকোষের মত হয়ে রয়েছে। ইলাবৃতের উত্তর দিক থেকে ক্রমে নীল, শ্বেত আর শৃঙ্গবান এই তিন পর্বত যথাক্রমে রম্যক, হিরণ্ময় আর কুরুবর্ষের সীমা নির্দেশ করছে। ঐ তিনটি পর্বতই পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা আর তাদের দুই পাশে লবণসমুদ্র। এদের প্রত্যেকেই দু'হাজার যোজন বিস্তৃত। পর্বতগুলির প্রথমটির থেকে দ্বিতীয়টির এবং দ্বিতীয়টির থেকে তৃতীয়টির দৈর্ঘ্য এক-দশাংশের থেকে সামান্য কম, কিন্তু এদের উচ্চতায় আর বিস্তারে কোন তফাৎ নেই। ইলাবৃতের দক্ষিণে নিষধ, হেমকুট আর হিমালয়, এই তিনটি পর্বত আছে। তারাও নীল প্রভৃতি পর্বতের মত পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা এবং অযুত যোজন করে বিস্তৃত। এই পর্বতগুলি যথাক্রমে হরিবর্ষ, কিংপুরুষবর্ষ এবং ভারতবর্ষের সীমান্ত পর্বত। ইলাবৃতের পূর্বে আর পশ্চিমে মাল্যবান এবং গন্ধমাদন এই পর্বত দুটি নীল থেকে নিষধ পর্বত পর্যন্ত দু হাজার যোজন বিস্তীর্ণ। এরা হল কেতুমাল আর ভদ্রাশ্ব বর্ষের সীমান্ত পর্বত। সুমেরু পর্বতকে ঘিরে আছে মন্দর, মেরুমন্দর, সুপার্শ্ব এবং কুমুদ নামে আর চারটি পর্বত। ঐ পর্বতগুলি দশ হাজার যোজন করে বিস্তৃত। এদের মধ্যে পূর্ব আর পশ্চিম দিকে যারা আছে তারা উত্তর-দক্ষিণে লম্বা, আর উত্তর এবং দক্ষিণ দিকে যারা রয়েছে তারা আবার পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা। ঐ চার পর্বতে আম, জাম কদম আর বট—এই চার রকমের গাছ আছে। তারা বিস্তারে এক একশ যোজন। পর্বতের ধ্বজার মত ঐ গাছগুলি উচ্চতায় এগারশ যোজন; তাদের ডালাপালাও ঐ রকমই উঁচু। ৭-১২

ঐ গাছগুলির কাছেই আছে চারটি হ্রদ। হ্রদগুলির একটি দুধে, একটি মধুতে, একটি আখের রসে এবং বাকিটি জলে ভরা। ঐসব হ্রদের জল পান করে উপদেবগণ যোগের ঐশ্বর্য লাভ করেন। হ্রদ ছাড়া চারিটি উদ্যানও সেখানে আছে। তাদের নাম নন্দন, চৈত্ররথ, বৈভ্রাজক আর সর্বতোভদ্র। শ্রেষ্ঠ দেবতারা যখন দেবাঙ্গনাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তাঁদের পত্নীদের নিয়ে সেখানে বিহার করেন, তখন গন্ধর্বরা তাঁদের মহিমা গান করেন। মন্দর পর্বতের কোলে এগার যোজন উঁচু এক স্বর্গীয় গাছের থেকে পর্বতচূড়ার মত বিরাট বিরাট আর অমৃতের মত সুস্বাদ ফল ভূমিতে পড়ে ফেটে যায়। তার থেকে অপূর্ব সুগন্ধ আর অরুণবর্ণ রস বেরোয়। সেই সুগন্ধি রসে অরুণোদা নামে এক নদীর সৃষ্টি হয়েছে। ঐ নদী মন্দর পর্বতের চূড়া থেকে নেমে এসে পূর্বদিকে ইলাবৃত বর্ষকে প্লাবিত করছে। ভবানীর সঙ্গিনীরা ঐ নদীর জল পান করে বলেই তাদের গায়ে সুগন্ধ হয় এবং যে বাতাস তাদের গা ছুঁয়ে আসে তার গন্ধেও দশ যোজন পর্যন্ত আমোদিত হয়। ১৩-১৮

সেরকম, জামগাছে যে জাম হয় সেগুলো হাতীর মত বড় বড়, কিন্তু তাদের বীচি অতি ক্ষুদ্র। উঁচু থেকে পড়ে ফেটে যাওয়াতে সেই জামের রস থেকে জম্বু

নদীর সৃষ্টি হয়েছে। জম্বু নদী মেরুমন্দর পর্বতের চূড়া থেকে অযুত যোজন নেমে এসে ভূমণ্ডলে পড়েছে, তারপর দক্ষিণ দিকে সমস্ত ইলাবৃতকে প্লাবিত করে প্রবাহিত হচ্ছে। ঐ নদীর দুই পাড়ের মাটি তার রসে ভিজে এবং রোদে-বাতাসে পাক হয়ে সোনায় পরিণত হচ্ছে। জাম্বুনদ নামে ঐ সোনা দিয়ে নানা অলংকার তৈরী করে দেবতারা সবসময় পরেন। সুপার্শ্ব পর্বতের ধারে মহাকদম্ব নামে যে গাছ আছে তার কোটর থেকে প্রতিটি পাঁচ ব্যাম[১] পরিমাণ পাঁচটি মধুর ধারা বেরিয়ে ঐ পর্বতের মাথা থেকে নেমে এসে পশ্চিমদিকে ইলাবৃতকে গন্ধে ভরিয়ে দিচ্ছে। ঐ পাঁচটি ধারার জল যারা পান করে তাদের মুখের সুগন্ধে চারদিকে একশ যোজন পর্যন্ত সুগন্ধ হয়ে যায়। এইরকম কুমুদ পর্বতে শতবল্‌শ অর্থাৎ শতস্কন্ধা নামে যে বিশাল বটগাছ আছে তার স্কন্ধ থেকে দুধ, দই, মধু, ঘি, গুড়, অন্ন এবং বসন, ভূষণ, শয্যা, আসন ইত্যাদি নানাবস্তুর প্রবাহযুক্ত সব নদী বেরিয়ে কুমুদ পর্বতের মাথা থেকে নীচে নেমে আসছে এবং উত্তরে ইলাবৃতকে প্লাবিত করেছে। ঐ সব নদীর জল যারা পান করে তাঁদের কখনও দেহের বিকলতা, ক্লান্তি, ঘাম, জরা, রোগ, অপমৃত্যু, শীতে-গ্রীষ্মে কষ্ট, বিবর্ণতা বা অন্য কোন উপসর্গ হয় না। সারা জীবন তারা সুখে থাকে। কুরঙ্গ, কুরর, কুসুম্ভ, বৈকঙ্ক, ত্রিকূট, শিশির, পতঙ্গ, রুচক, নিষধ, শিতিবাস, কপিল, শঙ্খ, বৈদূর্য, জারুধি, হংস, ঋষভ, নাগ, কালঞ্জর, নীরদ প্রভৃতি পর্বত সুমেরুর পাদদেশকে ঘিরে রয়েছে। সুমেরু পর্বত যেন পদ্মের বীজকোষের মত, আর ঐ পর্বতগুলি তার কেশরের মত। ১৯-২৬

সুমেরুর পূর্বদিকে জঠর আর দেবকূট পর্বত। ঐ দুই পর্বতের প্রত্যেকটিই উত্তরে আঠার যোজন করে বিস্তৃত এবং দুহাজার যোজন উঁচু। পশ্চিম দিকে আছে পবন আর পারিযাত্র পর্বত; দক্ষিণে কৈলাস এবং করবীর পর্বত। এগুলি পূর্বদিকে বিস্তৃত। উত্তরদিকে ত্রিশৃঙ্গ এবং মকর পর্বত। এইভাবে মূল থেকে এক হাজার যোজন ছেড়ে এই আটটি পর্বত সুমেরু পর্বতকে বেষ্টন করে রয়েছে, আর মাঝখানে সুমেরু আগুনের মত শোভা পাচ্ছে। পণ্ডিতেরা বলেন, সুমেরুর চূড়ার ঠিক মাঝখানে হাজার অযুত যোজন বিস্তৃত ভগবান ব্রহ্মার পুরী বিরাজ করছে। সোনার তৈরী ঐ পুরী সমচতুষ্কোণ। তার চারদিকে পূর্বদিক থেকে শুরু করে আটজন দিকপালের আটটি পুরী[২] আছে। ঐ পুরীগুলির প্রত্যেকটির পরিমাণ ব্রহ্মপুরীর চারভাগের একভাগ অর্থাৎ আড়াই হাজার যোজন এবং দিকপালদের রং যা, পুরীগুলির রংও তাই। ২৭-২৯

সপ্তদশ অধ্যায়

রুদ্রদেবের সংকর্ষণ স্তব

শুকদেব বললেন, মহারাজ, ভগবান বিষ্ণু বামনরূপ ধরে বলিরাজার যজ্ঞে দান গ্রহণ করবার সময় ডান পা দিয়ে পৃথিবী অধিকার করে যখন বাঁ পা উপরে তোলেন

১ বিস্তৃত বাহুদ্বয়ের এক হাতের আঙুলের ডগা থেকে অপর হাতের আঙুলের ডগা পর্যন্ত দীর্ঘ।

২ পূর্বদিকে ইন্দ্রের অমরাবতী; অগ্নিকোণে অগ্নির তেজোবতী; দক্ষিণে যমের সংযমনী; নৈঋতে নিঋতের কৃষ্ণাঙ্গনা; পশ্চিমে বরুণের শ্রদ্ধাবতী; বায়ুকোণে বায়ুর গন্ধবতী, উত্তরে কুবেরের মহোদয়া এবং ঈশানে ঈশানের যশোবতী।

তখন ঐ পায়ের আঙ্গুলের নখে লেগে ব্রহ্মাণ্ড-কটাহের উপরের দিকটি ফেটে যায়। তাতে যে গর্ত হয়েছিল সেই গর্ত দিয়ে বাইরে থেকে জলের একটি ধারা কটাহের মধ্যে ঢুকে পড়ে এবং এক হাজার যুগ ধরে স্বর্গের মাথায় এসে পড়তে থাকে। ঐ জল ভগবানের চরণ ধুইয়ে দেয় বলে তাতে রক্তিম কুংকুম মিশে পরাগের মত শোভা হয়। ঐ পবিত্র জলধারার স্পর্শে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের পাপ ধুয়ে যায়। বিষ্ণুপদী নামে ঐ জলধারা দু'হাজার যুগ পরে স্বর্গ থেকে পৃথিবীতে নেমে আসে। স্বর্গের মাথাকে পণ্ডিতেরা বিষ্ণুপদ বলে থাকেন। পরম ভাগবত ধ্রুব ভগবান হরির চরণামৃতরূপ ঐ জল এখনও প্রতিদিন মাথায় ধারণ করেন। তাঁর প্রেম-ভক্তিতে তাঁর হৃদয় আর্দ্র এবং দেহ রোমাঞ্চিত হয়, চোখ দিয়ে প্রেমাশ্রু ঝরতে থাকে। বাসুদেবে ভক্তিযোগ লাভ করে যে সপ্তর্ষিরা অন্য সব পুরুষার্থ এবং জ্ঞানকে তুচ্ছ করেন তাঁরা গঙ্গার মহিমা জেনে এবং গঙ্গাই সব তপস্যার সিদ্ধি, এই জ্ঞানে গঙ্গাকে আজও অতি আদরে তাঁদের জটাতে ধারণ করছেন। স্বর্গের হাজার হাজার বিমান যেখানে ভিড় করে, গংগা সেই আকাশপথে নেমে এসে চন্দ্রমণ্ডলকে ভাসিয়ে সুমেরুর মাথায় ব্রহ্মার পুরীতে এসে পড়েছেন। সেখানে গংগা সীতা, অলকনন্দা, বংক্ষু এবং ভদ্রা এই চার ধারায় চারদিকে প্রবাহিত হয়ে সমুদ্রে গিয়ে মিশেছেন। চারটি ধারার মধ্যে সীতা ব্রহ্মপুরী থেকে বেরিয়ে কেশব পর্বতের শৃংগগুলির মধ্যে দিয়ে গিয়ে গন্ধমাদন পর্বতের মাথায় পড়েছেন। তারপর ভদ্রাশ্ববর্ষের মধ্য দিয়ে বয়ে গিয়ে লবণ সমুদ্রে মিশেছেন। ১-৬

বংক্ষু মাল্যবান পর্বতের শিখর থেকে বেরিয়ে কেতুমালকে পাশে রেখে পশ্চিম দিকে সমুদ্রে গিয়ে পড়েছেন। ভদ্রা উত্তরে সুমেরুর চূড়া থেকে নেমে এসে নানা পর্বতের শিখরের পর শিখর পেরিয়ে, শৃংগধাম পর্বতের চূড়ার তলার দিক দিয়ে উত্তর কুরুকে ঘিরে, উত্তর দিকে লবণ সমুদ্রে ঢুকেছেন। অলকনন্দাও ব্রহ্মার পুরী থেকে দক্ষিণ দিকে গিয়ে পর্বতশৃংগ পেরিয়ে অতি বেগে হিমকূট এবং হেমকূট ভেদ করে এবং ভারতবর্ষকে প্লাবিত করে দক্ষিণ দিক থেকে লবণ সমুদ্রে গিয়ে পড়েছেন। যাঁরা এখানে স্নান করতে আসেন তাঁদের প্রতিপদে অশ্বমেধ এবং রাজসূয় যজ্ঞের ফল লাভ হয়। প্রত্যেক বছরই এইরকম বহু নদী মেরু ইত্যাদি পর্বত থেকে উৎপন্ন হয়। সমস্ত বর্ষের মধ্যে পণ্ডিতেরা ভারতবর্ষকেই কর্মক্ষেত্র বলে থাকেন। অন্য আটটি বর্ষ স্বর্গবাসীদের অবশিষ্ট পুণ্য উপভোগের জায়গা। দিব্য, ভৌম আর বিল[১] এই তিন স্বর্গের মধ্যে অষ্টবর্ষকে পণ্ডিতেরা ভৌম অর্থাৎ পৃথিবীর স্বর্গ বলে থাকেন। এখানে যারা বাস করে তাঁদের আয়ু অযুত বছর, শরীর সুদৃঢ় এবং তাতে অযুত হাতীর বল। শক্তি, যৌবন এবং হর্ষে ভরপুর স্ত্রী-পুরুষেরা মহাসম্ভোগে পরম আনন্দ উপভোগ করে। সম্ভোগ শেষ হলে এক বছর আয়ু বাকী থাকতে তাদের স্ত্রীরা গর্ভ ধারণ করে। এইভাবে ত্রেতাযুগের মত পরম সুখে তাদের কাল কাটে। ৭-১২

এইসব বর্ষে দেবতাদের অধিপতির তুল্য লোকেরা নিজের নিজের সেবকদের কাছ থেকে নানা শ্রেষ্ঠ উপচারে সেবা পায়। তারা যেমন ইচ্ছা আশ্রম কি পর্বতের গুহা অথবা নির্মল সরোবরে মহা আনন্দে খেলা করে। সেখানে সুন্দরী দেবাঙ্গনাদের জলখেলা এবং নানারকম বিচিত্র লীলাবিলাস, তাদের সকাম কটাক্ষ পুরুষদের মন আর দৃষ্টি কেড়ে নেয়। আশ্রমগুলোতে সব ঋতুর ফুল, ফল কিশলয়ের ভারে গাছের ডাল নত হয়ে পড়ছে, বহু লতা তাতে জড়িয়ে আছে। সব মিলে এক

১। বিবর বা গর্ত, পাতাল

আশ্চর্য শোভার সৃষ্টি হয়েছে। আর সরোবরগুলির সৌন্দর্যও কম নয়। সদ্য ফোটা অজস্র পদ্মের সুগন্ধে, রাজহংস, জলহংস, জলকুক্কুট, কারণ্ডব[১], সারস, চক্রবাক প্রভৃতির কলরবে এবং ভোমরার মধুর গুঞ্জনে তারা অপরূপ শোভাময় হয়েছে। মহারাজ, ঐ নয়টি বর্ষেই ভগবান নারায়ণ সেখানকার অধিবাসীদের কৃপা করার জন্য নানারূপে আজও বর্তমান রয়েছেন। ইলাবৃত বর্ষে ভগবান শংকর ছাড়া অন্য পুরুষ নেই। ভবানীর অভিশাপের কথা যারা জানে তারা কেউ সেখানে ঢুকবে না, কারণ সেখানে গেলেই পুরুষ স্ত্রীলোকের মত হয়ে যায়। সে বিষয়ে পরে (নবম স্কন্ধে) বলব। সেখানে ভবানীর এক হাজার অর্বুদ সংখ্যক স্ত্রী শংকরকে সেবা করছেন। ভগবান বিষ্ণুর চার রূপের[২] মধ্যে সংকর্ষণ নামে চতুর্থ তামস রূপই শংকরের নিজের প্রকৃতি অর্থাৎ এই রূপ থেকেই তিনি প্রকাশিত হয়েছেন। তাই ভগবান এই মূর্তিকে নিজের কাছে প্রকাশিত করে মন্ত্র জপ করে তাঁর আরাধনা করেন এবং এইভাবে তাঁর স্তব করেন—যাঁর থেকে সমস্ত গুণ প্রকাশ পায় অথচ যিনি অনন্ত এবং অব্যক্ত সেই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কর্তা মহাপুরুষ ভগবানকে বার বার নমস্কার করি। হে পূজ্যতম, তুমি ঈশ্বর, তোমার পাদপদ্ম শরণাগতের আশ্রয়, তুমি ঐশ্বর্য ইত্যাদি ছয়গুণের আধার। ভক্তদের কাছে তোমার কল্যাণমূর্তি প্রকাশ করে তুমি তাদের সংসার-দুঃখ দূর কর। কিন্তু যারা ভক্ত নয় ভোগের জন্য তাদের সংসারে পাঠাও। ১৩-১৮

আমরা যারা ক্রোধ ইত্যাদি রিপুর বশ তাদের মত তোমার দৃষ্টি কখনই মায়ার দ্বারা রঞ্জিত হয় না, যদিও বিশ্ব নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সবসময়ই তুমি মায়াকে দেখছ। এমন কে আছে যে ইন্দ্রিয় জয় করতে চায় অথচ তোমার আরাধনা করতে অনিচ্ছুক? যাদের দৃষ্টি মোহে আচ্ছন্ন তাদের কাছে তুমি পানমত্ত রক্তচক্ষু ব্যক্তির মত ভয়ংকর। নাগবধূরা তোমার চরণ স্পর্শ করে মোহিত হয়ে যায়, তাই তারা তোমার পূজা আর করে উঠতে পারে না। এহেন তোমাকে কে না অর্চনা করবে? ঋষিরা তোমাকে তিন গুণের অতীত, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়বিহীন এবং অনন্ত বলেন, আবার তুমিই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কারণ। এই বিশাল পৃথিবী তোমার মাথার কোন একপাশে সামান্য সরষের মত পড়ে আছে তা তুমি জানও না। এমন সর্বশক্তিমান তোমার আশ্রয় কে না চাইবে? মহৎতত্ত্ব তোমার প্রথম গুণময়ী মূর্তি, ঐ মূর্তিই সত্ত্বগুণের আশ্রয় ব্রহ্মার শরীর। ঐ ব্রহ্মার থেকেই রুদ্ররূপী আমি সৃষ্ট হয়েছি। আমি তিনগুণ বিশিষ্ট আপন তেজ বা অহংকার দ্বারা দেবতা, ইন্দ্রিয় এবং ভূতগণকে সৃষ্টি করি। পাখী যেমন সুতোয় বাঁধা থাকে তেমনি মহৎ, অহঙ্কার, দেবতা, ভূত ও ইন্দ্রিয়গণ এবং আমরা তোমার সুতোয় অর্থাৎ ক্রিয়াশক্তিতে বাঁধা থেকে তোমার অনুগ্রহে ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করি। এই মায়া তোমার সৃষ্টি, কর্ম তার গ্রন্থি। গুণের দ্বারা সৃষ্ট বস্তুতে মুগ্ধ হয়ে লোকে কখনই মায়াকে সহজে বুঝতে পারে না, তাই এর থেকে মুক্ত হবার পথ কি করে সে জানবে? তোমার থেকেই যেমন বিশ্বের উৎপত্তি, তেমনি তোমাতেই তার লয়। এই সমস্ত কিছুর কারণস্বরূপ তোমাকে আমি নমস্কার করি। ১৯-২৪

১ একরকম হাঁস। ২ বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ। সংহার তমোগুণের কাজ। শ্রীহরির সঙ্কর্ষণ রূপ সংহারের প্রবর্তক বলে তাকে তামস বলা হয়। কিন্তু বস্তুত এই রূপ তুরীয় অর্থাৎ তম, রজ ও সত্ত্ব এই তিনগুণের অতীত, শুদ্ধ চিন্ময়।

অষ্টাদশ অধ্যায়

বর্ষবর্ণন

শুকদেব বললেন, মহারাজ, ভদ্রাশ্ববর্ষে ভদ্রশ্রবা নামে ধর্মপুত্র হলেন বর্ষপতি। তিনি আর তাঁর প্রধান সেবকেরা হয়শীর্ষ নামে সাক্ষাৎ ধর্মময় মূর্তিকে একাগ্রচিত্তে এই মন্ত্র উচ্চারণ করে আরাধনা করতেন—যিনি সর্বশক্তিমান ধর্মস্বরূপ এবং জীবের অবিদ্যা দূর করে তার আত্মাকে সংশোধন করেন, তাঁকে নমস্কার করি। ভগবানের লীলা কি বিচিত্র, মৃত্যু মানুষকে বিনাশ করছে কিন্তু মানুষ তা দেখেও দেখছে না! সন্তান বা পিতা মারা গেলে তার দেহ দাহ করে মানুষ তাদের ধন হস্তগত করে এবং নানা পাপকাজ করে বেঁচে থাকতে চায়। পণ্ডিতেরা এই বিশ্বকে অনিত্য বলেন, আত্মতত্ত্ব যাঁরা জেনেছেন তাঁরা ধ্যানে এর নশ্বরতা অনুভবও করেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও মায়ায় মুগ্ধ হন। হে অজ, তোমার মায়ার খেলা অতি আশ্চর্য। আমি সর্বান্তঃকরণে তোমার চরণে প্রণতি জানাই। বেদ ইত্যাদি শাস্ত্র বলে যে তুমি অকর্তা, অথচ নিজে মায়ার আবরণ থেকে মুক্ত হয়েও তুমি এই বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় ঘটাও। মায়ার দ্বারা যা ঘটে তুমি সে সবের কারণ, তুমিই সকলের আত্মস্বরূপ। এতে তুমি যে কর্তা তাই প্রকাশ পায়, অথচ তুমি আবার সববিছু থেকেই ভিন্ন। এই বিরুদ্ধভাব তোমার পক্ষেই সম্ভব। প্রলয়ের সময় দৈত্যেরা সমস্ত বেদ অপহরণ করে জলের তলায় লুকিয়ে রেখেছিল। প্রলয়ের শেষে হয়শীর্ষ মূর্তি ধারণ করে ঐ বেদ তুমি রসাতল থেকে উদ্ধার করে ব্রহ্মাকে ফিরিয়ে দিয়েছিলে। সত্যসংকল্প ভগবান, তোমাকে নমস্কার করি। ১-৬

হরিবর্ষে ভগবান নরসিংহ মূর্তিতে রয়েছেন। ঐ নরসিংহ মূর্তি ধারণ করার কথা পরে বলব। মহাপুরুষদের যেসব গুণ থাকে প্রহ্লাদ সেইসব গুণের আধার, তিনি পরমভাগবত। তাঁর নির্মল চরিত্র দৈত্যদানবকুলকে পবিত্র করেছে। হরিবর্ষের জনগণের সঙ্গে প্রহ্লাদ একান্ত ভক্তির দ্বারা ঐ নরসিংহমূর্তির আরাধনা করতেন। তিনি এই মন্ত্র উচ্চারণ করতেন—ভগবান, তুমি সর্বশক্তিমান, সকল তেজের তেজ, তোমায় নমস্কার। হে বজ্রনখ, হে বজ্রদন্ত, তুমি আমাদের মঙ্গলের জন্য প্রকাশিত হও, আমাদের কর্মের বন্ধন ছেদ কর, অজ্ঞান দূর কর, অভয় দাও। হে নাথ, বিশ্বের মঙ্গল হোক, খল ব্যক্তিরা তাদের দুষ্টস্বভাব ত্যাগ করুক। সমস্ত লোক বুদ্ধি দিয়ে মঙ্গলময় ভগবানের কথা আলোচনা করুক, মনেও পরস্পরের মঙ্গলচিন্তা করুক। আমাদের মন কামনা ত্যাগ করে ঈশ্বরে প্রবেশ করুক। আমাদের মন যেন গৃহ, পুত্র, ধন, বন্ধু ইত্যাদিতে আসক্ত না হয়, তা যেন ভগবানের প্রিয় ভক্তদের সঙ্গই কামনা করে। শুধু প্রাণধারণের জন্য সামান্য যেটুকু দরকার সেইটুকুই পেলে ভক্তেরা যতখানি তুষ্ট হন, বিষয়ে আসক্ত ব্যক্তি নানা বস্তু উপভোগ করেও তেমন সন্তুষ্ট হতে পারে না। ভগবানের প্রিয় ভক্তগণের সঙ্গ ঘটলে তাঁর নাম কানের মধ্য দিয়ে হৃদয়ে প্রবেশ করে এবং মনের মলিনতা দূর করে। অন্য তীর্থ করলে সাংসারিক অমঙ্গল দূর হতে পারে, কিন্তু মন শুদ্ধ হয় না। কাজেই শ্রীহরির মাহাত্ম্য কে না শুনতে চাইবে? শ্রীহরির প্রতি যাঁর নিষ্কাম ভক্তি আছে, দেবতারা সব গুণের সঙ্গে তাঁকে আশ্রয় করেন। কিন্তু শ্রীহরিতে যার ভক্তি নেই তার গুণ কোথায়? বিষয়-কামনা তার মনকে অনবরত নানাদিকে টানে। ৭-১২

জল যেমন মাছের প্রাণ, শ্রীহরি সেরকম প্রাণীদের আত্মা বা জীবন। যদি কোন মহৎ ব্যক্তি শ্রীহরিকে ত্যাগ করে গৃহে আসক্ত হন, তবে তাঁর মহত্ত্ব শুধুই

বয়সে, জ্ঞানে নয়। তাই হে অসুরগণ, যা থেকে তৃষ্ণা, রাগ, বিষাদ, ক্রোধ, মান, স্পৃহা, ভয়, দৈন্য ইত্যাদি মনের দুঃখসমূহ জন্মে এবং যা এই জন্ম-মরণ রূপে সংসারের মূল কারণ সেই গৃহ ছেড়ে নৃসিংহের অভয় পাদপদ্ম আশ্রয় কর। কেতুমাল বর্ষে লক্ষ্মীর প্রিয় কাজ করবার ইচ্ছায় ভগবান কামদেবরূপে বর্তমান রয়েছেন। সম্বৎসর নামে প্রজাপতির পুত্র এবং কন্যাগণ ঐ বর্ষের অধিপতি। তারা পুরুষের আয়ু পরিমাণ[1] দিনরাত্রির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। ভগবানের (কাল) চক্রের তেজে নষ্ট হয়ে কন্যাদের গর্ভ সম্বৎসরের শেষে পাত হয়ে যায়। ভগবান কামদেব তাঁর মনোহর চলনভঙ্গীতে, সহাস্য কটাক্ষে, সুমধুর ভ্রূবিলাসে আর মুখপদ্মের শোভায় রমাকে রমণ করিয়ে নিজের ইন্দ্রিয়দের তৃপ্ত করেন। ভগবানের সেই মায়াময় রূপকে রমাদেবী সম্বৎসরের রাত্রিতে রাত্রির অধিষ্ঠাত্রী দেবী এবং দিনে দিনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে পরম সমাধিযোগে উপাসনা করেন। তার মন্ত্র হল — যিনি সর্বশক্তিমান, সকল ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা হৃষীকেশ, সকল গুণের আশ্রয়, ক্রিয়া, জ্ঞান, সংকল্প এবং অধ্যবসায় ইত্যাদির অধিপতি, ষোলকলা, একাদশ ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চভূত যাঁর অংশ, যাঁকে বেদোক্ত কর্মদ্বারা পাওয়া যায় এবং যিনি অন্নময় অমৃতময় সর্বময়, যিনি শক্তিরূপে দেহ-মন এবং ইন্দ্রিয়সকলের প্রভু, যিনি কাম্য এবং কামমূর্তি, সেই ভগবানকে নমস্কার করি। তিনি আমাদের ইহলোকে এবং পরলোকে মঙ্গল করুন। ১৩-১৮

যে স্ত্রীরা ব্রত-নিয়ম পালন করে তোমাকে আরাধনা করেও অন্য স্বামী কামনা করে, সেই স্বামীরা কিন্তু তাদের স্ত্রীদের প্রিয় সন্তান, ধন, আয়ু কিছুই রক্ষা করতে পারে না, কারণ তারা পরাধীন। যিনি নিজে নির্ভয়, স্বাধীন এবং সকলকে ভয় থেকে রক্ষা করেন তিনিই প্রকৃত পতি। তাই পতি শব্দে একমাত্র তোমাকেই বোঝায়, অন্য কাউকে নয়। তুমি আত্মলাভ অর্থাৎ পরমানন্দরূপে বিরাজ করছ তাই তোমাকে পাওয়ার থেকে বড় লাভ কিছু নেই। তোমাকে পেয়েই জীব কৃতার্থ হয়। যে নারী পরমপতি তোমাকে চায় সে অতি বুদ্ধিমতী, সব কামনার ফল লাভ করে সে ধন্য হয়। তোমার কাছে অন্য বিষয় যে চায় সে বুদ্ধিহীন। তুমি তাকে প্রার্থিত ফল দাও বটে, কিন্তু সেই ফল ভোগ করা হয়ে গেলে তাকে অনুতাপ করতে হয়। তুমি যদি আমাকে সব কামনার ফলদাত্রী বল, তবে আমি বলি যে ইন্দ্রিয়ের সুখভোগ চেয়ে ব্রহ্মা, রুদ্র প্রভৃতি দেবতারা এবং অসুরেরা আমাকে পাবার জন্য কঠিন তপস্যা করে থাকেন। কিন্তু তোমার শ্রীচরণ সেবা না করাতে তাঁরা আমাকে পান না, কারণ আমি তোমার চরণেই নিজেকে সমর্পণ করেছি। তুমি যেখানে, আমিও সেখানে। তোমাতে যার ভক্তি নেই তার কোনরকমেই সুখ পাওয়া সম্ভব নয়। হে অচ্যুত, তোমার যে করকমল সব কামনা পূর্ণ করে, যা সবার পূজনীয় তা ভক্তদের মাথায় যেমন রেখেছ তেমনি আমার মাথাতেও রাখ। তুমি শ্রীবৎসচিহ্নরূপে আমাকে বুকে রেখেছ। তুমি ঈশ্বর। তোমার মায়া কে বুঝতে পারে? রম্যক বর্ষের অধিপতি মনুকে ভগবান তাঁর সব থেকে প্রিয় যে মৎস্যরূপ দেখিয়েছিলেন, তিনি সেই রূপেই সেখানে বর্তমান আছেন। মনু আজও পরম ভক্তিভরে তাঁর আরাধনা করছেন এবং এইভাবে তাঁর স্তব করছেন। ১৯-২৪

সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বসত্ত্বময়, প্রাণ, তেজ ও শক্তিরূপে মহামৎস্য অবতারকে বারবার নমস্কার করি। তুমি বেদময় সর্বশক্তিমান, পরমেশ্বর। সবার অন্তরে এবং বাইরে

---

১ একশ বছর। তাই ৩৬০ দিনে বছর ধরে ঐ পুত্রকন্যাদের সংখ্যা ছত্রিশ হাজার।

তুমি বিরাজ করছ, তা সত্ত্বেও ইন্দ্র প্রভৃতি লোকপালেরা[১] তোমার স্বরূপ দেখতে পান না। মানুষ যেমন কাঠের পুতুলকে ইচ্ছামত চালায়, তুমিও তেমনি ব্রাহ্মণ প্রভৃতি নাম দিয়ে এই বিশ্বকে চালাচ্ছ। ইন্দ্র ইত্যাদি গর্বিত দেবতারা অন্যের ভাল দেখতে পারেন না। কিন্তু প্রভু, তুমি ছাড়া তাঁরা পৃথক পৃথক বা সকলের মিলিত চেষ্টাতেও দ্বিপদ, চতুষ্পদ, সরীসৃপ বা স্থাবর-জঙ্গম কোন কিছুকেই রক্ষা করতে পারেন না। তুমি অজ। ভীষণ ঢেউয়ে উত্তাল প্রলয়সমুদ্রে নিমগ্ন সব ওষধি, লতাদের আশ্রয় পৃথিবীকে আমার (মনুর) সঙ্গে ধারণ করে তুমি নিজের তেজের প্রভাবে বিচরণ করতে। তুমি সকল জীবের জীবনস্বরূপ, পরম শক্তিমান। তোমাকে নমস্কার করি। মহারাজ, হিরন্ময়-বর্ষে ভগবান কূর্মরূপে বর্তমান আছেন। ভগবানের ঐ প্রিয় মূর্তিকে পিতৃগণের অধিপতি অর্যমা বর্ষপুরুষদের সঙ্গে পূজা করেন। পূজার মন্ত্র হল এইরকম - সর্বশক্তিমান, সকল সত্ত্বগুণের আধার, কাল তোমাকে খণ্ডিত করতে পারে না। তুমি সর্বব্যাপী, অথচ তোমার আবাস কেউ জানতে পারে না। সর্বভূতের আশ্রয়স্বরূপ তোমাকে বারবার নমস্কার করি। তোমার মায়ায় রচিত এই পৃথিবী এবং তোমার এই অপর রূপ যে সব দৃশ্য বস্তুর স্বরূপ, দয়া করে তা তুমি ভক্তকে দেখালে। এই রূপের মহিমা বাক্য এবং মনের অতীত, তাই তার সীমাও কেউ জানে না। নিজের মায়ায় তুমি নানারূপ ধারণ কর, তোমাকে নমস্কার। ২৫-৩১

জরায়ুজ (মানুষ প্রভৃতি), স্বেদজ (মশা প্রভৃতি), অণ্ডজ (পাখী প্রভৃতি), উদ্ভিজ (গাছ প্রভৃতি) এবং স্থাবর, জঙ্গম, দেবতা, ঋষিগণ, পিতৃগণ, ভূতগণ, ইন্দ্রিয়সকল, স্বর্গ, আকাশ, পৃথিবী, পর্বত, নদী, সমুদ্র, দ্বীপ, গ্রহ, নক্ষত্র এরা নামেই বিভিন্ন, কিন্তু এই সবই তুমি। তোমার নাম, রূপ এবং আকৃতির সংখ্যা নেই, তবুও কপিল প্রভৃতি ঋষিরা চব্বিশটি তত্ত্বের রূপে কল্পনা করেছেন। যে তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা ঐ সমস্তই লোপ পায়, সেই পরমার্থ-তত্ত্বজ্ঞানরূপী তোমাকে নমস্কার। উত্তর কুরুদেশে ভগবান যজ্ঞপুরুষ বরাহরূপে বর্তমান আছেন। কুরুদেশের জনগণের সঙ্গে পৃথিবী গভীর ভক্তিতে তাঁর আরাধনা করেন এবং এই পরম মন্ত্র উচ্চারণ করেন—ভগবান, মন্ত্র-তন্ত্র দ্বারা তুমি প্রকাশ পাও। তুমি যজ্ঞস্বরূপ, সব ধর্মের মূল, মহাপুরুষ। তুমি যজ্ঞ অনুষ্ঠানের কর্তা ত্রিযুগরূপী[২]। তোমাকে বার বার নমস্কার করি। কাঠের মধ্যে আগুনের মত দেহের ইন্দ্রিয়সকলের মধ্যে গুপ্ত তোমার স্বরূপ দেখতে চেয়ে বিবেকী পণ্ডিতেরা বিবেক-যুক্ত বিশুদ্ধ মনে কর্ম এবং কর্মফলের দ্বারা অনুসন্ধান করেন। সকলের পূজনীয় সেই তোমাকে নমস্কার। রূপ-রস ইত্যাদি বিষয় দর্শন প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের কাজ, দেবতা, দেহ, কাল এবং অহঙ্কার—এগুলো মায়ার কর্ম। এইসব অবস্তুর মধ্যে তুমিই বস্তু অর্থাৎ আত্মা। যাঁদের বুদ্ধি যোগসাধন দ্বারা নির্মল হয়েছে, তাঁরা তোমাকে নিশ্চয় করে জেনেছেন। তাঁরা আর তোমার মায়ানির্মিত আকৃতি দেখেন না. তোমাকেই স্বরূপে দেখেন। তোমাকে নমস্কার। অয়স্কান্তমণির আকর্ষণে লোহা যেমন গতি পায় তেমনি তোমার সান্নিধ্যে এলেই মায়া এই বিশ্বের সৃষ্টি, রক্ষা এবং ধ্বংস করে। তোমাকে নমস্কার। যিনি জগতের আদি, যিনি বরাহমূর্তিতে আমাকে দাঁতে ধরে প্রথমে রসাতল থেকে, তারপর প্রলয়সমুদ্র থেকে মত্ত হাতীর মত বেরিয়ে এসেছিলেন এবং যিনি বিশাল দৈত্য হিরণ্যাক্ষকে বধ করে তাকে নিয়ে খেলা করছিলেন সেই ভগবান বিষ্ণুকে আমি প্রণাম করি। ৩২-৩৯

১ শিব, কুবের, ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি, বায়ু যম, ও নৈঋর্ত—এই আটজন দিকপাল।

২ সত্যযুগে যজ্ঞের অনুষ্ঠান নেই, তাই ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই তিন যুগ।

উনবিংশ অধ্যায়

ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণন

শুকদেব বললেন, মহারাজ, শ্রীরামচন্দ্রের চরণ যিনি অবিরাম চিন্তা করছেন সেই পরমভাগবত হনুমান কিম্পুরুষ বর্ষে সেখানকার জনগণের সঙ্গে সীতাপতি আদি-পুরুষ ভগবান শ্রীরামচন্দ্রকে সেবা করছেন। গন্ধর্বেরা শ্রীরামচন্দ্রের পরম মঙ্গলময় লীলা গান করলে তিনি আর্ষ্টিষেণের সঙ্গে তা শোনেন এবং নিজে এই মন্ত্র জপ করেন—সর্বশক্তিমান ভগবানকে নমস্কার। তাঁর কথা আলোচনা করলেও পুণ্য হয়। সকলের প্রিয় এবং পূজনীয়, নানা গুণে ভূষিত, সংযতচিত্ত, মহাপুরুষ শ্রীরাম-চন্দ্রকে বার বার নমস্কার করি। সাধুতার তিনি চরম দৃষ্টান্ত। বেদান্তে যাকে এক এবং অদ্বিতীয় বলা হয়েছে তিনি সেই বস্তু। তিনি নিজ মহিমায় প্রকাশিত, তাই গুণসমূহের বিক্ষোভ তাঁতে নেই। তিনি সর্বব্যাপী, প্রশান্ত, নাম এবং রূপ-হীন, অহঙ্কার ইত্যাদি বিকারশূন্য, তত্ত্বজ্ঞানীর উপলব্ধির বিষয়। আমরা সেই পরমতত্ত্বরূপী শ্রীরামচন্দ্রের শরণ নিই। যিনি সর্বশক্তিমান, বিভু, তিনি যে মানুষের দেহধারণ করেছিলেন তা শুধু রাক্ষসবধ করবার জন্য নয়, লোকশিক্ষার জন্য। তা না হলে জগতের আত্মা এবং ঈশ্বর হয়েও তাঁকে কেন সীতা হারাতে হবে আর কেনই বা সীতা উদ্ধারের জন্য অত কষ্ট করতে হবে? আত্মজ্ঞানীদের পরম বন্ধু, সর্বাত্মা, সর্বশক্তিমান বাসুদেব রামচন্দ্র তিন লোকে কোন কর্মেই আসক্ত হতে পারেন না। তাই স্ত্রীর জন্য ব্যাকুল হওয়া বা সামান্য কারণে লক্ষ্মণকে বর্জন করাও তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। এই সবই লোকশিক্ষার জন্য। ১-৬

সৎকুলে জন্ম, সৌভাগ্য, বিদ্যা, বুদ্ধি, গুণ, রূপ এগুলোর কোনটাতেই সন্তোষ হয় না যদি ভক্তি না থাকে। আমরা বনচর বানর, আমাদের এসব কিছুই নেই, তবুও আমাদের তিনি বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন। তাই দেবতা, অসুর, মানুষ, বানর যাই হোক না কেন সকলেরই সর্ব অন্তঃকরণ দিয়ে তাঁর পূজা করা উচিত। সামান্য ভক্তিতেই সন্তুষ্ট হয়ে তিনি অযোধ্যার সব লোককে বৈকুণ্ঠ দর্শন করিয়ে-ছিলেন। ভগবান নরনারায়ণ দয়া করে আত্মজ্ঞানীদের শেখাবার জন্য স্বল্পকাল পর্যন্ত কঠিন তপস্যা করেন যাতে ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য, জিতেন্দ্রিয়তা, নিরহঙ্কারতা, এসবের সঙ্গে আত্মোপলব্ধি হয়। দেবর্ষি নারদ বর্ণাশ্রমধর্মী ভারতবাসীদের সঙ্গে পরম ভক্তি এবং ভাবের সঙ্গে তাঁর ভজনা করেন। তিনি সাবর্ণি মনুকে উপদেশ করার জন্য সাংখ্য এবং যোগের সঙ্গে ভগবানের মহিমা বর্ণনা করে পঞ্চরাত্র নামে গ্রন্থ রচনা করেছেন। তিনি এই মন্ত্রও পাঠ করেন—ভগবান, নিরহঙ্কার, নিঃস্বদের বন্ধু, ঋষিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পরমহংসদের গুরু এবং আত্মজ্ঞানীদের প্রভু নরনারায়ণকে প্রণাম করি। যিনি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কর্তা হয়েও 'আমি কর্তা' এই অভিমানে বদ্ধ হন না, দেহের মধ্যে থেকেও ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর হন না, এবং সব কিছুর দ্রষ্টা হলেও দৃশ্য বস্তুর দ্বারা যাঁর দৃষ্টির বিকার ঘটে না, সেই ভগবানকে প্রণাম করি। ৭-১২

যোগেশ্বর, তুমি নির্গুণ পূর্ণব্রহ্ম। অন্তিম সময়ে এই নশ্বর দেহের মায়া কাটিয়ে তোমাতে মনোনিবেশ করাই হল শ্রেষ্ঠ যোগ। ব্রহ্মা একেই পুরুষযোগ বলেছেন। ইহলোক আর পরলোকের কামনার বস্তুতে আসক্ত হয়ে এবং স্ত্রী-পুত্র,

ধন ইত্যাদির কথা চিন্তা করে বিদ্বান ব্যক্তি যদি এই অনিত্য দেহ নষ্ট হবার ভয়ে ভীত হয় তবে তার শাস্ত্রপাঠ বৃথা পরিশ্রম মাত্র। হে প্রভু, তোমার মায়ায় এই নশ্বর দেহই 'আমি এবং আমার' এই মিথ্যা বোধ থেকে যে কঠিন বন্ধনের সৃষ্টি হয়েছে, তা যাতে কাটাতে পারি এমন যোগ উপদেশ কর। অন্য অন্য বর্ষের মত ভারতবর্ষেও বহু নদী, পর্বত প্রভৃতি আছে। মলয়, মঙ্গলপ্রস্থ, মৈনাক, ত্রিকূট, ঋষভ, কূটক, কোল্ব, সহ্য, দেবগিরি, ঋষ্যমূক শ্রীশৈল, বেঙ্কট, মহেন্দ্র, বারিধার, বিন্ধ্য, শুক্তিমান, ঋক্ষগিরি, পারিপাত্র, দ্রোণ, চিত্রকূট, গোবর্ধন, রৈবতক, ককুভ, নীল, গোকামুখ, ইন্দ্রকীল, কামগিরি এবং আরো শতসহস্র পর্বত এখানে আছে, আর আছে ঐ সব পাহাড় থেকে নেমে-আসা অসংখ্য নদ-নদী। তার মধ্যে চন্দ্রবশা, তাম্রপর্ণী, অবটোদা, কৃতমালা, বৈহায়সী, কাবেরী, বেণ্বা, পয়স্বিনী, শর্করাবর্তা, তুঙ্গভদ্রা, কৃষ্ণবেণ্বা, ভীমরথী, গোদাবরী, নির্বিন্ধ্যা, পয়োষ্ণী, তাপী, রেবা, সুরসা, নর্মদা, চর্মণ্বতী, অন্ধ (ব্রহ্মপুত্র) ও শোননদ, মহানদী, বেদস্মৃতি, ঋষিকুল্যা, ত্রিসামা, কৌশিকী, মন্দাকিনী, যমুনা, সরস্বতী, দৃশদ্বতী, গোমতী, সরযূ, ওঘবতী, ষণ্ঠবতী, সপ্তবতী, সুষোমা, শতদ্রু, চন্দ্রভাগা, মরুদ্‌বৃধা, বিতস্তা, অসিক্নী এবং বিশ্বা— এইগুলো হল মহানদী। এদের নামেও পুণ্য হয়। ভারতবাসী এইসব নদীর পবিত্র জল স্পর্শ করে পান করে। এই বর্ষে যে সব পুরুষের জন্ম হয় তারা তাদের সাত্ত্বিক, রাজসিক কি তামসিক কর্ম অনুসারে দিব্য, মানুষ বা নারক গতি লাভ করে অর্থাৎ স্বর্গে, পৃথিবীতে বা নরকে যায়। আবার বর্ণ এবং আশ্রম ধর্ম অনুসারে এখানে লোকের ধর্মসঞ্চয় এবং মুক্তিও হয়ে থাকে। ১৩-১৮

যাঁরা অজ্ঞান দূর করেন সেই পরম ভাগবত ব্যক্তিদের সঙ্গ করলে পরমাত্মা বাসুদেবে যে অহেতুক ভক্তি জন্মে তা মোক্ষস্বরূপ। তাই দেবতারা প্রশংসা করে বলেন—অনেক পুণ্যের ফলেই ভারতবর্ষে মনুষ্যজন্ম লাভ হয়, অথবা হয়ত ভগবান হরির অনুগ্রহেই হয়। আমাদেরও ইচ্ছা হয় এখানে মানুষ হয়ে জন্মাই। আমাদের এই দিব্য দেহ বা কঠিন যজ্ঞ, তপস্যা, ব্রত, দান, স্বর্গবাস এসবে কি লাভ? এখানে অত্যধিক ইন্দ্রিয়ভোগের ফলে নারায়ণের পাদপদ্মকেও ভুলেছি। কল্পকাল আয়ু নিয়ে আমরা স্বর্গবাস করছি; আয়ুক্ষয় হলেই আবার জন্ম নিতে হবে। এর চেয়ে অল্প আয়ু নিয়ে ভারতভূমিতে জন্মান ভাল, কারণ সেখানে লোকে সামান্য সময়ের মধ্যেই শুভ অশুভ সব কর্ম পরিত্যাগ করে শ্রীহরির অভয় পদ লাভ করে। যেখানে শ্রীহরির কথারূপ অমৃতের নদী নেই, যেখানে ভক্ত সাধুরা বাস করেন না, আর যেখানে তাঁর পূজা, মহোৎসব ইত্যাদি হয় না, সে স্থান ব্রহ্মলোক হলেও সেখানে থাকা উচিত নয়। ১৯-২৪

এই ভারতবর্ষে যে লোক জ্ঞান, কর্ম ইত্যাদির অনুকূল দুর্লভ মানবজন্ম পেয়ে মুক্তির জন্য চেষ্টা না করে, তার অবস্থা হল ব্যাধের হাত থেকে ছাড়া পেয়েও আবার তার জালে ধরা-পড়া পাখীর মত। জালে আটকা পড়ে সে কেবল দুঃখই পায়। ভারতবাসীর সৌভাগ্যের কথা আর কি বলব। সর্বমঙ্গলময় ভগবান এক, তবুও ভারতবাসী যখন যজ্ঞে ইন্দ্র ইত্যাদি নানা দেবতার নাম করে আহুতি দেয়, তিনি সে-সবই 'এটি আমার' এই বলে অতি আদরের সঙ্গে গ্রহণ করেন। এর উপর আবার যাঁরা নিষ্কাম সাধক তাঁদের ভাগ্যের তো কথাই নেই। কোন কিছু চেয়ে যারা ভগবানকে ডাকে, ভগবান তাদের শুধু সেই বস্তুটিই দেন, পরমার্থ দেন না। কারণ তার মর্ম না বুঝে সে আবার অন্য কোন কিছুর প্রার্থনা করবে। কিন্তু যারা কিছুই না চেয়ে ভগবানকে ভজনা করেন, ভগবান তাঁদের নিজের শ্রীপাদপদ্ম দান করেন। তাঁর শ্রীচরণ লাভ করলে সব কামনা নষ্ট হয়। তাই আমরা যজ্ঞ, অধ্যয়ন

এবং অন্য সৎকাজ করার ফলস্বরূপ যে স্বর্গভোগ করছি, তারপরেও যদি কিছু ফল অবশিষ্ট থাকে তবে যেন ভারতবর্ষে মানুষ হয়ে জন্মাতে পারি, যাতে অনুক্ষণ শ্রীহরিকে স্মরণে রাখতে পারি। ভারতবর্ষে যাঁরা শ্রীহরিকে স্মরণ করেন এবং তাঁর ভজনা করেন সেই ভক্তদের তিনি সবরকমে কল্যাণ করেন। ২৫-২৯

শুকদেব বললেন, মহারাজ, কোন কোন পণ্ডিত বলেন সগর রাজার ছেলেরা ঘোড়া খুঁজতে গিয়ে পৃথিবী খুঁড়বার সময় এই জম্বুদ্বীপে আটটি উপদ্বীপের সৃষ্টি করেন। সেগুলো হল স্বর্ণপ্রস্থ, চন্দ্রশুক্ল, আবর্তন, রমণক, মন্দহরিণ, পাঞ্চজন্য, সিংহল এবং লঙ্কা। জম্বুদ্বীপের বর্ষগুলির কথা আমি যেমন জানি তোমাকে বললাম। ৩০

বিংশ অধ্যায়

লোকালোক পর্বতের অবস্থান

শুকদেব বললেন, মহারাজ, এবপর প্লক্ষ ইত্যাদি ছ'টি দ্বীপের পরিমাণ এবং আকার কিরকম, আর সেখানে কি ভাবে বর্ষ ভাগ করা হয়েছে সে কথা বলছি। জম্বুদ্বীপ যেমন সুমেরুকে ঘিরে রয়েছে তেমনি জম্বুদ্বীপকে ঘিরে আছে লবণ-সমুদ্র। লবণসমুদ্রের পরিমাণ জম্বুদ্বীপের সমানই অর্থাৎ লক্ষযোজন। পরিখা যেমন বাইরের দিকে উপবনে ঘেরা থাকে, সেরকম লবণসাগরও তার থেকে দ্বিগুণ বড় প্লক্ষদ্বীপ দিয়ে ঘেরা। ঐ প্লক্ষদ্বীপে একটি প্লক্ষগাছ আছে। তার জন্যই ঐ দ্বীপের নাম প্লক্ষ। আগে যে জম্বুগাছের কথা বলা হয়েছে, ঐ গাছ তার মতই বিশাল। প্লক্ষ গাছটি সোনার। তাতে সপ্তজিহ্ব অগ্নি বাস করছেন। প্লক্ষদ্বীপের রাজা প্রিয়ব্রতের পুত্র ইধ্মজিহ্ব দ্বীপটিকে সাতটি বর্ষে ভাগ করে তাঁর সাত ছেলেকে দেন, আর নিজে যোগবলে দেহত্যাগ করেন। ঐ সাতটি ছেলের নামে সাত বর্ষের নাম হল শিব, বয়স, সুভদ্র, শান্ত, ক্ষেম, অমৃত আর অভয়। সেই সপ্তবর্ষের সাতটি পর্বত আর সাতটি নদী অতি প্রসিদ্ধ। পর্বত-গুলির নাম হল মণিকূট, বজ্রকূট, ইন্দ্রসেন, জ্যোতিষ্মান, সুবর্ণ, হিরণ্যষ্ঠীব ও মেঘমাল, আর নদীর নাম—অরুণা, নৃম্ণা, আঙ্গিরসী, সাবিত্রী, সুপ্রভাতা, ঋতম্ভরা এবং সত্যম্ভরা। ওখানেও ব্রাহ্মণ ইত্যাদির মত চারটি বর্ণ আছে। তাদের নাম হংস, পতঙ্গ, ঊর্ধ্বায়ন এবং সত্যাঙ্গ। এঁরা ঐ সব নদীর জল স্পর্শ করে রজ এবং তমোগুণশূন্য হয়েছেন এবং তাঁদের পরমায়ু হয়েছে হাজার বছর। বেদবিদ্যা দিয়ে তাঁরা বেদ এবং সূর্যরূপী ভগবান পরমাত্মার উপাসনা করেন। সেই উপাসনার মন্ত্র হল—আমরা সত্য, ঋত, অমৃত এবং মৃত্যুর অধিষ্ঠাতা পুরাণ-পুরুষ, বিষ্ণুরূপী সূর্যদেবের শরণ নিলাম। প্লক্ষ প্রভৃতি পাঁচটি দ্বীপেই সব পুরুষের আয়ু, ইন্দ্রিয়ের শক্তি, সাহস, বল, বিক্রম, বুদ্ধি এবং স্বাভাবিক সিদ্ধি সমান সমান। ১-৬

প্লক্ষদ্বীপ তার সমান আয়তনের আখের রসের সমুদ্র দিয়ে ঘেরা, আর প্লক্ষদ্বীপের থেকে দ্বিগুণ বড় শাল্মলী দ্বীপকে ঘিরে রেখেছে সুরার সমুদ্র। সেখানে প্লক্ষগাছের মতই বিশাল এক শাল্মলী গাছে মহাশক্তিশালী গরুড় বাস করেন। বেদে গরুড়ের অনেক প্রশংসা আছে। এ শাল্মলী গাছের নামেই দ্বীপের নাম-করণ হয়েছে। সেখানকার রাজা হলেন প্রিয়ব্রতের পুত্র যজ্ঞবাহু। তিনি তাঁর

সাত পুত্রের নামে দ্বীপটিকে সাত ভাগে (বর্ষে) ভাগ করে দেন। তাদের নাম—সুরোচন, সৌমনস্য, রমণক, দেহবর্হ, পারিভদ্র, আপ্যায়ন এবং অভিজ্ঞাত। ঐ সাত বর্ষেও সাতটি পর্বত আর সাতটি নদী বিশেষ প্রসিদ্ধ। পর্বতগুলির নাম—সুরস, শতশৃঙ্গ, বামদেব, কুন্দ, কুমুদ, পুষ্পবর্ষ এবং সহস্রশ্রুতি। নদীগুলি হল—অনুমতী, সিনীবালী, সরস্বতী, কুহু, রজনী, নন্দা আর রাকা। ঐ বর্ষের অধিবাসী শ্রুতধর, বীর্যধর, বসুন্ধর, ইষুন্ধর ইত্যাদি পুরুষেরা বেদের বিধি অনুসারে ভগবানের সোম বা চন্দ্র রূপের আরাধনা করেন। তার মন্ত্র হল—চন্দ্র নিজের রশ্মির দ্বারা শুক্ল এবং কৃষ্ণপক্ষে যথাক্রমে দেবগণ এবং পিতৃগণের অন্ন ভাগ করে দেন। তিনি আমাদের সমস্ত প্রজাদের রাজা হোন। ৭-১২

সুরাজল-সমুদ্রের পরে হল কুশদ্বীপ। তার পরিমাণ প্লক্ষদ্বীপের দ্বিগুণ এবং তা ঘিয়ের সমুদ্রে ঘেরা। সেখানে দেবতাদের নির্মিত একটি কুশের স্তম্ব (গুচ্ছ) আছে বলে তার নাম কুশদ্বীপ হয়েছে। ঐ স্তম্ব আগুনের মত উজ্জ্বল, তার কোমল শিখার দীপ্তি সর্বদিক আলো করেছে। কুশদ্বীপের রাজা প্রিয়ব্রতের পুত্র হিরণ্যরেতা দ্বীপটিকে বসু, বসুদান, দৃঢ়রুচি, নাভিগুপ্ত, সত্যব্রত, বিপ্রনাম এবং দেবনাম নামে তাঁর সাত পুত্রের মধ্যে ভাগ করে দিয়ে নিজে তপস্যা করতে থাকেন। ঐ সাত ভাগ বা বর্ষের সাতটি বিখ্যাত পর্বত এবং নদী আছে। বভ্রু, চতুঃশৃঙ্গ, কপিল, চিত্রকূট, দেবানীক, উর্ধ্বরোমা এবং দ্রবিণ এই সাতটি হল পর্বত, আর রসকুল্যা, মধুকুল্যা, মিত্রবিন্দা, শতবিন্দা, দেবগর্ভা, ঘৃতচ্যুতা এবং মন্ত্রমালা এই সাতটি হল নদী। দ্বীপের অধিবাসীরা এই সব নদীর জল পান করেন এবং কুশল, কোবিদ, অভিযুক্ত আর কুশক নামে আখ্যাত হয়ে ভগবান অগ্নির পূজো করেন। সেই পূজার মন্ত্র হল, হে অগ্নি, তুমি পরব্রহ্মের হবি বহন কর। তাই আমরা পরম পুরুষের অঙ্গস্বরূপ দেবতাদের নামে যে হবি অর্পণ করি তা তুমি তাঁকে পোঁছে দিও। ঘিয়ের সমুদ্রে ঘেরা কুশদ্বীপের পরে হল তার দ্বিগুণ আকারের ক্রৌঞ্চদ্বীপ যাকে ঘিরে আছে ক্ষীরের সমুদ্র। ঐ দ্বীপে ক্রৌঞ্চ নামে এক পর্বত আছে। সেই পর্বতের নামেই দ্বীপের নামও ক্রৌঞ্চদ্বীপ। ১৩-১৮

কার্তিকের অস্ত্রের আঘাতে এক সময় এই পর্বতের কোমর (মধ্যদেশ) ভেঙে গিয়েছিল এবং তার নিকুঞ্জ বনগুলিও ছিন্নভিন্ন হয়েছিল। কিন্তু ক্ষীরসমুদ্রের জলের স্পর্শে এবং বরুণের আশ্রয় পেয়ে সে এখন নির্ভয় হয়েছে। প্রিয়ব্রতের পুত্র ঘৃতপৃষ্ঠ হলেন এই দ্বীপের রাজা। তিনি দ্বীপটিকে সাত পুত্রের নামে সাত ভাগে ভাগ করে তাদের হাতেই রাজ্যভার দিয়েছেন এবং নিজে পুণ্যশ্লোক ভগবান শ্রীহরির চরণপদ্মে আশ্রয় নিয়েছেন। ঘৃতপৃষ্ঠের সাত পুত্রের নাম আত্মা, মধুরুহ, মেঘপৃষ্ঠ, সুধামা, ভ্রাজিষ্ঠ, লোহিতার্ণ এবং বনস্পতি। তাঁদের সাত বর্ষে সাতটি সীমান্ত পর্বত এবং সাতটি নদী আছে। পর্বতগুলি হল শুক্ল, বর্ধমান, ভোজন, উপবর্হণ, নন্দ, নন্দন এবং সর্বতোভদ্র। আর নদীগুলির নাম অভয়া, অমৃতৌঘা, আর্যকা, তীর্থবতী, রূপবতী, পবিত্রবতী এবং শুক্লা। পুরুষ, ঋষভ, দ্রবিণ আর দেবক নামে ঐ বর্ষের অধিবাসীরা ঐ সব নদীর নির্মল জল পান করেন এবং জলের অঞ্জলি দিয়ে জলময় দেবতাদের আরাধনা করেন। তাঁরা বলেন, হে জলদেবগণ, আপনারা পরমপুরুষ ভগবানের অংশ। আপনারা ত্রিলোক পবিত্র করছেন। আমরা পাপনাশক আপনাদের স্পর্শ করছি; আমাদের পবিত্র করুন। ক্ষীর-সমুদ্রের ওপারে বত্রিশ লক্ষ যোজন বিস্তৃত শাকদ্বীপ। তাকে ঘিরে আছে অতখানিই বিরাট দধিসমুদ্র। দ্বীপের নাম শাকদ্বীপ হওয়ার কারণ সেখানে শাক নামে এক বিরাট সুগন্ধ গাছ আছে। তার সৌরভে ঐ দ্বীপ সর্বদা সুরভিত থাকে। ১৯-২৪

এই দ্বীপের রাজাও প্রিয়ব্রতের মেধাতিথি নামে পুত্র। তাঁর সাত পুত্রের নাম পুরোজব, মনোজব, বেপমান, ধুম্রানীক, চিত্ররেফ, বহুরূপ এবং বিশ্বাধার। মেধাতিথি শাকদ্বীপকে তাঁর সাত পুত্রের সাতটি ভাগে বা বর্ষে ভাগ করেন এবং এক এক পুত্রকে এক এক বর্ষের রাজা করে নিজে বনে গিয়ে ভগবানের আরাধনায় মন দেন। ঐ সব বর্ষের বিখ্যাত সাতটি পর্বত আর নদীর নাম হল যথাক্রমে—ঈশান, উরুশৃঙ্গ, বলভদ্র, শতকেশর, সহস্রস্রোতা, দেবপাল, মহানস এবং অনঘা, আয়ুর্দা, উভয়স্পৃষ্টি, অপরাজিতা, পঞ্চনদী, সহস্রশ্রুতি ও নিজধৃতি। ঐ বর্ষের ঋতব্রত, সত্যব্রত, দানব্রত আর অনুব্রত নামে অধিবাসীরা প্রাণায়ামের সাহায্যে রজ এবং তমোগুণ নষ্ট করে পরম সমাধিযোগে বায়ুরূপী ভগবানের উপাসনা করেন। উপাসনার মন্ত্র—যিনি ভিতরে প্রবেশ করে প্রাণ ইত্যাদি বৃত্তি দ্বারা জীবকে পালন করছেন এবং এই জগৎ যাঁর বশে রয়েছে সেই অন্তর্যামী, সাক্ষাৎ ভগবান আমাদের রক্ষা করুন। দধিসমুদ্রের পরে হল শাকদ্বীপের দ্বিগুণ আকারের পুষ্করদ্বীপ। ঐ দ্বীপ তার সমান বড় পবিত্র সুস্বাদু জলের সাগরে ঘেরা। সেখানে আগুনের শিখার মত উজ্জ্বল, অযুত সোনার পাপড়ি বিশিষ্ট একটি বিশাল পুষ্কর (পদ্মফুল) আছে। ঐ ফুলটি ব্রহ্মার আসন বলে বিখ্যাত। মানসোত্তর নামে অযুত যোজন বিস্তৃত এবং উঁচু একটি সীমান্ত পর্বত দ্বীপটিকে পূর্ব আর পশ্চিম এই দুই বর্ষে ভাগ করেছে। ঐ পর্বতের চারদিকে রয়েছে ইন্দ্র প্রভৃতি লোকপালদের চারটি পুরী। সূর্যের সম্বৎসর রূপ রথচক্র মেরু প্রদক্ষিণ করবার সময় এই সব পুরীর উপর দিয়ে যায়। তাতে দেবতাদের দিন রাত্রি আর মানুষের উত্তরায়ণ দক্ষিণায়ন হয়। ২৫-৩০

প্রিয়ব্রতের পুত্র বীতিহোত্র পুষ্করের রাজা। তিনি রমণক আর ধাতক নামে নিজের দুই পুত্রকে দুই বর্ষের রাজা করে নিজে অন্য ভাইদের মতই ভগবানের আরাধনায় মন দিয়েছেন। সেই বর্ষের পুরুষরা ব্রহ্মলোক পাবার জন্য ব্রহ্মরূপী অর্থাৎ পদ্মাসন-মূর্তি ভগবানের আরাধনা করেন এবং এই ভাবে তাঁর গুণকীর্তন করেন - যিনি কর্মফলস্বরূপ, যিনি মূর্তি ধারণ করে ব্রহ্মকেই প্রকাশ করেন এবং পরমেশ্বরেই যাঁর স্থিতি অর্থাৎ যিনি প্রকৃতপক্ষে অদ্বৈত সেই সর্বশক্তিমান শ্রীভগবানকে নমস্কার। ঐ জলময় সমুদ্রের পরে লোকালোক নামে এক পর্বত আছে। তার একদিকে সূর্যের আলো পড়ে আর একদিকে পড়ে না। যে অংশ সূর্যের আলো পায় তার নাম লোক আর যে অংশ আলো পায় না তার নাম অলোক। ঐ সমুদ্রের পরে সুমেরু থেকে মানসোত্তর পর্বতের মাঝামাঝি পর্যন্ত যে দেশ তার পরিমাণ এক কোটি সাতান্ন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার যোজন। সলিল সমুদ্রের পরেও আবার ঐ পরিমাণ ভূমি ; সেখানে প্রাণীর বাস আছে। তারও পরে রয়েছে আট কোটি উনচল্লিশ লক্ষ যোজন স্বর্ণময় ভূমি যা দেখতে দর্পণের মত। সেখানে কোন কিছু রাখলে তা কোথায় আছে বুঝতে পারা যায় না। এইজন্য এখানে কোন প্রাণীই থাকে না, শুধু দেবতারা খেলা করেন। ৩১-৩৫

ঐ পর্বত লোক এবং অলোক এই দুই দেশের মাঝখানে থেকে তাদের আলাদা করে রেখেছে বলে তার নাম লোকালোক। ঈশ্বর লোকালোক পর্বতকে তিন লোকের শেষে তাদের সীমান্ত পর্বতরূপে স্থাপন করেছেন। এই পর্বত এতদূর বিস্তৃত এবং এত উঁচু যে সূর্য থেকে শুরু করে ধ্রুবলোক পর্যন্ত যত জ্যোতিষ্ক আছে তাদের আলো নীচের তিন লোকে পড়ে, কিন্তু লোকালোক পর্বতের বাধা পেরিয়ে তার ওপারে আর যেতে পারে না। এই ভাবে পণ্ডিতেরা নাম, আকার ইত্যাদি উল্লেখ করে ঐ সব লোক কি ভাবে রচনা করা হয়েছে তা বর্ণনা করেছেন।

ভূগোলকের পরিমাণ পঞ্চাশ কোটি যোজন। আগে যে লোকালোক পর্বতের কথা বলেছি তার পরিণাম হল এর চার ভাগের একভাগ। সমস্ত জগতের গুরু ব্রহ্মা লোকালোক পর্বতের চারদিকে ঋষভ, পুষ্করচূড়, বামন আর অপরাজিত নামে চার গজাপতিকে স্থাপন করেছেন। সব লোককে স্থিরভাবে রাখা এদের কাজ। এই দিগ্‌গজদের, আর নিজের বিভূতিস্বরূপ মহেন্দ্র ইত্যাদি লোকপালদের শক্তি বাড়াবার জন্য এবং সমস্ত লোকের মঙ্গলের জন্য সর্বশক্তিমান অন্তর্যামী ভগবান ঐ পর্বতে অবস্থান করছেন। সেখানে তাঁর ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য এবং ঐশ্বর্য প্রভৃতি আটটি মহাসিদ্ধিযুক্ত বিশুদ্ধসত্ত্ব উজ্জ্বল মূর্তি প্রকাশিত। বিষ্বক্‌সেন প্রভৃতি তাঁর শ্রেষ্ঠ পার্ষদরা তাঁর চারদিকে রয়েছেন। তিনি নিজেও নানা দিব্য অস্ত্রে সজ্জিত। তিনি মহাবিভূতি এবং পরম ঐশ্বর্যের আধার, তাই একই মূর্তিতে চারদিকে বিরাজ করছেন। ভগবান অন্তর্যামীরূপে থেকেই সব কাজ করতে পারেন, তবু তিনি নানা মূর্তি ধারণ করে নিজেকে বাইরে প্রকাশ করেছেন। তার অর্থ হল এই যে তাঁর নিজেরই যোগমায়ায় যে বিশ্বের সৃষ্টি হয়েছে তাকে রক্ষা করবার জন্য তিনি নানা লীলা-বিগ্রহ স্বীকার করেছেন। ৩৬-৪১

মেরু থেকে শুরু করে লোকালোক পর্যন্ত যতখানি, তার পরে অলোক দেশের বিস্তার ততখানি। তারও পরে যেসব জায়গা আছে সেখানে শুধু যোগেশ্বররাই গিয়ে থাকেন। ব্রাহ্মণের পুত্রকে আনবার সময় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে সেখানে নিয়ে গিয়েছিলেন। ঐ স্থান অতি পবিত্র। ব্রহ্মাণ্ডরূপ গোলকের মাঝখানে আছেন সূর্য। সূর্য থেকে ঐ গোলকের যেদিকেই যাওয়া হোক সবদিকেই পঁচিশ কোটি যোজন। এই অণ্ড যখন মৃত অর্থাৎ অচেতন ছিল তখন সূর্য তাতে বিরাজ করতেন, তাই তিনি মার্তণ্ড। আর ঐ হিরণ্ময় অণ্ড থেকে তিনি জন্মান বলে তাঁর নাম হিরণ্যগর্ভ। মহারাজ, সূর্যই দিক, আকাশ, পৃথিবী এবং অন্য সব কিছুকে ভাগ করছেন। ভোগের স্থান (স্বর্গ), মোক্ষের স্থান, নরক, রসাতল—এসবকেও তিনিই ভাগ করছেন। সূর্যই দেবতা, মানুষ, পশু, পক্ষী, সরীসৃপ, লতা প্রভৃতি সমস্ত জীবের আত্মা, তিনিই দর্শন-ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। ৪২-৪৬

একবিংশ অধ্যায়

সূর্যের রাশিচক্রে ভ্রমণ

শুকদেব বললেন, মহারাজ, পরিমাণ আর লক্ষণের কথা বলে আপনার কাছে ভূমণ্ডলের বিন্যাস বর্ণনা করলাম। এর বিস্তার পঞ্চাশ কোটি যোজন, আর উচ্চতা পঁচিশ কোটি যোজন। স্বর্গতত্ত্ব জানেন এমন পণ্ডিতেরা এর থেকেই স্বর্গের পরিমাণের হিসাব করে থাকেন। ছোলা ইত্যাদির বীজে যে দুটি করে দল থাকে তার একটির যা পরিমাণ দ্বিতীয়টির পরিমাণও তাই হয়। ভূমণ্ডল আর স্বর্গমণ্ডলও তেমনি দুটি দলের মত সমান ভাগে বিভক্ত। এদের একটি অপরটির সঙ্গে সংলগ্ন হয়ে যে অণ্ডের আকার ধারণ করেছে তার মধ্যেকার জায়গার নাম আকাশ। আকাশের মাঝখানে থেকে সূর্যদেব ত্রিলোককে তাপ দিচ্ছেন এবং নিজের জ্যোতিতে তাদের প্রকাশিত করছেন। সূর্য তাঁর উত্তরায়ণ পথে বা ধীর গতিতে মকর প্রভৃতি রাশিতে উঠে গিয়ে দিনকে বড় আর রাত্রিকে ছোট করেন। আবার দক্ষিণায়নে দ্রুত গতিতে নেমে এসে দিনকে ছোট আর রাত্রিকে বড় করেন।

বিষুব বা সমান গতিতে সমান জায়গায় থেকে তিনি দিন-রাত্রিকে সমান করেন। এটা হয় যখন তিনি মেষ এবং তুলা রাশিতে থাকেন। বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা—এই পাঁচটি রাশিতে থাকলে দিন বাড়তে থাকে আর প্রতি মাসে এক এক ঘণ্টা করে রাত্রি ছোট হতে থাকে। সূর্য যখন বৃশ্চিক প্রভৃতি পাঁচটি রাশিতে যান তখন তার বিপরীত ব্যাপার হয় অর্থাৎ রাত্রি বড় হতে থাকে, দিনের দৈর্ঘ্য কমতে থাকে। মোটকথা, যতদিন সূর্যের দক্ষিণায়ন ততদিন রাত বাড়ে, আর যতদিন তাঁর উত্তরায়ণ দিন বাড়ে। ১-৬

পণ্ডিতেরা বলেন, এইভাবে সূর্যের ধীর আর দ্রুত গতির পরিমাপে তাঁর মানসোত্তর পর্বতের আবর্তন পথটির (অর্থাৎ সূর্য তাকে ঘুরে যতখানি পথ ভ্রমণ করেন) পরিমাণ নয় কোটি একান্ন যোজন। মানসোত্তর পর্বতে, মেরুর পূর্বদিকে ইন্দ্রের পুরী দেবধানী, দক্ষিণে যমের পুরী সংযমনী, পশ্চিমে বরুণের পুরী নিম্লোচনী এবং উত্তরে চন্দ্রের পুরী বিভাবরী। মেরুর চারদিকে ঐসব পুরীতে বিশেষ বিশেষ সময়ে উদয়, অস্ত, মধ্যাহ্ন আর নিশীথ হয়ে থাকে। তা দিয়েই প্রাণীরা কখন কাজ আরম্ভ বা শেষ করবে সে ঠিক হয়[১]। যারা মেরুতে আছে মধ্যাহ্নসূর্য তাদের সর্বদা তাপ দিচ্ছেন। সূর্য যখন নক্ষত্রের দিকে চলা শুরু করেন তখন মেরু থাকে তাঁর বাঁ দিকে। কিন্তু প্রবহ নামে যে বায়ু দক্ষিণাবর্ত ঘটায় তা জ্যোতিশ্চক্রকে ঘোরায় বলে সূর্য প্রতিদিনই মেরুকে একবার করে ডানদিকে রেখে চলেন। সূর্য চক্রাকার পথে চলেন বলে দূর থেকে কখনও মনে হয় তিনি মাটির সঙ্গে লেগে আছেন। তাকেই বলা হয় সূর্যের উদয়। যখন দেখা যায় তিনি আকাশে উঠে গিয়েছেন তখন হল মধ্যাহ্ন, মাটিতে ঢুকে পড়েছেন এইরকম মনে হলে বলি তাঁর অস্ত, আর তারও পরে অনেক দূরে গেলে হয় নিশীথ। সূর্যের যেখানে উদয় তার ঠিক বরাবর বিপরীতে তাঁর অস্ত। যেদিকে তাঁর প্রচণ্ড তাপে প্রাণী ঘর্মাক্ত হচ্ছে তার উল্টোদিকেই, নিশীথকালে প্রাণীরা নিদ্রায় মগ্ন। যারা সূর্যকে অস্ত যেতে দেখে, সূর্য সেখানে (অর্থাৎ নিশীথে তিনি যেখানে থাকেন) গেলে তারা আর তাঁকে দেখতে পায় না। ইন্দ্রপুরী থেকে যমপুরী যেতে সূর্যের পনের ঘণ্টা সময় লাগে এবং দুই কোটি সাঁইত্রিশ লক্ষ পঁচাত্তর হাজার যোজন পথ চলতে হয়। সেখান থেকে যথাক্রমে বরুণ এবং চন্দ্রের পুরী ঘুরে সূর্য আবার ইন্দ্রপুরীতে ফিরে আসেন। চন্দ্র প্রভৃতি গ্রহও সূর্যের মতই নক্ষত্রদের সংগে জ্যোতিশ্চক্রে উদিত হন এবং তাদের সংগেই অস্ত যান। এই ভাবে সূর্যের বেদময় রথ ঐ চার পুরী ঘুরে আসার সময় প্রতি মুহূর্তে চৌত্রিশ লক্ষ আটাশ যোজন পথ চলে।[২] ৭-১২

সূর্যের রথের একটিই চাকা। তার নাম সংবৎসর। তার বারটি অর[৩] বার মাস, ছয় নেমি[৪] হল ছয় ঋতু, আর তিন নাভি[৫] তিন চতুর্মাস। ঐ চাকার অক্ষের[৬] একভাগ মেরুপর্বতের চূড়ায় আর অন্য ভাগ মানসোত্তর পর্বতে স্থাপিত রয়েছে।

---

১ এর তাৎপর্য হল—অবস্থান অনুসারে সূর্যোদয় বা সূর্যাস্তের সময়ের পার্থক্য ঘটে। তাই এক জায়গায় যখন সূর্যোদয় অর্থাৎ দিনের এবং বিভিন্ন কাজের শুরু, অন্য জায়গায় হয়ত তখন মধ্যাহ্ন অর্থাৎ দিন অনেকটাই অগ্রসর। এই রকম কোথাও হয়ত সূর্যাস্ত বা কাজ শেষ করবার সময়, আবার কোথাও মধ্যরাত্র।

২ সূর্যের গতি সংক্রান্ত পুরাণের মতের সঙ্গে উপনিষদের মতের পার্থক্য বিদ্যমান (দ্র. ছান্দোগ্য উপনিষদ, ৩৬-১১, অখণ্ড উপঃ (হরফ প্রকাশনী) পৃঃ ৪৮৪-৮৮। ৩ চাকার পাখি (spoke)।
৪ ঐ বেড় (tire)। ৫ ঐ মধ্যস্থল (hub)। ৬ ঐ দণ্ড (axle)।

সূর্যরথ মানসোত্তর পর্বতে স্থাপিত হওয়াতে তা তৈলযন্ত্রের (ঘানির) চাকার মত অবিরাম ঘুরছে। ঐ রথের আরও একটি অক্ষ আছে। তার এক অংশ প্রথম অক্ষের সঙ্গে যুক্ত আর দ্বিতীয় অংশ ধ্রুবলোকে থেকে ঘানির অক্ষের মতই আবর্তিত হচ্ছে। দ্বিতীয় অক্ষটি প্রথম অক্ষের এক চতুর্থাংশ মাত্র। ঐ রথের নীড় (রথী যেখানে বসেন সে জায়গা) ছত্রিশ যোজন উঁচু আর নয় লক্ষ যোজন বিস্তৃত। ঐ রথের যুগের (জোয়ালের) পরিমাণও তাই। গায়ত্রী প্রভৃতি সাতটি ছন্দ ঐ রথের সাত ঘোড়া। তাদের রথে জুড়ে সারথি অরুণ সূর্যদেবকে বহন করে নিয়ে যান। অরুণ সূর্যদেবের রথের সারথি বলে তিনি তাঁর সামনে বসছেন, কিন্তু তা হলেও তাঁর মুখ থাকছে পশ্চিমে। কারণ যা সূর্যের সামনের দিক তাই হল পশ্চিম। বুড়ো আঙুলের সমান লম্বা ষাট হাজার বালখিল্য ঋষি সূর্যের আগে আগে থেকে তাঁর স্তবগান করতে করতে চলেন। অন্য অন্য ঋষি, গন্ধর্ব, অপ্সরা, নাগ, রাক্ষস, দৈত্য প্রভৃতি এক এক মাসে এক এক রকম কাজের দ্বারা নানা নামধারী পরমাত্মারূপী ভগবান সূর্যের উপাসনা করেন। তাঁরা সবাই সংখ্যায় চৌদ্দজন করে হলেও দু'জন দু'জন করে সাতটি করে জোড়া বেঁধে থাকেন। মহারাজ, এইভাবে ঋষি প্রভৃতিদের সঙ্গে নিয়ে আদিত্যদেব প্রতিক্ষণে নয় কোটি একান্ন লক্ষ যোজন পরিমাণ ভূমণ্ডলের দু হাজার যোজন আর দুই ক্রোশ পথ চলেন। ১৩-১৯

দ্বাবিংশ অধ্যায়

জ্যোতিশ্চক্রের মধ্যে চন্দ্রের স্থান

রাজা বললেন, ভগবান, আপনি যে বললেন আদিত্যদেব মেরু এবং ধ্রুবলোককে প্রদক্ষিণ করেন (ডানদিকে রেখে ঘুরে আসেন), অথচ রাশিদের দিকে যাবার সময় তাদের অপ্রদক্ষিণ করে (বাঁ দিকে রেখে) যান, একথা আমার কাছে পরস্পরবিরুদ্ধ মনে হচ্ছে। প্রকৃত ব্যাপারটা কি করে জানতে পারব ? রাজার সন্দেহ দূর করবার জন্য শুকদেব বললেন, কুমোরের চাকা যখন ঘুরতে থাকে, তার উপরে পিঁপড়ে থাকলে সেও চাকার সঙ্গে সঙ্গে একই দিকে ঘোরে। তা সত্ত্বেও পিঁপড়েরা যখন অন্যদিকে মুখ করে চলে তখন তাদের যে নিজের গতি আছে সেটা বোঝা যায়। তেমনি নক্ষত্র এবং রাশিদের নিয়ে যে কালচক্র ধ্রুব আর সুমেরুকে প্রদক্ষিণ করে ঘুরছে, তাতে অবস্থিত থেকে সূর্য, গ্রহ ইত্যাদি তার মতই গতি পাচ্ছে। কিন্তু তারা যখন এক নক্ষত্র কি রাশি থেকে আর এক নক্ষত্র কি রাশিতে যায় তখন তাদের গতি আলাদা বলে বোধ হয়। ভগবান আদিত্যদেব আদি-পুরুষ সাক্ষাৎ নারায়ণ। তিনি লোকের মঙ্গল আর কর্মশুদ্ধির জন্য নিজের বেদময় দেহকে বার ভাগে ভাগ করে সূর্যরূপী হয়েছেন। ঐ বার ভাগকে আবার ছয় ঋতুতে ভাগ করে কর্মভোগ অনুসারে তাদের কোনটিতে শীত, কোনটিতে গ্রীষ্মের ব্যবস্থা করেছেন। জ্ঞানী ব্যক্তিরাও বেদ আলোচনা করে তাঁর স্বরূপ সম্বন্ধে নানা তর্ক-বিতর্ক করে থাকেন। যাঁরা বর্ণাশ্রমের বিধি মেনে বেদোক্ত নানা কর্মের দ্বারা শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁর আরাধনা করেন তাঁরা সহজেই ইন্দ্র প্রভৃতি রূপে তাঁকে পান। আর যাঁরা শ্রদ্ধাভরে ধ্যান ইত্যাদির দ্বারা তাঁর আরাধনা করেন তাঁরা সহজেই তাঁকে পান অন্তর্যামীরূপে। এই আদিত্যদেব সব লোকের আত্মা। তিনি

স্বর্গ আর পৃথিবীর মধ্যবর্তী আকাশে কালচক্রে থেকে বার মাসে সব রাশিকে ঘুরে আসেন। মেষ প্রভৃতি বারটি রাশির নামেই মাসগুলির নামকরণ হয়েছে। তারাই সম্বৎসরের দেহস্বরূপ। মাস আবার নানা রকমের হতে পারে। চন্দ্রের হিসাবে দুই পক্ষে এক মাস হয়। সৌর হিসাবে সূর্যের সওয়া দুই নক্ষত্রে স্থিতিকাল হল এক মাস। ঐ একমাস পিতৃগণের এক অহোরাত্র। তাঁদের হিসাবে কৃষ্ণপক্ষ হল একদিন আর শুক্লপক্ষ একরাত্রি। আদিত্যদেব যে সময়ে সম্বৎসরের ছয়ভাগের একভাগ অর্থাৎ দুটি রাশি ভোগ করেন, তাকে বলে ঋতু। তাই ঋতুও সম্বৎসরের এক দেহ। এইভাবে সূর্যদেব যে সময়ে আকাশমণ্ডলের অর্ধেক পথ চলেন তার নাম অয়ন। এক অয়ন হল বৎসরের অর্ধেক বা ছয়মাস। ১-৬

যেই পরিমাণ সময়ে সূর্যদেব স্বর্গ এবং ভূমণ্ডলের সঙ্গে সমস্ত নভোমণ্ডল সম্পূর্ণ ভোগ করেন তা হল সম্বৎসর। সূর্যের ধীর, দ্রুত বা সমান গতি অনুসারে ঐ পরিমাণ সময়কে সম্বৎসর ছাড়া আরো চারটি নাম দেওয়া হয়েছে— পরিবৎসর, ইদাবৎসর, অনুবৎসর এবং উদাবৎসর। সূর্যমণ্ডল থেকে লক্ষ যোজন দূরে থেকে দ্রুতগামী চন্দ্র দুই পক্ষে সূর্যের এক সম্বৎসর, সোয়া দু'দিনে এক মাস. আর এক দিনে এক পক্ষ ভোগ করে থাকেন। চন্দ্রের কলা যখন বাড়তে থাকে তখন হল শুক্লপক্ষ, আর যখন কমে তখন কৃষ্ণপক্ষ। শুক্লপক্ষ দেবপূজার আর কৃষ্ণপক্ষ পিতৃপূজার পক্ষে প্রশস্ত। এইভাবে চন্দ্র শুক্ল এবং কৃষ্ণপক্ষের সাহায্যে দেব এবং পিতৃপূজার সময় নির্দেশ করেন এবং ত্রিশ মুহূর্তে এক এক নক্ষত্র ভোগ করেন। চন্দ্র হলেন ওষধিদের প্রভু, তাই তিনি অন্নময়, এবং অন্নময় বলে জীবদের প্রাণস্বরূপ। তিনি জীবনের কারণ এবং অমৃতময়, তাই তাঁর এক নাম জীব। ষোলকলা যুক্ত ভগবান চন্দ্র মনের দেবতা, তাই তিনি মনোময়। মনোময়, অন্নময়, অমৃতময় চন্দ্রদেব দেবতা, পিতা, মানুষ, ভূত, পশু, পক্ষী, সরীসৃপ, লতা প্রভৃতি উদ্ভিদের প্রাণকে তৃপ্ত করছেন। এইজন্য জ্ঞানীরা তাঁকে সর্বময় বলে থাকেন। ৭-১০

চন্দ্রমণ্ডলের উপরে দু'লক্ষ যোজন দূরে নক্ষত্রগণ ঈশ্বরের নিয়ম অনুসারে কালচক্রে মেরুকে প্রদক্ষিণ করছে; তাদের নিজস্ব গতি নেই। তাদের সংখ্যা সাতাশ, কিন্তু উত্তরাষাঢ়া আর শ্রবণার মিলনস্থানকে অভিজিৎ নক্ষত্র নাম দেওয়ায় তাকে ধরে মোট সংখ্যা হল আটাশ। নক্ষত্রমণ্ডলের উপরের দিকে দু'লক্ষ যোজন দূরে আছেন শুক্রগ্রহ। সূর্যের মত এঁরও গতির তারতম্য হয়—কখনও হয়ত দ্রুত চলেন, কখনও আস্তে, আবার কখনও বা সমানভাবে। তাই ইনি কখনও সূর্যের আগে থাকেন; কখনও সঙ্গে সঙ্গে চলেন, আবার কখনো বা সূর্যের থেকে পিছিয়ে পড়েন। ইনি সব সময়ই সব লোকের মঙ্গল করেন। শুক্রের সঞ্চারে প্রায়ই বৃষ্টি হয়। আর যে সব গ্রহ বৃষ্টির পক্ষে বাধা সৃষ্টি করে শুক্র তাদের প্রভাব নষ্ট করেন। ১১-১২

শুক্রের মত বুধও কখনও সূর্যের আগে, পিছে বা সঙ্গে সঙ্গে চলেন। বুধ হলেন সোমের পুত্র এবং শুক্রের থেকে দু'লক্ষ যোজন দূরে তাঁকে দেখা যায়। এঁর থেকে প্রায়ই লোকের মঙ্গল হয়। কিন্তু ইনি যখন সূর্যকে অতিক্রম করে যান তখন ঝড়-ঝঞ্ঝা এবং অনাবৃষ্টি ঘটে। তার থেকে দু'লক্ষ যোজন উঁচুতে আছেন মঙ্গল। ইনি এক একটি রাশি তিন পক্ষে অতিক্রম করে বারটি রাশি ভোগ করেন। কিন্তু তাঁর গতি যদি বেঁকে যায় তবে কিছু অন্যরকম হয়। মঙ্গল অশুভ গ্রহ, এঁর থেকে নানা দুঃখের উৎপত্তি হয়। মঙ্গলের থেকেও দু'লক্ষ যোজন উঁচুতে হলেন বৃহস্পতি। ভগবান বৃহস্পতি যে পরিমাণ সময়ে একটি রাশি অতিক্রম করেন তার নাম পরিবৎসর। তবে তার গতি বক্র হলে ঐ সময়ের কিছু এদিক ওদিক হয়।

ইনি ব্রাহ্মণদের পক্ষে বিশেষ মঙ্গলপ্রদ। বৃহস্পতির দু লক্ষ যোজন উপরে শনি গ্রহ। প্রতি রাশিতে এর অবস্থান হয় ত্রিশ মাস করে। ঐ সময়ের নাম অনুবৎসর। তাই শনির বারটি রাশিভোগ করতে ত্রিশ বৎসর লাগে। ইনি প্রায় সকলের পক্ষেই অশান্তিকর। শনিগ্রহ থেকে এগার লক্ষ যোজন উত্তরে দেখা যায় সপ্তর্ষি মণ্ডলকে। ঐ সাত জন ঋষি সব লোকের মঙ্গল চিন্তা করতে করতে ভগবান বিষ্ণুর পরম পদ অর্থাৎ ধ্রুবলোককে প্রদক্ষিণ করে ঘুরছেন। ১৩-১৭

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

ধ্রুবলোক ও শিশুমার জ্যোতিশ্চক্রের অবস্থিতি

শুকদেব বললেন, মহারাজ, সপ্তর্ষিমণ্ডলের থেকে তের লক্ষ যোজন দূরে যে ধ্রুবলোক, তাই বিষ্ণুর পরমপদ। উত্তানপদের পুত্র মহাভাগবত ধ্রুব এই লোকে আছেন। অগ্নি, ইন্দ্র, প্রজাপতি কশ্যপ এবং ধর্ম নক্ষত্রের রূপে অতি সম্মানের সঙ্গে তাঁকে প্রদক্ষিণ করছেন। কল্পান্ত পর্যন্ত যাঁদের আয়ু ধ্রুব আজও তাঁদের অবলম্বন হয়ে ভগবানের উপাসনা করছেন। গ্রহ, নক্ষত্র প্রভৃতি যত জ্যোতিষ্ক আছে সে সবই কালচক্রে ঘুরছে, ধ্রুবই শুধু স্থির আছেন। ঈশ্বর ধ্রুবলোককে জ্যোতিষ্কদের অবলম্বনস্বরূপ করে স্তম্ভের (খুঁটির) মত স্থাপন করেছেন এবং তা চিরকাল দীপ্তি পাচ্ছে। ধান মাড়াই করবার সময় পশুরা যেমন দড়ি দিয়ে খুঁটির সঙ্গে বাঁধা থেকে খুঁটির থেকে তার দূরত্ব অনুসারে আস্তে আস্তে বা তাড়াতাড়ি (বেশী বা কম সময়ে) তার চারদিকে বৃত্তের আকারে ঘুরে ঘুরে চলে, তেমনি গ্রহনক্ষত্রেরা ধ্রুবকে অবলম্বন করে কেউ কাছে, কেউ, মাঝামাঝি আবার কেউ বা দূরে—এই ভাবে কালচক্রে যুক্ত থেকে এবং বায়ুদ্বারা বিচালিত হয়ে কেউ ধীর, কেউ মধ্য, কেউ বা দ্রুত গতিতে কল্পান্তকাল পর্যন্ত ঘুরছে। মেঘেরা এবং শ্যেন প্রভৃতি পাখীরা যেমন বাতাসের সাহায্যে ডানা নেড়ে আকাশে ওড়ে, গ্রহনক্ষত্ররাও তেমনি ঈশ্বরের মায়াবশে এবং তাঁরই শক্তিতে গতি পেয়ে আকাশপথে চলছে, পৃথিবীতে এসে পড়ছে না। কেউ কেউ বলেন এই জ্যোতিশ্চক্র শিশুমারের (শুশুক) দেহ-সংস্থানের মত ভগবান বাসুদেবের যোগধারণায় অবস্থিত, তাই এর পড়ে যাবার ভয় নেই। ১-৪

এই শিশুমার কুণ্ডলী পাকিয়ে নীচের দিকে মুখ করে আছে। ধ্রুব তার লেজের ডগা, প্রজাপতি, অগ্নি, ইন্দ্র আর ধর্ম তার লেজ, ধাতা এবং বিধাতা লেজের গোড়া, সপ্তর্ষি তার কোমর। ঐ শিশুমারের শরীর ডানপাশ হয়ে কুণ্ডলী পাকিয়েছে। তার ডানদিকে উত্তরায়ণ নক্ষত্র অর্থাৎ অভিজিৎ থেকে শুরু করে পুনর্বসু পর্যন্ত চৌদ্দটি নক্ষত্র, আর বাঁদিকে দক্ষিণায়ন নক্ষত্র পুষ্যা থেকে উত্তরাষাঢ়া পর্যন্ত চৌদ্দটি নক্ষত্র রয়েছে। তাই শিশুমারের কুণ্ডলী পাকান দেহের দু' পাশেই অবয়বের সংখ্যা সমান। এর পিঠ হল অজবীথী অর্থাৎ মূলা, পূর্বাষাঢ়া এবং উত্তরাষাঢ়া আর পেট আকাশগঙ্গা। মহারাজ, কোন নক্ষত্রকে কোন অঙ্গ বলে কল্পনা করা হয়েছে তা বিস্তারিত করে বলছি শুনুন। ঐ শিশুমারের ডান নিতম্ব পুনর্বসু, বাঁ নিতম্ব পুষ্যা; ডান পা আর্দ্রা, বাম পা অশ্লেষা; নাকের ডান দিকের ছিদ্র অভিজিৎ, বাঁ দিকের ছিদ্র উত্তরাষাঢ়া; ডান চোখ শ্রবণা, বাঁ চোখ পূর্বাষাঢ়া; ডান কান ধনিষ্ঠা আর বাঁ কান হল মূলা। মঘা থেকে অনুরাধা

পর্যন্ত যে আটটি দক্ষিণায়ন নক্ষত্র আছে তা ঐ শিশুমারের বাঁ পাশের হাড়ের সঙ্গে যুক্ত এবং মৃগশিরা থেকে পূর্বভাদ্রপদ পর্যন্ত যে আটটি উত্তরায়ণ নক্ষত্র তারা বিপরীত দিক থেকে তার ডান পাশের হাড়ের সঙ্গে যুক্ত। ঐ শিশুমারের ডান কাঁধে শতভিষা, বাঁ কাঁধে জ্যেষ্ঠা; চোয়ালের উপরের দিকে নক্ষত্ররূপী অগস্ত্য, নীচের দিক ক্ষেত্ররূপী যম; মুখ হল মঙ্গল গ্রহ, উপস্থ শনিগ্রহ, ককুৎ (পিঠের কুঁজ) বৃহস্পতি, বুক সূর্য, হৃদয় নারায়ণ, মন চন্দ্র, নাভি শুক্র, দুই স্তন দুই অশ্বিনীকুমার, প্রাণ এবং অপান বুধ, গলা রাহু, সর্বাঙ্গ কেতু আর গায়ের লোম হল তারাসমূহ। শ্রীভগবানের এই রূপ সর্বদেবময়। সংযত এবং বাগ্যত (বাক্যে সংযত) হয়ে প্রতিদিন তিন সন্ধ্যা এঁকে দেখা এবং এঁর উপাসনা করা উচিত। মন্ত্র হল—জ্যোতিঃগণের আশ্রয় এবং কালচক্ররূপ, দেবগণের অধিপতি মহাপুরুষকে বার বার নমস্কার করি এবং তাঁর ধ্যান করি। এই মন্ত্র তিন সন্ধ্যা জপ করে পাপহরণ পরমেশ্বরের এই গ্রহ-নক্ষত্র-তারাময় রূপকে যিনি স্মরণ এবং প্রণাম করেন তাঁর সমস্ত পাপ দূর হয়ে যায়। ৫-৯

চতুর্বিংশ অধ্যায়

সপ্ত অধোলোকের কথা

শুকদেব বললেন, মহারাজ, কেউ কেউ বলেন যে রাহু সূর্য থেকে অযুত যোজন নীচে রয়েছে এবং নক্ষত্রের মতই ভ্রমণ করছে। সিংহিকার পুত্র রাহু নিজে সব অসুরের অধম। কিন্তু অযোগ্য হয়েও সে ভগবানের দয়ায় অমর হয়েছিল। তার জন্ম-কর্মের কথা পরে বলছি। যে সূর্যমণ্ডল নীচের দিকে রাহুকে তাপ দেয় তার বিস্তার অযুত যোজন; চন্দ্রমণ্ডলের বিস্তার বার যোজন, আর রাহুর নিজের বিস্তার হল তের যোজন। এই রাহু আগে অমৃত পান করবার সময় সূর্য আর চন্দ্রের মাঝখানে ঢুকেছিল। সূর্য এবং চন্দ্র সেকথা প্রকাশ করে দেওয়াতে তাদের সঙ্গে রাহুর শত্রুতা জন্মে, তাই অমাবস্যা আর পূর্ণিমাতে রাহু সূর্য আর চন্দ্রের দিকে ছুটে যায়। একথা জানতে পেরে ভগবান চন্দ্র-সূর্যকে রক্ষা করবার জন্য তার সুদর্শন চক্র প্রয়োগ করেন। ঐ চক্র অনবরত ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং তার তেজ দুঃসহ। তাই রাহু চন্দ্র-সূর্যের দিকে যেতে গিয়েও আবার ভয়ে দূরে সরে যায়। তার এই চন্দ্র-সূর্যের অভিমুখে যাওয়াকেই লোকে উপরাগ বা গ্রহণ বলে থাকে। রাহু সোজাসুজি থাকলে হয় সর্বগ্রাস, একটু বেঁকে থাকলে হয় অর্ধগ্রাস। আসলে অবশ্য কোনটাই গ্রাস নয়, দেখে সেই রকম মনে হয় এই মাত্র। রাহুর বার হাজার যোজন নীচে সিদ্ধ, চারণ এবং বিদ্যাধরদের বাস। তারও নীচে যে জায়গার নাম অন্তরীক্ষ সেখানে যক্ষ, রক্ষ, পিশাচ, ভূত আর প্রেতেরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। গ্রহ প্রভৃতি আর কিছুই সেখানে নেই। যতদূর পর্যন্ত বাতাস বয় এবং মেঘমালা দেখা যায় ততদূরই অন্তরীক্ষ। তার থেকে একশ যোজন নীচের দিকে রয়েছে এই পৃথিবী। হংস, ভাস (শকুন), শ্যেন এবং সুপর্ণ প্রভৃতি প্রধান পাখীরা যতদূর উড়তে পারে ঐ পর্যন্তই পৃথিবীর সীমা। ১-৬

পৃথিবীর ভূ-সংস্থানের কথা আগেই বলেছি। এর নীচের দিকে অযুত যোজন করে দূরে দূরে, দৈর্ঘ্য আর প্রস্থে সমান সাতটি গর্ত আছে। ঐ সাতটি গর্ত বা লোকের নাম অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল আর পাতাল। ঐসব লোকে

ঘরবাড়ী, খেলবার-বেড়াবার জায়গা সবই আছে। ভোগ, বিলাস, ঐশ্বর্য, আনন্দ, ধন-সম্পত্তি, নানা বিভূতি ইত্যাদিতে সে সব জায়গা স্বর্গকেও হার মানায়। দৈত্য, দানব আর নাগেরা পরম সুখে সেখানে বাস করছে। তাদের স্ত্রী-পুত্র, বন্ধু-বান্ধব, অনুচর ইত্যাদির। আমোদপ্রিয় এবং তাদের প্রতি সর্বদাই অনুরক্ত। তারা যা চায় তাই পায় এবং এ বিষয়ে তারা ইন্দ্রকেও ছাড়িয়ে যায়। মায়ার সাহায্যে তারা নানারকম আমোদ-প্রমোদ করে থাকে। ময়দানবের তৈরী সুন্দর সুন্দর নগর ঐসব লোককে উজ্জ্বল করে রেখেছে। সে সব নগরে বহু বিচিত্র বাড়ী, প্রাচীর নগরদ্বার, সভাগৃহ, চৈত্য, চত্বর এবং বিশ্রামের স্থান শ্রেষ্ঠ সব মণিতে তৈরী। ঐসব লোকের অধিপতিদের বাড়ীগুলিতে নাগ, অসুর, কপোতমিথুন আর শুক-শারী শোভা পাচ্ছে। আর সেখানকার সব উদ্যানের শোভার কাছে স্বর্গের শোভাও লাগে না। লতা-জড়ানো গাছের ডাল ফুল, ফল, কিশলয়ের ভারে নুয়ে পড়েছে। তাদের শোভা দেখলে চোখ এবং মন আনন্দে ভরে ওঠে। স্বচ্ছ জলে ভরা সরোবরে বহু মাছ। তারা লাফিয়ে উঠে ক্ষণে ক্ষণে জলকে চঞ্চল করে তুলছে। জলের উপরে লাল, নীল, শাদা নানা রঙের পদ্ম, শালুকের বন। সেখানে জোড়ায় জোড়ায় পাখিরা বিহার করছে। তাদের গান এমন মিষ্টি যে শুনলে কান জুড়ায়। পৃথিবীর তলার ঐ সব লোকে সূর্যের আলো পড়ে না বলে দিনরাত্রির ভেদ নেই। তাই কালের ভয়ও সেখানে মনে জাগে না। মহাসর্প অনন্তের মাথার মণির আলো সেখানকার অন্ধকার সম্পূর্ণ দূর করেছে। ৭-১২

ঐ স্থানের অধিবাসীরা নানা উপকারী গাছ-গাছড়ার রস, রোগনাশক, আয়ু-বৃদ্ধিকারী পথ্য পান-ভোজন করে বলে তাদের আধিব্যাধি নেই, বার্ধক্যের নানা লক্ষণ যেমন চর্ম কুঞ্চিত হওয়া, চুলপাকা, দেহের বিবর্ণতা, ঘাম, দুর্গন্ধ, ক্লান্তি, উৎসাহের অভাব এসব কিছুই নেই। বয়সের জন্য তাদের শরীরের অবস্থার কোন পরিবর্তনই হয় না, এবং ভগবানের সুদর্শনচক্ররূপ তেজ ছাড়া মৃত্যুও কল্যাণভাজন এই অধিবাসীদের উপর আধিপত্য করতে পাবে না। সেই তেজ ঐসব লোকে প্রবেশ করলে ভয়ে দৈত্যবধূদেরও গর্ভপাত ঘটে। অতলে ময়ের ছেলে বল নামে অসুর বাস করে। ছিয়ানব্বুই রকম মায়া সে সৃষ্টি করেছিল। তার মধ্যে কোনটা এখনও মায়াবীরা ধারণ করে থাকে। বল হাই তুললে পরে তার মুখ থেকে স্বৈরিণী, কামিনী আর পুংশ্চলী—এই তিনরকম স্ত্রী উৎপন্ন হয়। যে স্ত্রী সবর্ণ পুরুষে রত সে হল স্বৈরিণী; যে সবর্ণ অসবর্ণ দুয়েতেই রত সে কামিনী; আর যে কামিনী হয়েও চঞ্চলা সে পুংশ্চলী। যদি কোন পুরুষ ঐ বিবরের কোন বাড়ীতে ঢোকে তবে ঐ স্ত্রীরা প্রথমে তাকে হাটক নামে একরকম রস পান করিয়ে সম্ভোগে সমর্থ করে তোলে। তারপর অপূর্ব বিলোল কটাক্ষ, সানুরাগ মৃদুহাসি, সপ্রেম সম্ভাষণ, আলিঙ্গন ইত্যাদির দ্বারা তাকে মিলনে প্ররোচিত করে এবং ইচ্ছানুযায়ী রমণ করায়। হাটক-রসের এমন অদ্ভুত গুণ যে তা পান করলে পুরুষের 'আমি ঈশ্বর', 'আমি সিদ্ধ' এই রকম অহংকার জন্মে এবং তার শরীরে অযুত মত্ত হাতীর শক্তি এসে উপস্থিত হয়। অতলের নীচে হল বিতল নামে বিবর বা গর্ত। সেখানে শিব হাটকেশ্বর নাম নিয়ে নিজের পার্ষদ ভূত-প্রেতদের নিয়ে অবস্থান করছেন এবং সৃষ্টি বৃদ্ধির জন্য ভবানীর সঙ্গে মিলিত অবস্থায় রয়েছেন। শিব-শিবানীর বীর্যে হাটকী নামে নদী এই বিতল থেকেই বেরিয়েছে। অগ্নি পবনের সাহায্যে প্রদীপ্ত হয়ে এই হাটক-রস পান করে অর্থাৎ আপন তেজে শোষণ করে নেয়। তারপর তাকে কঠিন করে ফুঁ দিয়ে বার করে দেয়। সেই বস্তুই হাটক নামে সোনা, যা নাকি দৈত্যরাজদের অন্তঃপুরে পুরুষেরা স্ত্রীদের সঙ্গে অলংকার রূপে ধারণ

করেছেন। এই বিতলের নীচের দিকে সুতল। এখানে বিরোচনের পুত্র কীর্তিমান পুণ্যশ্লোক বলি আজও বাস করছেন। ইন্দ্রের প্রিয় কাজ করে দেবার জন্য ভগবান অদিতির গর্ভে বামনরূপে জন্ম নেন এবং প্রথমে তিনলোক অধিকার করে তারপর দয়া করে বলিকে সুতলে স্থান দেন। সেখানে বলি যতখানি শোভা-সম্পদের অধিকারী হয়েছেন তা ইন্দ্রলোকেও নেই। তিনি আজও নির্ভয়ে সেই আরাধ্য ভগবানের অর্চনা করছেন। ১৩-১৮

সুতলে বলির অতুল ঐশ্বর্য যে ভূমিদানেরই সাক্ষাৎ ফল, তা নয়। ভগবান সমস্ত জীবের জীবনস্বরূপ, তিনিই পরমাত্মা বাসুদেব, পবিত্রতম পাত্র। পরম শ্রদ্ধায়, আদরে একচিত্ত হয়ে তাঁকে কিন্তু দান করলে তা মোক্ষের কারণ হয়ে থাকে। তাই অকিঞ্চিৎকর ঐশ্বর্য ঐ দানের ফল হতে পারে না। মানুষ ক্ষুধার সময়, পড়ে গিয়ে বা মৃত্যুকালে বিবশ হয়ে যদি একবার তাঁর নাম উচ্চারণ করে তা হলে অনায়াসে কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হয়। এই বন্ধন সামান্য নয়; একে কাটাবার জন্য মুক্তিকামীরা যোগ অনুষ্ঠান ইত্যাদি নানা কষ্ট সহ্য করেন।[১] নারদ প্রভৃতি ভক্তকে ভগবান আত্মদান করেছেন, সনক ইত্যাদি জ্ঞানিগণের তিনি আত্মতম। তাই, তাঁকে ভূমিদানের ফল ঐশ্বর্যলাভ—এ হতে পারে না। এমনকি ইন্দ্রত্ব ইত্যাদিও ভগবানের দয়ার ফল নয়। কারণ ভোগ-বিলাস মায়াময়; ওসবে আকৃষ্ট হলে মন ঈশ্বরের থেকে দূরে সরে আসে। তাই ঐশ্বর্য ভক্তের পথে বিরাট বাধার মত।[২] ভগবান যখন অন্য উপায় না দেখে ভিক্ষাচ্ছলে ত্রিলোক অপহরণ করে বলির শরীরমাত্র বাকী রাখলেন এবং তাকেও বরুণের পাশে বেঁধে পাহাড়ের গুহায় ছুঁড়ে ফেললেন তখন বলি বলেছিলেন, কি দুঃখের বিষয়! ইন্দ্র দেবরাজ এবং বৃহস্পতি তাঁর পরামর্শদাতা গুরু হলেও পরমার্থের ব্যাপারে তাঁর অভিজ্ঞতা বিশেষ আছে বলে মনে হয় না। কারণ ইন্দ্র ভগবানকে দিয়ে আমার কাছে কিনা ত্রিভুবন ভিক্ষা করালেন, কিন্তু তাঁর দাস্য চাইলেন না। অনন্তকালের প্রবাহে কত ত্রিভুবন ভেসে যাচ্ছে, তার আধিপত্যের কি মূল্য? আমার পিতামহ প্রহ্লাদের পিতার মৃত্যুর পর ভগবান তাঁকে পিতার সিংহাসন দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ঈশ্বর আর তাঁর (প্রহ্লাদের) মাঝখানে বাধা হয়ে দাঁড়াবে চিন্তা করে প্রহ্লাদ রাজত্ব গ্রহণ করলেন না। চাইলেন ভগবানের দাস্য ভক্তি। ১৯-২৫

কিন্তু আমার মত যাদের কামনা-বাসনা নিঃশেষ হয় নি বা যারা ভগবানের কৃপালাভও করে নি তারা কি তাঁর পথে যেতে চাইবেন? শুকদেব এইভাবে বলির মহত্ত্বের কথা কিছুটা বর্ণনা করে বললেন, মহারাজ, দৈত্যরাজ বলির কথা পরে ভাল করে বলব। ভগবান নারায়ণ নিজে গদা হাতে তাঁর দরজায় দ্বারপালের কাজ করছেন। একদিন রাবণ সেই দরজা দিয়ে ঢুকতে যাচ্ছিল। তখন নিজের পায়ের আঙুলের এক আঘাতে ভগবান তাকে অযুত যোজন দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেন।

---

১ তুলনীয়: যোগী স্বীয় ইন্দ্রিয় ও মনকে সংযত করে, সমস্ত ভোগের উপকরণ ত্যাগ করে এবং মন হতে বাসনা আকাঙ্ক্ষা দূর করে একাকী নির্জন স্থানে অবস্থানপূর্বক আত্মাকে ভগবানের সঙ্গে যুক্ত করবেন।—গীতা, ৬।১০ শ্লোক।

২ তুলনীয়: শ্রেয় (কল্যাণকর বস্তু) এবং প্রেয় (প্রীতিকর বস্তু) পরস্পর বিভিন্ন, এদের প্রয়োজনও বিভিন্ন। শ্রেয়ের প্রয়োজন মুক্তিলাভে, প্রেয়ের প্রয়োজন ঐহিক ও পারত্রিক সুখভোগে। এ উভয়ই পুরুষকে আবদ্ধ করে। এদের মধ্যে যিনি শ্রেয়কে গ্রহণ করেন তাঁর কল্যাণ হয়, আর যিনি প্রেয়কে বরণ করেন তিনি পরমার্থ হতে বিচ্যুত হন।—কঠ উপনিষৎ, ১।২।১ শ্লোক।

সুতলের নীচে আছে তলাতল। ভক্ত বলি যেমন শ্রীহরির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়ে সুখে বাস করছেন, তেমনি ময় নামে যে দানবরাজ মায়াবীদের গুরু আর ত্রিপুরের অধিপতি তাকে ভগবান ত্রিপুরারি দয়া করে এই তলাতলে আশ্রয় দিয়েছেন। ত্রিভুবনের মঙ্গলের জন্য শিব প্রথমে তার তিনটি পুরই পুড়িয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু পরে তিনি তার উপর প্রসন্ন হন। তখন ময় মহাদেবের চরণ লাভ করে সুদর্শন চক্রের ভয় থেকে মুক্ত হয়। তলাতলের নীচে হল মহাতল। সেখানে রুদ্রের অপত্য বহু ফণাধারী ক্রুদ্ধস্বভাব সর্পের বাস। তাদের মধ্যে কুহক, তক্ষক, কালিয়, সুষেণ প্রভৃতি প্রধান। ঐসব সাপেরা নারায়ণের বাহন গরুড়ের ভয়ে সর্বদা অস্থির। তারই মধ্যে কখনও কখনও তারা স্ত্রীপুত্র, বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে বিহার করতে যায়। মহাতলের নীচে রসাতল। সেখানে দৈত্য-দানব, কালকেয় হিরণ্যপুরবাসী দেবতাদের শত্রু অসুরেরা বাস করে। জন্ম থেকেই তারা মহাতেজস্বী এবং সাহসী, কিন্তু শ্রীহরির তেজে তাদের বীর্য নষ্ট হওয়াতে গর্তের সাপের মত বাস করছে। তারা সরমার কথা স্মরণ করে সর্বদাই ইন্দ্রের ভয়ে ভীত।[১] রসাতলের নীচে পাতাল। সেখানে বাসুকি, শঙ্খ, কুলিক, মহাশঙ্খ, শ্বেত, ধনঞ্জয়, ধৃতরাষ্ট্র, শঙ্খচূড়, কম্বল ইত্যাদি বিশাল ফণাধারী নাগরাজগণ বাস করছে। এদের মধ্যে কারো পাঁচ, কারো সাত, কারো দশ এবং কারো বা হাজারটি মাথা। তাদের মাথার উজ্জ্বল মহামণির দীপ্তিতে পাতালপুরীর অন্ধকার দূর হয়ে যায়। ২৬-৩১

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

সংকর্ষণদেবের বিবরণ

শুকদেব বললেন, মহারাজ, যেখানে পাতালের মূল সেখান থেকে ত্রিশ হাজার যোজন দূরে অনন্ত নামে ভগবানের এক তামস অংশ বাস করছেন। যাঁরা সাত্বত-তন্ত্রের (বৈষ্ণবধর্মের) বিধান অনুসারে চতুর্ব্যূহের উপাসনা করেন তাঁরা এঁকে বলেন সংকর্ষণ; কারণ ইনি দ্রষ্টা এবং দৃশ্যকে সম্যক কর্ষণ বা একীভূত করেন। ঐরকম করবার কারণ হচ্ছে এই যে মানুষের যে 'আমি' এবং 'আমার' এই অভিমান বা অহঙ্কার আছে ইনি তার অধিষ্ঠাতা। সহস্রশির অনন্তের একটি মাথায় এই ভূমণ্ডল অবস্থিত। পৃথিবীকে সেখানে একটি শাদা সরষের মত দেখায়। প্রলয়ের সময় যখন ইনি সৃষ্টিকে সংহার করতে চান তখন ক্রোধে কুটিল তাঁর মনোহর দুই ভুরুর মাঝখান থেকে একাদশব্যূহ আর তিননেত্র বিশিষ্ট সঙ্কর্ষণ নামে রুদ্র ত্রিশূল হাতে নিয়ে উঠে আসেন। অনন্তদেবের দুই পাদপদ্মের অরুণবর্ণ মণির তুল্য উজ্জ্বল নখে দর্পণের মত প্রতিফলন হয়। ভক্তদের সঙ্গে নাগরাজেরা যখন গভীর ভক্তিতে সেখানে প্রণত হন তখন উজ্জ্বল কুণ্ডলে শোভিত তাঁদের সুন্দর

১ একসময় অসুরেরা দেবতাদের গাভী চুরি করে লুকিয়ে রেখেছিল। ইন্দ্র দেবশুনী সরমাকে সেই চুরি-করা গাভীর খোঁজে পাঠান। সরমাকে দেখে অসুররা ভাবল ইন্দ্র নিশ্চয় সব জেনে ফেলে-ছেন। তখন তারা মিটমাট করবার ইচ্ছায় সরমাকে জিজ্ঞাসা করল, 'সরমা, তোমার কি ইচ্ছা বল।' তখন সরমা বুঝল যে এ অসুরদেরই কাজ। সে রেগে গিয়ে বলল, 'হতভাগারা, তোরা যদি বাঁচতে চাস তো শীগ্‌গির পালা। নইলে আমার প্রভু ইন্দ্র এসে তোদের শেষ করবে।' ঐ কথা শুনে অসুররা খুবই ভয় পেয়েছিল।

মুখমণ্ডল ঐ নখদর্পণে প্রতিফলিত হলে তাঁরা তা দেখে আনন্দ পান। নাগরাজ কন্যারা নানা বস্তু কামনা করে অনন্তদেবের রজতশুভ্র বাহুতে অগুরু, চন্দন আর কুংকুম মাখিয়ে দেন। সেই হাত স্পর্শ করলেই তাঁদের হৃদয় আলোড়িত হয়, মনে কামবলার উদয় হয়, ললিত হাসিতে মুখমণ্ডল শ্রীময় হয়ে ওঠে। তাঁরা তখন ভগবানের মুখে দেখতে পান অনুরাগ-ভরা মদির আনন্দের ভাব, করুণামাখান দুটি চোখ আবেশে অরুণ। ঐ অনন্তের পুরীতে থেকে অনন্ত গুণের আধার ভগবান আদিদেব অনন্ত সমস্ত লোকের মঙ্গল করছেন। সেখানে সুর, অসুর, সিদ্ধ, গন্ধর্ব, বিদ্যাধর, সর্প এবং মুনিরা অনুক্ষণ তাঁর ধ্যান করেন। তাঁর ঢুলু ঢুলু দুটি চোখ মদে বিহ্বল এবং বিকৃত। তিনি সুমধুর বাক্যে আপন পার্ষদ দেবতাদের পরিতুষ্ট করছেন। তাঁর বসনের রঙ নীল, কানে কুণ্ডল, পিঠে হল (লাঙ্গল), বাহু দুখানি অতি সুন্দর। তাঁর গলায় বৈজয়ন্তী মালার শোভা দেখে ইন্দ্রের স্বর্ণময় গজকুম্ভের কথা মনে পড়ে। সেই মালার অম্লান নবীন তুলসীর সুগন্ধ-রূপ মধুর রসে মধুকরেরা মত্ত। মুমুক্ষুরা ভগবানের এই রূপের বর্ণনা শুনলে এবং তার ধ্যান করলে তিনি তাদের অন্তরে উদিত হন এবং অনাদিকাল যাবৎ সঞ্চিত সত্ত্ব, রজ, তম গুণময় হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন করেন। দেবর্ষি নারদ ব্রহ্মার সভায় তুম্বুরুর সঙ্গে ঐ অনন্তদেবের মহিমা এইভাবে কীর্তন করেছিলেন। ১-৮

যিনি এই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের কারণ, সত্ত্ব প্রভৃতি তিনটি গুণ যাঁর চোখের ইঙ্গিতে নিজের নিজের কাজ করছে, যাঁর রূপের আদি-অন্ত নেই, যিনি অদ্বিতীয় হয়েও বিশ্বসৃষ্টির জন্য নানারূপী হয়েছেন, তাঁর স্বরূপ জানতে পারে কে? সৎ-অসৎ সমস্ত বস্তু যাঁতে প্রকাশিত, তিনি আমাদের অনেক কৃপা করে সত্ত্বমূর্তি ধারণ করেছেন। ভক্তের মন বশ করবার জন্য তিনি যে লীলা করেছেন মহাবল সিংহেরা[1] তার থেকে শিক্ষা নিয়েছেন। তাঁর নাম অন্যের মুখে শুনে রোগী রোগ থেকে মুক্তি পায়, সে নাম কোনক্রমে পতিতজনের কানে গেলে তার তো মুক্তি হয়ই, অন্য যে শোনে তারও অশেষ কলুষ ক্ষয় হয়। তিনি ছাড়া মুমুক্ষু ব্যক্তির আর কোন আশ্রয় আছে? তাঁর সহস্র শিরের একটিতে নদী-সমুদ্র, পাহাড়-পর্বত, চরাচরসহ এই ভূমণ্ডল একটি পরমাণুর মত স্থাপিত রয়েছে। অমিতবিক্রম এই বিরাট পুরুষের অনন্ত গুণ কি সহস্র মুখেও গুনে শেষ করা সম্ভব? এই রকম অসীম শক্তি, অলৌকিক বীর্য, গুণ আর ক্ষমতা যুক্ত হয়ে এই ভগবান রসাতলের মূলে থেকে অবলীলাক্রমে পৃথিবীকে স্থিরভাবে নিজের শিরে ধরে রেখেছেন। তাঁকে ধারণ করবার জন্য কারো দরকার হয় না, তিনি নিজেই নিজের আধার। শুকদেব বললেন, মহারাজ, এসব আমি যেমন শুনেছি তেমনি তোমাকে বললাম। কোন লোকের কি গতি হবে তা ঠিক হয় তার কৃতকর্মের দ্বারা। যে সব পুরুষ প্রবৃত্তিমার্গ অনুসরণ করে তাদের নিজ নিজ কর্মের ফল অনুসারে উচ্চ বা নীচ যেমন গতি হয় তাই তোমাকে বললাম। এবার কি বলব বল। ৯-১৫

ষড়্‌বিংশ অধ্যায়

বিভিন্ন নরকের বর্ণনা

পরীক্ষিৎ শুকদেবকে জিজ্ঞাসা করলেন, মহর্ষি, লোকের এরকম ভিন্ন ভিন্ন গতি

১ মহাবীর্যবান ব্রহ্মা প্রভৃতি বরদাতা দেবগণ।

হবার কারণ কি ? ঋষি বললেন, সব মানুষ কর্ম করছে বটে কিন্তু কর্তার (কর্ম যে করছে তার) মধ্যে তিন গুণের তারতম্যের হিসাবে কর্তা তিন রকমের এবং তাদের শ্রদ্ধাও তিন রকমের হয়ে থাকে। শ্রদ্ধা সাত্ত্বিক, কি রাজসিক, কি তামসিক সেই অনুযায়ী অনুষ্ঠিত কর্মের ফল যথাক্রমে সুখ, দুঃখ এবং মোহমিশ্রিত দুঃখ হয়ে থাকে।[১] তা ছাড়াও, একই লোকের শ্রদ্ধাও সবসময় এক রকম থাকে না, তাই কর্ম-ফলেরও ইতরবিশেষ হয়। শাস্ত্রে নিষিদ্ধ কাজ করলে অকর্ম করা হয়। এক্ষেত্রেও শ্রদ্ধার তারতম্যে অকর্মের ফল যে দুঃখ তার কম-বেশী হয়ে থাকে। অবিদ্যা থেকে জীবের নানা কু-কামনার উৎপত্তি হয়। ঐসব কামনার পরিণাম হল নরকে গতি। এরকম সহস্র সহস্র গতির কথা বলা হয়েছে ; সে-সবই এবার তোমার কাছে বর্ণনা করব। রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, ভগবান, যাকে নরক বলা হয় সে কি পৃথিবীরই কোন দেশ, নাকি তা ত্রিভুবনের বাইরে অবস্থিত, অথবা ত্রিভুবনের মধ্যেই কোন স্থান ? শুকদেব বললেন, এইসব নরক ত্রিলোকের মধ্যেই রয়েছে। দক্ষিণদিকে যেখানে সপ্তপাতাল, সেই ভূমির নীচে এবং ভূমিগর্ভস্থ জলের উপরে এদের অবস্থান। সেখানে অগ্নিষ্বাত্ত ইত্যাদি পিতৃগণ পরম সমাধিযোগে নিজ নিজ কুলের মঙ্গল কামনা করছেন। পিতৃরাজ যম এইখানে নিজ পার্ষদদের সঙ্গে বাস করেন। তাঁর রাজ্যে যাদের আনা হয় তিনি ভগবানের আদেশ মেনে তাদের অপরাধ অনুসারে শাস্তি দিয়ে থাকেন। কেউ কেউ বলেন, নরকের সংখ্যা হল একুশ। নাম, রূপ আর লক্ষণ অনুসারে তারা যথাক্রমে এইরকম—তামিস্র, অন্ধ-তামিস্র, রৌরব, মহারৌরব, কুম্ভীপাক, কালসূত্র, অসিপত্রবন, শূকরমুখ, অন্ধকূপ, কৃমিভোজ, সংদংশ, তপ্তশূর্মি, বজ্রকণ্টকশাল্মলী, বৈতরণী, পূয়োদ, প্রাণরোধ, বিশসন, লালাভক্ষ, সারমেয়াদন, অবীচি এবং অয়ঃপান। এছাড়া ক্ষারকর্দম, রক্ষোগণভোজন, শূলপ্রোত, দন্দশূক, অবটনিরোধন, পর্যাবর্তন এবং সূচীমুখ নামে আরো সাতটি নরক আছে। এই আটাশটি নরক অশেষ যন্ত্রণার স্থান। ১-৭

এইবার পাপ অনুসারে কার কি গতি হয় বলি শোন। যে লোক পরের ধন, সন্তান বা স্ত্রী চুরি করে ভীষণ যমদূতেরা তাকে কালপাশে বেঁধে তামিস্রনরকে নিয়ে ফেলে। ঐ অন্ধকারাচ্ছন্ন নরকে যে যায় সে ক্ষুধায়, তৃষ্ণায়, প্রহারে এবং পীড়নে তৎক্ষণাৎ জ্ঞানহীন হয়ে পড়ে। যে লোক কাউকে বঞ্চনা করে তার স্ত্রীকে উপভোগ করে তার স্থান হয় অন্ধতামিস্রে। ছিন্নমূল গাছের মত সেখানে গিয়ে পড়ে জীব যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে বুদ্ধি আর দৃষ্টি দুইই হারায়। যে ব্যক্তি 'এই শরীরই আমি', 'এই ধন আমার' এইরকম ভেবে প্রাণিহিংসা করে এবং নিজের আর আত্মীয়-কুটুম্বের ভরণপোষণ করে, শরীর ছেড়ে সে যায় রৌরবে। পৃথিবীতে সে যেই প্রাণীর উপর যে রকম অত্যাচার করেছিল, সেসবই রুরু রূপ ধরে তার উপরও সেই রকম অত্যাচার করে। রুরু হচ্ছে সাপের থেকেও হিংস্র, ভারশূঙ্গ নামে একরকম প্রাণী। তার নামের থেকেই ঐ নরকের নাম রৌরব। যে ব্যক্তি প্রাণিহিংসা করে শুধুই নিজের দেহকে পোষণ করে সে গিয়ে পড়ে মহারৌরব নরকে। সেখানে ক্রব্যাদ নামে রুরুরা তার দেহের মাংস খুবলে খুবলে তাকে যন্ত্রণা দেয়। যেই নিষ্ঠুর লোক নিজের দেহপুষ্টির জন্য পশুপাখীকে জীবন্ত অবস্থায়ই রেঁধে খায়, তাকে রাক্ষসরাও নিন্দা করে। যমলোকে যমদূতেরা তাকে কুম্ভীপাকে ফেলে তপ্ত তেলে ভাজে। ৮-১৩

যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণের অনিষ্ট করে সে কালসূত্র নামে নরকে যায়। এই নরক

১ গীতা, ১৭।২-৪ শ্লোকাবলী দ্রষ্টব্য।

অযুত যোজন বিস্তৃত, উত্তপ্ত তামায় মোড়া। পাপী এখানে গেলে তার দেহ ভিতরে এবং বাইরে উপরে সূর্যের তেজে আর নীচে আগুনের তাপে পুড়তে থাকে। সে কখনও দাঁড়ায়, কখনও বসে, শোয়, হাত পা ছোঁড়ে, ছুটাছুটি করে। তার গায়ে যত লোম তত হাজার বছর সে ঐ যন্ত্রণা ভোগ করে। যে ব্যক্তি অকারণে বেদাচার ছেড়ে অনাচারে প্রবৃত্ত হয় যমদূতেরা তাকে অসিপত্রবন নরকে নিয়ে গিয়ে কশা (চাবুক) দিয়ে মারতে থাকে। মার খেয়ে ছুটে পালাতে গেলে দুপাশে তালবনের অসিপত্রে (তরোয়ালের মত ধারাল পাতায়) তার সর্বাঙ্গ ছিন্নভিন্ন হয়; আর সে 'হা হতোঽস্মি' (আমি মরলাম) বলে দারুণ যন্ত্রণায় পদে পদে জ্ঞান হারায়। স্বধর্ম ত্যাগ করলে এরকম শাস্তিই ভোগ করতে হয়। পৃথিবীতে যে রাজা বা রাজপুরুষ নিরপরাধ ব্যক্তিকে শাস্তি দেয় অথবা ব্রাহ্মণকে দৈহিক দণ্ড দেয় সেই মহাপাপী যমলোকে শূকরমুখ নরকে গিয়ে পড়ে। সেখানে মহাশক্তিমান যমদূতেরা তার শরীরকে আখের মত পিষতে থাকে। নির্দোষ ব্যক্তি শাস্তি পেয়ে যেমন যন্ত্রণা ভোগ করেছিল, শাস্তিদাতাও তেমনি যন্ত্রণায় চীৎকার করতে করতে একসময় মূর্ছিত হয়ে পড়ে। মৎকুন (ছারপোকা) প্রভৃতি প্রাণী মানুষের রক্ত খেয়ে বাঁচে। ঈশ্বরই তাদের জন্য ঐরকম ব্যবস্থা করেছেন। তাদের বুদ্ধি নেই বলে অন্যের কষ্ট বুঝতে পারে না। কিন্তু মানুষ তার বিবেক দিয়ে অপরের দুঃখ অনুভব করতে পারে। তাই যারা ঐসব প্রাণীকে মারে তারা সেই পাপে অন্ধকূপ নরকে যায়। পশু, পাখী, সরীসৃপ, মশা, যূক (উকুন), মৎকুন, মাছি প্রভৃতি যে সব প্রাণীকে হিংসা করেছিল তারা চারদিক থেকে তাকে আক্রমণ করে। সেই ঘোর অন্ধকারে তারা না পারে ঘুমাতে না পারে স্থির থাকতে। তারা পশুর মত শুধু ইতস্তত ছুটাছুটি করতে থাকে। অল্পস্বল্প যতটুকুই হোক খাদ্য পেলে যে পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান না করে (ব্রাহ্মণ, অতিথি, দেবতা, পিতৃগণ এবং ইতর প্রাণীদের না দিয়ে) নিজে তা খায় সে পরলোকে কৃমিভোজ নামে নরকে যায়। সেখানে শত সহস্র যোজন কৃমির কুণ্ডে নিজেও কৃমি হয়ে কৃমিই খায়। অন্য কৃমিরাও তাকে খেতে থাকে। প্রাণী এবং দেবতাদের না দিয়ে খাবার জন্য যে পাপ তা ক্ষয় হয়ে না যাওয়া পর্যন্ত তার এই যন্ত্রণাভোগ চলবে। যে ব্যক্তি চুরি করে অথবা কেড়ে ব্রাহ্মণের ধন-রত্ন নিয়ে নেয় এবং খুব বিপদে না পড়েও অন্যজাতির ধনরত্নও ঐভাবে আত্মসাৎ করে, পরলোকে যমদূতেরা জ্বলন্ত লোহার পিণ্ড আর সংদংশ (সাঁড়াশি) দিয়ে তাকে টুকরো টুকরো করে ছেঁড়ে। ১৪-১৯

যে পুরুষ অগম্যা নারী অথবা যে নারী অগম্য পুরুষের সহবাস করে পরলোকে যমদূতেরা কশাঘাত করতে করতে সেরকম পুরুষকে আগুনের মত গরম লোহার নারীমূর্তির সঙ্গে আর নারীকে ঐরকম পুরুষমূর্তির সঙ্গে আলিঙ্গন করায়। পশুর সঙ্গেও যে সঙ্গম করে তাকে যমদূতেরা বজ্রকণ্টক শাল্মলী (শিমুল) গাছের উপর ফেলে ঘষতে থাকে। সৎকুলে জন্মেও যে রাজা বা রাজপুরুষ ধর্মের মর্যাদা লঙ্ঘন করে মৃত্যুর পর তাকে বৈতরণী নদীতে ফেলা হয়। নরকের পরিখা (নর্দমা) স্বরূপ এই নদীতে পড়লেই জলজন্তুরা তাকে খেতে আরম্ভ করে। অত যন্ত্রণাতেও কিন্তু তার চেতনা লোপ পায় না। তার পাপের ফল স্মরণ করতে করতে মল, মূত্র, পুঁজ, রক্ত, চুল, নখ, হাড়, মেদ, মাংস, চর্বির স্রোতযুক্ত নদীতে পড়ে দুঃসহ ক্লেশ ভোগ করে। যারা শূদ্র-জাতির নারীর সঙ্গ করে এবং বর্ণাশ্রম-বিহিত শুদ্ধ আচার, নিয়ম, লজ্জা ত্যাগ করে নিজের ইচ্ছানুযায়ী চলে, তারা পুঁজ, মলমূত্র, শ্লেষ্মা আর লালায় ভর্তি সমুদ্রে পড়ে ঐসব বীভৎস বস্তুই খায়। ইহলোকে যে ব্রাহ্মণ পোষা কুকুর আর

গাধা নিয়ে শিকার করে, আর যেখানে শাস্ত্রে পশুবধের বিধি নেই সেখানেও পশুবধ করে, পরলোকে যমদূতেরা তাকে তীর দিয়ে বিদ্ধ করতে থাকে। যে সব দাম্ভিক লোক দম্ভের জন্য যজ্ঞ করে পশুহত্যা করে, মৃত্যুর পর তাদের গতি হয় বৈশস নামে নরকে। সেখানে যমদূতেরা তাদের অশেষ যন্ত্রণা দিয়ে পীড়ন করতে থাকে। ২০-২৫

যদি কোন ব্রাহ্মণ কামমোহিত হয়ে নিজ বর্ণের স্ত্রীকে শুক্র পান করায় তবে যমপুরুষেরা তাকে শুক্রে পূর্ণ নদীতে ফেলে শুক্র পান করায়। যেসব রাজা বা রাজপুরুষ দস্যুর মত আগুনে বা বিষে জনপদ এবং পথিকের সর্বনাশ করে পরলোকে সাতশ বিশটা ভীষণ কুকুর বজ্রের মত শক্ত দাঁতে তাদের ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায়। যে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়, কেনা-বেচার সময় বা দান করবার সময় মিথ্যা কথা বলে পরলোকে যমদূতেরা তাকে একশ' যোজন উঁচু পর্বতের চূড়া থেকে অবীচি নামে অবলম্বনশূন্য নরকে ফেলে দেয়। এই নরকের অবীচি নাম হবার কারণ তা পাথরে বাঁধান হলেও বীচি (ঢেউ) শূন্য জলের মত দেখায়। তার উপর পড়ে পাপীর দেহ তিল তিল হয়ে চূর্ণ হলেও তার চৈতন্য লোপ পায় না। বারবার তাকে এই রকম উঁচু থেকে নীচে ফেলা হতে থাকে। যদি কোন ব্রাহ্মণ বা তার স্ত্রী সুরাপান করে, অথবা কোন ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য ব্রত আচরণ করলেও মত্ত হয়ে সোমপান করে তবে যমদূতেরা তাকে নরকে এনে বুকে পা দিয়ে চেপে ধরে মুখে গলান লোহা ঢেলে দেয়। যে লোক নিজে অধম হয়েও মিথ্যা অহংকারে জন্ম, তপস্যা, বিদ্যা, আচার, বর্ণ এবং আশ্রমের দিক দিয়ে তার থেকে যে শ্রেষ্ঠ এবং পূজনীয়, তার সম্মান না করে সে বেঁচেও মৃত। মরলে পরে সেই পাপী নীচের দিকে মুখ করে ক্ষারকর্দম নরকে গিয়ে পড়ে এবং সেখানে দুরন্ত যন্ত্রণা ভোগ করে। ২৬-৩০

ইহলোকে যে ব্যক্তি নরবলি দিয়ে ভৈরব প্রভৃতির পূজা করে এবং যে স্ত্রীলোক নরমাংস খায়, বলি প্রদত্ত পশুরা রাক্ষসের রূপ ধরে ঐ পুরুষ এবং স্ত্রীলোককে তীক্ষ্ণ অস্ত্রে ছিন্ন ভিন্ন করে এবং দারুণ উল্লাসে তাদের রক্তপান করে নাচতে থাকে। সব প্রাণীই বাঁচতে চায়। তারা প্রথমে বন্য বা গৃহপালিত পশুপাখীর বিশ্বাস জন্মিয়ে তারপর তাদের শূলে বিঁধে বা দড়ির ফাঁসে আটকে যন্ত্রণা দিয়ে মারে, যমলোকে তাদেরও ঐরকম শূলবিদ্ধ হয়ে যমযন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় যখন তারা কাতর হয়ে পড়ে তখন কংক, বট প্রভৃতি পাখীরা তীক্ষ্ণ ঠোঁটের আঘাতে তাদের অস্থির করে তোলে। তখন যে পাপ তারা করে এসেছে তার কথা মনে জাগে। যে সব বদরাগী লোক সাপের মত সবার আতঙ্কের সৃষ্টি করে, মরলে পরে তাদের গতি হয় দন্দশূক নামে নরকে। সাপ যেমন ইঁদুর ধরে খায়, সেখানে পাঁচমুখো, সাতমুখো সব সাপ তাদের ধরে গিলতে থাকে। এই সংসারে যারা প্রাণীদের অন্ধবাট[১] বা কুশূলে[২] আটকে রাখে, পরলোকে যমের দূতেরা তাদের ঐরকম গর্তে ঢোকায়, তারপর আগুন আর বিষাক্ত ধোঁয়া দিয়ে সেখানে বন্ধ করে রাখে। এই পৃথিবীতে যে গৃহকর্তা অতিথি অভ্যাগত এলে রেগে গিয়ে তাদের দিকে এমন দৃষ্টিতে তাকায় যেন চোখের আগুনে তাদের ভস্ম করে ফেলবে, তারাও নরকে যায় এবং সেখানে কাক, শকুনি প্রভৃতি পাখীরা ধারালো ঠোঁটে সেই-সব লোকের দুই চোখ উপড়ে ফেলে। ৩১-৩৫

যে ব্যক্তি ঐশ্বর্যের গর্বে 'আমি সবার থেকে বড়' এই ভেবে লোককে অবজ্ঞা করে, কিছু চুরি করে নেবে এই মনে করে গুরুজনদেরও সন্দেহের চোখে দেখে এবং

১ বায়ুহীন গর্ত। ২ ধান ইত্যাদি রাখবার জন্য বদ্ধ ছোট জায়গা ; গোলা।

অর্থব্যয় করবার নামেই যার মুখ আর বুক শুকিয়ে যায়, তার কোন কিছুতেই সুখ বা শান্তি হয় না, শুধু যক্ষের মত ধন আগলানই সার হয়। মৃত্যুর পর তাকে সূচীমুখ নরকে যেতে হয়। সেখানে যমদূতেরা তাঁত বোনার মত করে তার দেহের মধ্য দিয়ে সুতো চালাতে থাকে। মহারাজ, যমপুরীতে এই রকম শতসহস্র নরক আছে। যে সব পাপীদের কথা বললাম এবং যাদের কথা বলা হল না তারা সবাই পালা করে ঐসব নরকে গিয়ে থাকে। তেমনি আবার যারা ধর্মের পথে চলে তারা স্বর্গে গিয়ে সুখ ভোগ করে। মানুষ তার আগের আগের জন্মে যে পুণ্যের বা পাপের ফল অর্জন করেছে পরলোকে তার কিছু অংশ ভোগ হয়; বাকীটা ভোগ করবার জন্য তাকে আবার পৃথিবীতে জন্ম নিতে হয়। নিবৃত্তিমার্গের কথা আগে (দ্বিতীয় স্কন্ধে) বলেছি। চৌদ্দটি কোষে এইভাবে ব্রহ্মাণ্ড বিভক্ত বলে সব পুরাণেই বলা আছে। এ হল মহাপুরুষ ভগবান নারায়ণের মায়াগুণময় স্থূলরূপ। যিনি আদর করে এই বিবরণ নিজে পড়েন, শোনেন এবং অপরকে শোনান, শ্রদ্ধায় আর ভক্তিতে তাঁর বুদ্ধি নির্মল হয়। উপনিষদে ভগবানের যে দুর্জ্ঞেয় রূপের কথা বলা হয়েছে তা ধারণার অতীত হলেও তিনি তাকে উপলব্ধি করতে পারেন।[১] যোগীরা ভগবানের স্থূল এবং সূক্ষ্ম রূপের কথা ভাল করে শুনে স্থূল বিষয়ের চিন্তার সাহায্যে মনকে জয় করে তারপর ক্রমশঃ সূক্ষ্মরূপে মন স্থাপন করবেন।[২] মহারাজ, এই পৃথিবীর দ্বীপ, বর্ষ, পর্বত, নদী, সমুদ্র, আকাশ, নক্ষত্র, পাতাল, নরক প্রভৃতি যে লোকবিন্যাসের কথা তোমার কাছে বর্ণনা করলাম, সেসবই ঈশ্বরের সেই স্থূল দেহ এবং সমস্ত জীবের আশ্রয়। ৩৬-৪০

১ সেই ব্রহ্মকে চক্ষুদ্বারা গ্রহণ করা যায় না, বাক্য দ্বারাও তিনি গ্রহণীয় নন, অন্য কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা, তপস্যা বা কোন কর্মদ্বারাও তাঁকে পাওয়া যায় না। জ্ঞানের প্রসন্নতাহেতু যাঁর অন্তঃকরণ নির্মল হয়েছে, সে ব্যক্তি চিত্তের নির্মলতা সাধনের পর সেই নিষ্কল (নিরবয়ব) পুরুষকে দেখতে পান। —মুণ্ডক উপনিষৎ, ৩।১।৮ শ্লোক।

২ তিনি সূক্ষ্ম অপেক্ষাও সূক্ষ্মতর, আবার মহৎ হতেও মহত্তর। এই পরমাত্মা জীবের বুদ্ধিরূপ গুহাতে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত আছেন। পরমেশ্বরের অনুগ্রহে সাধক সেই সর্ব-সংকল্পবর্জিত ঈশ্বর ও তাঁর মহিমা দেখতে পেয়ে সকল দুঃখ জয় করেন।—শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ, ৩।২০ শ্লোক।

ষষ্ঠ স্কন্ধ

প্রথম অধ্যায়

অজামিলের উপাখ্যান

পরীক্ষিৎ বললেন, ভগবান, আপনি আগে নিবৃত্তিমার্গের কথা সবই বলেছেন। এও বলেছেন যে সেই পথে মানুষ ক্রমে জ্যোতির্লোক ইত্যাদি লাভ করে, অবশেষে ব্রহ্মলোকে যায় এবং ব্রহ্মার সঙ্গেই মোক্ষলাভ করে। আর, যে প্রবৃত্তিমার্গ দ্বারা স্বর্গ-সুখ ইত্যাদি লাভ হয়, যার ফলে প্রকৃতির লয় না হওয়া পর্যন্ত মানুষ ভোগের জন্য দেহ ধারণ করে বারবার সংসারে আসা-যাওয়া করতে থাকে, তার কথাও বলেছেন। অধর্মের পরিণামে যেসব নরকে যেতে হয় তাও ইতিপূর্বে বললেন। যে মন্বন্তরে প্রথম মনু স্বায়ম্ভুব আবির্ভূত হলেন, তার কথা এবং দুই মনুপুত্র প্রিয়ব্রত আর উত্তানপাদের বংশ, চরিত্র বর্ণনা করেছেন। তারপর দ্বীপ, বর্ষ, সমুদ্র, পর্বত, নদী, উদ্যান, বনস্পতি এবং ভাগ, লক্ষণ ও পরিমাণ অনুসারে ধরামণ্ডল, সূর্য প্রভৃতি জ্যোতিষ্কগণ এবং অতল প্রভৃতি অধোলোক; প্রভু যেভাবে সৃষ্টি করেন, তাও ব্যাখ্যা করেছেন। হে মহাভাগ, এখন যা করলে মানুষকে নানা রকম ভীষণ যন্ত্রণায় পূর্ণ নরকে না যেতে হয়, দয়া করে তা বলুন। ১-৬

শুকদেব বললেন, মানুষ শরীরে, মনে বা কথায় যে পাপ করে যদি এই লোকেই শরীর, মন বা কথা দিয়ে তার প্রায়শ্চিত্ত না করে তবে যে সব ভয়ানক যন্ত্রণাদায়ক নরকের কথা বললাম, মৃত্যুর পর তাকে সেসব নরকে নিশ্চয়ই যেতে হবে। তাই চিকিৎসক যেমন রোগ সহজ না কঠিন তা বিবেচনা করে রোগীর চিকিৎসা করে থাকেন, সে রকম পাপীরও দেহ ক্ষীণ না হতে এবং মৃত্যুর আগে পাপ গুরু না লঘু সে বিবেচনা করে তাড়াতাড়ি তার প্রায়শ্চিত্ত করা দরকার। রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, পাপ করলে ইহলোকে রাজদণ্ড আর পরলোকে নরকবাস, এ দেখে এবং জেনেশুনেও লোকে প্রায়শ্চিত্ত করার পর আবার পাপে লিপ্ত হয়। তাহলে ধর্মশাস্ত্রে যে সব ব্রত, যেমন দ্বাদশ বার্ষিক ব্রত, প্রায়শ্চিত্ত বলে নির্দিষ্ট হয়েছে সে সব কি রকম প্রায়শ্চিত্ত যাতে পাপের অঙ্কুর থেকেই যায়? কখনও মানুষ যৌবনে হয়তো পাপ করা বন্ধ করল কিন্তু বার্ধক্যে আবার সেই পাপে লিপ্ত হয়। তাই হাতী যেমন স্নান করেই আবার গায়ে ধুলো মাখতে থাকে, প্রায়শ্চিত্তও তেমনি বৃথা মনে হচ্ছে। শুকদেব বললেন, পাপ আচরণও যেমন একরকম কর্ম, চান্দ্রায়ণ প্রভৃতি প্রায়শ্চিত্তও তেমনি কর্ম। এক কর্ম দিয়ে অন্য কর্মকে সমূলে নষ্ট করা যায় না। কারণ কর্মের অধিকারী অবিদ্যা দ্বারা কলুষিত। যার অবিদ্যা আছে তার পাপ সাময়িক নষ্ট হলেও সংস্কার থেকে আবার পাপের অঙ্কুর জন্মায়। তাই জ্ঞানই হল প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত। যে লোক হিতকর পথ্য খায়, অসুখ তাকে আক্রমণ করতে পারে না। তেমনি যে ব্যক্তি নিয়ম ইত্যাদি পালন করে চলে সে ক্রমে ক্রমে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করতে পারে। ৭-১২

তপস্যা[1], ব্রহ্মচর্য[2], শম[3], দান, সত্য, শৌচ, যম[4] ও নিয়ম[5] পালন করে ধীর, শ্রদ্ধাযুক্ত এবং ধর্মজ্ঞ ব্যক্তিরা শরীর, মন এবং বাক্য থেকে উৎপন্ন গুরুতর পাপকেও নাশ করতে পারেন। আগুন যেমন বাঁশকে ভস্ম করে, তাঁরাও পাপকে তেমনি নাশ করেন। মহারাজ, এই যে জ্ঞানরূপ প্রায়শ্চিত্তের কথা বললাম, এ অতি শক্ত কাজ। কাজেই আর এক রকম বড় প্রায়শ্চিত্তের কথা বলি শোন। তবে এ পথের পথিক কিন্তু খুবই কম। এই পথ ধরে কেউ কেউ শ্রীহরিতে ভক্তিমান হন। তাঁরা তপস্যা ইত্যাদির উপর নির্ভর না করে কেবল ভক্তিকে আশ্রয় করেন। সূর্য যেমন শিশিরকে সম্পূর্ণ নাশ করে তাঁরাও তেমনি ভক্তি দিয়েই সমস্ত পাপকে সমূলে ধ্বংস করেন। এই ভক্তিমার্গ জ্ঞানমার্গ থেকে শ্রেষ্ঠ, কারণ পাপী শ্রীকৃষ্ণে প্রাণ অর্পণ এবং তাঁর ভক্তদের সেবা করে যতখানি শুদ্ধ হতে পারে, তপস্যা করে ততখানি পারে না। তার কারণও বলছি শোন। পৃথিবীতে ভক্তির পথই সব থেকে উপযুক্ত। এ পথ শুভ, এতে বাধাবিঘ্নের ভয় নেই। জ্ঞানমার্গে সহায়হীন হবার ভয় আছে, কর্মমার্গে দুষ্টলোকের শত্রুতার ভয় আছে। ভক্তিমার্গে ঈশ্বরপরায়ণ সুশীল সাধুরা আছেন। হে রাজেন্দ্র, সমস্ত নদীও যেমন মাত্র এক কলস সুরাকে সম্পূর্ণ পবিত্র করতে পারে না, তেমনি জ্ঞান বা কর্মের পথে অনুষ্ঠিত প্রায়শ্চিত্ত ভক্তিহীন এবং নারায়ণে মতিহীন ব্যক্তিকে শুদ্ধ করতে পারে না। ভক্তি কিন্তু অন্য কোন কিছুর সাহায্য ছাড়াই পাপীকে শুদ্ধ করতে সমর্থ। ১৩-১৮

কৃষ্ণের মহিমার ধারণা হোক বা নাই হোক মন যদি কৃষ্ণে অনুরক্ত হয় তবে সেই মনকে যাঁরা কৃষ্ণের চরণপদ্মে স্থাপন করতে পারেন তাঁদের এত পাপ নষ্ট হবে যে স্বপ্নেও তাঁদের যম বা তাঁর অনুচরদের দেখতে হবে না। এ বিষয়ে বিষ্ণুদূত আর যমদূতের সংবাদ বিষয়ে একটি পুরাতন গল্প শোন। কান্যকুব্জে অজামিল নামে এক ব্রাহ্মণ ছিল। তার স্ত্রী ছিল দাসী। দাসীর সংসর্গে দূষিত হয়ে অজামিলের সদাচার সবই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ঐ অশুচি ব্রাহ্মণ পণ রেখে পাশা খেলা, লোক ঠকান, চুরি ইত্যাদি নিন্দিত কাজ করে, প্রাণীদের যন্ত্রণা দিয়ে পরিবারের ভরণ-পোষণ করত। এইভাবে তার জীবনের সুদীর্ঘ আশি বছর কেটে গেল। তার দশটি ছেলের মধ্যে সবচেয়ে ছোটটির নাম ছিল নারায়ণ। সে তার বাপমায়ের অতি প্রিয় ছিল। ১৯-২৪

মধুরভাষী ঐ ছেলেটির প্রতি বৃদ্ধ অজামিলের মন খুবই আসক্ত হয়েছিল। তার শিশুসুলভ খেলাধুলা দেখতে অজামিলের খুব ভাল লাগত। যখনই সে নিজে কিছু খেত তখন স্নেহের বশে ছেলেটিকেও খাওয়াত। এ ভাবে দিন যেতে যেতে কখন যে তার শেষ সময় এসে গেছে তা সে বুঝতেই পারে নি। মৃত্যুকালেও সেই নির্বোধ অজামিল নারায়ণ নামে তার শিশুপুত্রটির কথাই চিন্তা করতে লাগল। সে দেখল যে অতি ভীষণ চেহারার তিনজন পুরুষ তাকে নিতে এসেছে। তাদের মুখ বিকৃত, গায়ে খাড়া খাড়া লোম, আর হাতে পাশ। সেই পুরুষদের দেখে তার মন আর সব ইন্দ্রিয় আকুল হল। নারায়ণ নামে তার ছেলেটি দূরে খেলছে দেখে সে চীৎকার করে তাকে 'নারায়ণ, নারায়ণ' বলে ডাকতে লাগল। মহারাজ, মুমূর্ষু অজামিলের মুখে শ্রীহরির নাম উচ্চারিত হচ্ছে শুনতে পাওয়া-মাত্র বিষ্ণুর অনুচরগণ তার কাছে এসে উপস্থিত হলেন। ২৫-৩০

যমদূতদের অজামিলের হৃদয়ের মধ্য থেকে জীবকে টেনে বার করতে উদ্যত

---

১ মন এবং ইন্দ্রিয়গণের একাগ্রতা। ২ নারী-সংসর্গ সম্পূর্ণ ত্যাগ করে বীর্যধারণ। ৩ মনঃসংযম। ৪ অহিংসা, সত্য ইত্যাদি। ৫ ধ্যান, জপ ইত্যাদি।

দেখে তাঁরা বাধা দিলেন। তখন যমদূতেরা জিজ্ঞাসা করল, তোমরা কে যে ধর্মরাজের কাজে বাধা দিচ্ছ? কার লোক তোমরা? কোথা থেকে এসেছ? আর কেনই বা বাধা দিচ্ছ? তোমরা কি দেবতা, না উপদেবতা, না সিদ্ধ[১]? তোমাদের সকলেরই পদ্মপলাশের মত টানা চোখ, পরনে পীত কাষায় বস্ত্র, মাথায় মুকুট, কানে কুণ্ডল, গলায় পদ্মমালা। তোমরা সকলেই বয়সে তরুণ, সুন্দর, চতুর্ভুজ। ধনু, তূণ, অসি, গদা, শঙ্খ, চক্র, পদ্মে তোমাদের মনোহর শোভা হয়েছে। তার উপর তোমাদের তেজে সমস্ত দিকের অন্ধকার দূর হচ্ছে, অন্য আলো ম্লান হচ্ছে। তোমাদের দেখে ভদ্র বলে মনে হচ্ছে, তবে আমাদের বাধা দিচ্ছ কেন? ৩১-৩৬

শুকদেব বললেন, যমদূতদের কথা শুনে বাসুদেবের পার্ষদরা উচ্চহাসি হেসে মেঘগর্জনের মত গম্ভীর স্বরে তাদের বললেন, তোমরা যদি ধর্মরাজের দাস হও তবে আমাদের কাছে ধর্মের তত্ত্ব আর লক্ষণ কি বল। দণ্ড কি ভাবে দেওয়া উচিত, কাকে দণ্ড দিতে হয়? কর্ম করলেই কি মানুষকে দণ্ড পেতে হবে, নাকি মানুষের মধ্যে কেউ কেউ দণ্ডনীয়? যমদূতেরা বলল, বেদে যা কর্তব্য বলে বলা আছে তাই ধর্ম আর বেদে যা নিষিদ্ধ তাই অধর্ম। আমরা শুনেছি যে বেদ নারায়ণের নিঃশ্বাস থেকে স্বয়ং উদ্ভূত হয়েছে, তাই বেদ সাক্ষাৎ নারায়ণ এবং স্বয়ম্ভু। যিনি নিজ স্বরূপে সত্ত্ব, রজ আর তমোগুণ বিশিষ্ট প্রাণীদের শান্তত্ব প্রভৃতি গুণ, ব্রাহ্মণ প্রভৃতি নাম, অধ্যয়ন প্রভৃতি ক্রিয়া আর বর্ণাশ্রম প্রভৃতি রূপ দিয়ে যথোচিত ভাগ করেছেন তিনিই নারায়ণ। সূর্য, চন্দ্র, আগুন, আকাশ, বাতাস, সন্ধ্যা, দিন, রাত্রি, দিকসমূহ, জল, পৃথিবী এবং স্বয়ং ধর্ম—এরা সব জীবের কৃতকাজের সাক্ষী। ৩৭-৪২

এইসব সাক্ষী যাকে অধর্মী বলবে সেই শাস্তির পাত্র। যারাই অধর্ম আচরণ করবে, তারাই ক্রমে শাস্তি পাবে। কর্ম না করে কেউ থাকতে পারে না, তাই সকলেই কর্মী, কারণ সকলেরই গুণের (দেহ এবং ইন্দ্রিয়ের) সঙ্গে সম্পর্ক আছে। কাজেই সকলের পাপ করবারও যেমন সম্ভাবনা আছে তেমনি পুণ্য করবারও সম্ভাবনা আছে। যে ধর্ম আচরণ করে সে যেমন তার কাজ অনুসারে সুখভোগ করে তেমনি যে অধর্মের কাজ করে সে পরলোকে সে রকম ফল ভোগ করে। ইহলোকে যেমন উত্তম, মধ্যম, অধম—এই তিন রকম প্রাণী দেখা যায়, পরলোকেও তেমনি তারা তিন রকম হবে এটা অনুমান করা যায়। বর্তমান বসন্তকাল দেখে যেমন অতীত এবং আগামী বসন্তকালের লক্ষণ বোঝা যায়, তেমনি বর্তমান জন্ম পূর্বেকার এবং ভবিষ্যতের জন্মের ধর্ম-অধর্মের নিদর্শন হয়ে থাকে। আমাদের প্রভু অনাদি ভগবান যম নিজের আলয়ে থেকেই মানুষের অতীত আচরণ দেখতে পান এবং সেই অনুযায়ী তার ভবিষ্যৎ আচরণ ঠিক করে রাখেন, কারণ ইনি ভগবান ব্রহ্মার মত। ৪৩-৪৮

যেমন ঘুমন্ত ব্যক্তি স্বপ্ন দেখবার সময় স্বপ্নে নির্মিত দেহকেই দেখে, জাগ্রত অবস্থার দেহকে দেখে না, তেমনি অজ্ঞান জীব তার বর্তমান দেহের কথাই জানে তার আগের কথা, পরের কথা কিছুই জানে না; কারণ তার জন্মান্তরের স্মৃতি নষ্ট হয়ে গিয়েছে। জীব পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা দেওয়া-নেওয়া, চলাফেরা ইত্যাদি কাজ করে, পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় দিয়ে বিষয় ভোগ করে। ষোড়শ পদার্থ মনের সঙ্গে মিলে নিজেই সপ্তদশ-স্থানীয় হয়ে জীব কর্মেন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয় আর মন—এই তিনের সঙ্গে সমস্ত বিষয় ভোগ করে। ষোলকলা বিশিষ্ট অনাদি লিঙ্গশরীর

১ দেবযোনি বিশেষ।

(সূক্ষ্ম শরীর) সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিন গুণের কার্য বা ফল। এর দ্বারাই জীবের আনন্দ, শোক, ভয় অনুভব হয় এবং দুঃখদায়ক সংসার বা জাগতিক ব্যাপার নির্বাহ হয়ে থাকে। এই শরীরের জন্যই রিপুর অধীন অজ্ঞান জীব তার ইচ্ছা না থাকলেও কর্ম করতে বাধ্য হয়। গুটিপোকা যেমন নিজের তৈরী গুটির মধ্যে আটকা পড়ে আর বেরিয়ে আসার পথ পায় না, জীবও সেরকম কর্মের দ্বারা নিজেকে এমন ভাবে আবদ্ধ করে যে আর মুক্তির পথ খুঁজে পায় না। কাজ না করে মানুষ সামান্যতম সময়ও থাকতে পারে না। পূর্ব কর্মের সংস্কার থেকে গুণত্রয়ের দ্বারা রাগ প্রভৃতি সৃষ্টি হয়ে জীবকে জোর করে কর্মে প্রবৃত্ত করে। সেই কর্মের ফলে যে অদৃষ্ট তৈরী হয় তাই হল জীবের স্থূল বা সূক্ষ্ম দেহের কারণ। মায়ের ভাবনা বেশী শক্তিশালী হলে দেহ মায়ের মত, আর পিতার ভাবনার শক্তি বেশী হলে দেহ পিতার মত হয়ে থাকে। ৪৯-৫৪

প্রকৃতির সংসর্গে জীবের বন্ধন ঘটে, কিন্তু পরমেশ্বরের উপাসনা করলে ঐ বন্ধন থেকে অচিরে মুক্তি লাভ হয়। অজামিল প্রথম বয়সে বেদ ইত্যাদি শাস্ত্রে পণ্ডিত, সুস্বভাব, সদাচার এবং ক্ষমা প্রভৃতি গুণে পূর্ণ ছিল। সে ব্রত পালন করত এবং স্বভাবে কোমল, ইন্দ্রিয়জয়ী, সত্যবাদী, মন্ত্রজ্ঞ ও পবিত্র ছিল। সে গুরু, অগ্নি, অতিথি ও বৃদ্ধদের সেবা করত ; অহঙ্কারশূন্য, সবার বন্ধু, সাধু, মিতভাষী ও ঈর্ষাহীন ছিল। অজামিল একদিন পিতার আদেশে বনে গিয়ে ফল, ফুল, যজ্ঞের কাঠ আর কুশ সংগ্রহ করে বাড়ী ফিরছিল। এমন সময় সে দেখতে পেল যে এক কামুক শূদ্র একটি দাসীর সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মেরেয় মধু (ধেনো মদ) পান করে মত্ত হওয়াতে ঐ রমণীর দুই চোখে নেশার ঘোর লেগেছিল, আর কোমরের কাপড়ের বাঁধন শিথিল হয়ে গিয়েছিল। ঐ অনাচারী শূদ্র অজামিলের সামনেই নির্লজ্জ ভাবে দাসীটির সঙ্গে হাসি খেলা গান—এসব করতে লাগল। রমণীকে আলিঙ্গন করায় তার গায়ে মাখা হলুদ রং পুরুষটির বাহুতে লেগে তার কামকে আরো জাগিয়ে তুলছিল। এই দৃশ্য দেখে অজামিলের মন বিচলিত হল। তারও কামের ইচ্ছা জাগল। ৫৫-৬১

ধৈর্য ও জ্ঞানের সাহায্যে যতদূর পারল সে নিজেকে স্থির রাখতে চেষ্টা করল, কিন্তু চঞ্চল মনকে কিছুতেই বশ করতে পারল না। সেই দাসীর স্মৃতি তার মনকে গ্রাস করল, আর তার চিন্তাতেই অজামিল নিজের ধর্ম থেকে বিচ্যুত হল। পিতার যা টাকাপয়সা ছিল সবই সে সেই নারীর জন্য ব্যয় করতে লাগল। তাকে খুশী করার জন্য নানা গ্রাম্য মনভুলান জিনিস কিনতে লাগল। তার ঘরে সদ্‌ব্রাহ্মণ বংশে জাত যুবতী পত্নী ছিল। কিন্তু স্বৈরিণী স্ত্রীলোকটির নয়নবাণে বিদ্ধ হয়ে ঐ পাপিষ্ঠ নিজের পত্নীকেও শীঘ্রই ত্যাগ করল। অজামিল ন্যায় পথে বা অন্যায় পথে যা কিছু উপার্জন করত তাতে ঐ দাসীর আত্মীয়-স্বজনদের ভরণপোষণ চলত। এভাবে সে শাস্ত্র অমান্য করে যা ইচ্ছা তাই করেছে, বেশ্যার উচ্ছিষ্ট খেয়ে এবং অশুচি হয়ে অনেক কাল কাটিয়েছে, কিন্তু কোন প্রায়শ্চিত্ত করেনি। তাই আমরা এই পাপিষ্ঠকে দণ্ডধর যমরাজের কাছে নিয়ে যাব ; সেখানে দণ্ড ভোগ করে এ শুদ্ধিলাভ করবে। ৬২-৬৮

দ্বিতীয় অধ্যায়

বিষ্ণুদূতদের অজামিলকে বিষ্ণুলোকে আনয়ন

শুকদেব বললেন, মহারাজ, যমদূতদের ঐসব কথা শুনে বিষ্ণুদূতেরা আশ্চর্য হয়ে বললেন—কি দুঃখের কথা, যাঁরা ধর্ম-অধর্মের বিচার করবেন অধর্ম তাঁদেরও *স্পর্শ করল! তাই যে নিরপরাধ, যার শাস্তি পাওয়া উচিত নয়, তাকেই তাঁরা* বৃথা দণ্ড দিচ্ছেন। যাঁরা পিতার মত সকলকে রক্ষা করবেন, শাসন করবেন, যাঁরা সাধু এবং সমদর্শী তাঁরাও যদি শাস্তির অযোগ্য ব্যক্তিকে শাস্তি দিতে উদ্যত হন তবে লোকে কার কাছে যাবে। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা যা করেন অন্যেরা তারই অনুসরণ করে থাকে এবং তাঁরা যা শাস্ত্রসঙ্গত বলে স্বীকার করেন সাধারণ লোক তাকেই প্রমাণ বলে গ্রহণ করে।[1] পশু যেমন প্রভু মারবে কি রাখবে সে ভার সম্পূর্ণ প্রভুর উপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্তে থাকে, তেমনি ধর্ম-অধর্ম বিচারের সম্পূর্ণ ভার ধর্মরাজের উপর ছেড়ে দিয়ে যারা নিশ্চিন্তে আছে, সবার বিশ্বাসের পাত্র সেই দয়াবান পুরুষ কি করে তাদের অনিষ্ট করবেন? ১-৬

যে হরিনামে মোক্ষলাভ হয় এই ব্যক্তি অবশ হয়েও সেই হরিনাম উচ্চারণ করেছে। এই পাপী যে আভাসেও 'নারায়ণ' এই চারটি অক্ষর উচ্চারণ করেছে তাতেই এর কোটি জন্মের সব পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়েছে। চুরি, সুরাপান, মিত্রদ্রোহিতা, ব্রহ্মহত্যা, গুরুপত্নী গমন, স্ত্রীহত্যা, রাজা-হত্যা, পিতৃহত্যা, গো-হত্যা এবং অন্যান্য যত মহাপাপ আছে—বিষ্ণুনাম উচ্চারণ সেই সব পাপের শ্রেষ্ঠ প্রায়শ্চিত্ত। নাম নেওয়া মাত্রই ভক্তের প্রতি বিষ্ণুর দয়া হয়। তিনি মনে করেন—এ আমার ভক্ত, কাজেই একে রক্ষা করতে হবে। হরিনাম মাত্র উচ্চারণ করে পাপী যেমন শুদ্ধ হয়, ব্রহ্মবাদী ঋষিরা যে সব প্রায়শ্চিত্তের কথা বলেছেন তাতে তেমন হয় না। শ্রীহরির নাম সকলকে ভগবানের গুণসমূহ মনে করিয়ে দেয়। চান্দ্রায়ণ প্রভৃতি প্রায়শ্চিত্ত পাপকে বীজশুদ্ধ নষ্ট করে না, কারণ তার পরেও মন আবার অসৎপথে ছোটে। কাজেই পাপকে যাঁরা সমূলে ধ্বংস করতে চান তাঁদের পক্ষে শ্রীহরির গুণকীর্তনই হল সব থেকে উত্তম প্রায়শ্চিত্ত, তাতেই চিত্ত শুদ্ধ হয়। ৭-১২

এই অজামিল মৃত্যুর সময় ভগবান নারায়ণের নাম সম্পূর্ণরূপে উচ্চারণ করেছে এবং তাতেই এর সমস্ত পাপ নষ্ট হয়েছে। তাই তোমরা একে নিয়ে যেতে পারবে না। সে নিজের ছেলেকে ডেকেছে মাত্র, ভগবানকে ডাকে নি—সে কথা বললেও চলবে না। ভগবানের নাম ছেলেকে ডেকেই হোক, হাসি-তামাশা করেই হোক, গানের পদ শেষ করবার জন্যই হোক, এমনকি যদি 'বিষ্ণুকে দিয়ে কি দরকার' এরকম অবজ্ঞা করেও নেওয়া হয়, তাহলেও তাতে সব পাপ দূর হয়। যদি কেউ কোন উঁচু বাড়ী থেকে পড়ে, পথে পা পিছলে হাত পা ভেঙে, সর্পদংশনে, জ্বর ইত্যাদি রোগে ভুগে বা অন্য আঘাত পেয়ে অবশ হয়েও 'হরি' এই নাম উচ্চারণ করে, তবে আর তাকে নরকযন্ত্রণা ভোগ করতে হয় না। মনু প্রভৃতি মহর্ষিরা অনেক বিবেচনা করে তবেই গুরুপাপে গুরু প্রায়শ্চিত্ত এবং লঘুপাপে লঘু প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করেছেন। তপস্যা, দান এবং ব্রত পালন করে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়, কিন্তু তারপরেও পাপের সূক্ষ্ম সংস্কার মনে থেকে যায়। নামকীর্তনে কিন্তু তাও নির্মূল হয়। আগুন যেমন কাঠকে পোড়ায় তেমনি জ্ঞানে কি অজ্ঞানে ভগবানের

১ এই শ্লোকটি (ভা: ৬।২।৪) সামান্য পরিবর্তিত আকারে গীতাতেও (৩।২১ শ্লোক) আছে।

পবিত্র নামকীর্তনে সব পাপ নষ্ট হয়। যেমন কেউ না জেনেও খুব শক্তিশালী কোন ওষুধ খেলে ওষুধ তার কাজ করবেই, না জেনে হরিনাম মন্ত্র উচ্চারণ করলেও সেইরকম কাজ হবেই। ১৩-১৯

শুকদেব বললেন, মহারাজ, বিষ্ণুদূতেরা এইভাবে ভাগবত ধর্মের প্রকৃত তত্ত্ব ব্যাখ্যা করলেন এবং অজামিলকে যমদূতের পাশ থেকে মুক্ত করে তাকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচালেন। তখন যমদূতেরা নিজেদের প্রভুর কাছে গিয়ে তাঁকে সমস্ত জানাল। আর অজামিল যমের হাত থেকে পরিত্রাণ পেয়ে মাটিতে মাথা লুটিয়ে বিষ্ণুদূতদের প্রণাম করল এবং তাঁদের দেখে পরম আনন্দ প্রকাশ করতে লাগল। বিষ্ণুর অনুচরেরা তার ভাব দেখে বুঝলেন যে সে কিছু বলতে চায়। তাই তাঁরা তখনি সেখান থেকে অদৃশ্য হলেন। যমদূতদের মুখে বেদের সগুণ ধর্মের কথা আর বিষ্ণুদূতদের মুখে ভগবানের শুদ্ধ নির্গুণ ধর্ম এবং শ্রীহরির মহিমার কথা শুনে অজামিলের মনে ভগবানের প্রতি গভীর ভক্তি জন্মাল। তখন আগেকার সব কুকাজের কথা স্মরণ করে তার গভীর অনুতাপ হল। সে বলতে লাগল—হায়, ইন্দ্রিয় জয় করতে না পারাতে কত কষ্টই না ভোগ করলাম। কি ঘৃণার কথা যে আমি শূদ্রার গর্ভে সন্তান উৎপাদন করে নিজের ব্রাহ্মণত্ব নষ্ট করেছি। আমি যুবতী সতী স্ত্রীকে ত্যাগ করে মদ্যপায়ী এক বেশ্যাতে আসক্ত হয়েছি। আমি মহাপাপী কুলাঙ্গার! ধিক্ আমাকে! আমার পিতা-মাতা বৃদ্ধ এবং অনাথ, আমি ছাড়া তাঁদের অন্য পুত্র বা বন্ধুবান্ধব নেই। তাঁরা নির্দোষ; হায়, আমি নীচ ব্যক্তির মত অকৃতজ্ঞ হয়ে তাঁদের ঐ অবস্থায় ছেড়ে এসেছি। আমি ঠিক বুঝতে পারছি যে ধর্মহীন, কামী ব্যক্তিরা যেখানে যমযন্ত্রণা ভোগ করে আমাকেও সেই ভীষণ নরকেই যেতে হবে। এই অদ্ভুত ব্যাপার কি স্বপ্ন না সত্য? যারা পাশ হাতে আমাকে টানছিল তারা কোথায় গেল? পাশে বাঁধা পড়ে আমি পৃথিবীর নীচের দিকে যাচ্ছিলাম। যাঁরা আমাকে মুক্ত করলেন সেই চারজন সুদর্শন সিদ্ধপুরুষই বা কোথায় গেলেন? ২০-৩১

যাহোক, এজন্মে আমি ঘোর পাপী তাতে সন্দেহ না থাকলেও আমার পূর্বজন্মের কিছু পুণ্য নিশ্চয়ই অবশিষ্ট ছিল। তার ফলেই দেবশ্রেষ্ঠদের দেখা পেলাম। তাঁদের দেখে আমার আত্মা প্রসন্ন হচ্ছে। জন্মান্তরের পুণ্য না থাকলে আমার মত অপবিত্র, দাসীপতির জিহ্বা কখনও মৃত্যুকালে 'নারায়ণ' নাম উচ্চারণ করতে পারত না। কোথায় বা ধূর্ত, নির্লজ্জ, পাপী, ব্রাহ্মণত্ব-নাশকারী আমি, আর কোথায় 'নারায়ণ' এই মঙ্গলময় নাম। তাই আমি মহাপাপী হলেও প্রাণ-মন-ইন্দ্রিয় সংযত করে চেষ্টা করব যেন আবার সেই মহা অন্ধকারে গিয়ে না পড়ি। দেহকে আত্মা মনে করার মত অবিদ্যা, বিষয়ভোগের ইচ্ছারূপ কাম আর অর্থ—এই তিন কারণ থেকে যে বন্ধন সৃষ্টি হয়েছে তা কাটিয়ে আমি সকলের উপকারী বন্ধু, শান্ত, দয়ালু আর আত্মজ্ঞ হব। স্ত্রীরূপা মায়া যাকে গ্রাস করেছে আমার সেই আত্মাকে এইভাবেই আমি মুক্ত করব। ঐ নারী আমাকে একটা সামান্য হরিণের মত নাচিয়েছে। এবার 'আমি, আমার' এই বুদ্ধি বিসর্জন দিয়ে ভগবানের নামকীর্তন ইত্যাদির সাহায্যে মন শুদ্ধ করে, তাকে সেই ভগবানেই স্থাপন করব। মহারাজ, অজামিল ক্ষণকালমাত্র সাধুসঙ্গ করেছিল, তাতেই তার ঐরকম তীব্র বৈরাগ্য জন্মাল। তারপর সে পুত্রস্নেহ ইত্যাদি সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে গঙ্গাদ্বারে গেল এবং সেই দেবস্থানে বসে যোগমগ্ন হল। সে বিষয় থেকে ইন্দ্রিয়কে সরিয়ে এনে আত্মায় মনঃসংযোগ করল। তারপর চিত্ত নিবিষ্ট করে দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি থেকে আত্মাকে প্রত্যাহার করে এনে জ্ঞানময় পরমব্রহ্মে স্থাপন করল। তখন তার চিত্ত পরব্রহ্মেই

অচল হয়ে রইল। আর সেই সময়ই সে পূর্বে-দেখা সেই পুরুষদের আবার সামনে দেখতে পেল এবং তাঁদের চিনতে পেরে মাথা নত করে প্রণাম করল। বিষ্ণুদূতদের দর্শনের পর অজামিল গঙ্গাদ্বার তীর্থে দেহত্যাগ করে ভগবানের অনুচরদের রূপ গ্রহণ করল এবং বিষ্ণুদাসদের সঙ্গে সোনার রথে চড়ে বৈকুণ্ঠে চলে গেল। ৩২-৪৪

দাসীপতি অজামিল ব্রাহ্মণ হলেও সব ধর্মের বিরুদ্ধ আচরণ করে আর নানা পাপকাজ করে পতিত হয়েছিল এবং কোন ব্রতই পালন না করায় তার নরকে যাবার উপক্রম হয়েছিল। কিন্তু ঐ সময়ে ভগবানের নাম নিয়ে সে মুক্ত হল। কাজেই যারা মুমুক্ষু তাদের কর্মের বন্ধন ছিন্ন করবার পক্ষে ভগবানের নামকীর্তনের থেকে ভাল উপায় আর কিছু নেই। কারণ অন্য সমস্ত প্রায়শ্চিত্তেই মন আগের মত রজ, তম ইত্যাদি গুণের প্রভাবে মলিন থেকে যায়, কিন্তু হরিকীর্তন করলে মন আর কর্মে লিপ্ত হয় না। এই পরম গূঢ়, পাপনাশক কাহিনী যে শ্রদ্ধার সঙ্গে শোনে বা ভক্তির সঙ্গে কীর্তন করে তার কখনও নরকবাস হয় না বা যমদূতদের দেখতে হয় না। সে ব্যক্তি পাপিষ্ঠ হলেও বিষ্ণুলোকে পূজা পায়। মৃত্যুর সময়ে পুত্রের নাম উচ্চারণ করতে গিয়ে ভগবানের নাম উচ্চারণ করায় শ্রদ্ধাহীন ও অবশ হলেও অজামিল ভগবানের লোকে গেল। শ্রদ্ধায় ভগবানের নাম নিলে জীব যে তাঁর ধামে যাবে সেকথা আর বলতে হবে কেন? ৪৫-৪৯

তৃতীয় অধ্যায়

যমরাজের বৈষ্ণবধর্মের উৎকর্ষ বর্ণনা

রাজা পরীক্ষিৎ বললেন, সমস্ত লোকের অধীশ্বর যমরাজ তাঁর দূতদের মুখে সব ব্যাপার শুনে এবং বিষ্ণুদূতেরা তাঁর দূতদের কাজ করতে দেয় নি জেনে কি বললেন? হে ঋষি, যমরাজের দণ্ড কোথাও বাধা পেয়েছে, এমন কথা শুনিনি। আর একথা শুনলে মনে যে সংশয় জাগবে, আপনি ছাড়া তা আর কেউ দূর করতে পারবে না। শুকদেব বললেন, যমদূতেরা বিষ্ণুদূতদের বাধায় কাজে বিফল হয়ে তাদের প্রভু, সংযমনী পুরীর অধিপতি যমকে সব বিবরণ জানিয়ে বলল, প্রভু, এই জীবলোকে শাসনকর্তা কজন? পৃথিবীতে মানুষ তিন রকম[১] কাজ করে। এই কর্মের ফল কে কে দান করেন? জগতে যদি অনেক শাসনকর্তা থাকেন তবে তাঁদের মধ্যে মতভেদ হলে, হয় কেউ সুখদুঃখ কিছুই পাবে না, কেউ পাবে শুধুই সুখ আর কারো লাভ হবে অবিচ্ছিন্ন দুঃখ। কর্মী পুরুষের সংখ্যা বহু। তাই তাদের কর্মফলের ব্যবস্থার জন্য শাসনকর্তা বহু হলেও তাঁদের কর্তৃত্ব হয় নামে মাত্র। কারণ তাঁরা যাঁর অধীন শাসনের আসল কর্তৃত্ব তাঁতেই বর্তাবে। ১-৬

আপনিই প্রাণিগণের এবং তাদের অধিপতিগণের একমাত্র প্রভু, দণ্ডধর শাসনকর্তা, আপনিই তাদের শুভ-অশুভের বিচারকর্তা—আমাদের এইরকম ধারণা ছিল। কিন্তু এখন দেখছি জগতে আপনার আদেশ পালিত হচ্ছে না, চারজন অদ্ভুত সিদ্ধপুরুষ আপনার আদেশ লঙ্ঘন করে গেল। আপনার আদেশে আমরা একজন

---

১ [illegible] নিষিদ্ধ বা অবিহিত এবং বিহিতাবিহিত বা মিশ্রিত।

পাপীকে যন্ত্রণাগৃহে নিয়ে আসছিলাম এমন সময় তারা হঠাৎ এসে উপস্থিত হল এবং জোর করে আপনার পাশ ছিঁড়ে তাকে মুক্ত করে দিল। প্রভু, যদি আমাদের মঙ্গল ইচ্ছা করেন তবে বলুন, তারা কে? 'নারায়ণ' এই শব্দটি উচ্চারিত হওয়া মাত্র তারা 'ভয় নেই' বলতে বলতে দ্রুত চলে এল। ৭-১০

শুকদেব বললেন, যমরাজ নিজের দূতদের এই প্রশ্নে আনন্দিত হলেন এবং ভগবান শ্রীহরির পাদপদ্ম স্মরণ করে হৃষ্টচিত্তে তাদের বললেন, আমি ছাড়া জগতের আর একজন সর্বপ্রধান প্রভু আছেন। কাপড়ে যেমন সুতো তেমনি সমস্ত বিশ্ব তাঁতে ওতপ্রোত রয়েছে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র তাঁর অংশ। বলদ যেমন নাকে দড়ি দিয়ে বাঁধা থাকে তেমনি সব লোক তাঁর অধীন, বেদ তাঁরই বাক্য। মানুষ যেমন দড়ি দিয়ে পশুদের বেঁধে রাখে তেমনি তিনি ব্রাহ্মণ ইত্যাদি নাম দিয়ে জীবকে আপন বেদরূপ সূত্রে বেঁধে রেখেছেন। নাম এবং কর্মের বাঁধনে বন্ধ জীব ভয়ে তাঁর অধীনে থেকে কর্ম করছে। আমি, মহেন্দ্র, নির্ঋতি, বরুণ, সোম, অগ্নি, বায়ু, চন্দ্র, সূর্য, বিশ্বদেব[1], সাধ্য[2], মরুৎ[3], রুদ্র[4], ও সিদ্ধগণ এবং বিশ্বস্রষ্টা অন্যান্য প্রধান দেবতারা সকলেই সত্ত্বপ্রধান ; রজোগুণ আর তমোগুণ আমাদের মধ্যে দমিত হয়ে রয়েছে। তবুও আমরা মায়ার অধীন বলে তাঁর ইচ্ছা বা কাজ কোনটাই জানি না ; অন্য কেউ যে জানে না তাতে আর সন্দেহ কি? এই পরমেশ্বর দ্রষ্টা হয়ে সকলের মধ্যে রয়েছেন, তবুও প্রাণিগণ ইন্দ্রিয়, বাক্য, মন বা চিত্ত দ্বারা তাঁকে দেখতে পায় না, যেমন চোখ শরীরের সব অবয়বকে দেখে, কিন্তু তারা চোখকে দেখতে পায় না। সকলের ঈশ্বর, মায়ার অধিপতি শ্রীহরির দূতদের রূপ, গুণ এবং স্বভাব তাঁর মতই। তাঁরা প্রায়ই জগতে ঘুরে বেড়ান। দেবতারাও বিষ্ণুর এই অনুচরদের পূজা করেন। অল্প ভাগ্যে তাঁদের দর্শন পাওয়া যায় না। বিষ্ণুভক্ত জীবদের তাঁরা শত্রুর হাত থেকে, আমার হাত থেকে এবং অন্য সব বিপদ থেকে রক্ষা করেন। সাক্ষাৎ ভগবানের রচিত যে ধর্ম তা ভৃগু প্রভৃতি ঋষিরা, কি দেবতারা, কি সিদ্ধগণ, অসুরগণ, কি মানুষ, কেউই জানে না। ১১-১৯

দূতগণ, সেই ভাগবত ধর্ম শুধু ব্রহ্মা, নারদ, শম্ভু, সনৎকুমার, কপিল, মনু, প্রহ্লাদ, জনক, ভীষ্ম, বলি, শুকদেব আর আমি—এই বারোজনে জানি। অতি পবিত্র, গোপন আর কঠিন এই ধর্ম যিনি জানেন তিনি মোক্ষলাভ করেন। নাম সংকীর্তন দ্বারা ভগবানে ভক্তিরূপ আরাধনা এ জগতে জীবগণের পরম ধর্ম। হরিনাম উচ্চারণের মহিমা দেখ। অজামিল কেবল হরিনামের মাহাত্ম্যেই মৃত্যুর হাত থেকে মুক্ত হল। তাই পাপক্ষয়ের জন্য ভগবানের গুণ, কর্ম এবং নাম এই সবকিছু কীর্তন করার দরকার নেই। কারণ মহাপাপী অজামিল অপবিত্র হলেও মৃত্যুকালে অবশ অবস্থায় ছেলেকে ডাকবার জন্য 'নারায়ণ' কথাটি উচ্চারণ করেই শুধু পাপ থেকে নিষ্কৃতি নয়, একেবারে মুক্তি পেয়ে গেল। স্বয়ম্ভু প্রভৃতি যে বারোজনের কথা আগে বলা হয়েছে তাঁরা ছাড়া অন্য কেউ ভাগবত ধর্ম জানেন না। তাই অন্যেরা পাপনাশের জন্য নাম-মাহাত্ম্যের কথা না বলে নানা ব্রতের বিধান দিয়েছেন। যেমন, যে চিকিৎসক মৃতসঞ্জীবনীর সন্ধান জানে না সে রোগীকে নিম ইত্যাদি তিক্ত দ্রব্য খেতে বলে—এও সেইরকম। লতা যেমন ফুলে ভরা থাকলে সুন্দর দেখায়

১ গণদেবতা বিশেষ। ২ দেবযোনি বিশেষ। ৩ পবনদেবের অধীন উনপঞ্চাশজন দেবতা।
৪ ব্রহ্মার ললাট থেকে জাত দেবতা একাদশ মূর্তিতে সূর্য ইত্যাদিতে অবস্থান করেন।

তেমনি নানা যজ্ঞের অনুষ্ঠান করলে স্বর্গ ইত্যাদি সুখলাভ হবে—এই সব প্রলোভনে পূর্ণ হয়ে কর্মকাণ্ড বেদ লোকের মনকে আকৃষ্ট করছে[১]। ২০-২৫

যে সব বুদ্ধিমান লোক হরিনামের মাহাত্ম্য চিন্তা করে সমস্ত অন্তঃকরণের সঙ্গে অনন্ত ভগবানে ভক্তিমান হন তাঁরা আমার দণ্ড ভোগ করেন না। তাঁদের পাপ হতেই পারে না; আর যদিই বা হয় ভগবানের নাম কীর্তনে তা তৎক্ষণাৎ নষ্ট হয়। যাঁরা ভগবানের শরণ নিয়েছেন তাঁরাই সাধু এবং সমদর্শী। দেবতারা, সিদ্ধেরা তাঁদের পবিত্র কথা কীর্তন করেন। ভগবানের গদা সর্বদা তাঁদের রক্ষা করছে, তাই আমার কিংবা কালের সাধ্য নেই তাঁদের দণ্ড দিই। তোমরা কিন্তু তাঁদের কাছে কখনও যেও না। পরমহংস ঋষিরা শ্রীহরির পাদপদ্মের মধু সর্বদা পান করেন তাতে বিমুখ হয়ে যে সব অসাধু জীব নরকের পথস্বরূপ ধর্মহীন সংসারে আসক্ত হয়ে আছে তাদের আমার কাছে নিয়ে আসবে। যাদের জিহ্বা কখনও ভগবানের গুণ বা নাম কীর্তন করেনি, যারা কখনও তাঁর শ্রীপদ স্মরণ করে নি, যাদের মাথা কখনও শ্রীকৃষ্ণের পায়ে নত হয় নি আর যারা কখনও ভগবানের ব্রত আচরণ করে নি তাদেরও তোমরা আনবে। আমার অনুচরেরা যে অন্যায় কাজ করেছে ভগবান নারায়ণ যেন তা ক্ষমা করেন। আমরা তাঁর দাস, না জেনে অপরাধ করেছি, তার জন্য হাতজোড় করে মার্জনা ভিক্ষা করছি। ভগবান সকলের থেকে মহৎ, ক্ষমা তাঁর স্বাভাবিক গুণ। সেই পরমপুরুষের পায়ে আমরা প্রণাম করি। ২৬-৩০

শুকদেব বললেন, কৌরব্য, একথা তুমি নিশ্চয় জেনো যে ভগবান বিষ্ণুর নাম কীর্তনেই জগতের মঙ্গল। তাতে অতি মহাপাতকেরও প্রায়শ্চিত্ত হয়। শ্রীহরির নানা পরাক্রমের কাহিনী সর্বদা শুনলে, কীর্তন করলে যে ভক্তি জন্মে তাতে আত্মা যেমন পবিত্র হয়, ব্রত-নিয়মের দ্বারা তা হয় না। শ্রীকৃষ্ণের চরণপদ্মের মধু যে আস্বাদ করেছে, সে পাপ বিষয়কে একবার ত্যাগ করিলে আর কখনই তাতে তার মতি হয় না। কিন্তু যে তা করে নি, ক্রোধে অন্ধ সেই ব্যক্তি পাপনাশের জন্য যে কাজই করতে যায়, তাতেই আবার পাপে লিপ্ত হয়ে পড়ে। মহারাজ, যমের ভৃত্যগণ তাদের প্রভুর মুখে ভগবানের মাহাত্ম্য শুনে তা বিশ্বাস করল এবং সেই থেকে তারা কৃষ্ণের আশ্রিত ভক্তদের দিকে দৃষ্টিপাত করতেও ভয় পেতো। একদিন মহর্ষি অগস্ত্য মলয়পর্বতে বসে ভগবানের চরণ পূজা করতে করতে এই কাহিনী বলেছিলেন। ৩১-৩৫

চতুর্থ অধ্যায়

দক্ষের শ্রীহরি আরাধনা

রাজা বললেন, ভগবান, আপনি স্বায়ম্ভুবের মন্বন্তরে দেব, দৈত্য, মানুষ, নাগ, পশু, পক্ষী ইত্যাদির সৃষ্টির কথা এর আগে সংক্ষেপে বলেছেন। এখন সেসব বিস্তারিত ভাবে আপনার কাছে জানতে ইচ্ছা করি। পরমপুরুষ ব্রহ্মা প্রত্যেকবার সৃষ্টির সময় কোন্ শক্তির সাহায্যে কি ভাবে সৃষ্টি করেন তা দয়া করে বলুন। সূত

১ তুলনীয়: গীতা, দ্বিতীয় অধ্যায়, ৪২-৪৪ শ্লোকাবলী।

মুনিদের বললেন, মুনিশ্রেষ্ঠগণ, মহাযোগী শুকদেব পরীক্ষিতের ঐ প্রশ্ন শুনে তাঁর প্রশংসা করে বলতে আরম্ভ করলেন, মহারাজ, প্রচীনবর্হি'র দশ পুত্র দশ প্রচেতা[১] সমুদ্র থেকে বাইরে এসে দেখলেন যে পৃথিবী বৃক্ষলতায় ভরে গেছে। তপস্যাবলে তাঁদের ক্রোধের খুব তীব্রতা হয়েছিল। তাঁরা ক্রুদ্ধ হয়ে ঐসব গাছপালা পোড়াবার জন্য মুখ থেকে বাতাস আর আগুন সৃষ্টি করলেন। ১-৫

সেই বাতাস আর আগুনে সমস্ত গাছ পুড়তে শুরু করলে বনস্পতিদের রাজা সোম তাঁদের ক্রোধের শান্তি করবার জন্য মধুরস্বরে বললেন, হে মহাভাগগণ, গাছেরা অতি নিরীহ। এদের উপর রাগ করা আপনাদের উচিত নয়। প্রজা বৃদ্ধি করতে চান তাই আপনাদের নাম প্রজাপতি। আপনাদের প্রভু ভগবান শ্রীহরি পৃথিবীর সমস্ত বনস্পতি এবং ওষধিকে প্রজাদের (প্রাণীদের) খাদ্যরূপে সৃষ্টি করেছেন। তিনি পুষ্পলতাদের ভ্রমর ইত্যাদির, ঘাসকে গো-মহিষের ধান-গমকে মানুষের অন্ন (খাদ্য) রূপে সৃষ্টি করেছেন। তিনি আপনাদের প্রজা সৃষ্টি করতে আদেশ করেছেন। তবে কেন আপনারা সমস্ত গাছ পুড়িয়ে শেষ করতে যাচ্ছেন? আপনাদের পিতা, পিতামহ প্রপিতামহ যে শান্তির পথে চলে এসেছেন আপনারাও সেই পথেই চলুন এবং ক্রোধ সংবরণ করুন। ৬-১১

যেমন বালকের বন্ধু তার পিতামাতা, চক্ষুর বন্ধু তার পক্ষ্ম (পালক), স্বামী স্ত্রীর বন্ধু, গৃহ ভিক্ষুকের বন্ধু আর অজ্ঞানের বন্ধু জ্ঞানী ব্যক্তি, তেমনি প্রজাপতি হলেন সমস্ত প্রজাদের বন্ধু। সমস্ত প্রাণীর দেহে আত্মারূপে শ্রীহরি বিরাজ করছেন। তাই সকলকেই শ্রীহরির আবাস মনে করে কারোর উপর ক্রোধ করবেন না। তবেই শ্রীহরি আপনাদের উপর সন্তুষ্ট হবেন। হঠাৎ তীব্র ক্রোধ হলেও যিনি তাকে দমন করতে পারেন তিনিই তিন গুণের অতীত হতে পারেন। তাই যে সব গাছ এখনও অবশিষ্ট আছে তাদের আর আপনারা দগ্ধ করবেন না। এইসব গাছেরা একটি কন্যাকে পালন করছে; আপনারা তাকে বিবাহ করুন। সে অতি সুন্দরী এবং গুণবতী। রাজা সোম এইভাবে প্রচেতাদের শান্ত করে প্রম্লোচা নামে অপ্সরার গর্ভে জাত ঐ কন্যাকে তাঁদের দান করলেন। তাঁদের ঔরসে ঐ কন্যার গর্ভে দক্ষের জন্ম হয়। 'প্রাচেত' বলে ইনি বিখ্যাত। দক্ষের সৃষ্ট প্রজাতে ত্রিলোক পূর্ণ হয়েছে। ১২-১৭

কন্যার প্রতি স্নেহশীল দক্ষ যেভাবে শুক্র এবং মন দ্বারা প্রজাসৃষ্টি করেন তা মন দিয়ে শোন। তিনি প্রথমে জল, স্থল আর আকাশের অধিকারী দেব, দৈত্য, মানুষ ইত্যাদিকে মনের দ্বারা সৃষ্টি করেন। তারপর দক্ষ যখন দেখলেন যে তাঁর সৃষ্ট প্রজাদের সংখ্যা বিশেষ বাড়ছে না, তখন তিনি বিন্ধ্যপর্বতের কাছাকাছি একটি ছোট পাহাড়ে গিয়ে কঠিন তপস্যা আরম্ভ করলেন। সেখানে অঘমর্ষণ নামে এক পাপহর পরম তীর্থ আছে। সেই তীর্থে তিন সন্ধ্যা স্নান-তপস্যা করে তিনি শ্রীহরিকে প্রীত করলেন। দক্ষ হংসগুহ্য নামে যে স্তোত্র দ্বারা ভগবানের স্তব করেছিলেন এবং যাতে শ্রীহরি তাঁর উপর প্রসন্ন হন তা তোমাকে বলছি শোন। ১৮-২২

প্রজাপতি বললেন, তাঁর চিৎ-শক্তি অব্যর্থ বলে তিনি সর্বোত্তম এবং তাই জীব এবং মায়াকে নিয়ন্ত্রণ করেন। তিনি পরিমাণ এবং সীমার অতীত বলে, যেসব জীব গুণকেই তত্ত্ব মনে করে তারা তাঁর স্বরূপ দর্শন করতে সমর্থ হয় নি। তিনি স্বপ্রকাশ, তাঁকে নমস্কার করি। জীব এই দেহে বাস করছে, পরমেশ্বরও তার সখা

১ সমুদ্রের অধিপতি, বরুণ।

হয়ে এই দেহেই বাস করছেন এবং ইন্দ্রিয়দের প্রবৃত্তি দিচ্ছেন। জীব কিন্তু তাঁর এই সখ্য জানতে পারে না। ইন্দ্রিয় বিষয়কে প্রকাশ করলেও বিষয় ইন্দ্রিয়কে জানে না। জীব যে সর্বদ্রষ্টাকে জানতে পারে না সেই পরমেশ্বরকে নমস্কার করি। দেহ, প্রাণ, ইন্দ্রিয়, অন্তঃকরণ, পঞ্চভূত আর পঞ্চতন্মাত্র এরা আপন আপন স্বরূপ, অন্য ইন্দ্রিয় এবং ঐ দুয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাদের জানতে পারে না। জীব এই তিন পদার্থ এবং তাদের গুণকে জানে, কিন্তু সেই সর্বজ্ঞকে জানতে পারে না। আমি সেই ভগবান অনন্তের স্তুতি করি। জগতের নাম এবং রূপ হল মনের কল্পনা। জাগ্রত অবস্থায় এবং স্বপ্ন দেখবার সময় মনের বিক্ষেপ ঘটে সুষুপ্তির অবস্থায় তার লয় হয়। কিন্তু যখন দর্শনশক্তি আর স্মৃতিশক্তির নাশ হবার ফলে মনের সমাধি হয়, তখন ঐ দুই দোষও লোপ পায়। সেই অবস্থাতেই কেবল যাঁর স্বরূপ জানা যায় এবং নিষ্কলুষ চিত্ত দ্বারা যাঁকে লাভ করা যায় সেই হংসকে আমি নমস্কার করি। প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহংকার, পঞ্চতন্মাত্র, তিন গুণ, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চভূত আর মন—এই সাতাশটি উপাধি দ্বারা তিনি নিজেকে আবৃত করেছেন। ঋত্বিকগণ যেমন পনেরটি সামধেনী মন্ত্রের দ্বারা কাঠের মধ্য থেকে অলৌকিক অগ্নিকে বাইরে টেনে এনে প্রকাশ করেন, সেই রকম পণ্ডিতেরা যাঁকে বুদ্ধি দিয়ে হৃদয়ের মধ্যে স্থির করে তারপর সেখান থেকে বাইরে আকর্ষণ করেন, তিনি আমার প্রতি প্রসন্ন হোন। মায়ার অসংখ্য রূপ আছে। পরমাত্মাই সেই মায়াকে ত্যাগ করে নির্বাণসুখ অনুভব করছেন। বিশ্বে যত নাম আর যত রূপ আছে সবই তাঁর নাম, তাঁর রূপ। তবুও তিনি ঐসবই বর্জন করতে পারেন, কারণ তাঁর মায়া পরমাত্মার শক্তি বলে ঐ মায়ার রচিত নাম-রূপ পরমাত্মার নাম-রূপ। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান হলে ঐ মায়া দূর হয়, তাই ঐ মায়া মিথ্যা এবং পরমেশ্বর তা ত্যাগ করতে পারেন। এই সর্বনাম এবং বিশ্বরূপ প্রভু আমার প্রতি প্রসন্ন হোন। বাক্য দ্বারা যা বলা যায়, বুদ্ধি দ্বারা যা নিরূপণ করা অথবা মন দ্বারা যা সংকল্প করা যায় তারা সবই গুণের দ্বারা বর্ধিত বলে ঈশ্বরের স্বরূপ হতে পারে না, কারণ তিনি গুণসকলের লয় হবার পরে এবং তাদের সৃষ্টি হবার পূর্বেই শুধু নিজস্বরূপে প্রকাশ পান। ২৩-২৯

যাতে, যা থেকে, যার দ্বারা, যার সম্বন্ধে, যার প্রতি, যে কাজ, যে ভাবে যে করে, যাকে দিয়ে করায়—তার সবই ব্রহ্ম। মুখ্য এবং গৌণ যত কারণ আছে সে সবেরই পরম কারণ হলেন ব্রহ্ম। তিনি সবার মধ্যে স্বতঃসিদ্ধ হয়ে বিরাজ করছেন। যেহেতু তিনি অনন্য বা বিজাতীয়-শূন্য এবং এক বা স্বজাতীয়-শূন্য তাই তাঁর সহকারী কেউ নেই, তিনি নিরপেক্ষ। যাঁর অবিদ্যা ইত্যাদি শক্তিগুলি বিভিন্ন মতবাদের ব্যক্তিদের মধ্যে বিবাদ[1] এবং সংবাদের[2] বিষয় হয়ে আছে এবং বার বার তাদের আত্মায় মোহের সৃষ্টি করছে—সেই অনন্তগুণের আধার মহাপুরুষকে আমি নমস্কার করি। যোগশাস্ত্রে বলা হয়েছে পাতাল তাঁর পদ, আবার সাংখ্য বলেছেন তিনি 'অপাণিপাদ', 'অচক্ষু' এবং 'অশ্রোত্র', অতএব তার পদ নেই[3] এই দুই শাস্ত্র পরস্পরের বিরোধী মনে হলেও আসলে তাদের বিরোধ নেই, কারণ উভয়েরই প্রতিপাদ্য বিষয় এক অর্থাৎ ব্রহ্ম। ইনি যে আছেন তার প্রমাণ এই যে একটি কিছু না থাকলে তার 'পা আছে' একথা কি করে মনে করা যাবে? আবার কিছু অবশ্যই আছে একথা মেনে না নিলে শুধু 'পা নেই' কি করে বলা যাবে? এই উভয় শাস্ত্রের তর্কের বিষয় সেই শ্রেষ্ঠ বস্তুকে নমস্কার। যিনি নাম-রূপহীন হয়েও কর্ম স্বীকার করে চরণসেবীদের অনুগ্রহের জন্য নানা রূপ এবং নানা জন্ম

১ মতবিরোধ। ২ মতৈক্য। ৩ দ্রঃ শ্বেঃ উঃ ৩।১৯

গ্রহণ করে থাকেন সেই ভগবান অনন্ত আমার প্রতি প্রসন্ন হোন। বাতাস যেমন নানা ফুল ইত্যাদির গন্ধ বহন করে সুগন্ধ এবং ধুসর রেণু ইত্যাদি বহন করে রূপযুক্ত বলে মনে হয়, সেইরকম যেই অন্তর্যামী নানা উপাসকের ইচ্ছা অনুসারে নানা রূপে প্রকাশ পান তিনি আমার মনোরথ সফল করুন। ৩৩-৩৪

শুকদেব বললেন, কুরুশ্রেষ্ঠ, সেই অঘমর্ষণ তীর্থে দক্ষ এইরকম স্তব করছেন, এমন সময় ভক্তবৎসল ভগবান তাঁর সামনে দেখা দিলেন। তাঁর দুই পদ গরুড়ের কাঁধে স্থাপিত, জানু পর্যন্ত লম্বিত আট হাতে চক্র, শংখ, অসি, ঢাল, বাণ, ধনুক, পাশ এবং গদা শোভা পাচ্ছে। তাঁর পরনে পীত বস্ত্র, গায়ের রং মেঘের মত শ্যাম, দুই চক্ষু এবং মুখখানি প্রসন্ন। তাঁর গলা থেকে পা অবধি সমস্ত অঙ্গে বনমালা, বুকে শ্রীবৎস[১] এবং কৌস্তুভ মণি শোভা পাচ্ছে। তিনি মাথায় কিরীট, পায়ে নুপুর, কানে উজ্জ্বল মকর কুণ্ডল, হাতে বলয় ইত্যাদি অলংকারে ভূষিত। ত্রিভুবনের ঈশ্বর হরি এই মোহন রূপ ধরে দেখা দিলেন। নারদ, নন্দ প্রভৃতি পারিষদেরা এবং লোকপালগণ তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়েছিলেন। সিদ্ধ, চারণ এবং গন্ধর্বেরা গান করে তাঁর স্তব করছিল। প্রজাপতি দক্ষ সেই আশ্চর্য রূপ দেখে সম্ভ্রম এবং আনন্দে মাটিতে লুটিয়ে তাঁকে প্রণাম করলেন। ঝরনা যেমন নদীকে পূর্ণ করে তেমনি দক্ষের সমস্ত ইন্দ্রিয় অতুল আনন্দে পূর্ণ হওয়াতে তাঁর মুখ দিয়ে কোন কথাই বার হলো না। ৩৫-৪১

ভক্ত প্রজাপতিকে ঐরকম প্রণত দেখে অন্তর্যামী জনার্দন বলতে লাগলেন, প্রচেতার পুত্র, তুমি যে শ্রদ্ধার সঙ্গে আমাতে ভক্তিমান হয়েছ তাতেই তোমার তপস্যায় সিদ্ধিলাভ হয়েছে। আমি তোমার উপর সন্তুষ্ট হয়েছি, কারণ প্রজাবৃদ্ধি হোক এই আমার ইচ্ছা। ব্রহ্মা, ভব, তোমরা, মনুগণ এবং দেবেশ্বরগণ এঁরা সবই আমার বিভূতি, এঁদের থেকেই প্রাণীদের উৎপত্তি হয়। হে ব্রহ্মা, তপস্যা অর্থাৎ যম, নিয়ম ইত্যাদির সঙ্গে ধ্যান আমার হৃদয়, বিদ্যা অর্থাৎ মন্ত্রজপ আমার দেহ, ক্রিয়া অর্থাৎ ধ্যানের বিষয় সম্বন্ধে ভাবনা আমার আহুতি, যজ্ঞ আমার অঙ্গ, ধর্ম অর্থাৎ যজ্ঞ ইত্যাদি থেকে যে অদৃষ্ট রচিত হয় তাই আমার মন এবং যে দেবগণ যজ্ঞ ভোগ করে থাকেন তাঁরাই আমার প্রাণ। প্রথমে কেবল আমিই ছিলাম। তখন অন্য কোন ক্রিয়া, গ্রহণ করতে পারে এমন ব্যক্তি বা গ্রহণ করা যায় এমন বস্তু, কিছুই ছিল না। আমিই কেবল চৈতন্যরূপে ছিলাম। কিন্তু সে চৈতন্য ছিল অব্যক্ত, কারণ তা ইন্দ্রিয়বৃত্তি দ্বারা ব্যক্ত হত না। কাজেই সব যেন গাঢ় ঘুমে মগ্ন অবস্থায় ছিল। আমি নিজে অনন্ত, আমার গুণও অনন্ত। যখন গুণের সাহায্যে আমার গুণময় দেহ অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হল তখনই তোমাদের মধ্যে যিনি প্রথম তিনি অর্থাৎ অযোনিজ স্বয়ম্ভু উৎপন্ন হন। ৪২-৪৮

আমার বীর্যের সাহায্যে বর্ধিত হয়েও যখন তিনি সৃষ্টি করতে অসমর্থ বোধ করছিলেন তখন আমি তাঁকে তপস্যা করতে উপদেশ দিই। তখন কঠোর তপস্যা করে ব্রহ্মা তোমাদের নয়জন প্রজাপতিকে সৃষ্টি করলেন। হে প্রজাপতি, তুমি পঞ্চজন নামে প্রজাপতির কন্যা অসিক্নীকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ কর। তাহলে স্ত্রী-পুরুষের রতিক্রিয়া রূপ ধর্ম অবলম্বন করে ধর্মশালী নারীতে অনেক সন্তান উৎপন্ন করতে পারবে। তোমার পরে সব পুরুষই আমার মায়ায় মোহিত হয়ে স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হয়ে সন্তানরূপে উৎপন্ন হবে এবং আমার পূজার উপচার সংগ্রহ

১ বিষ্ণুর বক্ষঃস্থ রোমের আবর্ত।

করবে। শুকদেব বললেন, ভগবান শ্রীহরি এই বলে দক্ষের সামনেই স্বপ্নে পাওয়া বস্তুর মত মিলিয়ে গেলেন। ৪৯-৫৪

পঞ্চম অধ্যায়

নারদের প্রতি দক্ষের অভিশাপ

শুকদেব বললেন, প্রজাপতি দক্ষ বিষ্ণুর মায়ায় শক্তিমান হয়ে পঞ্চজনের কন্যা অসিক্নীর গর্ভে অযুত পুত্রের জন্ম দিলেন ; তাঁদের নাম হল হর্যশ্ব। মহরাজ, সেই অযুত পুত্রের সকলেরই স্বভাব একরকম, আচার একরকম। পিতা তাঁদের প্রজাসৃষ্টি করতে বললে তাঁরা সবাই পশ্চিমদিকে গেলেন। সিন্ধুনদ যেখানে সমুদ্রের সঙ্গে মিলেছে সেখানে 'নারায়ণ-সর' নামে এক প্রধান তীর্থ আছে। মুনিগণ এবং সিদ্ধগণ প্রায়ই সেখানে গিয়ে থাকেন। সেখানে স্নান করা মাত্র তাঁদের হৃদয় থেকে ক্রোধ ইত্যাদি সব মলিনতা দূরে হয়ে গেল এবং পরমহংসের ধর্মে তাঁদের মতি হল। কিন্তু পিতা যেমন আদেশ করেছিলেন সে অনুসারে তাঁরা প্রজাসৃষ্টির জন্য উগ্র তপস্যা শুরু করলেন। প্রজাবৃদ্ধির জন্য তাঁদের যত্ন করতে দেখে দেবর্ষি নারদ সেখানে এসে তাঁদের বললেন, হর্যশ্বগণ, কি দুঃখের বিষয় যে তোমরা পালক হয়েও যেখানে ভূমি শেষ হয়েছে এবং যেখানে একমাত্র পুরুষ বাস করেন সে রাজ্য না দেখে সৃষ্টি করতে যাচ্ছ। যে গর্ত থেকে বেরোবার পথ দেখা যায় না, যে নারীর বহুরূপ, কুলটা নারীর স্বামী, দুদিকে প্রবাহিত নদী, পঁচিশটি পদার্থে তৈরী অদ্ভুত গৃহ, বিচিত্রভাষী হাঁস, ক্ষুর আর বজ্রের তৈরী স্বয়ংচল বস্তু—এসব না দেখে, না জেনে কি করে তোমরা সৃষ্টি করবে ? তোমাদের পিতা সব জানেন। তিনি তোমাদের সবকিছু জানবার আদেশ দিয়েছেন। তা না জেনে কি করে তোমরা সৃষ্টি করবে ? দেবর্ষির এই কূট কথাগুলো শুনে হর্যশ্বরা তাদের স্বাভাবিক বিচারশক্তি দিয়ে সেগুলো বিচার করে বললেন—'ভূমি' শব্দের অর্থ ক্ষেত্র অর্থাৎ লিঙ্গশরীর। তা অনাদি এবং আত্মার বন্ধনের হেতু। জ্ঞানের দ্বারা তার নির্বাণ বা নাশ হয়। তা না জেনে অসৎ অর্থাৎ যে কাজ মোক্ষের উপযোগী নয়, সে কাজ করলে কি ফল হবে ? ঈশ্বরই হলেন একমাত্র পুরুষ। তিনি সকলের সাক্ষী, সবার শ্রেষ্ঠ, সকল ঐশ্বর্য সম্পন্ন এবং নিজেই নিজের আধার। তাঁকে না দেখে অসৎ অর্থাৎ যে কর্ম ঈশ্বরে অর্পণ করা হয় নি, তার দ্বারা কি ফল লাভ হবে ? ১-১২

যে পাতালে যায় সে যেমন ফিরে আসতে পারে না, তেমনি যাঁকে পেলে পুরুষকে আর ফিরতে হয় না সেই জ্যোতিস্বরূপ ব্রহ্মকে না জেনে অসৎ অর্থাৎ যে কর্ম দ্বারা কেবল নশ্বর স্বর্গ ইত্যাদিই লাভ হয়, সে কাজে ফল কি ? আত্মার অর্থাৎ জীবের বুদ্ধির অনেক রূপ। তা রজ ইত্যাদি গুণযুক্ত এবং বেশ্যার মত পুরুষকে মোহিত করে। বিবেকের উদয় হলে তা দূর হয়। কিন্তু যার বিবেক জাগে নি তার অসৎ অর্থাৎ যে কাজে চিত্ত শান্ত না হয়ে চঞ্চল হয়, তেমন কাজে কি লাভ ? অসৎচরিত্র স্ত্রীর স্বামীর যেমন কোন স্বাধীনতা থাকে না, তেমনি বুদ্ধির সংস্পর্শে জীবের স্বাতন্ত্র্য নষ্ট হয়। বুদ্ধির থেকে মানুষের সুখ দুঃখ দুইই জন্মে। এ যার জানা নেই সে অসৎ অর্থাৎ যে কর্মের প্রেরণা শুধুই বুদ্ধি, বিবেক নয়, তেমন কর্ম করে কি ফল পাবে ? মায়ার দ্বারা সৃষ্টি এবং

প্রলয় ঘটে থাকে, তাই মায়ার প্রবাহ দ্বিমুখী। তপস্যা, বিদ্যা ইত্যাদি হচ্ছে ঐ মায়ানদীর ডাঙ্গা, তাদের সাহায্যেই ঐ প্রবাহ থেকে বেরিয়ে আসা যায়। কিন্তু তাদের সঙ্গে সঙ্গে ক্রোধ, অহঙ্কার ইত্যাদি থাকায় বেরোবার পথে যেমন বাধার সৃষ্টি হয়েছে তেমনি নদীর স্রোতও প্রবল হয়েছে। যে লোক ক্রোধ ইত্যাদিতে বিবশ এবং মায়ার এই স্বরূপ বিচার করতে সমর্থ নয় তার অসৎ অর্থাৎ মায়াবশে কাজের দ্বারা কি ফল হবে? অন্তর্যামী পুরুষ হলেন পঁচিশটি তত্ত্বের আশ্চর্য আশ্রয়। দেহের সেই অধিষ্ঠাতাকে যে জানে না তার অসৎ অর্থাৎ 'আমি স্বতন্ত্র' এই মিথ্যা অভিমানের বশে করা কাজে কি ফল লাভ হবে? যে শাস্ত্রে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকৃত তাতে চিদ্‌বস্তু এবং জড় বস্তুর পার্থক্য বিচার করা হয়েছে, তাই তা হংসের মত। কি কি কর্মে বন্ধন হয় এবং কিসে মোক্ষ হয় ঐ শাস্ত্র তাও দেখিয়েছে। তা না জেনে অসৎ অর্থাৎ শুধু বাহ্যিক কাজের দ্বারা কি ফল হবে? ১৩-১৮

কালচক্র চলমান ক্ষুরের মত অতিতীক্ষ্ন এবং বজ্রের মত কঠোর। সমস্ত জগৎকে তা ধ্বংস করছে, তাই সে স্বাধীন। ঐ চক্রকে না জেনে নিত্য মনে করে অনিত্য কাম্যকর্ম করে গেলে তাতে কি ফল? শাস্ত্রও আমাদের পিতা, কারণ শাস্ত্রবিধি অনুসারে উপনয়ন ইত্যাদি দ্বারা দ্বিতীয় জন্মলাভ হয়। শাস্ত্র জীবকে নিবৃত্তির পথ অবলম্বন করতে উপদেশ দেয়। শাস্ত্রের এই আদেশ যে জানে না সে গুণময় প্রবৃত্তির পথে বিশ্বাস স্থাপন করে থাকে। সে কি করে শাস্ত্রের আদেশ পালন করবে? শুকদেব বললেন, মহারাজ, হর্যশ্বরা এইরকম চিন্তা করে সকলেই একমত হলেন, তারপর তাঁরা নারদকে প্রদক্ষিণ করে নিবৃত্তিমার্গ অবলম্বন করলেন। নারদও হৃষীকেশের চরণপদ্মে নিজের চিত্তকে সম্পূর্ণ নিবিষ্ট করে সারা ভুবন ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। এইভাবে কিছুদিন গেল। তারপর নিজের সচ্চরিত্র পুত্রেরা নারদের উপদেশে আপন ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়েছে শুনে দক্ষ অনুতাপ করে বললেন —হায়, সুপুত্র লাভ করলেই শোক পেতে হয়। তখন ব্রহ্মা এসে তাঁকে সান্ত্বনা দিলেন। তিনি আবার পঞ্চজনীর গর্ভে সবলাশ্ব নামে এক হাজার পুত্রের জন্ম দিলেন। তাঁরাও প্রজাসৃষ্টির জন্য পিতার আদেশ পেয়ে যেই নারায়ণসর তীর্থে তাঁদের অগ্রজরা সিদ্ধিলাভ করেছিলেন সেখানেই গেলেন। সেই তীর্থের জল স্পর্শ করতেই তাদের মনের কামনা-বাসনা সব ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে গেল। তাঁরা প্রণব জপ করতে করতে সেখানে কঠোর তপস্যা শুরু করলেন। তাঁদের কয়েক মাস জল-পান করে এবং আরো কয়েক মাস বায়ুভক্ষণ করে কাটল। সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্তা মহাপুরুষ, বিশুদ্ধসত্ত্বের আশ্রয়, পরমহংস নারায়ণকে নমস্কার করি—এই মন্ত্র জপ করতে করতে তাঁরা বিষ্ণুর আরাধনা করতে লাগলেন। হে রাজেন্দ্র, সবলাশ্বরাও প্রজাসৃষ্টি করতে চান দেখে দেবর্ষি নারদ তাঁদের কাছে গিয়ে আগেকার সেই কূটবাক্য বললেন। তিনি বললেন, দক্ষের পুত্রগণ, তোমরা আমার উপদেশ শোন; তোমাদের অগ্রজরা যে পথে গিয়েছেন তোমরাও সেই পথে চল। ১৯-৩০

যে ধর্মজ্ঞ ভাই নিজের অন্য ভাইদের মতই উৎকৃষ্ট, অর্থাৎ মোক্ষপ্রদ পথে চলেন, তিনি ভাইয়ের প্রতি স্নেহশীল দেবতাদের সঙ্গে আনন্দ ভোগ করেন। নারদ এই কথা বলে চলে গেলে সবলাশ্বরাও তাঁদের ভাইদের পথই অনুসরণ করলেন। যে রাত্রি কেটে গেছে তা যেমন আর ফিরে আসে না, অন্তর্মুখ আত্মার দ্বারা লভ্য ঈশ্বর-প্রাপ্তির পথে গিয়ে তাঁরাও আর ফিরলেন না। প্রজাপতি দক্ষ যখন শুনলেন যে তাঁর এই পুত্রেরাও নারদের উপদেশে আগের পুত্রদের মতই নিবৃত্তির পথে

গিয়েছেন; তখন তিনি শোকে মূর্ছিত হলেন এবং নারদের উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। সেই সময় নারদ তাঁকে সান্ত্বনা দেবার জন্য উপস্থিত হলে দক্ষ রাগে কাঁপতে কাঁপতে তাঁকে বললেন, রে অসাধু, তোমার বেশ সাধুর মত হলেও তুমি সাধু নও। কারণ তুমি আমার পুত্রদের ক্ষতি করেছ। তারা নিজেদের ধর্মপালন করছিল, কিন্তু তুমি তাদের ভিক্ষুকের পথ দেখিয়েছ। জন্মগ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণ ঋষিঋণ, দেবঋণ এবং পিতৃঋণ এই তিন ঋণে আবদ্ধ হন। ব্রহ্মচর্য পালন করে ঋষিঋণ, যজ্ঞ দ্বারা দেবঋণ আর পুত্র উৎপাদন করে পিতৃঋণ শোধ করতে হয়। আমার ছেলেরা এই তিন ঋণের কোনটি থেকেই মুক্ত হয় নি। তুমি তাদের বিষয় ত্যাগ করিয়ে ইহলোকে যা করলে মঙ্গল হয় সে কাজে যেমন বাধা ঘটিয়েছ, তেমনি মোক্ষের অধিকারী না হতেই তাদের মোক্ষ উপদেশ করে পরলোকের কল্যাণেও বাধার সৃষ্টি করেছ। তুমি অতি নির্দয়, তাই ঐ বালকদের বুদ্ধি নষ্ট করেছ। এই কাজের দ্বারা শ্রীহরির যশ নষ্ট করে কোন লজ্জায় তুমি এখনও তাঁর পার্ষদদের মধ্যে রয়েছ? আমি দেখছি ভগবানের সমস্ত ভক্তই সর্বভূতে দয়া করে থাকেন, একমাত্র তুমি ছাড়া। তোমার কাজই হচ্ছে লোকের সদ্ভাব নষ্ট করা আর যে শত্রুতার যোগ্য নয় তার সঙ্গে শত্রুতা করা। তুমি মনে করছ বিষয়ে বৈরাগ্য জন্মালেই স্নেহের বন্ধন ছিন্ন করা যায়, আর যার বৈরাগ্য জন্মেছে তার ঐ তিন ঋণ পরিশোধ করার দরকার নেই। তা যদি ঠিকও হয় তবুও তুমি তাদের ক্ষতিই করেছ। তুমি সাধুর বেশ ধারণ করলেও তোমার জ্ঞান নেই। তাই তোমার মত সাধুর কাছে বৈরাগ্যের কথা শুনে লোকের মনে বৈরাগ্য জন্মাবে না। বিষয় যে দুঃখের কারণ, বিষয় ভোগ না করলে পুরুষ সেকথা জানতে পারে না। ভোগের দ্বারা দুঃখের তীব্রতা বুঝলে পরে আপনা থেকেই যে নির্বেদ বা বৈরাগ্য আসে, পরের কথায় তা হয় না। যাহোক, আমরা সাধু গৃহস্থ, অন্যের অমঙ্গল করতে জানি না, তাই তুমি আমার যে দারুণ ক্ষতি করলে তাও সহ্য করতে হবে। কিন্তু হে বংশনাশকারী, তুমি আমার পুত্রদের পথভ্রষ্ট করেছ, এইজন্যে তুমি ত্রিলোকে শুধুই ঘুরে বেড়াবে কোথাও তোমার স্থিতি হবে না। ৩১-৪৩

শুকদেব বললেন, সাধুরা যাঁর চরিত্রের প্রশংসা করেন সেই নারদ 'তথাস্তু' বলে দক্ষের অভিশাপ মেনে নিলেন। প্রতিশাপ দিতে সক্ষম হলেও সাধুরা যে অপরের অভিশাপ সহ্য করেন তাতেই তাঁদের সাধুতার পরিচয়। ৪৪

ষষ্ঠ অধ্যায়

দক্ষ-কন্যাগণের বংশ বর্ণন

শুকদেব বললেন, এরপর দক্ষ ব্রহ্মার আদেশ পেয়ে অসিক্নীর গর্ভে ষাটটি কন্যা উৎপাদন করলেন। সব কটি কন্যাই পিতাকে ভক্তি করতেন। কন্যাদের মধ্যে দক্ষ দশটি ধর্মকে, তেরটি কশ্যপকে এবং সাতাশটি চন্দ্রকে দিলেন। ভৃগু, অঙ্গিরা আর কৃশাশ্ব এঁদের প্রত্যেককে দিলেন দুটি করে এবং বাকী চারটি তার্ক্ষ্যকে সম্প্রদান করলেন। এই কন্যাদের এবং তাঁদের সন্তানদের নাম বলছি শুনুন। এঁদের পুত্র, পৌত্র ইত্যাদিতে ত্রিলোক পূর্ণ হয়েছে। ভানু, লম্বা, ককুদ্, যামি, বিশ্বা, সাধ্যা, মরুত্বতী, বসু, মুহূর্তা আর সংকল্পা হলেন ধর্মের দশ পত্নী। এঁদের

মধ্যে ভানুর পুত্রের নাম দেবর্ষভ এবং তার পুত্রের নাম ইন্দ্রসেন। লম্বার পুত্র বিদ্যোত, তাঁর পুত্র স্তনয়িত্নু (মেঘ) সকল। ককুদের পুত্র সংকট, তাঁর পুত্র কীকট যার থেকে দুর্গের অধিষ্ঠাত্রী দেবতারা উৎপন্ন হয়েছেন। যামির পুত্র হলেন স্বর্গ, তাঁর থেকে নন্দি জন্মেছেন। ১-৬

বিশ্বদেবেরা হলেন বিশ্বার পুত্র। শোনা যায় তাঁরা নিঃসন্তান। সাধ্যার পুত্র সাধ্যগণ; তাঁদের থেকে অর্থসিদ্ধি নামে পুত্র জন্মেছেন। মরুত্বতীর গর্ভে মরুত্বান আর জয়ন্ত নামে দুই পুত্র জন্মান। ওদের মধ্যে জয়ন্ত বাসুদেবের অংশ বলে উপেন্দ্র নামে বিখ্যাত। মুহূর্তার গর্ভে মৌহূর্তিক নামে দেবতারা জন্মেছেন। এঁরা প্রাণীদের নিজ নিজ কালজাত ফল দেন। সংকল্পার গর্ভে সংকল্প এবং তাঁর থেকে কামের জন্ম হয়। বসুর পুত্র অষ্টবসুর নাম হল দ্রোণ, প্রাণ, ধ্রুব, অর্ক, অগ্নি, দোষ, বাস্তু ও বিভাবসু। দ্রোণের স্ত্রী অভিমতির গর্ভে হর্ষ, শোক, ভয় ইত্যাদি পুত্রের জন্ম হয়। প্রাণের পত্নী ঊর্জস্বতী। তাঁর গর্ভে সহ, আয়ু ও পুরোজব নামে তিন পুত্র জন্মে। ধ্রুবের স্ত্রী হলেন ধরণী। তিনি অনেক পুত্র প্রসব করেন। ৭-১২

অর্কের পত্নী বাসনা। বলা হয়েছে যে তাঁর গর্ভে তর্ষ ইত্যাদি অনেক পুত্র জন্মান। অগ্নির স্ত্রী হলেন ধারা। তিনি দ্রবিণক প্রভৃতি পুত্রদের প্রসব করেন। তাঁর অন্য স্ত্রী কৃত্তিকার গর্ভে স্কন্দের জন্ম হয়। বিশাখা ইত্যাদিরা হলেন স্কন্দের পুত্র। দোষ নামে বসুর স্ত্রী হলেন শর্বরী। শর্বরীর পুত্র শিশুমার হরির অংশ। আঙ্গিরসী বাস্তুর স্ত্রী; তাঁর গর্ভে শিল্পাচার্য বিশ্বকর্মার জন্ম হয়েছে। বিশ্বকর্মার ছেলে চাক্ষুষ মনু; বিশ্বদেবগণ এবং সাধ্যগণ এই মনুর থেকে জন্মান। বিভাবসুর পত্নী উষার তিন পুত্র—ব্যুষ্ট, রোচিষ এবং আতপ! তার মধ্যে আতপের পুত্র হলেন পঞ্চযাম অর্থাৎ দিন। তাই রাত্রিকে বলে ত্রিযামা। দিনে প্রাণীরা নিজ নিজ কাজে রত থাকে। প্রজাপতি ভূতের দুই স্ত্রীর একজন সরূপা। তিনি কোটি কোটি রুদ্রকে প্রসব করেন। এদের মধ্যে প্রধান এগার জন হলেন—রৈবত, অজ, ভব, ভীম, বাম, উগ্র, বৃষাকপি, অজৈকপাদ, অহির্বুধ্ন, বহুরূপ আর মহান। এই এগার জন প্রধান রুদ্রের সহচর অতি ভয়ানক প্রেতগণ ভূতের অন্য স্ত্রীর গর্ভে উৎপন্ন হয়েছিল। ১৩-১৮

প্রজাপতি অঙ্গিরার দুই পত্নী—স্বধা ও সতী। স্বধা পিতৃগণকে এবং সতী অথর্বাঙ্গিরস নামে বেদকে প্রসব করেন। কৃশাশ্ব অর্চির গর্ভে ধূম্রকেতুকে এবং ধিষণার গর্ভে বেদশিব, দেবল, বয়ুন আর মনুকে উৎপাদন করেন। তার্ক্ষ্যের পত্নী হলেন বিনতা, কদ্রু, পতঙ্গী এবং যামিনী। তার মধ্যে পতঙ্গী পাখিগণকে এবং যামিনী পতঙ্গদিগকে প্রসব করেন। বিনতা বিষ্ণুর বাহন গরুড় এবং সূর্যের সারথি অরুণকে আর কদ্রু অনেক নাগকে প্রসব করেন। কৃত্তিকা ইত্যাদি নক্ষত্রেরা হলেন চন্দ্রের পত্নী। চন্দ্র রোহিণীর প্রতি বেশী আসক্ত হওয়াতে দক্ষের শাপে তিনি যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হন। তাই তাঁর কোন সন্তান হয় নি। চন্দ্র দক্ষকে পরে সন্তুষ্ট করে পুত্র না পেলেও কৃষ্ণপক্ষের ক্ষয় পেয়ে যাওয়া কলাগুলিকে শুক্লপক্ষে ফিরে পেলেন। মহারাজ, কশ্যপের যে সব পত্নী এই জগৎ প্রসব করেছেন তাঁরাই আসলে বিশ্বজননী। তাঁদের মঙ্গলকর নাম শোন—অদিতি, দিতি, দনু, কাষ্ঠা, অরিষ্টা, সুরসা, ইলা, মুনি, ক্রোধবশা, তাম্রা, সুরভি, সরমা এবং তিমি। জলজন্তুরা হল তিমির পুত্র। সরমা থেকে শ্বাপদরা উৎপন্ন হয়েছে। গো-মহিষ ইত্যাদি যে সব প্রাণীর পায়ে দুই খুর আছে তারা জন্মেছে সুরভির গর্ভে। শোন, গৃধ্র

ইত্যাদিরা তাম্রার পুত্র। অপ্সরাগণ মুনির গর্ভে জাত। দন্দশূক ইত্যাদি সাপেরা ক্রোধবশার সন্তান। বৃক্ষসকল হল ইলার পুত্র এবং রাক্ষসারা সুরসার গর্ভে জন্মেছে। অরিষ্টার গর্ভে গন্ধর্বরা আর দ্বিখুর ছাড়া অন্য পশুরা কাষ্ঠার গর্ভে জন্মেছে। দনুর পুত্রের সংখ্যা হল একষট্টি। তাঁদের মধ্যে প্রধান হলেন—দ্বিমূর্ধা, শম্বর, অরিষ্ট, হয়গ্রীব, বিভাবসু, অয়োমুখ, শঙ্কুশিরা, স্বর্ভানু, কপিল, অরুণ, পুলোমা, বৃষপর্বা, একচক্র, অনুতাপন, ধূম্রকেশ, বিরূপাক্ষ, বিপ্রচিত্তি ও দুর্জয়। স্বর্ভানুর কন্যা সুপ্রভাকে নমুচি বিয়ে করেন। বৃষপর্বার মেয়ে শর্মিষ্ঠাকে বিবাহ করেন নহুষের পুত্র পরাক্রান্ত যযাতি। হে রাজা, দনুর পুত্র বৈশ্বানরের চারটি সুন্দরী কন্যা জন্মে। তাঁদের নাম উপদানবী, হয়শিরা, পুলোমা এবং কালকা। হিরণ্যাক্ষ উপদানবীকে আর ক্রতু হয়শিরাকে বিবাহ করেন। পুলোমা এবং কালকা দানবী হলেও প্রজাপতি কশ্যপ ব্রহ্মার আদেশে তাঁদের বিবাহ করেন। ঐ দুই কন্যার গর্ভে পৌলোম ও কালকেয় নামে ষাটহাজার রণকুশল সন্তানের জন্ম হয়। তারা যজ্ঞের বাধা ঘটিয়েছিল। তাই তোমার পিতামহ অর্জুন যখন দেবতাদের প্রিয় কাজ করবার জন্য স্বর্গে যান তখন একাই তাদের সকলকে বধ করেন। সিংহিকার গর্ভে বিপ্রচিত্তি একশ একটি পুত্র উৎপাদন করেন। তাদের মধ্যে রাহু হলেন জ্যেষ্ঠ আর বাকী একশর নাম কেতু। তাঁরা সকলেই গ্রহে পরিণত হয়েছেন। ১৯-৩৭

এরপর অদিতির বংশের কথা শোন। তাঁরই বংশে বিভুদেব নারায়ণ নিজ অংশে স্বয়ং জন্ম নিয়েছিলেন। বিবস্বান, অর্যমা, পূষা, ত্বষ্টা, সবিতা, ভগ, ধাতা, বিধাতা, বরুণ, মিত্র, শুক্র আর উরুক্রম—এঁরা হলেন অদিতির বারটি ছেলে যাঁদের আদিত্য বলা হয়ে থাকে। বিবস্বানের স্ত্রী সংজ্ঞা শ্রাদ্ধদেব নামে মনুকে প্রসব করেন। সেই ভাগ্যবতীই যমদেব এবং যমী বা যমুনা—এই দুই যমজ পুত্রকন্যার জননী। সংজ্ঞাই আবার বড়বা (ঘোটকী) হয়ে পৃথিবীতে দুই অশ্বিনীকুমারকে প্রসব করেন। বিবস্বানের অন্য পত্নী ছায়ার গর্ভে শনৈশ্চর ও সাবর্ণি-মনু এবং তপতী নামে কন্যা জন্মান। তপতী রাজা সম্বরণকে বিবাহ করেন। অর্যমার পত্নী হলেন মাতৃকা। তাঁদের পুত্রেরা হিতাহিত জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। এদের থেকেই ব্রহ্মা মানুষ জাতির কল্পনা করেছেন। পূষার সন্তান হয় নি। মহাদেব দক্ষের উপর ক্রুদ্ধ হলে পূষা দাঁত বের করে হেসেছিলেন বলে তাঁর দাঁতগুলো ভাঙে। তাই তিনি পিষ্ট জিনিস খান। প্রজাপতি ত্বষ্টার পত্নী হলেন রচনা নামে এক দৈত্যকন্যা। তাঁদের সন্নিবেশ এবং বিশ্বরূপ নামে দুটি পুত্র হয়। দেবতারা অবজ্ঞা করলে বৃহস্পতি যখন তাঁদের ছেড়ে চলে আসেন তখন তাঁরা শত্রু দৈত্যদের ভাগ্নে হলেও বিশ্বরূপকেই পুরোহিত রূপে বরণ করেন। ৩৮-৪৫

সপ্তম অধ্যায়

বিশ্বরূপকে দেবগণের পুরোহিতরূপে বরণ

রাজা বললেন, ভগবান, আচার্য বৃহস্পতি নিজের শিষ্য দেবতাদের পরিত্যাগ করলেন কেন? গুরুর কাছে শিষ্যরা কি অপরাধ করেছিলেন তা দয়া করে বলুন। **শুকদেব বললেন,** মহারাজ, একদিন ইন্দ্র তাঁর সভার সিংহাসনে বসেছিলেন। মরুৎ, বসু, রুদ্র, আদিত্য, ঋভু, বিশ্বদেব এবং সাধ্যগণ আর দুই অশ্বিনীকুমার তাঁকে ঘিরে বসেছিলেন। সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব, ব্রহ্মবাদী মুনি, বিদ্যাধর, অপ্সরা,

কিন্নর, উরগ, পতঙ্গ ইত্যাদি সভাসদ্‌রা তাঁর সেবা ও স্তব করেছিলেন। ত্রিভুবনের ঐশ্বর্যে মত্ত হয়ে ইন্দ্র সৎপথ লংঘন করলেন। তাঁর মাথায়-ধরা চন্দ্রমণ্ডলের মত সুন্দর ছত্রে, চামর-ব্যজন এবং অন্যান্য রাজচিহ্নে ভূষিত হয়ে অর্ধেক আসনে বসা শচীদেবীর সঙ্গে ইন্দ্রের অতি অপূর্ব শোভা হয়েছিল। সেই সময় বৃহস্পতি সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। সুর এবং অসুরের নমস্য মুনিবর বৃহস্পতি দেবতাদের এবং ইন্দ্রেরও গুরু। কিন্তু তাঁকে দেখে ইন্দ্র আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন না বা আসন দান করে তাঁকে সম্মানও দেখালেন না। ১-৮

মহাপণ্ডিত প্রভু বৃহস্পতি বুঝতে পারলেন যে ঐশ্বর্যের গর্বে ইন্দ্রের বুদ্ধির বিকার ঘটেছে। তাই কাউকে কিছু না বলে তিনি সভা থেকে বেরিয়ে নিজের বাড়িতে চলে গেলেন। তখনি ইন্দ্রের খেয়াল হল যে গুরুকে অপমান করা হয়েছে। তখন সভার মধ্যেই তিনি নিজেকে ধিক্কার দিয়ে বললেন ! ছি, ছি, আমি কি নির্বোধ। ঐশ্বর্যের মোহে মত্ত হয়ে সভার মধ্যে গুরুর অপমান করলাম। আমার ঐশ্বর্যকে ধিক্। এরপর আর কোন বিজ্ঞলোক ত্রিভুবনেশ্বরের ঐশ্বর্যও কামনা করবেন না। দেবতাদের ঈশ্বর হয়েও এই ঐশ্বর্যের জন্য আমি অসুরের মত হয়ে গেলাম। রাজা সিংহাসনে আসীন থাকলে কাউকে দেখেই উঠে দাঁড়াবেন না এমন উপদেশ যাঁরা দেন তাঁরা নিশ্চয়ই সৎ ধর্মের মর্ম না জেনে লোককে কুপথে চালিত করেন এবং নিজেরাও অধঃপাতে যান। পাথরের ভেলায় করে যে জল পার হতে যায় ভেলাব সঙ্গে সঙ্গে যেমন সেও ডোবে, তেমনি ঐরকম লোকের উপদেশে যারা নির্ভর কবেন উপদেশদাতার সঙ্গে সঙ্গে তাদেরও নরকবাস ঘটে। ৯-১৪

যা হোক, এখন আমি কপটতা ভুলে জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ দেবগুরুর পায়ে মাথা রেখে তাঁকে তুষ্ট করব। ইন্দ্র এইভাবে অনুতাপ করছেন জানতে পেরে বৃহস্পতি মায়াবলে তাঁর বাড়ী থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। ইন্দ্র অনেক খুঁজেও গুরুকে না পেয়ে চিন্তিত হলেন এবং অন্য দেবতাদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন ; কিন্তু তাতেও শান্তি পেলেন না। এদিকে দুর্দান্ত অসুরেরা যখন ইন্দ্রের এই অবস্থাব কথা শুনল, তারা তাদের গুরু শুক্রাচার্যের অনুমতি নিয়ে অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে দেবতাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করল। অসুরদের তীক্ষ্ণ তীরে দেবতাদের কারো মাথা, কারো উরু, কারো বা বাহু ছিন্নভিন্ন হল। তখন দেবতারা লজ্জায় মাথা নীচু করে ইন্দ্রের সঙ্গে গিয়ে ব্রহ্মার শরণ নিলেন। ১৫-১৯

দেবতাদের ঐ দুরবস্থা দেখে ভগবান ব্রহ্মার দয়া হল। তিনি তাঁদের সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, দেবশ্রেষ্ঠগণ, ঐশ্বর্যের অহংকারে মত্ত হয়ে তোমরা ব্রহ্মনিষ্ঠ জিতেন্দ্রিয় ব্রাহ্মণকে সম্মান দেখাও নি। এ কাজ অত্যন্ত অন্যায় হয়েছে। তোমরা সমৃদ্ধিশালী ; আর অসুরেরা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করে শক্তিহীন হচ্ছিল। তবুও তাদের হাতে যে তোমাদের পরাজয় ঘটল তা তোমাদের এই অন্যায়ের ফল। ইন্দ্র, তোমাদের শত্রু অসুরগণ আগে একবার তাদের গুরুকে অবহেলা করে দুর্বল হয়ে পড়েছিল। এখন ভক্তিভরে শুক্রাচার্যের আরাধনা করে তারা আবার শক্তিমান হয়ে উঠেছে। গুরুভক্ত এই অসুরেরা এক সময় আমার আবাসও অধিকার করবে বলে মনে হচ্ছে। শুক্রের শিষ্যরা অভেদ্য-মন্ত্র অর্থাৎ তাদের মন্ত্রণা বাইরের কেউ জানতে পায় না। তারা স্বর্গকে কি আর গ্রাহ্য করে ? গো, ব্রাহ্মণ এবং গোবিন্দ যাঁদের সহায় সে সব নৃপতিদের কখনও অমঙ্গল হয় না। তাই তোমরা তাড়াতাড়ি গিয়ে ত্বষ্টার পুত্র বিশ্বরূপের আরাধনা কর। তিনি জিতেন্দ্রিয় এবং তপস্বী। তোমরা যদি অসুরদের প্রতি তাঁর পক্ষপাত সহ্য করে তাঁকে পূজা কর তবে তিনি নিশ্চয়ই তোমাদের ইচ্ছা পূরণের উপায় বলে দেবেন। ২০-২৫

শুকদেব বললেন, ব্রহ্মা এই কথা বললে দেবতাদের মনঃকষ্ট দূর হল। তাঁরা ঋষি বিশ্বরূপের কাছে গিয়ে তাঁকে আলিঙ্গন করে বললেন, বৎস, আমরা তোমার পিতা। অতিথি হয়ে তোমার আশ্রমে এসেছি। তোমার পিতাদের যা কামনা তা এবার পূর্ণ কর। সেবাই সুপুত্রের পরম ধর্ম। যে পুত্রের পুত্র হয়েছে তারও পিতার সেবা করা অবশ্যই উচিত। তোমার মত ব্রহ্মচারী যে সেই ধর্মই পালন করবে—তা কি বলার অপেক্ষা রাখে? আচার্য হলেন মূর্তিমান বেদ, পিতা প্রজাপতির মূর্তি, ভাই হলেন ইন্দ্রের মূর্তি, মা সাক্ষাৎ পৃথিবী, বোন দয়ার মূর্তি, অতিথি ধর্মের, অভ্যাগত অগ্নির এবং প্রাণিমাত্রেই শ্রীবিষ্ণুর মূর্তি। আমরা তোমার পিতা, শত্রুর কাছে পরাস্ত হয়ে আমরা অতি কাতর হয়েছি। বৎস, তুমি আমাদের ইচ্ছা অনুসারে তপস্যা দ্বারা আমাদের কষ্ট দূর কর। তুমি ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ, তাই তুমি গুরু। আমরা তোমাকে উপাধ্যায়পদে বরণ করছি। এর ফলে তোমার তেজে আমরা শত্রুদের সহজেই পরাজিত করতে পারব। তুমি বয়সে ছোট হলেও আমরা তোমার চরণবন্দনা করব তাতে নিন্দার কিছু নেই। বেদজ্ঞান না থাকলে শুধু বয়সেই লোক বড় হয় না। ২৬-৩৩

শুকদেব বললেন, দেবতারা মহাতপা বিশ্বরূপকে তাঁদের পুরোহিত হবার প্রার্থনা জানালে তিনি প্রসন্ন হয়ে মিষ্টকথায় তাঁদের বললেন, পুরোহিতের কাজে ব্রহ্মতেজ ক্ষয় হয় বলে মুনিরা এর নিন্দা করেছেন। কিন্তু লোকপালগণ, আপনারা যখন প্রার্থনা করছেন তখন আমার মত ব্যক্তি কি তা অস্বীকার করতে পারে? পৌরোহিত্য করলে ধন উপার্জন করা যায় এবং সেই ধনে ধর্ম পালন হয়; কিন্তু নির্ধনের ধর্মপালন হয় না এ কথাও ঠিক নয়। কারণ আমরা দরিদ্র হলেও সাধুসেবা করে থাকি। ক্ষেতে যে শস্যকণা কৃষকের অবহেলায় পড়ে থাকে, এবং হাটে (কেনাবেচার সময়ে) যে ধান ইত্যাদি পড়ে, সেসব কুড়িয়েই আমরা সাধুসেবা করি। হে অধীশ্বরগণ, পৌরোহিত্য অতি নিন্দার কাজ, দুষ্ট লোকেরাই এ কাজ পেলে খুশী হয়। তবুও আপনারা আমার গুরুজন, আপনাদের এই সামান্য প্রার্থনা আমি অস্বীকার করতে পারলাম না। আপনারা যদি এর থেকে বেশী কিছুও চান তাও আমি নিজের ধন-প্রাণ দিয়ে সম্পাদন করব। শুকদেব বললেন, মহারাজ, মহাতপা বিশ্বরূপের কাছে এই রকম প্রতিশ্রুতি পেয়ে দেবতারা তাঁকে পৌরোহিত্যে বরণ করলেন। বিশ্বরূপও অতিশয় উৎসাহের সঙ্গে পৌরোহিত্য করতে লাগলেন। অসুরদের রাজশ্রী শুক্রাচার্যের বিদ্যায় সুরক্ষিত থাকলেও তেজস্বী বিশ্বরূপ নারায়ণ-কবচরূপ বিদ্যার শক্তিতে তা আকর্ষণ করে এনে মহেন্দ্রকে দিলেন। যে বিদ্যায় বলীয়ান হয়ে ইন্দ্র অসুর-সেনাদের জয় করেন তা বিশ্বরূপই তাঁকে দিয়েছিলেন। ৩৪-৪০

অষ্টম অধ্যায়

ইন্দ্রের দানব-বিজয়

রাজা বললেন, ভগবান, যে নারায়ণ-কবচে সুরক্ষিত হয়ে ইন্দ্র বাহন সমেত অসুর-সেনাদের জয় করেছিলেন তার কথা দয়া করে আমাকে বলুন। শুকদেব বললেন, ত্বষ্টার পুত্র বিশ্বরূপকে পুরোহিত পদে বরণ করা হলে তিনি ইন্দ্রকে যে নারায়ণ

কবচের কথা বলেছিলেন, তা মনোযোগ দিয়ে শোন। বিশ্বরূপ বললেন, কোন ভয় উপস্থিত হলে হাত-পা ধুয়ে উত্তরদিকে মুখ করে বসবে এবং পবিত্র কুশ হাতে নিয়ে আচমন করবে। তারপর বাক্যসংযম করে শুদ্ধ হয়ে আট অক্ষরের এবং বারো অক্ষরের দুটি মন্ত্র দ্বারা অঙ্গন্যাস আর করন্যাস করবার পর নারায়ণকবচ গ্রহণ করবে। অঙ্গন্যাস এইরকম—'ওঁ নমো নারায়ণায়' এই আট-অক্ষর মন্ত্রের প্রত্যেক অক্ষর প্রণবযুক্ত করে যথাক্রমে দুই পা, দুই হাঁটু, দুই ঊরু, পেট, হৃদয়, বুক এবং মাথা এই আটটি স্থানে ন্যাস করবে। পা থেকে শুরু না করে মাথা থেকেও শুরু করা যেতে পারে। ১-৬

তারপর বারো অক্ষরের 'ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়' মন্ত্রে করন্যাস করবে। তার পদ্ধতি হচ্ছে এইরকম – মন্ত্রের আরম্ভ থেকে শুরু করে প্রতিটি অক্ষর প্রণবযুক্ত করে ডান ও বাঁ হাতের তর্জনী থেকে কনিষ্ঠা পর্যন্ত চার চার আট আঙুলে ন্যাস করবে। অবশিষ্ট চারটি অক্ষর ডান এবং বাঁ হাতের অঙ্গুষ্ঠের প্রথম এবং শেষ দুটি পর্বে ন্যাস করবে। 'ওঁ বিষ্ণবে নমঃ' এই ছয় অক্ষরের মন্ত্র দিয়েও অঙ্গন্যাস হয়। তা হল এইরকম—মন্ত্রের প্রণব হৃদয়ে, 'বি' মাথায়, 'ষ' দুই ভ্রূর মাঝখানে, 'ণ' শিখায়, 'বে' দুই চোখে, আর সমস্ত সন্ধিস্থানে 'ন' ন্যাস করে 'ম' কে অস্ত্ররূপে ধ্যান করতে হবে। তারপর সাধক নিজেই মন্ত্ররূপ হয়ে 'মঃ অস্ত্রায় ফট্' উচ্চারণ করে সমস্ত দিক্ বন্ধন করবে। তারও পরে ঐশ্বর্য আদি ছয় শক্তিযুক্ত ধ্যানের বিষয় ঈশ্বরস্বরূপ সেই আত্মার ধ্যান করবে এবং বিদ্যা, তেজ আর তপস্যা যার মূর্তিস্বরূপ সেই নারায়ণকবচ পাঠ করবে। তা হল এই—যাঁর পাদপদ্ম গরুড়ের পিঠে স্থাপিত রয়েছে, যাঁর আট বাহু শঙ্খ, চক্র, চর্ম, অসি, গদা, বাণ, ধনু এবং পাশে সাজ্জিত, যিনি অণিমা প্রভৃতি আটটি ঐশ্বর্যে মণ্ডিত এবং যিনি সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ের কর্তা সেই শ্রীহরি সর্বদেশে এবং সর্বকালে আমাকে রক্ষা করুন। মৎস্যমূর্তি ভগবান জলে জলজন্তুরূপ বরুণ পাশ থেকে আমাকে রক্ষা করুন। মায়াদ্বারা যিনি বটুবামন হয়েছিলেন তিনি স্থলে আমাকে রক্ষা করুন। যিনি বিশ্বরূপ এবং ত্রিবিক্রম রূপ ধরেছিলেন তিনি আকাশে আমায় রক্ষা করুন। যাঁর ভীষণ অট্টহাসিতে সমস্ত দিক ধ্বনিত হয়েছিল, গর্ভিণীদের গর্ভপাত হয়েছিল, দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর শত্রু সেই প্রভু নৃসিংহ বনে এবং যুদ্ধক্ষেত্র প্রভৃতি বিপদের স্থানে আমাকে রক্ষা করুন। যিনি দাঁত দিয়ে পৃথিবী উদ্ধার করেছিলেন সেই যজ্ঞরূপী বরাহ আমাকে পথে রক্ষা করুন। জমদগ্নি-পুত্র রাম আমাকে গিরিচূড়ায় এবং লক্ষ্মণের সঙ্গে ভরতের অগ্রজ রাম প্রবাসে রক্ষা করুন। ভগবান নারায়ণ ঋষি নানা উগ্র প্রবৃত্তি এবং মত্ততা থেকে, নরঋষি গর্ব থেকে, যোগেশ্বর দত্তাত্রেয় যোগভ্রংশ থেকে, কপিল কর্মবন্ধন থেকে আমাকে রক্ষা করুন। সনৎকুমার কাম থেকে, হয়গ্রীব পথে দেবমূর্তিকে প্রণাম না করার অপরাধ থেকে আমাকে রক্ষা করুন। দেবর্ষি নারদ দেবপূজার ত্রুটি থেকে, কর্মরূপী শ্রীহরি অশেষ নরক থেকে আমাকে রক্ষা করুন। ভগবান ধন্বন্তরি কুপথ্য থেকে, জিতেন্দ্রিয় ঋষভদেব সুখ-দুঃখ ইত্যাদির দ্বন্দ্ব ভয় থেকে, যজ্ঞ অবতার লোকের অপবাদ থেকে, বলভদ্র মানুষের দেওয়া দুঃখ থেকে এবং বাসুকি ক্রোধী সর্পদের থেকে আমাকে পরিত্রাণ করুন। ৭-১৮

ভগবান দ্বৈপায়ন আমাকে অজ্ঞান থেকে, বুদ্ধ দুরাত্মা লোকের সংস্পর্শহেতু বুদ্ধিনাশ থেকে এবং ধর্মরক্ষায় অবতীর্ণ কল্কি কালের মলস্বরূপ কলি থেকে রক্ষা করুন। প্রাতে সূর্য উদয়ের পর তিন মুহূর্ত কেশব গদা দ্বারা, তার পরের তিন মুহূর্ত গোবিন্দ বেণু ধারণ করে, পূর্বাহ্নের বাকী সময় নারায়ণ শক্তি ধারণ

করে এবং মধ্যাহ্নে বিষ্ণু চক্রপাণি হয়ে আমাকে রক্ষা করুন। পরাহ্নে দেব মধুসূদন উগ্রধনু ধারণ করে, সায়ংকালে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বররূপী মাধব এবং প্রদোষে হৃষীকেশ আমাকে রক্ষা করুন। অর্ধরাত্রে ও নিশীথে একমাত্র পদ্মনাভ, অপর-রাত্রে অর্থাৎ অরুণোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত শ্রীবৎসধারী ঈশ, প্রত্যুষে ঈশ জনার্দন অসিধারী হয়ে, প্রভাতে দামোদর এবং সন্ধ্যায় কালরূপ ভগবান বিশ্বেশ্বর আমাকে রক্ষা করুন। ভগবানের চক্রের নেমি প্রলয়ের আগুনের মত প্রচণ্ড। হে চক্র, বাতাসের সাহায্যে আগুন যেমন শুষ্ক ঘাসকে পোড়ায়, তেমনি তুমিও ভগবানের নির্দেশে আমাদের শত্রুসৈন্যদের পুড়িয়ে শেষ কর। হে গদা, তোমার স্ফুলিঙ্গের স্পর্শ বজ্রের স্পর্শের মত। তুমি অজিত ভগবানের প্রিয়. আমিও তাঁর দাস। তাই তুমি কুষ্মাণ্ড, বৈনায়ক, যক্ষ, রক্ষ, ভূত এবং গ্রহদের পিষে ফেল, শত্রুদের চূর্ণ কর। হে পাঞ্চজন্য, তোমার স্বর অতি ভীষণ। শ্রীকৃষ্ণ তোমাকে ফুঁ দিলে তুমি বেজে উঠে শত্রুর হৃদয় কম্পিত করে রাক্ষস, প্রমথ, ভূত, প্রেত, পিশাচ প্রভৃতিকে এবং ব্রহ্মরাক্ষস ও অন্যান্য বিকটাকৃতি দুরাত্মাদের তাড়িয়ে দাও। হে অসিশ্রেষ্ঠ, তোমার ধার অতি তীক্ষ্ন। ঈশ্বরের আদেশে তুমি শত্রুসৈন্যদের ছিন্ন কর। হে চর্ম, তোমাতে চন্দ্রের মত একশত মণ্ডল আছে। তুমি পাপী শত্রুদের চোখ ঢেকে ফেল, আর যাদের দৃষ্টি উগ্র তাদের দৃষ্টি নষ্ট কর। গ্রহ, কেতু, মানুষ, সরীসৃপ. দংষ্ট্রী, ভূত এবং পাপ থেকে আমাদের যে ভয় হয় সে সব ভগবানের নাম কীর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই দূরে হোক; আর যারা আমাদের মঙ্গলের পথে বাধা সৃষ্টি করে তারাও নষ্ট হোক। যে ভগবান বেদরূপী, বৃহদ্রথান্তর নামে সামদ্বারা যাঁর স্তব করা হয়, যিনি বিষ্বক্সেন নামে অভিহিত, তিনি নিজের নামের গুণে আমাদের অশেষ দুঃখ থেকে রক্ষা করুন। শ্রীহরির নাম, রূপ, যাগ, বাহন, অস্ত্র ইত্যাদি এবং শ্রেষ্ঠ পার্ষদগণ আমাদের বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, মন এবং প্রাণকে নানা আপদ থেকে রক্ষা করুন। ১৯-৩০

মূর্ত ও অমূর্ত সমস্ত জগৎ ভগবানেরই স্বরূপ—এই সত্য আমাদের সমস্ত উপদ্রব ক্ষয় করুক। জগতে যাঁরা একমাত্র আত্মবস্তুর উপাসনা করেন, তিনি নিজে তাঁদের থেকে অভিন্ন হলেও মায়াবলে ভূষণ, আয়ুধ, লিঙ্গ (নৃসিংহ ইত্যাদি রূপ) প্রভৃতি বিবিধ শক্তি ধারণ করেন। তাঁর সত্যতার এই প্রমাণ দ্বারাই সর্বজ্ঞ, সর্বগামী ভগবান শ্রীহরি নিজের সকল স্বরূপে, সর্বদা, সকল স্থানে আমাদের রক্ষা করুন। যাঁর গর্জনে ত্রিলোকের ভয় দূর হয়, যাঁর প্রভাবে সমস্ত তেজ নষ্ট হয় সেই ভগবান নৃসিংহ সকল দিকে-বিদিকে, উপরে-নীচে, ভিতরে-বাইরে এবং সব জায়গায় আমাদের রক্ষা করুন। ইন্দ্র, তোমাকে এই নারায়ণময় কবচের কথা বললাম। তুমি এই কবচে আবৃত হও, তাহলে নিশ্চয়ই অসুর-দলপতিদের জয় করতে পারবে। ঐ কবচ ধারণ করে লোকে যার দিকে তাকায় বা যাকে পা দিয়ে স্পর্শ করে সে সঙ্গে সঙ্গেই ভয় থেকে মুক্ত হয়। ৩১-৩৬

এই বিদ্যা যিনি ধারণ করেন রাজা, দস্যু, গ্রহ, ব্যাধি ইত্যাদি কোন কিছু থেকেই তাঁর কখনও ভয় হয় না। দেবরাজ, পুরাকালে কৌশিক নামে এক ব্রাহ্মণ এই বিদ্যা ধারণ করে মরুভূমির মধ্যে যোগ-ধারণার সাহায্যে দেহত্যাগ করেছিলেন। যেখানে সেই ব্রাহ্মণের দেহত্যাগ হয়েছিল, গন্ধর্বদের রাজা চিত্ররথ একদিন তাঁর স্ত্রীদের সঙ্গে আকাশপথে সেই স্থানের উপর দিয়ে যাচ্ছিলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি বিমান শুদ্ধ উল্টে গিয়ে মাথা নীচের দিকে করে আকাশ থেকে পড়ে গেলেন। তারপর চিত্ররথ বালখিল্য মুনিদের উপদেশে ঐ ব্রাহ্মণের সব অস্থি সংগ্রহ করে সরস্বতীর জলে নিক্ষেপ করলেন এবং স্নান করে আশ্চর্য হয়ে নিজের আলয়ে ফিরে গেলেন।

শুকদেব বললেন, যিনি উপযুক্ত সময়ে এই নারায়ণকবচ শোনেন বা শ্রদ্ধার সঙ্গে ধারণ করেন, সকলে তাঁকে নমস্কার করে; তিনি সর্বপ্রকার ভয় থেকে মুক্ত হন। ইন্দ্র বিশ্বরূপের কাছে এই বিদ্যা পেয়ে যুদ্ধে অসুরদের পরাজিত করেন এবং ত্রিলোকের লক্ষ্মীকে ভোগ করেন। ৩৭-৪২

নবম অধ্যায়

বৃত্রাসুরের উৎপত্তি

শুকদেব বললেন, ভারত, শোনা যায় বিশ্বরূপের তিনটি মাথা ছিল। তিনি একটিতে সোমপান করতেন, একটিতে সুরাপান করতেন আর বাকীটি দিয়ে আহার করতেন। যজ্ঞ করবার সময় তিনি উচ্চকণ্ঠে বিনয়ের সঙ্গে—'এ ইন্দ্রকে দিলাম', 'এ অগ্নিকে দিলাম' ইত্যাদি বলে দেবতাদের হবির ভাগ দিতেন, কারণ দেবতারা হলেন তাঁর পিতৃপক্ষ। কিন্তু তিনিই আবার গোপনে মাতৃস্নেহের বশে অসুরদেরও যজ্ঞের ভাগ দিতেন, কারণ অসুররা তাঁর মাতৃপক্ষ। দেবতাদের প্রতি বিশ্বরূপের এই অবহেলা আর ধর্মের নামে কপটতা দেখে ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হলেন এবং পাছে অসুরদের শক্তি বেড়ে যায় এই ভয়ে তাঁর তিনটি মাথাই কেটে ফেললেন। বিশ্বরূপের কাটামুণ্ডগুলি তিনটি পাখীতে পরিণত হল—যে মুণ্ড সোমপান করত তা চাতক, যে সুরাপান করত সে চড়াই আর যে অন্নভোজন করত সে তিতির পাখী হল। এই ব্রহ্মহত্যার পাপ ইন্দ্র নিবারণ করতে পারতেন, কিন্তু তবুও তিনি অঞ্জলি পেতে তা গ্রহণ করলেন। এক বছর কেটে যাবার পর ইন্দ্র লোকনিন্দার থেকে মুক্ত হবার জন্য সেই পাপকে ভূমি, জল, বৃক্ষ আর স্ত্রীজাতি—এই চার জায়গায় ভাগ করে দিলেন। গর্ত নিজে থেকেই ভরে উঠবে—এই বর পেয়ে ভূমি পাপের চার ভাগের এক ভাগ নিলেন। এই পাপের ফলেই ভূমিতে ঊষরতা দেখা যায়। ডাল-পালা কি বাকল কাটলেও তা আবার জন্মাবে—এই বর পেয়ে বৃক্ষগণ আর এক চতুর্থাংশ পাপ নিল। গাছের যে রস বেরোয় তা ঐ পাপের ফল। প্রসবের সময় পর্যন্ত সম্ভোগ করলে গর্ভপাত হবে না—এই বর পেয়ে স্ত্রীগণ পাপের চার ভাগের আর এক ভাগ নিল। এই পাপের চিহ্ন হল তাদের মাসে মাসে ঋতুস্রাব। দুধ ইত্যাদি অন্য বস্তুর সঙ্গে মিশ্রিত হতে পারবে—এই বর নিয়ে জল আরো এক চতুর্থ অংশ পাপ নিল। ঐ পাপের চিহ্ন জলের ফেনা আর বুদ্বুদ। বিশ্বরূপ নিহত হলে তাঁর পিতা ত্বষ্টা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে ইন্দ্রকে মারবার জন্য 'হে ইন্দ্রশত্রু[1] বেড়ে উঠে তাড়াতাড়ি শত্রুকে নাশ কর' বলে আগুনে আহুতি দিলেন। তাঁর তিনটি অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে দক্ষিণেরটি থেকে প্রলয়কালের কৃতান্তের মত এক ভীষণ অসুর উঠে এল এবং একটা তীর ছুঁড়লে যতদূর যায় প্রতিদিন সে চারদিকে ততখানি করে বাড়তে লাগল। ১-১৩

---

১ 'ইন্দ্রশত্রু' কথাটির আগের স্বরে জোর দিয়ে উচ্চারণ করলে 'ইন্দ্র শত্রু (নাশক) হবে' এই মানে হয়। আর তা না হলে 'ইন্দ্রের শত্রু' (ইন্দ্রনাশক) এই অর্থ বোঝায়। ত্বষ্টা তাড়াতাড়িতে প্রথমে 'ইন্দ্রশত্রু' উচ্চারণ করায় বিপরীত ফল হল।

সে আগুনে-পোড়া পর্বতের মত কালো অথচ সন্ধ্যার মেঘমালার মত উজ্জ্বল, তার শিখা এবং দাড়ি তপ্ত তামার মত পিঙ্গল, দুই চোখ মধ্যাহ্নের সূর্যের মত অতি প্রখর। সেই অসুর যেন তিন ফলা-যুক্ত শূলে পৃথিবী আর আকাশকে বিদ্ধ করে মহা গর্জন করতে করতে নাচতে লাগল। তার পায়ের ভারে পৃথিবী কাঁপতে লাগল। তার পাহাড়ের গুহার মত গভীর ও বিস্তৃত মুখে ভীষণ দাঁতের সারি। সে হাঁ করে বারবার হাই তুলে যেন আকাশকে পান, নক্ষত্রদের লেহন আর ত্রিভুবনকে গ্রাস করে ফেলতে গেল। সমস্ত লোক তাকে দেখে ভয়ে দশ দিকে পালাতে লাগল। ত্বষ্টার সৃষ্ট তমোময় মূর্তি ত্রিলোককে আবৃত করে ফেলল বলে ঐ ভীষণ অসুরের নাম হল 'বৃত্র'। দেবতারা তাকে দেখামাত্র ছুটে গিয়ে নিজ নিজ দিব্য অস্ত্র দ্বারা তাকে প্রহার করলেন। কিন্তু বৃত্র সে সবই গ্রাস করে ফেলল। ১৪-১৯

তা দেখে দেবতারা বিস্মিত, বিষণ্ণ এবং হতবুদ্ধি হয়ে একমনে অন্তর্যামী আদিপুরুষের স্তব করতে লাগলেন। তাঁরা বললেন, পঞ্চভূতে রচিত ত্রিভুবন, ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ এবং আমরা সকলে সভয়ে যেই কালকে পূজা করি সেই কালও যাঁকে ভয় করে, সেই পরমেশ্বরই আমাদের রক্ষা করুন। যিনি রাগ, অহঙ্কার ইত্যাদি বর্জিত, পূর্ণকাম এবং নিরুপাধি সেই পরমেশ্বরকে ছেড়ে যে অন্য কারো শরণ নেয় সে অতি মূর্খ, সে কুকুরের লেজ ধরে সাগর পার হবার আকাঙ্ক্ষা করে। মহাপ্রলয়ের সময় মনু যাঁর বিশাল শৃঙ্গে এই পৃথিবীরূপ নৌকাকে বেঁধে বিপদ থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন, মৎস্যরূপী সেই নারায়ণ নিশ্চয়ই আমাদের দারুণ বৃত্রভয় থেকে রক্ষা করবেন। পুরাকালে প্রচণ্ড বাতাসে বিক্ষুব্ধ প্রলয়-সমুদ্রের বিশাল ঢেউয়ের গর্জনে নাভিপদ্ম থেকে পড়ে যেতে যেতে অসহায় ব্রহ্মা যাঁর কৃপায় ভয় থেকে মুক্ত হন, তিনিই আমাদের ত্রাণ করুন। সেই একমাত্র ঈশ্বর নিজের মায়ায় আমাদের সৃষ্টি করেছেন। তাঁর অনুগ্রহেই আমরা জগৎ সৃষ্টি করছি। আমাদের সৃষ্টির আগে থেকেই তিনি অন্তর্যামীরূপে কাজ করে চলেছেন, কিন্তু আমরা নিজেদের এক একজন ঈশ্বর মনে করাতে তাঁর প্রকৃত রূপ দেখতে পাই না। শত্রুরা আমাদের পীড়ন করছে দেখলে যিনি নিজের মায়াবলে দেবতা, ঋষি, মানুষ বা অন্য প্রাণীদের মধ্যে যুগে যুগে অবতীর্ণ হয়ে আমাদের রক্ষা করেন আমরা সেই শরণ্য দেবতারই আশ্রয় নিলাম। আত্মস্বরূপ সেই দেবতা বিশ্বরূপ হয়েও বিশ্ব থেকে আলাদা, তিনি বিশ্বের কারণ, তিনিই প্রকৃতি, তিনিই পুরুষ। আমরা তাঁর স্বজন, সেই মহান দেব আমাদের মঙ্গল করুন। ২০-২৭

শুকদেব বললেন, মহারাজ, দেবতারা এইরকমে স্তব করলে শঙ্খ, চক্র, গদাধারী শ্রীহরি প্রথমে তাঁদের হৃদয়ে আবির্ভূত হলেন। তারপরেই দেবগণ তাঁকে তাঁদের সামনে দেখতে পেয়ে আনন্দে বিহ্বল হয়ে মাটিতে পড়ে প্রণাম করলেন এবং তারপর উঠে বসে জোড়হাতে আবার স্তব শুরু করলেন। শ্রীহরির ষোলজন পার্ষদ তাঁকে সেবা করছিলেন। তাঁরাও দেখতে তাঁরই মত, শুধু তাঁদের শ্রীবৎস আর কৌস্তুভ নেই। শ্রীহরির চোখ দুটি শরতের ফোটা পদ্মের মত মনোহর। দেবতারা এই বলে তাঁর স্তব করলেন, প্রভু, তোমার ইচ্ছাতেই যজ্ঞের ফল উৎপন্ন হয়, তুমি কালরূপী। দৈত্যেরা যজ্ঞের ব্যাঘাত ঘটালে তুমি তাদের প্রতি তোমার চক্র নিক্ষেপ কর। ঐসব কীর্তির জন্যই তোমার অসংখ্য সুন্দর নাম। তোমাকে বারবার নমস্কার করি। সৃষ্টিতে আমরা এই সেদিন মাত্র এলাম, তাই তোমার নির্গুণ স্বরূপ জানা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তোমাকে আমরা শুধু নমস্কার করি।

হে ভগবান, নারায়ণ, বাসুদেব, আদিপুরুষ, মহানুভব, পরম মঙ্গল, পরমকারুণিক, অদ্বিতীয়, জগতের আধার একনাথ, সর্বেশ্বর, লক্ষ্মীনাথ, পরমহংস পরিব্রাজকরা অষ্টাঙ্গ যোগ সাধনা করে সমাধির পথে যে পারমহংস্য ধর্মের অনুষ্ঠান করেন তাতে হৃদয়ের তমোরূপ কপাট খুলে যায় এবং তখন আত্মস্বরূপ প্রকাশের যে আনন্দ আপনিই অভিব্যক্ত হয়, তুমি তারই অনুভব স্বরূপ। কিন্তু তোমার লীলা বোঝা আমাদের পক্ষে কঠিন। তোমার আশ্রয় নেই, আকার নেই, গুণ নেই, তবুও তুমি আমাদের সাহায্যের অপেক্ষা না করে এই বিশ্বের সৃষ্টি, পালন ও সংহার করছ, কিন্তু তোমার নিজের কোন বিকার ঘটছে না। ২৮-৩৪

দেবদত্ত ইত্যাদি যে কোন লোক বাড়ী তৈরী করে তাতে বাস করে নিজের ভাল মন্দ কাজের ফল ভোগ করে। তুমি কি ব্রহ্মরূপী হয়েও জীবরূপে সংসারে এসে কর্মের ফলভোগী হও? নাকি এতে তোমার চিৎশক্তির কোন বিকার ঘটে না বলে সদানন্দ এবং শান্তভাবে সাক্ষিরূপে অবস্থান কর? তোমার পক্ষে দুইই সম্ভব, কারণ তুমি ভগবান, তোমার ঐশ্বর্যের সীমা নেই, তোমার মাহাত্ম্য তর্কের অতীত। যেসব শাস্ত্র অসার তর্ক, যুক্তি, অনুসন্ধান, বিষয়ের মিথ্যা প্রমাণ ও তার সমর্থনে নানা কুতর্কে পূর্ণ সেইসব শাস্ত্রের আলোচনায় যাদের হৃদয় ব্যাকুল হয় এবং দুষ্ট আগ্রহের বশ হয় তুমি তাদের বিবাদের অতীত। সমস্ত মায়াময় সংসার তোমার মধ্যে বিলীন থাকে, তুমি অদ্বিতীয়। তোমাতে কর্তৃত্ব-ধর্ম না থাকলেও তুমি মায়াকে অবলম্বন করলে কর্তৃত্ব ইত্যাদি কোন বস্তুই তোমার পক্ষে অসম্ভব নয়। তবে তোমাতে যদি সত্য সত্যই কর্তৃত্ব থাকত তবে বিরোধ হত। কিন্তু তা নেই কারণ তোমার স্বরূপ একটিই, দ্বিতীয় কিছু নেই। ভুল করবার কারণ থাকলে দড়িকে সাপ মনে হতে পারে, না হলে দড়িকে দড়িই মনে হবে। তেমনি যাঁর বুদ্ধি যথার্থ তিনি তোমার আসল রূপেই দেখবেন, কিন্তু যার বুদ্ধি ভ্রান্ত সে তোমাকে নানা রূপে দেখে। যিনি নানা বস্তুতে নানা রূপে অনুভূত হন তিনিই একমাত্র, সৎ-স্বরূপ সকলের ঈশ্বর, সমস্ত জগতের কারণ এবং সবার অন্তরে থেকে সব কিছুকে প্রকাশ করছেন। মধুসূদন, যে পাদপদ্মের সেবা করলে আর সংসারে আসতে হয় না, তোমার পরম ভক্তেরা কি করে তোমার সেই পাদপদ্মের সেবা পরিত্যাগ করবেন? পুরুষার্থের ব্যাপারে এঁরা অতি নিপুণ, তাই তাঁদের প্রিয় এবং সুহৃদরূপ তোমাতে একনিষ্ঠ হয়ে তাঁরা সকলের আত্মস্বরূপ তোমাকেই মন সমর্পণ করে শান্তি-সুখ উপভোগ করছেন। তোমার মহিমা অমৃতরসের সমুদ্র। সেই রসের এক বিন্দুও আস্বাদ করলে মনে অনবরত যে সুখের উদয় হতে থাকে তা কানে শোনা বা চোখে দেখার সামান্য সুখকে ভুলিয়ে দেয়। তাই ঐ ভক্তদের মন সব সময় তোমাতেই আসক্ত এবং তোমার থেকেই তারা পরম আনন্দ লাভ করেন। ৩৫-৩৯

ভগবান, তুমি ত্রিভুবনের আত্মা এবং আশ্রয়। তোমার মহিমা ত্রিভুবনের মন হরণ করে। দৈত্য-দানব ইত্যাদি সবই তোমার বিভূতি। তুমি আগেও এদের অত্যাচারের সময় নিজের মায়াবলে কখনও দেবতারূপে, কখনও মানুষ ও পশুর মিশ্ররূপে, কখনও বা জলচররূপে এদের অপরাধ অনুসারে শাস্তি দিয়েছ। এখন এই বৃত্রাসুরকে যদি বধের যোগ্য মনে কর তবে তাকে সংহার কর। হে হরি, আমরা তোমার স্বজন। আমরা তোমার পায়ে প্রণত এবং সব সময় তোমার পাদপদ্মই আমাদের হৃদয়ে ধ্যানরূপ শৃঙ্খলে বদ্ধ রয়েছে। তুমিও নিজের মূর্তিতে আমাদের কাছে প্রকাশিত হয়ে আমাদের তোমার নিজের জন বলে স্বীকার করেছ। প্রভু, তুমি অনুরাগের সঙ্গে মৃদু হাসি হেসে আমাদের দিকে তাকাও

এবং করুণায় স্নিগ্ধ সুমধুর প্রিয়বাক্যরূপ অমৃতকলা দ্বারা আমাদের মনের জ্বালা জুড়িয়ে দাও। ভগবান, নিখিল ভুবনের সৃষ্টি স্থিতি ও লয়ের কারণ যে দৈবী মায়া তার সঙ্গে তোমার খেলা। তুমি সমস্ত জীবের অন্তরে ব্রহ্ম এবং অন্তর্যামিরূপে, আর বাইরে প্রকৃতিরূপে দেশ, কাল ও দেহের অবস্থা অনুসারে যার যেমন রচনা তাকে সেভাবেই অনুভব করছ। তুমি আকাশের মত নির্লিপ্ত তাই তুমি বুদ্ধি প্রভৃতির সাক্ষী। তুমি পরব্রহ্ম এবং পরমাত্মা। তুমি সবই জান। তাই আগুনের স্ফুলিঙ্গ যেমন আগুনকে প্রকাশ করতে পারে না তেমনি আমরাই বা তোমার কাছে কোন কাম্য বিষয় প্রকাশ করতে পারি? তাই, ভগবান, তোমার যে চরণপদ্মের ছায়া এই সংসার-যন্ত্রণার হাত থেকে শান্তি দেয় আমরা তার আশ্রয় কামনা করছি; তুমি তা পূর্ণ কর। হে ঈশ, হে কৃষ্ণ, বৃত্রাসুর আমাদের তেজ এবং অস্ত্রশস্ত্র গ্রাস করে এখন ত্রিভুবন গ্রাস করছে। তুমি তাকে শীঘ্র সংহার কর। তুমি হংস অর্থাৎ শুদ্ধ, কারণ জীবের হৃদয়-আকাশে তোমার বাস। তুমি অনাদি, তাই বুদ্ধি প্রভৃতির সাক্ষী এবং কৃষ্ণ অর্থাৎ সদানন্দ। তোমার যশ বিশুদ্ধ, সাধুরা সর্বদা তোমাকেই আশ্রয় করেন। সংসারে জীবগণ তোমার শরণ নিলে সংসারের অন্তে পরমগতিরূপ তোমাকেই লাভ করে। ৪০-৪৫

শুকদেব বললেন, মহারাজ, দেবতারা ভক্তিভরে এইরকম স্তব করলে ভগবান শ্রীহরি তুষ্ট হয়ে তাঁদের বললেন, সুরশ্রেষ্ঠগণ, তোমাদের স্তবে এবং জ্ঞানের পরিচয়ে আমি সন্তুষ্ট হয়েছি। আত্মার সঙ্গে যে সংসারের সম্বন্ধ নেই--এর ফলে জীবের সেকথা স্মরণ হয় এবং আমার প্রতি ভক্তির উদয় হয়। আমি সন্তুষ্ট হলে কারো পক্ষে কোন বস্তুই পাওয়া কষ্টকর নয়। কিন্তু যিনি একনিষ্ঠ হয়ে আমাতেই মন সমর্পণ করেন তিনি আমাকে ছাড়া আর কিছুই চান না। যে ব্যক্তি বিষয়কেই একমাত্র ইষ্ট বলে মনে করে সে অতি দীন। সে কিসে নিজের মঙ্গল হয় তা জানতেও পারে না বা লাভ করতেও পাবে না। আর চাইলে পরে যে তাকে বিষয়সমূহ দান করে সেও সমান অজ্ঞ। কর্মের পথে সংসার-বন্ধন জন্মায়; তাই মুক্তির পথ জানা থাকলে অজ্ঞলোককে কখনই কর্মের পথ দেখাবে না। রোগী চাইলেও সুচিকিৎসক কখনও তাকে কুপথ্য দেয় না। ৪৬-৫০

দেবরাজ, তোমাদের মঙ্গল হোক। তোমরা এখনি ঋষিশ্রেষ্ঠ দধীচির কাছে গিয়ে বিদ্যা, ব্রত আর তপস্যায় অতি দৃঢ় তাঁর দেহখানি চাও। অথর্ব ঋষির সন্তান দধীচি নিজে বিশুদ্ধ ব্রহ্মবিদ্যা জেনে দুই অশ্বিনীকুমারকে তা বলেন। অশ্বশির নামে অতি প্রসিদ্ধ সেই ব্রহ্মবিদ্যা তাঁদের জীবন্মুক্ত করেছে। অথর্ববেদজ্ঞ দধীচিই ত্বষ্টাকে অভেদ্য নারায়ণ-কবচ দান করেছিলেন। ত্বষ্টা তা বিশ্বরূপকে দেন এবং তুমি বিশ্বরূপের কাছ থেকে তা পেয়েছ। অশ্বিনীকুমারেরা তোমাদের জন্য চাইলে শিষ্যের প্রতি স্নেহশীল ঋষি নিশ্চয়ই নিজের দেহ দান করবেন। তারপর বিশ্বকর্মা দধীচির অস্থি দিয়ে বজ্ররূপ শ্রেষ্ঠ অস্ত্র নির্মাণ করলে তুমি আমার তেজে শক্তিমান হয়ে তা দিয়ে বৃত্রাসুরের মস্তক ছেদন করবে। সেই অসুর নিহত হলে তোমরা সকলে আবার নিজ নিজ তেজ, অস্ত্র ও সম্পদ ফিরে পাবে। আমার ভক্তদের হিংসা করা কারো সাধ্য নয়। তাই তোমাদের অবশ্যই মঙ্গল হবে। ৫১-৫৫

দশম অধ্যায়

ইন্দ্র-বৃত্রাসুর যুদ্ধ

শুকদেব বললেন, মহারাজ, ভগবান শ্রীহরি ইন্দ্রকে এই আদেশ করে দেবতাদের চোখের সামনে সেখানেই অন্তর্ধান করলেন। তারপর দেবতা আর ঋষিরা মহাত্মা দধীচির কাছে গিয়ে তাঁর দেহ প্রার্থনা করলে তিনি মনে মনে হৃষ্ট হলেও বাইরে যেন পরিহাসের সঙ্গে বললেন—দেহধারী জীবের মৃত্যুর সময়ে যে দুঃসহ দুঃখ হয়ে থাকে তা কি তোমরা জান না? পৃথিবীতে যারা বেঁচে থাকতে চায় দেহ তাদের অতি প্রিয় বস্তু। তাই স্বয়ং বিষ্ণুও যদি চান তাহলেই বা কে সেই দেহকে দান করতে পারে? দেবতারা বললেন, ব্রহ্মন্, পুণ্যকীর্তি লোকেরাও যাঁদের কাজের প্রশংসা করেন আপনাদের মত সর্বজীবে দয়াবান সেই মহানুভব ব্যক্তিরা কি না ত্যাগ করতে পারেন? স্বার্থপর লোক অন্যের কষ্ট বুঝতে পারে না। যদি পারত তবে সে অন্যের কাছে নির্বিচারে কিছু চাইতে পারত না; আর যার আছে, সেও পরের দুঃখ বুঝতে পারলে প্রার্থীকে 'না' বলতে পারত না। ১-৬

ঋষি বললেন, দেবগণ, আমি আগে যা বলেছি তা তোমাদের কাছে ধর্মতত্ত্ব শুনবার ইচ্ছায়। দেহ আমার অতি প্রিয় হলেও একদিন সে আমাকে ত্যাগ করবেই। তাই তোমরা যখন চাইছ, আমি তাকে এখনি ত্যাগ করছি। জীবে দয়া করে যে ব্যক্তি এই অনিত্য দেহ দিয়ে ধর্ম বা যশ অর্জন করবার চেষ্টা না করেন, অচেতন বস্তুও তাঁর জন্য দুঃখ করে। যিনি অপরের শোকে শোক অনুভব করেন এবং অপরের আনন্দে আনন্দিত হন তাঁর ধর্মকেই পুণ্যশ্লোক মহাজনেরা সনাতন আখ্যা দিয়েছেন। ধন, স্বজন এবং শরীরের কোনটিই মানুষের নিজের প্রয়োজনে লাগে না। এগুলো সবই অতি ভঙ্গুর এবং অপরের ভোগ্য। তাই এসব দিয়ে যদি সে পরের উপকার না করে তবে সত্যি তা অতি দুঃখের কথা। অথর্ব ঋষির সন্তান দধীচি এই বলে আত্মাকে পরব্রহ্ম ভগবানের সঙ্গে যুক্ত করে দেহত্যাগ করলেন। তত্ত্বদর্শী মুনি ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন এবং বুদ্ধির সংযম করে সবরকম বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। তাই পরমযোগ অবলম্বন করাতে নিজের দেহের পতন তিনি অনুভব করেন নি। ৭-১২

তারপর বিশ্বকর্মা দধীচির অস্থি দিয়ে বজ্র নির্মাণ করলে ইন্দ্র তা হাতে নিয়ে ভগবানের তেজে তেজস্বী হয়ে ঐরাবতের পিঠে বসলেন। অন্য দেবতারা তাঁকে ঘিরে দাঁড়ালেন এবং মুনিরা তাঁর স্তব করলেন। সমস্ত জগৎ যেন উৎফুল্ল হয়ে উঠল। ভগবান রুদ্র যেমন অন্ধক নামে অসুরকে মারবার জন্য সক্রোধে তার দিকে ছুটে গিয়েছিলেন ইন্দ্রও সেরকম অসুর সেনাপতি বেষ্টিত বৃত্রকে বেগে আক্রমণ করলেন। সত্যযুগ তখন প্রায় শেষ, ত্রেতাযুগ আরম্ভ হওয়ার অল্পই বাকী। সে সময়ে নর্মদার পারে দেবতা আর অসুরদের মধ্যে অতি ভয়ানক যুদ্ধ হল। সেই যুদ্ধে রুদ্র, বসু, আদিত্য, পিতৃগণ, অগ্নি, মরুৎ, ঋভু, সাধ্য ও বিশ্বদেবগণ এবং অশ্বিনীকুমারদের সঙ্গে বজ্রপাণি দেবরাজ ইন্দ্র নিজের দীপ্তিতে শোভা পাচ্ছিলেন। বৃত্র প্রভৃতির অসুরেরা সে দৃশ্য সহ্য করতে পারল না। ১৩-১৮

তাই নমুচি, শম্বর, অনর্বা, দ্বিমূর্ধা, ঋষভ, হয়গ্রীব, শঙ্কুশিরা, বিপ্রচিত্তি, অয়োমুখ, পুলোমা, বৃষপর্বা, প্রহেতি, হেতি, উৎকল, সুমালী, মালি ইত্যাদি অসুরেরা স্বর্ণময় পোশাক পরে সিংহনাদ করতে করতে যমের থেকেও দুর্ধর্ষ ইন্দ্র-

সেনাদের অবরোধ করে প্রচণ্ড বিক্রমে আঘাত হানতে লাগল এবং গদা, পরিঘ, বাণ, প্রাস, মুদ্গর, তোমর, শূল, পরশু, খড়্গ, শতঘ্নী ভুশুণ্ডি ইত্যাদি নানা অস্ত্র বর্ষণ করে তাদের একেবারে আচ্ছন্ন করে ফেলল। মেঘের আড়ালে যেমন চন্দ্র-সূর্য অদৃশ্য হয়, তেমনি অসুরদের নিক্ষিপ্ত তীরগুলি একটির পেছনে আর একটি লেগে লেগে এমন এক জালের সৃষ্টি হল যে তাতে দেবতারা ঢাকা পড়ে গেলেন। ১৯-২৪

তার উপর দেবতারা শত্রুর সব অস্ত্রকে ক্ষিপ্রহস্তে নিজেদের অস্ত্রের দ্বারা সহস্র টুকরো করে ফেলছিলেন বলে সেইসব অস্ত্র তাঁদের স্পর্শও করতে পারল না। এইভাবে নিজেদের অস্ত্রশস্ত্র নিঃশেষ হতে থাকলে অসুরেরা দেবতাদের লক্ষ্য করে পাহাড়ের চূড়া, গাছ-পাথর এসব ছুঁড়তে শুরু করলে দেবতারা সে-সবও খণ্ড খণ্ড করে ফেললেন। অস্ত্র, গাছ-পাথর ইত্যাদি ছোঁড়া সত্ত্বেও ইন্দ্রের সৈন্যেরা অক্ষত আছে দেখে অসুরেরা ভয় পেয়ে গেল। দুর্জন ব্যক্তি কোন মহাপুরুষকে কটু কথা বললে তা যেমন নিষ্ফল হয় অর্থাৎ তাতে যেমন মহাপুরুষের মনে কোন বিকার ঘটে না, তেমনি শ্রীকৃষ্ণের আশ্রিত দেবতাদের প্রতি অসুরদের আক্রমণ সম্পূর্ণই বিফল হল। অসুরেরা সকলেই মহাবলী হলেও শ্রীহরির প্রতি ভক্তি না থাকায় দেবতারা সহজেই তাদের অধৈর্য করে তাদের দর্প চূর্ণ করলেন। তারাও তাদের চেষ্টায় কোন ফল হল না দেখে বৃত্রকে ফেলেই রণক্ষেত্র থেকে পালাবার উদ্যোগ করল। মহাবীর ও মহামনা বৃত্র প্রথমে নিজের সৈন্যদের দারুণ ভয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে পালাতে দেখে এবং পরে তাঁর মহা মহা বীর সেনাপতিদেরও এদিক ওদিক ছোটাছুটি করতে দেখে উচ্চহাসি হেসে বলল, ওহে বিপ্রচিত্তি, নমুচি, পুলোমা, ময়, অনর্বা, শম্বর, তোমরা আমার কথা শোন। জন্মগ্রহণ করলে মরতেই হবে। আজ পর্যন্ত তার কোন প্রতিকার আবিষ্কার হয়নি। তাই মৃত্যু থেকে যদি যশ আর স্বর্গলাভ সম্ভব হয় তবে সেই সার্থক মৃত্যুকে কোন বুদ্ধিমান লোক সাদরে বরণ না করবে? দুরকম মৃত্যু সংসারে শাস্ত্রসম্মত এবং দুর্লভ। প্রথম হল যোগধারণ দ্বারা প্রাণ জয় করে মৃত্যু এবং দ্বিতীয় হল রণক্ষেত্রে সৈন্যদের সামনে থেকে সম্মুখ যুদ্ধে বীরের মত মৃত্যু। ২৫-৩৩

একাদশ অধ্যায়

বৃত্রাসুরের তত্ত্বোপদেশ

শুকদেব বললেন, মহারাজ, অসুরের প্রভু বৃত্র ঐরকম ধর্মসম্মত কথা বললেও ভীত ও পলায়মান জ্ঞানহীন অসুরেরা তা শুনল না। সুযোগ পেয়ে দেবতারাও তাদের চারদিকে বিতাড়িত করতে লাগলেন। অসুরদের এই শোচনীয় অবস্থা দেখে বৃত্রের অত্যন্ত দুঃখ হল। সে রাগে অধীর হয়ে জোর করে দেবতাদের বাধা দিয়ে তাঁদের তিরস্কার করে বলতে লাগল, দেবগণ, যে সব অসুর-সৈন্যরা পালাতে গিয়ে দেহের পেছন দিকে আঘাত পেয়েছে তারা নিজের মায়ের বিষ্ঠার মত হীন। তাদের মেরে কি লাভ? যারা বীরত্বের বড়াই করে, ভীত ব্যক্তিকে মেরে তাদের যশ বা স্বর্গ কোনটাই লাভ হবে না। হে নীচাশয়গণ, যুদ্ধে যদি তোমাদের শ্রদ্ধা থাকে,

মনে ধৈর্য থাকে এবং বিষয়সুখে আসক্তি না থাকে, তবে আমার সামনে একটু সময় দাঁড়াও। মহাবল বৃত্রাসুরের ক্রুদ্ধ মূর্তি দেখে দেবতারা ভয় পেয়ে গেলেন। তার সিংহনাদে ত্রিভুবন চেতনা হারালো, এমন কি দেবতারাও মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেলেন। ১-৭

তখন ভীত দেবসেনারা চোখ বুজে দাঁড়িয়ে থাকলে, মত্ত হাতী যেমন নলের বনকে পায়ে দলিত করে, তেমনি করে শূলপাণি বৃত্র যুদ্ধে মেতে শক্তিতে পৃথিবী কাঁপিয়ে দুই পায়ে তাঁদের পিষ্ট করতে লাগল। বজ্রধর ইন্দ্রও তার এই কাজ দেখে খুব ক্রুদ্ধ হলেন এবং বৃত্র দ্রুতবেগে তাঁকে লক্ষ্য করে ছুটে আসছে দেখে তার দিকে এক মহাগদা ছুঁড়ে মারলেন। বৃত্র কিন্তু সেই ভয়ানক গদাকে অনায়াসেই বাঁ হাতে ধরে ফেলল। তারপর সে মহাক্রোধে সিংহনাদ করে সেই গদা দিয়ে ইন্দ্রের বাহন ঐরাবতের মাথার ঢিবিতে আঘাত করলে সকলেই তার বীরত্বের প্রশংসা করল। বৃত্রের সেই গদার আঘাতে ঐরাবত বজ্রাহত পর্বতের মত অত্যন্ত কাতর হয়ে ইন্দ্রকে নিয়েই আঠার হাত পেছিয়ে গেল আর হাঁ করে রক্তবমি করতে লাগল। বাহন ঐরাবতের ঐরকম অবসন্ন অবস্থা দেখে ইন্দ্রের হৃদয়ও বিষণ্ন হল। তা দেখে উদারচিত্ত বৃত্র তাঁর দিকে আর গদা নিক্ষেপ করল না। দেবরাজ নিজের অমৃতময় হাত ঐরাবতের গায়ে বুলিয়ে তার ব্যথা দূর করলেন এবং নিজেও কিছু সময় বিশ্রাম নিলেন। ৮-১২

তারপর বৃত্র তার ভ্রাতৃহন্তা শত্রু ইন্দ্রকে বজ্রহাতে দেখে এবং তাঁর নিষ্ঠুর পাপ কাজের কথা স্মরণ করে শোকে আর মোহে হাসতে হাসতে বলল, মহাপাপী, তুমি ব্রহ্মহত্যা করেছ, গুরুহত্যা করেছ, আবার আমার ভাইকেও মেরেছ। সৌভাগ্যের বিষয় যে পরম শত্রু তোমাকে এবার আমি সামনে পেয়েছি। আরও সৌভাগ্য যে আজ আমি তোমার পাথরের মত কঠিন বুক শূল দিয়ে বিদীর্ণ করে অল্প সময়ের মধ্যেই ভ্রাতৃঋণ থেকে মুক্ত হব। স্বর্গলাভ করবার জন্য যে যজ্ঞ করে সে যেমন নিষ্ঠুরভাবে বলির পশুর মাথা কেটে ফেলে তুমিও সেরকম স্বর্গের প্রভুত্ব রক্ষার জন্য তোমার গুরু আমার নিষ্পাপ ভাই বিশ্বরূপের মনে বিশ্বাস জন্মিয়ে তারপর খড়্গ দিয়ে তার মাথাগুলো কেটে ফেলেছ। এখন লক্ষ্মী, লজ্জা, দয়া, কীর্তি সবাই তোমাকে ছেড়ে গিয়েছে। নিজের কর্মদোষে তুমি রাক্ষসদেরও নিন্দার পাত্র হয়েছ। তাই আমার শূলে তোমার দেহ ভিন্ন হলে আগুনে তার সৎকার হবে না, তা শকুনিতে ছিঁড়ে খাবে। আর অন্য যে সব দেবতারা যুদ্ধক্ষেত্রে তোমাকে অনুসরণ করছে তারা আমাকে মারতে এলে আমি তীক্ষ্ন ত্রিশূলে তাদের গলা কেটে তাদের রক্তে ভৈরব ভূতনাথ আর তাঁর অনুচরদের পূজা করব। আর, ওহে ইন্দ্র, তুমিই যদি এই যুদ্ধক্ষেত্রে তোমার বজ্র দিয়ে আমাকে হত্যা কর, তবে আমি এই দেহ ভূতগণকে বলিস্বরূপ দিয়ে কর্মের বন্ধনমুক্ত হয়ে জ্ঞানীদের গতি লাভ করব। ১৩-১৮

দেবরাজ, তোমার শত্রু আমি তোমার সামনে উপস্থিত, তবুও তুমি বজ্র দিয়ে আমাকে কেন মারছ না? কৃপণের কাছে যেমন কিছু চাওয়া নিষ্ফল তোমার গদাও তেমনি নিষ্ফল হয়েছে বটে, তবে তোমার বজ্র বৃথা যাবে না। শ্রীহরির তেজে আর দধীচির তপস্যায় তা শক্তিমান হয়েছে—এ দিয়েই তুমি শত্রু বিনাশ কর। স্বয়ং ভগবান শ্রীহরি তোমাকে পাঠিয়েছেন। তিনি যেখানে আছেন সেখানে বিজয়, শ্রী, সদ্গুণ এসব থাকবেই।[১] দেবরাজ, আমার প্রভু ভগবান সঙ্কর্ষণের উপদেশ

১ তুলনীয়: ভগবদ্গীতা, ১৮শ অধ্যায় ৭৮ শ্লোক।

অনুসারে আমি তাঁর পায়ে মন নিবিষ্ট করে এবং বিষয়ভোগের ইচ্ছা ত্যাগ করে তোমার বজ্রের আঘাতে দেহত্যাগ করব ; তাহলে আমার যোগীদের গতি লাভ হবে। পরম ভক্ত নিজের জনদের ভগবান কখনও ত্রিভুবনের সম্পদ দান করেন না ; কারণ ঐ সম্পদ থেকে শুধু বিদ্বেষ, উদ্বেগ, দুঃখ, মত্ততা, বিবাদ, বিপত্তি এবং কষ্ট জন্মে। ভগবান নিজের ভক্তদের ধর্ম, অর্থ, কাম ইত্যাদি পাবার চেষ্টা থেকে নিবৃত্ত করেন। তাই যিনি ওসব চান না তিনি ভগবানের প্রসাদ পেয়েছেন একথা বলা যায়। ঐ প্রসাদ শুধু অনাসক্ত ভক্তরাই পান, অন্যেরা নয়। ১৯-২৩

ভগবান শ্রীহরি, আমি আবার তোমার পায়ে আশ্রয় নিয়ে তোমার দাসানুদাস হব। তুমি প্রাণের ঈশ্বর, আমার মন যেন তোমার গুণ স্মরণ করে, আমার কণ্ঠ যেন তোমার গুণ কীর্তন করে, আমার শরীর যেন তোমার সেবাই করে। হে সর্ব-সৌভাগ্যের আধার, তোমাকে ছেড়ে ধ্রুবলোক, ব্রহ্মলোক, জগতের কর্তৃত্ব, রসাতলের আধিপত্য, যোগে সিদ্ধি, এমন কি মুক্তি পর্যন্ত চাই না। যে পক্ষিশাবকের পাখা হয় নি সে যেমন ক্ষুধা পেলে মায়ের কাছে ফিরবার জন্য, দড়িতে-বাঁধা বাছুর যেমন মায়ের দুধ খাবার জন্য, আর কামার্ত নারী যেমন তার দূর-বিদেশগত প্রিয়তমকে দেখবার জন্য আকুল হয়, হে পদ্মলোচন, আমার মনও তেমনি তোমাকে দেখবার জন্য ব্যগ্র হয়েছে। প্রভু, তোমার মায়ায় বিষয়ে লিপ্ত হয়ে আমি নিজের কর্ম অনুসারে সংসার-চক্রে ঘুরছি। এ অবস্থায় তোমার ভক্তদের সঙ্গেই যেন আমার সখ্য হয়। দেহ, পুত্র, স্ত্রী এবং গৃহে যেন আমার আর আসক্তি না থাকে। ২৪-২৭

দ্বাদশ অধ্যায়

ইন্দ্রের বৃত্রবধ

শুকদেব বললেন, মহারাজ, তারপর বৃত্র যুদ্ধ জয়ের থেকে মৃত্যুকেই শ্রেষ্ঠ মনে করে যুদ্ধক্ষেত্রে দেহত্যাগ করতে মনস্থ করল এবং প্রলয়-জলধিতে দৈত্য কৈটভ যেমন ভগবান বিষ্ণুর দিকে ছুটে গিয়েছিল, তেমনি সেও ত্রিশূল তুলে ইন্দ্রকে লক্ষ করে ছুটল। প্রলয়ের অগ্নির মত সেই সুতীক্ষ্ন ত্রিশূল বেগে ঘোরাতে ঘোরাতে সিংহনাদ করে ইন্দ্রের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে সে বলল, পাপিষ্ঠ, এই বার তুমি মরলে। কক্ষচ্যুত গ্রহ এবং উল্কার মত প্রচণ্ড গতিতে ছুটে-আসা সেই ভীষণদর্শন ত্রিশূলকে দেখেও ইন্দ্র অবিচলিতভাবে শতপর্ব বজ্র দিয়ে তাকে এবং বাসুকির দেহের মত বৃত্রাসুরের স্থূল এবং বিশাল দক্ষিণ বাহুকে কেটে ফেললেন। এক বাহু কাটা গেলে বৃত্র মহাক্রোধে বজ্রধারী ইন্দ্রের কাছে এসে পরিঘ দিয়ে ইন্দ্রের গালে এবং ঐরাবতকে এমন প্রচণ্ড আঘাত করল যে ইন্দ্রের হাত থেকে বজ্র মাটিতে পড়ে গেল। বৃত্রাসুরের ঐ অদ্ভুত কর্ম দেখে দেবতা, অসুর, চারণ আর সিদ্ধরা সমস্বরে তার প্রশংসা করলেন, আর ইন্দ্রের ঐ বিপদ দেখে উচ্চস্বরে হাহাকার করে উঠলেন। হাত থেকে বজ্র খসে পড়াতে দেবরাজ লজ্জা পেয়ে শত্রুর সামনে আর তা হাতে নিলেন না। তখন বৃত্রই তাঁকে বলল, ইন্দ্র, তুমি বজ্র হাতে নিয়ে শত্রুকে হত্যা কর ; এখন বিষণ্ন হবার সময় নয়। ১-৬

যিনি সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের ঈশ্বর, সর্বজ্ঞ নিত্য অনাদি পুরুষ, একমাত্র তাঁরই

সর্বত্র জয় হয়। দেহাভিমানী অন্য ব্যক্তিরা অস্ত্রহাতে যুদ্ধে গেলে কখনও বিজয়ী, কখনও বিজিত হয়। লোকপালদের সঙ্গে এই সমস্ত লোক জালে-বন্ধ পাখীর মত অবশ হয়ে যাঁর ইচ্ছায় কাজ করে যাচ্ছে, কালরূপী সেই ভগবানই জয়-পরাজয়ের কারণ। তিনিই জীবের মনের শক্তি, দেহের শক্তি, প্রাণ, অমৃত এবং মৃত্যুস্বরূপ। আশ্চর্য এই যে, জীব তাঁকে জয়-পরাজয়ের কারণরূপে না জেনে জড় দেহকে তার কারণ মনে করে। ইন্দ্র, কাঠের তৈরী নারীদেহ বা পাতার তৈরী পশুদেহকে যেমন মানুষ তার ইচ্ছামত চালায়, তেমনি জগতের সমস্ত প্রাণী ভগবানের ইচ্ছার অধীন। তাঁর অনুগ্রহ ছাড়া জীব, প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, ভূত, ইন্দ্রিয়, মন—এসবও বিশ্ব সৃষ্টি করতে পারে না। যারা একথা জানে না তারা জীবকে সৃষ্টির কারণ বলে মনে করে। ঈশ্বরই হচ্ছেন প্রকৃত স্রষ্টা। তিনি যেমন পিতা থেকে পুত্র এভাবে প্রাণী সৃষ্টি করেন তেমনি আবার এক প্রাণী দিয়ে (যেমন বাঘ ইত্যাদি) অন্য প্রাণীর বিনাশ করেন। ৭-১২

লোকে না চাইলেও যেমন আয়ু, সৌন্দর্য, কীর্তি, ঐশ্বর্য ইত্যাদি সবই কালে লুপ্ত হয়, তেমনি ঐসব বস্তু লোকে আপনিই পেয়ে থাকে। তাই সবই যখন ঈশ্বরের হাতে তখন যশ-অযশ, জয়-পরাজয়, সুখ-দুঃখ, জীবন-মরণ—সব অবস্থাতেই হর্ষ বা বিষাদশূন্য হওয়া উচিত।[১] সত্ত্ব, রজ, তম এই তিনটি প্রকৃতির গুণ, আত্মার নয়। যে লোক আত্মাকে ঐ তিনের সাক্ষীমাত্র বলে জানেন তিনি হর্ষ ইত্যাদিতে বন্ধ হন না। ইন্দ্র, তুমি আমার দিকেই তাকিয়ে দেখ—আমি যুদ্ধে তোমার কাছে পরাজিত। আমার অস্ত্র গেছে, একটি বাহুও গেছে। তবুও আমি তোমাকে হত্যা করবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করছি। এই যুদ্ধ ঠিক পাশাখেলার মতই, দুই যোদ্ধার জীবন হচ্ছে তার পণ, অস্ত্র তার পাশা আর হাতী ইত্যাদি বাহন হল ঘুঁটি। এই যুদ্ধরূপ খেলায় কে জিতবে আর কে হারবে তা আগে থাকতে কেউ জানে না। ১৩-১৭

শুকদেব বললেন, মহারাজ, দেবরাজ ইন্দ্র বৃত্রাসুরের ঐ অকপট কথা শুনে তার প্রশংসা করলেন এবং বিস্ময় ত্যাগ করে বজ্র হাতে নিয়ে হেসে বললেন, অসুররাজ, তোমার যখন এতদূর সুমতি হয়েছে তখন তুমি অবশ্যই সিদ্ধিলাভ করেছ। আর তুমি জগতের ঈশ্বর এবং বন্ধু পরমাত্মাকে সর্ব অন্তঃকরণ দিয়ে ভজনা করেছ। অসুরভাব ছেড়ে তুমি যে মহাপুরুষের স্বভাব পেয়েছ তাতে বোঝা যাচ্ছে তুমি বিষ্ণুর মোহিনী মায়াকেও অতিক্রম করেছ। খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার যে তুমি রজঃস্বভাব হলেও সত্ত্বময় ভগবান বাসুদেবে তোমার দৃঢ় মতি হয়েছে। মুক্তিদাতা ভগবান শ্রীহরির প্রতি যাঁর তোমার মত ভক্তি জন্মেছে তিনি তো অমৃতের সাগরে বিহার করছেন। স্বর্গসুখের মত ছোটখাট পুষ্করিণীতে তাঁর কি দরকার? ১৮-২২

শুকদেব বললেন, মহারাজ, দুই মহাবলী যোদ্ধা ইন্দ্র আর বৃত্র ধর্মের তত্ত্ব জানবার ইচ্ছায় এইরকম কথোপকথন করতে করতে যুদ্ধ শুরু করলেন। বৃত্রাসুর এক ভয়ঙ্কর লোহময় পরিঘ ঘোরাতে ঘোরাতে ইন্দ্রকে ছুঁড়ে মারল। ইন্দ্রও তাঁর বজ্র দিয়ে ঐ পরিঘ আর পরিঘের তুল্য বৃত্রের বাম বাহুখানি একই সঙ্গে কেটে ফেললেন। বৃত্রের ছিন্ন দুই বাহুর মূলদেশ থেকে রক্তের ধারা বয়ে যাচ্ছিল। ইন্দ্র ডানা কেটে ফেললে ভূপতিত পর্বতগুলোর যেমন আকৃতি হয়েছিল, বৃত্রকেও সেইরকম দেখাচ্ছিল। তারপর বিরাটাকৃতি বৃত্র তার নীচের চোয়াল মাটিতে আর

১ তুলনীয়: ভগবদ্গীতা, ২য় অধ্যায় ৩৮ শ্লোক।

উপরের চোয়াল স্বর্গে ঠেকিয়ে রেখে আকাশের মত গভীর মুখ, সাপের মত ভীষণ জিহ্বা এবং মৃত্যুর মত ভয়াল তীক্ষ্ণ দাঁত দিয়ে যেন ত্রিভুবন গ্রাস করতে চাইল। তারপর সে দুই পা দিয়ে পৃথিবী চূর্ণ করতে করতে চলন্ত পর্বতের মত কাছে এসে, বিরাট সাপ যেমন হাতী গ্রাস করে, তেমনি ঐরাবত শুদ্ধ ইন্দ্রকে গ্রাস করে ফেলল। এই দৃশ্য দেখে প্রজাপতি আর মহর্ষিদের সঙ্গে সঙ্গে দেবতারাও আর্তনাদ করে উঠলেন। বৃত্রের পেটের মধ্যে চলে গেলেও ইন্দ্রের মৃত্যু হল না; নারায়ণকবচ, যোগবল এবং মায়াবল তাঁকে রক্ষা করল। ২৩-৩১

তারপর মহাপরাক্রান্ত ইন্দ্র বজ্র দিয়ে বৃত্রের পেট চিরে বেরিয়ে এসে সবলে শত্রুর গিরিচূড়ার মত মাথাটি কেটে ফেললেন। ইন্দ্রের বজ্র অতি দ্রুতগামী হলেও বৃত্রের গলা কাটতে তার তিনশ ষাট দিন লেগেছিল। তখন আকাশে দুন্দুভি বেজে উঠল, মহর্ষিদের সঙ্গে গন্ধর্ব আর সিদ্ধগণ বৃত্রহন্তা ইন্দ্রের স্তুতি করতে করতে পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেন। মহারাজ, তখন বৃত্রাসুরের দেহ থেকে তার জ্যোতির্ময় আত্মা বেরিয়ে দেবতাদের চোখের সামনেই লোকাতীত ভগবানে লীন হল। ৩২-৩৫

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ব্রহ্মহত্যার ভয়ে ইন্দ্রের অশ্বমেধযজ্ঞ সাধন

শুকদেব বললেন, হে দানশীল পরীক্ষিৎ, বৃত্র নিহত হলে ইন্দ্র ছাড়া আর সব লোকপালদের সঙ্গে সঙ্গে ত্রিভুবনের সবারই প্রাণে শান্তি এল। দেব, ঋষি, পিতৃগণ, ভূত ও দৈত্যগণ, দেবানুচরগণ এবং ব্রহ্মা, মহাদেব প্রভৃতিরা সবাই যাঁর যাঁর স্থানে ফিরে গেলেন, কিন্তু ইন্দ্রকে কেউ কোন কথা জিজ্ঞাসা করলেন না। শ্রান্তি দূর হলে ইন্দ্রও চলে গেলেন। পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করলেন, মুনিবর, ইন্দ্রের দুঃখের কারণ কি তা শুনতে ইচ্ছা হচ্ছে। বৃত্র নিহত হলে সব দেবতাই সুখী হলেন, কিন্তু ইন্দ্র অসুখী হলেন কেন? শুকদেব বললেন, মহারাজ, বৃত্রাসুরের বিক্রমে অতিষ্ঠ হয়ে ঋষি এবং দেবতারা ইন্দ্রের কাছে তাকে মারবার প্রার্থনা জানান, কিন্তু ব্রহ্মহত্যার ভয়ে ইন্দ্রের ওকাজ করবার ইচ্ছা ছিল না। তিনি বললেন, আমি আগে বিশ্বরূপকে হত্যা করে যে পাপ করেছিলাম তা স্ত্রীলোক, ভূমি, বৃক্ষ এবং জল অনুগ্রহ করে ভাগ করে নিয়েছিল, কিন্তু বৃত্রকে মারলে যে পাপ হবে তা থেকে কি করে শুদ্ধ হব? ইন্দ্রের এই কথা শুনে ঋষিরা বললেন, দেবরাজ, তুমি ভয় পেয়ো না। তোমাকে দিয়ে আমরা অশ্বমেধ যজ্ঞ করাব। তোমার কল্যাণ হোক। ঐ যজ্ঞের দ্বারা পরমপুরুষ নারায়ণের আরাধনা করে তুমি, এমন কি জগতের সমস্ত প্রাণী হত্যার পাপ থেকেও মুক্ত হতে পারবে, বৃত্রহত্যা তো সামান্য। ব্রাহ্মণ, পিতা, গো, মাতা বা গুরু হত্যা করেছে এমন পাপী, কুকুরের মাংসভোজী দুরাচার এবং চণ্ডাল ইত্যাদি নীচজাতিও যাঁর নামকীর্তন করে শুদ্ধ হয়, তুমি অশ্বমেধ যজ্ঞের দ্বারা শ্রদ্ধায় সেই ভগবান নারায়ণের আরাধনা করলে সমস্ত জগৎকে হত্যা করেও পাপে লিপ্ত হবে না, ব্রহ্মহত্যা করলে যে হবে না সে কথা তো বলাই বাহুল্য। ১-৯

শুকদেব বললেন, মহারাজ, ব্রাহ্মণেরা এইরকম বলাতেই ইন্দ্র নিজের শত্রু বৃত্রাসুরকে বধ করেছিলেন। বৃত্রকে বধ করলে, ব্রহ্মহত্যার পাপ তাঁকে আশ্রয় করল। যদিও দেবতা প্রভৃতি সকলে মিলে ইন্দ্রকে দিয়ে বৃত্রবধ করান কিন্তু ব্রহ্মহত্যার পাপের কষ্ট ইন্দ্র একাই ভোগ করতে লাগলেন, কিছুতেই তিনি মনে শান্তি পেলেন না। যে লজ্জাশীল সে কোন নিন্দার কাজ করলে ধৈর্য থাকা সত্ত্বেও তার সুখ হয় না। যাহোক, ইন্দ্র দেখলেন যে ব্রহ্মহত্যার পাপ ভীষণ চণ্ডালিনীর রূপ ধরে তাঁকে তাড়া করে আসছে। তার আকৃতি ক্ষয়রোগীর মত, পরনের বস্ত্ররক্তাক্ত আর জরায় সমস্ত দেহ কম্পমান। মাথার পাকাচুল এলিয়ে সে শুধু বলছে, তিষ্ঠ, তিষ্ঠ। তার মাছের গন্ধের মত নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধে সমস্ত পথ পূর্ণ হচ্ছিল। ১০-১৩

মহারাজ, ইন্দ্র তখন ভয় পেয়ে প্রথমে আকাশে, তারপর সমস্ত দিকে পালাবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু কোনরকমেই পরিত্রাণ না পেয়ে শেষে পূর্ব-উত্তর দিকে গিয়ে মানস সরোবরের মধ্যে ঢুকে পড়লেন। সেখানে সবার চোখের আড়ালে পদ্মের নালের মধ্যে থেকে হাজার হাজার বছর ধরে ইন্দ্র ব্রহ্মহত্যার পাপ থেকে মুক্তির উপায় চিন্তা করেছিলেন। একমাত্র অগ্নিই হচ্ছেন তাঁর দূত অর্থাৎ তিনিই ইন্দ্রের জন্য যজ্ঞের ভাগ বহন করে আনেন। কিন্তু জলে অগ্নির ঢোকার উপায় নেই বলে ইন্দ্র আর যজ্ঞভাগ পাচ্ছিলেন না। যতদিন দেবরাজ ঐ ভাবে ছিলেন ততদিন রাজা নহুষ বিদ্যা, তপস্যা আর যোগবলের প্রভাবে স্বর্গরাজ্য শাসন করছিলেন। কিন্তু স্বর্গের অতুল ঐশ্বর্যের মোহে রাজার বিবেক-বুদ্ধি লোপ পায় এবং ইন্দ্রের পত্নী শচীদেবীর উপর তাঁর লোভ হয়। তার ফলে নহুষকে সাপ হয়ে জন্মাতে হয়।[১] লক্ষ্মীদেবী এবং রুদ্রদেবের প্রভাবে ব্রহ্মহত্যার পাপের তেজ নষ্ট হওয়াতে তা ইন্দ্রকে আর অভিভূত করতে পারে নি। তাঁর ব্রহ্মহত্যার প্রবৃত্তিব পাপ শ্রীহরিব ধ্যানের দ্বারা নষ্ট হয়। তখন ব্রাহ্মণদের আহ্বানে ইন্দ্র আবার স্বর্গলোকে ফিরে গেলেন। ব্রহ্মর্ষিরাও তাঁর কাছে এসে নারায়ণের আরাধনার উদ্দেশ্যে শাস্ত্রের বিধান অনুসারে তাঁকে অশ্বমেধ যজ্ঞে দীক্ষিত করলেন। ১৪-১৮

সেই যজ্ঞে দেবরাজ ইন্দ্র সর্বদেবতাময় পরমাত্মা পরমপুরুষ শ্রীহরির আরাধনা করলেন। সূর্য যেমন কুয়াশা নাশ করে, ইন্দ্রের বৃত্রহত্যার পাপও তেমন সম্পূর্ণ দূর হল। এইভাবে মরীচি ইত্যাদি মহর্ষিদের অনুষ্ঠিত অশ্বমেধ যজ্ঞের দ্বারা পুরাণপুরুষ শ্রীহরির আরাধনা করে পাপমুক্ত হওয়াতে ইন্দ্র আগের মহত্ত্ব ফিরে পেয়েছিলেন। মহারাজ, এই উপাখ্যান অতি মহৎ, কারণ এতে বিশেষভাবে শ্রীহরি এবং তাঁর ভক্তদের কথা আর দেবরাজ ইন্দ্রের পাপমোচন আর জয়ের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। এতে অশেষ পাপ দূর হয়ে মনে ভক্তির উদয় হয়। পণ্ডিতেরা সবসময় এই উপাখ্যান পাঠ করেন অথবা প্রত্যেক পর্বের দিনে এ-কাহিনী শুনে থাকেন। এতে সব পাপ নষ্ট হয় আর ইন্দ্রিয়ের বল, ধন, কীর্তি, শত্রুজয়, আয়ু এবং মঙ্গল লাভ হয়। ১৯-২৩

১ নহুষ শচীকে কামনা করলে শচী তাঁকে ব্রাহ্মণদের দ্বারা বাহিত শিবিকায় আসতে বলেন। অগস্ত্য ইত্যাদি মুনিদের বাহক করে নহুষ শচীর কাছে যাবার সময় 'সর্প, সর্প' অর্থাৎ 'শীঘ্র চল, শীঘ্র চল' বলে অগস্ত্যকে লাথি মারলেন। অগস্ত্য ক্রুদ্ধ হয়ে নহুষকে সর্প হবার শাপ দিলে নহুষ অজগর সাপ হন।

চতুর্দশ অধ্যায়

চিত্রকেতুর শোক

পরীক্ষিৎ বললেন, মুনি, রজ এবং তম-প্রধান পাপী বৃত্রাসুরের ভগবান নারায়ণে এত দৃঢ় ভক্তি জন্মাল কি করে? শুদ্ধাত্মা দেবতা বা ঋষিদেরও তো অনেক সময়েই শ্রীহরির পায়ে মতি হয় না। জগতে ধূলিকণার মত অসংখ্য প্রাণীর মধ্যে মানুষ প্রভৃতি মাত্র কয়েকরকম প্রাণীই নিজের মঙ্গলের চেষ্টা করে। তাদের মধ্যেও আবার সামান্য কয়েকজনই মুক্তি চান। যাঁরা মুক্তিকামী তাঁদের মধ্যেও অল্প সংখ্যক ব্যক্তিই মুক্তি লাভ করে সিদ্ধ হন। আবার কোটি কোটি সিদ্ধপুরুষের মধ্যেও নারায়ণের ভক্ত শান্তচিত্ত ব্যক্তি পাওয়া কষ্ট।[1] প্রভু, এই অবস্থায় কি করে পাপী বৃত্রাসুরের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অমন দৃঢ় ভক্তি উদয় হয়েছিল? এ-ব্যাপারে আমার মনে বিরাট সংশয় দেখা দিয়েছে এবং এর কারণ জানতে খুব কৌতূহল হচ্ছে। বৃত্রাসুর যে ইন্দ্রের ভয়ে ভগবানের শরণ নিয়েছিল তা বলা চলে না, কারণ রণক্ষেত্রে নিজের পরাক্রমে সে ইন্দ্রকে সন্তুষ্ট করেছিলে। ১-৭

সূত বললেন, মুনিগণ, মহারাজ পরীক্ষিতের ঐ সশ্রদ্ধ প্রশ্ন শুনে আনন্দিত হয়ে শুকদেব উত্তর করলেন, মহারাজ, এ-সম্বন্ধে আমি আগে মহর্ষি ব্যাস, নারদ এবং দেবলের কাছে যা শুনেছি, তোমাকে তা বলছি। তুমি মন দিয়ে শোন। পুরাকালে শূরসেন অর্থাৎ মথুরায় চিত্রকেতু নামে এক বিখ্যাত সম্রাট ছিলেন। পৃথিবী তাঁর ইচ্ছা অনুসারে শস্য এবং অন্যান্য সম্পদ দান করত। ঐ রাজার এক কোটি পত্নী ছিল। কিন্তু রাজা সন্তান উৎপাদনে সমর্থ হলেও ঐ সব স্ত্রীর গর্ভে কোন সন্তান হল না। রূপ, যৌবন, বিদ্যা, কৌলীন্য, ঐশ্বর্য, উদারতা — এর সবই তাঁর বহুল পরিমাণে ছিল। কিন্তু সন্তান না থাকায় দুঃখে অজস্র সম্পদ, অসংখ্য সুন্দরী স্ত্রী, সমস্ত পৃথিবীর আধিপত্য এসব কিছুই তাঁর ভাল লাগত না। ৮-১৩

এই অবস্থায় একদিন অঙ্গিরা ঋষি নানা লোকে ঘুরতে ঘুরতে চিত্রকেতুর কাছে এসে উপস্থিত হলেন। চিত্রকেতু উপযুক্ত পাদ্য-অর্ঘ্য ইত্যাদি দিয়ে সমাদর করে ঋষিকে বসালেন এবং নিজেও সংযত হয়ে তাঁর কাছে বসলেন। মহর্ষি অঙ্গিরা চিত্রকেতুকে আশীর্বাদ করে সস্নেহে জিজ্ঞাসা করলেন, মহারাজ, আপনার শরীর ভাল তো? আপনার নিজের এবং প্রজাদের মঙ্গল তো? সাংখ্য শাস্ত্রে আছে যে জীব যেমন মহত্তত্ত্ব ইত্যাদি সাতটি প্রকৃতির দ্বারা দেহের মধ্যে সুরক্ষিত থাকে, রাজাও তেমনি নীতিশাস্ত্র অনুযায়ী সাত বস্তু[2] দ্বারা রক্ষিত হন। রাজা প্রজাদের মতের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারলেই তাঁর রাজ্যসুখ লাভ হয়। প্রজারাও রাজার উপর সব ভার দিয়ে এবং তাঁর আশ্রয়ে থেকে সমৃদ্ধি লাভ করে। মহারাজ, আপনার স্ত্রী, প্রজা, অমাত্য বণিক, মন্ত্রী, নাগরিক, সামন্তরাজা এবং পুত্রগণ, এরা সব আপনার বশে আছে তো? নিজের মন যার বশে আছে স্ত্রী প্রভৃতিও তার বশে থাকে এবং লোকপালদের সঙ্গে সমস্ত লোক তাঁকে পূজা করে। কিন্তু আমার যেন বোধ হচ্ছে আপনার মনে শান্তি নেই। আপনার মুখ চিন্তায় মলিন দেখছি। এর কারণ কি আপনার মনে, না কি বাইরে

১ তুলনীয়: কঠ উপনিষৎ, ১।২।৭ শ্লোক

২ গুরু, অমাত্য, রাষ্ট্র, দুর্গ, কোষ, দণ্ড আর মন্ত্রণায় সাহায্য করেন এমন মিত্র।

কোথাও ? আমার ধারণা আপনি কিছু কামনা করছেন, কিন্তু তা পাচ্ছেন না। সর্বজ্ঞ মুনি এরকম নানা প্রশ্ন করলে রাজা বললেন, ভগবান, তপস্যা, জ্ঞান, আর যোগের দ্বারা যাঁদের চিত্তশুদ্ধি হয়েছে তাঁদের কাছে মানুষের অন্তরের কি বাইরের কোন কথা অজানা থাকে ? আপনি আমার সবকিছু জানলেও, যেহেতু প্রশ্ন করছেন, তাই আমার চিন্তার কারণ আপনাকে জানাচ্ছি। ১৪-২৪

মহামুনি, ক্ষুধায় তৃষ্ণায় কাতর হয়ে যে ব্যক্তি খাদ্য পানীয় চায়, মালা, চন্দন ইত্যাদি পেলে তার যেমন আনন্দ হতে পারে না, তেমনি সন্তান না পাওয়াতে এই বিশাল সাম্রাজ্য, ঐশ্বর্য ইত্যাদি আমাকে কোন আনন্দ দিতে পারছে না। সন্তান না থাকায় আমি পূর্বপুরুষদের সঙ্গে নরকে যাবার ভয়ে ভীত হচ্ছি। আপনি আমাকে রক্ষা করুন এবং সন্তানের দ্বারা যাতে নরক থেকে রক্ষা পাই তার ব্যবস্থা করুন। শুকদেব বললেন, রাজা চিত্রকেতু এই প্রার্থনা জানালে ভগবান অঙ্গিরা চরু পাক করে ত্বষ্টার উদ্দেশে হোম করলেন। চিত্রকেতুর রানীদের মধ্যে সবচেয়ে যিনি বড় এবং শ্রেষ্ঠ তাঁর নাম কৃতদ্যুতি। অঙ্গিরা তাঁকে যজ্ঞের অবশিষ্ট চরু খেতে দিলেন। তারপর তিনি চিত্রকেতুকে বললেন, তোমার একটি মাত্র পুত্র হবে। সে তোমাকে সুখ এবং দুঃখ দুইই দেবে। এই বলে অঙ্গিরা চলে গেলেন। কৃত্তিকা যেমন অগ্নির ঔরসে নিজের গর্ভে সন্তান ধারণ করেছিলেন, কৃতদ্যুতিও সে রকম যজ্ঞশেষ চরু খেয়ে চিত্রকেতুর ঔরসে গর্ভ ধারণ করলেন। কৃতদ্যুতির গর্ভ শুক্লপক্ষের চন্দ্রের মত দিনে দিনে বাড়তে লাগল। যথাসময়ে তাঁর একটি পুত্রসন্তান জন্মালে সমস্ত শূরসেনবাসী পরম আনন্দ লাভ করল। ২৫-৩২

পুত্র হবার সংবাদ শুনে রাজা চিত্রকেতু আনন্দিত মনে স্নান করে শুদ্ধ হয়ে অলংকার পরে এবং ব্রাহ্মণদের দিয়ে আশীর্বাদ পাঠ করিয়ে পুত্রের জাতকর্ম করালেন। তারপর তিনি ব্রাহ্মণদের সোনা, রূপা, বস্ত্র, অলংকার, বহু গ্রাম, হাতী, ঘোড়া আর ষাট কোটি দুগ্ধবতী গাভী দান করলেন। মেঘ যেমন অকৃপণভাবে জল বর্ষণ করে রাজাও তেমনি পুত্রের ধন, যশ, আয়ু বৃদ্ধির জন্য সকলকে অকাতরে আরও নানা বস্তু দান করলেন। অনেক কষ্টে উপার্জন-করা ধনের প্রতি দরিদ্রের মায়া যেমন ক্রমেই বাড়তে থাকে, বহু কষ্টে পাওয়া সন্তানের প্রতি চিত্রকেতুর স্নেহ তেমনি প্রতিদিনই বাড়তে লাগল। তাঁর মা কৃতদ্যুতি তো সন্তানের স্নেহে একেবারে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তা দেখে তাঁর সতীনদের মনে পুত্রের অভাবে দুঃখের সীমা রইল না। পুত্রকে আদর করে চিত্রকেতু কৃতদ্যুতির প্রতি যতটা ভালবাসা দেখাতেন অন্য স্ত্রীদের প্রতি তা করতেন না। ৩৩-৩৮

অন্য রানীরা পুত্র না হওয়ার দুঃখে আর রাজার আদর না পাওয়াতে ঈর্ষিত হয়ে বলতে লাগলেন, যে নারীর সন্তান নেই সে পাপী, তাকে ধিক্। স্বামী তাকে স্ত্রী বলেই মনে করে না, আর যাদের ছেলে আছে সেই সতীনরা তার সঙ্গে দাসীর মত ব্যবহার করে। যে সব দাসীরা প্রভুর সেবা করে তারা প্রভুর আদর পায়। কিন্তু আমরা দাসীরও দাসীর মত হতভাগ্য। সতীনের পুত্রসুখ আর নিজেদের অবহেলা দেখে অন্য রানীরা দগ্ধাতে লাগলেন। ক্রমে তাঁদের মনে একটা প্রচণ্ড বিদ্বেষের সৃষ্টি হল। বিদ্বেষের ফলে বুদ্ধি নষ্ট হওয়ায় তাঁরা নিষ্ঠুর হলেন এবং কুমারকে বিষ খাওয়ালেন। কৃতদ্যুতি সতীনদের এই ভয়ানক অপরাধের কথা জানতে পারলেন না। ছেলে ঘুমাচ্ছে মনে করে তিনি যথারীতি কাজকর্ম করতে লাগলেন। অনেকক্ষণ পরেও ছেলেকে নিদ্রিত দেখে তিনি ধাত্রীকে বললেন তাকে তাঁর কাছে নিয়ে আসতে। ধাত্রী ছেলের কাছে গিয়ে দেখল যে তার চোখ

কপালে উঠে গেছে এবং দেহ প্রাণহীন। এ দেখেই সে 'সর্বনাশ হয়েছে' বলে চীৎকার করে মাটিতে পড়ে গেল এবং বুক চাপড়াতে লাগল। তাঁর করুণ আর্তনাদ শুনে কৃতদ্যুতি ছুটে ছেলের কাছে গিয়ে দেখলেন সে আর বেঁচে নেই। সঙ্গে সঙ্গেই রানী শোকে মূর্ছিত হলেন। তাঁর মাথার চুল এবং পরনের কাপড় স্খলিত হয়ে পড়ল। ৩৯-৪৮

সেই চিৎকার, কান্না ইত্যাদি শুনে অন্তঃপুরের অন্য সকলেও সেখানে এসে কাঁদতে লাগলেন। আর অপরাধী রানীরাও দুঃখের ভান করে কান্না শুরু করলেন। অজ্ঞাত কারণে হঠাৎ পুত্রের মৃত্যু হয়েছে এই সংবাদ শুনে রাজা দশদিক অন্ধকার দেখলেন। ছুটে তার কাছে আসতে গিয়ে পা পিছলে পড়ে আর গভীর পুত্রশোকে রাজা বার বার মূর্ছিত হতে লাগলেন। অমাত্য, বন্ধু, ব্রাহ্মণগণ তাঁকে ঘিরে রাখলেন। এভাবে রাজা মৃত পুত্রের কাছে এসে তার পায়ে আছড়ে পড়লেন। তাঁরও বেশবাস বিস্রস্ত হল, দীর্ঘশ্বাস পড়তে লাগল এবং কণ্ঠ বাষ্পে রুদ্ধ হল। স্বামীকে এইরকম শোকে আকুল আর একমাত্র শিশুপুত্রকে মৃত দেখে রানী নানাভাবে বিলাপ করতে লাগলেন। তাঁর বিলাপে সবাই শোকাকুল। ৪৯-৫২

কৃতদ্যুতির চোখের জলে কাজল মিশে তাঁর কুঙ্কুমলিপ্ত স্তনযুগল ভিজতে লাগল। খোঁপায় জড়ান মালা খুলে পড়ায় চুল এ ায়িত করে তিনি কুররীর মত উচ্চকণ্ঠে এইরকম বিচিত্র বিলাপ করতে লাগলেন, বিধাতা, তুমি মূর্খ বলেই নিজের সৃষ্টির বিপরীত কাজ করছ। যার সৃষ্টির ক্ষমতা নেই সেই বৃদ্ধ পিতা বেঁচে থাকছে, অথচ ভবিষ্যতে যে সৃষ্টি করতে পারতো সেই বালক মরে গেল। এরকম ঘটলে তো তোমার সৃষ্টি লোপই পেয়ে যাবে। আর এইরকম কাজই যদি তোমার পক্ষে স্বাভাবিক হয় তবে তুমি জীবের পরম শত্রু, তার জন্যে তোমার কিছুমাত্র দয়া নেই। তোমার জগতে জন্ম আর মৃত্যুর যদি কোন নির্দিষ্ট সময় না থাকে তবে জীবের কর্ম অনুসারেই তো জন্ম মৃত্যু ঘটতে পারে, তোমার আর কি প্রয়োজন? সৃষ্টিকে বাড়াবার জন্য তুমি যে স্নেহের বন্ধন রচনা করেছিলে তুমিই তাকে কেটে ফেললে। বৎস, আমি অতি দুঃখী, অনাথা। আমাকে ছেড়ে যাওয়া কি তোমার উচিত হচ্ছে? তোমার পিতার দিকে একবার তাকিয়ে দেখ, তোমার শোকে তিনি কি দারুণ কষ্ট পাচ্ছেন। আমাদের আশা ছিল যে তোমাকে দিয়েই আমরা দুস্তর পুন্নাম নরক থেকে পরিত্রাণ পাব। আমাদের ফেলে তুমি নিষ্ঠুর যমের সঙ্গে চলে যেও না। ৫৩-৫৬

বৎস, তুমি ওঠ, তোমার সাথীরা খেলবার জন্য তোমাকে ডাকতে এসেছে। অনেকক্ষণ ঘুমিয়ে নিশ্চয় তোমার খুব খিদে পেয়েছে। এবার উঠে কিছু খাও, স্তন্য পান কর, আমাদের দুঃখ ঘুচাও। পুত্র, আমি অতি অভাগী। এখানে এসে আমি না দেখলাম তোমার চাঁদমুখের মনভুলান হাসি, না দেখলাম ঐ দুটি সুন্দর চোখ। তোমার আধো-আধো মিষ্টি কথাও একবার শুনতে পেলাম না। হায়, তা হলে সত্যি কি যম তোমাকে নিয়ে গেল? তার কাছ থেকে আর কি তুমি ফিরে আসবে না? শুকদেব বললেন, মহারাজ, রানী কৃতদ্যুতি এরকমভাবে কাঁদতে থাকলে চিত্রকেতুও শোকে আকুল হয়ে চীৎকার করে কাঁদতে লাগলেন। স্বামী-স্ত্রীকে কাঁদতে দেখে তাঁদের অনুরক্ত স্ত্রী-পুরুষ সকলেই কাঁদতে শুরু করল এবং কাঁদতে কাঁদতে অজ্ঞান হয়ে গেল। চিত্রকেতুর এই বিপদের সময় তাঁকে সান্ত্বনা দেবার কেউ নেই জানতে পেরে মহর্ষি অঙ্গিরা নারদকে নিয়ে সেখানে এলেন। ৫৭-৬১

পঞ্চদশ অধ্যায়

চিত্রকেতুকে নারদ ও অঙ্গিরার উপদেশ

শুকদেব বললেন, মহারাজ, মহর্ষি অঙ্গিরা আর দেবর্ষি নারদ চিত্রকেতুকে মৃত-পুত্রের পাশে শোকে মৃতপ্রায় অবস্থায় দেখে তাঁকে প্রবোধ দিয়ে বললেন, রাজেন্দ্র, যার জন্য আপনি শোক করছেন এই জন্মে সে আপনার কে? আগের জন্মেই বা কে ছিল আর পরের জন্মেই বা কে হবে? আপনিই বা তার কে? বালি যেমন স্রোতের টানে কখনও একত্র হচ্ছে আবার ছড়িয়ে যাচ্ছে, প্রাণীরাও তেমনি কালের প্রভাবে একসঙ্গে এসে মেলে আবার বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। বীজের মধ্যে কোন কোন বীজ থেকে যেমন অন্য বীজ জন্মায় আবার কোন বীজ থেকে জন্মায় না, বা জন্মালে নষ্ট হয়ে যায়, জীবের মধ্যেও তেমনি কারো থেকে সন্তান রূপে অন্য জীবের সৃষ্টি হয়, কারো বা হয় না, আবার কারো হয়েও নষ্ট হয়। ঈশ্বরের মায়াতেই এসব হয় বলে এর কোন সত্যতা নেই। আমরা, আপনি বা স্থাবর জঙ্গম যা কিছু এখন দেখছি এ সবের কিছুই যেমন আগে ছিল না এবং পরেও থাকবে না, তেমনি বর্তমানেও এদের কোন বাস্তব সত্তা নেই। স্বপ্নে দেখা বস্তুর মত এরা সবাই অস্তিত্বহীন। ঈশ্বর তাঁর প্রয়োজন না থাকলেও বালকের মত খেলার ছলে এক প্রাণী দ্বারা অন্য প্রাণী সৃষ্টি করছেন, তাদের পালন করছেন, সংহারও করছেন। ১-৬

মহারাজ, বীজ থেকে যেমন অন্য বীজই জন্মায় তেমনি এক দেহীর (অর্থাৎ পিতার) দেহ দ্বারা অন্য দেহীর (অর্থাৎ মাতার) দেহ থেকে আর এক দেহীর (পুত্রের) দেহ উৎপন্ন হয়। বীজের উৎপত্তিতে উৎপত্তির স্থান ভূমির যেমন কোন পরিবর্তন হয় না, তেমনি দেহ সৃষ্টিতে দেহীর অর্থাৎ আত্মার অবস্থার কোন পরিবর্তন হয় না। অদ্বিতীয় ব্রহ্মই একমাত্র সৎস্বরূপ। সেই ব্রহ্মে নানা জাতি বা নানা ব্যক্তিরূপে ভেদ দেখার মত অনাদি কাল থেকে দেহ আর দেহীর ভেদ দেখার মূলে হচ্ছে অজ্ঞান। ঋষিদের কাছে এই আশ্বাসের কথা শুনে রাজা চিত্রকেতু তাঁর শোকে মলিন মুখ হাত দিয়ে মুছে জিজ্ঞাসা করলেন, অবধূত বেশধারী আপনারা কে? আপনারা শুধু জ্ঞানীই নন, মহাপুরুষদের মধ্যেও আপনারা অতি মহান। ভগবানের প্রিয় ব্রাহ্মণরাই আমাদের মত নির্বোধ লোকদের জ্ঞান দিতে পৃথিবীতে এসে থাকেন। সনৎকুমার, নারদ, ঋভু, অঙ্গিরা, দেবল, অসিত, বেদব্যাস, মার্কণ্ডেয়, গোতম, বশিষ্ঠ, পরশুরাম, কপিল, শুকদেব, দুর্বাসা, যাজ্ঞবল্ক্য, জাতূকর্ণ, আরুণি, রোমশ, চ্যবন, দত্তাত্রেয়, আসুরি, পতঞ্জলি, বেদশিরা ঋষি, ধৌম্য, পঞ্চশিখ হিরণ্যনাভ, কৌশল্য, শ্রুতদেব এবং ঋতধ্বজ—এঁরা এবং আরো অনেক সিদ্ধপুরুষেরা জ্ঞান দান করবার জন্য ঘুরে বেড়ান। আপনারা দুজনে আমার মনে জ্ঞানের দীপ জেলে দিন, অজ্ঞানের অন্ধকারে আমি ডুবে আছি। ৭-১৬

অঙ্গিরা বললেন, মহারাজ, আমি অঙ্গিরা। আপনি পুত্রের কামনা করলে আমিই আপনাকে পুত্র-বর দিয়েছিলাম। আর ইনি ব্রহ্মার পুত্র দেবর্ষি নারদ। আপনি হরিভক্ত, তাই আপনার এরকম শোকমগ্ন হওয়ার কথা নয়। তবুও পুত্রশোকে আপনি ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়েছেন জেনে আমরা দুজনে আপনাকে অনুগ্রহ করার জন্য এসেছি। আপনি ব্রাহ্মণদের উপকার করে থাকেন এবং আপনি ঈশ্বর-ভক্ত। আপনার পক্ষে এরকম অবসন্ন হওয়া ঠিক নয়। আমি এর আগে যখন আপনার বাড়ীতে এসেছিলাম তখনই আপনাকে পরম জ্ঞান দান করতাম, কিন্তু তখন

আপনি পুত্র চেয়েছিলেন বলে পুত্রই দিয়েছিলাম। যার পুত্র আছে তাকে কতখানি দুঃখভোগ করতে হয় আপনি নিজেই এখন তা ভালভাবে বুঝতে পারছেন। স্ত্রী, গৃহ, ধন, ঐশ্বর্য ইত্যাদি থেকেও এইরকমই দুঃখ জন্মে। ইন্দ্রিয়ের ভোগ্য শব্দ ইত্যাদি পাঁচটি বিষয়, রাজৈশ্বর্য, পৃথিবী, রাজত্ব, ক্ষমতা, ধনভাণ্ডার, ভৃত্য, অমাত্য, সুহৃদ্‌জন, প্রজা—এই সবই অনিত্য এবং শোক, মোহ, ভয় ও দুঃখদায়ক। গন্ধর্ব-নগরের মত কখনও এদের উদয় হয়, আবার কিছুকাল পরেই এরা মিলিয়ে যায়। এগুলো সবই স্বপ্ন, মায়া আর আকাশকুসুমের মত অলীক। ১৭-২৩

ঐ সব কটি বস্তুই মনের কল্পনা মাত্র, বাস্তব নয়, তাদের এই মুহূর্তে দেখা যায়, পরের মুহূর্তেই আর দেখা যায় না। কর্মের সুপ্ত বাসনা মানুষকে বিষয়-চিন্তা করায়। ক্রমে মন থেকেই কর্ম আসে। পঞ্চভূত, জ্ঞানেন্দ্রিয় আর কর্মেন্দ্রিয় দিয়ে জীবের দেহ নির্মিত হয়েছে। দেহকেই যে 'আমি' মনে করে দেহ তাকে নানা দুঃখ-ক্লেশ দেয়। তাই স্থিরচিত্তে আত্মার তত্ত্ব চিন্তা করে, দ্বৈত বস্তুকে নিত্য বলে বিশ্বাস না করে শান্তি অবলম্বন করুন। নারদ বললেন, সংযতভাবে আপনি আমার কাছ থেকে এই মন্ত্র গ্রহণ করুন। পরম মঙ্গলদায়ক এই মন্ত্র ধারণ করলে সাতদিনের মধ্যেই আপনি সঙ্কর্ষণদেবকে দেখতে পাবেন। রাজেন্দ্র, এর আগে মহাদেব ইত্যাদি যাঁর চরণ আশ্রয় করে পরম করুণা লাভ করেছেন, আপনিও অবিলম্বে তাঁকে পাবেন। ২৪-২৮

ষোড়শ অধ্যায়

চিত্রকেতুকে নারদের সংকর্ষণ মন্ত্রদান

শুকদেব বললেন, মহারাজ, তারপর দেবর্ষি নারদ যোগবলে মৃত রাজপুত্রের আত্মাকে এনে শোকে আকুল জ্ঞাতিদের দেখালেন এবং তাকে উদ্দেশ করে বললেন, হে জীবাত্মা, তোমার মঙ্গল হোক। তুমি নিজের পিতামাতার দিকে তাকাও। তোমার আত্মীয়বন্ধুরা তোমার শোকে খুবই কাতর হয়েছে। তোমার আয়ু এখনও অবশিষ্ট আছে, তাই তুমি তোমার দেহে প্রবেশ করে সবার মধ্যে থেকে বাকী জীবন পিতার বিষয় ভোগ কর এবং সিংহাসনে বস। সেই আত্মা বলল. কর্মের বশে আমি দেবতা, মানুষ এবং অন্য নানা যোনিতে ঘুরে বেড়াচ্ছি। এঁরা কোন জন্মে আমার পিতামাতা ছিলেন? বার বার জন্ম নেওয়ার ফলে সবার সঙ্গেই সবার বন্ধু, জ্ঞাতি, শত্রু, মিত্র, মধ্যস্থ, বিদ্বেষী এবং উদাসীন সম্পর্ক ঘটে থাকে। সোনা ইত্যাদি পণ্যদ্রব্য যেমন কেনাবেচার ফলে হাতে হাতে ঘুরতে থাকে, জীবও সেরকম নানা জন্মে নানা ব্যক্তির সন্তানরূপে ঘুরছে। ১-৬

আবার জীবিত অবস্থাতেই পশু, ভৃত্য ইত্যাদিকে বিক্রী করে ফেললে আগের প্রভুর সঙ্গে তার আর সম্পর্ক থাকে না। সেইরকম জীব আসলে নিত্য অর্থাৎ জন্ম-রহিত এবং অহঙ্কারশূন্য হলেও, কর্মের বশে যতদিন কাউকে মাতা-পিতা বলে স্বীকার করে ততদিনই তাদের সঙ্গে তার সম্বন্ধ থাকে। দেহের জন্ম হয়, কিন্তু দেহের আশ্রয় যে জীব তাঁর জন্ম ইত্যাদি নেই। তিনি, নিত্য, অক্ষয়, স্বপ্রকাশ। অথচ ইনিই নিজের মায়াগুণ দ্বারা নিজেকে বিশ্বরূপে বা সর্বরূপে সৃষ্টি করেন।

আত্মা উপকারী, অপকারী, শত্রু, মিত্র ইত্যাদি সবলোকের সবরকম বুদ্ধির সাক্ষী মাত্র। তাই তাঁর প্রিয় বা অপ্রিয় কেউ নেই, আত্মীয় বা পরও নেই। আত্মা দেহের অধীন নন, কার্য-কারণের সাক্ষী মাত্র। তাই তিনি উদাসীন, সুখ-দুঃখ বা রাজ্য ইত্যাদি কর্মের ফল ভোগ করেন না। এই যখন আমার আসল রূপ তখন আমার সঙ্গে আপনাদের কি সম্বন্ধ আছে? কাজেই আপনারা শোক বা মোহগ্রস্ত হবেন না। ৭-১১

শুকদেব বললেন, মহারাজ, জীব এই কথা বলে আবার দেহ ছেড়ে চলে গেল। তখন তার জ্ঞাতিরা আশ্চর্য হয়ে স্নেহের বন্ধন ছিন্ন করে শোক ত্যাগ করল। তারপর আত্মীয়গণ রাজকুমারের দেহের সংকারের পর বিধিমত তর্পণ ইত্যাদি করল। বালককে যারা হত্যা করেছিল সেই রানীদের মনেও অনুতাপ এল এবং শিশুহত্যার পাপে তাঁদের আকৃতি মলিন হল। পুত্র ইত্যাদিই দুঃখের কারণ— মহর্ষি অঙ্গিরার সেই কথা মনে করে তাঁরা পুত্রকামনা ত্যাগ করলেন এবং ব্রাহ্মণদের নির্দেশ অনুসারে যমুনার তীরে শিশুহত্যার প্রায়শ্চিত্ত করলেন। মহর্ষির সান্ত্বনাবাক্যে চিত্রকেতুর মন শান্ত হল। হাতী যেমন গভীর পাঁক থেকে বেরিয়ে আসে, তিনিও সেরকম ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন। তারপর যমুনার জলে স্নান-তর্পণ করে মৌন হয়ে এবং ইন্দ্রিয়-সংযম করে দুই ঋষিকে প্রণাম করলেন। নারদ সন্তুষ্ট হয়ে চিত্রকেতুকে এই বিদ্যা উপদেশ করলেন—হে প্রভু, ভগবান বাসুদেব, সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই চতুর্ব্যূহ স্বরূপ তোমাকে আমি হৃদয় দ্বারা নমস্কার করি। ১২-১৮

তুমি বিজ্ঞানমাত্র, তুমি পরম আনন্দের মূর্তি, আত্মারাম, প্রশান্ত। তোমার কাছে দ্বৈতভাব থাকতে পারে না। তোমাকে নমস্কার। মায়া থেকেই রাগ, দ্বেষ এসব জন্মে। আত্মানন্দ অনুভব করে তাদের তুমি দূরে রেখেছ। তুমি বিষয় এবং সকল ইন্দ্রিয়ের প্রভু, অতি মহৎ। তুমি অনন্তমূর্তি, তোমাকে নমস্কার। মনের সঙ্গে (বাক্য) ইত্যাদিও যাঁকে না পেয়ে নিরস্ত হলে[1] যিনি নিজে প্রকাশ পান, যাঁর নাম নেই, রূপ নেই, যিনি চিৎস্বরূপ এবং কার্য ও কারণের কারণ তিনি আমাদের রক্ষা করুন। যাঁর থেকে জগতের সৃষ্টি, যাঁতে তার স্থিতি এবং লয়, মাটির তৈরী বস্তুতে মাটির মত যিনি সব কিছুতে ওতপ্রোত, তুমি সেই ব্রহ্ম, তোমাকে নমস্কার। আকাশের মত অন্তরে বাহিরে ব্যাপ্ত থাকলেও মন, বুদ্ধি, সমস্ত ইন্দ্রিয় এবং প্রাণ যাঁকে স্পর্শ করতে বা জানতে পারে না, তাঁকে নমস্কার। লোহা যেমন গরম না হলে অন্য বস্তুকে পোড়াতে পারে না, তেমনি দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন, বুদ্ধি তাঁর চৈতন্যের অংশ দ্বারা আবিষ্ট হয়ে জাগ্রত আর স্বপ্ন অবস্থায় আপন আপন কাজ করে, কিন্তু সুষুপ্তি বা মূর্ছার সময় নয়। সাক্ষিরূপ জীবকে তিনি জানেন। তাঁকে নমস্কার। শ্রেষ্ঠ ভক্তগণ তাঁদের মুকুলিত কমলের মত হাত দিয়ে যাঁর চরণ সেবা করছেন সেই সর্বেশ্বর ভগবানকে নমস্কার। ১৯-২৫

শুকদেব বললেন, শরণাগত ভক্তকে এই বিদ্যা উপদেশ করে নারদ অঙ্গিরার সঙ্গে ব্রহ্মলোকে চলে গেলেন। চিত্রকেতু এক সপ্তাহ শুধু জল খেয়ে সমাধিস্থ থেকে সেই বিদ্যা ধারণ করলেন। তারপর সাত রাত্রি কেটে গেলে রাজা ঐ বিদ্যার দ্বারা বিদ্যাধরদের উপর কর্তৃত্ব লাভ করলেন। এরও কয়েকদিন পরে তাঁর হৃদয়

---

১ যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।—তৈঃ উপঃ ২।৪ শ্লোক।

আলোকিত হয়ে উঠল এবং মনের সেই অবস্থায় তিনি দেবদেব ভগবান অনন্তের চরণপ্রান্তে উপস্থিত হলেন। সিদ্ধেশ্বরগণ ভগবানকে বেষ্টন করে ছিলেন। তিনি মৃণালের মত গৌরবর্ণ এবং উজ্জ্বল মুকুট, কেয়ুর, কটিসূত্র আর কঙ্কণে শোভিত। তাঁর পরনে নীল বস্ত্র, মুখভাব প্রসন্ন, দুই চোখ রক্তিম। অনন্তদেবকে দেখে চিত্রকেতুর সব পাপ নষ্ট হয়ে গেল, তাঁর হৃদয় নির্মল এবং শান্ত হল। ভক্তিতে তাঁর দুই চোখ থেকে আনন্দের অশ্রু ঝরতে লাগল, দেহে রোমাঞ্চ হল। রাজা ভগবানের চরণে প্রণত হলেন এবং যে সিংহাসনে অনন্তদেবের চরণ রাখা ছিল, চোখের জলে তা ধুইয়ে দিলেন। ভক্তির আবেগে স্বর বন্ধ হয়ে যাওয়াতে অনেকক্ষণ তিনি কথা বলতে পারলেন না। ২৬-৩২

তার বুদ্ধির সাহায্যে মনকে সংযত করে তিনি কথা বলার শক্তি পেলেন। তখন তিনি ইন্দ্রিয়গুলির বাহ্যবৃত্তি রোধ করে, বৈষ্ণবশাস্ত্রে যাঁর বিগ্রহের বর্ণনা আছে সেই জগদ্‌গুরু ভগবানের স্তব করে বললেন—হে অজিত, অন্য কেউ তোমাকে জয় করতে না পারলেও জিতেন্দ্রিয় এবং সমদর্শী ভক্তেরা তোমাকে বশ করেছেন। আবার তাঁরা নিষ্কাম হলেও তুমি তাঁদের জয় করেছ কারণ তুমি নিজেকেই তাঁদের দান করেছ। হে ভগবান, এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় তোমারই লীলা। জগতের সৃষ্টিকর্তা বলে লোকে যাঁদের জানে সেই ব্রহ্মা ইত্যাদি দেবগণ ঈশ্বর নন, তোমার অংশের অংশ মাত্র। তবুও তাঁরা নিজেদের ঈশ্বর মনে করে বৃথা অহংকার করে থাকেন। যা পরমাণু বা সৃষ্টির সূক্ষ্মতম মূল উপাদান এবং যা পরম মহৎ যা সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে বড়, তুমি ঐ দুয়ের আদিতে, অন্তে এবং মধ্যে রয়েছ। তোমার কিন্তু আদি, অন্ত, মধ্য কিছুই নেই—তুমি নিত্য। যা কিছু বর্তমান আছে সেই সমস্ত সৃষ্ট বস্তুর আদিতে, অন্তে আর মধ্যে তুমিই আছ। সোনা দিয়ে অলঙ্কার তৈরী হবার আগে সোনা সোনাই থাকে, আবার তৈরী অলঙ্কার ভেঙে ফেললেও সোনা সোনাই থেকে যায়। তাই অলঙ্কারের বিষয়ে সোনা ধ্রুব বস্তু। জগতের ব্যাপারে তুমিও তেমনি ধ্রুব বস্তু। প্রথমটি দ্বিতীয়টির থেকে দশগুণ বড় এরকম সাতটি আবরণে ঢাকা এই ব্রহ্মাণ্ড আরো কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে সামান্য পরমাণুর মত তোমার মধ্যে থেকে ঘুরছে। তাই তুমি অনন্ত। যারা তোমার উপাসনা না করে বিষয়ের আকাঙ্ক্ষায় তোমার বিভূতিরূপ ইন্দ্র ইত্যাদি দেবতাদের উপাসনা করে তারা নরপশু। রাজার বংশ নষ্ট হলে তাঁর ভৃত্যদের বিষয়ভোগেরও যেমন শেষ হয়, তেমনি ঐ নরপশুরা যে দেবতাদের উপাসনা করে তাদের নাশ হলে উপাসকদের ভোগেরও সমাপ্তি ঘটে। ৩৩-৩৮

বীজকে ভেজে ফেললে যেমন তার থেকে অঙ্কুর বেরোয় না, তেমনি বিষয় চেয়েও যদি কেউ তোমাকে ভজনা করে তবে তার আর পুনর্জন্ম হয় না। গুণসকলের থেকে জীবের সুখ-দুঃখের উৎপত্তি হয়, কিন্তু তুমি নির্গুণ। তাই কিছু কামনা করেও তোমার উপাসনা করলে ক্রমে নির্গুণ অবস্থা লাভ হয়। হে অজিত, তুমি যখন অনিন্দ্য ভাগবত ধর্ম বর্ণনা করেছ তখনই সকলকে জয় করেছ। সনৎকুমার প্রভৃতি নিষ্কাম আত্মারাম মুনিরাও মুক্তির জন্য তোমার উপাসনা করে থাকেন। যে ধর্মের মূলে হল কামনা তাতে যেমন 'আমি-তুমি' 'আমার তোমার' এইসব ভেদবুদ্ধি রয়েছে, ভাগবত ধর্মে তা নেই। যদিও সেই সকাম ধর্মের বিধানও বেদেই আছে তবুও শত্রুনাশ ইত্যাদির জন্য তার অনুষ্ঠান করা হয় বলে তা বিশুদ্ধ নয়; তা নশ্বর এবং অধর্মে পূর্ণ। এ ধর্মে কারোই মঙ্গল হয় না। এতে ব্রত পালন করতে গিয়ে নিজের দেহ যেমন কষ্ট পায় তেমনি অন্যাকে দুঃখ দেওয়াতে নিজেরও দুঃখ আর অধর্ম দুইই লাভ হয়। সমস্ত প্রাণীকে যাঁরা সমান চোখে দেখেন সেই

মহাজনরা তোমার বলা ভাগবত ধর্ম পালন করেন। তুমি যে তত্ত্বদৃষ্টিতে ঐ ধর্ম উপদেশ করেছ তার কখনও বিচ্যুতি ঘটে না। ভগবান, তোমার নাম একবার শুনলেই নীচ চণ্ডালেরও মুক্তি হয়, তোমাকে দর্শন করলে যে সব পাপ ক্ষয় হবে তাতে আর সন্দেহ কি। তোমাকে দেখে আমার মনের সব ময়লা সম্পূর্ণ পরিষ্কার হয়েছে। তোমার ভক্ত দেবর্ষি নারদ বলেছেন তা ব্যর্থ হতে পারে না। ৩৯-৪৫

হে অনন্ত, তুমি সকলের অন্তর্যামী, জগতে যে যা করছে সবই তোমার জানা। তাই সূর্যের কাছে জোনাকির মত তোমার কাছে আমি কি আর প্রকাশ করব? তুমি জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ের কর্তা। কুযোগীরা ভেদবুদ্ধির জন্য তোমার তত্ত্ব জানতে পারে না। তুমি পরমহংস, তোমাকে নমস্কার। যিনি সক্রিয় হলে বিশ্বস্রষ্টা দেবতারা উদ্যোগী হন, যিনি প্রকাশ করলে জ্ঞানের ইন্দ্রিয়গুলি নিজের নিজের বিষয় গ্রহণ করতে পারে এবং যাঁর একটি মাথার একপাশে বিশাল পৃথিবী সামান্য একটি সরষের মত পড়ে আছে, সেই সহস্রশীর্ষ ভগবান অনন্তদেবকে নমস্কার। শুকদেব বললেন, মহারাজ, এই স্তবে সন্তুষ্ট হয়ে ভগবান চিত্রকেতুকে বললেন, নারদ আর অঙ্গিরা তোমাকে আমার বিষয়ে যা বলেছেন তার প্রভাবে আমাকে দর্শন করে তুমি সম্পূর্ণ সিদ্ধ হলে। আমিই সর্বভূত, আমিই ভোক্তা, আমিই ভূতসকলকে প্রকাশ করি। আমিই তাদের কারণ। শব্দব্রহ্ম (অর্থাৎ বেদ) এবং পরব্রহ্ম—এই দুইই আমার শাশ্বত রূপ। এই ভোগ্য জগতে আমিই ভোক্তারূপে রয়েছি। আবার জীবাত্মার মধ্যে ভোগ্যরূপে যে সংসার রয়েছে তাও আমি। আমিই এই দুয়ের মধ্যে আছি। আমাতেই এই দুই রয়েছে। স্বপ্নে যেমন লোকে অন্য দেশের পাহাড়, বন ইত্যাদি নানা জিনিস নিজের মধ্যেই দেখে, আবার স্বপ্নের মধ্যেই মনে করে যেন জেগে বিছনায় শুয়ে আছে, তেমনি বুদ্ধির জাগরণ ইত্যাদি অবস্থা আত্মার মায়া ছাড়া কিছু নয়। ঐ অবস্থায় আসল দ্রষ্টা হচ্ছেন আত্মা। তাঁকেই ধ্যান করবে। ৪৬-৫৪

সুষুপ্তি বা গভীর ঘুমের অবস্থায় দৃশ্য কিছু থাকে না বলেই যে দ্রষ্টাও থাকে না, সেকথা মনে করো না। গভীর ঘুমে মগ্ন জীব যেই রূপে ঐ গাঢ় ঘুম এবং তার অতীন্দ্রিয় সুখ অনুভব করে, আমাকেই সেই আত্মা বা ব্রহ্মস্বরূপ জানবে। যদি ঐ ঘুম এবং সেই সময়ের সুখের জ্ঞান না থাকত তবে জেগে উঠে তার সে সময়ের কথা মনে পড়ত না। যিনি সুষুপ্তি আর জাগরণের কথা স্মরণ করেন তাঁর যে চৈতন্য ঐ উভয়কে প্রকাশ করে, আবার উভয়ের অভাবেও যে চৈতন্যের অভাব হয় না তাই পরব্রহ্ম। ছেলেবেলায় কোন জিনিস দেখে লোকে যেমন যৌবনে তা মনে করতে পারে, তেমনি সুষুপ্ত অবস্থার আনন্দের কথা জাগলে পরেও স্মরণ হতে পারে। যদি জীব 'আমিই ব্রহ্ম' এই কথা বিস্মৃত হয়, তবে জীব-ব্রহ্মের ভেদজ্ঞান থেকে তার জন্মের পর জন্ম আর মৃত্যুর পর মৃত্যু—এইভাবে সংসার চলতেই থাকে। ৫৫-৫৭

মহারাজ, মনুষ্যদেহে জ্ঞান, বিজ্ঞান দুইই লাভ হতে পারে। মানুষরূপে জন্ম নিয়ে আত্মাকে যে জানল না তার মঙ্গল কোথায়? প্রবৃত্তির পথে দুঃখ তো আছেই, আবার সেপথে গেলে অন্য বিপত্তিও ঘটতে পারে, কিন্তু নিবৃত্তির পথ মোক্ষের পথ। এ কথা বুঝে পণ্ডিতেরা প্রবৃত্তির পথ ত্যাগ করেন। সুখ পাবার জন্য দুঃখ দূর করবার জন্য স্ত্রী-পুরুষে কত কি করে, কিন্তু তাতে না হয় সুখ, না যায়

দুঃখ। প্রবৃত্তিমার্গে যারা নিজেদের দক্ষ মনে করে তাদের কাজেও বিপরীত ফল হয়। এ দেখে এবং আত্মার তত্ত্ব জাগরণ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি এই তিন অবস্থার অতীত তা জেনে বিবেকের শক্তিতে ইহলোক-পরলোকের বিষয় থেকে মুক্ত ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে তৃপ্ত হয়ে পুরুষ আমার ভক্ত হবে। যাঁদের বুদ্ধি যোগের দ্বারা নিপুণ হয়েছে, পরমাত্মা আর জীবাত্মার অভেদ-জ্ঞানই তাঁদের একমাত্র লভ্য। শ্রদ্ধার সঙ্গে, মন দিয়ে আমার উপদেশ গ্রহণ কর, তাহলে জ্ঞান বিজ্ঞান লাভ করে অবিলম্বে সিদ্ধ হবে। শুকদেব বললেন, জগদ্‌গুরু বিশ্বাত্মা ভগবান হরি এইভাবে চিত্রকেতুকে আশ্বাস দিয়ে তাঁর সামনেই অদৃশ্য হলেন। ৫৮-৬৫

সপ্তদশ অধ্যায়

চিত্রকেতুর বৃত্রাসুর-জন্ম প্রাপ্তি

শুকদেব বললেন, মহারাজ, ভগবান অনন্তদেব যে দিকে অন্তর্ধান করলেন বিদ্যাধর চিত্রকেতু সেইদিকে প্রণাম করে আকাশপথে বেড়াতে লাগলেন। মুনি, সিদ্ধ এবং চারণরা মহাযোগী চিত্রকেতুকে দেখলে তাঁর স্তব করতেন। সুমেরু পর্বতের যে সব গুহাতে শুধু সঙ্কল্প দ্বারাই নানা সিদ্ধি লাভ হয়, সেখানে বিদ্যাধরীদের দিয়ে শ্রীহরির গুণকীর্তন করিয়ে চিত্রকেতু আনন্দ পেতেন। এভাবে কয়েক লক্ষ বছর কেটে গেলেও চিত্রকেতুর শরীর এবং ইন্দ্রিয়ের শক্তি অটুট রইল। একদিন তিনি শ্রীবিষ্ণুর দেওয়া উজ্জ্বল বিমানে করে বেড়াতে বেড়াতে ভগবান শঙ্করকে দেখতে পেলেন। সিদ্ধ এবং চারণগণ তাঁকে ঘিরে রেখেছিলেন। শঙ্কর দেবী পার্বতীকে নিজের কোলে বসিয়ে তাঁকে বাহু দিয়ে আলিঙ্গন করে মুনিদের মধ্যে বসেছিলেন। চিত্রকেতু তাঁর সামনেই উচ্চহাসি হেসে দেবীকে শুনিয়ে বলতে লাগলেন, ইঁনি লোকগুরু, ব্রহ্মবাদী, জীবশ্রেষ্ঠ, অথচ নীচ ব্যক্তির মত লজ্জাহীন হয়ে স্ত্রীকে কোলে নিয়ে বসে আছেন। ইতর লোকেও স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হবার জন্য নির্জনতা খোঁজে, কিন্তু ইনি এতবড় যোগী হয়েও একেবারে সভার মধ্যেই স্ত্রীর সঙ্গে বসে আছেন। ১-৮

জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ মহাদেব একথা শুনে উচ্চস্বরে হেসে উঠলেন, কিন্তু কিছু বললেন না। সেখানে উপস্থিত অন্যরাও চুপ করে রইলেন। এতে চিত্রকেতুর মনে আরো অহংকার হল। 'আমি মস্ত জিতেন্দ্রিয়' এই গর্বে প্রগল্ভ চিত্রকেতু মহাদেবের মহিমা না বুঝে আরো নানা অশোভন কথা বলতে লাগলেন। তখন দেবী ভগবতী রুষ্ট হয়ে বললেন, ইঁনি কি এখন লোককে উপদেশ দেবার আর আমাদের মত দুষ্ট এবং নির্লজ্জদের শাস্তি দেবার কর্তা হয়েছেন? তাহলে নিশ্চয়ই ব্রহ্মা, তাঁর পুত্র ভৃগু, নারদ প্রভৃতি মুনিরা, সনৎকুমার, কপিল, মনু—এঁরা কেউই ধর্ম জানেন না। কারণ শংকর শাস্ত্র অতিক্রম করে কিছু করলেও তাঁরা তাঁকে বারণ করেন না। ব্রহ্মা প্রভৃতিরা যাঁর দুই পাদপদ্ম সর্বদা ধ্যান করেন, এই ক্ষত্রিয়ের এমন স্পর্ধা যে সে তাঁদের অজ্ঞ প্রমাণ করে জগদ্‌গুরু শিবকে শাসন করছে। এর অবশ্যই শাস্তি হওয়া উচিত। চিত্রকেতু নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করে উদ্ধত হয়েছে, তাই সে আর শ্রীহরির পদমূলের কাছে থাকবার যোগ্য নয়। তাই, হে দুর্বুদ্ধি, তুমি গিয়ে

পাপময় অসুরজন্ম নাও যাতে এ জগতে মহাপুরুষদের কাছে আর অপরাধ না করতে হয়। ৯-১৫

চিত্রকেতু ঐ অভিশাপ শোনামাত্র বিমান থেকে নেমে মাথা নীচু করে দেবীকে প্রসন্ন করবার চেষ্টা করতে লাগলেন। তিনি বললেন, মা, আপনার অভিশাপ আমি অঞ্জলি পেতে নিলাম। দেবতারা মর্ত্যের মানুষকে যাই বলেন তাই তার পূর্ব-কর্মের ফল বলে মনে করতে হবে। অজ্ঞানে মুগ্ধ জীব সংসারচক্রে ঘুরতে ঘুরতে সর্বত্র এবং সর্বদা সুখ-দুঃখ ভোগ করে। তবে জীব নিজে বা অন্য কেউ সেই সুখ-দুঃখের কর্তা নয়, যদিও অজ্ঞ ব্যক্তি সেইরকম মনে করে থাকে। এই মায়াময় জগতে অভিশাপ, অনুগ্রহ, স্বর্গ-নরক, সুখ-দুঃখ সবই মায়ার কল্পনা। যিনি সব বন্ধন থেকে মুক্ত একমাত্র সেই ভগবানই নিজের মায়া দিয়ে জীব সৃষ্টি করেন এবং তাদের বন্ধন মুক্তি, সুখ-দুঃখ এসবও সৃষ্টি করেন। তিনি নিরঞ্জন বা নিঃসঙ্গ, সর্বত্র একই ভাবে রয়েছেন। তাই তাঁর প্রিয়, অপ্রিয়, জ্ঞাতি, বন্ধু, আত্মীয়, পর কিছুই নাই, সুখেও তাঁর আসক্তি নাই, তাঁর ক্রোধ কোথা থেকে আসবে? ১৬-২২

তবুও তাঁরই মায়ার বিলাসে পুণ্য আর পাপ কাজ, জীবের সুখ-দুঃখ, ভাল-মন্দ, বন্ধন-মুক্তি এবং জন্ম-মৃত্যুরূপ সংসার উৎপন্ন হচ্ছে। তাই, দেবী, আমি শাপমুক্তির জন্য আপনাকে সন্তুষ্ট করবার চেষ্টা করছি না। আমার যে কথা আপনি অনুচিত বলে মনে করছেন তা ক্ষমা করুন। চিত্রকেতু এইভাবে হরপার্বতীকে প্রসন্ন করে নিজের বিমানে করে সেখান থেকে চলে গেলে সবাই বিস্মিত হয়ে দেখলেন। তারপর ভগবান শঙ্কর দেবতা, ঋষি, দৈত্য, সিদ্ধ এবং পার্ষদগণের সামনেই পার্বতীকে বললেন, সুন্দরী, যাঁরা ভগবান শ্রীহরির দাসানুদাস সেই নিষ্কাম মহাপুরুষদের মাহাত্ম্য দেখলে তো? তাঁরা স্বর্গ, মোক্ষ আর নরককে সমান মনে করেন বলে কাউকেই ভয় করেন না। ঈশ্বরের লীলাতে জীব দেহধারণ করলে সুখ-দুঃখ, জন্ম-মৃত্যু, অনুগ্রহ-অভিশাপ এই বিরুদ্ধ ভাবগুলির উদয় হয়। স্বপ্নে সুখ দুঃখ বোধ বা দড়িতে সর্প ভ্রম যেমন অবিবেক থেকেই হয়ে থাকে, মায়া দ্বারা উৎপন্ন বস্তুর মধ্যে দোষগুণ ভেদ-বিচারও তেমনি বিবেকের অভাবেরই ফল। ২৩-৩০

ভগবান বাসুদেবে ভক্তিমান এবং গভীর জ্ঞান আর তীব্র বৈরাগ্যের অধিকারী মহাজনরা সব জিনিসকেই সমান মনে করেন। আমি, ব্রহ্মা, সনৎকুমার, নারদ, মরীচি ইত্যাদি ঋষিরা এবং প্রধান দেবতারা সেই ভগবানের লীলা বা ইচ্ছা জানতে পারি না। তাঁর অংশের অংশ হয়েও যাঁরা নিজেদের আলাদা ঈশ্বর বলে অহংকার করে তারা যে কখনই তাঁর স্বরূপ জানতে পারে না সে তো বলাই বাহুল্য। এ জগতে তাঁর প্রিয়-অপ্রিয়, আত্মীয়-পর কেউ নেই। ভগবান শ্রীহরিই সর্বভূতের আত্মা, সর্বভূতের প্রিয়। চিত্রকেতু শ্রীহরির প্রিয় অনুচর, ইনি সমদর্শী, শান্ত। আমিও শ্রীহরির প্রিয় বলে তাঁর উপর আমার রাগ হয় নি। যাঁরা মহাপুরুষ, নারায়ণের ভক্ত, শান্ত, সমদর্শী তাঁদের কাজে আশ্চর্য হয়ো না। ৩১-৩৫

শুকদেব বললেন, মহারাজ, পার্বতী শঙ্করের এই কথা শুনে শান্ত হলেন। চিত্রকেতু দেবীকে শাপ দিতে পারতেন। কিন্তু তা না করে তিনি যে দেবীর শাপ মাথা পেতে নিলেন, এই হল সাধুর লক্ষণ। তারপর বহু জ্ঞান-বিজ্ঞানের অধিকারী চিত্রকেতু পার্বতীর শাপে দানব-দেহ পেয়ে ত্বষ্টার যজ্ঞে আবির্ভূত হন এবং বৃত্র নামে বিখ্যাত হন। তুমি যে জিজ্ঞাসা করেছিলে বৃত্র কি করে অসুর হয়ে জন্মালেন আর কিভাবেই বা তাঁর ভগবানে মতি হল, সেসব কথা তোমাকে বললাম।

মহাত্মা চিত্রকেতুর পবিত্র কাহিনী দ্বারা বিষ্ণুভক্তদের মাহাত্ম্য প্রকাশ পায়। এই কাহিনী শুনলে মানুষ সংসার-বন্ধন থেকে মুক্তি পায়। যিনি সকালে উঠে শ্রীহরিকে স্মরণ করে সংযত বাক্যে এবং শ্রদ্ধার সঙ্গে এই কাহিনী পড়বেন তিনিও পরমগতি লাভ করবেন। ৩৬-৪১

অষ্টাদশ অধ্যায়

দিতির বংশকীর্তন

শুকদেব বললেন, মহারাজ, সবিতার স্ত্রী পৃশ্নি সাবিত্রী, ব্যাহৃতি ও ত্রয়ীকে আর অগ্নিহোত্র, পশুযাগ, সোমযাগ এবং পাঁচটি মহাযজ্ঞকে প্রসব করেন। ভগ নামে আদিত্যের পত্নী সিদ্ধি মহিমা, বিভু এবং প্রভু এই তিন পুত্র আর আশী নামে এক সুন্দরী কন্যা প্রসব করেন। ধাতার চার স্ত্রীর নাম হল কুহু, সিনীবালি, রাকা ও অনুমতি। তাঁরা যথাক্রমে সায়ং, দর্শ, প্রাতঃ এবং পূর্ণমাসকে প্রসব করেন। বিধাতা তাঁর স্ত্রী ক্রিয়ার গর্ভে পুরীষ্য নামে পাঁচ অগ্নিকে উৎপন্ন করেন। ব্রহ্মার পুত্র ভৃগু আবার বরুণের স্ত্রী চর্ষণীর গর্ভে জন্মান। বল্মীক থেকে যিনি বেরিয়েছিলেন সেই মহাযোগী বাল্মীকিও বরুণের পুত্র। ভৃগু আর বাল্মীকি বরুণের এই দুটি পুত্রই অসাধারণ। অগস্ত্য এবং বশিষ্ঠ এই দুই ঋষি মিত্র এবং বরুণ উভয়েরই পুত্র। উর্বশীকে দেখে তাঁদের বীর্য স্খলিত হলে তাঁরা ঐ বীর্য একটি কলসীর মধ্যে ফেলেছিলেন। তার থেকেই ঐ দুই ঋষির জন্ম হয়। মিত্রের দ্বারা রেবতীর গর্ভে উৎসর্গ, অরিষ্ট, আর পিপ্পলের জন্ম হয়। ১-৬

শোনা যায় প্রভু ইন্দ্র পৌলোমীর (শচীর) গর্ভে জয়ন্ত, ঋষভ আর মীঢ়ুষ নামে তিনটি পুত্র উৎপাদন করেন। মায়াবলে বামনরূপী উরুক্রমের স্ত্রী কীর্তির বৃহৎশ্লোক নামে একটি পুত্র হয়। সৌভগ ইত্যাদিরা হল তার পুত্র। কশ্যপের পুত্র বামনদেব কি করে অদিতির গর্ভে জন্মেছিলেন সে কথা আর তাঁর শৌর্য ইত্যাদির কথা পরে (৮ম স্কন্ধে) বলব। এখন আমি কশ্যপের যেই পুত্ররা দিতির গর্ভে জন্মেছিল তাদের কথা বলছি। এই বংশেই ভক্ত প্রহ্লাদ আর বলির জন্ম হয়। দিতির দুটি ছেলে দৈত-দানবদের পূজনীয় হিরণ্যাক্ষ আর হিরণ্যকশিপু। জম্ভাসুরের কন্যা কয়াধুর গর্ভে হিরণ্যকশিপুর সংহ্লাদ, অনুহ্লাদ, হ্লাদ আর প্রহ্লাদ নামে চার পুত্র জন্মে। তাদের বোন সিংহিকা বিপ্রচিত্তি নামে দানবের ঔরসে রাহুকে প্রসব করে। ৭-১৩

রাহু যখন অমৃত পান করছিল তখন শ্রীহরি সুদর্শনচক্রে তার মাথাটি কেটে ফেলেন। সংহ্লাদ আর তার পত্নী কৃতির পুত্র হল পঞ্চজন। হ্লাদের স্ত্রী ধমনীর গর্ভে বাতাপি আর ইল্বল এই দুই পুত্র জন্মায়। এই ইল্বলই অগস্ত্যকে মারবার জন্য মেষরূপী বাতাপির মাংস রান্না করে তাঁকে খেতে দিয়েছিল। অনুহ্লাদের স্ত্রী হল সূর্যা। তার গর্ভে জন্মায় বাস্কল আর মহিষ নামে দুই পুত্র। প্রহ্লাদের ছেলে হল বিরোচন। তার স্ত্রী দেবীর গর্ভে বলির জন্ম হয়। বলি আবার স্ত্রী অশনার গর্ভে একশ পুত্র উৎপন্ন করেন। তাদের মধ্যে বাণ হল সর্বজ্যেষ্ঠ। বলির গুণ এবং কীর্তির কথা আমি পরে বলব। বাণ শিবের আরাধনা

করে তাঁর অনুচরদের মধ্যে প্রধান একজন হয়েছিলেন। এখনও শিব তাঁর পুরী রক্ষা করেন এবং সর্বদা তাঁর পাশে থাকেন। ঊনপঞ্চাশ মরুৎও ঐ দিতির পুত্র। তাঁরা নিঃসন্তান। ইন্দ্র তাঁদের দেবত্ব দান করেন। ১৪-১৯

পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করলেন, গুরুদেব ইন্দ্র কি করে অসুরপ্রকৃতির মরুৎদের দেবতায় পরিণত করলেন? তাঁরা ইন্দ্রের কি উপকার করেছিলেন? এই ঋষিদের এবং আমার সেকথা শুনবার জন্য খুব আগ্রহ হচ্ছে, দয়া করে তা বলুন। শুকদেব রাজার ঐ প্রশ্ন শুনে তাঁর অনেক প্রশংসা করে বলতে লাগলেন—বিষ্ণুকে সহায় করে ইন্দ্র দিতির পুত্রকে হত্যা করলে দিতি শোকে এবং ক্রোধে জ্বলতে জ্বলতে চিন্তা করলেন—আমি কবে ইন্দ্রিয়সুখে আসক্ত, নিষ্ঠুর, কঠিন হৃদয়, ভ্রাতৃহন্তা, পাপিষ্ঠ এই ইন্দ্রকে বধ করে সুখে ঘুমাব। বেঁচে থাকতে লোকে যাঁদের প্রভু বলত মৃত্যুর পর এমন কত রাজার দেহ কৃমি, বিষ্ঠা, ভস্মে পরিণত হয়েছে। সেই দেহের সুখের জন্য যে জীবহিংসা করে সে কিসে নিজের মঙ্গল তা বোঝে না; কারণ জীবহিংসা করলে নরকে যেতে হয়। ইন্দ্র এই দেহকে চিরস্থায়ী মনে করে স্বভাবে উচ্ছৃংখল হয়েছে। তার গর্ব নষ্ট করতে পারে এমন পুত্র লাভ করবার জন্য আমি স্বামীসেবা করব। ২০-২৬

তখন থেকে দিতি শুশ্রূষা, অনুরাগ বিনয় এবং ইন্দ্রিয়সংযম দ্বারা অনবরত স্বামীকে তুষ্ট করতে লাগলেন। তারপর স্বামীর মনের ভাব বুঝে দিতি পরম ভক্তি, প্রিয় বাক্য আর বিলোল কটাক্ষে তাঁর মন হরণ করলেন। প্রজাপতি কশ্যপ জ্ঞানী হলেও সে সময় তিনি ঐ সুন্দরী স্ত্রীর এমন বশ হয়েছিলেন যে তাঁর কামনা পূর্ণ করতে সম্মত হলেন। এতে আশ্চর্যের কিছু নেই, কারণ সৃষ্টির প্রথমে ব্রহ্মা প্রাণীদের সঙ্গীহীন দেখে নিজের দেহের অর্ধেক অংশকে স্ত্রীরূপে সৃষ্টি করেন। সেই থেকে স্ত্রীলোক পুরুষের মন হরণ করে আসছে। বৎস পরীক্ষিৎ, ভগবান কশ্যপ স্ত্রীর সেবায় খুব সুখী হয়ে হেসে তাকে আদর করে বললেন, সুন্দরী, আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছি। তুমি বর চাও। স্বামী সন্তুষ্ট হলে ইহলোকে বা পরলোকে স্ত্রীলোকের কোন কামনা অপূর্ণ থাকে? স্বামীই স্ত্রীলোকের পরম দেবতা। ভগবান শ্রীহরি সর্বভূতের অন্তর থেকে নানা দেবতা রূপে মানুষের পূজা পাচ্ছেন, আবার তিনিই পতিরূপে রমণীগণের সেবাগ্রহণ করছেন। তাই পতিব্রতা স্ত্রী মঙ্গল কামনা করে পরম ভক্তিতে আত্মা এবং ঈশ্বর রূপে পতির পূজা করেন। ভদ্রে, আমি তোমার স্বামী, তুমি আমাকে এই ভাবে অর্থাৎ ঈশ্বর মনে করে পূজা করেছ। তোমার ইচ্ছা আমি পূর্ণ করব। ২৭-৩৬

দিতি বললেন, ব্রহ্মন্, যদি আমাকে বর দিতে চান তবে এমন একটি অমর পুত্র আমায় দিন যে ইন্দ্রকে বধ করবে। সে আমার দুটি পুত্রকে বিষ্ণুর সহায়তায় হত্যা করেছে। দিতির প্রার্থনা শুনে কশ্যপ অনুতাপ করে বললেন, হায়! আমার দেখছি মহা অধর্ম ঘটল। খুবই দুঃখের ব্যাপার যে আমি ইন্দ্রিয়সুখে আসক্ত হয়ে নারীরূপী মায়ায় মুগ্ধ হলাম। আমার এখন নরকে যাওয়া ছাড়া আর গতি নেই। বর চেয়ে এই নারী আর কি অপরাধ করেছে। সে তার স্বভাব অনুসারেই কাজ করেছে। কিন্তু ধিক্ আমাকে, আমি জিতেন্দ্রিয় হতে পারি নি। নারী-চরিত্র কে বুঝবে? তাদের মুখ শরতের পদ্মের মত সুন্দর, কথা কানে অমৃত বর্ষণ করে, কিন্তু হৃদয় ক্ষুরের মত শাণিত। স্বার্থপর নারীর কাছে কেউ প্রিয়

নয়। স্বার্থের জন্য সে স্বামী, পুত্র, ভ্রাতাকে হয় নিজেই হত্যা করে, নয় তো অন্যকে দিয়ে হত্যা করায়। যাহোক, এখন দিতিকে তার প্রার্থিত বর দেব বলে যে কথা দিয়েছি তা যাতে মিথ্যা না হয় আবার ইন্দ্রও নিহত না হয়, তাই করা দরকার। ভগবান কশ্যপ এইরকম চিন্তা করে একটু রাগের বশেই নিজেকে নিন্দা করতে করতে দিতিকে বললেন, দেখ কল্যাণী, তুমি যদি এক বছর বিধি অনুসারে এই ব্রত পালন করতে পার তবে তোমার এমন পুত্র হবে যে হয় ইন্দ্রকে বধ করবে, না হয় তো দেবতাদের বন্ধু হবে। দিতি বললেন, তাই হবে। আপনি যেমন বলবেন আমি সেভাবেই ব্রত ধারণ করব। এখন আমি কি করব আর কি করব না অর্থাৎ যা করলে ব্রত নষ্ট হবে না তা বলে দিন। ৩৭-৪৭

কশ্যপ বললেন, এই ব্রতে একত্রিশটি কাজ নিষিদ্ধ, যথা—প্রাণিহিংসা করবে না, কাউকে শাপ দেবে না, মিথ্যা কথা বলবে না, নখ এবং লোম কাটবে না, অমঙ্গলজনক কোন জিনিস ছোঁবে না। জলে নেমে স্নান করবে না, কখনও রাগ করবে না, দুর্জনের সঙ্গে কথা বলবে না, না-ধোয়া কাপড় পরবে না, একবার পরা মালা আর পরবে না। উচ্ছিষ্ট, ভদ্রকালীকে নিবেদন করা আমিষ, শূদ্রার ছোঁয়া বা ঋতুমতী নারীর দেখা অন্ন খাবে না, অঞ্জলি করে জল পান করবে না। উচ্ছিষ্টমুখে, না আঁচিয়ে, সন্ধ্যায় এলোচুলে, অলঙ্কার না পরে, বাক্য সংযম না করে বা সমস্ত গা না ঢেকে ঘরের বাইরে যাবে না। পা না ধুয়ে, অপবিত্র অবস্থায়, ভিজে পায়ে উত্তর বা পশ্চিম দিকে মাথা রেখে, অন্যের সঙ্গে, বিবস্ত্র হয়ে বা সকালে এবং সন্ধ্যায় শোবে না। প্রতিদিন প্রাতে খাবার আগে ধোয়া কাপড় পরে, সব-রকম মাঙ্গলিক দ্রব্য আহরণ করে, পবিত্রভাবে গো, ব্রাহ্মণ, লক্ষ্মী, নারায়ণের পুজো করবে। মালা, গন্ধ, উপহার এবং অলংকার দিয়ে সধবা স্ত্রীদের অর্চনা করবে। স্বামীর অর্চনা করে তাঁর সেবা করবে এবং তিনি তোমার গর্ভে আছেন এই রকম ধ্যান করবে। এই পুংসবন ব্রত যদি একবছর নির্বিঘ্নে পালন করতে পার তবে তোমার যে পুত্র হবে সে ইন্দ্রকে হত্যা করবে। মহারাজ, উদারমতি দিতি 'তাই করব' বলে ব্রত স্বীকার করলেন এবং কশ্যপের থেকে গর্ভ ধারণ করে ব্রত পালন করতে লাগিলেন। ৪৮-৫৫

এদিকে মাসীর[১] মনের ইচ্ছার কথা জানতে পেরে ইন্দ্র নিজের স্বার্থে দিতির খুব সেবা করতে লাগলেন। রোজ তিনি বন থেকে ফুল, ফলমূল, যজ্ঞের কাঠ, কুশ, পাতা, অংকুর, মাটি আর জল এনে দিতিকে দিতেন। মহারাজ, ব্যাধ যেমন হরিণকে ভোলাবার জন্য হরিণের বেশ ধরে, ইন্দ্রও তেমনি ব্রতচারিণী দিতির ব্রতে ছিদ্র বার করবার জন্য সাধু সেজে তাঁর সেবা করছিলেন। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও ইন্দ্র ব্রতের কোন ত্রুটি না পেয়ে কিসে তাঁর মঙ্গল হবে সেই চিন্তায় আকুল হলেন। একদিন সন্ধ্যায় ব্রত পালনে ক্লান্ত দিতি দৈববশে খাবার পর ভুলে না আঁচিয়ে এবং পা না ধুয়েই ঘুমিয়ে পড়লেন। এই ছিদ্র পেয়ে ইন্দ্র তখনি যোগমায়ার বলে ঘুমে অচেতন দিতির উদরে ঢুকে পড়লেন এবং তাঁর গর্ভের স্বর্ণকান্তি সন্তানকে বজ্র দিয়ে সাতখণ্ড করে ফেললেন। ঐ খণ্ডগুলি কেঁদে উঠলে তিনি 'কেঁদো না' বলে ঐ সাত খণ্ডের প্রত্যেক খণ্ডকে আবার সাতখণ্ডে ভাগ করে ফেললেন। মহারাজ, ইন্দ্র যখন গর্ভকে এইভাবে খণ্ড খণ্ড করছিলেন তখন খণ্ডিত অংশগুলি হাত জোড় করে তাঁকে বলল, ইন্দ্র, আমরা মরুৎ, তোমারই ভাই, তুমি আমাদের মারতে চাইছ কেন? তখন ইন্দ্র তাদের বললেন, ভয় পেয়ো

[১] দিতি ইন্দ্র ইত্যাদির মা দেবমাতা অদিতির বোন।

না, তোমরা আমার ভাই-ই। সাতটি দলে বিভক্ত মরুৎদের ইন্দ্র নিজের পার্ষদ করে নিলেন। ৫৬-৬৪

মহারাজ, তুমি যখন মায়ের গর্ভে ছিলে তখন অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্রে আহত হলেও শ্রীহরির অনুগ্রহে তোমার যেমন মৃত্যু হয় নি, তেমনি দিতির গর্ভ ইন্দ্রের বজ্রে খণ্ডবিখণ্ড হয়ে শ্রীহরির কৃপায় নষ্ট হল না। কারণ যে আদিপুরুষ শ্রীহরিকে একবার মাত্র পূজা করলে মানুষ তাঁর ভাব পায়, দিতি কিছু কম এক বছর তাঁর পূজা করেছিলেন। সেই উনপঞ্চাশ মরুৎ ইন্দ্রের সঙ্গে মিলে মোট পঞ্চাশজন দেবতা হলেন। শ্রীহরি তাদের মাতৃদোষ অর্থাৎ অসূয়ত্ব দূর করে তাদের সোমপানের অধিকারী করলেন। দিতি জেগে উঠে ইন্দ্রের সংগে আগুনের মত উজ্জ্বল তাঁর শিশুসন্তানদের দেখে আনন্দিত হলেন। তিনি ইন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করলেন, বৎস, অদিতির পুত্রেরা যাকে ভয় করবে এমন পুত্রের জন্য আমি একবছর দুঃসাধ্য ব্রত পালন করেছি। আমি চেয়েছিলাম একটিমাত্র পুত্র, সেখানে উনপঞ্চাশটি হল কি করে? এর কারণ যদি তুমি জান তবে সত্য করে বল, মিথ্যা বল না। ৬৫-৭০

ইন্দ্র বললেন, মাতা, আপনার অভিপ্রায় জেনে আমি সেবা করবার ছলে আপনার কাছ থেকে ব্রতের ছিদ্র খুঁজেছি। আজ সুযোগ পেয়ে গর্ভ ছেদন করেছি। স্বার্থের বশে কাজ করতে গিয়ে আমি ধর্মের কথা চিন্তা করি নি। আপনার গর্ভকে সাত খণ্ড করলে প্রথমে সাতটি কুমার হয়। তারপর সেই সাতজনের প্রত্যেককে আবার সাত ভাগে কেটেছি। কিন্তু এতেও কারোই মৃত্যু হল না —এই অতি আশ্চর্য ব্যাপার দেখে আমি নিশ্চিত বুঝলাম যে এ মহাপুরুষ শ্রীহরিকে পূজা করবার ফল। যাঁরা নিষ্কামভাবে ঈশ্বরের আরাধনা করে মোক্ষ পর্যন্ত চান না, তাঁদেরই প্রকৃত স্বার্থলাভ হয়। জগতের ঈশ্বর শ্রীহরি ভক্তের কাছেই নিজেকে সমর্পণ করেন, তিনি ভক্তের আত্মা। কোন্ জ্ঞানী ব্যক্তি তাঁকে আরাধনা করে তার কাছে তুচ্ছ বিষয়ভোগ প্রার্থনা করবে? বিষয়ভোগ তো নরকেও আছে। তাই হে মহীয়সী মাতা, আমি মূর্খ বলে আমার এই গর্হিত কাজ আপনি ক্ষমা করুন। সৌভাগ্য যে আমার কাজে অন্য ক্ষতি হয় নি; আপনার গর্ভ নষ্ট হয়েও আবার জীবিত হয়েছে। ৭১-৭৬

শুকদেব বললেন, ইন্দ্রের এই আন্তরিক এবং শুদ্ধভাব দেখে সন্তুষ্ট হয়ে দিতি তাঁকে স্বর্গে ফিরে যাবার অনুমতি দিলেন। ইন্দ্রও মরুৎদের সঙ্গে দিতিকে প্রণাম করে চলে গেলেন। মহারাজ, তুমি আমার কাছে যা জিজ্ঞাসা করেছিলে মরুৎগণের সেই মঙ্গলময় জন্মকথা সম্পূর্ণ তোমাকে বললাম। এবার আর কি বলব। ৭৭-৭৮

উনবিংশ অধ্যায়

পুংসবন-ব্রতের কথা

পরীক্ষিৎ বললেন, ব্রহ্মন্, আপনি যে পুংসবন ব্রতের কথা বললেন, যাতে বিষ্ণু প্রসন্ন হন, তা বিস্তারিতভাবে জানতে ইচ্ছা হচ্ছে। শুকদেব বললেন, স্ত্রী স্বামীর অনুমতি নিয়ে অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লপক্ষের প্রতিপদ তিথি থেকে এই সর্বকামপ্রদ

ব্রত আরম্ভ করবে। মরুৎগণের জন্মকথা শুনে এবং ব্রাহ্মণদের অনুমতি নিয়ে দাঁত মেজে স্নান করে দুখানি সাদা কাপড় (গায়ের চাদর আর পরবার কাপড়) পরবে। তারপর অলঙ্কার ধারণ করে প্রাতে জলযোগের আগেই লক্ষ্মী-নারায়ণের পূজো করবে। পূজোর মন্ত্র—হে পূর্ণকাম, তোমার সব সম্পদই প্রচুর আছে বলে অন্য বস্তুর অপেক্ষা নেই। তুমি লক্ষ্মীদেবীর পতি, অণিমা ইত্যাদি সব সিদ্ধি তোমাতে রয়েছে, তাই তোমাকে শুধু প্রণাম করি। হে ঈশ, দয়া, ধৈর্য, তেজ, সামর্থ্য, মহিমা এবং অন্যান্য গুণ যতদূর থাকা দরকার সবই তোমাতে আছে। তুমিই ভগবান এবং সকলের প্রভু। হে মহামায়া, বিষ্ণুপত্নী, মহাপুরুষ নারায়ণের সর্বগুণই তোমাতে রয়েছে। হে জগন্মাতা, তুমি সন্তুষ্ট হও, আমি তোমাকে প্রণাম করি। ১-৬

মহাবিভূতি অর্থাৎ লক্ষ্মীর ঈশ্বর, মহানুভাব, ভগবান মহাপুরুষকে আমি নমস্কার করি। মহাবিভূতিযুক্ত তোমাকে পূজোর উপহার অর্পণ করছি। প্রতিদিন একাগ্রচিত্ত হয়ে ঐ মন্ত্রে বিষ্ণুকে আহ্বান করে পাদ্য, অর্ঘ্য; আচমনের এবং স্নানের জল, বস্ত্র, উপবীত, অলঙ্কার, গন্ধ, ধূপ, দীপ ও অন্যান্য উপকরণ নিবেদন করবে। তারপর হবি-শেষ অর্থাৎ ঐ সব উপচারের বাকী অংশ দিয়ে বারো বার অগ্নিতে আহুতি দেবে। তার মন্ত্র হল - 'আমি মহাবিভূতিপতি মহাপুরুষ ভগবানের উদ্দেশ্যে এই উপহার সমর্পণ করছি।' যে সম্পদ কামনা করে, সে সব কাম্যবস্তুর আধার বরদাতা লক্ষ্মী এবং বিষ্ণু উভয়কেই ভক্তির সঙ্গে পূজো করবে এবং ভক্তিনম্র হয়ে মাটিতে লুটিয়ে প্রণাম করবে। তারপর দশবার মন্ত্র জপ করে এই স্তোত্র পাঠ করবে—হে দেব, হে দেবী, তোমরা দুজনেই জগতের প্রভু এবং পরম কারণ। হে নারায়ণ, লক্ষ্মীদেবী তোমার সূক্ষ্ম প্রকৃতি, তিনিই দুর্বার মায়াশক্তি আর তুমি তাঁর অধীশ্বর, সাক্ষাৎ পরম পুরুষ। তুমি সমস্ত যজ্ঞ, তিনি ইজ্যা।[১] আবার তিনি ক্রিয়া, তুমি তার ফলভোক্তা। তিনি গুণময়ী, তুমি গুণের প্রকাশক এবং ভোক্তা। তুমি সব জীবের আত্মা; তিনি দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ। ভগবতী লক্ষ্মীদেবী নাম এবং রূপ, তুমি ঐ নামরূপের প্রকাশক এবং আধার। হে পুণ্যকীর্তি, পরমেশ্বর আর পরমেশ্বরী রূপে তোমরা দুজনে যেমন ত্রিভুবনকে বর দান করছ, তেমনি তোমাদের অনুগ্রহে আমার মনের সব কামনা পূর্ণ হোক। ৭-১৪

এইভাবে লক্ষ্মীদেবীর সংগে বরদাতা নারায়ণের স্তব করে পূজোর সব উপচার সেখান থেকে সরিয়ে নেবে এবং আচমনের জল নিবেদন করে অর্চনা করবে। তারপর ভক্তিনম্র চিত্তে স্তব করে এবং যজ্ঞের অবশিষ্ট বস্তুর ঘ্রাণ নিয়ে আবার পূজো করবে। পূজো হলে পরম ভক্তিতে নিজের স্বামীকে ঈশ্বর জ্ঞানে ঐসব প্রিয় বস্তু নিবেদন করে পূজো করবে। স্বামীও প্রেমশীল হয়ে স্ত্রীর সমস্ত কাজে সহায়তা করবে। স্ত্রী যদি এই ব্রত পালন করতে না পারে তবে স্বামীই একচিত্ত হয়ে তা করবে, কারণ উভয়ের মধ্যে যে কোন একজন করলেও দুজনেই তার ফল পাবে। ভগবান বিষ্ণুর এই ব্রত নিলে তাতে যেন ছেদ না পড়ে। ব্রত চলতে থাকার সময় প্রতিদিন ভক্তির সঙ্গে মালা, গন্ধদ্রব্য, নানা উপহার আর অলংকার দিয়ে ব্রাহ্মণ এবং সধবা নারীদের পূজো করবে, নিয়ম অনুসারে ভগবান বিষ্ণুর আরাধনা করবে। তারপর আরাধ্য ভগবানকে তাঁর স্থানে বিসর্জন দিয়ে চিত্ত-শুদ্ধি এবং সর্বপ্রকার কামনা পূরণের জন্য নিবেদন-করা বস্তুর কিছু অংশ

১ যজ্ঞীয় কর্মবিশেষ।

প্রসাদরূপে খাবে। সাধ্বী স্ত্রী এক বছর অর্থাৎ বারো মাস যাবৎ এই পূজাবিধি পালন করে কার্তিকের পূর্ণিমা তিথিতে উপবাস করবে। ১৫-২১

সেই রাত্রি প্রভাত হলে স্বামী স্নান করে কৃষ্ণের অর্চনা করবার পর দুধে ঘি দিয়ে চরু পাক করে বারো বার আহুতি দেবে। তারপর ব্রাহ্মণরা সন্তুষ্ট হয়ে আশীর্বাদ করলে তা মাথা পেতে নিতে হবে। ভক্তিভরে পায়ে মাথা ঠেকিয়ে তাঁদের প্রণাম করে তাঁদের আদেশ নিয়ে সেই চরু খাবে। এরপর আচার্যকে আগে রেখে, কথা বন্ধ করে, বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে পত্নীর কাছে গিয়ে তাঁকে ঐ চরুর শেষ অংশ খেতে দেবে। এতে সৎপুত্র আর সৌভাগ্য লাভ হয়। বিষ্ণুর এই ব্রত ঠিকভাবে পালন করলে পুরুষ ইহজন্মে যা চায় তাই পায়, এবং স্ত্রী এর দ্বারা সৌভাগ্য, শ্রী, পুত্র, যশ, আর গৃহ লাভ করে চিরদিন সধবা থাকে। কুমারী এই ব্রত পালন করলে সম্পূর্ণ সুলক্ষণযুক্ত স্বামী, আর বিধবা নিষ্পাপ গতি পায়। মৃতবৎসা জীবিত পুত্র পায়, দুর্ভাগা নারী ধনেশ্বরী এবং সৌভাগ্যবতী হয়, কুরূপা সুরূপা হয়, রোগী রোগমুক্ত হয়ে ইন্দ্রিয়ের শক্তির সঙ্গে সুস্থ দেহ লাভ করে। যে ব্যক্তি আভ্যুদয়িক অর্থাৎ শ্রাদ্ধ ইত্যাদি কাজে এই ব্রতকথা পড়বে তার পিতৃগণের এবং দেবগণের অনন্ত তৃপ্তি হবে। হোম শেষ হলে অগ্নি, লক্ষ্মী আর শ্রীহরি তুষ্ট হয়ে সমস্ত কামনা পূর্ণ করেন।[১] মহারাজ, মরুৎগণের পবিত্র জন্ম আর দিতির মহাব্রতের কথা তোমাকে বললাম। ২২-২৮

---

১ ঐহিক বিত্ত, পুত্রাদি লাভের নিমিত্ত নানাপ্রকার ক্রিয়ার বিধান বৃহদারণ্যক উপনিষদেও আছে। এ-প্রসঙ্গে ঐ উপনিষদের ষষ্ঠ অধ্যায়ের চতুর্থ ব্রাহ্মণ দ্রষ্টব্য।

সপ্তম স্কন্ধ

প্রথম অধ্যায়

যুধিষ্ঠির ও নারদের কথোপকথন

রাজা বললেন, ব্রাহ্মণ, ভগবান স্বয়ং সর্বত্র সমদর্শী, সর্বভূতের প্রিয় ও সুহৃদ। তিনি কেন ইন্দ্রের জন্য বৈষম্যমূলক আচরণ করে দৈত্যদের প্রাণ নাশ করলেন? তিনি স্বয়ং পরমানন্দ; দেবতাদের দিয়ে তাঁর কোন স্বার্থসিদ্ধির প্রয়োজন নেই; তিনি গুণের অতীত, তাঁর কোন উদ্বেগেরও কারণ নেই। হে মহাভাগ্যবান, নারায়ণের প্রতি আমাদের এই সন্দেহ আপনি দূর করুন। ঋষি বললেন, মহারাজ, আপনি শ্রীহরির অদ্ভুত চরিত্র সম্বন্ধে প্রাসঙ্গিক প্রশ্নই করেছেন। যে ভগবৎ-মাহাত্ম্য ভগবানের প্রতি ভক্তি বাড়ায়, নারদ এবং অন্যান্য ঋষিরা যে পবিত্র পুণ্যকথা গান করেন, আমি মুনি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসকে প্রণাম করে সেই হরিকথা বর্ণনা করব। ১-৫

প্রকৃতির অতীত পরমপুরুষ ভগবান গুণাতীত, তাই তিনি রাগ, দ্বেষ ও দ্বন্দ্বহীন। তাঁর শরীর ও ইন্দ্রিয়সকল না থাকলেও, তিনি নিজের মায়াগুণ আশ্রয় করে বাধ্যবাধকতা স্বীকার করেন। সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিনগুণ প্রকৃতির, আত্মার নয়। এদের হ্রাস বা বৃদ্ধি একসঙ্গে হয় না। সত্ত্বগুণে নিজের বৃদ্ধির সময়ে দেবতা ও ঋষিকে, রজোগুণে বৃদ্ধির সময় অসুরদের ও তমোগুণে রাক্ষসদের সমৃদ্ধ করে। ভগবান সকলের মধ্যে সমানভাবে থাকলেও আশ্রয়ভেদে বৈষম্য হয়। যেমন কাঠে আগুনের পাত্রভেদে জলের ঘট বা পটে আকাশের নানারূপ দেখা যায়, তেমনি পরমাত্মাও নানাদেহে নানারূপে প্রকাশ পান। যদি বলা হয় সর্বাশ্রয় ভগবানকে সর্বত্র দেখা যায় না কেন, তার উত্তরে বলা যায় যে অবিবেকী ব্যক্তি সর্বত্র তাঁকে জানতে পারে না সত্য, কিন্তু বিচারবান, নিপুণ পুরুষ আত্মস্থ ভগবানকে মনন করে দর্শন ও লক্ষণের সাহায্যে শেষ পর্যন্ত তাঁকে জানতে পারেন। যখন ভগবান শরীর সৃষ্টির ইচ্ছা করেন তখন তিনি নিজের মায়া দ্বারা রজোগুণকে পৃথক করে সৃষ্টি করেন। যখন তিনি ঐ সমস্ত বিবিধ শরীরে ক্রীড়া করতে অভিলাষী হন, তখন সত্ত্বগুণকে সৃষ্টি করেন। আর সেইসব শরীর সংহার করতে ইচ্ছা করে তিনি তমোগুণের সৃষ্টি করেন। তিনি নিজের মায়ায় সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার করেন। হে নরেন্দ্র, ভগবান পুরুষের সহায়কারী প্রকৃতিকে সৃষ্টি করেছেন। আবার এদের সহায়কারী কালকেও তিনিই সৃষ্টি করেন। অতএব তিনি কালের অধীন নন। সেই কাল সত্ত্বগুণেরই বৃদ্ধি সাধন করছে। সেই কারণে সুরপ্রিয় ঈশ্বরও সত্ত্বগুণপ্রধান দেবগণেরই ইষ্টকামনা করে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী রজস্তমোগুণ সম্পন্ন অসুরদের বিনাশ সাধন করছেন। ৬-১১

মহারাজ, যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞে প্রশ্ন করলে দেবর্ষি সন্তুষ্ট হয়ে পূর্বে এই বিষয়েই একটি কাহিনী বলেছিলেন। চেদিরাজ শিশুপাল ভগবানের সঙ্গে সাযুজ্য লাভ করলেন। এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখে যুধিষ্ঠির বিস্মিত হয়ে দেবর্ষিকে এর কারণ জিজ্ঞাসা

করলেন। সভায় উপস্থিত অন্যান্য মুনিরাও যুধিষ্ঠিরের কথা শুনতে লাগলেন। যুধিষ্ঠির বললেন, খুবই আশ্চর্যের বিষয় যে একান্ত ভক্তদের পক্ষেও পরমতত্ত্ব বাসুদেবের যে সাযুজ্যলাভ দুর্লভ, চেদিরাজ শত্রু হয়েও তা লাভ করলেন। হে মুনি, ভগবানের নিন্দা করেছিল বলে রাজা বেণকে ব্রাহ্মণেরা নরকে নিক্ষেপ করেছিলেন। কিন্তু দমঘোষের পাপিষ্ঠ পুত্র এবং দুষ্টচরিত্র দন্তবক্র আধফোটা কথা শিখতে শিখতেই গোবিন্দের বিদ্বেষী হয়েছিল। এরা অবিনাশী পরমব্রহ্ম বিষ্ণুর প্রতি বারবার কটূক্তি করেছে, তবুও যে এদের জিহ্বায় কুষ্ঠব্যাধি হয় নি এবং এরা যে ঘোর নরকে প্রবেশ করল না আমরা কেউ এর কারণ বলতে পারব না। এই সমস্ত লোকের সাক্ষাতেই তারা কি করে সুদুর্লভ সেই ভগবানের সাযুজ্য লাভ করল? যেমন বায়ুর দ্বারা দীপশিখা চালিত হয়, সেইরকম এই ঘটনায় আমার বুদ্ধি অস্থির হয়েছে। নিশ্চয়ই এর কোন একটা আশ্চর্য কারণ রয়েছে। আপনি সব জানেন, আপনাকে তা বলতে হবে। ১২-২০

শুকদেব বললেন, ঋষি নারদ রাজা যুধিষ্ঠিরের সেই কথা শুনে আনন্দিত হয়ে তাঁকে বলতে আরম্ভ করলেন, আর সভার সমস্ত লোক তা শুনতে লাগল। নারদ বললেন, মহারাজ, নিন্দা-স্তুতি এবং সৎকার-তিরস্কার অনুভব করার জন্য প্রকৃতি ও পুরুষের অবিবেক বশে এই দেহ তৈরী হয়েছে। পৃথিবীতে মানুষের দেহে অহংভাব থাকায় প্রাণীদের 'আমি' ও 'আমার' এইরকম বৈষম্যবোধ জন্মে এবং এর জন্যই সংসারে পীড়ন, তাড়ন ও নিন্দা হয়ে থাকে। যাকে নিয়ে অহংকার তার বিনাশ হলে প্রাণীদেরও বিনাশ হয়। কিন্তু ঈশ্বর অদ্বিতীয় এবং সকলের আত্মা; তাঁর এরূপ অহংবোধ নেই। সুতরাং তাঁর দ্বারা হিংসা কোন মতেই কখনো সম্ভব নয়। তবে পরম নিয়ন্তা ঈশ্বর যে দানব বধ করেন তা তাদের মঙ্গলের জন্য দণ্ডদান মাত্র, এটা হিংসা নয়। অতএব বৈরিভাবেই হোক বা নির্বৈর ভক্তিভাবেই হোক অথবা স্নেহ, কাম বা অন্য যে কোনো প্রকারে হোক ভগবানকে চিন্তা করা কর্তব্য। মানুষ শত্রুতা দ্বারা যে রকম তন্ময়তা লাভ করতে পারে ভক্তিযোগের দ্বারা সেরূপ সম্ভব নয়—এটা আমার ধারণা। কাঁচপোকার ভয়ে তেলাপোকা গর্তে প্রবেশকালে কাঁচপোকার কথা মনে করতে করতে তারই স্বরূপতা লাভ করে। ২১-২৮

জীব ভক্তির পথে ভগবানে মনঃসংযোগ করে যেমন পাপ থেকে নিস্তার পেয়ে ভগবানকে লাভ করে, তেমনি কাম, দ্বেষ, ভয় বা স্নেহ দিয়েও অনেকে তাঁকে লাভ করেছেন। কামভাবে গোপীরা, ভয়ে কংস, দ্বেষ করে শিশুপাল প্রভৃতি রাজারা, সম্বন্ধ দ্বারা বৃষ্ণিবংশীয়েরা, স্নেহের দ্বারা তোমরা এবং ভক্তি দ্বারা আমরা তাঁকে পেয়েছি। কিন্তু রাজা বেণ এই পাঁচ উপায়ের কোন উপায়েই কৃষ্ণ-চিন্তা করেন নি। অতএব যে কোন উপায়েই হোক শ্রীকৃষ্ণে মন দেবে। পাণ্ডবগণ, তোমাদের মাসতুত ভাই শিশুপাল এবং দন্তবক্র এই দুজনেই বিষ্ণুর প্রধান সহচর, এরা ব্রহ্মশাপে পদচ্যুত হয়। ২৯-৩২

যুধিষ্ঠির বললেন, যে শাপ বিষ্ণুভৃত্যকে আক্রমণ করেছিল সে শাপ কিরকম এবং কার? হরিভক্তদের জন্মকথা যেন বিশ্বাসযোগ্য মনে হচ্ছে না। প্রাকৃত দেহ, ইন্দ্রিয় ও প্রাণের সঙ্গে শুদ্ধ সত্ত্বময় শরীরধারী বৈকুণ্ঠ-পুরবাসীদের কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু তাঁরা কি প্রকারে প্রাকৃত দেহ বন্ধনে আবদ্ধ হলেন তা আপনি বলুন। ৩৩-৩৪

নারদ বললেন, একদিন ব্রাহ্মণপুত্র সনন্দন প্রভৃতি ঋষিরা ত্রিভুবন পরিক্রমা

করতে করতে স্বেচ্ছায় বিষ্ণুলোকে উপস্থিত হলেন। যদিও তাঁরা মরীচি প্রভৃতি ঋষিদের অপেক্ষা বড়, কিন্তু দেখতে পনের কি ষোল বছরের বালকের মতো। তাঁরা বিবস্ত্র ছিলেন। দু'জন দ্বাররক্ষী তাঁদের বালক মনে করে প্রবেশ করতে নিষেধ করলে তাঁরা ক্রুদ্ধ হয়ে শাপ দিলেন—তোরা দুইজন রজ ও তমোগুণরহিত মধুসূদনের পাদমূলেরও যোগ্য নোস্‌; তোরা নির্বোধ, পাপিষ্ঠ। এখনই পাপময় আসুরী যোনিতে গিয়ে জন্মগ্রহণ কর। পরে ঋষিরা দয়াপরবশ হয়ে বললেন, তিন জন্মের পর আবার তোরা স্বস্থানে ফিরে আসবি। তারা দিতির পুত্ররূপে জন্ম লাভ করে দৈত্য ও দানবদের মধ্যে প্রধান হয়েছিল। জ্যেষ্ঠের নাম হিরণ্যকশিপু ও কনিষ্ঠের নাম হল হিরণ্যাক্ষ। শ্রীহরি নরসিংহরূপ ধারণ করে হিরণ্যকশিপুকে এবং ধরণী উদ্ধার করার সময়ে বরাহমূর্তি ধারণ করে হিরণ্যাক্ষকে বধ করেন। হিরণ্যকশিপু তার হরিভক্ত পুত্র প্রহ্লাদকে হত্যা করতে অভিলাষী হয়ে তাকে নানারকম মৃত্যুতুল্য যন্ত্রণা দেয়। সর্বভূতের আত্মস্বরূপ শান্ত ও সমদর্শী প্রহ্লাদকে ভগবান আপন তেজে ঢেকে রেখেছিলেন। সুতরাং নানা উপায়েও হিরণ্যকশিপু তাকে বধ করতে পারল না। তারপর তারা বিশ্বশ্রবার ঔরসে কেশিনীর গর্ভে রাবণ ও কুম্ভকর্ণ নামে রাক্ষসরূপে জন্মলাভ করে মানবকুলের অশান্তির কারণ হয়ে ওঠে। তখন রাঘবরূপে শ্রীহরি তাদের শাপ-মুক্তির জন্য বধ করেন। মহারাজ, মার্কণ্ড মুনির মুখে শ্রীরামের কথা পরে শুনবে। সেই দুজন এই জন্মে তোমার মাসীর পুত্ররূপে শিশুপাল ও দন্তবক্র নাম নিয়েছে; শ্রীকৃষ্ণের চক্রদ্বারা নিহত হওয়ার ফলে শাপমুক্ত হল। তারা বহুদিন বৈরভাবে কৃষ্ণকে একাগ্রচিত্তে ধ্যান করেছিল; তারই ফলে তারা অচ্যুতের সাযুজ্য লাভ করে বিষ্ণুসান্নিধানে গমন করেছে। ৩৫-৪৬

যুধিষ্ঠির বললেন, প্রিয়পুত্র মহাত্মা প্রহ্লাদের প্রতি পিতা হিরণ্যকশিপুর বিদ্বেষ হল কেন? প্রহ্লাদই বা কি কারণে শ্রীকৃষ্ণে একাগ্রচিত্ত হয়েছিলেন? প্রভু, কৃপা করে এসব কথা আমাকে বলুন। ৪৭

দ্বিতীয় অধ্যায়

হিরণ্যকশিপু কর্তৃক ভ্রাতুষ্পুত্রদের সান্ত্বনাদান

নারদ বললেন, মহারাজ, দেবতাদের মঙ্গলসাধনের জন্য ভগবান বরাহমূর্তি ধরে হিরণ্যাক্ষকে হত্যা করলে তার ভাই হিরণ্যকশিপু রাগে অস্থির হয়ে বার বার নিজের ঠোঁট কামড়াতে লাগল। ক্রোধদীপ্ত চোখে সে ধূমায়িত আকাশের দিকে তাকাল। তারপর শূল উদ্যত করে সভায় উপস্থিত দানবদের বলল, দানবগণ, তোমরা আমার কথা শুনে সেই অনুযায়ী কাজ কর; বিলম্ব করো না। ক্ষুদ্র শত্রুরা আমার প্রিয় ও পরম সুহৃদ সহোদরকে বিনষ্ট করেছে। ভগবান শ্রীহরি সর্বত্র সমদর্শী বলে পরিচিত, কিন্তু সেই হরি দেবতাদের সেবার প্রলোভনে মুগ্ধ হয়ে অস্থিরচিত্ত বালকের মত নিজের স্বভাব ত্যাগ করে বরাহমূর্তি ধরেছেন। যে তাঁকে ভজনা করে তিনি তারই অনুগত হয়ে থাকেন। আমি শূল দিয়ে তাঁর গলা চিরে ঐ রক্তে আমার ভাইয়ের তর্পণ করে মনের দুঃখ দূর করব। গাছের মূলোচ্ছেদ করলে যেমন তার শাখা-প্রশাখা শুকিয়ে যায়, তেমনি সেই কপট-শত্রু হরি বিনষ্ট হলে বিষ্ণুপ্রাণ দেবতারাও বিনষ্ট হবে। এখন তোমরা দৈত্যরা ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় পরিপূর্ণ

পৃথিবীতে গিয়ে যজ্ঞ, বেদপাঠ, ব্রত-নিয়ম এবং দান প্রভৃতি কর্মে নিযুক্ত ধর্ম-পরায়ণ লোকদের সংহারে প্রবৃত্ত হও। যদিও তাদের কোন দোষ নেই, তবুও যজ্ঞক্রিয়াই বিষ্ণুর মূল, আর বিষ্ণু স্বয়ং যজ্ঞমূর্তি এবং ধর্মময়। তিনিই দেবতা, ঋষি, পিতৃপুরুষ ও অন্যান্য প্রাণীসহ ধর্মের আশ্রয়। যেখানে যেখানে গো, ব্রাহ্মণ, বেদ ও বেদবিহিত বর্ণাশ্রমোচিত কাজ দেখবে সেই সেই নগর ও গ্রাম জ্বালিয়ে দেবে এবং সেখানকার বৃক্ষাদিও কেটে ফেলবে। ১-১৪

সংহারপ্রিয় দানবগণ প্রভু হিরণ্যকশিপুর আদেশ শিরোধার্য করে প্রজা-সংহারে প্রবৃত্ত হল। হাট-বাজারের সঙ্গে গ্রাম নগর, গোচারণভূমি, বাগান-বাড়ী, ধানের ক্ষেত, বনপ্রদেশ, ঋষিদের আশ্রম, চাষীদের ঘরবাড়ী, পার্বত্য প্রদেশ, গোপপল্লী, রাজধানী সর্বত্র তারা অগ্নিকান্ড শুরু করল। কেউ কেউ কুঠার নিয়ে ফলের গাছ-গুলো কাটতে লাগল। তারা শাবল দিয়ে সেতু, প্রাচীর ও বড় বড় দ্বার ভেঙ্গে ফেলল। কেউ কেউ আশ্রয়স্থানগুলোও জ্বলন্ত কাঠ দিয়ে জ্বালিয়ে দিল। এইভাবে দৈত্যরাজের অনুচরেরা জনগণকে অসহায় করে ফেললে যজ্ঞভাগের অভাবহেতু দেবতারা স্বর্গ ছেড়ে আত্মগোপনের জন্য ধরাতলে বিচরণ করতে লাগলেন। হিরণ্যকশিপু ভ্রাতার মৃত্যুর পর তর্পণ, শ্রাদ্ধাদি কাজ করল। পরে শকুনি, শম্বর, ধৃষ্টি, ভূতসন্তাপন, বৃক, কালনাভ, মহানাভ, হরিশ্মশ্রু ও উৎকচ—এই সব ভ্রাতুষ্পুত্র ও তাদের মাতা, ভ্রাতৃবধূ ভানু এবং নিজের মা দিতিকে সান্ত্বনা দিয়ে মধুর বচনে হিরণ্যকশিপু বলল, মাতা, বধূমাতারা, ভ্রাতুষ্পুত্রেরা, আমার বীর ভ্রাতার জন্য তোমাদের শোক করা উচিত নয়। বীর পুরুষেরা শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে মৃত্যু বরণ করে। সব বীর এইভাবে মৃত্যুকামনা করে। পরে মাকে সম্বোধন করে বলল, মা, কোন জলাশয়ে যেমন জল-পিপাসুরা চারদিক থেকে মিলিত হয় আবার কর্মশেষে নিজ নিজ কাজে ফিরে যায়, সংসারের প্রাণীদের সম্বন্ধেও সেইরকম বলা চলে। তারা পূর্বজীবনের কর্মফলে কখনও সংযোজিত, কখনও বা বিয়োজিত হয়। আত্মার মৃত্যু নেই, তিনি অব্যয়, নির্মল, সর্বগত ও সর্বজ্ঞ; কারণ তিনি দেহ থেকে ভিন্ন। আত্মা মায়াপ্রভাবে জীবের লিঙ্গশরীর ধারণ করে কখনও জন্ম কখনও মৃত্যুর বশীভূত হয়। যেরকম জল চঞ্চল হলে প্রতিবিম্বিত গাছগুলোকেও চঞ্চল মনে হয়, আর চোখ ঘুরলে মাটিও ঘুরছে মনে হয়, সেই রকম মন ত্রিগুণ দ্বারা ভ্রান্ত হলে পূর্ণপুরুষ লিঙ্গদেহবিহীন হয়েও ঐ মনের সমপর্যায় বলে প্রতীয়মান হন। এই যে আত্মাকে দেহ বলে ভুল হয় এরই নাম আত্ম-বিপর্যাস। এই আত্ম-বিপর্যাস বা বিপরীত ভাবনাই প্রিয়জনের বিয়োগ, অপ্রিয়ের সঙ্গে সংযোগ এবং কর্ম ও সংসারের মূল। ১৫-২৫

এর থেকে জন্ম, মৃত্যু, শোক, অবিবেক, চিন্তা এবং বিবেক-বিস্মরণ হয়। মানুষ অকারণে শোক করে। এ বিষয়ে পণ্ডিতরা একটি পুরোনো ইতিহাস থেকে উদাহরণ দিয়ে থাকেন। কোন মৃতলোকের আত্মীয়দের সঙ্গে যমরাজের আলাপ হয়েছিল, এরূপ একটি ঘটনা বলছি, মন দিয়ে শোন। উশীনর দেশে সুযজ্ঞ নামে একজন প্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন। তিনি শত্রুদের দ্বারা নিহত হলে তাঁর জ্ঞাতিরা তাঁর কাছে উপস্থিত হলেন। সেই সময় যুদ্ধক্ষেত্রে আত্মীয় পরিবেষ্টিত রাজার শরীরের রত্নখচিত কবচ বিশীর্ণ এবং অলংকারগুলি স্থানচ্যুত হয়েছিল। তীক্ষ্ন বাণে বিদ্ধ হয়ে তাঁর বক্ষস্থল থেকে রক্ত ঝরতে লাগল। তাঁর কেশ বিস্রস্ত, চক্ষু কোটরগত ছিল। তখনও তিনি ক্রোধবশত দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ছিলেন এবং মুখপদ্ম ধুলোয় ধূসরিত ও খণ্ডিতহস্ত অবস্থায় পড়েছিলেন। অদৃষ্টের বিপাকে রাজা উশনীরকে রণস্থলে ঐভাবে শুয়ে থাকতে দেখে তাঁর পত্নীরা নিদারুণ দুঃখে 'নাথ,

আমরাও মরলাম' বলে বুকে করাঘাত করতে করতে তাঁর পায়ে পড়ে রইলেন। তাঁরা কুচ-কুঙ্কুম দ্বারা রঞ্জিত অশ্রুজলে প্রিয় স্বামীর পাদপদ্ম বার বার অভিষিক্ত করে অনেকক্ষণ উচ্চস্বরে ক্রন্দন করতে লাগলেন। শোকের বশে তাঁদের কেশ-বেশ সবই আলুলায়িত হয়ে গেল। তাঁরা এরকম আকুল হয়ে কাঁদছিলেন যে যাঁরাই দেখছিলেন তাঁরাই দুঃখে অভিভূত হলেন। তাঁরা বিলাপ করে বললেন, অকরুণ বিধাতা তোমার কি দশা করেছেন! প্রভু, তুমি ছিলে উশীনর দেশবাসীর বৃত্তিদাতা পালক; এখন সেই তুমি আমাদের শোক বৃদ্ধির কারণ। মহীপতি, তোমার মত পরম সুহৃদের বিরহে আমরা কি ভাবে জীবন ধারণ করব। তুমি যেখানে গিয়েছ সেখানকার পথের সন্ধান দাও, আমরাও তোমাকে অনুসরণ করে সেখানে গিয়ে তোমার সেবা করি। এইরকম বিলাপ করে তাঁরা মৃত পতিকে ঘিরে রইলেন; শব-সৎকারের ইচ্ছা আর তাঁদের ছিল না। এই অবস্থাতেই ক্রমে সূর্যাস্ত-কাল উপস্থিত হল। ২৬-৩৫

মৃতের আত্মীয়দের বিলাপ শুনে স্বয়ং যম বালকমূর্তি ধরে সেখানে উপস্থিত হয়ে তাঁদের বললেন, আহা, এইসব লোক আমার চেয়ে বয়স্ক। এরা বার বার মানুষের জন্ম-মৃত্যু দেখেছে, অথচ এদের কি মোহ। যেখান থেকে মানুষ এসেছিল সেখানেই সে চলে গিয়েছে; তবে এরা এ-রকম বৃথা শোক করে কেন? যারা শোক করে তারাও তো মৃতের সমধর্মী অর্থাৎ তারাও একদিন মরবে, তবে শোক কেন? এটাই আশ্চর্য যে আমাদের বয়স অল্প হলেও আমরা অতি ধন্য। কেননা মাতা-পিতা দ্বারা পরিত্যক্ত হলেও আমাদের মনে চিন্তামাত্র নেই। যাঁর কৃপায় বলহীন অবস্থায়ও হিংস্র বাঘ প্রভৃতি পশু আমাদের খায় নি এবং যিনি গর্ভে অবস্থিত আমাদের সযত্নে রক্ষা করেছেন, তিনিই রক্ষক। অবলাগণ, যে অব্যয় ঈশ্বর আপন ইচ্ছানুসারে এই বিশ্ব রচনা করেছেন, তিনিই সকলের রক্ষাকর্তা। চরাচর বিশ্ব তাঁর ক্রীড়ার সামগ্রী। তিনিই এর সংহার ও পালনের প্রভু। যদি পরমেশ্বরের ইচ্ছা হয়, তবে পথের মধ্যে পড়ে থাকলেও জীব রক্ষা পায়, আর গৃহে সযত্নে থাকলেও তাঁর ইচ্ছা না থাকলে সে রক্ষা পেতে পারে না। বনে রক্ষকহীন প্রাণীও তাঁর কৃপায় বেঁচে থাকে। এদিকে ঘরে পিতামাতা এবং আত্মীয়-স্বজন দ্বারা রক্ষিত থাকলেও শ্রীভগবান যদি প্রতিকূল হন তা হলে সে জীবন ধারণ করতে পারে না। ৩৬-৪০

এই সমস্ত দেহ নিজ-কারণ লিঙ্গশরীরের জন্য কর্মের অধীন হয়ে কালক্রমে উৎপন্ন ও বিনষ্ট হয়। এইভাবেই কর্মবশে দেবতাদিরও দেহ উৎপন্ন ও বিনষ্ট হয়। কিন্তু দেহের মধ্যে থেকেও আত্মা দেহ-ধর্ম, জন্ম, মৃত্যু প্রভৃতিতে আবদ্ধ হন না। কারণ আত্মা দেহ থেকে ভিন্নধর্মী। মোহের বশে মানুষ নিজের দেহ সম্বন্ধে যেরূপ 'আমি স্থূল, আমি কৃশ' এইরকম ভাবে এবং যেরকম বাড়ী-ঘরকে নিজের বলে মনে করে, সেই কারণে দেহই তার নিকট আত্মা বলে প্রতীয়মান হয়। কিন্তু আত্মা দেহ থেকে পৃথক। দেহ ভৌতিক, আত্মা সেরকম নয়। যেমন জলের কণা থেকে বুদ্বুদ, মাটির কণা থেকে ঘট, তৈজস কণা থেকে সোনার তৈরী কুণ্ডল সবই বিনষ্ট হয়, সেরকম পরমাণু থেকে উৎপন্ন সবই বিকৃত হয়, নষ্ট হয়। আত্মা কিন্তু অবিনশ্বর। অগ্নি যেমন কাঠের মধ্যে থেকেও পৃথক, বায়ু যেমন দেহের ভিতর থেকেও ভিন্ন, আকাশ যেরূপ সর্বগত হয়েও কোথাও আবদ্ধ হয় না, সেই রকম আত্মাও সব দেহ এবং ইন্দ্রিয়ের আশ্রয় হয়েও পৃথকই থাকেন। ৪১-৪৩

মূঢ়জন, তোমরা যার জন্য শোক করছ তোমাদের প্রভু সেই সুযজ্ঞ এই তো

শুয়ে রয়েছেন। যিনি শ্রোতা এবং প্রত্যুত্তর-দাতা তিনি কখনই দৃষ্টিগোচর হন না। ইন্দ্রিয়দের প্রধান প্রাণও দ্রষ্টা বা বক্তা নয় ; এই দেহের এবং ইন্দ্রিয়-কাজের সাক্ষী আত্মাই শ্রোতা ও বক্তা। আর তিনি প্রাণ এবং দেহ থেকে আলাদা। উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট সব দেহই পঞ্চভূত, ইন্দ্রিয় এবং মন দিয়ে তৈরী হয়। এই দেহ থেকে আলাদা আত্মাই দেহাভিমানী হন। আবার তিনিই বিবেকবলে এই দেহ ত্যাগ করেন। আত্মা যতক্ষণ লিঙ্গশরীর যুক্ত হয়ে থাকেন ততক্ষণ তাঁর কর্মসকল বন্ধনের কারণ হয় ; তারপর দেহে 'আমি' বলে মিথ্যাজ্ঞান ও পরে ক্লেশ হয়। কিন্তু এ সবই মায়া। গুণ ও গুণকার্য সুখ-দুঃখগুলিকে পরমার্থ বলে দেখা ও ব্যাখ্যা করা অভিনিবেশ মাত্র। মানসিক কল্পনারাশি এবং ইন্দ্রিয়জাত সবকিছুই স্বপ্নের মতো অলীক। অতএব যে সব ব্যক্তি নিত্য ও অনিত্য পদার্থ জানেন তাঁরা মৃতের জন্য শোক করেন না। স্বভাবের পরিবর্তন দুঃসাধ্য বলেই কোন কোন বিজ্ঞ ব্যক্তিও শোকে কাতর হন। ৪৪-৪৯

মৃত ব্যক্তির সমানধর্মা হয়েও তোমরা তার জন্য শোক করছ। এবিষয়ে একটি পুরানো কথা বলছি, শোন। পাখীদের যমস্বরূপ এক ব্যাধ নানারকম প্রলোভনের বস্তু দিয়ে জাল ছড়িয়ে এক বনে পাখী ধরছিল। কুলিঙ্গ নামে এক পক্ষী-মিথুন সেই প্রলোভন-সামগ্রী দেখেছিল। তার মধ্যে স্ত্রী পাখীটি সহজেই প্রলুব্ধ হল এবং জালে আবদ্ধ হল ; পুরুষ কুলিঙ্গ তার সঙ্গিনীকে জালে আবদ্ধ দেখেও তার অসহায় অবস্থার কোন প্রতিকার করতে না পেরে অত্যন্ত দুঃখে এই বলে বিলাপ করতে লাগল, আহা, আমার দীন স্ত্রী আমার জন্য করুণ সুরে শোক করছে। বিধি এই দীনকে নিয়ে কি করবে ? এই প্রেয়সী আমার অর্ধাঙ্গিনী ; তার বিরহে আমার অপর অর্ধাঙ্গ দুঃখে জীবনধারণ করবে। আমার এই দেহ রাখার প্রয়োজন নেই, দৈব আমাকেও গ্রহণ করুন। আহা ! আমার সন্তানগুলির এখনও পাখা হয় নি। তারা মাতৃহীন হলো। আমি কি করে তাদের লালন-পালন করব ? এতক্ষণ বাসায় তারা তাদের মায়ের জন্য অপেক্ষা করছে। কুলিঙ্গ পাখী প্রিয়া-বিয়োগে এই রকম ব্যাকুল ও অশ্রুকণ্ঠ হয়ে বিলাপ করছিল। এই অবসরে পক্ষী-হন্তা ব্যাধ গোপনে তাকেও বিদ্ধ করল। তোমরাও এই রকম নির্বোধ, নিজের অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর দিকে তাকাও না। তোমরা একশো বছর শোক করলেও এই স্বামীকে আর ফিরে পাবে না। ৫০-৫৭

হিরণ্যকশিপু বলল, সেই বালক এই রকম বললে আত্মীয়েরা সবাই বিস্মিত হয়ে মনে করতে লাগল যে, সব বস্তুই অনিত্য ও মিথ্যা। যম এই উপাখ্যান বলে সেখানেই অন্তর্ধান করলেন। তখন সুযজ্ঞ রাজার জ্ঞাতিরা শোক পরিহার করে রাজার পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পন্ন করলেন। অতএব তোমাদের পরের বা নিজের জন্য শোক করা উচিত নয়। এই সংসারে নিজই বা কে পরই বা কে ? কেই বা নিজের লোক কেই বা পরের লোক ? 'এ আত্মীয়, এ পর' এরূপ বোধই অজ্ঞান ; এ ছাড়া দেহের আত্মীয় বা পর এরকম গণনা হতে পারে না। নারদ বললেন, পুত্রবধূর সঙ্গে দিতি দৈত্যপতির এরকম কথা শুনে কিছুক্ষণের মধ্যে পুত্রশোক বিসর্জন দিয়ে পরমাত্মার তত্ত্বানুসন্ধানে মনোনিবেশ করলেন। ৫৮-৬১

তৃতীয় অধ্যায়

হিরণ্যকশিপুর তপস্যা ও বরলাভ

নারদ বললেন, মহারাজ, হিরণ্যকশিপুর ইচ্ছা হয়েছিল যে সে অজেয়, অজর, অমর এবং প্রতিপক্ষহীন অদ্বিতীয় রাজা হবে। সে উর্ধ্ববাহু হয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে এবং পাদাঙ্গুষ্ঠের উপর ভর করে দারুণ কষ্টসাধ্য তপস্যা আরম্ভ করল। ১-২

তার মাথার জটার তীব্র দীপ্তি প্রলয়কালের সূর্যকিরণের মত প্রকাশ পাচ্ছিল। তার তপস্যার প্রবৃত্তি দেখে যে সব দেবতা তার ভয়ে অন্যখানে লুকিয়ে ছিলেন তাঁরা নিজের নিজের স্থানে ফিরে গেলেন তপস্যার প্রভাবে তার মাথা থেকে ধূম ও আগুন বেরিয়ে উপরে নীচে সর্বলোকের সন্তাপের কারণ হল। তার তপস্যার প্রভাবে নদ-নদী ও সাগর ক্ষুব্ধ, পর্বত-দ্বীপ ও পৃথিবী বিচলিত, গ্রহ-তারারা পতিত হল এবং দশদিক জ্বলে উঠল। এই দেখে দেবতারা সন্তপ্ত হয়ে স্বর্গলোক ত্যাগ করে ব্রহ্মলোকে চলে গেলেন এবং বিধাতাকে বললেন, দেবদেব, দৈত্যেন্দ্র হিরণ্যকশিপুর তপস্যায় সন্তপ্ত হয়ে আমরা আর স্বর্গে বাস করতে পারছি না। আপনার ভক্তরা যাতে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট না হয় তার জন্য আপনি অনুগ্রহপূর্বক এখনই এর শাস্তিবিধানের ব্যবস্থা করুন। ৩-৭

যদিও আপনার অজানা নয়, তবুও কেন সে এই দুষ্কর তপস্যা করছে তা আপনাকে বলছি, শুনুন। হিরণ্যকশিপুর সংকল্প হল, পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা যেরকম তপস্যা এবং যোগ প্রভাবে স্থাবর-জঙ্গমাত্মক ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করে সর্বশ্রেষ্ঠ সত্যলোকে নিজের আসনে অধিষ্ঠিত আছেন, গুরুতর তপোযোগ নিষ্ঠা দ্বারা আমিও সেইরকম শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করব। তা না হলে তপস্যার প্রভাবে এই জগতের সমস্ত নিয়ম বদলে দেব। এ-ছাড়া কল্পান্তে, বিনাশশীল বৈষ্ণবাদি পদে আমার কি প্রয়োজন? তার পরম তপস্যায় ব্রতী হবার এই উদ্দেশ্যই আমরা শুনেছি। এখন স্বয়ং ত্রিভুবনেশ্বর আপনি যা যুক্তিযুক্ত মনে করেন তাই করুন। আপনার স্থান ভ্রষ্ট হলে সাধুদের অনিষ্ট হবে। হে জগৎপতি, গো-ব্রাহ্মণের রক্ষাকল্পে এবং সুখ ও ঐশ্বর্যের রক্ষণ ও উৎকর্ষের জন্যই আপনার এই পরম শ্রেষ্ঠ আসনের উদ্ভব। এই ভাবে বিজ্ঞাপিত হয়ে আত্মযোনি ব্রহ্মা ভৃগু, দক্ষ প্রভৃতির সঙ্গে মিলিতভাবে দৈত্যেশ্বর হিরণ্যকশিপুর আশ্রমে গেলেন। সেখানে তিনি দৈত্যেশ্বরকে প্রথমে দেখতে পেলেন না, কারণ সে বল্মীক, তৃণ ও কীচকে আবৃত হয়েছিল এবং চারদিক থেকে পিপীলিকার দল তার চামড়া, মাংস, মেদ ও রক্ত খাচ্ছিল। ৮-১৫

এইভাবে তপস্যারত অবস্থায় মেঘে-ঢাকা সূর্যের মত তাকে বিশেষভাবে লক্ষ করে হংসবাহন ব্রহ্মা অবাক হয়েও হেসে বললেন, ওহে কশ্যপনন্দন, ওঠ, ওঠ, তোমার মঙ্গল হোক। তুমি তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করেছ। আমি বরদাতা তোমার কাছে এসেছি, বর প্রার্থনা কর। আমি তোমার হৃদয়ের অতি অদ্ভুত ধৈর্য দেখলাম। পিঁপড়েরা তোমার দেহ খেয়ে ফেলেছে। তোমার প্রাণটুকু শুধু হাড়ে ভর করে রয়েছে। এই রকম তপস্যা আগে কোন ঋষি করেন নি; পরেও হয়তো কেউ করতে পারবেন না। জল পর্যন্ত ত্যাগ করে নিরম্বু উপবাসে একশো বছর পর্যন্ত কে আবার প্রাণ ধারণ করতে পারবে? ১৬-১৯

দিতিনন্দন, তোমার তপস্যার নিষ্ঠা ঋষিদের পক্ষেও দুঃসাধ্য। তোমার এই প্রচেষ্টা দ্বারা আমাকে তুমি জয় করেছ। অসুরশ্রেষ্ঠ, তোমাকে আমি সর্বরকম আশীর্বাদ করছি। মর্ত্যজীবের পক্ষে আমার দর্শন নিষ্ফল হতে পারে না। নারদ বললেন, এই বলে আদিপুরুষ ব্রহ্মা দৈত্যরাজের সেই পিপীলিকা-ভক্ষিত শরীরে তাঁর অমোঘবল কমণ্ডলুর জল ছিটিয়ে দিলেন। তখন হিরণ্যকশিপু ঘাস ও বাঁশে ঢাকা বল্মীক-মৃত্তিকা থেকে সর্বাবয়বসম্পন্ন ও বজ্রসদৃশ দেহ, শক্তি ও তেজের সঙ্গে উঠে এলেন। তাঁর দেহ অগ্নিতপ্ত স্বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল এবং কাঠের আগুনের মত তার উজ্জ্বল শিখা প্রকাশ পাচ্ছিল। তিনি হংসবাহন ব্রহ্মাকে আকাশে দেখে আনন্দে উল্লসিত হলেন এবং তাঁকে মাটিতে লুটিয়ে প্রণাম করলেন। তারপর মাটি থেকে উঠে ব্রহ্মাকে করজোড়ে বিনীতভাবে হাসি-কান্নায় আনন্দে গদ্গদ কণ্ঠে বলতে লাগলেন, যিনি স্বয়ংজ্যোতি, যিনি কল্পান্তে কালের প্রভাব-সৃষ্ট অন্ধকারে ঢাকা জগৎকে নিজের আলোতে আলোকিত করেছেন, আত্মগুণ সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিন গুণের দ্বারা যিনি এই জগৎ সৃষ্টি, পালন ও সংহার করছেন, সেই তিন গুণের আশ্রয়স্বরূপ পরম মহৎ আপনাকে নমস্কার করি। যিনি জগতের আদি ও বীজ, জ্ঞান ও বিজ্ঞান যাঁর মূর্তি ও প্রাণ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি প্রভৃতি বিকার দ্বারা যিনি নিজেই নিজেকে প্রকটিত করেছেন আমি তাঁকে প্রণাম করি। ২০-২৮

এইভাবে জগতের কারণরূপে তাঁকে প্রণাম করে পরে তাঁর মহত্ত্ব ও ঈশ্বরত্বের জন্য বললেন, তুমি এই স্থাবর ও জঙ্গমময় জগতে মুখ্য প্রাণবায়ু রূপে প্রবেশ করে সমস্ত জীবের পতি বা প্রজাপতি হয়ে বিরাজ করছ। তুমিই চিত্ত, মন ও ইন্দ্রিয়দের পতি, তুমিই মহৎ আকাশাদি, পঞ্চমহাভূত শব্দাদি, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় এবং তাদের গ্রহণ বা ত্যাগ বিষয়ে বাসনার ঈশ্বর। তুমিই সপ্ততন্তু মত অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞ বিস্তার করেছ। তিন বেদ ও চার প্রকার হোতার যজ্ঞকর্ম সম্বন্ধীয় বিদ্যা দ্বারা এই যজ্ঞের বিস্তার করে তুমিই প্রাণীদের আত্মা ও অন্তর্যামী এবং সেইহেতু সর্বজ্ঞ। তুমি অদ্বিতীয়, অখণ্ড, অনাদি ও অনন্ত। দেশ বা কাল দ্বারা তোমার অন্ত নির্ণয় করা যায় না। কালরূপে তুমিই সংহর্তা; কালের ক্ষুদ্র অংশ ক্ষণ-লবাদি দ্বারা তুমিই সকলকে ক্ষীণ কর। এইভাবে সৃষ্টি প্রভৃতির কর্তৃত্ব থাকলেও তুমি নির্বিকার কূটস্থ, কারণ তুমি সকলের আত্মা, জ্ঞানময় পরমেষ্ঠী, জন্মরহিত ও অপরিচ্ছিন্ন। জীব-জগৎ কর্মবশে বিকারপ্রাপ্ত হয়। তুমি জীবের জীবনের অধিকারী। তুমি ছাড়া আর কেউ থাকলে তার থেকে তোমার জন্মাদি বিকার বা নিয়ামকত্বাদি থাকত। তুমি ভিন্ন আর কোনো পরম কারণ বা কার্য নেই। তুমি ছাড়া স্থাবর জঙ্গম কিছু নেই। বেদ, উপবেদ, কলাবিদ্যা সকলই তোমার অঙ্গে; তুমি হিরণ্যগর্ভ। তুমি ত্রিগুণাত্মক এবং প্রধানেরও পরাৎপর। হে অনন্ত, এই জগৎ স্থূল শরীর, এই শরীরের ইন্দ্রিয়, প্রাণ ও মনের বিষয় তুমি ভোগ কর সত্য, কিন্তু তুমি এইভাবেও পরম ঈশ্বর রূপে বর্তমান। ঐ সমস্ত ভোগ করেও তুমি নিরুপাধি ব্রহ্ম এবং পুরাণ পুরুষ আত্মা। ২৯-৩৩

হে অনন্ত, অব্যক্তরূপে তুমি এই জগৎ ব্যাপ্ত করে চিৎ ও অচিৎ উভয় প্রকার শক্তিযুক্ত হয়ে বিরাজ করছ। অতএব ষড়ৈশ্বর্যশালী তোমাকে নমস্কার। হে শ্রেষ্ঠ বরদাতা, যদি আমার ইচ্ছানুরূপ বরদান কর, তবে আমাকে এই বর দাও যেন তোমার সৃষ্ট কোন প্রাণী দ্বারা আমার মৃত্যু না হয়। আর গৃহের অভ্যন্তরে বা বাইরে, দিনে বা রাত্রিতে, তোমার সৃষ্টি ছাড়া কারুর দ্বারা, কোন অস্ত্র দ্বারা, ভূমিতে বা শূন্য আকাশে কোনও মানুষ বা পশু দ্বারা, প্রাণহীন বা প্রাণবান

দেবতা, অসুর, মহাসর্পাদি দ্বারা যেন আমার মৃত্যু না হয়। যুদ্ধে অপ্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং জীবদের উপর একাধিপত্য ও সকল লোকপালের উপর যে মহিমা তোমর আছে, তা আমাকে দান কর। পরিশেষে আমার তপস্যা, সমাধিলব্ধ প্রভাবা ও অণিমাদি ঐশ্বর্য যেন কোন দিন বিনষ্ট না হয়—এই বরদান কর। ৩৪-৩৮

চতুর্থ অধ্যায়

হিরণ্যকশিপুর অত্যাচার

নারদ বললেন, অশেষ ধৈর্যের আকর ব্রহ্মা হিরণ্যকশিপুর তপস্যায় প্রীত হয়ে তাকে দুর্লভ বর দিয়েছিলেন। ব্রহ্মা বললেন, বৎস, যে বর তুমি আমার কাছে প্রার্থনা করেছ তা অতি দুর্লভ হলেও তোমাকে সেই বরই আমি দিলাম। তারপর অসুরশ্রেষ্ঠ হিরণ্যকশিপুর দ্বারা পূজিত এবং প্রজাপতিদের দ্বারা সংস্তুত হয়ে বিভু ব্রহ্মা স্বস্থানে ফিরে গেলেন। এই রকম বর লাভ করে, স্বর্ণকান্তি দেহ ধারণ করে, হিরণ্যকশিপু ক্রমে দেবতা, অসুর, মানুষ, ইন্দ্র, গন্ধর্ব, গরুড় ও সর্পদেব, এমন কি সিদ্ধ, চারণ, বিদ্যাধর, ঋষিকুল, পিতৃগণ, মনু, যক্ষ, রক্ষ, পিশাচেশ্বর, প্রেত ও ভূতপতি প্রভৃতি সমস্ত প্রাণীজগতের পালকদের পরাজিত করে তাঁদের স্ববশে আনল এবং নিজের বিশ্বজয়ী বলের দ্বারা লোকপালদের স্থান হরণ করল। অনন্তর সেই দৈত্যরাজ নন্দনবন প্রভৃতি দিব্য উদ্যান পরিশোভিত স্বর্গে গিয়ে বাস করতে লাগল। সেখানে সে সাক্ষাৎ বিশ্বকর্মার নির্মিত ইন্দ্রের গৃহে ত্রিলোকের সমস্ত সম্পদের আশ্রয়স্থলে সবরকম সমৃদ্ধিতে পূর্ণ হয়ে অবস্থান করতে লাগল। সেই গৃহের সোপানগুলি প্রবালনির্মিত, ভূমি মরকত-মণিময় স্ফটিকের ভিত্তির উপর বৈদূর্য-মণিময় স্তম্ভ শোভিত ছিল। আর ছিল বিচিত্র চন্দ্রাতপতলে পদ্মরাগমণিময় আসন, দুগ্ধফেনার মত কোমল শুভ্র শয্যা ও তাতে মুক্তামণির ঝালর। যেখানে নূপুর-ধ্বনিতে চতুর্দিক মুখরিত করে দেবাঙ্গনারা রত্নখচিত স্থানে নিজেদের সুন্দর মুখ এবং দাঁতের শোভা দেখে থাকেন সেই ইন্দ্রালয়ে মহাপরাক্রমশালী ত্রিলোকজয়ী মহাপ্রতাপ ও উগ্রশাসন হিরণ্যকশিপু একাধিপত্য বিস্তার করে দেবতাদের দ্বারাও স্তুত হয়ে বিরাজ করতে থাকল। ১-১২

যুধিষ্ঠির, উগ্রগন্ধ সুরাপানে প্রমত্ত ও রক্তচক্ষু, যোগবল ও তেজের আশ্রয় সেই দানবকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর ছাড়া সমস্ত লোকপালরা নানা উপহার সহ উপাসনা করত। হিরণ্যকশিপু যে বলে ইন্দ্রের আসন অধিকার করে বসেছিল তার ফলে বিশ্বাবসু, তুম্বুরু, অস্মদাদি মহর্ষিগণ এবং সমস্ত গন্ধর্ব, সিদ্ধ, বিদ্যাধর ও অপ্সরা সবাইকে তার স্তব গান করতে হতো। সে নিজের বলে বর্ণাশ্রমচারী ব্যক্তিদের অনুষ্ঠিত বহু দক্ষিণাসহ যজ্ঞের হবির ভাগ গ্রহণ করত। তার প্রভাবে সপ্তদ্বীপবতী ধরণী বিনা কর্ষণেই শস্য প্রদান করতে লাগল। স্বর্গের মান্য দেবতারা তার অভিলাষ পূর্ণ করতে লাগলেন এবং আকাশেও নানারূপ আশ্চর্য দর্শন হতে লাগল। লবণ, ইক্ষু, সুরা, ঘি, মধু, দই, দুধ ও অমৃতাস্বাদ জলে পূর্ণ রত্নাকর সাগরসমূহ বহু রত্নদানে প্রবৃত্ত হল। তাদের পত্নী নদীরাও তরঙ্গে তরঙ্গে রত্ন বহন করে আনতে লাগল। ১৩-১৭

পর্বতসমূহ শৈলসমূহ তার ক্রীড়াস্থান হল। সমস্ত লোকপালের কাজ সে

একাই সমাধান করত বলে তার জন্য বৃক্ষগুলো সমস্ত ঋতুতেই ফল-পুষ্প ভূষিত হয়ে অবস্থান করত। এইভাবে দিগ্‌বিজয়ী একাধিপতি নিজের প্রিয় ভোগ্যবিষয় ভোগ করেও কিন্তু অজিতেন্দ্রিয় বলে তৃপ্তিলাভ করল না। এইভাবে ঐশ্বর্যপ্রমত্ত, অভিমানী ও উৎপথগামী দানবের বহুকাল অতিবাহিত হল। ব্রহ্মশাপগ্রস্ত সেই দানবের উগ্র দণ্ডবিধানে লোকপালসহ সকলেরই অত্যন্ত উদ্বেগ হল। তাঁরা অন্যত্র আশ্রয় না পেয়ে অবশেষে অচ্যুতের শরণাপন্ন হলেন। তাঁরা সংযতেন্দ্রিয়, সমাহিত-চিত্ত, নির্মল হয়ে বিনিদ্র থেকে ও বায়ুমাত্র ভক্ষণ করে হৃষীকেশের উপাসনা করে বললেন, যেদিকে শ্রীহরি পরমেশ্বর অবস্থান করেন, যেখানে গেলে শান্তমনা নির্মলান্তঃকরণ সন্ন্যাসীরা আর ফিরে আসেন না, সেই দিককে প্রণাম করি। এইভাবে লোকপালরা উপাসনা করতে থাকলে অশরীরী দৈববাণীতে দিক্‌সমূহ মুখরিত হল; মেঘগম্ভীর সেই ধ্বনি সাধুদের ভয় নাশ করল। তাঁরা এই বাণী শুনলেন, বুধ-শ্রেষ্ঠগণ, আপনাদের সকলের মঙ্গল হোক। আমার দর্শন সমস্ত জীবের পরম মঙ্গলের কারণ। দানবাধমের দৌরাত্ম্যের বিষয় আমি অবগত আছি। তার উপশমের কাল পর্যন্ত আপনারা প্রতীক্ষা করুন। যখন কোন ব্যক্তি দেবতা, বেদ, গোমাতা, ব্রাহ্মণ, সাধু, ধর্ম ও আমার প্রতি বিদ্বেষ করে, তখন সেই বিদ্বেষী কিছুকাল পরেই বিনষ্ট হয়। ব্রহ্মার বরে অত্যন্ত তেজোদৃপ্ত হলেও হিরণ্যকশিপু যখন তার নিজ পুত্র মহাত্মা, প্রশান্তমনা, নির্বৈর প্রহ্লাদের প্রতি অনিষ্টাচরণ করবে, তখন আমি তাকে নিহত করব। ১৮-২৮

নারদ বললেন, এই রকম কথা শুনে দেবতাগণ লোকগুরু ভগবানকে প্রণাম করে 'আর চিন্তা নেই, অসুর এবার মরেছে' ভেবে স্ব স্ব স্থানে প্রত্যাবর্তন করলেন। সেই দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপুর চারটি পুত্রই অতি অদ্ভুতচরিত্র। তাদের মধ্যে প্রহ্লাদ মহতের উপাসক এবং গুণে মহান হয়েছিলেন। তিনি জিতেন্দ্রিয়, ব্রাহ্মণবৎসল, সুশীল, সত্যসন্ধ, সর্বভূতে প্রীতিসম্পন্ন ও সকলের পরম বান্ধব ছিলেন। ২৯-৩১

মান্য ব্যক্তির কাছে তিনি দাসের মত থাকতেন। দীনজনের প্রতি বাৎসল্য-পরায়ণ, সমজাতীয় ব্যক্তির প্রতি স্নেহবান ও গুরুজনের প্রতি ঈশ্বরভাব-পরায়ণ ছিলেন। তাঁর বিদ্যা, ধন, রূপ এবং আভিজাত্য সম্বন্ধে কোন অহংকার ছিল না। বিপদে তাঁর চিত্ত উদ্বিগ্ন হত না। দৃষ্ট ও শ্রুত বিষয়ে অবস্তু বিচার করে তিনি এ সকলে নিস্পৃহ ছিলেন।[১] তাঁর দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ ও বুদ্ধি সংযত এবং কামনা শান্ত হওয়ার ফলে অসুরকুলে জন্মগ্রহণ করলেও তাঁর আসুরভাব ছিল না। মহারাজ, কবি জ্ঞানীজন যাঁর মহদ্‌গুণসমূহ বারংবার গ্রহণ করে থাকেন আজও তাঁর সেই সমস্ত গুণ তিরোহিত হয় নি। যেমন ঈশ্বরে সদ্‌গুণাবলী চির বিদ্যমান থাকে, তাঁতেও সেগুলি সেইভাবেই বিরাজমান রয়েছে। দেবতারা অসুরকুলের শত্রু হয়েও সৎকথা আলোচনা প্রসঙ্গে যখন প্রহ্লাদকে সর্বজনগ্রাহ্য সাধনমার্গের আদর্শ-স্থল বলে স্বীকার করেন, তখন আপনাদের কথা আর কি বলব। ভগবান বাসুদেবে যাঁর রতি স্বাভাবিক, তাঁর গুণ অগণিত। আমি শুধু তাঁর মাহাত্ম্য সূচনা করলাম। ৩২-৩৬

বালককালে প্রহ্লাদ খেলার সামগ্রী পরিত্যাগ করে কৃষ্ণগ্রহে আবিষ্ট ও তন্ময় হয়ে জড়বস্তুর মত নিস্পন্দ হয়ে থাকতেন। জাগতিক কোনও কিছুই তিনি জানতেন না। এইরকম ছিল তাঁর স্বাভাবিক চিত্তবৃত্তি। শ্রীগোবিন্দের আলিঙ্গন

১ সর্ববিধ দুঃখে যাঁর চিত্তে কোনরূপ উদ্বেগ জন্মে না, কোনপ্রকার সুখে যাঁর স্পৃহা নেই···তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ বলে বর্ণিত হন।—গীতা ২।৫৬ শ্লোক।

অনুভব করে উপবিষ্ট অবস্থায়, ভ্রমণদশায়, ভোজনসময়ে, শয়নাবস্থায়, জলপান সময়ে বা কথা বলবার কালে কোনও সময়েই তিনি ঐ সমস্ত বিষয়ের কোন খোঁজখবর রাখতেন না। ভগবান বৈকুণ্ঠের চিন্তায় তাঁর মন বিহ্বল হলে তিনি কখনও কাঁদতেন, কখনও হাসতেন, কখনও বা আনন্দে উচ্চস্বরে গান করতেন। উৎকণ্ঠায় কোন সময় চিৎকার করতেন, আবার নির্লজ্জের মত নৃত্য করতেন। কখনও ভগবদ্‌ভাবনায় তন্ময় হয়ে তাঁর লীলার অনুকরণ করতেন। কখনও পুলকাঙ্গ হয়ে চুপ করে ভগবৎ-সংস্পর্শের আনন্দ অনুভব করতেন। তখন তাঁর দেহ স্পন্দনহীন ও নয়নযুগল প্রেমানন্দের অশ্রুতে ঈষৎ নিমীলিত হয়ে থাকত। অকিঞ্চন ভক্তসঙ্গলব্ধ ভগবান উত্তমশ্লোকের চরণ-কমলযুগলের সেবানন্দে মুহুর্মুহু আনন্দ বিতরণ করে তিনি দুঃসঙ্গজনিত দীনের মনকেও শান্ত করে দিতেন। সে মহাভাগ্যবান মহাত্মা নিজের পুত্র হলেও হিরণ্যকশিপু তাঁর প্রতি বিরুদ্ধাচরণ করতে লাগল। ৩৭-৪৩

যুধিষ্ঠির বললেন, সুব্রত দেবর্ষি, পিতা হয়েও নিজের শুদ্ধচরিত্র পুত্রের প্রতি কেন তিনি দ্রোহাচরণ করেন তা জানতে ইচ্ছা করি। পুত্র যদি বিপরীত ভাবাপন্ন অবাধ্য হয়, তবে পুত্রবৎসল পিতা তাকে শিক্ষা দেবার জন্য তিরস্কার করতে পারেন। কিন্তু অপর কোনও ব্যক্তির মত তিনি তো পুত্রের শত্রুতা করেন না। পিতা প্রভৃতি গুরুজনকে যাঁরা দেবতার মত শ্রদ্ধা করেন, সেই রকম সাধুস্বভাব অনুকূল-ভাবাপন্ন পুত্রের সম্বন্ধে আর কি বলা যায়। প্রভু, পুত্রের মৃত্যুচেষ্টায় পিতার যে শত্রুতা এ পূর্বে কখনও শুনি নি। এই বিষয়ে আমাদের কৌতূহল নিবৃত্ত করুন। ৪৪-৪৬

পঞ্চম অধ্যায়

হিরণ্যকশিপুর প্রহ্লাদ-বধ প্রয়াস

নারদ বললেন, অসুরেরা ভগবান শুক্রাচার্যকে পুরোহিতের পদে বরণ করেছিলেন। তাঁর দুই পুত্র ষণ্ড এবং অমর্ক দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর গৃহের নিকটেই থাকতেন। হিরণ্যকশিপু আপনার নীতিপরায়ণ পুত্র প্রহ্লাদকে তাঁদের কাছে পাঠাতেন। তাঁরা দু'জনে প্রহ্লাদ ও অন্যান্য বালকদের দণ্ডনীতি প্রভৃতি পাঠ্য বিষয় পড়াতেন। শিক্ষক যা শিক্ষা দিতেন তা শুনে আবার সেটা নিজে পাঠ করলেও সেই শিক্ষার মধ্যে আপন-পর ভাব থাকার জন্য প্রহ্লাদ সেটা মনে মনে সৎশিক্ষা বলে মেনে নিতে পারেন নি। যুধিষ্ঠির, এক সময় দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু পুত্রকে কোলে বসিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, বৎস, বল তো তোমার কোন বস্তু ভাল লাগে? প্রহ্লাদ বললেন, হে অসুরশ্রেষ্ঠ, 'আমি ও আমার' এই অসৎ বোধ থাকার ফলে মানুষ সর্বদা উদ্বিগ্ন। আত্মার এই অধঃপতনের হেতু গৃহরূপ অন্ধকূপ পরিত্যাগ করে বনে গিয়ে শ্রীহরির আশ্রয় গ্রহণ করাই আমি ভাল মনে করি। ১-৫

নারদ বললেন, শত্রুপক্ষ বিষ্ণুর প্রতি পুত্রের এই ভক্তিপ্রকাশক কথা শুনে দৈত্যরাজ বালকদের বুদ্ধি শত্রুর বুদ্ধি দ্বারা নষ্ট হয়েছে মনে করে হাসলেন এবং বললেন, শিশুবুদ্ধি এরূপ পরবুদ্ধিতে নষ্ট হয়ে থাকে। গুরুগৃহে ব্রাহ্মণরা একে ভালভাবে রক্ষা করুন যাতে ছদ্মবেশ ধারণ করে বিষ্ণুপক্ষের কোনও ব্যক্তি এর বুদ্ধিকে

বিচলিত না করে। দৈত্যযাজক প্রহ্লাদকে নিজের গৃহে এনে তাকে মিষ্টি কথায় প্রশংসা করে শান্তভাবে জিজ্ঞেস করলেন, বৎস প্রহ্লাদ, তোমার মঙ্গল হোক। সত্য বল, মিথ্যার আশ্রয় নিও না। অন্যান্য বালকের বুদ্ধি অতিক্রম করে তোমার এই বুদ্ধির বিপর্যয় কেমন করে হল? তোমার এই মতিভ্রম অপরে ঘটিয়েছে, না আপনা থেকে হয়েছে? কুলনন্দন, আমরা তোমার শিক্ষক, আমরা শুনতে চাই, তুমি সত্যি কথা বল। প্রহ্লাদ বললেন, আপনারা মায়ায় মোহিত হয়ে আমাকে দোষী করছেন। যাঁর মায়া প্রভাবে মায়ামোহিত ব্যক্তিদের আপন-পর এই মিথ্যা অভিনিবেশ হয়, আমি সেই ঈশ্বরকে প্রণাম করি। সেই ভগবান যখন কারো প্রতি অনুকূল হন, তখন সাধারণ জীবেরও পাশবিক বুদ্ধি দূর হয়ে যায়। সেই বুদ্ধি 'এটা অন্য, আমি অন্য' এইরকম ভেদ জন্মায় বলে তা মিথ্যা, সুতরাং তা সকলের পরিত্যাজ্য। ৬-১২

বুদ্ধিহীন লোক সেই আত্মাকেই 'ইনি আপন, উনি পর' এইভাবে বিচার করে। যাঁকে জানতে চেষ্টা করে বেদবাদী ব্রহ্মাদিরও মোহ উৎপন্ন হয়, তিনিই আমার বুদ্ধির বিপর্যয় এনে দিয়েছেন। ব্রাহ্মণ, আপনি যদি মনে করেন, নির্বিকার আত্মার পক্ষে বুদ্ধি-বিপর্যয় ঘটার সম্ভাবনা কি, তার উত্তরে বলি, লোহাখণ্ড নির্বিকার চুম্বকের কাছে গেলে যে রকম ভ্রমণ করে সেইভাবেই চক্রধারী ভগবানের নিকট আমার চিত্তও আপনা থেকেই ঘুরতে থাকে। নারদ বললেন, মহামতি প্রহ্লাদ ব্রাহ্মণকে এই পর্যন্ত বলে বিরত হলেন। কিন্তু সেই রাজসেবক (প্রহ্লাদের শিক্ষক) নিরুপায় হয়ে ক্রোধে তাঁকে ভর্ৎসনা করে বললেন, ওরে কে আছিস, বেতটা নিয়ে আয় দেখি। আমাদের অখ্যাতির কারণ এই দুর্বুদ্ধি কুলাঙ্গারের দমনের জন্য দৈহিক শাস্তি ছাড়া আর উপায় নেই। দানবকুলরূপ চন্দনবনে এই একটা কাঁটা গাছ জন্মেছে। এই বালক কাঁটা-গাছটি চন্দনবন উন্মূলিত করবার জন্য বিষ্ণুর কুঠারের দণ্ডস্বরূপ হয়েছে। এইভাবে নানা উপায়ে তর্জন-গর্জন করে তাকে ভয় দেখিয়ে গুরুপুত্ররা ধর্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গ প্রতিপাদক বিদ্যা প্রহ্লাদকে পাঠ করালেন। কিছুদিন পরে গুরু বুঝতে পারলেন যে সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড এই চারটি জ্ঞাতব্য বিষয়ই তাঁর পরিজ্ঞাত হয়েছে। তখন তিনি সর্বপ্রথমে প্রহ্লাদের জননী দ্বারা তাঁর স্নানাদি করিয়ে এবং রাজকুমারের যোগ্য ভূষণে ভূষিত করে দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপুর কাছে গিয়ে তাঁকে দেখালেন। পিতার চরণে পড়ে প্রহ্লাদ প্রণাম করলে তাঁকে আদর করে তুলে দৈত্যপতি আশীর্বাদ করে দু'হাতে জড়িয়ে ধরল এবং আলিঙ্গন করে পরম আনন্দ লাভ করল। দৈত্যরাজ নিজের কোলে প্রসন্নমুখ প্রহ্লাদকে বসিয়ে তার মাথার ঘ্রাণ নিয়ে প্রেমাশ্রুধারায় তাঁর মস্তক অভিষিক্ত করল এবং প্রহ্লাদকে বলল, বৎস প্রহ্লাদ, এতদিন গুরুগৃহ থেকে যে সব বিষয় শিখেছ তা থেকে কিছু উৎকৃষ্ট বিষয় আমাকে শোনাও দেখি। ১৩-২২

প্রহ্লাদ বললেন, শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন, এই নববিধ ভক্তি অধ্যয়ন করে যদি কোনও ব্যক্তি ভগবান বিষ্ণুতে বুদ্ধি সমর্পণ করে কর্ম অনুষ্ঠান করে, আমার বিবেচনায় তারই উত্তম অধ্যয়ন হয়েছে। হিরণ্যকশিপু পুত্রের এইরকম কথা শুনে ক্রোধে অধীর হয়ে গুরুপুত্রকে বলল, দুর্মতি ব্রহ্মবন্ধু, তোমরা বিপক্ষ আশ্রয় করে আমার অনাদরের জন্য আমার পুত্রকে এইরকম অসার শিক্ষা দিয়েছ? বুঝলাম এই সংসারে অনেক ছদ্মবেশী অসাধু লোক মিত্রতার ভান করে থাকে। সময় বুঝে পাপীর পাপরোগের প্রকাশের মত তাদেরও শত্রুতা প্রকাশ পেয়ে থাকে। গুরুপুত্র বললেন, দৈত্যরাজ, আপনার পুত্র যে কথা বলল তা আমি শিক্ষা দিই নি, বা অন্য কেউ শিক্ষা দেয় নি। এই বুদ্ধি তার স্বাভাবিক। বৃথা আমাদের প্রতি দোষারোপ করে রাগ করবেন না। ২৩-২৯

নারদ বললেন, গুরুপুত্র এই রকম উত্তর দিলে দৈত্য হিরণ্যকশিপু পুত্রকে জিজ্ঞাসা করল, ওরে অভদ্র, গুরুর উপদেশে যদি এই শিক্ষা না পেয়ে থাক তবে গুরুমুখী বিদ্যা ছাড়া এ বিদ্যা কোথায় অর্জন করেছ? প্রহ্লাদ বললেন, আপনার মত বিষয়াসক্ত গৃহস্থরাও গুরুর উপদেশে বা স্বাভাবিকভাবে অথবা পরস্পর আলোচনার দ্বারা কোন ভাবেই শ্রীকৃষ্ণে মতিলাভ করতে পারে না, কারণ তারা ইন্দ্রিয়ের বশীভূত হয়ে বারংবার সংসারে আসা-যাওয়া করে চর্বিত চর্বণ করে থাকে। তাদের বিষয়ভোগের আর শেষ হয় না। শ্রীকৃষ্ণ পরমানন্দস্বরূপ হলেও তাঁর প্রতি নিষ্ঠা হয় না। তার কারণ, জরাশয় বিষয়াসক্ত মানুষ তাঁকে জানতে পারে না। যারা বাহ্যবিষয়ে আসক্ত, তারা গুরুর উপদেশেও অধ্যাত্মজ্ঞানগম্য ভগবানকে জানতে অক্ষম। যে রকম অন্ধ ব্যক্তি অপর অন্ধকে চালিত করলে বিপথে পতিত হয়, সেই রকম তারা গুরুর উপদেশেও বেদবিধির দীর্ঘ রজ্জুতে আবদ্ধ হয়ে পড়ে।[১] বেদবাক্য অনুসারে জানা যায় যে এক দেবতাই সর্বভূতে অবস্থান করেন এবং সর্বব্যাপী[২], তবুও গৃহাসক্ত মানুষ যতদিন মহৎ সাধুদের পদধূলিতে অভিষিক্ত না হয় ততদিন তাদের মতি সমস্ত অনর্থের বিনাশকারী শ্রীবিষ্ণুর চরণ স্পর্শ করতে পারে না। ৩০-৩২

এই কথা বলে প্রহ্লাদ বিরত হলে ক্রোধে অন্ধ হিরণ্যকশিপু নিজের কোল থেকে পুত্রকে মাটিতে ফেলে দিল। অসহ্য ক্রোধের আবেশে রক্তচক্ষু দানব চিৎকার করে বলল, অসুরগণ, তাড়াতাড়ি একে বধ কর। একে এখান থেকে দূরে নিয়ে যাও। এই অধম বালককে বধ করাই ভাল, কেননা আত্মীয়-বান্ধব আমাদের ত্যাগ করে এই পামর দাসের মত পিতৃব্যহন্তা বিষ্ণুর চরণ অর্চনা করে। যে পাঁচ বছর বয়সে পিতামাতার স্নেহ-সৌহার্দ্য ত্যাগ করেছে, সেই অবিশ্বাসী বালক বিষ্ণুরই বা কোন্ উপকারে আসবে? অপরের পুত্র যদি ওষুধের মত উপকার তবে তাকেও নিজের সন্তানের মত গ্রহণ করা উচিত, আর নিজের সন্তান অপকারী রোগের মত হলে দ্বেষের পাত্র হয়। নিজের শরীরের কোন অঙ্গ যদি বিষাক্ত হয় তবে সেটা কেটে বাদ দেওয়াই উচিত। কারণ এতে দেহ অবশিষ্ট সমস্ত অঙ্গহানি থেকে রক্ষা পেয়ে সুখে বাঁচতে পারে। ভোজন, শয়ন, আসন প্রভৃতিতে বিষাদি প্রয়োগ করে যে কোন প্রকারে একে বধ করা প্রয়োজন। কারণ দুষ্ট ইন্দ্রিয়েরা যেরকম যোগীদের অনিষ্ট সাধন করে, সেই রকম বন্ধু-বেশধারী এই শত্রুও আমার অনিষ্ট সাধন করছে। দানবরা যখন তাদের প্রভুর এই আদেশ পেল, তখন তাদের হাতে ছিল ভয়ংকর শূল। তারা তীক্ষ্ণদংষ্ট্র ও ঘোর-বদন এবং তাদের দাড়ি ও কেশ তাম্রবর্ণ। তারা 'মারু মারু, কাটু কাটু' চিৎকার করতে করতে উপবিষ্ট প্রহ্লাদের মর্মস্থানগুলোতে শূলাঘাত করতে লাগল। যে রকম পুণ্য না থাকলে সৎকর্মের সামান্য প্রচেষ্টাও বিফল হয়, সেইরকম মন ও বাক্যের অগোচর সর্বাত্মা, ষড়ৈশ্বর্যশালী পরমব্রহ্মে সমাহিত প্রহ্লাদের অঙ্গে শূলের আঘাতগুলো নিষ্ফল হয়ে গেল। ৩৩-৪১

এভাবে সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যাহত হলে দৈত্যপতি শঙ্কিত হয়ে আরও দৃঢ়তার সঙ্গে তার বধের উপায় অবলম্বন করতে প্রবৃত্ত হল। বৃহৎকায় দিগ্‌হস্তী, সর্প, অভিচার, পর্বত থেকে নিক্ষেপ, নানাপ্রকার মায়াবাজী, গর্তে আবদ্ধ রাখা, বিষপ্রদান, অনাহারে রাখা, হিম ঝড় অগ্নি ও জলে নিক্ষেপ, পাথর চাপা দেওয়া প্রভৃতি কিছুই বাকী রইল না। নিষ্পাপ পুত্রকে যখন কোন মতেই হত্যা করতে সক্ষম হল না, তখন অসুর

১ তুলনীয়: কঠ উপনিষৎ, ১।২।৫ শ্লোক। ২ তুলনীয়: কঠ ২।২।১২, একো বশী সর্বভূতান্তরাত্মা।

নিজেও চেষ্টা করল, কিন্তু অসফল হয়ে অত্যন্ত বিচলিত হল। সে চিন্তা করতে লাগল, আমি প্রহ্লাদকে অনেক মন্দ কথা বলে গালি দিয়েছি, আর তাকে বধ করবারও অনেক চেষ্টা করেছি, কিন্তু কোন প্রচেষ্টাই সফল হল না। সে নিজের বলে সমস্ত শত্রুতার অপচেষ্টা থেকে মুক্ত আছে। আমার খুব কাছে থেকেও এই বালক নির্ভয়চিত্ত। যেরকম অজীগর্তের পুত্র শুনঃশেফ পিতামাতা দ্বারা হরিশচন্দ্র রাজার কাছে বিক্রীত হওয়ায়[১] পিতা-মাতার অপকারের কথা স্মরণে রেখে বিপক্ষ বিশ্বামিত্রকে আশ্রয় করে গোত্রান্তরিত হয়ে গিয়েছিল, সেইরকম এই প্রহ্লাদও আমার অপকারের কথা বিস্মৃত হয় নি। অপরিমিত প্রভাবশালী এই বালকের মৃত্যুও নেই, আবার কোথাও ভয় নেই। হয়তো বা এর বিরোধের ফলে আমার মৃত্যু ঘটবে। এই রকম চিন্তায় হিরণ্যকশিপু ম্লান ও অধোবদন হয়ে রইল। এমন সময়ে নির্জনে ষণ্ড ও অমর্ক দুই গুরুপুত্র তাকে বললেন, নাথ, আপনি একা ত্রিলোকজয়ী, আপনার ভ্রূভঙ্গিতে দিক্‌পাল দেবতারা ভয়ভীত, সেই আপনি এত চিন্তান্বিত কেন, বুঝি না। বালকদের ব্যবহারে দোষগুণ কিছুই বিচার করার প্রয়োজন বোধ করি না। প্রহ্লাদ এখনও বালক মাত্র। যাতে ভয়ে কোথাও পালাতে না পারে সেজন্য বরুণের পাশে তাকে বন্ধ করে রাখা হোক। বয়সের সঙ্গে সাধুসঙ্গ হলে বুদ্ধি ভাল হয়। আপনি গুরু শুক্রাচার্যের আগমন পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। গুরুপুত্রদের কথা শুনে হিরণ্যকশিপু বললেন, তবে তাই হোক। আপনারা একে ততদিন গৃহস্থের রাজধর্ম বিষয়ে উপদেশ দিতে থাকুন। ৪২-৫১

যুধিষ্ঠির, এরপর ধর্ম, অর্থ ও কাম সম্বন্ধে প্রহ্লাদকে উপদেশ দেওয়া হয়েছিল। শ্রদ্ধার সঙ্গে, বিনীতভাবে প্রহ্লাদও তা গ্রহণ করতে লাগলেন। রাগ-দ্বেষাদিপূর্ণ হৃদয় নিয়ে ষণ্ড ও অমর্ক গুরুদ্বয় প্রহ্লাদকে যে ত্রিবর্গের শিক্ষা দিতেন, সেটা কিন্তু সে উত্তম বলে মেনে নিতে পারে নি। আচার্য গুরুরা অধ্যাপনার কাজ থেকে অন্য কোন গার্হস্থ্য কর্মে বাইরে গেলে সমবয়সের বালকেরা প্রহ্লাদকে অবসর বুঝে আহ্বান করল। মহাবুদ্ধিমান প্রহ্লাদ তাদের আহ্বান গ্রহণ করে মধুর কথায় তাদের ব্যবহারে নিষ্ঠা বুঝে সহাস্যে করুণা করে নানা উপদেশ-কথা বললেন। প্রহ্লাদের প্রতি শ্রদ্ধাবশত অসুরবালকরা খেলাধুলো ত্যাগ করল। তারা অতি অল্পবয়স্ক শিশু। সাধারণ সুখ-দুঃখে আসক্ত সংসারী মানুষের মত তাদের বুদ্ধি দূষিত ছিল না। অসুরবালকরা প্রহ্লাদের প্রতি আসক্তহৃদয় হয়ে ও তাঁর দিকে দৃষ্টি সংলগ্ন করে তাঁর উপাসনা করত। করুণস্বভাব, মিত্রভাবাপন্ন, মহাভাগবত, অসুরবংশজাত প্রহ্লাদ তাদের উপদেশ দিতে লাগলেন। ৫২-৫৭

ষষ্ঠ অধ্যায়

অসুরবালকদের প্রতি প্রহ্লাদের উপদেশ

প্রহ্লাদ বললেন, ভাইসব, জন্ম লাভ করে বিবেকী মানুষ মাত্রেরই অল্প বয়স থেকেই ভাগবতধর্ম আচরণ করা উচিত। কারণ, মনুষ্যজন্ম দুর্লভ, অল্পকাল-স্থায়ী, অথচ পরমার্থ লাভের উপযোগী। সমস্ত জীবেরই পরমপুরুষ ভগবান বিষ্ণুর পাদোপসনা করা কর্তব্য; কারণ তিনিই সকলের প্রভু, বন্ধু, প্রিয়তম ও

---

১ এই প্রসঙ্গ নবম স্কন্ধের সপ্তম অধ্যায়ে পাওয়া যাবে।

আত্মা। দেহপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সুখ বা দুঃখ অদৃষ্টবশে জীবদেহে স্বাভাবিক কারণে জন্মে থাকে। তার প্রাপ্তি বা অপ্রাপ্তির জন্য স্বতন্ত্র চেষ্টা আয়ুক্ষয় ছাড়া আর কিছু নয়। তাতে পরম মঙ্গল লাভ হয় না। কেবল মুকুন্দের চরণকমলের সেবা দ্বারাই পরম মঙ্গল লাভ হয়। মৃত্যু কখন আসবে কিছুই বলা যায় না। সুতরাং জীবের ভয় সবসময় বিদ্যমান; অতএব যতদিন শরীর ভাল থাকে, মৃত্যু এসে গ্রাস না করে, ততদিন প্রেমের সঙ্গে পরম মঙ্গল লাভের জন্য যত্ন করা উচিত। ১-৫

মানুষের একশো বছর আয়ু নির্দিষ্ট।[১] ইন্দ্রিয়াসক্ত জীবের আয়ু মাত্র তার অর্ধেক অর্থাৎ পঞ্চাশ বছর, তার কারণ সে রাত্রির অন্ধকারে তমোগুণের প্রভাবে নিদ্রায় অনর্থক কাল কাটায়। মোহগ্রস্ত জীবের বাল্য-কৈশোর অবস্থায় খেলাধুলোয় কুড়ি বছর চলে যায়, জরাগ্রস্ত হয়ে অসমর্থ অবস্থায়ও কুড়ি বছর কাটে, অবশিষ্ট যে পরমায়ু থাকে সেটা দুষ্পূরণীয় কামনায় বলবান মোহের প্রকোপে গৃহাসক্ত ভোগ-প্রমত্ত ব্যক্তির বৃথাই চলে যায়। একবার ইন্দ্রিয়াসক্ত হয়ে গৃহের প্রতি আকৃষ্ট হলে স্নেহপাশে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ অবস্থায় কোন্ ব্যক্তি আর তা থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারে? অর্থপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা প্রাণাপেক্ষা অধিক প্রিয়, সুতরাং তা কে ত্যাগ করতে পারে? তস্কর, রাজসেবক এবং বণিক সকলেই অর্থপ্রাপ্তির আশায় প্রাণ পর্যন্ত ত্যাগ করে। প্রেমিকা-প্রিয়ার সঙ্গে রহস্যালাপ, মধুর মনোহর মন্ত্রণার কথা স্মরণ করে কোন্ ব্যক্তি সংসার ত্যাগ করতে পারে? বান্ধবদের স্নেহবন্ধন ছিন্ন করে তাদের সঙ্গ কে ছাড়তে পারে? শিশুদের মধুর কথায় যাদের চিত্ত অনুরক্ত, তারাই বা কেমন করে এই সম্পর্ক ত্যাগ করতে সক্ষম? ৬-১১

পুত্র, কন্যা, ভাই, বোন, অসহায় পিতা-মাতা এবং ভাল ভাল মনোহারী পরিচ্ছদ, গৃহপরম্পরা প্রাপ্ত ধনাগমের বৃত্তি, গৃহপালিত পশু প্রভৃতি এবং প্রিয় ভৃত্যদের স্মরণ করলে কি কেউ গৃহত্যাগ করতে পারে? যে রকম গুটি-পোকা নিজের গৃহ নির্মাণ করে বেরোবার আর পথ রাখতে পারে না, সেইরকম দুরন্ত মোহাচ্ছন্ন ব্যক্তি লোভের বশবর্তী হয়ে অতৃপ্ত কামনা বহন করে উপস্থজাত ও জিহ্বার স্বাদজনিত সুখকেই বহু বলে মনে করে। সে আর কি ভাবে বৈরাগ্য লাভ করতে পারে? প্রমত্ত ব্যক্তি যে কুটুম্ব-পোষণ দ্বারা নিজের আয়ুক্ষয় করে পরম পুরুষার্থ লাভে বাধা সৃষ্টি করছে—তাও সে বুঝতে পারে না. ফলে সে কেবল সর্বত্র ত্রিবিধ তাপে দুঃখ ভোগ করে। সুতরাং সে আর নির্বেদ (সংসার-বৈরাগ্য) লাভ করবে কি করে? কুটুম্ব সঙ্গ-সুখেই তো সে ডুবে থাকে। বিত্ত লাভে চিরদিন অভিনিবিষ্টচিত্ত ব্যক্তিকে ইহলোক ও পরলোকে যে দোষের ভাগী হতে হয়, এটা জেনেও অজিতেন্দ্রিয় অশান্ত-কাম সেই ব্যক্তি কুটুম্বের দায়ে পরের বিত্ত হরণ করে। গৃহাসক্ত ব্যক্তির বৈরাগ্য লাভ অসম্ভব। কেন না, কুটুম্ব পোষণের জন্য 'আমি কে, কি করছি' এই রকম আত্মসমীক্ষা করবারও তার অবসর থাকে না। কাজেই মোহগ্রস্ত ব্যক্তি বিদ্বান হলেও তমোগুণের বশীভূত হয় এবং 'এটা আমার, ওটা অপরের' এই রকম দ্বিবিধ চিন্তায় মোহাচ্ছন্ন থাকে। ১২-১৬

যেহেতু মানুষ নিজেকে মুক্ত করতে অসমর্থ, অতএব নারায়ণের শরণ গ্রহণ করা কর্তব্য। অসামর্থ্যের কারণ ভোগে আসক্ত মানুষ, যাদের দৃষ্টিতে কামনা ব্যাধি, তারা কামিনীগণের ক্রীড়ামৃগস্বরূপ হয়ে শৃঙ্খলের তুল্য পুত্র-কন্যার বন্ধনে

১ জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ। ঈশ উপনিষদ-২

পড়ে। অতএব দানবপুত্রগণ, তোমরা বিষয়াসক্ত দানবের সঙ্গ ত্যাগ করে নারায়ণের শরণাপন্ন হও। কারণ তাঁর শরণেই মোক্ষলাভ। বিমুক্তসঙ্গ মুনিদের এই অভিলাষ। ভগবান অচ্যুতের প্রীতি বিধান করা বহু আয়াসসাধ্য নয়। যেহেতু তিনি সকলের আত্মা, তিনি সর্বত্র আছেন। উচ্চ-নীচ সর্বভূতে, ব্রহ্মা থেকে স্থাবর পর্যন্ত পাঞ্চভৌতিক বিকারে, পঞ্চ মহাভূতে এবং মহৎ-তত্ত্বে, ত্রিগুণে ও গুণ সাম্যাবস্থায় (প্রকৃতিতে) এবং ব্যক্তাব্যক্ত উভয় রূপে এক অব্যয় আত্মা পরমেশ্বর ভগবান বিরাজমান। এক পরমেশ্বরই প্রত্যগাত্মা, দ্রষ্টা ও দৃশ্যরূপে ব্যাপ্য ও ব্যাপক বিকল্পের অতীত হয়েও তিনি নির্দেশ্য-অনির্দেশ্যরূপে প্রতিভাত হন। কেননা তিনি কেবল অবিমিশ্র আনন্দ অনুভব স্বরূপ। সর্বত্র তাঁর সর্বজ্ঞভাব অনুভূত না হবার কারণ, তিনি গুণসৃষ্টিকারিণী মায়া দ্বারা নিজের ঐশ্বর্য অন্তর্হিত করে রাখেন। ১৭-২৩

অতএব দানবভাব পরিত্যাগ করে সমস্ত জীবের প্রতি দয়া ও প্রীতির ভাব কর। এতেই শ্রীবিষ্ণু প্রসন্ন হবেন। সেই আদিপুরুষ অনন্তদেব তুষ্ট হলে আর অলভ্য কি থাকে? সবই লাভ করা যায়। গুণ-পরিণামে দৈবাৎ অযত্ন-সিদ্ধ ধর্মাদি ফলে কি হবে? গুণাতীত মোক্ষের আকাঙ্ক্ষায় বা কি ফল? আমরা সর্বদা তাঁর নামকীর্তন এবং তাঁর চরণারবিন্দের সুধা-সার সেবন করি, অতএব মোক্ষের প্রয়োজন নেই। ধর্ম, অর্থ ও কামকে ত্রিবর্গ বলা হয়েছে। একে আচার্যেরা বেদোক্ত পুরুষার্থ বলে নির্ণয় করেন। ত্রিবর্গ নামে অভিহিত ধর্ম, অর্থ ও কামকে বলা হয়েছে আত্মজ্ঞান, কর্মবিদ্যা, তর্কবিচার, দণ্ডনীতি, বিবিধ জীবিকা। এই সমস্ত বেদ-প্রতিপাদ্য বিষয় যদি আত্মার পরম পুরুষে আত্মসমর্পণের সাধক হয়, তাহলেই তা সত্য, নচেৎ অসত্য। পূর্বে নর-ঋষির সখা নারায়ণ ঋষি এই দুর্লভজ্ঞান দেবর্ষি নারদকে উপদেশ দিয়েছিলেন। যাঁরা একান্ত ভক্ত ও অকিঞ্চন জন, তাঁদের পদারবিন্দ-পরাগ দ্বারা অভিষিক্ত দেহী মাত্র এই জ্ঞানের অধিকারী। আমিও সেই দেবদর্শন দেবর্ষি নারদের কাছে বিজ্ঞান সংযুক্ত জ্ঞানের কথা শুদ্ধ ভাগবত ধর্ম শ্রবণ করেছি। দৈত্যপুত্রেরা বলল, প্রহ্লাদ, তুমি আমাদের উপদেষ্টা। ষণ্ড-অমর্ক দুই গুরুপুত্র ছাড়া তুমিও অন্য গুরু জান না, আমরাও কাউকে জানি না। আমাদের মত বালকদের উপদেষ্টা কর্তা বলে তো এদের জানি। অন্তঃপুরে বাস করে মহতের সঙ্গলাভ তো সম্ভব নয়। এই বিষয়ে আমাদের সংশয় হচ্ছে। সুতরাং সৌম্য প্রহ্লাদ, যদি বিশ্বাসযোগ কোন কারণ থাকে তা দ্বারা তুমি আমাদের সংশয় দূর করে দাও। ২৪-৩০

সপ্তম অধ্যায়

মাতৃগর্ভস্থ প্রহ্লাদকে নারদের উপদেশ

নারদ বললেন, দানবপুত্রদের দ্বারা অনুরুদ্ধ হয়ে মহাভাগবত প্রহ্লাদ আমার উপদেশ স্মরণ করে তাদের বলতে লাগলেন, আমার পিতা তপস্যার জন্য মন্দরাচলে গেলে দেবতারা দানবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজন করলেন। ইন্দ্রাদি দেবতারা তখন বললেন, সুযোগ পেলে যেভাবে ক্ষুদ্র পিপীলিকা মহাসর্পকে ভক্ষণ করে সেই রকম স্বকৃত পাপেই লোকসন্তাপকারী হিরণ্যকশিপু বিনষ্ট হল। ১-৩

দেবতারা নানাভাবে বল প্রকাশ করে যুদ্ধের উদ্‌যোগ করছে এই শুনে দানব দলপতিরা নিহত হবার ভয়ে যে যেদিকে পারল পালিয়ে গেল। প্রাণরক্ষার জন্য তারা এত ত্বরিতগতিতে পালাল যে স্ত্রী-পুত্র, পশু, বিত্ত বা বস্ত্রাদি কোথায় কি পড়ে রইল তাদের সেদিকে দৃষ্টি দেবার অবকাশ ছিল না। জয়াকাঙ্ক্ষায় দেবতারা দৈত্যরাজের গৃহ পর্যন্ত লুট করে ফেলল। দেবরাজ ইন্দ্র কিন্তু দৈত্যরাজ মহিষী আমার মাকে গ্রহণ করল। ভয়ে কাতরা ক্রন্দনপরায়ণা অসহায় কুররী পক্ষীর মত আমার মাকে যখন ইন্দ্র নিয়ে যায়, তখন দৈবাৎ পথে সমাগত দেবর্ষি নারদ সেখানে তাকে দেখতে পেলেন। তিনি বললেন, দেবরাজ, নিরপরাধ একে ছেড়ে দিন, ইনি সতী এবং পরস্ত্রী। ইন্দ্র বললেন, এর গর্ভে দানবের সন্তান রয়েছে। সে ভয়ংকর দেবশত্রু, যতদিন এর সন্তান প্রসব না হয় এবং তাকে হত্যা করা না হয়, ততদিন এই নারী আমার গৃহেই থাকুক। নারদ বললেন, এই ভাবী সন্তান নিষ্পাপ, সাক্ষাৎ মহাভাগবত এবং মহৎ ব্যক্তি, ইনি অনন্ত দেবের অনুচর মহা-বলবান, আপনি একে নিহত করতে পারবেন না। দেবর্ষি'র এই রকম কথা শুনে তাঁর নির্দেশ অনুসারে দেবরাজ আমার মাকে অনন্তপ্রিয় ভক্তসহ পরিক্রমা করে ছেড়ে দিয়ে স্বর্গে চলে গেলেন। ৪-১১

এর পর দেবর্ষি আমার মাকে নিজের আশ্রয়ে নিয়ে গেলেন ; তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, বৎসে, তোমার পতি না আসা পর্যন্ত তুমি এই আশ্রমেই থাক। 'তবে তাই হোক' বলে নির্ভয়ে তিনি দেবর্ষি'র আশ্রমে থাকতে লাগলেন। দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপু তপস্যা থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত তিনি সেখানেই রইলেন। আমার সতী মা ইচ্ছানুসারে সময়মত সন্তান প্রসব করবার উদ্দেশ্যে এবং গর্ভস্থ সন্তানের মঙ্গলের জন্য পরম ভক্তির সঙ্গে আশ্রমে থেকে ঋষির পরিচর্যা করেছিলেন। করুণ-হৃদয় ঋষি মায়ের অভিলষিত উভয় বর দান করেন এবং গর্ভস্থ আমাকে উদ্দেশ করে ধর্মের তত্ত্ব ও জ্ঞান উপদেশ দেন। বহুকাল অতীত হওয়ার ফলে এবং স্ত্রীলোক বলে মা তা ভুলে গিয়েছিলেন ; কিন্তু ঋষির অনুগ্রহে সেই তত্ত্বজ্ঞানের স্মৃতি আমাকে এ-পর্যন্ত ত্যাগ করেনি। আমার কথায় শ্রদ্ধালু হলে তোমাদের এবং স্ত্রী, বালক প্রভৃতি সকলেরই সেই শ্রদ্ধা থেকে সংসার-বন্ধন ছিন্ন করবার মত বুদ্ধির উদয় হবে। গাছের ফুল, ফল প্রভৃতি যথাসময়ে উৎপন্ন হয়ে রূপান্তরিত হয় এবং শেষে নষ্ট হয়, কিন্তু গাছ বর্তমান থাকে। সেই রকম আত্মার আশ্রয়ে দেহের জন্ম প্রভৃতি ছয়টি ভাববিকার দেখা যায়, সেটা আত্মার নয়। ১২-১৮

আত্মা চিরন্তন, ক্ষয়শূন্য, শুদ্ধ, এক, অদ্বিতীয়, বিজ্ঞাতা, সর্বাশ্রয়, বিকার-রহিত, স্বপ্রকাশ, কারণস্বরূপ, সঙ্গহীন এবং অনাবৃত। পূর্বোক্ত দ্বাদশ লক্ষণ দ্বারা আত্মাকে জেনে দেহাদিতে 'আমি ও আমার' এই মিথ্যা মায়া-জনিত মোহ ত্যাগ করবে। স্বর্ণের খনি যেখানে আছে, সেখানকার প্রস্তর-খণ্ডে স্বর্ণকণিকার অস্তিত্ব থাকে। স্বর্ণকারেরা প্রস্তর থেকে স্বর্ণ নিষ্কাশন করবার উপায় জেনে স্বর্ণ লাভ করে থাকে। সেইরকম কার্য-কারণ জ্ঞাতা পুরুষ ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায় জেনে দেহে আত্মযোগ দ্বারা ব্রহ্মত্বলাভ করতে সমর্থ হন। প্রকৃতি আট প্রকার যথা : প্রকৃতি, মহৎ, অহংকার, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ। সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিন গুণ প্রকৃতিরই। একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চমহাভূত, এই ষোড়শ বিকার। সাক্ষীস্বরূপে সম্বন্ধ বলে আত্মা এক এবং প্রকৃতি থেকে ভিন্ন—পণ্ডিতগণ একথা বলেন। এই সমস্তের সমষ্টিস্বরূপ দেহ দ্বিবিধ—স্থাবর ও জঙ্গম। এই দেহেই তন্ন তন্ন করে সেই আত্মাকে অন্বেষণ করা উচিত। দেহের সঙ্গে আত্মার সম্বন্ধ ও পার্থক্য বিচারবলে বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ দ্বারা স্থিরভাবে সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারের কারণ পর্যালোচনা করে আত্মার

অনুসন্ধান করা উচিত ; জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি—এই সব বুদ্ধির বৃত্তি যিনি অনুভব করেন, তিনি সাক্ষী পরম পুরুষ। ১৯-২৫

কুসুম-সৃষ্ট গন্ধের আশ্রয় বায়ুকে যেমন গন্ধদ্বারা জানা যায়, সেইপ্রকার ত্রিগুণময়ী ক্রিয়া থেকে উৎপন্ন বুদ্ধি এই ভিন্ন বৃত্তির সঙ্গে যুক্ত হওয়ার ফলে আত্মাকে গুণময় বলে মনে হয়; বস্তুত আত্মা গুণাতীত। সংসার-বন্ধন বুদ্ধিসম্বন্ধ, এর মূলে অজ্ঞান। যেরকম রজ্জুতে মিথ্যা সর্প ভাবনা, সেইরকম আত্মার সংসারবন্ধন না থাকলেও তাকে যে সংসারবন্ধ বলে মনে হয় তা স্বপ্নের মতই অলীক। অতএব তোমরা সকলেই ত্রিগুণাত্মক কর্মবীজ ধ্বংস করবার উপায় যে যোগ, যাতে জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি প্রভৃতি অজ্ঞান-প্রবাহ বিনষ্ট হয়, সেই যোগ সাধন কর। পূর্বোক্ত কর্মবীজ ধ্বংসের সহস্র সহস্র উপায় থাকলেও ভগবান যে উপায় নিজমুখে বলেছেন তা হল—যথাশাস্ত্র ধর্মানুষ্ঠান করে ভগবানে কর্ম সমর্পণ করলে ভগবদ্ভক্তি লাভ হয়। গুরুসেবা, তাঁর প্রতি ভক্তি, নিজের সমস্ত লব্ধবস্তু গুরুকে সমর্পণ, সাধু ও ভক্তদের সঙ্গ এবং ঈশ্বরারাধনা, শ্রদ্ধার সঙ্গে ভগবৎ-কথা শ্রবণ, তাঁর গুণ ও কর্মাদি কীর্তন, তাঁর চরণকমল ধ্যান, শ্রীবিগ্রহ দর্শন ও পূজন এবং সর্বত্র শ্রীহরি অবস্থিত এই জ্ঞান—এই ভাবে চিন্তা করে সর্বভূতে সাধু দৃষ্টি রাখতে হবে। পূর্বোক্ত উপায়ে ষড়্‌বর্গকে বশীভূত করে ঈশ্বরকে ভক্তি করলে ভগবান বাসুদেবে রতি লাভ হয়। ২৬-৩৩

তখন দেখা যায়—ভগবানের লীলাবিগ্রহের দ্বারা অনুষ্ঠিত লীলাকীর্তনে ও তাঁর অতুলনীয় বীর্য-প্রকাশক কথা শ্রবণে ভক্তের হৃদয়ে অপূর্ব আনন্দের সঞ্চার হয় এবং সে পুলকভরা অঙ্গ, অশ্রুসিক্ত নেত্র, প্রেমরুদ্ধ কণ্ঠের গদ্‌গদ বাণীতে আকুল হয়ে উচ্চস্বরে গান করে, বিলাপ করে, আবার নৃত্য করে। কখনও গ্রহগ্রস্ত ব্যক্তির মত হাসে, কাঁদে, স্তব্ধ হয়ে ধ্যান করে, আবার প্রণাম করে, শ্বাস ঘন ঘন বইতে থাকে। হে হরি, হে জগন্নাথ, হে নারায়ণ—এইভাবে নিজের মনে উচ্চারণ করে নির্লজ্জের মত অবস্থান করে। তখন সেই জীব সমস্ত বন্ধন মুক্ত হয়ে ভগবদ্ভাবে পরিভাবিত হয় এবং তার মন ও শরীর থেকে বাসনাসহ অজ্ঞানবীজ বিনষ্ট হয়ে গেলে সে ঐকান্তিক ভক্তির প্রয়োগে ভগবানের সান্নিধ্য লাভ করে। অশুভ সংসারানুরাগী দেহীর জন্ম-মৃত্যুরূপ সংসার-বন্ধন ছেদনকারক ভগবান অধোক্ষজের আশ্রয় গ্রহণ করাই যে নির্বাণ-সুখস্বরূপ পণ্ডিতেরা সেকথা জানেন। অতএব হৃদয়ের মধ্যে অন্তর্যামী ঈশ্বরকে আরাধনা কর। ৩৪-৩৭

অসুরবালকগণ, যে হরি হৃদয়ে আকাশের মত অবস্থান করেন তাঁকে ভজনা করা আর কঠিন কি? তিনি আত্মার বন্ধু; দেহধারী ব্যক্তির ন্যায় সাধারণ শূকরাদি জীবের মত শুধু বিষয়ের প্রতি তিনি আসক্ত হবেন কেন? তা হলে তাঁর আর অসামান্যতা কোথায়? ধন, সম্পদ, স্ত্রী, গবাদি পশু, পুত্র-কন্যা, গৃহ, ভূসম্পত্তি, হস্তী, অশ্ব বা ধনভাণ্ডার, ঐশ্বর্য, অর্থ ও কাম—এ সবই চঞ্চল। মর্ত্য মানুষের সেটা কতদিন প্রিয় থাকবে? যজ্ঞদ্বারা প্রাপ্ত স্বর্গাদির সুখও ক্ষয়িষ্ণু, অতএব সর্বতোভাবে নির্মল নয়। সেইজন্য তাও পরিত্যাগ করে যাঁর দোষ দেখা যায় না বা শোনা যায় না, আত্মোপলব্ধির জন্য পূর্বোক্ত ভক্তি দ্বারা সেই পরমেশ্বরের আরাধনা কর। পাণ্ডিত্যাভিমানী ব্যক্তিরা যে সংকল্প নিয়ে বার বার কর্মে প্রবৃত্ত হয় প্রায়ই তার বিপরীত ফল তারা লাভ করে। ৩৮-৪১

পাণ্ডিত্যাভিমানী ব্যক্তি দুঃখমোচন ও সুখপ্রাপ্তির জন্যই কর্ম করে, কিন্তু ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় তার সুখাবৃত দুঃখই লাভ হয়। যে দেহের ভোগের জন্য

কামনা করে লোকে ফল প্রার্থনা করে, সেই দেহই কুক্কুরভোগ্য ও ক্ষণভঙ্গুর—দেহ আসে, আবার যায়। দেহই যখন নিজের নয়, দেহ থেকে পৃথক পুত্র, কন্যা, ধন-কোষাগার, গজ-অমাত্য, ভৃত্য বা বন্ধুকে আর কেমন করে মমতার আস্পদ বলা যায়? এই সব তুচ্ছ নশ্বর পদার্থ যার মধ্যে কোন সার নেই, তারা নিত্যানন্দ রস-সাগর আত্মাকে লাভ করবার বিষয়ে কি উপকারে আসবে? অসুরগণ, জন্মলাভ অবধি ক্লেশভোগকারী জীব কর্মদ্বারা কি স্বার্থলাভ করতে পারে তা বিচার করে দেখ। কর্মদ্বারা দেহীর দেহারম্ভ, এই রকম কর্ম ও দেহ উভয়ের অনুগমন ছাড়া আর কি লাভ? অতএব ধর্ম, অর্থ ও কাম যাঁর অধীন, সেই সর্বপ্রকার কামনারহিত শ্রীহরিকে নিষ্কামভাবে ভজনা কর। শ্রীহরি স্বকৃত মহাভূত দ্বারা সৃষ্ট সর্বজীবের অন্তর্যামী। দেবতা, অসুর, মনুষ্য, যক্ষ ও গন্ধর্ব যেই হোক, মুকুন্দের চরণ ভজন করে আমি যে রকম শান্তি লাভ করেছি, সে রকম তারাও মুকুন্দের চরণারবিন্দ সেবা করে শান্তি ও মঙ্গল লাভ করবে। ৪২-৫০

দ্বিজত্ব, দেবত্ব ও ঋষিত্ব বা এই জাতীয় অন্য কিছু মুকুন্দের প্রীতির কারণ নয়, নির্মল ভক্তিতে শ্রীহরি যে রকম প্রীত হন, দান, তপ, যজ্ঞ, শৌচ, ব্রত বা অন্য কিছুতেই তিনি সে রকম প্রীত হন না; কারণ অন্য সব কিছুই বিড়ম্বনা মাত্র। অতএব, দানবসন্তানগণ, সকল জীবকে আপনার মত দেখে সকল জীবের আত্মা ভগবান শ্রীহরিকে ভক্তি করে যক্ষ, রাক্ষস, স্ত্রী, শূদ্র, ব্রজবাসী, পশুপক্ষী, সকলেই অচ্যুতের সঙ্গে সাম্যভাব লাভ করেছে। এই ধরণীতে জীবের পরম পুরুষার্থ হল সর্বত্র ভগবানকে দর্শন করা। শ্রীগোবিন্দের প্রতি ঐকান্তিকী ভক্তি দ্বারাই তা সম্ভব। ৫১-৫৫

অষ্টম অধ্যায়

হিরণ্যকশিপু বধ

নারদ বললেন, দৈত্যবালকেরা প্রহ্লাদের কথা শুনে তাকেই উৎকৃষ্ট বিবেচনায় গ্রহণ করল। গুরু ষণ্ড ও অমর্কের শিক্ষা তারা পরিহার করল। শুক্রাচার্য-পুত্ররা যখন দেখলেন সমস্ত দৈত্যবালকের বুদ্ধিই বিষ্ণুভক্তিতে নিবদ্ধ, তখন তিনি ভয় পেয়ে রাজার কাছে তা নিবেদন করেন। রাজা হিরণ্যকশিপু রোষে কম্পিত হয়ে পরুষ-বাক্যে প্রহ্লাদকে তিরস্কার করল এবং পুত্রকে হত্যা করার সংকল্প করল। প্রহ্লাদের প্রতি ক্রোধ সমীচীন না হলেও পদাহত সর্পের ন্যায় উদ্ধত ভয়ংকর সেই দানব ভক্তিনম্র কৃতাঞ্জলিপুট প্রহ্লাদকে বক্রদৃষ্টিতে দেখে বলল, ওরে দুরন্ত দুষ্টবুদ্ধি, তুই আমাদের কুলনাশ করার জন্যই জন্মগ্রহণ করেছিস। তুই অধম জড়বুদ্ধি, আমার শাসনও অমান্য করিস? আচ্ছা দেখ, আজই তোকে যমালয়ে পাঠাচ্ছি। আমি ক্রুদ্ধ হলে লোকপালসহ ত্রিলোক কম্পিত হয়, আর তুই আমাকে কিছুমাত্র ভয় না করে কার বলে বলীয়ান হয়ে আমার শাসন লংঘন করিস? ১-৬

প্রহ্লাদ বললেন, মহারাজ, যাঁর বলে আমি বলবান সেই ভগবান কেবল আমার নন আপনারও এবং অপর যত বলবান আছে, সকলেরই বল তিনি। পরাৎপর ব্রহ্মা থেকে আরম্ভ করে স্থাবর-জঙ্গম সকলকেই তিনি নিজের বলে বশীভূত করে রেখেছেন। তিনিই ঈশ্বর কালস্বরূপ, তাঁর অসীম পরাক্রম। তিনি তেজ, সাহস, ধৈর্য, বল,

বুদ্ধি প্রভৃতির পরমাশ্রয়। ত্রিগুণের অধীশ্বর তিনিই নিজের শক্তিসমূহ দ্বারা বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও পালন করেন। আপনি আপনার প্রাণের এই আসুরভাব ত্যাগ করুন। মনে সমভাব ধারণ করলে আর কেউ বিদ্বেষ করবার থাকবে না। উৎপথগামী মন ভিন্ন আর শত্রু নেই। মনের সমভাবই অনন্তদেবের সর্বশ্রেষ্ঠ আরাধনা। অনেকে সর্বস্বাপহারী দস্যুকে (কামক্রোধাদি ষড়্‌রিপু) জয় না করেই দশদিক আপনার বশ হয়েছে মনে করে। জিতাত্মা, বিজ্ঞ, সর্বভূতে সমদৃষ্টি সম্পন্ন সাধুদের শত্রু নেই। অজ্ঞানতাই শত্রুতার কারণ। ৭-১০

হিরণ্যকশিপু বলল, ওরে মন্দবুদ্ধি, নিশ্চয়ই তুই মরবার জন্য প্রস্তুত হয়েছিস। তা না হলে এই রকম সীমাহীন গর্ব অনুভব করবি কেন? মুমূর্ষু ব্যক্তিরই বাক্য বিভ্রম হয়, সে অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করতে পারে না। ওরে দুর্ভাগা, তুই যে বললি আমি ছাড়া অন্য জগদীশ্বর আছে, সে কোথায় আছে? যদি বলিস সর্বত্র আছে, তবে কোথায় এই স্তম্ভের মধ্যে তাকে তো দেখা যাচ্ছে না? আমি তোর দেহ থেকে মস্তক ছিন্ন করছি, তুই যে হরির শরণ শ্রেয় বলে মনে করেছিস, আজ সে তোকে রক্ষা করুক। ১১-১৩

তীব্র ক্রোধে এইরকম দুর্বাক্য উচ্চারণ করে সেই মহাসুর মহাভাগবতপুত্রকে তর্জন করল এবং খড়্গ হাতে নিয়ে সিংহাসন থেকে লাফিয়ে নেমে মুষ্টি দ্বারা স্তম্ভটিকে সবলে আঘাত করল। তখনই সেই স্তম্ভ থেকে ভীষণ শব্দ উত্থিত হয়ে ব্রহ্মাণ্ড-কটাহকে যেন বিদীর্ণ করল। সেই ধ্বনি শুনে ব্রহ্মাদি দেবগণ নিজ নিজ স্থান ধ্বংসের আশংকা করলেন। পুত্রবধের জন্য বলবিক্রম প্রকাশ করতে গিয়ে হিরণ্যকশিপু সেই অদ্ভুত ভয়ংকর ধ্বনি শুনে সভার দিকে চেয়ে দেখল। কিন্তু যে ধ্বনিতে দেবতার শত্রু দানবশ্রেষ্ঠরা ভীত হয়েছিল তার মূল আশ্রয়কে সে দেখতে পেল না। ভগবানের ভক্ত প্রহ্লাদ যে কথা বলেছিলেন এবং চরাচর নিখিল ভূতে আত্মার ব্যাপ্তি সত্য প্রমাণিত করার জন্য ভগবান যে অদ্ভুত রূপ স্তম্ভে প্রকাশ করলেন, সেই রূপ মৃগেরও নয়, মানুষেরও নয়। হিরণ্যকশিপু স্তম্ভের মধ্য থেকে সেই নৃসিংহ-মূর্তিকে বেরোতে দেখে বলল, একি আশ্চর্য! এ মৃগও নয়, মানুষও নয়, তবে কোন্ প্রাণী? এটা নৃসিংহের রূপ? হিরণ্যকশিপু যখন সেই ভীষণ নৃসিংহ-রূপের মীমাংসা করতে ব্যস্ত তখনই নৃসিংহরূপী শ্রীহরি তার সম্মুখে উপস্থিত হলেন। ১৪-১৯

তাঁর চোখ তপ্ত সোনার মত এবং রূপ ভয়ংকর। কেশররাশিতে আবৃত ভীষণ মুখমণ্ডল, তরবারির তুল্য তীক্ষ্ণ দন্ত ও ক্ষুরধার জিহ্বা এবং ভ্রূকুটিসহ বিশাল বদন যুক্ত সেই মূর্তিকে ভয়ানক মনে হোল। তাঁর দুই কর্ণ নিশ্চল ও উন্নত, মুখ ও নাসিকা পর্বত-কন্দরের মত, গণ্ডযুগল ভীষণ-দর্শন, দেহ গগনস্পর্শী, গ্রীবা ক্ষুদ্র ও স্থূল, বক্ষ বিশাল, উদর কৃশ। শরীরের সমস্ত অংশ চন্দ্রকিরণ-ধবল রোমাবৃত, অগণিত ভুজ চতুর্দিকে প্রসারিত, তাতে নখরূপ ভয়ংকর অস্ত্ররাশি। এ ছাড়া চক্র প্রভৃতি নিজ অস্ত্র দ্বারা সমস্ত দৈত্য-দানবকে তিনি শংকিত করছিলেন। দুর্লভ তাঁর সেই আবির্ভাবের কারণ বিচার করে হিরণ্যকশিপু বলল, নানারকম মায়া প্রদর্শনে সমর্থ এই হরি এই রূপ ধারণ করেই আমাকে নিহত করতে মনস্থ করেছেন, তা স্পষ্টই বুঝতে পারছি। কিন্তু তাঁর এই উদ্যমে আমার কি হবে? এই বলে সেই দৈত্যপ্রধান গর্জন সহকারে গদা ধারণ করে নৃসিংহের প্রতি আক্রমণ করল। যেমন পতঙ্গ অগ্নিতে পড়ে অদৃশ্য হয়ে যায়, সেই রকম ঐ দানবরাজ শ্রীনৃসিংহের তেজের প্রভায় অদৃশ্য হয়ে গেল। সত্ত্বপ্রকাশ শ্রীহরিতে তমোময় অসুরের অদর্শন কিছু আশ্চর্য ব্যাপার নয়,

কারণ তিনি প্রলয়কালের প্রগাঢ় অন্ধকারকেও পান করেছিলেন। সেই মহাসুর নৃসিংহকে আক্রমণ করে সবেগে গদাদ্বারা আঘাত আরম্ভ করলে তার বিক্রম দেখে, গরুড় যেমন মহাসর্পকে অনায়াসে ধারণ করে, সেইভাবে গদাসহ অসুরকে গদাধর শ্রীহরি ধরে ফেললেন। ২০-২৫

ভারত, হিরণ্যকশিপু একবার নিজেকে মুক্ত করে গরুড়ের আক্রমণ থেকে বিমুক্ত সর্পের মত বিক্রম প্রকাশ করতে লাগল। স্থানভ্রষ্ট দেবতাগণ দানবকে ঐরকম পরাক্রম প্রকাশ করতে দেখে ব্যাকুলচিত্তে মেঘের অন্তরালে অবস্থান করতে লাগলেন। তাঁরা আশংকা করলেন যে, যদি এই দানব বাঁচে, তা হলে কোথাও আর স্থান পাওয়া যাবে না। যাঁর হাত থেকে কোনক্রমে বিমুক্ত হল, সেই নৃসিংহকে শংকিত মনে করে হিরণ্যকশিপু একটু বিশ্রামের পর খড়্গ ও চর্ম ধারণ করে সবেগে তাঁকে পুনরায় আক্রমণ করল। দানব হিরণ্যকশিপু খড়্গ-চর্ম নিয়ে শ্যেনবেগে উপরে নীচে ভ্রমণ করছিল। তখন শ্রীহরি তীক্ষ্ণ, ভয়ংকর অট্টহাসিতে ভীত, নিমীলিত-নয়ন দানবকে গ্রহণ করলেন। বজ্রপ্রহারেও যার গায়ে আঁচড় লাগেনি, শ্রীহরি ধরা মাত্র সর্পধৃত মূষিকের মত সে কাতর হয়ে ধড়ফড় করতে লাগল। ভগবান দ্বারদেশে আপনার উরুর উপরে তাকে রেখে, গরুড় যেমন মহাবিষ সর্পকে ছিন্ন করে, সেই রকম অবলীলাক্রমে নখর দ্বারা বিদীর্ণ করে ফেললেন। সেই নৃসিংহের করাল-লোচন ক্রোধে রক্তবর্ণ হয়েছিল, তিনি নিজ রসনা দ্বারা ব্যক্ত বদনভাগ বারংবার লেহন করছিলেন। হস্তিবধ দ্বারা সিংহের ন্যায় নৃসিংহের কেশর ও মুখ রক্তাক্ত হয়ে অরুণবর্ণ ধারণ করল। তিনি নখাংকুর দ্বারা তার হৃৎপদ্ম উৎপাটন করে ফেললেন। তারপর তাকে পরিত্যাগ করে তার সহস্র সহস্র অনুচরবর্গকে বধ করলেন। তাঁর নখরাস্ত্রধারী দোর্দণ্ড বাহুসকল সৈন্যরূপ কাজ করছিল। ২৬-৩১

মহারাজ, নৃসিংহ দৈত্যবধের জন্য ব্যগ্র হয়ে ভয়ংকর আড়ম্বর করেছিলেন। মেঘসকল তাঁর জটাস্পর্শে কম্পমান হয়ে বিশীর্ণ, গ্রহগণের জ্যোতি তাঁর দৃষ্টি দ্বারা তিরস্কৃত এবং সাগরগুলি তার নিঃশ্বাস-বায়ুতে আহত হয়ে ক্ষুব্ধ হয়েছিল। দিগ্‌হস্তিসমূহ সেই শব্দে ভীত হয়ে চিৎকার করছিল। তাঁর জটাঘাতে উৎক্ষিপ্ত সহস্র বিমানে ব্যাপ্ত হয়ে স্বর্গ যেন আরও ঊর্ধ্বে উঠল, পদভর-পীড়িতা পৃথিবী যেন নিম্নে যেতে লাগল। তার বেগে পর্বতগুলি যেন উৎপতিত হল। আকাশ ও দিক্‌সকল তাঁর তেজে দীপ্তিশূন্য মনে হল। এরপর সভামধ্যে উত্তম নৃপাসনে উপবিষ্ট, প্রতিদ্বন্দ্বীশূন্য, অতি তেজস্বী, অতি ক্রোধী, ভীমবদন প্রভুকে সেবা করতে কেউ এগিয়ে আসতে সাহস করল না। লোকত্রয়ের শিরঃপীড়াস্বরূপ আদিদৈত্য সমরে নৃসিংহের হস্তে নিহত হয়েছে শুনে হর্ষাবেগে প্রফুল্লবদনা দেবাঙ্গনারা মুহুর্মুহুঃ তাঁর উপরে পুষ্পবর্ষণ করতে লাগলেন। ঐ সময়ে দর্শনাভিলাষী স্বর্গবাসী দেবগণের বিমানসমূহে গগনমণ্ডল ব্যাপ্ত হয়ে পড়ল। দেবতারা দুন্দুভি ও পটহ বাজাতে লাগলেন। গন্ধর্বগণ সঙ্গীত আরম্ভ করল। অপ্সরাসকল নৃত্য করতে লাগল। ব্রহ্মা, ইন্দ্র ও গিরিশ প্রভৃতি বিবুধগণ, ঋষিগণ, পিতৃগণ, সিদ্ধগণ, বিদ্যাধরগণ, মহাসর্পনিচয়, প্রজাপতিগণ, গন্ধর্ব, অপ্সরা, চারণ, যক্ষ, কিংপুরুষ, বেতাল, কিন্নর এবং সুনন্দ-কুমারাদি বিষ্ণুর অনুচরবৃন্দ সেই সভায় সিংহাসনাসীন তীব্রতেজা সেই নৃসিংহকে অনতিদূরে থেকে অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে পৃথক পৃথক স্তব করতে লাগলেন। ৩২-৩৯

ব্রহ্মা বললেন, দুরন্তশক্তি, বিচিত্রবীর্য, পবিত্রকর্মা নিজ লীলারূপে জগতের

সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারকারী অব্যয়াত্মা অনন্তকে প্রণাম করি। রুদ্র বললেন, ভগবন্, সহস্র যুগান্ত আপনার কোপের সময়; এখন আপনার কোপকাল নয়। এই ক্ষুদ্র অসুর নিহত হল। হে ভক্তবৎসল, সমীপাগত তার ভক্ত পুত্রকে রক্ষা করুন। ইন্দ্র বললেন, হে পরম, আপনার যজ্ঞভাগ দৈত্যবৃন্দ হরণ করে নেয়, আপনি আমাদের পরিত্রাণ করে সে সমস্ত পুনরায় এনে দিয়েছেন। আপনার আবাসস্থল আমাদের হৃৎপদ্ম দৈত্যদ্বারা অধিকৃত হয়েছিল। আপনি তা এখন মুক্ত করলেন। হে নাথ, অচিরস্থায়ী এই ত্রৈলোক্যরাজ্য আপনার সেবকদের পক্ষে অতি তুচ্ছ। হে সিংহ, মুক্তিও তাঁদের আদরণীয় নয়; অন্য কথা তো সামান্য। ঋষিগণ বললেন, আদিপুরুষ, আপনি আমাদের তপস্যাকে আপনার তেজ-স্বরূপ করেছেন। যাদ্বারা আপনার আত্মাতে লীন হলে আপনি এই জগতের সৃষ্টি করেন, সেই তপস্যা মৃতদৈত্য দ্বারা বিলুপ্ত হয়েছিল। হে শরণাগত-পালক, বিশ্বপালনার্থ গৃহীত এই শরীর দ্বারা আপনি পুনর্বার সেই তপস্যা করতে অনুমতি দিলেন, আপনাকে নমস্কার। পিতৃলোকেরা বললেন, পুত্রগণ আমাদের শ্রাদ্ধদান করলে যে দুরাত্মা স্বয়ং বলপূর্বক তা ভোজন করত এবং তীর্থ-স্নান কালে দত্ত তিলোদক স্বয়ং পান করত, প্রখর নখর দ্বারা সেই উদর বিদারণ করে যিনি ঐ সব পুনরায় আহরণ করে দিলেন, সেই অখিল ধর্মরক্ষক নরসিংহকে আমরা নমস্কার করি। সিদ্ধগণ বললেন, হে নৃসিংহ, যে নিজের যোগ ও তপস্যার বলে আমাদের যোগসিদ্ধ অণিমাদি সিদ্ধি হরণ করেছিল বহুদর্পিত সেই অসুরকে যিনি নখর দ্বারা বিদীর্ণ করলেন, হে নৃসিংহ, সেই আপনাকে আমরা প্রণাম করি। ৪০-৪৫

বিদ্যাধরগণ বললেন, আমাদের পৃথক পৃথক ধারণা দ্বারা প্রাপ্ত বিদ্যা বলদর্পে দর্পিত যে অজ্ঞ অসুর নিবারণ করেছিল, তাকে যিনি যুদ্ধে পশুর ন্যায় হত্যা করলেন সেই নৃসিংহদেবকে আমরা প্রণাম করি। নাগগণ বললেন, যে পাপাত্মা আমাদের ফণাস্থিত রত্ন ও স্ত্রীরত্নদের হরণ করেছে, তার বক্ষ বিদীর্ণ করে আমাদের যিনি আনন্দ দান করলেন তাঁকে নমস্কার। মনুগণ বললেন, দেবাদিদেব, আমরা আপনার নির্দেশ পালন করি। যে দিতি-নন্দন আমাদের বর্ণাশ্রম ধর্মসেতু ভঙ্গ করেছেন, সেই খলকে আপনি প্রশমিত করেছেন। প্রভু, আমরা আপনার সেবক। অতএব আদেশ করুন আমরা আপনার কি সেবা করব। প্রজাপতি বললেন, পরেশ, আমরা আপনার সৃষ্ট প্রজাপতি। যে দুরাত্মা দৈত্যের বিরুদ্ধাচরণে আমরা এতকাল প্রজা সৃষ্টি করতে পারি নি, যার নিষেধে আমরা প্রজা সৃষ্টি করি নি সেই দৈত্য এই। আপনি এর বক্ষস্থল বিদীর্ণ করায় এ ভূমিসাৎ হয়েছে। সত্ত্বমূর্তি, আপনার অবতার জগতের মঙ্গলস্বরূপ। গন্ধর্বগণ বললেন, বিভু, আমরা আপনার নর্তক এবং নাট্য-গায়ক। যে দুরাত্মা শৌর্য, বীর্য ও শক্তি দ্বারা প্রভাবশালী হয়ে আমাদের অধীন করেছিল, আপনি তার এই দশা করেছেন! বিপথগামী কোনও ব্যক্তি কি মঙ্গল লাভ করতে পারে? ৪৬-৫০

চারণগণ বললেন, শ্রীহরি, আপনার যে চরণকমল সংসার-ভয় দূর করে মুক্তি দান করে সেই চরণে আমরা আশ্রয় নিলাম। যে অসুর সাধুদের হৃদয়ে ভয়ের কারণ হয়েছিল, সেই দুরাত্মাকেই আপনি নিহত করলেন। যক্ষগণ বললেন, প্রভু, মনের মত কাজ করে আপনার অনুচরগণের মধ্যে আমরা প্রধান স্থান পেয়েছি। সেই দানব আমাদের বাহক নিযুক্ত করেছিল। হে পঞ্চবিংশতত্ত্ব[১] পরমেশ্বর, যে

১ প্রকৃতি, মহৎ, অহংকার, পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চমহাভূত ও একাদশ ইন্দ্রিয়—এই চতুর্বিংশতি তত্ত্বের অতিরিক্ত।

দৈত্য সকল জীবের পরিতাপের বিষয় হয়েছিল আপনি তার বিনাশ সাধন করেছেন, আপনাকে নমস্কার। কিংপুরুষগণ বললেন, আমরা তুচ্ছ কিংপুরুষ, আর আপনি মহাপুরুষ ঈশ্বর। সাধুদের দ্বারা ধিক্‌কৃত কুৎসিৎ পুরুষ এই দানব আপনার দ্বারা নিহত হয়েছে। আপনাকে আর কি প্রশংসা করব! বৈতালিকগণ বললেন, ভগবান, সভা-সমিতিতে এবং যজ্ঞস্থলে আপনার পবিত্র যশোগান করে আমরা অনেক সমাদর পেতাম, এই দুর্জন দৈত্য আমাদের সেই পূজা কেড়ে নিয়েছিল। সৌভাগ্যবশত রোগের ন্যায় দুঃখপ্রদ এই অসুরকে নিহত করায় আবার আমরা আগের সেই পূজা থেকে বঞ্চিত হব না। কিন্নরগণ বললেন, পরমেশ্বর, আমরা আপনার অনুগত কিন্নর। এই দানব বিনা বেতনে আমাদের দিয়ে কাজ করিয়ে নিত; সেই পাপকে আপনি নিহত করেছেন। নৃসিংহ, এখন আপনি আমাদের মঙ্গলবিধান করুন। বিষ্ণুর পার্ষদগণ বললেন, হে শরণাদাতা ঈশ, আজ আমরা সর্বলোক-সুখপ্রদ এই অদ্ভুত নরসিংহরূপ দেখলাম। এই দৈত্য আপনার সেই ব্রহ্মশাপগ্রস্ত কিংকর; এর নিধন আপনারই অনুগ্রহফল বলে আমরা মনে করি। ৫১-৫৬

নবম অধ্যায়

প্রহ্লাদ কর্তৃক ভগবান নৃসিংহের স্তব

নারদ বললেন, রাজা যুধিষ্ঠির, এই ভাবে ব্রহ্মা, রুদ্র প্রভৃতি দেবতারা দূর থেকে নৃসিংহকে স্তব করলেন। কেউ তাঁর কাছে যেতে সাহস করলেন না; কারণ তখনও নৃসিংহ ক্রোধের আবেশে দুর্গম। দেবতারা সাক্ষাৎ লক্ষ্মীদেবীকে প্রেরণ করলেও তিনিও সেই অতি অদ্ভুত, অদৃষ্ট ও অশ্রুত রূপ দেখে ভয়ে কাছে গেলেন না। তখন ব্রহ্মা নিকটে অবস্থিত প্রহ্লাদকে ডেকে বললেন, বৎস, প্রভু নৃসিংহ তোমার পিতার প্রতি ক্রুদ্ধ; তাঁর কাছে গিয়ে ক্রোধের নিবৃত্তি কর। মহাভাগবত সেই বালক তখনই 'যথা আজ্ঞা' বলে নৃসিংহের কাছে জোড়হাতে আস্তে আস্তে গিয়ে মাটিতে দণ্ডবৎ হয়ে প্রণাম করলেন। সেই বালক প্রহ্লাদকে নিজের পদতলে পতিত দেখে ভগবান নৃসিংহের কৃপার উদয় হল। তিনি তাঁকে তুলে তাঁর মস্তকে নিজের হাত রাখলেন। এই করকমল কালসর্পের ভয়-ভীতদের নিকট অভয়প্রদ। প্রহ্লাদ সেই করকমল স্পর্শে সর্বপ্রকার অশুভ থেকে মুক্ত হলেন; তৎক্ষণাৎ তাঁর হৃদয়ে ব্রহ্মজ্ঞান উদিত হল। নৃসিংহের পাদপদ্ম হৃদয়ে ধারণ করে তিনি ধ্যান করতে লাগলেন। তখন তাঁর দেহ পুলকিত, হৃদয় বিগলিত ও নয়ন অশ্রুসিক্ত হল। ১-৬

প্রহ্লাদ এইভাবে অবস্থান করে সমাহিতচিত্তে একাগ্রমনে শ্রীহরিকে হৃদয় ও নয়ন রেখে প্রেমে গদ্‌গদ হয়ে স্তব করতে লাগলেন। ব্রহ্মাদি দেবগণ, মুনিগণ এবং সিদ্ধ-চারণাদি সকলে একাগ্রমনে সত্ত্বগুণে অবস্থিত হয়ে বহু গুণ-যুক্ত বাক্য ব্যবহারে যাঁকে পরিতুষ্ট করতে পারলেন না, সেই শ্রীহরি দানবজাতি আমার বাক্যে কি প্রকারে সন্তোষ লাভ করবেন? আমার মনে হয় ধন, সৎকুলে জন্ম, দৈহিক সৌন্দর্য, তপস্যা, পাণ্ডিত্য, ইন্দ্রিয়ের যোগ্যতা, কান্তি, প্রতাপ, শারীরিক বল, উদ্যম, প্রজ্ঞা ও অষ্টাঙ্গ যোগ এই সকল গুণও পরম পুরুষের আরাধনার সম্পূর্ণ উপযোগী নয়। কেবল শুদ্ধা ভক্তি দ্বারা গজেন্দ্রের প্রতি ভগবানের সন্তোষ সাধিত হয়েছিল। আমার আরও

মনে হয় পূর্বোক্ত ধনাদি বারটি গুণযুক্ত ব্রাহ্মণও যদি সেই ভগবান পদ্মনাভের চরণ-কমলে বিমুখ হন, তবে যে চণ্ডালের মন, বাক্য, কর্ম, ধন ও প্রাণ ভগবানে অর্পিত হয়েছে সেও তার থেকে শ্রেষ্ঠ। গর্বিত ব্রাহ্মণ নিজেকেও পবিত্র করতে অসমর্থ, চণ্ডাল ভক্তিবলে কুল পর্যন্ত পবিত্র করে। ৭-১০

ভগবান শ্রীহরি নিজ আনন্দলাভে সদাপূর্ণ। অজ্ঞানী জীবের প্রতি করুণা করেই তিনি তাদের পূজা গ্রহণ করেন, নিজের জন্য নয়। নিজের মুখে তিলক-শোভা রচনা করলে আয়নায় প্রতিবিম্বকে আর পৃথক সাজাতে হয় না। সেই রকম ভগবান মূলবিম্ব; তাঁকে সাজালে, সম্মান করলে সেটা নিজের শোভা-সম্মানের জন্যই হয়ে থাকে। অতএব আমি নিঃশঙ্কচিত্তে যথাবুদ্ধি সর্বপ্রকারে ভগবান পরমেশ্বরের মহিমা বর্ণনা করি। নীচ হলেও তাঁর স্তুতি দ্বারা অজ্ঞানময় সংসারে পতিত জীব শুদ্ধ হয়ে থাকে। হে ঈশ্বর, এইসব ব্রহ্মাদি দেবতারা সত্ত্বমূর্তি তোমার বিধান অনুসারে কার্য সাধন করে তোমার ভক্ত; আমরা অসুর, আমাদের বৈরভাব, এঁদের সেরূপ নয়। প্রভু, তোমার ভক্তদের নিকটে মনোহর অবতার-লীলার প্রকাশ বিশ্বের মঙ্গলের জন্য, ভয়ের জন্য নয়। অতএব সকলের ভয় দূর করার জন্য তুমি ক্রোধ সংবরণ কর। যার জন্য এই ক্রোধের প্রকাশ সেই অসুর নিহত হয়েছে। এখন ক্রোধের আর কি প্রয়োজন? সর্প-বৃশ্চিকাদি নিহত হলে সাধুরাও আনন্দিত হয়ে থাকেন। প্রভু, সকল লোকের আনন্দ হয়েছে, ভয় দূর হয়েছে এখন তারা তোমার ক্রোধ পরিত্যাগ করবার প্রতীক্ষায় রয়েছে। তোমার এই রূপ স্মরণেই সকলের ভয় দূর হয়ে যাবে। তোমার এই রূপ দেখে আমি ভীত নই। ভয়ঙ্করবদন, সূর্যসদৃশ নেত্র ও ভ্রূকুটি এবং ভয়ংকর দন্ত, গলায় অন্ত্রমালা, কর্ণ ও কেশর রক্তমাখা অবস্থায় তুমি দণ্ডায়মান, তোমার গর্জনে দিগ্‌হস্তী ভীত হয়ে পলায়নপর, নখাগ্রে শত্রুর বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ, তথাপি এতে আমার ভয় হয় না। দীনবন্ধু, সংসারচক্রে ভ্রামিত হয়ে যে দুঃখ আসে তাই আমার ভয়ের কারণ। ১১-১৫

আমার মনে হচ্ছে বন্ধদশায় গ্রাসকারী হিংস্র জন্তুর মধ্যে আমি পড়েছি। কবে তুমি প্রীত হয়ে অপবর্গস্বরূপ শরণ্য তোমার চরণকমলে আমাকে আহ্বান করবে, ? যেহেতু সব যোনিতেই প্রিয় বিয়োগ ও অপ্রিয়-সংযোগজনিত অতিশয় জ্বালা অনুভূত হয়, দুঃখের প্রতিকার করতে গিয়েও দুঃখ ভিন্ন আর কিছু লাভ হয় না। আমি এই ভাবে অহং-বুদ্ধি প্রণোদিত হয়ে আত্মাভিমানে মুগ্ধ হয়ে ভ্রমণ করছি। অতএব আমার উদ্ধারের জন্য তোমার দাস্য লাভের উপায় বলে দাও। নৃসিংহদেব, তোমার পাদপদ্ম লাভ করলে পরমবন্ধু পরমদেবতা তোমার লীলাকথা উচ্চারণ করে আমি কোন দুঃখকেই দুঃখ বলে গণ্য করব না। তখন যাঁরা তোমার চরণাশ্রিত সেই ভক্ত জ্ঞানী সাধুদের সঙ্গগুণে নানারকম বিষয়াসক্তি থেকে রক্ষা পাব। দুঃখ দূর করার যে উপায় সংসারে প্রসিদ্ধ আছে তা তোমার উপেক্ষিত (আশ্রিত নয়) জনের প্রকৃত উপকারে আসে না। বালকের পিতামাতা তাকে সকল সময় ও সকল অবস্থায় রক্ষা করতে পারে না। এমন কি কোন ক্ষেত্রে তাদের কারণে সন্তানের মৃত্যুও ঘটে। আবার ওষুধ খেয়েও অনেকের মৃত্যু ঘটে। সমুদ্রে ডুবে গেলে নৌকা কাজে লাগে না; নৌকার সঙ্গেও অনেককে ডুবে যেতে হয়। তুমি উপেক্ষা করলে আর কোথাও আশ্রয় পাওয়া যায় না। ভগবান, সর্বপ্রকার রূপে তুমিই আছ। যার দ্বারা প্রেরণা, যে অধিকরণে স্থিতি, যে জন্য কিছু ঘটে, যে কালে হয়, যে কারণে ঘটে, যার সম্বন্ধে যোগ, যে অপাদান থেকে স্খলিত, পতিত, যে যে প্রকারে অভিলষিত বিষয় উৎপন্ন হয় ও রূপান্তর ঘটে, সবই তুমি। ১৬-২০

প্রভু, কালের প্রেরণায় মায়ার গুণ ক্ষোভ হয় এবং তোমার অংশস্বরূপ পুরুষের

অনুগ্রহে সেই মায়ার প্রভাবেই মন-প্রধান লিঙ্গশরীর উৎপন্ন হয়। মন বলবান কর্তা, তার জন্য কর্মময় বেদ, এই অবিদ্যাগ্রস্ত মনের ভোগের জন্য ষোড়শ বিকার-জাত সামগ্রী। হে জন্মরহিত মহাপুরুষ, এই সংসারচক্রে পতিত মনকে পৃথক করে তোমার ভজনে নিযুক্ত না করে কে এই সংসার থেকে নিস্তার পেতে পারে? তুমি চিৎশক্তিতে বুদ্ধির গুণসমস্তকে পরাজিত করে পুরুষস্বরূপে কালের ঈশ্বররূপে বিরাজমান। আমি সংসারের ষোড়শবিকার-চক্রে পড়ে ইক্ষুদণ্ডের মত নিপীড়িত হচ্ছি। কৃপা করে আমাকে উদ্ধার কর। আমি তোমার শরণাপন্ন। আমাকে কাছে টেনে নাও। লোকপালের ঐশ্বর্য, পিতৃরাজ্য বা দীর্ঘায়ু, সম্পদ, অভ্যুদয় কোন কিছুতেই আমার আর অভিলাষ নেই। আমার পিতা হিরণ্যকশিপুর প্রতাপে ঐ সমস্তই বিনষ্ট হতে দেখেছি। আমার সেই দোর্দণ্ডপ্রতাপ পিতার প্রভাবও তোমার নিকট নিরস্ত হয়েছে। শরীরধারীর ভোগের পরিণাম আমি জানি। অতএব আয়ু, স্ত্রী, বিভব অথবা ব্রহ্মার ভোগ পর্যন্ত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় কিছুই আমি চাই না, অণিমাদি সিদ্ধিও চাই না; কাল সমস্তই নষ্ট করে। পরিশেষে আমার প্রার্থনা আমাকে তোমার নিজ সেবকদের নিকটে স্থান দাও। ২১-২৪

কাম্যবিষয়সকল যদিও সুখদায়ক, শ্রুতিসুখকর, সেগুলি বাস্তবিক মৃগতৃষ্ণার মত মিথ্যা। সব রোগের উদ্ভব-ক্ষেত্র এই দেহ লাভ করেও তাতে আসক্তি নষ্ট হয় না, তার কারণ হল আপাতমধুর সুখকণিকার স্বাদ। সেই ক্ষীণ সুখকণিকার দ্বারা কামাগ্নিকে তৃপ্ত করাব জন্য জীব অত্যন্ত উদ্বিগ্ন: তাই সে নির্বেদ লাভ করতে অক্ষম। তোমার অনুগ্রহে আমার মনে নির্বেদ এসেছে। আজন্ম রজ ও তমোগুণের প্রাচুর্যে অসুরকুলে উৎপন্ন আমি তোমাব কৃপার যোগ্য নই। তবুও ব্রহ্মাদির দুর্লভ তোমার প্রসাদস্বরূপ দণ্ডাপহারী করুণার হস্ত আমার মস্তকে অর্পণ করেছ। তুমি জগতের আত্মা ও সুহৃদ। তাই সাধারণ জীবের মত তোমার 'এই ব্রহ্মাদি দেবতা উত্তম আর এই অসুর অতি নীচ', এইরকম বিচারে উত্তম বা অধম বুদ্ধি নেই। এতেই আমার প্রতি তোমার কৃপা হয়েছে। কল্পবৃক্ষ তার সেবকের সংকল্প অনুসারে ফল দান করে, অন্যথা করে না। তোমার সেবাই তোমার প্রসন্নতার কারণ, তাতে উত্তমত্ব বা অধমত্বের কোনও বিচার নেই। কামনার দাস হয়ে জন্মমৃত্যুরূপ সর্পাদি-পরিপূর্ণ সংসার-কূপে পতিত জীবের সঙ্গে আমিও পতিত। কিন্তু তবুও তোমার অনুগ্রহ লাভ করলাম। ইতিপূর্বে দেবর্ষি নারদ আমায় এই ভাবে তাঁর অধীন করে কৃপা করেছিলেন। আমি আর কি করে তোমার সেবকের সেবা ত্যাগ করতে পারি? তুমি আমাকে নিজ সেবকের সমীপে স্থান দাও। আমার প্রাণরক্ষা ও আমার পিতা বধ, এই দুয়ের মূলে তোমার নিজ সেবক দেবর্ষির বাক্য সত্য প্রতিপন্ন করা। আমার পিতা অন্যায় কাজে নিরত হয়ে খড়্গ উত্তোলন করে বলেছিলেন, 'আমি ছাড়া অন্য ঈশ্বর আছে বলছ, যদি থাকে সে তোমাকে রক্ষা করুক; তোমার মস্তক দ্বিখণ্ডিত করছি।' পক্ষপাত করে ভৃত্য-রক্ষা ও দৈত্য-হত্যা করা তোমার স্বভাব নয়, তা আমি বুঝেছি। সমগ্র জগৎ তোমার স্বরূপ। তুমি আদি, তুমি অন্ত আর তুমিই 'মধ্য। নিজ মায়ায় বিশ্ব রচনা করে তাতে তুমিই অনুপ্রবিষ্ট হয়ে কখনও স্রষ্টা, কখনও রক্ষক, আবার কখনও হন্তা — সবই তুমি। ২৫-৩০

প্রভু, বৈষম্য তোমার হয় না। তুমিই সৎ ও অসৎ, কার্য ও কারণ এবং আদি, মধ্য ও অন্ত সর্বকালে অবস্থান কর। 'এ আপন, এ পর' এই বুদ্ধি মায়া। জগতে প্রকাশ ও সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশ বীজ ও অঙ্কুরের মতো। বৃক্ষ যেমন বীজময়, পৃথিবী যেমন ভূত সূক্ষ্মময়, তেমনি কার্য-কারণ সকলের পরম কারণ তুমি। তুমি

নিজেই নিজের মধ্যে বীজ নিক্ষেপ করে প্রলয়জলরাশির মধ্যে শয়ন কর। জীবের মত তোমার নিদ্রা নয়; তোমার নিদ্রা যোগনিদ্রা। তুমি জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তির অতীত হয়ে তমোগুণে অস্পৃষ্ট। জীবের মত বিষয়-জগৎ তুমি দেখ না। প্রলয়জলে শায়িত তোমার স্বরূপই এই জগৎ। নিজ শক্তিতে তুমি কালকে প্রেরণা দিয়ে সত্ত্বাদি গুণের প্রকাশ কর। অনন্তশয্যা থেকে সমাধি ভঙ্গ হবার সময় হলে তোমার নাভি থেকে যে মহা-পদ্মের আবির্ভাব হয় তা তোমার মধ্যেই সুপ্ত আছে। সূক্ষ্ম বটবীজ থেকে বিরাট বটবৃক্ষের জন্মের মত সেই নাভিপদ্ম থেকে চতুর্দশ ভুবনময় জগৎ হয়েছে। সেই পদ্ম থেকে জন্মগ্রহণ করে ব্রহ্মা আর কিছুই দেখতে পান নি। উপাদান-কারণ স্বরূপে তুমি তার দেহে ব্যাপ্ত থাকলেও তোমাকে জানতে না পেরে শতবর্ষ পর্যন্ত তিনি জলমগ্ন থাকেন। অঙ্কুর উৎপন্ন হলে বীজ কেমন করে দেখা যাবে? তাই তিনি বীজস্বরূপ তোমাকে দেখতে পান নি। কিন্তু তোমার উপাসনায় তোমাকে দেখা যায়। ব্রহ্মা বিস্ময়ের সঙ্গে সেই জন্মস্থান-পদ্মকে আশ্রয় করে বহুকাল তপস্যার দ্বারা শুদ্ধচিত্ত হওয়ার ফলে পঞ্চভূত, ইন্দ্রিয় এবং অন্তঃকরণাদিময় সৎস্বরূপে বর্তমান তোমাকে দেখতে পান। ৩১-৩৫

তখন সহস্র কর, চরণ, মস্তক এবং সহস্র উরু, নাসিকা, কর্ণ ও নয়নসম্বলিত তোমার রূপ প্রকাশিত হয়েছিল। তুমি সহস্র সহস্র অলংকারে অলংকৃত, সহস্র সহস্র অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হয়েছিলে। পাতাল প্রভৃতি তোমার ঐ মায়াময় মূর্তির অবয়ব তোমার ঐ বিশ্বরূপ দর্শন করে ব্রহ্মা পরম আনন্দ লাভ করেন। তখন তুমি হয়গ্রীব মূর্তি ধারণ করে ব্রহ্মার প্রতি কৃপা করে দেবদ্রোহী মহাবলশালী মধু-কৈটভ নামে দুই অসুরকে বধ কর এবং ব্রহ্মাকে বেদজ্ঞান ও রজ-তমোগুণ দ্বারা কৃতার্থ কর। বেদে বলা হয় যে সত্ত্বগুণ তোমার প্রিয়তম তনু। হে মহাপুরুষ, তুমি মানুষমূর্তি, তির্যক, ঋষি, দেবতা, মৎস্যমূর্তি প্রভৃতি অবতার রূপে বন্ধুজনের পালন ও শত্রুদের বিনাশ করে যুগানুরূপ ধর্মের সংরক্ষণ করে থাক। কলিযুগে সেই অবতারমূর্তি প্রকাশ না করে তুমি স্বরূপ আচ্ছন্ন করে রাখ। এজন্য তোমার এক নাম ত্রিযুগ। আমার মন অধর্মে দূষিত, বহির্মুখী, দুরন্ত, কামাতুর। সে হর্ষ, শোক, ভয় ও ত্রিবিধ দুঃখে পীড়িত হয়েও তোমার কথায় প্রীতি লাভ করে না। এই মন দিয়ে অতিদীন আমি তোমার তত্ত্বিচার করব কি প্রকারে? আমার অতৃপ্ত জিহ্বা বিবিধ রসের আকৃষ্ট হয়। এইভাবে শিশ্ন, ত্বক্, উদর ও শ্রবণেন্দ্রিয়, ঘ্রাণেন্দ্রিয়, চঞ্চল নয়ন এবং কর্মশক্তি আমাকে তাদের গ্রহণীয় পৃথক পৃথক বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ করছে। যেমন সপত্নীরা গৃহস্বামীকে নিজ নিজ দিকে আকৃষ্ট করে ব্যস্ত করে তোলে, এই ইন্দ্রিয়গুলিও সেইরকম আমাকে সর্বদা অস্থির করছে। ৩৬-৪০

এইভাবে আমি নিজের কর্মদোষে সংসার-বৈতরণী নদীতে পড়েছি। বারবার জন্ম-মৃত্যুর ভয়ে আমি ভীত। আপন-পর বুদ্ধিতে আমি কারও প্রতি বৈরভাব, কারও প্রতি মিত্রভাব পোষণ করি, আমি অতি দীন। ভব-নদীর পারস্থিত প্রভু, আমাকে তুমি সংসার-নদী পারের ব্যবস্থা করে রক্ষা কর। ভগবান, তোমার আপনার জীবগণকে তুমি অনায়াসেই উদ্ধার করতে পার। আর্তবান্ধব তুমি মূঢ়জনের প্রতিও অনুগ্রহ দেখাও। আমরা তোমার ভক্তের সেবক। হে পরমপুরুষ, তোমার গুণগান-অমৃতে আমার চিত ডুবে আছে। আমি দুষ্পার ভবনদী পার হবার জন্য উদ্বিগ্ন হই না। তবে যেসব মূঢ় লোক তোমার লীলাগান-অমৃত থেকে বিমুখ হয়ে ইন্দ্রিয়জ সুখভোগ ও কুটুম্বাদি ভরণ-পোষণের ভারে ক্লান্ত, তাদের দেখে আমার দুঃখ হয়। হে দেব, দেখতে পাই মুনিরা প্রায়ই নিজ নিজ মুক্তি কামনায় নির্জনে

মৌনব্রত আচরণ করে ভ্রমণ করেন ; পরার্থে তাঁরা তা করেন না। আমার কিন্তু সঙ্গী এই দীন অসুর-বালকদের পরিত্যাগ করে একাকী মুক্ত হওয়ার ইচ্ছা হয় না।[১] অতএব অনন্যশরণ তুমি ছাড়া এদের পরিত্রাণের জন্য আর কাউকে দেখি না। গৃহাশ্রমে স্ত্রীসম্ভোগাদি দ্বারা যে সুখ, তা হাত চুলকানোর মত দুঃখের পর দুঃখই নিয়ে আসে। আসক্ত ব্যক্তিরা বহু দুঃখ পেয়েও ঐরূপ কামনা দ্বারা ক্ষণিক সুখভোগ করেও তৃপ্তিলাভ করে না, কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তি তা বুঝতে পেরে কামনা থেকে বিরত হন। হে অন্তর্যামী, মোক্ষের সাধক মৌন অবলম্বন, ব্রত পালন, গুরুমুখে উপদেশ শ্রবণ, তপস্যা, অধ্যয়ন, স্বধর্ম ব্যাখ্যা, নির্জনে বাস, জপ ও সমাধি প্রভৃতিকে ইন্দ্রিয়-ভোগাসক্ত জীব নিজের ভোগ্যসামগ্রী সংগ্রহের জন্য জীবিকার উপায় বলে ব্যবহার করে। দাম্ভিক প্রকৃতির লোকের কাছে ওটা কখনও জীবনোপায় হয়, আবার কখনও হয় না। তোমার সৎ ও অসৎ এই কার্য-কারণ রূপ বেদে উক্ত আছে। এটা বীজ ও অঙ্কুরের মতই বুঝতে হবে। কাঠে যেমন আগুন অনুপ্রবিষ্ট সেরূপ উভয় স্থলেই যোগবলে যোগীরা তোমাকে কার্য ও কারণে অনুপ্রবিষ্ট দেখতে পান ; কিন্তু ভক্তরা তা দেখতে পান না। তুমি ভিন্ন স্থূল অথবা সূক্ষ্ম কোন বস্তুই কার্য-কারণরূপ হতে পারে না। তুমিই পরম কারণ, সর্বত্র অনুস্যূত। ৪১-৪৭

তুমিই বায়ু, অগ্নি, পৃথিবী, আকাশ, জল, রূপ-রসাদি পঞ্চতন্মাত্র, প্রাণ, ইন্দ্রিয়সমূহ, মন, চিত্ত, অহংকার প্রভৃতি সর্বরূপে বিরাজমান। হে ভূমাপুরুষ, তুমি স্থূল ও সূক্ষ্ম, মন এবং বাক্য দ্বারা প্রকাশ্য সব কিছুই। দেবতা, মানুষ এবং অন্য সকলেই জড়ধর্মবিশিষ্ট আদি ও অন্তবান এবং জন্মমৃত্যুর অধীন। তাঁরা কেউই নিরুপাধি তোমাকে জানতে পারেন না। জ্ঞানী ব্যক্তিরা বেদপাঠ থেকে বিরত হয়ে শুধু সমাধিযোগে তোমাকে উপাসনা করেন। নমস্কার, স্তব, কর্মার্পণ, অর্চনা, স্মরণ ও কথাশ্রবণ—এই ষড়ঙ্গ সেবা ভিন্ন পরমহংসদের প্রাপ্য তোমার প্রতি ভক্তি আর কি ভাবে লাভ করা সম্ভব? ৪৮-৫০

নারদ বললেন, এইভাবে গুণ বর্ণনা করলে ভগবান নৃসিংহ প্রীত হয়ে প্রহ্লাদকে বললেন, ভদ্র প্রহ্লাদ, তুমি অসুরদেব মধ্যে উত্তম। আমি তোমার ব্যবহারে প্রীতিলাভ করলাম, তোমার মঙ্গল হোক। তুমি অভিলষিত বর প্রার্থনা কর, আমি সকলের অভিলাষ পূর্ণ করি। আমার সন্তোষবিধান করতে না পারলে আমার দর্শন হয় না। আমার দর্শন হলে কামনা পূরণ হল না বলে কাউকেও দুঃখ করতে হয় না। তাই মঙ্গলের আকাঙ্ক্ষা করে ধীরপ্রকৃতির সাধুবা সকল কল্যাণের অধিপতি আমাকে সর্বতোভাবে সন্তুষ্ট করে থাকেন। ৫১-৫৪

নারদ বললেন, যে সব বরে লোভ হয়, এই রকম অনেক বরের কথা বলে লোভ দেখালেও নিরুপাধি ভক্ত অসুরশ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদ কিছুই গ্রহণ করতে ইচ্ছা করলেন না।[২] ৫৫

১ তুলনীয় : বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি, সে আমার নয়।
অসংখ্য বন্ধন-মাঝে মহানন্দময় লভিব মুক্তির স্বাদ। —রবীন্দ্রনাথ।

২ তুলনীয় : বিত্ত বা ধন দ্বারা মানুষের তৃপ্তিলাভ হয় না।...কাজেই আত্মার তত্ত্ববিষয়ক বরই আমার প্রার্থনীয়।—যম-নচিকেতা সংবাদ, কঠোপনিষৎ, ১।১।২৭ শ্লোক।

দশম অধ্যায়

প্রহ্লাদের রাজ্যাভিষেক ও ত্রিপুরদহন বৃত্তান্ত

নারদ বললেন, ভগবানের কথিত বর ভক্তিযোগের পথে বাধা সৃষ্টি করে, এই চিন্তা করে প্রহ্লাদ বললেন, ভগবান, আমি স্বভাবত কামনা-আসক্ত, বর দিয়ে কামনার লোভ আর দেখিও না। কামাসক্তিতে ভীত হয়েই বৈরাগ্যবান, মুমুক্ষু আমি তোমার শরণাপন্ন।[১] প্রভু আপনি বোধ হয় ভৃত্যের পরিচয় জানতে ইচ্ছা করে সংসারের বীজ হৃদয়গ্রন্থিকে কার্মবিষয়ের সঙ্গে যুক্ত করতে চাইছ। তা না হলে, হে নিখিলের গুরু করুণাময়, অনর্থসাধনে প্রবৃত্তি দান তোমার পক্ষে সম্ভব হতে পারে না। দুর্লভদর্শন তোমাকে পেয়ে যে সাংসারিক মঙ্গল প্রার্থনা করে, সে তোমার ভৃত্য নয়; সে তোমার সঙ্গে বণিকের মত আচরণ করে। কামনা পরিপূরণের সেব্য-সেবকের যে প্রভু ও ভৃত্যভাব তা বাস্তব নয়, তা উপাধিক। প্রভুর কাছে যে নিজের কল্যাণ প্রার্থনা করে সে ভৃত্য নয়। যিনি ভৃত্যের উপর প্রভুত্ব করার জন্য ভৃত্যকে অর্থাদি দেন তিনিও প্রভু নন। প্রভু, আমাদের দুজনেরই এরূপ ভাব নয়। আমি তোমার নিষ্কাম ভক্ত। তুমি আমার অভিসন্ধিরহিত প্রভু। রাজা ও তার সেবকের মত কামনা ও অভিসন্ধিতে আমাদেব প্রয়োজন নেই। হে শ্রেষ্ঠবর-দাতা, আমাকে বর দিয়ে যদি তুমি সন্তোষ লাভ কব, তবে আমি তোমার কাছে এই বব প্রার্থনা করি—আমার হৃদয়ে যেন কোন কামনার অংকুর উদ্‌গত না হয়। ভগবান, কামনা অত্যন্ত অনিষ্টকারী। ওতে ইন্দ্রিয়, মন, প্রাণ, দেহ, ধর্ম, ধৈর্য, বুদ্ধি, লজ্জা, সম্পদ, তেজ, স্মৃতি এবং সত্য সবই নষ্ট হয়ে যায়। যখন মানুষ মনের কামনা ত্যাগ করে, তখনই সে তোমাব মত গুণসম্পন্ন হওয়ার যোগ্য হয়। তুমি পরমপুরুষ ভগবান, অতি অদ্ভুত সিংহমূর্তি ধারণ করেছ। পরমব্রহ্ম পরমাত্মা তোমাকে নমস্কার। ১-১০

ভগবান বললেন, বৎস, তোমার মত ভক্ত ইহকাল বা পরকালের কোন মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা করে না। তবু আমার আজ্ঞা পালন কর। তুমি এই মন্বন্তর কাল পর্যন্ত এখানে থেকে দৈত্যেশ্বরদের ভোগ্য রাজ্য ভোগ কর। মদ্‌গতচিত্ত হয়ে তুমি আমার প্রিয়কার্য সাধন কর, সর্বভূতে বর্তমান যজ্ঞেশ্বর আমাকে যজ্ঞদ্বারা আরাধনা কর। বৎস, আমাতে আত্মনিবেশিত হয়ে ফলের দিকে না তাকিয়ে কর্মের অনুষ্ঠান কর।[২] পুণ্য আচরণ করে পাপ ক্ষয় কর। কালের গতিতে দেহত্যাগ করে বন্ধনমুক্ত হলে তুমি দেবতাদের দ্বারা গীত আমার বিশুদ্ধ কীর্তিগাথা প্রচার করে আমাকে লাভ করবে। তোমার এই স্তব স্মরণ করে তোমাকে ও আমাকে মনে রেখে যে এই কথা অধ্যয়ন করবে সেও কর্মসংসার থেকে মুক্তি পাবে। ১১-১৪

প্রহ্লাদ বললেন, প্রভু, তুমি বর দিতে চেয়েছ; তোমার কাছে আর একটি বর চাই। আমার পিতা তোমার ঈশ্বরভাব না জেনে তোমাকে নিন্দা করেছেন, ক্রুদ্ধ হয়ে মিথ্যা দৃষ্টিতে সর্বলোকগুরু তোমাকে ভ্রাতৃহন্তা বলে কটূক্তি করেছেন। আমি তোমার ভক্ত বলে আমার প্রতি তিনি অত্যাচার করেছেন। এইসব কাজের

১ যা আমার পক্ষে শ্রেয় তাই আমাকে নিশ্চয় করে বল। আমি তোমার শিষ্য, তোমার শরণাগত, আমাকে শিক্ষা দাও।—শ্রীকৃষ্ণের নিকট অর্জুনের প্রার্থনা, গীতা, ২।৭ শ্লোক।

২ দ্রষ্টব্য, ঐ, ২।৪৭ শ্লোক।

জন্য তিনি যে পাপে মগ্ন হয়েছেন, তা থেকে তিনি মুক্ত হোন।[১] তোমার দৃষ্টিতে পরে আমার পিতা নিশ্চয়ই পবিত্র হয়েছেন। তবুও আমি অবুঝ বলে এই প্রার্থনা করলাম। ১৫-১৭

ভগবান বললেন, নিষ্পাপ প্রহ্লাদ, কেবল তোমার পিতা নন, তাঁর পূর্বে একুশ পুরুষ পর্যন্ত পাপমুক্ত হয়ে পবিত্র হয়েছেন, কারণ তুমি এই কুলে জন্মগ্রহণ করেছ। সাধু, তুমি তোমার পিতার কুলপাবন। সমদর্শী, প্রশান্তমনা, সাধু ও সদাচারসম্পন্ন আমার ভক্তরা যেখানে থাকেন, সেখানে কীকট নামক অতি হীন ব্যক্তিরাও পবিত্র হয়। দৈত্যেন্দ্র, যারা ছোট বড় কাউকে হিংসা করে না, ভক্তি দ্বারা যাদের লালসা নিবৃত্ত হয়েছে, যারা তোমার মত ভক্তদের অনুব্রত, তারা তোমার মতই আমার ভক্ত হয়। তুমি তাদের আদর্শ, শ্রেষ্ঠ ভক্ত। যা হোক, তোমার পিতা সম্পূর্ণ পবিত্র হয়েছেন, এখন তুমি তাঁর প্রেতকার্য সম্পাদন কর। তোমার পিতা তোমার মত পুত্র লাভ করেছেন, আমার অঙ্গ স্পর্শে অবশ্যই সদ্‌গতি লাভ করবেন। এরপর তুমি পিতার আসনে অধিষ্ঠিত হয়ে বেদজ্ঞ মুনিদের নির্দেশ অনুসারে আমাতে মন রেখে মৎপরায়ণ হয়ে কর্ম করতে থাক।[২] ১৮-২৩

নারদ বললেন, রাজা যুধিষ্ঠির, ভগবানের আজ্ঞানুসারে ব্রাহ্মণদের দ্বারা অভিষিক্ত হয়ে প্রহ্লাদ তাঁদের অভিমত অনুসারে পিতার পারলৌকিক কাজ সম্পাদন করলেন। তারপর ব্রহ্মা দেবগণ সমভিব্যাহারে প্রসন্নচিত্তে ভগবান নৃসিংহের শ্রীমুখ অবলোকনপূর্বক তাঁকে পবিত্র বাক্যে স্তব করে বললেন, দেবাদিদেব, অখিলপতি ভূতভাবন, আদিপুরুষ, দুরাত্মা হিরণ্যকশিপু আমার সৃষ্ট কোন প্রাণীর দ্বারা হত হবে না বলে বর পেয়েছিল। সে তপস্যাযোগে শক্তিলাভ করে উদ্ধত হওয়ার ফলে সকল ধর্মকে উচ্ছেদ করার চেষ্টা করে। আমাদের পরম ভাগ্য যে আপনি সেই লোকসন্তাপক পাপী অসুরকে নিহত করলেন। সেই দৈত্যপুত্র প্রহ্লাদ মহাভাগবত, তাকে যে মৃত্যু থেকে রক্ষা করেছেন তাও পরম ভাগ্যেরই বিষয়। এই প্রহ্লাদ এখন আপনাকে সম্যক্‌রূপে লাভ করেছে এটা তার অপরিসীম ভাগ্য। ভগবান, আপনি পরমাত্মা, যে আপনার ধ্যান করে আপনার এই অবতার শরীর তাকে সর্বপ্রকার ভয়, জিঘাংসা ও মৃত্যু থেকে রক্ষা করে। ভগবান বললেন, বিভু, পদ্মযোনি, অসুরদের স্বভাব অত্যন্ত নিষ্ঠুর; সাপকে দুধ দিয়ে বলবান করার ন্যায় অসুরদের এরকম বর আর দেবেন না। ২৪-৩০

নারদ বললেন, এই বলে নৃসিংহ হরি ব্রহ্মা দ্বারা পূজিত হয়ে সব প্রাণীর নিকট থেকে অদৃশ্য হয়ে অন্তর্ধান করলেন। তখন ভগবানের অংশস্বরূপ ভক্ত প্রহ্লাদ মস্তক অবনত করে ব্রহ্মা, শংকর ও প্রজাপতিদের প্রণাম করলেন। এরপর পদ্মসম্ভব ব্রহ্মা শুক্রাচার্য প্রভৃতির সঙ্গে মিলিত হয়ে প্রহ্লাদকে দৈত্য-দানবের আধিপত্য দান করলেন। ব্রহ্মাদি দেবতা প্রহ্লাদকে আশীর্বাদ দ্বারা আনন্দিত করে এবং নিজেরাও প্রহ্লাদের পূজা গ্রহণ করে স্ব স্ব আলয়ে প্রস্থান করলেন। বিষ্ণুর প্রসিদ্ধ দুই পার্ষদ এইভাবে দিতির পুত্ররূপে জন্মলাভ করে। পরে তারাই বৈরভাব হেতু হরির হাতে নিহত হয়। পুনরায় তারা ব্রাহ্মণের শাপে কুম্ভকর্ণ ও দশানন রাবণ হয়ে জন্মগ্রহণ করে এবং শ্রীরামের বিক্রমে নিহত হয়। শ্রীরামচন্দ্রের বাণে বিদ্ধ হয়ে যুদ্ধে দেহত্যাগ করার সময়ে পূর্বজন্মের রীতিতে ভগবানকে চিন্তা

১ তুলনীয়: পিতার মঙ্গল আকাঙ্ক্ষায় যমের নিকট নচিকেতার বর প্রার্থনা। —কঠ ১।১।১০

২ দ্রষ্টব্য: গীতা, ৯।৩৪ শ্লোক।

করতে করতেই তারা মৃত্যুবরণ করেছিল। সেই দুই ব্যক্তিই শিশুপাল ও দন্তবক্ররূপে পুনরায় জন্মগ্রহণ করে তোমার সামনেই শত্রুভাবের তীব্রতায় যোগাদি সাধন ছাড়াই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সাযুজ্য লাভ করল। এইরূপে কৃষ্ণবিদ্বেষী রাজারা ভগবানের ধ্যানপ্রভাবে পাপমুক্ত হওয়ার ফলে কাঁচপোকার ধ্যান দ্বারা তেলাপোকার তন্ময়তা লাভের মতো কৃষ্ণ-সাযুজ্য লাভ করেছেন। তুমি আমাকে অনুরোধ করেছিলে, ভক্তিভাব অবলম্বনে অথবা অভেদচিন্তা দ্বারা শিশুপাল প্রভৃতি রাজারা যেভাবে ভগবানের সারূপ্যলাভ করেন তা বর্ণনা করতে। আমি তাই করলাম। দমঘোষ-পুত্র শিশুপাল যদিও কৃষ্ণবিদ্বেষী ছিল, তবুও এই সব রাজারা শ্রীকৃষ্ণের সারূপ্য মুক্তি লাভে সমর্থ হয়েছিল। ৩৯-৪১

ব্রহ্মণ্যদেব শ্রীকৃষ্ণের পুণ্যময় অবতারকথা বলা হল ; এতে দুজন আদিদৈত্যের (হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপু) বধের বৃত্তান্ত রয়েছে। এতেই রয়েছে মহাভাগবত প্রহ্লাদের চরিত-কথা, তাঁর হরিভক্তি, জ্ঞান ও বৈরাগ্য, আর আছে সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়কারী পরমেশ্বরের গুণকথা এবং অন্যান্য দেবতা ও দানবদের স্থান ও কালের প্রভাবে তার পরিবর্তন সংবাদ। ভগবানকে লাভ করবার উপায়স্বরূপ ভক্তদের অনুশীলিত ভাগবতধর্ম এবং আধ্যাত্মিক বিষয়সমূহ এতে বর্ণিত হয়েছে। ভগবান বিষ্ণুর মহিমাপূর্ণ এই পুণ্যময় আখ্যান যিনি শ্রদ্ধার সঙ্গে শুনে কীর্তন করবেন, তিনি কর্মবন্ধন থেকে মুক্তি পাবেন। এই আদিপুরুষ শ্রীভগবানের নরসিংহ-লীলা এবং দানবেন্দ্র হিরণ্যকশিপু সহ অন্যান্য দানবদের বধকথা যিনি মনোযোগ সহকারে পাঠ করবেন এবং দৈত্যপুত্র, সাধুশ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদের পুণ্য-চরিত শ্রবণ করবেন, সর্বপ্রকার ভয়শূন্য সেই ব্যক্তির বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তি হবে। মহারাজ, প্রহ্লাদ ভাগ্যবান আর তোমরা দুর্ভাগ্য, একথা ভেবে বিষণ্ণ হয়ো না। তোমরাও মহাভাগ্যবান, কেননা ভুবনপাবন মুনিগণ সর্বদা তোমাদের গৃহে যাতায়াত করেন। পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ সেখানে নরাকৃতিরূপে গোপনে অবস্থান করছেন। এই পরমব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণই মহাজনের অন্বেষণীয়, তিনিই তোমাদের প্রিয় বান্ধব, সুহৃদ, মাতুলপুত্র, পূজ্য গুরু এবং আজ্ঞাকারী। ব্রহ্মা, শংকরাদি দেবতারা যাঁর তত্ত্বনিরূপণে অসমর্থ, সেই পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তোমাদের প্রতি প্রসন্ন। বিরিঞ্চি প্রভৃতি সুরগণ নিজেদের বুদ্ধিবলে যাঁর রূপ নিশ্চয় করে বর্ণনা করতে পারেন না, প্রার্থনা করি যে তিনি মৌন, শান্তভাব প্রভৃতি দ্বারা সমাদৃত ও পূজিত হয়ে প্রসন্ন হোন। মহারাজ, অগণিত মায়াবিস্তারে নিপুণ ময়-দানব দেবাদিদেব রুদ্রের যশ নষ্ট করলে এই ভগবান পুনরায় তাঁর মহিমা বিস্তার করেন। ৪২-৫১

রাজা যুধিষ্ঠির প্রশ্ন করলেন, এমন কোন কর্ম ময়দানব করেছিল যাতে শংকরের মহিমা বিনষ্ট হয়েছিল এবং শ্রীকৃষ্ণ দ্বারা সেই মহিমা পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ? ৫২

নারদ বললেন, দেবতা ও দানবের যুদ্ধে দেবগণ কর্তৃক সম্বর্ধিত শ্রীকৃষ্ণ দানবদের পরাজিত করেন। তখন দানবেরা তাদের পরমাচার্য ময়দানবের শরণাগত হয়। তার ফলে সেই দানব সোনা, রূপা ও লোহা দিয়ে তিনটি দুর্ভেদ্য পুরী তাদের জন্য তৈরী করে। সেই তিন পুরীর মধ্যে দানবরা কে কখন কোথা দিয়ে যাওয়া-আসা করত তা কেউ বুঝতে পারত না ; আর সেখানে কত দ্রব্যাদি আছে, তাও কেউ নিরূপণ করতে পারত না। তারপর অসুর-সেনাপতিরা ঐ তিন পুরীতে অদৃশ্য থেকে পূর্বশত্রুতাবশত লোকপালসহ ত্রিলোক বিনাশ করতে আরম্ভ করল। তখন লোকপালেরা শিবের কাছে গিয়ে প্রণত হয়ে বিনীতভাবে বললেন, দেবাদিদেব

শংকর, ত্রিলোক আপনার, কিন্তু ত্রিপুরবাসী দানবেরা আমাদের বিনষ্ট করছে ; আপনি রক্ষা করুন। কাতর প্রার্থনা শুনে শংকর করুণা করে দেবতাদের 'ভয় করো না' বলে অভয় দিলেন এবং নিজের ধনুতে শর যোজনা করে সেই মন্ত্রপূত শর ত্রিপুরের দিকে প্রেরণ করলেন। সূর্যমণ্ডল থেকে বিকীর্ণ কিরণের মত সেই একটি শর থেকে অগ্নিবর্ণ বহু শর বের হয়ে ত্রিপুর আচ্ছন্ন করল। সেই শরের স্পর্শমাত্রে ত্রিপুরবাসী দানবরা নিহত হতে লাগল। এই দেখে মহামায়াবী ময়দানব সেই মৃত দানবদের তার নির্মিত অমৃতময় কূপে ফেলতে লাগল। সিদ্ধ অমৃত স্পর্শে দানবরা মহাতেজস্বী ও বজ্রের মত দৃঢ়শরীর হয়ে মেঘদলনকারী বিদ্যুতের মত পুনরুত্থিত হল। এতে সংকল্প ভঙ্গ হল বলে বিষণ্ণ বৃষধ্বজ শংকরকে দেখে ভগবান বিষ্ণু একটি উপায় উদ্ভাবন করলেন। ৫৩-৬১

তখন ব্রহ্মাকে বৎস করে স্বয়ং বিষ্ণু নিজে গাভীমূর্তি ধারণ করলেন। তাঁরা ত্রিপুরের মধ্যে প্রবেশ করে অমৃতময় কূপের সমস্ত অমৃত পান করলেন। মায়ামোহিত হওয়ায় অসুররা এই দেখেও তাঁদের নিষেধ করতে পারে নি। এটা বুঝতে পেরে শোকমুক্ত মহাযোগী শংকর সহাস্যে দৈবগতি স্মরণ করে শোকার্ত লোকপালদের এই কথা বলেন, নিজের বা অপরের প্রতি দৈবনির্দিষ্ট যা অনুষ্ঠিত হয় তা দেবতা, অসুর, মানুষ, যে কেউ হোক না কেন, অন্যথা করতে পারে না। ভগবান শ্রীহরি নিজের শক্তি, ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য, সম্পদ, তপস্যা, বিদ্যা ও ক্রিয়া দ্বারা শংকরের যুদ্ধের উপকরণ রচনা করে দিলেন। রথ, সারথি, ধ্বজা, অশ্ব, ধনু, বর্ম, শর প্রভৃতি সবই হল। শংকর যুদ্ধের বেশ পরিধান করে রথের উপরে বসে শর-ধনু ধারণ করলেন। শংকর ধনুতে শর যোজনা করে মধ্যাহ্ন সময়ে দানবের তিনটি দুর্ভেদ্য পুরীই পুড়িয়ে ফেললেন। ত্রিপুর দগ্ধ হলে শত শত বিমানে আচ্ছন্ন আকাশে দুন্দুভির ধ্বনি হতে লাগল এবং পুষ্পবর্ষণের সঙ্গে দেবতা, ঋষি, পিতৃগণ ও সিদ্ধশ্রেষ্ঠদের মুখে জয়ধ্বনি উঠল। তাঁরা পুষ্পবর্ষণ শুরু করলেন, আনন্দে গান এবং নৃত্য করলেন। অপ্সরারাও এইভাবে উৎসব করলেন। ত্রিপুর বিনাশকারী শংকর তিনটি পুরী দগ্ধ করে ব্রহ্মাদি দেবতাদের দ্বারা সম্বর্ধিত হয়ে নিজ ধামে ফিরে গেলেন। নিজ মায়ায় নরাকৃতি অনুকরণ করে শ্রীহরি এইভাবে লীলা করেন। জগদ্গুরুর ত্রিভুবনপাবক এইসব লীলাসমূহ ঋষিরা গান করেছেন। মহারাজ, এসবই তোমার নিকট বর্ণনা করলাম। অন্য আর কি বলব বল। ৬২-৭০

একাদশ অধ্যায়

মানবধর্ম, বর্ণধর্ম ও স্ত্রীধর্ম

শুকদেব বললেন, দৈত্যরাজ প্রহ্লাদের মন সর্বদা এই শ্রীভগবানে লগ্ন থাকত বলে তিনি ছিলেন মহত্তমদের মধ্যেও শ্রেষ্ঠ। তাঁর পবিত্র চরিত-কথা সাধুসভায় সমাদৃত। সেই কথা শুনে যুধিষ্ঠির প্রীত হয়ে পুনরায় স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার পুত্র নারদকে জিজ্ঞাসা করলেন, ভগবান, যে ধর্ম অনুশীলনে মানুষ পরমবস্তু লাভ করতে পারে, সেই সনাতন ধর্ম, যাতে বর্ণাশ্রমাচার ব্যবস্থা আছে, তা শুনতে ইচ্ছা করি। আপনি প্রজাপতি ব্রহ্মার পুত্র। তপস্যা, যোগ ও সমাধির গুণে অন্যান্য পুত্রদের মধ্যে

আপনি তাঁর অতিপ্রিয়। নারায়ণপরায়ণ ব্রাহ্মণরা পরমগুহ্য ধর্ম সম্পর্কে অবহিত আছেন। তাঁরা দয়ালু, সাধু এবং শান্ত ; আর তাঁদের মধ্যে আপনার মত আর কেউ নেই। ১-৪

নারদ বললেন, সর্বলোকের ধর্মসেতু, জন্মরহিত শ্রীভগবানকে প্রণাম করে স্বয়ং নারায়ণের মুখ-নিঃসৃত সনাতন ধর্ম সম্বন্ধে বলছি। এই নারায়ণ দাক্ষায়ণীর সন্তান রূপে ভগবদংশে অবতীর্ণ হয়ে ধর্মরক্ষা ও সর্বলোকের মঙ্গলের জন্য বদরিকাশ্রমে তপস্যা-নিরত হয়ে আছেন। সর্ববেদময় ভগবান শ্রীহরি ধর্মের মূল। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদের স্মৃতিও সেই ধর্ম, তাতেই আত্মার প্রসন্নতা লাভ হয়। রাজা যুধিষ্ঠির, সকলের প্রাণপুরুষ ভগবান যাতে সন্তোষলাভ করেন, এরকম ত্রিশটি লক্ষণযুক্ত মানুষের পরম ধর্মের কথা তোমাকে বলছি শোন—সত্য, দয়া, তপস্যা, শৌচ, তিতিক্ষা, ন্যায়-অন্যায় বিবেকবোধ, শম, দম, অহিংসা, ব্রহ্মচর্য, ত্যাগ, স্বাধ্যায়, সরলতা, সন্তোষ, সমদর্শী সাধুদের সেবা, প্রবৃত্তিমূলক কর্ম থেকে বিরতি, মনুষ্যকৃত কর্মের নিষ্ফলতা জ্ঞান, বৃথা বাক্যব্যয় বন্ধ, আত্মানুসন্ধান, প্রাণীদের যথাযোগ্য খাদ্য বণ্টন, সর্বভূতে আত্মা ও দেবতাজ্ঞান, ভগবানের নাম শ্রবণ, কীর্তন স্মরণ, তাঁর সেবা, পূজা, প্রণাম, দাস্যভাব, তাঁর সঙ্গে সখ্যভাব এবং তাঁতে আত্মসমর্পণ। ৫-১১

সব মানুষের পরম ধর্ম বলে এই ত্রিশটি লক্ষণ বর্ণিত হয়েছে। সর্বাত্মা ভগবান শ্রীহরি এই ত্রিশ লক্ষণযুক্ত ধর্মের অনুশীলনে সন্তুষ্ট হন। সংস্কারাদি যুক্ত ব্রাহ্মণরাই দ্বিজ বলে ভগবান ব্রহ্মাদ্বারা নির্দিষ্ট হয়েছেন। শূদ্ররা মন্ত্রযুক্ত সংস্কারবান নয়, উপনয়নও তাদের হতে পারে না ; অতএব তারা দ্বিজ নয়। শুদ্ধকুলে শুদ্ধ আচারে যার জন্ম এই রকম দ্বিজ সন্তানের জন্য যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দানগ্রহণ এবং ব্রহ্মচর্য এই ছয়টি অশ্রমোচিত ক্রিয়ার ব্যবস্থা আছে ; অপর দ্বিজ অর্থাৎ ক্ষত্রিয়জাতির জন্য আছে দানগ্রহণ ভিন্ন আর পাঁচটি ক্রিয়া।[১] তবে যে ক্ষত্রিয় প্রজাপালনে নিযুক্ত তিনি ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য প্রজার থেকে কর নিয়ে জীবিকা অর্জন করবেন। বৈশ্যদের জীবিকা কৃষি, বাণিজ্য এবং ব্রাহ্মণানুকূল্য। শূদ্ররা সেবার দ্বারা জীবিকা অর্জন করবেন। ব্রাহ্মণগণ প্রধান ও অপ্রধানভাবে অন্য বৃত্তিও গ্রহণ করতে পারেন যথা, কৃষি প্রভৃতি অনিষিদ্ধ কাজ, অযাচিত প্রাপ্ত সামগ্রী, প্রত্যহ ভিক্ষা, ক্ষেত্রে পরিত্যক্ত ধান্যাদি সংগ্রহ। এই বৃত্তিগুলির মধ্যে পূর্বাপেক্ষা উত্তর বৃত্তি উত্তম। বিপদে না পড়লে কখনও হীনজাতি উত্তম জাতিকে পাঠ দেবে না। বিপদের সময় ক্ষত্রিয় ছাড়া সব জাতিই সব কর্ম করতে পারে। বিপদের সময় ক্ষত্রিয় প্রতিগ্রহ (দানগ্রহণ) করবে না, অন্য বৃত্তি অবলম্বন করতে পারে। ব্রাহ্মণের চারটি বৃত্তির মধ্যে ঋত ও অমৃত অথবা মৃত ও প্রমৃত অথবা সত্যানৃত দ্বারা সমস্ত জাতিই জীবিকা অর্জন করতে পারে। কিন্তু শ্ববৃত্তি (দাসত্ব বা চাকুরি) দ্বারা জীবন-ধারণ বিহিত নয়। 'ঋত' শব্দের অর্থ উঞ্ছ ও শিল, 'অমৃত'-এর অর্থ অযাচিত প্রাপ্ত, 'মৃত' অর্থ প্রাত্যহিক ভিক্ষালব্ধ, 'প্রমৃত' অর্থ কৃষিলব্ধ, 'সত্য-অমৃত' অর্থ বাণিজ্য, 'শ্ববৃত্তি'র অর্থ নীচসেবা। মহারাজ, শ্ববৃত্তি নিন্দিত, সুতরাং ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের পক্ষে এটা সর্বদা পরিত্যাজ্য। কারণ ব্রাহ্মণ সর্ববেদময় এবং ক্ষত্রিয় সর্বদেব-স্বরূপ। ১২-২০

---

১ আপৎকালে ক্ষত্রিয়েরও যাজন ও অধ্যাপন আছে। এজন্য অপর দ্বিজের পাঁচ প্রকার কর্ম বলা হয়েছে ; অনাপদে তিন প্রকার।

শম, দম, তপস্যা, শৌচ, সন্তোষ, ক্ষমা, সরলতা, জ্ঞান, দয়া, বিষ্ণুপরায়ণতা ও সত্য— এই সকল গুণশালী ব্রাহ্মণের লক্ষণ। শৌর্য, বীর্য, ধৈর্য, তেজ, ত্যাগ, ইন্দ্রিয়জয়, ক্ষমা, ব্রহ্মণ্যতা, প্রসন্নতা ও সত্য—এইসব গুণ ক্ষত্রিয়ের লক্ষণ। দেব, গুরু ও অচ্যুতে ভক্তি, ধর্ম অর্থ কাম এই তিন বর্গের পোষণ, আস্তিক্য, নিত্য উদ্যম ও নৈপুণ্য—এই সকল গুণ বৈশ্যের। সর্বদা নমস্কার, শৌচ, অকপট-ভাবে প্রভুসেবা, মন্ত্র-উচ্চারণবিহীন যজ্ঞ, চুরি না করা, সত্য ও গো-বিপ্রের রক্ষা করা—এইগুলি শূদ্রের ধর্ম।[১] পতিব্রতা নারীর ধর্ম পতির আনুকূল্য এবং তার শুশ্রূষা। পতির আত্মীয়দের অনুবর্তন, নিত্য পতির ব্রত পালন, মার্জন, লেপন, চিত্রাদি অংকন দ্বারা গৃহের শোভা বৃদ্ধি করা, নিজেও সব সময় সজ্জিত বস্ত্রাদি ধারণ করে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা—এসব স্ত্রীধর্মের অঙ্গ। বিশেষত সাধ্বী পত্নী বিনয়, দম, সত্য আচরণ ও প্রীতিবাক্য দ্বারা নিষ্পাপ ও সৎস্বভাব পতির সেবা করবে। সতী স্ত্রী অল্পে সন্তুষ্ট, লোভহীন, অনলস ও ধর্মপ্রাণ হয়ে প্রিয় সত্য বাক্যে সর্ববিষয়ে দৃষ্টি রেখে এবং শুচিতা ও স্নিগ্ধতা বজায় রেখে দোষশূন্য স্বামীর সেবা করবে। শ্রীলক্ষ্মীর মত তৎপরা স্ত্রী যিনি শ্রীহরিভাবে স্বামীকে সেবা করেন, তিনি সত্যিই লক্ষ্মীর মত শ্রীহরিস্বরূপ পরম পতির সঙ্গে হরিলোকে আনন্দে বাস করেন। অন্ত্যজ ও সংকরজাতীয় ব্যক্তিদের মধ্যে যারা পাপাচারণ চৌর্যাদি করে না, নিজ নিজ কুল অনুসারে যার যে কর্ম নির্দিষ্ট তা করাই তাদের ধর্ম। চৌর্য বা হিংসা ধর্ম নয়। ২১-৩০

যুগে যুগে মানুষের স্বভাব অনুসারে ধর্মের ব্যবস্থা হয়েছে। বেদজ্ঞ জ্ঞানী ব্যক্তি ইহলোকে ও পরলোকে যা মঙ্গলজনক তাকেই ধর্ম বলে নিরূপণ করেছেন। স্বভাব অনুসারে বৃত্তি অবলম্বন করে জীবনযাপন করে ক্রমে মানুষ সেই স্বভাবজ কর্মও ত্যাগ করে নির্গুণতা লাভ করেন।[২] একই ক্ষেত্রে বার বার বীজবপন করে শস্য উৎপাদন করলে, সেই ভূমি যেমন স্বভাবতই উর্বরতা হারায় এবং সেখানে উপ্ত বীজও নষ্ট হয়, সেই রকম জীব কাম্যকর্ম করে ফলভোগ করতে করতেও একদিন তার নির্গুণভাব আসে ; পরে তাঁর কর্মবীজ নষ্ট হয়। এইভাবেই চিত্ত কামনায় পূর্ণ হলেও অতিরিক্ত কামসেবায় এক সময় বিরাগ এসে যায়। কিন্তু অগ্নিতে ঘৃতবিন্দুর মত অল্প কামসেবন কামকে উপশমিত করতে পারে না। রাজা যুধিষ্ঠির, যাঁর যে বর্ণ-প্রকাশক লক্ষণসমূহ বলা হয়েছে, যদি অন্য বর্ণে ঐসব লক্ষণ দেখা যায়, তবে সেই লক্ষণযুক্ত ব্যক্তিকে লক্ষণানুসারেই সেই বর্ণ বলে নির্দিষ্ট করতে হবে। ৩১-৩৫

দ্বাদশ অধ্যায়

বিভিন্ন আশ্রমধর্মের কথা

নারদ বললেন, ব্রহ্মচারী গুরুকুলে বাস ও আশ্রমধর্ম পালন করে সংযতচিত্তে গুরুর হিতাচরণপূর্বক তাঁর সেবকরূপে প্রীতি ও নম্রতার সঙ্গে অবস্থান করবে। প্রতিদিন

১ গীতায় অনুরূপ জাতি অনুসারে কর্মবিভাগ নির্দিষ্ট হয়েছে। ১৮।৪২-৪৪ শ্লোকসমূহ দ্রষ্টব্য।
২ স্বধর্মোচিত কর্মই যে শ্রেয় এবং এরূপ কর্মদ্বারা যে মানুষ নির্গুণত্ব লাভ করতে পারে সে কথা গীতায়ও বলা হয়েছে। এ সম্পর্কে ১৮।৪৫-৪৯ শ্লোকাবলী দ্রষ্টব্য।

ত্রিসন্ধ্যায় গুরু, অগ্নি, সূর্য ও দেবশ্রেষ্ঠ বিষ্ণুর উপাসনা এবং গায়ত্রীমন্ত্র জপ করে বন্দনা করবে। সকাল-সন্ধ্যায় মৌনভাবে মন্ত্র জপ করবে। গুরুদেব আহ্বান করলে তাঁর নিকট সংযতভাবে বেদপাঠ করবে। অধ্যয়নের প্রারম্ভে এবং শেষে মস্তক দ্বারা গুরুর পাদস্পর্শ করে প্রণাম করবে। মেখলা, অজিন, বসন, জটা, দণ্ড, কমণ্ডলু প্রভৃতি উপবীত-ধারণের সময় যে সব সামগ্রী ধারণ করতে হয় তা ধারণ করবে। কুশহস্তে সর্বদা পবিত্রভাবে সকাল-সন্ধ্যায় ভিক্ষা করে অন্নাদি গুরুকে দেবে এবং তাঁর প্রদত্ত অন্নে জীবনধারণ করবে ; অন্য কিছু ভোজন করবে না। সুচরিত্র, পরিমিতাহারী, কার্যনিপুণ; শ্রদ্ধাবান ও জিতেন্দ্রিয় হয়ে স্ত্রীলোক ও স্ত্রীলোকের অধীন লোকদের সঙ্গে কেবল প্রয়োজন মত ব্যবহার করবে ; তাদের কাছে বেশী সময় থাকবে না। গৃহস্থ ছাড়া ব্রহ্মচারী, ব্রতচারী সকলের পক্ষেই স্ত্রীসঙ্গ বর্জনীয়। কারণ ইন্দ্রিয়সমূহ অত্যন্ত বলবান সন্ন্যাসীরও মন হরণ করে। গুরুপত্নী যুবতী হলে যুবা ব্রহ্মচারী তার দ্বারা কেশ প্রসাধন, গাত্রমর্দন, স্নপন বা অভ্যঞ্জনাদি কাজ করাবে না। কারণ যুবতী স্ত্রী অগ্নির সমান এবং পুরুষ ঘৃত-কুম্ভ তুল্য। অতএব নির্জনে কন্যার কাছেও থাকবে না। অন্যত্র যেটুকু প্রয়োজন মাত্র সেইটুকু সময় থাকবে। আত্মসাক্ষাৎকারে দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি মায়াস্বরূপ এরূপ জ্ঞানে জীব স্বতন্ত্র না হওয়া পর্যন্ত স্ত্রী-পুরুষ দেহ ভেদ এবং দ্বৈতবুদ্ধি দূর হয় না। সেই কারণে আমি ভোক্তা অপবে ভোগ্য, এইরকম অজ্ঞান ভাব সৃষ্টি হয়। অতএব স্ত্রীসঙ্গ ত্যাগই বিধেয়। ১-১০

ব্রহ্মচারীর জন্য যা বলা হল তা গৃহস্থ ও যতি-সন্ন্যাসীরও পালনীয়। যে গৃহস্থ কেবল ঋতুকালে স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হয়, তার গুরুশুশ্রূষা না করলেও প্রত্যবায় হয় না। ব্রহ্মচাবী অঞ্জন, অভ্যঞ্জন, গাত্রমার্জন, স্ত্রীলোকের ছবি আঁকা, মৎস্যাদি ভোজন, মধু, মালা, গন্ধদ্রব্য, অনুলেপন, চন্দনাদি ও অলংকাব ত্যাগ করবে। এই ভাবে গুরুগৃহে বাস করে ষড়ঙ্গ বেদ-উপনিষদ্ অর্থসহ পাঠ করে বুঝে নেবে। যথাসাধ্য এর অন্যথা করবে না। এর পর গুরুদেবের নির্দেশ অনুসারে দক্ষিণা প্রদান করে ইচ্ছানুসারে গার্হস্থ্যাশ্রম অথবা সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করবে। ব্রহ্মচারী গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ বা প্রব্রজ্যা যে আশ্রমেই প্রবেশ করুক না কেন, শ্রীবিষ্ণুকে নিজ আশ্রয় জীবের সঙ্গে অগ্নি, গুরু, আত্মা ও আশ্রিত সর্বভূতে প্রকৃতই প্রবিষ্ট না হলেও নিয়ন্তারূপে প্রবিষ্ট বলে দর্শন করবে। এই রকমে ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থাবলম্বী অথবা সন্ন্যাসী সর্বত্র ভগবৎ-দর্শনে অভ্যস্ত হয়ে বিজ্ঞেয় বস্তু পরমব্রহ্মকে অনুভব করেন। এরপর মুনিসম্মত বানপ্রস্থের নিয়মাবলী বলছি। এই সমস্ত নিয়ম মেনে চললে ঋষিদের প্রাপ্য লোক অর্থাৎ মহর্লোক অনায়াসে লাভ হয়। বানপ্রস্থ অবলম্বনকারী ব্যক্তি কৃষিদ্বারা লব্ধ পক্ব অথবা অকালপক্ব শস্য ভোজন করবে না। অপক্ব ফলও তার ভোজন করা নিষেধ। কেবল সূর্যপক্ব ফল সেবা করে সে জীবনধারণ করবে। বন্য নীবার, যা কৃষিদ্বারা লব্ধ নয়, এইরকম দ্রব্য দিয়ে চরু তৈরী করবে বা পুরোডাশের কাজ সম্পাদন করবে। নতুন অন্নাদি পেলে পূর্বসঞ্চিত অন্ন পরিত্যাগ করবে, সঞ্চয় করে রাখবে না। বানপ্রস্থাশ্রমী কেবল অগ্নিস্থাপনের জন্যই গৃহ বা পাতার কুটির অথবা গিরিগহ্বর আশ্রয় করে থাকবে। কিন্তু নিজে হিমবায়ু, অগ্নিতাপ, বর্ষা, রৌদ্র প্রভৃতি সহ্য করবে। ১১-২০

সে কেশ-রোম, নখ, শ্মশ্রু ও জটা ধারণ করবে। শরীরের মলিনতা দূর করবে না এবং কমণ্ডলু, অজিন, দণ্ড, বল্কল ও অগ্নিরক্ষার অনুকূল পরিচ্ছদ ধারণ করবে। এইভাবে বারো, আট, চার, দুই বা অন্তত এক বছরও তপস্যা করে বনে

বিচরণ করবে। সর্বদা সাবধানে থাকবে যেন তপস্যার ক্লেশে বুদ্ধির কোন রকম ব্যতিক্রম না হয়। ব্যাধি বা বার্ধক্য বশত কর্তব্যকর্ম সম্পাদনে অথবা জ্ঞানাভ্যাসে অসমর্থ হলে অনশনাদি ব্রত করবে। 'আমি ও আমার' বলে যে অহংকার তা ত্যাগ করে নিজের দেহে অগ্নি সংযোগ করে দেহকে তার মূল উপাদান-কারণ পঞ্চমহাভূতে বিলীন করে দেবে। একটির পর একটি স্থূল মহাভূত উৎপন্ন হয়েছে, ঐগুলি আবার বিপরীতক্রমে একটির পর একটি লয় করবে। অর্থাৎ প্রথমে দেহগত আকাশ মহাকাশে, নিঃশ্বাসবায়ুকে বাইরের বায়ুমণ্ডলে, দেহের তাপকে বহিঃস্থিত তেজে, শুক্র, রক্ত, শ্লেষ্মাদি রসকে জলে এবং হাড়, মাংস প্রভৃতি দেহের কঠিন অংশকে পৃথিবীতে লয় করাবে। এরপর বাক্‌শক্তিকে অগ্নিতে, শিল্পনিপুণ হস্তকে ইন্দ্রে, গতিশক্তি সহ পদদ্বয়কে ত্রিবিক্রম বিষ্ণুতে এবং রতিশক্তি সহ উপস্থ প্রজাপতিতে লয় করাবে। যেখানে যার উৎপত্তি সেই কারণে ইন্দ্রিয়কে লয় করাবে। শব্দসহ শ্রবণেন্দ্রিয়কে দিক্‌মণ্ডলে, স্পর্শসহ ত্বক্‌কে বায়ুতে লয় করাবে। চক্ষুসহ রূপকে তেজে ও বরুণের সঙ্গে জিহ্বাকে জলে এবং অশ্বিনীকুমারসহ ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে ভূমিতে বিলীন করাবে। মনের সমস্ত কামনাসহ মনকে চন্দ্রে, বোধ্য বিষয় সহ বুদ্ধিকে ব্রহ্মে, অহংকার সহ কর্মকে রুদ্রে লয় করাবে। এই রুদ্র থেকেই 'আমি ও আমার' বোধে সমস্ত কর্ম হয়ে থাকে। চেতনার সঙ্গে চিত্তকে ক্ষেত্রজ্ঞে এবং গুণ-সঙ্গে বিকৃতিপ্রাপ্ত ক্ষেত্রজ্ঞকে নির্বিকার পরমব্রহ্মে লীন করবে। এইভাবে পৃথিবীকে জলে, জলকে তেজে, তেজকে বায়ুতে, বায়ুকে আকাশে, আকাশকে কূটস্থ অহংকার-তত্ত্বে, অহংকারকে মহৎতত্ত্বে, মহৎতত্ত্বকে প্রধানে এবং প্রধান বা প্রকৃতিকে অক্ষর পরমাত্মাতে লয় করবে। কাঠ পুড়ে গেলে আগুনও যেমন আর জ্বলে না, তেমনি সমস্ত উপাধির লয় হলে অবশিষ্ট চেতন ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মাকে অক্ষররূপে জেনে মুনি দ্বৈতরহিত অদ্বয়জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হন। ২১-৩১

ত্রয়োদশ অধ্যায়

সিদ্ধাবস্থা বর্ণন

নারদ বললেন, জ্ঞানাভ্যাসে সমর্থ ব্যক্তি পূর্বোক্ত নিয়মে চিন্তা করে সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বনপূর্বক দেহমাত্র ধারণ করে অবস্থান করবে। তিনি কোনও গ্রামে গিয়ে এক রাত্রির বেশী সেখানে বাস করবেন না; অনিকেতন (আশ্রয়হীন) হয়ে সর্বত্র ভ্রমণ করে দিন যাপন করবেন। কৌপীনমাত্র আচ্ছাদন-বস্ত্র ও দণ্ডাদি চিহ্নমাত্র ধারণ করে অন্য সব কিছু পরিত্যাগ করে বিপন্ন না হলে আর তা গ্রহণ করবেন না। সন্ন্যাসী একাকী, আত্মারাম, সর্বজীবের বান্ধব, শান্তস্বভাব, নারায়ণপরায়ণ হয়ে এবং কারও আশ্রয় গ্রহণ না করে থাকবেন। এই বিশ্ব আত্মতত্ত্বে অবস্থিত এবং পরমাত্মা পরব্রহ্ম সৎ ও অসতে, কার্য ও কারণে পরিব্যাপ্ত এরূপ দর্শন করবেন। আত্মদর্শী যোগী সুষুপ্তি ও জাগরণ এই দুই অবস্থার সন্ধি-সময়ে, যখন অজ্ঞান ও বিক্ষেপ কিছু না থাকে, তখন নিজের স্বরূপ অনুভবের জন্য সচেষ্ট হবেন। অতএব তিনি বন্ধন ও মোক্ষ এই উভয়ই মায়ামাত্র বলে জানবেন। মৃত্যুকে নিশ্চিত জেনে অথবা জীবনকে অধ্রুব মনে করে সাধক এদের সমাদর করবেন না। প্রাণীদের উৎপত্তি-বিনাশকারী কালের প্রতীক্ষায়ই তিনি থাকবেন। আত্মতত্ত্ব-বোধক গ্রন্থ

ছাড়া অসৎ শাস্ত্রে তিনি আসক্ত হবেন না। নক্ষত্রবিদ্যা বা জ্যোতিষশাস্ত্র দ্বারা জীবিকা অর্জন করবেন না। জল্প-বিতণ্ডাময় তর্কবিদ্যার অভ্যাস ত্যাগ করবেন ও কোনও পক্ষ-বিশেষের আশ্রয় নেবেন না। প্রলোভনাদি দ্বারা শিষ্য সংগ্রহ বা বহু গ্রন্থ অভ্যাস করবেন না। শাস্ত্র ব্যাখ্যা বা মঠাদি নির্মাণে আগ্রহ দেখাবেন না। পরমহংস সাধুর বিশেষ লক্ষণ এই যে তিনি সর্বদা শান্ত ও সমচিত্ত হয়ে থাকেন। তাঁর সন্ন্যাস আশ্রম-নিয়ন্ত্রিত ধর্ম পালনের জন্যই নয়। কেন না, যম, নিয়ম প্রভৃতি পালন করে জ্ঞানলাভের পর আর নিয়মাদির প্রয়োজন থাকে না। ইচ্ছা করলে লোকসংগ্রহের[১] জন্য তিনি নিয়ম পালন অথবা তা ত্যাগ করতে পারেন। বাইরে কোনও আশ্রমচিহ্ন ধারণ না করেও মনীষী সাধু সাধারণ লোকের কাছে পাগল বা বালকের ন্যায় অবস্থান করেন। নিজে পণ্ডিত হয়েও তিনি বাগিন্দ্রিয়হীন মূকের মত থাকেন। ১-১০

এই বিষয়ে প্রহ্লাদ ও অজগরব্রতী মুনির ঘটনা সম্বলিত একটি প্রাচীন কাহিনীর উদাহরণ দিচ্ছি শোন। অজগরের ব্রত ধারণ করে এক মুনি কাবেরী নদীর কাছে সহ্য-পর্বতের কোলে ভূপৃষ্ঠে শয়ন করেছিলেন। তাঁর শরীর ধূলাতে আচ্ছাদিত হওয়ায় অমল তেজ সুপ্ত অবস্থায় ছিল। ভগবানের প্রিয়ভক্ত প্রহ্লাদ কয়েকজন অমাত্য পরিবেষ্টিত হয়ে লোকতত্ত্ব জানবার উদ্দেশ্যে সেখানে উপস্থিত হলেন। কর্ম, আকৃতি, বাক্য, বর্ণ বা আশ্রমোচিত চিহ্ন দ্বারাও যাঁকে জানা যায় না, ইনি সেরকম সাধু কিনা এই ভেবে মহাভাগবত অসুর প্রহ্লাদ তাঁর চরণে মস্তক স্পর্শ করে সাদরে প্রণাম জানিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, ব্রাহ্মণ, আপনার দেহটি দেখে মনে হচ্ছে যে উদ্যমশীল ভোগী ব্যক্তির যেরকম স্থূল শরীর, সেরূপই আপনি। উদ্যোগীদের ধন, ধনবান লোকের ভোগ এবং ভোগীদের স্থূলদেহ হয়ে থাকে। বিনা ভোগে এরূপ স্থূলকায় তো সম্ভব নয়। ব্রাহ্মণ, আপনি নিরন্তর শয়ান, সুতরাং নিরুদ্যোগ; আপনার অর্থোপার্জন অসম্ভব। অর্থ থেকে ভোগ হয়। উপভোগ না করেও যে কারণে আপনার দেহ স্থূল হয়েছে, যদি সম্ভব হয় তো আমাকে তা বলুন। আপনি বিদ্বান, বর্মিষ্ঠ, চতুর, নানারকম মধুরালাপে লোকের মনোহরণ করতে সক্ষম এবং আপনার প্রকৃতিও মধুর। আপনি দেখছেন যে সকল লোকেই কর্মে ব্যাপৃত; অথচ এসব দেখেশুনেও আপনি নিশ্চেষ্ট হয়ে শুয়ে আছেন। ১১-১৯

নারদ বললেন, দৈত্যপতি প্রহ্লাদ এইরকম বললে মহামুনি তাঁর মধুর কথায় প্রীত হয়ে কিঞ্চিৎ হেসে বললেন, অসুরশ্রেষ্ঠ, আপনি জ্ঞানী; অতএব অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা মানুষের প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির সব ফলই জানতে পারেন। সূর্যদেব যেরকম অন্ধকার নাশ করেন, সেরকম সর্বদা যাঁর অন্তরে ভগবান নারায়ণ বর্তমান তিনি কেবল ভক্তিদ্বারাই সব অজ্ঞান-অন্ধকার দূর করে থাকেন। মহারাজ, তবুও আমি যা শুনেছি, সেই অনুসারে আপনার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি। নিজের শুদ্ধি-কামনাকারী ব্যক্তিমাত্রেরই আপনাকে সম্মান করা উচিত। সংসার-প্রবাহের কারণস্বরূপ অপূরণীয় ভোগ-তৃষ্ণায় নানাকর্মে লিপ্ত হয়ে আমি বিভিন্ন যোনিতে ভ্রমণ করেছি। কর্মবশে নানা যোনিতে জন্মগ্রহণ করলে সেই ভোগ-তৃষ্ণাই আমাকে এই মনুষ্যদেহ প্রদান করেছে। এই দেহে ধর্মানুষ্ঠান দ্বারা স্বর্গের দ্বার, অধর্ম দ্বারা কুকুর-শূকর যোনির দ্বার, মিশ্রকর্ম ধর্মাধর্ম দ্বারা পুনরায় মনুষ্য-যোনির

---

১ লোকসংগ্রহ - দৃষ্টান্ত প্রদর্শনপূর্বক লোকদের স্বপথে প্রবর্তন। দ্রষ্টব্য: গীতা, ৩.২০ ও ৩.২১

দ্বার এবং ধর্ম বা অধর্ম কর্মাদি থেকে সর্বতোভাবে নিবৃত্ত হলে অপবর্গের দ্বার পাওয়া যায়। এই মনুষ্যদেহে সুখ লাভ এবং দুঃখ পরিহার করার জন্য স্ত্রী-পুরুষের কর্ম বিষয়ে বিপর্যয় দেখে আমি সব বিষয় থেকে নিবৃত্ত হয়েছি। সুখই জীবের আত্মার স্বরূপ। যখন সবরকম বাসনা থেকে নিবৃত্তি ঘটে তখন আপনা আপনি সেই সুখের অনুভব হয়। অতএব ভোগ্য সামগ্রীর সুখ-দুঃখ মনের ব্যাপার অনিত্যমাত্র বুঝে আমি নিরুদ্যম হয়ে প্রারব্ধমাত্র ভোগ করছি। যদিও সুখস্বরূপ আত্মা সঙ্গেই আছেন, তবুও তাকে ভুলে মানুষ মিথ্যা দ্বৈতভাবে অজ্ঞানময় সংসারে ভ্রমণ করে। যেমন অজ্ঞ ব্যক্তি নিকটস্থ শেওলা-পরিবৃত জল ত্যাগ করে জলের সন্ধানে মৃগ-তৃষ্ণার পেছনে ছুটে যায়, সেরূপ আত্মায় সুখ না দেখে অন্যত্র পুরুষার্থ অনুসন্ধান করে মানুষ সংসারবদ্ধ হয়। আমার নিরুদ্যম হওয়ার কারণ বিপর্যয়-দৃষ্টি অর্থাৎ মানুষ কর্মফল থেকে প্রাপ্ত দেহের সুখ ও দুঃখের মধ্যে নিবৃত্তি হবে মনে করে। সেই নির্দৈব অদৃষ্টহীন ব্যক্তির সমস্ত কর্ম বৃথা হয়। ২০-৩০

যে মানুষ আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক, এই ত্রিবিধ দুঃখ থেকে মুক্ত হয় নি, তার দুঃখে উপার্জিত অর্থ ও কাম লাভে বা ভোগে কি ফল হতে পারে? তার মৃত্যু যে অনিবার্য। বিনা ক্লেশে অর্থ লাভও দুঃখের কারণ হয়, কেননা অজিতেন্দ্রিয় ধনবান ব্যক্তি প্রচুর অর্থ লাভ করেও ক্লেশ ভোগ করে। ভয়ে রাত্রিতে তার নিদ্রা হয় না। সর্বদা সর্বদিক দিয়ে তার ভয়—রাজার করের ভয়, চোরের উপদ্রব, শত্রুর ভয়, স্বজনের ভয়, এমনকি পশু-পক্ষী, যাচক থেকে, কাল থেকে এবং শেষে নিজের বিনাশ-ভয় সব সময় তার থাকে। যে অর্থ ও প্রাণ শোক, মোহ, ভয়, ক্রোধ, অনুরাগ, ক্লীবতা ও পরিশ্রমের মূল, জ্ঞানী ব্যক্তির সেই ধন ও প্রাণের স্পৃহা ত্যাগ করা উচিত। মধুকর ভ্রমর ও অজগর সাপ এই দুয়ের কাছে যথাক্রমে বৈরাগ্য ও সন্তোষ আমরা শিক্ষা করেছি; এরা উত্তম গুরু। মধুকর অনেক কষ্টে মধু সঞ্চয় করে, কিন্তু অপরে তাকে বধ করে তার মধুরূপ অর্থ অপহরণ করে। মধুকরের এই দশা দেখে আমি সর্ব কামনা থেকে বৈরাগ্য শিক্ষা করেছি। অজগরের কাছে শিক্ষা গ্রহণ করে আমি নিশ্চেষ্ট ও যা-ইচ্ছা পেয়ে সন্তুষ্ট থাকি। কোনও সময় কিছু না পেলেও ধৈর্য ধরে অজগরের মত শুয়ে পড়ে থাকি; কখনও অল্প কখনও বেশী যখন যা পাই ভোজন করি। কোনটা ভাল, কোনটা খারাপ, অল্প বা বেশী গুণযুক্ত সামগ্রী, আবার কখনও শ্রদ্ধায় অর্পিত, কখনও বা অপমানিত হয়ে প্রাপ্ত খাদ্য, কখনও ভোজনের ওপর ভোজন. আর কোনও দিন উপবাসী থেকে রাত্রিতে অল্প কিছু পেয়ে তা দিয়েই ক্ষুধার নিবৃত্তি করে থাকি। খাওয়ার কোনও নিয়ম নেই। পরিধেয় সম্বন্ধেও কখনো ক্ষৌমবসন, কখনও মৃগচর্ম, কৌপীন, বল্কল অথবা যা পাই তাই ধারণ করি; এইভাবে সন্তুষ্ট থেকে প্রারব্ধ ভোগ করি। শয়নেরও কোনও নির্দিষ্ট স্থান নেই। কোন সময় ভূমিতে, কখনও তৃণ বা শুষ্ক পাতায় বা পাথরের ওপর অথবা ছাইয়ের ওপরে শুয়ে থাকি। কেউ যত্ন করে অট্টালিকায় খাটের ওপর নরম শয্যায় শয়ন করালে সেখানেই নিদ্রা যাই। ৩১-৪০

ভ্রমণেও নিয়ম নেই। ভাল কাপড়, মালা চন্দনাদি দ্বারা সজ্জিত হয়ে রথ, হাতী বা ঘোড়ার পিঠে বেড়িয়ে থাকি, আবার কখনও দিগম্বর হয়ে গ্রহের মত ঘুরে বেড়াই। আমি কারও নিন্দা বন্দনা করি না। কারও ভাল মন্দ বিচার না করে সকলের মঙ্গল কামনা করি এবং মহান ভগবান বিষ্ণুকে প্রাণদেবতা জেনে তাঁর সঙ্গে একাত্মতা কামনা করি। এইভাবে থাকবার কারণ হল আত্ম-অভিমানের বিলোপ সাধন। এজন্য ভেদ-দর্শনের মনোবৃত্তিতে বিকল্প হোম করে সেই বৃত্তিকে

মনে লয় করবে। মনই অনর্থকে অর্থ প্রতীতি জন্মায় ; সুতরাং সেই মনকে বৈকারিক অহংকারে লীন করবে। আবার অহংকারকে মহত্তত্ত্ব সহ মায়া অর্থাৎ প্রকৃতিতে হোম করবে। সত্যদ্রষ্টা মননধর্মী মুনি মায়াকে আত্মানুভূতিতে হোম করবে। তারপর পরমাত্মায় স্থিত হয়ে আত্মানুভবে সত্যদর্শী মুনি নিশ্চেষ্ট হয়ে অবস্থান করবে। মহারাজ, তুমি ভগবানের প্রিয় ; এই জন্য অত্যন্ত গোপনীয় হলেও নিজ বৃত্তান্ত তোমার কাছে নিবেদন করলাম। সাংসারিক দৃষ্টিতে লোক এবং শাস্ত্রের বিধান থেকে পৃথক মনে হলেও তত্ত্বদৃষ্টিতে এটা সেরকম নয়। নারদ বললেন, অসুরদের অধিপতি প্রহ্লাদ মুনির কাছে এই পরমহংসের ধর্মোপদেশ শোনার পর তাঁকে পূজা ও অভিবাদন করে তাঁর অনুমতিক্রমে গৃহে প্রস্থান করলেন। ৪১-৪৬

চতুর্দশ অধ্যায়

গৃহস্থের বিশিষ্ট ধর্ম

যুধিষ্ঠির বললেন, দেবর্ষি, গৃহস্থ যে নিয়ম পালন করলে এই অবস্থায় উন্নীত হতে পারেন, অনুগ্রহ করে তাই বলুন। কেননা আমার মত লোক গৃহস্থধর্ম বিষয়ে একান্ত অজ্ঞ। নারদ বললেন, মহারাজ যুধিষ্ঠির, গৃহে অবস্থিত থেকে যথোচিত সমস্ত কর্ম অনুষ্ঠান করে তা বাসুদেবকে সমর্পণ করবে এবং সময়মত মহামুনিদের উপাসনা করবে। অমৃতস্বরূপ ভগবানের অবতার-কথা শ্রদ্ধান্বিত হয়ে বারবার শুনবে এবং শম-দম সম্পন্ন ব্যক্তিদের দ্বারা বেষ্টিত হয়ে থাকবে। যেরকম স্বপ্নে দেখা স্ত্রী-পুত্রাদি জাগরিত ব্যক্তির হৃদয় থেকে আপনা আপনি দূর হতে থাকে, সেইরকম জ্ঞানী ব্যক্তিদের সংসর্গে গৃহস্থও স্ত্রী-পুত্রাদির প্রতি আসক্তি পরিত্যাগ করে। যে পরিণাম অর্থে একান্ত প্রয়োজন, তাই গ্রহণ করে মনে-প্রাণে বৈরাগ্য অবলম্বন করবে, কিন্তু বাইরে অনুরক্ত লোকের মতই ব্যবহার করবে। কোথাও কোন বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করবে না। জ্ঞাতি, বাপ-মা, ভাই, সন্তান, বন্ধু-বান্ধব যে যা চায় তাই অনুমোদন করবে, কিন্তু কিছুতেই মমতা রাখবে না। বৃষ্টি দ্বারা প্রাপ্ত ক্ষেত্রজাত ধান্যাদি, ভূমি খননে প্রাপ্ত রত্নাদি, দৈবাৎ প্রাপ্ত ধন, হঠাৎ প্রাপ্ত কোনও সম্পদ, সবকিছু সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেই অপরের প্রার্থনা পূর্ণ করবে। দৈববশে অধিক লাভ হলে মনে কখনও অহমিকার ভাব আরোপ করবে না। যে পরিমাণ ধনে জীবিকা নির্বাহ হয়, উদর পূর্ণ হয় তাতেই ব্যক্তির অধিকার। তার বেশী ভোগ ও সঞ্চয় করলে তাকে চোর বলা যায়। সে ধর্মশাস্ত্রানুসারে দণ্ডনীয়। এমনকি কোনও মৃগ, উট, গাধা, বানর, ইঁদুর, সাপ, পাখি বা পতঙ্গ প্রভৃতি প্রাণী ঘরে বা ক্ষেতে প্রবেশ করে শস্যাদি ভোজন করলেও, তাকে নিবারণ করবে না ; বরং অন্য জীবদের আপন সন্তানের মতই মনে করবে। পুত্র থেকে তাদের পার্থক্য কি ? গৃহস্থের অত্যধিক কষ্ট করে ধর্ম, অর্থ ও কামনা পূরণ করবার চেষ্টা করা উচিত নয়। যে দেশে, যে কালে, যেটুকু অদৃষ্টবশে লাভ করা যায়, তাতেই সন্তুষ্ট থাকা উচিত। ১-১০

কুকুর, পতিত জন অথবা চণ্ডাল পর্যন্ত প্রাণীকে যথাযোগ্য তাদের ভোগ্যবস্তু বিভাগ করে দেবে। এমনকি নিজের পত্নীকেও অতিথির সেবায় নিযুক্ত করলে তাতে যদি নিজের সেবায় কিছু ত্রুটিও হয় তাও স্বীকার করবে। মানুষ স্ত্রীর জন্য নিজের প্রাণ বিসর্জন দেয়, এমনকি মা-বাবা, গুরুকেও হত্যা করে, সেই স্ত্রীর মমতা যে

ব্যক্তি ত্যাগ করে, অজিত ভগবানকে সে জয় করতে সমর্থ হয়। পত্নীর পক্ষেও স্বামিত্ব ভাবনা ত্যাগ করা কঠিন, কিন্তু তত্ত্ব বিচার করে অসাধ্য সাধন করা যায়। শরীরের শেষ পরিণতি কৃমি, বিষ্ঠা, আর নয় তো ভস্ম। এই শরীর কোথায় যাবে, আর এই দেহে যার সংগে রতি হয় সেই পত্নীই বা কোথায় যাবে? যে আত্মা সর্বব্যাপী তার সংগে কার তুলনা? এইসব বিচার করলে দেহ বা ভার্যা কোনও পদার্থের মমতা থাকবে না। গৃহস্থ ব্যক্তি অদৃষ্ট অনুসারে প্রাপ্ত অর্থাদি দ্বারা পঞ্চযজ্ঞ অনুষ্ঠান করবে, এরপর যা অবশিষ্ট থাকবে তা দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করবে। যিনি এইভাবে থেকে অবশিষ্ট অংশে নিজের স্বামিত্ব ত্যাগ করেন, তিনিই প্রাজ্ঞ এবং তিনিই মহৎ ব্যক্তিদের নিবৃত্তিময় পথের অধিকারী হন। দেবতা, ঋষি, মনুষ্য, ভূত ও পিতৃগণ পঞ্চযজ্ঞের দেবতা। পৃথকভাবে এই পঞ্চযজ্ঞ দ্বারা আত্মার অর্চনায় নিজের বিত্ত নিয়োজিত করবে। এদের অর্চনা করলে অন্তর্যামীরই অর্চনা হবে। যখন সর্বপ্রকার সম্পদে নিজের অধিকার হবে, তখন কর্মকাণ্ডের নিয়ম অনুসারে অগ্নিহোত্র প্রভৃতি যজ্ঞ দ্বারা যজন (পূজা) করবে। ১১-১৬

তবে যজ্ঞের জন্য বিশেষ ব্যবস্থার কোন প্রয়োজন নেই। কেননা, সকল যজ্ঞের ভোক্তা ভগবান ব্রাহ্মণের মুখে হুত হবি দ্বারা (অর্থাৎ ব্রাহ্মণভোজনে) যেরকম তৃপ্ত হন, অগ্নিমুখে আহুতি দিলে সেরকম তৃপ্ত হন না. অতএব ব্রাহ্মণ, দেবতা বা মানুষে পূর্বোক্ত কামনা করে যথাযোগ্য ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মার যজনা করবে। ব্রাহ্মণদের পর অন্যান্য জীবের মধ্যেও ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষের অর্চনা করা বিধেয়। ধনী ব্রাহ্মণ পিতা-মাতা ও আত্মীয়দের উদ্দেশ্যে ভাদ্র মাসে তার সম্পদের উপযুক্তভাবে অপর পক্ষীয় (মহালয়া) শ্রাদ্ধ করবে। এইভাবে উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়নে. বিষুবদ্বয়ে, ব্যতীপাত যোগে, ত্র্যহস্পর্শ দিনে, চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ কালে, দ্বাদশী তিথি ও শ্রবণা নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করবে। ১৭-২০

বৈশাখের অক্ষয় তৃতীয়াতে কার্তিক মাসের শুক্লা নবমীতে হেমন্ত ও শীতকালে অগ্রহায়ণাদি চার মাসে চারটি অষ্টকা শ্রাদ্ধ করবে। মাঘ মাসের শুক্লা সপ্তমী, মঘা নক্ষত্র, পূর্ণিমা এবং যে যে নক্ষত্র থেকে যে যে মাসের নাম হয়, সেইসব নক্ষত্র যখন পূর্ণিমা তিথির সংগে মিলিত হয়, সেই সময় শ্রাদ্ধ করবে। দ্বাদশী তিথিতে অনুরাধা, শ্রবণা, উত্তরফাল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া বা উত্তরভাদ্রপদ এই সব নক্ষত্রে একাদশী হলে সেই সেই জন্মনক্ষত্র অথবা শ্রবণানক্ষত্র যুক্ত দিনে শ্রাদ্ধ করবে। পূর্বে উল্লিখিত সময় শ্রাদ্ধের জন্য নির্দিষ্ট। কেবল শ্রাদ্ধের জন্য নয়, এই কাল মংগলবর্ধক এবং এই সময় মানুষ সবরকম মংগলজনক কার্যে অনুষ্ঠান করবে—এতেই পরমায়ুর সাফল্য। এইসময় স্নান, জপ, হোম, ব্রত, দেবতা ও ব্রাহ্মণের পূজা, পিতৃগণ, মানুষ ও দেবতাদের উদ্দেশ্যে যা কিছু দান করা হয়, তা চিরদিন অক্ষয় হয়ে থাকবে। পত্নীর পুংসবন প্রভৃতি সংস্কার, পুত্র-কন্যার অন্নপ্রাসন, নিজের যজ্ঞদীক্ষাদি সময়ে, প্রেতদাহ সময়ে, মৃত্যুদিনে বা অন্যান্য আভ্যুদায়িক কর্মকালে মংগলজনক কর্মাদি করা শ্রেয়স্কর। ২১-২৬

এরপর যে সব দেশ মংগলজনক তা বলছি, যে দেশে সংলোক বাস করে, সেটাই সর্বাপেক্ষা পবিত্র দেশ। সমস্ত স্থাবর-জংগম যে ভগবানে অবস্থিত সেই ভগবানের বিগ্রহ যে সব স্থানে আছে, যে স্থানে তপস্যা, বিদ্যা, দয়া প্রভৃতি গুণসমূহে সমন্বিত ব্রাহ্মণ পরিবার বাস করেন, সেই দেশ পুণ্যতম। যে স্থানে শ্রীহরির বিগ্রহ অর্চনা হয়, সেই দেশ সকল মংগলের পীঠস্থান। যেখানে গংগা প্রভৃতি পুরাণ-বিখ্যাত পুণ্য নদী, পুষ্করাদি সরোবর ও সাধুসেবিত পবিত্র ক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র, গয়া, প্রয়াগ, পুলহ মুনির আশ্রম, নৈমিষারণ্য, ফল্গু নদী, সেতুবন্ধ, প্রভাসতীর্থ, কুশস্থলী,

দ্বারকা, কাশী, মথুরা, পম্পা ও বিন্দু সরোবর বিদ্যমান সেই দেশই পুণ্যতম দেশ বলে জানবে। ২৭-৩১

নারায়ণাশ্রম, নন্দানদী, সীতারামের আশ্রম প্রভৃতি স্থান, মহেন্দ্র পর্বত, মলয় পর্বত প্রভৃতি পর্বত পুণ্যতম দেশ, আর যে স্থানে ভগবানের বিগ্রহ বা শালগ্রাম প্রতিষ্ঠিত, সে স্থানও পবিত্র। যিনি সর্বপ্রকার মঙ্গল কামনা করেন, এইসব স্থান তাঁর অবশ্য পরিচর্যা করা কর্তব্য। কারণ এইসব স্থানে আচরিত ধর্ম সহস্রগুণ ফলদায়ক। ৩২-৩৩

কবিরা শ্রীহরিকেই সর্বশ্রেষ্ঠ পাত্র বলে নির্ণয় করেছেন, কারণ এই চরাচর বিশ্ব শ্রীহরিময়। রাজা, তোমার অনুষ্ঠিত রাজসূয় যজ্ঞে দেবতা, ঋষি, ব্রহ্মার পুত্র সনকাদি মহর্ষিও উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা উপস্থিত থাকলেও অগ্রপূজায় ভগবান অচ্যুত শ্রীকৃষ্ণই সর্বসম্মত সৎপাত্র বিবেচিত হন। সর্বপ্রকার জীবরাশি দ্বারা পরিপূর্ণ এই ব্রহ্মাণ্ড কোষ একটি সুবৃহৎ বৃক্ষস্বরূপ (সংসার-বৃক্ষ)। এর মূল শ্রীভগবান অচ্যুত[1], অতএব তাঁর অর্চনা করলে সমস্ত জীবেরই তৃপ্তি বিধান করা হয়। পুরুষ নামের তাৎপর্য এই যে, পুরাকালে ভগবান পশু-পক্ষী, ঋষি, দেবতাস্বরূপে নানারূপে শরীর বা পুর সৃষ্টি করে সেইসব পুরে অন্তর্যামীরূপে প্রত্যগংশে শয়ন করেন। এইজন্য তিনি 'পুরুষ' বলে অভিহিত। ৩৪-৩৭

ভগবান সেইসব শরীরেই তারতম্য অনুসারে অবস্থান করেন. অর্থাৎ পশু অপেক্ষা মানুষ, মানুষ অপেক্ষা ঋষি, ঋষি অপেক্ষা দেবতায় এরূপে পূর্ব পূর্ব রূপে থেকে পর পর উৎকৃষ্টতর রূপে অবস্থিত। অতএব পুরুষই পাত্র। তাঁর মধ্যেও তপস্যা যোগাদি দ্বারা যেখানে তাঁর যে রূপে অধিক অংশের বিকাশ, সেখানে সেই পরিমাণে পাত্রের যোগ্যতাও অধিক। মানুষেরা পরস্পর পরস্পরকে অবজ্ঞা করতে শুরু করায় পণ্ডিতেরা তাদের ভাব বুঝে ত্রেতাদি যুগে ভগবানের অর্চনার জন্য তাঁরই বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর কিছু লোক শ্রদ্ধার সঙ্গে বিগ্রহে শ্রীহরিকে অর্চনা করে উপাসনা করেন। কিন্তু মানুষের প্রতি বিদ্বেষ করে বিগ্রহ উপাসনায় প্রবৃত্ত হলে তাতে অভীষ্ট সিদ্ধি হয় না। সকল মানুষের প্রতি দ্বেষশূন্য হয়ে অর্চনা করলে অতি নিম্নাধিকারী ব্যক্তিও পুরুষার্থ লাভ করতে পারে। ৩৮-৪০

মহারাজ, পুরুষের মধ্যে ব্রাহ্মণকেই সুপাত্র বলে জানবে। তাদের মধ্যে যিনি তপস্যা, বিদ্যা ও সন্তোষ দ্বারা শ্রীহরির মূর্তি ধারণ করেন, তিনি অতিশয় উত্তম পাত্র। ব্রাহ্মণের মহিমা কি আর বলব! জগতের আত্মস্বরূপ ভগবান ব্রাহ্মণের পদধূলি দ্বারা ত্রিভুবন পবিত্র করেন। কাজেই ব্রাহ্মণেরা যে পরম পাত্র এতে আর সন্দেহ নেই। ৪১-৪২

পঞ্চদশ অধ্যায়

বর্ণাশ্রম ধর্মের সারকথা

নারদ বললেন, ব্রাহ্মণদের মধ্যে কেউ কর্মনিষ্ঠ, কেউ তপোনিষ্ঠ, কেউ স্বাধ্যায়নিরত, কেউ বা বেদব্যাখ্যায় নিপুণ, আর কেউ জ্ঞান ও যোগে নিষ্ঠালাভ করে থাকেন। দানের অনন্ত ফললাভের জন্য জ্ঞাননিষ্ঠ ব্রাহ্মণকেই পিতৃ-উদ্দেশে দেয় শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য

১ কঠোপনিষদেও পরমব্রহ্মকে সংসার-বৃক্ষের মূল বলা হয়েছে। —কঠ ২।৩।১

(কব্য) এবং দেবতার উদ্দেশে দাতব্য দ্রব্য (হবি) দান করা উচিত। এরূপ ব্রাহ্মণ পাওয়া না গেলে যথাযোগ্য ও যথাক্রমে অন্য ব্রাহ্মণকেও তা দেওয়া যায়। দৈব পক্ষে দুইজন, পিতৃপক্ষে তিনজন অথবা উভয় পক্ষে একজন করে ব্রাহ্মণ ভোজন করাবে। খুব ধনী হলেও অতি বেশী সংখ্যক ব্রাহ্মণ ভোজন করাবে না। শ্রাদ্ধ ব্যাপারে মাংসাদি আমিষ পদার্থ দেবে না এবং ধর্মতত্ত্বজ্ঞানীর মৎস্য-মাংস ভোজন করাও নিষিদ্ধ। নীবার-ধান প্রভৃতিতে যে রকম সন্তোষলাভ হয়, পশুহিংসায় সে রকম হয় না। সৎ-ধর্মাভিলাষীদের কায়মনোবাক্যে প্রাণীর প্রতি অহিংসভাবের মত আর পরম ধর্ম নেই। জ্ঞানী সাধকের যজ্ঞের পরম রহস্য জেনে নিষ্কাম জ্ঞানের দ্বারা প্রজ্বলিত আত্মসংযমরূপ অগ্নিতে কর্মময় যজ্ঞসকল আহুতি দেন। তাতে বাহ্য কর্ম আর থাকে না। দ্রব্য যজ্ঞ দ্বারা যাঁরা যাগ করেন, তাঁদের দেখে অন্যান্য প্রাণীর ভয় হয়। তারা ভাবে যে এই যাজ্ঞিকেরা আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ, এরা শুধু নিজেদের প্রাণের তৃপ্তি চায়। এদের করুণা নেই, আমাদের এরা বধ করতে পারে। ১-১০

এইজন্য ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি দৈবপ্রাপ্ত নীবার বা যজ্ঞাদি দ্বারা সন্তুষ্ট মনে তাদের নিত্যনৈমিত্তিক কাজ সম্পন্ন করেন। বিধর্ম, পরধর্ম, ধর্মাভাস, উপধর্ম এবং ছলধর্ম—এই পাঁচটি অধর্ম-শাখা। এদের অধর্মের মত নিষিদ্ধ মনে করে ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি সেগুলি ত্যাগ করবেন। স্বধর্মে বাধা পড়ে এমন কাজ ধর্ম বলে মনে হলেও তা বিধর্ম, অন্যের উপদিষ্ট ধর্ম পরধর্ম আর অভিমানপূর্ণ পাষণ্ডতা বা দম্ভপূর্ণ কাজ উপধর্ম। নামে ধর্ম কাজে অন্য তার নাম ছলধর্ম। স্বকপোলকল্পিত ব্যবস্থায় পূজা প্রভৃতি ধর্মাভাস, তাও ধর্ম নয়; আশ্রমধর্ম থেকে তা পৃথক। স্বভাব অনুসারে বিহিত ধর্মেই শান্তি ও তুষ্টি আসে। নির্ধন ব্যক্তি ধর্মের জন্য অথবা জীবিকার জন্য কোনও কারণেই যদি অর্থ কামনা না করেন, তাঁর এই নিশ্চেষ্টতাই মহাসর্প অজগরের মত জীবনধারণের সংস্থান করে দেয়। নিরীহ কামনাশূন্য সন্তুষ্ট আত্মারাম ব্যক্তির যে সুখানুভব, কামনার আকর্ষণে অর্থপ্রাপ্তির জন্য দিকে দিকে ধাবমান ব্যক্তি তা কি করে লাভ করবে? সন্তুষ্টচিত্ত ব্যক্তির সব দিকেই মঙ্গল। পাদুকা পরলে পথের কাঁটা বা কাঁকর কিছুই কষ্টদায়ক হয় না, সুখেই বিচরণ করা যায়। হৃষ্টচিত্ত লোক একটু জল পেয়েও সন্তুষ্ট থাকে। আর যার মন সন্তুষ্ট নয়, সে স্ত্রীসঙ্গকামনা, জিহ্বার লালসা ও নানা ইন্দ্রিয়ের তাড়নায় অস্থির হয়ে কুকুরের মত ছুটোছুটি করে। অসন্তুষ্ট ব্যক্তির তেজস্বিতা, বিদ্যা, তপস্যা, যশ সব কিছুই ইন্দ্রিয়ের লালসায় বিনষ্ট হয় এবং জ্ঞানও অন্তর্হিত হয়। অন্নজল পেলে যেরূপ ক্ষুধার্ত ব্যক্তির কামনার নিবৃত্তি হয়, সেরূপ ক্রুদ্ধ ব্যক্তির কামনা পূরণ করতে পারলে তার ক্রোধের উপশম হয়। কিন্তু সর্বদিক জয় করে বা এই পৃথিবীকে ভোগ করেও লোভের শেষ হয় না। ১১-২০

সমাজের নেতৃস্থানীয় বহু পণ্ডিত ব্যক্তিরও অসন্তোষ হেতু অধঃপতন হয়ে থাকে। সংকল্প ত্যাগ করে কামকে জয় করবে, কামকে পরিত্যাগ করে ক্রোধকে জয় করবে, আবার অর্থ যে নানারকম অনর্থের মূল, এটা ভালভাবে বুঝে লোভকে জয় করবে। তত্ত্ববিচার করে ভয়কে জয় করবে। আত্মা ও অনাত্মার বিচার করে শোক ও মোহকে জয় করবে। মহতের উপাসনা দিয়ে দম্ভ-অভিমানকে জয় করবে। মৌন অভ্যাস করে যোগপ্রতিবন্ধক কথাবার্তা ত্যাগ করবে। কামাদি বিষয়ে চেষ্টা ত্যাগ করে হিংসা থেকে নিবৃত্ত থাকবে। দুঃখ ত্রিবিধ—আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক। তার মধ্যে আধিভৌতিক অর্থাৎ কোন প্রাণী দ্বারা দুঃখ পেলে সেই প্রাণীর প্রতি করুণা-প্রদর্শন করে ঐ দুঃখ ত্যাগ করবে। আধিদৈবিক অর্থাৎ কোন

দৈব বা অজানা কারণে দুঃখ হলে প্রাণায়াম, সাত্ত্বিক আহার ও সমাধি দ্বারা তা দূর করবে। আধ্যাত্মিক দুঃখ উপস্থিত হলে যোগবলে তাকে জয় করবে। ঘুমের আবেশ হলে সত্ত্বগুণের অনুশীলন দ্বারা তাকে দূর করবে। আবার সত্ত্বগুণ অনুশীলন দ্বারাই রজ ও তমোগুণের প্রভাব থেকেও মুক্ত থাকবে। উপশম বা শান্তভাবের প্রভাবে সত্ত্বগুণের অহমিকা থেকেও নিজেকে মুক্ত রাখা সম্ভব। এই সবকিছুই গুরুর প্রতি ভক্তি দ্বারা মানুষ অনায়াসে জয় করবে। জ্ঞানপ্রদীপ প্রদানকারী গুরু সাক্ষাৎ ভগবানের স্বরূপ। যে এই গুরুর সঙ্গে সাধারণ মানুষের ন্যায় ব্যবহার করে তার সকল শাস্ত্র শ্রবণ হস্তিস্নানের ন্যায় নিরর্থক হয়। যুধিষ্ঠির, গুরুই সাক্ষাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ এবং প্রকৃতি-পুরুষের ঈশ্বর। যোগেশ্বরেরা এঁরই চরণ অন্বেষণ করেন। লোকেরা এঁকে ভুলবশত সামান্য মানুষ বলে ধারণা করে। শাস্ত্রে যেসব বিধি এবং নিয়ম আছে, সেইগুলির উদ্দেশ্য কাম-ক্রোধাদি ষড়্‌বর্গের দমন। ঐ সব বিধি ইন্দ্রিয়কে সংযত করে যদি মানুষকে ধ্যানপরায়ণ করতে না পারে, তবে সবই বিফল। কৃষিকার্য দ্বারা যেরূপ যোগসাধানার ফল মোক্ষ লাভ সম্ভব নয়, সেরূপ শাস্ত্রবিধি নির্দিষ্ট ইষ্টাপূর্ত প্রভৃতি সাংসারিক সুখ-কামনাকারী কর্মও মোক্ষসাধক হতে পারে না; বরং সেগুলি লোককে আরো সংসারমুখী করে তোলে। চিত্তজয়ের জন্য উদ্‌যোগী ব্যক্তি গৃত্যাগ করবেন, সন্ন্যাসী হয়ে নির্জনে বাস করবেন। ভিক্ষালব্ধ অল্প আহার্য গ্রহণ করে কোনও মতে দেহধারণ করবেন। ২১-৩০

মহারাজ, পবিত্র সমতল স্থানে নিজের আসন স্থাপন করে স্থিরভাবে সুখে দুঃখে শরীরকে সমান রেখে আসনে বসে ওঙ্কার জপ করবে। পূরক, কুম্ভক ও রেচক ক্রিয়া দ্বারা সাধক প্রাণ ও অপান বায়ুর গতি নিয়ত করবেন এবং নাসাগ্রে স্থির দৃষ্টি রেখে যে-সময় পর্যন্ত মন কামনাকে ত্যাগ না করে সে-সময় পর্যন্ত নিরীক্ষণরত থাকবে। কামাহত হওয়ার ফলে মন যে দিক দিয়ে ছুটে যেতে চাইবে সেই দিক থেকে তাকে ফিরিয়ে ধীরে ধীরে ধীরব্যক্তি তাকে হৃদয়ে আবদ্ধ করবেন। এইভাবে সর্বদা অভ্যাস করলে সন্ন্যাসীর মন অচিরে কাষ্ঠহীন অগ্নির মত শান্ত-ভাব ধারণ করে অর্থাৎ নির্বাণপ্রাপ্ত হয়। কামাদি দোষে অসংসৃষ্ট চিত্তবৃত্তি যখন প্রশান্তভাব লাভ করে, তখন তা ব্রহ্মানন্দস্পর্শ সুখ অনুভব করে, আর সেই আনন্দ থেকে অন্যত্র যেতে চায় না। গৃহস্থাশ্রম ধর্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গের বপনক্ষেত্র। এই গৃহ ত্যাগ করে যে সন্ন্যাস গ্রহণ করে এবং সন্ন্যাসী অবস্থায় পুনরায় সংসারসেবায় মনোনিবেশ করে, তাকে 'বান্তাশী' বলা হয়। আগে বমি করে আবার যে খায় এরকম ঘৃণিত কুকুর হল বান্তাশী। অতি অসৎ ব্যক্তিরাই একবার দেহকে অনাত্মা, জড়, মৃত্যু-ধর্মশীল, অন্তে কৃমি, বিষ্ঠা বা ভস্মের সমান মনে করে সন্ন্যাস গ্রহণ করে, আবার এই দেহকেই সারবস্তু মনে করে প্রশংসা করে এবং সংসারে ফিরে আসে। যারা গৃহস্থ হয়েও স্বধর্মকর্মানুষ্ঠান ত্যাগ করে, ব্রহ্মচারী হয়ে ব্রত ত্যাগ করে, তপস্বী হয়ে গ্রামে বাস করে, সন্ন্যাসী হয়ে ইন্দ্রিয়-লালসায় পড়ে তারা সকল আশ্রমের নিন্দিত ব্যক্তি। দেব-মায়ায় মুগ্ধ এরকম লোককে অনুগ্রহ দেখাবে না, বরং উপেক্ষা করবে। একবার আত্মজ্ঞান হলে সেই জ্ঞানে তার সব কামনা-বাসনা ধুয়ে যায়; তখন জ্ঞানীর আর কোন ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্য বা লালসা থাকে না যে তিনি দেহকে পোষণ করবেন। ৩১-৪০

পণ্ডিতগণ এই দেহকে রথ বলেছেন। ইন্দ্রিয়গুলি এই রথের অশ্ব ইন্দ্রিয়ের কর্তা মন হল ঘোড়ার মুখের বল্‌গা। রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শময় বিষয়-জগৎ এই রথের গন্তব্য পথ, বুদ্ধি হল সারথি, চিত্ত এই শরীর রথের বন্ধনরজ্জু, আর বন্ধনের

কর্তা পরমেশ্বর।[১] ধর্ম ও অধর্ম এই রথের দুই চাকা। তাতে দশ প্রাণবায়ু[২] চক্রের অক্ষ বা আল, অহংকারী জীব রথী, প্রণব তার ধনুক, শুদ্ধ জীবস্বরূপ তার শর, পরমব্রহ্ম লক্ষ্য। ধনুক দ্বারা শর উৎক্ষিপ্ত হয়ে যেমন লক্ষ্য ভেদ করে, সেই রকম অশুদ্ধ জীব প্রণবমন্ত্র দ্বারা তার শুদ্ধ স্বরূপকে উৎক্ষিপ্ত করে পরমব্রহ্মরূপ লক্ষ্যে পেঁছাবে।[৩] ৪১-৪২

রাগ, দ্বেষ, লোভ, মোহ, শোক, ভয়, মদ, মান, অপমান, অসূয়া, মায়া, হিংসা, মাৎসর্য, অভিনিবেশ, অনবধানতা, ক্ষুধা ও নিদ্রা—এগুলি এবং এরূপ আরো অনেক শত্রু জীবের আছে। তারা রজ ও তম-প্রকৃতিরও হয়, আবার সত্ত্ব-প্রকৃতিরও হয়। সত্ত্বপ্রকৃতির হলেও সমাধিপ্রাপ্ত যতির পক্ষে পরোপকারাদি প্রবৃত্তিও শত্রুস্বরূপ, সুতরাং এসবও পরিহার করা কর্তব্য। এই শরীররূপ রথের প্রধান উপকরণ সেই ইন্দ্রিয়কে বশীভূত করে যতদিন দেহধারণ করবে, ততদিনই শ্রীগুরুসেবা দ্বারা জ্ঞান-খড়্গকে সুতীক্ষ্ন রাখবে এবং শ্রীভগবান অচ্যুতকে আশ্রয় করে উপশান্ত হবে। পরে আত্মানন্দে সন্তুষ্ট হলে দেহরথকে উপেক্ষা করবে। ভগবান অচ্যুতকে আশ্রয় না করলে অসৎ-ইন্দ্রিয় অশ্বরা ও বুদ্ধিরূপে সারথি সেই ভোগপ্রমত্ত ব্যক্তিকে ভোগের পথে নিয়ে গিয়ে বিষয় নামক দস্যুর কাছে নিক্ষেপ করে। তারপর সেই দস্যুরা অশ্ব ও সারথির সঙ্গে সেই ব্যক্তিকে মৃত্যুভয়াবহ অন্ধকারময় সংসার-কূপে ফেলে দেয়। বৈদিক কর্ম প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি ভেদে দুই প্রকার—প্রবৃত্তির পথে বারবার প্রত্যাবর্তন হয়, আর নিবৃত্তির পথে অমৃত ভোগ করে, ফিরে আসতে হয় না। হিংসাময় দ্রব্যযজ্ঞ, কাম্য অগ্নিহোত্রাদি অনুষ্ঠান অশান্তি বৃদ্ধি করে। ৪৩-৪৭

দর্শ, পূর্ণমাস, চাতুর্মাস্য, পশুযাগ, বৈশ্বদেব কর্ম ও বলিহরণকে বলে ইষ্ট। এগুলি কাম্যকর্ম ও অশান্তিপ্রদ প্রবৃত্তিমূলক কর্ম। দেবালয় নির্মাণ, উপবন প্রতিষ্ঠা, কূপখনন, জলসত্র স্থাপন প্রভৃতি করার নাম পূর্ত কর্ম। ইষ্ট এবং পূর্ত কর্ম দ্বারা আরোহণ ও অবরোহণ ক্রমে সংসারে আবৃত্তি হয়। যজ্ঞে চরু ও পুরোডাশ ইত্যাদি আহুতি দিলে পরিণামে মৃত্যুর পর নতুন দেহের আরম্ভ হয়। ধূমদেবতা, রাত্রিদেবতা, কৃষ্ণপক্ষ, দক্ষিণায়ন এবং চন্দ্রলোক ক্রমে মৃত্যুর পর কর্মানুসারে ভোগ হয়। চন্দ্রলোকে ভোগ শেষ হলে শোকাগ্নি দ্বারা দেহ লয় বা অদর্শন হয়। তারপর বৃষ্টির সঙ্গে সূক্ষ্ম জীব বৃক্ষাদি ও শস্যাদিরূপে পরিণত হয়ে ক্রমে পুনরায় জন্মগ্রহণ করে। এর নাম পিতৃযান বা প্রবৃত্তিমূলক কর্মমার্গ। পূর্বোক্ত প্রত্যেকটি অবস্থার সান্নিধ্য লাভ করে পরে পুনর্জন্ম হয়। তখন এই পৃথিবীতে নিষেকাদি শ্মশানান্ত সংস্কার দ্বারা সংস্কৃত হলে জীবকে দ্বিজ বলা হয়। কিন্তু নিবৃত্ত কর্মপথে এই প্রকার আবৃত্তি হয় না। নিবৃত্তির পথে অর্চিরাদি ক্রমে ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি ঘটে। এতে নিবৃত্তিপথের সাধক জীবনকালেই জ্ঞানের দ্বারা ইন্দ্রিয়সকলের ক্রিয়াগুলিকে আহুতি প্রদান করেন; কাজেই কোন কর্ম করা হয় না। ৪৮-৫২

যজ্ঞক্রিয়া ইন্দ্রিয়ে, ইন্দ্রিয়কে দর্শনাদি সংকল্পরূপ মনে, বিকারযুক্ত মনকে বাক্যে, বাক্যসমূহকে বর্ণে, অকারাদি বর্ণগুলিকে স্বরত্রয়ে অর্থাৎ অ, উ, ম এই তিন স্বরে, তিন স্বরাত্মক ওঁকারবিন্দুতে, সেই বিন্দু নাদে এবং নাদকে প্রাণে, প্রাণকে

১ কঠোপনিষদেও অনুরূপ দেহরথের বর্ণনা আছে। দ্রষ্টব্য, ১।৩।৩ ও ১।৩।৪ শ্লোকদ্বয়।
২ দশ প্রাণবায়ু—প্রাণ, অপান, সমান, ব্যান, উদান এবং নাগ, কূর্ম, কৃকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয়।
৩ প্রণবই (ওঙ্কার) ধনু, জীবাত্মাই বাণ এবং ব্রহ্ম উক্ত বাণের লক্ষ্য। অপ্রমত্ত হয়ে সেই লক্ষ্যকে ভেদ করতে হবে।—মুণ্ডকোপনিষদ, ২।২।৪ শ্লোক।

মহৎ ব্রহ্মে আহুতি প্রদান করে নিবৃত্তিপর সাধক অগ্রসর হন। নিবৃত্তিকর্মে রত পুরুষ অগ্নি, সূর্য, দিবা, পূর্বাহ্ণ, শুক্লপক্ষ, পূর্ণিমার জ্যোৎস্না এবং উত্তরায়ণ এদের প্রত্যেকের অভিমানিনী দেবতার সান্নিধ্য লাভ করে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়। সেইসব স্থানে ভোগাবসানে প্রথম স্থূলোপাধি বিশ্ব নাম হয়। এর পর সূক্ষ্ম হয়ে তৈজস নাম হয়। তৈজসকে কারণে লয় করে কারণোপাধি লাভ করে। এই কারণকে সাক্ষীস্বরূপে লয় করলে তার তুরীয় অবস্থা হয়। পরে এই সাক্ষিত্ব বিলীন হয়ে শুদ্ধ আত্মস্বরূপ হতে পারে। মহারাজ, এই পথের নাম দেবযান। প্রবৃত্তিপথে পুরুষ যেমন ক্রমে অগ্রসর হয়েও জন্মগ্রহণ করতে পুনরায় ফিরে আসে, নিবৃত্তিপথ দেবযানে সেরকম নয়। এই পথে অগ্রসর হয়ে আত্মযাজী আত্মস্থ পুরুষ ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়ে আর ফিরে আসেন না। ৫৩-৫৫

বেদনির্মিত এই পিতৃযান ও দেবযান নামে দুই পথের বিবরণ যিনি শাস্ত্ররূপ চক্ষুদ্বারা জানতে পারেন, তিনি দেহে থেকেও মায়াতে মুগ্ধ হন না। এর কারণ তিনি জানেন দেহের আরম্ভের পূর্বে কারণরূপে, এবং অন্তে অবধিস্বরূপে যে সৎবস্তু বর্তমান থাকে, যাকে অবলম্বন করে ভোগ্য ও ভোক্তা, উচ্চ ও নীচ, অপ্রকাশ ও প্রকাশ, নাম ও রূপ—এ-সমস্তই বাসুদেব ছাড়া আর কিছু নয়। অতএব মোহ কার হবে? যুক্তিতর্কের বিরুদ্ধ হলেও প্রতিবিম্বকেও বস্তু বলে ধরা হয়। সেই রকম ইন্দ্রিয়, দেহ ও তৎসংক্রান্ত বিষয়সমূহকে পদার্থ বলে কল্পনা করা হয় বটে, কিন্তু পরমার্থ বিচারে তারা পদার্থ নয়। মহারাজ, দেহতত্ত্ব শোন। মাটি, জল, আগুন, বায়ু ও আকাশ—এই পঞ্চ মহাভূত একত্র হয়ে এই দেহ তৈরী করেছে। অথবা এদের কোনও পরিণত অবস্থায় দেহ হয়েছে এরকম মনে হতে পারে। কিন্তু এই দুইয়ের একটাও ঠিক নয়। কেননা তা অবয়ব থেকে খুব বেশী পৃথক নয়। অবয়ব দেহের অংশবিশেষ, একে অপরের সঙ্গে সম্বন্ধ থাকে না; সুতরাং তা মিথ্যা পদার্থই জানবে। দেহাদি যেরকম মিথ্যা, তার কারণ মাটি, জল প্রভৃতি পঞ্চভূতও সেরকম মিথ্যা। আবার পঞ্চভূতের ধাতু অর্থাৎ সূক্ষ্মতন্মাত্র ছাড়া পঞ্চভূত মিথ্যা। পঞ্চভূত অবয়বী আর সূক্ষ্মতন্মাত্র অবয়ব। অবয়বী মিথ্যা হলে শেষ পর্যন্ত অবয়বও মিথ্যা হয়ে যায়। তবে একটা কথা —বালক দেবদত্ত যৌবনে পদার্পণ করলেও তাকে তো চিনতে ভুল হয় না। তাহলে অবয়ব মিথ্যা একথা বলা যায় কি করে? অবিদ্যাজনিত বিকল্প থাকাতে পূর্ব-পূর্ব আরোপ জ্ঞানের সাদৃশ্যবশত 'ইনি সেই দেবদত্ত' এরকম ভুল হতে পারে। যতক্ষণ না অবিদ্যা বা অজ্ঞান দূর হয়, ততক্ষণ ঐ ভুল থাকে। স্বপ্নের মধ্যে যেমন জাগ্রত ও নিদ্রাবস্থার স্বপ্ন দেখা যায়, জ্ঞানোদয় হলে যেমন তা মিথ্যা বলে মনে হয়, শাস্ত্রকৃত বিধিনিষেধও সেরকম। ৫৬-৬১

মননশীল মুনি ভাবনা, ক্রিয়া ও দ্রব্যের অদ্বৈতভাব আলোচনা করে আত্মতত্ত্ব অনুভব দ্বারা জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিন অবস্থার নিবৃত্তি করেন। ভাবনার অদ্বৈত কাকে বলে শোন। বিকল্প অর্থাৎ দ্বিতীয় ভাবের চিন্তামাত্রই অবস্তু। বস্ত্র ও সূত্রের কার্য ও কারণকে এক বস্তু ভাবাই ভাবনাদ্বৈত। কায়মনোবাক্যে যা কিছু কাজ করা হয় সব কাজকেই পরমব্রহ্মে সাক্ষাৎভাবে সমর্পণের নাম ক্রিয়াদ্বৈত—সব কাজই তাঁর কাজ এরকম ভাবনা। নিজের সঙ্গে পুত্র-কলত্র বা অন্য সব দেহধারীর অভিন্নতা আলোচনা করে ধন, সম্পদ বা কামনার ঐক্য দর্শন দ্রব্যাদ্বৈত। দেহ পঞ্চভূতজাত, অন্যান্য দ্রব্যও তাই। পরম আত্মা এক, অদ্বৈত। বিপন্ন না হলে যার জন্য, যে উপায়ে, যেখানে, যার কাছ থেকে, যে বস্তু ব্যবহারের নিষেধ নেই, সেটা ছাড়া অন্য দ্রব্য দিয়ে কোনও কাজ করবে

না। পূর্বোক্ত বিধান অবলম্বনে এবং বেদোক্ত অন্যান্য বিধান অনুসারে স্বকর্ম অনুশীলন করে ভক্তিমান গৃহস্থও ভগবানের গতি লাভ করেন। যুধিষ্ঠির, তোমরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সাহায্যে অপার দুস্তর বহু বিপদ থেকে উদ্ধার লাভ করেছ। তাঁর পাদপদ্ম সেবা দ্বারা তোমরা দিগ্‌গজদেরও পরাজিত করে বহু যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছ। সেইভাবে শ্রীকৃষ্ণ-কৃপায় এই সংসার থেকেও উদ্ধারলাভ কর। ৬২-৬৮

পুরাকালে অতীত মহাকল্পে আমি গন্ধর্বদের মধ্যে উপবর্হণ নামে সম্মানিত গন্ধর্বশ্রেষ্ঠ ছিলাম। আমার দেহের সৌন্দর্য, মাধুর্য, সৌকুমার্য ও সৌগন্ধগুণে আমি ছিলাম সকলের প্রিয়দর্শন। স্ত্রীলোকেরা আমাকে ভালবাসত, আমি প্রায়ই মদমত্ত ও লম্পট হয়ে নিজের ঘরে বাস করতাম। এক সময়ে দেবতাদের যজ্ঞে হরিগাথা গানের জন্য বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মা গন্ধর্ব ও অপ্সরাদের ডেকে পাঠালেন। এই আহ্বানে আমিও স্ত্রীদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে মদমত্তভাবে তাদের সঙ্গে গান করতে করতে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলাম। আমার সেই তাচ্ছিল্যভাব ও ধৃষ্টতা দেখে ব্রহ্মা অভিশাপ দিলেন—'তুমি দেবতাদের সভায় অবহেলা দেখিয়েছ, আমাদের প্রভাবে কিছুক্ষণের মধ্যেই তুমি বিগতশ্রী হয়ে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হও।' সেই অভিশাপের ফলে ব্রহ্মবাদী মুনিদের দাসীর গর্ভে আমার জন্ম লাভ হয়। তবে সেই মুনিদের সেবা ও সঙ্গলাভ করে পুনরায় ব্রহ্মার পুত্র হয়ে জন্ম লাভ করেছি। ৬৯-৭৩

মহারাজ, গৃহস্থের এই পাপনাশক ধর্ম তোমার নিকট বর্ণনা করলাম। এই ধর্ম সব পাপ নাশ করে। গৃহস্থ এই ধর্ম পালন করেই সন্ন্যাসীদের গতি লাভ করতে পারে। এই মর্ত্যলোকে তোমরা খুব ভাগ্যবান। লোক-পবিত্রকারী মুনিরা তোমাদের গৃহে সর্বদা আসা-যাওয়া করছেন। এই গৃহে পরমব্রহ্ম মনুষ্য-চিহ্ন ধারণ করে গূঢ়রূপে অবস্থান করছেন। মহৎ ব্যক্তিদের পরম অন্বেষণীয় কৈবল্য নির্বাণসুখের অনুভূতিস্বরূপ সেই পরমব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ তোমাদের প্রিয় সুহৃদ, মাতুলপুত্র, ভ্রাতা, পূজ্য, বিধানদাতা এবং গুরু। অতএব তোমাদের মত ভাগ্যবান আর কে আছে? সাক্ষাৎ শংকর, ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ যাঁর রূপ নিজেদের বুদ্ধি দ্বারা বিচার করেও নিরূপণ করতে অসমর্থ, আমি আর তাঁর কথা কি বলব? আমার মৌন, ভক্তি এবং শান্তভাবের দ্বারা সেই ভক্তপালক শ্রীকৃষ্ণ পূজিত হয়ে প্রসন্ন হোন। ৭৪-৭৭

শুকদেব বললেন, দেবর্ষি এই রকম বর্ণনা করলে তা শুনে যুধিষ্ঠির পরম পরিতোষ লাভ করলেন এবং প্রেমবিহ্বল হয়ে শ্রীকৃষ্ণকেও পূজা করলেন। মুনিশ্রেষ্ঠ দেবর্ষি নারদ শ্রীকৃষ্ণ ও যুধিষ্ঠিরকে পুনরায় প্রীতিসম্ভাষণ করে স্বস্থানে ফিরে গেলেন। নারদের মুখে শ্রীকৃষ্ণ পরমব্রহ্ম এই কথা শুনে যুধিষ্ঠির খুবই বিস্মিত হলেন। রাজা পরীক্ষিৎ, তোমার কাছে দক্ষকন্যাগণের পৃথক বংশের কথা বর্ণনা করলাম। ঐ বংশেই দেবতা, অসুর, মানুষ প্রভৃতি সম্পূর্ণ চরাচর-জগৎ সৃষ্ট হয়েছে। ৭৮-৮০

প্রথম খণ্ডঃ পরিশিষ্ট

শ্লোকসংগ্রহের পদ্যানুবাদ

[শ্রীমদ্‌ভাগবত গ্রন্থের প্রথম খণ্ড থেকে সংগৃহীত কিছু ভাবসমৃদ্ধ শ্লোক ও তাদের পদ্যানুবাদ নিচে দেওয়া হল। এই শ্লোকসংগ্রহ ও পদ্যানুবাদ আমরা ভাই মহিমচন্দ্র সেন কৃত 'ধর্মশাস্ত্র-সমন্বয়' গ্রন্থ থেকে গ্রহণ করেছি। এজন্য আমরা তাঁর নিকট কৃতজ্ঞ।

এই পদ্যের ভাষা সরল, অনুবাদ মূলানুগ। সারসংগ্রহটি পদ্যে পরিবেশন করার উদ্দেশ্য—ভাগবত একটি বিশাল গ্রন্থ, এর মূল ভাবধারা লোকের মনে গেঁথে রাখার জন্য পদ্যের আশ্রয়ই শ্রেয়। কারণ গাথা (পদ্য) যেরূপ স্মৃতিপথে গেঁথে থাকে, গদ্য পদসমূহ সেরূপ থাকে না। এজন্যই কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীরাম দাসের মহাভারত আপামর জনসাধারণের কাছে সমাদৃত।]

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্‌।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥ ১।২।১১

তত্ত্ববিদ সুধীগণ, করে তত্ত্ব নিরূপণ,
যেই হয় অদ্বিতীয় জ্ঞান।
ত্রিবিধ শবদে আর, পরিচয় সদা তার,
ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ভগবান্‌ ॥

*

সকৃদ্‌যদ্দর্শিতং রূপমেতৎ কামায় তেঽনঘ।
মৎকামঃ শনকৈঃ সাধুঃ সর্বান্মুঞ্চতি হৃচ্ছয়ান্‌ ॥ ১।৬।২৩

একবার দেখা সৌম্য দিয়েছি তোমারে।
আমাপ্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি করিবারে ॥
সাধুজন আমাপ্রতি অনুরাগ ভরে।
ক্রমে ক্রমে সব পাপ পরিত্যাগ করে ॥

*

পিবন্তি যে ভাগবত আত্মনঃ সতাং
কথামৃতং শ্রবণপুটেষু সম্ভৃতম্‌।
পুনন্তি তে বিষয়বিদূষিতাশয়ং
ব্রজন্তি তচ্চরণসরোরুহান্তিকম্‌ ॥ ২।২।৩৭

ভকতগণের সহ বসি যত জন।
পরমাত্মকথাসুধা করে আস্বাদন ॥
বিষয় দূষিত চিত্ত করিয়া পবিত্র।
লভেন তাঁহারা তাঁর পদ-আতপত্র ॥

যচ্ছ্রদ্ধয়া শ্রুতবত্যা চ ভক্ত্যা
সংমৃজ্যমানে হৃদয়েঽবধায় ।
জ্ঞানেন বৈরাগ্যবলেন ধীরা
ব্রজেম তত্তেঽঙ্ঘ্রিসরোজপীঠম্ ॥ ৩।৫।৪১

শ্রদ্ধাযুক্তা[1] শ্রুতবতী[2] ভকতি অন্তরে ;
থাকিয়া হৃদয় পূত যাঁহাদের করে ।
পবিত্র হৃদয়ে তাঁরা, ওহে ভগবন্ !
তব পাদ-পদ্ম ধ্যান করি' অনুক্ষণ ।
বৈরাগ্য-প্রপুষ্ট জ্ঞান করিয়া অর্জন ।
বিষয়-বাসনাশূন্য ধীর সবে হন ॥
আমরাও সেইরূপ তোমার চরণ ।
লাভ করি' হব ধন্য এই আকিঞ্চন ॥

*

তস্মিন্ প্রত্যগাত্মানং ধিয়া যোগপ্রবৃত্তয়া ।
ভক্ত্যা বিরক্ত্যা জ্ঞানেন বিবিচ্যাত্মনি চিন্তয়েৎ ॥ ৩।২৬।৭২

যে সাধক যোগ-সিদ্ধি অভিলাষ করে ।
বৈরাগ্য ভকতি সহ একাগ্র অন্তরে ॥
চিন্তিবে পরম-আত্মা আত্মাতে আপন ।
বিচার করিয়া জ্ঞানে, কার্য ও কারণ ॥

*

অত এব শনৈশ্চিত্তং প্রসক্তমসতাং পথি ।
ভক্তিযোগেন তীব্রেণ বিরক্ত্যা চ নয়েৎ বশম্ ॥ ৩।২৭।৫

ক্রমে গাঢ় ভক্তিযোগে বৈরাগ্য সহিত ।
উন্মার্গ সংসারে-সক্ত-বশকর চিত ॥

*

লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতম্ ।
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে ॥ ৩।২৯।১২

ফলের কামনাহীন হইয়া যখন ।
বিনা ব্যবধানে করে ভকতি অর্পণ ॥
সে ভকতি ভগবানে, বলেন নির্গুণ ।
ভকতি যোগের যাঁরা তত্ত্বজ্ঞ নিপুণ ॥

*

যস্য যদ্দৈববিহিতং স তেন সুখদুঃখয়োঃ ।
আত্মানং তোষয়ন্ দেহী তমসঃ পারমৃচ্ছতি ॥ ৪।৮।৩৩

ঈশ্বর যাহাকে যাহা করেন অর্পণ ।
সুখে দুঃখে তাহে পরিতুষ্ট রাখি' মন ॥
দেহী সুখে পার হ'বে ভব অন্ধকার ।
(সন্তোষ সুখের মূল জানিবেক সার) ॥

*

যোঽন্তঃ প্রবিশ্য মম বাচমিমাং প্রসুপ্তাং
সঞ্জীবয়ত্যখিলশক্তিধরঃ স্বধাম্না ।

১ শ্রদ্ধা—বিশ্বাস। ২ শ্রুতবতী—বেদাদি শ্রবণ প্র.প্র.।

অন্যাংশ্চ হস্তচরণশ্রবণত্বগাদীন্
প্রাণান্নমো ভগবতে পুরুষায় তুভ্যম্ ॥ ৪।৯।৬

অখিল শকতি ধর যিনি এ অন্তরে ;
প্রবেশি' নিদ্রিত বাণী জাগরিত করে।
করিলেন ক্রিয়াশীল ইন্দ্রিয় সকল।
হস্ত, পদ, ত্বক, প্রাণে, কর্ণে দিয়া বল।
পরম পুরুষ তিনি জানিলাম সার।
বারে বারে পদে তাঁর করি নমস্কার ॥

*

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা
সর্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্গুণা
মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ ॥ ৫।১৮।১২

ভগবানে অকিঞ্চন ভকতি যাহার।
গুণসহ অমরেরা হৃদে বসে তার ॥
সাধুগুণ কোথা পাবে অভকত জনে ?
অসৎ বিষয়ে-সক্ত থাকে নিশি দিনে ॥

*

সত্যং দিশত্যর্থিতমর্থিতো নৃণাং
নৈবার্থদো যৎ পুনরর্থিতা যতঃ।
স্বয়ং বিধত্তে ভজতামনিচ্ছতা-
মিচ্ছাপিধানং নিজপাদপল্লবম্ । ৫।১৯।২৭

প্রার্থিত বিষয় দেন সত্যই ঈশ্বর।
কিন্তু যাহা পেয়ে পুনঃ ক্ষুধিত অন্তর ;
না দেন এমন কিছু আপন ভকতে।
কামনার বস্তু যত এ সব জগতে।
সব ত্যজি' যাঁরা শুধু তাঁহাকে ভজেন।
বাসনা-সমাপ্তি-পর চরণ লভেন ॥

*

তপসা ব্রহ্মচর্যেণ শমেন চ দমেন চ।
ত্যাগেন সত্যশৌচাভ্যাং যমেন নিয়মেন চ ॥
দেহবাগ্‌বুদ্ধিজং ধীরা ধর্মজ্ঞাঃ শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
ক্ষিপন্ত্যঘং মহদপি বেণুগুল্মমিবানলঃ ॥ ৬।১।১৩-১৪

শম, দম, ব্রহ্মচর্য, তপস্যা সাধিয়া।
ত্যাগ, সত্য, শৌচ, যম, নিয়ম পালিয়া।
ধরমে-অভিজ্ঞ ধীর, শ্রদ্ধাবান্ জন।
দেহ-মন-বাক্-কৃত পাপ আচরণ।
নাশ করে, সেইরূপ, অনল যেমন।
ভস্ম করে বেণু-গুল্ম করিয়া দহন ॥

*

তৈস্তান্যঘানি পূয়ন্তে তপোদানব্রতাদিভিঃ।
নাধর্মজং তদ্ধৃদয়ং তদপীশাঙ্ঘ্রিসেবয়া ॥ ৬।২।১৭

তপ, দান, ব্রত আদি করিয়া গ্রহণ।
সাধকেরা ছাড়ে সব পাপ আচরণ ॥
পবিত্র না হয় তাহে দূষিত হৃদয়।
ঈশ্বর-চরণ সেবি' তাহা শুদ্ধ হয় ॥

*

এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং ধর্মঃ পরঃ স্মৃতঃ।
ভক্তিযোগো ভগবতি তন্নামগ্রহণাদিভিঃ ॥ ৬।৩।২২

গ্রহণ করিয়া নাম ভকতি ধরম।
জানিবেক মানবের সাধন পরম ॥

*

ধর্মার্থকাম ইতি যোঽভিহিতস্ত্রিবর্গ
ঈক্ষা ত্রয়ী নয়দমৌ বিবিধা চ বার্তা।
মন্যে তদেতদখিলং নিগমস্য সত্যং
স্বাত্মার্পণং স্বসুহৃদঃ পরমস্য পুংসঃ ॥ ৭।৬।২৬

(মনোযোগ দিয়া শুন প্রহ্লাদ বচন।
সকলের মূলে সত্য আত্মসমর্পণ ॥)
ধরম ও অর্থ কাম, ত্রিবর্গ যাহার নাম।
জীবিকা-উপায়-তত্ত্ব আর।
দণ্ডনীতি, আত্মবিদ্যা, তর্কশাস্ত্র, কর্মবিদ্যা,
মূলে সত্য এই সবাকার ॥
মম মনে যাহা হয়, শুন, বলি নিঃসংশয়,
আত্মার সুহৃদ যিনি হন।
সেই পরম ঈশ্বরে, (শাশ্বতী শান্তির তরে,)
মূলে সত্য আত্ম-সমর্পণ ॥

*

কোঽতিপ্রয়াসোঽসুরবালকা হরে-
রুপাসনে স্বে হৃদি ছিদ্রবৎ সতঃ।
স্বস্যাত্মনঃ সখ্যুরশেষদেহিনাং
সামান্যতঃ কিং বিষয়োপপাদনৈঃ ॥ ৭।৭।৩৮

অসুর বালকগণ করহ শ্রবণ।
হৃদয়ের সখা হরি হৃদে অনুক্ষণ।
অনাসক্ত অবস্থিত, আকাশ যেমন।
উপাসনা নহে তাঁর প্রয়াস কারণ।
ইন্দ্রিয় সংযোগে করি' আহার গ্রহণ।
ধরম সকল প্রাণী পালে সাধারণ ॥
পুরুষার্থ মানবের রহিল কোথায়।
যদি সদা থাকে রত ইন্দ্রিয় সেবায় ॥

শ্রীমদ্‌ভাগবত

দ্বিতীয় খণ্ড

অষ্টম স্কন্ধ

প্রথম অধ্যায়

মন্বন্তর বর্ণন

পরীক্ষিৎ বললেন, গুরুদেব, আমি আপনার কাছ থেকে স্বায়ম্ভুব মনুর বংশের বিস্তৃত বিবরণ শুনলাম। এই বংশেই বিশ্বস্রষ্টা মরীচিদের পুত্র-পৌত্রাদির জন্ম হয়েছে। এখন আপনি আমাদের কাছে অন্য মনুদের কথা বলুন। যে যে মন্বন্তরে ভগবান শ্রীহরির যে সমস্ত অবতার ও কর্ম পণ্ডিতেরা বলে থাকেন সে সব কথাও আপনি আমাদের বলুন। জগতের কর্তা ভগবান অতীতের মন্বন্তরে যা করেছেন, বর্তমানে যা করছেন এবং ভবিষ্যতে যা করবেন আপনি সে সমস্তই বলুন, আমরা শুনতে ইচ্ছুক। ১-৩

শুকদেব বললেন, মহারাজ, এই মন্বন্তরে স্বায়ম্ভুব প্রভৃতি ছয়জন মনু গত হয়েছেন; তার মধ্যে স্বায়ম্ভুব মনু প্রথম। আমি তাঁর কথা এবং এই মন্বন্তরে দেবতাদের জন্মবৃত্তান্ত তোমার কাছে বলেছি। ধর্ম আর জ্ঞানের উপদেশ দেবার জন্য স্বায়ম্ভুব মনুর মেয়ে আকূতি ও দেবহূতির গর্ভে ভগবান শ্রীহরি তাদের পুত্র-রূপে যথাক্রমে যজ্ঞ ও কপিল নামে জন্মগ্রহণ করেন। আমি আগেই ভগবান কপিলের বর্ণনা করেছি, এখন ভগবান যে যজ্ঞ করেছিলেন সে কথা বলব। ৪-৬

শতরূপার স্বামী স্বায়ম্ভুব মনু বিষয়ভোগে উদাসীন হয়ে রাজ্য ছেড়ে পত্নীর সঙ্গে তপস্যার জন্য বনে গেলেন। তিনি সুনন্দা নদীর তীরে এক পায়ে দাঁড়িয়ে একশ বছর ঘোরতর তপস্যা করতে করতে বলেছিলেন—যিনি এই বিশ্বকে চৈতন্যযুক্ত করেন, বিশ্ব কিন্তু তাঁকে চেতন করতে পারে না। এই বিশ্ব নিদ্রিত থাকলে তিনি জেগে থাকেন অর্থাৎ সাক্ষী থাকেন। লোক তাঁকে জানে না, কিন্তু তিনি লোককে জানতে পারেন। এই জগতে যা কিছু পদার্থ আছে তাকেই ঈশ্বরের সত্তা ও চৈতন্যদ্বারা ব্যাপ্ত আছে মনে করবে। সেইজন্য ঈশ্বর যা ধন দেন তা দিয়েই ভোগ্যবস্তু ভোগ কর, অন্যের ধনের আশা করো না।[১] তিনি সর্বদা সকলকে দেখতে পাচ্ছেন, কিন্তু লোকে তাঁকে দেখতে পায় না।[২] সেই সর্বজ্ঞানাধার অন্তর্যামী নিঃসঙ্গ পুরুষকে ভজনা কর। যাঁর আদি-অন্ত-মধ্য, আত্মীয়-পর ও অন্তর-বাহির কিছুই নেই, অথচ বিশ্বের সব বস্তুই যাঁর থেকে উৎপন্ন হয় এবং এই বিশ্ব যাঁর রূপ তিনিই সত্য, পরিপূর্ণ ব্রহ্ম। তিনি জগতের ঈশ্বর, জন্মরহিত, সত্য, স্বপ্রকাশ ও নির্বিকারস্বরূপ।[৩] এই বিশ্ব তাঁর শরীর এবং তাঁর নাম অসংখ্য। তিনি নিজের মায়াশক্তির দ্বারা এই বিশ্বের সৃষ্টির কারণ এবং তিনি নিত্যসিদ্ধ

১ ভাগবতের এই শ্লোকটি (৮।১।১০) কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত আকারে ঈশ উপনিষৎ থেকে গৃহীত হয়েছে। ঈশ উপনিষদের সেই বিখ্যাত শ্লোকটি হল:

ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্ ॥ ১

২ দ্রষ্টব্য: কেন উপনিষৎ, ১।৭। ৩ সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।—তৈত্তিরীয় উপনিষৎ ২।১

বিদ্যা অর্থাৎ জ্ঞানদ্বারা মায়াকে নিরস্ত করে নিষ্ক্রিয়ভাবে অবস্থান করছেন। এই জন্যই ঋষিরা মোক্ষলাভের জন্য প্রথমে কর্ম করেন, কারণ মানুষ কর্ম করতে করতেই নৈষ্কর্ম্য লাভ করে। ভগবান কর্ম করেন, অথচ তাতে লিপ্ত হন না। সেইজন্য যাঁরা তাঁর অনুগামী হয়ে আত্মলাভে পরিপূর্ণ তাঁরা কর্ম করেও তাতে আবদ্ধ হন না।[১] ভগবান অখিল ধর্মের প্রবর্তক, তিনি নিজের আচরণ দিয়ে জীবকে শিক্ষা দেবার জন্য অবতার হয়ে জন্মান। তিনি অন্যের দ্বারা পরিচালিত হন না, কারণ তিনি নিজেই প্রভু। তিনি কামনার প্রত্যাশী নন, যেহেতু তিনি পূর্ণ। তিনি নিরহংকার, কারণ তিনি জ্ঞানময়। আমি এই প্রভুর শরণাগত হই। ৭-১৬

শুকদেব বললেন, স্বায়ম্ভুব মনু যখন সমাধিমগ্ন অবস্থায় মন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন, তখন অসুরেরা তাঁকে বিবশ মনে করে ক্ষুধার জ্বালায় তাঁকে খেতে যাচ্ছিল। সর্বগত শ্রীহরি তাদের অভিলাষ বুঝতে পেরে তাদের বধ করেন এবং নিজ পুত্র যাম নামক দেবতাদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে স্বয়ং ইন্দ্ররূপে স্বর্গরাজ্য শাসন করেন। অগ্নির পুত্র স্বারোচিষ দ্বিতীয় মনু হয়েছিলেন। দ্যুমান্, সুষেণ, রোচিষ্মান প্রভৃতি তাঁর পুত্র বলে পরিচিত। এই মনুর সময়ে রোচন নামক ইন্দ্র, তুষিত প্রভৃতি দেবতা আর ঊর্জ, স্তম্ভ প্রভৃতি সাতজন ব্রহ্মবাদী ঋষি ছিলেন। বেদশিরা ঋষির তুষিতা নামক স্ত্রী ছিলেন। বিভু নামে বিখ্যাত দেব তাঁর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। সেই চিরকুমার ব্রহ্মচারী বিভুর চরিত্র এত অসাধারণ ছিল যে, আটাশি হাজার ব্রতধারী মনু তাঁর কাছে ব্রতশিক্ষা করেছিলেন। মহারাজ, প্রিয়ব্রতের পুত্র উত্তম তৃতীয় মনু হন ; পবন, সৃঞ্জয় ও যজ্ঞহোত্র এঁর পুত্র। এই মন্বন্তরে বশিষ্ঠের পুত্র প্রমদ প্রভৃতি সপ্তর্ষি হন, আর সত্য, বেদশ্রুত ও ভদ্র দেবতা এবং সত্যজিৎ ইন্দ্র হয়েছিলেন। এই মন্বন্তরে ভগবান শ্রীহরি ধর্মের ভার্যা সুনৃতার গর্ভে জন্মগ্রহণ করে সত্যসেন নামে বিখ্যাত হন। সত্যব্রত নামে তাঁর অনেক ভাই জন্মেছিল। তিনি সত্যজিতের সহায় হয়ে মিথ্যারত, দুর্বৃত্ত ও অসৎ যক্ষ-রাক্ষসদের আর হিংস্র প্রাণীদের বিনাশ করেন। উত্তমের ভাই তামস চতুর্থ মনু। পৃথু, খ্যাতি, নর, কেতু প্রভৃতি তাঁর দশজন পুত্র ছিল। তামস মন্বন্তরে সত্যক, হরি ও বীরগণ দেবতা হন। ত্রিশিখ ইন্দ্র আর জ্যোতির্ধাম প্রভৃতি সপ্তর্ষি হয়েছিলেন। এই মন্বন্তরে বিধৃতির পুত্র বৈধৃতিরাও দেবতা হন, আর তাঁরা কালপ্রভাবে লুপ্তপ্রায় বেদসমূহকে নিজেদের তেজোবলে ধারণ করে রেখেছিলেন। সেই মন্বন্তরেই ভগবান বিষ্ণু হরিণীর গর্ভে হরিমেধার পুত্র হয়ে জন্মান। তিনিই হরি নামে বিখ্যাত হয়ে গজরাজকে কুমীরের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন। ১৭-৩০

মহারাজ পরীক্ষিৎ বললেন, ব্যাসনন্দন মুনিবর, হরি কিভাবে গজরাজকে কুমীরের হাত থেকে রক্ষা করেন তা আমাদের জানতে ইচ্ছা হয়। যে যে কথায় মহাযশা শ্রীহরির কীর্তন হয়, তা শুভ, মঙ্গলজনক, ধন্য ও পরম পবিত্র। ৩১-৩২

সূত বললেন, ব্রাহ্মণগণ, রাজা পরীক্ষিৎ হরির বিষয়ে প্রশ্ন করলে ব্যাসনন্দন শুকদেব সানন্দে মহারাজকে অভিনন্দন জানিয়ে শ্রোতা মুনিদের সভায় বলতে লাগলেন। ৩৩

১ তুলনীয় : ন মাং কর্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্মফলে স্পৃহা।
ইতি মাং যোঽভিজানাতি কর্মভির্ন স বধ্যতে ॥ গীতা, ৪।১৪

দ্বিতীয় অধ্যায়

গজেন্দ্র উপাখ্যান

শুকদেব বললেন, মহারাজ, চারিদিকে ক্ষীরের সমুদ্র দিয়ে ঘেরা, দশহাজার যোজন উঁচু ত্রিকূট নামে খ্যাত একটি সুন্দর পর্বত আছে। এই পর্বতটির বিস্তারও দশহাজার যোজন আর তার তিনটি প্রধান চূড়া রূপা, লোহা ও সোনার তৈরী। এই চূড়া তিনটিই ক্ষীর সমুদ্রকে আর চার দিককে উজ্জ্বল করে রেখেছে। নানারকম গাছ, লতাপাতা, নানারকম রত্ন ও গেরুয়া রঙের চূড়াযুক্ত ঐ পর্বতটি ঝর্ণা-জল-প্রপাতের শব্দে চারদিকের শোভা বাড়িয়েছে। ক্ষীর সমুদ্রের ঢেউগুলি চারদিক থেকে ত্রিকূট পর্বতের পাদদেশ ধৌত করছে এবং সবুজবর্ণ মরকতশিলা দ্বারা নিকটস্থ ভূভাগ শ্যামল হয়েছে। এই পর্বতের গুহাগুলিতে ক্রীড়ারত সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব, বিদ্যাধর, মহাসর্প, কিন্নর আর অপ্সরাগণ বাস করেন। গুহাগুলি কিন্নরদের সঙ্গীতে মুখরিত হলে বনের সিংহেরা ঐ শব্দকে অন্য সিংহের গর্জন মনে করে নিজেরাও গর্জন করতে থাকে। এই পর্বতের ভিতরে নানারকম বন্য পশু বাস করে। বিচিত্র গাছপালা এবং উদ্যানগুলি পাখীদের কলরবে মুখর থাকে। ফলে এই পর্বতটি দেবতাদের একটি মনোরম ভ্রমণস্থান হয়েছে। এই পর্বতটি পরিষ্কার জলপূর্ণ নদী, পুকুর, মণির মত উজ্জ্বল বালি, দেবরমণীদের স্নানের জন্য সুন্দর জলরাশি ও বায়ুপ্রবাহে পরিপূর্ণ। এই পাহাড়ের মাঝখানে ভগবান বরুণের ঋতুমান নামে একটি উপবন আছে যেটি দেবরমণীদের ক্রীড়াস্থল। সেখানে সব ঋতুতেই সকল ফুল ফোটে ও ফল জন্মায়। মন্দার, পারিজাত, পারুল, অশোক, চাঁপা এবং আম, পিয়াল, আমড়া, সুপারী, নারকেল, খেজুর, লেবু, মউগাছ, শাল, তমাল, অর্জুন, বট, অশ্বত্থ, কাঞ্চন, সরল, দেবদারু, দ্রাক্ষা প্রভৃতি বৃক্ষে এই বন সুশোভিত। উপবনের মধ্যে সোনার পদ্মশোভিত একটি বড় দীঘি আছে। তাতে কুমুদ, উৎপল, কহ্লার, শতপত্র ও মাধবীলতা পরিপূর্ণ শোভা বিস্তার করে আছে। সেই উপবনে ভ্রমরেরা সবসময় মধুমত্ত হয়ে গুঞ্জন করে। হাঁস, কারণ্ডব, চক্রবাক, সারস, জলকুক্কুট, টিট্টিভ ও ডাহুক প্রভৃতি নানারকম পাখীর কলরবে ঐ দীঘিটি সর্বদাই মুখরিত। মাছ ও কচ্ছপদের সন্তরণে বিক্ষিপ্ত পদ্মপরাগরাশি দ্বারা ঐ দীঘির জল সর্বদা ভরে থাকে। দীঘিটি কদম্ব, বেতস, নল, কেলিকদম্ব ও বেতসলতা দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং কুন্দ, কুরুবক, অশোক, শিরীষ, ইঙ্গুদী, কুব্জক, স্বর্ণযূথিকা, নাগ, পুন্নাগ, জাতি, মল্লিকা ও সমস্ত ঋতুর নিত্যসমাবেশে ফলপুষ্পশালী তীরজাত অন্যান্য গাছদ্বারা সুশোভিত। ১-১৯

একদিন সেই ত্রিকূট পর্বতে বনের অধিবাসী এক হস্তীদলনেতা হস্তিনীদের সঙ্গে বেড়াতে বেড়াতে কীচক, বেণু ও বেত্রবিশিষ্ট, কণ্টকাকীর্ণ বিশাল গাছপালা, লতা সবকিছু উপড়ে ফেলছিল। তাদের গন্ধ পেয়েই সিংহ, গণ্ডার, বাঘ প্রভৃতি হিংস্র পশুরা এবং মহাসর্প, মৃগ ও চমরীগণ ভয়ে এদিক ওদিক পালাতে লাগল। নেকড়ে বাঘ, শূকর, মহিষ, ভালুক, শজারু বনকুক্কুর, বানর হরিণ, শশক প্রভৃতি অন্যান্য জন্তুরা ঐ বনের অন্য দিকে নির্ভয়ে বিচরণ করছিল। হস্তিনী ও তাদের সন্তানদের দ্বারা পরিবেষ্টিত সেই মদোন্মত্ত গজরাজ রৌদ্রের তেজে ক্লান্ত হয়ে যখন সরোবরের দিকে যাচ্ছিল, তখন তার দেহের ভারে পর্বতগুলি কাঁপছিল। সেই হাতীদের মদগন্ধে আকৃষ্ট হয়ে অলির দল গুঞ্জন করতে করতে তাদের অঙ্গে পড়ছিল। তারপর গজরাজ সেই দীঘির পদ্মপরাগরঞ্জিত স্বচ্ছ অমৃতের মত জল ইচ্ছামত পান

করতে লাগল এবং ঐ জল দিয়েই স্নান করে ক্লান্তি দূর করল। তারপর গজরাজ নিজের শুঁড় দিয়ে তোলা জলে হস্তিনী ও শাবকদের স্নান করিয়ে তাদের জল খাওয়াতে লাগল। কিন্তু ভগবানের মায়ায় মোহিত হয়ে দুর্মদ গজরাজ নিজের আসন্ন বিপদের কথা জানতে পারল না। মহারাজ, তখন সেই দীঘিতে এক শক্তিশালী কুমীর দৈবপ্রেরিত হয়েই ক্রোধে গজরাজের পা কামড়ে ধরল। হঠাৎ এই রকম বিপদে পড়ে সেই মহাগজ আপন শক্তিতে মুক্ত হবার আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল। হস্তিনীরা তখন বলবান কুমীরের দ্বারা ধৃত কাতর গজরাজকে দেখে চীৎকার করেছিল। এই অবস্থায় অন্য হাতীরা তার উদ্ধারের জন্য শত চেষ্টা করেও ব্যর্থ হল। মহারাজ, এইভাবে সেই গজরাজ ও কুমীর সংগ্রামে রত হয়ে একে অপরকে যথাক্রমে জলের বাইরে ও ভিতরে টানার চেষ্টা করতে করতে এক হাজার বছর কেটে গেল। এই সুদীর্ঘ সময়ে কারও মৃত্যু হল না দেখে দেবতারাও বিস্মিত হয়েছিলেন। তারপরে জলের মধ্যে যুদ্ধ করতে করতে গজরাজ ক্লান্ত হয়ে পড়ল। যদিও তার উৎসাহ, দেহবল ও ইন্দ্রিয়শক্তির যথেষ্ট ক্ষয় হয়েছিল, কিন্তু কুমীরের শক্তি অক্ষুণ্ণ ছিল। এইভাবে গজেন্দ্র যখন প্রায় মৃত্যুমুখে এবং নিজেকে মুক্ত করতে না পেরে হতাশ ও বিহ্বল হয়ে পড়ল, তখন দীর্ঘকাল চিন্তা করে তার মনে এই কথার উদয় হল যে হস্তীরা আমাকে উদ্ধার করতে পারল না, সুতরাং হস্তিনীরা আমাকে কিভাবে উদ্ধার করবে? যেহেতু এই কুমীররূপে বিধাতার পাশই আমাকে আবদ্ধ করেছে, অতএব আমিও ব্রহ্মাদি দেবগণের আশ্রয়দাতা পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হই। যে অনির্বচনীয় পরমেশ্বর প্রচণ্ড বেগবান কালরূপ সাপের কবল থেকে ভীত ও শরণাগত জীবকে রক্ষা করেন এবং স্বয়ং মৃত্যুও যাঁর ভয়ে পালায়[১] আমি তাঁরই আশ্রয় গ্রহণ করি। ২০-৩৩

তৃতীয় অধ্যায়

গজরাজের মুক্তি

শুকদেব বললেন, মহারাজ, সেই গজরাজ তখন বুদ্ধিদ্বারা মনকে সান্ত্বনা দিয়ে পূর্বজন্ম-শিক্ষিত- পরম জপমন্ত্র উচ্চারণ করতে লাগল— যা থেকে এই দেহ-প্রকৃতি চেতন লাভ করে, যিনি প্রকৃতি ও পুরুষস্বরূপ, যিনি দেহে কারণরূপে প্রবিষ্ট এবং স্বতন্ত্র পরমেশ্বর, সেই ভগবানকে প্রণাম ও ধ্যান করি। যিনি বিশ্বের আধার, উপাদান ও নির্মাতা, যিনি স্বয়ং এই বিশ্ব হয়েছেন, যিনি কার্য আর কারণের অনেক উপরে, সেই স্বতঃসিদ্ধ প্রভুর শরণাপন্ন হই।[২] এই বিশ্ব যাঁর মায়ায় রচিত হয়ে যাঁর মধ্যে অভিব্যক্ত হয়, আবার প্রলয়ের সময় যাঁর মধ্যে তিরোহিত হয়,[৩] কার্য ও কারণ এই উভয়কেই সাক্ষিরূপে দেখলেও যাঁর দৃষ্টি লুপ্ত হয় না, যিনি চক্ষু প্রভৃতি পদার্থগুলির প্রকাশক বলে স্বপ্রকাশ সেই প্রভুই আমায় রক্ষা করুন। প্রলয়ের সময় যখন লোকসমূহ, লোকপালগণ আর কারণবস্তুসমুদয় নষ্ট হয়ে যায়, তখন দুর্ভেদ্য অনন্ত অন্ধকার বিরাজ করে। সেই অন্ধকারের পরপারে যিনি বিভুরূপে অবস্থান করেন[৪], যিনি নটের মত নানা আকারে লীলা

১ তুলনীয়: কঠ উপনিষৎ, ২।৩।৩ শ্লোক। ২ শ্বেতাশ্বতর উপ: ৩।২১

৩ তুলনীয়: শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ, ৪।১। ৪ ঐ, ৩।৮

করেন বলে দেবতা আর ঋষিরাও যাঁর স্বরূপ জানতে পারেন না, অর্বাচীন মানুষ আর প্রাণীরা কি করে তাঁর স্বরূপ জানবে বা বর্ণনা করবে ? এই দুর্জ্ঞেয়চরিত্র পরমেশ্বর আমায় রক্ষা করুন। সমস্ত বস্তুতে যিনি নিজেকে দেখতে পান ও সমস্ত জীবের যিনি বন্ধু, বিষয়পরিজন ত্যাগকারী পরম সাধু-মুনিগণ যাঁর দর্শনের জন্য বনবাসী হয়ে অক্ষুণ্নভাবে ব্রহ্মচর্যাদি ব্রত পালন করেন, তিনিই আমার আশ্রয়। যাঁর জন্ম, কর্ম, নাম, রূপ দোষ বা গুণ কিছুই না থাকলেও যিনি লোকসমূহের সৃষ্টি ও প্রলয়ের জন্য স্বরচিত মায়াদ্বারা জন্মগ্রহণ করেন আমি তাঁকে নমস্কার করি। যাঁর কর্মসকল আশ্চর্যজনক বলে যিনি অরূপ হয়েও বহুরূপে বিরাজমান, অনন্ত শক্তিশালী সেই পরমেশ্বর ব্রহ্মকে প্রণাম করি। যিনি সাক্ষী অর্থাৎ স্বপ্রকাশ বলে তাঁর প্রকাশের অপর কোন বস্তু নেই এবং যিনি জীবগণের পরিচালক বলে সমস্ত বাক্য, মন ও চিত্তবৃত্তির অতীত তাঁকে প্রণাম করি। বিদ্বান ব্যক্তি সন্ন্যাস অথবা বিশুদ্ধচিত্তের সাহায্যে যাঁকে প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করতে পারেন এবং যিনি মুক্তিকালীন জ্ঞান ও আনন্দ স্বরূপ অথচ কৈবল্যপদের অধীশ্বর তাঁকে প্রণাম করি। যিনি কখনো সত্ত্বগুণে শান্ত, কখনো রজোগুণে ঘোর, কখনও বা তমোগুণে মূঢ় হয়ে থাকেন, এসব থাকলেও যিনি নির্বিশেষে সাম্য ও অনন্তজ্ঞানের আধার তাঁকে নমস্কার করি। প্রভু, তুমিই ক্ষেত্রজ্ঞ, সাক্ষী ও সর্বাধ্যক্ষ তুমি সকলের পূর্বে পূর্ণভাবে বিরাজ কর বলে জীবদের মূল কারণ এবং বিশ্বপ্রকৃতিরও উৎপত্তির কারণ বলে তোমাকে নমস্কার করি। ১-১২

তুমি ইন্দ্রিয়গুলির স্রষ্টা, ইন্দ্রিয়বৃত্তিগুলিও তোমার অস্তিত্ব প্রকাশ করে থাকে। যেমন জলে সূর্যের ছায়া মিথ্যা হলেও আকাশে সূর্যের অস্তিত্ব সত্য, সেরকম জগতের অহংকার প্রভৃতি অসৎপদার্থ দিয়ে তোমার তত্ত্ব সূচিত হলেও অসৎ বিষয়-সমূহের মধ্যে তোমার আভাস সৎস্বরূপ ; তোমাকে প্রণাম করি। তুমি অবিকারী, কারণ মৃত্তিকা ঘট তৈরী করতে গিয়ে বিকৃত হয়, কিন্তু তুমি সর্বকারণ হয়েও বিকৃত হও না। নদীসমূহ যেমন সমুদ্রে গিয়ে পড়ে সেরকম পঞ্চরাত্র প্রভৃতি আগমসমূহ ও বেদসমূদয় তোমাতেই পরিসমাপ্ত হয়। তুমি মোক্ষস্বরূপ, ব্রহ্মাদি ও উত্তম পুরুষদের আশ্রয়স্থল ; তোমাকে নমস্কার করি। যেমন কাঠের মধ্যে আগুন প্রচ্ছন্ন থাকে, সেরকমই সত্ত্ব, তম ও রজোগুণের মধ্যে তুমি জ্ঞানরূপে অবস্থান কর। আর এই গুণসকল সৃষ্টিকার্যে উন্মুখ হলে তুমি বহুরূপ ধারণের সংকল্প গ্রহণ কর। যাঁরা আত্মতত্ত্বের ভাবনা দিয়ে শাস্ত্রের বিধিনিষেধ অতিক্রম করেছেন, তাঁদের মধ্যে তুমি স্বয়ং প্রকাশিত হয়ে থাক ; তোমাকে নমস্কার করি তুমি করুণাশালী, স্বয়ং মুক্ত ও আলস্যহীন বলে আমার মত শরণাগত পশুকে রক্ষা কর ; তোমাকে প্রণাম করি। তুমি অন্তর্যামী হয়ে দেহিগণের মধ্যে জ্ঞানের প্রকাশ কর এবং ভগবানরূপে তাদের নিয়মিত করছ। তুমি মনের মধ্যে থাকলেও মন তোমাকে ঢাকতে পারে না, তাই তোমাকে প্রণাম করি। যারা দেহ, পুত্র, বন্ধু, গৃহ, বিত্ত ও স্বজনের প্রতি আসক্ত তারা তোমাকে লাভ করতে পারে না, কারণ তুমি গুণ ও আসক্তি বর্জিত। যাঁরা দেহাদিতে অনাসক্ত, তাঁরা নিজের হৃদয়ে ধ্যান করে তোমাকে ঈশ্বররূপে অনুভব করে থাকেন ; তাই তোমাকে প্রণাম করি। ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষপ্রার্থী পুরুষেরা যাঁর ভজনা করে আকাঙ্ক্ষিত ধর্ম লাভ করেন এবং যিনি সেই ভজনকারীদের প্রার্থনায় অতিরিক্ত বস্তু এবং নিত্যশরীর দান করেন, সেই অপার করুণাময় তুমি আমাকে মুক্ত কর। যাঁরা মুক্তপুরুষদের সেবা করেছেন, সেই একান্ত ভক্তরা ভগবানের কাছে কোন বস্তু প্রার্থনা করেন না। তাঁরা তোমায় মঙ্গলময়, অতিবিচিত্র চরিতকথা গান করতে করতে আনন্দসাগরে ডুবে থাকেন। যিনি অক্ষর, অব্যক্ত, আধ্যাত্মিকযোগ লভ্য, সূক্ষ্ম-

বস্তুর মত অতীন্দ্রিয়, অনন্ত, পরিপূর্ণস্বরূপ পরমেশ্বর, পরমব্রহ্ম, আমি সেই পরমেশ্বরের স্তুতি করছি। ব্রহ্মাদি দেবগণ, বেদসমূহ ও চরাচর লোকসকলকে যিনি আপন অংশ দিয়ে নামরূপ বিভাগসহ সৃষ্টি করেছেন তিনি আমাকে উদ্ধার করার জন্য আবির্ভূত হোন। যেমন আগুন থেকে শিখা বের হয়ে তাতেই লীন হয়[১], সূর্য থেকে অনন্ত কিরণ বের হয়ে তাতেই লয় পায়, সেরকম যাঁর থেকে বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয়বর্গ সৃষ্ট হয়, তারা আবার তাঁতেই লয়প্রাপ্ত হয়। এই পরম স্রষ্টা তিনি দেবতা, অসুর, মানুষ, পশুপক্ষী, স্ত্রী, পুরুষ ক্লীব, বা অপর কোন প্রাণীই নন, তিনি সমস্ত বিশ্ব লয় হলে অবধিরূপে অবশিষ্ট থাকেন, অথচ তিনিই আবার মায়াবলেঅনন্তস্বরূপ।[২] তিনি আমাকে মুক্ত করুন। আমি কেবল এই কুমীরের মুখ থেকেমুক্তহয়ে জীবনধারণ করতে চাই না, কারণ ভিতরে ও বাইরে অজ্ঞানে আচ্ছন্ন এই হস্তিজন্ম রক্ষা করবার কি প্রয়োজন? যে অজ্ঞান আমাকে ঢেকে রেখেছে আমি তা থেকে মুক্তি প্রার্থনা করছি, কারণ কাল এই মুক্তিকে নষ্ট করতে পারে না। যিনি বিশ্বকে সৃষ্টি করেও বিশ্ব থেকে পৃথক এবং যিনি বিশ্বের আত্মা, আমি সেই পরমপদ ব্রহ্মকে প্রণাম জানাই। যোগ দ্বারা কর্মরাশি দগ্ধ হলে যোগীরা যোগ-বিশুদ্ধ হৃদয়ে যাঁকে দর্শন করেন, আমি সেই যোগেশ্বরকে প্রণাম করি। প্রভু, তোমার সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিন গুণের বেগ সহ্য করা সহজ নয়। তুমিই ইন্দ্রিয়সকলের গুণ অর্থাৎ শব্দাদিরূপে বাইরে প্রকাশিত হও। তুমি অনন্ত শক্তির আধার, তুমি শরণাগত. পালক। কিন্তু যাদের ইন্দ্রিয় বহির্মুখ, তারা তোমার পথ জানতে পারে না।[৩] যাঁর মায়ায় জীবেরা অহংকারবশত নিজে আত্মস্বরূপকে জানতে অক্ষম, আমি সেই অক্ষয়মাহাত্ম্য ভগবানের শরণাপন্ন হলাম।[১] ৩-২৯

শুকদেব বললেন, গজরাজ কোন মূর্তিবিশেষের উল্লেখ না করে যখন কেবল তত্ত্বের স্তুতিবাদ করল, ব্রহ্মাদি দেবগণ তার উদ্ধারের জন্য এগিয়ে এলেন না। তখন শ্রীহরি আবির্ভূত হলেন, কারণ তিনি নিখিলাত্মক ও সর্বদেবময়। জগতের আধার সুদর্শন শ্রীহরি গজেন্দ্রকে এরূপ কাতর দেখে ও তার স্তব শুনে গরুড়ে চড়ে তার সামনে উপস্থিত হলেন। দেবতারাও স্তব করতে করতে গজরাজের কাছে উপস্থিত হলেন। সরোবর-মধ্যে কুমীরের দ্বারা আক্রান্ত গজরাজ আকাশে গরুড়ের উপর ভগবান বিষ্ণুকে দেখে পদ্মযুক্ত হাত উপরে তুলে অতিকষ্টে বলল—হে নারায়ণ হে অখিলগুরু, তোমাকে নমস্কার করি। তারপর ভগবান শ্রীহরি গজেন্দ্রকে কাতর দেখে তাড়াতাড়ি গরুড়ের পিঠ থেকে জলে নেমে দর্শনরত দেবতাদের সামনেই সুদর্শন-চক্র দিয়ে কুমীরের মুখ বিদীর্ণ করে গজেন্দ্রকে রক্ষা করলেন। ৩০-৩৩

চতুর্থ অধ্যায়

গজরাজের স্বর্গে গমন

শুকদেব বললেন, মহারাজ; সেই সময় ব্রহ্মা, শংকর প্রভৃতি দেবতা এবং ঋষি ও গন্ধর্বরা শ্রীহরির সেই অদ্ভুত কাজের প্রশংসা করতে করতে পুষ্পবৃষ্টি করলেন। এইভাবে স্বর্গের দুন্দুভি বাজল, গন্ধর্বেরা নৃত্য-গীত করলেন আর

১ তুলনীয়: মুণ্ডক উপনিষৎ, ২।১।১ শ্লোক। ২ তুলনীয়: শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ, ৪।৯ শ্লোক।
৩ তুলনীয়: কঠ উপনিষৎ, ২।১।১

ঋষি, চারণ ও সিদ্ধরা পুরুষোত্তম শ্রীহরির স্তুতি করতে লাগলেন। সেই কুমীরও তখন দেবল ঋষির শাপ থেকে মুক্ত হয়ে পরম আশ্চর্য রূপ ধারণ করল। সে পূর্বে হূহূ নামক গন্ধর্ব ছিল। সেই গন্ধর্ব একবার স্ত্রীদের সঙ্গে জলক্রীড়া করতে করতে দেবল ঋষির পা টেনে ধরেছিলেন। তাতে মুনিবর 'কুমীর হও' বলে তাকে শাপ দেন। গন্ধর্বরাজ অনেক অনুনয় করলে মুনি প্রসন্ন হয়ে বললেন, এই ভাবে তুমি গজরাজকে আক্রমণ করলে, শ্রীহরি তাকে উদ্ধার করতে গিয়ে তোমাকেও উদ্ধার করবেন। এখন গন্ধর্বরাজ দেবল ঋষির শাপ থেকে মুক্ত হয়ে পুণ্যকীর্তি, যশস্বী ও সর্বগুণাধার শ্রীহরিকে অবনতমস্তকে প্রণাম করে তাঁর গুণগান করলেন। তারপর শ্রীহরির কৃপায় শাপমুক্ত হয়ে সেই গন্ধর্ব ভগবানকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করে সকলের সামনে গন্ধর্বলোকে চলে গেলেন। শ্রীহরির স্পর্শে অজ্ঞান-বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে গজরাজ পীতবসনধারী ও চতুর্ভুজ হয়ে শ্রীহরির সারূপ্য লাভ করলেন। গজরাজ পূর্বজন্মে ছিলেন দ্রবিড়শ্রেষ্ঠ ও বিষ্ণুর পরমভক্ত পাণ্ড্যদেশের রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন। একদিন এই জিতেন্দ্রিয় রাজা স্নান করে মলয়-পর্বতের জটাধারী আশ্রমে মৌন হয়ে শ্রীহরির অর্চনা করছিলেন। এমন সময়ে মহাযশা অগস্ত্য মুনি অনেক শিষ্য নিয়ে হঠাৎ সেখানে উপস্থিত হলেন। মহারাজ সেই অতিথিদের আপ্যায়ন না করে মৌনভাবে একান্তে উপাসনায় নিমগ্ন থাকলেন। এই দেখে মুনি ক্রুদ্ধ হয়ে অভিশাপ দিয়ে বললেন, অশিক্ষিতবুদ্ধি ও ব্রাহ্মণের অসম্মানকারী এই অসাধু দুরাত্মা নরকে প্রবেশ করুক। যেহেতু এই রাজা হস্তীর মত জড়বুদ্ধি অতএব এ হস্তীই হোক। ১-১০

শুকদেব বললেন, মহারাজ, ঋষি অগস্ত্য এইরকম শাপ দিয়ে শিষ্যদের নিয়ে সেখান থেকে চলে গেলেন। এদিকে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নও এটা দৈব ঘটনা মনে করে হস্তীজন্ম লাভ করলেন, কিন্তু শ্রীহরির আরাধনার জন্য তাঁর পূর্বজন্মের কথা সব মনে ছিল। পদ্মনাভ শ্রীহরি এইভাবে গজরাজকে মুক্ত করে নিজের পার্ষদ করে নিলেন। গন্ধর্ব, সিদ্ধ ও দেবতারা তাঁর এই অদ্ভুত কাজের প্রশংসা আরম্ভ করলে তিনি গরুড়ে চড়ে গজেন্দ্রকে নিয়ে নিজ ধামে চলে গেলেন। মহারাজ, আপনার কাছে আমি গজেন্দ্রমোচনরূপ শ্রীকৃষ্ণের এই প্রভাব ব্যক্ত করলাম। যাঁরা এই উপাখ্যান শোনেন তাঁদের ইহজীবনে যশ ও পরকালে স্বর্গ উভয়ই লাভ হয়। এই উপাখ্যান শুনলে দুঃস্বপ্ন ঘোচে, এইজন্য মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী দ্বিজাতিগণ সকালবেলা স্নান সেরে শুদ্ধচিত্তে এর কীর্তন করেন। কুরুশ্রেষ্ঠ, সর্বভূতময় শ্রীহরি প্রসন্ন হয়ে সকলের সামনেই বলেছিলেন—রাত্রিশেষে উঠে একাগ্রচিত্তে আমাকে, তোমাকে, এই সরোবর, পর্বত, গুহা ও বনের বেত, কীচক ও বেণুসকলের গুল্ম, দেবতরুসমূহ, ব্রহ্মা, আমার ও শিবের ধাম এই পর্বতশৃঙ্গসমূহ, আমার প্রিয় আবাস-স্থান এই ক্ষীরোদসাগর, উজ্জ্বল শ্বেতদ্বীপ, শ্রীবৎস, কৌস্তুভ, বনমালা, আমার গদা কৌমোদকী, সুদর্শন চক্র, পাঞ্চজন্য শঙ্খ, পক্ষিরাজ গরুড়, আমার সূক্ষ্ম অংশ শেষনাগ, আমার আশ্রিতা লক্ষ্মীদেবী, ব্রহ্মা, নারদঋষি, শিব, প্রহ্লাদ, মৎস্য-কূর্ম-বরাহাদি অবতারে আমার অনুষ্ঠিত পুণ্যকর্ম, সূর্য, চন্দ্র, অগ্নি, প্রণব, সত্য, মায়া, গো, ব্রাহ্মণ, ভক্তিরূপ অক্ষয়ধর্ম, চন্দ্র ও কশ্যপের স্ত্রী, দক্ষ-কন্যাগণ, গঙ্গা, সরস্বতী, নন্দা, যমুনা, ঐরাবত হস্তী, ধ্রুব, সপ্ত ব্রহ্মর্ষি এবং পুণ্যকীর্তি ব্যক্তিদের যারা আমার বিভূতিরূপে স্মরণ করে, তারা সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়। বৎস্য, যারা রাত্রিশেষে উঠে এই বৃত্তান্ত পাঠ করে আমার স্তুতি করে আমি তাদের মৃত্যুর সময় উত্তম গতি দান করি। ১১-২৫

শুকদেব বললেন, মহারাজ, ভগবান শ্রীহরি তখন গজরাজকে এই রকম উপদেশ দিয়ে পাঞ্চজন্য শঙ্খ বাজিয়ে গরুড়ে চড়ে স্বর্গে চলে গেলেন। ২৬

পঞ্চম অধ্যায়

ব্রহ্মার পরমেশ্বর স্তুতি

শুকদেব বললেন, মহারাজ, তোমার কাছে শ্রীহরির গজমোচনরূপ পাপনাশক, পুণ্যজনক কর্মের কথা বলেছি, এখন রৈবত মন্বন্তর কথা শোন। চতুর্থ মনু তামসের ভাই রৈবত হলেন পঞ্চম মনু। অর্জুন, বলি ও বিন্ধ্য প্রভৃতি তাঁর পুত্র। এই মন্বন্তরে বিভু, ইন্দ্র, ভূতরয় প্রভৃতি দেবতা আবির্ভূত হন এবং হিরণ্যরোমা, বেদশিরা, উর্ধ্ববাহু প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ সপ্তর্ষি হয়েছিলেন। শুভ্রের স্ত্রী হলেন বিকুণ্ঠা। স্বয়ং ভগবান শুভ্রের ঔরসে ও বিকুণ্ঠার গর্ভে নিজ অংশে জন্মে বৈকুণ্ঠ নামে আবির্ভূত হন। বৈকুণ্ঠরূপী ভগবান শ্রীহরিই লক্ষ্মীদেবীর প্রার্থনায় তাঁকে প্রীত করবার জন্য সমস্ত লোকের বন্দনীয় বৈকুণ্ঠলোক রচনা করেন। বরাহাদিরূপে তাঁর যুদ্ধ, লীলা ও সমস্ত গুণ আগেই বর্ণনা করা হয়েছে। যিনি পৃথিবীর ধূলিকণা গুনতে পারেন তাঁর পক্ষেই বিষ্ণু গুণাবলী বর্ণনা সম্ভব। ১-৬

চক্ষুর পুত্র চাক্ষুষ ষষ্ঠ মনু। পুরু, পুরুষ আর সুদ্যুম্ন প্রভৃতি তাঁর পুত্র। এই মন্বন্তরে ইন্দ্রের নাম মন্ত্রদ্রুম; হর্ষ্মান, বীরক প্রভৃতি এই মন্বন্তরের ঋষি। এই মন্বন্তরে জগৎপতি শ্রীহরি নিজ অংশে, দেবসম্ভূতির গর্ভে বৈরাজের পুত্র হয়ে অজিত নামে প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন। ইনিই সমুদ্রমন্থন করে দেবতাদের জন্য অমৃত সংগ্রহ করেন এবং কচ্ছপরূপ ধরে জলের মধ্যে আবর্তনশীল মন্দর পর্বতকে পিঠে ধারণ করেছিলেন। ৭-১০

রাজা বললেন, ব্রাহ্মণ, ভগবান যেভাবে ক্ষীরসগের মন্থন করেছিলেন, যে জন্য কচ্ছপরূপ ধারণ করে মন্দর পর্বতকে আপন পিঠে ধারণ করেন, দেবতারা যেভাবে অমৃত পেয়েছিলেন, আর যা যা পরমাশ্চর্য ঘটনা ঘটেছিল আপনি আমাদের সেগুলি সবিস্তারে বলুন। মুনিবর, আপনি যতই ভগবানের মহিমা বর্ণনা করছেন, দীর্ঘকাল দুঃখতাপিত আমার মন কিছুতেই তৃপ্তিলাভ করছে না, বরং আরও শোনার জন্য উৎসুক হয়ে আছে। ১১-১৩

সূত বললেন, ঋষিগণ, মহারাজ পরীক্ষিৎ এরূপ জিজ্ঞাসা করলে শুকদেব তাঁকে অভিনন্দন করে শ্রীহরির পরাক্রম বর্ণনা প্রসঙ্গে বললেন, মহারাজ, পুরাকালে যে সময়ে দেবতারা যুদ্ধে অসুরদের তীক্ষ্ণ অস্ত্রের দ্বারা আহত হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করলেন এবং যে সময়ে দুর্বাসা মুনির অভিশাপে ইন্দ্রপ্রমুখ এবং ত্রিলোক লক্ষ্মীশূন্য হয়েছিল আর লোকমধ্যে যজ্ঞাদি সকল কর্ম লোপ পাচ্ছিল, তখন ইন্দ্র, বরুণ প্রভৃতি দেবতারা নিজেরা মন্ত্রণা করেও প্রতিকারের কোন উপায় বার করতে পারলেন না। তারপর তাঁরা সকলে সুমেরুর উপরিভাগে অবস্থিত ব্রহ্মার সভায় গিয়ে প্রণাম করে ব্রহ্মার কাছে সব কথা বললেন। ভগবান ব্রহ্মা ইন্দ্র, বায়ু প্রভৃতি দেবতাদের নির্বীর্য ও কান্তিহীন, ত্রিলোককে প্রায়ই অমঙ্গলযুক্ত এবং অসুরদের বলবান দেখে একাগ্রভাবে পরমপুরুষ শ্রীহরিকে ধ্যান করতে করতে উৎফুল্লবদনে দেবতাদের বললেন, দেবগণ, আমি, শঙ্কর, তোমরা, অসুর, মানুষ, পশু-পক্ষী, গাছ, স্বেদজ

প্রাণীরা যাঁর অবতারের অংশের অংশ দ্বারা উৎপন্ন হয়েছি, এস, সকলে তাঁরই শরণাগত হই। যদিও কেউ তাঁর বধ্য বা কেউ রক্ষণীয়, কেউ উপেক্ষণীয় বা কেউ আদরণীয় নেই, তথাপি তিনি সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের জন্য সমুচিত কালে সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণ ধারণ করেন। প্রাণীদের কল্যাণের জন্য সত্ত্বগুণধারী সেই শ্রীহরির এ স্থিতিরক্ষার সময় বলে আমরা সেই জগদ্‌গুরুরই শরণাপন্ন হব। সেই দেবতাপ্রিয় ভগবানই আমাদের মঙ্গল করবেন। ১৪-২৩

শুকদেব বললেন, মহারাজ, ব্রহ্মা দেবতাদের এরূপ বলে তাঁদের সঙ্গে তমোগুণের অতীত শ্রীহরির সাক্ষাৎ অধিষ্ঠানক্ষেত্র সেই ক্ষীরোদ সাগরে গেলেন। ভগবান ব্রহ্মা সেখানে গিয়ে, পূর্বে যাঁর কথা কেবল শুনেছিলেন, কিন্তু যাঁর রূপ দেখেননি; সেই পরমপুরুষ শ্রীহরিকে বেদবাক্য দ্বারা স্তুতি করতে আরম্ভ করলেন। ২৪-২৫

ব্রহ্মা বললেন, ভগবান, আপনি মন অপেক্ষাও বেগবান বলে মনদ্বারা বিচারের অযোগ্য, উপাধিমুক্ত বলে সর্বত্র গমন করতে পারেন না।[১] আপনার আদি অন্ত নেই বলেই আপনি নির্বিকার। আপনি বাক্যের বিষয় নন এই হেতু বাক্য আপনাকে নির্বাচন করতে পারে না। আপনি বাক্যের অগোচর সত্যস্বরূপ বরেণ্য শ্রেষ্ঠ দেবতা।[২] আমরা আপনাকে প্রণাম করি। যিনি প্রাণ, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কারের জ্ঞাতা, যিনি বিষয় ও ইন্দ্রিয়রূপে প্রকাশিত হন, অথচ যিনি স্বপ্নদ্রষ্টার মত অজ্ঞানরহিত এবং দেহহীন বলে আকাশের মত সর্বব্যাপক, যাঁকে জীবের মত ছায়া ও আতপ অর্থাৎ অবিদ্যা ও বিদ্যা স্পর্শ করে না, যিনি তিন যুগেই আবির্ভূত হন, আমরা তাঁরই শরণাপন্ন হই। জীবের দেহ চক্রের মত মায়াদ্বারা চালিত হচ্ছে। মন এই চক্রের প্রধান অংশ ; দশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চপ্রাণ এই পনেরটি এই চক্রের মধ্যভাগে গ্রথিত ও চারিদিকে প্রান্তভাগে সংলগ্ন শলাকা। সত্ত্বাদি তিন গুণ এর নাভি অর্থাৎ মধ্যভাগ। এই চক্র বিদ্যুতের মত চঞ্চল। প্রকৃতি, মহৎতত্ত্ব, অহঙ্কার ও শব্দাদি পঞ্চতন্মাত্র—এই আটটি এই চক্রের নেমি (প্রান্তভাগের আবরণস্বরূপ)। যিনি এই চক্রের অক্ষ অর্থাৎ অধিষ্ঠান বা অবলম্বন, সেই সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরের শরণাগত হই। যিনি দেশ ও কালদ্বারা অপরিচ্ছিন্ন, তিনি অব্যক্ত ও অদৃশ্য হয়েও প্রকৃতির অতীত জ্ঞানমাত্ররূপে নিত্য বিদ্যমান এবং জীবের কাছে তার নিয়ামকরূপে বিদ্যমান। ধীর পুরুষেরা যোগের দ্বারা যাঁর উপাসনা করেন আমরা তাঁকেই প্রণাম করি। যাঁর মায়াকে কেউ অতিক্রম করতে পারে না, যাঁর মায়ার প্রভাবে লোক আত্মাকে জানতে পারে না, অথচ যিনি আত্মশক্তি, যিনি মায়া ও তার গুণসকলকে জয় করে সমানভাবে সর্বভূতে বিচরণ করছেন, সেই পরমেশ্বরকে প্রণাম করি। ২৬-৩০

আমরা এই দেবতা ও ঋষিগণ সত্ত্বগুণে সৃষ্ট হয়েও যাঁর প্রিয়মূর্তি ও সূক্ষ্ম স্বরূপ জানতে অসমর্থ, রজ ও তমোগুণপ্রধান অসুরেরা কিভাবে তাঁকে জানতে পারবে ? যে পৃথিবীতে জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জরূপ চার প্রকার প্রাণী সৃষ্ট হয়, সেই পৃথিবী যাঁর দুটি পা, সেই মহাবিভূতিশালী অচ্যুতস্বরূপ পরমপুরুষ ব্রহ্ম আমাদের প্রতি প্রসন্ন হোন। মহাপ্রভাবশালী যে জল থেকে এই লোকসমষ্টি

১ তুলনীয় : ব্রহ্ম এক ও গতিহীন হয়েও মন থেকে অধিকতর বেগবান। ইন্দ্রিয়গণ এঁকে প্রাপ্ত হয় না, কারণ ইনি সকলের পূর্বে গমন করেন। —ঈশ উপনিষৎ-৩ ২ যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ। আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন। —তৈত্তিরীয় উপনিষদ, ২।৪

আর নিখিল লোকপালেরা উৎপন্ন, জীবিত ও বর্ধিত হয়, জল যাঁর শুক্রস্বরূপ সেই, পরমেশ্বর আমাদের প্রতি প্রসন্ন হোন। যে সোম (চন্দ্র) দেবতাদের অন্ন, বল ও আয়ুস্বরূপ, যিনি বৃক্ষদের ঈশ্বর ও প্রজাদের বর্ধক, সোম যাঁর মন বলে খ্যাত সেই মহাবিভূতিশালী প্রভু আমাদের প্রতি প্রসন্ন হোন। যাঁর বক্ষস্থল থেকে লক্ষ্মী, ছায়া থেকে পিতৃগণ, স্তন থেকে ধর্ম, পিঠ থেকে অধর্ম, মাথা থেকে স্বর্গ, বিহার থেকে অপ্সরারা জন্মেছে সেই মহাবিভূতি প্রভুর আমরা শরণাপন্ন হই। যাঁর মুখ থেকে ব্রাহ্মণ ও পরমরহস্য বেদবাণী, হাত থেকে ক্ষত্রিয় আর বল, উরু থেকে বৈশ্য ও পটুতা এবং পা থেকে শূদ্র ও শুশ্রূষার উৎপত্তি হয়েছে সেই পরমেশ্বর আমাদের প্রতি প্রসন্ন হোন। যাঁর অধর থেকে লোভ, ওষ্ঠ থেকে প্রীতি, নাম থেকে দ্যুতি অর্থাৎ কান্তি, স্পর্শ থেকে পশুদের হিতকর কাম, ভ্রূযুগল থেকে যম ও পক্ষ্ম থেকে কাল উৎপন্ন হয়েছে সেই মহাবিভূতি প্রভু আমাদের প্রতি প্রসন্ন হোন। পৃথিবী ও ভূতসকল, কাল, কর্ম ও গুণত্রয়, এই সকলের সমাবেশে যে লৌকিক প্রপঞ্চ হয়েছে তার স্বরূপ বলা কঠিন, কারণ জ্ঞানীরাও তাঁর অস্তিত্ব বিষয়ে প্রচুর তর্ক করেন। এই অনিত্য সংসার যাঁর যোগমায়ায় সৃষ্ট হয়েছে বলে সুধীগণ বলে থাকেন, সেই প্রভু আমাদের প্রতি প্রসন্ন হোন। যাঁতে সমস্ত মায়াশক্তি নিষ্ক্রিয় রয়েছে, যিনি স্বরূপে বিরাজিত থেকে আত্মাতে পূর্ণ হয়ে অবস্থান করছেন, যিনি বায়ুর মত দর্শনাদি বৃত্তি দ্বারা মায়ারচিত গুণসকলে আসক্ত হন না, তাঁকে নমস্কার করি। ৩১-৪৪

প্রভু, আমরা আপনার শরণাগত। আপনার হাস্যোজ্জ্বল পদ্মবদন দেখতে আমরা ইচ্ছা করি; আপনি আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর হয়ে আপনাকে প্রকাশিত করুন। যে সমস্ত কাজ আমরা করতে পারি না, ভগবান, আপনি যুগে যুগে স্বেচ্ছায় রূপধারণ করে সেই সমস্ত কাজ নিজে সম্পাদন করেন। যারা বিষয়ে আসক্ত সেই সব মানুষ যে সমস্ত ক্লেশকর কর্ম করে থাকে, তাও বিফল হয়ে যায়; কিন্তু ভক্তরা আপনাতে যে কর্ম অর্পণ করেন, তা নিষ্ফল না হয়ে পরম মহাফল প্রদান করে। ভগবান, অতি অল্প পরিমাণ কর্মও যদি ঈশ্বরের প্রতি অর্পিত হয়, তা হলে তা বিফল হয় না, কারণ তিনি জীবের আত্মা, অতএব সকলের প্রিয় ও হিতকারী। যেমন গাছের মূলে জল দিলে কাণ্ড ও শাখাগুলিরও সেচন হয়, তেমনি বিষ্ণুর আরাধনা করলে নিজ আত্মা ও সর্বভূতের আরাধনা করা হয়। আপনি অনন্ত, আপনার স্বরূপ ও কর্ম তর্কের অতীত; আপনি নির্গুণ অথচ গুণাধীশ। এখন পালনের জন্য আপনি সত্ত্বগুণে অবস্থান করছেন, আপনাকে নমস্কার করি। ৪৫-৫০

ষষ্ঠ অধ্যায়

দেবাসুরের সন্ধিস্থাপন ও অমৃতলাভের প্রয়াস

শুকদেব বললেন, মহারাজ, দেবতারা ভগবান শ্রীহরির এরূপ স্তুতি করলে তিনি সহস্র সূর্যের মত উজ্জ্বল মূর্তিতে[১] তাঁদের নিকট আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর

১ অনুরূপ বর্ণনা গীতার বিশ্বরূপদর্শন যোগে আছে: দিবি সূর্যসহস্রস্য ভবেদ্ যুগপদুত্থিতা।
—গীতা, ১১।১২

সেই সমুজ্জ্বল তেজে দৃষ্টি প্রতিহত হওয়ায় দেবতারা আকাশ, দিঙ্মণ্ডল, পৃথিবী বা নিজেদের পর্যন্ত দেখতে পেলেন না ; এ অবস্থায় শ্রীহরিকে কিভাবে দেখতে সমর্থ হবেন ? তারপর দেবপ্রধান ব্রহ্মা শংকরের সংগে সেই মূর্তি দেখে সাষ্টাংগে প্রণাম করলেন এবং অন্য দেবতারাও সেই পরমপুরুষের স্তুতি করলেন। তাঁর সেই মূর্তি সুনির্মল মকরতমণির মত শ্যামবর্ণ, তাঁর চোখ দুটি পদ্মফুলের মত রক্তবর্ণ, সর্বাঙ্গ উত্তপ্ত সোনার মত পীতবর্ণ, মনোহর কৌষেয় বস্ত্রে আবৃত অবয়ব প্রসন্ন ও সুন্দর, মুখমণ্ডল ও ভ্রূ দুটি সুন্দর, মাথা মহামণিময় মুকুট-শোভিত, হাত দুটি কেয়ূরমণ্ডিত, শ্রীমুখ-কমল কুণ্ডলের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত গণ্ডদ্বয়ের শোভায় রমণীয়, নানা অঙ্গ চন্দ্রহার, বলয়, হার ও নূপুরে অলংকৃত আর গলায় কৌস্তুভমণি আর বনমালা শোভা পাচ্ছে। তিনি বক্ষস্থলে লক্ষ্মীদেবীকে ধারণ করেছিলেন, সুদর্শন প্রভৃতি অস্ত্রগুলি মূর্তিমান হয়ে তাঁর উপাসনা করছিল। ১-৭

ব্রহ্মা বললেন, ভগবান, যাঁর জন্ম, স্থিতি ও বিনাশ আমরা জানি না, যিনি নির্গুণ ও অপার মুক্তিসুখের মত, এবং যিনি অণু থেকেও সূক্ষ্মতর, অথচ যাঁর মূর্তির অভাব নেই, সেই মহাপ্রভাবশালী আপনাকে বার বার প্রণাম করি। পুরুষোত্তম, আপনার এই মূর্তি মঙ্গলাভিলাষী ব্যক্তিরা বৈদিক ও তান্ত্রিক উপায়ে চিরকাল পূজা করবেন, অতএব তা সনাতন। হে বিধাতা, এই নিখিল বিশ্ব আপনার মূর্তির মধ্যেই অবস্থিত বলে আমরা আপনার মধ্যে ত্রিলোকসহ আমাদের সকলকেই দেখতে পাচ্ছি ; সুতরাং এ মূর্তি পরিচ্ছিন্ন নয়। হে দেব, আপনি স্বতন্ত্র পুরুষ। সৃষ্টির আগে এই বিশ্ব আপনাতেই ছিল, বর্তমানে আপনাতেই আছে, ধ্বংসের পরেও আপনাতেই থাকবে। আপনি প্রকৃতিরও পরবর্তী তত্ত্ব। অতএব মাটি যেমন ঘটের আদি, মধ্য ও অনন্তস্বরূপ, আপনি সেইরকম এই বিশ্বের আদি, মধ্য ও অনন্তস্বরূপ। আপনি নিজের মায়া দ্বারা এই বিশ্ব রচনা করে তাতে অন্তর্যামীরূপে প্রবেশ করেছেন। অতএব যাঁরা যোগী, বিবেকী ও শাস্ত্রজ্ঞ তাঁরা উপলব্ধি করেন যে গুণসকল জগৎ রূপে পরিণত হয়, কিন্তু আপনি নির্গুণ বলে অবিকৃতই থাকেন। লোকে যেমন মন্থন করে কাঠের থেকে আগুন, দোহন করে গরুর থেকে ঘি, কর্ষণ করে ভূমিতে ধান এবং বাণিজ্য দ্বারা পুরুষকারের সাহায্যে জীবিকার সন্ধান পায়, সেই রকম মনীষী ব্যক্তিরা বুদ্ধি সহযোগে গুণের মধ্যে আপনাকে লাভ করে থাকেন। হে প্রভু পদ্মনাভ, আগুনে পীড়িত হাতীরা গঙ্গার জল পেয়ে যেমন শান্তিলাভ করে, আমরাও এখন চিরবাঞ্ছিত আপনাকে দেখে সেই রকম শান্তিলাভ করছি। হে অন্তরাত্মা, আমরা লোকপালেরা সকলে যে কাজের জন্য আপনার পদতলে উপস্থিত হয়েছি আপনি তা সম্পাদন করুন। আপনি জগতে সকল বিষয়ই প্রত্যক্ষ করছেন ; অন্যে বাক্যদ্বারা আপনাকে আর অধিক কি জানাতে পারে ? যেমন আগুন থেকে বিস্ফুলিঙ্গগুলি পৃথক পৃথক বের হয়, সেই রকম আমি, গিরীশ প্রভৃতি দেবতাগণ ও দক্ষ প্রজাপতিরা, আমরা সকলেই আপনার থেকে পৃথক পৃথক উৎপন্ন হয়েছি বলে আমরা নিজেদের মঙ্গল কিরূপেই বা জানব ? অতএব আপনিই ব্রাহ্মণ ও দেবতাদের কর্তব্য বিষয়ে উপদেশ দিন। ৮-১৫

শুকদেব বললেন, মহারাজ, ভগবান শ্রীহরি ব্রহ্মাদি দেবতাদের দ্বারা স্তুত হয়ে এবং তাঁদের মনের অভিপ্রায় জানতে পেরে উপস্থিত দেবতাদের উদ্দেশ্যে মেঘগম্ভীর স্বরে বলতে লাগলেন। যদিও নারায়ণ একাই দেবতাদের সকল কাজ করতে সমর্থ তথাপি সমুদ্রমন্থনাদি দ্বারা বিহার করবার অভিলাষে তিনি বললেন, ব্রহ্মন্, শঙ্কর, দেবতাগণ, গন্ধর্বাদি, কি করলে তোমাদের কল্যাণ হবে সকলে মন দিয়ে তা শোন। যতদিন না তোমাদের আত্মোন্নতি লাভ হয়, ততদিন পর্যন্ত শুক্রাচার্যের অনুগ্রহ-

পুষ্ট দানব ও দৈত্যদের সঙ্গে সন্ধি কর। দেবগণ, যেমন পেটিকাতে আবদ্ধ সাপ মুক্ত হবার জন্য প্রথমে ইঁদুরের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে, পরে তাকেই খেয়ে ফেলে, সেরূপ কর্তব্যের জন্য কর্মমার্গে প্রবৃত্ত ব্যক্তিদের শত্রুসঙ্গেও সন্ধিস্থাপন করতে হয়। তোমরা শীঘ্রই অমৃত আহরণের জন্য প্রস্তুত হও। অমৃত পান করলে মুমূর্ষু প্রাণীও অমরত্ব লাভ করতে পারে। দেবগণ, তোমরা ক্ষীরোদ সাগরে তৃণ, লতা, গুল্ম, ওষধি ফেলে দিয়ে মন্দর পর্বতকে মন্থনদণ্ড আর বাসুকি নাগকে রজ্জু করে আমার সাহায্যে সাবধানে মন্থন কর ; তাতে দৈত্যগণ ক্লেশভাগী আর তোমরা ফলভাগী হবে। কাজের সময় অসুরেরা যা করতে ইচ্ছা করে তোমরা তা অনুমোদন করবে। সাম্যভাব দেখিয়ে যেমন সমস্ত কাজ সিদ্ধ হয় ক্রোধ দেখিয়ে তা হয় না। মন্থনের সময় উৎপন্ন কালকূট বিষ দেখে ভয় পেয়ো না। আর সমুদ্র-মন্থন থেকে যে সমস্ত বস্তু উৎপন্ন হবে কখনও তা লাভ করবার জন্য লোভ ও কামনা করো না বা না পেলে ক্রোধ করবে না। ১৬-২৫

শুকদেব বললেন, মহারাজ, স্বচ্ছন্দগামী ভগবান পুরুষোত্তম দেবতাদের এরূপ আদেশ করে তাঁদের সামনেই অন্তর্ধান করলেন। তারপর ভগবানকে প্রণাম করে ব্রহ্মা ও শঙ্কর স্ব স্ব ধামে চলে গেলে দেবতারা দৈত্যরাজ বলির ভবনে গেলেন। শত্রু দেবতাদের যুদ্ধসজ্জাহীন দেখেও বলিরাজের সেনাপতিরা তাঁদের আক্রমণ করতে গিয়েছিলেন, কিন্তু সন্ধি ও বিগ্রহের সময়বিশেষে অভিজ্ঞ দৈত্যরাজ বলি তাঁদের নিবৃত্ত করলেন। তারপর দেবতারা অসুরসেনাপতিদের দ্বারা পরিবৃত পরম সমৃদ্ধিশালী ত্রিলোকবিজয়ী বলিরাজের কাছে উপস্থিত হলেন। ভগবান পুরুষোত্তম যে সকল বিষয়ে উপদেশ দেন মহামতি ইন্দ্র কোমল বাক্যে শান্তভাবে বলিরাজকে তা সবই নিবেদন করলেন। দেবরাজ ইন্দ্রের কথা দৈত্যরাজ বলি আর সেখানে উপস্থিত শম্বর, অরিষ্টনেমি ও ত্রিপুরবাসী সমস্ত দৈত্যনায়কদেরই সঙ্গত মনে হল। তারপর দেবতা ও অসুরেরা অমৃত লাভের জন্য সখ্যসূত্রে আবদ্ধ হয়ে পরম উদ্যমে কাজে লাগলেন। বিশালবাহু, শক্তিশালী সেই দুর্মদ দেবতা এবং অসুরেরা বিক্রমের সঙ্গে মন্দরপর্বত তুলে নিয়ে সিংহনাদ করতে করতে সমুদ্রের দিকে চললেন। কিন্তু দীর্ঘপথ ভার বহন করে তাঁরা শ্রান্ত ও অবশ হয়ে মধ্যপথে সেই পর্বতকে পরিত্যাগ করলেন। সোনালি রঙের সেই মন্দরপাহাড় মাটিতে পড়ে গেলে তার ভারে বহু দেবতা ও অসুর নিহত হয়। তারপর দেবাসুরগণ বাহু, উরু ও গ্রীবা ভঙ্গহেতু মন্থন-সংকল্প ত্যাগ করছেন, এ কথা জানতে পেরে গরুড়াসীন শ্রীহরি সেখানে উপস্থিত হলেন এবং আপন দৃষ্টিদ্বারা আহত দেবাসুরদের নীরোগ ও অক্ষত করে জীবনদান করলেন। তারপর তিনি এক হাত দিয়ে অনায়াসে পর্বতটিকে গরুড়ের উপর রাখলেন এবং নিজেও তার পিঠে উঠে দেবতা ও অসুর-বেষ্টিত হয়ে ক্ষীর-সমুদ্রের দিকে যাত্রা করলেন। ক্ষীরসমুদ্রের তীরে উপস্থিত হয়ে পক্ষিরাজ গরুড় নিজের কাঁধ থেকে পর্বতটিকে নামিয়ে জলের প্রান্তভাগে স্থাপন করলেন এবং শ্রীহরির নিকট বিদায় নিয়ে অন্যত্র চলে গেলেন ; তার কারণ গরুড় থাকলে বাসুকি নাগ আসতে পারবে না। ২৬-৩৯

সপ্তম অধ্যায়

সমুদ্রমন্থনে কালকূট বিষের উৎপত্তি

শুকদেব বললেন, মহারাজ, তারপর দেবতা আর অসুরেরা সর্পরাজ বাসুকিকে সমুদ্রমন্থনের ফলস্বরূপ অমৃত দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাকে রজ্জুরূপে মন্দর

পর্বতে যুক্ত করলেন এবং অমৃতলাভের জন্য যত্নসহকারে সানন্দে সমুদ্রমন্থন আরম্ভ করলেন। ভগবান শ্রীহরি প্রথমে বাসুকির মুখ ধরাতে দেবতারাও তাই ধরলেন। শ্রীহরির এই কাজে দৈত্যপতিরা রাজি হল না। তারা বলল, আমরা শাস্ত্রপাঠ করে জ্ঞানবান এবং জন্মকর্মদ্বারা বিখ্যাত বলে সাপের অমঙ্গলকর অঙ্গ লেজ ধারণ করব না। এই বলে তারা চুপ করে রইল। তা দেখে শ্রীহরি মৃদু হেসে দেবতাদের সঙ্গে বাসুকির অগ্রভাগ ছেড়ে পুচ্ছ ধরলেন। এইভাবে কশ্যপের পুত্র দেবতা ও অসুরদের স্থান বিভক্ত হলে তাঁরা অমৃত লাভের জন্য অত্যন্ত পরিশ্রম ও যত্নসহকারে সমুদ্র মন্থন করতে লাগলেন। সমুদ্রমন্থন আরম্ভ হলে সেই মন্দরপর্বত বলবান দেবাসুরদের দ্বারা ধৃত হয়েও আপন গুরুভারে জলের মধ্যে তলিয়ে যেতে লাগল। অতিবলবান দৈব কর্তৃক এভাবে নিজেদের পৌরুষ নষ্ট হলে দেবতা ও অসুরদের মন অতি বিষণ্ণ ও মুখশ্রী মলিন হল। তখন অদৃষ্ট বিঘ্ন উৎপাদন করছে দেখে সত্য-সংকল্প ভগবান শ্রীহরি অদ্ভুত ও বিরাট কচ্ছপমূর্তি ধারণ করে জলে প্রবেশ করে পাহাড়টিকে উপরের দিকে তুলে ধরলেন। দেবতা ও অসুরেরা মন্দরপর্বতকে উঠতে দেখে আবার মন্থন আরম্ভ করলেন, আর মহাদ্বীপের মত কূর্মরূপী ভগবান লক্ষ যোজন বিস্তৃত নিজের পিঠ দিয়ে মন্দরপাহাড়কে ধরে রাখলেন। ১-৯

মহারাজ, অতুলনীয় প্রভাবশালী আদি কচ্ছপমূর্তি শ্রীহরি দেবতা ও অসুরদের দ্বারা বাহুবলে পরিচালিত ও ঘূর্ণ্যমান সেই মন্দরপাহাড়ে নিজের পিঠে ধারণ করে তার সেই ঘূর্ণনকে নিজ অঙ্গ-কণ্ডূয়নের মত মনে করছিলেন। তখন ভগবান শ্রীহরি অসুরদের বলবীর্য উদ্দীপিত করবার জন্য তাদের মধ্যে অসুররূপে, দেবতাদের মধ্যে দেবরূপে এবং বাসুকির মধ্যে অজ্ঞাতভাবে আবিষ্ট হয়েছিলেন, অর্থাৎ তাদের দেহে অদৃশ্যভাবে শক্তিসঞ্চার করেছিলেন। ভগবান স্বয়ং সহস্রবাহু হয়ে মন্দরকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে দ্বিতীয় গিরিরাজের মত অবস্থান করলেন। এই দেখে ব্রহ্মা, শংকর ও ইন্দ্রাদি দেবগণ স্বর্গে ভগবানের স্তব করতে করতে পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেন। এইভাবে শ্রীহরি উপরে সহস্রবাহুরূপে অধোভাগে কূর্মরূপে, দেব ও দৈত্যদের মধ্যে সাত্ত্বিক ও রাজস রূপে, পর্বতে দৃঢ়তারূপে, বাসুকিতে মোহরূপে অবস্থান করে তাদের বল যোগালে দেবতা ও অসুরেরা মদোদ্ধত মহাবলে ক্ষীরসমুদ্র মন্থন করতে প্রবৃত্ত হল। মহাপর্বতের এই সংঘর্ষে জলজন্তুরা সব বিচলিত হয়ে উঠল। তারপর নাগরাজের উগ্র সহস্র চোখ, মুখ ও শ্বাস থেকে নির্গত আগুন ও ধোঁয়ায় অসুরদের তেজ ম্লান হয়ে গেল। পৌলম, কালেয়, বলি ও ইল্বল প্রভৃতি দৈত্যরা অগ্নিদগ্ধ সরলগাছের মত আকার ধারণ করল। বাসুকির তপ্ত নিশ্বাসে দেবতারাও নিষ্প্রভ হলেন; তাঁদের বসন, মালা, বর্ম ও মুখ ধোঁয়ায় মলিন হয়ে গেল। তখন ভগবানের আদেশে মেঘেরা বর্ষণ করতে লাগল আর সমুদ্রের তরঙ্গস্পর্শে বাতাস শীতল হয়ে বইতে শুরু করল। ১০-১৫

এইভাবে দেবতা ও অসুরেরা মিলে সমুদ্রমন্থন করলেও যখন অমৃত উঠল না, তখন ভগবান শ্রীহরি নিজেই মন্থন করতে লাগলেন। তাঁর বর্ণ মেঘের মত কালো, পরিধানে পীতবস্ত্র, কানে বিদ্যুতের মত উজ্জ্বল কুণ্ডল, মাথায় আলুলায়িত কেশ, গলায় বনমালা আর চোখদুটি রক্তবর্ণ। সেই শ্রীহরি মন্দরপাহাড়কে ধরে রাখলেন, নিজের দুহাতে বাসুকিকে ধারণ করে মন্থনদণ্ডরূপী মন্দর দিয়ে মন্থন করতে করতে তিনি যেন প্রতিদ্বন্দ্বী অন্য একটি পর্বতের মত শোভা পাচ্ছিলেন। এই ভাবে অনবরত মন্থনের ফলে জলের মাছগুলি উদ্বেগে চঞ্চল হয়ে উঠল; মকর, সাপ কচ্ছপ, তিমি, জলহস্তী, কুমীর প্রভৃতি জলজন্তুগুলিও আকুল হয়ে উঠল। তখন সমুদ্র থেকে সবার আগে উঠল হলাহল নামে অতি তীব্র বিষ। ১৬-১৮

সেই অসহ্য তীব্র বিষ উপরে নীচে এবং চারিদিকে বিস্তৃত হতে লাগল। সেই দেখে ভীত লোকপালেরা ও ত্রিলোকবাসী সকলে অন্য কোন রক্ষকের সন্ধান বৃথা জেনে ভগবান শিবের শরণাপন্ন হলেন। ভগবান সদাশিব তখন সৃষ্টিবৃদ্ধির জন্য দেবীর সঙ্গে গিরিশৃঙ্গে উপবিষ্ট ছিলেন। কৈলাস পর্বতে মুনিদের মুক্তির জন্য তপস্যারত অবস্থায় তাঁকে দেখে প্রজাপতিরা স্তুতিসহকারে প্রণাম করে নিবেদন করলেন—হে সর্বভূতময়, ভূতপালক, দেবদেব, মহাদেব, আপনি শরণাগত, আমাদের ত্রিলোকবিনাশী বিষ থেকে রক্ষা করুন। আপনিই নিখিল জগতের বন্ধু ও মুক্তির অধিপতি। বিচক্ষণ ব্যক্তিরা আশ্রিতদের বিপদনাশক জগদ্গুরু আপনার পূজা করেন। হে বিভু, যে সময় আপনি গুণময়ী নিজের শক্তি দিয়ে জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার করেন, তখন স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানময় এক আপনিই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এই তিন নাম ধারণ করেন। পরমরহস্য ব্রহ্মা, উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট স্বভাব দেব ও অন্যান্য প্রাণীদের আপনিই সৃষ্টি করে থাকেন। আপনি আত্মা, সৃজ্য বস্তুরূপ আপনার থেকে পৃথক নয়। যেহেতু আপনি জগতের ঈশ্বর, এইজন্য নানাশক্তি যোগে প্রকাশমান আপনিই এই আত্মা। আপনার থেকেই বেদের জন্ম হয়েছে বলে আপনার জ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ। মহত্তত্ত্ব, প্রাণ, ইন্দ্রিয় ও দ্রব্যসকলের কারণ যে সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস এই ত্রিবিধ অহংকার, তাও আপনি। আপনিই স্বভাব, কাল আর সংকল্প এবং আপনিই সত্য ও ঋতস্বরূপ ধর্ম। ত্রিগুণাত্মক প্রধান প্রকৃতিও আপনার আশ্রিত—একথা জ্ঞানী ব্যক্তিরা বলে থাকেন। ১৯-২৫

হে ত্রিলোকজনক, নিখিল দেবতাদের আত্মা, সর্বদেবতার মত অগ্নি আপনার মুখ, পৃথিবী আপনার পা, কাল আপনার গতি, দিকসকল আপনার কান ও বরুণ আপনার জিহ্বা এবং আপনি সর্বদেবময়। হে ভগবান, আকাশ আপনার নাভি, বাতাস আপনার নিঃশ্বাস, সূর্য আপনার চোখ, জল আপনার শুক্রধাতু, আপনার আত্মা উত্তম, অধম সমস্ত জীবের আশ্রয়, চন্দ্র আপনার মন ও স্বর্গ আপনার মাথা। হে বেদমূর্তি ভগবান, সমুদ্র আপনার জঠর, পর্বতসমূহ আপনার অস্থিসমষ্টি, সমস্তরকম ওষধি ও লতা আপনার রোম, বেদসমূহ আপনার সপ্তধাতু আর ধর্ম আপনার হৃদয়। তৎপুরুষ, অঘোর, সদ্যোজাত, বামদেব ও ঈশান, এই পাঁচপ্রকার মন্ত্রই আপনার পঞ্চমুখ; তা থেকে আটত্রিশটি মন্ত্র আবির্ভূত হয়েছে। হে দেব, শিব নামক স্বপ্রকাশ যে পরমতত্ত্ব তাই আপনার শান্ত অবস্থা। অধর্মের তরঙ্গসমূহ অর্থাৎ দম্ভ, লোভ প্রভৃতির মধ্যে আপনার ছায়া বর্তমান। সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণ আপনার তিনটি চোখ। আপনিই শাস্ত্রের কর্তা, সাংখ্যজ্ঞানই আপনার আত্মা বা স্বরূপ। রজ, তম ও সত্ত্ব এই তিন গুণের সংসর্গশূন্য আপনার সেই পরমজ্যোতি রূপকে নিখিল লোকপাল, ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং দেবরাজ ইন্দ্র এঁরা কেউ জানতে পারে না। আপনার এই রূপ নির্বেদ পরমব্রহ্ম স্বরূপ। কন্দর্প, দক্ষযজ্ঞ, ত্রিপুর, কালকূট প্রভৃতি ব্যক্তি ও বস্তুকে আপনি বিনষ্ট করলেও ঐ সমস্ত কাজ অতি ক্ষুদ্র বলে স্তুতির অযোগ্য। কারণ প্রলয়ের সময় আপনার চোখের আগুনের একটি কণিকার দ্বারা এই ব্রহ্মাণ্ড ভস্ম হলেও আপনি তাতে ভ্রূক্ষেপ করেন না। যাঁরা আত্মারাম ও বিশ্বের হিতোপদেষ্টা, তাঁরা আপনার পদযুগল হৃদয়ে চিন্তা করেন, আর যারা উমাদেবীর সঙ্গে বিচরণকারী আপনাকে কামুক, শ্মশানচারী, ক্রূর ও হিংস্র বলে ব্যঙ্গ করে সেই নির্লজ্জরা আপনার লীলা বুঝতে অক্ষম, তারা অতি মূর্খ। যে প্রকৃতি কার্য-কারণের অতীত, আপনি সেই প্রকৃতির পরপারে অবস্থিত ভূমা পুরুষ; এজন্য ব্রহ্মারাও আপনার স্বরূপ বলতে পারেন না। এ অবস্থায় আমরা তাঁদের সৃষ্টিমধ্যে অতি অর্বাচীন বলে কোন ভাবেই আপনার স্তুতি করতে সমর্থ নই।

তবুও যে স্তুতি আমাদের নিজশক্তির দ্বারা সম্ভব তাই করলাম। হে মহেশ্বর, আমরা কেবল আপনার এই আবির্ভূত মূর্তিই দেখছি, আপনার পরম রূপ প্রত্যক্ষ করতে পারছি না ; তথাপি এই মূর্তি দেখেই আমরা কৃতার্থ হয়েছি। আপনার কর্ম অব্যক্ত হলেও লোকরক্ষার নিমিত্তই আপনার এই রূপের প্রকাশ। ২৬-৩৫

শুকদেব বললেন, মহারাজ, সকল জীবের বন্ধু ভগবান শম্ভু প্রজাদের এই বিপদ দেখে করুণাপরবশ হয়ে ও ব্যথিতচিত্তে প্রিয়তমা সতীকে বললেন, ভবানি, ক্ষীরোদ সমুদ্র মন্থনে উৎপন্ন কালকূট-বিষ থেকে প্রজাদের কি বিপদ উপস্থিত হয়েছে দেখ। এরা এখন প্রাণরক্ষার নিমিত্ত ব্যাকুল হয়ে পড়েছে। এ অবস্থায় প্রজাদের অভয়দানই আমার অবশ্য কর্তব্য, কারণ বিপন্ন দীনদের রক্ষাই শক্তিমানের কাজ। নিজে মায়ায় মোহিত সাধারণ প্রাণী পরস্পর শত্রুতা করলে সাধুরা নিজেদের ক্ষণভঙ্গুর জীবন দিয়ে প্রাণীদের রক্ষা করেন। কল্যাণি, কৃপাকারী পুরুষের প্রতি শ্রীহরি প্রসন্ন হন আর ভগবান শ্রীহরি সন্তুষ্ট হলে চরাচরসহ আমি প্রসন্ন হই। অতএব সকল প্রাণীর মঙ্গলের জন্য আমি এই কালকূট বিষ গলাধঃকরণ করব। ৩৬-৪০

মহারাজ, বিশ্বের পালক ভগবান শিব এই বলে কালকূট বিষ খেতে প্রবৃত্ত হলেন। দেবী ভবানী তাঁর প্রভাব জানেন বলে তা থেকে তাঁকে নিবৃত্ত করলেন না। তারপর ভূতপালক মহাদেব প্রাণীদের প্রতি কৃপা করে সেই কালকূট বিষ নিজের করতলে রেখে তা পান করলেন। কালকূট বিষও মহাদেবকে নিজের প্রভাব দেখিয়ে তাঁর কণ্ঠকে নীলবর্ণ করেছিল। কণ্ঠের সেই নীলবর্ণ ভগবান শিবের ভূষণ হল। সাধু পুরুষেরা প্রায়ই পরের দুঃখে কাতর হন, পরের জন্য এই অনুকম্পাই ভগবানের পরম আরাধনা। তখন প্রভু শম্ভুর এই অদ্ভুত কাজ দেখে প্রজাগণ, সতী, ব্রহ্মা ও বিষ্ণু সকলেই প্রশংসামুখর হলেন। ঐ কালকূট বিষ পান করবার সময় মহাদেবের হাত থেকে অল্প পরিমাণ বিষ মাটিতে পড়েছিল ; বৃশ্চিক, সর্প, দন্দশূক ও বিষৌষধিসমূহ এবং অন্যান্য বিষধর প্রাণীরা তা গ্রহণ করেছিল। তাতেই তাদের বিষের এত তীব্রতা ! ৪১-৪৬

অষ্টম অধ্যায়

সমুদ্রমন্থনে বিবিধ রত্নরাজিসহ অমৃতের আবির্ভাব

শুকদেব বললেন, মহারাজ, ভগবান শংকর কালকূট বিষ পান করলে দেবতা ও অসুরেরা সন্তুষ্ট হয়ে নতুন উদ্যমে সমুদ্রমন্থন শুরু করলেন এবং তার ফলে যজ্ঞীয় হবির আধার কামধেনু সুরভি সমুদ্রগর্ভ থেকে উঠল। ব্রহ্মলোকের উপযোগী যজ্ঞের ঘিয়ের জন্য ব্রহ্মবাদী ঋষিরা সুরভি গ্রহণ করেছিলেন। তারপর চন্দ্রের মত সাদা রঙের উচ্চৈঃশ্রবা নামে ঘোড়া উঠে এলে দানবরাজ বলি তাকে লাভ করার ইচ্ছা জানালেন। কিন্তু ভগবান শ্রীহরির পূর্ব-পরামর্শক্রমে দেবতারা তা পাওয়ার প্রচেষ্টা থেকে বিরত হন। তারপর ঐরাবত নামে হাতী পর্বতের চূড়ার মত চারটি দাঁত দিয়ে ভগবান শংকরের কৈলাসপর্বতের শোভা হরণ করে বার হল। পরে ঐরাবত প্রভৃতি আটটি দিগ্‌গজ এবং তাদের পত্নী অভ্রমু প্রভৃতি আটটি হস্তিনী উঠেছিল। তারপর সেই মহাসমুদ্র থেকে কৌস্তুভ নামে পদ্মরাগমণি উঠলে ভগবান শ্রীহরি তাঁর নিজ

বক্ষের অলংকার করবার জন্য সেটি আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন। এরপর সমুদ্র থেকে স্বর্গের ভূষণস্বরূপ পারিজাত গাছ উঠল। মহারাজ, আপনি যেমন পৃথিবীতে নিজের অর্থ দিয়ে প্রার্থীদের ইচ্ছা পূরণ করেন, তেমনি ঐ পারিজাতও প্রার্থিত বস্তু দিয়ে প্রার্থীদের ইচ্ছা পূরণ করে। তারপর গলায় সোনার অলংকার ও মনোরম বস্ত্র শোভিত অপ্সরারা উঠে মনোহর গতিভঙ্গী, নানারকম লীলা ও দৃষ্টিপাত করে দেবতাদের অনুরাগ সৃষ্টি করেছিলেন। এরপর সুদামা পর্বতশৃঙ্গে প্রকাশিত বিদ্যুতের মত নিজের কান্তিদ্বারা দশ দিক উদ্ভাসিত করে ভগবৎপরায়ণা লক্ষ্মীদেবী সাক্ষাৎ আবির্ভূত হলেন। তখন তাঁর রূপ, উদারতা, যৌবন, বর্ণ ও মহিমা দেখে দেবতা, অসুর ও মানুষদের সকলেরই মন আকৃষ্ট হল; সকলেই তাঁকে পাবার জন্য আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র তাঁর জন্য অতিবিচিত্র উত্তম আসন, শ্রেষ্ঠ নদীসকল স্বর্ণকলসে পবিত্র জল, অভিষেকের যোগ্য ভূমি, সমস্ত রকম ওষধি, গাভীগণ পঞ্চ গব্য এবং ঋতুরাজ বসন্ত চৈত্র ও বৈশাখ মাসের ফুল নিয়ে এলে ঋষিরা যথাবিধি তাঁর অভিষেক সম্পন্ন করলেন। তখন গন্ধর্বরা মঙ্গলগান, নর্তকীরা নৃত্যগীত আর মেঘেরা তুমুল ধ্বনি তুলে মৃদঙ্গ, পণব, শঙ্খ, বেণু ও বীণা বাজিয়েছিল। ১-১৪

দিগ্‌হস্তীরা স্বর্ণকলস দ্বারা ও ব্রাহ্মণরা বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করে পদ্মহস্তা লক্ষ্মীদেবীর অভিষেক করলেন। এ সময় সমুদ্র তাঁকে পীতবর্ণ কৌষেয় বস্ত্রদ্বয়, বরুণ বৈজয়ন্তীমালা, প্রজাপতি বিশ্বকর্মা নানারকম অলংকার, সরস্বতী হার, ব্রহ্মা পদ্ম আর সাপেরা দুটি কুণ্ডল উপহার দিয়েছিলেন। এইভাবে মঙ্গল অনুষ্ঠান শেষ হলে লক্ষ্মীদেবী একছড়া ভ্রমরগুঞ্জিত পদ্মমালা গ্রহণ করে কুণ্ডলশোভিত কর্ণে এবং সলজ্জ হাসিতে শোভাবিস্তার করে চলতে আরম্ভ করলেন। তাঁর চন্দন আর কুংকুমলিপ্ত সুডৌল স্তনযুগল মধ্যে কোন ব্যবধান ছিল না। নূপুরধ্বনি করে এদিক-ওদিক পা ফেলতে ফেলতে তিনি স্বর্ণলতিকার মত ভ্রমণ করছিলেন। এই সময়ে তিনি নিজের আশ্রয়ের জন্য সকল গুণের আধার ও অনিন্দ্য কোন নিত্য পুরুষের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়ে গন্ধর্ব, সিদ্ধ, অসুর, যক্ষ, চারণ ও দেবতাদের মধ্যে কাউকে পেলেন না, কারণ সকলের মধ্যেই একটি করে দোষ ছিল। তিনি বিচার করে দেখলেন যে কারও তপস্যা আছে কিন্তু ক্রোধ জয় করতে পারেন নি, যেমন দুর্বাসা প্রভৃতি; কারও জ্ঞান আছে কিন্তু সে জ্ঞান আসক্তিশূন্য নয়, যেমন বৃহস্পতি ও শুক্রাচার্য প্রভৃতি; কেউ মহান অথচ কামকে জয় করতে পারেন নি, যেমন ব্রহ্মা, চন্দ্র প্রভৃতি। এরকম কেউ বা অপরের অপেক্ষা করেন অতএব তাঁর পক্ষে ঈশ্বরত্ব সম্ভব নয়, যেমন ইন্দ্রাদি দেবতারা; কারও ধর্মানুষ্ঠান আছে, অথচ তিনি প্রাণীদের প্রতি দয়ালু নন, যেমন পরশুরাম; কারও ত্যাগ আছে অথচ তিনি মুক্তির কারণ নন, যেমন শিবি প্রভৃতি; আবার কারও বীরত্ব আছে কিন্তু কালের প্রভাব থেকে তিনি মুক্ত অর্থাৎ চিরস্থায়ী নন, যেমন কার্তবীর্য প্রভৃতি। এইরূপ যিনি প্রাকৃত গুণের সংসর্গ থেকে মুক্ত, তিনিও সমাধিনিষ্ঠ বলে তাঁর সহচর হতে পারেন না, যেমন সনক প্রভৃতি। মার্কণ্ডেয় প্রভৃতির আয়ু দীর্ঘ হলেও ইন্দ্রিয়কে দমন করার জন্য তাঁদের শীল ও মঙ্গলের অভাব। হিরণ্যকশিপু প্রভৃতির মধ্যে শীল ও মঙ্গল থাকলেও বিষ্ণুকে বিদ্বেষ করার জন্য আয়ুর স্থিরতা নেই। আবার শংকরের শীল, মঙ্গল ও আয়ু থাকলেও নিজে শ্মশানবাস প্রভৃতি অমঙ্গল আচরণযুক্ত। কিন্তু এমন এক পুরুষ আছেন যিনি সর্বগুণসম্পন্ন এবং সমস্ত দোষ থেকে মুক্ত, অথচ আত্মারাম বলে লক্ষ্মীকেও আকাঙ্ক্ষা করেন না। ১৫-২৩

লক্ষ্মীদেবী এরকম বিচার করে অবশেষে ধর্মজ্ঞান ও শাশ্বত সত্ত্বগুণের আধার এবং প্রাকৃত গুণের অতীত শ্রীহরিকেই নিজের একমাত্র আশ্রয় জেনে তাঁকেই পতিরূপে বরণ করলেন। তিনি ভাবলেন শ্রীহরি সর্বনিরপেক্ষ হয়েও যেহেতু আশ্রিত অণিমাদি সিদ্ধিসমূহকে উপেক্ষা করেন না, অতএব আমাকেও উপেক্ষা করবেন না। তারপর তিনি মত্ত ভ্রমর গুঞ্জিত নূতন পদ্মফুলের মালাটি শ্রীহরির গলায় পরিয়ে তাঁর বক্ষস্থলে আশ্রয় লাভের আশায় সলজ্জ হাসিমুখে উৎফুল্লনয়নে মৌনভাবে অপেক্ষা করতে লাগলেন। তখন ত্রিজগতের জনক শ্রীহরি নিজের বক্ষস্থলে ত্রিলোকজননী লক্ষ্মীদেবীকে আশ্রয় দিলেন। লক্ষ্মীদেবীও সেই আশ্রয় গ্রহণ করে করুণামিশ্রিত দৃষ্টি দিয়ে আপন প্রজা, লোকপালদের ও ত্রিলোকের সম্পদ বাড়াতে লাগলেন। এ সময়ে সস্ত্রীক দেবানুচরেরা নৃত্যগীত আরম্ভ করলে তাঁদের শংখ, ভেরী, মৃদঙ্গ প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের তুমুল শব্দ শোনা যেতে লাগল। ব্রহ্মা, রুদ্র, অঙ্গিরা প্রভৃতি বিশ্বস্রষ্টা পুরুষেরা পুষ্পবৃষ্টি করতে করতে মন্ত্র উচ্চারণ করে বিষ্ণুর মহিমা কীর্তন করলেন। তারপর লক্ষ্মীদেবীর কৃপাদৃষ্টি লাভ করে দেবতা ও প্রজাপতিদের সঙ্গে সমস্ত প্রজা শীলাদি সদ্গুণ সম্পন্ন হয়ে পরম সুখের অধিকারী হল। আর এ সময়ে দৈত্য ও দানবরা লক্ষ্মীদেবী দ্বারা উপেক্ষিত হওয়ায় নির্লজ্জ, বীর্যহীন, লোভপরবশ ও উদ্যমশূন্য হয়ে পড়ল। ২৪-৩০

তারপর সমুদ্র থেকে সুরার অধিষ্ঠাত্রী দেবী কমলনয়না বারুণী আবির্ভূত হলে শ্রীহরির অনুমতিতে অসুরেরা তাকে গ্রহণ করল। মহারাজ, অমৃতলাভাকাঙ্ক্ষী দেবতারা আবার সমুদ্রমন্থন করতে থাকলে সেখান থেকে পরম অদ্ভুত এক পুরুষের আবির্ভাব হল। তাঁর বাহু দুটি দীর্ঘ ও স্থূল, গলা শংখের নাভির মত রেখাত্রয়যুক্ত, দুই চোখ রক্তবর্ণ, দেহের কান্তি শ্যামল। তিনি বয়সে যুবা এবং মালা ইত্যাদি সবরকম অলংকারে বিভূষিত ছিলেন। তাঁর পরিধানের বস্ত্র পীতবর্ণ, বক্ষ বিশাল, কানে সুমার্জিত মণিময় কুণ্ডল আর কেশের প্রান্তভাগ স্নিগ্ধ, কুঞ্চিত ও শোভাবর্ধক ছিল। বলয়ভূষিত ও সুধাভাণ্ডধারী সেই সিংহবিক্রম পুরুষ ভগবান বিষ্ণুর অংশের অংশ থেকে উদ্ভূত হয়ে ধন্বন্তরি নামে খ্যাত হলেন। ইনি আয়ুর্বেদশাস্ত্রে বিশারদ আর যজ্ঞেরও অংশভাগী। অসুরেরা তাঁকে এবং তাঁর হাতে অমৃত-কলস দেখে অমৃত সম্পূর্ণ আত্মসাৎ করবার জন্য বলপূর্বক ঐ কলসটি কেড়ে নিল। অসুরেরা অমৃতকলস নিয়ে গেলে দেবতারা বিষণ্ণমনে শ্রীহরির শরণাপন্ন হলেন। ভৃত্যদের বাঞ্ছাপূরক ভগবান শ্রীহরি তাঁদের ঐ দুর্দশা দেখে বললেন, দেবগণ, তোমরা খেদ করো না, আমি নিজের মায়া দিয়ে অসুরদের পরস্পরের মধ্যে কলহ বাধিয়ে দিয়ে তোমাদের ইচ্ছা পূরণ করব। ৩১-৩৮

মহারাজ, তারপর অমৃতের অধিকার নিয়ে লোভী অসুরদের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হল। 'আমি আগে খাব', 'তুমি খাবে না'—এরূপ বলতে বলতে তারা কলহ আরম্ভ করল। প্রবল দৈত্যরা কলস কেড়ে নিলে দুর্বলেরা হিংসাপরবশ হয়ে তাদের বার বার নিবারণ করে বলল, এই অমৃত উৎপাদনে দেবতারাও সমান ক্লেশ করেছেন। সত্রযজ্ঞে যেমন সকলেই সমান ফলভাগী, সেরকম এখানেও তাঁদের নিজেদের অংশের অধিকার রয়েছে, এই সনাতন ধর্ম। ৩৯-৪১

মহারাজ, ইতিমধ্যে সর্ববিষয়ে উপায়জ্ঞ ভগবান শ্রীহরি এক অতি আশ্চর্য ও অবর্ণনীয় স্ত্রীরূপ ধারণ করলেন। ঐ সর্বাঙ্গসুন্দর স্ত্রীরূপ নীলোৎপলের

ন্যায় শ্যামবর্ণ ও মনোহর। তাঁর অবয়ব সর্বাঙ্গসুন্দর—কান দুটি পরস্পর সমান ও অলংকারশোভিত, দুই গাল সুগঠিত, নাক উন্নত, নবযৌবনের উন্মেষে পরিপুষ্ট স্তনযুগলের ভারহেতু উদার অতিকৃশ, চোখদুটি মুখসৌরভ দ্বারা আকৃষ্ট ভ্রমরদের ঝংকারহেতু চঞ্চল। মনোরম কেশপাশ প্রস্ফুটিত মল্লিকাফুলের মালায় বেষ্টিত। তাঁর সুন্দর গলায় কণ্ঠাভরণ এবং সুন্দর হাতে কেয়ূরের শোভা প্রকাশ পাচ্ছিল। সুনির্মল বস্ত্রাবৃত বিশাল নিতম্ব চন্দ্রহারে অলংকৃত হয়েছিল। এ অবস্থায় তাঁর চঞ্চল চরণযুগলে নূপুরধ্বনি মুখরিত হয়েছিল। আর তিনি সলজ্জ মধুর হাসিতে ভ্রূযুগল কম্পিত করে মোহনদৃষ্টিতে দৈত্যপতিদের চিত্তে নিরন্তর কামের বাসনা জাগিয়ে তুলছিলেন। ৪২-৪৭

নবম অধ্যায়

অমৃত-পরিবেশন

শুকদেব বললেন, মহারাজ, তখন সেই অসুরেরা সৌহার্দ্যহীন দস্যুর মত একে অন্যের কাছ থেকে সুধাভাণ্ড কেড়ে নিয়ে পরস্পর বিবাদ করছিল। ইতিমধ্যে সেই মোহিনী স্ত্রীমূর্তিকে তাদের দিকে আসতে দেখে অসুরেরা কামপীড়িত হয়ে ভাবতে লাগল—আহা! এর কি সুন্দর রূপ, কি অদ্ভুত কান্তি, কি মনোরম নবযৌবন! তারা তাঁর দিকে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, পদ্মপলাশলোচনে, তুমি কে? কোথা থেকে এসেছ? তুমি কারই বা কন্যা? তোমার উদ্দেশ্য কি? তুমি আমাদের সারা মনকে আলোড়িত করছ। সুন্দরি, আমরা জানি যে দেবতা, দৈত্য, সিদ্ধ, গন্ধর্ব ও চারণেরা এমন কি লোকপালেরা কেউই তোমাকে স্পর্শ করেন নি, অতএব মানুষেরা কি করে তোমাকে. পাবে? করুণাময় বিধাতা প্রাণীদের সমস্ত ইন্দ্রিয় ও চিত্তের শান্তির জন্য কি তোমাকে পাঠিয়েছেন? আমরা জ্ঞাতিরা একই বস্তু লাভের জন্য একে অন্যের সঙ্গে শত্রুতা করেছি। তুমি আমাদের মঙ্গল কর। আমরা সকলেই কশ্যপের পুত্র বলে পরস্পর ভাই, আর সকলেই এই অমৃত লাভ করবার জন্য বল প্রকাশ করেছি। অতএব তুমি আমাদের উচিতভাবে এই অমৃত ভাগ করে দাও যাতে আমাদের মধ্যে কোনরূপ ঝগড়া না হয়। দৈত্যরা স্ত্রীরূপী ভগবান শ্রীহরির কাছে এরূপ প্রার্থনা করলে তিনি হেসে মনোরম কটাক্ষে তাদের দিকে চেয়ে বললেন, কশ্যপ পুত্রগণ, আমি বেশ্যা, তোমরা কি জন্য আমাকে কামনা করছ? পণ্ডিত ব্যক্তিরা কখনও রমণীদের বিশ্বাস করেন না। অসুরগণ, পণ্ডিতেরা কুকুর আর বেশ্যা রমণীদের প্রণয়কে অনিত্য বলে থাকেন, যেহেতু তারা প্রতিদিন নূতন প্রণয়ীর খোঁজ করে। ১-১০

শুকদেব বললেন, অসুরেরা মোহিনী রমণীর এই পরিহাসবাক্যে আশ্বস্ত হয়ে হেসে তাঁর হাতে সুধাভাণ্ড দিল। তখন শ্রীহরি সেই সুধাভাণ্ড হাতে নিয়ে মৃদু হেসে বললেন; আমার কাজ সঙ্গত বা অসঙ্গত যাই হোক, তোমরা যদি নির্বিচারে তা স্বীকার কর; তা হলেই আমি তোমাদের এই অমৃত ভাগ করে দিতে পারি। অসুরপতিরা সেই মোহিনী মূর্তির লীলা বুঝতে না পেরে তাঁর কথায় সম্মতি জানাল। তারপর তারা সকলে উপবাসী থেকে স্নান ও ঘৃতাহুতি দিয়ে গো-ব্রাহ্মণকে নমস্কার করলে ব্রাহ্মণরা তাদের স্বস্ত্যয়ন কাজ শেষ করলেন। এরপর

সকলে নিজের নিজের রুচিমত নতুন কাপড়, অলংকার পরে কুশাসনে বসলেন। তখন দেবতা ও অসুরেরা মালা আর প্রদীপে শোভিত ও ধূপের গন্ধযুক্ত ঘরের মধ্যে পূব দিকে মুখ করে বসলে মদমত্তনয়না সেই মোহিনীমূর্তি হাতে সুধাকুম্ভ নিয়ে সোনার নূপুরের সঙ্গীতধ্বনি করতে করতে সেই ঘরে ঢুকলেন। তাঁর সুগোল স্তনযুগল দুটি কলসের মত শোভা পাচ্ছিল, আর মনোরম পট্টবস্ত্রশোভিত বিশাল নিতম্বের ভারে তাঁর গতিবেগ মন্থর হয়েছিল। দেবাসুরগণ সেই পরমদেবতা শ্রীহরিকে দেখলেন যেন লক্ষ্মীর সখী ; তাঁর শ্রবণে কনক কুণ্ডল এবং কর্ণ, নাসিকা, গণ্ডদেশ ও বদন সুচারু, তাঁর কটাক্ষে মৃদুহাসি প্রকাশ পাচ্ছিল ও স্তনযুগল থেকে কঞ্চুক বিগলিত হচ্ছিল। দেবাসুরগণ তাঁকে দেখে মুগ্ধ হয়ে পড়ল। ১১-১৮

তখন হিংস্র ও ক্রূর অসুরদের অমৃতদান সাপেদের দুধ দেওয়ার মতই অনুচিত বিবেচনা করে শ্রীহরি তাদের সুধার ভাগ দিলেন না। তিনি দেবতা ও অসুরদের আলাদা আলাদা পংক্তিতে বসালেন। তারপর মোহিনীমূর্তি ভগবান সমাদর আর প্রিয়বাক্য দ্বারা দৈত্যদের মন ভুলিয়ে দূরে উপবিষ্ট দেবতাদের জরামৃত্যুনাশক সেই অমৃত পান করাতে লাগলেন। স্ত্রীলোকের সঙ্গে ঝগড়া করা নিন্দনীয় বলে অসুরেরা পূর্বকৃত শপথ রক্ষা করে মৌনভাবেই বসে রইল। বস্তুত তারা সেই মোহিনীর প্রতি প্রণয়াসক্ত হওয়ায় প্রণয়ভঙ্গের আশংকায় কাতর ছিল, আর মোহিনীও নানারকম সমাদর দ্বারা তাদের অনুরক্ত করায় তারা কোনরকম বিরুদ্ধ ও অপ্রিয় কথা বলল না। অসুর রাহু দেবচিহ্ন দ্বারা নিজের রূপ গোপন করে দেবতাদের পঙ্‌ক্তিতে চন্দ্র আর সূর্যের মাঝখানে প্রবেশ করে অমৃত পান করছিল। চন্দ্র আর সূর্য তার স্বরূপ প্রকাশ করে দিলেন। তখন ভগবান শ্রীহরি অমৃতপানে রত রাহুর মাথাটি চক্র দিয়ে কেটে ফেললে তার মুণ্ডহীন দেহটা সুধাসিক্ত না হয়েই ভূতলে পড়ল। তবে ছিন্ন মুণ্ডটি সুধাপানের জন্য অমরত্ব লাভ করলে ভগবান ব্রহ্মা তাকে গ্রহ করে দেন। সেই রাহুগ্রহ শত্রুতাহেতু এখনও পূর্ণিমা আর অমাবস্যায় চন্দ্র-সূর্যকে গ্রাস করার জন্য তাদের দিকে ধাবিত হয়। ১৯-২৬

দেবতাদের অমৃতপান শেষ হলে লোকপালক ভগবান শ্রীহরি অসুরদের সামনেই আবার নিজের রূপ ধারণ করলেন। মহারাজ, সমুদ্র-মন্থনের সময় দেবতা ও অসুরদের দু'দলেরই দেশ, কাল, হেতু,[১] অর্থ,[২] কর্ম, বুদ্ধি সমানই ছিল। কিন্তু দু'দলের বিভিন্ন ফললাভ হল। কারণ দেবতারা শ্রীহরির পাদপদ্মরেণু আশ্রয় করেছিলেন বলে অমৃত লাভ করলেন, কিন্তু অসুরেরা তা না করায় অমৃতপানে অসমর্থ হয়। এই শ্রীহরিই সকলের একমাত্র সেব্য। ২৭-২৮

মহারাজ, ঈশ্বরের থেকে পৃথক বোধে মানুষেরা দেহ ও পুত্র ইত্যাদির উদ্দেশ্যে প্রাণ, ধন, কর্ম, মন ও বাক্যদ্বারা যা অনুষ্ঠান করে, তা ভেদবুদ্ধির প্রভাবে অসৎ অর্থাৎ ব্যর্থ হয়। কিন্তু ঐ প্রাণাদি দ্বারাই ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে যা দেওয়া হয়, তা সৎ অর্থাৎ সার্থক হয়। কারণ ঈশ্বর সর্বগত বলে তাঁর তর্পণ করে দেহ প্রভৃতি সমস্ত পদার্থেরই তৃপ্তি হয়ে থাকে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, বৃক্ষের মূলে জল দিলে তা কাণ্ড, শাখা প্রভৃতি সমস্ত অবয়বকেই সিক্ত করে ; কিন্তু মূল বাদ দিয়ে কেবল কণ্ড আর শাখায় জল দিলে গাছের সমস্ত অংশের সেচন হয় না।[৩] ২৯

১ মন্থনোপায় মন্দর পর্বত। ২ সমুদ্রের জলে যে সব লতা, ওষধি নিক্ষেপ করা হয়েছিল।

৩ গীতা বলেন : যাঁর অন্তঃকরণ থেকে সমস্ত আসক্তি দূর হয়েছে, যিনি অহঙ্কারশূন্য এবং যাঁর চিত্ত ব্রহ্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত—এরূপ পুরুষের যজ্ঞরূপে অনুষ্ঠিত সমস্ত কর্ম লয়প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ তিনি কর্মবন্ধনে আবদ্ধ হন না। —গীতা, ৪।২৩

দশম অধ্যায়

দেবাসুর-সংগ্রাম

শুকদেব বললেন, মহারাজ, দানব ও দৈত্যরা মন্থনকার্যে নিযুক্ত থেকেও শ্রীহরির প্রতি বিমুখতার কারণে অমৃতলাভে সমর্থ হয় নি। গরুড়বাহন ভগবান শ্রীহরি অমৃত উদ্ধার করে নিজের অনুগত দেবতাদের তা পান করালেন এবং সকলের বিস্মিত দৃষ্টির সামনে নিজধামে চলে গেলেন। তখন দৈত্যরা শত্রুদের এপ্রকার পরম সমৃদ্ধি দেখে অসহিষ্ণু হয়ে অস্ত্র-শস্ত্র তুলে যুদ্ধের জন্য দেবতাদের দিকে অগ্রসর হল। অমৃতপানে শক্তিমান এবং শ্রীহরির পদাশ্রিত দেবতারাও সকলে মিলে অস্ত্র নিয়ে অসুরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন। মহারাজ, এইভাবে ক্ষীরোদসমুদ্রের তীরে দু'দলের মধ্যে তুমুল রোমাঞ্চকর যুদ্ধ হয়েছিল। ঐ যুদ্ধ দেবাসুর সংগ্রাম নামে বিখ্যাত। এই যুদ্ধে শত্রুভাবাপন্ন ও ক্রুদ্ধচিত্ত দেবতা ও অসুরেরা খড়্গ, বাণ ও অন্যান্য নানা অস্ত্র দিয়ে পরস্পরকে আঘাত করতে লাগলেন। সেই যুদ্ধক্ষেত্র শঙ্খ, তূর্য, মৃদঙ্গ, ভেরী ও ডমরুর ধ্বনিতে এবং হাতী, ঘোড়া, রথ আর পদাতিকদের হুংকারে ভীষণ হয়ে উঠল। সেখানে রথীরা রথীদের সঙ্গে, পদাতিকরা পদাতিকদের সঙ্গে, ঘোড়ারা ঘোড়াদের সঙ্গে আর হাতীরা হাতীদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হল। দেবতা ও অসুর এই উভয় পক্ষের সৈন্যদের মধ্যে কেউ উট, কেউ হাতী, কেউ গাধা, কেউ ভাল্লুক, কেউ বাঘ, কেউ বানর, কেউ শকুন, কাক, বক, ঈগল ও ভাস, কেউ বা তিমিঙ্গিল, হরিণ, মহিষ, গণ্ডার, বৃষ, গবয়, শিয়াল, ইঁদুর, কৃকলাশ, খরগোশ, মানুষ, ছাগল, কৃষ্ণসার, হাঁস, শূকরে আরোহণ করে যুদ্ধ করেছিল। আবার অন্য যোদ্ধারা বিকটাকার জলচর ও স্থলচর পাখীতে আরূঢ় হয়ে শত্রুর সম্মুখীন হলেন। দেবতা ও অসুরের দুই সেনাবাহিনী পতাকার বিচিত্র বস্ত্র, শ্বেতছত্র, মহামূল্য হীরকদণ্ডযুক্ত পাখা, উত্তরীয়, উষ্ণীষ, বর্ম সূর্যকিরণ স্পর্শে সমুজ্জ্বল অস্ত্ররাশি নানারকম ভূষণ, এবং শ্রেণীবদ্ধ বীরগণের সমাবেশে হিংস্র জন্তু সংকুল দুটি বিশাল সাগরের ন্যায় দেখাচ্ছিল। ১-১৫

যুদ্ধক্ষেত্রে অসুরবাহিনীর অধিপতি বিরোচনপুত্র বলি ময়দানবের তৈরী ইচ্ছানুরূপ গতিশালী 'বৈহায়স' নামক আকাশগামী বিমানে আরোহণ করে উদয়গিরির চন্দ্রের মত শোভা পেতে লাগল। সেই উত্তম বিমানটি সবরকম যুদ্ধসম্ভারে সুসজ্জিত, অত্যাশ্চর্য, তর্কাতীত ও অবর্ণনীয় ছিল। এটি কখনও কখনও দৃষ্টি-গোচর, কখনও বা অদৃশ্য হয়ে যেত। বলিরাজ ঐ বিমানে চড়ে সেনাপতিদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে চামর, পাখা ও উত্তম রাজছত্রে সুশোভিত হয়েছিলেন। তখন নমুচি, শম্বর, বাণ, বিপ্রচিত্তি, অয়োমুখ, দ্বিমূর্ধা, কালনাভ, প্রহেতি, হেতি, ইল্বল, শকুনি, ভূতসন্তাপনন, বজ্রদংষ্ট্রা, বিরোচন, হয়গ্রীব, শঙ্কুশিরা, কপিল, মেঘদুন্দুভি, তারক, চক্রদৃক্, শুম্ভ, নিশুম্ভ, জম্ভ, উৎকল, অরিষ্ট, অরিষ্টনেমি, ত্রিপুরাধিপ ময় এবং পৌলোম, কালেয়, নিবাতকবচ প্রভৃতি অন্যান্য অসুরসেনাপতি-গণ রথে চড়ে বলিরাজের চারদিকে অবস্থান করছিল। এরা সকলেই সমুদ্রমন্থনের কষ্টস্বীকার করেছিল, কিন্তু কেউ অমৃতের ভাগ পায় নি। এরা যুদ্ধে অনেকবার দেবতাদের পরাজিত করেছিল। এখন এরা সকলেই সিংহনাদ করতে করতে শঙ্খধ্বনিতে দশদিক নিনাদিত করল। ১৬-২৪

দেবরাজ ইন্দ্র শত্রুদের দর্প দেখে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। তিনি মদস্রাবী ঐরাবতের পিঠে চড়ে প্রস্রবণযুক্ত উদয় পর্বতের উপরে সূর্যের মত শোভা পাচ্ছিলেন। আর

নানা বাহন, ধ্বজ ও অস্ত্রধারী দেবতারা এবং বায়ু, অগ্নি, বরুণ প্রভৃতি লোকপালেরা ইন্দ্রকে ঘিরে অবস্থান করছিলেন। তখন দেবতা আর অসুরেরা পরস্পরকে নাম ধরে আহ্বান ও তিরস্কার করতে করতে সামনে গিয়ে দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন। মহারাজ, তার মধ্যে ইন্দ্রের সঙ্গে বলি, তারকাসুরের সঙ্গে কার্তিক, হেতির সঙ্গে বরুণ, প্রহেতির সঙ্গে মিত্র, কালনাভের সঙ্গে যম, ময়ের সঙ্গে বিশ্বকর্মা, ত্বষ্টার সঙ্গে শম্ভর, বিরোচনের সঙ্গে সবিতা, অপরাজিতের সঙ্গে নমুচি, বৃষপর্বার সঙ্গে অশ্বিনীকুমারযুগল, বাণ প্রমুখ একশ বলিপুত্রের সঙ্গে সূর্যদেব, রাহুর সঙ্গে চন্দ্র, পুলোমার সঙ্গে বায়ু, নিশুম্ভ ও শুম্ভের সঙ্গে বেগবতী দেবী ভদ্রকালী, জম্ভের সঙ্গে বৃষাকপি, মহিষাসুরের সঙ্গে অগ্নি, ব্রহ্মার পুত্রদের সঙ্গে ইল্বল ও বাতাপি, কামদেবের সঙ্গে দুর্মর্ষ, মাতৃগণের সঙ্গে উৎকল, শুক্রাচার্যের সঙ্গে বৃহস্পতি, নরকাসুরের সঙ্গে শনি, নিবাতকবচদের সঙ্গে মরুদ্‌গণ, কালকেয়গণের সঙ্গে বসুগণ, পৌলোমগণের সঙ্গে বিশ্বদেবগণ আর ক্রোধবশগণের সঙ্গে রুদ্রগণ যুদ্ধ করেছিলেন। ২৫-৩৪

এইভাবে সেই রণক্ষেত্রে দেবতা ও অসুরেরা দ্বন্দ্বযুদ্ধ করতে করতে জয়লাভের আকাঙ্ক্ষায় পরস্পরকে আক্রমণ করে প্রবলশক্তিতে তীক্ষ্ন বাণ, খড়্গ, ও তোমর দ্বারা আঘাত করেছিলেন। তাঁরা ভুশুণ্ডি, চক্র, গদা, ঋষ্টি পট্টিশ, শক্তি, উল্মুক, প্রাস, কুঠার, নিস্ত্রিংশ, ভল্ল, পরিঘ, মুদ্গর আর ভিন্দিপাল দিয়ে পরস্পরের শিরচ্ছেদ করেছিলেন। অস্ত্রের আঘাতে হাতী, ঘোড়া, রথ, পদাতিক ও আরোহীদের সঙ্গে বাহনদেরও হাত, গলা, পা, ধ্বজ, ধনু, বর্ম আর ভূষণগুলি ছিন্নভিন্ন হয়েছিল। মহারাজ, তখন দেবতা আর অসুরদের পায়ের আঘাত ও রথের চক্রের দ্বারা যুদ্ধক্ষেত্রের মাটি চূর্ণ-বিচূর্ণ হলে ধূলিরাশি ক্রমশ আকাশ ও সূর্যকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। কিন্তু পরক্ষণে যোদ্ধাদের রক্তে রণভূমি সিক্ত হওয়াতে ধূলিজাল নিবৃত্ত হল। সেই যুদ্ধক্ষেত্র তখন যোদ্ধাদের ছিন্ন মাথা, অলংকার এবং অস্ত্রধারী বিরাট বিরাট বাহুদ্বারা পরিব্যাপ্ত হয়ে বিচিত্র আকার ধারণ করেছিল। ঐ সকল ছিন্নমুণ্ড সেই অবস্থায়ও দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়িয়ে রেখেছিল, তাদের চোখে ক্রোধের চিহ্ন প্রকাশ পাচ্ছিল আর ঐ সমস্ত মুণ্ডের মুকুট আর কুণ্ডল স্থানচ্যুত হয়ে এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়েছিল। তারপর দু'পক্ষের মৃত সৈন্যদের কবন্ধগুলি উঠে এসে অস্ত্র নিয়ে বিপক্ষের সৈন্যদের আক্রমণ করতে লাগল। আপন আপন ছিন্নমুণ্ডের চোখ দিয়েই তারা দেখছিল। তখন অসুররাজ বলি ইন্দ্রের প্রতি দশটি বাণ, ঐরাবত হাতীর প্রতি তিনটি, ঐরাবতের চার পাদরক্ষকের প্রতি চারটি আর এক বাণ হাতীর চালকের প্রতি নিক্ষেপ করলেন। কিন্তু লক্ষ্যস্থানে আসার আগেই দেবরাজ ইন্দ্র ভল্লাস্ত্র দিয়ে ঐ সকল বাণকে অনায়াসে সহাস্যে ছেদন করলেন। তাঁর কাজে অসহিষ্ণু হয়ে অসুররাজ একটি শক্তি হাতে নিলেন। কিন্তু দেবরাজ প্রদীপ্ত উল্কার মত সমুজ্জ্বল সেই শক্তিটিকে শত্রুর হাতে থাকতেই ছেদন করলেন। এরপর বলি ক্রমে শূল, প্রাস, তোমর, ঋষ্টি যে অস্ত্রই ধরেন দেবরাজ ইন্দ্র তাদের সব খণ্ড বিখণ্ড করেন। মহারাজ, তারপর বলি যুদ্ধক্ষেত্রে অদৃশ্য হয়ে আসুরী মায়া সৃষ্টি করলেন। প্রথমে দেব-সৈন্যদের উপরে একটা পর্বত আবির্ভূত হল। তারপর আগুনের হলকায় পুড়ে জ্বলন্ত গাছগুলি তাদের উপর পড়তে শুরু করল আর পাথরকাটা অস্ত্রের মত তীক্ষ্ন শিলাখণ্ড নেমে এসে দেবসৈন্যদের আহত করতে লাগল। তার উপর মহাসর্প, বৃশ্চিক, সিংহ, বাঘ, বরাহ, বড় বড় হাতীরা এসে দেবসৈন্যদের আক্রমণ করল। শত শত নগ্নমূর্তি রাক্ষস ও রাক্ষসী শূল হাতে নিয়ে মার্ মার্ কাট্ কাট্ শব্দে দেবতাদের দিকে ছুটে আসতে লাগল। এরপর আকাশে গর্জনকারী মেঘরাশি বাতাসের আঘাতে আগুনে

বর্ষণ করতে শুরু করল। তারপর মায়াবী দৈত্যরাজ সৃষ্ট সেই আগুন বাতাসের সাহায্যে প্রলয়াগ্নির মত উগ্রমূর্তি ধারণ করে দেবসেনাদের দগ্ধ করতে লাগল। সবশেষে দেবসৈন্যদের চারদিকে উদ্বেল সমুদ্রের আবির্ভাব হল আর প্রবল বাতাসের আঘাতে ক্ষুব্ধ হয়ে তা ঢেউ আর ঘূর্ণিসমূহ দ্বারা ভয়ংকর মূর্তি ধারণ করল এবং সকল দিক গ্রাস করতে উদ্যত হল। যুদ্ধক্ষেত্রে মহামায়াবী দৈত্যরা নানারকম মায়া সৃষ্টি করতে আরম্ভ করলে দেবসৈন্যরা হতাশ ও বিষণ্ন হয়ে পড়ল। ৩৫-৫২

মহারাজ, ইন্দ্রাদি দেবতারা যখন নানারূপ চিন্তা করেও এই সমস্ত মায়ার কোন প্রতিকার করতে পারলেন না, তখন বিশ্বপালক ভগবান শ্রীহরির ধ্যান করায় তিনি সেখানে আবির্ভূত হলেন। তাঁর পরিধানে পীতবস্ত্র, চোখ দুটি নবপ্রস্ফুটিত পদ্মের মত, বক্ষস্থলে কৌস্তুভমণি, মাথায় মহামূল্য মুকুট আর কানে কুণ্ডল। ভগবান শ্রীহরি গরুড়ের কাঁধে চড়ে নিজের হাতে আট প্রকার অস্ত্র নিয়ে সকলের সামনে এসে উপস্থিত হলেন। মহারাজ, জেগে উঠলে পর স্বপ্ন যেরকম বিলীন হয়, সেরকম মহাপ্রভাবশালী শ্রীহরি আগমন করলে তাঁর মহিমায় অসুরদের মায়াজাল কূটমন্ত্রের মত নষ্ট হয়ে গেল। কারণ ভগবানের আবির্ভাব জগতের সর্ববিপত্তি-নাশক। সিংহবাহন কালনেমি যুদ্ধক্ষেত্রে গরুড়বাহন শ্রীহরিকে দেখে একটি শূল ঘুরিয়ে তাঁর দিকে ছুঁড়লে গরুড়ের মাথায় পড়ার আগেই শ্রীহরি সেটি ধরে নিয়ে তা দিয়েই শত্রুকে বধ করলেন। তারপর মহাবলশালী মালী ও সুমালী শ্রীহরির চক্রের আঘাতে ছিন্নমুণ্ড হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে লুটিয়ে পড়ল। তখন মাল্যবান প্রচণ্ড গদা দিয়ে তাঁকে আঘাত করে আবার গরুড়কে আঘাত করামাত্রই আদিপুরুষ শ্রীহরি চক্র দিয়ে সেই গর্জনকারী শত্রুর মস্তক ছেদন করলেন। ৫৩-৫৭

একাদশ অধ্যায়

দেবাসুরের যুদ্ধাবসান

শুকদেব বললেন, মহারাজ, তারপর ইন্দ্র, বায়ু প্রভৃতি দেবতারা পরমপুরুষ শ্রীহরির কৃপায় চৈতন্যলাভ করে আঘাতকারী সেই শত্রুদের প্রচণ্ড প্রত্যাঘাত করতে লাগলেন। ইন্দ্র যখন ক্রুদ্ধ হয়ে বলির প্রতি বজ্র তুললেন তখন সমস্ত লোক হাহাকার করে উঠল। মনস্বী বলি অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে রণক্ষেত্রে বিচরণ করলে ইন্দ্র তাঁকে তিরস্কার করে বলতে লাগলেন, মূঢ়, কপট লোকেরা যেমন বালকদের চোখ বেঁধে তাদের ধন হরণ করে, তুমিও সেই রকম মায়া বিস্তার করে আমাদের জয় করতে ইচ্ছা করছ। যারা মায়া দিয়ে স্বর্গরাজ্য জয় করতে যায় কিংবা স্বর্গ অতিক্রম করে মুক্তিপদ লাভে ইচ্ছুক হয়, আমি সেই মূঢ় দস্যুদের পূর্বস্থান অপেক্ষাও নিম্নস্থানে নিক্ষেপ করি। আমি এখন এই শতগ্রন্থিবিশিষ্ট বজ্র দিয়ে তোমার মাথা কাটছি, তুমি জ্ঞাতিদের সঙ্গে এর প্রতিকারের চেষ্টা কর। বলি বললেন, দেবরাজ, কালই জীবের কর্মের প্রেরণা দেয় অর্থাৎ জীবেরা কালপ্রেরিত হয়েই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। যোদ্ধাদের কখনও বিজয়কীর্তি এবং কখনও পরাজয় ও মৃত্যু ঘটে থাকে। পণ্ডিতেরা এই জগৎকে কাল-নিয়ন্ত্রিত বলেই মনে করেন, অতএব তাঁরা ঐহিক সুখ-দুঃখে আনন্দ বা শোক করেন না। কিন্তু তোমরা এ বিষয়ে অজ্ঞ। তোমরা জয় ও পরাজয় বিষয়ে নিজেদের কর্তা মনে করছ বলে তোমরা সত্যিই শোকের পাত্র, সুতরাং আমরা তোমাদের এই মর্মপীড়াজনক বাক্য গ্রাহ্য করি না। ১-৯

শুকদেব বললেন, মহারাজ, মহাবীর বলি দেবরাজ ইন্দ্রকে এরূপে তিরস্কার করলেন এবং ধনুর জ্যা কর্ণ পর্যন্ত আকৃষ্ট করে নারাচ অস্ত্র দিয়ে আবার আঘাত করলেন। যথার্থবাদী শত্রু বলির তিরস্কার দেবরাজ ইন্দ্র সহ্য করতে পারলেন না। অংকুশাহত হাতীর মত শত্রুদমনকারী ইন্দ্র বলির প্রতি অব্যর্থ বজ্র নিক্ষেপ করলেন। সেই বজ্রের আঘাতে দৈত্যরাজ পাহাড়ের মত নিজের বিমানসহ মাটিতে পড়ে গেলেন। তখন বলিমিত্র জম্ভাসুর আপন সখার পতন লক্ষ করে মৃত বন্ধুর সৌহার্দ্য স্মরণ করে ইন্দ্রের দিকে এগিয়ে গেলেন। তারপর সিংহবাহন মহাবল জম্ভাসুর কাছে এসে গদা তুলে ইন্দ্র আর ঐরাবতের কাঁধ আর বুকে আঘাত করলেন। ঐরাবত গদার প্রহারে পীড়িত ও বিহ্বল হয়ে হাঁটু দিয়ে ভূমি স্পর্শ করে মূর্ছিত হয়ে গেল। তারপর মাতলি হাজার ঘোড়াযুক্ত রথ নিয়ে এগিয়ে এলে ইন্দ্র ঐরাবতকে ত্যাগ করে রথে চড়লেন। দানবশ্রেষ্ঠ জম্ভ মাতলির কাজের প্রসংসা করে এক জ্বলন্ত শূল দিয়ে মাতলিকে আঘাত করলেন। মাতলি ধৈর্য সহকারে সেই দুঃসহ যন্ত্রণা সহ্য করলে দেবরাজ ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হয়ে বজ্র দিয়ে জম্ভাসুরের মাথা কেটে ফেললেন। তখন নমুচি, বল আর পাক নামে জম্ভের তিনজন স্বজন দেবর্ষি নারদের মুখ থেকে তার মৃত্যু-সংবাদ শুনে তখনি সেখানে উপস্থিত হল এবং কর্কশ বাক্যবাণে ইন্দ্রকে বিদ্ধ করতে লাগল। মেঘেরা যেমন বৃষ্টি বর্ষণ করে পাহাড়ের চারদিক আচ্ছন্ন করে ফেলে, সেরকম তারাও বাণে বাণে দেবরাজ ইন্দ্রকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। তখন বল নামে অসুর ক্ষিপ্রহস্তে এক হাজার বাণ নিক্ষেপ করে এক সঙ্গেই ইন্দ্রের রথের এক হাজার ঘোড়াকে আহত করল। পাক নামে অসুর দুই বাণ একসঙ্গে ধনুকে যোজনা ও নিক্ষেপ করে পৃথকভাবে সারথি মাতলি আর অবয়বসহ রথটিকে আঘাত করলে যুদ্ধক্ষেত্রে অত্যাশ্চর্য সব ব্যাপার ঘটতে লাগল। নমুচি সোনার পুঙ্খযুক্ত পঞ্চাশটি বিশাল বাণ মেরে ইন্দ্রকে আহত করে সজল মেঘের মত গর্জন করতে লাগল। বর্ষার মেঘেরা যেমন সূর্যকে আচ্ছন্ন করে, সেরকম অসুরেরাও বাণের দ্বারা ইন্দ্র, সারথি, আর রথকে চারদিক থেকে আচ্ছাদিত করে ফেলল। সমুদ্রে নৌকা ভেঙে গেলে বিপন্ন বণিকেরা যেরূপ হাহাকার করে, তেমনিই শরজালে আবৃত ইন্দ্রকে না দেখে শত্রুর মধ্যবর্তী দেবতারা ও তাঁদের অনুচরেরা নিজেদের অসহায় বোধ করে কাতরস্বরে চীৎকার করতে লাগলেন। ১০-২৫

তারপর ইন্দ্র ঘোড়া, রথ, পতাকা আর সারথির সঙ্গে শত্রুদের বাণরচিত পিঞ্জর থেকে বেরিয়ে এলেন এবং রাত্রির অবসানে উদিত সূর্যের মত নিজের তেজদ্বারা দিঙ্মণ্ডল আর ধরাতল উজ্জ্বল করে শোভা পেতে লাগলেন। তিনি তখন নিজের সেনাদলকে শত্রুদের দ্বারা দলিত দেখে শত্রুবধের জন্য ক্রোধে বজ্র তুললেন। মহারাজ, তারপর আটটি ধারযুক্ত সেই বজ্রের সাহায্যে উপস্থিত অন্য অসুরদের ভয় জন্মিয়ে তাদের সামনেই বল ও পাকের মাথা কেটে ফেললেন। চোখের সামনে তাদের নিহত হতে দেখে নমুচি শোকে অসহিষ্ণু ও ক্রুদ্ধ হয়ে ইন্দ্রকে মারার জন্য এগিয়ে গেল। তারপর সে ক্রুদ্ধচিত্তে স্বর্ণালংকৃত আর ঘণ্টাযুক্ত পাথরের মত কঠিন একটি শূল নিয়ে দেবরাজের দিকে ধাবিত হল, আর ক্রোধভরে 'তুই হত হলি' বলে সিংহের মত গর্জন করতে করতে ইন্দ্রের দিকে সেটি নিক্ষেপ করল। এ সময় দেবরাজ ইন্দ্র আকাশে উত্থিত সেই মহাবেগবান শূলটিকে বাণ দিয়ে সহস্রখণ্ডে ভেঙে নমুচির শিরশ্ছেদের জন্য ক্রোধভরে তার গ্রীবাদেশে বজ্র দিয়ে আঘাত করলেন। কিন্তু ইন্দ্রের তেজস্বী বজ্র নমুচির গলদেশের চামড়াও ভেদ করতে পারল না। যে শত্রুকে আঘাত করতে না পেরে বজ্র ব্যাহত হয়ে ফিরে এল ইন্দ্র তার ভয়ে যৎপরোনাস্তি ভীত হলেন। তখন তিনি ভাবলেন, দৈবযোগে একি অত্যাশ্চর্য ব্যাপার ঘটল। পুরাকালে পর্বতেরা

পাখা দিয়ে উড়তে গিয়ে গুরুভারের জন্য মাটিতে পড়ে গেলে অনেক প্রজানাশ হওয়াতে আমি এই বজ্র দিয়েই তাদের পাখা কেটেছিলাম। ত্বষ্টার তপস্যার সারস্বরূপ বৃত্রকে আর সকল অস্ত্র দিয়েও যাদের চামড়া ভেদ হয়নি এরকম আরও মহাবলশালী শত্রুদের আমি এই বজ্র দিয়েই মেরেছি। আজ আমার সেই বজ্র এক ক্ষুদ্র অসুরের প্রতি নিক্ষিপ্ত হয়ে বাধাপ্রাপ্ত হল, অতএব আমি আর এই বজ্র ধারণ করব না। সম্প্রতি দধীচির তেজও নিষ্ফল হল। ইন্দ্র এরকম চিন্তা করে বিষাদগ্রস্ত হলে তাঁকে লক্ষ করে এই দৈববাণী উচ্চারিত হল—দেবরাজ, এই দানবকে শুষ্ক বা আর্দ্র কোন পদার্থ দিয়ে মারতে পারবে না, কারণ আমি একে এরকম বর দিয়েছি যে আর্দ্র বা শুষ্ক পদার্থে এর মৃত্যু হবে না। অতএব, ইন্দ্র, এই শত্রুকে বধের জন্য তোমাকে অন্য উপায় ভাবতে হবে। ২৬-৩৯

ইন্দ্র সেই দৈববাণী শুনে একাগ্রচিত্তে ধ্যান করতে করতে বুঝতে পারলেন যে ফেনাই একমাত্র বস্তু যা আর্দ্র-শুষ্ক উভয়স্বরূপ। তারপর তিনি শুষ্ক না আর্দ্রও না এরূপ সমুদ্রের ফেনা দিয়েই নমুচির মাথা কাটলে মুনিরা তাঁর স্তব করে মাল্য-বর্ষণ করতে লাগলেন। তখন বিশ্বাবসু ও পরাবসু নামে শ্রেষ্ঠ দুই গন্ধর্ব আনন্দভরে গান করতে লাগলেন, স্বর্গীয় দুন্দুভি বেজে উঠল আর নর্তকীরা নাচতে লাগল। সিংহরা যেমন হরিণ মারে সেরকম বায়ু, অগ্নি, বরুণ প্রভৃতি দেবতারা প্রতিদ্বন্দ্বী অসুরদের মারতে লাগলেন। মহারাজ, তখন দানবদের সংহার দেখে পিতামহ ব্রহ্মা দেবর্ষি নারদকে ডেকে পাঠালে তিনি সেখানে উপস্থিত হয়ে দেবতাদের বারণ করলেন। নারদ বললেন, দেবতাগণ, ভগবান নারায়ণের ভুজবল আশ্রয় করে তোমরা অমৃত পেয়েছ, আর সকলেই লক্ষ্মীদেবীর অনুগ্রহে সমৃদ্ধশালী হয়েছ; অতএব যুদ্ধ থামাও। শুকদেব বললেন, মহারাজ, তখন দেবর্ষি নারদের আদেশবাক্যে দেবতারা ক্রোধ সংবরণ করে স্বর্গরাজ্যে ফিরে গেলেন আর অনুচরেরা তাঁদের স্তুতিগান করতে লাগলেন। সেই যুদ্ধে যে সমস্ত দৈত্য অবশিষ্ট ছিল তারা নারদের অনুমতি পেয়ে বিপন্ন বলিকে নিয়ে অস্তাচলে চলে গেল। যুদ্ধক্ষেত্রে পতিত যে সমস্ত দৈত্যদের দেহ বিনষ্ট হয়নি ও মুণ্ড অক্ষত ছিল, শুক্রাচার্য নিজের সঞ্জীবনী বিদ্যা দিয়ে তাদের জীবন দান করেন। শুক্রাচার্যের স্পর্শে বলি আবার ইন্দ্রিয় আর স্মৃতিশক্তি লাভ করেছিলেন। তিনি লোকতত্ত্ব বিষয়ে অভিজ্ঞ ছিলেন বলে পরাজয় সত্ত্বেও বিষাদগ্রস্ত হন নি। ৪০-৪৮

দ্বাদশ অধ্যায়

শ্রীভগবানের মোহিনীরূপ দেখে শংকরের মোহ

শুকদেব বললেন, মহারাজ, ভগবান শ্রীহরি নারীমূর্তি ধরে দানবদের মোহিত করে দেবতাদের অমৃত পান করিয়েছেন শুনে বৃষবাহন শিব অনুচর ভূতদের নিয়ে দেবীর সঙ্গে শ্রীহরিকে দেখবার জন্য তাঁর নিবাসে গেলেন। তখন ভগবান শ্রীহরি উমার সঙ্গে শংকরকে সাদরে অভ্যর্থনা করলে ভগবান শংকরও প্রতি পূজা করে বসে বিশ্রাম করলেন। তারপর তিনি হেসে বলতে লাগলেন, হে দেবদেব, বিশ্বপালক, জগদীশ, আপনিই এ জগতে সমস্ত পদার্থের আত্মা ও কারণস্বরূপ ঈশ্বর। আপনি জগন্ময় হলেও জগতের মত অসত্য আর জড়বস্তু নন। এই জগতের আদি,

মধ্য আর অন্ত আপনার থেকেই উদ্ভূত, অথচ আপনি অব্যয়। আপনার আদি, মধ্য অথবা অন্ত নেই। যিনি দৃশ্য-দ্রষ্টা, ভোগ্য-ভোক্তা, সত্য ও চিৎস্বরূপ, সেই ব্রহ্মই আপনি। আপনি জগন্ময় বলে আপনার বিকার নেই। নিষ্কাম মুমুক্ষু মুনিরা ইহলোক ও পরলোকের আসক্তি ছেড়ে আপনারই চরণের উপাসনা করেন। আপনি ব্রহ্ম হলেও একান্ত উদাসীন নন, কারণ আপনি এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ। আপনি সকল জীবের ঈশ্বর আর ফলদাতা। অথচ রাজাদের মত কোন উদ্দেশ্যের আশায় আপনি সেবকদের ফল দেন না। জীবেরাই ফলদানের জন্য আপনার অপেক্ষা করে থাকে; আপনি নিরপেক্ষ, আপনি পূর্ণব্রহ্ম সুখস্বরূপ। এই সুখের সঙ্গে বিষয়সুখের পার্থক্য আছে, কারণ আপনি নিত্য আনন্দমাত্র, তার জন্য শোক আপনাকে স্পর্শ করতে পারে না। আপনি গুণের অতীত, আপনাকে ছাড়া অন্য বস্তুর অস্তিত্বই নেই, এই জন্যই আপনি নিরপেক্ষ। অথচ সমস্ত কাজের কারণ বলে আপনি ঐ সকল থেকে ভিন্ন; এই জন্য সর্বাত্মক হলেও আপনার বিকার হয় না। সোনা যেমন এক হয়েও কুণ্ডল ও নানারকম অলংকাররূপে অনেক হয়, সেইরকম এক আপনিই কার্য-কারণ রূপে দ্বৈত এবং পরম কারণ অর্থাৎ নিখিল কারণের কারণরূপে অদ্বৈত। বস্তুতে আপনার কোন ভেদ নেই, অজ্ঞানবশত মানুষ আপনাতে ভেদ কল্পনা করে। বৈদান্তিকেরা আপনাকে ব্রহ্ম বলে মনে করেন, মীমাংসকেরা ধর্ম বলেন, সাংখ্যেরা আপনাকে প্রকৃতি ও পুরুষের পরবর্তী পুরুষ বলে মনে করেন,[১] কেউ কেউ (পঞ্চরাত্রেরা) আপনাকে নবশক্তিযুক্ত[২] পরমপুরুষ এবং পাতঞ্জলেরা আপনাকে অব্যয় স্বতন্ত্র মহাপুরুষ বলেন। হে ঈশ, আমি, ব্রহ্মা ও মরীচি প্রভৃতি ঋষিরা সত্ত্বগুণে সৃষ্ট হয়েও আপনার মায়ায় মোহিত হয়ে আপনার স্বরূপ দূরের কথা আপনার রচিত এই বিশ্বের তত্ত্বই জানতে পারি না। এ অবস্থায় যাদের উৎপত্তি ও আচার সব সময় রজ ও তমোগুণাশ্রিত সেই দৈত্য, মানুষ প্রভৃতি জীবেরা যে আপনার স্বরূপ জানতে পারে না, এ বিষয়ে আর কথা কি! ভগবান, বাতাস যেরকম চরাচর বস্তুরাজি ও আকাশের মধ্যে সর্বত্র আছে, সেইরকম জ্ঞানরূপী আপনিও নিখিল বিশ্ব জুড়ে আত্মরূপে অবস্থিত আছেন, কারণ আপনি জ্ঞানস্বরূপ। আপনি অনেকবার অবতার হয়ে ভক্তবৎসলাদি গুণ দেখিয়ে যে ক্রীড়া করেছেন তা আমরা দেখেছি। এখন আপনি যে নারীরূপ ধারণ করেছিলেন, তা দেখতে ইচ্ছা করছি। যে রূপ ধারণ করে আপনি দৈত্যদের মোহিত করে দেবতাদের সুধাপান করিয়েছেন সেই মূর্তি দেখতে কৌতূহলী হয়ে আমরা এখানে এসেছি। ১-১৩

শুকদেব বললেন, মহারাজ, মহাদেব এইরকম প্রার্থনা করলে ভগবান শ্রীহরি ভাবগম্ভীর হেসে তাঁকে বললেন, দেবশ্রেষ্ঠ, সেসময় সুধাভাণ্ড দৈত্যদের হস্তগত হলে রমণীর বেশে দেবতাদের কার্য সিদ্ধ করবার বাসনায় আমি দৈত্যদের কৌতুক উৎপাদনের জন্যই নারীমূর্তি ধারণ করেছিলাম। আপনি এখন তা দেখতে ইচ্ছা করছেন বলে আমি আপনাকে কামুকদের আদরণীয় আর কামোদ্দীপক সেই নারীমূর্তি দেখাবো। শুকদেব বললেন, মহারাজ, ভগবান শ্রীহরি এরকম বলতে বলতে সেখানেই অদৃশ্য হলে মহাদেব উমার সঙ্গে চারিদিকে তাকাতে লাগলেন। তারপর মহাদেব বিচিত্র ফুল আর রক্তবর্ণ পত্রযুক্ত উপবনে কন্দুক ক্রীড়ারতা এক পরমাসুন্দরী নারীকে

১ ভগবদগীতা, ১৫শ অধ্যায়ের ১৭শ শ্লোক দ্রষ্টব্য। ২ নবশক্তি—বিমলা, উৎকর্ষিণী, জ্ঞানা, ক্রিয়া, যোগা, প্রহ্বী, সত্যা, ঈশানা ও অনুগ্রহা।

দেখতে পেলেন। তার মনোরম নিতম্বদেশে চন্দ্রহার শোভা পাচ্ছিল। ক্রীড়ার সময়ে কন্দুকটির ঊর্ধ্বগতি আর নিম্নগতির সঙ্গে সেই রমণীও দেহটিকে একবার উন্নত ও অবনত করায় কম্পিত স্তনযুগল, উৎকৃষ্ট মালা আর স্থূল ঊরুদেশের গুরুভারে প্রতি পদক্ষেপেই তাঁর ক্ষীণ কটি যেন ভেঙে পড়ছিল। এইভাবে তিনি প্রবালের মত রক্তিম সুকোমল পদযুগল এদিক-ওদিক চালনা করছিলেন। তখন কন্দুকটি চারিদিকে চঞ্চলভাবে ভ্রমণ করায় তাঁর আয়ত চক্ষুর তারাদুটিও উদ্বিগ্ন ও চঞ্চল হচ্ছিল। তাঁর গণ্ডস্থলের শোভা কানের উজ্জ্বল কুণ্ডলদুটির দীপ্তিতে আরো বর্ধিত হয়েছিল। সেই শোভাময় কপোল এবং নীলবর্ণ কেশে মুখমণ্ডল মণ্ডিত হয়েছিল। সেই রমণীমূর্তি শিথিল বস্ত্র ও স্খলিত কেশবন্ধনকে সুকোমল বাঁ হাত দিয়ে আবদ্ধ করতে করতে ডান হাতে কন্দুক ছুঁড়ে আপন মায়ার সাহায্যে জগতের মোহ উৎপাদন করছিলেন। এই রকম কন্দুকক্রীড়া জনিত ঈষৎ লজ্জাবশত সেই রমণীমূর্তি হেসে কটাক্ষ করে মহাদেবের চিত্তহরণ করলেন। শংকর তাঁর দিকে তাকালে সেই নারীও তাঁর প্রতি বার বার কটাক্ষপাত করায় তিনি ব্যাকুলচিত্ত হয়ে উমাদেবী আর নিজের অনুচরদের পর্যন্ত ভুলে গেলেন। এক সময়ে সেই কন্দুকটি মোহিনীমূর্তির হাত থেকে দূরে চলে গেলে যখন তিনি তা ধরবার জন্য ছুটছিলেন, তখন মহাদেবের চোখের সামনেই বাতাস তাঁর সূক্ষ্ম বস্ত্রটি চন্দ্রহারের সঙ্গে উড়িয়ে নিল। ১৪-২১

সে সময়ে সেই রমণী মহাদেবকে কুণ্ঠিত কটাক্ষ করলে তিনি সেই মনোরমা সুনয়নার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়লেন। এইভাবে মোহিনীমূর্তি মহাদেবের জ্ঞানহরণ করলে তিনি সেই সুন্দরীর প্রতি কামাবেশে বিহ্বল হয়ে উমাদেবীর সামনেই মোহিনীর কাছে গেলেন। মহাদেবকে কাছে আসতে দেখে সেই বিবসনা মোহিনীমূর্তি অতিশয় লজ্জিত হয়ে গাছের অন্তরালে আত্মগোপন করবার উদ্দেশ্যে পলায়ন করতে লাগলেন। যূথপতি হাতী যেমন কামপীড়িত হয়ে হস্তিনীর অনুগমন করে, মোহিনী কর্তৃক আকৃষ্ট হয়ে মহাদেবও সেরকম কামাবিষ্ট হয়ে তাঁর অনুসরণ করেছিলেন। তারপর মহাদেব অতিবেগে তাঁর দিকে ধাবিত হয়ে সেই মোহিনীর কেশবন্ধন ধারণ করলেন এবং রমনী অনিচ্ছুক হলেও তাঁকে কাছে এনে দুই হাত দিয়ে আলিঙ্গন করলেন। হস্তী কর্তৃক আলিঙ্গিত হস্তিনীর মত ভগবান শংকর কর্তৃক আলিঙ্গিতা সেই মোহিনীমূর্তিও তখন এদিক ওদিক চলতে আরম্ভ করলেন। এ অবস্থায় তাঁর কেশরাশি চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হতে লাগল। এভাবে ভগবান শ্রীহরির রচিত বিশাল নিতম্বশালিনী সেই মায়ামূর্তি মহাদেবের হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে আবার দৌড়াতে আরম্ভ করলেন। মহারাজ, মহাদেব নিজের শত্রু কন্দর্প দ্বারা পরাভূত হয়েই যেন বিচিত্রকর্মা ভগবান বিষ্ণুকে অনুসরণ করেছিলেন। তখন ঋতুমতী হস্তিনীর অনুসরণকারী কামমত্ত হাতীর মত মোহিনীর পশ্চাদ্ধাবনকারী অব্যর্থবীর্য মহাদেবের বীর্যস্খলন হয়েছিল। মহাপ্রভাবশালী মহাদেবের স্খলিত বীর্য মাটিতে যে যে স্থানে পড়েছিল, সেই সেই স্থানই সোনা আর রূপার খনিতে পরিণত হল। নদী, সরোবর, পাহাড়, বন আর উপবনসহ যে সমস্ত জায়গায় ঋষিরা বাস করছিলেন, মোহিনীকে অনুসরণ করে মহাদেব সেই সমস্ত জায়গায় উপস্থিত হয়েছিলেন। বীর্য স্খলিত হলে ভগবান শংকর বুঝতে পারলেন যে তিনি দেবমায়া দ্বারা বশীকৃত হয়েছেন। তখন তিনি ঐ মোহ থেকে মুক্ত হলেন। দুজ্ঞেয় মাহাত্মশালী জগদাত্মা শ্রীহরির মাহাত্ম্যের কথা তিনি জানতেন। তাই তিনি ঈশ্বরের মায়াপ্রভাবে মোহে জড়ীভূত হয়েও বিস্ময়বোধ করেন নি। ২২-৩৬

তখন ভগবান শ্রীহরি মহাদেবের কোনরকম বিহ্বলতা বা লজ্জা না দেখে পরম

সন্তুষ্ট হয়ে নিজে পুরুষমূর্তি ধরে বললেন, দেবশ্রেষ্ঠ, আপনি আমার মায়ারচিতা রমণীমূর্তি কর্তৃক মোহিত হয়েও যে আবার মনকে স্বাভাবিক করেছেন তা সৌভাগ্যের বিষয়। আপনি ছাড়া অন্য কোন বিষয়াসক্ত পুরুষ কি আমার মায়া অতিক্রম করতে পারে? এই গুণময়ী মায়া সৃষ্টি প্রভৃতির কারণস্বরূপ কালরূপী আমার সঙ্গে রজ প্রভৃতি অংশ দিয়ে মিলিত হয়ে আমারই অধীনে আছে। এ আপনাকে কখনও অভিভূত করবে না। ৩৭-৪১

শুকদেব বললেন, মহারাজ, শ্রীবৎসচিহ্ন-শোভিত ভগবান শ্রীহরি মহাদেবের এরূপ প্রশংসা করলে তিনিও শ্রীহরির অনুমতি নিয়ে তাঁকে প্রদক্ষিণ করে অনুচরদের সঙ্গে নিজধামে চলে গেলেন। ভরতনন্দন, তারপর ভগবান শংকর নিজ অংশরূপ আর মুনিদেরও পূজিতা মহামায়া ভবানীকে প্রীতি সহকারে বললেন, প্রিয়তমে, তুমি জন্মরহিত পরমদেবতা পরমপুরুষ শ্রীহরির মায়া দেখলে তো? আমি ভগবানের অংশের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হয়েও ঐ মায়ায় মোহিত হয়েছি, যাদের চিত্ত স্ববশ নয় তেমন পুরুষেরা যে তার দ্বারা মোহিত হবে, এ আর আশ্চর্য কি? আমি হাজার বছর যোগানুষ্ঠানের পর যোগ থেকে বিরত হলে তুমি আমার কাছে এসে যাঁর তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করেছিলে, এই শ্রীহরিই সাক্ষাৎ সেই সনাতন পুরুষ। কাল তাঁর মহিমা নির্ণয় করতে পারে না, বেদও তাঁকে বর্ণনা করতে অক্ষম। ৪২-৪৪

শুকদেব বললেন, বৎস, যিনি সমুদ্রমন্থনের সময় মহাগিরি মন্দরকে পিঠে নিয়েছিলেন, আমি এখন সেই ভগবান শ্রীহরির বিক্রমকথা তোমাকে বললাম। যেহেতু শ্রীহরির গুণবর্ণন সবরকম সংসারকষ্টের নিবারক, অতএব যে ব্যক্তি সবসময় এ কথা কীর্তন করেন, তাঁর উদ্যম কখনও বিফল হয় না। মোহিনীরূপে দানবদের মোহিত করে যিনি অসাধুদের অপ্রাপ্য ও ভক্তদের লভ্য নিজ পাদপদ্মের শরণাগত শ্রেষ্ঠ দেবতাদের সমুদ্রমন্থনজাত অমৃত পান করিয়েছিলেন, আমি আশ্রিতদের বাঞ্ছাপূরণকারী সেই ভগবান শ্রীহরিকে প্রণাম করি। ৪৫-৪৭

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ভবিষ্যৎ সপ্ত মন্বন্তর বর্ণন

শুকদেব বললেন, মহারাজ, বিবস্বানের পুত্র শ্রাদ্ধদেব নামে বিখ্যাত সপ্তম মনু এখনও বর্তমান। তুমি আমার কাছ থেকে তাঁর সন্তানদের কথা শোন। ইক্ষ্বাকু নভগ, ধৃষ্ট, শর্যাতি, নরিষ্যন্ত, নাভাগ, দিষ্ট, করূষ, পৃষধ্র আর বসুমান—এ, দশজন বৈবস্বত মনুর পুত্র। ঐ মন্বন্তরে আদিত্যগণ, বসুগণ, রুদ্রগণ, বিশ্বদেবগণ মরুদ্‌গণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয় ও ঋভুগণ, এঁরা সব দেবতা আর পুরন্দর তাঁদের ইন্দ্র। কশ্যপ, অত্রি, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, গৌতম, জমদগ্নি ও ভরদ্বাজ এই সাতজন ঋষি। এই মন্বন্তরেও প্রজাপতি কশ্যপ থেকে তাঁর স্ত্রী অদিতির গর্ভে ভগবানের আবির্ভাব হয়েছিল। তিনি আদিত্যদের কনিষ্ঠ বামনরূপী বিষ্ণু। ১-৬

তোমায় কাছে সংক্ষেপে সাতটি মন্বন্তরের কথা বর্ণনা করলাম। এরপর বিষ্ণুর শক্তিতে পরিব্যাপ্ত ভবিষ্যৎ সাতটি মন্বন্তরের কথা বলব। মহারাজ, বিবস্বানের দুই স্ত্রী—সংজ্ঞা আর ছায়া। এরা দুজনেই বিশ্বকর্মার কন্যা। আমি আগেই এই

দুজনের কথা তোমার কাছে বলেছি। কেউ কেউ সূর্যের বড়বা নামে আর এক স্ত্রীর কথা বলেন কিন্তু বড়বা সংজ্ঞারই নামান্তর বলে তিনি সংজ্ঞা থেকে আলাদা নন। সংজ্ঞার দুই পুত্র, যম ও শ্রাদ্ধদেব আর এক কন্যা, যমী। এখন ছায়ার পুত্রদের কথা শোন। ছায়ার এক পুত্র সাবর্ণি, কন্যা তপতী, ইনি সংবরণের স্ত্রী। শনিও ছায়ারই পুত্র। অশ্বিনীকুমারেরা বড়বার পুত্র। অষ্টম মন্বন্তরে সূর্যপুত্র সাবর্ণি মনু হবেন। নির্মোক, বিরজস্ক প্রভৃতি সাবর্ণির পুত্র। এই মন্বন্তরে সুতপা, বিরজা ও অমৃতপ্রভা দেবতা আর বিরোচনপুত্র বলি তাঁদের ইন্দ্র হবেন। তিনি (সপ্তম মন্বন্তরে) যাচক বিষ্ণুকে ত্রিপদের সমান ভূমি দান করতে গিয়ে সমস্ত ভূমণ্ডল দান করে ইন্দ্রপদ পেয়েও তা পরিত্যাগ করে সিদ্ধিলাভ করবেন। ভগবান বামনরূপী বিষ্ণু সেই বলিকে বেঁধে স্বর্গ অপেক্ষাও অধিক সমৃদ্ধিশালী সুতলে প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং তিনি এখন সেখানে পরমানন্দে বিরাজ করছেন। মহারাজ, এই মন্বন্তরে গালব, দীপ্তিমান, পরশুরাম, অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য, ঋষ্যশৃঙ্গ আর আমাদের পিতা ভগবান ব্যাসদেব এই সাতজন ঋষি হবেন। এই অষ্টম মন্বন্তরে ভগবান বিষ্ণু দেবগুহ্য ও সরস্বতীর পুত্র সার্বভৌম নামে আবির্ভূত হয়ে পুরন্দরের কাছ থেকে ইন্দ্রত্ব কেড়ে নিয়ে বলিকে ইন্দ্রপদ প্রদান করবেন। ৭-১৭

নবম মন্বন্তরে বরুণের পুত্র দক্ষসাবর্ণি মনু হবেন। ভূতকেতু আর দীপ্তকেতু প্রভৃতি তাঁর পুত্র। এই মন্বন্তরে মরীচিগর্ভ প্রভৃতি পারগণ দেবতা হবেন, আর অদ্ভুত নামে একজন ইন্দ্র হবেন। দ্যুতিমান প্রভৃতি সাতজন ঋষি আর আয়ুষ্মান ও অম্বুধারার পুত্র ঋষভদেব এই মন্বন্তরে ভগবানের অংশরূপে আবির্ভূত হবেন। ইনিই অদ্ভুত নামে ইন্দ্রকে সমৃদ্ধিশালী ত্রিলোকের আধিপত্য ভোগ করাবেন। উপশ্লোকের পুত্র ব্রহ্মসাবর্ণি দশম মনু। ভূরিষেণ প্রভৃতি তাঁর পুত্র আর হবিষ্মান প্রভৃতি ঐ মন্বন্তরের সাতজন ঋষি। এই দশম মন্বন্তরের ঋষিরা হলেন হবিষ্মান, সুকৃত, সত্য, জয় আব মূর্তি প্রভৃতি ব্রাহ্মণরা। সুবাসন, বিরুদ্ধ প্রভৃতিরা হলেন দেবতা আর তাঁদের প্রভু ইন্দ্রের নাম শম্ভু। তখন ভগবান বিষ্ণু, বিশ্বসৃক্‌ আর বিষূচীর পুত্র হয়ে বিষ্বক্‌সেন নামে প্রসিদ্ধ হবেন আর তিনি শম্ভু নামে ইন্দ্রের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করবেন। মনস্বী ধর্মসাবর্ণি একাদশ মনু হবেন, আর সত্য, ধর্ম প্রভৃতি দশজন তাঁর পুত্র। ঐ মন্বন্তরে বিহঙ্গম, কামগণ, নির্বাণরুচি প্রভৃতিরা দেবতা হবেন। বৈধৃত তাঁদের ইন্দ্র আর অরুণ প্রভৃতি সাতজন ঋষি হবেন। তখন শ্রীহরির অংশ থেকে বৈধৃতার গর্ভে আবির্ভূত আর্যকপুত্র ধর্মসেতু এই ত্রিলোকের পরিপালন করবেন। ১৮-২৬

দ্বাদশ মনুর নাম রুদ্রসাবর্ণি। দেববান, উপদেব, দেবশ্রেষ্ঠ প্রভৃতি তাঁর পুত্র। ঐ মন্বন্তরে ঋতনামা, ইন্দ্র, হরিত প্রভৃতি দেবতা হবেন আর তপোমূর্তি, তপস্বী আর আগ্নীধ্রক প্রভৃতি সাতজন হবেন ঋষি। ঐ সময়ে সত্যসহা আর সূনৃতার পুত্র স্বধামা নামে ভগবান শ্রীহরির অংশ ঐ মন্বন্তরে প্রসিদ্ধ হবেন। মনস্বী দেবসাবর্ণি ত্রয়োদশ মনু আর চিত্রসেন, বিচিত্র প্রভৃতি তাঁর পুত্র। তখন সুকর্মা, সুত্রামা প্রভৃতি দেবতাগণ আর দিবস্পতি ইন্দ্র হবেন। নির্মোক, তত্ত্বদর্শী প্রভৃতি সাতজন হবেন ঋষি। তখন বৃহতীর গর্ভে দেবহোত্রের পুত্ররূপে আবির্ভূত ভগবান শ্রীহরির অংশ যোগেশ্বর দিবস্পতিকে ইন্দ্রত্ব লাভে সহায়তা করবেন। চতুর্দশ মনুর নাম ইন্দ্রসাবর্ণি। উরু, গম্ভীর প্রভৃতি তাঁর পুত্র। ঐ মন্বন্তরে পবিত্র আর চাক্ষুষ প্রভৃতি দেবতা আর শুচি ইন্দ্র হবেন। অগ্নি, বাহু, শুচি, শুদ্ধ, মাগধ প্রভৃতি সাতজন হবেন ঋষি। তখন বিনতার গর্ভে সত্রায়ণের পুত্র বৃহদ্ভানু নামে আবির্ভূত হয়ে ভগবান শ্রীহরি লোককল্যাণকর কাজের বিস্তার করবেন। মহারাজ,

ভূত, ভবিষ্যৎ আর বর্তমান এই ত্রিকালসম্বন্ধীয় চতুর্দশ মন্বন্তরের কথা তোমার কাছে বর্ণনা করলাম। এই চতুর্দশ মন্বন্তরে এক কল্প হয়, এর পরিমাণ এক হাজার বছর। ২৭-৩৭

চতুর্দশ অধ্যায়

মনুদের পৃথক পৃথক কর্ম নিরূপণ

মহারাজ পরীক্ষিৎ বললেন, ভগবান্, পূর্বের মন্বন্তরসমূহে মনু প্রভৃতিরা যেভাবে যাঁর দ্বারা যে কাজে নিয়োজিত হন, তা আমাকে বলুন। শুকদেব বললেন, মহারাজ, মনুরা, মনুপুত্ররা, মুনিরা, ইন্দ্ররা, দেবতারা সকলেই পরমপুরুষ বিষ্ণুর দ্বারা নিজ নিজ কাজে নিয়োজিত হন। আমি আগে তোমার কাছে যজ্ঞাদি এবং যে সমস্ত অবতার মূর্তির কথা বলেছি, তাঁরাও সকলেই ঈশ্বরের দ্বারা পরিচালিত হয়েই জগতের কাজ করেন। চার যুগের অবসানে বেদসমূহ কালের প্রভাবে লুপ্ত হলে ঋষিরা তপোবলে ঐ সমস্ত বেদকে আবার উপলব্ধি করেন। ঐ বেদ থেকেই লোকের মধ্যে সনাতন ধর্ম প্রবর্তিত হয়। তারপর মনুরা নিজ নিজ কালে শ্রীহরির আদেশে পৃথিবীতে চতুষ্পাদ ধর্ম প্রবর্তন করেন। ১-৫

এইভাবে প্রজাপালক মনুপুত্রবাও যজ্ঞভাগভোজী দেবতা এবং স্বর্গ ও পৃথিবী-তলে যজ্ঞকর্মের ফলভোগী মানুষের সঙ্গে মিলিত হয়ে মন্বন্তরের অবসান পর্যন্ত পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে এই ধর্মপ্রতিপালন করেন। এ সময়ে দেবরাজ ইন্দ্র শ্রীহরিদত্ত ত্রিলোকের ঐশ্বর্য ভোগ করে লোকের রক্ষাবিধান করেন এবং প্রজাদের অভিলষিত দ্রব্যাদি বর্ষণ করেন। শ্রীহরি যুগে যুগে সিদ্ধ-সনকাদিরূপে জ্ঞান, ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যাদি-রূপে কর্ম আর দত্তাত্রেয় প্রভৃতি যোগেশ্বররূপে যোগের উপদেশ দেন। এই ভাবে তিনি মরীচি প্রভৃতি প্রজাপতিরূপে প্রজাসৃষ্টি, রাজরূপে দস্যুদের সংহার আর শীতোষ্ণাদি নানা রকম গুণযুক্ত কালরূপে সৃষ্টির লয় করে থাকেন। মহারাজ, যদিও বিভিন্ন দর্শনশাস্ত্র এই শ্রীহরির স্বরূপ নিরূপণ করেছেন, তবুও জগতের লোকেরা মায়া দ্বারা মোহিত হওয়ায় তাঁকে সম্যক্ উপলব্ধি করতে পারে না। আমি এইভাবে তোমার কাছে কল্প আর বিকল্পের পরিমাণ বললাম। পুরাতত্ত্ব-জ্ঞরা এই কল্পের মধ্যেই চতুর্দশ মন্বন্তর নির্দেশ করে থাকেন। ৬-১১

পঞ্চদশ অধ্যায়

দৈত্যরাজ বলির স্বর্গ জয়

রাজা পরীক্ষিৎ বললেন, ভগবান, শ্রীহরি ঈশ্বর হয়েও কি কারণে বলির কাছে দীনব্যক্তির মত ত্রিপাদভূমি চেয়েছিলেন, আর প্রার্থিত বস্তু পেয়ে কেনই বা তাঁকে বেঁধেছিলেন? সর্বৈশ্বর্যশালী ঈশ্বরের এই ভিক্ষা আর নিরপরাধ পুরুষকে বাঁধা সত্যিই বিস্ময়কর বলে আমরা এর রহস্য জানতে চাই, কারণ এই ব্যাপারে আমাদের মহাকৌতূহল রয়েছে। ১-২

শুকদেব বললেন, মহারাজ, দৈত্যরাজ বলি ইন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে নিহত হলে শুক্রাচার্য তাঁকে পুনর্জীবিত করেন। তাই শুক্রাচার্য-শিষ্য মহাত্মা বলি যাবতীয় বিষয় সমর্পণ করে সর্বতোভাবে শুক্রাচার্য প্রমুখ ভৃগুবংশীয়দের সেবা করেন। তখন ঐ বংশের মহাপ্রভাবশালী ব্রাহ্মণেরা সন্তুষ্ট হয়ে স্বর্গজয়ের অভিলাষী বলিকে মহাভিষেকবিধি (ঐন্দ্রাভিষেক ক্রিয়া) অনুসারে অভিষিক্ত করে তাঁকে দিয়ে বিশ্বজিৎ যজ্ঞ সম্পন্ন করান। তারপর যজ্ঞে হবি প্রদান করায় আরাধিত আগুনের ভেতর থেকে সোনার পট্টবস্ত্র ভূষিত রথ, ইন্দ্রের অশ্বের ন্যায় হরিদ্বর্ণ অশ্বসমূহ আর সিংহমূর্তি রথধ্বজ আবির্ভূত হয়েছিল। এইভাবে সেই আগুন থেকে সোনার নির্মিত দিব্যধনু, অক্ষয়বাণ পূর্ণ দুটি তূণ আর দিব্য কবচ আবির্ভূত হলে পিতামহ প্রহ্লাদ বলিকে অম্লান পুষ্পময় একটি মালা আর শুক্রাচার্য তাঁকে শঙ্খ দান করলেন। এইভাবে ভৃগুবংশীয় ব্রাহ্মণদের সাহায্যে যুদ্ধের উপকরণ সংগ্রহ হলে ব্রাহ্মণেরা স্বস্ত্যয়নক্রিয়া সম্পাদন করলেন। এরপর বলি ব্রাহ্মণদের প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করে পিতামহ প্রহ্লাদকে সম্ভাষণ আর প্রণাম করলেন। ৩-৭

তারপর মহারথ বলি ভৃগুপ্রদত্ত দিব্যরথে চড়ে সুরম্য মালা, কবচ, ধনু, খড়্গ, আর তূণযুগল ধারণ করলেন। তখন তাঁর দুই হাতে সোনার কেয়ূর শোভা পাচ্ছিল আর কানদুটি ছিল কুণ্ডলশোভিত। এই অবস্থায় রথে অবস্থিত বলি যেন কুণ্ডমধ্যে আগুনের মত বিরাজ করছিলেন। তারপর পরাক্রান্ত বলি স্বসদৃশ ঐশ্বর্য, বল ও শ্রীসম্পন্ন দৈত্যযূথপতিগণে পরিবৃত হয়ে দৃষ্টি দ্বারা যেন আকাশকে পান করতে করতে আর দিঙ্মণ্ডলকে দগ্ধ করতে করতে স্বর্গ আর ভূমণ্ডল কাঁপিয়ে ইন্দ্রপুরীর দিকে যাত্রা করলেন। ঐ ইন্দ্রপুরী নন্দন প্রভৃতি সুন্দর উপবনের শোভায় অতি মনোরম। ঐ সমস্ত উপবন আর উদ্যান পাখীর কাকলি আর মধুপানে মত্ত ভ্রমরের গুঞ্জনে মুখরিত থাকে। ওখানে মন্দার, পারিজাত প্রভৃতি দেববৃক্ষ নতুন পাতা, ফল আর ফুলের ভারে অবনত। সেখানে সরোবরগুলি হাঁস, সারস, চক্রবাক, কারণ্ডব ইত্যাদি জলচর পাখীদের দ্বারা সমাকীর্ণ। দেবতাদের প্রেয়সীরা ঐ সকল সরোবরে ক্রীড়া করেন। পরিখার মত মন্দাকিনী নদী আর উপরে যুদ্ধস্থানযুক্ত উঁচু অগ্নিবর্ণ প্রাচীর সেই ইন্দ্রপুরীকে ঘিরে রয়েছে। ৮-১৪

বিশ্বকর্মার তৈরী রাজপথসমূহে সুশোভিত সেই ইন্দ্রপুরীর পুরদ্বারগুলি স্ফটিকময় আর তার দরজাগুলিতে রয়েছে সোনার পাল্লা। উপবেশন-স্থান, প্রাঙ্গণ, উঁচু পথ আর মন্দির দিয়ে সুশোভিত সেই ইন্দ্রপুরীতে হীরা ও প্রবালের বেদিযুক্ত মণিময় চৌরাস্তা শোভা পাচ্ছে। ওই ইন্দ্রপুরীতে নিত্যরূপ-যৌবন-শালিনী, নির্মলবসনা, রূপবতী, শ্যামা রমণীরা শিখাপ্রদীপ্ত আগুনের মত বিরাজ করছেন। সেখানে দেবরমণীদের কেশবন্ধন থেকে সুগন্ধি মালা পড়ে গেলে বাতাস তার সৌরভ বহন করে পথে পথে প্রবাহিত হয়। ওই পুরীর স্বর্ণময় গবাক্ষ থেকে নির্গত অগুরুগন্ধযুক্ত সাদা ধূমরাশিতে পথ আচ্ছন্ন, সেই পথে অপ্সরারা বিচরণ করেন। সেই পুরী সর্বদা মুক্তার মত চাঁদের আলো, স্বর্ণমণিময় ধ্বজা আর বিচিত্র পতাকাযুক্ত দেবমন্দিরে পরিব্যাপ্ত রয়েছে। দেবমন্দিরগুলি রমণীদের মাঙ্গলিক কলগীতিতে মুখরিত। এইভাবে সেই ইন্দ্রপুরী মৃদঙ্গ, শঙ্খ, ঢাক, দুন্দুভি, বীণা, বেণুধ্বনি আর গন্ধর্ব উপদেবতাদের নৃত্য গীত আর বাদ্যদ্বারা মনোরম হয়েছে। এর এমনি দীপ্তি যে মনে হয় তা যেন কান্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকেও জয় করছে। অধার্মিক, খল, প্রাণিহিংসাকারী, শঠ, দাম্ভিক, কামুক আর লোভী ব্যক্তিরা সেই স্বর্গপুরে যেতে পারে না। কেবল অধর্ম-

দোষবর্জিত ব্যক্তিরাই সেখানে প্রবেশের অধিকারী। তখন অসুরদলের অধিপতি বলি সৈন্য দ্বারা চারিদিক থেকে ইন্দ্রপুরীকে অবরুদ্ধ করে ইন্দ্রবধূদের ভয় জন্মাবার জন্য শুক্রাচার্যের দেওয়া প্রচণ্ড শব্দকারী শংখটি বাজালেন। ১৫-২৩

দেবরাজ ইন্দ্র বলিকে যুদ্ধে উদ্যত দেখে দেবতাদের সঙ্গে গিয়ে গুরু বৃহস্পতিকে নিবেদন করলেন, ভগবান্, এখন আমরা দেখছি আমাদের পূর্বশত্রু বলির উদ্যম অতি প্রচণ্ড। এ সত্যিই অসহ্য মনে হয়। সে আজ কোন তেজে এত বলবান হল? সে যেন মুখ দিয়ে এই বিশ্ব পান করছে, জিভ দিয়ে দশ দিক লেহন করছে, আর চোখ দিয়ে চারদিক পুড়িয়ে দিচ্ছে। বস্তুত সে যেন প্রলয়ের আগুনের মত উঠে এসেছে। মনে হয় সম্প্রতি কেউই কোন উপায়েই তার এই পরাক্রম নিবারণে সমর্থ নয়। গুরুদেব, যে কারণে আমার শত্রু এরকম দুর্ধর্ষ হয়েছে এবং যার থেকে তার এই ইন্দ্রিয়বল, মনোবল দৈহিক সামর্থ্য আর তেজের উদ্ভব হয়েছে তা আপনি আমাকে বলুন। ২৪-২৭

বৃহস্পতি বললেন, দেবরাজ, আমি তোমার এই শত্রুর উন্নতির কারণ জানি। ব্রহ্মবাদী ভৃগুবংশীয় ব্রাহ্মণেরা শিষ্য বলির মধ্যে এরূপ তেজ সঞ্চয় করিয়েছেন। সুতরাং একমাত্র ঈশ্বর শ্রীহরি বিনা তুমি কিংবা তোমার মত অন্য কেউই এখন তেজস্বী বলিকে জয় করতে সমর্থ হবে না। ব্রহ্মতেজে বলীয়ান বলিকে এখন পরাজয় করতে পারবে না। বস্তুত, লোক যেমন যমের সামনে থাকতে পারে না, সেরকম কেউই এর সামনে দাঁড়াতে পারবে না। অতএব তোমরা সকলে আপাতত স্বর্গপুরী ছেড়ে অন্যত্র লুকিয়ে থাক; আর যতদিন শত্রুর পরাজয় না হয় ততদিন অপেক্ষা কর। ব্রহ্মতেজহেতু উত্তরোত্তর বল বেড়েছে বলে সে প্রবল পরাক্রমশালী হয়ে উঠেছে। কিন্তু শেষে ব্রাহ্মণদের অবমাননা করে সে সবংশে বিনষ্ট হবে। ২৮-৩২

মহারাজ, কর্তব্যবিচারনিপুণ বৃহস্পতি এইভাবে সুমন্ত্রণা দিলে দেবতারা স্বর্গ ছেড়ে অন্যত্র চলে গেলেন। তারপর দেবতারা অদৃশ্য হলে বিরোচনপুত্র বলি দেবতাদের নিবাসস্থান স্বর্গপুরীতে থেকে ত্রিলোকের উপর নিজের আধিপত্য বিস্তার করলেন। তখন শিষ্যবৎসল ভৃগুবংশীয় ব্রাহ্মণেরা বিশ্ববিজয়ী অনুগত শিষ্য বলিরাজাকে দিয়ে একশত অশ্বমেধ যজ্ঞ করান। মহামনা বলি সেই একশত অশ্বমেধ যজ্ঞের প্রভাবে দশদিকে ত্রিলোক বিখ্যাত কীর্তি বিস্তার করে চন্দ্রের মত বিরাজ করতে লাগলেন। তিনি নিজেকে কৃতার্থ মনে করে ব্রাহ্মণদের প্রসাদে অতি সমৃদ্ধিশালী স্বর্গসম্পদ ভোগ করতে লাগলেন। ৩৩-৩৭

ষোড়শ অধ্যায়

দেবমাতা অদিতিকে কশ্যপের পয়োব্রত উপদেশ

শুকদেব বললেন, মহারাজ, এইভাবে আপন পুত্র দেবতারা অদৃশ্য হলে আর স্বর্গরাজ্য দৈত্যেরা অধিকার করলে অদিতি অনাথার মত দুঃখ করতে লাগলেন। এই সময়ে একদিন দীর্ঘকাল পরে সমাধি থেকে বিরত হয়ে প্রজাপতি কশ্যপ অদিতির নিরুৎসব ও নিরানন্দ আশ্রমে গেলেন। তিনি অদিতির দ্বারা পূজিত হয়ে আসন গ্রহণ করলেন এবং পত্নীকে ম্লানমুখ দেখে বললেন, কল্যাণি, এখন লোকমধ্যে ব্রাহ্মণ, ধর্ম আর মৃত্যুবশবর্তী জনগণের কোনরকম অমঙ্গল হয় নি তো?

যে গৃহে বাস করে যোগহীন গৃহীরাও যোগফল লাভ করে তোমার সেই গৃহে ধর্ম, অর্থ আর কামের কোন বিঘ্ন ঘটে নি তো? অথবা তুমি যখন পোষ্যদের পরিচর্যায় ব্যস্ত ছিলে, তখন অতিথিরা অভ্যর্থনা না পেয়ে ফিরে যান নি তো? যে সমস্ত গৃহে অতিথিরা অন্তত জল দিয়েও পূজিত না হয়ে ফিরে যান সে সমস্ত গৃহ শৃগালের আবাস। অথবা আমি প্রবাসে থাকাকালে চিত্তের উদ্বেগহেতু তুমি কি কখনও যথাসময়ে হবি দিয়ে অগ্নিত্রয়ের হোম করো নি? গৃহস্থ ব্যক্তি যাঁর পূজা দ্বারা পুণ্যলোকে যায় সেই ব্রাহ্মণ আর অগ্নিই ভগবান বিষ্ণুর মুখ। মনস্বিনি, তোমার পুত্ররা সকলে কুশলে তো? মুখ মলিন দেখে আমি তোমার অন্তঃকরণের অসুস্থতা অনুমান করছি। ১-১০

অদিতি বললেন, ব্রহ্মন্‌, গো, ব্রাহ্মণ, ধর্ম আর লোকসমুদয় কুশলেই আছে। আমাদের এই গৃহ, ধর্ম, অর্থ আর কামের উত্তম ক্ষেত্ররূপেই বিদ্যমান আছে। আমি সবসময়ই আপনার আদর্শের চিন্তা করি বলে অগ্নি, অতিথি, ভৃত্য, ভিক্ষুক আর ক্ষুধার্ত কারও যথোচিত সৎকার ক্ষুণ্ণ হয় নি। আপনি যখন আমার ধর্মোপদেশক, তখন কি আমার মানসিক কোন কামনা অসিদ্ধ থাকতে পারে? হে মরীচিনন্দন, সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণভোগী এই প্রজারা সকলেই আপনার মন আর শরীর থেকে উৎপন্ন। যদিও আপনি অসুর ইত্যাদি সকলের প্রতিই সমভাব পোষণ করেন, তথাপি পরমেশ্বর-ভক্তদের প্রতিই বিশেষ অনুগ্রহ দেখান। আমিও আপনারই ভজনা করি, সেজন্য আপনি আমাদের মঙ্গল চিন্তা করুন। শত্রুরা আমাদের ঐশ্বর্য আর বাসস্থান হরণ করে নিয়েছে, আপনি আমাদের রক্ষা করুন। আমি শত্রুদ্বারা নির্বাসিত হয়ে বিপদে পড়েছি, প্রবল শত্রুরা আমার ঐশ্বর্য, সম্পদ, যশ আর স্থান সবই নিয়েছে। প্রভু, আমার পুত্ররা যাতে সেই ঐশ্বর্য আবার ফিরে পায় আপনি সেই উপায় বলুন। ১১-১৭

শুকদেব বললেন, মহারাজ, অদিতি এইরকম প্রার্থনা করলে প্রজাপতি কশ্যপ একটু হেসে তাঁকে বললেন, বিষ্ণুর মায়া আশ্চর্যজনক। এই জগৎ সেই মায়াবলেই স্নেহবন্ধনে আবদ্ধ। পঞ্চভূতে নির্মিত জড় এই দেহই বা কোথায়, প্রকৃতির অতীত এই আত্মাই বা কোথায়? কে কার স্বামী-পুত্র? পরন্তু এসব বিষয়ে মোহই একমাত্র কারণ। সতি, তুমি সমস্ত জীবের হৃদয়গুহায় বিরাজমান জগতের গুরু জনার্দন পরমপুরুষ ভগবান বাসুদেবের আরাধনা কর দীনজনের প্রতি কৃপালু সেই শ্রীহরিই তোমার কামনা পূরণ করবেন। অন্য সেবা ব্যর্থ হতে পারে, কিন্তু ভগবৎসেবা কখনই ব্যর্থ হবে না। অদিতি বললেন, ব্রহ্মন্‌, আমি কি প্রকারে সেই জগদ্‌গুরুর আরাধনা করব, যাতে সেই সৎকল্প প্রভু আমার মনোবাসনা পূর্ণ করবেন? পুত্রদের সঙ্গে আমিও কষ্ট পাচ্ছি। যাতে শ্রীহরি শীঘ্রই আমার প্রতি প্রসন্ন হন, আপনি সেরূপ উপাসনাবিধি উপদেশ করুন। ১৮-২৩

কশ্যপ বললেন, ভদ্রে, আমি আগে সন্তান কামনায় ভগবান ব্রহ্মাকে এই বিধি জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেছিলেন, আমি তোমাকে ভগবান শ্রীহরির সন্তোষজনক সেই ব্রতের কথা বলছি। ফাল্গুন মাসের শুক্লপক্ষে পরম ভক্তিসহকারে বারো দিন শুধু দুধ পান করে ভগবান কমলনয়ন শ্রীহরির অর্চনা করবে। যদি বন্য বরাহদ্বারা উৎখাত মাটি সহজলভ্য হয় তবে তা গায়ে মেখে অমাবস্যা তিথিতে নদীতে স্নান করে এই মন্ত্র উচ্চারণ করবে, হে দেবী মৃত্তিকা, স্নানার্থী ভগবান আদিবরাহ রসাতল থেকে তোমাকে উদ্ধার করেছেন। আমি তোমাকে প্রণাম করি; তুমি আমার পাপ বিনাশ কর। তারপর নিত্যনৈমিত্তিক নিয়মিত কাজের অনুষ্ঠান করে প্রতিমা, কুশাচ্ছাদিত

ভূমি, সূর্য, জল, অগ্নি বা গুরুর মধ্যে একাগ্রচিত্তে ভগবান শ্রীহরির অর্চনা করবে। হে দেব, আপনি সকল ভূতের আধার, সর্বসাক্ষী, ভগবান, মহামহিমময়, পরমপুরুষ বাসুদেব; আপনাকে প্রণাম করি। আপনি পুরুষোত্তম অথবা সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি ও পুরুষ, আপনিই চতুর্বিংশতি তত্ত্বের প্রবর্তক। আপনাকে প্রণাম করি। আপনি যজ্ঞের ফলদাতা অথচ যজ্ঞস্বরূপ। যজ্ঞের আরম্ভকালীন কর্ম আর সমাপ্তিকালীন কর্ম আপনার দুটি মাথা, যজ্ঞকালীন তিনবার স্নান আপনার তিনটি পা, চারটি বেদ আপনার চারটি শৃঙ্গ, সাতটি ছন্দ আপনার সাতটি হাত এবং আপনি মন্ত্র, ব্রাহ্মণ আর কাল এই ত্রিবিধ শাস্ত্রে আবদ্ধ আছেন। আপনাকে প্রণাম করি। আপনি শিব, আপনিই রুদ্র, আপনিই শক্তিধর, সমস্ত বিদ্যার অধিপতি এবং ভূতপতি। আপনাকে প্রণাম করি। আপনি হিরণ্যগর্ভ, সূত্রাত্মা, জগদাত্মা, যোগ ও ঐশ্বর্য আপনার শরীর, আপনি যোগের প্রবর্তক। আপনাকে নমস্কার করি। আপনি আদিদেবতা ও সকলের সাক্ষী, আপনি নর ও নারায়ণ এই দুই ঋষি, আবার আপনিই শ্রীহরি। আপনাকে প্রণাম করি। আপনার দেহ মরকতমণির মত শ্যামবর্ণ, আপনি সমস্ত সম্পদ বা লক্ষ্মীকে লাভ করেছেন। আপনি কেশব এবং পীতাম্বর, আপনাকে প্রণাম করি। হে বরদশ্রেষ্ঠ, বরেণ্য, আপনি সমস্ত বরদাতা, অতএব পণ্ডিত ব্যক্তিরা শ্রেয়োলাভের জন্য আপনার পদরেণুর উপাসনা করেন। নিখিল দেবতারা আর স্বয়ং লক্ষ্মীদেবীও পাদপদ্মযুগলের সৌরভলাভের আশায় যাঁর অনুসরণ করেন সেই ভগবান আমার প্রতি প্রসন্ন হোন। ২৪-৩৭

এই নটি মন্ত্র বলে ভগবান হৃষীকেশকে আবাহনপূর্বক সম্মানিত করবে; পরে পা ধুয়ে শ্রদ্ধাযুক্ত মনে জল দিয়ে অর্চনা করবে। তারপর ভগবানকে গন্ধ আর মালা দিয়ে পুজো করে দুধ দিয়ে স্নান করাবে; এরপরে বস্ত্র, উপবীত, আভরণ, পাদ্য, আচমনীয়, গন্ধ আর ধূপ দিয়ে তাঁকে অর্চনা করবে। অর্চনাকারী ব্যক্তি বিত্তশালী হলে তিনি দুধে শালিধানের অন্ন পাক করে ঘি ও গুড় সহযোগে নৈবেদ্য দিয়ে দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রে হোম করবেন। ভগবানের উদ্দেশ্যে নিবেদিত অন্ন ভক্তকে দান করবে অথবা নিজে খাবে। পরে আচমন করে অর্চনাপূর্বক তাম্বূল নিবেদন করবে। তারপর একশ আটবার মূলমন্ত্র জপ আর স্তব করে প্রভুকে প্রদক্ষিণ করে হৃষ্টচিত্তে মাটিতে দণ্ডবৎ হয়ে প্রণাম করবে। নিজের মাথায় নির্মাল্য ধারণ করে এবং দেবতাকে বিসর্জন দিয়ে অন্তত দুজন ব্রাহ্মণকে পরমান্ন সহযোগে যথোচিত ভোজন করাবে। এর পর পূজিত ব্রাহ্মণদের অনুমতি নিয়ে নিজের বন্ধুদের সঙ্গে অবশিষ্ট অন্ন ভোজন করবে। আর সেদিন রাত্রিতে ব্রহ্মচর্য পালন করে পরের দিন স্নান দ্বারা শুদ্ধ হয়ে যথাবিধি সংযতচিত্তে আরাধ্য দেবতাকে দুধ দিয়ে স্নান করাবে। ব্রতের সমাপ্তিকাল পর্যন্ত এরকম করতে হবে। বিষ্ণুপুজোয় শ্রদ্ধাযুক্ত ব্যক্তি একমাত্র দুধ খেয়ে এই ব্রত আচরণ করবে আর ব্রতের সময় প্রত্যেক দিন আগুনে হোম করে ব্রাহ্মণদের খাওয়াবে। এইভাবে বারোদিন পর্যন্ত প্রতি দিন দুধ খেয়েশ্রীহরির আরাধনা, হোম, পুজো আর ব্রাহ্মণদের সন্তোষবিধান করবে। প্রতিপদ দিন থেকে শুক্লা ত্রয়োদশী পর্যন্ত ব্রহ্মচর্য পালন, মাটিতে শয়ন আর প্রত্যেকদিন তিনবার স্নান করতে হবে। এই ব্রতের সময় একমাত্র ভগবান বাসুদেবে আত্মসমর্পণ করে হিংসা, অসদালাপ আর নানারকম ভোগ পরিত্যাগ করবে। তারপর ত্রয়োদশী তিথিতে বিধিজ্ঞ ব্রাহ্মণদের দিয়ে শাস্ত্রের বিধি অনুসারে পঞ্চামৃত সহযোগে ভগবান বিষ্ণুর স্নান করাবে। বিত্ত থাকতে শঠতাহেতু তাঁর বায়বিষয়ে কুণ্ঠা না করে ভালভাবে পুজো করবে। দুধের পায়েস তৈরী করে জীবের অন্তর্যামী বিষ্ণুকে তা নিবেদন করতে হবে। সংযতচিত্ত হয়ে পূর্বের মন্ত্রে ভগবান বিষ্ণুর পুজো করবে এবং তাঁর

সন্তোষবিধায়ক উৎকৃষ্ট নৈবেদ্য দেবে। জ্ঞানী আচার্য ও ঋত্বিক্‌দিগকে বস্ত্র, আভরণ ও গরু দান করে সন্তুষ্ট করবে। এটাই শ্রীহরির আরাধনা বলে জানবে। ভদ্রে, আচার্য, ঋত্বিক আর সমাগত অন্যান্য ব্রাহ্মণদের সকলকেই অতি উত্তম অন্ন দিয়ে ভোজন করাবে। তারপর আচার্য আর ঋত্বিকদের যথাযোগ্য দক্ষিণা দিয়ে সমাগত আচণ্ডাল সকল লোককে অন্নদানে সন্তুষ্ট করবে। দীন, অন্ধ আর দুর্গত-দের খাওয়া হলে পর আত্মীয়-বন্ধুদের সঙ্গে বসে নিজে খাবে। দীনদুঃখীদের ভোজন করালেই বিষ্ণু প্রীত হয়ে থাকেন, একথা মনে রাখবে। এইভাবে ব্রতকালমধ্যে প্রতিদিনই নাচ, বাজনা, গান, স্বস্তিবাচন আর ভগবানের গুণকীর্তন করে তাঁর পূজার অনুষ্ঠান করবে। ৩৮-৫৭

ভদ্রে, এই পয়োব্রত ভগবান বিষ্ণুর পরমারাধনা স্বরূপ। ভগবান ব্রহ্মা আমাকে এর উপদেশ দিয়েছিলেন। এখন আমি তোমার কাছে এই ব্রত আচরণের কথা বললাম। তুমি সংযমের সঙ্গে বিশুদ্ধচিত্তে নিয়মমত এই ব্রত পালন করে শ্রীহরির আরাধনা কর। এরই নাম সর্বযজ্ঞ, সর্বব্রত নামেও এ আখ্যাত হয়েছে। এ-ই সকল তপস্যার সার, এ-ই মহৎ দান, আর এ-ই ঈশ্বরের তর্পণ বলে খ্যাত। এর দ্বারাই ভগবান শ্রীহরি তুষ্ট হন, সুতরাং এ-ই সাক্ষাৎ নিয়ম, এ-ই উত্তম যম, এ-ই তপস্যা, এ-ই দান, এ-ই ব্রত এবং এ-ই যজ্ঞ। অতএব তুমি সংযত হয়ে শ্রদ্ধার সঙ্গে এই ব্রত আচরণ কর। তা হলেই ভগবান শ্রীহরি সন্তুষ্ট হয়ে শীঘ্রই তোমার অভীষ্ট বর দেবেন। ৫৮-৬২

সপ্তদশ অধ্যায়

অদিতির গর্ভে ভগবানের জন্ম

শুকদেব বললেন, মহারাজ, অদিতির স্বামী মহর্ষি কশ্যপ ঐ রকম উপদেশ দিলে অদিতি আলস্যহীন হয়ে দ্বাদশ-দিন-সাধ্য ঐ ব্রত আচরণ করতে আরম্ভ করলেন। তিনি আপন বুদ্ধিতে চালিত হয়ে ইন্দ্রিয়রূপ দুষ্ট অশ্বগুলিকে নিগ্রহ করে অনন্য-চিত্তে মহাপুরুষ ঈশ্বরের চিন্তায় প্রবৃত্ত হলেন। একাগ্রবুদ্ধি দ্বারা তিনি অখিলাত্মা ভগবান বাসুদেবে মন সমাধান করে অহরহ পয়োব্রতের অনুষ্ঠান করতে লাগলেন। অদিতির ব্রতচারণে সন্তুষ্ট হয়ে অচিরেই পীতবস্ত্র পরিহিত শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী শ্রীহরি অদিতির সামনে আবির্ভূত হলেন। অদিতি তাঁকে সামনে দেখতে পেয়ে ব্যস্তসমস্ত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন এবং প্রীতিবিহ্বল নেত্রে ভূমিতে দণ্ডবৎ হয়ে প্রণাম করলেন। পরে গাত্রোত্থান করে কৃতাঞ্জলিপুটে দাঁড়িয়ে রইলেন। স্তব করার সামর্থ্য তাঁর ছিল না, তিনি নীরবে দাঁড়িয়ে রইলেন, কারণ তাঁর দুই চোখ আনন্দাশ্রুতে প্লাবিত এবং দেহ পুলকে পরিব্যাপ্ত হয়ে উঠল। নারায়ণ-দর্শন জনিত যে আনন্দ জন্মাল, সেই আনন্দে তাঁর দেহে শিহরণ হতে লাগল। হে কুরুশ্রেষ্ঠ, অদিতি নয়ন দিয়ে রমাপতি, যজ্ঞপতি জগৎপতিকে যেন পান করতে লাগলেন এবং অবশেষে ধীরে ধীরে প্রীতিপূর্ণ গদ্‌গদ বাক্যে স্তব করতে আরম্ভ করলেন। ১-৭

অদিতি বললেন, হে যজ্ঞেশ্বর, যজ্ঞপুরুষ, তীর্থপাদ, তীর্থকীর্তি, আদ্য, আপনি আমাদের মঙ্গল বিধান করুন। আপনার নাম শ্রবণমাত্রই মঙ্গল হয়। ভগবান্, আপনি দীনবন্ধু শরণাগত লোকদের পাপরাশি নাশের জন্যই আপনার আবির্ভাব। আপনি

মহৎ,বিশ্ব আপনার স্বরূপ। আপনার থেকেই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় হয়ে থাকে। আপনি স্বেচ্ছায় মায়াগুণ গ্রহণ করেন, কিন্তু আপনি স্বরূপ পরিত্যাগ করেন না। যে পূর্ণজ্ঞানে আপনি উদ্ভাসিত, তার দ্বারা মায়ারূপ অন্ধকারকে আপনি নিজে থেকে অপসারণ করেন ; আপনাকে নমস্কার করি। হে অনন্ত, আপনি তুষ্ট হলে ব্রহ্মার মত দীর্ঘ পরমায়ু, লোভনীয় দেহ, অতুল ঐশ্বর্য, স্বর্গ, পৃথিবী, পাতাল এবং যোগগুণ সবই উৎপাদন করতে পারেন, শত্রুজয় প্রভৃতি অতি সামান্য মঙ্গলের কথা আর বেশী কি বলব ? ৮-১০

শুকদেব বললেন, মহারাজ, অদিতি এই রকম স্তব করলে পদ্মপলাশলোচন অন্তর্যামী ভগবান বললেন, দেবজননি, অমর শত্রুরা সৌভাগ্য-শ্রী সবলে অপহরণ করে তোমার পুত্রদের নিজ নিজ অধিকার থেকে বিচ্যুত করেছে। তুমি অনেকদিন যাবৎ যে বাসনা করছ তা আমি জানি। ১১-১২

তোমার ইচ্ছা এই যে, তোমার পুত্ররা যুদ্ধস্থলে দৈত্যশ্রেষ্ঠদের পরাজিত করে লুপ্ত জয়শ্রী ফিরে পান এবং তুমি তাদের সঙ্গে একত্রে থাকতে পার। যাতে তোমার পুত্ররা দৈত্যদের বধ করলে পর তাদের মহিষীরা দুঃখে ক্রন্দন করে আর তুমি তা বসে দেখ এবং যাতে তোমার পুত্ররা যশ ও সম্পদলাভ করে দৈত্যদের হাত থেকে জয়লক্ষ্মী পুনর্বার উদ্ধার করে স্বর্গধামে বিহার করেন, এই তোমার একান্ত অভিলাষ। কিন্তু দেবি, আমার মনে হচ্ছে যে এখন তুমি দেত্যদলপতিদের পরাজয় করতে সমর্থ হবে না। সমর্থ ব্রাহ্মণরা তাদের রক্ষা করছেন, সুতরাং বিক্রমের দ্বারা মঙ্গলের আশা নেই। তোমার ব্রত আচরণে আমি সন্তুষ্ট হয়েছি, অতএব এ বিষয়ে আমি উপায় চিন্তা করব। তোমার আরাধনা ব্যর্থ হবে না, তা শ্রদ্ধানুরূপ ফলই প্রসব করবে। তুমি পুত্র-রক্ষার্থ আমার যে অর্চনা এবং পয়োব্রত দ্বারা আমার যে স্তব করলে তাতে আমি পরম পরিতুষ্ট হয়েছি। কশ্যপের তপস্যা আশ্রয় করে আমি নিজের অংশে তোমার পুত্রত্ব গ্রহণ করব এবং তোমার পুত্রদের রক্ষা ও পালন করব। তুমি এখন তোমার নিষ্পাপ পতি প্রজাপতির কাছে গিয়ে তাঁর ভজনা কর। ভজনাকালে চিন্তা করবে যে আমিই তোমার পতির মধ্যে এইরূপে আছি। এরপর যা যা ঘটবে তা তোমাকে বলব না। কেননা ওটা গোপনীয় থাকা প্রয়োজন। দেবতাদের রহস্য যত গুপ্ত থাকবে তা দ্বারা ততই উত্তমরূপে সিদ্ধিলাভ করা যাবে। ১৩-২০

শুকদেব বললেন, মহারাজ, ভগবান এই কথা বলে সেখান থেকে অন্তর্হিত হলেন। অদিতি নিজের গর্ভে প্রভু শ্রীহরির দুর্লভ জন্মলাভের আশায় পরম কৃতার্থ হয়ে দৃঢ়ভক্তি সহকারে পতিকে ভজনা করতে লাগলেন। অব্যর্থদৃষ্টি মহর্ষি কশ্যপ সমাধিযোগে দেখতে পেলেন যে শ্রীহরির অংশ তাঁতে প্রবিষ্ট হল। যেরকম সর্বত্র সমান বায়ু কাষ্ঠ সংঘর্ষণ দ্বারা বনদাহক অগ্নি উৎপাদন করে, সেই রকম মন স্থির করে বহুকাল কঠোর তপস্যা করে যে বীর্য প্রজাপতি সঞ্চয় করেছিলেন, অদিতির গর্ভে সেই বীর্য আধান করলেন। সনাতন ভগবান অদিতির গর্ভে অধিষ্ঠিত হয়েছেন জানতে পেরে হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা গুহ্য নাম দ্বারা তাঁর স্তব করে বললেন, হে উরুগায় ভগবান, আপনার জয় হোক ; আপনাকে নমস্কার। পূর্ব-জন্মে এই অদিতির নাম পৃশ্নি ছিল ; আপনি তাঁর গর্ভে জন্মেছিলেন। বেদসকল আপনার গর্ভে অবস্থান করে। বিধাতা, লোকত্রয় আপনার নাভিস্থল ; আপনি ত্রিলোকের উপরিভাগে অধিষ্ঠিত, আপনাকে নমস্কার, নমস্কার। আপনি ভুবনের আদি, অন্ত ও মধ্য ; পণ্ডিতেরা আপনাকে অনন্ত শক্তিশালী পুরুষ বলে কীর্তন করে থাকেন। গভীর স্রোত যেরকম তার মধ্যে পতিত তৃণকে আকর্ষণ করে, সেইরকম

কালরূপী আপনি এই বিশ্বকে প্রলয়কালে আকর্ষণ করেন। স্থাবর, জঙ্গম, প্রজা এবং প্রজাপতিরা আপনা থেকে উৎপন্ন হয়ে থাকেন।[১] জল-নিমগ্নপ্রায় ব্যক্তির পক্ষে নৌকা যেমন আশ্রয়, সেরকম আপন স্বর্গভ্রষ্ট দেবতাগণের একমাত্র আশ্রয়। ২১-২৮

অষ্টাদশ অধ্যায়

বলির যজ্ঞশালায় বামনদেবের আবির্ভাব

শুকদেব বললেন, মহারাজ, ব্রহ্মা এইভাবে ভগবানের কর্ম ও প্রভাব বিষয়ে স্তব করতে থাকলে জন্ম-মৃত্যুরহিত চতুর্ভুজ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী, পীতবাস, পদ্ম-সদৃশ, দীর্ঘলোচন পুরুষ অদিতির গর্ভে আবির্ভূত হলেন। শ্রীহরির বর্ণ শ্যাম, অথচ উজ্জ্বল মুখমণ্ডল মকরকুণ্ডলের প্রভায় উদ্ভাসিত। বলয়, অঙ্গদ, কিরীট, কাঞ্চীদাম এবং নূপুর তাঁর শ্রীঅঙ্গে শোভা পাচ্ছিল। তাঁর গলদেশে বেষ্টিত শোভনীয় বনমালা মধ্যে অলিকুল গুনগুন রবে গান করছিল। তাঁর কণ্ঠে কৌস্তুভমণি সন্নিবেশিত ছিল। ভগবান এইভাবে আবির্ভূত হয়ে আপন দীপ্তিতে কশ্যপের গৃহের অন্ধকার দূর করলেন। তাঁর জন্মসময়ে সকল দিক ও সরোবর প্রসন্ন হয়। প্রজাবর্গ অত্যন্ত আনন্দিত হল, ঋতুসকল নিজ নিজ গুণ প্রকাশ করল এবং স্বর্গ, আকাশ, পৃথিবী, গো-ব্রাহ্মণ-দেবগণ ও পর্বতরাজি সকলেই আনন্দিত হলেন। ঐ দিন চন্দ্র শ্রবণানক্ষত্রে অবস্থিত ছিল। অশ্বিনী প্রভৃতি গ্রহ, সমস্ত নক্ষত্র এবং বৃহস্পতি, শুক্র প্রভৃতি গ্রহগণও অনুকূলে থেকে শুভাবহ হয়েছিলেন। ১-৫

পণ্ডিতেরা বলেন যে দ্বাদশীতে শ্রীহরির জন্ম হয়েছিল তার নাম বিজয়া দ্বাদশী। তখন সূর্যদেব দিনের মধ্যভাগে অবস্থিত ছিলেন। ভগবান বামনদেব ভূমিষ্ঠ হওয়ামাত্র শঙ্খ, দুন্দুভি, ভেরী, মৃদঙ্গ, পণব, আনক এবং অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র ও তূরীর তুমুল শব্দ উত্থিত হল। অপ্সরাগণ আনন্দে নাচতে লাগল, গন্ধর্বরা গান করল এবং মুনিরা স্তব আরম্ভ করলেন। দেব, মনু, পিতৃগণ, অগ্নি আর সিদ্ধ, বিদ্যাধর, কিংপুরুষ, কিন্নর, চারণ, যক্ষ, রক্ষ, সুপর্ণ, পন্নগ, দেবানুচর, আদিত্যগণ নৃত্য করতে করতে তাঁর গুণগান ও প্রশংসা করে পুষ্পবৃষ্টি দ্বারা কশ্যপের আশ্রম আচ্ছন্ন করলেন। নিজ গর্ভসম্ভূত সেই পরমপুরুষকে নিরীক্ষণ করে অদিতির বিস্ময় ও আনন্দ দুই-ই হল। প্রজাপতি কশ্যপ যোগমায়ায় গৃহীত-কলেবর সেই পরেশকে দর্শন করে এই শুধু বললেন, ভগবান জয়যুক্ত হও। ভগবান শ্রীহরি চিৎ অব্যক্ত থেকে ব্যক্ত বিগ্রহ ধারণ করে নিজের দ্যুতি, ভূষণ ও অস্ত্র সজ্জিত সেই শরীরেই দর্শনকারী মাতা-পিতার সামনে নটের মত বামন ব্রাহ্মণকুমার হলেন। তাঁর অতিদিব্য-ঐ রূপ পরিগ্রহ বিচিত্র নয়। যাহোক ঐ বামন বটুকে দেখে মহর্ষিরা আনন্দ প্রকাশ করতে করতে প্রজাপতি কশ্যপের ঘরে গেলেন এবং তাঁর জাত-কর্মাদি সংস্কার করালেন। তারপর যখন ঐ বটুর উপনয়ন হল, তখন সূর্যদেব স্বয়ং গায়ত্রী উপদেশ করলেন, আর বৃহস্পতি যজ্ঞসূত্র এবং কশ্যপ মেখলা পরিয়ে দিলেন। বামনরূপী জগৎপতিকে বসুন্ধরা কৃষ্ণাজিন, বনস্পতি সোমদণ্ড, মাতা কৌপীনবস্ত্র, স্বর্গ ছত্র, যক্ষরাজ ভিক্ষাপাত্র এবং সাক্ষাৎ ভগবতী অম্বিকা সতী তাঁকে ভিক্ষা দিলেন।

১ তুলনীয়: শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ, ৪।৪

সেই সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকুমার এই ভাবে ব্রাহ্মণোচিত সমস্ত সামগ্রী লাভ করে নিজের ব্রহ্মতেজ দ্বারা ব্রহ্মর্ষিগণের সভায় অপূর্ব শোভা ধারণ করলেন। তারপর তিনি প্রজ্বলিত অগ্নির চারদিকে সম্মার্জন করে কুশ আস্তরণ এবং অর্চনা করে তাতে যজ্ঞকাষ্ঠ দিয়ে হোম নিষ্পন্ন করলেন। ৬-১৯

এই সময় শোনা গেল যে ভৃগুগণ মহাবল দৈত্যপতি বলিকে অশ্বমেধযজ্ঞে দীক্ষিত করেছেন। এই কথা শুনেই সকল বলে পরিপূর্ণ বামনদেব সেখানে যাত্রা করলেন। তাঁর প্রতি পদক্ষেপে ধরাতল কম্পিত হতে লাগল। নর্মদা নদীর উত্তর তটে ভৃগুকচ্ছ নামক ক্ষেত্রে বলির যে সব ভৃগুবংশীয় ঋত্বিক ঐ শ্রেষ্ঠ যজ্ঞের কাজ করছিলেন, বামনরূপী নারায়ণ সেখানে উপস্থিত হলেন। তাঁকে দেখে ব্রাহ্মণদের মনে হল যেন অতি নিকটে সূর্যদেবের উদয় হয়েছে। তাঁর তেজে পুরোহিত, যজমান বলি এবং সদস্যরা হতপ্রভ হলেন এবং ভাবতে লাগলেন – স্বয়ং সূর্য, অগ্নি অথবা সনৎকুমার যজ্ঞ দেখার জন্য এখানে এসেছেন। সশিষ্য ভৃগুগণ যখন বামনদেব সম্বন্ধে এই রকম নানা আলোচনা করছেন, এমন সময়ে ভগবান দণ্ড, ছত্র এবং জলপূর্ণ কমণ্ডলু ধারণ করে অশ্বমেধ মণ্ডপে প্রবিষ্ট হলেন। মায়াবামন রূপধারী শ্রীহরির কটিদেশ মুঞ্জনির্মিত মেখলায় বেষ্টিত, যজ্ঞোপবীতের ন্যায় কৃষ্ণাজিনময় উত্তরীয় বাম স্কন্ধে নিবেশিত, মস্তকে জটাকলাপ এবং দেহ খর্ব। তাঁকে দেখেই ভৃগুগণ তাঁর তেজে অভিভূত হলেন এবং শিষ্য ও অগ্নিদের সঙ্গে গাত্রোত্থান করে অভ্যর্থনা করলেন। যজমান বলিও দর্শনীয় মনোরম রূপের অনুরূপ অবয়বধারী বামনকে আসন প্রদান করলেন এবং স্বাগত বলে বন্দনা করে পাদদ্বয় প্রক্ষালন করিয়ে মুক্তসঙ্গ ও মনোরম ভগবান বামনদেবের পূজা করলেন। ধর্মজ্ঞ বলি বামনের কুলপাপ-নাশন সুমঙ্গল পাদোদক মস্তকে ধারণ করলেন। সেই পাদোদক সামান্য নয়; চন্দ্রশেখর দেবদেব মহাদেব পরম ভক্তি সহকারে ঐ পাদোদক মস্তকে ধারণ করেছিলেন। ২০-২৮

বলি বললেন, ব্রাহ্মণ, আপনাকে নমস্কার। সুখে এসেছেন তো? পথে কোন কষ্ট হয়নি তো? আজ্ঞা করুন, আপনার কোন্ কার্য সাধন করব? প্রভু, মনে হচ্ছে আপনি ব্রহ্মর্ষিদের মূর্তিমতী তপস্যা। আপনার পদার্পণে আজ আমাদের পিতৃগণ তৃপ্ত হলেন, আজ আমাদের কুল পবিত্র হল, আজ এই যজ্ঞ সুচারুরূপে সম্পাদিত হল। ব্রাহ্মণনন্দন, আজ আমার অগ্নিসকল যথাবিধি হুত হলেন, আপনার পদজলে আমার সকল পাপ নষ্ট হল এবং আপনার ক্ষুদ্র চরণে এই ভূমিও পবিত্র হল। আপনি প্রার্থীরূপে এসেছেন বলে মনে হচ্ছে। ভূমি, স্বর্ণ, উৎকৃষ্ট বাসস্থান, মিষ্টান্ন, কন্যা, সমৃদ্ধ গ্রাম, অশ্ব, গজ বা রথ—এর মধ্যে আপনার যা ইচ্ছা হয় তাই আপনি আমার কাছ থেকে গ্রহণ করুন। ২৯-৩২

ঊনবিংশ অধ্যায়

বলির নিকট বামনদেবের ত্রিপাদ ভূমি প্রার্থনা

শুকদেব বললেন, মহারাজ, বলির এই ধর্মানুযায়ী সত্যবাক্য শুনে ভগবান সন্তুষ্ট হয়ে তাঁর প্রশংসা করে বললেন—পারলৌকিক ধর্মে কুলবৃদ্ধ শান্ত পিতামহ প্রহ্লাদ তোমার নিদর্শন। অতএব নরদেব, তুমি যে এই সত্য কথা বললে, এটা ধর্মযুক্ত,

যশস্কর এবং তোমার কুলোপযোগীই বটে । তোমাদের বংশে এরূপ হৃদয়হীন বা কৃপণ কেউই জন্মায়নি যে ব্রাহ্মণকে দান করতে অস্বীকার করে বা দান করব বলে করে না। তোমাদের কুলে যে সব পুরুষ জন্মেছেন তাঁরা দানকালে অথবা যুদ্ধ-সময়ে যাচক কর্তৃক প্রার্থিত হয়ে কখনও পরাঙ্মুখ হন নি। প্রহ্লাদ অমল কীর্তি-প্রভা বিস্তার করে আকাশে তারাপতির মতো দীপ্তি পাচ্ছেন। তোমাদের এই বংশে হিরণ্যাক্ষ জন্মগ্রহণ করে গদাহস্তে একা দিগ্বিজয় করে অখিল ভূমণ্ডল ভ্রমণ করেছিলেন, কোথাও প্রতিযোদ্ধার সম্মুখীন হন নি। বিষ্ণু কর্তৃক পৃথিবীর উদ্ধারকালে হিরণ্যাক্ষ তাঁর কাছে গেলেন। নারায়ণ বহু কষ্টে তাঁকে জয় করে তাঁর ভূরিবীর্য স্মরণ করে নিজেকে জয়ী বলে ঘোষণা করেছিলেন। হিরণ্যাক্ষের ভ্রাতা হিরণ্যকশিপু সহোদরের সংহারবার্তা শুনে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে ভ্রাতৃহন্তাকে বধ করার জন্য শ্রীহরির আলয়ে যাত্রা করেছিলেন। শমন সদৃশ হিরণ্যকশিপুকে শূলহস্তে আসতে দেখে মায়াবীশ্রেষ্ঠ কালজ্ঞ বিষ্ণু ভাবতে লাগলেন—আমি যেখানে যেখানে যাচ্ছি, প্রাণীর মৃত্যুর মতো এই অসুরও সেই সেই স্থানে আমার পিছন পিছন যাচ্ছে। অতএব এর হৃদয়ে আমি প্রবেশ করব। এখন আমি ওর দৃষ্টির বাইরে। এইভাবে সংকল্প করে ভগবান স্বয়ং নাসারন্ধ্র দিয়ে শত্রুর অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন। প্রবেশকালে শ্বাসবায়ুতে তাঁর সূক্ষ্মদেহ অন্তর্হিত হল এবং হৃদয় কাঁপতে লাগল। হিরণ্যকশিপু বিষ্ণুকে দেখতে না পেয়ে তাঁর শূন্য ভবনের চারদিকে ঘুরে সিংহনাদ করতে লাগলেন এবং তাঁকে খোঁজার জন্য পৃথিবী, স্বর্গ, দিঙ্মণ্ডল, আকাশ এবং সমুদ্র তোলপাড় করলেন ; কিন্তু কোথাও তিনি নারায়ণের দেখা পেলেন না। তখন বললেন, আমি সমস্ত জগৎ খুঁজেও আমার ভাইয়ের হত্যাকারীর সন্ধান পেলাম না। মানুষ যেখানে গেলে আর ফেরে না আমার ভ্রাতৃহন্তাও নিশ্চয় সেখানেই গেছে। ১-১২

মহারাজ, ইহকালে দেহীর শত্রুতা মৃত্যু পর্যন্ত এমনই প্রবল থাকে। প্রহ্লাদের পুত্র এবং তোমার পিতা বিরোচন দ্বিজবৎসল ছিলেন। দেবগণ দ্বিজবেশ ধারণ করে তাঁরই শত্রুতাচরণ করতে এসেছেন একথা জানতে পেরেও তিনি সেই ছদ্মবেশী দেবগণের প্রার্থনা মত তাঁদের নিজ পরমায়ু দান করেছিলেন। গৃহ-ধর্মপরায়ণ ব্রাহ্মণগণ, প্রাচীন বীরগণ এবং অন্যান্য যশস্বী ব্যক্তিরা যে সব ধর্মের অনুষ্ঠান করেছেন, তুমিও সেই সকলই আচরণ করছ। অতএব, দৈত্যেন্দ্র, তোমার কাছে আমার পদের ত্রিপাদ পরিমিত ভূমি প্রার্থনা করি। তুমি দাতা ও জগতের প্রভু, কিন্তু তোমার কাছে আর কিছুই আমি চাইনা। যেটুকু প্রয়োজন বিদ্বান ব্যক্তি সেটুকু গ্রহণ করলে পাপভাগী হন না। বলি বললেন, বিপ্রতনয়, আপনার বাক্য বৃদ্ধের মত কিন্তু আপনি তো বালক, অতএব আপনার বুদ্ধি অজ্ঞের মত। কারণ আপনার স্বার্থবিষয়ে কোনই বোধ নেই। আমি ত্রিলোকের অধীশ্বর, একটা দ্বীপ দান করতে পারি। কিন্তু আপনি এমনই অবোধ যে আমাকে কথা দিয়ে সন্তুষ্ট করে ত্রিপাদ পরিমিত সামান্য ভূমি চাইছেন। আমার কাছে এলে কোন ব্যক্তির আর অপর পুরুষের কাছে কিছুই প্রার্থনা করতে হয় না। অতএব আপনার সংসার-যাত্রা নির্বাহ করতে যত পরিমাণ ভূমি প্রয়োজন তা আপনি আমার কাছ থেকে গ্রহণ করুন। ১৩-২০

শ্রীভগবান বললেন, মহারাজ, ত্রিলোকের মধ্যে যা কিছু প্রিয়তম, অভীষ্ট বস্তু আছে সে সবও অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির পরিতৃপ্তি সাধন করতে পারে না। যে ব্যক্তি ত্রিপাদ পরিমিত ভূমিতে সন্তুষ্ট হয় না, নয়টি বর্ষ বিশিষ্ট একটি দ্বীপ পেলেও তার আশা মেটে না ; কারণ তখন তার সপ্তদ্বীপ লাভের বাসনা হয়।

এমনও শুনেছি যে পৃথু, গয় প্রভৃতি রাজগণ সপ্তদ্বীপের অধীশ্বর হলেও এবং যাবতীয় অর্থ-কাম ভোগ করলেও তাঁদের বিষয়ভোগের তৃষ্ণা নিবৃত্ত হয় নি। সন্তুষ্ট ব্যক্তি যদৃচ্ছা (অনায়াসলব্ধ) বস্তু পেয়েও সুখে বাস করেন, কিন্তু অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি ত্রিলোকের অধিপতি হয়েও সুখী হয় না। পণ্ডিতেরা বলেন, অর্থ ও কাম বিষয়ে অসন্তোষই মানুষের সংসার-দুঃখের কারণ। যদৃচ্ছালব্ধ বস্তুতে সন্তুষ্ট থাকলে তার তেজ বর্ধিত হয়, কিন্তু অসন্তোষ প্রযুক্ত ব্রহ্মতেজ জলে নিপতিত অগ্নির মত নিবে যায়। বরদশ্রেষ্ঠ, আমি তোমার কাছে ত্রিপাদ পরিমিত ভূমিই চাই। আমি তা পেলেই নিজেকে চরিতার্থ জ্ঞান করব। ২১-২৭

শুকদেব বললেন, বামনদেবের এই কথা শুনে বলি হেসে 'এই নিন' বলে ভূমি দান করার জন্য জলপাত্র গ্রহণ করলেন। কিন্তু জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য বিষ্ণুর উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে ভূমিদানে উদ্যত শিষ্য বলিকে বললেন, বলি, ইনি সাক্ষাৎ অব্যয় ভগবান বিষ্ণু, দেবগণের কার্যসাধনের জন্য কশ্যপের ঔরসে অদিতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছেন। তুমি আসন্ন বিপদ বুঝতে পারছ না বলেই এঁকে দান করতে উদ্যত হয়েছ। আমি ভাল বুঝছি না ; দৈত্যদের মহাবিপদ উপস্থিত। এই মায়াবামনরূপী শ্রীহরি তোমার স্থান, ঐশ্বর্য, শ্রী, তেজ, যশ ও বিদ্যা সবই অপহরণ করে ইন্দ্রকে দেবেন। বিশ্বই এঁর দেহ, ইনি তিনবার পদবিন্যাসে তিন লোক অধিকার করবেন। তোমার সর্বস্ব শেষ হবে। মূর্খ, বিষ্ণুকে সর্বস্ব দান করে তুমি কি নিয়ে থাকবে ? এই বামনের একপদে পৃথিবী, দ্বিতীয় পদে স্বর্গ আর বিশাল দেহে গগনমণ্ডল ব্যাপ্ত হবে। তৃতীয় পদের গতি কি হবে ? তুমি দান করবার অঙ্গীকার করেছ, কিন্তু তোমার দেবার আর কিছুই তখন থাকবে না। সুতরাং স্বীকৃত দান করতে অসমর্থ হবে, প্রতিজ্ঞা পূরণ করতে পারবে না। আপন প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে না পারার দরুন তোমাকে নরকবাস করতে হবে। ২৮-৩৫

বৃত্তিসম্পন্ন পুরুষই দান, যজ্ঞ, তপস্যা ও পূর্তাদি কাজ করতে পারেন। যে দান দ্বারা অঙ্গোপায় নষ্ট হয়ে যায়, পণ্ডিতগণ সে দানের প্রশংসা করেন না। পুরুষ সম্পত্তিকে পাঁচ ভাগে ভাগ করে ধর্ম, যশ, অর্থ, কাম স্বজনের উদ্দেশ্যে ব্যয় করে থাকেন ; এতে ইহলোক ও পরলোক উভয় লোকেই তিনি সুখে কালযাপন করতে পারেন। শ্রুতিতেও এ সম্বন্ধে যা কথিত হয়েছে, আমার নিকট তা শোন। 'হাঁ দেব' এই যে অঙ্গীকার, ঋগ্বেদ-শ্রুতিতে তাই 'সত্য' বলে নির্দিষ্ট হয়েছে। তারপর 'না, দেব না' এই যে অস্বীকার এ 'মিথ্যা' বলে পরিগণিত।[১] সত্য হল দেহরূপ বৃক্ষের পুষ্প ও ফল ; কারণ শ্রুতিতে এই রকমই বলা হয়েছে। বৃক্ষ জীবিত না থাকলে তার ফুল-ফল নষ্ট হয়ে যায়। মিথ্যা দ্বারা দেহরক্ষা হয়ে থাকে। কারণ মিথ্যা দেহের মূল। যে রকম মূল উৎপাটিত হলে বৃক্ষ শীঘ্রই পতিত ও শুষ্ক হয়, সেরকম যে ব্যক্তির মিথ্যা নাশ পায়, তার দেহ নিশ্চয়ই সদ্য শীর্ণ হয়ে পড়ে। মানুষ যা কিছু 'হ্যাঁ, দান করব' বলেন, তাতে আর তাঁর অধিকার থাকে না। অতএব 'হ্যাঁ, দেব' এই শব্দে পূর্ণতা আসে না, কেননা সমস্ত সম্পত্তি দান করলেও যাচকের আশা পূর্ণ করা সম্ভব নয়। আর, এতে দাতার অর্থ দূরে চলে যায়। যে ব্যক্তি ভিক্ষুকের প্রার্থিত বস্তু সবকিছুই দান করতে স্বীকৃত হন, তিনি নিজে কিছুই ভোগ করতে পান না। অতএব 'না' এই মিথ্যাবাক্য পূর্ণ, কেননা

---

১ সত্যমেব জয়তে নানৃতং, সত্যেন পন্থা বিততো দেবযানঃ।

যেনাক্রমন্ত্যৃষয়ো হ্যাপ্তকামা যত্র তৎ সত্যস্য পরমং নিধানম্। মুণ্ডক উপঃ ৩।১।৬

এতে অর্থব্যয় ঘটেনা এবং যে ব্যক্তি নিত্য 'আমার কিছু নেই, আমি কষ্ট পাচ্ছি' এরূপ বলে সে সেই মিথ্যা বাক্য দ্বারা অপরের অর্থকে আকর্ষণ করে। কিন্তু সাধারণক্ষেত্রে মিথ্যাবাক্য বলবে না। কারণ যিনি সর্বদা এই কথা বলেন, তিনি দুষ্কীর্তির ভাগী হন এবং জীবিত অবস্থায়ও মৃততুল্য গণ্য হন। স্ত্রীবশীকরণ কালে, হাস্য-পরিহাসে, বিবাহে বরের গুণানুকীর্তনে, জীবিকা-বৃত্তি রক্ষার জন্য প্রাণসঙ্কটে, গো-ব্রাহ্মণের হিতসাধনের জন্য এবং কারও প্রাণসংশয় উপস্থিত হলে মিথ্যাকথন দোষাবহ নয়। ৩৬-৪৩

বিংশ অধ্যায়

বিশ্বরূপ দর্শন

শুকদেব বললেন, মহারাজ, গৃহপতি বলি কুলাচার্য শুক্রের এইসব কথা শুনে ক্ষণকাল নীরবে অবস্থান করে গুরুকে বললেন, গুরুদেব, আপনি সত্যই বলেছেন—যাতে কোন সময়েই অর্থ; কাম, যশ এবং বৃত্তি ব্যাঘাত হয় না, গৃহস্থের তাই প্রকৃত ধর্ম। কিন্তু আমি প্রহ্লাদের পৌত্র, 'দেব' বলে অঙ্গীকার করেছি, এখন ধনলোভে সামান্য বঞ্চকের মত কিভাবে ব্রাহ্মণকে 'দেব না' বলব? মিথ্যার মত গুরুতর অধর্ম আর নেই। পৃথিবী বলেছিলেন, মিথ্যাবাদী মানুষ ছাড়া আমি সকলকেই বহন করতে সমর্থ। ব্রাহ্মণকে বঞ্চনা করতে আমার যেমন ভয় হয়, নরক, দারিদ্র্য, স্থানচ্যুতি কিংবা মৃত্যু থেকেও সেই রকম ভয় হয় না। মানুষের মৃত্যু হলে ইহলোকের সমস্ত বস্তুই তাকে ত্যাগ করবে। যে বস্তু দ্বারা ব্রাহ্মণের সন্তোষ না জন্মে, সেরূপ দান নিষ্ফল। দধীচি, শিবি প্রভৃতি সাধুরা নিজেদের প্রাণ দান করেও প্রাণীর হিত সাধন করে গিয়েছেন। তাই পৃথিবী পরিত্যাগ করতে দ্বিধা কেন? ১-৭

যুদ্ধে অনিবৃত্ত থেকে যে সব দৈত্যপতি এই পৃথিবী ভোগ করে গিয়েছেন, করাল কাল তাঁদের ভোগ বিনষ্ট করেছে, কিন্তু তাঁরা অবনীতলে যে যশ অর্জন করেছিলেন, তা আজও অক্ষয় হয়ে আছে। হে বিপ্রর্ষি, প্রতিযোদ্ধার প্রার্থনানুসারে যুদ্ধে যিনি মৃত্যুবরণ করেন, এমন ব্যক্তি লোকমধ্যে সুলভ। কিন্তু সৎপাত্র পেয়ে তাঁকে তাঁর প্রার্থিত ধন দান করেন এমন মানুষ বড়ই দুর্লভ। সামান্য অর্থীর অভিলাষ পূরণ করে দরিদ্র হওয়া যখন দয়াশীল মনস্বী ব্যক্তির গৌরববৃদ্ধিকর, তখন আপনাদের মতো ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণকে দান করে দরিদ্র হওয়ার কথা আর কি বলব। আপনারা বেদবিহিত বিধানে যজ্ঞ ও ক্রতু দ্বারা যাঁর আরাধনা করেন, ইনি যদি সেই বরদ বিষ্ণুই হন, তবে শত্রু হলেও আমি এঁকে এঁর প্রার্থিত ভূমি দান করব। আমি নিরপরাধ, যদি ইনি অধর্ম করে আমাকে বন্ধন করেন, তবুও আমি ভীরুস্বভাব ব্রাহ্মণরূপধারী এই বটুর হিংসা করব না। এই উত্তমশ্লোক পুরুষ যদি নিজের যশ ত্যাগ করতে ইচ্ছা না করেন, তা হলে আমাকে যুদ্ধে বধ করে এই পৃথিবী গ্রহণ করবেন অথবা নিহত হয়ে ধরাশায়ী হবেন। ৮-১৩

শুকদেব বললেন, মহারাজ, শিষ্য এইরকম অশ্রদ্ধা করে আদেশ পালন না করাতে গুরু যেন দৈব কর্তৃক প্রেরিত হয়ে সেই সত্যপ্রতিজ্ঞ অসুরশ্রেষ্ঠ বলিকে অভিশাপ দিয়ে বললেন, তুই অজ্ঞ; কিন্তু পণ্ডিত বলে তোর অহঙ্কার রয়েছে।

আমাদের উপেক্ষা করে তুই আমার শাসন অতিক্রম করলি। অচিরে তুই শ্রীভ্রষ্ট হবি। নিজের গুরু এইরকম অভিশাপ দিলেও মহাত্মা বলি সত্য থেকে বিচলিত হলেন না। তিনি জল হাতে নিয়ে অর্চনা করে বামনকে ভূমি দান করলেন। সেই সময় বলির স্ত্রী বিন্ধ্যাবলি মুক্তাভরণ ও মাল্যে বিভূষিতা হয়ে পাদপ্রক্ষালন উপযোগী জলপূর্ণ স্বর্ণকলস নিয়ে স্বামীর কাছে স্থাপন করলেন। যজমান বলি পরম সন্তোষে বামনের সুন্দর পদযুগল ধৌত করে সেই বিশ্বপাবন জল নিজ মস্তকে ধারণ করলেন। এই সময় স্বর্গে দেবতা, গন্ধর্ব, বিদ্যাধর, সিদ্ধ ও চারণগণ সকলেই আনন্দিত হয়ে ঐ মহৎ কাজের প্রশংসা করতে করতে পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেন। সহস্র সহস্র দুন্দুভি বারংবার বাজতে লাগল। মনস্বী বলি সবকিছু জেনে শুনেও শত্রুকে ত্রিভুবন দান করলেন—এ অতি দুষ্কর কাজ। একথা বলে গন্ধর্ব, কিন্নর ও কিম্পুরুষগণ সুস্বরে গান করতে আরম্ভ করল। ১৪-২০

দেখতে দেখতে শ্রীহরির সেই বামনরূপ আশ্চর্যভাবে বর্ধিত হল। গুণত্রয় ঐ রূপের অন্তর্গত; সুতরাং পৃথিবী, আকাশ, দিক, স্বর্গ, বিবর, সমুদ্র, পশু, পক্ষী, নর, দেব, ঋষিগণ সকলেই ঐ রূপে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বলি এবং তাঁর ঋত্বিক, আচার্য ও সদস্যগণ মহাবিভূতিশালী সেই শ্রীহরির গুণাত্মক দেহে এই ত্রিগুণাত্মিক বিশ্ব এবং ভূত, ইন্দ্রিয়, বিষয়, চিত্ত ও জীবকে দেখতে পেলেন।[১] তখন বলি দেখলেন—সেই পরমপুরুষ বিশ্বমূর্তি শ্রীহরির পদতলে রসাতল, পাদদ্বয়ে ধরণী, জঙ্ঘাযুগলে পর্বতরাজি, জানুদেশে পক্ষিগণ এবং উরুদ্বয়ে মরুদ্‌গণ। তাঁর বসনে সন্ধ্যা, গুহ্যে প্রজাপতি, জঘনস্থলে স্বয়ং ও সমস্ত অসুরগণ, নাভিস্থলে আকাশ, কুক্ষিদেশে সপ্তসমুদ্র, বক্ষঃস্থলে নক্ষত্রনিচয়, হৃদয়ে ধর্ম, স্তনদ্বয়ে ঋত ও সত্য, মনে চন্দ্র, উরঃস্থলে পদ্মহস্ত কমলা, কণ্ঠে সামবেদ। তার বাহুচতুষ্টয়ে ইন্দ্র প্রভৃতি যাবতীয় দেবতা, কর্ণযুগলে দিক্‌সকল, মস্তকে স্বর্গ, কেশে মেঘ, নাসিকায় বায়ু, দুই চক্ষুতে সূর্য, বদনে অগ্নি, বচনে বেদসকল, রসনায় বরুণ, ভ্রূদ্বয়ের মধ্যভাগে নিষেধ ও বিধি, চোখের পাতায় দিবা ও রাত্রি, ললাটে ক্রোধ, অধরে লোভ, স্পর্শে কাম, শুক্রে জল, পৃষ্ঠে অধর্ম পাদন্যাসে যজ্ঞ, ছায়াতে মৃত্যু, হাস্যে মায়া এবং লোমে ওষধি। সেই শ্রীহরির নাড়ীগুলীতে নদী, নখে শিলা, বুদ্ধিতে ব্রহ্মা, ইন্দ্রিয়গুলিতে দেব ও ঋষিগণ এবং গাত্রে স্থাবর-জঙ্গম সহ যাবতীয় প্রাণীকে বলি দেখতে পেলেন।[২] ২১-২৯

মহারাজ, অসুরেরা সর্বাত্মা বামনের দেহে এই ত্রিভুবন দর্শন করে বিস্মিত হল। অসহ্যতেজ সুদর্শন চক্র, মেঘের মতো গম্ভীরশব্দযুক্ত শৃঙ্গনির্মিত ধনু, পাঞ্চজন্য শঙ্খ, কৌমোদকী গদা, বিদ্যাধর নামে শতচন্দ্রশোভিত অসি এবং অক্ষয়বাণ পূরিত তূণ-যুগল—এই সবের অধীশ্বর শ্রীহরিকে বেষ্টন করে সুনন্দ প্রভৃতি পার্ষদ ও লোকপালগণ স্তব করতে লাগলেন। অতুলবিক্রম শ্রীহরি দীপ্তিমান কিরীট, অঙ্গদ, মকরকুণ্ডল, রত্নশ্রেষ্ঠ শ্রীবৎস, মেখলা, বস্ত্র এবং অলিকুলসেবিত বনমালা ধারণ করে শোভা পেতে লাগলেন। ভগবান এক পায়ে বলির পৃথিবী, শরীর দ্বারা আকাশ, এবং বাহু দ্বারা দিঙ্‌মণ্ডল আক্রমণ করলেন। তারপর

১ এই প্রসঙ্গে ভগবদ্‌গীতার সমগ্র একাদশ অধ্যায় (বিশ্বরূপদর্শন যোগ) দ্রষ্টব্য। ঐ অধ্যায়ের ১৫শ শ্লোকে অর্জুন বললেন: 'হে দেব, আমি আপনার বিরাট দেহে সমস্ত দেবতা, নানা ধরনের স্থাবর-জঙ্গম ভূতসমূহ, নারদাদি দেবর্ষিগণ, বাসুকি প্রভৃতি সর্পসমূহ এবং পদ্মাসনস্থ প্রভু ব্রহ্মাকে দেখতে পাচ্ছি।'

২ তুলনীয়: ভগবদ্‌গীতা, ১১শ অধ্যায়ের ১৫-২১শ শ্লোকাবলী।

যখন দ্বিতীয় পা বিস্তার করলেন তখন স্বর্গে তার কোনরূপে স্থান হল বটে, কিন্তু তৃতীয় পায়ের জন্য অণুমাত্র স্থানও আর রইল না। উরুক্রম শ্রীহরির দ্বিতীয় পদই ক্রমে ঊর্ধ্বভাগে মহর্লোক, জনলোক ও তপোলোক অতিক্রম করে সত্যলোক স্পর্শ করল। ৩০-৩৪

একবিংশ অধ্যায়

বিষ্ণু কর্তৃক বলির বন্ধন

শুকদেব বললেন, মহারাজ, ভগবান বামনের সেই চরণকে সত্যলোকে উপস্থিত হতে দেখে ব্রহ্মা মরীচি, সনন্দন প্রভৃতি ঋষিগণের সঙ্গে বলির যজ্ঞস্থানে ভগবানের চরণসন্নিধানে এলেন। শ্রীহরির পদনখরূপ চন্দ্রের কিরণে তাঁর নিজধামের দীপ্তি ম্লান দেখাচ্ছিল। তিনি নিজেও সেই প্রভায় আচ্ছন্ন হলেন। বেদ, উপবেদ, যম, নিয়ম, তর্ক, ইতিহাস, বেদাঙ্গ, পুরাণ এবং সংহিতাসমুদয় সেখানে উপস্থিত হয়ে বিষ্ণুকে প্রণতি জানালেন। যোগরূপ বায়ুসংযোগে উজ্জ্বল জ্ঞানাগ্নি দ্বারা যে সব ব্যক্তির কর্মসকল ভস্মীভূত হয়েছিল এবং যাঁরা বিষ্ণুস্মরণ প্রভাবেই কর্মদ্বারা অপ্রাপ্য সেই ব্রহ্মলোক পেয়েছিলেন, তাঁরাও সেখানে উপস্থিত হয়ে শ্রীহরিকে বন্দনা করলেন। তারপর ব্রহ্মা বিষ্ণুর শ্রীচরণে প্রক্ষালনের জল অর্পণ করে তাঁর পূজা করলেন এবং তারপর ভক্তি সহকারে স্তব করতে লাগলেন। কমলযোনি ব্রহ্মা ঐ বিষ্ণুর নাভিপদ্ম থেকে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বিধাতার কমণ্ডলুজল বিষ্ণুর পাদপ্রক্ষালনের দ্বারা পবিত্র হয়ে স্বর্গনদীরূপে আকাশ-গঙ্গায় পরিণত হল। ঐ জল আজও অমল কীর্তির মত আকাশতলে পতিত হতে হতে আমাদের এই ধরাধাম পবিত্র করছে। ক্রমে বিষ্ণু নিজের বিস্তার সংকোচ করে পুনরায় বামনমূর্তি ধারণ করলেন। তখন ব্রহ্মা প্রভৃতি লোকনাথেরা অনুচরবর্গের সঙ্গে উপস্থিত হয়ে বামনরূপী স্বয়ং বিষ্ণুকে শীতল জল, সুন্দর মালা, সুরভি চন্দন ও অনুলেপন, বিবিধ সুগন্ধি ধূপ, দীপ, খৈ ও আতপ চাল এবং ফল প্রভৃতি পূজোপহার অর্পণ করে স্তব করলেন। সে সময় বীর্য ও মাহাত্ম্যসূচক জয়ধ্বনি উচ্চারিত হল। নানারকম বাদ্য সহকারে নাচ ও গান হতে লাগল; শঙ্খ ও দুন্দুভি ধ্বনিত হল। ঋক্ষরাজ জাম্ববান ভেরীর শব্দে দিকে দিকে বিজয় মহোৎসব ঘোষণা করলেন। ১-৮

ত্রিপাদ ভূমি-ভিক্ষাচ্ছলে যজ্ঞদীক্ষিত বলির সমগ্র ধরাধাম অপহৃত হল দেখে অসুরেরা অত্যন্ত ক্রোধে বলতে লাগল, এ ব্রাহ্মণবন্ধু বিষ্ণু নয়, এ প্রধান মায়াবী, ছদ্মব্রাহ্মণরূপে ভিক্ষুক হয়ে আমাদের প্রভুর সর্বস্ব হরণ করল। প্রভু সত্যব্রত, কখনই মিথ্যা বলেন না। বিশেষত সম্প্রতি যজ্ঞে দীক্ষিত হয়ে অগ্নিতে দণ্ড নিক্ষেপ করেছেন। ইনি দয়াবান ও ব্রাহ্মণহিতৈষী। তাই বামনরূপী শত্রুকে বধ করলে আমাদের অধর্ম হবে না; বরং তাতে স্বামীর সেবা করাই হবে। এই বলে অনুচর অসুরেরা বধ করার জন্য শূল, পট্টিশ প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বলির অনিচ্ছাসত্ত্বেও মহাক্রোধে বামনের দিকে ছুটে গেল। তাদের এভাবে ধাবিত হতে দেখে বিষ্ণুর অনুচরেরা হেসে নিজের নিজের অস্ত্র নিয়ে অসুরদের নিবারণ করলেন। কিন্তু তারা কিছুতেই নিবৃত্ত হল না দেখে নন্দ, সুনন্দ, জয়, বিজয়, প্রবল, বল, কুমুদ, কুমুদাক্ষ, বিষ্বক্‌সেন, গরুড়, জয়ন্ত,

শ্রুতদেব, পুষ্পদণ্ড ও সাত্বত এঁরা সকলে অসুরসেনা সংহার করতে লাগলেন। বিষ্ণুর অনুচরেরা সকলেই অযুত হস্তিতুল্য বলশালী। ৯-১৭

নিজের সৈন্যদের নিহত হতে দেখে বলি শুক্রাচার্যের শাপ স্মরণ করে ক্রুদ্ধ দৈত্যদের নিষেধ করে বললেন, হে বিপ্রচিত্তি, রাহু, নেমি, আমার কথা শোন, যুদ্ধ কোর না, ক্ষান্ত হও, সময় এখন আমাদের অনুকূল নয়। যিনি সর্বপ্রাণীর সুখ-দুঃখ-জন্মের কর্তা, পৌরুষে কেউই তাঁকে অতিক্রম করতে পারে না। পূর্বে যে ভগবান আমাদের মঙ্গলদাতা এবং দেবতাদের অমঙ্গলদাতা হয়েছিলেন, এখন তিনিই তাঁর বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হয়েছেন। বল, অমাত্য, বুদ্ধি, দুর্গ, মন্ত্র, ঔষধ কিংবা সাম প্রভৃতি উপায়—এর কোনটির দ্বারাই মানুষ কালকে জয় করতে পারে না। পূর্বে তোমরা শ্রীহরির এই অনুচরদের বহুবার জয় করেছিলে। কিন্তু এখন এঁরা দৈব কর্তৃক সমৃদ্ধ হয়েছেন, সেইজন্য এঁরা সম্প্রতি আমাদের জয় করে মহাগর্জন করছেন। দৈব যখন অনুকূল হবেন, তখন আমরা আবার এঁদের জয় করতে পারব। এই কাল আবার আমাদের অনুকূল হবে। তোমরা তার জন্য অপেক্ষা কর। ১৮-২৪

শুকদেব বললেন, মহারাজ, বলির এই কথা শুনে দৈত্যদলপতিরা বিষ্ণুপার্ষদদের তাড়নাভয়ে রসাতলে (পাতালে) প্রবেশ করতে উদ্যত হল। তারপর গরুড় শ্রীহরির অভিপ্রায় বুঝতে পেরে যজ্ঞীয় সোমাভিষব দিবসে বরুণপাশ দ্বারা বলিকে বেঁধে ফেললেন। বলিকে বন্ধন করলে আকাশ ও পৃথিবী সর্বদিকেই মহান হাহাকার ধ্বনি উঠতে লাগল। বরুণ-পাশবদ্ধ, শ্রীভ্রষ্ট, স্থিরপ্রতিজ্ঞ, মহাযশা বলিকে শ্রীহরি বললেন, অসুরবর, তুমি আমাকে তিনপাদ ভূমি দান করেছ, আমি দুই পদে সমগ্র পৃথিবী অধিকার করেছি, তৃতীয় পদের স্থান কোথায়? আমাকে তৃতীয় পদ রাখবার স্থান দাও। ২৫-২৯

তিনি আরো বললেন, এই সূর্য যতদূর পর্যন্ত উত্তাপ দেয়, যতদূর পর্যন্ত চন্দ্র নক্ষত্রদের সঙ্গে প্রভা বিস্তার করে থাকেন এবং যতদূর পর্যন্ত মেঘেরা বারিবর্ষণ করে; ততটুকুই তো তোমার ভূমি। আমি একপায়ে সমস্ত ভূলোক, শরীর দ্বারা আকাশ ও দিক্‌সকল এবং দ্বিতীয় পায়ে তোমার স্বর্গলোক আক্রমণ করেছি। এইভাবে আমি তোমার যথাসর্বস্ব গ্রহণ করলাম, তবুও তুমি প্রতিশ্রুত ভূমি দিতে পারলে না। তোমার নরকবাস করা উচিত; গুরু শুক্রের অনুমতি নিয়ে তুমি নরকে প্রবেশ কর। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণের কাছে প্রতিজ্ঞা করে প্রতিশ্রুতি বস্তু তাঁকে দান করতে পারে না, তার বাসনা বিফল হয়ে যায়, তার থেকে স্বর্গ থাকে বহু দূরে, তার অধঃপতন হয়। তুমি নিজেকে সমৃদ্ধিশালী মনে কর, অথচ দানের প্রতিশ্রুতি দিয়েও আমাকে প্রতারিত করেছ। অতএব এ মিথ্যা ব্যবহারের ফলস্বরূপ কয়েক বৎসর নরকবাস ভোগ কর। ৩০-৩৪

দ্বাবিংশ অধ্যায়

সত্যনিষ্ঠ বলির বন্ধনমুক্তি ও বরলাভ

শুকদেব বললেন, মহারাজ, ভগবান বামনদেব এইভাবে বলির অপকার সাধন করে তাঁকে সত্যভ্রষ্ট করার উপক্রম করলেও অসুররাজ বলি ক্ষুব্ধ না হয়ে নিঃসঙ্কোচে

এই কথা বললেন, সুরশ্রেষ্ঠ, আপনি কপট আচরণ করে বাসনারূপ ধারণ করে ত্রিপাদ ভূমি প্রার্থনা করেছেন। পরে বিরাট দেহ ধারণ করে সেই ভূমি নিতে চেয়েছেন বলে সেই পরিমাণ ভূমি না দিতে পারলেও আপনি আমার প্রতিজ্ঞা-বাক্যকে মিথ্যা বলতে পারেন না। তবুও যদি আপনি তাকে মিথ্যাই বলেন, তাহলে যাতে আমার প্রতিশ্রুতিবাক্য নিষ্ফল না হয়, তাই করছি। আপনি আমার মাথায় তৃতীয় পা দিন। আমি এখন নিজের পদ থেকে বিচ্যুত হয়েছি। এ অবস্থায়ও আমি অপকীর্তিকে যেরকম ভয় করি, নরক, পাশবন্ধন, দুর্লঙ্ঘ্য বিপত্তি, অর্থকষ্ট বা আপনার দেওয়া পীড়নকেও সেরকম ভয় করি না। পরমপূজ্যগণ যে দণ্ড দেন, তাকে আমি দণ্ডিত পুরুষদের পক্ষে আদরণীয় বলেই মনে করি, কারণ এরূপ দণ্ড মা, বাবা, ভাই বা বন্ধুরাও দিতে পারে না। ভগবান্, আপনি প্রভুর মত আমাদের অসুরদের প্রমত্তভাব নষ্ট করে জ্ঞানদৃষ্টি দেওয়াতে নিশ্চয়ই আমাদের পরোক্ষ পরমগুরু। অনেক অসুরই আগে আপনার প্রতি নিরবচ্ছিন্ন বৈরভাব পোষণ করে যে সিদ্ধিলাভ করেছেন, তা কেবল একনিষ্ঠ যোগীরাই লাভ করেন। বহু লীলার আশ্রয় সেই পরমগুরু আপনি এখন আমাকে নিগৃহীত করে বরুণপাশে আবদ্ধ করেছেন, এতে আমার লজ্জা নেই। দেবগণ দ্বারা সমাদৃত ও প্রশংসিত প্রহ্লাদ আপনার শত্রু নিজের পিতার দ্বারা নানাভাবে উৎপীড়িত হয়েও আপনাতেই শরণাগত হয়েছিল। মৃত্যুর পর যে দেহ অবশ্যই জীবকে ছেড়ে চলে যায়, মরণশীল লোকের সেই দেহের কি প্রয়োজন? বিত্ত-হরণকারী পুত্রদেরই বা কি প্রয়োজন? এইরকম সংসার-বন্ধনের কারণ পত্নী দ্বারাই বা কোন্ ইষ্টসিদ্ধি হতে পারে? আর যে গৃহে কেবল আয়ুক্ষয়ই সার, সেই গৃহ দিয়েই বা কি হবে? এইরকম ভেবেই আমার পিতামহ মহাজ্ঞানী মহাপুরুষ প্রহ্লাদ লোকসঙ্গ থেকে ভয় পেয়ে নিজের কুলের সংহারকারী আপনারই নির্ভয় ও অক্ষয় পাদপদ্মের আশ্রয় নিয়েছিলেন। আমিও সেই প্রহ্লাদের সৌভাগ্যবশেই নিজের শত্রু আপনার পায়ের কাছে এসেছি। আর যে সম্পদের মোহে মুগ্ধ মানুষ প্রায়ই মৃত্যুর দ্বারে উপস্থিত হয়েও নিজের জীবনকে কখনও অনিত্য মনে করে না, প্রহ্লাদের সৌভাগ্যই আমাকে সেই মোহসম্পদ ত্যাগ করিয়েছে। ১-১১

শুকদেব বললেন, কুরুশ্রেষ্ঠ মহারাজ, বলি যখন এরকম বলছিলেন, তখনই উদিত পূর্ণচন্দ্রের মত ভগবানের প্রিয় প্রহ্লাদ সেখানে উপস্থিত হলেন। তখন দৈত্যপতি বলি পদ্মসদৃশ বিশালাক্ষী, উন্নতকায়, পিঙ্গলবস্ত্রধারী, শ্যামবর্ণ, দীর্ঘবাহু, শ্রেষ্ঠ সৌভাগ্যশালী তাঁর পিতামহকে দেখতে পেলেন। এসময় বলি বরুণপাশে আবদ্ধ ছিলেন বলে পূর্বের ন্যায় তাঁকে পাদ্যার্ঘ্য দিতে পারলেন না; কেবল সজল চোখে তাঁকে প্রণাম করে আপন অহংকারের অপরাধের জন্য লজ্জায় মুখ নত করে-ছিলেন। মহামতি প্রহ্লাদ সেখানে সুনন্দ প্রভৃতি অনুচরদের দ্বারা সেবিত, সজ্জনপালক শ্রীহরিকে দেখে পুলকিত ও অশ্রুধারায় বিহ্বল হয়ে তাঁর কাছে এসে মাথা নিচু করে প্রণাম করলেন। প্রহ্লাদ বললেন, ভগবান্, আপনিই বলিকে আগে সমৃদ্ধি-শালী ইন্দ্রপদ দিয়ে এখন তা কেড়ে নিচ্ছেন। বস্তুত এ ভালই হয়েছে। আমি মনে করি আপনি তাকে যে আত্মমোহজনক সম্পদ থেকে বিচ্যুত করেছেন, এতে তার প্রতি পরম অনুগ্রহ প্রকাশ করা হল। যে সম্পদ লাভ করলে বিদ্বান এবং সংযত লোকও মোহিত হন, সেই সম্পদ থাকতে অপর কোন্ ব্যক্তিই বা যথার্থভাবে আত্মতত্ত্ব জানতে সমর্থ হয়? অতএব বলির সম্পদ হরণ করে আপনি তার মহা উপকার করেছেন। আমি সর্বলোকের সাক্ষী জগদীশ্বর নারায়ণরূপী আপনাকে প্রণাম করি। ১২-১৭

শুকদেব বললেন, মহারাজ, তারপর ভগবান ব্রহ্মা কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থিত প্রহ্লাদের শ্রুতিগোচর করে মধুসূদনকে কিছু বললেন। এ সময়ে বলিপত্নী সাধ্বী বিন্ধ্যাবলি পতিকে আবদ্ধ দেখে ভয় পেয়ে কৃতাঞ্জলি হয়ে বামনদেবকে প্রণাম করে নতমুখে বললেন, ঈশ, আপনি নিজের লীলা প্রকাশের জন্যই এই ত্রিলোকের সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু অন্য দুর্বুদ্ধি লোকেরা এই ত্রিলোকে প্রভুত্ব বিস্তার করে। এই জগতের সৃষ্টিকর্তা, পালক আর সংহারকারী বলে আপনি যাদের কেবলমাত্র কর্তৃত্ব দিয়েছেন সেই নিলজ্জরা আপনাকে কোন্ বস্তু দান করতে পারে? ব্রহ্মা বললেন, ভূতভাবন, ভূতেশ, দেবদেব, জগন্ময়, আপনি হৃতসর্বস্ব এই বলিকে বন্ধনমুক্ত করুন, কারণ ইনি নিগ্রহের যোগ্য নন। ইনি আপনাকে সমগ্র ভূমি ও কর্মদ্বারা অর্জিত সকল লোক দান করেছেন এবং অবশেষে অকাতরে সর্বস্ব, এমনকি নিজেকে পর্যন্ত নিবেদন করেছেন। ভগবন্, সরলবুদ্ধি যে কোন লোক আপনার পায়ে জল আর দূর্বা দিয়ে পূজার অনুষ্ঠান করে উত্তমগতি লাভ করে; এ অবস্থায় অকাতরচিত্তে এই ত্রিলোক দান করে বলি কেন নিগ্রহ ভোগ করবে? ১৮-২৩

ভগবান বললেন, ব্রহ্মন্, আমি যাকে অনুগ্রহ করি তার সকল অর্থ অপহরণ করি, কারণ লোক ধনমদে গর্বিত হয়ে জগৎ এবং আমাকে পর্যন্ত অবজ্ঞা করে। পরাধীন জীবগণ নানা যোনি, যথা কীটপতঙ্গের যোনিতে ভ্রমণ করতে করতে সৌভাগ্যক্রমে কখনও মানুষরূপে জন্মায়। সেই মানুষজন্মে যদি জীবের উত্তম বংশে জন্ম, সৎকর্ম, যৌবন, সৌন্দর্য, বিদ্যা, প্রভুত্ব আর ধনাদি দ্বারাও মোহমত্ততার সৃষ্টি না হয়, তা হলে তার প্রতি আমার অনুগ্রহ বর্ষিত হয়েছে মনে করতে হবে। মান ও অহংকারের ঔদ্ধত্য সকল দিকের সমস্ত রকম মঙ্গলের প্রতিকূল। আমার ভক্তরা এ সকল দ্বারা মুগ্ধ হন না। এজন্য ধ্রুবের মত ভক্তদের আমি ইচ্ছানুরূপ সম্পদ দান করি। দৈত্যকুলের সর্বশ্রেষ্ঠ নায়ক দৈত্যরাজ বলি দুর্জয় মায়াকে জয় করেছে আর বিপদে বা প্রলোভনেও মোহগ্রস্ত হয় নি। বলি সম্প্রতি ধনহীন, স্থানভ্রষ্ট, শত্রুদের দ্বারা তিরস্কৃত ও বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে, জ্ঞাতিরাও একে পরিত্যাগ করেছে এবং এ নানাভাবে যাতনাভোগ করছে। দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যও বলিকে ভর্ৎসনা করে অভিশাপ দিয়েছেন, তবুও এই সুব্রত পুরুষ সত্য পরিত্যাগ করে নি। আর আমি ছল করে যে ধর্মের কথা বলেছি, সত্যবাদী বলি সেই ধর্মকেও লঙ্ঘন করে নি। অতএব আমি একে দেবতাদেরও দুর্লভ স্থান দান করছি। সাবর্ণি মন্বন্তরে এই বলি ইন্দ্র হবে, আর আমি তার পালকরূপে থাকব। যতদিন না ঐ মনুপদ লাভ হয় ততদিন বলি বিশ্বকর্মার নির্মিত সুতলে বাস করবে। আমার দৃষ্টির প্রভাবে সুতলের অধিবাসীরা আধি, ব্যাধি, ক্লান্তি, তন্দ্রা, পরাভব ও অন্যান্য উপদ্রব থেকে মুক্ত থাকবে। ২৪-৩২

তারপর শ্রীহরি বলিকে বললেন, মহারাজ, তোমার মঙ্গল হোক। এখন তুমি আত্মীয়দের দ্বারা পরিবৃত হয়ে দেবতাদের বাঞ্ছিত সুতলে যাও। লোকপালেরাও তোমাকে পরাভূত করতে পারবে না, অপরের কথা কি? যে সমস্ত দৈত্য তোমার আদেশ অমান্য করবে আমার সুদর্শন চক্র তাদের বধ করবে। হে বীর, আমি অনুচর ও পরিচ্ছদ সহ সর্বতোভাবে তোমাকে রক্ষা করব, আর তুমি সুতলে সবসময়ই আমাকে উপস্থিত দেখবে। সেখান দৈত্য-দানবদের সঙ্গহেতু তোমার আসুর ভাব উৎপন্ন হলেও আমার প্রভাবে তখনই তা নষ্ট হবে। ৩৩-৩৬

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

বলির সুতলে গমন

শুকদেব বললেন, মহারাজ, পুরাণপুরুষ বামনরূপী ভগবান শ্রীহরির কথা শুনে মহানুভব বলির চক্ষু আনন্দাশ্রুতে পূর্ণ হল। ভক্তিনত হয়ে তিনি কৃতাঞ্জলিপুটে বললেন, ভগবান্, আপনার উদ্দেশ্যে প্রণামের অদ্ভুত মহিমা! আমি প্রণাম করি নি, প্রণাম করবার উদ্যম করেছিলাম শুধু। আর আমি আপনার ভক্তও নই। তা সত্ত্বেও শরণাগত ভক্তদের ক্ষেত্রে যেমন করেন সেভাবেই আপনি আমারও মনোবাঞ্ছা পূরণ করেছেন। সত্ত্বপ্রধান লোকপালেরা আপনার যে অনুগ্রহ পূর্বে লাভ করতে পারেন নি, আমি নিকৃষ্ট অসুর হলেও কেবলমাত্র প্রণামের উদ্যমের দ্বারাই আপনার সেই অনুগ্রহ লাভ করেছি। ১-২

শুকদেব বললেন, মহারাজ, বন্ধনমুক্ত বলি একথা বলে শ্রীহরি, ব্রহ্মা ও শঙ্করকে প্রণাম করলেন এবং সন্তুষ্টচিত্তে অসুরদের সঙ্গে সুতলে প্রবেশ করলেন। ভগবান শ্রীহরি এইভাবে ইন্দ্রকে স্বর্গলোক দিয়ে অদিতির মনোবাসনা পূর্ণ করে নিজে উপেন্দ্ররূপে ত্রিলোক পালন করেছিলেন। এদিকে হরি-ভক্তিপরায়ণ প্রহ্লাদ পৌত্র বলিকে বন্ধনমুক্ত হয়ে ভগবানের অনুগ্রহ পেতে দেখে ভগবানকে বললেন, বিশ্বপূজ্য পুরুষেরা যাঁর পাদপদ্মের বন্দনা করেন, সেই আপনি যে আমাদের অসুরদের দুর্গরক্ষক হলেন এরূপ অনুগ্রহ ব্রহ্মা, লক্ষ্মী বা শঙ্করও লাভ করেন নি, অন্য লোকের কথা আর কি বলব! হে ভক্তবৎসল, ব্রহ্মাদি দেবতারা যাঁর চরণকমলের মধুপান করে নানারকম ঐশ্বর্য ভোগ করছেন, আমাদের মত দুর্বৃত্ত উগ্রজাতি অসুরেরা কিভাবে আপনার সেই উদার দৃষ্টিতে পড়ল? ভগবান্, আপনার চরিত্র অতি বিচিত্র। আপনি যোগমায়ার লীলায় ভুবনসকল সৃষ্টি করেছেন। এজন্য আপনি সর্বভূতের আত্মা, আপনি সর্বজ্ঞ, এই জন্য সমদর্শী।[১] ভক্তরা আপনার প্রিয় বলে তাদের প্রতি আপনার পক্ষপাত আছে এরূপ মনে হয়, কিন্তু আসলে তা নয়। কল্পতরুর মত আপনি সকলের বাসনাই পূর্ণ করে থাকেন। ৩-৮

ভগবান বললেন, বৎস প্রহ্লাদ, তোমার মঙ্গল হোক। তুমিও সুতলে যাও, আর নিজের পৌত্রের সঙ্গে হৃষ্টচিত্তে জ্ঞাতিদের সুখবর্ধন কর। তুমি আমাকে সর্বদা সুতললোকে গদাহাতে দেখবে আর আমার দর্শনে তোমার অজ্ঞান নষ্ট হবে। ৯-১০

শুকদেব বললেন, মহারাজ, তারপর নির্মলবুদ্ধি অসুরসেনাপতি প্রহ্লাদ বলির সঙ্গে ভগবানের আদেশবাক্য মাথায় নিয়ে কৃতাঞ্জলি হয়ে আদিপুরুষ শ্রীহরিকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করলেন। তারপর তাঁর অনুমতি নিয়ে সুতললোকে প্রবেশ করলেন। তখন ভগবান নারায়ণ ব্রহ্মবাদী ঋত্বিকদের সভার মাঝখানে উপবিষ্ট শুক্রাচার্যকে বললেন, ব্রহ্মন্, আপনার শিষ্য বলির যজ্ঞ অনুষ্ঠানে যে ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটেছে, এখন তা আপনি সংশোধন করুন। যজমান না থাকলেও ব্রাহ্মণদের উপস্থিতিতেই যজ্ঞকর্মের বৈষম্য দূর হয়। ১১-১৪

শুক্রাচার্য বললেন, ভগবান্, সকল কর্মের প্রবর্তক, যজ্ঞফলদাতা ও যজ্ঞময় পরমপুরুষ, আপনাকে যে সর্বস্ব দিয়ে পূজা করেছে তার কাজে কিভাবে বৈষম্য

১ তুলনীয়: সমং পশ্যন্ হি সর্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্। গীতা, ১৩।২৮

ঘটবে ? যে কোন কাজে মন্ত্র, বিধি (অনুষ্ঠানপ্রণালী), দেশ, কাল, পাত্র বা দ্রব্যগত কোন ত্রুটি ঘটলে আপনার নাম-সংকীর্তন করলেই তা পূরণ হয়। আপনি আদেশ করেছেন, তাই আমি আপনার আজ্ঞা পালন করব। আপনার আদেশ পালন করাতেই মানুষের পরম মঙ্গল। শুক্রাচার্য এইভাবে শ্রীহরির আদেশবাক্য শিরোধার্য করে ব্রহ্মর্ষিদের সঙ্গে বলির যজ্ঞের ত্রুটি পূরণ করলেন। ১৫-১৮

মহারাজ, বামনরূপী ভগবান শ্রীহরি এইভাবে বলির কাছ থেকে ভূমি ভিক্ষা করে শত্রুদের দ্বারা হৃত স্বর্গরাজ্য ভ্রাতা ইন্দ্রকে দান করলেন। তখন প্রজাপতিদের অধিপতি ব্রহ্মা, দেবগণ, ঋষিগণ, পিতৃগণ, মনুগণ, দক্ষ, ভৃগু, অঙ্গিরা, সনৎকুমার আর শংকরের সঙ্গে মিলিত হয়ে কশ্যপ আর অদিতির প্রীতির নিমিত্ত এবং সকল লোকের মঙ্গলসাধনের জন্য ভগবান বামনদেবকে লোকপালদের অধিপতি করলেন। সকল প্রাণীর সম্পদ ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধির নিমিত্ত বেদসমূহ, সকল দেবতা, ধর্ম, যশ, শ্রী, মঙ্গলময় ব্রতসমূহ, স্বর্গ ও মোক্ষ এই সকলের পালনকর্তারূপে ব্রহ্মা সুদক্ষ উপেন্দ্রকে নিযুক্ত করলেন। তখন সব প্রাণীরাই তাতে আনন্দে সম্মতি জানাল। তারপর ব্রহ্মার অনুমতি নিয়ে লোকপালদের সঙ্গে দেবরাজ ইন্দ্র বামনদেবকে বিমানে করে স্বর্গলোকে নিয়ে গেলেন। এই ভাবে উপেন্দ্রের বাহুবলে রক্ষিত ইন্দ্রের সকল ভয় দূর হল। তিনি ত্রিভুবন লাভ করে পরম ঐশ্বর্যশালী হয়ে আনন্দ উপভোগ করতে লাগলেন। তারপর ব্রহ্মা, শংকর, সনৎকুমার, ভৃগু প্রভৃতি মুনিরা, পিতৃগণ, নিখিল ভূতবর্গ, সিদ্ধগণ ও আকাশচারীরা সকলেই বামনরূপী ভগবান বিষ্ণুর সেই পরম অদ্ভুত কর্মের কথা প্রচার করতে করতে নিজ নিজ স্থানে চলে গেলেন। তখন তারা অদিতিদেবীরও প্রশংসা করেছিলেন। কুরুনন্দন, আমি তোমার কাছে ভগবান শ্রীহরির এই চরিত্রটি সম্পূর্ণ বর্ণনা করলাম। এই চরিতকথা যাঁরা শোনেন তাঁদের পাপ নাশ হয়। যে লোক পৃথিবীর সকল ধূলিকণা গণনা করতে সক্ষম সেই কেবল অনন্তবিক্রমশালী বিষ্ণুর মহিমার অন্ত নির্ণয় করতে পারে। মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি বশিষ্ঠ বলেছেন, এমন কি কেউ জন্মেছেন বা জন্মাবেন, যিনি বিষ্ণুর মহিমার অন্ত পাবেন ? যিনি অদ্ভুতকর্মা দেবদেব শ্রীহরির এই অবতার চরিত শোনেন, তিনি পরমগতি লাভ করেন। দেব, পিত্র্য বা মনুষ্যসম্বন্ধীয় যে কোন কাজের অনুষ্ঠানের সময় যদি এই বামনচরিত কীর্তিত হয়, তা হলে পণ্ডিতেরা ঐ সমস্ত কাজ যথাযথ অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে মনে করেন। ১৯-৩১

চতুর্বিংশ অধ্যায়

মৎস্যাবতার কথন

মহারাজ পরীক্ষিৎ বললেন, মুনিবর, যাতে বিচিত্রচরিত ভগবান শ্রীহরির মায়াদ্বারা মৎস্যরূপ ধারণের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে, আমি এখন সেই আদি অবতারকথা শুনতে ইচ্ছা করি। পরমেশ্বর যে জন্য লোকনিন্দিত তমঃপ্রকৃতি ও দুঃসহ মৎস্যরূপ ধারণ করেছিলেন, আপনি সে বিষয়ে আমাদের বিস্তারিত বলুন। উত্তমশ্লোক শ্রীহরির চরিতকথা সকল লোকেরই আনন্দদায়ক, এতে সন্দেহ নেই। ১-৩

সূত বললেন, পরীক্ষিৎ একথা বললে মৎস্যরূপ ধারণ করে বিষ্ণু যে যে কাজ

করেছিলেন, শুকদেব সে সবের বর্ণনা করতে গিয়ে বলতে লাগলেন—গো, ব্রাহ্মণ, দেবতা, সাধু, বেদ, ধর্ম আর অর্থ রক্ষার জন্য ঈশ্বর অবতার-মূর্তি ধারণ করেন। বুদ্ধির গুণের তারতম্যের জন্য জীবের উৎকৃষ্ট আর অপকৃষ্ট রূপ হয়ে থাকে। ঈশ্বর নিজে নির্গুণ বলে মায়ার গুণের দ্বারা নানারকম কল্পিত প্রাণীদের মধ্যে অন্তর্যামীরূপে বায়ুর মত বিচরণ করেও জীবভাব (জীবের উৎকর্ষ অপকর্ষ) দ্বারা লিপ্ত হন না। ৪-৬

মহারাজ, অতীত কল্পের শেষে, ব্রহ্মার নিদ্রাকাল উপস্থিত হলে যে নৈমিত্তিক প্রলয় হয়েছিল, তাতে পৃথিবীর সমস্ত লোক সমুদ্রজলে নিমগ্ন হয়। সে সময়ে কালবশে ঘুমের আবেশে ব্রহ্মা শয়ন করতে গেলে হয়গ্রীব তাঁর মুখনির্গত বেদসকল হরণ করেছিল। ভগবান জগদীশ্বর শ্রীহরি দানবপ্রবর হয়গ্রীবের ঐ কর্মের কথা জানতে পেরে নিজে সফরী মৎস্যের (পুঁটি মাছের) রূপ ধারণ করেছিলেন। তখনকার দিনে ভগবান নারায়ণের ভক্ত সত্যব্রত নামে কোন এক শ্রেষ্ঠ রাজর্ষি জলে বসে তপস্যা করছিলেন। সেই রাজর্ষি সত্যব্রতই বর্তমান মহাকালে সূর্যের পুত্র শ্রাদ্ধদেব নামে খ্যাত হয়ে শ্রীহরির দ্বারা মনুপদে অভিষিক্ত হয়েছেন। একদিন সেই সত্যব্রত কৃতমালা নদীর জলে তর্পণ করছেন, এমন সময় তাঁর অঞ্জলিধৃত জলের মধ্যে একটি পুঁটি মাছ দেখলেন। দ্রাবিড়দেশের রাজা সত্যব্রত যখন হাতের মধ্যের মাছটিকে জলে ফেলে দিতে উদ্যত হলেন, তখন সেই পুঁটি মাছ পরমদয়ালু নরপতিকে কাতরভাবে নিবেদন করল, দীনবৎসল মহারাজ, আমি দুর্বল, আমি আমাদের জ্ঞাতিঘাতী জলজন্তুদের ভয় পাই। অতএব আপনি কেন আমাকে এই নদীর জলে ফেলতে উদ্যত হয়েছেন? ভগবান শ্রীহরিই যে অনুগ্রহ দেখানোর জন্য মাছের রূপ ধারণ করেছেন, এ না জেনে মহারাজ সত্যব্রত সেই পুঁটি মাছটিকে রক্ষা করার সংকল্প করলেন। তারপর দয়ালু রাজর্ষি সত্যব্রত মাছটির কাতর বাক্য শুনে কলসীর জলে রেখে তাকে নিজের আশ্রমে নিয়ে এলেন। সেই মাছটি একরাত্রেই এত বড় হয়ে গেল যে সেই কলসীর জলে আর তার স্থান সংকুলান হল না। তখন সে রাজাকে বলল, মহারাজ, আমি আর এই কলসীর মধ্যে কষ্টে বাস করতে পারছি না আপনি আমাকে একটি বড় জায়গায় রাখুন। তখন রাজা তাকে একটি বড় জালার মধ্যে রেখে দিলেন; কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে সে তিন হাত পরিমাণ বড় হয়ে গেল। তখন পুঁটিমাছ আবার বলল, মহারাজ, এই জালাটিও আমার সুখে বাস করার পক্ষে উপযুক্ত নয়। অতএব আপনি আমাকে আরও বড় জায়গা দিন, কারণ আমি আপনারই আশ্রয় নিয়েছি। তারপর সত্যব্রত তাকে এক পুকুরে ছেড়ে দিলেন, কিন্তু সেখানেও সে বড় হয়ে তার শরীরে সমস্ত পুকুর ভরে ফেলল। তখন সে আবার বলল, মহারাজ, আমি জলবাসী জীব, কিন্তু এই পুকুরের জল আমার পক্ষে তৃপ্তিদায়ক হচ্ছে না। তাই আমার রক্ষার উপায় যাতে হয়, সেজন্য এমন কোন হ্রদে আমাকে রাখুন, যার জল কখনও শেষ হয় না। মাছের এই কথায় সত্যব্রত তাকে এক এক করে অনেক অক্ষয়জল হ্রদে নিয়ে গেলেন, কিন্তু দেহবৃদ্ধির দরুন সমস্ত জলাশয়ই তার পক্ষে অপর্যাপ্ত বোধ হতে লাগল। রাজা তখন তাকে সমুদ্রের জলে ফেলতে উদ্যত হলে মাছটি রাজাকে বলল, বীর, আপনি আমাকে সমুদ্রের জলে ফেলবেন না। এখানে অতিবলবান মকরজাতীয় জলজন্তুরা আমাকে খেয়ে ফেলবে। ৭-২৪

তারপর মধুরভাষী মৎস্যের দ্বারা এইরকম মোহিত হয়ে রাজা সত্যব্রত তাকে বললেন, আপনি আমাকে মৎস্যরূপে মুগ্ধ করছেন, আপনি কে? আপনি একদিনেই একশ যোজন পরিমাণ সরোবরকে আপনার দেহ দিয়ে ব্যাপ্ত করেছেন।

আমরা এরকম জলচর দেখি নি বা তার কথা কখনও শুনি নি। নিশ্চয়ই আপনি অব্যয়পুরুষ সাক্ষাৎ নারায়ণ শ্রীহরি হবেন। কেবলমাত্র লোকের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশের জন্য মৎস্যমূর্তি ধারণ করেছেন। হে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের অধীশ্বর পুরুষশ্রেষ্ঠ, হে বিভু, আপনাকে প্রণাম করি। আপনি আমাদের মত শরণাগত ভক্তদের পরম আত্মা ও আশ্রয়। আপনার সমস্ত লীলা-অবতারই প্রাণীদের মঙ্গলের কারণ। অতএব আপনি যে উদ্দেশ্যে এই মৎস্যমূর্তি ধারণ করেছেন তা জানতে ইচ্ছা করি। হে কমললোচন, দেহাদিতে আসক্ত ইতর ব্যক্তিদের চরণসেবা যেরূপ বিফল হয়, আপনার শরণাগতি সেরূপ ব্যর্থ হয় না ; কারণ আপনি সকলের বন্ধু ও প্রিয় আত্মা। যেহেতু আমরা আপনার পাদপদ্মের শরণাগত, সেহেতু আপনি আমাদের এই অদ্ভুতমূর্তি দেখালেন। ২৫-৩০

শুকদেব বললেন, মহারাজ, রাজর্ষি সত্যব্রত এরকম বললে যুগাবসানে মৎস্যরূপধারী, ভক্তজনপ্রিয় এবং প্রলয়সলিলে বিহার করতে ইচ্ছুক ভগবান শ্রীহরি জগতের প্রিয়কার্য করার মানসে সত্যব্রতকে বললেন, হে রিপুদমন, আজ থেকে সাতদিন পরে ভূর্লোক, ভুবর্লোক ও স্বর্লোক এই তিনলোক প্রলয়সমুদ্রে ডুবে যাবে। ত্রিলোক প্রলয়সমুদ্রে ডুবে যাবার উপক্রম হলে আমার প্রেরিত একটি বিশাল নৌকা তোমার কাছে উপস্থিত হবে। তুমি সপ্তর্ষিদের দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং সমস্ত প্রাণীদের সঙ্গে মিলিত হয়ে সকল প্রকার ধান্যাদি সঙ্গে নিয়ে সেই বিশাল নৌকায় উঠে অন্ধকারময় প্রলয়সমুদ্রে সপ্তর্ষিদের দেহের আলোর সাহায্যে সুস্থির হয়ে বিচরণ করবে।[১] প্রলয়ের সময় প্রবল বাতাসে সেই নৌকা যখন বিচলিত হবে, তখন আমি কাছে এলে রজ্জুর মত মহাসর্প বাসুকির দেহ দিয়ে নৌকাটিকে আমার শিঙে বাঁধবে। ব্রহ্মার নিশাকাল পর্যন্ত সপ্তর্ষিদের সঙ্গে নৌকা সহ তোমাকে নিয়ে আমি প্রলয়সমুদ্রে ঘুরে বেড়াবো। তখন আমি তোমার যে প্রশ্নগুলির উত্তর দেব, তাতেই তুমি আমার কৃপায় আমার যে মহিমা ব্রহ্মস্বরূপ বলে কথিত, তা হৃদয়ে সাক্ষাৎ অনুভব করবে। ৩১-৩৮

ভগবান শ্রীহরি রাজাকে এরকম আদেশ দিয়ে অন্তর্হিত হলেন। তখন ভগবান যে কালের নির্দেশ করেছিলেন তিনি তারই প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। তারপর রাজর্ষি সত্যব্রত মৎস্যরূপী শ্রীহরির চরণপদ্ম ধ্যান করতে করতে পূর্বদিকে কুশবিস্তার করে তার উপর বসলেন। সে সময় দেখা গেল সমুদ্র বেলাভূমি পেরিয়ে চারিদিকে পৃথিবীকে প্লাবিত করতে আরম্ভ করেছে আর মেঘের অবিশ্রান্ত বর্ষণে সেই প্লাবন ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। রাজা সত্যব্রত ভগবানের আদেশের কথা চিন্তা করছিলেন, এমন সময় দেখলেন ভগবানের কথিত সেই নৌকাটি কাছে এসেছে। তখন তিনি ধান্যাদি ও লতাপাতা নিয়ে সপ্তর্ষিদের সঙ্গে সেই নৌকায় উঠলেন। সপ্তর্ষিরা হৃষ্ট হয়ে সত্যব্রতকে বললেন, মহারাজ, ভগবান শ্রীহরির ধ্যান কর, তিনিই আমাদের এই সংকট থেকে রক্ষা করবেন। তারপর রাজা সত্যব্রত ভগবানের ধ্যান করলে একশৃঙ্গধারী নিযুতযোজন পরিমাণ এক সোনার মাছের আবির্ভাব হল। তখন সত্যব্রত শ্রীহরির পূর্ব নির্দেশ অনুসারে নৌকাটিকে রজ্জুরূপী বাসুকির দেহ দিয়ে ঐ মাছের শিঙে বেঁধে তুষ্টমনে ভগবান মধুসূদনের স্তব করতে লাগলেন। রাজা সত্যব্রত বললেন, হে দেব, অশেষ অবিদ্যায় জীবদের আত্মজ্ঞান আচ্ছন্ন রয়েছে। তারা অজ্ঞানের জন্য সংসারে পরিশ্রম করে কাতর হয়ে পড়ে। এই সংসারে যাঁর কৃপায় যাঁকে পায় সেই সাক্ষাৎ মুক্তিপ্রদ আপনি পরম-

---

১ অনুরূপ কাহিনী কিছু পরিবর্তিত আকারে বাইবেলে কথিত Noah's Arc নামক উপাখ্যানে পাওয়া যায়।

গুরু হয়ে আমাদের অজ্ঞানগ্রন্থি ছেদন করুন। অজ্ঞ জীব নিজের কর্মেই আবদ্ধ হয়। সে সুখের আশায় যে কাজ করে, তা দুঃখেরই কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যাঁর সেবাদ্বারা সেই মিথ্যা সুখাভিলাষ ত্যাগ করা যায়, তিনিই আমাদের মোহগ্রন্থি ছেদন করুন, কারণ তিনিই আমাদের গুরু। আগুনের সংস্পর্শে রূপা যেমন নির্মল হয়ে স্বাভাবিক রঙ ধারণ করে, সেরূপ যাঁর সেবাদ্বারা জীব নিজের মলস্বরূপ অজ্ঞান ত্যাগ করে নিজ স্বরূপ লাভ করে, সেই অব্যয় জগদীশ্বর আমাদের গুরু হন; কারণ তিনি গুরুরও পরম গুরু। হে প্রভু, অন্য দেবতারা, গুরুরা, মহাজনেরা সকলে মিলিত হয়েও স্বতন্ত্রভাবে মানুষকে যাঁর অনুগ্রহের অযুতভাগের লেশমাত্রও দিতে পারেন না, আপনিই সেই ঈশ্বর; আমি আপনার শরণাগত হলাম। ৩৯-৪৯

অন্ধের পথপ্রদর্শক অন্ধ হলে যেমন হয় অজ্ঞলোকদের পক্ষে অজ্ঞ গুরুও সেই রকম।[১] কিন্তু আপনার জ্ঞান সূর্যপ্রকাশের ন্যায় স্বতঃস্ফূর্ত বলে আপনি জীবদের সমস্ত ইন্দ্রিয়ের প্রকাশক। সুতরাং আমরা নিজেদের গতি জানবার জন্যই আপনাকে গুরুরূপে বরণ করেছি। অপণ্ডিত গুরু লোককে অর্থ ও কাম বিষয়ে উপদেশ দেয়, তাতে সে অজ্ঞানের অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়। কিন্তু আপনি অক্ষয় অব্যর্থ জ্ঞান উপদেশ দেন। এরই সাহায্যে লোকে অনায়াসে আপনার পদ লাভ করে। আপনি সকল লোকের সুহৃদ, প্রিয়, ঈশ্বর, আত্মা, গুরু, জ্ঞান আর অভীষ্ট সিদ্ধিস্বরূপ। কিন্তু কামনাগ্রস্ত লোকেরা বাহ্যবিষয়ে আসক্তির জন্য হৃদয়স্থিত আপনাকে জানতে পারে না। প্রভু, আমি এখন তত্ত্বজ্ঞান উপদেশের জন্য বরণীয় ঈশ্বর ও দেবতাদের শ্রেষ্ঠ আপনারই শরণাগত হচ্ছি। ভগবান্, পরমার্থ প্রকাশক কথা শুনিয়ে আমাদের অহংকার দূর করে আপনি নিজের রূপ প্রকাশ করুন। ৫০-৫৩

শুকদেব বললেন, মহারাজ, রাজা সত্যব্রত একথা বললে আদিপুরুষ মৎস্যরূপী ভগবান প্রলয়সমুদ্রে বিহার করতে করতে রাজাকে তত্ত্বোপদেশ দিতে লাগলেন। তখন ভগবান সত্যব্রতকে সাংখ্য আর যোগক্রিয়ার উপদেশমূলক দিব্য মৎস্যপুরাণ আর গুহ্য আত্মজ্ঞানের উপদেশ দিয়েছিলেন। সত্যব্রত নৌকায় বসে সপ্তর্ষিদের সঙ্গে ভগবানের শ্রীমুখে সনাতন ব্রহ্মস্বরূপ সংশয়হীন আত্মতত্ত্বের কথা শুনেছিলেন। তারপর অতীত প্রলয়ের অবসানে ব্রহ্মা জাগরিত হলে মৎস্যমূর্তি ভগবান শ্রীহরি হয়গ্রীব অসুরকে বধ করে তাঁকে আবার বেদসমূহ প্রত্যর্পণ করলেন। বিষ্ণুর অনুগ্রহে জ্ঞানবিজ্ঞান সম্পন্ন হয়ে রাজর্ষি সত্যব্রত বর্তমান কালে বৈবস্বত মনু হয়েছেন। মহারাজ, যে ব্যক্তি রাজর্ষি সত্যব্রত আর মৎস্যরূপী ভগবান শ্রীহরির এই পুণ্য আখ্যান শোনেন, তিনি পাপমুক্ত হন।[২] যে মানুষ প্রত্যেক দিন ভগবান শ্রীহরির এই মৎস্যাবতারের কথা কীর্তন করেন, তাঁর সকল ইচ্ছা পূরণ হয় আর তিনি পরমগতি লাভ করেন। যিনি হয়গ্রীব নামে দৈত্যকে মেরে, প্রলয়-সমুদ্রে নিদ্রিত ব্রহ্মার মুখ থেকে অপহৃত বেদ উদ্ধার করে সত্যব্রত আর সপ্তর্ষিদের সনাতন ব্রহ্মতত্ত্ব উপদেশ দেন, আমি মায়া-মৎস্যরূপী সর্বলোকের পরমকারণ সেই ভগবানকে প্রণাম জানাই। ৫৪-৬১

১ তুলনীয়: যে সকল মূঢ় ব্যক্তি অজ্ঞানে আচ্ছন্ন থেকে আপনাদের বুদ্ধিমান ও পণ্ডিত বলে অহংকার প্রকাশ করে তারা অন্ধের দ্বারা চালিত অপর অন্ধের ন্যায় বিপথগামী হয়।—কঠ উপনিষৎ, ১।২।৫।

২ আত্মতত্ত্বের উপদেশ শ্রবণে মোক্ষ প্রাপ্তির কথা অনেক উপনিষদের শেষভাগে বিবৃত হয়েছে—যথা, যে কেহ এ-প্রকার আত্মতত্ত্ব শ্রবণ করেন, তিনি নচিকেতার মত ব্রহ্মকে পেয়ে বিরজ হন ও মৃত্যুকে জয় করেন। (কঠ উপনিষৎ, ২।৩।১৮)। অনুরূপ কথা তৈত্তিরীয় ও মুণ্ডক উপনিষদেও বলা হয়েছে।

নবম স্কন্ধ

প্রথম অধ্যায়

সুদ্যুম্নের নারী-রূপ প্রাপ্তি

মহারাজ পরীক্ষিৎ বললেন, ব্রহ্মান্, অনন্তশক্তি ভগবান শ্রীহরি সকল মন্বন্তর কালে যে শৌর্যের কাজ করেছিলেন, সে সমস্তই আপনার বর্ণনা থেকে শুনেছি। অতীত-কল্পের শেষে দ্রাবিড় দেশের অধিপতি মহর্ষি সত্যব্রত ভগবানের সেবা করে যেভাবে আত্মজ্ঞান লাভ করেছিলেন এবং বিবস্বানের পুত্র মনু হয়ে জন্মেছিলেন তাও আপনার মুখে শুনলাম। ইক্ষ্বাকু প্রভৃতি রাজারা সেই বৈবস্বত মনুর সন্তানরূপে সুবিদিত। আমার সর্বদা সেই নৃপতিদের বংশ আর বংশানুচরিত কথা শুনতে ইচ্ছা হয়। আপনি একে একে সেসব কথা বলুন। সে রাজাদের বংশে আগে যাঁরা জন্মেছিলেন, এখন যাঁরা আছেন এবং পরে যাঁরা আসবেন পুণ্যকীর্তি সেই পুরুষদের বলবীর্যের কথা বলুন। ১-৫

সূত বললেন, ব্রহ্মবাদী ঋষিদের সভায় মহারাজ পরীক্ষিৎ সে সব কাহিনী শুনতে চাইলে পরমধর্মজ্ঞ শুকদেব তখন বলতে লাগলেন, হে পরন্তপ, মনুবংশের কথা শত শত বৎসরেও সবিস্তারে বলা সম্ভব হবে না, তবু আমি সাধ্যমত বিশেষ বিশেষ কাহিনী বলছি, শুনুন। যে পরমপুরুষ সমস্ত উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট প্রাণীর আত্মা, কল্পের শেষে শুধু তিনিই ছিলেন, আর কিছুই ছিল না। সেই পরমপুরুষের নাভিদেশ থেকে তখন এক হিরন্ময় পদ্ম উত্থিত হল; তার মধ্যে চতুর্মুখ ব্রহ্মা স্বয়ং ব্যক্ত হয়েছিলেন। ব্রহ্মার মন থেকে মরীচি আর মরীচি থেকে কশ্যপের জন্ম হয়। কশ্যপের ঔরসে দক্ষকন্যা অদিতির গর্ভে বিবস্বান নামে পুত্র জন্মেছিলেন। বিবস্বান-পত্নী সংজ্ঞার গর্ভে শ্রাদ্ধদেব মনুর জন্ম হয়। সংযতাত্মা মনুর স্ত্রী শ্রদ্ধার ছিল দশটি পুত্র। তাঁদের নাম ইক্ষ্বাকু, নৃগ, শর্যাতি, দিষ্ট, ধৃষ্ট, করূষ, নরিষ্যন্ত, পৃষধ্র, নভগ আর কবি। মনু আগে নিঃসন্তান ছিলেন; তাই প্রভাবশালী ভগবান বশিষ্ঠ তাঁর সন্তান লাভের জন্যে মিত্র ও বরুণদেবের যজ্ঞ করেছিলেন। সে যজ্ঞের সময় পয়োব্রতা মনুপত্নী হোতার কাছে এসে, তাঁকে প্রণাম করে কন্যাসন্তানের জন্য প্রার্থনা জানিয়েছিলেন। এদিকে অধ্বর্যু হোতাকে যখন যাগ করার নির্দেশ দিলেন, তখন হোতা হবিগ্রহণ করে শ্রদ্ধার প্রার্থনামত কন্যা কামনা করে 'বষট্‌কার' শব্দযোগে যজ্ঞে আহুতি দিয়েছিলেন। হোতার সেই ব্যভিচারে ইলা নামে এক কন্যার জন্ম হয়েছিল। মনু কন্যাকে দেখে তেমন খুশী হতে পারেন নি। তাই গুরুকে বলেছিলেন, ভগবান্, আপনাদের মত ব্রহ্মজ্ঞের কাজে কেমন করে এ বিপর্যয় ঘটল? হায়, কি দুঃখের ব্যাপার! মন্ত্রের তো কখনও অন্যথা হতে পারে না। আপনারা ব্রহ্মজ্ঞ; তপস্যার আগুনে আপনাদের সমস্ত পাপ পুড়ে গেছে। আপনাদের এমন সংকল্প-বৈষম্য তো দেবগণের মধ্যে মিথ্যার আবির্ভাবের মতই অসম্ভব ব্যাপার। এটা কেমন করে হল? মনুর কথা শুনে ভগবান বশিষ্ঠ সেই হোতার ব্যতিক্রম বুঝতে পেরে সূর্যপুত্রকে বলেছিলেন, হে মহাভাগ, আপনার হোতা

ব্যভিচার করেছিলেন, তাই সংকল্পের এ বৈষম্য ঘটেছে ; তবু আমার তেজ-প্রভাবে আপনার সুপুত্র হবে। মহারাজ, সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মহযশা বশিষ্ঠদেব মনুকন্যা ইলার পুরুষত্ব কামনায় আদিপুরুষের স্তব করেছিলেন। সে স্তুতিতে তুষ্ট হয়ে ভগবান শ্রীহরি মহর্ষি বশিষ্ঠের কামনা পূরণের জন্যে বর দেওয়ায় ইলা সুদ্যুম্ন নামে শ্রেষ্ঠ পুরুষরূপ লাভ করেছিলেন। একদিন মহাবীর সুদ্যুম্ন বর্মাবৃত হয়ে মনোজ্ঞ শরাসন আর বিচিত্র সব শর নিয়ে, সিন্ধু-দেশের ঘোড়ায় চড়ে, অমাত্য-পরিবৃত হয়ে যখন বনে মৃগয়া করছিলেন, তখন মৃগের অনুসরণ করতে করতে উত্তর দিকে চললেন। যেতে যেতে তিনি ভগবান শংকর-পার্বতীর বিহারস্থান সুমেরু পর্বতের নীচে এক সুরম্য বনে প্রবেশ করলেন। বীর সুদ্যুম্ন সেই বনে প্রবেশ করতেই নিজের দিকে তাকিয়ে দেখলেন যে তিনি স্ত্রীরূপ পেয়েছেন, আর তাঁর অশ্বও অশ্বা হয়ে গিয়েছে। তাঁর অনুচরদের মধ্যেও লিঙ্গব্যত্যয় ঘটেছিল। তাতে সকলে মনের দুঃখে পরস্পরের দিকে তাকাতে লাগলেন। ৬-২৭

পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করলেন, ভগবান্‌, সেই বনপ্রদেশের কেন এমন গুণ হয়েছিল ? কেই বা তাঁকে এমন করেছিলেন ? এ ব্যাপারে আমার খুব কৌতূহল হয়েছে, এ প্রশ্নের উত্তর দিন। শুকদেব বললেন, মহারাজ, ভগবান গিরিশকে দেখার আকাঙ্ক্ষায় সুব্রত ঋষিগণ একদিন তাঁদের প্রভায় সকল দিকের অন্ধকার দূর করে এবং অন্য সকলের দীপ্তি নাশ করে সেই বনে প্রবেশ করলেন। তখন ভগবতী অম্বিকা বিবস্ত্রা ছিলেন। সে অবস্থায় ঋষিদের দেখে লজ্জায় স্বামীর কোল থেকে উঠে তিনি কটিবাস পরলেন। শংকর-পার্বতীর বিহার দেখেই ঋষিরা তখনি সেখান থেকে নরনারায়ণ আশ্রমে চলে গেলেন। এই ঘটনায় ভগবান শংকর তাঁর প্রেয়সীকে তুষ্ট করার জন্য বললেন, এখন থেকে কোন পুরুষ এখানে এলেই স্ত্রী হয়ে যাবে। তারপর থেকে সব পুরুষই সেই বন ছেড়ে চলে গিয়েছে। এদিকে স্ত্রীরূপী রাজা সুদ্যুম্ন স্ত্রীরূপী অনুচরদের সঙ্গে বনে বনে ঘুরতে ঘুরতে এক সময় ভগবান বুধের আশ্রমের কাছে এসে পড়লেন। পরমা সুন্দরী এক নারীকে স্ত্রীলোকদের সঙ্গে সেভাবে আশ্রমের কাছে দেখে ভগবান বুধের কামভাব জাগল। তিনি সুদ্যুম্নকে স্ত্রীরূপে পেতে ইচ্ছা করলেন। সুদ্যুম্নের মনেও সেই বাসনা জাগল। উভয়ের মিলনের ফলে তাদের পুরূরবা নামে এক পুত্র জন্মেছিল। রাজা সুদ্যুম্ন নারীরূপ পেলে তাঁর কুলগুরু মহর্ষি বশিষ্ঠকে তিনি স্মরণ করলেন। রাজার এ দশা দেখে বশিষ্ঠদেবেরও খুব দুঃখ ও করুণা হল ; তাই তিনি সুদ্যুম্নের পুরুষত্ব কামনা করে ভগবান শংকরের কাছে গিয়ে তাঁর স্তব করলেন। তাতে ভগবান শংকর তুষ্ট হয়ে বশিষ্ঠদেবের প্রীতিসাধন এবং নিজ বাক্যের সত্যতা রক্ষার জন্যে বললেন, ঋষিবর, তোমার গোত্রজ সুদ্যুম্ন এখন থেকে একমাস পুরুষ আর একমাস নারী হয়ে থাকবে আর এই ব্যবস্থা মতই সে পৃথিবী পালন করবে। কুলগুরু বশিষ্ঠের কৃপায় আবার পুরুষত্ব লাভ করে সুদ্যুম্ন সেভাবেই পৃথিবী পালন করেছেন। কিন্তু মাসান্তরে স্ত্রীরূপ পেলে লজ্জায় তাঁকে লুকিয়ে থাকতে হত ; প্রজারা তাঁকে অভিবাদন করতে পারত না। সুদ্যুম্নের তিনজন ধার্মিক পুত্র উৎকল, গয় ও বিমল দাক্ষিণাপথের রাজা হয়েছিলেন। প্রতিষ্ঠানপতি সুদ্যুম্ন বৃদ্ধ বয়সে পুরূরবাকে রাজ্য দিয়ে বনে প্রস্থান করলেন। ২৮-৪২

দ্বিতীয় অধ্যায়

মনুপুত্রদের বংশ বিবরণ

শুকদেব বললেন, মহারাজ, সুদ্যুম্ন এভাবে বনে চলে গেলে বৈবস্বত মনু পুত্র কামনায় যমুনা নদীতে গিয়ে একশ বছর তপস্যা করেন ; পরে সেই উদ্দেশ্যে প্রভু শ্রীহরির উপাসনা করে তাঁর নিজের মত দশটি পুত্র লাভ করেন। মনুর সেই পুত্রদের মধ্যে পৃষধ্রকে তাঁর গরু গোপালকের (রাখালের) কাজ দিয়েছিলেন। পৃষধ্রও একাগ্রচিত্তে রাত জেগে সে কাজ করতেন। একদিন রাত্রে বৃষ্টি পড়ছিল ; সে সময় একটা বাঘ এসে গোয়ালে ঢুকল। গরুগুলো শুয়েছিল ; বাঘ দেখে ভয় পেয়ে উঠে তারা এদিক সেদিক ছুটাছুটি করতে লাগল। এদিকে হিংস্র বাঘটা একটি গরুকে ধরতেই সে ভয়ে চিৎকার করতে লাগল। তার আর্তরব শুনে পৃষধ্রও বাঘের অনুসরণ করতে লাগলেন। সে রাত্রে মেঘাচ্ছন্ন আকাশে গভীর অন্ধকারে ঠিক বুঝতে না পেরে তিনি একটা কপিলা গরুকে বাঘ মনে করে খড়্গ দিয়ে তার মাথা কেটে ফেললেন। সেই খড়্গের আঘাতে বাঘেরও একটা কান কাটা যায় এবং সে তখন ভয় পেয়ে পালাতে গেলে তার কাটা কান থেকে সারা পথে রক্ত ঝরছিল। শত্রুঘাতী পৃষধ্র ভেবেছিলেন যে বাঘটা মরে গেছে ; কিন্তু রাত শেষ হলে সকালে তিনি দেখলেন যে একটা কপিলা গরু তাঁর হাতেই নিহত হয়েছে। এই ঘটনায় তিনি খুব দুঃখিত হলেন। কিন্তু তাঁর অজ্ঞাতে এ অপরাধ ঘটলেও কুলাচার্য তাঁকে অভিশাপ দিলেন— এই দুষ্কর্মের জন্য এখন থেকে তুই আর ক্ষত্রিয় থাকবি না, শূদ্র বলে পরিচিত হবি। পৃষধ্র জোড়হাতে আচার্যের অভিশাপ মেনে নিয়ে তখন থেকেই উর্ধ্বরেতা হয়ে ব্রহ্মচর্য পালন করতে লাগলেন। তিনি পরে সর্বাত্মা পরমপুরুষ বাসুদেবের একান্ত ভক্তি লাভ করে সমস্ত প্রাণীর সুহৃদ ও সকল জীবে সমদৃষ্টি সম্পন্ন হন। এভাবেই লোকসঙ্গ ত্যাগ করে শান্তচিত্ত, জিতেন্দ্রিয়, অপরিগ্রহী, জ্ঞানতৃপ্ত, একাগ্রমনা হয়ে পরমাত্মায় চিত্ত সমর্পণ করে তিনি জড়, অন্ধ আর বধিরের ন্যায় পৃথিবীময় ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। একদিন আচারনিষ্ঠ মুনিব্রতী পৃষধ্র বনে গিয়ে এক প্রজ্বলিত দাবাগ্নি দেখে তার মধ্যে নিজের দেহ দগ্ধ করে ব্রহ্মপদ লাভ করেন। ১-১৪

মনুর কনিষ্ঠ পুত্র বিষয়নিঃস্পৃহ ছিলেন। তাই আত্মীয়, বান্ধব, রাজ্য সব ছেড়ে বনে চলে যান এবং স্বপ্রকাশ পরমপুরুষের ধ্যানে মগ্ন হয়ে কৈশোরেই পরমপদ লাভ করেন। মনুপুত্র করূষ থেকে কারূষ নামে বিখ্যাত ব্রাহ্মণভক্ত ধার্মিক ক্ষত্রিয়জাতির উৎপত্তি হয়। তাঁরা উত্তরাপথের রক্ষক ছিলেন। এভাবে মনুতনয় ধৃষ্ট থেকে ধার্ষ্ট নামে ক্ষত্রিয়কুল সৃষ্টি হয়। তাঁরা পরে পৃথিবীতে ব্রাহ্মণত্ব পান। নৃগের পুত্র সুমতি, সুমতির পুত্র ভূতজ্যোতি এবং ভূতজ্যোতির পুত্র বসু। বসু-পুত্রের নাম প্রতীক, প্রতীকের পুত্র ওঘবান। ওঘবানের ওঘবান নামে এক পুত্র আর ওঘবতী নামে এক কন্যা জন্মে। রাজা সুদর্শনের সঙ্গে ওঘবতীর বিবাহ হয়। মনুর পুত্র নরিষ্যন্ত থেকে চিত্রসেন, চিত্রসেন থেকে ঋক্ষ, ঋক্ষ থেকে মীঢ্বান, মীঢ্বান থেকে পূর্ণ আর পূর্ণ থেকে ইন্দ্রসেনের জন্ম হয়। ইন্দ্রসেনের পুত্র বীতিহোত্র, বীতিহোত্রের পুত্র সত্যশ্রবা, সত্যশ্রবার পুত্র উরুশ্রবা এবং উরুশ্রবার দেবদত্ত নামে পুত্র জন্মে। ভগবান অগ্নি স্বয়ং অগ্নিবেশ্য নামে দেবদত্তের পুত্র হয়ে জন্ম নেন। তিনিই কানীন ও মহর্ষি জাতুকর্ণ নামে বিখ্যাত। অগ্নিবেশ্যায়ন নামক ব্রাহ্মণ বংশ তাঁর থেকেই সৃষ্টি হয়। মহারাজ, নরিষ্যন্তের

বংশ কথা বললাম ; এবার দিষ্টবংশ কাহিনী শুনুন। দিষ্টের পুত্র নাভাগ। পরে যে না ভাগের কথা বলব, তিনি কিন্তু অন্য লোক। ইনি কর্মবশে বৈশ্য হন। এঁর পুত্র ভলন্দন থেকে বৎসপ্রীতির জন্ম হয়। বৎসপ্রীতির পুত্র প্রাংশু, প্রাংশুর পুত্র প্রমিতি, প্রমিতির পুত্র খনিত্র, খনিত্রের পুত্র চাক্ষুষ, চাক্ষুষের পুত্র বিবিংশতি। তাঁর থেকে রম্ভ এবং রম্ভের থেকে পরমধার্মিক খনীনেত্রের জন্ম হয়। রাজা করন্ধম খনীনেত্রের আত্মজ। করন্ধমের পুত্র অবিক্ষিৎ। তাঁর পুত্র মরুত্ত সার্বভৌম নৃপতি হন। মহাযোগী অঙ্গিরার পুত্র সংবর্ত মরুত্তকে যজ্ঞ করিয়েছিলেন। মরুত্তের যজ্ঞের মত আর যজ্ঞ হয় নি। সেই যজ্ঞের সব পাত্রগুলো ছিল সোনার ; তাই দেখতেও বড় সুন্দর হয়েছিল। ইন্দ্র সেখানে সোমরস পান করে এবং ব্রাহ্মণরা প্রচুর দক্ষিণা পেয়ে অত্যন্ত পরিতৃপ্ত হন। সে যজ্ঞে মরুদ্‌গণ পরিবেশক আর বিশ্বদেবগণ সভাসদ্ ছিলেন। মরুত্তের পুত্র দম, দমের পুত্র রাজ্যবর্ধন, রাজ্যবর্ধনের পুত্র সুধৃতি এবং সুধৃতির পুত্র নর। নরের থেকে কেবল, কেবল থেকে ধুন্ধুমান, ধুন্ধুমান থেকে বেগবান, বেগবান থেকে বুধ আর বুধের থেকে জন্ম নেন মহারাজ তৃণবিন্দু। তৃণবিন্দু নানা সদ্‌গুণের আধার ছিলেন। শ্রেষ্ঠ অপ্সরা অলম্বুষাদেবী তাঁর আরাধনা করেন ; তাতে সেই অপ্সরার কয়েকটি পুত্র আর ইলবিলা নামে এক কন্যার জন্ম হয়। যোগেশ্বর বিশ্রবা ঋষি তাঁর পিতার কাছে পরমবিদ্যা লাভ করেন। তাঁর ঔরসে ও ইলবিলার গর্ভে কুবেরের জন্ম হয়। তৃণবিন্দুর তিন ছেলের নাম বিশাল, শূন্যবন্ধু আর ধূম্রকেতু। তাঁদের মধ্যে বিশাল হলেন বংশধর রাজা। বৈশালীনগর তিনিই প্রতিষ্ঠা করেন। বিশালের ছেলে হেমচন্দ্র, হেমচন্দ্রের ছেলে ধূম্রাক্ষ, ধূম্রাক্ষের ছেলে সংযম। কৃশাশ্ব আর দেবজ নামে সংযমের দুই পুত্র জন্মে। সোমদত্ত কৃশাশ্বের পুত্র। তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন এবং যজ্ঞপতি পরমপুরুষের আরাধনা করে যোগীদের প্রাপ্য উত্তমগতি লাভ করেন। সুমতি সোমদত্তের পুত্র, আর সুমতির পুত্র জনমেজয়। এসব রাজার বিশাল বংশে জন্ম ; এঁরা সকলেই তৃণবিন্দুর কীর্তি অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন অর্থাৎ বিশালরাজের ন্যায় যশস্বী হন। ১৫-৩৬

তৃতীয় অধ্যায়

সুকন্যা ও রেবতীর কাহিনী

শুকদেব বললেন, মহারাজ, মনুপুত্র শর্যাতি পরম বেদজ্ঞ ছিলেন। অঙ্গিরাগণের যজ্ঞে দ্বিতীয় দিনের কর্তব্য সম্বন্ধে তিনি উপদেশ দিয়েছিলেন। রাজা শর্যাতির এক মেয়ের নাম সুকন্যা ; পদ্মের পাঁপড়ির মত আয়ত তার চোখ দুটি। একদিন তিনি মেয়ের সঙ্গে বনে গিয়ে মহর্ষি চ্যবনের আশ্রমে ঢুকলেন। সেই বনে রাজকন্যা সখীদের সঙ্গে গাছের ফুল তুলছিলেন। এমন সময় সুকন্যার নজরে পড়ল যে এক জায়গায় একটা উঁইঢিপির দুটো গর্তের ভেতর থেকে জোনাকির আলোর মত আলো বের হচ্ছে। তখন দৈববশে সুকন্যা না জেনে সেই আলো দুটোতে কাঁটা ফুটিয়ে দিতেই তা থেকে রক্ত ঝরতে লাগল ; ফলে রাজসৈন্যদের মলমূত্র তখনি বন্ধ হয়ে গেল। এই ঘটনায় রাজা শর্যাতি একেবারে আশ্চর্য হয়ে তার অনুচরদের বললেন, মহর্ষি চ্যবনের কাছে তোমরা কোনও অপরাধ করনি

তো ? মনে হচ্ছে আমাদের মধ্যে কেউ নিশ্চয়ই মহর্ষির আশ্রম অপবিত্র করেছে। তখন সুকন্যা ভয় পেয়ে তার বাবাকে বলল, আমি না জেনে একটা কাজ করেছি। ঐ দুটো আলোর মধ্যে কাঁটা বিঁধিয়ে দিয়েছি। মেয়ের কথা শুনে শর্যাতি ভয় পেলেন। চ্যবন ঋষি প্রচ্ছন্নভাবে উঁইঢিপির মধ্যে ছিলেন। রাজা তখন তাঁকে সাধ্যমত সন্তুষ্ট করলেন। শেষে মুনির ইচ্ছা বুঝতে পেরে রাজা কন্যাকে তাঁর হাতেই সম্প্রদান করে বিপদ থেকে উদ্ধার পেলেন। পরে মুনিকে সম্ভাষণ করে তাঁর অনুমতি নিয়ে শান্তমনে রাজা নিজ রাজ্যে ফিরে গেলেন। সুকন্যার স্বামী চ্যবন মুনি অত্যন্ত বদরাগী মানুষ। তাই সুকন্যা মহর্ষির মনের কথা বুঝে সব সময় খুব সাবধানে তাঁর অনুগত থেকে তাঁকে খুশি রাখার চেষ্টা করতেন। ১-১০

কিছুকাল পরে একবার অশ্বিনীকুমারদ্বয় সেই আশ্রমে আসলে মুনি যথোচিত তাঁদের পূজা করে বললেন, আপনারা আমার যৌবন ফিরিয়ে দিন আর আমার এমন রূপ দিন যাতে আমি নারীর মন হরণ করতে পারি। আপনাদের কৃপায় তা হলে, যজ্ঞে আপনাদের সোমপানের অধিকার না থাকলেও আমি আপনাদের সোমরসপূর্ণ পাত্র দেব। এ কথা শুনে দেববৈদ্য দুজন মুনিকে অভিনন্দন জানিয়ে বললেন, তাই হবে; আপনি সিদ্ধের তৈরী এই হ্রদের জলে নেমে স্নান করুন। দুজন দেববৈদ্য সে কথা বলে জরাগ্রস্ত, লোলচর্ম, শিরাময়-দেহ আর পক্ককেশ মুনিকে নিয়ে সেই হ্রদে নামলেন। কিছুক্ষণ পরে সেই হ্রদ থেকে তিনজন সুপুরুষ উঠে আসলেন। তিন জনই পদ্মমালা, কুণ্ডল আর সুন্দর বেশে সজ্জিত। এরূপ সুদর্শন পুরুষ সব নারীরই কাম্য। পতিব্রতা সুকন্যা সূর্যের মত দীপ্তিশালী রূপবান তিনজন পুরুষকে দেখে তাঁদের মধ্যে কে তাঁর স্বামী চিনতে পারলেন না, তাই অশ্বিনীকুমারদের শরণাপন্ন হলেন। তাঁরা সুকন্যার স্বামী-অনুরক্তিতে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁর স্বামীকে দেখিয়ে দিলেন এবং মহর্ষির অনুমতি নিয়ে বিমানে স্বর্গলোকে চলে গেলেন। পরে একদিন রাজা শর্যাতি যজ্ঞ করার উদ্দেশ্যে চ্যবনমুনির আশ্রমে গিয়ে দেখলেন যে সূর্যের মত তেজস্বী এক পুরুষ তাঁর মেয়ের পাশে বসে আছেন। সুকন্যা পিতাকে দেখে উঠে এসে তাঁকে প্রণাম করলেন। কিন্তু রাজা শর্যাতি মনে মনে অসন্তুষ্ট হলেন; তাই মেয়েকে কোন আশীর্বাদ না করেই বললেন, তোর এমন দুর্মতি কেন ? তুই তোর সর্বলোকপূজ্য ঋষি স্বামীকে প্রতারণা করেছিস ? তিনি জরাগ্রস্ত; তাই বুঝি তুই তোর অপ্রিয় স্বামীকে ত্যাগ করে এই পথিককে উপপতিরূপে গ্রহণ করেছিস ? সদ্‌বংশে জন্ম নিয়েও তোর এই বিপরীত বুদ্ধি কেমন করে হল, আর এত জঘন্য কাজে কি করে তুই লিপ্ত হলি ? পিতার কথা শুনে সুকন্যা একটু হেসে বললেন, বাবা, ইনিই তো আপনার জামাতা ভৃগুনন্দন। পরে তিনি স্বামীর রূপযৌবন ফিরে পাওয়ার সব ঘটনা তাঁর পিতাকে বললেন। সে কাহিনী শুনে রাজা শর্যাতি বিস্ময়ে অভিভূত হলেন এবং সন্তুষ্ট হয়ে কন্যাকে আলিঙ্গন করলেন। মহর্ষি চ্যবন তারপর শর্যাতিকে সোমযজ্ঞ করালেন এবং অশ্বিনীকুমারদের সোমপান করার অধিকার না থাকলেও তিনি তাঁর তেজে তাঁদের সোমরসপূর্ণ পানপাত্র দিলেন। তাতে দেবরাজ ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হয়ে তখনি শর্যাতিকে মারবার জন্য বজ্র তুললেন। কিন্তু ভৃগুনন্দন বজ্রসমেত ইন্দ্রের ডান হাত স্তব্ধ করে দিলেন। অশ্বিনীকুমারেরা বৈদ্য; তাই আগে তাঁরা সোমযজ্ঞে যোগদান করতে পারতেন না। কিন্তু তখন থেকে সব দেবতা তাঁদের দুজনকেই সোমপাত্র দিতে সম্মত হলেন। ১১-২৬

উত্তানবর্হি, আনর্ত আর ভূরিষেণ নামে রাজা শর্যাতির তিন ছেলে হয়।

তাদের মধ্যে আনর্তের রেবত নামে এক পুত্র জন্মে। রেবত সমুদ্রের মধ্যে কুশস্থলী নামে এক নগর প্রতিষ্ঠা করে আনর্ত নামে দেশ পালন করতেন। তাঁর একশ গুণী পুত্র হয়, তাদের মধ্যে কুকুদ্মী জ্যেষ্ঠ। একবার কুকুদ্মী তাঁর মেয়ে রেবতীকে সঙ্গে নিয়ে ব্রহ্মাকে তার উপযুক্ত পাত্রের কথা জিজ্ঞেস করার জন্যে মুক্তদ্বার ব্রহ্মলোকে গেলেন। সেখানে তখন গন্ধর্বদের গান হচ্ছিল। তাই রাজা কোন সুযোগ না পেয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেন। গান শেষ হলে ব্রহ্মাকে প্রণাম করে তিনি তাঁর অভিপ্রায় নিবেদন করলেন। সে কথা শুনে ব্রহ্মা উচ্চকণ্ঠে হেসে বললেন, মহারাজ, তুমি পৃথিবীতে তোমার মেয়ের জন্যে পাত্র হিসেবে মনে মনে যাদের ভেবেছ, তারা সবাই কালের কবলে বিনষ্ট হয়েছে। এখন তাদের পুত্র-পৌত্র-নাতিদের বংশের কথাও শোনা যায় না। এর মধ্যে সাতাশটি চতুর্যুগ কাল অতীত হয়েছে। তবে দেবদেবের অংশ মহাবল বলদেব আছেন। সেখানে গিয়ে সেই নবরত্নকে তোমার কন্যাটি সম্প্রদান কর। যাঁর নাম শুনলে, কীর্তন করলে পুণ্য হয় সেই পরমপুণ্যবান জগৎপতি ভগবান পৃথিবীর ভার হরণ করবার জন্যে নিজের অংশে অবতীর্ণ হয়েছেন। সেই আদেশ পেয়ে ব্রহ্মাকে প্রণাম করে রাজা তাঁর রাজ্যে ফিরে গেলেন। তখন রাজার ভাইয়েরা যক্ষদের ভয়ে রাজ্য ছেড়ে নানা জায়গায় বাস করছিলেন। রাজা মহাবিক্রম বলদেবকে তাঁর পরমা সুন্দরী কন্যা সম্প্রদান করে নারায়ণাশ্রমে চলে গেলেন। ২৭-৩৬

চতুর্থ অধ্যায়

নভগের বংশ-কাহিনী

শুকদেব বললেন, মহারাজ, নভগের পুত্র নাভাগ। তিনি অনেকদিন গুরুকুলে ছিলেন। তাঁর বড় ভাইয়েরা ভাবলেন যে নাভাগ নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী হয়েছেন; তাই তাঁকে বাদ দিয়ে অন্য সব ভাই পিতার সম্পত্তি ভাগ করে নিলেন। এদিকে নাভাগ গুরুগৃহ থেকে ফিরে এলে বড় ভাইয়েরা তাঁদের পিতাকেই ছোট ভাইয়ের প্রাপ্য ভাগস্বরূপ নির্দেশ করলেন। নাভাগ জিজ্ঞেস করলেন, ভাইসব, তোমরা আমার জন্যে কি ভাগ রেখেছ? ভাইয়েরা উত্তর দিলেন, তোমার ভাগের অংশরূপে আমরা পিতাকে রেখেছি। তুমি তাঁকে গ্রহণ কর। সে কথা শনে নাভাগ পিতাকে জিজ্ঞেস করলেন, বাবা, ভাইয়েরা আপনাকে আমার ভাগ হিসাবে ঠিক করে দিয়েছে। পিতা বললেন, পুত্র, তুমি তাদের কথা বিশ্বাস করো না; আমি তোমাকে জীবিকার উপায় বলে দিচ্ছি। আঙ্গিরস মুনিরা এখন যজ্ঞ করছেন। তাঁরা খুব মেধাবান; তবু ছ' দিনের যজ্ঞে করণীয় বিভিন্ন অনুষ্ঠান করার সময় ষষ্ঠ দিনের কাজে তাঁরা বিভ্রান্ত হচ্ছেন। তুমি সেখানে গিয়ে বৈশ্বদেবের সুক্ত দুটি তাঁদের পাঠ করাও। কাজ শেষ হলে তাঁরা স্বর্গে যাওয়ার সময় যজ্ঞের অবশিষ্ট ধন তোমাকে দিয়ে যাবেন। তুমি সেখানে শীঘ্র চলে যাও। পিতার উপদেশে নাভাগ সেভাবেই কাজ করলেন এবং আঙ্গিরস মুনিরা যজ্ঞের অবশিষ্ট ধন তাঁকে দিয়ে স্বর্গলোকে চলে গেলেন। কিন্তু নাভাগ যখন সেই ধন নিতে গেলেন, ঠিক তখনি উত্তরদিক থেকে কৃষ্ণকায় এক পুরুষ এসে বললেন, যজ্ঞভূমির এসব ধন আমার। নাভাগ বললেন, ঋষিরা

এই ধন আমাকে দিয়েছেন, তাই এ ধন আমার। পুরুষ বললেন, বেশ, আমাদের দুজনের প্রশ্ন সম্বন্ধে তোমার পিতাকে জিজ্ঞেস কর। তখন নাভাগ তাঁর পিতার কাছে গিয়ে এ কথা জিজ্ঞেস করাতে তাঁর পিতা বললেন, বৎস, দক্ষ-যজ্ঞে ঋষিরা উদ্বৃত্ত সমস্ত বস্তুই ভগবান রুদ্রের ভাগরূপে নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন। তাই রুদ্রদেবই এ ধনের অধিকারী। সে কথা শুনে নাভাগ সেই পুরুষের কাছে এসে তাঁকে প্রণাম করে বললেন, হে ঈশ, বাবা আমাকে বলেছেন যে যজ্ঞভূমির সব ধন আপনার। আপনাকে প্রণাম করছি, আপনি প্রসন্ন হন। রুদ্র বললেন, ব্রাহ্মণ, তোমার বাবা ধর্মসম্মত কথা বলেছেন। তুমিও সত্য কথা বলেছ। তুমি মন্ত্রদর্শী; তাই তোমাকে সনাতন ব্রহ্মজ্ঞান আর যজ্ঞের উদ্বৃত্ত ধন দিচ্ছি; তুমি গ্রহণ কর। ধর্মবৎসল রুদ্রদেব এ কথা বলে অন্তর্হিত হলেন। মহারাজ, সকালে আর সন্ধ্যায় একাগ্রচিত্তে যিনি এই কাহিনী স্মরণ করেন তিনি জ্ঞানী ও মন্ত্রজ্ঞ হন এবং সদ্গতি লাভ করেন। ১-১২

নাভাগের পুত্র অম্বরীষ। অপ্রতিহত ব্রহ্মশাপ তাঁকে স্পর্শ করতে পারে নি; তাই তিনি মহাভাগবত ও পুণ্যবান। পরীক্ষিৎ বললেন, ভগবন্, দুর্লঙ্ঘ্য ব্রহ্মশাপেও যাঁর কিছু হল না, সেই ধীমান রাজর্ষি অম্বরীষের কাহিনী শুনতে ইচ্ছে হচ্ছে। আপনি বলুন। ১৩-১৪

শুকদেব বললেন, মহারাজ, মহাভাগ অম্বরীষ সপ্তদ্বীপ পৃথিবী, অক্ষয় সম্পদ আর মনুষ্যদুর্লভ অতুল ঐশ্বর্য লাভ করেন। কিন্তু তিনি জানতেন যে ধন-সম্পদ সবই নশ্বর এবং এতে মানুষ মোহগ্রস্ত হয়; তাই এ সবকিছুই তাঁর কাছে স্বপ্নের মত অসার মনে হয়েছিল। তিনি ভগবান বাসুদেব এবং তাঁর ভক্ত সাধুদের পরমভক্তি লাভ করেন; ফলে এই বিশ্ব তাঁর কাছে প্রস্তরখণ্ডের ন্যায় তুচ্ছ মনে হয়। ভগবদ্ভক্ত সাধুদের প্রতি অনুরক্তির জন্যে মহারাজ অম্বরীষ তাঁর হৃদয়কে শ্রীকৃষ্ণের পদারবিন্দে, বাক্যকে বৈকুণ্ঠ-গুণকীর্তনে, করযুগলকে ভগবানের মন্দির-মার্জন কাজে, শ্রবণেন্দ্রিয়কে অচ্যুতের সৎকথা শ্রবণে, নয়নযুগলকে নারায়ণ বিগ্রহের অধিষ্ঠানক্ষেত্র দর্শনে, অঙ্গসমূহকে ভগবদ্ভৃত্যোব গাত্রস্পর্শে, ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে ভগবানের চরণস্পর্শে উৎপন্ন তুলসী-সৌরভ গ্রহণে, রসনাকে প্রসাদান্ন আস্বাদনে নিযুক্ত করলেন। তিনি চরণযুগল তীর্থ পরিক্রমায়, মস্তক হৃষীকেশের চরণবন্দনায় এবং কামনাকে ভগবানের সেবায় নিয়োগ করেছিলেন। তিনি বিষয়ভোগের কামনা করেন নি। সর্বব্যাপী আত্মার চিন্তায় তিনি সব কর্মফল যজ্ঞেশ্বর ভগবানকে সমর্পণ করে[১] ভগবদ্ভক্ত ব্রাহ্মণদের উপদেশে রাজ্য পালন করতেন। সরস্বতী নদীর বিপরীত দিকে মরুপ্রদেশে বহু অশ্বমেধ যজ্ঞ করে তিনি ভগবান যজ্ঞেশ্বরের আরাধনা করেন। বশিষ্ঠ, অসিত, গৌতম প্রভৃতি ঋষিরা এসব যজ্ঞানুষ্ঠানে তাঁকে সাহায্য করেন। সে সব যজ্ঞের সদস্য ও ঋত্বিকগণ সুন্দর বেশে সেজে এসেছিলেন বলে তাঁদের ঠিক দেবতাদের মতই দেখাচ্ছিল, আর তাঁরা উৎসুক হয়ে দেবতাদের মতই অপলক দৃষ্টিতে সেই আশ্চর্য যজ্ঞের নানা কাজ দেখছিলেন। অম্বরীষের স্বজনেরা সুরপ্রিয় স্বর্গলোকও কামনা করতেন না; তাঁরা কেবল ভগবানের চরিতকথা শুনতেন আর কীর্তন করতেন। ভগবান মুকুন্দকে তাঁরা সর্বদা হৃদয়ে অনুভব করতেন; তাই সিদ্ধদেরও দুর্লভ সেই বিষয়ভোগেও তাঁদের আনন্দ ছিল না। মহারাজ অম্বরীষ আপন ভক্তিযোগ ও তপস্যার ধর্মবলে শ্রীহরিকে সন্তুষ্ট করে ক্রমে সমস্ত কামনা ত্যাগ করেন। গৃহ, স্ত্রী, পুত্র, মিত্র, হাতী, ঘোড়া, রথ, অক্ষয়রত্ন,

১ তুলনীয়ঃ ভগবদ্গীতা, ৪।২৩

বসন-ভূষণ, অনন্ত রাজকোষেও তাঁর বৈরাগ্য জন্মে। তাঁর ভক্তিতে সন্তুষ্ট হয়ে ভগবান শ্রীহরি তাঁকে যে সুদর্শন চক্র দিয়েছিলেন, তা শত্রুর ভীতি জন্মায় আর ভক্তদের রক্ষা করে। ১৫-২৮

রাজা অম্বরীষ শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করার আকাঙ্ক্ষায় তাঁরই সুযোগ্যা মহিষীকে সংগে নিয়ে সারা বছর দ্বাদশীব্রত পালন করেন। ব্রতের শেষ কার্তিক মাসে তিনরাত উপোসী থেকে, যমুনায় স্নান করে মধুবনে শ্রীহরির পুজো করতে বসলেন। সেই পুজোয় মহাভিষেকের বিধিমত সব উপচারে অভিষেক করে তিনি বসন, ভূষণ, গন্ধ, মালা ইত্যাদি দিয়ে একাগ্রচিত্তে প্রথমে বিষ্ণুর আরাধনা করেন; পরে পূর্ণকাম মহাভাগ্যবান ব্রাহ্মণদেরও তিনি পুজো করেন। সেই সাধুবিপ্রদের তিনি ষাট কোটি স্বর্ণশৃঙ্গ, রৌপ্যখুরে, দুগ্ধবতী, শান্ত, সবৎসা ধেনু দান করলেন। শেষে ব্রাহ্মণদের ভূরিভোজনে আপ্যায়িত করে তাঁদের অনুমতি নিয়ে যখন পারণ করতে যাবেন তখন সাক্ষাৎ ভগবান দুর্বাসা ঋষি এসে তাঁর অতিথি হলেন। রাজা তক্ষুণি উঠে তাঁকে অভ্যর্থনা করে তাঁর পায়ে পড়ে ভোজনের জন্যে প্রার্থনা জানালেন। দুর্বাসা ঋষিও তাঁর প্রার্থনায় আনন্দে সম্মতি দিয়ে নিত্যকর্ম সমাধা করতে গেলেন এবং কালিন্দীর পবিত্র জলে ডুব দিয়ে ব্রহ্মচিন্তা করতে লাগলেন। এদিকে দ্বাদশী তিথির আর অর্ধেক মুহূর্ত মাত্র বাকী। এর মধ্যেই পারণ শেষ করতে হবে। তাই ধর্মসংকটে পড়ে ধর্মজ্ঞ রাজা ইতিকর্তব্য সম্বন্ধে ব্রাহ্মণদের অভিমত চাইলেন। তিনি মহা চিন্তায় পড়েলেন—ব্রাহ্মণকে কথা দিয়ে তা রক্ষা করতে না পারলে যেমন অধর্ম হয়, তেমনি দ্বাদশী ব্রতের পারণ না করলেও দোষ হয়। কি করলে আমার মঙ্গল হবে, অথচ অধর্ম আমাকে স্পর্শ করবে না? শুধু জল দিয়েই আমি পারণ করব; কারণ, ব্রাহ্মণরা বলেন যে শুধু জল খাওয়া বা না খাওয়া একই কথা। ২৯-৪০

হে কুরুশ্রেষ্ঠ, রাজর্ষি সে কথা ভেবে মনে মনে অচ্যুতকে স্মরণ করে জল খেয়ে দুর্বাসার অপেক্ষা করতে লাগলেন। এদিকে দুর্বাসা তাঁর কৃত্যকর্ম সেরে নদী হতে ফিরে আসতেই রাজা তাঁকে অভিনন্দন জানালেন। কিন্তু ধীসম্পন্ন মুনি অম্বরীষের এই আচরণ বুঝতে পারলেন। রাগে তাঁর শরীর কাঁপতে লাগল, ভ্রুকুটিতে কুটিল ভাব প্রকাশ পেল। তিনি তখন ক্ষুধার্ত; তাই রাজা জোড়হাতে থাকলেও দুর্বাসা তাঁকে বললেন, এই নৃশংস, ঐশ্বর্যমত্ত, বিষ্ণুর অভক্ত রাজা কেমন করে ধর্মের মর্যাদা লঙ্ঘন করেছে দেখ। আমি তোর অতিথি হয়ে এসেছি। আতিথ্যের রীতি অনুসারে আমাকে নিমন্ত্রণ করেছিস; তবু আমার আহার না হতেই তুই নিজে আগেই খেয়েছিস। তোকে এখনি এর প্রতিফল দেখাচ্ছি। এ কথা বলতে বলতেই ক্রোধে উদ্দীপ্ত হয়ে দুর্বাসা ঋষি তাঁর মাথার জটা উপড়িয়ে অম্বরীষের বিরুদ্ধে কালাগ্নির মত এক কৃত্যা[১] সৃষ্টি করলেন। কিন্তু সেই কৃত্যাকে খড়্গ হাতে নিয়ে, পদভরে পৃথিবী কাঁপিয়ে আসতে দেখেও তিনি নিজের জায়গা থেকে এক চুলও নড়লেন না। দাবানল যেমন ক্রুদ্ধ সাপকে পুড়িয়ে মারে, সেভাবেই পরমপুরুষের আদেশে সুদর্শন চক্র ভক্তকে বাঁচানোর জন্যে কৃত্যাকে পুড়িয়ে ফেলল। দুর্বাসা যখন দেখলেন তাঁর চেষ্টা নিষ্ফল হয়েছে আর চক্র তাঁর দিকে ছুটে আসছে তখন তিনি প্রাণ রক্ষার জন্যে এদিক-ওদিক ছুটতে লাগলেন। প্রজ্বলিত দাবানলশিখা যেমন সাপের দিকে ধেয়ে যায় ভগবানের চক্রও সেভাবেই দুর্বাসার অনুসরণ করতে লাগল আর মুনিও সুমেরুর গুহায় আশ্রয় নেবার জন্য সেদিকে ছুটতে লাগলেন। এভাবে দশদিক, আকাশ, পৃথিবী, পাতাল, সমুদ্র,

১ মারণ দেবতা

লোকপালদের বিভিন্ন লোক, স্বর্গ যেখানেই তিনি যাচ্ছেন সেখানেই সেই দুঃসহ সুদর্শনকে দেখতে পাচ্ছেন। ৪৯-৫১

ঋষি সভয়ে সর্বত্র আশ্রয় খুঁজলেন, কিন্তু কোথাও পেলেন না। তখন ব্রহ্মার কাছে গিয়ে বললেন, হে আত্মযোনি, বিধাতা, আমাকে দারুণ চক্রের হাত থেকে রক্ষা করুন। ব্রহ্মা বললেন, ঋষি, দুই পরার্ধ সংবৎসর কাল পরে ক্রীড়া[1] শেষ হলে কালস্বরূপ বিষ্ণু যদি এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ড পুড়িয়ে শেষ করে ফেলতে চান, তবে শুধু তাঁর ভ্রূভঙ্গীতেই বিশ্বসমেত আমার ব্রহ্মলোকও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। আমি, শংকর, দক্ষ, ভৃগুগণ, প্রজাপতি, ভূতপতি, সুরেশ ইত্যাদি সকলেই আমরা তাঁর কাছ থেকে লোকহিত কাজ করার আদেশ পেয়েছি ; সে আদেশই আমাদের শিরোধার্য। ব্রহ্মার কাছে ব্যর্থকাম হয়ে সুদর্শনচক্রের তাড়নায় দুর্বাসা কৈলাসে ভগবান শংকরের শরণ নিলেন। শংকর বললেন, বৎস, যে ব্রহ্মাণ্ডে আমরা ঘুরে বেড়াই, এমন জীবরূপী ব্রহ্মার উপাধিস্বরূপে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডের যথাকালে উদ্ভব আর লয় হচ্ছে। সেই ভূমা পুরুষের উপর আমাদের কোন অধিকার নেই। আমি, সনৎকুমার, নারদ, ভগবান ব্রহ্মা, কপিল, দেবল, ধর্ম, আসুরি, মরীচি ইত্যাদি আমরা সকলেই সর্বজ্ঞ হয়েও তাঁর মায়া জানতে পারি না ; বরং তাঁর মায়ায় আমরা অভিভূত হয়ে আছি। বিশ্বেশ্বরের এই অস্ত্র আমাদের নিকটও অত্যন্ত দুঃসহ। তুমি তাঁর শরণ নাও ; তাঁর আশ্রয়ে তোমার মঙ্গল হবে। ৫২-৫৯

দুর্বাসা এভাবে শংকরের কাছে নিরাশ হয়ে শ্রীহরির আবাসস্থান বৈকুণ্ঠে গেলেন। সুদর্শন চক্রের তেজে উত্তপ্ত হয়ে দুর্বাসা কাঁপতে কাঁপতে ভগবানের পায়ে পড়ে আর্তস্বরে বললেন, হে অচ্যুত, অনন্ত, বিশ্বপালক, আমি অপরাধ করেছি। আমাকে রক্ষা করুন। বিধাতা, আপনার অতুলনীয় প্রভাব না জেনে আপনার প্রিয়জনকে দুঃখ দিয়েছি। আপনি তা থেকে আমাকে নিষ্কৃতি দিন। আপনার নাম উচ্চারণ করলে নরকবাসীও মুক্তি পায়। ভগবান বললেন, দ্বিজ, আমি ভক্তের অধীন ; আমি সেই হেতু পরাধীন। ভক্তজন আমার প্রিয় এবং সাধু ভক্ত আমার হৃদয় অধিকার করে আছে।[2] আমি ভক্তসাধুদের পরমগতি ; তাই তাঁদের ছেড়ে আমি আপন আত্মা এবং চিরন্তন শ্রীসম্পদ আকাঙ্ক্ষা করি না। যাঁরা স্ত্রী, পুত্র, স্বজন, প্রাণ, ধন, ইহলোক ও পরলোকের সব বাসনা ত্যাগ করে আমার শরণ নেন আমি কেমন করে তাঁদের পরিত্যাগ করি? সাধ্বী স্ত্রী যেমন করে সৎপতিকে বশ করেন, সমদর্শী সাধুরাও ভক্তিডোরে সেভাবে আমাকে বাঁধেন। তাঁরা আমার সেবাতেই পরিতৃপ্ত, সালোক্যাদি চার প্রকারের মুক্তিফল পেলেও তাঁরা তা গ্রহণ করেন না ; তাই কালপ্রভাবে বিনাশশীল বিষয় তাঁরা কেমন করে আকাঙ্ক্ষা করবেন? ভক্তসাধুরা আমার হৃদয়, আমিও তাঁদের হৃদয়। আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে তাঁরা জানেন না, আমিও তাঁদের ছাড়া অন্য কিছুই জানি না। ব্রাহ্মণ, আমি তোমার উপায় বলে দিচ্ছি। যাঁর কাছ থেকে তুমি মৃত্যুর আশঙ্কা করছ, দেরি না করে তাঁর কাছে চলে যাও। সাধুজনের প্রতি কোন শক্তি প্রয়োগ করলে প্রয়োগকারীর অমঙ্গল হয়। তপস্যা ও বিদ্যা ব্রাহ্মণদের পক্ষে মোক্ষপ্রদ ; কিন্তু যিনি দুর্বিনীত তাঁর পক্ষে উভয় ক্ষেত্রেই বিপরীত ফল হয়। তুমি নাভাগ-নন্দন রাজা অম্বরীষের কাছে যাও ; তোমার মঙ্গল হবে। তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, তাতেই তুমি শান্তি পাবে। ৬০-৭১

---

১ বিশ্বের পালন-লীলা। ২ তুলনীয় : গীতা, ৭।১৭। এই ভক্তের লক্ষণ প্রসঙ্গে গীতার নবম ও দ্বাদশ অধ্যায় দুটিও দ্রষ্টব্য।

পঞ্চম অধ্যায়

দুর্বাসার পরিত্রাণ

শুকদেব বললেন, মহারাজ, সুদর্শনের তাপে তপ্ত দুর্বাসা ভগবানের আদেশে অম্বরীষের কাছে গিয়ে মনের দুঃখে তাঁর দু'পা জড়িয়ে ধরলেন। ঋষি এভাবে তাঁর পা ছোঁয়াতে রাজা খুব লজ্জা পেলেন এবং ঋষির এ-ধরনের প্রয়াস দেখে সমবেদনায় তিনি সুদর্শন চক্রের স্তুতি করতে লাগলেন--হে সুদর্শন, তুমি অগ্নি, ভগবান সূর্য, নক্ষত্রাধিপতি চন্দ্র, জল, পৃথিবী, আকাশ, বায়ু, পঞ্চতন্মাত্র এবং তুমিই সকল ইন্দ্রিয়, তোমাকে নমস্কার করি। হে অচ্যুতপ্রিয়, তোমার হাজারটি অর। হে সকল অস্ত্রের বিনাশক, হে পৃথিবীপতি, তুমি এই ব্রাহ্মণকে রক্ষা কর। তুমি ধর্ম, ঋত, যজ্ঞ, অখিল-যজ্ঞভোক্তা, লোকপাল, সর্বাত্মা। তুমি বিষ্ণুর পরম তেজ, তুমি সকল ধর্মের সেতু। অধার্মিক অসুরদের কাছে তুমি ধূমকেতুর মত। তুমি ত্রিলোকের রক্ষক, বিশুদ্ধতেজ। তুমি মনের মতই দ্রুতগামী ও অদ্ভুতকর্মা। তোমার স্তুতি করা অসম্ভব; তাই তোমাকে শুধু প্রণাম করি। হে গিরিশপতি, তোমার ধর্মের তেজে অন্ধকার দূর হয়ে মহাত্মাদের জ্ঞানদৃষ্টি লাভ হয়েছে। তোমার মহিমা অপার। সৎ, অসৎ, উৎকৃষ্ট, নিকৃষ্ট, সকল বস্তু তোমারই স্বরূপ। ভগবান যখন তোমাকে নিক্ষেপ করেন, তখন যুদ্ধক্ষেত্রে দৈত্যদানবদের মধ্যে ঢুকে তুমি বারবার তাদের হাত, পা, উরু, পেট ও গলা কাটতে থাক। হে জগৎ-রক্ষক, তুমি সর্বংসহ। ভগবান গদাধর দুষ্টের দমনের জন্যেই তোমাকে প্রয়োগ করেন। তাই আমাদের বংশের সৌভাগ্যের জন্যে তুমি এই ব্রাহ্মণের কল্যাণ বিধান কর। তাতেই আমরা অনুগৃহীত হব। যদি আমার দান বা যজ্ঞে কোন সুকৃতি থাকে, সুষ্ঠুভাবে স্বধর্ম পালন করে থাকি, আমার কুলদেবতা যদি বিপ্র হন, তবে এই ব্রাহ্মণের বিপদ দূর হোক। সর্বভূতে আমার আত্মজ্ঞানে এক এবং সর্বগুণাশ্রয় ভগবান যদি প্রসন্ন হয়ে থাকেন, তবে এই ব্রাহ্মণ বিপদ থেকে মুক্ত হন। ১-১১

শুকদেব বললেন, সুদর্শন দুর্বাসাকে উত্তপ্ত করছিল; রাজার স্তুতি আর প্রার্থনায় বিষ্ণুচক্র শান্ত হল। অস্ত্রের তাড়না থেকে পরিত্রাণ পেয়ে দুর্বাসা স্বস্তি বোধ করলেন এবং রাজাকে আশীর্বাদ করে তাঁর প্রশংসা করতে লাগলেন। দুর্বাসা বললেন, মহারাজ, আমি অপরাধী; তবু তুমি আমার মঙ্গলের জন্যে চেষ্টা করেছ। আজ আমি ভগবদ্‌ভক্তদের অদ্ভুত মহত্ত্ব দেখলাম। ভক্তের প্রভু শ্রীহরিকে যাঁরা বশ করেছেন সেই সাধু মহাত্মাদের দুঃসাধ্য কিছুই নেই। যাঁর নাম শুনলেই লোক নির্মল হয়, তাঁর তীর্থপদ[১] পেলে ভক্তের কোন্ প্রয়োজন অবশিষ্ট থাকে? তুমি অতি দয়ালু। আমার অপরাধ না নিয়ে তুমি আমাকে বাঁচিয়েছ। এতেই আমি অনুগৃহীত হয়েছি। মহারাজ অম্বরীষ দুর্বাসার ফিরে আসার অপেক্ষা করে এতক্ষণ অনাহারে ছিলেন। এবার তাঁর পায়ে ধরে তাঁকে প্রসন্ন করে খাওয়ালেন। যত্ন-পরিবেশিত ও মনের মত খাবার খেয়ে দুর্বাসা খুব তৃপ্তি পেলেন এবং সাদরে রাজাকে বললেন, এবার তুমিও খাও। মহারাজ, তুমি পরম ভাগবত। তোমাকে দেখে, স্পর্শ করে, তোমার সঙ্গে কথা বলে, আতিথ্য সৎকারে এবং তোমার আত্মজ্ঞানে আমি পরম সন্তোষ লাভ করেছি। স্বর্গের সুরাঙ্গনারা সর্বদা তোমার

১ যাঁর পদে গঙ্গাতীর্থ বিরাজ করেন।

পবিত্র কাজের কীর্তন করবেন এবং পৃথিবীও সর্বদা তোমার নির্মল কীর্তিকথা প্রচার করবেন। শুকদেব বললেন, প্রসন্নমনা মহর্ষি দুর্বাসা এভাবে রাজার গুণগান করে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে আকাশপথে ব্রহ্মার নিত্যলোকে চলে গেলেন। সুদর্শন চক্রের তাড়া খেয়ে দুর্বাসা ঋষি পালিয়ে গিয়েছিলেন ; তারপর থেকে তাঁর আবার ফিরে আসতে এক বছর অতীত হল। তাঁকে দেখার আকাঙ্ক্ষায় রাজা সে সময় শুধু জল খেয়েছিলেন। দুর্বাসা চলে গেলে অম্বরীষ ব্রাহ্মণের উচ্ছিষ্ট পবিত্র অন্ন খেলেন এবং ভাবলেন যে তাঁর পরম-পুরুষের প্রতি ভক্তির প্রভাবেই দুর্বাসার এই বিপদ। পরে আবার তাঁর বিপদ থেকে পরিত্রাণ ঘটেছিল। বহুগুণশালী রাজা নানা ক্রিয়াকলাপে পরমাত্মা ব্রহ্মরূপী বাসুদেবকে ভক্তি করতে লাগলেন। তাঁর প্রভাবে ব্রহ্মপদ থেকে শুরু করে জাগতিক সব ভোগই রাজার কাছে নরকের মত মনে হতে লাগল। পরে প্রাজ্ঞ অম্বরীষ তাঁর সমধর্মী পুত্রদের হাতে রাজ্য দিয়ে বনে চলে গেলেন। এভাবে তিনি ত্রিগুণের প্রভাব মুক্ত হয়েছিলেন। যিনি মহারাজ অম্বরীষের পবিত্র কাহিনী কীর্তন আর সর্বদা স্মরণ করবেন, তিনি ভগবানের ভক্ত হয় থাকবেন। যাঁরা মহাত্মা অম্বরীষের চরিত্র ভক্তিভাবে শুনবেন, তাঁরা মুক্তি লাভ করবেন। ১২-২৮

ষষ্ঠ অধ্যায়

অম্বরীষ-বংশ ও সৌভরির উপাখ্যান

শুকদেব বলতে লাগলেন, মহারাজ, অম্বরীষের তিন পুত্র, বিরূপ, কেতুমান আর শম্ভু। বিরূপের পুত্র পৃষদশ্ব ও পৃষদশ্বের পুত্র রথীতর। রথীতরের কোন সন্তান ছিল না। তাঁর প্রার্থনা অনুসারে মহর্ষি অঙ্গিরার ঔরসে রথীতরের স্ত্রীর গর্ভে কয়েকজন ব্রহ্মতেজসম্পন্ন সন্তানের জন্ম হয়। রথীতর-জাত পুত্রেরা রথীতর-গোত্র হলেও তাঁরা আঙ্গিরস নামেও পরিচিত। অতএব রথীতরের অন্য সব পুত্রের মধ্যে তাঁরা ক্ষত্রিয়-গোত্রের ব্রাহ্মণ হিসাবে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। একবার হাঁচতে গিয়ে মনুর নাক থেকে ইক্ষ্বাকু নামে এক পুত্রের জন্ম হয়। ইক্ষ্বাকুর একশ ছেলে ; বিকুক্ষি, নিমি আর দণ্ডক এ তিনজন তাঁদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ। ইক্ষ্বাকুর সন্তানদের মধ্যে পঁচিশজন আর্যাবর্তের পূর্বদিকে, পঁচিশজন পশ্চিমদিকে, তিনজন মধ্য-ভাগে এবং অবশিষ্ট পুত্ররা নানা জায়গায় রাজা হন। একদিন রাজা ইক্ষ্বাকু অষ্টকা শ্রাদ্ধ উপলক্ষে বিকুক্ষিকে ডেকে বললেন, শ্রাদ্ধের জন্যে পবিত্র মাংস নিয়ে এস। তাড়াতাড়ি যাও, দেরি করো না। পিতার আদেশে বিকুক্ষি বনে গিয়ে অনেক পশু বধ করলেন। কিন্তু পরিশ্রমে আর ক্ষুধার জ্বালায় ভুল করে তিনি সেই পশুগুলোর মধ্যে থেকে একটা খরগোশের মাংস খেয়ে ফেললেন। পরে তিনি অবশিষ্ট মাংস তাঁর পিতাকে এনে দিলেন। ইক্ষ্বাকু তাঁর গুরু বশিষ্ঠদেবকে শ্রাদ্ধের কাজের জন্যে সেই মাংস শোধন করে নিতে বললেন। তাতে বশিষ্ঠ বললেন, এ মাংস দূষিত ; এতে শ্রাদ্ধের কাজ হবে না। বশিষ্ঠের কথায় ইক্ষ্বাকু ছেলের সেই কাজ জানতে পেরে রাগে সদাচারভ্রষ্ট ছেলেকে রাজ্য থেকে বের করে দিলেন। ইক্ষ্বাকু পরে বশিষ্ঠের সঙ্গে আত্মতত্ত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়ে জ্ঞানযোগী হন এবং যোগবলে দেহত্যাগ করে ব্রহ্মপদ লাভ করেন। পিতার মৃত্যু হলে বিকুক্ষি দেশে ফিরে এসে রাজ্যভার গ্রহণ করে

রাজ্যশাসন করতে লাগলেন। তিনি বহুযজ্ঞ করে শ্রীহরিকে উপাসনা করেন। তিনি শশাদ নামেও খ্যাত ছিলেন। বিকুক্ষির পুত্র হলেন পুরঞ্জয়। তিনি ইন্দ্রবাহ আর ককুৎস্থ বলেও পরিচিত। যে কাজের জন্যে তাঁর এই নাম হয়েছিল এবার সে কথা শুনুন। ১-১২

একবার দেব-দানবদের মধ্যে প্রলয়ংকর যুদ্ধ হয়েছিল। সেই যুদ্ধে দেবতারা দানবদের কাছে পরাজয় স্বীকার করে বীর পুরঞ্জয়ের সাহায্য চান এবং তাঁকে বরণ করেন। তখন পুরঞ্জয় ইন্দ্রকে তাঁর বাহন হতে বললেন। ইন্দ্রও বিষ্ণুর কথায় মহাবৃষরূপে তাঁর বাহন হন। পুরঞ্জয় যুদ্ধের বর্ম পরে, দিব্য ধনু আর সুতীক্ষ্ণ বাণ নিয়ে বৃষরূপী ইন্দ্রের কুঁজের উপর চড়ে বসলেন। এভাবে পরমপুরুষ বিষ্ণুর তেজে বলীয়ান হয়ে দেবগণকে সঙ্গে নিয়ে তিনি দৈত্যপুরীর পশ্চিম দিক অবরোধ করলেন। সেখানে দৈত্যদের সংগে তাঁর তুমুল যুদ্ধ হয়। যে দৈত্যই তাঁর সামনে যুদ্ধ করতে এল তাকেই তিনি বর্শার আঘাতে যমালয়ে পাঠালেন। দৈত্যেরা তাঁর প্রলয়াগ্নির মত জ্বলন্ত বাণের আঘাতে আহত হয়ে পাতালপুরে পালিয়ে গেল। রাজর্ষি পুরঞ্জয় দৈত্যদের জয় করে দৈত্যরমণীদের ও তাদের ধনসম্পদ সবই বজ্রপাণিকে দিয়ে দিলেন। এ সব কাজের জন্যেই তাঁর বিভিন্ন নাম। পুরঞ্জয়ের পুত্র অনেনা, তাঁর পুত্র পৃথু। বিশ্বগন্ধি পৃথুর পুত্র, বিশ্বগন্ধির পুত্র চন্দ্র এবং চন্দ্রের পুত্র যুবনাশ্ব। যুবনাশ্বের পুত্র শ্রাবস্ত; তিনি শ্রাবস্তীপুরী তৈরী করেন। বৃহদশ্ব শ্রাবস্তের পুত্র আর বৃহদশ্বের পুত্র কুবলয়াশ্ব। তিনি তাঁর একুশ হাজার ছেলেকে সংগে নিয়ে ধুন্ধু নামে এক অসুরকে বধ করে উতংক ঋষিকে সন্তুষ্ট করেন। তাই তিনি ধুন্ধুমার নামে খ্যাতিলাভ করেন। কিন্তু ধুন্ধুর মুখের আগুনে দৃঢ়াশ্ব, কপিলাশ্ব আর ভদ্রাশ্ব ছাড়া তাঁর সব ছেলেই ভস্মীভূত হয়। ১৩-২৩

দৃঢ়াশ্বের পুত্র হর্যশ্ব হর্যশ্বের পুত্র নিকুম্ভ। নিকুম্ভের পুত্র বহুলাশ্ব, বহুলাশ্বের পুত্র কৃশাশ্ব, কৃশাশ্বের পুত্র সেনজিৎ। যুবনাশ্ব সেনজিতের পুত্র। নিঃসন্তান যুবাশ্ব বনে চলে যান; কিন্তু সঙ্গে একশ স্ত্রী থাকলেও তাঁর মনের দুঃখে দিন অতিবাহিত হয়। তাঁকে দেখে ঋষিদের দয়া হল; তাই তাঁরা একাগ্রচিত্তে ইন্দ্রযজ্ঞ আরম্ভ করলেন। একরাত্রে তৃষ্ণার্ত যুবনাশ্ব যজ্ঞশালায় গিয়ে দেখলেন যে ঋত্বিক ব্রাহ্মণরা সকলেই ঘুমিয়ে আছেন। তখন তিনি নিজেই কলসী থেকে মন্ত্রপূত জল খেয়ে ফেললেন। ব্রাহ্মণরা ঘুম থেকে উঠে দেখলেন কলসীতে জল নেই। তাঁরা বললেন, কে এমন কাজ করেছে? পুত্রলাভের জল কে খেয়েছে? পরে তাঁরা যখন জানতে পারলেন যে ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে রাজাই সেই জল খেয়েছেন, তখন ঋষিরা ঈশ্বরকে নমস্কার করে বললেন, অহো, দৈববলই প্রধান বল। এদিকে যথাসময়ে যুবনাশ্বের দক্ষিণ কুক্ষি (উদর) ভেদ করে রাজলক্ষণযুক্ত পুত্র ভূমিষ্ঠ হল। ব্রাহ্মণরা বললেন, এই কুমার স্তন্যপানের জন্যে খুব কাঁদছে, এ কি পান করবে? দেবরাজ ইন্দ্র সে কথা শুনে বললেন, এ শিশু আমাকে পান করবে। সেই শিশুকে তিনি তাঁর নিজের তর্জনীটি (বুড়ো আঙ্গুল) পান করতে দিয়ে বললেন, বৎস, কেঁদো না। এই শিশুর পিতা দেবতা আর ব্রাহ্মণদের অনুগ্রহে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন। তিনি সেখানেই তপস্যা করে সিদ্ধিলাভ করেন। মহারাজ, রাবণের মত দস্যুরা এই মান্ধাতাকে সর্বদাই খুব ভয় পেত; তাই ইন্দ্র তাঁর নাম দিয়েছিলেন 'ত্রসদ্দস্যু'। যুবনাশ্বের ছেলে মান্ধাতা পরে ভগবান শ্রীহরির প্রভাবে একচ্ছত্র সম্রাট হয়ে সপ্তদ্বীপা পৃথিবী শাসন করেন। তিনি আত্মতত্ত্বজ্ঞ হয়েও সর্বাত্মক, অতীন্দ্রিয়, সর্বদেবময় বিষ্ণুর আরাধনা করে

অনেক যজ্ঞ করেন এবং প্রচুর দক্ষিণা দেন। সে সব দ্রব্য, মন্ত্র, বিধি, যজ্ঞ, যজমান, ঋত্বিক, ধর্ম, দেশ ও কাল সেই পরম পুরুষের স্বরূপ। যেখান থেকে সূর্যের উদয় হয় আর যেখানে তাঁর অস্ত হয় সেই সম্পূর্ণ স্থান মান্ধাতা-ক্ষেত্র নামে পরিচিত। ২৪-৩৭

মান্ধাতার ঔরসে শশবিন্দুর কন্যা বিন্দুমতীর পুরুকুৎস, অম্বরীষ আর যোগী মুচুকুন্দ নামে তিন পুত্রের জন্ম হয়। তাঁদের পঞ্চাশটি বোন ছিল। তাঁরা সকলেই সৌভরিকে পতিত্বে বরণ করেন। সৌভরি একদিন যমুনার জলে ডুবে তপস্যা করছেন এমন সময় দেখলেন যে একটি মৎস্যরাজ মৈথুন-সুখ ভোগ করছে; এতে তাঁরও সেই ইচ্ছা হয়। তিনি মান্ধাতার কাছে গিয়ে তাঁর এক মেয়েকে প্রার্থনা করলেন। রাজা বললেন, ব্রাহ্মণ, আপনি স্বয়ংবরে আপনার পছন্দ মত মেয়ে পাবেন। সৌভরি ভবলেন যে তিনি জরাজীর্ণ; তাঁর চুল পেকে গিয়েছে, মাথা কাঁপে; তাছাড়া তিনি তপস্বী এবং মেয়েদের কাছে অপছন্দের পাত্র। বোধ হয়, এসব কথা ভেবেই রাজা তাঁকে উপেক্ষা করেছেন। যাক, আমি আমার দেহকে এমন সুন্দর করব যে দেবকন্যারাও আমাকে কামনা করবেন, রাজকন্যাদের তো কথাই নেই। তারপর দ্বাররক্ষক সৌভরিকে সমৃদ্ধিশালী অন্তঃপুরে রাজকন্যাদের কাছে নিয়ে গেলে পঞ্চাশজন রাজকন্যাই তাঁকে পতিত্বে বরণ করতে উদ্যত হল। সব রাজকন্যার মন তাঁর দিকে আকৃষ্ট হল এবং তাঁকে পাবার জন্যে রাজকন্যারা নিজেদের মধ্যে হিংসাবশত—ইনি আমার মনের মত বর, তোমাদের নন—এ কথা বলে ঝগড়া করতে লাগল। সৌভরির অপার তপস্যাবলে সব বাড়িগুলোর অমূল্য সজ্জা হল, নানা রকম উপবন, সুগন্ধি বন আর স্বচ্ছ জলের সরোবরে তারা সুশোভিত হল। গৃহে গৃহে স্ত্রী-পুরুষ সুন্দর বেশে সাজলেন। পাখি, ভ্রমর এবং স্তুতিকারেরা সর্বত্র মধুরস্বরে গান করতে লাগল। সৌভরি মহামূল্য শয্যা, আসন, বসন, ভূষণ, স্নান, অনুলেপন, আহার এবং মালায় সেজে সেই রাজকন্যাদের সঙ্গে সব সময় বিহারে মত্ত থাকতেন। ঋষির এমন সাংসারিক ভোগবিলাস দেখে সপ্তদ্বীপ পৃথিবীর অধিপতি মান্ধাতাও অবাক হয়ে গেলেন। ফলে তাঁর একচ্ছত্র রাজ-সম্পদের গর্বও আর রইল না। ৩৮-৪৭

সৌভরি সংসারে আসক্ত হয়ে নানা সুখ ভোগ করলেন, কিন্তু ঘি ঢেলে আগুনকে যেমন তৃপ্ত করা যায় না, তেমনি তিনিও কিছুতেই পরিতৃপ্ত হতে পারলেন না।[১] সৌভরি ঋষি একদিন বসে ভাবলেন যে মৎস্যের মৈথুন-ক্রিয়া দেখে তাঁর তপস্যাহানি ঘটেছে। তাই অনুতপ্ত হয়ে তিনি বললেন, হায়! তপস্বী, সাধু ও ব্রতনিষ্ঠ আপনারা আমার সর্বনাশ দেখুন। জলের মধ্যে থেকে মৈথুনরত মৎস্যের সঙ্গদোষে আমার চিরকালের সঞ্চিত তপস্যার ক্ষয় হয়েছে। মুক্তিকামী মানুষ অবশ্যই মনে-প্রাণে মৈথুনধর্মী জীবদের সঙ্গ ত্যাগ করবেন, ইন্দ্রিয়সমূহকে বহির্মুখী হতে দেবেন না[২], একা নির্জনে থেকে অনন্ত ঈশ্বরে মনোনিবেশ করবেন। আর সংগ যদি করতেই হয়, তবে একমাত্র ভগবৎপরায়ণ সাধুদের সঙ্গ করবেন।[৩] আমি একা জলের মধ্যে তপস্যা করছিলাম। পরে মৎস্য সঙ্গদোষে পঞ্চাশটি স্ত্রী গ্রহণ করে আমি পঞ্চাশ হলাম এবং প্রত্যেকের গর্ভে শতপুত্রের জন্ম দিয়ে এখন আমি পঞ্চাশ হাজার হয়েছি। তবু আমি ইহকাল ও

---

১ তুলনীয়: ন জাতু কামঃ কামানাম্ উপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্ধতে॥—ভাগবত, ৯।১৯।১৪

২ তুলনীয়ঃ কঠ উপনিষদ, ২।১।১। ৩ গীতা, ৬।১০

পরকালের কর্ম-বাসনার অন্ত দেখছি না। কারণ, মায়াগুণে আমি মোহগ্রস্ত হয়ে বিষয়-সম্পদকে পুরুষার্থ মনে করেছি। কিছুকাল এভাবে গৃহীর জীবন যাপনের পর তাঁর বৈরাগ্য উপস্থিত হয়। বানপ্রস্থ ধর্ম নিয়ে যখন তিনি বনে চলে যান, তখন তাঁর সাধবী পত্নীগণও তার সঙ্গে গিয়েছিলেন। আত্মজ্ঞ ঋষি সেখানে আত্মদর্শনের জন্যে কঠিন তপস্যা করে তিন অগ্নির[১] সঙ্গে আত্মাকে পরমাত্মায় যুক্ত করেন। ঋষির পত্নীরা তাঁদের স্বামীর ব্রহ্মনির্বাণ দেখলেন। আগুন নিভে গেলে যেমন তার শিখাগুলিও নিভে যায়, সেভাবেই ঋষিপত্নীরাও ঋষির প্রভাবে তাঁর অনুগমন করলেন। ৪৮-৫৫

সপ্তম অধ্যায়

ত্রিশংকু হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান

শুকদেব বললেন, মহারাজ, মান্ধাতার সর্বশ্রেষ্ঠ পুত্র অম্বরীষের কথা আগে বলেছি। তাঁর পিতামহ যুবনাশ্ব তাঁকে পুত্ররূপে গ্রহণ করেছিলেন। অম্বরীষের ছেলে যৌবনাশ্ব আর যৌবনাশ্বের ছেলে হারীত। মান্ধাতার গোত্রে এই তিনজনই প্রধান। নাগগণ তাঁদের ভগিনী নর্মদাকে পুরুকুৎসের হাতে সম্প্রদান করেন। নাগরাজের কথায় নর্মদা পুরুকুৎসকে পাতালে নিয়ে যান। বিষ্ণুশক্তিধর পুরুকুৎস সেখানে গিয়ে বধযোগ্য অনেক গন্ধর্বকে বিনাশ করেন। নাগগণ সেজন্যে পুরুকুৎসকে বর দেন যে তাঁর উপাখ্যান স্মরণ করলে সাপের ভয় থাকবে না। পুরুকুৎসের পুত্র ত্রসদ্দস্য; তিনি অনরণ্যের পিতা। অনরণ্যের পুত্র হর্যশ্ব, হর্যশ্বের পুত্র প্রারুণ আর প্রারুণের পুত্র ত্রিবন্ধন। সত্যব্রত ত্রিবন্ধনের পুত্র। তিনি ত্রিশংকু[২] নামে খ্যাত। ক্রুদ্ধ পিতার অভিশাপে তিনি চণ্ডাল হয়েছিলেন। তবু বিশ্বামিত্রের প্রভাবে তিনি সশরীরে স্বর্গে যান। তাঁকে আজও আকাশে দেখা যায়। দেবতারা তাঁকে স্বর্গ থেকে যখন ফেলে দিচ্ছিলেন তখন তাঁর মাথাটা নীচের দিকে ছিল, কিন্তু বিশ্বামিত্র মুনি নিজের শক্তিতে তাঁকে আকাশে নিশ্চল করে রাখেন। ১-৫

হরিশ্চন্দ্র ত্রিশংকুর পুত্র। হরিশ্চন্দ্রের জন্যই বশিষ্ঠ আর বিশ্বামিত্র উভয়ে পাখীরূপে[৩] অনেক বছর যুদ্ধ করেছিলেন। রাজা হরিশ্চন্দ্রের কোন সন্তান না থাকায় তাঁর মনে শান্তি ছিল না। একদিন দেবর্ষি নারদের উপদেশে বরুণের শরণাপন্ন হয়ে রাজা বললেন, প্রভু, আপনি অনুগ্রহ করলে আমার পুত্র-সন্তান হবে, যদি আমার বীর পুত্র হয়, তবে তাকেই পশু হিসাবে উৎসর্গ করে আপনার যজ্ঞ করব। বরুণ বললেন, তথাস্তু। এরপর রোহিত নামে রাজার এক পুত্র হয়। তখন বরুণদেব বললেন, রাজা, তোমার তো ছেলে হয়েছে। এবার একে দিয়ে আমার যজ্ঞ কর। হরিশ্চন্দ্র বললেন, দেব, দশদিন না গেলে

১ তিন অগ্নির নাম—গার্হপত্য, আহবনীয় ও দক্ষিণাগ্নি।

২ তিনটি শঙ্কু অর্থাৎ দোষ—যেমন, পিতার অসন্তোষ, গুরুর ধেনুবধ ও অসংস্কৃত দ্রব্য ভোজন।

৩ হরিশ্চন্দ্রের রাজসূয় যজ্ঞে দক্ষিণার ছলে বিশ্বামিত্র তাঁর সর্বস্ব হরণ করেন। বশিষ্ঠ এতে ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে আড়ী পাখী হওয়ার শাপ দেন এবং বিশ্বামিত্রও পাল্টা শাপে বশিষ্ঠকে বক পাখী হতে বলেন। এই বক ও আড়ী পাখীদের উভয়ের মধ্যে অনেক বছর যুদ্ধ হয়েছিল।

পশু যজ্ঞের উপযুক্ত হয় না। দশদিন পরে বরুণদেব এসে বললেন, রাজা, এবার যজ্ঞ কর। হরিশ্চন্দ্র বললেন, দেব, পশুর দাঁত না হলে তো তাকে দিয়ে যজ্ঞ হবে না। রোহিতের দাঁত হল। বরুণ তখন এসে বললেন, এবার যজ্ঞ কর। রাজা বললেন, এর সব দাঁত যখন পড়ে যাবে তখন একে দিয়ে যজ্ঞ করা যাবে। রোহিতের দাঁত পড়ে গেলে বরুণ আবার এসে যজ্ঞ করার কথা বললেন। হরিশ্চন্দ্র বললেন, এর সব দাঁত আবার না গজানো পর্যন্ত এ শুদ্ধ হবে না। সব দাঁত হল, বরুণদেবও এসে বললেন, তোমার ছেলের সব দাঁত আবার হয়েছে ; এবার যজ্ঞ কর। রাজা বললেন, বরুণদেব, ক্ষত্রিয় পশু বর্ম না পরা পর্যন্ত অশুচি থাকে। বাৎসল্যস্নেহের মোহে বরুণদেবকে বঞ্চনা করার উদ্দেশ্যে রাজা তাঁকে বার বার যে সময়ের কথা বলেছেন, তিনি সেই সময়ের প্রতীক্ষা করেছেন। ইতিমধ্যে রোহিত তাঁর পিতার অভিপ্রায় জানতে পেরে প্রাণরক্ষার জন্যে তীর-ধনুক নিয়ে বনে চলে গেলেন। এদিকে তাঁর পিতা বরুণের শাপে উদরী রোগে আক্রান্ত হলেন। সে খবর পেয়ে রোহিত বন থেকে গ্রামে ফিরে আসবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু ইন্দ্র এসে তাঁকে বারণ করে বললেন, বিভিন্ন তীর্থের সেবায় পৃথিবী পর্যটন করা পুণ্যের কাজ। তুমি সে কাজ কর। রোহিত ইন্দ্রের কথায় এক বছর বনেই কাটালেন। এভাবে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম বৎসরেও ইন্দ্র বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে এসে তাঁকে গ্রামে যেতে নিষেধ করেছিলেন। ষষ্ঠ বৎসরও বনে বিচরণ করে রোহিত নগরে ফিরে আসার পথে অজীগর্ত নামে এক ব্রাহ্মণের কাছ থেকে তাঁর মধ্যম পুত্র শুনঃশেফকে কিনে এনে তাঁর পিতাকে দিলেন এবং তাঁকে প্রণাম করলেন। যশস্বী হরিশ্চন্দ্র বরুণ ইত্যাদি দেবতাদের উদ্দেশ্যে নরমেধযজ্ঞ করে উদরী রোগ মুক্ত হন।[১] ৬-২১

ধার্মিক ব্যক্তিদের মধ্যে রাজা হরিশ্চন্দ্রের কথা প্রসিদ্ধ। এই যজ্ঞে বিশ্বামিত্র হোতা, আত্মজ্ঞ জমদগ্নি অধ্বর্যু, বশিষ্ঠ ব্রহ্মা এবং অয়াস্য মুনি উদ্গাতা হয়েছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র এই যজ্ঞে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে একটি সোনার রথ দেন। শুনঃশেফের মাহাত্ম্য পরে বলব। রাজা হরিশ্চন্দ্র এবং তাঁর পত্নীদের সত্য, সামর্থ্য আর ধৈর্য দেখে বিশ্বামিত্র অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন এবং তাঁকে পরম জ্ঞান দেন। সেই জ্ঞান লাভ করে তিনিও মনকে পৃথিবীর সঙ্গে, পৃথিবীকে জলের সঙ্গে, জলকে তেজের সঙ্গে, তেজকে বায়ুর সঙ্গে, বায়ুকে আকাশের সঙ্গে, আকাশকে অহংকারের সঙ্গে এবং অহংকারকে মহৎ-তত্ত্বের সঙ্গে এক করে শুদ্ধ জ্ঞান-কলাকেই আত্মরূপে ধ্যান করেন। ফলে আত্মার অজ্ঞান-আবরণ সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়। পরে তিনি নির্বাণসুখের অনুভূতির সাহায্যে সেই জ্ঞানকলাও পরিহার করেন এবং বন্ধনমুক্ত হয়ে অনির্দেশ্য ও অচিন্তনীয় স্বরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ২২-২৭

অষ্টম অধ্যায়

সগরবংশের উপাখ্যান

শুকদেব বললেন, মহারাজ, হরিত রোহিতের পুত্র। হরিতের পুত্র চম্প চম্পাপুরী প্রতিষ্ঠা করেন। চম্পের পুত্র সুদেব, সুদেবের পুত্র বিজয়। বিজয়ের পুত্র ভরুক,

১ মনে হয় সেকালে দাসপ্রথা ও নরবলির প্রচলন ছিল।

তাঁর পুত্র বৃক। বৃকের পুত্র বাহুক। শত্রুরা তাঁর রাজ্য হরণ করে; তাই পত্নীদের সঙ্গে নিয়ে তিনি বনে আশ্রয় নেন। বাহুক বৃদ্ধ বয়সে দেহত্যাগ করেন। তখন তাঁর মহিষী সহমরণের চেষ্টা করলে মহর্ষি ঔর্ব তাঁকে বিরত করেন; কারণ তিনি গর্ভবতী ছিলেন। এই মহিষীর সপত্নীগণ তাঁর গর্ভের কথা জানতে পেয়ে তাঁর খাবারের মধ্যে 'গর' অর্থাৎ বিষ মিশিয়ে দিয়েছিলেন। সেই বিষ নিয়েই পুত্র ভূমিষ্ঠ হয়ে সগর নামে বিখ্যাত হন। তিনি সম্রাট হয়েছিলেন। তাঁর ছেলেরা সাগর সৃষ্টি করেন। সগর তাঁর গুরুর কথায় তালজঙ্ঘ, যবন, শক, হৈহয় ও বর্বরদের প্রাণে না মেরে তাদের বিকৃতবেশ করে দেন। তিনি তাদের মধ্যে কোন কোন জাতিকে মুণ্ডিতমস্তক অথচ শ্মশ্রুধারী, কোন জাতিকে মুক্তকেশ অথচ অর্ধমুণ্ডিত, কোন জাতিকে অন্তর্বাসহীন, আবার কোন জাতিকে বহির্বাসহীন করেন। ১-৬

মহর্ষি ঔর্বের উপদেশে বহু অশ্বমেধ যজ্ঞ করে তিনি সর্ববেদ ও সর্বদেবস্বরূপ পরমাত্মা শ্রীহরির আরাধনা করেন। ইন্দ্র তাঁর যজ্ঞে উৎসর্গ-করা একটি ঘোড়া চুরি করেন। সুমতির[১] পুত্রেরা নিজেদের বলের গর্ব করতেন; তাই পিতার আজ্ঞায় ঘোড়া খুঁজতে গিয়ে তাঁরা পৃথিবীর চারদিক খুঁড়তে আরম্ভ করলেন। অবশেষে উত্তর-পূর্বদিকে কপিলমুনির কাছে সেই ঘোড়াটা দেখতে পেয়ে ষাট হাজার সগরপুত্র বলতে লাগলেন, এই লোকটাই ঘোড়াচোর, এখন চোখ বুজে বসে আছে। এই পাপিষ্ঠকে মেরে ফেল। অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তাঁরা মুনির দিকে ছুটে যেতেই তিনি চোখ মেলে তাকালেন। প্রকৃতপক্ষে ইন্দ্রের মায়ায় তাঁদের বুদ্ধি লোপ পেয়েছিল। তাই মহাত্মা কপিলের প্রতি এমন অন্যায় আচরণের জন্যই তাঁরা নিজেদের দেহের আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেলেন। রাজপুত্ররা কপিলের রোষানলে দগ্ধ হয়েছিলেন, এ কথা ঠিক নয়। কারণ, পার্থিব ধূলিহীন নির্মল আকাশের মতই যাঁর আত্মা জগৎ-পবিত্রকারী, সেই শুদ্ধসত্ত্ব মুনির মধ্যে কেমন করে ক্রোধের তামসভাব প্রকাশ পাবে? ইহলোকে যিনি সাংখ্যরূপ সুদৃঢ় তরীর প্রচলন করেছেন, যে তরীর সাহায্যে মুমুক্ষু মানুষ মৃত্যু-পথস্বরূপ দুর্লঙ্ঘ্য ভবসাগর পার হয়, সেই সমদর্শী সর্বজ্ঞ পুরুষ কেমন করে শত্রু-মিত্র ভেদজ্ঞান করবেন? সগর রাজার ঔরসে কেশিনীর গর্ভে যে পুত্রের জন্ম হয় তাঁর নাম অসমঞ্জস। তাঁর পুত্র অংশুমান। তিনি তাঁর পিতামহ সগরের হিতে রত ছিলেন। পূর্বজন্মে তিনি যোগী ছিলেন; লোকসঙ্গদোষে তিনি যোগভ্রষ্ট হন। জাতিস্মর হয়ে পরজন্মে লোকসঙ্গের ভয়ে তিনি অসামাজিক হয়ে থাকতেন। তিনি লোকনিন্দার কাজ করতেন বলে তাঁর আচরণে আত্মীয়-স্বজনরা অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। ছেলেরা যখন খেলাধুলা করত তখন তিনি তাদের ধরে সরযূ নদীতে ছুঁড়ে ফেলে দিতেন, তাতে সকলেই উদ্বেগ বোধ করতেন। পুত্রের এরূপ কাজ দেখে সগর বাৎসল্যস্নেহ ছেড়ে অসমঞ্জসকে পরিত্যাগ করলেন। কিন্তু তিনি যোগবলে সেই জলমগ্ন ছেলেদের আবার এনে দেখালেন ও পরে সে জায়গা ছেড়ে চলে গেলেন। অযোধ্যাবাসীরা সেই ছেলেদের আবার ফিরে আসতে দেখে অবাক হয়ে গেলেন। রাজা সগর নিজেও অনুতপ্ত হয়েছিলেন। ৭-১৮

এবার সগর রাজা অংশুমানকে ঘোড়ার খোঁজে পাঠালেন। তাঁর পিতৃব্যগণ যে পথ খুঁড়েছিলেন অংশুমান সেই পথে যেতে ছাই-গাদার কাছে ঘোড়াটাকে দেখতে

---

১ সগরের সুমতি ও কেশিনী নামে দুই রানী ছিলেন।

পেলেন। সেখানে কপিলমুনিরূপী ভগবান বিষ্ণুও বসেছিলেন। তাঁকে দেখে অংশুমান মুনিকে প্রণাম করে কৃতাঞ্জলিপুটে একাগ্রচিত্তে তাঁর স্তব করতে লাগলেন—হে ভগবান, যদিও ব্রহ্মা অজ বা জন্মরহিত, তবু তিনি সমাধিযোগে প্রত্যক্ষভাবে, এমন কি পরোক্ষভাবেও, যুক্তি দিয়ে আপনাকে অনুভব করতে পারেন না। কারণ, আপনি পরমেশ্বর। এই অবস্থায় ব্রহ্মার শরীর, মন আর বুদ্ধি নিয়ে যে দেবতা, পশুপক্ষী ও মানুষের সৃষ্টি তারা কেমন করে আপনকে জানবে? আমার মত একজন অজ্ঞ আর অর্বাচীন লোকের কথা ছেড়েই দিচ্ছি। যারা দেহী তারা তিনগুণের অধীন। তারা শুধু বাহ্যবিষয়ের জ্ঞান লাভ করে। আপনি তাদের হৃদয়ে বিরাজ করছেন; তবু তারা আপনাকে জানে না। আপনার মায়ায় তারা মোহিত হয়ে আছে। তাই তারা অজ্ঞানে ডুবে আছে। যাঁরা মায়াগুণের ভেদজ্ঞান ও মোহপাশ ছিন্ন করেছেন, সেই সনন্দন প্রমুখ মুনিগণ আপনার জ্ঞানঘন স্বরূপ ধ্যান করতে পারেন। আমি মূঢ়, কি করে আপনার ধ্যান করব? আপনি মায়াগুণ কর্মে সৃষ্ট নাম-রূপ এবং সৎ-অসৎ থেকে বিমুক্ত। আপনি পুরাণপুরুষ। জ্ঞানোপদেশ দেবার জন্যেই আপনি দেহধারণ করেছেন; আপনাকে প্রণাম করি। এই জগৎ আপনার মায়ার সৃষ্টি। মানুষ বিষয়বুদ্ধিতে কাম, লোভ, ঈর্ষা আর মোহে ভ্রান্তচিত্তে সংসারে বিচরণ করে। হে সর্বভূতাত্মা, আজ আপনাকে দেখে আমাদের কাম, কর্ম ও ইন্দ্রিয়ের দৃঢ় মোহপাশ ছিন্ন হয়েছে। ১৯-২৬

শুকদেব বললেন, মহারাজ, অংশুমান এভাবে স্তবগান করলে কপিলমুনি কৃপা করে তাঁকে বললেন, বৎস, তোমার পিতামহের যজ্ঞীয় অশ্বটি নিয়ে যাও। তোমার ভস্মীভূত পিতৃপুরুষগণ একমাত্র গঙ্গাজলেই উদ্ধার পাবেন; আর কিছুতে হবে না। এরপর অংশুমান কপিল মুনিকে প্রদক্ষিণ করে নতমস্তকে তাঁকে প্রণাম করলেন এবং ঘোড়া নিয়ে প্রস্থান করলেন। সগর রাজাও সেই ঘোড়া দিয়ে অবশিষ্ট যজ্ঞ শেষ করলেন। শেষে অংশুমানের হাতে রাজ্যভার দিয়ে নিস্পৃহ মহারাজ সগর ঔর্বমুনির উপদেশে বন্ধনমুক্ত হয়ে সাধনমার্গের সর্বোত্তম গতি লাভ করেন। ২৭-৩০

নবম অধ্যায়

গঙ্গাবতরণ কথা ও সৌদাস উপাখ্যান

শুকদেব বললেন, রাজা অংশুমান গঙ্গাকে নিয়ে আসার কামনা করে বহুকাল তপস্যা করেও কৃতকার্য হতে পারেন নি। কিছুকাল পরে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর পুত্র দিলীপও গঙ্গা আনার চেষ্টায় বিফল হন এবং তাঁরও মৃত্যু ঘটে। ভগীরথ তাঁর পুত্র। তিনি গঙ্গার জন্যে কঠোর তপস্যা করেন। গঙ্গাদেবী তাঁর তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে দেখা দিয়ে বললেন, বৎস, আমি তোমাকে বর দেব। সে কথা শুনে ভগীরথ নতমস্তকে তাঁর মনের ইচ্ছা দেবীকে নিবেদন করলেন। গঙ্গাদেবী বললেন, মাহারাজ, আমি যখন পৃথিবীতে নামব, তখন কে আমার বেগ ধারণ করবে? তা না হলে আমি যে পৃথিবী ভেদ করে একেবারে পাতালে চলে যাব। তাছাড়াও আমার পৃথিবীতে যাওয়ার ইচ্ছা নেই; কারণ, পৃথিবীর সব মানুষ

আমার জলেই তাদের পাপ ধোবে। কিন্তু সে পাপ আমি কোথায় ফেলব ? মহারাজ, তার কি উপায় ? সে কথা ভেবে দেখ। ১-৫

ভগীরথ বললেন, দেবি, পৃথিবীতে ব্রহ্মনিষ্ঠ, শান্তাত্মা, লোকপাবন সাধুরা আপনার জলে স্নান করবার সময় আপনার পাপ দূর হয়ে যাবে। কারণ সর্বপাপ-নাশক শ্রীহরি তাঁদের মধ্যেই আছেন। কাপড় যেমন সুতোর মধ্যে ওতপ্রোত থাকে, তেমনি এই বিশ্ব যাঁর মধ্যে পরিব্যাপ্ত, সকল প্রাণীর আত্মা সেই রুদ্র আপনার বেগ ধারণ করবেন।[১] ৬-৭

রাজা ভগীরথ গঙ্গাকে এ কথা বলে শিবকে তুষ্ট করার জন্যে তপস্যা করতে লাগলেন। ভগবান শংকর অল্প সময়েই তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হলেন। সর্বলোক-হিতৈষী শিব রাজার মনস্কামনা পূরণের জন্য প্রতিজ্ঞা করে বললেন, তাই হবে। তারপর তিনি শ্রীহরির চরণস্পর্শে পবিত্র গঙ্গাকে নিজের মাথায় ধারণ করেন। ৮-৯

রাজর্ষি ভগীরথের পিতৃপুরুষদের ভস্মীভূত দেহ যেখানে পড়েছিল, ভুবন-পাবনী গঙ্গাকে তিনি সেখানে নিয়ে গেলেন। ভগীরথ দ্রুতগামী রথে চড়ে আগে যেতে লাগলেন, আর গঙ্গাদেবী তাঁকে অনুসরণ করে বিভিন্ন দেশ পবিত্র করতে করতে অবশেষে ভস্মীভূত সগরপুত্রদের তাঁর জলে ভিজিয়ে দিলেন। সগরপুত্রগণ ব্রাহ্মণকে অবমাননা করে প্রাণ হারিয়েছিলেন, কিন্তু গঙ্গাজলের স্পর্শে ভস্মীভূত দেহ নিয়েই তাঁরা স্বর্গে গেলেন। সগর রাজার ছেলেরা পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিলেন ; তবু গংগার স্পর্শ পাওয়ামাত্র তাঁরা ভস্মদেহ নিয়েই স্বর্গে যান, আর যাঁরা ব্রতনিষ্ঠ হয়ে শ্রদ্ধায় গঙ্গাদেবীর সেবা করেন, তাঁদের কথা আর কি বলব। মহারাজ, শ্রীহরির পাদপদ্মজাত ভব-বন্ধননাশিনী গঙ্গাদেবীর মাহাত্ম্য বললাম ; কিন্তু এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। কারণ, পূর্বেও নির্মলচরিত্রের মুনিগণ শ্রদ্ধার সঙ্গে অনন্তে[২] চিত্ত-নিবেশ করে ত্রিগুণের[৩] কঠিন মোহপাশ থেকে মুক্ত হয়ে সদাই তাঁর স্বরূপে মিশে যান। ১০-১৫

ভগীরথের ছেলের নাম শ্রুত। তাঁর ছেলে নাভ। নাভের ছেলে সিন্ধুদ্বীপ। তাঁর ছেলে অযুতায়ু। অযুতায়ুর ছেলে ঋতুপর্ণ। তিনি নলের সখা। নলকে পাশাখেলার রহস্য শিখিয়ে তাঁর কাছ থেকে তিনি অশ্ববিদ্যা শিখেছিলেন। ঋতুপর্ণের ছেলের নাম সর্বকাম। সুদাস তাঁর পুত্র। সুদাসের পুত্র সৌদাস মদয়ন্তীর স্বামী। তিনি কোথাও 'মিত্রসহ' আবার কোথাও 'কল্মাষপাদ' নামেও খ্যাত। তিনি বশিষ্ঠের শাপে রাক্ষস হয়েছিলেন। নিজের কর্মদোষে তিনি নিঃসন্তান হন। ১৬-১৮

পরীক্ষিৎ বললেন, ব্রহ্মন্‌, মহাত্মা সৌদাসকে কুলগুরু কেন অভিশাপ দিলেন তা শুনতে ইচ্ছা হচ্ছে। যদি গোপন কিছু না থাকে তবে সে কথা বলুন। ১৯

শুকদেব বললেন, মহারাজ, একবার মৃগয়ায় গিয়ে সৌদাস এক রাক্ষসকে বধ করেন ; কিন্তু তার ভাইকে ছেড়ে দেন। সেই রাক্ষস ভ্রাতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে চাইল। তাই রাজার অনিষ্টচিন্তা করে সে রাজবাড়িতে একজন পাচক হয়েছিল। একদিন গুরুদেব রাজবাড়িতে খেতে এলে সে তাঁকে নর-মাংস রেঁধে খাওয়াল। কিন্তু মাংস পরিবেশনের সময় বশিষ্ঠদেব দিব্যদৃষ্টিতে বুঝতে পারলেন যে সে

১ তুলনীয় : শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ, ১।১২ শ্লোক।
২ শ্রীহরিতে। ৩ দেহসম্বন্ধের।

মাংস অভক্ষ্য। তিনি তখনি রেগে রাজাকে অভিশাপ দিলেন, এই দোষে তুই রাক্ষস হবি। কিন্তু পরে তিনি বুঝতে পারলেন যে রাক্ষসই এই কাজ করেছে; তাই তিনি রাজার প্রতি তাঁর শাপের ফল কমিয়ে বারো বছর করে দিলেন। এদিকে সৌদাসও হাতে জল নিয়ে গুরুকে অভিশাপ দিতে যাচ্ছিলেন; কিন্তু তাঁর স্ত্রী এসে বাধা দিলেন। তাতে তিনি দেখলেন সব দিক, আকাশ, পৃথিবী সমস্তই জীবময়। অবশেষে তিনি সেই উগ্র জল নিজের পায়ের উপর ফেলে দেন। সে জন্যে তিনি রাক্ষসভাবাপন্ন এবং কল্মাষপাদ[১] হয়ে গেলেন। ২০-২৫

এ অবস্থায় বনে ঘুরতে ঘুরতে একদিন তিনি মৈথুনক্রীড়ারত এক ব্রাহ্মণ দম্পতিকে দেখতে পেলেন। তখন তিনি ক্ষুধার তাড়নায় সেই ব্রাহ্মণকে ধরে খেতে গেলে ব্রাহ্মণী অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে বললেন, মহারাজ, আপনি রাক্ষস নন, ইক্ষ্বাকুবংশের একজন মহারথ। আপনি মদয়ন্তীর স্বামী, আপনার এই অধর্ম করা উচিত নয়। আমি সন্তান চাই; আমার অভিলাষ পূর্ণ হয় নি। আমার স্বামী ব্রাহ্মণ। তাঁকে আমার কাছে ফিরিয়ে দিন। মানবদেহে পুরুষের সর্বার্থ সাধন হয়; তাই দেহ নাশ হলে পুরুষার্থও বিনষ্ট হয়ে যায়। এই ব্রাহ্মণের বিদ্যা, তপস্যা ও শীল নানা গুণ আছে। গুণস্বরূপে সর্বভূতে যিনি আত্মারূপে বর্তমান, যিনি মহাপুরুষ নামে অভিহিত, ইনি সেই পরব্রহ্মের আরাধনাকাঙ্ক্ষী। পুত্র যেমন পিতার বধযোগ্য হয় না, তেমনি আপনার মত রাজর্ষিশ্রেষ্ঠের কাছে এই ব্রহ্মর্ষিশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণও বধ্য হতে পারেন না। বিদ্যা ও বিবেকসম্পন্ন পণ্ডিতগণ কর্ম, মন ও বাক্যে সমস্ত প্রাণীর প্রতি সহৃদয়তাকেই শীল বলে থাকেন। আপনি সজ্জন রাজা, আর আমার স্বামী নিষ্পাপ, ব্রহ্মবাদী শ্রোত্রিয়, সাধুপুরুষ। এ অবস্থায় গো-বধের মত ব্রহ্মবধকে আপনি কেমন করে সঙ্গত কাজ মনে করছেন? আপনি এঁকে খেয়ে ফেললে এঁর বিরহে মৃতপ্রায় হয়ে আমি এক মুহূর্তও বাঁচতে পারব না: তাই আগে আমাকে খেয়ে ফেলুন। ব্রাহ্মণী অনাথার মত করুণ স্বরে বিলাপ করতে লাগলেন; কিন্তু শাপগ্রস্ত সৌদাস তাতে কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করে বাঘ যেমন করে পশু খায়, ঠিক সেভাবেই ব্রাহ্মণকে খেয়ে ফেললেন। ব্রাহ্মণী তাঁর গর্ভাধান-কর্তা স্বামীকে এভাবে রাক্ষসের পেটে যেতে দেখে শোকাবেগে ক্রুদ্ধ হয়ে সৌদাসকে অভিশাপ দিলেন, রে পাপিষ্ঠ, আমার কামার্ত স্বামীকে তুই খেয়েছিস, তাই মৈথুনকর্মের সময় তোরও মৃত্যু হবে।[২] পতিলোক-পরায়ণা ব্রাহ্মণী রাজা মিত্রসহকে এই অভিশাপ দিয়ে তাঁর স্বামীর অস্থিগুলি প্রজ্বলিত অগ্নিতে সমর্পণ করে নিজেও সেই অগ্নিতে দেহত্যাগ করলেন। ২৬-৩৭

বারো বছর পরে শাপমুক্ত হয়ে সৌদাস একদিন স্ত্রীসঙ্গ করতে গেলে রানী মদয়ন্তী ব্রাহ্মণীর অভিশাপ মনে করিয়ে তাঁকে বিরত করেছিলেন। তারপর থেকে রাজা সৌদাস স্ত্রীসম্ভোগ সুখ ত্যাগ করেন এবং আপন কর্মদোষে এভাবে নিঃসন্তান হন। বশিষ্ঠদেব রাজার অনুমতিতে রানী মদয়ন্তীর গর্ভোৎপাদন করেছিলেন। সাত বছর সেই গর্ভ ধারণ করেও রানীর কোন ছেলে হল না। তখন বশিষ্ঠ একটি অশ্ম (প্রস্তরখণ্ড) দিয়ে মদয়ন্তীর পেটে আঘাত করেন এবং তাতে এক পুত্র ভূমিষ্ঠ হয়। সেই পুত্রই অশ্মক নামে খ্যাত। ৩৮-৪১

অশ্মক থেকে বালিকের জন্ম হয়। নারীরা তাঁকে ঘিরে রেখে পরশুরামের হাত

১ মিশ্রিত নানা বর্ণ বিশিষ্ট।
২ তুলনীয়: মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতী সমাঃ
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্। রামায়ণ, ২।১৫

থেকে বাঁচিয়েছিলেন। তাই তাঁকে নারীকবচ বলা হয়। আবার পৃথিবী ক্ষত্রিয়হীন হলে তিনিই ক্ষত্রিয়কুলের মূল হয়েছিলেন। সেজন্যে তিনি মূলক নামেও পরিচিত। মূলকের পুত্র দশরথ, তাঁর পুত্র ঐড়বিড়। ঐড়বিড় থেকে রাজা বিশ্বসহের জন্ম হয়। তাঁর পুত্র খট্বাঙ্গ রাজচক্রবর্তী হন। দুর্জয় রাজা খট্বাঙ্গ দেবতাদের প্রার্থনায় যুদ্ধ করে দৈত্যদের বধ করেন। পরে তিনি যখন জানতে পারলেন যে তাঁর আয়ু আর মুহূর্তকাল মাত্র বাকী আছে, তখন তিনি নিজের রাজ্যে ফিরে এসে পরমেশ্বরে মনোনিবেশ করলেন। তিনি মনস্থির করে ভাবতে লাগলেন, কুলদেবতা ব্রাহ্মণের চেয়ে আমার প্রাণ, পুত্র, ধনসম্পদ, পৃথিবী, রাজ্য, স্ত্রী প্রিয়তর নয়। অধর্মে আমার বিন্দুমাত্রও মতি হয় নি, ভগবান ছাড়া অন্য কোন বস্তু জগতে দেখি না। ত্রিভুবনের দেবগণ আমাকে বাঞ্ছিত বর দিতে চেয়েছিলেন; কিন্তু আমার চিত্ত জীবের পালনকর্তা ভগবানে রত। তাই আমি সে বর প্রার্থনা করি নি। দেবগণের ইন্দ্রিয়-বুদ্ধিও বিক্ষিপ্ত। তাঁরাও তাঁদের হৃদয়বাসী পরমপ্রিয় আত্মাকে সর্বদা দেখতে পান না, অন্যের কথা দূরে থাক। গুণময় জাগতিক বিষয়ে চিত্ত স্বভাবতই আসক্ত হয়; কিন্তু সে সবই ভগবানের মায়ারচিত গন্ধর্ব-নগরীর মত বাস্তবসত্তাহীন। বিশ্বকর্তার চিন্তায় সেই মায়া কাটিয়ে আমি ভগবানের শরণ নেব। ৪২-৪৮

তারপর রাজা খট্বাঙ্গ নারায়ণ-আশ্রিত বুদ্ধিযোগে অহংকাররূপে অজ্ঞান ত্যাগ করে আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হন। যিনি সূক্ষ্ম, শূন্যরূপে কল্পিত অথচ শূন্য না হয়ে পরিপূর্ণরূপে বিরাজিত পরব্রহ্ম, ভক্তগণ যাঁকে বাসুদেব বলে থাকেন, তিনিই আত্মস্বরূপ। ৪৯-৫০

দশম অধ্যায়

রামচরিত কথা

শুকদেব বললেন, মহারাজ, রাজা খট্বাঙ্গের পুত্র দীর্ঘবাহু। তাঁর পুত্র মহাযশস্বী রঘু। রঘুর পুত্র মহারাজ অজ; অজের ঔরসে রাজা দশরথের জন্ম হয়। দেবগণের প্রার্থনায় ব্রহ্মময় শ্রীহরি স্বয়ং রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন নামে চার অংশে ভাগ হয়ে রাজা দশরথের পুত্ররূপে জন্ম নেন। তত্ত্বদর্শী ঋষিগণ সীতাপতি রামচন্দ্রের চরিতকথা বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেছেন আপনি বারবার সে কাহিনী শুনেছেন। আমি সংক্ষেপে সে কথা আবার বলছি, শুনুন। ১-৩

পিতৃসত্য পালনের জন্য তিনি রাজ্য ত্যাগ করেন এবং প্রিয়তমার করস্পর্শকাতর কোমল চরণে বনে বনে বিচরণের সময় বানররাজ আর অনুজ লক্ষ্মণ তাঁর পথশ্রম দূর করেন। শূর্পনখার বিরূপসাধন হেতু রাবণ সীতাকে হরণ করলে প্রিয়াবিরহে তাঁর ক্রোধকুটিল নয়ন দেখে সমুদ্র ভীত হন এবং তখন তার উপর সেতুবন্ধন করে খলপ্রকৃতি রাবণদের বধ করেন। বিশ্বামিত্র ঋষির যজ্ঞক্ষেত্রে লক্ষ্মণের সামনে তিনি মারীচ প্রভৃতি প্রধান রাক্ষসদের বধ করেন। সীতার স্বয়ংবর গৃহে লোকবিখ্যাত বীরদের সভাস্থলে তিনশ বাহক হরধনুটিকে নিয়ে এলে তিনি এক গজশিশুর মত লীলাচ্ছলে তাতে জ্যা আরোপণ করেন এবং টান দিয়ে একটা ইক্ষুদণ্ডের মত তার মাঝ-

খানে ভেঙ্গে ফেলেন। যাঁকে বুকে রেখে আগে আদর করেছেন, সমধর্মী গুণ, শীল, বয়স ও অঙ্গকান্তি সম্পন্ন সেই লক্ষ্মীরূপা সীতাদেবীকে স্বয়ংবর সভায় জয় করে নিয়ে যাবার সময় পথে একুশবার পৃথিবীর ক্ষত্রকুলবিনাশকারী পরশুরামের দর্প তিনি চূর্ণ করেন। সত্যপাশে আবদ্ধ স্ত্রৈণ পিতার আদেশ শিরোধার্য করে মুক্তসঙ্গ যোগীর মতই অনায়াসে রাজ্য, সম্পদ, সুহৃদ ও বাসগৃহ ত্যাগ করে তিনি সীতাকে নিয়ে বনে গিয়েছিলেন। পাপমতি শূর্পনখার রূপ বিকৃত করে, হাতে অসহনীয় ধনু নিয়ে তিনি শূর্পনখার আত্মীয় খর, দূষণ, ত্রিশিরা প্রভৃতি চোদ্দ হাজার রাক্ষস বধ করেন এবং কষ্টে বনবাস পালন করেন। কোশলরাজ সেই রামচন্দ্র আমাদের রক্ষা করুন। ৪-৯

মহারাজ, সীতাদেবীর কথা শুনে কামাতুর রাবণ সীতাহরণের অভিপ্রায়ে রামচন্দ্রকে আগে আশ্রম থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যান। পরে রুদ্রের দক্ষবধের মত শ্রীরাম তীক্ষ্ন বাণে মারীচকে কালবিলম্ব না করে সংহার করেন। রামচন্দ্রের অনুপস্থিতিতে রাক্ষসাধম রাবণ বৃকের (নেকড়ে বাঘের) মত রক্ষকহীন জনকনন্দিনীকে অপহরণ করেন। প্রিয়ার বিচ্ছেদ-বিরহে রামচন্দ্র ভাইয়ের সঙ্গে অতি দীনভাবে বনে বনে ঘুরে দুঃখ করে বলতে লাগলেন, সঙ্গে স্ত্রী থাকলেই এই দুর্গতি হয়। ব্রহ্মা ও শংকর যাঁর অর্চনা করেন মানবরূপী সেই ভগবান রামচন্দ্র সীতার অন্বেষণ করতে করতে জটায়ুকে দেখতে পেলেন। রাবণের সঙ্গে যুদ্ধে জটায়ুর মৃত্যু হয়; কিন্তু শাস্ত্রবিধিমত তাঁর সংকার হয় নি। রামচন্দ্র জটায়ুর যথোচিত সংকার করেন। পরে কবন্ধ তাঁর হাতে নিহত হয়। এদিকে বানরদের সঙ্গে মিত্রতা করে তিনি বালীকে বধ করেন। অবশেষে বানরদেব সাহায্যে প্রিয়তমা সীতাব সংবাদ পেয়ে বানরসৈন্যদের নিয়ে তিনি সমুদ্রতীবে গেলেন। রামচন্দ্রের ক্রোধ-কুটিল কটাক্ষ দেখে কুমীর, মকর প্রভৃতি প্রাণীবা বিচলিত হল এবং সমুদ্রেব গর্জন ও ভয়ে স্তব্ধ হয়ে গেল। তখন সমুদ্র স্বয়ং মূর্তি ধারণ করে পূজার উপচাব মাথায় এনে তাঁর পায়ে প্রণাম করে বললেন, ভূমন্, যাঁব সত্ত্বগুণ থেকে সুরগণ, রজোগুণ থেকে প্রজাপতিগণ আর তমোগুণ থেকে ভূপতিবা সব জন্মেছেন আপনি সেই সকল গুণের অধীশ্বব। আপনি জগতের অধিপতি. নির্বিকার এবং আদিপুরুষ। আমরা জড়বুদ্ধি, তাই আপনাকে বুঝতে পারি না। হে বীর, আপনি স্বচ্ছন্দে যাত্রা করুন। দুরাত্মা রাবণ বিশ্রবা মুনিব পুরীষতুল্য এবং ত্রিলোকেব কষ্টের কারণ; তাকে বধ করে আপনার পত্নীকে উদ্ধার করুন। জগতে যশ বিস্তারের জন্যে আমার জলের উপর সেতু রচনা করুন। দিগ্বিজয়ী রাজারা এই সেতুর কাছে এসে তার কীর্তি ঘোষণা করবে। ১০-১৫

তারপর রামচন্দ্র নানা পর্বতশিখর দিয়ে সমুদ্রের উপর সেতু তৈরী করেন। সেই পর্বতশিখরে অনেক গাছ ছিল। বানরদের হাত লেগে গাছের ডালপালাগুলো কাঁপতে লাগল। এদিকে বিভীষণের পরামর্শে সুগ্রীব, নীল, হনুমান প্রভৃতি সেনাদের নিয়ে তিনি লংকায় প্রবেশ করেন। এই লংকা আগেই দগ্ধ হয়েছিল। হাতির দল নদীতে নামলে জলে যেমন আলোড়ন সৃষ্টি হয়, তেমনি তিনি বানররাজ সৈন্যদের নিয়ে লংকায় প্রবেশ করলে সেখানে বিক্ষোভ উপস্থিত হয়। তারা লংকায় ক্রীড়াক্ষেত্র, ধান্যাগার, কোষ, পুরদ্বার, গৃহদ্বার, ছাদ, কপোতদের আশ্রয়স্থান সব কিছুই অবরোধ করে এবং বেদি, পতাকা, স্বর্ণকুম্ভ ও চতুষ্পথসকল ভেঙ্গে ফেলে। রাক্ষসরাজ এই পরিস্থিতি দেখে নিকুম্ভ, কুম্ভ, ধূম্রাক্ষ, দুর্মুখ, সুরান্তক, নরান্তক, প্রহস্ত, অতিকায়, বিকম্পন, ইন্দ্রজিৎ প্রভৃতি বীর অনুচরদের এবং পরে কুম্ভকর্ণকে যুদ্ধে পাঠালেন। শূল, ধনু, প্রাস, ঋষ্টি, শক্তি, শর, তোমর, খড়্গ ইত্যাদি নানা

অস্ত্রে সজ্জিত দুর্ধর্ষ রাক্ষসসেনাদের বিরুদ্ধে রামচন্দ্র সুগ্রীব, লক্ষ্মণ, হনুমান, গন্ধমাদন, নীল, অঙ্গদ, জাম্ববান, পনস প্রভৃতিদের নিয়ে যুদ্ধে যাত্রা করলেন। সীতাদেবীর দেহস্পর্শদোষে রাবণের মঙ্গলরাশি নষ্ট হয়েছিল। তাই হস্তী, পদাতিক, অশ্ব ও রথী শত্রুসৈন্যদের আক্রমণ করে রামচন্দ্রের অঙ্গদ প্রভৃতি সেনাপতিরা রাক্ষসদের উপর গাছ, পাহাড়, গদা ও শর নিক্ষেপ করে তাদের বধ করতে লাগল। রাক্ষসরাজ তাঁর সৈন্যদের এভাবে বিনষ্ট হতে দেখে বিষম রেগে নিজের রথে চড়ে রামচন্দ্রের দিকে ধেয়ে গেলেন। মাতলি যে ইন্দ্ররথ এনেছিলেন রামচন্দ্র তাতে আরোহণ করেছিলেন। ১৬-২১

রাবণ রামচন্দ্রকে তীক্ষ্ণ ক্ষুরপ্র অস্ত্রাদি দিয়ে আঘাত করলেন। রামচন্দ্র তখন রাবণকে বললেন, রে রাক্ষসাধম, আমার স্ত্রীকে তুই অগোচরে কুকুরের মত চুরি করে নিয়ে গিয়েছিস। অলংঘ্য কালের প্রভাবে অধার্মিক ব্যক্তি যেমন সমুচিত ফল পায়, তেমনি আজ আমি তোর মত নির্লজ্জ লোকের নিন্দিত কর্মের উচিত শিক্ষা দেব। রাবণকে এভাবে তিরস্কার করে তিনি ধনুকে শর যোজনা করে তার দিকে ছুঁড়লেন। সেই শর বজ্রের মত তার হৃদয় ভেদ করল। ফলে, পুণ্যক্ষয় হলে কৃতিমান ব্যক্তি যেমন স্বর্গচ্যুত হয়, তেমনি রাবণও দশমুখে রক্তবমি করতে করতে রথ থেকে মাটিতে পড়ে গেল। রাক্ষসরা সকলেই হাহাকার করে উঠল। রাবণের মৃত্যুতে মন্দোদরীর সঙ্গে হাজার হাজার রাক্ষসী লংকাপুরী থেকে বের হয়ে কাঁদতে কাঁদতে সেখানে উপস্থিত হল। লক্ষ্মণের বাণে নিহত তাদের আপন আপন বন্ধুদের জড়িয়ে ধরে, বুক চাপড়ে করুণস্বরে কেঁদে তারা বলতে লাগল, হে নাথ, হে লোকরাবণ, আমরা মরে গিয়েছি। তোমার অভাবে এই লংকাপুরীকে শত্রুর উৎপীড়ন থেকে কে বাঁচাবে? হে মহাভাগ, তুমি কামের বশে সীতার প্রভাব জানতে পারনি; তাই তোমার এ দশা হয়েছে। হে কুলনন্দন, তুমি লংকার সঙ্গে আমাদেরও বিধবা করলে; নিজের দেহ শকুনভোগ্য করেছ, আর আত্মাকেও নরকগামী করেছ। ২২-২৮

শুকদেব বললেন, তারপর রামচন্দ্রের অনুমতি নিয়ে বিভীষণ মৃত জ্ঞাতিদের পারলৌকিক ক্রিয়া যথাবিধি সম্পন্ন করলেন। রামচন্দ্র পরে অশোক বনে গিয়ে শিংশপা গাছের নীচে তাঁর বিরহ-বেদনায় শীর্ণকায়া সীতাকে দেখতে পেলেন। স্বামীকে দেখে আনন্দে সীতার মুখ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। তাঁকে দেখে রামেরও দয়া হল। শেষে রামচন্দ্র বিভীষণকে লংকাপুরী ও রাক্ষসদের অধিপতি করে কল্পান্ত পর্যন্ত তাঁকে পরমায়ু দিলেন। এদিকে তাঁর বনবাস-ব্রতও সমাপ্ত হল এবং সীতাকে রথে তুলে তিনি লক্ষ্মণ, হনুমান আর সুগ্রীবের সঙ্গে অযোধ্যার দিকে যাত্রা করলেন। তাঁর যাত্রাপথে লোকপালগণ তাঁর উপর পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেন। আর ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ প্রীতিভরে তাঁর গুণগান করতে শুরু করলেন। ২৯-৩৩

ভরত এতকাল জটাবল্কল ধারণ করে গোমূত্রপক্ক যবসিদ্ধ খেয়ে মাটিতে কুশ-শয্যায় শয়ন করতেন। তাঁর কথা শুনে পরমকরুণাময় রামচন্দ্রের বড় দুঃখ হল। রামের আগমনবার্তা শুনে ভরত তাঁর পাদুকা মাথায় করে পুরবাসী, অমাত্য আর পুরোহিতদের নিয়ে বড় ভাইকে আনার জন্যে যখন তাঁর শিবির নন্দিগ্রাম থেকে যাত্রা করেন, তখন ব্রহ্মবাদী ব্রাহ্মণগণ উচ্চস্বরে বেদমন্ত্র পাঠ আর সকলে গীতবাদ্য-ধ্বনি করছিল। তাছাড়া স্বর্ণরঞ্জিত পতাকা, বিচিত্র ধ্বজ ও উত্তম অশ্বযুক্ত রথ, স্বর্ণবর্মাবৃত সৈন্য, বারাঙ্গনা, পদচারী ভৃত্য, রাজোচিত ছত্র-চামর ও বিবিধ রত্নাদি নিয়ে ভরত রামের নিকট গিয়ে তাঁর পায়ে পড়লেন। প্রেমাশ্রুধারায় ভরতের হৃদয়

ও নয়ন আকুল হল। তিনি পাদুকা দুটি তাঁর সামনে রেখে বাষ্পপূর্ণ চোখে কৃতাঞ্জলি হয়ে দাঁড়ালে রামচন্দ্র দুহাতে আলিঙ্গন করে দুই চোখের জলে তাঁকে ভিজিয়ে দিলেন। পরে রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা ব্রাহ্মণ ও কুলবৃদ্ধদের প্রণাম করলেন এবং প্রজারাও তাঁদের নমস্কার জানালেন। উত্তরকোশলবাসী প্রজাগণ দীর্ঘকাল পরে তাদের রাজাকে আবার ফিরে পেয়ে আনন্দে উত্তরীয় উড়িয়ে তাঁদের দিকে ফুলের মালা ছুঁড়ে নাচতে লাগল। তখন ভরতের কাছে ছিল রামের পাদুকা, সুগ্রীব ও বিভীষণের হাতে ছিল চামর, হনুমান ধরেছিলেন শ্বেতচ্ছত্র, শত্রুঘ্নের কাছে ছিল ধনু ও তূণ, সীতাদেবীর হাতে ছিল তীর্থজলের কমণ্ডলু, অঙ্গদ নিয়েছিলেন খড়্গ আর জাম্ববান পরেছিলেন সুবর্ণময় চর্ম। পুষ্পকরথে রামচন্দ্রকে যখন নারী ও বন্দীরা স্তুতি আর বন্দনা করছিল, তখন তিনি গ্রহদের মধ্যে চন্দ্রের মত শোভা পাচ্ছিলেন। ৩৪-৪৪

ভরতের অভিনন্দন গ্রহণ করে রামচন্দ্র উৎসব-মুখর নগরীতে প্রবেশ করলেন। রাজভবনে এসে তিনি তাঁর নিজের মা, বিমাতাগণ ও গুরুজনদের পূজা করলেন। বয়স্য ও কনিষ্ঠরা রামচন্দ্রকে পূজা করলে তিনি সকলকে যথাযোগ্য সম্মান দেখালেন। পরে সীতা ও লক্ষ্মণ সকলের কাছে গেলেন। প্রাণসঞ্চার হলে দেহ যেমন উঠে দাঁড়ায়, সেভাবেই আপন আপন পুত্রকে পেয়ে মায়েরা উঠে তাঁদের কোলে তুলে নিলেন এবং চোখের জলে নিজেদের শোক ভুলে গেলেন। তারপর কুলগুরু বশিষ্ঠ রামের জটা খুলিয়ে কুলবৃদ্ধদের নিয়ে চার সমুদ্রের জল দিয়ে যথাবিধি ইন্দ্রের মত তাঁর অভিষেক সম্পন্ন করলেন। অভিষেক-স্নানের পরে রামচন্দ্র, সীতাদেবী আর বস্ত্রালংকারে সজ্জিত ভাইদের সঙ্গে নিজেও সুন্দর বসন, মালা এবং নানা অলংকারে সাজলেন। ভরত তাঁকে প্রণাম করলেন; তিনিও প্রসন্নচিত্তে রাজসিংহাসনে বসে স্বধর্মনিষ্ঠ প্রজাগণকে পিতার মত পালন করতে লাগলেন; প্রজারাও তাঁকে পিতা বলে মানতে লাগল। সর্বলোকমঙ্গলকারী ধর্মজ্ঞ রামচন্দ্র রাজা হলে ত্রেতাযুগও সত্যযুগের মত হয়েছিল। ৪৫-৫১

হে ভরতকুলশ্রেষ্ঠ, তখন বন, নদী, পর্বত, দ্বীপ, সাগর, বর্ষ সব কিছুই প্রজাদের অভীষ্ট পূরণ করেছিল। রাম-রাজত্বে প্রজাদের আধি, ব্যাধি, জরা, শোক, দুঃখ, ভয়, গ্লানি কিছুই ছিল না। ইচ্ছা না করলে কেউ মৃত্যুর কবলে পড়ত না। একভার্যাব্রতী রাজর্ষি রামচন্দ্র শুদ্ধভাবে নিজের আচরণ দ্বারা প্রজাদের গার্হস্থ্যধর্ম শিক্ষা দিতে লাগলেন। সীতাদেবী স্বামীর মনের কথা জানতেন। তাই তিনি সবসময় বিনয়, প্রেম, আনুগত্য, শীল, বুদ্ধি ও লজ্জা দিয়ে স্বামীর চিত্তহরণ করতে লাগলেন। ৫২-৫৫

একাদশ অধ্যায়

শ্রীরামচন্দ্রের যজ্ঞ সম্পাদন

শুকদেব বললেন, মহারাজ, আচার্য বশিষ্ঠদেবের উপদেশে সর্বশ্রেষ্ঠ যাগ-যজ্ঞ করে পরমদেব রামচন্দ্র নিজেকে নিজেই অর্চনা করেন। যজ্ঞের শেষে তিনি হোতাকে পূর্বদিক, ব্রহ্মাকে দক্ষিণদিক, অধ্বর্যুকে পশ্চিমদিক এবং সামগায়ককে

উত্তরদিক দান করেন। এই চারদিকের মধ্যভাগে যে ভূমি অবশিষ্ট ছিল, তিনি ভাবলেন যে সেটা কোন নিস্পৃহ ব্রাহ্মণকে দেওয়া উচিত। তাই তিনি সেই ভূমি আচার্যকে দান করেন। এভাবে দান করতে করতে রামচন্দ্রের শুধুমাত্র বসনভূষণই অবশিষ্ট ছিল আর রাজরানী সীতাদেবীর মাঙ্গলিক আভরণ ছাড়া আর কিছুই রইল না। রামচন্দ্রের এরূপ বাৎসল্য দেখে দানপ্রাপ্ত ব্রাহ্মণগণ সন্তুষ্ট হলেন এবং সস্নেহে সমস্ত দান ফিরিয়ে দিয়ে রামকে বললেন, ভুবনেশ্বর, আপনি আমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করে নিজ প্রভায় অজ্ঞান-অন্ধকার দূর করেছেন; সুতরাং আপনি আমাদের কি দেন নি? আপনি ব্রহ্মণ্যদেব, মেধাবী, যশস্বী; অহিংস মুনিগণ আপনার চরণপদ্ম সেবা করেন। আপনাকে প্রণাম করি। ১-৭

তাঁর সম্বন্ধে রাজ্যের প্রজাদের কি ধারণা সেটা রামচন্দ্র জানতে চাইলেন। তাই একদিন রাত্রিকালে তিনি ছদ্মবেশে সকলের অলক্ষ্যে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ শুনলেন যে এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে বলছে, তুই পরগৃহগামী দুষ্টা, অসতী। তোকে আর ভরণ-পোষণ করব না। রামচন্দ্র স্ত্রৈণ; তাই পরগৃহীতা সীতাকে পালন করছেন। আমি কিন্তু তোকে আর গ্রহণ করব না। রামচন্দ্র দেখলেন, এমন বহু লোক আছে যারা অজ্ঞ; যুক্তিতর্ক দ্বারা তাদের বোঝান বিড়ম্বনা মাত্র। এ অবস্থায় লোকভয়ে রামচন্দ্র সীতাকে ত্যাগ করলে তিনি বাল্মীকির আশ্রমে আশ্রয় নেন। তখন সীতাদেবী গর্ভবতী ছিলেন। যথাসময়ে তিনি দুটি যমজ সন্তান প্রসব করেন। তাঁরা লব ও কুশ নামে খ্যাত। মহর্ষি বাল্মীকিই তাঁদের জাতকর্ম-ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। ৮-১১

মহারাজ, অঙ্গদ ও চিত্রকেতু নামে লক্ষ্মণের দুই পুত্র জন্মে। ভরতেরও দুই পুত্র—একজন তক্ষ, আর একজন পুষ্কল। শত্রুঘ্নের সুবাহু ও শত্রুসেন নামে দুই পুত্র হয়। ভরত দিগ্‌বিজয়ে যাত্রা করে কোটি কোটি গন্ধর্ব বধ করেন এবং তাদের ধনরাশি নিয়ে এসে রামচন্দ্রকে অর্পণ করেন। মধুপুত্র লবণ রাক্ষসকে বধ করে শত্রুঘ্ন মধুবনে মথুরাপুরী প্রতিষ্ঠা করেন। ১২-১৪

নির্বাসিত সীতাদেবী তাঁর দুই ছেলেকে বাল্মীকি মুনির হাতে সমর্পণ করে শ্রীরামের চরণধ্যান করতে করতে পাতালে প্রবেশ করেন। সে সংবাদ পেয়ে রামচন্দ্র চিত্তনিরোধ করে শোক সংবরণের চেষ্টা করলেন; কিন্তু সীতার গুণরাশি স্মরণ করে স্বয়ং ঈশ্বর হয়েও তিনি শোকে আকুল হয়ে পড়লেন। স্ত্রী-পুরুষের আসক্তি সর্বত্রই এরূপ ভয়ের কারণ হয়ে থাকে। ঈশ্বরদের অবস্থাই যখন এমন হয়, তখন গৃহাসক্ত গ্রাম্য লোকের কথা কি আর বলব। প্রভু রামচন্দ্র তারপর অখণ্ড ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করে তেরো হাজার বছর অগ্নিহোত্র ব্রতের অনুষ্ঠান করেন। তাঁর চরণকমল দণ্ডকারণ্যের কাঁটায় বিদ্ধ হয়; ভক্তহৃদয়ে সেই স্মরণ-চিহ্ন রেখে তিনি অমরজ্যোতি লোকে যাত্রা করেন। ১৫-১৯

দেবগণের প্রার্থনায় রামচন্দ্র লীলার জন্যে নরদেহ ধারণ করেছিলেন। তাঁর সমান বা তাঁর চেয়ে বেশী প্রভাবশালী কেউ নেই। তাই তাঁর সমুদ্রবন্ধন এবং অস্ত্র দিয়ে রাক্ষসবধের ঘটনাকে কবিরা অদ্ভুত বলে বর্ণনা করলেও সেগুলো তাঁর যশের কারণ নয়। সুতরাং বানরগণ তাঁর শত্রুবধে কি সাহায্য করবে? ঋষিগণ যাঁর পাপনাশক ও দিগন্ত-ব্যাপী নির্মল কীর্তিকথা আজও রাজসভায় গান করেন এবং দেবগণ ও নৃপতিগণ মাথার মুকুট দিয়ে যাঁর চরণবন্দনা করেন, আমরা সেই রঘুপতির শরণাপন্ন হই। রামচন্দ্রকে যাঁরা স্পর্শ বা দর্শন করেছেন কিংবা তাঁকে উপবেশন করিয়েছেন তাঁর সেই অনুগত কোশলবাসীরা যোগীদের

ন্যায় অমরবাস লাভ করেন। মহারাজ, মানুষ হিংসা ও নিষ্ঠুরতা ত্যাগ করে রামচরিত-কথা শুনলে কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে। ২০-২৩

পরীক্ষিৎ বললেন, ভগবান রামচন্দ্র নিজে কেমন আচরণ করতেন? আপন অংশস্বরূপ ভাইদের প্রতিই বা তাঁর কিরূপ আচরণ ছিল? সাক্ষাৎ ঈশ্বরস্বরূপ রামচন্দ্রের প্রতি তাঁর ভাইদের, প্রজাগণের এবং পুরবাসীদের আচরণ কেমন ছিল? ২৪

শুকদেব বললেন, ত্রিভুবনেশ্বর রামচন্দ্র ভাইদের দিগ্‌বিজয়ের আদেশ দিয়েছিলেন এবং অনুচরদের সঙ্গে নিয়ে জনগণকে দেখার জন্যে তিনি নগরীতে ঘুরে বেড়াতেন। নগরীর পথ তখন গন্ধজল আর হাতীর মদজলে সিক্ত থাকত। দেখে মনে হত যেন নগরী আপন স্বামীকে আসতে দেখে আনন্দে উদ্‌বেল হয়ে উঠেছে। নগরীর প্রাসাদ, পুরদ্বার, সভা, চৈত্য, দেবালয় প্রভৃতিতে সজ্জিত স্বর্ণকুম্ভ ও পতাকায় শোভা পেত। নগরীতে স্থানে স্থানে বৃন্তযুক্ত কদলীবৃক্ষ, মনোরম বস্ত্র-পট্টিকা, দর্পণ, বস্ত্র এবং মালা দিয়ে মঙ্গলতোরণ রচিত হত। নগর-দর্শনের সময় তিনি যেখানেই যেতেন সেখানেই পুরবাসিগণ উপহার হাতে তাঁর কাছে আসতেন এবং তাঁকে আশীর্বাদ করে বলতেন, দেব, আপনি পূর্বে এই পৃথিবীকে উদ্ধার করেছেন, এখন তাকে পালন করুন। ২৫-২৯

রাজ্যের প্রজাগণ বহুদিন পরে তাদের অধিপতির আগমন সংবাদ পেয়ে তাঁকে দেখার আগ্রহে নিজ নিজ গৃহ ছেড়ে প্রাসাদে উঠে এল এবং অতৃপ্ত নয়নে পদ্মলোচন রামচন্দ্রকে দেখতে দেখতে তাঁর উপর পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগল। রামচন্দ্র তাঁর পূর্বপুরুষ নৃপতিদের রত্নভাণ্ডার ও মহামূল্য পরিচ্ছদে সজ্জিত রাজভবনে প্রবেশ করলেন। সেই ভবনদ্বারের দেওয়ালগুলো বিদ্রুমমণিময়, স্তম্ভশ্রেণী বৈদূর্যরত্নখচিত, গৃহতল অতি স্বচ্ছ মরকতমণি নির্মিত এবং ভিত্তিগুলো স্ফটিকময় ছিল। এরূপে সেই ভবনটি বিচিত্র মালা, পট্টিকা, বসন, মণিরাজির প্রভা, চৈতন্য-সদৃশ উজ্জ্বল মুক্তা, মনোরম ভোগসামগ্রী, সুগন্ধ ধূপ, দীপ, পুষ্পসজ্জা এবং অলংকারস্বরূপ দেবতুল্য স্ত্রী-পুরুষে শোভা পাচ্ছিল। সাধকপ্রবর ভগবান রামচন্দ্র তাঁর প্রিয়তমা পত্নী সীতার সঙ্গে সে ভবনে বাস করতেন। এভাবে স্বধর্ম পালন করে তিনি বহু বছর বিষয়ভোগ করেছিলেন। সেকালের মানুষরা নিরন্তর তাঁর পাদপদ্ম আরাধনা করত। ৩০-৩৬

দ্বাদশ অধ্যায়

কুশের বংশ বিবরণ

শুকদেব বললেন, মহারাজ, কুশের পুত্র অতিথি, অতিথির পুত্র নিষধ, তাঁর পুত্র নভ। নভের পুত্র পুণ্ডরীক, পুণ্ডরীকের পুত্র ক্ষেমধন্বা। ক্ষেমধন্বার পুত্র দেবানীক, তাঁর পুত্র অনীহ। অনীহের পুত্র পারিযাত্র, পারিযাত্রের পুত্র বল, তাঁর পুত্র স্থল। স্থলের পুত্র বজ্রনাভ সূর্যের অংশে জন্মগ্রহণ করেন। বজ্রনাভের পুত্র সগন, তাঁর পুত্র বিধৃতি। বিধৃতির পুত্র যোগাচার্য হিরণ্যনাভ। ইনি জৈমিনির শিষ্য ছিলেন। কোশলদেশীয় যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি এঁর কাছে মহাসিদ্ধিদায়ক ও অহংকারনাশক অধ্যাত্মযোগ শিখেছিলেন। হিরণ্যনাভের পুত্র পুষ্প, তাঁর পুত্র

ধ্রুবসন্ধি। ধ্রুবসন্ধির পুত্র সুদর্শন, তাঁর পুত্র অগ্নিবর্ণ। অগ্নিবর্ণের পুত্র শীঘ্র এবং শীঘ্রের পুত্র মরু। যোগে সিদ্ধিলাভ করে তিনি এখন কলাপগ্রামে বাস করছেন। কলিযুগের শেষে তিনি আবার বিনষ্ট সূর্যবংশের প্রবর্তন করবেন। ১-৬

মরুর পুত্র প্রসুশ্রুত, প্রসুশ্রুতের পুত্র সন্ধি, সন্ধির পুত্র অমর্ষণ, অমর্ষণের পুত্র মহস্বান ও মহস্বানের পুত্র বিশ্ববাহু। বিশ্ববাহুর পুত্র প্রসেনজিৎ, তাঁর পুত্র তক্ষক আর তক্ষকের পুত্র বৃহদ্বল। আপনার পিতা অভিমন্যুর হাতে বৃহদ্বল যুদ্ধে নিহত হন। এঁরা সকলেই ইক্ষ্বাকু বংশের অতীত নৃপতি। এবার ভবিষৎ রাজাদের কথা শুনুন। ৭-৯

বৃহদ্বলের বৃহদ্রণ নামে এক পুত্র হবে। বৃহদ্রণ থেকে উরুক্রিয়, তাঁর থেকে বৎসবৃদ্ধ, বৎসবৃদ্ধ থেকে প্রতিব্যোম, প্রতিব্যোম থেকে ভানু এবং ভানু থেকে সেনাপতি দিবাক জন্মগ্রহণ করবেন। দিবাক থেকে সহদেব, সহদেব থেকে বীর বৃহদশ্ব, বৃহদশ্ব থেকে ভানুমান, ভানুমান থেকে প্রতীকাশ্ব এবং প্রতীকাশ্ব থেকে সুপ্রতীকের জন্ম হবে। সুপ্রতীক থেকে মরুদেব, তাঁর থেকে সুনক্ষত্র, তাঁর থেকে পুষ্কর, তাঁর থেকে অন্তরীক্ষ, তাঁর থেকে সুতপা এবং সুতপা থেকে অমিত্রজিতের উৎপত্তি হবে। অমিত্রজিৎ থেকে বৃহদ্রাজ, বৃহদ্রাজ থেকে বর্হি, বর্হি থেকে কৃতঞ্জয়, কৃতঞ্জয় থেকে রণঞ্জয় এবং রণঞ্জয় থেকে সঞ্জয়ের জন্ম হবে। সঞ্জয়ের পুত্র শাক্য, তাঁর পুত্র শুদ্ধোদ, শুদ্ধোদের পুত্র লাঙ্গল, লাঙ্গল থেকে প্রসেনজিৎ এবং তাঁর থেকে ক্ষুদ্রকের উৎপত্তি হবে। ক্ষুদ্রক থেকে রণক, তাঁর থেকে সুরথ এবং সুরথ থেকে সুমিত্রের জন্ম হবে। সুমিত্র পর্যন্তই বংশ স্থায়ী হবে। এঁরা সকলেই বৃহদ্বলের বংশ। ইক্ষ্বাকুবংশে সুমিত্রই শেষ রাজা। কারণ তাঁর রাজত্বকালেই কলিযুগে এই বংশ লুপ্ত হবে। ১০-১৬

ত্রয়োদশ অধ্যায়

নিমির বংশকথা

শুকদেব বললেন, মহারাজ, ইক্ষ্বাকুপুত্র নিমি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে বশিষ্ঠকে যখন ঋত্বিকপদে বরণ করলেন বশিষ্ঠ তখন বললেন, রাজা, ইন্দ্র আমাকে আগেই ঋত্বিক-পদে বরণ করেছেন। আমি ইন্দ্রের যজ্ঞ করতে যাচ্ছি ; সে যজ্ঞ শেষ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা কর। একথা শুনে নিমি চুপ করে রইলেন। বশিষ্ঠও ইন্দ্রযজ্ঞ আরম্ভ করলেন। আত্মজ্ঞানী নিমিরাজ জানতেন যে জীবন অস্থায়ী। তাই কুলগুরু ফিরে আসার আগেই তিনি অন্য ঋত্বিকদের দিয়ে যজ্ঞ আরম্ভ করে দিলেন। ইতিমধ্যে ইন্দ্রের যজ্ঞ শেষ করে বশিষ্ঠ ফিরে এসে শিষ্যের এমন অন্যায় কাজ দেখে তাঁকে অভিশাপ দিলেন—পাণ্ডিত্যাভিমানী নিমির দেহপাত হোক। কুলগুরুর অন্যায় আচরণে নিমিও তাঁকে অভিশাপ দিলেন—লোভে পড়ে আপনি ধর্মজ্ঞান হারিয়েছেন ; আপনারও দেহপাত হোক। আত্মতত্ত্বজ্ঞ নিমি এ কথা বলে দেহত্যাগ করলেন। এদিকে উর্বশীকে দেখে মিত্র ও বরুণের বীর্যস্খলন হল। তা থেকে আমার প্রপিতামহ বশিষ্ঠের জন্ম হয়।[১] ১-৬

১ উর্বশীকে দেখে মিত্র-বরুণের বীর্যস্খলন হয়ে কলসীর মধ্যে পড়ে এবং কলসীর মধ্য থেকে বশিষ্ঠ আর অগস্ত্যের উৎপত্তি হয়।

ঋত্বিক মুনিগণ নিমির দেহ গন্ধদ্রব্যের মধ্যে রক্ষা করে যজ্ঞ শেষ করলেন এবং সমাগত দেবগণের নিকট তাঁরা প্রার্থনা করলেন—আপনারা যদি প্রসন্ন ও সমর্থ হন, তবে রাজার এই দেহে আবার প্রাণ ফিরে আসুক। দেবগণ বললেন, তাই হবে। কিন্তু নিমি গন্ধদ্রব্যের মধ্যে থেকেই বলে উঠলেন, আমার যেন দেহবন্ধন আর না হয়। শ্রীহরির প্রতি যাঁদের চিত্ত সমর্পিত সেই মুনিরা দেহবিচ্ছেদের ভয়ে ব্যাকুল হয়ে কখনও দেহ-প্রাপ্তির কামনা করেন না; তাঁরা শুধু ভগবানের পাদপদ্ম ভজনা করেন। মৎস্যদের জলেই মৃত্যু হয়; তেমনি দেহেরও সর্বত্র বিনাশ ঘটে। মনুষ্যদেহ দুঃখ, শোক ও ভয়ের আধার। তাই আমি আর দেহ চাই না। ৭-১০

দেবগণ বললেন, তা হলে নিমি বিদেহ (দেহহীন) হয়েই প্রাণীদের চোখে ইচ্ছামত বাস করবেন। তারপর থেকে নিমিকে প্রাণীদের চোখের উন্মেষ ও নিমেষের প্রবর্তকরূপে দেখা যাচ্ছে। এবার মহর্ষিরা ভেবে দেখলেন যে অরাজক রাজ্যে প্রজাদের সর্বদা ভয়ের সম্ভাবনা থাকে। তাই তাঁরা নিমির দেহ মন্থন করলেন এবং তাতে এক কুমারের জন্ম হল। অসাধারণ উপায়ে জন্মের জন্যে তাঁর নাম জনক, বিদেহ নিমি থেকে উৎপত্তির জন্যে তাঁর নাম বৈদেহ আর মন্থন থেকে জন্মের জন্যে তিনি মিথিল নামেও পরিচিত। তিনি মিথিলাপুরী তৈরী করিয়ে-ছিলেন। ১১-১৪

জনকের পুত্র উদাবসু, তাঁর পুত্র নন্দিবর্ধন। নন্দিবর্ধনের পুত্র সুকেতু, সুকেতুর পুত্র দেবরাত। দেবরাতের পুত্র বৃহদ্রথ, তাঁর পুত্র মহাবীর্য; মহাবীর্যের পুত্র সুধৃতি, সুধৃতির পুত্র ধৃষ্টকেতু। তাঁর পুত্র হর্যশ্ব এবং হর্যশ্বের পুত্র মরু। মরুর পুত্র প্রতীক, তাঁর পুত্র কৃতরথ, কৃতরথের পুত্র দেবমীঢ়। দেবমীঢ়ের পুত্র বিশ্রুত, তাঁর পুত্র মহাধৃতি। মহাধৃতির পুত্র কৃতিরাত, তার পুত্র মহারোমা, মহারোমার পুত্র স্বর্ণরোমা, তাঁর পুত্র হ্রস্বরোমা, হ্রস্বরোমার পুত্র সীরধ্বজ। একবার তিনি যজ্ঞের জন্যে ভূমি চাষ করছিলেন; এমন সময় সীর অর্থাৎ লাঙ্গলের অগ্রভাগ থেকে সীতার আবির্ভাব হয়েছিল। তখন থেকেই তিনি সীরধ্বজ নামে বিখ্যাত হন। ১৫-১৮

সীরধ্বজের পুত্র কুশধ্বজ, তাঁর পুত্র ধর্মধ্বজ। ধর্মধ্বজের দুই পুত্র—কৃতধ্বজ আর মিতধ্বজ। কৃতধ্বজের পুত্র কেশিধ্বজ এবং মিতধ্বজের পুত্র খাণ্ডিক্য। কেশিধ্বজ আত্মবিদ্যায় এবং খাণ্ডিক্য কর্মতত্ত্বে পারদর্শী ছিলেন। কেশিধ্বজের ভয়ে খাণ্ডিক্য পালিয়ে যান। কেশিধ্বজের পুত্র ভানুমান ও ভানুমানের পুত্র শতদ্যুম্ন। শতদ্যুম্নের পুত্র শুচি, তাঁর পুত্র সনদ্বাজ, সনদ্বাজের পুত্র ঊর্জকেতু, তাঁর পুত্র অজ এবং অজের পুত্র পুরজিৎ। পুরজিতের পুত্র অরিষ্টনেমি, তাঁর পুত্র শ্রুতায়ু, শ্রুতায়ুর পুত্র সুপার্শ্বক, সুপার্শ্বকের পুত্র চিত্ররথ এবং চিত্ররথের পুত্র মিথিলাধিপতি ক্ষেমাধি। ক্ষেমাধির পুত্র সমরথ, তাঁর পুত্র যুযুধ, যুযুধের পুত্র সুভাষণ। সুভাষণের পুত্র শ্রুত, তাঁর পুত্র জয়, জয়ের পুত্র বিজয় এবং বিজয়ের পুত্র ঋত। ঋতের পুত্র শুনক, তাঁর পুত্র বীতহব্য, বীতহব্যের পুত্র ধৃতি। ধৃতির পুত্র বহুলাশ্ব, তাঁর পুত্র কৃতি, কৃতির পুত্র মহাবশী। মিথিলার এই নৃপতিগণ সকলেই যোগেশ্বরদের অনুগ্রহে আত্মবিদ্যায় সুপণ্ডিত ছিলেন। এঁরা গৃহী হয়েও সুখ-দুঃখের বন্ধ থেকে মুক্ত ছিলেন। ১৯-২৭

চতুর্দশ অধ্যায়

সোমবংশের কাহিনী

শুকদেব বললেন, মহারাজ, এবার চন্দ্রবংশের কথা শুনুন। ঐল প্রভৃতি পুণ্যকীর্তি নরপতিগণ এ বংশেই জন্মেছিলেন। সহস্রশীর্ষ পরমপুরুষের নাভি-হ্রদের পদ্ম থেকে ব্রহ্মা উৎপন্ন হন। ব্রহ্মার পুত্র অত্রি সর্বগুণে পিতার মতই ছিলেন। অত্রির আনন্দাশ্রু থেকে সোম নামে অমৃতময় এক পুত্র হলে ব্রহ্মা তাঁকে ব্রাহ্মণ, ওষধি এবং নক্ষত্রদের অধিপতি করেন। তিনি ত্রিভুবন জয় করে রাজসূয় যজ্ঞ আরম্ভ করেন। একবার দাম্ভিক সোম বৃহস্পতির স্ত্রী তারাকে সবলে হরণ করেছিলেন। দেবগুরু বৃহস্পতি সোমের নিকট বারবার প্রার্থনা করলেন, কিন্তু সোম গর্বে মত্ত হয়ে তারাকে ত্যাগ করলেন না। ফলে দেব-দানবের মধ্যে সংগ্রাম আরম্ভ হল। বৃহস্পতির উপর শুক্রাচার্যের বিদ্বেষভাব ছিল। তাই তিনি অসুরদের নিয়ে সোমের পক্ষ অবলম্বন করলেন। এদিকে ভগবান শঙ্কর ভূতগণের সঙ্গে গুরু অঙ্গিরার পুত্র বৃহস্পতির সহায় হলেন। ইন্দ্রও সমস্ত দেবতাদের নিয়ে বৃহস্পতির পক্ষে যোগ দিলেন। তারপর তারার জন্যে দেবতা আর অসুরদের মধ্যে ঘোর যুদ্ধ শুরু হল।[১] ইতিমধ্যে অঙ্গিরা বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মাকে সব কথা জানালে ব্রহ্মা সোমকে ভর্ৎসনা করলেন। তাতে সোম তারাকে তাঁর স্বামীর হাতে ফিরিয়ে দিলেন। বৃহস্পতি কিন্তু বুঝতে পারলেন যে তারা গর্ভবতী হয়েছেন। সুতরাং তিনি তারাকে বললেন, রে অসতি, আমার ঔরসে না হয়ে অন্যের সাহায্যে তোর গর্ভ হয়েছে। এ গর্ভ তুই ত্যাগ কর। আমি সন্তান কামনা করি ; তাই তোকে ভস্ম করব না। সে কথা শুনে তারা লজ্জায় তখনি গর্ভ থেকে স্বর্ণকান্তি এক কুমারকে ত্যাগ করলেন। সেই কুমারকে দেখে বৃহস্পতি আর সোম দুজনেই আকৃষ্ট হলেন। তখন দুজনেই 'এ ছেলে আমার, তোমার নয়'—একথা বলে ঝগড়া করতে লাগলেন। এ অবস্থায় মুনিগণ আর দেবগণ তারার কাছে প্রকৃত ঘটনা জিজ্ঞেস করলেন ; কিন্তু লজ্জায় তারা কিছুই বললেন না। মাতার অলীক লজ্জায় কুমার তখন ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, রে অসদাচারিণী, নিজের দোষ স্বীকার করছ না কেন? আমার কাছে এখনি সে কথা প্রকাশ কর। তখন ব্রহ্মা তারাকে একান্তে ডেকে তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন। তাতে তিনি ধীরে ধীরে বললেন, এ কুমার সোমের। সোম তখনই সে পুত্রকে নিয়ে গেলেন। ১-১৩

মহারাজ, ব্রহ্মা সেই বালকের প্রখর বুদ্ধি দেখে তার নাম রাখলেন বুধ। সোম সেই পুত্র পেয়ে খুব খুশী হন। বুধের ঔরসে ইলার গর্ভে পুরূরবার জন্ম হয় ; সে কথা আগেই বলা হয়েছে। দেবর্ষি নারদ ইন্দ্রের সভায় পুরূরবার রূপ, গুণ, উদারতা, শীল, ঐশ্বর্য ও বিক্রমের কথা বর্ণনা করেন। সে কথা শুনে উর্বশী কামাতুর হয়ে পুরূরবার কাছে চলে গেলেন। মিত্র ও বরুণের শাপে উর্বশী মনুষ্যভাব লাভ করেন। তখন তিনি ধৈর্য ধরে কন্দর্পের মত রূপবান পুরুষশ্রেষ্ঠ পুরূরবার কাছে গেলেন। উর্বশীকে দেখে পুরূরবার দুচোখে আনন্দের উচ্ছ্বাস বয়ে গেল, শরীর রোমাঞ্চিত হল। তিনি সুমধুর স্বরে উর্বশীকে বললেন, সুন্দরি, তোমার শুভাগমন হয়েছে তো? এখানে বস।

১ এরই অনুরূপ কাহিনী গ্রীক পুরাণে পাওয়া যায়। হেলেনকে উপলক্ষ করে গ্রীক ও ট্রয়বাসীদের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ হয়, যা 'ট্রয়ের যুদ্ধ' নামে প্রসিদ্ধ।

তোমার জন্যে কি করব? তুমি আমার সঙ্গে বিহার কর। আমাদের দুজনের বিহার দীর্ঘস্থায়ী হোক। উর্বশী বললেন, হে সুন্দর, তোমাতে কার মন ও নয়ন আসক্ত হবে না? তোমার বক্ষদেশের স্পর্শ পেলে বিহারের ইচ্ছা এতই প্রবল হয় যে কেউ সেখান থেকে সরে আসতে চাইবে না। মহারাজ, আমার এই মেষ দুটি তুমি গচ্ছিত রাখ। যতদিন তুমি এদের রক্ষা করবে, ততদিন আমি তোমার সঙ্গে বিহার করব। তুমি রমণীদের প্রশংসার পাত্র। হে বীর, আমি শুধু ঘি খেয়ে থাকব আর মৈথুনের সময় ছাড়া কখনও তোমাকে নগ্ন দেখব না। মহামতি পুরূরবা এ কথায় সম্মত হলেন। পুরূরবা বললেন, দেবি, তোমার আশ্চর্য রূপ ও ভাব দেখলেই নরলোকের মোহ হয়। তুমি স্বর্গের নারী, স্বয়ং এখানে এসেছ, কে তোমার সেবা করবে না? তারপর পুরুষশ্রেষ্ঠ পুরূরবা উর্বশীর সঙ্গে স্বর্গের চৈত্ররথ প্রভৃতি স্থানে বিহার করতে লাগলেন এবং উর্বশীও নিজেকে সে কাজে ব্যাপৃত রাখলেন। উর্বশীর শরীর পদ্মকেশর গন্ধযুক্ত। রাজা তাঁর সঙ্গে রতিক্রীড়া করতে করতে তাঁর মুখসৌরভে আকৃষ্ট হয়ে বহুকাল পরম আনন্দে কাটালেন। ১৪-২৫

এদিকে দেবরাজ ইন্দ্র উর্বশীকে না দেখে বললেন, আমার সভায় উর্বশী না থাকলে শোভা পায় না। তাই তিনি উর্বশীকে আনার জন্যে গন্ধর্বদের পাঠালেন। গন্ধর্বরা একদিন মধ্যরাত্রে অন্ধকারে এসে রাজার কাছে গচ্ছিত উর্বশীর মেষ দুটো হরণ করলেন। উর্বশী মেষ দুটোকে ছেলের মতই মনে করতেন। গন্ধর্বরা তাদের নিয়ে যাওয়ার সময় তারা আর্তস্বরে চিৎকার করতে লাগল। সেই চিৎকার শুনে উর্বশী বলতে লাগলেন—হায়! এই বীরাভিমানী, নপুংসক ও নিন্দনীয় পতির হাতে পড়ে আমার সর্বনাশ হল। এঁকে বিশ্বাস করে আমি নষ্ট হলাম। দস্যুরা আমার দুই ছেলেকেই চুরি করে নিয়ে গেল। ইনি দিনের বেলা পুরুষের মত আচরণ করেন, কিন্তু রাত্রে স্ত্রীলোকের মত ভয়ে শুয়ে থাকেন। অঙ্কুশাহত হাতীর মত উর্বশীর বাক্যবাণে পীড়িত হয়ে রাজা সে রাত্রেই খড়্গ হাতে নিয়ে বিবস্ত্র অবস্থায় ক্রোধে দস্যুদের দিকে ধেয়ে গেলেন। গন্ধর্বরা তখন মেষ দুটো ছেড়ে দিয়ে তাঁদের উজ্জ্বল প্রভায় দীপ্তিমান হলেন আর উর্বশীও দেখতে পেলেন যে তাঁর স্বামী মেষ দুটো নিয়ে নগ্ন অবস্থায় ফিরে আসছেন। পুরূরবা ফিরে এসে শয্যায় পত্নীকে দেখতে না পেয়ে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। তিনি উর্বশীর চিন্তায় শোকে অভিভূত হয়ে উন্মত্তের মত পৃথিবীময় ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। ২৬-৩২

কিছুকাল পরে একদিন তিনি কুরুক্ষেত্রে সরস্বতী নদীর তীরে পাঁচজন সখীর সঙ্গে উর্বশীকে দেখতে পেয়ে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে তাঁকে বললেন, প্রিয়ে, দাঁড়াও, দাঁড়াও। আমি এখনও তোমাকে চরম সুখ দিতে পারি নি; তাই আমাকে ছেড়ে যাওয়া তোমার উচিত নয়। এস আমরা একসঙ্গে আবার কথা বলি। দেবি, আমার এই কামনার দেহ তুমিই এতদূরে আকর্ষণ করে এনেছ। তোমার অভাবে এখানেই দেহপাত ঘটবে আর তোমার অনুগ্রহের পাত্র হতে না পারলে আমার এই দেহ নেকড়ে বাঘ[১] আর শকুনের ভোগে যাবে। উর্বশী বললেন, রাজা, তুমি মরো না। তুমি পুরুষ, ধৈর্য ধর। নেকড়েরা তোমাকে যেন না খায়। স্ত্রীদের সখ্য কখনও থাকে না, তাদের হৃদয় নেকড়ের মত। স্ত্রীলোকগণ অকরুণ, ক্রূর, ক্ষমাশূন্য। কাম্যবস্তুর জন্যে তারা সাহস প্রকাশ করে এবং সামান্য বিষয়ের লোভে বিশ্বস্ত স্বামী বা ভাইকে হত্যা করে। বিশেষত অসতী নারীরা অজ্ঞদের

১ ইন্দ্রিয়রূপী নেকড়ে।

মনে মিথ্যা বিশ্বাস জন্মিয়ে, সৌহার্দ্য বিসর্জন দিয়ে স্বেচ্ছাচার করে বেড়ায় এবং নিত্য নতুন পুরুষ কামনা করে। রাজা, সংবৎসর পরে তুমি এক রাত আমার সঙ্গে রমণ করতে পারবে, এতে তোমার আরও সন্তান হবে। অনন্তর পুরূরবা উর্বশীকে গর্ভবতী দেখে তাঁর নিজের রাজ্যে ফিরে গেলেন। এক বছর পরে আবার সেখানে গিয়ে পুরূরবা বীরপ্রসবিনী উর্বশীকে পেয়ে পরম আনন্দে তাঁর সঙ্গে এক রাত সহবাস করলেন। নিশা অবসানে রাজাকে বিচ্ছেদ-বিরহে কাতর দেখে উর্বশী বললেন, রাজা, তুমি গন্ধর্বদের স্তুতি কর, তাহলে তাঁরা আমাকে তোমার কাছে দেবেন। তখন পুরূরবা গন্ধর্বগণের স্তুতি করলে তাঁরা সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে একটি অগ্নিস্থালী[১] দান করলেন। সেই অগ্নিস্থালীকে উর্বশী মনে করে রাজা সেটি নিয়ে বনে বনে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। পরে তিনি বুঝতে পারলেন যে সেটি অগ্নিস্থালী, উর্বশী নয়। ৩৩-৪২

অবশেষে সেই স্থালীটি বনের মধ্যে রেখে তিনি বাড়ি ফিরে গেলেন; কিন্তু প্রতি রাত্রেই তিনি সেই চিন্তাই করতে লাগলেন। এভাবে ত্রেতাযুগ আরম্ভ হল এবং তাঁর মনে কর্মবোধক তিন বেদের উদ্ভব হল। পরে রাজা আবার সেই অগ্নিস্থালীর কাছে গিয়ে সেখানে দেখলেন যে একটি শমীবৃক্ষের মধ্যে এক অশ্বত্থ বৃক্ষ জন্মেছে। তিনি উর্বশীলোক কামনা করে সেই গাছ দিয়ে দুটি অরণি (যজ্ঞকাষ্ঠ) তৈরী করলেন এবং নীচের অরণিকে উর্বশী, উপরের অরণিকে আপন স্বরূপ আর মধ্যের কাষ্ঠখণ্ডকে পুত্ররূপে মন্ত্রানুসারে ধ্যান করতে করতে মন্থন করতে লাগলেন। সেই অরণি-মন্থন থেকে জাতবেদা অগ্নি উৎপন্ন হলেন। ত্রয়ী বিদ্যাবিহিত[২] আধান সংস্কারের দ্বারা সেই অগ্নি ত্রিরূপে[৩] পরিণত হন এবং রাজা তাঁকে পুত্ররূপে কল্পনা করলেন। তারপর পুরূরবা উর্বশীলোক কামনা করে সেই অগ্নি দিয়ে সর্বদেবময় যজ্ঞেশ শ্রীহরির উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করলেন। ৪৩-৪৭

মহারাজ, সত্যযুগে সকল প্রকার বাক্যের বীজস্বরূপ প্রণবই (ওংকার) বেদ এবং নারায়ণই একমাত্র দেবতা ছিলেন। তখন লৌকিকরূপে অগ্নির রূপ ও বর্ণ একই ছিল। ত্রেতাযুগে পুরূরবা থেকেই বেদ তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে প্রকাশিত হন। পুরূরবা অগ্নিরূপ প্রজ্ঞার সাহায্যে গন্ধর্বলোক লাভ করেন। ৪৮-৪৯

পঞ্চদশ অধ্যায়

ঋচীক, জমদগ্নি ও পরশুরামের কথা

শুকদেব বললেন, মহারাজ, উর্বশীর গর্ভে পুরূরবার ছটি পুত্র জন্মে। তাঁদের নাম—আয়ু, শ্রুতায়ু, সত্যায়ু, রয়, বিজয় এবং জয়। এঁদের মধ্যে শ্রুতায়ুর পুত্র বসুমান, সত্যায়ুর পুত্র শ্রুতঞ্জয়, রয়ের পুত্র এক, জয়ের পুত্র অমিত আর বিজয়ের পুত্র ভীম। ভীমের পুত্র কাঞ্চন, তাঁর পুত্র হোত্রক, হোত্রকের পুত্র জহ্নু। তিনি এক গণ্ডূষে গঙ্গাকে পান করেছিলেন। জহ্নুর পুত্র পুরু, পুরুর পুত্র বলাক, তাঁর পুত্র অজক। অজকের পুত্র কুশ। কুশের কুশাম্বু, তনয়, বসু ও কুশনাভ

১ অগ্নিস্থালী—যজ্ঞাদির উপযোগী অগ্নিরক্ষার পাত্র।
২ ত্রয়ী বিদ্যা—ঋক্‌, সাম ও যজু এই তিন বেদের বিদ্যা। ৩ ত্রিরূপ—দক্ষিণাগ্নি, গার্হপত্য ও আহবনীয়।

নামে চার পুত্র জন্মে। কুশাম্বুর পুত্র গাধি। গাধির সত্যবতী নামে এক কন্যা ছিল। একবার ঋচীক নামে এক ব্রাহ্মণ গাধির কাছে এসে সেই কন্যাকে বিবাহ করতে চাইলে গাধি তাঁকে অনুপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করে বললেন, ব্রাহ্মণ, যে ঘোড়ার এক কান শ্যামবর্ণ আর দেহের দীপ্তি চাঁদের মত, সেরকম এক হাজার ঘোড়া আমার মেয়েকে পণ দিন; কারণ আমরা কৌশিক বংশের সন্তান। সে কথা শুনে ঋচীক রাজার অভিপ্রায় বুঝতে পেরে বরুণের কাছে গেলেন এবং সেখান থেকে ঠিক সেরকম ঘোড়া এনে রাজাকে পণ দিয়ে সুন্দরী সত্যবতীকে বিবাহ করলেন। কিছুকাল পরে ঋচীকের স্ত্রী আর শাশুড়ী (সত্যবতীর মা) দুজনই পুত্র কামনা করলে তিনি স্ত্রীর জন্যে ব্রাহ্মমন্ত্রে ও শাশুড়ীর জন্যে ক্ষাত্রমন্ত্রে চরু পাক করে স্নান করতে গেলেন। ইতিমধ্যে সত্যবতীর মা ভাবলেন যে জামাই নিজের স্ত্রীর জন্যে যে চরু তৈরী করেছেন সেটা নিশ্চয়ই তাঁর চরুর চেয়ে শ্রেষ্ঠ। তাই তিনি কন্যার কাছে সেই চরু চাইলেন। সত্যবতী মাকে তাঁর চরু দিয়ে মায়ের চরু নিজে খেয়ে ফেললেন। ঋচীক মুনি ফিরে এসে একথা জানতে পেরে স্ত্রীকে বললেন; তুমি অত্যন্ত অন্যায় কাজ করেছ। তাই তোমার ছেলের স্বভাব হবে উগ্র আর হিংসাপ্রবণ; কিন্তু তোমাব ভাই হবে শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মজ্ঞ। তখন সত্যবতী মুনিকে নানা ভাবে প্রসন্ন করে বললেন, আমার এমন সন্তান যেন না হয়। ভার্গব বললেন, তবে তোমার পৌত্র তাই হবে। অবশেষে সত্যবতীর গর্ভে জমদগ্নির জন্ম হয়। এই সত্যবতীই মহাপুণ্যা লোকপাবনী কৌশিকী নদী হয়েছিলেন। ১-১১

জমদগ্নি রেণুর কন্যা রেণুকাকে বিবাহ করেন। রেণুকার গর্ভে জমদগ্নি ঋষির বসুমান প্রভৃতি পুত্রদের জন্ম হয়। তাঁদের মধ্যে কনিষ্ঠ পুত্র রাম (পরশুরাম) নামে বিখ্যাত। ভগবান বাসুদেবের অংশে তাঁর জন্ম এবং হৈহয়-বংশের তিনি নাশকর্তা। তিনি পৃথিবীকে একুশবার নিঃক্ষত্রিয় করেছিলেন। ক্ষত্রিয়জাতি রজ ও তমোগুণের প্রভাবে অহংকারী এবং ব্রাহ্মণবিরোধী হয়ে পৃথিবীর ভারস্বরূপ হয়েছিল। তাই সামান্য দোষেই তিনি তাঁদের বধ করেছিলেন। ১২-১৫

পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করলেন, ব্রাহ্মণ, অজিতেন্দ্রিয় ক্ষত্রিয়েরা ভগবান রামের কাছে এমন কি অপরাধ করেছিলেন যাতে তিনি বারবার ক্ষত্রিয়কুল বিনাশ করলেন? ১৬

শুকদেব বললেন, মহারাজ, হৈহয় অধিপতি ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ অর্জুন একবার নারায়ণের অংশজাত দত্তাত্রেয় ঋষিকে পরিচর্যা ও আরাধনা করেছিলেন। তাই ঋষির অনুগ্রহে তিনি সহস্রবাহু এবং শত্রুদের কাছে দুর্ধর্ষ বলে খ্যাত হন। তিনি অব্যাহত ইন্দ্রিয়সামর্থ্য, সম্পদ, প্রভাব, বীর্য, বল, যশ লাভ করেন এবং যোগেশ্বরও হন। তাছাড়া অণিমাদি গুণযুক্ত ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়ে তিনি বায়ুর মত অপ্রতিহত গতিতে লোকমধ্যে বিচরণ করতেন। একবার তিনি বৈজয়ন্তীমালা গলায় দিয়ে বহুস্ত্রী পরিবৃত হয়ে মদমত্ত অবস্থায় নর্মদায় জলকেলি করতে করতে হাত দিয়ে নদীর প্রবাহ রোধ করেন। রাবণ দিগ্বিজয়ে বের হয়ে তখন নর্মদা-তীরে স্বীয় শিবির স্থাপন করেন। নদীর স্রোত এভাবে রুদ্ধ হওয়ায় জলপ্রবাহ প্রতিকূলগামী হয়ে রাবণের শিবির পর্যন্ত ভাসিয়ে দিল। দশানন রাবণ অর্জুনের এই কাজ সহ্য করতে না পেরে তখনি তাঁকে আক্রমণ করলেন। অর্জুন স্ত্রীলোকদের সামনেই রাবণকে বানরের মত অনায়াসে ধরে মাহিষ্মতী নগরে আটকে রাখলেন। অবশ্য কিছুকাল পরে অবজ্ঞাভরে আবার তাঁকে ছেড়ে দিয়েছিলেন। ১৭-২২

অর্জুন একবার মৃগয়ায় বের হয়ে নির্জন বনে ঘুরতে ঘুরতে ক্রমে জমদগ্নি মুনির আশ্রমে এসে পড়লেন। মুনি তখন তাঁর কামধেনুর কল্যাণে রাজাকে ও তাঁর অমাত্য, সৈন্য, অশ্ব ইত্যাদি সকলের যথোচিতভাবে আতিথিসংকার করলেন। রাজা দেখলেন যে তাঁর সমস্ত ঐশ্বর্যের চেয়ে মুনির এই ধেনুরত্ন শ্রেষ্ঠ। তাই তিনি মুনির আতিথ্যে সন্তুষ্ট তো হলেনই না, উপরন্তু তাঁর হোমধেনুটিকে নিয়ে যেতে চাইলেন। অহঙ্কারে মত্ত রাজা তাঁর লোকদের সেই হোমধেনুটি হরণ করার আদেশ দিলেন। তারা জোর করে ক্রন্দনরতা সবৎসা গাভীটিকে মাহিষ্মতী নগরে নিয়ে গেল। ইতিমধ্যে রাজা আশ্রম ছেড়ে চলে যাবার পরেই রাম ফিরে এলেন এবং অর্জুনের দৌরাত্ম্যের কথা শুনেই আহত সাপের মত ক্রোধে ফেটে পড়লেন। তিনি তখনি বর্ম পরে পরশু, তূণ আর ধনু নিয়ে, সিংহ যেমন দলপতি হাতীর দিকে ধেয়ে ধায়, সেভাবেই রাজার পেছনে ছুটে চললেন। অর্জুন নগরে প্রবেশ করার সময় দেখলেন যে ভৃগুশ্রেষ্ঠ রাম কৃষ্ণাজিন পরে পরশু, বাণ ও ধনু নিয়ে দ্রুতবেগে ছুটে আসছেন আর তাঁর সূর্যের মত উজ্জ্বল জটাগুলো চারদিকে দুলছে। এই ব্যাপার দেখে রাজা গদা, অসি, বাণ, ঋষ্টি, শতঘ্নী ও শক্তি অস্ত্রে সজ্জিত এবং হাতী, ঘোড়া, রথ আর পদাতিকের সমাবেশে সতের অক্ষৌহিণী সৈন্য পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু রাম একাকী সমস্তই বিনাশ করলেন। শত্রুসৈন্য নাশক রাম বায়ুবেগে যেখানেই পরশুর আঘাত করতে লাগলেন, সেখানেই বিপক্ষ সৈন্যদের বাহু, উরু ও মস্তক ছিন্ন হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল; তাদের অশ্ব, সারথি সমস্তই বিনষ্ট হল। হৈহয়রাজ অর্জুন যখন দেখলেন যে যুদ্ধক্ষেত্র রক্তে ভেসে যাচ্ছে এবং রামের পরশু আর বাণের আঘাতে তাঁর সৈন্যদের বর্ম, ধ্বজ, ধনু, বাণ সবকিছু ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে প্রায় সব সৈন্যই যুদ্ধে নিহত হতে চলেছে, তখন তিনি ক্রোধে নিজেই যুদ্ধে নাবলেন এবং রামকে লক্ষ করে তাঁর সব হাতে পাঁচশ ধনু নিয়ে সেগুলোতে পাঁচশ সুতীক্ষ্ণ তীর জুড়লেন। কিন্তু অস্ত্রবিশারদ রাম তার একমাত্র ধনুতে শর-যোজনা করে অর্জুনের সমস্ত ধনুই কেটে ফেললেন। অর্জুন তখন যুদ্ধের জন্যে সব হাতে পাহাড় ও গাছ নিয়ে অতি দ্রুত রামের দিকে ছুটে গেলেন। এবার রাম সাপের ফণার মত তীক্ষ্ণ কুঠারাঘাতে আগে অর্জুনের সব হাতগুলি এবং শেষে তাঁর পর্বত-চূড়ার মত মাথাটাও কেটে ফেললেন। পিতার মৃত্যু দেখে তাঁর দশ হাজার পুত্রও ভয়ে সেখান থেকে পালিয়ে গেলেন। ২৩-৩৫

রাম সন্তানতুল্য ও ক্লিষ্ট হোমধেনুটি নিয়ে আশ্রমে ফিরে এলেন। পিতাকে সেটি দিয়ে তাঁকে এবং আর ভাইদের কাছে সব কথা খুলে বললেন। সে কথা শুনে জমদগ্নি বললেন, রাম, তুমি পাপের কাজ করেছ; কারণ, রাজা ছিলেন সর্বদেব-স্বরূপ। তুমি তাঁকেই হত্যা করেছ। আমরা ব্রাহ্মণ; ক্ষমাগুণে আমরা পূজ্য হয়েছি। স্বয়ং ব্রহ্মা ক্ষমাগুণেই লোকগুরু হয়ে পারমেষ্ঠ্য পদ পেয়েছেন। বৎস, সূর্যপ্রভা তুল্য ব্রহ্মশ্রী ক্ষমাতেই শোভা পায়। ক্ষমাশীল পুরুষের প্রতি শ্রীহরি সহজেই সন্তুষ্ট হন। অভিষিক্ত ক্ষত্রিয়রাজাকে বধ করলে যে দোষ হয় তা ব্রহ্মবধের চেয়েও বেশী। অতএব এই পাপ থেকে মুক্তির জন্যে তুমি ভগবানে চিত্ত সমর্পণ করে তীর্থ সেবা কর।[১] ৩৬-৪১

১ এই প্রসঙ্গে গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ের ১৩শ ও ১৪শ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

ষোড়শ অধ্যায়

বিশ্বামিত্রের বংশকথা

শুকদেব বললেন, কুরুনন্দন, পিতার উপদেশে রাম 'যে আজ্ঞা' বলে এক বছর তীর্থে তীর্থে ঘুরে আবার আশ্রমে ফিরে এলেন। জমদগ্নির স্ত্রী রেণুকা একদিন গঙ্গা থেকে জল আনতে গিয়ে দেখলেন যে গন্ধর্বরাজ পদ্মমালা পরে অপ্সরাদের নিয়ে সেখানে কেলি করছেন। ক্রীড়াসক্ত গন্ধর্বরাজকে দেখে তাঁর কিছুটা চিত্ত-চাঞ্চল্য হল; তিনি তখন তার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। এদিকে হোমের সময় যে পার হয়ে যাচ্ছে সে কথা তিনি ভুলে গেলেন। পরে যখন বুঝতে পারলেন যে সময় পার হয়ে গিয়েছে, তখন তিনি মুনির অভিশাপের ভয়ে নিজ জায়গায় ফিরে এসে কলসটি মুনির সামনে রেখে হাতজোড় করে দাঁড়ালেন। মুনি তাঁর স্ত্রীর ব্যভিচার বুঝতে পেরে রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললেন, পুত্রগণ, এই পাপীয়সীকে তোমরা বধ কর। রাম ছাড়া তাঁর কোন পুত্রই এ কাজে রাজি হলেন না। রাম পিতার আদেশে তাঁর মা এবং ভাইদের মুণ্ডচ্ছেদ করলেন। জমদগ্নি এতে খুশী হয়ে রামকে বর দিতে চাইলেন। রাম তাঁর পিতার সমাধি ও তপস্যার প্রভাব জানতেন। তাই বললেন, যাদের আমি হত্যা করেছি, তারা আবার প্রাণ ফিরে পাক; এদের বধ করার কথা কখনও যেন আমার মনে আর স্থান না পায়। জমদগ্নির বরে মৃতগণ তৎক্ষণাৎ সুস্থ ও স্বাভাবিকভাবে উঠে দাঁড়াল; তা দেখে মনে হল যেন তারা সদ্য ঘুম থেকে উঠেছে। রাম তাঁর পিতার তপোবীর্য বিশেষভাবে জানতেন; সে কথা জেনেই তিনি আপনজনদের বধ করেন। ১-৮

মহারাজ, রামের বিক্রমে পরাজিত হয়ে অর্জুনের পুত্রগণ তাদের পিতার মৃত্যু-কথা স্মরণ করে কোথাও শান্তি পায় নি। রাম তাঁর ভাইদের নিয়ে একদিন আশ্রম ছেড়ে বনে গেলেন। সেই সুযোগে অর্জুনের পুত্রেরা প্রতিশোধ গ্রহণের কথা চিন্তা করে আশ্রমে এসে ঢুকল। জমদগ্নি তখন অগ্নিগৃহে বসে ভগবানের ধ্যান করছিলেন। সেই পাপাত্মারা তখনি তাঁকে সেই অবস্থায় বধ করল। রামের মা ব্যাকুল হয়ে স্বামীর প্রাণভিক্ষা চেয়েছিলেন, কিন্তু সেই নিষ্ঠুর ক্ষত্রিয়েরা জোর করে মুনির মুণ্ডচ্ছেদ করে নিয়ে গেল। রেণুকা শোকে অধীর হয়ে নিজের দেহে আঘাত করে 'রাম, রাম, বাবা, বাবা' বলে চীৎকার করে কাঁদতে লাগলেন। দূর থেকে সেই আর্তরব শুনেই রাম ভাইদের নিয়ে সেখানে ফিরে এসে দেখলেন যে তাঁদের পিতা নিহত হয়েছেন। তাঁরা দুঃখে, শোকে অভিভূত হয়ে ধৈর্য হারিয়ে 'পিতা, আমাদের ছেড়ে আপনি স্বর্গে চলে গেলেন' বলে বিলাপ করতে লাগলেন। রাম পিতার মৃতদেহ ভাইদের সামনে রেখে হাতে পরশু নিয়ে ক্ষত্রিয়কুল বিনাশের সংকল্প করলেন। ৯-১৬

মহারাজ, ব্রহ্মঘাতী অর্জুনপুত্রদের শাসনে মাহিষ্মতী পুরী শ্রীহীন হয়েছিল। রাম সেখানে গিয়ে তাদের ছিন্নমুণ্ডের এক প্রকাণ্ড পাহাড় সাজালেন এবং তাদের রক্ত দিয়ে ভয়ংকর এক নদী তৈরী করলেন। ব্রহ্মদ্বেষীদের কাছে সেই নদী খুবই ভয়ের কারণ ছিল। এভাবে ক্ষত্রিয়জাতি কোন অন্যায় করলেই তিনি তাঁর পিতৃবধকে উপলক্ষ করে একুশবার এই পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করে কুরুক্ষেত্রের সমন্তপঞ্চকে নয়টি রক্তের হ্রদ সৃষ্টি করেছিলেন। ১৭-১৯

রাম নিহত পিতার মস্তক মৃতদেহের সঙ্গে জুড়ে সেই দেহ কুশের উপর

রাখলেন এবং নানা যজ্ঞে সর্বদেবময় আত্মাকে অর্চনা করলেন। সেই যজ্ঞে তিনি হোতাকে পূর্বদিক, ব্রহ্মাকে দক্ষিণদিক, অধ্বর্যুকে পশ্চিমদিক, উদ্গাতাকে উত্তরদিক, কশ্যপকে মধ্যদেশ, উপদ্রষ্টাকে আর্যাবর্তভূমি এবং অন্যান্য ঋত্বিকদের অপ্রধান দিক-সকল দক্ষিণা দেন। সদস্যগণও যথাযোগ্য ভূমি দক্ষিণা পান। তারপর মহানদী সরস্বতীতে অবভৃথ-স্নান (যজ্ঞান্ত স্নান) করে সব পাপ ধুয়ে তিনি মেঘমুক্ত সূর্যের মত বিরাজ করতে লাগলেন। রামের পূজায় স্মৃতিরূপ আপন দেহ পেয়ে জমদগ্নি মুনি সপ্তর্ষিমণ্ডলে সপ্তম ঋষি হয়েছেন। জমদগ্ন রামও আগামী মন্বন্তরে বেদপ্রবর্তক হয়ে সপ্তর্ষিমণ্ডলে বিরাজ করবেন। তিনি এখন হিংসা ত্যাগ করে প্রশান্তচিত্তে মহেন্দ্র পর্বতে বাস করছেন। সিদ্ধ, গন্ধর্ব আর চারণগণ তাঁর বিচিত্র মহিমা কীর্তন করছেন। বিশ্বাত্মা হরি এভাবে ভৃগুকুলে অবতীর্ণ হয়ে বহুবার ক্ষত্রিয় বধ করে পৃথিবীকে ভারমুক্ত করেন। ২০-২৭

মহারাজ, প্রদীপ্ত অগ্নির মত মহাতেজস্বী বিশ্বামিত্র গাধির পুত্র। তপস্যার প্রভাবে তিনি ক্ষত্রিয় থেকে ব্রাহ্মণ হন। তাঁর একশ পুত্র ছিলেন। তাঁদের মধ্যে মধ্যম পুত্রের নাম মধুচ্ছন্দা হলেও আর সব পুত্ররাও সে নামে পরিচিত ছিলেন। ভৃগুবংশীয় অজীগর্তের পুত্র শুনঃশেফ; বিশ্বামিত্র তাঁকে সন্তানরূপে গ্রহণ করে তাঁর নাম দেন দেবরাত এবং তাঁর নিজের পুত্রদের বলেন, তোমরা একে জ্যেষ্ঠ বলে গণ্য করবে। অজীগর্ত শুনঃশেফকে রাজা হরিশ্চন্দ্রের যজ্ঞে পশুরূপে বিক্রয় করেন। কিন্তু তিনি প্রজাপতি প্রভৃতি দেবগণের স্তুতি করে পাশবন্ধন থেকে মুক্ত হন। তিনি ভৃগুবংশের হলেও দেবযজ্ঞে 'রাত' অর্থাৎ প্রদত্ত হয়েছিলেন; তাই গাধিবংশে তিনি 'দেবরাত' নামেই খ্যাত ছিলেন। মধুচ্ছন্দা নামে বিশ্বামিত্রের উনপঞ্চাশটি পুত্র দেবরাতের জ্যেষ্ঠত্ব স্বীকার করলেন না। তাই বিশ্বামিত্র ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁদের অভিশাপ দিলেন—ওরে দুর্জনপুত্ররা, তোরা ম্লেচ্ছ হয়ে যা। তখন মধ্যমপুত্র মধুচ্ছন্দা সবচেয়ে ছোট ভাইয়ের সঙ্গে একযোগে বললেন, পিতা, আপনি যাকে জ্যেষ্ঠ বা কনিষ্ঠ মনে করেন আমরা তাই মেনে নেব। তাঁরা মন্ত্রদ্রষ্টা শুনঃশেফকে জ্যেষ্ঠরূপে স্বীকার করে নিয়ে বললেন, আমরা সকলেই আপনার কনিষ্ঠ হলাম। বিশ্বামিত্র এতে সন্তুষ্ট হয়ে পুত্রদের বললেন, তোমরা আমার সম্মান রেখে আমাকে পুত্রবান করেছ। অতএব তোমরাও পুত্রবান হবে। ওহে কৌশিকগণ, দেবরাত আমার পুত্র হয়েছে, তাই তোমরাও কৌশিক-গোত্রীয় হলে। তোমরা এঁর অনুগত হও। বিশ্বামিত্রের অষ্টক, হারীত, জয়, ক্রতুমান প্রভৃতি আরও অনেক পুত্র ছিল। এভাবে বিশ্বামিত্রের পুত্রদের মধ্যে কেউ অভিশাপগ্রস্ত, কেউ অনুগৃহীত এবং কেউ পুত্ররূপে কল্পিত হয়েছেন। তাই কৌশিক-গোত্র নানা প্রকার ও প্রবরে বিভক্ত হয়েছে। দেবরাতকে জ্যেষ্ঠ করাতেই এরূপ হয়েছে। ২৮-৩৭

সপ্তদশ অধ্যায়

ক্ষত্রবৃদ্ধদের বংশকথা

শুকদেব বলতে লাগলেন, মহারাজ, পুরূরবার আয়ু নামে যে পুত্র ছিলেন তাঁর নহুষ, ক্ষত্রবৃদ্ধ, রজি, রম্ভ ও অনেনা এই নামে পাঁচটি পুত্র জন্মেছিল। এখন ক্ষত্রবৃদ্ধের বংশকথা শুনুন। ক্ষত্রবৃদ্ধের পুত্র সুহোত্র; সুহোত্রের তিন পুত্র—

কাশ্য, কুশো ও গৃৎসমদ। গৃৎসমদের পুত্র শুনক। শুনকের পুত্র শৌনক শ্রেষ্ঠ ঋগ্‌বেদজ্ঞ ছিলেন। কাশ্যের পুত্র কাশি, কাশির পুত্র রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রের পুত্র দীর্ঘতমা। দীর্ঘতমার পুত্র ধন্বন্তরি আয়ুর্বেদের প্রবর্তক। তিনি বাসুদেবের অংশস্বরূপ, যজ্ঞের ভাগ তাঁর প্রাপ্য। তাঁকে স্মরণ করলেই সকল রোগের উপশম হয়। তাঁর পুত্র কেতুমান, তাঁর পুত্র ভীমরথ। তাঁর পুত্র দিবোদাস, তাঁর পুত্র দ্যুমান। তিনি প্রতর্দন, শত্রুজিৎ, বৎস, ঋতধ্বজ ও কুবলয়াশ্ব নামেও খ্যাত। তাঁর অলর্ক প্রভৃতি অনেক সন্তান ছিল। একমাত্র অলর্কই ছেষট্টি হাজার বছর রাজত্ব করেছিলেন; আর কোন রাজা অক্ষুণ্ণ যৌবন নিয়ে সে কাজ করতে পারেন নি। অলর্কের পুত্র সন্ততি, তাঁর পুত্র সুনীথ, সুনীথের পুত্র নিকেতন। নিকেতনের পুত্র ধর্মকেতু, তাঁর পুত্র সত্যকেতু, সত্যকেতুর পুত্র ধৃষ্টকেতু, ধৃষ্টকেতুর পুত্র রাজা সুকুমার। সুকুমারের পুত্র বীতিহোত্র, তাঁর পুত্র ভর্গ, তাঁর পুত্র ভার্গভূমি। এঁরা সকলেই কাশির পুত্র-পৌত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন এবং সকলেই ক্ষত্রবৃদ্ধ বংশগত। রম্ভের পুত্র রভস, তাঁর পুত্র গম্ভীর, তাঁর পুত্র অক্রিয়; অক্রিয়ের সন্তান ব্রহ্মজ্ঞ ছিলেন। তাই তাঁর বংশ-বিস্তৃতি হয় নি। এবার অনেনার বংশকথা শুনুন। অনেনার পুত্র শুদ্ধ, তাঁর পুত্র শুচি; শুচির পুত্র ধর্মসারথি চিত্রকৃ। চিত্রকৃর পুত্র শান্তরজা। তিনি কর্মমার্গ থেকে নিবৃত্ত এবং আত্মজ্ঞ ছিলেন। রজির অতুল পরাক্রমশালী পাঁচশত পুত্র ছিলেন। একবার মহারাজ রজি দেবগণের প্রার্থনায় দৈত্যদের বধ করে ইন্দ্রকে স্বর্গরাজ্য নিষ্কণ্টক করে দেন। কিন্তু ইন্দ্র তাঁর চরণ ধরে স্বর্গরাজ্য আবার রজির হাতে তুলে দিয়ে প্রহ্লাদ প্রভৃতি শত্রুদের ভয়ে তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করলেন। রজির মৃত্যু হলে ইন্দ্র তাঁর রাজ্য ফিরে চাইলেন; কিন্তু রজির পুত্ররা রাজ্য ফিরিয়ে দিতে রাজি হলেন না, এমন কি ইন্দ্রের যজ্ঞভাগও তাঁরাই ভোগ করতে লাগলেন। অগত্যা দেবগুরু বৃহস্পতি রজিপুত্রদের বুদ্ধিলোপের উদ্দেশ্যে আভিচারিক হোম করতে লাগলেন। ফলে তাঁরা সৎপথ থেকে বিচ্যুত হলে ইন্দ্রও তাঁদের হত্যা করলেন; তাঁদের মধ্যে একজনও বেঁচে রইলেন না। ১-১৫

মহারাজ, ক্ষত্রবৃদ্ধের পৌত্র কুশ, তাঁর পুত্র প্রতি। প্রতির পুত্র সঞ্জয়, তাঁর পুত্র জয়, জয়ের পুত্র হর্যবল। হর্যবলের পুত্র সহদেব, তাঁর পুত্র হীন। হীনের পুত্র জয়সেন, তাঁর পুত্র সংকৃতি এবং তাঁর পুত্র ক্ষত্রধর্মনিষ্ঠ মহারথ জয়। এই সকল রাজাই ক্ষত্রবৃদ্ধের বংশজাত। এবার নহুষ বংশের কথা শুনুন। ১৬-১৭

অষ্টাদশ অধ্যায়

যযাতির উপাখ্যান

শুকদেব বললেন, মহারাজ, দেহধারী মানুষের ছয় ইন্দ্রিয়ের মত রাজা নহুষের যতি, যযাতি, সংযাতি, আয়তি, বিয়তি আর কৃতি নামে ছটি পুত্র ছিল। নহুষ তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র যতিকে রাজ্য দেন; কিন্তু রাজ্যপালনের অনর্থ বুঝতে পেরে যতি রাজ্যভার গ্রহণে অনিচ্ছা জানালেন। কারণ তিনি জানতেন যে রাজ্যে প্রবেশ করলে অর্থাৎ রাজা হলে পুরুষের আত্মজ্ঞান লোপ পায়। স্বর্গরাজ্যের অধিপতি

হয়ে নহুষ একবার ইন্দ্রাণীর[১] প্রতি ধৃষ্টতা প্রকাশ করেছিলেন ; তাই অগস্ত্য প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ তাঁকে স্বর্গচ্যুত করে অজগর করেন। অতএব যযাতি রাজা হলেন। রাজা হয়ে যযাতি তাঁর কনিষ্ঠ চার ভাইকে চারদিক শাসন করতে আদেশ দেন এবং নিজে শুক্রাচার্য ও বৃষপর্বার কন্যাদের[২] বিবাহ করে পৃথিবী পালন করতে লাগলেন। ১-৪

পরীক্ষিৎ জানতে চাইলেন, আচ্ছা, ভগবান শুক্রাচার্য ব্রহ্মর্ষি আর যযাতি ক্ষত্রিয়। ব্রাহ্মণ আর ক্ষত্রিয়ের মধ্যে এই প্রতিলোম (বিরুদ্ধ) বিবাহ কেমন করে সম্ভব হল ? ৫

শুকদেব বললেন, একদিন দৈত্যরাজ বৃষপর্বার কন্যা শর্মিষ্ঠা হাজার সখী নিয়ে গুরু শুক্রাচার্যের কন্যা দেবযানীর সঙ্গে ফল-ফুলে শোভিত পুরোদ্যানে ভ্রমর-গুঞ্জন-মুখর এক পদ্মসরোবরের তীরে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। তখন পদ্মাক্ষি কন্যাগণ সরোবরের কাছে এসে আপন আপন অঙ্গবাস খুলে রেখে, জলে নেমে পরস্পর জল ছিটিয়ে খেলা করতে লাগলেন। এমন সময় ভগবান গিরিশ পার্বতীর সঙ্গে বৃষে চড়ে সেই পথে যাচ্ছিলেন। কন্যারা তাঁদের দেখে লজ্জায় তাড়াতাড়ি জল থেকে তীরে উঠে কাপড় পরে ফেললেন। কিন্তু তাড়াহুড়োর মধ্যে শর্মিষ্ঠা ভুলে দেবযানীর শাড়িটা নিজের মনে করে পরে ফেল্লেন। এতে দেবযানী খুব রাগ করে বললেন, ওহে, এই দাসীটার অন্যায় কাজ তোমরা দেখ ; একটা কুকুর যেমন যজ্ঞের হবি খায়, তেমনি এই দাসীটা আমার কাপড় পরেছে। যাঁরা তপস্যার প্রভাবে এই জগৎ সৃষ্টি করেছেন, যাঁরা পরমপুরুষের মুখস্বরূপ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ, যাঁরা ব্রহ্মতত্ত্ব অবগত আছেন, যাঁরা মঙ্গলময় বেদমার্গের প্রদর্শক, লোকপালশ্রেষ্ঠ দেবগণ, এমন কি বিশ্বাত্মা শ্রীহরিও যাঁদের বন্দনা করেন, সেইব্রাহ্মণগণ সকলেরই পূজনীয়, তার মধ্যে আমাদের আবার ভৃগুবংশে জন্ম। এই দাসীর পিতা অসুর বৃষপর্বা আমাদের শিষ্য। তাহলেও এই অসতী শূদ্রের বেদধারণের মতই আমাদের পরিধেয় বস্ত্র পরেছে। গুরুকন্যা দেবযানীর ভর্ৎসনায় শর্মিষ্ঠা আহত সাপের মত ক্রোধে ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলে নিজের ঠোঁট কামড়াতে কামড়াতে বললেন, রে ভিক্ষুকি, তুই কিরূপ নিচু ব্যবহার করছিস তা জানিস না ; তাই এত দম্ভ করছিস। কাকের মত তোরা কি আমাদের গৃহের প্রতীক্ষায় থাকিস না ? শর্মিষ্ঠা এভাবে ক্রোধে কর্কশ ভাষায় গুরুকন্যাকে গালাগালি দিয়ে তাঁর কাপড় কেড়ে নিয়ে তাঁকে এক কুয়োর মধ্যে ফেলে দিলেন। ৬-১৭

শর্মিষ্ঠা তাঁর বাড়িতে ফিরে গেলেন। এদিকে রাজা যযাতি মৃগয়ায় বের হয়ে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ সেখানে এসে পড়লেন এবং তৃষ্ণার্ত হয়ে জলের জন্যে কুয়োর কাছে যেতেই দেবযানীকে দেখতে পেলেন। তাঁর মনে দয়া হল। তিনি তখনি তাঁর গায়ের চাদরটি বিবস্ত্রা দেবযানীকে পরতে দিলেন এবং নিজের হাতে দেবযানীর হাত ধরে তাঁকে কুয়ো থেকে তুলে আনলেন। শুক্রাচার্যকন্যা এভাবে উদ্ধার পেয়ে প্রেমার্ত বাক্যে যযাতিকে বললেন, ওহে শত্রুপুরঞ্জয়ী রাজা, আপনি আমার পাণি গ্রহণ করেছেন ; অতএব আপনি আমাকে গ্রহণ করেছেন। প্রার্থনা করি, যে হাত আপনি একবার ধরেছেন সে হাত আর কেউ যেন গ্রহণ না করে। হে বীর, আমি কুয়োয় পড়েছিলাম, এ সময় আপনার দেখা পেলাম। এটা দৈবের ঘটনা, মানুষের নয়। আমাদের এ সম্বন্ধ নিশ্চয়ই বিধাতার নির্বন্ধ, এতে মানুষের কোন হাত নেই। বহুকাল আগে বৃহস্পতিপুত্র কচকে আমি শাপ দিয়েছিলাম। কচও

১ শচীদেবী। ২ দেবযানী ও শর্মিষ্ঠা।

আমাকে অভিসম্পাত দিলেন যে আমার ভাগ্যে ব্রাহ্মণ স্বামী লাভ ঘটবে না। এরূপ অশাস্ত্রীয় বিবাহ অবাঞ্ছিত হলেও রাজা যযাতি মনে করলেন যে দৈবযোগে এই ব্যাপার ঘটেছে এবং দেবযানীর প্রতি আপন চিত্তের অনুরাগ বুঝতে পেরে তাঁর কথায় সম্মত হলেন। ১৮-২৩

যযাতি চলে গেলে দেবযানী কাঁদতে কাঁদতে তাঁর পিতার কাছে শর্মিষ্ঠা যা কারছিলেন সবই বললেন। শুক্রাচার্য সব কথা শুনে অত্যন্ত দুঃখ পেলেন এবং পৌরোহিত্যবৃত্তির নিন্দা আর উঞ্ছবৃত্তির প্রশংসা করতে করতে দেবযানীকে নিয়ে নগর থেকে বের হয়ে গেলেন। বৃষপর্বা বুঝতে পারলেন যে গুরু শুক্রাচার্য অসুরদের পরাজয়ের উদ্দেশ্যে তাঁদের শত্রু দেবতাদের সাহায্য করার অভিপ্রায়ে যাচ্ছেন; অতএব তিনি কালবিলম্ব না করে পথেই শুক্রাচার্যের পায়ে মাথা রেখে তাঁকে প্রসন্ন করার চেষ্টা করতে লাগলেন। শুক্রাচার্যের ক্রোধ কণার্ধও স্থায়ী হল না। শিষ্য বৃষপর্বাকে তিনি বললেন, রাজা, আমার কন্যাকে আমি কোনমতেই ত্যাগ করতে পারি না। সুতরাং তুমি তার মনের ইচ্ছা পূর্ণ কর। বৃষপর্বা সে কথায় রাজি হলে দেবযানী বললেন, পিতা আমাকে সমর্পণ করেছেন; আমি যেখানে যাব শর্মিষ্ঠাকেও তার সখীদের নিয়ে আমার পেছন পেছন যেতে হবে। বৃষপর্বা ভাবলেন যে শুক্রাচার্য চলে গেলে তাঁদেরই বিপদ আর এখানে থাকলে তাঁকে দিয়ে গুরুতর কার্যসিদ্ধির সম্ভাবনা। তাই তিনি শর্মিষ্ঠাকে সহচরীদের সহ দেবযানীর অনুগামী হতে দিলেন। শর্মিষ্ঠাও হাজার সখী নিয়ে দাসীর মত দেবযানীর সেবা করতে লাগলেন। ২৪-২৯

শুক্রাচার্য শর্মিষ্ঠার সঙ্গে নিজের কন্যা দেবযানীকে যযাতির হাতে সম্প্রদান করে বললেন, মহারাজ, তুমি, শর্মিষ্ঠাকে কখনও শয্যা-সঙ্গিনী করো না। কিছু কাল পরে দেবযানীকে পুত্রবতী হতে দেখে নিজের ঋতুকাল হলে শর্মিষ্ঠা তাঁর সখীর স্বামী যযাতির কাছে পুত্র উৎপাদনের জন্যে প্রার্থনা জানালেন। রাজকন্যা শর্মিষ্ঠা এভাবে পুত্রের প্রার্থনা জানালে, শুক্রাচার্যের নিষেধবাক্য স্মরণ হলেও, এ কাজ ধর্মসঙ্গত মনে করে দৈবপ্রাপ্তিজ্ঞানে তিনি শর্মিষ্ঠার সঙ্গে সহবাসে রাজি হলেন। দেবযানী যদু ও তুর্বসু নামে দুই পুত্র এবং শর্মিষ্ঠা দ্রুহ্যু, অনু আর পুরু নামে তিন পুত্র প্রসব করেছিলেন। নিজের স্বামীর ঔরসে শর্মিষ্ঠার সন্তান হওয়ার কথা জানতে পেরে অভিমানে ক্রোধে আত্মবিস্মৃত হয়ে দেবযানী পিত্রালয়ে চলে গেলেন। কামার্ত যযাতি নানাভাবে অনুনয়-বিনয় করে পত্নীকে সান্ত্বনা দিতে দিতে তার পিছনে যেতে লাগলেন। কিন্তু তার পায়ে ধরেও তাকে তুষ্ট করতে পারলেন না। এই ঘটনায় শুক্রাচার্য অত্যন্ত রেগে যযাতিকে বললেন, ওরে কামুক মিথ্যাচারী, মনুষ্যদেহ বিরূপকারী জরা তোকে আক্রমণ করুক। যযাতি বললেন, ব্রহ্মন্, আপনার কন্যাকে উপভোগ করে এখনও আমার কাম পরিতৃপ্ত হয় নি। শুক্রাচার্য বললেন, রাজা, তোমার জরা কেউ যদি নিতে চায়, তবে তার যৌবনের সঙ্গে তুমি ইচ্ছামত তোমার জরা বিনিময় করতে পারবে। ৩০-৩৭

যযাতি জরা সম্বন্ধে এরূপ ব্যবস্থা লাভ করে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র যদুকে বললেন, বৎস, তুমি আমার জরা নিয়ে তোমার যৌবন আমাকে দাও। তোমার মাতামহ আমাকে জরাগ্রস্ত করেছেন; অথচ আমার বিষয়ভোগের তৃষ্ণা এখনও মেটে নি। তাই তোমার যৌবন লাভ করে আরও কিছুকাল সুখভোগ করতে চাই। যদু বললেন, আমি আপনার জরা নিয়ে থাকতে চাই না। কারণ, মানুষ বিষয়-সুখে

ভোগ না করলে বিষয়-বৈরাগ্য লাভ করতে পারে না। এর পর যযাতি তুর্বসু, দ্রুহ্যু আর অনুকেও সেভাবে জরা গ্রহণের জন্যে অনুরোধ করলেন। কিন্তু তারা কেউ পিতার অনুরোধ রক্ষা করে নিজেদের যৌবনের বিনিময়ে পিতার জরা নিতে চাইল না। কারণ অধার্মিক পুত্রগণ অনিত্য সম্পদকেই নিত্য বলে মনে করেছিল। যযাতি এবার গুণাধিক কনিষ্ঠপুত্র পুরুকে বললেন, বৎস, তোমার বড় ভাইদের মত তুমি আমাকে প্রত্যাখ্যান করো না। পুরু বললেন, মহারাজ, যে পিতার অনুগ্রহে মানুষ পরমার্থ লাভ করে, যিনি জন্মদাতা সেই পিতার প্রত্যুপকার কেউ কি করতে পারে? পিতার অভিপ্রায় অনুসারে যে পুত্র কাজ করে সে উত্তম, পিতার আদেশে যে কাজ করে সে মধ্যম, অশ্রদ্ধার সঙ্গে যে পিতার আদেশ পালন করে সে অধম, আর যে পিতার আদেশ মোটেও রক্ষা করে না সে পিতার মলের তুল্য। একথা বলে পুরু পিতার জরা গ্রহণ করলেন এবং যযাতিও কনিষ্ঠ পুত্রের যৌবন লাভ করে ইচ্ছামত কামোপভোগ করতে লাগলেন। ৩৮-৪৫

যযাতি সপ্তদ্বীপের একচ্ছত্র অধিপতি হয়ে তাঁর পিতার মত সুষ্ঠুভাবে প্রজা পালন করতে লাগলেন এবং অক্ষুণ্ণ ইন্দ্রিয়শক্তি নিয়ে হৃষ্টচিত্তে বিষয়ভোগে রত হলেন। দেবযানীও কায়মনোবাক্যে বিবিধ ভোগ্যবস্তু দিয়ে প্রতিদিন প্রিয়তম পতির মন তুষ্ট করে চলতে লাগলেন। যযাতি বহু যজ্ঞ আর দক্ষিণা দিয়ে সর্বদেব ও বেদময় হরিকে অর্চনা করেন। আকাশে মেঘের মত এই বিশ্বজগৎ যাঁর মধ্যে বিরচিত; স্বপ্ন, মায়া ও মনোরথের মত কখনও নানারূপে প্রকাশিত বা অপ্রকাশিত, সেই সর্বান্তর্যামী নারায়ণকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা করে যযাতি তাঁরই অর্চনা করেছিলেন। সার্বভৌম রাজা যযাতি এভাবে মন ও পঞ্চ ইন্দ্রিয় সহযোগে হাজার বছর বিষয়সুখ ভোগ করেও তৃপ্তিবোধ করেন নি। ৪৬-৫১

ঊনবিংশ অধ্যায়

যযাতির বৈরাগ্য

শুকদেব বলতে লাগলেন, মহারাজ, স্ত্রৈণ যযাতি এভাবে বিষয়ভোগ করতে করতে অবশেষে আত্মার অবনতি বুঝতে পারলেন। তিনি বিরাগী হয়ে একদিন তাঁর প্রিয়াকে এই ইতিহাস বর্ণনা করলেন, ভৃগুনন্দিনি, আমার মত বিষয়াসক্ত ব্যক্তির আচরণে বনবাসী জ্ঞানিগণ যে দুঃখ পান সেরূপ এক কাহিনী বলছি, শোন। একবার একটি ছাগ বনের মধ্যে তার কাম্যবস্তু খুঁজতে খুঁজতে এক ছাগীকে দেখতে পেল। ছাগীটি আপন কর্মফলে একটা কুয়োর মধ্যে পড়ে গেল। ছাগটি অত্যন্ত কামুক ছিল। ছাগীটাকে উদ্ধারের উপায় চিন্তা করে সে নিজের শিংয়ের সাহায্যে কুয়োর পাড়ের মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে ছাগীটিকে বাইরে আসার পথ তৈরী করে দিল। যুবতী ছাগী কুয়ো থেকে উঠে সেই ছাগটিকে বরণ করে নিল। তা দেখে আরও কতকগুলো ছাগী সেই হৃষ্টপুষ্ট, শ্মশ্রুযুক্ত, রতিনিপুণ ছাগের প্রতি আসক্ত হল এবং আপন আপন কান্তরূপে তাকে পেতে চাইল। ছাগটি কামার্ত হয়ে একাই বহু ছাগীর কামতৃপ্তি সাধন করতে করতে নিজের আত্মাকে বিস্মৃত হয়ে গেল। ১-৬

এদিকে কুয়ো থেকে যে ছাগী উঠে এসেছিল, সে দেখতে পেল যে তার চেয়ে প্রিয় অন্যান্য ছাগীর সঙ্গে সেই ছাগ বিহার করছে। ছাগের এ কাজ সে সহ্য করতে না পেরে মিত্রবেশী ছাগকে ত্যাগ করে দুঃখে তার প্রতিপালকের কাছে চলে গেল। স্ত্রৈণ ছাগও দুঃখিতচিত্তে তার অনুগমন করে অনুনয়-বিনয়ে তাকে অনুরোধ করতে লাগল, কিন্তু ছাগীকে তুষ্ট করতে পারল না। যে ব্রাহ্মণ সেই ছাগের প্রতিপালক ছিলেন, তিনি ক্রোধে ছাগের লম্বমান অণ্ড দুটি কেটে দিলেন ; কিন্তু পরে প্রয়োজন-বোধে সেগুলো আবার জুড়ে দিলেন। অণ্ড-সংযুক্ত ছাগ আবার সেই কূপলব্ধ ছাগীর সঙ্গে বহুদিন ধরে বিহার করতে লাগল। কিন্তু আজও কামভোগে তার পরিতৃপ্তি হল না। ৭-১১

ভদ্রে, সেই ছাগের মত আমিও তোমার প্রেমে আবদ্ধ হয়ে অত্যন্ত দীন হয়ে গিয়েছি। তোমার মায়ায় মুগ্ধ হয়ে নিজেকে নিজেই বুঝতে পারছি না। পৃথিবীর তাবৎ ধান, যব, স্বর্ণ, পশু ও স্ত্রী কামান্ধ পুরুষকে তৃপ্তি দিতে পারে না। কাম্য বিষয়ের উপভোগে কখনও কামের উপশম হয় না[১] ; বরং অগ্নির মতই ঘৃতাহুতিতে তা উত্তরোত্তর বেড়েই যায়। ১২-১৪

পুরুষ সর্বভূতে সমদর্শী হলে তার সকল দিক সুখের হয়। দুর্মতি ব্যক্তিগণের পক্ষে যা ত্যাগ করা দুঃসাধ্য, মানুষ জরাগ্রস্ত হলেও যা জীর্ণ হয় না, সুখার্থী পুরুষ দুঃখের আদিকারণ সেই তৃষ্ণাকে সত্বর ত্যাগ করবেন। ভগিনী বা কন্যার সঙ্গে নির্জনে বাস করা অনুচিত ; কারণ ইন্দ্রিয়গুলো অত্যন্ত শক্তিশালী, অতিবড় পণ্ডিতকেও তারা আকর্ষণ করতে পারে। আমি এক হাজার বছর ধরে বারবার বিষয়ভোগে লিপ্ত হয়েছি, তবু আমার ভোগতৃষ্ণা দিন দিন বেড়েই চলেছে। সুতরাং এবার আমি তৃষ্ণা ত্যাগ করে ব্রহ্মপদে মনোনিবেশ করব, সুখ-দুঃখ ইত্যাদি দ্বন্দ্বাতীত হব, অহংকার ছাড়ব এবং এই অবস্থায় বনে বনে মৃগদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াব। যিনি বিষয়রাশি ও আত্মার বিনাশকে অসৎ বলে উপলব্ধি করে তার চিন্তা বা ভোগ থেকে বিরত হতে পারেন, তিনি আত্মদর্শী।[২] ১৫-২০

মহারাজ, যযাতি পত্নীকে একথা বলে কনিষ্ঠপুত্র পুরুকে তার যৌবন ফিরিয়ে দিলেন আর পুরুর কাছ থেকে নিজের জরা আবার গ্রহণ করলেন। বিষয়স্পৃহা থেকে তিনি সম্পূর্ণ মুক্ত হয়েছিলেন। তারপর তিনি দ্রুহ্যুকে দক্ষিণ-পূর্বদিক, যদুকে দক্ষিণদিক, তুর্বসুকে পশ্চিমদিক এবং অনুকে উত্তর দিকের অধিপতি করে দিলেন। পুরুকে তিনি সমগ্র পৃথিবীর অধীশ্বর করলেন আর অন্যান্য পুত্রদের পুরুর অধীনে রেখে বনে চলে গেলেন। যযাতি বহুশত বৎসর বিষয়-ইন্দ্রিয়ভোগ করেছিলেন সত্য, কিন্তু ডানা গজালে পাখী যেমন হঠাৎ একদিন তার বাসা ছেড়ে চলে যায়, তেমনি এক মুহূর্তেই তিনি সব পরিত্যাগ করেছিলেন। সর্বসঙ্গ ত্যাগ করে তিনি ত্রিগুণাত্মক উপাধি মুক্ত হলেন এবং আত্মজ্ঞান লাভ করে পরব্রহ্ম বাসুদেবে ভাগবতী গতি লাভ করলেন। ২১-২৫

স্ত্রী-পুরুষের প্রণয়বশত প্রায়ই এরূপ গ্লানি ঘটে বলে যে গাথাটি পরিহাসচ্ছলে বলা হল তা থেকে দেবযানী বুঝেছিলেন যে তাঁকে মুক্তিপথে

---

১ ন বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যঃ। কঠ উপ ১।১।২৭

২ '...মানুষ যদি আত্মাকে জানতে না পারে, তবে তার মহতী বিনষ্টি (মহা বিনাশ) হয়। সুতরাং জ্ঞানিগণ সর্বভূতে পরমাত্মাকে উপলব্ধি করে এই প্রাকৃত জীবনের ঊর্ধ্বে উঠে অমৃতত্ব লাভ করেন।'—কেন উপনিষৎ, ২।৫ শ্লোক।

উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। ভৃগুকন্যা দেবযানীর মনে হল যে জলসত্রের দিকে তৃষ্ণার্ত মানুষের গতির মতই ঈশ্বরপরায়ণ সুহৃদগণের একত্র সহবাস মায়ার সৃষ্টি এবং স্বপ্নবৎ। তিনি নিঃসঙ্গ হয়ে কৃষ্ণপদে মনোনিবেশ করলেন এবং লিঙ্গশরীর (উপাধি) ত্যাগ করে প্রার্থনা করলেন, হে ভগবান্, আপনি বাসুদেব, সর্বভূতের অন্তর্যামী, পরম শান্ত, বিরাট পুরুষ। আপনাকে নমস্কার। ২৬-২৯

বিংশ অধ্যায়

পুরুবংশের কথা

শুকদেব বললেন, ভারত, এবার পুরুবংশের কথা বলছি, শুনুন। বহু রাজর্ষি ও ব্রহ্মর্ষি পুরুবংশে জন্মেছেন। আপনারও এই বংশে জন্ম। পুরুর পুত্র জনমেজয়, তাঁর পুত্র হল প্রচিন্বান। প্রচিন্বানের পুত্র প্রবীর, প্রবীরের পুত্র মনস্যু, তাঁর পুত্র চারুপদ, তাঁর পুত্র সুদ্যু, সুদ্যুর পুত্র বহুগব, তাঁর পুত্র সংযাতি। সংযাতির পুত্র অহংযাতি, তাঁর পুত্র রৌদ্রাশ্ব। রৌদ্রাশ্বের ঔরসে ঘৃতাচী অপ্সরার গর্ভে ঋতেয়ু, কক্ষেয়ু, স্থণ্ডিলেয়ু, কৃতেয়ু, জলেয়ু, সন্নতেয়ু, ধর্মেয়ু, সত্যেয়ু, প্রত্যেয়ু ও বনেয়ু নামে দশজন পুত্র হয়। বনেয়ু সর্বকনিষ্ঠ পুত্র। ইন্দ্রিয়বর্গ যেমন জগদাত্মা প্রাণের অধীন, তেমনি সেই পুত্রেরা রৌদ্রাশ্বের বশীভূত ছিল। জ্যেষ্ঠ ঋতেয়ুর পুত্র রন্তিনাব। তাঁর সুমতি, ধ্রুব ও অপ্রতিরথ নামে তিনজন পুত্র জন্মেছিল। অপ্রতিরথের পুত্র কণ্ব, কণ্বের পুত্র মেধাতিথি। মেধাতিথি থেকে প্রস্কন্ন প্রভৃতি দ্বিজগণের উৎপত্তি হয়। রন্তিনাবের জ্যেষ্ঠ পুত্র সুমতি থেকে রেভিব জন্ম হয়। রেভির পুত্র দুষ্মন্ত। ১-৭

একদিন রাজা দুষ্মন্ত কয়েকজন অনুচর নিয়ে মৃগয়ার জন্য বনে ঘুরতে ঘুরতে মহর্ষি কণ্বের আশ্রমে এসে পড়লেন। সেই আশ্রমে সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর মত এক কন্যা তাঁর লাবণ্যপ্রভায় চারদিক আলো করে বসেছিলেন। দুষ্মন্ত তাকে দেখেই মুগ্ধ হলেন. আনন্দে তাঁর শ্রম দূর হয়ে গেল। কতিপয় সৈন্যের সঙ্গে তিনি সেই বরাঙ্গনার কাছে গিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন। কামার্ত রাজা দুষ্মন্ত সহাস্যে মিষ্টি কথায় তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, পদ্মপলাশলোচনে, তুমি কে? অয়ি হৃদয়হারিণি, তুমি কার কন্যা? তুমি এই নির্জন বনে কি করছ? পুরুবংশীয়দের চিত্ত কখনও অধর্মে রত হয় না। কিন্তু আমার চিত্ত তোমার প্রতি অনুরক্ত হয়েছে; স্পষ্টই মনে হচ্ছে তুমি কোন ক্ষত্রিয়কন্যা। শকুন্তলা বললেন, আমি বিশ্বামিত্রের কন্যা। মেনকা আমার মা। তিনি আমাকে বনের মধ্যে ফেলে গিয়েছেন। ভগবান কণ্ব একথা জানেন। হে বীর, আপনার জন্য কি করব, বলুন। বসুন, আমাদের পূজা গ্রহণ করুন। আশ্রমে নীবার তণ্ডুল আছে, ভোজন করুন। যদি অভিরুচি হয়, এখানে থাকুন। দুষ্মন্ত বললেন, সুন্দরি, কুশিকবংশে তোমার জন্ম। এরূপ অতিথিসৎকার তোমার পক্ষে উপযুক্তই বটে, কারণ কন্যারা নিজেরাই রাজাদের মধ্যে থেকে মনের মত বর বরণ করে থাকেন। শকুন্তলা বললেন, তাই হোক। এই কথামত দেশকালাভিজ্ঞ রাজা গন্ধর্বমতে শকুন্তলার পাণিগ্রহণ করলেন। রাজর্ষি দুষ্মন্ত অমোঘবীর্য ছিলেন। তিনি শকুন্তলাতে বীর্যাধান করে পরদিন তাঁর নিজের রাজপুরীতে চলে গেলেন। যথাসময়ে শকুন্তলা এক পুত্র সন্তান হল। মহর্ষি কণ্ব বনের

মধ্যেই নবজাতকের সমস্ত সংস্কার-ক্রিয়া সম্পন্ন করলেন। বাল্যাবস্থাতেই এই কুমার সিংহশিশু ধরে তার সঙ্গে খেলা করতেন। ৮-১৮

নারীকুলশ্রেষ্ঠা শকুন্তলা ভগবানের অংশে উৎপন্ন সেই বালককে নিয়ে তাঁর স্বামী দুষ্মন্তের কাছে গেলেন, কিন্তু দুষ্মন্ত তাঁর অনিন্দিতা স্ত্রী বা নির্দোষ পুত্রকে গ্রহণ করলেন না। তখন সকলেই এক দৈববাণী শুনল—দুষ্মন্ত, মাতা চর্মপাত্রের ন্যায় আধারমাত্র, পুত্র পিতার, কারণ পুত্ররূপে আত্মারই জন্ম হয়। অতএব তুমি তোমার পুত্রকে গ্রহণ করে প্রতিপালন কর, শকুন্তলার অবমাননা করো না। যে পুরুষ বীর্যাধান করে, তার পুত্র যমালয় থেকে তাকে উদ্ধার করে। তুমি এর জন্মদাতা, শকুন্তলা সত্য কথাই বলেছে। রাজা দুষ্মন্ত তাঁর স্ত্রী-পুত্রকে গ্রহণ করলেন। দুষ্মন্ত পরলোকে গমন করলে ভগবানের অংশে উৎপন্ন পুত্র ভরত সম্রাট হলেন। ভূমণ্ডলে সর্বত্র তাঁর মহিমা কীর্তিত হয়েছে। তাঁর দক্ষিণ হস্তে চক্রচিহ্ন আর পদযুগলে পদ্মকোষচিহ্ন বিরাজ করছিল। রাজচক্রবর্তী পদে অভিষিক্ত হয়ে ভরত গঙ্গাকূলে পঞ্চান্নটি অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। মমতানন্দন ভরদ্বাজকে পুরোহিত করে, ব্রাহ্মণদের প্রচুর ধন দান করে তিনি যমুনাতীরে আটাত্তরটি অশ্বমেধের অশ্ব বেঁধেছিলেন। মহারাজ, প্রকৃষ্টগুণশালী দেশে রাজা ভরতের অগ্নিচয়ন করা হয়েছিল। সে অগ্নিচয়নের সময় হাজার হাজার ব্রাহ্মণ প্রত্যেকে এক এক বদ্ধ অর্থাৎ তের হাজার চুরাশিটি গাভী পেয়েছিলেন। ভরত এভাবে একবারে তিন হাজার তিনশ যজ্ঞের ঘোড়া বেঁধেছিলেন; তা দেখে সকল রাজাই বিস্মিত হয়েছিলেন। তিনি দেবতাদের বৈভবও অতিক্রম করেছিলেন। কারণ, তিনি স্বয়ং শ্রীহরিকে লাভ করেন। তিনি 'মষ্ণার' নামে কোনও কর্মে চোদ্দ নিযুত কৃষ্ণবর্ণের শ্বেতদন্ত-বিশিষ্ট এবং স্বর্ণমণ্ডিত হস্তী দান করেন। উদ্বাহু হয়ে যেমন স্বর্গ পাওয়া যায় না, তেমনি মহাত্মা ভরতের মত মহৎ কার্যাবলীর অনুষ্ঠান অন্য রাজারা করতে পারেন নি, পারবেনও না। তিনি দিগ্বিজয়ে বের হয়ে কিরাত, হূণ, যবন, পৌণ্ড্র, কঙ্ক, খশ, শক এবং অন্যান্য অব্রাহ্মণ রাজা ও ম্লেচ্ছজাতিকে বিনাশ করেছিলেন। পুরাকালে যে সমস্ত অসুর দেবতাদের পরাস্ত করে তাঁদের স্ত্রী নিয়ে পাতালে বাস করছিল, ভরত তাদের বধ করে সব দেবস্ত্রীদের উদ্ধার করেছিলেন। ১৯-৩১

ভরতের রাজত্বকালে স্বর্গে ও মর্ত্যে প্রজাদের সমস্ত অভিলাষ সবসময়েই পূর্ণ হত। তিনি সাতাশ হাজার বছর রাজত্ব করে সকল দিকেই তাঁর আদেশ প্রবর্তন করেছিলেন। কিছুকাল এভাবে রাজ্যভোগ করে ভরতের কাছে লোকপালদের মত ঐশ্বর্য, অধিরাজ সম্পদ, দুর্ধর্ষ সেনা, এমন কি নিজের প্রাণও মিথ্যা বলে মনে হল। ফলে বিষয়ভোগে তাঁর বিতৃষ্ণা এল। ৩২-৩৩

ভরতের তিনজন প্রিয়তমা পত্নী বিদর্ভদেশীয়। তাঁদের মধ্যে এক রানীর পুত্রসন্তান হলে রাজা বলেছিলেন, এ পুত্র আমার মত হয় নি। তখন থেকে রানীদের পুত্র হলে রাজা আবার সে কথা বলে ব্যভিচারিণী ভেবে তাঁদের ত্যাগ করবেন—এ আশঙ্কায় তাঁরা আপন আপন সন্তান জন্মাবার পরই বিনষ্ট করে ফেলতেন। এভাবে বংশ ব্যর্থ হতে দেখে রাজা পুত্রকামনায় মরুৎসোম যজ্ঞ করেন। মরুদ্গণ এই যজ্ঞে তুষ্ট হয়ে তাঁকে ভরদ্বাজ নামে এক পুত্র দিলেন। এই ভরদ্বাজের জন্মবৃত্তান্ত সম্পর্কে এরূপ বলা হয় যে, একবার বৃহস্পতি তাঁর ভাই উতথ্যের গর্ভবতী স্ত্রী মমতাকে রমণ করতে প্রবৃত্ত হলে গর্ভস্থ পুত্র তাঁকে

বারণ করেন। তাতে বৃহস্পতি ক্রুদ্ধ হয়ে 'তুই অন্ধ হ' এই শাপ দিয়ে বীর্য ত্যাগ করেন। স্বামী তাঁকে ব্যভিচারিণী ভেবে ত্যাগ করবেন এই ভয়ে মমতা সদ্যোজাত সন্তানকে পরিত্যাগ করতে চাইলেন। তখন দেবতারা বৃহস্পতি-মমতাঘটিত পুত্রের নামকরণের উদ্দেশ্যে এরূপ গান করেন—মূঢ়ে, তুমি এই দ্বাজকে (একের ক্ষেত্রে অন্যের বীর্যে উৎপন্ন পুত্র) পালন কর। বৃহস্পতি, তুমি এই দ্বাজকে ভরণ-পোষণ কর। পিতামাতা পরস্পর একথা বলে চলে গেলেন। এই পুত্র ভরদ্বাজ নামে বিখ্যাত। মহারাজ, দেবগণ এভাবে বলা সত্ত্বেও মমতা ব্যভিচারজাত সেই সন্তান নিরর্থক মনে করে তাকে ত্যাগ করেন। পরিত্যক্ত পুত্রকে মরুদ্‌গণ প্রতিপালন করেন এবং ভরতবংশ ব্যর্থ হওয়ার উপক্রম হলে তাঁরা ভরদ্বাজ নামে সন্তানটি রাজাকে সমর্পণ করেন। ৩৪-৩৯

একবিংশ অধ্যায়

রন্তিদেবের আত্মোৎসর্গ

শুকদেব বললেন, পাণ্ডুনন্দন, বিতথ অর্থাৎ ভরদ্বাজের পুত্র মন্যু। মন্যুর পাঁচ পুত্র—বৃহৎক্ষেত্র, জয়, মহাবীর্য, নর আর গর্গ। নরের পুত্র সংকৃতি। তাঁর পুত্র গুরু ও রন্তিদেব। রন্তিদেবের মহিমা ইহলোকে ও পরলোকে কীর্তিত হয়ে থাকে। তাঁর সম্পদ সব সময় পরহিতার্থে ব্যয়িত হত। তিনি ক্ষুধার্ত থাকলেও যা পেতেন, তাই দান করে দিতেন। এভাবে দান করতে করতে তাঁর সব সম্পদ নিঃশেষ হয়ে গেলে তিনি সপরিবারে অনাহারে ক্রমে অবসন্ন হতে লাগলেন এবং জলবিন্দু পান না করে তাঁর আটচল্লিশ দিন কেটে গেল। পরিবারবর্গ ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর হয়ে পড়লেন, তাঁর নিজের শরীরও কাঁপতে লাগল। উনপঞ্চাশ দিনের সকাল বেলায় রন্তিদেবের জন্যে কোন ব্যক্তি ঘি, পায়েস, সংযাব (ক্ষীর ও ঘিয়ের তৈরী গোধূমচূর্ণ) ও পানীয় জল এনে দিল। রন্তিদেব খেতে যাবেন এমন সময় এক ব্রাহ্মণ অতিথি হয়ে এলেন। রন্তিদেব সর্বত্র সর্বজনে হরি দর্শন করতেন। তিনি সেই ব্রাহ্মণকে শ্রদ্ধা সহকারে সাদরে সব খাদ্য পরিবেশন করলেন। ব্রাহ্মণ ভোজন করে চলে গেলে অবশিষ্ট খাদ্য তাঁর পরিবারের লোকদের মধ্যে ভাগ করে দিয়ে নিজে খেতে যাবেন, এমন সময় একজন শূদ্র তাঁর কাছে অতিথি হয়ে এল। রন্তিদেব পরিবারের জন্যে ভাগ-করা অবশিষ্ট অন্ন শ্রীহরিকে স্মরণ করে তাঁর শূদ্র অতিথিকে দিলেন। ভোজনান্তে শূদ্র বিদায় নিয়ে চলে গেলে কতকগুলি কুকুর নিয়ে আর একজন লোক এসে বলল, রাজা, আমি আর আমার কুকুরগুলো অত্যন্ত ক্ষুধার্ত; আমাদের খেতে দিন। রাজা এ কথা শুনে অবশিষ্ট অন্ন সমাদরে ও সসম্মানে সেই কুকুরগুলি এবং তাদের প্রভুকে দিয়ে নমস্কার করলেন।[1] ১-৯

এভাবে শুধু পানীয় জল ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট রইল না। রাজা তাই

১ তুলনীয়: 'আমি অন্ন ...আমি মূর্তামূর্ত জগতের প্রথম উৎপন্ন, সুতরাং দেবতাদেরও পূর্ববর্তী। যে লোক অন্নপ্রার্থীকে অন্নরূপী আমায় দান করেন তিনি এভাবেই আমাকে রক্ষা করেন। আর যিনি অন্নরূপী আমাকে দান না করে স্বয়ং ভোজন করেন আমি তাঁকে ভক্ষণ করি। সূর্যের ন্যায় জ্যোতিঃস্বরূপ স্বপ্রকাশ আমিই সমগ্র জগৎরূপে অভিব্যক্ত আছি।' ইহাই উপনিষৎ। —তৈত্তিরীয় উপনিষৎ, ৩।১০।৬

পান করতে যাবেন এমন সময় একজন পুক্কশ চণ্ডাল এসে কাতর আবেদন জানিয়ে বলল, মহারাজ, আমি অত্যন্ত শ্রান্ত; এই অপবিত্র ব্যক্তিকে একটু জল দিন। তার করুণ কথা শুনে রাজার অত্যন্ত দয়া হল। তিনি মধুরবাক্যে বললেন, আমি পরমেশ্বরের কাছে অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি বা মুক্তি কামনা করি না। প্রার্থনা করি আমি যেন প্রাণীদের অন্তরে থেকে তাদের দুঃখ অনুভব করি আর সকল দেহীর দুঃখ যেন দূর করতে পারি। এই দীনজন জীবনরক্ষার বাসনা করছে। এর প্রাণরক্ষার জন্যে জল দিলেই আমার ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ক্লান্তি, শ্রম, কাতরতা, বিষাদ, মোহ সব ঘুচে যাবে। একথা বলে নিজে পিপাসায় কাতর হলেও রন্তিদেব পুক্কশকে তাঁর পানীয় জল দিয়ে দিলেন।[1] ত্রিলোকের অধীশ্বর ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ ফলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিদের ফল দান করেন। রন্তিদেবের ধৈর্য পরীক্ষার জন্য বিষ্ণুর মায়ার প্রভাবে তাঁরা ব্রাহ্মণ প্রভৃতি অতিথিরূপে এসেছিলেন; তাঁর ধৈর্য দেখে এবার তাঁরা আত্মপ্রকাশ করলেন। রাজা সেই মায়ামূর্তিদের প্রণাম করে সংগ ও কামনামুক্ত হয়ে শুদ্ধ বাসুদেবে চিত্ত নিবেদন করলেন; মায়া-দেবগণের কাছে তিনি কিছুই প্রার্থনা করলেন না। তিনি ঈশ্বর ভিন্ন অন্য কোন ফলের অপেক্ষা করলেন না; সেই গুণময়ী মায়াও বিলীন হয়ে গেল। রন্তিদেবের অনুগামী ব্যক্তিগণ তাঁর প্রভাবে নারায়ণপরায়ণ যোগী হয়েছিলেন। ১০-১৮

মহারাজ, মনুর অপর পুত্র গর্গ থেকে শিনির জন্ম হয়। শিনির পুত্র গার্গ্য। ক্ষত্রিয়বংশে তাঁর জন্ম হলেও তিনি ব্রাহ্মণ হয়েছিলেন। মহাবীর্যের পুত্র দুরিতক্ষয়। তাঁর ত্রয্যারুণি, কবি ও পুষ্করারুণি নামে তিন পুত্র ছিল। তাঁরা তিনজনই ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেছিলেন। বৃহৎক্ষত্রের পুত্র হস্তী, হস্তিনাপুর নগর তিনিই প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর তিন পুত্র—অজমীঢ়, দ্বিমীঢ় আর পুরুমীঢ়। অজমীঢ়ের বংশে প্রিয়মেধ প্রমুখ ব্রাহ্মণগণ জন্মেছিলেন। বৃহদিষু নামে অজমীঢ়ের অন্য আর একটি পুত্র ছিল। বৃহদিষুর পুত্র বৃহদ্ধনু, তাঁর পুত্র বৃহৎকায়, তাঁর পুত্র জয়দ্রথ, তাঁর পুত্র বিশদ। বিশদের পুত্র শ্যেনজিৎ, শ্যেনজিতের পুত্র রুচিরাশ্ব, দৃঢ়হনু, কাশ্য ও বৎস। রুচিরাশ্বের পুত্র পার, পারের পুত্র পৃথুসেন। পারের নীপ নামে আর একটি পুত্র ছিলেন; তাঁর আবার একশ পুত্র জন্মেছিলেন। নীপের ঔরসে শুককন্যা কৃত্বীর গর্ভে ব্রহ্মদত্ত নামে এক পুত্রের জন্ম হয়। ব্রহ্মদত্ত যোগী ছিলেন। তিনি তাঁর স্ত্রী সরস্বতীর গর্ভে বিষ্বক্‌সেন নামে এক সন্তানের জন্ম দেন। জৈগীষব্যের উপদেশে তিনি যোগশাস্ত্র রচনা করেন। বিষ্বক্‌সেন থেকে সদক্‌সেন এবং উদক্‌সেন থেকে ভল্লাটের জন্ম হয়। এঁরা সকলেই বৃহদিষুর বংশজাত। ১৯-২৬

দ্বিমীঢ়ের পুত্র যবীনর, তাঁর পুত্র কৃতিমান। কৃতিমানের পুত্র সত্যধৃতি, সত্যধৃতির পুত্র দৃঢ়নেমি, দৃঢ়নেমির পুত্র সুপার্শ্ব, সুপার্শ্বের পুত্র সুমতি, সুমতির পুত্র সন্নতিমান, সন্নতিমানের পুত্র কৃতী। তিনি হিরণ্যনাভের কাছে যোগশিক্ষা লাভ করে প্রাচ্যসামের ছখানি সংহিতা ভাগ করে শিক্ষাদান করেন। কৃতীর পুত্র উগ্রায়ুধ, তাঁর পুত্র ক্ষেম্য। ক্ষেম্যের পুত্র সুবীর, সুবীরের পুত্র রিপুঞ্জয়, রিপুঞ্জয়ের পুত্র বহুরথ। পুরুমীঢ় নিঃসন্তান ছিলেন। অজমীঢ়ের নলিনী নামে এক স্ত্রী ছিলেন; তাঁর গর্ভে নীল নামে এক সন্তানের জন্ম হয়েছিল।

---

১ এই প্রসঙ্গে স্যার ফিলিপ সিডনির বিখ্যাত উক্তি স্মরণীয়: 'Thy necessity is greater than mine.'

নীলের পুত্র শান্তি, তাঁর পুত্র সুশান্তি, তাঁর পুত্র পুরুজ, তাঁর পুত্র অর্ক এবং অর্কের পুত্র ভর্ম্যাশ্ব। তাঁর মুদ্গল, যবীনর, বৃহদশ্ব, কাম্পিল্য ও সঞ্জয় নামে পাঁচটি পুত্র ছিলেন। ভর্ম্যাশ্ব একবার বলেছিলেন, আমার পাঁচ পুত্র পাঁচটি বিষয় রক্ষা করতে পারবে। তাই পরে তাঁরা পঞ্চাল নামে পরিচিত হন। মুদ্গল থেকে মৌদ্গল্য গোত্রের ব্রাহ্মণ জাতির উৎপত্তি হয়। মুদ্গলের যমজ পুত্র-কন্যা জন্মেছিল। পুত্রের নাম দিবোদাস, কন্যার নাম অহল্যা। গোতমের ঊরসে অহল্যার গর্ভে শতানন্দের জন্ম হয়। শতানন্দের পুত্র সত্যধৃতি ধনুর্বেদ বিশারদ ছিলেন। সত্যধৃতির পুত্র শরদ্বান। একবার উর্বশীকে দেখে শরদ্বানের শুক্র শরস্তম্ভে পড়েছিল। তা থেকে সুদর্শন যমজ পুত্র হয়। রাজা শান্তনু একদিন মৃগয়ায় গিয়ে হঠাৎ তাদের দেখতে পান এবং তাঁর মনে করুণার উদ্রেক হয়। তিনি তাদের নিয়ে আসেন। সেই বালকের নাম কৃপ আর কন্যার নাম কৃপী। কৃপী পরে দ্রোণাচার্যের স্ত্রী হয়েছিলেন। ২৭-৩৬

দ্বাবিংশ অধ্যায়

জরাসন্ধ, যুধিষ্ঠির ও দুর্যোধন প্রভৃতির জন্মকথা

শুকদেব বলতে লাগলেন, মহারাজ, দিবোদাসের পুত্র মিত্রায়ু, তাঁর পুত্র চ্যবন। চ্যবনের পুত্র সুদাস, সুদাসের পুত্র সহদেব, সহদেবের পুত্র সোমক। সোমকের একশ পুত্র ছিল ; তাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠের নাম জন্তু আর কনিষ্ঠের নাম পৃষত। সর্বসম্পদশালী দ্রুপদ পৃষতের পুত্র। দ্রুপদ থেকে দ্রৌপদী এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতির জন্ম হয়। ধৃষ্টদ্যুম্নের পুত্র ধৃষ্টকেতু। এঁরা সকলেই ভর্ম্যাবংশীয় পাঞ্চাল। অজমীঢ়ের ঋক্ষ নামে আর এক পুত্র ছিলেন। সেই ঋক্ষের পুত্র সংবরণ। সংবরণের ঔরসে সূর্যকন্যা তপতীর গর্ভে কুরু জন্মগ্রহণ করেন। কুরু কুরুক্ষেত্রের অধিপতি ছিলেন। পরীক্ষিৎ, সুধনু, জহ্নু ও নিষধ নামে কুরুর চার পুত্র ছিলেন। সুধনুর পুত্র সুহোত্র, তাঁর পুত্র চ্যবন। চ্যবনের পুত্র কৃতী, কৃতীর পুত্র উপরিচর বসু ; বসুর বৃহদ্রথ, কুশাম্ব, মৎস্য, প্রত্যগ্র ও চেদিপ প্রভৃতি পুত্র জন্মে। তাঁরা সকলেই চেদিরাজ্যের নৃপতি ছিলেন। ১-৬

বৃহদ্রথের পুত্র কুশাগ্র। কুশাগ্রের পুত্র ঋষভ, তাঁর পুত্র সত্যহিত। সত্যহিতের পুত্র পুষ্পবান, পুষ্পবানের পুত্র জহু। বৃহদ্রথের আর এক পত্নীর গর্ভে দুই খণ্ড সন্তান জন্মে। তা দেখে সন্তানের জননী তাদের বাইরে ফেলে দেন। পরে জরা নামে এক রাক্ষসী সেগুলো নিয়ে 'বেঁচে ওঠ, বেঁচে ওঠ' বলে খেলতে খেলতে দুইখণ্ড একত্রে মিলিয়ে দেয়। সেই সন্তান জরাসন্ধ নামে পরিচিত। জরাসন্ধের পুত্র সহদেব, তার পুত্র সোমাপি এবং সোমাপির পুত্র শ্রুতশ্রবা। কুরুপুত্র পরীক্ষিৎ অপুত্রক ছিলেন। জহ্নুর পুত্র সুরথ, তাঁর পুত্র বিদূরথ, তাঁর পুত্র সার্বভৌম ; সার্বভৌমের পুত্র জয়সেন, জয়সেনের পুত্র রাধিক, রাধিকের পুত্র অযুতায়ু। অযুতায়ুর পুত্র অক্রোধন, তাঁর পুত্র দেবাতিথি, তাঁর পুত্র ঋক্ষ। ঋক্ষের পুত্র দিলীপ, দিলীপের পুত্র প্রতীপ। প্রতীপের তিন পুত্র—দেবাপি শান্তনু ও বাহ্লীক। জ্যেষ্ঠ পুত্র দেবাপি রাজ্য ত্যাগ করে বনে চলে যান ; শান্তনু রাজা হন। শান্তনু পূর্বে মহাভিষ নামে পরিচিত ছিলেন। কোন জরাগ্রস্ত

মানুষকে ইনি হাত দিয়ে স্পর্শ করলেই সে যৌবন ফিরে পেত এবং পরম শান্তি লাভ করত ; এই কাজের জন্যে মহাভিষ শান্তনু নামে খ্যাত হন। শান্তনু রাজার রাজ্যে একবার বারো বছর ধরে অনাবৃষ্টি হয়। রাজা ব্রাহ্মণদের কাছে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। ব্রাহ্মণগণ বললেন, মহারাজ, আপনার বড় ভাই থাকতে আপনি রাজা হয়েছেন। তাই আপনি পরিবেত্তা।[1] অতএব রাজ্যের মঙ্গলের জন্যে শীঘ্র আপনার অগ্রজকে এনে তাঁকে রাজা করুন। ৭-১৫

ব্রাহ্মণদের কথা শুনে শান্তনু বনে গিয়ে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে রাজ্যগ্রহণ করতে অনুরোধ করলেন। কিন্তু ইতিপূর্বে শান্তনুর মন্ত্রী অশ্মরাত দেবাপির কাছে কয়েকজন ব্রাহ্মণ পাঠিয়েছিলেন। তাঁদের কাছে পাষণ্ডমত সমর্থক কথাবার্তা শুনে দেবাপি বেদমার্গভ্রষ্ট হন এবং বেদের নিন্দাবাদ করেন। ফলে তাঁর পাতিত্য-দোষ ঘটে এবং তিনি রাজা হওয়ার অযোগ্য বলে বিবেচিত হন। সুতরাং শান্তনুর রাজ্যভোগে আর কোন দোষ থাকল না। রাজ্যে যথারীতি বৃষ্টি হতে লাগল। দেবাপি যোগ অবলম্বন করে কলাপ গ্রামে বাস করতে লাগলেন। কলিযুগে চন্দ্রবংশ বিলুপ্ত হলে, সত্যযুগের সূচনায় তিনি সেই বংশ আবার প্রতিষ্ঠা করবেন। ১৬-১৭

বাহ্লীক থেকে সোমদত্তের জন্ম হয়। সোমদত্তের ভূরি, ভূরিশ্রবা ও বল নামে তিন পুত্র ছিলেন। শান্তনুর ঔরসে গঙ্গার গর্ভে আত্মজ্ঞ ভীষ্ম জন্মগ্রহণ করেন। মহানুভব ভীষ্ম সর্বধর্মজ্ঞদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, পরমভাগবত, বিদ্বান ও বীরদের অগ্রগণ্য ছিলেন। একবার যুদ্ধে পরশুরামকে তিনি তুষ্ট করেছিলেন। শান্তনু সত্যবতী নামে দাসকন্যাকে বিবাহ করেন। সত্যবতীর গর্ভে চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য নামে দুই পুত্রের জন্ম হয় ; বিচিত্রবীর্য কনিষ্ঠ। চিত্রাঙ্গদ একবার চিত্রাঙ্গদ নামে এক গন্ধর্বের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হন। পরাশরের ঔরসে কুমারী অবস্থায় সত্যবতীর গর্ভে শ্রীহরির অংশে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ঋষির জন্ম হয়। তিনি বেদরক্ষক। আমি তাঁর সন্তান ; তাঁর কাছে আমি ভাগবতশাস্ত্র পড়েছি। আমি তাঁর একমাত্র উপযুক্ত গুণগ্রাহী সন্তান ; তাই ভগবান বাদরায়ণ তাঁর নিজের শিষ্য পৈল প্রভৃতিকে ত্যাগ করে পরমগুহ্য ভাগবত-তত্ত্ব আমাকে ব্যাখ্যা করে বলেছেন। বিচিত্রবীর্য কাশিরাজের দুই কন্যা অম্বিকা ও অম্বালিকাকে বিবাহ করেন। সেই দুইজন কাশিরাজ-দুহিতাকে ভীষ্ম স্বয়ংবর সভা থেকে বলপূর্বক এনেছিলেন। দুই স্ত্রীর প্রতি আসক্ত হয়ে বিচিত্রবীর্য অল্পদিনের মধ্যে যক্ষ্মা-রোগের কবলে পড়ে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁর সন্তান-সন্ততি কিছুই ছিল না। সুতরাং মায়ের আদেশে ব্যাসদেব অম্বিকার গর্ভে ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুর নামে তিন পুত্রের জন্ম দেন। ১৮-২৫

ধৃতরাষ্ট্রের ঔরসে গান্ধারীর গর্ভে একশ পুত্র এবং দুঃশলা নামে এক কন্যা জন্মে। পুত্রদের মধ্যে দুর্যোধন জ্যেষ্ঠ। কোন মুনির শাপে[2] পাণ্ডু মৈথুন কার্যে নিষিদ্ধ হন। সুতরাং তাঁর পত্নী কুন্তীর গর্ভে ধর্ম, বায়ু ও ইন্দ্র যথাক্রমে যুধিষ্ঠির, ভীম আর অর্জুনের জন্ম দেন। পাণ্ডুর মাদ্রী নামে আর এক

---

১ জ্যেষ্ঠের বর্তমানে কনিষ্ঠের রাজ্যভোগ বা বিবাহ।

২ মৃগরূপে মৃগীসহবাস কালে পাণ্ডু এক ব্রাহ্মণকে মৃগভ্রমে বাণবিদ্ধ করলে ব্রাহ্মণ অভিশাপ দেন যে স্ত্রীসহবাস করলে পাণ্ডুর মৃত্যু হবে।

পত্নীর গর্ভে অশ্বিনীকুমারদ্বয় নকুল ও সহদেবের জন্ম দেন। দ্রৌপদী পঞ্চপাণ্ডবের পত্নী। তাঁদের ঔরসে দৌপদীর পাঁচজন পুত্র জন্মেছিল। মহারাজ, তাঁরা আপনার পিতৃপুরুষ। যুধিষ্ঠিরের পুত্র প্রতিবিন্ধ্য, ভীমের পুত্র শ্রুতকর্মা। পঞ্চপাণ্ডবের আরও কয়েকজন পত্নী ছিলেন। তাঁদেরও কয়েকজন পুত্র ছিলেন। পৌরবীর গর্ভে যুধিষ্ঠিরের দেবক নামে এক পুত্র হয়; হিড়িম্বার গর্ভে ভীমসেনের ঘটোৎকচ ও কালীর গর্ভে সর্বগত নামে পুত্র জন্মে; বিজয়া নামে পত্নীর গর্ভে সহদেবের সুহোত্র নমে পুত্র হয়; নকুলের ঔরসে করেণুমতীর নরমিত্র নামে পুত্রের জন্ম হয়; উলুপীর গর্ভে অর্জুনের ইরাবান, মণিপুর রাজদুহিতার গর্ভে বভ্রুবাহন আর সুভদ্রার গর্ভে আপনার পিতা অভিমন্যুর জন্ম হয়। বভ্রুবাহণ মণিপুর রাজার পুত্রিকাপুত্র ছিলেন। মহাবীর অভিমন্যু সমস্ত অধিরথ বিজেতা; সেই অভিমন্যুর ঔরসে উত্তরার গর্ভে আপনার জন্ম। একবার অশ্বত্থমার ব্রহ্মাস্ত্র-প্রভাবে কুরুবংশ লোপ পেতে যাচ্ছিল; তখন শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহে আপনি সজীব অবস্থায় মৃত্যুর কবল থেকে উদ্ধার পেয়েছেন। আপনার জনমেজয়, শ্রুতসেন, ভীমসেন ও উগ্রসেন নামে চার পুত্র হয়েছে। তক্ষক দংশনে আপনার মৃত্যুসংবাদ পেয়ে জনমেজয় ক্রোধে সর্পযজ্ঞের অনুষ্ঠান করে যজ্ঞাগ্নিতে সর্পকুলকে আহুতি দেবেন। তিনি পৃথিবী জয় করে আরও অনেক যজ্ঞ করবেন এবং কবষপুত্র তুর ঋষিকে পৌরোহিত্যে বরণ করে আরও অনেক যজ্ঞ করবেন। ২৬-৩৭

মহারাজ, জনমেজয়ের শতানীক নামে এক পুত্র হবে। তিনি যাজ্ঞবল্ক্য ঋষির কাছে বেদ অধ্যয়ন করে ক্রিয়াজ্ঞান, শৌনকের কাছ থেকে আত্মজ্ঞান এবং কৃপাচার্যের কাছে অস্ত্রজ্ঞান লাভ করবেন। শতানীকের পুত্র সহস্রানীক, তাঁর পুত্র অশ্বমেধজ, তাঁর পুত্র অসীমকৃষ্ণ, এবং অসীমকৃষ্ণের পুত্র নেমিচক্র। নদীর প্লাবনে হস্তিনাপুর বিনষ্ট হলে তিনি কৌশাম্বী নগরে সুখে বাস করবেন। নেমিচক্রের পুত্র উপ্ত, উপ্তের পুত্র চিত্ররথ। চিত্ররথের শুচিরথ নামে পুত্র হবে। শুচিরথের পুত্র বৃষ্টিমান, তাঁর পুত্র সুষেণ; সুষেণের সুত্র মহীপতি, তাঁর পুত্র সুনীথ, তাঁর পুত্র নৃচক্ষু। নৃচক্ষুর সুখীনল নামে এক পুত্র হবে। সুখীনলের পুত্র পারিপ্লব, তাঁর পুত্র সুনয়, তাঁর পুত্র মেধাবী। মেধাবীর পুত্র নৃপঞ্জয়। তাঁর দুর্ব নামে এক পুত্রের জন্ম হবে। দুর্বের পুত্র তিমি, তাঁর পুত্র বৃহদ্রথ, বৃহদ্রথের পুত্র সুদাস, সুদাসের পুত্র শতানীক, শতানীকের পুত্র দুর্দমন এবং তাঁর পুত্র মহীনর। মহীনরের পুত্র দণ্ডপাণি. তাঁর পুত্র নিমি। ক্ষেমক নামে নিমির এক পুত্র হবে। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের উৎপাদক আর ঋষি আদৃত এই বংশ কলিযুগে ক্ষেমক রাজা পর্যন্ত থাকবে। ৩৮-৪৫

মহারাজ, এবার মগধ বংশে যাঁরা রাজা হবেন তাঁদের কথা বলছি। জরাসন্ধের পুত্র সহদেব, তাঁর পুত্র মার্জারি। মার্জারি থেকে শ্রুতশ্রবার জন্ম হবে। শ্রুতশ্রবার পুত্র অযুতায়ু, তাঁর পুত্র নিরমিত্র, তাঁর পুত্র সুনক্ষত্র, তাঁর পুত্র বৃহৎসেন ও বৃহৎসেনের পুত্র কর্মজিৎ। কর্মজিতের পুত্র সুতঞ্জয়, সুতঞ্জয়ের পুত্র বিপ্র, বিপ্রের পুত্র শুচি ও শুচির পুত্র ক্ষেম। ক্ষেমের পুত্র সুব্রত, তাঁর পুত্র ধর্মসূত্র, তাঁর পুত্র সম, সমের পুত্র দ্যুমৎসেন। দ্যুমৎসেনের পুত্র সুমতি, তাঁর পুত্র সুবল, সুবলের পুত্র সুনীথ, তাঁর পুত্র সত্যজিৎ। সত্যজিতের পুত্র বিশ্বজিৎ, বিশ্বজিতের রিপুঞ্জয় নামে এক পুত্র হবে। বৃহদ্রথ বংশের রাজারা আরও হাজার বছর রাজত্ব করবেন। ৪৬-৪৯

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

অনু, দ্রুহ্য, তুর্বসু ও যদুর বংশ-বৃত্তান্ত

শুকদেব বললেন, মহারাজ, সভানর, চক্ষু ও পরেক্ষু এ'রা তিনজন অনুর পুত্র। সভানরের পুত্র কালনর, তাঁর পুত্র সৃঞ্জয়। সৃঞ্জয়ের পুত্র জনমেজয় জনমেজয়ের পুত্র মহাশাল, মহাশালের পুত্র মহামনা। মহামনার উশীনর ও তিতিক্ষু নামে দুজন পুত্র হয়। উশীনরের চার পুত্র—শিবি, বর, কৃমি ও দক্ষ। শিবির বৃষাদর্ভ, সুবীর, মদ্র ও কেকয় নামে চার পুত্র ছিলেন। তিতিক্ষুর পুত্র রুষদ্রথ, তাঁর পুত্র হোম, তাঁর পুত্র সুতপা এবং সুতপার পুত্র বলি। বলির ক্ষেত্রে দীর্ঘতমা ঋষির ঔরসে অংগ, বংগ, কলিংগ, সুহ্ম, পুণ্ড্র ও ওড্র নামে নৃপতিদের উৎপত্তি হয়। তাঁরা নিজেদের নামে পূর্বদেশে ছয়টি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। ১-৬

অংগ থেকে খলপানের জন্ম হয়। খলপানের পুত্র দিবিরথ, তাঁর পুত্র ধর্মরথ, তাঁর পুত্র চিত্ররথ। চিত্ররথ অপুত্রক ছিলেন। তিনি রোমপাদ নামে বিখ্যাত। রাজা দশরথ তাঁর সখা ছিলেন; তাই তিনি তাঁকে তাঁর আপন কন্যা শান্তাকে দান করেন। পরে শান্তার সংগে ঋষ্যশৃংগ মুনির বিবাহ হয়। একবার রোমপাদ রাজার রাজ্যে দেবতারা বারিবর্ষণ না করায় অনাবৃষ্টি হয়। তখন রাজার আদেশে কয়েকজন বারাংগনা সেই হরিণীপুত্র ঋষ্যশৃংগ মুনির তপোবনে গিয়ে নাচ, গান, বাদ্য, বিলাস, আলিংগন ও যথাবিধি অর্চনা করে তাঁকে রাজ্যে নিয়ে আসে। ফলে রাজ্যে আবার বারিবর্ষণ হয়। ঋষ্যশৃংগ ঋষি ইন্দ্রযজ্ঞ করে নিঃসন্তান রাজা রোমপাদকে পুত্র প্রদান করেন। অপুত্রক দশরথও মুনির সাহায্যে পুত্রলাভ করেন। রোমপাদের পুত্র চতুরংগ, তাঁর পুত্র পৃথুলাক্ষ। পৃথুলাক্ষের বৃহদ্রথ, বৃহৎকর্মা ও বৃহদ্ভানু নামে তিন পুত্র হয়। বৃহদ্রথের পুত্র বৃহন্মনা, তাঁর পুত্র জয়দ্রথ ও জয়দ্রথের পুত্র বিজয়। বিজয়ের সংভূতি নামে এক স্ত্রী ছিলেন। তাঁর গর্ভে ধৃতি নামে এক পুত্রের জন্ম হয়। ধৃতির পুত্র ধৃতব্রত, ধৃতব্রতের পুত্র সৎকর্মা আর সৎকর্মার পুত্র অধিরথ। একদিন তিনি গংগাতীরে খেলা করতে করতে একটি মঞ্জুষার মধ্যে এক শিশুকে পান। কুন্তীর কুমারী অবস্থায় এই শিশু জন্মেছিল; তাই কুন্তী তাকে পরিত্যাগ করেন। সেই পরিত্যক্ত শিশুকে অধিরথ নিজের পুত্ররূপে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর নাম কর্ণ। কর্ণের পুত্র বৃষসেন। দ্রুহ্যুর পুত্র বভ্রু, তাঁর পুত্র সেতু, তাঁর পুত্র আরব্ধ, তাঁর পুত্র গান্ধার, তাঁর পুত্র ধর্ম, তাঁর পুত্র ধৃত, তাঁর পুত্র দুর্মদ এবং দুর্মদের পুত্র প্রচেতা; প্রচেতার একশো পুত্র। তাঁরা সকলেই উত্তরদিকে ম্লেচ্ছদের অধিপতি হন। তুর্বসুর পুত্র বহ্নি। বহ্নির পুত্র ভর্গ, ভর্গের পুত্র ভানুমান, ভানুমানের পুত্র ত্রিভানু। ত্রিভানুর করন্ধম নামে উদারমতি পুত্র হয়। করন্ধমের পুত্র মরুত্ত। তিনি অপুত্রক ছিলেন, তাই পুরুবংশের দুষ্মন্তকে পুত্ররূপে গ্রহণ করেন। দুষ্মন্ত রাজ্যাভিলাষী হয়ে আবার পুরুবংশে ফিরে যান। ৭-১৮

মহারাজ, এবার আমি যযাতির জ্যেষ্ঠপুত্র যদুবংশ বর্ণনা করছি। এই বংশ অতি পবিত্র এবং সে কাহিনী শুনলে মানুষ সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হতে পারে। এই বংশে পরমাত্মা শ্রীহরি নররূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। যদুর সহস্রজিৎ, ক্রোষ্টু, নল ও রিপু নামে চারটি পুত্র জন্মে। সহস্রজিতের পুত্র শতজিৎ। শতজিতের তিন পুত্র—মহাময়, রেণুহয় ও হৈহয়। হৈহয়ের পুত্র ধর্ম, তাঁর পুত্র নেত্র, তাঁর পুত্র কুন্তি। কুন্তির পুত্র মোহঞ্জি, মোহঞ্জির পুত্র মহিষ্মান আর মহিষ্মানের পুত্র

ভদ্রসেন। দুর্মদ ও ধনক নামে ভদ্রসেনের দুজন পুত্র জন্মে। ধনকের চার পুত্র—কৃতবীর্য, কৃতাগ্নি, কৃতবর্মা ও কৃতৌজা। কৃতবীর্যের পুত্র অর্জুন। তিনি সপ্তদ্বীপের অধীশ্বর হন এবং ভগবানের অংশজাত দত্তাত্রেয়র কাছে যোগগুণ লাভ করেন। আর কোন রাজা যজ্ঞ, দান, তপস্যা, যোগ, শাস্ত্রজ্ঞান, শৌর্য, বীর্য, দয়া প্রভৃতি গুণে অর্জুনের সমকক্ষ হতে পারবেন না। তিনি অক্ষুণ্ণ ইন্দ্রিয়শক্তি নিয়ে অপ্রতিহতবিক্রমে পঁচাশি হাজার বছর বিষয়ভোগ করেছিলেন। তাঁর কথা স্মরণ করলে লোকের বিত্ত নষ্ট হয় না, নষ্ট বিত্ত আবার লাভ হয়। ১৯-২৫

অর্জুনের সহস্র পুত্র ছিলেন, কিন্তু যুদ্ধে তাঁদের মধ্যে মাত্র পাঁচজন জীবিত ছিলেন। তাঁদের নাম জয়ধ্বজ, শূরসেন, বৃষভ, মধু, ও ঊর্জিত। জয়ধ্বজের পুত্র তালজংঘ। তাঁর একশ পুত্র জন্মে। তালজংঘ নামে সেই ক্ষত্রিয়দের সগর রাজা বিনাশ করেন। তালজংঘের শতপুত্রের মধ্যে বীতিহোত্র জ্যেষ্ঠ ছিলেন, তাঁর পুত্র মধু। মধুর একশ পুত্রের মধ্যে বৃষ্ণি সর্বজ্যেষ্ঠ। যদু, মধু ও বৃষ্ণির জন্যে এই বংশ যাদব. মাধব আর বৃষ্ণি নামে পরিচিত। যদুর পুত্র ক্রষ্টু, তাঁর পুত্র বৃজিনবান্, তাঁর পুত্র স্বাহিত, বিশদ্গু এবং বিশদ্গুর পুত্র চিত্ররথ। চিত্ররথের পুত্র মহাযোগী এবং মহানুভব শশবিন্দু। তিনি শ্রেষ্ঠ চৌদ্দ মহারত্নের[১] অধীশ্বর এবং অপরাজেয় সার্বভৌম নৃপতি ছিলেন। শশবিন্দুর দশ হাজার পত্নী ছিলেন। প্রত্যেক পত্নীর একলক্ষ সন্তান হয়; তাতে তাঁর শতকোটি পুত্র জন্মে। তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছজন হলেন পৃথুশ্রবা, পৃথুকীর্তি, পৃথুযশা ইত্যাদি। পৃথুশ্রবার পুত্র ধর্ম, তাঁর পুত্র উশনা। তিনি একশত অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। উশনার আত্মজ রুচক। রুচকের পুরুজিৎ, রুক্ম, রুক্মেষু, পৃথু ও জ্যামঘ নামে পাঁচ পুত্র জন্মে। ২৬-৩৪

জ্যামঘের পত্নী শৈব্যা। জ্যামঘের পুত্রসন্তান ছিল না; তবুও শৈব্যার ভয়ে তিনি অন্য পত্নী গ্রহণ করেন নি। একবার জ্যামঘ শত্রুভবন থেকে এক কন্যাকে হরণ করে নিয়ে আসছিলেন; সে অবস্থায় রথের মধ্যে কন্যাকে তাঁর সঙ্গে দেখে শৈব্যা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, এ কে? কাকে রথে করে এনেছ? জ্যামঘ বললেন, রানি, ইনি তোমার পুত্রবধূ। একথা শুনে শৈব্যা সবিস্ময়ে বললেন, আমি বন্ধ্যা, আমার কোন সপত্নীও নেই, অথচ ইনি আমার পুত্রবধূ একথা কেমন করে বিশ্বাস করব? তখন জ্যামঘ বললেন, রানি, তুমি যে পুত্র সন্তান প্রসব করবে ইনি তার বধূ হবেন। জ্যামঘের এই কথা শুনে বিশ্বদেব ও পিতৃগণ তা অনুমোদন করলেন। কিছুকালের মধ্যে শৈব্যা গর্ভবতী হলেন এবং এক পুত্র প্রসব করলেন। সেই কুমার বিদর্ভ নামে খ্যাত। তিনি সেই সাধ্বী কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। ৩৫-৩৯

চতুর্বিংশ অধ্যায়

বিদর্ভপুত্রদের কাহিনী

শুকদেব বললেন, মহারাজ, বিদর্ভের সেই পত্নী কুশ আর ক্রথ নামে দুই পুত্রের জন্ম দেন। বিদর্ভকুলনন্দন রোমপাদ বিদর্ভের তৃতীয় সন্তান। রোমপাদের পুত্র বভ্রু তাঁর পুত্র কৃতী, তাঁর পুত্র উশিক। উশিক থেকে চেদি, দমঘোষ প্রভৃতি রাজাদের

১ উৎকৃষ্ট স্ত্রী, অশ্ব, রথ, স্ত্রী, বাণ, নিধি, মাল্য, বস্ত্র, বৃক্ষ, শক্তি, পাশ, মণি, ছত্র, ও বিমান।

উৎপত্তি হয়। ক্রথের পুত্র কুন্তি, কুন্তির পুত্র বৃষ্ণি, বৃষ্ণির পুত্র নিবৃতি, নিবৃতির পুত্র দশার্হ। দশার্হের পুত্র ব্যোম, তাঁর পুত্র জীমূত, তাঁর পুত্র ভীমরথ, তাঁর পুত্র নবরথ। নবরথ থেকে দশরথ, দশরথ থেকে শকুনি, শকুনি থেকে করম্ভি, করম্ভি থেকে দেবরাত এবং দেবরাত থেকে দেবক্ষত্রের জন্ম হয়। দেবক্ষত্রের পুত্র মধু, তাঁর পুত্র কুরুবংশ, তাঁর পুত্র অনু, তাঁর পুত্র পুরুহোত্র, তাঁর পুত্র আয়ু। আয়ুর পুত্র সাত্বত; সাত্বতের ভজমন, ভজি, দিব্য, বৃষ্ণি, দেবাবৃধ, অন্ধক ও মহাভোজ নামে সাতজন পুত্রের জন্ম হয়। ভজমানের দুই স্ত্রী। তাঁদের মধ্যে একজনের গর্ভে নিম্লোচি, কিঙ্কন ও ধৃষ্টি নামে তিনজন এবং আর একজনের গর্ভে শতাজিৎ, সহস্রাজিৎ ও অযুতাজিৎ নামে তিন পুত্রের জন্ম হয়েছিল। ১-৮

বভ্রু দেবাবৃধের পুত্র। এই পিতা-পুত্র প্রসঙ্গে কবিগণ দুটি শ্লোক গান করেন; যথা—আমরা দূরে থেকে যেমন শুনি, কাছে থেকেও তেমন দেখি। মানুষের মধ্যে বভ্রু শ্রেষ্ঠ আর দেবতুল্য। ছ' হাজার তিয়াত্তর জন লোক বভ্রু ও দেবাবৃধের উপদেশে মোক্ষ লাভ করেন। সাত্বতের পুত্র মহাভোজ অত্যন্ত ধার্মিক ছিলেন। ভোজগণ তাঁর বংশজাত। সুমিত্র ও যুধাজিৎ নামে বৃষ্ণির দুই পুত্র জন্মে। যুধাজিতের পুত্র শিনি এবং অনমিত্র। অনমিত্রের পুত্র নিঘ্ন। নিঘ্নের পুত্র সত্রাজিৎ ও প্রসেন। অনমিত্রের শিনি নামে আর এক পুত্র ছিল। শিনির পুত্র সত্যক। সত্যকের পুত্র যুযুধান (সাত্যকি), তাঁর পুত্র জয়, তাঁর পুত্র কুণি, তাঁর পুত্র যুগন্ধর। অনমিত্রের বৃষ্ণি নামে আর এক পুত্র ছিল। সেই বৃষ্ণির শ্বফল্ক ও চিত্ররথ নামে দুই পুত্র হয়। শ্বফল্কের ঔরসে গান্দিনীর গর্ভে অক্রুর আসঙ্গ, সারমেয়, মৃদুর, মৃদুবিৎ, গিরি, ধর্মবৃদ্ধ, সুকর্মা, ক্ষত্রোপেক্ষ, অরিমর্দন, শত্রুঘ্ন, গন্ধমাদ ও প্রতিবাহু নামে তেরজন পুত্র এবং তাঁদের সুচারু নামে এক ভগিনীর জন্ম হয়। অক্রুরের দুই পুত্র—দেববান ও উপদেব। চিত্ররথের পৃথু, বিদূরথ প্রভৃতি বহু সন্তান জন্মেছিল; তাঁরা সকলেই বৃষ্ণিবংশজাত। অন্ধকের চার পুত্র—কুকুর, ভজমান, শুচি আর কম্বলবর্হিষ। কুকুরের পুত্র বহ্নি, তাঁর পুত্র বিলোমা, তাঁর পুত্র কপোতরোমা এবং কপোতরোমার পুত্র অনু। তুম্বুরু অনুর সখা ছিলেন। অনুর পুত্র অন্ধক, অন্ধকের পুত্র দুন্দুভি, দুন্দুভির পুত্র অবিদ্য, অবিদ্যের পুত্র পুনর্বসু। পুনর্বসুর পুত্রের নাম আহুক এবং কন্যার নাম আহুকী। আহুকের দুই পুত্র হয়। দেবকের চার পুত্র—দেববান, উপদেব, সুদেব আর দেববর্ধন। তাঁদের ধৃতদেবা, শান্তিদেবা, উপদেবা, শ্রীদেবা, দেবরক্ষিতা, সহদেবা ও দেবকী নামে সাতজন ভগিনীও ছিলেন। বসুদেবের সঙ্গে তাঁদের বিবাহ হয়। কংস, সুনামা, নাগ্রোধ, কঙ্ক, শঙ্কু, সুহূ, রাষ্ট্রপাল, ধৃষ্টি ও তুষ্টিমান—এঁরা সকলেই উগ্রসেনের পুত্র তাছাড়া কংসা, কংসবতী, কঙ্কা, শূরভূ আর রাষ্ট্রপালিকা নামে তাঁর পাঁচজন কন্যাও ছিলেন। বসুদেবের দেবভাগ প্রভৃতি কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের সঙ্গে তাঁদের বিবাহ হয়েছিল। ৯-২৫

চিত্ররথের পুত্র বিদূরথ থেকে শূর জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পুত্র ভজমান, তাঁর পুত্র শিনি, তাঁর পুত্র ভোজ এবং ভোজের পুত্র হৃদিক। দেবমীঢ়, শতধনু ও কৃতবর্মা নামে হৃদিকের তিন পুত্র ছিলেন। দেবমীঢ়ের পুত্র শূর। তাঁর পত্নীর নাম মারিষা। মারিষার গর্ভে বসুদেব, দেবভাগ, দেবশ্রবা, আনক, সৃঞ্জয়, শ্যামক, কঙ্ক, শমীক, বৎসক ও বৃক নামে দশজন নিষ্পাপ পুত্রের জন্ম হয়। বসুদেবের জন্মের সময় দেবতারা স্বর্গে আনক (ঢাক) ও দুন্দুভি বাজিয়েছিলেন। তাই তাঁর আর এক নাম 'আনকদুন্দুভি'। বসুদেবই শ্রীহরির উৎপত্তিস্থান। তাঁদের পৃথা, শ্রুতদেবা, শ্রুতকীর্তি, শ্রুতশ্রবা ও রাজাধিদেবী নামে

পাঁচ ভগিনী ছিলেন। কুন্তিরাজ শূরের সখা ছিলেন। কুন্তিরাজকে অপুত্রক দেখে শূর তাঁর কন্যা পৃথাকে তাঁর হাতে দান করেন। পৃথা একবার দুর্বাসাকে তুষ্ট করে তাঁর কাছে দেবহূতি বিদ্যা লাভ করেন। সেই বিদ্যার বল পরীক্ষা করার জন্যে শুচি হয়ে তিনি সূর্যদেবকে আহ্বান করেন। সূর্যদেব তৎক্ষণাৎ এসে হাজির হলে পৃথা অত্যন্ত বিস্মিত হলেন এবং সবিনয়ে বললেন, হে দেব, আমি শুধু পরীক্ষা করে দেখার জন্যেই এই বিদ্যা প্রয়োগ করেছি, অন্য কোন কারণ নেই। অতএব আমাকে ক্ষমা করুন, এবার আপনি চলে যান। সূর্যদেব বললেন, দেবদর্শন ব্যর্থ হয় না; আমি তোমার গর্ভাধান করব এবং তোমার যোনি যাতে দূষিত না হয় আমি তাই করব। সূর্যদেব এ কথা বলে পৃথার গর্ভাধান করে চলে গেলেন। তখনি পৃথার দ্বিতীয় সূর্যের মত দীপ্তিশালী এক পুত্র হল। কিন্তু লোকনিন্দার ভয়ে তিনি সেই শিশুকে নদীতে ত্যাগ করলেন। তোমার প্রপিতামহ সত্যবিক্রম পাণ্ডু পৃথার পাণিগ্রহণ করেন। ২৬-৩৬

করূষবংশের বৃদ্ধশর্মা শ্রুতদেবাকে বিবাহ করেন। দিতির পুত্র দন্তবক্র ঋষি শাপগ্রস্ত হয়ে শ্রুতদেবার গর্ভে জন্ম নেন। কেকয়বংশীয় ধৃষ্টকেতু শ্রুতকীর্তিকে বিবাহ করেন। তাঁর সন্তর্দন প্রভৃতি পাঁচ পুত্র হয়। জয়সেন রাজাধিদেবীকে বিবাহ করেন; তাঁদের বিন্দ ও অনুবিন্দ নামে দুই পুত্র জন্মে। চেদিরাজ দমঘোষের সঙ্গে শ্রুতশ্রবার বিবাহ হয়; তাঁদের পুত্র শিশুপাল। তাঁর জন্মবিবরণ আগেই বলেছি। দেবভাগের ঔরসে কংসার গর্ভে চিত্রকেতু ও বৃহদ্বল, দেবশ্রবার ঔরসে কংসবতীর গর্ভে সুবীর ও ইষুমান, কঙ্কের ঔরসে কঙ্কার গর্ভে বক, সত্যজিৎ ও পুরুজিৎ, সৃঞ্জয়ের ঔরসে রাষ্ট্রপালীর গর্ভে বৃষ ও দুর্মর্ষণ প্রভৃতি, শ্যামকের ঔরসে শূরভূমির গর্ভে হরিকেশ ও হিরণ্যাক্ষ, বৎসকের ঔরসে মিশ্রকেশী অপ্সরার গর্ভে বৃক ইত্যাদি, বৃকের ঔরসে দুর্বাক্ষীর গর্ভে তক্ষ ও পুষ্করমাল প্রভৃতি, শমীকের ঔরসে সুদামনীর গর্ভে সুমিত্র, অর্জুনপাল ইত্যাদি এবং আনকের ঔরসে কর্ণিকার গর্ভে ঋতধামা ও জয়ের জন্ম হয়। বসুদেবের পৌরবী, রোহিণী, ভদ্রা, মদিরা, রোচনা, ইলা, দেবকী প্রভৃতি বহু পত্নী ছিলেন। তাঁদের মধ্যে বলদেব, গদ, সারণ, দুর্মদ, বিপুল, ধ্রুব, কৃত প্রভৃতি রোহিণীর পুত্র; সুভদ্র, ভদ্রবাহু, দুর্মদ, ভদ্র, ভূত ইত্যাদি বারোজন পৌরবীর পুত্র; নন্দ, উপনন্দ, কৃতক, শূর প্রভৃতি মদিরার পুত্র; কেশী ভদ্রার একমাত্র পুত্র; হস্ত, হেমাঙ্গদ প্রভৃত রোচনার পুত্র; যদুশ্রেষ্ঠ উরুবল্ক প্রভৃতি ইলার পুত্র; বিপৃষ্ঠ ধৃতদেবার পুত্র; প্রশম, প্রথিত প্রভৃতি শান্তিদেবার পুত্র। উপদেবার রাজন্য, কল্প, বর্ষ প্রভৃতি দশজন পুত্র হয়। শ্রীদেবার বসু, হংস, সুবংশ প্রভৃতি ছজন পুত্র জন্মে। দেবরক্ষিতার গর্ভে গদ প্রভৃতি নজন পুত্রের জন্ম হয়। সাক্ষাৎ ধর্ম থেকে যেমন বসুদের উৎপত্তি হয়, তেমনি বসুদেবের ঔরসে সহদেবার গর্ভে প্রবর, শ্রুতমুখ প্রভৃতি আটটি সন্তানের জন্ম হয়। দেবকীর গর্ভেও বসুদেবের কীর্তিমান, সুষেণ, ভদ্রসেন, ঋজু, সম্মর্দন, ভদ্র, নাগরাজ ও সংকর্ষণ নামে আটটি পুত্র হয়। স্বয়ং শ্রীহরি তাঁদের অষ্টম সন্তান। আপনার পিতামহী সুভদ্রাও তাঁদের সন্তান। ৩৭-৫৫

যখনই ধর্মের হ্রাস ও অধর্মের বৃদ্ধি হয়, ভগবান শ্রীহরি তখনই অবতাররূপে আপনাকে সৃষ্টি করেন।[১] মহারাজ, যিনি মায়ানিয়ন্তা, সঙ্গহীন, সর্বসাক্ষী ও সর্বগত, তাঁর আপন মায়া ছাড়া জীবের জন্ম বা কর্মের হেতু আর কি হতে পারে?

১ তুলনীয়: যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্। গীতা, ৪।৭

তাঁর মায়ালীলা জীবের পক্ষে অনুগ্রহস্বরূপ। তিনি সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের আদি নিদান ; তাঁতে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় নিবৃত্ত হয় এবং তিনিই জীবের মোক্ষ লাভের কারণ হয়ে থাকেন। রাজলক্ষণযুক্ত বহু অক্ষৌহিণীর অধীশ্বর অসুরগণ পৃথিবী আক্রমণ করলে পৃথিবী ভারাক্রান্ত হয়। সেই ভার হরণের জন্যে ভগবান অবতাররূপে আসেন। দেবশ্রেষ্ঠগণ মনে চিন্তা করেও যে সমস্ত কাজের মীমাংসা করতে পারেন না, মধুসূদন সংকর্ষণের (বলদেবের) সঙ্গে অবলীলাক্রমে সে সবই সম্পন্ন করেন। তিনি সংকল্প মাত্রেই ভূভার হরণে সমর্থ। তবু কলিযুগে তাঁর যে সব ভক্ত জন্মাবেন তাঁদের প্রতি অনুগ্রহ করে তিনি দুঃখ, শোক ও অজ্ঞানান্ধকার দূর করার জন্যে তাঁর পবিত্র যশ বিস্তার করে গিয়েছেন। এই যশ সাধুপুরুষদের কর্ণামৃত এবং শ্রেষ্ঠতীর্থস্বরূপ। কর্ণরূপ অঞ্জলিতে তা একবার মাত্র পান করলে মানুষ কর্মবাসনা ত্যাগ করতে পারে। তাই ভোজ, বৃষ্ণি, অন্ধক, মধু, শূরসেন, দশার্হ, কুরু, সৃঞ্জয় ও পাণ্ডু বংশের লোকগণ সর্বদা তাঁর চরিত্রের গুণগান করেন। স্নিগ্ধ হাস্যময় দর্শনে, উদার বাক্যে, বিক্রমলীলায় এবং সর্বাঙ্গসুন্দর মূর্তিতে তিনি মনুষ্য-লোকের আনন্দ বৃদ্ধি করেছিলেন। মকরকুণ্ডলে তাঁর কর্ণদ্বয় এবং কপোল-যুগল পরম রমণীয় হয়ে থাকত ; তাঁর সুন্দর মুখে বিলাসের হাসি লেগেই ছিল ; দেখে মনে হত যেন সব সময় উৎসব হচ্ছে। তাঁর মুখচ্ছবি বারবার দেখেও নর-নারীদের পরিতৃপ্তি হত না। এমন কি পলকের জন্যে চোখের আড়াল হলেই তারা নিমেষকর্তা নিমির প্রতি ক্রুদ্ধ হত। শ্রীকৃষ্ণ নিজরূপে জন্মগ্রহণ করেন, পরে মানুষের আকার ধরে পিতৃগৃহ থেকে ব্রজে যান। সেখানে গিয়ে তিনি ব্রজবাসীদের প্রয়োজনে বহু শত্রু নাশ করেন। তার পর বহুদার-পরিগ্রহ করে শত শত সন্তানের জন্ম দেন। শেষে লোকসমাজে তাঁর বেদমার্গ প্রচার করে এবং অসংখ্য যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে নিজের আত্মাকে অর্চনা করেন। কৌরবদের আত্মকলহকে হেতু করে তিনি দৃষ্টিদ্বারা নৃপতিদের সৈন্যগণকে সংহার করেন ; ফলে পৃথিবীর গুরুভার হরণ এবং অর্জুনের জয় ঘোষিত হয়। অবশেষে উদ্ধবকে তত্ত্বজ্ঞান দান করে তিনি পরমধামে চলে যান। ৫৬-৬৭

দশম স্কন্ধ

প্রথম অধ্যায়

কংসের দ্বারা দেবকীর ছয় পুত্র বধ

রাজা পরীক্ষিৎ শুকদেবকে বললেন, ভগবান্, আপনি চন্দ্র ও সূর্য বংশের কথা এবং ঐ দুই বংশের রাজাদের পরমাশ্চর্য চরিত্রকথা বলেছেন। তারপর আপনি মহাত্মা যদুর বংশাবলীও বর্ণনা করলেন। এখন যদুবংশে অংশ (বলরাম) সহ অবতীর্ণ ভগবান বিষ্ণুর লীলাসমূহের কথা বলুন। মুনি, যদিও আপনি নবম স্কন্ধের শেষে সংক্ষেপে ভগবানের নানা কাজের বর্ণনা করেছেন তবুও বিশ্বাত্মা বিষ্ণু, যিনি সর্বভূতের পালক, যদুবংশে জন্ম নিয়ে যা যা করেছেন তা বিস্তারিত ভাবে বলুন। ১-৩

পৃথিবীতে তিন রকমের মানুষ আছে—মুক্ত, মুমুক্ষু ও বিষয়ী। এদের মধ্যে কারোরই হরিচরিত্র শুনে আশ মেটে না। যিনি মুক্ত তিনি সর্বদাই ভগবানের গুণকথা কীর্তন করেন। হরিকথা সংসারতাপের মহৌষধ বলে তা মুমুক্ষু পুরুষের মোক্ষের উপায়, আর তা কানের ও মনের আনন্দদায়ক বলে বিষয়ীদের পরম বিষয়। আত্মঘাতী বা পশুঘাতী ছাড়া কে হরিনামে বিরক্ত হবে? তার উপর আবার ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আমাদের কুলদেবতা, তাই তাঁর কথা নিত্যই শোনা উচিত। আমার পিতামহ পাণ্ডবগণ তাঁর চরণ দুখানি তরীরূপে পেয়ে অমরজয়ী ভীষ্ম প্রভৃতি তিমিতুল্য মহারথে পূর্ণ অতি ভীষণ কৌরবসৈন্য-সাগরও গোষ্পদের মত অনায়াসে পার হয়েছিলেন। তিনি যে শুধু পাণ্ডবদেরই রক্ষা করেছেন, এমন নয়। কুরুপাণ্ডবদের সন্তান আমার এই শরীর মায়ের গর্ভে থাকার সময় যখন অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্রে দগ্ধ হয়ে যাচ্ছিল তখন মা তাঁর শরণাপন্ন হন। তিনি সুদর্শন চক্র নিয়ে মাতৃগর্ভে ঢুকে আমাকে রক্ষা করেছিলেন। সেই মায়ারূপী ভগবানের বীর্যের কাহিনী যথাযথ বর্ণনা করুন। তিনি কালরূপে সমস্ত প্রাণীর অন্তরে এবং বাইরে থেকে মৃত্যু বা সংসার ও মুক্তি দান করছেন। তাঁর কথা বলুন। প্রভু, আপনি একবার বললেন, সংকর্ষণ রাম রোহিণীর পুত্র, আবার তাঁকেই দেবকীর পুত্র বলেও বর্ণনা করলেন। দেহান্তর গ্রহণ না করে রোহিণীর পুত্র আবার কি করে দেবকীর গর্ভে এলেন? আর ভগবান মুকুন্দই বা কি কারণে পিতৃগৃহ থেকে ব্রজে যান? সাত্বতপতি ভগবান জ্ঞাতিদের সঙ্গে কোথায় বাস করেছিলেন? কেশব ব্রজ ও মধুপুরে বাস করার সময় কি কি করেছিলেন? কংস তাঁর মামা, তাঁর বধযোগ্য নিশ্চয়ই নয়; তবে কি কারণে তিনি কংসকে বধ করেন? পরম সুন্দর মানবদেহ ধারণ করে কত বৎসর শ্রীকৃষ্ণ যদুপুরে বৃষ্ণিদের সঙ্গে বাস করেছিলেন? তাঁর পত্নীই বা কজন? মুনি, আপনি সর্বজ্ঞ। এই সব ও শ্রীকৃষ্ণের অন্যান্য লীলাগুলি বর্ণনা করুন, শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে আমি শুনব। যদিও আমি জলগ্রহণ পর্যন্ত ত্যাগ করেছি, তবু আপনার মুখনিঃসৃত হরিকথামৃত প্রাণ ভরে পান করায় উপবাসে

করলেন এবং কলির কলুষনাশক কৃষ্ণচরিত্র বর্ণনা শুরু করলেন। তিনি বললেন, রাজর্ষি, তোমার বুদ্ধি উপযুক্ত বিষয়েই নিবিষ্ট হয়েছে। সে জন্যই বাসুদেবের কথায় তোমার দৃঢ় অনুরাগ জন্মেছে। বিষ্ণুর শ্রীচরণ থেকে উৎপন্ন গঙ্গায় স্নান করলে যেমন লোকের তিনপুরুষ পবিত্র হয়, তেমনি বাসুদেবের বিষয়ে প্রশ্ন প্রশ্নকর্তা, বক্তা ও শ্রোতা এই তিন জনকেই পবিত্র করে। মহারাজ, দর্পিত রাজার রূপধারী দৈত্যদের অসংখ্য সেনার ভাবে পীড়িত হয়ে পৃথিবী ব্রহ্মার শরণাপন্ন হয়েছিলেন। কাতর ও অশ্রুমুখী হয়ে পৃথিবী গাভীর রূপ ধরে ব্রহ্মার কাছে গিয়ে করুণ স্বরে কাঁদতে কাঁদতে তাঁকে নিজের দুঃখ জানালেন। ব্রহ্মা সব বৃত্তান্ত শুনে পৃথিবীকে নিয়ে ত্রিলোচন প্রভৃতি দেবতাদের সঙ্গে ক্ষীর-সমুদ্রের তীরে গেলেন। সেখানে তাঁরা সমাহিতচিত্তে পুরুষসূক্ত মন্ত্রে দেবদেব, জগন্নাথ, সব কামনার ফলদাতা ও সব দুঃখের পরিত্রাতা পরমপুরুষ ভগবানের উপাসনায় প্রবৃত্ত হলেন। কিছু পরেই ব্রহ্মা এক আকাশবাণী শুনতে পেয়ে দেবতাদের সম্বোধন করে বললেন, অমরগণ, পরমপুরুষ যা বললেন আমার কাছে তা শোন ও অবিলম্বে সেই অনুসারে কাজ কর। পৃথিবীর যে কষ্ট হচ্ছে তা আমাদের আগেই পরমপুরুষ ভগবানের জানা হয়ে গেছে; তোমরা নিজ নিজ অংশে যদুবংশে জন্ম নাও। ঈশ্বরের ঈশ্বর শ্রীহরি নিজের কালশক্তি দিয়ে পৃথিবীর ভার হরণ করবার জন্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হচ্ছেন। পরমপুরুষ সাক্ষাৎ ভগবান বসুদেবের ঘরে শীঘ্রই জন্মগ্রহণ করবেন। তাঁর প্রিয় কাজ করবার জন্য দেবাঙ্গনারাও গিয়ে পৃথিবীতে জন্ম নিন। দেবগণ, বাসুদেবের অংশ সহস্রমুখ অনন্তদেব ভগবানের প্রিয়কাজ করার জন্য আগেই আবির্ভূত হবেন। যে ভাগবতী বিষ্ণুমায়ায় জগৎ সম্মোহিত হয় তিনিও প্রভুর আদেশে যশোদার গর্ভে আপন অংশে অবতীর্ণ হবেন। শুকদেব বললেন, প্রজাপতিদের পতি ব্রহ্মা দেবতাদের এ রকম আদেশ করে এবং সান্ত্বনা বাক্যে পৃথিবীকে আশ্বস্ত করে নিজধামে ফিরে গেলেন। ১৪-২৬

মহারাজ, আগে যদুপতি শূরসেন মথুরা নগরে বাস করে মথুরামণ্ডলের মধ্যে শূরসেন নামে রাজ্য পালন করতেন। সেই থেকে এই মথুরা নগরী সমস্ত যাদবদের রাজধানী হয়। ভগবান শ্রীহরি সব সময় সেখানে বিরাজ করছেন। শূর বংশের বসুদেব একসময় মথুরা নগরে বিবাহ করে নবোঢ়া পত্নী দেবকীকে নিয়ে রথে করে নিজ গৃহে যাচ্ছিলেন। উগ্রসেনের পুত্র কংস তার বোন দেবকীর প্রীতির জন্য রথের অশ্বরজ্জু ধরে শত শত স্বর্ণময় রথে পরিবৃত হয়ে রথ চালিয়ে যাচ্ছিল। দেবকীর পিতা দেবক কন্যাবৎসল ছিলেন। তিনি মেয়ের বিদায়ের সময় সোনার মালায় অলংকৃত চারশ হাতী, দশ হাজার ঘোড়া, আঠারো শ' রথ ও নানা অলংকারে ভূষিত দুই শত সুকুমারী দাসী যৌতুক দিয়েছিলেন। বরবধূর বিদায়যাত্রা শুরু হলে তাঁদের মঙ্গলের জন্য অসংখ্য শঙ্খ, তূর্য, খোল, দুন্দুভি ইত্যাদি বেজে উঠল। কংস বল্গা ধরে যেতে থাকলে পথের মধ্যে এক অশরীরী বাণী তাকে সম্বোধন করে বলল, অবোধ কংস, তুই যাকে বহন করছিস সেই দেবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তান তোকে হত্যা করবে। এই কথা শোনামাত্র পাপিষ্ঠ কংস ভগ্নীর প্রাণবধের উদ্দেশ্যে খড়্গ হাতে তার চুলের মুঠি ধরল। মহামতি বসুদেব, অবতার জন্ম নিলেই খলের প্রতিকার সম্ভব হবে ভেবে, ঐ নির্লজ্জ ক্রূর কংসকে কিছুটা শান্ত করবার জন্য বললেন, বীর, তুমি ভোজ-বংশের গৌরব, অন্যান্য বীরেরা তোমার প্রশংসা করেন। তুমি কি করে অবলা বোনকে বিবাহ-উৎসবের মধ্যেই হত্যা করবে? হে বীর, মৃত্যুর ভয়েই কি তুমি এঁকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছ? জন্ম নিলেই দেহীর মৃত্যু আছে, কেননা বিধাতা তা জন্মের সময় ললাটে লিখে দেন। আজ হোক বা একশ বছর

পরেই হোক প্রাণীদের মৃত্যু নিশ্চয়ই হবে। তাই মৃত্যুভয়ে পাপ করা যুক্তিযুক্ত নয়, অনিবার্য মৃত্যুকে বিলম্বিত করবার জন্যও পাপ করা অযৌক্তিক। পঞ্চত্ব পাবার পর যদি আবার দেহান্তর না হয় তাহলেও হয়তো পাপ করে এই দুর্লভ দেহের পালন করা উচিত হতে পারে। কিন্তু তা তো নয়। যেমন পথ চলার সময় লোকে আগের পা মাটিতে রেখে তবেই পেছনের পা তোলে, যেমন জোঁক একটি ঘাস ধরে তবেই আগের ঘাসটি ত্যাগ করে, দেহীও সে রকম নিজ কর্ম অনুসারে অন্য দেহ অবলম্বন করে পূর্বদেহ ত্যাগ করে থাকে। জাগ্রত অবস্থায় কোন কিছু দেখা বা শোনার ছাপ মনের মধ্যে গভীর ভাবে অঙ্কিত হয়ে গেলে একমনে সেই কথা চিন্তা করতে করতে লোকে স্বপ্নে সে সবই দেখে বা শুনে তন্ময় হয়ে যায়। এমনকি নিজের প্রকৃত অবস্থা ও দেহ পর্যন্ত বিস্মৃত হয়ে আসক্তির অনুরূপ দেহ ধারণ করে স্বপ্নে-দেখা বিষয় ভোগ করে। সেই রকম জীবও কামনা অনুসারে আগের দেহ বিসর্জন দিয়ে অন্য দেহ ধারণ করে। মানুষের কামনাময় মন নানা সংস্কারে পূর্ণ থাকে। তবুও মৃত্যুর সময় যে কর্ম প্রবল হয়ে ফলদানে উন্মুখ হয় জীব তার অনুরূপ দেহ এবং ভোগ পেয়ে থাকে। গুণের তারতম্য অনুসারে পঞ্চভূতে গঠিত অনন্ত দেহের মধ্যে কর্মফল অনুসারে যেটিতে মন আসক্ত হয় সেই দেহ নিয়েই জীব জন্মায়। চন্দ্র প্রভৃতি জ্যোতি যে রকম তেল, ঘি ইত্যাদি বস্তুতে বা জলপূর্ণ ঘটে প্রতিবিম্বিত হলে বাতাসের স্পর্শে কাঁপে বলে মনে হয়, সেরকম জীব অবিদ্যা-রচিত সেই দেহমনকে আত্মা মনে করে মুগ্ধ হয়। অতএব, যে পুরুষ নিজের মঙ্গল কামনা করেন, তিনি কখনও কাউকে হিংসা করবেন না। কারণ, যিনি অন্যকে হিংসা করেন, অন্যেরও তাঁকে হিংসা করবার সম্ভাবনা থাকে এবং পরকালেও তাঁকে যমযন্ত্রণা ভোগ করতে হতে পারে। তোমার এই কনিষ্ঠা বোন বালিকামাত্র। সে অসহায় এবং কাতর; দেখ সে ভয়ে প্রায় কাঠের পুতুলের মত অচেতন হয়ে গেছে। বীর, তুমি দীনকে দয়া করে থাক। এই স্নেহের পাত্রীকে হত্যা করা তোমার পক্ষে উচিত কাজ হবে না। ২৭-৪৫

শুকদেব বললেন, হে কৌরব, কংস একে অতি নির্দয় তার উপর আবার সে দৈত্যদের অনুগামী হয়েছিল। তাই বসুদেব যদিও তাকে ঐ রকম তোষণ করে ও ভয় দেখিয়ে উপদেশ দিলেন তবুও সে ভগ্নী-হত্যার চেষ্টা থেকে নিবৃত্ত হল না। তার মনের দৃঢ় সঙ্কল্পের কথা বুঝতে পেরে বসুদেব কর্তব্য চিন্তা করতে লাগলেন। শেষে ভেবে একটি উপায় দেখতে পেলেন। প্রথমে তাঁর মনে হল এ ব্যক্তি খল, এ আমার কথা মানবে না। পরে নিজেই বিবেচনা করলেন যে, বুদ্ধি এবং বল দিয়ে যতদূর সম্ভব মৃত্যুকে নিবারণ করাই বুদ্ধিমানের কর্তব্য। তাতেও যদি নিবারণ না হয় তাহলে তার অপরাধ নেই। তাই মৃত্যুরূপী এই কংসের হাতে আমার পুত্রকে সমর্পণ করার অঙ্গীকার করে এখনকার মত তো এই দীন বালিকাকে রক্ষা করি। পরে যখন পুত্র জন্মাবে তখন যা হবার তা হবে। আমার পুত্র জন্মাবার আগেই যদি এই দুরাত্মা মরে যায় তা হলে আমার এ কাজ অন্যায় হবে না। আর যদি ইতিমধ্যে এ না মরে তবে আমার পুত্রের দ্বারাই যে এর মৃত্যু ঘটবে না তা-ই বা কে বলতে পারে? দেবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তান তোমায় হত্যা করবে—এই আকাশবাণী যখন শোনা গেল তখন সন্তান অর্পণ করতে অঙ্গীকার করাই সৎ পরামর্শ; বিধাতার বিধানের তো অন্যথা হয় না। অঙ্গীকার করলে আপাতত মৃত্যু নিবারিত হবে। পরে কিছু ঘটলে আমার অপরাধ হবে না। বনে বা গ্রামে আগুন লাগলে কখনও দেখা যায় যে কাছাকাছি কোন গাছ বা ঘর হয়তো রক্ষা পেল, অথচ দূরের গাছপালা ঘরবাড়ি দগ্ধ হল। একে যেমন অদৃষ্ট ছাড়া অন্য কিছু বলা

যায় না তেমনি প্রাণীদের জন্ম-মৃত্যুর কারণও অদৃষ্ট মাত্র, আর কিছু নয়। নিজের জ্ঞান অনুসারে এ রকম নানা বিবেচনার পর বসুদেব অনেক সম্মান করে সেই পাপাত্মা কংসের পূজা করলেন। তারপর মনে মনে ক্ষুব্ধ হলেও কংসের বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য মুখমণ্ডল হাসিতে ভরিয়ে সেই নির্লজ্জ ক্রূরকে সম্বোধন করে আবার বললেন, সৌম্য, অশরীরী বাণী যা বলল, আমি নিশ্চয় বলছি, তা থেকে তোমার কোন রকম ভয়ের সম্ভাবনা নেই। আকাশবাণী বলল, দেবকীর অষ্টম গর্ভে জাত সন্তান তোমার হন্তা হবে। জন্মের পর দেবকীর সব পুত্রসন্তানই আমি তোমার হাতে সমর্পণ করব। তুমি তাদের নিয়ে যা ইচ্ছা করো। ৪৬-৫৪

শুকদেব বললেন, মহারাজ, কংস বসুদেবের কথা যুক্তিযুক্ত মনে করে ভগ্নীবধ থেকে নিবৃত্ত হল। বসুদেবও প্রীত হয়ে তার প্রশংসা করতে করতে নিজের গৃহে গেলেন। তারপর প্রসূতিকাল উপস্থিত হলে সর্বদেবময়ী দেবকী বৎসরে একটি করে ক্রমে আটটি পুত্র ও একটি কন্যা প্রসব করলেন। বসুদেব মিথ্যাকে প্রশ্রয় দিতেন না, তাই শোকে বিহ্বল হয়েও অঙ্গীকার পালনের জন্য প্রথম পুত্রসন্তান কীর্তিমানকে অতিকষ্টে কংসের হাতে তুলে দিলেন। বসুদেব পিতা হয়ে কি ভাবে ছেলেকে নিজেই মৃত্যুর হাতে তুলে দিলেন এখানে সেই বিচার করা ঠিক হবে না। কারণ সত্যপ্রতিজ্ঞ সাধুদের কাছে দুঃসহ কিছুই নেই। যাঁরা ভগবানকেই একমাত্র সত্য বলে জানেন, তাঁরা আর কিসের অপেক্ষা করেন? অসৎ ব্যক্তি করতে পারে না হেন কাজ নেই। আর যাঁরা হৃদয়ে ভগবান হরিকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন তাঁদের কিছুই অত্যাজ্য নয়। যাই হোক, বসুদেবের সাধুতা ও সত্যনিষ্ঠা দেখে কংস সন্তুষ্ট হল এবং হাসতে হাসতে বলল, তুমি এই পুত্র নিয়ে যাও, এর থেকে আমার ভয় নেই। তোমাদের অষ্টম সন্তান থেকেই আমার মৃত্যুভয়। জন্ম হলেই তাকে এনে দিও। ৫৫-৬০

এই কথা শুনে বসুদেব পুত্র নিয়ে চলে গেলেন। কিন্তু অসৎ কংসের ঐ কথায় তাঁর পূর্ণ বিশ্বাস না হওয়ায় আনন্দ করতে পারলেন না। ব্রজপুরে নন্দ প্রভৃতি গোপ ও তাঁদের স্ত্রীরা এবং বসুদেব প্রভৃতি বৃষ্ণিবংশীয়, দেবকী প্রভৃতি যদুস্ত্রী, বসুদেব ও নন্দের উভয় কুলের জ্ঞাতি, সুহৃদ-বন্ধুরা যাঁরা কংসের অনুগত তাঁরা সকলেই দেবতা। একদিন নারদ কংসের কাছে ঐ কথা বলে এলেন এবং পৃথিবীর ভারস্বরূপ দৈত্যদের বধ করার জন্য দেবতারা উদ্যোগ করছেন তাও জানালেন। দেবর্ষি চলে যাবার পরই কংস, যদুরা দেবতা এবং দেবকীর গর্ভজাত সন্তানই নিজের মৃত্যুরূপী সাক্ষাৎ বিষ্ণু একথা মনে করে তৎক্ষণাৎ বসুদেব ও দেবকীকে শিকলে বেঁধে কারাগারে আবদ্ধ করল। তাঁদের যেমন একটি একটি করে পুত্র জন্মাতে থাকল কংসও সেই পুত্রই বিষ্ণু এই আশংকায় একটি একটি করে তাদের বধ করতে লাগল। মহারাজ, পৃথিবীতে কোন লোভী রাজাই ইন্দ্রিয়তৃপ্তি এবং সুখভোগের জন্য মা বাবা ভাই বোন এমনকি সমস্ত বন্ধুদের পর্যন্ত হত্যা করতে সঙ্কুচিত হয় না। কংসের পিতা উগ্রসেন যদু, ভোজ ও অন্ধক বংশের রাজা ছিলেন। কংস তাঁকে কারারুদ্ধ করে নিজে সমস্ত শূরসেন রাজ্য ভোগে প্রবৃত্ত হল। বিষ্ণুর হাতে নিহত মহাসুর কালনেমিই এখন কংসরূপে জন্ম নিয়েছে একথা জেনে সে (কংস) যদুদের সঙ্গে বিরোধ আরম্ভ করল। ৬১-৬৯

দ্বিতীয় অধ্যায়

দেবকীর গর্ভে ভগবানের আবির্ভাব

শুকদেব বললেন, মহারাজ, মগধরাজ জরাসন্ধের একান্ত আশ্রিত মহাবল কংস প্রলম্ব, বক, চানূর, তৃণাবর্ত, অঘ, মুষ্টিক, অরিষ্ট, দ্বিবিদ, পূতনা, কেশী, ধেনুক, বাণ, ভৌম প্রভৃতি অসুর-রাজাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে যদুদের পীড়ন করতে লাগল। তাতে ব্যতিব্যস্ত হয়ে যাদবরা কুরু, পাঞ্চাল, কেকয়, শাল্ব, বিদর্ভ, নিষধ, বিদেহ, কোশল প্রভৃতি দেশে পালিয়ে গেল। কিছু জ্ঞাতি কংসের আজ্ঞাবহ হয়ে তার সেবায় নিবিষ্ট রইল। তারপর কংসের দ্বারা ক্রমে দেবকীর ছয় পুত্র নিহত হলে ভগবান বিষ্ণুর কলাস্বরূপ অনন্তদেব দেবকীর সপ্তম গর্ভে প্রবেশ করলেন। সেই গর্ভ দেখে দেবকীর আনন্দ এবং শোক দুইই একসঙ্গে উৎপন্ন হল। দুষ্ট কংসের অত্যাচারে তাঁর অনুগত যদুরা ভীত হয়েছেন জেনে বিশ্বাত্মা ভগবান যোগমায়াকে আদেশ করলেন, দেবি, গোপ ও গোসমূহে শোভিত ব্রজে চলে যাও। বসুদেব-গৃহিণী রোহিণী গোকুলে নন্দের গৃহে বাস করছেন। শুধু তিনিই নন, বসুদেবের অন্যান্য স্ত্রীরাও কংসের ভয়ে ভীত হয়ে অলক্ষ্যস্থানে বাস করছেন। দেবকীর গর্ভে যে সন্তান আছে তাঁকে আকর্ষণ করে রোহিণীর উদরে সংস্থাপন কর। আকর্ষণ করলে গর্ভ কিভাবে বেঁচে থাকবে সে আশংকা করো না, কেন না তা অনন্ত নামে আমারই অংশ। পরে আমি পূর্ণরূপে দেবকীর পুত্রত্ব গ্রহণ করব, তুমি নন্দপত্নী যশোদার গর্ভে জন্ম নিও। ভদ্রে, যারা পুত্র প্রভৃতি কামনা করে যজ্ঞ ইত্যাদি অনুষ্ঠান করে সেই মানুষেরা তাদের সমস্ত কাম্যবরের দাত্রীরূপে নানা উপহার ও বলি দিয়ে ঈশ্বরীরূপে তোমার পূজা করবে। পৃথিবীতে মানুষেরা নানা স্থানে তোমাকে প্রতিষ্ঠা করবে এবং দুর্গা, ভদ্রকালী, বিজয়া, বৈষ্ণবী, কুমুদা, চণ্ডিকা, কৃষ্ণা, মাধবী, কন্যকা, মায়া, নারায়ণী, ঈশানা, শারদা, অম্বিকা, এই সব নামে তোমাকে আখ্যাত করবে। দেবি, তোমার দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছে বলে ঐ গর্ভের শিশুকে পৃথিবীর লোকেরা সংকর্ষণ বলবে। তিনি সব লোকের আনন্দ উৎপাদন করবেন বলে তাঁকে রামও বলা হবে। আবার বলের আধিক্যের জন্য লোকে তাঁকে বলভদ্র বলেও ডাকবে। ১-১৩

ভগবানের এই আদেশ পেয়ে যোগমায়া তাই করবেন বলে তাঁর বাক্য স্বীকার করলেন, তারপর পৃথিবীতে গিয়ে সেই অনুসারে সব কাজ করলেন। যোগমায়া দেবকীর গর্ভ রোহিণীতে স্থানান্তরিত করলে পুরবাসীরা দেবকীর গর্ভপাত হল মনে করে বিলাপ করতে লাগল, কিন্তু তার প্রকৃত কারণ জানতে পারল না। তারপর ভক্তজনের অভয়দাতা বিশ্বাত্মা ভগবান শ্রীহরি পরিপূর্ণভাবে বসুদেবের মনে আবির্ভূত হলেন। বসুদেব সেই তেজ ধারণ করে সূর্যের মত দেদীপ্যমান হয়ে উঠলেন। সমস্ত লোক তাঁর তেজে অভিভূত হল। তারপর পূর্বাকাশ যে রকম আনন্দকর চন্দ্র ধারণ করে সে রকম দীপ্তিশালিনী শুদ্ধসত্ত্বা দেবকী বসুদেব কর্তৃক বেদদীক্ষা-বলে অর্পিত অচ্যুতের অংশকে মনোমধ্যে ধারণ করে সেরকম শোভা পেতে লাগলেন। ভগবানের ঐ অংশ সর্বাত্মা, অতএব তা আগেও দেবকীর আত্মাতে বর্তমান ছিলেন। দেবকী যদিও এভাবে সর্বাধার ভগবানের আশ্রয়রূপিনী হলেন তবু তাঁর শোভা সকলের কাছে প্রকাশ না পাওয়াতে তাঁর আনন্দে সকলকে আনন্দিত করতে পারলেন না। ঘটে আবদ্ধ প্রদীপশিখার মত, জ্ঞানদানে কৃপণ ব্যক্তির বিদ্যার মত তিনি কংসের কারাগারে অবরুদ্ধ রইলেন। একসময় কংস শুচিস্মিতা দেবকীকে

অঙ্গের প্রভায় চারদিক আলোকিত করতে দেখে মনে মনে বলল, নিশ্চয়ই আমার প্রাণহরণকারী হরি দেবকীর গর্ভে প্রবেশ করেছেন। কেননা দেবকীকে তো আগেও দেখেছি ; এরকম উজ্জ্বল তো সে ছিল না। এখন আমি কি করি ? এই হরি দেবকার্য সাধনের জন্য অবতীর্ণ হয়েছেন। ইনি কখনো নিজের বিক্রম নষ্ট করবেন না, পরে অবশ্য আমার বধের জন্য পরাক্রম প্রকাশ করবেন। আর আমি দেবকীকেও বধ করতে পারি না। সে আমার বোন, স্ত্রীলোক, তার উপর গর্ভবতী। একে বধ করলে যশ, কল্যাণ ও পরমায়ু সবই নষ্ট হবে। যে লোক অত্যন্ত ক্রূরভাবে জীবন ধারণ করে সে প্রাণ থাকা সত্ত্বেও মৃততুল্য। লোকে নানা দুর্বাক্য বলে তাকে ধিক্কার দেয়, তার মৃত্যুকামনা করে। আর মারা গেলে দেহাভিমানী সেই পাপীর অন্ধকার নরক লাভ হয়। এরকম ভেবে কিছুটা সংযত হয়ে কংস শ্রীহরির জন্মের প্রতীক্ষা করে রইল। বসা, শোয়া, দাঁড়ানো, খাওয়া, ঘোরা, পান করা সব অবস্থায়ই সব ইন্দ্রিয়ের ঈশ্বর ভগবানের চিন্তা করতে করতে সমস্ত জগৎকে সে বিষ্ণুময় দেখতে লাগল। ১৪-২৪

এই সময়ে নারদ প্রভৃতি মুনি ও সানুচর দেবতাদের সঙ্গে ভগবান ব্রহ্মা ও মহেশ্বর দেবকীর গৃহে এসে সর্বকামপ্রদ ভগবান হরির স্তব করতে লাগলেন। ভগবান তাঁর প্রতিশ্রুতি সত্য করলেন, তাই আনন্দিত মনে দেবতারা প্রথমে সত্যরূপে তাঁর স্তব করতে লাগলেন, হে ভগবান, আপনি সত্যব্রত। আপনার সঙ্কল্প সত্য, সত্য দ্বারা শ্রেষ্ঠ লাভ আপনাকে পাওয়া যায়। আপনি (সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়) তিন কালেই সত্যরূপে রয়েছেন, কারণ আপনি সত্ত্বের[১] যোনি। তাই সৃষ্টির আগে আপনি ছিলেন, এখনও আকাশ প্রভৃতি পঞ্চভূতে অন্তর্যামী রূপে রয়েছেন ; এতে সৃষ্টির সময় আপনার সত্তাও দেখা যাচ্ছে। আর আপনি ঐ সত্ত্বের পারমার্থিক স্বরূপ, যেহেতু তার বিনাশে আপনিই অবশিষ্ট থাকেন। তাই প্রলয়ের সময়েও আপনার সত্তাও থাকে নিশ্চয়। আবার আপনি সত্যের (সূনৃতা) বাণী ও সমদর্শনের প্রবর্তক। এরকম সব ভাবেই আপনি সত্যাত্মক হয়েছেন। আমরা সত্যরূপী আপনার শরণাপন্ন হলাম। এই দেহপ্রপঞ্চ আদি-বৃক্ষের মত। এর এক আশ্রয়, দুই ফল, তিন মূল, চার রস, পাঁচ জ্ঞান, ছয় স্বভাব, সাত ত্বক্, আট শাখাপ্রশাখা, নয় দ্বার ও দশ প্রাণ।[২] জীবাত্মা ও পরমাত্মা এই বৃক্ষে দুটি পাখী।[৩] একমাত্র আপনিই এর কারণ, লয়স্থান ও পালক। যাদের জ্ঞান আপনার মায়ায় আচ্ছন্ন, তারা আপনাকে নানাভাবে দেখে থাকে, কিন্তু বিদ্বানরা (সিদ্ধরা) সেরকম দেখেন না। আপনি জ্ঞানস্বরূপ আত্মা, চরাচর জগতের কল্যাণের জন্য সময়ে সময়ে নানারকম মূর্তি গ্রহণ করে থাকেন। আপনার ঐ সত্ত্বগুণান্বিত মূর্তি ধার্মিক লোকের সুখসাধক ও খলদের বিনাশকর। হে অম্বুজাক্ষ, আপনি নির্মল সত্ত্বগুণের ধাম। বিবেকী পুরুষেরা সমাধিযোগে আপনার চরণরূপ তরণী আশ্রয় করে সংসার-সাগরকে গোষ্পদের মত তুচ্ছ জ্ঞান করেন। পূর্বেও মহাজনমাত্রই আপনার শ্রীচরণকে সেবারূপে গ্রহণ করেছিলেন। হে

১ সত্ত্বের পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ, এই পঞ্চভূতের।

২ এক—প্রকৃতি। দুই—সুখ ও দুঃখ। তিন—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণ। চার—ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। পাঁচ—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্, এই জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি। ছয়—শোক, মোহ, জরা, মৃত্যু, ক্ষুধা ও পিপাসা। সাত—ত্বক্, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র। আট—পঞ্চ ইন্দ্রিয়, মতান্তরে পঞ্চভূত এবং মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার। নয়—ইন্দ্রিয়ের নয় ছিদ্র। দশ—প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান, নাগ, কূর্ম, কৃকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয়।

৩ তুলনীয় : মুণ্ডক উপনিষৎ, ৩।১।১ শ্লোক।

স্বপ্রকাশ প্রভু, আপনি কৃপাসিন্ধু, ভক্তরা আপনার কৃপায় ভবসাগর পার হয়ে আপনার চরণতরী এখানেই রেখে যান, কেননা সর্বভূতে তাঁদের অপার করুণা। ২৫-৩১

হে অরবিন্দলোচন, যারা আপনাকে ত্যাগ করে নিজেদের মুক্ত বলে অভিমান করে, তাদের বুদ্ধি বিশুদ্ধ নয়। তারা অনেক জন্মের কঠোর তপস্যায় মোক্ষের দ্বারে উপস্থিত হয়েও একমাত্র আপনার প্রতি বিমুখতার দোষে আবার অধঃপাতে যায়। কিন্তু মাধব, যাঁরা আপনার ভক্ত, আপনার সঙ্গেই সৌহার্দ্য-বন্ধনে আবদ্ধ তাঁদের সে রকম দুর্গতি হয় না। তাঁরা আপনার দ্বারা সুরক্ষিত থেকে নির্ভয়ে বিঘ্নকারীদের মাথায় পা দিয়ে বিচরণ করেন। আপনি স্থিতির সময়ে বিশুদ্ধ সত্ত্বরূপ শরীর ধারণ করেন। লোকে বেদ-অধ্যয়ন (ব্রহ্মচর্য), ক্রিয়াযোগ (গার্হস্থ্য), তপস্যা (বানপ্রস্থ) এবং সমাধি (সন্ন্যাস) এই চতুরাশ্রম ধর্ম পালন করে আপনার পূজা করে থাকেন। আপনি যদি সত্ত্বশরীর আশ্রয় না করতেন তাহলে কর্মফল সিদ্ধি হতে পারত না। অজ্ঞান ও ভেদের বিনাশ-সাধক বিজ্ঞানও উৎপন্ন হতে পারত না। যাঁর সান্নিধ্যে এসে গুণময় বুদ্ধি প্রভৃতি প্রকাশ পাচ্ছে এবং অচেতন হয়েও সচেতনের মত সমস্ত বস্তুকে প্রকাশিত করছে, আপনিই সেই সর্বসাক্ষী, বুদ্ধি প্রভৃতির আদি অধিষ্ঠাতা। যাঁরা আপনার শুদ্ধসত্ত্ব মূর্তির সেবা করেন সেই সকল সেবকের হৃদয়ে আপনি স্বয়ং প্রকাশিত হন। হে ভগবান্, গুণ, কর্ম ও জন্ম দিয়ে আপনার নাম ও রূপ নিরূপণ করা যায় না ; কেননা আপনি তারও সাক্ষী। আপনার গতি মন ও বাক্যের অনুমেয়মাত্র, তবু হে দেব, উপাসকরা উপাসনা প্রভৃতি ক্রিয়াযোগে আপনাকে সাক্ষাৎ দর্শন করতে পায় এরকম প্রসিদ্ধি আছে। ৩২-৩৬

যে ব্যক্তি আপনার মঙ্গলময় নাম ও রূপ শ্রবণ, কীর্তন ও চিন্তা করতে করতে অথবা অন্যান্যদের স্মরণ বা শ্রবণ করাতে করাতে আপনার চরণকমলে মন নিবিষ্ট করেন তাঁদের আর সংসারে ফিরে আসতে হয় না। হে হরি, আপনি ঈশ্বর। আপনার আবির্ভাবমাত্রই আপনার চরণভূতা ধরণীর ভার অপনীত হল, এ মস্ত বড় ভাগ্য, সত্যিই মঙ্গলের বিষয়। ভগবান্, আপনি কৃপা করে ধ্বজ, বজ্র, অঙ্কুশ প্রভৃতি চিহ্নযুক্ত কোমল চরণে পৃথিবী ও সুরলোককে চিহ্নিত করলেন। হে ঈশ্বর, আপনি অসংসারী, আপনার জন্মের কারণ লীলা ছাড়া অন্য কিছুই নয়। আসলে জীবাত্মারও জন্মাদি কিছুই নেই। আপনি অন্য সময়ে মৎস্য, অশ্ব, কচ্ছপ, বরাহ, নৃসিংহ, হংস, ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ ও দেবতা—এই সব যোনিতে অবতার রূপে আবির্ভূত হয়ে আমাদের ও ত্রিভুবনকে যেভাবে পালন করেছেন এখনও ভূমির ভার হরণ করে সেভাবেই রক্ষা করুন। হে যদুশ্রেষ্ঠ, আপনাকে বন্দনা করি। (দেবকীকে উদ্দেশ্য করে) হে অম্ব, ভাগ্যক্রমে পরমপুরুষ সাক্ষাৎ ভগবান আমাদের মঙ্গলের জন্য তোমার গর্ভে এসেছেন। ভোজপতি কংসের মৃত্যুর ইচ্ছা হয়েছে। তাকে আর ভয় পেও না, তোমার আত্মজ যদুদের রক্ষাকারী হবেন। ৩৭-৪১

মহারাজ, যাঁর রূপ সর্বজীবের আত্মস্বরূপ, এই ভাবে সেই পুরুষের যথার্থ স্তব করে দেবতারা ব্রহ্মা ও মহেশকে সম্মুখে রেখে সেখান থেকে প্রস্থান করলেন। ৪২

তৃতীয় অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণের জন্ম

শুকদেব বললেন, মহারাজ, তারপর সর্বগুণসম্পন্ন পরম রমণীয় সময় এল। রোহিণী নক্ষত্রের উদয় হল ও অশ্বিনী প্রভৃতি তারাগুলি শান্ত হল। দিকসমস্ত প্রসন্ন হল, আকাশে নির্মল নক্ষত্রগুলি শোভা পেতে লাগল আর পৃথিবীস্থ নগর, গ্রাম, গোষ্ঠ ও আকরগুলি মঙ্গলময় হল। নদীগুলির জল প্রসন্ন হল, প্রস্ফুটিত কমলে হ্রদগুলি অপূর্ব শোভা ধারণ করল। পাখী ও ভ্রমরের কলরবে এবং পুষ্পস্তবকে পরিপূর্ণ হয়ে বনরাজি সুশোভিত হয়ে উঠল। সুখস্পর্শ বাতাস পুণ্যগন্ধ বহন করে ব্রাহ্মণদের শান্ত যজ্ঞাগ্নি উদ্দীপ্ত করল। অসুরদ্রোহী সাধুদের মন প্রফুল্ল হল। জন্মরহিত ভগবানের আবির্ভাব আসন্ন হলে আকাশপথে দুন্দুভি ধ্বনি শোনা গেল। গন্ধর্ব, সিদ্ধ-চারণরা স্তব করতে লাগল, অপ্সরাদের সঙ্গে বিদ্যাধররা আনন্দে নৃত্য আরম্ভ করল। দেবতা ও ঋষিরা আনন্দিত হয়ে পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেন। তারপর যখন অন্ধকারময় রাত্রিতে ভগবান জনার্দনের জন্মগ্রহণ করার সময় উপস্থিত হল তখন সাগরের জলের সঙ্গে মেঘেরা মন্দ মন্দ গর্জন করতে লাগল। এই রকম সুন্দর সময়ে, পূর্ব আকাশে যেমন চন্দ্র প্রকাশ পায়, তেমনি দেবরূপিণী দেবকীর গর্ভে সর্বান্তর্যামী ভগবান হরি আবির্ভূত হলেন। ১-৯

বসুদেব দেখলেন সেই বালকের সবই অত্যন্ত অদ্ভুত। তাঁর পদ্মপলাশের মত চোখ, চারটি হাত—তাতে শঙ্খ, গদা প্রভৃতি আয়ুধ রয়েছে। তাঁর বক্ষে শ্রীবৎস চিহ্ন ও গলায় কৌস্তুভমণি শোভা পাচ্ছে। পরনে পীত বস্ত্র, বর্ণ ঘনমেঘের মত, মহামূল্য বৈদূর্য মণিময় মুকুট ও কুণ্ডলের দ্যুতিতে কেশপাশ দেদীপ্যমান আর তিনি অতি উত্তম মেখলা এবং অঙ্গদ, কঙ্কণ প্রভৃতি অলংকারে দীপ্তি পাচ্ছেন। ভগবান হরিকে এভাবে আবির্ভূত দেখে বসুদেবের দুই চোখ বিস্ময়ে উৎফুল্ল হল। পুত্রমুখ দর্শনের আনন্দে তৎক্ষণাৎ তিনি মনে মনে দশ হাজার ধেনু দান করলেন। বন্দী অবস্থায় দান কি করে সম্ভব। হে ভারত, তারপর শুদ্ধবুদ্ধি বসুদেব ঐ পুত্রকে পরমপুরুষ বলে বুঝতে পেরে হাতজোড় করে এবং প্রণত হয়ে স্তব করতে লাগলেন। এই সময় নবজাতকের কান্তিময় শরীরের দীপ্তিতে সূতিকাগৃহ আলোকিত হচ্ছিল। বসুদেব প্রথমে ভগবানকে পুত্র-বুদ্ধিতে দর্শন করেছিলেন। পরে তা পরিত্যাগ করে বললেন, আমি জেনেছি যে আপনি প্রকৃতির অতীত পরমপুরুষ। কি আশ্চর্য আপনি আমাকে সাক্ষাৎ দর্শন দিলেন। ভগবান, শুধু অনুভব আর আনন্দই আপনার স্বরূপ। আপনি সর্বপ্রাণীর অন্তর্যামী। আপনি নিজ মায়ায় এই ত্রিগুণাত্মক বিশ্ব সৃষ্টি করে পরে এতে প্রবিষ্ট না হয়েও প্রবিষ্টের মত প্রতিভাত হচ্ছেন। ১০-১৫

মহৎ প্রভৃতি অবিকারী তত্ত্বগুলি ষোড়শ বিকারের[১] সঙ্গে মিলিত হয়েই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করে। ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির পরে তারা তার মধ্যে প্রবিষ্ট বলে লক্ষিত হয়। কিন্তু ঐ সব তত্ত্ব আগে কারণরূপে বিদ্যমান থাকায় বাস্তবিক সৃষ্টিমধ্যে তাদের প্রবেশ সম্ভব নয়। এই রকম রূপ প্রভৃতি জ্ঞান দ্বারা যাদের স্বরূপ অনুমান করতে হয় আপনি সেই সব বিষয়ে বর্তমান থাকলেও আপনি অনন্ত বলে তাদের সঙ্গে আপনার এক জ্ঞান হতে পারে না। আপনি সর্বস্বরূপ, সর্বাত্মা, সর্বব্যাপক

---

১ ষোড়শ বিকার—দশ ইন্দ্রিয়, মন ও পঞ্চভূত।

পরমার্থ বস্তু, তাই আপনি সীমাহীন। অতএব আবরক না থাকায় আপনার অন্তর বা বাইরের কোন ভেদ নেই। হে ভগবান্, তা হলেও আপনাকে যে জানতে পারলাম, এ আমার পরম সৌভাগ্য। যে লোক আত্মার দৃশ্যগুণ দেহকে আত্মা থেকে পৃথক এক সদ্‌বস্তু বলে মনে করে সে মূর্খ, কেননা তার ভেদ দর্শন রয়েছে। দেহ প্রভৃতিকে বিচার করে দেখলে বাক্য ছাড়া অন্য কিছু বলে মনে হয় না, তাই তা সদ্‌বস্তু বলে কখনই গৃহীত হতে পারে না। যে ব্যক্তি সেই সবকে বাস্তব বলে স্বীকার করে সে অজ্ঞ। হে প্রভু, তত্ত্বদর্শীরা বলে থাকেন যে আপনার থেকে এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় হয়ে থাকে, অথচ আপনি নির্গুণ, তাই নিষ্ক্রিয় ও নির্বিকার। ভগবান্, যদিও সৃষ্টিকর্তৃত্ব ও নির্বিকারত্ব পরস্পর-বিরুদ্ধ, তবু আপনি ঈশ্বর এবং সাক্ষাৎ ব্রহ্ম, তাই আপনাতে কোন কিছুই বিরুদ্ধ নয়। গুণসমূহের সৃষ্টি ইত্যাদি কাজে আপনি তাদের আশ্রয়, তাই আপনাতে সৃষ্টি প্রভৃতি কর্তৃত্ব আরোপিত হয়।[১] আপনি নিজের মায়ায় ত্রিলোকের পালনের জন্য সর্বাত্মক শুক্লবর্ণ, সৃষ্টির জন্য রজোগুণযুক্ত রক্তবর্ণ গ্রহণ করেন, আবার প্রলয়-সময়ে তমোগুণ দ্বারা কৃষ্ণবর্ণ স্বীকার করে থাকেন। ১৬-২০

হে অখিলেশ্বর, হে বিভু, আপনি এই সমস্ত লোকের রক্ষার জন্য আমার গৃহে অবতীর্ণ হলেন। রাজন্য নাম নিয়ে কোটি কোটি অসুর সেনাপতির সঙ্গে যে সব সৈন্য ইতস্তত ভ্রমণ করছে আপনি তাদের সংহার করবেন। হে সুরেশ্বর, আমার গৃহে আপনার জন্ম হবে শুনে দুষ্ট কংস আপনার অগ্রজদের বধ করেছে। প্রহরীরা আপনার জন্ম-সংবাদ তাকে জানালে সে তা শুনে অস্ত্র উদ্যত করে এখানে এখনই আসছে। ২১-২২

শুকদেব বললেন, মহারাজ, তারপর কংসভীতা দেবকী পুত্রের মহাপুরুষ লক্ষণ দেখে বিস্মিতচিত্তে তাঁর স্তব করতে আরম্ভ করলেন, ভগবান্, বেদে যাকে একমাত্র আদি কারণ বলা হয়েছে আপনি সেই অধ্যাত্মদীপ সাক্ষাৎ বিষ্ণু। তাই আপনার ভয় বা আশঙ্কা নেই। আপনি ইন্দ্রিয়গুলির প্রকাশক। দ্বিপরার্ধ (প্রলয়) কালের অবসানে যখন চরাচর লোক বিনষ্ট হয়, পঞ্চ মহাভূত আদিভূতে (সূক্ষ্মভূতে) বিলয় পায় এবং ব্যক্ত অব্যক্তে প্রবেশ করে, তখন আপনিই অবশিষ্ট থাকেন। যে সময় অশেষাত্মক প্রধান (প্রকৃতি) আপনাকে আশ্রয় করে, আপনাতেই এই সব বিলীন আছে আপনি এরকম বোধ করেন। তা হলেও, হে প্রকৃতি-প্রবর্তক ভগবান্, নিমেষ থেকে বৎসর পর্যন্ত এই বিশ্ব যে কালের প্রভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা বলেন যে ঐ সর্বসংহারক মহাকাল লীলামাত্র। প্রভু, আপনি সকলের ঈশ্বর এবং অভয় স্থান। আমি আপনার শরণাপন্ন হলাম। হে আদ্য, মর্ত্যের প্রাণী মৃত্যুরূপ বিষধরের ভয়ে ভীত হয়ে পালিয়ে সমস্ত লোকেই গিয়েছিল, কিন্তু কোথাও অভয় লাভ করেনি। কোন অনির্বচনীয় ভাগ্যের উদয়ে আপনার পাদপদ্ম লাভ করে সে এখন মৃত্যু-ভয়হীন হয়ে শান্তিতে শুয়ে আছে। ভগবান্, আপনি ভক্তের ভয়হারী। আপনি উগ্রসেনপুত্র ঘোর কংসের ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত আমাদের অনুগ্রহ করে রক্ষা করুন। আপনার ঐ ধ্যেয় ঐশ্বরিক রূপ চর্মচক্ষুর গোচর করবেন না। হে মধুসূদন, আমার ঘরে আপনার এই জন্মের সংবাদ পাপ কংস যেন জানতে না পারে। প্রভু, আমি আপনার জন্য কংসের ভয়ে ভীত হচ্ছি, আমার চিত্ত ব্যাকুল হচ্ছে। হে বিশ্বাত্মা, শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্মের শোভায় শোভিত চতুর্ভুজ এই অদ্ভুত রূপ সম্বরণ করুন। ভগবান্, আপনি

১ তুলনীয় : গীতা, ১৭।১৮-২৭

পরমপুরুষ, প্রলয়শেষে নিজের শরীরে চরাচর বিশ্ব ধারণ করেছিলেন। যাঁর দেহে জগৎ অসংকোচে ছিল, কোন পদার্থের স্থান সংকীর্ণ হয়নি, সেই আপনি যে আমার গর্ভে জন্ম নিলেন তা সাধারণ মানুষের কাছে উপহাসের বস্তু। ২৩-৩১

শ্রীভগবান বললেন, সতি, প্রথম জন্মে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে তুমিই পৃশ্নি[১] ছিলে। তখন নিষ্পাপ বসুদেব সুতপা নামে প্রজাপতি ছিলেন। ব্রহ্মা তোমাদের প্রজাসৃষ্টির আদেশ করলে তোমরা দুজনে ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ করে পরম তপস্যা করেছিলে। বর্ষা, রৌদ্র, হিম, গ্রীষ্ম প্রভৃতি কালের গুণ সব তোমাদের শরীরের উপর দিয়ে গেল। প্রাণায়াম দ্বারা তোমাদের মনোমল ধৌত হয়েছিল, শীর্ণপত্র ও বায়ুমাত্র আহার করে শান্তচিত্ত হয়ে অভীষ্ট সিদ্ধির উদ্দেশ্যে তোমরা আমার আরাধনা করতে। ভদ্রে, এভাবে আমাকে চিত্ত সমর্পণ করে দুশ্চর তপস্যা করতে করতে দিব্য দ্বাদশ সহস্র বৎসর অতিক্রান্ত হলে আমি তোমাদের প্রতি তুষ্ট হই। তপস্যা, শ্রদ্ধা ও ভক্তি যোগে নিত্য আমার চিন্তা করায় শ্রেষ্ঠ বরদাতা আমি আবির্ভূত হয়ে তোমাদের বলেছিলাম, বর প্রার্থনা কর। তখন তোমরা আমার মত পুত্র চেয়েছিলে। তোমরা পুত্রহীন ছিলে, লৌকিক বিষয়ও কিছু ভোগ করনি, তাই আমার মায়ায় মুগ্ধ হয়ে আমার কাছে মুক্তি প্রার্থনা করনি। আমি তোমাদের প্রার্থিত বর দান করে চলে গেলে তোমরা গ্রাম্য সুখ প্রভৃতি ভোগে প্রবৃত্ত হয়েছিলে। সতি, আমি তোমাদের পুত্র হয়ে জন্মেছিলাম। শীল, ঔদার্য প্রভৃতি গুণে আমার সমান কাউকে দেখতে না পেয়ে আমি ঐ জন্মে (ত্রেতাযুগে) পৃশ্নিপুত্র নামে বিখ্যাত হয়েছিলাম। ৩২-৪১

দ্বিতীয় জন্মেও আমি তোমাদের দুজনের পুত্র হয়েছিলাম। তখন কশ্যপ ও অদিতির গৃহে জন্মগ্রহণ করে উপেন্দ্র নামে বিখ্যাত হই। ঐ জন্মে আমার আকৃতি খর্ব হওয়ায় লোকে আমাকে বামন বলত। এখন এই তৃতীয় বার আমি তোমাদের গৃহে শরীর ধারণ করে জন্ম নিলাম। তোমরাই সেই পৃশ্নি ও সুতপা[২]—আমার একথা সত্য জেনো। আমার আগের জন্ম স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য তোমাদের এই রূপ দেখালাম, নয়তো সাধারণ মানবশিশু ভেবে আমায় চিনতে পারতে না। তোমরা দুজনে ব্রহ্মভাবে বা পুত্রভাবে আমাকে চিন্তা করে এবং আমার প্রতি স্নেহ করে পরমগতি লাভ করবে। ৪২-৪৫

শুকদেব বললেন, মহারাজ, ভগবান হরি একথা বলে নীরব হলেন এবং নিজ মায়ায় পিতা-মাতার সামনেই সামান্য মানবশিশুতে পরিণত হলেন। তারপর বসুদেব ভগবানের আজ্ঞায়[৩] পুত্রকে নিয়ে সূতিকা-গৃহের বাইরে যাবার উদ্যোগ করলেন। এদিকে সে সময় ভগবানের যোগমায়া জন্মরহিত হয়েও নন্দজায়ার গর্ভে জন্মগ্রহণ করলেন। সেই মায়ার প্রভাবে সমস্ত দ্বারপাল প্রহরীদের ইন্দ্রিয়বৃত্তি অবশ হয়ে গেল এবং নগরবাসী সকলে নিদ্রায় অভিভূত হয়ে পড়ল। বসুদেব-দেবকীর ঘরের বিশাল কপাট লোহার খিল ও শিকলে শক্তভাবে বন্ধ ছিল। কিন্তু বসুদেব যখন শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে বের হতে গেলেন তখন সূর্যের উদয়ে যেমন অন্ধকার নিজেই দূর হয়, সেভাবেই সমস্ত দ্বার, শৃংখল ইত্যাদি আপনি খুলে গেল। তখন মন্দ মন্দ মেঘগর্জনের সঙ্গে বৃষ্টিপাত হচ্ছিল সত্য, কিন্তু তাতে বসুদেবের কোন কষ্ট হল না। অনন্তদেব তাঁর বিস্তৃত ফণা দ্বারা জল নিবারণ করে তাঁর পেছন

---

১ পৃশ্নি—দেবকীর পূর্বজন্মের নাম। ২ সুতপা—বসুদেবের পূর্বজন্মের নাম।

৩ 'যদি কংসের ভয় [illegible] করা হয়ে থাকে যে জন্মেছেন তাঁকে নিয়ে এসো।' শ্রীধর স্বামী [illegible] অনুসারে।

পেছন যেতে লাগলেন। ইন্দ্রের অনবরত বর্ষণে যদিও যমুনার জলরাশি সহস্র তরঙ্গে ফেনিল এবং অসংখ্য আবর্তে ভয়ানক হয়ে উঠেছিল, তবু সাগর যেমন রামচন্দ্রকে পথ দিয়েছিল, ঐ নদীও সেরকম শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে যাবার জন্য বসুদেবকে পথ করে দিল। ৪৬-৫০

বসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে নন্দব্রজে উপস্থিত হয়ে দেখলেন যে, গোপেরা সবাই নিদ্রায় মগ্ন হয়ে রয়েছে। তিনি নিজের পুত্রকে যশোদার শয্যায় রেখে তাঁর কন্যাকে তুলে নিয়ে আবার ফিরে এলেন। দেবকীর শয্যায় তনয়াটিকে রেখে নিজেকে লোহার শিকলে বাঁধলেন এবং আবার আগের মত বন্দী অবস্থায় রইলেন। যশোদা এইমাত্র বোধ করেছিলেন যে, যা হোক একটি সন্তান হয়েছে। ক্লান্তি ও মায়ায় অপহৃতস্মৃতি হওয়াতে তিনি সন্তানের পুত্র বা কন্যা কোন লক্ষণ স্থির করতে পারেন নি। ৫১-৫৩

চতুর্থ অধ্যায়

অসুরদের পরামর্শ

শুকদেব বললেন, মহারাজ, বসুদেব ফিরে আসার পর বহির্দ্বার, অন্তর্দ্বার এবং পুরদ্বার সবই আগের মত বন্ধ হয়ে গেল, তারপর শিশুর কান্নায় প্রহরীরা জেগে কংসকে দেবকীর অষ্টমপ্রসব বার্তা তাড়াতাড়ি জানাল। কংস এর জন্যই উদ্বিগ্ন-চিত্তে প্রতীক্ষা করছিল। এই আমার কাল এরূপ বিবেচনা করে শয্যা থেকে উঠে সে বিহ্বল হয়ে গেল, তারপর মুক্তকেশ হয়ে তাড়াতাড়ি দেবকীর সূতিকা-গৃহে ছুটে গেল। ভাইকে দেখে দীনা দেবকী করুণ বাক্যে বলতে লাগলেন, এটি তোমার ভাগিনেয়ী। নারীবধ তোমার সাজে না। ভাই, কালপ্রেরিত হয়ে অগ্নিতুল্য তুমি অনেক শিশু বধ করেছ। একটি সন্তান আমাকে ভিক্ষা দাও। আমি তো তোমার কনিষ্ঠা বোন। তার উপর এতগুলি সন্তানের শোকে নিতান্ত কাতর হয়েছি। অভাগিনীকে অনুগ্রহ করে শেষের কন্যাটি দাও। ১-৬

শুকদেব বললেন, দেবকী কন্যাটিকে জড়িয়ে ধরে কাতরনয়নে কাঁদতে কাঁদতে প্রার্থনা করতে লাগলেন। কিন্তু খল কংস তাঁকে ভর্ৎসনা করে তাঁর হাত থেকে সদ্যোজাত কন্যাটিকে কেড়ে নিল এবং তার পা ধরে পাথরে আছাড় মারল। হীন স্বার্থের জন্য তার আত্মীয়স্নেহ নির্মূল হয়েছিল। দুষ্ট কংস বিষ্ণুর সেই অনুজাকে পাথরের উপর আছাড় দেওয়া মাত্র তিনি তার হাত থেকে উপরে আকাশে উঠে গেলেন। সবাই দেখতে পেল সেই দেবী ধনু, শূল, বাণ, চর্ম, অসি, খড়্গ, চক্র ও গদা ধারণ করে অষ্টভুজা হয়েছেন, এবং তিনি দিব্য মালা, বস্ত্র, অনুলেপন ও রত্নাভরণে ভূষিতা। সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব, অপ্সরা, কিন্নর ও উরগগণ নানা রকম উপহার দিয়ে তাঁর স্তব করেছিলেন। ৭-১১

দেবী বললেন, ওরে মূঢ়, আমাকে বধ করে তোর কি হবে? তোর পূর্বশত্রু তোর অন্তক হয়ে কোথাও জন্মগ্রহণ করেছেন। তুই আর বৃথা শিশু বধ করিস না। ভগবতী কংসকে এই কথা বলে পৃথিবীতে বারাণসী প্রভৃতি নানা স্থানে নানা নামে বিখ্যাত হলেন। ১২-১৩

কংস মায়ার কথা শুনে বিস্মিত হল এবং দেবকী ও বসুদেবকে বন্ধন থেকে মুক্ত করে বিনীতভাবে বলল, ভগ্নী ও ভগ্নীপতি, তোমরা আমার আত্মীয়, কিন্তু পাপাত্মা আমি তোমাদের কতকগুলি পুত্রকে রাক্ষসের মত সংহার করেছি। এতে আমার দয়াগুণ লোপ পেয়েছে ; জ্ঞাতি, ও বান্ধবরা আমাকে ত্যাগ করেছেন। আমি খল, কে জানে মৃত্যুর পর কোন লোকে আমার স্থান হবে। ব্রহ্মঘাতীর মত আমি জীবন্মৃত হয়েছি। শুধু মানুষ নয়, দেবতারাও মিথ্যাবাদী। দেবতাদের কথায় বিশ্বাস করেই আমি আমার বোনের, পুত্রদের বধ করেছি। হে মহাভাগ-দম্পতি, পুত্রদের জন্য দুঃখ করো না। তারা নিজ নিজ কর্মফল ভোগ করেছে। সমস্ত প্রাণীই দৈবের অধীন, সব সময় সবাই একত্রে থাকতে পারে না। ১৪-১৮

যে রকম পৃথিবীতে পার্থিব ঘট প্রভৃতি উৎপন্ন হয়ে আবার ভেঙে যায়, কিন্তু মাটি অবিকৃতই থাকে সেরকম দেহ প্রভৃতি উৎপন্ন হয়ে আবার বিনষ্ট হয়, আত্মা তাঁর একই অবস্থায় থাকেন। দেহের বিকার হলেও আত্মার বিকার হয় না। যাঁরা যথার্থরূপে এ তত্ত্ব জানেন না তাঁদেরই দেহে আত্মবুদ্ধি জন্মে থাকে। সেই বুদ্ধিতে ভেদজ্ঞান হয়, ভেদ থেকে পুত্র প্রভৃতির দেহের সঙ্গে মিলন বা বিচ্ছেদ ঘটে। তারই ফলে সংসৃতি অর্থাৎ সুখ-দুঃখের উৎপত্তি হয়ে থাকে। যতদিন পর্যন্ত জীব অজ্ঞান থাকবে ততদিন পর্যন্ত তার সংসার-নিবৃত্তি হবে না, অতএব ভদ্রে, যে সব শিশু গিয়েছে তারা আসলে তোমার পুত্র নয়, আর আমিও আসলে তাদের হত্যা করি নি, অজ্ঞান দৃষ্টিতে তুমি তাদের নিজের তনয় মনে করে আর আমার দ্বারা তারা নিহত হয়েছে বলে শোক করো না।[১] কেননা সব লোক (মায়ায়) অবশ হয়ে নিজ নিজ কর্ম ভোগ করে। দেহাভিমানী ব্যক্তি যে পর্যন্ত 'আমি হন্তা' বা 'হত হলাম' এভাবে বিবেচনা করে সেই পর্যন্ত সে অজ্ঞানজনিত চিন্তায় দেহের নাশকে আত্মার নাশ কল্পনা করে বাধ্য ও বাধকভাবের বশ হয়। তোমরা সাধু ও দীনবৎসল। আমার এতদিনের দৌরাত্ম্য ক্ষমা কর। কংস এই কথা বলে চোখের জল ফেলতে ফেলতে ভগ্নী ও ভগ্নীপতির পায়ে ধরল। সেই কন্যার কথায় বিশ্বাস হওয়ায় সে দেবকী ও বসুদেবের প্রতি সৌহার্দ্য দেখিয়ে তাদের বন্ধনমুক্ত করল। ১৯-২৪

ভাইকে পরিতাপ করতে দেখে দেবকী তার প্রতি কোপ ত্যাগ করলেন। বসুদেবও রোষ পরিত্যাগ করে সহাস্যে তাকে বললেন মহারাজ, ঠিকই বলেছ। দেহীদের অহং-বুদ্ধির মূলে হল অজ্ঞানতা। আর অহংবুদ্ধি থেকেই 'এ আপন', 'এ পর' এরকম ভেদবুদ্ধি জন্মায়। এই ভেদবুদ্ধির জন্যই জীব দেহকে নিমিত্ত করে শোক, হর্ষ, ভয়, দ্বেষ, লোভ, মোহ এবং গর্বে পরিপূর্ণ হয়ে পরস্পর পরস্পরকে হত্যা করে থাকে। কিন্তু সর্বাত্মা জগদীশ্বর যে তাদের সমস্ত কাজ দেখছেন, তা তারা একবারও চিন্তা করেনা। শুকদেব বললেন, মহারাজ, বসুদেব ও দেবকী প্রসন্ন হয়ে এসব বললে কংস তাঁদের অনুমতি নিয়ে নিজের গৃহে চলে গেল। তারপর সেই রাত্রি প্রভাত হলে কংস তার মন্ত্রীদের ডেকে কন্যারূপিণী মায়ার সব কথা তাদের জানাল। দেবশত্রু মন্ত্রীরা কংসের কথা শুনে বলল, রাজেন্দ্র, যদি তাই হয় তাহলে নগর, গ্রাম, ব্রজ যেখানে যত শিশু জন্মেছে, তাদের বয়স দশ দিনের কমই হোক বা বেশিই হোক, সবাইকে হত্যা করা যাক। মহারাজ, দেবতারা ভীরু, তারা আপনার ধনুকের টঙ্কারের শব্দে সব সময়ই উদ্বিগ্ন থাকে। তারা উদ্যম করে আর কি-ই বা করতে পারবে। ২৫-৩২

১ দ্রঃ গীতা, ২।১১ [illegible]। ২ নিজেকে [illegible]।

একসময় আপনার বাণে বিদ্ধ হয়ে দেবতারা প্রাণভয়ে চারদিকে পালিয়ে গিয়েছিল। কোন কোন দেবতা ভীত হয়ে অস্ত্রশস্ত্র ত্যাগ করে হাতজোড় করে দাঁড়িয়েছিল। কেউ বা মুক্তকচ্ছ ও মুক্তশিখ হয়ে বলেছিল, আমরা ভয় পেয়েছি। সেই সব অস্ত্রহীন, রথহীন, ভীত, ভগ্নধনু দেবতাকে যুদ্ধে বিমুখ দেখে আপনি তাদের বধ করেননি। দেবতারা ভয়হীন দেশেই বীর, যেখানে যুদ্ধ নেই সেখানেই তাদের শৌর্য-বীর্যের কথা শোনা যায়। তাদের দ্বারা কি হবে? আর হরি ও শম্ভুর থেকে ভয়ের কি আছে? হরি নির্জনে থাকেন (সকলের অন্তরে তাঁর অধিষ্ঠান, বাইরে তাঁর প্রকাশ নেই)। শিব বনবাসী, ইন্দ্র অল্পবীর্য আর ব্রহ্মা তো সব সময় তপস্যায় নিযুক্ত। তবু দেবতারা আমাদের শত্রু, তাই তাদের উপেক্ষা করা চলে না। তাদের নির্মূল করার জন্য আমাদের নিযুক্ত করুন। আমরা আপনার অনুগত, আপনার আদেশ প্রাণপণে পালন করব। রোগকে উপেক্ষা করলে সেই রোগ ক্রমে চিকিৎসার অসাধ্য হয়ে পড়ে। যেমন ইন্দ্রিয়গুলিকে প্রথমেই দমন না করলে তাদের আর বশীভূত করা যায় না, তেমনি শত্রু শক্তি সঞ্চয় করে প্রবল হলে তাকে বিচলিত করা দুঃসাধ্য। ৩৩-৩৮

(কংসের মন্ত্রীরা আরও বলল) মহারাজ, দেবতাদের মূলে বিষ্ণু। যেখানে সনাতন ধর্ম, বিষ্ণু সেখানে থাকেন। সেই ধর্মের মূল বেদ, গো, ব্রাহ্মণ, তপস্যা এবং সদক্ষিণা যজ্ঞ। তাই আগে বেদবাদী তপস্বী, যজ্ঞশীল ব্রাহ্মণ ও ঘৃত-প্রদায়ী গাভীদের বধ করা যাক। গো, ব্রাহ্মণ, বেদ, তপস্যা, সত্য, শম, দম, শ্রদ্ধা, দয়া, তিতিক্ষা, যজ্ঞ, এসবই বিষ্ণুর মূর্তি। বিষ্ণু সব দেবতার অধ্যক্ষ, সকলের অন্তর্যামী অসুরদ্রোহী। তিনিই ঈশ্বর, চতুর্মুখ সহ সমস্ত দেবতার মূলে। যেহেতু ব্রাহ্মণ প্রভৃতিরা হলেন বিষ্ণুর শরীর, তাই ঋষিদেরও বধ করা যাক, এটাই বিষ্ণুকে বধ করার উপায়। তখন দুর্মতি কংস তার অসুর মন্ত্রীদের সঙ্গে মন্ত্রণা করে ব্রহ্ম-হিংসাকেই শ্রেয় মনে করল। সে পরপীড়ক, কামুক দানবদিগকে সাধুব্যক্তিদের পীড়ন করবার আদেশ দিয়ে নিজের গৃহে প্রবেশ করল। ভারত, অসুররা একে রজঃস্বভাব তার উপর আবার তমোগুণে তাদের চিত্ত বিমূঢ়। এদিকে তাদের মৃত্যুও ঘনিয়ে এসেছিল। তাই তারা উৎসন্ন হবার জন্যই সবরকমে সাধুদের হিংসা করতে লাগল। মহারাজ, মহৎ লোককে পীড়ন করলে পীড়কের আয়ু, শ্রী, যশ, ধর্ম, স্বর্গাদি লোক, কল্যাণ এবং সব রকম শুভ নষ্ট হয়। ৩৯-৪৬

পঞ্চম অধ্যায়

নন্দ ও বসুদেবের সমাগম

শুকদেব বললেন, মহারাজ, পুত্রসন্তান পেয়ে উদারচিত্ত নন্দ অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। তিনি স্নাত, শুদ্ধ ও অলংকৃত হয়ে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদের আহ্বান করে স্বস্তিবাচন পূর্বক যথানিয়মে পুত্রের জাতকর্ম করালেন। ঐসঙ্গে পিতৃপূজা ও দেবপূজাও হল। তিনি কুড়ি লক্ষ অলংকৃত ধেনু ও সাতটি তিলপর্বত ব্রাহ্মণদের দান করলেন। তিলপর্বত-গুলি স্বর্ণরস-রঞ্জিত বস্ত্র ও রত্নদ্বারা আবৃত হয়েছিল। কোন কোন বস্তু[১] কালে শুদ্ধ হয়, কোন কোনটি[২] স্নানে শুদ্ধ হয়, কোনটি[৩] বা শৌচ-সংস্কার দ্বারা শুদ্ধ

১ ভূমি প্রভৃতি। ২ দেহ। ৩ গর্ভ প্রভৃতি।

হয়। তেমনি কোন কোন বস্তু[১] তপস্যায় পবিত্র হয়, কোন কোন মানুষ[২] যজ্ঞে পবিত্র হন, কিছু কিছু পদার্থ[৩] সন্তোষে শুদ্ধ হয়। সেরকম, আত্মা আত্মজ্ঞান দ্বারা শুদ্ধ হয়ে থাকেন। যাই হোক, তারপর ব্রাহ্মণরা স্বস্তিবাচন আরম্ভ করলেন। সূত, মাগধ ও বন্দীরা স্তব করতে লাগলেন। গায়করা গান আরম্ভ করল এবং অনবরত ভেরী ও দুন্দুভির ধ্বনি হতে লাগল। ব্রজপুরীর সমস্ত দ্বার, আঙিনা, ঘরবাড়ি সব কিছু সুমার্জিত ও জলসিঞ্চিত হয়ে অপূর্ব শোভা বিস্তার করতে লাগল। ১-৬

ব্রজের গাভী, বৃষ ও বৎসগুলি তেল-হলুদে লিপ্ত হয়ে বিচিত্র ধাতু, মালা, ময়ূরপুচ্ছ, বস্ত্র ও কাঞ্চন দ্বারা বিভূষিত হল। গোপরা মহামূল্য বস্ত্র, আভরণ, কঞ্চুক (জামা) ও উষ্ণীষে সজ্জিত হলেন। তারপর তাঁরা নিজ নিজ গৃহে মঙ্গলচারণ করে মহারত্ন প্রভৃতি নানারকম উপহার হাতে নিয়ে নন্দের গৃহে আসতে লাগলেন। গোপীরাও যশোদার সন্তান হয়েছে শুনে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন এবং বস্ত্র, অলংকার এবং অঞ্জনে নিজেদের ভূষিত করতে লাগলেন। বিশালনিতম্বা, ত্রিবলীশোভিতা গোপীদের মুখকমল নবকুঙ্কুম ও পদ্মের কেশরে সুশোভিত হয়েছিল। চলার বেগে তাঁদের পীনস্তন আন্দোলিত হতে লাগল। তাঁদের পরিধানে ছিল বিচিত্র বস্ত্র, কানে দোদুল্যমান মণিকুণ্ডল, কণ্ঠে বিলম্বিত স্বন্দব পদক। অঙ্গে নানা রকম কনকভূষণ ধারণ করে সেই গোপীরা যখন নন্দের গৃহে যাচ্ছিলেন তখন পথের মধ্যে তাঁদের কেশপাশ থেকে মালা খসে পড়তে লাগল। চঞ্চল কুণ্ডল, পয়োধর ও হারে তাঁরা অপূর্ব শোভমানা হয়েছিলেন। তাঁরা বালককে 'রাজা হয়ে চিরকাল প্রজাপালন কর', এই আশীর্বাদ করে তাঁদের তেল, হলুদ ও জল দিয়ে অভিষিক্ত করলেন এবং তাঁর স্তুতিগান করতে লাগলেন। ৭-১২

শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-মহোৎসবে নানা বিচিত্র বাজনা বাজতে লাগল। গোপেরা পুলকিত হয়ে পরস্পরের গায়ে দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, জল সিঞ্চন ও নবনী লেপন করতে লাগলেন। নন্দ তাঁদের প্রসাদস্বরূপ বস্ত্র, অলংকার ও গোদান করলেন। পৌরাণিক, মাগধ, বন্দী ও অন্যান্য উপস্থিত বিদ্যোপজীবীরা যে যা চাইল তাকে সেরকম দান করে নন্দরাজ তাদের যথোচিত অভ্যর্থনা করলেন। আর মহাভাগ্যবতী রোহিণী দিব্য বসন, মালা ও কণ্ঠাভরণে ভূষিতা হয়ে ভগবানের আরাধনা এবং নিজপুত্রের[৪] মঙ্গল কামনায় যথাশক্তি দান করলেন। তা দেখে নন্দ ও অন্যান্য গোপদের যথেষ্ট আনন্দ হল। ১৩-১৭

সেই থেকে নন্দের ব্রজ সর্ব সমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ হল এবং বিষ্ণুর বাসের জন্য ব্রজধাম নানা গুণে বিভূষিত হয়ে মহালক্ষ্মীর বিহারভূমি হয়ে উঠল। তারপর নন্দ গোপদের গোকুল রক্ষায় নিযুক্ত করে কংসকে বার্ষিক রাজস্ব দেবার জন্য মথুরায় গেলেন। নন্দ মথুরায় এসেছেন এবং রাজাকে তাঁর কর দেয়া হয়ে গেছে জেনে বসুদেব তাঁর কাছে গেলেন। সখার সঙ্গে দেখা হওয়ায় নন্দ পরম আনন্দিত হলেন। জ্ঞান ফিরে এলে যেমন দেহ উত্থিত হয়, প্রিয়মিত্র বসুদেবকে দেখামাত্র নন্দ সেই ভাবে উঠে প্রীতি ও প্রেমে বিহ্বল হয়ে দুই বাহু দিয়ে তাঁকে আলিঙ্গন করলেন। তারপর বসুদেব পূজিত হয়ে সুখে বসে শ্রান্তি দূর করলেন এবং সাদরে কুশল জিজ্ঞাসা করে বললেন, ভাই, তুমি বৃদ্ধ হয়েছ, এপর্যন্ত তোমার পুত্র হয়নি, পুত্রের আশাও ত্যাগ করেছিলে এখন যে তোমার পুত্র হল এ পরম ভাগ্য। আমিও আজ

১ ইন্দ্রিয় প্রভৃতি। ২ ব্রাহ্মণ। ৩ মন প্রভৃতি। ৪ নিজপুত্রের—বলরামের।

ভাগ্যবলে তোমাকে দেখে যেন পুনর্জন্ম লাভ করলাম। কারণ সংসারচক্রে অবস্থান করা খুবই দুর্লভ প্রিয়দর্শন। ১৮-২৪

স্রোতের টানে ভেসে আসা তৃণ, কাঠ প্রভৃতি যেমন একত্র থাকে না, সে রকম যে সব বন্ধুর কর্ম বিভিন্ন ও বিচিত্র, তাদের পরস্পর একসঙ্গে থাকা হয়ে ওঠে না। বন্ধু, এখন তুমি যে বৃহৎ বলে সুহৃদদের নিয়ে বাস করছ সেখানকার (গবাদি) পশুদের কুশল তো? সেখানে কোন বিকার বা রোগের প্রাদুর্ভাব হয়নি তো? জল, তৃণ, লতা তো প্রচুর পাওয়া যাচ্ছে? ভাই, আমার এক পুত্র তার মার[১] সঙ্গে তোমাদের ব্রজে আছে। সে তোমাকে পিতা বলে মানে, তোমাদের কাছে সে নিশ্চয়ই সুখে আছে। আত্মীয়-বন্ধুদের সুখের জন্য ত্রিবর্গের (ধর্ম, অর্থ ও কাম) সাধনাই পুরুষের জন্য শাস্ত্রে বিহিত হয়েছে। তারা কষ্ট পেতে থাকলে ত্রিবর্গের প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না। নন্দ এই সব শুনে বসুদেবকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, বন্ধু, তোমার স্ত্রী দেবকীর অনেকগুলি সন্তান কংসের দ্বারা নিহত হয়েছে, শেষের কন্যাটিও স্বর্গে চলে গেছে। অদৃষ্টই লোকের পরম পদার্থ, অদৃষ্টকে যে সুখ-দুঃখের কারণ বলে জানে, সে কিছুতেই কাতর হয় না। বসুদেব বললেন, বন্ধু, রাজাকে বার্ষিক কর দেয়া হয়েছে, আমাদের সঙ্গেও সাক্ষাৎ হল। এখানে আর বেশী সময় থাকা ঠিক নয়, কেন না গোকুলে নানা উৎপাত, তাই তাড়াতাড়ি চলে যাও। বসুদেবের এই কথা শুনে নন্দ প্রভৃতি গোপেরা তাঁর কাছে বিদায় নিয়ে বৃষ-শকটে গোকুলে ফিরলেন। ২৫-৩২

ষষ্ঠ অধ্যায়

পুতনা-বধ

শুকদেব বললেন, ফেরার পথে নন্দ চিন্তা করতে লাগলেন যে বসুদেবের কথা কখনো মিথ্যা হয় না। হয়তো ব্রজে সত্যিই কোন উৎপাত শুরু হয়ে থাকবে এই আশঙ্কায় তিনি শ্রীহরিকে শরণ করলেন। এদিকে তখন বাস্তবিকই কংসের দ্বারা প্রেরিত হয়ে নিষ্ঠুর পুতনা নগর, গ্রাম ও ব্রজের বিভিন্ন স্থানে শিশু-হত্যা করে বেড়াচ্ছিল। মহারাজ, কোন আশংকা করো না। সাত্বতদের পতি হরির নাম শোনা মাত্র রাক্ষসরা নিহত হয়। যেখানে (তাঁর নাম) শ্রবণ ও কীর্তন হয় না সেখানেই রাক্ষসরা নিজ নিজ স্বভাবজ কর্ম করে থাকে। কাজেই সাক্ষাৎ ভগবান যেখানে উপস্থিত সেখানে ভয়ের আশংকা কোথায়? সেই নিশাচরী কামচারিণী পুতনা একদিন রাত্রে মায়াবলে পরমা সুন্দরী নারীর রূপ ধরে আকাশপথে নন্দ-গোকুলে প্রবেশ করল। তার কেশ-পাশে মল্লিকা কুসুম বিন্যস্ত, বিশাল নিতম্ব, স্তনদ্বয় স্থূল এবং উদর কৃশ। তার পরিধানে রমণীয় বস্ত্র, দেদীপ্যমান কুণ্ডলে তার মুখমণ্ডল উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল। সে মনোহর হাসি ও কটাক্ষে ব্রজবাসীদের চিত্ত হরণ করছিল বলে গোপেরা তাকে নিবারণ করল না। গোপীরা তাকে দেখে মনে করল ইনি বুঝি শ্রীকৃষ্ণের বনিতা লক্ষ্মী, এভাবে মূর্তিমতী হয়ে পতিকে দর্শনের জন্য আসছেন। তাই সে অনায়াসে নগরীর মধ্যে প্রবেশ করতে পারল। ১-৬

১ বলরাম ও তার মা রোহিণী

পূতনা শিশু খুঁজতে খুঁজতে নন্দের গৃহে শায়িত দুষ্টনাশন শিশু শ্রীকৃষ্ণকে দেখতে পেল। শিশুর অসীম তেজ ছাই-চাপা আগুন-এর মত প্রচ্ছন্ন ছিল। চরাচরসমূহের আত্মা, শিশুরূপী ভগবান ঐ রাক্ষসী আসা মাত্র বুঝতে পেরেছিলেন এ শিশুঘাতক। তাই তিনি যেন ভয়ে দুচোখ বন্ধ করে রইলেন। অনভিজ্ঞ লোক যেমন সাপকে দড়ি ভেবে তুলে নেয়, ঐ রাক্ষসী তেমনি কাছে গিয়ে দুষ্টের অন্তক সেই অনন্তকে শিশু ভেবে নিজের কোলে তুলে নিল। ঐ রাক্ষসী খাপে-ঢাকা তলোয়ারের মত তীক্ষ্ণচিত্ত হলেও বাইরে তার আচরণে খুবই বাৎসল্যের ভাব ছিল। শ্রীকৃষ্ণের দুই জননী যশোদা ও রোহিণী আগন্তুকের সৌন্দর্যে ও প্রভায় অভিভূতের মত তার দিকে তাকিয়ে রইলেন, কিছু বলতে পারলেন না। সেই অবসরে রাক্ষসী শিশুকে কোলে নিয়ে মারাত্মক বিষ মাখানো স্তন তাঁর মুখে দিল। ভগবান ক্রুদ্ধ হয়ে দুই হাতে তার দুই স্তন পেষণ করে রাক্ষসীর প্রাণের সঙ্গে তা পান করতে আরম্ভ করলেন। ফলে তার প্রাণের মর্মে মর্মে এমন ভীষণ যন্ত্রণা শুরু হল যে সে তা সহ্য করতে না পেরে বারবার 'ছাড়্ ছাড়্' বলতে লাগল। তার দুই চক্ষু বিস্ফারিত হল, সে মুহুর্মুহু হাত-পা ছুঁড়ে কাঁদতে আরম্ভ করল। স্তন আকর্ষণের বেগে তার শরীর ঘামে পরিপূর্ণ হয়ে গেল; পূতনার ভয়ানক চিৎকারে পর্বতসহ পৃথিবী ও গ্রহনক্ষত্র সমেত নভোমণ্ডল বিচলিত হল এবং পাতালসহ সমস্ত দিক প্রতিধ্বনিত হল। তাছাড়া যাবতীয় প্রাণিকুল বজ্রপাতের আশংকায় মাটিতে পড়ে গেল। আর ঐ নিশাচরী ঐ রকম ব্যথায় প্রাণ যাবে বুঝতে পেরে মৃত্যুর সময়ে চুল ছড়িয়ে, হাত-পা-শরীর বিস্তৃত ও মুখ বিকৃত করে নিজের রাক্ষসীরূপ ধারণ করল। মহারাজ, তারপর বৃত্রাসুর যে রকম বজ্রাহত হয়ে ভূমিতে পড়েছিল, পূতনার প্রাণহীন দেহও সেভাবেই গোষ্ঠে পড়ল। ৮-১৩

পূতনার দেহের ভারে ছয় ক্রোশের মধ্যে যত গাছ ছিল সব চূর্ণ হল। তার দাঁত লাঙ্গলের ফলার মত, নাক পর্বতগুহার মত, স্তনদ্বয় পাথরচূড়ার মত, আর আলুলায়িত কেশগুচ্ছের বর্ণ লাল। তার দুই চোখ অন্ধকূপের মত, দুই জঘন নদীর দুই তীরের মত। দুই হাত, উরু ও দুই পা যেন কয়েকটি বন্ধ সেতু আর পেট জলশূন্য হ্রদের মত। এর আগে ঐ রাক্ষসীর বিকট চিৎকারে গোপীদের হৃদয়, কর্ণ, মস্তক প্রভৃতি প্রায় বিদীর্ণ হয়েছিল, এখন তার ঐ ভীষণ দেহ দেখে তাঁদের অত্যন্ত ভয় হল। ঐ শিশু কিন্তু মৃতা রাক্ষসীর বুকের উপর নির্ভয়ে খেলা করছিল। গোপীরা আকুল হয়ে তাড়াতাড়ি তাকে কোলে তুলে নিলেন। যশোদা ও রোহিণীর সঙ্গে মিলিত হয়ে তারা সবাই বালকের সারা শরীরে গোপুচ্ছ সঞ্চালন প্রভৃতির সাহায্যে তাঁর রক্ষা বিধান করলেন। তারপর প্রথমে গোমূত্র পরে গোধূলি দিয়ে তাঁকে স্নান করিয়ে তাঁর ললাট প্রভৃতি দ্বাদশ অঙ্গে কেশব প্রভৃতি দ্বাদশ নামে[১] তিলক দিয়ে রক্ষাবন্ধন করলেন। ১৪-২০

তারপর গোপীরা বিধিমত আচমন করে নিজেদের শরীরে ও হাতে পৃথক ভাবে একাদশ বীজন্যাস করলেন, পরে বালকের দেহেও সেরকম করলেন। যেমন, অজ তোমার চরণদ্বয়, মণিমান তোমার জানুদ্বয়, যজ্ঞ তোমার উরুযুগল, অচ্যুত তোমার কটিতট, হয়গ্রীব তোমার জঠর, কেশব তোমার হৃদয়, ঈশ তোমার বক্ষঃস্থল, ইন (সূর্যদেব) তোমার কণ্ঠ,, বিষ্ণু তোমার ভুজদ্বয়, উরুক্রম[২] তোমার মুখ এবং ঈশ্বর

---

১ ললাটে কেশব, উদরে নারায়ণ, বক্ষে মাধব, কণ্ঠকূপে গোবিন্দ, দক্ষিণ কুক্ষিতে বিষ্ণু, দক্ষিণ বাহুতে মধুসূদন, দক্ষিণ স্কন্ধে ত্রিবিক্রম, বাম কুক্ষিতে বামন, বাম বাহুতে শ্রীধর, বাম স্কন্ধে হৃষীকেশ, পৃষ্ঠে পদ্মনাভ ও কটিতে দামোদর। ২ শ্রীহরি

তোমায় মস্তক রক্ষা করুন। তোমার আগে চক্রপাণি মুরারি, পেছনে গদাধারী শ্রীহরি, দু পাশে অসিধারী অর্জুন, কোণগুলিতে শঙ্খধারী উরুগায়[১], উপরে উপেন্দ্র এবং নিচে গরুড় আর সর্বদিকে হলধারী পুরুষ অবস্থান করুন। এভাবে গোপীরা বাইরের রক্ষা সাধনের পর অভ্যন্তর রক্ষা করে বলতে লাগলেন—হৃষীকেশ তোমার ইন্দ্রিয়সমূহ, নারায়ণ তোমায় প্রাণসকল, শ্বেতদ্বীপপতি তোমার চিত্ত রক্ষা করে অবস্থান করুন। যোগেশ্বর তোমার মন, পৃশ্নিগর্ভ তোমার বুদ্ধি এবং পরম ভগবান তোমার আত্মাকে রক্ষা করুন। গোবিন্দ তোমাকে ক্রীড়ার সময়ে, মাধব শয়নকালে, বৈকুণ্ঠ গমনকালে, শ্রীপতি উপবেশন সময়ে, সর্বগ্রহের ভয় উৎপাদক যজ্ঞভোক্তা তোমাকে ভোজনের সময় রক্ষা করুন। ডাকিনীরা, রাক্ষসীরা, কুষ্মাণ্ড প্রভৃতি বালকগ্রাহী ভূত, প্রেত, পিশাচ, যক্ষ, রাক্ষস ও বিনায়করা এবং কোটরা, রেবতী, জ্যেষ্ঠা, পুতনা প্রভৃতি মাতৃকাগণ; প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের নাশক অপস্মার[২], উন্মাদ প্রভৃতি রোগ; স্বপ্নদৃষ্ট মহা মহা উৎপাত এবং বৃদ্ধ ও বালকহন্তা সকলেই বিষ্ণুর নামে ভীত হয়ে বিনষ্ট হোক। ২১-২৯

মহারাজ, স্নেহবদ্ধ গোপীরা ঐ ভাবে রক্ষাবন্ধন করলে মাতা যশোদা সন্তানকে স্তন্য পান করিয়ে শয্যায় শোয়ালেন। এই সময়ে নন্দ প্রভৃতি গোপরা মথুরা থেকে ব্রজে ফিরে এলেন। তাঁরা পুতনার মৃতদেহ দেখে অত্যন্ত বিস্মিত হলেন। তাঁরা পরস্পর বলাবলি করতে লাগলেন, কি আশ্চর্য! বসুদেব নিশ্চয়ই ঋষি বা তপস্যার প্রভাবে সম্পূর্ণ জ্ঞানী হয়েছেন। তিনি মথুরাতে থেকে যে উৎপাতের কথা বলেছিলেন আমরা ব্রজে ফিরে তাই দেখলাম। তারপর ব্রজবাসী সকলে মিলিত হয়ে কুঠারের আঘাতে পুতনার মৃতদেহ খণ্ড খণ্ড করলেন। তারপর সেই দেহাংশকে দূরে ফেলে কাঠ দিয়ে বেষ্টন করে পোড়াতে লাগলেন। পুতনার দেহ দগ্ধ হবার সময় ব্রজবাসীদের কাছে আর এক বিস্ময় উপস্থিত হল। সেই দেহের ধূম অগুরু-চন্দনের মত সুরভিত হয়ে উঠল। শ্রীকৃষ্ণ স্তন্য পান করবার জন্য পুতনার দেহ স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে তার সমস্ত পাপ নষ্ট হয়েছিল। বালকঘাতিনী, রুধিরাশনা রাক্ষসী পুতনা হত্যা করার ইচ্ছায় হরিকে স্তন দিয়ে সদ্‌গতি লাভ করেছিল। আর যাঁরা শ্রদ্ধা ও ভক্তি দিয়ে পরমাত্মা ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে প্রিয়তম করেছিল তাঁদের সদ্‌গতির কথা আর কি বলব? ৩০-৩৬

যে চরণকমল ভক্তের হৃদয়ে স্থিত, যা লোক-বন্দিতদেরও বন্দনার বস্তু, সেই শ্রীচরণ দু'টি দিয়ে যার দেহে আঘাত করে ভগবান স্বয়ং স্তন্যপান করলেন সেই রাক্ষসীও জননীর গতি (স্বর্গ) লাভ করল। অখিল অর্থপ্রদ ভগবান দেবকী-নন্দন যে সব গাভী ও গোপীদের স্তনদুগ্ধ পান করেছিলেন, পুত্রস্নেহে যাঁদের স্তনদুগ্ধ ক্ষরিত হয়েছিল তাঁরা যে মায়ের উপযুক্ত সদ্‌গতি লাভ করবেন, তাতে আর আশ্চর্য কি! তাঁরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে অবিরত পুত্রদৃষ্টিতে দেখতেন, তাই অজ্ঞানজনিত সংসার-পাশে তাঁদের বন্ধন কল্পনা করা যায় না। যে সব ব্রজবাসী দূরে গিয়েছিলেন চিতাধূমের সৌরভ আঘ্রাণ করে 'এ সুগন্ধ কোথা থেকে এল' বলতে বলতে তাঁরাও ব্রজে এলেন। তারপর অন্যান্য গোপদের মুখে পুতনার বধ প্রভৃতি সমস্ত বৃত্তান্ত ও শিশুর কোন অমঙ্গল ঘটেনি এসব শুনে আশ্চর্যান্বিত হলেন। আর নন্দ প্রবাস থেকে ফিরে পুত্রকে কোলে নিয়ে তার মস্তক আঘ্রাণ করে পরম আনন্দিত হলেন। মহারাজ, পুতনার মুক্তি-বিবরণ তথা শ্রীকৃষ্ণের এই শৈশব-চরিত শ্রদ্ধার সঙ্গে যাঁরা শোনেন গোবিন্দে তাঁদের অনুরাগ জন্মাবে। ৩৭-৪৪

---

১ শ্রীবিষ্ণু। ২ পূর্বস্মৃতি লোপক অথবা মৃগীরোগ।

সপ্তম অধ্যায়

শকট ভঞ্জন ও তৃণাবর্ত সংহার

রাজা বললেন, প্রভু, ভগবান হরি বিভিন্ন অবতার রূপে যে যে কর্ম করেন, সে সবই আমাদের কানের তৃপ্তি ও মনের আনন্দদায়ক। তবুও যা শুনলে জীবের মনের গ্লানি এবং নানা ভোগবাসনা দূর হয়ে অচিরে চিত্ত শুদ্ধ হয়, হরিভক্তি জন্মে ও হরিভক্তের সঙ্গে সখ্য হয়, অনুগ্রহ করে সেই মনোহর ভাগবত-কথা বর্ণনা করুন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মনুষ্যলোকে অবতীর্ণ হয়ে মানুষের মতই আচরণ করেছিলেন। শুনতে পাই, তাঁর অন্যান্য বাল্যলীলা অত্যন্ত অদ্ভুত, অনুগ্রহ করে সে সবও বর্ণনা করুন। শুকদেব বললেন, মহারাজ, এক সময় বালকের অঙ্গ পরিবর্তন[1] এবং জন্মদিন উপলক্ষে নন্দালয়ে মহোৎসব হল। সেই মহোৎসবে যে সব পুরস্ত্রীরা উপস্থিত হলেন, সাধ্বী যশোদা তাঁদের সঙ্গে মিলিত হয়ে বাদ্য, সঙ্গীত ও দ্বিজদের মন্ত্রোচ্চারণ দ্বারা পুত্রের অভিষেক করলেন। পুত্রের স্নান প্রভৃতি মাঙ্গলিক কার্য শেষ হলে ব্রাহ্মণরা ভোজ্য, বস্ত্র, মালা এবং ধেনু লাভ করে স্বস্ত্যয়ন করলেন। নন্দপত্নী দেখলেন যে শ্রীকৃষ্ণের চোখে ঘুম এসেছে তিনি তাই তাঁকে আস্তে আস্তে শোয়ালেন। তারপর যে সব ব্রজস্ত্রী মহোৎসবে এসেছিলেন তিনি তাঁদের আপ্যায়নে ব্যস্ত রইলেন। তাই একসময় শিশুটি কেঁদে উঠলে তিনি তা শুনতে পেলেন না। শ্রীকৃষ্ণ একটি শকটের নীচে শুয়ে ছিলেন। স্তন্যপান করার জন্য কাঁদতে কাঁদতে তিনি উপরদিকে পা ছুঁড়তে লাগলেন। তাঁর পল্লবের মত কোমল ও ক্ষুদ্র চরণের স্পর্শেই শকট উলটে পড়ল। ফলে দধি, দুগ্ধ প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ যে পাত্রগুলি শকটের উপর ছিল সে সব চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে পড়ে গেল এবং শকটের চাকা, চাকার মধ্যভাগ ও জোয়াল ভেঙ্গে গেল। ১-৭

যশোদা ও সমাগত ব্রজনারীরা এবং নন্দ প্রভৃতি গোপগণ এই দৃশ্য দেখে ব্যাকুল হয়ে বলতে লাগলেন, কি ভাবে এই অতি বৃহৎ শকটটি নিজে নিজেই উল্টাল? এ কি কোন দৈত্যের কাজ? না কোন দুষ্ট গ্রহের কাজ? গোপ ও গোপীরা কিছুই স্থির করতে পারলেন না। তখন উপস্থিত বালকরা বললেন, এই বালক কাঁদতে কাঁদতে পা দিয়ে এই শকট ফেলে দিয়েছেন। কিন্তু গোপ ও গোপীরা বালকদের কথায় বিশ্বাস করলেন না। তাঁরা মায়ামনুষ্যশিশুর অলৌকিক অপ্রমেয় বলের বিষয় বুঝতে পারেন নি। যশোদা তাড়াতাড়ি গিয়ে ক্রন্দনরত পুত্রটিকে কোলে তুলে নিলেন এবং দুষ্ট গ্রহের আশংকায় প্রথমে ব্রাহ্মণদের দ্বারা রক্ষামন্ত্র পাঠের সঙ্গে স্বস্ত্যয়ন করিয়ে স্তন্যপান করাতে লাগলেন। বলশালী গোপরা পরিচ্ছদ প্রভৃতি সহ শকটটি যথাস্থানে রাখলেন। ব্রাহ্মণরা গ্রহাদির হোম করে দধি, আতপ চাল, কুশ ও জল দিয়ে মঙ্গল বিধান করলেন। মহারাজ, যে সব ব্রাহ্মণ অসূয়া, অসত্য, দম্ভ, ঈর্ষা, হিংসা ও অভিমান বর্জিত এবং সত্যশীল সেই সব ব্রাহ্মণাগ্রগণ্যরা যে আশীর্বাদ করেন তা কখনো বিফল হয় না, এই মনে করে নন্দ সমাহিতচিত্তে ব্রাহ্মণদের দ্বারা ঋক, সাম ও যজু মন্ত্রে সংস্কৃত, পবিত্র ওষধি মিশ্রিত জলে অভিষেক করিয়ে স্বস্তিবাচন করালেন। তারপর তিনি অগ্নিতে হোম করিয়ে ব্রাহ্মণদের উত্তম সুস্বাদু ও সুগন্ধযুক্ত অন্ন দিলেন। আর পুত্রের সমৃদ্ধি কামনা করে বস্ত্র, মালা ও স্বর্ণহারে ভূষিত অনেক গাভী দান করলেন। ব্রাহ্মণরা সবাই

১ শিশুর নিজে নিজেই পার্শ্ব পরিবর্তনে সক্ষম হওয়া।

আশীর্বাদ করতে লাগলেন। বেদজ্ঞ যোগী ব্রাহ্মণদের আশীর্বাদ কখনো নিষ্ফল হয় না। ৮-১৭

মহারাজ, ভগবানের অন্য বাল্যক্রীড়ার কথা বলি শোন। একদিন নন্দপত্নী পুত্রকে কোলে নিয়ে আদর করছিলেন এমন সময় হঠাৎ তাঁর মনে হল সেই শিশু যেন গিরিশিখরের মত অসহনীয় গুরুভার। তিনি তাঁকে কোলে রাখতে পারলেন না। ঐ গুরুভারে পীড়িত ও বিস্মিত হয়ে তিনি পুত্রকে মাটিতে শোয়ালেন এবং মহাপুরুষ নারায়ণকে স্মরণ করতে লাগলেন। এমন সময় তৃণাবর্ত নামে কংসের ভৃত্য এক দৈত্যরাজা কংসের আদেশে ঘূর্ণিবাতাস রূপে মাটিতে-রাখা বালককে হরণ করল। সেই অসুর প্রচণ্ড শব্দে দিগ্‌বিদিক্‌ ধ্বনিত করে ধূলিরাশি দ্বারা সমগ্র গোকুল আচ্ছন্ন করে সকলের দৃষ্টি হরণ করল। মুহূর্তের মধ্যে গোষ্ঠ ধূলোয় অন্ধকার হল। যশোদা যেখানে পুত্রকে রেখেছিলেন সেখানে তাঁকে দেখতে পেলেন না। তৃণাবর্ত নিক্ষিপ্ত ধূলি, পাথরখণ্ড ইত্যাদিতে আহত হয়ে শোকে বিমূঢ় হয়ে পড়ল। ফলে একে অপরকে দেখতে পেল না, কিছু শোনাও সম্ভব হল না। প্রচণ্ড ঘূর্ণিবায়ু থেকে এভাবে ধূলি বর্ষণ হতে থাকলেও মাতা যশোদা পুত্রের অনুসন্ধান করতে লাগলেন। কিন্তু পুত্রকে না পেয়ে তিনি মৃতবৎসা গাভীর মত মাটিতে আছড়ে পড়ে অতি করুণস্বরে কাঁদতে লাগলেন। তারপর বাতাস থেমে ধূলিবর্ষণ বেগ শান্ত হলে গোপীরা যশোদার কান্না শুনতে পেয়ে অশ্রুপূর্ণ মুখে সেখানে এলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে দেখতে না পেয়ে মনে মনে অত্যন্ত সন্তপ্ত হয়ে তাঁরাও কাঁদতে লাগলেন। ১৮-২৫

এদিকে দানব তৃণাবর্ত চক্রবায়ুর রূপ ধরে যখন শ্রীকৃষ্ণকে হরণ করে নিয়ে যাচ্ছিল তখন শিশুর ভারে তার বেগ কমে গেল। কষ্টে-সৃষ্টে যদিও সে আকাশ পর্যন্ত উঠল কিন্তু আর যেতে পারল না। মহারাজ, ঐ অদ্ভুত বালক দানবের কাছে পর্বততুল্য মনে হচ্ছিল কিন্তু বহু চেষ্টাতেও সে তাঁকে ত্যাগ করতে পারল না, কারণ বালক এত শক্ত করে তার গলা আঁকড়ে ধরেছিলেন যে শীঘ্রই তার সকল অঙ্গ অসাড় হল এবং চক্ষু বেরিয়ে এল। অস্পষ্ট শব্দ করতে করতে সেই দানব প্রাণ হারাল এবং বালককে নিয়ে ব্রজে এসে পড়ল। এদিকে যে নারীরা এতক্ষণ বিলাপ করছিলেন তাঁরা দেখলেন যে সেই ভীষণ রাক্ষস মহাদেবের বাণে বিদ্ধ ত্রিপুরাসুরের[১] মত শিলার উপর পড়ল এবং তার সর্বাঙ্গ চূর্ণ হয়ে গেল। শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু তার বুকের দিক অবলম্বন করে নিরাপদে ছিলেন। বিস্মিত রমণীরা তাড়াতাড়ি তাঁকে নিয়ে যশোদার কাছে দিলেন। রাক্ষস বালককে নিয়ে আকাশে উঠলেও তিনি মৃত্যুর হাত থেকে তো পরিত্রাণ পেলেনই, উপরন্তু তাঁর শরীরে কোন আঘাতই লাগলো না দেখে গোপীরা এবং নন্দ প্রভৃতি গোপরা অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে বলতে লাগলেন, কি আশ্চর্য, রাক্ষস বালককে হত্যা করলেও সে আবার জীবিত হয়ে ফিরে এসেছে! হিংস্র খল ব্যক্তি নিজের পাপেই মারা যায়, আর সাধু ব্যক্তিরা সর্বপ্রাণীকে সমান দেখেন বলে বিপদমুক্ত হয়ে থাকেন। আমরা তপস্যা, বিষ্ণুপূজা বা ইষ্ট, পূর্ত, দান এসব করেছিলাম, যেই পুণ্যে এই বালক মৃত্যুমুখ থেকে আত্মীয়-স্বজনের কাছে ফিরে এসে তাদের আনন্দে মগ্ন করল। গোপরাজ নন্দ এরকম সব অদ্ভুত ব্যাপার দেখে আশ্চর্যান্বিত হলেন এবং বসুদেবের কথা যে যথার্থ তা বারবার স্মরণ করতে লাগলেন। ২৬-৩৩

একদিন যশোদা শ্রীকৃষ্ণকে কোলে নিয়ে পুত্রস্নেহে বিগলিত হয়ে স্তন্যপান

[১] ত্রিপুর নামক অসুরকে নিহত করে শিব ত্রিপুরারি হয়েছেন।

করাচ্ছিলেন। শিশুর স্তন্যপান প্রায় শেষ হয়েছে, মা তাঁকে নিয়ে আদর করছেন, এমন সময়ে আলস্যবশে শ্রীকৃষ্ণ হাঁ করে হাই তুললেন। মা যশোদা শিশুর মুখের মধ্যে আকাশ, স্বর্গ, মর্ত্য, জ্যোতির্মণ্ডল, সর্বদিক, সূর্য, চন্দ্র, অগ্নি, বায়ু, দ্বীপ, পর্বত, নদী, বন এবং স্থাবর-জঙ্গম যাবতীয় প্রাণী-জগৎ দেখতে পেলেন।[১] মহারাজ, মৃগনয়না যশোদা হঠাৎ পুত্রের মুখে বিশ্ব দর্শন করে বিস্ময়ে চোখ বুজলেন, তাঁর সমস্ত দেহ থর থর করে কাঁপতে লাগল। ৩৪-৩৭

অষ্টম অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা

শুকদেব বললেন, মহারাজ, যদুকুলের পুরোহিত মহাতপস্বী গর্গ বসুদেব কর্তৃক প্রেরিত হয়ে একসময় নন্দরাজের গোকুলে এলেন। গোপরাজ নন্দ তাঁকে দেখে পরম প্রীত হলেন এবং তাঁকে সাক্ষাৎ বিষ্ণু জ্ঞান করে করজোড়ে প্রণাম করে পূজা করলেন। গর্গ তৃপ্ত হয়ে আসন গ্রহণ করলে গোপরাজ বললেন, ভগবান্, দীন গৃহী মানুষের মঙ্গলের জন্যই আপনার মত মহৎ ব্যক্তিরা আশ্রম ছেড়ে লোকালয়ে আসেন। এই যে জ্যোতিষ শাস্ত্র যাতে অতীন্দ্রিয় বস্তুর জ্ঞান জন্মে আপনিই তা প্রণয়ন করেছেন। ঐ শাস্ত্রের দ্বারা মানুষ পূর্ব জন্মের কর্ম ও বর্তমান জন্মের ভাব-ভাবী ফল জানতে পারে। আপনি শুধু জ্যোতির্বিদদের মধ্যেই শ্রেষ্ঠ নন, ব্রহ্মবিদদের মধ্যেও শ্রেষ্ঠ। আপনি তাই এই বালক দুটির নামকরণ-সংস্কার সম্পন্ন করুন। জন্মমাত্রই ব্রাহ্মণ মানুষের গুরু, আপনি সংস্কার করলে তা গুরুকৃত হবে। ১-৬

গর্গ বললেন, আমি যদুদের আচার্য বলে পৃথিবীতে বিখ্যাত। তাই আমি যদি এই পুত্রদের সংস্কার করি তা হলে লোকে এদের দেবকীর পুত্র মনে করবে। তোমার ও বসুদেবের যে পরস্পর সখ্যভাব আছে, পাপাত্মা কংস তা বিলক্ষণ জানে। দেবকীর অষ্টম গর্ভে যে কখনও কন্যা হতে পারে না, দেবকীর কন্যা মহামায়ার এই কথাও সে সবসময় চিন্তা করে থাকে। তাই দেবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তান কোথাও জীবিত আছেন এই আশঙ্কা করে যদি সে এই বালককে হত্যা করে তা হলে আমাদের সর্বনাশ হবে। নন্দ বললেন, ভগবান্, আপনি গোপনে শুধু স্বস্তিবাচন করে দ্বিজাতিযোগ্য সংস্কার সম্পন্ন করুন। আপনাকে কেউই, এমনকি আমাদের আত্মীয়-স্বজনরাও দেখতে পাবেন না। ৭-১০

শুকদেব বললেন, মহারাজ, গর্গাচার্য নিজেই ঐ কাজ করতে এসেছিলেন। এখন এ-ভাবে প্রার্থিত হয়ে গুপ্তভাবে নির্জনে দুই বালকের নামকরণ করে বললেন, এই রোহিণীর পুত্র গুণ দ্বারা আত্মীয়দের আনন্দিত করছেন, তাই এঁর নাম রাম হবে। এঁর বলও অধিক তাই এঁকে বল বলেও জানবে। আর বসুদেব এবং তোমাতে অভিন্ন ভাব থাকাতে এঁতে দুই কুলের আকর্ষণ রয়েছে। এই জন্য এঁকে সংকর্ষণ[২] নামেও অভিহিত করা হবে। পূর্বে বিভিন্ন যুগে লীলাদেহধারী শ্রীভগবান

১ তুলনীয়: অর্জুনের বিশ্বরূপ দর্শন; গীতা, ১১।১২ শ্লোক।

২ দেবকীর গর্ভ থেকে আকর্ষণ করে রোহিণীর গর্ভে [illegible] সঙ্কর্ষণ নাম হয়েছিল।

শুক্ল, রক্ত ও পীত এই তিনটি বর্ণ ধারণ করেছিল এখন কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করেছেন, তাই এঁর নাম কৃষ্ণ হবে। শ্রীমান্, তোমার পুত্র কোন এক সময়ে বসুদেবের পুত্র হয়েছিলেন তাই ইনি বাসুদেব নামেও অভিহিত হবেন। তোমার পুত্রের গুণ ও কর্মের উপযুক্ত নানা রকম নাম ও রূপ রয়েছে, সে সব অন্যে না জানলেও আমি জানি। এই গোকুলনন্দন তোমাদের মঙ্গল বিধান করবেন, এঁর প্রভাবে তোমরা সমস্ত বিপদ থেকে উদ্ধার পাবে। ব্রজপতি, পুরাকালে দস্যুরা সাধুদের উপর উৎপাত করলে অরাজকতা উপস্থিত হয়েছিল। তখন ইনি সাধুদের রক্ষা করেন তাতে তাঁরা শক্তিমান হয়ে দস্যুদের পরাস্ত করেন। অসুরেরা যেমন বিষ্ণুর অনুচরদের পরাজিত করতে পারে না, তেমনি যে সব ভাগ্যবান মানুষ এঁকে ভালবাসেন শত্রুরা তাঁদের পরাস্ত করতে পারে না। নন্দ, তোমার এই পুত্র গুণ, সম্পত্তি, কীর্তি এবং অনুভবে নারায়ণের সমান, তুমি এঁকে সাবধানে রাখবে। এই রকম আদেশ করে গর্গাচার্য নিজের বাড়ি ফিরে গেলে নন্দ সানন্দে নিজেকে সকল কল্যাণে মণ্ডিত মনে করতে লাগলেন। ১১-২০

এভাবে কিছু সময় গেলে ক্রীড়াশীল রাম ও কৃষ্ণ হামাগুড়ি দিয়ে ব্রজে বিহার করতে লাগলেন। যখন তাঁরা তাঁদের অতি সুন্দর পা দুখানি টেনে টেনে চলতেন তখন ঘুঙুরের উচ্চ শব্দ হোত। তাঁরা সে শব্দে আনন্দিত হতেন এবং কখনও বা কোন পথচারীকে অনুসরণ করে যেন মুগ্ধ ও ভীত হয়ে মায়েদের কাছে ফিরে আসতেন। কর্দম প্রভৃতিও অঙ্গরাগের মতই দুই ভাইয়েরই সুন্দর দেহকে আরও সুন্দর করে তুলতো। স্নেহে তাঁদের মায়েদের স্তনে ক্ষীরধারা ক্ষরিত হোত। তাঁরা দুজনে সন্তান কোলে নিয়ে মুগ্ধদৃষ্টিতে তাদের বিরল-দন্ত শোভিত কচি মুখ দেখতেন এবং অতুল আনন্দ লাভ করতেন। তাঁরা যখন ক্রীড়াচ্ছলে গোবৎসের লেজ ধরতেন, তখন বৎসগুলি তাঁদের দুজনকে আকর্ষণ করে ইতস্তত দৌড়ে বেড়াত। ব্রজকামিনীরা গৃহকাজ ভুলে তাঁদের এইসব কাজ দেখে হেসে আনন্দ করতেন। আবার যখন দুই জননী ক্রীড়ারত অতি চপল বালক দুটিকে শৃঙ্গী, কুকুর, দংষ্ট্রী, খড়্গাদি অস্ত্র, জল, সর্প, পক্ষী, কণ্টক প্রভৃতি নানা বিপদ থেকে রক্ষা করা এবং গার্হস্থ্যকর্ম একই সঙ্গে সম্পন্ন করে উঠতে পারতেন না, তখন তাঁরা কি করবেন ভেবে স্থির করতে না পেরে উদ্বিগ্ন হতেন। ২১-২৫

হে রাজর্ষি, রাম ও কৃষ্ণ অল্পদিনের মধ্যেই জানুঘর্ষণ (হামাগুড়ি) ত্যাগ করে পায়ে হেঁটে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করতে লাগলেন। তারপর তাঁরা ব্রজবালকদের সঙ্গে ব্রজনারীদের আনন্দ সঞ্চার করে ক্রীড়া করতে লাগলেন। গোপীরা শ্রীকৃষ্ণের মনোহর বাল্যচপলতা দেখে এসে তাঁর মাকে বললেন, তোমার এই ছেলে কখনো অসময়ে বৎসদের মুক্ত করে দেয়, কেউ ভর্ৎসনা করলে হাসতে থাকে, কখনো বা চুরি করে সুস্বাদু দধি-দুগ্ধ ভক্ষণ করে, আবার তা বানরদের ভাগ করে দেয়। বানরেরা না খেলে ভাণ্ডগুলি ভেঙ্গে ফেলে। কোন কিছু না পেলে গৃহস্থের প্রতি কুপিত হয়ে তাদের শিশুদের কাঁদায়। যদি হাত বাড়িয়ে নাগালের মধ্যে কোন কিছু না পায় তাহলে পীঠ (পিঁড়ি) ও উদুখল (উখলি) প্রভৃতি দিয়ে উপায় রচনা করে তা হস্তগত করে। শিকায়-ঝোলানো ভাণ্ডের মধ্যে যে দধি, দুগ্ধাদি থাকে, তা নেবার ইচ্ছে হলে তাতে ছিদ্র করে দেয়। তোমার পুত্র ছিদ্র করতে বিলক্ষণ পটু। এর এর দেহ স্বভাবত উজ্জ্বল, তাতে আবার তা মণিমালায় শোভিত। গোপীরা গৃহকার্যে ব্যস্ত থাকলে বালক অন্ধকার ঘরে ঢুকে নিজের অঙ্গকান্তিকে প্রদীপের মত ব্যবহার করে প্রয়োজন সাধন করে থাকে। সে এ ভাবে নানা দৌরাত্ম্য করে। সে নানা জিনিস চুরি করেই ক্ষান্ত হয় না সম্মার্জিত স্থানে

মল-মূত্রও ত্যাগ করে। এই সব অপকর্ম করে তোমার কাছে সাধুর মত থাকে। ২৬-৩২

ব্রজকামিনীরা যখন কৃষ্ণের সভয় দুটি চোখে শোভিত মুখমণ্ডলের দিকে তাকিয়ে এ সব গুণ ব্যাখ্যা করেন, তখন মা যশোদা হাসতে থাকেন। তাঁর তিরস্কার করতে একটুও প্রবৃত্তি হয় না। একদিন বলরাম প্রভৃতি গোপবালকরা খেলতে এসে মা যশোদার কাছে নালিশ করল, কৃষ্ণ মাটি খেয়েছে। হিতৈষিণী যশোদা শিশুর হাত দু'টি ধরে ভয় দেখানো চোখ করে তাঁকে তিরস্কার করলেন, অশান্ত ছেলে, মাটি খেয়েছিস কেন? এই ব্রজবালকেরা আর জ্যেষ্ঠ রামও বলছে একথা। শ্রীকৃষ্ণ বললেন, মা, আমি মাটি খাইনি। এরা সবাই মিথ্যা কথা বলছে। সবার সামনেই আমার মুখ দেখ তা হলেই এদের কথা মিথ্যা কিনা বুঝতে পারবে। যশোদা বললেন, তা হলে হাঁ কর। মহারাজ, ভগবান শ্রীহরি লীলাচ্ছলে মানব-শিশুরূপে আবির্ভূত হলেও তাঁর ঐশ্বর্য নষ্ট হয় নি। তিনি মার ঐ কথা শুনে হাঁ করলেন এবং মা যশোদা তাঁর মুখের মধ্যে তাকিয়ে দেখলেন স্থাবর, জঙ্গম, অন্তরীক্ষ, সকলদিক, পর্বত, সাগর, দ্বীপ, সমুদ্রের সঙ্গে ভূলোক, প্রবাহ বায়ু, বিদ্যুৎ, অগ্নি, চন্দ্র ও তারামণ্ডলের সঙ্গে জ্যোতিশ্চক্র, জল, তেজ, আকাশ, স্বর্গ, ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতারা, সমস্ত ইন্দ্রিয়, মন, শব্দ প্রভৃতি বিষয়, ত্রিগুণ প্রভৃতি সহ সমস্ত বিশ্ব তাঁর মুখের মধ্যে বিরাজ করছে। পুত্রের বিস্ফারিত মুখের মধ্যে জীব, কাল, স্বভাব, কর্ম ও তার সংস্কার প্রভৃতি দ্বারা চরাচর শরীরের ভেদলক্ষণযুক্ত বিচিত্র বিশ্ব, এমন কি, ব্রজভূমি এবং নিজেকেও দেখে যশোদার ভয় হল।' তিনি বলতে লাগলেন, একি স্বপ্ন, না দৈব মায়া? না আমার বুদ্ধির বিকার ঘটেছে? দর্পণে যে রকম মুখ দেখি এর মধ্যে সেরকম সমস্ত বিশ্বকে দেখছি। এ বোধ হয় শিশু-সন্তানেরই কোন স্বাভাবিক ঐশ্বর্য। চিত্ত, মন, বাক্য এবং কর্মদ্বারা যে পদার্থের যথার্থ স্বরূপ নির্ণয় করা যায় না, যা জগতের আশ্রয়, যার অধিষ্ঠানের জন্য বুদ্ধিবৃত্তি অভিব্যক্ত হয় এবং যে পদ থেকে এই জগৎ প্রতীয়মান হচ্ছে, আমি সেই অনন্ত দুর্জ্ঞেয় পদকে নমস্কার করি। আমি যশোদা নাম্নী গোপী, এই ব্রজেশ্বর নন্দগোপ আমার পতি, আমি এর যাবতীয় বিত্তের অধিষ্ঠাত্রী সতী পত্নী, কৃষ্ণ আমার পুত্র, এই গোপ গোপী, গোধন আমার—এইসব কুমতি যাঁর মায়া থেকে উৎপন্ন হয়েছে সেই ভগবান আমাকে ত্রাণ করুন। ৩৩-৪২

মহারাজ, গোপী যশোদা সমস্ত তত্ত্ব উপলব্ধি করতে পারলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর প্রতি পুত্রস্নেহ-রূপিণী নিজ মায়া প্রয়োগ করলেন। তাতে গোপীর আত্মজ্ঞান বিলুপ্ত হল। তিনি পুত্রকে কোলে নিয়ে বুকের কাছে রেখে আবার আগের মত স্নেহে অচেতন হলেন। বেদ, উপনিষদ, সাংখ্য, যোগশাস্ত্র এবং ভক্তরা যাঁর মাহাত্ম্য গান করেন সেই শ্রীহরিকে যশোদা মায়ার বশে নিজের পুত্র মনে করলেন। ৪৩-৪৫

পরীক্ষিৎ বললেন, ভগবান্, নন্দ-যশোদাই বা এমন কি পুণ্য করেছিলেন যে পণ্ডিতেরা শ্রীকৃষ্ণের যে পাপনাশক উদার বাল্যলীলা আজ পর্যন্ত গান করে থাকেন, শ্রীকৃষ্ণের পিতা-মাতা বসুদেব ও দেবকী পর্যন্ত যা দর্শন করতে পারেন নি, কিন্তু এঁরা তা পারলেন? উপরন্তু ভগবান স্বয়ং যশোদার স্তন্য পান করলেন? শুকদেব বললেন, বসুশ্রেষ্ঠ দ্রোণ ধরা নাম্নী ভার্যার সঙ্গে ব্রহ্মার আদেশ পালন করার উদ্দেশ্যে তাঁকে বলেছিলেন, আমরা পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করলে লোকে যে ভক্তির দ্বারা উদ্ধার পায় বিশ্বেশ্বর শ্রীহরির প্রতি আমাদের যেন সেই পরম

ভক্তি জন্মে। তাতে ব্রহ্মা স্বীকৃত হয়েছিলেন এবং সেজন্য সেই দ্রোণ ব্রজের মহাযশ 'নন্দ' আর সেই ধরা 'যশোদা' নামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। হে ভারত, সেইজন্য ভগবান জনার্দনকে পুত্ররূপে পেয়ে তাঁর প্রতি তাঁর অগাধ ভক্তি জন্মে। অন্যান্য গোপ গোপীদেরও তাঁর প্রতি ভক্তি ছিল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মার আজ্ঞা সফল করার জন্য বলরামের সঙ্গে ব্রজে বাস করে নিজের লীলার দ্বারা তাঁদের দিব্য আনন্দ দিয়েছিলেন। ৪৬-৫২

নবম অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণের উদূখলে বন্ধন

শুকদেব বললেন, একদিন গৃহের দাসীরা অন্যকাজে নিযুক্ত থাকায় নন্দপত্নী যশোদা নিজে দধি মন্থন করতে শুরু করলেন। শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার কথা স্মরণ করে তিনি তা গান করছিলেন। যশোদার পরিধানে ছিল অতি সূক্ষ্ম বিচিত্রবর্ণে রঞ্জিত ক্ষৌমবস্ত্র, কটিতটে বন্ধ ছিল কাঞ্চী (মেখলা)। মন্থনরজ্জুর আকর্ষণে তাঁর ক্লান্ত বাহুদ্বয়ে কঙ্কণ ও কানে কুণ্ডল দুলছিল। তাঁর সর্বাঙ্গ কাঁপছিল আর পুত্রস্নেহে স্তনযুগল থেকে দুগ্ধ ক্ষরিত হচ্ছিল। তাঁর মুখমণ্ডলে বিন্দু বিন্দু স্বেদ উদ্গত হয়েছিল এবং দেহ-সঞ্চালনের সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণবর্ণ কবরী থেকে মেঘনির্মুক্ত জলবিন্দুর মত মালতী ফুল ইতস্তত খসে পড়ছিল। জননী যশোদা এভাবে দধি মন্থন করছেন, এমন সময়ে শ্রীকৃষ্ণ স্তন্যপানের জন্য তাঁর কাছে এসে একহাতে মন্থনদণ্ড ধরে তাঁর কাজ বন্ধ করলেন। এতে যশোদার আনন্দ হল। তিনি কৃষ্ণকে কোলে তুলে নিয়ে পুত্রের সহাস্য মুখ দেখতে দেখতে স্তন্যপান করাতে লাগলেন। স্নেহে স্তন থেকে অতিরিক্ত দুগ্ধ ক্ষরণ হতে লাগল। এর মধ্যে চুল্লীর উপর যে দুধের ভাণ্ড চাপানো ছিল, তা উথলে উঠল। তাই যশোদা শিশুকে কোল থেকে নামিয়ে রেখে তাড়াতাড়ি সেইদিকে ছুটলেন। তখনও স্তন্যপানে শ্রীকৃষ্ণের পরিতৃপ্তি হয় নি। তাই তিনি রেগে রক্তবর্ণ ওষ্ঠ দাঁত দিয়ে কামড়ে কপটভাবে কাঁদতে কাঁদতে নুড়ি দিয়ে দধিভাণ্ড ভেঙে ফেললেন ও ঘরের মধ্যে ঢুকে নির্জনে ননি খেতে আরম্ভ করলেন। যশোদা দুধের কড়া নামিয়ে ফিরে এসে দেখেন, দধিপাত্র ভাঙা, কৃষ্ণও সেখানে নেই। তাই নিজের পুত্রেরই একাজ তা বুঝতে পেরে হাসতে লাগলেন। ঘরের মধ্যে তাকিয়ে দেখলেন যে শ্রীকৃষ্ণ উদূখল উলটে তার উপর দাঁড়িয়ে শিকা থেকে ননি নিয়ে নিজের খুশিমত বানরদের দিচ্ছেন। মাকে লুকিয়ে এই কাজ করছেন বলে তাঁর চোখের দৃষ্টি চঞ্চল। এ দেখে যশোদা চুপিচুপি তাঁর পেছনে গিয়ে উপস্থিত হলেন। শ্রীকৃষ্ণ বুঝতে পেরে পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখলেন যে মা লাঠি হাতে দাঁড়িয়ে আছেন। অমনি তিনি যেন ভয় পেয়ে উদূখল থেকে নেমে ছুটে পালাতে লাগলেন। যশোদাও তাঁর পেছনে পেছনে ছুটলেন। যোগীরা তপস্যা দ্বারাও যাঁর নাগাল পান না, যশোদা সেই শ্রীকৃষ্ণকে ধরার জন্য ছুটছিলেন! তাঁর বিশাল নিতম্বভারে গতি মন্থর হল, কেশবন্ধন থেকে ফুলগুলি খসে পড়তে লাগল; এইভাবে কিছুদূর গিয়ে তিনি কৃষ্ণকে ধরে ফেললেন। ১-১০

তিনি দেখলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ অপরাধ করেছেন বলে কাঁদছেন, নিজের হাতে চোখ

মুছছেন, তাঁর চোখের চার পাশে কাজল লেপটে গেছে। মা যশোদা কৃষ্ণের হাত দু'টি ধরে ভয় দেখিয়ে ভৎ'সনা করতে লাগলেন। পুত্র ভয় পেয়েছেন দেখে পুত্রবৎসলা মা হাতের লাঠি ফেলে তাঁকে দাড়ি দিয়ে বাঁধতে উদ্যত হলেন। যাঁর অন্তর নেই, বাহ্য নেই, পূর্ব নেই, পর নেই, যিনি জগতের পূর্ব, পর, বাহ্য ও অন্তর, যিনি নিজেই জগৎ, গোপী যশোদা সেই অব্যক্ত অধোক্ষজকে পুত্র মনে করে সাধারণ শিশুর মত দাড়ি দিয়ে উদুখলে বাঁধতে গেলেন। যশোদা অপরাধী পুত্রকে যে দাড়ি দিয়ে বাঁধছিলেন তা দুই আঙ্গুল ছোট হল দেখে তিনি আরেক গাছি দাড়ি যোগ করলেন। কিন্তু তাও একই পরিমাণে ছোট হল। তখন তিনি আরও এক-গাছি দাড়ি যোগ করলেন, কিন্তু তাও সেই দুই আঙ্গুল ছোট হল, শিশুকে আর বাঁধা গেল না। এভাবে নিজের এবং গোপীদের ঘরে যত দাড়ি ছিল সব যোগ করেও যশোদা যখন শ্রীকৃষ্ণকে বাঁধতে পারলেন না, তখন তিনি বিস্মিত ও লজ্জিত হলেন। অন্যান্য গোপীদেরও অতিশয় বিস্ময় জন্মাল। ১১-১৭

শ্রীকৃষ্ণকে বাঁধবার চেষ্টায় শ্রান্ত হয়ে যশোদা ঘামে প্রায় স্নান করে উঠেছিলেন, তাঁর খোঁপার ফুলের মালা খসে পড়েছিল। শ্রীকৃষ্ণ মায়ের পরিশ্রমে কৃপাপরবশ হয়ে নিজে স্বেচ্ছায় বন্ধ হলেন। মহারাজ, শ্রীহরি আত্মবশ, ঈশ্বর প্রভৃতি সহ সমস্ত জগৎ তাঁর বশবর্তী, তিনি স্বতন্ত্র হয়েও এভাবে ভক্তবশ্যতা দেখালেন। মুক্তিদাতা শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে গোপী যশোদা যে অনুগ্রহ লাভ করলেন তা ব্রহ্মা (পুত্র হয়ে), শিব (আত্মীয় হয়ে) এবং স্বয়ং লক্ষ্মীও (অঙ্গাশ্রিতা ভার্যা হয়ে) লাভ করেন নি। কারণ গোপীনন্দন ভগবান ভক্তিমান মানুষের কাছে যে রকম সুখলভ্য, দেহাভিমানী তপস্বীদের বা আত্মভূত জ্ঞানীদের কাছে ততটা নন। ১৮-২১

মা যশোদা যখন ঐ ভাবে তাঁকে বেঁধে রেখে ঘরের অন্যান্য কাজে ব্যস্ত হলেন, যমলার্জুন নামের দু'টি গাছের দিকে শ্রীকৃষ্ণের চোখ পড়ল। ঐ গাছ দু'টি আগের জন্মে কুবেরের পুত্র নলকূবর ও মণিগ্রীব নামে বিখ্যাত ঐশ্বর্যশালী যক্ষ ছিল। গর্বে অন্ধ হওয়ার জন্য নারদের শাপে তারা গাছ হয়েছিল। ২২-২৩

দশম অধ্যায়

যমলার্জুন উদ্ধার

পরীক্ষিৎ বললেন, ভগবান, ঐ দুজন কি কারণে অভিশপ্ত হয়েছিল, তা বলুন। শুকদেব বললেন, মহারাজ, কুবেরের ঐ দুই পুত্র রুদ্রের অনুচর হওয়াতে অত্যন্ত গর্বিত ও মদমত্ত হয়ে পড়ে। তারা কৈলাস পর্বতের রমণীয় পুষ্পময় উপবনে ও মন্দাকিনীর তীরে মদ্যপান করে ঘূর্ণিতচোখে নারীদের সঙ্গে বিচরণ ও নৃত্যগীত করত। একদিন তারা পদ্মবনে শোভিত গঙ্গার জলে নেমে হস্তি যেমন হস্তিনীদের সঙ্গে বিহার করে, সেরকম ভাবে যুবতীদের সঙ্গে জলকেলিতে মত্ত হল। হে কৌরব, এই সময় দেবর্ষি নারদ ঘুরতে ঘুরতে ঐ জায়গায় এসে তাদের দেখতে পেলেন। বিবস্ত্রা অপসরারা তাঁকে দেখে অভিশাপের ভয়ে তাড়াতাড়ি নিজের নিজের বস্ত্র পরলেন, কিন্তু ঐ দুই গুহ্যক দিগম্বর হয়েই রইল। নারদ দেখলেন যে কুবেরের ঐ দুই পুত্র সুরা এবং ঐশ্বর্য এই দুই মদেই মত্ত হয়েছে। তিনি তাদের প্রতি অনুগ্রহ করার জন্যই শাপ দিয়ে বললেন হায়, ঐশ্বর্যমদের প্রভাবে নারী, দ্যূত এবং মদ্য এই তিনেরই সমাবেশ ঘটে। এই সবে আসক্ত পুরুষের যে রকম বুদ্ধিভ্রংশ হয়,

সৎকুলে জন্মের জন্য অভিমান বা রজোগুণের ফলে ক্রোধ ইত্যাদি থেকেও সে রকম হয় না। সম্পদের গর্বে গর্বিত হয়ে নির্দয় মানুষেরা এই নশ্বর দেহকে জরা-মৃত্যুহীন চিরস্থায়ী মনে করে পশুহত্যা করে। এই নশ্বর দেহ নরদেব, ভূদেব প্রভৃতি আখ্যায় আখ্যাত হলেও শেষে কৃমি, বিষ্ঠা বা ভস্মে পরিণত হয়। এই রকম দেহের জন্য যে প্রাণিহিংসা করে সে কখনই নিজের মঙ্গলসাধন করতে পারে না, কারণ জীবহিংসাই নরকে যাওয়ার প্রথম সোপান। ১-১০

যে দেহের জন্য এত যত্ন তা কি নিজের, অন্নদাতার, পিতামাতার, না পিতামহের ? না কি তা ক্রেতার বা বলবানের, অগ্নির বা কুকুরের ? কিছুই তো জানা যায় না। যখন এরকম সন্দেহ, তখন তো দেহ সাধারণ সম্পত্তি। প্রকৃতি থেকে তা উৎপন্ন হয়, আবার প্রকৃতিতেই বিলীন হয়ে যায়। তাই মূঢ় ব্যক্তি ছাড়া কোন্ জ্ঞানী এরকম দেহে আত্মবুদ্ধি করে তার জন্য প্রাণি-হত্যা করে ? ঐশ্বর্য-মদে যাদের চোখ অন্ধ হয়েছে, দারিদ্র্যই তাদের উৎকৃষ্ট অঞ্জন। দরিদ্রলোক নিজের সঙ্গে তুলনা করে সবাইকেই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করে। যার দেহে কাঁটা বিঁধছে সে-ই অপরের মুখের যন্ত্রণা ও মালিন্যের চিহ্ন দেখে তার দুঃখ জানতে পারে। অন্যে তার মত দুঃখ পাক তা সে চায় না। কিন্তু যার দেহে কাঁটা বেঁধেনি সে কখনো পরের দুঃখ বুঝতে পারে না, তাই পরোপকারও করতে পারে না। দরিদ্রের 'আমি' ও 'আমরা' এইরকম অহংবোধ দূর হয়ে যায়। সর্ব অহংকার থেকে সে মুক্ত। তার জীবনে যে সব দুঃখ উপস্থিত হয় সে সব সহ্য করাতেই তার পরম তপস্যার ফল লাভ হয়। অন্নহীন দরিদ্রের দেহ ক্ষুধায় প্রায় প্রত্যহ ক্ষীণ হয়ে আসে, ইন্দ্রিয়গুলি নিস্তেজ হয়ে পড়ে, তাই নরক প্রভৃতির কারণ হিংসারও নিবৃত্তি হয়। সমদর্শী সাধুপুরুষরা দরিদ্রের সঙ্গ করেন। এভাবে সাধুসঙ্গ হওয়ার ফলে তার বিষয়তৃষ্ণা ক্ষয় হয় এবং শীঘ্রই চিত্তশুদ্ধি হয়ে পরমানন্দ লাভ হয়। যে সাধুব্যক্তি শুধু মুকুন্দের চরণের অভিলাষী, ধনগর্বিত অসৎ লোকের সঙ্গ তার কি প্রয়োজন ? তাই আমি মদমত্ত, ঐশ্বর্যগর্বে অন্ধ, স্ত্রৈণ ও ইন্দ্রিয়পরবশ এই দুই গন্ধর্বের অজ্ঞানকৃত অহঙ্কার নাশ করব। এরা লোকপাল কুবেরের পুত্র হয়েও এমন অজ্ঞানান্ধ ও দুর্বিনীত হয়েছে, যে নিজেদের বিবস্ত্র বলে বুঝতেও পারছে না। এই অপরাধে এরা বৃক্ষযোনি লাভ করুক। ঐ স্থাবর শরীর লাভ করেও আমার প্রসাদে এদের পূর্বস্মৃতি থাকবে। একশত দিব্য বৎসর অতীত হলে এরা বাসুদেবের সান্নিধ্যলাভ করে আবার স্বর্গে এসে কৃষ্ণভক্তি লাভ করবে। ১১-২২

শুকদেব বললেন, দেবর্ষি নারদ এই কথা বলে বৈকুণ্ঠধামে চলে গেলেন। নলকূবর ও মণিগ্রীব তাঁর শাপে দুই যমজ অর্জুনবৃক্ষ হয়ে গোকুলে বাস করতে লাগল। ভগবান শ্রীহরি পরম ভাগবত দেবর্ষির বাক্য সত্য করার জন্য যেখানে ঐ যমলার্জুন ছিল ধীরে ধীরে সেদিকে গেলেন। দেবর্ষি আমার প্রিয়তম, আর এরাই সেই কুবের-পুত্রদ্বয়। মহাত্মা নারদ যা বলেছেন আমি তা সফল করব। মনে মনে এই বলে ভগবান যমজ অর্জুন-গাছদুটির মাঝখানে গেলেন। তিনি যে উদূখলের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বাঁধা ছিলেন তা উল্টে গিয়ে তার সঙ্গে সঙ্গে চলতে চলতে বাঁকাভাবে গাছদুটিতে আটকে গেল। শ্রীকৃষ্ণ সজোরে উদূখল টানলেন এবং যমলার্জুন মূল সহ উৎপাটিত হল। শ্রীকৃষ্ণের পরাক্রমে ঐ গাছদুটি শাখাপ্রশাখা ও স্কন্ধপত্র সহ কাঁপতে কাঁপতে সশব্দে মাটিতে পড়ে গেল। সেই দু'টি গাছের মধ্য থেকে আগুনের মত মূর্তিমান দু'জন সিদ্ধপুরুষ আবির্ভূত হলেন। তাঁদের সৌন্দর্যের ছটায় চারদিক উদ্ভাসিত হল। তাঁরা মাথা নিচু করে অখিল লোকনাথ

শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করে কৃতাঞ্জলিপুটে নম্রতা ও বিনয়ের সঙ্গে বলতে লাগলেন, হে কৃষ্ণ, হে মহাযোগী, আপনি বালক নন, আপনি পরমপুরুষ আদ্যকারণ। তত্ত্বজ্ঞ পুরুষরা বলেন, স্থূল ও সূক্ষ্মরূপে প্রকাশিত এই বিশ্ব আপনার রূপ। হে প্রভু, একমাত্র আপনিই সর্বভূতের দেহ, প্রাণ, আত্মা এবং ইন্দ্রিয়ের ঈশ্বর। আপনি অব্যয় ঈশ্বর বিষ্ণু, আপনিই কাল। আপনিই মহান কার্য, আপনিই সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণময়ী সূক্ষ্ম প্রকৃতি। আপনিই পুরুষ, সর্বক্ষেত্রের অধ্যক্ষ, তাই আপনি সর্বস্বরূপ। হে প্রভু, আপনি সমস্ত জীবদেহের অবস্থা, কার্য ও মন প্রভৃতির দ্রষ্টা, সর্বনিয়ন্তা পুরুষরূপে বিদ্যমান আছেন। জীব আপনাকে জানতে পারে না, কারণ সর্বজীবের উৎপত্তির আগে থেকে আপনার সত্তা রয়েছে। দেহে আবদ্ধ কোন্ জীব আপনাকে জানতে পারবে? আপনি স্বয়ং ভগবান বাসুদেব, আপনাকে প্রণাম করি। মেঘে ঢাকা পড়লে যেমন সূর্যের তেজ আচ্ছন্ন মনে হয় সে রকম নিজের ঐশ্বর্যের ছটাতেই নিজেকে আবৃত করে আপনি বিরাজ করছেন। হে পরব্রহ্ম, আপনাকে নমস্কার। আপনি অশরীরী হলেও যখন অবতার-রূপে দেহ ধারণ করেন, তখন আপনার লোকাতীত বীর্য দর্শন করে জ্ঞানীরা আপনার আবির্ভাব নিরূপণ করতে পারেন। সেই আপনি সর্বলোকের ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গলের জন্য এখন পূর্ণস্বরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন। হে পরমকল্যাণ, হে বিশ্বমঙ্গল, আপনাকে নমস্কার করি। হে শান্তমূর্তি, যদুপতি বাসুদেব আপনাকে নমস্কার। ২৩-৩৬

হে সর্বব্যাপী ভূমা, আমরা দুজন আপনার অনুচরের কিংকর। দেবর্ষির অনুগ্রহে আমবা আপনার দর্শন লাভ করলাম আমাদের জিহ্বা আপনার গুণকীর্তনে, কান আপনার গুণ শ্রবণে, হাত আপনার প্রীতিকব কাজে, মন আপনার চরণ স্মরণে, মস্তক আপনার অধিষ্ঠানে এই জগৎকে প্রণামে, চক্ষু আপনার মূর্তিস্বরূপ ভক্তজন দর্শনে নিযুক্ত থাকুক। ৩৭-৩৮

শুকদেব বললেন, মহারাজ, গোকুলেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উদূখলে বদ্ধ থেকেও এই স্তুতি সংকীর্তন শুনে হাসতে হাসতে গুহ্যকদের বললেন, করুণাময় দেবর্ষি নারদ তোমাদের মদান্ধ দেখে অনুগ্রহ করে যে শাপ দিয়েছিলেন, আমি তা আগেই জেনেছিলাম। আমাতে অনুরক্ত সাধু ও সমদর্শী মহাপুরুষদের দর্শন করলেই জীবমাত্রের বন্ধন দূর হয়, যেমন সূর্য দেখলে চোখের বন্ধন বা অন্ধকার দূর হয়। অতএব কুবেবনন্দন, তোমরা দুজনে নিজেদেব গৃহে চলে যাও। আমার প্রতি তোমাদের পবম প্রীতি জন্মেছে, তোমাদের আর বন্ধনভয় নেই। শুকদেব বললেন, শ্রীকৃষ্ণ সেই দুই গুহ্যককে (যক্ষকে) একথা বললে তাঁরা উদূখল-বদ্ধ শ্রীকৃষ্ণকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করে এবং সম্ভাষণ জানিয়ে উত্তরদিকে চলে গেলেন। ৩৯-৪৩

একাদশ অধ্যায়

বৎসাসুর ও বকাসুর বধ

শুকদেব বললেন, কুরুশ্রেষ্ঠ, এদিকে নন্দ প্রভৃতি অন্যান্য গোপরা ঐ দুই গাছ পড়ার শব্দ শুনে বজ্রপাত আশংকা করে সত্বর সেখানে গিয়ে দেখলেন যে যমজ অর্জুনগাছ মাটিতে পড়ে আছে। যমলার্জুনের পতনের কারণ যে নন্দপুত্র স্বয়ং, তিনি যে উদূখল দিয়ে দড়ি-বাঁধা অবস্থায় থেকে তখনও ঐ উদূখল টানছেন সেদিকে

নন্দ প্রভৃতি গোপদের মনোযোগ আকৃষ্ট হল না। কার দ্বারা, কি কারণে এরকম অদ্ভুত উৎপাত শুরু হল, সেই চিন্তায় তাঁরা কাতর হলেন। সেখানে উপস্থিত অন্যান্য বালকরা বলতে লাগল (শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়ে), এই কৃষ্ণই দুটি গাছের মাঝখানে তেরছা হয়ে আটকে-যাওয়া, দড়িতে বাঁধা উদুখল টেনেছিলেন, তাতেই গাছ দু'টি উপড়ে পড়ে গেল। আমরা আরও দেখলাম যে গাছ দুটি থেকে দু'জন দিব্যপুরুষ বেরিয়ে এলেন। কিন্তু গোপেরা তাদের কথা গ্রাহ্য করলেন না, অত ছোট শিশুর পক্ষে এ কাজ সম্ভব বলে মনে করলেন না। অবশ্য কেউ কেউ গোপবালকদের কথায় মনে করলেন যে এ হলেও হতে পারে। ভগবৎ-মায়ায় মোহিত নন্দ দড়িবাঁধা নিজ পুত্রকে উদুখল টানতে দেখে হাসতে হাসতে তাঁর বন্ধন মোচন করে দিলেন। ১-৬

এভাবে বাল্যলীলায় ভগবান কখনও কখনও গোপীদের হাততালিতে উৎসাহিত হয়ে নাচতেন, তাঁদের বশবর্তী হয়ে দারুযন্ত্রের[১] মত গাইতেন, আজ্ঞাক্রমে পাদুকা, কলস, পীঠ প্রভৃতি বহন করে নিয়ে আসতেন। প্রথমে যেন তাঁর সামর্থ্য নেই এরকম ভাব দেখিয়ে পীঠ, পাদুকা ইত্যাদি শুধু ধরে রাখতেন, কখনও বা বল দেখবার জন্য দুই বাহু উপরে তুলতেন। তিনি যে ভৃত্যদের (ভক্তদের) বশীভূত তা দেখানোর জন্য ঐরকম ভাবে তিনি আত্মীয়-বন্ধুদের প্রীতি উৎপাদন করতেন। একদিন এক ফল-বিক্রয়িণীর 'ফল চাই' চিৎকার শুনে সমস্ত ফলের দাতা শ্রীকৃষ্ণ অঞ্জলি ভরে ধান[২] নিয়ে তাড়াতাড়ি ফল নেবার জন্য ছুটলেন। যেতে যেতে তাঁর হাত থেকে কিছু কিছু ধান পড়ে যেতে লাগল। ফল-বিক্রয়িণী তাঁর দুই হাত সুমধুর ফলে পূর্ণ করে দিতেই তার ফলের ঝুড়ি নানা রত্নে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। ৭-১১

যমলার্জুন পতনের পর একদিন শ্রীকৃষ্ণ ও রাম যমুনাতীরে অন্যান্য বালকদের সঙ্গে খেলছিলেন। সেই সময় জননী রোহিণী স্তন্যপানের জন্য তাঁদের ডাকতে লাগলেন। কিন্তু খেলায় মত্ত রাম ও কৃষ্ণ কেউ যখন ঐ ডাকে সাড়া দিলেন না তখন পুত্রবৎসলা রোহিণী তাঁদের আনার জন্য যশোদাকে পাঠিয়ে দিলেন। বেলা অতিক্রম করে শ্রীকৃষ্ণ বলরাম ও অন্যান্যদের সঙ্গে খেলছেন দেখে, পুত্রস্নেহে স্তনদ্বয় ক্ষরিত হতে শুরু করলে, তিনি ডাকতে লাগলেন, ওরে কৃষ্ণ, কমললোচন বাছা, তাড়াতাড়ি এস, স্তন্য পান কর, আর খেলে কাজ নেই। ক্ষুধায় ক্লান্ত হয়েছ, খাবে এস। কুলনন্দন রাম, ছোট ভাইকে সঙ্গে নিয়ে তাড়াতাড়ি এস। সেই কখন সকালের খাবার খেয়ে এসেছ, খেলতে খেলতে তোমরা ক্লান্ত হয়েছ। ব্রজপতি নন্দ ভোজন করতে বসে তোমাদের জন্য প্রতীক্ষা করছেন। এস, তোমরা আমাদের সুখী করবে চল। (অন্যদের প্রতি) ছেলেরা তোমরা এখন নিজের নিজের ঘরে যাও। (নিজ পুত্রের প্রতি) বাছা, তোমার সারা শরীর ধুলায় ধূসর হয়েছে, চল স্নান করবে। আজ তোমার জন্মনক্ষত্র, শুদ্ধ হয়ে ব্রাহ্মণদের গোদান করতে হবে। দেখ দেখি তোমার ঐসব বন্ধুদের মায়েরা ওদের কেমন স্নান করিয়ে সাজিয়ে দিয়েছে। তুমিও চল, স্নান-খাওয়া সেরে সেজেগুজে এসে আবার খেলবে। ১২-১৯

যশোদা স্নেহবশে নিখিলের চূড়ামণি ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে নিজের পুত্রবোধে হাত ধরে নিজের ঘরে এনে মাঙ্গলিক কাজগুলি সম্পন্ন করলেন। ২০

শুকদেব বললেন, এদিকে বৃহৎ বনের মধ্যে রোজ মহা উৎপাত ঘটতে লাগল দেখে নন্দ প্রভৃতি প্রাচীন ও বয়স্ক গোপেরা একত্রে মিলিত হয়ে কর্তব্য বিষয়ে পরামর্শ করতে লাগলেন। তাঁদের মধ্যে উপনন্দ নামে দেশ, কাল ও কার্যের তত্ত্বজ্ঞ,

---

১ সূত্র-সঞ্চালিত কাঠের পুতুল। ২ পূর্বে বিনিময় (Barter) নিয়মে পণ্যের কেনা-বেচা রীতি চালু ছিল, বোঝা যায়।

বিচক্ষণ ও বয়োবৃদ্ধ এক গোপ রাম-কৃষ্ণের মঙ্গল কামনায় বললেন, গোকুলের হিত চাইলে আমাদের এখান থেকে অন্য কোথাও চলে যাওয়া উচিত। এখানে সব সময় বালকদের প্রাণনাশ করার জন্য মহা সব উৎপাত উপস্থিত হচ্ছে। তারপর তিনি শ্রীকৃষ্ণকে কোলে তুলে বলতে লাগলেন, দেখ, দৈববলেই বালঘাতিনী পূতনার হাত থেকে বালকটি মুক্ত হয়েছে। ভগবান হরির অনুগ্রহে শকট এর উপর পড়েনি। চক্রবায়ুরূপধারী তৃণাবর্ত দানব একে আকাশ-পথে নিয়ে বিপদ ঘটাচ্ছিল। এই শিশু শিলাতলে পড়েছিল শুধু সুরেশ্বররা একে রক্ষা করেছেন। তারপর গাছদুটির মধ্যে প্রবেশ করে এ বা অন্য কোন বালক যে চাপা পড়ে মরেনি সেও অচ্যুতের অনুগ্রহ। তাই আর কোন উৎপাত বা অমঙ্গল ঘটবার আগেই চল আমরা সমস্ত বালকদের নিয়ে অন্য কোথাও চলে যাই। বৃন্দাবন নামক বন পশুচারণযোগ্য অজস্র নবীন বৃক্ষলতা তৃণে সমাকীর্ণ, সেখানে অনেক পবিত্র পর্বতও আছে। গো, গোপ ও গোপীদের পক্ষে বৃন্দাবন সুখকর হবে। শকট যোজনা কর, আর দেরী করা ঠিক হবে না। তোমরা সবাই যদি সম্মত হও তাহলে আজই আগে গোধন পাঠিয়ে দাও। ২১-২৯

উপনন্দের এই কথা শুনে গোপেরা সবাই একমত হলেন এবং তাঁকে সাধুবাদ জানিয়ে সকলেই নিজের নিজের শকট যোজনা করে তাতে দ্রব্যাদি রাখলেন এবং সেগুলি আবৃত করে যাত্রা করলেন। তাঁরা বালক, বৃদ্ধ, স্ত্রী ও সমস্ত গৃহোপকরণ শকটে চাপিয়ে নিজেরা সযত্নে ধনুর্বাণ গ্রহণ করলেন। গোধনগুলি আগে আগে চলল আর গোপেরা চারদিক থেকে তূর্যধ্বনি সহ শিঙ্গা বাজিয়ে বাজিয়ে পুরোহিত সঙ্গে নিয়ে যেতে লাগলেন। গোপীরা রথে বসে আনন্দিতচিত্তে কৃষ্ণলীলা গান করছিলেন। তাঁদের কুচমণ্ডল কুঙ্কুমরাগে রঞ্জিত, স্কন্ধে রমণীয় কণ্ঠভূষণ ও পরিধানে বিচিত্র বসন। যশোদা এবং রোহিণীও একটি রথে আরোহণ করে শ্রীকৃষ্ণ ও রামের সঙ্গে শোভা পেতে লাগলেন। রাম-কৃষ্ণের কথা শোনার জন্য তাঁদের চিত্ত সর্বক্ষণ উৎসুক থাকত। বৃন্দাবন সর্বকালেই সুখাবহ, গোপেরা তার মধ্যে প্রবেশ করে অর্ধচন্দ্রাকারে শকটগুলি স্থাপন করে সেখানে ব্রজবাসীদের বাসস্থান ঠিক করলেন। বৃন্দাবন, গোবর্ধন এবং যমুনাতীর দেখে রাম ও মাধব পরম পুলকিত হলেন। বাল্যক্রীড়া ও মধুর বচন দ্বারা ব্রজবাসীদের মধ্যে আনন্দ বিতরণ করতে করতে ক্রমে তাঁরা বৎসপাল (রাখাল) হয়ে উঠলেন। গোচারণ কাজের মধ্যে নানা রকম খেলায় তাঁদের সময় অতিবাহিত হতে লাগল। ৩০-৩৭

নানা রকম ক্রীড়াসামগ্রী নিয়ে তাঁরা গোপবালকদের সঙ্গে বৃন্দাবনের কাছে বৎস-চারণ করতে লাগলেন। তাঁরা কখনও বেণু বাজান, কখনও বেল আমলকী ফল নিয়ে ক্ষেপণ[১] কল্পনা করে ছুঁড়ে ছুঁড়ে খেলতে থাকেন। কখনও কিংকিণী সহ চরণ মাটিতে আঘাত করে নৃত্য করেন, কখনও বা বাছুরের শরীরে কম্বল মুড়ে কৃত্রিম বৃষ বানান এবং নিজেরাও বৃষের মত হয়ে তাদের মত শব্দ করতে করতে যুদ্ধ করেন। কখনও বা নানারকম জন্তুর অনুকরণে নানাবিধ শব্দ[২] করেন। কৌমার কালে রাম-কৃষ্ণ এভাবে সামান্য বালকের মত বিচরণ করতে লাগলেন। ৩৮-৪০

একদিন শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম বন্ধুদের সঙ্গে যমুনার তীরে বৎস চারণ করছিলেন, এমন সময় তাঁদের হত্যা করার জন্য এক দৈত্য সেখানে এল। ভগবান শ্রীহরি বৎসরূপধারী দৈত্যকে বৎসপালের মধ্যে দেখে চিনতে পারলেন এবং বলরামকে দেখিয়ে দিলেন। পরে তিনি কিছুই জানেন না এই ভাব দেখিয়ে

১ ক্ষেপণ—লাটিম অথবা বল। ২ প্রচলিত শব্দ 'হরবোলা'।

ধীরে ধীরে তার কাছে গেলেন। কাছে গিয়েই বৎসরূপধারী সেই অসুরের পেছনের পা দুটি লেজ সহ ধরে উপস্থিত বালকদের সামনে কিছুক্ষণ শূন্যে ঘোরালেন। তারপর তার প্রাণবায়ু বের হয়ে গেলে তাকে নিকটস্থ এক কদবেল গাছের উপর ছুঁড়ে ফেললেন। বৎসাসুরের দেহের ভারে ঐ কদবেল গাছটি পড়ে গেল এবং বৎসাসুরেরও পতন হল। মৃত অসুর দেখে বিস্মিত হয়ে গোপবালকরা তাঁকে সাধুবাদ দিলেন আর দেবতারা পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেন। ৪১-৪৪

মহারাজ, রাম-কৃষ্ণ সর্বলোকের[১] মুখ্য পালক। তারা দুজন বৎসপালক হয়ে প্রাতরাশ সঙ্গে নিয়ে ইতস্তত ঘুরে বেড়াতেন। একদিন গোপ-বালকরা নিজ নিজ বৎসদের জল পান করানোর জন্য জলাশয়ের কাছে গেলেন এবং বৎসদের জল পান করিয়ে নিজেরাও পান করলেন। তখন তাঁরা দেখতে পেলেন যে বজ্রাঘাতে ভগ্ন পর্বতশৃঙ্গের মত বিরাট এক জন্তু সেখানে বসে আছে। তাকে দেখে তাঁরা ভয় পেলেন। ঐ প্রাণীটি হল বকের রূপধারী এক মহা অসুর। তীক্ষ্ণচঞ্চু মহাবলশালী ঐ বকাসুর তড়িৎবেগে ছুটে এসে শ্রীকৃষ্ণকে গ্রাস করে ফেলল। তা দেখে বলরাম প্রভৃতি অন্যান্য গোপবালকরা প্রাণহীন ইন্দ্রিয়সমূহের মত অচেতন হয়ে পড়লেন। আর জগদ্গুরুপিতা[২] ঐ গোপাল-বালক শ্রীকৃষ্ণ বকের মুখের মধ্যে ঢুকে তার তালুমূল দগ্ধ করতে লাগলেন। অসুর সেই জ্বালা সহ্য করতে না পেরে তাঁকে উগরে ফেলে দিল। কিন্তু তাঁকে সম্পূর্ণ অক্ষত দেখে বকাসুর ক্রোধে জ্ঞানশূন্য হয়ে তীক্ষ্ণ চঞ্চু দিয়ে আঘাত করার জন্য তাঁর কাছে ছুটে এল। সাধুদের গতি ও দেবতাদের আনন্দদাতা শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত গোপ-বালকদের চোখের সামনে কংস-সখা ঐ বকের দুটি ঠোঁট দু'হাতে ধরে অবলীলায় তৃণের মত চিরে ফেললেন। তখন দেবতারা নন্দনকাননের মল্লিকা পারিজাত প্রভৃতি ফুলের বর্ষণে বকারি শ্রীকৃষ্ণকে আচ্ছাদিত করে ফেললেন এবং ঢাক, শঙ্খ ধ্বনি প্রভৃতি সহ নানা মন্ত্রে তাঁর স্তব করতে লাগলেন। গোপবালকরা এসব ব্যাপার দেখে হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন। তারপর শ্রীকৃষ্ণ বকাসুরের কবল থেকে মুক্ত হয়ে ফিরে এলে, ইন্দ্রিয়গুলি যেমন প্রাণ ফিরে এলে জেগে ওঠে সে ভাবে চেতনা ফিরে পেয়ে তাঁরা শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করলেন। পরে বৎসযূথ নিয়ে ব্রজে ফিরে এসে সকলের কাছে সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করলেন। ৪৫-৫৩

গোপ ও গোপীরা এ সব শুনে অত্যন্ত বিস্মিত হলেন। অতি আদরের ধন নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে কাছে পেয়ে তাঁরা আনন্দে পূর্ণ হয়ে মনে করলেন তিনি যেন পুনর্জন্ম লাভ করে ফিরে এসেছেন। তাঁকে দেখে তাদের আর যেন আশ মিটতে চাইছিল না। তারা বলতে লাগলেন, কি আশ্চর্য! কত বার এই বালক কৃষ্ণের মৃত্যুর কারণ উপস্থিত হল, কিন্তু যারা একে মারতে এসেছিল তারাই মরল। আগে এদের থেকেই অন্যের ভয় হত। এসব দানব অতি ভীষণ হয়েও একে হত্যা করতে পারে নি। পতঙ্গ যেমন আগুনে পুড়ে মরে, শ্রীকৃষ্ণকে মারতে এসে তারা নিজেরাই সে ভাবে মরল। ব্রহ্মবিদদের কথা কখনও মিথ্যা হয় না। ভগবান গর্গ যা বলেছেন[৩] তাই ঘটল। নন্দ প্রভৃতি গোপরা এইভাবে রাম-কৃষ্ণের কথা কীর্তন করে মহানন্দে কাল কাটাতে লাগলেন। সংসারযন্ত্রণা তাঁদের আর কষ্ট দিতে পারল না। আর রাম-কৃষ্ণও লুকোচুরি খেলে, সেতু তৈরী করে এবং বানরের মত লম্ফঝম্ফ সহ বালকোচিত নানা খেলায় রত থেকে কৌমার কাল অতিবাহিত করলেন। ৫৪-৫৯

---

১ সর্বলোকের—স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতালের। ২ জগদ্গুরুর পিতা—ব্রহ্মার জন্মদাতা বা ব্রহ্মার গুরুদেব। ৩ নারায়ণের সমান গুণ।

দ্বাদশ অধ্যায়

অঘাসুরের মুক্তি

শুকদেব বললেন, একদিন ভগবান হরির বনে ভোজন করার ইচ্ছা হল। তিনি প্রাতে উঠে মনোহর শৃঙ্গধ্বনি করে সমবয়স্ক রাখাল বালকদের ঘুম থেকে জাগালেন এবং নিজের বৎসসমূহ সামনে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। সহস্র সহস্র স্নেহশীল বালক নিজ নিজ সহস্রাধিক বৎস নিয়ে সানন্দে তার সঙ্গে চললেন। তাঁদের হাতে সুন্দর শিকা, বেত, বেণু ও বিষাণ ছিল। তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের অসংখ্য বৎসের সঙ্গে নিজেদের বৎসগুলিকে একত্র করে চরাতে চরাতে নানা বাল্যক্রীড়ার সংগে বিহার আরম্ভ করলেন। ঐ সব বালকদের জননীরা কাচ, মুক্তা, মণি তথা স্বর্ণভূষণ দিয়ে তাদের সাজিয়ে দিয়েছিলেন। তবুও তাঁরা বন থেকে পুষ্পগুচ্ছ, ফল, স্তবক এবং ময়ূরপুচ্ছ, গৈরিক রঙ প্রভৃতি সংগ্রহ করে সে সব দিয়ে আবার নিজেদের সাজাতে লাগলেন। পরস্পর পরস্পরের শিকা প্রভৃতি চুরি করে আবার ধরা পড়লেই দূর থেকে ছুঁড়ে দিতেন। এর মধ্যে এগুলি অন্য বালকের হাতে পড়লে তিনি আবার তা আরো দূরে ছুঁড়ে দিতে লাগলেন। শ্রীকৃষ্ণ বনশোভা দেখবার জন্য দূরে গেলে 'আমি আগে, আমি আগে' বলে বালকেরা তাঁকে স্পর্শ করে খেলতে লাগলেন। ১-৫

বালকদের মধ্যে কেউ বেণু, কেউ বা শিঙ্গা বাজাতে বাজাতে, কেউ ভৃঙ্গের সংগে গান করতে করতে, কেউ আবার কোকিলের কণ্ঠের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে কলধ্বনি করতে করতে খেলা করতে লাগলেন। কেউ আবার উড়ন্ত পাখীদের ছায়ার সঙ্গে ছুটলেন। কেউ বা মরালদের থেকেও মন্দ গতিতে চলতে লাগলেন। কেউ বকের অনুকরণে বসে বকধার্মিক সাজলেন, কেউ বা ময়ূরের সঙ্গে তালে তালে নৃত্য করতে লাগলেন। আবার কোন বালক গাছের-ডালে-বসা বানরের ঝুলন্ত লেজ ও বানরশিশুদের ধরে টানতে লাগলেন। কেউ বা গাছে উঠে তাদেরই মত লাফালাফি করে দাঁত দেখিয়ে ও চোখ-মুখ বিকৃত করে তাদের সংগে খেলতে লাগলেন। আবার কেউ ঝরনার জলে ভিজে ভেকদের সংগে লাফিয়ে ক্ষুদ্র জলাশয় অতিক্রম করতে লাগলেন। আবার ঐ জলাশয়ে নিজেদের ছায়া দেখে মুখবিকৃতি করে উপহাস এবং প্রতিধ্বনির উত্তর দিতে গিয়ে নানা কটুকথা বলতে লাগলেন। ৬-৯

মহারাজ, যে ভগবান শ্রীহরি জ্ঞানীজনের ব্রহ্মস্বরূপ ভক্তজনের পরমদেবতা এবং মায়ামূঢ় জনের সামান্য মনুষ্যবালক তাঁর সংগে গোপবালকেরা যখন এরকম বিহার করতে লাগলেন, তখন অবশ্যই তাঁরা রাশি রাশি পুণ্য সঞ্চয় করেছিলেন। আসলে ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষেরা যাঁর অনুভবমাত্র করেন, ভক্তেরা অতিগৌরবে যাঁর উপাসনা করে থাকেন, ব্রজবালকেরা সখ্যভাবে যে তাঁর সংগে বিহার করছিলেন এতে তাদের আশ্চর্য ভাগ্য ছাড়া আর কি বলা যাবে ? অথবা যোগিগণ বহুজন্ম কৃচ্ছ্রসাধন করে সংযতচিত্ত হয়েও যাঁর চরণরেণু লাভ করতে পারেন না সেই নিখিলেশ্বর ভগবান স্বয়ং যে সকল ব্রজবাসীকে প্রত্যক্ষ দর্শন দিয়েছেন তাঁদের ভাগ্যও যে অতি আশ্চর্য, একথা বলা বাহুল্য মাত্র। ১০-১১

সে যা হোক, বালকেরা একদিন এভাবে বনবিহার করছিলেন, এমন সময়ে অঘ নামে এক মহা অসুর ব্রজবালকদের আনন্দে খেলা করতে দেখে অসহিষ্ণু হয়ে সেখানে

এসে উপস্থিত হল। ঐ দানব অতি দুর্দান্ত ; দেবতারা অমৃতপানে অমর। তবুও তাঁরা অঘাসুরকে দেখে মৃত্যুভয়ে চিন্তা করতেন, এ পাপাত্মা কি ভাবে বিনষ্ট হবে। বকী (পূতনা) ও বকাসুরের অনুজ সেই অঘাসুর কংসের আদেশেই সেখানে এসেছিল। সে কৃষ্ণকে দেখে স্থির-নিশ্চয় হল এই বালকই আমার ভগ্নী ও ভ্রাতা পূতনা ও বকাসুরের হত্যাকারী। তাই বৎসপালের সঙ্গে একে আমি আজই বধ করব। এরা নিহত হলে ব্রজবাসীরাও অবশিষ্ট থাকবে না। এরা যখন আমার সুহৃদদের জন্য তিলোদকেরই ব্যবস্থা করেছে তখন ব্রজবাসীরা তো নিহত হয়েই রয়েছে। কৃষ্ণ ব্রজবাসীর প্রাণস্বরূপ। সেই কৃষ্ণরূপ প্রাণ চলে গেলে আর দেহের জন্য চিন্তা কি ? জীবলোকে পুত্রই প্রাণস্বরূপ। সেই পুত্র নষ্ট হওয়া অর্থই প্রাণও নষ্ট হওয়া। এই চিন্তা করে ঐ খল অসুর এক দীর্ঘ এবং পর্বতের মতই বিশাল এক অজগর দেহ ধারণ করল। তারপর সে বালকদের গ্রাস করবার আশায় পর্বতের গুহার মত বিশাল হাঁ করে পথের মধ্যে শুয়ে রইল। তার নিচের ওষ্ঠ পৃথিবী ও উপরের ওষ্ঠ মেঘ স্পর্শ করল। তার দাঁতগুলো গিরিশৃঙ্গের মত, মুখের মধ্যে গাঢ় অন্ধকার, জিহ্বা একটা প্রশস্ত পথের মত বিস্তৃত। তার নিঃশ্বাসের সঙ্গে রুক্ষ তপ্ত বাতাস প্রচণ্ড বেগে বেরিয়ে আসছিল আর চোখের দৃষ্টি জ্বলন্ত দাবাগ্নির মত মনে হচ্ছিল। ১২-১৭

রাক্ষসের ঐ বিকট চেহারা দেখে বালকেরা তাকে বাস্তবিক অজগর মনে করলেন, এবং 'এ আমাদের বৃন্দাবনেরই অপূর্বদৃষ্ট কোন বস্তু', এই ভেবে নির্ভয়ে তার কাছে গিয়ে তার সঙ্গে অজগরের সাদৃশ্য নিয়ে তর্ক করতে আরম্ভ করলেন। তাঁরা প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে পরস্পর বলতে লাগলেন, বলতো আমাদের সামনে এই যে বস্তুটি রয়েছে তা কি কোন নিশ্চয় প্রাণী ? এই জন্তু কি আমাদের গ্রাস করার জন্যই এইভাবে সাপের মত মুখ হাঁ করে আছে ? পরে তাঁরা নিশ্চিত হয়ে বলতে লাগলেন, হ্যাঁ, তাই, ঐ কথাই ঠিক। ঐ দেখ সূর্যকিরণে আরক্ত মেঘ এর উপরের ওষ্ঠের এবং ঐ মেঘের প্রতিচ্ছায়ায় রঞ্জিত ভূমি এর অধর ওষ্ঠের মত দেখাচ্ছে। বাঁ ও ডান দিকের দু'টো গিরিগুহা ওষ্ঠ-প্রান্তের সমান মনে হচ্ছে। আর এই সব উঁচু উঁচু শৃঙ্গগুলিই বোধ হয় এর দাঁত। এ ছাড়াও, দীর্ঘ বিস্তীর্ণ পথটি এর জিহ্বা এবং তার পাশে যে ঘোর অন্ধকারময় প্রকাণ্ড গর্ত দেখা যাচ্ছে তাই এর মুখ-গহ্বর বলে বোধ হচ্ছে। দাবাগ্নির মত উত্তপ্ত এই খরবায়ু নিশ্চয়ই এর নিঃশ্বাস। দাবানলে দগ্ধ প্রাণীদের যে দুর্গন্ধ তা-ই সাপের দেহনিঃসৃত আমিষ গন্ধের মত মনে হচ্ছে। ১৮-২৩

এভাবে প্রকৃত অজগরকে অজগরতুল্য বিবেচনা করে বালকেরা বলতে লাগলেন, এ কি এখানে আমাদের গ্রাস করবে ? যদি তাই করতে চায় তবে অসুরহন্তা এই শ্রীকৃষ্ণের হাতে ক্ষণকালের মধ্যে এও বকাসুরের মতই নিহত হবে। এই বলে তাঁরা বকারি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কমনীয় মুখখানি দেখে হাসতে হাসতে, করতালি দিতে দিতে সকলেই সেই অজগরের মুখগহ্বরে প্রবেশ করলেন। বালকেরা না জেনে যে সব কথা বললেন, ভগবান তা শুনে চিন্তা করলেন, বাস্তবিক সাপের দেহধারী ঐ রাক্ষসটা আমার আত্মীয় ঐ সব বালকের কাছে সাপের মত বলে মনে হচ্ছে। তখন তিনি ভাবলেন যে তাঁদের নিবারণ করবেন। কিন্তু তার মধ্যেই সেই শিশুরা গোবৎস-সহ সেই অসুরের উদরের মধ্যে প্রবেশ করেছে। কিন্তু তাঁরা প্রবিষ্ট হলেও রাক্ষস তাঁদের গলাধঃকরণ করল না। কেননা সে তার দুই নিহত আত্মীয় পূতনা ও বকাসুরের কথা স্মরণ করে শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশের প্রতীক্ষা করছিল। ত্রিভুবনের অভয়দাতা ভগবান হরি তাঁর একান্ত অনুগত সে সব দীন বালকদের তাঁর আশ্রয় থেকে

ভ্রষ্ট হয়ে অনলে তৃণের মত সাক্ষাৎ মৃত্যুর জঠরে প্রবেশ করতে দেখে অতিশয় বিস্মিত হলেন। এ ব্যাপার দৈব নির্দিষ্ট মনে করে তিনি অত্যন্ত পীড়িত হলেন। 'খলের জীবন সাধুর হিংসন'। এই খল অসুরেরও নাশ হবে অথচ বালকদের কোন ক্ষতি হবে না, এই দু'টি কিভাবে সিদ্ধ হবে তিনি তা চিন্তা করতে লাগলেন। অনেকক্ষণ ভেবে উপায় স্থির করে অবশেষে নিজেও সেই সাপের মুখের মধ্যে প্রবেশ করলেন। ২৪-২৮

শ্রীকৃষ্ণ অজগররূপী অঘাসুরের মুখের মধ্যে প্রবেশ করা মাত্র দেবতারা মেঘের আড়ালে থেকে সভয়ে হাহাকার করতে লাগলেন। কিন্তু অন্যদিকে অঘাসুরের বান্ধব রাক্ষসদের আনন্দের সীমা রইল না। দেবতাদের ঐ 'হা হা' রব শুনে ভগবান অসুরের গলার মধ্যে নিজের দেহ বর্ধিত করতে লাগলেন। তাতে অতিকায় যেই অঘাসুর গোবৎস আর বালদের সঙ্গে তাঁকে চূর্ণ করতে চেয়েছিল তার কণ্ঠ রুদ্ধ এবং চক্ষু দু'টি বেরিয়ে এল। সে ব্যাকুল হয়ে ইতস্তত ছোটাছুটি করতে লাগল এবং অবিলম্বে তার দেহ বায়ুতে পূর্ণ হয়ে ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ হয়ে গেল। এই বাতাসের সঙ্গেই তার যাবতীয় ইন্দ্রিয় নির্গত হল। শ্রীকৃষ্ণ দেখলেন, তাঁর সমস্ত বন্ধুরা তাদের বৎসগণসহ প্রাণশূন্য হয়েছেন। তখন তিনি তাঁর অমৃতবর্ষী দৃষ্টি দ্বারা তাঁদের জীবন দান করে সবার সঙ্গে মিলিত হয়ে বেরিয়ে এলেন। ঐ সাপের স্থূলদেহের শুদ্ধসত্ত্বময়, অদ্ভুত মহৎ জ্যোতি নিজের তেজে সর্বদিক উজ্জ্বল করে ভগবানের নির্গমনের জন্য আকাশে অপেক্ষা করছিল। ভগবান বাইরে আসার সঙ্গে সঙ্গে আকাশস্থ দেবতাদের সামনে ঐ জ্যোতি শ্রীকৃষ্ণে (ঈশে) গিয়ে প্রবেশ করল। এই দেখে হৃষ্টচিত্তে দেবতারা পুষ্পবৃষ্টি করলেন, অপ্সরাগণ নৃত্য শুরু করলেন, সুগায়কেরা গীত ও বিদ্যাধরেরা বাদ্য করতে লাগলেন, নারদ এবং গরুড় প্রভৃতি স্তব ও জয়ধ্বনি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের পূজা করতে লাগলেন। সেই সব আশ্চর্য স্তব, গীত-বাদ্য, জয়ধ্বনি প্রভৃতি শুনে ব্রহ্মা তৎক্ষণাৎ সেখানে এলেন এবং পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করে বিস্মিত হলেন। ২৯-৩৫

মহারাজ, অঘাসুর যে অজগরের দেহ ধারণ করেছিল তার অদ্ভুত চর্ম শুষ্ক হয়ে একটি বড় বিলের মত হয়েছিল। বৃন্দাবনের চালকেরা বহুকাল সেই বিলে খেলা করছে। সে যা হোক, ভগবান পাঁচ বৎসর বয়সে মৃত্যুরূপী অঘাসুরের কবল থেকে নিজেকে ও বালকদের পরিত্রাণ করেছিলেন, অঘাসুরেরও সংসার-মোচন করেছিলেন। বালকেরা সেই সময়েই শ্রীকৃষ্ণের এই কাজ দেখেছিলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের ছয় বৎসর বয়সের সময়েও ঐ বালকেরা বলতেন, আজই এই সব ঘটনা ঘটেছে। অঘাসুরও শ্রীকৃষ্ণের স্পর্শমাত্রে পাপমুক্ত হয়ে অসুরদের পক্ষে দুর্লভ ভগবানের সারূপ্য লাভ করেছিল। যিনি কেবল মায়া প্রভাবেই মানবরূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন সেই পরাৎপর পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে একাজ কিছু বিচিত্র নয়। পরমানন্দস্বরূপ সাক্ষাৎ বাসুদেব যাঁর অন্তরে প্রবেশ করেছেন তাঁর যে মুক্তি হবে তাতে সন্দেহ কি? ৩৬-৩৯

সূত বললেন, দ্বিজগণ, শ্রীকৃষ্ণ যাকে জীবন দিয়েছিলেন সেই রাজা পরীক্ষিৎ জীবনদাতার এই বিচিত্র চরিত্র শুনে শুকদেবকে তাঁর কথাই আবার জিজ্ঞেস করলেন। শ্রীহরিচরিত শুনে তাঁর মন সংযত হয়েছিল। রাজা বললেন, এক বৎসর আগে যে কাজ করা হয়েছে, ব্রজ-বালকরা তাঁর ছয় বৎসর বয়সে কি করে বলল যে সেই কাজ তখনই করা হয়েছে? আপনি এ ব্যাপারটি বুঝিয়ে বলুন। গুরুদেব, আমরা ক্ষত্রিয়ের অধম হয়েও মানুষের মধ্যে ধন্য, কারণ আপনার মুখনিঃসৃত পুণ্য কৃষ্ণ-কথামৃত মুহুর্মুহু পান করছি। সূত বললেন, ভাগবতশ্রেষ্ঠ শৌনক, রাজা

পরীক্ষিৎ যে ভগবান অজগরের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন, তিনি যদিও শুকদেবের যাবতীয় ইন্দ্রিয় অপহরণ করলেন (অর্থাৎ তিনি সমাধিস্থ হলেন), তবুও তিনি অতি কষ্টে আবার বাহ্যজ্ঞান লাভ করে তাঁকে বলতে শুরু করলেন। ৪০-৪৪

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ব্রহ্মার মোহনাশ

শুকদেব বললেন, মহাভাগ, তুমি খুব সুন্দর প্রশ্ন করেছ, তোমাকে সাধুবাদ দিই। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথা বারবার শুনলেও পূর্বে না-শোনা চিত্তাকর্ষক কাহিনীর মত নিত্যই নূতন মনে হয় এবং আনন্দ দেয়। সারগ্রাহী সাধু পুরুষদের কাছে অচ্যুত-বার্তাই বাক্য, কান ও মনের বিষয়। লম্পট স্ত্রৈণ ব্যক্তির কাছে রমণীর বিষয়ে কথা যেমন আনন্দকর, সাধুপুরুষদের হৃদয়ে কৃষ্ণকথা সেই রকম অভিনব আনন্দের সৃষ্টি করে থাকে। তুমি শ্রীকৃষ্ণের কথা জিজ্ঞেস করছ, মনোযোগ দিয়ে শোন। যদিও এটা গুহ্য বিষয়, তবু তা তোমাকে বলব। কেননা গুরু প্রিয় শিষ্যকে একান্ত গোপনীয় বিষয়ও বলে থাকেন। মৃত্যুরূপী অঘাসুরের মুখ থেকে বৎসপাল রক্ষা করে সরোবরের তীরে এনে ভগবান বলতে লাগলেন, ভাই, দেখ এই স্থানটি অতি সুন্দর, আর এখানে আমাদের খেলার উপকরণ সবই রয়েছে। এখানকার বালু কোমল অথচ নির্মল। সরোবরে বহু পদ্ম ফুটে আছে। তার সুগন্ধে কত পাখী ও ভ্রমর এসেছে। তাদের কাকলি ও গুঞ্জন তীরের সব গাছগুলোতে বিলসিত[১] হচ্ছে। এস, আমরা সবাই মিলে এখানেই ভোজনপর্ব সাঙ্গ করি। বেলা অনেক হয়েছে, সবাই ক্ষুধার্ত। বৎসরা জল খেয়ে আস্তে আস্তে মাঠে চরতে থাকুক। শ্রীকৃষ্ণের এই কথায় বালকেরা তাই ভাল মনে করলেন। তাঁরা গোবৎসদের জল খাইয়ে সবুজ ঘাসে ভরা মাঠে বেঁধে দিলেন। তারপর শিকা থেকে খাবার বার করে শ্রীহরির সঙ্গে মহানন্দে ভোজন করতে লাগলেন। ব্রজবালকেরা ভগবানের চারদিকে পদ্মফুলের দলের মত অসংখ্য পংক্তি রচনা করে শ্রীকৃষ্ণের সামনাসামনি বসলেন। শ্রীকৃষ্ণ মাঝখানে, সকলের মুখ তাঁর দিকে, তাই বিকশিত পদ্মের মতই তাঁদের আকৃতি হল। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ ফুল, কেউ পাতা, কেউ বা অঙ্কুর, ফল, গাছের বাকল, শিকা এমনকি পাথরের খণ্ডকেও পাত্র (বাসন) কল্পনা করে খেতে শুরু করলেন। সকলেই নিজের খাদ্যদ্রব্যের স্বাদ পৃথক করে দেখিয়ে হাসতে হাসতে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে খেতে লাগলেন। ১-৭

সকল যজ্ঞের ভোক্তা শ্রীকৃষ্ণ সেই সব গোপবালকদের সঙ্গে বসে যে ভোজন করলেন তার কারণ তিনি নিজেই তাঁদের সঙ্গে লীলা করেছেন। তিনি উদরের বস্ত্রের ভাঁজে বেণু, বাম বগলে শিঙ্গা, বাম হাতে বেত, বাম আঙুলে ফল ইত্যাদি আর ডান হাতে দইমাখা ভাতের গ্রাস নিয়ে খাচ্ছিলেন। তিনি নিজে পদ্মের মাঝখানের বীজকোষের মত বসে সকলের সঙ্গে পরিহাস করতে করতে হাসছিলেন। স্বর্গ ও মর্ত্যলোকের অধিবাসীরা আশ্চর্য হয়ে এই ভোজনলীলা দেখছিল। হে ভারত, ব্রজবালকরা যখন শ্রীকৃষ্ণগত-চিত্ত হয়ে নিবিষ্ট মনে ভোজন করছিলেন তখন তাঁদের গোবৎসগুলি চরতে চরতে আরও ভাল ঘাসের লোভে দূরের একটা বনের মধ্যে ঢুকে পড়ল। কিছু পরে তাদের না দেখে ব্রজবালকেরা উদ্বিগ্ন হলেন। শ্রীকৃষ্ণ

---

১ বিলসিত—[illegible] প্রকাশিত।

তা দেখে তাঁদের অভয় দিয়ে বললেন, প্রিয় বন্ধুরা, তোমরা নিরুদ্বেগে খেতে থাক। আমি তোমাদের সব বৎস এনে দিচ্ছি। এই কথা বলে তিনি খাবারের গ্রাস হাতে নিয়েই পর্বত, পর্বতগুহা, লতায় ঢাকা গর্ত প্রভৃতি দুর্গম স্থানে বৎস খুঁজতে লাগলেন। পূর্বে ব্রহ্মা আকাশ থেকে শ্রীকৃষ্ণের অঘাসুর মোচন দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন। তিনিই এখন বাল্যলীলায় রত ঈশ্বর হরির মহিমা দেখার জন্য ব্রজবালকদের আহারের অবসরে এসে তাঁদের সব বৎস এবং বৎসপাল হরণ করে নিয়ে গেলেন। তারপর সেসব অন্য জায়গায় রেখে নিজে অন্তর্হিত হলেন। এদিকে শ্রীকৃষ্ণ বৎসগুলি খুঁজে না পেয়ে আগের জায়গায় ফিরে এসে দেখলেন যে ব্রজবালকরাও অন্তর্হিত। তখন তিনি গোবৎস ও ব্রজবালক উভয়েরই সন্ধান করতে লাগলেন বনের চারধারে। যখন বনের সর্বত্র খোঁজ করে কোথাও তাঁদের দেখতে পেলেন না তখন হঠাৎ তাঁর মনে হল যে এসব বোধ হয় ব্রহ্মার কাজ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সর্বজ্ঞ, তাঁর পক্ষে একথা জানা আশ্চর্য নয়। ৮-১৭

যাহোক, তখন বিশ্বকর্তা ভগবান হরি সেই সব বালকদের জননীদের এবং ব্রহ্মার আনন্দের জন্য নিজেকে বৎস ও বৎসপাল এই দু'রকমে প্রকাশ করলেন। তিনি চিন্তা করলেন, ব্রহ্মা বৎস ও বৎসপালদের হরণ করে নিয়ে গেছেন। যদি আমি বৎসপালদের মূর্তি না ধরি তাহলে তাঁদের জননীদের দুঃখের সীমা থাকবে না। আর বৎসদের যদি এনে দিই তা'হলে ব্রহ্মার আনন্দ নষ্ট হবে। কাজেই উভয়ের প্রীতির জন্য তিনি নিজেই দুই রূপে অসংখ্য হয়ে রইলেন। বৎস ও বৎসপালদের যেরকম ছোট দেহ, ছোট ছোট হাত-পা, একই রকম বেণু, শিঙ্গা, শিকা প্রভৃতি, যেমন বসন-ভূষণ, শীল-গুণ, আকার-বয়স, বিহার, অবিকল সেইরকম হয়ে ভগবান বিরাজ করতে লাগলেন। 'সমস্ত জগৎ বিষ্ণুময়' এই প্রসিদ্ধ কথাটি তখন প্রত্যক্ষগোচর হল। ভগবান এ রকম সর্বাত্মা হয়ে ব্রজে প্রবেশ করলেন। তিনি নিজেই বৎসরূপ ধরে বিচরণ করছেন আবার বৎসপালক হয়ে তাদের চারণ করছিলেন। ভগবান মায়াবলে (সুদাম, সুবল প্রভৃতি) ব্রজবালকদের রূপ ধারণ করছিলেন। এবার তাঁদের মায়া-বৎসগুলি নিয়ে আলাদা আলাদা ভাবে প্রত্যেকের গৃহে প্রবেশ করলেন। বালকদের মায়েরাও ভগবানের মায়ায় মুগ্ধ হয়েছিলেন তাই তাঁরা বেণুর ধ্বনি শুনে নিজ নিজ পুত্রের গৃহে ফেরার সময় হয়েছে জেনে এগিয়ে গেলেন। তারপর সেই সব মায়া-বালকদের নিজেদের পুত্র ভেবে পরমব্রহ্মকেই কোলে তুলে আদর করতে লাগলেন এবং স্নেহবশত ক্ষরিত, অমৃততুল্য স্তন্য পান করালেন। এভাবে যখন যেমন প্রয়োজন তখন সেরকম খেলাধুলা করলেন। এভাবে প্রতি সন্ধ্যায় যথারীতি প্রতি গৃহে গিয়ে বালকদের মত আচরণ করে তাদের মায়েদের আনন্দ দিতে লাগলেন। তাঁরাও মর্দন, স্নান, গাত্রমার্জনা, অলংকার, রক্ষাবন্ধন, তিলক, খাওয়ানো ইত্যাদি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণর বহুরূপকে লালন করতে লাগলেন। আর গাভীরাও কৃষ্ণমায়ায় বিমোহিত হয়ে তাড়াতাড়ি গোষ্ঠে ফিরতে লাগল এবং হাম্বা রবে নিজ নিজ বৎসদের ডেকে ক্ষরিত স্তন্য পান করাতে লাগল। ১৮-২৪

মহারাজ, আগেও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গাভী ও গোপ-রমণীদের বাৎসল্যভাব ছিল। এখন সেই স্নেহ আরও বাড়ল। গোপীদের প্রতি ভগবানের মাতৃভাবও আগে থেকেই ছিল। এখন মমতাযুক্ত হওয়াতে তার মাধুর্য আরও বাড়ল। এর ফলে ব্রজবাসীদের যশোদানন্দনের প্রতি আগে যে স্নেহ ছিল এখন নিজ সন্তানরূপে তাঁকে পেয়ে সেই স্নেহ আরও বেড়ে গেল। এক বৎসর পর্যন্ত তা এত বাড়ল যে তার আর সীমা রইল না। এভাবে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বৎসপালকের রূপ ধরে আত্মস্বরূপ বৎসগণকে পালন করে প্রায় এক বৎসর বনে ও গোষ্ঠে লীলা করে বেড়ালেন। ২৫-২৭

এক বৎসর পূরো হতে পাঁচ বা ছয় দিন বাকী আছে এমন সময় একদিন শ্রীকৃষ্ণ বলরামের সঙ্গে বৎসচারণ করতে করতে বনের মধ্যে প্রবেশ করলেন। সেই বন থেকে অনেক দূরে গোবর্ধন পর্বতের শিখরে কতকগুলি গাভী চরছিল। গাভীরা সেখান থেকে দেখল ব্রজের কাছাকাছি জায়গায় তাদের বৎসগুলি চরছে। তাদের দেখামাত্র গাভীরা স্নেহে আকৃষ্ট হয়ে হুংকার করতে করতে, পালকদের অগ্রাহ্য করে, দুর্গম পার্বত্য পথ ধরে ছুটতে লাগল। মুখ ও লেজ তুলে দু'পা একসঙ্গে ফেলে তারা অতিবেগে ছুটে আসতে লাগল। মনে হতে লাগল তারা দ্বিপদ, চতুষ্পদ নয়। গাভীদের স্তন থেকে স্নেহবশে দুধ ক্ষরিত হচ্ছিল। যদিও আবার গাভীরা বৎসবতী হয়েছিল তবু তারা গোবর্ধন গিরির নীচে এসে সেইসব বৎসের সঙ্গে মিলিত হয়ে তাদের স্নেহভরে স্তন্যপান করাতে লাগল। মহারাজ, গোপরা ঐ সব গাভীদের আটকাবার বিস্তর চেষ্টা করেছিলেন, সব ব্যর্থ হওয়ায় লজ্জিত ও ক্রুদ্ধ হয়ে মহাকষ্টে দুর্গম পার্বত্য পথ পেরিয়ে গাভীদের পিছনে পিছনে ছুটে এলেন এবং গোবৎসগুলির সঙ্গে নিজেদের পুত্রদেরও দেখতে পেলেন। নিজের সন্তানদের দেখামাত্র তাঁদের চিত্ত স্নেহে পরিপূর্ণ হল, লজ্জা ও ক্রোধ দূরে গেল। তাঁরা বালকদের কোলে তুলে দু'বাহু দিয়ে আলিঙ্গন করলেন ও মস্তক আঘ্রাণ করতে করতে পরম আনন্দ পেলেন। এরপর বয়স্ক গোপেরা আস্তে আস্তে নিজেদের আলিঙ্গন থেকে সন্তানদের মুক্ত করলেও তাদের কথা মনে করে তাঁদের চোখ থেকে অশ্রু ঝরতে লাগল। যে সব গোবৎসরা স্তন্যপান ছেড়ে দিয়েছিল তাদের উপরও গাভীদের স্নেহের আতিশয্য দেখে বলরাম চিন্তা করতে লাগলেন, 'আগে বাসুদেব অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের ওপর ব্রজবাসীদের যে রকম স্নেহ ছিল এখন গাভীরাও নিজেদের বৎসদের ওপর সে রকম অনুরক্ত দেখছি। কি আশ্চর্য! ব্রজবাসীদের এবং এমনকি আমারও ঐ বালকদের জন্য এত বেশি স্নেহবোধ হচ্ছে কেন? এ কোন্ মায়া? দেবতাদের, না মানুষের, না অসুরের মায়া? যেহেতু আমারও এতে মোহ জন্মেছে তাই মনে হয়, প্রভু শ্রীকৃষ্ণেরই মায়ায় এরকম হচ্ছে। এসব চিন্তা করতে করতে তিনি জ্ঞানময় চক্ষু মেলে দেখলেন যে, সমস্ত বৎস ও সমস্ত বৎসপাল সখা, সবই শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ। বলরাম সমস্ত কিছুকে শ্রীকৃষ্ণরূপ জেনে পরে হরিকে জিজ্ঞাসা করলেন, ভাই, এইসব বৎসপাল দেবতাদের অংশ এবং গোবৎসগুলি ঋষিদের অংশ বলে জানতাম। কিন্তু এখন আর সেরকম মনে হচ্ছে না। এখন দেখি বিভিন্ন হলেও সকলের মধ্যেই তুমি রয়েছ। সব কিছুই তুমিময়। তুমি কি করে পৃথক পৃথক হলে বল। এই জিজ্ঞাসার উত্তরে সংক্ষেপে ভগবান সব বলেন, ফলে বলদেব সমস্ত ব্যাপার জানতে পারেন। ২৮-৩৯

মহারাজ, তারপর যা হয়েছিল বলি শোন। শ্রীকৃষ্ণ বৎস ও বৎসপালদের সৃষ্টি করে তাদের নিয়ে লীলা করতে লাগলেন, এভাবে এক বৎসর কেটে গেল। কিন্তু আমাদের এক বৎসর ব্রহ্মার এক ত্রুটিকাল[১] মাত্র। ব্রহ্মা ঐ কালের পর ঐ একই জায়গায় এসে দেখলেন যে হরি ঠিক আগের মতই অনুচরদের নিয়ে খেলছেন। এই দেখে ব্রহ্মা মনে মনে ভাবলেন, একি? গোকুলে যত বালক ও গোবৎস ছিল তাদের সকলেই তো আমার মায়া-শয্যায় শয়ান আছে, আজ পর্যন্ত কাউকে তো জাগানো হয় নি। আমার মায়ায় মোহিত বালকদের থেকে অতিরিক্ত এসব বৎস ও বালকরা কোথা থেকে কি ভাবে এল? শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে ততগুলি বালকই দেখছি এক বৎসর যাবৎ খেলা করে আসছে। অনেকক্ষণ মনে মনে চিন্তা করেও ব্রহ্মা ঐ বালকদের মধ্যে কোনগুলি সত্য ও কোনগুলি মায়া স্থির করতে পারলেন

১ নিমেষমাত্র কাল কিংবা অঙ্গুলিক্ষেপন মাত্র সময়

না। ব্রহ্মা বিশ্বমোহন বিষ্ণুকে মোহিত করতে গিয়ে নিজেই মোহিত হয়ে পড়লেন। ৪০-৪৪

মহারাজ, হিমজনিত অন্ধকার যেমন তামসী রাত্রির অন্ধকার দূর করতে পারে না, রাত্রির অন্ধকারেই তা লীন হয়ে যায় এবং খদ্যোত যেরূপ দিনের বেলায় জ্যোতি প্রকাশে সমর্থ হয় না, সেরকম যে লোক পৃথক মহৎ-লোকের প্রতি মায়া প্রয়োগ করেন, তাঁর মায়া তাঁর নিজেরই সামর্থ্য নাশ করে থাকে। ঐ সময় আর একটি আশ্চর্য ব্যাপার ঘটল। ব্রহ্মা দেখলেন, সব বৎস ও বৎসপাল এবং তাদের বেণু, শিঙ্গা, পাচন প্রভৃতি সব পদার্থই মেঘের মত ঘন কালো, সকলেই পীত পট্টবস্ত্র পরিহিত, চতুর্ভুজ, এবং শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধারী। সকলেরই মাথায় মুকুট, কানে কুণ্ডল, সকলেরই গলায় হার ও বনমালা। সকলেরই বাহুতে শ্রীবৎসের প্রভাযুক্ত অঙ্গদ, সকলেরই হাতে শঙ্খের মত তিনটি ধারা-যুক্ত রত্ননির্মিত কঙ্কণ এবং সকলেই নূপুর, কটিসূত্র ও অঙ্গুরীয়ক ধারণ করে শোভা পাচ্ছেন। পুণ্যবান ভক্তবৃন্দ দ্বারা অর্পিত তুলসীর নতুন পত্রে সকলেরই সর্বশরীর, শ্রীচরণযুগল ও মস্তক আবৃত দেখা গেল। তাহলেও মনে হল যেন জ্যোৎস্নার মত নির্মল হাসি ও অরুণবর্ণ অপাঙ্গ দৃষ্টিতে সকলেই রজ ও সত্ত্বগুণের সাহায্যে নিজ নিজ ভক্তদের মনোবাঞ্ছা সৃষ্টি ও পালন করছেন। আর ব্রহ্মাদি থেকে তৃণ পর্যন্ত সমস্ত চর ও অচর মূর্তি ধারণ করে নৃত্য, গীত, বাদ্য প্রভৃতি পূজো উপচারে তাঁদের উপাসনা করছেন। সকলেই অণিমাদি মহিমা, অবিদ্যাদি শক্তি এবং মহদাদি চতুর্বিংশতি তত্ত্বে পৃথক পৃথক বেষ্টিত মনে হল। এছাড়াও কাল, স্বভাব, সংসার, কাম, কর্ম, গুণ প্রভৃতি সমস্ত পদার্থও মূর্তিমান হয়ে ঐসব বিগ্রহের উপাসনা করতে লাগলেন। তাঁরা সবাই সত্য, জ্ঞান ও আনন্দরূপ, অনন্তমূর্তি[১] ও সকলেই বিজাতীয় ভেদশূন্য এবং সব সময় একরূপ। অচিন্ত্য মাহাত্ম্যে তাঁরা জ্ঞানচক্ষু, আত্মজ্ঞদেরও অগম্য বলে বোধ হচ্ছিল। মহারাজ, যাঁর দীপ্তিতে চরাচর সমস্ত জগৎ প্রকাশমান, ব্রহ্মা এভাবে সেই পরব্রহ্মের ব্রহ্মময় নানা রূপ একত্র এবং একই সময়ে দেখালেন। ৪৫-৫৩

এত সব দেখে অতিবিস্ময়ে ব্রহ্মার চিত্ত আলোড়িত হতে থাকল। আনন্দে তাঁর সমস্ত ইন্দ্রিয় নিস্তব্ধ হল। ঐসব মূর্তির তেজে তাঁকে ব্রজাধিষ্ঠাত্রী দেবীর কাছে বালকের ক্রীড়নক স্বরূপ একটি চতুর্মুখ মাটির পুতুলের মত মনে হল। মহারাজ, যে ব্রহ্ম তর্কের অগোচর, 'তা নয়, তা নয়'[২] এই ভাবে সমস্ত দৃশ্যবস্তুর থেকে আলাদা করে উপনিষদ যাঁকে কেবল সর্বপ্রকাশক জ্ঞানস্বরূপ বলেছেন, যিনি প্রকৃতির পর এবং জন্মরহিত, অসাধারণ যাঁর মহিমা, সেই ব্রহ্মাও ঐভাবে মুগ্ধ হয়ে 'এটা কি?' বলে জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়লেন।[৩] পরম তেজঃস্বরূপ ভগবান বিষ্ণু তা জানতে পেরে তৎক্ষণাৎ মায়াযবনিকা অপসারণ করলেন। মায়া অপসৃত হওয়ামাত্র ব্রহ্মার বাহ্যদৃষ্টি লাভ হল। মৃত ব্যক্তি জীবন পেলে যেমন উঠে দাঁড়ায় তিনি সেভাবেই উঠলেন এবং অতিকষ্টে চক্ষুদুটি মেলে নিজের সঙ্গে এই জগৎকে দেখলেন। সব দিক দেখতে দেখতে হঠাৎ সামনের দিকে বৃন্দাবন তাঁর চোখে পড়ল। এই বৃন্দাবন জীবের আহার উৎপাদক নানা তরুলতায় আকীর্ণ, নানা অভীষ্ট দ্রব্যে পরিপূর্ণ। যে সব প্রাণীদের মধ্যে স্বাভাবিক বৈরিতা আছে, যেমন মানুষ ও সিংহ, তারাও সেখানে বন্ধুর মত একত্র বাস করছিল। আর ভগবান অজিতের নিবাস, এই বৃন্দাবন থেকে ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। ৫৪-৬০

১ তুলনীয় : তৈত্তিরীয় উপ: ২।১।২ ২ নেতি, নেতি—বৃহ: উপ: ২।৪।৬

৩ শ্বেতাশ্বতর উপ: ৫।২

ব্রহ্মা আবার অদ্বয়, অনন্ত পরমব্রহ্মকে সেই বৃন্দাবনে নন্দদুলালরূপী এক গোপবালকের বেশে দেখলেন। আগের মতই তিনি খাদ্যের গ্রাস হাতে নিয়ে ইতস্তত বৎস ও নিজের সখাদের অন্বেষণ করছেন এই দেখে ব্রহ্মা তাঁর বাহনের পিঠ থেকে নামলেন এবং স্বর্ণদণ্ডের মত ভূতলে পড়লেন। তারপর তাঁর চারটি মুকুটের অগ্রভাগ দিয়ে শ্রীহরির দুই চরণে প্রণত হয়ে আনন্দাশ্রুতে সেই চরণযুগল অভিষিক্ত করলেন। এর আগে শ্রীকৃষ্ণের যে মহিমা দেখেছিলেন তা স্মরণ করে বারবার তাঁর পাদপদ্মে প্রণত হলেন। তারপর ধীরে ধীরে উঠে চোখ দুটি মুছলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের দিকে তাকিয়ে নতমস্তক, কৃতাঞ্জলি ও সংযতচিত্ত হয়ে কাঁপতে কাঁপতে গদ্‌গদকণ্ঠে তাঁর স্তব করতে লাগলেন। ৬১-৬৪

চতুর্দশ অধ্যায়

ব্রহ্মা কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি

ব্রহ্মা বললেন, হে স্তবনীয়, আপনার প্রসন্নতার জন্য আপনারই স্তব করি। প্রভু, আপনার নতুন মেঘের মত শ্যামবর্ণ শরীরে পীতবসনরূপ বিদ্যুৎ স্ফুরিত হচ্ছে। গুঞ্জানির্মিত কর্ণভূষণ এবং ময়ূরপুচ্ছের শিরোভূষণে আপনার মুখমণ্ডল বিকশিত কমলের মত শোভা পাচ্ছে। আপনি গলায় বনমালা ধারণ করেছেন। আপনার হাতে দধিমিশ্রিত অন্নের গ্রাস, কক্ষে বেত্র, শৃঙ্গ, বেণু, বক্ষে শ্রীবৎসচিহ্ন। প্রভু, নন্দের নন্দন আপনার ঐ রূপ দেখে আপনার সুকোমল চরণপদ্ম স্পর্শ করে আজ কৃতার্থ হলাম। হে দেব, আমার এবং অখিল জগদ্‌বাসীর মঙ্গলের জন্য আপনি যে বিরাটরূপ বিগ্রহ ধারণ করেছেন তার মহিমা অন্যে দূরে থাক, আমি স্বয়ং ব্রহ্মাও বিশুদ্ধ মনের দ্বারা জানতে পারলাম না। যে ভগবান, আপনার এই মূর্তি ভূতময় নয়, এ অচিন্ত্য ও শুদ্ধসত্ত্বময়। প্রভু, যখন আপনার গুণময় রূপের মহিমাই জানা যায় না, তখন আপনার সাক্ষাৎ সচ্চিদানন্দ, অচিন্ত্য, শুদ্ধসত্ত্বাত্মক স্বরূপে প্রকৃত মহিমা জানতে কে সমর্থ হবে? ১-২

আপনার মহিমা এরকম দুজ্ঞেয় হলেও সংসার থেকে মুক্তি অবশ্যই সম্ভব। কারণ যে সব লোক জ্ঞানের জন্য বৃথা পরিশ্রম না করে সাধুজনের সংস্পর্শে এসে নিত্য প্রকট আপনার লীলাকথায় কায়মনোবাক্যে নিবিষ্ট হয়ে জীবনধারণ করেন, হে হরি, আপনি অজিত হয়েও তাঁদের দ্বারা জিত হন অর্থাৎ আপনি ভক্তের বশীভূত হন। যাঁরা অল্প পরিমাণ ধানের পরিবর্তে শস্যকণাহীন পর্বতপ্রমাণ তুষের রাশি সংগ্রহ করে চাল পাবার আশায় পরিশ্রম করেন তাঁদের কোন ফলই লাভ হয় না, সে রকম যাঁরা আপনার মঙ্গলময় ভক্তি পরিত্যাগ করে কেবল জ্ঞান লাভের চেষ্টা করেন তাঁদের ক্লেশ স্বীকারই সার। হে ভূমা, ইহলোকে আগে অনেকে যোগী হয়ে ভক্তি ব্যতীত যোগ অভ্যাস করে উদ্দেশ্য লাভে সমর্থ হননি। তখন তাঁরা আপনাকে চিত্ত-সমর্পণ করে লৌকিক কর্মানুষ্ঠান এবং আপনার লীলাকথা অবিরত শ্রবণ করেন। তাতে আপনার প্রতি তাঁদের যে ভক্তিভাবের উদয় হয়, সেই ভক্তিযোগেই তাঁরা আপনার স্বরূপ জানতে পেরে উৎকৃষ্ট গতি লাভ করেছেন। অতএব ভক্তিদ্বারাই জ্ঞান লাভ হয়ে থাকে। ৩-৫

যদিও সগুণ নির্গুণ আপনি উভয় প্রকারেই দুর্বোধ, তবুও যাঁরা সকল ইন্দ্রিয়কে বিষয় থেকে নিবৃত্ত করে অন্তঃকরণের মধ্যে রুদ্ধ রেখেছেন, তাঁরা বরং নির্গুণ নারায়ণস্বরূপ আপনার মহিমা কিছু জানতে পারেন। কিন্তু আপনার নির্বিকার বিষয়শূন্য, স্বপ্রকাশ, আত্মাকার-প্রাপ্ত অন্তঃকরণের সাক্ষাৎকার দুর্লভ। যে সকল নিপুণ ব্যক্তি অনেক জন্ম ধরে পৃথিবীর পরমাণু, শূন্যের হিমকণা অথবা মহাকাশের নক্ষত্রাদির কিরণেরও পরমাণুরাশি গণনা করতে পারেন তাঁদের মত লোকেরাও এই পৃথিবীর মঙ্গলের জন্য অবতীর্ণ, গুণের অধিষ্ঠাতা আপনার গুণগুলির কিছু অংশও ধারণা করতে সমর্থ হন না। কবে আপনার অনুগ্রহ হবে তার প্রতীক্ষায় যিনি নিজে উপার্জিত কর্মফল ভোগ ও কায়মনোবাক্যে আপনার প্রতি ভক্তি দ্বারা জীবিত থাকেন, তিনিই পিতার ধনে পুত্রের অধিকারের মত মুক্তিধনের অধিকারী হন। ৬-৮

মহারাজ, ব্রহ্মা এইভাবে স্তব করে পরে ক্ষমালাভের জন্য নিজের অপরাধ উল্লেখ করে বললেন, হে ঈশ্বর, আমার দুর্জনতা দেখুন। আপনি অনন্ত, আদ্য, পরমাত্মা এবং মায়াবীদেরও মোহকারী ; তা সত্ত্বেও আমি নিজের মায়া আপনার উপর বিস্তার করে নিজের ঐশ্বর্য দেখাতে চেয়েছিলাম। প্রভু, আগুনের শিখা যেমন আগুনের কাছে কিছুই না, সেরকম আমিও আপনার কাছে কিছুই নই। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। রজোগুণ থেকে আমার উৎপত্তি, কাজেই আমি অজ্ঞ। আমার দুই চোখ অন্ধ হয়েছিল, আমি আপনাব চেয়ে পৃথক ঈশ্বর আমার এরকম অভিমান হয়েছিল। প্রভু, 'এ ব্যক্তি অন্যত্র প্রভুরূপে মাননীয় হলেও আমার ভৃত্য, তাই আমার অনুকম্পার পাত্র' মনে করে আমাকে ক্ষমা করুন। আমার শরীর সপ্তবিতস্তিমাত্র (সাত বিঘত) পরিমিত এই প্রকৃতি এবং অহংকার-আকাশ-বায়ু-অগ্নি-জল-পৃথিবী সহ ব্রহ্মাণ্ড, আর আপনার রোমকূপসমূহ এরকম অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড পরমাণুর যাতায়াতের গবাক্ষের মত, আপনার মহিমার তুলনায় আমি কোথায় ? হে অজ, জননীর জঠরে থেকে শিশু তার পায়ের দ্বারা জননীকে যে আঘাত করে, তাতে কি জননীর প্রতি তার অপরাধ হয় ? ভাব অভাব, স্থূল সূক্ষ্ম, কার্য কারণ ইত্যাদি বাচক যা কিছু আছে তার কোনটিই কি আপনার বাইরে আছে ? তাই সমস্ত বস্তু আপনার কুক্ষিগত এবং আমিও আপনার মধ্যে ; মায়ের মত আপনাকে আমার অপরাধ নিজ গুণে সহ্য করতে হবে। ৯-১২

হে ঈশ্বর, ত্রিজগতের অন্তে অর্থাৎ প্রলয়ের সময় যখন সাগরগুলি পরস্পর মিলিত হয়, তখন জলে শয়ান নারায়ণের নাভি থেকে ব্রহ্মা প্রকাশ হয়েছিলেন, এই প্রবাদ মিথ্যা নয়। আমি কি আপনার মধ্য থেকে উৎপন্ন হইনি ? আপনি সর্বদেহীর আত্মা এবং যাবতীয় লোকের সাক্ষী, অবু কি আপনি নারায়ণ নন ? 'নার' অর্থাৎ জীবসমূহ আপনার 'অয়ন' বা আশ্রয়স্থান। তাই সর্বদেহীর আশ্রয় আপনিই নারায়ণ। নর থেকে উৎপন্ন চব্বিশ তত্ত্ব এবং জল তাঁর আশ্রয় বলে যিনি নারায়ণ নামে বিখ্যাত তিনিও আপনার মূর্তি। হে দেব, জগতের আশ্রয়ভূত আপনার এই দেহ কল্পশেষে জলশায়ী ছিল এ যদি সত্য হত তা হলে আমি আপনার নাভি-কমলের নাল পথে জলে প্রবেশ করে শত বৎসর পর্যন্ত অন্বেষণ করেও আপনাকে দেখতে পাই নি কেন ? তখন আমি হৃদয়েতেও আপনাকে দেখতে পাই নি কেন ? আবার সে সময়ই তপস্যা করা মাত্র সুন্দররূপে আপনি দৃষ্টিপথে আবির্ভূত হয়েছিলেন কেন ? ১৩-১৫

হে মায়ানাশক, বাইরে এই যে জগৎপ্রপঞ্চ স্পষ্ট প্রকাশ পাচ্ছে তাও আপনিই, এবং আপনিই আপনার উদরের মধ্যে বিদ্যমান আছেন। জননী যশোদাকে যে তা দেখিয়েছেন তার দ্বারা বুঝিয়েছেন যে এসবই আপনার ইচ্ছাধীন মায়ামাত্র। অতএব,

ভগবান্‌, আপনার সঙ্গে এই সমস্ত বিশ্ব আপনার উদরে যে রকম প্রকাশ পায় তা বাইরেও একই ভাবে প্রকাশ পায়। প্রভু, মায়া ছাড়া কি এসব ঘটতে পারে? আপনি যে কেবল মাকেই মায়া দেখিয়েছেন এমন নয়, আপনি ভিন্ন এই জগতের সবই যে মায়া আমাকেও কি তা দেখান নি? আজই তা দেখালেন, তার নিদর্শন এই যে প্রথমে আপনি একাকী ছিলেন, তারপর আপনিই সমস্ত ব্রজবাসী সখা ও সব বৎস হলেন। আমি সে সকলকে আবার চতুর্ভুজরূপে দেখি, তারপর আমি অখিল তত্ত্বের সঙ্গে উপাসনা করলে সবাই চতুর্ভুজ হয়েও তত সংখ্যক ব্রহ্মাণ্ড হয়। এখন আপনি অপরিমিত, অদ্বয় ব্রহ্মমাত্ররূপে বিরাজ করছেন। হে প্রভু, আপনিই প্রকৃতিস্থ আত্মা। যারা আপনার স্বরূপ জানে না তাদের কাছে আপনি নিজেই নিজ মায়া বিস্তার করে প্রকাশ পাচ্ছেন, যেমন জগতের সৃষ্টিতে আমি, পালনে আপনি আর সংহারে ত্রিলোচন প্রকাশ পান। হে প্রভু, হে বিধাতা, হে ঈশ্বর, জন্মহীন হয়েও দেবতা, ঋষি, মানুষ, তির্যকজাতি এবং জলচরদের মধ্যে যে আপনার জন্ম হয় সে শুধু অসাধুদের দমন এবং সাধুদের প্রতি অনুগ্রহ করার জন্য। ১৬-১৯

হে ভগবান, হে পরমাত্মা, হে যোগেশ্বর, ত্রিলোকের মধ্যে কে কোথায় কিভাবে আপনার কোন্‌ লীলা জানতে পারে? আপনার মায়াবৈভব অচিন্ত্য। আপনি যোগমায়া বিস্তার করে সত্যিই ক্রীড়া করছেন। অতএব, এই অসৎস্বরূপ, স্বপ্নতুল্য, প্রতিভাস-শূন্য, দুঃখবহুল অশেষ বিশ্ব নিত্যসুখ ও নিত্যবোধস্বরূপ আপনার মায়াদ্বারা উদ্ভূত হওয়াতে যদিও শেষে লয় পায়, তবুও তা নিত্যরূপে প্রকাশ পাচ্ছে। ভগবান এক আপনি সত্য, কারণ আপনি আত্মা এবং পুরুষ, আপনি আদি কারণ, আপনি পুরাণ অর্থাৎ সৃষ্ট্যাদি কার্যের পূর্ব থেকে বর্তমান আছেন। আর আপনি নিত্য, আপনি পূর্ণ, অজস্রসুখ, অক্ষর ও অমৃত। তাই আপনার বৃদ্ধির বিপরিণাম, অপক্ষয় বা বিনাশ নেই। আপনি অনন্ত অদ্বয়, আপনার সুখ নিরবচ্ছিন্ন। আপনি স্বয়ং জ্যোতিঃস্বরূপ, বিদ্যা ও অবিদ্যা দু'রকম উপাধি থেকেই ভিন্ন। ভগবান, আপনি এ প্রকার এবং সকলের আত্মা। যে সব লোকেরা আপনাকে আত্মস্বরূপে দেখেন তাঁরা সূর্যস্বরূপ গুরুর কাছে অধ্যয়ন দ্বারা উপনিষদরূপ সুন্দর চক্ষু দ্বারা সংসাররূপ মিথ্যা-সাগর উত্তীর্ণ হন। অজ্ঞানবশতই রজ্জুকে মহাসর্প বলে ভুল হয়, আবার জ্ঞান হলে সেই ভুল ভেঙে যায়। সে রকম যাঁরা অজ্ঞানের জন্য আত্মাকে আত্মা বলে জানে না, তাঁদের সেই অজ্ঞান থেকেই এই সংসার লাভ আবার জ্ঞানের দ্বারা আত্মোপলব্ধি হলেই সংসার লয় হয়। ভবের বন্ধন ও মোক্ষ দুইই অজ্ঞান দ্বারা লব্ধ দু'টি নাম মাত্র, কিন্তু পরমার্থরূপ আত্মাতে এর কোন সম্পর্ক নেই। অখণ্ডের অনুভবস্বরূপ আত্মা ও দেহাদি সঙ্গহীন আত্মস্বরূপ জীবের বিচার করলে অজ্ঞান বা বন্ধন কিছুই থাকে না। সূর্যের কাছে যেমন দিন-রাত্রি কিছু নেই, সে রকম জ্ঞানস্বরূপ আত্মারও বন্ধন-মোক্ষ কিছুই নেই। প্রভু, আপনি অন্তরের ধন আত্মা। আপনাকে দেহাদি জ্ঞান করে এবং দেহাদিকে আত্মজ্ঞান করে অজ্ঞ লোকেরা বাইরে আত্মার অনুসন্ধান করে। সাধু ও বিবেকী মানুষেরা চিৎ-জড়াত্মক শরীরের মধ্যে অসৎ পদার্থ পরিত্যাগ করে আপনাকেই খুঁজে থাকেন। মূর্খ ব্যক্তি রজ্জুকে সর্প মনে করে ভীত হতে পারে; জ্ঞানী কিন্তু রজ্জুকে প্রকৃত রজ্জু বলেই দেখে থাকেন। তেমনি যিনি বিবেকী তিনি পরমপুরুষকে আত্ম-স্বরূপ থেকে অভিন্নভাবে নিজের হৃদয়েই দেখেন। হে দেব, হে ভগবান যদিও জ্ঞান দ্বারা মোক্ষ লাভ হয়, তবুও যিনি আপনার চরণকমলদ্বয়ের প্রসাদ লেশমাত্র পেয়েছেন তিনিই আপনার মহিমার তত্ত্ব জানতে পারেন। ভক্তিহীন ব্যক্তি জড়বস্তু পরিত্যাগ

না করে সারাজীবন বিচার করলেও তা জানতে পারেন না। অতএব, হে নাথ, এই ব্রহ্মজন্মেই হোক বা পরে কোন পশুপক্ষীর জন্মেই হোক, আপনার জনগণের মধ্যে একজন হয়ে আপনার চরণপল্লব সেবা করবার মহাভাগ্য যেন আমার হয়। ২০-৩০

ব্রজের গো ও গোপীরা ধন্য, কারণ সমস্ত যজ্ঞ আজ পর্যন্ত যাঁকে তৃপ্ত করতে সমর্থ হয় নি সেই আপনি প্রতিক্ষণ তৃপ্তভাবে ঐ সব গো ও গোপীদের বৎসতর ও পুত্ররূপে মহানন্দে অমৃতের মত স্তন্য পান করছেন। নন্দগোপ ও ব্রজবাসীদের অত্যাশ্চর্য সৌভাগ্য, পরমানন্দরূপী পূর্ণব্রহ্ম তাঁদের মিত্র হয়েছেন। আমি, একাদশ ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা একাদশ দেব এবং অহংকারে অধিষ্ঠাতা শর্ব সকলেই মহাভাগ্যশালী। আমরা ইন্দ্রিয়রূপ পানপাত্র দ্বারা আপনার পাদপদ্মের সুস্বাদু মকরন্দ পান করছি। এই জীবলোকে, তার মধ্যেও বনে, তার মধ্যেও গোকুলে যে কোন জন্ম হওয়া মহাভাগ্য, কারণ তাতে যে কোন গোকুলবাসীর পদধূলি দ্বারা অভিষিক্ত হবার সম্ভাবনা আছে। প্রভু, গোকুলবাসীরাই বা এত ধন্য কেন? তার কারণ তাদের সমগ্র জীবন সেই মুকুন্দপরায়ণ, যাঁর পদধূলি আজও বেদসকল অনুসন্ধান করছেন। হে দেব, এই বিচার করে আমার চিত্ত মুগ্ধ হচ্ছে। প্রভু, আপনার ভক্তদের বেশের অনুকরণ মাত্র করে পাপিষ্ঠা পূতনাও আত্মীয়গণ সহ যখন আপনাকে পেয়েছে, তখন যাদের গৃহ, ধন, বন্ধু, প্রিয়জন, আত্মীয়, পুত্র, প্রাণ ও অভিলাষের সমস্তই আপনাতে অর্পিত তাদের এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ ফল না দিলে হবে কেন? হে কৃষ্ণ, যতদিন লোক আপনার হতে না পারে ততদিন পর্যন্তই দ্বেষ ইত্যাদি তস্কর, গৃহ কারাগৃহ আর মোহও পায়ের শিকল হয়ে থাকে। আপনি বস্তুত অসংসারী, শুধু ভক্তদের মধ্যে আনন্দ বিস্তারের জন্য সংসারীর অনুকরণ করছেন। কপট পুত্রত্ব কি ঐ ভক্তির বিনিময় হতে পারে? যারা বলে আপনার মহিমা সম্পূর্ণ জানে, তারা তা বলুক। কিন্তু আপনার বৈভব আমার দেহ-মন-বাক্যের অতীত। হে কৃষ্ণ, আমাকে আজ্ঞা করুন, আমি নিজের লোকে প্রস্থান করি। প্রভু, নিজের মহিমা এবং আমাদের জ্ঞান, বল প্রভৃতি সবই আপনি জানেন। আপনিই সমস্ত জগতের নাথ, অতএব মমতার আশ্রয় এই জগৎ আর আমার এই শরীর আমি আপনার শ্রীচরণে অর্পণ করলাম। ৩১-৩৯

মহারাজ, ব্রহ্মা এই ভাবে স্তব করে প্রস্থানের অনুমতির জন্য ভগবানকে প্রণাম করে বললেন, হে শ্রীকৃষ্ণ, হে বৃষ্ণিকুল-কমলের প্রকাশকারী সূর্য, দেব-দ্বিজ-পশু-পৃথিবীরূপ সমুদ্রের বৃদ্ধিসাধক, পাষণ্ডধর্মরূপ রাত্রির অন্ধকার-হরণকারী চন্দ্র, পৃথিবীর রাক্ষসনাশক, সূর্য প্রভৃতি পূজনীয়দের পরমপূজ্য, যতদিন কল্প থাকবে আপনাকে ততদিন পর্যন্ত প্রণাম করি। ৪০

শুকদেব বললেন, জগৎ-স্রষ্টা ব্রহ্মা সেই অভীষ্টকে তিনবার পরিক্রমাপূর্বক প্রণাম করে নিজে ধামে প্রস্থান করলেন। ভগবান হরিও আত্মযোনি ব্রহ্মার অনুমতি নিয়ে অপহৃত বৎসসকলকে যমুনাপুলিনে আনলেন। সেখানে তখনও আগের মত তাঁর সব সখা উপস্থিত ছিলেন। মহারাজ, নিজেদের প্রাণের ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বিহীন হয়ে বালকদের কাছে ক্ষণকালও এক বৎসরের বেশি মনে হতে পারত। কিন্তু তাঁরা মায়ায় মুগ্ধ হয়ে সম্পূর্ণ এক বৎসর সময়কে অর্ধক্ষণমাত্র মনে করলেন। মায়ামোহিত ব্যক্তিদের কি না বিস্মরণ হয়? এই জগৎ মায়ামোহিত হওয়াতে তারা বারবার আত্মাকেই বিস্মৃত হচ্ছে। এত বেশি সময় গত হলেও ঐসব বালকের ক্ষুধা বা তৃষ্ণা কিছুই বোধ হয় নি, তাঁরা শ্রীকৃষ্ণকে দেখতে পেয়ে বলতে লাগলেন, সখা,

তুমি খুব তাড়াতাড়ি এসেছ। তোমাকে রেখে আমরা একগ্রাসও ভোজন করি নি। এখানে এসো, ভোজনের জন্য বসো। তারপর শ্রীকৃষ্ণ হাসতে হাসতে সেইসব শিশুদের সঙ্গে ভোজন করে অজগর চর্ম দেখাতে দেখাতে তাদের সঙ্গে বন থেকে ব্রজে ফিরে এলেন। ময়ূরপুচ্ছ, ফুল এবং গৈরিক প্রভৃতি বনধাতু দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত অঙ্গ চিত্রিত হয়েছিল, তিনি স্বয়ং বাঁশি ও শিঙ্গায় উচ্চ ধ্বনিতে উৎসব-উল্লসিত হয়েছিলেন। আদর করে বৎসদের ডাকতে ডাকতে তিনি সকলকে নিয়ে ব্রজে প্রবেশ করলেন। গোপীগণ তাঁকে দর্শন করে নয়নের উৎসব বোধ করতে লাগলেন। তারপর ব্রজবালকেরা বলতে লাগল, আজ যশোদানন্দন বনে একটি মহাসর্প বধ করেছেন, আমরা এঁর দ্বারা রক্ষা পেয়েছি। ৪১-৪৮

পরীক্ষিৎ বললেন, ভগবান, আপনি আগে বলেছিলেন ব্রজবাসীদের নিজ পুত্রের চাইতে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বেশি স্নেহ হয়েছিল। জিজ্ঞাসা করি, তাদের নিজের ছেলের থেকেও অন্যের পুত্র শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বেশি স্নেহ কিভাবে জন্মাল? ৪৯

শুকদেব বললেন, মহারাজ, সব প্রাণীর আত্মাই পরমপ্রিয়। পুত্র, সম্পত্তি প্রভৃতি বস্তু আত্মার প্রিয় বলেই প্রিয়।[১] অতএব, হে রাজেন্দ্র, এ কারণেই আত্মার উপলক্ষে দেহীদের নিজ দেহে যেমন প্রেম জন্মে মমতার বস্তু পুত্র, সম্পত্তি, গৃহ ইত্যাদির প্রতি সেরকম হয় না। তাই দেহ জীর্ণ হয়ে মৃত্যু আসন্ন হলেও বাঁচার আশা বলবতী হয়ে থাকে। কাজেই দেহীদের আত্মাই প্রিয়তর, আত্মার জন্যই চরাচর জগৎ প্রিয় হয়ে থাকে। তুমি ঐ শ্রীকৃষ্ণকে অখিল দেহীর আত্মা বলে জান, তিনি জগতের হিতের জন্য মায়াদ্বারা এখানে দেহীর মত প্রকাশমান। আসলে যাঁরা সর্ব জগতের কারণরূপে শ্রীকৃষ্ণকে জানেন তাঁদের কাছে স্থাবর-জঙ্গমসহ সমস্ত জগৎ ভগবৎ-রূপে প্রকাশ পায়। তাঁরা নিশ্চয় জানেন তিনি ছাড়া কোন জিনিস এই জগৎমণ্ডলে নেই। সব বস্তুর পরম অর্থ কারণে, আর সেই কারণেরও কারণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। অতএব, শ্রীকৃষ্ণহীন বস্তু কি কিছু আছে? ৫০-৫৭

মহারাজ, পুণ্যযশ মুরারির পদপল্লবকে যাঁরা আশ্রয় করেন তাঁদের কাছে ভবসাগর গোষ্পদতুল্য এবং তাঁরা পরমপদ অর্থাৎ বৈকুণ্ঠধাম লাভ করেন। বিপদের আশ্রয়ে তাঁদের কখনো ফিরে আসতে হয় না অর্থাৎ বৈকুণ্ঠধাম থেকে তাঁদের আর সংসারে আসতে হয় না। মহারাজ, আমাকে যা জিজ্ঞাসা করেছিলে, শ্রীকৃষ্ণের পাঁচ বৎসর বয়সের কর্ম কি করে তাঁর ষষ্ঠবর্ষের কর্ম বলে বর্ণিত হয়েছিল তা সব তোমার কাছে বললাম। সুহৃদ্‌গণসহ ভগবানের এই চরিত্র, অঘাসুর-বধ, তৃণে বসে ভোজন, শুদ্ধসত্ত্বাত্মক ভগবৎরূপ, ব্রহ্মার স্তব, এসব পাঠ ও শোনায় পুরুষার্থ লাভ হয়। মহারাজ, রাম-কৃষ্ণ ব্রজে থেকে ঐরকম লুকোচুরি, সেতুবন্ধন, বালকদের সঙ্গে বানরের মত লাফালাফি প্রভৃতি ক্রীড়ায় কৌমার কাল অতিবাহিত করেছিলেন। ৫৮-৬১

পঞ্চদশ অধ্যায়

ধেনুকাসুর বধ

শুকদেব বললেন, তারপর রাম ও কৃষ্ণের ছয় বৎসর বয়স হলে ব্রজে সখাদের সঙ্গে গাভী চরাতে চরাতে ইতস্তত চরণস্পর্শের দ্বারা শ্রীবৃন্দাবনকে পবিত্র করতে লাগলেন।

১ তুলনীয়: আত্মনস্তু কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবতি। বৃহঃ উপঃ ২।৪।৫

একদিন শ্রীকৃষ্ণ বলরামের সঙ্গে মিলে নিজের যশগায়ক গোপগণ দ্বারা পরিবৃত হয়ে বাঁশি বাজাতে বাজাতে গাভীদের আগে নিয়ে ফুলে-ভরা এক বনে প্রবেশ করলেন। মহারাজ, বৃন্দাবন অতি মনোরম। মধুর গুঞ্জনকারী অলি, মৃগ ও পাখীতে সর্বদা তা পরিপূর্ণ। সেখানে মহতের মনের মত পূর্ণ সরোবরের স্বচ্ছ জলে বাতাস বয়ে যায় আর প্রস্ফুটিত পদ্মের সৌরভে সে বাতাস ভরপুর হয়। আদিপুরুষ ভগবান ঐ বনে বেড়াতে বেড়াতে দেখলেন যে এক জায়গায় ফল-ফুলের ভারে অবনত হয়ে গাছের মাথাগুলো তাঁদের চরণ স্পর্শ করছে। তা দেখে বিস্মিত এবং আনন্দিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণ বলরামকে সম্বোধন করে বললেন, দেববর, এইসব গাছগুলো ফুল-ফল উপহার নিয়ে তাদের মাথা ঠেকিয়ে তোমায় প্রণাম করছে। যে পাপে এদের তরুজন্ম হয়েছে এরা সে পাপের শান্তি প্রার্থনা করছে। হে অনঘ, হে আদিপুরুষ, এইসব ভ্রমর তোমার সর্বলোকপাবন যশোগান করতে করতে তোমার অনুগামী হয়েছে। আমার মনে হচ্ছে এরা তোমার সেবকপ্রধান মুনি, তুমি এদের অভীষ্ট দেবতা। বনে তুমি প্রচ্ছন্ন থাকতে এরা তোমায় ত্যাগ করছে না অর্থাৎ তুমি মানুষের বেশ ধরায় মুনিরাও ভ্রমরবেশে তোমার উপাসনা করছেন। ময়ূর তোমাকে দেখে আনন্দে নৃত্য করছে, গোপীদের মত হরিণীরা মধুর দৃষ্টি দ্বারা এবং কোকিলগুলি সুমধুর কুহু রবে তোমার সন্তোষ জন্মাচ্ছে। সাধুদের স্বভাবই এই যে তাঁদের নিজেদের যা কিছু থাকে গৃহে আগত মহাজনকে তার সবই সমর্পণ করেন। তোমার চরণ-স্পর্শে আজ এই বৃন্দাবন ও এর তৃণলতা ধন্য হল, তোমার নখস্পৃষ্ট তরুলতাকেও ধন্য বলে প্রশংসা করি। এখানকার নদ, নদী, পর্বত, এমনকি হরিণ, পাখী প্রভৃতিরাও তোমার সদয় দৃষ্টিপাতে ধন্য। আর এই গোপীরা ধন্য, কারণ লক্ষ্মীও এক সময় যাঁর স্পৃহা করেছিলেন সেই তোমার বক্ষঃস্থল অনায়াসে তাঁরা লাভ করছেন। ১-৮

শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনের শোভায় প্রীত হয়ে পর্বতের কাছে, নদীর তীরে পশুচারণ করতে করতে সঙ্গীদের নিয়ে আনন্দে বিহার করতে লাগলেন। কোথাও অলিকুল মধুপানে মত্ত হয়ে গুন্ গুন্ শব্দে গান করলে বলদেবের সঙ্গে মিলে তিনিও সে রকম গান করেন। সঙ্গীরা সে সময় তাঁর লীলা-মাহাত্ম্য কীর্তন করেন। কোথাও মধুর কূজনকারী শুকের সঙ্গে তিনি স্বর মেলালেন। কখনও কোকিলের কুহু রবের অনুরূপ মনোহর ধ্বনি করতে থাকেন। কলহংসদের সঙ্গে মধুর রব করছেন, কখনও বয়স্যদের হাসিয়ে ময়ূরের সঙ্গে নৃত্য করছেন। কখনও বা গাভী ও গোপদের নাম ধরে মেঘগম্ভীর স্বরে দূরের পশুদের ডেকে আনতে লাগলেন। কখনো চকোর, বক, চক্রবাক, ভরদ্বাজ (ভারুই পাখী) ও ময়ূরের অনুকরণ করে শব্দ করতে করতে ইতস্তত ছুটে বেড়ালেন, কখনো বা ভান করে দেখালেন অন্য পশুদের মত বাঘ ও সিংহ দেখে তিনি ভয় পেয়েছেন। কোথাও বিহারে শ্রান্ত বলরামকে গোপবালকের কোলে শুইয়ে দিয়ে নিজে পাদ মর্দনাদি দ্বারা তাঁর সেবা করেন। কোথাও দুই ভাই হাত ধরাধরি করে হাসতে হসেতে নাচ, গান ও লাফালাফি করতে করতে মল্লযোদ্ধা গোপবালকদের প্রশংসা করেন। কোথাও বাহুযুদ্ধে পরিশ্রান্ত হয়ে দুর্বলের মত ভাব করে গাছের নীচে ঝরাপাতার শয্যায় গোপবালকদের কোলে মাথা দিয়ে শয়ন করেন। শ্রীকৃষ্ণ এই ভাবে শয়ন করলে কয়েকজন গোপবালক তাঁর পাদসেবা ও কয়েকজন পুণ্যশালী বালক পাতার পাখা দিয়ে তাঁকে হাওয়া করতে থাকে। কেউ স্নেহার্দ্রচিত্ত হয়ে তাঁর মনোহর কণ্ঠস্বরের নকল করে ধীরে ধীরে গান করে। মহারাজ, লক্ষ্মীদেবী যাঁর পদসেবা করেন সেই হরি নিজের ইচ্ছাতেই আপন অচিন্ত্য মায়াশক্তিকে প্রচ্ছন্ন রেখে গোপবালকদের সঙ্গে তাঁদের মত

হয়ে খেলা করেন। তবু অসুরবধ ইত্যাদি অলৌকিক কাজের মধ্য দিয়ে তাঁর ঈশ্বরত্ব প্রকাশ পেত। ৯-১৯

রাম-কৃষ্ণের সখা শ্রীদাম, সুবল, স্তোককৃষ্ণ প্রভৃতি গোপবালকেরা এক সময় ভালবাসার সঙ্গে বললেন, হে মহাবল রাম, হে দুষ্টদমনকারী শ্রীকৃষ্ণ, এই গোবর্ধন পর্বতের কাছে একটি বড় বন আছে, সেই বনে অনেক ভাল তালগাছ। সেখানে গাছের তলায় অজস্র তালফল পড়ে রয়েছে এবং এখনও পড়ছে। কিন্তু দুরাত্মা ধেনুকাসুর সেই তালগুলিকে আটকে রেখেছে। হে রাম, হে কৃষ্ণ, সেই অসুর নিজে অত্যন্ত ভয়ংকর এবং অন্যান্য বলবান জ্ঞাতি অসুররা তার সহায়। হে শত্রু-নাশন, ঐ অসুর নরখাদক, তার ভয়ে কোন মানুষ সেই বনের সুন্দর সুগন্ধ ফল ভোজন করতে পারে না। সেখানে অনেক ফল পড়ে রয়েছে। ঐ দেখ তার সুগন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। কৃষ্ণ, এই সুগন্ধে আমাদের প্রলোভন হচ্ছে। ঐ সব ফল অনেকদিন থেকেই আমাদের খাবার ইচ্ছে। চল সেখানে যাই। সখাদের কথা শুনে তাঁদের আনন্দ দেবার জন্য রাম ও কৃষ্ণ গোপবালকদের নিয়ে সেই তালবনে গিয়ে ঢুকলেন। তারপর মদমত্ত হাতীর মত দু'হাতে গাছগুলোকে ঝাঁকিয়ে তাল মাটিতে ফেলতে লাগলেন। ২০-২৮

তাল পড়ার শব্দ শোনামাত্র গর্দভাকৃতি ধেনুকাসুর পর্বত-বন কাঁপিয়ে সেখানে এসে পেছনের দু'পা দিয়ে বলদেবের বুকে আঘাত করল ও কর্কশ স্বরে চিৎকার করে চারদিকে ছোটাছুটি করতে লাগল। তারপর সে প্রচণ্ড রাগে আবার এগিয়ে এসে বলরামকে মারবার জন্য পেছনের দুই পা তার দিকে ছুঁড়ল। রাম একহাতে সেই পা দু'টো ধরে ঐ অসুরকে তুলে ঘোরাতে লাগলেন এবং তাতেই তার মৃত্যু হল। তখন তিনি মৃতদেহটাকে তালগাছের গায়ে ছুঁড়ে মারলেন। তার আঘাতে উঁচু তালগাছ কেঁপে পাশের গাছকে কাঁপিয়ে ভেঙে পড়ল। ভাংগা গাছের ভারে আবার তার কাছের গাছ ভেংগে পড়ল। এমনি করে পর পর বহু তালগাছ ভেংগে পড়ল। তালবনে যেন একটা ঝড় বয়ে গেল। কাপড়ে যেমন সুতো, তেমনি জগদীশ্বরে এই বিশ্ব ওতপ্রোত[১] রয়েছে। তাঁর পক্ষে এই কাজ আশ্চর্যের নয়। তারপর ধেনুকা-সুরের গর্দভাকৃতি আত্মীয়রা সক্রোধে রাম-কৃষ্ণকে আক্রমণ করল কিন্তু রাম ও কৃষ্ণ তাদেরও পেছনের পা ধরে অবলীলায় ছুঁড়ে ছুঁড়ে তালগাছগুলির উপর ফেলতে লাগলেন। ২৯-৩৭

দৈত্যদের মৃতদেহ, পতিত তাল এবং তালগাছের মাথায় সমাকীর্ণ হয়ে সেই স্থানটি মেঘাচ্ছন্ন আকাশের মত শোভা ধারণ করল। আর রাম-কৃষ্ণের এই সুমহান কর্মের বিবরণ জেনে দেবতারা স্বর্গ থেকে পুষ্প-বৃষ্টি, দুন্দুভি ধ্বনি ও নানা রকম স্তব-স্তুতি করতে লাগলেন। সেই থেকে তালবনটি ফলাদির জন্য মানুষ ও তৃণাদির জন্য পশুদের গমনযোগ্য হল। তারপর যাঁর নাম শোনা ও কীর্তন করা পুণ্যজনক, সেই কমলাক্ষ শ্রীকৃষ্ণ অনুচর গোপদের উচ্চারিত স্তব শুনতে শুনতে বলরামের সঙ্গে ব্রজমণ্ডলে প্রবেশ করলেন। তাঁকে দেখার জন্য গোপীরা উৎসুক হয়ে অপেক্ষা করছিল। এবার তিনি ফিরে আসায় তাঁকে দেখতে পেয়ে সকলে কাছে এলেন। গাভীর পালের পেছনে পেছনে আসায় তাদের খুরের আঘাতে ওঠা ধুলোয় তাঁর ধূসর কেশরাশিতে ময়ূরপুচ্ছ ও বনফুল শোভা পাচ্ছিল।

১ পরমেশ্বর স্বরূপত এক ও অদ্বিতীয় হয়েও অব্যক্ত প্রকৃতি হতে জাত তন্তুস্থানীয় নাম, রূপ ও কর্ম দ্বারা আপনাকে আচ্ছাদিত করে রেখেছেন।—শ্বেতাশ্বতর উপ: ৬।১১

শ্রীকৃষ্ণের মুখে মধুর হাসি, চোখে মনোহর কটাক্ষ, ঠোঁটের ফাঁকে ধরা বাঁশি। গোপীগণ তাঁদের সারাদিনের কৃষ্ণ-বিরহের তাপ নয়নভঙ্গ দ্বারা তাঁর মুখ-মধু পান করে দূর করলেন। আর তিনিও তাদের সলজ্জ হাসি, বিনয় ও কটাক্ষ রূপ পূজো পেয়ে গোষ্ঠে ঢুকলেন। তারপর পুত্রবৎসলা যশোদা ও রোহিণী রাম ও কৃষ্ণকে আশীর্বাদ করলেন। তাঁরা স্নান করে গন্ধদ্রব্য মেখে পথের শ্রান্তি দূর করলেন। তারপর তাঁরা সুন্দর বস্ত্র ও দিব্য মালায় সজ্জিত হলেন। মায়েরা সুস্বাদু অন্ন পরিবেশন করলে তাঁরা তা ভোজন করে কোমল শয্যায় শুয়ে পড়লেন। ৩৮-৪৬

একদিন শ্রীকৃষ্ণ বলরামকে না বলে সখাদের সঙ্গে কালিন্দীতীরে গোচারণ করতে গেলেন। গাভী ও গোপবালকরা গরমে ও তৃষ্ণায় কাতর হয়ে কালিন্দীর বিষাক্ত জল পান করলেন। হে কুরুশ্রেষ্ঠ, দৈববশে হতবুদ্ধি হওয়ায় সেই বিষ-জল পান করে সকলে কালিন্দীর তীরে প্রাণহীন হয়ে পড়ে রইলেন। যোগেশ্বরদেরও ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের সেই অবস্থায় দেখে তাঁর অমৃতবর্ষী দৃষ্টিতে আবার সকলকে বাঁচিয়ে তুললেন। মহারাজ, হরি নিজেই তাঁদের নাথ, কাজেই এভাবে তাঁদের বাঁচিয়ে তোলা তাঁর পক্ষে কিছুই আশ্চর্য কর্ম নয়। সে যাহোক, তাঁরা জলের ধার থেকে উঠে এসে পরস্পরকে দেখতে দেখতে বিস্ময়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁদের স্মৃতি পুরোপুরি ফিরে এসেছিল তাই তাঁরা সহজেই অনুমান করতে পারলেন যে ভগবান গোবিন্দের অনুগ্রহ-দৃষ্টিতেই তাঁদের আবার জীবন লাভ সম্ভব হয়েছিল। ৪৭-৫২

ষোড়শ অধ্যায়

কালিয়-দমন

শুকদেব বললেন, মহারাজ, কালসর্প কালিয়র বিষে কালিন্দীর জল বিষাক্ত হয়েছে দেখে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেই জল বিশুদ্ধ করবার জন্য সেই সাপকে সেখান থেকে বহিষ্কৃত করেছিলেন। রাজা পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করলেন, ভগবান্, শ্রীকৃষ্ণ কালিন্দীর অগাধ জলে কালিয় সাপকে কি করে দমন করেছিলেন আর সেই বা কি ভাবে বহুযুগ ধরে তার মধ্যে বাস করে আসছিল, তা বলুন। সর্বব্যাপী ভগবান নিজের ইচ্ছায় সর্বত্র বিরাজ করেন, গোপাল বেশে তাঁর যে উদার চরিত্র প্রকাশ হয়েছিল তা অমৃতের মত, সেই চরিতামৃত সেবার জন্য তৃষ্ণার শেষ নেই। শুকদেব বললেন, মহারাজ, সেই কালিন্দীর মধ্যে আরো একটা হ্রদ ছিল। তার মধ্যেই কালিয় বাস করত। কালিয়ের বিষাগ্নিতে হ্রদের জল উত্তপ্ত হয়ে সব সময় ফুটত। তাই তার উপর দিয়ে পাখীরা উড়ে গেলেও তৎক্ষণাৎ বিষক্রিয়ায় হ্রদের জলে পড়ে মরত। ঐ হ্রদের জলকণায় তীরের বাতাসও এমন বিষাক্ত হয়েছিল যে সেই বাতাসের সংস্পর্শে কেউ এলে সেও মৃত্যুমুখে পতিত হত। শ্রীকৃষ্ণ খলের দমনের জন্য অবতীর্ণ হন। তিনি ঐ বিষধরের তীব্র বিষে হ্রদের জল অত্যন্ত দূষিত হয়েছে দেখে তীরের একটি কদমগাছে উঠলেন। যদিও কালকূট কালিয়র তেজে কালিন্দীর তীরের সব গাছ-পালাও শুকিয়ে গিয়েছিল, তবু ঐ একটা কদম গাছ শুকোয় নি। অমৃত-সংগ্রহ করে গরুড় ঐ গাছে বসেছিলেন বলে অমৃত-স্পর্শে সে গাছ অমর হয়। অথবা হয়তো শ্রীকৃষ্ণের চরণলাভের জন্যই ঐ গাছ শুকোয় নি। শ্রীকৃষ্ণ শক্তভাবে মুখ বন্ধ করে দুই হাত প্রসারিত করে সেই উঁচু গাছ থেকে লাফিয়ে বিষাক্ত জলে পড়লেন। পুরুষশ্রেষ্ঠ

ভগবানের পতনে বিষহ্রদ আলোড়িত হল, সাপেরা সংক্ষোভিত হয়ে উঠল। তখন তাদের বিষের তেজে হ্রদের জল ফুলে উঠল। গজরাজের মত বিক্রমশালী হরি সর্পহ্রদে খেলা করতে করতে হাত দিয়ে জলে আঘাত করলেন। তার শব্দ শুনে এবং নিজের রাজ্য আক্রান্ত হল দেখে সর্পরাজ তা সহ্য করতে না পেরে বেরিয়ে এল। মহারাজ, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অতি সুকুমার, মেঘের মত উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, পীত বসনধারী, শ্রীবৎসশোভিত। তাঁর চরণ দু'টি লাক্ষারসের মত লাল, ঈষৎ হাসিতে মুখমণ্ডল পরমসুন্দর। তিনি নির্ভয়ে হ্রদে খেলা করছিলেন। কালিয় বেরিয়ে এসেই তাঁর মর্মস্থানে দংশন করল এবং তাঁর শরীর আষ্টে-পৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরল। ১-৯

সাপ তাঁকে বেষ্টন করলেও তা থেকে মুক্তির জন্য শ্রীকৃষ্ণের কোন চেষ্টা দেখা গেল না। তাঁকে ঐ অবস্থায় দেখে তাঁর প্রিয় সখা গোপদের অত্যন্ত দুঃখ হল। দুঃখে ও ভয়ে তাঁরা হতবুদ্ধি হয়ে পড়লেন। কেন না তাঁরা তাঁদের আত্মা, আত্মীয়, অর্থ, স্ত্রী, প্রয়োজন, অভিলাষ যাবতীয় নিজস্ব বস্তু তাঁকে দিয়েছিলেন। বৃষ, গাভী, বৎস, বৎসতরী, বৃক্ষাদি প্রভৃতি এই ঘটনা দেখে দুঃখে কাঁদতে কাঁদতে শ্রীকৃষ্ণের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। এ সময় ব্রজে ভূকম্পন, উল্কাপাত, বাম অঙ্গের স্ফুরণ ইত্যাদি তিন প্রকার উৎপাত আরম্ভ হল। এই আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক উৎপাত এত বেশি হল যে ব্রজবাসী সবাই ভয় পেলেন। নন্দ প্রভৃতি গোপেরা আরো বেশি ভীত ও অধৈর্য হলেন, যখন জানতে পারলেন যে শ্রীকৃষ্ণ বলরামকে না নিয়ে একাই গোচারণে গিয়েছেন। তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ জানতেন না, তাই ঐ সব দুর্লক্ষণ দেখে তিনি নিহত হয়েছেন মনে করে দুঃখ-শোক ও ভয়ে কাতর হলেন। তাঁদের প্রাণ-মন সব কিছুই তাঁকে সমর্পণ করা ছিল। তাই ব্রজের শ্রীকৃষ্ণবৎসল আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা কাতর হয়ে কৃষ্ণ-দর্শনের জন্য গোকুল থেকে বার হলেন। ১০-১৪

ভগবান বলরাম ছোট ভাইয়ের প্রভাব জানতেন। তাই তিনি সবাইকে ওরকম কাতর দেখে শুধু হাসলেন, কিছুই বললেন না। ব্রজবাসীরা শ্রীকৃষ্ণের পায়ের চিহ্ন লক্ষ করে পথ ধরে যমুনার তীরে পৌঁছালেন। মহারাজ, যোগীরা যেমন বেদমার্গে বিশেষ উপাধি পরিত্যাগ করে পরমতত্ত্বের সন্ধান করেন, তেমনি তাঁরা গাভীদের চরণচিহ্নের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের ধ্বজ, চক্র, অঙ্কুশ, পদ্ম ও যব চিহ্নিত পদরেখা চিনে তাড়াতাড়ি যমুনাতটে পৌঁছালেন। তারপর যখন দূর থেকে দেখলেন হ্রদে শ্রীকৃষ্ণ সাপবেষ্টিত হয়েও নিশ্চেষ্ট হয়ে রয়েছেন, গোপবালকেরা অচেতন হয়ে রয়েছে আর গাভীরা চারদিকে কেঁদে বেড়াচ্ছে, তখন সকলে অতি দুঃখে মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। গোপীদের মন ভগবান অনন্তের প্রতি অনুরক্ত ছিল। তাঁরা সব সময় তাঁর সৌহার্দ্য, সহাস্য দর্শন ও সুস্মিত বাক্য স্মরণ করতেন। তাই সেই প্রিয়তমকে সাপের কবলে দেখে দুঃখে ও প্রিয়বিরহে কাতর হয়ে তাঁরা ত্রিভুবন শূন্য দেখতে লাগলেন। যেখানে কৃষ্ণজননী সন্তানের জন্য বিলাপ করছিলেন তাঁরা তাঁর কাছে গিয়ে শোক প্রকাশ করতে করতে ব্রজপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণেরই কথা বলতে লাগলেন আর শ্রীকৃষ্ণের মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে মৃতের মত নিশ্চেষ্ট হয়ে রইলেন। তারপর শ্রীকৃষ্ণ-অন্তপ্রাণ নন্দ প্রভৃতি ঐ হ্রদে প্রবেশ করতে উদ্যত হলে বলরাম তাঁদের নিবারণ করলেন, কারণ তিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রভাব জানতেন। ১৫-২১

গোকুলবাসীর একমাত্র গতি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর জন্য স্ত্রীপুত্র সহ সমস্ত গোকুলকে অত্যন্ত দুঃখিত দেখে সাপের বন্ধন থেকে মুক্ত হবার জন্য শরীর প্রসারিত করতে লাগলেন। ভগবানের শরীরের প্রসারণে ব্যথা পেয়ে সাপ তাঁকে ত্যাগ করল। তারপর

সক্রোধে ফণা তুলে সশব্দে নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইল। তার নাক থেকে বিষ ঝরতে লাগলো, চোখ দু'টো উত্তপ্ত কটাহের মত এবং মুখ অগ্নিময় হতে লাগল। ভগবান হরি সেই সাপের চারদিকে ঘুরে খেলতে লাগলেন। দ্বিধা-বিভক্ত জিহ্বা দিয়ে বারবার কালিয় দুই ওষ্ঠ-প্রান্ত লেহন করছিল, তার দৃষ্টি থেকে যেন ভয়ঙ্কর বিষ ঝরে পড়ছিল। ভগবানই শুধু তার চারদিকে ঘুরতে লাগল। এই ভাবে সে ক্লান্ত হলে তার উঁচু কাঁধ নামিয়ে এনে অখিল কলার আদ্যগুরু, আদি-পুরুষ তাঁর মাথার উপর উঠলেন। তার মাথার রত্নিকরের স্পর্শে ভগবানের পাদপদ্ম অপূর্ব তাম্রবর্ণ ধারণ করছিল। শ্রীকৃষ্ণ তার চঞ্চল মাথার উপরেও নাচতে লাগলেন। তাঁকে নৃত্য করতে দেখামাত্র গন্ধর্ব, সিদ্ধ, মুনি, চারণ ও দেব-বধূরা প্রীতির সঙ্গে মৃদঙ্গ, পণব, অন্যান্য বাদ্য, সঙ্গীত, ফুলের মালা উপহার নিয়ে এবং স্তবস্তুতি করতে করতে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। কালিয় নাগের একশ মাথার যে যে মাথা নত হল না দুষ্টদমন হরি নাচের ছলে পায়ের আঘাতে সেই মাথাগুলি নত করে দিলেন। শ্রীহরির চরণের আঘাতে মুখ ও নাক দিয়ে রক্তবমন করে কালিয় অচেতন হয়ে পড়ল। আবার সে চক্ষু দিয়ে বিষ ঝরিয়ে ক্রোধে নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে লাগল। সে ফণা তোলামাত্র শ্রীকৃষ্ণ তার মাথার উপর নাচতে নাচতে পদাঘাতে তাকে দমন করলেন। সে সময় দেব ও গন্ধর্বগণ অনন্ত শয্যায় নারায়ণের মত যশোদানন্দনকে নানা পুষ্পে পূজো করলেন। ২২-২৯

তাঁর ঐ রকম আশ্চর্য নৃত্যে কালিয়ের সহস্র ফণা ও শরীর একেবারে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল। কালিয় তার সব মুখ দিয়ে রক্তবমি করতে করতে চরাচরের গুরু পুরাণপুরুষ নারায়ণকে স্মরণ করে তাঁরই শরণাপন্ন হল। সমস্ত জগৎ যাঁর উদরে রয়েছে সেই যশোদানন্দনের শরীরের অতি ভারে অবসন্ন ও তাঁর শ্রীচরণের প্রহারে বিধ্বস্ত কালিয়ের স্ত্রীরা শোকার্ত হল। তাদের বসন এবং চুলের খোঁপা পর্যন্ত শিথিল হয়ে পড়ল। তারাও সেই আদ্যপুরুষেরই শরণাপন্ন হল। সেই সাধ্বী স্ত্রীরা পাপাত্মা স্বামীর মুক্তি-কামনায় সকল প্রাণীর আশ্রয়দাতা হরিকে করজোড়ে প্রণাম করতে লাগল। বিহ্বলচিত্ত নাগপত্নীরা তাঁর দয়ার জন্য নিজেদের শিশুসন্তানদের সামনে রেখেছিল। ৩০-৩২

ভগবানের শাস্তি যে উপযুক্তই হয়েছে সেকথা স্বীকার করে নাগপত্নীরা বলতে লাগল, ভগবান্, আপনি খলদের নিগ্রহের জন্য অবতীর্ণ হয়েছেন। আমাদের স্বামী কালিয় খল, তিনি পাপ করেছিলেন, তাঁর যোগ্য শাস্তিই হয়েছে। হে প্রভু, শত্রু এবং মিত্রে আপনার সমান দৃষ্টি, ফলের বিবেচনা করে আপনি দণ্ড দিয়ে থাকেন। আপনার দণ্ড অসতের পক্ষে মঙ্গলকর, সন্দেহ নেই। আপনি এরকম দণ্ড দান করে আমাদের প্রতি অনুগ্রহই প্রকাশ করেছেন। তাতে সর্পদেহ থেকে আমাদের স্বামীর মুক্তি হবে। ইনি নিজে কি আগের জন্মে অভিমানশূন্য হয়ে অন্যকে সম্মান দান করে অপূর্ব তপস্যা করেছিলেন? না সকলকে দয়া করে ধর্মসঞ্চয় করেছিলেন, যার জন্য সর্বজীবের জীবনদাতা হয়ে আপনি এঁর প্রতি তুষ্ট হয়েছেন? ভগবান্, ব্রহ্মাদি দেবতারাও যে লক্ষ্মীর প্রসাদ প্রার্থনা করেন, সেই লক্ষ্মী পত্নী হয়েও আপনার চরণরেণু স্পর্শের জন্য অন্যান্য কামনা ত্যাগ করে ব্রতপালনে অনেকদিন তপস্যা করেছিলেন। এই সাপকে সেই চরণরেণু স্পর্শ করার অধিকারী দেখছি; জানিনা এটা তাঁর কোন্ পুণ্যের ফল। মনে হয় এই ভাগ্য তপস্যার দ্বারা নয়, আপনার অচিন্ত্য কৃপার ফলেই সম্ভব হয়েছে। প্রভু, আপনার চরণরেণু সামান্য নয়, যাঁরা তা পান তাঁরা স্বর্গ, সার্বভৌম, ব্রহ্মপদ, পৃথিবীর আধিপত্য, যোগসিদ্ধি বা পুনর্জন্মহীন নির্বাণ কিছুই কামনা করেন না। হে নাথ, এই সর্পরাজ তমোগুণ-

যুক্ত ও ক্রোধের বশবর্তী হয়েও সেই পদরজ লাভ করলেন ; ইনি ধন্য। সংসার-চক্রে ভ্রমণরত জীব 'আমার মাথায় থাকুক' বলে এই চরণরেণু প্রার্থনা করলেই সমস্ত প্রার্থিত ধন পেয়ে থাকে। সেই চরণরেণু কি সহজে পাওয়া যায় ? ৩৩-৩৬

হে প্রভু, আপনার ঐশ্বর্যাদি গুণ অচিন্ত্য, আপনাকে প্রণাম করি। আপনি সকলের দেহে অন্তর্যামীরূপে আছেন। আপনি সর্বব্যাপক, এবং আকাশ প্রভৃতি ভূতের আশ্রয়। পূর্ব থেকেই রয়েছেন তাই আপনি সকলের কারণ, অথচ নিজে কারণের অতীত। আর আপনি জ্ঞান-বিজ্ঞানের আকর এবং নির্গুণ, নির্বিকার, প্রকৃতির প্রবর্তক, অনন্তশক্তি, ব্রহ্মস্বরূপ অতএব আপনাকে প্রণাম করি। আপনি কালস্বরূপ, কালশক্তির আশ্রয়, কালের অবয়বের সাক্ষী ; আপনি বিশ্বরূপ, বিশ্বের দ্রষ্টা, কর্তা এবং সর্বকারণ, আপনাকে প্রণাম। পঞ্চভূত, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন ও বুদ্ধি আপনার স্বরূপ। ত্রিগুণের অভিমানে আচ্ছন্ন থাকায় জীব আপনাকে জানতে পারে না। ভগবান্, আপনি অপরিচ্ছিন্ন, অনন্ত, অদৃশ্য, সূক্ষ্ম, কূটস্থ ও সর্বজ্ঞ। আপনি মায়ায় অস্তিনাস্তি, সর্বজ্ঞ-কিঞ্চিদজ্ঞ, বদ্ধমুক্ত, এক-অনেক প্রভৃতি বিভিন্ন বাদের অনুবর্তী হন ; কিন্তু আপনি সব তর্কের অতীত। আপনি বাচ্য ও বাচক শক্তি। ভগবান্, আপনি প্রমাণসমূহের মূল, আপনি কবি, নিখিল শাস্ত্রের যোনী, আর আপনি প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির স্বরূপ, আপনাকে প্রণাম করি। প্রভু, শুদ্ধসত্ত্বে প্রকাশ শ্রীকৃষ্ণ, সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন এবং অনিরুদ্ধ আপনার এই চারমূর্তি ; আপনি উপাসকদের পতি, আপনাকে প্রণতি। প্রভু, আপনি অন্তঃ-করণ সকলকে প্রকাশ করছেন, কিন্তু অহংকার দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে নানারূপে প্রকাশিত হন। চিত্তের চেতন-বৃত্তি দ্বারা অনুমিত আর সত্ত্ব প্রভৃতি ত্রিগুণের সাক্ষী ও স্বগোচর, আপনাকে নমস্কার করি। আপনার মহিমা তর্কের অতীত, আপনি সব কাজের উৎপত্তি ও প্রকাশের কারণ, তাই অনুমানের যোগ্য। আপনি ইন্দ্রিয়গুলির প্রবর্তক। আপনি আত্মারাম এবং পূর্ণকাম, আপনাকে প্রণাম করি। প্রভু, পরাবর অর্থাৎ স্থূল ও সূক্ষ্ম ভূতসকলের গতি আপনি সকলের অধিষ্ঠাতা, আপনাকে প্রণাম। আপনাতে বিশ্ব বর্তমান নয়, অথচ আপনি বিশ্বস্বরূপ। আপনি বিশ্বের দ্রষ্টা ও হেতু, আপনাকে প্রণাম করি। আপনি চেষ্টাহীন হয়ে কালশক্তি ধারণ করে গুণের দ্বারা এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় করে থাকেন। তাই এখন সংস্কাররূপে বর্তমান বিশেষ বিশেষ স্বভাব বুদ্ধিদ্বারা প্রকটিত করে আপনি লীলা করছেন। আপনার লীলা অব্যর্থ। ভগবান্, এইসব শান্ত, অশান্ত বা মূঢ়যোনি জীব যদিও আপনারই দেহ, তবু মনে হয় শান্ত জনেরাই এখন আপনার প্রিয়, কেননা আপনি সাধুজনের ধর্মরক্ষার ইচ্ছা করছেন। আপনি স্বামী, আপনার ভৃত্যের প্রথম অপরাধ ক্ষমা করতে হবে। হে শান্ত আত্মা, ইনি অত্যন্ত মূঢ়, আপনাকে জানেন না, তাই এঁকে আপনি ক্ষমা করুন। ভগবান, আপনি অনুগ্রহ করুন, না হলে এই সাপের প্রাণ যাবে। আমরা এঁর পত্নী ; এঁর মৃত্যু হলে আমরা নিরাশ্রয় হব। প্রভু, আমাদের প্রাণস্বরূপ স্বামীকে প্রাণদান করুন। আমরা আপনার কিংকরী, আমাদের বিহিত আদেশ করুন, যা আজ্ঞা করবেন তাই করব। প্রভু, শুনেছি, শ্রদ্ধার সঙ্গে আপনার আদেশ পালন করলে সবরকম ভয় থেকে পরিত্রাণ হয়। ৩৭-৫৩

শুকদেব বললেন, নাগপত্নীদের দ্বারা এইভাবে স্তুত হয়ে ভগবান সেই ভগ্নমুণ্ড ও মূর্ছিত নাগরাজকে শ্রীচরণের সামান্য আঘাত দিয়ে ছেড়ে দিলেন। দীন কালিয় ছাড়া পেয়ে ধীরে ধীরে ইন্দ্রিয়শক্তি ও প্রাণ ফিরে পেল এবং অতি কষ্টে নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে করতে হাতজোড় করে শ্রীহরিকে বলল, ভগবান্,

আমরা জন্ম থেকে খল এবং তমোগুণী। আমাদের ক্রোধ অতিকষ্টেও শান্ত হয় না। হে নাথ, দুষ্টগ্রহের মত প্রাণীদের সহজাত স্বভাব ত্যাগ করা যায় না। নানা গুণের প্রভাবে জগতে বীর্য, সামর্থ্য, যোনি, বীজ, বাসনা, আকৃতি প্রভৃতি নানারকম দেখা যায়; আপনি এই জগৎ সৃষ্টি করেছেন। এই পৃথিবীতে আমরা সাপজাতি এবং জন্ম থেকেই আমরা ভয়ানক ক্রোধী। আমরা মোহাচ্ছন্ন, আপনার মায়া কি করে ত্যাগ করব? একমাত্র সর্বজ্ঞ জগদীশ্বর আপনিই ঐ মায়া দূর করতে পারেন। তাই অনুগ্রহ বা নিগ্রহ আপনার যা ইচ্ছা হয় করুন। ৫৪-৫৯

শুকদেব বললেন, নররূপী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ঐ সব শুনে বললেন, সর্প, তুমি আর এখানে থেকো না। পুত্র, স্ত্রী, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন সব নিয়ে সমুদ্রে চলে যাও। দেরি করো না, কারণ গরু ও মানুষেরা নদীর জল পান করে, তুমি থাকলে তারা এখানে আসতে পারবে না। তোমার প্রতি আমার যে শাসন তা যে লোক স্মরণ করবে ও সকাল-সন্ধ্যায় কীর্তন করবে তোমরা কখনও তাকে ভয় দেখাবে না। আর যে সব লোক আমার লীলাস্থানরূপে এই হ্রদে স্নান করে দেবতাদের তর্পণ করবে ও উপবাস করে স্মরণপূর্বক আমার অর্চনা করবে, তারা সব পাপ থেকে মুক্ত হবে। তাই তোমার এ জায়গা ছেড়ে চলে যাওয়া দরকার। তুমি এখানে থাকলে কেউ আসতেই পারবে না, স্নান-পুজো তো দূরের কথা। তুমি এখান থেকে চলে গেলে গরুড়ের কাছ থেকে তোমার কোন ভয়ের আশংকা নেই, তুমি এই হ্রদ ছেড়ে রমণক দ্বীপে গিয়ে আশ্রয় নাও। যার ভয়ে এই হ্রদে আশ্রয় নিয়েছিলে সেই সুপর্ণ তোমাকে খাবে না, কারণ তোমার মাথায় আমার চরণচিহ্ন রইল। শুকদেব বললেন, মহারাজ, একথা বলে অদ্ভুতকর্মা শ্রীকৃষ্ণ কালিয়কে ছেড়ে দিলে সে ও তার স্ত্রীরা আনন্দিত হল। উৎকৃষ্ট পোশাক, মালা, মণি-মাণিক্য ইত্যাদি নানারকম ভূষণ উপহার দিয়ে তারা গরুড়ধ্বজ জগন্নাথকে পুজো করে প্রসন্ন করল। তারপর তাঁকে প্রদক্ষিণ ও অভিবাদন করে স্ত্রী-পুত্র-মিত্র সহ সমুদ্রের মধ্যে সেই রমণক দ্বীপে চলে গেল। মহারাজ, লীলার জন্য নিত্য মানুষ-রূপধারী ভগবান হরির অনুগ্রহে ঐ সময় থেকে যমুনা বিষহীন ও তার জল অমৃতের মত সুস্বাদু হয়েছে। ৬০-৬৭

সপ্তদশ অধ্যায়

দাবানল থেকে বন্ধুগণকে রক্ষা

রাজা পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করলেন, ভগবান্, কালিয় কেন নাগদের বাসস্থান রমণক দ্বীপ ত্যাগ করেছিল আর সে গরুড়ের কি অপ্রিয় কাজ করেছিল? শুকদেব বললেন, নাগদের অধীন এবং তাদের ভক্ষ্য প্রাণীরা নাগের উপদ্রব নিবারণের জন্য প্রতি মাসে বনস্পতির মূলে কিছু বলি রাখার নিয়ম করেছিল। নাগরা প্রত্যেক পূর্ণিমায় ও অমাবস্যায় মহাত্মা গরুড়কে সেই বলি এনে দিত। কিছুদিন পরে কদ্রুর ছেলে কালিয় নিজের বিষ ও বীর্যে উন্মত্ত হয়ে গরুড়কে গণ্য না করে নিজেই সমস্ত বলির দ্রব্য খেতে আরম্ভ করল। এতে ভগবানের প্রিয় পার্ষদ গরুড়ের খুব রাগ হল। তিনি কালিয়কে হত্যা করবার জন্য ভয়ংকর বেগে তার দিকে ছুটলেন। তাকে আসতে দেখে অসংখ্য ফণা তুলে কালিয়ও বিষ ত্যাগ করতে করতে যুদ্ধ করার জন্য

তাঁর দিকে ছুটল। কালিয়ের জিহ্বা ভয়ানক, নিঃশ্বাস সুদীর্ঘ ও চোখ উগ্র হয়ে উঠেছিল। সে তার দাঁত দিয়ে সুপর্ণকে কামড়াতে লাগল। মহাত্মা গরুড় ক্রোধে চঞ্চল হয়ে তাঁর স্বর্ণবর্ণ বাম পাখা দিয়ে কালিয়কে প্রচণ্ডভাবে আঘাত করলেন। গরুড়ের পাখায় আহত হয়ে কালিয় বিহ্বল হয়ে পড়ল এবং প্রাণভয়ে তাঁর অগম্য ও অগাধ কালিন্দী হ্রদে গিয়ে ঢুকল। মহারাজ পরীক্ষিৎ, কালিন্দী হ্রদ গরুড়ের অগম্য কেন তা বলি। এক সময় গরুড় হ্রদের একটি বিরাট মাছকে খাবার জন্য ধরতে যাচ্ছিলেন। সৌভরি ঋষি তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বারবার গরুড়কে মাছ ধরতে নিষেধ করলেন, কিন্তু ক্ষুধার্ত গরুড় সে নিষেধ কর্ণপাত না করে জোর করে মাছটিকে ধরে নিয়ে গেলেন। সেই মৎস্যরাজকে হরণ করায় অন্যান্য মাছেরা অত্যন্ত কাতর হয়ে সৌভরির কাছে তাদের দুঃখ নিবেদন করল। তাতে সৌভরির হৃদয় দয়ার্দ্র হল। তখন তিনি ঐ জলাশয়ের অধিবাসীদের মঙ্গল আকাঙ্ক্ষায় গরুড়কে অভিশাপ দিয়ে বললেন, এরপর গরুড় যদি এখানে এসে মাছ প্রভৃতি প্রাণীদের খায় তাহলে তৎক্ষণাৎ তার মৃত্যু হবে। ১-১১

ঐ শাপের কথা শুধু কালিয় জানত, অন্য সাপেরা জানত না। তাই গরুড়ের ভয়ে কালিয় ওখানে বাস করছিল। এখন শ্রীকৃষ্ণ তাকে সেখান থেকে নির্বাসিত করে দিলেন। সে যা হোক, এদিকে শ্রীকৃষ্ণ দিব্য বস্ত্র, দিব্য মালা, দিব্য গন্ধ ধারণ করে সোনা ও উৎকৃষ্ট মণিমাণিক্যে অলংকৃত হয়ে কালিন্দী হ্রদ থেকে বের হয়ে এলেন। প্রাণহীন দেহ প্রাণ ফিরে পেলে ইন্দ্রিয়গুলি যেমন সচল হয়, সেরকম গোপেরা শ্রীকৃষ্ণকে দেখামাত্র সচল হয়ে উঠলেন, আনন্দে তাঁকে প্রীতির আলিঙ্গন করলেন। হে কৌরব, যশোদা, রোহিণী, অন্যান্য গোপী এবং নন্দ ও অন্যান্য গোপেরাও শ্রীকৃষ্ণকে দেখতে পেয়ে যেন জ্ঞান ফিরে পেলেন। এমন কি শুকনো গাছগুলোও যেন তাঁর দর্শনে পল্লবিত হয়ে সজীব হল। বলরামও তাঁকে হাসমুখে আলিঙ্গন করলেন, কেননা তিনি শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য জানতেন আর স্নেহভরে তাঁকে কোলে নিয়ে বারবার দেখতে লাগলেন। গরু ও বাছুরগুলিও অত্যন্ত আনন্দিত হল। তারপর গুরু ও ব্রাহ্মণেরা সস্ত্রীক নন্দের কাছে এসে বলতে লাগলেন, গোপরাজ, তোমার পরম ভাগ্য, তাতেই তোমার ছেলে মহাসর্প কালিয়ের দ্বারা বেষ্টিত হয়েও আবার মুক্ত হয়ে ফিরে এল। ব্রাহ্মণদের প্রীতি ও আশীর্বাদের জন্য নন্দরাজ আনন্দে তাঁদের গাভী ও সোনা দান করলেন। যশোদাও ছেলেকে আবার ফিরে পেয়ে কোলে নিয়ে বুকে ধরে আনন্দে বারবার চোখের জল ফেলতে লাগলেন। ১২-১৯

রাজেন্দ্র, ব্রজবাসীরা এবং ধেনুগুলি যদিও ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় পরিশ্রান্ত হয়েছিল, তবুও সে রাত্রে তারা কালিন্দী তীরেই রয়ে গেল। গভীর রাত্রে হঠাৎ শুকনো বন থেকে উদ্ভূত দাবানল চারদিক থেকে ঘুমন্ত ব্রজবাসীদের বেষ্টন করে পোড়াবার উপক্রম করল। ব্রজবাসীরা আগুনের স্পর্শে জেগে উঠলেন এবং পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হয়ে বলতে লাগলেন, হে কৃষ্ণ, হে মহাভাগ, হে রাম, হে অমিতবিক্রম, এই ঘোর দাবানল আমাদের সকলকে গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছে। প্রভু, এই কালাগ্নি অতি দুস্তর। আমরা তোমার সুহৃদ, আমাদের এই কাল আগুন থেকে রক্ষা কর। আমরা মৃত্যুতে ভীত নই; কিন্তু পাছে তোমার শ্রীচরণ থেকে বিযুক্ত হতে হয় এই ভয়েই আমরা ব্যাকুল হয়েছি। আমরা তোমার ঐ অভয় চরণ পরিত্যাগ করতে পারি না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আত্মীয়স্বজনকে এই রকম কাতর দেখে সেই ভীষণ দাবানল পান করলেন। তিনি নিজে অনন্ত, তাঁর শক্তিও অনন্ত। তাঁর পক্ষে ঐ কাজ বিচিত্র নয়। ২০-২৫

অষ্টাদশ অধ্যায়

প্রলম্বাসুর-বধ

শুকদেব বললেন, তারপর শ্রীকৃষ্ণ আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে সানন্দে ব্রজধামে ঢুকলেন। তাঁর আত্মীয়রাও আনন্দে তাঁর যশ কীর্তন করতে করতে তাঁর অনুগামী হলেন। গোপালন মায়াচ্ছলে রাম-কৃষ্ণ ব্রজে বিহার করছেন ; এর মধ্যে প্রাণীদের অসহনীয় গ্রীষ্ম ঋতু এল। কিন্তু যেখানে কেশব বলরামের সঙ্গে বাস করছিলেন সেই বৃন্দাবনের গুণে গ্রীষ্ম ঋতুকে বসন্তের মত মনে হল। প্রচণ্ড গ্রীষ্মেও বৃন্দাবনের নির্ঝরগুলির ধ্বনিতে ঝিল্লীর রব আচ্ছন্ন হয়ে গেল। চতুর্দিক ঐ সব ঝর্নার জলে সুস্নিগ্ধ শ্যামল শোভায় মণ্ডিত হয়ে রইল। নদী, সরোবর, ঝর্নার শীতল জলকণার সঙ্গে পদ্ম প্রভৃতির পরাগ বহন করে বাতাস বইতে লাগল। তাই বৃন্দাবনের তৃণহীন অংশেও ব্রজবাসীদের গ্রীষ্মের উত্তাপে কষ্ট বোধ হল না। অগাধ জলপূর্ণ নদীর ঢেউয়ে তীরের মাটি ভিজতে লাগল। তাই সূর্যের কিরণ বিষের মত তীব্র হলেও বৃন্দাবনভূমির রস ও তৃণ শুষ্ক করতে পারল না, তার শীতলতা অক্ষুণ্ণ রইল। যে সব বন সব রকম ফুলে পরিপূর্ণ ও মনোরম শোভাযুক্ত, যেখানে হরিণ ও পাখিরা বিচিত্র রব, ভ্রমর ও ময়ূরেরা সুমধুর গীত এবং কোকিল কূজন ও সারসরা অব্যক্ত ধ্বনি করছিল একদিন সেই রকম এক বনে ক্রীড়া করবেন বলে গোপ ও গোধন পরিবৃত হয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলভদ্রের সঙ্গে বেণু বাজাতে বাজাতে তাতে প্রবেশ করলেন। ১-৮

বনে ঢুকে রাম, কৃষ্ণ প্রভৃতি সব গোপ-বালকরা কচি পাতা, ময়ূরের পাখা, ফুলের স্তবক ও গৈরিক ধাতুতে বিভূষিত হয়ে নাচ, গান ও বাহুযুদ্ধ ইত্যাদি খেলা শুরু করলেন। যখন শ্রীকৃষ্ণ নাচেন, কতকগুলি গোপাল বাজনা বাজান। কেউ গান করেন, কেউ বাঁশী বাজান, কেউ বা হাততালি দিয়ে শিঙা বাজিয়ে প্রশংসা করেন। নটেরা যেমন নটের সেবা করে, সেরকম গোপজাতির বেশে অবতীর্ণ দেবতারা গোপালরূপী রাম-কৃষ্ণের স্তব করতে লাগলেন। চুল বেণী করে বলরাম ও কৃষ্ণ ঘুরপাক খেলেন, দূরে ও উপরে লাফালাফি করলেন, উরুতে হাতের তালু দিয়ে আঘাত করে করে তাল ঠুকলেন, পরস্পর টানাটানি ও বাহুযুদ্ধ করে খেলতে লাগলেন। কখনো বা অন্যান্য গোপ-বালকেরা নাচতে শুরু করলে তাঁরা দুজন গান গেয়ে করতালি দিয়ে তাদের প্রশংসা করতে লাগলেন। কখনও বেল, কুম্ভফল, আমলকী নিয়ে খেলতে লাগলেন। কখনও অস্পৃশ্য হয়ে অন্যকে ছোঁবার জন্য বা চোখ বেঁধে দৌড়াদৌড়ি করে খেলতে লাগলেন। কখনও হরিণ ও পাখীর মত ব্যবহার করে খেলতে লাগলেন। কখনও ব্যাঙের মত লাফালেন, কখনও বা হাসি-পরিহাসে দোলায় দুলতে লাগলেন। কোন সময় রাজা-রাজা খেলায় সময় কাটালেন। রাম-কৃষ্ণ এই দুজনে অন্যান্য গোপবালকদের নিয়ে বৃন্দাবনে নদী, পর্বত, গহ্বর, কুঞ্জসমূহ, ক্রীড়াকানন, সরোবর প্রভৃতি মনোরম স্থানে নানারকম খেলা খেলতে লাগলেন। ৯-১৬

ঐ বনেই একদিন গোপদের সঙ্গে রাম-কৃষ্ণ পশুচারণ করছিলেন, এমন সময়ে প্রলম্বাসুর গোপরূপ ধারণ করে তাঁদের দুজনকে হরণ করার জন্য ঐ বনে এল। যদিও অন্তর্যামী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ঐ অসুরের ইচ্ছা জানতে পারলেন, তবু বধ করবার জন্যই তাকে ক্রীড়ায় সখা বলে গ্রহণ করলেন। তারপর শ্রীকৃষ্ণ গোপালকদের আহ্বান করে বললেন, গোপগণ, এস, আমরা বয়স ও শক্তি অনুসারে

দু'দলে ভাগ হয়ে খেলি। এই শুনে গোপবালকেরা সেখানেই রাম-কৃষ্ণকে ক্রীড়ার নায়ক করল। তারপর কয়েকজন বালক শ্রীকৃষ্ণের, কয়েকজন বলরামের পক্ষ নিয়ে নানারকম খেলা শুরু করল। সেই সব খেলায় যারা জয়ী হল পরাজিতরা তাদের পিঠে তুলে বেড়াতে লাগল। এইভাবে বাহিত ও বাহক হয়ে ক্রীড়া ও গোচারণ করতে করতে তাঁরা ভাণ্ডারিক নামে এক বটগাছের কাছে পেঁছালে যখন বলদেবের পক্ষের শ্রীদাম প্রভৃতি ক্রীড়ায় জয়ী হল, তখন শ্রীকৃষ্ণ ও অন্যান্য গোপালগণ তাঁদের বহন করতে লাগলেন। আবার শ্রীকৃষ্ণ পরাজিত হয়ে শ্রীদামকে, ভদ্রসেন বৃষভকে, প্রলম্বাসুর বলরামকে পিঠে বয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন। এই সময় সে শ্রীকৃষ্ণকে অসহ্য মনে করে বলদেবকে নিয়ে তাঁর দৃষ্টির বাইরে দূরে চলে গেল। এই দৈত্যের দেহ ঘন মেঘের মত কালো, সারা শরীর স্বর্ণালংকারে ভূষিত। বলরাম পর্বতরাজের মত ভারী হওয়ায় তাঁকে বহন করতে গিয়ে অসুরের চলার বেগ কমে গেল। সে তখন আসুরিক দেহ ধারণ করল। তখন আকাশে স্থিরবিদ্যুৎ ও চন্দ্র থাকলে মেঘের যে শোভা হয়, তাকেও সেরকম দেখাতে লাগল। দৈত্যের চোখ দু'টি থেকে আগুনের স্ফুলিঙ্গ বের হচ্ছিল, ভয়ানক দন্তরাজি ভ্রূকুটিতটে সংলগ্ন হয়েছিল। তার কেশকলাপ আগুনের জলন্তশিখার মত দীপ্ত হল আর মুকুট ও কর্ণভূষণের জ্যোতিতে তা অদ্ভুত দ্যুতিময় হয়ে উঠল। সেই ভীষণ দেহ দেখে হলধর একটু ভীত হলেন। পরক্ষণেই তাঁর স্মৃতির উদয় হল, তিনি ভয় ত্যাগ করলেন। যে শত্রু, তাঁর সখা গোপদের পরিত্যাগ করে তাঁকে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল বলভদ্র রাগে, ইন্দ্র যেমন গিরিকে বজ্রবেগে তাড়না করেছিলেন, তেমনি ত্বরিৎগতিতে তার মাথায় দৃঢ় মুষ্টিতে আঘাত করলেন। আহত হওয়ামাত্র ঐ অসুর বিশীর্ণশিব হল, তার স্মৃতি নষ্ট হওয়ায় সে রক্তবমি করতে লাগল। তারপব যেমন দেবরাজের বজ্রে আহত হয়ে পর্বত পড়ে যায়, সেই অসুরও সেভাবেই চিৎকার করে পড়ে প্রাণত্যাগ করল। বলশালী বলরামের হাতে প্রলম্ব নিহত হলে গোপেরা আশ্চর্য হয়ে সাধুবাদ করতে লাগল। কেউ কেউ আশীর্বাদ বাক্য উচ্চারণ করতে করতে বলরামের প্রশংসা করতে লাগল। মৃত্যুর কবল থেকে ফিরে আসা প্রিয়জনের মত তাঁকে আবার তারা ফিরে পেয়ে প্রেমবশে আলিঙ্গন করতে লাগল। আনন্দে তাদের চিত্ত বিহ্বল হয়ে গেল। পাপী প্রলম্ব নিহত হলে দেবতারাও পরম সুস্থ বোধ করে বলরামের উপর মাল্যবর্ষণ করলেন ও 'সাধু সাধু' বলে বারবার প্রশংসা করতে লাগলেন। ১৭-৩২

ঊনবিংশ অধ্যায়

পশু ও গোপালদের দাবাগ্নি থেকে রক্ষা

শুকদেব বললেন, মহারাজ, গোপালেরা খেলায় মত্ত হলে তাদের গরুগুলি দূরে গিয়ে চরতে আরম্ভ করল ও স্বাধীনভাবে চরতে চরতে ঘাসের লোভে এক গুহায় ঢুকল। ছাগ, গাভী ও মহিষগুলি একবন থেকে অন্য বনে গিয়ে ঘাস খেতে খেতে শেষে হঠাৎ বনের আগুনে তপ্ত ও তৃষ্ণার্ত হয়ে চিৎকার করতে করতে উঁচু ঘন মুঞ্জঘাসময় এক বনে ঢুকল। এদিকে রাম-কৃষ্ণ প্রভৃতি গোপালরা পশুদের দেখতে না পেয়ে নানাভাবে খুঁজলেন, কিন্তু তারা কোথায় জানতে পারলেন না। যেহেতু পশুরাই গোপদের জীবন-উপায়, সেই পশুদের খুঁজে না পেয়ে অনুতপ্তহৃদয়ে তাঁরা তাদের

পায়ের ছাপ-অঙ্কিত রাস্তা, দাঁত ও ক্ষুর দিয়ে ছেঁড়া ঘাস দেখে দেখে অনুসন্ধান করতে লাগলেন। অনেকক্ষণ পর মুঞ্জ (শর) বনের মধ্যে পথভ্রষ্ট, ক্রন্দনরত নিজেদের গরুগুলিকে দেখতে পেলেন। যদিও গোপালরা পরিশ্রান্ত হয়েছিলেন, তবু তাঁরা সেখান থেকে ফিরলেন না। শ্রীকৃষ্ণ যখন মেঘ-গম্ভীর স্বরে গাভীদের প্রত্যেককে নিজ নিজ নাম ধরে ডাকলেন, তখন তারা তা শুনে পুলকিত হয়ে প্রতিধ্বনি করতে লাগল। ১-৫

তারপর বিধ্বংসী মহাদাবানল বায়ু দ্বারা উদ্দীপিত হয়ে ভয়ংকর লেলিহান শিখায় স্থাবর ও জঙ্গমকে গ্রাস করতে করতে চারদিক থেকে এগিয়ে আসতে লাগল। চারদিকে দাবানল দেখে গরু ও গোপালদের মনে প্রচণ্ড ভয় হল এবং মানুষেরা যেমন মৃত্যুভয়ে পীড়িত হয়ে ভগবান হরির শরণাপন্ন হয় সেরকম সকলে বলরামের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হয়ে বলতে লাগল, হে কৃষ্ণ, হে মহাবীর্য, হে রাম, হে অমোঘ-বিক্রম, আমরা দাবানলে দগ্ধ হতে হতে তোমার শরণাপন্ন হচ্ছি, আমাদের পরিত্রাণ কর। হে কৃষ্ণ, এই সব লোক তোমার বান্ধব, এঁদের বিপন্ন হতে দেওয়া তোমার উচিত নয়। হে সর্বধর্মজ্ঞ, আমরা তোমাকে নিজেদের নাথ ও পরম আশ্রয় বলে জানি। ৬-১০

শুকদেব বললেন, মহারাজ, ভগবান হরিবন্ধুদের ঐ রকম কাতর আকুতি শুনে করুণা প্রকাশ করে বললেন, ভয় নেই, তোমরা চোখ বোজো। এই শুনে গোপেরা চোখ বন্ধ করলে যোগাধীশ্বর ভগবান সেই জ্বলন্ত দাবানল পান করে নিবিয়ে ফেললেন। তারপর সকলকে ভাণ্ডীর বনে এনে পিপাসা ও ক্লান্তি থেকে পরিত্রাণ করলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা ভাণ্ডীর বনে আনীত হয়েছে দেখে গোপ-বালকদের অত্যন্ত বিস্ময় হল। তারা দেখল যে নিজেরা এবং গাভীসকল সমস্ত বিপদ থেকে মুক্ত। শ্রীকৃষ্ণের অনির্বচনীয় যোগবীর্য ও যোগমায়ার অদ্ভুত প্রভাব ও দাবানল থেকে নিজেদের মুক্ত দেখে তারা তাঁকে অমর জ্ঞান করতে লাগল। তারপর সন্ধ্যাবেলায় ভগবান জনার্দন বলরামের সঙ্গে বাঁশি বাজাতে বাজাতে নিজেদের গো-পাল ফিরিয়ে নিয়ে গোষ্ঠে এলেন। গোপরা তাঁর স্তব করল, গোপীরা গোবিন্দ দর্শনে পরম আনন্দ পেল, কারণ তাঁকে ছাড়া এক মুহূর্তকে তাদের শতযুগ বলে মনে হোত। ১১-১৬

বিংশ অধ্যায়

বর্ষা ও শরৎ-শ্রী বর্ণনা

শুকদেব বললেন, রাজা, গোপেরা ঘরে ফিরে দাবাগ্নি থেকে পরিত্রাণ ও প্রলম্ব-বধ, কৃষ্ণ-বলরামের এই দুই অদ্ভুত কীর্তি গোপীদের কাছে বর্ণনা করল। বৃদ্ধ গোপ ও গোপীরা তা শুনে আশ্চর্য হয়ে অনুমান করল রাম ও কৃষ্ণ কখনই মানুষ নন, এঁরা দুই প্রধান দেবতা। লীলার জন্য ব্রজে অবতীর্ণ হয়েছেন। তারপর যে কাল সব প্রাণীর উৎপত্তি ও জীবিকা-সাধক, যে সময় সব দিক সমুজ্জ্বল হয়ে থাকে আর আকাশতল সব সময় সংক্ষুভিত দেখা যায়, সেই বর্ষাকাল এল। বিদ্যুৎ ও গর্জন সহ নিবিড় নীল মেঘে আচ্ছন্ন হওয়ায় আকাশে জ্যোতি অস্পষ্ট হল, তাই তা সগুণ ব্রহ্মের মত প্রকাশ পেতে লাগল। তাছাড়া সূর্য নিজ কিরণের সাহায্যে আট মাস পৃথিবীর যে জলরূপ ধন আকর্ষণ করেছিলেন, সময় উপস্থিত হওয়ায় তা

মোচন করতে লাগলেন। যেমন করুণাময় সজ্জনরা সংসারতাপে সন্তপ্ত জনকে কৃপা করে তাকে রক্ষা করার জন্য নিজের জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দেন, সে রকম বিদ্যুৎযুক্ত মেঘরাশি বিদ্যুৎরূপ চোখে জগৎকে গ্রীষ্মে তপ্ত দেখে দয়ালু হল ও জগতের কল্যাণে প্রচুর বারিবর্ষণ করল। যদিও গ্রীষ্মে পৃথিবী কৃশ হয়েছিল তবু বৃষ্টির জলে ভিজে আবার সে আগের মত পুষ্ট হতে লাগল, তপস্বীর শরীর যেমন তপস্যার কাম্য ফল পেয়ে পুষ্ট হয়। যেমন কলিযুগে পাপী-পাষণ্ডরাই শোভা পায়, ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণরা পায় না, তেমনি বর্ষার সন্ধ্যায় খদ্যোতই দ্যুতিমান হয়, নক্ষত্ররা প্রকাশ পায় না। যেমন নিত্যকর্মের শেষে গুরুদেবের সাড়া পেলে শিষ্যরা অধ্যয়ন শুরু করে, তেমনি এতদিন যে ভেককুল মৌন হয়ে ঘুমিয়েছিল, মেঘের ধ্বনি শুনে তারা ডাকতে লাগল। ১-৯

ছোট ছোট নদীগুলি গ্রীষ্মকালে প্রখর সূর্যের কিরণে শুকিয়ে যাচ্ছিল। এখন বর্ষা এলে তারা জলপূর্ণ হয়ে ইন্দ্রিয়পরবশ পুরুষের দেহধন ও সম্পত্তির মত উৎপথে প্রবাহিত হতে লাগল। এসময়ে পৃথিবী কোথাও নতুন ঘাসের রঙে সবুজ, কোথাও বা ইন্দ্র-গোপকীটের রঙে লোহিত আর কোন কোন স্থানে ছত্রাকের ছায়ায় শ্যামল হয়ে রাজাদের সেনা-সম্পদের মত শোভা পেতে লাগল। খেতগুলি শস্য-সম্পত্তিতে পূর্ণ হয়ে কৃষকদের আনন্দ দিতে লাগল। আর যে সব মানীরা কৃষিকে নীচকর্ম মনে করে চাষ করেনি তাদের অনুতাপ হল। তারা অবশ্য জানে না যে হর্ষ, অনুতাপ সবই দৈবের অধীন। যে রকম হরিকে সেবা করে লোকে সৌন্দর্য-লাভ করে তেমনি নতুন বৃষ্টির জলে অভিষিক্ত হয়ে জল ও স্থলবাসী সব জীব সুন্দর, সজীব হয়ে উঠল। অপক্ক যোগীর কামে আসক্ত মন যেরকম ক্ষুব্ধ হয়, তেমনি নদীগুলির সঙ্গে মিলনে ও বাতাসে তরঙ্গিত সমুদ্র ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। ভগবানের প্রতি যাঁদের মন আসক্ত তাঁরা নানারকম দুঃখেও যেমন ব্যথিত হন না, সে রকম বৃষ্টির ধারায় বারবার আহত হলেও পাহাড়গুলি ব্যথিত হল না। বর্ষায় সংস্কারের অভাবে ঘাসে আচ্ছাদিত-পথ আছে কি নেই বোঝা যায় না, যেমন ব্রাহ্মণদের অনভ্যাসে এবং কালবশে শ্রুতি আছে কি নেই, এরূপ সন্দেহ হয়। যেরকম অস্থির প্রণয়িনী নারী গুণী পুরুষের কাছে স্থির থাকতে পারে না, তেমনি এ সময় চঞ্চল বিদ্যুৎ মানুষের হিতকারী মেঘমালায় স্থির থাকতে পারল না। ত্রিগুণে জাত প্রপঞ্চে যেমন নির্গুণ পুরুষ প্রকাশ পায়, গর্জনমুখর আকাশে তেমনি নির্গুণ (জ্যাহীন) ইন্দ্রধনু শোভা পেতে লাগল। আবার নিজের চৈতন্য দ্বারা প্রকাশিত অহংকারে আচ্ছন্ন হয়ে জীব যেমন অপ্রকাশ থাকে চন্দ্রও সেরকম নিজের জ্যোৎস্নায় প্রকাশিত মেঘে ঢাকা পড়ে প্রকাশ পেতে পারল না। ১০-১৯

যেমন সন্তপ্ত গৃহীরা ঘরে ভাগবত পুরুষের আগমনে আনন্দিত হয়, সেরকম ময়ূরেরা মেঘের আগমনে উৎসব বোধ করে পুলকিত হল ও আনন্দ প্রকাশ করল। এই সময় গাছগুলি নিজ নিজ মূলের দ্বারা জল পান করে পল্লবিত হয়ে নানারূপ গ্রহণ করল, যেমন ক্ষীণ ও তপস্যাক্লান্ত ঋষিরা সিদ্ধি লাভ করে নানারকম শরীর ধারণ করেন। যেমন বিষয়াসক্ত গৃহীর চিত্ত নানা ঘোর কর্মে অপরিতৃপ্ত হলেও সে গৃহেই বাস করে, সেরকম চক্রবাকেরা সরোবরের তীরে কাদা ও কাঁটা থাকলেও সে সব জায়গায় বাস করতে লাগল। যে রকম কলিযুগে পাষণ্ডদের কুতর্কে বেদমার্গ বিনষ্ট হয়, তেমনি এই সময় দেবরাজ ইন্দ্র অনবরত বৃষ্টিপাতে প্রবৃত্ত হলে জলের বেগে সেতুগুলি ভগ্ন হয়ে পড়ল। যে রকম রাজারা পুরোহিতদের নির্দেশ যথাকালে গ্রহণ করেন, সেরকম মেঘেরা যথাকালে বাতাসদ্বারা চালিত হয়ে প্রাণীদের প্রতি অমৃত-বর্ষণ করতে লাগল। ২০-২৪

মহারাজ, এই রকম বর্ষার সময়ে খেলার ইচ্ছায় গো ও গোপালদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে বলরামের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ পাকা খেজুর ও জামে সমৃদ্ধ এক বনে ঢুকলেন। স্তনভারে মন্দগতি গাভীরা শ্রীকৃষ্ণের আহ্বানে সত্বর সঙ্গে সঙ্গে চলল, কিন্তু তাদের স্তন থেকে দুধ ক্ষরিত হতে লাগল। সেই বনে গাছগুলি সজীব, গাছে গাছে ভরা মধুর চাক, পর্বত থেকে জলধারা নেমে আসছে—শ্রীকৃষ্ণ চারদিকে সে সব দেখলেন। জলধারা পতনে গুহায় শব্দ উঠছিল। বনের মধ্যে যখন বৃষ্টিপাত হচ্ছিল তখন শ্রীকৃষ্ণ গাছের নীচে গুহায় থাকলেন, কন্দমূল ও ফল আহার করে বেড়ালেন। দই প্রভৃতি মিষ্টান্ন আনা হলে জলাশয়ের কাছে পাথরের উপর বসে সংকর্ষণাদি গোপগণের সঙ্গে বসে তিনি সে সব ভোজন করলেন। স্তনভারে পরিশ্রান্ত গাভীরা, ষাঁড় ও বাছুরেরা পরিতৃপ্ত হয়ে নতুন ঘাসের উপর বসে চোখ বুজে রোমন্থন করছিল। ভগবান ঐ সব এবং সব কালের সুখদাত্রী বর্ষালক্ষ্মীকে দেখে আনন্দিত হয়ে নিজের শক্তির দ্বারা বর্ধিত ঐ শ্রীর সমাদর করলেন। এইভাবে লীলা করে বৃন্দাবনে রাম-কৃষ্ণ বাস করতে থাকলে বর্ষা গিয়ে শরৎ-ঋতু এল। জলপূর্ণ মেঘ আর আকাশে দেখা গেল না, জলাশয় স্বচ্ছ হল আর বাতাস শান্ত হল। ২৫-৩২

শরৎকালে বিকশিত পদ্মের শোভায় জলাশয়গুলি নিজেদের স্বভাব ফিরে পেল, যেন ভ্রষ্টযোগী আবার যোগসাধন করে নিজের প্রকৃতি ফিরে পেল। যেমন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অচলা ভক্তি চার আশ্রমের[১] সকল লোকদের অমঙ্গল হরণ করে, তেমনি শরৎ এসে আকাশের মেঘ, জীবের সংকীর্ণবাসের[২] ক্লেশ, ভূমির পংক এবং জলের মল এই চার রকম মালিন্য দূর করল। এই সময় মেঘগুলি সর্বস্ব ত্যাগ করে সাদা হয়ে উঠল—পাপহীন মুনিরা যেমন পুত্র ও ধন-সম্পত্তির বাসনা ত্যাগ করে শান্তভাবে থাকেন। এ সময় পাহাড়গুলি কোথাও নির্মল জল বর্ষণ করতে লাগল, কোথাও বা কিছুই করল না, যেমন জ্ঞানীরা কারো প্রতি কৃপাপরশ হয়ে জ্ঞানামৃত বিতরণ করেন, কারোকে বা কিছুই দেন না। সূর্যের প্রখর কিরণে রোজই জলাশয়ের জল হ্রাস পেতে লাগল, কিন্তু যে সব জলচরেরা অল্প জলে চরে বেড়ায় তারা তা জানতে পারল না, যেমন মূঢ় ও পরিজনে আসক্ত মানুষেরা ক্রমশ পরমায়ু হ্রাসের কথা বুঝতে পারে না। যেমন অজিতেন্দ্রিয়, দরিদ্র, কৃপণ পরিজনাসক্তরা অভাবে সন্তাপ ভোগ করে, সে রকম গভীর জলবিহারী মাছেরা শরৎ-সূর্যের তাপে সন্তপ্ত হতে লাগল। যেমন ধীর লোকেরা অনাত্ম দেহ-মন্দিরে অহং-মমতাবুদ্ধি ত্যাগ করে থাকেন, সে রকম শরতের আগমনে স্থলভাগ কাদা ও লতাগুলি অপক্কতা ত্যাগ করল। আত্মার কাজ পরিত্যক্ত হলে মুনি যে রকম নিশ্চল হন, সে রকম শরতের আগমনে সংক্ষুব্ধ সাগর নীরব গম্ভীর হয়ে উঠল। ৩৩-৪০

আবার, যোগীরা যেমন ইন্দ্রিয়পথ রোধ করে প্রাণধারণ করেন, সে রকম কৃষকরা নিজের নিজের জমিতে আল বেঁধে সেতুবন্ধ কেদার থেকে জল নিতে লাগল। যেমন জ্ঞানে দেহাভিমান ও মুকুন্দ-দর্শনে ব্রজাঙ্গনাদের মনস্তাপ দূর হয়, চন্দ্র তেমনি শরতের সূর্যকিরণে তপ্ত জীবদের সন্তাপ হরণ করতে লাগল। শরতের আগমনে আকাশে তারাগুলি বিমল হয়ে উঠল। অতএব যাবতীয় মীমাংসিত অর্থ অন্তরে গ্রহণ করে বিশুদ্ধসত্ত্ব চিত্ত যেমন শোভা পায়, সে রকম আকাশমণ্ডল এ সময় নির্মেঘ ও নক্ষত্রমণ্ডিত হয়ে শোভা পেতে লাগল। আবার আকাশের উপর নিশানাথ চন্দ্র অখণ্ডমণ্ডল হয়ে নক্ষত্রসহ বিরাজ করলেন, যেমন যদুপতি শ্রীকৃষ্ণ নিজের বিষ্ণুচক্রে

১ ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস—এই চার আশ্রম।
২ সংকীর্ণবাসের ক্লেশ—চলাফেরার অসুবিধের জন্য সীমিত স্থানে বাস করবার ক্লেশ।

পরিবৃত হয়ে ভূমণ্ডলে বিরাজমান হন। যেমন শ্রীকৃষ্ণগতপ্রাণা গোপীরা ধ্যানেও শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করে সন্তাপ দূর করেন, তেমনি এই সময় পুষ্পবনের সমান শীতল ও উষ্ণ বাতাসের আলিঙ্গনে মানুষেরা শীতল হতে লাগল। শরতে গরু, হরিণ ও বিহঙ্গিনীরা ইচ্ছা না থাকলেও নিজ নিজ স্বামীদের বলপূর্বক অনুগমনে গর্ভিণী হয়ে উঠল, যেমন ফলের কামনা না থাকলেও ঈশ্বরের আরাধনায় নানারকম সুফল স্বর্গাদি ভোগ আপনা আপনি হয়ে থাকে। যেমন রাজার আবির্ভাবে দস্যু ছাড়া অন্যলোক নির্ভয় ও হৃষ্ট হয়, তেমনি সূর্যের প্রকাশে কুমুদ ছাড়া যাবতীয় জলজ পুষ্প প্রফুল্ল হল। এ সময়ে গ্রামে-নগরে লৌকিক ও বৈদিক মহোৎসবের জন্য পাকা শস্যে পরিপূর্ণ ভূমি শোভা পেতে লাগল সত্য, কিন্তু ভগবান হরির দুই অংশ (রাম ও কৃষ্ণ) দ্বারা পৃথিবীর শোভা আরও অনেক বেড়ে গেল। সিদ্ধপুরুষরা যেমন সময় হলে যোগাদি-প্রাপ্য নিজ নিজ দেহ পেয়ে থাকেন, তেমনি যে বণিক, মুনি, রাজা ও স্নাতক ব্রাহ্মণরা বর্ষার জন্য নিজ নিজ স্থানে রুদ্ধ ছিলেন এখন সুসময় উপস্থিত হওয়ায় নিজ নিজ বৃত্তি অবলম্বন করলেন। ৪১-৪৯

একবিংশ অধ্যায়

গোপীদের কথোপকথন

শুকদেব বললেন, মহারাজ, শরতে সরোবর স্বচ্ছ হল ও পদ্মের সুগন্ধ বহন করে চারদিকে বাতাস বইতে লাগল। সেসময় গাভী ও গোপালগণ সহ শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে প্রবেশ করলেন। শ্রীকৃষ্ণ বনে ঢুকে বলরাম ও গোপালকদের সঙ্গে গোচারণ করতে করতে বাঁশি বাজাতে লাগলেন। সে সময় সেখানে পাহাড়, নদী ও সরোবরের কাছাকাছি ফুলবনে পাখী ও মৌমাছিরা মত্ত হয়ে মধুর স্বরে রব করছিল। শ্রীকৃষ্ণের বাঁশির ধ্বনিতে মদনের উদ্ভব হয়। কোন কোন ব্রজাঙ্গনা সেই বাঁশি শুনে পরোক্ষে সখীদের কাছে তাঁর বিষয় বর্ণনা করতে লাগলেন। কিন্তু বর্ণনা করতে করতে তাঁর চরিত্র স্মরণ হওয়ায় গোপীরা বর্ণনা শেষ করতে পারলেন না, কারণ শ্রীকৃষ্ণের বাঁশি শুনে কন্দর্পের আবেগে তাঁদের মন চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। তাঁদের মনে হতে লাগল নটবর শ্রীকৃষ্ণ শরীর ধারণ করে তাঁর চরণের চিহ্ন অঙ্কিত রমণীয় বৃন্দারণ্যে প্রবেশ করলেন। তাঁর মাথায় ময়ূরপুচ্ছ মুকুট, কানে কর্ণিকার ফুল, পরনে সোনার বর্ণ হলুদ পোশাক আর গলায় বৈজয়ন্তীমালা। তিনি নিজে অধরসুধা দিয়ে বাঁশির রন্ধ্রে স্বর তুলছেন আর অন্যান্য গোপরা তাঁর চারদিকে থেকে তাঁরই কীর্তিগান করছেন। সর্বভূত-মনোহর সেই অনন্তের বাঁশিধ্বনি শুনে ব্রজাঙ্গনারা তাঁর গুণ বর্ণনা করতে করতে পরমানন্দ-মূর্তিকে যেন মনে মনে আলিঙ্গন করলেন। ১-৬

গোপীরা সখীদের বললেন, প্রিয়দর্শনই চক্ষুষ্মানদের চক্ষুর ফল, তা ছাড়া অন্য ফল কি আছে আমাদের জানা নেই। গোপবালক ও গাভী সহ ব্রজেশপুত্র রাম-কৃষ্ণ এখন বৃন্দাবনে ঢুকছেন। তাঁদের মুখে বাঁশি চোখ থেকে কটাক্ষ বিচ্ছুরিত হচ্ছে। যাঁরা তাঁদের বদনারবিন্দ পান করছেন, তাঁদের চক্ষু সার্থক। অন্যান্যেরা বললেন, আহা, গোপদের কি আশ্চর্য পুণ্য ; রাম ও কৃষ্ণ সময়ে সময়ে তাঁদের মধ্যে নীল ও হলুদ বেশে রঙ্গমঞ্চে যেমন নটরা শোভা পায় তেমনি বিরাজ করছেন। তাঁদের

মাথার চূড়ায় আমের মুকুল ও ময়ূরপুচ্ছে, গলায় উৎপল ও পদ্মফুলের মালায় অনির্বচনীয় শোভা হয়েছে। কখনও কখনও দু'জনে গানও করছেন। অন্য গোপীরা বললেন, এই বেণু কি যে পুণ্য করেছিল বলতে পারি না। শ্রীকৃষ্ণের যে অধরসুধা শুধু গোপীদের জন্য তা এই বেণু একা পান করছে, হয়তো সামান্যই অবশিষ্ট আছে। এই বাঁশির আরও সৌভাগ্য দেখ, যে নদীগুলির জলে এর পুষ্টি হয়েছিল তারা এর অপূর্ব সৌভাগ্য দেখে কমলরূপ রোমে শিহরিত হচ্ছে। যেমন কুলবৃদ্ধ পুরুষরা বংশে কোন ছেলে ভগবৎসেবক হলে রোমাঞ্চিত হয়ে আনন্দাশ্রু মোচন করতে থাকেন, সেরকম এই বাঁশির পুণ্য দেখে যে গাছগুলির বংশে এর উৎপত্তি হয়েছিল তারা মধুধারা বর্ষণের ছলে চোখের জল মোচন করছে। কোন কোন গোপী বললেন, সখি, দেখ, দেখ, দেবকীসুতের চরণকমল-যুগলের স্পর্শে শ্রীবৃন্দাবন কেমন সম্পত্তিশালী হয়েছে। তাঁর বাঁশি শুনে মৃদুমন্দ মেঘগর্জন মনে করে ও তাঁকে নীল মেঘ মনে করে ময়ূরেরা নৃত্যে মত্ত হয়েছে। তাদের পেখম-তোলা নৃত্য দেখে পর্বতের গুহার অন্যান্য প্রাণীরা বেরিয়ে এসে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সর্বসুখময় বৃন্দাবন পৃথিবীর কীর্তি বিস্তার করছে। অন্যান্য নারীরা বলল, সখি, হরিণীরা পশুযোনিতে উৎপন্ন হয়েছে বটে, কিন্তু এরা বাঁশি শুনে তাদের কৃষ্ণসার পতিদের সঙ্গে একত্র হয়ে বিচিত্রবেশধারী শ্রীনন্দ-নন্দনকে প্রণয়-দৃষ্টি দিয়ে পূজা করছে। অন্য গোপী বলল, শ্রীকৃষ্ণের রূপ ও চরিত্র দর্শন করলে কোন স্ত্রীর আনন্দ না হয়? তাঁকে দেখে ও মুরলীধ্বনি শুনে বিমানে যেতে যেতে দেবাঙ্গনারা দেবতাদের কোলে থেকেও আবেগে চঞ্চল হয়ে ওঠেন। তাঁদের খোঁপার ফুল খসে পড়ে ও নীবীবন্ধন[১] শ্লথ হয়। উৎকর্ণ হয়ে শ্রীকৃষ্ণের মুখ-নির্গত বাঁশির গীতামৃত পান করতে করতে গো-বৎসরা স্তনক্ষীর পান করা থেকে বিরত হয়ে চোখের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করতে লাগল। তাদের চোখও অশ্রুসিক্ত দেখাচ্ছিল। এই বনে যে পাখীরা বাস করে তারাও বোধ হয় মুনিই হবে। যা করলে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করা যায় সেভাবে মনোহর পত্রবহুল গাছের শাখায় উঠে তারা শ্রীকৃষ্ণের মোহন বাঁশি শুনছে। পরম সুখের অনুভূতিতে তাদের চোখ বন্ধ হয়েছে, মুখে বাক্য নেই। সচেতনের কথা কি, অচেতন নদীগুলিও শ্রীকৃষ্ণের বাঁশি শুনে ঢেউরূপ হাত দিয়ে কমল উপহার আহরণ করে তাঁর শ্রীচরণযুগল গ্রহণ করছে। তারা আবর্তছলে তাদের আবেগ-চাঞ্চল্য প্রকাশ করছে, তাদের বেগ ভগ্ন হয়ে যাচ্ছে। অন্য সখীরা বললেন, মেঘেরা যেমন লোকের আর্তি হরণ করে শ্রীকৃষ্ণও সেরকম লোকের আর্তিহারী, তাই তিনি মেঘের বন্ধু। ঐ দেখ, জলধর নিজবন্ধু শ্রীকৃষ্ণকে গোপদের নিয়ে রোদে পশুচারণ ও বাঁশি বাজাতে দেখে তাঁর মাথার উপর উদিত হচ্ছে আর প্রেমবশে কুসুমতুল্য জলকণাগুলিকে মুক্তামালার মত সাজিয়ে তাঁর ছত্র রচনা করছে। অন্য গোপীরা বললেন, শবরী-স্ত্রীরা ধন্য, তারা কৃতার্থ হল; কারণ যে কুঙ্কুম কৃষ্ণপ্রিয়াদের কুচমণ্ডল রঞ্জিত করেছিল এবং পরে মিলনকালে শ্রীকৃষ্ণের চরণ-পঙ্কজে লিপ্ত হয়েছিল তা শ্রীকৃষ্ণের বনে ভ্রমণের সময় তাঁর চরণ থেকে তৃণরাজিতে সংলগ্ন হয়েছে। তারা সেই কুঙ্কুম নিয়ে নিজেদের স্তন ও বদনে লেপন করে মিলনবাধা বিসর্জন দিচ্ছে। এই কুঙ্কুম দর্শনেই তাদের মিলনতাপ জন্মেছিল। এই গোবর্ধন পর্বত শ্রীহরির দাসদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; কারণ রাম-কৃষ্ণকে দেখে আনন্দিত হয়ে সে সুন্দর দূর্বাঘাস, কন্দর, কন্দ-মূল দিয়ে ঐ গাভী ও গোপালসহ রাম-কৃষ্ণের পূজো করছে। সখীরা, দেখ কি আশ্চর্যের বিষয়! গোপবৃন্দের সঙ্গে বনে বনে

১ কোমরের কাছে পরিধেয় বস্ত্রের বাঁধন।

গোচারণকারী রাম-কৃষ্ণ দোহন সময়ে গরুর পা বাঁধার ও ধেনুসংযোজনের দড়ি নিয়ে গোপালদের সংগে গাভীগুলিকে এক বন থেকে অন্য বনে নিয়ে যাচ্ছেন। সেই রাম ও কৃষ্ণের মধুর পদযুক্ত বাঁশির শব্দে প্রাণীদের মধ্যে যে নিশ্চলতা প্রভৃতি স্থাবর স্বভাব আর গাছগুলির যে পুলক ইত্যাদি জঙ্গম স্বভাবের উৎপত্তি হচ্ছে তা অতি বিচিত্র। ৭-১৯

বৃন্দাবনচারী ভগবান হরির এরকম ক্রীড়া পরস্পর বর্ণনা করতে করতে গোপীরা তন্ময় হয়েছিলেন। ২০

দ্বাবিংশ অধ্যায়

গোপীগণের বস্ত্রহরণ

শুকদেব বললেন, মহারাজ, হেমন্তের প্রথম মাসে নন্দব্রজের কুমারীরা হবিষ্যভোজী হয়ে কাত্যায়নীর ব্রত আরম্ভ করলেন। সূর্যোদয়ের সময় কালিন্দীর জলে স্নান করে তাঁরা জলের নিকট বালুর প্রতিমা তৈরী করে সুগন্ধ দ্রব্য, মালা, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, প্রবাল, ফল, চাল প্রভৃতি নানা উপহার দিয়ে দেবীর পূজা করতে লাগলেন। 'হে কাত্যায়নি, হে মহামায়া, হে মহাযোগিনি, হে অধীশ্বরি, অনুগ্রহ করে আমাদের নন্দগোপের পুত্রকে পতিরূপে প্রদান করুন, আপনাকে প্রণাম করি। তাঁরা এইরূপ প্রার্থনা করে পূজা করলেন। নন্দসুত আমাদের পতি হোন, এই কামনায় ব্রজ-কুমারীরা এক মাস ব্রত পালন করে ভদ্রকালীর অর্চনা করতে লাগলেন। তাঁরা ভোরে উঠে হাত ধরাধরি করে নিজেদের নামের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের গুণগান করতে করতে যমুনায় স্নান করতে যেতেন। একদিন সেই ব্রজকুমারীরা নদীতীরে উপস্থিত হয়ে অন্যান্য দিনের মত তীরে নিজেদের বস্ত্র রেখে শ্রীকৃষ্ণের গুণগান করতে করতে জলের মধ্যে আনন্দে কেলি শুরু করলেন। যোগেশ্বরদের ঈশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তা অবগত হয়ে তাঁদের কর্মের ফল দান করার জন্য বয়স্য বালকদের নিয়ে সেখানে এলেন এবং তাঁদের বস্ত্র হরণ করে তাড়াতাড়ি কদম্ব গাছে আরোহণ করলেন। পরে অন্যান্য বালকদের সঙ্গে হাসতে হাসতে বললেন, অবলাগণ, তোমরা এখানে এসে ইচ্ছামত নিজেদের বস্ত্র গ্রহণ কর। আমি সত্য বলছি, পরিহাস করছি না, কারণ তোমরা ব্রতক্লান্ত হয়েছ। আমি এখনও মিথ্যা বলছি না, আগেও কখন মিথ্যা বলিনি, এই বালকরা তা জানে; তাই সুমধ্যমা সুন্দরীগণ, তোমরা একে একে অথবা সবাই মিলে এসে বস্ত্র নিয়ে যাও। ১-১১

মহারাজ, শ্রীকৃষ্ণের এই পরিহাসে গোপকুমারীরা লজ্জিত ও প্রেমরসে মগ্ন হলেন এবং নিজেরা নিজেদের দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগলেন, কেউ জল থেকে উঠতে পারলেন না। শ্রীকৃষ্ণ বার বার ঐরকম পরিহাস করতে থাকলে তাঁদের চিত্ত ব্যগ্র হল এবং ঠাণ্ডা জলে কণ্ঠ পর্যন্ত মগ্ন থাকায় শীতে কাঁপতে কাঁপতে বললেন, শ্রীকৃষ্ণ, অন্যায় করোনা। তুমি নন্দতনয়, ব্রজের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ভদ্র এবং আমাদের প্রিয়। আমাদের বস্ত্রগুলি দিয়ে দাও। চেয়ে দেখ, আমরা শীতে কাঁপছি। শ্যামসুন্দর, আমরা তোমার দাসী, তোমার আজ্ঞায় চলি। তুমি ধর্মজ্ঞ, আমাদের বস্ত্র ফিরিয়ে দাও, না হলে রাজাকে বলে দেব। শ্রীকৃষ্ণ বললেন, শুচিস্মিতাগণ, তোমরা যদি আমার দাসী হও এবং আজ্ঞাবাহী হও, তা হলে আমি তোমাদের বলছি এখানে

এসে নিজের নিজের বস্ত্র নাও, আমার কাছে এসে না নিলে কখনই দেব না। রাজাকে বলে দিলেই বা ক্ষতি কী? রাজা ক্রুদ্ধ হয়ে আমার কি করবেন? এভাবে গোপকুমারীরা শীতে কষ্ট পাচ্ছিলেন, তাঁরা হাত দিয়ে যোনিদেশ আচ্ছাদিত করে জলাশয় থেকে উঠলেন। ভগবান তাঁদের অক্ষত বিশুদ্ধ ভাব দেখে প্রসন্ন হলেন এবং তাঁদের বস্ত্রগুলি কাঁধে রেখে হাসতে হাসতে বললেন, তোমরা ব্রতপালন করতে করতে বিবস্ত্রা হয়ে জলে স্নান করেছ, তাতে দেবতাকে অবহেলা করা হয়েছে। সেই পাপ দূর করার জন্য মাথায় অঞ্জলি ধারণ করে নতমস্তকে প্রণাম কর, তারপর বস্ত্র নিও। বিবস্ত্রা হয়ে অবগাহনে ভগবান অচ্যুত এরকম দোষ আরোপ করায় কুমারীরা মনে করল হয়তো তাঁদের ব্রত ভঙ্গ হয়েছিল। তাই তাঁরা ব্রতের পূর্ণতা কামনা করে সমস্ত অনুষ্ঠানের সাক্ষাৎ ফলস্বরূপ সেই ভগবান দেবকীসুতকেই প্রণাম করলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের ভক্তি দেখে বস্ত্রগুলি ফিরিয়ে দিলেন। ১২-২১

শ্রীকৃষ্ণ ব্রজকুমারীদের বঞ্চনা ও উপহাস করলেও, লজ্জা জলাঞ্জলি দেওয়ালেও, বস্ত্রহরণ করলেও এমনকি তাদের ক্রীড়া-পুত্তলিকার মত পরিচালনা করলেও সেই সব কুমারীরা দোষদৃষ্টিতে তাঁকে দেখলেন না। কারণ প্রিয়সঙ্গে তারা সুখী হয়েছিলেন। বস্ত্র পরেও তাঁরা সেখান থেকে চলে গেলেন না, কারণ প্রিয়সঙ্গমে বশীভূত হয়ে তাঁদের মন আকৃষ্ট হয়েছিল; তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সলজ্জ দৃষ্টিপাত করতে লাগলেন। ভগবান দামোদর তাঁর পাদস্পর্শ কামনায় নারীরা ব্রত পালন করেছেন এই উদ্দেশ্য জানতে পেরে বললেন, সাধ্বীগণ, তোমরা আমার অর্চনা করেছ, তোমাদের মনোরথ আমি অনুমোদন করে নিলাম, তা সত্য হবার যোগ্য। যাদের চিত্ত আমার প্রতি আবিষ্ট হয় তাদের কামনা সাংসারিক বিষয়ভোগে পরিণত হয় না। পাকা বা ভাজা বীজের যেমন অংকুরোদ্গম হয় না, অবলাগণ, তোমরা সিদ্ধ হয়েছ, এখন ব্রজে যাও। আগামী রজনীতে তোমরা আমার সঙ্গে ক্রীড়া করতে পারবে। এই জন্যই তোমরা কাত্যায়নীর অর্চনা করেছিলে। ২২-২৮

শুকদেব বললেন, ব্রজকুমারীরা ভগবানের এই আদেশ পেয়ে কৃতার্থ হলেন এবং তাঁর পাদপদ্ম ধ্যান করে অতিকষ্টে তাঁকে ত্যাগ করে ব্রজে ফিরে গেলেন। তারপর ভগবান দেবকীনন্দন অগ্রজের সঙ্গে গোপনে পরিবৃত হয়ে গোচারণ করতে করতে বৃন্দাবন থেকে অনেক দূরে চলে গেলেন। নিদাঘ কালের প্রখর রৌদ্রে গাছগুলিকে তাঁদের মাথার উপর ছত্রের মত ছায়া বিতরণ করতে দেখে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজ-বালকদের বলতে লাগলেন, স্তোককৃষ্ণ, অংশ, শ্রীদাম, সুবল, অর্জুন, বৃষভ, ওজস্বী, দেবপ্রস্থ, বরূথপ, তোমরা দেখ, এইসব বৃক্ষগুলি মহাভাগ্যবান। পরার্থেই এদের জীবন। এরা নিজেরা বাতাস, গ্রীষ্ম-বর্ষা ও শীত সহ্য করে আমাদের তা থেকে অব্যাহতি দিচ্ছে। এরা সবাইকে জীবন দিচ্ছে। এদের জন্ম শ্রেষ্ঠ। দয়ালুদের কাছে যেমন, এদের কাছেও তেমনি যাচকেরা কখনো বিমুখ হয় না। এরা পত্র, পুষ্প, ফল, ছায়া, মূল, বল্কল, কাষ্ঠ, গন্ধ, নির্যাস, ভস্ম, অস্থি, পল্লব, অংকুর প্রভৃতি দ্বারা সকলের কামনা নিরন্তর পূর্ণ করে। প্রাণীদের প্রতি ধন, প্রাণ, বুদ্ধি, বাক্য এসব দিয়ে কল্যাণ আচরণ করাই তো প্রাণীদের জন্মের সার্থকতা। মহারাজ, এই ভাবে আনন্দ প্রকাশ করতে করতে ভগবান প্রবাল, স্তবক, ফুল, ফল ও পাতায় অবনত বৃক্ষরাজির মধ্যে দিয়ে যমুনাতীরে উপস্থিত হলেন। গোপবালকেরা গাভীদের সুশীতল ও পবিত্র যমুনার জল পান করালেন আর নিজেরাও ঐ স্বাদু জলে পিপাসা নিবৃত্ত করলেন। যমুনার উপবনে সেই সব গোপালরা পশুচারণ করতে করতে রাম-কৃষ্ণের কাছে এসে তাদের বক্তব্য বলতে লাগলেন। ২৯-৩৮

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক বিপ্রপত্নীদের অনুগ্রহণ

গোপবালকরা বললেন, হে রাম, হে শ্রীকৃষ্ণ, আমাদের ক্ষুধায় কষ্ট হচ্ছে ; অনুগ্রহ করে ক্ষুধার শান্তি কর। শুকদেব বললেন, গোপবালকরা ঐ রকম বললে, দেবকীনন্দন ভগবান ভক্তিমতী ব্রাহ্মণবধূদের প্রতি অনুগ্রহ করবার ইচ্ছায় বললেন, তোমরা দেবযজ্ঞের স্থানে যাও, ব্রহ্মবাদী ব্রাহ্মণেরা স্বর্গকামনা করে আঙ্গিরস নামক বহুজনসাধ্য যজ্ঞ করছেন। সেখানে গিয়ে অন্ন চেয়ে আন। আমরা দু'জনে পাঠাচ্ছি, এতে তোমাদের লজ্জা কি? যদি এরকম আশঙ্কা কর যে অপাত্র বলে আমাদের অন্ন দেবে না, আমি বলছি ভগবান বলভদ্র ও আমার নাম গ্রহণ করো। মহারাজ, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আদেশ পেয়ে গোপবালকরা যজ্ঞস্থানে গেলেন এবং মাটিতে দণ্ডবৎ হয়ে পড়ে কৃতাঞ্জলি-পুটে শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ অনুসারে যাচঞা করে বললেন, ভূদেবতাগণ, শুনুন, আমরা আজ্ঞাকর্তা শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে আসছি। আপনাদের মঙ্গল হোক, আমাদের বলভদ্রের প্রেরিত গোপাল বলে জানুন। ব্রাহ্মণগণ, রাম ও কৃষ্ণ এ স্থানের নিকটে গোচারণ করছেন, তাঁরা ক্ষুধার্ত হয়ে আপনাদের অন্ন অভিলাষ করছেন। ধর্মজ্ঞপ্রবর আপনারা যদি তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধাযুক্ত হন তাহলে দুই মহাত্মার প্রার্থিত অন্ন দান করুন। সাধুশ্রেষ্ঠগণ, দীক্ষা আরম্ভ করে অগ্নিষোমীয়[1] পশুমারণের আগে দীক্ষিত ব্যক্তির অন্নগ্রহণে দোষ হয়, তবে সৌত্রামণী[2] থেকে অন্য দীক্ষিতের অন্নভোজন দোষের হয় না। ১-৮

শুকদেব বললেন, মহারাজ, ব্রাহ্মণরা ভগবানের অভিলাষ শুনেও শুনলেন না। সামান্য স্বর্গ প্রভৃতিতে তাঁদের আশা ছিল। ক্লেশাধীন কর্মই তাঁরা করতেন আর নিজেদের বৃথা জ্ঞানবৃদ্ধ বলে মনে করতেন। হায়! দেশ, কাল, বিভিন্ন দ্রব্য, মন্ত্র-তন্ত্র, ঋত্বিক, অগ্নি, দেবতা, যজমান, যজ্ঞ এবং ধর্ম যাঁর স্বরূপ সেই সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম ভগবান অধোক্ষজকে (মর্ত্যে ক্রীড়া হেতু) সামান্য মানুষ বলে গণ্য করে তাঁরা মান্য করলেন না। তাঁরা মহৎ ব্রাহ্মণ এই জ্ঞানে দেহাভিমানী। তাই গোপালদের উক্তি শুনে হাঁ বা না কিছুই বললেন না। গোপরা নিরাশ হয়ে রাম-কৃষ্ণের কাছে ফিরে এসে সমস্ত বৃত্তান্ত হুবহু বর্ণনা করলেন। তা শুনে ভগবান জগদীশ্বর হাসলেন। কার্যসিদ্ধি করতে হলে প্রত্যাখ্যাত হয়েও বিরক্ত হতে নেই, এই লৌকিক গতি বুঝিয়ে আবার গোপদের বললেন, তোমরা এবার ব্রাহ্মণ-পত্নীদের কাছে বল, বলভদ্র সহ শ্রীকৃষ্ণ এখানে এসেছেন। ঐসব অবলারা শুধু দেহদ্বারা গৃহে বাস করে, আসলে মনের মধ্যে সব সময় আমাতেই অবস্থিত করছেন। আমার প্রতি তাদের স্নেহ অত্যধিক, আমার নাম শুনলেই তোমাদের প্রচুর অন্ন দেবে, সন্দেহ নেই। শ্রীকৃষ্ণের এই কথায় গোপবালকরা যজ্ঞক্ষেত্রের পত্নীশালায় গিয়ে উপবিষ্ট ও উত্তম অলঙ্কারে সজ্জিত দ্বিজ-সতীদের প্রণাম করে সবিনয় বচনে বলতে লাগলেন, বিপ্রপত্নীগণ, আপনাদের প্রণাম করি। আমাদের কথা শুনুন ; এ জায়গার কাছাকাছি শ্রীকৃষ্ণ এসে অবস্থান করছেন। তিনিই আমাদের পাঠিয়ে দিলেন। তিনি গোপবালকদের সঙ্গে গোচারণ করতে করতে বলদেবের সঙ্গে দূরে এসে পড়েছেন, অনুচরদের সঙ্গে তাঁরও অত্যন্ত

---

১ ব্রহ্মার মানসপুত্রের মতো কীর্তিমান। ২ যাগ বিশেষ। যজুর্বেদের কাব শাখার ২১শ অধ্যায়ে এর বিবরণ আছে। এই যজ্ঞে সুরাপানে ব্রাহ্মণ পতিত নয়।

ক্ষুধা পেয়েছে। তাঁর জন্য অন্ন দান করুন। মহারাজ, বিপ্রপত্নীদের চিত্ত কৃষ্ণ-কথাতেই আকৃষ্ট হয়েছিল। তাঁরা নিত্য কৃষ্ণ-দর্শনার্থ উৎসুক থাকতেন। এখন কৃষ্ণ কাছাকাছি এসেছেন এই কথা শুনে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। ৯-১৮

পতি, পিতা, ভ্রাতা এবং পুত্ররা বারবার নিষেধ করলেও অনেকদিন যাবৎ কৃষ্ণকথা শুনে উত্তমশ্লোক শ্রীকৃষ্ণের প্রতি নিজেদের চিত্ত সমর্পিত রাখায় ব্রাহ্মণ-পত্নীরা তৎক্ষণাৎ বিভিন্ন পাত্রে অন্ন এবং চর্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় এই চার রকম ভোজ্য নিয়ে, নদী যেমন সমুদ্রের দিকে বেগে ধাবিত হয়, সেরকম প্রবল বেগে প্রিয় কৃষ্ণের উদ্দেশে যাত্রা করলেন। তাঁরা সকলে সত্বর তাঁর কাছে উপস্থিত হয়ে দেখলেন অশোকের নব পল্লবে মণ্ডিত যমুনার উপবনে অগ্রজসহ শ্রীকৃষ্ণ গোপগণে পরিবৃত হয়ে ভ্রমণ করছেন। তাঁর শরীর শ্যামবর্ণ, পরনে পীতবস্ত্র; বনমালা, ময়ূরপুচ্ছ, সোনা প্রভৃতি ধাতু ও প্রবালে নটের মত বেশে তিনি শোভমান। তিনি অনুচর সখার কাঁধে একটি হাত রেখে অন্য হাতে লীলাকমল ঘোরাচ্ছেন। কানে উৎপল, কপোলে অলকা ও মুখপদ্মে মনোহর হাসি বিরাজ করছে। অনেকবার প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের উৎকৃষ্ট কর্মকথা শুনে তাঁদের কান পরিতৃপ্ত হয়েছিল। এখন শ্রীকৃষ্ণের লীলা প্রত্যক্ষ করায় তাঁদের চিত্ত আবিষ্ট হয়েছিল। তাঁরা চক্ষুপটে তাঁকে হৃদয়ের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট করে ধ্যানযোগে আলিঙ্গন দ্বারা মনের সন্তাপ দূর করলেন। যেমন যোগিগণ সুষুপ্তির সাক্ষী (চৈতন্য) প্রাজ্ঞকে আলিঙ্গন করে সন্তাপ পরিত্যাগ করেন, তেমনি এইসব অবলা কৃষ্ণরূপ হৃদয়ে ধারণ করে সংসার-জ্বালা থেকে নিষ্কৃতি লাভ করেছিলেন। যদিও সর্বান্তর্যামী ভগবান বুঝতে পারলেন, তবু হাসতে হাসতে বললেন, ভাগ্যবতীগণ, তোমাদের আগমন শুভ। কোন প্রতিবন্ধক না মেনে আমার দর্শনাকাঙ্ক্ষায় তোমরা ছুটে এসেছ এতে ভালই হয়েছে। বিবেকবানেরা বিবেক দ্বারা নিজেদের স্বার্থ দেখেন। তাঁরা ফলের কামনা-রহিত হয়ে অচলা ভক্তি করে থাকেন। যাঁর সঙ্গে সম্পর্ক আছে বলে প্রাণ, বুদ্ধি, মন, দেহ, পুত্র, সম্পত্তি, জ্ঞাতি ইত্যাদি প্রিয় হয়ে থাকে সেই পরম প্রেমের আশ্রয় আত্মস্বরূপের চেয়ে বেশি প্রিয় আর কি হতে পারে? কাজেই আমাকে দর্শন করে তোমরা কৃতার্থ হলে। এখন যজ্ঞস্থানে যাও। যদিও তোমাদের আর যাগযজ্ঞের আবশ্যক নেই, তবু তোমাদের পতি ব্রাহ্মণেরা তোমাদের নিয়ে নিজ নিজ সংকল্পিত যজ্ঞ সমাপন করবেন। এ কথা শুনে বিপ্রপত্নীরা বলতে লাগলেন, হে বিভু, এরকম নিষ্ঠুর কথা বলবেন না। আপনার ভক্তের বিনাশ নেই এবং তাকে আর সংসারে ফিরে আসতে হয় না—আপনার এই অভয়বাণীর কখনই অন্যথা হবে না এই প্রতিজ্ঞা সত্য করুন। আপনি যদি অবজ্ঞাভরেও আপনার চরণের তুলসী দেন তাও মাথায় রাখার জন্য আমরা সমস্ত বন্ধু-বান্ধব বিসর্জন দিয়ে আপনার চরণতলে উপস্থিত হয়েছি। অন্যের কথা দূরে থাক, পতি, পিতা-মাতা, ভ্রাতা, পুত্র ও সুহৃদরা আমাদের আর গ্রহণ করবেন না। অতএব, হে অরিন্দম, আপনার শ্রীচরণে আশ্রয় নিলাম, আমাদের ভগবৎ-গতি ছাড়া যেন অন্য গতি না হয়। ১৯-৩০

ভগবান বললেন, তোমাদের পতি, পিতা, মাতা, পুত্র প্রভৃতিরা তোমাদের প্রতি দোষারোপ করবে না। আর আমার ইচ্ছায় অন্য লোকেরাও কিছু বলবে না। ঐ দেখ, দেবতারাও অনুমতি দিচ্ছেন। শুধু দেহের সঙ্গলাভে বা অনুরাগ বৃদ্ধিতেই যে মানুষের সুখ হয়, তা নয়। তোমরা আমাতে মন সমর্পণ করেছ, তাতেই আমাকে পাবে। আমার নাম শ্রবণ, আমাকে দর্শনের চিন্তা ও আমার গুণকীর্তন করলে যে ভাব জন্মাবে, কাছে থাকলে ঠিক সেরকম হবে না। তাই তোমরা নিজের নিজের গৃহে ফিরে যাও। শুকদেব বললেন, ব্রাহ্মণ-বনিতারা

শ্রীকৃষ্ণের ঐ কথা শুনে আবার যজ্ঞস্থলে ফিরে গেলেন। সেই ব্রাহ্মণরাও দোষদৃষ্টি না করে সস্ত্রীক যজ্ঞ সমাপন করলেন। ৩১-৩৩

কোন এক নারী স্বামী কর্তৃক নিরুদ্ধ হওয়ায় কৃষ্ণ-দর্শনে আসতে পারেন নি, সেজন্য তিনি যেমন শুনেছিলেন ধ্যানযোগে সেইভাবে নিজের হৃদয়ে ভগবানকে আলিঙ্গন করে কর্মানুবন্ধী লৌকিক দেহ ত্যাগ করলেন। এদিকে বিপ্রবধূরা চলে গেলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের উপহার সেই অন্ন-ব্যঞ্জনাদি সকল গোপদের খাওয়ালেন এবং নিজেও খেলেন। লীলার জন্য নরদেহধারী ভগবান হরি এভাবে মানুষের ব্যবহারের অনুকরণ করে সুন্দরবাক্য ও চরিত্র দ্বারা গো, গোপ ও গোপীদের ক্রীড়া করানোর জন্য নিজেও ক্রীড়া করেন। তারপর, সেই ব্রাহ্মণদের মনে হল নরানুকারী রাম-কৃষ্ণ সাক্ষাৎ বিশ্বেশ্বর, তাঁদের অন্ন যাচঞা অগ্রাহ্য করায় তাঁরা অপরাধী হয়েছেন। সেই কথা স্মরণ করে তাঁরা অনুতাপ করতে লাগলেন। আর নিজেদের বনিতাদের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অলৌকিকী ভক্তি ও নিজেরা সেই ভক্তি-বিহীন উপলব্ধি করে আত্মনিন্দা করতে লাগলেন। তাঁরা বললেন, শুক্র[১], সাবিত্রী[২] ও দীক্ষা[৩]— এই তিন শ্রেষ্ঠবস্তু বিশিষ্ট আমাদের যে ব্রাহ্মণ জন্ম হয়েছে, তাকে ধিক্। আমাদের ব্রহ্মচর্যকেও ধিক্, বহুজ্ঞতাকেও ধিক্, কুলকে ধিক্, কর্মকেও ধিক্, কেননা আমরা অধোক্ষজ ভগবানে বিমুখ।[৪] এখন বুঝতে পারছি ভগবৎ-মায়া যোগীদেরও মোহিত করে, আমরা নরগুরু ব্রাহ্মণ হয়েও স্বার্থ বুঝতে পারলাম না। জগদ্গুরু শ্রীকৃষ্ণের প্রতি নারীদেরও ভক্তি দেখ, এই ভক্তি তাদের গৃহ নামক মৃত্যুপাশ ছেদন করেছে। ৩৪-৪১

কি আশ্চর্য, এই সব অবলার উপনয়ন-সংস্কার হয় নি, এরা ব্রহ্মচর্যের জন্য গুরুকুলে বাসও করে নি, এদের তপস্যা অথবা আত্মবিচার কিংবা শৌচাচার অথবা সন্ধ্যোপাসনাদি শুভক্রিয়াও কিছুই নেই, তবুও যোগেশ্বরদের ঈশ্বর যে ভগবান উত্তমশ্লোক শ্রীকৃষ্ণ, তাঁর প্রতি এদের দৃঢ় ভক্তি হয়েছে। আমরা সংস্কারবিশিষ্ট হয়েও সেরকম ভক্তি উপার্জন করতে সক্ষম হইনি। নিশ্চিত মনে হচ্ছে গৃহ চেষ্টায় প্রমত্ত হয়ে স্বার্থ বিষয়ে বিমূঢ় আছি। যা হোক, গোপদের বাক্য আমাদের সদ্গতি স্মরণ করিয়ে দিল, তা না হলে পূর্ণকাম কৈবল্যাদি বরদানের অধিপতি আমাদের কাছে যাচঞা করবেন কেন? এটা সেই পরমেশ্বরের ছলনামাত্র। স্বয়ং লক্ষ্মী যাঁর চরণ-স্পর্শ প্রত্যাশায় নিজের চাঞ্চল্য-দোষ পরিহার করে, অন্য সকলকে পরিত্যাগ করে বারবার যাঁর উপাসনা করে থাকেন, তাঁর যাচঞা দেখে মানুষদের শুধু বিস্ময় জাগে। দেশ, কাল, দ্রব্য, মন্ত্র, ঋত্বিক, অগ্নি, দেবতা, যজমান, যজ্ঞ এবং ধর্ম প্রভৃতি তাঁর স্বরূপ সেই সাক্ষাৎ ভগবান যোগেশ্বরদের ঈশ্বর বিষ্ণু যদুকুলে জন্মগ্রহণ করেছেন— যদিও একথা সর্বত্র শ্রবণ করেছি, তবু আমরা এত মূঢ় যে তাঁকে জানতে পারিনি। এখন অকুণ্ঠমেধা সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করি। যাঁর মায়ায় মোহিত হয়ে আমরা শুধুমাত্র কর্মমার্গে ভ্রমণ করছি সেই আদ্যপুরুষ আমাদের এই অপরাধ ক্ষমা করুন, কেননা তাঁর মায়াতেই আমাদের চিত্ত মোহিত হয়েছে বলে আমরা তাঁর অনুভব জানতে পারিনি। মহারাজ, সেই সব ব্রাহ্মণ এইভাবে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অবহেলার জন্য নিজেদের অপরাধ স্মরণ করে যদিও তাঁকে দর্শন করতে ইচ্ছুক হলেন, তবু কংসের ভয়ে ভীত হওয়ায় কিছুতেই ব্রজের দিকে যেতে পারলেন না। ৪২-৫২

১ ব্রাহ্মণের ঔরসে জন্ম। ২ বেদাচরণ বা গায়ত্রী জ্ঞান। ৩ পূজা অথবা রীতি। অর্চনমার্গে দীক্ষার অপরিহার্যতা স্বীকার্য আছে। ৪ তুলনীয়: গীতা, ৯।৩৩

চতুর্বিংশ অধ্যায়

ব্রাহ্মণদের প্রতি বাসুদেবের উপদেশ

শুকদেব বললেন, ব্রাহ্মণরা কংসের ভয়ে নিজ নিজ আশ্রমে থেকেই শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করতে লাগলেন। এদিকে শ্রীকৃষ্ণ বলরামের সঙ্গে ব্রজে বাস করতে করতে গোপদের ইন্দ্রযজ্ঞ করার জন্য উদ্‌যোগ করতে দেখলেন। ভগবান সর্বাত্মা এবং সর্বদর্শী[১]; তাই যদিও নিজে ঐ বিষয়ের তত্ত্ব অবগত ছিলেন, তবুও বিনয়াবনত হয়ে নন্দ প্রভৃতি বৃদ্ধ গোপদের জিজ্ঞাসা করলেন. পিতা, আপনাদের এই উদ্‌যোগ কি জন্য ? শুধু শুধু ব্যস্ততা হয় না, নিশ্চয়ই কোন যজ্ঞ হবে। আর যদি তা হয় তাহলে যজ্ঞে কি ফল. দেবতাই বা কে, কি রকম ব্যক্তিই বা এতে অধিকারী, কি সাধন দ্বারাই বা এই অনুষ্ঠান করতে হয় ? পিতা, এ বিষয়ে আপনাদের খুব ব্যগ্রতা দেখছি, তাই আমি শুনতে ইচ্ছা করি, বিস্তারিত ভাবে বলুন। পিতা, যাঁরা সর্বত্র আত্মদর্শী, স্থাবর-জঙ্গমেও আত্মা ছাড়া কিছুই দেখেন না, যাঁদের এ আত্মীয়, এ আত্মীয় নয়—এরকম ভেদ-দৃষ্টি নেই তাঁদের শত্রু-মিত্র কোন পক্ষই নেই। সে সব পুরুষদের কোন কাজই গোপনীয় নয়। আর যদিও ভেদজ্ঞান থাকে তবু উদাসীন ব্যক্তিই শত্রুর মত পরিত্যাজ্য হয়। সুহৃদ্‌জন আত্মতুল্য, তাই গোপন মন্ত্রণায় তারা বর্জনীয় নয়। মানুষের মধ্যে কেউ জেনে, কেউ না জেনে কাজ করে থাকেন। যিনি জ্ঞানবশত কাজ করেন, তাঁরই কাজ সুসিদ্ধ হয়, যিনি অজ্ঞান সহকারে করেন তাঁর কাজ সে রকম সুসিদ্ধ হয় না। আপনাদের এই অনুষ্ঠেয় কার্য কি শাস্ত্র অনুসারে না লৌকিক আচার মতে হবে ? এ বিষয়ে যুক্তিসঙ্গত ভাবে বলুন। ১-৭

নন্দ বললেন, বাছা, ভগবান ইন্দ্র পর্জন্যরূপী, মেঘগুলি তাঁর প্রিয় মূর্তি। সেই সব মেঘ প্রাণীদের প্রীতিসাধক ও জীবনরক্ষার অপরিহার্য জল দান করে থাকে। আমরা ও অন্যান্য মানুষরা সেই মেঘপতি ঈশ্বর ইন্দ্রকে তাঁরই বর্ষণ-করা জলে উৎপন্ন দ্রব্য দিয়ে তাঁর যজ্ঞ করে থাকি। মানুষেরা তাঁরই যজ্ঞাবিশিষ্ট দ্রব্যদ্বারা জীবন ধারণ করে ধর্ম, অর্থ ও কাম সিদ্ধ করে থাকে। বর্ষা ঋতুই মানুষের বৃত্তি ও ব্যবসায়ের ফলোৎপাদক। এই ধর্ম অনেকদিন থেকেই চলে আসছে। যে লোক কাম, দ্বেষ, ভয় বা লোভবশত ইন্দ্রার্চন করে না তার কখনই মঙ্গল হয় না। শুকদেব বললেন, মহারাজ, নন্দর ও অন্যান্য ব্রজবাসীদের এই কথা শুনে ভগবান কেশব ইন্দ্রের ক্রোধ জন্মিয়ে গর্বরূপ পর্বত থেকে ইন্দ্রকে নাবিয়ে আনার অভিপ্রায়ে বললেন, জীবমাত্রই কর্মফলে জন্ম নেয় আর কর্মফলেই লয় পায় এবং সুখ, দুঃখ, ভয় ও মঙ্গল লাভ করে থাকে। নিজে কর্মে নির্লিপ্ত হয়েও অন্য জীবদের কর্মফলদাতা কোন ঈশ্বর যদি থাকেন তা হলেও তিনি কর্মকর্তারই অধীন, তিনি তাকে ফল দান করতে পারেন না। কাজেই জীবদের যখন কর্মেরই অনুবর্তন করতে হচ্ছে তখন তাদের ইন্দ্রের প্রয়োজন কি ? পূর্ববর্তী সংস্কার অনুসারে মানুষের ভাগ্যে যা বিহিত হয়ে আছে, সে কখনই তার অন্যথা করতে পারে না। ৮-১৫

মানুষ স্বভাবেরই অধীন, সে স্বভাবের অনুসরণ করে থাকে। দেবতা, অসুর ও মানুষ সহ এই সমস্ত জগৎ স্বভাবেই অবস্থিত। কর্মবশেই জীব উঁচু নীচু নানা দেহ ধারণ করে আবার তা ত্যাগ করে। শত্রু, মিত্র, উদাসীন কর্ম থেকেই উদ্ভূত হয়, কর্মই সকলের গুরু, কর্মই ঈশ্বর, কর্মই পূজ্য। তাই স্বভাবস্থ

১ তুলনীয় : শ্বেতাশ্বতর উপ: ৩।১৬

হয়ে কর্মকারী পুরুষ কর্মেরই সম্মান দেবে। যে যার দ্বারা জীবিত থাকে তা-ই তার দেবতা। তাই যে লোকে জীবিকার জন্য এক দেবতার উপাসনা করে, তাতে তৃপ্তি না পেয়ে আবার অন্য দেবতায় নির্ভর করে, তার দশা হল কুলটা স্ত্রীর মত, যে স্বামীকে ত্যাগ করেছে আবার উপপতির দ্বারাও অবজ্ঞাত হচ্ছে। কাজেই তা থেকে সে কখনই মঙ্গল বা সুফল পায় না। তাই ব্রাহ্মণজাতি বেদ অধ্যয়ন, ক্ষত্রিয় পৃথিবী পালন, বৈশ্য কৃষি-বাণিজ্যাদি কর্ম ও শূদ্ররা দ্বিজ-সেবা বৃত্তি দ্বারা জীবন ধারণ করে থাকে। ১৬-২০

এর মধ্যে বৈশ্যদের বৃত্তি চার রকম—কৃষি, বাণিজ্য, গোরক্ষা এবং কুসীদ।[১] আমরা গোপজাতি গোরক্ষাই আমাদের বৃত্তি, সে কাজই আমরা সব সময় করে থাকি। সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিন গুণ সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ। রজোগুণে বিশ্ব উৎপন্ন হয়, এই রজোগুণেই চালিত হয়ে মেঘেরা সর্বত্র বৃষ্টিপাত করে থাকে, প্রজারা সেই জল দ্বারাই জীবন ধারণ করে। সেখানে ইন্দ্র কি করবেন? আমরা বন ও পর্বতে বাস করি, আমাদের নগর, জনপদ, গ্রাম কিছুই নেই। পর্বতই আমাদের যোগক্ষেমের[২] কারণ। তাই গো, ব্রাহ্মণ ও পর্বতের যজ্ঞ আরম্ভ করুন। ইন্দ্রযজ্ঞের জন্য যে সব দ্রব্য সংগ্রহ করা হয়েছে তা দিয়েই এই যজ্ঞ সম্পূর্ণ হোক। পায়স থেকে সূপ (ডাল) পর্যন্ত নানারকম পাক, পিঠা, শষ্কুলী (জিলিপি) প্রস্তুত করা হোক। গাভীদের দোহন করা হোক আর ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণরা অগ্নিতে হোম করুন। আপনারা তাঁদের বহু গুণান্বিত অন্ন ও ধেনু সহ দক্ষিণা দিন। কুকুর, চণ্ডাল ও পতিতদেরও যথাযোগ্য দান করা হোক। গাভীদের তৃণ ও পর্বতকে পূজোপহার দান করুন। আর উত্তম আহার করে, শোভন বস্ত্র ও সুন্দর অলংকার পরে এবং সুগন্ধি লেপন করে গো, ব্রাহ্মণ ও পর্বতকে প্রদক্ষিণ করুন। পিতা, আমার এই মত, যদি ভাল মনে করেন তাহলে এরকমই করুন। এই যজ্ঞ গো, বিপ্র প্রভৃতির প্রিয় আর আমারও অভীপ্সিত। ২১-৩০

শুকদেব বললেন মহারাজ, কালরূপী ভগবান হরি ইন্দ্রের দর্প চূর্ণ করার জন্য একথা বললে নন্দ প্রভৃতি গোপরা সর্বতোভাবে তাঁর বাক্য গ্রহণ করলেন। তিনি যা যা বললেন সেইভাবেই সমস্ত কিছু করার আয়োজন করলেন। পরে স্বস্তিবাচন করিয়ে ইন্দ্র-যজ্ঞের সব দ্রব্য দিয়ে পর্বত ও ব্রাহ্মণদের যথাযোগ্য উপহার দিলেন। তাঁরা গরুকে তৃণ দান করলেন আর গোধন আগে রেখে পর্বত প্রদক্ষিণ করতে লাগলেন। তাঁরা সকলেই উত্তমরূপে অলংকৃত হয়ে বলশালী বৃষযুক্ত শকটে উঠলেন। সুসজ্জিত গোপীরাও শ্রীকৃষ্ণের কীর্তি গান করতে করতে ব্রাহ্মণদের আশীর্বাদ নিয়ে শকটে করে গিরি প্রদক্ষিণ করলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোপদের বিশ্বাসজনক অন্য-প্রকার রূপ গ্রহণ করে 'আমিই পর্বত' এই বলে পূজার উপকরণগুলি ভক্ষণ করলেন। তখন তাঁর আকৃতি বিশাল হয়েছিল। তারপর ব্রজবাসীদের সঙ্গে তিনি নিজেকেই প্রণাম করলেন ও বলতে লাগলেন, কি আশ্চর্য! দেখ, এই মূর্তিমান পর্বত আমাদের অনুগ্রহ করছে। কামরূপী এই পর্বতই সর্পাদির রূপ ধরে অবজ্ঞাকারী বনবাসীদের হত্যা করেছেন। এস, আমরা নিজেদের ও গোসকলের মঙ্গলের জন্য এঁকে প্রণাম করি। মহারাজ, সেইসব গোপজাতি বাসুদেবের পরামর্শে পর্বত, গো ও ব্রাহ্মণদের যজ্ঞ যথাযথভাবে অনুষ্ঠিত করে আবার ব্রজে ফিরে এলেন। ৩১-৩৮

১ দ্রঃ গীতা, ১৮।৪৪ শ্লোক। ২ অপ্রাপ্তবিষয়ের লাভ ও প্রাপ্তবিষয়ের রক্ষণ

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

গোবর্ধন-ধারণ

শুকদেব বললেন, মহারাজ, সে সময় দেবরাজ ইন্দ্র নিজের অর্চনার উচ্ছেদ জানতে পেরে শ্রীকৃষ্ণ যাঁদের নাথ, সেই নন্দ প্রভৃতি গোপগণের প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। তিনি ক্রোধে মেঘদের মধ্যে সংবর্তক নামে প্রসিদ্ধ প্রলয়ঙ্কর মেঘদের ব্রজে পাঠালেন এবং বললেন, বনবাসী গোপদের কি আশ্চর্য ধনগর্ব জন্মেছে। তারা সামান্য মানুষ কৃষ্ণকে আশ্রয় করে দেবতা আমাকে অবজ্ঞা করল। যেমন অজ্ঞ পুরুষরা আধ্যাত্মিক চিন্তা ত্যাগ করে ভঙ্গুর, নামেমাত্র নৌকারূপ ক্রিয়াময় যাগ-যজ্ঞ দ্বারা ভবসাগর পার হতে চায়, তেমনি বাচাল, বালক, অবিনীত, অজ্ঞ, পণ্ডিতম্মন্য মানুষ যে কৃষ্ণ, তাকে আশ্রয় করে গোপগণ আমার অপ্রিয় কাজ করল। কৃষ্ণের জন্যই ধনমদে মত্ত এই সব গোপদের এত স্পর্ধা হয়েছে। তোমরা গিয়ে এদের ঐশ্বর্য-গর্ব দূরে কর ও এদের সব পশু ধ্বংস কর। তোমরা ভয় পেয়ো না। আমিও নন্দ-গোপকে ধ্বংস করবার জন্য ঐরাবতে চড়ে মহাবেগে তোমাদের অনুসরণ করেই ব্রজে যাচ্ছি। ১-৭

শুকদেব বললেন, যে সব প্রলয়ংকর মেঘ এতদিন আবদ্ধ ছিল, তারা দেবরাজের আজ্ঞায় বন্ধন মুক্ত হয়ে মহাবলে বৃষ্টিপাত করে নন্দের গোকুলে উৎপাত আরম্ভ করল। তারা প্রচণ্ড বিদ্যুৎ ও বজ্র সহ প্রবল বাতাসের সঙ্গে শিলাবৃষ্টি করতে লাগল। মেঘগুলি স্তম্ভের মত স্থূল জলধারায় অজস্র বর্ষণ করতে থাকলে ভূমি জলরাশিতে প্লাবিত হল, তাই কোন জায়গা আর উঁচু-নিচু বোঝা গেল না। প্রচণ্ড জল ও ঝড়ে সমস্ত পশুরা কাঁপতে লাগল। আর গোপ ও গোপীরা ঠাণ্ডায় নিদারুণ কষ্ট পেয়ে গোবিন্দের শরণাপন্ন হলেন। পশুরা বৃষ্টির জলে পীড়িত হয়ে নিজ নিজ দেহদ্বারা শাবকদের আচ্ছাদিত করে গোবিন্দের পাদমূলে এল আর গোপ ও গোপীরা প্রার্থনা করতে লাগলেন, হে কৃষ্ণ, হে প্রভু, আপনিই এই গোকুলের নাথ। হে ভক্তবৎসল, দেবরাজের কোপ থেকে আমাদের এবং এই গোকুলকে রক্ষা করুন। গোপ ও গোপীদের প্রার্থনার আগেই ভগবান শিলাবৃষ্টি আর ঝড়ে গোকুলের এবং গোকুলবাসীদের দুর্দশা দেখে অনুমান করেছিলেন যে ইন্দ্রই ক্রোধের বশে এই সব করেছেন। ভগবান বললেন, বর্ষার সময় গত হয়েছে। তবু এই যে শিলাবৃষ্টি ও ঝঞ্ঝা হচ্ছে এই দেখে বোধ হচ্ছে ইন্দ্রযজ্ঞ বন্ধ করায় ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হয়ে আমাকে ধ্বংস করতে চাইছেন? ভয় কি? আমি নিজের সামর্থ্য অনুসারে এর প্রতিকার করব। মোহবশে যাঁরা নিজেকে লোকের ঈশ্বর বলে অভিমান করে তাঁদের ঐশ্বর্য-গর্বরূপ অজ্ঞান নাশ করা প্রয়োজন। যে সব দেবতার সদ্ভক্তি আছে, তাঁরা গর্বের বশে কখনও নিজেদের ঈশ্বর বলে ভাবেন না। আমি অহংকার নষ্ট করলে তাতে অসাধুরা বিনীত হবে। এই গোষ্ঠ আমার শরণাপন্ন হয়েছে, আমি এর আশ্রয় ও প্রভু। তাই আত্মযোগ দ্বারা একে রক্ষা করব, আমি এই প্রতিজ্ঞা করলাম। এই কথা বলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এক হাতে গোবর্ধন পর্বতকে তুলে, বালক যেমন ছাতা ধরে থাকে তেমনি অবলীলাক্রমে, তাকে ধরে রইলেন। ৮-১৯

পরে তিনি গোপদের সম্বোধন করে বলতে লাগলেন, মা, বাবা ও ব্রজবাসীরা তোমরা গোধন সহ এই গিরিগর্তে প্রবেশ কর। আমার হাত থেকে পর্বত পড়ে যাবে এ আশংকা করো না। আর বাতাস ও বৃষ্টিকে ভয় করতে হবে না, তার হাত থেকে এবার সবাই ত্রাণ পাবে। শ্রীকৃষ্ণের আশ্বাসে গোধন, শকট, ভৃত্য, পুরোহিত

প্রভৃতি সহ সব ব্রজবাসী স্বচ্ছন্দে গিরিগর্তে প্রবেশ করলেন। ভগবান ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ব্যথা ও সুখেচ্ছা ত্যাগ করে সাতদিন পর্যন্ত পর্বত ধারণ করে রইলেন, মুহূর্তের জন্যও তিনি স্থান থেকে বিচলিত হলেন না। ব্রজবাসী সকলেই এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখে বিস্মিত হলেন। শ্রীকৃষ্ণের এই অদ্ভুত ক্ষমতা দেখে দেবরাজ ইন্দ্রও বিস্মিত হলেন। তিনি গর্ব ও অভিমান ত্যাগ করে তাঁর আজ্ঞাবাহী মেঘদের বর্ষণ করতে বারণ করলেন। আকাশ নির্মেঘ হল, সূর্যদেব প্রকাশ পেলেন। বাতাস ও বৃষ্টিপাত বন্ধ হলে গোবর্ধনধারী হরি গোপদের বললেন, গোপগণ, আর ভয় নেই। বাতাস ও বৃষ্টি বন্ধ হয়েছে, নদীর জল কমে আসছে। এখন তোমরা স্ত্রী-পুত্র, গাভী ও ধনসম্পত্তি নিয়ে গিরিগর্ত থেকে বেরিয়ে এস। ২০-২৬

তারপর গোপেরা শকটে সব কিছু বহন করে নিজ নিজ গোধন নিয়ে বেরিয়ে এলেন। তখন সকলের সামনেই সেই পর্বতটিকে ভগবান আগের মত যথাস্থানে রেখে দিলেন। পরে ব্রজবাসীগণ প্রেমাবেগে পূর্ণ হয়ে আলিঙ্গন প্রভৃতি দ্বারা তাঁকে অভিনন্দিত করলেন। গোপীরাও স্নেহ প্রকাশ করে পরম আনন্দে দই, আতপচাল ও জল দিয়ে তাঁর পুজো করলেন এবং তাঁকে অনেক আশীর্বাদ করলেন। যশোদা, রোহিণী, নন্দ এবং মহাবলী রাম স্নেহে বিহ্বল হয়ে শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করে আশীর্বাদ করলেন। স্বর্গে দেবতা, সিদ্ধ- সাধ্য, গন্ধর্ব ও চারণগণ তুষ্ট হয়ে স্তব ও পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেন। দেবতাদের আদেশে দেবলোকে শঙ্খ, দুন্দুভি প্রভৃতি বেজে উঠল এবং তুম্বুরু প্রভৃতি গন্ধর্বরাজারা গান করতে লাগলেন। তারপর অনুরক্ত গোপদের নিয়ে বলভদ্রের সঙ্গে ভগবান হরি ব্রজপুরে যাত্রা করলেন। গোপীরা ও মহানন্দে তাঁর ঐরকম হৃদয়গ্রাহী কীর্তির কথা গান করতে করতে গৃহে ফিরলেন। ২৭-৩৩

ষড়্‌বিংশ অধ্যায়

নন্দ ও গোপগণের কথোপকথন

শুকদেব বললেন, মহারাজ, গোপগণ শ্রীকৃষ্ণের বিক্রম জানত না। তাঁর ঐ গোবর্ধন পর্বত ধারণ দেখে তারা বিস্মিত হল এবং বলাবলি করতে লাগল কি করে গোপদের বংশে এই অদ্ভুত বালক জন্মগ্রহণ করল? এই মানুষ-জন্ম তো এঁর উপযোগী নয়, কারণ এঁর যেসব কাজ দেখছি তা সবই আশ্চর্যজনক। গজরাজ যেরকম পদ্ম ধারণ করে সেরকম সাত বৎসরের এই শিশু কি অবলীলায় গিরিরাজকে তুলে ধরল! কাল যেমন জীবের আয়ু শুষে নেয় তেমনি এই বালক নয়নযুগল ঈষৎ নিমীলিত করে কিভাবেই বা মহাবল পুতনা রাক্ষসীর স্তন পান করেছিল! এঁর যখন তিন মাস বয়স তখন এক প্রকাণ্ড শকটের নীচে শুয়ে দুই পা ছুঁড়ে কাঁদছিলেন। সেই পায়ের আঘাতে গাড়িটা কিভাবে কাত হয়ে পড়েছিল। তাঁর এক বৎসর বয়সে তৃণাবর্ত দৈত্য তাঁকে অপহরণ করে আকাশে উঠেছিল, কিন্তু শিশু তার গলা ধরে সেই দৈত্যকে নিহত করলেন। আর একদিন ননি চুরি করেছিল বলে জননী এঁকে উখলিতে বেঁধে রাখেন। সেই অবস্থায় ইনি দুই অর্জুন গাছের মাঝে গিয়ে দু'হাতে গাছ দু'টিকে কিভাবে উপড়ে ফেলেন। ১-৭

আবার ইনি বালকদের সঙ্গে গোচারণ করতে করতে কিভাবে বকাসুরের মুখ বিদারণ করে তাকে নিহত করলেন! আর আমাদের গোবৎসগুলিকে মারবার জন্য বৎসাসুর যখন তাদের মত রূপ ধরে বৎসদেব দলে ঢুকেছিল তখন ইনি অবলীলাক্রমে তাকে একটা গাছের মতই মাটিতে ফেলে বধ করলেন। বলরামের সঙ্গে মিলিত হয়ে গর্দভাসুর ও তার জ্ঞাতিদের হত্যা করে কিভাবেই বা পক্বফলপূর্ণ তালবনকে সকলের উপভোগ্য করে তুলেছিলেন! কিভাবেই বা বলশালী বলরামকে দিয়ে প্রলম্বাসুরকে মেরে ব্রজের পশু ও গোপদের দাবাগ্নি থেকে রক্ষা করেন! কি করে অতি তীক্ষ্ন বিষধর কালিয়কে সবলে দমন ও তার গর্ব চূর্ণ করে তাকে হ্রদ থেকে নির্বাসিত করলেন ও কালিন্দীর জল বিষশূন্য করেন! মহারাজ নন্দ, তোমার এই পুত্রের প্রতি আমাদের সকলের অনুরাগ অতি প্রবল এবং এঁরও আমাদের প্রতি স্বাভাবিক অনুরাগ দেখা যায় কেন? ইনি কি সর্বাত্মা ব্রজনাথ, কোথায় এই সাত বছরের বালক আর কোথায় সেই উন্নত মহাগিরি গোবর্ধন! তবু তোমার পুত্র তা অনায়াসে স্বহস্তে তুলে ধরলেন। তাই, এই বালক আমাদের আশংকা ও ভয়ের কারণ। ৮-১৪

এসব শুনে নন্দ বললেন, গোপগণ, আমার কথা শোন, এই বালকের প্রতি তোমাদের যে সন্দেহ আছে তা দূর কর। গর্গ এই বালকের উদ্দেশ্য করে যা বলেছিলেন তা বলছি, শোন, ইনি যুগে যুগে শরীর ধারণ করে থাকেন। এঁর সাদা, লাল ও হলুদ, এই তিন বর্ণ ছিল। সম্প্রতি ইনি কৃষ্ণবর্ণ হয়ে অবতীর্ণ হয়েছেন। তোমার এই পুত্র আগে কোন সময় বসুদেবের ঘরে জন্মান, তাই পণ্ডিতরা এঁকে বাসুদেব বলে থাকেন।[১] তোমার এই পুত্রের গুণ ও কর্মের অনুরূপ অনেক রূপ ও নাম আছে। সে সমস্ত আমি জানি, অন্যে জানে না। ইনি গরু ও গোপদের আনন্দ দিয়ে তোমাদের মঙ্গল করবেন। তোমরা এঁর দ্বারা সকল বিপদ থেকে রক্ষা পাবে। আগে দস্যুরা সাধুদের পীড়ন করতে থাকলে এবং দেশ অরাজক হয়ে উঠলে এই বালকের অনুগ্রহে সাধুরা সমৃদ্ধিলাভ করে দস্যুদের জয় করেছিলেন।[২] যেমন অসুরেরা বিষ্ণুভক্তদের পরাভূত করতে পারে না, তেমনি যেসব সৌভাগ্যশালী মানুষ তোমার এই পুত্রকে প্রীতির চক্ষে দেখেন, শত্রুরা তাদের পরাস্ত করতে সমর্থ হয় না। নন্দ, তোমার এই পুত্র গুণ, সম্পত্তি, কীর্তি এবং প্রভাবে নারায়ণের সমকক্ষ। তাই বলছি, গোপগণ, এঁর কার্যাবলী দেখে আশ্চর্যান্বিত হবার কারণ নেই। গর্গ সাক্ষাৎ আমাকে এই আদেশ দিয়ে স্বস্থানে চলে গেলে আমি সেই থেকে শ্রীকৃষ্ণকে নারায়ণের অংশ বলেই মনে করি, কারণ তিনি আমাদের সকল ক্লেশ দূর করেন। ১৫-২৩

ব্রজবাসীরা নন্দের মুখে গর্গের কথা শুনে বিস্ময় ত্যাগ করে আনন্দিত হল এবং নন্দ ও শ্রীকৃষ্ণের অর্চনা করতে লাগল। যজ্ঞনাশের দরুন ক্রুদ্ধ হয়ে ইন্দ্র বর্ষণ করতে শুরু করলে বজ্র, শিলাবৃষ্টি ও প্রবল বাতাসে ব্রজের গোপগণ পশু ও স্ত্রীলোকরা সকলে অবসন্ন হয়ে পড়ে। তখন স্বয়ং যিনি ব্রজের রক্ষক তিনিই ব্রজকে রক্ষার জন্য গোবর্ধন উৎপাটন করেন। বালক যেমন অনায়াসে

১ শ্রীকৃষ্ণের জন্মের অলৌকিকত্ব সম্পর্কে এই স্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য। যীশুর জন্মবিষয়ে অনুরূপ Immaculate Conception তত্ত্ব এ-প্রসঙ্গে স্মরণীয় (Bible; St. Matthew 1:18 এবং St. Luke 1:31-35)।

২ দ্রঃ গীতা, ৪।৮ শ্লোক।

ছাতা ধরে থাকে তেমনি করে তিনি হাসতে হাসতে সেই পাহাড়কে তুলে ধরে সকলকে রক্ষা করেছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্রের গর্ব হরণকারী সেই গোবিন্দ আমাদের প্রতি প্রসন্ন হোন। ২৪-২৫

সপ্তবিংশ অধ্যায়

ইন্দ্র ও সুরভি কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের অভিষেক

শুকদেব বললেন, গোবর্ধন পর্বত ধারণ করে বৃষ্টিধারা থেকে ব্রজমণ্ডলকে রক্ষা করলে গোলোক থেকে সুরভি ও ইন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের কাছে এলেন। শ্রীকৃষ্ণকে অবজ্ঞাসূচক বাক্য বলেছিলেন বলে দেবরাজ ইন্দ্র লজ্জিতবদনে তাঁর সূর্যপ্রভাতুল্য কিরীটযুক্ত মস্তকে শ্রীকৃষ্ণের চরণ স্পর্শ করলেন। অমিততেজা শ্রীকৃষ্ণের অলৌকিক প্রভাব পূর্বে ব্রহ্মা প্রভৃতির মুখে যেরকম শুনেছিলেন তা প্রত্যক্ষ করে তাঁর ত্রিলোকের অধীশ্বরত্বের গর্ব চূর্ণ হল। তিনি করজোড়ে বলতে আরম্ভ করলেন, ভগবান, আপনার স্বরূপ শান্ত, তপোময় এবং রজ ও তমোগুণ বিরহিত। মায়াময় এই সংসার আপনার নেই, কারণ অজ্ঞান থেকেই এর উৎপত্তি। তাই অজ্ঞান ও এসব অজ্ঞানতা-ব্যঞ্জক গুণগুলি সর্বজ্ঞ আপনাতে কিরূপে সম্ভব? লোভাদি না থাকলেও আপনি ধর্মরক্ষা এবং দুষ্টের দমনের জন্য দণ্ড ধারণ করছেন, তাই দণ্ড দেবার জন্যই আমার অহংকার চূর্ণ করলেন। ১-৫

আপনি জগতের জনক, গুরু এবং নিয়ন্তা। আবার আপনিই কালস্বরূপ, তাই দণ্ড ধারণ করে লীলাবতার রূপে ক্রীড়া করে বেড়ান। আপনার এই কার্যাবলী লীলামাত্র। কিন্তু আমরা নিজেদের জগদীশ্বর বলে অভিমান করি আর আপনি আমাদের এই অহংকার বিনষ্ট করেন। প্রভু, আমার মত যে অজ্ঞ লোকেরা নিজেদের জগদীশ্বর বলে অহংকার করে তারা ভয়ের সময়ও আপনাকে ভয়শূন্য দেখে সেই অহংকার ত্যাগ করে নিরহংকার হয় এবং আপনার ভক্তিস্বরূপ সেবা করে। করবে না কেন? আপনার লীলাই দুষ্টদের দণ্ডস্বরূপ। আমি ঐশ্বর্য-মদে মত্ত হয়ে আপনার প্রভাব জানতে পারিনি, অপরাধ করেছি। আমার চিত্ত অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন। প্রভু, আমাকে ক্ষমা করুন। এরকম কুবুদ্ধি যেন আমার আর কখনও না হয়। হে অধোক্ষজ, হে দেব, যারা স্বয়ং পৃথিবীর ভারস্বরূপ এবং যাদের থেকে আরও অনেক ভারের উৎপত্তি হয় সেই সব সেনাপতির বিনাশ ও সেবকদের মঙ্গলের জন্যই আপনি অবতীর্ণ হন। আমি আপনার সেবক, আমার বহু অপরাধ সত্ত্বেও আমাকে ক্ষমা করুন। প্রভু, আপনি ভগবান এবং অন্তর্যামী মহাত্মা সকলের অন্তরে অবস্থিত হয়েও অবিভক্ত। আবার আপনি বাসুদেব অর্থাৎ সকলের নিবাস-স্থান এবং যাদবদের অধিপতি আপনাকে প্রণাম করি। আপনি যদুদের পতি, অথচ নিজে যাদব নন। আপনি বিশুদ্ধ জ্ঞানমূর্তি, নিজের ইচ্ছায় দেহধারণ করেন। আপনি আব্রহ্ম যাবতীয় জীব-জগতের বীজ, তাই সর্বভূতের আত্মা। আপনাকে প্রণাম করি। ভগবান, অভিমানী বলে আমার ক্রোধও অতি প্রচণ্ড। যজ্ঞ নষ্ট হওয়ায় আমি অভিমান-বশত ব্রজ ধ্বংস করতে উদ্যত হয়েছিলাম। হে ঈশ্বর, আপনি আমার গর্বনাশ করে আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করলেন। উদ্যম ব্যর্থ হওয়ায় আমার গর্ব নষ্ট হয়েছে। আপনি ঈশ্বর, গুরু ও আত্মা, আপনার শরণাগত হলাম। ৬-১৩

শুকদেব বললেন, সুরপতি ইন্দ্র এভাবে স্তব করলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ একটু হেসে জলদগম্ভীর স্বরে ইন্দ্রকে বললেন, ইন্দ্র, তুমি দেবরাজের ঐশ্বর্যে মত্ত হয়েছিলে। তুমি আমায় স্মরণ করতে পারবে বলেই আমি অনুগ্রহ করে তোমার যজ্ঞ ভঙ্গ করেছি। লোকে ঐশ্বর্যের গর্বে আমায় ভুলে যায়। আমি যে দণ্ডপাণি তা তারা দেখতে পায়না। আমি যাকে অনুগ্রহ করতে চাই তাকে আগে ঐশ্বর্য থেকে ভ্রষ্ট করে থাকি। দেবেন্দ্র, এখন চলে যাও, তোমার মঙ্গল হোক। আমার আজ্ঞা পালন করো, স্বর্গে গিয়ে নিরহঙ্কার ও সংযত হয়ে নিজ অধিকারে আগের মত অবস্থান কর। তাতেই তোমার মঙ্গল হবে। ১৪-১৫

তারপর মনস্বিনী সুরভি শ্রীকৃষ্ণকে অভিবাদন করে নিজের সন্তান-সন্ততি ও গাভীদের সঙ্গে একত্র হয়ে গোপবেশধারী ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে বন্দনা করে বলতে লাগলেন, হে শ্রীকৃষ্ণ, হে মহাযোগী, হে বিশ্বের জনক, হে অচ্যুত, হে লোকনাথ, এখন আমাদের আর ইন্দ্রের প্রয়োজন নেই। আপনি আমাদের পরম দেবতা। হে জগৎপতি, গো-ব্রাহ্মণ-দেবতা এবং অন্যান্য সাধুদের অভ্যুদয়ের কারণ আপনিই আমাদের ইন্দ্র হোন। আমরা আপনাকে আমাদের ইন্দ্রত্বে অভিষিক্ত করব। ব্রহ্মা এইজন্যই আমাদের আপনার নিকট পাঠিয়েছেন। হে বিশ্বাত্মা, আপনি সামান্য মানুষ নন। পৃথিবীর ভার হরণ করার জন্য যদুকুলে মানববেশে আপনার জন্ম। ১৬-১৯

শুকদেব বললেন, মহারাজ, সুরভি ভগবানকে এভাবে সম্ভাষণ করে নিজের দুধ দিয়ে কৃষ্ণকে অভিষিক্ত করলেন। দেবমাতা অদিতির আজ্ঞা পেয়ে ইন্দ্র দেবতা ও ঋষিদের একত্রে ঐরাবত হাতীর শুণ্ডাহৃত আকাশ-গঙ্গার জল দিয়ে শ্রীকৃষ্ণকে অভিষেক করলেন এবং পরে গোবিন্দ বলে তাঁর নামকরণ করলেন। সে সময় তুম্বুরু, নারদ প্রভৃতি দেবর্ষি এবং গন্ধর্ব, বিদ্যাধর, সিদ্ধ ও চারণগণ সেখানে উপস্থিত হয়ে ভগবানের পাপনাশন চরিত্র কীর্তন শুরু করলেন আর দেবাঙ্গনারা আনন্দে নৃত্য করতে লাগলেন। দেবশ্রেষ্ঠরা তখন পুষ্পবর্ষণ করে তাঁর স্তব করতে লাগলেন। এরূপ মহোৎসবে ত্রিলোকের জীবমাত্রই পরম শান্তি লাভ করল আর গাভীরা নিজেদের দুগ্ধধারায় ধরাতলকে আর্দ্র করে তুলল। কুরুনন্দন, কৃষ্ণ অভিষিক্ত হলে নদ-নদীগুলিতে ক্ষীর প্রভৃতি নানারকম রসের ধারা বইতে লাগল। গাছগুলিতে মধুক্ষরণ হতে লাগল, ধান, গম, যব প্রভৃতি শস্যাদি কর্ষণ ছাড়াই পরিপক্ব হয়ে উঠল। আর পর্বতগুলি নিজ নিজ গর্ভস্থিত মণিসমূহ বাইরে প্রকাশ করে অদ্ভুত শোভা ধারণ করল। এ ছাড়াও বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ক্রুরস্বভাব প্রাণীগুলি পরস্পর বৈরভাব ত্যাগ করে অহিংস হয়ে উঠল। দেবরাজ ইন্দ্র এইভাবে গাভীগণের হিতকারী ব্রজনাথ গোবিন্দকে অভিষিক্ত করে তাঁর অনুমতি নিয়ে অন্যান্য দেবতাদের সঙ্গে স্বর্গরাজ্যে ফিরে গেলেন। ২০-২৮

অষ্টাবিংশ অধ্যায়

বরুণালয় থেকে নন্দকে ভগবানের পুনরানয়ন

শুকদেব বললেন, মহারাজ, একবার গোপরাজ নন্দ একাদশী উপবাস করে জনার্দনের অর্চনা করলেন এবং দ্বাদশীর দিন স্নান করার জন্য কালিন্দীর জলে

নামলেন ! আসুরীবেলা[১] অগ্রাহ্য করে রাত্রে জলে নামা প্রশস্ত নয় বিবেচনা করে বরুণের এক ভৃত্য নন্দকে ধরে নিয়ে আপন প্রভুর কাছে উপস্থিত হল। গোপেরা নন্দকে না দেখে ব্যাকুল হয়ে 'হে রাম, হে কৃষ্ণ' বলে চিৎকার করতে লাগল। পিতাকে বরুণ হরণ করে নিয়ে গেছে শুনে ভগবান সকলকে অভয় দিয়ে তৎক্ষণাৎ বরুণের কাছে গেলেন। তাঁকে আসতে দেখে লোকপাল বরুণ অত্যন্ত আনন্দিত হলেন এবং প্রচুর পুজোপকরণ দ্বারা হৃষীকেশের পুজা করে বললেন, হে প্রভু, আজ আমার দেহ ধারণ সার্থক হোল, যথার্থই আজ পরমার্থ পেলাম। যারা আপনার চরণপদ্ম সেবা করে তাদের মোক্ষ সুনিশ্চিত। আজ আমারও সংসার-নিবৃত্তি হল। ত্রিলোক সৃষ্টিকারী মায়া আপনার দেহকে কখনও আক্রমণ করতে পারে না। আপনি ভক্তের ভগবান, যোগীর পরমাত্মা ও জ্ঞানীর পরম ব্রহ্ম; আপনাকে প্রণাম করি। আমার ভৃত্য মূর্খ, তার কার্য-অকার্য বোধ নেই। সে না জেনে আপনার পিতাকে ধরে এনেছে। হে প্রভু, ক্ষমা করুন। হে পিতৃ-বৎসল গোবিন্দ, আপনার পিতা এখানেই রয়েছেন, এঁকে নিয়ে যান। ১-৮

শুকদেব বললেন, লোকপাল বরুণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে এভাবে প্রসন্ন করলে তিনি নিজের পিতাকে নিয়ে ব্রজে ফিরে এলেন, বন্ধুরাও আনন্দিত হলেন। গোপরাজ নন্দ লোকপাল বরুণের অদৃষ্টপূর্ব ঐশ্বর্য ও তাঁর শ্রীকৃষ্ণ-অর্চনা দেখে বিস্মিত হয়ে জ্ঞাতিগণের কাছে আনুপূর্বিক সব বর্ণনা করলেন। গোপেরাও শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বর মেনে উৎসুকচিত্তে চিন্তা করতে লাগলেন, ভগবান অবশ্য আমাদেরও তাঁর সূক্ষ্মতম বিভূতিসমূহ দেখাবেন। অখিলদর্শী ভগবান তাঁদের সঙ্কল্প বুঝতে পেরে তা সিদ্ধ করার জন্য কৃপাবশে চিন্তা করতে লাগলেন, ইহলোকে জীবগণ অবিদ্যা, কাম ও কর্মের যোগে উচ্চ-নীচ নানা রকম যোনিতে ভ্রমণ করে, কিন্তু তারা নিজেদের পরম স্বরূপ জানতে পারে না। মহাকরুণাময় বিভু ভগবান এই চিন্তা করে গোপদের প্রকৃতির অতীত নিজের বিশুদ্ধ সত্ত্বস্বরূপ এবং বৈকুণ্ঠলোক দর্শন করালেন। যিনি সত্য, জ্ঞান, অনন্তস্বরূপ[২], যিনি স্বপ্রকাশ, যিনি নিত্য, মননশীল মুনিগণ সমাহিতচিত্তে যাঁকে উপলব্ধি করে থাকেন, ভগবান কৃপা করে সেই স্বীয় ব্রহ্মরূপ গোপগণকে দেখালেন। তারপর তিনি তাঁদের ব্রহ্মহ্রদের নিকটে নিয়ে গেলেন। তাঁরা ঐ হ্রদে অবগাহন করে বৈকুণ্ঠলোক দেখতে পেলেন। অক্রূর পূর্বে ঐ হ্রদেই স্নান করে বৈকুণ্ঠাদি দেখেছিলেন। জল থেকে উঠে নন্দাদি গোপগণ তাঁকে আবার আগের মতই দেখতে পেয়ে বিস্মিত হলেন এবং বেদসমূহ দ্বারা তাঁর স্তব করলেন। ৯-১৭

ঊনত্রিংশ অধ্যায়

রাসলীলার সূচনা

শুকদেব রাজা পরীক্ষিৎকে বললেন, মহারাজ, ভগবান হয়েও শ্রীকৃষ্ণ মল্লিকা প্রস্ফুটিত শরৎকালের রাত্রির শোভা দেখে যোগমায়া শক্তিকে আশ্রয় করে ক্রীড়া করতে ইচ্ছা করলেন। অনেকদিন পরে স্বামী প্রবাস থেকে ফিরে এলে যেমন প্রিয়ার মুখমণ্ডল

১ অসুরগণের বিহার সময় অন্ধকার স্তন্ন গভীর রাত। ২ সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।—তৈত্তিরীয় উপনিষৎ; ২।১।৩ দ্রষ্টব্য।

কুংকুমে-রঞ্জিত করেন সেরকম নক্ষত্রপতি চন্দ্রও সে সময় স্নিগ্ধ, সুখকর কিরণে পূর্বদিক রঞ্জিত করে দর্শক মাত্রেরই সন্তাপ দূর করতে লাগলেন। ভগবান দেখলেন, বিকশিত পদ্মসদৃশ চন্দ্র অখণ্ড মণ্ডল হয়ে আকাশে উদিত হয়েছেন, তাঁর প্রভা লক্ষ্মীর বদনের মত প্রকাশ পাচ্ছে। বনভূমিকে তাঁর স্নিগ্ধ কিরণে রঞ্জিত দেখে শ্রীকৃষ্ণ সুনয়না রমণীদের মনোমুগ্ধকর সুমধুর বেণুধ্বনি আরম্ভ করলেন। ব্রজাঙ্গনাদের চিত্ত পূর্বেই সর্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণে আকৃষ্ট ছিল। এখন তাঁর কামোদ্দীপক বেণুরব শুনে তাঁরা অধীর হয়ে উঠলেন। কৃষ্ণসান্নিধ্য লাভের জন্য একে অপরের দিকে লক্ষ না করেই তাঁরা যেখানে সেই কমনীয় কৃষ্ণ রয়েছেন সেদিকে ছুটে আসতে লাগলেন। ত্রস্ততায় তাঁদের কানের দুলগুলি চঞ্চল হয়ে দুলতে লাগল। কৃষ্ণের সঙ্গলাভের জন্য তাঁরা সকলে এতই ব্যগ্র হয়েছিলেন যে, যিনি গো-দোহন করছিলেন, যে গোপীরা উনুনে দুধ চাপিয়েছিলেন, যাঁরা গোধূমকণা অন্ন রাঁধছিলেন, সকলেই যিনি যতটুকু কাজ করেছিলেন সে অবস্থায় ফেলে ছুটলেন। কোন কোন গোপী হয়ত পরিবেশন, শিশুদের দুগ্ধপান, পতিসেবা, ভোজন ইত্যাদি কাজে রত ছিলেন। সে সবই ফেলে তাঁরা ছুটে আসলেন। কেউবা অঙ্গরাগ লেপন করছিলেন, কোন গোপী হয়ত গাত্রমার্জনে রত, কেউবা চোখে কাজল পরছিলেন; এঁরা সকলেই সেই গান শুনে সব কাজ রেখে ব্যগ্রচিত্তে শ্রীকৃষ্ণের দিকে ছুটলেন। এই ব্যস্ততায় অনেকেই বস্ত্র ও অলংকার উল্টো করে পরেই চললেন। যাঁদের মন শ্রীকৃষ্ণে সমর্পিত তাঁদের কাজে কোন বিঘ্নই ঘটে না। ঐ ব্রজসুন্দরীদের আত্মীয়-বন্ধুরা বারবার নিষেধ করলেও গোবিন্দ-সমর্পিত-চিত্ত হওয়ায় তাঁরা মোহিত হয়ে ছুটলেন। কৃষ্ণভক্ত যে গোপীরা বাইরে যেতে পারলেন না তাঁরা চোখ বুজে শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করতে লাগলেন। প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের দুঃসহ বিরহে কাতর সেই সব গোপীদেরও অশুভ দূর হল। কারণ ধ্যানযোগে তাঁর আলিঙ্গন লাভ করায় তাঁদের পরম সুখভোগ আর পুণ্যার্জন হল। যদিও তাঁরা উপপতিবুদ্ধিতে পরমাত্মা শ্রীহরিতে আত্মসমর্পণ করেছিলেন, তবু তাঁরা সংসারের অচ্ছেদ্য বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে তাঁদের মায়াময় দেহ পরিত্যাগ করলেন। ১-১১

একথা শুনে রাজা পরীক্ষিৎ শুকদেবকে জিজ্ঞাসা করলেন, মহামুনি, গোপীকারা শ্রীকৃষ্ণকে পরম কমনীয় রূপেই জানত, তাঁর ব্রহ্মস্বরূপ কখনো তাদের মনে উদয় হয় নি। তবে কি করে তাদের সংসার-বিরতি হয়ে ব্রহ্মপ্রাপ্তি ঘটল? শুকদেব বললেন, মহারাজ, আমি আগেই বলেছি যে শিশুপাল হৃষীকেশের শত্রুতা করেও যখন সিদ্ধিলাভ করেছিল, তখন যারা তাঁর প্রিয়, তাদের কথা আর কি বলব? ভগবান অব্যয়, অপ্রমেয়, নির্গুণ ও গুণের নিয়ন্তা; তাঁর অন্য দেহীর মত কর্ম-নিবন্ধন দেহধারণ সম্ভব নয়। মানুষের মঙ্গলের জন্যই তাঁর আবির্ভাব হয়। গোপীদের কামই হোক, শিশুপাল প্রভৃতির ক্রোধই হোক, কংস প্রভৃতির ভয়ই হোক, নন্দ প্রভৃতির স্নেহই হোক, ভক্তের ভক্তিই হোক, তত্ত্বজ্ঞানীর শ্রদ্ধাই হোক আর যুধিষ্ঠির প্রভৃতির সম্বন্ধই হোক -- যে কোন প্রকারে ভগবানে আসক্তি জন্মালে তা মুক্তির কারণ হয়। তাঁর প্রতি কাম, ক্রোধ, ভয়, স্নেহ, ভক্তি যে কোন একটির দ্বারা তাঁর সারূপ্য লাভ সম্ভব। যোগেশ্বরের ঈশ্বর, জন্মরহিত, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মোক্ষপ্রদানের সামর্থ্য সম্বন্ধে তুমি বিস্ময় প্রকাশ করো না। তাঁর কৃপায় স্থাবর-জঙ্গম প্রাণিবর্গ সংসার-বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে থাকে। বাগ্মীশ্রেষ্ঠ ভগবান সেই ব্রজসুন্দরীদের দেখে বাগ্‌বিলাসের দ্বারা তাদের বিমোহিত করে বললেন, ভাগ্যবতী ব্রজ-সুন্দরীগণ, তোমাদের আগমন নির্বিঘ্ন হল তো? এখন বল, আমি তোমাদের কোন কাজ

সম্পাদন করব? সকলে সসম্ভ্রমে আসছ দেখে ভয় হচ্ছে; ব্রজের কুশল তো? আগমনের কারণ কি বল। ১২-১৮

এই অন্ধকার রাত্রিতে ভয়ংকর প্রাণীরা ইতস্তত বিচরণ করছে, তাই তোমরা ব্রজে ফিরে যাও। সুমধ্যমাগণ, এখানে অবলাদের থাকা উচিত নয়। তোমাদের মা, বাবা, ছেলে, ভাই, স্বামী সকলেই তোমাদের দেখতে না পেয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে। এখানে থেকে বন্ধুজনদের ভয়ের কারণ হয়ো না। এই কথা শুনে গোপীদের ঈষৎ প্রণয়কোপে অন্যদিকে চেয়ে থাকতে দেখে তিনি আবার বললেন, এই কুসুমিত বন রাকেশের (রাকাপতি চন্দ্র) কিরণে রঞ্জিত এবং যমুনাস্পর্শী মন্দ মন্দ বাতাসের সঞ্চরণে কম্পমান তরুপল্লবে শোভিত হয়েছে। তোমরা যদি বনের এই মনোহর শোভা দেখতে এসে থাক, তাহলে দেখা হল তো? এখন অবিলম্বে ব্রজে ফিরে যাও। তোমরা ঘরে ফিরে নিজ নিজ পতিদের সেবা কর গিয়ে, গৃহে তোমাদের ছেলে-পুলেরা কান্নাকাটি করছে, দুধ দুইয়ে তাদের পান করাও। আর যদি আমার প্রতি অনুরাগে চিত্ত বশীভূত হওয়াতেই এখানে এসে থাক, তা হলেও দোষ নেই; কারণ সব প্রাণীই আমার প্রতি অনুরক্ত হয়ে থাকে। কল্যাণীগণ, অকপটে পতিসেবা, আত্মীয়-বন্ধুজনদের শুশ্রূষা এবং পুত্রকন্যাদের লালন-পালন করাই স্ত্রীলোকের পরম ধর্ম। পতি যদি দুশ্চরিত্র বা বৃদ্ধ, জড় বা রোগী অথবা নির্ধন বা উদ্যমহীন কিংবা অকর্মণ্যও হয় স্বর্গাদি পবিত্রলোক-প্রার্থিনী নারীর পক্ষে সে পরিত্যাজ্য নয়। কুলকামিনীদের উপপতি ভজনা স্বর্গলাভের প্রতিবন্ধক। একাজ অযশস্কর, ক্ষণস্থায়ী, তুচ্ছ, দুঃখ-উৎপাদক, ভয়াবহ ও নিন্দিত এবং সর্বতোভাবে গর্হিত। আর শ্রবণ, দর্শন, ধ্যান, ও নাম-কীর্তনে যেমন আমাব প্রতি সহজে প্রীতিভাবের উদয় হতে পারে আমার সন্নিকটে এলে তেমন হয় না। তাই তোমরা গৃহে ফিরে যাও। ১৯-২৭

শুকদেব বললেন, গোবিন্দের এই অপ্রিয় বাক্য শুনে গোপীরা ভগ্নমনোরথ ও বিষণ্ণবদনে দুর্নিবার চিন্তার অকুল-পাথারে পড়ে আত্মহারা হলেন। শোকে তাঁদের ঘনঘন নিঃশ্বাস বইতে লাগল, ঠোঁট শুকিয়ে গেল। তাঁরা অত্যন্ত দুঃখে মাথা নিচু করে মাটিতে দাগ কাটতে লাগলেন। তাঁদেব কাজল-আঁকা চোখের জলে কুচতটের কুঙ্কুম ধুয়ে যাচ্ছিল। যে সব গোপী শ্রীকৃষ্ণের জন্য সমস্ত কামনা পরিত্যাগ করে এসেছিলেন তাঁরা ক্রোধের বশে অশ্রু-গদ্‌গদ বাক্যে প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণকে বললেন, প্রভু, এরকম নিষ্ঠুর বাক্য আপনার বলা উচিত নয়। আমরা সমস্ত বিষয়-বিভব ত্যাগ করে আপনার পাদমূলে ভজনা করেছি যেরকম আদিপুরুষ দেব মুমুক্ষু ব্যক্তিদের গ্রহণ করেন, সেরকম আপনি আমাদেব গ্রহণ করুন। আপনি যে পতি-পুত্রাদির সেবা করাই স্ত্রীলোকের ধর্ম বলেছেন, তা আপনাব মধ্যেই বর্তমান থাকুক। কেননা আপনিই প্রকৃত হিতকারী ও প্রাণীদেব সর্বাপেক্ষা প্রিয়তম আত্মা। সুতরাং পতি প্রভৃতি রূপে শুশ্রূষার পাত্র আমাদের এক আপনিই। আপনি যে ঈশ্বর তার প্রমাণ আপনি দেহধারীদের আত্মা এবং প্রিয়তম বন্ধু। হে পরমাত্মা, শাস্ত্র-নিপুণ জনগণ নিত্যপ্রিয়, আত্মরূপী আপনাকেই প্রেমের পরম আস্পদ পরমাত্মজ্ঞানে প্রেম নিবেদন করে থাকেন। পতি, পুত্র, স্বজনদের প্রেম ক্ষণস্থায়ী, ভঙ্গুর; তা দিয়ে কি হবে? অতএব বরদাতা পরমেশ্বর, আমাদের প্রতি আপনি প্রসন্ন হোন। চিরকাল যে আশা পোষণ করে আসছি তা নষ্ট করবেন না। প্রভু, আপনি আমাদের যে গৃহে ফিরে যেতে বললেন আমাদের পক্ষে তা অসম্ভব। কারণ আমাদের যে চিত্ত ও হাতদুটি এতকাল স্বচ্ছন্দে গৃহকাজে রত থাকত, সুখস্বরূপ আপনি তা হরণ করেছেন। আপনার পাদমূল থেকে আমরা এক পাও সরতে পারছি না,

ব্রজে কি করে ফিরে যাব ? সেখানে কিই বা করব ? আপনার হাস্যময় দৃষ্টি ও সুমধুর সঙ্গীতে আমাদের মধ্যে যে কামভাবের উদয় হয়েছে আপনার অধরামৃত দিয়ে তা প্রশমিত করুন। না হলে আমরা বিরহাগ্নিতে দগ্ধদেহ হয়ে আপনার শ্রীচরণের ধ্যান করে আপনার কাছে উপস্থিত হব। হে পদ্মপলাশলোচন, স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী আপনার শ্রীচরণ অন্বেষণে ব্যগ্র। আপনি অরণ্যচারী ব্রজবাসীদের প্রাণধন। আমরা আপনার চরণ স্পর্শ করে ধন্য হয়েছি, এখন আর পতি-স্বজনাদির কাছে কি করে থাকতে পারব ? ২৮-৩৬

হে ভগবান, যে লক্ষ্মীদেবীর কটাক্ষ লাভের বাসনায় ব্রহ্মাদি দেবগণ তপস্যা করে থাকেন, তিনি অতি কষ্টে আপনার বক্ষমাঝে স্থান পেয়েছেন। তিনি তুলসীর সঙ্গে একত্রে ভৃত্যজন-সেবিত আপনার যে পদধূলি কামনা করেন। আমরাও লক্ষ্মীর মত আপনার পদরেণুর শরণাপন্ন হলাম। অতএব, হে দুঃখনাশক, আমাদের প্রতি প্রসন্ন হোন। আপনার চরণসেবার অভিলাষে আমরা যোগীদের মত গৃহধর্মে জলাঞ্জলি দিয়ে আপনার শ্রীচরণে স্থান নিয়েছি। হে পুরুষরত্ন, আপনার সুন্দর হাসি দেখে মিলনাকাঙ্ক্ষায় আমাদের চিত্ত দগ্ধ হচ্ছে। আমাদের আপনার দাসী হতে দিন। আপনার সুন্দর অলকদামে আবৃত মুখারবিন্দ, কুণ্ডলশোভিত কপোলদ্বয়, অভয়দানকারী ভুজদ্বয় এবং লক্ষ্মীর রমণস্থল বক্ষ দর্শন করে আমাদের আপনার দাসী হতে বাসনা হচ্ছে। ত্রিভুবনে এমন কে নারী আছে যে আপনার মধুরপদের অমৃতময় বেণুগীতে মোহিত হয়ে সদাচার-আচরিত স্ব স্ব ধর্ম থেকে বিচলিত হয় না ? আপনার এই ত্রৈলোক্য মোহরূপ দর্শন করে গাভী, পাখী, হরিণ, বৃক্ষলতা প্রভৃতি সকলেরই রোমাঞ্চ হয়। নিশ্চয় জানি, যেরকম আদিপুরুষ দেবলোকের রক্ষক হয়ে জন্মেছিলেন তেমনি আপনিও ব্রজভূমের ভয় নিবারণের জন্য অবতীর্ণ হয়েছেন। অতএব হে পীড়িতের বন্ধু, কৃপা করে আমাদের উত্তপ্ত স্তনে ও মস্তকে আপনার করকমল স্পর্শ করুন। আমরা আপনার কিঙ্করী। ৩৭-৪১

শুকদেব বললেন, যোগেশ্বরদের ঈশ্বর নিজে আত্মারাম হয়েও সেইসব গোপীর কাতরোক্তিতে দয়াপরবশ হয়ে হেসে তাঁদের সঙ্গে বিহারে প্রবৃত্ত হলেন। উদারকর্মা অচ্যুতের সুমধুর হাসি থেকে কুন্দকুসুমের আভা বের হল। তিনি প্রিয়দর্শনে উৎফুল্ল সেই সব গোপীকা পরিবৃত হয়ে তারকারাজি পরিবৃত চন্দ্রের মত শোভা পাচ্ছিলেন। শত রমণীদের মধ্যে যূথপতি শ্রীকৃষ্ণ বৈজয়ন্তীমালা ধারণ করে কখনো নিজে গান করছিলেন কখনো বা তাঁর উদ্দেশ্যে গোপীরা গাইছিল। যমুনাতীরে প্রবেশ করে তিনি গোপীগণের সঙ্গে বেড়াতে লাগলেন। যমুনার সেই জ্যোৎস্না-স্নাত তটভূমি শীতল বালুকায় পরিপূর্ণ ছিল, পদ্ম গন্ধ সুশীতল সমীরণ মন্দ মন্দ বইছিল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বাহুপ্রসারণ, আলিঙ্গন এবং হস্ত, চূর্ণকুন্তল, উরু, নীবী, স্তন ইত্যাদির স্পর্শন, নখাগ্রপাত, কটাক্ষনিক্ষেপ, হাস্যপরিহাস ইত্যাদি দ্বারা ব্রজাঙ্গনাদের কাম উদ্দীপ্ত করে তাঁদের সঙ্গে ক্রীড়া করতে লাগলেন। ভগবান এবং মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণের কাছে এভাবে সম্মান লাভ করে গোপিনীরা মানিনী হয়ে উঠলেন। আর তাঁরা নিজেদের পৃথিবীর যাবতীয় অঙ্গনাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে অহঙ্কার করতে লাগলেন। ব্রহ্মা ও মহেশ্বরের থেকেও অধিক বীর্যশালী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নারীদের এরকম সৌন্দর্যাভিমান জন্মেছে দেখে অনুগ্রহপূর্বক তাঁদের গর্ব দূর করবার উদ্দেশ্যে সেখান থেকে অকস্মাৎ অন্তর্হিত হলেন। ৪২-৪৮

ত্রিংশ অধ্যায়

গোপীদের শ্রীকৃষ্ণ-অন্বেষণ

শুকদেব বললেন, মহারাজ, ভগবান অন্তর্হিত হলে যূথপতির অদর্শনে হস্তিনীগণ কেমন ব্যাকুল হয়, শ্রীকৃষ্ণকে না দেখে ব্রজাঙ্গনারাও সেরকম ভাবে তাঁর অনুসন্ধান করতে লাগলেন। শ্রীকৃষ্ণের চলন, অনুরাগ, মৃদুহাসি, বিলাসদৃষ্টি, মনোরম আলাপ, ক্রীড়া ও বিভ্রম দ্বারা গোপীদের চিত্ত আকৃষ্ট হওয়ায় তাঁরা কৃষ্ণাত্মিকা হয়েছিলেন। এখন তাঁরা রমাপতির নানা রকম চেষ্টা অনুকরণ করতে লাগলেন। তাঁর গতি, হাসি, দৃষ্টিপাত, আলাপ এ সবে গোপীদের মূর্তি আবিষ্ট হয়েছিল। তাই তাঁদের বিহার ও বিভ্রম শ্রীকৃষ্ণের মতই হল, সকলেই কৃষ্ণাত্মিকা হয়ে 'আমিই এই কৃষ্ণ' বলতে লাগলেন। তারপর তাঁরা মিলিত হয়ে উচ্চস্বরে গান করতে করতে এক বন থেকে অন্য বনে উন্মত্তের মত শ্রীকৃষ্ণকে অন্বেষণ করতে লাগলেন। যিনি আকাশের মত প্রাণীদের ভেতরে ও বাইরে অবস্থান করেন সেই পরমেশ্বরের কথা তাঁরা বনস্পতিদের কাছে জিজ্ঞাসা করলেন, হে অশ্বত্থ, হে বট, নন্দতনয় শ্রীকৃষ্ণ সপ্রেম হাসি ও বিলাস-দৃষ্টি দ্বারা আমাদের চিত্ত হরণ করে চলে গেছেন। তোমরা কি তাঁকে দেখেছ? হে কুরুবক, অশোক, পুন্নাগ, চম্পক, যাঁর হাসি মানিনীদের মান হরণ করে, সেই রামানুজ কি এই পথ দিয়ে গিয়েছেন? হে পরম কল্যাণী তুলসী, তোমার অতিপ্রিয় অচ্যুত, যিনি অলিকুলের সঙ্গে তোমাকে ধারণ করেন, তাঁকে দেখেছ কি? হে মালতী মল্লিকা, চামেলি, যূথিকা, মাধব কি করস্পর্শদান দ্বারা তোমাদের আনন্দ দান করে এপথ দিয়ে গিয়েছেন? হে চূত, পিয়াল, পনস, আসন, কোবিদার, জম্বু, আকন্দ, বিল্ব, বকুল, আম, কদম, নীপ ও অন্যান্য বৃক্ষরাজি, পরের জন্যই তোমরা জন্মলাভ করে যমুনাতীরে আছ। শ্রীকৃষ্ণ কোথায় গিয়েছেন কৃপা করে তাঁর পথটি বলে দাও। তাঁর বিরহে আমাদের চিত্ত শূন্য বোধ হচ্ছে। পৃথিবী, তুমি কি তপস্যাই না করেছিলে। সেজন্যই কেশবের চরণস্পর্শে বোধ হয় তৃণরাজি দ্বারা তোমাকে রোমাঞ্চিত ও পুলকিত দেখাচ্ছে। এই আনন্দ কি শ্রীকৃষ্ণের পাদস্পর্শ থেকে হয়েছে, না ত্রিবিক্রমের সর্বাক্রমণ হেতু হয়েছে? অথবা তারও আগে বরাহ-মূর্তির আলিঙ্গনে হয়েছে? ১-১০

সখী হরিণপত্নী, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়তমার সঙ্গে নিজ মনোহর অঙ্গের দর্শন দ্বারা তোমাদের চোখের আনন্দ বিধান করে এই বনে এসেছেন কি? এখানে গোকুলপতি শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমার অঙ্গস্পর্শে তার কুচলিপ্ত কুঙ্কুমদ্বারা রঞ্জিত কুন্দফুলে গাঁথা মালা থেকে গন্ধ বইছে। তরুগণ, ভগবান শ্রীরামানুজ প্রিয়তমার কাঁধে বাম বাহু স্থাপন করে তুলসীর রসপানে মত্ত ভ্রমরকুল দ্বারা অনুসৃত হয়ে ডান হাতে কমল ধারণ করে বিচরণ করছেন। তোমাদের প্রণামে তিনি সন্তুষ্ট হয়ে তোমাদের প্রতি কি কৃপাদৃষ্টি করেছেন? সখি, আমাদের অনুমান হয় এই সব লতা কৃষ্ণসংসর্গ লাভ করেছে। এদের জিজ্ঞাসা কর, এদের আশ্চর্য ভাগ্য। এরা বৃক্ষবাহু আলিঙ্গন করেও নিশ্চয় শ্রীকৃষ্ণের নখস্পৃষ্ট হয়েছে; কারণ এদের রোমাঞ্চিত দেখাচ্ছে। শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণে অতিশয় বিহ্বল হয়ে শ্রীকৃষ্ণাত্মিকা গোপিকারা এ রকম উন্মত্তের মত কথা বলতে বলতে অবশেষে তাঁর বিভিন্ন ক্রীড়ার অনুকরণ করতে লাগলেন। এক গোপী কৃষ্ণ হলেন, আরেক গোপী পূতনা হয়ে তাঁকে স্তন্যপান করাতে লাগলেন। একজন শকট হলেন, আরেকজন কৃষ্ণ হয়ে তাঁকে পাদপ্রহার করলেন। এক রমণী বালক শ্রীকৃষ্ণ হলেন, অন্য গোপী দৈত্য হয়ে তাঁকে হরণ

করলেন। কোন গোপী রাখাল বালকের শব্দের অনুকরণ করে হামাগুড়ি দিয়ে চলতে লাগলেন। দু'জন রাম ও কৃষ্ণ হলেন, অন্যরা গোপবালকের অনুকরণ করলেন। কেউ 'সাধু সাধু' বলে প্রশংসা করতে লাগলেন। কৃষ্ণমনা কোন গোপী অন্য এক গোপীর স্কন্ধে বাহু স্থাপন করে বিচরণ করতে করতে অন্যদের বলতে লাগলেন, আমি কৃষ্ণ, কেমন মনোহর রূপে গমন করছি দেখ ; ঝড়-জলের ভয়ে ভীত হয়ো না, আমি তোমাদের রক্ষার উপায় করেছি। এই বলে যত্নসহকারে পরিধেয় বস্ত্র উর্ধ্বে ধারণ করলেন। ১১-২০

কোন গোপী শ্রীকৃষ্ণ হয়ে কালিয়রূপী কোন গোপীর মাথায় উঠে বলতে লাগলেন, দুষ্ট কালিয়, তুমি এখান থেকে দূর হও। না হলে আমি তোমাকে শাস্তি দেব, যেহেতু আমি দুষ্টের দমনের জন্য জন্মগ্রহণ করেছি। কেউ কৃষ্ণের মত করে বললেন, গোপগণ, তোমরা দুঃসহ দাবাগ্নি দেখতে পাচ্ছ, নিজেদের চোখ বন্ধ কর, আমি তোমাদের কল্যাণ বিধান করছি। মাতা যশোদার অনুকরণ করে এক গোপী নিজের মালা নিয়ে আরেক গোপীকে 'আমি দধি-মন্থন ভাণ্ড ভঙ্গকারী এই ননিচোরকে বাঁধি' বলে বাঁধতে লাগলেন। সে বরাঙ্গী ভীতা হয়ে মুখ ঢেকে ভয়ের অনুকরণ করতে লাগলেন। এই ভাবে শ্রীবৃন্দাবনের বৃক্ষলতাকে জিজ্ঞাসা ও কৃষ্ণানুকরণ করতে করতে বনের এক জায়গায় সকলের মূলস্বরূপ পরমাত্মার পদচিহ্নগুলি দেখতে পেলেন। তা দেখে ব্রজসুন্দরীরা পরস্পর বলাবলি করতে লাগলেন, এইসব পদচিহ্ন মহাত্মা নন্দতনয়ের, এতে কোন সন্দেহ নেই। ধ্বজ, বজ্র, পদ্ম, অঙ্কুশ, যবাদি দেখেই তা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। গোপীরা সেই সব পদচিহ্ন লক্ষ করে তাঁর পথ অন্বেষণ করতে লাগলেন। কিছুদূর গিয়ে এই পদচিহ্নগুলির সঙ্গে আরেকটি পদচিহ্ন[১] মিশ্রিত দেখলেন। তখন তাঁরা দুঃখিত মনে পরস্পর বলতে লাগলেন, হস্তীর অনুগামিনী হস্তিনীর মত নন্দপুত্র শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে গিয়েছে এমনি কোন রমণীর এই পদচিহ্নগুলি। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর কাঁধে হাত রেখে চলছিলেন। নিশ্চয়ই সেই রমণী আরাধনা করে[২] ভগবান শ্রীহরিকে তুষ্ট করেছেন ; না হলে শ্রীগোবিন্দ আমাদের পরিত্যাগ করে তাকে নির্জনে নিয়ে গেলেন কেন ? সখীগণ, গোবিন্দের এই সব পদরেণু অতি পবিত্র। ব্রহ্মা, মহেশ্বর ও লক্ষ্মীদেবী পাপক্ষালনের জন্য এ সব মস্তকে ধারণ করেন। এস, আমরা এই সব পুণ্যপ্রদ পদরেণুতে স্নান করি। কোন গোপী বললেন, সেই কামিনীর এই পদচিহ্ন আমাকে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ করছে, কারণ তিনি গোপীদের লুকিয়ে নির্জনে অচ্যুতের অধরসুধা পান করছেন। ২১-৩০

এখানে আর সেই রমণীর পদচিহ্ন দেখা যাচ্ছে না; কারণ প্রিয়তমার কোমল ও সুন্দর চরণতলে তৃণাঙ্কুরে বিদ্ধ হতে থাকলে প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে বহন করে নিয়ে

১ রাধারাণীর পদচিহ্ন। ২ "...শ্রীগোবিন্দের চরণচিহ্নের পার্শ্বে যে রমণীর চরণ চিহ্ন দেখা যাইতেছে তাঁহার মত ভাগ্যবতী রমণী ত্রিজগতে আর কেহ নাই।... নিশ্চয়ই তিনি জন্মজন্মান্তরে ভগবান নারায়ণকে ভজনা করিয়াছেন। নারায়ণ হরি সর্বদুঃখহারী। নারায়ণ ঈশ্বর, ভক্তের বাঞ্ছাপূরণে তিনি সমর্থ। নারায়ণ-ভজন করিয়া সেই রমণী নিশ্চয়ই তাঁহার কৃপা লাভ করিয়াছেন। কারণ, কৃপা ছাড়া এরূপ দুর্লভ সৌভাগ্য লাভ করা অসম্ভব। শতকোটি ব্রজরমণীদের ত্যাগ করিয়া শ্যামসুন্দর যাঁহার সঙ্গে নির্জনে মিলিত হইয়াছেন, তিনি অবশ্যই সর্বাধিক আরাধনা করিয়াছেন ভগবানকে।"—ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী, শ্রীধর স্বামীর টীকা সম্মত। শ্রীজীব গোস্বামী বলেন—"রাধয়তি গোবিন্দং, গোবিন্দেন বা রাধ্যতে ইতি।—যে রমণী গোবিন্দকে আরাধনা করেন; অথবা গোবিন্দ কর্তৃক আরাধিত হন, তিনি রাধিকা।"

গিয়েছিলেন। গোপীগণ, দেখ, দেখ, কামী শ্রীকৃষ্ণ তাঁর প্রিয়তমাকে বহন করে ভারাক্রান্ত হয়েছিলেন, তাই এখানে তাঁর পদক্ষেপ মাটিতে বেশি মগ্ন হয়েছে মনে হয়। কমলাকান্ত কুসুমের জন্য এখানে কান্তাকে নামিয়েছিলেন, এখানে প্রিয়ার জন্য পুষ্পচয়ন করেছিলেন। দেখ, মাটিতে পায়ের অগ্রভাগ মাত্র রেখেছিলেন; সেজন্য পায়ের চিহ্ন অসমাপ্ত। কামী এখানে কামিনীর কেশ-প্রসাদন করে পুষ্পরাজি দিয়ে কেশ-বন্ধন করার জন্য নিশ্চয় বসেছিলেন। ৩১-৩৪

শুকদেব বললেন, মহারাজ, শ্রীকৃষ্ণ স্বতঃপরিতৃপ্ত, স্বক্রীড় এবং নারীবিভ্রমে অনাকৃষ্ট হয়েও কামীদের দৈন্য এবং অবলাদের দৌরাত্ম্য প্রদর্শন করার জন্য প্রেয়সীর সঙ্গে কেলি করেছিলেন। যা হোক ঐ সব গোপীরা এই ভাবে পদচিহ্নাদি দর্শন করে বিগতচেতনের মত ভ্রমণ করতে লাগলেন। অন্যান্য গোপীদের পরিত্যাগ করে শ্রীকৃষ্ণ যাঁকে নির্জনে এনেছিলেন, সেই কৃষ্ণপ্রিয়াও নিজেকে যাবতীয় স্ত্রীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিল, গোপীরা এই প্রিয়ের অভিলাষিণী হলেও তিনি তাঁদের পরিত্যাগ করে আমাকেই ভজনা করছেন। ৩৫-৩৭

সগর্বে তিনি প্রিয়কে বললেন, আমি নিজে আর চলতে পারি না। তুমি আমাকে যেখানে ইচ্ছা বয়ে নিয়ে যাও। কেশব তাঁকে বললেন, তুমি আমার কাঁধে ওঠ। তারপর সেই গোপী যেমন তাঁর কাঁধে উঠতে যাবেন, তখনি শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্ধান করলেন। কৃষ্ণকে হারিয়ে অনুতাপ করে সেই গোপী বলতে লাগলেন, হে নাথ, প্রিয়তম, তুমি কোথায় গেলে? সখা, আমি দুঃখিনী, তোমার দাসী। কোথায় রয়েছ তুমি, আমায় দেখা দাও। শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণরত গোপীরা ঘুরতে ঘুরতে দেখতে পেলেন তাঁদের সখী প্রিয়-বিচ্ছেদে মোহিত ও দুঃখিত হয়ে আছেন। মাধবের কাছ থেকে তাঁর প্রেম, সম্মান ও দুরভিমানহেতু অপমান লাভের কথা শুনে তাঁরা অত্যন্ত বিস্মিত হলেন। তারপর যতক্ষণ জ্যোৎস্না রইল ততক্ষণ তাঁরা কৃষ্ণান্বেষণে এদিক ওদিক দেখতে লাগলেন। অন্ধকার হলে অন্বেষণ অসম্ভব হয়ে পড়লেও নিজেদের ঘরের কথা কারোরই মনে পড়ল না। কারণ, সকলে শ্রীকৃষ্ণের বিষয়েই আলাপ করতেন, তাঁর অনুকরণ করতেন। তাঁরা সকলে কৃষ্ণময় হয়ে উঠেছিলেন। তাই সবাই শ্রীকৃষ্ণের গুণগান করছিলেন। তাঁরা এভাবে শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করতে করতে আবার যমুনা-পুলিনে এলেন এবং তাঁর আগমনের আকাঙ্ক্ষায় সকলে একত্রে তাঁর গান করতে লাগলেন। ৩৮-৪৫

একত্রিংশ অধ্যায়

গোপীদের শ্রীকৃষ্ণের আগমন-প্রার্থনা

গোপীরা বললেন, প্রিয়, আপনার আবির্ভাবে আমাদের এই ব্রজভূমি বৈকুণ্ঠের থেকেও বেশী শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছে। স্বয়ং ইন্দিরা লক্ষ্মী একে অলংকৃত করে নিরন্তর বাস করছেন। এতে ব্রজের সকলেই সুখী। কিন্তু নাথ, যারা আপনারই জন্য প্রাণধারণ করছে, সেই অভাগিনী গোপীরা আপনার বিরহে নিতান্ত কাতর হয়ে এখানে দিকে দিকে আপনাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। অতএব আপনি আমাদের দৃষ্টিপথে আবির্ভূত হোন। হে সম্ভোগপতি, বরদ, আপনার চক্ষু শরৎকালের সরোবরে বিকশিত পদ্মের শোভাকেও হরণ করছে। আমরা আপনার দাসী, আপনি

আমাদের ঐ দৃষ্টি দিয়ে আঘাত করেছেন। এও কি বধ করা নয়? হে শ্রেষ্ঠ, আপনি আমাদের বিষজল পান থেকে, অঘাসুর, জলঝঞ্ঝা, বজ্রপাত, দাবাগ্নি, বৃষাসুর, ব্যোমাসুর এবং নানারকম ভয় থেকে বারবার রক্ষা করেছেন। এখন তা হলে উপেক্ষা করছেন কেন? আপনি যশোদার নন্দন নন, যাবতীয় প্রাণীর বুদ্ধির সাক্ষী। আপনি ব্রহ্মার প্রার্থনায় বিশ্বের পালনের জন্য সাত্বত (যদু) কুলে অবতীর্ণ হয়েছেন। আমরা আপনার ভক্ত, অতএব আমাদের প্রার্থনাও পূরণ করুন। হে যদুকুলশ্রেষ্ঠ, যাঁরা সংসারভয়ে আপনার চরণে শরণ নেন, আপনি অভয় দান করে তাঁদের অভিলাষ পূরণ করে থাকেন। ঐ করযুগল কমলার হস্ত ধারণ করে থাকে। আপনি আমাদের মস্তকে ঐ করপদ্ম স্থাপন করুন। ব্রজবাসীদের দুঃখনাশন, হে বাসুদেব, আপনার হাসি ভক্তজনের গর্বনাশ করে। সখা, আমরা কিঙ্করী, কৃপা করে আমাদের আশ্রয় দিন। আগে আপনার মুখপদ্ম আমাদের দেখান। নাথ, আপনার পাদপদ্ম ভক্ত-প্রাণীমাত্রের পাপনাশন, তৃণচর পশুদের অনুগামী, সৌভাগ্যে লক্ষ্মীর নিকেতন, কালিয় নাগের ফণাতে স্থাপিত আপনার চরণকমল দুটি আমাদের কুচোপরি রেখে আমাদের হৃদয়ব্যথা নিবারণ করুন। হে কমললোচন, আপনার মনোহর সার্থক শব্দযুক্ত বাক্যাবলীতে আমাদের মোহ জন্মাচ্ছে, আপনার কিঙ্করী আমাদের অধরামৃত দান করে সঞ্জীবিত করুন। পৃথিবীতে যাঁরা তাপিতজনের জন্য অমৃতের বিবরণ করেন, কবিগণ কর্তৃক স্তুত হন, কাম ও কর্ম নিবারণ করেন, আপনার ঐ পবিত্র কথামৃত সবিস্তারে বর্ণনা করেন, তাঁরা পূর্ব-জন্মে নিশ্চয় অনেক দান করে পুণ্যার্জন করেছেন। ১-৯

হে প্রিয়, হে কপট, যা চিন্তা করলে মঙ্গল হয়, আপনার সেই হাসি, সপ্রেম কটাক্ষ, বিহার, সেই হৃদয়গ্রাহিণী সাংকেতিক পরিহাসকথা স্মরণ করে আমাদের চিত্ত ক্ষুব্ধ হচ্ছে। হে কান্ত, হে নাথ, যখন আপনি পশুচারণ করতে করতে ব্রজ থেকে চলে যান তখন আপনার কমলবৎ কোমল চরণ পাছে ধানের শিষ বা উপলখণ্ডে আহত হয় এই চিন্তায় আমাদের মন ব্যাকুল হয়। হে বীর, দিনশেষে আপনি যখন ধেনু নিয়ে ফিরে আসেন, তখন নিবিড় ধূলিরাশিতে ধূসরিত, নীলবর্ণ কুন্তলে আবৃত আপনার বদনকমল দর্শন করে আমাদের মনে মদন জাগরিত হয়। কিন্তু আপনি কিছুতেই সঙ্গ দেন না; তাই আপনাকে কপট বলব না তো কি বলব? হে প্রাণরমণ, আপনার ঐ চরণকমল প্রণতজনের অভিলাষ পূর্ণ করে, লক্ষ্মীর করকমল দ্বারা সেবিত হয়। পৃথিবীর ভূষণ, আপৎকালে চিন্তনীয়, সেবার সময়েও সুখপ্রদ, এখন তা আমাদের স্তনতটে রাখুন। আপনার অধরামৃত সম্ভোগসুখ উত্তরোত্তর বর্ধন করে ও শোক নাশ করে। তুচ্ছ বাঁশিও যখন সেই অধরামৃত অশেষ পান করছে, তখন আপনার দাসীগণকে তা বিতরণে কার্পণ্য করবেন না। ১০-১৪

দিনের বেলা যখন আপনি বৃন্দাবনে গমন করেন, তখন আপনাকে না দেখে লোকের ক্ষণার্ধ[১] কালও যুগ বলে মনে হয়। তারপর দিনান্তে আপনি ফিরে এলে আপনার কুটিল কুন্তল-শোভিত বদন যে আনন্দে নয়নে প্রাণভরে দেখব তারও সুযোগ হয় না। কারণ যে ব্রহ্মা আমাদের আঁখিপল্লব দিয়েছেন তাঁকে জড় ও অন্যায়কারী বলে মনে হয়। হে অচ্যুত, আপনার বংশীধ্বনিতে মোহিত হয়ে আমরা পতি, পুত্র, জ্ঞাতি, ভ্রাতা ও বান্ধবদের উপেক্ষা করে আপনার কাছে চলে এসেছি। আপনি শঠ; রাত্রিকালে শরণাগত কামিনীদের আপনি ছাড়া আর কে পরিত্যাগ করতে পারে? আপনার নিভৃত সঙ্কেতক্রীড়া, সহাস্য বদন, সপ্রেম কটাক্ষ ও লক্ষ্মীর

১ মতান্তরে ত্রুটি কাল অর্থাৎ ক্ষণের ২৭০০তম ভাগ। ক্ষণ = $\frac{৩২}{২৫}$ সেঃ, ত্রুটি = ১৬৮৭৫ সেঃ।

ঈপ্সিত আবাসস্থল বক্ষ দেখে আমাদের হৃদয়াকাঙ্ক্ষা বেড়ে যাচ্ছে, মন বারবার মুগ্ধ হচ্ছে। সখা, আপনার আবির্ভাব ব্রজবাসীদের দুঃখনাশক এবং মঙ্গলের কারণ। আপনাকে পাবার আকাঙ্ক্ষায় আমাদের চিত্ত ব্যাকুল হয়েছে। পাছে আঘাত পান এই আশংকায় আপনার কোমল চরণকমল আমাদের কঠিন কুচতটে সন্তর্পণে ধারণ করি। আপনি সেই পাদপদ্ম দ্বারা এখন বনে ভ্রমণ করছেন। না জানি আপনার শ্রীচরণ তীক্ষ্ণ পাথরখণ্ডে কত না আঘাত পাচ্ছে! এই ভেবে আমাদের মন অত্যন্ত ব্যাকুল হচ্ছে। কারণ আপনিই আমাদের জীবন। ১৫-১৯

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক গোপীদের সান্ত্বনাদান

শুকদেব পরীক্ষিৎকে বললেন, মহারাজ, এইভাবে গোপীরা শ্রীকৃষ্ণের দর্শনের আকাঙ্ক্ষায় গান ও বিলাপ করতে করতে উচ্চস্বরে কাঁদছিলেন। তখন পীতাম্বরধারী, বনমালায় বিভূষিত বাসুদেব হাসিমুখে তাঁদের সামনে অকস্মাৎ আবির্ভূত হলেন। মূর্ছিত দেহে প্রাণ এলে হাত-পা যেমন চেতনা ফিরে পায়, সে রকম প্রিয়তমকে আগত দেখে আনন্দে উৎফুল্ল গোপীদের কেউ যদুনন্দনের করকমল হাতের মধ্যে নিলেন, কেউ তাঁর চন্দনচর্চিত বাহু নিজের কাঁধে নিলেন, কোন গোপী তাঁর চর্বিত তাম্বুল অঞ্জলি পেতে নিলেন, আর বিরহ-সন্তপ্তা কোন গোপী তাঁর (দক্ষিণ) চরণ নিজের স্তনের উপর রাখলেন। প্রণয়কোপে বিবশা আর এক গোপী ভ্রূকুটি করে, ওষ্ঠাধর দংশন করে ও তীব্র কটাক্ষ হেনে যেন প্রহার করতে উদ্যত হলেন। কোন গোপী অনিমেষ নেত্রে তাঁর মুখমণ্ডল বারবার দেখতে লাগলেন, কিন্তু সাধক যেমন ভগবানের চরণ সেবা করেও সহজে তৃপ্ত হন না, তেমনি সেই গোপনারীদের কৃষ্ণ-পিপাসাও শান্ত হল না। কোন গোপী নেত্রপথে তাঁকে হৃদয়ে নিয়ে আঁখিপল্লব বন্ধ করে হৃদয়ে আলিঙ্গন করলেন। তাতে পুলকিত ও আনন্দে আত্মহারা হয়ে যোগীর মত হয়ে গেলেন। মুমুক্ষু ব্যক্তিরা ঈশ্বরকে পেয়ে যেমন সংসারতাপ মোচন করেন, তেমনি সমস্ত গোপী শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনে বিরহজনিত সন্তাপ পরিত্যাগ করলেন। মহারাজ, পরমাত্মা যেমন সত্ত্বাদি গুণে পরিবৃত হয়ে শোভা পান, ভগবান অচ্যুতও তেমনি বিগতশোকা গোপীদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে শোভা পেতে লাগলেন। ১-১০

মদনমোহন সেই সব গোপীদের নিয়ে যমুনাতীরে ক্রীড়া করতে লাগলেন। সেখানে বিকশিত কুন্দ ও মন্দার পুষ্পের সুবাসে অলিকুল মত্ত হয়েছিল, শরৎ-জ্যোৎস্নায় অন্ধকার দূর হয়েছিল আর যমুনা তার তরঙ্গরূপ হাত দিয়ে পুলিনে কোমল বালুকা বিস্তার করে রেখেছিল। শ্রুতিসমূহ যেমন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে পরমেশ্বরের পূর্ণ দর্শন না পেয়ে জ্ঞানকাণ্ডে সাক্ষাৎ পরমেশ্বরের স্বরূপ দর্শন করে পূর্ণকাম হয়, তেমনি শ্রীকৃষ্ণ দর্শনে গোপীদের মনঃকষ্ট দূর হলে তাঁরাও পূর্ণমনোরথ হলেন। তাঁরা কুচকুঙ্কুম রঞ্জিত নিজ নিজ উত্তরীয় বসন দ্বারা অন্তর্যামী ভগবানের আসন রচনা করে দিলেন। যোগীশ্বরদের হৃদয়ে যাঁর আসন পাতা আছে আজ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের রচিত সেই আসনে উপবিষ্ট হলেন। ত্রিলোকের সকল শোভার সাহায্যে যেন শরীর ধারণ করে তিনি গোপমণ্ডলীর মধ্যে বিরাজ করতে লাগলেন। গোপীরা হাস্যলীলায় সুশোভন কটাক্ষ ও ভ্রূবিলাসের

দ্বারা অনুরাগ প্রকাশ করে এবং শ্রীকৃষ্ণের হস্ত ও চরণ সম্মর্দন দ্বারা সেবা করে ঈষৎ কোপাবেশে বললেন, হে শ্রীকৃষ্ণ, জগতে দেখা যায় যে অনেকে ভজনাকারীর ভজনা অনুরূপ সাধ পূরণে তাঁকে ভজনা করে থাকে। কেউ কেউ আবার ভজনার অপেক্ষা না করে যারা ভজনা করে না তাদেরও দয়াপরবশে ভজনা করে। অন্যরা, ভজনকারী কি অভজনকারী, কাউকেই ভজনা করে না। এ কিরকম ব্যাপার, আমাদের ভাল করে বুঝিয়ে বলুন। ১১-১৬

ভগবান বললেন, সখীগণ, যারা প্রত্যুপকারের আশায় অন্যের উপকার করে, তারা নিতান্ত স্বার্থপর। তাদের পরস্পরের এই উপকারে প্রেম বা ধর্মের কোন সংস্রব নেই, স্বার্থই এর উদ্দেশ্য মাত্র। উপকারের কোন প্রত্যাশা না করে যাঁরা উপকার করেন তাঁরাই প্রকৃত করুণাপূর্ণ সাধু। এরকম আচরণ কেবল স্নেহময় পিতামাতাতেই দেখা যায়। সুন্দরীগণ, এরূপ নিরপেক্ষ ভজনে নির্দোষ ধর্ম ও সৌহার্দ্য অপকটে উৎপন্ন হয়, এতে সন্দেহ নেই। আবার এও দেখা যায় যে যারা ভজনা বা সেবাদি দ্বারা কোন উপকার করেনি, তাদের উপকার করা দূরে থাকুক, অনেকে প্রকৃত উপকারীরও কোন উপকার করে না। ভজনাকারী মানুষ চার শ্রেণীতে বিভক্ত ঃ যথা, যাঁরা আত্মারাম (ব্রহ্মানন্দে মগ্ন তাই বাহ্যদৃষ্টি-শূন্য), আপ্তকাম (পূর্ণকামের বিষয় পেয়েও ভোগেচ্ছাহীন), অকৃতজ্ঞ (উপকার বিস্মৃত হয় যারা) এবং গুরুদ্রোহী (যারা উপকারীরও অপকারে লিপ্ত থাকে)।[১] সখি, আমি কিন্তু এদের মধ্যেও নেই। যাঁরা আমাকে ভজনা করেন তাঁদেরও আমি ভজনা করি না। কেননা, তাহলে তাঁরা সর্বক্ষণ আমাকেই চিন্তা করতে থাকবে। নির্ধন ব্যক্তি ধনলাভ করে যদি সেই ধন হারিয়ে ফেলে তাহলে সেই ধনেরই চিন্তায় সে সর্বক্ষণ নিমগ্ন থাকে, অন্য চিন্তা ভুলে যায়। তোমরাও ধর্মাধর্ম বিবেচনা না করে আমার জন্য লোক ও জ্ঞাতি পরিত্যাগ করেছ। তোমরা নিরন্তর আমাকেই চিন্তা করবে, এইজন্য আমি অন্তর্হিত হয়েছিলাম, অথচ পরোক্ষে আমি তোমাদেরই ভজনা করেছিলাম। প্রিয়াগণ, আমার প্রতি দোষারোপ করো না। তোমরা দৃঢ়তর গৃহ-বন্ধন ছিন্ন করে আমার সঙ্গে মিলিত হয়েছ, পরম অনুরাগ সহকারে আত্মনিবেদন করেছ। এই মিলনের নিন্দা নেই। দেবতার আয়ু পেলেও তোমাদের প্রত্যুপকার করতে সমর্থ হব না। তাই তোমাদের সুশীলতার গুণেই আমাকে ঋণমুক্ত করো, প্রত্যুপকার করে তোমাদের ঋণশোধ করতে পারব না। ১৭-২২

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা

শুকদেব বললেন, মহারাজ, অতিশয় কোমলচিত্ত গোপীগণ ভগবানের এরকম সান্ত্বনাবাক্য শুনে তাঁর হস্ত ও চরণ গ্রহণ ও তাঁকে আলিঙ্গন করে পূর্ণকাম হয়ে বিরহজনিত সন্তাপ দূর করলেন। সেখানে গোবিন্দ পরস্পর বাহুপাশে আবদ্ধ আনন্দিত গোপীদের সঙ্গে মিলিত হয়ে রাসক্রীড়া আরম্ভ করলেন। গোপীমণ্ডলে অলংকৃত রাসোৎসব আরম্ভ হোল। যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের প্রত্যেক দুজনের

১ গীতায় চার প্রকার ভক্তের উল্লেখ আছে, যথা: আর্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী।—গীতা, ৭।১৬

মধ্যে প্রবেশ করে তাঁদের কণ্ঠধারণ করলে তাঁরা সকলেই কৃষ্ণকে নিকটে মনে করেছিলেন। সেই সময় তা দেখার জন্য সস্ত্রীক উপস্থিত দেবগণের শত শত বিমানে আকাশ আচ্ছন্ন হল। তারপর আকাশে দুন্দুভি বাজতে লাগল ও সেখান থেকে পুষ্পবৃষ্টি হতে লাগল। গন্ধর্বপতিরা পত্নীদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের নির্মল যশোগান করতে লাগলেন। রাসমণ্ডলে প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত গোপীদের বালা, নূপুর ও কিঙ্কিণীর তুমুল ধ্বনি উত্থিত হল। ১-৬

সুবর্ণমণির মধ্যস্থিত মহামরকত নীলমণি যেমন শোভা পায়, গোপীগণ বেষ্টিত ভগবান দেবকীনন্দন রাসমণ্ডলে সেরকম শোভা পেতে লাগলেন। চরণবিন্যাস, হস্ত-সঞ্চালন, হাস্যময় ভ্রূভঙ্গী, স্বাভাবিক কৃশতা হেতু ভগ্নপ্রায় ক্ষীণ কটিদেশ, চঞ্চল স্তনবসন এবং দোদুল্যমান কুণ্ডলগুলি দ্বারা শোভিত কৃষ্ণসমন্বিতা গোপীদের বদন-কমল স্বেদবিন্দুতে আপ্লুত হল। তাঁদের কবরী ও চন্দ্রহার শিথিল হয়ে গেল। তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের গুণগান করতে করতে মেঘশ্রেণীতে বিদ্যুৎচমকের মত শোভা পেতে লাগলেন। নানারাগে অনুরঞ্জিত কণ্ঠ যাঁদের সেই কৃষ্ণানুরাগক্রিয়া গোপীগণ কৃষ্ণ-অঙ্গ স্পর্শে আনন্দিত হয়ে নৃত্য করতে করতে উচ্চস্বরে গান করতে লাগলেন। সেই গানে ব্রহ্মাণ্ড পরিব্যাপ্ত হল। কোন গোপী মুকুন্দের সঙ্গে স্বর না মিশিয়েই ষড়্‌জ প্রভৃতি স্বরের আলাপ করতে লাগলেন। তাতে শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত প্রীত হয়ে সাধুবাদ জানিয়ে প্রশংসা করতে লাগলেন। অন্য এক গোপী ঐ স্বরালাপকেই ধ্রুবতালে পরিণত করে গান করতে লাগলেন; শ্রীকৃষ্ণ তাঁকেও অনেক সম্মান প্রদান করলেন। ৭-১০

রাসক্রীড়ায় পরিশ্রান্ত কোন গোপীর হাতের বালা ও খোঁপার ফুলগুলি শ্লথ হয়ে পড়েছিল। তিনি কৃষ্ণের পাশে গিয়ে তাঁকে বাহুদ্বারা আলিঙ্গন করলেন। তার মধ্যে আর এক গোপী নিজের কাঁধে স্থাপিত, চন্দনচর্চিত ও পদ্ম-গন্ধযুক্ত শ্রীকৃষ্ণের বাহু আঘ্রাণ করে রোমাঞ্চিত হয়ে তা চুম্বন করতে লাগলেন। কোন গোপী নৃত্যে দোলায়মান কুণ্ডলের প্রভায় সমুজ্জ্বল গণ্ডস্থল শ্রীকৃষ্ণের গণ্ডে স্থাপন করলে তিনি তাঁকে চর্বিত তাম্বুল প্রদান করলেন। নৃত্যোগায়নপরায়ণা কোন গোপীর নূপুর ও কটিভূষণের ধ্বনি হচ্ছিল। পরিশ্রান্ত হয়ে তিনি পার্শ্বস্থ শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গলপ্রদ হস্ত নিজের স্তনের উপর ধারণ করলেন। লক্ষ্মীদেবীর একান্ত প্রিয় ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে পেয়ে ও তাঁর বাহুর আলিঙ্গন পেয়ে গোপীরা তাঁর গুণগান করতে করতে বিহার করতে লাগলেন। বালা, নূপুর ও কিঙ্কিণীর ধ্বনি করতে করতে সেসব গোপীই রাসসভায় ভগবানের সঙ্গে নৃত্য করলেন। তখন তাঁদের নিজ নিজ কেশকলাপ থেকে মালা খসে পড়ছিল এবং কর্ণোৎপল, কুন্তলে অলংকৃত গণ্ডস্থল ও স্বেদবিন্দু দ্বারা তাঁদের মুখমণ্ডল এক অপূর্ব শোভা ধারণ করল। এই অনুপম রাস-সভায় ভ্রমরনিকরই গায়ক হয়েছিল। বালক যেমন নিজ প্রতিবিম্বের সঙ্গে খেলা করে, সেরকম লক্ষ্মীপতি শ্রীকৃষ্ণও গোপীদের সঙ্গে পরস্পর আলিঙ্গন, করমর্দন, প্রণয়, অবলোকন, উদ্দাম বিলাস ও হাস্যমুখর হয়ে ক্রীড়া করছিলেন।[১] ১১-১৭

হে কুরুশ্রেষ্ঠ, শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে অঙ্গে গোপীদের প্রকৃষ্ট প্রীতি জন্মাল, তাতে তাঁদের ইন্দ্রিয়গুলি এমন বিবশ হল যে মালা ও অলংকারাদি খসে পড়ল। তাঁরা কেশরাশি, পরিধানের বসন ও বক্ষাবরণী আর ধরে রাখতে পারলেন না। শুধু যে গোপীরা ব্যাকুল হলেন এমন নয়, দেবাঙ্গনারাও শ্রীকৃষ্ণের রাসকেলি দেখে কামপীড়িতা

১ আসলে শ্রীকৃষ্ণ নিজেরই সর্বকলা-কৌশল এবং সুগন্ধলাবণ্য, মাধুর্য—এসব ব্রজাঙ্গনাদের মধ্যে সঞ্চারিত করে তাঁদের সঙ্গে ক্রীড়া করলেন।

হয়ে বিমোহিতা হলেন, আর নক্ষত্রগণের সংগে চন্দ্রও বিস্ময়ান্বিত হলেন। যতসংখ্যক গোপী সেই রাসমণ্ডলে বিহার করছিলেন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আত্মরূপকে তত সংখ্যক করে তাঁদের মধ্যে নানারকম বিলাসে বিহার করতে লাগলেন। গোপীরা অতি বিহারজনিত পরিশ্রমে শ্রান্ত হলে করুণাময় শ্রীকৃষ্ণ সপ্রেমে তাঁর মঙ্গলপ্রদ করকমল দ্বারা তাঁদের মুখ স্পর্শ করলেন। শ্রীকৃষ্ণের নখাদি স্পর্শে হৃষ্টচিত্ত গোপীরা সুধাক্ষরিত হাসি ও প্রেমপূর্ণ কটাক্ষ দ্বারা সেই সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণকে সম্মান জানিয়ে তাঁর পবিত্র গুণগাথা গান করতে লাগলেন। ১৮-২২

পরিশ্রান্ত গজরাজ হস্তিনীদের সহ যেমন জলে প্রবেশ করে, শ্রীকৃষ্ণ সেরকম শ্রম দূর করার জন্য গোপীদের সঙ্গে যমুনায় প্রবেশ করলেন। সে সময় গোপীদের অঙ্গ সংমর্দিত ও স্তনলিপ্ত কুংকুমে অনুরঞ্জিত মালায় আকৃষ্ট হয়ে গন্ধর্বশ্রেষ্ঠদের মত ভ্রমরকুল গান করতে করতে অনুগমন করছিল। যুবতীরা বারবার শ্রীকৃষ্ণকে যমুনার জলে সিঞ্চিত করলেন ও প্রেমপূর্ণ দৃষ্টিতে তাঁকে দেখলেন বিমানচারী দেবতারা পুষ্পবৃষ্টি করে তাঁর স্তুতি করতে লাগলেন। আত্মারাম হয়েও তিনি গজরাজের মত ক্রীড়াপরায়ণ হয়ে যমুনাসলিলে সখীদের সঙ্গে বিহার করতে লাগলেন। মত্ত হস্তী যেমন হস্তিনীদের সঙ্গে ভ্রমণ করে, সেভাবে শ্রীকৃষ্ণ জলজ ও স্থলজ কুসুমের সৌরভে আমোদিত যমুনাতটের উপবনে ভ্রমর ও গোপীদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে বিচরণ করতে লাগলেন। শ্রীকৃষ্ণ সত্যসংকল্প। সুতরাং গোপীগণ তাঁর প্রতি যতই অনুরক্ত হোন না কেন, তাঁর চরমধাতু অঙ্গ থেকে নির্গত হয় নি। কাব্যে বর্ণিত শরৎকালীন যাবতীয় রসের আশ্রয় পূর্ণচন্দ্রের বিমল জ্যোৎস্নায় উজ্জ্বল সেই রাত্রিগুলিতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ক্রীড়া করেছিলেন। ২৩-২৬

রাজা পরীক্ষিৎ বললেন, ভগবান, ধর্ম-সংস্থাপন ও অধর্ম-বিনাশের জন্য ভগবান জগদীশ্বর অংশের (বলরামের) সঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।[1] তিনি স্বয়ং ধর্ম-সেতুর বক্তা, কর্তা ও রক্ষক হয়ে কি ভাবে ধর্মবিরুদ্ধ পরস্ত্রী-সম্ভোগ করলেন? যদুপতি আপ্তকাম হয়েও কি অভিপ্রায়ে এই নিন্দিত কর্ম করলেন? আমাদের এই সংশয় নিবারণ করুন। শুকদেব বললেন, মহারাজ, অগ্নি সর্বভুক্ হয়েও যেমন দোষলিপ্ত হয় না, ঈশ্বরদেরও সে রকম ধর্মমর্যাদা লঙ্ঘন ও সাহস দেখা গেলেও তা দোষণীয় নয়।[2] যাঁরা ঈশ্বর নন, তাঁদের এরকম আচরণ কল্পনা করাও দোষণীয়। রুদ্র ছাড়া অন্যে সমুদ্র-মন্থনে উত্থিত বিষপান করলে বিনষ্ট হত। ঈশ্বরদের বাক্য সত্য, আচরণও কোন কোন সময় সত্য। অতএব, বুদ্ধিমানেরা ঈশ্বরদের যে আচরণ তাঁদের উপদেশের অনুরূপ মাত্র সেই আচরণই করবে। প্রভু, ঐ সব ঈশ্বরদের কোন অহংকার নেই, মঙ্গলানুষ্ঠানে তাঁদের ইহলোকে বা পরলোকে কোন ফলের সম্ভাবনা নেই, পাপাচরণেও তাঁদের কোন অনর্থ হয় না। তাই, যিনি পশুপক্ষী, মানুষ ও দেবতা সমস্ত বিশ্বজীবের নিয়ন্তা, যিনি সমস্ত ঐশ্বর্যের পতি সেই পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের কুশল ও অকুশলের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই, এতে আর আশ্চর্য কি? ২৭-৩৪

যাঁর চরণপদ্ম সেবায় ভক্ত পরিতৃপ্ত, যোগবলে যাঁকে পেয়ে যোগীরা কর্মবন্ধন মুক্ত হন এবং যাঁর তত্ত্ব জেনে জ্ঞানীরা বন্ধনশূন্য হয়ে স্বেচ্ছায় বিচরণ করেন, নিজ ইচ্ছায় লীলা বিগ্রহধারী সেই শ্রীকৃষ্ণের বন্ধন কিভাবে হবে? যিনি গোপীদের, তাঁদের স্বামীদের ও সমস্ত দেহীর অন্তরে বিরাজ করছেন, যিনি বুদ্ধি প্রভৃতির

১ তুলনীয় : যদা যদা হি ধর্মস্য…সম্ভবামি যুগে যুগে ।। গীতা, ৪।৭ ও ৪.৮

২ তুলনীয় : কঠ উপনিষৎ, ২।২।১১ শ্লোক।

সাক্ষী, তিনি লীলার জন্য দেহধারণ করেছিলেন। জীবের মঙ্গলের জন্য মানুষের মূর্তি গ্রহণ করে তিনি ঐভাবে নানারকম ক্রীড়া করে থাকেন যা শ্রবণ করে যে কেউ ভগবৎপরায়ণ হতে পারে। মহারাজ, শ্রীকৃষ্ণের মায়ায় মোহিত হয়ে ব্রজবাসীরা স্ত্রীদের নিজ নিজ পাশে অবস্থিত মনে করে তাঁর প্রতি হিংসা করেন নি। তারপর ভগবৎপ্রিয় গোপীরা ব্রাহ্মমুহূর্তের সময় তাঁর অনুমোদনে অনিচ্ছা সত্ত্বেও নিজ নিজ গৃহে ফিরে গেলেন। ব্রজবধূদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের এই রাসক্রীড়া যিনি শ্রদ্ধার সঙ্গে শ্রবণ ও কীর্তন করবেন, তিনি ভগবানে অচলা ভক্তি লাভ করে ধীরচিত্তে অবিলম্বে কামরূপ মানসিক পীড়া থেকে মুক্ত হতে পারবেন। ৩৫-৪০

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়

সুদর্শন-উদ্ধার ও শংখচূড়-বধ

শুকদেব বললেন, মহারাজ, দেবযাত্রার (শিবরাত্রি) সময় উপস্থিত হলে নন্দ প্রভৃতি গোপগণ কৌতূহলভরে গরু-গাড়ী করে অম্বিকা বনে গেলেন। সেখানে তাঁরা সরস্বতী নদীতে স্নান করে নানা উপকরণে দেবদেব পশুপতি ও অম্বিকা দেবীর পূজা করলেন। দেবতা আমাদের প্রতি প্রসন্ন হোন, এই প্রার্থনায় সকলে ব্রাহ্মণদের সাদরে গাভী, সোনা, বস্ত্র, মধু ও মধুযুক্ত অন্ন দান করলেন। নন্দ, সুনন্দ প্রভৃতি মহাভাগ্যবান গোপেরা উপবাস করে সে রাত্রে সরস্বতীর তীরে বাস করলেন। সেই বনের ক্ষুধার্ত এক বিশাল সাপ এসে শায়িত নন্দকে আক্রমণ করতে উদ্যত হল। সাপের কবলে পড়ামাত্র 'কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, এক মহাসাপ আমাকে গ্রাস করছে, আমার জীবন বিপন্ন, বৎস, আমাকে মুক্ত কর'—এই বলে চিৎকার করতে লাগলেন। নন্দের আর্তনাদ শুনে গোপগণ তৎক্ষণাৎ উঠলেন ও তাঁকে সর্পগ্রস্ত দেখে বিভ্রান্ত হয়ে জ্বলন্ত কাঠ দিয়ে সাপটিকে তাড়া করতে লাগলেন। জ্বলন্ত কাঠ দ্বারা তাড়িত হয়েও সাপটি নন্দরাজকে পরিত্যাগ করল না তখন ভক্তের পতি ভগবান কাছে এসে সেই সাপটিকে শ্রীচরণ দিয়ে স্পর্শ করলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণস্পর্শে সাপটির অশুভ দূর হল এবং সে সর্পযোনি ত্যাগ করে অপূর্ব বিদ্যাধর দেহ ধারণ করল। তারপর দীপ্যমান কলেবর, স্বর্ণমালাধারী সেই পুরুষকে প্রণত দেখে শ্রীকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করলেন, পরম রমণীয় অপূর্ব শোভা ধারণ করে উপস্থিত হয়েছেন, আপনি কে? কি কারণেই বা আপনি এই সর্পযোনি পেলেন? ১-১১

সে বলল, আমি সুদর্শন নামে প্রসিদ্ধ এক বিদ্যাধর ছিলাম। নিজ শোভা ও দেহের সৌন্দর্যে সমৃদ্ধ ও দীপ্ত হয়ে একদিন আমি বিমানে বিচরণ করতে করতে অঙ্গিরার বংশধর কদাকার ঋষিদের উপহাস করেছিলাম। তাঁদের অভিশাপে আমি এই সর্পযোনি পেয়েছি। সেই দয়ালু ঋষিরা আমার প্রতি কৃপাপরবশ হয়েই আমাকে অভিশাপ দিয়েছিলেন, যে জন্য আজ আপনার ত্রিলোকবন্দিত চরণ স্পর্শ করতে পেরে শাপমুক্ত হলাম। হে দুঃখনাশন, ভবভয়ভঞ্জন এখন অনুমতি করুন আমি নিজলোকে ফিরে যাই। হে মহাযোগী, পুরুষোত্তম, সজ্জনপালক, আমি শরণাগত। হে সকল ঈশ্বরদের ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ আমাকে ফিরে যেতে অনুমতি দিন। হে অচ্যুত, আপনাকে দেখামাত্র আমি ব্রহ্মদণ্ড থেকে মুক্তিলাভ করলাম।

যাঁর নামকীর্তন করে লোকে শ্রোতাদের ও নিজেদের মুহূর্তে পবিত্র করে, তখন সেই আপনার পাদস্পর্শে আমি যে পবিত্র হয়েছি, তাতে আর আশ্চর্য কি ? ১২-১৭

শুকদেব, সুদর্শন এইভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অনুমতি নিয়ে তাঁকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করে স্বর্গে ফিরে গেল, নন্দরাজও ক্লেশমুক্ত হলেন। ব্রজবাসীরা শ্রীকৃষ্ণের অসাধারণ বৈভব দেখে বিস্মিত হলেন এবং সেখানে ব্রত সমাপন করে সাদরে কৃষ্ণকথা বলতে বলতে ব্রজে ফিরে এলেন। ১৮-১৯

তারপর কোন এক সময়ে অদ্ভুত বিক্রমশালী শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম ব্রজাঙ্গনাদের সঙ্গে এক রাত্রে বনবিহার করছিলেন। তাঁরা সুন্দর অলংকার, চন্দনাদি সুগন্ধের অনুলেপন, মালা ও নির্মল বসনে শোভিত ছিলেন। প্রীতিপরায়ণা গোপীরা সুললিত স্বরে তাঁদের গুণগান করতে লাগলেন। তখন আকাশে চন্দ্র ও তারারাজি শোভা পাচ্ছিল। কুসুমগন্ধে সুরভিত বাতাস মৃদুমন্দ বইছিল। রাম-কৃষ্ণ এরূপ সন্ধ্যার শুভাগমনে উৎফুল্ল হয়ে সেই সৌন্দর্যবর্ণনায় মুখর হয়ে উঠলেন। তাঁরা সাধারণের শ্রুতিসুখকর সুর সৃষ্টি করে সেখানকার সকল প্রাণীর তুষ্টি বিধান করে গান করতে লাগলেন। সেই মনোহর গীতি শুনে আত্মহারা গোপাঙ্গনাদের দেহ থেকে যে বস্ত্র ও মালা খসে পড়ল তারা তা জানতেও পারলেন না। ২০-২৪

এভাবে গান করতে করতে রাম-কৃষ্ণ যখন নিজেদের ইচ্ছামত ক্রীড়া করছেন তখন শংকচূড় নামে কুবেরের এক অনুচর সেখানে উপস্থিত হয়ে রাম ও কৃষ্ণকে উপেক্ষা করেই তাঁদের সামনে তাঁদের একান্ত অনুগত ব্রজসুন্দরীদের উত্তর দিকে তাড়িয়ে নিয়ে চলল। শংখচূড়ের তাড়নায় ব্যাকুল হয়ে ব্যাঘ্রতাড়িত গাভীদের মত ব্রজনারীদের আর্ত চিৎকার করতে দেখে দুভাই তাঁদের দিকে ছুটে গেলেন। 'তোমরা ভয় করো না' এই অভয়বাক্য বলতে বলতে রাম-কৃষ্ণ শালবৃক্ষ হাতে নিয়ে দ্রুত পলায়নপর সেই যক্ষের দিকে ছুটলেন। সেই মূঢ় শংখচূড় কাল ও মৃত্যুর মত রাম ও কৃষ্ণকে আসতে দেখে প্রাণভয়ে রমণীদের পরিত্যাগ করে পালাতে শুরু করল। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তার মাথার মণিটি নেবার জন্য সর্বত্র তার পশ্চাদ্ধাবন করতে লাগলেন। বলরাম স্ত্রীদের রক্ষকরূপে থাকলেন। বিভু শ্রীকৃষ্ণ কিছুক্ষণের মধ্যে তাঁর কাছে উপস্থিত হলেন। তাঁর একটি মুষ্টির আঘাতেই দুরাত্মা শংখচূড়ের চূড়ামণি সহ মস্তক মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। তারপর রমণীদের সামনেই উজ্জ্বল রত্নটি এনে কৃষ্ণ অগ্রজ বলরামের হাতে দিলেন। ২৫-৩২

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে গোপীগণের বিলাপ

শুকদেব বললেন, মহারাজ, ব্রজাঙ্গনাদের রাত্রিভাগ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে বিহারে পরম সুখে অতিবাহিত হত। কিন্তু দিনের বেলা তিনি বনে গেলে গোপীদের মন তাঁর প্রতি ধাবিত হত। তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের লীলা-কীর্তন করে কোন রকমে কষ্টে দিন যাপন করতেন। তাঁরা বলতেন, সখীগণ, বামবাহুমূলে বামকপোল স্থাপন করে, ভ্রূযুগল নাচাতে নাচাতে অধরযুক্ত বাঁশির সপ্তস্বর-ছিদ্রে তাঁর কোমল অঙ্গুলি সঞ্চালিত করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন মুরলীধ্বনি করেন তখন সেই ধ্বনি শুনে

সিদ্ধদের নিকটে থেকেও সিদ্ধাঙ্গনাদের প্রথমে বিস্ময় জাগে। তারপর তাঁরা মোহিত ও চঞ্চলচিত্ত হওয়ায় লজ্জিত হন, কারণ তাদের বস্ত্র শিথিল হয়ে গেলেও তাঁরা বস্ত্রবন্ধন করতে ভুলে যান। অবলাগণ, আরেকটি আশ্চর্য ঘটনা শোন। যাঁর বক্ষে লক্ষ্মী স্থির সৌদামিনীর মত বিরাজ করছেন, এবং যিনি আর্তজনের আনন্দ দান করেন, সেই নন্দনন্দন যখন বাঁশি বাজান তখন দূরে থাকলেও ব্রজের বৃষ, মৃগ ও গাভীরা তৃণগ্রাস মুখে করে এবং কান উঁচু করে নিদ্রিত ও চিত্রার্পিতের মত দাঁড়িয়ে থাকে। গোবিন্দ, বলরাম ও গোপালদের সঙ্গে ময়ূরপুচ্ছ, গৈরিকাদি ধাতু ও নানা পত্র-পল্লবে মল্লদের বেশ ধারণ করে যখন সেই গরুগুলিকে আহ্বান করেন, তখন তাঁর চরণরেণু আকাঙ্ক্ষা করে নদীগুলির গতিভঙ্গ হয়। কিন্তু মনে হয় আমাদের মত তাদের পুণ্যও ক্ষীণ, কারণ প্রেমবশে তাদের তরঙ্গরূপ দেহ একবার মাত্র কম্পিত হয়, কিন্তু পরক্ষণেই আমাদের অশ্রুর মতই তারাও নিশ্চল হয়ে পড়ে। ১-৭

আদিপুরুষের মত তাঁর কাছে লক্ষ্মীও নিশ্চলা। দেবতারা তাঁর পরাক্রম-গাথা কীর্তন করে থাকেন। তিনি বনে গিয়ে যখন গিরিতটে বিচরণকারী গাভীদের বাঁশি বাজিয়ে আহ্বান করেন, তখন বনের ফুল-ফলের ভারে অবনত লতাগুলি প্রেমে পুলকিত হয়ে অবিরল ধারে মধু বর্ষণ করতে থাকে। বনমালায় স্থিত দিব্যগন্ধ তুলসীর মধুপানে মত্ত অলিকুল যে উচ্চ ঝংকার করে, যেন তারই সমাদর করে শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণ অধরে বেণু ধারণ করেন। মনোহর সেই বেণুরবে আকৃষ্ট হয়ে সরোবরের হাঁস প্রভৃতি বিহঙ্গরা তাঁর কাছে এসে একাগ্রচিত্তে বসে বেণু শোনে। অন্যের কথা আর কি বলব? সখীগণ, মেঘেরাও হরিকে সম্মান করে তাঁর উপরে ছায়া বিস্তার করে দেয়। সে সময় মালার বর্ণভূষণে ভূষিত হয়ে বলরামের সঙ্গে আনন্দে গোবর্ধন পর্বতের সানুদেশ হর্ষিত করে মুরলীধ্বনিতে তিনি জগৎ পূর্ণ করেন। মেঘেরা সেই বাঁশির শব্দের সঙ্গে মিলিয়ে মৃদুমন্দ গর্জন করে। যশোদা, তোমার পুত্র নানা রকম গোপক্রীড়ায় নিপুণ। তিনি যখন বেণুবাদ্য বিষয়ে নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়ে নানা স্বরে আলাপ করতে থাকেন, তখন ইন্দ্র, মহাদেব, ব্রহ্মা প্রভৃতি সুরেশ্বরেরাও মন্দ্র-মধ্যমাদির স্বরালাপ শুনে মোহগ্রস্ত হন। বেণু নির্গত ধ্বনির রাগে তাঁদের গ্রীবা ও চিত্ত আনত হয়ে পড়ে। তাঁরা ঐ সব স্বরলিপির ভেদ নিশ্চয় করতে পারেন না। সখী, গজগামী শ্রীকৃষ্ণ যখন পদ্ম, ধ্বজ, বজ্র, অঙ্কুশ চিহ্নিত তাঁর পাদপদ্মের ধুলায় ব্রজভূমির গোক্ষুর-প্রহারজনিত ব্যথা বাঁশি বাজিয়ে শান্ত করে গজেন্দ্র-গমনে ভ্রমণ করেন, তখন তাঁর বিলাস-বঙ্কিম কটাক্ষে আমাদের কামবেগ সৃষ্টি হয়। আমরা বৃক্ষবৎ জড় হই, মোহে বস্ত্র ও কবরীবন্ধন স্খলিত হলেও তা জানতে পারি না। ৮-১৭

তিনি গাভী গণনার জন্য মণিগাঁথা মালায় শোভিত হয়ে যখন প্রিয় অনুচরের কাঁধে হাত রেখে চারদিকে গরু গুনতে গুনতে গান করেন, তখন তাঁর বেণুরবে হৃষ্টচিত্ত হরিণীরা গুণসাগর শ্রীকৃষ্ণের কাছে ছুটে আসে ও ব্রজাঙ্গনাদের মত সবকিছু জলাঞ্জলি দিয়ে তাঁর কাছেই অবস্থান করে। হে নিষ্পাপ যশোদা, কুন্দফুলের মালায় বিভূষিত তোমার পুত্র কৃষ্ণ গাভী ও গোপসমূহে পরিবৃত হয়ে প্রণয়ীদের মনে আনন্দ সঞ্চার করতে করতে যখন যমুনাপুলিনে ভ্রমণ করেন, তখন মৃদুমন্দ চন্দনের মত সুরভিত ও শীতল বাতাস শ্রীকৃষ্ণের সম্মানে অনুকূল হয়ে বইতে থাকে এবং গন্ধর্বাদি উপদেবতারা স্তুতি করে গান-বাজনা ও নানা উপকরণ দ্বারা চারদিকে তাঁর উপাসনা করেন। সখি, এখন দিনের অবসান হচ্ছে। ঐ দেখ দেবকী-জঠরজাত গোকুলচন্দ্র সুহৃদজনের মনোরথ পূর্ণ করার জন্য দিনান্তে গোধন একত্রিত

করে বেণু বাজাতে বাজাতে আসছেন। পরম দয়ালু তিনি গোবর্ধন গিরি ধারণ করেছিলেন। তাই ব্রজে যে গাভীরা আবদ্ধ রয়েছে তাদের প্রতি তিনি সদয় হয়েছেন। পথে ব্রহ্মাদি দেবতাগণও তাঁর চরণ বন্দনা করছেন। ঐ শোন, অনুচরেরা তাঁর কীর্তি গান করছেন। দেখ, দেখ, তাঁর মনোহর কান্তি গোচারণ শ্রান্তিতে ম্লান হয়েছে, তবু তাঁর দৃষ্টিতে আনন্দধারা বইছে। তাঁর মালাগুলি গাভীদের খুরে-ওঠা ধূলিতে ধূসর হয়েছে। ঐ দেখ, দিনান্তে নিশাপতি চন্দ্রের তুল্য যদুপতি শ্রীকৃষ্ণ ব্রজের গাভী-সকলের মত আমাদেরও সারাদিনের বিরহসন্তাপ দূর করতে এগিয়ে আসছেন। তাঁর নয়নযুগল অভিমানের মদ-বিহ্বলতায় ঈষৎ ঘূর্ণিত হচ্ছে। তাঁর গলায় বনমালা, গণ্ডস্থল কর্ণকুণ্ডলে শোভমান আর বদরীফলের ন্যায় মুখমণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করেছে। এভাবে কৃষ্ণলীলা গান করে কৃষ্ণগত-জীবন ও কৃষ্ণগত-মন ব্রজাঙ্গনারা দিবাভাগের বিরহেও যে আনন্দ লাভ করতেন তা তাঁদের পক্ষে মহা উৎসব স্বরূপ ছিল। ১৮-২৬

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়

অরিষ্টাসুর বধ ও কংসের আদেশ

শুকদেব বললেন, মহারাজ, তারপর শ্রীকৃষ্ণ যখন একদিন গোষ্ঠে ফিরছিলেন, তখন অরিষ্ট নামে এক অসুর বিশালকায় বৃষের আকার ধারণ করে, খুর দিয়ে পৃথিবীকে ক্ষতবিক্ষত ও কম্পিত করে গোষ্ঠের দিকে এগিয়ে এল। চোখ বিস্ফারিত করে বিকট শব্দে সে চরণ দ্বারা ভূমি বিদীর্ণ করছিল। পুচ্ছ তুলে শিংয়ের অগ্রভাগ দিয়ে সে উঁচু মাটির স্তূপে উৎক্ষিপ্ত করছিল। মাঝে মাঝে সে মলমূত্রও ত্যাগ করছিল। তার শব্দ এমনই ভয়ানক যে তাতে অকালে গাভী ও নারীদের গর্ভস্রাব ও গর্ভপাত হয়ে যেত। মেঘগুলি পর্বতভ্রমে তার ককুদে প্রবেশ করত। অত্যন্ত তীক্ষ্ণ শিংযুক্ত ঐ বৃষকে দেখে গোপ-গোপীরা এবং বনের পশুরা ভয় পেয়ে দলে দলে গোকুল ত্যাগ করতে লাগল। গোকুলবাসীরা 'হে কৃষ্ণ, হে কৃষ্ণ, রক্ষা কর' বলে সকলেই গোবিন্দের শরণাপন্ন হল। ভয়বিহ্বল গোকুলকে উদ্দেশ করে 'ভয় পেয়ো না' এই আশ্বাস দিয়ে শ্রীকৃষ্ণ বৃষাসুরকে আহ্বান করে বললেন, রে মূঢ় দুর্বুদ্ধি, তোর মত দুষ্ট দুরাত্মাদের শাসনকর্তা আমি বর্তমান থাকতে অনর্থক পশু ও গোপালদের ভয় দেখাচ্ছিস কেন? ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বাহু প্রসারিত করে জোরে হাততালি দিয়ে অরিষ্টের ক্রোধসঞ্চার করলেন এবং সখার কাঁধে সর্পাকৃতি বাহু স্থাপন করে অপেক্ষা করতে লাগলেন। অরিষ্টাসুরও এতে আরো ক্রুদ্ধ হয়ে খুর দিয়ে মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে ও উৎক্ষিপ্ত পুচ্ছ দিয়ে মেঘমণ্ডল ঘূর্ণিত করে মহাক্রোধে শ্রীকৃষ্ণের দিকে এগিয়ে এল। শিং উঁচু করে ও রক্তচক্ষু বিস্ফারিত করে, বক্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করতে করতে ইন্দ্র-নিক্ষিপ্ত বজ্রের মত সে প্রচণ্ড বেগে কৃষ্ণের দিকে দৌড়ে এল। ১-১০

শ্রীকৃষ্ণ তার শিং দুটি ধরে, হাতী যেমন প্রতিদ্বন্দ্বী হাতীকে নিক্ষেপ করে সেরকমভাবে, তাকে আঠারো পা দূরে ছুঁড়ে ফেললেন। এভাবে আহত হয়ে সেই অসুর উঠে ঘর্মাক্ত দেহে ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে আবার অন্ধ আক্রোশে শ্রীকৃষ্ণের দিকে ছুটে গেল। বৃষাসুর কাছে এলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তার

শিং দু'টি ধরে পা দিয়ে আক্রমণ করে তাকে মাটিতে ফেলে সিক্ত বস্ত্রের মত নিষ্পেষিত করতে লাগলেন। পরে তার শিং দু'টি উপড়ে ফেলে, তা দিয়ে তাকে আঘাত করলেন। এতেই অসুর ভূপতিত হল। পতিত হয়ে সে রক্তবমি ও মলমূত্র ত্যাগ করল, তার চারটি পা ইতস্তত ছটফট করতে লাগল আর চোখ ঘুরতে লাগল। এইরকম কষ্টভোগ করে সে যমালয়ে গেলে দেবতারা পুষ্পবৃষ্টি করতে করতে শ্রীহরির স্তব করতে লাগলেন। গোপীদের নয়নাভিরাম শ্রীকৃষ্ণ এভাবে বৃষাসুরকে বধ করে ও স্বজাতি গোপদের দ্বারা স্তুত হয়ে বলরামের সঙ্গে গোষ্ঠে প্রবেশ করলেন। ১১-১৫

অদ্ভুতকর্মা শ্রীকৃষ্ণ গোষ্ঠে অরিষ্টকে সংহার করার পর ভগবান নারদ কংসের কাছে এসে বলতে লাগলেন, দেবকীর (অষ্টম গর্ভের) কন্যারূপে যিনি প্রসিদ্ধ তিনি যশোদার গর্ভজাত দেবকীর পুত্র শ্রীকৃষ্ণ আর রোহিণীপুত্র বলরামও দেবকীর (সপ্তম গর্ভের) সন্তান। ভয়ে বসুদেব দুই পুত্রকে আপন বন্ধু নন্দের কাছে রেখে এসেছেন। তোমার অনুচররা তাদের দ্বারা বিনষ্ট হয়েছে। ভোজরাজ কংস এই বৃত্তান্ত শুনে ক্রোধে অস্থির হয়ে বসুদেবকে বধ করার জন্য শাণিত খড়্গ গ্রহণ করল। কিন্তু নারদ তাকে নিবারণ করলেন। তখন বসুদেবের পুত্র দু'টিই তার মৃত্যুর কারণ হবে জানতে পেরে সে সস্ত্রীক বসুদেবকে লৌহময় শৃঙ্খলে বন্ধন করল। দেবর্ষি নারদ চলে গেলে কংস কেশী নামক দৈত্যকে ডেকে বলরাম ও কৃষ্ণকে বধ করবার আদেশ দিয়ে তাকে ব্রজে পাঠাল। তারপর সে মুষ্টিক, চাণূর, শল, তোশলক প্রভৃতি মন্ত্রী এবং হস্তীপালকদের ডেকে বলল, মহাবীর চাণূর, মহাবীর মুষ্টিক, তোমরা আমার কথা শোন। বসুদেবের পুত্র বলরাম ও কৃষ্ণ নন্দব্রজে বাস করছে, তাদের হাতেই আমার মৃত্যু নির্দিষ্ট। অতএব তারা এখানে উপস্থিত হলে তোমরা মল্লযুদ্ধে তাদের সংহার করবে। মল্লযুদ্ধক্ষেত্রের চারদিকে নানারকম মঞ্চ নির্মাণ কর, পুরবাসী ও দেশবাসী সকলেই এই মল্লযুদ্ধ দেখুক। তোমরা রঙ্গদ্বারে কুবলয়াপীড় হস্তীকে রেখে তার দ্বারা আমার শত্রু দু'টিকে বধ কর। চতুর্দশী তিথিতে যথাবিহিত ধনুর্যজ্ঞ আরম্ভ কর ও বরদাতা ভূতরাজের উদ্দেশ্যে যজ্ঞীয় পশুদের বলি দাও। এরকম উপদেশ দিয়ে রাজনীতিজ্ঞ কংস যদুশ্রেষ্ঠ অক্রূরকে ডেকে তাঁর হাতে হাত রেখে বলতে লাগল, অক্রূর, তুমি আমার সুহৃদ, সুহৃদের জন্য একটি কাজ কর। ভোজ ও বৃষ্ণি বংশে তুমি ছাড়া আমার আর কেউ হিতকামী বন্ধু নেই। তাই ক্ষমতাশালী ইন্দ্র যেমন বিষ্ণুকে আশ্রয় করে নিজের কাজ সাধন করেছিলেন, আমিও সেরকম এক গুরুতর কার্য-সিদ্ধির জন্য তোমাকে আশ্রয় করলাম। তুমি নন্দব্রজে যাও। সেখানে বসুদেবের দুই পুত্র আছে, এই রথে তাদের এখানে নিয়ে এস, দেরি করো না। ১৬-৩০

বিষ্ণু যাঁদের আশ্রয়, সেইসব দেবতারা তাদের দু'জনকে আমার মৃত্যুরূপে সৃষ্টি করেছেন। উপহার-উপঢৌকন ইত্যাদি নিয়ে যাও এবং নন্দ প্রভৃতি গোপদের সঙ্গে তাদের দু'জনকে এখানে নিয়ে এস। তাদের এখানে এনে আমি কালরূপ হস্তীদ্বারা বধ করাব। যদি তা থেকে তারা অব্যাহতি পায় তাহলে বজ্রসদৃশ মল্লদের দিয়ে তাদের হত্যা করাব। তারা দু'জন নিহত হলে শোকসন্তপ্ত বসুদেব প্রভৃতি এবং তাদের বৃষ্ণি, ভোজ ও দশার্হবংশীয় বান্ধবদের হত্যা করব। রাজ্য-লোভী বৃদ্ধ পিতা উগ্রসেন, তাঁর ভাই দেবক এবং অন্যান্য যারা আমার বিদ্বেষী তাদেরও বধ করব। বন্ধু, তাহলে এই পৃথিবী নিষ্কণ্টক হবে। পূজনীয় শ্বশুর জরাসন্ধ আমার গুরু, বানররাজ দ্বিবিদ আমার প্রিয় সখা আর শম্বর, নরক, বাণ প্রভৃতি রাজারা আমার সঙ্গে সৌহার্দ্য স্থাপন করেছে। আমি এদের দ্বারা দেবপক্ষীয়

রাজাদের বধ করে সুখে পৃথিবী ভোগ করব। আমার এই মনের কথা বুঝে তুমি ধনুর্যজ্ঞ ও যদুপুরীর শোভা দেখানোর উদ্দেশ্যে রাম-কৃষ্ণ বালক দুটিকে শীঘ্র এখানে নিয়ে এস। অক্রূর বললেন, মহারাজ, বিচার করে তুমি যা স্থির করেছ তা ভালই হয়েছে। এই উপায়ে তোমার মৃত্যু নিবারিত হবে। কিন্তু সিদ্ধি ও অসিদ্ধি সমানভাবে চিন্তা করা উচিত।[১] কারণ দৈবই ফল সাধন করে। উচ্চাভিলাষগুলি দৈবদ্বারা প্রতিহত হয়, তবু লোকে অভিলাষ করে আনন্দ, দুঃখ এ-সব ভোগ করে। যহোক, আমি তোমার আজ্ঞা পালন করব। ৩১-৩৯

শুকদেব বললেন, কংস মন্ত্রীদের ও অক্রূরকে এ-রকম আদেশ দিয়ে বিদায় করে আপনার ঘরে প্রবেশ করল আর অক্রূরও স্বগৃহে ফিরে গেলেন। ৪০

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়

কেশী ও ব্যোমাসুর বধ

শুকদেব বললেন, মহারাজ, কংসপ্রেরিত দৈত্য কেশী বিশাল অশ্বমূর্তি ধরে হ্রেষারবে ও খুরের আঘাতে পৃথিবী বিদীর্ণ করতে করতে সকলের ত্রাস সৃষ্টি করল। সে তার কেশরের আঘাতে আকাশের মেঘ ও বিমানগুলিকে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত করতে করতে নন্দের ব্রজমণ্ডলে প্রবেশ করল। সেই কেশীদৈত্যের চোখ দুটি বিশাল, মুখগহ্বর বিকট, গলদেশ স্থূল ও দীর্ঘ, গাত্রবর্ণ কৃষ্ণবর্ণ মেঘের ন্যায়। এই দুষ্ট দৈত্য কংসের মঙ্গল কামনায় নন্দরাজের ব্রজধাম কাঁপিয়ে উপস্থিত হল। কেশী তার হ্রেষারবে গোকুলকে ভীত এবং পুচ্ছ ও কেশরে নভোমণ্ডল আচ্ছন্ন করে ভীমবেগে যুদ্ধের জন্য শ্রীকৃষ্ণকে অন্বেষণ করতে লাগল। তখন শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বেরিয়ে এসে সিংহের মত গর্জন করে তাকে আহ্বান করলেন। শ্রীকৃষ্ণকে দেখতে পেয়ে সে আকাশ গ্রাস করার মত মুখব্যাদান করে তাঁর দিকে ছুটে এল। প্রচণ্ড বেগশালী দুরতিক্রমা সেই অসুর পেছনের দুই পা দিয়ে শ্রীকৃষ্ণকে আঘাত করতে এল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অবলীলাক্রমে সেই আঘাত এড়িয়ে গেলেন। তখন অসুর আবার আঘাত করতে চেষ্টা করলে তিনি দুই হাতে তার পা দুটি ধরে ঘোরাতে ঘোরাতে, গরুড় যেমন সাপকে ছুঁড়ে ফেলে সে রকম অনায়াসে, তাকে শতধনু দূরে ছুঁড়ে ফেলে স্থির হয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন। অসুর কিছুক্ষণ পর সংজ্ঞা ফিরে পেয়ে আবার উঠে পড়ল এবং ক্রোধে মুখবিকৃত করে অতিবেগে শ্রীকৃষ্ণের দিকে দৌড়ে এল। তখন শ্রীকৃষ্ণও সাপের গর্তপ্রবেশের মত অনায়াসে পলকে তার মুখ-গহ্বরের মধ্যে নিজের হাত ঢুকিয়ে দিলেন। তপ্ত লোহার স্পর্শের মত শ্রীকৃষ্ণের বাহুস্পর্শে তার দাঁতগুলি খসে পড়ল। অচিকিৎসত স্ফীতোদর রোগের মত কেশীর মুখবিবরে কৃষ্ণ-বাহু ক্রমশ বেড়ে উঠতে লাগল। তাঁর ক্রম-বর্ধনশীল বাহুর চাপে অসুরের নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এল। সে ঘর্মাক্ত দেহে, চোখ উপরে তুলে, পা ইতস্তত ছুঁড়ে ও বিষ্ঠা ত্যাগ করতে করতে প্রাণহীন অবস্থায় মাটিতে পড়ে গেল। কাঁকুড় পাকলে যেমন আপনি ফেটে যায় কেশীর দেহও সেরকম বিদীর্ণ হল। মহাবাহু শ্রীকৃষ্ণ তার দেহ থেকে অনায়াসে নিজের হাত বের করে নিলেন। নিতান্ত অবহেলায় শত্রুসংহার করে শ্রীকৃষ্ণ নিরভিমানে অবস্থান করতে

[১] তুলনীয়ঃ সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা··· ।। গীতা, ২।৪৮

লাগলেন এবং দেবতারা বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে পুষ্পবৃষ্টি সহকারে তাঁর স্তব করতে লাগলেন। ১-৯

ভাগবতপ্রধান দেবর্ষি নারদ অক্লিষ্টকর্মা শ্রীকৃষ্ণের কাছে উপস্থিত হয়ে নির্জনে তাঁকে বললেন, জগদীশ্বর, সর্বাশ্রয়, যদুশ্রেষ্ঠ বাসুদেব, কাঠের মধ্যে জ্যোতির মত আপনি সর্বভূতের অভ্যন্তরে আত্মরূপে অবস্থিত রয়েছেন, আপনি গূঢ়, বুদ্ধিরও অগোচর, সর্বসাক্ষী, পরমপুরুষ পরমেশ্বর।[১] স্বতন্ত্র, সত্য-সংকল্প ঈশ্বর আপনি। প্রথমে মায়াদ্বারা আপনি গুণের সৃষ্টি করেছেন। পরে ঐ গুণসমূহ দিয়ে আপনি বিশ্বের সৃষ্টি, পালন ও সংহার করছেন। সেই আপনি রাজরূপী দৈত্য, প্রমথ ও রাক্ষসদের ধ্বংস এবং সাধুদের রক্ষা করার জন্যই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছেন।[২] আমাদের কী সৌভাগ্য, যার প্রচণ্ড হ্রেষারবে সন্ত্রস্ত হয়ে দেবতারাও স্বর্গ ত্যাগ করেছেন সেই অশ্বাকৃতি দৈত্যকে আপনি অবলীলাক্রমে সংহার করলেন। আগামীদিনে দেখতে পাব যে, আপনি চাণূর, মুষ্টিক, অন্যান্য শত্রু, হস্তী এবং এমনকি কংসকেও সংহার করেছেন। হে জগৎপতি, তারপর শঙ্খ-যবন-মুর-নরকাসুরদের নিধন, পারিজাত হরণ উপলক্ষে দেবরাজ ইন্দ্রের পরাজয়, আপন বীর্য ও বীরত্ব দ্বারা বীর কন্যাদের সঙ্গে বিবাহ, দ্বারকায় নৃগরাজের শাপমোচন, ভার্যা জাম্ববতীর সঙ্গে স্যমন্তকমণি সংগ্রহ, যমপুরী থেকে ব্রাহ্মণের মৃতপুত্র আনয়ন, পৌণ্ড্রক-বধ, কাশীপুরীর দহন, রাজসূয় মহাযজ্ঞে শিশুপাল ও দন্তবক্রের নিধন ইত্যাদি আপনার অনুষ্ঠিত কাজগুলি আমরা দেখতে পাব। আপনি দ্বারকায় বাস করে যে সমস্ত বিক্রম প্রকাশ করবেন তাও দেখতে পাব; পৃথিবীতে কবিগণ কর্তৃক কীর্তনীয় সমস্ত লীলাই আমি দেখতে পাব। শেষে ভূভার-হরণকারী কালরূপী আপনি অর্জুনের সারথি হয়ে যে অক্ষৌহিণী সেনা সংহার করবেন তাও দেখব। আপনি বিশুদ্ধজ্ঞান ও পূর্ণকাম, আপনি সর্বশ্রেষ্ঠ ও পরম আশ্রয়, আপনি গুণময়ী মায়াকে নিজ অধীনে চিরকাল রেখেছেন। ভগবান্, আমি আপনার শরণ নিলাম। আপনি লীলার জন্য মানুষের দেহ ধারণ করেন। যদু, বৃষ্ণি ও সাত্বতকুলের শ্রেষ্ঠ স্বামী ও ঈশ্বর আপনাকে প্রণাম করি। ১০-২৪

শুকদেব বললেন, মহারাজ, শ্রীকৃষ্ণের দর্শনলাভে ভক্তশ্রেষ্ঠ দেবর্ষি নারদের আনন্দ জন্মেছিল। তিনি এভাবে যদুপতিকে প্রণাম করে তাঁর অনুমতি নিয়ে প্রস্থান করলেন। ভগবান গোবিন্দও যুদ্ধে কেশীকে বধ করে ব্রজবাসীদের আনন্দ বিধান করে প্রসন্নচিত্তে গোপালদের সঙ্গে পশুপালন করতে লাগলেন। এক সময় সেই সব গোপালেরা পর্বতের সানুদেশে পশুচারণ করতে করতে চোর ও পশুপালকের অনুকরণ করে লুকোচুরি খেলতে লাগল। সেই খেলায় কেউ চোর, কেউ পশুপালক, কোন বালক মেষ হয়ে নির্ভয়ে খেলতে লাগল। ময়দানবের পুত্র মহামায়াবী ব্যোমাসুর পশুপালকের রূপ ধরে এসে খেলায় চোর হয়ে যোগ দিয়ে অনেক গোপ-বালককে হরণ করতে লাগল। ক্রমে ক্রমে ব্যোমাসুর গোপ-বালকদের পর্বত-গুহায় রেখে পাথর চাপা দিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল। এভাবে মাত্র চার পাঁচটি বালক অবশিষ্ট রইল। সাধুদের শরণদাতা শ্রীকৃষ্ণ তার সেই দুষ্কর্মগুলি জানতে পারলেন। সিংহ যেমন নেকড়েকে ধরে তিনিও সেরকম তাকে সবলে ধরলেন। সেই অসুরও মহাবল; নিজেকে মুক্ত করার জন্য সে পর্বতপ্রমাণ দেহ ধারণ করল। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ এত শক্তভাবে তাকে ধরলেন যে সেই চাপে সে খুবই

১ তুলনীয়: কঠ উপনিষৎ, ১।৩।২ ও ২।২।১১ শ্লোক।

২ পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্……সম্ভবামি যুগে যুগে। গীতা, ৪।৮

নিস্তেজ হয়ে পড়ল। সে আত্মরক্ষা করার পূর্বেই ভগবান অচ্যুত তাকে দু'হাতে ধরে মাটিতে নিক্ষেপ করলেন এবং দেবতাদের চোখের সামনে তাকে পশুর মত বিনাশ করলেন। তারপর তিনি গুহার আচ্ছাদন (পাথর) উদ্ঘাটিত করে অপহৃত গোপদের সেই অবরুদ্ধ স্থান থেকে বার করে আনলেন। অনুচরদের ও দেবতাদের দ্বারা স্তুত হয়ে তিনি নিজ গোকুলে প্রবেশ করলেন। ২৫-৩৪

অষ্টত্রিংশ অধ্যায়

অক্রূরের গোকুলে আগমন

শুকদেব বললেন, মহামতি অক্রূরও ঐ রাত্রে মধুপুরীতে বাস করার পর কৃষ্ণকে আনিবার জন্য রথে আরোহণ করে নন্দের গোকুলে যাত্রা করলেন। পথে মহাভাগ্যবান অক্রূর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি পরম ভক্তি লাভ করে মনে মনে চিন্তা করতে লাগলেন, আমি এমন কি সৎকর্ম করেছি বা এমন কি তপস্যা করেছি অথবা যোগ্যপাত্রে এমন কি দান করেছি যে আজ শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাব ? বিষয়ে আসক্তচিত্ত আমার পক্ষে এই উত্তমশ্লোক শ্রীকৃষ্ণের দর্শনলাভকে শূদ্রের বেদমন্ত্র উচ্চারণের সুযোগ লাভ করার মত দুর্লভ বলেই আমি মনে করি। অথবা আশংকার প্রয়োজন নেই, আমি অধম হলেও শ্রীকৃষ্ণ-দর্শন আমার হবেই। কালনদীর প্রবাহে জীবদের মধ্যে তো কদাচিৎ কেউ উত্তীর্ণ হয়। আজ আমার অমঙ্গল নাশ হয়েছে, আমার জন্মও সফল হয়েছে। কেননা যোগীদের ধ্যেয় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে প্রণাম করতে পাব। কি আশ্চর্য ! কংস আমার প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ করেছে। কংসই আমায় পাঠিয়েছে বলেই আমি অবতার শ্রীহরির চরণকমলের দর্শন পাব, যাঁর নখকান্তিচ্ছটায় পূর্ব-বর্তীগণ দুস্তর ভব-অন্ধকার উত্তীর্ণ হয়েছেন। ব্রহ্মা-মহেশ আদি দেবতারা, লক্ষ্মীদেবী এবং ভক্তসহ মুনিরা ঐ চরণকমলের অর্চনা করে থাকেন। ঐ চরণকমল সখাদের সঙ্গে গোচারণে বনে বনে বিচরণ করে থাকে ও গোপিকাদের স্তনালগ্ন কুংকুমে রঞ্জিত থাকে। আমি নিশ্চয়ই সুন্দর কপোল, সুন্দর নাসিকা, সহাস্য দৃষ্টি, অরুণকমলতুল্য দীপ্ত আঁখি যুক্ত এবং কুঞ্চিত কেশে আবৃত মুকুন্দের মুখকমল দেখতে পাব। আমার মনোরথ সিদ্ধ হবে, কেননা আমাকে প্রদক্ষিণ করে হরিণরা চরে বেড়াচ্ছে। পৃথিবীর ভার লাঘব করার জন্য নিজের ইচ্ছায় মানুষের দেহধারী ও সৌন্দর্যলক্ষ্মীর আশ্রয় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দর্শন আজ আমার হবে এবং তাতেই আমার দৃষ্টি সার্থক হবে। ১-১০

যিনি কার্য-কারণের দ্রষ্টা হয়েও অহংকারশূন্য এবং যিনি স্বীয় প্রভাবে ভেদ ও ভ্রমশূন্য, তিনি নিজ মায়াশক্তি প্রভাবে ঐ ভেদভ্রম দর্শন করার ইচ্ছায় প্রাণ, ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির সঙ্গে নিজ অংশে সৃষ্ট জীবের ন্যায় প্রকাশ পেয়ে থাকেন। যাঁর সর্ব-পাপবিনাশক ও পরম-মঙ্গলদায়ক গুণ, কর্ম ও জন্মবিষয়ক কথা জগৎকে সঞ্জীবিত, শোভিত ও পবিত্র করে, তাঁর সঙ্গে সম্পর্কহীন যত কথা সাধুদের কাছে অলঙ্কারাদি শোভিত মৃতদেহের মত মনে হয়। যিনি স্বরচিত বর্ণাশ্রম ধর্মের প্রতিপালক দেবশ্রেষ্ঠদের সুখ বিধান করে থাকেন, সেই ঈশ্বর যদুবংশে অবতীর্ণ হয়ে যশ

বিস্তার করে ব্রজে বাস করছেন ; দেবতারাও অশেষ মঙ্গলস্বরূপ তাঁর যশ কীর্তন করেন। সাধুদের গতি ও গুরুস্বরূপ তিনি যে রূপ ধারণ করেছেন ত্রিলোকের মধ্যে একমাত্র সুন্দর সেই রূপ দর্শনে দৃষ্টিমানরাই অসীম আনন্দ লাভ করেন। সেই রূপ কমলারও অভিলষিত। আজ তাঁকে নিশ্চয় দেখতে পাব, কেননা আজ প্রভাতে অসংখ্য মঙ্গলচিহ্ন দর্শন করেছি। সেই বিগ্রহধারী শ্রীহরি দৃষ্টিপথে আবির্ভূত হওয়ামাত্র আমি রথ থেকে নামব এবং যোগীরা আত্মজ্ঞান বা ভগবৎ-সান্নিধ্য লাভের জন্য প্রধান পুরুষগণের যে চরণপদ্ম শুদ্ধ চিত্তে ধারণ করেন সেই শ্রীচরণে এবং রাম-কৃষ্ণের সখাদের চরণে প্রণাম করব। ১১-১৫

কালসর্পের ভয়ে উদ্বিগ্ন শরণাগতের জন্য যিনি অভয় করকমল দান করেন আমি তাঁর শ্রীচরণে পতিত হলে তিনি ঐ করপদ্ম আমার মাথায় অর্পণ করে ভয়-ভঞ্জন করবেন। দেবরাজ ইন্দ্র ও অসুররাজ বলি ঐ করকমলে পূজার উপকরণ অর্পণ করে ত্রিজগতের ইন্দ্রত্ব লাভ করেছিলেন। আর পদ্মগন্ধের মত সুগন্ধি ঐ করকমল রাসলীলায় সময় ব্রজাঙ্গনাদের স্পর্শ করে তাঁদের শ্রম দূর করেছিল। যদিও আমি কংস প্রেরিত দূত, তা হলেও বিশ্বদর্শী অচ্যুত শ্রীকৃষ্ণ আমাকে শত্রু ভাববেন না। তিনি ক্ষেত্রজ্ঞ, তাই তাঁর অমল দৃষ্টি দ্বারা সকলের মনোগত অভিপ্রায় জানতে পারেন। আমি তাঁর চরণপ্রান্তে কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণত হলে তিনি যদি কৃপা করে আমার দিকে সহাস্য দৃষ্টিপাত করেন তাহলে তৎক্ষণাৎ আমার সমস্ত পাপ নষ্ট হবে এবং আমি সম্পূর্ণ নিঃশঙ্কচিত্তে পরমানন্দ লাভ করব। ১৬-১৯

তারপর তিনি বিশাল দুই বাহু দিয়ে যখন পরম বান্ধব, জ্ঞাতি ও তাঁর একান্ত সেবক আমাকে আলিঙ্গন করবেন, তখই আমার দেহ পবিত্র হবে এবং আমার কর্মবন্ধন শিথিল হয়ে যাবে। বিপুলকীর্তি শ্রীকৃষ্ণ যখন আলিঙ্গন-প্রাপ্ত ও কৃতাঞ্জলিবদ্ধ হয়ে প্রণত আমাকে 'হে অক্রূর, হে তাত,' বলে সম্বোধন, করবেন তখনই আমার জন্মগ্রহণ সার্থক হবে। যে পরমপূজ্য মহামান্য বাসুদেব কর্তৃক আত্মীয়রূপে পরিগৃহীত হয় নি, তাঁর জন্ম বৃথা। তাঁর প্রিয়-অপ্রিয়, হিতকারী-দ্বেষী বা উপেক্ষণীয় বলে কেউ নেই।[১] তবু কল্পবৃক্ষ যেমন সকলকে প্রার্থনা অনুসারে ফল দেয়, তিনিও যে যেমন ভজনা করে সেই ভক্তকে সে রকম ফল দান করেন।[২] আবার, অবনত হয়ে অঞ্জলিবন্ধন করলে অগ্রজ বলরাম হয়ত আলিঙ্গন করে সেই অঞ্জলিবদ্ধ হাত ধরেই গৃহে নিয়ে যাবেন। আমি যথাযথ অভ্যর্থনাদি পাবার পর নিজ আত্মীয়-স্বজনের প্রতি কংসের আচরণের কথা তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করবেন। ২০-২৩

শুকদেব বললেন, শ্বফল্কতনয় অক্রূর পথের মধ্যে এই চিন্তা করতে করতে রথে করে গোকুলে এসে উপস্থিত হলেন, আর তখন সূর্যদেবও অস্তাচলে গেলেন। ব্রহ্মাদি লোকপাল যাঁর বিমল চরণরেণু নিজ নিজ কিরীটে ধারণ করে থাকেন অক্রূর গোষ্ঠমধ্যে পদ্ম, অংকুশ প্রভৃতি চিহ্নিত পৃথিবীর অলংকাররূপ বাসুদেবের পদচিহ্নগুলি দেখতে পেলেন। এই দেখার আনন্দের আবেগে অক্রূরের শরীর রোমাঞ্চিত ও চক্ষু অশ্রুসিক্ত হল। তিনি রথ থেকে লাফিয়ে পড়ে 'আহা, এই সেই প্রভুর পদরেণু' এই বলে ধূলায় লুণ্ঠিত হলেন। কংসের আজ্ঞা থেকে শুরু করে শ্রীহরির চিহ্ন দর্শন, তাঁর সম্বন্ধে শ্রবণ ও চিন্তা দ্বারা অক্রূরের যে ভক্তিভাব জন্মেছিল, দম্ভ শোক বিসর্জন দিয়ে ঐরকম আচরণ করাই দেহী জীবমাত্রের পুরুষার্থ।

১ তুলনীয় : মানাপমানয়োস্তুল্যস্তুল্যো মিত্রারিপক্ষয়োঃ।—গীতা, ১৪।২৫
২ তুলনীয় : যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।—গীতা, ৪।১১

তারপর অক্রূর ব্রজের মধ্যে গোদোহন স্থানে শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামকে দেখতে পেলেন। তাঁদের পরনে (যথাক্রমে) পীত ও নীল বসন, নয়নযুগল শরৎকালের কমলতুল্য, দু'জনেই কিশোর এবং যথাক্রমে শ্যাম ও শ্বেতবর্ণ বিশিষ্ট, দু'জনেই পরম শোভার আধার—দীর্ঘবাহু, প্রসন্নবদন ও পরম সুন্দর। উভয়েই হস্তীশরভের মত বিক্রমশালী; ধ্বজ, অংকুশ, পদ্ম ইত্যাদি চিহ্নিত শ্রীচরণ দ্বারা ব্রজভূমিকে শোভিত করছেন। তাঁদের দৃষ্টি করুণাব্যঞ্জক, মুখ মৃদুহাস্যে মণ্ডিত আর ক্রীড়া উদার ও মধুর। তাঁদের গলায় রত্নহার ও বনমালা শোভমান এবং অঙ্গ পবিত্র চন্দনে অনুলিপ্ত। তাঁরা স্নান করে নির্মল বস্ত্র পরেছেন। তাঁরা প্রধান ও আদিপুরুষ, জগতের কারণ ও জগতের পতি। পৃথিবীর ভার লাঘবের জন্য মূর্তিভেদে কেশব ও রামরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন। উভয়ে নিজ নিজ কান্তিপ্রভায় সব দিকের অন্ধকার নাশ করে সুবর্ণমণ্ডিত মরকতময় ও রৌপ্যময় পর্বতের মত শোভা পাচ্ছিলেন। প্রেমবিহ্বল অক্রূর তাড়াতাড়ি রথ থেকে নেমে বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণের চরণপ্রান্তে দণ্ডবৎ প্রণাম করলেন। ২৪-৩৪

মহারাজ, ভগবানের দর্শন লাভের আনন্দের আতিশয্যে অক্রূরের চোখদুটি বাষ্পাচ্ছন্ন ও দেহ রোমাঞ্চিত হল। তিনি উৎকণ্ঠাবশে নিজের পরিচয় দিতে পারলেন না। ভক্তবৎসল ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তা বুঝতে পেরে প্রসন্ন হয়ে চক্রচিহ্নিত নিজের হাত দিয়ে অক্রূরকে নিজের দিকে টেনে নিয়ে আলিঙ্গন করলেন। মহামতি বলদেবও প্রণত অক্রূরকে আলিঙ্গন করে নিজের হাতে তাঁর হাত গ্রহণ করে অনুজ শ্রীকৃষ্ণ সহ তাঁকে ঘরের মধ্যে নিয়ে গেলেন। তারপর তিনি স্বাগত সম্ভাষণ ও কুশল-প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করে তাঁকে উৎকৃষ্ট আসন দিলেন এবং যথাবিধান পদপ্রক্ষালন করে মধু সংযোগে আপ্যায়ন করলেন। শ্রীকৃষ্ণ অতিথিকে গাভী দান করে তাঁর শ্রম অপনোদনের জন্য স্বয়ং সাদরে ব্যজন করতে লাগলেন এবং পরে শ্রদ্ধার সঙ্গে সুমিষ্ট ষড়্‌রসযুক্ত অন্নব্যঞ্জনাদি অক্রূরের সামনে সমাদরে পরিবেশন করলেন। পরমধর্মজ্ঞ বলরাম প্রীতির সঙ্গে মুখশুদ্ধি এবং সুগন্ধ মালা দিয়ে ভোজনে পরিতৃপ্ত অক্রূরের পরম সন্তোষ বিধান করলেন। আতিথি-সৎকার শেষে অক্রূরকে মহারাজা নন্দ জিজ্ঞেস করলেন, দশার্হ, নির্দয় কংস জীবিত থাকতে পশুঘাতীর পালিত মেষের ন্যায় তোমরা কেমন করে জীবন ধারণ করে আছ? কংস খল। নিজ প্রাণের পরিপোষণেই সচেষ্ট সে শোককাতরা ক্রন্দনরতা ভগ্নীর সন্তানদের স্বহস্তে বধ করতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয় নি। তারই প্রজা তোমরা; তাই তোমাদের কুশল কিভাবে সম্ভব তা-ই বিচার করছি। মহারাজ, নন্দের এই রকম সত্য ও সুমধুর বচনে আপ্যায়িত হয়ে অক্রূর কুশল-প্রশ্নের দ্বারা পথক্লান্তি মোচন করলেন। ৩৫-৪৩

ঊনচত্বারিংশ অধ্যায়

অক্রূরের মথুরা যাত্রা

শুকদেব বললেন, মহারাজ, বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে অনেক সম্মান লাভ করে অক্রূর পালংকে আরামে বসলেন এবং পথে আসতে আসতে যা যা আশা করেছিলেন সে সমস্তই লাভ করলেন। লক্ষ্মীর আশ্রয় ভগবান প্রসন্ন হলে কোন বস্তু আর অপ্রাপ্য থাকে? তবু ঈশ্বরপরায়ণ মানুষেরা কিছুই প্রার্থনা করেন না। দেবকী-

নন্দন শ্রীকৃষ্ণ সন্ধ্যার ভোজন সমাপনান্তে বন্ধুদের সঙ্গে কংসের আচরণ ও অভিপ্রায় সম্পর্কে অক্রূরকে জিজ্ঞাসা করলেন। শ্রীকৃষ্ণ বললেন, প্রিয় পিতৃব্য, আপনার আগমন সুখের হয়েছে তো? আপনার মঙ্গল হোক। সুহৃদ, জ্ঞাতি ও বন্ধুরা সুখে ও সুস্থ আছেন তো? তাত, আমাদের বংশের ব্যাধিস্বরূপ মাতুল নামধারী কংস বেঁচে থাকতে আমাদের জ্ঞাতি ও তার প্রজাদের কুশল আর কি জিজ্ঞাসা করব? আহা, আমার জন্যই জনক-জননীর দুঃখভোগ হয়েছে, তাঁদের পুত্রদের মৃত্যু ঘটেছে আর তাঁদের এই বন্দীদশা। তাত, আজ আমার ভাগ্যবশত আপনার মত বহু আকাঙ্ক্ষিত আত্মীয়ের দর্শনলাভ ঘটল। আপনার আগমনের কারণ কি বলুন। ১-৭

শুকদেব বললেন, মধুবংশীয় অক্রূর শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হয়ে যাদবদের উপর কংসের শত্রুতা, বসুদেবকে নিহত করার জন্য তার চেষ্টা সম্বন্ধে আনুপূর্বিক সমস্তই বর্ণনা করলেন। অক্রূরের কথা শুনে মহাবল শত্রুবিনাশকারী শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম হেসে পিতা নন্দকে রাজার আদেশ জানালেন। ৮-১০

গোপরাজ নন্দও গোপদের আদেশ করলেন, তোমরা সবাই দুগ্ধ-দধি-ক্ষীর গ্রহণ কর, উত্তম উপঢৌকন নাও এবং শকটগুলি যোজনা কর। আমরা আগামী কাল মধুপুরীতে যাব, রাজাকে দুগ্ধাদি প্রদান করব, ধনুর্যজ্ঞ মহোৎসব দর্শন করব। গ্রামবাসী সবাই সেখানে যাচ্ছে। গোপালরাজ নন্দ নিজ গোকুলের মধ্যে এরকম ঘোষণা করলেন। ১১-১২

বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণকে মথুরায় নিয়ে যাবার জন্য অক্রূর এসেছেন শুনে ব্রজ-গোপীদের দুঃখের অবধি রইল না। ঐ সংবাদে কোন কোন গোপীর হৃদয়ের সন্তাপে মুখ ম্লান হল, কোন কোন গোপীর বস্ত্র, বালা ও কেশবন্ধন স্খলিত হয়ে পড়ল। শ্রীকৃষ্ণধ্যানে কোন কোন গোপীর চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গুলি রুদ্ধ হয়ে গেল এবং পরমাত্মলোকপ্রাপ্ত মুক্ত পুরুষদের মত তাঁদের বাহ্যজ্ঞান আর কিছুই রইল না। অন্যান্য গোপীরা শ্রীকৃষ্ণের অনুরাগে হাস্যময় হৃদয়স্পর্শী বিচিত্র কথাগুলি এবং তাঁর মনোহর চলনভঙ্গি, সুন্দর আচরণ, সহাস্য দৃষ্টিপাত, শোকনাশক পরিহাস ও উদার চরিত্রের কথা স্মরণ করে মোহপ্রাপ্ত হলেন। শ্রীকৃষ্ণগতপ্রাণ গোপীরা তাঁর চিন্তা করতে করতে তাঁর ভাবী বিরহে কাতর, ভীত ও আকুলনয়ন হয়ে দলে দলে সমবেত হয়ে বলতে লাগলেন, বিধাতা, তোমার দয়ার লেশমাত্রও নেই। মৈত্রী ও স্নেহের সঙ্গে দেহীদের যুক্ত করে তাঁদের বাসনা চরিতার্থ হতে না হতেই বিযুক্ত করে দাও। তোমার আচরণ বালকের চেষ্টার মত সর্বাংশে নিরর্থক। যেহেতু তুমি কৃষ্ণবর্ণ কেশে আবৃত, সুন্দর কপোলযুক্ত, উন্নত নাসিকাবিশিষ্ট এবং সন্তাপহারী ঈষৎ হাস্যময় অতি সুন্দর শ্রীকৃষ্ণের মুখমণ্ডল একবার দেখিয়ে আবার দৃষ্টির বহির্ভূত করছ, তাই তোমার একাজ সাধুজনসম্মত নয়, এতে তোমাকে নিন্দারই ভাগী হতে হবে। আমাদের যে চোখ দিয়েছিলে, যা দিয়ে আমরা মুরারীর এক অংশে তোমার বিশ্ব-সৃষ্টির সৌন্দর্য দেখছিলাম, তুমি অক্রূর নাম ধরে আমাদের সেই চোখ অজ্ঞের ন্যায় হরণ কর। ১৩-২১

হায় সখীগণ! শ্রীকৃষ্ণও নিতান্ত ভঙ্গপ্রেমিক; নিত্য নতুনেই তাঁর বাসনা দেখছি। কারণ আমরা তাঁরই গূঢ় হাসিতে বশীভূত হয়ে গৃহ, স্বজন, পুত্র ও স্বামীদের পরিত্যাগ করে সাক্ষাৎ তাঁরই দাসী হয়েছি, অথচ তিনি এখন আমাদের আর দেখছেন না। মথুরাপুরবাসিনী রমণীদের আজকের রাত্রি নিশ্চয়ই সুপ্রভাত হয়েছে ও তাঁদের সকল সাধ-আহ্লাদ একত্র পূর্ণ হল। কারণ তাঁরা মথুরাপুরীতে

প্রবিষ্ট ব্রজপতি শ্রীকৃষ্ণের নয়নপ্রান্তে ঈষৎ হাস্য-বিলসিত বদনসুধা পান করবেন। শ্রীকৃষ্ণ যদিও পিতৃবৎসল, ধীর, তা হলেও ঐ পুরনারীদের মধুরবাক্য ও তাঁদের সলজ্জ হাসিতে বিভ্রান্ত হলে তিনি কি আবার আমাদের মত গ্রাম্য অঙ্গনাদের কাছে ফিরে আসবেন ? সেখানে আজ যেসব দশার্হ, ভোজ, অন্ধক, বৃষ্ণি ও সাত্বত বংশের ও পথের মধ্যে অন্যান্য যে লোকেরা সৌন্দর্য ও মাধুর্যাদি সমস্ত গুণের আধার দেবকীসুতকে দর্শন করবেন, নিশ্চয়ই তাঁদের অপূর্ব নয়নোৎসব ঘটবে। যাঁর মনে এরূপ দুরভিসন্ধি সেই করুণাহীন ক্রূরহৃদয় অক্রূর আমাদের মত নিতান্ত দুঃখীদের কোনরকম আশ্বাস না দিয়েই আপন প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয় শ্রীকৃষ্ণকে আমাদের দৃষ্টির অগোচর দূরদেশে নিয়ে যাচ্ছে ; এরকম অকরুণ লোকের নাম অক্রূর হওয়া শোভা পায় না। কৃষ্ণের হৃদয়ও বা কি কঠিন ! তিনি যাবার জন্য অনায়াসে রথে আরোহণ করছেন, আর এই দুষ্ট গোপালেরাও শকটে তাঁর পিছনে পিছনে ব্যস্ত হয়ে ছুটছে, বৃদ্ধরাও তাদের নিবারণ করছে না। দৈবও নিশ্চয় আমাদের প্রতিকূল আজ। এক নিমেষের অর্ধেক কালও যে শ্রীকৃষ্ণসঙ্গ ত্যাগ করে আমরা থাকতে পারি না, তা থেকে দুর্দৈববশত বিযুক্ত হওয়ায় আমাদের হৃদয়ে কি আর চিত্ত আছে ! তাই চল, আমরা সকলে মাধবের কাছে উপস্থিত হয়ে তাঁকে যেতে বারণ করি ! আমাদের ন্যায় দীন ভ্রষ্টচিত্ত অবলাদের কুলবৃদ্ধ ব্রাহ্মণরা আর কি করবেন ? ২২-২৮

গোপীগণ, যাঁর অনুরাগময় সুললিত হাসি, মনোহর রহস্যালাপ, লীলাময় অবলোকন, প্রেমালিঙ্গন প্রভৃতি সমন্বয়ে রাসক্রীড়ায় আমরা মুহূর্তকালের মত রাত্রিগুলি অতিবাহিত করেছিলাম, শ্রীকৃষ্ণবিহীন হয়ে কি ভাবে এই বিরহদুঃখ উত্তীর্ণ হব ? সখাগণ পরিবৃত হয়ে দিবাবসানে বেণুধ্বনি করতে করতে ব্রজে প্রবেশ করে সস্মিত কটাক্ষ নিরীক্ষণে যিনি আমাদের চিত্ত হরণ করেন তাঁকে ছাড়া আমরা কিভাবেই বা বেঁচে থাকব ? ২৯-৩০

শুকদেব বললেন, কৃষ্ণাসক্তচিত্তা ব্রজরমণীরা তাঁর বিরহে অত্যন্ত কাতর হয়ে এই সব বলতে বলতে লজ্জা বিসর্জন দিয়ে 'হে গোবিন্দ, হে দামোদর, হে মাধব' বলে উচ্চস্বরে চিৎকার করতে লাগলেন। নারীদের এই কাতরধ্বনিতে অক্রূর কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে সূর্যোদয় হওয়ামাত্র সন্ধ্যা-বন্দনাদি শেষ করে রথ চালিয়ে দিলেন। তারপর নন্দ প্রভৃতি গোপেরা অনেক উপঢৌকন ও দধি-দুগ্ধ-ঘি পূর্ণ অনেকগুলি কলসী নিয়ে শকটে তাঁদের পিছনে পিছনে চলতে লাগলেন। গোপীরাও প্রিয় শ্রীকৃষ্ণের অনুগমন করলেন এবং তাঁর সপ্রেম নিরীক্ষণাদি ভাবভঙ্গি দ্বারা কিছু পরিমাণ আশ্বস্ত হয়ে তাঁর প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষায় পথে দাঁড়িয়ে রইলেন। যদুপতি গোবিন্দ নিজের প্রস্থানের জন্য গোপীদের অত্যন্ত কাতর দেখে 'আবার আসব' এই কথা দূত দ্বারা জানিয়ে তাঁদের সান্ত্বনা দিলেন। যে পর্যন্ত রথের চূড়া ও ধূলি দেখা যাচ্ছিল শ্রীকৃষ্ণানুগতচিত্ত গোপীরা ততক্ষণ পর্যন্ত চিত্রার্পিতের মত দাঁড়িয়ে রইলেন। ৩১-৩৬

শেষে গোবিন্দের ফিরে আসা সম্পর্কে নিরাশ হয়ে গোপীরা ঘরে ফিরে এলেন এবং কৃষ্ণলীলা কীর্তন দ্বারা শোকসংবরণ করে দিনযাপন করতে লাগলেন। এদিকে ভগবান বাসুদেব বলরাম ও অক্রূরের সঙ্গে বায়ুর ন্যায় বেগবান রথে পাপনাশিনী কালিন্দীর কূলে উপস্থিত হলেন। তাঁরা স্নানাদি সেরে স্বচ্ছ মণির মত নির্মল জল পান করলেন এবং পরে আবার বলরামের সঙ্গে গাছগুলির কাছে এসে রথে গিয়ে বসলেন। অক্রূর তাঁদের দুজনকে বসিয়ে অনুমতি নিয়ে কালিন্দীর হ্রদে অবগাহন করলেন। তিনি যখন জলে ডুব দিয়ে সনাতন পরম ব্রহ্মের নাম জপ

করছেন, তখন তিনি দেখতে পেলেন যে, রাম ও কৃষ্ণ সেখানে বসে আছেন। বসুদেবের দুই পুত্র রথের উপর বসে আছেন। তাঁরা এখানে এলেন কি করে? তাঁরা কি রথের উপর নেই? এইরকম চিন্তা করে অক্রূর জল থেকে উঠে দেখলেন যে তাঁরা আগের মতই রথে বসে আছেন। তা হলে আমি যে জলের মধ্যে তাঁদের দেখলাম সেটা কি মিথ্যা? এই ভেবে অক্রূর আবার জলে ডুব দিলেন; তারপর আবার দেখলেন, সেখানে নাগরাজ অনন্তদেব রয়েছেন, সিদ্ধ-চারণ-গন্ধর্ব অনুচরগণ নতমস্তকে তাঁর স্তব করছেন। তাঁর পরনে নীল বস্ত্র, মৃণালের মত শুভ্র অঙ্গ। তাঁর সহস্র মস্তক, এই সহস্র ফণায় সহস্র কিরীট শোভা পাচ্ছে, তিনি অসংখ্য শিখরযুক্ত কৈলাস পর্বতের মত অবস্থান করছেন। সেই অনন্তদেবের ক্রোড়ে তিনি ঘনশ্যাম বর্ণ, পীত কৌষেয় বস্ত্রধারী, চতুর্ভুজ, শান্ত ও পদ্মপাতার মত আরক্তলোচন পুরুষকে দেখতে পেলেন। ৩৭-৪৫

তাঁর বদনমণ্ডল মনোহর ও প্রসন্ন; মনোজ্ঞ হাসিময় দৃষ্টি, সুন্দর ভ্রূ, উন্নত নাসিকা, মনোহর কর্ণ, সুগঠিত কপোল, আরক্ত অধর, মাংসল ও আয়ত বাহু, উন্নত স্কন্ধ; আর বক্ষে তাঁর লক্ষ্মী বিরাজমানা; তাঁর কণ্ঠ শঙ্খের মত, নাভি গভীর, উদর ত্রিবলীবিশিষ্ট এবং অশ্বত্থদলের মত; কটিতট ও নিতম্বদেশ বিশাল, উরু হস্তী-শুঁড় তুল্য, জঙ্ঘা মনোহর; পাদপদ্ম ঈষৎ উন্নত গোড়ালিযুক্ত, অরুণবর্ণ নখের কিরণে কোমল অঙ্গুলি ও অঙ্গুষ্ঠে শোভিত। তিনি অত্যন্ত মূল্যবান মণিরাজিতে খচিত কিরীট, বালা, বাজু, কটিসূত্র, ব্রহ্মসূত্র, হার, নূপুর ও কুণ্ডল ধারণ করে শোভা পাচ্ছেন। পদ্ম-শঙ্খ-চক্র-গদাধারী তিনি; তাঁর বক্ষে শ্রীবৎসচিহ্ন, দীপ্তিশালী কৌস্তুভ ও গলায় বনমালা। নির্মলচিত্ত সুনন্দ, নন্দ, সনক প্রভৃতি পার্ষদ, ব্রহ্মা, রুদ্র প্রভৃতি সুরেশ্বরগণ, নয়জন দ্বিজশ্রেষ্ঠ, প্রহ্লাদ, নারদ, বসু প্রভৃতি ভাগবত প্রধানেরা বিভিন্ন ভাবে উত্তম বচনে তাঁর স্তব করছেন। শ্রী, পুষ্টি, সরস্বতী, কান্তি, কীর্তি, ইলা, উর্জা প্রভৃতি দেবী, বিদ্যা ও অবিদ্যা এবং শক্তি ও মায়া তাঁর সেবা করছেন। বহুক্ষণ ধরে এই অপূর্ব দৃশ্য দর্শন করে তিনি প্রীতিলাভ করলেন, তাঁর গাত্র পুলকিত হল। ভাবে চিত্ত ও চক্ষু আর্দ্র হয়ে উঠল। ভক্তশ্রেষ্ঠ অক্রূর সত্ত্বগুণ অবলম্বন করে মনোযোগ সহকারে তাঁকে প্রণাম করলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে ধীরে ধীরে ভক্তিপূর্ণ বাক্যে তাঁর স্তব করতে লাগলেন। ৪৬-৫৭

চত্বারিংশ অধ্যায়

অক্রূরের শ্রীকৃষ্ণ-স্তব

অক্রূর বললেন, হে শ্রীকৃষ্ণ, আপনাকে প্রণাম করি। আপনি বালক নন, আদ্য পুরুষ; আপনি অখিল কারণের কারণ; আপনি অব্যয় নারায়ণ; আপনারই নাভিপদ্ম থেকে ব্রহ্মা উৎপন্ন হয়ে এই লোক সৃষ্টি করেছেন। আপনাকে প্রণাম করি। পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, অহঙ্কারতত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব, প্রকৃতি ও পুরুষ, মন, ইন্দ্রিয়বর্গ, ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলি এবং সমস্ত দেবতা—জগতের এই সব কারণগুলি আপনার অঙ্গ থেকেই উদ্ভূত হয়েছে। জড় বলে পরিগৃহীত প্রকৃতি —কি আত্মস্বরূপী আপনার স্বরূপ জানতে পারে না। ব্রহ্মাও প্রকৃতির গুণ দিয়ে

আচ্ছন্ন তাই গুণাতীত আপনার স্বরূপে জানতে সমর্থ হননি। যোগী সাধুরা আপনাকে অধ্যাত্ম, অধিভূত ও অধিদেবের সাক্ষী, মহাপুরুষ ও নিয়ন্তারূপে সাক্ষাৎ আরাধনা করে থাকেন। কোন কর্মযোগী ব্রাহ্মণ কর্মকাণ্ডময়ী বিদ্যায় বোধিত অনেক ভাবে বিস্তারিত যজ্ঞে আপনাকেই নানারকম রূপবিশিষ্ট ইন্দ্রাদিদেব রূপে আরাধনা করে থাকেন। যে সব জ্ঞানী কর্ম পরিত্যাগ করে শান্তচিত্ত হয়েছেন, তাঁরা জ্ঞানযজ্ঞ দ্বারা জ্ঞানরূপী আপনারই পূজা করেন। আর যাঁরা সংস্কৃতাত্মা সাধক (বৈষ্ণব ও শৈব ধর্মে দীক্ষিত) তাঁরা তন্ময় হয়ে চিন্তা করে আপনার পঞ্চরাত্রাদি বিধান অনুসারে বহুমূর্তি ও একমূর্তি আপনারই উপাসনা করে থাকেন। হে ভগবান, অন্য সাধকগণ আচার্যভেদে শৈবপন্থা অনুসারে শিবরূপী আপনারই উপাসনা করে থাকেন। যাঁরা অন্য দেবতার ভক্ত তাঁরাও সবাই সর্বদেব মহেশ্বর আপনারই উপাসনা করেন। প্রভু, পর্বত থেকে উৎপন্ন এবং মেঘদ্বারা আপূরিত নদীগুলি যেরকম চতুর্দিকের বর্ষার জলে পূর্ণ হয়ে সব দিক থেকেই সমুদ্রে গিয়ে পড়ে, তেমনি সমস্ত উপাসনার পথ শেষে আপনার কাছেই গিয়ে শেষ হয়।[১] সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিনটি আপনার শরীরভূত প্রকৃতির গুণ, সেই গুণগুলিতেই প্রাকৃত স্থাবরাদি ব্রহ্ম পর্যন্ত জীবরা নিজেদের উপাধি দ্বারা প্রবিষ্ট হয়। ১-১১

হে প্রভু, আপনি সর্বাত্মা, তাই আপনার বুদ্ধি কিছুতেই লিপ্ত নয়, আপনি সমস্ত বুদ্ধির সাক্ষী। দেব, মানুষ, পশুপক্ষী প্রভৃতি শরীরধারী আত্মা শরীরাভিমানী; তাদের মধ্যে আপনার অবিদ্যার এই গুণপ্রবাহ রয়েছে, তাই সে সব থেকে আপনার অনেক প্রভেদ বিদ্যমান; আপনাকে প্রণাম করি। হে ভগবান, অগ্নি আপনার মুখ, পৃথিবী চরণ, সূর্য চক্ষু, আকাশ নাভি, দিকগুলি শ্রবণেন্দ্রিয়, স্বর্গ মস্তক, দেবেন্দ্ররা বাহু, সাগরগুলি কুক্ষি, বাতাস আপনার প্রাণ ও বল বলে কথিত হয়।[২] বৃক্ষ ও ওষধিগুলি আপনার কেশ, পর্বতসমূহ অস্থি ও নখ, রাত্রি-দিন নিমেষ মাত্র, প্রজাপতি গুহ্যদেশ আর বৃষ্টি আপনার বীর্য। হে অব্যয় আত্মা, জলে যেমন জলচর প্রাণীর এবং যজ্ঞডুমুর ফলে ক্ষুদ্র কীটগুলি বিচরণ করে, সেরকম আপনার মধ্যে বহু জীবে ব্যাপ্ত লোকপাল সহ লোকেরা অবস্থান করে। ১২-১৫

আপনার স্বরূপ ঐরকম দুরবগাহ, তাই আপনার অবতারের কথামৃতই সাধুরা সেবন করে থাকেন। আপনি লীলার জন্য এই পৃথিবীতে যে যে রূপ ধারণ করেন, লোকেরা সেই সব রূপের উপাসনা করে শোক বিসর্জন দিয়ে আধ্যাত্মিক আনন্দে আপনার যশ গান করে থাকেন। আপনি আদি মৎস্য হয়ে প্রলয়সমুদ্রে বিচরণ করেছিলেন, হয়গ্রীব হয়ে মধু ও কৈটভকে সংহার করেছিলেন, আপনাকে প্রণাম। মন্দরপর্বতধারী অতি বৃহৎ কূর্মরূপী আপনাকে প্রণাম। পৃথিবী উদ্ধারের জন্য বিহারকারী বরাহমূর্তিধারী আপনাকে প্রণাম। হে সাধুজন ভয়-ভঞ্জন, আপনি অদ্ভুত নৃসিংহ রূপ ধারণ করে হিরণ্যকশিপুকে সংহার করেছিলেন, আপনাকে প্রণাম। আপনি বামন হয়ে ত্রিভুবন আক্রমণ করেছিলেন, আপনাকে প্রণাম। আপনি ভৃগুকুলের অধিপতি পরশুরাম হয়ে দর্পিত ক্ষত্রিয়-বন ছেদন করেছিলেন, আপনাকে প্রণাম। রঘুশ্রেষ্ঠ হয়ে রাবণ বধ করেছিলেন, আপনাকে প্রণাম। আপনি সাত্বতদের পতি বাসুদেব, আপনাকে প্রণাম। আপনি সঙ্কর্ষণ, আপনি প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, আপনাকে প্রণাম। দৈত্য ও দানবমোহন বিশুদ্ধ বুদ্ধ, আপনাকে প্রণাম। ক্ষত্রিয় সদৃশ ম্লেচ্ছ-বিনাশকারী কল্কিরূপী আপনাকে প্রণাম। ১৬-২২

---

১ তুলনীয়: মুণ্ডক উপঃ ৩।২।৮ ২ তৈত্তিরীয় উপঃ ২।১।৩

ভগবান, এই সমস্ত জীবলোক আপনার মায়ায় মোহিত। সেজন্য এরা অনিত্য দেহাদিতে 'আমি' 'আমার' এরূপ দুরাগ্রহে কর্মপথে বারবার ভ্রমণ করে। বিভু, মূঢ় আমি নিজেও স্বপ্নের মত অনিত্য দেহ, পুত্র, গৃহ, স্ত্রী, অর্থ, স্বজন প্রভৃতিকে সত্য বোধ করে ভ্রমণ করছি। আমি তমোগ্রস্ত, তাই অনিত্য কর্মফলে নিত্যবুদ্ধি, অনাত্ম দেহে আত্মবুদ্ধি এবং দুঃখময় গৃহগুলিতে সুখবোধ করছি। আর সুখ-দুঃখের দ্বন্দ্বেই আমার আরাম বোধ হচ্ছে, পরম প্রেমাস্পদ আপনাকে জানতে পারছি না। যেরকম অবোধ লোকে তৃণাদিতে আচ্ছন্ন জল ফেলে মৃগতৃষ্ণার দিকে ধাবিত হয়, সেরকম আমি আপনার প্রতি পরাঙ্মুখ (সংসার অনুরক্ত)। আমার মন বিষয়-বাসনাতে যুক্ত, নিজের মনকে সংযত করতে সমর্থ হচ্ছি না। আমার মন কাম ও কর্ম দ্বারা চঞ্চল, তাকে আবার বলবান বিষয় সংশ্লিষ্ট ইন্দ্রিয়গুলি আকর্ষণ করছে।[১] একে নিরোধ করার সাধ্য কোথায়? এরকম পরবশ আমি আপনার শ্রীচরণে শরণ নিলাম। হে অন্তর্যামী, অসৎ ব্যক্তি আপনার চরণে শরণ পায় না। তাই আমার মনে হয় আমার প্রতি আপনার অশেষ অনুগ্রহ। হে পদ্মনাভ, যখন আপনার কৃপায় জীবের সংসার সমাপ্তির সম্ভাবনা হয়, তখনই সাধুসেবা করে আপনার প্রতি তাদের মতি হয়। কিন্তু আপনার কৃপা না হলে সাধুসেবা বা ঈশ্বরে মতি কখনই হয় না, তাই মুক্তি অসম্ভব। বিজ্ঞানই যাঁর মূর্তি, যিনি সমস্ত জ্ঞানের কারণ, যিনি পরিপূর্ণস্বরূপ ও অনন্তশক্তি, জীবের প্রতি প্রভাবকারী ঈশ্বরস্বরূপ কাল, কর্ম ও স্বভাবের নিয়ন্তা, সেই বিভু আপনাকে প্রণাম করি।[২] ভগবান, চিত্তের অধিষ্ঠাতা বাসুদেব ও সর্ব প্রাণীর আশ্রয় অর্থাৎ অহংকারাধিষ্ঠাতা সংকর্ষণ আপনাকে প্রণাম করি। প্রভু, হৃষীকেশ, বুদ্ধি ও মনের অধিষ্ঠাতা প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ, আমি আপনার চরণে শরণ নিলাম; আমায় রক্ষা করুন। ২৩-৩০

একচত্বারিংশ অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণের মথুরায় প্রবেশ

শুকদেব বললেন, মহারাজ, এই ভাবে অক্রূর স্তব করছিলেন। নট যেরকম নাটকের রূপ দর্শন করিয়ে আবার অন্তর্ধান করেন, শ্রীকৃষ্ণ জলের মধ্যে তাঁকে সেইভাবে নিজের শরীর দেখিয়ে আবার অন্তর্হিত হলেন। অক্রূরও তাঁকে দেখতে না পেয়ে জল থেকে উঠলেন এবং তাড়াতাড়ি আবশ্যক কর্মগুলি শেষ করে বিস্ময়বিহ্বল হয়ে রথের কাছে ফিরে এলেন। হৃষীকেশ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, অক্রূর, তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে যেন তুমি এখানে জল, স্থল, আকাশে অদ্ভুত কিছু দর্শন করে এলে। অক্রূর বললেন, ভগবান, ভূতলে, জলে, নভঃস্থলে যা কিছু অদ্ভুত আছে সবই আপনার মধ্যে বিরাজিত। যখন আপনাকে বিশেষ বিশেষ ভাবে দর্শন করেছি, তখন কোন্ অদ্ভুত না দর্শন করেছি? পরমেশ্বর, আপনার মধ্যে সমস্ত অদ্ভুতই দেদীপ্যমান; আপনাকে যদি দর্শন না করি তাহলে জল-স্থল-আকাশে আর কি অদ্ভুত দেখব? ১-৫

---

১ তুলনায়: কঠ উপনিষৎ, ১।৩।৫ ২ দ্রঃ শ্বেতাশ্বতর উপঃ ৫।৫

শুকদেব বললেন, মহারাজ, গান্দিনীপুত্র অক্রূর এই কথা বলে রথ চালিয়ে দিলেন এবং রাম-কৃষ্ণকে নিয়ে দিনের শেষে মথুরায় পৌঁছলেন। মথুরার পথে রাম-কৃষ্ণ যে যে গ্রামের মধ্য দিয়ে গিয়েছিলেন সেসব গ্রামের লোকেরা কাছে এসে তাঁদের দর্শন করে আনন্দিত হল। বসুদেব-নন্দনদ্বয়ের শ্রীমুখ থেকে তারা তাদের দৃষ্টি সরাতে পারল না। নন্দ প্রভৃতি ব্রজবাসীরা আগে এসে নগরের উপবনে উপস্থিত হয়ে রাম ও কৃষ্ণের আগমনের প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। ভগবান জগদীশ্বর তাঁদের সঙ্গে মিলিত হয়ে বিনীত অক্রূরের হাত ধরে হাসতে হাসতে তাঁকে বললেন, তুমি শকট নিয়ে আগে নগরে ও নিজের গৃহে প্রবেশ কর। আমরা এখানে বিশ্রাম করে পরে নগর দেখতে যাব। ৬-১০

অক্রূর বললেন, প্রভু, আমি আপনাদের না নিয়ে নগরে প্রবেশ করতে পারব না। আমি ভক্ত, আপনি ভক্তবৎসল। আমাকে আপনার পরিত্যাগ করা উচিত নয়। অতএব আসুন, আমাদের গৃহে যাই। সুহৃদ, আপনি অগ্রজ, গোপালগণ ও বন্ধুদের সঙ্গে আমাদের গৃহে গিয়ে আমাদের সনাথ করুন। আমরা গৃহস্থ, পদধূলি দিয়ে আমাদের গৃহ পবিত্র করুন। আপনাদের পদপ্রক্ষালনের জল গৃহাঙ্গনে থাকলে তাতে পিতৃলোক ও অগ্নিগণের সঙ্গে দেবতারা তৃপ্ত হয়ে থাকেন। ঐ পাদোদক দিয়ে মহাত্মা বলি পবিত্র কীর্তি, অতুল ঐশ্বর্য ও ভক্তের গতি লাভ করেছেন। আপনার চরণধোয়া জলে ত্রিলোক পবিত্র হয়েছে। মহাদেব ঐ জল নিজের শিরে ধারণ করেন এবং সগর-রাজের সন্তানরা ঐ পবিত্র জলের প্রভাবে স্বর্গে গমন করতে সমর্থ হয়েছিলেন। হে দেবদেব, জগন্নাথ, আপনার কথা শ্রবণ ও কীর্তন দুইই পুণ্যপ্রদ। হে যদুশ্রেষ্ঠ, উত্তমশ্লোক নারায়ণ, আপনাকে প্রণাম করি। ১১-১৬

ভগবান বললেন, অক্রূর, অগ্রজের সঙ্গে আমি যদুবংশের শত্রুকে সংহার করে আপনার গৃহে আসব এবং সুহৃৎদের প্রিয়সাধন করব। ভগবানের এই কথা শুনে অক্রূর কিঞ্চিৎ বিমনা হলেন এবং নগরীতে প্রবেশ করে কংসকে কৃতকার্যের কথা জানিয়ে স্বগৃহে যাত্রা করলেন। তারপর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মথুরা দর্শনের ইচ্ছায় গোপগণ পরিবৃত হয়ে বলরামের সঙ্গে অপরাহ্নে মথুরায় প্রবেশ করলেন। তাঁরা দেখলেন উচ্চ নগরদ্বার, স্ফটিক নির্মিত গৃহদ্বার ও বৃহৎ সুবর্ণ কপাটযুক্ত তোরণগুলি শোভা পাচ্ছে। তামা ও পিতলময় ধানের পাত্রে পূর্ণ, পরিখা দ্বারা দুর্গম, উদ্যান এবং রমণীয় উপবন প্রভৃতি দ্বারা শোভিত মথুরাপুরী তিনি দর্শন করতে লাগলেন। স্বর্ণময় চতুষ্পথ, ধনীদের গৃহ, গৃহোচিত উপবন, ব্যবসায়ীদের সভাস্থান ও অন্যান্য গৃহগুলি মথুরাপুরীকে অলংকৃত করে রেখেছে। গৃহগুলির সামনের বারান্দার বাঁকা কাঠ, তার নীচের বেদী, গবাক্ষ এবং কুট্টিম (চাতাল) সমস্তই বৈদুর্য, হীরক, স্ফটিক, নীলকান্ত মণি, মুক্তা ও মরকতমণি খচিত। সেই সমস্ত কুট্টিমে ময়ূর ও পায়রাগুলি শব্দ করছে। রাজপথ, পণ্যপথ, সাধারণ পথ ও চত্বরগুলি সমস্তই অভিষিক্ত এবং সেখানে মালা, যব প্রভৃতির অংকুর, খই ও চাল ছড়ান রয়েছে। আর সেখানকার সমস্ত ভবন দধি ও চন্দনচর্চিত অজস্র কুম্ভে সুন্দরভাবে সাজান। কুম্ভগুলি চারদিকে ফুল ও দীপশ্রেণীতে বিভূষিত এবং মুখে পল্লব ও কণ্ঠে পট্টিযুক্ত। এভাবে ভবনগুলি কলাগাছ, সুপারি ও তোরণে সুসজ্জিত হয়েছিল। রাম-কৃষ্ণ গোপালগণ পরিবৃত হয়ে রাজপথ দিয়ে সেই সুসজ্জিত উৎসবময় পুরীতে প্রবেশ করলেন। পুরনারীরা তাঁদের দেখবার জন্য তাড়াতাড়ি প্রাসাদের উপর চড়লেন। কেউ কেউ বস্ত্র ও অলংকার বিপরীত ভাবে পরে, কেউ বা কংকণ ও বালার একটি পাট ফেলে, কেউ দুই কানের

এক কানে পত্র রচনা করে, কেউ এক পায়ে নূপুর গলিয়ে, কেউ এক চোখে কাজল না দিয়েই তাঁদের দেখবার জন্য উর্ধ্বশ্বাসে ছুটলেন। যাঁরা ভোজন করছিলেন অর্ধেক খাওয়া না হতেই ভোজনপাত্র রেখে, যাঁরা তেল মাখছিলেন স্নান না করেই, কেউ নিদ্রা যাচ্ছিলেন তাঁদের আগমন-শব্দ শ্রবণমাত্রই উঠে, যে মায়েরা সন্তানদের স্তন্যপান করাচ্ছিলেন তাঁরা তা পরিত্যাগ করে—এভাবে সকলেই শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনে ছুটলেন। ১৭-২৬

মহারাজ, মত্ত গজরাজের মত বিক্রমশালী কমলাক্ষ শ্রীহরি নিজের যে শরীরে লীলার সঙ্গে হাসি এবং দৃষ্টিতে কমলার আনন্দবর্ধন করেন সেই শরীর দ্বারা ঐ সমস্ত পুরনারীদের নয়ন সার্থক করে তাঁদের মন হরণ করলেন। তাঁর কথা বারবার শোনার ফলে সেই সমস্ত নারীদের চিত্ত তাঁরই প্রতি অনুরক্ত ছিল। এখন তাঁরা তাঁকে দর্শন করে তাঁর হাস্যসুধাময় কটাক্ষের অভিষেকে সম্মান লাভ করলেন এবং দৃষ্টিপথের মাধ্যমে মনের মধ্যে প্রাপ্ত আনন্দমূর্তিকে আলিঙ্গন করে পুলকিত হলেন। প্রীতিবশে নারীদের মুখপদ্ম প্রফুল্ল হয়ে উঠল, তাঁরা প্রাসাদশিখরে আরোহণ করে রাম-কৃষ্ণের উপর পুষ্পবর্ষণ করতে লাগলেন। ব্রাহ্মণরাও আনন্দিত হয়ে স্থানে স্থানে জলপূর্ণ ঘট সহ আতপ চাল, মালা, গন্ধদ্রব্য ও উপকরণ দিয়েতাঁদের পূজা করতে লাগলেন। পুরস্ত্রীরা বলতে লাগলেন, ওঃ, ব্রজের গোপীরা কি মহা তপস্যাই না করেছিলেন, সেজন্যই তাঁরা নরলোকের দুই মহোৎসব স্বরূপ এই রাম-কৃষ্ণকে সব সময় দর্শন করবেন। সে পথ দিয়ে এক বস্ত্ররঞ্জক ধোপা আসছিল। শ্রীকৃষ্ণ তার কাছে ভাল ভাল ধৌত বস্ত্র চেয়ে বললেন, রজক, আমাদের উপযুক্ত বস্ত্র দাও। দান করলে নিশ্চয়ই তোমার মঙ্গল হবে। সেই ধোপা ছিল রাজা কংসের ভৃত্য, তাই অহঙ্কারী। পূর্ণব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ যে তার কাছে বস্ত্র চাইলেন, তা সে বুঝতে পারল না। নিজের দর্পে সে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে তিরস্কার করে বলল, তোরা বনে-পাহাড়ে ঘুরে বেড়াস, রোজ এরকম বস্ত্রই পরে থাকিস বটে! রাজার জিনিস চাইছিস! পালা, তাড়াতাড়ি পালা। মূর্খ, যদি বাঁচার ইচ্ছা থাকে তাহলে আর এরকম প্রার্থনা করিস না। রাজার লোক উচ্চাকাঙ্ক্ষী মানুষকে বন্ধন, নাশ ও তার সম্পত্তি হরণ করে থাকে। ২৭-৩৬

সেই রজক এভাবে তিরস্কার করতে লাগলে দেবকীনন্দন ক্রুদ্ধ হয়ে হাত দিয়ে তার শরীর থেকে মস্তক ভূপাতিত করলেন। তার সঙ্গে আর যারা ছিল তারা বস্ত্রগুলি ফেলে দিয়ে চারদিকে ছুটে পালাল। অচ্যুত বস্ত্রগুলি গ্রহণ করলেন। শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম যে সব বস্ত্র ভালবাসেন সেগুলি পরে কতকগুলি গোপদের দিলেন, অবশিষ্টগুলি মাটিতে ফেলে দিলেন। তারপর এক তাঁতী এসে নানারকম বস্ত্রের ভূষণ দ্বারা তাঁদের বেশ রচনা করে দিল। পরের দিন রাম-কৃষ্ণ নানারকম বেশ ধারণ করে সাদা ও কালো শিশুহাতীর মত শোভা পেতে লাগলেন। ভগবান প্রসন্ন হয়ে সেই তন্তুবায়কে নিজের সারূপ্য এবং ইহলোকে পরম লক্ষ্মী, বল, ঐশ্বর্য, স্মৃতিশক্তি ও ইন্দ্রিয়পটুতা প্রদান করলেন। তারপর দু'জনে সুদামা নামক মালাকারের গৃহে উপস্থিত হলেন। সুদামা তাঁদের দু'জনকে দেখামাত্র উঠে মাটিতে পড়ে নমস্কার করলেন এবং আসন দিয়ে পাদ্য-অর্ঘ্য, পূজার উপকরণ, মালা, পান, চন্দন প্রভৃতি দিয়ে তাঁদের অনুচরগণ সহ পূজা করে বললেন, প্রভু, আপনাদের আগমনে আমাদের জন্ম সার্থক এবং কুল পবিত্র হল। পিতা, ঋষি ও দেবতারা আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন। আপনারা নিশ্চয়ই জগতের চরম কারণ, মুক্তি ও ভোগ দেবার জন্য এই পৃথিবীতে অংশে অবতীর্ণ হয়েছেন। প্রভু, যদিও আপনারা ভজনাকারী ব্যক্তিকেই ভজনা করে থাকেন তা হলেও আপনাদের বিষম দৃষ্টি নেই।

কারণ আপনারা জগতের আত্মা ও বন্ধু এবং সকল জীবে সমানভাবে বিরাজমান। আমি আপনাদের ভৃত্য, আদেশ করুন আপনাদের জন্য আমি কি করতে পারি। আপনাদের আদেশ লোকের পক্ষে মংগলকর। ৩৭-৪৭

হে রাজেন্দ্র, সুদামা এই রকম নিবেদন করে তাঁদের অভিপ্রায় বুঝে সন্তুষ্টচিত্তে নানা রকম ভাল ভাল সুগন্ধি ফুলের মালা রচনা করে দিলেন। অনুচরগণ সহ রাম-কৃষ্ণ প্রসন্ন হয়ে সেইসব মালায় সুন্দরভাবে অলংকৃত হলেন এবং প্রণত ও শরণাগত সেই মালাকারকে অজস্র বর দান করলেন। সেই ব্যক্তি অখিলাত্মা ভগবানের প্রতিই অচলা ভক্তি এবং তাঁর ভক্তজন সহ সৌহার্দ্য ও সর্বভূতে পরম দয়া প্রার্থনা করলেন। ভগবান তাঁকে প্রার্থিত সমস্ত বর প্রদান করে পরে সে প্রার্থনা না করলেও বললেন, মালাকার, তোমার বংশে লক্ষ্মীশ্রী সর্বদা বৃদ্ধি পাবে এবং তোমার বল, আয়ু, যশ ও কান্তি সমন্বিত হবে। এই বর দিয়ে তিনি অগ্রজ বলরামের সংগে সেখান থেকে বার হলেন। ৪৮-৫২

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়

কুব্জাকে অনুগ্রহ ও মল্লরঙ্গে প্রবেশ

শুকদেব বললেন, মহারাজ, তারপর রাজপথ দিয়ে যেতে যেতে শ্রীকৃষ্ণ দেখলেন এক যুবতী নারী অংগবিলেপনের পাত্র হাতে করে সেই পথে যাচ্ছে। সে সুন্দরী সত্য, কিন্তু কুব্জা। শ্রীকৃষ্ণ হেসে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, অংগনা, তুমি কে? আমাদের গায়ে লেপনের যোগ্য এই অনুলেপনই বা কার? আমাদের সত্য করে বল। এই উত্তম অনুলেপন আমাদের অংগে দান কর, তাতে অচিরে তোমার মংগল হবে। কুব্জা বলল, হে সুন্দর, আমার নাম ত্রিবক্রা। আমি কংস রাজার অনুলেপন-ক্রিয়ার দাসী। আমার প্রস্তুত-করা অংগবিলেপন ভোজ-রাজার অত্যন্ত প্রিয়, আপনারা দু'জন ছাড়া আর কোন ব্যক্তি এর যোগ্য হতে পারেন? ত্রিবক্রা তাঁদের রূপ, সৌকুমার্য, রসিকতা, মধুর হাসি, মনোজ্ঞ আলাপ ও কটাক্ষে বিমোহিত হয়ে দুজনকেই সেই ঘন অনুলেপন দিলেন। তারপর রাম ও কৃষ্ণ দু'জনেই সেই পীত, লোহিত ইত্যাদি অঙ্গবিলেপনে অনুরঞ্জিত হয়ে পরম শোভা পেতে লাগলেন। ভগবান তাঁর প্রতি প্রসন্ন হয়ে সাক্ষাৎ লাভের ফল প্রদর্শন করার জন্য রুচিরাননা কুব্জাকে তখনি সরলাঙ্গী করতে ইচ্ছা করলেন। তিনি নিজের দুই পা দিয়ে তার দুই পায়ের অগ্রভাগ চেপে ধরলেন, তাঁর ডান হাতের দু'টি আঙ্গুল দিয়ে তাঁর চিবুক ধরে দেহকে উন্নত করে দিলেন। ঐ রকম করামাত্র কুব্জার দেহ সরল এবং তার গঠন সুসমঞ্জস হল। তার নিতম্ব সুবৃহৎ ও পয়োধর উন্নত হয়ে উঠল। ফলে কুব্জা হল প্রমদাশ্রেষ্ঠ। সেই নবদেহধারিণী রূপ, গুণ ও ঔদার্যসম্পন্না হয়ে কামাবেশে শ্রীকৃষ্ণের উত্তরীয়ের প্রান্তভাগ আকর্ষণ করে বলতে লাগল, প্রভু, এস গৃহে যাই, তোমাকে আমি এখানে রেখে যেতে পারব না। পুরুষশ্রেষ্ঠ, তোমাকে দেখে আমার চিত্ত উন্মথিত হল, আমার প্রতি তুমি প্রসন্ন হও। যুবতী নারীর প্রার্থনা শুনে শ্রীকৃষ্ণ বলরাম এবং উপস্থিত অন্যান্য অনুচরদের মুখের দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বললেন, হে সুভ্রূ, আমি স্বকার্য সাধন করে নিই, তারপর তোমার মনঃপীড়া নাশ করবার জন্য তোমার গৃহে আসব। এই পুরীতে গৃহহীন আমাদের তুমিই পরম আশ্রয়। ১-১২

ভারত, এরকম সুমধুর বচনে সেই রমণীকে বিদায় দিয়ে ভগবান অগ্রজ বলরামের সঙ্গে চলতে লাগলেন। পথে তাঁদের দেখতে পেয়ে বণিকেরা মালা, সুগন্ধদ্রব্য, পান-সুপারি প্রভৃতি নানা রকম উপহার দিয়ে পূজা করল। আবার তাঁকে দেখে কামমোহিত অবলারা আত্মবিস্মৃত হলেন। তাঁদের বস্ত্র, বেণী, বালা, প্রভৃতি বিস্রস্ত হয়ে পড়ল ও তাঁরা চিত্রার্পিত মূর্তি'র মত হয়ে রইলেন। তারপর শ্রীকৃষ্ণ পুরবাসী লোকদের কংসের ধনুর্যজ্ঞের স্থান কোথায় জিজ্ঞাসা করতে করতে সেখানে গিয়ে ঢুকলেন। ঢুকে দেখলেন সেখানে ইন্দ্রধনুর মত একটি অদ্ভুত পরম ঐশ্বর্যযুক্ত ধনুক রয়েছে; বহু পুরুষ তার রক্ষায় নিয়োজিত। রক্ষীদের নিষেধ সত্ত্বেও শ্রীকৃষ্ণ বলপূর্বক সেই ধনুক গ্রহণ করলেন। তারপর তিনি অবলীলায় তা বাঁ হাতে ধরে ধনুকের জ্যা যুক্ত করলেন এবং সকলের সামনেই মত্ত হাতী যেমন আখের ডাল ভাঙে সেভাবে নিমেষে ধনুর্কটি ভেঙ্গে ফেললেন। ধনুর্ভঙ্গের শব্দে স্বর্গ-মর্ত্য-আকাশ সমস্ত দিক পরিপূর্ণ হল। তা শুনে ভোজরাজ কংস অত্যন্ত সন্ত্রস্ত হল। তার রক্ষীরা মার-মার, ধর-ধর শব্দে অনুচরগণসহ কৃষ্ণকে ঘিরে ফেলল। রাম-কৃষ্ণ তাদের দুরভিসন্ধি বুঝতে পেরে শুধু ক্রুদ্ধ হলেন তা নয়, ভাঙ্গা ধনুকের টুকরো দু'টো নিয়ে আক্রমণকারীদের বিনাশ করতে লাগলেন। তারপর কংসপ্রেরিত সৈন্যদের হত্যা করে যজ্ঞশালা থেকে বাইরে চলে এলেন ও পুরসম্পদ দর্শন করে আনন্দে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। পুরবাসীরা তাঁদের দু'জনের এই অদ্ভুত বীর্যপ্রভাব, তেজ, ধৃষ্টতা ও রূপ দেখে সকলেই তাঁদের দুই শ্রেষ্ঠ দেবতা বলে মান্য করল। ১৩-২২

স্বেচ্ছায় বিচরণ করতে করতে দিন অবসান হল, সূর্যও অস্ত গেলেন। তাঁরা দু'জনে গোপগণ পরিবৃত হয়ে যেখানে তাঁদের শকটগুলি রাখা ছিল সেখানে এলেন। ব্রজ থেকে শ্রীকৃষ্ণের যাত্রার সময় গোপীরা মথুরাঙ্গনাদের যে সমস্ত ভাগ্যের কথা বলেছিলেন, সে সমস্তই ফলল। ব্রহ্মাদি দেবতারা কৃপাকটাক্ষ লাভ করবার জন্য যে লক্ষ্মীকে ভজনা করেন সেই লক্ষ্মীদেবীর নিত্য আরাধ্য পুরুষবরের অঙ্গশোভা মধুপুরীর জনগণ নয়নভরে দেখতে পেল। ২৩-২৪

মহারাজ, তারপর রাম-কৃষ্ণ হাত পা ধুয়ে ক্ষীরান্ন ভোজন করে কংস কি করছে তা শুনে সুখে সেই রাত্রি যাপন করলেন। দুর্মতি কংস যখন শুনল যে রাম ও কৃষ্ণ অবলীলায় সেই ধনুর্ভঙ্গ করে রক্ষকদের ও তার নিজের সৈন্যদের সংহার করেছেন, তখন তার আর ভয়ের সীমা রইল না। রাত্রে সে ঘুমোতে পারল না। জাগরণ ও স্বপ্ন উভয় অবস্থাতেই সে মৃত্যুর দূতের মত নানা রকম দুর্লক্ষণ দেখতে লাগল। সে দেখল যে জলের মধ্যে যেন তার ছায়া পড়েছে, অথচ কাঁধে মাথা নেই। আঙুল প্রভৃতি দিয়ে চোখ না ঢাকলেও প্রত্যেক দীপ্তিময় পদার্থকে সে দুই দুই দেখতে লাগল। যেন নিজ ছায়ার মধ্যে ছিদ্রের বোধ হতে লাগল। কর্ণরন্ধ্র রুদ্ধ করলে সে প্রাণবায়ুর শব্দ শুনতে পেল না। গাছগুলিকে তার সোনালি রংয়ের মনে হল। সে ধূলিকাদায় নিজের পদচিহ্ন দেখতে পেল না। স্বপ্নে প্রেতের সঙ্গে আলিঙ্গন করতে লাগল। গাধার পিঠে চড়ে যেতে লাগল, কখন যেন পদ্মের ডাঁটা খেতে লাগল এবং একজন তৈলাক্তদেহ জবাফুলের মালাধারী দিগম্বরকে তার দিকে আসতে দেখল। জাগ্রত ও স্বপ্নাবস্থায় এরকম বিভিন্ন দুর্লক্ষণ দর্শন করে যারপর নাই ভীত হওয়ায় চিন্তায় কংসের আর ঘুম হল না। ২৫-৩১

এভাবে অতি কষ্টে রাত্রি প্রভাত হল, দেখতে দেখতে জলের মধ্য দিয়ে সূর্যোদয় হল। কংস মল্লক্রীড়া মহোৎসবের আদেশ দিল। পুরুষেরা রঙ্গস্থানের পূজা

করে তূরী ও ভেরী বাজাতে লাগল। মঞ্চগুলি মালা, পতাকা, বিচিত্র বস্ত্র ও তোরণে অলংকৃত হল। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি পৌর, জনপদবাসী ও রাজারা সেই সব মঞ্চে যথাসুখে উপবিষ্ট হলেন। কংস মন্ত্রিগণ পরিবৃত হয়ে রঙ্গমঞ্চের উপর অন্যান্য রাজগণের মধ্যে ক্ষুব্ধহৃদয়ে উপবেশন করল। তারপর বাদ্য বাজতে শুরু করলে মল্লদের তাল শোনা যেতে লাগল। মল্লাচার্যগণের সংগে সুন্দর সাজে অলংকৃত দর্পিত মল্লরা মল্লস্থানে প্রবেশ করল। চাণূর, মুষ্টিক, কূট, শল, তোশল এই মল্লরা তূর্যবাদ্যে হৃষ্ট হয়ে মল্লরংগে এল। নন্দ প্রভৃতি গোপগণ ভোজরাজের আহ্বানে নানা উপহার নিবেদন করে এক মঞ্চে আসন গ্রহণ করলেন। ৩২-৩৮

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়

কুবলয়াপীড়-বধ ও মল্লক্রীড়ার সূচনা

শুকদেব বললেন, হে পরন্তপ, তারপর রাম ও কৃষ্ণ মল্লদের তাল ও দুন্দুভি বাজনা শুনে মল্লক্রীড়া দেখতে গেলেন। তাঁরা আগের দিনই বিচার করেছিলেন — আমরা ধনুর্ভংগ প্রভৃতি কাজের মধ্য দিয়ে আমাদের ঐশ্বর্য প্রকটিত করলাম। তবু দুরাত্মা কংস আমাদের পিতা-মাতাকে মুক্ত করল না, উপরন্তু আমাদেরও হত্যা করবার চক্রান্ত করেছে। অতএব যদিও সে আমাদের মাতুল, তবু তার প্রাণবধে দোষ নেই। রঙ্গদ্বারে উপস্থিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণ দেখলেন যে সেখানে কুবলয়াপীড় নামে এক বিশাল হাতী উপস্থিত রয়েছে। তা দেখে ভগবান যুদ্ধের বেশ ধারণ করে, কুটিল কেশ-বন্ধন করে মেঘগম্ভীর স্বরে হস্তীপালককে বললেন, ওরে হস্তীপালক, পথ থেকে হাতী সরিয়ে আমাদের যেতে দাও। দেরি কর না ; না হলে হাতীর সংগে তোমাকেও এখনি যমালয়ে পাঠিয়ে দেব। হস্তীপালক এই ভর্ৎসনায় ক্রুদ্ধ হয়ে কালান্তক যমতুল্য সেই হাতীকে বাগিয়ে শ্রীকৃষ্ণের দিকে চালিত করল। গজরাজ তাঁর দিকে দৌড়ে গিয়ে শুঁড় দ্বারা তাঁকে সবলে ধরলে কৌশলে তিনি তার শুঁড় থেকে বিশ্লিষ্ট হয়ে তার পায়ে আঘাত করে লুকিয়ে রইলেন। ক্রুদ্ধ হাতী তাঁকে দেখতে না পেয়ে আরো ক্রুদ্ধ হল, ঘ্রাণশক্তি দ্বারা তাঁকে আবিষ্কার করে আবার শুঁড়ে আটকাল, তিনিও সবলে শুঁড় থেকে নির্গত হলেন। ১-৭

গরুড় যেমন সাপ ধরে শ্রীকৃষ্ণ সেরকম অবলীলায় সেই অতিবল কুবলয়াপীড়ের লেজ ধরে পঁচিশ ধনু (শত হাত) দূরে টেনে আনলেন। বালকরা যেমন ভ্রাম্যমাণ গোবৎস সহ ভ্রমণ করে সেরকম তিনি বাঁয়ে ও ডাইনে সেই হাতীর সংগে ঘুরতে লাগলেন। শ্রীকৃষ্ণ তার লেজ ধরাতে হাতী তাঁকে ধরার জন্য যেমন বাঁ দিকে ঘুরল, অমনি তিনি তাকে ডান দিকে, আবার যেমন সে ডান দিকে ঘুরল, অমনি তাকে বাঁদিকে ঘুরিয়ে যেতে লাগলেন। তারপর তিনি সামনে এসে ঐ হাতীকে হাত দিয়ে আঘাত করলেন এবং চতুর্দিকে দৌড়ে তার পদ দ্বারা পিষ্ট হওয়ার ভান করে পড়ে গেলেন। তাঁর ক্রীড়াচ্ছলে দৌড়ানো ও পড়ে যাওয়া দেখে ক্রুদ্ধ হাতী দাঁত দিয়ে পৃথিবীকে আঘাত করতে লাগল ও নিজের বিক্রম ব্যর্থ হতে দেখে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হল। তারপর প্রধান হস্তীপালক কর্তৃক চালিত হয়ে সে রোষে শ্রীকৃষ্ণের দিকে ধাবিত হল। সে সামনে যেতেই ভগবান শুঁড় ধরে তাকে মাটিতে ফেলে দিলেন। হাতী মাটিতে পড়ে গেলে তিনি সিংহের ন্যায় অবলীলাক্রমে তাকে পা দিয়ে

আক্রমণ করে দাঁত দু'টি উৎপাটিত করে তা দিয়েই হস্তী ও হস্তীপালকদের সংহার করলেন। তারপর মৃত হাতী ফেলে রেখে ঐ দাঁত হাতেই মল্লরঙ্গে প্রবেশ করলেন। কাঁধে হস্তীদন্ত, সর্বাঙ্গে রক্ত ও মদকণায় অঙ্কিত আর মুখপদ্মে ঘর্মবিন্দু উদ্গত হওয়ায় তিনি অপূর্ব শোভায় মণ্ডিত হয়েছিলেন। বলরাম ও জনার্দন কয়েকজন গোপ পরিবৃত হয়ে হস্তীদন্তরূপ উৎকৃষ্ট অস্ত্র নিয়ে মল্লরঙ্গে প্রবেশ করলেন। তখন তিনি মল্লদের পক্ষে বজ্র, মানুষের পক্ষে নরশ্রেষ্ঠ, যুবতীদের চোখে মূর্তিমান মদন, গোপদের স্বজন, অসৎ রাজাদের শাসক, পিতামাতার কাছে শিশু, ভোজপতি কংসের চোখে সাক্ষাৎ মৃত্যু, অজ্ঞদের কাছে সাধারণ মানুষ, যোগীদের পরম তত্ত্ব এবং বৃষ্ণিদের পরম দেবতা রূপে প্রকাশিত হলেন। ৮-১৭

মহারাজ, কুবলয়াপীড়কে নিহত হতে দেখে কংস, প্রভূত মনোবলের অধিকারী হলেও, রাম-কৃষ্ণকে জয় করা দুঃসাধ্য মনে করল এবং তার অন্তরে ভয়ের সঞ্চার হল। উপরন্তু বিচিত্র বেশ, বস্ত্র, ভূষণ ও মালায় ভূষিত হয়ে দুই মহাভুজ নির্ভয়ে মনোহর ভঙ্গিমায় নাটকের অভিনেতার মত রঙ্গস্থলে উপস্থিত হয়ে দর্শকদের চিত্ত আকর্ষণ করলেন। মঞ্চে উপস্থিত নাগরিক ও রাজকীয় লোকদের চোখ ও মুখ আনন্দের আবেগে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। তাঁরা সতৃষ্ণনয়নে তাঁদের বদন-সৌন্দর্য পান করতে লাগলেন, কিন্তু তবুও তাঁদের পিপাসার নিবৃত্তি হল না। তাঁরা যেন চোখ দিয়ে রাম-কৃষ্ণ মাধুর্য পান, জিহ্বা দিয়ে লেহন, নাসারন্ধ্র দিয়ে আঘ্রাণ এবং দু'হাত দিয়ে আলিঙ্গন করতে লাগলেন। তাঁরা আগে যেরকম দর্শন ও শ্রবণ করেছিলেন সেইভাবে পরস্পর বলাবলি করতে লাগলেন। রাম-কৃষ্ণের রূপ, গুণ, মাধুর্য ও প্রগল্ভতা তাঁদের এই সব স্মরণ করিয়ে দিল। তাঁরা বলতে লাগলেন—এঁরা দু'জন সাক্ষাৎ শ্রীহরির অংশে পৃথিবীতে বসুদেবের গৃহে অবতীর্ণ হয়েছেন। ইনিই দেবকীর গর্ভে আবির্ভূত হয়েছেন, এঁকেই গোকুলে নিয়ে যাওয়া হয়; সেখানে এতকাল গুপ্তভাবে বাস করে নন্দের গৃহে বড় হয়েছেন। এঁরই হাতে পূতনা, তৃণাবর্ত, যমলার্জুন, ধেনুক, কেশী, শঙ্খচূড়, অঘাসুর প্রভৃতি দুষ্টরা বিনষ্ট হয়েছে। ইনিই রাখালদের সঙ্গে পশুদের অগ্নিরূপী দানবের গ্রাস থেকে মুক্ত করেছিলেন, ইনিই কালিয়কে দমন করেছিলেন। এঁর দ্বারাই ইন্দ্রের গর্ব খর্ব হয়েছে, কেননা এক সপ্তাহকাল এক হাতে গিরিরাজ গোবর্ধনকে তুলে ধরে বর্ষা, বাতাস ও বজ্রের হাত থেকে গোকুলকে রক্ষা করেছিলেন। এঁর মুখে হাসি ও কটাক্ষ নিত্য বিরাজিত, গোপীরা এই মুখমণ্ডল দর্শন করেই পরমানন্দে নানারকম সন্তাপ থেকে অনায়াসে উত্তীর্ণ হন। অতএব, অনেকে বলে থাকেন এঁর দ্বারা রক্ষিত হয়ে যদুর বংশ বিখ্যাত হয়ে লক্ষ্মী, কীর্তি ও মহত্ত্ব লাভ করবে। কমললোচন বলরাম এঁরই অগ্রজ, ইনি প্রলম্বাসুরকে বধ করেছিলেন। বৎসাসুর ও বকাসুর বলরামেরই হাতে নিহত হয়েছে। ১৮-৩০

জনতা এরকম বলাবলি করতে থাকলে ও বাদ্যযন্ত্রগুলি ধ্বনিত হতে থাকলে চাণূর রাম-কৃষ্ণকে ডেকে বলল, ওহে নন্দতনয় কৃষ্ণ আর রাম, তোমরা দুজনে বীর বলে খ্যাত এবং বাহুযুদ্ধে দক্ষ। রাজা একথা শুনে পরীক্ষা করার জন্য তোমাদের আহ্বান করেছেন। প্রজারা কর্ম, মন ও বাক্য দ্বারা রাজার প্রিয়সাধন করেই মঙ্গল লাভ করে। এর অন্যথা হলে বিপদ ঘটে। একথা সকলেই জানে যে গোপালেরা প্রত্যহ বনে সানন্দে মল্লযুদ্ধে ক্রীড়া করেই গোচারণ করে বেড়ায়। তাই এস, তোমরা আর আমরা রাজার ইষ্টসাধন করি। তাহলে সকল প্রাণীই আমাদের প্রতি প্রসন্ন হবে, কারণ রাজা সর্বভূতস্বরূপ। বাহুযুদ্ধ শ্রীকৃষ্ণের অভীষ্ট, তাই তার বাক্যকে অভিনন্দিত করে দেশ ও কালের সমুচিত বাক্যে তিনি বললেন, আমরাও

ভোজরাজের বনচর প্রজা, তাই তাঁর ইষ্টসাধনের আজ্ঞা আমাদের পক্ষে পরম অনুগ্রহ। আমরা তা প্রতিপালন করে তাঁর প্রিয়কার্য অবশ্যই করব। কিন্তু আমরা বালক; আমাদের সমান বলশালী বালকদের সঙ্গে বাহুযুদ্ধের ক্রীড়া করতে চাই। এরূপ (সমানে সমানে যুদ্ধ) হলে মল্লসভাসদদের অধর্ম স্পর্শ করবে না। চাণূর বলল, তুমি অথবা বলরাম উভয়ে বালকও নও, কিশোরও নও; যেহেতু তুমি বা বলরাম হাজার হাতীর সমান বলশালী এক হাতীকে অবহেলায় বিনাশ করেছ। কাজেই তোমরা দু'জনে আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ কর, এই যুদ্ধে নিশ্চয়ই কোন অধর্ম নেই। বৃষ্ণিনন্দন, এস তুমি আমার সঙ্গে যুদ্ধ কর, মুষ্টিক বলভদ্রের সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করবে। ৩১-৪০

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়

কংস-বধ

শুকদেব বললেন, মহারাজ, এইরকম স্থির হলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চাণূরের এবং রোহিণী-নন্দন বলরাম মুষ্টিকের কাছে উপস্থিত হলেন। তাঁরা দু'টি হাত দিয়ে দুটি হাত, দুটি পা দিয়ে দুটি পা বন্ধন করে জয়ের জন্য পরস্পর পরস্পরকে (কৃষ্ণ ও চাণূর এবং বলরাম ও মুষ্টিককে) আকর্ষণ করতে লাগলেন। একজন দুই অরত্নি (কনুইয়ের উপরাংশ) দ্বারা অপর জনের দুই অরত্নি, দুই জানু দ্বারা দুই জানু, মস্তক দ্বারা মস্তক, বক্ষঃস্থল দ্বারা বক্ষঃস্থলে প্রহার করতে লাগলেন। তাঁরা হাতে-পায়ে জড়াজড়ি করে ঘুরে, পরস্পরকে ছুঁড়ে ফেলে, বাহু দ্বারা পেষণ করে, আগে পিছে গিয়ে এবং পরস্পর জয়ের অভিলাষে পরস্পরের দেহ উত্থাপন, উন্নয়ন, চালন, স্থাপন প্রভৃতি প্রক্রিয়ায় পরস্পরের দেহে আঘাত করলেন। সমবেত রমণীরা দলবদ্ধ হয়ে করুণ দৃষ্টিতে একদিকে বলশালী অন্যদিকে অবলের (কিশোর) এই বিষম যুদ্ধ দর্শন করে বলাবলি করতে লাগলেন, এটা রাজসভাসদ্-দের অত্যন্ত অধর্মের কাজ হচ্ছে যে এরা বালকের সঙ্গে বলবানের যুদ্ধ বন্ধ করবার জন্য রাজাকে তো বলছেনই না, উপরন্তু নিজেরাও ঐ অসঙ্গত যুদ্ধ অনু-মোদন করছেন। পর্বতের মত বিশাল ও বজ্রের মত কঠোর এই মল্লদের দেহ কোথায়, আর কোথায় অতি সুকুমার অপ্রাপ্তযৌবন কিশোরদ্বয়ের দেহ! নিশ্চয়ই এতে সমাজে ধর্মের ব্যতিক্রম ঘটবে। যেখানে অধর্ম সেখানে কখনো থাকা উচিত নয়। সভায় উপস্থিত থেকে যিনি কিছু না বলেন, যিনি বিপরীত বলেন; যিনি 'কিছুই জানি না' বলেন, তাঁরা সকলেই সমান দোষে দোষী হন। অধর্মের সভায় সভ্যমাত্রের দোষ আছে স্মরণ করে প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা এরকম স্থানে প্রবেশই করেন না। ১-১০

চেয়ে দেখ, শত্রুর দিকে ধাবমান শ্রীকৃষ্ণের মুখকমল জলদ্বারা পদ্মকোষের মত ঘামে সিক্ত হচ্ছে। তখন অন্যান্য সখীরা বলল, তোমরা ব্যাকুল হচ্ছ কেন? তোমরা কি দেখছ না যে বলরামের ঈষৎ তাম্রলোচন শোভিত মুখ মুষ্টিকের প্রতি সক্রোধ হলেও তা হাস্য-আবেগে শোভিত হয়েছে? ব্রজভূমির পুণ্য আছে, কারণ শিব ও লক্ষ্মী যাঁর চরণ অর্চনা করে থাকেন সেই পুরাণপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ বলরামের সঙ্গে বেণু বাজিয়ে গোচারণ করতে করতে ক্রীড়া করছেন। গোপীরা কি তপস্যা

করেছেন, যে তায় বলে তাঁরা নয়নদ্বারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই রূপ নিত্য দর্শন করেন ? এমন লাবণ্যময় শ্রেষ্ঠ পুরুষ আর নেই। আভরণ প্রভৃতি থেকেও লাবণ্যের উৎপত্তি হয় না। লাবণ্য লক্ষ্মী ও যশের একমাত্র আধার। ব্রজরমণীরা ধন্য। তাঁরা অশ্রুকণ্ঠী হয়ে দোহন, উদূখলে ধানের সংস্কার, দধি-মাখন মন্থন, গৃহলেপন, দোলায় আন্দোলন, বালকের রোদন, জলসেচন ও অঙ্গমার্জন প্রভৃতি সব সময়েই এঁর পবিত্র কীর্তি গান করে থাকেন। তাঁদের চিত্ত এই শ্রীকৃষ্ণেই অনুরক্ত। অতএব তাঁর প্রতি অর্পিত চিত্ত দিয়েই তাঁদের সমস্ত বিষয় লাভ হয়েছে। বেণু বাজাতে বাজাতে শ্রীহরি গোপদের সংগে প্রাতে ব্রজ থেকে বের হন এবং সন্ধ্যায় ব্রজে প্রবেশ করেন। তখন বেণুরব শুনে শীঘ্র নির্গত হয়ে যে সব অবলা এঁর সদাহাস্যময় দৃষ্টি ও মুখ দেখতে পান, তাঁদের অনেক পুণ্য। ১১-১৬

হে ভরতশ্রেষ্ঠ, মথুরার স্ত্রীরা এরকম বলতে থাকলে যোগেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শত্রুকে সংহার করতে মনস্থ করলেন। স্ত্রীলোকদের কথা শুনে রাম-কৃষ্ণের পিতামাতা পুত্রস্নেহে কাতর হয়ে পড়লেন। পুত্রদ্বয়ের বলবিক্রমের বিষয় না জেনে অনুতাপ করতে লাগলেন। চাণূর ও শ্রীকৃষ্ণ বাহুযুদ্ধের বিশেষ নিয়মানুসারে যে রকম যুদ্ধ করতে লাগলেন মুষ্টিক ও বলরামও সেভাবেই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন। ভগবানের তীক্ষ্ণ বজ্রপাতের মত কঠিন প্রহারে ভগ্নাঙ্গ হয়ে চাণূর বারবার কষ্ট পেতে লাগল। বাজপাখীর মত বেগবান চাণূর দুই হাত মুঠো করে লাফ দিয়ে সক্রোধে ভগবানের বক্ষে আঘাত করল। কিন্তু ফুলের মালায় আহত হাতীর মত তার প্রহারে তিনি কিছুমাত্রও বিচলিত হলেন না। শ্রীকৃষ্ণ তাকে দুই হাতে ধরে বারবার ঘোরাতে লাগলেন ; তাতে তার জীবনীশক্তি ক্ষীণ হয়ে এলে তাকে সবলে ভূপৃষ্ঠে আছড়াতে লাগলেন। সেই ভীষণ প্রহারে তার মালা, চুল ও বেশবাস বিস্রস্ত হল, সে ইন্দ্রধ্বজের মত নিপতিত হল। মুষ্টিকও আগে ঐভাবে নিজেব মুষ্টি দ্বারা বলরামকে আঘাত করেছিল, আর বলরামও বজ্রমুষ্টি দিয়ে তাকে প্রচণ্ডভাবে আঘাত করলেন। মুষ্টিক এই প্রহারে কাঁপতে লাগল এবং আহত হয়ে মুখ দিয়ে রক্তবমি করতে করতে ঝড়ে-উপড়ানো গাছের মত প্রাণশূন্য হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। মুষ্টিক এভাবে প্রাণত্যাগ করলে কূট মামক এক দানব বলরামের সম্মুখীন হল। সে মল্লযুদ্ধে পর্বতশৃঙ্গের মত স্থির হয়ে তাঁকে আঘাত করলেও তিনি অবহেলায় তাকে বাম মুষ্টির আঘাতে বিনাশ করলেন। সেই সময়েই শ্রীকৃষ্ণের চরণাঘাতে শলের মাথা এবং তোশলের দেহ দু' টুকরা হয়ে তারা প্রাণত্যাগ করল। এভাবে চাণূর, মুষ্টিক, কূট, শল, তোশল প্রভৃতি মল্লরা নিহত হলে অবশিষ্ট মল্লরা প্রাণরক্ষার জন্য পলায়নপর হল। ১৭-২৮

তখন সমস্ত বাদ্য বেজে উঠল। বয়স্য গোপদের আকর্ষণ করে তাঁদের সঙ্গে মিলিত হয়ে রাম-কৃষ্ণ মল্লোচিত নৃত্য ও বিহার করতে লাগলেন। তাঁদের আচরণে কংস ছাড়া মুখ্য ব্রাহ্মণ ও সাধু ব্যক্তিরা আনন্দিত হয়ে তাঁদের সাধুবাদ দিলেন। মল্লশ্রেষ্ঠ চাণূর প্রভৃতি নিহত ও অন্য মল্লরা পলায়ন করেছে দেখে ভোজরাজ কংস আদেশ দিল, বাদ্য বাজাতে নিষেধ কর। বসুদেবের দুই পুত্র দুর্বৃত্ত রাম ও কৃষ্ণকে নগর থেকে বার করে দাও। গোপদের ধন কেড়ে নাও এবং দুর্বুদ্ধি নন্দকে বিনাশ কর। অসৎ দুরাত্মা বসুদেবকে শীঘ্র হত্যা কর। আর আমার শত্রু-সমর্থক পিতা উগ্রসেনকেও অনুচরদের সহ বিনাশ কর। ২৯-৩৩

কংস এরকম অহংকার-বাক্য বললে অব্যয় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে

নিজের দেহ লঘু করে লাফ দিয়ে সবেগে কংস যে মঞ্চে উপবিষ্ট সে মঞ্চে আরোহণ করলেন। মনস্বী কংস সাক্ষাৎ মৃত্যুরূপী শ্রীকৃষ্ণকে মঞ্চের মধ্যে প্রবেশ করতে দেখে অত্যন্ত ভয় পেয়ে সহসা আসন থেকে উঠে ঢাল-তলোয়ার হাতে নিল। দুঃসহ অমিততেজা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, গরুড় যেমন সাপ ধরে সেরকম ভাবে, শ্যেনপক্ষীর মত আকাশে ডানে ও বাঁয়ে ভ্রমণশীল খড়্গধারী কংসকে বলপূর্বক ধরে ফেললেন। তার কেশ ধরামাত্র তাঁর মুকুট খসে পড়ল, তাকে এরকম অবস্থায় উঁচু মঞ্চ থেকে রঙ্গভূমির উপর ছুঁড়ে ফেলে পদ্মনাভ, বিশ্বের আশ্রয়, স্বাধীন ভগবান স্বয়ং তার উপর নিপতিত হলেন। সিংহ যেমন মৃত হাতীকে টেনে নিয়ে যায় সেরকম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উপস্থিত দর্শকবৃন্দের সামনেই তাঁর দ্বারা নিষ্পেষিত মৃত কংসকে টেনে নিয়ে যেতে লাগলেন ; দর্শকরা হাহাকার করতে লাগল। কংস উদ্বিগ্নচিত্তে পান, ভোজন, কথন, বিচরণ, নিন্দা, জাগরণ প্রভৃতি সকল সময়েই চক্রপাণি শ্রীকৃষ্ণকে সামনে দেখতে পেত। এখন তাঁর হাতে নিহত হয়ে সে তাঁরই দুষ্প্রাপ্য রূপ প্রাপ্ত হল। কংসের অনুজ কংকও ন্যগ্রোধ প্রভৃতি আট ভাই কংসের ঋণ পরিশোধ করতে প্রবৃত্ত হয়ে অত্যন্ত ক্রোধে শ্রীকৃষ্ণের দিকে দৌড়ে গেল। কিন্তু সিংহ যেমন পশুদের নিহত করে, রোহিণীনন্দন বলরাম সেরকম প্রতাপে পরিঘ (লোহার গদা) উত্তোলন করে কংক প্রভৃতি ভ্রাতাদের নিহত করলেন। ৩৪-৪১

এভাবে ভ্রাতাদের সঙ্গে কংস নিহত হলে দেবতাদের খুব আনন্দ হয়েছিল। তখন আকাশে দুন্দুভি বেজে উঠল, তাঁর বিভূতি-ভূত ব্রহ্মাদি দেবতারা প্রীতমনে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি পুষ্পবর্ষণ করে তাঁর স্তব করতে লাগলেন। অপ্সরারা নৃত্য করতে আরম্ভ করল। আর অন্যদিকে কংস প্রভৃতির পত্নীরা তাদের পতিদের মৃত্যুতে নিদারুণ দুঃখে মাথা চাপড়াতে চাপড়াতে সাশ্রুনয়নে সেখানে এল। রমণীরা বীরশয্যায় শায়িত পতিদের আলিঙ্গন করে, শোকে অভিভূত হয়ে, বিরামহীন অশ্রুবিসর্জন করে উচ্চস্বরে বিলাপ করতে লাগল—হায় নাথ, প্রিয়, ধর্মজ্ঞ, দয়ালু, অনাথবৎসল, তোমার মৃত্যুতে গৃহ ও প্রজাদের সাথে আমরাও নিহত হয়েছি। পুরুষশ্রেষ্ঠ স্বামী, তোমার বিরহে এই পুরীর সমস্ত উৎসব ও মঙ্গল আমাদের মত নিষ্প্রভ হয়ে পড়েছে। হায় স্বামী, তুমি নিরপরাধ ব্যক্তিদের প্রতি ভয়ানক শত্রুতা করেছিলে ; সেজন্য এ দশা ! প্রাণীর অনিষ্ট চেষ্টা করে কোন ব্যক্তি মঙ্গল লাভ করতে পারে ? আর ইনি সব প্রাণীরই সৃষ্টি ও লয়ের স্থান এবং রক্ষাকর্তা। যে এঁকে অবজ্ঞা করে তার কখনই সুখলাভ হয় না।[১] ৪২-৪৮

শুকদেব বললেন, মহারাজ, লোকভাবন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রাজমহিষীদের আশ্বাস দিয়ে (মনু, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি ঋষিরা যেমন নির্দেশ করেছেন) মৃত কংস প্রভৃতির সেইরকম লৌকিক সৎকার করালেন। তারপর রাম-কৃষ্ণ মাতা দেবকী ও পিতা বসুদেবকে বন্ধন থেকে মুক্ত করে চরণে মস্তক স্পর্শ করে তাঁদের বন্দনা করলেন। দেবকী ও বসুদেব বন্দনাকারী পুত্রদ্বয়কে জগদীশ্বর শ্রীভগবান জেনে ভীত হলেন এবং আলিঙ্গন করতে পারলেন না। কেবল বদ্ধাঞ্জলি হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। ৪৯-৫১

---
১ তুলনীয় : শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ, ৪।১ শ্লোক।

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়

উগ্রসেনের রাজ্যাভিষেক

শুকদেব বললেন; মহারাজ, পুরুষশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ বুঝতে পারলেন যে পিতা-মাতা সাংসারিক সুখলাভের আগেই দুই পুত্রকে পরমেশ্বর বলে জানতে পেরেছেন। আমি প্রসন্ন হলে এরকম জ্ঞান লাভ অসম্ভব নয়, বরং আমাকে পুত্র ভেবে এঁরা যে প্রেমসুখ লাভ করতেন তা দুর্লভ হবে। তাই আমার প্রতি এঁদের ঈশ্বরজ্ঞানে কাজ নেই, এই ভেবে শ্রীকৃষ্ণ মোহিনী মায়া বিস্তার করে অগ্রজের সঙ্গে পিতা-মাতার কাছে গেলেন। বিনয়নম্র ভাবে মা, বাবা বলে ডেকে তাঁদের সন্তুষ্ট করে বললেন, পিতা, আমরা আপনার পুত্র, কিন্তু সর্বদা উৎকণ্ঠিত থাকায় আপনারা আমাদের বাল্য ও কিশোর অবস্থা থেকে বাৎসল্যাদি সুখ অনুভব করতে পারেন নি। আমাদেরই অদৃষ্ট মন্দ, আপনাদের স্নেহচ্ছায়ায় বাস করতে পারি নি। পিতৃগৃহে পিতা-মাতার লালনে থাকার সুখ আমাদের ভাগ্যে ঘটে নি। ধর্মাদি সমুদয় পুরুষার্থ এই দেহেই উৎপন্ন হয়। যাঁদের দ্বারা এই দেহ লাভ হয়েছে শত বৎসর জীবিত থেকেও সেই জনক-জননীর ঋণ শোধ করা যায় না। যে পুত্র সমর্থ হয়েও পিতা-মাতার জীবিকা সম্পাদন করে না, লোকান্তরে যমদূতেরা তাকে তার নিজের মাংস আহার করায়। সমর্থ ব্যক্তি যদি বৃদ্ধ মাতা-পিতা, সাধ্বী ভার্যা, শিশু-সন্তান, ব্রাহ্মণ ও বিপন্ন ব্যক্তিকে ভরণ-পোষণ না করে তা হলে সে জীবন্মৃত। আমাদের এতদিন তাই নিরর্থক ব্যয়িত হয়েছে, আমরা সমর্থ হয়েও কংসের ভয়ে ভীত হয়ে আপনাদের সেবা করতে পারি নি। আপনারা আমাদের ক্ষমা করুন। আমরা পরাধীন ছিলাম, দুরাশয় কংসের কাছ থেকে আমরা অনেক কষ্ট পেয়েছি। আপনাদেরও শুশ্রূষা করতে পারি নি। ১-৯

শুকদেব বললেন, বসুদেব ও দেবকী মায়া-মানুষ বিশ্বাত্মা শ্রীহরির এই রকম বাক্যে মোহিত হয়ে তাঁকে কোলে তুলে নিলেন এবং আলিঙ্গন করে পরমানন্দে পুলকিত হলেন। কণ্ঠ তাঁদের বাষ্পরুদ্ধ হল। স্নেহপাশে আবদ্ধ এবং মোহিত হয়ে তাঁরা অশ্রুধারায় পুত্রদ্বয়কে অভিষিক্ত করতে লাগলেন, কিছুই বলতে পারলেন না। ভগবান দেবকীনন্দন পিতামাতাকে এভাবে আশ্বাস দিয়ে মাতামহ উগ্রসেনকে যদুদের রাজসিংহাসনে স্থাপন করলেন। তিনি উগ্রসেনকে বললেন; মহারাজ, আপনার প্রজা আমরা। আমাদের আদেশ করুন। যযাতির শাপ আছে, সেজন্য যদুরা রাজসিংহাসনে উপবেশন করবেন না। আমি ভৃত্য উপস্থিত থাকতে অন্য রাজাদের কথা দূরে থাক স্বয়ং দেবতারাও অবনত হয়ে আপনাকে পূজো করবেন। বিশ্বকর্তার জ্ঞাতি ও বন্ধু যদু, বৃষ্ণি, অন্ধক, মধু, দশার্হ ও কুকুরাদি কংসের ভয়ে দূরদেশে পালিয়ে প্রবাস-ক্লেশ ভোগ করছিল। তিনি তাদের অভ্যর্থনা করে সাদরে আনিয়ে ধন দিয়ে তাদের তুষ্ট করলেন এবং নিজ নিজ গৃহে বাস করালেন। শ্রীকৃষ্ণ ও রামের বাহুবলে কংস প্রভৃতি ভয়হীন হয়ে রক্ষিত হওয়ায় তাদের সমস্ত মনোরথ সিদ্ধ হল। তারা সর্বদা মুকুন্দের নিত্যপ্রসন্ন শ্রীযুক্ত সদয় হাসিতে ভরা মুখশ্রী দর্শন করে নিজ নিজ গৃহে সুখে কালযাপন করতে লাগল। ১০-১৮

সেখানে বৃদ্ধরাও বারবার দৃষ্টি দ্বারা মুকুন্দের মুখপদ্ম-সুধা পান করে যৌবন ও সামর্থ্য ফিরে পেয়েছিলেন। তারপর দেবকীনন্দন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও বলদেব নন্দের কাছে গিয়ে তাঁকে আলিঙ্গন করে বললেন, পিতা, আপনারা অতিশয়

স্নেহপরায়ণ হয়ে নিজেদের চেয়েও বেশি স্নেহে আমাদের পালন করছেন। নিজের দেহের চাইতে পুত্রের উপর মাতা-পিতার অধিকতর প্রীতি হয়ে থাকে। পোষণে অসমর্থ বন্ধুদের পরিত্যক্ত শিশুদের যাঁরা পোষণ করেন তাঁরাই পিতা-মাতা। পিতা, এখন আপনি ব্রজে ফিরে যান। আমরা আত্মীয়দের সুখ বিধান করে জ্ঞাতিগণ সহ পরে ব্রজে আসব। ভগবান অচ্যুত ব্রজবাসীদের সঙ্গে নন্দকে এভাবে সান্ত্বনা দিয়ে বস্ত্র, অলংকার এবং কাঁসার পাত্র প্রভৃতি দ্বারা সাদরে পূজা করলেন। নন্দ এই কথা শুনে স্নেহে বিহ্বল হলেন এবং রাম-কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করে জলে-ভরা চোখে ব্রজে যাত্রা করলেন। ১৯-২৫

তারপর বসুদেব পুরোহিত গর্গাচার্য এবং ব্রাহ্মণদের দিয়ে দুই পুত্রের যথাবিধি উপনয়ন-সংস্কার করলেন ও সেই সব ব্রাহ্মণদের উত্তমরূপে অলংকৃত করে অর্চনাপূর্বক স্বর্ণমালা ভূষিত, সুন্দর সাজে সজ্জিত, সবৎসা এবং ক্ষৌমবস্ত্রে আচ্ছাদিত গাভী দক্ষিণা দিলেন। রাম-কৃষ্ণের জন্ম-নক্ষত্রে মহামতি বসুদেব যে সমস্ত গাভী মনে মনে দান করেছিলেন, দুরাত্মা কংস তা জানতে পেরে হরণ করে নিয়েছিল। এখন বসুদেব তা স্মরণ করে রাজগোষ্ঠ থেকে সেই সব গাভী আনিয়ে ব্রাহ্মণদের দান করলেন। তারপর সুব্রত রাম-কৃষ্ণ যদুকুলের আচার্য গর্গের কাছ থেকে উপনয়ন-সংস্কারে সংস্কৃত হয়ে দ্বিজত্ব লাভ করে ব্রহ্মচর্যব্রত ধারণ করলেন। তাঁরা জগদীশ্বর ও সর্ববিদ্যার প্রকৃষ্ট জনক, তাই সর্বজ্ঞ। তাঁরা নরলীলা দ্বারা স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান গোপন করে রেখেছিলেন। গুরুকুলে বাস করার ইচ্ছায় উভয় ভ্রাতা অবশেষে অবন্তীপুর নিবাসী কাশ্যপগোত্রীয় সান্দীপনি নামক মুনির কাছে গেলেন। সকল ইন্দ্রিয় দমন করে তাঁরা যথানিয়মে গুরুর কাছে উপস্থিত হয়ে গুরুর প্রতি এত বিনীত ও অনিন্দিত ব্যবহার করল যে তা এবং গুরুকে দেবতুল্য জ্ঞানে তাঁদের সেবা অপরের শিক্ষণীয় হয়ে রইল। দ্বিজ সান্দীপনি তাঁদের বিশুদ্ধ ভক্তিযুক্ত সেবায় তুষ্ট হয়ে তাঁদের ষড়ঙ্গ ও উপনিষদের সঙ্গে সমগ্র বেদ শিক্ষা দিলেন। রাম-কৃষ্ণ তাঁর কাছে মন্ত্র ও দেবতা-জ্ঞানের সঙ্গে ধনুর্বেদ, বিভিন্ন ধর্ম, নীতিমার্গ, আন্বীক্ষিকী (তর্ক বা আত্মবিদ্যা) এবং সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন, দ্বৈধীভাব ও সমাশ্রয়—এই ছয় রকম রাজনীতিও শিখলেন। সর্ববিদ্যার প্রবর্তক সেই দুই দেবশ্রেষ্ঠ একবার গুরুর উচ্চারণ মাত্রই সমস্ত বিদ্যা আয়ত্ত করলেন। এভাবে সংযত হয়ে তাঁরা চৌষট্টি দিন যাবতীয় কলাবিদ্যা আয়ত্ত করলেন। এপ্রকারে সমস্ত বিদ্যাধ্যয়ন শেষ করে তাঁরা গুরুদক্ষিণা গ্রহণ করতে আচার্যকে অনুরোধ করলেন। প্রভাসক্ষেত্রে সাগরগর্ভে সান্দীপনির পুত্র মারা গিয়েছিল। তিনি রাম-কৃষ্ণের অদ্ভুত মহিমা এবং অতি-মানুষী বুদ্ধি দর্শন করে পত্নীর পরামর্শে সেই পুত্রকেই দক্ষিণারূপে প্রার্থনা করলেন। ২৬-৩৭

দুরন্তবিক্রম রাম-কৃষ্ণ সেই প্রার্থনা স্বীকার করে রথে করে প্রভাসতীর্থে উপস্থিত হলেন। তাঁরা সেখানে ক্ষণকাল অবস্থান করলে সমুদ্র জানতে পেরে তাঁদের পূজো এনে দিলেন। ভগবান তাঁকে বললেন, তুমি যাকে এখানে তোমার বিশাল ঢেউ দিয়ে গ্রাস করেছ, আমার সেই গুরুপুত্রকে ফিরিয়ে দাও। সমুদ্র বললেন, দেব, আমি সেই ব্রাহ্মণতনয়কে অপহরণ করিনি। পঞ্চজন নামক শঙ্খরূপী যে মহান দৈত্য জলে বিচরণ করছে, সে-ই ব্রাহ্মণপুত্রকে অপহরণ করেছে। এইকথা শুনে কৃষ্ণ সমুদ্রে ঢুকে তৎক্ষণাৎ পঞ্চজনকে সংহার করলেন, কিন্তু তার পেটে গুরুপুত্রকে পেলেন না। তখন কৃষ্ণ সেই দৈত্যের শরীর থেকে উৎপন্ন পাঞ্চজন্য নামে শঙ্খ নিয়ে রথে ফিরে গেলেন। তারপর জনার্দন শ্রীকৃষ্ণ হলধর বলরামের সঙ্গে যমের সংযমনী

শঙ্খনাদ শ্রবণে একান্ত ভক্তি সহকারে মহাসমারোহে রাম-কৃষ্ণের অর্চনা করলেন। তিনি প্রণত হয়ে সকল প্রাণীর হৃদয়ের আলয়স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে বললেন, প্রভু, আপনারা উভয়েই বিষ্ণুর অবতারলীলা প্রকাশের জন্য মানবজন্ম নিয়েছেন। আপনাদের কি আদেশ পালন করব, বলুন। ৩৮-৪৪

ভগবান বললেন, মহারাজ, আমাদের গুরুপুত্র নিজের কর্মনিবন্ধনই আপনার ভৃত্য কর্তৃক এখানে আনীত হয়েছে। অতএব আমার আদেশ অনুসারে তাকে নিয়ে আসুন। 'তাই হবে' স্বীকার করে যমরাজ গুরুপুত্রকে এনে দিলে, রাম-কৃষ্ণ তাকে সঙ্গে করে নিয়ে গুরুর কাছে প্রত্যর্পণ করলেন। আবার বর নেবার জন্য তাঁরা গুরু সান্দীপনিকে অনুরোধ করলেন। গুরুদেব বললেন, বৎস, তোমাদের গুরুদক্ষিণা সম্যক্‌রূপে প্রদত্ত হয়েছে। তোমাদের গুরু হয়ে আমার কি কোন অভিলাষ অসম্পূর্ণ থাকতে পারে? বীরদ্বয়, তোমরা নিজগৃহে যাও। তোমাদের কীর্তি দ্বারা সর্বলোক পবিত্র হোক এবং অধীত বেদসকল ইহজন্মে ও পরজন্মে সর্বদা স্ফুরিত হোক। গুরুর অনুজ্ঞায় রাম কৃষ্ণ বায়ুর মত বেগশালী ও বজ্রের মত শব্দায়মান রথে চড়ে নিজ গৃহে ফিরে এলেন। অনেকদিন মথুরার প্রজাগণের রাম-কৃষ্ণের দর্শনলাভ হয়নি। নষ্ট ধন ফিরে পেলে লোকে যে রকম আনন্দিত হয় এখন থেকে তাঁদের দেখা পেয়ে তারাও সে রকম আনন্দিত হল। ৪৫-৫৫

ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায়

উদ্ধবের ব্রজে গমন

শুকদেব বললেন, সাক্ষাৎ বৃহস্পতির শিষ্য, বুদ্ধিতে শ্রেষ্ঠ, বৃষ্ণিবংশীয়দের প্রধান-মন্ত্রী উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়সখা ছিলেন। শরণাগত-পালক ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নির্জন স্থানে একান্ত অনুরক্ত প্রিয়তম ভক্ত উদ্ধবের হাত ধরে বলতে লাগলেন, উদ্ধব, তুমি ব্রজে যাও এবং আমাদের পিতামাতা নন্দ ও যশোদার সুখ বিধান কর। আর আমার সংবাদ বলে গোপরমণীদের বিরহজনিত মনস্তাপ ঘুচাও। আমার মন-প্রাণ সমর্পিত ও আমার জন্য পতিপুত্রাদি ত্যাগী সেই ব্রজরমণীরা প্রিয়তম আত্মস্বরূপ আমাকেই মনের দ্বারা লাভ করেছে। আমার জন্য যাঁরা লোকধর্ম ত্যাগ করে থাকেন, আমি তাঁদের সুখী করি। উদ্ধব, সমস্ত প্রিয় বস্তুর থেকেও যাকে তারা বেশী প্রিয় মনে করে সেই আমি দূরে থাকলে গোকুল-রমণীরা আমাকে স্মরণ করে বিরহ-উৎকণ্ঠায় বিহ্বল হয়ে মূর্ছিত হয়ে পড়ে। তারা আমার ফিরে যাওয়ার অপেক্ষায় কোন রকমে অতিকষ্টে জীবনধারণ করছে। তাদের দেহে আত্মা নেই, থাকলে তা বিরহের আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যেত। ১-৬

শুকদেব বললেন মহারাজ, এই ভাবে শ্রীকৃষ্ণের কথায় ও সমাদরে উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণের আদেশ গ্রহণ করে রথে চড়ে নন্দ-গোকুলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। সূর্যদেব অস্ত গেলেন। গোষ্ঠ থেকে যেসব গবাদি পশুরা গৃহে ফিরে যাচ্ছে তাদের খুরের ধুলোয় রথ আবৃত হল। এরকম অবস্থায় উদ্ধব নন্দব্রজে উপস্থিত হলেন। পুষ্পবতী গাভীদের জন্য বৃষদের মত্ততা, দুগ্ধভারে পীড়িত গাভীদের বৎসদের জন্য ব্যস্ততা, শুভ্রবর্ণ গোবৎসদের চঞ্চলতা, গো-দোহনের শব্দ এবং

বেণু-নিনাদ এইসব মিলে শব্দ ও সৌন্দর্যে ব্রজধাম মনোরম হয়ে উঠেছিল। সুচারুরূপে অলঙ্কৃতা গোপীরা রাম-কৃষ্ণের শুভকর্মগুলি কীর্তন করছিল। তাদের দ্বারা ও শ্রীদাম প্রভৃতি গোপগণে ব্রজ শোভিত হয়েছিল। অগ্নি, সূর্য, অতিথি, গো, ব্রাহ্মণ ও পিতৃদেবের অর্চনাযুক্ত গোপভবন ও ধূপ-দীপ-মালা দ্বারা ব্রজ মনোরম হয়েছিল। চারদিকে অসংখ্য সুগন্ধি পুষ্পের বন, পক্ষীকুল ও ভৃঙ্গকুলে নিনাদিত এবং হংস, জল-কুক্কুটাদিতে পূর্ণ পদ্মভূষিত সরোবরের শোভায় এই ব্রজ সুশোভিত ছিল। উদ্ধব এ রকম অতি মনোহর ব্রজধামে এলেন। ৭-১৩

শ্রীকৃষ্ণের অনুচর ভক্তপ্রিয় উদ্ধব গৃহদ্বারে উপস্থিত হয়েছেন জেনে ব্রজরাজ নন্দ পরম প্রীতি সহকারে তাঁকে আলিঙ্গন করে বাসুদেব বোধেই তাঁর অর্চনা করলেন। পরমান্ন ভোজনের পরে উদ্ধব শয্যায় ক্ষণকালের জন্য শরীর বিস্তৃত করে এবং পাদমর্দনাদিতে পথশ্রম মোচন করলে ব্রজরাজ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, মহাভাগ, আমাদের সখা শূরনন্দন বসুদেব বন্ধনমুক্ত এবং সুহৃদ্‌গণ পরিবৃত হয়ে অপত্যাদির সঙ্গে কুশলে আছেন তো? পাপিষ্ঠ কংস নিজের পাপে অন্য ভাইদের সঙ্গে বিনষ্ট হয়েছে এটা আমাদের পক্ষে নিশ্চয়ই আনন্দের বিষয়, কেননা সে ধর্মশীল সাধু ও যদুদের শত্রু ছিল। সর্বচিত্তাকর্ষক শ্রীকৃষ্ণ আমাদের, তাঁর জননী, সুহৃৎ, মাতুল প্রভৃতিকে, শ্রীদাম প্রভৃতি সখাদের, সাধারণ গোপ-গোপীদের, আত্মনাথ ব্রজকে, গাভীগণ, বৃন্দাবন ও গোবর্ধন পর্বতকে স্মরণ করে থাকেন কি? গোবিন্দ স্বজনদের সঙ্গে দেখা করতে একবার আসবেন কি? কবে আমরা উন্নত নাসিকা শোভিত ও কটাক্ষ মণ্ডিত তাঁর সুন্দর মুখ দেখতে পাব? উদ্ধব, শ্রীকৃষ্ণের দাবাগ্নি মোক্ষণাদি রূপ, প্রভাবময় চরিত্র, লীলা সহ অপাঙ্গ নিরীক্ষণ, হাসি এবং মধুর বাক্য স্মরণ করে আমাদের আহারাদি সমস্ত কাজেই শিথিল হয়ে পড়েছে। তাঁর চরণচিহ্নে অলঙ্কৃত যমুনাতীর, পর্বতসানু, বনাঞ্চল এবং তাঁর মনোহর লীলার সাক্ষী প্রাণীমাত্রের মন তন্ময় হয়ে আছে। আমার মনে হয় গর্গমুনি যে মহৎ বাক্য বলেছিলেন দেবতাদের কার্যসিদ্ধির জন্য দেবোত্তম রাম ও কৃষ্ণ দুই দেবশ্রেষ্ঠই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছেন। কংস অযুতনাগের বল ধারণ করত, তাঁরা দুজনে কংসকে, দুই মল্লকে এবং হস্তীকে, পশুরাজ যেমন পশুদের বধ করে তেমনি অবলীলায় বধ করেছেন। গজরাজ যেমন ইক্ষুদণ্ড ভাঙে সেরকমভাবে হেলায় শ্রীকৃষ্ণ তিনটি তালগাছের সমান মহা কঠিন ধনুক ভেঙেছেন। সপ্তাহ কাল শুধু বা হাতে গোবর্ধন পর্বত ধরে থেকেছেন। (এই শ্রীকৃষ্ণই) সুর ও অসুর বিজেতা, বক, প্রলম্ব, ধেনুক, অরিষ্ট, তৃণাবর্ত প্রভৃতি দৈত্যকে বিনাশ করেছেন। ১৪-২৬

শুকদেব বললেন, শ্রীকৃষ্ণানুরক্ত নন্দ ঐ রূপমাধুর্য ও প্রভাব বারবার স্মরণ করে প্রেমবিহ্বলতা বশত নির্বাক রইলেন। স্বামী নন্দরাজ কৃত শ্রীকৃষ্ণচরিত্র কীর্তন শ্রবণে মাতা যশোদার স্তন থেকে দুগ্ধ ক্ষরিত হতে লাগল; তিনি অশ্রু-বিসর্জন করতে লাগলেন। উদ্ধব ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি নন্দ-যশোদার এরকম অপূর্ব অনুরাগ দেখে সহর্ষে নন্দরাজকে বললেন, অখিল গুরু নারায়ণে যখন আপনার এইরকম মতি তখন আপনারাই জগতের দেহীদের মধ্যে শ্লাঘ্যতম। বলরাম ও মুকুন্দ বিশ্বসংসারের কারণ, এঁরাই প্রধান ও পুরাণপুরুষ, এঁরাই নিজ অংশ জীব ও নিজ শক্তি প্রকৃতিস্বরূপ। উভয়েই ভূতসমূহে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে তাঁদেরই কল্পিত নানারকম ভেদবিশিষ্ট জীবের নিয়ন্তা হয়েছেন। হে মহাত্মা, প্রাণী প্রাণ-বিয়োগকালে ক্ষণকালের জন্যও শ্রীকৃষ্ণে বিশুদ্ধ মন নিবিষ্ট করলে তার কর্মবাসনা দগ্ধ হয় এবং তাঁর স্বরূপ সাক্ষাৎকার পাওয়ায় ব্রহ্মময় হয়ে সে পরম গতি

লাভ করে।[১] আপনারা অখিলের আত্মা ও কারণ, প্রয়োজনে মানব-শরীরধারী সেই শ্রীকৃষ্ণে একান্ত ভক্তি করছেন তাই আপনাদের আর কি কাজ অবশিষ্ট আছে? সাত্বতদের অধিপতি ভগবান অচ্যুত অতি অল্পকালের মধ্যেই ব্রজে এসে পিতামাতার প্রিয় সাধন করবেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রঙ্গস্থলে সাত্বতদের শত্রু কংসকে বিনাশ করে আপনাদের (ফিরে আসার ব্যাপারে) যা বলেছিলেন তা সত্য করবেন। হে মহাভাগ, আপনারা খেদ করবেন না; অল্পকালের মধ্যেই শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাবেন। কাঠের মধ্যে আগুন যেমন লুক্কায়িত থাকে সেরকম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রাণীদের হৃদয়াভ্যন্তরে সদা বিদ্যমান রয়েছেন।[২] অভিমানশূন্য বিকাররহিত শ্রীকৃষ্ণের কেউ অতি প্রিয় বা অপ্রিয় নেই, উত্তম নেই, অধম নেই বা সর্বতোভাবে সমান নেই।[৩] তাঁর পিতা নেই. মাতা নেই, ভার্যা নেই, আত্মীয় নেই, পর নেই, দেহ নেই, জন্মও নেই; এমনকি তাঁর কর্মও নেই। তিনি জন্মকর্মাদি রহিত হলেও লীলার জন্য সাধুদের পরিপালন করার ইচ্ছায় এই জগতে উত্তম, মধ্যম ও অধম যোনিতে আবির্ভূত হয়ে থাকেন। তিনি অজ ও নির্গুণ হয়েও ক্রীড়ার জন্য সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিনগুণ আশ্রয় করেন। ক্রীড়াতীত হয়েও এই গুণগুলির দ্বারা বিশ্বকে সৃজন, রক্ষণ ও পালন করেন। চোখের ঘূর্ণি হলে (ভ্রমরিকা দৃষ্টি) পৃথিবীও ঘুরছে বলে মনে হয়। তেমনি চিত্তের কর্তৃত্ব থাকলেও সেই চিত্তে জীবাত্মার প্রতিবিম্বপাত হওয়াতে আত্মাই কর্তা বলে নিজেকে বিবেচিত করেন। আসলে তাঁর কোন জনক নেই। এই ভগবান শ্রীহরি কেবল আপনাদেরই পুত্র নন, তিনি সকলের আত্মজ. পরমাত্মা, পিতা, মাতা ও ঈশ্বর। প্রকৃত পক্ষে অচ্যুত শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া দেখা বা শোনা, অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ, স্থাবর ও জঙ্গম, মহৎ ও অল্প এমন কোন কিছুই নেই যা তাঁর নামের উপযুক্ত হতে পারে। একমাত্র অচ্যুতই সর্বভূতে বিদ্যমান, তিনিই পরমাত্মস্বরূপ।[৪] ২৭-৪৩

মহারাজ, এইভাবে কৃষ্ণের কথাতেই শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় অনুচর উদ্ধব ও ব্রজরাজের রাত্রি কেটে গেল। গোপীরা গাত্রোত্থান করে প্রদীপ জ্বাললেন। সুগন্ধি ফুল দিয়ে দেহলী (ঘরের চৌকাঠের সামনের দাওয়া) প্রভৃতির অর্চনা করে তাঁরা দধি মন্থন করতে লাগলেন। সেইসব গোপীরা যখন মালায় ভূষিত হাতে মন্থনরজ্জু আকর্ষণ করতে লাগলেন তখন তাঁদের গাল কুণ্ডলের কান্তিতে, মুখমণ্ডল কুঙ্কুমরাগে দীপ্তি পেতে লাগল। তাঁদের কাঞ্চী প্রভৃতির মণিগুলি জ্বলন্ত প্রদীপের আভায় দীপ্ত হয়ে উঠল। মন্থনের সময় তাঁদের নিতম্ব, কুচদ্বয় ও হার দুলতে লাগল। গোপাঙ্গনারা কমললোচন শ্রীকৃষ্ণকে উদ্দেশ করে উচ্চস্বরে গান শুরু করলেন। সেই গানের ধ্বনি দধিমন্থন-ধ্বনির সঙ্গে মিশে সমস্ত দিকের অমঙ্গল নাশ করতে লাগল। তারপর সূর্যদেব উদিত হলে ব্রজবাসীরা স্বর্ণময় রথ দেখে বলাবলি করতে লাগলেন, কার এই রথ? কংসের প্রয়োজন সাধন করার জন্য শ্রীকৃষ্ণকে যে মধুপুরী নিয়ে গেছে সেই অক্রূর কি এসেছে? সে তার মৃত প্রভু কংসের ঔর্ধ্বদেহিক ক্রিয়া কি আমাদের মাংসপিণ্ড দিয়ে সম্পন্ন করবে? গোপাঙ্গনারা এরকম বলছেন এমন সময়ে উদ্ধব আহ্নিক সেরে সেখানে এলেন। ৪৪-৪৯

১ তুলনীয়: 'মৃত্যুকালে যিনি আমাকেই স্মরণ করে অন্য বিষয়ে উদাসীন থেকে এই দেহ পরিত্যাগপূর্বক প্রস্থান করেন, তিনি আমারই ভাব প্রাপ্ত হন।'—অর্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ (দ্র: গীতা, ৮।৫-৬) ২ এষো দেবো বিশ্বকর্মা মহাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট:।—শ্বে: উপ: ৪।১৭ ৩ তুলনীয়: গীতা, ১৪।২৪-২৫ শ্লোক। ৪ বিশ্বসাথে যোগ যেথায় বিহার" সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারো।—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গীতাঞ্জলি।

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়

উদ্ধব সকাশে গোপীদের বিরহ-প্রকাশ

শুকদেব বললেন, মহারাজ, শ্রীকৃষ্ণানুচর উদ্ধবের বাহুদ্বয় আজানুলম্বিত, দুই চোখ সদ্য-ফোটা দু'টি পদ্মফুলের ন্যায়, পরিধানে পীতবস্ত্র, গলায় বনমালা, মুখমণ্ডল উজ্জ্বল কমলতুল্য এবং কুণ্ডল দু'টি মার্জিত। ব্রজকামিনীরা তাঁকে দেখে বিস্মিত হলেন ও 'এই সুদর্শন পুরুষ কে? ইনি কার দূত, কোথা থেকেই বা এলেন? এঁর বেশভূষা অচ্যুতের মত' এসব কথা বলে সবাই উৎসুকচিত্তে উদ্ধবের চারদিক বেষ্টন করলেন। তিনি রমাপতির সংবাদ নিয়ে এসেছেন জেনে বিনয়াবনত হয়ে তাঁরা সলজ্জ হাসি, কটাক্ষ ও মধুর বাক্যে তাঁর পূজা করলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন; ব্রজজনের সমীপে সমাগত তোমাকে যদুপতি শ্রীকৃষ্ণের সেবক বলে জানতে পেরেছি। পিতামাতারই অভীষ্ট সাধন করার জন্য তোমার প্রভু তোমাকে পাঠিয়েছেন। না হলে এই ব্রজে সেই মহাপুরুষের অন্য কিছুই স্মরণীয় বস্তু দেখতে পাই না। মুনিরাও বন্ধুর সঙ্গে স্নেহসম্বন্ধ ত্যাগ করতে পারেন না। অন্যের সঙ্গে যে বন্ধুত্ব করা হয়, তা কেবল কাজের জন্য। যে পর্যন্ত প্রয়োজন থাকে সেই পর্যন্তই বন্ধুত্বের অনুকরণ করা হয় মাত্র, প্রকৃত মিত্রতা হয় না, যেমন পরস্ত্রীদের সঙ্গে পরপুরুষের বা ফুলের সঙ্গে ভ্রমরের সম্পর্ক। বেশ্যা নির্ধনকে, প্রজা অসমর্থ রাজাকে, কৃতবিদ্য শিষ্য আচার্যকে এবং পুরোহিত দক্ষিণা পেয়ে যজমানকে পরিত্যাগ করে থাকে। পাখীরা ফলহীন বৃক্ষ ছেড়ে যায়, ভোজনের পর অতিথি বিদায় নেন, পশুরা দগ্ধ অরণ্য ছেড়ে যায় এবং উপপতিরা নিজেদের ভোগ শেষ হলেই অনুরক্তা নারীকে পরিত্যাগ করে যায়। ১-৮

গোপীদের কথা, দেহ ও মন শ্রীকৃষ্ণেই অর্পিত ছিল। শ্রীকৃষ্ণের দূত উদ্ধব এলে তাঁরা লৌকিক ব্যবহার ভুলে এরকম বলতে লাগলেন এবং প্রিয়তমের কিশোর ও বাল্যাবস্থার ক্রীড়াগুলি স্মরণ করতে করতে নির্লজ্জ হয়ে পড়লেন। এ সমস্তই গান করে কাঁদতে কাঁদতে তাঁরা শ্রীকৃষ্ণকথা জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। কোন গোপী প্রিয়তমের আগমন চিন্তা করতে করতে মধুকরকে পর্যন্ত প্রিয়-প্রেরিত দূত মনে করে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন, মধুকর, ধূর্তের বন্ধু, আমাদের সপত্নীর কুচ-বিমর্দিত মালার কুঙ্কুম রঞ্জিত তোমার শ্মশ্রু। তুমি আমাদের চরণ স্পর্শ করো না। তুমি যাঁর দূত সেই শ্রীকৃষ্ণের মানিনীদের কুচকুঙ্কুমরূপ উপহাসাস্পদ প্রসাদ মধুপতি শ্রীকৃষ্ণই যদুদের সভায় বহন করুন, আর ঐ প্রসাদকণাবাহী তুমিও যদুদের প্রসাদ লাভ কর। আমাদের খুশী করে কি হবে? দুর্মতি তুমি যেমন একবার মাত্র মধুপান করে বনের পুষ্পরাজিকে পরিত্যাগ কর, তিনিও সে রকম ভাবে আমাদের একবার মাত্র তাঁর নিজের মোহিনী অধরসুধা পান করিয়ে ত্যাগ করে গেছেন। লক্ষ্মীদেবী কেন তাঁর পাদপদ্ম সেবা করছেন? ও বুঝেছি, শ্রীকৃষ্ণের চাটুবাক্যে তাঁর চিত্ত মোহিত হয়েছে। ৯-১৩

হে ষট্‌পদ, তুমি কেন এই বনচারিণী আমাদের কাছে সেই পুরাতন যদুপতিকে নিয়ে বারবার গান করছ। যারা অর্জুনসখা শ্রীকৃষ্ণের বর্তমানের সঙ্গী তাদের কাছে গিয়ে তাঁর গান গাও। তারা তো তাঁর প্রিয়া, তাকে আলিঙ্গন করে তাদের হৃদয় শান্ত হয়েছে। তারা তোমাকে অভীষ্ট প্রদান করবে। স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতালে এমন কোন নারী আছে যাকে মনোহর হাসি ও ভ্রূবিলাসের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ পেতে না পারেন? স্বয়ং লক্ষ্মী তাঁর চরণরেণু সেবা করেন, তাঁর কাছে আমরা কে? কিন্তু যিনি

দীনজনের প্রতি অনুকম্পা প্রকাশ করেন তাঁর প্রতিই উত্তমশ্লোক শব্দ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তোমার মস্তকে-ধরা আমার চরণ পরিত্যাগ কর। মুকুন্দের কাছ থেকে শেখা দৌত্য এবং চাটুবাক্য দ্বারা প্রার্থনায় তুমি পটু। যদি বল, তিনি কি অপরাধ করেছেন? তিনি অকৃতজ্ঞ। কেননা তাঁর জন্যই আমরা স্বামী, পুত্র, মাতা, পিতা প্রভৃতি আত্মীয়-স্বজন পরিত্যাগ করেছি, আর তিনি আমাদের ফেলে চলে গেছেন। এরকম কঠোরের সঙ্গে কি সন্ধি করা উচিত? ক্রূর নিষ্ঠুর তিনি রামাবতারে নির্দয় ও গুপ্তভাবে ব্যাধের মত কপিরাজ বালীকে বধ করেছেন। স্ত্রীর বশবর্তী হয়ে শূর্পণখাকে বিরূপ করেছেন। বামন অবতারে পরম ধার্মিক বলিরাজের পূজোপহার গ্রহণ করে কাকের মত বলি ভোজন করে আবার ছল করে সেই বলি-রাজকেই বন্ধন করেছেন। তাই তাঁর সখ্যে আমাদের প্রয়োজন নেই। অথচ তাঁর কথারূপ বস্তু ত্যাগ করা যায় না। তাঁর চরিত্র-লীলারূপ যে কর্ণামৃত তার কণিকা-মাত্র পান করে ধীর ব্যক্তিদের রাগ, দ্বেষ প্রভৃতি দ্বন্দ্বগুলির নিবৃত্তি হয়। তাঁরা বিনষ্টপ্রায় হয়ে হঠাৎ দুঃখময় গৃহ-পরিবার পরিত্যাগ করে ভোগে বিরত হয়ে হাঁসের মত সদসৎ বিষয়ে বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন হয়ে শুধু প্রাণধারণ করে থাকেন। তবুও তাঁর কথা পরিত্যাগ করা যায় না। যেরকম অবোধ কৃষ্ণসার হরিণী ব্যাধের গানে বিশ্বাস করে তীরের আঘাতে ব্যথা পায়, তেমনি আমরাও কুটিলমন শ্রীকৃষ্ণের কথায় বিশ্বাস করে বারবার তাঁর নখস্পর্শের জন্য মদন-ব্যথা সহ্য করেছি। অতএব, দূত, দুঃখের কথা ছেড়ে অন্য কথা বল। প্রিয়সখা, প্রিয় কর্তৃক আবার প্রেরিত হয়ে তুমি এসেছ কি? যদি তাই হয়, তাহলে দূত তুমি আমার পূজ্য। কি চাও বল, যদি সেখানে আমাদের নিয়ে যাবার জন্য তুমি এসে থাক, তাহলে বলব যাঁর অন্য নারীর সংগ অপরিহার্য তাঁর কাছে কি করে তুমি আমাদের এখান থেকে নিয়ে যাবে? সৌম্য, প্রিয়তমারূপে লক্ষ্মী সব সময় তাঁর বক্ষঃস্থলে বাস করছেন। আর্যপুত্র এখন কি মধুপুরীতে বাস করছেন? পিতা, গৃহ, বন্ধু গোপদের তিনি মনে রেখেছেন কি? এই কিঙ্করীদের কথা কখনও কি মুখে আনেন? হায়! অগুরু চন্দনের মত সেই সুগন্ধ বাহু কবে তিনি আমাদের মাথায় রাখবেন? ১৪-২১

শুকদেব বললেন, মহারাজ, ঐ রকম প্রেমবিকারের শান্তির পর উদ্ধব গোপীদের প্রিয় শ্রীকৃষ্ণের সংবাদ সহ সান্ত্বনা দিয়ে বলতে লাগলেন, স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণে তোমাদের মন সমর্পিত হয়েছে। তোমরা পূর্ণমনোরথ এবং লোক-পূজিতও বটে। দান, ব্রত, তপস্যা, হোম, জপ, বেদাভ্যাস ও সংযম এবং অন্য নানা রকম মাংগলিক অনুষ্ঠানের দ্বারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণে নিশ্চয়ই ভক্তি সাধিত হয়ে থাকে। কিন্তু ভগবান উত্তমশ্লোকের প্রতি তোমাদের যে ভক্তিধারা বহমান তা মুনিদেরও দুর্লভ ভাগ্যের বলেই তোমরা পুত্র-পতি-দেহ-গৃহাদি পরিত্যাগ করে শ্রীকৃষ্ণরূপ পরমপুরুষকে বরণ করেছ। ভগবানের প্রতি ঐকান্তিক ভক্তি লাভ করেছ তোমরা। তোমরা ভাগ্যবতী। তোমাদের বিরহই আমার প্রতি আজ অনুগ্রহের কারণ হল। সেজন্যই আমি আজ ভগবানের প্রেম-সুখময় স্বরূপ দেখতে পেলাম। ২২-২৭

আমি প্রভুর গুপ্ত কাজ করে থাকি। তোমাদের প্রিয়তমের যে সংবাদ নিয়ে এসেছি তা শোন। তাতে তোমাদের সুখ হবে। শ্রীভগবান বলেছেন, তোমাদের সংগে আমার কখনও বিচ্ছেদ নেই। আমি সকলের আত্মা। আকাশ, জল, তেজ, বাতাস ও পৃথিবী যেমন যাবতীয় বস্তুতে কারণরূপে অবস্থিত রয়েছে তেমনি আমি মন, প্রাণ, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় ও গুণাদিতে পরম কারণরূপে বর্তমান। আমি ভূত, ইন্দ্রিয় ও গুণরূপ নিজমায়ার প্রভাবে নিজের দ্বারাই নিজের মধ্যে নিজেকে সৃজন, পালন ও নাশ করে থাকি। আত্মা জ্ঞানময়, নির্বিকার, দেহ ইন্দ্রিয় মন প্রাণ

প্রভৃতির অতীত। আত্মা শুদ্ধ ; সৃষ্টিকালে গুণযুক্ত হয়ে সুষুপ্তি, স্বপ্ন ও জাগরণ প্রভৃতি মায়াবৃত্তি দ্বারা আত্মা বিশ্ব, তৈজস ও প্রাজ্ঞরূপে প্রতীয়মান হয় থাকেন।[১] যেমন ঘুম থেকে উঠেও মানুষেরা অসত্য স্বপ্নের কথাই চিন্তা করে সে রকম পুরুষ মায়ার পরিণামরূপে মন দিয়ে ইন্দ্রিয়াদির চিন্তা করে ও ইন্দ্রিয়গুলির বৃত্তি লাভ করে ; আলস্য ত্যাগ করে সেই মনকে দমন করা কর্তব্য। যেমন নদীর গতি সাগরে পর্যবসিত হয় তেমনি মননিরোধ প্রভৃতি বেদের কর্মযোগ, সাধুদের অষ্টাঙ্গযোগ, সন্ন্যাস ইত্যাদি একই তাৎপর্যে পর্যবসিত হয়। নয়নের প্রিয় আমি যে তোমাদের কাছ থেকে দূরে বাস করছি এর উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়, শুধু ধ্যান করে আমার সঙ্গে তোমাদের মনের মিলন হবে। প্রিয়তম স্বামী দূরে থাকলে স্ত্রীদের মন যেমন তার চিন্তায় আবিষ্ট হয়ে থাকে, কাছে ও প্রত্যক্ষে থাকলে ঠিক সেরকম হয় না। এই জন্যই তোমরা অশেষবৃত্তি ত্যাগ করে আমাকে মন সমর্পণ করে নিত্য ধ্যান করলে শীঘ্রই আমাকে পাবে। কল্যাণীগণ, আমি বৃন্দাবনে রাসলীলা করার সময় যারা পতি প্রভৃতি গুরুজনের বাধায় তাতে যোগ দিতে পারেনি তারা আমার মহিমা চিন্তা করে আমাকে লাভ করেছে। শুকদেব বললেন, ব্রজনারীরা প্রিয়তমের এই বক্তব্য শুনে আনন্দিত হলেন এবং তাঁর স্মৃতি বিশেষভাবে মনে আলোড়িত হওয়ায় উদ্ধবকে বললেন, উদ্ধব, আমাদের সৌভাগ্যেই যদুদের পরম শত্রু কংস অনুচরদের সঙ্গে নিহত হয়েছে। এটা আমাদের মহা আনন্দের, কেননা অচ্যুত পূর্ণমনোরথ হয়ে এখন কুশলে আছেন। কোন কোন গোপী বললেন, সৌম্য, যিনি আমাদের স্নিগ্ধ অথচ সলজ্জ হাসির সঙ্গে উদার দৃষ্টি দ্বারা অর্চিত সেই শ্রীকৃষ্ণ তাঁর হাসি ও দৃষ্টিতে পুরস্ত্রীদের প্রীতি উৎপাদন করছেন? পুরকামিনীদের প্রিয়, রতিবিশেষে অভিজ্ঞ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পুরস্ত্রীদের বাক্যবিভ্রমে পূজিত হয়ে কেনই বা তাদের প্রতি অনুরক্ত হবেন না? অবশ্যই হবেন। উদ্ধব, আমরা গ্রাম্য, পুরস্ত্রীদের সভায় কথায় কথায় আমাদের কথা উত্থাপিত হলে তিনি কি আমাদের স্মরণ করেন? আর সেই সব রাত্রি স্মরণ করেন কি? কুমুদ, কুন্দের সুগন্ধ ও জ্যোৎস্নার প্লাবনে রমণীয় বৃন্দাবনে তাঁর ও আমাদের নূপুর নিক্কণের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়াদের সঙ্গে রাসমণ্ডলীতে বিহার করেছিলেন এবং আমরা তাঁর মনোহর কথা কীর্তন করেছিলাম। সেসব কথা তাঁর মনে আছে কি? ২৮-৪৩

তাঁর জন্য আমরা শোকসন্তপ্ত হচ্ছি। ইন্দ্র যেরকম অমৃত বর্ষণ করে নিদাঘতপ্ত বনকে উজ্জীবিত করেন, শ্রীকৃষ্ণ কি সে রকম এখানে এসে করস্পর্শনাদি দ্বারা আমাদের সন্তাপ দূর করবেন? আর এক গোপী বললেন, না সখি, শ্রীকৃষ্ণ রাজ্য পেয়েছেন, শত্রুসংহার করেছেন এবং রাজকন্যাদের বিয়ে করে বান্ধব-বান্ধবীতে বেষ্টিত হয়ে সুখে আছেন। সে ঐশ্বর্য ত্যাগ করে তিনি আর এখানে আসবেন কেন? আর এক গোপী বললেন, তোমরা বোঝ না কেন তিনি আপ্তকাম হয়েছেন, তাই তিনি পূর্ণ। বনবাসিনী আমরা আর তাঁর কোন্ অভিলাষের কাজে লাগব? অন্য রাজকন্যারাই বা কি করবে? কামচারিণী পিঙ্গলাও বলেছে যে আশা ত্যাগ করাই পরম সুখ। আমরা তা জেনেও আশা ত্যাগ করতে পারছি কোথায়? শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আমাদের এরকমই আশা যে তা ত্যাগ করার নয়। আর তা ছাড়া যিনি লক্ষ্মীকে না চাইলেও লক্ষ্মী যাঁর বক্ষ থেকে কখনো বিচ্ছিন্ন হন না, উজ্জ্বলকীর্তি সেই শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে নির্জনে আলাপ করতে কে না উৎসাহী হয়? প্রভু, এই সব গাভী, বেণুধ্বনি, এই সব নদী, পর্বত ও বনপ্রান্তর রামের সঙ্গে

১ তুলনীয়: মাণ্ডুক্য উপনিষৎ, ৩-৫ মন্ত্র।

কৃষ্ণের ক্রীড়াসামগ্রী ও বিহারস্থান ছিল। হায়, শ্রীনন্দতনয়ের চরণচিহ্নিত এইসব নদী-পর্বত-বন বার বার তাঁর কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। কিছুতেই যে ভুলতে পারছি না! উদ্ধব, শ্রীকৃষ্ণের ললিত গতি, উদার হাসি, লীলা, কটাক্ষ এবং মধুর বাক্য আমাদের চিত্ত হরণ করেছে। তা কি করে বিস্মৃত হব? হে কৃষ্ণ, হে রমানাথ, হে ব্রজনাথ, হে আর্তিনাশক, হে গোবিন্দ, তুমি একবার এসে দেখে যাও গোকুল দুঃখ-সাগরে নিমগ্ন হয়েছে। তুমি তাকে রক্ষা কর। ৪৪-৫২

শুকদেব বললেন, তারপর এরকম বিলাপাদির পর কিছু ধৈর্য ধরে শ্রীকৃষ্ণের সংবাদ শুনে গোপীদের বিরহজ্বর দূর হল এবং শ্রীকৃষ্ণ যে সর্বজ্ঞ আত্মস্বরূপ এবং জীবাত্মা তাঁর অংশ এই জ্ঞানে তাঁরা উদ্ধবকে অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণ মনে করে পূজা করলেন। উদ্ধব গোপীদের দুঃখ দূর করে কয়েক মাস ব্রজে বাস করেছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের মথুরার ও গোকুলের লীলাকথামৃত কীর্তন করে গোকুলবাসীদের সুখী করেছিলেন। যতদিন তিনি নন্দব্রজে বাস করছিলেন শ্রীকৃষ্ণ-কথাময় হয়ে সে দিনগুলি ক্ষণমাত্র মনে হয়েছিল। হরিদাস উদ্ধব নদী, পর্বত, পর্বতগুহা, কুসুমিত বৃক্ষসকল সাক্ষাৎ দর্শন করে ব্রজবাসীদের লীলা-প্রশ্নাদি করে ও শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করিয়ে আনন্দে ব্রজে কালযাপন করতে লাগলেন। উদ্ধব ব্রজদেবীদের ঐ রকম চরিত্র ও শ্রীকৃষ্ণাবেশে বিহ্বলতা দর্শন করে তাদের প্রণাম করার আগে এইরকম কীর্তন করেছিলেন, নিখিলের অন্তর্যামী গোবিন্দে প্রেমবতী গোপবধূদের দেহই শ্রেষ্ঠ। সংসারভীরু মুনিরা মুক্তির জন্য এই প্রেমভাব প্রার্থনা করেন। শ্রীকৃষ্ণের সদাসঙ্গী আমরা ভক্ত হয়েও শুধুমাত্র তাঁকে পাবার ইচ্ছা করি, পাই না। গোবিন্দের কথামৃতে অনুরাগীর ব্রাহ্মণবংশে জন্ম, উপনয়ন-সংস্কার ইত্যাদির প্রয়োজন কি? বনচারিণী ব্যভিচার-দূষিতা এই নারীরাই বা কোথায়, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি পরম প্রেমই বা কোথায়। কেউ না জেনে অমৃত ভক্ষণ করলেও মঙ্গল লাভ করেন। অজ্ঞ ব্যক্তিও ভজনা করলে ঈশ্বর তাকে সাক্ষাৎ কল্যাণ দান করেন। রাসোৎসবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাহুলতা দ্বারা কণ্ঠে গৃহীতা হয়ে মনোরথ পূর্ণ হওয়ায় ব্রজসুন্দরীরা যে প্রসাদ লাভ করেছেন তা তাঁর বামবক্ষলগ্না প্রেমময়ী লক্ষ্মীদেবী বা পদ্মগন্ধা ও কান্তিমতী অপ্সরারাও পাননি। তাই অন্যান্য কামিনীদের কথা আর কি বলব? আমি বৃন্দাবনের ব্রজদেবীদের চরণরেণু স্পর্শের যোগ্য কোনও তৃণ-কীটাদিরূপে জন্মলাভ করলেও ধন্য হব। ব্রজদেবীরা অন্যলোকে দুস্ত্যাজ্য পতি-পুত্রাদি পরিজনদের এবং অর্থ-ধর্ম পরিত্যাগ করে বেদসমূহের অন্বেষণীয় সেই গোবিন্দ পদবী ভজনা করে থাকেন। মহালক্ষ্মী, ব্রহ্মাদি দেবগণ, আপ্তকাম ও যোগেশ্বরগণ বিশুদ্ধ আত্মা দ্বারা অর্চিত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেই চরণকমল গোপীরা রাসগোষ্ঠীতে আপন কুচমণ্ডল স্থাপন ও আলিঙ্গন করে বিরহতাপ দূর করেছিলেন। যে ব্রজস্ত্রীদের হরিকথা কীর্তন ত্রিভুবন পবিত্র করে থাকে তাঁদের চরণ আমি বারবার বন্দনা করি। ৫৩-৬৩

এভাবে যদুনন্দন উদ্ধব অবশেষে যশোদা, নন্দরাজা ও গোপীদের আজ্ঞা নিয়ে এবং তাঁদের সম্ভাষণ করে যাত্রা করার জন্য রথে আরোহণ করলেন। তাঁর বিদায়ের সময় নন্দ প্রভৃতি গোপরা নানারকম উপহারসহ কাছে গিয়ে অনুরাগে অশ্রুসিক্ত চোখে বললেন, আমাদের মনোবৃত্তিগুলি যেন শ্রীকৃষ্ণের চরণপদ্ম আশ্রয় করে, কথা যেন তাঁরই নাম-কীর্তনে রত থাকে। কর্মবশে ভ্রমণ করতে করতে ঈশ্বরের ইচ্ছায় যে কোন যোনিতে জন্মলাভ করি না কেন, শুভকর্মের অনুষ্ঠান, দান প্রভৃতির মাধ্যমে যেন ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণে আমাদের মতি থাকে। গোপদের এই কৃষ্ণভক্তিতে

পূজিত হয়ে উদ্ধব আবার শ্রীকৃষ্ণ-পালিত মথুরায় ফিরে এলেন এবং শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করে ব্রজবাসীদের ঐকান্তিক ভক্তির কথা জানিয়ে তাঁদের উপহারগুলি বাসুদেব, বলরাম ও রাজার সামনে রাখলেন। ৬৪-৬৯

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়

অক্রূর-সংবাদ

শুকদেব বললেন, মহারাজ, সর্বাত্মা সর্বদর্শন ভগবান (উদ্ধবের আনীত সংবাদ) সব শুনলেন। তারপর সেই কামসন্তপ্তা সৈরিন্ধ্রীর (কুব্জা) কথা মনে করে তাঁর ইচ্ছাপূরণের জন্য (উদ্ধব সহ) তাঁর গৃহে গেলেন। ঐ গৃহে নানা রকম মূল্যবান উপকরণ এবং কমোদ্দীপক দ্রব্যাদিতে পরিপূর্ণ। মুক্তামালা, পতাকা, চন্দ্রাতপ, শয্যা, আসনে তা সজ্জিত; সুগন্ধ ধূপ, দীপ ও মালায় সুবাসিত। সৈরিন্ধ্রী অচ্যুতকে নিজের গৃহেব দিকে আসতে দেখে সসম্ভ্রমে ও ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে আসন থেকে উঠে সখীদের সঙ্গে সোনার আসন প্রভৃতি দিয়ে তাঁকে যথোচিত সম্মান দেখালেন। উদ্ধবও সৈরিন্ধ্রীর পূজা পেলেন, কিন্তু তিনি তাঁর দেওয়া আসনে না বসে ভক্তির সঙ্গে আসন স্পর্শ করে নীচেই বসলেন। শ্রীকৃষ্ণ লোকাচার অনুকরণ করে মহামূল্য পালংকে বসলেন। স্নান, অনুলেপন, বস্ত্র, অলঙ্কার, মালা, পান, সুধা প্রভৃতিতে প্রসাধিতা কুব্জা সলজ্জ অথচ লীলায়িত ভঙ্গিমায় প্রণয়-কটাক্ষ নিক্ষেপ করতে করতে মাধবের দিকে অগ্রসর হলেন। তিনিও নতুন সাক্ষাতে লজ্জায় ভীতা নারী সৈরিন্ধ্রীকে আহ্বান করে কংকণে অলংকৃত হাত দুটি ধরে শয্যায় বসালেন এবং তাঁর সঙ্গে রমণ করতে লাগলেন। কুব্জা ভগবান অনন্তের চরণ আঘ্রাণ করে কামসন্তপ্ত কুচযুগলের, বক্ষস্থলেব ও চোখের কামপীড়া নাশ করলেন এবং স্তনদ্বয়ের মাঝখানে আনন্দমূর্তি কান্তকে আলিঙ্গন করে শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাপ্তিজনিত দীর্ঘদিনের সন্তাপ দূর করতে সমর্থ হলেন। সেই দুর্ভাগা দাসীরূপী কুব্জা অংগরাগ সমর্পণ দ্বারা কৈবল্যনাথ দুষ্প্রাপ্য ঈশ্বরকে পেয়ে প্রার্থনা করলেন, কমলনয়ন প্রিয়তম, এখানে আমার সংগে কয়েকদিন বাস কর, তোমার সংগ ত্যাগ করতে পারছি না। ১-৯

মানদাতা সর্বেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ কুব্জাকে মধুর বাক্যে সম্ভাষণ করে কাম্যবর দিয়ে উদ্ধবের সঙ্গে নিজের সমৃদ্ধিসম্পন্ন ধামে ফিরে এলেন। দুরারাধ্য সর্ব ঈশ্বরের ঈশ্বর শ্রীবিষ্ণুকে আরাধনা কবে যে লোক মনোগ্রাহ্য অতি তুচ্ছ ও অনর্থকারী বিষয়সুখ প্রার্থনা করে সে নিতান্ত কুজ্ঞানী। অক্রূরের প্রিয় সাধনের জন্য তাঁকে হস্তিনাপুরে পাঠাবার বাসনা কবে প্রভু বলরাম ও উদ্ধবের সঙ্গে তাঁর গৃহে যাত্রা করলেন। ১০-১২

অক্রূর দূর থেকেই সেই আত্মবান্ধব নরশ্রেষ্ঠদের আসতে দেখে আনন্দে এগিয়ে গিয়ে তাঁদের আলিঙ্গন ও অভিনন্দিত করলেন। তাঁরাও তাঁকে অভিবাদন করে আসনে বসালেন। অক্রূর শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামকে প্রণাম করে পূজা করলেন। অক্রূর তাঁদের পাদপ্রক্ষালন জল মস্তকে ধারণ করে দিব্য গন্ধমালা, পূজার উপকরণ, বস্ত্র, অলংকার প্রভৃতি দিয়ে তাঁদের অর্চনা করলেন। তারপর তাঁদের চরণযুগল নিজের কোলে নিয়ে মার্জনা করতে করতে বিনম্রাবনত হয়ে রাম-কৃষ্ণকে বলতে

লাগলেন, পাপাত্মা কংস অনুচরদের সঙ্গে বিনষ্ট হয়েছে। ভাগ্যক্রমে আপনারা এই কুলকে কংসের অত্যাচারের দুঃখ থেকে উদ্ধার করেছেন। এখন তা সংবর্ধিত হচ্ছে। শুধু এই বংশই যে আপনাদের, তা নয়। আপনারা দু'জনে বহিরঙ্গ শক্তি ও অন্তরঙ্গ শক্তি দ্বারা শ্রেষ্ঠ পুরুষ হয়ে জগতের উপাদান ও কারণ হয়ে থাকেন। সমস্ত জগৎই আপনাদের। আপনাদের ছাড়া এজগতে কোন কাজ বা কারণ নেই। পরমেশ্বর, আপনি আপনার শক্তিতে আপনারই সৃষ্ট এই পৃথিবীর মধ্যে প্রবেশ না করেও যেন প্রবেশ করেছেন এইভাবে থেকে শ্রুত ও প্রত্যক্ষগোচর নানা ভাবে নানা রূপে প্রতীয়মান হন।[১] কারণের অভিব্যক্তিস্থান কার্য, সেই কার্যস্বরূপ চরাচর ভূতের কারণ পৃথিবী প্রভৃতি নানাভাবে প্রতিভাত হয়ে থাকে। আপনিও স্বয়ং পরম কারণ, আত্মা স্বতন্ত্র হয়েও ভূত ও ভৌতিকাদি পদার্থ বা জীবরূপে নানা রকম শরীরে এবং বালক, যুবক প্রভৃতি নানা অবস্থায় প্রতীত হন। রজ, তম ও সত্ত্বগুণে আপনার নিজের শক্তি। আপনি এইসব শক্তি দিয়ে সৃষ্টি, পালন ও নাশ করছেন। কিন্তু আপনি এই সব গুণ বা কর্ম দ্বারা বন্ধ নন।[২] কারণ আপনি জ্ঞানস্বরূপ, তাই আপনার মধ্যে বন্ধনের কারণ অবিদ্যা কখনও থাকতে পারে না। বিচার করে সাক্ষাৎ আশ্রয়স্বরূপে আপনার বন্ধনের হেতু দেহাদি উপাধির নিরূপণ হয় না বলে আপনার দেহ গ্রহণ বা উদ্ভব এবং দেহত্যাগ নেই। আপনি বন্ধন বা মোক্ষ উভয় থেকেই মুক্ত। কিন্তু, আমাদের দেহগ্রহণ, বন্ধন ও মুক্তি রয়েছে, সেই জন্যই আপনার প্রতি অবিবেক মায়ামোহিত জীবের মত আমাদের দৃষ্টি। ১৩-২২

জগতের কল্যাণের জন্য আপনি প্রাচীন বেদপথ প্রকাশ করেছেন। এই পথ যখনই পাষণ্ডমার্গী দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয় আপনি তখনই সত্ত্বগুণময় দেহধারণ করেন।[৩] হে বিভু, আপনি সেই শত সহস্র অসুর রাজাদের বধ করে পৃথিবীর ভার হ্রাস করার জন্য আর এই যাদবকুলের যশ বিস্তার করার জন্য নিজ অংশ বলরামের সংগে বসুদেবের গৃহে অবতীর্ণ হয়েছেন। হে সর্বেশ্বর, হে অধোক্ষজ আপনি দেব, ঋষি, পিতা, ভূত ও মানুষ এই পঞ্চযজ্ঞের মূর্তে দেবতা, আপনার এবং আপনার চরণামৃত ত্রিজগৎকে পবিত্র করে থাকে। ত্রিজগতের গুরু আপনি যে আমাদের গৃহে প্রবিষ্ট হলেন তাতে তা নিশ্চয়ই পবিত্র হল। ভক্তপ্রিয়, সত্যবাক্, পরমহিতৈষী কৃতজ্ঞ আপনি ছাড়া পণ্ডিত ব্যক্তি আর কার শরণাপন্ন হবে? আপনার হ্রাস-বৃদ্ধি নেই। আপনি ভক্তকে সমস্ত অভিলষিত অর্থ এমনকি আত্মা পর্যন্ত দান করেন। হে জনার্দন, সুরশ্রেষ্ঠরাও যে আপনার স্বরূপ জানতে পারেন না, সেই আপনি যে আমাদের দৃষ্টিগোচর হবেন, এ আমাদের পরম সৌভাগ্য। আপনার যে মায়া পুত্র, স্ত্রী, ধন, জন, গৃহ ও দেহে মোহপাশ উৎপন্ন করে আপনি অবিলম্বে সেই মায়ারজ্জু ছিন্ন করুন। ২৩-২৭

ভক্তচূড়ামণি অক্রুর এই ভাবে অর্চনা ও স্তব করলে ভগবান তাঁর মধুর হাসিতে তাঁকে মোহিত করে বললেন, তাত, আপনি আমাদের পিতৃব্য, গুরু এবং সর্ব সময়ের প্রশংসনীয় বন্ধু। আমরা যাতে কখনো কুপথে পদার্পণ না করি বা শত্রুকুল আমাদের কোন অনিষ্ট করতে না পারে সেজন্য আমাদের উপর সর্বদা আপনার

---

১ তুলনীয়: একো বশী সর্বভূতান্তরাত্মা একং রূপং বহুধা যঃ করোতি।—কঠ ২।২।১২

২ এই গুণাতীত অবস্থা সম্পর্কে গীতার চতুর্দশ অধ্যায়ের ১৯-২৮ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

৩ তুলনীয়: গীতা, ৪।৭

দৃষ্টি রাখা দরকার, কেননা আমরা আপনার পুত্রস্থানীয় ও কৃপার পাত্র। মোক্ষ প্রভৃতি শ্রেয়োলাভের জন্য প্রার্থনারত জনগণ আপনার মত শ্রেষ্ঠ মহাভাগ পুরুষেরই সেবা করে থাকেন। দেবতারাও স্বার্থের প্রতি লক্ষ রেখে জীবের উপকার করেন; কিন্তু সাধুরা সেরকম নন, তাঁরা নিঃস্বার্থভাবে পৃথিবীর উপকার করেন। জলময় (গঙ্গা) তীর্থগুলি বা শিলাময় ও মৃন্ময় দেবতারা কখনো সাধুর থেকে উৎকৃষ্ট হতে পারে না। কারণ শিলাময়ী দেবতা বা তীর্থগুলি অনেকদিন ভজনা করলে জীবকে পবিত্র করে, কিন্তু সাধুদের দর্শনেই জ্ঞান ও উপদেশ লাভে জীব পবিত্রতা লাভ করে। আপনিই এরকম সাধুদের হৃদয় এবং আপনিই আমাদের পরম সুহৃদ্।[১] আমাদের প্রিয় সুহৃদ্ পাণ্ডবদের মংগল কামনায় আপনি একবার হস্তিনাপুর যান এবং তাদের কুশলাদি বিষয় জেনে আসুন। তাঁরা বালক; পিতা স্বর্গারোহণ করায় রাজা ধৃতরাষ্ট্র তাঁদের নিজ পুরীতে আনেন। তাঁরা মায়ের সংগে অতি কষ্টে দিনযাপন করছেন। এরকম শুনেছি অম্বিকানন্দন রাজা ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ; বিশেষত তাঁর কুপুত্র দুর্যোধন প্রভৃতির বশীভূত হয়ে তিনি হিতাহিত বিবেচনায়ও সম্পূর্ণ অন্ধ হয়েছেন। তাই তাঁর ভ্রাতা মহারাজ পাণ্ডুর পুত্র যুধিষ্ঠিরদের প্রতি সমান ব্যবহার করেন না। আপনি সেখানে গিয়ে জেনে আসুন পাণ্ডবরা কিভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করছেন। তাঁদের এখনকার অবস্থা জেনে যাতে সেই সুহৃদদের মংগলসাধন হয় সেই চেষ্টাই করব। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অক্রূরকে এই রকম আদেশ দিয়ে উদ্ধব ও বলরামের সঙ্গে নিজভবনে ফিরে এলেন। ২৮-৩৬

ঊনপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

অক্রূরের হস্তিনাপুরে গমন

শুকদেব বললেন, মহারাজ, তারপর অক্রূর কৌরবদের কীর্তিস্তম্ভে সুসজ্জিত হস্তিনাপুরে গিয়ে ভীষ্মের সঙ্গে একত্রে উপবিষ্ট ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর এবং পৃথা কুন্তীদেবীকে দেখলেন। সেখানে বাহ্লীক, তার পুত্র সোমদত্ত, ভরদ্বাজপুত্র দ্রোণ, কৃপাচার্য, কর্ণ, দুর্যোধন, দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা, পাণ্ডব ভ্রাতাগণ ও অন্যান্য সুহৃদদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। অক্রূর সুহৃদদের সংগে মিলিত হয়ে যথাযোগ্য সম্ভাষণ ও অভিবাদন করলেন; তাঁরাও প্রত্যভিবাদন করলে তিনি কুশলবার্তা জিজ্ঞাসা করলেন। যে রাজার পুত্ররা খল, যিনি দুষ্ট-প্রকৃতির কর্ণ প্রভৃতির কথায় কাজ করতেন, যাঁর বুদ্ধির গুরুত্ব ছিল না তাঁর ব্যবহার উপলব্ধি করার জন্য অক্রূর হস্তিনাপুরে কয়েক মাস রয়ে গেলেন। ১-৪

কুন্তী ও বিদুর পাণ্ডবদের তেজ, বল, শৌর্য-বীর্য, বিনয় প্রভৃতি সদ্‌গুণ, প্রজাদের প্রতি অনুরাগ প্রভৃতি বিষয় অক্রূরের কাছে বর্ণনা করলেন। আর ধৃতরাষ্ট্রের দুর্বৃত্ত পুত্ররা পাণ্ডবদের বিষদান প্রভৃতি যে সব অসৎ কাজ করেছিলেন এবং পরেও করার মনস্থ করেছিলেন সেসবও বর্ণনা করেছিলেন। ভ্রাতা অক্রূর এসেছেন শুনে কুন্তী আগেই তাঁর কাছে গিয়েছিলেন এবং জন্মস্থান পিতৃগৃহ স্মরণ করে সাশ্রুনয়নে গদ্‌গদ কণ্ঠে তাঁকে সম্বোধন করে বলছিলেন, সৌম্য, বাবা, মা, ভাইবোন, ভাইপো, কুলবধূরা ও আমার আগের সখীরা কি এখনও আমাকে মনে

১ তুলনীয়: অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাম্‌......মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ। —গীতা, ১২।১৩-১৪

রেখেছেন ? জগতের আশ্রয়প্রদ, ভক্তবৎসল, ভ্রাতুষ্পুত্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং কমললোচন রাম কি তাঁদের পিসীর পুত্রদের স্মরণ করেন ? বাঘদের মধ্যে হরিণীর মত আমি শত্রুদের মধ্যে বাস করে শোক করছি। শ্রীকৃষ্ণ কি আমাকে ও পিতৃহীন এই অসহায় বালকদের সান্ত্বনাবাক্য দেবেন ? হে মহাযোগী শ্রীকৃষ্ণ, তুমি বিশ্ব-সংসারকে পালন করছ এবং অন্তরের সকল কথাই জান। হে বিশ্বাত্মা গোবিন্দ, এই অসহায় বালকদের নিয়ে আমি অত্যন্ত কষ্ট পাচ্ছি ; আমার আর কোন উপায়ই নেই। হে শরণাগত প্রতিপালক, আমি তোমার আশ্রয় নিলাম ; তুমি আমাকে রক্ষা কর। হে ঈশ্বর, তোমার মোক্ষপ্রদ চরণকমল ছাড়া মৃত্যু ও সংসার ভয়ে ভীত মানুষদের অন্য শরণ দেখতে পাই না। হে সদানন্দমূর্তি শ্রীকৃষ্ণ, তোমাকে প্রণাম করি, তুমি রাগদ্বেষশূন্য বেদ-প্রতিপাদ্য সর্বান্তর্যামী পরমব্রহ্ম, তুমিই যোগেশ্বরদের যোগফল দান করে থাক এবং তুমিই যোগের ফলস্বরূপও বটে। তোমার শরণাগত আমি, তোমায় প্রণাম করি।[1] ৫-১৩

শুকদেব বললেন, মহারাজ, আপনার প্রপিতামহী কুন্তী এইভাবে বসুদেব প্রভৃতি স্বজনবর্গ ও জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করে অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে কাঁদতে লাগলেন। কুন্তীর দুঃখে সমবেদনাসম্পন্ন অক্রূর এবং মহাযশ বিদুর তাঁর পুত্রদের জন্মবৃত্তান্ত শুনিয়ে সান্ত্বনা দিলেন। মথুরায় ফিরে আসার আগে রাজা ধৃতরাষ্ট্রের কাছে গিয়ে অক্রূর অন্যান্য বন্ধুদের সামনেই তাঁকে সম্বোধন করে পাণ্ডবদের প্রতি তাঁর বিষম ব্যবহার সম্বন্ধে রাম-কৃষ্ণ সুহৃদভাবে যে রকম বলতে বলেছিলেন তা বর্ণনা করলেন। তিনি বললেন, বিচিত্রবীর্য-নন্দন, আপনি কুরুবংশের যথেষ্ট গৌরব বৃদ্ধি করেছেন। আপনার ভাই পাণ্ডুর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র যুধিষ্ঠির বর্তমান থাকতেও আপনি অবলীলায় রাজসিংহাসনে বসেছেন। যদি আপনি সমস্ত আত্মীয়দের প্রতি সমান ব্যবহার করে সৎচরিত্র দ্বারা প্রজাদের মনোরঞ্জন করে ধর্ম অনুসারে পৃথিবী পালন করেন, তা হলে মঙ্গল ও কীর্তি লাভ করবেন, এতে কোন সন্দেহ নেই। আর বিপরীত আচরণ করলে জগতে নিন্দিত হয়ে শেষে নরকে পতিত হবেন। তাই আপনি আপনার পুত্র ও পাণ্ডবদের প্রতি সমান আচরণ করুন। এই জগতে কারো সঙ্গে কারো নিরন্তর সম্পর্ক থাকে না। নিজের দেহের সঙ্গেই নিজের সম্বন্ধ যখন চিরস্থায়ী নয়, তখন স্ত্রী-পুত্র প্রভৃতির সঙ্গে সম্বন্ধ যে সব সময় পরিবর্তন সাপেক্ষ, তাতে আর বলার কি আছে ? জীব একাই জন্মগ্রহণ করে ও একাই মৃত্যুবরণ করে, সে কারও সঙ্গে আসে না, কাউকে সঙ্গে নিয়েও যায় না। নিজের কৃত সৎকাজ বা কুকাজের সুফল বা কুফল নিজেই ভোগ করে ; তার অংশ অন্য কাউকে দিয়ে নিজে নিষ্কৃতি লাভ করতে পারে না। যেমন জলবাসী মাছ প্রভৃতির জীবনস্বরূপ যে জল তাও তার সন্তানেরা অধিকার করে থাকে, সেরকম পুত্র প্রভৃতি পোষ্যরূপ শত্রুরা মূঢ় লোকের অধর্ম-সঞ্চিত ধন হরণ করে। যে মূঢ় আপন মনে করে প্রাণ, ধন ও পুত্রদের অধর্ম দ্বারা পোষণ করে, ভোগ চরিতার্থ হতে না হতেই তারা তাকে ছেড়ে চলে যায়। তারা ছেড়ে গেলে স্বধর্ম-বিমুখ, অর্থতত্ত্বে অনভিজ্ঞ ব্যক্তি অপূর্ণকাম হয়ে পাপের ফলে অন্ধতামস নরকে প্রবেশ করে।[2] অতএব মহারাজ, এই দৃশ্যমান জগৎকে মায়া, স্বপ্ন ও কল্পনার উচ্ছ্বাসের মত অলীক ও অনিত্য

১ তুলনীয়: গীতা, ১১।৩৯-৪০

২ তুলনীয়: পরলোকে যে সব অজ্ঞান অন্ধকারাবৃত লোক আছে, আত্মার স্বরূপ যারা বুঝতে পারে না তারা মৃত্যুর পর সেই সব লোকে যায়।—ঈশ উপ-৩

মনে করে বুদ্ধিবলে নিজেকে সংযত করুন এবং রাগ ও ঈর্ষাশূন্য, শান্ত ও সর্বত্র সমদর্শী হোন।[১] ১৪-২৫

ধৃতরাষ্ট্র তখন অক্রূরকে বললেন, অক্রূর, আপনি আমার কল্যাণকর কথা বললেন। কিন্তু মানুষ যেমন অমৃত পেলে 'আর না' বলে না, আমিও সে রকম আপনার কথা শুনে 'আর শুনব না' একথা বলতে পারছি না। তথাপি, সৌম্য, আমার হৃদয় পুত্রের জন্য অনুরাগে বিষম চঞ্চল। আপনার প্রিয় বাক্য সত্য হলেও তা স্ফুরিত বিদ্যুতের মত আমার হৃদয়ে স্থির হতে পারছে না। যে ঈশ্বর পৃথিবীর ভার হরণের জন্য যদুকুলে অবতীর্ণ হয়েছেন, তিনি যা বিধান করেছেন তার অন্যথা করতে পারে কে? যিনি অচিন্ত্যশক্তি মায়ার গতিতে এই বিশ্বের সৃষ্টি করে এর অভ্যন্তরে প্রবেশ করে কর্ম ও কর্মফলের বিভাগ করে দেন[২] সেই পরমেশ্বরকে প্রণাম করি। তাঁর দুর্বোধ লীলাই সংসারের কারণ, তাঁর থেকেই এর গতি হয়ে থাকে। ২৬-২৯

শুকদেব বললেন, যদুনন্দন অক্রূর এই কথোপকথন থেকে রাজা ধৃতরাষ্ট্রের মনের ইচ্ছা বুঝতে পারলেন ও পাণ্ডব প্রভৃতি সুহৃদদের সম্মতি নিয়ে যদুপুরী মথুরায় ফিরলেন। পাণ্ডবদের প্রতি ধৃতরাষ্ট্রের আচরণ জেনে আসার জন্য শ্রীকৃষ্ণ অক্রূরকে পাঠিয়েছিলেন। তিনি ফিরে এসে সমস্ত বৃত্তান্ত রাম-কৃষ্ণের কাছে বর্ণনা করলেন। ৩০-৩১

পঞ্চাশত্তম অধ্যায়

জরাসন্ধের সঙ্গে সংঘর্ষ ও দ্বারকা দুর্গ নির্মাণ

শুকদেব বললেন, ভরতশ্রেষ্ঠ, স্বামী নিহত হলে কংসের দুই স্ত্রী অস্তি ও প্রাপ্তি দুঃখে কাতর হয়ে নিজেদের পিতৃগৃহে গেলেন এবং পিতা মগধরাজ জরাসন্ধকে নিজেদের বৈধব্যের কারণ বললেন। রাজা জরাসন্ধ সেই অপ্রিয় সংবাদ শুনে জামাতার জন্য শোকার্ত এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রতি রুষ্ট হলেন। তিনি পৃথিবীকে যাদবশূন্য করার জন্য উদ্যোগ-আয়োজন করলেন। তারপর তিনি একুশ অক্ষৌহিণী সেনা নিয়ে চারদিক থেকে যদুদের রাজধানী মথুরা অবরোধ করলেন। উদ্বেলিত সমুদ্রের মত জরাসন্ধের সৈন্যসামন্ত চারদিক থেকে মথুরাপুরীকে অবরোধ করলে যদুবংশের স্বজনেরা ভয়ে ব্যাকুল হল। মানুষরূপধারী সর্বৈশ্বর্যপূর্ণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দেশ ও কালের গুণ অনুযায়ী নিজ অবতারের প্রয়োজন চিন্তা করলেন। সমস্ত সৈন্যসহ জরাসন্ধকে নিধন করা বা শুধু জরাসন্ধকে নিধন করে সমস্ত সৈন্য-সামন্তকে নিজে সংগ্রহ করা অথবা শুধু সৈন্যদের নিহত করে জরাসন্ধকে পরিত্যাগ করা—কোনটা করা মঙ্গলজনক তাই বিবেচনা করতে লাগলেন। তিনি ভাবলেন, মগধরাজ জরাসন্ধের অনুগত সমস্ত রাজাদের পদাতিক, অশ্ব, হাতী ও রথ সমন্বয়ে গঠিত কয়েক অক্ষৌহিণী সৈন্য যা নিয়ে আমায় আক্রমণ করল এগুলিই পৃথিবীর সঞ্চিত ভারস্বরূপ। আমি এই সৈন্য-বাহিনীই সংহার করব। মগধরাজকে বধ করা হবে না; সে আবার এরকম সৈন্য

১ দ্রঃ গীতা, ১৩।২৮ ২ দ্রঃ ঈশ উপনিষৎ-৮

সংগ্রহ করতে পারবে। কারণ দুষ্টের নিধন করে পৃথিবীর ভার লাঘব করে সাধুদের রক্ষা করাই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য, আমি এই কারণেই অবতীর্ণ হয়েছি। কোন সময় অধর্মের প্রশ্রয় হলে তার নিবারণের এবং ধর্মের প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনে আমি অন্য দেহও ধারণ করে থাকি।[১] ১-১০

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এ রকম চিন্তা করছেন এমন সময়ে ধ্বজ-পতাকাদিতে সজ্জিত, সূর্যের মত অতুল তেজোদীপ্ত সারথিযুক্ত দু'খানি রথ হঠাৎ আকাশ থেকে তাঁর কাছে উপস্থিত হল। রথের সঙ্গে দিব্য ও প্রাচীন অস্ত্রশস্ত্রও ছিল। ভগবান হৃষীকেশ সে সব দেখে অগ্রজ বলরামকে বললেন, আর্য যদুরা আপনারই প্রতিপাল্য, সেই যদুবংশীয়দেরই বিপদ উপস্থিত হয়েছে। আপনার রথ ও প্রিয় অস্ত্রশস্ত্রও উপস্থিত রয়েছে। রথে উঠে শত্রুসৈন্যকে সংহার ও স্বজনবর্গকে রক্ষা করুন। হে ঈশ্বর, সাধুদের মঙ্গল করার জন্যই আমরা জন্ম নিয়েছি। তেইশ অক্ষৌহিণী সেনা সংহার করে পৃথিবীর ভার অবিলম্বে লাঘব করুন। তারপর যদুনন্দন দু'জনই বর্ম পরে ও অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে রথে উঠে বসলেন এবং সামান্য কিছু সৈন্য নিয়েই মথুরাপুরী থেকে বার হলেন। দারুক-সারথিসহ হরি মথুরার দরজা থেকে বেরিয়েই শঙ্খধ্বনি করলেন। কিন্তু সেই শঙ্খনিনাদ শুনে মগধীয় সৈন্য-দলের মধ্যে ভীষণ আতঙ্কের সঞ্চার হল, তাদের দেহ কেঁপে উঠল। মগধরাজ জরাসন্ধ তখন সেই রাম-কৃষ্ণকে দেখে বললেন, পুরুষাধম কৃষ্ণ, তুই বালক; যুদ্ধ করার জন্য কেন এসেছিস? আমি বীরপুরুষ হয়ে কোন্ লজ্জায় তোর মত অসহায় একটা বালকের সঙ্গে যুদ্ধে নামব? মূঢ়মতি, তোর যে রকম বয়স তাতে আত্মরক্ষার জন্যই অন্যের সাহায্যের প্রয়োজন, আমি যুদ্ধ করব না। বিশেষত তুই মহাপাপী, নিজের পরমাত্মীয় মাতুলকেও বধ করেছিস। তুই ফিরে যা। তবে রাম, তোমার ইচ্ছা থাকলে যুদ্ধ কর। ভয়ে পালিয়ে যেও না যেন। হয় আমার বাণে ছিন্নভিন্ন হয়ে দেহত্যাগ করে স্বর্গে যাও, নয়তো যুদ্ধে আমাকেই সংহার করে জয়ী হও। ১১-১৮

এই শুনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন, রাজা, বীরেরা কখনও কথায় বীরত্ব প্রকাশ করে না, কাজেই পৌরুষের পরিচয় দিয়ে থাকে। মৃত্যু যার সন্নিকট সেই আতুরের কটূক্তি আমরা গ্রাহ্য করলাম না। শুকদেব বললেন, বাতাস যেমন মেঘমালা দিয়ে সূর্যকে ও ধূলিরাশি দ্বারা অগ্নিকে আচ্ছাদিত করে, মগধরাজ জরাসন্ধও তেমনি প্রবলপরাক্রমে তাঁর সৈন্যপ্রবাহ দিয়ে পদাতিক, অশ্ব, ধ্বজ, রথ ও সারথির সঙ্গে রাম ও কৃষ্ণকে আবৃত করে ফেলল। পুর-রমণীরা নগরীর অট্টালিকা, হর্ম্য ও গোপুরে আরোহণ করে শ্রীহরি ও রামের গরুড় ও তালধ্বজ চিহ্নিত রথ দু'টি যুদ্ধস্থলে দেখতে না পেয়ে ক্ষণে ক্ষণে মূর্ছিত হতে লাগল। সর্বত্র ব্যাপ্ত বিশাল মেঘের মত শত্রুসৈন্যদের তীব্র বাণবর্ষণে নিজের সৈন্যদের পীড়িত হতে দেখে শ্রীকৃষ্ণ শ্রেষ্ঠ শার্ঙ্গধনুতে জ্যা আকর্ষণ করে টঙ্কারধ্বনি করলেন। তারপর তূণের থেকে তীক্ষ্ণ বাণগুলি নিয়ে ধনুকে যোজনা করে নিক্ষেপ করতে আরম্ভ করলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর শৃঙ্গনির্মিত ধনু থেকে নিক্ষিপ্ত বাণে রথ, হাতী, ঘোড়া ও পদাতিকদের সংহার করতে করতে তাঁর সেই শার্ঙ্গ ধনুকে অবিরাম অঙ্গার চক্রের মত বিস্ফুরিত করতে লাগলেন। শরপ্রহারে হাতীরা ছিন্নমস্তক হয়ে ভূতল-শায়ী হতে লাগল। রথের ঘোড়া, ধ্বজ, সারথি ও রথীরা শরাঘাতে কে কোথায়

১ তুলনীয়: গীতা, ৪।৭ ও ৪।৮ শ্লোক।

ছিন্ন-বিছিন্ন হয়ে পড়ল তার ঠিক রইল না। পদাতিক সৈন্যরা বাহু, বক্ষ, উরু, গ্রীবা প্রভৃতি ছিন্ন হয়ে ধরাশায়ী হতে লাগল। ১৯-২৪

পদাতিক, হাতী, ঘোড়া প্রভৃতির ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন অংগ-প্রতংগ থেকে নির্গত রক্তধারায় শত শত নদী প্রবাহিত হতে লাগল। সেই রক্তস্রোতে মৃত পদাতিকদের ছিন্ন বাহুগুলি সাপের মত মনে হতে লাগল। রক্তস্রোতে ভাসমান মানুষের মাথাগুলি কচ্ছপ ও হাতীদের দেহগুলি দ্বীপের মত দেখা যেতে লাগল। ঐ স্রোতে অশ্বদের মস্তক হাংগরের মত, ছিন্ন করতল ও উরুদেশ মাছের মত, মানুষের চুলগুলি শৈবাল, ধনুকগুলি তরংগ (ঢেউ), অস্ত্রগুলি গুল্ম, রথের চাকাগুলি ভয়ানক আবর্ত এবং শ্রেষ্ঠ মণি, অলংকার প্রভৃতি প্রস্তর ও কংকর স্বরূপ মনে হচ্ছিল। দুর্মদ শত্রুকুলকে মুষলাঘাতে নিহত করে অতুল তেজস্বী ভগবান রামকৃষ্ণ মগধরাজের সৈন্য-সাগরকে প্রায় নিঃশেষ করে ফেললেন। বসুদেব-নন্দন জগতের পতি। এরকম কাজ তাঁর ক্রীড়ামাত্র। যে অনন্তগুণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শুধু সংকল্পমাত্র অবলীলায় এই ত্রিভুবনের সৃষ্টি, পালন ও প্রলয় করেন তাঁর পক্ষে শত্রুনিগ্রহ করা কিছু আশ্চর্যের বিষয় নয়। তবু তিনি মানুষের অনুকরণ করেছিলেন বলেই এরকম ভাবে বর্ণিত হ'ল মাত্র। ২৫-২৯

সিংহ যেমন অন্য সিংহকে আক্রমণ করে মহাবল রাম সেরকম জরাসন্ধকে বলপূর্বক আক্রমণ করলেন। বলরাম যখন বরুণপাশ ও মানুষপাশে জরাসন্ধকে নিহত করার জন্য বাঁধলেন, শ্রীকৃষ্ণ নিজ কার্য সাধন করার উদ্দেশ্যে তাঁকে পরিত্যাগ করতে বললেন। রাজা জরাসন্ধ একজন প্রসিদ্ধ বীর। তিনি লোকনাথ রাম-কৃষ্ণ দ্বারা পরিত্যক্ত হয়ে লজ্জায় তপস্যা করার জন্য বনে গমনের উদ্যোগ করলেন। পথে অন্য রাজারা নানারকম পবিত্র ও লৌকিক উপদেশ-বাক্যে তাঁকে নিবৃত্ত করে বললেন, বীর, নিজের কর্মফলে আপনি যদুদের নিকট পরাজিত হয়েছেন। এতে আপনার বলবিক্রম কিছু কম বলে প্রতিপন্ন হয় না। সমস্ত সৈন্যদল নিহত হলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা উপেক্ষিতে জরাসন্ধ নিজ রাজ্য মগধ দেশে প্রস্থান করলেন। ৩০-৩৪

বিস্তীর্ণ সৈন্য-সাগরকে নিধন করলেও শ্রীকৃষ্ণের নিজের কোন রকম বলক্ষয় হয়নি। তিনি সন্তাপশূন্য হৃষ্টচিত্ত হয়ে মথুরাবাসীদের সঙ্গে নগরে ফিরে গেলেন। তাঁর অমৃতদৃষ্টিতে সৈন্যদের কারও গায়ে আর কোন ক্ষত রইল না। দেবতারা তাঁর উপর পুষ্পবৃষ্টি করে তাঁর লীলার সাধুবাদ করলেন। শত্রুনিধনে আনন্দিত মথুরাবাসী, সূত, মাগধ ও বন্দীরা শ্রীকৃষ্ণের স্তব করতে লাগলেন। প্রভু পুরীতে প্রবেশ করলে চারদিকে তুরী, ভেরী, বেণু, বীণা, মৃদঙ্গ, শংখ, দুন্দুভি বাদ্য বাজতে লাগল। জল সিঞ্চিত নানা পতাকায় অলংকৃত রাজপথগুলি পুলকিত নগরবাসীতে পূর্ণ হল। ব্রাহ্মণদের বেদ অধ্যয়নের শব্দ শোনা যাচ্ছিল, আর উৎসব উপলক্ষে বহু তোরণ নির্মিত হল। প্রবেশের সময় পুরনারীরা প্রভুর উপর মালা, দধি, অক্ষত (আতপ চাল) ও দুর্বাংকুর বিকীর্ণ করে প্রীত ও প্রসন্নচিত্তে এবং আনন্দ-বিকশিত লোচনে তাঁকে সস্নেহে দেখতে লাগলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি যে অনন্ত ধনসম্পত্তি ও বীরদের মণিময় রত্নালংকারাদি সংগ্রহ করেছিলেন তা সমস্তই যদুরাজ উগ্রসেনকে দিয়েছিলেন। ৩৫-৪০

মগধরাজ জরাসন্ধ এইভাবে প্রতিবার তেইশ অক্ষৌহিণী সেনা সংগ্রহ করে ক্রমান্বয়ে সতের বার কৃষ্ণের আশ্রিত যদুদের সংগে যুদ্ধ করেছিলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের তেজে যদুরা সহজেই প্রত্যেকবার সেই সৈন্য সংহার করে জয়ী হলেন।

আর প্রত্যেকবারই জরাসন্ধ সৈন্য হারিয়ে ও শত্রুদের দ্বারা পরিত্যক্ত হয়ে অবনতমুখে নিজ নগরে ফিরে গেলেন। তারপর আঠার বার যুদ্ধ হবার উপক্রম হয়েছে এমন সময়ে কালযবন নামে এক বীর নারদ কর্তৃক প্রেরিত হয়ে যুদ্ধস্থানে উপনীত হল। পৃথিবীতে শুধুমাত্র বৃষ্ণিবংশীয় বীরগণ তার সমকক্ষ শুনে সে তিনকোটি ম্লেচ্ছ সৈন্য নিয়ে মথুরা অবরোধ করল। শ্রীকৃষ্ণ তাকে দেখে সংকর্ষণের সংগে একত্র চিন্তা করে বললেন, দু'দিক থেকে যদুদের মহাদুঃখ উপস্থিত হল। মহাবল এই যবন আমাদের আক্রমণ করল আর আজ; কাল অথবা পরশু মগধরাজও আসবে। আমরা দু'জনই এর সংগে যুদ্ধ করতে থাকলে মহাবলী জরাসন্ধ এসে নিশ্চয়ই আমাদের বন্ধুদের সংহার করবে বা বন্দী করে তার নগরীতে নিয়ে যাবে। এরকম অবস্থায় এমন একটি দুর্গ তৈরী করা প্রয়োজন, যেখানে মানুষের গতিবিধি সম্ভব না হতে পারে। সেই দুর্গে জ্ঞাতিদের রেখে এসে আমরা কালযবনকে নিধন করব। ৪১-৪৮

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অগ্রজ বলরামের সঙ্গে এই মন্ত্রণা করে সমুদ্রের মধ্যে এক অদ্ভুত দুর্গ তৈরী করালেন এবং সেই দুর্গের মধ্যে বার যোজন বিস্তীর্ণ এক আশ্চর্য নগর নির্মাণ করালেন যাতে স্বয়ং বিশ্বকর্মার বিজ্ঞান ও শিল্পনৈপুণ্য প্রকাশ পেতে লাগল। রাজপথ, প্রাঙ্গণ, উপপথ ও বাস্তুগৃহ নির্মাণের নির্দিষ্ট স্থান সুশৃংখল ও অপূর্ব বলে মনে হতে লাগল। সেখানের উদ্যান ও উপবনগুলি স্বর্গীয় তরু ও লতায় শোভিত ছিল। স্বর্ণময় চূড়াবিশিষ্ট অতি উচ্চ স্ফটিক নির্মিত অট্টালিকাসমূহ ও পুরদ্বার নির্মিত হয়েছিল। রূপা ও পিতলের কলসে শোভিত রন্ধনশালা, অশ্বশালা প্রস্তুত হল। পদ্মরাগ প্রভৃতি বিচিত্র মণিতে খচিত চূড়াযুক্ত বাসগৃহ; মহা-মরকত প্রভৃতির গৃহতল নির্মিত হল। নগরের প্রত্যেক বাসভবন, দেবমন্দির ও চন্দ্রশালিকায় সুশোভিত হল। ব্রাহ্মণ প্রভৃতি চার বর্ণের লোকদের বাসভবন সব জায়গায় আলাদা আলাদা তৈরী হল। এ সবের মাঝখানে যদুপতি উগ্রসেন, শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম ও বাসুদেবের জন্য আবার আলাদা করে এক একটি রাজপ্রাসাদ তৈরী হল। দেবরাজ ইন্দ্রও শ্রীকৃষ্ণের কাছে সুধর্মা সভা (দেবসভা) ও পারিজাত বৃক্ষ পাঠালেন। ঐ সভায় থাকলে মর মানুষেরও ক্ষুধা-তৃষ্ণা বোধ থাকে না। বরুণদেব শ্রীকৃষ্ণকে মনের মত বেগশালী কতকগুলি সাদা রঙের ঘোড়া উপহার পাঠালেন ; তাদের একটি করে কান শ্যামবর্ণ। নিধিপতি কুবের ভগবানকে অষ্টনিধি[১] দিলেন। আর অন্যান্য লোকপালরা নিজ নিজ বিভূতি পাঠিয়ে দিলেন। ভগবান শ্রীহরি নিজ নিজ অধিকার সিদ্ধির জন্য যে সিদ্ধদের যে যে আধিপত্য দিয়েছিলেন তাঁরা সকলেই শ্রীহরিকে পৃথিবীতে অবতীর্ণ দেখে তাঁকে নিজ নিজ বিভূতি প্রত্যর্পণ করলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজের অচিন্ত্য শক্তি যোগমায়ার প্রভাবে সকলের অজ্ঞাতসারে স্বজনদের মথুরা থেকে সেই দুর্গে নিয়ে গেলেন এবং মথুরায় ফিরে বলরামের সঙ্গে পরামর্শ করে গলায় পদ্মফুলের মালা পরে একাই নিরস্ত্র অবস্থায় মথুরার দ্বারপথে নির্গত হলেন। ৪৯-৫৭

১ অষ্টনিধি—পদ্ম, মহাপদ্ম, মৎস্য, কূর্ম, খর্বক, নীল, মকুন্দ।

একপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

কালযবন বিনাশ ও মুচুকুন্দ কাহিনী

শুকদেব বললেন, মহারাজ, পীত কৌশেয় বসন পরিহিত পরম সুন্দর ও শ্যামবর্ণ শ্রীহরি নবোদিত পূর্ণচন্দ্রের মত মথুরার দ্বার দিয়ে বার হলেন। বক্ষে শ্রীবৎস চিহ্ন ও গলায় দীপ্তিশালী কৌস্তুভ মণি, স্থূল ও দীর্ঘ চতুর্ভুজ ও নতুন কমলের মত অরুণাভ আঁখি দুটিতে তাঁকে মনোহর মনে হতে লাগল। তাঁর কপোলযুগল সুন্দর ও সুঠাম; তাঁর শুভ্রহাস্যশোভিত সদাপ্রফুল্ল মুখকমল মকর-কুণ্ডলে শোভমান; তাঁর ঐ রূপ দেখে কালযবনের নারদ-বর্ণিত লক্ষণগুলোর কথা মনে পড়ল। সে মনে মনে বিবেচনা করল, এই পদ্মপলাশলোচন চতুর্ভুজ শ্রীবৎসবক্ষ অতি সুন্দর বনমালাধারী অপূর্বদর্শন পুরুষ নিশ্চয়ই বাসুদেব ছাড়া অন্য কেউ নন। বিশেষ করে ইনি নিরস্ত্র অবস্থায় পায়ে হেঁটে আসছেন। আমিও নিরস্ত্র হয়েই এঁর সঙ্গে যুদ্ধ করব। এই রকম ভেবে যোগীদেরও দুষ্প্রাপ্য ভগবানকে আক্রমণ করার ইচ্ছায় কালযবন যখন তাঁর দিকে ছুটে গেল তখন ভয়ে ভীত হবার মত শ্রীকৃষ্ণও তার আগে আগে পালাতে লাগলেন। যেন এই ধরা পড়লেন—শ্রীহরি এরকম ভান করতে করতে তাকে দূরবর্তী এক গিরিগুহা পর্যন্ত নিয়ে গেলেন। পেছনে ছুটতে ছুটতে কালযবন শ্রীকৃষ্ণকে বলতে লাগল, তুমি যদুকুলে জন্মগ্রহণ করেছ, তোমার পালানো উচিত নয়। কিন্তু সে তাঁকে ধরতে পারল না, কেননা পূর্ব কর্মফল তার শেষ হয় নি। ভগবান তার তিরস্কার শুনেও গিরি-গুহার মধ্যে ঢুকলেন। যবনও তার মধ্যে ঢুকে দেখল একজন মানুষ ঘুমিয়ে আছে। এ নিশ্চয়ই আমাকে দূরে এনে এখন সাধু সেজে ঘুমিয়ে আছে, এই কথা ভেবে যবনপতি তাঁকে পদাঘাত করল। পদাঘাতে সেই নিদ্রিত পুরুষের নিদ্রাভঙ্গ হল। অনেকদিন নিদ্রার পর উঠে ক্রমশ চোখ খুলে সেই পুরুষ যখন চারদিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলেন, তখন তাঁর পাশে দাঁড়ানো কালযবনকে তিনি হঠাৎ দেখলেন। হে ভারত, নিদ্রাভঙ্গের জন্য তিনি রুষ্ট হয়ে তার দিকে তাকালেন, আর তক্ষুণি তাঁর দেহস্থ আগুনের সংস্পর্শে যবন ভস্মীভূত হয়ে গেল। ১-১১

রাজা পরীক্ষিৎ প্রশ্ন করলেন, ভগবান, কালযবনের সংহারকারী এই পুরুষটির নাম কি? কোন কুলে তাঁর জন্ম? পিতা কে? তাঁর বলবীর্য কি রকম এবং কি কারণেই বা তিনি ঐ পর্বতগুহায় শুয়ে ছিলেন? অনুগ্রহ করে এই সব বিষয় আনুপূর্বিক বলুন। ১২

শুকদেব বললেন, মহারাজ, এই ব্যক্তির ইক্ষ্বাকু বংশে জন্ম, ইনি মহাত্মা মান্ধাতার পুত্র, নাম মুচুকুন্দ। ইনি একজন প্রধান ব্রাহ্মণভক্ত ছিলেন এবং সত্য পালনের জন্য জীবন উৎসর্গ করতেও পরাঙ্মুখ হন নি। ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতারা অসুরদের ভয়ে ভীত হয়ে তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করায় তিনি তাঁদের অনেকদিন রক্ষা করেছিলেন। তারপর কার্তিককে স্বর্গের রক্ষক পেয়ে তাঁরা মুচুকুন্দকে বললেন, মহারাজ, আমাদের রক্ষা করার জন্যে আর আপনাকে কষ্ট করতে হবে না। হে বীর, নরলোক ও নিষ্কণ্টক রাজ্য পরিত্যাগ করে আপনি আমাদের রক্ষাকার্যে প্রবৃত্ত থেকেছেন এবং যাবতীয় সুখভোগ বিসর্জন দিয়েছেন। কিন্তু এখন আপনার পুত্র, স্ত্রী, জ্ঞাতি, বন্ধু, মন্ত্রীরা এবং আপনার সময়ের প্রজারাও আর কেউ নেই। প্রচণ্ড কালস্রোতে সকলেই বিনষ্ট হয়েছে। কাল বলবানদের চেয়েও শ্রেষ্ঠ। ভগবান কাল, অব্যয় ও সর্বনিয়ামক। খেলতে খেলতেই যেমন পশুরাজ পশুদের চালনা করেন,

তিনিও তেমনি প্রজাদের চালনা করছেন। আপনার মঙ্গল হোক। মুক্তি ছাড়া অন্য যে কোন বর আপনি আমাদের কাছে চাইতে পারেন, কেননা মোক্ষদাতা একমাত্র কালকর্তা বিষ্ণু। বিখ্যাত মহারাজ মুচুকুন্দ অনেকদিন পর্যন্ত অবিশ্রান্তভাবে দেবতাদের রক্ষাকার্যে নিযুক্ত থাকায় পরিশ্রান্ত হয়েছিলেন, তাই দেবতাদের অভিবাদন করে দীর্ঘকাল স্থায়ী নিদ্রা প্রার্থনা করলেন এবং বললেন, সুরশ্রেষ্ঠগণ, আমার এটাও প্রার্থনা যে যদি কেউ আমার ঘুম ভাঙায় আমার দৃষ্টিপাতেই যেন সে তৎক্ষণাৎ ভস্মীভূত হয়। দেবতারা 'তথাস্তু' বলে আরও বললেন, রাজা, আপনি সংজ্ঞাহীনের মত নিদ্রিত থাকার সময় কেউ আপনাকে জাগালে আপনার দৃষ্টিমাত্রেই সে ভস্মীভূত হবে।[১] ১৩-২১

মুচুকুন্দের সক্রোধ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাতে কালযবন ভস্মীভূত হলে ভক্তবৎসল ভগবান গোবিন্দ তাঁকে দর্শন দিলেন। নবীন মেঘতুল্য শ্যামসুন্দর, পীত কৌশেয় বস্ত্র পরিহিত, বক্ষে শ্রীবৎসচিহ্ন, গলায় উজ্জ্বল কৌস্তুভ মণি ও বিচিত্র বর্ণের পুষ্পমালা, প্রশান্ত বদনমণ্ডল, কানে মকরাকৃতি উজ্জ্বল কুণ্ডল, চতুর্ভুজধারী, সহাস্য প্রেমপূর্ণ দৃষ্টিযুক্ত নবীন বয়স্ক এবং মত্ত কেশরীর মত বিপুলবিক্রম, মনোহর রূপবিশিষ্ট ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে মুচুকুন্দ অকস্মাৎ চোখের সামনে উপস্থিত দেখলেন। রাজা মুচুকুন্দ ঐ মূর্তি দেখে তাঁর অনুপম তেজে অভিভূত, ভীত ও শঙ্কাবিহ্বল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, এই কণ্টকাকীর্ণ বনের মধ্যে দুষ্প্রবেশ্য গিরিগুহায় পদ্ম-পলাশ তুল্য শ্রীচরণে বিচরণ করছেন, আপনি কে? আপনি কি তেজস্বীদের তেজ না ভগবান অগ্নিদেব? আপনি কি সূর্য, চন্দ্র, মহেন্দ্র বা অন্য কোন লোকপাল? আপনি তিন দেবের মধ্যে বিষ্ণু বলে আমার মনে হচ্ছে। কারণ ভীষণ অন্ধ-কারাচ্ছন্ন এই গিরিগুহা শুধু আপনার জ্যোতিতেই প্রদীপের আলোর মত আলোকিত হয়েছে। নরশ্রেষ্ঠ, আপনার যথার্থ পরিচয় জানার জন্য আমার বিশেষ কৌতূহল হচ্ছে। যদি অভিরুচি হয়, আপনার জন্ম, কর্ম ও গোত্রের কথা বলুন। ২২-৩১

মুচুকুন্দ বললেন, প্রভু, আমি ইক্ষ্বাকুবংশের বিখ্যাত ক্ষত্রিয়। যুবনাশ্বনন্দন মান্ধাতার পুত্র আমি, আমার নাম মুচুকুন্দ। অনেকদিন জেগে থাকায় শ্রান্ত ও নিদ্রাভিভূত হয়ে এই জনহীন বনে স্বাধীনভাবে শয়ন করেছিলাম। এই মাত্র যে আমার ঘুম ভাঙালে সেই হতভাগ্য নিশ্চয়ই নিজের পাপে ভস্মীভূত হয়ে গেছে। এর পরই শত্রুশাসক অপূর্ব রূপধারী আপনার দর্শন হল। হে মহাভাগ, আপনার যে রকম দুর্বিষহ তেজ তা আমি এই সামান্য দৃষ্টিতে বেশিক্ষণ তাকিয়ে দেখতে পারছি না; আপনি দেহীদের মাননীয়। ৩২-৩৫

রাজার এরকম সম্ভাষণে ভূতভাবন ভগবান ঈষৎ হেসে মেঘগম্ভীর স্বরে মুচুকুন্দকে সম্বোধন করে বললেন, প্রিয় মুচুকুন্দ, আমার জন্ম, কর্ম ও নাম অসংখ্য। নিজে অনন্ত হয়েও আমি সেই সব অনন্ত জন্মকর্মের বিষয় বর্ণনা করতে পারি না। সূক্ষ্মদর্শী বিচক্ষণের বহু জন্মের প্রয়াসে পার্থিব পরমাণুগুলির গণনা বরং সম্ভব, কিন্তু আমার জন্ম, কর্ম ও নামগুলির গণনা একেবারেই অসম্ভব। মহারাজ, ত্রিকালজ্ঞ নারদ প্রভৃতি পরম ঋষিরা আজ পর্যন্ত ক্রমান্বয়ে কীর্তন করেও আমার ত্রিকাল সম্পর্কিত জন্ম, কর্ম ও নামের সম্যক বর্ণনায় এ পর্যন্ত সমর্থ হন নি। কিন্তু তুমি

১ মুচুকুন্দের বরপ্রাপ্তির বিষয় কোন কোন সংস্করণে উল্লিখিত হয় নি। সেজন্য এই অধ্যায়ের ২০ ও ২১ সংখ্যক শ্লোক দুটিকে অনেকে প্রক্ষিপ্ত মনে করেন

আমার প্রিয়পাত্র। আমার বর্তমান জন্ম-কর্মের বিবরণ বর্ণনা করছি, তা শোন। পূর্বে কমলযোনি ব্রহ্মা ধর্মরক্ষা ও পৃথিবীর ভারস্বরূপ অসুরদের সংহার করার জন্য আমার প্রার্থনা করায় আমি যদুকুলে বসুদেবের গৃহে অবতীর্ণ হয়েছি। বসুদেবের পুত্র বলে লোকে আমাকে বাসুদেব বলে থাকে। সাধুদের শত্রু কালনেমি, কংস, প্রলম্ব, প্রভৃতি অন্যান্য দৈত্যরাও আমার দ্বারা নিহত হয়েছে। তোমার ঐ তীব্র দৃষ্টি স্বরূপ ক্রোধানল দ্বারা আমিই ঐ কালযবনকে দগ্ধ করেছি। পূর্বজন্মে তুমি আমার যথেষ্ট আরাধনা করেছিলে তাই দর্শনদানে তোমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশের জন্য আমি এই গিরিগুহায় এসেছি। হে রাজর্ষি, তুমি আমার কাছে তোমার অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। আমি সর্বকাম দান করি। যারা আমার শরণাগত হয় তাদের আর কোন বিপদ বা দুঃখের কারণ কখনও থাকে না। ৩৬-৪৪

শুকদেব বললেন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এইভাবে মুচুকুন্দকে আত্মপরিচয় দেবার পর গর্গাচার্যের 'অষ্টাবিংশ যুগে বসুদেবের গৃহে ভগবান অবতীর্ণ হবেন' এই কথা মুচুকুন্দের মনে পড়ল। তখন আনন্দিত হয়ে তিনি শ্রীকৃষ্ণকে পরমপুরুষ নারায়ণ জ্ঞানে প্রণাম করে বলতে লাগলেন, জগৎপতি, এই সংসারের নরনারী যাবতীয় মানুষই আপনার মায়ায় মোহিত। তাই তারা পরমার্থসুখ-স্বরূপ আপনাকে দেখতে পায় না, ভজনাও করে না। পরস্পর পরম্পরের কাছ থেকে বঞ্চিত হয়ে সুখের জন্য দুঃখের উৎপত্তিস্থান গৃহে আসক্ত হয়ে থাকে। হে নিষ্পাপ, এই কর্মভূমিতে কোন রকমে দুর্লভ অবিকলাংগ মানুষজন্ম লাভ করে লোকে বিষয়সুখেই আকৃষ্ট হয়ে থাকে। পশুরা যেমন তৃণলোভে তৃণাচ্ছন্ন অন্ধকূপে পতিত হয়, তারাও সেরকম গৃহরূপ অন্ধকূপে পতিত হয়ে আপনার চরণকমল ভজনা করে না। হে অজিত, আমি নিজে রাজা ছিলাম, রাজ্য-সম্পত্তির জন্য আমার গর্ব হয়েছিল ; আমি দেহকেই আত্মা ভাবতাম। তাই দুরন্ত চিন্তায় স্ত্রী, পুত্র, রাজকোষ ও ভূমি প্রভৃতি ঐহিক পদার্থেই আসক্ত হয়েছিলাম। ঘট বা পর্ণকুটিরের মত অতি তুচ্ছ, কেবল জলপূর্ণ ক্ষণস্থায়ী, পঞ্চভূতময় এবং পরের উপভোগের জন্য তৈরী এই দেহে অবস্থান করে 'আমি রাজা' এই অভিমানে অন্ধ হয়ে আমি সর্বসংহর্তা কালরূপী আপনার স্বরূপকে বিস্মৃত হয়েছি এবং রথ, হস্তী, অশ্ব ও পদাতিক দ্বারা বিরচিত সেনায় পরিবৃত হয়ে বিচরণ করতে করতে অতি গর্ববোধে আপনার কথা আর ভাবি নি। এতকাল আমার অনর্থক ব্যয়িত হয়েছে। ক্ষুধিত সাপ যেমন ওষ্ঠ লেহন করতে করতে ইঁদুরকে আক্রমণ করে সেরকম প্রমাদশূন্য যমরূপী আপনি 'এ কর্তব্যগুলি করতে হবে' এই চিন্তায় ব্যাকুল, লোভী ও বিষয়-বাসনায় প্রমত্ত লোককে হঠাৎ অভিভূত করেন। যে দেহ আগে রাজারূপে আখ্যাত হয়ে সোনার রথে অথবা হাতীর পিঠে ভ্রমণ করত, এখন সেই দেহ দুর্লঙ্ঘ্য কালমূর্তি দ্বারা আক্রান্ত হয়ে কুকুর-শৃগালের দ্বারা ভক্ষিত হলে বিষ্ঠা, ভক্ষিত না হলে কৃমি-কীট এবং দগ্ধ হলে ভস্মরূপে পরিণত হয়। ৪৫-৫১

হে ঈশ্বর, যে ব্যক্তি দিগ্‌দিগন্তের আধিপত্য লাভে বা রাজাদের জয় করে সংগ্রাম থেকে নিবৃত্ত হয়ে সর্বোচ্চ আসনে উপবেশন করে সমকক্ষ রাজাদের বন্দনীয় হয়ে থাকেন, তিনিই আবার সংসর্গদোষে গৃহের অভ্যন্তরে নারীদের ক্রীড়ামৃগ বানর রূপে পরিচালিত হয়ে থাকেন। অতুল ঐশ্বর্যের অধিপতি রাজচক্রবর্তী হলেও আশার আর বিরাম নেই। জন্মান্তরে যেন এরূপ রাজচক্রবর্তী হতে পারি, এই প্রত্যাশায় মানুষ ভোগ থেকে নিবৃত্ত হয়েও আবার সেই ভোগেরই অপেক্ষায় তপস্যায় মগ্ন হয়ে অতিশয় নিষ্ঠার সঙ্গে কর্ম করে। এই ভাবে তার ভোগতৃষ্ণা সর্বদা বাড়তে থাকে, সে আর সুখলাভে সমর্থ হয় না। হে অচ্যুত, সংসারে ভ্রমণ

করতে করতে যখন আপনার অনুগ্রহে সংসারী জীবের সংসার শেষ হয়ে আসে, তখন তিনি সাধুসঙ্গ লাভ করে থাকেন। যখনই সাধুসঙ্গ ঘটে তখনই সাধুভক্তদের শাস্তিদাতা সর্বফলস্বরূপ সর্বনিয়ামক সর্বেশ্বর আপনার প্রতি প্রেম ও আপনাতে রতি হয়ে থাকে। হে জগদীশ্বর, তপস্যার জন্য বনে যেতে অভিলাষী হয়ে বিবেকী রাজচক্রবর্তীরা আপনার কাছে যা প্রার্থনা করেন সেই রাজ্যানুরাগ থেকে আপনারই প্রসাদে আমার আজ বৈরাগ্য উপস্থিত হয়েছে। প্রভু, আপনার চরণ-সেবাই নিরভিমান পুরুষদের একমাত্র প্রার্থনা ; আমি আপনার কাছে সেই বর প্রার্থনা করি। শ্রীহরি, আপনি মুক্তি দান করেন। কোন্ বিবেকী ব্যক্তি আপনাকে আরাধনা করে যাতে আত্মার বন্ধন ঘটে এরকম বর প্রার্থনা করবেন ? অতএব, ঈশ্বর, যাবতীয় ভোগ্য বিষয়ই যখন রজ, তম ও সত্ত্বগুণের দ্বারা প্রসূত তখন সে সমস্ত বিষয়ে আমার আর প্রয়োজন নেই।[১] ঐ রকম বন্ধন-কারণ বিষয়গুলিকে বিষের মত দূরে নিক্ষেপ করে আমি ধর্মাধর্ম ও রাগদ্বেষাদি দোষশূন্য, প্রাকৃতিক গুণের অতীত, অদ্বৈত, বিজ্ঞানমাত্র ও শ্রেষ্ঠ পুরুষ আপনার চরণে আশ্রয় গ্রহণ করলাম। হে শরণপ্রদ পরমাত্মা, এই সংসারে আমি অনেক কাল কর্মফল দ্বারা পীড়িত হয়েছি, দীর্ঘকাল বাসনা দ্বারা সন্তপ্ত হচ্ছি, তবুও আমার ছয় রিপুর তৃষ্ণা দূর হয় নি। তাই কোন ভাবেই শান্তি না পেয়ে আপনার সত্য, ভয়শূন্য ও শোকহীন চরণকমল আশ্রয় করেছি। হে ঈশ্বর, আমি বিপন্ন, আমাকে রক্ষা করুন। ৫২-৫৮

ভগবান বললেন, মহারাজ, তোমার বুদ্ধি অত্যন্ত নির্মল এবং পরমার্থ সন্দর্শনের উপযুক্ত আশ্রয়। কারণ আমার দ্বারা এরকম বিভিন্ন বরের প্রলোভনে প্রলোভিত হয়েও তুমি ভোগ ও বৈভবের জন্য একবারও আকাঙ্ক্ষা কর নি। তোমাকে যে আমি বর দিতে প্রলুব্ধ করেছিলাম তা নয়, তবে জগতে ভক্তহৃদয়ের অনাসক্তির পরিচয় দেওয়াই আমার উদ্দেশ্য। কারণ যারা আমার প্রকৃত ভক্ত, তাদের চিত্ত কখনও বিষয়-চিন্তায় ব্যগ্র হয় না। রাজা, যাদের হৃদয়ে প্রকৃত ভক্তি নেই, প্রাণায়ামাদি যোগাঙ্গের অনুষ্ঠানে তাদের মন আমার প্রতি অভিনিবিষ্ট হয়েও কখনও বিষয়ের দিকে ছুটে যায়। তোমার ভক্তি অচলা ও চিরন্তনী। কখনই আমার প্রতি তোমার উদাসীনতা আসে না। তাই আমার প্রতি চিত্ত আবিষ্ট রেখে জগতে যথেচ্ছ পর্যটন কর। রাজ্য-পালনাদি ক্ষত্রিয়ের ধর্ম যতকাল পালন করেছ ততকাল মৃগয়া প্রভৃতিতে অনেক প্রাণীর প্রাণবধ করেছ। এখন আমার প্রতি চিত্তকে সংযত করে তপস্যাদ্বারা পাপ নাশ কর। রাজা, পরজন্মে তুমি সর্বভূতের উপকারী উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণ হয়ে জন্মগ্রহণ করে গুণাতীত পরমানন্দস্বরূপ পরমব্রহ্ম আমাকে লাভ করবে। ৫৯-৬৪

দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণ সকাশে রুক্মিণীর দূত

শুকদেব বললেন, মহারাজ, ইক্ষ্বাকুনন্দন মুচুকুন্দ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এরকম অনুগ্রহ লাভ করে তাঁকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করে গুহা থেকে বার হলেন। বেরিয়েই তিনি দেখলেন যে পশু, লতা ও বনস্পতিগুলি ক্ষুদ্রাকৃতি হয়ে পড়েছে। অতএব কলিযুগ আরম্ভ হয়েছে এই মনে করে তিনি তপস্যার জন্য উত্তরদিকে গেলেন। পরম শ্রদ্ধা

১ তুলনীয় : যম-নচিকেতা সংবাদ, কঠোপনিষৎ, ১।১।২৬ ও ২৭ শ্লোক

ও ভক্তিসহ তপস্যার অনুষ্ঠান করে বিষয়াসক্তি বিসর্জন দিয়ে তিনি জিতেন্দ্রিয় হলেন, তাঁর হৃদয় থেকে আত্মা ও অনাত্মা সম্বন্ধে অজ্ঞান দূর হল। তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণে চিত্ত স্থির করে গন্ধমাদন পর্বতে প্রবেশ করলেন। সেখানে নরনারায়ণের বাসস্থান বদরিকাশ্রমে সর্বদ্বন্দ্ব সহ্য করে শান্তভাব অবলম্বন করে তপস্যা দ্বারা শ্রীহরির আরাধনা করতে আরম্ভ করলেন। ১-৪

এদিকে কালযবন নিহত হলে শ্রীকৃষ্ণ আবার মথুরায় ফিরে এলেন এবং ম্লেচ্ছসেনা সংহার করে তাদের ধন দ্বারকায় নিয়ে যেতে লাগলেন। অচ্যুতের নির্দেশে ভৃত্যরা ধনসামগ্রী বলদের পিঠে স্থাপন করে মথুরার দিকে যাচ্ছে, এমন সময়ে জরাসন্ধ হঠাৎ তেইশ অক্ষৌহিণী সেনা নিয়ে আবার যুদ্ধের জন্য সেখানে উপস্থিত হল। শত্রুসৈন্যের প্রচণ্ড যুদ্ধোদ্যম ও বেগ দেখে মনুষ্যলীলায় অবতীর্ণ মহামনা শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরাম যেন সাধারণ মানুষের মতই ভয় পেয়েছেন এরকম ভাব দেখিয়ে দ্রুত পালিয়ে যেতে আরম্ভ করলেন। তাঁরা নির্ভয় হয়েও অতি ভীরুর ন্যায় প্রচুর ধন পরিত্যাগ করে পদ্মপলাশের মত কোমল চরণে বহু যোজন পথ অতিক্রম করে চললেন। ৫-৮

বলবান মগধরাজ জরাসন্ধ অতুল ঐশ্বর্যসম্পন্ন রাম-কৃষ্ণের প্রভাব জানতেন না, তাই তাঁদের পালাতে দেখে হাসতে হাসতে রথ-সৈন্য সহ তাঁদের পশ্চাদ্ধাবন করলেন। দ্রুতবেগে বহুদূরে পালিয়ে যাওয়ায় রাম-কৃষ্ণ উভয়েই নিতান্ত পরিশ্রান্ত হয়ে প্রবর্ষণ নামক নিকটবর্তী একটি উচ্চ পর্বতে আরোহণ করলেন। ইন্দ্র এই পর্বতে সর্বদা বর্ষণ করে থাকেন। রাজা জরাসন্ধ দেখলেন যে রাম কৃষ্ণ ঐ পর্বতে লুকালেন। কিন্তু সর্বত্র অন্বেষণ করেও যখন তাঁদের সন্ধান পেলেন না তখন পর্বতের চারদিকে আগুন জ্বালিয়ে পর্বতকে দগ্ধ করতে লাগলেন। পর্বতের পাদদেশ যখন দগ্ধ হচ্ছিল তখন সেখান থেকে লাফ দিয়ে রাম-কৃষ্ণ এগার যোজন দূরে নীচের ভূমিতে পড়লেন। তারপর শত্রু ও তার অনুচরদের দৃষ্টিপথ অতিক্রম করে সমুদ্র-বেষ্টিতে নিজপুরী দ্বারকায় আবার ফিরে গেলেন। রাম ও কৃষ্ণ আগুনে ভস্মীভূত হয়েছেন এই ধারণা করে জরাসন্ধ নিজের বিপুল সৈন্যসহ মগধ অভিমুখে যাত্রা করলেন। ৯-১৪

মহারাজ, আনর্তদেশের অধিপতি রৈবত নিজের কন্যা রেবতীকে বলরামের সঙ্গে বিবাহ দেন তা পূর্বেই বর্ণনা করেছি।[১] গরুড় যেরকম দেবতাদের দলন করে সুধা হরণ করেছিলেন, ভগবান গোবিন্দও সেই রকম সর্বলোকের সমক্ষে শিশুপাল পক্ষীয় শাল্বাদি রাজাদের পরাস্ত করে সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর অংশ সমুৎপন্ন বিদর্ভ-রাজ ভীষ্মকের কন্যা রুক্মিণীকে স্বয়ম্বর সভা থেকে হরণ করে বিবাহ করেছিলেন। ১৫-১৭

রাজা পরীক্ষিৎ তখন শুকদেবকে জিজ্ঞাসা করলেন, ভগবান রাক্ষস-বিধি অনুসারে ভীষ্মক-কন্যা চারুবদনা রুক্মিণীকে বিবাহ করেন, এটা শুনেছি। বিভু যেভাবে জরাসন্ধ ও শাল্ব প্রভৃতিকে জয় করে কন্যাহরণ করেছিলেন, অমিততেজা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেই কথা শুনতে ইচ্ছা করি। শ্রীকৃষ্ণ-কথা মহাফলপ্রদ ও আনন্দদায়ক। এই কথা লোকের পাপ-নাশিনী এবং চিরনতুন। তা শুনে কোন্ শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তির আশ মেটে? শুকদেব বললেন, মহারাজ, ভীষ্মক নামে এক প্রধান রাজা বিদর্ভদেশের সিংহাসনে আসীন ছিলেন। তাঁর পাঁচ পুত্র রুক্মী, রুক্মরথ, রুক্মবাহু, রুক্মকেশ, রুক্মমালী এবং কন্যা সাধ্বী রুক্মিণী। গৃহে সমাগত লোকের মুখে

১ নবম স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে, (দ্রঃ পৃঃ ৪৫৩)।

শ্রীকৃষ্ণের রূপ, বীর্য, গুণ ও সম্পদের বর্ণনা শুনে রুক্মিণী তাঁকেই নিজের পতি বলে স্থির করেন। শ্রীকৃষ্ণও বুদ্ধি, লক্ষণ, রূপ, শীল, ঔদার্য প্রভৃতি গুণের আশ্রয়ভূতা সেই রুক্মিণীকে নিজের যোগ্য পাত্রী ভেবে তাঁকে বিবাহ করা মনস্থ করেন। ১৮-২৪

রুক্মী শ্রীকৃষ্ণদ্বেষী ছিল। তাই তাঁর হাতে ভগ্নী রুক্মিণীকে সম্প্রদানের জন্য পিতা ও বন্ধুরা উৎসুক হয়েছেন শুনে সে তাঁদের বারণ করল ও চেদিরাজ শিশুপালকেই বোনের বর রূপে স্থির করল। ভাই রুক্মীর মনের অভিপ্রায় জেনে সুনীলনয়না বিদর্ভরাজকন্যা রুক্মিণী খুব মর্মাহত হলেন এবং নিতান্ত কাতরহৃদয়ে কৃষ্ণ-লাভের উপায় চিন্তা করে অবশেষে একজন বিশ্বস্ত ব্রাহ্মণকে গোপনে শ্রীকৃষ্ণের কাছে পাঠালেন। সেই ব্রাহ্মণ রুক্মিণীর অনুরোধে বিদর্ভ থেকে যাত্রা করে অতি অল্প সময়ের মধ্যে দ্বারকায় পৌঁছলেন। পুররক্ষক প্রতিহারীরা সাদরে ব্রাহ্মণকে শ্রীকৃষ্ণের কাছে নিয়ে গেল। স্বর্ণসিংহাসনে আসীন শ্রীকৃষ্ণকে দেখে ব্রাহ্মণের আনন্দের আর সীমা রইল না। ব্রাহ্মণকে দেখে শ্রীকৃষ্ণ সিংহাসন থেকে নেমে তাঁকে নিজের আসনে বসালেন এবং দেবতারা যেরকম তাঁর পূজা করেন সেরকম ভাবে তিনি ব্রাহ্মণের অর্চনা করলেন। বিশ্রাম লাভের পর ব্রাহ্মণের আহারাদি শেষ হলে সাধুদের একান্ত আশ্রয় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিনীতভাবে তাঁর কাছে গিয়ে অতি সমাদরে তাঁর চরণমর্দন করতে করতে জিজ্ঞাসা করলেন, দ্বিজশ্রেষ্ঠ, সব সময় সন্তুষ্টমনে থেকে প্রাচীনদের দ্বারা সেবিত বর্ণাশ্রম ধর্ম সহজে অনুষ্ঠিত হচ্ছে তো? ব্রাহ্মণ যদি সন্তুষ্ট থেকে স্বধর্ম থেকে বিচ্যুত না হয়ে জীবনধারণ করতে পারেন, তা হলে ধর্মই তাঁর যাবতীয় অভিলাষ পূরণ করেন। যিনি সদা অসন্তুষ্ট, তিনি অনন্তলোক লাভ করেও তৃপ্তিলাভে সমর্থ হন না। আর যিনি নিত্য সন্তুষ্ট তিনি জগতে কিছুই প্রার্থনা করেন না। এমন কি, জীবিকা-নির্বাহের উপযুক্ত সামগ্রীর সংস্থান না হলেও তিনি সুখে কালযাপন করেন। যাঁরা অল্প লাভে সন্তুষ্ট হয়ে স্বধর্মের প্রতিপালন করে প্রাণীদের হিতসাধনেই নিরত থাকেন[১] এবং দম্ভ, অভিমান ইত্যাদি ত্যাগ করে শান্ত গুণাবলী অবলম্বন করে কালাতিপাত করেন, আমি অবনতমস্তককে তাঁদের বারবার প্রণাম করি।[২] ব্রাহ্মণ, আপনি যে রাজার অধিকারে বাস করছেন তাঁর সুশাসনে আপনাদের সর্বাঙ্গীন কুশল তো? প্রজারা যে রাজার অধীনে নিরুপদ্রবে ও সুখে বাস করে সে আমার বিশেষ প্রিয়। আপনি যে কাজের ইচ্ছায় ও যেখানে থেকে দুরতিক্রম্য সমুদ্র পার হয়ে এখানে এসেছেন তা গোপনীয় না হলে আমার কাছে খুলে বলুন। আপনার কি কাজ আমি সাধন করব তাও বলুন। লীলাচ্ছলে মনুষ্য-শরীরধারী পরমেশ্বর এভাবে ব্রাহ্মণকে প্রশ্ন করলে ব্রাহ্মণ তাঁকে রুক্মিণীর কথা বর্ণনা করলেন। ২৫-৩৬

রুক্মিণী বলেছেন, হে ভুবনসুন্দর অচ্যুত, আপনার যে সর্বগুণের কথা শ্রোতাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করে তাদের অঙ্গতাপ হরণ করে সেইসব গুণ এবং আপনার যে রূপ মানুষের যাবতীয় দর্শনীয় বিষয়ের লাভস্বরূপ, সেই রূপের কথা শুনে আমি চিত্তের লজ্জা বিসর্জন দিয়ে আপনার প্রতি আসক্ত হয়েছি। হে মুকুন্দ, কুল, শীল, রূপ, বিদ্যা, বয়স, দ্রব্য-সম্পত্তি ও প্রভাবে আপনি আপনার নিজেরই তুল্য। হে অনুপম নরশ্রেষ্ঠ, আপনি নরলোকের মনোরঞ্জন করে থাকেন। বিবাহের সময় উপস্থিত হলে কোন্ রূপ-গুণবতী কামিনী আছে যে আপনার মত ব্যক্তিকে পতিরূপে বরণ না করে? হে প্রাণপ্রিয় অচ্যুত, আমি এসব ভেবেই

১ ছিন্নদ্বৈধা যতাত্মানঃ সর্বভূতহিতে রতাঃ॥ গীতা, ৫।২৫ ২ গীতা, ১২।৪

আপনাকে পতিরূপে বরণ করেছি এবং আত্মসমর্পণ করেছি। অতএব আপনি এখানে এসে আমাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করুন। হে কমলাক্ষ, শৃগাল যেমন কখনও সিংহের অঙ্গস্পর্শ করতে সাহস পায় না, সে রকম আপনার মত বীরকেশরীর প্রতি নিবেদিত আমার দেহকে যেন চেদিপতি শিশুপাল কখনো স্পর্শ না করে। যদি আমি কখনো ইষ্টাপূর্ত[১] কর্ম এবং দেবতা, ব্রাহ্মণ ও গুরুর অর্চনা দ্বারা পরমেশ্বরের আরাধনা করে থাকি তা হলে দমঘোষ-নন্দন শিশুপাল প্রভৃতি কেউই আমাকে স্পর্শ করতে পারবে না। আপনি এসে আমার পাণিগ্রহণ করুন। হে অজিত, আগামী পরশুই আমার বিবাহের দিন। আপনি প্রথমে অন্যের অলক্ষ্যে এই বিদর্ভপুরে আসবেন; পরে সৈন্যসামন্তে পরিবৃত হয়ে শিশুপাল ও জরাসন্ধের সৈন্যদের বিধ্বস্ত করে রাক্ষস-বিধানে শুধু বংশের পরিচয়ে আমার পাণিগ্রহণ করবেন। আমি অন্তঃপুরচারিণী। তাই আমাকে হরণ করতে হলে রক্ষকরূপী আমার আত্মীয়-স্বজনদেরই নিহত করতে হবে, আপনি এই আশংকা যাতে না করেন সে জন্য বলছি শুনুন। বিবাহের আগের দিন কুলদেবতা দর্শনের প্রথা আছে এবং এই উপলক্ষে কন্যাকে পুরের বাইরে অবস্থিত পার্বতীদেবীর মন্দিরে নিয়ে যাওয়া হয়। আপনার চরণপদ্মের আশ্রয়ে নিজের অজ্ঞান-অন্ধকার দূর করার জন্য ত্রিলোচনের মত ব্রহ্মা প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ লোকপালরাও যখন প্রার্থনা করেন তখন আমি যদি সেই প্রসাদে বঞ্চিত হই, তা হলে আমার জীবন-ধারণের আর প্রয়োজন নেই। আমি উপবাস প্রভৃতি কষ্টকর ব্রতানুষ্ঠানে শতবার জীবন পরিত্যাগ করব, তবু আপনার আশা কখনও ছাড়ব না।

ব্রাহ্মণ বললেন, যদুপতি, রুক্মিণীর সমস্ত কথাই আপনাকে জানালাম। এখন বিচার-বিবেচনা করে যা ভাল মনে করেন, তাই করুন। ৩৭-৪৪

ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

রুক্মিণী হরণ

শুকদেব বললেন, মহারাজ, রুক্মিণীর সেই সংবাদ শুনে যদুনন্দন ব্রাহ্মণের হাত নিজের হাতে নিয়ে হেসে বললেন, আমার চিত্তও রুক্মিণীর জন্য এত উৎকণ্ঠিত হয়েছে যে রাত্রে তার জন্য ঘুম হয় না। আমি জানি, রুক্মী আমার বিদ্বেষী। সে-ই আমাদের বিয়ের প্রতিবন্ধকতা করেছে। বাতাস যেমন ইন্ধন-কাঠ প্রভৃতি থেকে আগুনের শিখাকে হরণ করে, আমি সেরকম রাজন্যবেশধারী ক্ষত্রিয়াধমদের যুদ্ধে পরাজিত করে আমার প্রতি অনুরক্তা সেই সর্বাঙ্গসুন্দরী রুক্মিণীকে নিয়ে আসব। হে ভরতনন্দন, পরশু রাত্রে রুক্মিণীর বিয়ে হবে মধুসূদন তা জেনে সারথিকে বললেন, দারুক, তাড়াতাড়ি রথ প্রস্তুত কর। দারুকও শৈব্য, সুগ্রীব, মেঘপুষ্প এবং বলাহক এই চার অশ্বে যোজিত রথ এনে কৃতাঞ্জলিপুটে শ্রীকৃষ্ণের সামনে এসে দাঁড়ালেন। ১-৫

শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণকে নিয়ে রথে আরোহণ করে দ্রুতগামী ঘোড়াগুলির সাহায্যে একরাত্রে আনর্তদেশ থেকে বিদর্ভদেশে পৌঁছলেন। এদিকে সেই কুণ্ডিনাধিপতি

১ ইষ্টাপূর্ত—ইষ্ট=যজ্ঞ, তপস্যা, নিয়ম, অতিথি, জীবসেবা ইত্যাদি বৈদিক কর্মের অনুষ্ঠান। পূর্ত=পুষ্করিণী কূপ খনন, মন্দির-নির্মাণ, অন্নদান ইত্যাদি।

রাজা ভীষ্মক পুত্রস্নেহের বশে শিশুপালকেই কন্যা সম্প্রদান করার জন্য আয়োজন সম্পূর্ণ করালেন। রাজপথ, সাধারণ পথ ও চতুষ্পথগুলি পরিষ্কার করা ও জলে ধোয়া হল। নানা রঙের ধ্বজা, পতাকা ও তোরণে নগরী সুসজ্জিত হল। পুরবাসী স্ত্রী-পুরুষরা মালা, চন্দন ও অলংকার ধারণ করল ও নির্মল বসনে সজ্জিত হয়ে অত্যন্ত শোভা পেতে লাগল। শ্রীমণ্ডিত গৃহগুলি অগুরু-ধূপে সুরভিত হল। রাজা ভীষ্মক বিধিমত পিতৃগণ ও দেবগণকে অর্চনা ও ব্রাহ্মণ-ভোজন করিয়ে কন্যার মঙ্গলবাচন করালেন। ৬-১০

সেই সুদন্তী কন্যাকে স্নান করিয়ে সূত্রবন্ধনাদি মাঙ্গলিক কর্ম অনুষ্ঠান করা হল এবং তাঁকে নতুন বস্ত্র ও উত্তম অলংকার প্রভৃতি দিয়ে সাজান হল। শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণরা ঋক্, সাম ও যজুর্মন্ত্রে রুক্মিণীর রক্ষাবন্ধন করলেন এবং অথর্ববেদজ্ঞ ব্রাহ্মণরা মন্ত্রের প্রয়োগে কন্যার গ্রহদোষ খণ্ডন করলেন। মহাপ্রাজ্ঞ শাস্ত্রদর্শী রাজা ভীষ্মক ব্রাহ্মণদের স্বর্ণ, রৌপ্য, মহামূল্য বস্ত্র, গুড়মিশ্রিত তিল ও ধেনু দান করতে লাগলেন। অনুরূপভাবে চেদিপতি রাজা দমঘোষও মন্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণদের দ্বারা স্বীয় সন্তান শিশুপালের আভ্যুদয়িক কার্য সম্পন্ন করালেন। তারপর শিশুপাল মহামূল্য স্বর্ণমালায় সুসজ্জিত বহু উৎকৃষ্ট হাতী, রথ এবং পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্যে পরিবৃত হয়ে কুণ্ডিন নগরে উপস্থিত হলেন। ১১-১৫

বিদর্ভরাজ ভীষ্মক এগিয়ে তাঁর সম্বর্ধনা করলেন। চেদিপতির জন্য অন্য যে বাসভবন নির্মিত হয়েছিল বিদর্ভাধিপতি তাঁকে সেখানে নিয়ে গেলেন। সেখানে শাল্ব, জরাসন্ধ, দন্তবক্র, বিদূরথ ও পৌণ্ড্রক প্রভৃতি চেদিরাজের পক্ষের হাজার হাজার রাজা সমাগত হলেন। রাম-কৃষ্ণদ্বেষী রাজাদের কামনা ছিল শিশুপাল যেন রুক্মিণীকে লাভ করেন। সেজন্য তাঁরা পরামর্শ করলেন, যদি শ্রীকৃষ্ণ বলরাম প্রভৃতি অন্যান্য যদুদের সঙ্গে এসে কন্যা হরণ করেন, তাহলে তাঁরা একপক্ষ হয়ে তাঁর সংগে যুদ্ধ করবেন। এই স্থির করে সকলে সকল বল ও বাহন নিয়ে সেখানে উপস্থিত ছিলেন। বিপক্ষীয় দলের এই বিরাট উদ্যম এবং শ্রীকৃষ্ণ একাই কন্যাহরণে যাত্রা করেছেন, ভগবান রাম এই সব সংবাদ শুনে অনিবার্য যুদ্ধের আশংকায় ভাইয়ের রক্ষার জন্য হাতী, ঘোড়া, রথ ও পদাতিক সহ বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে কুণ্ডিনের পথে যাত্রা করলেন। ১৬-২১

এদিকে পরমা সুন্দরী ভীষ্মককন্যা রুক্মিণী শ্রীহরির জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে বসেছিলেন। সূর্যোদয় হতে চলল, তবু সেই ব্রাহ্মণ ফিরে না আসায় তিনি চিন্তা করতে লাগলেন, হায়, আমার ভাগ্য নিতান্তই খারাপ। এই রাত্রি শেষ হওয়ার পর কালই তো আমার বিয়ে হয়ে যাবে। কিন্তু কমললোচন শ্রীকৃষ্ণ তো এখনো এলেন না। এর কারণ বুঝতে পারছি না। তাছাড়া সেই সংবাদবাহী ব্রাহ্মণও এ-পর্যন্ত ফিরে এলেন না। আমার মনে হচ্ছে সংবাদ পাবার পর শ্রীকৃষ্ণ আসার উদ্যোগই করছিলেন, কিন্তু পরে আমার কোন রকম দোষ দেখে নির্দোষচিত্ত তিনি আমার পাণিগ্রহণে অসম্মত হয়েই এখানে না আসা স্থির করেছেন। আর সেইজন্য ঐ ব্রাহ্মণেরও ফিরে আসার দেরি হচ্ছে। আমি নিতান্তই ভাগ্যহীনা, সেইহেতু বিশ্ববিধাতা ব্রহ্মা এবং দেবাদিদেব ত্রিলোচনও আমার প্রতিকূল হয়েছেন। কিন্তু হায়, হিমাদ্রিকন্যা পতিপরায়ণা মহেশগৃহিণী গৌরীও কি আমার উপর বিরূপ হয়েছেন? কৃষ্ণগতহৃদয় রুক্মিণী যখন এরকম কাতরভাবে চিন্তা করেছেন সে সময় তাঁর মনে হল যে শ্রীকৃষ্ণের আসার

তখনও উপযুক্ত সময় হয়নি। তিনি তাঁর জলভরা চোখদুটি বুজলেন। এভাবে গোবিন্দের আসার প্রতীক্ষা করতে করতে এক সময়ে রুক্মিণীর বাঁ উরু, বাঁ হাত, বাঁ চোখ কেঁপে উঠে শুভলক্ষণ সূচিত করল। তারপর শ্রীকৃষ্ণপ্রেরিত সেই বার্তাবাহী ব্রাহ্মণ অন্তঃপুরে প্রবেশ করে অন্তঃপুরবাসিনী রাজকন্যা রুক্মিণীর সামনে এলেন। ব্রাহ্মণের প্রফুল্ল মুখমণ্ডল এবং অবিকৃত ভাব দেখে লক্ষণজ্ঞা রুক্মিণী অভীষ্ট সিদ্ধির সম্ভবনায় যৎপরোনাস্তি খুশি হলেন এবং হাসিমুখে ব্রাহ্মণকে সংবাদ জিজ্ঞাসা করলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এসে পড়েছেন এবং তিনি যে সত্য করেছেন তাও ব্রাহ্মণ বললেন। শ্রীকৃষ্ণ এসেছেন এই জেনেই বিদর্ভনন্দিনী আনন্দিত হলেন এবং হাতের কাছে ভাল কিছু না পেয়ে ব্রাহ্মণকে শুধুই প্রণাম করলেন; পরে অবশ্য তিনি ব্রাহ্মণকে অনেক ধনসম্পত্তি দান করেছিলেন। ২২-৩১

বিদর্ভরাজ যখন শুনলেন যে তাঁর মেয়ের বিবাহ দেখতে আগ্রহী হয়ে রাম-কৃষ্ণ এসেছেন। তখন তিনি সানন্দে পূজার উপকরণ নিয়ে তূর্যধ্বনির সঙ্গে তাঁদের অভ্যর্থনা করতে এগিয়ে গেলেন। মধুপর্ক, শুদ্ধ বস্ত্র, ও অভীষ্ট উপহার-দ্রব্যাদি দান করে তিনি বিধিমতে তাঁদের পূজো করলেন। মহামতি রাজা সৈন্য ও অনুচরদের সঙ্গে সমাগত দুই যদুবীরের বাসস্থান ঠিক করে দিয়ে উপযুক্ত আতিথ্যের ব্যবস্থা করলেন। স্বয়ম্বর-সভা উপলক্ষে উপস্থিত অন্যান্য রাজাদেরও বল, বীর্য, বয়স ও সম্পত্তি অনুসারে যথাযোগ্য দ্রব্যাদি উপহার দিয়ে তিনি এভাবে সম্মান দেখালেন। শ্রীকৃষ্ণ এসেছেন শুনে বিদর্ভবাসীরা সবাই চারদিক থেকে সেখানে এলেন এবং চক্ষুরূপ অঞ্জলি পেতে তাঁর মুখপদ্মের অপূর্ব লাবণ্যসুধা আকণ্ঠ পান করতে লাগলেন। সকলেই বলাবলি করতে লাগলেন, রুক্মিণীই এঁর উপযুক্ত পত্নী এবং সর্বাঙ্গসুন্দর ও সর্বদোষশূন্য শ্রীকৃষ্ণই রাজকন্যার একমাত্র পাত্র হবার যোগ্য। যদি আমরা পূর্বজন্মে কিছু পুণ্য সঞ্চয় করে থাকি তবে তার ফলে ত্রিলোক-কর্তা ভগবান নারায়ণ যেন প্রসন্ন হয়ে আজ বিদর্ভ রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করেন। পুরবাসীরা যখন পরস্পর এসব কথা বলছিলেন তখন রাজকুমারী রুক্মিণী রাজসৈন্য পরিবৃত হয়ে অন্তঃপুর থেকে বেরিয়ে অম্বিকাদেবীর মন্দিরের দিকে যাত্রা করলেন। ৩২-৩৯

রুক্মিণীদেবী বর্মাচ্ছাদিত, উদ্যত-অস্ত্রধারী বীর সৈনিকদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে সখীদের সংগে সম্পূর্ণ মৌনভাবে মুকুন্দের চরণপদ্ম ধ্যান করতে করতে ভবানীর মন্দিরের উদ্দেশ্যে অন্তঃপুর থেকে বার হলেন। তাঁর সংগে মাতৃতুল্যা পরিচারিকারাও যাচ্ছিলেন। এমনি সময় মৃদঙ্গ, শংখ, তুরী ও ভেরীগুলি বেজে উঠল। তখন নানা উপহার নিয়ে সহস্র সহস্র বারবনিতা, মালা, বস্ত্র, অলংকার ও সুগন্ধে ভূষিতা ব্রাহ্মণপত্নীরা, গায়ক, বাদক, সূত, মাগধ ও বন্দীরা চারদিকে দলবদ্ধ হয়ে তাঁর সংগে চলতে লাগল। রাজকন্যা দেবগৃহে উপস্থিত হয়ে হাত-পা ধুয়ে ও আচমন করে পবিত্র ও শান্ত হয়ে দেবীর কাছে গেলেন। অভিজ্ঞা এক ব্রাহ্মণপত্নী রাজকুমারীকে দিয়ে মহাকাল-সহিতা ভবপত্নী ভবানীর বন্দনা করলেন। রাজকুমারী বললেন, হে মংগলময়ী অম্বিকা, গণেশ প্রভৃতি সন্তান-পরিবৃত আপনাকে প্রণাম করি। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যেন আমার প্রতি প্রসন্ন হন, আপনি অনুমোদন করুন। তারপর তিনি জল, চন্দন, আতপ চাল, ধূপ, বস্ত্র, মালা, ভূষণ ও দীপশিখা দিয়ে জগদম্বার পূজো করলেন। সধবা ব্রাহ্মণপত্নীরাও তাঁর সংগে লবণ, ধূপ, তাম্বুল, কণ্ঠসূত্র, ফল ও ইক্ষু দিয়ে অম্বিকার পূজো করলেন। এর পরে সেই ব্রাহ্মণপত্নীরা রুক্মিণীকে নির্মাল্য দিয়ে আশীর্বাদ করলেন। রাজকন্যা তাঁদের

ও দেবীকে প্রণাম করলেন এবং আশীর্বাদ গ্রহণ করে মৌনভাব ত্যাগ করে রত্নাঙ্গুরীয় শোভিত হাতে দাসীকে ধরে অম্বিকার মন্দির থেকে বার হলেন। ৪০-৫০

কুণ্ডলভূষিতা, সুমধ্যমা, দেবমায়ার মত অপূর্ব লাবণ্যময়ী রুক্মিণীকে দেখে বীরদেরও মোহ জন্মায়। রুক্মিণী অজাতরজস্কা[১] কুমারী। তাঁর নিতম্বদেশে রত্নময় চন্দ্রহার বিন্যস্ত, বক্ষে নবোদ্গত স্তনচিহ্নের আভাস, অবাধ্য কেশদামের তাড়নায় চক্ষু দু'টি ভীত চঞ্চল। তাঁর নির্মল হাসি ও বিম্বফলের মত ঈষৎ রক্তাভ ওষ্ঠাধরের জ্যোতিতে এবং বিকশিত কুন্দফুলের মত দন্তরাজিতে তাঁকে অপূর্ব দেখাচ্ছিল। শিঞ্জিত নূপুরে শোভিত চরণে তিনি কলহংসের মত মৃদুমন্দ গতিতে চলছিলেন। তাঁকে দেখে সমাগত মহাবীর মহীপতিরা সকলেই কামের তাড়নায় নিতান্ত কাতর হয়েছিলেন। অশ্ব, রথ ও হস্তীতে আরূঢ় রাজারা তাঁর উদাস হাসি এবং সলজ্জ দৃষ্টিপাতে মোহিত এবং হৃতচিত্ত হয়ে অস্ত্র-সস্ত্র ফেলে তাঁকে চোখ ভরে দেখতে লাগলেন এবং মূর্ছিতের মতই মাটিতে পড়ে যেতে লাগলেন। এইভাবে চরণপদ্মের বিন্যাসে যেতে যেতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেখানে এসেছেন কিনা শুধু তাই দেখবার জন্য রুক্মিণী নিজের বাঁ হাতের আঙুল দিয়ে কেশরাশি সরিয়ে সলজ্জ কটাক্ষপাতে উপস্থিত নরপতিদের দেখলেন এবং অচ্যুতকেও দেখতে পেলেন। মহারাজ, রাজকন্যা যখন নিজের রথে উঠেছিলেন ঠিক সেই সময় শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে উপস্থিত রাজাদের সামনেই হরণ করলেন। শৃগালদের মধ্য থেকে সিংহের মতই তিনি তাঁদের মাঝখান থেকে নিজের অংশ রুক্মিণীকে হরণ করে গরুড়ধ্বজ রথে তুললেন এবং ক্ষত্রিয়-চক্র ভেদ করে বলরাম-চালিত যদুসৈন্যে পরিবৃত হয়ে নির্ভয়ে সেখান থেকে বের হয়ে গেলেন। জরাসন্ধ প্রভৃতি অভিমানী শত্রুরা নিজেদের পরাজয় ও যশক্ষয় সহ্য করতে না পেরে আক্রোশে বলতে লাগলেন, আমাদের মত বীরপুরুষদের যশে ধিক্। সিংহের ভাগ যেমন মৃগরা এসে হরণ করে, আজ সেরকম ধনুর্ধারী গোপরা এসে আমাদের যশ হরণ করে নির্বিবাদে চলে গেল। ৫১-৫৭

চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

রুক্মিণী-শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ

শুকদেব বললেন, শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীকে হরণ করে চলে গেলে জরাসন্ধ প্রভৃতি রাজারা নিজেদের শৌর্যকে ধিক্কার দিলেন ও ক্রোধে আগুন হয়ে উঠলেন। তাঁরা বর্মাবৃত হয়ে শরাসন হাতে নিজ নিজ সৈন্য-সামন্ত সহ সকলেই শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য দ্রুত তাঁর উদ্দেশ্যে চললেন। বিপক্ষীয় সৈন্যদের তাঁদের দিকে আসতে দেখে যাদব-সেনাপতিরা নিজের নিজের ধনুকে টঙ্কার-ধ্বনি করে শত্রুপক্ষের দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন। মেঘ যেমন অবিশ্রান্ত বৃষ্টিপাতেও পর্বতের কোন ক্ষতি করতে পারে না, সেরকম জরাসন্ধ প্রভৃতিরা অবিশ্রান্ত বাণবর্ষণ করেও যাদবদের বিশেষ কোন অনিষ্ট করতে পারলেন না। যাদবসৈন্যরা বিপক্ষের বাণজালে এরকম আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে দেখে কোমলহৃদয়া রুক্মিণী ভয়বিহ্বল চোখে তাঁর স্বামী শ্রীকৃষ্ণের দিকে তাকালেন। তা দেখে শ্রীকৃষ্ণ একটু হেসে তাঁকে বললেন, সুলোচনা, তোমার ভয় নেই। যাদবসৈন্যরা অতি অল্প দিনের মধ্যেই বিপক্ষের শক্তি ধ্বংস করতে সমর্থ

১ যার তখনও পর্যন্ত রজোদর্শন হয়নি।

হবে। গদ ও সংকর্ষণ প্রভৃতি বীরেরা শত্রুদের সেই ধৃষ্টতায় বিরক্ত হয়ে ধারালো বাণবর্ষণ করে তাদের হাতী, ঘোড়া ও রথগুলি বিনষ্ট করতে লাগলেন। তাতে রথারোহী; অশ্বারোহী ও গজারোহী যোদ্ধাদের কুণ্ডল, কিরীট ও উষ্ণীষশোভিত মস্তকগুলি এবং তরোয়াল, গদা ও ধনুক সহ হাত, ঊরু ও পা'গুলি ছিন্ন হয়ে মাটিতে পড়তে লাগল। ১-৮

যাদবসৈন্যদের হাতে নিজেদের সৈন্যসামন্ত নিহত হচ্ছে দেখে জরাসন্ধ প্রভৃতি রাজারা যুদ্ধে বিমুখ হয়ে পালিয়ে গেল। নিজের বিবাহিত স্ত্রীকে অপরে হরণ করে নিলে যেরকম হয় সেরকম বিষণ্ণ, ম্লানমুখ, নিষ্প্রভ ও উৎসাহশূন্য শিশুপালের কাছে গিয়ে তাঁরা তাকে প্রবোধ দিয়ে বললেন, পুরুষশ্রেষ্ঠ, এ ব্যাপারে তোমার এ রকম উৎকণ্ঠিত হবার কোন কারণ নেই। তুমি মনের ক্ষোভ ত্যাগ কর। জাগতিক সুখ বা দুঃখের সঙ্গে দেহধারী জীবের কখনো কোন স্থির সম্বন্ধ আরোপ করা ঠিক নয়। যে রকম সুতো-ধরা বাজিকরের উপরই কাঠের পুতুলের নাচ ও অভিনয়াদি নির্ভর করে, তেমিন দেহীও ঈশ্বরের অধীন হয়ে সুখ-দুঃখের মধ্যে বিচরণ করে থাকে।[১] এই সামান্য পরাজয়ে তোমার আর কি বিশেষ অপমান হয়েছে? জরাসন্ধ বললেন, আমি তেইশ অক্ষৌহিণী[২] সেনায় পরিবৃত হয়েও সতের বার শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধে পরাস্ত হয়েছিলাম, শুধু শেষ একবার মাত্র জয়লাভ করেছি। তবু আমি কখনো শোক বা আনন্দ করি না। কেন না আমি জানি এই জগৎ অদৃষ্ট চালিত কালের বশবর্তী। এই দেখ না আমাদের মত বীর চূড়ামণিরা সামান্য সংখ্যক কৃষ্ণপালিত সৈন্য দ্বারা পরাজিত হলাম। এখন কাল শত্রুদের অনুকূলে, তাই তারা জয়ী হল, আবার যখন কাল আমাদের অনুকূলে হবে তখন আমরাও জয়ী হব। মিত্রগণ শিশুপালকে এভাবে প্রবোধ দিলে তিনি অনুচরদের নিয়ে নিজ পুরে প্রস্থান করলেন এবং অন্যান্য রাজারাও নিজ নিজ রাজ্যে ফিরে গেলেন। ৯-১৭

শ্রীকৃষ্ণদ্বেষী বলবান রুক্মী নিজের বোনের রাক্ষসবিধিতে বিবাহ সহ্য করতে না পেরে এক অক্ষৌহিণী সেনায় পরিবৃত হয়ে যুদ্ধ করার জন্য শ্রীকৃষ্ণের অনুসরণ করল। দারুণ ক্রোধে সে বর্ম প্রভৃতিতে সজ্জিত হয়ে, তীর-ধনুক নিয়ে সমস্ত রাজাদের সামনেই প্রতিজ্ঞা করে বলল, বীরগণ, আপনারা শুনুন, আমি আজ কৃষ্ণকে বিনাশ না করে এবং রুক্মিণীকে উদ্ধার না করে কুণ্ডিনপুরে ফিরে যাব না। আমার এই বাক্যের অন্যথা হবে না। এই বলে রথে উঠে সে তাড়াতাড়ি সারথিকে বলল, কৃষ্ণ যে দিকে গেছে সে দিকে রথ চালাও, কারণ তার সঙ্গে আজ আমার যুদ্ধ হবে। দুর্মতি গোপাল যে শক্তির দর্পে আমার বোনকে হরণ করেছে আজ এই তীক্ষ্ণবাণ দিয়ে সেই দর্পের সমুচিত দণ্ড দেব। মহারাজ পরীক্ষিৎ, দুর্মতি রুক্মী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, তাই সে এরকম প্রগল্ভতা প্রকাশ করতে করতে একাই রথ নিয়ে গোবিন্দকে আহ্বান করল, যুদ্ধের জন্য দাঁড়াও, পালিয়ে যেও না। এই বলে সে ধনুকে জ্যা আরোপ করে তিনটি বাণে শ্রীকৃষ্ণকে বিদ্ধ করল এবং আস্ফালন করে বলতে লাগল, ওরে যদুকুল-কলংক, আরেকটু অপেক্ষা কর। কাক যেমন যজ্ঞের হবি হরণ করে, তুই সেরকম আমার বোনকে হরণ করে

১ তুলনীয়: হে অর্জুন, ঈশ্বর সর্বজীবের অন্তরে থেকে নিজের মায়াদ্বারা যন্ত্রারূঢ় পুত্তলিকার ন্যায় তাদের ভ্রমণ করাচ্ছেন। —গীতা, ১৮।৬১

২ অক্ষৌহিণী—১০৯৩৫০ পদাতি, ৬৫৬১০ অশ্ব, ২১৮৭০ হস্তী, ২১৮৭০ রথ, মোট ২১৮৭০০ চতুরঙ্গ-সেনাবিশিষ্ট বাহিনী।

কোথায় পালাচ্ছিস ? তোর কপট যুদ্ধ ও মায়ায় কোন ফল হবে না। আজ তোর সর্বস্ব হরণ করব। আমার ধারালো বাণে আহত হয়ে ধরাশায়ী হবার আগেই রুক্মিণীকে ফিরিয়ে দে। রুক্মীর এরকম কটুবাক্য শুনে শ্রীকৃষ্ণ হেসে তাঁর তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা তার ধনুক কেটে ফেললেন এবং আরো ছয় বাণে রুক্মীকে, আট-বাণে তার চারটি ঘোড়াকে, তিন বাণে রথের ধ্বজ ও দুই বাণে সারথিকে বিদ্ধ করলেন। তখন রুক্মী অন্য ধনুক নিয়ে পাঁচবাণে শ্রীকৃষ্ণকে বিদ্ধ করল। ভগবান অচ্যুত আবার তার ধনুকের ছিলা কেটে ফেললেন। রুক্মী নতুন ধনুক হাতে নিতেই শ্রীকৃষ্ণ তাও অকর্মণ্য করে ফেললেন। তারপর পরিঘ, পট্টিশ, শূল, চর্ম, অসি, শক্তি ও তোমর প্রভৃতি যে যে অস্ত্র রুক্মী গ্রহণ করল ভগবান শ্রীহরি একে একে সে সমস্তই কাটলেন। ভীষ্মকনন্দন রুক্মী তখন ক্রোধে কাঁপতে কাঁপতে, পতঙ্গ যেমন আগুনের দিকে ছুটে যায়, সেভাবে খড়্গ হাতে শ্রীকৃষ্ণের দিকে ছুটে গেল। রুক্মীকে ছুটে আসতে দেখে শ্রীকৃষ্ণ তীক্ষ্ণ বাণের আঘাতে তার খড়্গ ও চর্মকে তিল তিল অংশে ছিন্ন করলেন এবং তাকে বিনাশ করার জন্য ধারালো এক খড়্গ তুললেন। ভ্রাতৃবধের উপক্রম দেখে পতিব্রতা রুক্মিণী ভয়ে কাতর হয়ে ভাইয়ের প্রাণরক্ষার জন্য স্বামীর চরণে লুটিয়ে পড়ে করুণস্বরে বলতে লাগলেন, মঙ্গলময়, যোগেশ্বর, অপ্রমেয়, দেবদেব, জগৎপতি, মহাবাহু, আমার ভাইকে বধ করবেন না। ১৮-৩৩

শুকদেব বললেন, মহারাজ, ভ্রাতৃবধের উপক্রম দেখে ভয়ে রুক্মিণীর দেহ কাঁপতে লাগল। শোকে তাঁর মুখ মলিন ও কণ্ঠ রুদ্ধ হতে লাগল, গলা থেকে সোনার হার খসে পড়ল। এই অবস্থায় তিনি কাঁদতে কাঁদতে চরণযুগল আশ্রয় করায় শ্রীকৃষ্ণ রুক্মীবধ থেকে নিবৃত্ত হলেন। বাসুদেব সেই রুক্মীকে ধরে তারই বস্ত্র দিয়ে তাকে বাঁধলেন এবং জায়গা বিশেষে চুল-দাড়ি কামিয়ে তার রূপ বিকৃত করে দিলেন। রুক্মীর সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের যতক্ষণ যুদ্ধ হচ্ছিল ততক্ষণে হস্তীসর্দার যেমন পদ্মবন দলিত করে, সেভাবে যাদব-বীরেরা রুক্মীপক্ষীয় সৈন্যদলকে বিধ্বস্ত করছিলেন। তারপর তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের কাছে এসে হস্তপদ বদ্ধ অবস্থায় মৃতপ্রায় রুক্মীকে দেখলেন। দয়ার্দ্র ভগবান বলরাম এই অবস্থা দেখে তার বন্ধন খুলে দিয়ে শ্রীকৃষ্ণকে বললেন, কৃষ্ণ, চুলদাড়ি কামিয়ে একে এরকম বিকৃতরূপ করা আমাদের পক্ষে খুবই অন্যায় হয়েছে, কেননা বন্ধুজনকে বিকৃত করা তাকে বধ করারই তুল্য। রুক্মিণীকে সান্ত্বনা দিয়ে বলরাম বললেন, সাধ্বী, তুমিও এ-ব্যাপারে আমাদের উপরই শুধু দোষ দিও না। কারণ মানুষ এই দেহে যে সুখ বা দুঃখ অনুভব করে তা সবই পূর্বজন্মের সঞ্চিত কর্মফল বলে জানতে হবে। অন্য কাউকে সুখ বা দুঃখদাতা বলে মনে করো না। তারপর শ্রীকৃষ্ণকে বললেন, কৃষ্ণ, বন্ধু যদি কখনও বধযোগ্য অপরাধও করে তা হলেও বন্ধু চিরকালই মার্জনীয়। তাকে বধ করা নয়, ত্যাগ করাই বিধেয়। কারণ যে নিজের অপরাধে আপনিই মৃততুল্য তাকে কি আবার বধ করা উচিত ? বলরাম আবার রুক্মিণীকে বললেন, রুক্মিণী, ক্ষত্রিয়ধর্মই এই। প্রয়োজনে নিজের ভাইকে বধ করতেও তাদের কুণ্ঠা হয় না। প্রজাপতিই (ব্রহ্মা) স্বয়ং ক্ষত্রিয়দের জন্য এই ভয়াবহ ধর্মের বিধান দিয়েছেন। তাই ধর্ম আচরণ করায় আমাদের কোন অপরাধ নেই। ৩৪-৪০

তারপর বলরাম আবার শ্রীকৃষ্ণকে বললেন, আমাদের এই আচরণ নিতান্ত দেহাভি-মানীর ন্যায় কি হচ্ছে না ? কারণ যারা ঐশ্বর্যমদে অন্ধ, তারাই রাজত্ব, ভূমি, ধন, স্ত্রী, মান, তেজ বা অন্য কোনও বস্তুর জন্য মানী ব্যক্তির অপমান করে থাকে। তিনি রুক্মিণীকে আবার বললেন, তোমার যে সব ভাইয়েরা সব সময় সকল জীবের

অনিষ্ট করে থাকে, তুমি অজ্ঞের মত তাদের মঙ্গলকামনা করছ। তোমার এবুদ্ধি ঠিক নয়, কেননা এতে তাদের অমঙ্গলই হচ্ছে। যারা দেহকেই আত্মা মনে করে সেসব মানুষ কাউকে শত্রু, কাউকে মিত্র, কাউকে উদাসীন রূপে চিন্তা করে।[১] এই আত্মমোহ ভগবানের মায়ায় জন্মায়। সমস্ত জীবের অন্তরে আত্মারূপে যিনি নিত্য বিরাজ করছেন তিনি অখণ্ড, শুদ্ধ, পরমপুরুষ, পরমাত্মা। কিন্তু জলে চন্দ্র ও ঘটে আকাশের প্রতিবিম্বের মত তাঁকে দেহী বিভিন্ন বলে গ্রহণ করে থাকে।[২] দেহ পঞ্চমহাভূত, মন সহ একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ তন্মাত্রের সমবায়ে উৎপন্ন হয় এবং কালক্রমে এই সমস্ত তত্ত্বের বিশ্লেষে ধ্বংস হয়ে যায়। কিন্তু এই দেহকে উপাধিরূপে অবলম্বন করায় দেহাতীত জীবও দেহধর্মে আত্মভাব প্রকাশ করে সংসারে মোহিত হন। আত্মস্বরূপে অবস্থিত অজ্ঞানই সমস্ত অনিষ্টের মূল। সাধ্বী, অনিত্য ও ক্ষণধ্বংসী এই দেহের সঙ্গে জীবের আত্মার প্রকৃত কোন সম্বন্ধ নেই। তাই এর সঙ্গে আত্মার যোগ বা বিচ্ছেদও ঘটে না। আত্মাই এর কারণ ও উপদ্রষ্টা।[৩] যেমন সূর্য থেকে চোখ ও রূপ দুয়েরই প্রকাশ হয় সে রকম আত্মা থেকে অধিভূতাদির প্রকাশ হয়ে থাকে। জন্ম প্রভৃতি দেহেরই বিকার, আত্মার নয়। চাঁদের যেমন নিজের জন্ম নেই, তার কলারই ঐ সব আছে, সেরকম আত্মার জন্ম নেই, দেহেরই আছে।[৪] চাঁদের কলার ক্ষয়স্বরূপ অমাবস্যাকে যেমন চন্দ্রক্ষয় বা চন্দ্রের বিনাশ বলে, সেরকম দেহের মৃত্যুকেই লোক জীবাত্মার মৃত্যু বলে।[৫] ঘুমের মধ্যে ঘুমন্ত ব্যক্তি স্বপ্নের প্রভাবে ভোগ্য, ভোগ ও নিজেকে ভোক্তারূপে অনুভব করে। তেমনি অবিবেকী পুরুষ শুধু মায়ার প্রভাবে মিথ্যা বস্তুতেও একান্ত হয়ে সংসারে বদ্ধ হয়ে থাকে। অজ্ঞানোৎপন্ন শোকে জীবের চিত্ত সংকুচিত ও বিমোহিত হয়ে পড়ে। শুচিস্মিতা, তুমি আত্মজ্ঞানের দ্বারা সেই অজ্ঞানজনিত শোক দূর করে স্বস্থ হও। ৪১-৪৯

শুকদেব বললেন, মহারাজ, তন্বী রুক্মিণী ভগবান বলরামের কাছ থেকে এরকম সান্ত্বনাবাক্য শুনে মনের দুঃখ ত্যাগ করে বিবেকবুদ্ধি দিয়ে মনস্থির করলেন। এদিকে রুক্মীর বল ও প্রভাব শত্রুর হাতে নষ্ট হয়ে শুধু প্রাণ অবশিষ্ট রইল, তার মনোরথ পূর্ণ হল না। সে এই অবস্থায় পরিত্যক্ত হয়ে এবং নিজের বিকৃত রূপের কথা চিন্তা করে ভোজকট নামে এক নগর তৈরী করল তার নিজের বাসের জন্য। 'শ্রীকৃষ্ণকে নিহত না করে আর রুক্মিণীকে ফিরিয়ে না নিয়ে কুণ্ডিনপুরে ফিরব না' বলে ক্রোধে যে প্রতিজ্ঞা সে করেছিল এখন সে প্রতিজ্ঞা স্মরণ করে পরাজয়-স্থান ভোজকট নগরে বাস করতে লাগল। আর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রাজাদের যুদ্ধে পরাজিত করে ভীষ্মকনন্দিনী রুক্মিণীকে দ্বারকায় আনলেন এবং যথাবিধি তাঁর পাণিগ্রহণ করলেন। তখন যদুপতি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রীতিযুক্ত পুরবাসীরা এই বিবাহ উপলক্ষে ঘরে ঘরে আনন্দোৎসবে মেতে উঠল। সমস্ত নরনারীরা উজ্জ্বল মণিময় কুণ্ডল ধারণ করে বরবধূকে উপহার দেবার জন্য নানারকম উপকরণ-সামগ্রী আনতে লাগলেন। যদুদের সেই নগরী অপূর্ব শোভা ধারণ করেছিল। নানারকম ধ্বজ, পতাকা, মালা, বস্ত্র ও রত্নতোরণে নগরী সুসজ্জিত

১ তুলনীয়: গীতা, ৬।৯ শ্লোক। ২ এ-প্রসঙ্গে গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ১৪শ থেকে ১৬শ শ্লোক দ্রষ্টব্য। ৩ তুলনীয়: গীতা ১৩।২২ শ্লোক। ৪ তুলনীয়: ন জায়তে ম্রিয়তে অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ম্।—গীতা ২।২০ ৫ প্রমাণের অতীত, সর্বদা একরূপ, অবিনাশী এই আত্মা যে সকল বিভিন্ন দেহ ধারণ করে বিদ্যমান আছে, সেই দেহগুলিই বিনাশশীল; কিন্তু সকল দেহে অবস্থিত এই আত্মার বিনাশ নেই। —গীতা, ২।১৮

হল। প্রত্যেক ঘরের দরজা অগুরু-চন্দন লিপ্ত এবং ধূপ-দীপে শোভিত জলপূর্ণ কুম্ভগুলিও দূর্বা, ফুল, পল্লব প্রভৃতি মাঙ্গলিক চিহ্নযুক্ত হয়ে অপূর্ব শোভা ধারণ করল। নিমন্ত্রিত রাজাদের মদস্রাবী হস্তীদের মদক্ষরণ দ্বারা নগরের পথগুলি সিক্ত হতে লাগল। প্রতিটি ঘরের দরজায় কলাগাছ ও সুপারিগাছ শোভা পেতে লাগল। কুরু, সৃঞ্জয়, কৈকেয়, বিদর্ভ, যদু ও কুন্তীবংশীয় বন্ধুবর্গ মহানন্দে ইতস্তত রাজপথে বিচরণ করতে করতে উৎসব-স্থানের দিকে অগ্রসর হল। রুক্মিণী-হরণ বার্তাসহ শ্রীকৃষ্ণের বীর্যবত্তার কীর্তন হতে লাগল। তা শুনে রাজা ও রাজকন্যারা খুবই আনন্দিত ও চমৎকৃত হলেন। মহারাজ, লক্ষ্মীস্বরূপা রুক্মিণীসহ স্বামী শ্রীকৃষ্ণকে এক আসনে অধিষ্ঠিত দেখে দ্বারকাবাসী সকলেই পরম তৃপ্তি ও আনন্দ পেল। ৫০-৬০

পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

প্রদ্যুম্নের জন্ম ও শম্বরাসুর বধ

শুকদেব বললেন, মহারাজ, বাসুদেবের অংশ কামদেব আগে রুদ্রের ক্রোধে দগ্ধ হয়েছিলেন। তিনি আবার দেহলাভের জন্য বাসুদেবকেই আশ্রয় করলেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণবীর্যে বিদর্ভনন্দিনী রুক্মিণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করে কামদেব প্রদ্যুম্ন নামে অভিহিত হলেন এবং সমস্ত গুণে পিতার তুল্য হলেন। কামরূপী শম্বর-দৈত্য জানত যে প্রদ্যুম্ন তার শত্রু। তাই প্রদ্যুম্নের দশদিন বয়স অতিক্রম না হতেই সে শিশুটিকে অপহরণ করে সমুদ্রের জলে নিক্ষেপ করে নিজের ঘরে চলে গেল। সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হওয়া মাত্র বিরাট এক মাছ ঐ শিশুকে গিলে ফেলল। সেই মাছ অন্যান্য মাছের সঙ্গে মৎস্যজীবী জেলেদের জালে আটকে পড়ল। জেলেরা ঐ বড় মাছটি শম্বরকে উপহার দিল। পাচকরা ঐ মাছটিকে রন্ধনশালায় নিয়ে কেটে ফেলল এবং তার পেটে ঐ শিশুকে পেয়ে মায়াবতী নামে এক নারীকে দিল। বালকটিকে নিয়ে মায়াবতী যখন বিস্মিত হয়ে চিন্তা করছিলেন তখন দেবর্ষি নারদ সেখানে উপস্থিত হয়ে বালকের পূর্ব বৃত্তান্ত বর্ণনা করলেন। রুদ্রের কোপানলে ভস্মীভূত কামের আবার দেহপ্রাপ্তির প্রতীক্ষায় কামপত্নী রতিদেবী এতকাল মায়াবতী নাম নিয়ে শম্বরের গৃহে রান্নার কাজে নিযুক্ত ছিলেন। এখন ঐ শিশুই কামদেব একথা জেনে তিনি তাকে যথেষ্ট স্নেহ ও যত্ন করতে লাগলেন। অল্পদিনের মধ্যেই শ্রীকৃষ্ণনন্দন প্রদ্যুম্ন যৌবনে পদার্পণ করলেন এবং নিজের রূপলাবণ্যে সকল যুবতীর মন হরণ করতে লাগলেন। পদ্মপলাশের মত আয়ত চোখ আজানুলম্বিত বাহু, নরলোকদুর্লভ প্রাপ্তযৌবন প্রদ্যুম্নের মধ্যে নিজের স্বামী কামদেবকে দেখে মায়াবতী একদিন আর স্থির থাকতে পারলেন না। সলজ্জ মৃদুমন্দ হাসি ও উল্লসিত ভ্রূযুগলের কুঞ্চনে কটাক্ষ হেনে প্রেম নিবেদন করতে প্রদ্যুম্নের কাছে এগিয়ে গেলেন। প্রদ্যুম্ন মায়াবতীকে বললেন, মা, আজ আমার প্রতি তোমার অন্য মতি দেখছি। তুমি মাতৃভাব ত্যাগ করে কামিনীর মত ব্যবহার করছ। ১-১১

মায়াবতীরূপী রতি বললেন, আপনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পুত্র। শম্বর আপনাকে সূতিকা-গৃহ থেকে হরণ করেছিল। প্রভু, আমি আপনার পত্নী রতি, আপনি

সাক্ষাৎ কামদেব। আপনার বয়স দশদিন না হতেই এই শম্বরাসুর আপনাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করেছিল। তারপর এক মাছ আপনাকে গিলে ফেলে, ঐ মাছের পেটে আপনাকে পেয়েছি। এই দুর্ধর্ষ, দুর্জয় অসুর নানারকম মায়া জানে। প্রভু, নিজের মোহন মায়াশক্তির বিস্তার করে আপনার নিজের পরমশত্রু এই শম্বরাসুরকে অবিলম্বে বিনাশ করুন। হায়, আপনার মা পুত্রশোকে কাতর হয়ে বৎসহীনা গাভীর মত কাতর হয়ে কাঁদছেন। মায়াবতী একথা বলে মহাত্মা প্রদ্যুম্নকে সবরকম মায়াবিনাশিনী মহামায়া দান করলেন। প্রদ্যুম্ন শম্বরাসুরের কাছে উপস্থিত হয়ে কটু বাক্যে তাকে তিরস্কার করতে লাগলেন এবং কলহের সৃষ্টি করে যুদ্ধে আহ্বান করলেন। তিরস্কৃত হয়ে পদাহত সাপের মত ক্রোধে শম্বরের চোখ তাম্রবর্ণ ধারণ করল। সে গদাহাতে বাইরে এসে সবলে গদা ঘুরিয়ে প্রদ্যুম্নের দিকে নিক্ষেপ করল। তাতে বজ্রধ্বনির মত ভীষণ শব্দ হল। গদা যখন প্রদ্যুম্নের দিকে আসছিল তখন তিনি নিজের গদা দিয়ে সেই গদা নিবারণ করলেন। তারপর ক্রোধে শত্রুর দিকে নিজের গদা ছুঁড়ে দিলেন। সেই অসুরও ময়দানব প্রদর্শিত আসুরী মায়া আশ্রয় করে আকাশে উঠে শ্রীকৃষ্ণতনয়ের দিকে পাথর ছুঁড়তে লাগল। ১২-২১

রুক্মিণীনন্দন মহারথ প্রদ্যুম্ন পাথর প্রভৃতির আঘাতে পীড়িত হয়েও সর্বমায়া-বিনাশিনী সত্ত্বগুণময়ী মহাবিদ্যা প্রয়োগ করলেন। তখন সেই দৈত্য গুহ্যক, গন্ধর্ব, পিশাচ, সাপ ও রাক্ষস সম্বন্ধীয় নানারকম মায়ার প্রয়োগে প্রদ্যুম্নকে পরাস্ত করার চেষ্টা করল, কিন্তু তিনি তার সব মায়াকেই বিনাশ করলেন। শেষে তিনি ধারালো খড়্গে কিরীট ও কুণ্ডলশোভিত শম্বরের তাম্রবর্ণ শ্মশ্রুবিশিষ্ট মাথা দেহ থেকে ছিন্ন করে মাটিতে ফেলে দিলেন। দেবতারা তাঁর উপর পুষ্প বর্ষণ করে স্তব করতে লাগলেন। বিদ্যুতের সঙ্গে মেঘের মত অকস্মাৎ মায়াবতী পত্নীর সঙ্গে প্রদ্যুম্ন শত ললনাসঙ্কুল দ্বারকার অন্তঃপুরে প্রবেশ করলেন। ঘনমেঘের মত শ্যামবর্ণ, পীত-কৌষেয় বস্ত্র পরিহিত, বিলম্বিত বাহু, তাম্রবর্ণ নয়ন, সুন্দর হাসি, কুঞ্চিত অলকদাম শোভিত নীলবর্ণ মুখপদ্মে মনোহর প্রদ্যুম্নকে দূরে থেকে দেখে নারীরা তাঁকে শ্রীকৃষ্ণ মনে করে লজ্জিত হয়ে এদিক ওদিক লুকিয়ে পড়তে লাগলেন। ক্রমে ক্রমে চেহারায় কিছু বৈসাদৃশ্য লক্ষ করে, ইনি কৃষ্ণ নন তা বুঝতে পেরে তাঁরা বিস্মিত হলেন এবং সঙ্গের সেই অদ্ভুত স্ত্রীরত্ন দর্শনে আশ্চর্যান্বিত হয়ে কাছে আসতে লাগলেন। ২২-২৯

তারপর মধুরভাষিণী সুনীললোচনা বিদর্ভনন্দিনী রুক্মিণীদেবী সেখানে এসে নিজের অপহৃত পুত্রকে স্মরণ করলেন। স্নেহে তাঁর পয়োধর থেকে দুধ ক্ষরণ হতে লাগল। তিনি ভাবলেন, এই পুরুষশ্রেষ্ঠ কমললোচন কে? কোন কামিনী এঁকে গর্ভে ধারণ করেছেন? এঁর সঙ্গে এই রমণীরত্নটিই বা কে? সূতিকাগৃহ থেকে আমার যে পুত্র অপহৃত হয়েছে সে যদি কোথাও জীবিত থাকে তাহলে আজ সে বয়স ও রূপে এঁর মতন হবে। কি আশ্চর্য! আকৃতি, অংগ-প্রত্যংগ, গতি, স্বর, হাসি, দৃষ্টিপাত এর সব কিছুই যে শ্রীকৃষ্ণের অনুরূপ! এঁকে দেখে আমার গর্ভজাত শিশুকে সম্পূর্ণ স্মরণ হচ্ছে। বিশেষ করে, এঁকে দেখে আমার অত্যন্ত স্নেহের উদ্রেক হচ্ছে। আর বাম বাহুও স্পন্দিত হচ্ছে। রুক্মিণী মনে মনে এরকম চিন্তা করছেন এমন সময়ে দেবকী ও বসুদেবের সংগে শ্রীকৃষ্ণ সেখানে এলেন। কিন্তু ভগবান জনার্দন প্রদ্যুম্ন সম্বন্ধে সমস্ত বিষয় অবগত থাকলেও চুপ করেই রইলেন। এর মধ্যে দেবর্ষি নারদ এসে প্রদ্যুম্নের পূর্ব বৃত্তান্ত বর্ণনা করলেন। নারদের বর্ণনা শুনে দ্বারকার অন্তঃপুরের নারীরা চমৎকৃত হলেন এবং যমালয়

থেকে ফিরে আসা লোকের মত বহু বৎসর পূর্বের নিরুদ্দিষ্ট প্রদ্যুম্নকে ফিরে পেয়ে অনেক আদর-যত্ন করতে লাগলেন। দেবকী, বসুদেব, বলরাম, শ্রীকৃষ্ণ ও রুক্মিণী নবদম্পতিকে আলিঙ্গন করে অত্যন্ত পরিতৃপ্ত হলেন। প্রদ্যুম্ন ফিরে এসেছেন শুনে দ্বারকাবাসী জনগণ বিস্মিত হল এবং মৃতব্যক্তি জীবন ফিরে পেয়েছে এই ভাব মনে হওয়ায় তারা আনন্দ প্রকাশ করল। কৃষ্ণপুত্র প্রদ্যুম্নের রূপ পিতার মতই ছিল বলে অন্যান্য কৃষ্ণপত্নীরা ভ্রান্তিবশে তাঁকে দেখে মনে মনে ভজনা করতেন। স্বয়ং লক্ষ্মীর আশ্রয় শ্রীকৃষ্ণ-কলেবরের প্রতিবিম্ব-স্থানীয় ও সাক্ষাৎ কন্দর্পের অংশে উদ্ভূত প্রদ্যুম্নকে দেখে অন্যান্য নারীরা ভ্রান্তিবশে তাঁর ভজনা করবেন তাতে আর আশ্চর্য কি? ৩০-৪০

ষট্পঞ্চাশত্তম অধ্যায়

স্যমন্তক মণি হরণ

শুকদেব বললেন, মহারাজ, সত্রাজিৎ[১] নিজের অপরাধে ভয় পেয়ে বিনা অনুরোধেই নিজে উদ্যোগ করে স্যমন্তক মণি সহ নিজকন্যা সত্যভামাকে শ্রীকৃষ্ণের হাতে সমর্পণ করেন। এই শুনে পরীক্ষিৎ বললেন, ভগবান, শ্রীকৃষ্ণের কাছে সত্রাজিৎ কি অপরাধ করেছিলেন? স্যমন্তক মণি তিনি কোথায় পেলেন আর শ্রীকৃষ্ণকে দিলেনই বা কেন? আপনি তা বলুন। শুকদেব বললেন, সত্রাজিৎ সূর্যদেবের একজন পরম ভক্ত ছিলেন এবং সূর্যদেবও তাঁকে বন্ধুর মত ভালবাসতেন। একদিন সত্রাজিতের ভক্তিতে বিশেষ তৃপ্ত ও সন্তুষ্ট হয়ে সূর্যদেব তাঁকে স্যমন্তক মণি দান করেন। সত্রাজিৎ সেই মণি কণ্ঠে পরে সূর্যের মত প্রদীপ্ত হয়ে দ্বারকায় প্রবেশ করলেন। তা থেকে এমন তেজ নির্গত হচ্ছিল যে তাঁকে সত্রাজিৎ বলে কেউ বুঝতেই পারল না। দূর থেকে তাঁকে দেখে অনেকের চোখই নষ্ট হল। ভগবান সে সময় পাশা খেলছিলেন। সকলে সত্রাজিৎকে সূর্য বলে আশংকা করে তাঁর কাছে গিয়ে নিবেদন করল, হে সর্বকারণ নারায়ণ, হে সর্বরক্ষক শঙ্খ-চক্র-গদাধর, আপনাকে প্রণাম করি। হে জগৎপতি, আপনাকে দর্শন ও প্রণাম করার জন্য ভগবান অংশুমান কিরণজাল বিকীরণ করে জনগণের দৃষ্টিশক্তিকে নষ্ট করতে করতে এখানে আসছেন। সত্রাজিতের স্বরূপ সম্বন্ধে অজ্ঞ লোকদের ঐ রকম কথা শুনে শ্রীকৃষ্ণ হেসে সকলকে বললেন, ইনি সূর্য নন। স্যমন্তক মণির উজ্জ্বলতায় ঐরকম দীপ্তিমান হয়ে তোমাদের পূর্ব-পরিচিত সত্রাজিৎই আসছেন। ১-৯

এদিকে সত্রাজিৎ নানারকম মঙ্গলানুষ্ঠানে নিজ গৃহ পবিত্র করলেন ও ব্রাহ্মণ দিয়ে অর্চনা করিয়ে সেই মণিটিকে দেবমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করলেন। সেই স্যমন্তক মণি প্রতিদিন অষ্টভার সুবর্ণ প্রসব করতে লাগল। এই মণি পূজিত হয়ে যেখানে থাকে সেই দেশের দুঃখের কারণগুলি, যেমন দুর্ভিক্ষ, মহামারী, গ্রহপীড়া, সাপের ভয়, মনঃপীড়া, রোগ-ব্যাধি, দৈত্যভয় প্রভৃতি অশুভ কিছু থাকে না। এক সময় যদুনন্দন ঐ মণিটি যদুরাজের জন্য সত্রাজিতের কাছে চাইলেন। কিন্তু লোভী সত্রাজিৎ শ্রীকৃষ্ণের প্রার্থনা অগ্রাহ্য করে মণিটি দিলেন

১ সোমবংশীয় নিঘ্নের পুত্র; ৯ম স্কন্ধের ২৪শ অধ্যায় দ্রষ্টব্য (পৃঃ ৭৯৯)।

না। তারপর একদিন সত্রাজিতের ভাই প্রসেনজিৎ ঐ মহাপ্রভাবশালী মণি গলায় পরে ঘোড়ায় চড়ে মৃগয়া করতে বনে গেলেন। সেখানে একটি সিংহ অশ্বসহ প্রসেনজিৎকে বধ করে মণিটি নিয়ে পর্বতে চলে যায়। জাম্ববান ঐ সিংহকে বধ করে মণিটি নিলেন, তারপর গুহায় ফিরে সেটি নিজের সন্তানকে খেলতে দিলেন। এদিকে ভাইকে না দেখে সত্রাজিৎ দুঃখে কাতর হয়ে বলতে লাগলেন, আগে শ্রীকৃষ্ণই আমার কাছে এই মণি চেয়েছিলেন, তখন আমি দিইনি। এখন আমার ভাই যখন ঐ মণি গলায় পরে মৃগয়ার জন্য বনে ঢোকে, তখন নিশ্চয় শ্রীকৃষ্ণই মণির লোভে তাকে হত্যা করে মণিটি আত্মসাৎ করেছেন। সত্রাজিতের এই কথা লোকজনদের মধ্যে কানাকানি হতে লাগল। ক্রমে এই রটনা শ্রীকৃষ্ণের কানেও গেল। এই অপযশের রটনা যে মিথ্যা তা প্রমাণের জন্য শ্রীকৃষ্ণ নগরের অনেক লোককে সঙ্গে নিয়ে প্রসেনজিতের সন্ধানে বনের মধ্যে ঢুকলেন। বনপথে কিছুদূরে গিয়ে সবাই প্রসেনজিৎ ও তাঁর ঘোড়ার মৃতদেহ দেখতে পেলেন এবং আর কিছু পরে পর্বতের উপর সিংহের মৃতদেহও দেখলেন। শ্রীকৃষ্ণ তখন সঙ্গীদের বাইরে রেখে একাই অন্ধকারাচ্ছন্ন গিরিগুহার মধ্যে ঢুকলেন এবং দেখলেন যে ঋক্ষরাজের বাসগৃহে তাঁর পুত্র স্যমন্তক মণি নিয়ে খেলছে। শ্রীকৃষ্ণ মণিটির জন্য সেই পুত্রের কাছে যেতেই অপরিচিত লোককে দেখে ঐ বালকের ধাত্রী ভয়ে অত্যন্ত কর্কশভাবে চিৎকার করে উঠল। ধাত্রীর চিৎকার শুনে ক্রুদ্ধ হয়ে জাম্ববান দৌড়ে এলেন এবং নিজের ইষ্টদেবকে[১] না চিনে প্রাকৃত মানুষ মনে করেই তাঁর সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন। দুজনেই জয়াভিলাষী। সামান্য মাংসের জন্য দুটি শ্যেনপাখী যেমন পরস্পর যুদ্ধ করে সেরকমভাবে তাঁরা দুজনে অস্ত্র, পাথর, গাছ ও হাত দিয়ে তুমুল দ্বন্দ্বযুদ্ধ আরম্ভ করলেন। আঠার দিন দিবারাত্রি দুজনে অবিশ্রান্ত বজ্রের মত কঠিন মুষ্টি-প্রহারে যুদ্ধ করেছিলেন। ১০-২৪

অবশেষে শ্রীকৃষ্ণের মুষ্টির আঘাতে জাম্ববানের শরীর শিথিল হয়ে পড়ল। দরদর করে ঘাম বের হতে লাগল। নিজেকে এত দুর্বল দেখে জাম্ববান বিস্ময়াবিষ্ট হলেন। কারণ সামান্য লোকে তাঁকে বলহীন করতে পারে না। তিনি তখন ভগবানকে বললেন, প্রভু, আপনি যে বিশ্বস্রষ্টা, সর্বাধার ও সর্বান্তর্যামী আদিপুরুষ বিষ্ণু তা আমি বুঝতে পারলাম। প্রভু, আপনি প্রাণীদের প্রাণ, ইন্দ্রিয়শক্তি, মনোবল ও দেহবল রূপে একা বিরাজমান। আপনি বিশ্বস্রষ্টাদেরও স্রষ্টা, আপনি সর্বনিয়ন্তা ও সর্ববিনাশকারীদেরও অধীশ্বর কাল এবং সমস্ত জীবের আশ্রয়স্থল পরমাত্মা। আপনার ঈষৎ রোষকটাক্ষে মকর, কুমির, তিমি, প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ মহাসাগরও স্তম্ভিত হয়ে পড়েছিল। সমুদ্র বিনা আপত্তিতে আপনাকে পথ দিলেও আপনি সেই সমুদ্রের উপর সেতু বন্ধন করেছিলেন, স্বর্ণপুরী লংকাকে ছারখার করেছিলেন। তীক্ষ্ন শরাঘাতে রাবণ প্রভৃতি রাক্ষসকুলের মস্তক ছিন্ন করে আপনি ধরায় লুণ্ঠিত করেছিলেন। আমার সেই ইষ্টদেব যে আপনিই তা আমি বুঝতে পেরেছি। ঋক্ষরাজ জাম্ববান এই ভাবে শ্রীকৃষ্ণের পরমতত্ত্ব উপলব্ধি করলে দেবকীনন্দন কমলাক্ষ ভগবান তাঁর মাথায় হাত রেখে পরম কৃপায় মেঘ-গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, ঋক্ষরাজ, আমি এ মণির জন্য এই গুহার মধ্যে এসেছি। এ দিয়ে আমার মিথ্যা কলংক ঘোচাব। জাম্ববান এ কথা শুনে সন্তুষ্ট হয়ে মণির সঙ্গে নিজের কন্যা জাম্ববতীকেও শ্রীকৃষ্ণের হাতে সমর্পণ করলেন। এদিকে প্রজারা শ্রীকৃষ্ণকে গুহা থেকে বার হতে না দেখে বার দিন অপেক্ষায় রইলেন।

১ শ্রীকৃষ্ণ রাম-অবতারের লীলার সময় জাম্ববান তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভক্ত ছিলেন।

অবশেষে দুঃখিত মনে তাঁরা নগরে ফিরে গেলেন। শ্রীকৃষ্ণ গুহা থেকে বার হন নি এই কথা শুনে বসুদেব, দেবকী, রুক্মিণী এবং অন্যান্য সুহৃদ ও জ্ঞাতিরা সকলেই শোক করতে লাগলেন। শ্রীকৃষ্ণকে ফিরে পাবার জন্য দ্বারকাবাসীরা চন্দ্রভাগা নামে দুর্গতিনাশিনী দুর্গার আরাধনা করতে লাগলেন। ২৫-৩৫

তাঁরা দেবীর আশীর্বাদ লাভ করার সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীকৃষ্ণ নিজের কাজ উদ্ধার করে জাম্ববতীসহ দ্বারকায় উপস্থিত হলেন। গলায় স্যমন্তক মণি পরিহিত সস্ত্রীক হৃষীকেশকে পেয়ে সকলেরই মৃত ব্যক্তিকে ফিরে পাওয়ার সমান মহা আনন্দ হল। তারপর ভগবান সভার সমস্ত রাজন্যবর্গের সামনে সত্রাজিৎকে ডাকলেন এবং যে ভাবে মণি ফিরে পেয়েছেন তা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে তাঁকে মণিটি ফেরত দিলেন। সত্রাজিৎ লজ্জিত হয়ে নতমস্তকে মণিটি নিয়ে নিজ অপরাধে মনে কষ্ট পেতে পেতে গৃহে ফিরে গেলেন। তিনি অপরাধের কথা ও বলবানের সঙ্গে কলহ হওয়ার চিন্তায় ব্যাকুল হয়ে ভাবতে লাগলেন, কিসে অপরাধ মোচন হবে? কিসে অচ্যুত প্রসন্ন হবেন? কি করলে আমার মঙ্গল হবে? কি করলেই বা লোকে আমাকে অবিবেকী, মন্দবুদ্ধি, ধনলোভী বলে নিন্দা করবে না? আমার কন্যা এবং মণি এই দুই রত্নই তাঁকে উপহার দেব। এটাই সঠিক উপায়, অন্য কিছুতে আমার অপরাধের শান্তি হবে না। সত্রাজিৎ মনে মনে এইরকম স্থির করে শ্রীকৃষ্ণকে নিজের মঙ্গলস্বরূপা দুহিতা ও মণি এই দুইই উপহার দিলেন। ৩৬-৪৩

সত্রাজিৎ-কন্যা সত্যভামা রূপ, গুণ, ঔদার্য ইত্যাদিতে মণ্ডিতা ছিলেন। তাঁকে অনেকেই বিবাহের জন্য প্রার্থনা করেছিল। ভগবান যথানিয়মে তাঁর পাণিগ্রহণ করলেন। ভগবান সত্রাজিৎকে বললেন, সূর্যদেবের দেওয়া মণি সূর্যভক্ত আপনার কাছেই থাক। আমরা শুধু এর ফল ভোগ করব। ৪৪-৪৫

সপ্তপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

স্যমন্তক উপাখ্যান

শুকদেব বললেন, মহারাজ, পাণ্ডবরা যে সুরঙ্গ পথ দিয়ে জতুগৃহ থেকে নির্বিঘ্নে বের হয়ে এসেছিলেন গোবিন্দ তা জানতেন। তবুও পাণ্ডবরা জননী কুন্তীর সঙ্গে জতুগৃহে পুড়ে ভস্মীভূত হয়েছেন এই সংবাদ শুনে ভাই বলরামের সঙ্গে তিনি হস্তিনাপুরে গেলেন এবং ভীষ্ম, কৃপ, বিদুর, গান্ধারী ও দ্রোণের সঙ্গে মিলিত হয়ে তাঁদের সমান দুঃখ প্রকাশ করলেন। শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় নেই, কাজেই সত্রাজিৎকে বধ করবার এই উপযুক্ত সময় এই রকম চিন্তা করে অক্রূর ও কৃতবর্মা শতধনুকে গিয়ে বললেন, এমন সুযোগ পেয়েও তুমি কেন সত্রাজিতের কাছ থেকে মণিটি নেবার চেষ্টা করছ না? সত্রাজিৎ আমাদের কাছে কন্যাদানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে পরে আমাদের অবজ্ঞা করে শ্রীকৃষ্ণকে কন্যা দান করেছে, কিন্তু মণি দেয় নি। এই অপমানের ফলস্বরূপ তারও তার ভাইয়ের দশা (মৃত্যু) ঘটবে না কেন? তাদের দুজনের প্ররোচনায় পাপী ক্ষীণজীবী শতধনুর মতিভ্রম হল। সে লোভের বশে ঘুমন্ত অবস্থায় সত্রাজিতের প্রাণসংহার করল। সত্রাজিতের স্ত্রীরা কাতর হয়ে অনাথার মত কাঁদতে লাগল। পশুহন্তা যেভাবে পশুবধ করে শতধনু সে রকম নৃশংসভাবে.

সত্রাজিৎকে বধ করে মণি নিয়ে চলে গেল। সত্যভামা পিতাকে নিহত হতে দেখে শোকে দুঃখে বিহ্বল হয়ে 'হায় বাবা, আপনি আমাদের শোক-সাগরে ফেলে কোথায় গেলেন ?' ইত্যাদি বলে শোক করতে লাগলেন। তারপর পিতার মৃতদেহ একটা তেলপূর্ণ পাত্রে রেখে তিনি হস্তিনাপুরে গিয়ে সমস্ত বিবরণ শ্রীকৃষ্ণকে জানালেন। শ্রীকৃষ্ণ পূর্বেই সব জেনেছিলেন। রাম-কৃষ্ণ সর্বজ্ঞ পরমপুরুষ হলেও তাঁরা এ সংবাদ শুনে সাধারণ মানুষের মত 'হায়, কি বিষম দুর্দৈব উপস্থিত হল !' ইত্যাদি বলে বিলাপ করতে লাগলেন। ১-৯

তারপর ভগবান হস্তিনাপুর থেকে স্ত্রী ও অগ্রজের সঙ্গে দ্বারকায় ফিরলেন এবং শতধনুকে বধ করে মণি সংগ্রহের সংকল্প করলেন। শতধনুও শ্রীকৃষ্ণের ঐ রকম মনোভাব বুঝতে পেরে নিজের জীবন রক্ষার জন্য কৃতবর্মার কাছে প্রার্থনা করল। কিন্তু কৃতবর্মা বললেন, রাম ও কৃষ্ণ সাক্ষাৎ ঈশ্বর, আমি তাঁদের সংগে শত্রুতা করতে পারব না। তাঁদের কাছে অপরাধী হলে জগতে আর মংগল কোথায় ? কংস তাঁদের বিরুদ্ধাচরণ করায় রাজলক্ষ্মী তাকে ত্যাগ করেছেন ও সে নিহত হয়েছে, জরাসন্ধ সতের বার যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে পালিয়েছে। কৃতবর্মার কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়ে শতধনু অক্রূরের কাছে সাহায্য চাইল। অক্রূর বললেন, রাম-কৃষ্ণের শক্তি যাঁরা জানেন তাঁরা কখনও তোমাকে সাহায্য করবার জন্য তাঁদের বিরুদ্ধে যাবেন না। যিনি অবলীলায় মায়াপ্রভাবে এই পৃথিবীর সৃষ্টি, পালন ও সংহার করে থাকেন, বিশ্বস্রষ্টারা যাঁর মায়ায় মুগ্ধ হয়ে তাঁর চেষ্টা পর্যন্ত জানতে পারেন না, যিনি সতের বছর বয়সে শিশুর ছাতা ধরার মত একহাতে পাহাড় তুলে ধরেছিলেন, সেই অনাদি ও অনন্ত, আদিভূত, কূটস্থ আত্মাকে প্রণাম জানাই। ১০-১৯

মহারাজ, শতধনু কৃতবর্মার কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়েও স্যমন্তক মণিটি তাঁরই হাতে দিয়ে শত যোজনগামী এক ঘোড়ায় চড়ে পালাতে লাগল। এ দিকে রাম-কৃষ্ণও অতি দ্রুতগামী চারটি ঘোড়ায়-টানা গরুড়ধ্বজ রথে চড়ে গুরুদ্রোহী শতধনুর পশ্চাদ্ধাবন করলেন। শতযোজন পথ যাবার পর শতধনুর ঘোড়া শ্রান্ত হয়ে মিথিলার এক উপবনে মরে পড়ে গেল। তখন সে ঘোড়া ছেড়ে তাড়াতাড়ি পায়ে হেঁটে পালাতে লাগল। শতধনুকে পায়ে হেঁটে পালাতে দেখে ভগবানও পায়ে হেঁটে তাকে অনুসরণ করে ধারালো চক্রে তার মাথা কেটে তার বস্ত্রের মধ্যে মণি খুঁজতে লাগলেন। মণি না পেয়ে শ্রীকৃষ্ণ অগ্রজ বলরামের কাছে এসে বললেন, অকারণে শতধনুকে বধ করলাম, তার কাছে মণি নেই। একথা শুনে বলরাম বললেন, তাহলে সে নিশ্চয়ই অন্য কারো কাছে মণি রেখে এসেছে। দ্বারকায় গিয়ে মণির সন্ধান কর। আমি কিন্তু এখন দ্বারকায় ফিরব না। আমি বিদেহরাজের সংগে দেখা করব। এই বলে বলরাম মিথিলায় চলে গেলেন। মিথিলাবাসীরা পূজনীয় বলরামকে আসতে দেখে আনন্দিত মনে বিভিন্ন উপকরণে তাঁর অর্চনা করলেন। বিভু বলরাম মিথিলার রাজা জনকের আতিথ্যে কয়েক বৎসর সুখে কাটালেন। এর মধ্যে ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র দুর্যোধন (ঐ রাজ্যের অতিথি হয়ে) বলরামের কাছে গদাযুদ্ধ শিখলেন। এদিকে শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় পেঁছে শতধনু যে নিহত হয়েছে, অথচ তার কাছে স্যমন্তক মণি পাওয়া যায় নি সে কথা সত্যভামাকে বললেন এবং মৃত সত্রাজিতের যে সব পারলৌকিক অনুষ্ঠান বাকী ছিল জ্ঞাতি ও বন্ধুদের দিয়ে সে সব সম্পন্ন করালেন। শতধনুর প্রাণনাশের সংবাদ শুনে অক্রূর ও কৃতবর্মা ব্যাকুল হয়ে দ্বারকা ছেড়ে পালিয়ে গেলেন। অক্রূর চলে গেলে দ্বারকায় নানা রকমের উৎপাত আরম্ভ হল। শারীরিক ব্যাধি, মানসিক কষ্ট, অনাবৃষ্টি প্রভৃতি নানা দৈবদুর্বিপাক ও সাপ, চোর ইত্যাদির উৎপাত শুরু হল। ২০-৩০

শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য ভুলে কেউ কেউ অক্রূরের দেশান্তরী হওয়াই এই সব দুঃখের কারণ, এ-কথা বলতে লাগলেন। কিন্তু ভগবানের ইচ্ছা ছাড়া কিছুই হয় না। মুনিদের আশ্রয় শ্রীহরি যেখানে নিত্য বিরাজ করছেন সেখানে কি এরকম অমঙ্গল ঘটতে পারে? একবার কাশীরাজ্যে যখন অনাবৃষ্টি হয় তখন কাশিরাজ তাঁর কন্যা গান্দিনীকে অতিথি শ্বফল্কের হাতে সমর্পণ করেন। তারপর সে রাজ্যে প্রচুর বৃষ্টি হয়েছিল। অক্রূর সেই শ্বফল্কের পুত্র এবং তার প্রভাবও সেই রকম। তিনি যে যে জায়গায় থাকেন সেই সেই জায়গায় ইন্দ্র বৃষ্টিপাত করেন এবং সেখানে মারীভয় প্রভৃতি কোন রকম উৎপাতের আশংকা থাকে না। বৃদ্ধদের এই সব উক্তি শুনে শ্রীকৃষ্ণ ভাবলেন, অক্রূরের চলে-যাওয়া দ্বারকার নানা অমংগলের কারণ নয়, কারণ হচ্ছে সেই স্যমন্তক মণি। তবু তিনি অক্রূরকে আনালেন এবং তাঁর যথাবিধি সৎকার করলেন। তারপর নানা প্রিয় কথার অবতারণা করে তাঁকে বললেন, দানপতি, আমার অনুমান হচ্ছে যে শতধনু পালিয়ে যাবার সময় স্যমন্তক মণি আপনার কাছেই গচ্ছিত রেখে গিয়েছিলেন। মণি প্রত্যেক দিন যে অষ্টভার সোনা প্রসব করে তারই প্রসাদে আপনার সম্প্রতি এত দান-সামর্থ্য দেখা যাচ্ছে। অপুত্রক সত্রাজিতের কন্যা সত্যভামার পুত্ররাই মাতামহকে জলপিণ্ডদান ও তাঁর ঋণপরিশোধ করে তাঁর সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হয়েছে, কিন্তু স্যমন্তক মণিটি পায় নি। সাধারণ কোন লোকও ঐ মণি রাখতে পারে না। আপনি সত্যনিষ্ঠ ও ধার্মিক, সেইজন্যই তা রাখতে সমর্থ হয়েছেন। এখন ওটা আপনার কাছেই থাক। কিন্তু মণির বিষয়ে আমার অগ্রজ বলরামও আমার কথায় বিশ্বাস করছেন না। আপনি অন্তত একবারও ঐ মণিটি দেখিয়ে বন্ধুদের শান্তিবিধান করুন। মণি আপনার কাছে নেই একথা বলবেন না, কারণ সোনার বেদী সমন্বিত যজ্ঞের বিভিন্ন আয়োজনে স্পষ্টই বোঝা যায় তা আপনার কাছেই আছে। এইভাবে প্রবোধিত হয়ে শ্বফল্কপুত্র অক্রূর বস্ত্রের মধ্য থেকে সূর্যের মত প্রভাযুক্ত স্যমন্তক মণি ভগবনের হাতে দিলেন। ভগবান সেই মণি জ্ঞাতিদের দেখিয়ে নিজের মিথ্যা অপবাদ মোচন করলেন ও সবার সামনে অক্রূরের হাতেই আবার তা ফিরিয়ে দিলেন। যিনি ভগবান বিষ্ণুর বীর্যবিষয়ক অনিষ্টহারী সুমংগল এই আখ্যান পড়েন, শোনেন বা স্মরণ করেন তিনি অকীর্তি ও দুষ্কৃতি থেকে মুক্ত হয়ে শান্তিলাভ করেন। ৩১-৪২

অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

কালিন্দী প্রভৃতির পাণিগ্রহণ

শুকদেব বললেন, মহারাজ, জনরব ছিল যে পাণ্ডবরা জতুগৃহে দগ্ধ হয়ে নিহত হয়েছেন। কিন্তু তাঁরা নিহত হননি, দ্রুপদ রাজার গৃহে বাস করছেন জেনে পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ একদিন সাত্যকি প্রভৃতি যাদবদের নিয়ে তাঁদের দেখার জন্য ইন্দ্রপ্রস্থে গেলেন। কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির প্রভৃতিরা অখিলেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে আসতে দেখে মৃতদেহে প্রাণ ফিরে এলে যেমন ভাবে সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি সচেতন হয়ে ওঠে সেরকম আনন্দ-উত্তেজনায় সবাই উঠে দাঁড়ালেন। অচ্যুতকে আলিঙ্গন করে পাণ্ডবরা তাঁর অংগস্পর্শে পাপমুক্ত হলেন। তাঁরা তাঁর অনুরাগে ও উজ্জ্বল হাসিতে মণ্ডিত মুখশ্রী দর্শন করে পরমানন্দ লাভ করলেন। শ্রীকৃষ্ণ বয়োজ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির ও

ভীমসেনের চরণ-বন্দনা করলেন, সমবয়স্ক অর্জুনকে আলিঙ্গন করলেন এবং বয়ঃকনিষ্ঠ নকুল সহদেবের দ্বারা বন্দিত হলেন। শ্রীকৃষ্ণ আসন গ্রহণ করলে নববধূ কৃষ্ণা সলজ্জে ধীরে ধীরে এসে তাঁকে অভিবাদন করলেন। এইভাবে সাত্যকি ও অন্যান্য যাদবরাও পাণ্ডবদের দ্বারা যথোচিত ভাবে পূজিত হলেন এবং যথাযোগ্য আসনে বসলেন। শ্রীকৃষ্ণ কুন্তীকে প্রণাম করলে স্নেহে তাঁর দুই চোখ ভিজে গেল। তিনি যদুনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে স্নেহালিঙ্গন করে বন্ধু-বান্ধবদের কুশল জিজ্ঞাসা করলেন। শ্রীকৃষ্ণও তাঁর পিসী কুন্তী ও নববধূ দ্রৌপদীর কুশল জিজ্ঞাসা করলেন। স্নেহে রুদ্ধকণ্ঠা কুন্তী আগের সব দুঃখের ঘটনাগুলি স্মরণ করে অশ্রুসিক্ত নয়নে শ্রীকৃষ্ণকে বললেন, কৃষ্ণ, দুঃখ দূর করার জন্যই তুমি দেখা দিয়ে থাক। তুমি আমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী। তাই ভাই অক্রূরকে পাঠিয়ে আমাদের তত্ত্ব নিয়েছ, তাতেই আমাদের কুশল হয়েছে। তুমি সংসারের সমস্ত জীবের বন্ধু ও আত্মস্বরূপ। তোমার আপন-পর বলে কোন ভেদ নেই; কিন্তু যাঁরা প্রাণের সঙ্গে সব সময় তোমাকে স্মরণ করেন তাঁদের হৃদয়ে তুমি নিত্য বিরাজ করে সমস্ত দুঃখ নিবারণ করে থাক। ১-১৩

যুধিষ্ঠির বললেন, জানি না আমরা কী পুণ্য করেছিলাম যে তুমি যোগীদের কাছে দুর্লভ হয়েও বিষয়াসক্তচিত্ত আমাদের দর্শন দিলে। ভগবান এইভাবে অভ্যর্থিত হয়ে বর্ষার কয়েক মাস সকলের নয়নের আনন্দ হয়ে ইন্দ্রপ্রস্থে বাস করলেন। এর মধ্যে একদিন বীর ও শত্রু-সংহারকারী অর্জুন দুই অক্ষয়বাণপূর্ণ তূণ ও গাণ্ডীব ধনু নিয়ে বর্ম পরে সখা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে কপিধ্বজ রথে চড়ে বিহার করার জন্য শ্বাপদসঙ্কুল একটি বিশাল বনে ঢুকলেন। সেখানে বাণ দিয়ে বাঘ, শূকর, মহিষ, মৃগ, বানর, গণ্ডার, হরিণ, শশক ও শজারুদের বধ করতে লাগলেন। পর্বের সময় উপস্থিত হওয়ায় যজ্ঞীয় পশুগুলিকে ভৃত্যরা রাজা যুধিষ্ঠিরের কাছে নিয়ে গেল। পরিশ্রান্ত অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ তৃষ্ণা নিবারণের জন্য যমুনাতীরে উপস্থিত হলেন। সেখানে মহারথ কৃষ্ণ ও অর্জুন যমুনার জলে স্নান করে ও তার নির্মল জল পান করে যখন তীরে উঠে আসছেন, তখন দেখলেন এক পরমা সুন্দরী কন্যা যমুনাতীরে বিচরণ করছেন। সখা শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞায় অর্জুন ঐ অপূর্ব রূপ-লাবণ্যসম্পন্না, সুদন্তী বরাননা নারীরত্নকে জিজ্ঞাসা করলেন, সুন্দরী কে তুমি? কি তোমার পরিচয়? কিসের জন্য এখানে ঘুরছ? মনে হয় তুমি তোমার পতির অন্বেষণে এখানে বিচরণ করছ। আমার কাছে সব খুলে বল। ১১-১৯

অর্জুনের প্রশ্ন শুনে সেই নারী বললেন, আমি ভগবান সূর্যের কন্যা, সর্ব-বরদাতা বরেণ্য বিষ্ণুকে স্বামীরূপে কামনা করে কঠোর তপস্যা করছি। হে বীর, সেই শ্রীনিবাস বিষ্ণু ছাড়া অন্য স্বামী আমার বরণীয় নন। সেই অনাথ-নাথ মুকুন্দ সন্তুষ্ট হয়ে আমাকে গ্রহণ করুন, এই প্রার্থনা। আমার নাম কালিন্দী। যে পর্যন্ত না ভগবান অচ্যুতের দর্শন ঘটে সে পর্যন্ত আমি যমুনার গর্ভে আমার পিতার গৃহে বাস করব। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের কাছে সব শুনে সেই কুমারীকে রথে তুলে সখার সঙ্গে যুধিষ্ঠিরের কাছে গেলেন। ২০-২৩

অর্জুনের অনুরোধে সেখানে শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বকর্মার দ্বারা একটি বিচিত্র নগর নির্মাণ করালেন। ভগবান তাঁর ভক্ত পাণ্ডবদের মঙ্গল সাধনের জন্য কিছুদিন সেই নগরে বাস করলেন। এরই মধ্যে অগ্নিকে খাণ্ডব-বন দহন করতে দেবার জন্য তিনি অর্জুনের সারথি হলেন। অগ্নি খাণ্ডব-বন দগ্ধ করে পরিতৃপ্ত হয়ে

অর্জুনকে ধনুক, শ্বেত অশ্ব ও ধ্বজ, দুই অক্ষয় তূণ এবং অভেদ্য বর্ম দান করেন। ময়-দানব শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় অগ্নির সর্বগ্রাসী শিখা থেকে মুক্ত হয়ে অর্জুনের জন্য এক বিচিত্র সভা রচনা করে দিলেন। সেই সভা দেখতে দেখতে দুর্যোধনের স্থলকে জল আর জলকে স্থল বলে ভ্রম হয়েছিল। সুহৃদ্‌দের অনুমতি নিয়ে ভগবান বাসুদেব সাত্যকি প্রভৃতি যদুদের সঙ্গে দ্বারকায় ফিরে গেলেন। তারপর সকলকে আনন্দে মগ্ন করে অনুকূল ঋতুতে ও শুভ লগ্নে তিনি যথানিয়মে কালিন্দীর পাণিগ্রহণ করলেন। ২৪-২৯

এদিকে অবন্তীরাজ (এবং শ্রীকৃষ্ণের আর এক পিসী রাজাধিদেবীর) কন্যা মিত্রবিন্দা স্বয়ংবর সভায় শ্রীকৃষ্ণকে বরণ করতে মনস্থ করেন। কিন্তু তাঁর দুই ভাই বিন্দ ও অনুবিন্দ দুর্যোধনের বশবর্তী হয়ে তাঁকে নিষেধ করেন। তাতে শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত রাজাদের সামনেই মিত্রবিন্দাকে বলপূর্বক হরণ করে আনলেন। কোশল দেশের ধার্মিক রাজা নগ্নজিতের সুন্দরী কন্যার নাম ছিল সত্যা। পিতার নাম অনুসারে সত্যাকে নাগ্নজিতীও বলা হত। নগ্নজিতের পণ ছিল তাঁর সাতটি ষাঁড়কে যে পরাজিত করতে পারবে কেবল তাকেই ঐ কন্যা দান করবেন। ঐ ষাঁড়গুলি যেমন দুষ্ট ছিল তেমান তাদের শিংগুলি ছিল অতি তীক্ষ্ন। বীরদের গন্ধ পর্যন্ত তারা সহ্য করতে পারত না। স্বয়ংবর সভায় উপস্থিত রাজাদের মধ্যে কেউ ঐ ষাঁড়গুলিকে জয় করতে পারেন নি; ফলে সত্যাকে বিয়েও করতে পারেননি। কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ঐ বৃত্তান্ত শুনে অনেক সৈন্য-সামন্ত নিয়ে কোশলে গেলেন। শ্রীকৃষ্ণ এসেছেন দেখে কোশলরাজ মনে মনে অত্যন্ত খুশী হলেন। তিনি নিজে এগিয়ে গিয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা করে আনলেন এবং বিশেষ আসনে বসিয়ে নানা বহুমূল্য উপহার দিয়ে ও কুশল জিজ্ঞাসা করে তাঁর সন্তোষ বিধান করলেন। রাজকুমারী নাগ্নজিতী চিরবাঞ্ছিত সাক্ষাৎ রমাপতি শ্রীকৃষ্ণকে বরবেশে আসতে দেখে মনে মনে তাঁকেই স্বামীরূপে প্রার্থনা করে ভাবলেন, যদি আমি ব্রত পালন করে থাকি তা হলে ইনিই যেন আমার পতি হন এবং আমার মনোবাঞ্ছা সফল করেন। শ্রীকৃষ্ণ যথোচিত অভ্যর্থিত হলে রাজা তাঁকে সম্বোধন করে বলতে লাগলেন, হে নারায়ণ, হে জগৎপতি, আপনি আত্মানন্দে পূর্ণ, আমি ক্ষুদ্র। বলুন আপনার কোন কাজ আমার দ্বারা সাধিত হতে পারে? লক্ষ্মী, ব্রহ্মা ও গিরিশ লোকপালদের সঙ্গে যাঁর চরণপদ্মরেণু নিজের মাথায় রাখেন, যিনি আপন সৃষ্ট ধর্মের মর্যাদা রক্ষা করার জন্য লীলা-দেহ ধারণ করে থাকেন, তিনি যদি অনুগ্রহ করে আমার প্রতি প্রসন্ন হন তবেই আমার মঙ্গল। ৩০-৩৮

কুরুনন্দন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আসনে বসে জলদ-গম্ভীর স্বরে কোশলরাজকে হেসে বললেন, স্বধর্মপরায়ণ ক্ষত্রিয়ের পক্ষে কিছু চাওয়া পণ্ডিতরা নিন্দনীয় মনে করেন। তবু আপনার সঙ্গে সৌহার্দ্যের জন্য আপনার কন্যাটিকে প্রার্থনা করছি, তবে আমরা কিন্তু শুল্ক দিয়ে বিয়ে করি না। রাজা বললেন, প্রভু, আপনি গুণের আধার এবং আপনার শরীরে লক্ষ্মী নিয়ত বাস করেন। অতএব আমার মেয়ের জন্য আপনার চেয়ে বেশি প্রার্থনীয় বর আর কে আছে? কিন্তু যদুশ্রেষ্ঠ, আমার কন্যা যেন যোগ্য পাত্রে পড়ে এই কামনা করে তার পাণিপ্রার্থী পুরুষদের বীর্যবত্তা পরীক্ষার জন্য আমি একটি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম। এই যে সাতটি দুর্দান্ত ষাঁড় দেখছেন, এদের কেউ আয়ত্ত করতে পারে নি। এদের তেজে অনেক ক্ষত্রিয়পুত্রের যেমন দেহ, হাত-পা ভেঙ্গেছে তেমনি অনেকে হতও হয়েছেন। এখন এই ষাঁড়গুলি যদি আপনার হাতে পরাজিত হয়, তা হলে আপনিই আমার মেয়ের উপযুক্ত বর বলে নির্বাচিত হবেন। নগ্নজিতের এরকম প্রতিজ্ঞার কথা শুনে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর বসন এবং

উত্তরীয় ঠিক করে বেঁধে নিলেন। তারপর নিজেকে সাত ভাগে বিভক্ত করে একই সঙ্গে সেই সাতটি বৃষকে আক্রমণ করলেন। ক্ষণকালের মধ্যেই সেই বৃষদের শক্তি এবং তেজ দমিত হল। বালক যেমন খেলতে খেলতে কাঠের গরু-ষাঁড়কে দড়ি বেঁধে টানে সেই ভাবে তাদের দড়িতে বেঁধে শ্রীকৃষ্ণ সকলের সামনে টেনে আনলেন। শ্রকৃষ্ণের হাতে বৃষগুলির ঐ রকম নিগ্রহ দেখে রাজা বিস্মিত ও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রসন্ন হয়ে তাঁকেই কন্যাদান করলেন। কন্যা পুরুষশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে লাভ করাতে রাজমহিষীরাও আনন্দিত হলেন। এই উপলক্ষে সেখানে বিরাট উৎসব পালিত হল। শঙ্খ, ভেরী, ঢাক প্রভৃতি বাদ্য বাজতে লাগল, গান ও ব্রাহ্মণদের আশীর্বাদ ধ্বনি শোনা যেতে লাগল। নগরের নরনারীরা উৎকৃষ্ট অলঙ্কার ও বস্ত্রে সাজলেন। রাজা নগ্নজিৎ সোনার অলংকার ও ক্ষৌম বসনে সুসজ্জিত তিন হাজার যুবতী দাসী, দশ হাজার গাভী, নয় হাজার হাতী, নয় লক্ষ রথ, নয় কোটি ঘোড়া, নয় পদ্ম পদাতিক সৈন্যও জামাতাকে যৌতুক দিলেন। দুহিতা-বৎসল কোশলরাজ নগ্নজিৎ এভাবে বিশাল সৈন্যবাহিনীতে পরিবৃত নব বর-বধূকে রথে তুলে দিয়ে স্নেহার্দ্র হৃদয়ে বিদায় দিলেন। ৩৯-৫২

• সত্যাকে বিবাহ করে এত ধনরত্ন নিয়ে শ্রীকৃষ্ণ বাড়ী ফিরছেন শুনে সপ্তবৃষ ও যদুদের কাছে যে সব রাজা পরাস্ত হয়েছিলেন তাঁরা অতি আক্রোশের সঙ্গে পথের মধ্যেই তাঁকে আক্রমণ করলেন। তাঁরা আষাঢ়ের বৃষ্টিধারার মত শরবর্ষণ করতে লাগলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়সুহৃদ অর্জুন রাজাদের সংহারের জন্য সিংহবিক্রমে গাণ্ডীবে টংকার দিতেই সবাই প্রাণভয়ে পলায়ন করলেন। দেবকীনন্দন বিবাহের সমস্ত জিনিস সহ সত্যাকে নিয়ে দ্বারকায় এলেন ও আনন্দে বিহার করতে লাগলেন। তিনি নিজের পিসী শ্রুতকীর্তির কন্যা ভদ্রাকে তার ভাই সন্তর্দন প্রভৃতির অনুমোদনে বিয়ে করলেন। এই কন্যাব কেকয় দেশে জন্ম বলে ইনি কেকয়ী নামে অভিহিত হন। গরুড় যেমন একাই সুধা হরণ করেছিলেন সেরকম শ্রীকৃষ্ণও একাই মদ্রদেশের রাজকন্যা সুলক্ষণা লক্ষণাকে হরণ করেন। শ্রীকৃষ্ণের এইরকম সহস্র-সংখ্যক পত্নী হয়েছিল। ভূমিপুত্র নবককে সংহার করে অন্তঃপুরে থেকে অবরুদ্ধ রূপলাবণ্যবতী সহস্র সহস্র রমণীকেও শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধার করে নিয়ে আসেন। ৫৩-৫৮

উনষষ্টিতম অধ্যায়

মুর ও নরকাসুর বধ

পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করলেন, ভগবান, ভূমিপুত্র নরকাসুর কেন এত নারীকে অবরুদ্ধ করে রেখেছিল? কি কারণেই বা সে ভগবানের হাতে নিহত হয়? আপনি শ্রীকৃষ্ণের এই বিক্রমের বিষয় বলুন। শুকদেব বললেন, নরকাসুর ইন্দ্রমাতা অদিতির দুটি কুণ্ডল ও ইন্দ্রের ছত্র হরণ করে তাঁকে অমরাদ্রি থেকে বিতাড়িত করায় ইন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের কাছে এসে তার অত্যাচারের কথা জানান। তা শুনে শ্রীকৃষ্ণ গরুড়ের পিঠে চড়ে স্ত্রী সত্যভামার সংগে প্রাগ্জ্যোতিষপুরে এলেন। নরকাসুরের রাজধানী এই নগরে প্রবেশ করা সাধারণ মানুষের পক্ষে অসম্ভব ব্যাপার। তার চারদিকে পর্বতশ্রেণী, পর্বত-প্রাচীরের গায়ে অস্ত্রদুর্গ, চারদিকে জল, অগ্নি ও বায়ু। আর মুরদৈত্যের দশ হাজার অতি প্রচণ্ড পাশ দিয়ে সমস্ত

স্থানটি সুরক্ষিত ছিল। শ্রীকৃষ্ণ গদার আঘাতে প্রথমে পর্বতশ্রেণী, অস্ত্র নিক্ষেপ করে অস্ত্রদুর্গ, সুদর্শন চক্রের সাহায্যে অগ্নি, জল ও বায়ুদুর্গ, তরোয়াল দিয়ে মুরপাশ এবং প্রবেশের প্রতিবন্ধক স্বরূপ অন্য যন্ত্রগুলিকে নিঃশেষে ধ্বংস করে ফেললেন। তিনি তাঁর শঙ্খের ধ্বনিতে সেখানকার বীরদের হৃদয় ও প্রচণ্ড গদার আঘাতে নগরপ্রাচীর ভেদ করলেন। যুগান্তকালের বজ্রনির্ঘোষের মত তাঁর পাঞ্চজন্য শঙ্খের ভীষণ ধ্বনি শুনে জলশয্যায় শায়িত পঞ্চমুণ্ড মুরদৈত্য জল ছেড়ে উঠল এবং প্রলয়কালের সূর্য ও আগুনের মত উগ্রমূর্তি ধরে ত্রিশূল উদ্যত করে, সাপ যেমন গরুড়ের দিকে ছুটে যায় সেরকম ভাবে, পাঁচ মুখে হাঁ করে যেন ত্রিলোক গ্রাস করে; সে শ্রীকৃষ্ণের দিকে ছুটে গেল। সে প্রথমে গরুড়ের দিকে ত্রিশূল নিক্ষেপ করে, পাঁচমুখে একসঙ্গে বিকট শব্দ করতে লাগল। সেই শব্দ স্বর্গ, মর্ত্য, আকাশ ও দিগ্‌দিগন্ত ব্যাপ্ত করে যেন ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করে ফেলল। মুরের ত্রিশূল গরুড়ের দিকে সবেগে ছুটে যাচ্ছে দেখে ভগবান শ্রীহরি দুই বাণে তাকে তিন খণ্ড করে ফেললেন এবং অসংখ্য বাণে দৈত্যের পাঁচটি মুখই আহত করলেন। মুর ক্রোধে তাঁর দিকে গদা ছুঁড়ে দিলে গদাগ্রজ নিজের গদা দিয়ে তার গদাকে হাজার খণ্ডে ভেঙ্গে ফেললেন। তখন দৈত্য হাত তুলে শ্রীকৃষ্ণের দিকে ছুটলে অজিত শ্রীকৃষ্ণ চক্র দিয়ে তাঁর শিরশ্ছেদ করলেন। মুর ছিন্নমস্তক ও প্রাণহীন হয়ে ইন্দ্রের তেজে ভগ্ন পর্বতের শৃঙ্গের মত জলের মধ্যে পড়ে গেল। তার সাত পুত্র তাম্র, অন্তরীক্ষ, শ্রবণ, বিভাবসু, বসু, নভস্বান্‌ ও অরুণ নরকাসুরের আদেশে পিতৃহন্তাকে বধ করার জন্য অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে সেনাপতি পীঠকে সামনে নিয়ে শ্রীকৃষ্ণের দিকে বাণ, খড়্গ, গদা, ঋষ্টি ও শূল বর্ষণ করতে লাগল। অমোঘবীর্য ভগবান সেই অস্ত্রজাল নিজের শরে তিল তিল করে ছিন্ন করলেন এবং তাদের মাথা, কাঁধ, হাত, পা, বর্ম প্রভৃতি কেটে ফেলে অধিনায়ক পীঠের সঙ্গে সকলকে যমালয়ে পাঠালেন। ভূমিপুত্র নরকাসুর অচ্যুতের চক্রে ও বাণে নিজের সেনাপতি ও সৈন্য-সামন্তদের পরাস্ত এবং নিহত হতে দেখে মহাক্রোধে সমুদ্রজাত এক বিশাল হাতীর পিঠে চড়ে শ্রীকৃষ্ণকে আক্রমণ করল। ১-১৪

সত্যভামার সঙ্গে গরুড়ের উপর উপবিষ্ট শ্রীকৃষ্ণকে দেখে বোধ হচ্ছিল যেন সূর্যের উপরে বিদ্যুৎ-জড়িত মেঘ। নরকাসুর শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শতঘ্নী অস্ত্র নিক্ষেপ করল। তার পক্ষের অন্যান্য যোদ্ধারাও একত্রে তাঁর দিকে নানারকম অস্ত্রবৃষ্টি শুরু করল। গদাগ্রজ ভগবান তৎক্ষণাৎ বিচিত্র পুঙ্খবিশিষ্ট সুতীক্ষ্ণ বাণ দিয়ে ভৌমসৈন্যের ঘোড়া ও হাতীগুলিকে বধ করে কারও হাত, কারও উরু, কারও মাথা, কারও গ্রীবা, কারও বা দেহ ছিন্ন করলেন। যোদ্ধারা যে সব শরক্ষেপ করেছিল সেই সব শর তাঁর কাছে আসবার আগেই শ্রীকৃষ্ণ সেই সময়ে তত পরিমাণ শত্রুসৈন্য বধ করে তিন তিনটি শর দিয়ে তাদের ছিন্ন করলেন। শ্রীকৃষ্ণের বাহন গরুড়ও তাঁর দুই পাখার আঘাতে শত শত হাতী বিনাশ করতে লাগলেন। তার ঠোঁট, পাখা ও নখের আঘাতে কাতর হয়ে হাতীগুলি পালিয়ে গিয়ে নগরে ঢুকল। যুদ্ধক্ষেত্রে নরকাসুর নিজে ছাড়া আর কেউ রইল না। গরুড়ের দ্বারা নিজের সৈন্যরা বিতাড়িত হল দেখে নরকাসুর এমন ভীষণ এক শক্তি দিয়ে গরুড়কে আঘাত করল যে তার কাছে ইন্দ্রের বজ্রও তুচ্ছ হয়ে যায়। কিন্তু তাতেও গরুড় ফুলের মালার দ্বারা প্রহৃত গজপতির ন্যায় অটল রইলেন। নিজের উদ্যম বিফল হয় দেখে নরকাসুর শ্রীকৃষ্ণকে বিনাশ করার জন্য শূল হাতে নিল, কিন্তু তা নিক্ষেপ করার আগেই ভগবান শ্রীহরি তীক্ষ্ণধার চক্র দিয়ে গজারূঢ় নরকের শিরশ্ছেদ করলেন। কুণ্ডল ও সুন্দরকিরীটে ভূষিত তার মাথা মাটিতে পড়ে পৃথিবীর শোভা বৃদ্ধি

করল। ঋষি ও দেবতারা শ্রীকৃষ্ণকে সাধুবাদ দিয়ে ও পুষ্পবৃষ্টি করে তাঁর স্তব করতে লাগলেন। ১৫-২২

তারপর পৃথিবী (নরকাসুরের জননী) শ্রীকৃষ্ণকে উজ্জ্বল সোনা ও মণি-খচিত (অদিতির) দুই কুণ্ডল, ইন্দ্রের ছত্র, নানা রত্নগ্রথিত বৈজয়ন্তী বনমালা, মহামণি প্রভৃতি প্রত্যর্পণ করলেন ববং কৃতাঞ্জলি হয়ে ভক্তিযুক্ত হৃদয়ে প্রণাম করে দেবতাদেরও পূজনীয় বিশ্বপতির স্তব করে বলতে লাগলেন, হে শঙ্খ-চক্র-গদাধর দেবদেব ঈশ্বর, ভক্তের ইচ্ছানুযায়ী রূপধারী পরমাত্মা আপনাকে প্রণাম। কমললোচন, কমলনাভ, কমলচরণ, কমলমালাধারী, আপনাকে প্রণাম। হে ভগবান, বাসুদেব, বিষ্ণু, পুরুষশ্রেষ্ঠ, আদিবীজ, পূর্ণস্বরূপ, আপনাকে প্রণাম। হে বিশাল অনন্তশক্তিময়, জন্মরহিত অথচ পৃথিবীর জন্মদাতা, উৎকৃষ্ট অপকৃষ্টের পরমাত্মা, আপনাকে প্রণাম। প্রভু, আপনি নির্লিপ্ত হয়েও বিশ্বসৃষ্টির ইচ্ছায় উৎকট রজোগুণ, জগৎপালনের জন্য সত্ত্বগুণ ও জগৎ-সংহারের জন্য আছন্ন না হয়েও তমোগুণ ধারণ করেন। জগৎপতি, আপনি কাল, প্রকৃতি ও পুরুষ রূপে সর্বত্র বিরাজমান। হে ভগবান, পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, সূক্ষ্মভূত, মন, ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা দেবতারা, অহঙ্কার ও মহত্তত্ত্ব ইত্যাদি রূপে প্রতিভাত এই বিপুল ব্রহ্মাণ্ড অদ্বিতীয় আপনার মধ্যেই বর্তমান আছে।[১] লোকেরা আপনার এই পরমভাব না জেনে ভুল করে অন্যভাব উপলব্ধি করে। হে শরণাগত মানুষের দুঃখনাশকারী, আপনার ভয়ে ভীত ভৌমের পুত্র ভগদত্ত আপনার পাদপদ্মে শরণ নিল। একে পালন করুন, এর মাথায় আপনার কালপাপনাশক হাত রাখুন। ২৩-৩১

শুকদেব বললেন, ভগবান এইভাবে ভক্তিনম্র পৃথিবীর স্তুতিবাক্যে পূজিত হয়ে তাঁকে অভয় দান করে বিভিন্ন সমৃদ্ধি সম্পন্ন ভৌম-ভবনে প্রবেশ করলেন। নরকাসুর বিভিন্ন রাজাদের কাছ থেকে ষোল হাজার কন্যা অপহরণ করেছিল। শ্রীকৃষ্ণ এই রমণীদের সেই অন্তঃপুরে দেখতে পেলেন। তাঁরা তাঁকে প্রবেশ করতে দেখেই প্রেমে হতজ্ঞান হলেন এবং নিজেদের অভীষ্ট শ্রীকৃষ্ণকেই মনে মনে পতিরূপে বরণ করলেন। তাঁরা প্রত্যেকে মনে মনে প্রার্থনা করলেন বিশ্ববিধাতা পরমেশ্বর যেন তাঁদের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করেন। তাঁরা আলাদাভাবে প্রত্যেকে শ্রীকৃষ্ণকে হৃদয়ে ধ্যান করতে লাগলেন। ভগবান তাঁদের বন্দীদশা থেকে মুক্তি দিয়ে স্নান করালেন এবং দিব্য বস্ত্র ও দিব্য অলঙ্কারে ভূষিত করে সকলকে দ্বারকায় পাঠালেন। ভগবান কেশব বিপুল ঐশ্বর্যের ধনভাণ্ডার, রথ, অশ্ব এবং চতুর্দন্ত অতি বেগবান ঐরাবত কুলোৎপন্ন চৌষট্টিটি পাণ্ডুরবর্ণ হাতীও দ্বারকায় পাঠিয়ে দিলেন। তারপর শ্রীকৃষ্ণ সত্যভামা সহ সুরেন্দ্রভবন অমরাপুরীতে প্রবেশ করলেন এবং দেবেন্দ্রমাতা অদিতিকে কুণ্ডল দু'টি দিলেন। মহেন্দ্র ও ইন্দ্রাণী তাঁকে পূজা করলেন। কিন্তু সত্যভামার অনুরোধে স্বর্গের পারিজাত গাছটি তুলে গরুড়ের পিঠে রাখলে দেবতাদের সঙ্গে তাঁর বিষম যুদ্ধ শুরু হল। যুদ্ধে দেবতাদের পরাজয় হল এবং শ্রীকৃষ্ণ পারিজাত ফুলের গাছটি দ্বারকায় এনে সত্যভামার গৃহোদ্যানের শোভা বৃদ্ধির জন্য সেখানেই তাকে রোপণ করলেন। পারিজাত ফুলের গন্ধে ও মধুর লোভে স্বর্গ থেকে অলিকুল আত্মহারা হয়ে তাকে অনুসরণ করে দ্বারকায় এসেছিল। ইন্দ্র প্রণত হয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণযুগল নিজের মুকুটের অগ্রভাগ দিয়ে স্পর্শ করে স্বার্থসিদ্ধির জন্য তাঁর কাছে প্রার্থনা করে থাকেন। তাঁরই কৃপায় সিদ্ধমনোরথ হয়ে (নরকাসুর বধ ইত্যাদি ঘটনা) তিনিই আবার পারিজাতের জন্য ভগবানের

১ তুলনীয় : গীতা, ১১।৭ শ্লোক।

সঙ্গে যুদ্ধ করলেন। এতে দেবতাদেরও তমোগুণের পরিচয় পাওয়া গেল। ক্রোধ ও ঐশ্বর্যকে ধিক্। তারপর ভৌমাসুরের অন্তঃপুর থেকে ভগবান যত নারীকে নিয়ে এসেছিলেন তিনি তত রূপ ধরে এক শুভলগ্নে প্রত্যেকের আলাদা গৃহে এক সময়েই তাঁদের সকলকে বিবাহ করলেন। প্রত্যেক স্ত্রীর গৃহই অতুল সৌন্দর্যে সুশোভিত ছিল এবং বাসুদেব প্রত্যেকের গৃহেই অবিচ্ছেদ বাস করতে লাগলেন। নিজের ভক্ত কামিনীদের প্রার্থনায় বশীভূত হয়ে রমাপতি সাধারণ মানুষের মত গার্হস্থ্য ধর্মের অনুশীলন করে কমলার অংশ ঐ নারীদের সঙ্গে বিহার করতে লাগলেন। যাঁকে জানা ব্রহ্মা প্রভৃতির পক্ষেও কষ্টসাধ্য তাঁকে কাছে পেয়ে ঐ নারীরা অনুরাগে হাসি, দৃষ্টিপাত, মিলন ও স্বাভাবিক লজ্জায় তাঁর ভজনা করতে লাগলেন। যদিও প্রত্যেক স্ত্রীর শত শত দাসী ছিল, তবু তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যুদ্গমন, অভিবাদন, আদর-অভ্যর্থনা, আসনদান, পাদ-প্রক্ষালন, তম্বুলদান, চরণসেবা, ব্যজন, গন্ধলেপন, মাল্যদান, কেশ-প্রসাধন, শয্যারচনা, স্নান, উপহার প্রভৃতি দ্বারা নিজেরাই দাসীর মত ভগবানের সেবায় ব্যস্ত থাকতেন। ৩২-৪৫

ষষ্টিতম অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণ ও রুক্মিণীর কথোপকথন

শুকদেব বললেন, মহারাজ, একদিন শ্রীকৃষ্ণ ভীষ্মকনন্দিনী রুক্মিণীদেবীর গৃহে পালঙ্কের উপর শুয়ে ছিলেন। রুক্মিণী সখীদের সঙ্গে বাতাস করতে করতে জগদ্গুরু পতির সেবা করতে লাগলেন। যে ঈশ্বর লীলাচ্ছলে এই বিশ্বের সৃষ্টি, পালন ও বিনাশ করেন তিনি জন্মরহিত হয়েও স্বকৃত ধর্মের মর্যাদা রক্ষার জন্য যদুকুলে জন্ম নিয়েছিলেন। রুক্মিণীর গৃহ মুক্তাদাম শোভিত চন্দ্রাতপ, মণিময় দীপাবলী, মল্লিকা, ফুলের সুগন্ধে আকৃষ্ট ভ্রমরের ঝংকার—এই সবে মিলে অত্যন্ত রমণীয় হয়েছিল। গবাক্ষপথে পারিজাত-বনের সৌরভবাহী বাতাস ও জ্যোৎস্নালোক প্রবেশ করত, গৃহ অগুরুর গন্ধে আমোদিত হত। রুক্মিণীদেবী সেই গৃহে পালঙ্কে দুগ্ধ-ফেনানিভ শয্যায় শায়িত জগদীশ্বর শ্রীহরির সেবা করতে লাগলেন। তিনি সখীর হাত থেকে রত্নদণ্ডযুক্ত পাখা নিয়ে নিজেই বাতাস করতে আরম্ভ করলেন। তাঁর অঙ্গুরি আর বালা শোভিত ডান হাতে পাখা ধরা ছিল। বাতাস করার সময় দেহ সঞ্চালনে তার পায়ের মণিময় নূপুর ধ্বনিত হতে লাগল। বস্ত্রে আবৃত কুচযুগল কুঙ্কুমে রঞ্জিত, তার উপর মুক্তার হার ও নিতম্বে বেষ্টিত অমূল্য কাঞ্চীতে তিনি শোভা পাচ্ছিলেন। তাঁর রূপ লীলা-দেহধারী শ্রীকৃষ্ণেরই অনুরূপ। কেশদাম, কুণ্ডলযুগল, গলায় হারের পদক, মুখে মধুর হাসির ছটা, কৃষ্ণ-অন্ত-প্রাণ, স্বয়ং লক্ষ্মী রুক্মিণীদেবী শ্রীকৃষ্ণের কাছে ছিলেন। ১-৯

তাঁকে দেখে হৃষ্টমনে ভগবান বললেন, রাজদুলালী, ইন্দ্র প্রভৃতি লোকপালদের অনুরূপ বিভূতিশালী, মহানুভব, রূপবান, অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী উদার ও বলবান রাজারা তোমাকে প্রার্থনা করেছিলেন। মদনোন্মত্ত শিশুপাল তোমাকে পাবার ইচ্ছায় এসেছিলেন। তোমার ভাই এবং বাবাও তাঁদেরই কারো হাতে তোমাকে সম্প্রদান করেছিলেন প্রায়, কিন্তু তুমি তাঁদের উপেক্ষা করে আমার মত অনুপযুক্ত লোককে কি মনে করে বরণ করলে? প্রবলপরাক্রম জরাসন্ধ প্রভৃতি রাজাদের ভয়ে ভীত হয়ে আমি সমুদ্রের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছি, বলবানদের সঙ্গে

কলহ করেছি, রাজসিংহাসন প্রায় ত্যাগই করেছি। সুন্দরী, আমার মত আচার, ব্যবহার ও লোকধর্মে অনভিজ্ঞ লোকদের অনুসরণ যারা করে, পরিণামে তাদের কষ্ট পেতে হয়। আমরা ধন-সম্পত্তিহীন, তাই নিঃস্বরাই আমাদের ভালবাসেন। ধন, জন্ম, আকৃতি, প্রভাব ইত্যাদিতে যাঁরা সমকক্ষ তাঁদের মধ্যেই বন্ধুত্ব, বিবাহ এ-সব সম্পর্কের সম্ভব হয়। উত্তম ও অধমের কখনও বিবাহ বা বন্ধুত্ব হতে পারে না। তুমি তো দূরদর্শিনী নও, আমাদের এ-সব গুণহীনতা না জেনে আমাকে বরণ করেছ। নারদ প্রভৃতি নিঃস্ব ভিক্ষুক ছাড়া অন্য কেউ আমাদের মর্যাদা দেয় না। এখন তোমার অনুরূপ শ্রেষ্ঠ কোন ক্ষত্রিয়কে ভালবাসা তোমার কর্তব্য, তাতে ইহকাল ও পরকালে সুখ পাবে। তবে আমি যে সবার সামনে তোমাকে হরণ করে এনেছি, তার কারণ জরাসন্ধ, শাল্ব, চৈদ্য, দন্তবক্র প্রভৃতি রাজারা এমনকি তোমার ভাই রুক্মী পর্যন্ত আমার শত্রুতা করে থাকে। বীর্যমদে অন্ধপ্রায় এই গর্বিত ব্যক্তিদের অভিমান চূর্ণ করার ইচ্ছায় আমি তোমাকে সেখান থেকে হরণ করে এনেছি। আমরা দেহে ও গৃহে উদাসীন। স্ত্রী, পুত্র ও ধনের জন্য আমাদের কামনা নেই। অন্তরের আত্মলাভেই পূর্ণ আমি। দীপশিখার মত পরের কাজের সাক্ষীস্বরূপ হয়ে নিজে স্বার্থরহিতভাবে অবস্থান করি। ১০-২০

শুকদেব বললেন, মহারাজ, রুক্মিণী কৃষ্ণসঙ্গ লাভ করে মনে করেছিলেন ভগবান অন্যান্যদের থেকে তাঁকেই বেশি ভালবাসেন। ভগবান তাঁর সেই অভিমান চূর্ণ করার ইচ্ছায় এ রকম বলে থামলেন। লোকপালদের অধীশ্বর প্রিয় স্বামীর এই অশ্রুতপূর্ব, অপ্রিয় বাক্য শুনে ভয়ে দেবী রুক্মিণী মনে খুবই আঘাত পেলেন। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে বিচ্ছেদের ভয়ে তাঁর হৃৎকম্প উপস্থিত হল। তিনি অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে কাঁদতে লাগলেন। সুন্দর কোমল চরণ দ্বারা তিনি যেন কিছুক্ষণ মাটিতে (মেঝেতে) কিছু লিখতে লাগলেন। কাজলরঞ্জিত চোখের জল অবিরল ঝরে গড়িয়ে পড়ে তাঁর কুংকুমলিপ্ত স্তনযুগলকে সিক্ত করতে লাগল। দুঃখের আবেগে তাঁর কণ্ঠরোধ হয়ে গেল। তিনি আনতমুখে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। স্বামীর অপ্রিয় ভাষণে দুঃখ, বিচ্ছেদ-আশংকা ও অনুতাপে রুক্মিণীর বুদ্ধি একান্ত বিহ্বল হয়ে পড়ল। দেহ এত দুর্বল ও ক্ষীণ হয়ে পড়ল যে তাঁর মণিবন্ধ থেকে রত্নবালা খসে পড়ে গেল, শিথিল মুষ্টি থেকে পাখা স্খলিত হয়ে পড়ল। তাঁর চৈতন্য ক্রমশ বিলুপ্ত হয়ে এল। ঝড়ে আহত কদলী বৃক্ষের মত তাঁর সুকোমল দেহতনু চুলের রাশি চারদিকে ছড়িয়ে মাটিতে পড়ে গেল। উপহাসের গভীর তত্ত্বে প্রিয়ার এ রকম অনভিজ্ঞতা ও তার প্রেমবন্ধন দেখে শ্রীকৃষ্ণ তাড়াতাড়ি শয্যা থেকে নেমে তাঁকে তুললেন এবং কেশপাশ বেঁধে করকমল দিয়ে তাঁর মুখ মুছিয়ে দিলেন। তারপর পরম কৃপার প্রিয়ায় অশ্রুসিক্ত চোখদু'টি ও শোকাশ্রু প্লাবিত কুচযুগল মুছিয়ে অনন্যপরায়ণা সতীকে দুই বাহু দিয়ে আলিঙ্গন করে সান্ত্বনা দিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃত শরণাগতা একনিষ্ঠা কামিনীর চিত্তবিনোদনে যথেষ্ট পারদর্শী ছিলেন, তাই উপহাসে অনভিজ্ঞা সরলহৃদয়া রুক্মিণীকে নানা রকম প্রণয়বাক্যে সান্ত্বনা দিলেন। তিনি বললেন, বিদর্ভকন্যা, তুমি আমার উপর দোষারোপ করে বিরক্ত হয়ো না; আমি যে তোমার একমাত্র অবলম্বন তা আমি বেশ জানি। তোমার সঙ্গে আমার পরিহাস চলে তাই আমার কথায় রেগে গিয়ে তুমি কি বল তা শোনার জন্যই আমি পরিহাস করে এরকম বলেছি। প্রণয়কোপে স্ফুরিত অধর ও ভ্রূকুটিযুক্ত রক্তিম আঁখির কটাক্ষে তোমার মুখমণ্ডলের কি রকম শোভা হয় তা-ই দেখার জন্য আমি তোমার সঙ্গে এরকম আলাপ করেছি। ভামিনী, প্রেয়সীর সঙ্গে প্রেমালাপপূর্ণ পরিহাস করে সময় কাটানো গৃহস্থদের পক্ষে অত্যন্ত প্রীতিপ্রদ। শুকদেব বললেন,

মহারাজ, বিদর্ভতনয়া ভগবানের কাছ থেকে এরকম সান্ত্বনা লাভ করে এবং পরিহাসচ্ছলেই তিনি ঐভাবে কথা বলেছেন তা জানতে পেরে আশ্বস্ত হলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে পরিত্যাগ করবেন সে ভয়ও তাঁর অন্তর্হিত হল। ২১-৩২

হে ভারত, রুক্মিণী তখন সলজ্জ হাসি সহ মৃদু মধুর স্নিগ্ধ অপাঙ্গ দৃষ্টিতে ভগবানের মুখ দর্শন করে শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপনের জন্য আগের কথাগুলির প্রকৃত অর্থ ব্যাখ্যা করে বলতে লাগলেন। রুক্মিণী বললেন, হে পদ্মপলাশলোচন, আপনি সর্বব্যাপক ও সর্ব-ঐশ্বর্যপূর্ণ। আপনি যে বলেছেন আমি আপনার তুলনীয় নই, তা সত্যিই, কারণ আপনি তিনের[১] নিয়ন্তা, নিজ মহিমায় পরিপূর্ণ আর আমি তিন গুণযুক্ত মূঢ় কামীদের পূজনীয়া ; কত বিভিন্নতা! হে বিশালবিক্রম, হে নিরবচ্ছিন্ন জ্ঞানঘন আত্মা, আপনি রাজাদের ভয়ে সমুদ্রে বাস করছেন একথা সত্য। কেননা সব সময় আপনি ভক্তদের হৃদয়-সমুদ্রে বিরাজিত। ইন্দ্রিয় যাদের বহির্মুখ[২] তাদের সংগে আপনার বিরোধ। রাজপদ গভীর অজ্ঞানময়। সে তো আপনার সেবকরাই ত্যাগ করেছেন, আপনার আর কথা কি? আপনার ভক্ত মুনিদের আচরণ দুর্বোধ্য, সাধারণ মনুষ্যদেহী পশুরা তা বুঝতে পারে না। যাঁরা আপনার অনুসরণ করেন তাঁদের চরিত্রও অলৌকিক, অতএব আপনি স্বয়ং ঈশ্বর, আপনার চরিত্র তো অলৌকিক হবেই। আপনি নিষ্কিঞ্চন নন, অনেকে যে ব্রহ্মার সেবা করে তিনিও আপনার জন্য পূজার উপহার সংগ্রহ করেন। আর জগতে আপনি ছাড়া কিছুই নেই। ধনমদে অন্ধ ইন্দ্রিয়াধীন মানুষরা কালস্বরূপ আপনাকে বুঝতে পারে না। আপনি জীবকে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ দান করে থাকেন। আপনি পরমানন্দ স্বরূপ পরমাত্মা। আপনাকে দর্শন করার ইচ্ছায় বুদ্ধিমান ও বিবেকীরা সাংসারিক সমস্ত বস্তুই পরিত্যাগ করেন। ব্রহ্মাদির সংগে সম্বন্ধই আপনার যোগ্য, আমাদের মত স্ত্রী-পুরুষের সংগে লৌকিক সম্বন্ধ আপনার যোগ্য নয়, কারণ আমরা সুখে দুঃখে আকুল হই। ৩৩-৩৮

ভিক্ষাজীবী মুনিরাই আপনার শক্তি জানেন। আপনি জগতের আত্মা এবং আত্মপ্রদ একথা জেনেই আমি ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবতাদের ত্যাগ করেও আপনাকেই বরণ করেছি। আপনার থেকে যে কালের উৎপত্তি হয়েছে তা দিয়ে তাঁদের অমংগল দূর হয়েছে, অতএব অন্য রাজাদের কথায় কাজ কি? হে গদাগ্রজ, সিংহ যেমন গর্জন করে অন্যান্য জন্তুদের তাড়িয়ে আপন অংশ অধিকার করে, আপনিও সেরকম শিংগার শব্দে সমস্ত ক্ষত্রিয়রাজদের তাড়িয়ে আপনার নিজের অংশ আমাকে হরণ করেছিলেন। সেই আপনি যে রাজাদের ভয়েই সমুদ্রের শরণ নিয়েছেন একথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। হে কমললোচন, আপনার দর্শনের প্রার্থনায় অংগ, পৃথু, ভরত, যযাতি, গয় প্রভৃতি অন্যান্য রাজচক্রবর্তীরা রাজ্য, সম্পদ, একাধিপত্য পরিত্যাগ করে বনে প্রবেশ করেছেন এবং কঠোর সাধনায় আপনাকে পেয়েছেন। আপনি গুণের আশ্রয়, আপনার চরণকমলের সৌরভ লক্ষ্মীদেবীর সেব্য, সাধুদের বর্ণনার বিষয় ও মানুষের মোক্ষফলদাতা ঐ সৌরভ একবার আঘ্রাণ করলে কোন্ স্বচ্ছদৃষ্টি নারী মরণশীল ও সংসারভয়ে ভীত ব্যক্তিকে আশ্রয় করবে?[৩] তাই, হে কৃষ্ণ, জগতের অধীশ্বর, আত্মা ও সর্বান্তর্যামী, ইহ ও পরকালের অভিলাষ-পূরণকারী আপনাকেই আমি বরণ করেছিলাম। আমি দেব, তির্যক নানা

১ তিন—রজ, সত্ত্ব ও তম গুণ অথবা ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর।
২ তুলনীয়: কঠ উপনিষৎ, ২।১।১ শ্লোক। ৩ শ্বেতাশ্বতর উপ: ৪।২১

যোনিতে ভ্রমণ করার পরও আপনার শ্রীচরণের শরণাপন্ন হয়েছি। যিনি আপনাকে ভজনা করেন, আপনি তাঁকে নিজের করে নেন এবং তাঁর সমস্ত সাংসারিক প্রার্থনারই নিরসন হয়।[১] আপনি আমার প্রতিও ঐরকম অনুগ্রহ প্রকাশ করুন। ৩৯-৪৩

হে শত্রুনাশন, আপনার লীলামৃত শিব ও ব্রহ্মার সভায় সুন্দরভাবে পরিবেশিত হয়ে থাকে। লীলাপ্রসঙ্গ যাদের কানে কখনো যায় নি সেই নারীরাই গর্দভ, বৃষ, কুকুর, বিড়াল ও ভৃত্যের অনুকরণে গৃহস্থাশ্রমে আপনার উল্লিখিত নারীসেবী রাজাদের পতিরূপে লাভ করুক। যে মূঢ় নারী আপনার চরণ-কমলের সৌরভ কখনো আঘ্রাণ করে নি সে ত্বক, শ্মশ্রু, রোম, নখ ও কেশদ্বারা আবৃত মাংস, অস্থি, রক্ত, কৃমি, বিষ্ঠা, কফ, পিত্ত ও বাতে পরিপূর্ণ জীবিত শবরূপী ঐ সমস্ত রাজন্যবর্গ প্রভৃতি পুরুষের ভজনা করে থাকে। আপনি আত্মাতেই নিরত, আমার প্রতি আপনার চিত্ত আসক্ত হবার কোন কারণ নেই। কিন্তু আমার চিত্ত আপনার চরণকমলে নিত্য অনুরক্ত থাকুক। অনন্ত বিশ্ব-সংসারের শ্রীবৃদ্ধির কামনায় আপনি রজোগুণকে স্বীকার করে যখন আমার দিকে দৃষ্টিপাত করেন তখনই আমার প্রতি ও অন্যান্য সকল শক্তির প্রতিই আপনার (ভগবৎ) অনুগ্রহের প্রকাশ হয়। হে মধুসূদন; আপনি যে অনুরূপে কোন ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠকে বরণ করতে বলেছেন সে কথা মিথ্যা নয়। কেননা জগতে কোন কোন কামিনী নিজের (যথেষ্ট যোগ্য ও উপযুক্ত) স্বামী থাকা সত্ত্বেও পর-পুরুষে আসক্ত হয়, কাশিরাজের মেয়ে অম্বার শাল্বরাজার প্রতি আসক্তি হয়েছিল। বিবাহিতা কামিনীর মন অন্য পুরুষে গেলে তার নূতনতরের প্রতি দুর্বার আসক্তি হয়ে থাকে। বুদ্ধিমান লোক কখনো অসতী স্ত্রীর ভরণ করেন না, কেননা তা হলে তাঁর ইহলোক পরলোক দুইই নষ্ট হবে। ৪৪-৪৮

ভগবান বললেন, সাধ্বী রাজনন্দিনী, তোমার এই সব উক্তি শোনার ইচ্ছায় আমি তোমার সঙ্গে রহস্য করেছি। আমার সব কথার ভাবের ব্যাখ্যা তুমি যে রকম করেছ, তা যথার্থ। সব মঙ্গলের আস্পদ, হে ভামিনী, সাংসারিক সুখের জন্য সমস্ত কামনার নিরসনের উদ্দেশ্যে তুমি যে বর প্রার্থনা করেছ সে সবই তোমার রয়েছে। হে নিষ্পাপ, আমি তোমার পতিপ্রেম ও পাতিব্রত্য ধর্ম উপলব্ধি করেছি, কেননা আমার পরিহাসে তোমার ক্ষোভ জন্মালেও আমার থেকে তোমার মন বিচ্যুত হয় নি। আমি মোক্ষের অধীশ্বর। নানা তপস্যা ও ব্রতচারণ দ্বারা স্বামী-স্ত্রীর উপভোগ্য সুখের জন্য যে কামাত্মা নারীরা আমার ভজনা করে, তারা আমার মায়ায় মুগ্ধ। হে মানিনী, মুক্ত ও জাগতিক সম্পত্তি আমার মধ্যে অবস্থিত, যাবতীয় সম্পত্তির অধীশ্বর আমি। যাঁরা আমাকে লাভ করে ও আমার কাছে সম্পত্তি প্রার্থনা করে, তাঁরা মন্দভাগ্য। নিকৃষ্ট যোনিতে জন্ম হলেও সম্পত্তির উপভোগ হতে পারে। ঐ সব লোকের আত্মা বিষয়েই নিবিষ্ট, নিকৃষ্ট যোনিতেই তাদের জন্ম শোভা পায়। তাই গৃহেশ্বরী, তুমি যে বারবার আমার নিষ্কাম পরিচর্যা করেছ তার পরিণাম অতি মঙ্গলময়। যারা পরের কথা চিন্তা না করে শুধু নিজের ইন্দ্রিয়সুখের জন্য সব সময় ব্যস্ত, তেমনি দুষ্টবুদ্ধি পুরুষের পক্ষে ঐরকম সেবা করা সম্ভব নয়। কাজেই ঐরকম প্রকৃতির স্ত্রীলোকের পক্ষে যে তা খুব দুষ্কর হবে তাতো বলাই বাহুল্য। ৪৯-৫৪

১ তুলনীয়: অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্‌॥ গীতা, ৯।২২

মানিনী, অন্য সব পত্নীদের মধ্যে তোমার মত প্রণয়িনী গৃহিণী আর দেখি না। তুমি লোকের মুখে আমার কথা শুনে স্বয়ংবর সভায় উপস্থিত রাজাদের উপেক্ষা করে অতি গোপনে একজন ব্রাহ্মণকে দিয়ে আমাকে সংবাদ দিয়েছিলে। আমি তোমার দাদাকে যুদ্ধে পরাজিত করে তোমার সামনেই তাকে বিরূপ করেছিলাম। পরে অনিরুদ্ধের বিবাহের সময় দ্যূত-সভায় তার জীবন পর্যন্তও আমরা নষ্ট করেছি। কিন্তু আমার জন্য তুমি ভ্রাতৃশোকও অবলীলাক্রমে সহ্য করেছ, কখনো কোন কটূক্তি করনি। এই সব গুণেই তুমি আমাকে বশ করেছ। তুমি আমাকে পাবার জন্য তোমার উদ্দেশ্য সুন্দরভাবে দূতের মাধ্যমে জানিয়েছ। আমার যেতে দেরি দেখে সংসার শূন্যময় ভেবে দেহত্যাগ করতেও সংকল্প করেছিলে। তোমার কর্ম তোমারই থাকুক, আমরা তার প্রশংসা করা ছাড়া প্রতিদানে কিছু করতে সম্পূর্ণ অক্ষম। ৫৫-৫৭

শুকদেব বললেন, মহারাজ, ভগবান নিজে আত্মারাম ও পূর্ণকাম হয়েও মানুষের অনুকরণে লক্ষ্মীর অবতাররূপী রুক্মিণীর সঙ্গে প্রেমালাপে আনন্দে বিহার করতে লাগলেন। প্রভু লোকগুরু হয়েও গৃহীর মত অন্যান্য মানিনীদের গৃহেও গার্হস্থ্য-ধর্মের আচরণ করে অবস্থান করতে লাগলেন। ৫৮-৫৯

একষষ্টিতম অধ্যায়

রুক্মী-বধ

শুকদেব বললেন, মহারাজ, শ্রীকৃষ্ণের পূর্বের মহিষীরা প্রত্যেকে দশটি করে পুত্র প্রসব করেছিলেন। ঐ সব পুত্ররা আত্মসম্পত্তিতে (সাদৃশ্য ও গুণে) পিতার সমান ছিলেন। ভগবান যে আত্মারাম, তা মহিষীরা জানতেন না ; সেই জন্য তাঁরা প্রত্যেকে নিজের গৃহে সবসময় তাঁকে থাকতে দেখে মনে করতেন যে, শ্রীকৃষ্ণ শুধু তাঁকেই ভালবাসেন। পদ্মকোষের মত মুখমণ্ডল, আজানুলম্বিত বাহু, আকর্ণায়ত চক্ষু, সপ্রেম দৃষ্টি ও মনোহর বাক্যে সম্মোহিত হয়ে নিজ নিজ বিভ্রমে তাঁরা কেউই সেই আত্মানন্দে পরিপূর্ণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মন বশীভূত করতে পারেন নি। ষোল সহস্র বনিতা তাঁদের গূঢ় হাস্যময় কটাক্ষ, ভ্রূভঙ্গী প্রভৃতি নানা কামোদ্দীপক ভাব ও কামশাস্ত্রের অন্যান্য উপায় দ্বারাও শ্রীকৃষ্ণের মন বশ করতে সমর্থ হন নি। ব্রহ্মা প্রভৃতিরাও যাঁর স্বরূপ জানতে পারেন না, ঐ সব কামিনী সেই রমাপতিকে পতিরূপে পেয়ে সব সময় ক্রমবর্ধিত অনুরাগপূর্ণ হাসি, দৃষ্টিপাত, নবমিলন প্রভৃতি বিলাস-সম্ভোগ করতে লাগলেন। তাঁরা প্রত্যেকে শত দাসীর অধীশ্বরী ছিলেন, তবু শ্রীকৃষ্ণ আসার সঙ্গে সঙ্গে উঠে তাঁকে আসন, পূজা-সামগ্রী. পাদপ্রক্ষালনের জল, তাম্বুল ইত্যাদি দিয়ে এবং পাদমর্দন, গন্ধপুষ্প ও মাল্যদান, কেশ-প্রসাধন, স্নান, উপহার, ব্যজন প্রভৃতির দ্বারা পতির শুশ্রূষা-কাজে সর্বদা নিজেরাই লিপ্ত হতেন। ১-৬

শ্রীকৃষ্ণের মহিষীদের মধ্যে যে আটজনের দশটি করে পুত্র জন্মেছিল সেই রুক্মিণী প্রভৃতির নাম বলেছি। এখন তোমার কাছে তাঁদের পুত্র প্রদ্যুম্ন প্রভৃতির বর্ণনা করি তুমি শোন। রুক্মিণীর গর্ভে প্রদ্যুম্ন, চারুদেষ্ণ, সুদেষ্ণ, চারুদেহ, সুচারু, চারুগুপ্ত, ভদ্রচারু, চারুচন্দ্র, বিচারু ও চারু—এই দশটি পুত্র জন্মেছিলেন। এঁরা পিতর,

মত রূপ ও গুণের অধিকারী ছিলেন। সত্যভামার দশ পুত্র হল ভানু, সুভানু, স্বর্ভানু, প্রভানু, ভানুমান, চন্দ্রভানু, বৃহদ্ভানু, অবিভানু, শ্রীভানু ও প্রতিভানু। জাম্ববতীর গর্ভে সাম্ব, সুমিত্র, পুরুজিৎ, শতজিৎ, সহস্রজিৎ, বিজয়, চিত্রকেতু, বসুমান, দ্রবিড় ও ক্রতু এই দশটি পুত্র জন্মে। এঁরা সকলেই পিতার অনুরূপই ছিলেন। নগ্নজিৎকন্যার (সত্যার) গর্ভে বীর, চন্দ্র, অশ্বসেন, চিত্রগু, বেগবান, বৃষ, আম, শঙ্কু, বসু ও কুন্তি নামে দশটি শ্রীসম্পন্ন পুত্র জন্মেছিলেন। কালিন্দীর পুত্ররা ছিলেন শ্রুত, কবি, বৃশ, বীর, সুবাহু, ভদ্র, শান্তি, দর্শ, পূর্ণমাস ও সোমক। প্রঘোষ, গাত্রবান, সিংহ, বল, প্রবল, ঊর্ধ্বগ, মহাশক্তি, সহ, ওজ ও অপরাজিত—এঁরা মাদ্রী বা লক্ষণার পুত্র। মিত্রবিন্দার পুত্র বৃক, হর্ষ, অনিল, গৃধ্র, বর্ধন, অন্নাদ, মহাংশ, পবন, বহ্নি ও ক্ষুধি। ভদ্রার পুত্ররা সংগ্রামজিৎ, বৃহৎসেন, শূর, প্রহরণ, অরিজিৎ, জয়, সুভদ্র, রাম, আয়ু ও সত্যক। রোহিণীর গর্ভেও দীপ্তিশালী তাম্রতপ্ত প্রভৃতি পুত্ররা জন্মগ্রহণ করেছেন। মহারাজ, ভোজকট নগরে রুক্মিকন্যা রুক্মবতীর গর্ভে প্রদ্যুম্নের ঔরসে প্রবলপরাক্রম অনিরুদ্ধের জন্ম হয়। এঁদের এবং অন্যান্য শ্রীকৃষ্ণ-পুত্রদের কোটি কোটি পুত্র-পৌত্রাদি জন্মে, কেন না শ্রীকৃষ্ণ-সন্তানদের মায়েরাই সংখ্যায় ষোল হাজার ছিলেন। ৭-১৯

রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, ভগবান, রুক্মী যুদ্ধে পরাজিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণকে বধ করার জন্য সব সময় সুযোগ খুঁজতেন। এ রকম শত্রুতা থাকা সত্ত্বেও শত্রুপুত্রকে তিনি কন্যাদান করলেন, শত্রুতে শত্রুতে এরকম বৈবাহিক সম্পর্ক কীভাবে ঘটেছিল, বলুন। যোগীরা ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান এবং ইন্দ্রিয়ের অগোচর দূরের ও অন্তরালের সব কিছুই দেখতে পান। শুকদেব বললেন, যদিও শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা অপমানিত হয়ে রুক্মী মনের মধ্যে সর্বদা শত্রুতা পোষণ করত তবু ভগ্নীর প্রীতি-সাধন করবার জন্য ভাগিনেয় প্রদ্যুম্নকে কন্যাদান করেছিল। রুক্মবতী মূর্তিমান অনঙ্গের মত প্রদ্যুম্নকে পতিত্বে বরণ করলে তিনি সমবেত রাজাদের পরাজিত করে তাঁকে হরণ করেন। কৃতবর্মার পুত্র বলবান বলী আবার রুক্মিণীর কন্যা বিশালাক্ষী চারুমতিকে বিবাহ করেন। শ্রীহরির সঙ্গে রুক্মীর পরম শত্রুতা ছিল, তাই ঐ রকম বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন ধর্মসঙ্গত নয় জেনেও ভগ্নীর প্রীতির জন্য সে শ্রীকৃষ্ণদৌহিত্র অনিরুদ্ধের কাছে নিজের পৌত্রী রোচনাকে সম্প্রদান করেছিল। সেই উৎসব উপলক্ষে রুক্মিণী, বলরাম, শ্রীকৃষ্ণ, শাম্ব, প্রদ্যুম্ন প্রভৃতি ভোজকট নগরে উপস্থিত হলেন। সেখানে বিবাহকার্য সুসম্পন্ন হয়ে গেলে কলিঙ্গ প্রভৃতি দর্পিত রাজারা রুক্মীকে পাশা খেলে বলরামকে পরাজিত করার পরামর্শ দিলেন। বলরাম পাশা খেলায় পারদর্শী না হলেও এই খেলায় তাঁর ঝোঁক ছিল খুব বেশি। ২০-২৭

রুক্মী বলরামকে ডেকে পাশা খেলতে বসলেন। বলরাম ক্রমান্বয়ে শত, সহস্র ও দশ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা বাজি রেখে রুক্মীর কাছে হেরে গেলেন। কলিঙ্গরাজ দাঁত দেখিয়ে বলরামকে উপহাস করায় তিনি তা সহ্য করতে না পেরে আবার পাশা খেলায় প্ররোচিত হলেন। রুক্মী লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা পণ ধরে বলরামকে খেলতে বসাল। বলরাম তা জয় করে নিলেন, কিন্তু রুক্মী শঠতা করে বলল যে তারই জয় হয়েছে। পূর্ণি-মাদি পর্বদিনে সমুদ্র যেমন ক্ষুব্ধ হয়, বলরাম সে রকম ক্ষুব্ধ হয়ে আরক্ত নয়নে এবার দশকোটি মুদ্রা পণ ধরলেন এবং জিতেও গেলেন সহজেই। কিন্তু রুক্মী ছল করে বলে উঠল, এই খেলায় আমিই জয়ী হয়েছি, এখানে পাশে যাঁরা আছেন তাঁরাই বলুন না। এ সময় আকাশবাণী ধ্বনিত হল যে বলরামই ধর্ম অনুসারে বাজি জিতেছেন। রুক্মী কপটতা করে বলছে যে সে জয়লাভ করছে, তার কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা। বিদর্ভপুত্র রুক্মী কালের মায়ায় ঐ দৈববাণী অগ্রাহ্য করল এবং পরামর্শ করে বলরামকে

উপহাস করে বলতে লাগল, তোমরা অক্ষক্রীড়ায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। রাজারাই পাশা ও বাণ দিয়ে খেলে থাকেন। তোমাদের মত অরণ্যবাসী পশুপালকদের এ কাজ নয়। রুক্মীর এই রকম কথা ও রাজাদের উপহাসে বলরাম ক্রুদ্ধ হলেন এবং পরিঘ (মুদগর) হাতে নিয়ে সেই মঙ্গল-সভায়ই রুক্মীকে সংহার করলেন। যে কলিঙ্গরাজ দাঁত দেখিয়ে উপহাস করেছিল বলরাম দশ পা লাফিয়ে তাকে ধরে তার দাঁতগুলি উপড়ে ফেললেন। অন্যান্য উপস্থিত রাজারা বলরামের পরিঘে আঘাতে পীড়িত, ভগ্নবাহু, ভগ্ন-উরু, ভগ্নশির ও রক্তাক্তকলেবর হয়ে ভয়ে সভা থেকে পালিয়ে গেল। ২৮-৩৮

মহারাজ, শ্যালক রুক্মী বলরামের হাতে নিহত হওয়ায় শ্রীহরি রুক্মিণী বা বলরাম কাউকেই কিছু বললেন না। কেন না, স্ত্রী বা ভাই কারো প্রতি স্নেহভঙ্গ হয় তা তাঁর ইচ্ছা ছিল না। এরপর বলরাম মধুসূদনের আশ্রিত যদুরা প্রয়োজনীয় সমস্ত কাজ সম্পন্ন করে নব বরবধূ অনিরুদ্ধ ও রোচনাকে রথে উঠিয়ে ভোজকট থেকে কুশস্থলীতে ফিরে এলেন। ৩৯-৪০

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়

বাণ কর্তৃক কৃষ্ণপৌত্র অনিরুদ্ধের বন্ধন

রাজা পরীক্ষিৎ বললেন, মহাযোগী, যদূত্তম অনিরুদ্ধ বাণের কন্যা ঊষাকে বিবাহ করেন। সেই বিয়েতে শ্রীকৃষ্ণ ও শঙ্করের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ হয়েছিল, শুনেছি। আপনি এই ঘটনা সবিস্তারে বলুন। ১

শুকদেব বললেন, মহারাজ, মহাত্মা বলিরাজার একশ পুত্রের মধ্যে বাণ জ্যেষ্ঠ ছিলেন। বাণ মহাদেবের পরম ভক্ত, মান্য, বদান্য, বুদ্ধিমান, সত্যপ্রতিজ্ঞ ও দৃঢ়চেতা ছিলেন। তিনি আগে রমণীয় শোণিতপুরে রাজত্ব করতেন এবং মহাদেবের কৃপায় তাঁর কাছে দেবতারাও কিঙ্করের মত থাকতেন। মহাদেব শঙ্কর যখন তাণ্ডবনৃত্য করতেন তখন তিনি তাঁর সহস্রবাহু দিয়ে অপূর্ব বাদ্যধ্বনি করে গিরিশের তুষ্টি সাধন করতেন। ভক্তবৎসল, সর্বভূতের শরণদাতা, ভগবান ত্রিলোচন সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে বর প্রার্থনা করতে বলেছিলেন। তখন রাজা বাণ তাঁকে তাঁর পুররক্ষক হয়ে থাকার জন্য প্রার্থনা করেছিলেন। এরপর বীর্যগর্বে গর্বিত বাণরাজ একদিন তাঁর সূর্যের মত তেজোময় কিরীট অবনত করে মহাদেবের চরণস্পর্শ করে বললেন, মহাদেব, আপনি অল্পে তুষ্ট, সকলের কামপূরক ও কল্পতরু, আপনাকে প্রণাম করি। আপনার প্রসাদে পাওয়া সহস্রবাহু এখন আমার কাছে ভারস্বরূপ মনে হচ্ছে। কারণ ত্রিলোকের মধ্যে আপনি ছাড়া আমার যোগ্য প্রতিযোদ্ধা আমি কাউকে দেখতে পাচ্ছি না। বল ও বীর্যের প্রভাবে যুদ্ধের উত্তেজনায় আমি এইসব হাত দিয়ে পর্বতের পর পর্বত তুলে চূর্ণ-বিচূর্ণ করেছি। যুদ্ধের জন্য দিগ্‌গজদের কাছে ছুটে গেছি, অথচ তারাও ভয় পেয়ে পালিয়ে গিয়েছে। ২-৭

এই কথা শুনে মহাদেব ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, মূঢ়, যেদিন তোমার এই ময়ূর চিহ্নিত ধ্বজা ভেঙ্গে পড়বে সেদিন নিশ্চয় জেনো আমার সমান কারো সঙ্গে তোমার দর্পনাশক যুদ্ধ হবে। এই কথা শুনে নির্বোধ বাণ খুশি হয়ে ঘরে ফিরে গেলেন

এবং মহাদেবের কথানুযায়ী ধ্বজা ভেঙ্গে পড়বার প্রতীক্ষায় দিন গুনতে লাগলেন। এই বাণরাজার উষা নামে এক কন্যা ছিলেন। বিয়ের আগেই সেই কন্যা অজ্ঞাতকুলশীল ও সম্পূর্ণ অপরিচিত প্রদ্যুম্ন-পুত্র অনিরুদ্ধের সঙ্গে স্বপ্নের মধ্যে বিহারসুখ লাভ করেন। পরে স্বপ্নের মধ্যেই অনিরুদ্ধকে আর দেখতে না পেয়ে, হে প্রিয়তম, কোথায় গেলে, বলে আকুল হয়ে চিৎকার করে সখীদের মাঝখানে জেগে উঠলেন। পরে স্বপ্নের ঘোর কাটলে তিনি লজ্জিত হলেন। বাণরাজার মন্ত্রী কুম্ভাণ্ডের কন্যা চিত্রলেখা উষার সখী ছিলেন। তিনি স্বপ্নের মধ্যে উষার ঐ চিৎকার শুনে কৌতূহলী হয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, সখি, তুমি কার খোঁজ করছ? তুমি তো অবিবাহিত, তোমার আবার কান্ত কে? আমাকে খুলে বল। ৮-১৫

উষা বললেন, সখি, আমি স্বপ্নে একজন শ্যামবর্ণ পুরুষকে দেখেছি। তাঁর দীর্ঘ বাহু, পদ্মের মত চক্ষু, পরনে পীতবস্ত্র। কামিনীদের মনোরঞ্জনকারী তিনি। আমি তাঁরই অন্বেষণ করছি। আমাকে তাঁর অধর-সুধা পান করিয়ে তৃপ্ত না করেই তিনি কোথায় চলে গেলেন। ১৬-১৭

চিত্রলেখা বললেন, সখি, চিন্তা করো না। তোমার দুঃখ আমি দূর করব। তোমার মন-হরণকারী যদি ত্রিভুবনেব কোথাও থাকেন, তা হলে আমি তাঁকে এখানে এনে উপস্থিত করব। এই আমি সকলের চিত্র আঁকছি[১], তা থেকে তুমি তোমার বর চিনে নাও। একথা বলে চিত্রলেখা দেবতা, গন্ধর্ব, সিদ্ধ, চারণ, দৈত্য, বিদ্যাধর, যক্ষ ও শ্রেষ্ঠ সব মানুষদের প্রতিকৃতি আঁকলেন। মানুষদের মধ্যে বৃষ্ণিবংশের বলবান আনকদুন্দুভি, বলরাম, কৃষ্ণ ও প্রদ্যুম্নের চিত্র সুন্দর করে আঁকলেন। প্রদ্যুম্নের চিত্র দেখে উষা লজ্জা পেলেন (শ্বশুর জ্ঞানে)। তারপর অনিরুদ্ধের প্রতিকৃতি চিত্রপটে সুস্পষ্টভাবে আঁকা হলে উষার আর আনন্দের সীমা রইল না। আনন্দের উচ্ছ্বাসে বিকসিতবদনা উষা লজ্জাবনতা হয়ে বললেন, এই তিনি। শ্রীকৃষ্ণপৌত্র অনিরুদ্ধই উষার প্রিয়তম একথা বুঝতে পেরে চিত্রলেখা যোগবলের সাহায্যে আকাশপথে অবলীলায় কৃষ্ণ-দ্বারকায় পেঁছিলেন। সেখানে সুন্দর খাটে নিদ্রিত অনিরুদ্ধকে যোগবলে তুলে আবাব শোণিতপুরে এনে উষাকে প্রিয়দর্শন করালেন। রাজকন্যা উষা স্বপ্নের দেখা বরকে চাক্ষুষ দেখতে পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হলেন। তাঁকে পুরুষের দুষ্প্রবেশ্য তাঁর অন্তঃপুরে লুকিয়ে রেখে তাঁর সঙ্গে আনন্দে বিহার করতে লাগলেন। বহুমূল্য বস্ত্র, মালা, ধূপ, দীপ, আসন, পেয় ও চর্ব্য নানারকম ভোজন-সামগ্রী এবং মধুর আলাপ দ্বারা উষা অনিরুদ্ধকে এমনভাবে সেবা করতে লাগলেন যে তিনি উষার ক্রমবর্ধমান প্রেমে আবদ্ধ হতে লাগলেন। ক্রমে উষা তাঁর চিত্তকে সম্পূর্ণভাবে অধিকার করলেন। এরকম আনন্দানুভবে কত যে দিনরাত্রি দেখতে দেখতে কেটে গেল তা অনিরুদ্ধ বুঝতেও পারলেন না। ১৮-২৬

এভাবে যদুবীর অনিরুদ্ধের সঙ্গে গোপনে প্রেমরতা এবং সর্বদা পুলকিতা উষাকে দেখে একদিন অন্তঃপুরের রক্ষীরা সন্দিগ্ধ হল। গর্ভধারণের অনিবার্য লক্ষণগুলি অবিবাহিতা রাজকন্যার দেহে লক্ষ করে ভয়ে ভয়ে তারা রাজাকে গিয়ে বলল, নরনাথ, আপনার অবিবাহিতা কন্যা পরপুরুষের সঙ্গ করে কুল দূষিত করছে, সেরকম লক্ষণ দেখছি। প্রভু, আমরা অত্যন্ত সতর্কভাবে কন্যার গৃহ রক্ষা করে থাকি। তবু কি করে এমন হল তা আমরা কিছুতেই বুঝতে পারছি না। ২৭-২৯

---

১ সম্ভবত সে সময় সামান্য কয়েকটি রেখায় 'পোর্ট্রেট' জাতীয় চিত্র আঁকার প্রচলন ছিল।

কন্যার ঐরকম দোষের কথা শুনে মহারাজ বাণ অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে তৎক্ষণাৎ রাজসভা ত্যাগ করে ঊষার অন্তঃপুরে প্রবেশ করলেন। শ্যামসুন্দর, পীতাম্বর, কমলাক্ষ, দীর্ঘবাহু, হাস্যমুখ কামতনয় অনিরুদ্ধ কুণ্ডল ও কুন্তলের প্রভায় ঘর আলো করে বসে সর্বমঙ্গলস্বরূপা প্রিয়তমা ঊষার সঙ্গে তখন পাশা খেলছিলেন। তাঁর বাহুদ্বয়ের মধ্যে দোদুল্যমান মল্লিকার মালা প্রিয়ার অঙ্গস্পর্শে কুচকুঙ্কুমে রঞ্জিত হয়েছিল। মহারাজ দুঃসাহসী অনিরুদ্ধকে দেখে আশ্চর্যান্বিত হলেন। আর মুক্ত অস্ত্রধারী সৈন্য পরিবৃত রাজাকে আসতে দেখেই মধুবংশীয় কৃষ্ণপৌত্র অনিরুদ্ধ লোহার পরিঘ তুলে মহাকালের মত সকলকে সংহার করতে উদ্যত হয়ে দাঁড়ালেন। তখন সশস্ত্র সৈন্যরা তাঁকে চারদিক থেকে বেষ্টন করলে শূকর যূথপতি যেমন কুকুরদের সংহার করে সেভাবে তিনি রাজসৈন্যদের আহত করতে লাগলেন। সৈন্যরা কেউ ভাঙা মাথা, কেউ ভাঙা ঊরু, কেউ বা ভাঙা হাত নিয়ে পালাতে লাগল। বলিনন্দন মহাবল বাণ নিজের সৈন্যদের বিধ্বস্ত হতে দেখে নাগপাশের দ্বারা অনিরুদ্ধকে বেঁধে ফেললেন। অনিরুদ্ধের ঐ অবস্থা দেখে ঊষা মনে অত্যন্ত কষ্ট পেলেন। শোকে বিহ্বলা হয়ে তিনি সাশ্রুনয়নে কাঁদতে লাগলেন। ৩০-৩৫

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়

বাণরাজ-শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধ

শুকদেব বললেন, ভারত, অনিরুদ্ধের বন্ধু-বান্ধবরা তাঁর অভাবে বর্ষার চার মাস শোকে অতিবাহিত করলেন। পরে নারদের কাছে বাণের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ ও বন্ধনের বৃত্তান্ত শুনে বৃষ্ণিরা শোণিতপুরে যাত্রা করলেন। প্রদ্যুম্ন, যুযুধান, গদ, সাম্ব, সারণ, নন্দ, উপনন্দ, ভদ্র প্রভৃতি রাম-কৃষ্ণের অনুগামী যদু-শ্রেষ্ঠরা বার অক্ষৌহিণী সেনায় পরিবৃত হয়ে সর্বদিক থেকে শোণিতপুর আক্রমণ করলেন। সাত্বতশ্রেষ্ঠ যোদ্ধারা উদ্যান-প্রাচীর ও গোপুরগুলি ভেঙ্গে ফেলায় ক্রোধে বাণরাজ বিপক্ষের তুল্য বার অক্ষৌহিণী সেনায় পরিবৃত হয়ে যুদ্ধের জন্য নগর থেকে বার হলেন। এদিকে বাণের সাহায্যের জন্য কার্তিকের সঙ্গে ভগবান রুদ্রদেব নিজের সঙ্গীদের নিয়ে নন্দিবৃষভে চড়ে রাম-কৃষ্ণের সংগে যুদ্ধ করার জন্য সমরাঙ্গনে উপস্থিত হলেন। ১-৬

মহারাজ, ঐ যুদ্ধের দৃশ্য উপস্থিত ব্যক্তিদের রোমাঞ্চিত করেছিল। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে শংকরের, প্রদ্যুম্নের সংগে কার্তিকের, কুম্ভাণ্ড ও কূপকর্ণের সংগে বলরামের, বাণপুত্রের সংগে সাম্বের এবং সাত্যকির সংগে স্বয়ং বাণরাজার তুমুল যুদ্ধ হল। ঐ অদ্ভুত যুদ্ধ দেখার জন্য ব্রহ্মা প্রভৃতি সুরপতিরা, মুনিরা, সিদ্ধ ও চারণরা, গন্ধর্ব, অপ্সরা ও যক্ষরা সকলেই বিমানে সেখানে এলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর শার্ঙ্গধনু দ্বারা নিক্ষিপ্ত তীক্ষ্ন তীরের আঘাতে শংকরের অনুচর ভূত, প্রমথ, গুহ্যক, ডাকিনী, যাতুধান, বিনায়কসহ বেতালগণ, ভূত-মাতৃগণ, পিশাচসমূহ, কুষ্মাণ্ড এবং ব্রহ্মরাক্ষসদের এমনই পীড়িত করতে লাগলেন যে তারা সকলে ইতস্তত পালিয়ে যেতে লাগল। পিনাকী মহাদেব শার্ঙ্গধনুর্ধারী শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বিচিত্র সব দিব্য অস্ত্র প্রয়োগ করতে লাগলেন। শ্রীকৃষ্ণও সেই সব অস্ত্র তাদের বিপরীত অস্ত্রের দ্বারা অবলীলায় ছেদন করতে লাগলেন। ব্রহ্মাস্ত্রের বিরুদ্ধে ব্রহ্মাস্ত্র, বায়ব্যাস্ত্রের বিরুদ্ধে পার্বতাস্ত্র, আগ্নেয়াস্ত্রের প্রতিকূলে পার্জন্যাস্ত্র ও পাশুপতাস্ত্রের বিরুদ্ধে নারায়ণাস্ত্র নিক্ষেপ করে

রুদ্রের অস্ত্রগুলি প্রতিহত করলেন এবং জৃম্ভণাস্ত্রের প্রয়োগে ত্রিশূলপাণিকে সম্পূর্ণ বিমুগ্ধ করে ফেললেন। আর গদা, অসি ও তীর নিক্ষেপ করে তিনি বাণরাজার সৈন্যকুলকে প্রায় নিঃশেষে সংহার করে ফেললেন। প্রদ্যুম্নের শরাঘাতে কার্তিক অভিভূত হয়ে পড়লেন। তাঁর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হয়ে অবিরল রক্তস্রোত প্রবাহিত হচ্ছিল। তিনি একান্ত ব্যাকুল হয়ে নিজ বাহন ময়ূরের পিঠে চড়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বেরিয়ে এলেন। ৭-১৫

বলরামের মুষলের আঘাতে বিষম আহত হয়ে বাণমন্ত্রী কুম্ভাণ্ড ও কূপকর্ণ ধরাশায়ী হলেন। এই দেখে সৈন্যরা ছত্রভঙ্গ হয়ে ইতস্তত পালিয়ে যেতে লাগল। নিজের সৈন্য-সামন্তদের বিধ্বস্ত দেখে মহারাজ বাণ ক্রোধে আত্মহারা হলেন। তিনি প্রতিযোদ্ধা সাত্যকিকে উপেক্ষা করে রথে চড়ে যুদ্ধের জন্য শ্রীকৃষ্ণের দিকেই ছুটে গেলেন। রণদুর্মদ বাণ একসঙ্গে পাঁচশ ধনুকের প্রত্যেকটিতে দু'টি করে তীর যোজনা করে শ্রীকৃষ্ণের দিকে নিক্ষেপ করতে লাগলেন। শ্রীহরি ঐ রকম শরজাল নিক্ষিপ্ত হবার আগেই একই সময়ে বাণের তীর ও পাঁচশ ধনুক ছিন্ন করে ফেললেন এবং তাঁর সারথি, রথ ও অশ্বগুলিকে বিনাশ করে শংখধ্বনি করতে লাগলেন। ১৬-১৯

বাণজননী কোটরা পুত্রের প্রাণ সংকটাপন্ন দেখে আতংকে আলুলায়িত কেশ ও প্রায় বিবসনা অবস্থায়ই দ্রুতবেগে পুত্রের প্রাণভিক্ষার জন্য শ্রীকৃষ্ণের কাছে উপস্থিত হলেন। গদাগ্রজ শ্রীহরি বিবসনা মাকে দেখবেন না বলে যেই অন্যদিকে মুখ ফেরালেন অমনি সেই ক্ষণিক অবসরে বাণ নিজের পুরীতে পালিয়ে গেলেন। এভাবে বাণের ও মহাদেবের সৈন্য-সামন্ত ও অনুচরবৃন্দ যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বিতাড়িত হলে মহাদেব ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে রুদ্রজ্বরের সৃষ্টি করলেন। তখন ত্রিশিরা ও ত্রিপাদবিশিষ্ট রুদ্রজ্বর আলোর ছটায় দশদিক আলোকিত করে যুদ্ধের জন্য শ্রীকৃষ্ণের দিকে ধাবিত হল। তাকে দেখে শ্রীকৃষ্ণ বিষ্ণুজ্বরকে উৎপাদন করে যুদ্ধে নিযুক্ত করলেন। রুদ্রজ্বর ও বিষ্ণুজ্বরে তুমুল যুদ্ধ শুরু হল। বৈষ্ণবজ্বরের ভীষণ বিক্রমে রুদ্রজ্বর অত্যন্ত বিপর্যস্ত হয়ে কাঁদতে লাগল এবং অন্য কোথাও অভয় না পেয়ে কৃতাঞ্জলিপুটে ভগবান হৃষীকেশের শরণাপন্ন হয়ে তাঁর স্তব করতে লাগল। ২০-২৪

রুদ্রজ্বর বলল, পরমেশ্বর, ব্রহ্মাদি লোকপালেরও নিয়ন্তা, বিশ্ব-সংসারে সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারের কর্তা আপনি জীবমাত্রেরই অন্তরাত্মা হয়ে বিশুদ্ধ চৈতন্য-বিগ্রহে ও প্রশান্ত মূর্তিতে অবস্থান করছেন, অবিকারী অনন্তশক্তির আধার ও বেদ-বোধিত আপনি, আপনাকে প্রণাম করি। কাল, দৈব, কর্ম, জীব, স্বভাব, সূক্ষ্মভূত, প্রাণ, অহংকার, একাদশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চমহাভূত, দেহ, পুনঃ-কর্ম, পুনর্দেহ এই রকম বীজ ও অংকুরের মত উৎপাদ্য ও উৎপাদক সম্বন্ধযুক্ত দেহ ও কর্মের অনির্বচনীয় সম্বন্ধস্রোত প্রভৃতি ভেদভাব শুধু আপনার মায়াতেই সংঘটিত হয়। আপনাকে জানতে পারলে সমস্ত ভেদজ্ঞান ও ভেদভাব দূর হয়ে যায়; আমি আপনার শরণ নিলাম। আপনি বিভিন্ন ভাবের প্রকাশক মৎস্য প্রভৃতি বিচিত্রবেশে অবতীর্ণ হয়ে দেবলোক, সাধু, ভক্তগণ ও বর্ণাশ্রম প্রভৃতি ধর্মের মর্যাদা প্রতিপালন দ্বারা জগৎ-সংসারকে তুষ্ট রাখছেন এবং উন্মার্গগামী দৈত্য প্রভৃতিকে সংহার করেছেন। আপনি শুধু পৃথিবীর ভার লাঘব করার জন্যই সমস্ত অবতারত্ব স্বীকার করেছেন। শীতল স্পর্শ অথচ পরিণামে উগ্র দাবদাহের মত আপনার ভয়ংকর দুর্বিষহ শক্তিরূপ জ্বরের প্রভাবে আমি অভিভূত

হয়ে গেছি। আপনি এই শরণাগতকে রক্ষা করুন। যতক্ষণ পর্যন্ত জীব কামনা বাসনায় লিপ্ত থেকে আপনার চরণকমলের অনুসরণ না করে ততক্ষণ পর্যন্তই দেহীর দুঃখ। আমি কিন্তু আপনার একান্ত শরণাগত, তাই আমাকে ঐ দুঃখভোগ থেকে ত্রাণ করুন। ২৫-২৮

ভগবান বললেন, ত্রিশিরা, আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হয়েছি, আর আমার জ্বর থেকে তোমার কোন ভয়ের আশংকা নেই। যে আমাদের এই স্তুতি ও প্রসন্নতার সংবাদ স্মরণ করবে তার আর জ্বর থেকে ভয় থাকবে না। ২৯

এই কথা শুনে রুদ্রজ্বর অচ্যুতকে প্রণাম ক'রে প্রস্থান করল। এদিকে বাণ আবার চক্রায়ুধের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য সহস্র বাহুতে নানা রকম অস্ত্রশস্ত্র ধারণ করে সক্রোধে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয়ে তাঁর উপর অসংখ্য তীর নিক্ষেপ করতে লাগলেন। বাণরাজা বারবার অস্ত্র নিক্ষেপ করলে শ্রীকৃষ্ণ অসহ্য হয়ে সুদর্শন চক্র প্রয়োগ করে তাঁর সহস্র বাহু বৃক্ষশাখার মত ছিন্ন করে ফেললেন। বাণের বাহুচ্ছেদ আরম্ভ হলে ভগবান রুদ্র ভক্তের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে বলতে লাগলেন, হে পরাৎপর স্বপ্রকাশ জ্যোতিঃস্বরূপ পূর্ণব্রহ্ম, তুমি শব্দময় বেদে অতি গূঢ়ভাবে অবস্থান করছ। যাঁদের চিত্ত সম্পূর্ণ নির্মল সেই সাধু ও ভক্তরাই শুধু তোমার মহাকাশতুল্য সর্বব্যাপী নির্লিপ্ত স্বরূপের দর্শন পান। এই বিশ্ব-সংসারে তুমি বিরাট মূর্তিতে অবস্থান করছ। আকাশ তোমার নাভি, অগ্নি মুখ, জল শুক্র, স্বর্গ মস্তক, দিকগুলি কর্ণ, পৃথিবী চরণ, আমি তোমার আত্মা আর সমুদ্র তোমার উদর, ইন্দ্র প্রভৃতি লোকপালেরা বাহু, ওষধি রোম, মেঘ কেশ, বিরিঞ্চি বুদ্ধি, প্রজাপতি তোমার উৎপাদন শক্তি মেঢ্র এবং ধর্ম তোমার হৃদয়। তুমিই এই বিভিন্ন অবয়বগুলির অবয়বীরূপে প্রতিপাদিত পুরুষশ্রেষ্ঠ ভগবান।[১] লোকসমূহ পটে-কল্পিত চিত্র-পুত্তলিকার মত এক তোমার স্বরূপেই কল্পিত হয়েছে মাত্র। ধর্মের পালন ও সংসারের মঙ্গলের জন্য তুমি এইসব অবতার গ্রহণ করে থাক। আমরা সবাই তোমারই অনন্ত শক্তির সাহায্যে সামর্থ্যবান হয়ে এই সপ্ত ভুবন পালন করছি। ৩০-৩৭

তুমি স্বতন্ত্র, স্বজাতীয়, ভেদশূন্য, শুদ্ধ, আদ্য, জীবের জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তিরূপে অবস্থান তিনটির অতীত তুরীয়স্বরূপ পরমভাব এবং স্বপ্রকাশ জ্ঞানস্বরূপও তুমি।[২] কারণ ও কারণরহিত অদ্বিতীয় ঈশ্বর হলেও সর্ববিষয় প্রকাশ করার জন্য নিজ মায়াযোগে প্রতিশরীরে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে প্রতীয়মান হয়ে থাক।[৩] সূর্য যেমন নিজ স্বরূপ থেকে উৎপন্ন মেঘ ও বর্ষা প্রভৃতির আবরণে আবৃত হয়েও সেই আবরক ছায়া ও রূপসমূহকে প্রকাশ করে থাকেন, সে রকম স্বপ্রকাশ তুমি নিজকার্যভূত গুণে আচ্ছাদিত হয়েও সত্ত্ব প্রভৃতি গুণ ও গুণযুক্ত জীবদের প্রকাশ কর। হে ভগবান, তোমার মায়ায় মুগ্ধবুদ্ধি জীবরা স্ত্রী, পুত্র, গৃহ প্রভৃতিতে আসক্ত হয়ে দুঃখ-সাগরে কখনো ডুবছে, কখনো ভাসছে। দেবপ্রদত্ত এই অপূর্ব মানবদেহ পেয়েও যে লোক শুধু ইন্দ্রিয় চরিতার্থের জন্য তোমার শ্রীচরণ চিন্তা না করে, সে প্রকৃতই বঞ্চিত এবং কৃপার পাত্র। যে মর্ত্যবাসী ইন্দ্রিয়ার্থের জন্য প্রিয় ঈশ্বর ও আত্মা তোমাকে ত্যাগ করে, সে অমৃত ছেড়ে বিষ পান করে। নির্মলচিত্ত মুনিরা, ব্রহ্মা ও আমি সর্বান্তঃ-করণে প্রিয়তম আত্মস্বরূপ তোমারই শরণাগত। হে দেব; এই বিশ্ব-সংসারের

১ এ-প্রসঙ্গে তৈত্তিরীয় উপনিষদের ব্রহ্মানন্দবল্লী, (প্রথম ও দ্বিতীয় অনুবাক) দ্রষ্টব্য।
২ তুলনীয়: মাণ্ডুক্য উপনিষৎ-১২ • কঠ উপ: ২।২।১০-১২

সৃষ্টি, স্থিতি, ও লয়কারী তুমিই জীবসকলের প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষী, পরমাত্মীয় ও সর্বফলদাতা। ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি কোন বিকার তোমাকে স্পর্শ করে না; জগৎ ও জীবনের তুমিই প্রকৃত আশ্রয়দাতা। শান্তস্বরূপ ধারণ করে তুমিই সকলের অন্তরে বিরাজ করছ; অনন্য ও এক তোমাকে সংসার-মুক্তির জন্য ভজনা করি। এই বাণ আমার একজন অনুগত সেবক, তাই প্রিয়পাত্র। হে দেব, আমি একে অভয় দান করেছি। তুমি দৈত্যরাজ প্রহ্লাদের প্রতি যেমন অনুগ্রহ করেছিলে এর প্রতিও সেরকম অনুগ্রহ কর। ৩৮-৪৫

ভগবান বললেন, হে ভগবান রুদ্র, আমি তোমার অভীষ্ট সাধন করব। তুমি যা কিছু করেছ, তা সবই উত্তম, তাতে আমার সম্পূর্ণ অনুমোদন আছে। আগে আমি প্রহ্লাদকে বর দিয়েছিলাম যে তার বংশীয় কাউকে বধ করব না। অতএব এই বলিপুত্র বাণ অসুর হলেও আমার অবধ্য। এর দর্প চূর্ণ করার জন্য আমি এর বাহুগুলি ছিন্ন করেছি। এর বল পৃথিবীর ভয়ের কারণ হয়েছিল, তাই তাও নষ্ট করেছি। এখন এর চারটি মাত্র বাহু অবশিষ্ট রইল। এই অসুর অজর ও অমর হয়ে তোমার পার্ষদশ্রেষ্ঠরূপে নিঃশঙ্কচিত্তে বিচরণ করবে। এর আর কোন ভয় নেই। ৪৬-৪৯

রাজা বাণ অভয় লাভ করে অবনতমস্তকে শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করে অনিরুদ্ধ ও নববধূ উষাকে রথে করে শ্রীকৃষ্ণের সামনে আনলেন। শ্রীকৃষ্ণ রুদ্রদেবের অনুমোদন নিয়ে এক অক্ষৌহিণী সেনার পরিবৃত হয়ে সালঙ্কারা পত্নী উষা সহ অনিরুদ্ধকে নিয়ে দ্বারকাপুরী যাত্রা করলেন। এদিকে শ্রীকৃষ্ণ ফিরে আসছেন জেনে মনোরম বিজয়-পতাকা ইত্যাদিতে দ্বারকাপুরী অলংকৃত এবং তার পথ ও চত্বরগুলি ভূষিত করা হয়েছিল। ভগবান সেই সুসজ্জিত নগরে প্রবেশ করলেন। পুরবাসী সুহৃদগণ ও ব্রাহ্মণেরা সবাই তাঁকে অভিবাদনের জন্য শাঁখ, ঢাক ও বাদ্যের ধ্বনি করতে করতে এগিয়ে গেলেন। মহারাজ, যিনি প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করে বাণের সঙ্গে যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণের জয় এবং ঐ উপলক্ষ্যে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে শংকরের যুদ্ধের কথা স্মরণ করেন, তাঁর কখনও পরাজয় না। ৫০-৫৩

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়

নৃগরাজের উপাখ্যান

শুকদেব বললেন, মহারাজ, একদিন সাম্ব, প্রদ্যুম্ন, চারু, ভানু ও গদ প্রভৃতি যদু-বংশীয় বালকরা খেলা করতে করতে এক উপবনের মধ্যে প্রবেশ করল। সেখানে বহুক্ষণ খেলার পর শ্রান্ত ও পিপাসার্ত হয়ে জলের খোঁজে এদিক ওদিক ঘুরে শেষে একটি জলশূন্য কূপের মধ্যে এক বিরাটকায় অদ্ভুত জন্তু দেখতে পেল। পরে জন্তুটি কৃকলাস (গিরগিটি) একথা জেনে তারা সদয় হয়ে তাকে ওঠাবার চেষ্টা করতে লাগল। তারা চামড়া ও সুতোর ফাঁসে বেঁধে তাকে উপরে তোলার চেষ্টা করল, কিন্তু কৃতকার্য হতে না পেরে শ্রীকৃষ্ণের কাছে গিয়ে সমস্ত বৃত্তান্ত বলল। বিশ্বভাবন কমললোচন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাদের কাছে সবকথা শুনে কূপের কাছে গিয়ে অবলীলা-ক্রমে বাঁ হাতে করে তাকে ওঠালেন। পবিত্রযশা ভগবানের করস্পর্শে সেই কৃকলাস তপ্ত সোনার ন্যায় মনোহর রূপ ধারণ করে ও নানা অলংকার প্রভৃতিতে বিভূষিত

হয়ে ত্রিদিববাসী দেবতাতে পরিণত হল। মুকুন্দ তার কারণ জেনেও জনসমাজে প্রচার করার ইচ্ছায় সেই দেবমূর্তিকে সম্বোধন করে বললেন, মহাভাগ, বরেণ্যরূপধারী আপনি কে? আপনাকে একজন শ্রেষ্ঠ দেবতা বলে মনে হচ্ছে। হে সুভদ্র, কি কর্ম করে আপনার এই দশা হল? আপনি এই কৃকলাস জন্মের যোগ্য নন। যদি আপত্তি না থাকে তা হলে আমাদের কাছে বলুন; আমরা জানতে কৌতূহলী। ১-৮

শুকদেব বললেন, মহারাজ, অনন্তমূর্তি শ্রীকৃষ্ণের প্রশ্ন শুনে সেই পুরুষ তাঁর সূর্যতুল্য দীপ্তিশালী কিরীট দ্বারা মাধবকে প্রণাম করে বলতে আরম্ভ করলেন, হে প্রভু, আমি ইক্ষ্বাকুবংশের রাজশ্রেষ্ঠ নৃগ। দাতাদের নাম উচ্চারণের সময় হয়তো আমার নাম শুনেছেন। আপনি সর্বভূতের বুদ্ধির সাক্ষী, কাল আপনার দৃষ্টি নাশ করতে সমর্থ নয়। আপনার অজানা কি আছে? তবু আপনার আজ্ঞানুসারে বলছি, পৃথিবীর যত ধূলিকণা, আকাশের যত নক্ষত্র ও বর্ষার যত ধারা তত সংখ্যক গাভী আমি দান করেছি। ন্যায় পথে অর্জিত গাভীগুলি দুগ্ধবতী ও অল্পবয়স্কা ছিল। শান্তস্বভাব সুবর্ণমণ্ডিত শৃঙ্গ ও রৌপ্যমণ্ডিত খুরযুক্ত, বস্ত্রমালায় অলংকৃত, সবৎসা, কপিলা, রূপ-গুণবতী ধেনু আমি সৎপাত্রে দান করেছিলাম। ঐ পাত্ররা ছিলেন গুণশীলসম্পন্ন, বহুকুটুম্বী, সদাচারী, তপস্যাপরায়ণ, শ্রৌত-কর্মান্বিত, বেদ অধ্যাপনায় নিরত, উদারস্বভাব শ্রেষ্ঠ দ্বিজ যুবক। এছাড়া আরো গাভী, ভূমি, স্বর্ণ, অট্টালিকা, অশ্ব, হস্তী, দাসীসহ কন্যা, তিল, রৌপ্য, শয্যা, অপূর্ব রত্নরাজি, গৃহোপকরণ, পরিচ্ছদ এবং মণিখচিত রথও আমি দান করেছিলাম। আমি অগ্নিষ্টোম[১] প্রভৃতি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছি। বাপী, কূপ, তড়াগ খনন, দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা, দীনজনকে অন্নদান প্রভৃতি জনকল্যাণকর কাজও করেছি। কিন্তু দুঃখের ব্যাপার হল, একদিন এক শুদ্ধচেতা ব্রাহ্মণের একটি গরু বন্ধনমুক্ত হয়ে সকলের অলক্ষ্যে আমার গরুদের মধ্যে এসে মিশে যায়। কাজেই না জেনে আমার অন্যান্য গরুর সঙ্গে সে গরুটিকেও আমি এক ব্রাহ্মণকে দান করেছিলাম। ৯-১৬

প্রতিগ্রাহী ব্রাহ্মণ যখন সেই গরুটি নিয়ে যাচ্ছিলেন সেই সময় তার প্রকৃত অধিকারী গরুটি দেখে তাঁর বলে দাবি করলেন। তা শুনে দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ বললেন, রাজা নৃগ গরু আমাকে দান করেছেন, সুতরাং এ আমার। এভাবে দুই ব্রাহ্মণ পরস্পর বিবাদ করতে করতে আমার কাছে এলেন। প্রতিগ্রাহী ব্রাহ্মণ বিষয়টি ব্যাখ্যা করে বললেন, আপনি এই গাভী আমাকে দান করেছেন। গাভীর মালিক ব্রাহ্মণ বললেন, আপনি আমার গাভী চুরি করেছেন। উভয়ের কথা শুনে আমার মনে বিষম সন্দেহের উদয় হল এবং আমি ব্যাকুল হয়ে পড়লাম। তখন আমি তাঁদের দুজনকে বললাম, এর চেয়ে উৎকৃষ্ট এক লক্ষ গরু আপনাদের মধ্যে একজনকে দান করছি, তিনি তার পরিবর্তে এই গরুটি অন্যকে দিন। এই গরু যে আমার নয় আমি তা না জেনে একে দান করেছিলাম। আমি আপনাদের একান্ত শরণাগত ভৃত্য, আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন। না হলে আমি ব্রাহ্মণের সম্পত্তি অপহরণের পাপে ঘোর নরকে পতিত হব। আপনারা আমাকে এই বিষম সংকট থেকে রক্ষা করুন। ঐ গরু যে ব্রাহ্মণের তিনি আমার কথা শুনে বললেন, আমি এরকম রাজার দান গ্রহণ করব না। তারপর তিনি তাঁর গরুটি নিয়ে চলে গেলেন। দ্বিতীয় ব্রাহ্মণও বললেন, [আমি দানে-পাওয়া গরুর বিনিময়ে একলক্ষ গরুও নিতে ইচ্ছুক নই।] এই বলে তিনি দান-করা গরুটি পরিত্যাগ করে চলে গেলেন। ইতিমধ্যে

১ অগ্নিষ্টোম—পঞ্চদিবস সাধ্য বসন্তকালীন যাগবিশেষ।

আমার মৃত্যুকাল ঘনিয়ে এল, যমদূতেরা এসে আমাকে যমালয়ে নিয়ে গেল। যমরাজ আমায় বললেন, নৃগরাজ, তুমি পাপ ও পুণ্যফলের মধ্যে কোনটি আগে ভোগ করতে চাও? দান, ধর্ম ও পুণ্যের অনুষ্ঠান করে তুমি স্বর্গাদি লোক অর্জন করেছ। তোমার পুণ্যফলের তো অন্ত দেখছি না। এই শুনে ধর্মরাজ যমকে আমি বলেছিলাম, দেব, আমি আগে অশুভই ভোগ করব। যম বললেন, তা হলে এখন তুমি নিকৃষ্ট যোনিতে যাও। হে প্রভু, তৎক্ষণাৎ আমি কৃকলাস মূর্তিতে পরিণত হলাম। ১৭-২৪

কেশব, আপনি ব্রাহ্মণসেবী ও দানবীর। আমি আপনার ভৃত্য। আপনার দর্শনের প্রার্থনায় এতকাল আমি কূপের মধ্যে পড়েছিলাম। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয়, এর মধ্যে কখনো আমার পূর্বস্মৃতি বিলুপ্ত হয়নি। আমার আপনাকে দর্শন করার বাসনা ছিল। কিন্তু অবাক হচ্ছি এই ভেবে যে কিভাবে আপনি স্বয়ং আমাকে দেখা দিলেন। দেবতাদের দেবতা, জগতের স্বামী এবং পুরুষোত্তম আপনি অন্তরের অন্তর এবং ইন্দ্রিয়বর্গেরও প্রভু। আপনার গুণ, ঐশ্বর্য এবং স্বরূপের কখনো হ্রাস হয় না। আপনিই আশ্রয়দাতা সাক্ষাৎ নারায়ণ। হে পরমাত্মা, যাঁদের সংসারমুক্তি ঘটে আপনি তাঁদের কাছে আবির্ভূত হন। সংসার-দুঃখে অন্ধ আমাকে যে আপনি দেখা দিলেন এ আমার পরম সৌভাগ্য। হে দেবদেব শ্রীকৃষ্ণ, অনুমতি দিন, আমি দেবলোকে ফিরে যাই। প্রার্থনা করি কর্মবশে যখন যে যোনিতেই জন্মলাভ করি না কেন, আপনার শ্রীচরণপদ্মে যেন আমার চিত্ত নিবিষ্ট থাকে। হে সর্বসৃষ্টিকর্তা অনন্তশক্তি, পূর্ণব্রহ্ম ও যোগফলদাতা বাসুদেব, আপনার আনন্দময় কৃষ্ণমূর্তিকে প্রণাম করি। ২৫-২৯

এরকম স্তব করে নৃগরাজ শ্রীকৃষ্ণকে প্রদক্ষিণ করে কিরীটসহ মস্তক তাঁর চরণে স্পর্শ করে তাঁর ও অন্যান্য সকলের অনুমতি নিয়ে বিমানে আরোহণ করে স্বর্গধামে চলে গেলেন। তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ক্ষত্রিয়রাজাদের উপদেশ দেবার উদ্দেশ্যে উপস্থিত পরিজনদের বললেন, দেখ, বিন্দুমাত্র ব্রহ্মস্ব (ব্রাহ্মণ-সম্পত্তি) গ্রহণ করা অতি গর্হিত কর্ম। অগ্নির মত তেজস্বীর পক্ষেও তা সহ্য করা দুঃসাধ্য। যে সব রাজা নিজেদের ঈশ্বর মনে করে তাদের যে তা সহ্য হবে না তাতে আর সন্দেহ কি? আমি প্রকৃত হলাহলকেও বিষ বলে মনে করি না, কারণ তার প্রতিকার হতে পারে। কিন্তু জগতে ব্রহ্মস্ব বিষের কোন প্রতিকার নেই। অগ্নি দাহ্য বস্তুকে দগ্ধ করলেও জলে প্রশমিত হয়, বিষ শুধু পানকারীর প্রাণনাশ করে, কিন্তু ব্রহ্মস্ব অপহরণ থেকে যে ভীষণ অগ্নি জন্মায় তা হরণকারীকে সবংশে নিধন করে। যদি নিতান্ত অনিচ্ছায় বা অজ্ঞাতে ব্রহ্মস্ব হরণ করা হয় তা হলে হরণকারীর তিনপুরুষ অধঃপতিত হয়। জোর করে কেড়ে নিলে হরণকারী আগের ও পরের দশপুরুষ সহ ক্ষয় পায়। রাজৈশ্বর্যমদে অন্ধ ও বিচারহীন যে রাজা ও রাজপুরুষরা ব্রহ্মস্ব হরণে অগ্রসর হন তাঁরা নরকে যাবার পথ প্রশস্ত করে থাকেন। বহুকুটুম্বযুক্ত, বদান্য ও মিতাচারী ব্রাহ্মণের বৃত্তি হরণ করলে তাঁর অশ্রুতে যত ধূলিকণা সিক্ত হয় তত বৎসর সেই ব্রহ্মস্বাপহারী রাজা, রাজপুরুষ বা রাজভৃত্যকে ঘোর কুম্ভীপাক নরকে কষ্ট পেতে হয়। ৩০-৩৭

যে নিজের বা অপরের দেওয়া ব্রহ্মবৃত্তি হরণ করে সে ষাট হাজার বৎসর বিষ্ঠার কৃমি হয়ে থাকে। আমার যেন কোন সময় ব্রহ্মস্ব গ্রহণ করতে না হয়। ব্রাহ্মণের ধন আকাঙ্ক্ষা করলেও লোকে অল্পায়ু, হীনবল ও শ্রীহীন হয়ে পরজন্মে সর্পযোনি প্রাপ্ত হয়ে থাকে। বন্ধুগণ, ব্রাহ্মণ যদি অপরাধও করেন, তাহলেও

তাঁর অনিষ্ট করবে না। তিনি অভিসম্পাত দিয়ে তিরস্কার বা বধ করতে অগ্রসর হলেও দূর থেকে তাঁকে সব সময়ই প্রণাম করবে। আমি যেমন অত্যন্ত সতর্কতার সংগে ত্রিসন্ধ্যা সমাহিতচিত্তে ব্রাহ্মণদের প্রণাম করি, তোমরাও সে রকম করবে। এর অন্যথা করলে আমার কাছে দণ্ডনীয় হবে। না জেনে ব্রাহ্মণের ধন হরণ করলেও নরকে পতিত হয়, এই জন্যই রাজা নৃগ কৃকলাস-যোনিতে জন্মেছিলেন। মহারাজ, সর্ব লোকপাবন ভগবান মুকুন্দ দ্বারকাবাসী জনগণকে এরকম উপদেশ দিয়ে মন্দিরে প্রবেশ করলেন। ৩৮-৪৪

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়

বলরামের যমুনা-আকর্ষণ

শুকদেব বললেন, হে কুরুশ্রেষ্ঠ, ভগবান বলরাম বন্ধুদের দর্শন করার জন্য উৎকণ্ঠিত হয়ে রথে আরোহণ করে নন্দগোকুলে যাত্রা করলেন। সেখানে গোপ-গোপীদের আলিংগনে অভ্যর্থিত হয়ে নন্দ ও যশোদাকে প্রণাম করলে তাঁরা আশীর্বাদ করলেন। দশার্হ, তুমি অনুজ জগদীশ্বর কৃষ্ণের সঙ্গে আমাদের সর্বদা পালন করছ, এই বলে তাঁরা তাঁকে কোলে নিয়ে চোখের জলে অভিষিক্ত করলেন। হলধর এভাবে বৃদ্ধ গোপদের বন্দনা করলেন এবং বয়ঃকনিষ্ঠ গোপদের দ্বারা অভিনন্দিত হলেন। হেসে, হাতে ধরে বয়স, সম্বন্ধ ও সখ্য অনুযায়ী অন্যান্য গোপদের সংগে কুশল বিনিময়ের পর সকলে বসে নানা আলাপ করলেন। কমলাক্ষ শ্রীকৃষ্ণে যাঁরা যাবতীয় বিষয় সমর্পণ করেছিলেন সেই গোপরা তাঁকে প্রেমগদ্গদ স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, রাম, কমলাক্ষ শ্রীকৃষ্ণকে পাবার জন্য যাঁরা সর্বস্ব ত্যাগ করে বসে আছেন আমাদের সেই বান্ধবরা মংগলে আছেন তো? তোমরা এখন স্ত্রীপুত্র নিয়ে মধুপুরে সুখেই আছ তো? আমাদের কথা কি আর মনে পড়ে? ভাগ্যবলে কংস নিহত হয়েছে এবং সুহৃদরা নিরুপদ্রব হয়ে সুখে বাস করছেন আর তোমরাও (জরাসন্ধ প্রভৃতি) শত্রুকুলের নিধন করে সৌভাগ্যক্রমে দুর্গে বাস করছ। ১-৮

বলরামকে দেখে গোপীরা হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করলেন, পুরস্ত্রীজনদের হৃদয়বল্লভ শ্রীকৃষ্ণ সুখে আছেন তো? তিনি বয়স্য গোপ, পিতা-মাতা ও আমাদের কি আর মনে রেখেছেন? তিনি অন্তত মাতা যশোদাকে দেখতেও কি একবার গোকুলে আসবেন না? হে প্রভু দশার্হ, আমরা পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নী এমন কি পতিপুত্রও পরিত্যাগ করে শুধু যাঁর অনুসরণ করতাম তিনি আমাদের সেই প্রেমের মূলোচ্ছেদ করে চলে গেছেন। যাবার সময় যে রকম আশ্বাস দিয়েছিলেন। তাতে অবিশ্বাস করি নি। এখন দেখছি বিশ্বাস করেই আমরা বঞ্চিত হয়েছি। আমরা না হয় গ্রাম্য, বুদ্ধিহীনা কিন্তু নাগরিক স্ত্রীরা তো বিশেষ বুদ্ধিমতী। তাঁরা কিভাবে এই অব্যবস্থিতচিত্ত ক্ষণপ্রেমিক অকৃতজ্ঞের কথায় বিশ্বাস করছেন! হয়তো তাঁরা মধুর বাক্পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণের কথায় ও তাঁর সুন্দর সহাস্য কটাক্ষে অভিভূত হয়ে বিশ্বাস করছেন। অন্য গোপীরা বললেন, গোপীগণ, আমাদের আর তাঁর কথায় প্রয়োজন কি? অন্য কথা বল। আমাদের কথা না ভেবে যদি তাঁর দিন কাটতে পারে, তা হলে আমাদেরও তাঁর কথা না ভেবে দিন কাটবে। ৯-১৪

এভাবে গোপীরা পরস্পর আলোচনা করতে করতে শ্রীকৃষ্ণের হাসি, আলাপ, মনোহর দৃষ্টি, চলন ও প্রেমালিঙ্গন স্মরণ করে কাঁদতে লাগলেন। নানা ভাবে সান্ত্বনা দানে পারদর্শী ভগবান সংকর্ষণ শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে অনেক চিত্তাকর্ষক সংবাদ দিয়ে সখীদের সান্ত্বনা দিলেন। তারপর রোহিণীনন্দন অন্য গোপীদের বহু রাত্রি আনন্দ বিতরণ করে মধু ও মাধব (চৈত্র ও বৈশাখ) দুই মাস সেই ব্রজপুরেই কাটালেন। পূর্ণিমার জ্যোৎস্নায় প্লাবিত ও কুমুদ-গন্ধে আমোদিত যমুনা উপবনে তিনি সখীদের সংগে বিহার করতে লাগলেন। এ সময় বরুণকন্যা মদিরাধিষ্ঠাত্রী বারুণীদেবী বরুণের আজ্ঞায় বৃক্ষকোটর থেকে মধুরূপে ঝরে পড়ে সমস্ত উপবন মধুময় করলেন। বলরাম মধুময় বাতাসের গন্ধে সেই বৃক্ষের কাছে গিয়ে ললনাদের সংগে মধুপান করে তৃপ্ত হলেন। মদিরা-মদে মত্ত হয়ে বলরাম গোপ-বনিতাদের সঙ্গে বিহার করতে লাগলেন। এই দৃশ্য দেখে দেবতা ও গন্ধর্বগণ বলরামের কীর্তন করলেন। গলায় বনফুলের মালা ও বৈজয়ন্তীমালা, কানে কুণ্ডল বলরাম তাঁর মহিমা কীর্তনকারী গোপললনাদের সঙ্গে বিহ্বল হয়ে লীলা করতে লাগলেন। ঘর্মাক্তকলেবর বলরাম জলকেলি করার জন্য যমুনাকে আহ্বান করলেন। কিন্তু বলরাম মত্ত ও বালক এই বিবেচনা করে যমুনা তাঁর আহ্বানে সাড়া দিলেন না। বলরাম রেগে তৎক্ষণাৎ হলাগ্র দ্বারা তরঙ্গিনীকে আকর্ষণ করে বললেন—পাপীয়সী আমি সাদরে তোমাকে নিজের কাছে আহ্বান করলাম, অথচ তুমি আমাকে অগ্রাহ্য করে কাছে এলে না। স্বেচ্ছাচারিণী, তোমাকে লাঙ্গলের আঘাতে শত খণ্ড করে ফেলব। ১৫-২৪

ভয়ে কম্পিতকলেবর যমুনা তৎক্ষণাৎ তাঁর চরণে পড়ে কাতরকণ্ঠে বললেন, হে মহাবাহু বলরাম, আমি আপনাকে চিনতে পারি নি। জগৎপালক পরমেশ্বর প্রভু, আপনার এক অংশে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড রচিত, আপনার শরণাপন্ন হচ্ছি। হে বিশ্বাত্মা, ভক্তবৎসল প্রভু, আমাকে ছেড়ে দিন। ২৫-২৭

যমুনা অপরাধ স্বীকার করে প্রার্থনা করলে বলরাম তাঁকে ছেড়ে দিলেন এবং হস্তিনীদের সঙ্গে মাতঙ্গের মত সখীগণে পরিবৃত হয়ে জলে নেমে জলক্রীড়া করলেন। যথেচ্ছ জলবিহার করে বলরাম তীরে উঠলে স্বয়ং লক্ষ্মী তাঁকে নীল বস্ত্র ও উত্তরীয়, মহামূল্যে অলংকার ও মংগলময়ী মালা দান করলেন। তিনি সে সব পরে ও সুগন্ধি চন্দনে লিপ্ত হয়ে ইন্দ্রের ঐরাবতের মত শোভমান হলেন। ২৮-৩০

মহারাজ, আজও দেখতে পাওয়া যায় যে বলরামের সেই লাংগল আকর্ষণের পথে যমুনা প্রবাহিত হচ্ছে। ব্রজনারীদের আচরণ ও বিলাস-মাধুর্যের মধ্যে ভগবান বলরাম যে ভাবে নিবিষ্ট মনে ঐ দু'মাস বিহার করেছিলেন, তা তাঁর কাছে এক রাত্রির মত মনে হয়েছিল। ৩১-৩২

ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায়

পৌণ্ড্রক ও কাশিরাজ বধ

শুকদেব বললেন, মহারাজ, এদিকে বলরাম নন্দব্রজে চলে যাওয়ার কয়েকদিন পরে করূষদেশের অধিপতি রাজা পৌণ্ড্রক নিজেকে সাক্ষাৎ বাসুদেব স্থির করে শ্রীকৃষ্ণের

কাছে দূত পাঠাল। সেখানকার বালকেরা কৌতুক করে তাঁকে উৎসাহ দিয়ে বলত যে সে-ই জগৎপতি ভগবান বাসুদেবের মূর্তিতে অবতীর্ণ হয়েছে। নির্বোধ পৌণ্ড্রক বালকদের মিথ্যা উৎসাহবাক্যে নিজেকে অচ্যুত বলে ভেবেছিল। খেলার সময় বালকেরা যেমন করে সেরকম কল্পিতরাজার মত আচরণ করে সেই মন্দবুদ্ধি করূষরাজ অব্যক্তগতি নারায়ণের কাছে দূত পাঠিয়েছিল। দূত দ্বারকায় এসে শ্রীকৃষ্ণের সুধর্মা নামক সভায় উপস্থিত হয়ে কমললোচন শ্রীকৃষ্ণের কাছে নিজের প্রভুর কথা নিবেদন করে বলল, মহারাজ পৌণ্ড্রক আপনাকে বলেছেন, সকল জীবের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহের প্রকাশের জন্যই আমি বাসুদেব রূপে অবতীর্ণ হয়েছি। তুমি শুধু নিরর্থক আমার বাসুদেব নাম ধারণ করেছ। জগতে অতএব আজ থেকে ঐ নাম তুমি পরিত্যাগ কর। হে সাত্বত, সামান্য যদুকুলে জন্মগ্রহণ করেই সর্বভূতোপহারী বাসুদেবরূপে জন্ম পরিগ্রহ করা সম্ভব নয়। তুমি মূঢ়তাবশে (শঙ্খ-চক্রাদি) যে সব চিহ্ন ধারণ করেছ, সেগুলি ফেলে আমার শরণাপন্ন হও। না হলে আমার সঙ্গে এসে যুদ্ধ কর। ১-৬

নির্বোধ পৌণ্ড্রকের ঐ দুরুক্তি শুনে উগ্রসেন প্রভৃতি সভাসদ্‌রা উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলেন। শ্রীকৃষ্ণ দূতকে বললেন, সেই মূর্খ পৌণ্ড্রক যে কৃত্রিম চিহ্ন ধারণ করে মিথ্যা গর্বে এরকম কথা বলেছে আমি তার সবই পরিত্যাগ করাব। যে মুখে সে ঐ সব বলেছে সেই মুখ ব্যাদিত করে শকুনি, গৃধিনী ইত্যাদিতে বেষ্টিত হয়ে যখন সে যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত অবস্থায় পড়ে থাকবে তখন সে শৃগাল ও কুকুরের ভোগেই লাগবে। আর তার মৃত্যুও আমার হাতেই হবে। দূত তখন নিজের প্রভু পৌণ্ড্রকের কাছে গিয়ে কৃষ্ণের সমস্ত কথা অবিকল বর্ণনা করল। এদিকে শ্রীকৃষ্ণও যুদ্ধের জন্য রথে চড়ে পৌণ্ড্রকের বাসস্থান কাশীধামে যাত্রা করলেন। ৭-১০

মহারথ পৌণ্ড্রক শ্রীকৃষ্ণের যুদ্ধের উদ্‌যোগের কথা জানতে পেরে দুই অক্ষৌহিণী সেনায় পরিবৃত হয়ে যুদ্ধের জন্য কাশী থেকে বার হল। পৌণ্ড্রক কৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য রওনা হয়েছে শুনে তার বন্ধু মহারাজ কাশীপতিও পৌণ্ড্রকের সাহায্যের জন্য তিন অক্ষৌহিণী সৈন্য নিয়ে তার পেছনে পেছনে চলল। যুদ্ধক্ষেত্রে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দেখলেন যে পৌণ্ড্রক শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্মে বিভূষিত এবং গলায় কৌস্তুভমণি ও বনমালা ধারণ করে বাসুদেব মূর্তিতে সজ্জিত। সে নিজে পীতবর্ণ কৌশেয় বস্ত্র ও উত্তরীয় পরেছিল। আবার নিজের রথের ধ্বজার উপর একটি কৃত্রিম গরুড়ও বসিয়েছিল। তার মাথায় ছিল অমূল্য মুকুট আর কানে মণিময় কুণ্ডল। রঙ্গমঞ্চের নটের মত কৃত্রিম বেশধারী পৌণ্ড্রককে দেখে বাসুদেব উচ্চস্বরে হেসে উঠলেন। ১১-১৫

ইতিমধ্যে পৌণ্ড্রকপক্ষীয় শত্রুরা শূল, গদা, পরিঘ, শক্তি, ঋষ্টি, প্রাস, তোমর, খড়্গ, পট্টিশ, বাণ প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র শ্রীকৃষ্ণের দিকে নিক্ষেপ করতে আরম্ভ করল। প্রলয়ের সময়ে কালাগ্নি যেমন জরায়ুজ প্রভৃতি চার রকম[১] জীব-জগৎকে পৃথক পৃথক ভাবে বিনষ্ট করে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণও গদা, অসি, চক্র ও বাণের আঘাতে পৌণ্ড্রক ও কাশীপতির চতুরঙ্গ সেনার[২] প্রত্যেককে আলাদা ভাবে অতিষ্ঠ ও বিপন্ন করে তুললেন। সুদর্শন চক্রের আঘাতে বিধ্বস্ত রথ, অশ্ব, হস্তী ইত্যাদিতে রণভূমি আচ্ছন্ন হয়ে প্রলয়ের সময়ে রুদ্রের অতি ভয়ানক ক্রীড়াভূমির মত সাহসী বীরপুরুষদের উৎসাহ বর্ধন করে শোভা পেতে লাগল।

---

১ জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ। ২ হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি—এই চার শাখাবিশিষ্ট সেনা।

তারপর শৌরী শ্রীকৃষ্ণ পৌণ্ড্রককে বললেন; পৌণ্ড্রক, তুমি আমাকে যে সব অস্ত্র ত্যাগ করতে বলেছিলে আমি সে সব অস্ত্র তোমার প্রতি নিক্ষেপ করছি। তুমি অনর্থক আমার 'বাসুদেব' নাম নিয়েছ তাও পরিত্যাগ করাচ্ছি। আর আমি যখন যুদ্ধ করতে অসমর্থ হব তখন (উপদেশ অনুযায়ী) তোমার শরণাপন্ন হব! এই কথা বলে ইন্দ্র যেমন বজ্রদ্বারা পর্বত ভেদ করেন, শ্রীকৃষ্ণ সেরকম ভাবে বাণে বাণে জর্জরিত করে পৌণ্ড্রককে রথচ্যুত করলেন এবং চক্র দিয়ে তার শিরশ্ছেদ করলেন। অনুরূপ ভাবে কাশিরাজের মস্তকও দেহ থেকে ছিন্ন করে বায়ুচালিত পদ্মকোষের মত কাশীতে নিয়ে ফেললেন। এভাবে কাশিরাজ সহ গর্বিত পৌণ্ড্রককে নিধন করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় ফিরে গেলে সিদ্ধরা অমৃততুল্য ভগবৎ-লীলা কীর্তন করতে লাগলেন। ১৬-২৩

মহারাজ, পৌণ্ড্রক বিদ্বেষবশে সর্বদাই ভগবানের চিন্তা করত। তাতেই তার সংসার-বন্ধন শিথিল হয়েছিল। এখন সে ভগবানের স্বরূপ লাভ করে বিষ্ণু-লোকে চলে গেল। এদিকে কাশীপুরীর রাজভবনের দরজায় সকুণ্ডল মুণ্ড দেখে আশ্চর্য হয়ে বলতে লাগল, একি? এই মাথাটা কার? যখন বোঝা গেল তা মহারাজ কাশীপতিরই ছিন্ন মস্তক, তখন তার মহিষী, পুত্র, বান্ধব ও প্রজারা সবাই শোকাতুর হয়ে উচ্চস্বরে বিলাপ করতে লাগল। রাজপুত্র সুদক্ষিণ পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করে প্রতিজ্ঞা করল পিতৃহন্তাকে সংহার করে পিতার ঋণ থেকে মুক্ত হব। মনে মনে এই সংকল্প করে সে উপাধ্যায় সহ একাগ্রচিত্তে দেবাদিদেব মহাদেবের আরাধনা আরম্ভ করল। ভগবান রুদ্র তার আরাধনায় পরিতুষ্ট হয়ে বর দিতে চাইলে সে পিতৃহন্তাকে বধ করবার উপায়ই বর রূপে চাইল। মহাদেব বললেন, অভিচার বা শত্রুমারণোক্ত প্রণালীর অনুসরণে তুমি ঋত্বিকদ্বারা দক্ষিণাগ্নির আরাধনা কর। সেই অগ্নি আমার প্রমথগণ দ্বারা পরিবৃত হয়ে তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ করবে। কিন্তু তা যেন ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য জনের প্রতিই প্রয়োগ করা হয়। ব্রাহ্মণকে প্রয়োগ করলে তাতে বিপরীত ফল ঘটবে। এ রকম আদেশ পেয়ে সুদক্ষিণ একাগ্রমনে শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে সেই অভিচার কর্ম আরম্ভ করল। ২৪-৩১

সুদক্ষিণের অগ্নিকুণ্ড থেকে তপ্ত তামার মত শিখা শ্মশ্রুধারী অগ্নি মূর্তিমান হয়ে বেরিয়ে এলেন। তাঁর দুচোখ দিয়ে যেন অঙ্গার বের হচ্ছিল, আর করাল দন্তরাজি ও ভ্রূকুটিতে ভয়ংকর আকৃতি হুতাশন তার দুই ওষ্ঠপ্রান্ত জিহ্বা দ্বারা লেহন করতে করতে দিগম্বরবেশে চতুর্দিক দগ্ধ করতে লাগল। হাতে এক ভীষণ ত্রিশূল সঞ্চালন করতে করতে এই অগ্নিমূর্তি এগিয়ে যেতে লাগল। তালগাছ প্রমাণ তার দুই পায়ের আঘাতে পৃথিবী কাঁপিয়ে প্রমথদের সঙ্গে কালানলের মত ঐ অগ্নি দ্বারকাভিমুখী হল। অভিচার-কার্য থেকে উৎপন্ন ভয়ংকর এই অগ্নিমূর্তিকে আসতে দেখে দ্বারকাবাসীরা দাবানলে আক্রান্ত জন্তুদের মত প্রাণভয়ে কাতর হয়ে পড়লেন। এই সময়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পাশা খেলছিলেন। দ্বারকাবাসীরা তাঁর কাছে এসে বললেন, হে ত্রিলোকপতি, এই প্রচণ্ড অগ্নির হাত থেকে তোমার দ্বারকাপুরীর শরণাগত প্রজা আমাদের রক্ষা কর। ৩২-৩৬

পরিজনদের ভীষণ বিপদ উপস্থিত দেখে ও তাদের ব্যাকুল আবেদন শুনে শ্রীকৃষ্ণ বললেন, ভয় করোনা। তোমাদের রক্ষাকর্তা আমি রয়েছি। ৩৭

সকলের অন্তর ও বাহ্য সাক্ষী ভগবান সেই অনলের আগমন-বার্তা মনে মনে অবধারণ করলেন এবং এটা যে মহেশ্বরের শক্তি তা বুঝতে পেরে সঙ্গে সঙ্গে সুদর্শন চক্রকে তা প্রতিহত করার নির্দেশ দিলেন। মুকুন্দের অস্ত্র সেই কোটি সূর্যের

প্রভাযুক্ত প্রলয়কালের কালানলের মতো জ্বলন্ত সুদর্শন চক্র নিজ প্রভাবে অন্তরীক্ষ, দিঙ্‌মণ্ডল, স্বর্গ ও মর্ত্যকে আলোকিত করে সেই কৃত্যাগ্নিকে[১] প্রতিহত করলেন। ৩৮-৩৯

মহারাজ, সেই কৃত্যাগ্নি প্রতিহত ও বিক্ষুব্ধ অস্ত্রতেজে নিরস্ত ও ভগ্নোদ্যম হয়ে বারাণসীতে ফিরে গেলে সে তার প্রেরক সুদক্ষিণকে ঋত্বিক ও জনগণসহ দগ্ধ করল। বিষ্ণুর চক্রও সেই কৃত্যানলকে অনুসরণ করে মঞ্চ, সভা, অট্টালিকা ও বিপণিতে পরিশোভিত পুরদ্বার, কোষ, হস্তী, অশ্ব, রথ এবং ধন-ধান্যে পরিপূর্ণ বারাণসীতে প্রবেশ করে সমুদয় ভস্মীভূত করল। তারপর সেই চক্র শ্রীকৃষ্ণের পাশে ফিরে এল। যিনি উত্তমশ্লোক ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই বিক্রমের বিষয় শোনেন ও অন্যের কাছে তা কীর্তন করেন তিনি সর্বপাপ থেকে মুক্ত হন। ৪০-৪৩

সপ্তষষ্টীতম অধ্যায়

বলরাম ও দ্বিবিদ বানরের যুদ্ধ

রাজা পরীক্ষিৎ বললেন, ভগবান, অনির্বচনীয় সামর্থ্যবান, অনন্ত, অপ্রমেয় বলরাম আরও যে সব কর্ম করেছিলেন তাঁর সে সব বিক্রম শুনতে ইচ্ছে হচ্ছে। ১

শুকদেব বললেন, মহারাজ, সুগ্রীবের মন্ত্রী ও মৈন্দের ভ্রাতা দ্বিবিদ নামে এক বীর্যবান বানর নরকাসুরের সখা ছিল। ঐ বানর নিহত সখার ঋণ শোধ করার জন্য রাষ্ট্রবিপ্লবের ইচ্ছায় অগ্নি প্রয়োগে নগর, গ্রাম, খনি ও গোপপল্লী দগ্ধ করতে লাগল। কখনও পাহাড় তুলে নিয়ে তার আঘাতে লোকের আবাস-ভূমি, বিশেষ করে আপনার মিত্র নরকাসুরের হত্যাকারী শ্রীহরির বাসস্থান দ্বারকার নিকটবর্তী আনর্ত প্রভৃতি গ্রামগুলি প্রায় ধ্বংস করে ফেলল। কখনও বা সমুদ্রে নেমে দুই হাতে জলের আলোড়ন সৃষ্টি করে তটবর্তী দেশগুলি প্লাবিত করে দিতে লাগল। সেই খল দ্বিবিদ ঋষিদের আশ্রমের বৃক্ষরাজি উৎপাটন করে, বিষ্ঠা ও মূত্র ত্যাগ করে যজ্ঞাগ্নি দূষিত করতে লাগল। ভ্রমর যেমন কীট ধরে নিজের গর্তে লুকিয়ে রাখে, সেভাবে দর্পিত বানর নরনারীদের দুই পর্বতের মধ্যে ও গুহায় ছুঁড়ে ফেলে পাথর দিয়ে আচ্ছাদিত করে রাখতে লাগল। এভাবে যখন সে দেশ, গ্রাম, নগর সব বিনষ্ট ও কুলনারীদের কলুষিত করছিল তখন একদিন রৈবতক পর্বত থেকে অপূর্ব গীতধ্বনি শুনতে পেয়ে ঐ বানর মোহাচ্ছন্ন হয়ে সেদিকেই চলতে লাগল। সেখানে গিয়ে সে নারীপরিবৃত পদ্মমালাধারী মনোহর যাদবেন্দ্র বলরামকে দেখতে পেল। ভগবান বলভদ্র বারুণী মদিরা পান করে গজেন্দ্রের মত মত্ত ও মদবিহ্বল লোচন হয়ে গান করছিলেন। সেই দুষ্ট বানর একটি গাছে উঠে গাছপালা আলোড়িত ও কামিনীদের দিকে মুখভঙ্গি করে কিচ্‌কিচ্‌ শব্দ করতে লাগল। বানরের ধৃষ্টতায় বলরামের রহস্যপ্রিয় তরুণী পত্নীরা হেসে উঠলেন। দুষ্ট বানর তখন বলরামের সমক্ষেই ভ্রূভঙ্গি, মুখভঙ্গি করে ও পায়ু দেখিয়ে তাঁদের অবজ্ঞা করতে লাগল। ২-১৩

১ কৃত্যাগ্নি—মাহেশ্বরী কৃত্যা শিব-সম্বন্ধীয় মারাত্মক দেবতা।

এই দেখে বলরাম ক্রোধে তার দিকে একটি পাথর ছুঁড়ে মারলেন। ধূর্ত বানর ঐ পাথরের আঘাত এড়িয়ে বলরামের মদিরার কলসটি তুলে নিয়ে হাসতে হাসতে পালাল। এই ঘটনায় বলরাম রাগে কাঁপতে লাগলেন। বানরের কিন্তু এতেও তৃপ্তি হল না। সে মদিরা-কলসটি ভেঙ্গে ফেলল ও আবার ছুটে কাছে এসে নারীদের কাপড় টেনে ছিঁড়ে ফেলতে লাগল। তার এই অপকীর্তি দেখে এবং গ্রাম-নগরাদি ধ্বংসের সংবাদ জেনে বলরাম ক্রোধে তাকে মারবার জন্য মুষল ও লাঙ্গল উদ্যত করে দাঁড়ালেন। এদিকে দ্বিবিদও তড়িৎবেগে একটি শালবৃক্ষ উপড়ে নিয়ে তা দিয়ে বলরামের মাথায় আঘাত করতে এগিয়ে এল। বলরাম অবিচলিতভাবে দণ্ডায়মান থেকে পতিতপ্রায় শালবৃক্ষটি ধরে ফেললেন ও সুনন্দন নামক মুষল দ্বারা বানরকে আঘাত করলেন। সেই আঘাতে তার মাথা ফেটে অবিরল রক্তপাত হতে লাগল। বানর তা গ্রাহ্য না করে গৈরিকধারায় শোভিত পর্বতের মত রক্তধারায় শোভিত হয়ে আরেকটি গাছ উপড়ে ও তার পাতা ফেলে দিয়ে তা দিয়ে বলরামকে আঘাত করতে উদ্যত হল। এবারও বলরাম বৃক্ষটিকে ধরে একশ টুকরো করে বানরের উদ্যম নিষ্ফল করলেন। এভাবে গাছ তুলতে তুলতে শালবন প্রায় বৃক্ষহীন হয়ে পড়ল, তাই দ্বিবিদ বলরামের উপর শিলাবর্ষণ শুরু করল। মুষলধারী বলরাম অবলীলায় সে সব শিলা চূর্ণবিচূর্ণ করলেন। শেষে সেই বানররাজ ছুটে এসে তালবৃক্ষ তুল্য দুই বাহু দিয়ে রোহিণীনন্দনের বক্ষে মুষ্টির আঘাত করতে লাগল। যাদবেন্দ্র তখন মুষল ও লাঙ্গল ফেলে দু'হাত দিয়ে তার কণ্ঠ ও বাহুমূলে আঘাত করতে লাগলেন। সেই বানর রক্তবমি করতে করতে পড়ে গেল। ১৪-২৫

হে কুরুশ্রেষ্ঠ, বাতাসে নৌকাগুলি যেমন জলের উপব দুলে ওঠে দ্বিবিদের পতনেও গুহা-গহ্বর ও বৃক্ষরাজি সহ পর্বত সেভাবে কেঁপে উঠল। আকাশে দেবতারা পুষ্পবৃষ্টি করলেন, সিদ্ধ ও মুনিরা জয়ধ্বনি, প্রণাম, মন্ত্র উচ্চারণ ও 'সাধু সাধু' রব করলেন। মহারাজ, ভগবান সঙ্কর্ষণ জগতে দুষ্কৃতকারী দ্বিবিদকে এভাবে সংহার করে নিজ পুরে প্রবেশ করলেন এবং পুরবাসীদের দ্বারা স্তুত হলেন। ২৬-২৮

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায়

শাম্ব-বন্ধন ও হস্তিনাপুর-আকর্ষণ

শুকদেব বললেন, মহারাজ, এ সব ঘটনার কিছুদিন পরে দুর্যোধন-কন্যা লক্ষ্মণার স্বয়ংবর সভা হয়েছিল। জাম্ববতীনন্দন যোদ্ধা সাম্ব স্বয়ংবর সভা থেকে তাঁকে বলপূর্বক হরণ করে আনলেন। দুর্যোধন প্রভৃতি কৌরবরা ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, এই নিতান্ত দুর্বিনীত বালক আমাদের কন্যার অমতে তাকে জোর করে হরণ করেছে, একে বাঁধো। বৃষ্ণিরা আমাদের কি করবে? আমাদের প্রসাদে তাদের রাজ্য সমৃদ্ধিশালী, তারা তো আর সত্যি রাজা নয়। পুত্রের নিগ্রহের কথা শুনে যদিই বা বৃষ্ণিরা আসে তা হলে প্রাণায়াম দ্বারা যেমন ইন্দ্রিয়গুলি দমিত হয়, তেমনি আমাদের পরাক্রমে তাদেরও দর্প খর্ব হবে। ১-৪

কুরুবৃদ্ধ ভীষ্মের অনুমোদন নিয়ে কর্ণ, শল্য, ভূরি, যজ্ঞকেতু, দুর্যোধন

প্রভৃতিরা সাম্বকে বাঁধবার জন্য তার পশ্চাদ্ধাবন করলেন। ধৃতরাষ্ট্রপক্ষীয় বীরেরা তাঁকে অনুসরণ করছে দেখে মহাবল সাম্ব এক মনোহর ধনুক হাতে নিয়ে সিংহের মত নির্ভয়ে একা দাঁড়িয়ে রইলেন। কর্ণের নেতৃত্বে কুরুনন্দনরাও, দাঁড়াও, যদি বীর হও পালিয়ো না, বলে কাছে এসে তাঁকে বাণজালে আচ্ছন্ন করে ফেলতে লাগলেন। সেই অচিন্ত্যপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের পুত্র সাম্ব সামান্য মৃগ কর্তৃক আক্রান্ত সিংহের মত এই ছয় রথীর অন্যায় যুদ্ধরূপ অত্যাচার সহ্য করলেন না। সেই বীরসুন্দর ধনুতে শর যোজনা করে ক্ষিপ্রগতিতে কর্ণ প্রভৃতি ছয় রথীদের প্রত্যেককে ছয়টি করে বাণে একেবারে আলাদা আলাদা ভাবে বিদ্ধ করলেন। তারপর চারটি করে বাণে রথের অশ্বগুলি ও একটি করে বাণে সারথিদের বিদ্ধ করলেন। মহারথী, মহাধনুর্ধররাও তাঁর যুদ্ধ-কৌশলের প্রশংসা করলেন। ৫-১০

কিন্তু কর্ণ প্রভৃতি ছয় রথী কৃষ্ণপুত্র সাম্বকে রথহীন করে দিলেন। চারজনে চার অশ্ব ও একজনে সারথিকে বধ করলেন। আর একজন তাঁর শরাসন ছিন্ন করে ফেললেন। এভাবে কৌরবরা অতিকষ্ঠে সাম্বকে রথচ্যুত ও নিরস্ত্র করে বেঁধে কন্যা সহ নিজেদের নগরে ফিরলেন। আর এদিকে দেবর্ষি নারদ এসে সাম্বের বন্ধনবার্তা বৃষ্ণিদের জানালেন। নারদের কাছে ঐ বৃত্তান্ত শুনে যাদবরা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন এবং উগ্রসেনের অনুমতি নিয়ে কুরুদের বিপক্ষে যুদ্ধের উদ্‌যোগ করলেন। কলির প্রধান লক্ষণ যে কলহ তা দূর করাই বলরামের স্বভাব। তাই কুরু ও যদুবংশে বিবাদ ঘটে, এটা তাঁর ইচ্ছা ছিল না। তিনি যাদবদের সান্ত্বনা দিয়ে গ্রহ-পরিবেষ্টিত চন্দ্রের মত ব্রাহ্মণ ও কুলবৃদ্ধগণ পরিবৃত হয়ে হস্তিনাপুরে যাত্রা করলেন। ১১-১৫

হস্তিনায় উপস্থিত হয়ে বলরাম বাইরের উপবনে থেকে ধৃতরাষ্ট্রের মনোভাব জানার জন্য উদ্ধবকে পাঠালেন। উদ্ধব অম্বিকাপুত্র ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম, দ্রোণ, বাহ্লিক ও দুর্যোধনকে যথাবিধি অভিবাদন করে তাঁদের বলরামের আগমন-বার্তা জানালেন। বলরাম এসেছেন শুনে কুরুগণ একান্ত প্রীত হয়ে পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়ে উদ্ধবের যথেষ্ট অভ্যর্থনা করলেন। পরে হাতে মাঙ্গল্যদ্রব্য উপহার নিয়ে সবাই সুহৃদ্‌বর বলরামের অভ্যর্থনার জন্য তাঁর কাছে গিয়ে বয়স ও সম্বন্ধ অনুসারে আলিঙ্গন, প্রণাম ইত্যাদি করে তাঁকে ধেনু ও অর্ঘ্য দান করলেন। পরস্পর কুশল ও শুভ সংবাদ আদান-প্রদান করার পর বলরাম ধীরভাবে বললেন, রাজাধিরাজ অমিতবিক্রম মহারাজ উগ্রসেন যা বলেছেন তা শুনুন এবং সেই অনুসারে কাজ করুন। আপনারা অধর্মাচরণ করে অনেকে মিলে একা বালক সাম্বের সঙ্গে অন্যায় যুদ্ধ করেছেন এবং জয়লাভ করে তাকে বেঁধে রেখেছেন। বন্ধুদের সঙ্গে একতা রক্ষার জন্য আমরা তা সহ্য করলাম। এবার এখনই আমাদের পুত্রকে আমাদের কাছে সমর্পণ করুন। উভয় বন্ধুকুলের মধ্যে বিরোধ না হওয়াই আমার একান্ত অভিপ্রায়। ১৬-২২

বলরামের কথা তাঁর নিজের শক্তির অনুরূপ বীর্য-শৌর্য ও বলব্যঞ্জক। তা শুনে কুরুগণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বলল, কি আশ্চর্যের বিষয়, কালের দুরন্ত গতিতে পাদুকা আজ মুকুটসেবিত মাথায় উঠতে চাইছে! কুন্তীর বিবাহ উপলক্ষে বৃষ্ণিদের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ ঘটেছে এবং এরা আমাদের সঙ্গে একত্রে উপবেশন, ভোজন, শয়ন ইত্যাদির অধিকার পেয়েছে। আমাদেরই অনুগ্রহে আজ এরা রাজাসনও লাভ করেছে। এরা আমাদের অনুমতির অপেক্ষা না রেখেই চামর, ব্যজন, শঙ্খ, শ্বেতছত্র, কিরীট, আসন ও শয্যা উপভোগ করছে এবং স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দিচ্ছে।

সাপকে দুধ দিয়ে পুষলে সে যেমন দুধদাতার দিকেই ফণা তোলে সেরকম যদুরা আমাদের আনুকূল্যে বৃদ্ধি পেয়ে আজ আমাদেরই আদেশ করছে। যথেষ্ট হয়েছে, এবার এদের যা কিছু দেওয়া হয়েছে সবই কেড়ে নেয়া হোক। মেষ যেমন সিংহের লভ্য অংশ প্রত্যাশা করতে পারে না, তেমনি ভীষ্ম, দ্রোণ, অর্জুন প্রভৃতি কুরুরা দয়া করে না দিলে ইন্দ্রও কি কোন বস্তু পেতে পারেন? আজ তুচ্ছ এক যাদব এসে যুদ্ধে পরাজিত বন্দী সাম্বকে পরিত্যাগ করার জন্য আমাদের আদেশ করছে! ২৩-২৮

শুকদেব বললেন, হে ভরতকুলশ্রেষ্ঠ, আভিজাত্য, জনবল, বংশমর্যাদা ও ধনসম্পদের গর্বে কৌরবরা এত উন্মত্ত হয়েছিল যে তারা ভদ্রসমাজে স্থান লাভ করার যোগ্যতা হারিয়েছিল। বলরামকে ঐ রকম দুর্বাক্য শুনিয়ে তারা নগরে প্রবেশ করল। তাদের দুষ্টাচার ও দুর্বাক্যে ক্রোধে ভীষণ হয়ে বলরাম হেসে বললেন, ঠিকই নানা গর্বে গর্বিত অসাধুরা শান্তি চায় না। পশুদের মত তারা একমাত্র লগুড়ের আঘাতেই শান্ত হয়। কি আশ্চর্য, আমি এদেরই মঙ্গল কামনায় ক্রুদ্ধ যদুদের এবং ক্ষুব্ধ শ্রীকৃষ্ণকে অতিকষ্টে সান্ত্বনা দিয়ে এখানে এসেছিলাম। কিন্তু এরা এতই নির্বোধ ও খলপ্রকৃতির যে আমার মত হিতকারীকেও অবমাননা করে দুর্বাক্য প্রয়োগ করছে। ইন্দ্র প্রভৃতি লোকপালরা যাঁর আদেশ মান্য করেন, বৃষ্ণি ও অন্ধকদের অধীশ্বর সেই উগ্রসেনও রাজা হবার উপযুক্ত নন? যিনি সুধর্মা নামে দেবসভাকে আক্রমণ করেছিলেন, স্বর্গ থেকে পারিজাত এনে মর্ত্যে ভোগ করেছেন তিনি রাজার আসন পাবার যোগ্য নন? অখিলেশ্বরী সাক্ষাৎ লক্ষ্মী যাঁর পদযুগল সেবা করেন, সেই লক্ষ্মীপতি শ্রীকৃষ্ণও রাজসিংহাসনের উপযুক্ত পাত্র নন? কিন্তু হতভাগ্য মূর্খরা জানে না যে যোগিগণের যিনি পরমতীর্থ, লোকপালরা মুকুটশোভিত মস্তকে যাঁর পদপঙ্কজ-রজ পরম সৌভাগ্য জ্ঞানে ধারণ করে থাকেন, সর্বতীর্থময়ী গঙ্গা যাঁর চরণস্পর্শে পবিত্র হন, যাঁর অংশের অংশ ব্রহ্মা, মহাদেব, লক্ষ্মী আর আমিও যাঁর চরণ বহন করি, সেই বাসুদেবের আবার রাজাসন! সত্যই বটে যদুরা কুরুদের প্রদত্ত রাজাসন সম্ভোগ করছে! যদুরা হল মাথার মণি, আর আমরা বৃষ্ণিরা পাদুকা! ওঃ এত গর্ব! ঐশ্বর্যমদে কুরুরা মাদকমত্তের চেয়েও বেশি উন্মত্ত হয়েছে। আমি এদের শাস্তি দিতে সমর্থ হয়েও এ সব সহ্য করব? আজই এই পৃথিবীকে কৌরবহীন করব। এই বলে বলরাম ক্রোধে যেন ত্রিভুবন দগ্ধ করে হল নিয়ে দাঁড়ালেন এবং হস্তিনাপুর নগরটিকে উপড়ে তুলে গঙ্গায় ছুঁড়ে ফেলতে মনস্থ করে লাঙ্গলের অগ্রভাগ দিয়ে তাকে আকর্ষণ করলেন। লাঙ্গলের আকর্ষণে হস্তিনাপুর গঙ্গাজলে গিয়ে পড়তে যাচ্ছে ও জলযানের মত ঘুরছে দেখে কৌরবরা ভয়ে আকুল হল। পরিবারবর্গ সহ নিজেদের জীবনরক্ষার প্রত্যাশায় তারা নববধূ লক্ষ্মণা সহ সাম্বকে বলরামের কাছে এনে কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁর শরণাপন্ন হয়ে স্তব করতে লাগল। ২৯-৪৩

হে অখিলাধার রাম, আমরা মূঢ় ও কুবুদ্ধি। আপনার প্রভাব আমাদের জানা নেই। আপনি সৃষ্টি, স্থিতি ও ধ্বংসের একমাত্র কারণ। আমাদের অপরাধ ক্ষমা করুন। আপনার উৎপত্তির অন্য কোন কারণ নেই। আপনি ক্রীড়া করতে প্রবৃত্ত হলে এই সব লোক আপনার ক্রীড়াসামগ্রীরূপে উৎপন্ন হয়ে থাকে, ঋষিরা এরকম বলেন। হে সহস্রমস্তক, আপনিই অনন্ত, লীলাবশে নিজ মস্তকে ভূমণ্ডল ধারণ করছেন। প্রলয়ের সময়ে আপনি বিশ্বকে নিজের মধ্যে সংহত করে একা অবস্থান করেন ও অনন্তশয্যায় শায়িত হন। আপনি স্থিতি ও পালনে তৎপর হয়ে সত্ত্বগুণ অবলম্বন করে আছেন। শিক্ষা দেবার জন্যই আপনার ক্রোধ, দ্বেষ বা মাৎসর্য

থেকে তনয়। হে সর্বভূতাত্মা, আপনাকে নমস্কার। আমরা আপনার চরণের শরণ নিলাম। আমাদের রক্ষা করুন। ৪৪-৪৮

শুকদেব বললেন, মহারাজ, যাদের নগর গঙ্গাবক্ষে কম্পিত হচ্ছিল সেই বিপন্ন ও ভয়ার্ত কুরুদের স্তবের পর ভগবান বলরাম তাদের অভয় দিলেন। তারপর কন্যা-বৎসল দুর্যোধন ষাট বৎসর বয়স্ক বারো শ' হস্তী, একলক্ষ বারো শ' অশ্ব, স্বর্ণ-নির্মিত সূর্যতুল্য দীপ্তিশালী ষাট হাজার রথ এবং কণ্ঠে পদক শোভিত এক হাজার দাসী যৌতুকস্বরূপ দান করলেন। যদুশ্রেষ্ঠ সেই সব দান গ্রহণ করে পুত্রবধূর সঙ্গে বন্ধু-পরিজনদের দ্বারা অভিনন্দিত হয়ে প্রস্থান করলেন। দ্বারকায় পৌঁছে হলধর অনুরাগী বন্ধুদের সঙ্গে মিলিত হলেন এবং কুরুরা যে আচরণ করেছিলেন যদুশ্রেষ্ঠদের সভায় তা বর্ণনা করলেন। মহারাজ, অদ্ভুতকর্মা বলরামের এই অপূর্ব বিক্রমের পরিচয়স্বরূপে হস্তিনাপুর আজও গঙ্গার অভিমুখে দক্ষিণভাগে যথেষ্ট উন্নত দেখা যায়। ৪৯-৫৪

ঊনসপ্ততিতম অধ্যায়

নারদ কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের গার্হস্থ্যলীলা দর্শন

শুকদেব বললেন, মহারাজ, নরকাসুর নিহত হয়েছে ও শ্রীকৃষ্ণ বহু স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করে গার্হস্থ্যলীলা করছেন শুনে দেবর্ষি নারদ তা দেখার জন্য সেখানে উপস্থিত হলেন। শ্রীকৃষ্ণ ষোল হাজার কামিনীর পৃথক পৃথক গৃহে একই সময়ে লীলা করছেন, এ আশ্চর্যের বিষয় বৈকি! তখন দ্বারকার কি অপূর্ব শোভাই হয়েছিল। উৎসুকচিত্তে নারদ দেখলেন, দ্বারকার বন-উপবন-উদ্যান ফলফুলে শোভিত, পাখীর কাকলি ও ভ্রমরের গুঞ্জনে ধ্বনিত আর প্রস্ফুটিত শ্বেত ও লাল পদ্ম, কহ্লার ও উৎপলে ব্যাপ্ত জলাশয়গুলি ক্রীড়ারত হাঁস ও সারসের কলধ্বনিতে মুখরিত। স্ফটিক ও রজতময় লক্ষ লক্ষ প্রাসাদে মরকতমণির মত অপূর্ব জ্যোতি-বিশিষ্ট স্বর্ণরত্নময় বিচিত্র আসবাব-পত্রাদি শোভা পাচ্ছিল। পুরীর মধ্যে রাজপথ, প্রশস্ত পথ, চতুষ্পথ, চত্বর, হাট-বাজার, অন্নসংগ্রহশালা, সভামণ্ডপ, মন্দির প্রভৃতি যথাস্থানে স্থাপিত হয়ে নিত্য জলসিক্ত ও ধৌত হত। অজস্র ধ্বজা-পতাকাদির আবরণের জন্য সূর্যকিরণও প্রচণ্ড মনে হত না। দেবর্ষি নারদ দ্বারকার অপূর্ব শোভা দেখে বিস্মিত হলেন। বিশ্বকর্মা যেন তাঁর সমস্ত নৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা প্রকাশ করেছিলেন শ্রীহরির অন্তঃপুর রচনায়। ইন্দ্র প্রভৃতি লোকপালদেরও প্রশংসিত ষোল হাজার গৃহে পরিশোভিত অপূর্ব অন্তঃপুরে নারদ উপস্থিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণের এক পত্নীর গৃহে প্রবেশ করলেন। ১-৮

ঐ ভবনটি প্রবাল-স্তম্ভে পরিশোভিত, বৈদুর্যমণি ফলকে আচ্ছাদিত এবং গৃহের প্রাচীর ও ভূমি ইন্দ্রনীল-মণিময় ও স্বচ্ছ, যাতে তাদের মসৃণতা ও জ্যোতি অম্লান থাকত। বিশ্বকর্মা নির্মিত মুক্তাদাম শোভিত চন্দ্রাতপ, উত্তম মণিমালা ও গজদন্ত নির্মিত পর্যঙ্কসমূহ ঐ গৃহে শোভা পাচ্ছিল। উত্তম বস্ত্র পরিহিতা পদককণ্ঠী দাসীরা এবং কঞ্চুক ও উষ্ণীষধারী, সুন্দর বস্ত্র ও মণিময় কুণ্ডলধারী পুরুষরা গৃহের শোভা বর্ধন করছিল। অসংখ্য রত্নদীপ অন্ধকার দূর করছিল। অগুরুর ধূমরাশি দেখে মেঘভ্রমে ময়ূরগুলি পেখম ছড়িয়ে ও বিচিত্র কেকাধ্বনি করে বিচরণ করছিল।

১ সেকালে যে দাসপ্রথা প্রচলন ছিল তার আরো বহু উদাহরণ পূর্বতন অধ্যায়সমূহে পাওয়া যাবে। তাছাড়া রাজারা আপন কন্যাদের তাদের মতের অপেক্ষা না করেই যত্রতত্র সম্প্রদান করতেন। এতে মনে হয় বেদের যুগে যে স্ত্রীস্বাধীনতার প্রচলন ছিল মধ্যযুগে তা লোপ পায়।

নারদ সেই গৃহে যদুপতিকে দর্শন করলেন। গৃহিণী রুক্মিণী রূপ, গুণ, বয়স ও বেশে প্রায় সমকক্ষ দাসীদের দ্বারা বেষ্টিত হয়ে রৌপ্যদণ্ডকযুক্ত চামর দ্বারা তাঁকে সর্বক্ষণ ব্যজন করছিলেন। ধার্মিকশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ নারদকে দেখে তাড়াতাড়ি রুক্মিণীর পালঙ্ক থেকে নেমে কৃতাঞ্জলিপুটে কিরীটমণ্ডিত শিরে তাঁর চরণে প্রণাম করে নিজের আসনে বসালেন। যাঁর চরণ-নিঃসৃত জল গঙ্গা নামে প্রবাহিত হয়ে অশেষ তীর্থময় বলে বিখ্যাত হয়েছে, সেই সাধুদেব অধিপতি ও জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ গুরু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং নারদের দুই চরণ প্রক্ষালন করে পাদোদক নিজের মস্তকে ধারণ করলেন। 'ব্রহ্মণ্যদেব' এই নাম যথার্থই তাঁর উপযুক্ত। ৯-১৫

পুরাণ-ঋষি নরসখা নারায়ণ শাস্ত্রোক্ত বিধানে দেবর্ষি নারদকে অভিবাদন ও পূজা করে অমৃতবর্ষিণী বাণীতে কুশলাদি প্রশ্ন করে বললেন, প্রভু, বলুন আপনার জন্য আমি কি করতে পারি ? ১৬

নারদ বললেন, অখিলের লোকনাথ, হে বিভু, সকলের সঙ্গে মিত্রতা আর খলদের দণ্ডবিধান এই উভয়ই আপনার কাজ, ওতে আশ্চর্যের কিছু নেই। আমরা ভাল করে জানি যে জগতের ধারণ ও পালনের জন্য আপনি স্বেচ্ছায় অবতীর্ণ হন। ভক্তজনের পরম আশ্রয় আপনার চরণ অসীম জ্ঞানী ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবতারা শুধু হৃদয়ে ধ্যান করতে সমর্থ। সংসারকূপে পতিত মানুষের উদ্ধারের প্রধান অবলম্বন-স্বরূপ সেই চরণযুগল আজ আমি দর্শন করলাম। অখিল জীবের মুক্তিপ্রদ আপনার চরণকমল চিন্তা করেই আমি যেন বিচরণ করতে পারি। অনুগ্রহ করুন, চিরকাল যেন আমার ঐ চরণে মতি থাকে। ১৭-১৮

শুকদেব বললেন, মহারাজ, দেবর্ষি নারদ এই সময় যোগেশ্বরেরও ঈশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অনির্বচনীয় যোগমায়া বিভূতি দর্শনের কামনায় আর এক কৃষ্ণ-বনিতার গৃহে প্রবেশ করলেন। সেখানেও দেখলেন, শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়া ভার্যাকে নিয়ে উদ্ধবের সঙ্গে পাশা খেলছেন। লক্ষ্মীপতি শ্রীকৃষ্ণ নারদের পূর্বের উপস্থিতি যেন না জেনেই উঠে আসন ইত্যাদি দিয়ে পরম ভক্তিতে তাঁর অর্চনা করলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কতক্ষণ এখানে এসেছেন ? আপনার অভিপ্রায়ই বা কি ? আমরা অতি সামান্য ব্যক্তি, আপনারা পূর্ণ। আপনার কোন অভীষ্টই সাধন করতে পারি না। তবুও হে ব্রাহ্মণ, আমাদের আজ্ঞা করুন, আমাদের জন্ম সার্থক হোক। নারদ এ-কথা শুনে বিস্মিত হলেন এবং কিছু না বলে অন্য এক ঘরে গেলেন। সেখানে গিয়ে দেখলেন যে ভগবান গোবিন্দ শিশু-সন্তানকে লালন করছেন। আবার অন্য গৃহে প্রবেশ করে দেখলেন শ্রীকৃষ্ণ স্নান করার উদ্যোগ করছেন। কোন গৃহে তিনি পঞ্চমহাযজ্ঞ প্রভৃতির অনুষ্ঠানে আহবনীয় অগ্নিতে হোম করছেন, কোথাও বা বেদ অধ্যয়ন, অতিথিসেবা, তর্পণ ও বলি প্রদান করছেন। কোথাও ব্রাহ্মণদের ভোজন করাচ্ছেন, কোথাও বা অনুষ্ঠান ও ব্রাহ্মণভোজনের শেষে নিজে ভোজন করছেন ; কোথাও বা বাগ্‌যত হয়ে পরব্রহ্মের জপসহ সন্ধ্যা করছেন। কোথাও বা শ্রীকৃষ্ণ অসি-চর্ম নিয়ে, কখনও অশ্বে, কখনও গজে, কখনও বা রথে আরোহণ করে বিচরণ করছেন। আবার কোন গৃহে তিনি পালঙ্কে শয়ান আছেন, স্তাবকরা তাঁর স্তব করছে। কোথাও উদ্ধব প্রভৃতি মন্ত্রীদের সঙ্গে একত্রে বসে কোন গভীর বিষয়ের মন্ত্রণায় নিবিষ্ট আছেন। কোথাও বা তিনি বারবনিতা প্রভৃতিতে বেষ্টিত হয়ে জলক্রীড়া করছেন। আবার কোথাও অলঙ্কৃতা গাভী ব্রাহ্মণদের দান করছেন। কোন গৃহে ইতিহাস, পুরাণ ও মঙ্গল-কথা শ্রবণ করছেন। কোথাও তিনি প্রিয়ার সঙ্গে হাস্য-কৌতুকে রত। কোনও গৃহে তিনি ধর্মের অনুষ্ঠান করছেন। কোনও গৃহে অর্থের ও ভোগের সংগ্রহে যত্নবান রয়েছেন। কোথাও

তিনি প্রকৃতির অতীত পরম পুরুষ সর্বান্তর্যামী পরমাত্মারই (নিজেরই) চিন্তায় মগ্ন। কোন গৃহে নানা রকম বস্ত্র, অলংকার প্রভৃতি কাম্যবস্তু দান এবং পূজার দ্বারা গুরুদের সেবা করছেন। আবার তিনি কারো সংগে ঝগড়া-বিবাদ করছেন; কোন গৃহে বা তিনি কারো সংগে সন্ধি করছেন। কোথাও তিনি বলরামের সংগে একত্র হয়ে সাধুদের শুভ-চিন্তায় ব্যস্ত রয়েছেন, কোথাও বা যথাকালে, যথাবিধানে তিনি নিজ পুত্র-কন্যাদের যথোপযুক্ত পাত্রী ও পাত্রের সংগে বিবাহ সম্পন্ন করাচ্ছেন। আবার কোথাও তিনি কন্যা ও জামাতাদের প্রেরণ বা আনয়ন এই দুয়েরই উৎসব উদ্‌যাপন করছেন। ১৯-৩৩

কোথাও সমৃদ্ধিসম্পন্ন বহুদক্ষিণা বিশিষ্ট যজ্ঞদ্বারা তিনি নিজ অংশভূত দেবতা-গণের অর্চনা করছেন; কোথাও বা কূপখনন, দেবমন্দির-প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি দ্বারা প্রচুর পূর্তকর্মের অনুষ্ঠান করছেন। কোন গৃহে সিন্ধুদেশ জাত উৎকৃষ্ট অশ্বে আরোহণ করে যদুবীরগণে পরিবৃত হয়ে তিনি মৃগয়ার উদ্‌যোগ করছেন এবং মৃগয়ায় যজ্ঞীয় পশুসকলকে বধ করছেন। কোথাও বা যোগেশ্বর গুপ্তবেশে বিশেষ বিশেষ সম্ভোগ করার জন্য অন্তঃপুর ও গৃহগুলিতে অমাত্য প্রভৃতির মধ্যে স্ত্রীসকলের সংগে বিচরণ করছেন। মানবলীলা করার জন্য অবতীর্ণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ঐ রকম অচিন্ত্য শক্তির অনির্বচনীয় বিকাশ দেখে দেবর্ষি বিস্মিত হয়ে হেসে তাঁকে বললেন, প্রভু, আপনার যোগমায়া সকল যোগীদেরও দুজ্ঞের্য়। কিন্তু আপনার পদসেবা কার বলে ঐ সব আমার মনে প্রতিভাত হয়ে আমায় জানতে সাহায্য করছে। অনুমতি করুন, আমি এখান থেকে ফিরে গিয়ে আপনার ভুবনপাবন লীলাসমূহ গান করে আপনার পবিত্র যশে পরিপ্লাবিত লোকসমূহে ভ্রমণ করি। ৩৪-৩৯

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন, দেবর্ষি আমি ধর্মের বক্তা, কর্তা ও অনুমোদয়িতা। কাজেই যাতে জগতে ধর্মশিক্ষা দেওয়া যায় সেজন্য আমি এইভাবে অবস্থান করছি। এ দেখে আপনি মোহগ্রস্ত হবেন না। ৪০

শুকদেব বললেন, মহারাজ, নারদ একমাত্র শ্রীকৃষ্ণকেই সমস্ত গৃহে গৃহস্থদের পবিত্র ধর্মসকল আচরণ করতে দেখতে পেলেন। তিনি অনন্তবীর্য শ্রীকৃষ্ণের যোগমায়ার প্রভাব বারবার দেখার পর যারপর নাই বিস্মিত হলেন। ধর্ম, অর্থ ও কাম বিষয়ে একান্ত শ্রদ্ধাবান ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক সম্মানিত হয়ে দেবর্ষি নারদ খুবই প্রীত হলেন। শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করতে করতে তিনি যথাস্থানে প্রস্থান করলেন। নিখিল সংসারের প্রয়োজনে যিনি নানা মূর্তিতে আবির্ভূত হন সেই নারায়ণ মনুষ্যপদবী অনুকরণ করে ষোল হাজার উৎকৃষ্ট রূপ ও লাবণ্যবতী পত্নীর গৃহে সলজ্জ ও সপ্রেম হাসি এবং মধুর অবলোকনে নিরন্তর সেবিত হয়ে বিহার করেছিলেন। বিশ্বের উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ শ্রীহরি এই পৃথিবীতে যে সমস্ত অসাধারণ লীলার পরিচয় দিয়েছেন সে সব লীলা শুধু শ্রবণ, কীর্তন ও অনুমোদন করলেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মোক্ষপ্রদ ভক্তি জন্মে। ৪১-৪৫

সপ্ততিতম অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণ সমীপে রাজদূতের আগমন

শুকদেব বললেন, মহারাজ, একদিন কুক্কুটের উচ্চরবে রাত্রি ভোর হওয়ার কথা জানতে পেরে শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠলগ্নশায়িতা পৃথক্ পৃথক্ কৃষ্ণ-পত্নীরা বিরহের আশংকায়

কুক্কুটদের অভিশাপ দিতে লাগলেন। মৌমাছি মধু-গন্ধবাহী বাতাসের সঙ্গে গান করতে লাগল এবং পাখীরা প্রবুদ্ধ হয়ে বন্দীদের মত শ্রীকৃষ্ণকে জাগাবার জন্য মধুর স্বরে গান করছিল। উষাকাল অতি সুন্দর হলেও স্বামীর কণ্ঠলগ্না রুক্মিণী প্রভৃতি পত্নীরা শ্রীকৃষ্ণের বিরহের আশংকায় তা সহ্য করতে পারলেন না। শ্রীপতি শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মমুহূর্তে শয্যা থেকে উঠে আচমনাদি করে দেহ ও ইন্দ্রিয়ের প্রসন্নতা সাধন করলেন। তারপর তিনি উপাধিশন্য, আত্মসংস্থিত, অব্যয়, অখণ্ড, সাক্ষাৎ জ্যোতিঃস্বরূপ, এই জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও নাশের কারণ, নিজ শক্তিসমূহ দ্বারা যাঁর সত্তা ও আনন্দ লক্ষিত হয়ে থাকে সেই ব্রহ্ম নামক সদানন্দময় নিজেরই ধ্যানে নিমগ্ন হলেন। সাধু-শ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ নির্মল জলে স্নান সেরে বস্ত্র ও উত্তরীয় পরে যথাবিধি সন্ধ্যা-উপাসনা ও অগ্নিতে হোম করলেন। তারপর তিনি মৌনী হয়ে গায়ত্রী জপ করতে লাগলেন। সূর্যদেবের উদয় হলে তাঁর অর্চনা করে শ্রীকৃষ্ণ নিজকলারূপ দেবতা, ঋষি ও পিতৃলোকের তর্পণ করে বয়োজ্যেষ্ঠ ও ব্রাহ্মণদের অর্চনা করলেন। পরে শান্তস্বভাব, দুগ্ধবতী চুরাশি হাজার তেরটি গাভী একত্র করে ক্ষৌমবস্ত্র, অজিন ও তিলসহ অলংকৃত ব্রাহ্মণদের দান করলেন। ১-৯

তারপর নিজের বিভূতি-স্বরূপ গো, ব্রাহ্মণ, দেবতা, বৃদ্ধ, গুরু ও যাবতীয় প্রাণীকে নমস্কার করে কপিলা গাভী প্রভৃতি মঙ্গল দ্রব্যগুলি স্পর্শ করলেন। নিজে বসন, ভূষণ, দিব্যমাল্য ও চন্দনে সজ্জিত হয়ে নরলোক-মনোহর রূপ ধারণ করলেন এবং ঘৃত, দর্পণ, গো, বৃষ, দ্বিজ ও দেবতাদের দর্শন করে সর্ববর্ণের পুরবাসী ও অন্তঃপুরচারীদের অভিলষিত সামগ্রীর প্রার্থনা পূরণ করে আনন্দ লাভ করলেন। তারপর আগে ব্রাহ্মণদের চন্দন এবং তাম্বুল দান করে পরে বন্ধু, আত্মীয় এবং মহিষীদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ মিলিত হলেন। এই অবসরে সারথি চার অশ্ব যুক্ত পরম উৎকৃষ্ট রথ নিয়ে বিনম্রভাবে শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করে তাঁর সামনে দাঁড়ালেন। ১০-১৪

শ্রীকৃষ্ণ তখন সারথির হাত ধরে সাত্যকি ও উদ্ধবসহ উদীয়মান সূর্যের মতো সেই দিব্যরথে আরোহণ করলেন। অন্তঃপুর থেকে পত্নীরা সলজ্জ প্রেমদৃষ্টিতে তাঁকে দেখতে লাগলেন। তিনি কিছুক্ষণ সেখানে থাকলেন। তারপর অতিকষ্টে তাঁরা তাঁকে বিদায় দিলে মধুর হাসিতে তাঁদের মন ভরিয়ে তিনি যাত্রা করলেন। ১৫-১৬

মহারাজ, এভাবে তিনি পৃথক পৃথক ভাবে সমস্ত গৃহ থেকে বার হয়ে এক হলেন এবং যদুদের সঙ্গে সুধর্মা নামে সভায় প্রবেশ করলেন। যারা ঐ সভায় প্রবেশ করে তাদের শোক, মোহ, জরা, মৃত্যু, ক্ষুধা ও পিপাসা—এই ছয় দেহ-ধর্ম লোপ পেয়ে থাকে। যদুশ্রেষ্ঠ বিভু সেই সভায় প্রবেশ করে তারাবেষ্টিত চন্দ্রদেবের মত নৃসিংহতুল্য যদুকুল পরিবৃত হয়ে নিজ জ্যোতিতে সর্বদিক আলোকিত করে বিরাজ করতে লাগলেন। সেখানে পরিহাস রসিকরা নানা রকম হাস্যরসে, নটাচার্যরা তাণ্ডব-নৃত্যে এবং নর্তকীরা মৃদঙ্গ, বীণা, মুরজ, বেণু, করতাল ও শঙ্খের ধ্বনি সহযোগে নিজ নিজ কৌশল, নৃত্য-গীতাদি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের মনোরঞ্জন করলেন। সূত, মাগধ ও বন্দীরা তাঁর প্রসন্নতার জন্য স্তব শুরু করল। বাগ্মী ব্রাহ্মণরা বেদমন্ত্রের ব্যাখ্যা করতে লাগলেন এবং প্রাচীন যশস্বী রাজাদের পবিত্র কাহিনী বলতে লাগলেন। ১৭-২১

একদিন এক অপরিচিত ব্যক্তি সভাদ্বারে উপস্থিত হলেন। প্রতিহারীরা শ্রীকৃষ্ণের অনুমতি নিয়ে তাঁকে সভার মধ্যে নিয়ে এল। তিনি কৃতাঞ্জলিপুটে

পরেশ ভগবানকে নমস্কার করে জরাসন্ধ কর্তৃক বন্দী রাজাদের দুঃখের বৃত্তান্ত তাঁকে জানালেন। জরাসন্ধের দিগ্‌বিজয়ের সময় যে যে রাজা তাঁর অধীনতা স্বীকার করে বিনম্র হন নি, ঐ রকম বিশ হাজার রাজাকে জরাসন্ধ বলপূর্বক বন্ধন করে (মহাভৈরব যাগে লক্ষ রাজবলি দেবার অভিপ্রায়ে) গিরিব্রজ নামক দুর্গে আবদ্ধ রেখেছেন। রাজারা ঐ দূতের মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণের কাছে বলে পাঠিয়েছিলেন, হে ভয়ভঞ্জন অপ্রমেয়াত্মা শ্রীকৃষ্ণ, আমরা আপনার পরম স্বরূপ অবগত হতে অসমর্থ হয়েই দূরে পড়ে আছি এবং ভবভয়ে ভীত হয়েছি। এখন আমরা আপনার শরণাপন্ন হলাম, আপনি আমাদের রক্ষা করুন। সংসারের মনুষ্যেরা কাম্য ও নিষিদ্ধ কর্মে নিরত হয়ে আপনার অর্চনারূপ মঙ্গলকর কর্মে অমনোযোগী হলে আপনিই বলবান কালরূপে এসে অকস্মাৎ তার জীবনাশা ছিন্ন করে দেন। সেই কালরূপ আপনাকে প্রণাম। জগতের ঈশ্বর আপনি সাধুদের রক্ষা ও খল ব্যক্তিদের নিগ্রহ করার জন্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছেন। হে ঈশ্বর, অন্য কে আপনার আজ্ঞা লঙ্ঘন করছে অথবা কে নিজ নিজ কর্মফল ভোগ করছে তা আমরা কিছুই জানতে পারছি না। জগৎপতি, আপনার অনুগ্রহে বীতরাগ নিষ্কাম লোকেরা আত্মস্বরূপে বিদ্যমান আপনার পরমানন্দের অনুভবে শান্তিলাভ করে থাকেন। কিন্তু আমরা আপনার অচিন্ত্যশক্তি মহমায়ার প্রভাবে এতই ভ্রান্ত হয়েছি যে, সেই আত্মানন্দকে উপেক্ষা করে অতি তুচ্ছ এবং স্বপ্নের মত রাজসুখের প্রত্যাশায় সম্পূর্ণ অনিত্য শবতুল্য এই দেহে স্ত্রী-পুত্রের চিন্তা করছি আর কৃপণের মত দারুণ সংসার-ক্লেশ ভোগ করছি। দয়াময়, আপনার চরণযুগল প্রণতজনের শোক হরণ করে। সিংহ যেমন মেষপালকে অবরোধ করে, তেমনি একা অযুত নাগের বলধারী এই মগধরাজ নিষ্ঠুরভাবে আমাদের নিজ ভবনে রুদ্ধ করে রেখেছে। আপনি এই মগধরাজরূপ কর্মবন্ধন থেকে আমাদের মোচন করুন। হে সুদর্শনধারী, জরাসন্ধ আপনার সঙ্গে আঠারো বার যুদ্ধ করে সতের বার পরাজিত হয়েছিল। একবারই মাত্র অনন্তবীর্য আপনাকে জয় করে সে মহাদর্পে আপনার প্রজা ভক্তদেরও পীড়ন করছে। হে অজিত, এ বিষয়ে যা কর্তব্য হয় করুন। ২২-৩০

দূত বলল, এভাবে মগধরাজ কর্তৃক অবরুদ্ধ রাজারা আপনার দর্শনের অভিলাষী হয়ে আপনার চরণমূলে আশ্রয় নিয়েছেন। আপনি দীনজনের মঙ্গল করুন। ৩১

দূত যখন সবিস্তারে এই বৃত্তান্ত বলছে সে সময় পিঙ্গলবর্ণ জটাজুটধারী কান্তিমান দেবর্ষি নারদ সূর্যের মত সেখানে উদিত হলেন। সর্বলোকেশ্বরের ঈশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে দেখে সপারিষদ আসন ছেড়ে উঠে তাঁর যথাবিধ বন্দনা ও পূজা করলেন। দেবর্ষি আসন গ্রহণ করলে শ্রদ্ধা প্রদর্শনে তাঁকে সন্তুষ্ট করে মধুর বাক্যে শ্রীকৃষ্ণ বললেন, এখন তো ত্রিলোকের কোন বিষয় থেকে ভয়ের আশঙ্কা নেই? আপনি সর্বলোকে ভ্রমণ করেন ও আপনার কাছ থেকে আমরা সংবাদ পেয়ে থাকি, এ আমাদের পরম লাভ। সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের সমস্ত ভুবনের মধ্যে আপনার অজানা কিছুই নেই। তাই পাণ্ডবরা এখন কি করছেন আপনার কাছে জানতে চাই। ৩২-৩৬

নারদ বললেন, বিভু, আমি অনেকবারই আপনার দুরতিক্রম্য মায়া অনুভব করেছি। ব্রহ্মারও মোহ উৎপাদক আপনি অপ্রকাশ আগুনের মত নিজ শক্তিগুলির দ্বারা সর্বভূতে অন্তর্যামীরূপে বর্তমান। তাই আপনার এই জিজ্ঞাসা আমার

কাছে আশ্চর্যের বিষয় নয়। বস্তুত অবিদ্যমান এই জগৎও আপনার মায়ায় বিদ্যমান বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। নিজ মায়ায় আপনি এর সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় করছেন; আপনার কর্ম জানার সাধ্য কার? অচিন্ত্যস্বরূপ আপনাকে প্রণাম। জন্ম-মরণরূপ সংসারবন্ধ জীব নিষ্কৃতি লাভের একমাত্র উপায় আপনার অর্চনায় অমনোযোগী হয়ে শুধু অনর্থ লাভ করছে। কিভাবে সংসার থেকে মুক্তিলাভ করা যায়, তা সে জানে না। জীবের মুক্তির জন্য যিনি লীলা-অবতার-সমূহের দ্বারা নিজ যশ-প্রদীপ প্রজ্বলিত করে অজ্ঞানরূপ অন্ধকার দূর করছেন সেই আপনার শরণাপন্ন হলাম। হে ভগবান, যদিও আপনি সর্বজ্ঞ তবুও যখন নরলোকের অনুকরণ করেছেন তাই বলি, আপনার পিসীর পুত্র এবং ভক্ত রাজা যুধিষ্ঠিরের অভিলাষ যে তিনি আপনার চরণ লাভের কামনায় যজ্ঞশ্রেষ্ঠ রাজসূয় যজ্ঞে আপনার অর্চনা করবেন। আপনি অনুমোদন করুন। এই শ্রেষ্ঠ যজ্ঞে আপনাকে দর্শন করায় জন্য দেববৃন্দ ও যশস্বী রাজাগণ সকলেই আসবেন। যখন আপনার নাম ও কর্ম শ্রবণ-কীর্তন করে এবং শ্রীমূর্তি শুধু হৃদয়ে ধারণ করেই চণ্ডালও পবিত্র হয়, তখন হে সর্বেশ্বর পূর্ণব্রহ্ম আপনাকে সাক্ষাৎ যাঁরা দর্শন করেন তাঁদের কথা আর কি বলব। হে ভুবনমঙ্গল, আপনার অমল যশোরাশি স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতালের সর্বদিক আলোকিত করেছে। আপনার শ্রীচরণ-নিঃসৃত বারি স্বর্গে মন্দাকিনী, পাতালে ভোগবতী ও মর্তে গংগা নামে প্রবাহিত হয়ে ত্রিলোককে পবিত্র করেছে। ৩৭-৪৪

শুকদেব বললেন, মহারাজ, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দেবর্ষি নারদের ঐ উক্তি শুনে মনে মনে সন্তুষ্ট হলেন। কিন্তু তাঁর পক্ষের জয়লিপ্সু যাদবরা জরাসন্ধকে অবিলম্বে পরাজিত করার প্রস্তাব করল। তাদের কিছু না বলে কেশব হেসে মধুর বাক্যে ভক্ত উদ্ধবকে বললেন, উদ্ধব, তুমি আমাদের পরম বন্ধু। তুমি মন্ত্রণাবিষয়ে তত্ত্বজ্ঞ এবং পরামর্শদাতা, তাই চোখের মত পথ-প্রদর্শক। তুমি আমাদের কি কর্তব্য তা বল, আমরা বিশেষ শ্রদ্ধা সহকারে তাই করব। সর্বজ্ঞ প্রভু অনভিজ্ঞের মত পরামর্শ প্রার্থনা করলে উদ্ধব তাঁর আজ্ঞা শিরোধার্য করে যথার্থ প্রত্যুত্তর দিতে শুরু করলেন। ৪৫-৪৭

একসপ্ততিতম অধ্যায়

উদ্ধবের মন্ত্রণা ও শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রপ্রস্থে গমন

শুকদেব বললেন, মহারাজ, শ্রীকৃষ্ণের এই কথা শুনে এবং দেবর্ষি, সভ্যবৃন্দ ও শ্রীকৃষ্ণের মনের কথা বুঝতে পেরে মহামতি উদ্ধব বলতে লাগলেন, হে দেব, আপনার পিসীর পুত্র যখন রাজসূয় যজ্ঞ করতে অভিলাষী, তখন আপনি তাঁর সাহায্য করুন। এইমাত্র দেবর্ষি যা বললেন, আপনার তা করা কর্তব্য। আর শরণার্থী রাজাদের রক্ষা করাও আপনার উচিত। হে বিভু, দিগ্বিজয়ী হয়ে রাজা যুধিষ্ঠির যদি রাজসূয় যজ্ঞ করেন তাহলে দিগ্বিজয় উপলক্ষে জরাসন্ধকে পরাজিত করা হবে। এতে রাজসূয় যজ্ঞ ও শরণাগত রক্ষা উভয় কাজই সিদ্ধ হবে। জরাসন্ধের নিধন হলে আমাদের বিশেষ উপকার হয়, ভবিষ্যতে কোন বিপদের আশঙ্কা থাকে না। উপরন্তু কারারুদ্ধ রাজাদের মুক্ত করাতে আপনার যশ

আরও ছড়িয়ে পড়বে। প্রভু, প্রথমে দ্বারকা থেকে আমাদের ইন্দ্রপ্রস্থে যাওয়া কর্তব্য। সেখানে রাজসূয় যজ্ঞের জন্য যুধিষ্ঠিরের অনুমতি নিয়ে আপনি জরাসন্ধের নিধন ব্যবস্থা করুন। জরাসন্ধকে নিহত করা নিতান্ত তুচ্ছ ব্যাপার নয়, তার বল দশ হাজার হাতীর সমান। ভীম ছাড়া এমন কোন বীর নেই যে তার সামনে দাঁড়াতে পারে। শত শত অক্ষৌহিণী সেনা দ্বারা তাকে জয় করা যাবে না, তাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে পরাস্ত করতে হবে। সে একজন ব্রাহ্মণভক্ত, ব্রাহ্মণরা তার কাছে যাই প্রার্থনা করেন, সে কখনো তা প্রত্যাখ্যান করে না। ভীম ব্রাহ্মণবেশ ধারণ করে তার কাছে গিয়ে দ্বন্দ্বযুদ্ধ প্রার্থনা করুন। তারপর আপনার সামনেই দ্বন্দ্বযুদ্ধে ভীম তাকে বধ করবেন, তাতে সন্দেহ নেই। হে পরমেশ্বর, যেমন বিশ্ব-সংসারের সৃষ্টিতে ও সংহারকার্যে ব্রহ্মা ও শিব নিমিত্তমাত্র, কালরূপী পরমাত্মা আপনার প্রেরণাতেই প্রকৃতপক্ষে সমস্ত ঘটে থাকে, সেরকম জরাসন্ধের বধে আপনিই প্রকৃত কর্তা থাকবেন, ভীম হবেন নিমিত্ত মাত্র। গোপীরা শংখচূড় থেকে, গজেন্দ্র কুমির থেকে, সীতা রাবণ থেকে এবং আপনার পিতামাতা বসুদেব ও দেবকী কংসের থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে আপনার যশ ও কীর্তি গান করেছিলেন। মুনিরা ও আমরা আপনার শরণলাভ করে সর্বদাই মোক্ষবিষয়ে গান করে থাকি; তেমনি জরাসন্ধের কারাগার থেকে নৃপতিরা মুক্ত হলে তাদের পত্নীরা এই শত্রু-নিধনের বার্তা কীর্তন করবে। হে কৃষ্ণ, জরাসন্ধ-বধে যথেষ্ট উপকার সাধিত হবে। জরাসন্ধের পাপ ও রাজাদের পুণ্যফলের উদয়ে এই যজ্ঞ, এও আপনার অনুমোদন লাভ করুক। ১-১১

শুকদেব বললেন, মহারাজ, উদ্ধবের ঐ যুক্তিসম্মত সুপরামর্শ শুনে দেবর্ষি নারদ, যদুবৃদ্ধরা এবং শ্রীকৃষ্ণ সকলেই এঁর বিশেষ প্রশংসা করলেন। তারপর দেবকীপুত্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বসুদেব প্রভৃতি গুরুজনদের অনুমতি নিয়ে দারুক ও জৈত্রাদি ভৃত্যদের ইন্দ্রপ্রস্থে যাত্রার আয়োজনের জন্য আদেশ করলেন। অগ্রজ বলরাম ও যদুরাজের আদেশ নিয়ে শ্রীকৃষ্ণ যথোপযুক্ত পরিচ্ছদাদিতে বিভূষিত সপুত্র স্বীয় মহিষীদের এগিয়ে দিয়ে এসে গড়ুরধ্বজ রথে আরোহণ করলেন। রথ, হস্তী, পদাতি ও অশ্বারোহী দ্বারা রচিত বিরাট সৈন্যবাহিনী তাঁর সঙ্গে চলল। মৃদঙ্গ, ভেরী, আনক, শংখ ও গোমুখগুলির প্রচণ্ড রবে চতুর্দিক প্রতিধ্বনিত করে শ্রীকৃষ্ণ যাত্রা করলেন। উৎকৃষ্ট বস্ত্র, ভূষণ, চন্দনাদি সুগন্ধের অনুলেপন ও দিব্যমাল্য প্রভৃতিতে বিভূষিতা রুক্মিণী প্রভৃতি পতিব্রতা রমণীরা নিজ নিজ পুত্র ও অসি-চর্মধারী প্রহরী দ্বারা সুরক্ষিত হয়ে নরযান, অশ্বযান ও স্বর্ণময় শিবিকায় পতি অচ্যুতের অনুগমন করলেন। নারী ও বারনারীরা নানা বেশ-ভূষায় সুসজ্জিত হয়ে, তৃণ-নির্মিত গৃহ ও কম্বল এবং বস্ত্র ইত্যাদি সামগ্রী, উট, গো, মহিষ, গর্দভ, অশ্বতরী বা বলীবর্দযানে চাপিয়ে নানা দিক থেকে শ্রীকৃষ্ণের অনুগমন করতে লাগল। তিমি প্রভৃতি জলজন্তু ও তরঙ্গরাজিতে পূর্ণ সমুদ্র যেমন সূর্যকিরণে উদ্ভাসিত হয়ে দিনের বেলা শোভা পায়, সেরকম তুমুল শব্দকারী সেই সেনাবাহিনী বৃহৎ ধ্বজপট, ছত্র, চামর, অস্ত্রশস্ত্র, আভরণ, কিরীট ও বর্মে সূর্যের কিরণ প্রতিফলিত হয়ে শোভা পেতে লাগল। তারপর শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক পূজিত দেবর্ষি নারদ আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে তাঁকে প্রণাম করলেন ও হৃদয়মধ্যে কৃষ্ণরূপ চিন্তা করতে করতে আকাশপথে প্রস্থান করলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ রাজদূতকে সম্বোধন করে বললেন, ব্রাহ্মণ, ভয়ের কারণ নেই, তোমাদের মঙ্গল হোক, জরাসন্ধকে আমি নিশ্চয়ই বিনাশ করব। ১২-২০

রাজদূত ফিরে গিয়ে কারারুদ্ধ রাজাদের শ্রীকৃষ্ণের আশ্বাসবাক্য যথাযথ ভাবে

জানাল। তাঁরাও মুক্তির জন্য উৎসুক হয়ে শ্রীকৃষ্ণের আগমনের প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। এদিকে বাসুদেব সৈন্যসামন্ত পরিবৃত হয়ে ক্রমশ আনর্ত, সৌবীর মরু ও কুরুক্ষেত্র এবং সেসব স্থানের গিরি, নদী, পুর, গ্রাম, ব্রজ ও আকরাদি অতিক্রম করলেন। শ্রীকৃষ্ণ দৃষদ্বতী ও সরস্বতী নদী উত্তীর্ণ হয়ে ক্রমশ পাঞ্চাল ও মৎস্যদেশকেও অতিক্রম করে ইন্দ্রপ্রস্থে পৌঁছলেন। মানুষের দুর্লভদর্শন শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং এসেছেন শুনে অজাতশত্রু যুধিষ্ঠির অতি হৃষ্ট হয়ে উপাধ্যায় ও বন্ধুজন পরিবৃত হয়ে পুরী থেকে বের হলেন। ইন্দ্রিয়গুলি যেমন প্রাণলাভে পুনর্জাগরিত হয়ে প্রাণের অনুসরণ করে সেভাবে সেই পাণ্ডুনন্দন গীত-বাদ্যাদি ও বেদধ্বনি সহ সর্ব-ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্তা ভগবান হৃষীকেশের কাছে এগিয়ে গেলেন। স্নেহার্দ্র-হৃদয়ে যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণকে অনেকদিন পর প্রত্যাগত পরম বন্ধুর মত বার বার আলিঙ্গন করতে লাগলেন। লক্ষ্মীদেবীর পবিত্র আশ্রয়স্থান মুকুন্দ-কলেবর দুই বাহুতে আলিঙ্গন করে রাজার অমঙ্গল দূর হল, চক্ষু আনন্দাশ্রুতে প্লাবিত হল এবং শরীর পরমানন্দে রোমাঞ্চিত হল। তিনি যেন লোকব্যবহার বিস্মৃত হয়েছিলেন। মাতুলতনয় মুকুন্দকে আলিঙ্গন করে ভীম প্রেমাশ্রুতে বিগলিত হলেন। অর্জুন এবং নকুল-সহদেব শ্রীকৃষ্ণকে দেখে খুবই আনন্দ পেলেন ও আনন্দাশ্রু বিসর্জন করে প্রাণপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণকে গাঢ় আলিঙ্গন করলেন। ২১-২৮

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুন কর্তৃক আলিঙ্গিত, নকুল-সহদেব কর্তৃক বন্দিত হয়ে ব্রাহ্মণ ও বৃদ্ধদের নমস্কারাদি দ্বারা যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করলেন। তিনি কুরু, সৃঞ্জয় ও কেকয়বংশীয় কুলবৃদ্ধদেরও সম্মান দেখালেন। সূত, মাগধ, গন্ধর্ব, বন্দী ইত্যাদিরা মৃদঙ্গ, শঙ্খ, পটহ, বীণা, পণব, বেণু প্রভৃতি সহযোগে নৃত্য ও গীতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে তুষ্ট করলেন। ব্রাহ্মণরা অরবিন্দাক্ষ শ্রীকৃষ্ণের স্তব করলেন। পুণ্যশ্লোক ভগবান সুহৃদদের দ্বারা এভাবে অভ্যর্থিত হয়ে সুসজ্জিত ও অলঙ্কৃত নগরে প্রবেশ করলেন। ২৯-৩২

নগরে বিচিত্র ধ্বজা, পতাকা এবং সুবর্ণময় তোরণগুলিতে পূর্ণকুম্ভ শোভা পাচ্ছিল। বিশুদ্ধচিত্ত নবনারীরা নতুন বস্ত্র, নানা অলঙ্কার ও মালা-চন্দনাদিতে ভূষিত হয়ে সর্বত্র বিচরণ করছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ কুরুরাজের বাসস্থান দেখলেন। প্রতিগৃহে প্রদীপ্ত দীপমালা ও পূজোপহারের আয়োজন ছিল। ধূপগন্ধে সমগ্র পুরী আমোদিত হচ্ছিল। গৃহগুলির রজতময় স্থূল শৃঙ্গে স্বর্ণনির্মিত কলস শোভা পাচ্ছিল এবং পতাকা উড়ছিল। মানবচক্ষুর একমাত্র দর্শনীয় শ্রীকৃষ্ণ এসেছেন শুনে নগরবাসিনী যুবতী রমণীরা তাঁকে দর্শনের জন্য রাজপথে বেরিয়ে আসতে লাগল। ঔৎসুক্যে তাঁদের কেশ ও বস্ত্রবন্ধন শিথিল হয়ে পড়ল। গৃহে কাজ এমনকি শয্যায় স্বামীদেরও তারা অনায়াসে ফেলে রেখে এল। হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিকে পরিব্যাপ্ত রাজপথে স্ত্রীদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করে সেই নারীরা বাড়ীর উপর থেকে পুষ্পবর্ষণ করল। মনে মনে তাঁকে আলিঙ্গন করে সবিস্ময় দৃষ্টিপাতে তাঁকে স্বাগত সম্ভাষণ করল। চন্দ্র-সহচরী তারকামালার মত পথে মুকুন্দের সঙ্গিনী পত্নীদের দর্শন করে পুরনারীরা বলতে লাগল, আহা, এই নারীরা পূর্বজন্মে কী পুণ্যই না সঞ্চয় করেছেন। পুরুষ-শ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ উদার হাসি ও লীলা-কটাক্ষে এঁদের আনন্দ বর্ধন করেছেন। ৩৩-৩৭

তারপর শ্রেণীমুখ্য ও পুরবাসীরা ফুল, মালা এবং ফলাদি মঙ্গল্য দ্রব্য হাতে নিয়ে শ্রীকৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁর পূজা করতে লাগল। এভাবে প্রফুল্ল-লোচন মুকুন্দ অন্তঃপুরজনের প্রীতি ও সম্ভ্রমে অভিনন্দিত হয়ে রাজমন্দিরে প্রবেশ

করলেন। কুন্তী ভ্রাতুষ্পুত্র ত্রিভুবনেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে দেখামাত্র পুত্রবধূ (দ্রৌপদী) সহ পালঙ্ক থেকে নেমে তাঁকে প্রসন্নচিত্তে আলিঙ্গন করলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির আনন্দে অভিভূত হয়ে সাদরে দেব-দেবেশ গোবিন্দকে গৃহে আনলেন। সে সময় অভিভূত বা আত্মহারা যুধিষ্ঠির যথানিয়মে শ্রীকৃষ্ণের পূজার প্রকার-বিশেষও বিস্মৃত হয়েছিলেন। ৩৮-৪১

মহারাজ, শ্রীকৃষ্ণ পিসীকে ও গুরুপত্নীদের যথাযথভাবে অভিবাদন করলেন এবং নিজে দ্রৌপদী ও ভগ্নী (সুভদ্রা) কর্তৃক বন্দিত হলেন। শাশুড়ী কুন্তীর ইঙ্গিতে কৃষ্ণা রুক্মিণী, সত্যা, ভদ্রা, জাম্ববতী, কালিন্দী, মিত্রবিন্দা, শৈব্যা, নাগ্নজিতী প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত পত্নীদেরই পূজা করলেন এবং অন্যান্য অভ্যাগত নারীদেরও বস্ত্র, মালা, অলংকারাদি দিয়ে যথোপযুক্ত অর্চনা করলেন। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির সৈন্য, অনুচরবর্গ অমাত্য ও ভার্যাগণে পরিবৃত জনার্দনকে নিত্য নতুন সুখসেব্য দ্রব্য প্রদানে হস্তিনাপুরে নিজ আলয়ে বাস করতে প্রবৃত্ত করলেন। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের সঙ্গে মিলিত হয়ে রমণীয় খাণ্ডব উপবনটি আহুতিস্বরূপ প্রদান করে অগ্নির তৃপ্তিসাধন করলেন। ঐ উপবনের অধিবাসী মহামায়াবী ময়দানবকে তাঁরা অগ্নির হাত থেকে উদ্ধার করেন। পরে তাকে দিয়ে তাঁরা যুধিষ্ঠিরের অপূর্ব রাজসভা প্রস্তুত করিয়ে নেন। এভাবে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের নানারকম প্রিয়কার্য সাধন করে এবং সসৈন্যে অর্জুনের সঙ্গে রথে বিচরণ করে শ্রীকৃষ্ণ কয়েকমাস সেখানে অবস্থান করলেন। ৪২-৪৭

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়

জরাসন্ধ-বধ

শুকদেব বললেন, মহারাজ, একদিন মুনি, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, জ্ঞাতি, বন্ধু প্রভৃতি সভাসদ্গণে পরিবৃত হয়ে রাজা যুধিষ্ঠির সিংহাসনে বসে সভাস্থ সকলকে শুনিয়ে শ্রকৃষ্ণকে বললেন, গোবিন্দ, যজ্ঞশ্রেষ্ঠ রাজসূয়ের অনুষ্ঠানে তোমাব পবিত্র বিভূতিসমূহের অর্চনা করতে মনস্থ করেছি। প্রভু, তোমার পাপ-তাপহারী চরণের সেবা করে যারা তোমার শ্রীমূর্তি ধ্যান করে এবং লীলামৃত কীর্তন করে তারা এই ভবসাগর অনায়াসে পার হয়। তাদের হৃদয়ে ভোগবাসনা থাকলে তাও লাভ হয়। কিন্তু ভক্তিহীন হলে সর্বসম্পদশালী রাজচক্রবর্তীরাও সকল বিষয়ে বঞ্চিত হয়। অতএব, হে দেবদেব, তোমার চরণপদ্মের মহিমা জগদ্বাসী সবাই প্রত্যক্ষ করুক। কুরু ও সৃঞ্জয়দের মধ্যে যারা তোমাকে ভজনা করে আর যারা করে না তাদের কার কতদূর সামর্থ্য তা তুমি দেখাও। তুমি জীবমাত্রেরই অন্তরাত্মা, আত্মারাম ও সমদর্শী; তাই 'নিজ' ও 'পর' ভেদ তোমার নেই। ভক্তের প্রতি তোমার কল্পতরুর মত অনুগ্রহ, যে যেমন সেবা করে তাকে সে রকম ফল দিয়ে থাক তুমি।[১] কখনো তার বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনা নেই। ১-৬

ভগবান বললেন, মহারাজ, আপনি উৎকৃষ্ট বিষয়ের সংকল্প করেছেন। রাজসূয় যজ্ঞরূপ আপনার এই মঙ্গলকর কীর্তি সর্বলোকে পরিব্যাপ্ত হবে। ঋষিগণ, পিতৃগণ, দেবগণ, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়গণ, অন্যান্য প্রাণী এবং আমাদের সকলেরই আপনার

১ যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।—গীতা ৪।১১

এই মহাযজ্ঞ অভীপ্সিত। আপনি সমস্ত রাজাদের পরাজিত করে সমগ্র পৃথিবী নিজের বশীভূত করুন এবং যজ্ঞোপকরণ সংগ্রহ করে মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করুন। এরকম যজ্ঞের আয়োজন আপনার পক্ষেই সম্ভব। আপনার ভ্রাতারা সবাই লোকপালদের অংশে উৎপন্ন। বিশেষ করে অজিতাত্মা লোকদের অজেয় আমাকেও জিতেন্দ্রিয় আপনি বশীভূত করেছেন। পৃথিবীর রাজাদের কথা দূরে থাক, দেবতারাও আমার ভক্তকে পার্থিব শ্রী, ধন, সামর্থ্য এবং সৈন্য-সামগ্রীর বল ও বিক্রমে পরাস্ত করতে পারে না। ৭-১১

শুকদেব বললেন, মহারাজ, ভগবানের উক্তি শুনে রাজার মুখমণ্ডল আনন্দে উৎফুল্ল হল। বিষ্ণুতেজে বলীয়ান ভ্রাতাদের তিনি দিগ্‌বিজয়ের জন্য নিয়োগ করলেন। সৃঞ্জয়বংশীয়দের সঙ্গে সহদেবকে দক্ষিণদিকে, মৎস্যদের সঙ্গে নকুলকে পশ্চিমদিকে, কেকয়দের সঙ্গে অর্জুনকে উত্তরদিকে এবং মদ্রকদের সঙ্গে ভীমকে পূর্বদিকে পাঠালেন। ঐ সব বীরপুরুষরা চারদিক থেকে রাজাদের পরাজিত করে অজাতশত্রু যুধিষ্ঠিরকে প্রচুর ধন এনে দিতে লাগলেন। রাজসূয় যজ্ঞের প্রতিবন্ধকরূপে জরাসন্ধ অজিত থাকায় যুধিষ্ঠির উদ্বিগ্ন হলে ভগবান শ্রীহরি তাঁর কাছে উদ্ধব কথিত উপায় প্রস্তাব করলেন। তারপর ভীম, অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ তিনজনেই ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করে বৃহদ্রথ-তনয় প্রবলপরাক্রান্ত রাজা জরাসন্ধের বাসস্থান গিরিব্রজে উপস্থিত হলেন। ব্রাহ্মণবেশী ক্ষত্রিয়ত্রয় গৃহস্থাশ্রমী জরাসন্ধের গৃহে অতিথি-সৎকারের উপযুক্ত সময়ে উপস্থিত হয়ে বললেন, মহারাজ, আমরা অতিথি। অনেক দূর দেশ থেকে এসেছি, আমাদের প্রার্থনা পূরণ করুন। আপনার মঙ্গল হোক। ত্যাগীর পক্ষে কিছুই দুঃসহ নয় আর অসজ্জনের পক্ষে কিছুই অকার্য নয়। বিশেষ করে দানশীল ব্যক্তির অদেয় কিছুই নেই এবং সমদর্শীর কোন আপন-পর ভেদ নেই। দুর্লভ মানবজীবন লাভ করে সামর্থ্য সত্ত্বেও অনিত্য শরীর দ্বারা সাধুদের চিরস্থায়ী ও কীর্তনীয় যশ যিনি অর্জন না করেন, তিনি জগতে নিন্দনীয় ও ধিক্কৃত হন। হরিশ্চন্দ্র[1], রন্তিদেব[2], মুদ্গল[3], শিবি[4], বলি[5], ব্যাধ[6], কপোত[7] এবং অন্যান্য অনেকেই এরকম সৎকার্যের অনুষ্ঠানে অনিত্যশরীর হয়েও নিত্যলোক লাভ করেছেন। ১২-২১

কণ্ঠস্বর, আকৃতি ও জ্যা-ঘাত চিহ্নিত মণিবন্ধনস্থান দেখে এঁরা ছদ্মবেশী ক্ষত্রিয়

---

১ হরিশ্চন্দ্র সূর্যবংশের ত্রিশঙ্কুর পুত্র। বিশ্বামিত্রের দক্ষিণা দানের জন্যে স্ত্রী-পুত্রকে বিক্রয় করে নিজে চণ্ডালের কর্মও করেছিলেন; তবুও ঐ যশোলাভে পরাঙ্মুখ হন নি। শেষে অযোধ্যার আপামর জনসাধারণ সহ তিনি স্বর্গে গিয়েছিলেন। ২ রন্তিদেব ভরতবংশীয় রাজা। ইন্দ্রের আরাধনা করে প্রচুর অন্নলাভ করেন এবং তা দিয়ে অতিথিসৎকার করে চিরপ্রসিদ্ধ হয়েছেন। রাজা রন্তিদেব কুটুম্বদের সঙ্গে আটচল্লিশ দিন যাবত নিরম্বু উপবাসী থাকবার পরে যৎসামান্য অন্নজল লাভ করেও তা প্রার্থীদের দান করে ব্রহ্মলোকে যান (ভাঃ পৃঃ ৪৯২-৯৩)। ৩ মুদ্গল—পুরুবংশীয় ভর্ম্যাশ্বের পুত্র বহ্বৃচ ঋষি, শাকল্যের শিষ্য। উঞ্ছবৃত্তি কুটুম্বদের সঙ্গে ছয় মাস উপবাসী থেকেও সংগৃহীত অন্নের দ্বারা অতিথিসৎকার করে ব্রহ্মলোক লাভ করেন। ৪ শিবি—উশীনরপুত্র শিবিরাজ শরণাগত কপোতের জীবনরক্ষার জন্য তার শরীরের সমান মাংস নিজের দেহ থেকে কেটে শ্যেনপক্ষীকে দান করেন এবং স্বর্গবাসী হন। ৫ বলি—বিরোচনের পুত্র ও প্রহ্লাদের পৌত্র। ব্রাহ্মণ-বেশধারী বামনবিগ্রহ নারায়ণকে সর্বস্ব দান করে সাক্ষাৎ ভগবানকেই তিনি লাভ করেছিলেন। ভগবানকে দ্বারী করে তিনি সুতলে বাস করছেন (ভাঃ পৃঃ ৪৩৭-৪৫)। ৬ ব্যাধ ও ৭ কপোত—কপোতরাজ অতিথিরূপে সমাগত ব্যাধকে কপোতী সহ নিজের মাংস প্রদান করে অতিথিসৎকার করেছিল। এই পুণ্যের ফলে তার স্বর্গলাভ হয়। কপোত-কপোতীর ঐ মহত্ত্বে বিস্মিত হয়ে ব্যাধও মহাপ্রস্থানে যাত্রা করল। পথে দাবাগ্নিতে দগ্ধদেহ হয়ে পাপনির্মুক্ত হওয়ায় সেও স্বর্গে যেতে পেরেছিল।

এবং আগে এঁদের সঙ্গে কোথাও দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছে তা বুঝতে পেরে জরাসন্ধ বলল, রাজন্যবন্ধুগণ, তোমরা ব্রাহ্মণের চিহ্নধারণ করে এসেছ, তাই তোমাদের ভিক্ষা আমি পূরণ করব। যদি দুস্ত্যাজ্য দেহও প্রার্থনা কর তাও দান করব আমি। দৈত্যরাজ বলির ঐশ্বর্য হরণের জন্য ব্রাহ্মণবেশী বামনমূর্তিধারী ভগবান বিষ্ণু বলিরাজের কাছে ত্রিপাদ ভূমি প্রার্থনা করেন। দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের নিষেধ সত্ত্বেও শুধু ব্রাহ্মণ বলেই বলিরাজ ত্রিপাদ ভূমি দান করে সর্বস্বান্ত হয়ে উজ্জ্বল কীর্তি রেখেছেন। দৈত্যরাজ ব্রাহ্মণরূপধারী বিষ্ণুকে চিনতে পেরেও এমনকি গুরুর নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও, তাঁকে পৃথিবী দান করেছিলেন। এই ক্ষয়শীল দেহ দিয়ে ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের কার্যসিদ্ধি করে বিপুল যশ লাভ করতে যদি চেষ্টা না করে তা হলে তার জীবনধারণের ফল কি? উদারবুদ্ধি জরাসন্ধ এরকম চিন্তা করে স্থিরচিত্ত হয়ে বলল, ব্রাহ্মণগণ, আপনাদের যা অভিলাষ তা প্রার্থনা করুন। যদি আমার মস্তকও প্রার্থনা করেন তাও আমি অবলীলায় দান করব। ২২-২৭

ভগবান বললেন রাজেন্দ্র, যদি ইচ্ছা হয় তাহলে আমাদের দ্বন্দ্বযুদ্ধ প্রদান করুন। আমরা যুদ্ধপ্রার্থী হয়ে উপস্থিত হয়েছি, অন্য আর কিছু প্রার্থনীয় নেই। ইনি কুন্তীনন্দন বৃকোদর (ভীম), ইনি এঁর ভ্রাতা অর্জুন আর আমি এঁদের মাতুলপুত্র ও আপনার শত্রু সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ বলে জানুন। মগধরাজ জরাসন্ধ শ্রীকৃষ্ণের এই আবেদন শুনে উচ্চহাস্য করে ক্রোধের সঙ্গে বলল, মূঢ়গণ, দ্বন্দ্বযুদ্ধেই যদি তোমাদের সাধ হয়ে থাকে, তা-ই আমি দেব; এস তা হলে। কিন্তু কৃষ্ণ, তুমি ক্লীব, ভীরু; তোমার সঙ্গে যুদ্ধ নয়। তুমি আমার ভয়ে ভীত হয়ে নিজের মথুরাপুরী ত্যাগ করে সমুদ্রের শরণ নিয়েছ। আর এই অর্জুন বয়সে ছোট, তার বলও বেশি নেই এবং দেহও আমার দেহের তুল্য নয়। কাজেই এর সঙ্গেও যুদ্ধ করতে চাই না। ভীম সর্বাংশে আমার তুল্য, অতএব এঁর সঙ্গেই যুদ্ধ করব। ২৮-৩২

এই বলে জরাসন্ধ ভীমকে একটি গদা দিয়ে নিজে একটি গদা নিয়ে পুরীর বাইরে গেল। তারপর সেই রণদুর্মদ বীরদ্বয় বজ্রসদৃশ দুই গদা দিয়ে পরস্পরকে আঘাত করতে লাগলেন। বাম ও দক্ষিণ ভাগে মণ্ডলাকারে পরিভ্রমণের কৌশলে যুদ্ধ করার সময় তাঁদের রঙ্গমঞ্চে দুই যুদ্ধরত অভিনেতার মত মনে হচ্ছিল। যুধ্যমান দুই হস্তীর উপর নিপতিত আকন্দ-শাখা যেমন চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে মাটিতে পড়ে যায়, সেভাবে পরস্পরকে আঘাত করার উদ্দেশ্যে নিক্ষিপ্ত বজ্রতুল্য গদাও ভীম এবং জরাসন্ধের স্কন্ধ, কটি, পাদদেশ, হস্ত, ঊরু, কণ্ঠ প্রভৃতি স্থানে আঘাত করে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল। এভাবে গদা ভেঙ্গে গেলে বীরদ্বয় ক্রোধে লৌহকঠিন মুষ্টির আঘাতে পরস্পরকে আঘাত করতে লাগলেন। দুই হস্তীর যুদ্ধে উৎপন্ন শব্দের মত তাঁদের কর-তাড়নে বজ্রের মত কঠোর আঘাতধ্বনি উৎপন্ন হতে লাগল। রণকৌশল ও শৌর্যে সমান ভীম ও জরাসন্ধ কেউ কারো কাছে পরাস্ত না হওয়ায় যুদ্ধ সমানভাবেই চলতে লাগল। কাজেই যুদ্ধের পরিণাম সহজে বোঝা গেল না। এরকম সমানে সমানে যুদ্ধে সাতাশ দিন অতিবাহিত হল। দিনে যুদ্ধ ও রাত্রিতে পরম সুহৃদের মত চার-জনের একত্র অবস্থান চলল। একদিন ভীম শ্রীকৃষ্ণকে বললেন, জনার্দন, জরাসন্ধকে যুদ্ধে পরাস্ত করা যেন অসম্ভব বলেই মনে হচ্ছে। শ্রীহরি শত্রুর জন্ম, মৃত্যু ও জীবিত অবস্থা জানতেন। জরা রাক্ষসীর দ্বারা জরাসন্ধের পূর্ণাবয়ব প্রাপ্তির ঘটনা[1]

১ সোমবংশীয় রাজা বৃহদ্রথের স্ত্রী দু'খণ্ড মাংসপিণ্ড প্রসব করলে তা (নদীতে) পরিত্যক্ত হয়েছিল। ইতস্তত বিচরণ করতে করতে জরা নাম্নী রাক্ষসী অকস্মাৎ খণ্ড দুটি দেখে দু'হাতে দু'খণ্ড নিয়ে সুষমভাবে একত্র করা মাত্র পূর্ণশিশুর জীবিত মূর্তি প্রস্তুত হল। তা দেখে রাক্ষসী করুণার্দ্র হৃদয়ে তাকে ভক্ষণ না করে পালন-করার জন্য মগধরাজকে সমর্পণ করে; সেই থেকে ঐ পুত্রের নাম জরাসন্ধ। দ্রষ্টব্য: ভাগবত, পৃ: ৪৯৪

স্মরণ করে অমোঘদর্শন শ্রীকৃষ্ণ একটি বৃক্ষশাখা বিদীর্ণ করে সঙ্কেতে ভীমকে শত্রুবধের উপায় বলে দিলেন। যুদ্ধবিশারদ মহাবলী ভীমসেন শ্রীকৃষ্ণের সঙ্কেত বুঝতে পেরে শত্রুর পা দু'টি ধরে ভূমিতে নিপাতিত করলেন। নিজের পা দিয়ে তার একটি পা চেপে ধরে অন্য পা দু'হাতে ধরে তার গুহ্যদেশ থেকে মস্তক পর্যন্ত মহাগজ কর্তৃক বৃক্ষশাখা চিরে ফেলার মত দুভাগে চিরে ফেললেন। ৩৩-৪৫

লোকে বিস্মিত হয়ে দেখল যে জরাসন্ধের দেহের দুই খণ্ডের প্রত্যেকটিতে একটি করে পা, ঊরু, কটি, স্তন, স্কন্ধ, বাহু, চক্ষু, ভ্রূ ও কান রয়েছে। মগধরাজ নিহত হলে মহা হাহাকার ধ্বনি উঠল। আর অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ ভীমকে আলিঙ্গন করে অভিনন্দিত করলেন। পরমপুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আলিঙ্গনে ভীমের শরীর সুস্থ ও চিত্ত শান্ত হলে পূর্বের বল ও বিক্রম ফিরে এল। ভূতভাবন অমোঘাত্মা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধের পুত্র সহদেবকে তার পিতার স্থলে মগধরাজ্যের সিংহাসনে অভিষিক্ত করলেন এবং জরাসন্ধের কারাগারে বন্দী রাজন্যবর্গকে মুক্ত করলেন। ৪৬-৪৯

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়

বন্দী রাজগণের মুক্তিলাভ

শুকদেব বললেন, মহারাজ, জরাসন্ধ নিহত হলে গিরিদ্রোণী নামক দুর্গদ্বার দিয়ে যুদ্ধে পরাজিত ও বন্দী বিশ হাজার আটশ জন রাজা বেরিয়ে এলেন। দীর্ঘকাল বন্দী থেকে তাঁদের গাত্র ও বস্ত্র মলিন হয়ে গিয়েছিল। তাঁরা বেরিয়ে এসে সামনে বাসুদেবকে দেখতে পেলেন। তিনি চতুর্ভুজ, তাঁর পরনে পীতবস্ত্র, বক্ষে শ্রীবৎস-চিহ্ন, নয়নযুগল পদ্মগর্ভ তুল্য অরুণবর্ণ, মুখমণ্ডল মনোরম ও প্রসন্নতাময়, কানে উজ্জ্বল মকর কুণ্ডল এবং হস্তে পদ্ম শোভমান। গদা, শঙ্খ, চক্র, কিরীট, হার, বলয়, কটিসূত্র ও অঙ্গদে তিনি ভূষিত। তাঁর গ্রীবায় কৌস্তুভমণি শোভা পাচ্ছে এবং কণ্ঠে লম্বমান বনমালা। শ্রীকৃষ্ণ দর্শনে রাজাদের অবরোধের ক্লেশ দূর হল, তাঁদের পাপও বিনষ্ট হল। তাঁরা যেন দুই চোখ দিয়ে তাঁর অপরূপ রূপৈশ্বর্য পান, জিহ্বাদ্বারা লেহন, নাসারন্ধ্রদ্বয় দ্বারা আঘ্রাণ ও বাহুযুগল দ্বারা আলিঙ্গন করতে করতে এসে শ্রীহরির চরণে শির অবনত করে প্রণাম করলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে হৃষীকেশের স্তব শুরু করলেন। ১-৭

রাজারা বললেন, হে শরণাগত-দুঃখহরণকারী অব্যয়, দেব-দেবেশ, আপনাকে প্রণাম। এই ভয়ংকর সংসারে তিক্তবিরক্ত হয়ে আমরা আপনার শরণ নিলাম, আপনি আমাদের মুক্তি দিন। হে মধুসূদন, হে বিভু, ঈর্ষাবশত মগধেশ্বরের প্রতি কোন দোষারোপ করছি না। জরাসন্ধ যে আমাদের রাজ্যহীন ও কারারুদ্ধ করেছে তাতে আমাদের মঙ্গলই হয়েছে। কেননা সেই জন্যই আমরা আপনার অনুগ্রহভাজন হলাম। রাজৈশ্বর্যের মদে উচ্ছৃংখল রাজারা কখনও নিজেদের মঙ্গল বুঝতে পারেন না, তাঁরা আপনার মায়ায় মোহিত হয়ে নিতান্ত চঞ্চল ও অস্থায়ী এই পার্থিব সম্পত্তিকেই নিত্য ও অচল বলে মনে করে থাকেন। বালক তথা মূঢ়গণ যেমন মরীচিকাকে জলাশয় বলে ভুল করে, সে রকম অবিবেকীরা মায়ার বিকার

ভোগ্যবস্তুগুলিকে পরম পুরুষার্থ বলে জ্ঞান করে থাকে। পূর্বে ঐশ্বর্য-গর্বে আমাদের বুদ্ধি বিভ্রান্ত হয়েছিল। পৃথিবী জয় করার ইচ্ছায় আমরা পরস্পর পরস্পরকে পরাস্ত করার জন্য নিতান্ত নির্দয় ও দুর্মদ আচরণ করতে দ্বিধা করিনি। কালরূপী আপনাকে গ্রাহ্য না করে আমরা প্রজা বধ করেছি। ৮-১২

হে শ্রীকৃষ্ণ, এখন আমাদের সেই দর্প চূর্ণ হয়েছে। অলক্ষ্যবেগ দুরন্তবীর্য আপনার কালরূপ মূর্তির প্রভাবে আজ আমরা সেই ঐশ্বর্যগর্ব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে আপনার চরণতলে শরণ নিলাম। মরীচিকার তুল্য রাজ্য ও রোগের আধার ক্ষণভঙ্গুর দেহদ্বারা ভোগের প্রার্থনা আর করি না। পরকালেও কর্মফলদ্বারা লভ্য স্বর্গ প্রভৃতির কামনা করি না। অতএব আমাদের এমন উপায় বলে দিন যাতে আমরা সংসারে নিরন্তর ভ্রমণ করলেও যেন আপনার চরণযুগলের স্মৃতি থেকে বঞ্চিত না হই। হে শরণাগতের পালক, ভক্তদুঃখহারী অন্তর্যামী, হে বাসুদেব, হে শ্রীকৃষ্ণ, আপনাকে প্রণাম। ১৩-১৬

শুকদেব বললেন, করুণাময় ভক্তবৎসল ভগবান রাজাদের দ্বারা এভাবে স্তুত হয়ে তাঁদের মধুর বচনে বললেন, রাজগণ, তোমরা আমার কাছে যা প্রার্থনা করেছ, তাই হবে। আজ থেকে অখিলেশ্বর সর্বাত্মা আমার প্রতি তোমাদের অচলা ভক্তি জন্মাবে। আমাতে চিত্ত সংযত করে নিরন্তর ধ্যান করবার যে সঙ্কল্প করেছ তা অতি আনন্দের কথা। সৌভাগ্যমদের আধিক্য থেকে উন্মত্ততা জন্মে, আর তা শ্রেয়োলাভের প্রতিবন্ধক স্বরূপ। কার্তবীর্য[1], নহুষ[2], বেণ[3], রাবণ, নরক[4] এবং অন্যান্য দেব, দৈত্য ও রাজারা ঐশ্বর্য-গর্বে অন্ধ হয়ে নিজ নিজ স্থান থেকে পতিত হয়েছেন। দেহাদি বস্তুর শেষ আছে জেনে আমাতে সমর্পিতপ্রাণ হয়ে সাবধানে ধর্মানুসারে প্রজাপালন করবে। বংশ-বিস্তার, সুখ-দুঃখ, মঙ্গল অমঙ্গল, সবকিছুতেই সহিষ্ণু এবং সন্তুষ্ট থেকো। উদ্বিগ্নচিত্ত হযো না। দেহাদিতে উদাসীন, আত্মানন্দে নিরত ও ব্রতনিষ্ঠ হবে। আমাতে চিত্ত সমাহিত করে শেষে ব্রহ্মসাযুজ্য তথা আমাকে লাভ করবে। ১৭-২৩

শুকদেব বললেন, মহারাজ, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রাজাদের একথা বলে তাঁদের অঙ্গমার্জন করানোর জন্য অনেক দাস-দাসী নিয়োগ করলেন। তাঁর আজ্ঞায় জরাসন্ধ-পুত্র সহদেব রাজোচিত বস্ত্র, অলঙ্কার ও গন্ধমালাদি দিয়ে সেই রাজাদের বেশভূষা সম্পূর্ণ করালেন। তাঁদের স্নান ও পরিচ্ছদাদি পরিধান সম্পন্ন হলে সহদেব অন্নব্যঞ্জন প্রভৃতি দিয়ে তাঁদের রাজোচিত সেবা করলেন। মুক্তিদাতা শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক জরাসন্ধের কারাগার থেকে মুক্তি ও ঐরকম সম্মান লাভ করে মার্জিত কুণ্ডলে অলংকৃত রাজারা বর্ষাশেষে শরৎকালের পূর্ণ চন্দ্রের মত অপূর্ব শোভা বিস্তার করলেন। শ্রীকৃষ্ণ নানা মধুর বাক্যে রাজাদের সন্তুষ্ট করে মণিকাঞ্চন ভূষিত উত্তম অশ্বযুক্ত পৃথক পৃথক রথে করে তাঁদের নিজ নিজ দেশে পাঠিয়ে দিলেন। তাঁরা মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক এভাবে দুঃখসাগর থেকে উদ্ধার পেয়ে মনে মনে তাঁর আচরণ-

---

১ কার্তবীর্য—হৈহয় দেশে মাহিষ্মতী নগরীর রাজা (মতান্তরে ইনি চন্দ্রবংশীয় রাজা কৃতবীর্যের পুত্র)। নর্মদা নদীতে বহু রমণীসহ জলক্রীড়া কালে রাবণ ক্রুদ্ধ হয়ে এঁর সঙ্গে যুদ্ধ করে পরাস্ত ও বন্দী হয়। পুলস্ত্যের অনুরোধে কার্তবীর্য রাবণকে মুক্তি দেন। পরে সে ভৃগু বংশে জমদগ্নির কামধেনু হরণ করায় জমদগ্নিপুত্র পরশুরামের সঙ্গে যুদ্ধে কার্তবীর্য নিহত হন। (ভাঃ পৃঃ ৪৮১-৮২) ২ নহুষ—সোমবংশীয় আয়ুর পুত্র। স্বর্গরাজ্যের অধিকার লাভ করেও শচীর প্রতি ধৃষ্টতা প্রকাশ করায় স্বর্গভ্রষ্ট হন। (ভাগবত, পৃঃ ৪৮৫-৮৬)। ৩ বেণ—ভাগবত, পৃঃ ১৯৫-৯৭ দ্রষ্টব্য। ৪ নরক—ভাগবত, পৃঃ ৬৪৫-৪৭ দ্রষ্টব্য।

সকল স্মরণ করতে করতে প্রস্থান করলেন। নিজ রাজ্যে ফিরে গিয়ে তাঁরা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের অদ্ভুত কাজের কথা সকলের কাছে কীর্তন করলেন এবং তাঁর উপদেশ মত অতি সাবধানে ধর্ম-কর্মের অনুষ্ঠান করতে লাগলেন। ২৪-৩০

এদিকে ভীমসেনের দ্বারা জরাসন্ধের নিধনকার্য শেষ করে ভগবান কেশব যখন প্রস্থানের উদ্যোগ করলেন তখন জরাসন্ধ-তনয় সহদেব তাঁর যথোচিত পূজা করলেন। শ্রীকৃষ্ণ ভীম ও অর্জুনের সঙ্গে সেখান থেকে যাত্রা করলেন। ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরে এসে শত্রুবিজয়ী তিন বীর বান্ধবদের আনন্দ ও শত্রুর ভয়োদ্দীপক শঙ্খধ্বনি করলেন। শঙ্খধ্বনি শুনে ইন্দ্রপ্রস্থবাসী প্রজারা এবং স্বয়ং রাজা যুধিষ্ঠিরও শত্রু মগধরাজ হত হয়েছেন বুঝে নিশ্চিত ও আনন্দিত হলেন। তারপর ভীম, অর্জুন ও জনার্দন রাজা যুধিষ্ঠিরকে বন্দনা করে জরাসন্ধ-বধের সমস্ত বৃত্তান্ত আনুপূর্বিক বর্ণনা করলেন। কেশবের অনুগ্রহে কিভাবে তাঁর দুর্লভ মনোবাঞ্ছা সিদ্ধ হয়েছে তা শুনতে শুনতে যুধিষ্ঠির আনন্দাশ্রু মোচন করে প্রেমে বিহ্বল হলেন ; তাঁর যেন বাক্যস্ফূর্তি হল না। ৩১-৩৫

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়

শিশুপাল সংহার

শুকদেব বললেন, বিভু, রাজা যুধিষ্ঠির এভাবে জরাসন্ধের নিধন এবং শ্রীকৃষ্ণের পরাক্রমের কথা শুনে তুষ্টমনে কিছুক্ষণ পরে তাঁকে বললেন, প্রভু, ত্রিলোকগুরু লোকপালগণ ও অন্যান্য সকলে যাঁর দুর্লভ আজ্ঞা নিজ নিজ মস্তকে বহন করেন, সেই পদ্মপলাশলোচন আপনি আমাদের মত দীন ও অভিমানীদের আজ্ঞা প্রতিপালন করেন। হে সর্বস্বামী, এ নিতান্ত লজ্জার কথা। আপনি এক, অদ্বিতীয়, ব্রহ্ম ও পরমাত্মা। উদয়-অস্ত দ্বারা সূর্যের তেজের যেমন হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না, সে রকম কোন কর্ম দ্বারাই আপনার মহিমার হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না। মাধব, 'আমি' 'আমার', 'তুমি', 'তোমার' বলে যে বিচিত্র বুদ্ধিবৃত্তি পাশবপ্রকৃতি মানুষের চরিত্রে লক্ষ করে থাকি তা যখন তোমার ভক্তের চরিত্রে কখনও দেখা যায় না, তখন তোমার মধ্যে এ-রকম ভেদবুদ্ধির কোনই সম্ভাবনা নেই। ১-৫

শুকদেব বললেন, কুন্তীনন্দন রাজা যুধিষ্ঠির ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে এভাবে নানা রকম মধুর বাক্যে পরিতুষ্ট করে তাঁর অনুমতি নিয়ে যজ্ঞের উপযুক্ত সময়ে (বসন্তকালে) ব্রহ্মবাদী যোগ্য ব্রাহ্মণদের ঋত্বিক পদে বরণ করলেন। সেই রাজসূয় মহাযজ্ঞ দেখবার জন্য যে সব শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়গণ উপস্থিত হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন দ্বৈপায়ন, ভরদ্বাজ, সুমন্তু, গোতম, অসিত, বশিষ্ঠ, চ্যবন, কণ্ব, মৈত্রেয়, কবষ, ত্রিত, বিশ্বামিত্র, বামদেব, জৈমিনি, সুমতি, ক্রতু, পৈল, পরাশর, গর্গ, বৈশম্পায়ন, অথর্বা, কশ্যপ, ধৌম্য, রাম, ভার্গব, আসুরি, বীতিহোত্র, মধুচ্ছন্দা, বীরসেন, অকৃতব্রণ। অন্যদিকে ছিলেন দ্রোণ, ভীষ্ম, কৃপাচার্য, সপুত্র ধৃতরাষ্ট্র, মহামতি বিদুর। এঁরা ছাড়াও আরো অনেক মুনি, ঋষি, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, অন্যান্য রাজা, তাঁদের প্রজা ও অমাত্যবর্গ নিমন্ত্রিত হয়ে যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হলেন। তারপর ব্রাহ্মণরা স্বর্ণলাঙ্গলে যজ্ঞভূমি কর্ষণ করে শোধন করলেন এবং বেদবিধি অনুসারে রাজাকে (যুধিষ্ঠির) যজ্ঞে দীক্ষিত

করলেন। পূর্বে বরুণের যজ্ঞে যেরকম সোনার উপকরণ দেওয়া হয়েছিল, সে রকম ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞেও স্বর্ণ-নির্মিত উপকরণাদি সংগৃহীত হয়েছিল। কমলাসন ব্রহ্মা, ভগবান রুদ্রদেবের পশ্চাতে পার্ষদগণ পরিবৃত ইন্দ্র প্রভৃতি লোকপালগণ, সিদ্ধ, গন্ধর্ব, বিদ্যাধর, উরগ, মুনি, যক্ষ, রাক্ষস, খগ, কিন্নর, চারণ, রাজন্যবর্গ ও রাজবনিতারা দলে দলে নানা স্থান থেকে যজ্ঞস্থলে এসে উপস্থিত হলেন। তাঁরা সকলেই এই কৃষ্ণ-ভক্তের যজ্ঞ সুসম্পন্ন বলে স্বীকার করলেন। দেবতারা যেমন প্রচেতা বরুণকে রাজসূয় যজ্ঞে দীক্ষিত করেছিলেন সেরকম ভাবে দেবতুল্য ঋত্বিকরা বিধিমত যুধিষ্ঠিরকে সংস্কৃত করলেন। পরে সোমাভিষব (সোমরসপান) দিয়ে পৃথিবীপালক রাজা যুধিষ্ঠির বিশেষ সমাদরের সঙ্গে যথা-নিয়মে মহাভাগ যাজক ও সদস্য-শ্রেষ্ঠদের পূজা আরম্ভ করলেন। ৬-১৭

সে সময় যজ্ঞস্থলে উপস্থিতদের মধ্যে আগে পূজা পাবার যোগ্য অনেকে থাকায় সর্বাগ্রে কে পূজা পাবেন সভাসদরা তা স্থির করতে পারলেন না। তখন মাদ্রীপুত্র সহদেব সকলকে সম্বোধন করে বললেন, সাত্বতপতি ভগবান অচ্যুত অগ্রপূজার যোগ্য অধিকারী। দেশ, কাল, পাত্র ও ধনৈশ্বর্যাদির বিবেচনায় এঁর পূজা করলেই সমস্ত দেবতার পূজা করা হবে। এঁর আত্মস্বরূপ থেকে এই বিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে, ইনি যজ্ঞসমূহেরও আত্মা। ইনিই অগ্নি, আহুতি ও মন্ত্র। জ্ঞান, যোগ-সাধনা প্রভৃতি সমস্ত কিছুর চরম লক্ষ্য ইনিই। ইনি জন্ম-কর্ম ইত্যাদির অতীত এক এবং অদ্বিতীয় হয়েও আত্মস্বরূপে এই অনন্ত সংসারের সৃষ্টি, পালন ও সংহার করছেন। সভ্যগণ, যাঁর অনুগ্রহে ইহজগতে নানা কর্মের অনুষ্ঠান করে জনগণ বিবিধ মঙ্গল সাধন করতে পারে সেই সর্বান্তর্যামী মহান শ্রীকৃষ্ণকে শ্রেষ্ঠ পূজা দান করুন! কৃষ্ণ যদি আমাদের পূজা গ্রহণ করেন তা হলে যাবতীয় ভূতের এমনকি পূজকের আত্মস্বরূপেও যথাযথ পূজা হবে। দানের অনন্তফল যিনি কামনা করেন, সর্বভূতের অন্তরাত্মাস্বরূপ, সর্বত্র সমদর্শী, শান্ত, পূর্ণ আনন্দমূর্তি শ্রীকৃষ্ণকেই তাঁর (অগ্রপূজা) দান করা উচিত। ১৮-২৪

এই কথা বলে সহদেব নীরব হলেন। সভাস্থ সকলে সন্তুষ্ট হলেন এবং সাধুশ্রেষ্ঠরা তাঁর প্রশংসা করলেন। রাজা যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণদের সাধুবাদ শুনে এবং সভাসদ্দের অভিপ্রায় বুঝতে পেরে আনন্দ ও ঐকান্তিক প্রেমে হৃষীকেশ শ্রীকৃষ্ণের পূজা করলেন। তিনি প্রথমে তাঁর পবিত্র পাদোদক স্ত্রী, ভাই, মন্ত্রী ও কুটুম্বদের সঙ্গে মস্তকে ধারণ করলেন। পীত কৌষেয় বস্ত্র ও অমূল্য আভরণ দিয়ে শ্রীকৃষ্ণের পূজা করতে করতে তাঁর দৃষ্টি আনন্দাশ্রুতে রুদ্ধ হয়ে গেল। শ্রীকৃষ্ণকে এভাবে পূজিত হতে দেখে সকলেই উঠে দাঁড়িয়ে কৃতাঞ্জলিপুটে 'নমস্কার' ও 'জয় হোক' বলে তাঁকে সমবেতভাবে প্রণাম জানাতে লাগল। তখন স্বর্গ থেকে পুষ্পবর্ষণ শুরু হল। ২৫-২৯

মহারাজ, দমঘোষপুত্র শিশুপাল শ্রীকৃষ্ণের ঐ রকম সমাদর সহ্য করতে পারল না। সে ক্রোধে নিজের আসন থেকে উঠে দাঁড়িয়ে হাত তুলে শ্রীকৃষ্ণকে কটুবাক্যে বলতে লাগল, কি কলিই শুরু হল। এখন দেখছি জনপ্রবাদ সত্য বলে গণ্য হয়। কেননা বালকের কথায় বৃদ্ধদেরও বুদ্ধি বিচলিত হয়েছে। সভ্যগণ, আপনারা সবাই বিশেষ বিজ্ঞ। তাই 'কৃষ্ণ অগ্রপূজার যোগ্য' এই বালক-বাক্য গ্রাহ্য করবেন না। তপস্যা, বিদ্যা (বেদ-অধ্যয়ন), ব্রতাদি অনুষ্ঠানে যাঁরা দক্ষ, যাঁদের পাপ নষ্ট ও অজ্ঞান দূরীভূত হয়েছে, যাঁরা ব্রহ্মনিষ্ঠ, লোকপালেরা যাঁদের পূজা করেন, এ রকম মহাত্মারা এ-সভায় উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও কুলকলঙ্ক

গো-পালক কিভাবে অগ্রপূজা পাবার যোগ্য হয়? তাহলে দেবতাকে বর্জন করে যজ্ঞের পুরোডাশ কি কাককে দেওয়া হল না? কৃষ্ণ বর্ণ, আশ্রম ও কুল থেকে ভ্রষ্ট, সমস্ত ধর্ম থেকে সে বহিষ্কৃত। বিশেষ করে এ ধৈর্যহীন, বিবেকহীন এবং স্বেচ্ছাচারী। এরকম ব্যক্তি কি করে পূজা পাবার যোগ্য হয়? যযাতি কর্তৃক অভিশপ্ত[১] ও সর্বদা বৃথাপানে রত যদুবংশীয় কৃষ্ণ কি করে পূজনীয় হতে পারে? যদুরা ব্রহ্মর্ষিসেবিত দেশ পরিত্যাগ করে সমুদ্রের গর্ভে দুর্গ নির্মাণ করে দস্যুদের মত প্রজাপালন করছে। ৩০-৩৭

শিশুপাল এভাবে নানা নিন্দাবাক্য বলল। কিন্তু সিংহ যেমন শৃগালের চিৎকারে নীরব থাকে সেরকম শ্রীকৃষ্ণও কোন উত্তর দিলেন না। ঐ দুঃসহ ভগবৎ-নিন্দা শুনে সভাস্থ ব্যক্তিরা কান বন্ধ করে সক্রোধে চেদিরাজকে তিরস্কার করতে করতে সভা ত্যাগ করলেন। ভগবান বা ভক্তের নিন্দায় বাধা দেবার সামর্থ্য না থাকলে যে ব্যক্তি স্থানত্যাগ না করে, সে পূর্বসঞ্চিত পুণ্য থেকে চ্যুত হয়ে নরকে যায়। এর পর পাণ্ডুপুত্ররা এবং মৎস্য, সৃঞ্জয় ও কেকয়-বংশীয়েরা ক্রোধে অস্ত্র নিয়ে শিশুপালকে বধ করতে উদ্যত হলেন। এই দেখে শিশুপাল সভায় উপস্থিত যুধিষ্ঠির প্রভৃতি কৃষ্ণের সমর্থক রাজাদের ভৎসর্না করে নির্ভয়ে খড়্গ ও চর্ম ধারণ করল। শ্রীকৃষ্ণ নিজ পক্ষের রাজাদের নিবারণ করলেন এবং সরোষে নিজেই[২] ক্ষুরধার চক্রে শিশুপালের মুণ্ড ছিন্ন করে ফেললেন। শিশুপাল নিহত হলে মহা কোলাহল উঠল। তার অনুবর্তী রাজারা প্রাণ নিয়ে পালাতে লাগল। উল্কা যেমন আকাশচ্যুত হয়ে পৃথিবীতে প্রবেশ করে, সেভাবে শিশুপালের দেহ থেকে জীবজ্যোতি বেরিয়ে সকলের সামনেই শ্রীকৃষ্ণদেহে প্রবেশ করল। হিরণ্যকশিপু, রাবণ ও শিশুপাল—এই তিন জন্মে সর্বদা বৈরভাবে এবং ক্রুদ্ধচিত্তে কৃষ্ণধ্যান করায় শিশুপাল তন্ময়তা (শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপতা) লাভ করল। কারণ ধ্যানই ধ্যেয় বস্তুর স্বরূপতার একমাত্র কারণ। ৩৮-৪৬

তারপর যুধিষ্ঠির যজ্ঞশেষে ঋত্বিক ও সদস্যদের প্রচুর দক্ষিণা দিয়ে ও যথোপযুক্ত পূজা করে বেদবিধিমতে অবভৃথ (যজ্ঞান্ত) স্নান করলেন। এভাবে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়ে কুন্তীর এবং অর্জুন প্রভৃতি সুহৃদদের অনুরোধে শ্রীকৃষ্ণ আরও কয়েকমাস ইন্দ্রপ্রস্থে রয়ে গেলেন। পরে যুধিষ্ঠিরের ইচ্ছা না থাকলেও শ্রীকৃষ্ণ বিদায় নিয়ে অমাত্য ও ভার্যাদের সঙ্গে দ্বারকাপুরে ফিরে গেলেন। মহারাজ, সনক প্রভৃতি ব্রাহ্মণদের অভিসম্পাতে বৈকুণ্ঠবাসী জয় ও বিজয়কে বারবার জন্ম নিতে হয়েছিল। তাদের উপাখ্যান বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করলাম। ৪৭-৫০

রাজসূয় যজ্ঞের শেষে স্নান করে রাজা যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের মধ্যে দেবরাজের মত শোভা পেতে লাগলেন। পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠিরের সমৃদ্ধ রাজ্যশ্রী দেখে শুধু দুর্যোধন ছাড়া দেবতা, মানুষ ও প্রমথরা সকলেই রাজার পূজা লাভ করে এবং যজ্ঞের ও শ্রীকৃষ্ণের প্রশংসা কীর্তন করতে করতে আনন্দে নিজ নিজ ভবনে চলে গেলেন। শ্রীবিষ্ণুর এই শিশুপাল-সংহার প্রভৃতি কার্য এবং রাজাদের মুক্ত করার কথা যে ব্যক্তি কীর্তন করেন তিনি সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হবেন। ৫১-৫৪

১ যযাতি যাদবকুলকে নিকৃষ্ট-বিবেচনায় অভিসম্পাত দেন যে এঁরা কখনো রাজা হতে পারবেন না। ২ শিশুপাল শ্রীকৃষ্ণেরই অংশ, অন্যের হাতে তার বধ বিধেয় নয় বিবেচনা করে। শ্রীকৃষ্ণ নিজেই তার প্রাণসংহার করেন।

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায়

দুর্যোধনের অবমাননা

রাজা পরীক্ষিৎ বললেন, ভগবান, অজাতশত্রু যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের মহোৎসব দেখে উপস্থিত রাজা, ঋষি ও দেবগণের মধ্যে শুধু দুর্যোধন ছাড়া সকলেই আনন্দিত হলেন। দুর্যোধনের এই বিমর্ষতার কারণ কি? ১-২

শুকদেব বললেন, মহারাজ, আপনার পিতামহ মহাত্মা যুধিষ্ঠিরের ঐ যজ্ঞে বন্ধু-বান্ধবরা প্রেমপাশে বন্ধ হয়ে যজ্ঞকার্য নির্বাহের জন্য নিযুক্ত হয়েছিলেন। ভীম পাকশালার আর দুর্যোধন ধনের অধ্যক্ষ হয়েছিলেন। সহদেব অভ্যর্থনার, নকুল উপকরণ প্রস্তুত করার ও অর্জুন সাধুসেবার ভার নেন। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ পাদ-প্রক্ষালনের, দ্রৌপদী পরিবেশনের এবং কর্ণ দানের ভার গ্রহণ করেছিলেন। সাত্যকি, বিকর্ণ, হার্দিক্য, বিদুর, বাহ্লীকপুত্র ভূরি এবং সন্তর্দন এঁরা সকলে যজ্ঞের অন্যান্য কার্যে নিজেরাই নিযুক্ত ছিলেন। ঋত্বিক, সদস্য, জ্ঞানী সভাসদ ও প্রিয় বন্ধুরা মধুর ভাষা, দক্ষিণা, অলঙ্কার প্রভৃতি দ্বারা সুন্দরভাবে বৃত হয়েছিলেন। তারপর শিশুপাল যদুপতির চরণে প্রবেশ করলে রাজা যুধিষ্ঠির অবভৃথ (যজ্ঞান্ত) স্নানের জন্য গঙ্গায় গেলেন। স্নানোৎসবে মৃদঙ্গ, শঙ্খ, পণব, ঢাক, গোমুখ প্রভৃতি নানারকম বাদ্য বাজতে লাগল। নর্তকীরা আনন্দে নৃত্য করতে লাগল, গায়করা গানে প্রবৃত্ত হল। তাদের বেণু, বীণা, করতাল প্রভৃতির রবে আকাশ পূর্ণ হল। স্বর্ণমালায় ভূষিত যদু, সৃঞ্জয়, কাম্বোজ, কুরু, কৈকয় ও কোশল-বংশীয় রাজারা ধ্বজা ও পতাকাশোভিত হস্তী, অশ্ব, রথ ও সুসজ্জিত সৈন্যদের সংগে মেদিনী কাঁপিয়ে যুধিষ্ঠিরকে নিয়ে অগ্রসর হতে লাগলেন। ৩-১২

সদস্য, ঋত্বিক এবং ব্রাহ্মণরা উদাত্ত কণ্ঠে বেদোচ্চারণ করে এবং দেবতা ঋষি, পিতৃগণ এবং গন্ধর্বরা পুষ্পবৃষ্টি করে যুধিষ্ঠিরের বিশেষ পূজা করলেন। জনসাধারণ গন্ধ, মালা ও উৎকৃষ্ট অলংকারে ভূষিত হয়ে তৈল প্রভৃতি বিবিধ রসে পরস্পরকে লিপ্ত করে ক্রীড়া করতে আরম্ভ করল। বারাঙ্গনারা নায়কগণ কর্তৃক তৈল, গোরস[১], গন্ধজল, হরিদ্রা এবং আর্দ্রঘন কুঙ্কুমে অনুলিপ্ত হয়ে ও নিজেরা তাদের অনুলিপ্ত করে বিহার করল। এই সমস্ত দেখবার জন্য দেবীরা শূন্যপথে আকাশযানে করে বেরিয়ে এলেন। রাজপত্নীরা প্রহরীদের দ্বারা রক্ষিত হয়ে রথ প্রভৃতি যানে বার হতে লাগলেন। তখন তাঁদের পতির মাতুল পুত্র শ্রীকৃষ্ণ, দেবর ভীম প্রভৃতি এবং সখীরা তাঁদের পরিষিঞ্চিত[২] করলে সলজ্জ হাস্যবিকশিত বদনে তাঁরা অপূর্ব শোভা ধারণ করলেন। বসন সিক্ত হওয়ায় তাঁদের গা, স্তন, উরু প্রভৃতি স্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল। তাঁদের কবরী খুলে মালা খসে পড়তে লাগল। তাঁরাও অনুরূপভাবে অন্যদের জলে পরিষিঞ্চিত করে কামীদের চিত্তচঞ্চলকারী মধুর ভঙ্গিমায় বিহার করতে লাগলেন। ১৩-১৭

মহিষীগণের সংগে উৎকৃষ্ট অশ্বে ও সুবর্ণ-হারে সজ্জিত রথে আরূঢ় হলে রাজা যুধিষ্ঠির ক্রিয়াসমূহের সঙ্গে যজ্ঞশ্রেষ্ঠ রাজসূয়ের মত শোভা পেতে লাগলেন। তারপর ঋত্বিকরা 'পত্নী-সংযাজ' নামে এক যজ্ঞ ও অবভৃত বিষয়ক কাজ শেষ করে দ্রৌপদী সহ যুধিষ্ঠিরকে আচমন করালেন এবং গঙ্গায় স্নান করালেন। দেবলোক ও নরলোকে দুন্দুভিধ্বনি হতে লাগল। দেবতা, ঋষি, পিতৃগণ ও আপামর লোকেরা পুষ্প-

---

১ দুগ্ধ, দধি, ঘৃত প্রভৃতি গব্য বস্তু। ২ চর্মনির্মিত পিচকারির সাহায্যে।

বৃষ্টি করতে লাগলেন। সেখানে অন্যান্য সমস্ত বর্ণাশ্রমের লোকেরা স্নান করলেন, কেননা মহাপাতকীও গঙ্গায় স্নান করলে সর্বপাপ থেকে মুক্ত হয়। তারপর সোজা যুধিষ্ঠির নূতন ক্ষৌমবস্ত্র পরে, নানা আভরণে ভূষিত হয়ে উৎকৃষ্ট বস্ত্র ও অলঙ্কারে ঋত্বিক, সদস্য ও বিপ্রদের পূজা করলেন। নারায়ণভক্ত যুধিষ্ঠির জ্ঞাতি, কুটুম্ব, রাজা, বন্ধুবান্ধবাদি ও অন্যান্য সকলকে বস্ত্রালংকার দিয়ে অর্চনা করলেন। সকলে মণিকুণ্ডল, মালা, উষ্ণীষ, কঞ্চুক, বস্ত্র, অলংকার, স্বর্ণমেখলা প্রভৃতিতে ভূষিত হয়ে দেবতার মত শোভা পেতে লাগল। সমস্ত ব্রহ্মবাদী সদস্য, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, শূদ্র, রাজা, দেবতা, ঋষি, পিতৃগণ, ভূতগণ, অনুচরবর্গসহ লোকপালরা ও উপস্থিত অন্যান্যরা যথাযথভাবে অভ্যর্থিত হলেন। তারপর রাজা যুধিষ্ঠিরের অনুমতি নিয়ে তাঁরা সানন্দে নিজের নিজের আবাসে যাত্রা করলেন। অমৃত পান করে যেমন মর্ত্যবাসীর আশা মেটে না সে রকম ভক্ত রাজর্ষিরা রাজসূয়ের প্রশংসা করে তৃপ্ত হলেন না। তারপর রাজা যুধিষ্ঠির বিদায় দিতে নিতান্ত কাতর হন বলে সুহৃদ, সম্বন্ধী, বান্ধব ও শ্রীকৃষ্ণকেও বিদায় না দিয়ে নিজ নগরে বাস করালেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ রাজার হিতকারী যদুবীরদের ও সাম্ব প্রভৃতিকে দ্বারকায় পাঠিয়ে নিজে সেখানে বাস করলেন। শ্রীকৃষ্ণ সহায় থাকায় ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির এভাবে দুস্তর মনোরথ মহাসাগর উত্তীর্ণ হলেন। ১৮-৩০

মহারাজ, যুধিষ্ঠিরের রাজ-অন্তঃপুরের সম্পদ ও রাজসূয়ের প্রশংসা শুনে দুর্যোধন পরিতাপ করতে লাগলেন। ময় কর্তৃক নররাজ, দৈত্যরাজ ও দেবরাজদের সম্পদ সন্নিবিষ্ট হওয়ায় যুধিষ্ঠিরের অন্তঃপুরের শোভার শেষ ছিল না। দ্রুপদরাজ-দুহিতা দ্রৌপদী সেই শোভাময় অন্তঃপুরে পতিদের সঙ্গে বিচরণ করতেন। এসব দেখে দুর্যোধনের পরম ঈর্ষায় মনস্তাপ হল। ঐ অন্তঃপুরে শ্রীকৃষ্ণের সুমধ্যমা মহিষীরাও কুচযুগের কুংকুমে রঞ্জিত হার দুলিয়ে, গুরু নিতম্বের ভারে ধীর পদ-সঞ্চরণে চরণালংকারের শব্দ তুলে বিরাজ করতেন। তাঁদের শ্রীময় মুখপদ্ম চঞ্চল কুণ্ডল ও কুন্তলে শোভিত ছিল। এক সময় মহারাজ যুধিষ্ঠিরের ভাই, বন্ধু ও নিজের চোখের মণিসদৃশ শ্রীকৃষ্ণ পরিবৃত ও ব্রহ্মার মত সমৃদ্ধিসম্পন্ন হয়ে ময়-নির্মিত সভায় স্বর্ণসিংহাসনে ইন্দ্রের মত উপবিষ্ট ছিলেন। বন্দীরা তাঁর স্তব করছিল। এমন সময় দ্বারপালদের তিরস্কার করতে করতে ভ্রাতাদের সঙ্গে নিয়ে দুর্যোধন খড়্গ হাতে সভাস্থলে প্রবেশ করলেন। সেখানে ময়দানবের শিল্প-কৌশলে বিভ্রান্ত হয়ে দুর্যোধন জল মনে করে স্থলেই বস্ত্রের প্রান্তভাগ ওঠালেন এবং স্থলভ্রমে জলে পড়ে গেলেন। দুর্যোধনের এই দুরবস্থা দেখে ভীমসেন হেসে উঠলেন। যুধিষ্ঠির, অন্যান্য রাজা এবং স্ত্রীরা নিষেধ করলেও শ্রীকৃষ্ণের অনুমোদন পেয়ে ভীম হাসতেই থাকলেন। লজ্জায় ও ক্রোধে মুখ নিচু করে দুর্যোধন হস্তিনায় ফিরে গেলেন। সে সময় সাধুরা হাহাকার করে উঠলেন, যুধিষ্ঠির বিমনা হলেন, অথচ যাঁর দৃষ্টিতে দুর্যোধনের বিভ্রান্তি ঘটেছিল সেই পৃথিবীর ভার-হরণকারী ভগবান নীরব রইলেন। মহারাজ, রাজসূয় মহাযজ্ঞে দুর্যোধনের যে দৌরাত্মের কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন তা বললাম। ৩১-৪০

ষট্‌সপ্ততিতম অধ্যায়

যাদবদের সঙ্গে শাল্বের যুদ্ধ

শুকদেব বললেন, মহারাজ, শাল্ববধ মানবশরীরধারী শ্রীকৃষ্ণের আরেকটি লীলা। রুক্মিণীর বিবাহের সময় শিশুপাল-সখা শাল্ব জরাসন্ধ প্রভৃতির মত সমাগত যদুদের

হাতে যুদ্ধে পরাজিত হয়েছিল। শাল্ব সে সময় লোকপালদের সামনে তাঁদের শুনিয়ে প্রতিজ্ঞা করে, আমি এই পৃথিবীকে যাদবশূন্য করব, আপনারা আমার পৌরুষ প্রত্যক্ষ করুন। এই প্রতিজ্ঞা করে সেই থেকে শাল্ব রোজ একবার এক মুষ্টি ধূলিমাত্র আহার করে দেবাদিদেব পশুপতির আরাধনা আরম্ভ করল। আশুতোষ শিব শাল্বের তপস্যায় পরিতুষ্ট হলেন, কিন্তু কৃষ্ণবিদ্বেষী শাল্বকে বর দিলেও ফল হবে না ভেবে কিছু সময় নীরব রইলেন। অবশেষে শাল্বের একনিষ্ঠ সাধনায় আর চুপ করে থাকতে পারলেন না। এক বৎসর পর শরণাপন্ন শাল্বের কাছে এসে তাকে বর প্রার্থনা করতে বললেন। শাল্ব বৃষ্ণিকুলের ভয়প্রদ এবং দেবতা, অসুর, মানুষ, গন্ধর্ব, উরগ ও রাক্ষসদের সম্পূর্ণ অভেদ্য একটি অপূর্ব কামচারী যান প্রার্থনা করল। ত্রিলোচন উমাপতি তখন শত্রু-নগরজয়ী ময়দানবকে আদেশ করে লৌহময় 'সৌভ' নামক এক বিমান নির্মাণ করিয়ে শাল্বকে দিলেন। তারপর শাল্ব সেই অন্ধকারময় দুর্ভেদ্য কামচারী বিমান পেয়ে যদুদের শত্রুতা স্মরণ করে দ্বারকায় গেল। নিজের বিশাল সেনাবাহিনী দ্বারা শাল্ব ঐ নগর অবরোধ করে সব দিকে পুরী, উপবন এবং উদ্যানগুলি ভেঙ্গে ফেলতে লাগল। পুরীর বহির্দ্বার, গোপুর, প্রাসাদ, অট্টালিকা, ক্রীড়াভূমি প্রভৃতি ভেঙ্গে চূর্ণবিচূর্ণ করে সে বিমান থেকে অস্ত্রবৃষ্টি আরম্ভ করল। শিলা, বৃক্ষ, বজ্র, সর্প প্রভৃতিও বর্ষিত হতে লাগল, আর প্রচণ্ড ধূলিঝড়ে দিকসকল আচ্ছন্ন হয়ে গেল। ১-১১

পৃথিবী যেমন ত্রিপুরের দ্বারা পীড়িত হয়েছিল, সেরকম শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকাপুরীও শাল্বের আক্রমণে বিপন্ন হয়ে পড়ল। প্রজাদের বিপদগ্রস্ত দেখে তাঁদের অভয় দিয়ে মহারথী ভগবান প্রদ্যুম্ন রথে চড়ে ছুটলেন। সাত্যকি, চারুদেষ্ণ, সাম্ব, অনুজদের সঙ্গে অক্রূর, হার্দিক্য, ভানুবিন্দ, গদ, শুক, সারণ এবং অন্যান্য রথীদলপতিদেরও দলপতিরা সশস্ত্র হয়ে রথ, হস্তী, অশ্ব ও পদাতিকবাহিনী পরিবৃত হয়ে যুদ্ধের জন্য দ্বারকা থেকে বের হলেন। দেবাসুরের যুদ্ধের মত যদু ও শাল্ব উভয় পক্ষীয়দের তুমুল রোমহর্ষক যুদ্ধ আরম্ভ হল। সূর্য যেমন রাত্রির অন্ধকার দূর করে সেরকম রুক্মিণীনন্দন প্রদ্যুম্ন সৌভপতির বিখ্যাত মায়াজাল দিব্যাস্ত্র দিয়ে ক্ষণমাত্র সময়ে ছিন্নভিন্ন করে দিলেন। স্বর্ণপুঙ্খ, লৌহমুখ, নতপর্ব পঁচিশটি বাণ দ্বারা তিনি শাল্বের সেনাপতিকে বিদ্ধ করলেন। শতবাণে শাল্বকে, এক একটি বাণে তার সৈন্যদের, দশটি করে বাণে সেনানায়কদের এবং তিনটি করে বাণে বাহনদের বিদ্ধ করলেন। মহাত্মা প্রদ্যুম্নের এই অদ্ভুত লীলা দেখে দুপক্ষের সৈন্যরাও তাঁর প্রশংসা করতে লাগল। ময়নির্মিত মায়াময় সৌভবিমান কখনো বহু, কখনো একরূপ, কখনো দৃশ্য, কখনো বা অদৃশ্য হয়ে যাদবদের বিভ্রান্ত করতে লাগল। শাল্বের বাণ কোন স্থির জায়গায় না পড়ে কখনো মাটিতে কখনো আকাশে, কখনো জলে, কখনো বা গিরিশিখরে অংগারচক্রের মত ভ্রমণ করতে লাগল। ১২-২২

যেখানেই সৌভ-বিমানে শাল্বকে দেখা গেল যদুযূথপতি সেই সব জায়গায়ই শরজাল বর্ষণ করতে লাগলেন। যাদবদের নিক্ষিপ্ত অগ্নি ও সূর্যের মত তীব্র-স্পর্শ সর্পবিষতুল্য শরসমূহের নিদারুণ আঘাতে শাল্ব একান্ত বিব্রত হয়ে নিজেই বিমোহিত হয়ে পড়ল। যাদবসৈন্যরা শাল্বের সেনানায়কদের অস্ত্রজালে পীড়িত হয়েও ইহলোকে কীর্তি এবং পরলোকে সদ্গতি লাভের ইচ্ছায় নিজ নিজ রণভূমি পরিত্যাগ করলেন না। দ্যুমান নামে শাল্বের এক অমাত্য পূর্বে প্রদ্যুম্নের দ্বারা নিপীড়িত হয়েছিল। এখন সেই দ্যুমন হঠাৎ লৌহগদা দিয়ে প্রদ্যুম্নকে প্রহার করে আত্মশ্লাঘা অনুভব করল। দ্যুমানের গদা দ্বারা বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হলে ধর্মজ্ঞ সারথি দারুকনন্দন

অরিন্দম প্রদ্যুম্নকে রণক্ষেত্র থেকে অন্যত্র নিয়ে গেলেন। শ্রীকৃষ্ণতনয় মুহূর্ত মধ্যে চেতনা লাভ করে সারথিকে বললেন, যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আমাকে নিয়ে এসে অন্যায় করেছ। প্রাণরক্ষার জন্য কোন যাদব যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়েছেন, এমন ঘটনা কখনও ঘটেনি। শুধু তোমার মত দুর্বলচিত্ত সারথির হাতে পড়ে এই ঘোরতর অপযশের বোঝা কাঁধে নিলাম। জন্মদাতা শ্রীকৃষ্ণ ও জ্যেষ্ঠতাত বলরাম আমাকে ধর্মযুদ্ধ থেকে পালিয়ে আসার কারণ জিজ্ঞাসা করলে তাদের কাছে উত্তর দেবার কিছুই থাকবে না। ভ্রাতৃবধূরা উপহাস করে বলবেন, বীর দেবর, তোমার পালিয়ে আসার ব্যাপারটা ভাল করে বর্ণনা কর। শত্রু তোমাকে কিরকম নিগ্রহ করেছিল? ২৩-৩১

দারুকনন্দন বললেন, প্রভু, আপনি যাই বলুন, ধর্মবুদ্ধিতেই আমি এই কাজ করেছি। রথী বিপন্ন হলে সারথির উচিত তাঁর প্রাণরক্ষা করা, আবার সারথির বিপদ হলে রথীরও তাকে সর্বতোভাবে রক্ষা করা উচিত। যাতে পরস্পরের প্রাণরক্ষা হয় সেই ধর্ম-অনুষ্ঠান করা উচিত একথা জানি বলেই গদাঘাতে মূর্ছিত ও বিপন্ন আপনাকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে নিয়ে এসেছি। ৩২-৩৩

সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায়

শাল্ব-বধ

শুকদেব বললেন, মহারাজ, তারপর প্রদ্যুম্ন জল দিয়ে আচমন করলেন এবং কবচ পরে, ধনুক হাতে নিয়ে সারথিকে বললেন, আমাকে বীর দ্যুমানের কাছে নিয়ে চল। দ্যুমান প্রদ্যুম্নের সৈন্যদের বিনাশ করছিল। রুক্মিণীনন্দন তাতে বাধা দিয়ে হাসতে হাসতে আটটি নারাচ অস্ত্র দিয়ে তাকে বিদ্ধ করলেন। তারপর আর চারটি নারাচ অস্ত্রে দ্যুমানের রথের ঘোড়া এবং সারথিকে ভেদ করলেন। আরও দুই নারাচে তার ধনুক আর রথের পতাকা ছেদ করে আর এক নারাচে দ্যুমানের মাথা কেটে ফেললেন। এদিকে গদ, সাত্যকি, শাল্ব প্রভৃতি বীরেরা সৌভপতি শাল্বের সৈন্য ধ্বংস করছিলেন। সৌভ-সৈনিকেরা সকলেই ছিন্নমস্তক হয়ে সমুদ্রে পড়তে লাগল। এভাবে যদু আর শাল্বদের তুমুল বিধ্বংসী যুদ্ধ সাতাশ দিন-রাত্রি সমানভাবে চলতে লাগল। এদিকে ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের নিমন্ত্রণ পেয়ে শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রপ্রস্থে গিয়েছিলেন। রাজসূয় যজ্ঞ শেষ হলে আর শিশুপাল বধ হলে পর তিনি ভয়ানক অমঙ্গলসূচক লক্ষণসমূহ দেখতে লাগলেন। তাতে উদ্বিগ্ন হয়ে তিনি কৌরবগণ, মুনিগণ, কুন্তী ও তাঁর পুত্রদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে দ্বারকা যাত্রা করলেন। পথে তিনি মনে মনে চিন্তা করতে লাগলেন, আমি বলরামের সঙ্গে এই ইন্দ্রপ্রস্থে এসেছি, এই সুযোগ শিশুপালের পক্ষের লোকেরা নিশ্চয়ই আমার রাজ্যে উৎপাত আরম্ভ করেছে। ১-৬

এরকম চিন্তা করতে করতে ব্যাকুল হয়ে শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় উপস্থিত হলেন। সেখানে আপন লোকদের বিনাশ দেখে তিনি বলরামকে নগররক্ষায় নিযুক্ত করলেন। পরে সৌভবিমান আর শাল্বরাজকে দেখতে পেয়ে দারুককে বললেন, সারথি, শার্ঙ্গীর আমাকে শাল্বের কাছে নিয়ে চল। এই সৌভরাজ অত্যন্ত মায়াবী, ওকে কিছুমাত্র সমীহ করা চলবে না। দারুক এ-কথা শুনে স্থির হয়ে বসে রথ চালালেন। তখন

শ্রীকৃষ্ণের নিজের আর অন্য (পক্ষের) লোকেরা ধ্বজস্থিত গরুড়কে প্রবেশ করতে দেখতে পেল। শাল্ব যুদ্ধক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণকে দেখতে পেয়ে তাঁর সারথির উদ্দেশে ভীষণ শব্দকারী শক্তি-অস্ত্র ছুঁড়ল। সেই প্রচণ্ড শক্তি উল্কার মত দিঙ্মণ্ডল উদ্ভাসিত করে আকাশপথে মহাবেগে ছুটে আসতে লাগল। তাই দেখে শ্রীকৃষ্ণ শরাঘাতে সেই শক্তিকে শতছিন্ন করে ফেললেন। তিনি শাল্বকেও ষোলটি বাণ মেরে, সূর্য যেমন কিরণদ্বারা আকাশ ভেদ করে, তেমনি শরজাল দিয়ে আকাশে চলমান সৌভ-বিমানকে ভেদ করলেন। এদিকে শাল্বও কিন্তু বাণ দিয়ে শার্ঙ্গধনুর্ধারী শ্রীকৃষ্ণের বাঁ হাত ভেদ করল। এতে শার্ঙ্গধনুক তাঁর হাত থেকে পড়ে গেল। যে সমস্ত প্রাণী সেই তুমুল যুদ্ধ দেখছিল তারা মহা হাহাকার করে উঠল। সৌভরাজ চীৎকার করে জনার্দনকে বলল, মূঢ়, আমাদের সামনে তুই আমাদের সখা ও তোর (পিসতুত) ভাই শিশুপালের স্ত্রী রুক্মিণীকে হরণ করেছিলি আর আমাদের সেই সখা অসাবধান থাকতে তুই তাকে সভার মধ্যে বধ করেছিস। যদি তুই আমার সামনে থাকিস তা হলে শাণিত শরে তোকে যমালয়ে পাঠাব। তোর মনে মনে বড় গর্ব যে তোকে কেউ পরাস্ত করতে পারে না। ৭-১৮

ভগবান বললেন, মূর্খ, তুই বৃথাই গর্ব করছিস, তোর সামনে যে মূর্তিমান যম তা দেখছিস না। বীরেরা পৌরুষ দেখায়, বৃথা বাক্যব্যয় করে না। ভগবান এই বলে ক্রোধে প্রচণ্ড বেগশালী গদা দিয়ে শাল্বের গলায় আঘাত করলেন। তাতে সে রক্তবমি করতে করতে কাঁপতে লাগল। শ্রীকৃষ্ণের গদা শাল্বের গায়ে লাগলে সেখান থেকে শাল্ব অন্তর্হিত হল। তারপর মুহূর্তের মধ্যে এক পুরুষ এসে অচ্যুতকে প্রণাম করে কাঁদতে কাঁদতে বলল, দেব, দেবকী আপনাকে বলে পাঠিয়েছেন যে মাংসবিক্রয়ী যেমন পশুকে বাঁধে সেরকমভাবে শাল্ব তোমার পিতাকে বেঁধে নিয়ে গেছে। শ্রীকৃষ্ণ সেই অপ্রিয় এবং অশুভ সংবাদ শুনে স্নেহে বিবশ হলেন আর সাধারণ লোকের মত বললেন, সুরাসুরের অজেয় রাজাকে জয় করে ক্ষুদ্র শাল্ব আমার পিতাকে কি করে নিয়ে গেল? গোবিন্দ এই কথা বলছিলেন, এমন সময়ে সৌভরাজ শাল্ব বসুদেবের মত এক ব্যক্তিকে নিয়ে এসে শ্রীকৃষ্ণকে বলল, এই তোর জন্মদাতা পিতা। আমি তোর সামনে একে বধ করব। মূঢ়, যদি শক্তি থাকে রক্ষা কর্। মায়াবী এই কথা বলে খড়্গ দিয়ে বসুদেবের আকৃতির সেই পুরুষটির মাথা কেটে ফেলল এবং তা নিয়ে সৌভবিমানে গিয়ে বসল। ১৯-২৭

শ্রীকৃষ্ণ স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানবান হলেও স্বজনস্নেহে ক্ষণকালের জন্য মনুষ্যস্বভাব কাটিয়ে উঠতে পারলেন না। কিন্তু কিছু পরেই মহানুভব শ্রীকৃষ্ণ বুঝতে পারলেন যে ওটা ময়দানব আর শাল্বের আসুরী মায়া। জেগে উঠলে লোক যেমন স্বপ্নে-দেখা বস্তু আর দেখতে পায় না, সেরকম কিছুক্ষণ পরে অচ্যুত আর সেখানে সেই দূত আর পিতার মৃতদেহ কিছুই দেখতে পেলেন না। তারপর তিনি শত্রুকে সৌভবিমানে অবস্থিত থেকে আকাশে বিচরণ করতে দেখে তাকে মারতে উদ্যত হলেন। ২৮-২৯

শুকদেব বললেন, মহারাজ, এই যে বিষয় বললাম, এগুলি কয়েকজন ঋষির মত। কিন্তু এতে যে স্ববিরুদ্ধ উক্তি রয়েছে তা তাঁরা ভেবে দেখলেন না। অজ্ঞ জনের মনে শোক, মোহ, স্নেহ বা ভয় জন্মান এক কথা, কিন্তু অখণ্ডজ্ঞানবিজ্ঞানশালী দেবগণস্থিত শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তার তুলনা কোথায়? সাধুরা শ্রীকৃষ্ণের পদসেবা করেই আত্মবিদ্যার উন্নতিসাধন করেন, তাঁর দ্বারাই আত্ম-অনাত্ম বস্তু বিচার করে নেন এবং অবশেষে অনন্ত ঐশ্বরপদ লাভ করে থাকেন। এরকম সাধুজনাশ্রয় পরমেশ্বর

শ্রীকৃষ্ণের মোহসম্ভাবনা কোথায় ? সুতরাং যে ঋষি এইরকম বলেন তাঁদের মতের কোন মূল্য নেই। ৩০-৩২

শাল্বরাজ সবলে অস্ত্রঘাত করছিল। অমোঘবিক্রম শ্রীকৃষ্ণ বাণ বর্ষণ করে তার বর্ম, ধনু ও শিরোমণি ছেদন করলেন আর গদাপ্রহারে শত্রুর সৌভবিমান ভেঙে ফেললেন। শাল্বের সেই মায়াবিমান গদাহত হয়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ অবস্থায় জলের মধ্যে পড়ল। শাল্ব ভাঙা বিমান ছেড়ে মাটিতে নামল আর গদাহাতে শ্রীকৃষ্ণের দিকে এগিয়ে গেল। শ্রীকৃষ্ণ ভল্লের আঘাতে শাল্বের গদাসহ হাত ছেদন করলেন ; পরে তার বধের জন্য সূর্যের মত নিজের সুদর্শন চক্র ধারণ করে সূর্য-সমন্বিত উদয়পর্বতের মত শোভা পেতে লাগলেন। ইন্দ্র যেমন বজ্র দিয়ে বৃত্রাসুরের মাথা কেটেছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ সেই চক্র দিয়ে বহুমায়াবী শাল্বের মাথা কেটে ফেললেন। দানবেরা সকলে হাহাকার করে উঠল। মহারাজ, সাক্ষাৎ পাপরূপী শাল্ব বিনষ্ট হল আর তার সৌভবিমান গদার আঘাতে ভেঙে গেল দেখে দেবতারা দুন্দুভিধ্বনি দিয়ে পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেন। এমন সময় দন্তবক্র বন্ধুদের ঋণ পরিশোধ করবার জন্য সক্রোধে শ্রীকৃষ্ণের দিকে ছুটে এল। ৩৩-৩৭

অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায়

বলদেবের সূত-বধ

শুকদেব বললেন, মহারাজ, পরলোকগত শিশুপাল, শাল্ব আর পৌণ্ড্রকের সঙ্গে যে গুপ্তবন্ধুত্ব ছিল তা দেখাবার জন্য দুষ্ট দন্তবক্র ক্রোধে পদভরে মাটি কাঁপাতে কাঁপাতে এগোতে লাগল। দন্তবক্রকে উদ্যত গদাহস্তে আসতে দেখে শ্রীকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ রথ থেকে লাফ দিয়ে মাটিতে নামলেন এবং বেলাভূমি যেমন সমুদ্রকে রোধ করে তেমনি তার গতিরোধ করে দাঁড়ালেন। দুর্মদ দন্তবক্র গদা তুলে কৃষ্ণকে বলল, ভাল, আজ তুমি আমার চোখের সামনে এসেছ। কৃষ্ণ, তুমি আমাদের মাতুলপুত্র হলেও মিত্রঘাতী। তুমি আমাকেও মারতে চাও। অতএব আজ বজ্রের মত গদা দিয়ে তোমাকে মেরে বন্ধুদের ঋণশোধ করব। মাহুত যেমন অংকুশ দিয়ে হাতীকে আঘাত করে দন্তবক্র তেমনি রূক্ষ কথা বলে কৃষ্ণকে পীড়া দিতে লাগল। দন্তবক্র গদা দিয়ে তাঁর মাথায় মারল এবং সিংহের মত গর্জন করে উঠল। যদুশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ গদাহত হয়েও বিচলিত হলেন না, নিজের কৌমোদকী গদা তুলে দন্তবক্রের বক্ষে আঘাত করলেন। সেই প্রচণ্ড আঘাতে দন্তবক্রের বুক ভেঙে গেল। সে রক্তবমি করতে করতে চুল এলিয়ে হাত ও পা ছড়িয়ে প্রাণহীন দেহে মাটিতে পড়ে গেল। ১-৯

মহারাজ, যেমন শিশুপালের দেহের জ্যোতি কৃষ্ণপদে বিলীন হয়েছিল, তেমনি দন্তবক্রের দেহ থেকেও এক সূক্ষ্ম জ্যোতি বেরিয়ে সবার সামনেই কৃষ্ণপদে প্রবেশ করলেন। দন্তবক্রের ভাই বিদূরথ ভ্রাতৃশোকে অভিভূত হয়ে ক্রোধে ঢাল-তলোয়ার নিয়ে শ্রীকৃষ্ণকে বধ করার জন্য এগিয়ে গেল। শ্রীকৃষ্ণ ক্ষুরধার চক্র দিয়ে আক্রমণকারী বিদূরথের কিরীট-কুণ্ডল মণ্ডিত মাথা কেটে ফেললেন। এইভাবে যদুবীর শ্রীকৃষ্ণ সৌভ, শাল্ব এবং অনুজ দন্তবক্র প্রভৃতি বড় বড় বীরদের মেরে যদুশ্রেষ্ঠগণ সমভিব্যাহারে সুসজ্জিত দ্বারকা নগরীতে প্রবেশ করলেন। দেবতাগণ পুষ্পবৃষ্টিসহ

তাঁর স্তব করতে লাগলেন , মুনি, সিদ্ধ, গন্ধর্ব, বিদ্যাধর, চারণেরা তাঁর চরিতকথা গান করতে লাগলেন। যোগেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এভাবে অবলীলাক্রমে দুষ্কৃত-কারীদের জয় করে থাকেন, কিন্তু কোন কোন দুষ্টপ্রকৃতির লোক বলে যে তিনি জরাসন্ধের হাতে পরাজিত হয়েছিলেন। ১০-১৬

বলদেব যখন শুনলেন যে কুরুপাণ্ডবদের মধ্যে যুদ্ধের উদ্যম-আয়োজন হচ্ছে, তখন তিনি বাদ-বিসংবাদে নিরপেক্ষ থাকবার জন্য তীর্থযাত্রার ছল করে প্রভাসে গেলেন এবং সেখানে স্নানাদি সেরে দেব, ঋষি ও পিতৃ-তর্পণ করে ব্রাহ্মণদের সঙ্গে সরস্বতী নদীর তীরে আসলেন। ক্রমে তিনি পৃথুদক, বিন্দুসরোবর, ত্রিতকূপ, সুদর্শন, বিশালা, ব্রহ্মতীর্থ, চক্রতীর্থ হয়ে পূর্ববাহিনী সরস্বতীতে উপস্থিত হলেন। সেখান থেকে গঙ্গা-যমুনার কাছাকাছি তীর্থগুলি ঘুরে নৈমিষরারণ্যে প্রবেশ করলেন। সেখানে ঋষিরা বারো বছরব্যাপী এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করছিলেন। বলরাম সেখানে গেলে সেই দীর্ঘযজ্ঞে প্রবৃত্ত মুনিরা তাঁকে যথোচিত সম্মান ও পূজা করলেন। বলরাম সঙ্গীদের সঙ্গে পূজিত হয়ে আসনে বসে দেখলেন যে মহর্ষি ব্যাসের শিষ্য লোমহর্ষণ বসে আছেন। তিনি জাতিতে সূত হয়েও বলরামকে দেখে উঠে দাঁড়ালেন না এবং হাত তুলে প্রণামও করলেন না। আর তিনি ব্রাহ্মণদের অপেক্ষাও উচ্চাসনে বসে ছিলেন। এ-দৃশ্য দেখে বলদেব রেগে গিয়ে মনে মনে ভাবলেন, এই ব্যক্তি প্রতিলোমজাত[১] হয়েও ব্রাহ্মণদের অপেক্ষা উচ্চ আসনে বসে আছে কেন ? এই দুর্মতি বধের যোগ্য। এ ব্যক্তি বেদব্যাসের শিষ্য এবং অনেক পুরাণ, ইতিহাস আর সমস্ত ধর্মশাস্ত্র পড়েছে বটে কিন্তু জিতেন্দ্রিয় ও বিনয়ী হতে শেখেনি। এ লোক পণ্ডিতম্মন্য হয়েছে, আত্মজয়ী হতে পারে নি। অতএব এর যা কিছু গুণ তা নটসুলভ গুণের মত। এ প্রকৃত গুণের অধিকারী হতে পারে না। ধর্মধ্বজী ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা অধিক পাপী। এরকম কপট ধার্মিকদের বধ করবার জন্যই আমার অবতার-জন্ম। ভগবান বলরাম অসতের বধকার্য থেকেও বিরত হয়েছিলেন। কিন্তু ভবিষ্যতের কথা ভেবে তিনি হাতের কুশ দিয়ে সূতকে বধ করলেন। মুনিরা এই দুর্ঘটনায় হাহাকার করে উঠলেন আর ক্ষুণ্ণ হয়ে বললেন, ভগবান, আপনি বড়ই অধর্ম করলেন। যজ্ঞসমাপ্তি পর্যন্ত আমরা এই সূতকে ব্রহ্মাসনে বসিয়েছি। আর একে নিরাময় করে দীর্ঘায়ু দান করেছি। আপনি না জেনে একে মারলেন। আপনি যোগেশ্বর ; বেদও আপনার নিয়ামক নয়। কিন্তু আপনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এই ব্রহ্মহত্যার প্রায়শ্চিত্ত করুন ; তাহলে লোকে আপনার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করবে।[২] ১৭-৩২

বলরাম বললেন, মুনিগণ, আমি লোকের অনুগ্রহের জন্য এই ব্রহ্মহত্যার প্রায়শ্চিত্ত করব। মুখ্যকল্পে যে যে নিয়ম আছে, আপনারা তার ব্যবস্থা করুন। এই নিহত সূতের দীর্ঘায়ু, বল, ইন্দ্রিয়পটুতা বা অন্য যা কিছু আপনাদের প্রার্থনীয় আছে তা বলুন। আমি যোগমায়ার প্রভাবে তা সমস্তই সাধন করব। ঋষিগণ বললেন, হে রাম, আপনাকে আর বেশী কি বলব। আপনার অস্ত্র, বীর্য, সূতের মৃত্যু আর আমাদের বাক্য যাতে সত্য হয়, আপনি সে ব্যবস্থা করুন। ভগবান বললেন, বেদে বলেছে যে আত্মা পুত্ররূপে জন্মায়। অতএব রোমহর্ষণের পুত্র উগ্রশ্রবা আপনাদের বক্তা হবেন আর তিনিও আয়ু, ইন্দ্রিয়পটুতা ও বল লাভ করবেন। তারপর আপমাদের আর কোন কাজ করতে হবে, বলুন। আমি যে অজ্ঞানে এই ব্রহ্মবধ করলাম, এরই বা প্রায়শ্চিত্ত কি, তাও আপনারা চিন্তা করে

১ নীচবর্ণের ঔরসে উত্তমবর্ণার গর্ভে উৎপন্ন। ২ তুলনীয় : গীতা, ৩।২১

দেখুন। মুনিগণ বললেন, দেব, ইল্বলের পুত্র বল্বল নামে এক দানব প্রায়ই এসে আমাদের যজ্ঞে বাধা দেয়। আপনি সেই পাপিষ্ঠ দানবকে মারলে আমরা বিশেষ উপকৃত হব। ঐ দানব পুঁজ, রক্ত, মদ আর মাংস ছুঁড়ে আমাদের আরব্ধ যজ্ঞ অপবিত্র করে। আপনি তাকে বধ করবার পর কাম-ক্রোধ-রহিত হয়ে সারাদেশ পর্যটন করুন, আর বারো মাস কষ্ট করে তীর্থস্নান করে পবিত্র হোন। ৩৩-৪০

ঊনাশীতিতম অধ্যায়

বলদেবের তীর্থযাত্রা

শুকদেব বললেন, মহারাজ, তারপর পর্বদিন উপস্থিত হলে নৈমিষারণ্যে প্রচণ্ড ধূলি-ঝড় বইতে লাগল। সবদিক দুর্গন্ধময় হয়ে উঠল। বল্বল দানব ঋষিদের যজ্ঞশালায় পূতিগন্ধময় দ্রব্যাদি ফেলে নিজে শূলহাতে সেখানে উপস্থিত হল। বল্বল বিশালাকৃতি, তার গা কাজলের মত কালো আর চুলদাড়ি তপ্ত তামাটে রংয়ের। তার ভীষণদর্শন ভ্রূকুটিপূর্ণ মুখমণ্ডল দেখলেই ভয় হয়। সেই দানবকে দেখে বলদেব শত্রুসংহারক মুষল আর দৈত্যদমন লাঙলের কথা স্মরণ করলেন। তাঁর মনে হওয়া মাত্রই তারা এসে উপস্থিত হল। বলরাম তখন সেই ব্রাহ্মণশত্রু বল্বলকে লাঙল দিয়ে টেনে এনে মুষল দিয়ে প্রহার করলেন। সেই প্রহারে বল্বলের কপাল ফেটে গেল। বল্বল রক্তবমি ও চীৎকার করতে করতে বজ্রাহত রক্তবর্ণ পর্বতের মত মাটিতে পড়ে গেল। তা দেখে নৈমিষারণ্যের ঋষিরা বলরামের স্তব আর তাঁকে আশীর্বাদ করতে লাগলেন। বৃত্রহন্তা দেবরাজের মত বলদেবকে তাঁরা অভিষিক্ত করে বৈজয়ন্তীমালা, দিব্যবস্ত্র, দিব্য উত্তরীয় আর দিব্য আভরণ উপহার দিলেন। তারপর বলরাম ঋষিদের আজ্ঞা নিয়ে ব্রাহ্মণদের সঙ্গে কৌশিকীতে এসে স্নান করলেন। সরযূ নদী যেখান থেকে বেরিয়েছে সেই পুণ্য সরোবরেও তিনি অবগাহন করলেন। তারপর বলরাম ক্রমে প্রয়াগতীর্থে এলেন। তিনি স্নান আর দেবতাদের তর্পণ সেরে সেখান থেকে পুলহার আশ্রমে গেলেন। তারপর ক্রমে গোমতী, গণ্ডকী, বিপাশা আর শোণনদে স্নান করে গয়ায় গিয়ে পিতৃপূজা করলেন। অনন্তর তিনি গঙ্গাসাগর-সঙ্গমে স্নান করে মহেন্দ্রাচলে উপস্থিত হলেন। সেখানে পরশুরামকে দর্শন ও প্রণাম করে সপ্ত গোদাবরী, বেণা, পম্পা ও ভীমরথী নদীতে স্নান করে কার্তিককে দর্শন করে বলরাম গিরিশের নিবাস শ্রীশৈলে গেলেন। তিনি দ্রাবিড়ে অতিপবিত্র বেংকট পর্বত আরোহণ করলেন। কামকোষ্ণী, কাঞ্চীপুরী, নদীশ্রেষ্ঠা কাবেরী, শ্রীহরি নিবাস শ্রীরঙ্গপত্তন, হরিক্ষেত্র ঋষভ শর্বত আর দক্ষিণ মথুরা দেশে মহাপাপনাশক সেতুবন্ধে উপস্থিত হলেন। এখানে এসে বলরাম ব্রাহ্মণদের দশ হাজার গরু দিয়ে কৃতমালা আর তাম্রপর্ণী নদীতে স্নান করে মলয় পর্বতে উঠলেন। সেখানে অগস্ত্যকে অভিবাদন করে ও তাঁর আশীর্বাদ ও আজ্ঞা নিয়ে সেখান থেকে দক্ষিণসমুদ্রে যাত্রা করলেন। সেখানে গিয়ে কন্যানাম্নী দুর্গা-দেবীর দর্শনলাভ হল। অতঃপর অনন্তপুরে এসে পবিত্র পঞ্চাপ্সর সরোবরে স্নান করে দশ হাজার গরু দান করলেন। ভগবান বিষ্ণু এখানে অবস্থান করেন। অনন্তর বলরাম কেরল, ত্রিগর্ত আর মহাদেব যেখানে সদা বর্তমান সেই গোকর্ণ নামে শিবক্ষেত্রে গিয়ে আর্যা দ্বৈপায়নীকে দেখে শূর্পারক তীর্থে গেলেন। এখানে

তিনি তাপী, পয়োষ্ণী আর নির্বিন্ধ্যায় গিয়ে স্নান সারলেন। এরপর দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করে মাহিষ্মতী পুরীর কাছে নর্মদায় গেলেন। শেষে মনুতীর্থে স্নান করে আবার প্রভাসে উপস্থিত হলেন। ১-২১

প্রভাসতীর্থে এসে বলরাম ব্রাহ্মণদের পরস্পর আলোচনায় শুনতে পেলেন যে কুরুপাণ্ডব যুদ্ধে ভারতের প্রায় সমস্ত ক্ষত্রিয়ের মৃত্যু হয়েছে। তখন তিনি বুঝলেন যে পৃথিবীর ভার হরণ করা হয়ে গেছে। ঐ সময়ে ভীম আর দুর্যোধন পরস্পর গদাযুদ্ধ করছিলেন। বলরাম এই শুনে তাঁদের নিবারণ করবার জন্য কুরুক্ষেত্রে যাত্রা করলেন। কুরুক্ষেত্রে যাওয়ামাত্র যুধিষ্ঠির, অর্জুন, নকুল, সহদেব ও শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে অভিবাদন করলেন এবং বলরাম কি জন্য এখানে উপস্থিত হলেন, এই ভেবে সকলেই চুপ করে রইলেন। বলরাম দেখলেন ভীম ও দুর্যোধন উভয়ে ক্রুদ্ধ আর বিজয়ার্থী হয়ে বিবিধ মণ্ডলে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তিনি রাজা দুর্যোধন আর বৃকোদরকে সম্বোধন করে বললেন, তোমরা দুজনেই সমান বীর। তোমাদের মধ্যে একজনকে আমি বলে অধিক আর অপরজনকে শিক্ষায় অধিক মনে করি। সুতরাং এই যুদ্ধে তোমাদের দুজনের কারুরই জয়-পরাজয় দেখা যাচ্ছে না। কাজেই এ নিষ্ফল যুদ্ধ থেকে তোমরা নিবৃত্ত হও। ভীম আর দুর্যোধন পরস্পর শত্রুতাবদ্ধ। তাঁরা পরস্পরের দুর্বাক্য আর অপকারের কথা চিন্তা করে বলদেবের সেই হিতকর বাক্যে কান দিলেন না। এই দেখে বলরাম মনে মনে বললেন, অদৃষ্টই প্রবল, অতএব এখানে আর থাকা নিষ্প্রয়োজন। তাই তিনি দ্বারকায় ফিরে গেলেন। সেখানে গিয়ে তিনি জ্ঞাতিবর্গ আর উগ্রসেনাদির সঙ্গে মিলিত হয়ে সকলের আনন্দ বাড়ালেন। বলদেব আরও একবার নৈমিষারণ্যে গেলেন। এ-সময়ে তার মনে আর শত্রুতা, হিংসা বা ভেদজ্ঞান নেই। তিনি যজ্ঞমূর্তি; ঋষিরা আনন্দিত হয়ে তাঁর দ্বারা সর্বযজ্ঞ করালেন। তখন ভগবান বলরাম ঋষিদের যে জ্ঞান দিলেন, তার দ্বারা তাঁরা জানতে পারলেন যে এই নিখিল বিশ্বাত্মা সর্বত্র অবস্থিত। বলরাম জ্ঞাতি, বন্ধু ও সুহৃদ্‌গণে পরিবৃত হয়ে নিজের পত্নীর সঙ্গে যজ্ঞের পরে স্নান করলেন। নতুন কাপড় পরে মনোরম মালায় শোভিত হয়ে তিনি জ্যোৎস্নাপূর্ণ চন্দ্রের মত শোভা পেতে লাগলেন। মায়া-মনুষ্য, বলশালী, অপ্রমেয় ও অনন্ত বলদেবের এইরকম অনেক কর্ম আছে। যিনি সকাল ও সন্ধ্যায় এই অদ্ভুতকর্মা, অনন্ত বলরামের কর্মসকল স্মরণ করেন, তিনি বিষ্ণুর প্রীতিভাজন হন। ২২-৩৪

অশীতিতম অধ্যায়

শ্রীদাম ব্রাহ্মণের উপাখ্যান

রাজা পরীক্ষিৎ বললেন, ভগবান অনন্তবীর্য মহাত্মা মুকুন্দের আর যে সমস্ত বিক্রম-কাহিনী আছে আমরা তা শুনতে ইচ্ছা করি। ব্রহ্মন্‌, এমন কে আছেন যিনি ভগবদ্‌ বিষয়ে সৎকথা শুনতে বিরক্তবোধ করেন? যে বাক্য তাঁর গুণাবলী উচ্চারণ করে সেই বাক্যই বাক্য। যে হাত তাঁর সেবাকাজে নিযুক্ত সেই হাতই হাত। যে চিত্ত ভগবানের স্মরণে নিমগ্ন সেই চিত্তই চিত্ত। যেই কান সেই পুণ্য-কথা শোনে সেই কানই কান, আর যেই মাথা তাঁর চরাচর রূপকে প্রণাম জানায় সেই মাথাই মাথা। যেই চোখ তাঁর স্থাবর ও জঙ্গম এই দুই মূর্তিকেই দেখে সেই চোখই চোখ। আর যেসকল অঙ্গ ভগবানের পাদোদক রোজ ধারণ করে সেই অঙ্গই অঙ্গ। সূত বললেন,

বিষ্ণুভক্ত রাজা পরীক্ষিৎ ব্যাসপুত্র শুকদেবকে ঐ কথা জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি ভগবান বাসুদেবে মনপ্রাণ সমর্পণ করে বলতে লাগলেন। ১-৫

শুকদেব বললেন, মহারাজ, কোন এক শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ শ্রীকৃষ্ণের সখা ছিলেন। তিনি ইন্দ্রিয়ভোগে বিতৃষ্ণ হয়ে জিতেন্দ্রিয় ও প্রশান্তাত্মা হয়েছিলেন। যথাপ্রাপ্ত বস্তু নিয়েই ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ জীবনধারণ করতেন। জীর্ণ মলিন বসন পরে তিনি গৃহে বাস করতেন। তাঁর স্ত্রীও ঐরকম একখণ্ড কাপড় পরতেন আর রোজ ক্ষুধার তাড়নায় কোনরকমে দিন কাটাতেন। একদিন সেই পতিব্রতা নারী ক্ষুধায় কাঁপতে কাঁপতে ম্লানমুখে স্বামীকে বললেন, আমি শুনেছি ব্রাহ্মণহিতৈষী শরণাগতবৎসল স্বয়ং লক্ষ্মীপতি যদুপতি আপনার বন্ধু। তিনি সাধুদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। আপনি তাঁর কাছে যান। আপনি সপরিবারে কষ্ট পাচ্ছেন দেখে তিনি আপনার ধনের অভাব পূরণ করবেন। তিনি এখন ভোজ, বৃষ্ণি আর অন্ধকদের রাজা হয়ে দ্বারকায় বাস করছেন। তিনি চরাচর সকলের গুরু। যিনি তাঁর পাদপদ্ম চিন্তা করেন তিনি তাঁকে আত্মদান করে থাকেন। সুতরাং তাঁকে ভজনা করলে তিনি যে অবশ্য অভীষ্টদান করবেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণ স্ত্রীর দ্বারা বহুবার অনুরুদ্ধ হয়ে ভাবলেন, আর কিছু হোক না হোক পরমলাভ এই যে, শ্রীকৃষ্ণকে দেখতে পাব। এরকম চিন্তা করে ব্রাহ্মণ দ্বারকা যাওয়ার সংকল্প করে বললেন, কল্যাণী, সখাকে দেখতে যাব। ঘরে যদি কোন উপহার-সামগ্রী থাকে দাও, আমি নিয়ে যাই। ব্রাহ্মণী তখন অন্যান্য ব্রাহ্মণ-বাড়ী থেকে চারমুঠি চিঁড়া চেয়ে এনে পুরানো কাপড়ে বেঁধে স্বামীকে দিলেন। ব্রাহ্মণ সেই চিঁড়াটুকু নিয়ে কি করে তাঁর শ্রীকৃষ্ণ-দর্শন ঘটবে, এই চিন্তা করতে করতে দ্বারকায় উপস্থিত হলেন। ৬-১৫

দ্বারকায় এসে সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণ অন্যান্য ব্রাহ্মণদের সঙ্গে তিন সৈন্যব্যূহ আর তিন কক্ষ অতিক্রম করলেন। তারপর তিনি শ্রীকৃষ্ণের ষোল হাজার মহিষীর একজনের ঘরে গিয়ে প্রবেশ করলেন। তিনি যেখানে গেলেন সেখানে ব্রাহ্মণের মনে হল তিনি যেন ব্রহ্মানন্দ লাভ করলেন। শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীর পালঙ্কে শুয়ে ছিলেন। দূরে থেকে তিনি ব্রাহ্মণকে দেখেই উঠে দুই হাত বাড়িয়ে তাঁকে আলিঙ্গন করলেন। প্রিয়সখা ব্রাহ্মণের অঙ্গস্পর্শে শ্রীকৃষ্ণের এত আনন্দ হল যে তাঁর চোখ দিয়ে আনন্দাশ্রু ঝরতে লাগল। তারপর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বন্ধুকে পালঙ্কের উপরে বসিয়ে তাঁর জন্য পূজাসামগ্রী আনালেন এবং তাঁর পা ধুয়ে লোকপাবন ভগবান সেই পাদোদক মাথায় নিলেন। পরে তিনি দিব্যগন্ধযুক্ত চন্দন, অগুরু ও কুঙ্কুম বিপ্রের গায়ে মাখালেন আর সুগন্ধি ধূপ আর প্রদীপ দিয়ে আনন্দে তাঁর পূজা করে তাঁকে পান-সুপারি ও গরু দান করে কুশল জিজ্ঞাসা করলেন। ব্রাহ্মণ ছেঁড়া-ময়লা কাপড় পরে ছিলেন, তাঁর শরীরের শিরাগুলি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। স্বয়ং কৃষ্ণের মহিষী সখীদের নিয়ে তাঁকে পাখা করে তাঁর পরিচর্যা করতে লাগলেন। পুণ্যকীর্তি শ্রীকৃষ্ণ নিজের হাতে প্রীতিভরে ব্রাহ্মণকে পূজো করছেন দেখে অন্তঃপুরবাসীরা আশ্চর্য হলেন। তাঁরা ভাবলেন, এই ব্রাহ্মণ নির্ধন, অপরিচ্ছন্ন আর নিন্দিত। এই অধম ব্যক্তি কোন পুণ্যবলে শ্রীকৃষ্ণের সম্মানভাজন হল? শ্রীকৃষ্ণ পালঙ্কশায়িতা প্রিয়াকে ছেড়ে এই ব্যক্তিকে আলিঙ্গন করলেন! ১৬-২৬

মহারাজ, অতঃপর কৃষ্ণ আর ব্রাহ্মণ পরস্পরের হাত ধরে, নিজেরা যখন গুরুকুলে বাস করতেন, তখনকার সমস্ত মনোরম গল্প বলতে লাগলেন। ভগবান বললেন, বিপ্রবর, দক্ষিণা দিয়ে গুরুকুল থেকে গৃহে ফিরে এসে তুমি কি তোমারই

অনুরূপ সহধর্মিণী গ্রহণ করেছ? তুমি বিদ্বান, আমি জানি তোমার মন কামনা দ্বারা অভিভূত নয়। তাই গৃহধর্মে বা ধনে তুমি খুশী হও না। আমি যেমন বিষয়ে আসক্ত না হয়েও লোকের শিক্ষার জন্য কাজ করে থাকি।[১] সেরকম কেউ কেউ বিষয়-কামনায় প্রমত্ত না হয়ে ঈশ্বরের মায়ায় রচিত বিষয়-বাসনা ত্যাগ করে লোকশিক্ষার জন্য গৃহস্থধর্ম পালন করে।[২] তুমিও সেইরকম করেছ। ব্রাহ্মণেরা যে গুরুর কাছে বিজ্ঞেয় পরম আত্মতত্ত্ব জেনে অজ্ঞানের পরপারে গমন করেন, সেই গুরুকুলে আমাদের দুজনের বাসের কথা মনে আছে কি? সখা, এই সংসারে যাঁর থেকে জন্ম হয় তিনি প্রথম গুরু, উপনেতা আচার্য দ্বিতীয় গুরু আর আশ্রমের যিনি জ্ঞানদাতা গুরু তিনিই সাক্ষাৎ আমি। আমি গুরুরূপে উপদেশ দিলে যাঁরা অনায়াসে ভবসিন্ধু পার হয়ে যান, এই পৃথিবীর আশ্রমবাসীদের মধ্যে তাঁরাই প্রকৃত প্রয়োজনে সুপণ্ডিত। গুরুসেবায় আমি যেরকম খুশী হই, গার্হস্থ্য ধর্ম, ব্রহ্মচর্য ধর্ম, বানপ্রস্থ, কর্ম অথবা সন্ন্যাসধর্মের আচরণ দ্বারা তা হই না। যখন আমরা গুরুকুলে থাকতাম তখন একদিন গুরুপত্নী কাঠ আনবার জন্য পাঠালে যে ঘটনা ঘটেছিল তা কি তোমার মনে পড়ে? 'ছাত্ররা সব কাঠ নিয়ে এস' গুরুপত্নীর এই আজ্ঞা পেয়ে আমরা মহা-অরণ্যে প্রবেশ করলাম! আকালে ভীষণ ঝড় উঠল আর মেঘ দারুণ গর্জন করতে লাগল। ২৭-৩৬

সূর্যদেব অস্তাচলে গেলেন, দশদিক অন্ধকারে ছেয়ে ফেলল। উঁচু-নীচু সমস্ত জায়গায়ই জলে ডুবে গেছে, কোন দিকে কিছু দেখা গেল না। সেই জলপ্লাবিত বনে আমরা প্রচণ্ড বায়ু ও প্রবল জলের বেগে বারবার বাধা পেতে লাগলাম। তখন দিক ঠিক করতে না পেরে আমরা পরস্পরের হাত ধরে কাতরভাবে কাঠের ভার বহন করে নিয়ে আসতে লাগলাম। সূর্যোদয় হতে না হতেই আচার্য গুরু সান্দীপনি খুঁজতে বেরিয়ে আমাদের বনের মধ্যে কাতর অবস্থায় দেখে বললেন, বৎসগণ, প্রাণীদের আত্মাই শ্রেষ্ঠ বস্তু। তোমরা সেই আত্মাকে না মেনে গুরু আর গুরুপত্নীকে শ্রেষ্ঠ মনে বুঝে নিজেরা দুঃখ পেয়েছ। যাঁরা গুরুর জন্য সর্বার্থসাধক দেহ সমর্পণ করেন, যাঁরা আমার শিষ্য হন, তাঁরা এরকম আচরণ করে গুরুর প্রত্যুপকার করেন। দ্বিজপুত্রগণ, আমি তোমাদের উপর সন্তুষ্ট হলাম, তোমাদের সকল কামনা পূর্ণ হোক। ইহকালেই কি, আর পরকালেই কি, আমার কাছে অধীত বেদতত্ত্ব যেন তোমাদের মন থেকে বিলুপ্ত না হয়। বন্ধু, গুরুকুলে থাকার সময় আমাদের এরকম যত সব ঘটনা ঘটেছিল সে সমস্তই তোমার মনে আছে তো? গুরুর কৃপাতেই পুরুষ শান্তিপূর্ণ হতে পারে। ৩৭-৪৪

ব্রাহ্মণ বললেন, দেবদেব, তুমি পূর্ণকাম। একসঙ্গে যখন আমরা বাস করেছি আমাদের কি আর অপূর্ণ আছে? হে প্রভু, যাঁর দেহ বেদময় ব্রহ্ম আর যিনি নিখিল মঙ্গলের আকর, তাঁর গুরুকুলে বাস কেবল লোকশিক্ষার জন্য, তা মানুষের একান্ত অনুকরণযোগ্য। ৪৫

একাশীতিতম অধ্যায়

ব্রাহ্মণের সমৃদ্ধি

শুকদেব বললেন, মহারাজ, সর্ব-অন্তর্যামী শ্রীহরি সেই আগন্তুক ব্রাহ্মণের সঙ্গে

১ তুলনীয়: ভগবদ্গীতা, ৯।৯ ২ তুলনীয়: গীতা, ৩।২০ ও ৩।২৫

এরকম কথাবার্তা বলতে বলতে প্রেমদৃষ্টিতে তাঁকে দেখে পরিহাস করে বললেন, তুমি গৃহ থেকে আমার জন্য কি উপহার এনেছ? ভক্তরা যদি অল্প কিছু উপহার আনে আমি তাকেই প্রচুর মনে করে সন্তুষ্ট হই। অভক্ত কর্তৃক আনীত প্রচুর উপকরণেও আমি হৃষ্ট হই না। পাতা, ফুল, ফল আর জল ভক্তিপূর্বক আমাকে যে যা দেয় আমি সন্তুষ্ট মনে তাই গ্রহণ করি।[১] শ্রীকৃষ্ণের এই কথা শুনেও ব্রাহ্মণ লজ্জায় তাঁর বাড়ী থেকে আনা সেই চারমুঠা চিঁড়া কৃষ্ণকে কিছুতেই দিতে পারছিলেন না। তিনি শুধু অধোবদনে বসে রইলেন। সর্বভূতের অন্তর্যামী শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণের আগমনের কারণ আগেই বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি দেখলেন যে ব্রাহ্মণ সম্পদের জন্য ভগবানকে ভজনা করেন নি, পতিব্রতা স্ত্রীর প্রিয়সাধন করবার জন্যই তাঁর কাছে এসেছেন। তিনি স্থির করলেন যে ব্রাহ্মণকে দেবতাদেরও দুর্লভ সম্পত্তি দান করতে হবে। শ্রীকৃষ্ণ মনে মনে এই ভেবে ব্রাহ্মণের কাপড়ে-বাঁধা চিঁড়া কেড়ে নিয়ে বললেন, সখা, একি, এই তো আমার প্রীতিকর উপহার এনেছ। আমি বিশ্বাত্মা, এই চিঁড়া নিয়েই আমি সন্তুষ্ট হয়েছি। শ্রীকৃষ্ণ এই বলে একমুঠা চিঁড়া খেয়ে ফেললেন এবং আবার খাওয়ার জন্য যেই দ্বিতীয় মুঠি তুলেছেন, অমনি লক্ষ্মীরূপিণী রুক্মিণীদেবী পরমব্রহ্মের হাত ধরে বললেন বিশ্বাত্মা, ইহলোকে অথবা পরলোকে পুরুষের সকল সমৃদ্ধির জন্য আপনার এই একমুঠি চিঁড়াই যথেষ্ট। আপনি আর দ্বিতীয় মুঠি খাবেন না। এভাবে আমাকে আর মানুষের মধ্যে চিরবন্দিনী করে রাখবেন না। ১-১১

ব্রাহ্মণ সে রাত্রিতে কৃষ্ণালয়ে থাকলেন, আর পরম তৃপ্তির সঙ্গে পান-ভোজন করে নিজেকে যেন স্বর্গস্থ বলে মনে করলেন। রাত ভোর হলে ব্রাহ্মণ নিজের বাড়ীতে যাবার উদ্যোগ করলেন। বিশ্বস্রষ্টা শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সঙ্গে কিছুদূর গিয়ে প্রণাম করে আর বিনয় বচন বলে তাঁকে সন্তুষ্ট করলেন। ব্রাহ্মণ সখার কাছ থেকে অর্থ পেলেন না, আর নিজেও মুখ ফুটে কিছু চাইলেনও না। ব্রাহ্মণ যেতে যেতে ভাবলেন, আহা, ভগবানের কি ব্রহ্মণ্যতা দেখলাম, তিনি বক্ষে লক্ষ্মীকে ধারণ করেন, অথচ আমার মত দরিদ্রতম ব্যক্তিকে আলিঙ্গন করতে কুণ্ঠাবোধ করলেন না। কোথায় আমি দীন-দরিদ্র নীচ জন, আর কোথায় কমলার আবাসভূমি শ্রীকৃষ্ণ? আমি ব্রাহ্মণবংশে জন্মেছি বলে তিনি আমাকে আলিঙ্গন করলেন, লক্ষ্মীশোভিত পালঙ্কে ভ্রাতৃজ্ঞানে বসালেন। রুক্মিণীদেবী স্বয়ং আমাকে বাতাস করলেন! ব্রাহ্মণ যেমন দেবতাকে পূজা করে, তেমনিই দেবদেব পরম সেবা আর পাদমর্দন ছাড়া আমাকে পূজা করলেন। তাঁর চরণসেবা পুরুষের পরলোকে স্বর্গ ও মুক্তি, পৃথিবীতে সম্পত্তি আর সমস্ত সিদ্ধির মূল। তবু এ দরিদ্র ধন পেয়ে অত্যন্ত মত্ত হয়ে আমাকে আর মনে করবে না, নিশ্চয়ই এই ভেবে পরম দয়ালু আমাকে কোন ধন দেন নি। ১২-২০

ব্রাহ্মণ এইরকম চিন্তা করতে করতে নিজের গৃহের কাছে এসে দেখলেন যে সেখানে চন্দ্র, সূর্য আর অগ্নির মত উজ্জ্বল এক মন্দির শোভা পাচ্ছে, বিচিত্র বাগান আর উপবন বিরাজ করছে। সেই বাগানে গাছের শাখায় বসে নানারকম পাখিরা গান গাইছে। নীচে অতি সুন্দর সরোবরে পদ্ম, কহ্লার, শালুক, প্রভৃতি জলজ ফুল শোভা পাচ্ছে। সুন্দর বসন-ভূষণে সজ্জিত নরনারীরা সেখানকার শোভা আরও বাড়িয়ে তুলেছিল। ব্রাহ্মণ সবিস্ময়ে চিন্তা করতে লাগলেন, এ কার বাড়ী? কি ভাবে এ এত সুন্দর হয়ে উঠল! এই সময় দেবতার মত স্ত্রী-পুরুষেরা গীত-

১ তুলনীয়: পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ ॥ গীতা, ৯।২৬

বাদ্যের সঙ্গে উপহারসহ এগিয়ে এসে ব্রাহ্মণকে অভ্যর্থনা করল। স্বামী এসেছেন শুনে সতী ব্রাহ্মণপত্নীর অত্যন্ত আনন্দ হল। তিনি স্বামীকে সাদরে অভ্যর্থনার জন্য মূর্তিমতী লক্ষ্মীর মত বাড়ী থেকে বেরোলেন। পতিকে দেখে চোখ দিয়ে তাঁর আনন্দাশ্রু বইতে লাগল। তিনি চোখ বুজে মনে মনে পতিকে নমস্কার ও আলিঙ্গন করলেন। ব্রাহ্মণ দেখলেন, তাঁর পত্নী বিমান-বিহারিণী দেবীর মত দীপ্তি পাচ্ছেন, পদককণ্ঠী দাসীরা তাঁর চারদিকে বিরাজ করছে। এই দেখে ব্রাহ্মণ বিস্ময়ে অভিভূত হলেন, পরক্ষণেই তাঁর আনন্দ হল। তিনি পত্নীর সঙ্গে স্বয়ং ইন্দ্রের ভবনের মত শত-সহস্র মণি-শোভিত নিজের ঘরে ঢুকলেন। সেখানে দেখলেন সোনার ও হাতীর দাঁতের কাজ-করা খাটে দুধের মত সাদা নরম বিছানা পাতা রয়েছে। ঘরের ভিতরে রত্নপ্রদীপ জ্বলছে। সোনার চামর, পাখা, কোমল আস্তরণে আচ্ছাদিত বহু আসন আর মুক্তাদামে শোভিত সুন্দর ঝালরও শোভা পাচ্ছিল। ২১-৩১

ব্রাহ্মণ নিজের গৃহে এ-রকম আকস্মিক সুখ-সমৃদ্ধি দেখে মনে মনে ভাবতে লাগলেন, আমি এতকাল দুর্ভাগা ও চিরদরিদ্র ছিলাম। নিশ্চয়ই যদুপতির দর্শন-লাভই আমার এরূপ সুখ-সমৃদ্ধির কারণ। সখা আমার যদুশ্রেষ্ঠ। তিনি ভূরি-ভোজ আর বহু দান করেও নিজে তা খুব কম মনে করেন, আর কাউকে কিছু না বলেই মেঘের বর্ষণের মত যাচককে প্রচুর দান করে থাকেন। তাঁর বন্ধুরা যদি তাঁকে কিছু দেয় তবে তা তুচ্ছ হলেও বহু বলে মনে করেন। সেই কারণেই আমার দেওয়া চিঁড়া সেই মহাত্মা প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করেছিলেন। আমি প্রতিজন্মে যেন তাঁর বন্ধুত্ব, সৌহার্দ্য বা দাস্য লাভ করতে পারি। আমি যেন সেই সর্বগুণাধার, মহানুভব ও মহাপুরুষের সঙ্গ লাভ করে তাঁর ভক্তজনের সঙ্গে জন্মে জন্মে মিলিত হতে পারি। ভগবান নিজে বিবেকবান, তিনি ধনীদের গর্বজনিত অধঃপাত দেখবার জন্য তাঁর অবিবেকী ভক্তদের বিত্তবান করতে চান না। শ্রীদাম নামে সেই ব্রাহ্মণ এরকম আলোচনা করে ভগবান জনার্দনের প্রতি আরো ভক্তিমান হলেন। তিনি আস্তে আস্তে ত্যাগ অভ্যাস করতে লাগলেন আর অনাসক্তচিত্তে পত্নী সহ বিষয় উপভোগ করতে লাগলেন। তিনি বুঝতে পারলেন যে ভগবান শ্রীহরি আর যজ্ঞেশ্বর ব্রাহ্মণরাই তাঁর প্রভু এবং দেবতা, তাঁদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কেউ নেই। সেই ভগবৎসখা ব্রাহ্মণ এভাবে অন্যের পক্ষে দুর্লভ শ্রীকৃষ্ণকে নিজের ভক্তিদ্বারা বশীভূত ও দর্শন করে তাঁকে ধ্যান করতে করতে অহংকার-পাশ ছেদন করলেন আর শীঘ্রই ব্রহ্মবিদদের গন্তব্য সেই পরমধাম লাভ করলেন।[১] মহারাজ, যিনি শ্রীহরির এই ব্রাহ্মণপ্রীতির বিবরণ শ্রদ্ধা সহকারে শোনেন, তাঁর ভগবদ্‌ভক্তি লাভ হয়, তিনি কর্মবন্ধন থেকে মুক্তিলাভ করে থাকেন। ৩২-৪১

দ্বি-আশীতিতম অধ্যায়

কুরুক্ষেত্র-যাত্রা

শুকদেব বললেন, মহারাজ, একসময়ে বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় ছিলেন। তখন একদিন কল্পক্ষয়ের মত সর্বগ্রাসী সূর্যগ্রহণ হল। এইরকম গ্রহণের কথা আগের

১ লভন্তে ব্রহ্মনির্বাণমৃষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ।
ছিন্নদ্বৈধা যতাত্মানঃ সর্বভূতহিতে রতাঃ॥ গীতা, ৫।২৫

থেকেই দ্বারকাবাসীরা সকলে জানত, সেইজন্য গ্রহণের মাঙ্গলিক কাজ করার জন্য তারা সমন্তপঞ্চকে গেল। শস্ত্রধারীদের শ্রেষ্ঠ পরশুরাম পৃথিবী ক্ষত্রিয়শূন্য করলে রাজাদের রক্তে হ্রদ সৃষ্টি হয়েছিল। তিনি স্বয়ং ঈশ্বর, সুতরাং এই ঘোর কর্মে লিপ্ত হলেও পাপক্ষালন আর লোকশিক্ষার জন্য সামান্য ব্যক্তির মত ঐখানে এক যজ্ঞানুষ্ঠান করেন। যা হোক, সেই গ্রহণের উপলক্ষে তীর্থযাত্রা করে ভারতবর্ষের সমস্ত লোক সমন্তপঞ্চকে উপস্থিত হল। বসুদেব, অক্রূর, আহুক, গদ, প্রদ্যুম্ন, সাম্ব প্রভৃতি বৃষ্ণিবংশীয়রা নিজের নিজের পাপক্ষালনের জন্য দ্বারকা থেকে ঐখানে গেলেন। সুচন্দ্র, শুক, সারণ, অনিরুদ্ধ ও কৃতবর্মা দ্বারকার রক্ষাকার্যে নিযুক্ত থাকলেন। যে সমস্ত যাদবশ্রেষ্ঠ তীর্থ-পর্যটনে বের হলেন তাঁদের পরিধানে দিব্য-মালা, বস্ত্র ও বর্ম, গলায় কাঞ্চনমালা। মহাতেজস্বী এই যাদবশ্রেষ্ঠরা তাঁদের স্ত্রীদের সঙ্গে পথের মধ্যে বিমানের ন্যায় রথ, জলে তরঙ্গের মত ঘোড়া, সমুদ্রের মত গর্জন-কারী হাতী আর বিদ্যাধরের ন্যায় জ্যোতিঃসম্পন্ন মানুষের সঙ্গে দেবতাদের মত দীপ্তি পেতে লাগলেন। ১-৮

মহাভাগ বৃষ্ণিরা সমন্তপঞ্চকে স্নান করে এবং সমাহিতচিত্তে উপবাস করে ব্রাহ্মণদের বস্ত্র, মালা ও গরু দান করলেন। তাঁরা আবার রামহ্রদে বিধি অনুসারে মুক্তিস্নান করে শ্রীকৃষ্ণপরায়ণ হয়ে ব্রাহ্মণদের সুস্বাদু অন্ন দান করলেন। শ্রীকৃষ্ণই যাঁদের দেবতা সেই সকল বৃষ্ণিরা তাঁর আজ্ঞা পেয়ে নিজেরা ভোজন করে শীতাতপযুক্ত গাছের মূলে বাস করতে লাগলেন। মহারাজ, সেখানে মৎস্য, উশীনর, কৌশল্য, বিদর্ভ, কুরু, সৃঞ্জয়, কাম্বোজ, কেকয়, মদ্র, কুন্তি, আনর্ত, কেরল প্রভৃতি দেশের সুহৃদ ও সম্বন্ধী রাজারা অন্যান্য শত শত স্বপক্ষের রাজারা এবং সুহৃদ নন্দাদি গোপ আর শ্রীকৃষ্ণ দর্শনে চির-উৎকণ্ঠিত গোপীরাও উপস্থিত হয়েছিলেন। পরস্পরকে দর্শন করে যে আনন্দ হল, তাতে তাঁদের মুখ উৎফুল্ল হয়ে উঠল, গাঢ় আলিঙ্গনে তাঁদের চোখের জল পড়তে লাগল। তাঁরা অপার আনন্দ উপলব্ধি করতে লাগলেন। তাঁদের স্ত্রীরাও সৌহার্দ্যজনিত মৃদু হাসি দ্বারা পরস্পরের প্রতি নির্মল কটাক্ষপাত করতে লাগলেন তাঁরা পরস্পর স্তন দ্বারা স্তনকুঙ্কুম পেষণ করে পরস্পরকে আলিঙ্গন করলেন। তাঁদের চোখে ভালোবাসার অশ্রু প্রবাহিত হল। তারপর তাঁরা বৃদ্ধদের অভিবাদন করে আর কনিষ্ঠদের দ্বারা বন্দিত হয়ে পরস্পর স্বাগত আর কুশল জিজ্ঞাসা করে শ্রীকৃষ্ণ-কথা বলতে লাগলেন। কুন্তীদেবী বসুদেব, দেবভাগ প্রভৃতি ভাইদের, শ্রুতিদেবী প্রভৃতি বোনদের ও তাঁর পুত্রদের পিতামাতা শূরসেন ও মারিষাকে, ভাই-বৌদের আর মুকুন্দকে দেখে কথাবার্তায় স্বজনদের বিরহদুঃখ দূর করলেন। ৯-১৮

এরপর কুন্তীদেবী বসুদেবকে বললেন, ভাই, আমি নিজেকে অপূর্ণমনোরথ বলে মনে করছি, কারণ তোমরা অতি সজ্জন হয়েও বিপদের সময় আমার কোনই খোঁজ-খবর নাও না। দৈব যার প্রতিকূল, সে আত্মজন হলেও সুহৃদ, জ্ঞাতি, পুত্র, ভ্রাতা, পিতা ও মাতা কেউই তাকে স্মরণ করে না। বসুদেব বললেন, বোন, আমাদের দোষ দিও না। আমরা মানুষ, দেবতার খেলার বস্তু। লোকে ঈশ্বরেরই বশে স্বয়ং কাজ করে অথবা অপরের দ্বারা চালিত হয়। আমরা কংসের অত্যাচারে পীড়িত হয়ে দশদিকে পালিয়ে গিয়েছিলাম। যা হোক, এখন দৈবের বশেই এখানে এসে মিলিত হয়েছি। ১৯-২২

শুকদেব বললেন, পূর্বোক্ত রাজারা বসুদেব ও যদুদের দ্বারা পূজিত হয়ে অচ্যুতকে দর্শন করে পুলকিত হলেন। ভীষ্ম, দ্রোণ, ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রদের সঙ্গে

গান্ধারী, সস্ত্রীক পাণ্ডবগণ, কুন্তী, সঞ্জয়, বিদুর, কৃপ, কুন্তিভোজ, বিরাট, ভীষ্মক, নরশ্রেষ্ঠ নগ্নজিৎ, পুরুজিৎ, দ্রুপদ, শল্য, ধৃষ্টকেতু, কাশিরাজ, দমঘোষ, বিশালাক্ষ, মৈথিল, মদ্র, কেকয়, যুধামন্যু, সুশর্মা, সপুত্র বাহ্লিকাদি আর যুধিষ্ঠিরের অনুগত অন্যান্য নরপতিরা নিজ নিজ স্ত্রীদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের পরম-শোভানিকেতন দেহ দর্শন করে বিস্মিত হলেন। ২৩-২৭

তারপর সেই সমস্ত রাজারা কৃষ্ণ-বলরামের নিকট পূজা পেয়ে আনন্দের সঙ্গে যদুবংশীয়দের প্রশংসা করতে লাগলেন। ভোজরাজকে সম্বোধন করে তাঁরা বললেন, ভোজপতি, ইহলোকে মানবসমাজে আপনাদের জন্মই সার্থক, কেন না আপনারা যোগীদেরও দুষ্প্রাপ্য শ্রীকৃষ্ণকে সর্বদাই দর্শন করছেন। শ্রুতিসমূহ তাঁরই মাহাত্ম্য কীর্তন করে, তাঁর পাদ-প্রক্ষালন জল গঙ্গা এবং বাক্যরূপ বেদশাস্ত্র এই বিশ্বকে অতিশয় পবিত্র করছে। কালবশে এই পৃথিবীর মাহাত্ম্য নষ্ট হলেও তাঁর পাদস্পর্শে পুনরায় শক্তির প্রভাবে পৃথিবী আমাদের অভীষ্ট বস্তু প্রদান করছে। আপনারা প্রবৃত্তিমার্গে থাকলেও সেই বিষ্ণুর সঙ্গে আপনাদের দর্শন, স্পর্শন, অনুগমন, কথোপকথন, শয়ন, উপবেশন, বিবাহ-সম্বন্ধ ও দৈহিক সম্বন্ধ হচ্ছে। তিনি আপনাদের গৃহে আবির্ভূত, সুতরাং স্বর্গ ও মোক্ষ দ্বারা আপনাদের স্বয়ং তৃষ্ণা মিটিয়েছেন। ২৮-৩১

শুকদেব বললেন, মহারাজ, শ্রীকৃষ্ণাদি যদুগণ সেই স্থানে উপস্থিত হয়েছেন জানতে পেরে নন্দ তাঁদের দর্শনের আশায় শকটে করে গোপদের সঙ্গে সেখানে উপস্থিত হলেন। নন্দকে দেখে যদুরা আনন্দিত হয়ে তাঁকে গাঢ় আলিঙ্গন করলেন। কংসের সেই অত্যাচার আর বালক শ্রীকৃষ্ণকে গোপনে গচ্ছিত রাখা, এই সকল বিষয় স্মরণ করে বসুদেব নন্দকে আলিঙ্গন করে আনন্দিত ও প্রেমবিহ্বল হয়ে পড়লেন। হে কুরুশ্রেষ্ঠ, পিতামাতাকে আলিঙ্গন ও অভিবাদন করে শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের কণ্ঠ প্রেমাশ্রুতে রুদ্ধ হল, তাঁরা কিছুই বলতে পারলেন না। গোপরাজ নন্দ আর মহাভাগ্যবতী যশোদা সেই দুই পুত্রকে নিজেদের আসনে বসিয়ে আর হাত দিয়ে আলিঙ্গন করে সমস্ত শোক পরিত্যাগ করলেন। তখন রোহিণী আর দেবকী ব্রজেশ্বরী যশোদাকে আলিঙ্গন করে তাঁদের মিত্রতা স্মরণ করে বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে উভয়েই একসঙ্গে বলতে লাগলেন, ব্রজেশ্বরী, তোমাদের পতি-পত্নীর মিত্রতা কে ভুলতে পারে? ইন্দ্রের মত ঐশ্বর্য দান করলেও তার প্রতিদান হয় না। এই দুই বালক নিজের পিতামাতাকে দর্শন করতে পারে নি। এরা নিজের পিতামহ কর্তৃক তোমাদের হাতে ন্যস্ত হয়েছিল। চোখের পাতা যেমন চোখকে রক্ষা করে, তোমরাও তেমনি পালন ও পোষণ করে এদের রক্ষা করেছ। তোমাদের কাছে থেকে এরা অকুতোভয় হয়েছে। তোমরা এদের উপযুক্ত ভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করেছ। কেন না সাধুদের আত্মপর ভেদজ্ঞান নেই। ৩২-৩৯

শুকদেব বললেন, মহারাজ গোপীরা বহুকাল পরে শ্রীকৃষ্ণকে অনিমেষলোচনে দেখতে লাগলেন। কিন্তু যতই তাঁরা তাঁকে দেখেছেন, ততই তাঁদের দেখার ইচ্ছা বাড়তে লাগল। আজ বহুদিনের পর তাঁরা দুর্লভ শ্রীকৃষ্ণকে চক্ষু দিয়ে হৃদয়স্থ করে আলিঙ্গনপূর্বক ভক্তিভাবে গদ্‌গদ হলেন। ভগবান গোপীদের নির্জনে আলিঙ্গন করে অনাময় প্রশ্ন করে হাসতে হাসতে বললেন, সখীগণ, আমাদের তোমরা কি স্মরণ কর? আমরা বন্ধু-বান্ধবদের প্রয়োজনের জন্য তোমাদের ছেড়ে গিয়েছিলাম, তাই কি আমাদের অকৃতজ্ঞ মনে করে অবজ্ঞা করে থাক? দেখ, ভগবানই প্রাণীদের জন্ম-মৃত্যুর কারণ। বায়ু যেমন মেঘ,

তৃণ, তুলা ও ধূলিকণাসমূহের সংযোগ-বিয়োগ ঘটায়, সৃষ্টিকর্তাও তেমনি প্রাণীদের সেরূপ বিধান করে থাকেন। আমার প্রতি ভক্তি থাকলে প্রাণীরা মুক্তি পায়। ভাগ্যবশে আমার প্রতি তোমাদের স্নেহসঞ্চার হয়েছিল। এরূপ স্নেহই আমাকে লাভ করিয়ে দেয়। হে অঙ্গনাগণ, ভৌতিক পদার্থের আদি, অন্ত, মধ্য এবং বাহ্য যেমন আকাশ, জল, পৃথিবী, বায়ু ও তেজ, এই নিখিল ভূতের আদি, অন্ত, মধ্য এবং বাহ্যও তেমনি আমি। আর এই ভৌতিক দেহ এবং ভোক্তা আত্মা ঐ উভয়কে পরমপুরুষ-স্বরূপ আমাতে প্রকাশমান দর্শন কর।[১] ৪০-৪৭

শুকদেব বললেন, শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ জানতে পেরে গোপীরা তাঁকেই ধ্যান করে সংসারের মূল কারণ লিঙ্গশরীররূপে উপাধি ক্ষয় করায় যথাকালে তাঁদের তাঁরই সারূপ্য লাভ ঘটল। তাঁরা বললেন, হে পদ্মনাভ, আমরা গৃহবাসিনী। তবুও পরমজ্ঞানী যোগীর ধ্যানের বস্তু আর সংসারকূপে পতিত ব্যক্তির উদ্ধারের অবলম্বন আপনার চরণারবিন্দ যেন আমাদের অন্তরে সদা জাগরূক থাকে। ৪৮-৪৯

ত্রি-অশীতিতম অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণ-মহিষীদের আপন বিবাহ বর্ণন

শুকদেব বললেন, মহারাজ, সকলের গুরু ও গতি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের প্রতি অনুগ্রহ করে যুধিষ্ঠির ও সকল বন্ধুদের কুশল জিজ্ঞাসা করলেন। তাঁরা এইভাবে লোকনাথ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হয়ে সানন্দে উত্তর দিতে লাগলেন। শ্রীকৃষ্ণের চরণকমল দর্শনে তাঁদের সমস্ত পাপ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তাঁরা বললেন, প্রভু, আপনার চরণারবিন্দের মধু প্রাণীদের দেহগত অবিদ্যা নষ্ট করে দেয়। তা মহাজনদের মন থেকে তাঁদের মুখপথে বেরিয়ে আসে। যাঁরা কান দিয়ে কোনও সময়ের জন্য ঐ পুষ্পমধু পান করেন তাঁদের আর অমঙ্গল-সম্ভাবনা কোথায়? আপনি নিজের তেজে আপনা দ্বারা আপনাতে নিজের উৎপন্ন জাগরণ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি—এই তিন অবস্থা জয় করেছেন। সুতরাং আপনি সর্বানন্দ কদম্বস্বরূপ, আপনাকে নমস্কার করি। আপনি অকুণ্ঠশক্তি, তাই অখণ্ডস্বরূপ। কালবশে বেদসকল বিলুপ্ত হলে তা রক্ষার জন্য আপনি যোগমায়ার সাহায্যে নানারকম মূর্তি ধারণ করেন। পরমহংসদের আপনিই একমাত্র গতি। শুকদেব বললেন, মহারাজ, জনগণ এইভাবে শ্রীকৃষ্ণের স্তব করলে অন্ধক ও কৌরব রমণীরাও মিলিত হয়ে ত্রিলোক-কীর্তিত তাঁর মাহাত্ম্য-কথার আলোচনা করতে লাগলেন। ১-৫

সর্বপ্রথম দ্রৌপদী বললেন, বৈদর্ভী, ভদ্রা, জাম্ববতী, সত্যভামা, কালিন্দী, শৈব্যা, রোহিণী, লক্ষ্মণা এবং অন্যান্য কৃষ্ণপত্নীগণ, স্বয়ং ভগবান নিজ মায়াযোগে মানুষের অনুকরণ করে যেভাবে আপনাদের বিবাহ করেছিলেন তা বলুন। রুক্মিণী বললেন, জরাসন্ধ প্রভৃতি রাজারা চৈদিপতির হাতে আমাকে অর্পণ করবার জন্য অস্ত্রধারণ করেছিলেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ দুর্জয় যোদ্ধাদের মাথায় পা রেখে ছাগ ও মেষপালের মধ্য থেকে সিংহের মত আমাকে হরণ করে এনেছিলেন। সেই শ্রীনিবাসের চরণযুগল আমার চিরদিন অর্চনীয় হোক। সত্যভামা বললেন, ভ্রাতা প্রসেন হত হলে আমার পিতা সত্রাজিৎ অত্যন্ত দুঃখ পেয়েছিলেন। প্রসেন সিংহের

১ যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্।—মুণ্ডক উপঃ ২।৩।২

দ্বারা আক্রমণে হত হলেও সকলে বলছিল যে সামন্তক মণির লোভে শ্রীকৃষ্ণই আমার ভাইকে হত্যা করেছেন। এই অপবাদ দূর করার উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণ ভল্লুকরাজকে মেরে রত্ন আনিয়ে সভামধ্যে ঐ মণি পিতাকে দেন। তাতে আমার পিতা নিজের অপরাধে ভীত হয়ে পড়েন এবং আমি অক্রূরের বাগদত্তা হলেও আমাকে প্রভুর হাতেই সমর্পণ করেন। জাম্ববতী বললেন, পিতা জাম্ববান এঁকে নিজের আরাধ্য দেবতা সীতাপতি বলে বুঝতে না পেরে সাতাশ দিন এঁর সঙ্গে যুদ্ধ করেন। পরে যখন জানতে পারলেন যে ইনিই সাক্ষাৎ সীতাপতি তখন তাঁর পাদদুটি ধারণ করে পিতা সামন্তক মণির সঙ্গে আমাকে পূজার সামগ্রীরূপে তাঁকে প্রদান করেন। সেই থেকে আমি তাঁর দাসী। ৬-১০

কালিন্দী বললেন, আমি শ্রীকৃষ্ণের পাদস্পর্শের আশায় তপস্যা করছিলাম। একথা জানতে পেরে তিনি সখা অর্জুনের সঙ্গে গিয়ে আমার পাণিগ্রহণ করেছিলেন। ভদ্রা বললেন, আমি স্বয়ংবরা হয়েছিলাম। শ্রীনিবাস নিজে স্বয়ংবর সভায় এসে উপস্থিত রাজাদের আর আমার দুষ্ট ভাইদের পরাস্ত করে কুকুরের মাঝখানে সিংহের মত আমাকে ছিনিয়ে এনেছিলেন। সেই অবধি আমি তাঁর পদসেবিকা, জন্মে জন্মে যেন তাঁর সেবিকা হতে পারি। সত্যা বললেন, আমার পিতা রাজাদের বল পরীক্ষা করবার জন্য সাতটি বীর্যবান বৃষ পালন করতেন। যেমন শিশুরা ছাগশাবকদের বাঁধে, শ্রীকৃষ্ণ তেমনি বীরদের দর্পহারী সেই বৃষদের অবলীলাক্রমে বেঁধে ফেলেছিলেন। তিনি এইভাবে আপন শৌর্যবীর্যের দ্বারা পথে রাজাদের জয় করে চতুরঙ্গিনী সেনা ও দাসীদের সঙ্গে আমাকে নিয়ে আসেন। আমি যেন চিরদিন তাঁর দাসী হয়ে থাকি। মিত্রবিন্দা বললেন, আমার পিতা আমাকে শ্রীকৃষ্ণের অনুরাগিনী দেখে স্বয়ং সখীগণ ও অক্ষৌহিণী সেনার সঙ্গে মাতুলপুত্র শ্রীকৃষ্ণকে দান করেন। আমি নানারকম কর্মবশত সংসারে ভ্রমণ করছি, অতএব জন্মে জন্মে যেন শ্রীকৃষ্ণের চরণস্পর্শ করতে পারি। তাতেই আমার মঙ্গল। ১১-১৬

লক্ষ্মণা বললেন, রাজ্ঞী, নারদের মুখে বারবার শ্রীকৃষ্ণের জন্ম আর কর্মবিবরণ শুনে আমার মন লোকপালদের ছেড়ে শ্রীকৃষ্ণেই অনুরক্ত হয়েছিল। কমলা বহু বিবেচনার পর যাঁকে বরণ করেছিলেন, আমি তাঁরই দাসী হবার জন্য একান্ত উৎসুক হয়েছিলাম। কন্যাবৎসল পিতা বৃহৎসেন আমার মনোভাব বুঝতে পেরে তার উপায় করলেন। যেমন আপনার স্বয়ংবরে অর্জুনকে পাবার উদ্দেশ্যে মৎস্য নির্মাণ করা হয়েছিল, আমার স্বয়ংবরকালেও ঠিক সেইরকম হয়। তবে বিশেষত্ব এই যে এই মৎস্যটি বাইরে ঢাকা ছিল। ঐ মৎস্য স্তম্ভ-মূলে রাখা কলসীর জলেই কেবল দেখা যেত, সুতরাং নীচে দৃষ্টি রেখে উপরে লক্ষ্যভেদ করতে হয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া এই কঠিন কাজ করার শক্তি আর কারও ছিল না। এই লক্ষ্যভেদ পণের কথা শুনে সর্ববিধ অস্ত্রবিশারদ হাজার হাজার রাজা আচার্যদের সঙ্গে দিগ্‌দিগন্ত থেকে পিতার রাজ্যে আসতে লাগলেন। বীর্য আর বয়স অনুসারে পিতা সেই সকল রাজাকে পূজা করলে তাঁরা আমাকে লাভ করবার আশায় একে একে সকলেই লক্ষ্যভেদ করবার জন্য ধনুক হাতে নিলেন। কিন্তু কেউই সেই ধনুকে জ্যা আরোপণ করতে পারলেন না। মগধরাজ, অম্বষ্ঠ, চেদিপতি ও অন্যান্য বীরগণ এবং ভীম, দুর্যোধন ও কর্ণ শরাসনে জ্যা আরোপণ করেও লক্ষ্য স্থির করতে পারলেন না। ১৭-২৩

অতঃপর অর্জুন উঠলেন। তিনি জলে মাছের ছায়া ও মাছের অবস্থান জেনে সতর্কতার সঙ্গে শর নিক্ষেপ করলেন, কিন্তু লক্ষ্যভেদ করতে পারলেন না। এই ভাবে সমস্ত ক্ষত্রিয়রা নিবৃত্ত ও ভগ্নমনোরথ হলে পর ভগবান ধনুক গ্রহণ করে

অবলীলাক্রমে জ্যা অরোপণ করলেন, আর তাতে বাণ যোজনা করে অভিজিৎ মুহূর্তে জলে মৎস্যকে ভেদ করলেন। স্বর্গে ও পৃথিবীতে দুন্দুভি বাজতে লাগল। দেবতারা আনন্দে বিহ্বল হয়ে পুষ্পবর্ষণ করতে লাগলেন। তখন আমি নতুন পট্টবস্ত্র পরে সোনার উজ্জ্বল রত্নমালা ধারণ করে মধুর নূপুরধ্বনি করতে করতে সেই সভায় প্রবেশ করলাম। আমার কবরীতে মালা আর মুখে সলজ্জ হাসি শোভা পাচ্ছিল। আমার গণ্ডস্থল কুন্তলরাজি আর কুণ্ডল দ্বারা অলংকৃত ছিল। আমি মুখ তুলে স্নিগ্ধ হেসে কটাক্ষ দ্বারা চতুর্দিকে রাজাদের দেখতে দেখতে মুরারির গলায় বরমাল্য দিলাম। আমার হৃদয় তাঁতেই অনুরক্ত ছিল। ২৪-২৯

তখনই মৃদঙ্গ, পটহ, শঙ্খ, ভেরী ও ঢাক প্রভৃতি বাদ্য বেজে উঠল, নর্তকীরা নৃত্য করতে লাগল আর গায়কেরা মধুর গান গাইতে লাগল। আমি এই ভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বরণ করলে কামপীড়ায় কাতর রাজারা তা সহ্য করতে পারল না। তখন চতুর্ভুজ কৃষ্ণ আমাকে চারটি অশ্ব সংযুক্ত রথে তুলে নিয়ে বর্ম পরে ও শার্ঙ্গধনু উদ্যত করে যুদ্ধস্থলে অপেক্ষা করতে লাগলেন। রাজ্ঞী, কৃষ্ণসারথি দারুক সোনার রথ চালিয়ে নিয়ে গেলেন। মৃগপাল মধ্যে সিংহের ন্যায় শ্রীহরি রাজাদের মধ্যে বিচরণ করতে লাগলেন। রাজারা তাঁকে অনুসরণ করল। যেমন কুকুরের দল সিংহকে বাধা দিতে চেষ্টা করে, সে রকম কোন কোন রাজা এগিয়ে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণকে বাধা দেবার জন্য ধনুক তুলে যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত হল। তাদের মধ্যে কেউ কেউ শার্ঙ্গধনু থেকে নির্গত বাণের দ্বারা ছিন্নবাহু, ছিন্নপদ ও ছিন্নদেহ হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে শয়ান হল আর কেউ কেউ যুদ্ধ ছেড়ে পালাল। ৩০-৩৫

তারপর সূর্যের অস্তাচলে প্রবেশের ন্যায় যদুপতি স্বর্গে ও মর্ত্যে সকলের বন্দনীয় অলংকৃত নিজ নগরী দ্বারকা পুরীতে প্রবেশ করলেন। সেখানে সূর্যকিরণ যাতে না ঢুকতে পারে, এরকম পতাকাশোভিত সব তোরণ তৈরী হয়েছিল। আমার পিতা মহামূল্যে বস্ত্র, অলংকার, শয্যা, আসন ও পরিচ্ছদ পরে সুহৃদ, সম্বন্ধী আর বান্ধবদের পূজা করলেন। ভগবান সর্ববিষয়ে পরিপূর্ণ হলেও পিতা তাঁকে ভক্তিভরে দাসী, সর্বসম্পত্তি, সেনা, হাতী, ঘোড়া ও অস্ত্রশস্ত্র দিয়েছিলেন। এইভাবে আমরা (আটজন) সর্বসঙ্গ থেকে নিবৃত্ত হয়ে স্বধর্ম প্রতিপালন দ্বারা সেই আত্মারামের সাক্ষাৎ গৃহদাসী হয়েছিলাম। অন্যান্য কৃষ্ণভামিনীরা বললেন, নরকাসুরের দিগ্‌বিজয় ব্যাপারে যে সকল রাজা তাঁর হাতে পরাজিত হয়েছিলেন আমরা সেই সকল রাজার মেয়ে। নরকাসুর আমাদের আটকে রেখেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁকে নিহত করলেন, তখন আমরা মুক্তি পেয়ে চিরাভিলাষিত শ্রীকৃষ্ণকেই পতিরূপে বরণ করলাম। শ্রীকৃষ্ণ আপ্তকাম হলেও তাঁর সংসার-বিমোচন চরণযুগলের অভিলাষিণী আমাদের তিনি বিবাহ করলেন। আমরা সাম্রাজ্য, ইন্দ্রত্ব, ভোজ্য, বৈরাজ্য, ব্রহ্মপদ বা মোক্ষপদ চাই না, লক্ষ্মীর কুচকুংকুম-গন্ধযুক্ত গদাধরের পদধূলি চিরদিন মাথায় রাখতে চাই। গোচারণের জন্য তিনি যখন যমুনাপুলিনে বিহার করতেন, তখন গোপ-গোপীরা যা চেয়েছিল, আমরা মুরারির সেই পবিত্র পাদস্পর্শই কেবল কামনা করি। ৩৬-৪৩

চতুরশীতিতম অধ্যায়

বসুদেবের যজ্ঞানুষ্ঠান

শুকদেব বললেন, মহারাজ, কুন্তীদেবী, গান্ধারী, দ্রৌপদী, সুভদ্রা ও অন্যান্য

রাজপত্নীরা আর শ্রীকৃষ্ণভক্ত গোপীরা সর্বস্বরূপ ভক্তক্লেশহারী শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর মহিষীদের প্রণয়বন্ধনের কথা শুনে বিস্মিত হলেন। তাঁদের চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। স্ত্রীরা স্ত্রীদের সঙ্গে আর পুরুষেরা পুরুষদের সঙ্গে কথোপকথন করছেন, এমন সময় কৃষ্ণ বলরামকে দর্শন করবার জন্য ব্যাসদেব, নারদ, চ্যবন, দেবল, অসিত, বিশ্বামিত্র, শতানন্দ, ভরদ্বাজ, গৌতম, পরশুরাম, সশিষ্য ভগবান বশিষ্ঠ, গালব, ভৃগু, পুলস্ত্য, কশ্যপ, অত্রি, মার্কণ্ডেয়, বৃহস্পতি, দ্বিত, ত্রিত, একত, সনক প্রভৃতি ব্রহ্ম-পুত্ররা এবং অঙ্গিরা, আগস্ত্য, যাজ্ঞবল্ক্য আর বামদেবাদি ঋষিরা সেখানে উপস্থিত হলেন। রাজারা, পাণ্ডবেরা এবং শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম সেই সমস্ত বিশ্ববন্দিত ঋষিদের দেখে উঠে প্রণাম করলেন। সকলে যথানিয়মে তাঁদের অর্চনা করতে লাগলেন। বলরামের সঙ্গে অচ্যুত তাঁদের সকলকে স্বাগত করলেন এবং পাদ্য, অর্ঘ্য, মালা, ধূপ আর চন্দন দিয়ে পূজা করলেন। তারপর তাঁরা সুখে উপবিষ্ট হলে ধর্মরক্ষক-বিগ্রহধারী ভগবান তাঁদের উদ্দেশ করে বলতে আরম্ভ করলে সেই মহতী সভা নির্বাক হয়ে তাঁর কথা শুনতে লাগল। ১-৮

ভগবান বললেন, আজ আমাদের জন্ম সফল হল। আজ আমরা দেবতাদেরও দুষ্প্রাপ্য যোগেশ্বরদের দর্শন করে জীবনে পূর্ণসফল হলাম। মানুষের তপস্যা অল্প; তারা প্রতিমাকেই দেবতা বলে মনে করে। যোগেশ্বরদের দর্শন লাভ ও স্পর্শ করা, তাঁদের স্বাগত প্রশ্ন করা আর তাঁদের চরণ অর্চনা করা সেই মানুষদের পক্ষে কি সম্ভব হয়? জলময় তীর্থ অথবা মৃন্ময় ও শিলাময় রূপে দেবতার সেবা করলে মানুষ পবিত্র হয়, কিন্তু তাতে দীর্ঘ সময় লাগে। কিন্তু সাধুদের দর্শন-মাত্রই জীব পবিত্র হয়ে থাকে। ভেদবুদ্ধি নিয়ে অগ্নি, সূর্য, চন্দ্র, তারা, পৃথিবী, জল, আকাশ, বায়ু, বাক্য ও মনের উপাসনা করলে অজ্ঞাননাশ হয় না, কিন্তু সাধু-সেবা কিছুক্ষণ করলেই অজ্ঞানরাশি দূর হয়।[১] যার এই ত্রিধাতুময় দেহে আত্ম-বুদ্ধি, ভার্যা প্রভৃতিতে আত্মীয়বুদ্ধি, প্রতিমাদিতে দেবতাবুদ্ধি এবং জলে তীর্থবুদ্ধি আছে, অথচ সাধুদের প্রতি সেরকম দৃষ্টি নেই, সেই মানুষ তৃণবাহী গর্দভ ব্যতীত আর কিছুই নয়। ৯-১৩

শুকদেব বললেন, মহারাজ, ব্রাহ্মণরা অকুণ্ঠ ধীশক্তিসম্পন্ন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনে বিভ্রান্ত হয়ে কিছুক্ষণ মৌনভাবে থাকলেন। তারপর ঈশ্বরের মুখের সেই অনীশ্বর-ভাবের কথা তাঁরা অনেকক্ষণ বিবেচনা করে বুঝলেন যে ভগবান লোকশিক্ষার জন্যই এ সকল বলেছেন। মুনিরা তখন হেসে জগদ্‌গুরুকে বললেন, আমরা শ্রেষ্ঠতত্ত্ববিদ্‌ ও প্রজাপতিদের অধীশ্বর হয়েও যাঁর মায়ায় মোহিত হলাম, যিনি মানুষের মত ব্যবহারের দ্বারা গুপ্ত থেকে অনীশ্বরের মত আচরণ করছেন, ভগবানের সেই আচরণ কি অচিন্তনীয়! প্রভু, আপনি একমাত্র অবিকৃত হয়েও ঘট-পটাদি নানা নামরূপী ভূমির মত নানারূপে এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় করছেন, কিন্তু আপনি তাতে আবদ্ধ নন। পরিপূর্ণ পরমেশ্বর আপনি, আপনার জন্মগ্রহণরূপ আচরণ সাধারণ মানুষের অনুকরণ মাত্র। আপনি ঠিক সময়ে স্বজনদের রক্ষা আর খলদের নিগ্রহের জন্য শুদ্ধসত্ত্ব স্বরূপ ধারণ করেন। তপস্যা, বেদ অধ্যয়ন আর সনাতন বেদপথও রক্ষা করেন। আপনি বর্ণাশ্রম ধর্মের প্রবর্তক পুরুষ, আপনি নিজের আচরণ দিয়ে সনাতন বেদপথও রক্ষা করেন। তপস্যা, বেদ অধ্যয়ন আর সংযম দ্বারা যাতে কার্য ও তা থেকে ভিন্ন কারণস্বরূপ জানা যায় আর সৎস্বরূপ ব্রহ্মের উপলব্ধি করা যায় সেই বেদাখ্য ব্রহ্ম আপনার বিশুদ্ধ হৃদয়। হে ভগবান, সেই জন্যই আপনি শাস্ত্রযোনি।

১ তুলনীয়: শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ, ৬।২৩

আপনার শ্রেষ্ঠ উপলব্ধিস্থান ব্রাহ্মণদের সম্মান দেখান বলে আপনি ব্রাহ্মণদের অগ্রগণ্য, আপনি ব্রহ্মণ্যদেব। আপনি সকল মঙ্গলের আকর ; এইজন্য আজ আপনার সঙ্গে মিলিত হয়ে আমাদের জন্ম, বিদ্যা, তপস্যা আর দর্শন সফল হল। আপন যোগ-মায়া দিয়ে যাঁর মহিমা আচ্ছন্ন, যাঁর জ্ঞান অকুণ্ঠিত, সম্মিলিত রাজারা আর যদুগণ যাঁকে কালস্বরূপ পরমাত্মা পরমেশ্বর বলে জানেন না, সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার। যেমন নিদ্রিত পুরুষ স্বপ্নে যে সব বিষয় দেখে সেগুলিকে যথার্থ জ্ঞান করে, আর নিজেকে নামমাত্রে প্রকাশমানরূপে মনে করে, কিন্তু নিজের শ্রেষ্ঠ আত্ম-স্বরূপ বুঝতে পারে না, তেমনি এই মায়াবিভ্রান্ত লোকেরা আপন উপলব্ধির অভাবহেতু ইন্দ্রিয় ও নামদ্বারা প্রকাশিত রূপেই আপনাকে উপলব্ধি করে, কিন্তু আপনার স্বরূপ উপলব্ধি করতে অক্ষম। পাপরাশিনাশক গঙ্গাতীর্থ যা থেকে উৎপন্ন, আর ভক্তিযোগসম্পন্ন যোগীদের হৃদয়ে যাঁর স্থান আপনার সেই পাদপদ্ম আজ আমরা দেখলাম। অতএব আমরা আপনার ভক্ত বলে আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করুন। প্রবল ভক্তিযোগে যাঁদের বাসনার বীজ নষ্ট হয়েছে, তাঁরাই আপনার গতি-লাভ করেছেন। ১৪-২৬

শুকদেব বললেন, রাজর্ষি, মুনিরা এইরকম বলে শ্রীকৃষ্ণ, ধৃতরাষ্ট্র আর যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞা নিয়ে নিজেদের আশ্রমে ফেরা মনস্থ করলেন। তাঁদের যেতে দেখে মহাযশা বসুদেব কাছে গিয়ে পায়ে হাত দিয়ে অতি বিনীতভাবে বললেন ঋষিগণ, সর্বদেবস্বরূপ আপনাদের নমস্কার, আমার কথা শুনুন। যেরূপে যে কর্মদ্বারা আমাদের কর্মক্ষয় হতে পারে, তা আপনারা উপদেশ করুন। নারদ অন্যান্য ঋষিদের বুঝিয়ে বললেন, ইনি শ্রীকৃষ্ণের পিতা বসুদেব। তবুও যে ইনি কৃষ্ণকে সামান্য বালক মনে করে আমার কাছে নিজের মঙ্গলের কথা জিজ্ঞাসা করছেন তাতে আশ্চর্যের কিছুই নেই। যে নিকটে থাকে মানুষের কাছে সেই অনাদৃত হয়। তাই গঙ্গাতীরবর্তী লোক শুদ্ধির জন্য অন্য তীর্থে যায়।[১] এ জগতে সৃষ্টি, স্থিতি বা প্রলয় দ্বারা কিংবা স্বতঃ, পরতঃ বা গুণতঃ কোনপ্রকারেই শ্রীকৃষ্ণের জ্ঞানের বিনাশ নেই। মানুষের কাছে সূর্য যেমন তার নিজেরই সৃষ্ট মেঘ, হিম আর রাহুদ্বারা আচ্ছন্ন মনে হয়, অজ্ঞানী লোক তেমনি জ্ঞানময় অদ্বিতীয় ঈশ্বরকে তাঁর নিজেরই সৃষ্ট, ক্লেশ, কর্ম, কর্মফল, প্রাণ প্রভৃতির দ্বারা আচ্ছন্ন বলে মনে করে। ২৭-৩৩

অনন্তর মুনিরা সকল রাজা এবং বলরাম-কৃষ্ণের সামনে বসুদেবকে সম্বোধন করে বললেন, কর্মদ্বারা কর্মক্ষয় হয়ে থাকে, সাধুরা তাই বলে থাকেন। শ্রদ্ধাসহকারে যজ্ঞ দ্বারা সর্বযজ্ঞেশ্বর শ্রীবিষ্ণুর অর্চনাই কর্মবন্ধন-মুক্তির উপায়। শাস্ত্রদর্শী সাধুরা দেখিয়েছেন যে এই যজ্ঞরূপ কর্মই চিত্তশুদ্ধি ও মোক্ষলাভের সহজ উপায়। বিশুদ্ধচিত্তে পরমপুরুষের যজ্ঞানুষ্ঠান করতে হবে। দ্বিজাতি গৃহস্থদের এই পথেই মঙ্গল।[২] হে বসুদেব, জ্ঞানী ব্যক্তি যজ্ঞ, দান প্রভৃতি দ্বারা ধনাদি সকল বাসনাই ত্যাগ করেন। ধীর ব্যক্তিরা আগে গ্রামবাসী হয়ে সমস্ত বাসনা বিসর্জন দিয়ে পরে তপোবন আশ্রয় করেছেন। দেব-ঋণ, ঋষি-ঋণ, পিতৃ-ঋণ—এই ত্রিবিধ ঋণ নিয়ে দ্বিজ জন্মগ্রহণ করেন। সুতরাং যজ্ঞ, বেদ অধ্যয়ন ও পুত্র উৎপাদন দ্বারা তা থেকে মুক্ত না হলে পতিত হতে হয়। হে মহামতি, আপনি দ্বিবিধ ঋণ থেকে মুক্তি পেয়েছেন, এখন যজ্ঞ করে দেবঋণ থেকে মুক্ত

১ অর্থাৎ গাঁয়ের যোগীর ভিক্ষা মেলে না।

২ তুলনীয় : গীতা, ৪।৩০-৩১ শ্লোক।

হয়ে গৃহধর্ম পরিত্যাগ করুন। বসুদেব, আপনি নিশ্চয়ই জগদীশ্বর হরির প্রকৃষ্ট পূজা করেছিলেন, না হলে তিনি আপনাদের পুত্ররূপে আসবেন কেন ? ৩৪-৪১

শুকদেব বললেন, মুনিদের এই কথা শুনে মহামনা বসুদেব মাথা নীচু করে প্রণাম করলেন, আর তাঁদের প্রসন্ন করে নিজের অনুষ্ঠিত যজ্ঞের ঋত্বিক কর্মে তাঁদের বরণ করলেন। ঋষিরা যথাবিধি যজ্ঞে ব্রতী হয়ে সে পুণ্যক্ষেত্রেই নানা যজ্ঞ দ্বারা ধার্মিক বসুদেবকে যাজন করতে প্রবৃত্ত হলেন। তাঁর যজ্ঞদীক্ষা আরম্ভ হলে যদুগণ ও রাজারা স্নান করে পদ্মমালা ধারণ করে সুন্দর কাপড় ও অলঙ্কার পরে সেখানে এলেন। তাঁদের স্ত্রীগণও সুন্দর কাপড় পরে ও কণ্ঠে পদক ধারণ করে হাতে পূজার সামগ্রী নিয়ে সানন্দে দীক্ষাশালায় উপস্থিত হলেন। তখন মৃদঙ্গ, পটহ, শঙ্খ, ভেরী, ঢাক আর দুন্দুভি প্রভৃতি বাদ্য বাজতে লাগল, নট-নর্তকীরা নাচতে শুরু করল, সূত ও মাগধেরা স্তব পাঠ আর সুকণ্ঠী গন্ধর্বপত্নীরা পতিদের সঙ্গে দ্বৈত সঙ্গীত আরম্ভ করল। অনন্তর ঋত্বিকেরা তারাগণের মধ্যে শোভমান চন্দ্রের মত আঠারোজন পত্নীর সংগে বিরাজমান বসুদেবকে চোখে কাজল আর সর্বাঙ্গে ননি মাখিয়ে অভিষেক করলেন। তিনি কাপড়, বালা, হার, কুণ্ডল, নূপুর প্রভৃতি দ্বারা সুন্দররূপে অলঙ্কৃত হয়ে সমস্ত পত্নীদের সঙ্গে যজ্ঞদীক্ষিত হলেন এবং মৃগচর্মে আচ্ছাদিত হয়ে বিশেষরূপে শোভা পেতে লাগলেন। এই সময় বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ বন্ধুদের সঙ্গে একত্র হয়ে নিজ নিজ স্ত্রীপুত্র ও নানা ঐশ্বর্যে শোভা পেতে লাগলেন। অগ্নিহোত্র যজ্ঞে লক্ষিত প্রাকৃত ও বৈকৃত নানারকম যজ্ঞদ্বারা দ্রব্য, জ্ঞান আর ক্রিয়ার অধিপতি যজ্ঞপতি সেই যজ্ঞে অর্চিত হলেন। ৪২-৫১

অনন্তর বসুদেব যথাসময়ে বেদবিধি অনুসারে সুন্দররূপ অলঙ্কৃত ব্রাহ্মণদের অর্চনা করে দক্ষিণার সঙ্গে সংগে গরু, ভূমি, কন্যা আর মহাধন দান করলেন। সেই মহর্ষিরা পত্নী-সংযাজ নামে যজ্ঞ আর যজ্ঞান্তস্নান বিষয়ে কর্তব্যসকল শেষ করে যজমান বসুদেবকে আগে নিয়ে রামহ্রদে স্নান সারলেন। বসুদেব স্নান করে সুসজ্জিত হয়ে স্তুতিপাঠকদের নানা অলংকার আর বস্ত্রদান করলেন। কুকুর প্রভৃতি জীবকে অন্ন দিয়ে তৃপ্ত করলেন। পরে স্ত্রী-পুত্রদের সঙ্গে বন্ধুদের এবং বিদর্ভ, কোশল, কুরু, কাশী, কেকয় ও সৃঞ্জয়দের সদস্য ও ঋত্বিকদের, দেবতাদের আর মানুষ, ভূত, পিতৃগণ ও চারণদের প্রীতিসহকারে প্রচুর উপহার দিয়ে পূজা করলেন। শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞা নিয়ে তাঁরা যজ্ঞের প্রশংসা করতে করতে নিজের নিজের গৃহে ফিরে গেলেন। ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর, পৃথাপুত্রগণ, ভীষ্ম, দ্রোণ, কুন্তী, নকুল, সহদেব, নারদ, ব্যাস আর সুহৃদ, সম্বন্ধী ও বান্ধবরা—এঁরা সব যদুগণকে আলিঙ্গন করে সৌহার্দ্যবশত অতি দুঃখে বিরহে কাতর হয়ে নিজের নিজের দেশের অভিমুখে যাত্রা করলেন, অন্যান্য সকলেও পরে চলে গেলেন। কিন্তু বন্ধুবৎসল গোপরাজ নন্দ শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম আর উগ্রসেনাদি দ্বারা পূজিত হয়ে গোপালদের সঙ্গে সেখানে বাস করতে লাগলেন। ৫২-৫৯

শীঘ্রই মনস্কামনা পূর্ণ হওয়ায় বসুদেব বন্ধুদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে সানন্দে নন্দের হাত ধরে বললেন, ভাই, ঈশ্বরের সৃষ্ট স্নেহ নামক বন্ধন ছিন্ন করা যায় না। আমার মনে হয় বীরেরা বল দ্বারা আর যোগীরা জ্ঞান দ্বারা তা ছেদন করতে পারে না।[১] তোমরা সাধুশ্রেষ্ঠ, আমরা অকৃতজ্ঞ। তোমরা আমাদের প্রতি যে মৈত্রী স্থাপন করেছ তা অতুলনীয় আর এ কখনও বৃথা হবে না। আগে অসামর্থ্য-হেতু আমরা তোমাদের কোন উপকার করতে পারি নি, এখনও সৌভাগ্যমদে অন্ধ

১ দ্রষ্টব্য: গীতা, ২।৫৭ শ্লোক।

হয়ে তোমাদের দেখছি না। যে ব্যক্তি রাজলক্ষ্মী লাভ করে অন্ধ হয়ে স্বজন-বন্ধুদের প্রতি দৃষ্টিপাত করে না, সে যদি প্রকৃত মঙ্গল চায়, তবে যেন তার রাজ-লক্ষ্মী লাভ না ঘটে। বসুদেব এরূপ বন্ধুত্বের কথা স্মরণ করে আনন্দজড়িত চিত্তে চোখের জল ফেলতে লাগলেন। যা হোক, নন্দ যাদবদের দ্বারা পূজিত হয়ে নিজের সখা বসুদেব ও বলরাম-কৃষ্ণের অনুরোধ এড়াতে না পেরে 'যাই যাই' করেও তিনমাস সেখানে কাটালেন। তারপর নন্দ মহামূল্য বসন-ভূষণ ও নানারকম পরিচ্ছদ, ভোগ-সামগ্রী দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে ব্রজবাসী আর বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে স্বদেশ অভিমুখে যাত্রা করলেন। বসুদেব, উগ্রসেন, শ্রীকৃষ্ণ, উদ্ধব আর বলরাম প্রভৃতি যদুপ্রধানরা তাঁকে আলাদা আলাদা করে বহুমূল্য বস্ত্রাদি দিলেন। একদল যাদবসেনাও তাকে এগিয়ে নিয়ে চলল : নন্দগোপ আর গোপীরা শ্রীকৃষ্ণের চরণে মন সমর্পণ করেছিলেন। যাবার সময় সে মন ফিরিয়ে আনতে অসমর্থ হয়ে অতিকষ্টে তাঁরা মথুরায় ফিরে গেলেন। বন্ধুবান্ধবরা সকলেই নিজের নিজের গৃহে চলে গেলেন। এদিকে বর্ষাকাল আসন্ন দেখে যদুগণ আবার দ্বারকায় গেলেন। সেখানে গিয়ে সকলেই লোকের কাছে তীর্থযাত্রায় সুহৃদ-দর্শন এবং বসুদেবের যজ্ঞানুষ্ঠান প্রভৃতি ঘটনা বর্ণনা করতে লাগলেন। ৬০-৭১

পঞ্চাশীতিতম অধ্যায়

রাম ও কৃষ্ণের দেবকীর মৃতপুত্র আনয়ন

শুকদেব বললেন, মহারাজ, বসুদেব মুনিদের মুখে বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণের প্রভাবের কথা শুনে তাতে বিশ্বাস করেছিলেন। একসময় দুই ভাই তার কাছে এসে পাদবন্দনা করলে পর বসুদেব তাঁদের প্রীতিপূর্ণ আশীর্বাদ করে বললেন, হে মহাযোগী কৃষ্ণ আর বলরাম, হে সনাতন, আমি তোমাদের দুজনকে এই বিশ্বের সাক্ষাৎ কারণরূপে প্রকৃতি ও পুরুষ আর তারও কারণস্বরূপ ঈশ্বর বলে জানি। যেখানে, যার দ্বারা, যা থেকে, যার জন্য, যার প্রতি, যা যা, যখন যে ভাবে সংঘটিত হয়, তুমিই সে সমস্ত প্রকৃতি আর জীবের ঈশ্বর সাক্ষাৎ ভগবান। হে অধোক্ষজ, হে পরমাত্মা, জন্মহীন তুমি আত্মসৃষ্ট এই নানাবিধ বিশ্বে অন্তর্যামীরূপে স্বয়ং প্রবেশ করে ক্রিয়াশক্তি ও জ্ঞানশক্তিরূপে বিশ্বকে ধারণ আর পালন করছ।[১] ক্রিয়াশক্তি প্রভৃতি বিশ্বের কারণসমূহের যেসকল শক্তি আছে সে সবই ঈশ্বরের। কারণ, জ্ঞানশক্তি চেতন আর ক্রিয়াশক্তি জড়। উভয়েই একে অপরের অধীন। এই বিপরীতধর্মী উভয় শক্তিরই ব্যাপার ঈশ্বরের সত্তাতেই সম্পন্ন হয়। হে ঈশ্বর, তুমি চন্দ্রের কান্তি, আগুনের তেজ, সূর্যের জ্যোতি, নক্ষত্রের প্রভা, বিদ্যুতের স্ফুরণ। তুমিই পর্বতের স্থৈর্য আর ভূমির গন্ধ। তুমিই জলের তৃপ্তিজনকতা জীবনহেতুতা ; তুমিই জল ও জলের রস। তুমি বায়ুর ইন্দ্রিয়বল, মনোবল আর দেহবল অর্থাৎ তুমিও বায়ু-স্বরূপ। ১-৮

এই নিখিল দিঙ্‌মণ্ডল আর আকাশ তুমিই। আকাশ ও তার আশ্রয় শব্দমাত্র তোমাকেই বলা হয়। তুমি ওঙ্কার আর বর্ণসমূহ। সমস্ত পদার্থের নামকরণ তোমার থেকেই হয়। তুমিই সকলের ইন্দ্রিয় ইন্দ্রিয়দেবতা ও তাদের অনুষ্ঠানশক্তি।

---

১ তুলনীয় : শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্, ৬.২

তুমি বুদ্ধির অধ্যবসায় শক্তি ও অনুসন্ধান শক্তি। তুমি নিখিল ভূতের কারণ তামস অহঙ্কার, ইন্দ্রিয়ের কারণ রাজস অহংকার, দেবতাদের কারণ সাত্ত্বিক অহঙ্কার। আর জীবদের সংসার কারণ যে প্রকৃতি তাও তুমি।[১] যেমন দ্রব্যের বিকার অনিত্য ঘট আর কুণ্ডলের মধ্যে মাটি আর সোনা সত্য বলে দেখা যাচ্ছে, সেইরকম সমস্ত নশ্বর ভাবের মধ্যে তুমিই একমাত্র অবিনশ্বর নিত্য পদার্থ।[২] সত্ত্ব, রজ আর তম, এই তিনটি গুণের যে মহৎ পরিণাম, তা সাক্ষাৎ পরমব্রহ্ম তোমাতেই কল্পিত হয়েছে। অতএব তুমি এ সকল ভাব-বিকারের অতীত, তোমাতে এ সকল কিছুই নেই। যখন এই সকল তোমাতে কল্পিত হয়, তখনই তুমি এদের অনুগত বলে দেখা দাও। অন্য সময়ে তুমি নির্বিকল্প ব্যবহারিক সত্তা থেকে পৃথক অবস্থান কর। এই সংসাররূপ গুণপ্রবাহে পড়ে মানুষ তোমার বিশ্বাত্মতা-রূপ সূক্ষ্মগতি না বুঝে দেহের অহংকারজনিত অজ্ঞানমূলক কর্মের দ্বারা এই সংসারে প্রবৃত্ত হয়ে থাকে। হে ঈশ্বর, নিজের ইচ্ছায় যে ব্যক্তি দুর্লভ মানবজন্ম আর ইন্দ্রিয়সৌষ্ঠব লাভ করে স্বার্থপর হয়ে পড়ে, তোমার মায়ায় আচ্ছন্ন হয়ে তার জীবনকাল ফুরিয়ে যায়। দেহের প্রতি আর বংশধরদের প্রতি 'এই আমি' এবং 'এরা আমার' এইরকম স্নেহ-বন্ধনে তুমি এই জগৎকে বন্ধন কর। ৯-১৭

তোমরা দুজনে আমার ছেলে নও, তোমরা সাক্ষাৎ প্রকৃতি আর পুরুষের ঈশ্বর। অতএব সত্যি করে বল, পৃথিবীর ভারস্বরূপ ক্ষত্রিয়কুলের বিনাশের জন্যই তোমাদের আবির্ভাব কিনা? এখন আমরা বিপন্ন ব্যক্তিদের সংসার-ভয়হারী তোমাদের পাদপদ্মে শরণাপন্ন হলাম। এতদিন পর্যন্ত যার প্রভাবে এই মরণশীল শরীরকে আত্মা বলে মনে করেছি আর পরমেশ্বর তোমাদের পুত্র বলে জেনেছি সেই ইন্দ্রিয়-লালসাও যথেষ্ট হয়েছে। ভগবান, তুমি জন্মে জন্মে সূতিকাগৃহে আমাদের সম্বোধন করে বলেছ—'আমি অনাদি, ঈশ্বর, নিজের ধর্ম রক্ষার জন্য জন্ম স্বীকার করেছি।' তুমি নানা দেহ ধারণ কর আর তা আবার পরিত্যাগ কর; তোমার বিভূতি-মায়া কে বুঝতে পারে?[৩] ১৮-২০

শুকদেব বললেন, মহারাজ, ভগবান যাদবশ্রেষ্ঠ পিতার এরকম কথা শুনে বিনয় করে হাসতে হাসতে বললেন, পিতা, আমরা আপনাদের পুত্র। আমাদের উদ্দেশ করে যে সকল কথায় আপনি তত্ত্বসমূহ বর্ণনা করলেন, সে সব কথা আমরা যুক্তিযুক্ত মনে করি। যদুশ্রেষ্ঠ, কি আমি, কি আপনারা, কি আর্য বলদেব, কি এই দ্বারকাবাসীরা, এমন কি চরাচর জগৎ—এই সমস্তকেই ব্রহ্মরূপে ভাবা উচিত। আত্মা স্বয়ংজ্যোতি, স্বপ্রকাশ, নিত্য, ভেদশূন্য ও নির্গুণ। আত্মসৃষ্ট গুণের দ্বারা সম্পাদিত দেহে সেই আত্মা জীবভাবে নানারূপে দেখা দেয়। আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও পৃথিবী যেমন উপাধি অনুসারে তাদের উপাদানে রচিত ঘটাদি পদার্থসকলে আবির্ভাব, তিরোভাব, অল্পতা, বহুত্ব, একত্ব, প্রভৃতি নানারকম ভাব পায় আত্মাও সেরকম জীব-ভাব ধারণ করে অনেকত্ব, দৃশ্যত্ব, অনিত্যত্ব, ভিন্নভাব আর স্বগুণভাব প্রভৃতি নানাপ্রকারে দেখা দেয়, কিন্তু সেগুলি তার সত্যরূপ নয়।[৪] ২১-২৫

১ তুলনীয় : শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ, ৪।২-৪ শ্লোক। প্রসঙ্গত গীতার দশম অধ্যায়ের (বিভূতিযোগ) ১৯ থেকে ৪২ শ্লোক দ্রষ্টব্য। ২ তুলনীয় : শ্বেতাশ্বতর, ৬।১৩ ও কঠ, ২।২।১৩

৩ তুলনীয় : বৃষ্ণীনাং বাসুদেবোঽস্মি পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ।
মুনীনামপ্যহং ব্যাসঃ কবীনামুশনাঃ কবিঃ॥ গীতা, ১০।৩৭

৪ তুলনীয় : একং সদবিপ্রা বহুধা বদন্তি অগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ।—ঋগ্‌বেদ ১।১৬৪।৪৬

শুকদেব বললেন, ভগবানের এরকম কথা শুনে বসুদেবের ভেদবুদ্ধি বিনষ্ট হল, তিনি প্রীত হয়ে চুপ করে রইলেন। নিজের পুত্র বলরাম ও কৃষ্ণ মৃত গুরু-পুত্রকে এনে দিয়েছেন একথা শুনে সর্বলোকপূজ্যা দেবকী বিস্মিত হয়েছিলেন। এখন তিনি কংস কর্তৃক নিহত পুত্রদের স্মরণ করে শোকে বিহ্বল হয়ে চোখের জল ফেলে বলরাম ও কৃষ্ণকে বললেন, অপ্রমেয়াত্মা রাম, যোগেশ্বরের ঈশ্বর কৃষ্ণ, আমি জানতে পেরেছি যে তোমরা দুজনে বিশ্বস্রষ্টাদের ঈশ্বর আদিপুরুষ। যাদের সত্ত্বগুণ নষ্ট হয়েছে আর যারা শাস্ত্র-বহির্ভূত পথে পা বাড়িয়েছে পৃথিবীর ভারস্বরূপ সেই রাজাদের মারবার জন্য তোমরা আমার গর্ভে জন্মেছ। বিরাট পুরুষ যাঁর অংশ তার অংশ মায়া আর তার অংশ সত্ত্বাদি গুণসমূহ আর তারও অংশ পরমাণু-লেশ। তা থেকে এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় হয়ে থাকে, আমি আজ সেই তোমার শরণ নিলাম। তোমাদের গুরুপুত্র অনেকদিন আগে মারা গেলেও গুরু সান্দীপনি মুনির আদেশে যমালয় থেকে সেই মৃতপুত্রকে এনে তোমরা গুরুদক্ষিণা দিয়েছিলে। তোমরা যোগেশ্বরের ঈশ্বর সেইভাবে আমার অভিলাষ পূর্ণ কর। ভোজরাজ কর্তৃক নিহত আমার পুত্রদের এনে দাও, আমি তাদের দেখতে ইচ্ছা করি। ২৬-৩৩

শুকদেব বললেন, ভারত, বলরাম-কৃষ্ণ মাব আদেশে যোগমায়া দ্বারা সুতলে প্রবেশ করলেন। বিশ্বের ও নিজের আরাধ্য দেবতা সেই দুজনকে সেখানে প্রবেশ করতে দেখে দৈত্যরাজ বলির চিত্ত আনন্দে ভবে উঠল। তিনি সপরিবারে উঠে তাঁদের প্রণাম করলেন আর বসবার জন্য শ্রেষ্ঠ আসন পেতে দিলেন। সেই দুই মহাত্মা বসলে পরে দৈত্যরাজ তাঁদের পা ধুয়ে সেই জল মাথায় ধারণ করলেন। তারপর মহাবিভূতি, মহামূল্য বস্ত্র, আভরণ, চন্দন, মালা, ধূপ, দীপ, অমৃতময় অন্ন, পানীয় প্রভৃতি দ্বারা আর স্ত্রীপুত্রাদি, বান্ধব, বিত্ত আর আত্মসমর্পণ করে তাঁদের পূজা করলেন। বলিরাজ যখন প্রেমবিহ্বলচিত্তে ভগবানের চরণকমল হৃদয়ে ধারণ করলেন তখন তাঁর শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল, চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। তিনি গদ্‌গদ কণ্ঠে বললেন, মহান অনন্ত বলরামকে নমস্কার, বিশ্ববিধাতা শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার। আপনারা দুজনেই পরমাত্মা, সাংখ্যযোগেব প্রবর্তক সেই পরমব্রহ্মকে নমস্কার। হে ভগবান, আপনাদের দুই পুরুষের দর্শন প্রাণীদের দুর্লভ, আবার কখনও কখনও সুলভও বটে। কারণ রাজস ও তামস প্রকৃতিসম্পন্ন আমাদের নিকট আপনাদের শুভাগমন হল। দৈত্য, দানব, গন্ধর্ব, সিদ্ধ, বিদ্যাধর, চারণ, যক্ষ, রাক্ষস, পিশাচ, ভূত, প্রমথ ও তাদের নায়কেরা এরা সকলেই বিশুদ্ধসত্ত্বের আধার আপনার প্রতি প্রায়ই শত্রুতা করেছে। আর তাদের তুল্য শিশুপাল প্রভৃতি দৈত্যরাজগণ প্রচণ্ড বৈরভাবে আর গোপীরা কামপ্রভাবে যেমন আপনাকে লাভ করেছেন শুদ্ধসত্ত্ব দেবতারা সেরূপ আপনার সারূপ্যলাভে সমর্থ হন না। যোগের ঈশ্বররাও যখন আপনার যোগমায়া প্রভাবে আপনাকে নিশ্চিতরূপে জানতে পারে না, তখন আমরা কিভাবে জানব? অতএব আমাদের প্রতি প্রসন্ন হন যাতে করে নিরপেক্ষ মুনিদের অন্বেষণীয় আপনাদের পদারবিন্দরূপ আশ্রয় পাই। তা হলে অন্য আশ্রয় গৃহাদি রূপ অন্ধকূপ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে বিশ্ববিধাতার পাদমূলে শান্তি-লাভ করব অথবা সর্বজনপ্রিয় মহৎ ব্যক্তিদের সঙ্গে বিচরণ করব। হে সর্বজীবের অধীশ্বর, আমাদের উপদেশ দিন, নিষ্পাপ করুন। আপনার আজ্ঞামত চললে মানুষ অন্য সকল বিধি নিষেধের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবে। ৩৪-৪৬

ভগবান বললেন, পূর্বে স্বায়ম্ভুব-মন্বন্তরে ঊর্ণার গর্ভে মরীচির ছয়টি পুত্র জন্মায়। দেবসদৃশ সেই ঋষিপুত্রেরা ব্রহ্মাকে নিজ দুহিতার সঙ্গে মিলিত হতে উদ্যত

দেখে উপহাস করেন। সেই পাপ কাজের জন্য তাঁরা হিরণ্যকশিপুর ঔরসে আসুরী যোনিতে জন্মগ্রহণ করেন। পরে তাঁরা যোগমায়া দ্বারা নীত হয়ে দেবকীর গর্ভে জন্মান। হে বলিরাজ, তারাই কংস কর্তৃক নিহত হয়েছেন। দেবকী তাঁদের নিজের পুত্র ভেবে শোক করছেন। এখন তাঁরা তোমার কাছে আছেন। মাতা দেবকীর শোক দূর করবার জন্য আমি এখান থেকে তাঁদের নিয়ে যাব। তারপর তাঁরা শাপমুক্ত ও শোকহীন হয়ে দেবলোকে আশ্রয় নেবেন। স্মর, উদ্গীথ, পরিষ্বঙ্গ, পতঙ্গ, ক্ষুদ্রভুক ও ঘৃণি নামে ওই ছয় ঋষিকুমার আমার প্রসাদে আবার মোক্ষপ্রাপ্ত হবেন। এই বলে কেশব তাঁদের গ্রহণ করলেন আর তারা তখন বলিদ্বারা পূজিত হয়ে আবার দ্বারকায় গেলেন। সেই সকল বালককে দেখে পুত্রস্নেহ হেতু দেবকীর স্তন থেকে দুধ ঝরতে লাগল। তিনি তাদের আলিঙ্গন করে কোলে নিয়ে বারবার তাদের মাথা শুঁকতে লাগলেন। যাঁর দ্বারা সৃষ্টির কাজ হয়ে থাকে, সেই বিষ্ণুমায়ায় মোহিত হয়ে তিনি পুত্রের স্পর্শহেতু যা থেকে দুধ ঝরছিল, হৃষ্টমনে সেই স্তন ঐ সকল পুত্রকে খাওয়াতে লাগলেন। শ্রীকৃষ্ণ পান করে যা অবশিষ্ট রেখেছিলেন, সেই অমৃতদুধ পান আর নারায়ণের অঙ্গস্পর্শহেতু তাঁদের আত্মজ্ঞান লাভ হল। তাঁরা গোবিন্দকে, দেবকীকে, পিতাকে আর বলদেবকে নমস্কার করে দর্শনকারী সর্বভূতের সামনে আকাশপথে দেবলোকে চলে গেলেন। মৃতপুত্রের সেই আগমন আর স্বর্গ-গমন দেখে দেবকী খুব আশ্চর্য হয়ে তা শ্রীকৃষ্ণরচিত মায়া বলে বুঝলেন। ভারত, অনন্তবীর্য পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের এই রকম আরও অসংখ্য অদ্ভুত বিক্রমকার্য আছে। ৪৭-৫৮

সূত বললেন, পূজনীয় ব্যাসতনয় শুকদেব কর্তৃক বর্ণিত, জগতের পাপনাশক আর তাঁর ভক্তদের সুখাবহ কর্ণভূষণ-স্বরূপ অমৃত-কীর্তি মুরারির এই চরিতলীলা যিনি সবসময় নিঃশেষরূপে শুনবেন বা শোনাবেন, তিনি ভগবানে চিত্ত রেখে তাঁর মঙ্গলময় ধামে যেতে পারবেন। ৫৯

ষড়শীতিতম অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণের মিথিলা যাত্রা

রাজা পরীক্ষিৎ বললেন, ভগবান, যিনি আমার পিতামহী ছিলেন, বলরাম-কৃষ্ণের সেই বোন সুভদ্রাকে অর্জুন যেভাবে বিবাহ করেন, তা শুনতে ইচ্ছা করি। শুকদেব বললেন, মহারাজ, আপনার পিতামহ অর্জুন একসময়ে তীর্থযাত্রা উপলক্ষে পৃথিবী ঘুরতে ঘুরতে প্রভাসে গিয়ে শুনলেন যে বলরাম তাঁর নিজের মাতুলপুত্রী সুভদ্রাকে দুর্যোধনের হাতে সমর্পণ করতে ইচ্ছুক। কিন্তু বসুদেব এবং আরও অনেকের তাতে মত ছিল না। অর্জুন তাঁকে লাভ করবার ইচ্ছায় ত্রিদণ্ডী যতির বেশ ধারণ করে দ্বারকায় গেলেন। পৌরজন আর বলদেবও তাঁকে চিনতে পারলেন না। অর্জুন তাঁদের দ্বারা পূজিত হয়ে কন্যাকে পাবার আশায় কয়েক মাস সেখানে বসবাস করলেন। সেই সময়ে একদিন বলভদ্র তাঁকে নিমন্ত্রণ করে এনে শ্রদ্ধাপূর্বক খাবার এনে দিলে অর্জুন তা খাচ্ছেন, এমন সময়ে মনোহারিণী সুভদ্রা সেপথ দিয়ে যাবার সময় তাঁর চোখে পড়লেন। অর্জুন আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে তাঁর প্রতি কাম-পীড়িত মন স্থাপন করলেন। সেই কন্যাও নারীকুলের হৃদয়হারী ধনঞ্জয়কে প্রার্থনা করে মনে মনে হাসতে লাগলেন আর সলজ্জ কটাক্ষ করে তাঁর হৃদয় ও মন সমর্পণ

করে তাঁকে পতিরূপে পেতে ইচ্ছা করলেন। তারপর সবসময় সুভদ্রাকে চিন্তা করাতে কামার্ত অর্জুনের চিত্ত বিভ্রান্ত হতে লাগল। তিনি কোনরূপেই সুখলাভ করতে না পেরে সুভদ্রাকে হরণ করবার অবসর খুঁজতে লাগলেন। ১-৮

এই সময়ে একদিন সুভদ্রা দেবযাত্রা উপলক্ষে দেবতা দর্শনের জন্য রথে চড়ে দুর্গ থেকে বার হলে মহারথ অর্জুন সুভদ্রার পিতামাতার ও শ্রীকৃষ্ণের অনুমোদন ক্রমে রথস্থিতা সুভদ্রাকে হরণ করলেন। সিংহ যেরূপ অন্যান্য পশুদের মধ্য থেকে স্বীয় আহার্য হরণ করে, অর্জুনও সেরূপ রথারূঢ় হয়ে ধনুক গ্রহণ করে অবরোধকারী বীর সৈনিকদের তাড়িয়ে উচ্চস্বরে চিৎকাররত স্বজনদের মাঝখান থেকে তাঁকে হরণ করলেন। বলরাম তা শুনে উত্তালতরঙ্গ মহাসাগরের মত ক্ষুভিত হলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ আর বন্ধুরা তাঁর পা ধরে তাঁকে সান্ত্বনা দিলেন। তাতে বলদেব সন্তুষ্ট হলেন এবং বর-বধূকে মহামূল্য আভরণ-সমন্বিত হাতী, রথ, ঘোড়া আর দাসদাসী সকল উপঢৌকন পাঠালেন। ৯-১২

শুকদেব বললেন, মহারাজ, শ্রুতদেব নামে বিখ্যাত এক ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণের একান্ত ভক্ত ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণে একনিষ্ঠ ভক্তি করাতে তাঁর সমস্ত প্রয়োজনই পূর্ণ হয়েছিল। তিনি শান্ত, পণ্ডিত ও লোভশূন্য ছিলেন। বিদেহ দেশের মধ্যবর্তী মিথিলায় তাঁর বাসস্থান ছিল। বিনা চেষ্টায় যে অন্নদ্রব্য আসত, গৃহস্থাশ্রমী শ্রুতদেব তার দ্বারাই নিজের প্রয়োজন মিটাতেন। তাঁর জীবনযাত্রা নির্বাহের মতই আহার্য প্রতিদিন দৈববশে তাঁর কাছে আসত, তার বেশী না। তিনি তাতেই তুষ্ট হয়ে যথোচিত সকল কাজ করতেন। মহারাজ, জনকবংশসম্ভূত বহুলাশ্ব নামে প্রসিদ্ধ এক রাজা ঐ রাজ্যের অধিপতি ছিলেন। তিনি অতি নিরহংকার ছিলেন। আর শ্রুতদেবের মত শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। তাঁদের দুজনের উপর প্রসন্ন হয়ে প্রভু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সারথি দারুক চালিত রথে চড়ে মুনিদের সঙ্গে বিদেহ দেশে গেলেন। নারদ, বামদেব, অত্রি, ব্যাসদেব, পরশুরাম, অসিত, অরুণি, বৃহস্পতি, কণ্ব, মৈত্রেয় ও চ্যবন প্রভৃতি মুনিরা আর আমিও গেলাম। শ্রীকৃষ্ণ যে যে দেশ অতিক্রম করে গেলেন সেই সেই দেশের পুরবাসী ও জনপদবাসীরা হাতে অর্ঘ্য নিয়ে গ্রহদের সঙ্গে উদিত সূর্যের মত মুনিদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের অর্চনা করতে উপস্থিত হল। আনর্ত, মরু, কুরুজাঙ্গল, কঙ্ক, মৎস্য, পাঞ্চাল, কুন্তি, মধু, কেকয়, কোশল ও অর্ণ—এই সমস্ত দেশের ও অন্যান্য দেশেরও নরনারীরা উদার হাসি ও স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে মণ্ডিত তাঁর মুখপদ্ম দেখতে লাগল। সেই ত্রিলোক-গুরুকে দর্শন করাতে তাদের অজ্ঞান-দৃষ্টি নষ্ট হল। কৃষ্ণ সেই সকল নরনারীকে অভয় তত্ত্বজ্ঞান দান করে দেবতা ও মানুষ কর্তৃক গীত সুনির্মল, অশুভনাশক নিজ যশের কাহিনী শুনতে শুনতে ক্রমে বিদেহ নগরে এলেন। ১৩-২১

মহারাজ, তখন মিথিলার পুরবাসীরা ও বিদেহ-বাসীরা অচ্যুতের আগমনবার্তা শুনে সানন্দে পূজা-সামগ্রী হাতে নিয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা করবার জন্য অগ্রসর হল। সেই পবিত্রকীর্তি ভগবানকে দর্শন করে তাদের মুখ আর অন্তঃকরণ প্রফুল্ল হয়ে উঠল। তারা তাঁকে এবং আগে যাদের কথা শুনেছিল সেই সকল ঋষিদের কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণাম করল। অনুগ্রহ করবার জন্য জগদ্‌গুরু এসেছেন, এই ভেবে জনকরাজ বহুলাশ্ব ও শ্রুতদেব প্রভুর পায়ে পড়লেন আর একসঙ্গেই কৃতাঞ্জলি হয়ে অতিথি হবার জন্য ব্রাহ্মণদের সঙ্গে যাদবপতিকে নিমন্ত্রণ করলেন। ভগবান তাতে রাজি হয়ে দুজনেরই হিতকামনায় তাঁদের অজ্ঞাতসারে দুই মূর্তিতে দুজনের ঘরে ঢুকলেন। তারপর বহুলাশ্ব দূর থেকে স্বগৃহে আগত ও শ্রান্ত তাঁদের শ্রেষ্ঠ আসন

এনে দিলেন। তাঁরা তাতে বসে বিশ্রাম করলে পর প্রগাঢ় ভক্তিহেতু তাঁর হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ আর চোখ অশ্রুপূর্ণ হল। তিনি নমস্কার করে তাঁদের পা ধুয়ে দিলেন। লোকপাবন সেই পাদোদক জল তিনি কুটুম্বদের সঙ্গে আপন মাথায় ধারণ করে গন্ধ, মালা, বস্ত্র, ভূষণ, ধূপ, দীপ, অর্ঘ্য আর গো-বৃষসকলের দ্বারা তাঁদের পূজা করলেন। ২২-২৯

তারপর তাঁরা অন্নজল আর তাম্বূল দ্বারা পরিতৃপ্ত হলে জনকরাজ বহুলাশ্ব ভগবানের পা আপন কোলে রেখে মর্দন করতে করতে প্রফুল্লমনে মধুরবাক্যে ধীরে ধীরে বললেন, বিভু, সর্বপ্রকাশ আপনিই সর্বজীবের চেতনকারণ ও প্রকাশক। তাই আপনার পাদপদ্ম স্মরণকারী আমাদের দৃষ্টিপথে আপনি এসেছেন। আপনি যে বলে থাকেন—একান্ত ভক্ত অপেক্ষা বন্ধু অনন্তদেব, ভার্যা লক্ষ্মী আর পুত্র ব্রহ্মাও আমার প্রিয় নন, নিজের সেই কথা সত্য করবার জন্যই আপনি আমাদের দেখা দিলেন। আপনি আত্মারাম শান্ত মুনিদের আত্মজ্ঞানপ্রদ, এই জেনে কোন ব্যক্তি আপনার চরণপদ্ম পরিত্যাগ করতে পারে? আপনি এই পৃথিবীতে সংসারী মানুষদের মধ্যে যদুবংশে অবতীর্ণ হয়ে সংসার-শান্তির জন্য ত্রিলোকের পাপনাশক নিজ যশ বিস্তার করেছেন। আপনি শান্ত, তপস্যানিরত নারায়ণ-ঋষি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ; অতএব আপনাকে নমস্কার। হে সর্বব্যাপক, এখন ব্রাহ্মণদের সঙ্গে সমবেত হয়ে কিছুদিন আমাদের গৃহে বাস করে পদধূলির দ্বারা নিমির এই বংশ পবিত্র করুন। লোকপাবন শ্রীহরি রাজা কর্তৃক অনুরুদ্ধ হয়ে মিথিলার নরনারী-সকলের কল্যাণবিধানের জন্য সেখানে বাস করতে লাগলেন। ৩০-৩৭

মহারাজ, জনকরাজের মত শ্রুতদেবও নিজের গৃহে অচ্যুতকে আর মুনিদের উপস্থিত দেখে নমস্কার করলেন আর মহানন্দে বস্ত্র ঘুরিয়ে নাচতে শুরু করলেন। তারপর শ্রুতদেব নিজে তৃণময় ও কুশময় আসন এনে তাঁদের বসালেন আর স্বাগত জিজ্ঞাসা ও অভ্যর্থনা করে স্ত্রীর সঙ্গে সানন্দে তাঁদের পা ধুয়ে দিলেন। ভাগ্যবান শ্রুতদেব সর্বমনোরথ লাভ করে আনন্দিতচিত্তে সেই পাদোদক দ্বারা গৃহ ও স্বজনদের সঙ্গে আপনাকে অভিষিক্ত করলেন। পরে আমলকী প্রভৃতি ফল, উশীর-সুবাসিত অমৃতবৎ সুস্বাদু জল, সুগন্ধ মাটি, তুলসী, কুশ, পদ্ম আর সত্ত্ববর্ধক অন্ন—এই সমস্ত অনায়াসলব্ধ পূজার উপকরণ দিয়ে পূজা করে চিন্তা করলেন, আমি গৃহরূপ অন্ধকূপে পতিত। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এবং যাঁরা তাঁর মূর্তির বাসস্থল, যাঁদের পদরেণু সর্বতীর্থের আস্পদ, সেই সমস্ত ব্রাহ্মণদের সঙ্গ আমার কি করে সম্ভব হল? তারপর সকলে সুস্থ হয়ে বসলে পর শ্রুতদেব নিজের স্ত্রী, স্বজন ও পুত্রদের সঙ্গে তাঁর কাছে এসে পা মর্দন করতে করতে বললেন, ভগবান, আপনি পরমপুরুষ, আমরা যে আপনাকে পেলাম, তা নয়। যখন শক্তিসকল দ্বারা এই বিশ্ব সৃষ্টি করে আপনি নিজ সত্তা দ্বারা এঁর অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছেন, তখন জীবের অন্তরে থাকলেও আপনি আমাদের দৃষ্টিগোচর হন নি। আজই আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়েছেন। যেমন নিদ্রিত পুরুষ আত্মমায়া সহকারে মন দ্বারাই কেবল স্বপ্নজগৎ রচনা করে তাতে প্রবেশপূর্বক প্রতিভাত হয়, আপনিও তেমনি আজ আমাদের নয়নপথে প্রতিভাত হলেন। যে সকল নির্মলচিত্ত মানুষ সবসময় আপনার গুণকর্মরাশি শোনেন ও গান করেন, আপনাকে অর্চনা ও বন্দনা করেন, আপনার কথার আলাপ-আলোচনা করেন, আপনি তাঁদের হৃদয়ে প্রকাশিত হয়ে থাকেন। যে সমস্ত ব্যক্তির মন কর্মদ্বারা বিক্ষিপ্ত, আপনি হৃদয়ে থেকেও তাদের কাছে দূরে। আর যে সকল নিরহংকার ব্যক্তির মন শ্রবণ-কীর্তনাদি দ্বারা পবিত্রতা লাভ করেছে, আপনি তাঁদের নিকটেই আছেন, আপনাকে নমস্কার। আপনি অধ্যাত্মবিদ্‌দের পরমাত্মা, আপনিই আবার

অনাত্মা। নিজ মায়াদ্বারা জীবদের দৃষ্টির সংবরণ আর আবরণ আপনিই করে রেখেছেন সুতরাং সকারণ ও অকারণ এই দুই উপাধি আপনার বিদ্যমান। আপনি নিজের কাছ থেকেই সংসার বিস্তার করেন। সুতরাং আপনার মায়ায় আবৃত বলে জীবেরা আপনাকে দেখতে পায় না, সেই আপনাকে নমস্কার। হে দেব, আমরা আপনার ভৃত্য। আপনি আমাদের আজ্ঞা করুন. আপনার কোন কাজ করব? আপনি যতদিন না দৃষ্টিগোচর হন, ততদিনই মানুষের ক্লেশ থাকে।[১] ৩৮-৪৯

শুকদেব বললেন, মহারাজ, প্রণত জনগণের ক্লেশহারী ভগবান শ্রীহরি শ্রুতদেবের এই কথা শুনে নিজের হাত দিয়ে তাঁর হাত ধরে হাসতে হাসতে বললেন, ব্রাহ্মণ, এইসকল মুনি তোমাকে অনুগ্রহ করবার জন্য উপস্থিত হয়েছেন। এঁরা পদরেণু দ্বারা সর্বলোক পবিত্র করার জন্যই আমার সঙ্গে ভ্রমণ করেন। লোকে দেবতা, পুণ্যক্ষেত্র আর তীর্থ দর্শন আর স্পর্শন করে অল্পে অল্পে বহুকালে পবিত্র হয়ে থাকেন। কিন্তু ব্রাহ্মণের চরণস্পর্শে সদ্যই পবিত্রতা লাভ করতে পারা যায়। ব্রাহ্মণ ইহলোকে জন্ম দ্বারাই সর্বপ্রাণীর শ্রেষ্ঠ। তার মধ্যে আবার যেসবল ব্রাহ্মণ তপস্যা; বিদ্যা, তুষ্টি ও আমার উপাসনাযুক্ত তাঁদের কথা আব কি বলব? এই আমার চতুর্ভুজরূপ অপেক্ষা ব্রাহ্মণদের আরাধনাই আমার অত্যন্ত প্রিয়; কারণ ব্রাহ্মণ সর্ববেদময় আর আমি সর্বদেবময়। মন্দবুদ্ধি ব্যক্তিরা এই প্রকার না জেনে দোষ ধরে প্রতিমা উপাসনা করে আমার স্বরূপ ব্রাহ্মণকে অবজ্ঞা করে। কিন্তু যাঁরা প্রশস্তবুদ্ধি তাঁরা অর্চনা ব্যাপারে ব্রাহ্মণকে গুরু ও আমাকে আত্মা বলে জানেন। অতএব হে ব্রাহ্মণ, এই সকল ব্রহ্মর্ষিকে শ্রদ্ধাসহকারে অর্চনা কর। এঁদের অর্চনা করলে সাক্ষাৎ আমি অর্চিত হলাম। অন্য প্রকারে ভূরি সম্পত্তি দ্বারা আমাকে পূজো করলেও আমি পূজিত হই না। শুকদেব বললেন, সেই মিথিলাবাসী ব্রাহ্মণ প্রভু শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ উপদেশ পেয়ে তাঁর সঙ্গে দ্বিজশ্রেষ্ঠদের একাগ্রভাবে আরাধনা করে ভগবদ্গতি লাভ করলেন। মহারাজ, ভক্তবৎসল সেই ভগবান উভয় ভক্তকেই বেদসমূহের যে ভক্তিমার্গ তা উপদেশ দিয়ে আবার দ্বারকায় ফিরে গেলেন। ৫০-৫৯

সপ্তাশীতিতম অধ্যায়

বেদ কর্তৃক ভগবানের স্তব

রাজা পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করলেন, ভগবান, যাঁকে প্রত্যক্ষরূপে নির্দেশ করা যায় না, যিনি গুণাতীত এবং যিনি কার্যকারণে অস্পৃষ্ট, সগুণ শ্রুতিসকল সেই নির্গুণ পরব্রহ্মের স্বরূপ বর্ণনা করতে পারে? শুকদেব বললেন, মহারাজ, ঈশ্বর মানুষের অর্থ, ধর্ম, কাম আর মুক্তির জন্য বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, মন ও প্রাণ সৃষ্টি করেছেন। এর অর্থ—যিনি সৃষ্টি, স্থিতি, ও প্রলয়ের কর্তা তিনিই ব্রহ্ম, তিনি গুণের দ্বারা অভিভূত হন না, তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, সর্বেশ্বর, সর্বনিয়ন্তা। তিনি সকলের উপাস্য, সমস্ত কাজের ফলদাতা, সমস্ত কল্যাণ আর গুণের আশ্রয়, তিনি সচ্চিদানন্দময়—এই সমস্তই বেদে প্রতিপাদিত হয়েছে।[২] এই সব উপনিষদ-বাক্য পূর্ব পূর্ব আচার্যরা হৃদয়ে ধারণ করেছিলেন। যিনি শ্রদ্ধা সহকারে তা ধারণ করবেন, তিনি দেহের উপাধি থেকে মুক্ত হয়ে পরমানন্দ লাভ করবেন। এই

১ তুলনীয়: কঠ উপনিষদ, ১।২।১২ ২ দ্রষ্টব্য: ঈশ উপনিষদ-৮

বিষয়ে তোমাদের কাছে একটি কাহিনী বলছি। নারায়ণ ঐ কাহিনীর বক্তা আর তা হল নারদ ও নারায়ণ ঋষির কথোপকথন। একসময় নারদ সমস্ত লোক ঘুরতে ঘুরতে সনাতন ঋষিকে দর্শন করবার জন্য নারায়ণের আশ্রমে উপস্থিত হলেন। তিনি এই ভারতবর্ষের মানুষের মঙ্গলের জন্য কল্পের শুরু থেকে ধর্ম, জ্ঞান আর শমযুক্ত হয়ে তপস্যা করছিলেন। সেখানে কলাপগ্রামবাসী ঋষিদের দ্বারা বেষ্টিত হয়ে তিনি বসে ছিলেন। দেবর্ষি তাঁকে নমস্কার করে ব্রহ্মবাদের কথাই জিজ্ঞাসা করলেন। তখন ভগবান নারায়ণও সর্বসমক্ষে আগেকার জনলোকনিবাসী সনন্দ প্রভৃতি ঋষিগণ কর্তৃক নির্ণীত ব্রহ্মবাদ নারদকে বলতে লাগলেন। ১-৮

ভগবান নারায়ণ বললেন, ব্রহ্মানন্দ, পুরাকালে জনলোকবাসী ঊর্ধ্বরেতা ঋষিরা 'ব্রহ্মসত্র' নামে এক যজ্ঞ করেছিলেন। তখন তুমি আমারই অংশবিশেষ অনিরুদ্ধ-মূর্তি দেখবার জন্য শ্বেতদ্বীপে গিয়েছিলে। এখন তুমি আমাকে যা জিজ্ঞাসা করছ, তখন ঋষিদের মধ্যে এই প্রশ্নই হয়েছিল। সকলেরই শাস্ত্রজ্ঞান, তপস্যা ও স্বভাব সমান ছিল, আর তাঁরা শত্রু, মিত্র আর উদাসীন ব্যক্তিদের সমান জ্ঞান করতেন। তথাপি পালাক্রমে একজনকে বক্তা করে সকলে তাঁর কথা শুনতে লাগলেন। তাঁদের মধ্যে সনন্দন বললেন, অনুজীবী স্তুতিপাঠকেরা সকলে এসে সুন্দর শ্লোকে তাঁর পরাক্রম বর্ণনা করে ঘুমন্ত রাজাকে জাগিয়ে তোলেন। ঈশ্বরও সেরকম নিজের সৃষ্ট এই বিশ্ব সংহার করে নিজের শক্তিসকলের সঙ্গে যোগনিদ্রায় নিদ্রিত হলে শ্রুতিগণ প্রলয়ের পরে তাঁদের স্বরূপ-গুণ প্রতিপাদক বাক্য দ্বারা তাঁকে প্রবোধিত করতে লাগলেন। ৯-১৩

শ্রুতিসকল বললেন, হে অজিত অচ্যুত, জয়যুক্ত হোন। আপনি স্থাবর ও জঙ্গম সকল জীবের অবিদ্যা নাশ করুন। হে প্রভু, আপনার স্বরূপ সব ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ এবং অবিদ্যা আর জীবদের মোহ জন্মাতে সমর্থ আপনি সগুণরূপে অবস্থিত। অতএব এই পরপ্রতারিণী স্বৈরিণীরূপ অবিদ্যাকে আপনি বিনাশ করুন। হে প্রভু, আপনি সর্বান্তর্যামী, সর্বজীবের সর্বশক্তির উদ্বোধক, আপনি ছাড়া অবিদ্যা নাশ করতে আর কে পারে? হে ঠাকুর, এ তত্ত্ব আমরা জানি। সৃষ্টির সময়ে যে আপনি মায়া রচিত স্বরূপে এবং সত্য, জ্ঞান ও আনন্দসহ অখণ্ড নিত্যরূপে বিরাজ করেন, তা বেদেই বলেছে।[১] ইন্দ্র, অগ্নি প্রভৃতির প্রাধান্যও বেদে বলা হয়েছে বটে, কিন্তু সে সমস্ত বেদমন্ত্র ইন্দ্রাদিকেও আপনার স্বরূপই ভেবেছেন। যেমন মাটি থেকেই ঘটের উৎপত্তি হয় আর মৃত্তিকাই ঘটের শেষ অবস্থা, এইজন্য ঘট মৃত্তিকা থেকে আলাদা নয়[২], সেরকম অবিকারী ব্রহ্ম আপনার থেকেই সকলের (ইন্দ্র, অগ্নি প্রভৃতিরও) উৎপত্তি ও লয় হয়, আর সকলেরই চরম অবস্থা আপনি। অতএব ইন্দ্রাদিও আপনা থেকে আলাদা নয়।[৩] এই জন্য বেদমন্ত্র ও ঋষিরা আপনাতেই মন আর বাক্যের কর্ম সকল স্থাপন করেছেন। ভূচর, প্রাণী, পাথর, ইট প্রভৃতি যেখানেই পা ফেলা যায় তাই পৃথিবী—এ যেমন সত্যি, সেরকম বেদ, ইন্দ্র, অগ্নি প্রভৃতি যাই বলা হোক না কেন, তাই আপনার প্রতিপাদক।[৪] হে ত্রিগুণেশ্বর, আপনি পরমার্থ, এজন্য বিবেকিগণ সর্বলোক-পাপনাশক আপনার কথারূপ অমৃতসাগরে অবগাহন করে

---

১ দ্রষ্টব্য: সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম॥ তৈঃ উপঃ ২।১, আনন্দরূপমমৃতং যদ্‌ বিভাতি॥ মুঃ উপঃ ২।২।৮
২ তুলনীয়: বৃহদারণ্যক উপনিষৎ, ২।৪।১২ ও ৪।৫।১৩। ৩ তুলনীয়: যেরূপ সুদীপ্ত অগ্নি থেকে তারই সমানরূপবিশিষ্ট সহস্র অগ্নিকণা নির্গত হয়, সেরূপ অক্ষয়পুরুষ থেকে নানাবিধ জীব জন্মায় এবং তাঁতেই বিলীন হয়।—মুণ্ডক, ২।১।১। ৪ 'যাহা যাহা নেত্র পড়ে তাহা তাহা কৃষ্ণ স্ফুরে।'

পাপতাপ থেকে বিমুক্ত হয়েছেন। যাঁরা আত্মতত্ত্বজ্ঞান দ্বারা রাগদ্বেষ অন্তঃকরণ-ধর্ম এবং জরামরণ প্রভৃতি কালধর্ম থেকে মুক্ত হয়ে অখণ্ড আনন্দরূপে আপনার স্বরূপ ভজনা করেন, তাঁরা যে পাপ-তাপমুক্ত হন, তাতে আর সন্দেহ কি ? মানুষেরা যদি আপনার ভক্ত হয়, তবেই তাদের জীবন সার্থক, নতুবা তারা কেবল হাপরের মত বৃথাই শ্বাস-প্রশ্বাস নেয়। কেন না মহৎ-তত্ত্ব আর অহংকারাদি যাঁর অনুগ্রহে সমষ্টি-ব্যষ্টিরূপে ব্রহ্মাণ্ড ও এই দেহ উৎপাদন করেন, যিনি অন্নময়াদি পঞ্চকোশের[১] মধ্যে থেকে অন্নময়াদি পঞ্চকোশের মত প্রতীয়মান হন, যিনি স্থূল-সূক্ষ্ম এই পঞ্চকোশ থেকে অতিরিক্ত, আর তার অধিষ্ঠাতা, তিনি এই পঞ্চকোশের চরম প্রতিষ্ঠা, অতএব তিনি সত্য এবং তিনিই আপনি। অতএব যিনি দেহ-অন্তঃকরণাদিতে ওতপ্রোতভাবে অবস্থিত, সেই আপনার অভক্ত হলে কামাদি তুচ্ছ ফল লাভও হতে পারে না। স্থূলদৃষ্টিসম্পন্ন ঋষিদের সাধনা-সম্প্রদায় স্বীয় উদরস্থানে মণিপুরকস্থ ব্রহ্মের উপাসনা করেন ; আরুণি সম্প্রদায় বহুনাড়ী সংকুল হৃদয়ের মধ্যস্থিত দহরনামক সূক্ষ্ম পরমব্রহ্মের উপাসনা করেন। হে অনন্ত, আপনার উপলব্ধিস্থান মূলাধার থেকে জ্যোতির্ময়-শ্রেষ্ঠ সুষুম্নানাড়ী হৃদয়ের মধ্যে দিয়ে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত উত্থিত হয়। সেস্থান পেলে আর সংসারে প্রত্যাবর্তন হয় না। হে ভগবান, আপনার সৃষ্ট নানারকম যোনির আপনিই উপাদান কারণ, এই জন্য কারণরূপে আগে থেকেই সে সকলের সঙ্গে আপনি সম্বন্ধযুক্ত। সুতরাং তাতে আপনার মুখ্যভাবে প্রবেশের সম্ভাবনা না থাকলেও যেন সেই সেই যোনি-সমূহের অনুকরণ করছেন বলে প্রতীয়মান হয়ে থাকেন। স্বরূপতঃ অগ্নি এক হলেও যেমন ইন্ধনের আকার অনুসারে কমবেশী প্রকাশ পায়, সেরকম আপনিও জীবের তারতম্য অনুসারে দীপ্তি পেয়ে থাকেন। নির্মলচিত্ত বিবেকিগণ ঐহিক ও পারত্রিক কর্মফলজনিত জীবের দেহকে মিথ্যা আর তাতে অবস্থিত নির্বিশেষ আপনার সৎস্বরূপকেই সত্য বলে জানেন। নিজ নিজ কর্মদ্বারা উপার্জিত এই মনুষ্যদেহে বিরাজমান কার্যকারণের আবরণশূন্য পুরুষকে পণ্ডিতেরা অখিল শক্তিধারী পূর্ণস্বরূপ আপনারই অংশ বলে থাকেন।[২] পণ্ডিত সম্প্রদায় এই মনুষ্যতত্ত্ব জেনে বিচার করে বিশ্বাস সহকারে সমস্ত কর্মের অর্পণস্থান সংসার-নিবর্তক আপনার চরণযুগলের উপাসনা করেন। ১৪-২০

হে ঈশ্বর, আপনি দুর্জ্ঞেয় আত্মতত্ত্ব প্রকাশের জন্য মানুষরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন। আপনার পবিত্র চরিত্ররূপে মহাসুধা-সাগরে অবগাহন করে যাঁরা শ্রমশূন্য হয়েছেন আর আপনার শ্রীচরণকমলে হংসরূপী ভক্তদের সঙ্গলাভে যাঁরা গৃহত্যাগ করতে পেরেছেন, তাঁরা মুক্তি কামনা করেন না। আপনার অনুবর্তন করতে পারলে আপনার সেবার উপযুক্ত এই শরীরই আত্মার মত, বন্ধুর মত আর প্রিয়জনের মত আচরণ করে। কিন্তু আপনি অনুগ্রাহক, হিতকারী ও পরমপ্রিয় আত্মা হলেও লোকেরা দেহের উপাসনায় প্রমত্ত হয়ে আপনাকে বন্ধুরূপে ভজনা করে না। হায় ! যারা দেহাদি অসৎবস্তুর উপাসনার অভিলাষী, সেই নিন্দিত দেহিগণ আত্মঘাতী হয়ে সর্বক্ষণ সংসারচক্রে ভ্রমণ করছে। মুনিগণ প্রাণ, মন আর ইন্দ্রিয়কে সংযত করে দৃঢ়যোগে হৃদয়ে যে তত্ত্ব ধ্যান করেন, আপনার স্মরণপ্রভাবে শিশুপাল প্রভৃতি আপনার শত্রুরা সেই তত্ত্বই লাভ করেছেন। আর সর্পরাজের দেহের মত দীর্ঘ আপনার বাহুযুগলে আশ্রিত কামপীড়িত গোপীরা এবং আপনার চরণাশ্রিত সমদর্শী ও মন্ত্রাভিমানী দেবরূপী আমরা—আপনার কাছে এ

১ অন্ন, প্রাণ, মন, বিজ্ঞান ও আনন্দ—জীবের এই পঞ্চকোশ (দ্রষ্টব্য, তৈত্তিরীয় উপ: ৩।১-৬)।
২ যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি। ঈশ ১৬

উভয়ই তুল্য। সকল প্রকারের অধিকারীই আপনার কাছে সমান। হে ভগবান, এ জগতে পরবর্তীকালে যাদের উৎপত্তি ও বিনাশ হচ্ছে, তাদের মধ্যে কোন্‌ ব্যক্তি সৃষ্টিরও আগে আপনাকে জানতে পারে? আদি ঋষি ব্রহ্মা আপনা থেকে উৎপন্ন; পরে আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক দ্বিবিধ দেবতাদের জনকও আপনিই। আবার প্রলয়কালে আপনি যখন এই বিশ্ব লয় করে শয়ন করেন, তখন আকাশাদি স্থূল পদার্থ থাকে না, মহদাদি সূক্ষ্ম পদার্থ থাকে না, এই উভয়াত্মক শরীর থাকে না, কালবৈষম্য থাকে না, ইন্দ্রিয়াদি থাকে না, কোন শাস্ত্রও থাকে না। সুতরাং প্রলয়কালে জ্ঞান-সাধন কোন বস্তু না থাকায় জীবগণ তখনও আপনাকে জানতে পারে না। অতএব তোমাতেই একমাত্র শরণ নিয়ে ভক্তিপথই জীবদের অবলম্বন করা উচিত। ২১-২৪

যাঁরা বলেন অসৎ পদার্থ থেকে জগতের উৎপত্তি হয়েছে, যাঁরা অবিদ্যমান ব্রহ্মত্বের উৎপত্তির কথা বলেন, যাঁরা স্বরূপত বিদ্যমান একুশ প্রকার দুঃখের ধ্বংসকে মুক্তি বলেন, যাঁরা আত্মার পরস্পর ভেদ স্বীকার করেন আর যাঁরা কর্মফলকেই সত্য বলেন, সেই বৈশেষিক, পাতঞ্জল, সাংখ্য, ন্যায় আর মীমাংসার উপদেশ ভ্রান্তিপূর্ণ। পুরুষ ত্রিগুণময়, এরূপ কথা এবং পূর্বোক্ত নানা ভেদ-কল্পনা আপনার স্বরূপ-জ্ঞানের অভাবের জন্যই হয়ে থাকে। কিন্তু আপনি জ্ঞানময়, সঙ্গহীন; আপনাতে সেই ভেদরূপ কল্পনার আরোপ হতে পারে না। এই ত্রিগুণাত্মক জগৎ প্রকৃতপক্ষে অসত্য হলেও আপনাতে অধিষ্ঠিত বলে আপনার সদ্ভাব প্রযুক্ত সত্যবৎ দেখা দেয়। আর আত্মজ্ঞ ব্যক্তিগণ জগৎপ্রপঞ্চ আত্মা থেকে অভিন্ন এই তথ্য জেনে আত্মস্বরূপেই একে সত্য মনে করেন। আত্মা যখন স্বরচিত এই জগতে কারণরূপে প্রবিষ্ট তখন তা আত্মা ছাড়া কিছুই নয়, যেমন কেউ সোনার বিকার কুণ্ডলাদি হাতে পেলে তা সোনা জেনেই হাতছাড়া করে না। ২৫-২৬

আপনি সর্বভূতের আবাসস্থল, একথা জেনে যাঁরা আপনার পরিচর্যা করেন তাঁরা অবলীলায় মুক্তিলাভ করেন। আর যারা আপনার অভক্ত, পণ্ডিত হলেও আপনি তাদের বাক্য দ্বারাই বন্ধন করেন। কারণ যাঁরা আপনাকে অন্তর দিয়ে ভালবাসতে পেরেছেন তাঁরাই আপনাকে ও অন্যকে পবিত্র করেন, অভক্ত তা পারে না। আপনার ইন্দ্রিয় নেই, অথচ আপনি নিখিল-ইন্দ্রিয়শক্তি-প্রবর্তক। কারণ আপনি অপরের অপেক্ষা ছাড়াই দীপ্তি পেয়ে থাকেন। প্রজার কাছে থেকে কর গ্রহণ করে রাজন্যবর্গ যেমন সম্রাটকে করদান করেন, সেরকম যাঁরা লোকের প্রদত্ত হব্য-কব্য ভোজন করেন, সেই অবিদ্যা-আশ্রিত ইন্দ্রাদি দেবতারা এবং ব্রহ্মাদি প্রজাপতিরা আপনাকে পূজা-উপহার দিয়ে থাকেন। আপনার ভয়েই আপনার নিযুক্ত দেবতারা নিজের নিজের অধিকার সম্পাদন করেন।[1] হে নিত্যমুক্ত, আপনি মায়ার অতীত; কিন্তু আপনারই মায়াসৃষ্ট এই স্থাবর-জঙ্গম জীবদের আবির্ভাব হয়। আপনার ঈক্ষণে জীবদের কর্ম উৎপন্ন হয় আর লিঙ্গশরীর দ্বারা সেই জীবেরা যুক্ত হয়। কর্ম বা লিঙ্গশরীরের আবির্ভাব না হলে জীবসৃষ্টিতে এরকম বৈষম্য হত না। কেননা আপনি পরম কারুণিক, আকাশের মত সকলের পক্ষে সমান, নির্লেপ আর বাক্য ও মনের অগোচর। আপনার আত্মীয় বা অনাত্মীয় কেউ নেই। হে নিত্য, যদি জীবেরা বস্তুতই অনন্ত আর সেই জীবস্বরূপও নিত্য হয়, তাহলে তারা আপনার সঙ্গে সমান। কাজেই শাসিত-শাসক ভাব থাকতে পারে না এবং আপনিও তাঁদের নিয়ন্তা হতে পারেন না। কিন্তু এরকম না হলে তো আপনি নিয়ন্তা হতে পারেন। কেননা যা থেকে জীবের জন্ম, তিনিই জীবের

১ এঁরই ভয়ে অগ্নি তাপ দেয়, সূর্য উত্তাপ দেয় এবং এঁরই ভয়ে ইন্দ্র, বায়ু ও যম স্ব স্ব কার্যে নিযুক্ত হয়।—কঠ উপ, ২।৩।৩

অপরিত্যাজ্য কারণ; তিনিই জীবের নিয়ন্তা। তিনি যে কে, তা ঠিক বলতে পারি না। তবে এইমাত্র বলতে পারি যে, তিনি সর্বত্র বিদ্যমান।[১] তিনি জ্ঞানাভিমানী ব্যক্তিদের অজ্ঞাত; তিনি যে অজ্ঞাত, এ বিষয়ে প্রমাণ এই যে, জ্ঞাত বস্তুমাত্রেই কোন না কোন দোষ থাকে, কিন্তু তিনি নির্দোষ। ২৭-৩০

প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতি বা পুরুষের অথবা উভয়ের জীবরূপে উৎপত্তি হয় না। কেননা শ্রুতির প্রকৃতি ও পুরুষ জন্মরহিত বলে কীর্তিত হয়েছেন। তাছাড়া অন্য যুক্তিও আছে। তবে কিনা প্রকৃতি-পুরুষের পরস্পর সম্বন্ধ বিশেষেই প্রাণবিশিষ্ট জীবের উৎপত্তি হয়। এ বিষয়ের প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল জল-বুদ্‌বুদ্‌। কেবল জলেও বুদ্‌বুদের উৎপত্তি হয় না, কেবল বায়ু দ্বারাও তা হয় না, কিন্তু উভয়ের সংযোগেই বুদ্‌বুদ্‌ জন্মায়। জীবের বাস্তবিক জন্ম হয় না বলেই নানা প্রকার নাম আর গুণের সঙ্গে আপনাতে জীবের লয় হয়।[২] হে পরম, মধুরাশিতে নানা বৃক্ষের কুসুম-রসের মিশ্রণ হলে যেমন তার আর বিশেষত্ব উপলব্ধি হয় না, সুষুপ্তি আর প্রলয়কালে আপনাতে জীবের যে লয় হয়, তাতেও সেরূপ নানারকম নাম আর গুণের লয় হওয়ায় তার বিশেষত্ব জানা যায় না। আর আত্মজ্ঞান হলে আপনাতে জীবের যে লয় হয়, তা সমুদ্রে নদীমিলনের সমান।[৩] আপনার মায়াদ্বারা রচিত সংসারচক্রে এই সমস্ত জীব ভ্রমণ করছে, তা দেখে জ্ঞানিগণ সংসার-নিবর্তক আপনারই অন্বেষণ করেন। আপনার অনুসরণ করলে আর সংসার-ভয় থাকে না, কারণ আপনার কালরূপী ভ্রূকুটি আপনার অভক্তদের ভয় জন্মায়। যে অতিচঞ্চল মনরূপী অশ্ব বহিরিন্দ্রিয় এবং প্রাণ জয় দ্বারাও বশীভূত হয় না, গুরুর শরণ ব্যতীত তাকে বশ করতে গেলে উপায়বিমূঢ় হয়ে সমুদ্রবক্ষে কর্ণধার-বিহীন তরণীর বণিকদের মত বহু বাধাসংকুল সংসার-সমুদ্রে তাকে ভাসতে হয়। ভগবদ্ভক্ত ব্যক্তির সর্বানন্দময় পরমাত্মা আপনি থাকতে স্বজন, পুত্র, দেহ, পত্নী, ধন, গৃহ, পৃথিবী, প্রাণাদি তুচ্ছ বস্তুতে কি প্রয়োজন? এই সত্য কথা না জেনে স্ত্রীসঙ্গ-সুখে প্রবৃত্ত পুরুষদের স্বভাবত নশ্বর অসার এই সংসারে কেউই সুখী করতে পারে না। হে পুরুষোত্তম, যাঁদের হৃদয়ে আপনার পদকমল সবসময় বর্তমান, যাঁদের পাদোদক অপরের শাপরাশির বিনাশক, সেই নিরহংকার ঋষিরাও তীর্থ আর গুরুসেবায় দিন কাটান; কিন্তু তাঁরা মানুষের বিবেকনাশকারী গৃহে অবস্থান করেন না। অধিক কি, নিত্যানন্দময় পরমাত্মরূপী আপনাতে যাঁরা একবারও চিত্ত অর্পণ করেছেন, তাঁরাও আর সেই পাপগৃহে আসক্ত হন না। ৩১-৩৫

এই জগৎ সৎ (ব্রহ্ম) থেকে উৎপন্ন, অতএব এও সৎ এরকম ধারণা অসমীচীন। কেননা এতে ব্রহ্ম ও জগতের কার্য-কারণ ভাব প্রসঙ্গে পরস্পর ভিন্নভাব প্রতীয়মান হয়। যদি কেউ বলেন—এই একাত্মভাব দ্বারা ভেদাসিদ্ধি প্রমাণ করা উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু কার্য আর কারণে যে ভেদ থাকে না, তাই দেখান উদ্দেশ্য, তা হলেও আমরা বলতে পারি যে, এখানেও ব্যভিচার আছে, সুতরাং ব্যাপ্তি থাকতে পারে না। পুত্র পিতা থেকে উৎপন্ন হয়েও পিতৃভিন্ন। অনেকে হয়ত বলতে পারেন যে

১ কে সে। জানি না কে। চিনি নাই তারে—
শুধু এইটুকু জানি তারি লাগি রাত্রি অন্ধকারে।
চলেছে মানবযাত্রী যুগ হতে যুগান্তরের পানে……।—রবীন্দ্রনাথ

২ ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।। গীতা ২।২০

৩ তুলনীয়ঃ যথা নদ্যঃ স্যন্দমানা সমুদ্রেঽস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়।
তথা বিদ্বান্ নামরূপাদ্ বিমুক্তঃ পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্।।—মুণ্ডক ৩।২।৮

'উৎপন্ন' শব্দের অর্থ যা উপাদান-কারণ থেকে উৎপন্ন, যেমন সোনা থেকে কুণ্ডল। এখানে উপাদান-কারণ থেকে কার্যকে ভিন্ন বলা যায় না। কিন্তু এখানেও তর্কের অবকাশ আছে। রজ্জুকে সাপ মনে হল; সুতরাং সাপের উপাদান 'সৎ' রজ্জু, তবে কি সাপেরও সত্যত্ব আছে? তা ত নয়। যদি কেউ বলেন—সেখানে সাপের উপাদান শুধু রজ্জু নয়, তা হল অবিদ্যাযুক্ত রজ্জু, সুতরাং ভ্রমবশত উৎপন্ন সাপের সত্যতা নেই। তাহলে বলা যায় যে বিশ্বের উপাদানও অবিদ্যাময় তাই ঐ মিথ্যা সাপের মতই এই বিশ্বেরও পারমার্থিক সত্যতা নেই।[1] হে ভগবান, আপনার বেদরূপ বাক্যে দ্বৈতবাদই সমর্থিত হয়েছে। কেন না বেদে কর্মফল নিত্য বলে উক্ত হয়েছে। নিত্য হলে তা 'সৎ' এইরূপে বহু সৎপদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয়। কর্মফলও নিত্য নয়, বস্তুত কর্মফলাসক্ত ব্যক্তিমাত্রই মোহগ্রস্ত। যেহেতু এই বিশ্ব সৃষ্টির আগে ছিল না, প্রলয় হলেও থাকবে না, এই কারণে স্থির করা যায় যে, মধ্যসময়ে অদ্বিতীয় আপনাতে যে এই বিশ্ব প্রকাশ পায়, তা স্বরূপত মিথ্যা। এইজন্যই মৃত্তিকা-স্বর্ণাদির বিকার ঘট-কুণ্ডলাদির সঙ্গে এর উপমা শ্রুতিতে দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ নাম মাত্রেই ঘট কুণ্ডলাদির সত্তা, নামমাত্রেই জগতের সত্তা। মনের মধ্যে কল্পিত অসত্য এই বিশ্বকে যারা সত্য মনে করে, তাদের মূঢ়ই বলতে হবে। যেহেতু জীব মায়া প্রভাবে অবিদ্যাকে আলিঙ্গন করে দেহ-ইন্দ্রিয়কে আত্মরূপ বুঝে দেহে ইন্দ্রিয়াদির স্বরূপ ভজনা করে, এতেই তাঁর স্বাভাবিক আনন্দরূপভাব আবৃত থাকে আর সে সংসার-চক্রে ঘুরতে থাকে। যেরূপ সাপ নিজের দেহের খোলসকে নিজের উপযোগী বোধ করে না, সেরূপ আপনিও সিদ্ধ ও অপরিমিত ঐশ্বর্যময় আত্মস্থিত মায়াকেও আত্মগুণ বলে স্বীকার করেন না, বরং স্বেচ্ছায় তা পরিত্যাগ করেন। কারণ অপরিমিত ঐশ্বর্যময় আপনি অণিমাদি অষ্টবিভূতিময় হয়ে বিরাজ করেন। হে ভগবান, যতিগণও যদি হৃদয়স্থিত বাসনাকে দূর না করেন, তা হলে মণি কণ্ঠসংলগ্ন থাকলেও লোকে তা ভুলে গেলে তা থাকা না থাকা যেমন সমান, সেরূপ আপনি হৃদয়ে বর্তমান থাকলেও কুযোগীদের পক্ষে দুর্লভ হয়ে থাকেন। সেই ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিপরায়ণ কুযোগীদের দ্বিবিধ দুঃখ পেতে হয়। ধনার্জনাদি-জনিত ক্লেশ এবং যোগীর পক্ষে ভোগের বিভব প্রকাশ হয়ে পড়বে এই আশংকায় ইহলোকে দুঃখ আর ভগবানের স্বরূপ-প্রাপ্তি না হওয়ায় পরলোকে যে দুঃখ তাও ভোগ করা অর্থাৎ যোগীর নিজ ধর্মত্যাগের জন্য নিজের শাস্তিস্বরূপ পরলোকেও তাকে নরকভোগ করতে হয়। হে ষড়ৈশ্বর্যগুণসম্পন্ন, আপনাকে যিনি জানতে পেরেছেন, তিনি আপনার ব্যবস্থা অনুসারে আবির্ভূত শুভাশুভ কর্মের ফলস্বরূপ সুখ-দুঃখ সম্বন্ধে কোন অনুসন্ধানই রাখেন না, দেহাভিমানী ব্যক্তিদের প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি-বোধক বিধি-নিষেধ বাক্যেরও অনুবর্তন করেন না। কেন না সাধুদের উপদেশ অনুসারে আপনি যুগে যুগে মানুষদের শ্রবণপথ দিয়ে প্রবেশ করে হৃদয়স্থ হয়ে মুক্তি দেন। অতএব তাঁরাও বিধি-নিষেধের অতীত। আপনি অনন্ত, অতএব ব্রহ্মাদি লোকপালেরা আপনার অন্ত নির্ণয় করতে পারেন নি; এমন কি আপনিও আপনার অন্ত জানেন না। হে দেব, ব্রহ্মাণ্ড সপ্ত-আবরণময়। এই ব্রহ্মাণ্ড সমূহও আকাশে ধূলিকণার মত আপনাতেই যুগপৎ ভ্রমণ করছে। শ্রুতিবাক্যসকল[2] আপনাতেই

১ এখানে শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবাদ-ভিত্তিক মতের সমর্থনে বলা হয়েছে। শংকর ভগবদ্‌গীতা ও এগারখানি উপনিষদের অদ্বৈতবাদী ব্যাখ্যা করেন। তবে এই মতবাদের বিরুদ্ধে দ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, শুদ্ধাদ্বৈতবাদ ইত্যাদি বিভিন্ন মতবাদের সৃষ্টি হয়। এদের প্রবক্তা হলেন রামানুজ, মধ্ব, বলদেব, নিম্বার্ক ইত্যাদি আচার্যগণ। ২ বেদান্তের উপদেশাবলী।

পরিসমাপ্ত। এসব শ্রুতিবাক্যসমূহ তন্ন তন্ন করে তাৎপর্যক্রমে আপনাকেই প্রতিপাদন করছে। ৩৬-৪১

ভগবান নারায়ণ ঋষি বললেন, এ ভাবে ব্রহ্মার পুত্রেরা পরমাত্মবিষয়ে উপদেশ শুনে আত্মার গতি জেনে সনন্দনকে পূজা করতে লাগলেন। গগণবিহারী পূর্বতন ঋষিরা এ-ভাবে অশেষ শ্রুতি-পুরাণ রহস্যের তাৎপর্য উদ্‌ঘাটন করেছিলেন। হে নারদ, তুমি শ্রদ্ধাসহকারে মানুষের সর্বকামনা-বাসনা বিনাশক এই আত্মবিষয়ের উপদেশ হৃদয়ে ধারণ করে পৃথিবী পর্যটন কর। ৪২

শুকদেব বললেন, মহারাজ, সেই নৈষ্ঠিক-ব্রতচারী দেবর্ষি নারদ গুরুর এরূপ আদেশ পেয়ে শ্রুতার্থসকল হৃদয়ে অবধারণ করে কৃতার্থ হয়ে বললেন—যিনি সর্বভূতের সংসারপাপ মোচন করবার জন্য অবতাররূপে অংশকলা ধারণ করেছেন, সেই অমলকীর্তি ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করি। পরীক্ষিৎ, দেবর্ষি নারদ আদি ঋষি নারায়ণ ও তাঁর মহাত্মা শিষ্যদের আর শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করে আপন পিতা দ্বৈপায়নের আশ্রমে চলে গেলেন। তারপর দেবর্ষি নারদ পিতা দ্বারা সংস্কৃত হয়ে উপযুক্ত আসনে বসে নারায়ণ ঋষির মুখ থেকে শ্রুত সেই পরমাত্মা সম্বন্ধীয় সমস্ত বিষয় বলতে লাগলেন। অনির্দেশ্য নির্গুণ পরব্রহ্মে মন কিভাবে বিচরণ করবে, আপনি যে এই প্রশ্ন করেছিলেন, তা যথাযথ বর্ণনা করলাম। যিনি এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি আব সংহারকর্তা; যিনি এর সৃষ্টি করে জীবরূপে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছেন[১], যিনি প্রকৃতি পুরুষের নিয়ন্তা, যিনি ভোগায়তন এই শরীর নির্মাণ করে জীবের শাসন করছেন[২], মানুষ দণ্ডবৎ প্রণাম দ্বারা যাঁর চরণকমল লাভ করে অবিদ্যা পরিত্যাগ করে থাকেন, ঘুমন্ত ব্যক্তি যেমন অন্য কর্তৃক দৃষ্ট হয়েও আপনাকে দেখতে পায় না, সেরকম যাঁর কৃপায় জীবন্মুক্ত ব্যক্তি অপর দেহধারী সকলকেই দেখছেন, কিন্তু নিজ দেহের কোন উপলব্ধি করেন না, সেই সর্বদর্শী অভয়বরদাতা শ্রীহরিকে সকল সময় সকল অবস্থায় আমি ধ্যান করি। ৪৩-৫০

অষ্টাশীতিতম অধ্যায়

মহাদেবের সংকট মোচন

রাজা পরীক্ষিৎ বললেন, ভগবান, দেবতা, অসুর আর মানুষের মধ্যে যাঁরা ভোগবিলাসবর্জিত শিবকে পূজা করেন, প্রায়ই তাঁরা ধনী আর ভোগী হন। কিন্তু যাঁরা সমস্ত ভোগের আধার লক্ষ্মীপতিকে ভজনা করেন, তাঁরা সেরূপ হন না। এর কারণ কি? এ-বিষয়ে আমাদের মনে সন্দেহ জন্মেছে। বিরুদ্ধচরিত্র এই দুই প্রভুর ভজনাকারীদের এই বিরুদ্ধ গতি কেন? অহংকার তিন প্রকার—বৈকারিক, তৈজস আর তামস। এজন্য মহাদেবকে ত্রিলিংগ বলা হয়। শিবের এই অহঙ্কার থেকেই দশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চভূত ও মন এই ষোলটি বিকার উৎপন্ন হয়েছে। এই সকলের মধ্যে একটি বিকারকে শিবরূপে ভজনা করলেই বিকারের অনুরূপ বিভূতিসকলের স্বরূপ লাভ করতে পারা যায়। শ্রীহরি নির্গুণ, প্রকৃতি থেকে

---

১ যদিদং কিঞ্চ তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ।। তৈঃ উঃ ২।৬।৩

২ সূর্য যেমন উপর, নিচ ও চারপাশ—এই সমস্ত দিক প্রকাশ করে শোভা পান, তেমনি এই অদ্বিতীয়, ঐশ্বর্যশালী পরমেশ্বর নিজেরই স্বরূপভূত বিশ্বজীবে অবস্থান করে এদের নিয়মিত করেন।—শ্বেঃ উঃ ৫।৪

ভিন্ন সাক্ষাৎ পরমপুরুষ। তিনি সর্বদর্শী আর সকলের সাক্ষী। তাঁকে ভজনা করলে নির্গুণত্ব লাভ হয়। অশ্বমেধ যজ্ঞের পর তোমার পিতামহ যুধিষ্ঠির ভাগবত ধর্ম শুনতে শুনতে অচ্যুতকে এই কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন। যিনি মানুষের মুক্তির জন্য যদুকুলে জন্ম নেন, সেই প্রভু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে উত্তর দেন। ১-৭

তিনি বললেন, আমি যার প্রতি অনুগ্রহ করি, আস্তে আস্তে তার ধন কেড়ে নিই, দুঃখের উপর দুঃখ দেখে স্বজনেরা নিজের থেকেই তাকে ত্যাগ করে। তারপর সে যখন ধনের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হয়ে বিফল হওয়ায় নির্বেদ লাভ করে এবং আমাতে নিবিষ্টমনা ব্যক্তিদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে, তখনই আমি তার প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ প্রকাশ করি। সেই আমার অনুগৃহীত ধীর ব্যক্তি পরমসূক্ষ্ম, চিন্মাত্র, সৎ, অনন্ত ব্রহ্মকে জেনে সংসার থেকে মুক্ত হয়। এই জন্য লোকে নিতান্ত দুরারাধ্য আমাকে ছেড়ে অন্যান্য দেবতাদের উপাসনা করে। তারপর তারা সেই দেবতাদের কাছে রাজ্যশ্রী লাভ করে উদ্ধত, মত্ত আর প্রমত্ত হয়ে ওঠে, আর সেই দেবতাদেরই ভুলে যায় ও অবজ্ঞা করে। ৮-১১

শুকদেব বললেন, মহারাজ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবাদি সকলেই শাপ ও প্রসাদের অধীশ্বর। তার মধ্যে শংকর আর ব্রহ্মা সবসময়ই শাপ ও বর দান করে থাকেন, কিন্তু বিষ্ণু সেরূপ নন। এই বিষয়ে এক পুরাণো কাহিনী শোনা যায়। একবার ভগবান মহাদেব বৃকাসুরকে বর দিয়ে সংকটে পড়েছিলেন। শকুনির পুত্র বৃক নামে এক দুর্মতি অসুর পথে নারদকে দেখে জিজ্ঞাসা করল, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব, এই তিন দেবের মধ্যে কোন্ দেব অল্পে তুষ্ট হন? নারদ বললেন, দেব গিরিশের আরাধনা কর, তাড়াতাড়ি সিদ্ধ হবে। তিনি অল্প গুণ-দোষে তাড়াতাড়ি তুষ্ট আর রুষ্ট হয়ে থাকেন। শংকর স্তুতিপাঠকের মত স্তবকারী দশানন ও বাণের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে তাদের অতুল ঐশ্বর্য দান করে খুব সংকটে পড়েছিলেন। ১২-১৬

দেবর্ষি নারদ একথা বললে, বৃকাসুর কেদারতীর্থে গিয়ে আগুনে নিজের গায়ের মাংস আহুতি দিয়ে মহাদেবের আরাধনা করতে লাগল। সাতদিন এরকম আরাধনা করেও দৈত্য শংকরের দর্শন পেল না, তখন সে নির্বেদ হয়ে সেই কেদারতীর্থের জলে অভিষিক্ত নিজের মাথা কুঠার দিয়ে কাটতে গেল। অমনি পরম কারুণিক জটাধারী শিব আগুন থেকে মূর্তিমান আগুনরূপে উঠে দু'হাত দিয়ে দৈত্যের দু'বাহু আটকালেন। তাঁর দৈব স্পর্শহেতু আহুতির জন্য গা থেকে কর্তিত মাংস আবার গায়ে লেগে গেল এবং বৃকাসুরের দেহও পরিপূর্ণ হল। শিব তাকে বললেন, তুমি নিবৃত্ত হও। তোমার যা অভিলাষ, আমি সেই বর তোমাকে দেব। আমি শরণাগত মানুষদের প্রতি সবসময়ই সন্তুষ্ট থাকি। তুমি শুধু শুধুই আত্মাকে ক্লেশ দিচ্ছ। একথা শুনে পাপী অসুর মহাদেবের কাছে সর্বভূতের ভয়াবহ এই বর প্রার্থনা করল, আমি যার মাথায় হাত রাখব, সেই মরবে। ১৭-২১

ভগবান রুদ্র তা শুনে কিছুক্ষণ চিন্তাগ্রস্ত হয়ে রইলেন। পরে সাপকে অমৃত দেওয়ার মত হাসতে হাসতে তাকে 'তথাস্তু' বলে ঐ বরই দান করলেন। তারপর সেই অসুর শিবপত্নী গৌরীকে হরণ করবার আশায় সেই বর পরীক্ষা করবার জন্য শম্ভুর মাথায় নিজের হাত রাখতে উদ্যত হলেন। শঙ্কর তখন নিজ কর্ম পরিণতিতে ভীত হলেন আর ভয়ে ত্রস্তসমস্ত হয়ে কাঁপতে কাঁপতে উত্তরদিক থেকে পালাতে

গিয়ে স্বর্গ, পৃথিবী ও সকল দিকে ত্রস্ত হয়ে দৌড়ালেন। অসুরও তাঁকে অনুসরণ করল। এদিকে দেবশ্রেষ্ঠরা এর কোন প্রতিবিধান দেখতে না পেয়ে চুপ করে রইলেন। তারপর শংকর তমোরাজ্যের অতীত দীপ্তিময় বৈকুণ্ঠধামে গেলেন, যেখানে সর্বত্যাগী, শান্ত, সাক্ষাৎ নারায়ণ অবস্থান করছিলেন। দুঃখহারী ভগবান শ্রীহরি বৃকাসুরকে ও বিপদগ্রস্ত রুদ্রকে দেখে যোগমায়াবলে বটুকবেশ ধারণ করলেন এবং মেখলা, গাছের ছাল আর অক্ষমালা ধারণ করে আর কুশ হাতে নিয়ে আপন তেজে দীপ্তিমান হয়ে দানবের সামনে এলেন। তিনি বিনীত হয়ে অসুরকে অভিবাদন করে বললেন, শকুনিতনয়, আপনি কেন এতদূরে এসেছেন? আপনি নিশ্চয়ই শ্রান্ত। এখন কিঞ্চিৎক্ষণ বিশ্রাম করুন। পুরুষের দেহ সকল অভিলাষ পূর্ণ করে। অতএব আপনি দেহকে কষ্ট দেবেন না। পুরুষশ্রেষ্ঠ, যদি আপনার কাজ আমাদের শোনবার মত হয়, তাহলে বলুন, আমি তা পূরণ করব। কেননা একে অপরের সহায়তা করেই স্বার্থ সাধন করে থাকে। ২২-৩০

শুকদেব বললেন, মহারাজ, ভগবানের এরূপ অমৃতময় মধুর বচনে অসুরের শ্রান্তি দূর হল। সে আনুপূর্বিক ঘটনা সমস্তই তাঁর কাছে নিবেদন করল। ভগবান বললেন, যদি শংকর এরকম বর দিয়ে থাকেন, তা হলে আমরা তাঁর কথায় বিশ্বাস করি না। দক্ষের শাপে পিশাচবৃত্তি পেয়ে শংকর পিশাচের রাজা হয়েছেন। দানবেন্দ্র, তাঁকে জগদ্গুরু বলে যদি তাঁর কথায় আপনার বিশ্বাস হয়ে থাকে, তবে নিজের মাথায় হাত দিয়ে পরীক্ষা করুন না কেন? যদি শম্ভুর কথা মিথ্যাই হয় তাহলে পরীক্ষার পর সেই অসত্যবাদীকে শাস্তি দেবেন, যেন তিনি আবার এমন মিথ্যা কথা না বলেন। ভগবানের এরকম মনোরম বাক্যে হতবুদ্ধি ও বিস্মিত হয়ে কুমতি অসুর নিজের মাথায় হাত দিল। অমনি সে ছিন্নশিরা হয়ে বজ্রাহতের মত পড়ে গেল। তখন স্বর্গ জয়ধ্বনি ও সাধুবাদে মুখর হয়ে উঠল। পাপ বৃকাসুর নিহত হলে পর পর দেব, ঋষি, পিতৃগণ, গন্ধর্বগণ পুষ্পবর্ষণ করতে লাগলেন; শিবও সংকট থেকে মুক্ত হলেন। ভগবান পুরুষোত্তম সংকটমুক্ত গিরিশের কাছে এসে বললেন, মহাদেব, এই পাপাত্মা অসুর নিজ পাপেই মারা গেছে। হে ঈশ্বর, সাধুজনের কাছে অপরাধ করে কি কোন ব্যক্তি মঙ্গললাভ করতে পারে? আপনি জগদ্গুরু, যে দুর্বৃত্ত আপনার কাছে অপরাধী, তার কথা আর কি বলব? ৩১-৩৯

মহারাজ, যিনি বাক্য ও মনের অগোচর, শক্তির সমুদ্রস্বরূপ সাক্ষাৎ পরমাত্মা পরমেশ্বর শ্রীহরির এই শিবমোচন কথা কীর্তন করেন বা শোনেন, তিনি নানা যোনিতে ভ্রমণরূপ সংসারপাশ ও রিপুভয় হতে বিমুক্ত হয়ে থাকেন। ৪০

ঊননবতিতম অধ্যায়

ভগবানের মহিমা বর্ণন

শুকদেব বললেন, মহারাজ, সরস্বতীর তীরে যজ্ঞ করতে করতে ঋষিদের মনে এই বিতর্ক উপস্থিত হল—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এই তিন অধীশ্বরের মধ্যে কোন দেবতা মহান। এর উত্তর জানতে ইচ্ছুক হয়ে তাঁরা ব্রহ্মার পুত্র ভৃগুকে পাঠালেন। মহাত্মা ভৃগু সেই অনুসারে প্রথমে পিতা ব্রহ্মার সভায় গেলেন। ব্রহ্মার স্বরূপ পরীক্ষার

জন্য ব্রহ্মাকে প্রণাম ও স্তব কিছুই করলেন না। তাতে ব্রহ্মা তাঁর উপর খুব ক্রুদ্ধ হলেন। সূর্য যেমন নিজ সৃষ্ট আগুন বৃষ্টির জলে নির্বাপিত করেন, প্রভু ব্রহ্মাও পুত্রের প্রতি সেই ক্রোধকে সেভাবে আপনা থেকেই শান্ত করলেন। ১-৪

অনন্তর ভৃগু সেখান থেকে কৈলাসে গেলেন। দেব মহেশ্বর আনন্দে উঠে ভ্রাতাকে আলিঙ্গন করতে উদ্যত হলেন, কিন্তু ভৃগু তাঁকে 'তুমি উন্মার্গগামী' বলে তিরস্কার করলেন। তাতে রুদ্র ক্রোধে রক্তচক্ষু হয়ে শূল তুলে তাঁকে মারতে গেলেন। দেবী শংকরী পতির পায়ে ধরে অনেক অনুনয়-বাক্যে তাঁকে শান্ত করলেন। তারপর ব্রহ্মা-তনয় ভৃগু জনার্দনের আলয় বৈকুণ্ঠে গেলেন। সেখানে দেব-দেব জনার্দন লক্ষ্মীর কোলে শুয়েছিলেন। ভৃগু ভগবান তাঁর কাছে গিয়ে তাঁর বুকে পদাঘাত করলেন। তখন সাধুদের শরণ ভগবান শ্রীহরি লক্ষ্মীর সঙ্গে উঠে শয্যা থেকে নেমে মুনিকে নমস্কার করে মধুর বাক্যে বললেন, ব্রাহ্মণ, আপনার আগমন সুখের হল তো? কিছুক্ষণ এই আসনে বসুন। আপনি এসেছেন, আমরা জানতে পারি নি, এজন্য আমাদের ক্ষমা করুন। ভগবান, তীর্থসকলের পবিত্রকারী আপনার পাদোদক দিয়ে সর্বলোকের সঙ্গে আমাকে আর আমার অনুগত লোকপালদের পবিত্র করুন। আজ আমি একান্ত লক্ষ্মীদেবীর আশ্রয়স্থান হলাম; আপনার পদাঘাত দ্বারা পাপ দূর হওয়ায় আমার বক্ষঃস্থলে লক্ষ্মীদেবীসহ আপনার পদচিহ্ন যেন সবসময় বিরাজ করে। ৫-১২

শুকদেব বললেন, মহারাজ, বিষ্ণু এরকম বললে পর ভৃগু তাঁর সেই মধুর ও মহান বাক্যে পরম তৃপ্তিলাভ করে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকলেন। ভক্তিতে তাঁর চিত্ত গদ্গদ হয়ে উঠল, চোখে জল এল। তিনি যজ্ঞস্থলে ফিরে গিয়ে ব্রহ্মবাদী ঋষিদের কাছে নিজের পরীক্ষায় ফল বর্ণনা করলেন। মুনিরা তা শুনে আশ্চর্যান্বিত ও সন্দেহমুক্ত হলেন। যে বিষ্ণু থেকে শান্তি ও অভয় প্রবর্তিত হয়, তাঁরা তাঁকেই মহত্তম বলে নিশ্চয় করে বললেন। যিনি সাক্ষাৎ কর্মস্বরূপ, যাঁ থেকে জ্ঞান, বৈরাগ্য প্রভৃতি আট প্রকার ঐশ্বর্য ও আত্মার মলনাশক যশ লাভ করতে পারা যায়, যিনি শান্ত, সমবেত অকিঞ্চন মুনিদের পরম গতি, সত্ত্ব যাঁর প্রিয়মূর্তি ও ব্রাহ্মণরা যাঁর ইষ্টদেবতা, নিষ্কাম, শান্ত ও নিপুণবুদ্ধি মহাত্মারা যাঁকে ভজনা করে থাকেন, সেই বিষ্ণুই সর্বশ্রেষ্ঠ। যদিও সেই ভগবানের ত্রিগুণ মায়া দ্বারা রাক্ষস, অসুর ও দেবতা এই ত্রিবিধ আকৃতি সৃষ্টি হয়েছে, তা হলেও তাঁর সাত্ত্বিক মূর্তিই পরম পুরুষার্থ লাভের উপায়। ১৩-১৯

শুকদেব বললেন, সরস্বতী নদীর তীরবাসী মুনিরা জীবের সংসার-হরণের এই প্রকার উপায় নিশ্চয় করে পরমপুরুষের পাদপদ্ম সেবা দ্বারা তাঁর গতি লাভ করেছিলেন। সূত বললেন, মুনিতনয় শুকদেবের অমৃতস্বরূপ ভবভয়নাশক পরমপুরুষের প্রশস্তি যে পথিক শোনেন, তাঁকে সংসারপথে ভ্রমণজনিত ক্লেশ সহ্য করতে হয় না। ২০-২১

শুকদেব বললেন, ভরতকুলমণি, দ্বারকার এক ব্রাহ্মণের ছেলে জন্মাবামাত্র মৃত্যুমুখে পতিত হল। ব্রাহ্মণ তখন সেই মৃতকুমারকে রাজদ্বারে নিয়ে এসে কাতরোক্তি করে বলতে লাগলেন, ব্রহ্মদ্বেষী, শঠবুদ্ধি, লোভী, বিষয়াসক্ত ক্ষত্রিয়াধমের কর্মদোষেই আমার পুত্র মরেছে। হিংসা যার বিহার, যার চরিত্র দুষ্ট আর যার ইন্দ্রিয় অজিত, প্রজারা সেই রাজাকে ভজনা করলে দারিদ্র্যবশত দুঃখ-কষ্টে জর্জরিত হয়ে পড়ে। ব্রাহ্মণের দ্বিতীয় আর তৃতীয় পুত্রও এভাবে মারা গেলে তিনি তাদের রাজদ্বারে রেখে অনুরূপ অভিযোগই করতে লাগলেন। এভাবে ব্রাহ্মণের পুত্র

জন্মমাত্রই মরতে লাগল। তাঁর নবম পুত্র মারা গেলে পর অর্জুন কেশবের কাছে বসে ঐ কথা শুনে ব্রাহ্মণকে বললেন, ব্রাহ্মণ, বৃথা কেন কাঁদছেন? আপনার এখানে কোন ধনুকধারী নিকৃষ্ট ক্ষত্রিয়ও কি নেই যে দ্বারকায় আপনার পুত্রদের রক্ষা করতে পারে? এই ক্ষত্রিয়রা ব্রাহ্মণদের মত নিশ্চয়ই যজ্ঞ লক্ষ্য করে বসে আছেন। যে ক্ষত্রিয়রা জীবিত থাকতে ব্রাহ্মণেরা ধন, স্ত্রী আর পুত্র বিরহে শোক পায়, তারা রঙ্গমঞ্চে নটের ন্যায় ক্ষত্রিয়বেশে জীবিত থাকে মাত্র, তারা প্রকৃত ক্ষত্রিয় নয়। ভগবান, আপনারা স্বামী-স্ত্রী দু'জনে অসীম দুঃখ পেয়েছেন, আমি আপনাদের সন্তান রক্ষা করব। প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে না পারলে প্রায়শ্চিত্তের জন্য আগুনে প্রবেশ করব। ২২-৩০

ব্রাহ্মণ বললেন, বলরাম, বাসুদেব ও ধনুকধারী শ্রেষ্ঠ প্রদ্যুম্ন আর শ্রেষ্ঠরথী অনিরুদ্ধ এঁরা যাকে রক্ষা করতে সমর্থ হচ্ছে না, তুমি মূর্খতাবশত কেমন করে সেই জগদীশ্বরের দুষ্কর কাজ করতে ইচ্ছা করছ? আমরা তোমার কথায় বিশ্বাস করি না। অর্জুন বললেন, ব্রাহ্মণ, আমি বলদেব, কৃষ্ণ বা কৃষ্ণনন্দন নই, আমি অর্জুন, যাঁর ধনু গাণ্ডীব। আমার বিক্রমে সন্দেহ করবেন না, আমি ত্রিলোচনকেও তৃপ্ত করেছিলাম। যুদ্ধে মৃত্যুকে জয় করে আমি আপনার পুত্রদের এনে দেব। অর্জুন কর্তৃক এভাবে আশ্বস্ত হয়ে ব্রাহ্মণ তাঁর বীর্যবত্তা স্মরণ করতে করতে হৃষ্টচিত্তে নিজের ঘরে ফিরে গেলেন। কিছুকাল পরে দ্বিজপত্নীর আবার প্রসবসময় উপস্থিত হলে ব্রাহ্মণ কাতর হয়ে অর্জুনকে বললেন, অর্জুন, এইবার আপনি মৃত্যুর হাত থেকে আমার সন্তানকে রক্ষা করুন। তা শুনে অর্জুন পবিত্র জলে আচমন করে মহেশ্বরকে নমস্কার করলেন আর দিব্য অস্ত্রসকল স্মরণ করে জ্যাযুক্ত গাণ্ডীব গ্রহণ করলেন। পৃথানন্দন নানারকম অস্ত্র যোজিত বাণ দ্বারা সূতিকাগারের উপর, নিচ ও চারদিক বন্ধ করতে গিয়ে বাণের পিঞ্জর রচনা করলেন। ৩১-৩৮

তারপর ব্রাহ্মণপত্নীর সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়ে যেই কেঁদে উঠল আর তৎক্ষণাৎ তা আকাশপথে স্বশরীরে অদৃশ্য হল, শরীরমাত্রও অবশিষ্ট রইল না। তখন ব্রাহ্মণ শ্রীকৃষ্ণের কাছে গিয়ে অর্জুনের নিন্দা করে বললেন আমার মূঢ়তা দেখুন। আমি যে ক্লীবের আত্মশ্লাঘায় বিশ্বাস করেছিলাম তার এই ফল হল। প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ যাকে পরিত্রাণ করতে পারেন নি, অন্য কোন্ ব্যক্তি তাকে রক্ষা করতে সমর্থ হবে? মিথ্যাবাদী অর্জুনকে ধিক্। যে দুর্মতি মূর্খতাবশত দেবতাদের পরিত্যক্ত পুত্রকে আনতে ইচ্ছা করে সেই গর্বকারীর ধনুককে ধিক্। বিপ্র এইভাবে তিরস্কার করতে থাকলে যে বিদ্যাপ্রভাবে সর্বলোক ভ্রমণ করা যায় অর্জুন সেই বিদ্যা আশ্রয় করে সংযমনী-পুরীতে যমের কাছে গেলেন। সেখানে ব্রাহ্মণের পুত্রদের না দেখে পরে ইন্দ্রের পুরীতে গেলেন। তারপর তিনি অগ্নির, নিঋর্তির, চন্দ্রের, বায়ুর আর বরুণের পুরীতে এবং পরে রসাতলে, স্বর্গে ও অন্যান্য স্থানেও অস্ত্রহাতে খুঁজে বেড়ালেন। কিন্তু কোথাও ব্রাহ্মণপুত্রদের দেখতে পেলেন না। তারপর প্রতিজ্ঞা রক্ষা হল না দেখে অর্জুন আগুনে ঝাঁপ দিতে যাবেন, এমন সময় শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে বারণ করে বললেন, তোমাকে ব্রাহ্মণের পত্রদের দেখাবো। নিজেকে এত অবজ্ঞা করো না, তোমার বিমল কীর্তি মনষ্যলোকে স্থাপিত হবে। ৩৯-৪৬

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এ রকম বলে অর্জুনের সঙ্গে দিব্যাশ্বযুক্ত রথে চড়ে পশ্চিমদিকে গেলেন। তাঁরা সমুদ্রসহ সপ্ত দ্বীপ, সপ্তপর্বত এবং লোকালোক অতিক্রম করে ৪৭

ভয়ানক মহা অন্ধকারে প্রবেশ করলেন। সেখানে শৈব্য, সুগ্রীব মেঘপুষ্প আর বলাহক এই অশ্বসকল প্রবেশ করতে অসমর্থ দেখে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সহস্রসূর্যতুল্য প্রভাবশালী নিজ চক্রকে সেই নিবিড় অন্ধকারমধ্যে পাঠালেন। যেমন জ্যা থেকে প্রক্ষিপ্ত রামচন্দ্রের শর রাক্ষসসৈন্যশ্রেণী ভেদ করে প্রবেশ করে, তেমনি মনের ন্যায় বেগবান সুদর্শন অমিত তেজের সাহায্যে প্রকৃতির পরিণামস্বরূপ, নিবিড় ও অতি ভয়ানক সেই গাঢ় অন্ধকার ভেদ করে তার মধ্যে প্রবেশ করল। তখন চক্রের অনুগত পথে সেই অন্ধকারের পরে শ্রেষ্ঠ, অনন্ত, অপার জ্যোতিকে সমুজ্জ্বল দেখে অর্জুনের দৃষ্টি প্রতিহত হল এবং তাঁর দুই চোখ বুজে এল। ৪৭-৫৩

তারপর তাঁরা উচ্চতরঙ্গ শোভিত আকাশপথ থেকে নেমে বায়ুর দ্বারা চালিত জলের মধ্যে অতিবেগে প্রবেশ করে সেখানে দেদীপ্যমান সহস্র মণিময় স্তম্ভে শোভিত এক অদ্ভুত ভবনে প্রবেশ করলেন। সেই ভবনে সহস্র মস্তকের ফণায় অবস্থিত ও মণিদের প্রভায় প্রকাশমান, দ্বিসহস্র চোখ সমন্বিত ভীষণাকৃতি, স্ফটিক পর্বতের ন্যায় শোভমান, নীলকণ্ঠ, নীলজিহ্ব ও দীর্ঘাকার অনন্তনাগকে দেখলেন। সেই অনন্তের দেহরূপ আসনে মহানুভব বিভু পরমেষ্ঠীদের পতি পুরুষোত্তম সমাসীন। তাঁর আভা নিবিড় মেঘের মত, বসন সুন্দর আর পীতবর্ণ, মুখ প্রসন্ন, চোখ আয়ত ও মনোহর, মহামণি খচিত কিরীট ও কুণ্ডলের আভায় অপরিমিত কেশগুচ্ছ শোভা পাচ্ছে। তাঁর অষ্ট বাহু আজানুলম্বিত ও সুন্দর গলায় কৌস্তুভমণির সঙ্গে বনমালা এবং বক্ষে শ্রীবৎসচিহ্ন শোভমান। সুনন্দ ও নন্দ প্রভৃতি পার্ষদেরা, মূর্তিমান চক্র প্রভৃতি নিজের অস্ত্রশস্ত্র এবং পুষ্টি, শ্রী, কীর্তি, প্রকৃতি আর নিখিল অণিমাদি বিভূতি মূর্তিমতী হয়ে পরমেষ্ঠিপতি সেই শ্রীহরির সেবা করছেন। তাঁকে দর্শন করে শ্রীকৃষ্ণ সসম্ভ্রমে আত্মস্বরূপ সেই অনন্তকে নমস্কার করলেন আর অর্জুনও তাঁকে প্রণাম করলেন। ভূমা পরমেষ্ঠীদের অধিপতি সেই বিভু জোড়হস্তে দণ্ডায়মান তাঁদের দেখে সহাস্যে বললেন, আমি তোমাদের দুইজনকে দর্শন করবার ইচ্ছায় ব্রাহ্মণের পুত্রদের এখানে এনেছি। ধর্মরক্ষার জন্য ভূমণ্ডলে তোমরা আমার অংশে অবতীর্ণ হয়েছ।[১] ধরণীর ভারভূত অসুরদের সংহার করে শীঘ্রই আমার কাছে ফিরে এস। হে নর-নারায়ণ, তোমরা পূর্ণকাম হলেও মর্যাদারক্ষা ও লোকের শিক্ষার জন্য এরূপ ধর্ম আচরণ করছ।[২] ৫৪-৬০

শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন ভগবান পরমেষ্ঠিপতির দ্বারা এ ভাবে আদিষ্ট হয়ে 'যে আজ্ঞা' বলে বিভুকে নমস্কার করলেন এবং ব্রাহ্মণের পুত্রদের নিয়ে আনন্দ সহকারে নিজেদের গৃহে ফিরে এলেন। তারপর তাঁরা ব্রাহ্মণকে তাঁর পুত্রদের প্রত্যর্পণ করলেন। পার্থ বিষ্ণুর স্থান দেখে অতিশয় আশ্চর্যান্বিত হয়ে বললেন, পুরুষের যা কিছু পৌরুষ আছে, সকলই শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহে। শ্রীকৃষ্ণ এই পৃথিবীতে এরকম বিক্রম দেখিয়ে লৌকিক বিষয়ভোগ করেছিলেন এবং মহা মহা যজ্ঞসকল সম্পন্ন করেছিলেন। সর্বশ্রেষ্ঠ পদে অধিষ্ঠিত হয়ে ভগবান ব্রাহ্মণাদি প্রজাপুঞ্জের প্রতি ইন্দ্রের ন্যায় অভীষ্ট ফল প্রদান করতেন। অধার্মিক রাজাদের তিনি নিজে বধ করে এবং অর্জুনাদি দ্বারা বধ করিয়ে যুধিষ্ঠিরাদি দ্বারা অনায়াসে ধর্মপথ প্রবর্তিত করেছিলেন। ৬১-৬৬

১ আমারই (শ্রীকৃষ্ণের) সনাতন অংশ অবিদ্যাযোগে জীবরূপ হয়ে প্রকৃতিতে অবস্থিত মন ও পঞ্চেন্দ্রিয়কে সংসার-ভোগের নিমিত্ত জীবলোকে আকর্ষণ করে।—গীতা, ১৫।৭

২ তুলনীয়: গীতা, ৩।২০-২১

নবতিতম অধ্যায়

সংক্ষেপে কৃষ্ণলীলা

শুকদেব বললেন, মহারাজ, দ্বারকাপুরী সমস্ত সম্পদে সমৃদ্ধ ছিল। কৃষ্ণ আর যাদবগণ সেই মনোরম পুরীতে সুখে বাস করতেন। সেখানকার অট্টালিকার মধ্যে বিদ্যুৎপ্রভা, নবযৌবনে কান্তিশালিনী উৎকৃষ্টবেশা রমণীরা সানন্দে কন্দুক-ক্রীড়া করত। মদস্রাবী হাতী, সুন্দর অলংকৃত যোদ্ধা, সোনার রথ ও অশ্বে সেই পথসমূহ সব সময় পূর্ণ থাকত। সেখানকার বনে-বাগানে চারিদিকে ফুলের গাছে পাখীরা বসে কূজন করত। শ্রীপতি শ্রীকৃষ্ণ নিজের সেই পুরীতে বাস করে ষোল হাজার পত্নীর একমাত্র বল্লভ হয়ে ষোল হাজার মূর্তিতে তাদের গৃহে বিহার করতেন। কখন কখন তিনি প্রস্ফুটিত উৎপল, কহ্লার, কুমুদ ও পদ্মের রেণুপুঞ্জে বাসিত সরোবরের জলে স্নান করে অলিকুলের কূজন শুনতে শুনতে সেই সমস্ত মহিলাদের দ্বারা আলিঙ্গিত ও তাদের স্তনলিপ্ত কুংকুমে রঞ্জিত হয়ে বিহার করতেন। ১-৭

নদীর তটে তরুশাখায় পাখীরা গান করত। গন্ধর্বরা মৃদঙ্গ, পণব ও ঢাক বাজাত আর সূত, মাগধ ও বন্দীরা শ্রীকৃষ্ণের গুণগান করত। সেই সকল স্ত্রী রেচকযন্ত্র (পিচকারি) দ্বারা অচ্যুতকে সেচন করতেন, তিনিও তাঁদের সেচন করে যক্ষীদের সঙ্গে যক্ষরাজের মত ক্রীড়া করতেন। সেচন করতে করতে তাঁদের কাপড় ভিজে যেত, সুতরাং তাঁদের উরুদেশ ও বক্ষঃস্থল প্রকাশিত হয়ে পড়ত আর কবরী থেকে ফুল খসে পড়ত। এসময়ে তাঁরা কান্তের প্রতি জলসেচন করতে করতে তাঁর পিচকারিটি কেড়ে নিতে গিয়ে কান্তকে আলিঙ্গন করতেন। তখন কাম উদ্দীপিত হওয়াতে যে আনন্দ হত, তাতে তাঁদের বদন উৎফুল্ল হয়ে তাঁদের দেহ-শোভা বেড়ে উঠত। শ্রীকৃষ্ণ সেচন করতে করতে যুবতীদের দ্বারা অভিষিক্ত হয়ে হস্তিনীদের দ্বারা বেষ্টিত হস্তিরাজের মত ক্রীড়া করতে থাকতেন। ঐ সকল যুবতীদের স্তনলগ্ন হওয়ায় তাঁর মালা স্তনকুংকুমে লিপ্ত হত এবং ক্রীড়াতে যে অভিনিবেশ হত, তাতে তাঁর কেশরাশির বন্ধনসকল কাঁপতে থাকত। শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর মহিষীরা নট, নর্তকী আর গীতবাদ্যোপজীবীদের ক্রীড়া-সময়োচিত অলংকার আর বস্ত্র দান করতেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এভাবে তাঁর গতি, আলাপ, হাস্য, পরিহাস, দৃষ্টি, ক্রীড়া আর আলিঙ্গন করতে করতে স্ত্রীদের চিত্ত হরণ করেছিলেন। যাঁরা কেবল মুকুন্দেই চিত্ত স্থাপন করেছিলেন সে সকল স্ত্রীগণ কমললোচনকে চিন্তা করতে গিয়ে উন্মত্তের মত প্রগল্ভ বাক্যসকল বলতেন। আমি সেই সকল বাক্য বলছি শোন। ৮-১৪

তাঁরা বলতেন, সখি কুররি, এখন রাত্রিতে শ্রীকৃষ্ণ নিজ স্বরূপ গোপন রেখে গাঢ়নিদ্রায় অভিভূত, আমরা তাঁর নিদ্রাভঙ্গ করছি মনে করে তুমি বিলাপ করছ? তোমার তো নিদ্রা নেই, তাই শুতে যাচ্ছ না। সখি, কমললোচনের হাস্যশোভিত উদার লীলাকটাক্ষ দ্বারা কি আমাদের মত তোমারও চিত্ত গাঢ়রূপে বিদ্ধ হয়েছে? আহা, চক্রবাকি, তুমি নিজ প্রিয়ের দর্শন না পেয়ে রাত্রে চোখ বুজছ না কেন? করুণভাবে কাঁদছ কেন? অথবা তুমিও কি দাসীভাব প্রাপ্ত আমাদের মত অচ্যুতের চরণসেবিত মালা কবরীতে ধারণ করবার জন্য কাঁদছ? তুমি সর্বদা শব্দ করছ। তোমার ঘুম হচ্ছে না, এই জন্যই কি জেগে আছ? অথবা মুকুন্দ তোমার কৌস্তুভাদি চিহ্ন হরণ করাতে আমাদের মত তোমারও দুঃখের দশা উপস্থিত? চন্দ্র, তুমি কি নিদারুণ যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হয়ে ক্ষীণ হয়েছ? সেজন্যই কি তুমি আপন কিরণ-

জাল দ্বারা অন্ধকার নাশ করতে পারছ না ? অথবা, শশধর, আমাদেরই মত মুকুন্দের কথা বিস্মৃত হয়েই কি তুমি মৌন হয়েছ ? বাক্যহীন তোমাকে দেখে আমাদের সেরূপই মনে হচ্ছে। মলয়ানিল, আমরা তোমার কি অপ্রিয়াচরণ করেছিলাম যে, তুমি গোবিন্দের কটাক্ষ দ্বারা ছিন্নভিন্ন আমাদের হৃদয়ে কন্দর্পকে পাঠাচ্ছ ? মেঘ, নিশ্চয়ই তুমি যাদবেন্দ্রের প্রিয় ; এজন্যই প্রেমে আবদ্ধ হয়ে আমাদের মত শ্রীবৎসচিহ্নধারীকে চিন্তা করছ আর আমাদের মত তুমি সরল হৃদয়ে তাঁর কথা স্মরণ করে অতি উৎকণ্ঠাবশে চোখের জল ফেলছ ! ১৫-২০

কোকিল, তুমি এই মৃতসঞ্জীবন স্বর দ্বারা প্রিয়ংবদ শ্রীকৃষ্ণের সুন্দর কথার মত শব্দবিন্যাস করছ। রমণীয়কণ্ঠ, আমাকে বল, আজ আমি তোমার কি প্রিয়সাধন করব ? ভূধর, তোমার খুব বুদ্ধি, এই জন্য তুমি বুঝি কোন গুরুতর বিষয় চিন্তা করছ। তোমার সাড়া নেই, সংজ্ঞা নেই, মুখে কথা নেই। অথবা, তুমি কি আমাদের মত বসুদেবনন্দনের পাদপদ্ম শৃঙ্গরূপ স্তন দ্বারা বহন করতে ইচ্ছা করছ ? সিন্ধুপত্নী নদীসকল, তোমাদের গভীর হ্রদ শুকিয়ে গেছে, তাই তোমরা কমলশোভাশূন্য হয়ে অতি কৃশ হয়েছ। এই দারুণ গ্রীষ্মে প্রিয় সমুদ্র তোমাদের আনন্দ দানে বিরত হয়েছে। আমরা যেমন অভীষ্ট স্বামী যদুপতির প্রেমদৃষ্টি না পেয়ে শুষ্কহৃদয় ও কৃশ হয়ে থাকি, তোমরাও অনুরূপ কৃশ হয়েছ। হংস, তোমার আগমন সুখের হল তো ? বস, একটু দুধ পান কর। অহো, কৃষ্ণের খবর বল। বোধ করছি, তুমি দূত ; সৌহার্দ যাঁর স্থির থাকে না, সেই শ্রীকৃষ্ণ সুখে আছেন তো ? পূর্বে তিনি আমাদের যে কথা বলেছিলেন, তা একবারও কি মনে করে থাকেন ? আমরা তাঁকে কেমন করে ভজনা করব ? হে ক্ষুদ্র দূত, একা লক্ষ্মীই কি তাঁকে ভজনা করেন ? সেই লক্ষ্মীকে না নিয়ে কামপ্রদ শ্রীকৃষ্ণকে এখানে ডেকে আন। রমণীদের মধ্যে লক্ষ্মীই কি একমাত্র কৃষ্ণপরায়ণা ? কেন, আমরাও তো আছি।[১] ২১-২৪

শুকদেব বললেন, মহারাজ, যোগেশ্বরদের ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে এভাবে ভক্তিভাব স্থাপন করে তাঁর মহিষীরা বৈষ্ণবী গতি লাভ করেছিলেন। যিনি যে কোন ব্যক্তিদের দ্বারা যে কোন প্রকারে গীত হয়ে অথবা যিনি নানারকমে বহুজনের দ্বারা কীর্তিত হয়ে শ্রুতমাত্রেই কামিনীদের মন হরণ করেন, যে কোন মহিলা তাঁকে দেখামাত্রই যে তাঁতে অনুরক্ত হবেন, সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি ? যাঁরা স্বামিবুদ্ধিতে চরণ-সেবা দ্বারা প্রেমসহকারে জগদ্‌গুরুকে অর্চনা করেছিলেন তাঁদের তপস্যা আর কি বর্ণনা করব ? সাধুদের গতি শ্রীকৃষ্ণ বেদোক্ত ধর্ম এভাবে অনুষ্ঠান করে গৃহস্থাশ্রমীদের ধর্ম, অর্থ ও কাম এই তিনটি পুরুষার্থের পথ বারংবার দেখিয়েছিলেন। গৃহস্থাশ্রমীদের পরমধর্ম আচরণকারী শ্রীকৃষ্ণের ষোল হাজার একশ আটজন মহিষী ছিলেন। স্ত্রীরত্নরূপা সেই সকলের মধ্যে রুক্মিণী প্রভৃতি প্রধান আটজনের বিষয় পূর্বে উল্লেখ করেছি, তাঁদের পুত্রদের কথাও আনুপূর্বিকভাবে বলেছি। অমোঘরতি ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ নিজের প্রত্যেক স্ত্রীর গর্ভে দশটি করে পুত্রের জন্ম দিয়েছিলেন। ২৫-৩১

সেই সমস্ত উদ্দামবীর্য পুত্রদের মধ্যে আঠারোজন বিপুলযশা মহারথী ছিলেন। আমার কাছে সেই মহারথীদের নাম আপনি শুনুন। এঁরা হলেন প্রদ্যুম্ন,

[১] কৃষ্ণবিরহে রমণীগণের এই আকুলতা প্রকাশ পেয়েছে তাদের বিভিন্ন প্রাকৃতিক স্থাবর-জঙ্গম পদার্থকে দূত হিসাবে গ্রহণ করে। মহাকবি কালিদাস তাঁর 'মেঘদূত' কাব্য রচনায় ভাগবত গ্রন্থ থেকে যে যথেষ্ট অনুপ্রেরণা পেয়েছেন সেকথা বলা চলে। সেখানেও বিরহী যক্ষের আকুতি প্রাকৃতিক দূত মেঘের মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে।

অনিরুদ্ধ, দীপ্তিমান, ভানু, সাম্ব, মধু, বৃহদ্ভানু, ভানুবিন্দ, বৃক, অরুণ, পুষ্কর, বেদবাহু, শ্রুতদেব, সুনন্দন, চিত্রবাহু, বরূথ, কবি ও ন্যগ্রোধ। পিতার সমকক্ষ রুক্মিণীনন্দন প্রদ্যুম্ন শ্রীকৃষ্ণের এই পুত্রদের মধ্যেও শ্রেষ্ঠ। সেই মহারথ প্রদ্যুম্ন রুক্মীর কন্যা রুক্মবতীকে বিবাহ করেছিলেন। প্রদ্যুম্নের ঔরসে সেই পত্নীর গর্ভে অযুত নাগের বলসমন্বিত অনিরুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেছিলেন। অনিরুদ্ধ দৌহিত্র হয়েও রুক্মীর পৌত্রী রোচনাকে বিবাহ করেন। রোচনার গর্ভে অনিরুদ্ধের ঔরসে বজ্রের জন্ম হয়। মৌষল যুদ্ধের পর যদুবংশে একমাত্র বজ্রই অবশিষ্ট ছিলেন। বজ্রের ঔরসে প্রতিবাহু উদ্ভূত হন, সুবাহু তাঁর ছেলে। সুবাহু থেকে উপসেনের জন্ম হয়, তাঁর পুত্র ভদ্রসেন। এই কুলে যাঁরা জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তাঁরা কেউই ধনহীন, অল্পসন্তানযুক্ত, অল্পায়ু অল্পবীর্য বা ব্রাহ্মণের অহিতকারী হননি। ৩২-৩৯

যদুবংশ-প্রসূত যশস্বী পুরুষদের সংখ্যা একশ বছর বলেও শেষ করা যায় না। শুনেছি সেই অসংখ্য অপরিমিত কুমারদের অধ্যাপনার জন্য তিন কোটি আট হাজার আটশ জন যদুকুলের আচার্য ছিলেন। মহাত্মা যাদবদের সংখ্যা কে গুনতে পারবে? এই কুলে রাজা উগ্রসেন আহুক সর্বদা অযুতগণ অযুতলক্ষ যাদবদের সঙ্গে থাকতেন। যে সকল নিদারুণ দৈত্য দেবাসুরের যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করে তারা মানুষের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে মদগর্বে গর্বিত হয়ে প্রজাপীড়ন করত। তাদের শান্তিবিধানের জন্য শ্রীহরির আদেশে দেবতারা যদুকুলে জন্ম নেন। তাঁদের একশ এক কুল ছিল। ভগবান শ্রীহরি ঐ যদুকুলের পরিচালক প্রভুরূপে ছিলেন। যাদবেরা সকলেই শ্রীকৃষ্ণের অনুবর্তী হয়ে বৃদ্ধি পান। ৪০-৪৫

শ্রীকৃষ্ণচিত্ত যাদবেরা শোয়া, বসা, বেড়ান, আলাপ, খেলা, স্নান আর ভোজন বিষয়ে আপনাদের অস্তিত্বই বুঝতে পারতেন না। মহারাজ, পূর্বে গঙ্গাই সর্বশ্রেষ্ঠ তীর্থ ছিলেন, এখন যদুবংশে অবতীর্ণ শ্রীকৃষ্ণের কীর্তিরূপ তীর্থ যদুকুল যে তাঁর নিজের পাদ্যরূপ গঙ্গাতীর্থকে খর্ব করে সর্বশ্রেষ্ঠ হয়েছে, এ আর আশ্চর্য কি? শ্রীকৃষ্ণের শত্রু এবং মিত্ররাও যে তাঁর সারূপ্য লাভ করবে, এও খুব বিস্ময়ের নয়। যাঁকে লাভ করবার জন্য ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবতাদেরও চেষ্টার বিরাম নেই সেই দুর্লভ ও পরিপূর্ণা লক্ষ্মীদেবী শ্রীকৃষ্ণেরই আশ্রিতা হয়েছিলেন। যাঁর নাম শুনলে বা উচ্চারিত হলে সকল অমঙ্গল কেটে যায়, যিনি সমস্ত ঋষিকুলে সেই সেই বংশের বিশিষ্ট ধর্ম প্রবর্তিত করেছিলেন এবং কালচক্র যাঁর অস্ত্র, সেই শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক পৃথিবীর ভার হরণ আশ্চর্যের বিষয় নয়। যিনি জীবদের আশ্রয়, দেবকীর গর্ভে জন্ম যাঁর সম্বন্ধে প্রচলিত কথামাত্র, যদুশ্রেষ্ঠরা যাঁর সেবক, নিজ বাহুবলে যিনি অধর্মকে সংহার করেন, যিনি স্থাবর ও জঙ্গমের সংসার-দুঃখ হরণ করেন এবং যিনি সুন্দর হাস্যোজ্জ্বল শ্রীমুখ দিয়ে ব্রজপুর-কামিনীদের মুক্তিপ্রদ কামভাব বর্ধিত করেন, তাঁর জয় হোক। যিনি নিজ প্রবর্তিত বর্ণাশ্রম বা ভক্তিরূপ ধর্মের রক্ষার জন্য নানারকম বিগ্রহ ধারণ করেছিলেন, ভগবানের সেই সেই লীলা-দেহের, বিশেষত যদুতিলক ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মনুষ্যলীলার অনুকারী কর্মসকল শুনলে মানুষের সকল কর্মের কলুষ বিনষ্ট হয়। যিনি পরমেশ্বরের চরণযুগল সেবা করতে ইচ্ছা করেন, তিনি সেই কর্মকথাসকল শুনবেন। রাজারাও যাঁর জন্য গ্রাম ছেড়ে বনে গিয়েছিলেন, সেই ভগবৎসেবাবৃত্তি দ্বারা সংবর্ধিত পরম রমণীয় মুকুন্দকথা শ্রবণ, কীর্তন ও চিন্তা দ্বারা মানুষ তাঁর সালোক্য লাভ করে আর দুরন্ত কালকে জয় করতে সমর্থ হয়। ৪৬-৫০

দশম স্কন্ধ ঃ বিষয়প্রসঙ্গ আলোচনা

নব্বইটি অধ্যায়বিশিষ্ট দশম স্কন্ধ ভাগবতের বৃহত্তম স্কন্ধ। এই স্কন্ধের নানা প্রসঙ্গের মধ্যে পাঠকের চিত্তকে বোধ হয় সব থেকে বেশী আবিষ্ট করে ভগবানের অনুপম লীলা-বিগ্রহের বর্ণনা। আবার তার মধ্যেও শ্রেষ্ঠ হল তাঁর শৈশব, বাল্য আর কৈশোর-লীলা যা নাকি সুগভীর মানবিক উপলব্ধির এক অতি অপরূপ প্রকাশ। শ্রীকৃষ্ণের জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই কংসভয়ে বসুদেব তাঁকে ঐ মহাদুর্যোগময় রাত্রিতে গোকুলের নন্দরাজগৃহে স্থানান্তরিত করলেন। সেখানে লীলাময় তাঁর স্বরূপ আবৃত রেখে এক সাধারণ মানবশিশুর মতই হাসিতে, অশ্রুতে, স্নেহে, ভালবাসায়, চাপল্যে শুধু যে যশোদার বিশাল মাতৃহৃদয়কেই বাৎসল্যের রসে পরিপূর্ণ করে তুলেছিলেন তা নয়, তিনি সমস্ত গোপরমণীরও নয়নের নয়ন, নীলমণি হয়ে উঠলেন। অধিক কি, ঐ বালক গোপ-পুরুষদের হৃদয়ও সম্পূর্ণই অধিকার করেছিলেন। ধর্ম-সংস্থাপন আর দুষ্কৃত-বিনাশের জন্য অবতীর্ণ ঈশ্বরকে মাঝে মাঝে তাঁর ঐশী শক্তি প্রকট করতে হয়েছে। কিন্তু অচিরেই আবার তিনি মানব শিশুটি হয়ে সকলের পরম আদরের ধন নন্দদুলালে পরিণত হয়েছেন। কিশোর শ্রীকৃষ্ণ গোপললনাগণের একচ্ছত্র হৃদয়াধিপতি। পরিপূর্ণ আত্মনিবেদনের পথেই গোপীরা পরমাত্মস্বরূপকে লাভ করেছেন। যৌবনে শ্রীকৃষ্ণ মহিমান্বিত যদুকুল-শ্রেষ্ঠ, শৌর্যে-বীর্যে অতুলনীয় দ্বারকাধীশ।

মাটির পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়ে পরমপুরুষের এই যে স্নেহে, প্রেমে, ভালোবাসায় মানুষের আত্মার আত্মীয় হয়ে যাওয়া এটি একটি বিরল অনুভূতি। যমুনাপুলিনে অরণ্যে, প্রান্তরে বীরশ্রেষ্ঠ দিব্য কিশোর নায়কের নানা দুঃসাহসী কীর্তি, চন্দ্রালোকিত রজনীতে তাঁর প্রাণ-আকুল-করা মোহন বংশীধ্বনি, গোপীগণের ব্যাকুল প্রেম-ভিক্ষা, তাঁদের উৎকণ্ঠা, হর্ষ, মিলন, বিরহ সব মিলিয়ে এক অতি বিচিত্র চিত্রশালার দ্বারা পাঠকের কাছে উন্মোচিত হয়েছে। প্রকৃতিও এখানে তার উপযুক্ত স্থান গ্রহণ করেছে। ঋতুতে ঋতুতে প্রকৃতির বেশ পরিবর্তন ও মানবচিত্তে তার প্রভাব বর্ষা আর শরৎ বর্ণনার মধ্য দিয়ে অতি সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে। লঘুর সঙ্গে গুরু বিষয়ের সংমিশ্রণে অসংখ্য উপমার প্রয়োগে বর্ণনাটি স্নিগ্ধ কৌতুকরসে সিঞ্চিত ও অতি উপভোগ্য হয়েছে।

শ্রীকৃষ্ণলীলার যে অমিয় রসধারা ভাগবতের দশম স্কন্ধে স্বতঃই উৎসারিত হচ্ছে তা আবহমান কাল ভারতবাসীর হৃদয়কে অশেষ মাধুর্যে পরিপ্লুত করেছে। তার জীবনে, কর্মে, শিল্পে, সাহিত্যে শ্রীকৃষ্ণ এক সর্বব্যাপী চরিত্র।

একাদশ স্কন্ধ

প্রথম অধ্যায়

যদুবংশের প্রতি ঋষিদের অভিশাপ

শুকদেব রাজা পরীক্ষিৎকে বললেন, মহারাজ, শ্রীকৃষ্ণ অগ্রজ বলরাম ও যদুগণ দ্বারা পরিবৃত হয়ে পূতনা, কংস প্রভৃতি দৈত্যদের বধ করে এবং রাজাদের মধ্যে এক বিষম কলহ সৃষ্টি করে পৃথিবীর ভার হরণ করেন। দুর্যোধন ইত্যাদি শত্রুগণ কপট পাশা খেলা, অবজ্ঞা প্রদর্শন, দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ প্রভৃতি দ্বারা পাণ্ডুপুত্রদের অন্তরে ক্রোধের সঞ্চার করেছিল। ভগবান সেই পাণ্ডবগণকে নিমিত্ত করে উভয়পক্ষে সমবেত রাজন্যবর্গের সংহার করলে পৃথিবী ভারমুক্ত হয়। কিন্তু নিজ বাহুবলে রক্ষিত যাদবগণ ভূমণ্ডলের ভারস্বরূপ রাজাদের ও তাদের সৈন্যদের বধ করলেও ভগবান বাসুদেব চিন্তা করতে লাগলেন—আমার মনে হচ্ছে পৃথিবীর ভার এখনও লাঘব হয়নি, কারণ, মহাপরাক্রমশালী যদুকুল এখনও বর্তমান। তারা আমার আশ্রিত এবং বীর্য, ঐশ্বর্য ও অস্ত্র-শস্ত্রের উৎকর্ষ লাভ করেছে; কেউ এদের পরাভূত করতে পারবে না। সুতরাং এদের মধ্যে আত্মকলহ সৃষ্টি করে বেণুবনে দাবাগ্নির মতই সকলকে বিনাশ করে শান্ত হব এবং নিজধাম বৈকুণ্ঠে ফিরে যাব। সত্যসংকল্প ভগবান এভাবে মনস্থির করে ব্রাহ্মণগণের শাপের ছলে নিজের কুলনাশ করেছিলেন। ১-৫

তিনি মোহনমূর্তি প্রকাশ করে জগতের সমস্ত লাবণ্য ম্লান করেছিলেন। তাঁর সেই মূর্তি যাঁরা দেখেছেন, তাঁদের দৃষ্টি অন্য কোন দর্শনীয় বস্তুর প্রতি নিবিষ্ট না হয়ে শুধু তাঁর দিকেই আকৃষ্ট হয়ে থাকত। তাঁর মধুর বাক্য জীবমাত্রেরই চিত্ত আকর্ষণ করত এবং তাঁর চরণলাঞ্ছিত ধ্বজবজ্রাদি চিহ্ন দর্শন করে লোক যাবতীয় কর্ম থেকে নিবৃত্ত হত। তাঁর কীর্তির কথা শ্রবণ, কীর্তন, মননাদির দ্বারা ভবিষ্যতে মানুষ ভবসমুদ্র অনায়াসে পার হতে পারবে। তাই ভগবান পৃথিবীতে কবিগণের দ্বারা শ্রুতিমধুর কীর্তিকলাপ বিস্তার করে স্বস্থানে গমন করেন। ৬-৭

রাজা বললেন, যদুগণ ব্রাহ্মণভক্ত, বদান্য এবং বৃদ্ধদের সর্বদা সম্মান করেন। তাঁরা নিয়ত কৃষ্ণপরায়ণ; এমন অবস্থায় তাঁরা কেমন করে ব্রহ্মশাপগ্রস্ত হলেন? দ্বিজবর, যেরূপে যে কারণে তাদের ওপর এই অভিসম্পাত হয়েছিল এবং একাত্মা যাদবগণের মধ্যে বিভেদ ঘটেছিল আপনি সে বিষয়ে আমাকে বলুন। ৮-৯

শুকদেব বললেন, পূর্ণকাম উদারকীর্তি শ্রীকৃষ্ণ যাবতীয় সুন্দর বস্তুর আধারস্বরূপ মোহনমূর্তি প্রকাশ করে নানা শুভকর কর্ম সম্পন্ন করে পৃথিবীর ভার হরণ করেন। তিনি গৃহে থেকে নানাবিধ লীলা দ্বারা অবশিষ্ট কুলসংহারের ইচ্ছা করলেন। তাঁর সকল কর্মই পুণ্যপ্রদ ও সুমঙ্গল। বসুদেবের গৃহে থেকে তিনি এসকল কাজ সম্পন্ন করেছিলেন। সে সময়ে তিনি যজ্ঞার্থে আহূত বিশ্বামিত্র, অসিত, কণ্ব, দুর্বাসা, ভৃগু, অঙ্গিরা, কশ্যপ, বামদেব, অত্রি, বশিষ্ঠ, নারদ প্রভৃতি মুনিগণের দ্বারা যাবতীয় মঙ্গলজনক কাজ শেষ করে তাঁদের দ্বারকার নিকট পিণ্ডারক

তীর্থে পাঠিয়ে দিলেন। সেই পিণ্ডারক তীর্থের কাছেই যদুবংশের অশিষ্ট কুমারেরা একদিন খেলা করছিল। তারা ঋষিদের দেখে জাম্ববতীপুত্র সাম্বকে স্ত্রীবেশে সাজিয়ে তাঁদের নিকট উপস্থিত হল এবং বিনীত হয়ে তাঁদের চরণ ধরে জিজ্ঞাসা করল, সর্বদর্শী ব্রাহ্মণগণ, এই কৃষ্ণলোচনা গর্ভবতী নারী পুত্র-প্রার্থিনী হয়েছেন, কিন্তু আপনাদের জিজ্ঞাসা করতে লজ্জাবোধ করছেন। তাই আমাদের দিয়ে জিজ্ঞাসা করছেন, এর গর্ভে কি সন্তান জন্মাবে? ১০-১৫

মহারাজ, এইভাবে প্রতারিত হয়ে ক্রুদ্ধ মুনিগণ বলে উঠলেন, ওহে মূর্খগণ, এ তোমাদের কুলনাশক এক মুষল প্রসব করবে। একথা শুনে কুমারগণ অত্যন্ত ভয় পেলো এবং তখনি সাম্বের দেহের আবরণ-বস্ত্র খুলে সত্যই এক লৌহময় মুষল দেখতে পেলো। তখন তারা 'মন্দভাগ্য আমরা কি সর্বনাশ করেছি, লোকে আমাদের কি বলবে'—এই চিন্তায় অত্যন্ত বিহ্বল হয়ে সেই মুষলটি নিয়ে বাড়ী ফিরে গেল। পরে তারা মুষলটি গ্রহণ করে ম্লানমুখে সভাস্থলে উপস্থিত হল এবং সেখানে সমবেত যাদবদের নিকট সেই মুষল দেখিয়ে রাজা উগ্রসেনকে সব কথা নিবেদন করল। অমোঘ ব্রহ্মশাপের বিষয় শুনে এবং মুষলটি দেখে দ্বারকাবাসীরা সকলেই ভয়ে বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে গেল। যদুরাজ উগ্রসেন শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা না করেই সেই মুষল চূর্ণ-বিচূর্ণ করে চূর্ণাবশিষ্ট লোহখণ্ড সমেত সবকিছুই সমুদ্রের জলে নিক্ষেপ করলেন। কিন্তু কোন এক মাছ সেই চূর্ণ লোহখণ্ড খেয়ে ফেলল এবং অবশিষ্ট চূর্ণাংশগুলি তরঙ্গপ্রবাহে ভেসে এসে সমুদ্রতীরে সংলগ্ন হল। সেগুলি থেকে এরকা (নলখাগড়া) নামক এক জাতীয় তৃণ সৃষ্টি হল। যে মাছ লোহখণ্ড গ্রাস করেছিল সেও অন্যান্য মাছের সঙ্গে এক জেলের জালে ধরা পড়ল এবং জেলে তাকে টেনে তীরে তুলল। জরা নামক এক ব্যাধ সেই মাছের পেটের ভিতর লোহখণ্ডটি পেয়ে তা দিয়ে তার বাণের অগ্রভাগ নির্মাণ করল। সকল বিষয়ে অভিজ্ঞ হয়েও ভগবান ব্রহ্মশাপের অন্যথা করতে ইচ্ছা করলেন না; বরং তিনি কালরূপী হয়ে সেই ব্রহ্মশাপের অনুমোদনই করলেন। ১৬-২৪

দ্বিতীয় অধ্যায়

নারদ-বসুদেব সংবাদ

শুকদেব বললেন, কুরুকুল-তিলক, দেবর্ষি নারদ শ্রীকৃষ্ণকে সর্বদা দর্শনের লালসায় তাঁর (শ্রীকৃষ্ণের) শাসিত দ্বারকায় বাস করতেন। ইন্দ্রিয়সম্পন্ন মরণশীল কোন্‌ ব্যক্তি দেবশ্রেষ্ঠদেরও উপাস্য মুকুন্দের চরণকমল ভজনা করতে পরাঙ্মুখ হবে? একদিন দেবর্ষি নারদ বসুদেবের গৃহে উপস্থিত হলে বসুদেব তাঁর অর্চনা করলেন এবং নারদ সন্তুষ্ট হয়ে বসলে তাঁকে অভিবাদন করে বললেন, ভগবন্‌, পিতামাতার শুভাগমন যেমন পুত্রগণের পক্ষে কল্যাণকর তেমনই আপনাদের মত ভগবৎ-স্বরূপ মহামনা ব্যক্তিদের শুভাগমন ত্রিতাপদগ্ধ জীবের পক্ষে মঙ্গলজনক। দেবতাদের আচরণ প্রাণীমাত্রের পক্ষেই সুখ ও দুঃখের কারণ হয়ে থাকে, কিন্তু আপনাদের মতো ভগবদ্‌ভক্ত পুরুষের আচরণ কেবল সুখেরই হয়ে থাকে। দেবতারা কর্মের বাধ্য; মানুষরা যেভাবে তাঁদের ভজনা করে তাঁরা ছায়ার মতো তাদের কর্মানুসারে সেরূপ ফলই দিয়ে থাকেন। কিন্তু সাধুগণ দীনবৎসল; তাঁরা

কোন কর্মের অপেক্ষা না করেই জীবের মঙ্গলবিধান করেন। তথাপি যা শ্রদ্ধার সঙ্গে শুনলে মানুষ ভয় থেকে অনায়াসে মুক্তিলাভ করে, আমি আপনাকে সেই ভাগবত ধর্মের বিষয় জিজ্ঞাসা করছি। আমি নিশ্চয়ই ভগবানের মায়ায় মোহিত হয়ে মোক্ষদাতা অনন্তদেবকে শুধু পুত্রলাভের জন্যেই আরাধনা করেছি, মোক্ষলাভের জন্য নয়। সুব্রত, আপনাদের নিমিত্ত করে আমি যাতে ভয় ও দুঃখসংকুল এই সংসার-সাগর থেকে অনায়াসে মুক্তিলাভ করতে পারি আমাকে সুস্পষ্টভাবে সেই শিক্ষা দিন। ১-৯

শুকদেব বললেন, ধীমান বসুদেবের এই প্রশ্ন শুনে নারদ সন্তুষ্ট হলেন। শ্রীহরির গুণকথায় তাঁর চিত্তেও ভগবানের গুণরাশির উদয় হল। ১০

নারদ বললেন, ভক্তশ্রেষ্ঠ, তুমি যে সর্বপাপ-ক্ষয়কর ভাগবতধর্ম বিষয়ক প্রশ্ন করেছ তা অতি উত্তম ও অবশ্যকর্তব্য। এই ভাগবত ধর্ম শুধু গুরুমুখে শ্রুত; পঠিত, চিন্তিত, আস্তিক্য বুদ্ধিতে আদৃত ও অনুমোদিত হলেও তাতে বিশ্ব-সংসারের বিরুদ্ধাচারী, এমন কি দেবদ্রোহী ব্যক্তিও সদ্য পবিত্র হতে পারে। আমার ভাগ্য ভাল যে তুমি আজ আমাকে পরমকল্যাণময়, পুণ্যশ্রবণ, পুণ্যকীর্তন ও নানা লীলাময় নারায়ণের কথা স্মরণ করিয়ে দিলে। এই বিষয়ে ঋষভের পুত্রগণের সঙ্গে (নয়জন ব্রহ্মর্ষির) মহাত্মা নিমিরাজের কথোপকথন বিষয়ক এক পুরাতন কাহিনীর কথা আমি বলছি, শুনুন। স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র প্রিয়ব্রত। তাঁর পুত্র অগ্নীধ্র, তাঁর পুত্র নাভি। এই নাভির পুত্রই ঋষভ নামে খ্যাত। বন্ধুগণের পরিকীর্তিত ঋষভদেব মোক্ষধর্মের উপদেশ দেবার জন্যে বাসুদেবের অংশে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তাঁর ব্রহ্মবিদ্যায় পারদর্শী শতপুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁদের মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠ ভরত নারায়ণের পরম ভক্ত ছিলেন। যে বর্ষ (ভূখণ্ড) পূর্বে 'অজনাভ' নামে পরিচিত ছিল সেই বর্ষই ভরতের নামানুসারে 'ভারতবর্ষ' নামে বিখ্যাত হয়েছে। তিনি রাজ্যভোগের পর বৈরাগ্য অবলম্বন করে ঘর থেকে বের হন, তপস্যার দ্বারা শ্রীহরির অর্চনা করেন এবং তৃতীয় জন্মের পরে তাঁর পদবী লাভ করেন। ঋষভের পুত্রগণের মধ্যে ভারতের অন্তর্গত নিজ নামে খ্যাত নয়টি ভূখণ্ডের[১] অধিপতি হন। একাশিটি পুত্র কর্মকাণ্ডের প্রণেতা ব্রাহ্মণ হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ১১-১৯

অবশিষ্ট নয়জন আত্মবিদ্যার অভ্যাসে বিশেষ শ্রম স্বীকার করে অধ্যাত্মবিদ্যায় বিচক্ষণ মুনি হয়ে দিগম্বর বেশে সর্বত্র বিচরণ করতেন। তাঁদের নাম কবি, হরি, অন্তরিক্ষ, প্রবুদ্ধ, পিপ্পলায়ন, আবির্হোত্র, দ্রুমিল, চমস ও করভাজন। তাঁরা আত্ম-নির্বিশেষে স্থূল-সূক্ষ্মাত্মক এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে ভগবৎস্বরূপ প্রত্যক্ষ করে পৃথিবী পর্যটন করতেন। তাঁদের অবাধ গতি ছিল। তাঁরা অনাসক্ত অবস্থায় দেবতা, সিদ্ধ, সাধ্য, গন্ধর্ব, যক্ষ, নর, কিন্নর ও নাগলোকে এবং মুনি, চারণ, ভূতনাথ, বিদ্যাধর, দ্বিজ ও গোসমূহের বিহারস্থানে যথেচ্ছ বিচরণ করতেন। একবার ভারতবর্ষে ঋষিগণ মহাত্মা নিমির যজ্ঞের অনুষ্ঠান করছিলেন। এমন সময় তাঁরা যদৃচ্ছাক্রমে বিচরণ করতে করতে সেই যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হলেন। সূর্যের মত তেজস্বী সেই মহাভাগবত মুনিদের দেখে যজমান, হুতাশন ও ব্রাহ্মণগণ সকলেই উঠে দাঁড়ালেন। বিদেহরাজ নিমি তাঁদের দেখেই নারায়ণের পরমভক্ত বলে বুঝতে পারলেন ; তিনি প্রফুল্লচিত্তে তাঁদের যথাযোগ্য আসনে উপবেশন করিয়ে যথারীতি

১ সেই নয়টি ভূখণ্ড কুশাবর্ত, ইলাবর্ত, ব্রহ্মাবর্ত, মলয়, কেতু, ভদ্রসেন, ইন্দ্রস্পৃক্, বিদর্ভ ও কীকট নামে পরিচিত।

তাঁদের পূজা করলেন। রাজা তখন হৃষ্টচিত্তে ব্রহ্মপুত্র সনকাদি ঋষিগণের মত স্ব স্ব প্রভায় দীপ্যমান সেই নয়জন মুনিকে বিনীত বচনে জিজ্ঞাসা করলেন, আমার মনে হচ্ছে আপনারা সাক্ষাৎ মধুকৈটভ-ধ্বংসী শ্রীভগবানের পার্ষদ। আপনাদের ন্যায় বিষ্ণুভক্তগণ জীবলোককে পবিত্র করার জন্যে সর্বত্র বিচরণ করেন। মানবদেহ ক্ষণভঙ্গুর হলেও দুর্লভ; কিন্তু সেই দেহে বিষ্ণুর প্রিয় ভক্তগণের দর্শন আরো দুর্লভ। অতএব পূতচরিত্র মহাত্মাগণ, আপনাদের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল জিজ্ঞাসা করি, এই জন্ম-মৃত্যুময় সংসারে ক্ষণকালের জন্য হলেও আপনাদের ন্যায় সাধুসঙ্গ অপূর্ব নিধিস্বরূপ। যে ধর্মের দ্বারা ভগবান বিষ্ণু প্রীত হয়ে শরণাগত ভক্তকে আত্মস্বরূপ পর্যন্ত দান করেন, সেই ধর্ম আমাদের শ্রবণযোগ্য বলে আপনারা তা কীর্তন করুন। ২০-৩১

নারদ বললেন, বসুদেব, নিমির প্রশ্ন শুনে সেই মহামনা মুনিগণ সদস্য ও ঋত্বিকগণ পরিবৃত রাজাকে যথোচিত সম্মান ও প্রীতি সহকারে বলতে আরম্ভ করলেন। কবি বললেন, মহারাজ, আমার স্থির বিশ্বাস এই সংসারে নিয়ত অচ্যুতের চরণকমলের উপাসনাই অকুতোভয় (ভয়শূন্য) হবার একমাত্র উপায়, কারণ, ভগবানের উপসনাতেই সকল প্রকার ভয়ের নিবৃত্তি হয়।[১] এমন কি, অনিত্য ও অসৎ এই দেহাদিতে আত্মবুদ্ধিবশত যারা নিরন্তর উদ্বিগ্ন এই চরণসেবার দ্বারা তাদেরও ভয় নিবারণ হয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অজ্ঞ পুরুষদের আত্মোপলব্ধির জন্য যেসব উপায়ের কথা নিজমুখে বলেছেন তাই ভাগবত ধর্ম বলে জানবে। এই সকল উপায় আশ্রয় করলে মানুষের কখনও বিঘ্ন ঘটে না, মানুষ সংসার-পথে বিমোহিত হয় না, মুদ্রিত চক্ষে ধাবমান হলেও তার পদস্খলন বা পতন হয় না। দেহ, বাক্য, মন, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি, অহংকার অথবা সংস্কার ও স্বভাববশত মানুষ যে সব কর্ম করে সে সমস্তই নারায়ণকে সমর্পণ করা উচিত।[২] ভগবানের মায়া থেকেই ভয়ের উৎপত্তি, ঈশ্বরবিমুখ মানুষ অনাত্ম বস্তুতে আত্মবুদ্ধিবশত (অর্থাৎ দেহ, ঘরবাড়ি প্রভৃতিতে আসক্তির ফলে) ভীত হয়। তাই তাদের কাছে ভগবৎস্বরূপ প্রতিভাত হয় না; বরং তাদের বুদ্ধি-বিপর্যয় ঘটে। তাই জ্ঞানী ব্যক্তিরা পরমেশ্বরকে সাক্ষাৎ গুরু, দেবতা ও পরমাত্মজ্ঞানে ঐকান্তিক ভক্তির সঙ্গে ভজনা করেন। জগৎপ্রপঞ্চ মূলে মিথ্যা হলেও স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থ ও মনোরথের ন্যায় যথার্থ ও নিত্য বস্তুরূপে প্রতীয়মান হয়। সুতরাং যে মন সকল কর্মের সঙ্কল্প ও বিকল্পের হেতু তাকে বশ করাই বিবেকী ব্যক্তির প্রধান কর্তব্য।[৩] তা হলে আর ভয় থাকে না (মন হচ্ছে সংকল্প-বিকল্পাত্মক, আর বুদ্ধি হচ্ছে নিশ্চয়াত্মিকা)। চক্রপাণি শ্রীহরির পাপনাশক ও পুণ্যজনক জন্ম, কর্ম ও নাম জগতে গীত হয়ে থাকে। সাধু ভক্তজন লজ্জা ত্যাগ করে এই সকল নাম কীর্তন করে অনাসক্তভাবে সর্বত্র বিচরণ করেন। এভাবে আত্মপ্রিয় শ্রীহরির নামকীর্তন করতে করতে তাঁর অন্তরে অনুরাগের সঞ্চার হয়, হৃদয়ের আবেগে তিনি উন্মত্তের মত কখনো উচ্চহাস্য, কখনো ক্রন্দন, কখনো চীৎকার, কখনো গান, কখনো বা নৃত্য করে থাকেন। তিনি আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী, জ্যোতিষ্কমণ্ডলী, দিক্‌সমূহ, প্রাণিগণ, বৃক্ষাদি, নদী, সাগর, এবং চরাচর যে কোন পদার্থ

১ আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন ॥ তৈত্তিরীয় উপনিষদ, ২।৯।১

২ ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥—গীতা, ১২।১৪

৩ দ্রষ্টব্য: গীতা, ২।৪১ শ্লোক।

দর্শন করেন, সকলকেই শ্রীহরির স্বরূপবোধে প্রণাম করেন।[১] ভোজনকালে প্রতিগ্রাসেই যেমন দেহের পুষ্টি, মনের তুষ্টি ও ক্ষুধার নিবৃত্তি হয়, তেমনি ভগবানের শরণাগত ব্যক্তির একই সঙ্গে প্রেমলক্ষণা ভক্তি, ভগবৎ-স্বরূপের উপলব্ধি ও বিষয়ে বৈরাগ্য জন্মে। ভগবদ্‌ভক্তগণ অভ্যাস অনুসারে ভগবানের পাদপদ্ম ভজনা করলে তাঁদের মধ্যে ভক্তি, বৈরাগ্য ও ভগবৎ-স্বরূপের স্ফুরণ হয়; তাঁরা শেষে পরম শান্তি লাভ করেন।[২] ৩২-৪৩

রাজা বললেন, মানুষের মধ্যে কাকে ভাগবত বা ভক্ত বলা যায়? তাঁর ধর্ম কিরূপ? তাঁর স্বভাব, আচরণ ও উক্তিই বা কিরূপ? কোন কোন চিহ্নের দ্বারাই বা তাঁকে ভগবানের প্রিয় বলে জানা যায়? আপনি সবিস্তারে সে সব কথা বলুন।[৩] ৪৪

শ্রীহরি বললেন, যিনি সর্বভূতে ভগবদ্‌ভাব এবং পরমাত্মাতে সর্বভূত দর্শন করেন তিনিই ভাগবতোত্তম।[৪] যিনি ঈশ্বরে প্রেম, ঈশ্বরাধীন ভক্তের প্রতি মৈত্রীভাব, অজ্ঞানীর প্রতি কৃপা, ঈশ্বরদ্বেষী ও ভক্তদ্বেষী ব্যক্তির প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করেন, তিনি মধ্যম ভাগবত।[৫] যিনি ভগবানের সর্বব্যাপিত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে অসমর্থ হয়ে শ্রদ্ধাসহকারে প্রতিমাতে (শালগ্রামাদিতে) বিষ্ণুর অর্চনা করেন, অথচ তাঁর ভক্তগণের বা জগতের অন্য পদার্থের পূজা করেন না তিনি অধম ভক্ত (নিম্নস্তরের ভাগবত বা নিম্নাধিকারী)।[৬] নারায়ণে চিত্ত সমর্পিত থাকায় যিনি ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা বিষয়ভোগ করেও সুখে আনন্দিত বা দুঃখে বিষণ্ণ হন না[৭] এবং বিশ্বকে এক বিষ্ণুর মায়ারূপে দর্শন (নির্ধারণ) করেন, তিনিই প্রধান ভাগবত। হৃদয়মন্দিরে ভগবানের স্মৃতি সর্বদা জাগ্রত রেখে যিনি দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির ব্যাপারে মুক্ত হন না অর্থাৎ যিনি দেহের জন্ম ও বিনাশ, ইন্দ্রিয়ের শ্রমজনিত অবসাদ, প্রাণের ক্ষুধা ও তৃষ্ণা, মনের ভয় ও বুদ্ধির আকাঙ্ক্ষাকে সংসারের ধর্ম জেনে মুহ্যমান হন না তিনিই ভাগবত প্রধান। যাঁর চিত্তে বাসনা নেই এবং সংসারের বাসনাজনিত সংস্কারও নেই, একমাত্র বাসুদেবেই যিনি আত্মসমর্পণ করেছেন, তাঁকেই ভাগবতশ্রেষ্ঠ বলে জানবে।[৮] যাঁর হৃদয়ে উচ্চ বংশে জন্ম, পুণ্যকর্ম, উৎকৃষ্ট জাতিশ্রেষ্ঠ আশ্রম বা উৎকৃষ্ট বর্ণ হেতু অহংভাব (অহংকার) নেই তিনিই শ্রীহরির প্রিয়জন। ধন-সম্পত্তিতে, এমন কি নিজ দেহেও যাঁর আত্ম-পর ভেদজ্ঞান নেই, যিনি সর্বভূতে সমদর্শী ও জিতেন্দ্রিয় তিনি ভাগবতোত্তম।[৯] যিনি শ্রীহরির চরণকে সারাৎসার জেনে ত্রিভুবনের সাম্রাজ্যলাভের আশায় এক নিমেষের জন্যে বিচলিত হন না, দেবগণ বাঞ্ছিত ভগবানের চরণারবিন্দ থেকে ক্ষণেকের জন্যেও যাঁর চিত্ত স্খলিত হয় না, তিনিই বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ। চন্দ্রের আকাশে উদয় হলে যেমন সূর্যের তাপ নির্বাপিত হয়, তেমনি প্রভূত বিক্রমশালী ভগবানের পদযুগলের অঙ্গুলিস্থিত নখমণির স্নিগ্ধজ্যোতিতে সংসার-তাপক্লিষ্ট ব্যক্তির

১ বাংলার রজনীকান্তের গানে আছে :
'আছ অনলে অনিলে চির নভো নীলে ভূধরে সলিলে গহনে,
আছ বিটপী-লতায় জলদের গায় শশী তারকায় তপনে।'

২ বিহায় কামান্ যঃ সর্বান্ পুমাংশ্চরতি নিঃস্পৃহঃ।
নির্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি॥ গীতা, ২।৭১

৩ এ-প্রসঙ্গে গুণাতীত ব্যক্তির লক্ষণ সম্পর্কে শ্রীকৃষ্ণের নিকট অর্জুনের প্রশ্ন প্রণিধানযোগ্য (দ্রঃ গীতা, ১৪।২১)। ৪ তুলনীয় : ঈশ উপনিষদ-৬ এবং গীতা, ৬।২৯ ৫ ভগবদ্‌গীতা ১২।১৩
৬ ঐ, ৭।২০ ৭ ঐ, ২।৫৬ ও ২।৩৮ ৮ এরূপ গুণাতীত ব্যক্তির লক্ষণ সম্পর্কে শ্রীকৃষ্ণের উত্তর দ্রষ্টব্য (গীতা, ২।২২-২৫ ও ১২।১৩-১৪)। ৯ তুলনীয় : ঈশ উপনিষৎ ৬ ও গীতা, ৬।২৯-৩২

চিত্ত-সন্তাপ দূর হয়। বিবশভাবেও যাঁর নাম একবার করলে সকল পাপ দূর হয় সেই শ্রীহরির প্রেমে আবদ্ধ হয়ে যে ভক্তের হৃদয়মন্দির কখনো ত্যাগ করেন না, তাঁকেই ভাগবতশ্রেষ্ঠ বলে জানবে।[১] ৪৫-৫৫

তৃতীয় অধ্যায়

মায়াবন্ধন থেকে মুক্তির উপায়

রাজা নিমি বললেন, ভগবৎপরায়ণ ঋষিগণ, পরমপুরুষ পরমেশ্বর বিষ্ণুর অচিন্ত্য-শক্তিরূপা মায়ায় ব্রহ্মাদি মায়াবিগণও মোহিত হন। আমি সেই মায়াতত্ত্ব জানতে চাই। আমাকে এ বিষয়ে উপদেশ দিন। আমরা মর্তবাসী, সংসার-তাপে[২] একান্ত সন্তপ্ত। আপনাদের অমৃতময়ী হরিকথা সংসার-তাপের মহৌষধ। সে কথা যথেষ্ট শুনেও মন তৃপ্ত হচ্ছে না, শোনার আকাঙ্ক্ষা ক্রমশ বাড়ছে। অন্তরিক্ষ বললেন, হে মহাবাহু, মহাপরাক্রম বিষ্ণু অনাদি ও অনন্ত। তিনি অংশরূপে জীবদেহে প্রবেশ করে জীবরূপে পরিচিত হন।[৩] তিনি জীবগণের ভোগ ও মুক্তির জন্য পঞ্চ মহাভূতের দ্বারা উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট জীব (দেবতা, মনুষ্য ও পশুপক্ষী) সৃষ্টি করেছেন। এভাবে পঞ্চভূতের দ্বারা সৃষ্ট জীবদেহে অন্তরাত্মারূপে প্রবেশ করে তিনি প্রথম নিজেকে মনের অধিষ্ঠাতারূপে এবং পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্) ও পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়ের (বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ) অধিষ্ঠাতারূপে দশ প্রকারে বিভক্ত করে বিষয়ভোগ করছেন। সেই জীব ভগবৎ-প্রদত্ত চেতনায় চৈতন্যবান গুণরাশি দ্বারা উৎপন্ন ইন্দ্রিয় দিয়ে শব্দাদি বিষয় ভোগ করে এবং এই সৃষ্ট দেহকে আত্মজ্ঞান করে ভোগে আসক্ত হয়। জীব বাসনাজনিত কর্মদ্বারা পুণ্য ও পাপের কর্মফল ভোগ করে সংসারপথে বিচরণ করে। দেহধারী জীব এভাবে বিবিধ কর্মের ফলে মনুষ্য-তির্যগাদি গতি লাভ করে বিবশভাবে প্রলয়কাল পর্যন্ত জন্ম-মৃত্যুর স্রোতে ভাসতে থাকে। পঞ্চ-মহাভূতের বিনাশ যখন আসন্ন হয়, তখন অনাদি অনন্ত কাল স্থূল ও সূক্ষ্ম প্রপঞ্চকে তাদের কারণস্বরূপ অব্যক্ত প্রকৃতির দিকে আকর্ষণ করে। ১-৮

এসময় পৃথিবীতে শতবর্ষব্যাপী ভয়াবহ অনাবৃষ্টি হয়, আর সূর্যের প্রচণ্ড তাপে ত্রিভুবন উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। তখন সংকর্ষণের মুখ-নিঃসৃত অগ্নি প্রলয়পবনে চালিত হয়ে ঊর্ধ্বে শিখা বিস্তার করে পাতালতল থেকে আরম্ভ করে বিশ্বসংসার দগ্ধ করতে করতে সর্বদিকে ছড়িয়ে পড়ে। অবশেষে সংবর্তক মেঘগণ একশ বছর ধরে হস্তীশুঁড় প্রমাণ ধারা অবিরাম বর্ষণ করে; ফলে এই বিরাট বিশ্ব সেই সলিলে বিলীন হয়। বৈরাজ পুরুষ বিরাট কলেবর পরিত্যাগ করে ইন্ধনশূন্য অগ্নির মত আপনার অব্যক্ত স্বরূপে (প্রকৃতিতে বা সূক্ষ্ম কারণে) প্রবেশ করেন। সংবর্তক বায়ু পৃথিবীর গন্ধ হরণ করলে পৃথিবী জলে বিলীন হয়; রসগুণ অপহৃত হলে সেই জলও জ্যোতিতে পরিণত হয়, অন্ধকারের প্রভাবে জ্যোতির রূপাংশ অপহৃত হলে জ্যোতি বায়ুতে লয়প্রাপ্ত হয়। কারণ আকাশ (বা

---

১ বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ ।। গীতা, ৭।১৯

২ আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক—এই ত্রিবিধ তাপ

৩ মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ ।। গীতা, ১৫।৭

অবকাশ) কর্তৃক বায়ুর স্পর্শগুণ অপহৃত হলে বায়ুও আকাশে পরিণত হয় এবং কালরূপী ঈশ্বর আকাশের গুণ শব্দকে আকর্ষণ করলে আকাশ তামস অহংকারে লীন হয়ে যায়। তখন ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি রাজস অহংকারে, মন ও দেবতা-গণ সাত্ত্বিক অহংকারে এবং অহংকার স্বীয় গুণরাশির সঙ্গে মহৎ-তত্ত্বে প্রবেশ করে। তখন মহৎ-তত্ত্ব মূল প্রকৃতিতে বিলীন হয়। আমরা ভগবানের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার-কারিণী ত্রিগুণাত্মিকা মায়ার বিষয় বর্ণনা করলাম ; আপনি আর কোন বিষয় জানতে চান বলুন। ৯-১৬

নিমি বললেন, মহর্ষিগণ, যাঁরা অন্তঃকরণকে বশীভূত করতে পারেন নি, তাঁদের মত স্থূলবুদ্ধি ব্যক্তিগণ যাতে এই দুস্তর বৈষ্ণবী মায়া অনায়াসে পার হতে পারে, তা বর্ণনা করুন। ১৭

প্রবুদ্ধ বললেন, মানুষ দুঃখ-নিবারণ ও সুখলাভের কামনায় স্ত্রী-পুরুষে মিলিত হয়ে বিবিধ কর্মের অনুষ্ঠান করে থাকে, কিন্তু তারা বস্তুবিক পক্ষে বিপরীত ফলই ভোগ করে। বহু পরিশ্রমে অর্জিত বিত্ত, গৃহ, পুত্র, স্বজন, পশু প্রভৃতি সকলই ক্ষণভঙ্গুর, অনিত্য ও আত্মার পীড়াদায়ক। সুতরাং এইসকল বিষয়লাভে কি আনন্দ পাওয়া যায় ? আবার ইহলোকে সুখভোগ্য বিষয়ের মতো কাম্যকর্মের দ্বারা অর্জিত পরলোকও নশ্বর। মণ্ডলাধিপতি রাজগণ যেমন পরস্পরের প্রতি স্পর্ধা, প্রধানের প্রতি ঈর্ষা এবং ধ্বংসের আশংকায় ভীত হন, তেমনি পরলোকে গিয়েও মানুষ স্পর্ধা, অসূয়া ও ভয়ের হাত থেকে নিষ্কৃতি পায় না। অতএব নিজের প্রকৃত মঙ্গল সম্বন্ধে যিনি জানতে চান, তিনি শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্ম সম্পর্কে অভিজ্ঞ (বেদজ্ঞ ও ব্রহ্মজ্ঞানী), শান্তচিত্ত গুরুর শরণাগত হবেন। যে সকল ধর্মাচারণে শ্রীহরি তুষ্ট হন, গুরুকে আত্মা ও পরম দেবতাজ্ঞানে শ্রদ্ধা ও ভক্তির সঙ্গে অকপট সেবা দ্বারা সেই ভাগবত ধর্ম শিক্ষা করা কর্তব্য ; তা হলে শ্রীহরি ভক্তকে নিজের স্বরূপ পর্যন্ত সমর্পণ করেন।[১] সকল বিষয় থেকে মনকে সঙ্গহীন করে ভগবদ্ভক্ত সাধুদের সঙ্গ এবং দেশ, কাল ও বিত্তানুসারে সর্বজীবে দয়া, মৈত্রী, বিনয়, শৌচ, তপস্যা, ক্ষমা, মৌন (বৃথালাপ-বর্জন), স্বাধ্যায় (বেদ পাঠাদি), সরলতা, ব্রহ্মচর্য, অহিংসা ও সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্বে সমভাব শিক্ষা করতে হবে। সর্বত্র আত্মদৃষ্টি, স্থাবর-জঙ্গমাদি পদার্থে ঈশ্বরদৃষ্টি, নির্জনবাস, গৃহাদিতে অভিমান-ত্যাগ, পবিত্র চীরবসন ধারণ এবং সকল বিষয়েই মনের তুষ্টি অভ্যাস করা উচিত। ভাগবত শাস্ত্রে শ্রদ্ধা, অন্যশাস্ত্রের অনিন্দা, মন, বাক্য ও কর্মের সংযম, সত্য, শম ও দমের অভ্যাস অবশ্য করণীয়।[২] অদ্ভুতকর্মা শ্রীহরির জন্মকথা, কর্মকলাপ ও গুণাবলী শ্রবণ, কীর্তন ও ধ্যান এবং তাঁর উদ্দেশ্যে সর্বকর্মের অনুষ্ঠান করা কর্তব্য। বৈদিক যাগযজ্ঞ, স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত দান, তপস্যা, ব্রত, মন্ত্রজপ, লৌকিক আচরণ, আত্মপ্রিয় দ্রব্য বা সদাচার, এমন কি স্ত্রী, পুত্র, পরিবার ও নিজের প্রাণ সমস্তই পরমেশ্বরে নিবেদন করা উচিত। শ্রীকৃষ্ণই যাঁদের প্রাণ তাঁদের সঙ্গে মৈত্রী, স্থাবর-জঙ্গম সকল পদার্থের পরিচর্যা এবং মহাজন ও সাধু ব্যক্তিদের সেবা শিক্ষা করতে হবে। ভগবদ্ভক্তের সংসর্গে পরস্পরের মায়া নিরসন এবং ভগবানের পবিত্র যশ-কীর্তন, পরস্পরের প্রতি অনুরাগ ও পরস্পরের তুষ্টি এসব দুঃখ-নিবৃত্তির উপায়। সর্বপাপ-বিনাশন ভগবান শ্রীহরিকে স্বয়ং এবং পারস্পরিক বাক্যালাপে স্মরণ করে এবং সাধন-ভক্তির অনুশীলনে সঞ্জাত প্রেমভক্তিতে ভক্তহৃদয় রোমাঞ্চিত হয়।

১ ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ গীতা, ১২।১৪

২ তুলনীয় : ভগবদ্গীতা, ১৬শ অধ্যায়, ১ম থেকে ৩য় শ্লোক ।

ভক্তগণ ভগবান শ্রীহরির চিন্তায় এমন বিভোর হয়ে যান যে তাঁরা কখনও কাঁদেন, কখনও হাসেন কখনও কখনও আনন্দ প্রকাশ করেন, কখনও অলৌকিক কথা বলেন, কখনও পাগলের মত নাচেন, কখনও গান করেন, কখনও শ্রীহরির অভিনয় করেন, আবার কখনও পরমপ্রাপ্তি হলে পরমানন্দে তৃপ্ত হন এবং মৌনী হয়ে থাকেন। এভাবে ভাগবত ধর্মশিক্ষা করলে তার প্রভাবে মানুষ নারায়ণ-পরায়ণ হয়ে দুস্তর মায়া অনায়াসে অতিক্রম করতে পারবেন। ১৮-৩৩

রাজা নিমি বললেন, আপনারা ব্রহ্মজ্ঞানীদের অগ্রগণ্য ; অতএব নারায়ণ নামে অভিব্যক্ত পরমাত্মা পরব্রহ্মে কেমন করে নিষ্ঠা হয় সেই তত্ত্ব আমায় উপদেশ দিন। ৩৪

পিপ্পলায়ন বললেন, যিনি এই বিশ্বের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়ের একমাত্র কারণ, অথচ যাঁর উৎপত্তির কোন হেতু নেই, যিনি জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তিকালে নিত্য বিরাজমান, বাইরে সমাধি প্রভৃতিতেও যিনি সদ্‌রূপে বিদ্যমান, দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ ও মন যাঁর দ্বারা চৈতন্যময় হয়ে স্ব-স্ব কার্যে প্রবৃত্ত হয়, তাঁকেই পরমতত্ত্ব (ব্রহ্মস্বরূপ) বলে। স্ফুলিঙ্গ যেমন তার আধার-শক্তি অগ্নিকে প্রকাশ করতে পারে না, তেমনি মন, বাক্য, চক্ষু প্রাণ ও ইন্দ্রিয়সকল সেই পরমতত্ত্বকে গ্রহণ করতে অক্ষম।[১] বেদবাক্যও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সেই পরমতত্ত্বকে প্রকাশ করতে পারে না, তাঁকে 'নেতি নেতি' বলে ব্যক্ত করে[২], অথচ বেদবাক্যের গূঢ় অভিপ্রায় হচ্ছে, নিষেধের নিষেধক রূপে ব্রহ্মতত্ত্ব প্রতিপাদন করা। বেদবাক্য ভিন্ন তাঁর স্বরূপের বোধ জন্মাতে পারে, এমন কিছুই নেই – এরূপ নিষেধ-সিদ্ধিও সম্ভবপর নয় ; পরব্রহ্ম সর্বরূপে ও সর্বঘটে বিরাজমান।[৩] কার্য ও কারণসমূহ ব্রহ্মরূপেই প্রকাশমান ; তিনিই সত্ত্ব, রজ ও তম। এই গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থাকেই বলা হয় প্রধান বা প্রকৃতি। ক্রিয়া-শক্তিহেতু তিনি সূত্র নামে কথিত হন, আবার জ্ঞান-শক্তিহেতু তিনিই মহৎ বলে উক্ত হন। সেই মহৎ-তত্ত্ব থেকেই জীবোপাধিক অহংকারের ('আমি' এই বোধের) উৎপত্তি হয়। তিনিই ইন্দ্রিয়, মন ও সুখাদিরূপে প্রতীয়মান হন। সেই মহাশক্তি পরমব্রহ্ম স্থূলকার্য (যা সৎ-রূপে প্রতীয়মান হয়) ও সূক্ষ্মকারণের কারণস্বরূপ। পরব্রহ্ম সকল বিকারের অতীত, তাঁর জন্ম নেই, মৃত্যুও নেই, বৃদ্ধিও নেই ক্ষয়ও নেই[৪], তিনি জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি প্রভৃতি অবস্থার সাক্ষী এবং অবিনাশী জ্ঞানস্বরূপ। প্রাণ যেমন ইন্দ্রিয়জ্ঞানের দ্বারা বিকল্পিত হয়, তেমনি জ্ঞানরূপী পরব্রহ্মও সকল অবস্থাতেই বিকল্পিত হন ; জরায়ুজ, অণ্ডজ, উদ্ভিজ্জ ও স্বেদজ এই বিবিধ প্রাণিদেহে প্রাণবায়ু জীবের অনুকূলে প্রসৃত হয়, স্বরূপত নির্লিপ্ত হয়েও পরমাত্মা সকল অবস্থায় (জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি) অন্তর্যামীরূপে প্রাণিগণের অনুগমন করেন। স্বপ্নাবস্থায় লিঙ্গদেহ জীবাত্মার অনুসরণ করে আর সুষুপ্তি (গাঢ় নিদ্রা) অবস্থায় জীবের ইন্দ্রিয়গণ ও অহংকার বিলীন হয়ে গেলে কূটস্থ চৈতন্য নির্বিকার ভাবে বিরাজ করেন। তখন সংস্কারবর্জিত হওয়ায় শুধু আনন্দের অনুভূতি থাকে এবং নিদ্রাভঙ্গের পর 'আমি বেশ সুখে নিদ্রা গিয়েছিলাম, কিছুই জানতে পারিনি'—এইরূপ স্মরণ বা অনুভূতি হয়ে থাকে। পদ্মনাভের চরণকমল প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষায় ভক্তের অহৈতুকী ভক্তিপ্রভাবে গুণ-কর্মজনিত চিত্তমালিন্য যখন দূর হয়, তখন চক্ষুষ্মান ব্যক্তির নিকট যেমন

১ যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।। তৈঃ উপঃ ২।৯ ২ বৃ উপঃ ৪।২।৪

৩ সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।। ছাঃ উপঃ ৩।১৪।১ ৪ দ্রষ্টব্য : গীতা, ২।২০

সূর্য প্রকাশিত হয়, তেমনই তাঁর নির্মল হৃদয়ে সাক্ষাৎ আত্মতত্ত্বের উপলব্ধি হয়। ৩৫-৪০

রাজা নিমি বললেন, যে কর্মযোগের অনুষ্ঠানে মানুষ এই জন্মেই মোক্ষের প্রতিবন্ধক কর্মস্বরূপ পাপরাশিকে পরিত্যাগ করে নৈষ্কর্ম্যস্বরূপ পরমজ্ঞান পেতে পারেন, আপনারা সে বিষয়ে আমাকে উপদেশ দিন। আমার পিতা ইক্ষ্বাকুর নিকট উপস্থিত ব্রহ্মপুত্র সনৎকুমারাদি ঋষিগণকেও আমি এই প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তাঁরা এই প্রশ্নের কোন উত্তর দেন নি; এর কারণ কি? ৪১-৪২

আবির্হোত্র বললেন, বেদে তিন প্রকার কর্মের কথা বলা হয়েছে—শাস্ত্রবিহিত কর্ম, শাস্ত্র-অবিহিত অকর্ম ও শাস্ত্রনিষিদ্ধ বিকর্ম।[১] কিন্তু বেদের বাক্য লৌকিক নয়, সাক্ষাৎ পরমেশ্বর থেকে বেদের উদ্ভব। তাই জ্ঞানীদের বুদ্ধিও বৈদিক বাক্যে সম্যক প্রবেশ করতে পারে না। পরোক্ষবাদ বেদ বালকদের অনুশাসন বাক্যমাত্র। পিতা যেমন পুত্রকে রোগমুক্ত করার জন্য নানা প্রলোভন দেখিয়ে তাকে ওষুধ খেতে প্রবৃত্ত করেন, বেদও সেইরূপ জীবকে কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত করার জন্যই স্বর্গাদি ফলপ্রদ কর্মসমূহের বিধি দিয়েছেন। অজিতেন্দ্রিয় ও আত্মজ্ঞানে অনভিজ্ঞ ব্যক্তি যদি বেদবিহিত কর্মের অনুষ্ঠান না করে, তবে নিষিদ্ধ কর্মের আচরণের জন্যে অধর্মের ফলে মহাপাপে লিপ্ত হয় এবং বারবার জন্মমৃত্যুপাশে আবদ্ধ হয়। অনাসক্তভাবে বেদোক্ত কর্ম অনুষ্ঠান করে কর্মফল শ্রীভগবানে সমর্পণ করলে মানুষ নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি বা ব্রহ্মপদবী লাভ করেন[২], ফলের উল্লেখ শুধু মানুষকে কর্মে প্রেরণা দেওয়ার জন্যেই করা হয়েছে। যিনি জীবাত্মার অহংকাররূপ বন্ধন ছেদন করতে ইচ্ছা করেন, তিনি বেদোক্ত বিধানের সঙ্গে তন্ত্রোক্ত বিধানের সমন্বয়ে ভগবান কেশবের পূজা করবেন। প্রথমে আচার্যের অনুগ্রহ লাভ করতে হবে, পরে তাঁর প্রদর্শিত উপদেশ অনুসারে নিজের অভিপ্রেত মূর্তি দিয়ে পবিত্রভাবে মহাপুরুষের আরাধনা করতে হয়। পবিত্রভাবে প্রতিমার সম্মুখে উপবেশন করে প্রাণায়াম, ভূতশুদ্ধি প্রভৃতি দ্বারা পাঞ্চভৌতিক দেহ বিশুদ্ধ এবং ন্যাসাদির দ্বারা দেহের রক্ষাবিধান করে শ্রীহরির অর্চনা করবে। পুষ্পাদি পূজার উপচার কীট প্রভৃতি থেকে বিশুদ্ধ করবে, পূজার স্থান লেপন ও সম্মার্জিত করবে, নিজের চিত্ত সংযত করবে, বিগ্রহকে পূজার যোগ্য করে উপচারের দ্বারা পাদ্যাদির পাত্র কল্পনা করে সমাহিতচিত্তে ভগবানের ধ্যান করবে। পরে তাঁকে বিগ্রহে স্থাপন করে সংযত হৃদয়ে মূলমন্ত্রে তাঁর পূজা করবে। এরপর হৃদয়াদি অঙ্গ, অস্ত্রাদি উপাঙ্গ ও সনন্দাদি পার্ষদের সঙ্গে অভীষ্ট মূর্তিকে স্ব-স্ব মন্ত্রের দ্বারা পাদ্য, অর্ঘ্য ও আচমনীয়, স্নানীয়, বস্ত্র, ভূষণ, গন্ধ, মাল্য ও আতপচাল, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য প্রভৃতি দিয়ে যথাবিধি ভগবানের অর্চনা ও স্তব করে তাঁকে প্রণাম করবে। 'আপনার স্বরূপ হরিময়' এরূপ চিন্তা করে শ্রীহরির পূজা করতে হয়। পরে মস্তকে নির্মাল্য রেখে ইষ্টদেবকে নিজস্থানে (হৃদয়ে) স্থাপন করে পূজা সমাপন করবে। যিনি তন্ত্রোক্ত কর্মযোগ অনুসারে অগ্নি, সূর্য, জল, অতিথি এবং স্বীয় হৃদয়ে পরমাত্মার পূজা করেন, তিনি অচিরে সংসার-বন্ধন থেকে মুক্ত হবেন। ৪৩-৫৫

১ দ্রষ্টব্য, গীতা, ৪।১৬ ১৮ ২ তুলনীয়: ভগবদ্গীতা, ১৮।৪৯

চতুর্থ অধ্যায়

শ্রীভগবানের অবতার বর্ণন

নিমিরাজ বললেন, শ্রীভগবান স্বাধীনভাবে জন্মগ্রহণ করে যে সমস্ত অলৌকিক কর্ম করেছিলেন, করছেন বা ভবিষ্যতে করবেন সে সমস্ত কথা আমাকে বলুন। ১

দ্রুমিল বললেন, যে ব্যক্তি অনন্তদেবের অনন্ত গুণাবলী আনুপূর্বিক গণনা করতে ইচ্ছুক সে মন্দবুদ্ধি বালক। বহুকালে ও বহুযোগবলে পৃথিবীর ধূলিকণা বরং গণনা করা যেতে পারে, কিন্তু অখিল শক্তির আধার শ্রীভগবানের সমস্ত গুণ ও কর্ম বর্ণনা করা অসম্ভব। সেই আদিদেব নারায়ণ নিজসৃষ্ট পঞ্চমহাভূতের দ্বারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডরূপে নিজ দেহ নির্মাণ করে স্বয়ং যখন অন্তর্যামীরূপে তাতে প্রবিষ্ট হন, তখনই তিনি পুরুষ নামে অভিহিত হন।[১] তাঁর কলেবরেই ত্রিভুবন সন্নিবিষ্ট রয়েছে, তাঁর ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারাই প্রাণীদের জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয়, তাঁর নিজের স্বরূপ থেকে জ্ঞান আর তাঁর প্রাণ থেকে বল (দেহশক্তি), ওজঃ (ইন্দ্রিয়-শক্তি) ও ঈহা (চেষ্টা বা ক্রিয়াশক্তি) উৎপন্ন হয়েছে। সেই আদিপুরুষ সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণের দ্বারা অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার করে থাকেন। সৃষ্টিকার্যের জন্য যিনি রজোগুণের দ্বারা ব্রহ্মারূপে, সত্ত্বগুণের দ্বারা পালনের জন্য দ্বিজগণের ধর্মরক্ষক যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুরূপে এবং তমোগুণের দ্বারা সংহারকার্যে যিনি রুদ্ররূপে আবির্ভূত হয়েছেন, তিনিই সেই আদিপুরুষ। বারবার এই কর্মানুসারেই তিনি প্রজাসৃষ্টি, পালন ও সংহার করে থাকেন।[২] ২-৫

ধর্মপত্নী দক্ষকন্যা মূর্তির গর্ভে নর ও নারায়ণ নামে দুই মূর্তিতে প্রশান্তাত্মা ঋষিশ্রেষ্ঠের আবির্ভাব হয়েছে। এই ঋষি নৈষ্কর্ম্যের (কর্মফল ত্যাগের) দ্বারা আত্মস্বরূপের উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি নারদাদি ভক্তগণকে সেইরূপ নিষ্কাম কর্মেরই উপদেশ দিয়েছেন এবং লোকসংগ্রহের (লোকশিক্ষার) জন্যে স্বয়ং সেরূপ কর্মের আচরণ করেছেন।[৩] নারদাদি ঋষিগণ অদ্যাবধি তাঁর পদাঙ্ক অনুশীলন করেন। তাঁর কঠোর তপস্যায় শঙ্কিত হয়ে দেবেন্দ্র ভাবলেন যে তিনি তপস্যার প্রভাবে ইন্দ্রত্বলাভে অভিলাষী হয়েছেন। তাই তিনি মদনকে সপরিবারে[৪] সেই ঋষির যোগস্থান বদরিকাশ্রমে পাঠিয়ে দিলেন। কন্দর্প তাঁর প্রভাব জানতেন না; তাই তিনি রমণীদের কটাক্ষবাণে তাঁকে বিদ্ধ করতে লাগলেন। নিরভিমান আদিদেব ঋষি ইন্দ্রের অপরাধ বুঝতে পেরেও শাপভয়ে কম্পিতকলেবর মদন ও তার সহচরদের সহাস্যবদনে বললেন, তোমরা নির্ভয়ে আমার আতিথ্য গ্রহণ কর, আশ্রম ত্যাগ করে চলে যেও না। অভয়দাতা নারায়ণের কথা শুনে দেবগণ লজ্জায় অধোবদন হয়ে ভগবানকে বললেন, প্রভু, আপনি মায়াতীত ও বিকাররহিত। আত্মারাম ধীর ব্যক্তিগণ সর্বদা আপনার পাদপদ্মে প্রণত, আপনার এরূপ সদয় আচরণ বিচিত্র নয়। যাঁরা ভগবানে বিমুখ হয়ে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে দেবগণের প্রাপ্যভাগ বলিরূপে প্রদান করেন, ঈর্ষাপরায়ণ দেবতাগণ তাঁদেরও বহু বিঘ্ন ঘটান। কিন্তু যাঁরা আপনার সেবা করেন এবং আপনি যাঁদের রক্ষাকর্তা তাঁরা দেবতাগণকে উপেক্ষা করলেও তাঁদের কোন বিঘ্ন বা বিপদের আশংকা থাকে না। যাঁরা অনন্যশরণ হয়ে

১ তুলনীয়: কঠ উপনিষদ, ২।৩।১৭ ২ শ্বেতাশ্বতর উপ, ৪।১

৩ ভগবদগীতা, ৩।২০ ৪ বসন্ত ঋতু, সুমন্দ পবন ও অপ্সরাগণের সঙ্গে।

আপনার সেবা করেন তাঁরা স্বর্গকে অতিক্রম করে আপনার পরমপদ লাভ করেন।[১] যাঁরা আপনার সেবক নন, তাঁদের কেউ কেউ অপার সমুদ্ররূপ ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষাদি কালগুণ, প্রাণবায়ু, রসনা ও উপস্থের ভোগ্য পদার্থ এবং আমাদের ন্যায় দেবতাকে অতিক্রম করেও ব্যর্থ ক্রোধের বশীভূত হয়ে দুশ্চর তপস্যাও বৃথা ক্ষয় করেন এবং গোষ্পদের জলে মগ্ন হয়ে জীবন ত্যাগ করেন। ৬-১১

দেবতাগণ যখন এভাবে নারায়ণের স্তব করছিলেন, তখন ভগবান বিভু তাঁদের রূপলাবণ্যের দর্প খর্ব করার জন্যে যোগবলে অলৌকিক সৌন্দর্যসম্পন্ন কয়েকজন নারী তাঁদের দেখালেন। দেবগণ দেখলেন যে সেই রমণীরা নারায়ণের শুশ্রূষা করছেন। মূর্তিমতী কমলার ন্যায় রূপলাবণ্যবতী কামিনীকে দেখে তাদের সৌন্দর্যগর্বে দেবগণ যেন শ্রীভ্রষ্ট হলেন এবং তাঁরা তাদের গাত্রের সুগন্ধেই বিমোহিত হলেন। তখন মদন প্রভৃতি দেবগণের দশা দেখে দেবনারায়ণ সহাস্যে বললেন, স্বর্গরাজ্যের ভূষণস্বরূপা এই কামিনীদের মধ্যে তোমাদের মত যে কোন একজনকে তোমরা প্রার্থনা কর। ভগবান নারায়ণের কথায় 'যে আজ্ঞা' বলে ইন্দ্রের অনুচরগণ তাঁকে প্রণাম করে অপ্সরাশ্রেষ্ঠা উর্বশীকে নিয়ে স্বর্গরাজ্যে গেলেন। তাঁরা দেবসভায় গিয়ে দেবরাজকে প্রণাম করে উৎসুক দেবগণের কাছে নারায়ণের মাহাত্ম্য বর্ণনা করলেন। ইন্দ্র সে কথা শুনে বিস্ময়াবিষ্ট হলেন। ভগবান প্রাণিগণের মঙ্গলের জন্যই পরমহংস দত্তাত্রেয়, সনৎকুমার এবং আমাদের পিতা ভগবান ঋষভদেব বিষ্ণুর অংশে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁরা সকলেই আত্মতত্ত্বের উপদেশ দিয়েছেন। হয়গ্রীব অবতারে বিষ্ণু মধুদৈত্যের কবল থেকে বেদ-চতুষ্টয় উদ্ধার করেছিলেন। ১২-১৭

প্রলয়কালে জলমগ্ন পৃথিবীতে মৎস্য-অবতাররূপে অবতীর্ণ হয়ে তিনি সত্যব্রত পৃথিবী ও ওষধিসমূহ এবং ঋষিগণকে রক্ষা করেছেন। বরাহাবতারে কারণবারি থেকে পৃথিবীকে উদ্ধার করে তিনি আদিদৈত্য হিরণ্যাক্ষকে সংহার করেন। দেবাসুরের সমুদ্র-মন্থনের সময় ভগবান কূর্ম-মূর্তিতে মন্থনদণ্ড মন্দার পর্বতকে পৃষ্ঠে ধারণ করেন। বিষ্ণুই কুমীরের মুখ থেকে বিপন্ন ও শরণাগত গজেন্দ্রকে মুক্ত করেন। কশ্যপের আজ্ঞায় যজ্ঞকাষ্ঠ আহরণের জন্যে বালখিল্য ঋষিগণ গোষ্পদজলে পতিত হয়ে যখন ভগবানের স্তব করেন, তখন তিনি অবতীর্ণ হয়ে তাঁদের রক্ষা করেন। বৃত্রাসুরকে বধ করে ইন্দ্র ব্রহ্মহত্যা পাপে পড়লে বিষ্ণুই তাঁকে পাপ থেকে মুক্ত করেন। যখন দেবাসুর-সংগ্রামে পরাজিত দেবগণ পলায়ন করেন এবং অনাথা দেবরমণীগণ অসুরগৃহে অবরুদ্ধা হন, তখন ভগবানই তাঁদের বিপদমুক্ত করেন। প্রহ্লাদের মন সাধু ভক্তদের অভয়দান করার জন্যে তিনিই নৃসিংহমূর্তিতে অসুররাজ হিরণ্যকশিপুর প্রাণসংহার করেন। সকল মন্বন্তরেই তিনি দেবগণের কার্যসিদ্ধির জন্য অংশাবতাররূপে দেবাসুর-সংগ্রামে দৈত্যপতিদিগকে নিহত করে ভুবন পালন করছেন। তিনি বামনরূপে বলির যজ্ঞে ত্রিপাদ ভূমি যাচঞাচ্ছলে তাঁর ঐশ্বর্য হরণ করে অদিতি-নন্দনদিগকে দান করেছেন। হৈহয়কুলান্তক ভৃগুবংশের অগ্নিস্বরূপ পরশুরামরূপে অবতীর্ণ হয়ে একুশ বার ধরণীকে নিঃক্ষত্রিয় করেন। তিনি লোকপাবন শ্রীরামরূপে অবতীর্ণ হয়ে সাগর-বন্ধন করে লঙ্কাপতি দশাননকে সবংশে নিধন করেন। সেই শ্রীরামচন্দ্রের কীর্তি জয়যুক্ত হোক, জন্মহীন হৃষীকেশ ভূ-ভার হরণের জন্যে যদুকুলে অবতীর্ণ হয়ে দেবতাদেরও দুঃসাধ্য কর্ম করবেন। তিনি বুদ্ধরূপে অবতীর্ণ হয়ে যজ্ঞে অনধিকারী অথচ যজ্ঞানুষ্ঠানকারী দৈত্যদিগকে

১ তুলনীয়ঃ গীতা, ৯.২২ শ্লোক।

বেদবিরুদ্ধ বিতর্কের দ্বারা (অর্থাৎ অহিংসাবাদের দ্বারা) বিমুগ্ধ করবেন। অবশেষে কলিযুগে কল্কিরূপে আবির্ভূত হয়ে ম্লেচ্ছরাজাদিগকে নিধন করবেন। মহারাজ, অনন্তকীর্তি নারায়ণের এইরূপ বিবিধ জন্ম ও কর্মের বিষয় বর্ণিত হল। ১৮-২৩

পঞ্চম অধ্যায়

যুগধর্ম কথা

রাজা নিমি বললেন, জ্ঞানশ্রেষ্ঠ ঋষিগণ, জগতে প্রায় অনেকেই ভগবান শ্রীহরিকে ভজনা করে না; সেই অশান্তমনা অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিদের পরিণামে কি গতি হবে? ১

তদুত্তরে চমস বললেন, সেই আদিপুরুষের মুখ, বাহু, উরু ও পাদদেশ থেকে যথাক্রমে গুণের (সত্ত্ব, রজ ও তম) তারতম্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারবর্ণ[১] এবং ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এই চার আশ্রম পৃথকভাবে উৎপন্ন হয়েছে। এদের মধ্যে যারা নিজেদের জনক সাক্ষাৎ পরমপুরুষকে ভজনা করে না অথবা যারা তাঁর প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে, তাঁরা নিজ নিজ বর্ণ ও আশ্রম থেকে ভ্রষ্ট হয়ে অধঃপতিত হয়। হরিকথা শ্রবণ ও কীর্তন যাদের অদৃষ্টে ঘটে না এরূপ অসংস্কৃত ব্যক্তি, বিবেকহীন স্ত্রীজাতি ও সংস্কারবিহীন শূদ্রজাতি আপনাদের মতো ভক্তগণের অনুকম্পার পাত্র। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যজাতি জন্ম, উপনয়ন, সংস্কার ও বেদপাঠাদির দ্বারা শ্রীহরির চরণ-সান্নিধ্য লাভ করেও বেদোক্ত কর্ম-কলাপের ফলশ্রুতিতে মুগ্ধ হয়ে কর্মে আসক্ত হয়। কর্মানভিজ্ঞ, দাম্ভিক, মূর্খ অথচ পণ্ডিতাভিমানী মোহগ্রস্ত ব্যক্তি বেদোক্ত আপাতমধুর বাক্যে প্রলুব্ধ হয়ে সেইসকল কর্মের শ্রেষ্ঠত্বই কীর্তন করে থাকে। রজোগুণের প্রভাবে যারা হিংসাপরায়ণ, কামুক ও সর্পের মতো কোপনস্বভাব, পাপিষ্ঠ, দাম্ভিক ও অভিমানী তারা বিষ্ণুভক্ত সাধুদেরও উপহাস করে। ২-৭

নারীপ্রেমে আসক্ত ঐ সকল ব্যক্তি স্ত্রীসম্ভোগের চেয়ে সুখের আর কিছু নেই মনে করে। শুধু স্ত্রী-পুত্রাদির মঙ্গলের বিষয়ই পরস্পর আলাপ করে থাকে। তারা যজ্ঞে অন্নদান বা দক্ষিণাদান করে না। শাস্ত্রের তত্ত্ব না জেনে শুধু জীবিকার জন্যেই জীবহিংসা করে। ঐ সকল খল ব্যক্তি সম্পত্তি, ঐশ্বর্য, শ্রেষ্ঠ কুল, বিদ্যা, দানশক্তি, রূপ, বল ও কীর্তির গর্বে মোহান্ধ, হয়ে সাধু, বৈষ্ণব এবং লোকপালাদি দেবগণকেও অবজ্ঞা করে। মহাকাশের মতো সর্বব্যাপী, বেদবেদ্য, অন্তর্যামী আত্মা সকল দেহধারী জীবের মধ্যেই বিরাজমান[২], কিন্তু অজ্ঞ ব্যক্তিদের সেই আত্মার কথা শুনতেও আগ্রহ হয় না। তারা শুধু মনোরথ-কল্পিত ইন্দ্রিয়-সুখভোগাদির আলাপেই দুর্লভ নরজন্ম অতিবাহিত করে। জগতে স্ত্রীসংসর্গ, আমিষ-ভোজন ও মদ্যপান প্রাণীমাত্রেরই চির-ঈপ্সিত; এ বিষয়ে কোন শাস্ত্রের অনুশাসন নেই। তবে বিবাহে স্ত্রী-সংসর্গ, যজ্ঞে আমিষ-ভোজন ও সৌত্রামণি যজ্ঞে মদ্যপানের ব্যবস্থা থাকায় বুঝতে হবে যে, আসক্ত পুরুষের পক্ষে সেগুলো

---

১ ভগবদ্‌গীতা, ১৮।৪১

২ একো বশী সর্বভূতান্তরাত্মা একং রূপং বহুধা যঃ করোতি ॥ কঠ, ২।২।১২

নিবৃত্তিমার্গেরই বিধান। যে ধর্মের অনুষ্ঠানে পরোক্ষ ও অপরোক্ষজ্ঞান এবং পরে মোক্ষরূপ পরম শান্তি লাভ হয়, সেই ধর্মই ধনের একমাত্র ফল। কিন্তু বিষয়াসক্ত ব্যক্তি সেই ধনও শুধু দেহাদির জন্যে সাংসারিক প্রয়োজনেই ব্যয় করে থাকে; দুরন্তবীর্য মৃত্যুকে তারা দেখতে পায় না। শাস্ত্রে কোন কোন যজ্ঞে সুরার আঘ্রাণ পানরূপে বিহিত, কিন্তু অন্য সময় সুরাপান অবৈধ। সেরূপ দেবোদ্দেশে পশুবধের বিধান থাকলেও বৃথা হিংসার বিধান নেই। সন্তান লাভের জন্যেই শাস্ত্রকারেরা স্ত্রীসঙ্গের বিধান দিয়েছেন, ইন্দ্রিয়সুখের জন্য নয়। কিন্তু ভোগাসক্ত মানুষ এই বিশুদ্ধ ধর্ম জানে না। শাস্ত্রে অনভিজ্ঞ, গর্বিত ও পণ্ডিতম্মন্য সেই পাপাচারী নিঃশঙ্কচিত্তে পশুবধ করে, কিন্তু পরলোকে সেই নিহত পশুরাই তাদের মাংস খেয়ে থাকে। এইভাবে যারা পশুহিংসা দ্বারা পরদেহের প্রতি হিংসা করে, তারা সেই সর্বান্তর্যামী শ্রীহরিকেই দ্বেষ করে। তারা শবতুল্য স্বদেহে ও স্ত্রী-পুত্রে আসক্ত হয়ে অধঃপতিত হয়। তত্ত্বজ্ঞানে যাদের অধিকার জন্মেনি অথচ যারা মূর্খও নয়, তারা ত্রিবর্গ (ধর্ম, অর্থ ও কাম) আর দেহকে নিত্য বলে মনে করে, অপরের উপদেশ শোনারও তারা অবকাশ পায় না; এরূপ লোকই যথার্থ আত্মঘাতী।[১] এইসব অশান্তচিত্ত ও আত্মঘাতী ব্যক্তি অজ্ঞানকেই জ্ঞান বলে মনে করে; কালক্রমে তারা বিফলমনোরথ ও অকৃতকার্য হয়ে নানা যন্ত্রণা ভোগ করে। ভগবদ্‌বিমুখ ব্যক্তি বহু যত্নে ও পরিশ্রমে রচিত গৃহ, পুত্র-কন্যা, স্ত্রী ও বন্ধুবান্ধব অনিচ্ছা সত্ত্বেও ত্যাগ করে অজ্ঞানময় ঘোর নরকে প্রবেশ করে।[২] ৮-১৮

রাজা নিমি বললেন, ভগবান কোন সময়ে কি কি আকার, বর্ণ ও নাম গ্রহণ করে অবতীর্ণ হন, জগতে কোন্ বিধিমতে তাঁর পূজা হয়ে থাকে সেসব কথা কৃপা করে বলুন। ১৯

করভাজন বললেন, মহারাজ, সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চার যুগে ভগবান বিবিধ বর্ণ, আকার ও নাম গ্রহণ করেন এবং নানা প্রকারে তিনি পূজিত হয়ে থাকেন। সত্যযুগে তিনি কৃষ্ণসার মৃগচর্মের উপবীত, অক্ষমালা, দণ্ড ও কমণ্ডলুধারী, তিনি ছিলেন শুক্লবর্ণ ও চতুর্ভুজ, জটাজুটমণ্ডিত ও বল্কলপরিহিত। তখন মানুষ ছিল শান্ত, বৈরহীন, সকলের উপকারী ও সুখ-দুঃখে সমদর্শী। তারা শম, দম এবং তপস্যা দ্বারা শ্রীহরির অর্চনা করতেন। সত্যযুগে ভগবান হংস, সুপর্ণ, বৈকুণ্ঠ, ধর্ম, যোগেশ্বর, অমল, ঈশ্বর, পুরুষ, অব্যক্ত ও পরমাত্মা নামে কীর্তিত। ত্রেতাযুগে তিনি রক্তবর্ণ, পিঙ্গলকেশ, চতুর্ভুজ, মেখলা-পরিহিত, ত্রিবেদাত্মা (ঋক্, সাম ও যজু) এবং স্রুক্‌স্রুবাদি চিহ্নে শোভিত। ধর্মপরায়ণ ও ব্রহ্মবাদী মনুষ্যগণ তখন ত্রিবেদোক্ত কর্ম অনুষ্ঠান করে সর্বদেবময় শ্রীহরির আরাধনা করতেন। সে যুগে ভগবান বিষ্ণু, যজ্ঞ, পৃশ্নিগর্ভ, সর্বদেব, উরুক্রম, বৃষাকপি, জয়ন্ত ও উরুগায় নামে কীর্তিত হন। দ্বাপরে ভগবান শ্যামবর্ণ ও পীতবসন, শঙ্খ-চক্রাদি আয়ুধ ধারণে এবং শ্রীবৎসাদি চিহ্নে চিহ্নিত ছিলেন। তত্ত্বজ্ঞানেচ্ছু মর্তবাসী মানুষেরা তখন ছত্র-চামরাদি সম্পদে শোভিত পরম পুরুষকে বৈদিক ও তান্ত্রিক বিধিমতে আরাধনা করতেন। আপনি বাসুদেব, আপনাকে নমস্কার করি, আপনি সঙ্কর্ষণ, আপনাকে নমস্কার করি, আপনি ভগবান প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ, আপনাকে নমস্কার করি। আপনি নারায়ণ ঋষি, আপনি মহাত্মা

১ আত্মঘাতী—যারা আত্মাকে হনন করে অর্থাৎ পুনঃপুনঃ সংসারে নিপাতিত করে।
২ তুলনীয়: ঈশ উপনিষৎ-৩

পরুষ, আপনি বিশ্বেশ্বর, আপনি বিশ্বরূপী ও সর্বভূতের অন্তর্যামী, আপনাকে নমস্কার। দ্বাপরযুগে মানুষ এভাবে ভগবানের স্তব করতেন। কলিযুগে জীব নানা তন্ত্রের বিধান অনুসারে যেভাবে শ্রীভগবানের আরাধনা করে থাকেন, তাও বলছি, শুনুন। এযুগে তিনি কৃষ্ণবর্ণ, ইন্দ্রনীলমণির মত উজ্জ্বল, তিনি হৃদয়াদি অঙ্গ, কৌস্তুভাদি উপাঙ্গ, সুদর্শনাদি অস্ত্রশস্ত্র ও সনন্দাদি পার্ষদ নিয়ে বিরাজ করেন। বিবেকী ব্যক্তিগণ সংকীর্তন নামযজ্ঞে তাঁর আরাধনা করেন। হে মহাপুরুষ, হে ভক্তরক্ষক, আপনার চরণ সর্বদা ধ্যানযোগ্য, আপনি ভক্তের অভীষ্ট ফলপ্রদ, পরমপাবন, শিব ও ব্রহ্মা বন্দিত, ভক্ত ভৃত্যজনের আর্তিহর, সংসার-সমুদ্রে তরণীস্বরূপ, আপনার চরণকমল বন্দনা করি। হে মহাপুরুষ, আপনি অতি ধর্মিষ্ঠ, রামাবতারে পিতার আজ্ঞায় দেববাঞ্ছিত বিপুল ঐশ্বর্য এবং দুস্ত্যজ্য রাজলক্ষ্মী পরিত্যাগ করে বনে গমন করেছিলেন, আবার আপনি প্রিয়ার ঈপ্সিত মায়ামৃগের পশ্চাদ্ধাবন করেছিলেন, আপনার চরণে প্রণিপাত করি। ২০-৩৪

মহারাজ, প্রত্যেক যুগে মানুষ যুগের অনুরূপ নাম ও রূপ অনুসারে সর্বমঙ্গল বিধাতা শ্রীহরির পূজা ও আরাধনা করে থাকেন। গুণজ্ঞ, শ্রেষ্ঠ লোকেরা কলিযুগেরই বিশেষ প্রশংসা করেন; কেননা এই যুগে শুধু নাম-কীর্তনের মাহাত্ম্যে মানুষ পুরুষার্থ বা অভীষ্ট বস্তু লাভ করতে পারে। এই সংসারচক্রে ভ্রাম্যমাণ মানুষের পক্ষে নাম-সংকীর্তনের চেয়ে পরম লাভ আর কিছু নেই; কারণ এই নামসংকীর্তনের ফলেই মানুষ দেহত্যাগের পরে অনন্ত শান্তিলাভ করে এবং সংসার-বন্ধন থেকে মুক্তি পায়। অন্যান্য যুগের মনুষ্যগণও কলিযুগেই জন্মলাভের প্রার্থনা করেন, কারণ এই যুগেই বহু নারায়ণপরায়ণ বা ভগবদ্‌ভক্ত মানুষ জন্মগ্রহণ করবেন। দ্রাবিড় প্রভৃতি দেশে তাম্রপর্ণী, কৃতমালা, পয়স্বিনী, মহাপুণ্যা কাবেরী, প্রতীচী ও মহানদী প্রবাহিত। সেই দ্রাবিড় দেশে বিষ্ণুভক্তের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। যে সকল মানুষ সে সব নদীর পবিত্র জল পান করেন, তাঁরা প্রায়ই নির্মলাত্মা এবং বাসুদেবের ভক্ত হন। যিনি নিরংকার বিসর্জন দিয়ে সর্বতোভাবে শরণাগত-পালক মুকুন্দের চরণে আশ্রয় গ্রহণ করেন তিনি কখনও দেবতা, ঋষি, প্রাণী, আত্মীয়-স্বজন বা পিতৃ-ঋণে আবদ্ধ হন না, অথবা তাঁদের ভৃত্যও হন না। যিনি অনন্যচিত্তে শ্রীভগবানের পাদপদ্ম চিন্তা করেন, শ্রীহরির সেই প্রিয়ভক্ত ভুলবশত কখনও কোন শাস্ত্র-বিগর্হিত (নিষিদ্ধ) কর্মদোষে পতিত হলে তিনিই সেই পাপ বিনাশ করেন। ৩৫-৪২

নারদ বললেন, মিথিলেশ্বর নিমি যোগীন্দ্রদের কাছে ভাগবত ধর্ম শুনে অত্যন্ত পরিতুষ্ট হলেন এবং উপাধ্যায় প্রভৃতি সভাসদ্‌দের নিয়ে জয়ন্তী-নন্দনগণের (কবি প্রভৃতি মুনিগণের) যথাযোগ্য অর্চনা করলেন। তারপর সেই সিদ্ধ পুরুষগণ উপস্থিত সর্বজনের সমক্ষেই অন্তর্হিত হলেন। রাজা নিমিও ভাগবত ধর্মের অনুশীলনে পরম গতি লাভ করলেন। মহাভাগ, আপনিও বিষয়ে অনাসক্ত হয়ে শ্রদ্ধার সঙ্গে আমার মুখ থেকে শুনে ভাগবত ধর্মের অনুষ্ঠান করলে পরম পদ লাভ করবেন। আপনাদের ন্যায় দম্পতির (বসুদেব ও দেবকীর) যশে জগৎ পরিপূর্ণ হয়েছে, কারণ সর্বেশ্বর শ্রীহরি আপনাদেরই পুত্ররূপে অবতীর্ণ হয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি পুত্রস্নেহের ফলে তাঁকে দর্শন, আলিঙ্গন ও তাঁর সঙ্গে সম্ভাষণ, একত্র শয়ন, উপবেশন ও ভোজন করে আপনাদের চিত্ত সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ হয়েছে। শিশুপাল, পৌণ্ড্র ও শাল্বাদি রাজগণ শয়ন, ভোজন ও উপবেশনকালেও বৈরভাবে শ্রীকৃষ্ণের গতি ও বিলাস দেখে নিরন্তর তাঁর আকৃতি চিন্তা করে যখন তাঁর সারূপ্য লাভ করেছে, তখন যাঁদের মন তাঁর প্রতি সতত অনুরক্ত, তাঁরা যে সেই পদ লাভ করবেন তাতে

আর কথা কি ? সর্বাত্মা শ্রীকৃষ্ণে অপত্যবুদ্ধি করবেন না ; যোগমায়া শক্তিকে অবলম্বন করতেই তাঁর ঐশ্বর্য প্রচ্ছন্ন রয়েছে, বাস্তবিক পক্ষে তিনি পরম অব্যক্ত পুরুষ। ভূভারভূত রাজন্যবেশধারী অসুরদের বিনাশ এবং সাধু ভক্তগণের পরিত্রাণের জন্যেই তিনি ভূতলে অবতীর্ণ হয়েছেন। সর্বজনের আনন্দকর তাঁর যশোরাশি জগতে বিস্তৃত হয়েছে। ৪৩-৫০

শুকদেব বললেন, এই কথা শুনে সৌভাগ্যশালী বসুদেব ও দেবকী খুব আশ্চর্য হলেন ; তাঁদের অন্তঃকরণ থেকে অহঙ্কার ও মমত্ববোধরূপ মোহ দূরে হল। যে ব্যক্তি সমাহিত হয়ে এই পুণ্যকথা হৃদয়ে ধারণ করেন, তিনি এই জন্মেই মোক্ষের প্রতিবন্ধক পাপরাশি থেকে মুক্ত হয়ে ব্রহ্মস্বরূপ লাভের অধিকারী হবেন। ৫১-৫২

ষষ্ঠ অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণ-উদ্ধব সংবাদ

[দ্বাপরযুগে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভূভার-হরণের জন্য ও ধর্মের গ্লানি দূর করার মানসে মর্ত্যধামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। অধার্মিকদের বিনাশ ও ধর্মরাজ্য সংস্থাপনের পর তাঁর মনে অপ্রকট হবার ইচ্ছা জাগলো। লীলাসংবরণের পূর্বে তিনি যদুবংশীয় উদ্ধবকে উপলক্ষ করে নিখিল জগতের হিতের জন্যে যেসব উপদেশ দিয়েছিলেন, তা 'শ্রীকৃষ্ণ-উদ্ধব সংবাদ' নামে প্রসিদ্ধ। শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের ষষ্ঠ অধ্যায় থেকে ঊনত্রিশ অধ্যায় পর্যন্ত এই 'শ্রীকৃষ্ণ-উদ্ধব সংবাদ' বিবৃত হয়েছে।]

শুকদেব বললেন, একবার ব্রহ্মা তাঁর মানসপুত্রগণ (সনক, সনন্দ, সনাতন ও সনৎকুমার), ইন্দ্রাদি দেবগণ ও প্রজাপতিগণে বেষ্টিত হয়ে এবং মঙ্গলময় শিব ভূতগণে পরিবেষ্টিত হয়ে দ্বারকায় গেলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর দেহসৌষ্ঠবে আপন যশ বিস্তার করে সর্বলোকের পাপনাশ করেছিলেন। সেই পরমরমণীয় মূর্তি দর্শনের জন্যে মরুদ্‌গণে বেষ্টিত হয়ে ভগবান ইন্দ্র, দ্বাদশ আদিত্য, অষ্টবসু, অশ্বিনী-কুমারদ্বয়, ঋভু দেবগণ, দশ বিশ্বদেব এবং গন্ধ, অপ্সরা, নাগ, সিদ্ধ দেবগণের স্তুতিপাঠক চারণগণ, কুবেরের অনুচর গুহ্যকগণ, মরীচি, অত্রি প্রভৃতি ঋষিগণ, পিতৃগণ, বিদ্যাধরগণ, স্বর্গীয় গায়ক কিন্নরগণ—সকলেই শ্রীকৃষ্ণের দর্শনে উৎসুক হয়ে দ্বারকায় এসেছিলেন। বৈভব-সম্ভারে সমৃদ্ধ দ্বারকায় এসে দেবগণ অতৃপ্ত নয়নে অদ্ভুত দর্শন শ্রীকৃষ্ণকে দেখছিলেন। তাঁরা স্বর্গোদ্যানের (নন্দন-কাননের) পুষ্পমাল্যে শ্রীকৃষ্ণকে সাজিয়ে শ্রুতিমনোহর ও সুমধুর বাক্যে তাঁর স্তব করতে লাগলেন। ১-৬

দেবগণ বললেন, বিভু, যোগনিষ্ঠ ব্যক্তি মুক্তিকামী ও সংসারের দৃঢ় কর্ম-বন্ধন থেকে মুক্তিলাভের জন্য হৃদয়ে যাঁর ধ্যান করেন অথচ যাঁকে প্রত্যক্ষ করতে পারেন না, আপনার অনুগ্রহে আমরা আপনার সেই পাদপদ্ম সাক্ষাৎ দর্শন করছি ; তাই আমরা বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন ও বাক্যের দ্বারা আপনার নিকট প্রণতি জানাচ্ছি—হে অজিত, আপনি সত্ত্বাদি মায়িক গুণসমূহের নিয়ন্তা, ত্রিগুণাত্মিকা মায়ার দ্বারা আপনি স্বরূপে অবস্থান করেও প্রপঞ্চের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার করেন, অথচ এইসকল কর্মের মূলে রয়েছে আপনার অচিন্তনীয়

পরমেশ্বর-ভাব। কোন কর্মেই আপনি লিপ্ত হন না[১], কারণ অবিদ্যাদি দোষ আপনাকে স্পর্শও করতে পারে না, আপনি অনাবৃত, তাই সুখে আত্মস্বরূপে বিরাজিত। হে বন্দনীয়, শাস্ত্র অথবা গুরুমুখে আপনার যশ-কীর্তন শুনলে শ্রদ্ধা বেড়ে যায় এবং তাতে সাধুদের বিশুদ্ধি লাভ হয়। বিষয়াসক্ত মানুষ উপাসনা, বিদ্যাধ্যয়ন, দান ও কষ্টকর তপস্যাদি করে এমন পবিত্র হতে পারে না। হে বাসুদেব, মুমুক্ষু মুনিগণ প্রেমার্দ্রচিত্তে যাঁর চরণকমল সর্বদা ধ্যান করেন, শরণাগত ভক্তগণ সমান বিভূতি লাভের জন্য বাসুদেবাদি মূর্তিতে যাঁর অর্চনা করেন, আত্মজ্ঞানী ধীর ব্যক্তি স্বর্গাদি ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে বৈকুণ্ঠ-প্রাপ্তির অভিলাষে ত্রিকালে যাঁর আরাধনা করেন, আপনার সেই চরণ-কমল ধূমকেতুর মতো আমাদের বিষয়-বাসনা দগ্ধ করুক। জগৎপতি, যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ যুক্তহস্তে হবি গ্রহণ করে যজ্ঞাগ্নির মধ্যে ত্রয়ীয়[২] নির্দিষ্ট বিধি অনুসারে যে যজ্ঞপুরুষের চিন্তা করেন, যোগিগণ অধ্যাত্মযোগে আত্মমায়া উপলব্ধির জন্যে যার মনন করেন, পরম ভাগবতগণ বিষয়-বাসনাশূন্য হয়ে সর্বত্র যাঁর সেবা করেন, আপনার সেই পাদপদ্ম ধূমকেতুর মতো আমাদের বিষয়বাসনা দগ্ধ করুক। বিভু, লক্ষ্মীদেবী আপনার বক্ষ-বিলাসিনী, এই বক্ষে ভক্তপ্রদত্ত বনমালা দর্শনে সপত্নীবোধে লক্ষ্মীদেবীর মনে ঈর্ষা জাগে, কিন্তু আপনি তাঁকে অনাদর করে ভক্তের প্রদত্ত সামান্য বনমালাও প্রীতি সহকারে গ্রহণ করেন। ভক্তবৎসল সেই পাদপদ্ম ধূমকেতুর মতো আমাদের বিষয়-বাসনা বিনাশ করুক। ভগবান, বলিরাজের বন্ধনকালে আপনার পাদপদ্ম স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল ব্যাপ্ত করেছিল, তখন তা উন্নত বিজয়-ধ্বজের মতো শোভা পেয়েছিল। আপনার চরণ থেকে উদ্ভূত ত্রিধারা গঙ্গাও[৩] তখন তার পতাকা-রূপে শোভা পেয়েছিল। আপনার চরণ-মাহাত্ম্যে দেবগণের অভয় (মঙ্গল) আর অসুরদের ভয়ের কারণ হয়েছিল। আমরা ভজনশীল, আপনার পাদপদ্ম আমাদের পাপনাশ করুক। হে দেব, বলীবর্দ নাসারজ্জুবদ্ধ হয়ে আকৃষ্ট হলে স্বাধীনতা হারিয়ে প্রভুর আজ্ঞাধীন হয়, তেমনি ব্রহ্মাদি দেহধারিগণও আপনার বশীভূত হয়ে চলেছেন। আপনি প্রকৃতি-পুরুষেরও অতীত। আবার কালরূপে আপনি প্রকৃতি-পুরুষের নিয়ামক। তাই আপনি পুরুষোত্তম, আপনার পাদপদ্ম আমাদের মঙ্গল বিধান করুক। পুরুষোত্তম, আপনি প্রকৃতি, পুরুষ ও মহৎতত্ত্বের নিয়ন্তা, এই বিশ্বের সৃষ্টি, পালন ও সংহারকর্তা। আপনি অখিল জগতের সংহারে প্রবৃত্ত সংবৎসররূপী অতি বেগমান কাল। এই সংবৎসর আবার চাতুর্মাস্যরূপ তিনটি নাভিযুক্ত, অতএব আপনিই উত্তমপুরুষ বা পুরুষোত্তম।[৪] বিশ্বম্ভর, আপনি প্রকৃতিদ্রষ্টা পুরুষ থেকেও উত্তম; আপনার নিকট থেকে আদিপুরুষ, অমোঘবীর্য, অনন্তশায়ী মহাবিষ্ণু শক্তি লাভ করে বিশ্বের বীজরূপ মহৎতত্ত্বকে সৃষ্টি করেন। তিনি আপনার মায়াশক্তির দ্বারা মহৎতত্ত্বকে ধারণ করেন। তার দ্বারা অনুগত হয়েই হিরণ্যগর্ভরূপে নিজের বহির্দেশে সপ্ত-আবরণযুক্ত হিরন্ময় অণ্ডকোষের সৃষ্টি করেন।[৫] হৃষীকেশ, আপনি চরাচর জগতের একমাত্র অধীশ্বর। আপনার মায়ায় উৎপন্ন ইন্দ্রিয়বৃত্তি দ্বারা পরিকল্পিত ভোগ্যবিষয় রূপ, রস প্রভৃতি ভোগ করেও আপনি নির্লিপ্ত। কিন্তু সামান্য জীব, বিষয়ভোগ বিদ্যমান না থাকলেও, বিষয়ভোগে

---

১ ন মাং কর্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্মফলে স্পৃহা।। গীতা, ৪।১৪

২ ত্রয়ী—ঋক্, যজু ও সাম। অথর্ববেদ পরে রচিত হয় বলে ত্রয়ীর অন্তর্গত হয় নি।

৩ স্বর্গে মন্দাকিনী, মর্তে ভাগীরথী ও পাতালে ভোগবতী।

৪ দ্রষ্টব্য: গীতা, ১৫শ অধ্যায় ১৬শ থেকে ১৮শ শ্লোক।

৫ অনন্তনাগশায়ী মহাবিষ্ণুই ভগবানের প্রথম অবতার। মহৎতত্ত্ব, অহঙ্কার প্রভৃতি এঁর বিভূতি।

আসক্ত হয়ে ভীত হয়। জনার্দন, আপনার ষোল হাজার মহিষী ঈষৎ হাসির কটাক্ষে, মনোরম ভ্রূভঙ্গির প্রেমালাপে এবং চতুর কামকলা দেখিয়েও আপনাকে বশীভূত করতে পারেন নি। শ্রীভগবান শুধু অপ্রাকৃত প্রেমের বশীভূত; তাই মহিষীগণের বিচিত্র হাবভাব নির্লিপ্ত ভগবানকে উদ্‌ভ্রান্ত করতে পারেনি। পতিতপাবন, আপনার লীলা-কথারূপ কীর্তিনদী এবং আপনার পাদপদ্ম-নিঃসৃত গঙ্গাদি নদীসমূহ ত্রিলোকের পাপহরণে সমর্থ। যাঁরা আপন আশ্রমধর্ম পালন করেন, গুরুমুখে পুরাণাদিতে বর্ণিত আপনার লীলাকথা শোনেন এবং আপনার পাদপদ্ম-নিঃসৃত পুণ্যসলিলা গঙ্গায় অবগাহন করেন, তাঁরা পাপমুক্ত হন। ৭-১৯

শুকদেব বললেন, মহারাজ, ব্রহ্মা, রুদ্র ও দেবগণ শ্রীকৃষ্ণকে এইভাবে স্তব ও প্রণাম করে পুনরায় বলতে লাগলেন, সর্বাত্মা, পুরাকালে ভূভার হরণের জন্য আমরা আপনাকে যেভাবে অনুরোধ করেছিলাম, আপনি সেভাবেই সমস্ত কাজ সুসম্পন্ন করেছেন। আপনি সত্যসন্ধ, সজ্জনগণের মধ্যে ধর্ম স্থাপন করেছেন এবং আপনার পাপনাশক কীর্তি সকল দিকে বিস্তৃত হয়েছে। আপনি সর্বোত্তম রূপে যদুবংশে অবতীর্ণ হয়ে পৃথিবীর মঙ্গলের জন্য অলৌকিক বিক্রমের কাজ করেছেন। হে ঈশ, কলিযুগে সাধুজন আপনার পুণ্যচরিতকথা শ্রবণ ও কীর্তন করে সহজে অজ্ঞান অন্ধকার দূর করবেন। পুরুষোত্তম, যদুকুলে অবতীর্ণ হবার পর আপনার একশ পঁচিশ বছর উত্তীর্ণ হল। সম্প্রতি আপনার দেবকার্য (ভূভার-হরণ প্রভৃতি কাজ) সম্পন্ন হয়েছে, ব্রহ্মশাপে যদুবংশ বিনষ্টপ্রায়; অতএব যদি ইচ্ছা করেন, তবে আবার বৈকুণ্ঠে গিয়ে আমাদের মত বৈকুণ্ঠের অনুচর লোকপালদের আর সর্বজীবকে রক্ষা করুন। ২০-২৭

ভগবান বললেন, জীবেশ্বর, আপনার বক্তব্য আমি নিশ্চিতরূপেই অবগত আছি। ভূভার-হরণ সাধিত হয়েছে, আপনাদের সমস্ত কার্যও সমাধা হয়েছে। কিন্তু যদুকুল এখনও বল, বিক্রম, সাহস এবং ঐশ্বর্যমদে মত্ত হয়ে মহার্ণবের মতো লোকনাশে উদ্যোগী হয়েছে। আমি বেলাভূমির মতই তাদের রুদ্ধ করে রেখেছি। এই বলদৃপ্ত বিপুল যাদবকুল ধ্বংস না করে আমি যদি স্বধামে চলে যাই তবে উদ্বেল সমুদ্রের মতই তারা সকল লোককে নষ্ট করবে। সম্প্রতি ব্রহ্মশাপেই এই যদুবংশের ধ্বংস আরম্ভ হয়েছে। তারা নির্মূল হলে আমি বৈকুণ্ঠলোকে যাওয়ার সময়ে আপনার ভবনেও (ব্রহ্মলোকেও) যাব। ২৮-৩১

শুকদেব বললেন, জগৎপতি শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনে ব্রহ্মা তাঁকে প্রণাম করে দেবগণের সঙ্গে স্বধামে ফিরে গেলেন। ব্রহ্মা স্বধামে যাওয়ার পর দ্বারকাপুরীতে নানাবিধ উৎপাত শুরু হল। উৎপাতের প্রাদুর্ভাব দেখে শ্রীকৃষ্ণ সমাগত যদুবৃদ্ধগণকে বললেন, আর্যগণ, দ্বারকা নগরীতে সকল দিকেই ভয়াবহ উৎপাত আরম্ভ হয়েছে। বিশেষত আমাদের এই যদুবংশের উপর অব্যর্থ ব্রহ্মশাপও ঘটেছে। আমরা যদি প্রাণ বাঁচাতে চাই তবে আর দ্বারকায় থাকা উচিত হবে না। আর দেরি না করে চলুন আমরা পবিত্র প্রভাসতীর্থে চলে যাই। একবার দক্ষের অভিশাপে চন্দ্র যক্ষ্মারোগগ্রস্ত হয়েছিলেন,[১] তিনি তখন এই পবিত্র প্রভাসতীর্থে স্নান করে এই রোগ থেকে মুক্ত হন এবং আবার তাঁর কলাবৃদ্ধি হয়। আমরাও প্রভাসতীর্থে অবগাহন করে দেবতা ও পিতৃগণের তর্পণ করে ছয় রসযুক্ত (মধুর, অম্ল, লবণ, কটু, তিক্ত ও কষায়) অন্নের দ্বারা শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাব এবং তাঁদের

১ ষষ্ঠ স্কন্ধের ষষ্ঠ অধ্যায় দ্রষ্টব্য (পৃঃ ৩১৭)।

শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রচুর দান করব। তারপর লোকে যেমন নৌকাযোগে সমুদ্র পার হয়, তেমনি আমরাও স্নান, তর্পণ, দানাদির দ্বারা দুঃখসাগর অতিক্রম করব। ৩২-৩৮

শুকদেব বললেন, কুরুনন্দন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আদেশে যাদবগণ প্রভাস-তীর্থে যাওয়ার সংকল্প করে রথে অশ্বযুক্ত করলেন। তখন ভয়াবহ সব উৎপাত দেখে, শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনে এবং যাদবগণের প্রভাসতীর্থে যাওয়ার উদ্যোগ দেখে শ্রীকৃষ্ণের একান্ত ভক্ত উদ্ধব প্রভু শ্রীকৃষ্ণের কাছে গিয়ে প্রণাম করে করজোড়ে বলতে লাগলেন, দেবদেবেশ, আপনি ঈশ্বর, ব্রহ্মশাপ প্রতিহত করার ক্ষমতা আপনার আছে। কিন্তু আপনি তা করলেন না। আপনি নিশ্চয়ই এই যদুবংশ ধ্বংস করে মর্ত্যলোক ত্যাগ করবেন। কেশব, আপনার চরণকমল ক্ষণার্ধকালও ত্যাগ করে থাকতে পারব না। অতএব আমাকেও আপনার স্বধাম বৈকুণ্ঠে নিয়ে চলুন। আপনার লীলাকথামৃত মানুষের পক্ষে পরম মঙ্গলজনক, সে কথা শুনলে মানুষ আসক্তিশূন্য হয়ে যায়। আপনি আমাদের প্রিয় আত্মা। আমরা চিরকাল একসঙ্গে শয়নে, উপবেশনে, ভ্রমণে, অবস্থানে, স্নানে, ক্রীড়ায় ও ভোজনাদি কার্যে আপনার সেবা করেছি; তাই কেমন করে এখন আপনাকে ছেড়ে থাকব? আমরা আপনার উচ্ছিষ্টভোজী দাস। আপনার উপভোগের মালা, গন্ধ, বসন ও ভূষণে অলংকৃত হয়ে আমরা মায়া জয় করতে পারব। দিগম্বর, আত্মাভ্যাসে কৃতশ্রম, কামজয়ী, কামনাশূন্য, পাপশূন্য ঋষি ও সন্ন্যাসিগণ সাধনার দ্বারা আপনার ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন। আমরা কিন্তু ব্রহ্মলোকেও যেতে চাই না। মহাযোগী, আমরা সংসারে দেব-নরকুলে ভ্রমণ করি এবং ভক্তগণের সঙ্গে আপনার কথা কীর্তন করি। মানুষের ন্যায় আপনার গমন, মৃদুহাস্য, দৃষ্টি ও প্রেয়সীর সহিত পরিহাস এবং আপনার উপদেশবাণী স্মরণ ও কীর্তন করে দুঃখের ভবসাগর উত্তীর্ণ হব। ৩৯-৪৯

শুকদেব বললেন, মহারাজ, দেবকীপুত্র শ্রীকৃষ্ণ তাঁর পরমভক্ত উদ্ধবের কথা শুনে তাঁকে বলতে লাগলেন। ৫০

সপ্তম অধ্যায়

অবধূত এবং তাঁর আটজন গুরুর বর্ণনা

ভগবান বললেন, মহাভাগ, তুমি যা বলেছ তাই আমার অভীপ্সিত। ব্রহ্মা, মহেশ্বর ও অন্যান্য লোকপালগণও আমার বৈকুণ্ঠে বাসের আকাঙ্ক্ষা করে থাকেন। ব্রহ্মার প্রার্থনায় আমি যে কাজের জন্য (ভূভার-হরণ প্রভৃতি) পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছিলাম, সেই দেবকার্য সম্পূর্ণ হয়েছে। এখন ব্রহ্মশাপগ্রস্ত যদুবংশ পরস্পর বিবাদে বিনষ্ট হবে এবং আজ থেকে সপ্তম দিবসে সমুদ্রও এই পুরীকে (দ্বারাবতীকে) প্লাবিত করবে। যে মুহূর্তে আমি পৃথিবী পরিত্যাগ করব, সেই মুহূর্তেই পৃথিবী কলির দ্বারা অভিভূত হয়ে মঙ্গলশূন্য হবে। আমি এই পৃথিবী ত্যাগ করলে কলিযুগে মানুষের অধর্মে রুচি হবে। সুতরাং তোমার আর এখানে থাকা উচিত নয়। তুমি স্বজন ও বন্ধুবর্গের স্নেহ পরিত্যাগ করে সম্পূর্ণরূপে আমাতেই চিত্ত নিবিষ্ট করবে এবং সর্বত্র সমদর্শী হয়ে পৃথিবীতে বিচরণ করবে। মন, বাক্য, চক্ষু, কর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রহণীয় এই জগৎকে মনোময়, মায়াময় ও নশ্বর বলে মনে করবে। বিক্ষিপ্তচিত্ত মানুষের নানা বস্তুবিষয়ক ভ্রান্তি জন্মে অর্থাৎ

বস্তুতে 'আমি', 'আমার' রূপ অধ্যাস জন্মে, বাস্তবিক পক্ষে তাদের এই ভ্রম গুণ-দোষ যুক্ত। আর যাদের চিত্ত দোষগুণের মধ্যে আবদ্ধ, তারাই কর্ম, অকর্ম (বিহিত কর্মের অকরণ) ও বিকর্মের (নিষিদ্ধ কর্মের) ভেদ-বিচার করে থাকে। অতএব তুমি ইন্দ্রিয় ও চিত্তকে বশীভূত করে এই সুখ-দুঃখময় জগৎকে ভোক্তা জীবের ভোগ্য রূপে দর্শন করবে এবং আত্মাকে আমার মধ্যে পরমাত্মারূপী নিয়ন্তারূপে অবস্থিত দেখবে। জ্ঞান-বিজ্ঞান যুক্ত হয়ে স্বরূপের অনুভব দ্বারা পরিতৃপ্ত হলে তুমি দেবতাগণেরও প্রীতিভাজন হবে ; তখন আর কোন বাধাবিঘ্নে তুমি অভিভূত হবে না।[১] গুণ-দোষের অতীত জ্ঞানী ব্যক্তি দোষ-বোধেও নিষিদ্ধ কর্ম থেকে নিবৃত্ত হন না এবং গুণ মনে করেও বিহিত কর্মে প্রবৃত্ত হন না। তেমনি বালক যেমন প্রাক্তন সংস্কারের বশে কোন কর্মে আসক্ত হয়, আবার কোন কর্ম থেকে নিবৃত্ত থাকে, জ্ঞানীও প্রাক্তন সংস্কারবশেই বিহিত কর্ম করেন এবং নিষিদ্ধ কর্ম থেকে বিরত থাকেন। পূর্বোক্ত জ্ঞানী পুরুষ জ্ঞান ও বিজ্ঞানের তত্ত্বজ্ঞ সর্বভূতের সুহৃদ, সমদর্শী ও শান্ত। বিশ্বকে তিনি সৎস্বরূপ জানেন, তাই তিনি কখনও সংসার-বন্ধনে আবদ্ধ হন না। ১-১২

শুকদেব বললেন, মহারাজ, পরমভক্ত উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনে তত্ত্বজিজ্ঞাসু হয়ে অচ্যুতকে প্রণাম করে বলতে লাগলেন। ১৩

উদ্ধব বললেন, হে যোগেশ, যোগবিন্যাস, যোগাত্মা, যোগসম্ভব, আপনি আমার নিঃশ্রেয়সের (মুক্তি বা পরম মঙ্গল লাভের) জন্যই সন্ন্যাসাত্মক ত্যাগের বিষয় বলেছেন। হে ভূমা, বিষয়াসক্ত মানুষ ভক্ত হলেও তার পক্ষে কামনা ত্যাগ করা কঠিন। সুতরাং অভক্তগণের পক্ষে যে তা আরো দুষ্কর সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ভগবান, আপনি আমাকে ত্যাগের উপদেশ দিয়েছেন, কিন্তু আমি অতি নির্বোধ, কারণ আপনার মায়ারচিত এই দেহে ও স্ত্রী-পুত্রাদিতে 'আমি ও আমার' জ্ঞান করে অজ্ঞানে নিমগ্ন রয়েছি। অতএব আমি যাতে অনায়াসে আপনার উপদেশ সম্যক অনুসরণ করতে পারি, আমাকে সেরূপ শিক্ষাই দিন। আমি তো আপনারই ভৃত্য, সুতরাং নির্দেশের অনুবর্তী। স্বপ্রকাশ সত্য পরমাত্মা সম্পর্কে আমাকে উপদেশ দিতে পারেন, এরূপ বক্তা তো আপনি ভিন্ন অন্য দেবতাদের মধ্যে দেখতে পাই না। কারণ, ব্রহ্মাদি দেহীমাত্রেরই বুদ্ধি আপনার মায়ায় আচ্ছন্ন ; তাই তাঁরা বিষয়কেই পরম প্রয়োজন মনে করে। আমি দুঃখে সন্তপ্ত ও বৈরাগ্যযুক্ত হয়ে নর-নারায়ণরূপী আপনার আশ্রয় গ্রহণ করছি। কেন না, আপনি অনবদ্য, অনন্তপার, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান এবং মানুষের প্রতি অনুগ্রহপরায়ণ। ১৪-১৮

ভগবান বললেন, ইহলোকে লোকতত্ত্বে বিচক্ষণ মানুষ প্রায়ই বিবেকবুদ্ধির সাহায্যে বিচারপূর্বক নিজের চিত্তকে বিষয়-বাসনা থেকে উদ্ধার করেন। পুরুষের আত্মাই আত্মগুরু, আত্মাই প্রত্যক্ষ ও অনুমানের সাহায্যে পরম মঙ্গল লাভ করেন।[২] মনুষ্যজন্মে সাংখ্য ও যোগে বিশারদ বিবেকবান পুরুষগণ সর্বশক্তি-সম্পন্ন আমাকে সাক্ষাৎ আবির্ভূতরূপে দর্শন করেন, কেননা, মানুষই জ্ঞানের অধিকারী ; পশু-পক্ষীদের জ্ঞান ক্ষুধাতৃষ্ণার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এই পৃথিবীতে একপদ, দ্বিপদ, ত্রিপদ, চতুষ্পদ, বহুপদ, অথবা পদহীন প্রভৃতি বহু জীবের সৃষ্টি হয়েছে। এদের মধ্যে মানুষ আমার প্রিয়, কেননা মানুষ পরমার্থ সাধনে সক্ষম।

১ 'জ্ঞান' শব্দে বেদের তাৎপর্য নির্ণয় ও বিজ্ঞান শব্দে তার অর্থানুভবকে বোঝাচ্ছে।

২ তুলনীয়: আত্মার দ্বারা আত্মাকে উদ্ধার করতে হবে। আত্মাকে কখনো ভোগের দ্বারা অবসন্ন করো না। কারণ আত্মাই আত্মার বন্ধু, আত্মাই আত্মার শত্রু।—গীতা, ৬।৫

ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমার স্বরূপ প্রত্যক্ষ করা যায় না ; মানবদেহে স্থিত জীবগণ কিন্তু বুদ্ধি প্রভৃতি গুণের দ্বারা এবং লক্ষণ-দর্শনের ও অনুমানের সাহায্যে সকলের প্রবর্তক কৃষ্ণরূপী ঈশ্বর আমাকে অন্বেষণ করছে। আমি কিন্তু তর্কাতীত, তাই অনুমানেরও অগ্রাহ্য। এই বিষয়েও পণ্ডিতগণ পরম বিবেকী অবধূত[১] ও যদুর সংবাদরূপ প্রাচীন এক কাহিনীর উল্লেখ করেছেন। ধর্মজ্ঞ যদু একদিন বিবেকবান তরুণ এক অবধূতকে দেখতে পেলেন। তিনি নির্ভয়ে সর্বত্র বিচরণ করছিলেন। যদু সেই অবধূতকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি তো কোন কর্মের অনুষ্ঠান করেন না, আপনি জ্ঞানী হয়েও বালকের ন্যায় নিশ্চিন্তমনে সংসারে বিচরণ করছেন। আপনার এই নির্মল বুদ্ধি কেমন করে হল ? মানুষ প্রায়ই আয়ু, যশ ও সম্পদের কামনা করে ধর্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গে বা আত্মতত্ত্ব-বিচারে প্রবৃত্ত হয়। আপনি কিন্তু সমর্থ, জ্ঞানী, দক্ষ, সুভগ (সুন্দর) ও অমৃতভাষী হয়েও জড়, উন্মত্ত ও পিশাচের মত নিষ্কর্মা ও স্পৃহাশূন্য হয়েছেন। কাম ও লোভের দাবানলে মানুষ দগ্ধ হচ্ছে। কিন্তু আপনি কামাদি আগুন থেকে মুক্ত হয়ে জলে নিমগ্ন হাতীর ন্যায় তাপে দগ্ধ হচ্ছেন না। ব্রহ্মন্, আপনি বিষয়ভোগে বিরত এবং স্ত্রী-পুত্রাদিশূন্য হয়েও স্বীয় আত্মাতে কেমন করে এরূপ আনন্দে রয়েছেন তার কারণ আমি জানতে ইচ্ছুক। আমাকে তা বলুন। ১৯-৩০

ভগবান বললেন, ব্রাহ্মণহিতৈষী মেধাবী যদু এইভাবে তাঁকে পূজা করে প্রশ্ন করলে সেই মহাভাগ ব্রাহ্মণ বিনয়াবনত রাজাকে বলতে লাগলেন। ৩১

ব্রাহ্মণ বলেন, মহারাজ, আমি নিজ বুদ্ধি অনুসারে বহু গুরুর কাছে জ্ঞানলাভ করে সংসার-সন্তাপ থেকে মুক্ত হয়ে শংকাহীন হয়ে পৃথিবী পর্যটন করছি। সেই সকল গুরু পৃথিবীতে বিদ্যমান আছেন ; আপনি তাঁদের কথা শুনুন। আমি নিজের বুদ্ধির সাহায্যে যে চব্বিশজন গুরুর কাছে শিক্ষা গ্রহণ করেছি তাঁরা হলেন পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল, অগ্নি, চন্দ্র, সূর্য, কপোত, অজগর, সিন্ধু, পতঙ্গ, মধুমক্ষিকা, হস্তী, ব্যাধ, হরিণ, মীন, গণিকা পিঙ্গলা, কুরর পক্ষী, বালক, কুমারী, অয়স্কার বা শরনির্মাতা, সাপ, মাকড়সা এবং কাঁচপোকা। ৩২-৩৫

নহুষাত্মজ, আমি যাঁর কাছে যেমন শিখেছি, এবার তাই বলছি, শুনুন। ধীর ব্যক্তি দৈবাধীন প্রাণীদের দ্বারা উৎপীড়িত হলেও তা দৈবকর্ম মনে করে তাঁরা স্বধর্ম-পথ থেকে বিচলিত হন না। আমি পৃথিবী থেকে এই ক্ষমাগুণেই শিক্ষা করেছি। (পৃথিবী প্রাণি-পদাহতা হয়েও অবিচলিত থাকে, সুতরাং পৃথিবীর এই ক্ষমাগুণ শিক্ষণীয়)। যাঁর সকল প্রচেষ্টা পরের হিতের জন্য, সেই সাধু ব্যক্তি পর্বতের নিকট পরোপকার শিক্ষা করবেন। (পর্বত বৃক্ষ, তৃণ, নির্ঝরাদির দ্বারা পরের উপকার করে থাকে)। এভাবে তিনি বৃক্ষের শিষ্য হয়ে পরাধীনতা শিক্ষা করবেন অর্থাৎ বৃক্ষের মতো সহিষ্ণু হয়ে পরের উপকারের জন্যেই নিজেকে পরের নিকট সমর্পণ করবেন। মুনি শুধু প্রাণবৃত্তির দ্বারাই সন্তুষ্ট থাকবেন অর্থাৎ তিনি শুধু প্রাণরক্ষার জন্যেই আহার্য গ্রহণ করবেন ; ইন্দ্রিয়প্রিয় বিষয়ে তিনি অনাসক্ত হবেন। আহার্যের অভাবে মন বিকল হয় ও জ্ঞানের নাশ ঘটে। সুতরাং যাতে জ্ঞাননাশ না হয় এবং বাক্য ও মন বিক্ষিপ্ত না হয়, মুনি সেইভাবে চলবেন। প্রাণবায়ুর নিকট এই শিক্ষা গ্রহণীয়। যোগী শীতে ক্ষাদি নানা ধর্মবিশিষ্ট বিষয়সমূহ ভোগ করলেও তাঁর চিত্ত হবে সুখদুঃখের চিন্তাশূন্য ; তিনি বাহ্যবায়ুর ন্যায় অনাসক্ত ও

১ যিনি দেহাদি সংস্কারমুক্ত ও বিবেকী।

নির্লিপ্ত থাকবেন। বায়ু বিভিন্ন গন্ধের আশ্রয় হলেও তার দ্বারা লিপ্ত হয় না ; আত্মদর্শী যোগী পুরুষ তেমনি পার্থিব (পাঞ্চভৌতিক) দেহে প্রবেশ করে বাল্যাদি দেহধর্ম গ্রহণ করলেও তাতে আসক্ত হবেন না। ৩৬-৪১

মুনিপুরুষ দেহান্তর্গত হয়েও নিজের ব্রহ্মস্বরূপ ভাবনা করবেন—আকাশ যেমন চরাচর সকল পদার্থের মধ্যে অধিষ্ঠিত হয়েও নির্লিপ্ত থাকে, তেমনি তিনিও আত্মাকে আকাশের মত সর্বগত, অপরিচ্ছিন্ন ও নির্লিপ্ত বলে মনে করবেন। বায়ুচালিত মেঘে আকাশ সংস্পৃষ্ট হয় না ; কালসৃষ্ট তেজ, জল ও অন্নময় দেহাদির দ্বারাও তেমনি পুরুষ আকাশের ন্যায় অসঙ্গ বা নির্লিপ্ত। নির্মল জল সমুদয় বস্তুরই মল ধৌত করে ; তেমনি শুদ্ধচিত্ত, স্বভাবস্নিগ্ধ, মধুরালাপী ও তীর্থস্বরূপ মুনিগণ দর্শন, স্পর্শন ও কীর্তনের দ্বারা দর্শক ও শ্রোতাদের পবিত্র করেন। তেজস্বী, তপোদীপ্ত, শীতগ্রীষ্মাদির দ্বারা অনভিভূত, অপরিগ্রহশীল, মুক্তাত্মা মুনি অগ্নির ন্যায় সর্বভুক্ হয়েও পাপগ্রস্ত হন না। অগ্নি যেমন কখনো প্রচ্ছন্ন কখনো বা ব্যক্ত থেকে মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণের উপাস্য হন এবং দাতাদের ভূত-ভবিষ্যৎ পাপরাশি দগ্ধ করে তাদের আহুতি গ্রহণ করেন, মুনিগণও সেরূপ করবেন অর্থাৎ কোথাও গূঢ়রূপে, কোথাও প্রকাশ্যে শ্রেয়স্কাম ব্যক্তিদের উপাস্য হবেন এবং দাতাদের পাপরাশি দগ্ধ করে সর্বত্র ভোজন করবেন। অগ্নি যেমন কাষ্ঠে কাষ্ঠে প্রবিষ্ট হয়ে তদাকার হলেও অগ্নিরূপে প্রতীত হন, বিভু পরমাত্মাও তেমনি স্ব-মায়া রচিত সদসৎ-স্বরূপ নানা দেহে প্রবিষ্ট হয়েও বিভুত্বাদি স্বরূপে আত্মারূপেই নিরূপিত হয়ে থাকেন। অলক্ষিতবেগ (যার বেগ লক্ষ্য করা যায় না) কালের দ্বারা চন্দ্রের কলাসমূহেরই হ্রাস বৃদ্ধি হয়, চন্দ্রের কোনো হ্রাসবৃদ্ধি হয় না, তেমনি জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবের যে বিবিধ ভাব (জন্ম, অস্তিত্ব, বৃদ্ধি, বিপরিণাম, অপক্ষয় ও মৃত্যু) প্রকাশ পায়, তাতে তাদের দেহেরই বিকৃতি ঘটে, আত্মার কোন বিকৃতি ঘটে না। অগ্নিশিখার প্রতিক্ষণে উৎপত্তি ও বিনাশ ঘটে, কিন্তু স্বরূপত অগ্নির উৎপত্তি ও বিনাশ নেই। তেমনি জলপ্রবাহের ন্যায় বেগবান কালের দ্বারা জীবগণেরই প্রতিক্ষণে উৎপত্তি ও বিনাশ ঘটে, কিন্তু তা দৃষ্টিগোচর হয় না। আত্মার কিন্তু কোন অবস্থান্তরই ঘটে না। সূর্য যেমন তেজ দ্বারা গ্রীষ্মকালে জলরাশি আকর্ষণ করে বর্ষাকালে আবার তা পরিত্যাগ করে, তেমনি যোগী পুরুষ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয় গ্রহণ করলেও অর্থী উপস্থিত হলেই তা দান করবেন, তিনি তাতে আসক্ত হবেন না। একই সূর্য বিভিন্ন জলপাত্রে প্রতিবিম্বিত হলে স্থূলবুদ্ধি লোকের কাছে বিভিন্নরূপে প্রতীয়মান হয়। স্বরূপত অভিন্ন আত্মা বিভিন্ন দেহরূপ উপাধিতে প্রবেশ করলে স্থূলবুদ্ধি লোক তাঁকে বিভিন্নরূপে দেখে। ৪২-৫১

কোন বিষয়ে কারো সঙ্গে অতিস্নেহপ্রবণ বা অতি আসক্ত হলে বিবেকহীন কপোতের মত দুঃখভোগ করতে হয়। কোন বনে এক কপোত উচ্চ বৃক্ষে কুলায় নির্মাণ করে ভার্যা কপোতীর সঙ্গে কয়েক বছর ধরে সেখানে বাস করছিল। গৃহ-ধর্মে রত সেই কপোত-কপোতী পরস্পরের স্নেহে বদ্ধচিত্ত হয়ে একে অপরের দৃষ্টির দ্বারা দৃষ্টি, অঙ্গের দ্বারা অঙ্গ ও বুদ্ধির দ্বারা বুদ্ধি বন্ধন করে বাস করছিল। তারা একত্রে মিলে সেই বনে নিঃশঙ্কচিত্তে এক শয্যায় শয়ন, এক আসনে উপবেশন, একসঙ্গে ভ্রমণ, একত্রে অবস্থান এবং পরস্পর আলাপ, ক্রীড়া ও ভোজনাদি করত। কপোতী সহাস্য দৃষ্টি আর আলাপাদির দ্বারা কপোতকে প্রীত করেছিল ; পতির অনুকম্পা লাভ করে সে তার কাছে যা চাইত অজিতেন্দ্রিয় কপোতও কষ্ট করে সেই কাম্যবস্তু এনে তার বাসনা পূর্ণ করত। কপোতী প্রথম গর্ভধারণ করে তার পতির সামনেই বাসার মধ্যে কয়েকটি অণ্ড প্রসব করল। তারপর যথাসময়ে ভগবানের

অচিন্তনীয় শক্তির প্রভাবে সেই ডিমগুলো থেকে সুকুমার রোমরাজিবিশিষ্ট কয়েকটি শাবক বের হল। শাবকদের মধুর কূজন শুনে পুত্রবৎসল দম্পতি তাদের সুখে পালন করতে লাগল। হৃষ্ট শাবকদের পক্ষদ্বয়ের সুখস্পর্শ, মধুর কূজনে, সুন্দর ভঙ্গী ও উৎপতনাদি দর্শনে পিতামাতার পরম আনন্দ হত। মায়া-মোহে আবদ্ধ হয়ে কপোত-দম্পতি পরস্পর স্নেহবদ্ধ হৃদয়ে সেই শিশুসন্তানদের পালন করতে লাগল। একদিন কপোত-কপোতী শাবকদের আহার সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বনে গিয়ে আহার অন্বেষণে বহুক্ষণ বনমধ্যে বিচরণ করতে লাগল। ইতিমধ্যে এক লুব্ধক (ব্যাধ) সেই বনে বিচরণ করতে করতে হঠাৎ কপোত-শাবকদের তাদের বাসার কাছে খেলা করতে দেখে জাল বিছিয়ে তাদের ধরে ফেলল। এদিকে সন্তানপোষণের উৎসুক সেই কপোত-দম্পতি আহার সংগ্রহ করে বাসায় ফিরে এল। কপোতী জালে আবদ্ধ শিশু সন্তানদের ক্রন্দন শুনে অতি দুঃখে কাঁদতে কাঁদতে তাদের খুঁজে বেড়াতে লাগল। ৫২-৬৫

ভগবানের মায়ায় স্নেহপাশবদ্ধ কপোতী স্মৃতিভ্রমে শাবকগণকে জালবিদ্ধ দেখেও নিজে জালে গিয়ে পড়ল। তখন প্রাণাপেক্ষা প্রিয় সন্তানদের এবং প্রাণোপমা ভার্যাকে জালে আবদ্ধ দেখে কপোতও অতি দুঃখে বিলাপ করতে লাগল। অহো, আমি অতি অল্প পুণ্যবান ও দুর্মতি; আমার দুর্গতি দেখ; ঐহিক সুখে তৃপ্ত বা কৃতার্থ না হতে হতেই আমার ধর্ম, অর্থ ও কামসাধনের আশ্রয় নষ্ট হয়ে গেল। আমার পতিব্রতা, অনুকূলা ও অনুরূপা ভার্যা শূন্যগৃহে আমাকে একা ফেলে রেখে সাধুদের সঙ্গে স্বর্গে যাচ্ছে। অতএব মৃতদার, নষ্টপুত্র, বিরহ-কাতর আমি কি জন্যেই বা দুঃখময় জীবন নিয়ে বেঁচে থাকব? তারপর সেই মূর্খ ও দুঃখভারাক্রান্ত কপোত শাবকগণকে জালে আবদ্ধ, মরণাপন্ন ও মুক্তির জন্য প্রয়াসী দেখেও নিজে সেই জালে পড়ল। সেই নিষ্ঠুর ব্যাধ গৃহাসক্ত কপোত, কপোতী আর শাবকগণকে পেয়ে তার মনের বাসনা পূর্ণ হল এবং সে স্বগৃহে ফিরে গেল। এভাবে যে ব্যক্তি গৃহাসক্ত হয়ে দীন, অশান্তহৃদয় কুটুম্ব পোষণ করে, সে ঐ কপোতের মত বহু কষ্ট ভোগ করে। যে ব্যক্তি মুক্তির উদ্ঘাটিত দ্বারস্বরূপ মানবদেহ লাভ করেও কপোতের ন্যায় গৃহাসক্ত হয়, পণ্ডিতেরা তাকে 'আরূঢ়চ্যুত' বলে থাকেন। যিনি শ্রেয়ের পথে আরোহণ করেও পতিত হয়েছেন তাঁকেই বলা হয় 'আরূঢ়চ্যুত'। ৬৬-৭৪

অষ্টম অধ্যায়

নবগুরুর বর্ণনা

ব্রাহ্মণ বললেন, মহারাজ, জীবগণের স্বর্গে ও নরকে দুঃখ ও ইন্দ্রিয়সুখ প্রাক্তন কর্ম অনুসারে অযাচিত ভাবেই উপস্থিত হয়, সুতরাং বিবেকী পুরুষ ইন্দ্রিয়সুখের অভিলাষী হবেন না। অজগরবৃত্তি অবলম্বন করে উদাসীন থেকে বিবেকী পুরুষ যদৃচ্ছালব্ধ আহার গ্রহণ করবেন—সে আহার সরস হোক বা বিরসই হোক, প্রচুর পরিমাণই হোক বা অল্পপরিমাণই হোক। যদৃচ্ছালব্ধ আহার উপস্থিত না হলে দৈবকেই গ্রাসের প্রতিবন্ধক বুঝে বিবেকী পুরুষ ধৈর্য ধরে অজগরের মত অনাহারে ও নিরুদ্যমে দীর্ঘকাল শুয়ে থাকবেন। বিবেকী পুরুষ ইন্দ্রিয়ের, মনের ও দেহের বলের অধিকারী হলেও নিশ্চেষ্টদেহ ধারণ করে অজগরের মত শুয়ে থাকবেন;

নিদ্রাশূন্য হয়ে ভগবৎ-চিন্তাদি স্বার্থে দৃষ্টি রাখবেন এবং ইন্দ্রিয়বান হয়েও বিষয় গ্রহণের চেষ্টা করবেন না। বিবেকী পুরুষ প্রশান্তসলিল সাগরের মত বাইরে প্রসন্ন, অন্তরে গম্ভীর, দুরবগাহ (তেজস্বিতাবশত), অনতিক্রমণীয়, অনন্তপার ও রাগাদি ক্ষোভশূন্য হবেন। বর্ষাকালে সমুদ্র যেমন নদীসমূহের জলরাশি ধারণ করে স্ফীত হয়েও বেলাভূমিকে অতিক্রম করে না, আর গ্রীষ্মে নদীসকল শুষ্ক হলেও সমুদ্র নিজে শুষ্ক হয় না, তেমনি নারায়ণপরায়ণ মুনি যথেষ্ট পরিমাণে কাম্যবস্তু লাভ করলে আনন্দে মত্ত কিংবা কাম্যবস্তুর অভাবে শোকে কাতর হন না। ১-৬

অজিতেন্দ্রিয় পুরুষ দৈবমায়ারচিত কামিনীকে দর্শন করে, তার হাব-ভাবে প্রলুব্ধ হয়ে অগ্নিমুখে ধাবমান পতঙ্গের মত অন্ধনরকে পতিত হয় এবং ক্লেশ ভোগ করে। অবিবেকী পুরুষ দৈবমায়ারূপিণী কামিনী, কাঞ্চন, অলংকার ও বসনাদি দ্রব্যের উপভোগবুদ্ধিতে প্রলুব্ধ ও হতজ্ঞান হয়ে অবোধ পতঙ্গের মতই বিনষ্ট হয়। গৃহস্থগণকে পীড়ন না করে যে পরিমাণ আহারের দ্বারা দেহরক্ষা হয় সেই পরিমাণ আহার অল্প অল্প করে সংগ্রহ করে মুনি মাধুকরী বৃত্তি অবলম্বন করে থাকবেন। তিনি কখনো লোভবশত কোন গৃহস্থের আশ্রয় গ্রহণ করবেন না। ভ্রমর-সকল যেমন পুষ্প থেকেই মধু গ্রহণ করে, বিজ্ঞ পুরুষ তেমনি ক্ষুদ্র-মহৎ সকল শাস্ত্র থেকেই সার গ্রহণ করবেন। তিনি ভিক্ষালব্ধ অন্ন সায়ংকালের জন্য বা পরদিনের জন্য সঞ্চয় করে রাখবেন না। হাতে যেটুকু অন্ন ধরে বা যে পরিমাণ অন্নে উদরপূর্তি হয়, তিনি সেই পরিমাণ অন্ন গ্রহণ করবেন, মধুমক্ষিকার ন্যায় সঞ্চয়ী হবেন না। ভিক্ষু কাষ্ঠনির্মিত যুবতী মূর্তিকেও পাদদ্বারা স্পর্শ করবেন না; স্পর্শ করলে তার অঙ্গসংসর্গে হস্তী যেমন হস্তিনীর সঙ্গলালসায় তৃণাদিতে আচ্ছন্ন গর্তে পতিত হয়, তেমনি তিনিও সংসারবন্ধনে আবদ্ধ হবেন। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি মৃত্যুরূপিণী কামিনীর সাহচর্য কখনও কামনা করবেন না; যদি করেন তবে অধিকতর বলশালী হস্তী যেমন হস্তিনীতে আসক্ত হীনবল হস্তীকে বধ করে, সেইরূপ অধিকতর বলবান পুরুষের দ্বারা তিনিও নিহত হবেন। লোভী ব্যক্তি দুঃখসঞ্চিত অর্থ দান বা উপভোগ করতে পারে না। যেমন মধুহরণকারী ব্যাধ মৌমাছিদের সঞ্চিত মধুর সন্ধান জেনে তা হরণ করে, তেমনি অন্য কোনো ব্যক্তি তার গুপ্তধনের সন্ধান জেনে তা ভোগ করে। মধু-হরণকারী ব্যাধ যেমন মৌমাছিদের মধু তাদের পূর্বেই আস্বাদন করে, তেমনি যতিপুরুষও গৃহস্থদের মঙ্গলকামী হয়ে তাদের কষ্টোপার্জিত অর্থের দ্বারা সংগৃহীত আহার্য তাদের পূর্বেই মধুহারীদের মত ভোজন করেন। বনবাসী যতি কখনও গ্রাম্যগীত শুনবেন না। ব্যাধের গীতে মোহিত ও আবদ্ধ হরিণের নিকট থেকে তিনি এই শিক্ষা গ্রহণ করবেন। মৃগীপুত্র ঋষ্যশৃঙ্গ রমণীদের গ্রাম্য নৃত্য, গীত ও বাদ্য উপভোগ করে তাদের বশীভূত ও ক্রীড়নক হয়েছিলেন। আহার্যবশে বিমোহিত মৎস্য যেমন বড়শিতে বিদ্ধ হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তেমনি দুর্বুদ্ধি পুরুষও চিত্তবিক্ষোভকারী রসনার রসাস্বাদনে বিমোহিত হয়ে মৃত্যু-কবলিত হয়। বিবেকী পুরুষ আহার ত্যাগ করে প্রায় সকল ইন্দ্রিয়কেই জয় করতে পারেন, কিন্তু নিরাহার পুরুষের রসনেন্দ্রিয়ের লালসা ক্রমাগত বৃদ্ধিই পায়। মানুষ যতদিন রসনার লালসা জয় করতে না পারেন, ততদিন তিনি যথার্থ জিতেন্দ্রিয় হতে পারেন না; একমাত্র রসনাকে জয় করলে সকল ইন্দ্রিয়কেই জয় করা যায়। ৭-২১

নৃপনন্দন, পুরাকালে বিদেহনগরে পিঙ্গলা নামে এক গণিকা বাস করত। তার কাছেও আমি কিছু শিক্ষালাভ করেছি, সে কথা শুনুন। সেই কামচারিণী একদিন

কান্তকে সংকেত-স্থানে আনার জন্যে সন্ধ্যাকালে উত্তম বেশভূষা পরে দরজার বাইরে এসে দাঁড়িয়েছিল। এভাবে অর্থাভিলাষিণী পিঙ্গলা সেই পথে যে কোন পুরুষকে আসতে দেখলে তাকেই বিত্তবান ও কান্ত বলে মনে করতে লাগল। কিন্তু সঙ্কেত-স্থানের কাছে এসেও তাদের চলে যেতে দেখে জীবিকার্জনকারিণী পিঙ্গলা ভাবতে লাগল—অন্য কোন বিত্তবান পুরুষ আমার কাছে এসে অনেক ধন দিতে পারে। এই দুরাশায় নিদ্রাশূন্য হয়ে সে দ্বারে দাঁড়িয়ে রইল। কিছুক্ষণ পরে সে একবার গৃহে প্রবেশ করল, কিন্তু আবার বাইরে এল। এমনি করে রাত্রি গভীর হল এবং অর্থের আশায় তার মুখ শুকিয়ে গেল, হৃদয় দুঃখিত হল। এই অবস্থায় অর্থচিন্তা থেকেই পরিণামে সুখাবহ পরম এক নির্বেদ উপস্থিত হল। নির্বেদাপন্ন হৃদয়ে সে যা বলে বেড়াত তা আমার কাছে শুনুন—'নির্বেদ বা বৈরাগ্যই আশাপাশনাশক অসির তুল্য।' অজ্ঞান ব্যক্তি যেমন মমতা পরিত্যাগ করতে পারে না, তেমনি বৈরাগ্যহীন পুরুষের দেহবন্ধন ছেদনের উপায় নেই।[১] ২২-২৯

পিঙ্গলা বলল, অহো! আমি চিত্তকে জয় করতে পারি নি; দেখ, কী প্রবল মোহ আমায় অভিভূত করেছে। আমি বিবেক হারিয়ে তুচ্ছ নাগরের কাছে ধনাদি বস্তুর আশা করছি। আমি অত্যন্ত মূঢ়; কারণ রতিদাতা, ধনপ্রদ, নিত্য, প্রিয়তম ঈশ্বর অন্তর্যামিরূপে সর্বদা আমার অন্তরে বিরাজ করছেন, কিন্তু তাঁর সেবা না করে আমি বাসনাপূরণে অসমর্থ, দুঃখ, ভয়, দুশ্চিন্তা, শোক ও মোহপ্রদ তুচ্ছ পুরুষের ভজনা করছি। আমি লম্পট, অর্থলোভী, অনুশোচনীয় পুরুষের কাছে দেহ বিক্রয় করে দেহসুখ ও ধনলাভের আশায় অত্যন্ত নিন্দনীয় গণিকাবৃত্তি আশ্রয় করে অনর্থক দেহকে কষ্ট দিয়েছি। আমি ভিন্ন আর কোন্ নারী এই গেহরূপ নরদেহকে কান্ত-বুদ্ধিতে সেবা করে? পুরুষের দেহরূপ গৃহের অস্থি হল বংশ, পঞ্জরগুলি বংশের খণ্ড, পদদ্বয় স্তম্ভ, চর্ম-রোম-নখগুলি আচ্ছাদন; এতে ক্ষয়িষ্ণু নয়টি দ্বার আছে। সেই মল-মূত্রপূর্ণ দেহকে আমার মত মূঢ়বুদ্ধি নারী ছাড়া আর কে সেবা করে? আমি অসতী, তাই পরম সুখপ্রদ অচ্যুতকে পরিত্যাগ করে কোন পরপুরুষের নিকট ভোগসুখ কামনা করেছি। ভগবান অচ্যুত দেহধারীদের প্রিয়তম সুহৃৎ; আমি আত্মনিবেদন করে তাঁকে ক্রয় করে লক্ষ্মীদেবীর মতই তাঁর সঙ্গে বিহার করব। কাম্যবিষয় অনিত্য, মানুষ জন্মমরণশীল, দেবগণও কালের অধীন; সুতরাং তাঁরা তাঁদের পত্নীদের কতটুকু সুখ দিতে পারবেন? আমার কোন কর্মের জন্যে ভগবান বিষ্ণু নিশ্চয়ই সন্তুষ্ট হয়েছেন; কারণ আমার মত দুরাশাসম্পন্ন মানুষের অন্তরেও এই পরম সুখাবহ বৈরাগ্যের উদয় হয়েছে। যদি তা না হত, তবে যে বৈরাগ্য আশ্রয় করে মানুষ বিষয়সমূহ ত্যাগ করে শান্তি লাভ করে, তার কারণস্বরূপ আমার এত ক্লেশ হত না। অতএব আমি ভগবানের দান এই উপকার শিরোধার্য করে গ্রাম্য-বিষয়ে দুরাশা ত্যাগ করব এবং সেই অধীশ্বরের শরণাগত হব। আমি ভগবানের এই উপকারে শ্রদ্ধাযুক্তা হব এবং যদৃচ্ছালাভে সন্তুষ্ট হয়ে পতিরূপী আত্মার সঙ্গেই বিহার করব। আমার আত্মা সংসারকূপে নিপতিত, বিষয়সকল আমার বিবেক হরণ করেছে এবং আমি কালসর্পগ্রস্ত হয়েছি, সুতরাং শ্রীহরি ভিন্ন আর কে আমাকে উদ্ধার করতে পারে? পুরুষ নিখিল জগৎকে যখন কালসর্প-কবলিত দর্শন করবে এবং স্বয়ং অপ্রমত্ত হয়ে ঐহিক ও পারত্রিক সকল বিষয়ে বৈরাগ্য লাভ করবে, তখন নিজেই নিজেকে রক্ষা করতে পারবে। ৩০-৪২

১ দ্রষ্টব্য: কঠ উপনিষদ, ২।৩।১৫ ও মুণ্ডক উপ: ২।২।৯

অবধূত ব্রাহ্মণ বললেন, পিঙ্গলা এইরূপ নিশ্চয় করে কান্ত-সমাগমের দুরাশা ত্যাগ করে পরম শান্তিতে শয্যায় গিয়ে শয়ন করল। আশাই পরম দুঃখ, নিরাশাই (বাসনাহীনতা) পরম সুখ; কেননা কান্ত-সমাগমের আশা ত্যাগ করেই পিঙ্গলা সুখে গাঢ় নিদ্রায় নিদ্রিত হয়েছিল। ৪৩-৪৪

নবম অধ্যায়

সপ্তগুরুর কথা

ব্রাহ্মণ বললেন, মানুষের অত্যন্ত প্রিয় বস্তুর প্রতি আসক্তিই তার দুঃখের কারণ। যিনি তা জেনে অকিঞ্চন হতে পারেন তিনিই অনন্ত সুখ লাভ করেন। মাংসগ্রাহী কুরর পাখীকে অলব্ধমাংস বলবান শ্যেনগৃধ্রাদি বা অন্য কুররগণ বধ করতে উদ্যত হলে সেই কুরর পাখী মাংসখণ্ড ত্যাগ করেই সুখী হয়। আমার মান অপমান নেই, গৃহ ও পুত্রাদি বিষয়ের ভাবনাও নেই, অতএব আমি আত্মতৃপ্ত ও আত্মক্রীড় হয়ে বালকের মত এই সংসারে ভ্রমণ করি।[১] অজ্ঞ ও উদ্যমহীন বালক এবং যিনি গুণাতীত ঈশ্বর লাভ করেছেন, উভয়েই চিন্তামুক্ত ও পরমানন্দময়। ১-৪

একদিন কোন এক কুমারীর বন্ধুজন (পিত্রাদি) কার্যোপলক্ষে স্থানান্তরে গিয়েছিল, তখন কয়েকজন লোক তার গৃহে উপস্থিত হয়। তাই কুমারী নিজেই তাদের অভ্যর্থনা করে। কুমারী তাদের আহারের জন্য শালিধান কুটতে শুরু করলে তার হাতের শাঁখের বালাগুলির পরস্পর আঘাতে খুব শব্দ হতে থাকে। বুদ্ধিমতী কুমারী তাতে লজ্জা পেয়ে হাতের শাঁখা এক এক করে ভেঙে ফেলল; এক এক হাতে শুধু দু' গাছি করে শাঁখা অবশিষ্ট রাখল। কিন্তু ধান কোটার রত হলে শাঁখের বালা দুটি থেকে আবার শব্দ হতে লাগল। সে তখন মাত্র একগাছি শাঁখা রেখে অবশিষ্ট শাঁখা ভেঙে ফেলল; তাতে আর শব্দ হল না। হে অরিন্দম, আমি লোকতত্ত্ব জানার ইচ্ছায় পৃথিবীর সর্বত্র ভ্রমণ করতে করতে কুমারীর নিকট থেকে এই শিক্ষা লাভ করেছি যে বহুজনের একত্র বাস বিবাদের কারণ। দু' জনের একত্র বাসও পরস্পর বৃথা বাক্যালাপের কারণ হয়। অতএব কুমারী-কঙ্কণের ন্যায় একাকী বাস করা উচিত। ৫-১০

যোগিগণ আসনজয়ী ও শ্বাসজয়ী হবেন এবং বৈরাগ্য ও অভ্যাসযোগের দ্বারা একমাত্র লক্ষ্যের দিকেই মনকে সংযুক্ত করবেন। মন যাতে স্থিতিলাভ করে ক্রমে কর্ম-বাসনা ত্যাগ করে এবং পরিবর্ধিত সত্ত্বগুণের দ্বারা রজ ও তমোগুণকে পরিহার করে ইন্ধনশূন্য অগ্নির মতো নির্বাণ লাভ করে, সেই ভগবানেই মনকে সংযুক্ত রাখবে। এক বাণ-নির্মাতা বাণ নির্মাণের সময় এত নিবিষ্টচিত্ত ছিল যে তার পাশ দিয়ে রাজা চলে গেলেও সে তা জানতে পারেনি। তেমনি যোগী পুরুষও ধ্যেয় বিষয়ে নিমগ্নচিত্ত হলে বাহ্য বা অভ্যন্তরীণ বিষয় কিছুই জানতে পারেন না। মুনি সাপের মত একাকী বিচরণকারী, গৃহহীন, সাবধান, গুহাশায়ী, অলক্ষ্যগতি, অসহায় ও মিতভাষী হবেন। নশ্বরদেহধারী মানুষে গৃহ-নির্মাণ দুঃখের হেতু ও নিষ্ফল; সাপ পরকৃত গৃহে বা গর্তাদিতে সুখে বাস করে। ১১-১৫

১ তুলনীয়: ভগবদ্গীতা, ১৪।২৫ শ্লোক।

অখিলেশ্বর দেব নারায়ণ অন্যের সাহায্য ভিন্ন পূর্বসৃষ্ট এই জগৎকে প্রলয়কালে কালশক্তির দ্বারা নিজের অন্তরে সংহার করে আত্মাধার, নিখিলের আশ্রয় ও পদার্থান্তর-শূন্য হয়ে অবস্থান করেন। নিজশক্তি স্বরূপ কালের প্রভাবে সত্ত্বাদি গুণসমূহ যখন সাম্যাবস্থা লাভ করে (অর্থাৎ প্রকৃতিতে লীন থাকে) তখন প্রকৃতি-পুরুষের অধীশ্বর, আদিপুরুষ ব্রহ্মাদি ও মুক্ত জীবগণের পরম প্রাপ্য, নিরুপাধিক, পরমানন্দস্বরূপ, স্বপ্রকাশ ও কৈবল্যসংজ্ঞক সনাতন পুরুষই একমাত্র বর্তমান থাকেন। সৃষ্টিকালে সেই ভগবানই আত্মশক্তিরূপ কালের দ্বারা ত্রিগুণাত্মিকা নিজ মায়াকে সংক্ষুব্ধ করে মহত্তত্ত্বের সৃষ্টি করেন। ক্রিয়াশক্তিপ্রধান এই মহত্তত্ত্বই সৃষ্টির সূত্রস্বরূপ। কারণভূত সমষ্টিরূপ মহত্তত্ত্বেই এই বিশ্ব ওতপ্রোতভাবে প্রথিত, ইহার দ্বারাই পুরুষ সংসারে প্রবৃত্ত হয়। তারপর তিনি অহঙ্কারের দ্বারা বিশ্বসৃষ্টি করেন। তাই এই সর্বতোবিসারিণী ত্রিগুণাত্মিকা মায়াই সৃষ্টির সূত্রস্বরূপ। মাকড়সা যেমন মুখের লালার দ্বারা হৃদয় থেকে সুতোর জাল বিস্তার করে সেই জালে বাস করে এবং পুনরায় তা গ্রাস করে,[১] মহেশ্বরও তেমনি এই বিশ্বের সৃষ্টি করে তাতে ক্রীড়া করেন এবং প্রলয়কালে এই বিশ্বের সংহার করেন। ১৬-২১

দেহধারী জীব স্নেহ, দ্বেষ বা ভয়হেতু যে যে বিষয়ে সমগ্র মন নিবিষ্ট করে, মরণান্তে সেই সেই বিষয়ের স্বরূপ প্রাপ্ত হয়। কোন দুর্বল কীট (তেলাপোকা) পেশস্কারী (কাঁচপোকা) দ্বারা স্বগৃহে নিরুদ্ধ হয়ে ভয়ে তার ধ্যান করতে করতে পূর্বরূপ ত্যাগ না করেই সেই কাঁচপোকার রূপ প্রাপ্ত হয়। সুতরাং মরণান্তে জীব যে ধ্যেয় বস্তুর সারূপ্য লাভ করবে সে বিষয়ে আর কথা কি ?[২] ২২-২৩

প্রভু, এ সকল গুরুর কাছ থেকে যে সমস্ত শিক্ষা লাভ করেছি এবং সম্প্রতি স্বদেহ থেকে যা শিক্ষা পেয়েছি এবার তা বলছি, শুনুন। নিরন্তর দুঃখজনক যার পরিণাম, যা উৎপত্তি ও বিনাশশীল, সেই দেহ আমার গুরু ; কারণ দেহই বিবেক ও বৈরাগ্যের জনক। তবু, এই দেহ শৃগাল কুক্কুরাদির ভক্ষ্য ; ইহা স্থির করে এই দেহের আশ্রয়েই যথাযথ তত্ত্বানুসন্ধান করে অনাসক্তভাবে পথ পর্যটন করে থাকি। মানুষ কষ্টে ধন-সঞ্চয় করে দেহের হিতের জন্যে স্ত্রী-পুত্র, সম্পত্তি, পশু, ভৃত্য, গৃহ ও পরিজনবর্গের পোষণ করে থাকে। কিন্তু পরমায়ুর শেষে সেই বৃক্ষধর্মী দেহই দেহান্তর বীজ উৎপাদন করে বিনষ্ট হয়। বহুপত্নীক স্বামীকে যেমন প্রত্যেক স্ত্রী নিজের দিকে আকর্ষণ করে, তেমনি রসনা, পিপাসা, ত্বক, উদর, কর্ণ, নাসিকা, চপল চক্ষু এবং কর্মশক্তি নানা বিষয়ের দিকে এই দেহকে আকর্ষণ করে। ভগবান আত্মশক্তি মায়া দ্বারা বৃক্ষ, পশু, পক্ষী, মৎস্য প্রভৃতি বিভিন্ন শরীর সৃষ্টি করেও তৃপ্ত হলেন না। অবশেষে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারের উপযোগী জ্ঞানযুক্ত পুরুষ-শরীর সৃষ্টি করে পরম সন্তোষ লাভ করলেন। বহু জন্মের পর সংসারে অনিত্য হলেও সুদুর্লভ ও পুরুষার্থ-প্রাপক মনুষ্যদেহ লাভ করে ধীর ব্যক্তি নিয়ত-মরণশীল দেহের পতনের পূর্ব পর্যন্ত কালবিলম্ব না করে মুক্তির জন্যে যত্ন করবেন। কারণ, সকল জন্মেই বিষয়ভোগ করা যায়, কিন্তু মনুষ্যদেহ ভিন্ন অন্য দেহে পরম মঙ্গল লাভের সম্ভাবনা নেই। আমি এইরূপে বৈরাগ্য-সম্পন্ন হয়ে বিজ্ঞান-দীপ প্রভাবে আসক্তি ও অহংকার ত্যাগ করে আত্মনিষ্ঠ হয়ে পৃথিবী পর্যটন করি। এক গুরুর নিকট থেকে যে জ্ঞান লাভ করা যায়, তা নিশ্চয়ই যথেষ্ট বা সুস্থির নয় ; কেন না, ব্রহ্মবস্তু অদ্বিতীয় হলেও বিভিন্ন ঋষি তাঁকে বিভিন্নরূপে নির্ণয় করেছেন। ২৪-৩১

---

১ তুলনীয়: মুণ্ডক উপনিষদ, ১।১।৭ ২ তুলনীয়: ভগবদ্গীতা, ৮।৫-৬ শ্লোক।

ভগবান বললেন, অগাধবুদ্ধি সেই অবধূত ব্রাহ্মণ এইরূপ বলে নিবৃত্ত হলেন। তারপর রাজা যদু কর্তৃক অর্চিত ও বন্দিত হয়ে প্রসন্নচিত্তে যথেচ্ছ প্রস্থান করলেন। উদ্ধব, আমাদের পূর্বপুরুষগণেরও পূর্বজাত সেই যদুরাজা অবধূতের এই সকল কথা শুনে সর্বসঙ্গমুক্ত ও সর্বত্র সমদর্শী হয়েছিলেন। ৩২-৩৩

দশম অধ্যায়

উদ্ধবের প্রশ্ন

ভগবান বললেন, আমি স্বধর্মবিষয়ে যে উপদেশ দিয়েছি আমার আশ্রিত ব্যক্তি সর্বদা তাতে অবহিত হয়ে বাসনাশূন্য মনে বর্ণ, আশ্রম ও কুলের অনুরূপ আচার-অনুষ্ঠান করবেন। বিষয়াসক্ত দেহিগণ বিষয়কে যথার্থ মনে করে বিষয়প্রাপ্তির জন্যে যে যে কর্ম করে থাকে, তার বিপরীত ফল হয়; বিশুদ্ধাত্মা পুরুষ তা দেখে কামনা বিসর্জন দেন। নিদ্রিত ব্যক্তির স্বপ্নে বিষয় দর্শন অথবা চিন্তাপরায়ণ ব্যক্তির মনোরথে প্রতিভাত নানারূপ বিষয় নিষ্ফল হয়; তেমনি গুণসমূহের দ্বারা অনাত্মবস্তু দেহে যে আত্মবুদ্ধি জন্মে তাও পারমার্থিক ফলশূন্য হয়। মৎপরায়ণ হয়ে কাম্যকর্ম ত্যাগ ও নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম করবে। আত্মবিচারে সম্যক প্রবৃত্ত হলে নিবৃত্তিমূলক নিত্য-নৈমিত্তিক কর্মেও আদরে করবে না। মৎপরায়ণ হয়ে অহিংসাদি যমসমূহের[১] অনুষ্ঠান করবে, সামর্থ্য থাকলে শৌচাদি নিয়মেরও[২] সেবা করবে। আর আমাকে যিনি বিশেষরূপে জানেন, আমার স্বরূপ সেই শান্তগুরুর আরাধনা করবে। ১-৫

গুরুসেবক শিষ্য নিরহংকার, মাৎসর্যহীন, নিরলস, মমতাশূন্য, গুরুভক্তি-পরায়ণ, অব্যগ্র ও তত্ত্বজিজ্ঞাসু হবে এবং অসূয়া ও বৃথালাপ পরিহার করবে। স্ত্রী, পুত্র, গৃহ, ক্ষেত্র, স্বজন ও ধনাদিতে আত্মার প্রয়োজন সমান দেখে উদাসীন হয়ে সে শুধু গুরুর উপাসনা করবে। দাহক ও প্রকাশক অগ্নি যেমন দাহ্য কাষ্ঠ থেকে ভিন্ন পদার্থ, তেমনি দ্রষ্টা ও স্বপ্রকাশ আত্মা স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহ থেকে পৃথক। ধ্বংস, জন্ম, অণুত্ব, বৃহত্ত্ব ও নানাত্ব অগ্নির গুণ নয়, অগ্নি কাষ্ঠের অন্তর্গত হয়েই এই সকল গুণ গ্রহণ করে, তেমনি দেহের অন্তর্গত জীবাত্মাও এই সকল গুণবিশিষ্ট দেহের সহিত সংশ্লিষ্ট হয়ে গুণসমূহ ধারণ করে থাকেন। ঈশ্বরের মায়া দ্বারা এই স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহ রচিত; এই দেহে জীবের অধ্যাসবশত সংসারদশা উপস্থিত হয় এবং আত্মজ্ঞান দ্বারাই এই সংসারবন্ধন ছিন্ন হয়। জীবাত্মা দেহের অন্তর্গত হলেও বিশুদ্ধ ও দেহ থেকে পৃথক্; সুতরাং বিচারের দ্বারা পরমাত্মাকে সম্যকরূপে জেনে স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহে বাস্তব বুদ্ধি ত্যাগ করবে। ৬-১১

আচার্য হলেন নিম্নস্থিত অরণি, শিষ্য উপরিস্থিত অরণি, আচার্যের উপদেশ মধ্যস্থিত অরণি, আর এদের সংযোগের সমুৎপন্ন বিদ্যা অগ্নি; এই অগ্নিই অজ্ঞান-রাশিকে দগ্ধ করে। নিপুণ শিষ্য অতিবিশুদ্ধ আত্মবিদ্যা লাভ করে গুণসম্ভূত

১ পাতঞ্জলোক্ত যোগের আটটি অঙ্গ, যথা—যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি। যম—অহিংসা, সত্য, অস্তেয় বা অচৌর্য, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ।

২ নিয়ম—শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর-প্রণিধান।

মায়াকে নিবৃত্ত করে এবং এই বিশ্বের কারণস্বরূপ গুণরাশি ভস্মীভূত করে ইন্ধনশূন্য অগ্নির মত নিজেও বিরত হয়। উদ্ধব, যদি তুমি জৈমিনীয় মতের অনুসরণে কর্মকর্তা ও সুখদুঃখভোগী জীবাত্মার বহুত্ব স্বীকার কর, যদি স্বর্গাদি লোক, ভোগ-কাল এবং ভোগ-প্রতিপাদক শাস্ত্র ও ভোক্তা পুরুষের নিত্যতা মেনে নাও, যদি মনে কর যে ঘট-পটাদির আকারভেদে জ্ঞানের উৎপত্তি হয়, তবু এসবই অনিত্য, তাই নশ্বর; কিন্তু নিখিল জীবগণের দেহসম্বন্ধ ও কালসম্বন্ধবশত বারবার দুঃখপ্রদ জন্ম-মরণাদি ঘটে থাকে। সুতরাং কর্মসমূহের কর্তা ও সুখদুঃখের ভোক্তা পুরুষ অস্বতন্ত্র অর্থাৎ পরাধীন। ধর্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গের মধ্যে কোন্ পুরুষার্থ এই অস্বাধীন জীবকে আশ্রয় করবে? স্বাতন্ত্র্য থাকলে কেই বা দুঃখভোগ করত, আর কোন্ বিবেকী ব্যক্তিই বা দুষ্কর্মের আচরণ করত? কর্মবিদ্যায় অভিজ্ঞ দেহিগণের যেমন কিছুমাত্র সুখ নেই, তেমনি মূঢ়ব্যক্তিদেরও কোথাও দুঃখ নেই। অতএব কর্মনিপুণ বলেই আমরা সুখী হব, এরূপ অভিমান নিরর্থক। কর্মিগণ সুখলাভ ও দুঃখহানির উপায় জানলেও সাক্ষাৎ মৃত্যুর প্রভাবমুক্ত হওয়ার কোন উপায় জানেন না। সমীপে বিদ্যমান মৃত্যু কোন মানুষের পক্ষেই সন্তোষের কারণ হয় না। বধ্যস্থানে নীয়মান ব্যক্তির নিকট যেমন সুস্বাদু মিষ্টান্নও তৃপ্তিকর হয় না, তেমনি বিষয়সুখও মরণশীল মানুষকে তৃপ্তি দিতে পারে না। দুষ্ট জাগতিক সুখের মত স্বর্গাদি ভোগও স্পর্ধা (পরমসুখের অসহন), অসূয়া (পরগুণে দোষের আবিষ্কার), অত্যয় (নাশ) ও অপক্ষয় প্রভৃতি দোষে দুষ্ট এবং বিঘ্নসংকুল, তাই কৃষিকর্মের মত নিষ্ফল। (কারণ, একবার কৃষি-কর্মের দ্বারা শস্য লাভ করলেই যেমন কৃষকের আশা পূর্ণ হয় না, তেমনি একবার স্বর্গভোগের দ্বারাও আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয় না। ১২-২১

ধর্মকর্ম নির্বিঘ্নে এবং সুষ্ঠুরূপে সম্পাদিত হলে ফলস্বরূপ উপার্জিত স্থান যেভাবে পাওয়া যায় সে কথা শোন। যাজ্ঞিক পুরুষ ইহলোকে যজ্ঞের দ্বারা দেবগণের পূজা করে স্বর্গলোকে যান এবং সেখানে দেবতার মতই নিজের উপার্জিত দিব্য সুখ উপভোগ করেন। তিনি সেখানে মনোহর বেশে নিজের পুণ্যফলে লব্ধ শুভ্র বিমানে আরোহণ করে যখন অপ্সরাগণের মধ্যে বিহার করেন, তখন গন্ধর্বগণ তাঁর স্তুতি করে। তিনি দেবতাদের ক্রীড়াস্থানে কিঙ্কণীজাল-শোভিত কামগামী বিমানে হৃষ্টচিত্তে স্ত্রীগণের সঙ্গে ক্রীড়া করতে করতে আপনার পতন জানতে পারেন না। যতকাল পর্যন্ত তাঁর অর্জিত পুণ্য শেষ না হয় ততকাল তিনি স্বর্গে আনন্দ সম্ভোগ করেন; তারপর পুণ্যক্ষয় হলেই অনিচ্ছাসত্ত্বেও তিনি কালপ্রভাবে অধঃপতিত হন। ২২-২৭

জীব যদি অসৎসঙ্গে থেকে অধর্মে লিপ্ত, অজিতেন্দ্রিয়, কামাসক্ত, দীনাত্মা, লোভী, স্ত্রৈণ ও প্রাণিহিংসক হয় এবং আশাস্ত্রীয়ভাবে পশুবধ করে ভূত-প্রেতগণের যজন করে, তবে সে কর্মাধীন হয়ে নরকে অতি ঘোর স্থাবর-যোনিতে প্রবেশ করে। কর্মানুষ্ঠানের পরিণাম দুঃখপ্রদ, কারণ জীব পুনরায় তদনুযায়ী দেহ লাভ করে। অতএব মরণশীল জীবের সুখ কোথায়? লোকসমূহ, কল্পজীবী লোকপালগণ এবং দ্বিপরার্ধ সংবৎসর পরমায়ুসম্পন্ন ব্রহ্মাও কালরূপী আমাকে ভয় করেন। ইন্দ্রিয়বর্গ পাপ-পুণ্যাত্মক কর্মসমূহের সৃষ্টি করে; সত্ত্বাদি গুণ ইন্দ্রিয়সমূহকে কর্মে প্রবৃত্ত করে (আত্মা নয়), আবার জীবই ইন্দ্রিয় প্রেরিত হয়ে কর্মফলরূপ সুখ-দুঃখ ভোগ করে। যতদিন গুণবৈষম্য থাকে, ততদিন আত্মার নানাত্ব প্রতীত হয়, যতকাল আত্মার নানাত্ব থাকে, ততকাল গুণের পরতন্ত্রতাও ঘোচে না। যতদিন জীব কর্মের অধীন থাকে, ততদিন তার ঈশ্বরের অধীন থাকে। যাঁরা গুণবৈষম্য-

জাত ভোগ ও কর্মের সেবা করেন, তাঁরা শোক ও মোহগ্রস্ত হন। সৃষ্টির প্রারম্ভে যখন গুণত্রয়ের বিক্ষোভ ঘটে তখন বেদবাক্যসমূহ আমাকেই কাল, আত্মা, আগম, লোক, স্বভাব ধর্মরূপে বর্ণনা করে থাকে। ২৮-৩৪

উদ্ধব বললেন, বিভু, দেহী জীব গুণসমূহে বর্তমান থেকেও গুণদ্বারা কি হেতু সুখ-দুঃখাদিতে আবদ্ধ না হয়ে কেমন করে থাকতে পারে? আর জীব যদি গুণের দ্বারা অনাবৃতই থাকে অর্থাৎ আকাশের মত নির্লিপ্ত হয়, তবে গুণের দ্বারা বদ্ধ হয় কেন? বদ্ধ ও মুক্ত জীব কিরূপ ব্যবহার করেন, কিরূপে বিহার করেন? কোন্ কোন্ লক্ষণের দ্বারা তাঁদের জানা যায়? তাঁরা কিরূপ ভোজন করেন? কেমন করে অনিষ্ট ত্যাগ করেন? কোথায় শয়ন করেন? কোথায় উপবেশন করেন? কিরূপে গমন করেন? হে শ্রেষ্ঠ প্রশ্নবিৎ, এই আমার প্রশ্ন। এক আত্মাই কি নিত্যবদ্ধ ও নিত্যমুক্ত? এ বিষয়ে আমার ভ্রম আপনি দূর করুন। ৩৫-৩৭

একাদশ অধ্যায়

বদ্ধ ও মুক্ত আত্মার লক্ষণ

ভগবান বললেন, উদ্ধব, আমার অধীন সত্ত্বাদি ত্রিগুণের উপাধির জন্যেই আত্মাকে বদ্ধ বা মুক্ত বলা হয়ে থাকে, বস্তুত আত্মার বন্ধনও নেই, মুক্তিও নেই। কারণ, গুণসমূহ মায়ামূলক। স্বপ্নে দৃষ্ট বস্তু যেমন বুদ্ধির কাজ, তেমনি শোক, মোহ, সুখ, দুঃখ, সংসার ও দেহান্তর প্রাপ্তি, সকলই অবিদ্যার কাজ এবং অবাস্তব অর্থাৎ বাস্তবিক পক্ষে এদের কোনো সত্যতা নেই। দেহধারীদের বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয়ই আমার মায়ার দ্বারা নির্মিত, তারা আমার শক্তিস্বরূপ ও অনাদি। অবিদ্যা জীবের বন্ধন ও মোক্ষের কারণ জীব আমার অংশে উৎপন্ন, আর আমিও অদ্বিতীয়স্বরূপ, সুতরাং আমার শক্তিস্বরূপ অবিদ্যার দ্বারা জীবের বন্ধন ও বিদ্যার দ্বারা জীবের মুক্তি ঘটে।[১] হে তাত, এক দেহে অবস্থিত বিরুদ্ধ ধর্ম সম্পন্ন (অর্থাৎ শোক ও আনন্দবিশিষ্ট) বদ্ধ জীব ও মুক্ত ঈশ্বরের ভেদ তোমাকে বলছি। ১-৫

জীব ও ঈশ্বর সুন্দর পক্ষবিশিষ্ট দুটি পাখীর মত। তারা চিৎস্বরূপ তাই সাদৃশ্য আছে, তারা পরস্পর বন্ধুভাবে থাকে এবং যদৃচ্ছাক্রমে একই দেহবৃক্ষে হৃদয়রূপ নীড় রচনা করেছেন। তাদের মধ্যে একটি জীব পিপ্পলান্ন (অশ্বত্থ ফল) অর্থাৎ দেহবৃক্ষের কর্মফল ভোগ করেন, অপরটি নিরাহারী হলেও অর্থাৎ কর্মফল ভোগ না করলেও জ্ঞানশক্তিবলে শ্রেষ্ঠতর হয়ে বিরাজ করেন।[২] যিনি কর্মফলস্বরূপ পিপ্পলফল আহার করেন না অর্থাৎ যিনি কর্মফলের অভোক্তা সেই ঈশ্বর আত্মতত্ত্ব জ্ঞাত আছেন। যিনি কর্মফলভোক্তা, তিনি পরমাত্মাকে জানেন না। যিনি অবিদ্যার সঙ্গে যুক্ত, তিনি নিত্যবদ্ধ আর যিনি বিদ্যাময় অর্থাৎ ঈশ্বর, তিনি নিত্যমুক্ত। মুক্তব্যক্তি দেহস্থ হয়েও দেহস্থ নন; কারণ তিনি স্বপ্নোত্থিত ব্যক্তির মত স্বপ্নদেহের সুখ-দুঃখের ফলভোগী নন। সেই দেহকে তিনি নিজের

১ তুলনীয়: ঈশ উপনিষৎ-১১

২ দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে...ইত্যাদি॥ মুণ্ডক ৩।১।১

অবস্থিতি-স্থান বলে জ্ঞান করেন না। আর মূঢ় ব্যক্তি স্বপ্নদর্শীর ন্যায় দেহস্থ না হয়েও দেহস্থ; কারণ, স্বপ্নদর্শী অজ্ঞ যেমন নিজেকে স্বপ্নদেহে বর্তমান বলে মনে করে, তেমনি অবিদ্বান ব্যক্তিও দেহে আত্মাভিমানের বশে দেহকেই নিজের আশ্রয়স্থল বলে মনে করে। ৬-৮

যিনি নির্বিকার, তত্ত্বদর্শী তিনি গুণজাত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয় গ্রহণ করলেও 'আমি গ্রহণ করছি,' এরূপ অহংকার করেন না অর্থাৎ এরূপ অহং-বোধকে অন্তরে স্থান দেন না। অজ্ঞ ব্যক্তি গুণজাত কর্মের দ্বারা দৈবাধীন শরীরে বাস করে নিজেকে কর্তা মনে করে দেহাদিতে নিবন্ধ হয়। বিদ্বান ব্যক্তি বৈরাগ্যবান হয়ে শয়ন, উপবেশন, ভ্রমণ, স্নান, দর্শন, স্পর্শন, ঘ্রাণ, ভোজন ও শ্রবণাদি বিষয়সকল ইন্দ্রিয়গণকে ভোগ করিয়েও অজ্ঞের মত সেভাবে কর্মে আবদ্ধ হন না। তিনি সাক্ষিস্বরূপ প্রকৃতিতে বর্তমান থেকেও আকাশ, সূর্য ও বায়ুর ন্যায় অনাসক্ত থাকেন। তিনি বৈরাগ্যের দ্বারা তীক্ষ্ণীকৃত নিপুণ বুদ্ধির সাহায্যে সকল সংশয় ছেদন করেন এবং স্বপ্নোত্থিত ব্যক্তির ন্যায় দেহাদি-প্রপঞ্চ থেকে নিবৃত্ত হন। যাঁর প্রাণ, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির বৃত্তিসকল সংকল্পবর্জিত, তিনি দেহে অবস্থান করলেও দেহধর্ম থেকে মুক্ত হন। ৯-১৪

দেহ হিংস্রপ্রাণী দ্বারা পীড়িত হলেও কিংবা যদৃচ্ছাক্রমে অর্চিত হলেও জ্ঞানী বা জীবন্মুক্ত ব্যক্তির কিছুমাত্র বিকার হয় না। যিনি গুণদোষবর্জিত ও সমদর্শী হয়ে প্রিয়কারী বা প্রিয়বাদী ব্যক্তির প্রশংসা করেন না এবং অপ্রিয়কারী বা অপ্রিয়বাদী ব্যক্তির নিন্দা করেন না, তিনিই মুনি অর্থাৎ মুক্ত পুরুষ।[১] তিনি ভালো বা মন্দ কিছুই করেন না, বলেন না বা চিন্তা করেন না। তিনি সর্ব কর্মে উদাসীন থেকে জড়ের মত পর্যটন করে থাকেন। যিনি শব্দব্রহ্মে নিষ্ণাত হয়েও অর্থাৎ বেদের পারগামী হয়েও পরব্রহ্মে নিষ্ণাত হন না অর্থাৎ পরব্রহ্মের ধ্যানাদি করেন না দুগ্ধহীন গাভীর প্রতিপালকের মত তাঁর শাস্ত্রাভ্যাসের পরিশ্রম শুধু শ্রমেই পর্যবসিত হয়। উত্তরোত্তর দুঃখভোগী ব্যক্তি দুগ্ধহীন গাভী, অসতী ভার্যা, পরাধীন দেহ, অসৎ পুত্র, সৎপাত্রে অদত্ত ধন ও আমার প্রসঙ্গরহিত শাস্ত্রবাক্য ত্যাগ না করে রক্ষা করেন। যে বাক্যে বিশ্বের সংশোধক সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়াত্মক আমার চরিত্র-কথা বা ভক্তবাঞ্ছিত আমার লীলাবতারের জন্মবৃত্তান্ত বর্ণিত হয় না, ধীমান ব্যক্তি সেই নিষ্ফল বাক্য হৃদয়ে ধারণ করবেন না। এভাবে তত্ত্ব বিচার করে তিনি আত্মাতে নানাত্ব-ভ্রম ত্যাগ করবেন এবং বিশুদ্ধ মনকে পরিপূর্ণ ভগবৎ-স্বরূপ আমাতে অর্পণ করে বহু কর্মের শ্রম থেকে নিবৃত্ত হবেন। উদ্ধব, যদি ব্রহ্মরূপী আমাতে নিশ্চল মন ধারণে অসমর্থ হও, তা হলে ফলকামনাশূন্য হয়ে সমস্ত কর্ম আমাতে সমর্পণ কর। শ্রদ্ধালু ব্যক্তি আমার লোকপাবন সুমঙ্গল কথা শ্রবণ, কীর্তন ও সর্বদা স্মরণ করেন; বারংবার আমার জন্ম ও কর্মের অভিনয় করে আমাকে আশ্রয় করেন এবং আমার জন্যে ধর্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গের আচরণ করে সনাতন আমাতে নিশ্চলা ভক্তিলাভ করেন। তিনি সৎসঙ্গের প্রভাবে আমার প্রতি ভক্তি লাভ করে আমাকেই ধ্যান করেন। তিনি ধ্যানযোগে সাধুজন-প্রদর্শিত মদীয় পদ নিশ্চয়ই অনায়াসে লাভ করতে পারেন। ১৫-২৫

উদ্ধব বললেন, হে পবিত্রকীর্তি, কিরূপ সাধু আপনার প্রিয় বলে কথিত? সজ্জন সমাদৃত কেমন ভক্তিই বা আপনাতে স্থাপন করার যোগ্য? হে পুরুষাধ্যক্ষ,

১ তুলনীয়: দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে॥ গীতা, ২।৫৬

আমি আপনার ভক্ত, অনুরক্ত ও শরণাগত, আমাকে একথা বলুন। আপনি প্রকৃতির অতীত, আকাশের মত নির্লিপ্ত, নিঃসঙ্গ, পরম ব্রহ্মস্বরূপ ; ভক্তগণের ইচ্ছানুসারেই আপনি ভিন্ন ভিন্ন পরিমেয় দেহ ধারণ করে ভূতলে অবতীর্ণ হন। ২৬-২৮

ভগবান বললেন, উদ্ধব, যিনি কৃপালু, অহিংস ও ক্ষমাশীল, যিনি সত্যসার (অর্থাৎ সত্যই যাঁর বল), নির্দোষ, সমচিত্ত ও সর্বোপকারক, যাঁর চিত্ত কামসমূহের দ্বারা অভিভূত হয় না, যিনি জিতেন্দ্রিয়, কোমলচিত্ত, সদাচারী ও অকিঞ্চন, যিনি নিরীহ, মিতভোজী শান্ত ও স্থির, যিনি আমার শরণাগত ও চিন্তাশীল, যিনি অপ্রমত্ত নির্বিকার ও ধৈর্যবান, যিনি ছয় প্রকার দেহধর্ম[১] জয় করেছেন, যিনি অমানী ও মানদ, যিনি পরকে বোঝাতে দক্ষ, অবঞ্চক, কারুণিক ও সম্যক্ জ্ঞানী তিনিই সাধুশ্রেষ্ঠ। আর যিনি এভাবে গুণ ও দোষসকল অবগত হয়ে আমার উপদিষ্ট সকল প্রকার স্বধর্ম পরিত্যাগ করে ভক্তিযোগে আমার আরাধনা করেন, তিনিও সাধুশ্রেষ্ঠ। আমি যা, যতটুকু ও যেরূপ তা জেনে বা না জেনে (অর্থাৎ আমার স্বরূপ অবগত হয়ে বা না হয়ে) যাঁরা একান্তভাবে আমার ভজনা করেন, তাঁরাই আমার ভক্তশ্রেষ্ঠরূপে গণ্য। আমার প্রতিমাদির বা আমার ভক্তগণের দর্শন, স্পর্শন, অর্চন, পরিচর্যা, স্তুতি, প্রণাম, গুণকর্মের কীর্তন, আমার কথা-শ্রবণে শ্রদ্ধা, আমার অনুধ্যান, আমাতে লব্ধ পদার্থের সমর্পণ, দাস্যভাবে আত্ম-নিবেদন, আমার জন্ম ও চরিত-কথার কীর্তন, আমার পর্বসমূহের অনুমোদন, গীত, বাদ্য ও নৃত্যাদি ও গোষ্ঠীগণের দ্বারা আমার মন্দিরে উৎসব, সকল বার্ষিক পর্বদিনে যাত্রা ও পুষ্পোপহার-প্রদান, বৈদিকী ও তান্ত্রিকী দীক্ষাগ্রহণ, আমার ব্রত-পালন, আমার মূর্তিস্থাপনে শ্রদ্ধা, আমার উদ্দেশ্যে উদ্যান, উপবন, ক্রীড়াস্থান, পুর ও মন্দিরের কর্মে স্বতঃ অথবা মিলিত হয়ে, উদ্যম ও দাসের ন্যায় সম্মার্জন, লেপন গন্ধজলসেচন ও মণ্ডলস্থাপনের দ্বারা আমার মন্দিরের সেবা, মান ও দম্ভ পরিত্যাগ এবং আচরিত ধর্মকর্মের কীর্তন না করা—এ সবই ভক্তির লক্ষণ। ভক্তির আরও লক্ষণ হচ্ছে—অন্য দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদিত দীপালোক আমাকে নিবেদন করবে না এবং আমার উদ্দেশ্যে প্রদত্ত দীপালোকেও অন্য কাজ করবে না। লোকে যে যে বস্তু ইষ্টতম মনে করে, যে যে বস্তু নিজের অত্যন্ত প্রিয় সেই বস্তু আমাকে নিবেদন করবে ; তা হলেই সেই দান অক্ষয় হবে। ২৯-৪১

উদ্ধব, তুমি সূর্য, অগ্নি, ব্রাহ্মণ, গাভী, বৈষ্ণব, আকাশ, বায়ু, জল, পৃথিবী, আত্মা ও সমুদয় প্রাণীকে আমার পূজার অধিষ্ঠান বলে জানবে। বেদোক্ত সূক্ত মন্ত্রের দ্বারা সূর্যে, ঘৃতাহুতির দ্বারা অগ্নিতে, আতিথ্য-সৎকারের দ্বারা ব্রাহ্মণে, তৃণাদি দানের দ্বারা গোসমূহে, বন্ধুজনোচিত সম্মানের দ্বারা বৈষ্ণবে, ধ্যাননিষ্ঠার দ্বারা হৃদয়াকাশে, প্রাণদৃষ্টির দ্বারা বায়ুতে, জল প্রভৃতি দ্রব্যের দ্বারা জলমধ্যে, গোপনীয় বীজমন্ত্র অর্পণ দ্বারা ভূমিতে, শাস্ত্রবিহিত ভোগের দ্বারা জীবমধ্যে এবং সমদর্শনের দ্বারা সর্বভূতে অন্তর্যামী আমার পূজা করবে। এই ভাবে পূর্বোক্ত আধারসমূহে আমার শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্মধারী চতুর্ভুজ রূপ ধ্যান করে একাগ্রচিত্তে আমার অর্চনা করবে। যিনি সমাহিত হয়ে ইষ্টাপূর্ত বিধির দ্বারা অর্থাৎ যজ্ঞাদি বৈদিক কর্ম ও অন্নপ্রদানাদি কর্মের দ্বারা আমার পূজা করবেন, তিনি আমাতে উত্তমা ভক্তি লাভ করবেন। সাধুসেবার ফলে আমার সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞানের উদয় হবে। আমি সাধুদের শ্রেষ্ঠ আশ্রয়, তাই সাধুসঙ্গজনিত ভক্তিযোগ ভিন্ন সংসার-তরণের অন্য

১ ছয় প্রকার দেহধর্ম—ক্ষুধা, পিপাসা, শোক, মোহ, জরা ও মৃত্যু।

কোন উত্তম উপায় নেই।[১] যদুনন্দন, তুমি আমার ভৃত্য, সুহৃদ ও সখা ; আবার তুমি শ্রবণে অভিলাষী, সুতরাং অতি গোপনীয় পরম গুহ্যতত্ত্ব তোমার কাছে বিস্তারিত বলছি। ৪২-৪৯

দ্বাদশ অধ্যায়

সৎসঙ্গ মহিমা ও কর্মত্যাগ বিধি

ভগবান বললেন, উদ্ধব, সকল বিষয়ের আসক্তি-বিনাশক সাধুসঙ্গ আমাকে যেমন বশীভূত করে, যোগ, তত্ত্বজ্ঞান, অহিংসাদি ধর্ম, শাস্ত্রপাঠ, তপস্যা, সন্ন্যাস, যজ্ঞাদি ও জলাশয় খননাদি পুণ্যকর্ম, দান, ব্রত, দেবার্চনা, গোপনীয় মন্ত্র, তীর্থপর্যটন, নিয়ম, যম প্রভৃতি সেরূপ বশীভূত করতে পারে না। যুগে যুগে রজস্তম-প্রকৃতির দৈত্য, রাক্ষস, পশু, পক্ষী, গন্ধর্ব, অপ্সরা, নাগ, সিদ্ধ, চারণ, গুহ্যক ও বিদ্যাধরগণ, মনুষ্যলোকের মধ্যে রাজস ও তামসস্বভাব বৈশ্য, শূদ্র, স্ত্রী ও অন্ত্যজগণ, বৃত্র ও প্রহ্লাদাদি অসুরগণ, বৃষপর্বা, বলি, বাণ, ময়দানব, বিভীষণ, সুগ্রীব, হনুমান, জাম্ববান, গজ, গৃধ্র, জটায়ু, তুলাধার বণিক, ধর্মব্যাধ, কুব্জা, ব্রজের গোপিকাগণ ও যজ্ঞে দীক্ষিত ব্রাহ্মণপত্নীগণ সৎসঙ্গ প্রভাবে আমার পদ লাভ করেছেন। তাঁরা বেদপাঠ করেন নি, সেই উদ্দেশ্য কোন মহতের সেবা করেন নি ; কোন ব্রত বা তপস্যার অনুষ্ঠান করেন নি, কেবল সৎসঙ্গরূপ আমার সঙ্গবশত আমাকে লাভ করেছিলেন। ১-৭

এঁদের ভেতর বৃত্রাসুর প্রভৃতির হয়তো কিছু সাধনা ছিল কিন্তু গোপীগণ, ব্রজের গাভীকুল, যমলার্জুন নামক বৃক্ষদ্বয়, মৃগগণ, কালিয় প্রভৃতি মূঢ়বুদ্ধি নাগগণ এবং তরু, গুল্ম, লতা প্রভৃতি মূঢ়চিত্ত পদার্থগণ কেবল সাধুসঙ্গজনিত প্রীতির দ্বারা চরিতার্থ হয়ে স্বচ্ছন্দে আমাকে পেয়েছেন। অত্যন্ত যত্নবান হলেও যোগ, জ্ঞান, দান, ব্রত, তপস্যা, যজ্ঞ, বেদব্যাখ্যান, বেদাধ্যয়ন ও সন্ন্যাসাদির দ্বারা যাঁকে পাওয়া যায় না, গোপী প্রভৃতিরা সাধুসঙ্গ প্রভাবে আমাকে লাভ করেছেন। অক্রূর বলরামের সঙ্গে আমাকে মথুরায় নিয়ে গেলে আমার প্রতি যে গোপীগণের চিত্তে প্রবল অনুরক্তি ছিল এবং আমার বিরহে তীব্র ও দুঃসহ মনস্তাপে যারা তপ্ত হয়েছিল, তাদের কাছে অন্য কোন কিছুই সুখকর বলে মনে হয় নি। তারা বৃন্দাবনে গোচারণকারী প্রাণ-প্রিয়তমস্বরূপ আমার সঙ্গে সেই সেই রাত্রি ক্ষণার্ধের ন্যায় সুখে যাপন করেছিল, কিন্তু আমার বিরহে সেই সমস্ত রজনী তাদের কাছে কল্পতুল্য সুদীর্ঘ মনে হয়েছিল। মুনিগণের সমাধিকালে যেমন নাম ও রূপের জ্ঞান থাকে না, তেমনি আসক্তি হেতু গোপীরা আমাতে এমনভাবে চিত্ত সমাহিত করেছিল যে, তারা আপন আপন দেহ, ইহলোক ও পরলোকের বিষয় কিছুই জানতে পারে নি। সমস্ত নদী যেমন সমুদ্রের জলে প্রবেশ করে তেমনি তারাও আমার মধ্যে প্রবেশ করেছিল। অথচ গোপীরা আমার স্বরূপ জানত না, তবে রতিদায়ক উপপতিবুদ্ধিতে আমাকে কামনা করে হাজার হাজার গোপী সৎসঙ্গ-গুণে পরব্রহ্ম-

[১] 'তুমি চিত্তকে একমাত্র আমাতে নিবিষ্ট কর, আমারই ভক্ত হও, আমারই উদ্দেশ্যে যজ্ঞ কর, আমাকেই নমস্কার কর। এভাবে আমার শরণাগত হয়ে আমার সঙ্গে যুক্ত হলে আমাকেই পাবে।' —গীতা, ৯।৩৪

স্বরূপ আমাকে লাভ করেছিল। অতএব উদ্ধব, তুমি শ্রুতি, স্মৃতি, বিধি ও নিষেধাত্মক শাস্ত্র এবং শ্রোতব্য ও শ্রুত বিষয় ত্যাগ করে সকল দেহধারীর অন্তর্যামী একমাত্র আমাকে একান্ত ভক্তিতে শরণ যদি নাও, তবেই নির্ভয় হতে পারবে।[১] ৮-১৫

উদ্ধব বললেন, যোগেশ্বর, আপনার কথা শুনেও আমার সন্দেহ দূর হচ্ছে না; আমার মন নিতান্ত সংশয়াচ্ছন্ন হয়েছে। শ্রীভগবান বললেন, উদ্ধব, অপরোক্ষ পরমেশ্বর মূলাধার প্রভৃতি ষট্‌চক্র মধ্যে[২] প্রকাশিত হয়ে 'পরা' সংজ্ঞক নাদবিশিষ্ট প্রাণের সহিত আধারচক্র নামক গুহায় প্রবেশ করেন; তারপর মণিপুর চক্রে ও বিশুদ্ধচক্রে পশ্যন্তী ও মধ্যমা নামক সূক্ষ্ম মনোময় রূপে মুখবিবরে হ্রস্বাদি মাত্রা, উদাত্তাদি স্বর এবং অবশেষে অকারাদি বর্ণক্রমে নানা বেদের শাখাস্বরূপ 'বৈখরী' নামক স্থূল শব্দমূর্তিতে প্রকাশিত হন। অগ্নি যেমন আকাশে তপ্ত অবস্থায় অতি সূক্ষ্মরূপে থাকে এবং কাষ্ঠে সবলে মন্থন করলে বায়ুর সহায়তায় প্রথমে অণুরূপে অর্থাৎ সূক্ষ্ম বিস্ফুলিঙ্গাদি রূপে উৎপন্ন হয়ে, পরে প্রকৃষ্টভাবে প্রকাশিত হয়ে ঘৃতসংযোগে পরিবর্ধিত হয়, তেমনি বেদরূপা বাণীও স্থূলসূক্ষ্মরূপে আমারই অভিব্যক্তি বলে জানবে। কর্মেন্দ্রিয়ের বৃত্তিরূপে বাগিন্দ্রিয়ের কাজ হল কথন, হস্তদ্বয়ের কাজ কর্ম, পাদদ্বয়ের কাজ গতি, পায়ু ও উপস্থের কাজ মলমূত্রত্যাগ। নাসিকার বৃত্তি ঘ্রাণগ্রহণ, জিহ্বার বৃত্তি রসগ্রহণ, চক্ষুর কর্ম দর্শন, ত্বকের বৃত্তি স্পর্শন, কর্ণের বৃত্তি শ্রবণ—এগুলি হচ্ছে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বৃত্তি। এ ছাড়া মনের বৃত্তি সঙ্কল্প, চিত্তের বৃত্তি বুদ্ধি, অহঙ্কারের বৃত্তি অভিমান, এমনকি, প্রকৃতির কার্যসূত্র সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণের বিকার থেকে উৎপন্ন বিশ্বপ্রপঞ্চ আমারই অভিব্যক্তি। বীজ ক্ষেত্র পেয়ে যেমন বৃক্ষশাখাদি বহুরূপে প্রকাশ পায়, ত্রিগুণের আশ্রয়, সনাতন, ব্রহ্মাদি লোকপালগণের কারণভূত সেই পরমেশ্বরও তেমনি অব্যক্তরূপে মায়াশক্তি-যোগে নানারূপে প্রকাশিত হন। বস্ত্র যেমন বিস্তৃত তন্তুসমূহে ওতপ্রোতভাবে থাকে, তেমনি এই অনন্ত বিশ্ব পরমপুরুষ পরমেশ্বরে ওতপ্রোতভাবে ব্যাপ্ত রয়েছে। এই অনাদি প্রবৃত্তিস্বভাব সংসারতরু[৩] ভোগ ও মুক্তিরূপ দুটি পুষ্প ও ফল প্রসব করে। অনাদি কর্মাত্মক সংসাররূপ বৃক্ষের পাপ ও পুণ্য দুটি বীজ; তার মূলে অপরিমিত বাসনা, সত্ত্ব-রজ-তম এই তিন গুণ তার কাণ্ড, পঞ্চভূত তার স্কন্ধ, শব্দস্পর্শাদি পঞ্চ বিষয় এর রস, একাদশ ইন্দ্রিয় (পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় ও মন) এর শাখা, বায়ু-পিত্ত-শ্লেষ্মা এর তিনখানি বল্কল, সুখ ও দুঃখ এই দুটি তার ফল। এই বৃক্ষে জীবাত্মা ও পরমাত্মারূপে সুন্দর-পক্ষ-বিশিষ্ট দুটি পাখীর নীড় আছে। বৃক্ষটি সূর্যমণ্ডল পর্যন্ত ব্যাপ্ত। কামী গৃহস্থগণ এই বৃক্ষের দুঃখরূপ ফল এবং বনবাসী যোগীরা সুখরূপ ফল ভক্ষণ করেন।[৪] যিনি পূজ্য

১ তুলনীয়ঃ সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥ গীতা, ১৮।৬৬

২ ষট্‌চক্র—মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, আজ্ঞাচক্র ও বিশুদ্ধ। শব্দের বা বাক্যের স্থূল ও সূক্ষ্ম-ভেদ আছে। পরা বাক্ প্রাণময়ী, এর সঙ্গে মন ও ইন্দ্রিয় থাকে একীভূত, পশ্যন্তী বাক্ মনোময়ী, মধ্যমা বুদ্ধিময়ী এবং বৈখরী বর্ণরূপে পরিণতা। বৈখরী বাক্ হচ্ছে বাক্যের স্থূল রূপ। ৩ এই সংসার-বৃক্ষের উপমা কঠোপনিষদেও বিবৃত হয়েছে। দ্রষ্টব্য: কঠ, ২।৩।১ শ্লোক। ৪ সর্বদা যুক্ত ও পরস্পর সখ্যভাবাপন্ন দুটি সুন্দর পাখী (জীবাত্মা ও পরমাত্মা) একই দেহবৃক্ষকে আশ্রয় করে আলিঙ্গনাবদ্ধ আছে। তাঁদের মধ্যে একজন (জীবাত্মা) দেহবৃক্ষের বিচিত্র আস্বাদযুক্ত ফল (সুখদুঃখাত্মক কর্মফল) ভোজন করে, অপরটি কিছুই না খেয়ে কেবলমাত্র দর্শন করে। মুণ্ডক, ৩।১।১

গুরুর সহায়তায় এক পরমানন্দময় পরব্রহ্মকে মায়াময় বহুরূপ বলে জানেন, তিনিই বেদের তত্ত্বার্থ জেনে থাকেন। তুমিও বিবেকী ও অপ্রমত্ত হয়ে গুরুসেবা দ্বারা লব্ধ একান্ত ভক্তিযোগে শাণিত জ্ঞানকুঠার দিয়ে ত্রিগুণাত্মক লিঙ্গশরীররূপ সংসার-বৃক্ষকে ছেদন করে পরমাত্মাতে লীন হও এবং পরে জ্ঞানরূপ কুঠারাস্ত্র পরিত্যাগ কর। ১৬-২৪

ত্রয়োদশ অধ্যায়

হংসাবতার কাহিনী

ভগবান বললেন, সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিনটি গুণ বুদ্ধির, আত্মার নয়। সত্ত্ব-গুণের দ্বারা রজোগুণ ও তমোগুণ বিনাশ করবে, এবং পরে সত্ত্বগুণকেও (দয়া প্রভৃতি সাত্ত্বিক বৃত্তিকে) শম-দমাদি সত্ত্বের দ্বারাই জয় করবে। সত্ত্বগুণের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পুরুষের আমার প্রতি ভক্তিরূপ ধর্ম উৎপন্ন হবে; সাত্ত্বিক পদার্থ-সমূহের সেবা করলে সত্ত্বগুণ প্রকৃষ্টরূপে বৃদ্ধি পায়, আর সেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত সত্ত্বগুণ থেকেই উক্তপ্রকার ধর্মে প্রবৃত্তি হবে। সত্ত্ববৃদ্ধিজনিত সর্বোত্তম ধর্মের প্রভাবে রজোগুণ ও তমোগুণ বিনষ্ট হয়; রজোগুণ ও তমোগুণ বিনষ্ট হলে তা থেকে উদ্‌ভূত অধর্মও শীঘ্র নষ্ট হয়। শাস্ত্র, জল, জনসমূহ, দেশ, কাল, কর্ম, জন্ম, ধ্যান, মন্ত্র ও সংস্কার, এই দশটি গুণবৃদ্ধির হেতু। এগুলির মধ্যে শ্রীব্যাসাদি জ্ঞানবৃদ্ধগণ যে কয়টির প্রশংসা করেন সেগুলি সাত্ত্বিক, যে কয়টির নিন্দা করেন সেগুলি তমোসিক আর যেগুলিকে উপেক্ষা করেন (অর্থাৎ যেগুলির নিন্দাও করেন না প্রশংসাও করেন না) সেগুলি রাজসিক। যতদিন পর্যন্ত আত্মপ্রত্যক্ষ লাভ না হয় এবং সংসারের কারণ এই ত্রিগুণনাশক জ্ঞান উৎপন্ন না হয়, ততদিন পর্যন্ত পুরুষ সত্ত্বগুণের বৃদ্ধির জন্যে সাত্ত্বিক শাস্ত্রাদিরই সেবা করবেন। তা হলেই মদ্‌ভক্তিরূপ ধর্ম ও পরমাত্মবিষয়ক জ্ঞান বা ধ্রুব স্মৃতি উৎপন্ন হবে। বনের মধ্যে বেণুঘর্ষণ-জাত আগুন যেমন বেণুর কারণ অরণ্যকে দগ্ধ করে আপনাতে আপনি শান্ত হয়, তেমনি গুণবৈষম্যজাত দেহও নিজ থেকে উৎপন্ন জ্ঞানের দ্বারা নিজের কারণ গুণ-সকলকে অর্থাৎ সূক্ষ্ম দেহকে দগ্ধ করে নিবৃত্ত হয়। ১-৭

উদ্ধব বললেন, কৃষ্ণ, মানুষেরা প্রায়ই বিষয়সম্ভোগকে আপদের স্থান বলে মনে করে, কিন্তু তারা কুকুর, গর্দভ ও ছাগের মতো সেই দুঃখের কারণ বিষয়ভোগেই কেন লিপ্ত হয়? ভগবান বললেন, অবিবেকী প্রমত্ত ব্যক্তির হৃদয়ে দেহাত্মবুদ্ধিরূপ মিথ্যা-জ্ঞান উৎপন্ন হয় এবং সেই দুঃখাত্মক রজোগুণ সত্ত্বপ্রধান মনকে আচ্ছন্ন করে। রজোযুক্ত মনে সংকল্প ও বিকল্পের উদয় হয়, তখন দুর্মতি পুরুষের বিষয়চিন্তা-জনিত দুঃসহ কামনা জন্মে। রজোগুণের প্রভাবে বিমোহিত বিষয়-বাসনার বশীভূত, অজিতেন্দ্রিয় পুরুষ কর্মসমূহের দুঃখজনক পরিণাম জেনেও সেইসকল কর্মই করে থাকে। রজোগুণ ও তমোগুণ দ্বারা বুদ্ধি বিক্ষিপ্ত হলেও বিবেকী পুরুষ বিষয়ের দোষ দেখে সংযতচিত্তে সজাগ থেকে বিষয়ে আর আসক্ত হন না। অপ্রমত্ত অনলস ব্যক্তি জিতশ্বাস ও জিতআসন হয়ে (আসন ও প্রাণবায়ুকে জয় করে) আমাতে মন সমর্পণ করে ক্রমে সমাহিত হবেন। মনকে সকল বিষয় থেকে বিচ্ছিন্ন করে সাক্ষাৎ আমাতে ধারণ করবে। সনকাদি শিষ্যগণকে আমি এই যোগের নির্দেশ

। ৮-১৪

উদ্ধব বললেন, কেশব, আপনি যখন ও যেভাবে সনকাদি ঋষিগণকে এই যোগের উপদেশ দিয়েছিলেন, সেই কাল ও সেই রূপের বিষয় শোনার আগ্রহ হচ্ছে। ভগবান বললেন, একবার ব্রহ্মার মানসপুত্র সনকাদি ঋষিগণ পিতাকে যোগ সম্পর্কে দুজ্ঞের্য় (সূক্ষ্ম) পরমতত্ত্ব জিজ্ঞাসা করেছিলেন। সনকাদি ঋষিগণ বলেছিলেন, মানুষের চিত্ত বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং বিষয়ও বাসনারূপে মনে প্রবেশ করে, সুতরাং যাঁরা বিষয়সমূহকে অতিক্রম করতে ইচ্ছা করেন, এরূপ মুমুক্ষু ব্যক্তির বিষয় ও চিত্তের সম্বন্ধ কিভাবে নষ্ট হতে পারে, তা বলুন। ১৫-১৭

ভগবান বললেন, উদ্ধব, স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা দেবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং সর্বজীবের স্রষ্টা ; কিন্তু অনেক চিন্তা করেও কিছুতেই প্রশ্নের উত্তর ঠিক করতে পারলেন না। কারণ, তাঁর চিত্ত তখন সৃষ্টিকার্যাদিতে বিক্ষিপ্ত ছিল। তাই ব্রহ্মা প্রশ্নের উত্তর জানার জন্যে আমাকে ধ্যান করলেন ; আমিও তখন হংসরূপে[১] তাঁদের নিকট উপস্থিত হলাম। সনকাদি ঋষিগণ আমাকে দেখে উঠে দাঁড়ালেন এবং ব্রহ্মাকে সামনে রেখে কাছে এসে আমার পদবন্দনা করে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কে ? উদ্ধব, তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু মুনিগণ আমাকে একথা জিজ্ঞাসা করলে আমি তাঁদের যা বলেছিলাম, তা শোন। ১৮-২০

হংস বললেন, বিপ্রগণ, আত্মার সম্বন্ধে তোমরা যদি এই প্রশ্ন কর তবে তা অসঙ্গত ; কারণ, পরমাত্মস্বরূপ সৎপদার্থের নানাত্ব নেই, আমিই বা কাকে আশ্রয় করে তোমাদের প্রশ্নের উত্তর দেব ? আর যদি পঞ্চভূত-সমষ্টি সম্পর্কে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর, তা হলেও এই প্রশ্ন অনর্থক ; যেহেতু পঞ্চাত্মক সমুদয় পদার্থই অভিন্ন। (অর্থাৎ 'আপনি কেন ?' এরূপ প্রশ্ন সর্বতোভাবে অসঙ্গত, যেহেতু সৎপদার্থেরও নানাত্ব নেই, জীবেরও নানাত্ব নেই)। সমস্ত দেহই পঞ্চভূতাত্মক এবং ভগবদ্বস্তুর অধীন এবং স্বরূপত সকলেই সমান। সুতরাং 'আপনি কে ?' এই প্রশ্ন শুধু বাক্যের আরম্ভসূচক, তা নিরর্থক। মন, বাক্য, দৃষ্টি ও অপরাপর ইন্দ্রিয় দিয়ে যা গ্রহণ করা যায়, সবকিছুই আমি ; আমা থেকে ভিন্ন কেউ নয়, তত্ত্ববিচার দ্বারা এটা জান। পুত্রগণ, চিত্ত গুণসমূহে[২] প্রবেশ করে, আবার গুণসমূহ চিত্তে প্রবিষ্ট হয়। গুণ সমূহ ও চিত্ত উভয়ই ব্রহ্মস্বরূপ জীবের উপাধিমাত্র। বারবার বিষয় সেবা করার ফলেই চিত্ত বিষয়ে প্রবেশ করে। জীব নিজেকে গুণাদি থেকে পৃথক ও আমারই স্বরূপ বলে ভাববে এবং বিষয়ে প্রবিষ্ট চিত্ত ও চিত্তে উৎপন্ন বিষয় (চিত্ত ও গুণসমূহ) উভয়ই পরিহার করবে। জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই কয়টি বুদ্ধির বৃত্তি ও গুণজাত, জীবের স্বাভাবিক বৃত্তি নয়। জীব জাগ্রদাদি অবস্থার সাক্ষী এবং সেই সকল অবস্থা থেকে বিভিন্নরূপে নির্ধারিত। জীবের অহংকারই জাগ্রদাদি অবস্থারূপ বৃত্তি প্রদান করে, অতএব ত্রিবিধ অবস্থার অতীত তুরীয়স্বরূপ আমাতে প্রতিষ্ঠিত থেকে বুদ্ধির বন্ধন ত্যাগ করবে। তখন বিষয় ও চিত্তের পরস্পর সম্বন্ধও বিশ্লিষ্ট হবে। অহংকার-কৃত বন্ধনই যে আত্মার অনর্থের হেতু তা অবগত হয়ে এবং নির্বেদগ্রস্ত হয়ে তুরীয়স্বরূপ আমাতে অবস্থান করে সংসার চিন্তা (অহংজ্ঞান ও ভোগ-চিন্তা) ত্যাগ করবে। ২১-২৯

যতদিন পর্যন্ত জীবের ভেদজ্ঞান বিচারের দ্বারা লুপ্ত না হয় ততদিন পর্যন্ত জীবকে জাগ্রত ও কর্মে সচেষ্ট দেখা যায় বটে, কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে সে অজ্ঞ ;

১ প্রাণিগণের মধ্যে ক্ষীরকে ও নীরকে (সার ও অসার বস্তুকে) পৃথক করার ক্ষমতা একমাত্র হংসেরই আছে। ২ বিষয়সমূহ

সে জেগেও নিদ্রা যায়, স্বপ্নে জাগরণের ন্যায় তার সম্যক্ দর্শন হয় না। পরমাত্মা ভিন্ন দেহাদিকৃত বিভিন্ন ভাবসমূহের কোন সত্তা নেই, সুতরাং বর্ণাশ্রম ভেদ, গতি বা স্বর্গাদি ফল এবং হেতু বা কর্মফল অজ্ঞ ব্যক্তির নিকট যথার্থ বোধ হলেও জ্ঞানী ব্যক্তির নিকট উহা স্বপ্নদ্রষ্টা পুরুষের স্বপ্নদৃষ্ট বিষয়ের মতই মিথ্যা বলে প্রতিভাত হয়। যিনি জাগ্রদবস্থায় সমস্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ক্ষণভঙ্গুর স্থূল বিষয়সমূহ ভোগ করেন, যিনি স্বপ্নাবস্থায় হৃদয়ে জাগ্রৎকালে দৃষ্ট পদার্থের মত বাসনাময় বিষয়-সকল ভোগ করেন, তিনিই আবার সুষুপ্তিকালে বিষয়ভোগশূন্য হন। কারণ এক পরমাত্মাই সুষুপ্তিকালে সকল বিষয়কে অজ্ঞানে বিলীন করেন। সেই পরমাত্মাই অবস্থাত্রয়ের সাক্ষী ও ইন্দ্রিয়সমূহের ঈশ্বর। মনের এই অবস্থাত্রয় আমার মায়াগুণে আমাতেই বিরচিত হয়েছে, এইরূপ বিচার করে অনুমান ও সদুপদেশরূপ তীক্ষ্ণ জ্ঞানরূপ খড়্গের দ্বারা অহংকারকে ছিন্ন করবে, কারণ এই অহংকারই হচ্ছে সকল সংশয়ের আধার। তারপর অন্তরস্থিত আমার ভজনা করবে। মন-কল্পিত, বিনাশশীল, চক্রাকারে ঘূর্ণমান জ্বলন্ত অঙ্গারের মত অতি চঞ্চল এই দৃশ্যমান জগৎকে বিভ্রমস্থান বলে জানবে। বিজ্ঞানস্বরূপ এক ব্রহ্মই নানারূপে প্রকাশিত হন, কিন্তু তাঁর মধ্যে নানাত্ব নেই; যা বিভিন্ন বলে প্রতীত হয়, তা মায়া-স্বপ্ন মাত্র।[১] অতএব মুমুক্ষু ব্যক্তি এই জগৎ থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে বিষয়তৃষ্ণাশূন্য, মৌনী, নিরীহ ও নিজ সুখানুভবশীল হবে। যদি কখনও এই জগৎ ভোগ্য-বুদ্ধিতে দৃষ্ট হয়, তথাপি ইহা পুনরায় ভ্রমের কারণ হবে না; কারণ, পূর্বেই ইহা অবস্তু বলে পরিত্যক্ত হয়েছে, সুতরাং এ আর মোহের হেতু হবে না, দেহপাত পর্যন্ত এই স্মৃতি বিদ্যমান থাকবে। ৩০-৩৫

মদিরামদে অন্ধ ব্যক্তি পরিহিত বস্ত্র গাত্র থেকে স্খলিত হলে বা দেহে সংলগ্ন থাকলেও তা জানতে পারে না, তেমন জ্ঞানী ব্যক্তি আত্মার স্বরূপজ্ঞান লাভ করার ফলে এই নশ্বর দেহ উপবিষ্ট হোক, উত্থিত হোক, স্থানভ্রষ্ট হোক বা প্রতিনিবৃত্তই হোক, তা জানতে পারেন না, কারণ তিনি নিজ দেহকেই দর্শন করেন না। দেহও দৈবের বশবর্তী হয়ে যতদিন প্রারব্ধ বর্তমান থাকে ততদিন প্রাণ ও ইন্দ্রিয়গণের সহিত জীবিত থাকে, কিন্তু যিনি সমাধিযোগ লাভ করে পরমার্থতত্ত্ব অবগত হয়েছেন, তিনি স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর ন্যায় এই দেহে আসক্ত হন না। বিপ্রগণ, আমি তোমাদের নিকট সাংখ্য ও যোগের রহস্য প্রকাশ করলাম। আমি স্বয়ং বিষ্ণু, তোমাদের ধর্মোপদেশ দেবার জন্যেই এখানে উপস্থিত হয়েছি। আমি সাংখ্য (জ্ঞান), যোগ, সত্য, ঋত, তেজ, শ্রী, কীর্তি ও দমের পরম আশ্রয় বা পরমগতি। প্রাকৃত গুণসমূহ থেকে ভিন্ন সমতা, অসঙ্গ প্রভৃতি নিত্য গুণসকল নির্গুণ (মায়িক গুণের অতীত), নিরপেক্ষ, সকলের হিতকারী, সর্বপ্রিয়, সকলের আত্মস্বরূপ আমার ভজনা করে থাকে। ৩৬-৪০

উদ্ধব, এই প্রকারে আমার বাক্যে সনকাদি ঋষিগণ সংশয় থেকে মুক্ত হয়েছিলেন, পরম ভক্তি সহকারে আমার পূজা করেছিলেন এবং বিবিধ প্রকারে আমায় স্তুতি করেছিলেন। এই সকল পরম ঋষিগণ কর্তৃক সম্যগ্‌রূপে পূজিত ও স্তুত হয়ে আমি সাক্ষাৎকারী পরমেষ্ঠী ব্রহ্মার সমক্ষেই স্বীয় ধামে ফিরে গেলাম। ৪১-৪২

১ তুলনীয়: মনসৈবেদমাপ্তব্যং নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।
মৃত্যোঃ স মৃত্যুং গচ্ছতি য ইহ নানেব পশ্যতি। কঠ উপ ২।১।১১

চতুর্দশ অধ্যায়

ধ্যানযোগ বর্ণন

উদ্ধব বললেন, কৃষ্ণ, ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ মুক্তির বিবিধ সাধন নির্দেশ করে থাকেন। তাদের মধ্যে কি সকলগুলিই প্রধান, না কোন একটি সাধন প্রধান, কৃপা করে আমায় তা বলুন। যে অহৈতুকী ভক্তি দ্বারা মন বিষয়ে আসক্তি পরিত্যাগ করে আপনাতে প্রবিষ্ট হয়, সেই ভক্তিযোগের কথা আপনি বলেছেন, আবার অপর জ্ঞানিগণ মোক্ষের অন্যান্য উপায় নির্ধারণ করেছেন। আপনি এ-বিষয়ে আমার প্রশ্নের উত্তর দিন। ভগবান বললেন, যে বেদশাস্ত্রে আমার বাণী প্রকাশিত হয়েছে, কালপ্রভাবে প্রলয়কালে তা অদৃশ্য হয়েছিল। সৃষ্টির আদিতে আমিই এই বেদবাণী ব্রহ্মাকে উপদেশ দেই। ব্রহ্মা জ্যেষ্ঠপুত্র মনুকে সেই বেদবাণী শিক্ষা দেন, মনু থেকে সপ্ত ব্রহ্মর্ষি[১] তা লাভ করেন। তারপর ভৃগু প্রভৃতি পুত্রগণের নিকট থেকে উহা প্রাপ্ত হন। তাঁদের পুত্র দেব, দানব, গুহ্যক, মনুষ্য, সিদ্ধ, গন্ধর্ব, বিদ্যাধর, চারণ, কিংদেব, কিন্নর, নাগ, রাক্ষস ও কিংপুরুষগণ। এই সকল জীবের বিবিধ বাসনা রয়েছে। এই বাসনাগুলি রজ, তম ও সত্ত্বগুণ থেকে উৎপন্ন। এই সকল বাসনার দ্বারা দেবাসুর-মনুষ্য প্রভৃতি ভূতগণ ও ভূতপতিগণ পরস্পর বিভিন্ন হয়েছে, স্ব স্ব প্রকৃতি অনুসারে তাঁরা বেদবাক্যের নানা প্রকার ব্যাখ্যা করে থাকেন। প্রকৃতির বৈচিত্র্যহেতু মানুষদের বুদ্ধি বিভিন্ন হয়ে থাকে। বিভিন্ন পারম্পর্যগত উপদেশে কারো বুদ্ধি নাশ হয়, অপর কেহ কেহ বা বেদবিরুদ্ধ পাষণ্ড মত অবলম্বন করে। ১-৮

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, আমার মায়ার দ্বারা বিমোহিতচিত্ত মানুষেরা কর্ম ও রুচির ভেদবশত নানাপ্রকার শ্রেয়-সাধনের (পুরুষার্থের) নির্দেশ করেন। মীমাংসকগণ ধর্মকে ও আলংকারিকগণ যশকে পুরুষার্থ বলেন, আবার বাৎস্যায়ন প্রভৃতি পণ্ডিতরা বলেন, কামই পুরুষার্থ ; যোগিগণ বলেন সত্য, দম (বহিরিন্দ্রিয়-নিরোধ) ও শমই (অন্তরিন্দ্রিয় নিরোধ) পুরুষার্থ ; দণ্ডনীতিকারগণ বলেন, ঐশ্বর্যই পুরুষার্থ, চার্বাকমতাবলম্বিগণ বলেন, দান ও ভোজনই পুরুষার্থ, আবার কেউ কেউ যজ্ঞ, তপস্যা, দান, ব্রত, যম ও নিয়মকে পুরুষার্থ বা শ্রেয়সাধন বলে থাকেন। এঁদের কর্মের দ্বারা উপার্জিত লোকসকল নিশ্চয়ই অনিত্য, পরিণামে দুঃখ ও মোহজনক, ক্ষুদ্র, হীন ও শোকপ্রদ। ৯-১১

যিনি আমাতে চিত্ত সমর্পণ করেছেন এবং যিনি বিষয়বাসনাশূন্য, এরূপ ব্যক্তির হৃদয়ে পরমানন্দস্বরূপ আমার দ্বারা যে সুখের উদয় হয়, বিষয়ে আসক্ত ব্যক্তিগণের সে সুখ কোথায়? যিনি সর্বত্র স্পৃহাশূন্য, দান্ত, শান্ত, সমদর্শী ও আত্মাতেই পরিতৃপ্ত এরূপ পুরুষের নিকট সকল দিক সুখময়। যিনি আমাতে আত্ম-সমর্পণ করেছেন, তিনি আমাকে ত্যাগ করে ব্রহ্মপদ, ইন্দ্রপদ, চক্রবর্তিপদ, পাতাল-লোকের আধিপত্য, অণিমাদি যোগসিদ্ধি বা মোক্ষ কিছুই ইচ্ছা করেন না। ১২-১৪

তুমি আমার যেমন প্রিয়তম, ব্রহ্মা, শংকর, ভ্রাতা সংকর্ষণ (বলরাম), ভার্যা লক্ষ্মীদেবী, এমনকি, নিজের মূর্তিও সেরূপ প্রিয়তম নহে। 'ভক্তের পদধূলির

১ ভৃগু, মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ ও ক্রতু।

দ্বারা আমি ব্রহ্মাণ্ডকে পবিত্র করব', এরূপ মনে করে আমি নিরপেক্ষ শান্ত, বৈরভাবহীন ও সমদর্শী মুনিদিগের অনুগমন করে থাকি। যাঁরা নিষ্কিঞ্চন, আমাতে অনুরক্ত, শান্ত, অভিমানশূন্য ও সর্বভূতে দয়াযুক্ত, কামনা যাঁদের চিত্তকে স্পর্শ করতে পারে না; এইরূপ আমার ভক্তেরা আমার সেবা করে নিরপেক্ষ জনলভ্য যে পরম সুখ লাভ করেন, তা তাঁরাই জানেন, অন্যে তা জানতে পারে না। যিনি ইন্দ্রিয় জয়ে অসমর্থ, এরূপ নিকৃষ্ট ভক্তও ভক্তির প্রভাবে বিষয়ে অভিভূত হন না; উত্তম ভক্তদের কথা আর কি বলব। উদ্ধব, অগ্নিশিখা যেমন লেলিহান হয়ে কাঠকে ভস্মসাৎ করে, তেমনি মদ্‌বিষয়া ভক্তিও যাবতীয় পাপ সম্পূর্ণরূপে বিনাশ করে থাকে। আমার প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি আমাকে যেমন বশীভূত করে, যোগ, জ্ঞান, ধর্ম, বেদাধ্যয়ন, তপস্যা ও ত্যাগ আমাকে তেমনি বশীভূত করতে পারে না। ১৫-২০

সাধুদিগের প্রিয় আত্মা আমাকে সাধুগণ শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়ে কেবল ভক্তির দ্বারা লাভ করতে পারেন। আমার প্রতি ভক্তি চণ্ডালদিগকেও জাতিদোষ থেকে পবিত্র করে। সত্য ও দয়া সমন্বিত ধর্ম বা তপোযুক্ত বিদ্যা আমার প্রতি ভক্তিশূন্য মানুষের আত্মাকে নিশ্চয়ই সর্বতোভাবে পবিত্র করতে পারে না। রোমহর্ষ, মনের আর্দ্রভাব ও আনন্দাশ্রুর উদ্ভব ভিন্ন কি প্রকারে ভক্তির সঞ্চার হতে পারে? আর ভক্তির সঞ্চার ভিন্ন চিত্তই বা কিরূপে শুদ্ধ হতে পারে? যাঁর বাক্য গদ্‌গদ ও চিত্ত আর্দ্র হয়, যিনি মুহুর্মুহু কাঁদেন ও হাসেন কখনো বা লজ্জাহীন হয়ে উচ্চস্বরে গান করেন, কখনো বা নৃত্য করেন, আমার এরূপ ভক্ত নিখিল বিশ্বকে পবিত্র করেন। সোনা যেমন আগুনে তপ্ত হলে শুদ্ধ হয় এবং নিজ রূপ ধারণ করে, মানুষের চিত্তও তেমনি ভক্তিযোগের দ্বারা কর্মবাসনা পরিত্যাগ করে এবং মহাপ্রেমের আবির্ভাবে আমারই ভজনা করে। ফলে সে আমারই স্বরূপতা লাভ করে।[১] জীবাত্মা আমার পুণ্যকথা শ্রবণ ও কীর্তনের দ্বারা যে পরিমাণ নির্মলতা লাভ করে, অঞ্জনযুক্ত চোখের ন্যায় ততই সূক্ষ্মবস্তু উপলব্ধি করতে পারে। যে ব্যক্তি সর্বদা বিষয়ের চিন্তা করে, তার চিত্ত বিষয়ের প্রতি আসক্ত হয় আর যিনি সর্বদা আমার চিন্তা করেন, তাঁর চিত্ত আমাতেই বিলীন হয়। ধীর ব্যক্তি স্ত্রীগণের ও স্ত্রীসঙ্গী ব্যক্তিদের সঙ্গ দূর হতে ত্যাগ করে ভয়শূন্য নির্জন স্থানে উপবেশন করে অতন্দ্রিত হয়ে আমার ধ্যান করবে। স্ত্রীসঙ্গ ও স্ত্রীসঙ্গীদের সঙ্গ থেকে জীবের যেমন ক্লেশ ও সংসার-বন্ধন হয়, অন্য কোন বিষয়ের সঙ্গ সেরূপ ক্লেশ ও বন্ধনের কারণ হয় না। ২১-৩০

উদ্ধব বললেন, কমললোচন, মুক্তিকামী ব্যক্তি যেরূপে, যে মূর্তিতে ও যে স্বরূপে তোমার ধ্যান করেন, সেই ধ্যান আমার নিকট বিবৃত করুন। শ্রীভগবান বললেন, সমতল ভূমিতে, সমতল কম্বলাদি আসনে, অবক্রভাবে যথাসুখে উপবিষ্ট হয়ে হস্তদ্বয় ক্রোড়দেশে উত্তানভাবে উপর্যুপরি স্থাপন করবে এবং স্বীয় নাসিকার অগ্রভাগ মাত্র দর্শন করবে। এইভাবে জিতেন্দ্রিয় পুরুষ পূরক, কুম্ভক ও রেচকের দ্বারা এবং পরে বিপরীতভাবে অর্থাৎ রেচক, কুম্ভক ও পূরকক্রমে প্রাণবায়ুর পথ শোধন করবেন।[২] হৃদয়ে অবস্থিত, অবিচ্ছিন্ন ঘণ্টানাদতুল্য, মৃণালসূত্র সদৃশ, ওঙ্কারকে প্রাণবায়ুর দ্বারা ঊর্ধ্ব দ্বাদশাঙ্গুল পর্যন্ত নিয়ে পুনরায় সেই স্থানে বিন্দু-সংযোগ করবে (স্থির রাখবে)। এই প্রকারে যিনি ওঙ্কারসংযুক্ত প্রাণায়াম প্রতিদিন

---

১ তুলনীয়: মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্তৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ ।। গীতা, ৯।৩৪

২ তুলনীয়: ভগবদগীতা, ষষ্ঠ অধ্যায়, ১১-১৪শ শ্লোকাবলী।

ত্রিসন্ধ্যা দশবার অভ্যাস করেন, তিনি এক মাসের মধ্যেই প্রাণবায়ু জয় করতে পারেন। ৩১-৩৫

ঊর্ধ্বনাল, অধোমুখ, অন্তরস্থ মুকুলিত হৃৎ-পদ্মকে বীজকোষমধ্যে পর পর সূর্য, চন্দ্র ও অগ্নির চিন্তা করবে। অগ্নিমধ্যে আমার কথিত রূপ ধ্যান করবে ; এ-ই মঙ্গলজনক ধ্যান। সম-অবয়ববিশিষ্ট, প্রশান্তমূর্তি, সুমুখ, দীর্ঘ-চারু-চতুর্ভুজযুক্ত, রম্য সুন্দর গ্রীবাযুক্ত, সুন্দর গণ্ডস্থল ও মনোহর সহাস্য বদনযুক্ত আমার এই রূপ। সমান কর্ণদ্বয়ে বিন্যস্ত মকরাকৃতি দীপ্তিমান কুণ্ডলযুগল শোভিত, স্বর্ণের ন্যায় পীত-বর্ণ বসন পরিহিত, ঘনশ্যামবর্ণ, বক্ষোদেশের বাম ও দক্ষিণ ভাগ শ্রীবৎস ও শ্রীচিহ্নযুক্ত, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম ও বনমালায় বিভূষিত, নূপুরের দ্বারা শোভিত, কৌস্তুভ মণির প্রভায় দীপ্তিমান, কান্তিশালী কিরীট, কটক, কটিসূত্র ও অঙ্গদ প্রভৃতি অলংকারের দ্বারা ভূষিত; সর্বাঙ্গ সুন্দর, মনোহর, প্রসন্নতাবশত মুখ ও চক্ষুর দ্বারা অতি শোভাযুক্ত, আমার এই অতি সুকোমল রূপ সর্বাঙ্গে মনস্থির করে ধ্যান করবে। ধীর ব্যক্তি মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়ের বিষয় থেকে ইন্দ্রিয়সকলকে আকর্ষণ করবেন এবং বুদ্ধিরূপ সারথির সাহায্যে এই মনকে আমার সর্বাঙ্গে নিবিষ্ট করবেন।[১] ৩৬-৪২

সর্বব্যাপক চিত্তকে আকর্ষণ করে এক অঙ্গের ধ্যান করবে, অন্যান্য অঙ্গের চিন্তা করবে না, শুধু সুন্দর হাস্যযুক্ত মুখের ভাবনা করবে। চিত্ত সেখানে স্থির হলে অর্থাৎ মুখমণ্ডলের চিন্তা সুদৃঢ় হলে চিত্তকে সেই স্থান থেকে আকর্ষণ করে সর্বকারণ-স্বরূপ আকাশে ধারণ করবে, তারপর সে চিন্তাও পরিত্যাগ করে শুদ্ধ ব্রহ্মস্বরূপ আমাতে প্রতিষ্ঠিত হবে, এবং ধ্যাতা ও ধ্যেয়ের পার্থক্যও চিন্তা করবে না। চিত্ত এরূপে আমাতে সমাহিত হলে পর জ্যোতিতে সংযুক্ত জ্যোতির ন্যায় ব্রহ্মস্বরূপ আমাকে জীবাত্মায় দর্শন করবে, আর জীবাত্মাকে সকলের আত্মস্বরূপ আমাতে দর্শন করবে।[২] এইরূপ সুতীব্র ধ্যানের দ্বারা সমাহিতচিত্ত যোগীর দ্রব্য, জ্ঞান ও কর্মবিষয়ক ভ্রম (আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক ভ্রম) শীঘ্র বিনষ্ট হয়ে থাকে। ৪৩-৪৬

পঞ্চদশ অধ্যায়

আঠার প্রকার সিদ্ধির বিবরণ

ভগবান বললেন, উদ্ধব, যিনি জিতেন্দ্রিয় ও স্থির, যিনি প্রাণবায়ুকে জয় করেছেন, যিনি আমাতে চিত্তকে ধারণ করেছেন, এইরূপ যোগীর নিকট অণিমাদি যাবতীয় সিদ্ধি স্বয়ং উপস্থিত হয়। ১

উদ্ধব বললেন, অচ্যুত, আপনি যোগীদিগের সিদ্ধিদাতা, সুতরাং কোন্ ধারণার দ্বারা কিরূপে কোন্ সিদ্ধি লাভ হয়, ধারণা ও সিদ্ধিই বা কত প্রকার, তা আপনি বলুন। ২

ভগবান বললেন, যোগে পারদর্শী মুনিগণ বলেছেন, সিদ্ধি আঠার প্রকার। তার ভেতর আটপ্রকার সিদ্ধি প্রধানত আমায় আশ্রিত, অবশিষ্ট দশ প্রকার

১ তুলনীয় : কঠ উপনিষদ, ১।৩।৬ শ্লোক। ২ সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ গীতা, ৬।২৯

সত্ত্বগুণের কাজ। দেহের সিদ্ধি তিন প্রকার—অণিমা, মহিমা, ও লঘিমা। ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতার দর্শনরূপ সিদ্ধি যার দ্বারা হয় তাকে বলা হয় প্রাপ্তি নামক সিদ্ধি, শ্রুত পারলৌকিক বিষয়ে ও দৃষ্ট সকল বিষয়ে যে দর্শন-সামর্থ্য, তাকে বলা হয় প্রাকাম্য সিদ্ধি, সর্ব বিষয়ে শক্তির প্রেরণাকে বলে ঈশিতা সিদ্ধি, বিষয়ভোগে আসক্তিহীনতাকে বলা হয় বশিতা সিদ্ধি এবং যার দ্বারা অভিলষিত সকল বিষয়ের সুখ লাভ করা যায়, তাকে বলা হয় কামাবসায়িতা সিদ্ধি এই আটটি সিদ্ধি স্বাভাবিক ও নিরতিশয় বলে নির্ধারিত। ৩-৫

দশটি সিদ্ধি গুণজনিত, যথা—ক্ষুৎ-পিপাসাদির রাহিত্য, দূরশ্রবণ ও দূরদর্শন, মনোবেগে দেহের গতি, ইচ্ছানুরূপ রূপধারণ, নরদেহে প্রবেশ, স্বেচ্ছামৃত্যু, অপ্সরাদের সঙ্গে দেবতাদের ক্রীড়াদর্শন, সংকলিত বিষয়ের প্রাপ্তি এবং অপ্রতিহত গতি ও আজ্ঞা। আরও পাঁচটি ক্ষুদ্র সিদ্ধি আছে, যথা—ত্রিকালজ্ঞত্ব (ভূত, ভবিষ্যৎ ও অতীতকালের অভিজ্ঞতা), শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ব-সহিষ্ণুতা, পরচিত্ত প্রভৃতির জ্ঞান; অগ্নি, সূর্য, জল, বিষ, প্রভৃতির শক্তিকে স্তম্ভিত করে রাখা ও সর্বত্র অপরাজয়। যোগধারণার এই কয়টি সিদ্ধির নাম ও লক্ষণ বলা হল। এখন যে ধারণার দ্বারা যেরূপ সিদ্ধি লাভ হয়, তা আমার নিকট শোন। সূক্ষ্মভূতরূপ আমাতে যিনি সূক্ষ্মভূত রূপ মনের ধারণা করেন, সেই তন্মাত্রের উপাসক অণিমা নামক সিদ্ধি প্রাপ্ত হন। যিনি জ্ঞানশক্তি-প্রধান মহত্তত্ত্বরূপ আমাতে মহত্তত্ত্বাত্মক মনকে ধারণ করেন, তিনি আমার মহিমা নামক সিদ্ধিলাভ করেন। এইরূপ আকাশাদি অন্যান্য ভৌতিক উপাধিতে যিনি চিত্ত ধারণ করেন, তিনি তাদের অনুরূপ মহিমা লাভ করেন। ৬-১১

ভূতসকলের পরম সূক্ষ্মাংশ পরমাণুস্বরূপ আমাতে যিনি চিত্তের ধারণা করেন, তিনি সূক্ষ্ম পরমাণুতুল্য লঘিমা নামক সিদ্ধি লাভ করেন। যিনি সত্ত্বগুণের বিকার থেকে উৎপন্ন অহংকারতত্ত্ব-স্বরূপ আমাতে একাগ্রভাবে সমাহিতচিত্ত হন, তিনি সর্বেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপা প্রাপ্তি নামক সিদ্ধি লাভ করেন। আমি মহত্তত্ত্ব স্বরূপ সূত্রাকারে স্থিত আত্মা, এইরূপে যিনি আমাতে মন ধারণা করেন, তিনি আমার সর্বোৎকৃষ্ট প্রাকাম্য নামক সিদ্ধি লাভ করেন। ইহা অব্যক্ত প্রকৃতি থেকে দ্বিতীয় স্তরে প্রকাশিত। যিনি ত্রিগুণময়ী মায়ার নিয়ন্তা, কালমূর্তি, সর্বান্তর্যামী বিষ্ণুস্বরূপ আমাতে চিত্তের ধারণা করেন, তিনি জীব ও তার উপাধিসকলের প্রেরণারূপ ঈশিতা নামক সিদ্ধি লাভ করেন।[১] 'ভগবান' শব্দে অভিহিত (ষড়ৈশ্বর্য-সমৃদ্ধ) তুরীয় নামক নারায়ণস্বরূপ আমাতে যিনি চিত্তের ধারণ করেন, তিনি আমার সমানধর্ম হন ও বশিতা বা গুণসমূহে অনাসক্তিরূপ সিদ্ধি লাভ করেন। যিনি নির্গুণ ব্রহ্মস্বরূপ আমাতে নির্মল মন ধারণ করেন, তিনি পরম আনন্দ লাভ করেন, তাঁর সকল কামনার অবসান ঘটে। একেই বলা হয় কামাবসায়িতা সিদ্ধি। ১২-১৭

যোগী সাত্ত্বিক ধর্মের অধিষ্ঠাতা আমাতে চিত্ত ধারণ করলে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শোক, মোহ, জরা ও মৃত্যু—এই ছয় প্রকার মৃত্যুধর্মবর্জিত হন ও শুদ্ধরূপতা লাভ করেন। যে যোগী সমষ্টিপ্রাণরূপ আকাশাত্মা আমাতে মনের দ্বারা শব্দের ভাবনা করেন, তিনি আকাশে উচ্চারিত বিবিধ প্রাণীর বাক্যসকল দূর থেকে শুনে থাকেন। চক্ষুতে সূর্য ও সূর্যকে চক্ষুতে সংযোগ করে যোগী যখন মনে মনে

১ তিনি ভৌতিক পদার্থের উপর শক্তি-সঞ্চার করতে পারেন, কিন্তু পরমেশ্বরের ন্যায় বিশ্বের সৃষ্টি প্রভৃতি করতে পারেন না।

আমার ধ্যান করেন, তখন দূরে থেকে সমুদয় বিশ্ব তাঁর দৃষ্টিগোচর হয়।[1] মন ও দেহকে প্রাণবায়ুর সহিত আমাতে উত্তমরূপে সমাবেশিত করে যে ধারণা করা যায়, তার ফলে মন যে স্থানে যায়, দেহও সেস্থানে গমন করে থাকে। মনকে উপাদান কারণ করে যোগী যে যে দেবাদি রূপ ধারণের ইচ্ছা করেন, সেই সেই অভিলষিত রূপ ধারণ করতে পারেন, কারণ তিনি আমারই যোগবলকে আশ্রয় করেন। সিদ্ধ ব্যক্তি পরের দেহে প্রবেশ করতে ইচ্ছা করলে পরদেহে নিজের আত্মাকে চিন্তা করবেন। তাহলে ভ্রমর যেমন এক ফুল থেকে অন্য ফুলে অন্বেষণে যায়, তেমনি তিনিও নিজ দেহ পরিত্যাগ করে প্রাণপ্রধান লিঙ্গশরীরের দ্বারা বাহ্য বায়ুপথে পরশরীরে প্রবিষ্ট হবেন। ১৮-২৩

যোগী যদি ইচ্ছামৃত্যু বরণ করতে চান, তা হলে তিনি পাদমূলের দ্বারা গুহ্যদেশ নিরোধ করবেন, তারপর প্রাণোপাধিক আত্মাকে ক্রমশ হৃদয়, বক্ষস্থল, কণ্ঠ ও মস্তকে আরোপিত করবেন এবং তাকে ব্রহ্মরন্ধ্রের দ্বারা ব্রহ্মবস্তুর নিকট উপনীত করে স্বচ্ছন্দে দেহত্যাগ করবেন। দেবোদ্যানাদিতে বিহার করতে ইচ্ছা করলে তিনি আমার মূর্তিস্বরূপ শুদ্ধসত্ত্বের ভাবনা করবেন, তা হলে সত্ত্বগুণের অংশস্বরূপ সুরকামিনীগণ বিমানে আরোহণ করে তাঁর নিকট উপস্থিত হবেন। মৎপরায়ণ পুরুষ সত্যস্বরূপ আমাতে মনোনিবেশ করলে বুদ্ধির দ্বারা যখন যেরূপ যা সংকল্প করবেন, সেইরূপেই তা লাভ করবেন। যে যোগী সর্বনিয়ন্তা ও সকলের বশীকর্তা আমার ন্যায় স্বভাব প্রাপ্ত হয়েছেন, আমার আজ্ঞার ন্যায় তাঁর আজ্ঞাও কোথাও বাধা পায় না। আমার ভক্তির দ্বারা শুদ্ধসত্ত্ব ধারণাভিজ্ঞ যোগীর জন্ম-মৃত্যু জ্ঞানের সহিত ত্রিকালজ্ঞত্ব লাভ হয়ে থাকে অর্থাৎ বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ বস্তুবিষয়ক জ্ঞান উদয় হয়ে থাকে। জল যেমন জলচর জন্তুগণের মৃত্যুর কারণ হয় না, সেরূপ আমার যোগের দ্বারা শান্তচিত্ত মুনির যোগময় দেহও অগ্নি, জল বা বিষের দ্বারা নষ্ট হয় না। যে যোগী ধ্বজ, ছত্র, ব্যজন, শ্রীবৎস ও অস্ত্রের দ্বারা বিভূষিত আমার বিভূতিসকলের (অবতারসকলের) ধ্যান করেন, তিনি কখনো পরাজিত হন না। ২৪-৩০

এইরূপ যোগধারণার দ্বারা আমার উপাসক মুনির নিকট পূর্বকথিত অশেষ সিদ্ধি স্বয়ং উপস্থিত হয়। যিনি ইন্দ্রিয়জয়ী, দান্ত, জিতপ্রাণ (শ্বাসজয়ী), জিতচিত্ত এবং সর্বদা আমার ধারণায় রত, তাঁর নিকট কোন সিদ্ধিই সুদুর্লভ নয়। যিনি ভক্তিযোগের দ্বারা আমার স্বরূপেতে সম্পত্তি লাভ করতে চান, এরূপ মৎ-পরায়ণ যোগীর নিকট পূর্বকথিত সিদ্ধিসমূহ বিঘ্নস্বরূপ, যেহেতু এগুলি বৃথা কালক্ষেপের কারণ। ইহলোকে জন্ম, ওষধি, তপস্যা ও মন্ত্রের বলে যে সকল সিদ্ধি লাভ হয়, যোগী যোগের দ্বারা সেই সকলই পেয়ে থাকেন, কিন্তু আমার প্রাপ্তিরূপ যোগগতি অন্য উপায়ে লাভ করা যায় না। আমি সকল সিদ্ধির হেতু ; শুধু তাই নয়, আমি যোগ, মোক্ষসাধন জ্ঞান, ধর্ম ও ধর্মোপদেষ্টা ব্রহ্মবাদিগণেরও হেতু, পালক ও প্রভু। মহাভূতসমূহ যেমন চতুর্বিধ প্রাণিগণের বহির্দেশে ও অন্তরে অবস্থিত, অন্তর্যামী আমিও তেমনি আবরণহীন বলে সকল জীবের অন্তর ও বহির্ভাগ ব্যাপ্ত করে বিরাজমান রয়েছি।[2] ৩১-৩৬

১ সূর্যে ভুবনজ্ঞানম্—পতঞ্জলি। ইংরেজিতে দূরদর্শনকে clairvoyance ও ও দূরশ্রবণকে clairaudience বলা হয়।

২ এষ দেবো বিশ্বকর্মা মহাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ ।। শ্বেঃ উপঃ ৪।১৭

ষোড়শ অধ্যায়

ভগবানের বিভূতি দর্শন

উদ্ধব বললেন, আপনি সাক্ষাৎ পরমব্রহ্ম, আপনি অনাদি, অন্তহীন ও স্বাধীন বা আবরণশূন্য এবং সকল পদার্থের রক্ষণ, জীবন, নাশ ও উৎপত্তির কারণস্বরূপ। আপনি উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট সর্বভূতে অবস্থিত। অশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিগণ আপনাকে জানতে পারে না, কিন্তু যাঁরা বেদের তাৎপর্য জানেন, তাঁরা আপনাকে যথার্থরূপে উপাসনা করেন। পরম ঋষিগণ যে যে বস্তুতে ভক্তিপূর্বক আপনার উপাসনা করে বিভূতিবিষয়ে সিদ্ধিলাভ করেন, তা আমার নিকট বর্ণনা করুন। হে ভূতভাবন, আপনি সর্বভূতের অন্তর্যামী, আপনি প্রাণিগণের মধ্যে গূঢ়ভাবে বিচরণ করেন।[১] আপনি সকলই দেখছেন, কিন্তু প্রাণিগণ আপনাকে দেখতে পায় না, যেহেতু তারা আপনার মায়ায় মোহিত। হে মহাবিভূতিসম্পন্ন, পৃথিবীতে, স্বর্গে, রসাতলে এবং দিকসকলে আপনা কর্তৃক অনুভাবিত অর্থাৎ আপনার শক্তিবিশেষের দ্বারা সংযোজিত যে সকল বিভূতি আছে, সেই সমুদয় আমার নিকট বর্ণনা করুন; আমি সকল তীর্থের আশ্রয় আপনার শ্রীচরণকমলে প্রণাম করি। ১-৫

ভগবান বললেন, হে প্রশ্নবিৎশ্রেষ্ঠ উদ্ধব, কুরুক্ষেত্রে জ্ঞাতিশত্রুগণের সঙ্গে যুদ্ধে অভিলাষী অর্জুন আমাকে এই প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করেছিলেন।[২] 'আমি বধকর্তা' এবং 'এই ব্যক্তি আমার দ্বারা নিহত', এরূপ লৌকিক বুদ্ধির বশীভূত হয়ে রাজ্যলাভের জন্যে জ্ঞাতিবধকে নিন্দনীয় ও অধর্মজনক মনে করে অর্জুন যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত হয়েছিলেন।[৩] হে পুরুষব্যাঘ্র, তুমি আমাকে যেমন জিজ্ঞাসা করছ, আমি যুক্তির দ্বারা তাঁর জ্ঞান সম্পাদন করলে তিনিও রণক্ষেত্রে আমায় সেই প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করেছিলেন। উদ্ধব, আমি সকল ভূতের আত্মা, হিতকারী ও নিয়ন্তা, আমিই সর্বভূত, আমিই আবার তাদের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারের কারণ।[৪] আমি গতিসম্পন্ন সকলের গতিস্বরূপ, আমি বশীকারীদিগেরও কালস্বরূপ; আমি গুণসমূহের মধ্যে সাম্য (অর্থাৎ গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা বা প্রকৃতি) এবং গুণসমূহের মধ্যে আমি স্বাভাবিক গুণ। আমি গুণিগণের মধ্যে সূত্রস্বরূপ, মহৎ বস্তুর মধ্যে আমি মহত্তত্ত্বস্বরূপ, সমুদয় সূক্ষ্ম পদার্থের মধ্যে আমি জীবস্বরূপ এবং দুর্জয় বস্তুদিগের মধ্যে আমি মন। বেদাধ্যাপকগণের মধ্যে আমি হিরণ্যগর্ভ (ব্রহ্মা), মন্ত্রগণের মধ্যে অবয়বত্রয়সম্পন্ন প্রণব বা ওঙ্কার, অক্ষরসমূহের মধ্যে আমি অকার এবং ছন্দোগণের মধ্যে আমি ত্রিপদা গায়ত্রী। ৬-১২

দেবগণের মধ্যে আমি ইন্দ্র, বসুগণের মধ্যে আমি পাবক (অগ্নি), দ্বাদশ আদিত্যের মধ্যে আমি বিষ্ণু এবং রুদ্রগণের মধ্যে আমি নীললোহিত বা শিব (কণ্ঠে নীল ও কেশে লোহিত)। ব্রহ্মর্ষিগণের মধ্যে আমি ভৃগু, রাজর্ষিগণের

---

১ তুলনীয়: কঠ:উপনিষদ, ১।২।১২ শ্লোক। ২ এ-প্রসঙ্গে গীতার দশম অধ্যায় (বিভূতিযোগ), ১৬শ থেকে ১৮শ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

৩ দ্রষ্টব্য: ন চ শ্রেয়োঽনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে।
না কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ ॥ গীতা, ১।৩১

৪ তুলনীয়: গতির্ভর্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্ ॥ গীতা, ৯।১৮

মধ্যে আমি মনু, দেবর্ষিগণের মধ্যে আমি ভক্ত নারদ এবং ধেনুসকলের মধ্যে আমি কামধেনু। আমি সিদ্ধেশ্বরগণের মধ্যে আদিবিদ্বান কপিল মুনি, পক্ষিগণের মধ্যে আমি গরুড়, প্রজাপতিগণের মধ্যে আমি দক্ষ এবং পিতৃগণের মধ্যে অর্যমা। উদ্ধব, আমাকে দৈত্যদিগের মধ্যে অসুররাজ প্রহ্লাদ, নক্ষত্র ও ওষধিগণের মধ্যে সোম (চন্দ্র) এবং যক্ষ ও রাক্ষসগণের মধ্যে ধনের অধিপতি কুবের বলে জানবে। আমাকে গজরাজদিগের মধ্যে ঐরাবত, জলচরদিগের মধ্যে প্রভু বরুণ, তাপপ্রদাতা ও দীপ্তিশালী বস্তুসমূহের মধ্যে সূর্য এবং মনুষ্যগণের মধ্যে নৃপতি বলে জানবে। আমি অশ্বসকলের মধ্যে উচ্চৈঃশ্রবা, ধাতুসমূহের মধ্যে আমি স্বর্ণ, দণ্ডদাতাদের মধ্যে আমি যম এবং সর্পগণের মধ্যে আমি বাসুকি। আমি নগেন্দ্রদের মধ্যে অনন্ত, শৃঙ্গিগণের মধ্যে আমি মৃগেন্দ্র (কৃষ্ণসার মৃগ), দংষ্ট্রী পশুদিগের মধ্যে আমি সিংহ, আশ্রমসমূহের মধ্যে আমি চতুর্থ আশ্রম (সন্ন্যাস) এবং বর্ণসমূহের মধ্যে আমি ব্রাহ্মণ। আমি তীর্থ ও স্রোতস্বিনীদিগের মধ্যে গঙ্গা, স্থিরোদক জলাশয়সমূহের মধ্যে আমি সমুদ্র, অস্ত্রসকলের মধ্যে আমি ধনু, এবং ধনুর্ধারীদিগের আমি ত্রিপুরহন্তা শিব। নিবাস-স্থানসমূহের মধ্যে আমি সুমেরু, দুর্গম স্থানসমূহের মধ্যে আমি হিমালয়, বনস্পতিগণের মধ্যে আমি অশ্বত্থ এবং ওষধিসমূহের মধ্যে আমি যব। পুরোহিতদিগের মধ্যে আমি বশিষ্ঠ, বেদজ্ঞ ব্যক্তিদিগের মধ্যে আমি বৃহস্পতি, সকল সেনাপতির মধ্যে আমি দেবসেনাপতি কার্তিকেয় এবং সন্মার্গ প্রবর্তনায় অগ্রগামীদিগের মধ্যে আমি ব্রহ্মা। ১৩-২২

আমি যজ্ঞসমূহের মধ্যে ব্রহ্মযজ্ঞ (বেদাধ্যয়ন), সকল প্রকার ব্রতের মধ্যে আমি অহিংসা, শুদ্ধিকারক বস্তুসমূহের মধ্যে আমি বায়ু, অগ্নি, সূর্য, জল, বাক্য ও আত্মা-স্বরূপ। অষ্টাঙ্গ যোগের মধ্যে আমি সমাধি, জয়েচ্ছুদিগের মধ্যে আমি মন্ত্র বা নীতিপূর্ণ মন্ত্রণা, কৌশলপূর্ণ বিচারের মধ্যে আমি আন্বীক্ষিকী বা তর্কবিদ্যা এবং প্রত্যক্ষমাত্র প্রমাণবাদীদের মধ্যে আমি বিকল্পস্বরূপ অর্থাৎ আস্তিক্য বুদ্ধিসম্পন্ন আচার্যস্বরূপ। আমি স্ত্রীগণের মধ্যে স্বায়ম্ভুব মনুর পত্নী শতরূপা, পুরুষদিগের মধ্যে স্বায়ম্ভুব মনু, মুনিগণের মধ্যে নারায়ণ এবং ব্রহ্মচারীদের মধ্যে কুমার অর্থাৎ সনৎকুমার। আমি ধর্মসকলের মধ্যে সন্ন্যাস (ভগবানে আত্মসমর্পণরূপ বা সর্বভূতে অভয়দানরূপ), অভয় স্থানসমূহের মধ্যে আমি অন্তর্নিষ্ঠা, গুহ্যসমূহের মধ্যে আমি প্রিয়বচন ও মৌনস্বরূপ এবং মিথুনদিগের মধ্যে আমি অজ বা প্রজাপতি। অপ্রমত্তদিগের মধ্যে (কালের মধ্যে) আমি সংবৎসর, ঋতুসমূহের মধ্যে আমি বসন্ত, মাসসকলের মধ্যে আমি অগ্রহায়ণ (বৎসরের প্রথম মাস) এবং নক্ষত্রসকলের মধ্যে আমি অভিজিৎ। যুগসমূহের মধ্যে আমি সত্যযুগ, ধীর ব্যক্তিগণের মধ্যে আমি দেবল ও অসিত, ব্যাসসকলের (বেদ বিভাগকর্তাদের) মধ্যে আমি দ্বৈপায়ন এবং পণ্ডিতগণের মধ্যে আমি সংযতাত্মা শুক্রাচার্য। আমি ভগবানদিগের মধ্যে বাসুদেব, ভাগবতদিগের (ভগবদ্‌ভক্তদিগের) মধ্যে আমি উদ্ধব, বানরদিগের মধ্যে হনুমান এবং বিদ্যাধরদিগের মধ্যে আমি সুদর্শন নামক বিদ্যাধর। আমি রত্নসমূহের মধ্যে পদ্মরাগ, সুন্দর বস্তুসমূহের মধ্যে পদ্মকোশ, কাশাদি তৃণজাতির মধ্যে কুশ এবং ঘৃতসকলের মধ্যে গব্যঘৃত। ২৩-৩০

ব্যবসায়ীদিগের মধ্যে আমি লক্ষ্মী বা ধনসম্পদ, ধূর্তগণের মধ্যে দ্যূত, ক্ষমাশীল ব্যক্তিদের মধ্যে ক্ষমা এবং সত্ত্বশালী লোকদিগের ধৈর্য। আমি বলশালীদিগের ওজঃ ও সহ (ইন্দ্রিয়বল ও দেহবল), ভাগবতদিগের ভক্তিবিধায়ক কর্ম এবং ভাগবতদিগের পূজ্য নবমূর্তির[1] মধ্যে আমি শ্রেষ্ঠ আদিমূর্তি বাসুদেব। আমি গন্ধর্ব-

১ নবমূর্তি—বাসুদেব, সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, নারায়ণ, হয়গ্রীব, বরাহ, নৃসিংহ ও ব্রহ্মা।

গণের মধ্যে বিশ্বাবসু, অপ্সরাগণের মধ্যে পূর্বচিত্তি, পর্বতদিগের মধ্যে স্থৈর্য এবং পৃথিবীর মধ্যে আমি গন্ধতন্মাত্রস্বরূপ। আমি জলের মধুর রস, তেজস্বী পদার্থের মধ্যে আমি সূর্য, সূর্য-চন্দ্র-নক্ষত্রগণের মধ্যে আমি প্রভা এবং আকাশের মধ্যে পরা নামক শব্দ। ব্রাহ্মণদিগের হিতকারিগণের মধ্যে আমি বলি, বীরগণের মধ্যে আমি অর্জুন, আমি ভূতগণের উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয়স্বরূপ। আমি পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়ের ব্যাপারে গমন, ভাষণ, উৎসর্গ, অন্নাদি গ্রহণ ও আনন্দ, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ব্যাপারে স্পর্শন দর্শন, আস্বাদন, শ্রবণ ও আঘ্রাণস্বরূপ, আমি সকল ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রিয় অর্থাৎ বিষয় গ্রহণ-শক্তি। আমাকে গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ, রস ও রূপ, মহত্তত্ত্ব, পঞ্চ মহাভূত (পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল ও তেজ), একাদশ ইন্দ্রিয় (পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন), জীব, প্রকৃতি, সত্ত্ব, রজ ও তম এবং ব্রহ্ম বলে জানবে। আমি এই সকলের পরিগণনস্বরূপ, আমিই জ্ঞান ও তত্ত্ব-নির্ণয়কারী বেদ। আমি ঈশ্বর ও জীব, আমি গুণ ও গুণী, আমি সকলের আত্মা ও সর্বস্বরূপ, আমাকে ছাড়া কোন প্রকার ভাব কোথাও বিদ্যমান থাকতে পারে না।[১] ৩১-৩৮

কালক্রমে আমিই পরমাণুসমূহের গণনা করে থাকি, কিন্তু কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা আমার বিভূতি সকলের সেরূপ সংখ্যা করা যায় না। যে যে বস্তুতে প্রভাব, শ্রী, কীর্তি, ঐশ্বর্য, লজ্জা, ত্যাগ, সৌন্দর্য, ভাগ্য, বীর্য, তিতিক্ষা ও বিজ্ঞান আছে, সেই সমস্তই আমার বিভূতি।[২] উদ্ধব, আমার বিভূতিসকল তোমার নিকট সংক্ষেপে কথিত হল। এই সকল বিভূতি আমার মনঃকল্পনাপ্রসূত, আকাশ-কুসুমাদি পদার্থের মত বাঙ্‌মাত্র (উচ্চারিত শব্দমাত্র), সুতরাং এইগুলির প্রতি অভিনিবেশ অকর্তব্য। তুমি বাক্য সংযত কর, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়গণকে সংযমিত কর, আত্মার দ্বারা আত্মাকে সংযত কর, তা হলে পুনরায় সংসার-পথে পতিত হতে হবে না। যে যতি বুদ্ধির দ্বারা বাক্য ও মনকে সম্যক্‌রূপে সংযত না করেন, তাঁর ব্রত, তপস্যা ও দান অপক্ক ঘটে স্থিত জলের ন্যায় বিগলিত হয়ে যায়। অতএব মৎপরায়ণ ব্যক্তি ভক্তিযুক্ত বুদ্ধির দ্বারা বাক্য, মন ও প্রাণকে সংযত করবেন, তাহলেই তিনি কৃতকৃত্য হবেন অর্থাৎ সংসার থেকে মুক্তি লাভ করবেন। ৩৯-৪৪

সপ্তদশ অধ্যায়

বর্ণাশ্রম ধর্ম—ব্রহ্মচর্য ও গার্হস্থ্যধর্ম

উদ্ধব বললেন, প্রভু, পূর্বে আপনার প্রতি ভক্তিরূপ ধর্মের কথা আপনি বলেছেন। যারা বর্ণাশ্রমাচারবান ও যারা বর্ণাশ্রমাচারবিহীন—এই ভক্তিরূপ ধর্ম তাদের সকলের জন্যেই অর্থাৎ মানুষমাত্রের জন্যেই। সেই স্বধর্ম যেরূপে আচরিত হলে মানুষের আপনার প্রতি ভক্তিলাভ হতে পারে, তা আমার নিকট প্রকাশ করে বলুন। মাধব, আপনি পূর্বে হংসরূপে ব্রহ্মার নিকট পরম সুখরূপ যে ধর্ম কীর্তন করেছিলেন, দীর্ঘকাল অতীত হওয়াতে সেই পূর্বকথিত ধর্ম লুপ্তপ্রায়, ভবিষ্যতেও আর হবে না। যেখানে বেদবিদ্যাসকল মূর্তিমতী হয়ে বিরাজ করে, সেই ব্রহ্মসভাতেও

১ ভগবানের এই বিভূতিবর্ণন গীতার দশম অধ্যায়ের ২০শ থেকে ৩৯শ শ্লোকে বিবৃত হয়েছে।
২ তুলনীয়: গীতা, ১০।৪১।

আপনি ছাড়া আপনার ধর্মের বক্তা, কর্তা ও রক্ষক কেউ নেই। ধর্মের কর্তা, বক্তা ও পালক আপনি মহীতল পরিত্যাগ করলে আর কোন্ ব্যক্তি এই বিনষ্ট ধর্মের উপদেশ প্রদান করবেন? অতএব, সর্বধর্মজ্ঞ, আপনার প্রতি ভক্তিরূপ ধর্ম মানুষ-সাধারণের মধ্যে যার প্রতি যেরূপ বিহিত হয়েছে, আমার নিকট তা বর্ণনা করুন। ১-৭

শুকদেব বললেন, মহারাজ, ভক্তশ্রেষ্ঠ উদ্ধব এইরূপ জিজ্ঞাসা করলে ভগবান হরি প্রীত হয়ে মর্ত্যজীবের মঙ্গলের নিমিত্ত সনাতন ধর্ম বলতে আরম্ভ করলেন। ৮

ভগবান বললেন, উদ্ধব, তোমার এই প্রশ্ন সম্পূর্ণ ধর্মসঙ্গত, বর্ণাশ্রমাচারী মানুষের পক্ষে এ মুক্তিজনক, সুতরাং এই ধর্ম আমার নিকট শোন। আদিতে সত্যযুগে মানুষের 'হংস' নামে একটি মাত্র বর্ণ ছিল। সেই যুগে মানুষ জন্মমাত্রই কৃতকৃত্য হত, তাই সেই যুগকে লোকে 'কৃতযুগ' বলেই জানে। সত্যযুগে শুধু ওঙ্কারাত্মক বেদশাস্ত্র বর্তমান ছিল, আর আমি বৃষরূপধারী চতুষ্পদবিশিষ্ট ধর্ম[১] ছিলাম, অতএব তপোনিষ্ঠ পাপশূন্য ব্যক্তিগণ হংসরূপী (বিশুদ্ধরূপী) আমারই উপাসনা করতেন। ত্রেতাযুগের প্রারম্ভে আমার প্রাণ ও হৃদয় থেকে ঋক্, যজু ও সাম এই ত্রয়ী উৎপন্ন হয়, সেই বিদ্যা থেকে আমি হোতা, অধ্বর্যু ও উদ্গাতা এই ত্রিবৃৎ যজ্ঞস্বরূপ হয়েছিলাম অর্থাৎ তিন যজ্ঞরূপ ধারণ করেছিলাম। তারপর বিরাট পুরুষ আমার মুখ, বাহু, উরু ও পাদ থেকে যথাক্রমে নিজ নিজ আচারসম্পন্ন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র উৎপন্ন হয়েছিল। আমার নিতম্ব থেকে গার্হস্থ্যাশ্রম ও হৃদয় থেকে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্যাশ্রম উৎপন্ন হয়েছে, বানপ্রস্থাশ্রম আমার বক্ষস্থল থেকে উদ্ভূত হয়েছে, আর সন্ন্যাস আমার মস্তকে অবস্থিত। মনুষ্যগণের বর্ণ ও আশ্রম-সকলের প্রকৃতি জন্মস্থান অনুসারে হয়েছিল—উচ্চ স্থান থেকে উৎপন্ন উচ্চ ও নীচ থেকে জাত নীচ হয়েছিল। ৯-১৫

শম, দম, অধ্যয়ন-অধ্যাপনা, শৌচ, সন্তোষ, ক্ষমা, সরলতা, আমাতে ভক্তি, দয়া ও সত্য—এই সকল ব্রাহ্মণের প্রকৃতি। প্রতাপ, বল, ধৈর্য, প্রভাব বা বীরত্ব, সহিষ্ণুতা, ঔদার্য, উদ্যম, স্থৈর্য, ব্রাহ্মণভক্তি ও ঐশ্বর্য—এই সকল ক্ষত্রিয়ের প্রকৃতি। আস্তিক্য, দাননিষ্ঠা, দম্ভশূন্যতা, ব্রাহ্মণসেবা ও অর্থবৃদ্ধি সত্ত্বেও ধনাকাঙ্ক্ষা—এই সকল বৈশ্যের প্রকৃতি। অকপটে বেদ, দ্বিজ ও গোজাতির সেবা করা ও তা থেকে উপার্জিত ধনাদির দ্বারা সন্তুষ্ট থাকা—এ সকল শূদ্রগণের প্রকৃতি।[২] অশুচিতা, অসত্য, চৌর্য, নাস্তিক্য, অমূলক কলহ, কাম, ক্রোধ ও লোভ—এই সকল বর্ণাশ্রমবিহীন নীচ লোকের প্রকৃতি। অহিংসা, সত্য, অচৌর্য, কাম, ক্রোধ ও লোভের ত্যাগ এবং প্রাণিগণের হিত ও প্রিয় সাধনে চেষ্টা—এসব সকল বর্ণেরই ধর্ম। ১৬-২১

দ্বিজ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য গর্ভাধানাদি সংস্কারের ক্রম অনুসারে উপনয়ন নামক দ্বিতীয় জন্ম লাভ করে দান্ত হয়ে গুরুকুলে বাস করবেন এবং আচার্য কর্তৃক আহূত হয়ে বেদাধ্যয়ন করবেন ও বেদার্থ বিচারে প্রবৃত্ত হবেন। তিনি মেখলা, মৃগচর্ম, দণ্ড, অক্ষমালা, যজ্ঞোপবীত ও কুশ ধারণ করবেন, তৈলাদি মর্দনের অভাবে জটাধারী হবেন, বস্ত্র-প্রক্ষালন ও দন্তধাবন করবেন না এবং তাঁর আসন রক্তবর্ণে রঞ্জিত হবে না। স্নান, ভোজন, হোম, জপ ও মূত্রপুরীষাদি ত্যাগের

১ তপ, শৌচ, দয়া ও সত্য—এই চতুষ্পাদ ধর্ম।

২ গীতার ১৮শ অধ্যায়ের ৪২শ থেকে ৪৪শ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

সময়ে তিনি মৌনী হবেন এবং নখ, মুখলোম, কক্ষলোম ও উপস্থলোম ছেদন করবেন না। ব্রহ্মচারী স্বয়ং ইচ্ছাপূর্বক ব্রতভঙ্গ করবেন না, যদি অনিচ্ছায় কখনো বীর্যধারণরূপ ব্রতভঙ্গ হয়, তা হলে জলে অবগাহন করে প্রাণায়ামপূর্বক গায়ত্রী জপ করবেন। তিনি শুচি, সমাহিত ও মৌনী হয়ে প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যায় জপ করবেন এবং অগ্নি, সূর্য, আচার্য, গো, ব্রাহ্মণ, গুরু, বৃদ্ধ ও দেবগণের পূজা করবেন। আচার্যকে আমার স্বরূপ বলে জানবেন। কখনো তাঁর অবমাননা এবং মনুষ্য-বোধে কখনো তাঁর গুণে দোষারোপ করবেন না, কারণ গুরু সর্বদেবময়। প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে ভিক্ষাদ্বারা লব্ধ বা অন্যভাবে প্রাপ্ত সমস্তই গুরুকে নিবেদন করবেন এবং তিনি (গুরু) যা ভোজন করতে অনুমতি দেবেন, সংযত হয়ে তাই ভোজন করবেন। ব্রহ্মচারী আচার্য-শুশ্রূষাপরায়ণ হয়ে গুরুদেবের গমনকালে অনুগমনের দ্বারা, তাঁর শয়নের পর শয্যাগ্রহণের দ্বারা, বিশ্রামকালে পাদমর্দনের দ্বারা ও তাঁর উপবেশনের পর উপবেশনের দ্বারা তাঁর সেবা করবেন। তিনি নীচের ন্যায় তাঁর আদেশের প্রতীক্ষায় অনতিদূরে অবস্থান করবেন। যতদিন বিদ্যা সমাপ্ত না হয়, ততদিন তিনি ব্রহ্মচর্য ব্রত ধারণ করে ও এই সকল আচার পালন করে ভোগরহিত হয়ে গুরুকুলে বাস করবেন। ২২-৩০

ব্রহ্মচারী যদি মহর্লোকে বা ব্রহ্মলোকে আরোহণ করতে চান, তবে তিনি বৃহদ্‌ব্রত (নৈষ্ঠিক ব্রত) ধারণ করে অধিক অধ্যয়নের জন্য গুরুর নিকট আত্ম-সমর্পণ করবেন। ব্রহ্মতেজোযুক্ত নিষ্পাপ ব্রহ্মচারী ভেদবুদ্ধি বিসর্জন দিয়ে অগ্নিতে, গুরুতে, নিজ আত্মায় ও সর্বভূতে অবস্থিত পরমাত্মারূপী আমার উপাসনা করবেন। অগৃহস্থ ব্যক্তি অর্থাৎ ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থী বা সন্ন্যাসী স্ত্রীদিগের দর্শন, স্পর্শন, সম্ভাষণ ও পরিহাসাদি ত্যাগ করবেন এবং মিথুনীভূত প্রাণীদের দেখবেন না। হে উদ্ধব, শৌচ, আচমন, স্নান, সন্ধ্যোপাসনা, আমার অর্চনা, তীর্থসেবা, জপ, অস্পৃশ্য-অভক্ষ্য বর্জন, সর্বভূতে অন্তর্যামীরূপে আমার চিন্তা এবং মনঃসংযম, বাক্‌সংযম ও শরীরসংযম—সকল আশ্রমেই এই সকল নিয়ম বিহিত। এইরূপ বৃহদ্‌ব্রতধারী ব্রাহ্মণ যদি নিষ্কাম হন, তবে তিনি অগ্নির মতো দীপ্যমান হয়ে এবং কঠোর তপস্যার দ্বারা দগ্ধকর্মাশয় হয়ে আমাতে ভক্তিপরায়ণ হন। যদি তিনি দ্বিতীয় আশ্রমে (ব্রহ্মচর্য থেকে গার্হস্থ্যাশ্রমে) প্রবেশ করতে ইচ্ছা করেন, তা হলে বেদের অর্থ যথাবৎ বিচার করে গুরুকে দক্ষিণা প্রদান করে গুরুর অনুমতি অনুসারে স্নান করবেন। ব্রহ্মচারী যদি সকাম হন তবে তিনি গৃহস্থ হবেন, নিষ্কাম হলে বানপ্রস্থাশ্রমে প্রবেশ করবেন আর যদি দ্বিজোত্তম হন, তবে প্রব্রজ্যা অবলম্বন করবেন অথবা এক আশ্রম থেকে অন্য আশ্রমে যাবেন ; তিনি কখনো আশ্রমশূন্য হয়ে আমার প্রতিকূল আচরণ করবেন না। গৃহার্থী ব্যক্তি সবর্ণা, অনিন্দিতা ও বয়ঃকনিষ্ঠা কন্যাকে বিবাহ করবেন। কামহেতু যদি তিনি কোন অসবর্ণা কন্যাকে বিবাহ করেন, তা হলে তাকে সবর্ণার পরে যথাক্রমে বিবাহ করবেন। যজ্ঞ, অধ্যয়ন ও দান—এই তিনটি দ্বিজাতির (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের) সাধারণ ধর্ম। প্রতিগ্রহ, অধ্যাপন ও যাজন এই তিনটি শুধু ব্রাহ্মণের জন্য বিহিত।[১] ৩১-৪০

যিনি প্রতিগ্রহকে তপস্যা, তেজ ও যশের বিঘ্নকর মনে করেন, তিনি অন্য উপায়ে (যাজন ও অধ্যাপনার দ্বারা) জীবনধারণ করবেন। এই দুয়ের মধ্যেও

---

১ দ্রষ্টব্য : বিধাতা অধ্যয়ন, অধ্যাপন, যজন, যাজন, দান ও প্রতিগ্রহ—এই ছটি কর্ম ব্রাহ্মণের জন্য নির্দেশ করেছেন। —মনুসংহিতা

যিনি দোষদর্শন করবেন, তিনি শিলের দ্বারা (স্বামী-পরিত্যক্ত ক্ষেত্র-পতিত শস্যকণার দ্বারা) জীবিকা নির্বাহ করবেন। ব্রাহ্মণের এই দেহ তুচ্ছ বিষয়-ভোগের জন্যে নয়, ইহা ইহলোকে ক্লেশকর তপস্যা সাধনের এবং পরলোকে অসীম সুখলাভের জন্য। শিলবৃত্তি ও উঞ্ছবৃত্তির দ্বারা পরিতুষ্ট হয়ে নিষ্কাম মহৎ কর্মের অনুষ্ঠান করে এবং আমাতে চিত্ত সমর্পণ করে অনাসক্তভাবে গৃহে অবস্থান করেও তিনি শান্তিলাভ করবেন। যাঁরা অর্থক্লেশে অবসন্ন মৎপরায়ণ ব্রাহ্মণকে অর্থাৎ যে কোন ভক্তকে উদ্ধার করেন, সমুদ্রে পতিত ব্যক্তিকে নৌকার ন্যায় আমিও তাঁদের অচিরে আপদ্ থেকে উদ্ধার করি। ধীর নরপতি যেমন সকল প্রজাকে এবং আপনাকে রক্ষা করেন এবং গজরাজ যেমন যূথস্থিত সমস্ত হাতীকে ও নিজেকে রক্ষা করে, সেইরূপ ধীর ব্যক্তি আত্মার দ্বারাই আত্মাকে দুঃখ থেকে উদ্ধার করবেন। এই প্রকার প্রজারক্ষক রাজা এই জন্য সকল অশুভ দূর করে সূর্যতুল্য তেজস্বী বিমানে আরোহণ করে ইন্দ্রের সঙ্গে সুখভোগ করেন। ব্রাহ্মণ দারিদ্র্যক্লিষ্ট হলে বণিকবৃত্তি অবলম্বন করে বিক্রয়যোগ্য দ্রব্যের দ্বারা আপদ-বিপদ থেকে উত্তীর্ণ হবেন। তাতেও যদি আপদের শান্তি না হয়, তা হলে ক্ষাত্রবৃত্তি অবলম্বন করবেন এবং বাহুবলে আপদ থেকে উত্তীর্ণ হবেন, কিন্তু কোন অবস্থাতেই তিনি নীচসেবার আশ্রয় নেবেন না। ৪১-৪৮

আপৎকালে ক্ষত্রিয় কৃষি প্রভৃতি বৈশ্যবৃত্তির দ্বারা অথবা মৃগয়ার দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করবেন অথবা অধ্যাপনাদি বিপ্রবৃত্তি অবলম্বন করবেন, কিন্তু কখনো নীচ-সেবার আশ্রয় নেবেন না। বৈশ্য বিপন্ন হলে শূদ্রবৃত্তি অবলম্বন করবেন, আর শূদ্র বিপন্ন হলে মাদুর-বোনা প্রভৃতি বৃত্তি অবলম্বন করবেন। কিন্তু বিপদ থেকে মুক্ত হলে কেউ নিন্দিত কর্মের দ্বারা জীবিকা নির্বাহে সচেষ্ট হবেন না। গৃহস্থ ব্যক্তি প্রতিদিন পঞ্চযজ্ঞের[১] অনুষ্ঠান করবেন। তিনি যথাশক্তি বেদাধ্যয়নের দ্বারা ঋষিগণের, স্বাহা-প্রয়োগের দ্বারা দেবগণের, স্বধা-প্রয়োগের দ্বারা পিতৃগণের, উপহার বস্তুর দ্বারা ভূতগণের এবং অন্নজলাদির দ্বারা মনুষ্য-গণের অর্চনা করবেন। তিনি ঋষিগণকে, দেবগণকে, পিতৃগণকে, ভূতগণকে ও মনুষ্যগণকে আমারই স্বরূপ জ্ঞান করবেন। গৃহী যদৃচ্ছাক্রমে লব্ধ অথবা নিজের শুদ্ধ বৃত্তির দ্বারা অর্জিত ধনে পোষ্যদিগকে পীড়ন না করে অর্থাৎ যথাযথ প্রতিপালন করে ন্যায় অনুসারে পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান করবেন। জ্ঞানী গৃহস্থ ব্যক্তি বহু-স্বজনযুক্ত হলেও কারো প্রতি আসক্ত হবেন না, পরিজনে পরিবৃত হয়েও ঈশ্বরনিষ্ঠা বিস্মৃত হবেন না এবং দৃষ্ট পদার্থের ন্যায় (ঐহিক ভোগের ন্যায়) স্বর্গাদি অদৃষ্ট বস্তুকেও নশ্বর বলে জানবেন। পুত্র, স্ত্রী, আত্মীয় ও বন্ধুবর্গের সহিত মিলন পান্থশালার পথিকগণের মিলনের মতো—নিদ্রার অনুগামী স্বপ্ন যেমন নিদ্রাবসানে বিনষ্ট হয়ে যায়, সেরূপ প্রতি দেহের বিনাশের সঙ্গে এরাও বিনষ্ট হয়ে যায়। এইরূপ বিবেচনা করে উদাসীন বা অনাসক্তের ন্যায় গৃহে বাস করে মমতাহীন ও অহঙ্কারশূন্য ব্যক্তি গৃহে আবদ্ধ হন না। ভক্তিমান গৃহস্থ গৃহস্থাশ্রমে বিহিত কর্মের দ্বারা আমার অর্চনা করে গৃহেই বাস করবেন অথবা বনে যাবেন কিংবা পুত্রবান হলে সন্ন্যাস নেবেন। যার বুদ্ধি গৃহে আসক্ত, পুত্রবিত্তাদির কামনায় যে কাতর, স্ত্রৈণ ও অল্পবুদ্ধি সেই মূঢ় 'আমি ও আমার' এইরূপ ভাবনা করে সংসারে আবদ্ধ হয়। 'অহো! আমার বৃদ্ধ মাতাপিতা, শিশুসন্তানযুক্ত পত্নী এবং আমার দীন পুত্রকন্যাগণ আমাকে না পেয়ে অনাথের ন্যায় কিরূপে বেঁচে

১ ব্রহ্মযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ ও নৃযজ্ঞ—এই পঞ্চযজ্ঞ।

থাকবে ?'—এইরূপে গৃহ-বাসনায় যাদের চিত্ত আকৃষ্ট, যারা অপরিতৃপ্ত ও মন্দবুদ্ধি, এরূপ গৃহস্থ সর্বদা আত্মীয়গণের চিন্তা করতে করতে মৃত্যুর পরে অতি তামসী যোনীতে জন্মগ্রহণ করে। ৪৯-৫৮

অষ্টাদশ অধ্যায়

বর্ণাশ্রম ধর্ম—বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসাশ্রম

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন, উদ্ধব, বানপ্রস্থানাবলম্বী ব্যক্তি পুত্রগণের নিকট পত্নীর রক্ষণের ভার দিয়ে অথবা পত্নীর সঙ্গে জিতেন্দ্রিয় হয়ে জীবনের তৃতীয় ভাগ (পঁচাত্তর বৎসর পর্যন্ত) বনে বাস করবেন। তিনি বনজাত পবিত্র কন্দ, মূল ও ফলের দ্বারা প্রাণ রক্ষা করবেন এবং বল্কল, বসন, তৃণ, পাতা বা মৃগচর্ম পরবেন। তিনি কেশ, রোম, নখ ও শ্মশ্রু রাখবেন, গা পরিষ্কার করবেন না, দাঁত মাজবেন না, ত্রিসন্ধ্যা জলে স্নান করবেন এবং মাটিতে শোবেন। গ্রীষ্মকালে তিনি পঞ্চাগ্নির তাপে তপ্ত হবেন, বর্ষাকালে জলধারা-সম্পাত সহ্য করবেন, শীতকালে জলে আকণ্ঠ মগ্ন হয়ে থাকবেন, এই ভাবে তিনি তপস্যা করবেন। তিনি অগ্নিপক্ব বা কালপক্ব ফল ভক্ষণ করবেন। উদূখল বা প্রস্তরাদি দ্বারা তিনি আহার্য পেষণ করবেন অথবা দাঁতকেই উদূখলরূপে ব্যবহার করবেন। তিনি দেশ, কাল ও বল বিশেষরূপে বিচার করে নিজের জীবিকা অর্জনের জন্যে সকল দ্রব্য নিজে সংগ্রহ করবেন। এক কালে আহৃত দ্রব্য অন্য কালে গ্রহণ কববেন না। বনাশ্রমী ব্যক্তি বনজাত নীবারাদি ধান্যে প্রস্তুত চরু পুরোডাশাদির দ্বারা কালবিহিত নবান্নশ্রাদ্ধ প্রভৃতি বৈদিক কর্ম করবেন। কিন্তু বেদবিহিত পশু-মাংসের দ্বারা কখনও আমার যাগ করবেন না। বেদবাদিগণ বনাশ্রমী ব্যক্তির পক্ষেও গৃহস্থের মতো অগ্নিহোত্র, দর্শ, পৌর্ণমাস প্রভৃতি যজ্ঞের ও চাতুর্মাস্য ব্রতাদির বিধান দিয়েছেন। ১-৮

এইরূপে চিরজীবন তপস্যার অনুষ্ঠানের দ্বারা মুনি শিরাবিশিষ্ট ও শুষ্ক-মাংস হয়ে তপোময় আমার আরাধনা করেন এবং মহর্লোক থেকে আমাকেই প্রাপ্ত হন। যে বানপ্রস্থী ব্যক্তি অতি কষ্টসাধ্য ভগবৎ-প্রাপ্তিরূপ মুখ্যফলজনক এই মহৎ তপস্যাকে স্বর্গাদি তুচ্ছ কামনা পূরণের জন্যে নিয়োজিত করে, তার থেকে অধিক মূর্খ আর কেউ নেই। যদি সেই ব্যক্তি স্বধর্মানুষ্ঠানে অক্ষম এবং জরায় কম্পিতকলেবর হন, তা হলে আত্মাতে অগ্নি আরোপ করে এবং আমাতে চিত্ত সমর্পণ করে অগ্নিপ্রবেশ করবেন। যখন ধর্মানুষ্ঠানের দ্বারা লব্ধ স্বর্গাদি লোক দুঃখজনক বলে তাতে সম্যক্‌ বিরাগ উৎপন্ন হবে, তখন অগ্নি পরিত্যাগ করে সেই আশ্রম থেকে বেরিয়ে আসবেন (সন্ন্যাসগ্রহণ করবেন)। তিনি যথাবিধি অষ্টশ্রাদ্ধ করে ও প্রাজাপত্য যজ্ঞের দ্বারা আমার আরাধনা করে ঋত্বিককে সর্বস্ব দান করবেন, আত্মমধ্যে অগ্নিসমূহের আরোপ করবেন এবং নিরপেক্ষ হয়ে (বৈরাগ্যবান হয়ে) সন্ন্যাস গ্রহণ করবেন। 'এই ব্রাহ্মণ আমাদিগকে অতিক্রম করে ব্রহ্ম প্রাপ্ত হবেন'—এইরূপ চিন্তা করে দেবতাগণ স্ত্রী-পুত্রের রূপ ধারণ করে সন্ন্যাসে উদ্যোগী ব্রাহ্মণের পক্ষে বিঘ্নের সৃষ্টি করেন। সন্ন্যাসী যদি কৌপীন ভিন্ন অন্য বস্ত্র গ্রহণ করতে ইচ্ছা করেন, তা হলে যতটুকু বস্ত্রের দ্বারা কৌপীন আচ্ছাদিত হয় ততটুকু মাত্র বসন ধারণ করবেন। যদি আপৎকাল উপস্থিত না হয়, তবে দণ্ড ও কমণ্ডলু ভিন্ন পূর্বপরিত্যক্ত অন্য কিছুই গ্রহণ করবেন না। সন্ন্যাসী বিশেষ দৃষ্টি করে পাদক্ষেপ করবেন, বস্ত্রপূত

জল পান, সত্যপূত বাক্য উচ্চারণ এবং বিশেষ বিচার করে মনঃপূত আচরণ করবেন। ৯-১৬

মৌন হচ্ছে বাক্যের দণ্ড, অনীহা বা চেষ্টাহীনতা হচ্ছে দেহের দণ্ড আর প্রাণায়াম হচ্ছে চিত্তের দণ্ড। এই তিনটি দণ্ড যার নাই, তিনি শুধু বংশজাত ত্রিদণ্ড ধারণ করে যতি হতে পারেন না। সন্ন্যাসী চারি বর্ণের মধ্যে অভিশপ্ত, পতিত প্রভৃতিকে বর্জন করবেন আর কে ভিক্ষা দেবেন কি না দেবেন তা না জেনে অনির্দিষ্ট সপ্ত গৃহে ভিক্ষা করবেন এবং যা পেলেন তাতেই সন্তুষ্ট থাকবেন। তিনি গ্রামের বাইরে জলাশয়ে যাবেন, তথায় মৌনী হয়ে স্নান করবেন, আহৃত বিশুদ্ধ অন্নাদি দ্বারা ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও সূর্যের উদ্দেশে যথাযথ বিভক্ত করবেন এবং অবশিষ্ট অন্ন নিঃশেষে ভোজন করবেন। তিনি অনাসক্ত, সংযতেন্দ্রিয়, আত্মানন্দে আনন্দিত, আত্মারাম, বীর ও সমদর্শী হয়ে একাকী এই পৃথিবী বিচরণ করবেন। যিনি পর্যটনে অশক্ত, এরূপে সন্ন্যাসী বিজন স্থানে গিয়ে আমার ভাবনার দ্বারা নির্মলচিত্ত হয়ে আমার সঙ্গে অভিন্নরূপে আত্মার ধ্যান করবেন। মননশীল মুনি ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্যই বন্ধনের কারণ জেনে কাম-ক্রোধাদি ছয় রিপুকে জয় করবেন এবং ক্ষুদ্র কামনাসকল থেকে মুক্ত হয়ে আত্মার মধ্যে মহাসুখ বা চিদানন্দের অনুভব করে আমার ভাবনায় ভাবিত হয়ে বিচরণ করবেন। তিনি ভিক্ষার জন্যে নগর, গ্রাম, গোষ্ঠ এবং যাত্রিজনের নিকট যাবেন। তিনি এইভাবে পবিত্র দেশ, নদী, পর্বত ও আশ্রমে পর্যটন করবেন। সন্ন্যাসী বানপ্রস্থীদিগের আশ্রমে নিরন্তর ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করবেন, কেননা বানপ্রস্থিগণ শিলবৃত্তির দ্বারা যে অন্ন আহরণ করেন, সেই অন্ন ভোজন করে যতিগণ শুদ্ধসত্ত্ব ও মোহমুক্ত হয়ে সত্বর মোক্ষলাভ করেন। সন্ন্যাসী দৃশ্যমান মিষ্টান্নাদি বস্তুসমূহের দিকে তাকাবেন না, যেহেতু এই সকল বস্তুতে আসক্ত হলে বিনষ্ট হতে হয়। তিনি ইহলৌকিক ও পারলৌকিক বিষয়ে আসক্তিবিহীন হয়ে ভোগ্যবস্তু থেকে বিরত হবেন। তিনি মন, বাক্য ও প্রাণাদির সহিত অহঙ্কারাত্মক শরীর ও মমতাস্পদ জগৎকে এবং সমুদয় সুখকে আত্মাতে কল্পিত মায়ামাত্র জেনে ত্যাগ করবেন; তিনি আত্মনিষ্ঠ হয়ে পুনরায় তার চিন্তা করবেন না। যিনি মোক্ষ কামনায় কেমল মাত্র জ্ঞাননিষ্ঠ এবং বাহ্য বিষয়ে আসক্তি ত্যাগ করেন অথবা মুক্তি কামনাও পরিত্যাগ করে আমার ভক্ত হন, তিনি আশ্রমচিহ্নসকল ত্যাগ করে বিধি ও নিষেধের অধীন না হয়ে বিচরণ করবেন। তিনি বিবেকবান হয়েও বালকের ন্যায় ক্রীড়া করবেন, কুশল হয়েও জড়ের ন্যায় আচরণ করবেন, বিদ্বান হয়েও উন্মত্তের ন্যায় কথা বলবেন এবং বেদনিষ্ঠ হয়েও বৃষের ন্যায় নিয়মশূন্য হয়ে বিচরণ করবেন। তিনি বেদের কর্মকাণ্ডের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হবেন না, পাষণ্ডী হবেন না[১]। শুধু তর্কনিষ্ঠ হবেন না। এবং নিষ্প্রয়োজন বাদ-প্রতিবাদে কোনো পক্ষ অবলম্বন করবেন না। ধীর ব্যক্তি কোন লোক থেকে উদ্বিগ্ন হবেন না, অপরের মনেও উদ্বেগ জন্মাবেন না, অপরের প্রতিবাদ বা দুর্বাক্য সহ্য করবেন, কারো প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করবেন না এবং দেহের জন্যে কারো সঙ্গে পশুর ন্যায় শত্রুতাচরণ করবেন না। এক চন্দ্র নানা জলপাত্রে নানারূপে প্রতিবিম্বিত হয়, তেমনি একই আত্মা অন্তর্যামীরূপে বিভিন্ন দেহে ও আত্মমধ্যে বর্তমান আছেন। বাস্তবিক সমুদয় ভূতই একাত্মক অর্থাৎ এক আত্মার সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট[২]। ১৭-৩২

---

১ বেদবিরুদ্ধ ও স্মৃতিবিরুদ্ধ কাজ করবেন না।

২ একো বশী সর্বভূতান্তরাত্মা একং রূপং বহুধা যঃ করোতি। কঠ, ২।২।১২

ধৈর্যশীল ব্যক্তি কোন সময়ে অন্নাদি না পেলেও বিষাদগ্রস্ত হবেন না; আবার পেলেও হৃষ্টচিত্ত হবেন না। কারণ লাভ ও অলাভ উভয়ই দৈবের অধীন। আহারের জন্যে চেষ্টা করতেই হবে, কারণ প্রাণধারণ কর্তব্যরূপে নির্দিষ্ট। প্রাণরক্ষা হলেই তিনি তত্ত্ববিচার করবেন, আর তত্ত্বজ্ঞান হলেই মুক্তি লাভ করবেন। মুনি যদৃচ্ছাক্রমে উপস্থিত অন্ন ভোজন করবেন, সে অন্ন উৎকৃষ্ট কি অপকৃষ্ট, তার বিচার করবেন না। এইরূপ অনায়াসপ্রাপ্ত বস্ত্র বা শয্যাও তিনি প্রসন্নচিত্তে ব্যবহার করবেন। জ্ঞাননিষ্ঠ ব্যক্তি বিধি-নিষেধের অধীন না হয়েও স্বেচ্ছায় শৌচ, আচমন ও স্নান এবং অন্যান্য নিয়মসকল পালন করবেন। আমি ঈশ্বর (শ্রীকৃষ্ণ) যেমন বিধি-নিষেধের অধীন না হয়েও লীলাবশত কার্যের অনুষ্ঠান করি, তিনিও সেইরূপ করবেন। জ্ঞানী ব্যক্তির ভেদ-প্রতীতি থাকে না। পূর্বে যে ভেদজ্ঞান ছিল, তাও জ্ঞানের দ্বারা বিনষ্ট হয়। যতদিন দেহের বিনাশ না হয়, ততদিন কদাচিৎ ভেদ-জ্ঞানের উদয় হয়ে থাকে, তারপর দেহান্তে তিনি সার্ষ্টি-মুক্তি অর্থাৎ আমার তুল্য সম্পত্তি প্রাপ্ত হন। পরিণামে যা দুঃখকর, এরূপ কাম্যবিষয়ে যিনি নির্বেদ (বৈরাগ্য) প্রাপ্ত হয়েছেন, তিনি যদি আমাকে লাভ করার সাধনা না জানেন, তবে তিনি কোন মননশীল ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করবেন। যতদিন ব্রহ্মজ্ঞান লাভ না হয়, ততদিন শ্রদ্ধাবান ও অসূয়াশূন্য হয়ে ভক্তি ও শ্রদ্ধার সঙ্গে গুরুকে আমার স্বরূপ জেনে তাঁর পরিচর্যা করবেন। যে ব্যক্তির পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও মন অসংযত, যিনি প্রচণ্ড ইন্দ্রিয়-সারথিরূপ বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত, যাঁর জ্ঞান ও বৈরাগ্যের উদয় হয় নি, অথচ যিনি জীবিকা অর্জনের জন্যে ত্রিদণ্ড ধারণ করেছেন, এরূপ ধর্মঘাতী ব্যক্তি দেবগণকে, আত্মাকে ও আত্মস্থ আমাকে (শ্রীকৃষ্ণকে) বঞ্চিত করে; তারা বিষয়বাসনাগ্রস্ত হয়ে ইহলোক ও পরলোক উভয়লোক থেকেই ভ্রষ্ট হয়। ৩৩-৪১

সন্ন্যাসীর ধর্ম হচ্ছে শম (অন্তরিন্দ্রিয়-সংযম) ও অহিংসা, বানপ্রস্থের ধর্ম হচ্ছে তপস্যা ও তত্ত্ববিচার, গৃহীর ধর্ম হচ্ছে প্রাণিগণের রক্ষা ও পঞ্চ যজ্ঞের অনুষ্ঠান আর ব্রহ্মচারীর ধর্ম হচ্ছে আচার্যের সেবা। ব্রহ্মচর্য, তপস্যা, বাহ্যাভ্যন্তর শৌচ, সন্তোষ, সর্বজীবে সৌহার্দ্য এবং শুধু ঋতুকালে সন্তান কামনায় স্ত্রীগমন—গৃহস্থের এই ধর্ম। আমার আরাধনা সকল আশ্রমীরই নিত্যধর্ম। যিনি সর্বভূতে আমাকে ভাবনা করে একমাত্র আমারই ভজনা করেন, যিনি স্বধর্ম অনুসারে সর্বদা আমার সেবায় রত হন, তিনি আমাতে অনন্যা ভক্তি লাভ করেন। সেই ব্যক্তি অবিনাশিনী ভক্তির দ্বারা সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কারণভূত, সর্বলোক মহেশ্বর, জগৎকারণ, বৈকুণ্ঠ-বাসী আমার সামীপ্য লাভ করেন। এইভাবে তিনি স্বধর্মের আচরণের দ্বারা শুদ্ধসত্ত্ব হওয়ায় আমার ঐশ্বর্য জানতে পারেন এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানসম্পন্ন হয়ে অচিরে আমায় লাভ করেন। বর্ণাশ্রমাবলম্বী ব্যক্তিদের এই আচার ও ধর্ম আমার প্রতি ভক্তির সঙ্গে অনুষ্ঠিত হলে পরম মোক্ষপ্রদ হয়ে থাকে। উদ্ধব, স্বধর্মপরায়ণ আমার ভক্ত পরমেশ্বররূপী আমাকে যেভাবে লাভ করতে পারেন, সে বিষয়ে তুমি আমায় যে প্রশ্ন করেছিলে, আমি সমগ্রভাবে তা তোমার নিকট ব্যক্ত করলাম। ৪২-৪৮

ঊনবিংশ অধ্যায়

জ্ঞান ও যোগের লক্ষণ

ভগবান বললেন, উদ্ধব, যে ব্যক্তি শাস্ত্রশ্রবণ করে সে বিষয়ে অনুভব পর্যন্ত লাভ করেছেন, যিনি কেবল পরোক্ষ জ্ঞানই লাভ করেন নি আত্মতত্ত্বও অবগত হয়েছেন,

তিনি এই দ্বৈত প্রপঞ্চকে ও তার নিবৃত্তি-সাধনকে মায়ামাত্র বলে জানবেন এবং জ্ঞানকেও আমাতে অর্পণ করবেন। আমিই জ্ঞানী ব্যক্তিদের অভিষ্ট ফল ও অপেক্ষিত স্বার্থ, আমিই তার সাধন-স্বর্গ ও অপবর্গরূপে (মুক্তিরূপে) সম্মত, আমি ভিন্ন তাঁদের অন্য কোন প্রিয় বস্তু বা সাধন নেই। জ্ঞান-বিজ্ঞানসম্পন্ন ও শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিগণ আমার শ্রেষ্ঠ পদ জেনেছেন। জ্ঞানী ব্যক্তি জ্ঞানের দ্বারা আমাকে হৃদয়ে ধারণ করেন, তাই তিনি আমার অতীব প্রিয়। ভগবদ্‌জ্ঞানের লেশমাত্রের দ্বারা যে সিদ্ধির উদয় হয়, তপস্যা, তীর্থসেবা, জপ, দান বা অন্যান্য পুণ্যকর্মের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে সেই সিদ্ধিলাভ হয় না। অতএব জ্ঞানের সঙ্গে জ্ঞানের অবধিভূত আত্মবস্তুকে জান এবং জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্ন চিত্তে ভক্তিভাবে আমার আরাধনা কর। মুনিগণ পুরাকালে জ্ঞানবিজ্ঞানরূপ যজ্ঞের দ্বারা আত্মাতে সর্বযজ্ঞপতি আমার আরাধনা করেছেন এবং সংসিদ্ধিস্বরূপ আমাকেই প্রাপ্ত হয়েছেন। উদ্ধব, তোমাকে তিন প্রকার বিকার আশ্রয় করেছে—আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আদিদৈবিক। এই ত্রিবিধ বিকারকে মায়া বলেই জানবে, কারণ বর্তমান কালেই (বা মধ্যভাগে অর্থাৎ দেহধারণমাত্র সময়ে) তার প্রতীতি হয়, আদি ও অন্তে উহা লক্ষিত হয় না। জন্মাদি বিকার দেহেরই ধর্ম, আত্মার ধর্ম নয়, সুতরাং সেই সময়ে তোমার কোন হানি নাই। রজ্জুতে সর্পবুদ্ধি হলেও আদি, অন্ত ও মধ্যে শুধু রজ্জুই বর্তমান থাকে, বিকারসমূহের কোন বাস্তবিক সত্তা নেই। অসৎ পদার্থের আদি ও অন্তে যা, মধ্যেও তাই অবস্থিত। ১-৭

উদ্ধব বললেন, হে বিশ্বেশ্বর, হে বিশ্বমূর্তি, বৈরাগ্য ও বিজ্ঞানসংযুক্ত, সনাতন, বিশুদ্ধ ও বিপুল জ্ঞানযোগ এবং ব্রহ্মাদি মহৎ ব্যক্তিগণের প্রার্থনীয় আপনার প্রতি ভক্তিযোগ কিভাবে হয়, তা আমাকে বলুন। ঘোর সংসারমার্গে ত্রিবিধ তাপে পীড়িত জীবের পক্ষে আপনাব অমৃতবর্ষী চরণযুগলরূপ ছত্র ভিন্ন আর কোন আশ্রয় তো দেখতে পাচ্ছি নে। আমি সংসারকূপে নিপতিত, কালসর্পের দংশনে জর্জরিত, ক্ষুদ্র বিষয়সুখে আমার তৃষ্ণা অত্যন্ত প্রবল ; এরূপ আমার ন্যায় ব্যক্তিকে কৃপা করে উদ্ধার করুন এবং মোক্ষবোধক অমৃত বচনে তাকে অভিষিক্ত করুন। ৮-১০

ভগবান বললেন, পূর্বকালে রাজা অজাতশত্রু (যুধিষ্ঠির) আমাদের সম্মুখে ধার্মিকগণের মধ্যে অগ্রগণ্য ভীষ্মকে এই প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করেছিলেন। ভারতযুদ্ধের অবসান হলে যুধিষ্ঠির জ্ঞাতিবর্গের নিধনে বিহ্বল হয়ে বহুবিধ ধর্মের কথা শোনার পর মোক্ষধর্মের বিষয় জিজ্ঞাসা করেছিলেন। আমি দেবব্রতের (ভীষ্মদেবের) মুখ থেকে শ্রুত জ্ঞান, বিজ্ঞান (অনুভবসিদ্ধ জ্ঞান), বৈরাগ্য, শ্রদ্ধা ও ভক্তির দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত সেই সকল ধর্ম তোমাকে বলব। যে জ্ঞানের দ্বারা ব্রহ্মাদি স্থাবর পর্যন্ত সর্বভূতে আটাশটি তত্ত্বকে অনুগতরূপে দেখা যায় এবং এদের মধ্যেও এক আত্মতত্ত্ব অনুভব করা যায়, সেই জ্ঞানকে আমার সম্মত বলে জানবে। এই অষ্টাবিংশতি তত্ত্বের কথা শোন। প্রকৃতি, পুরুষ, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার ও পাঁচটি তন্মাত্র এই নয়টি তত্ত্ব, আর এগার ইন্দ্রিয়, পাঁচটি মহাভূত এবং সত্ত্ব, রজ ও তম, এই তিন গুণ—সর্বসাকুল্যে এই হল আটাশটি তত্ত্ব। ১১-১৪

যে জ্ঞানের দ্বারা পূর্বে এক পরমাত্মাকে পরম কারণরূপে নিখিল বিশ্বে অনুগত দর্শন করেছিলে, যাতে সেরূপ দর্শন হয় না, জগৎ ও আত্মাকে ভিন্ন জ্ঞান হয়, সেই জ্ঞানই বিজ্ঞান নামে কথিত হয়। সাবয়ব জাগতিক পদার্থসমূহ ত্রিগুণ থেকে উৎপন্ন। এদের উৎপত্তি, স্থিতি ও নাশ দর্শন করবে, তা হলেই সর্বকারণ পরমেশ্বরের একান্তভাব উপলব্ধি হবে। যে বস্তু আদিতে (উৎপত্তি-কালে),

মধ্যে (স্থিতিকালে) ও অন্তে (বিনাশ-কালে) আশ্রয়রূপে এক কার্য থেকে অপর কার্যের অনুগমন করে এবং যা প্রলয়ের শেষেও অবশিষ্ট থাকে তাকেই সৎ জানবে। শ্রুতি (বেদবাক্য), প্রত্যক্ষ, ঐতিহ্য (মহাজন-প্রসিদ্ধি) ও অনুমান, এই চারটি হচ্ছে প্রমাণ। সৎপদার্থের এই সমস্ত প্রমাণের সঙ্গে বিরোধ হয়, সুতরাং জগৎ অনিত্য ও পরিবর্তনশীল জেনে জ্ঞানী ব্যক্তির সংসারে বৈরাগ্য হয়। তিনি আত্মাকেই একমাত্র সত্য জেনে এবং আত্মাকে দর্শন করে অসৎ বস্তুতে বৈরাগ্য অবলম্বন করেন। পণ্ডিত ব্যক্তি জানেন, কর্মসকল পরিণামী ও অমঙ্গলস্বরূপ, সুতরাং তিনি ব্রহ্মলোক পর্যন্ত যাবতীয় অদৃষ্ট সুখকে সাংসারিক দৃষ্ট সুখের মতো দুঃখস্বরূপ ও বিনাশশীল বলে জানবেন। নিষ্পাপ উদ্ধব, পূর্বে তোমায় ভক্তিযোগের কথা বলা হয়েছে, তথাপি তোমার যখন তাতে পিপাসা মেটেনি, সেই কারণে আমার ভক্তির পরম কারণ সেই ভক্তিযোগ তোমায় আবার বলব। ১৫-১৯

উদ্ধব, আমার অমৃততুল্য কথায় শ্রদ্ধা, নিরন্তর সৎকথা-কীর্তন, আমার পূজায় আসক্তি, স্তুতিবাক্যের দ্বারা আমার স্তব, সেবায় আদর, সর্বাঙ্গের দ্বারা আমার অভিনন্দন (দণ্ডবৎ নতি), আমার সন্তোষ-জ্ঞানে আমার ভক্তদিগের বিশেষ যত্নের সঙ্গে পূজা, সর্বপ্রাণীতে আমার স্বরূপের অনুভূতি, আমার উদ্দেশ্যে লৌকিক কার্য, বাক্যের দ্বারা আমার গুণের কীর্তন, আমাতে মন সমর্পণ, সকল বাসনা পরিত্যাগ, আমার নিমিত্ত ভজনের প্রতিকূল অর্থ, ভোগ ও সুখ পরিত্যাগ, এবং আমার জন্য যজ্ঞ, দান, হোম, মন্ত্র-জপ, ব্রত ও তপশ্চর্যা – এই সকল ধর্মের দ্বারা আত্মনিবেদনকারী মানুষের আমার প্রতি ভক্তি জন্মায়, তখন তাঁর কোন বিষয়েরই অভাব থাকে না। যখন মানুষ সত্ত্বগুণের দ্বারা পরিপূর্ণ শান্ত চিত্তকে পরমাত্মরূপী আমাতে সমর্পণ করে, তখন সে ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য লাভ করে। আবার চিত্ত যখন দেহ-গেহাদিতে আসক্ত হয়ে ইন্দ্রিয়সমূহের সঙ্গে বিষয়ে ধাবিত হয়, তখন তাতে রজোগুণের আধিক্য হয়, ফলে ধর্মাদির বিপর্যয় ঘটে অর্থাৎ মানুষ তখন অধর্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বর্য প্রাপ্ত হয়। যার দ্বারা আমাতে ভক্তি জন্মায়, তাই হচ্ছে ধর্ম, সর্বত্র এক পরমাত্মার দর্শনই জ্ঞান, বিষয়ে অনাসক্তিই বৈরাগ্য এবং অণিমাদি সিদ্ধিই ঐশ্বর্য বলে কথিত হয়। ২০-২৭

উদ্ধব বললেন, প্রভু, যম ও নিয়ম কয় প্রকার? শম, দম, তিতিক্ষা ও ধৃতিই বা কি? দান, তপস্যা, শৌর্য, সত্য ও ঋতই বা কাকে বলে? ত্যাগ কি? ইষ্ট ধন, যজ্ঞ ও দক্ষিণাই বা কি? পুরুষের বল, দয়া ও লাভ কি? পরমা বিদ্যা, হ্রী (লজ্জা) ও শ্রী (ঐশ্বর্য) কি? সুখ এবং দুঃখই বা কি? পণ্ডিত এবং মূর্খই বা কে? সুপথ বা কুপথই বা কি? স্বর্গ এবং নরকই বা কাকে বলে? বন্ধু এবং গৃহই বা কি? আঢ্যই (ধনীই) বা কে, দরিদ্রই বা কে? কৃপণই বা কে আর ঈশ্বরই (স্বাধীনই) বা কে? আমার এই সকল প্রশ্নের এবং এদের বিপরীত বিষয়ের যথাযথ উত্তর আমাকে দিন। ২৮-৩২

শ্রীভগবান বললেন, অহিংসা, সত্য, অচৌর্য, অসঙ্গ, লজ্জা, অসঞ্চয়, আস্তিক্য (স্বধর্মে স্থির বিশ্বাস), ব্রহ্মচর্য, মৌন, স্থৈর্য, ক্ষমা ও অভয়— এই বারোটি হচ্ছে যম। আর বাহ্য ও আভ্যন্তরিক শৌচ, জপ, তপস্যা, হোম, শ্রদ্ধা, আতিথ্য, আমার অর্চন, তীর্থভ্রমণ, পরহিতচেষ্টা, তুষ্টি ও আচার্যের সেবা— এই বারোটি হল নিয়ম। উদ্ধব, এদের অনুষ্ঠানের দ্বারা প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি মার্গাবলম্বীদের কামনা অনুসারে অভ্যুদয় ও মোক্ষ লাভ হয়ে থাকে। আমাতে বুদ্ধিবৃত্তির নিষ্ঠাই শম, ইন্দ্রিয়সংযমই দম, দুঃখসহিষ্ণুতাই তিতিক্ষা, জিহ্বা ও উপস্থের জয়ই

ধৃতি, জীবগণের প্রতি বিদ্রোহাচরণ ত্যাগই পরম দান, কাম ত্যাগই তপস্যা, স্বভাব-বিজয়ই (বাসনাত্যাগ) শৌর্য, সমদর্শনই সত্য। কবিগণ বলেন, সত্য ও প্রিয় বাক্যই ঋত, কর্মফলে অনাসক্তিই শৌচ এবং ত্যাগই (কর্মফলত্যাগ বা স্ত্রীপুত্রাদিতে মমতাত্যাগ) সন্ন্যাস। ৩৩-৩৮

ধর্মই মানুষের ইষ্ট ধন, আমি পরমেশ্বরই যজ্ঞ, জ্ঞানোপদেশই যজ্ঞের দক্ষিণা এবং দুর্দমনীয় মনের দমনকারক প্রাণায়ামই পরম বল। আমার ঐশ্বর্যাদি ছ'টি গুণই ভগ, আমার প্রতি ভক্তিই উত্তম লাভ, আত্মাতে অভেদজ্ঞান বিদ্যা, পাপকর্মে হেয়তা-জ্ঞানই লজ্জা (হ্রী), সকল বিষয়ে নিরপেক্ষতা প্রভৃতি গুণসমূহই শ্রী, সুখদুঃখের জয়ই সুখ, বিষয়ভোগের কামনাই দুঃখ, বন্ধন ও মুক্তির বিষয়ে যিনি অভিজ্ঞ তিনিই পণ্ডিত, দেহাদিতে অহং-বুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তিই মূর্খ। যে নিবৃত্তিপথে আমাকে পাওয়া যায় উহাই সৎপথ, চিত্তের বিক্ষেপই উৎপথ (কুমার্গ), সত্ত্বগুণের উদ্রেকই স্বর্গ, তমোগুণের উদয়ই নরক। সখা, জগদ্‌গুরু আমিই বন্ধু, মনুষ্যদেহই গৃহ, গুণসম্পন্ন ব্যক্তিই আঢ্য (ধনী), অসন্তুষ্ট ব্যক্তিই দরিদ্র, অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিই কৃপণ (দীনাত্মা), বিষয়সমূহে অনাসক্ত ব্যক্তিই স্বাধীন, বিষয়াসক্ত ব্যক্তিই পরাধীন। উদ্ধব, তোমার প্রশ্নসমূহের উত্তর যথাযথ দিলাম। গুণ ও দোষের লক্ষণ অধিক বলার কোন প্রয়োজন নেই। গুণ ও দোষের দর্শনই দোষ, আর এই উভয় ভাবের প্রতি ঔদাসীন্যই গুণ বলে জানবে। ৩৯-৪৫

বিংশ অধ্যায়

জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তিযোগ

উদ্ধব বললেন, কমললোচন, সাক্ষাৎ পরমেশ্বর আপনার আজ্ঞাই বেদের বিষয়। এই বেদ বিধিনিষেধরূপ, ইহাই বিধেয় ও নিষিদ্ধ কর্মের গুণ ও দোষ প্রতিপন্ন করে থাকে। সেই বেদশাস্ত্রেই বর্ণভেদ, আশ্রমভেদ, প্রতিলোমজ[1] ও অনুলোমজ[2] গুণ-দোষ, দ্রব্য-দেশ-বয়স-কালের গুণ-দোষ এবং তার ফলে স্বর্গ ও নরক-প্রাপ্তি প্রভৃতি সকল বিষয় প্রতিপন্ন হয়। গুণ ও দোষের ভেদ-দর্শন ভিন্ন আপনার বিধি ও নিষেধরূপ বেদবাক্য কিরূপে মানুষের পক্ষে পরম শ্রেয়ের কারণ হতে পারে? ভগবান, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের অগোচর অনুপলব্ধ বিষয়ে এবং সাধ্য ও সাধন বিষয়ে আপনার আজ্ঞারূপ বেদশাস্ত্রই পিতৃলোক, মনুষ্যলোক ও দেবলোকের শ্রেষ্ঠ প্রমাণ-স্বরূপ। গুণ ও দোষের ভেদ দৃষ্টি আপনার আজ্ঞারূপ বেদবাক্য থেকেই হয়েছে স্বয়ং কখনো হয় নি। আবার আপনার আজ্ঞারূপ বেদবাক্যেই ভেদ-দৃষ্টির নাশ হয়, এরূপ কথা শুনে আমার সংশয় উপস্থিত হয়েছে, আপনি তা দূর করুন। ১-৫

ভগবান বললেন, মানুষের মঙ্গলবিধানের ইচ্ছায় আমি জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ ও ভক্তিযোগ এই তিনপ্রকার যোগের উপদেশ করেছি, এ ছাড়া শ্রেয়-সাধনের অন্য কোন উপায় নেই। যাঁরা দুঃখবোধবশত কর্মফলে বিরক্ত হয়ে কর্মত্যাগ করেন তাঁদের পক্ষে জ্ঞানযোগ সিদ্ধিপ্রদ, আর কর্মে যাঁরা দুঃখবুদ্ধিশূন্য ও কর্মফলের প্রতি যাঁদের চিত্তে বিতৃষ্ণা জন্মে নি তাঁদের পক্ষে কর্মযোগই সিদ্ধিপ্রদ। আর কোনো

১ নীচবর্ণের ঔরসে উত্তমবর্ণের নারীর গর্ভে উৎপন্ন। ২ উত্তমবর্ণের ঔরসে নীচবর্ণের নারীর গর্ভে উৎপন্ন।

ভাগ্যোদয়ের ফলে যে মানুষের আমার কথায় শ্রদ্ধা জন্মেছে, বিষয়ে যাঁর বৈরাগ্য জন্মেনি অথচ অতিমাত্রায় আসক্তিও নেই, ভক্তিযোগ তাঁর পক্ষেই সিদ্ধিপ্রদ হয় থাকে। যতদিন পর্যন্ত বিষয়ে বৈরাগ্য না জন্মে অথবা আমার কথায় শ্রদ্ধার উৎপত্তি না হয়, ততদিন নিত্যনৈমিত্তিক কর্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত থাকবে। যিনি ফলাভিলাষ করেন না, অথবা যজ্ঞের দ্বারা দেবগণের যজনা করেন, সেই স্বধর্মস্থ ব্যক্তি যদি নিষিদ্ধ বা কাম্যকর্মের অনুষ্ঠান না করেন, তা হলে তিনি স্বর্গেও যান না, নরকেও যান না। কিন্তু যিনি নিষিদ্ধ কর্ম ত্যাগ করেছেন, যিনি স্বধর্মপরায়ণ ও শুদ্ধচিত্ত তিনি ইহলোকে বর্তমান থেকেই বিশুদ্ধ জ্ঞান এবং ভাগ্যক্রমে আমার প্রতি ভক্তিমান হন। স্বর্গবাসী দেবগণ এবং নরকবাসী ব্যক্তিগণ মনুষ্য-দেহেরই কামনা করেন, কারণ, এই নরদেহেই জ্ঞান ও ভক্তির সাধনার দ্বারা মোক্ষলাভ করা যায়, স্বর্গবাসীর দেহ বা নরকবাসীর দেহ জ্ঞান ও ভক্তি সাধনের অযোগ্য। ৬-১২

বিচক্ষণ মানুষ স্বর্গ বা নরকের এবং মনুষ্যলোকের কামনা করবেন না ; কারণ দেহে আসক্তিবশত মানুষ জ্ঞান ও ভক্তি বিস্মৃত হয়ে প্রমাদগ্রস্ত হয়। এই মর্ত্যদেহই জ্ঞানভক্তিরূপ অর্থের সিদ্ধিপ্রদ হলেও একে নশ্বর জেনে তিনি অপ্রমত্ত হয়ে মৃত্যুর পূর্বেই মুক্তির জন্যে চেষ্টা করবেন। যাতে কুলায় নির্মাণ করা হয়েছে, নিজের আশ্রয়স্বরূপ সেই বনস্পতিকে যমসদৃশ নির্দয় কাঠুরিয়া দ্বারা ছিন্ন হতে দেখে অনাসক্ত পাখী উহা ত্যাগ করে নিশ্চয়ই মঙ্গল লাভ করে থাকে। দিবস ও রাত্রিসকল আয়ুক্ষয় করছে, তা উপলব্ধি করে তিনি ভয়কম্পিত দেহে বিষয়ে আসক্তি পরিত্যাগ করেন এবং পরমেশ্বরকে জেনেও নিশ্চেষ্ট হয়ে শান্তি লাভ করেন। যে মানুষ সকল বাঞ্ছিত ফলের মূলস্বরূপ, অতি দুর্লভ অথচ দৈবযোগে সুলভ, সুপটু, গুরুরূপ কর্ণধারযুক্ত এবং আমাদ্বারা অনুকূল পবনে চালিত মানবদেহরূপ নৌকা ভাগ্যবশে প্রাপ্ত হয়েও ভব-সমুদ্র উত্তীর্ণ না হয়, সে যথার্থই আত্মহননকারী বা আত্মঘাতী। ১৩-১৭

যোগী যখন আরব্ধ কর্মে দুঃখদর্শনে উদ্বিগ্ন হবেন ও কর্মফলে তার বৈরাগ্য উপস্থিত হবে, তখন তিনি ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করে অভ্যাসের দ্বারা মনকে অবিচলিতভাবে আমাতে ধারণ করবেন। যত্নপূর্বক ধারণ করলেও মন যদি প্রথম অবস্থায় বিষয়ান্তরে ভ্রমণ করার ফলে চঞ্চল হয়, তখন অনলসভাবে কিঞ্চিৎ আকাঙ্ক্ষার পূরণের দ্বারা মনকে আত্মবশে আনবেন। তিনি মনের গতিকে কখনো উপেক্ষা করবেন না, জিতপ্রাণ হয়ে অর্থাৎ প্রাণায়ামের দ্বারা শ্বাসকে জয় করে এবং ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করে তিনি সাত্ত্বিকী বুদ্ধির দ্বারা মনকে আত্মবশে আনবেন। অশ্বচালক যেমন দুর্দান্ত অশ্বের অভিপ্রেত গতি লক্ষ্য করে প্রথমে তার ইচ্ছানুরূপ গতিরই অনুসরণ করে, কিন্তু তার রশ্মি ধারণ করে পরে তাকে প্রকৃত পথে নিয়ে আসে, যোগীও সেরূপ অনুবৃত্তি মার্গের দ্বারা ক্রমশ নিজের চিত্তকে বশীভূত করবেন। একেই পরমযোগ বলা যায়। যতদিন পর্যন্ত মন স্থির না হয়, ততদিন পর্যন্ত তিনি সাংখ্য (তত্ত্ববিবেক) দ্বারা অনুলোমক্রমে সকল পদার্থের উৎপত্তি (মহত্তত্ত্ব থেকে স্থূল শরীর পর্যন্ত) এবং প্রতিলোমক্রমে (পৃথিব্যাদি ক্রমে) সকল পদার্থের লয়ের কথা চিন্তা করবেন। যে ব্যক্তির মন নির্বেদযুক্ত ও সংসারে বিতৃষ্ণ তিনি গুরুর উপদিষ্ট আত্মবিষয়ক আলোচনায় প্রবৃত্ত হবেন এবং চিন্তিত বিষয়ের বারংবার চিন্তনের দ্বারা দেহাদিতে আত্মাভিমান পরিত্যাগ করবেন। যম-নিয়মাদি যোগপথের দ্বারা, তত্ত্ববিচাররূপ জ্ঞানের দ্বারা অথবা আমার অর্চনা ও ধ্যানাদির দ্বারা পরমাত্মাকে স্মরণ করবে, অন্য কোন উপায়ের দ্বারা নয়। যোগী যদি অনবধানতা হেতু কোন নিষিদ্ধ বা নিন্দনীয় কর্মের অনুষ্ঠান করেন,

তা হল যোগের দ্বারাই (জ্ঞানানুশীলন, নামকীর্তন প্রভৃতির দ্বারা) পাপকে বিনষ্ট করবেন, অন্য কোন কৃচ্ছ্রসাধনের প্রয়োজন নেই। নিজ নিজ অধিকারে যে নিষ্ঠা তাকেই গুণ বলা হয়, যেমন কর্মযোগীর কর্মে নিষ্ঠা, জ্ঞানযোগীর জ্ঞানে নিষ্ঠা ও ভক্তিযোগীর ভক্তিতে স্থিতি। আর এই গুণের ব্যতিক্রম হলেই তা দোষ বলে কথিত হয়। মানুষ যাতে বিষয়াসক্তি ত্যাগ করে, সেই জন্যেই গুণ-দোষের বিধান করা হয়েছে। কর্মসকল স্বভাবতই অশুদ্ধ, তাই এসকল কর্মের মধ্যে এটা কর্তব্য ওটা অকর্তব্য, এইরূপ বিধিনিষেধের দ্বারা কর্মের সঙ্কোচ করা হয়েছে। ১৮-২৬

আমার কথায় শ্রদ্ধাবিশিষ্ট ব্যক্তি যদি কামনাসকল দুঃখপ্রদ জেনেও পরিত্যাগ করতে না পারেন, তবে তিনি বিষয়সমূহ উপভোগ করেও এ সকল পরিণামে দুঃখ-জনক বলে নিন্দা করবেন এবং শ্রদ্ধালু হয়ে ভক্তির দ্বারা সকলই সিদ্ধ হয়, এইরূপ নিশ্চয় জ্ঞানে প্রীতির সঙ্গে আমার ভজনা করবেন। আমার কথিত ভক্তিযোগের দ্বারা যিনি আমার ভজনা করেন, তাঁর হৃদয়ে আমি অবস্থান করি, সুতরাং তাঁর হৃদয়স্থিত সকল কামনা বিনষ্ট হয়। সর্বভূতের অন্তর্যামী পরমাত্মরূপী আমার সাক্ষাৎ যিনি লাভ করেন, তাঁর হৃদয়ের গ্রন্থি ছিন্ন হয় অর্থাৎ অহঙ্কার বিনষ্ট হয়, সকল সংশয় নষ্ট হয়ে যায় এবং সকল কর্ম ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।[১] ২৭-৩০

অতএব যিনি আমাতে ভক্তিযুক্ত মদ্‌গতচিত্ত, এরূপ যোগীর পক্ষে জ্ঞান ও বৈরাগ্য প্রায়ই মঙ্গলের কারণ হয় না। যা কর্ম ও তপস্যার দ্বারা, জ্ঞান ও বৈরাগ্যের দ্বারা, যোগ ও দানধর্মের দ্বারা এবং তীর্থযাত্রা, ব্রতাদি মঙ্গল অনুষ্ঠানের দ্বারা লাভ করা যায়, আমার ভক্ত একমাত্র ভক্তিযোগ আশ্রয় করেই অনায়াসে তা প্রাপ্ত হয়ে থাকেন। কখনো যদি তিনি স্বর্গ, মোক্ষ বা বৈকুণ্ঠের বাসনা করেন, তা হলে সেই বাঞ্ছিত বস্তুও অনায়াসে লাভ করে থাকেন। যে ভক্ত আমাতে প্রীতিযুক্ত, সাধু ও ধীর, তিনি আমার প্রদত্ত আত্যন্তিক মোক্ষেরও কামনা করেন না। কিছুর অপেক্ষা না রেখে সকল বাসনা ত্যাগ করাই মহৎ উৎকৃষ্ট ফল ও তৎসাধন বলে মনীষিগণ বলে থাকেন। অতএব যিনি প্রার্থনাশূন্য ও •নিরপেক্ষ, আমার প্রতি তাঁরই ভক্তি জন্মে। যিনি প্রকৃতিরও অতীত, সেই ঈশ্বরকে যাঁরা লাভ করেছেন, যাঁরা আমাতে একান্ত ভক্তিযুক্ত, সমচিত্ত ও সাধু, তাঁদের বিহিত কর্মের অনুষ্ঠানেও পুণ্য হয় না, নিষিদ্ধ কর্মের আচরণেও পাপ হয় না অর্থাৎ তাঁরা বিধি-নিষেধের অতীত হয়ে যান। যাঁরা আমার উপদিষ্ট এই সকল কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ বা ভক্তিযোগের অনুষ্ঠান করেন, তাঁরা আমার সেই লোক প্রাপ্ত হন যেখানে কাল, মায়া প্রভৃতির সম্পর্ক নেই, আবার পরব্রহ্মকেও তাঁরা জানতে পারেন। ৩১-৩৭

একবিংশ অধ্যায়

দেশ, কাল, দ্রব্যের দোষগুণ বিচার

ভগবান বললেন, যাঁরা আমাকে প্রাপ্ত হবার উপায়স্বরূপ ভক্তিযোগ, জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগের পথ পরিত্যাগ করে চঞ্চল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তুচ্ছ কামনাসমূহের সেবা

১ ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে।। মুণ্ডক. ২।২।৯

-করে, তারা এই সংসারে নানা যোনি পরিভ্রমণ করে থাকে। নিজ নিজ অধিকারে নিষ্ঠাকেই গুণ বলা হয়, আর পরের অধিকারে স্থিতিই হচ্ছে দোষ ; এই হল গুণ দোষের স্বরূপ নির্ণয়। উদ্ধব, এই দ্রব্য আমার পক্ষে যোগ্য অথবা অযোগ্য, এইরূপ সংশয়ের দ্বারা কোনো দ্রব্য সম্পর্কে মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তির প্রতিবন্ধের (সঙ্কোচের) জন্য সমজাতীয় দ্রব্যসমূহের ভেতরেও ধর্মের নিমিত্ত শুদ্ধি ও অশুদ্ধি, ব্যবহারের নিমিত্ত গুণ ও দোষ এবং প্রাণরক্ষার নিমিত্ত শুভ ও অশুভ—এইরূপ বিষয় নিয়ে শাস্ত্রে বিচার করা হয়েছে। ধর্মরূপ ভার বহনকারী লোকদের মঙ্গলের জন্যে মনু প্রভৃতি রূপে এই আচার আমি প্রদর্শন করেছি। পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ—এই পঞ্চ মহাভূত ব্রহ্মা থেকে স্থাবর পর্যন্ত প্রাণীরই দেহের উৎপত্তির হেতুরূপ বলা হয়েছে। আবার এরা সকলেই আত্মবস্তুর সঙ্গে সম্বন্ধ-বিশিষ্ট। ১-৫

এই সকল প্রাণী পঞ্চভূতে গঠিত, তথাপি তাদের পুরুষার্থসিদ্ধির[১] জন্য একবিধ দেহসমূহেও বেদ কর্তৃক বিভিন্ন নাম (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি) ও বিভিন্ন রূপ (দেব, মনুষ্য, পুষ্প প্রভৃতি) কল্পিত হয়েছে। হে সাধুশ্রেষ্ঠ, জীবের কর্মসকল সংকুচিত করার জন্যই আমি দেশ, কাল প্রভৃতি পদার্থের এবং ধান্যাদি বস্তুসকলের গুণ ও দোষের বিধান করি। তাই দেশভেদে বা কালভেদে কোনো বস্তুর ব্যবহার ফলদায়ক বা অনিষ্টকারক হয়ে থাকে। দেশসমূহের মধ্যে কৃষ্ণসার-বিহীন ও ব্রাহ্মণভক্তিশূন্য দেশ অশুচি বলে পরিগণিত হয়। আবার কৃষ্ণসার-মৃগ বিচরণ করলেও সৎপাত্রবিহীন দেশ, কীকট দেশ, মার্জনাদি শূন্য, ম্লেচ্ছ-বহুল দেশ ও মরুদেশ প্রভৃতি অনুর্বর দেশও অশুচি বলে গণ্য। আবার কালের মধ্যেও শুদ্ধ ও অশুদ্ধ রয়েছে। যে কালে দ্রব্য লাভ হয়, তা সেই কর্মের পক্ষে গুণযুক্ত। স্বভাবত পূর্বাহ্নাদি কালও কর্মযোগ্য। আবার যে কালে দ্রব্যের অলাভ ঘটে বা রাষ্ট্র-বিপ্লবাদির জন্যে কর্ম অসমাপ্ত থাকে অথবা যে কাল কর্মের অযোগ্য বলে কথিত হয়, সেই কাল অশুদ্ধ বলে জানবে। দ্রব্যের শুদ্ধি বা অশুদ্ধির বিচার হয় দ্রব্যের দ্বারা, বচনের দ্বারা, সংস্কারের দ্বারা, কালের দ্বারা এবং দ্রব্যের অল্পত্ব বা মহত্ত্ব এই পরিমাণ-ভেদের দ্বারা, যেমন জলের দ্বারা বস্ত্রাদি দ্রব্যের শুদ্ধি ও মূত্রাদির দ্বারা অশুদ্ধি ঘটে। আবার যেখানে এই দ্রব্য শুদ্ধ কি অশুদ্ধ, এইরূপ সংশয় জন্মে, সেখানে ব্রাহ্মণের বচনের দ্বারা শুদ্ধি বা অশুদ্ধি নিরূপিত হয় ইত্যাদি। দ্রব্যের অশুদ্ধির দ্বারা দেশ ও অবস্থা অনুসারে পাপ উৎপন্ন হয়। শক্তি বা অশক্তি অনুসারে, বুদ্ধি বা জ্ঞান অনুসারে এবং সমৃদ্ধি বা দারিদ্র্য অনুসারে শুদ্ধি বা অশুদ্ধির বিচার হয়ে থাকে। যেমন সমর্থ ব্যক্তির পক্ষে যা অশুদ্ধ, অসমর্থ ব্যক্তির পক্ষে তা শুদ্ধ। ধান্য, দারুময় দ্রব্য, গজদন্তাদি অস্থি, তন্তু, তৈল-ঘৃতাদি রস, তৈজস বস্তু, চর্ম এবং পার্থিব ঘটাদি পদার্থসমূহকে কাল, বায়ু, অগ্নি, মৃত্তিকা ও জল একত্রে মিলিত অবস্থায় বা পৃথকভাবে শোধিত করে থাকে। অপবিত্র বস্তুর দ্বারা লিপ্ত কোনো বস্তু যে পরিমাণ ক্ষার, অম্ল ও জলের সংযোগে গন্ধলেপ বর্জিত হয়ে স্বীয় স্বরূপ প্রাপ্ত হয়, সেই বস্তুর সেই পরিমাণ শোধন (শৌচ) করাই কর্তব্য। ৬-১৩

স্নান, দান, তপস্যা, অবস্থা, বীর্য, উপনয়নাদি সংস্কার ও উপাসনাদি কর্মের দ্বারা এবং আমার স্মরণ দ্বারা আত্মার শুদ্ধি হয়। দ্বিজ এরূপে শুদ্ধ হয়ে সকল কর্মের আচরণ করবেন। সদ্‌গুরুর মুখ থেকে মন্ত্রণার্থের পরিজ্ঞানই

১ ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চারিটি হচ্ছে পুরুষার্থ।

মন্ত্রশুদ্ধি, আমাতে সকল কর্মের অর্পণ কর্মশুদ্ধি। দেশ, কাল, দ্রব্য, কর্তা, মন্ত্র ও কর্ম, এই শুদ্ধির দ্বারাই ধর্ম সম্পাদিত হয় আর এগুলি অশুদ্ধ হলেই অধর্ম হয়। গুণও কোথাও কোথাও দোষ হয়, আবার বিধিবলে দোষও কখনো কখনো গুণ হয়ে থাকে। যেমন বিধি হল, সংসারী ব্যক্তির পক্ষে পরিবার-পরিজন ত্যাগে দোষ ঘটে, কিন্তু অন্তরে বৈরাগ্যের উদয় হলে এই সংসার-ত্যাগই গুণ হয়ে দাঁড়ায়। এক বিষয়েই গুণ-দোষের এরূপ নিয়ম গুণ-দোষের পার্থক্যকেই বাধা দেয়। শাস্ত্রে অধিকার অনুসারে কর্মের অনুষ্ঠান বিহিত হয়েছে, এই শাস্ত্র-নির্দিষ্ট কর্মের অনুষ্ঠানে পতিত ব্যক্তিদের পাতক হয় না, এ ক্ষেত্রে তাদের প্রবৃত্তি বা স্বাভাবিক আসক্তিই গুণরূপে পরিগণিত হয়। যে ব্যক্তি ভূমিতে শয়ান, তার আর অধঃপতনের সম্ভাবনা কোথায়? মানুষ যে যে বিষয় থেকে নিবৃত্ত হবে, সেই সেই বিষয়ের বন্ধন থেকে মুক্তিলাভ করবে। এই নিবৃত্তি-লক্ষণ ধর্মই মানুষের শোক, মোহ ও ভয় নাশ করে এবং পরম কল্যাণের হেতু হয়। বিষয়সমূহ থেকে সুখের উৎপত্তি হয়, এইরূপ আলোচনায় ফলে বিষয়ে আসক্তি জন্মে, আসক্তি থেকে কামনার উদয় হয়, আর কামনা থেকেই কলহের উৎপত্তি হয়। কলহ থেকে দুঃসহ ক্রোধ জন্মে, সম্মোহ সেই ক্রোধের অনুগামী হয়। সেই মোহ বা অবিবেকই পুরুষের সর্বব্যাপিনী চেতনাকে (কার্যাকার্য বোধকে) গ্রাস করে থাকে। বিবেকের অভাবে জীব অসত্তুল্য অর্থাৎ অস্তিত্ববিহীন হয়। তারপর চেতনারহিত ও মৃততুল্য সেই ব্যক্তি পুরুষার্থ থেকে ভ্রষ্ট হয়। চেতনাশূন্য ব্যক্তি বিষয়সমূহে আসক্তির জন্য আপনাকে ও পরমাত্মাকে জানতে পারে না, সে বৃক্ষের ন্যায় বৃথা বেঁচে থাকে এবং কামারের হাপরের মত বৃথা শ্বাস-প্রশ্বাস পরিত্যাগ করে। সুতরাং তাকে মৃততুল্য ছাড়া আর কি বলা যায়? ১৪-২২

বেদে যে কর্মজন্য মানুষের স্বর্গাদি ফলশ্রুতি আছে, তার দ্বারা মানুষ পরম পুরুষার্থ লাভ করতে পারে না। এর উদ্দেশ্য বৈধ কর্মের মধ্য দিয়ে জীবকে মোক্ষরূপ পরম মঙ্গলের দিকে চালিত করা, যেমন পিতা ঔষধ সেবনে পুত্রের রুচি জন্মাবার জন্যে লাড়ু প্রভৃতি প্রদানের আশ্বাস দেন। বৈধ কর্মের অনুষ্ঠানে মানুষ যখন শুদ্ধচিত্ত হয়, তখনই সে জ্ঞান ও ভক্তি লাভের ফলে মুক্তির অধিকারী হয়। মানুষ জন্মগ্রহণ করেই স্বভাবের বশে অনর্থকর স্বর্গাদি কাম্য বিষয়ের প্রতি, নিজের প্রাণের প্রতি ও স্বজনগণের প্রতি আসক্ত হয়ে থাকে; ফলে সে পরম সুখে বঞ্চিত। যারা বেদবাক্যে দৃঢ় বিশ্বাসবশত কামমার্গে ভ্রমণ করতে করতে কখনো দেব-মনুষ্যাদি উচ্চ যোনি আবার কখনো বৃক্ষাদি নীচ যোনি প্রাপ্ত হয়, সর্বজ্ঞ বেদ স্বয়ং কি প্রকারে তাঁদের পুনরায় কাম্য বিষয়ে প্রবৃত্তি দান করবেন? কুবুদ্ধি কর্ম-মীমাংসকেরা বেদশাস্ত্রের অভিপ্রায় জানতে না পেরে আপাতরমণীয় শ্রুতি বাক্যকেই পরম ফল বলে থাকেন। তাই এঁরা স্বর্গাদি ফলশ্রুতির বিধান করেন; ব্যাস প্রভৃতি প্রকৃত বেদজ্ঞরা তা করেন না। কামী, কৃপণ ও লুব্ধ মীমাংসকগণ পুষ্পকেই ফল বলে জ্ঞান করে, অগ্নিসাধ্য যজ্ঞাদি কাম্য কর্মে অভিনিবেশের জন্যে তারা বিবেকশূন্য ও পরিণামে ধূম-মার্গাবলম্বী হয় (যে মার্গে গমন করলে পুনঃপুনঃ জন্মমৃত্যুর ক্লেশভোগ করতে হয় সেই মার্গ অবলম্বন করে), তাই তারা নিজ লোক বা আত্মতত্ত্ব অবগত হতে পারে না। উদ্ধব, কুয়াশায় যার চোখ আবৃত এরূপ ব্যক্তি যেমন সামনের বস্তুকেও দেখতে পায় না, সেইরূপ যজ্ঞাদি কর্মই যাদের পশুহিংসা সাধনের উপায়, প্রাণের তৃপ্তিবিধানেই যারা রত, তারা এই দৃশ্যমান জগতের হেতু ও স্বরূপভূত হৃদিস্থিত অন্তর্যামী আমাকে জানতে পারে না।

শাস্ত্রে হিংসায় বিধান নেই, কিন্তু যদি কারো মাংস ভোজনের জন্যে হিংসায় প্রবৃত্তি জন্মে, তা হলে শুধু যজ্ঞেই হিংসা করবে, অধিকারিভেদে বেদের বিধান কিন্তু বিধি নয় ; এই বিধানের দ্বারা মানুষের হিংসাপ্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রিত করা হয় মাত্র। কিন্তু বিষয়াসক্ত খল ব্যক্তিগণ আমার এই অস্ফুট মতের তাৎপর্য না জেনে নিহত পশু-মাংস দ্বারা নিজ সুখেচ্ছায় দেবগণ, পিতৃগণ ও ভূতগণের আরাধনা করে থাকে। তারা স্বপ্নতুল্য, নশ্বর, শ্রুতিমধুর পরলোককে এবং ইহলোকে রাজ্যাদিকে সুখপ্রদ বলে কল্পনা করে, তাই সমুদ্র লংঘনের দ্বারা বহুধনলাভেচ্ছু বণিক যেমন পূর্বসঞ্চিত অর্থ ব্যয় করে সর্বস্বান্ত হয়, তেমনি যজ্ঞাদিতে অর্থব্যয় করে তারাও সর্বস্বান্ত হয়। ২৩-৩১

অতএব সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণ সম্পন্ন সেই ব্যক্তিগণ গুণসেবী ইন্দ্রাদি দেবগণের যেরূপ উপাসনা করে, আমার সেরূপ আরাধনা করে না। কারণ ইন্দ্রাদি দেবতা আমার অংশ হলেও তাদের (উপাসকদের) ভেতর ভেদজ্ঞান থাকায় ওই সকল দেবতার আরাধনায় আমার (ভগবানের) যথার্থ পূজা হয় না। তারা মনে করে— আমরা ইহলোকে যজ্ঞের দ্বারা দেবতাগণের আরাধনা করব, ফলে আমরা স্বর্গলোকে গিয়ে তথায় দেবতাদের ন্যায় বিহার করব, আবার পুণ্যের ক্ষয় হলে পুনরায় পৃথিবীতে মহাকুলে মহাগৃহস্থ হয়ে জন্মগ্রহণ করব, এই প্রকার রমণীয় বেদবাক্যে যাদের চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়, সেই অভিমানী অতিলুব্ধ ব্যক্তিদের আমার কথায় রুচি জন্মে না। কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তি—এই ত্রিকাণ্ডময় বেদ কিন্তু আত্মার ব্রহ্মত্বই প্রতিপাদন করেছেন। অবশ্য, মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণ তা স্পষ্ট বলেন নি ; তাঁরা বলেছেন, যে পরব্রহ্ম বেদের বিষয় তা পরোক্ষ (প্রত্যক্ষ প্রমাণের অতীত), আর এই পরোক্ষই আমার (শ্রীভগবানের) প্রিয়।[১] বিশুদ্ধাত্মা ব্যক্তিগণই এই পরোক্ষবাদ হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। শব্দব্রহ্ম বা বেদ স্বরূপত নিতান্ত দুর্বোধ্য, এ প্রাণময়, মনোময় ও ইন্দ্রিয়ময় (পরা, পশ্যন্তী ও মধ্যমা বাক্‌রূপে), এ সমুদ্রের মতোই অনন্তপার, গম্ভীর ও দুর্বিগ্রাহ্য (দুরবগাহ)। সেই শব্দব্রহ্ম অপরিচ্ছিন্ন, অনন্তশক্তি, সর্বব্যাপী ব্রহ্মস্বরূপ। আমাতে অধিষ্ঠিত হয়ে সেই শব্দব্রহ্ম মৃণালদণ্ডে তন্তুর মতো প্রাণি-গণের মধ্যে সূক্ষ্ম নাদরূপে অনুভূত হয়ে থাকে। যেমন ঊর্ণনাভ (মাকড়সা) হৃদয় থেকে মুখের দ্বারা ঊর্ণা বমন করে (তন্তুর বিস্তার ও সঙ্কোচ সাধন করে), তেমনি সূক্ষ্মনাদরূপে বেদমূর্তি অমৃতময়, প্রাণোপাধিযুক্ত, হিরণ্যগর্ভরূপী ভগবান মনের দ্বারা সমস্ত স্পর্শাদি বর্ণের সংকল্প করেন এবং হৃদয়াকাশে স্থিত ওঙ্কার থেকে অনন্ত অপার বেদাত্মক বাক্যের সৃষ্টি ও সংহার করেন। এই বেদাত্মক বাক্যকে বৃহতী বলা হয়। ইহার পথ বহু। ইহা উরঃ (কণ্ঠাদি) সংযোগে প্রকাশিত স্পর্শবর্ণ, অকারাদি স্বরবর্ণ, উষ্মবর্ণ (শ, ষ, স ও হ) ও অন্তঃস্থ বর্ণের (য, র, ল, ব) দ্বারা বিভূষিতা, বিচিত্র ভাষার দ্বারা বিস্তৃতা, উত্তরোত্তর চতুরক্ষরাধিক ছন্দঃসমূহের দ্বারা উপলক্ষিতা। ভগবান এই অনন্ত ও অপার বেদরাশি স্বরূপ বৃহতীর সৃষ্টি ও সংহার করেন। চতুর্বিংশতি অক্ষরাত্মক গায়ত্রী এবং উত্তরোত্তর চতুরক্ষরাধিক উষ্ণিক, অনুষ্টুপ, বৃহতী, পঙ্‌ক্তি, ত্রিষ্টুপ, জগতী, অতিচ্ছন্দ, অত্যষ্টি, অতিজগতী ও অতিবিরাট, এই সকল ছন্দ বেদরাশির অন্তর্গত।[২] বেদবাক্য-সমূহের যথার্থ তাৎপর্য আমি ভিন্ন আর কেউ জানে না। কর্মকাণ্ডে বিধিবাক্যে কি বিহিত হয়েছে, দেবতাকাণ্ডে মন্ত্রবাক্যে কি প্রকাশিত হয়েছে আর জ্ঞানকাণ্ডেই বা

১ পরোক্ষপ্রিয়া ইব হি দেবাঃ। ঐতরেয় উপ, ১।৩।১৪

২ উষ্ণিক ছন্দ আটাশটি অক্ষরবিশিষ্ট, অনুষ্টুপ ছন্দ বত্রিশটি অক্ষরবিশিষ্ট, বৃহতী ছন্দ ছত্রিশটি অক্ষরবিশিষ্ট, এই ভাবে সর্বত্র অক্ষরের গণনা করতে হবে।

নিষেধার্থ কাকে আশ্রয় করে তর্কবিতর্ক করা হয়েছে, এ সকলের তাৎপর্য একমাত্র আমিই জানি। বেদ কর্মকাণ্ডে যজ্ঞরূপে আমাকেই বিধান করেন, দেবতারূপে আমাকেই প্রতিপন্ন করেন, আবার বেদের জ্ঞানকাণ্ডে আমার বিরুদ্ধে প্রতিবাদীর তর্ককে খণ্ডন করা হয়েছে। যে সকল আকাশাদি পদার্থকে জ্ঞানকাণ্ডে নিরস্ত করা হয়েছে, তারাও কিন্তু আমারই স্বরূপভূত। ইহাই সকল বেদের অভিপ্রায়। বেদ প্রতিপন্ন করেছেন—পরমাত্মস্বরূপ আমিই আশ্রয়ণীয়; ভেদসকল মায়ামাত্র। এই ভেদকে প্রকৃতির কার্য বলে পরিত্যাগ করতে হবে[১]—এইরূপে নিষেধ করে বেদসকল নিবৃত্ত হয়েছেন। ৩২-৪৩

দ্বাবিংশ অধ্যায়

বিভিন্ন তত্ত্বের বিরোধ-মীমাংসা

উদ্ধব বললেন, বিশ্বেশ্বর, ঋষিগণ কত প্রকার তত্ত্বসংখ্যার নির্ণয় করেছেন, তা আপনি আমার নিকট বিবৃত করুন। আমি শুনেছি, আপনি আটাশটি তত্ত্বের কথা বলেছেন। কেহ ছাব্বিশ, কেহ পঁচিশ, কেহ সাত, কেহ নয়, কেহ ছয়, কেহ চার, কেহ এগার, কেহ সতের, কেহ ষোল, আবার কেহ বা তেরটি তত্ত্বের বর্ণনা করেছেন। ঋষিগণ তত্ত্বসমূহের এরূপ পৃথক সংখ্যার কথা বলেছেন কেন? এ বিষয়ে তাঁদের অভিপ্রায় কি? একথা আমাদের বিশদভাবে বুঝিয়ে দেওয়া আপনার উচিত। ১-৩

ভগবান বললেন, ব্রাহ্মণেরা যা যা বলেছেন, তা অযৌক্তিক নয়, কারণ সকল তত্ত্বই সকল তত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত। তাঁরা সকলে আমার মায়াকে স্বীকার করেই তত্ত্বসংখ্যার উল্লেখ করেছেন, সুতরাং তাদের পক্ষে অসম্ভব বা অযৌক্তিক কি আছে? 'তুমি যেরূপ বললে উহা এরূপ নয়, আমি যেরূপ বলছি উহা এইরূপই বটে'—এরকম যাঁরা বিবাদে লিপ্ত হন, আমার দুরতিক্রমণীয়া শক্তিই তাদের বিবাদের হেতু। আমার এই সত্ত্বাদি শক্তির ক্ষোভবশত বাদীদের বিবাদের কারণ নানা মতের উৎপত্তি হয়েছে। শম-দম লাভ হলেই তাঁদের বিকল্প অর্থাৎ মতভেদ লয়প্রাপ্ত হয়, আর মতভেদ লোপ পেলে বিবাদেরও নিষ্পত্তি হয়ে থাকে। পরস্পরের মতের মধ্যে অপর মতগুলি অনুপ্রবিষ্ট, তাই বক্তার অভিপ্রায় অনুসারে তত্ত্বসকলকে কার্য ও কারণরূপে ন্যূনাধিক-ভাবে গণনা করা হয়ে থাকে। পূর্ববর্তী কারণতত্ত্বে পরবর্তী কার্যতত্ত্বসমূহকে সূক্ষ্মরূপে প্রবিষ্ট হতে দেখা যায়, আবার পরবর্তী কার্যতত্ত্বসমূহেও কারণতত্ত্বগুলি অনুগতরূপে প্রবিষ্ট।[২] অতএব এই তত্ত্বের কার্য-কারণভাব ও ন্যূনাধিক্য গণনায় যে সব বাদী অভিলাষী, তাঁদের মধ্যে যিনি যে অভিপ্রায়ে যে বাক্য বলেন, যথাসম্ভব যুক্তি থাকায় আমরা সে সকল নিশ্চিতরূপে গ্রহণ করে থাকি। ৪-৯

অনাদি অবিদ্যাযুক্ত পুরুষের আপনা থেকে আত্মজ্ঞান অসম্ভব, তত্ত্বজ্ঞ অপর একজনই তাঁকে আত্মজ্ঞান দান করেন। তিনিই পরমেশ্বর। জীব ও ঈশ্বরের অণুমাত্রও ভেদ নেই, কারণ উভয়েই চিৎ-রূপ।[৩] অতএব তাদের অত্যন্ত ভেদকল্পনা

১ তুলনীয়: কঠ উপনিষৎ, ২।১।১০
২ যেমন মৃত্তিকামধ্যে ঘট সূক্ষ্মরূপে প্রবিষ্ট আর ঘটমধ্যে মৃত্তিকা অনুগতরূপে প্রবিষ্ট।
৩ স যশ্চায়ং পুরুষে যশ্চাসাবাদিত্যে স একঃ॥ তৈত্তিরীয় ২।৮।৬

অর্থহীন। এই মতে জ্ঞানও প্রকৃতিরই গুণ। গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থাই প্রকৃতি। প্রকৃতির এই গুণত্রয় সত্ত্ব, রজ ও তম যথাক্রমে স্থিতি, সৃষ্টি ও লয়ের কারণ। এই গুণত্রয় প্রকৃতির, আত্মার নয়।[১] ইহসংসারে জ্ঞান সত্ত্বগুণের, কর্ম রজোগুণের এবং অজ্ঞান তমোগুণের বৃত্তি বলে কথিত। যা থেকে গুণগণের ক্ষোভ হয় সেই ঈশ্বরই কাল নামে আর সূক্ষ্ম মহত্তত্ত্বই স্বভাব নামে অভিহিত হয়; পুরুষ, প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও পৃথিবী, এই নয়টি তত্ত্বের কথা আমি পূর্বেই বলেছি। কর্ণ, ত্বক, চক্ষু, নাসিকা ও রসনা, এই পাঁচটি হচ্ছে জ্ঞানেন্দ্রিয়, বাক্, হস্ত, উপস্থ, পায়ু ও পদ এই পাঁচটি হচ্ছে কর্মেন্দ্রিয়, আর মন হচ্ছে উভয়াত্মক; এই এগারটি তত্ত্ব। শব্দ, স্পর্শ, রস, গন্ধ ও রূপ, এই পাঁচটি হচ্ছে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয়, আর গতি, উক্তি, উৎসর্গ অর্থাৎ মল ও মূত্রত্যাগ এবং (হস্তের) শিল্প হচ্ছে পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়ের ফল। এই বিশ্বের সৃষ্টির প্রারম্ভের সময় প্রকৃতি কার্য-কারণরূপিণী হয়ে গুণগণের দ্বারা বিশেষ বিশেষ অবস্থা ধারণ করেন। পুরুষ কিন্তু অপরিণামী দ্রষ্টা, তিনি শুধু সাক্ষিরূপে উহা দর্শন করেন।[২] প্রকৃতিদ্রষ্টা পুরুষের দৃষ্টিবশে লব্ধবীর্য ও মিলিত হবার পর পুরুষ প্রকৃতিকে আশ্রয় করে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করে। ১০-১৮

যাঁরা সপ্ত-তত্ত্ববাদী তাঁরা বলেন—আকাশাদি পঞ্চমহাভূত, জীব এবং এই উভয়ের আশ্রয় পরমাত্মা, এই সাতটিই হচ্ছে তত্ত্ব। দেহ, ইন্দ্রিয় ও প্রাণ—এই সকল এই সাতটি তত্ত্ব থেকেই সম্ভূত। ষড়্বিধ তত্ত্ব মতে পাঁচটি মহাভূত আর পুরুষ হচ্ছে ষষ্ঠস্থানীয়। সেই পরমাত্মা বা ঈশ্বর নিজ থেকে উদ্ভূত পাঁচটি মহাভূতের সঙ্গে যুক্ত হন এবং জগৎ সৃষ্টি করে স্বয়ং সৃষ্ট পদার্থে প্রবিষ্ট হন।[৩] যাঁরা বলেন, তত্ত্ব হচ্ছে চারটি, তাঁদের মতে মাটি, জল, তেজ ও আত্মা এই চতুর্বিধ তত্ত্ব, আর এই চারিটি তত্ত্ব থেকেই অন্যান্য সকল তত্ত্বের উৎপত্তি হয়, এইজন্যে এসকল এদেরই অন্তর্ভূত। যাঁরা বলেন, তত্ত্ব হচ্ছে সতেরটি, তাঁদের মতে পঞ্চ মহাভূত, পঞ্চ তন্মাত্র, বাক্ প্রভৃতি, পঞ্চ ইন্দ্রিয় এবং মন ও আত্মা—এই সতেরটি হচ্ছে তত্ত্ব। যাঁরা বলেন, তত্ত্ব হচ্ছে ষোলটি, তাঁদের মতে মন ও আত্মা ভিন্ন নয়। যাঁদের মতে তত্ত্ব তেরটি, তাঁরা পঞ্চ মহাভূত, পঞ্চ ইন্দ্রিয়, মন, জীবাত্মা ও পরমাত্মা এইরূপে তত্ত্বের গণনা করে থাকেন। যাঁরা বলেন, তত্ত্ব হচ্ছে এগারটি, তাঁরা পঞ্চ মহাভূত, পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও আত্মা এইরূপে তত্ত্বের গণনা করেন। আর যাঁদের মতে তত্ত্ব নয়টি, তাঁরা অষ্ট প্রকৃতি (প্রকৃতি মহৎ অহংকার ও পঞ্চ মহাভূত) এবং পুরুষ, এই ভাবে তত্ত্বের গণনা করে থাকেন। ঋষিরা এইরূপ নানাভাবে তত্ত্বসমূহের সংখ্যা নির্দেশ করেছেন। যুক্তিযুক্ত বলে এই সকল মতই ন্যায্য ও গ্রাহ্য, বিদ্বানগণের কোন উক্তিই অশোভন নয়। ১৯-২৫

উদ্ধব বললেন, প্রকৃতি ও পুরুষ যদিও স্বভাবত বিলক্ষণ (ভিন্ন), তথাপি উভয়ের পরস্পর মিলিত ভাবেরই প্রতীতি হয়, উভয়ের ভেদ-দৃষ্টি হয় না কেন? প্রকৃতির কার্য দেহেতে যেমন আত্মা লক্ষিত হয়, তেমনি আত্মাতেও (পুরুষে) প্রকৃতি লক্ষিত হয়। হে সর্বজ্ঞ, যুক্তিযুক্ত বাক্যের দ্বারা আমার হৃদয়ের এই প্রবল সংশয় ছেদন করা আপনার উচিত। যেহেতু, আপনার অনুগ্রহেই জীবগণের জ্ঞানলাভ হয়, আবার আপনার মহাশক্তির প্রভাবেই জীবগণের জ্ঞাননাশ হয়ে

---

১ তুলনীয়: সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ।
নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্॥ গীতা, ১৪।৫

২ তুলনীয়: মুণ্ডক উপনিষৎ, ৩।১।১ ৩ তুলনীয়: তৈত্তিরীয় উপ ২।৭।১

থাকে। আপনার মায়াশক্তির স্বরূপ আপনিই জানেন, আর কেউ তা জানে না। ২৬-২৮

শ্রীভগবান বললেন, পুরুষশ্রেষ্ঠ উদ্ধব, প্রকৃতি ও পুরুষের মধ্যে অত্যন্ত ভেদ রয়েছে। এই দেহাদির সৃষ্টি গুণক্ষোভ-জনিত, সুতরাং উহা বিকারযুক্ত। আমার গুণময়ী মায়া সত্ত্বাদি গুণসমূহের দ্বারা বিবিধ ভেদ ও ভেদবুদ্ধি জন্মায়। এই ভেদ বিবিধ বিকারযুক্ত হলেও মূলত তিন প্রকার—অধ্যাত্ম, অধিভূত ও অধিদৈব। দেহে বিদ্যমান চক্ষু অধ্যাত্ম, ভূতগণে স্থিত দৃশ্য রূপাদি অধিভূত এবং চক্ষুগোলকের অন্তর্গত সূর্যের তৈজসাংশ অধিদৈব; এই তিনটি একে অন্যের সাহায্যে প্রকাশিত থাকে। আত্মা কিন্তু হৃদয়াকাশে স্বতঃপ্রকাশমান। আকাশস্থ সূর্যদেব যেমন স্বতঃসিদ্ধ ও স্বপ্রকাশ পদার্থ, নিজকে এবং অপর বস্তুকে প্রকাশ করতে উহা অন্যের অপেক্ষা রাখে না, তেমনি একরূপ ও অভিন্ন আত্মাই অধ্যাত্মাদি পদার্থের আদি কারণ। স্বতঃপ্রকাশমান এই আত্মাই চক্ষু প্রভৃতি থেকে পৃথক হয়েও নিখিল প্রকাশক বস্তুকেও প্রকাশ করে থাকে।[1] চক্ষুর ন্যায় ত্বক্ অধ্যাত্ম, স্পর্শ অধিভূত ও বায়ু অধিদৈব; কর্ণ অধ্যাত্ম, শব্দ অধিভূত ও দিক্‌সমূহ অধিদৈব; জিহ্বা অধাত্ম, রস অধিভূত ও বরুণ অধিদৈব; নাসা অধ্যাত্ম, গন্ধ অধিভূত ও অশ্বিনীকুমারদ্বয় অধিদৈব; চিত্ত অধ্যাত্ম, চেতয়িতব্য (জ্ঞানবিষয়) অধিভূত ও বাসুদেব অধিদৈব; মন অধ্যাত্ম, মন্তব্য অধিভূত ও চন্দ্র অধিদৈব; বুদ্ধি অধ্যাত্ম, বোদ্ধব্য অধিভূত, ব্রহ্মা অধিদৈব; অহংকার অধ্যাত্ম, অহংকর্তব্য অধিভূত ও রুদ্র অধিদৈব। গুণক্ষোভকারী কালকে (পরমেশ্বরকে) নিমিত্ত করে প্রকৃতিমূলক মহত্তত্ত্ব থেকে বিকারাত্মক অহংকার প্রসূত হয়েছে। উহা ত্রিবিধ—বৈকারিক, তামস ও ঐন্দ্রিয়। উহাই ভ্রান্তিরূপ বিকারের হেতু। প্রকৃতি ও পুরুষের কোন ভেদ নেই—এই প্রকার ভ্রান্তি অহংকার থেকেই উৎপন্ন হয়। আত্মা অখণ্ড জ্ঞানস্বরূপ। আত্মার সম্পর্কে ভেদ আছে কি নেই এরূপ বিবাদের মূলে রয়েছে অজ্ঞান। সুতরাং এরূপ বিবাদ অর্থহীন। কিন্তু আমা থেকে যাদের মন বহির্মুখ, তাদের কোন কালেই এরূপ বিবাদের নিবৃত্তি হয় না। আমি যাঁদের একমাত্র গতি, সেই ভক্তগণেরই এরূপ বিবাদের নিবৃত্তি হয়ে থাকে। ২৯-৩৪

উদ্ধব বললেন, প্রভু, যাদের মন আপনা থেকে দূরে সরে আছে তারা নিজ নিজ কর্মানুসারে যেরূপে উচ্চ-নীচ নানা দেহ ধারণ ও ত্যাগ করে, সেই তত্ত্বের কথা আপনি বলুন। অল্পবুদ্ধি মানুষের তা দুরধিগম্য। কারণ, প্রায় সকলেই আপনার মায়ায় মোহিত, সুতরাং এই তত্ত্ব বিদিত আছেন, এরূপ বিদ্বান ব্যক্তি দুর্লভ। ৩৫

ভগবান বললেন, মানুষের কর্মময় মনই পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে লোক থেকে লোকান্তরে যায়। আত্মা অহংকারের দ্বারা সেই মনেরই অনুবর্তন করে থাকে। কর্মাধীন মন প্রত্যক্ষ ও শ্রুত বিষয়ের চিন্তা করতে করতে সেই চিন্তিত বিষয়-সমূহের মধ্যে আবির্ভূত হয়, তারপর পূর্বোক্ত বিষয়সমূহ থেকে বিচ্যুত হয়। অবশেষে বিষয়ের স্মৃতিও নষ্ট হয়।[2] মানুষ কর্মফলের অনুরূপ বর্তমান দেহের পর অন্য দেহ লাভ করে। সেই দেহের সুখ বা দুঃখের প্রতি অত্যন্ত অভিনিবেশ বশত তার পূর্বদেহের বিস্মৃতি ঘটে। এই অত্যন্ত বিস্মরণই মৃত্যু।[3]

১ তুলনীয়: কঠ উপনিষদ, ২।২।১১ শ্লোক। ২ একজন্মেই যদি বিষয়ের স্মৃতি লুপ্ত হতে পারে, তবে জন্মান্তরের স্মৃতি যে লুপ্ত হবে, এ আর আশ্চর্যের বিষয় কি? ৩ অর্থাৎ মানুষের 'মহতী বিনষ্টি' ঘটে (দ্রষ্টব্য, কেন উপঃ ২।৫):।

স্বপ্ন ও মনোরথ যেমন অভিমানমাত্র, তেমনই দেহে যে অহংবোধ বা আত্মাভিমান, একেই জীবের জন্ম বলে। অর্থাৎ, উৎপত্তি-বিনাশশীল দেহে অবিনাশী আত্মারূপে যে অভিমান, তাই জন্ম। জীব বর্তমান দেহে প্রাক্তন স্থূলদেহের স্মরণ করে না; আবার বর্তমান স্বপ্ন ও মনোরথকেও পূর্বসিদ্ধ বলে স্মরণ করে না। বর্তমান স্বপ্নাদিতে জীব পূর্বসিদ্ধ আত্মাকে যেন সদ্যোজাত বলে অনুভব করে। ইন্দ্রিয়ের আশ্রয় দেহের সৃষ্টির দ্বারাই আত্মাতে উত্তম, মধ্যম ও অধম, এই তিনটি অসৎ ভাবের প্রতীতি হয়ে থাকে। অসৎ পুত্র যেমন পিতাকে বাহ্য ও অভ্যন্তরিক দুঃখ দেয়, তেমনই দেহে আত্মাভিমান দেহাত্মবাদী জীবকে বাহ্য ও আভ্যন্তরিক সন্তাপ দিয়ে থাকে। অলক্ষ্যবেগ কালের প্রভাবে প্রতিক্ষণেই জীবদেহের উৎপত্তি ও বিনাশ ঘটছে। কাল অতি সূক্ষ্ম বলে বিবেকশূন্য ব্যক্তিগণ তা দেখতে পায় না।[১] যেমন কালের প্রভাবে নিয়ত অগ্নিজ্যোতির, স্রোতের প্রবাহের ও বৃক্ষস্থিত ফলের অবস্থার পরিবর্তন ঘটছে, কিন্তু কালের সূক্ষ্মতাবশত তা লক্ষ্য করা যায় না, তেমনই সকল জীবের কৌমারাদি অবস্থা, তেজ ও বলের দ্বারা দেহের পরিবর্তন ঘটছে, কিন্তু কালের সূক্ষ্মতাহেতু তা লক্ষ্য করা যায় না। তথাপি শিখার সাদৃশ্যহেতু যেমন 'এই সেই প্রদীপ' এরূপ জ্ঞান হয়, স্রোতের সাদৃশ্যহেতু যেমন 'এই সেই জল' বলে বোধ হয়, তেমনই যারা বিবেকশূন্য, তাদের নিকট 'এই সেই পুরুষ' এইরূপ মিথ্যা জ্ঞানের উদয় হয় এবং তারা এরূপ মিথ্যা বাক্যেরই প্রয়োগ করে থাকে। দেহই নিজের কর্মরূপ বীজের দ্বারা জন্মগ্রহণ করে ও মৃত্যুমুখে পতিত হয়, জীবাত্মা কিন্তু জন্ম-মৃত্যুরহিত। মহাভূতরূপে অগ্নি যেমন কল্পান্তস্থায়ী হয়েও ইন্ধনের সংযোগ ও বিয়োগে উৎপত্তি ও নাশ প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ জীব জন্ম-মৃত্যুরহিত হলেও ভ্রান্তিবশত জাত ও মৃতের ন্যায় প্রতীয়মান হন। দেহের নয়টি অবস্থা—জঠরে প্রবেশ, জঠরমধ্যে বৃদ্ধি, জন্ম, বাল্য (পাঁচ বছর পর্যন্ত), কৌমার (ষোল বছর পর্যন্ত), যৌবন (পঁচিশ বছর পর্যন্ত), বয়োমধ্য (ষাট বছর পর্যন্ত), জরা (দেহের জীর্ণতা) ও মৃত্যু। স্বাভাবিক অবিবেকের বশে জীব কর্মজনিত দেহের উৎকর্ষ ও অপকর্ষকে নিজের বলে গ্রহণ করেন, কদাচিৎ কোনো জীব পরমেশ্বরের অনুগ্রহে দেহে আত্মাভিমান ত্যাগ করেন। পিতৃদেহের বিনাশ ও পুত্রদেহের জন্মের দ্বারা নিজ দেহেরও উৎপত্তি ও বিনাশের (জন্ম ও মৃত্যুর) অনুমান করা যায়। কিন্তু যে জীব জন্ম-মৃত্যুর অধীন এই দেহের দ্রষ্টা, সেই জীবের অর্থাৎ আত্মার উৎপত্তিও নেই বিনাশও নেই।[২] যিনি বীজ থেকে ওষধির উৎপত্তি এবং ফল পাকলে ওষধির বিনাশের কথা জানেন, তিনি ওষধি থেকে জ্ঞাতার ভিন্নতা দর্শন করেন। দেহের জন্ম-মৃত্যুদর্শী পুরুষকেও (জীব বা আত্মাকেও) তেমনই দেহ থেকে পৃথক বলে জানবে। অবিবেকী পুরুষ আত্মাকে প্রকৃতি থেকে পৃথক বলে জানে না, তাই সে দেহে আত্মাভিমানবশত সংসার-দশা প্রাপ্ত হয়। ৩৬-৫১

সত্ত্বগুণের আধিক্যে (দেহত্যাগ করলে) জীব ঋষিত্ব ও দেবত্ব লাভ করে, রজোগুণের আধিক্যে অসুরত্ব ও মনুষ্যত্ব লাভ করে এবং তমোগুণের প্রাবল্যে পশু-পক্ষী প্রভৃতি নিকৃষ্ট যোনি প্রাপ্ত হয়। এইরূপে কর্মফল অনুসারে জীব নানা

১ বকরূপী ধর্ম যখন যুধিষ্ঠিরকে প্রশ্ন করেছিলেন, 'সংসারে সব চেয়ে আশ্চর্যজনক ব্যাপার কি?' তখন যুধিষ্ঠির উত্তরে বলেছিলেন, 'সংসারে প্রতিদিন জীবসমূহ যমালয়ে যাচ্ছে তা দেখেও অবশিষ্ট মানুষ অমরত্বের কামনা করছে, এর চাইতে বিস্ময়কর আর কি হতে পারে?'

২ ন জায়তে ম্রিয়তে বা···ইত্যাদি। গীতা, ২।২০ ও কঠ উপঃ ১।২।১৮

যোনি পরিভ্রমণ করে।[১] বালক যেরূপ নর্তক ও গায়কদের দেখে তাদের অনুকরণ করে, তেমনিই জীবাত্মা নিষ্ক্রিয় হয়েও বুদ্ধির গুণসকল দর্শন করে তাদের অনুকরণ করে থাকে। উদ্ধব, যেমন জল কাঁপতে থাকলে জলে প্রতিবিম্বিত বৃক্ষসকলও কম্পিত বলে বোধ হয়, যেমন নয়নদ্বয় ঘুরতে থাকলে পৃথিবীও ঘূর্ণ্যমান বলে মনে হয়, বাসনাসক্ত ব্যক্তির বিষয়ানুভব এবং স্বপ্নদৃষ্ট বিষয় যেমন মিথ্যা, তেমনই জীবের জন্ম-মৃত্যু ও সংসার মিথ্যা বলে জানবে। স্বপ্নাবস্থায় বিষয়সকল বর্তমান না থাকলেও সর্পদংশনাদি নানাবিধ মিথ্যা বিষয়ের অনুভব হয়, তেমনই সংসার অসত্য হলেও বিষয়ের ধ্যানহেতু জীবের সংসারের সুখদুঃখের নিবৃত্তি হয় না। অতএব উদ্ধব, অসৎ ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা বিষয়ভোগ করো না, আত্মবিষয়ক অজ্ঞানবশত দেহে আত্মবিষয়ক যে বিকল্প, সেই বিকল্প থেকেই ভ্রমের উৎপত্তি হয়, তা বিচার করে দেখ। মুক্তিকামী ব্যক্তি যদি দুর্জনগণের দ্বারা তিরস্কৃত, উপহসিত, নিন্দিত, তাড়িত, বন্ধনমধ্যে রক্ষিত, অথবা জীবিকা থেকে বঞ্চিত হন, অথবা অজ্ঞজন যদি তাঁর দেহকে মল-মূত্রাদিতে লিপ্ত করে, তিনি যদি এইরূপ নানা কষ্টে নিপাতিত হন, তথাপি তিনি নিজ বুদ্ধির দ্বারা পরমেশ্বরে নিষ্ঠাযুক্ত হয়ে নিজেকে রক্ষা করবেন। ৫২-৬০

উদ্ধব বললেন, বাগ্মিশ্রেষ্ঠ, আপনার এই সকল দুরূহ উপদেশ যাতে সহজে ও বিশেষরূপে বুঝতে পারি, সেইরূপ উপদেশ পুনরায় দিন। বিশ্বাত্মা, মানুষের স্বভাব অনতিক্রমণীয়, অতএব যাঁরা আপনার এই ধর্মে নিরত, আপনার চরণে যাঁরা শরণাগত, যাঁরা আপনার শান্ত ভক্ত, তাঁরা ভিন্ন অসজ্জন দ্বারা আপনার এরূপ অবমাননা পণ্ডিতদেরও সহ্যশক্তির বাইরে বলে আমার মনে হচ্ছে। ৬১

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

তিতিক্ষু ব্রাহ্মণের উপাখ্যান

শুকদেব বললেন, যাঁর বিক্রম শ্রবণযোগ্য, সেই যাদবোত্তম শ্রীকৃষ্ণ ভক্তপ্রবর উদ্ধব কর্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হয়ে ভৃত্যবাক্যের সৎকারপূর্বক তাঁকে বলতে আরম্ভ করলেন। শ্রীকৃষ্ণ বললেন, বৃহস্পতি-শিষ্য, যিনি দুর্জনের দুর্বাক্যের দ্বারা ক্ষুব্ধ মনকে শান্ত করতে পারেন, সেরূপ সাধু ব্যক্তি ইহলোকে দুর্লভ। অসাধুদের কটুবাক্যরূপ শরসমূহ মর্মভেদী হয়ে জীবকে যেরূপ ক্লেশ দেয়, মর্মস্পর্শী লৌহময় বাণে বিদ্ধ হয়েও জীব তেমন ক্লেশ অনুভব করে না। উদ্ধব, এ বিষয়ে বৃদ্ধগণ এক পরমপুণ্যজনক কাহিনী বিবৃত করেন, আমি তা তোমায় বলব, তুমি সমাহিত-চিত্তে তা শোন। কোনো এক সন্ন্যাসী অসৎ ব্যক্তিগণ কর্তৃক অবজ্ঞাত হয়েও ধৈর্যধারণপূর্বক নিজের কর্মসকলের ফল স্মরণ করতে করতে যা গান করছিলেন, আমি তাই বর্ণনা করছি। পুরাকালে মালব দেশে কোন এক ঐশ্বর্যবান ব্রাহ্মণ বাস করতেন। কৃষি ও বাণিজ্যাদি বৃত্তির দ্বারা তাঁর প্রভূত অর্থ সঞ্চিত হয়েছিল।

১ ভগবদ্গীতার চতুর্দশ অধ্যায়ের ১৪শ ও ১৫শ শ্লোকে বলা হয়েছে যে সত্ত্বগুণের প্রাবল্যে কারো মৃত্যু ঘটলে তিনি নির্মল দিব্য লোকসকল প্রাপ্ত হন, রজোগুণের প্রাবল্যে কারো মৃত্যু হলে সে কর্মাধিকারী মানুষদের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে, আর তমোগুণের প্রাবল্যে দেহত্যাগ করলে জীব মূঢ় লোকদের মধ্যে অথবা পশ্বাদি যোনিতে জন্মগ্রহণ করে।

তিনি কামী, লুব্ধ ও অতিশয় কোপনস্বভাব ছিলেন; তাছাড়া তিনি ছিলেন কদর্যচরিত্র, স্ত্রী-পুত্রকে তিনি পীড়ন করতেন। তিনি জ্ঞাতি ও অতিথিগণকে মধুর বাক্যের দ্বারাও পরিতুষ্ট করতেন না। এমন কি, ধর্মকর্মহীন আবাসে নিজ দেহকেও কোনোদিন ভোগ্য বস্তুর দ্বারা পরিতৃপ্ত করেন নি। পুত্র ও বান্ধবগণ সেই দুঃশীল ও কৃপণ ব্যক্তির অনিষ্টই চিন্তা করত, স্ত্রী, কন্যা ও ভৃত্যগণ বিষণ্ণ হয়ে কেউ তাঁর প্রিয় আচরণ করত না। এইরূপে যক্ষের মতো ধনরক্ষণশীল, ধর্ম ও ভোগবর্জিত, ইহলোক হতে ভ্রষ্ট সেই ব্রাহ্মণের প্রতি পঞ্চযজ্ঞভাগী দেবতাগণও ক্রুদ্ধ হলেন। এইরূপে আত্মীয় পোষ্যবর্গের ও দেবতাগণের অনাদর হেতু তাঁর পুণ্য-সকল ক্ষয় পেল এবং কৃষির পরিশ্রম ও বাণিজ্যাদির আয়াসলব্ধ অর্থও শেষ হল। জ্ঞাতিগণ সেই বিপ্রাধমের কিছু ধন গ্রহণ করল, দস্যুরা কিছু নিল, গৃহদাহাদি দৈব ব্যাপারে কিছু নষ্ট হয়ে গেল, কালক্রমে কিছু ক্ষয়প্রাপ্ত হল এবং রাজা ও চোরেরা কিছু অর্থ নিল। এইরূপে সকল ধন নষ্ট হলে সেই ধর্মহীন ও ভোগহীন ব্রাহ্মণ স্বজনগণ কর্তৃক উপেক্ষিত হলেন, তখন তিনি অপার চিন্তা-সাগরে পড়লেন। তিনি ধননাশে সন্তপ্ত ও দীর্ঘ চিন্তায় রত হলেন, অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠ হয়ে খেদ করতে লাগলেন এবং তাঁর অন্তরে মহান বৈরাগ্য উপস্থিত হল। ১-১৩

সেই ব্রাহ্মণ বলতে আরম্ভ করলেন, অহো! আমি এত পরিশ্রমের দ্বারা যে ধন উপার্জন করলাম, তার দ্বারা ধর্ম বা ভোগ কোনটাই হল না। আমি কেবল বৃথা অর্থের নিমিত্ত দেহকে কষ্ট দিলাম। হায়, কি কষ্ট! কৃপণ ব্যক্তিদের অর্থ প্রায়ই সুখকর হয় না, ইহলোকে নিজের সন্তাপের এবং পরলোকে নরকভোগের হেতু হয়। ঈষৎ শ্বেতকুষ্ঠ যেমন রূপবান পুরুষের সৌন্দর্য নষ্ট করে, তেমনিই অল্প লোভও যশস্বী ব্যক্তিগণের নির্মল যশকে নষ্ট করে, গুণিগণের প্রশংসনীয় গুণরাশিকেও হরণ করে। অর্থের উপার্জনে এবং উপার্জিত অর্থের বর্ধনে আয়াস স্বীকার করতে হয়, অর্থের রক্ষণে ও উপভোগে চিন্তা জন্মে, অর্থব্যয়ে ত্রাস ও অর্থনাশে ভ্রম হয়। চৌর্য, পরপীড়ন, মিথ্যাভাষণ. দম্ভ, কাম, ক্রোধ, গর্ব, মত্ততা, ভেদবুদ্ধি, শত্রুতা, অবিশ্বাস, স্পর্ধা, স্ত্রী, দ্যূতক্রীড়া, মদ্যপান—এই পনের রকম অনর্থের মূল হচ্ছে অর্থ। অতএব কল্যাণকামী ব্যক্তি দূর থেকেও অর্থরূপ অনর্থকে পরিহার করবেন। অতি অল্প পরিমাণ অর্থের জন্যে ভ্রাতা, স্ত্রী, পিতামাতা, ও বান্ধবগণের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয় এবং একপ্রাণ ও অতিপ্রিয় ব্যক্তিরাও শত্রু হয়ে ওঠে। এরা সামান্য অর্থের জন্যে ক্ষুব্ধ ও ক্রোধোন্মত্ত হয়ে সৌহার্দ্য বিসর্জন দিয়ে পরস্পরকে ত্যাগ ও নাশ করে থাকে। ১৪-২১

যারা দেবগণের প্রার্থনীয় মনুষ্যজন্ম এবং তন্মধ্যে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হয়ে তাকে অনাদরপূর্বক নিজের হিতসাধন না করে, তারা অশুভ গতি লাভ করে। স্বর্গ ও মোক্ষের দ্বারস্বরূপ মনুষ্যদেহ প্রাপ্ত হয়ে মরণধর্মশীল কোন্ ব্যক্তি অনর্থের হেতুভূত অর্থে আসক্ত হয়? যে ব্যক্তি যক্ষের মতো শুধু বিত্ত সঞ্চয় করে, সে ব্যক্তি দেবতাগণ, ঋষিগণ, পিতৃগণ, ভূতগণ, জ্ঞাতিগণ, বান্ধবগণ ও অন্যান্য দায়-ভাগী পুরুষগণকে এবং নিজ দেহকে ভোগ থেকে বঞ্চিত করে অধঃপতিত হয়। বিবেকী পুরুষগণ যে অর্থের দ্বারা মুক্তি সাধন করে থাকেন, আমি বৃথা সেই অর্থ-চেষ্টায় প্রমত্ত হয়েছি। ফলে, আমার সেই ধন, আয়ু ও বল নষ্ট হয়েছে, এখন বৃদ্ধকালে আর কি সাধন করব? এরূপ অনর্থের বিষয় জেনেও মানুষ নিরন্তর বৃথা অর্থচেষ্টায় বারংবার ক্লেশ পায়। নিশ্চয়ই লোকসকল কারো মায়ার দ্বারা বিমোহিত হয়ে রয়েছে। মৃত্যুমুখে পতিতপ্রায় লোকের ধনে কি ফল? ধন-দাতাদেরই বা কি ফল? ভোগে কি ফল? ভোগদাতাগণেরই বা কি প্রয়োজন?

জন্মপ্রদ কর্মসমূহই বা তার কি করতে পারে? নিশ্চয়ই সর্বদেবময় [illegible] শ্রীহরি আমার প্রতি প্রসন্ন হয়েছেন, যেহেতু তাঁর কৃপায় আমার এরূপ [illegible] উপস্থিত হয়েছে এবং সংসারসিন্ধু উত্তরণের ভেলাস্বরূপ বৈরাগ্য আমার [illegible] উদিত হয়েছে। অতএব যদি আমার কিছু আয়ু অবশিষ্ট থাকে, তাহলে আমি আত্মনিষ্ঠ ও ধর্মসাধন বিষয়ে অপ্রমত্ত হয়ে এবং মনে মনে সন্তুষ্ট হয়ে কঠোর তপস্যার দ্বারা দেহ শুষ্ক করব। সেই ত্রিলোকাধিপতি দেবতারা আমার অনুগ্রহ করুন, তাঁদের প্রসাদে যখন রাজা খট্টাঙ্গ মুহূর্ত মধ্যে বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্ত হয়েছিলেন, তখন আমি বৃদ্ধ হলেও অল্পকালের মধ্যেই সিদ্ধিলাভ করতে পারি। ২২-৩০

শ্রীভগবান বললেন, মালবদেশীয় সে দ্বিজপ্রবর মনে মনে এরূপ স্থির করে হৃদয়গ্রন্থিরূপ অহংকার ও মমতাকে ছেদন করলেন এবং শান্ত মৌনব্রত অবলম্বন করে সন্ন্যাসী হলেন। তিনি দেহ, ইন্দ্রিয় ও প্রাণ সংযত করে এই পৃথিবী পর্যটন করতে প্রবৃত্ত হলেন। তিনি অনাসক্ত ও অলক্ষিত হয়ে ভিক্ষার জন্যে গ্রামে নগরে ভ্রমণ করতে লাগলেন। অসজ্জনেরা সেই বৃদ্ধ ভিক্ষু অবধূতকে দেখে বিবিধ অপমানজনক বাক্যে তাঁকে ভর্ৎসনা করতে লাগল। কোন কোন ব্যক্তি তাঁর ত্রিদণ্ড, কেউ কেউ তাঁর ভোজনপাত্র ও কমণ্ডলু, কেউ আসন, কেউ জপমালা, কেউ বা কাঁথা ও বস্ত্রখণ্ডসকল গ্রহণ করল, আবার মুনিকে সেই সকল দেখিয়ে ফিরিয়ে দিতে গেল। কিন্তু মুনি যখন সে সকল গ্রহণ করতে উদ্যত হলেন, তখন তারা মুনির নিকট থেকে পুনরায় সেগুলি দূরে সরিয়ে নিল। তিনি নদীতীরে ভিক্ষালব্ধ অন্ন ভোজন করতে বসলে পাপিষ্ঠগণ তাঁর অন্নে মূত্রত্যাগ করত এবং মস্তকে থুথু নিক্ষেপ করত। কেউ কেউ সেই মৌনী ভিক্ষুককে কথা বলাতে চেষ্টা করল। কথা না বলাতে কেউ কেউ দণ্ডাদির দ্বারা তাঁকে তাড়না করল। কোন কোন লোক 'এ ব্যক্তি চোর' বলে তাঁকে নানাবিধ অপমানসূচক বাক্যের দ্বারা শাসাতে লাগল, কেউ বা 'বধ কর, বধ কর' বলে তাঁকে দড়ি দিয়ে বাঁধতে গেল। কেউ কেউ তাঁকে এইরূপ বলে অবজ্ঞা ও নিন্দা করতে লাগল—এ ব্যক্তি ধর্মধ্বজী, বাইরে ধর্মের চিহ্নসকল ধারণ করেছে, এ ব্যক্তি লোকবঞ্চক, বিত্তনাশহেতু স্বজনদের দ্বারা পরিত্যক্ত হয়েই ভিক্ষুকের বৃত্তি অবলম্বন করেছে। এ ব্যক্তি অতি বলবান এবং গিরিরাজ হিমালয়ের ন্যায় ধৈর্যশালী দৃঢ়নিশ্চয় হয়ে মৌনভাবে বকের ন্যায় স্বকার্য সাধন করছে—এই বলে কতকগুলি লোক তাঁকে পরিহাস করতে লাগল। আবার কেউ তাঁর ওপর অপানবায়ু ত্যাগ করল, কেহ বা শুক-শারিকাদি ক্রীড়নক পক্ষীর ন্যায় তাঁকে শৃঙ্খলের দ্বারা বন্ধন করে কারাগারে রুদ্ধ করল। এই প্রকারে সেই ভিক্ষু দুর্জনাদিকৃত ভৌতিক দুঃখ, জরাদি নিমিত্ত দৈহিক দুঃখ ও শীতোষ্ণাদিজনিত দৈবিক দুঃখসমূহকে নিজের কর্মফল বলে এবং অপরিহার্য ও অবশ্য ভোক্তব্য বলে নিশ্চয় করেছিলেন।[১] ৩১-৪১

ঐ হীন লোকগুলো তাঁকে ধর্মচ্যুত করবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তাদের অত্যাচার সত্ত্বেও তিনি কঠিন ধৈর্য ধরে স্বধর্মে থেকে এই গাথা গান করেছিলেন—এই সব লোক আমার সুখ বা দুঃখের কারণ নয়। দেবতা, আত্মা, গ্রহ, কর্ম বা কাল—এরাও নয়। পণ্ডিতেরা বলেছেন সুখদুঃখের কারণ হল মন। মনই সংসার-চক্রকে আবর্তিত করছে।[২] তিনটি গুণের ধর্ম মন থেকেই জন্মাচ্ছে।

১ ঋষভদেব সম্পর্কে অনুরূপ কাহিনী পঞ্চম স্কন্ধের পঞ্চম অধ্যায়ে বিবৃত হয়েছে।
২ তুলনীয় : কঠ উপনিষৎ, ১৷৩৷৩-৯

ঐ ধর্ম বা বৃত্তি থেকে সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক কর্মসকল আলাদা ভাবে উৎপন্ন হচ্ছে। দেব, মানুষ, পশু ইত্যাদি জন্ম এই কর্মেরই ফল। আত্মা নির্লিপ্ত এবং সমস্ত জীবের বন্ধু জ্যোতিঃস্বরূপ পরমাত্মা জীবকে অনুগ্রহ করেন। কিন্তু যেই মন সংসারের কারণ, জীব তার বশবর্তী হয়ে গুণের সংস্পর্শহেতু সংসারে বন্ধ হয় এবং বিষয় ভোগ করে। দান, ধর্মপালন, নিয়ম, যম, বেদ অধ্যয়ন, কর্মসমূহ, সদ্ব্রত—এই সবই মনঃসংযমের উপায়, আর মনকে বশ করাই হল যোগ। মন যাঁর নিজের বশে এসে শান্ত হয়েছে তাঁর দান প্রভৃতির প্রয়োজনও শেষ হয়েছে; আর যে নিজেই মনের বশীভূত তার দান ইত্যাদি পুণ্যকাজে কোন ফল নেই। অন্যান্য দেবতারা মনের বশ, মন কিন্তু অন্যের বশ্যতা স্বীকর করে না। সে বলবান থেকেও বলবান, তাই যোগীদের পক্ষে ভীতিপ্রদ। মনকে যিনি দমন করতে পেরেছেন তিনি দেবশ্রেষ্ঠ। কিছু কিছু বুদ্ধিহীন ব্যক্তি মনরূপ শত্রুকে জয় করবার চেষ্টা না করে অন্যের সঙ্গে বিবাদে লিপ্ত হয় এবং ফলে কাউকে মিত্র, কাউকে শত্রু আবার কাউকে উদাসীন করে তোলে। ৪২-৪৮

এই শরীর মনেরই কল্পনামাত্র। একে 'আমি, আমার' ভেবে নির্বুদ্ধি মানুষেরা এ আমি, ও অন্য' এই মিথ্যাজ্ঞানে দুস্তর সংসার ঘুরে বেড়ায়। মানুষই যদি সুখদুঃখের কারণ হয়ে থাকে তা হলে আত্মা তার কর্তাও নয়, কর্মও নয়—তার কর্তা হতে পারে একমাত্র পঞ্চভূতে রচিত দেহ। অতএব সুখদুঃখকে উপলক্ষ করে কারো প্রতি ভালবাসা আর কারো প্রতি দ্বেষ—এ ঠিক নয়। নিজের দাঁত দিয়ে নিজের জিভ কামড়ে ব্যথা পেলে কার উপর রাগ করা যায়? ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতারাই দুঃখের কারণ—একথা বললেই বা আত্মার কি?[১] ভৌতিক দেহ আর মনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাতেই বরঞ্চ সেই দুঃখের কারণ থাকতে পারে। আত্মাই যদি সুখদুঃখের কারণ হন তা হলে অন্য আর কে কি করতে পারবে? সেই সুখদুঃখকে তখন আত্মারই স্বভাব বলতে হবে। কিন্তু আত্মা ছাড়া জগতে কি আর কিছু আছে? আছে, একথা যদি বলা হয় তবে তা ভুল। তাহলে আর রাগ কেন? আবার যদি বল গ্রহরাই সুখদুঃখের হেতু তা হলেও তো আত্মার কিছু নয়। আত্মার জন্ম নেই। সুখদুঃখ দেহাভিমানীরই ব্যাপার, জ্যোতিষীরা গ্রহসমূহের অবস্থান গণনা করে তার ফলাফল বলে থাকেন। তাই পুরুষ রাগ করবেন কার উপর? তিনি সব থেকেই ভিন্ন। ৪৯-৫৩

যদি কর্মই সুখ-দুঃখের কারণ হয়, তাহলেই বা আত্মার কি? কারণ জড়তা আর চৈতন্য উভয়ে যাকে আশ্রয় করে তারই কর্ম করা সম্ভব। শরীর হল জড় আর পুরুষ শুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ। সুতরাং সুখ আর দুঃখের মূল যে কর্ম, আত্মার তা নেই, কোপ করবে কার উপর? আবার কালই যদি সুখ-দুঃখের কারণ হন তাহলেও আত্মার কিছু নয়। কারণ কাল যদিও আত্মার অংশ, তাহলে আগুন যেমন আগুনের থেকে নির্গত স্ফুলিঙ্গের তাপ অনুভব করে না বা হিম থেকে উৎপন্ন করকা (শিল) প্রভৃতির শীতলতা হিমে লাগে না, তেমনি কাল থেকে উৎপন্ন সুখ-দুঃখ আত্মা অনুভব করে না। তাই কোপ কার উপর? যে অহংকার সংসারের মূল তার থেকে ভয় জন্মায়, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান হলে আর ভয় থাকে না। তেমনি আত্মার অন্য কারো থেকে, কারও দ্বারা, কোনখানে বা কোনভাবে সুখদুঃখ সম্ভব নয়। সুতরাং প্রাচীনতম মহর্ষিরা পরমাত্মার প্রতি যে নিষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন, আমি তা আশ্রয় করেই শ্রীহরির চরণসেবা করব এবং দুস্তর সংসার-সমুদ্র উত্তীর্ণ হব। ৫৪-৫৮

১ তুলনীয়: গীতা, ২।১৪

ভগবান বললেন, সমস্ত ধন যার নষ্ট হয়ে গিয়েছিল সেই মুনি এইরকম বৈরাগ্য অবলম্বন করে দুঃখ থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন। অসাধু ব্যক্তিরা তাঁকে নানা কটুকথা বললেও তিনি নিজের ধর্ম থেকে চ্যুত হন নি। সারা পৃথিবী ভ্রমণ করতে করতে তিনি এই গান করছিলেন—মানুষের সুখদুঃখ অন্য কেউ দেয় না। যাবতীয় অনর্থের মূল হচ্ছে অজ্ঞানাচ্ছন্ন মনের ভ্রম। এ শত্রু ও মিত্র আর তৃতীয় ব্যক্তি না শত্রু না-মিত্র, এইসবই কল্পনা মাত্র। তাই বলছি, বৎস, পরমাত্মা-স্বরূপ আমাতে বুদ্ধিকে স্থির করে সর্বরকমে মনকে বশে আন। তোমার কাছে যোগের শ্রেষ্ঠত্বের বিষয় বললাম। ভিক্ষুবেশী ব্রাহ্মণের এই ব্রহ্মনিষ্ঠার বিবরণ যিনি মন দিয়ে শুনবেন, শোনাবেন, নিজে ধারণা করবেন বা অপরকে ধারণা করাবেন, ক্ষুধা-পিপাসা, শোক-মোহ ইত্যাদির থেকে সুখদুঃখ আর তাঁকে অভিভূত করতে পারবে না। ৫৯-৬২

চতুর্বিংশ অধ্যায়

সাংখ্যযোগের আলোচনা

ভগবান বললেন, উদ্ধব, এবার কপিল প্রভৃতি প্রাচীন আচার্যগণ যে সাংখ্যযোগ উপদেশ করেছেন তার কথা তোমাকে বলছি। এই যোগের তত্ত্ব জানলে পুরুষ ভেদজ্ঞান হতে উৎপন্ন সুখদুঃখ থেকে মুক্তি পায়। ১

সৃষ্টির আগে, প্রলয়ের সময়ে এই দৃশ্যমান জগৎ এক অদ্বিতীয়, নির্বিকল্প পরব্রহ্মের লীন ছিল। তারপর যুগ আরম্ভ হল; সে সময়ে লোকের বিবেকজ্ঞান থাকাতে ভেদজ্ঞান ছিল না, তাই দ্রষ্টা এবং দৃশ্য এই উভয়কেই তাঁরা অভেদ বলে জানতেন। বাক্য এবং মনের অগোচর সত্যস্বরূপ পরমব্রহ্ম 'আমি বহু হব' এই সংকল্পরূপ মায়াদ্বারা প্রেরণাপ্রাপ্ত হয়ে দুভাগে ভাগ হলেন।[১] একভাগ হল কার্যকারণরূপ প্রকৃতি, অন্য ভাগ জ্ঞানস্বরূপ চৈতন্য বা পুরুষ। পুরুষের প্রেরণায় বিক্ষুব্ধ প্রকৃতি থেকে সত্ত্ব, রজ আর তমোগুণের অভিব্যক্তি হল। এই তিনগুণ থেকে ক্রিয়াশক্তির উৎপত্তি এবং ক্রিয়াশক্তি থেকে এল জ্ঞানশক্তি, জ্ঞানশক্তির বিকার হল অহংকার, যা নাকি ভ্রম-ভ্রান্তি ইত্যাদির কারণ। অহংকার তিন রকম—বৈকারিক, তৈজস আর তামস। পঞ্চ তন্মাত্র, দশ ইন্দ্রিয় আর মন—এরা অহংকার থেকে জন্মে। অহংকারতত্ত্ব চিন্ময় এবং অচিন্ময় বা চেতন এবং অচেতন এই দুই রূপেই থাকতে পারে। ২-৭

তিন রকম অহংকারের মধ্যে তামস অহংকার হল তন্মাত্রসমূহের কারণ। তার থেকে ক্ষিতি প্রভৃতি পঞ্চমহাভূত উৎপন্ন হল। তৈজস অহংকার থেকে দশ ইন্দ্রিয় আর সাত্ত্বিক বা বৈকারিক অহংকার থেকে দিক্, বায়ু, সূর্য, প্রচেতা, দুই অশ্বিনী-কুমার, অগ্নি, ইন্দ্র, উপেন্দ্র, মিত্র আর চন্দ্র—এই এগারটি দেবতার আবির্ভাব হল। এঁরা হলেন দশটি ইন্দ্রিয় আর মনের অধিপতি। আমার প্রেরণায় সমস্ত পদার্থ একত্র হল এবং তাদের মিলনে আমার ক্রীড়ার স্থান এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হল। ঐ

---

১ সোঽকাময়ত—বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি ॥ তৈত্তিরীয় উপ ২।৬।৩
এই প্রসঙ্গে তুলনীয়: যেভাবে পরম এক আনন্দে উৎসুক
আপনাকে দুই করি লভিছেন সুখ।—রবীন্দ্রনাথ

ব্রহ্মান্ড যখন কারণ-সলিলে মগ্ন ছিল তখনই আমি তাতে নারায়ণ মূর্তিতে ছিলাম। আমার নাভিপদ্ম থেকে বিশ্ব নামক পদ্ম এবং সেই পদ্মে ব্রহ্মা আবির্ভূত হলেন। সেই বিশ্বরূপ ব্রহ্মা জগৎ-সংসার রচনা করেন। প্রথমে তিনি আমার নাভিপদ্মে বসে কঠোর তপস্যা করেন এবং আমারই অনুগ্রহে তাঁর তপস্যা সফল হলে তিনি রজোগুণের সাহায্যে লোকপালক সমেত ভূলোক, অন্তরীক্ষসহ ভুবর্লোক এবং স্বর্লোক—এই ত্রিভুবন রচনা করলেন। ৮-১১

এই তিন লোকের মধ্যে স্বর্লোক দেবতাদের, ভুবর্লোক প্রেত-পিশাচ ইত্যাদির এবং ভূর্লোক মানুষের বাসস্থান বলে নির্ধারিত হল। ত্রিভুবনের বাইরে মহর্লোক প্রভৃতি হল সিদ্ধদের আবাস। ব্রহ্মা ভূর্লোকের নীচের দিকে অসুর আর নাগদের থাকবার জায়গা অতল প্রভৃতি সৃষ্টি করলেন। মহর্লোকর থেকে পাতাল পর্যন্ত স্থানেই ত্রিগুণবিশিষ্ট সমস্ত কিছু ব্যাপার সীমাবদ্ধ। প্রাণায়াম প্রভৃতি অষ্টাঙ্গযোগ, তপস্যা এবং সন্ন্যাসচর্যার ফলদ্বারা লভ্য রাগ-লোভ বর্জিত মহ, জন, তপ ও সত্য এই চারটি লোক ত্রিভুবনের ঊর্ধ্বে রয়েছে। কিন্তু ভক্তিযোগের পথে জীব লাভ করে বৈকুণ্ঠলোক। আমি কালস্বরূপ, বিশ্বের বিধানদাতা। আমার প্রেরণায় সমস্ত প্রাণী সংসারস্রোতে পড়ে কখনও উচ্চ, কখনও বা নিম্নগতি লাভ করছে। অণু, বৃহৎ, স্থূল এবং সূক্ষ্ম—যতরকম পদার্থ সংসারে আছে সে সবই পুরুষ-প্রকৃতির যোগে উৎপন্ন। বস্তুর যা আদি কারণ, অন্তে যাতে তা লীন হয়, তার বর্তমান অবস্থাও সেই একই কারণভূত। সোনা দিয়ে তৈরী কুণ্ডল বা মাটির তৈয়ারী ঘট, সরা ইত্যাদিতে সোনার বা মাটির যেটুকু পরিবর্তন সে শুধু ব্যবহারিক। তেমনি আমার লীলার প্রকাশের জন্য যে সব বিকার বা পরিবর্তনের উৎপত্তি হয়েছে তা মূল কারণ থেকে কোনরকমেই পৃথক নয়। মহৎ-তত্ত্ব থেকে অহংকার-তত্ত্বের উৎপত্তি, তাই অহংকারের সত্য কারণ মহৎ। এরকম যখন যেটি যার উপাদানস্বরূপ, তখন সেটিই তার থেকে (অর্থাৎ উৎপন্ন বস্তু থেকে) বেশী সত্য। কার্যের উপাদানভূত প্রকৃতি, প্রকৃতির আধার এবং অধিষ্ঠাতা চৈতন্যময় পুরুষ, আর তিনগুণের প্রকাশক কাল—তিনরূপেই পরমব্রহ্মস্বরূপ আমিই বিরাজ করছি। ১২-১৯

এইভাবে, নানা দেহে জীবরূপে যে পুরুষ অবস্থান করছেন তাঁর ভোগের জন্য পিতা থেকে পুত্র এই ক্রমে বিশাল সৃষ্টি ঈশ্বরের সংকল্প এবং ইচ্ছা পর্যন্ত স্থায়ী হয়। আবার কালরূপী আমার ইচ্ছায় প্রলয় উপস্থিত হলে লোকসমূহের নানা কল্পের যিনি কল্পনাকারী, তিনি নিজেই বিরাট আর মহাভূতরূপে বিশেষ বিশেষ ভাগে বিভক্ত হন। এই পার্থিব দেহ যে অন্নে পালিত হয়, শতবর্ষ অনাবৃষ্টিতে তা কমতে কমতে একসময় প্রায় শেষ হয়ে যায়। তখন অন্ন বীজে পরিণত হয়; বীজও ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে অংকুর উৎপাদনে অসমর্থ হয় এবং ভূমিরূপে থাকে। ভূমিও অবশেষে সূক্ষ্মরূপ ধারণ করে গন্ধতন্মাত্রে পরিণত হয়। এভাবে শতবৎসর অনাবৃষ্টিতে গন্ধতন্মাত্র জলে পরিণত হয়। প্রখর তাপে জল শুষ্ক হয়ে রসতন্মাত্রের রূপ গ্রহণ করে; রস ক্রমে জ্যোতিরূপ ধারণ করে। বায়ুর প্রভাবে জ্যোতি রূপতন্মাত্রে পরিণত হয়। বায়ু কিছু সময় স্পর্শ তন্মাত্ররূপে থেকে কালপ্রভাবে আকাশে মিলিয়ে যায়; আকাশ প্রথমে শব্দতন্মাত্র এবং তার থেকে অহঙ্কাররূপে পরিণত হয়। এইভাবে তামস অহংকারের সৃষ্টি হয়। ইন্দ্রিয়গণও নিজ নিজ অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণে লীন হয়ে রাজস অহংকাররূপে অবস্থান করে। ঐ রাজস অহঙ্কার এবং তার আশ্রিত দেবগণ মনে বিলীন হয়। শব্দতন্মাত্র এবং প্রাণিগণের আদিকারণ যে অহঙ্কার তাও সাত্ত্বিক মহৎতত্ত্বে মিলায়।

এই মহৎতত্ত্বই সংসারকে মোহিত করছে, এর থেকেই জ্ঞান আর ক্রিয়াশক্তির প্রকাশ হচ্ছে। ২০-২৫

মহৎতত্ত্ব আবার নিজের কারণ গুণসমূহে, গুণসমূহ প্রকৃতিতে এবং প্রকৃতি মহাকালে বিলীন হয়। কাল সেই অদ্বিতীয় পরমপুরুষে লয় পায়। তিনি জন্ম প্রভৃতি বিকারশূন্য, মায়ারূপে উপাধিযুক্ত এবং জ্ঞানরূপে জীবের জীবনদাতা। উৎপত্তি আর উপসংহার এই দুয়েরই শেষে নিরুপাধিক আত্মস্বরূপে তিনি অবস্থান করেন। এর অতিরিক্ত আর তাঁর বিলীন হবার অবকাশ নেই। সবসময়ে যিনি এভাবে জগৎ, জীব আর পরম আত্মতত্ত্বের বিচার করেন তাঁর পক্ষে 'আমি', 'আমার' এই ভ্রমের সম্ভাবনা নেই। সূর্যোদয়ে যেমন অন্ধকার দূর হয় তেমনি এইরকম বিচাররূপ জ্ঞানসূর্যের আলোতে জ্ঞানী ব্যক্তির হৃদয় থেকে ভেদজ্ঞান সম্পূর্ণ তিরোহিত হয়। উদ্ধব, আমি সর্বজ্ঞ, আমার অজানা কিছু নেই, সব অবতারের মূলই আমি। আত্ম-অনাত্ম বিচাররূপ যে সাংখ্যজ্ঞানের দ্বারা সমস্ত সংশয়-গ্রন্থি ছিন্ন হয় তা আমি সবিস্তারে তোমাকে বললাম। উৎপত্তি এবং উপসংহার এই দুয়ের বিষয়ই আমি বর্ণনা করলাম।[১] ২৬-২৯

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

সত্ত্ব-রজ-তমোগুণের স্বভাব

ভগবান বললেন, উদ্ধব, তিনটি গুণের মধ্যে কোনটির প্রভাবে পুরুষ কিরকম স্বভাব বা ধর্ম লাভ করে, এবার আমি তা বর্ণনা করছি শোন। সত্ত্বগুণী জীব শম, দম, তিতিক্ষা, তপস্যা, সত্যনিষ্ঠা, জীবে দয়া, পূর্বাপর স্মৃতি, সন্তোষ, ত্যাগ, বৈরাগ্য, আস্তিক্য, অনুচিত কাজে লজ্জা (হ্রী), দান, সরলতা, বিনয়, আত্মরতি প্রভৃতি গুণে ভূষিত হয়। রজোগুণীর স্বভাবে থাকে কামনা, চেষ্টা, দর্প, অসন্তোষ, গর্ব, ইষ্টলাভের জন্য দেবার্চনা, ভেদবুদ্ধি, ভোগে সুখ, যুদ্ধ প্রভৃতি বীরত্বের কাজে উৎসাহ, যশের প্রার্থনা, স্তুতিপ্রিয়তা, হাসি-উপহাস, প্রভাব বিস্তারে ইচ্ছা, বলপ্রয়োগের প্রবণতা ইত্যাদি। তমোগুণ যার স্বভাবে প্রধান সে ক্রোধ, লোভ, মিথ্যাচরণ, হিংসা, প্রার্থনা, বঞ্চনা, শ্রম, কলহ, শোক, মোহ, বিষাদ, দৈন্য, তন্দ্রা, আশা, ভয়, উদ্যমহীনতা—এই সব বৃত্তি পেয়ে থাকে। সত্ত্ব, রজ আর তম, এই তিনগুণের স্বভাব পৃথক পৃথক ভাবে তোমাকে বললাম। এখন গুণগুলি মিশ্রিতভাবে থাকলে তার ফলে যে মিশ্রস্বভাব উৎপন্ন হয়, সে কথা বলছি। ১-৫

'আমি', 'আমার' এই বোধ তিনগুণের মিশ্রভাবের ফল। ঐ অবস্থায় মানুষের ইন্দ্রিয়, প্রাণ এবং মনের বৃত্তিগুলি অর্থাৎ তাদের কাজ বা ব্যবহার তিনটি গুণের মিশ্রণের ফল একথা বলা যায়। ধর্ম-অর্থ-কাম বিষয়ক কোন কাজে প্রবৃত্ত হয়ে মানুষ যখন শ্রদ্ধা, আসক্তি এবং ধনলাভ করে তখন তাকেও (সেই কর্মপ্রবৃত্তিকে) তিনগুণের মিশ্রভাবের পরিচায়ক বলতে হবে। মানুষ যখন গৃহাশ্রমে নিষ্ঠাবান হয়ে স্বধর্ম পালন করে তখনও তিনটি গুণই একত্র কাজ করছে বুঝতে হবে।

---

১ সাংখ্যদর্শন মতে সৃষ্টিতত্ত্ব বিষয়ের আলোচনা গীতার সপ্তম অধ্যায়ের ২য় থেকে ৭ম শ্লোকে বিবৃত হয়েছে। বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য অতুলচন্দ্র সেন কৃত শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা (হরফ প্রকাশনী), পৃ ২৭২-২৭৯ দ্রষ্টব্য।

সত্বগুণের লক্ষণ শম, দম প্রভৃতি, রজোগুণের লক্ষণ কামনা প্রভৃতি, আর ক্রোধ প্রভৃতি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি হল তমোগুণের পরিচায়ক। বিষয়কামনা ত্যাগ করে যে স্ত্রী বা পুরুষ নিজ কর্ম অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ভক্তিভরে আমার আরাধনা করে সেই স্ত্রী বা পুরুষ অবশ্যই সত্বগুণযুক্ত। পুরুষ যখন নিজের ইষ্ট কামনা করে কর্মের অনুষ্ঠান দ্বারা আমার আরাধনা করেন, তখন তিনি রজঃপ্রকৃতি, আর অন্যের অনিষ্ট করবার ইচ্ছায় কর্ম অনুষ্ঠান করে যিনি আমার অর্চনা করেন তাঁর প্রকৃতি হল তামস। সত্ব, রজ, তম এই গুণগুলি আমার নয়, এগুলো জীবের। এদের উদ্ভব হল মনে এবং এরাই আসক্তিদ্বারা জীবকে সংসার-পাশে আবদ্ধ করে। যাঁর মধ্যে সত্বগুণের প্রকাশ হয়, তিনি নির্মলচিত্ত এবং শান্ত হয়ে থাকেন। সত্বগুণ যখন রজ আর তমোগুণকে আচ্ছন্ন করে মানুষ তখন ধর্ম আর জ্ঞানের সঙ্গে সুখের অধিকারী হন। আবার যদি রজোগুণ তম আর সত্বকে অভিভূত করে, তবে মানুষ দুঃখ, কর্ম, যশ ও সম্পদ লাভ করেন। তমোগুণের ধর্ম চিত্তকে অজ্ঞানে আবৃত করে কর্মবিমুখ করে রাখা এবং জীবকে বিবেকহীন করা। তমোগুণ যদি রজ আর সত্বগুণকে দমিত করে, তবে জীব শোক, মোহ, নিদ্রা, হিংসা, আশা ইত্যাদি দ্বারা অভিভুত হয়। ৬-১৫

যাঁর চিত্ত নির্মল ও প্রসন্ন, ইন্দ্রিয়গুলি শান্ত, দেহ রোগশোকমুক্ত এবং মন আসক্তিশূন্য, তাঁর হৃদয় অবশ্যই পরমাত্মস্বরূপের প্রকাশক সত্বগুণে উদ্ভাসিত। কিন্তু যারা সবসময় কর্মব্যস্ত, অস্থির, অবসাদগ্রস্ত, অসুস্থ এবং যাদের ইন্দ্রিয়গুলি সর্বদা অতৃপ্ত, মন চঞ্চল তাদের রজোগুণান্বিত বলে বুঝতে হবে। আবার বিচার প্রভৃতি মানসিক ক্রিয়ায় অপটু হয়ে চিত্ত যখন প্রায় লোপ পাবার (নিষ্ক্রিয় হবার) অবস্থা হয়, মনেও কোন সংকল্পের দৃঢ়তা থাকে না, তখন তমোগুণের প্রভাবে অজ্ঞান এবং গ্লানির ভাব হৃদয়কে অভিভূত করে ফেলে। সত্বগুণ উদ্রিক্ত হলে দেবতাদের শক্তি বৃদ্ধি পায়, রজোগুণ প্রাধান্য পেলে অসুরদের তেজ বাড়ে আর তমোগুণ বৃদ্ধি পেলে রাক্ষসরা শক্তিমান হয়। সত্ব থেকে জাগরণ, রজ থেকে স্বপ্ন আর তমের থেকে ঘোর নিদ্রা উৎপন্ন হয়। যিনি এই তিনের অন্তরে সাক্ষিরূপে থাকেন তিনি তুরীয় অবস্থায় থাকেন। ১৬-২০

সত্বগুণের সাহায্যে লোকে উর্ধে ব্রহ্মলোকে পর্যন্ত যেতে পারেন। তমোগুণে জীব ক্রমশ নীচে নামতে নামতে অবশেষে স্থাবর যোনিতে জন্ম নেয়। রজোগুণের উদ্রেক হলে জীব এই দুই-এর মধ্যবর্তী মানুষ-জন্ম লাভ করে। সত্বগুণের উদয়ের সময় কারো মৃত্যু হলে মৃত্যুর পর তার স্বর্গলাভ হয়, রজোগুণ থেকে লাভ হয় মনুষ্যলোক আর তমোগুণের প্রাবল্যের সময় মৃত্যু ঘটলে নরকে যেতে হয়।[১] যাঁরা এই তিনগুণকে অতিক্রম করতে পারেন তাঁরা আমাকেই পেয়ে থাকেন।[২] ফলের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে দাস্যভাবে যাঁরা ভগবৎস্বরূপ আমারই আরাধনা করেন তাঁদের কর্ম হল সাত্বিক। ফলের প্রত্যাশায় কর্ম হল রাজসিক কর্ম আর লোককে কষ্ট দেবার উদ্দেশ্যে যে কর্মের অনুষ্ঠান তা তামসিক। দেহের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য আত্মজ্ঞানই সাত্বিক জ্ঞান, দেহ ইত্যাদিকে আত্মা বলে জ্ঞান করা হল রাজস জ্ঞান এবং জাগতিক বস্তুর জ্ঞান বা তার জন্য মমতার ভাবকে তামসিক জ্ঞান বলা যায়। কিন্তু আমার বিষয়ক যে জ্ঞান তাই হল নির্গুণ জ্ঞান। ২১-২৪

অরণ্যই মানুষের সাত্বিক আবাস, গ্রামকে রাজসিক আবাস বলা যায় আর যেখানে পাশাখেলা ইত্যাদি কুকাজ হয় সে সব তামসিক আবাস। কিন্তু আমাতে যাঁরা

১ তুলনীয়: গীতা, চতুর্দশ অধ্যায়, ১৭শ ও ১৮শ শ্লোক। ২ দ্রঃ গীতা, ১৪।২০ শ্লোক।

বাস করেন তাঁদের আবাস হল নির্গুণ আবাস। বিষয়াসক্তিশূন্য কর্মের কর্তা সাত্ত্বিক, ফলের আকাঙ্ক্ষায় কর্মের কর্তা রাজসিক আর হিতাহিত-বিবেকশূন্য কাজের কর্তা তামসিক। কিন্তু যাঁরা আমাতে আত্মসমর্পণ করে কর্ম করেন তাঁরাই নির্গুণ কর্তা। অধ্যাত্মবিষয়ক শ্রদ্ধাকে সাত্ত্বিক, কর্মবিষয়ক শ্রদ্ধাকে রাজসিক আর অধর্মোচিত কর্মে শ্রদ্ধাকে তামসিক শ্রদ্ধা বলে। কিন্তু আমার সেবায় যে শ্রদ্ধা তা হল নির্গুণ শ্রদ্ধা। যে আহার পবিত্র, উপকারী এবং সহজে লভ্য তাই সাত্ত্বিক আহার; কেবল ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তির জন্য আহার হল রাজসিক, আর অপবিত্র, কদর্য আহার হল তামসিক আহার। আত্মার অনুচিন্তনে যে সুখ তা সাত্ত্বিক সুখ, বিষয়ভোগের সুখ হল রাজসিক সুখ, মোহ বা দীনতা থেকে উৎপন্ন সুখ তামসিক সুখ। কিন্তু আমার চিন্তায় যে সুখ তা গুণাতীত। দ্রব্য, দেশ, ফল, জ্ঞান, কর্ম, কর্তা, শ্রদ্ধা, অবস্থা, আকৃতি, নিষ্ঠা—এসবই তিনগুণের অধীন এবং এরাই জীবকে সংসারে আসক্ত করে।[১] ২৫-৩০

উদ্ধব, এ ছাড়া প্রকৃতি এবং পুরুষে অবস্থিত যে কোন ভাব বা বস্তু জগতে দেখা যায়, শোনা যায় বা বুদ্ধিতে ধারণা করা যায় তার সবই ত্রিগুণাত্মক এবং মায়াময়। তিনগুণের বৃত্তিগুলোকে যিনি নিষ্ঠার সাহায্যে নিজের নিয়ন্ত্রণে আনতে পারেন তিনি আমাতে ভক্তিপরায়ণ হয়ে জ্ঞানের শ্রেষ্ঠ ফল মোক্ষলাভ করে থাকেন। মানবজন্ম শাস্ত্রীয় জ্ঞান আর পরমাত্মবিষয়ক বিজ্ঞান লাভের পক্ষে অতি অনুকূল। কাজেই মনুষ্যদেহ লাভ করে বৃথা সময় নষ্ট করো না, গুণসঙ্গ বিসর্জন দিয়ে আমাকে ভজনা কর। যিনি জ্ঞান এবং বিজ্ঞানের অধিকারী হয়েছেন সেই মুনি প্রমাদশূন্য হয়ে ইন্দ্রিয় দমন করে এবং বিষয়ে আসক্তি ত্যাগ করে পরমাত্মস্বরূপ আমারই সেবা করে থাকেন। তিনি সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত থেকে বিচার ইত্যাদির সাহায্যে রজ আর তমোগুণকে জয় করেন। সত্ত্বগুণের ধর্ম হল উপশম বা শান্তি এবং নিবৃত্তি। সত্ত্বগুণের প্রভাবে যোগীর চিত্ত যখন সম্পূর্ণ শান্ত হয় তখন তাঁর হৃদয়ে সত্ত্বগুণের ক্রিয়াও নিবৃত্ত হয়ে যায়। যোগী তখন গুণসমূহ থেকে মুক্তি পান এবং লিঙ্গশরীর ত্যাগ করে ভগবৎস্বরূপ আমাকে লাভ করেন। লিঙ্গশরীর থেকে মুক্ত জীব কামনা-বাসনার হাত থেকে নিষ্কৃতি পান এবং ব্রহ্মস্বরূপ আমি তাঁকে পরিপূর্ণ করি।[২] ৩১-৩৬

ষড়্‌বিংশ অধ্যায়

পুরূরবার আত্মগ্লানি

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন, মানবদেহে আমার পরমানন্দরূপ ভগবদ্‌ভাবের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ হতে পারে। সেই দেহ লাভ করে যে ব্যক্তি ভক্তি এবং শ্রদ্ধার সঙ্গে আনন্দরূপ পরমাত্মাতে (আমাতে) চিত্ত নিবিষ্ট করেন তিনি আমাকেই লাভ করেন। যে গুণময়ী মায়া জীবের উপাধিস্বরূপ (বিভিন্ন অবস্থার কারণ) তার থেকে তিনি

---

১ সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক এই তিন গুণভেদে শ্রদ্ধা, আহার, যজ্ঞ, তপস্যা ও দানের কর্মও ত্রিবিধ হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে গীতার সপ্তদশ অধ্যায়ে বিস্তৃত আলোচনা আছে। দ্রষ্টব্য, শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা (হরফ প্রকাশনী), পৃঃ ৫২০-৩৫

২ তুলনীয়: ভগবদ্‌গীতা, ২।৭১ ও ২।৭২ শ্লোক।

অব্যাহতি পান এবং দেহে অবস্থান করলেও জ্ঞান-নিষ্ঠা দ্বারা দৃশ্যমান সবকিছুকে অবস্তু জেনে কোন গুণে আর আসক্ত হন না। শিশ্নোদরপরায়ণ (ইন্দ্রিয়াসক্ত) অসৎ ব্যক্তির সংসর্গে থাকা কখনই উচিত নয়। যে লোক ঐ রকম একজনও অসৎ লোকের সংস্পর্শে আসে তাকে অন্ধের দ্বারা চালিত অন্ধের মত ঘোর অন্ধকার নরকে যেতে হয়।[১] ১-৩

পুরাকালে অতি কীর্তিমান রাজচক্রবর্তী পুরূরবা উর্বশীর বিরহে শোকে মগ্ন হয়েছিলেন। উর্বশীকে ফিরে পেয়ে রাজার শোক দূর হল। তারপর মন শান্ত হলে পুরূরবা তাঁর বিরহে দুঃখ এবং সম্ভোগে অতৃপ্তির কথা স্মরণ করে এইরকম জ্ঞানগর্ভ উক্তি করেছিলেন। ৪

উর্বশী যখন শয্যা থেকে উঠে মহারাজ ঐলকে[২] ছেড়ে চলে যাচ্ছিলেন তখন বিরহে উন্মত্তের মত হয়ে ঐল 'পত্নী, আমাকে নিষ্ঠুরের মত ছেড়ে চলে যেও না, দাঁড়াও, দাঁড়াও!' এই বলে কাঁদতে কাঁদতে উলঙ্গ অবস্থাতেই উর্বশীর পেছনে ছুটেছিলেন। পরে গন্ধর্বলোকে গিয়ে দুজনের আবার মিলন হল। কিন্তু ঐল সুদীর্ঘকাল উর্বশীর সঙ্গসুখ উপভোগ করেও তৃপ্ত হলেন না। উর্বশীর প্রেমে রাজা এমন মোহিত হয়েছিলেন যে তুচ্ছ ইন্দ্রিয়ভোগে কত দিন, রাত্রি, বৎসর এল গেল তার খোঁজ তিনি রাখেন নি। অচেতনের মত কাম উপভোগ করে জীবন কাটাচ্ছিলেন। তারপর যখন রাজার বিবেক জাগ্রত হল, তিনি ভাবলেন, হায়! কামান্ধ হয়ে কি বিচিত্র মোহে আচ্ছন্ন হয়েছিলাম। এক স্বর্গবেশ্যার কণ্ঠলগ্ন হয়ে দুর্লভ মানব-জন্মের কতখানি অংশ হেলায় নষ্ট করেছি বুঝতেও পারিনি। তার প্রেম আমাকে এতদূর মোহিত করেছিল যে সূর্য কখন উদিত হল আর কখন অস্ত গেল তাও জানিনি। এভাবে কত দিন, রাত্রি, বৎসর কেটে গিয়েছে তার খবরও রাখিনি। ওঃ, কি ভুল, কি ভুল! আমি রাজাধিরাজ রাজচক্রবর্তী পুরূরবা নিজেকে এক রমণীর খেলার পুতুলে পরিণত করেছি। রাজৈশ্বর্য, রাজমহিমা ইত্যাদিকে তৃণের মত তুচ্ছ জ্ঞান করে আমি উলঙ্গ হয়ে কাঁদতে কাঁদতে একটা স্ত্রীলোকের পিছনে পাগলের মত ছুটেছি। গর্দভ যেমন লাথি খেলেও গর্দভীর পেছনেই ছোটে, আমিও তেমনি উর্বশীর তিরস্কার উপেক্ষা করেও তার পেছনে পেছনেই গিয়েছি। এই অবস্থায় কোথায় বা আমার মাহাত্ম্য, কোথায় তেজ, কোথায় জগতের আধিপত্য করবার শক্তি! ৫-১১

সামান্য নারী যার মনকে একেবারে অভিভূত করে ফেলতে পারে সে ব্যক্তির দেবার্চনা, তপস্যা, দান, বিদ্যা, নির্জনবাস, বাক্য-সংযম সবই বৃথা। জগতের প্রভুত্ব পেয়েও আমি গরু-গাধার মত তাড়না-তিরস্কার তুচ্ছ করে নারীর জন্য উন্মত্ত হয়েছি। আমি শুধুই পাণ্ডিত্যাভিমানী, কিন্তু আসলে মূর্খ; শ্রেয় কি তা জানিনা, ধিক্ আমাকে। উর্বশীর অধরসুধা বৎসরের পর বৎসর পান করে আমার কামনার তৃপ্তি হয়নি, ঘি-মাখান কাঠের দ্বারা আহূতি-প্রাপ্ত আগুনের মত তা ক্রমেই বেড়েছে মাত্র। একটা বেশ্যা আমার যে মনকে চুরি করেছে, আত্মারাম পরমেশ্বর ছাড়া আর কেউ তাকে উদ্ধার করতে পারবে না। আশ্চর্যের কথা হল, উর্বশী নানা ভাবে যুক্তি দিয়ে আমাকে বোঝাবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু আমি এমন নির্বোধ এবং তরলমতি যে কিছুতেই আমার দারুণ মোহের নিবৃত্তি হয়নি। প্রকৃতপক্ষে উর্বশীই যে আমার অনিষ্ট করেছে তা নয়। আমার আত্মজ্ঞান লাভ হয় নি, আমি

---

১ তুলনীয়: অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ।। কঠ, ১।২।৫

২ ইলার পুত্র বলে পুরূরবার এই নাম।

ইন্দ্রিয়জয়ও করতে পারি নি, তাই রজ্জুকে সর্প মনে করার মত ভুল করেছি। সুতরাং পদস্খলের অপরাধ আমারই, উর্বশীর নয়। কোথায় বা দুর্গন্ধময় মলের মত অশুচি নারীদেহ আর কোথায় ফুলের সুগন্ধ, বিশুদ্ধতা, সৌকুমার্য ইত্যাদি গুণ। একমাত্র অবিদ্যাবশেই ঐ দেহে এই সব গুণের আরোপ করা হয়েছে। ১২-১৮

এই দেহ কার সম্পত্তি? এ কি জন্মদাতা বলে পিতামাতার, ভোগপ্রদ বলে ভার্যার, না পালনকর্তা বলে স্বামীর অথবা শেষ পর্যন্ত আহুতিরূপে গ্রহণ করেন বলে অগ্নির? নাকি এ শকুনে কুকুরে খায় বলে তাদেরই? অথবা এও হতে পারে, দেহের দ্বারা যে শুভ বা অশুভ কাজ করা হয়, আত্মা দেহে থেকে তা ভোগ করেন বলে দেহ আত্মারই ধন, কিংবা বন্ধু উপকার করে বলে তার। এইভাবে যে বিচার করে না দেখে সে ব্যক্তিই যে দেহ কৃমি, বিষ্ঠা, ভস্ম ইত্যাদিতে পরিণত হয় সেই (নারী-) দেহ দেখে ভাবে—আহা, এই রমণীর মুখখানি কি সুন্দর! ওর নাকটি কি সুগঠিত! হাসিটি কি মিষ্টি! আর মোহে আবিষ্ট হয়। ত্বক, মাংস, রক্ত, স্নায়ু, মেদ, মজ্জা ও অস্থি এই সপ্ত ধাতুতে গঠিত দেহ বিষ্ঠা আর মূত্রের আধার। এই দেহে রমণ করে যে তৃপ্তি পায় বিষ্ঠাভোজী কৃমির সঙ্গে তার পার্থক্য কোথায়? বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সংস্পর্শ না হলে মন ক্ষুব্ধ হয় না।[1] যিনি বিবেকী তিনি এ তত্ত্ব জেনে কখনও স্ত্রী অথবা স্ত্রীবিষয়ক ব্যাপারে লিপ্ত হন না। ইন্দ্রিয়-সংযম দ্বারাই মনের বিক্ষোভ বা উত্তেজনা উপশমিত হয়ে মন স্থির, শান্ত হয়। পণ্ডিত এবং আত্মা-অনাত্মা বিচারে দক্ষ ব্যক্তিরও কখনই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় আর মনকে বিশ্বাস করা ঠিক নয়। সেক্ষেত্রে আমার মত বিচারহীন ব্যক্তির তো কথাই নেই। তাই ইন্দ্রিয়ভোগের পথে প্রীতিলাভ করব এই আশায় কামিনী বা কামুকের সংসর্গ একেবারেই উচিত নয়। ১৯-২৪

ভগবান বললেন, নৃপচূড়ামণি মহারাজ ঐল মনের এই সব ভাব প্রকাশ করে উর্বশীলোক ছেড়ে চলে এলেন এবং নিজ হৃদয়ে নিয়ন্তারূপে অবস্থিত আমার পরমাত্মরূপ জেনে পরমজ্ঞান লাভ করলেন। তাঁর মোহনাশ হল; তিনি জন্ম-মরণরূপ সংসার থেকে নিষ্কৃতি লাভ করলেন। তাই বুদ্ধিমান ব্যক্তির কর্তব্য হচ্ছে কুসঙ্গ ছেড়ে সাধুসঙ্গ করা যাতে সাধুদের উপদেশে তাঁর মনের আসক্তি আর সংশয় দূর হয়ে যায়। সাধুরা সংসারে কিছু পাবার আশা না রেখে ভগবানে মন সমর্পণ করে শান্ত হন। কেউ তাঁদের শত্রু বা মিত্র নয়, তাঁরা সমদর্শী, অভিমান এবং মমতা বর্জিত, সুখদুঃখের দ্বন্দ্ব, স্ত্রীপুত্রের স্নেহপাশ থেকে মুক্ত।[2] তাঁরা আমার লীলাকথা সর্বদাই আলোচনা করেন। শ্রদ্ধা ও ভক্তির সঙ্গে তা শুনলে মানুষ অনায়াসে পাপের হাত থেকে রক্ষা পেতে পারে এবং তা কীর্তন আর আলোচনা করে আমাতে ভক্তিলাভ করে। ভগবান অনন্তশক্তি। তিনি শ্রেষ্ঠদের শ্রেষ্ঠ, সর্বকারণের কারণ, আনন্দমূর্তি। তাই ভগবানে ভক্তিলাভ হলে জীবের আর কোন লাভ বাকী থাকে? অগ্নির আশ্রয় পেলে যেমন শীত, অন্ধকার ও ভয় দূর হয়, সাধুদের সেবা করলেও তেমনি সমস্ত পাপ নষ্ট হয়, সংসারভয় দূর হয়। মজ্জমান ব্যক্তির যেমন নৌকাই পরম অবলম্বন, ঘোর সংসার-সাগরে মগ্ন মানুষের পক্ষে তেমনি ব্রহ্মজ্ঞানী সাধুরাই পরম আশ্রয়। অন্ন যেমন প্রাণিগণের প্রাণস্বরূপ, আমি যেমন তাপজর্জর ব্যক্তির একান্ত আশ্রয়, ধর্ম যেমন পরলোকের একমাত্র সম্বল,—

১ দ্রষ্টব্য: মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ ॥ গীতা, ২।১৪
২ দ্রষ্টব্য: গীতা, ৪।২২ ও ৬।৯ শ্লোক।

সেরকম সংসারভয়ে ভীত ব্যক্তির পক্ষে সাধুরাই হলেন প্রধান অবলম্বন এবং পরিত্রাতা। সূর্যের উদয়ে রাত্রির অন্ধকার দূর হলে চক্ষু বাইরের বস্তুকে দেখবার দৃষ্টি পায়। সাধুর সংস্পর্শ ঘটলে তেমনি অজ্ঞানরূপ অন্ধকার দূর হয়ে সংসারী জীবের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হয়। তাই যে সাধু ভক্তিপথের উপাসক তিনি ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতার মত আরাধ্য, উপকারী স্বজনের মত মান্য, আত্মার মত প্রিয় এবং ইষ্টদেবতার মত পূজ্য। প্রতিমাতে দেবতার মত সাধুর মূর্তিতেই আমি লোকের কাছে আবিভূর্ত হই। ২৫-৩৪

ভগবান বললেন, উদ্ধব, সুদ্যুম্নের পুত্র পুরূরবা এইরকম আত্মগ্লানি প্রকাশ করে, উর্বশীর প্রতি স্পৃহাশূন্য হলেন এবং তার সঙ্গ ত্যাগ করে পরমাত্মচিন্তায় মগ্ন হয়ে অনাসক্তচিত্তে পৃথিবীতে বিচরণ করতে লাগলেন।[1] ৩৫

সপ্তবিংশ অধ্যায়

ক্রিয়াযোগ বর্ণন

উদ্ধব বললেন, ভগবান, ভক্তেরা যে প্রণালীতে আপনার উপাসনা করে থাকেন সেই ক্রিয়াযোগ আপনি আমাকে বলুন। নারদ, ব্যাসদেব, বৃহস্পতি এবং অন্যান্য মুনিরা বারবার তাকেই মানুষের মুক্তির পথ বলে বর্ণনা করেছেন। আপনার মুখপদ্ম নিঃসৃত এই পবিত্র উপদেশ ভগবান ব্রহ্মা তাঁর মানসপুত্র ভৃগু প্রভৃতিকে দান করেছিলেন এবং দেবদেব মহাদেব ভবানীকে বলেছিলেন। এই পূজা-প্রণালী সকল বর্ণের, আশ্রমের, মানুষের এবং স্ত্রীলোক ও শূদ্রদের পক্ষেও ধর্ম প্রভৃতি চতুর্বর্গ লাভের সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় একথা আমি শুনেছি। হে পদ্মপলাশলোচন, আপনি জগতের নিয়ন্তা, আপনার কিছুই অজ্ঞাত নেই। আমিও আপনার শরণাগত ভক্ত। কর্মের বন্ধন মোচনের ঐ উপায় আপনি আমাকে বলুন। ১-৫

ভগবান বললেন, উদ্ধব, কর্মকাণ্ড সীমাহীন; এ বিষয়ে গ্রন্থ, প্রকরণ ইত্যাদি অসংখ্য। তাই আমি অতি সংক্ষেপে যথাবিধি বর্ণনা করছি, শোন। ভগবানের উপাসনার তিনটি প্রণালী আছে—বৈদিক, তান্ত্রিক আর এই দুয়ের মিশ্রিত। এর মধ্যে যার যেটি মনোমত সেইটি দ্বারাই সে আমার পূজা করতে পারে। ব্রাহ্মণ ইত্যাদি তিন বর্ণের মানুষ যার যেমন অধিকার সেইরকমভাবে যথাবিধি উপনয়নের পর যে যেমন ভাবে, শ্রদ্ধায় এবং ভক্তিতে আমার অর্চনা করবে তা সবিস্তারে বলছি, শোন। যিনি দ্বিজ হয়েছেন তিনি অনাসক্ত হয়ে প্রতিমায়, বালুকা-বেদীতে, অনলে, সূর্যে, জলে বা আপন হৃদয়ে গন্ধপুষ্প ইত্যাদি উপকরণ দ্বারা পূজা করতে পারেন। সর্বপ্রথমে দাঁত মেজে স্নান করতে হবে। স্নানের সময় বৈদিক এবং তান্ত্রিক দুরকম মন্ত্রেই মাটি আর গোময় গায়ে মেখে শুদ্ধ হতে হবে। তিন বর্ণের মধ্যে যাঁর যেমন বিধি তিনি সেভাবে সন্ধ্যা-বন্দনা করে আমার পূজা করবেন। আট রকম প্রতিমাতে পূজা করা যেতে পারে—শিলাময়ী, কাষ্ঠময়ী, ধাতুময়ী, মাটি বা চন্দনের লেপনে প্রস্তুত, চিত্রপট, বালুকাময়ী, মনোময়ী এবং মণিময়ী। ঐ প্রতিমা আবার দুরকম—চলা অর অচলা; উভয়েই ভগবানের আবির্ভাব হয়। অচলা প্রতিমাতে পূজা করলে আবাহন বা বিসর্জনের প্রয়োজন

[1] পুরূরবা ও উর্বশীর পূর্ব কাহিনী নবম স্কন্ধের চতুর্দশ অধ্যায়ে বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে।

নেই। চলা প্রতিমাতে আবাহন-বিসর্জন হতেও পারে, না হতেও পারে। বালুকাময়ী প্রতিমাতে দুই-ই সম্ভব। মৃন্ময়ী বা চিত্রপটের প্রতিমা ছাড়া আর সব প্রতিমাকে স্নান করাতে হয়। অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রতিমাকে শুধু মাজতে হবে। ৬-১৪

ভক্তেরা নিষ্কামভাবে শাস্ত্রবিহিত এবং দেশ, কাল আর সামর্থ্য অনুসারে আয়োজিত দ্রব্যে ভক্তিভাবে নানা প্রতিমায় আমার পূজা করবে। জীবের হৃদয়রূপ মনোময়ী প্রতিমাতে পূজা করার জন্য বিশুদ্ধ ভাব ছাড়া অন্য উপচারের অপেক্ষা নেই। প্রতিমার স্নান এবং অলংকরণ আমার প্রিয়তম অনুষ্ঠান। প্রতিমার প্রধান অঙ্গে অধিষ্ঠিত দেবতাকে উল্লেখ করে মন্ত্রপাঠ দ্বারা তাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে হয়। আগুনে ঘৃতসিক্ত হোমদ্রব্যের আহুতি, সূর্যপ্রণাম, অর্ঘ্যদান এবং জলে জল প্রভৃতি উপকরণে অর্চনা করলে ভগবান প্রসন্ন হন। ভক্ত শ্রদ্ধায় আমাকে সামান্য জলমাত্র দিলেও তাকে আমি প্রিয় বলে মনে করি, কিন্তু অশ্রদ্ধায় নানা সামগ্রী দিলেও সন্তুষ্ট হই না।[১] তাই উপচারসমূহ শ্রদ্ধার সঙ্গে দিলেই যে আমার তৃপ্তি তা বলাই বাহুল্য। পূজায় বসবার আগেই পূজায় যা যা লাগবে তা জোগাড় করে কাছে সাজিয়ে রাখবে। নিজে স্নান করে পবিত্র হয়ে পূর্ব বা উত্তরমুখ হয়ে কুশাসনে বসে প্রতিমাকে সামনে রেখে পূজা শুরু করবে। গুরু প্রণাম করে অঙ্গন্যাস আর করন্যাস করবার পর হাত দিয়ে প্রতিমার অঙ্গ থেকে নির্মাল্য প্রভৃতি সরিয়ে ফেলে অঙ্গসংস্কার করবে। তারপর একটি জলভরা কলস আর প্রোক্ষণের (সিঞ্চনের) জন্য একটি জলপাত্র বসিয়ে ফুলচন্দন দিয়ে তাদের শোধন করবে। জলপাত্র থেকে জল নিয়ে পূজার জায়গা, পূজার দ্রব্য এবং নিজের গায়ে সিঞ্চনের পর পাদ্য, অর্ঘ্য আর আচমনের জন্য তিনটি পাত্র পূর্ণ করবে. শাস্ত্রোক্ত মঙ্গলদ্রব্যও তাতে দেবে। ঐ তিনটি পাত্রে অঙ্গুলি স্পর্শ করে 'হৃদয়ায় নম', 'শিরসে স্বাহা' এবং 'শিখায় বষট্' এই ক্রমে গায়ত্রীদ্বারা মন্ত্রপূত করবে। আমার নারায়ণমূর্তি বায়ু-অগ্নি দ্বারা শোধিত দেহে হৃৎপদ্মে স্থিত শ্রেষ্ঠ সূক্ষ্মমূর্তি। সিদ্ধেরা ঐ মূর্তিকেই প্রণবমন্ত্রে ধ্যান করেন। পূজক প্রাণায়াম দ্বারা ঐ নারায়ণমূর্তির ধ্যান করবেন। নিজের সঙ্গে ঐ মূর্তি অভিন্ন এই চিন্তাদ্বারা যখন পূজকের দেহ ঐ মূর্তির দ্বারা পরিব্যাপ্ত হবে তখন তিনি প্রথমে মনে মনে তার পূজা করে ভগবদ্‌ভাবে তন্ময় হয়ে সেই ভাব প্রতিমাতে আবাহন করে তাতে স্থাপন করবেন। তারপর অঙ্গন্যাস ইত্যাদি করে পূজা করতে থাকবেন। ১৫-২৪

ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য এবং অধর্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য আর অনৈশ্বর্য এই আটটি দলে শোভিত, নয় রকম শক্তিতে পুষ্ট এবং সূর্যমণ্ডলের মত উজ্জ্বল কর্ণিকা আর কেশরে দীপ্তিমান পদ্মকে আমার আসনরূপে কল্পনা করবে। তারপর বেদ ও তন্ত্রের বিধি অনুসারে গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য ইত্যাদি দিয়ে ভোগ এবং মুক্তি কামনা করে আমার পূজা করবে। পরে সুদর্শন চক্র, পাঞ্চজন্য শঙ্খ, গদা, ধনু, বাণ, অসি, শূল, মুষল—এই আটরকম অস্ত্র, গলায় কৌস্তুভ মণি ও বনমালা এবং বুকে শ্রীবৎস-চিহ্নকে একে একে পূজা করবে। এর পর নন্দ, সুনন্দ, প্রচণ্ড, চণ্ড, মহাবল, বল, কুমুদ, কুমুদেক্ষণ, দুর্গা, গণেশ, গরুড়, ব্যাস, বিষ্বক্‌সেন, গুরুগণ আর দেবগণ এই সহচরগণ মূল দেবতার দিকে মুখ করে আট দিকে তাঁকে

---

১ যজ্ঞ, দান, তপস্যা বা অন্য কোন কর্ম অশ্রদ্ধার সঙ্গে অনুষ্ঠিত হলে তা অসৎ বলে কথিত হয়। সে সকল কর্ম ইহলোকে বা পরলোকে কোথাও ফলপ্রদ হয় না।—গীতা, ১৭।২৮

ঘিরে নিজের নিজের জায়গায় রয়েছেন, এইরকম মনে করে তাঁদেরও পুজো করবে। সামর্থ্য থাকলে ভক্ত রোজই চন্দন, উশীর-তৃণ, কর্পূর, কুঙ্কুম ও অগুরু দ্বারা সুবাসিত জলে মন্ত্রপাঠ করে আমাকে স্নান করাবে। সুবর্ণ, অর্ঘ্য, মহাপুরুষ বিদ্যা, পুরুষ সূক্ত ও রাজনাদি সামমন্ত্রে পুজো করবে। যাতে প্রেম এবং ভক্তি জন্মে তার জন্য বস্ত্র, উপবীত, অলংকার, তুলসীদল, মাল্য, গন্ধ ও অনুলেপন দ্বারা ভক্ত আমার প্রতিমাকে ভূষিত করবে। পাদ্য, আচমনীয়, চন্দন, পুষ্প, ধূপ, দীপ এবং নৈবেদ্য শ্রদ্ধায় আমাকে নিবেদন করবে। ক্ষমতা থাকলে গুড়, পায়েস, ঘি, জিলাপী, পিষ্টক, মোদক, পরমান্ন, দই এবং ব্যঞ্জনের নৈবেদ্য দিয়ে রোজই আমার পুজো করবে। শক্তি থাকলে রোজ আর না হলে একাদশী প্রভৃতি দিনে সুগন্ধি তেল দিয়ে প্রতিমার মার্জনা, দর্পণ দান, দাঁতমাজা, পঞ্চামৃত দিয়ে অভিষেক, অন্ন ইত্যাদি দান, নাচ-গান এসব করা বিধেয়। পুজক নিজের অধিকার অনুযায়ী বেদোক্ত সূত্র অনুসারে মেখলা, কুশ ও বেদী দিয়ে কুণ্ড রচনা করে তার চারদিকে আগুন জ্বালাবে, তারপর হাত নেড়ে সেই আগুনকে উদ্দীপিত করে একসঙ্গে মিলিয়ে দেবে। ২৫-৩৬

তারপর কুণ্ডের চারপাশে কুশ বিছিয়ে বিধি অনুসারে সমিধ প্রক্ষেপ ইত্যাদি দ্বারা অগ্ন্যাধান[১] কর্ম করবে। অগ্নির উত্তরদিকে হোমের দ্রব্য সব রেখে জলপাত্র থেকে জল নিয়ে তাতে ছিটিয়ে দিতে হবে এবং অগ্নির মধ্যে আমাকে এইরকম ভাবে চিন্তা করবে—গলান সোনার মত বর্ণ, চার হাতে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম শোভা পাচ্ছে, প্রশান্ত, পদ্মকেশরের মত পীতবস্ত্রধারী, উজ্জ্বল মুকুট, বলয়, কটিসূত্র, অঙ্গদ প্রভৃতি ভূষণে অলঙ্কৃত, বক্ষে শ্রীবৎস, কণ্ঠে কৌস্তুভ, বনমালা। এইরকম ধ্যান করে পুজো করবে এবং শুকনো কাঠ ঘৃতে সিক্ত করে অগ্নিতে দেবে। পরে 'প্রজাপতয়ে স্বাহা', 'ইন্দ্রায় স্বাহা' এই দুই মন্ত্রে উত্তর, দক্ষিণ পরিসন্ধি শুরু করে অগ্নির মধ্য থেকে পরিধ্যান পর্যন্ত দুটি আজ্যভাগ[২] 'অগ্নয়ে স্বাহা' আর 'সোমায় স্বাহা' এই মন্ত্র উচ্চারণ করে অগ্নিতে দেবে। আবার ঘৃতাক্ত সমিধ দিয়ে 'ওঁ নমো নারায়ণায় স্বাহা' এই মূল মন্ত্রের দ্বারা সংকল্প করা আহুতি অগ্নিতে দেবে। তারপর ষোলটি ঋক উচ্চারণ করে তাদের এক একটির সাহায্যে এক একবার আহুতি দেবে আর পুরুষসূক্তের দ্বারা হোম করবে। 'ধর্মায় স্বাহা' এই রকম স্বাহান্ত (যার শেষে 'স্বাহা' আছে) মন্ত্র পড়ে ধর্ম প্রভৃতি প্রত্যেকের নাম উচ্চারণ করে ক্রমান্বয়ে পুজো করতে করতে অগ্নিতে আহুতি দিতে হবে। পরে হোতা 'অগ্নয়ে স্বিষ্টিকৃতে স্বাহা' এই মন্ত্রে স্বিষ্টিকৃত হোম করে অগ্নিতে বিদ্যমান ভগবানের অর্চনা, হোম এবং প্রণাম করে নন্দ প্রভৃতি পার্ষদদের উদ্দেশে বলি দেবে। পুজক আবার পুজার আসনে বসে পূর্ণব্রহ্মকে স্মরণ করে শক্তি অনুসারে মূলমন্ত্র জপ করবে। এরপরে প্রতিমাতে অবস্থিত ভগবানের ভোজন সমাপ্ত হয়েছে এরকম চিন্তা করে ভগবানকে (আচমনীয়) আঁচাবার উপকরণ দেবে। শেষ নৈবেদ্য দিতে হবে ভগবানের শ্রেষ্ঠ পার্ষদ বিষ্বক্‌সেনকে। পরে কর্পূর প্রভৃতি দ্বারা সুবাসিত তাম্বূল (মুখশুদ্ধি) নিবেদন করে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে পুজো শেষ করবে। এরপর আমার লীলা বিষয়ে গান, অভিনয়, নাম-মহিমা-কীর্তন, নৃত্য, বক্তৃতা করে, আমার কথা স্মরণ করে, শুনে, শুনিয়ে কিছুকাল আনন্দ করবে। কখনও উচ্চ, কখনও নিম্নকণ্ঠে পৌরাণিক বা প্রচলিত স্তোত্র ইত্যাদি দ্বারা আমার স্তব করে প্রার্থনা করবে—হে ভগবান, আমার প্রতি প্রসন্ন

১ বেদমন্ত্র সহযোগে অগ্নিস্থাপন। ২ হব্য বা যজ্ঞীয় ঘৃত।

হোন। এই প্রার্থনার পরে দণ্ডবৎ প্রণাম করতে হবে। প্রণামের সময় হাতজোড় করে প্রতিমার দুই পায়ের মাঝখানে মাথা রেখে, ডান আর বাঁ হাতে প্রতিমার ডান এবং বামপদ ধারণ করবে, আর বলবে—হে ঈশ্বর; মৃত্যুরূপ কুমীর ইত্যাদিতে পূর্ণ সংসার-সাগর দেখে ভীত আমি আপনার চরণে শরণ নিলাম, আপনি আমাকে ত্রাণ করুন। ৩৭-৪৬

প্রার্থনা হয়ে গেলে আমার নির্মাল্য নিয়ে তাকে আমার প্রসাদ মনে করে আদর করে মাথায় রাখবে. আমার চিন্ময় মূর্তি হৃদয়ে ধ্যান করবে। প্রতিমা বিসর্জনীয় হলে তাতে ঈশ্বরের যে জ্যোতির্ময় রূপ স্থাপন করা হয়েছিল তা আবার নিজের হৃদয়-জ্যোতিতে লীন করবে। প্রতিমার মধ্যে যখন যেটিতে পূজকের শ্রদ্ধা হবে তাতেই আমার পূজা করবে। স্থাবর-জঙ্গম সব কিছুতেই আমি নিত্য প্রতিষ্ঠিত আছি, কেবল ভক্তে শ্রদ্ধা বা ভাব অনুসারে প্রকাশিত হই, এইমাত্র পার্থক্য। এ ভাবে বৈদিক ও তান্ত্রিক পদ্ধতিতে আমার পূজা করলে ভক্ত তাঁর প্রার্থিত ফল লাভ করেন। পূজকের অর্থবল থাকলে দৃঢ় মন্দির তৈরী করে তাতে আমার প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করবে এবং তার কাছে সুন্দর ফুলের বাগান তৈরী করাবে, নিত্য পূজা, পর্ব উপলক্ষে যাত্রা, মহোৎসব এবং অন্যান্য প্রাত্যহিক কাজ যাতে বরাবর চলে তার ব্যবস্থা করবে। যাতে এই সব কাজ সুষ্ঠু এবং ধারাবাহিকভাবে চলে তার জন্য ভূমি এবং অন্যান্য সম্পত্তি দেবসেবার জন্য দান করবে! এই সব কাজের মধ্য দিয়ে ভক্ত আমার সমান ঐশ্বর্য লাভ করেন। ভগবানের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করলে সার্বভৌমত্ব, মন্দির প্রতিষ্ঠায় তিন ভুবন আর পূজায় ব্রহ্মলোক লাভ হয়। এই তিনটিই একসঙ্গে করলে আমার সমতা লাভ হয়। ফলের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে এই ভাবে পূজা করলে মানুষ আমার স্বরূপ এবং ভক্তিযোগ পান। কিন্তু নিজের বা অন্যের দেওয়া দেবতা বা ব্রাহ্মণের সম্পত্তি যে হরণ করে সে অনন্ত অযুত বছর বিষ্ঠাভোজী কৃমি হয়ে নরকে বাস করে। আর এইকাজে যে সাহায্য করে; উৎসাহ দেয় এবং এমনকি সমর্থনও করে, সেও পরলোকে ঐ রকম ফল পেয়ে থাকে। তবে পাপের গুরুত্ব অনুসারে তার ফলেরও তারতম্য অবশ্য হবে। ৪৭-৫৫

অষ্টাবিংশ অধ্যায়

পরমার্থ জ্ঞান নির্ণয়

ভগবান বললেন, উদ্ধব, এই বিচিত্র জগৎসংসার তিন গুণের সাম্যাবস্থা প্রকৃতি থেকে উৎপন্ন হয়েছে। পরমাত্মার প্রেরণায় জড় প্রকৃতি চেতনের মত উৎপাদন-ক্ষমতা পেয়ে জীব-জগতের সৃষ্টি করেছে। তাই এক পরমাত্মাই সর্বত্র এবং সর্ব বস্তুতে অধিষ্ঠিত, প্রকৃতি-পুরুষের সঙ্গে বিশ্বের সবকিছু একাত্ম। সুতরাং কারো শান্ত বা অশান্ত স্বভাব, সৎ বা অসৎ কাজের জন্য নিন্দা-প্রশংসা কোনটাই করা উচিত নয়। যে তা করে সে নিজের দেহে বা গৃহে আসক্ত হয়ে আত্মস্বরূপ উপলব্ধি থেকে বঞ্চিত হয়। ইন্দ্রিয়গুলি যখন রাক্ষস অহংকারের দ্বারা অভিভূত হয় তখন দেহে অবস্থিত জীব কেবল মনরূপে থেকে স্বপ্ন অনুভব করতে থাকে। মনও যখন সুষুপ্তিতে বিলীন হয় তখন জীব সজ্ঞাহীন হয়ে মৃত্যুতুল্য সুষুপ্তিকে আশ্রয় করে। যে পুরুষ দ্বৈত বিষয়ে নিবিষ্ট সে জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আবর্তিত

হয়ে ঘুরতে থাকে। সমস্ত সংসারই যেহেতু মায়ার রচনা, সেখানে মিথ্যাও অবস্তু কল্পনামাত্র। কথায় যা বলা যায়, ইন্দ্রিয় দ্বারা যা অনুভব করা যায় বা মনদ্বারা যা স্মরণ বা কল্পনা করা যায় সবই দ্বৈত ভাবের অভিব্যক্তি, সুতরাং অলীক। যার সবই মিথ্যা, সবই মায়া তার আর ভাল-মন্দ সুখ্যাতি-অখ্যাতি কি? তার ভালও যেমন মিথ্যা, মন্দও তাই। তবুও প্রতিবিম্ব, প্রতিধ্বনি আর ভ্রম—এই তিনটি পদার্থ না হলেও পদার্থের জ্ঞান জন্মায়। সেইরকম বিচার করে দেখলে দেহ ইত্যাদি পদার্থ মিথ্যা অথচ মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত জীব এর থেকে উৎপন্ন সংসার-ভয় ভোগ করে। বেদান্তে বলা হয়েছে যে এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড পরমাত্মাই। এক তিনি সমস্ত হন, সমস্তই করেন। তিনি বিশ্বরূপে প্রকাশিত হয়েছেন, আবার ঈশ্বররূপে মুক্তি দিচ্ছেন। প্রলয়কালে নিজেই নিজেকে বিলীন করে তিনি সৃষ্টিকে সংহার করছেন।[১] বেদ যখন পরমাত্মা ছাড়া অন্য কোন বস্তুর পৃথক অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, তখন জলে যেমন ফেনা তেমনি তাঁর সত্তাতেই নিখিল সংসারের বিকাশ। তাই জীবাত্মার দেহ, ইন্দ্রিয়, অন্তঃকরণ (অধিভূত, অধিদেব, অধ্যাত্ম) এই তিন ভাবের জ্ঞান অমূলক, ভ্রান্ত। ব্রহ্মস্বরূপ থেকে উৎপন্ন হলেও এই তিন ভাব ব্রহ্মের মায়ারূপ শক্তির কাজ এবং ত্রিগুণাত্মক। জ্ঞানবিজ্ঞানের চরম মীমাংসা, আমার বলা এই ভাবকে যিনি নিশ্চয় করে বুঝতে পারেন তিনি কখনও পরের স্বভাব বা কাজের দোষগুণ দেখে তার নিন্দা বা প্রশংসা করেন না; সূর্যের মত সমদৃষ্টি হয়ে জগতে বিচরণ করেন।[২] ইন্দ্রিয়ের সংযোগে বিষয়ের প্রত্যক্ষ জ্ঞান, চিহ্ন দেখে বিষয় সম্বন্ধে অনুমান ও বেদ প্রভৃতির থেকে লব্ধ আত্মজ্ঞান—এই কটির সাহায্যে বিচার করে আত্মা ছাড়া অন্য পদার্থকে উৎপত্তি এবং বিনাশশীল বলে জানবে এবং বিষয়ে আসক্তি বর্জন করে নির্লিপ্তভাবে সংসারে থাকবে। ১-৯

উদ্ধব বললেন, প্রভু, দেহের বিষয়ে দুটি বস্তুর অনুভূতি হয়, চৈতন্যময় আত্মা আর অচেতন দেহ। আত্মা সবকিছুর সাক্ষী, দ্রষ্টা, স্বতঃসিদ্ধ, জ্ঞানবান নির্লিপ্ত। দেহ জ্ঞানহীন জড়বস্তু। এই দৃশ্যমান বিশ্বসংসার উভয়ের কারোরই নয়। এ তবে কার? তা আপনি আমাকে বলুন। ভগবান বললেন, যতদিন শরীর, ইন্দ্রিয় আর প্রাণের সঙ্গে আত্মার যোগ থাকে ততদিন সংসার অবস্তু হলেও অজ্ঞানীর চোখে বস্তু বলে মনে হয়। স্বপ্নে দেখা নিজের শিরশ্ছেদ প্রভৃতি নানা দুঃখের দৃশ্য যেমন মিথ্যা হলেও স্বপ্নকালে সত্যের মত মনে হয় তেমনি বিষয়চিন্তায় আকুল হয়ে মানুষ মিথ্যা সুখদুঃখের অনন্ত স্রোতে ভাসছে বলে অনুভব করে। লোকে যতক্ষণ স্বপ্নে দেখে ততক্ষণই স্বপ্নে দেখা বিষয়কে সত্য ভেবে তার দরুন সুখদুঃখ উপভোগ করে, কিন্তু জেগে গেলে আর স্বপ্নের বস্তু তাকে ভীত বা আনন্দিত করতে পারে না; তেমনি অজ্ঞানীর পক্ষেই সংসার নানা দুঃখের কারণ, জ্ঞানীর পক্ষে নয়। শোক, হর্ষ, ভয়, ক্রোধ, লোভ মোহ, আকাঙ্ক্ষা, এইগুলি অহংকার থেকেই জন্মায়, কারণ গাঢ় ঘুমে নিদ্রিত ব্যক্তির মধ্যে এর কোনটাই দেখা যায় না। তেমনি জন্ম এবং মৃত্যুর অধিকার শুধু দেহের উপরেই, আত্মাতে নয়। আত্মার যখন 'দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ এবং মনই আমি' এই অভিমান হয় তখনই তিনি তাদের (দেহাদির) অন্তরে থেকে জীব নামে পরিচিত হন। জীব গুণময়, কর্মময় মূর্তিতে নিজেকে প্রকাশ

১ সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি।। ছান্দোগ্য উপনিষৎ, ৩।১৪।১
২ তুলনীয়: গীতা, ৪।২২

করেন এবং লিঙ্গদেহ বা মহত্তত্ত্ব ইত্যাদি কারণদেহ স্বীকার করে বিশ্ব, তৈজস, প্রাজ্ঞ বা দেবতা, মানুষ, তির্যক এই সব নামে অভিহিত হন এবং কালবশে সংসার লাভ করেন। ১০-১৭

অবিদ্যার প্রভাবে দেব, মানুষ এইরকম অনেক রূপে প্রকাশিত কিন্তু আসলে অমূলক বা ভিত্তিহীন অহংকারই মন, দশ ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ের কাজ, প্রাণশক্তি এবং ভূতময় দেহ রচনা করে। তাই সেই অহংকারকে সমূলে বিনষ্ট না করতে পারলে সংসার থেকে নিষ্কৃতি নেই। গুরুর উপাসনা আর ভগবানে ভক্তি দ্বারাই জ্ঞান লাভ হয়ে থাকে। তীব্র ভক্তির দ্বারা শাণিত জ্ঞানরূপ অসিতেই অহংকারের মূলোচ্ছেদ সম্ভব। অহংকার নষ্ট হলে বিষয়ে আসক্তি ত্যাগ করে ও ঈশ্বরে মন অর্পণ করে সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়ালেও যোগীর আর সংসার হয় না। সৃষ্টির আগে এবং সৃষ্টিশেষে যিনি সৎরূপে বর্তমান থাকেন, সৃষ্টির মধ্যভাগেও পরম কারণ এবং উপাদানরূপে সেই পরমব্রহ্মই বিরাজ করছেন। বেদ অধ্যয়ন, স্বধর্মনিষ্ঠা, প্রত্যক্ষ অনুভব, গুরুর উপদেশ, অনুমান ও তর্ক প্রভৃতির সাহায্যে বিশ্ব ব্রহ্মময় এই প্রকৃত জ্ঞান জন্মে। যে সোনা দিয়ে অলংকার তৈরী হয় তা যেমন তৈরীর পরেও সোনাই থাকে শুধু গঠন বা রূপ অনুসারে কটক বা কুণ্ডল নাম পায়, তেমনি সৃষ্টির আদিতে এবং অন্তে একই রূপে অবস্থিত পরমাত্মাস্বরূপ আমিই বিশ্বের কারণ, শুধু সৃষ্টির নানা রূপে নানা নামে প্রকাশিত হই। ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান, এই তিন অবস্থাতেই যিনি বিদ্যমান তিনিই বিজ্ঞান বা জীবাত্মা। তিন গুণের কাজ ইন্দ্রিসমূহ, দেহ এবং অহংকার এরাই সংসারের কারণ, কার্য আর কর্তা। এগুলি যাঁর সত্তায় কার্যকর হয় আর যাঁর সঙ্গে সম্পর্কিত না হলে নিষ্ক্রিয় থাকে সেই পরমার্থ সৎস্বরূপ আমিই সবকিছুর প্রকাশকরূপে সর্বত্র বর্তমান। সৃষ্টির আগে যা ছিল না বা অন্তে যা থাকবে না এই দুয়ের মধ্যভাগে অর্থাৎ যতকাল সৃষ্টি আছে ততকাল যা সেই সোনার মত নিজ স্বরূপেই থেকে শুধু ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত হয়, সেই সর্বপ্রকাশক ভাবই ব্রহ্ম। অলংকারের থেকে সোনা যেমন আলাদা নয় সেরকম আমি কার্যরূপে পরিণত না হয়েও সৃষ্ট জগৎ থেকে কোনরকমে পৃথক নই। যে সাত্ত্বিক, রাজসিক বা তামসিক বস্তুসমূহ সৃষ্টির পূর্বে ছিল না, কিন্তু সৃষ্টির সময়ে ব্রহ্মের শক্তিতে প্রকাশিত হয়ে তবে প্রকাশ পাচ্ছে, ব্রহ্ম এই সবেরই উপাদান-কারণ এবং প্রকাশক। সুতরাং দশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চতন্মাত্র, মন, দেবতা আর পঞ্চ মহাভূত প্রভৃতির সমবায়ে বিচিত্র সংসাররূপে এক পরাৎপর পূর্ণ ব্রহ্মই নিজেকে প্রকাশিত করছেন। তাই প্রত্যক্ষ, অনুমান আর আপ্তবাক্য প্রভৃতির দ্বারা বিচার করে তীক্ষ্ন আত্ম-অনাত্ম জ্ঞানের দ্বারা দেহাভিমান বিসর্জন দেবে এবং আত্মার বিষয়ে যাবতীয় সন্দেহ সমূলে নষ্ট করে শান্তভাবে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের কাজ থেকে নিবৃত্ত হয়ে ভোগে আসক্তি ত্যাগ করবে। ১৮-২৩

দেহ, ইন্দ্রিয়সমূহ, দেবতা, প্রাণ, বায়ু, ক্ষিতি, আকাশ, জল, অগ্নি, মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহংকার, পঞ্চ মহাভূত এবং প্রকৃতি এই সবই ঘট ইত্যাদির মত জড় পদার্থ, আত্মা নয়। যে লোক আমার পবিত্র পরমাত্মা-স্বরূপকে ঠিকভাবে জেনেছেন, গুণময় ইন্দ্রিয়সমূহকে সমাহিত করে তাঁর আর বেশী কি উপকার হবে? কারণ মেঘের উপস্থিতিতে সূর্যের যেমন কিছু যায় আসে না তেমনি যিনি পরমার্থজ্ঞান লাভ করেছেন তাঁর ইন্দ্রিয়গুলি বিক্ষিপ্ত হলেও কোন ক্ষতির সম্ভাবনা নেই। আকাশ যেমন বৃষ্টি, বাতাস, আগুন, ধুলো, প্রভৃতির দ্বারা বা ঋতুপরিবর্তনের দরুন শীত-উষ্ণতায় কোনক্রমে প্রভাবিত হয় না, তেমনি যে সত্ত্ব, রজ এবং তমোগুণ

সংসারের কারণ, তাদের বা তাদের থেকে উদ্ভূত বিষয়ের সংস্পর্শে এলেও অক্ষয় পরমাত্মা কখনও কিছুতেই লিপ্ত হন না। কিন্তু যদিও জীবাত্মার সঙ্গে সংসারের সম্পর্ক নেই, তবু অজ্ঞান পুরুষের পক্ষে ভগবানে দৃঢ় ভক্তি একান্ত দরকার। আর যে পর্যন্ত ভক্তির প্রবলতায় মনের আসক্তি দূর না হয় ততদিন মায়ারচিত ধন, স্ত্রী, পুত্র ইত্যাদি বিষয়ের সঙ্গত্যাগ করা দরকার। চিকিৎসায় রোগ সম্পূর্ণ দূর না হলে তা যেমন আবার প্রবল হয়ে রোগীকে বিপন্ন করে, তেমনি চিত্ত থেকে বিষয়ে আসক্তি এবং কর্মের বাসনা নিঃশেষে দূর না করলে কুযোগীর হৃদয় যোগের পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়। স্ত্রীপুত্র, আত্মীয়-বন্ধু, শত্রুমিত্র প্রভৃতির মূর্তিতে দেবতারা যদি বাধা সৃষ্টি করে যোগীকে যোগপথ থেকে স্খলিত করেন, তবে সেই যোগী পূর্বজন্মের যোগবলের প্রভাবে পরজন্মেও যোগ অনুষ্ঠান করেন, সকাম কর্মে লিপ্ত হন না। সাধারণ জীব কোন না কোন পূর্বসংস্কারের বশে আমৃত্যু কর্ম করে এবং তার দ্বারা আবার সংস্কার অর্জন করে। কিন্তু বিবেকী ব্যক্তি শরীরে থেকেও আত্মানন্দ উপভোগের ফলে কর্মে অনাসক্ত থাকেন। ২৪-৩০

যাঁর বুদ্ধি সর্বদা আত্মানুসন্ধানে নিযুক্ত তাঁর দেহ যাই করুক—বসুক, চলুক, শুয়ে থাক, মলমূত্র ত্যাগ করুক, ভোজন করুক বা স্বভাবজ দর্শন, স্পর্শন প্রভৃতিতে আকাঙ্ক্ষা করুক—তাতে তাঁর চিত্ত আকৃষ্ট হয় না। ইন্দ্রিয়গণের ভোগ্য শব্দ ইত্যাদি বিষয় থেকে তৃপ্তি এবং সুখলাভ হয় একথা লোকে বললেও জ্ঞানী ব্যক্তি অনুমানের সাহায্যে তাকে দুঃখ এবং অতৃপ্তির কারণ বলে প্রতিপন্ন করেন। ঘুম ভাঙলে স্বপ্নে দেখা বস্তু যেমন নিজে থেকেই মিলিয়ে যায় এবং কেবল স্মৃতি-রূপেই মনে থাকে মাত্র, কিন্তু কোন কাজে লাগে না, তেমনি জ্ঞানী ব্যক্তির কাছে ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহের কোন অর্থ নেই। এর আগে গুণ এবং কর্মে সমৃদ্ধ এই দেহ, অহঙ্কার প্রভৃতিকে আত্মা থেকে অভিন্ন বলা হলেও আত্মজ্ঞানের প্রভাবে তা মিথ্যা হয়ে যাচ্ছে। দেহ প্রভৃতি প্রাকৃতিক পদার্থ চৈতন্যরূপ আমাকে গ্রহণও করতে পারে না বা বর্জনও করতে পারে না। সূর্যের উদয়ে কেবল দৃষ্টির আবরক অন্ধকারই নষ্ট হয়, কিন্তু ঘট পট প্রভৃতি পদার্থ সৃষ্টি হয় না, তেমনি আমার স্বরূপজ্ঞান পুরুষের বুদ্ধির অজ্ঞান অন্ধকার নষ্ট করে, কিন্তু বুদ্ধির কোন পরিবর্তন ঘটায় না। আত্মা স্বপ্রকাশ এবং জন্ম, মৃত্যু প্রভৃতি সব রকম বিকারের অতীত। তিনি সর্বভাবময়, তুলনারহিত, অপ্রমেয়; তিনি এক, অদ্বিতীয় এবং বাক্যের অগোচর, কারণ বাক্য ও প্রাণ তাঁরই প্রেরণায় আপন আপন কাজ করছে।[১] এই অভিন্ন আত্মার ভেদের কল্পনা মনের ভ্রম থেকেই হয়ে থাকে। কারণ ভ্রমেরও একটি আশ্রয় আছে। মনের ভ্রম যাকে আশ্রয় করে প্রকাশ পায়, তিনিই সত্যস্বরূপ সর্বাশ্রয় আত্মা। নাম-রূপ দ্বারা প্রকাশিত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এবং পঞ্চভূতে রচিত দ্বৈত দেহকে যে পাণ্ডিত্যাভিমানী ব্যক্তিরা সত্য এবং আত্মস্বরূপ জ্ঞান করেন এবং বেদান্তের বাক্যকে শুধুমাত্র অর্থবাদ বলে থাকেন, তাঁরা ভ্রম এবং বৃথা তর্কেরই অবতারণা করেন, কারণ দ্বৈত পদার্থের অস্তিত্ব নেই। ৩১-৩৭

যে যোগীর যোগ পরিপক্ক হয় নি তার শরীরে রোগ ইত্যাদির দরুন যদি

১ রবীন্দ্রনাথের ভাষায়:

> অগ্নির প্রত্যেক শিখা ভয়ে তব কাঁপে,
> বায়ুর প্রত্যেক শ্বাস তোমার প্রতাপে,
> তোমারি আদেশ বহি মৃত্যু দিনরাত
> চরাচর মর্মরিয়া করে যাতায়াত। (নৈবেদ্য)

যোগধারণায় ব্যাঘাত ঘটে তবে তার প্রতিকারের উপায় বলছি শোন। শীত বা তাপ থেকে যে ক্লেশ তা দূর করবার জন্য সূর্য বা চন্দ্রে মন নিবিষ্ট করা দরকার। বায়ু থেকে রোগ জন্মালে আসনের সাহায্যে প্রাণায়াম করতে হবে। দুষ্টগ্রহ বা সাপ ইত্যাদি পার্থিব উৎপাত নিবারণ করতে হবে তপস্যা, মন্ত্র বা ওষুধ দিয়ে। কাম, ক্রোধ প্রভৃতি রিপুর উৎপাত ঘটলে আমাতে চিত্ত নিবেশ এবং আমার নাম সংকীর্তন করা উচিত। অন্য কোন উপদ্রব উপস্থিত হলে যোগেশ্বরদের পথ অনুসরণ করে ক্রমে তা দূর করবে। জিতেন্দ্রিয় ধীর ব্যক্তিরা এছাড়া আরো নানা উপায়ে দেহকে জরা এবং রোগের হাত থেকে মুক্ত রাখতে পারেন এবং যোগ অনুষ্ঠানের দ্বারা অন্যের দেহে প্রবেশ করার শক্তি ইত্যাদি সিদ্ধিলাভ করতে পারেন। তবে এ সব সিদ্ধিকে জ্ঞানীরা আদর করেন না, কারণ বনস্পতি থেকে যেমন বছর বছর ফল জন্মায় আবার ধ্বংস হয়, সে রকম নিত্যসিদ্ধ আত্মস্বরূপ থেকে দেহরূপ নানা অনিত্য সিদ্ধির উদয়ে এবং ধ্বংসে বিশেষ কিছু এসে যায় না। নিয়মিত প্রাণায়াম প্রভৃতি দ্বারা যোগ অনুষ্ঠান করার ফলে যদি শরীর বেশ সুস্থ এবং সবল হয় তা হলেও বুদ্ধিমান ব্যক্তি সিদ্ধিপ্রদ যোগাভ্যাস না করে ঈশ্বরপরায়ণ হয়ে তাঁর উদ্দেশ্যেই যোগের অনুষ্ঠান করে থাকেন। যাঁরা অনাসক্ত হয়ে ভগবানে চিত্ত সমাহিত করে যোগ অনুষ্ঠান করেন তাঁদের আর কোন বাধাবিপত্তির ভয় থাকে না তাঁরা পরমানন্দস্বরূপ আত্মসুখেই মগ্ন থাকেন। ৩৮-৪৪

ঊনত্রিংশ অধ্যায়

ভক্তিধর্মের সারকথা

উদ্ধব বললেন, অচ্যুত, আপনি যে যোগের কথা বললেন অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির পক্ষে তার অনুষ্ঠান করা অসম্ভব বলেই আমার মনে হয়। তাই লোকের সহজ মুক্তির জন্য কিছু সাধনের কথা আমাকে বলুন। মনকে বশে আনবার জন্য অনেক চেষ্টা করেও সহজে সফল হতে না পেরে যোগীরা যথেষ্ট কষ্ট পেয়ে থাকেন। হে কমললোচন, যাঁরা সার এবং অসার বিচার করতে পারেন সেরকম পরমহংসেরা আপনার চরণপদ্মকে আশ্রয় করে সবসময় আনন্দে থাকেন। কিন্তু যোগ অনুষ্ঠান করে যাঁরা গর্বিত হয়ে পড়েন তাঁরা শুধু সংসার-দুঃখই ভোগ করেন। আপনি জগতের পরম উপকারী প্রকৃত বন্ধু। ব্রহ্মা প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ দেবতারা তাঁদের উজ্জ্বল কিরীটে শোভিত মাথা নত করে যাঁর চরণে লুটান, সেই আপনি রাম অবতারে অতি সামান্য বানরের সঙ্গেও বন্ধুত্ব করে তাদের কৃতার্থ করেছেন। তাই নন্দ, বলি প্রভৃতি যে সব দাস শুধু আপনারই শরণ নিয়েছেন তাঁদের কাছে আপনার বশ্যতা স্বীকার করাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। আপনি নিখিল জগতের পরমপ্রিয় ঈশ্বর। ভক্ত এবং আশ্রিতদের আপনি সর্বপুরুষার্থ দান করেন। অন্তর্যামিরূপে আপনি জীবের যে উপকার করে থাকেন তা জেনে কে আপনাকে ভুলতে পারে? ইন্দ্রিয়ের ভোগ্য বিষয়সমূহ মনকে আপনার কাছ থেকে সরিয়ে নেয়, তাই সেই ভোগ কে চায়? কিন্তু যাঁরা আপনার চরণপদ্মের সেবা করেন আমার মত সেরকম ভৃত্যদের কোন ভোগ বাকী আছে? হে জগৎপতি, আপনি বাইরে আচার্যরূপে এবং অন্তরে অন্তর্যামিরূপে থেকে জীবমাত্রেরই বিষয়-কামনা দূর করে তাদের কাছে আপন স্বরূপ প্রকাশ করেন। তাই যাঁদের পরমায়ু

ব্রহ্মার মত সেই ব্রহ্মজ্ঞরাও আপনার ঋণ শোধ করতে পারবেন না। আপনার উপকার স্মরণ করে তাঁরা অতি আনন্দ অনুভব করে থাকেন। ১-৬

শুকদেব বললেন, মহারাজ, শিশু যেমন পুতুল নিয়ে খেলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তেমনি মনুষ্যদেহে এই সংসার নিয়ে খেলা করছেন মাত্র। নিজের শক্তিতে তিনিই ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর-রূপে এই সংসারের সবকাজই সমাধা করেন। উদ্ধবের কথায় প্রীত হয়ে তিনি সহাস্যে তাকে বললেন, উদ্ধব, যে পরমপবিত্র ভাগবত ধর্ম শ্রদ্ধার সঙ্গে অনুষ্ঠান করে মানুষ মৃত্যুর হাত থেকেও অনায়াসে অব্যাহতি পেতে পারে তাই আমি তোমাকে বলছি শোন। আমার ভক্তের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করে, আমার ধর্মে মন-প্রাণ দিয়ে এবং আমাকে স্মরণ করে সব কাজ করতে হবে। আমার ভক্ত সাধুরা যেখানে থাকেন সেই পবিত্র স্থানে বাস করা উচিত। দেব, মানুষ বা অসুর, যে কেউ আমার প্রতি ভক্তির পরিচয় দিয়েছেন তাঁদের কর্মের কথা সর্বদা শোনা কর্তব্য। একাদশী প্রভৃতি তিথি উপলক্ষে একা বা অনেকে মিলে নানা উপচার সংগ্রহ করে আমার উদ্দেশ্যে নাচ, গান, যাত্রা, উৎসব প্রভৃতি করতে হয়। এই সবের মধ্য দিয়ে যখন মনের মলিনতা দূর হয়ে যাবে তখন ভক্ত সর্বভূতের অন্তরে এবং বাইরে বিরাজিত আমাকে আপন হৃদয়ে স্পষ্টভাবে অনুভব করবেন।[১] চরাচর এই বিশ্ব যে সেই মহাবিভূতিময় পরমেশ্বরের শক্তিরই বিকাশ এই পরমজ্ঞান লাভ করলে ভেদবুদ্ধি আর থাকে না। তখন ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল, ব্রহ্মস্ব অপহরণকারী, ব্রাহ্মণসেবী, সূর্য-স্ফুলিঙ্গ, কুটিল-শান্ত সব কিছুর প্রতি যাঁদের সমদৃষ্টি জন্মায় তাঁরাই পণ্ডিত। ৭-১৪

সমস্ত মানুষের অন্তরে যিনি আমার প্রকাশ দেখেন দেহাভিমান তাঁকে আবদ্ধ করতে পারে না। স্পর্ধা, ঈর্ষা, তিরস্কারের প্রবৃত্তি এসব থেকেও তিনি মুক্ত হন। 'আমি শ্রেষ্ঠ, এ নীচ' এই ভাব কখনই মনে আনা চলবে না, এতে যদি স্বজন-বন্ধুরা উপহাসও করে, তাকে উপেক্ষা করতে হবে। এভাবে লজ্জা বিসর্জন দিয়ে, কুকুর, চণ্ডাল, গরু-গাধাতে পর্যন্ত ভগবানের অধিষ্ঠান আছে জেনে, সবাইকে দণ্ডবৎ প্রণাম করবে।[২] প্রাণীমাত্রই আমার স্বরূপ এ বোধ যতদিন না জন্মে ততদিন কায়মনোবাক্যে ঐ ভাবে প্রণাম, উপাসনা প্রভৃতি করে যেতে হবে। জগৎ ব্রহ্মময় এই জ্ঞানকেই বিদ্যা বলা হয়েছে। এই জ্ঞান লাভ হলে চিত্ত থেকে বিষয়-কামনা দূর হয় এবং সাধক সাংসারিক ব্যাপারে সহজেই স্পৃহাশূন্য হয়। সবরকম উপাসনার মধ্যে মনেপ্রাণে সর্বভূতে আমার অস্তিত্ব উপলব্ধি করাই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ। আমার ধর্মের আচরণ একবার শুরু করলে যদি বাধা পড়ে তাহলেও যেটুকু আচরণ করা হল সেটুকুর অণুমাত্রও নষ্ট হয় না। কারণ এই ধর্ম গুণের অতীত। এ অনুষ্ঠানের মূলে কোন কামনা নেই। হে সাধু, কাম প্রভৃতির মত অতি হীন প্রবৃত্তিও যদি ভগবানের উদ্দেশ্যেই নিয়োজিত হয় তা হলে তার থেকেও ধর্মসঞ্চয় হয়ে থাকে। তাই কংস কৃষ্ণের ভয়ে ভীত হয়ে, গোপীগণ কামপরবশ হয়ে, চেদিরাজ শিশুপাল কৃষ্ণের শত্রুতা করে মোক্ষলাভ করেছিল। অতি নশ্বর মায়াময় দেহের দ্বারা এই মানবজন্মেই অমৃতস্বরূপ অবিনাশী আমাকে যিনি লাভ করেন তিনিই জ্ঞানী। আমি তোমার কাছে

---

১ তুলনীয় : সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ॥ গীতা, ৬।২৯

২ তুলনীয় : জ্ঞানী পুরুষগণ বিদ্যা ও বিনয়যুক্ত ব্রাহ্মণে, গাভীতে, কুকুরে ও চণ্ডালে সমদৃষ্টিসম্পন্ন অর্থাৎ তাঁরা সকলকেই এক ব্রহ্ম বলে জানেন।—গীতা ৫।১৮

সংক্ষেপে, আবার বিস্তারিত করে বেদান্তের যে তত্ত্ব ব্যাখ্যা করলাম তা দেবতাদেরও অজানা, এই তত্ত্ব আমি যুক্তিযুক্ত ভাবে তোমাকে বললাম। এ জানলে মানুষের সব সংশয় দূরে হয়, তার হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হয়ে সে মুক্তিলাভ করে।[1] ১৫-২৪

উদ্ধব, তুমি যেমন সুন্দর প্রশ্ন করেছ আমিও সেভাবেই তার উত্তর দিলাম। যিনি, এমনকি তোমার প্রশ্নটিকেও ঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারবেন, তিনিও সনাতন পরমব্রহ্মকে লাভ করবেন। যিনি এই আত্মবিজ্ঞান সবিস্তারে আমার ভক্তদের বলেন তাঁকে আমি অত্মেদান করি। এই অতি পবিত্র সর্বপাপনাশক আত্মবিজ্ঞান যিনি উচ্চকণ্ঠে পড়েন, তাঁর জ্ঞানদীপ উজ্জ্বল হয় এবং আমার স্বরূপ অপরের কাছে প্রকাশ করে নিজেই পবিত্র হন। যিনি সশ্রদ্ধভাবে এই তত্ত্ব রোজ শোনেন তিনি শুদ্ধা ভক্তি লাভ করে কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হন। উদ্ধব, আমার বর্ণনা শুনে তুমি নিশ্চয়ই পরম ব্রহ্মকে উপলব্ধি করতে পেরেছ এবং তোমার চিত্তের মোহ এবং শোক প্রভৃতি আধ্যাত্মিক তাপ দূর হয়েছে। দাম্ভিক, বেদে অবিশ্বাসী, নাস্তিক, শঠ, ভক্তিহীন, বিনয়হীন এবং শুনতে অনিচ্ছুক ব্যক্তিকে কখনও এই পরম জ্ঞান দান করবে না। যারা ঐ সব দোষ থেকে মুক্ত, ব্রাহ্মণের হিতকারী, সাধু, পবিত্র তাদেরই দেবে। এমন কি স্ত্রীলোক কি শূদ্রও যদি ভক্তিমান হয়, তাদেরও দেবে। অমৃতপান করলে যেমন অন্য সবকিছু পান করবার আকাঙ্ক্ষা দূরে হয় সেরকম এই পরমাত্মতত্ত্ব একবার জানলে আর অন্য কিছুই জানার বাকী থাকে না। জ্ঞান, কর্ম, যোগসাধন, নানা জীবিকা আর শাসনধর্ম অনুশীলন করে মানুষ ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্বর্গ ফল পেয়ে থাকে। কিন্তু পরমাত্মতত্ত্বের অনুশীলন করলে সে ঐ সবকিছুর স্বরূপ আমাকেই পায়। সমস্ত সকাম কর্ম জলাঞ্জলি দিয়ে মানুষ যখন নিজেকে ঈশ্বরে সমর্পণ করে তখনই তার সব কর্মের অবসান হয়, অমৃতস্বরূপ মোক্ষ লাভ করে সে আমার সমান হয়। ২৫-৩৪

শুকদেব বললেন, মহারাজ, এইভাবে যোগ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করে উদ্ধব কৃতার্থ হলেন। শ্রীভগবানের কথা শুনতে শুনতে তিনি বিহ্বল হয়ে পড়লেন। আনন্দের অশ্রুতে তাঁর চোখ ভরে উঠল, কণ্ঠরুদ্ধ হল। তিনি করজোড়ে নির্বাক হয়ে কিছু সময় দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর কতকটা স্থির হয়ে তিনি মাথা হেঁট করে ভগবানের পাদপদ্ম স্পর্শ করলেন এহং কৃতাঞ্জলি হয়ে শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করে বললেন, হে দীনবন্ধু, ভীষণ মোহে এতদিন আমি আচ্ছন্ন ছিলাম। আজ আপনার উপদেশে তা দূর হল। আপনি ব্রহ্মাকেও সৃষ্টি করেছেন। আগুনের সান্নিধ্যে যেমন শীত, অন্ধকার আর ভয় দূর হয়, আপনার সান্নিধ্য লাভ করে আমিও তেমনি নির্ভয় হলাম। আমি আপনার দাস। আমাকে যে আপনি জ্ঞানের আলো দান করলেন সে আপনার অশেষ অনুগ্রহ। আপনার উপকার যিনি একবার উপলব্ধি করতে পারেন তিনি কি আর কখনই আপনার চরণকমল ছেড়ে অন্য কোথাও আশ্রয় নেন ? আপনি প্রজাবৃদ্ধির জন্য নিজ মায়ায় দাশার্হ, বৃষ্ণি, অন্ধক ও সাত্বতদের সঙ্গে আমাকে যে স্নেহপাশে আবদ্ধ করেছিলেন, তা আপনিই আবার আত্মজ্ঞানের শাণিত অস্ত্রে ছিন্ন করলেন। হে মহাযোগী, আপনাকে প্রণাম। অপনার দাস উদ্ধবকে এই শিক্ষা দিন যেন আপনার পাদপদ্মে তার ভক্তি অচলা হয়। ৩৫-৪০

ভগবান বললেন, উদ্ধব, তুমি এখান থেকে বদরিকাশ্রমে যাও। সেখানে আমার পাদতীর্থ জলে স্নান করে এবং তা স্পর্শ করে পবিত্র হবে। তারপর অলকনন্দা দর্শনে পাপ থেকে মুক্ত হয়ে গাছের বাকল পরবে, বনের ফল-মূল খাবে। সুখের

---

১ তুলনীয় : ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ ॥ মুণ্ডক, ২।২।৯

কামনা করো না, শীত-উষ্ণ প্রভৃতি দ্বন্দ্বভাব সহ্য করতে শেখো। সুশীল, জিতেন্দ্রিয়, শান্ত ও সমাহিত হয়ে বুদ্ধিযোগের সাহায্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানে অনুরক্ত হয়ো। আমি তোমাকে যা সবিস্তারে শেখালাম তুমি নির্জনে বসে তা ধ্যান করবে এবং বাক্য আর মন আমাতেই নিবিষ্ট করে আমার ধর্মে রত থাকবে। এভাবে সত্ত্ব, রজ আর তমোময় স্বর্গ, মর্ত্য আর পাতাল এই তিন গতির শেষ পরম গতি আমাকে পাবে। ৪১-৪৪

শুকদেব বললেন, যাঁর স্মরণে সংসারপাশ ছিন্ন হয় সেই ভগবানের কাছ থেকে এই উপদেশ পেয়ে উদ্ধব তাঁকে প্রদক্ষিণ করলেন এবং তাঁর পায়ে মাথা রাখলেন। তিনি সুখদুঃখ থেকে মুক্ত হওয়া সত্ত্বেও বিদায় নেবার সময় কাতর হয়ে অশ্রু বিসর্জন করতে লাগলেন। যাঁর প্রতি স্নেহ কখনও ত্যাগ করা যায় না তাঁর সঙ্গে বিচ্ছেদের চিন্তায় তিনি দুঃখে বিহ্বল হয়ে পড়লেন। তারপর শ্রীভগবানের পাদুকা-যুগল মাথায় রেখে বারবার প্রণাম করে অতি কষ্টে বিদায় নিলেন। শ্রীহরির আদেশে বদরিকাশ্রমে গিয়ে উদ্ধব তপস্যা দ্বারা তাঁর স্বরূপ লাভ করলেন। মহাযোগীরাও যাঁর চরণসেবায় রত সেই শ্রীকৃষ্ণের কথিত আনন্দের প্রবাহতুল্য এই জ্ঞানসুধা যিনি ভক্তির সঙ্গে অতি সামান্যও পান করেন তিনি মুক্ত হন, তাঁর সংস্পর্শে এসে জগৎও মুক্ত হয়ে থাকে। ভ্রমর যেমন ফুল থেকে মধু সংগ্রহ করে সেরকম সংসার, জরা, রোগ প্রভৃতির নাশ করবার জন্য যিনি সাগর থেকে জ্ঞান-বিজ্ঞানময় বেদের সাররূপ অমৃত উদ্ধার করে নিজের ভৃত্যদের পান করিয়েছেন, সেই বেদকর্তা শ্রীকৃষ্ণ নামক পুরুষোত্তমকে নমস্কার। ৪৫-৪৯

ত্রিংশ অধ্যায়

যদুকুল সংহার

পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করলেন, মুনিবর, ভক্তশ্রেষ্ঠ উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণকে ছেড়ে বদরিকাশ্রমে চলে গেলে ভূতভাবন শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকাতে থেকে কি করলেন? তাঁর নিজের বংশ যদুবংশ যখন ব্রহ্মশাপগ্রস্ত হল তখন শ্রীকৃষ্ণ কিভাবে দেহত্যাগ করেছিলেন? নয়নের আনন্দস্বরূপ যে দেহের দিকে একবার তাকালে নারীরা আর চোখ ফেরাতে পারতেন না, যে মধুর বাণী কানের মধ্য দিয়ে হৃদয়ে প্রবেশ করলে তার থেকে মন আর ফেরে না, যে দেহের শোভা বর্ণনায় কবির কবিত্ব শুধু বেড়েই চলে, কুরুক্ষেত্রে অর্জুনের সারথিরূপে যাঁকে দেখে যুদ্ধক্ষেত্রে শায়িত ব্যক্তিরা মোক্ষলাভ করেছেন—সেই দেহ কি করে তিনি ত্যাগ করলেন? ১-৩

শুকদেব বললেন, মহারাজ, আকাশে সূর্যমণ্ডল, পৃথিবীতে ভূমিকম্প, স্বর্গে দিগ্‌দাহ এইসব নানা অমঙ্গল চিহ্ন দেখে পদ্মলোচন শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সুধর্মা নামে সভায় উপস্থিত যদুদের বললেন, যাদবগণ, দ্বারকায় যেসব ভয়ানক উৎপাত দেখতে পাচ্ছি তাতে মনে হচ্ছে মহাকালের ধ্বজা খুব কাছেই এসে গেছে। তাই আমার বিবেচনায় এখানে আমাদের আর এক মুহূর্তও থাকা ঠিক হবে না। বালক, বৃদ্ধ আর স্ত্রীলোকগণ তাড়াতাড়ি করে শঙ্খোদ্ধার তীর্থে চলে যাক। সরস্বতী যেখানে পশ্চিমবাহিনী, আমরা সেই প্রভাসতীর্থে যাব। তার জলে স্নান করে পবিত্র হয়ে চিত্তকে সমাহিত করব। তারপর নানা উপচারে দেবতাদের পূজা করব। এছাড়া অমঙ্গল দূর করবার আর কোন উপায় দেখছি না। দেবতা, ব্রাহ্মণ আর গাভীর অর্চনা দ্বারাই জীবের উত্তম জন্মলাভ হয়ে থাকে। ৪-৯

যদুবীরেরা শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শমত দ্বারকা থেকে নৌকায় সমুদ্র পার হয়ে, তারপর রথে চড়ে প্রভাসে গেলেন। সেখানে গিয়ে তাঁরা কৃষ্ণের নির্দেশ অনুসারে গভীর ভক্তির সঙ্গে নানা মঙ্গলপ্রদ কাজের অনুষ্ঠান শুরু করলেন। কিন্তু অদৃষ্টের বিধানে তাঁদের সব চেষ্টাই বৃথা হল। সেই পবিত্র প্রভাস ক্ষেত্রে যাদবগণ সুমিষ্ট মৈরেয় মদ পান করে অভিভূত এবং উন্মত্তের মত হয়ে পড়লেন। কৃষ্ণমায়ায় মোহগ্রস্ত যাদবরা যখন অতিরিক্ত মদ্যপানে একেবারে বিবেকহীন হয়ে গেলেন তখন তাঁদের মধ্যে এক মহাকলহের সৃষ্টি হল। ক্রোধে জ্ঞান হারিয়ে তাঁরা আততায়ীর বেশে ধনুর্বাণ, খড়্গ, ভল্ল, গদা, তোমর, ঋষ্টি প্রভৃতি নানা অস্ত্র নিয়ে সেই সমুদ্রের ধারেই পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু করলেন। রথ, হাতী, ঘোড়া, উট, গরু, মোষ, সৈন্যসামন্ত ইত্যাদিতে সেই স্থান এক ভয়াবহ রণক্ষেত্রে পরিণত হল। বন্য হাতী যেমন দাঁতের আঘাতে একে অপরকে হত্যা করে, যদুবীরেরাও তেমনি শরের আঘাতে পরস্পর পরস্পরকে নিহত করতে লাগলেন। বধোন্মত্ত হয়ে সাম্বের সঙ্গে প্রদ্যুম্ন, ভোজের সঙ্গে অক্রূর, সাত্যকির সঙ্গে অনিরুদ্ধ, সংগ্রামজিতের সঙ্গে সুভদ্র, গদের সঙ্গে সারণ এবং সুরথের সঙ্গে সুমিত্রা দ্বন্দ্বযুদ্ধ শুরু করলেন। এছাড়াও শ্রীকৃষ্ণের মায়ায় মুগ্ধ হয়ে সহস্রজিৎ, শতজিৎ, ভানুমুখ্য, নিশঠ, উল্মুক ইত্যাদিরা মদ্যপানে জ্ঞানহীন হয়ে ভীষণ যুদ্ধে মত্ত হলেন। দাশার্হ, ভোজ, অন্ধক, বৃষ্ণি, সাত্বত, মধু, অর্বুদ, মাথুর, শূরসেন, বিসর্জন, কুকুর আর কুন্তীবংশীয়েরা বন্ধুভাব বিসর্জন দিয়ে পরস্পর নির্মম হানাহানিতে প্রবৃত্ত হল। যেন এক বিচিত্র মোহে আচ্ছন্ন হয়ে পুত্র পিতার সঙ্গে, ভাই ভাইয়ের সঙ্গে, দৌহিত্র মাতামহের সঙ্গে, ভাগ্নে মামার সঙ্গে, মিত্র মিত্রের সঙ্গে, পরম বন্ধুরা পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ করে একে অপরকে শেষ করতে লাগল। ১০-১৯

যুদ্ধ করতে করতে এক সময় বাণ নিঃশেষ হল, ধনুক ভেঙ্গে গেল, অন্য অস্ত্রও আর কিছু বাকী রইল না। যোদ্ধারা তখন এক এক মুঠো এরকা (একরকম জলজ তৃণ) তুলে নিয়ে তা দিয়েই পরস্পরকে আঘাত করতে লাগল। দৈবের কি লীলা! তাদের মুঠোয় ধরা সেই এরকাগুচ্ছ বজ্রের মত কঠিন লোহার দণ্ডে পরিণত হল। তখন শ্রীকৃষ্ণ তাদের ঐ যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত করবার চেষ্টা করলে 'রাম-কৃষ্ণ আমাদের শত্রু' এই ধারণা করে মোহগ্রস্ত যাদবরা তাঁদের হত্যা করবার জন্য ধাবিত হল। এতে কৃষ্ণ-বলরাম ক্রুদ্ধ হয়ে এক এক মুষ্টি তৃণ নিয়ে তাদের মারতে লাগলেন। একে ব্রহ্মশাপ, তার উপর কৃষ্ণের মায়ায় যাদবদের চিত্ত মুগ্ধ। ফলে বেণুবন থেকে উদ্ভূত আগুন যেমন সমস্ত বন দগ্ধ করে, স্পর্ধার থেকে উৎপন্ন বিষম ক্রোধ তেমনি সমস্ত যদুকুল ধ্বংস করল। ২০-২৪

এভাবে যখন যদুকুল সম্পূর্ণ নষ্ট হল, শ্রীকৃষ্ণ মনে করলেন, যাক্, এবার পৃথিবীর ভার লাঘব হল। এদিকে বলরাম সমুদ্রতীরে গিয়ে যোগস্থ হলেন এবং পরমাত্মায় চিত্ত সমাহিত করে মর্ত্যলোক ত্যাগ করলেন। বলরাম মনুষ্যলোক ছেড়ে নিজধামে চলে গিয়েছেন দেখে দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণ শোকে মগ্ন হয়ে একটি অশ্বত্থ গাছে হেলান দিয়ে নীরবে বসে রইলেন। তাঁর জ্যোতিতে দিগ্-দিগন্ত আলো হয়ে উঠল; চতুর্ভুজ মূর্তিতে প্রকাশিত হয়ে ধূমহীন অগ্নির মত তিনি শোভা পেতে লাগলেন। নবীন মেঘের মত তাঁর শ্যামসুন্দর মূর্তির বক্ষে শ্রীবৎস চিহ্ন অঙ্কিত, গলিত সোনার মত পীতবর্ণের দুখানি কৌশেয় বস্ত্রে তাঁর অঙ্গ আবৃত। মৃদু হাসিতে উদ্ভাসিত মুখমণ্ডল কেশদামে অলঙ্কৃত। চোখদুটি পদ্মপলাশের মত আয়ত, কটিতে শোভিত কটিসূত্র, গলায় ব্রহ্মসূত্র, মাথায় মুকুট, দুই বাহুতে কটক, অঙ্গদ, প্রভৃতি অলঙ্কার। তাঁর কণ্ঠে মণিহার আর কৌস্তুভ, পায়ে নূপুর, আজানু-

আংটি। তার উপর গলায় বনমালা, হাতে শঙ্খচক্র ইত্যাদি আয়ুধে ভগবানের কি অপূর্ব শোভাই না হয়েছিল। পদ্মের মত রক্তিম বাম পাখানি ডান উরুর উপরে রেখে শ্রীকৃষ্ণ বৃক্ষমূলে বসেছিলেন। সেই সময় জরা নামে এক ব্যাধ মুষলের ক্ষয়ে যাওয়া লোহার টুকরো দিয়ে বাণ তৈরী করে[১] হরিণ মারবার আশায় ইতস্তত ঘুরতে ঘুরতে ঐ বনে এসে উপস্থিত হল। দূর থেকে দেখে সে শ্রীভগবানের পাদপদ্মকে হরিণ বলে ভুল করল এবং তার তীরে সেই চরণ বিদ্ধ করল। পরমুহূর্তেই চতুর্ভুজ পুরুষকে দেখতে পেয়ে ব্যাধ বুঝতে পারল কি মহা অপরাধের কাজ সে করেছে। তৎক্ষণাৎ সে সভয়ে অসুরনাশক শ্রীকৃষ্ণের পায়ে মাথা রেখে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল এবং বলল, মধুসূদন, আমি না জেনে এ কাজ করেছি। আমার অপরাধ ক্ষমা করুন। যাঁকে কেবল স্মরণ করলেই জীবের অজ্ঞান-অন্ধকার দূর হয়, সেই সাক্ষাৎ বিষ্ণুর প্রতি আমি কি বিষম অন্যায় করেছি। বৈকুণ্ঠপতি, আমার মত একটা মৃগলোভী ব্যাধকে আপনি এখনি সংহার করুন যাতে আমার দ্বারা এমন অন্যায় কাজ আর না হয়। আপনার মায়ায় মোহিত হয়ে ব্রহ্মা নিজে, রুদ্র ইত্যাদি তাঁর পুত্রগণ এবং বেদে পারদর্শী অন্যান্য জ্ঞানী ব্যক্তিরাও যখন আপনার অপূর্ব স্বরূপ বুঝতে অক্ষম তখন আমার মত পাপী আর আপনার বিষয়ে কি বর্ণনা করবে? ২৫-৩৮

ভগবান তখন সেই ব্যাধকে বললেন, জরা, তোমার ভয় নেই। যা ঘটেছে সবই আমারই ইচ্ছা। এতে তোমার কোন দোষ নেই। তাই অনেক সৎকাজের ফলস্বরূপ পুণ্যবানেরা যে স্বর্গলাভ করেন, আমার ইচ্ছায় তুমি সেই দেবলোকে যাও। নিজের ইচ্ছায় যিনি শরীর ধারণ করেছেন সেই ভগবান বাসুদেব এই কথা বললে জরা তাঁকে তিনবার প্রদক্ষিণ করে প্রণাম করল, তারপর বিমানে চড়ে স্বর্গে চলে গেল। এদিকে শ্রীকৃষ্ণের সারথি দারুক প্রভুকে খুঁজতে খুঁজতে তাঁর চরণে লগ্ন তুলসীর গন্ধে সুরভিত বাতাসের অনুসরণ করে অবশেষে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। অশ্বত্থমূলে অপূর্ব জ্যোতির্ময় মূর্তিতে উপবিষ্ট শ্রীকৃষ্ণকে দেখে আবেগে তাঁর চোখ দিয়ে অশ্রুধারা নির্গত হতে লাগল। রথ থেকে নেমে তিনি প্রভুর চরণে লুটিয়ে পড়লেন এবং বলতে লাগলেন, প্রভু, আকাশে চন্দ্র না থাকলে রাত্রির গাঢ় অন্ধকারে চোখের দৃষ্টিশক্তি যেমন লোপ পায়, আপনাকে না দেখে আমিও তেমনি অন্ধের মতই হয়ে পড়েছি। এখন কোথায় যাব, কোথায় গেলে শান্তি পাব কিছুই বুঝতে পারছি না। ৩৯-৪৩

মহারাজ, সারথি দারুক যখন এভাবে বিলাপ করছিলেন, তখন ধ্বজা, অশ্ব প্রভৃতি সহ গরুড়ধ্বজ রথ দারুকের চোখের সামনেই আকাশে উঠে গেল, শ্রীকৃষ্ণের দিব্য অস্ত্র প্রভৃতিও রথের অনুসরণ করল। বিস্মিত দারুককে সম্বোধন করে ভগবান বললেন, সারথি, তুমি আপাতত দ্বারকায় ফিরে গিয়ে পরস্পর বিবাদে জ্ঞাতিধ্বংস, বলরামের স্বধামে গমন আর আমার এই অবস্থার কথা সেখানকার বন্ধুদের জানাও। তুমি তাঁদের বলবে যে তাঁরা যেন পরিবারবর্গ নিয়ে সেখানে আর না থাকেন। কারণ আমি দ্বারকা ছেড়ে চলে এসেছি বলে সমুদ্র অল্পকালের মধ্যেই তাকে প্লাবিত করে ফেলবে। তাই তাঁরা যেন নিজ নিজ পরিবার আর আমার বাবা-মাকে নিয়ে অর্জুনের আশ্রয়ে ইন্দ্রপ্রস্থে চলে যান। তুমিও আমার ধর্ম অনুশীলন করে বিষয়চিন্তা বিসর্জন দাও, আর এই দৃশ্যমান জগৎ শুধু আমারই যোগমায়ার প্রকাশিত হচ্ছে এই জ্ঞান লাভ করে শান্তভাবে থাক। ৪৪-৪৯

---

১ এই বাণ তৈরীর পূর্ণ বৃত্তান্ত এই স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ে বিবৃত হয়েছে।

শ্রীকৃষ্ণ একথা বললে দারুক তাঁকে প্রদক্ষিণ পূর্বক তাঁর পদযুগল মস্তকে ধারণ করে দুঃখিত অন্তঃকরণে দ্বারকায় গেলেন। ৫০

একত্রিংশ অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণের পরমধামে গমন

শুকদেব বললেন, মহারাজ, দারুক সেখান থেকে চলে গেলে ব্রহ্মা আর ঈশানীকে নিয়ে মহাদেব এলেন শ্রীকৃষ্ণের তিরোভাব দর্শন করবার জন্য। এছাড়া ইন্দ্র সহ অন্যান্য দেবতারা, মরীচি প্রভৃতি প্রজাপতিরা এবং সনক ও অন্যান্য মুনিরাও সেখানে উপস্থিত হলেন। পিতৃগণ, সিদ্ধ, গন্ধর্ব, বিদ্যাধর, উরগ, চরণ, যক্ষ, কিন্নর ও অপ্সরারা, মৈত্রেয় প্রভৃতি ব্রাহ্মণেরাও শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব এবং লীলার বিষয় গান আর কীর্তন করতে করতে সেখানে আসতে লাগলেন। আকাশ থেকে পুষ্পবৃষ্টি হতে লাগল, দেবতাদের বিমানে আকাশ আচ্ছন্ন হল। পিতামহ ব্রহ্মা আর আপন বিভূতিস্বরূপ দেবতারা সমাগত দেখে শ্রীকৃষ্ণ আত্মস্বরূপের ধ্যানে কমলদলের মত তাঁর আয়ত দুটি চোখ বন্ধ করলেন। তারপর লোকের নয়নের আনন্দ, অতি মনোহর যে মূর্তির ধারণায় জীবের সর্বরকমে মঙ্গল লাভ হয়ে থাকে, ভগবান যোগবলে তা দগ্ধ করে নিজধাম বৈকুণ্ঠে চলে গেলেন। তখন স্বর্গে দুন্দুভি বেজে উঠল। আকাশ থেকে বৃষ্টির মত রাশি রাশি ফুল পড়তে লাগল। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সঙ্গে সত্য, ধর্ম, ধৃতি, কীর্তি এবং শ্রীও পৃথিবী ছেড়ে চলে গেল। ১-৭

শ্রীকৃষ্ণের গতি বোঝার শক্তি দেবতাদেরও নেই। তাই তিনি অন্তর্হিত হবার সময় তাঁকে না দেখতে পেয়ে ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবতারা অতি আশ্চর্য হলেন। আকাশের বিদ্যুৎ যেমন মেঘের বুকে ছাড়া অন্য জায়গায় মানুষের অদৃশ্য, শ্রীকৃষ্ণের গতিও দেবতাদের কাছে সে রকম সম্পূর্ণই অজানা ছিল। এরপর ব্রহ্মা এবং রুদ্র ইত্যাদি দেবতারা শ্রীহরির যোগগতির বিষয়ে চিন্তা করে বিস্মিত হলেন ও তার প্রশংসা করতে করতে নিজ নিজ আবাসে ফিরে গেলেন। ৮-১০

মহারাজ, শ্রীকৃষ্ণের যাদবদের মধ্যে দেহধারণ করে জন্ম নেওয়া, তারপর মৃত্যুবরণ করা, এসবই দক্ষ অভিনেতার মত মায়ার অনুকরণ মাত্র। তিনি নিজেই দেহ রচনা করেছেন, নিজেই তার অন্তরে প্রবেশ করেছেন, তারপর কিছুকাল লীলা করার পর সেই দেহ উপসংহার করে আবার নিজের মহিমায় বিরাজ করছেন। যিনি দেহ ধারণ করেই নিজের গুরু সান্দীপনি মুনির মৃত পুত্রকে যমলোক থেকে সশরীরে পৃথিবীতে ফিরিয়ে এনেছিলেন, তোমার (পরীক্ষিতের) মা ব্রহ্মাস্ত্রের ভয়ে শরণ নিলে যিনি ব্রহ্মাস্ত্রে দগ্ধ তোমার এই দেহকে মায়ের গর্ভে রক্ষা করেছিলেন, যিনি বাণরাজের সঙ্গে যুদ্ধের সময় মহাকাল শিবকেও পরাজিত করেছিলেন, আর এখন যিনি জরা নামে এক সামান্য ব্যাধকেও সশরীরে স্বর্গে নিয়ে গেলেন, তাঁর কি নিজের দেহকে বা যাদবদের রক্ষা করবার শক্তি ছিল না? যিনি এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি আর প্রলয়ের একমাত্র কারণ, অনন্ত শক্তির আধার, তিনি যাদবদের ধ্বংসের পরে নিজের শরীরকে পৃথিবীতে রাখতে বা বৈকুণ্ঠে নিয়ে যেতে চান নি, কারণ পার্থিব দেহের প্রয়োজন তাঁর শেষ হয়েছিল। এই উপদেশ দেবার জন্য আত্মনিষ্ঠ ভক্তদের দিব্যগতি দেখাবার পর তিনি আর মর্ত্যদেহ রাখলেন না। যে

ব্যক্তি সকালে ঘুম থেকে উঠে আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভক্তির সঙ্গে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বৈকুণ্ঠে যাওয়ার বৃত্তান্ত কীর্তন করবেন, তিনিও ঐ দিব্যগতি লাভ করবেন ; ওর থেকে উত্তমগতি আর কিছু নেই। ১১-১৪

সারথি দারুক কৃষ্ণবিহীন দ্বারকায় ফিরে বসুদেব আর উগ্রসেনের পায়ে লুণ্ঠিত হলেন। তাঁর অবিরল চোখের জলে তাঁদের চরণ সিক্ত হতে থাকল। তারপর যখন দারুক যদুবংশের শোচনীয় পরিণতির কথা তাঁদের জানালেন, সেই ভয়ানক সংবাদ শুনে সমস্ত দ্বারকাবাসী ভয়ে উদ্বেগে মুহ্যমান হয়ে পড়লেন। তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের বিরহে কাতর এবং জ্ঞানহীনের মত হয়ে দু'হাতে মুখ চাপড়াতে চাপড়াতে আত্মীয়স্বজনরা যেখানে অন্তিমশয়নে শায়িত রয়েছেন সেইখানে ছুটে গেলেন। রাম-কৃষ্ণকে না দেখে দেবকী, রোহিণী আর বসুদেব শোকে মূর্ছিত হলেন ; পুত্রবিরহের শোকে তাঁদের হৃদয় এত তীব্রভাবে দগ্ধ হতে লাগল যে অবশেষে সেই প্রভাসক্ষেত্রেই তারা প্রাণত্যাগ করলেন। অন্যান্য নারীরা আপন আপন স্বামীর মৃতদেহকে আলিঙ্গন করে চিতায় আরোহণ করলেন। বলরামের পত্নীরা বলরামের দেহ, বসুদেবের পত্নীরা বসুদেবের দেহ আর তাঁর পুত্রবধূরা প্রদ্যুম্ন প্রভৃতির দেহ আলিঙ্গন করে আগুনে প্রবেশ করলেন। প্রাণের থেকে প্রিয় সখা কৃষ্ণের বিরহে অর্জুন নিতান্ত কাতর হলেও কৃষ্ণের মোহনিবারক উপদেশসমূহকে স্মরণ করে তিনি চিত্তকে কিছুটা সান্ত্বনা দিলেন। তারপর তিনি প্রভাসে নিহত নিঃসন্তান বন্ধুদের যথাবিধি দাহ এবং পিণ্ডদান প্রভৃতি পারলৌকিক কাজ সম্পন্ন করলেন। ১৫-২২

মহারাজ; এদিকে শ্রীহরি দ্বারকা ছাড়ামাত্র সমুদ্র শ্রীভগবানের আবাসটি বাদ দিয়ে বাকী সমস্ত দ্বারকাকে প্লাবিত করল। ঐ মন্দিরে ভগবান নিত্য বিরাজমান। তাই ঐ মন্দিরকে স্মরণ করলেও জীবের যেমন সব পাপ নষ্ট হয় তেমনি সমস্ত মঙ্গল লাভ হয়। তারপর অর্জুন যদুকুলের অবশিষ্ট স্ত্রীলোক, বালক আর বৃদ্ধদের ইন্দ্রপ্রস্থে নিয়ে গেলেন এবং অনিরুদ্ধের পুত্র বজ্রকে সেখানকার সিংহাসনে বসালেন। অর্জুনের মুখে সুহৃদদের মৃতসংবাদ শুনে যুধিষ্ঠির প্রভৃতি তোমার পিতামহরা বংশধররূপে তোমাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করে মহাপ্রস্থানের পথে যাত্রা করলেন। ভগবানের এই অপূর্ব জন্ম আর লীলা-বৃত্তান্ত যিনি শ্রদ্ধায় কীর্তন করেন এবং অন্যকে শোনান তিনি সব পাপ থেকে মুক্ত হন। ভক্তের দুঃখহরণ ভগবান শ্রীহরির মধুর মনোহর অবতার-লীলা আর এই পুরাণে বা অন্য পুরাণে বর্ণিত এই সব অপূর্ব বাল্যলীলা যিনি সর্বদা কীর্তন করেন, তিনি দুর্লভ কৃষ্ণপ্রেম এবং ভক্তি অনায়াসে লাভ করেন। ২৩-২৮

একাদশ স্কন্ধ : বিষয়প্রসঙ্গ আলোচনা

শ্রীমদ্‌ভাগবতের একাদশ স্কন্ধ যেমন ভক্ত-রসিকজনের, তেমনই তত্ত্বজ্ঞানী, জিজ্ঞাসু ও মুমুক্ষুগণের পরম আদরের সামগ্রী। এই স্কন্ধের ষষ্ঠ থেকে উনত্রিশ অধ্যায় পর্যন্ত যে শ্রীকৃষ্ণ-উদ্ধব সংবাদ বর্ণিত হয়েছে তা অতি উচ্চভাব সমৃদ্ধ হয়ে 'উদ্ধব গীতা' নামে সুধীসমাজে পরিচিত। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যেমন কুরুক্ষেত্রের সমরাঙ্গনে অর্জুনকে উপলক্ষ করে বিশ্বমানবের কল্যাণের জন্যে কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ধ্যানযোগ ও ভক্তিযোগের আদর্শ

স্থাপন করেছেন, তেমনই তিনি মর্ত্যলীলা সংবরণের পূর্বে প্রিয়সখা ও পরমাত্মীয় উদ্ধবকে উপলক্ষ করে নিখিল বিশ্বের পরম মঙ্গলের জন্যে ভাগবত ধর্মের লক্ষণ প্রেমসাধনার আদর্শ ও আনুষঙ্গিক নানা বিষয় বিশদভাবে বিবৃত করেছেন। গীতায় শ্রীভগবান অর্জুনকে বলেছেন—'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।' এই শরণাগতি বা প্রপত্তিতেই ভাগবত ধর্মের আরম্ভ, কিন্তু এই ভাগবত ধর্মের চরম স্ফূর্তি বৃন্দাবন-লীলায়। শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে শ্রীভগবান উদ্ধবকে শুধু শরণাগতির কথাই বলেন নি, গোপিকাগণের মধুর রতিতেই যে রস-সাধনার চরম উৎকর্ষ, লীলা-সংবরণের পূর্বে উদ্ধবের নিকট এ কথা নিজ মুখে প্রচার করেছেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে, জ্ঞানীর নিকট যিনি ব্রহ্ম, যোগীর নিকট যিনি পরমাত্মা, ভক্তের নিকট তিনিই ভগবান। তাঁর নিত্যলীলা ভক্তেরাই দেখতে পান। কিন্তু তাঁর প্রকটলীলার উদ্দেশ্য যে ভূভার-হরণ, ধর্ম-সংস্থাপন ও প্রেমধর্মের মহিমাপ্রচার, শ্রীকৃষ্ণ-উদ্ধব-সংবাদ থেকে তা আমরা জানতে পারি।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সখা ও প্রিয়পাত্র উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণের লীলা-সংবরণের কথা শুনে এবং আসন্ন কৃষ্ণবিরহে কাতর হয়ে নির্জনে তাঁর নিকট উপস্থিত হলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তখন তাকে মানবজন্মের দুর্লভত্ব ও মানবদেহের ক্ষণভঙ্গুরত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। তিনি বললেন, 'উদ্ধব, তুমি সন্ন্যাসগ্রহণ করে অনাসক্ত ও নির্লিপ্তভাবে পরমানন্দে পৃথিবীতে বিচরণ করবে।' এরপর তিনি তাঁর নিকট যদু ও অবধূত সংবাদ বর্ণনা করে দেখলেন, যথার্থ জ্ঞানী ব্যক্তি স্থাবর, জঙ্গম সকল পদার্থ থেকেই উপদেশ গ্রহণ করে জীবন সার্থক করতে পারে। শ্রীভগবান বললেন, 'প্রবৃত্তিমার্গে স্থূল ইন্দ্রিয়-সম্ভোগের পথে মানুষ কখনো স্থায়ী সুখ লাভ করতে পারে না। স্থায়ী সুখলাভের জন্যে চাই সদ্গুরুর সেবা, সাধুসঙ্গ, ভগবানের চরণে শরণাগতি, যুক্ত বৈরাগ্য। উদ্ধবের এক প্রশ্নের উত্তরে ভগবান বদ্ধ ও মুক্ত জীবের পার্থক্য প্রদর্শন করলেন। তিনি বললেন—সৎসঙ্গের দ্বারা ভক্তি লাভ করলে মানুষ অনায়াসে ভগবৎ-পাদপদ্ম লাভ করতে পারে।

ভগবতের একাদশ স্কন্ধের ষোড়শ অধ্যায়ে শ্রীভগবান তাঁর বিভূতির বর্ণনা করেছেন। এই বর্ণনার সঙ্গে ভগবদ্গীতার বিভূতি-যোগের (দশম অধ্যায়) বর্ণনার ভাবগত ও ভাষাগত সাদৃশ্য আছে। কিন্তু গীতায় ভগবান যে কথা বলেন নি, এখানে সে কথাও বলেছেন। তিনি বলেছেন, 'উদ্ধব, আমার বিভূতিতে অভিনিবেশ না করে বাক্য, মন ও প্রাণকে সংযত করে আমারই সেবায় নিযুক্ত হও।' শ্রীভগবান উদ্ধবের নিকট সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগের ধর্ম বর্ণনা করে ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসীর প্রধান ধর্মও বিবৃত করেছেন। সেই সঙ্গে তিনি বলেছেন, 'ভগবানের আরাধনা সর্বকালের সর্বযোগের মানবের ধর্ম।' ভগবান আবার বললেন, অধিকার-ভেদে কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ মানুষের অবলম্বনীয়। সংসারে মনুষ্যজন্ম দুর্লভ ও দেববাঞ্ছিত, যিনি ভগবদ্ভক্ত তিনি অন্য কোন সাধন অবলম্বন না করেও অনায়াসে ভবসাগর পার হন। তিনি ভগবৎকৃপায় পাপ ও পুণ্যকে অতিক্রম করেন।' তিনি আরো বললেন, 'বেদোক্ত ধর্মের রহস্য উপলব্ধি না করে সাধারণ মানুষ বেদের ফলশ্রুতিতে বিভ্রান্ত হয়। বেদের উদ্দেশ্য হচ্ছে সকাম মানুষের মন ধীরে ধীরে ভগবদ্ভজনের প্রবৃত্তি জাগিয়ে তোলা। যিনি যথার্থ ভগবদ্ভক্ত, অপমান, তাড়না বা লাঞ্ছনাও তাঁর চিত্তবিকার

ঘটাতে পারে না, কারণ তিনি ত্রিগুণাতীত।' তিনি আবার বলেছেন—মানুষের অহংবুদ্ধিই অনর্থের কারণ, বিবেকের দ্বারা এই অহংবুদ্ধিকে নাশ করতে হবে।

এই শ্রীকৃষ্ণ-উদ্ধব সংবাদে উদ্ধব তো উপলক্ষ্য মাত্র; বিশ্বের ত্রিতাপদগ্ধ নরনারীই তাঁর লক্ষ্য। ভগবান তাই উদ্ধবের নিকট উদাত্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন—ভগবানের নিষ্কাম আরাধনাই মানবজীবনের চরম সার্থকতা—যাগ-যজ্ঞাদি সকাম কর্মে নয়, কূট তর্ক-বিতর্কে নয়; যোগভ্যাস, দান বা অন্যবিধ তপস্যায়ও নয়। এরই প্রতিধ্বনি আমরা শুনতে পাই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে:

যে ভক্তি তোমারে লয়ে ধৈর্য নাহি মানে
মুহূর্তে বিহ্বল হয় নৃত্য-গীত-গানে
ভাবোন্মাদ মত্ততায়, সেই জ্ঞানহারা
উদ্‌ভ্রান্ত উচ্ছেলফেন ভক্তিমদধারা
নাহি চাহি নাথ। (নৈবেদ্য)

দ্বাদশ স্কন্ধ

প্রথম অধ্যায়

ভাবী রাজবংশের বিবরণ

রাজা পরীক্ষিৎ বললেন, মুনি, যদুবংশের অলংকার শ্রীকৃষ্ণ স্বধামে গমন করলে পর পৃথিবীতে কার বংশ রাজপদে অধিষ্ঠিত হবেন, তা আমাকে বলুন। শুকদেব বললেন, বৃহদ্রথবংশীয় পুরঞ্জয় নামে যিনি সর্বশেষে রাজা হবেন, তাঁর মন্ত্রী শুনক নিজ প্রভু পুরঞ্জয়কে হত্যা করে আপন পুত্রকে রাজা করবেন। এঁর নাম হবে প্রদ্যোত। প্রদ্যোতের পুত্র পালক; পালকের পুত্র বিশাখযূপ, বিশাখযূপ থেকে রাজক এবং রাজক থেকে তাঁর পুত্র নন্দিবর্ধন জন্মাবেন। প্রদ্যোতবংশীয় এই পাঁচজন রাজা একশ আটত্রিশ বছর পৃথিবী পালন করবেন। তারপর রাজা হবেন শিশুনাগ। তাঁর পুত্র কাকবর্ণ, কাকবর্ণের পুত্র ক্ষেমধর্মা। ক্ষেমধর্মার পুত্র হল ক্ষেত্রজ্ঞ। তাঁর পুত্র বিধিসার, তিনি অজাতশত্রু হবেন। বিধিসারের পুত্র হবেন দর্ভক এবং দর্ভকের পুত্র অজয়। অজয়ের পুত্র নন্দিবর্ধন, তাঁর পুত্র মহানন্দি। হে কুরুশ্রেষ্ঠ, শিশুনাগ থেকে আরম্ভ করে এই দশজন রাজা কলিকালে তিনশ ষাট বছর পৃথিবী ভোগ করবেন। মহানন্দির কোন শূদ্রা পত্নীর গর্ভে নন্দ নামে এক বলশালী পুত্র হবে। নন্দ রাজা হলে তাঁর আর এক নাম হবে মহাপদ্ম। তিনি ক্ষত্রিয়বংশ বিনাশ করবেন। নন্দের পরের রাজারা শূদ্রতুল্য ও অধার্মিক হবেন। মহাপদ্ম নন্দের শাসন কেউ লঙ্ঘন করতে পারবে না। তিনি দ্বিতীয় পরশুরামের মত একচ্ছত্ররূপে পৃথিবী পালন করবেন। নন্দের সুমাল্য প্রভৃতি আট পুত্র হবে এবং তাঁরা একশ বছর রাজত্ব করবেন। (চাণক্য নামে) এক ব্রাহ্মণ অনুগত নন্দ আর তাঁর আট পুত্রের বিনাশ সাধন করবেন। তাঁদের পরে কলিকালে মৌর্যগণ পৃথিবী ভোগ করবেন। সেই ব্রাহ্মণ চন্দ্রগুপ্তকে রাজ্যে অভিষিক্ত করবেন। চন্দ্রগুপ্তের পুত্র বারিসার এবং তাঁর পুত্র অশোকবর্ধন। অশোকের পুত্র হবেন সুযশা, তাঁর পুত্র সঙ্গত; সঙ্গতের পুত্র শালিশূক এবং তাঁর পুত্র হবেন সোমশর্মা। সোমশর্মার পুত্র শতধন্বা, তাঁর পুত্র বৃহদ্রথ। মৌর্য-বংশীয় এই দশজন রাজা কলিকালে একশ সাঁইত্রিশ বছর পৃথিবী ভোগ করবেন। তারপর কলিতে বৃহদ্রথের সেনাপতি পুষ্যমিত্র মৌর্যবংশীয় আপন প্রভুকে বধ করে নিজেই রাজা হবেন। পুষ্যমিত্রের পুত্র হবেন অগ্নিমিত্র, তাঁর পুত্র সুজ্যেষ্ঠ। সুজ্যেষ্ঠের পুত্র বসুমিত্র, বসুমিত্র থেকে ভদ্রক ও ভদ্রক থেকে তাঁর পুত্র পুলিন্দ জন্মাবেন। পুলিন্দের পুত্র ঘোষ, তাঁর পুত্র বজ্রমিত্র; বজ্রমিত্রের পুত্র ভাগবত, তাঁর পুত্র হবেন দেবভূতি। শুঙ্গবংশীয় এ দশজন রাজা একশ বছরের অধিক কাল রাজত্ব করবেন। এরপর এ পৃথিবী স্বল্পগুণশালী কণ্বদের হস্তগত হবে। ১-১৮

শুঙ্গবংশীয় রাজা কামাসক্ত দেবভূতিকে বধ করে তাঁর মন্ত্রী মহামতি বসুদেব কণ্ব নিজেই রাজ্য শাসন করবেন। তাঁর পুত্র হবেন ভূমিত্র, তাঁর পুত্র নারায়ণ এবং নারায়ণের সুশর্মা নামে পুত্র হবে। কণ্ববংশীয় এসকল নৃপতি কলিযুগে তিনশ পঁয়তাল্লিশ বছর রাজত্ব ভোগ করবেন। তারপর কণ্ববংশীয় রাজা সুশর্মাকে

বধ করে তাঁরই ভৃত্য অত্যন্ত দুষ্টাত্মা বলী নামে অন্ধ্রজাতীয় এক শূদ্র কিছুকাল রাজ্য ভোগ করবেন। বলীর পর তাঁর ভ্রাতা কৃষ্ণ রাজা হবেন। কৃষ্ণের পুত্র শ্রীশান্তকর্ণ, তাঁর পুত্র পৌর্ণমাস; তাঁর পুত্র লম্বোদর; লম্বোদরের পুত্র রাজা চিবিলক। চিবিলকের পুত্র মেঘস্বাতি, তাঁর পুত্র অটমান, অটমান থেকে অনিষ্ট-কর্মা, অনিষ্টকর্মার পুত্র হালেয়। হালেয়ের পুত্র তলক, তাঁর পুত্র পুরীষভীরু; তাঁর পুত্র রাজা সুনন্দন। সুনন্দনের পুত্র চকোর। তাঁর বহু (অর্থাৎ আট) পুত্র জন্মাবে। তাঁদের মধ্যে কনিষ্ঠ পুত্র অরিন্দম শিবস্বাতি; তাঁর পুত্র গোমতী; তাঁর পুত্র পুরীমান্। পুরীমানের পুত্র মেদশিরা; তাঁর পুত্র শিবস্কন্দ; শিবস্কন্দের পুত্র যজ্ঞশ্রী। যজ্ঞশ্রীর পুত্র হবেন বিজয়; তাঁর পুত্র চন্দ্রবিজ্ঞ, এবং তাঁর পুত্র সলোমধি। কুরুনন্দন, এ ত্রিশজন রাজা চারশ' ছাপান্ন বছর পৃথিবী ভোগ করবেন। ১৯-২৮

এর পর অবভৃতি নগরীতে আভীর বংশীয় সাতজন, গর্দভী বংশীয় দশজন এবং কংকবংশীয় ষোলজন অতি লোভী রাজা রাজত্ব করবেন। এদের পরে আটজন যবন, চৌদ্দজন তুরস্ক, দশজন গুরুণ্ড ও এগারজন মৌল পৃথিবী পালন করবেন। এগারজন মৌল রাজা ছাড়া আভীরাদি প'য়ষট্টিজন রাজা এক হাজার নিরানব্বই বছর পৃথিবী ভোগ করবেন। আর ঐ এগারজন মৌল নৃপতি তিনশ বছর রাজ্য পালন করবেন। মৌলদের পর কিলিকিলা নগরীতে ভূতনন্দ, বঙ্গির; শিশুনন্দি, তাঁর ভাই যশোনন্দি এবং প্রবীরক—এ সমস্ত রাজা একশ ছয় বছর রাজত্ব করবেন। ভূতনন্দ প্রভৃতির তেরজন পুত্র রাজা হবেন। এরা বাহ্লিক নামে পরিচিত হবেন। তারপর পুষ্পমিত্র নামে এক ক্ষত্রিয় এবং তাঁর পুত্র দুর্মিত্র রাজা হবেন। বাহ্লিক বংশ থেকে সাতজন অন্ধ্র ও সাতজন কোশল—এই চৌদ্দজন এবং বিদুরপতিগণ নিষধপতিগণ এককালেই (নিজ নিজ দেশে) রাজা হবেন। পরে মাগধদের রাজা হবেন বিশ্বস্ফূর্জি। ইনি পূর্বেকার পুরঞ্জয়ের মতই বিখ্যাত হবেন। ইনি ব্রাহ্মণাদি বর্ণকে পুলিন্দ, যদু ও মদ্রক নামক ম্লেচ্ছদের তুল্য করবেন। শক্তিশালী দুর্মতি বিশ্বফূর্জি ক্ষত্রিয়দের বিতাড়িত করে পদ্মাবতী নগরীতে ব্রাহ্মণাদি ত্রিবর্ণ বহির্ভূত নীচজাতিবহুল প্রজা স্থাপন করবেন, এবং গঙ্গাদ্বার অর্থাৎ হরিদ্বার থেকে প্রয়াগ পর্যন্ত ভূভাগে রাজত্ব করবেন। তারপর সৌরাষ্ট্র, অবন্তী, আভীর, শূর, অর্বুদ ও মালবদেশী দ্বিজগণ (অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ) ব্রাত্য অর্থাৎ উপনয়নাদি সংস্কারহীন হয়ে পতিত হবেন এবং রাজারাও শূদ্রতুল্য হবেন। বেদাচারহীন এসকল পতিত শূদ্রগণ ও ম্লেচ্ছগণ সিন্ধুনদের তটভূমি, কুন্তিদেশীয় চন্দ্রভাগা ও কাশ্মীরমন্ডল ভোগ করবেন। মহারাজ, এসকল ম্লেচ্ছতুল্য রাজা একই সময়ে রাজত্ব করবেন। এঁরা অধার্মিক, মিথ্যাচারী, অল্পদাতা, অত্যন্ত ক্রোধী, স্ত্রী-বালক-গো-ব্রাহ্মণদের হত্যাকারী, পরস্ত্রী ও পরধনে অভিলাষী হবেন। এদের অসময়ে জন্ম ও অকালে মৃত্যু হবে। এঁরা অল্পবল এবং অল্পায়ু হবেন। সংস্কারবিহীন ও ধর্মকর্ম-বিবর্জিত ক্ষত্রিয়রূপী এসকল ম্লেচ্ছগণ রজ ও তমোগুণে আচ্ছন্ন হয়ে প্রজাদের পীড়ন করবেন। এইসব রাজার অধীন প্রজাদের চরিত্র ও আচার এঁদের মতই হবে, এবং তারা নিজেদের মধ্যে কলহাদি দ্বারা এবং রাজাদের দ্বারা নিপীড়িত হয়ে ধ্বংস পাবে। ২৯-৪৩

দ্বিতীয় অধ্যায়

কলি-ধর্ম-কথা

শুকদেব বললেন, মহারাজ, তারপর বলবান কালের প্রভাবে দিন দিন জীবের ধর্ম সত্য, পবিত্রতা, ক্ষমা, দয়া, আয়ু বল ও স্মৃতি বিনষ্ট হবে। কলিকালে বিত্তই মানুষের জন্ম, আচার ও গুণের উৎকর্ষ নির্ধারণ করবে, এবং শারীরিক বলেই ধর্মবোধ ও ন্যায়বোধের মূল কারণ হয়ে দাঁড়াবে। (সোজা কথায়, যার টাকা-পয়সা আছে, তাকেই উচ্চ কুলে জাত, সদাচারী ও গুণবান বলে মানতে হবে, এবং যার গায়ের জোর আছে, তাকেই ধার্মিক ও ন্যায়বান বলে স্বীকার করতে হবে)। দাম্পত্যজীবনে কুল, গোত্র এসব বিচার্য হবে না। সেখানে স্ত্রী ও পুরুষের অভিরুচিই (নিজের পছন্দই) প্রাধান্য পাবে। জিনিসপত্র কেনা-বেচার ব্যাপারে ছল-প্রতারণাই দাঁড়াবে বড় হয়ে। কামকলায় পারদর্শিতা স্ত্রী ও পুরুষের শ্রেষ্ঠত্বের হেতু হবে, আর যজ্ঞসূত্র হবে ব্রাহ্মণত্বের পরিচায়ক। দণ্ড ও অজিন প্রভৃতি চিহ্ন ধারণই আশ্রমের জ্ঞান এবং এক আশ্রম থেকে অন্য আশ্রম গ্রহণ সূচিত করবে। বিচারালয়ে অর্থব্যয়ের অক্ষমতাই দোষের কারণ হবে; বেশী কথা বলাই হবে পাণ্ডিত্যের লক্ষণ। ধনহীনতা হবে অসাধুতার লক্ষণ, গর্ব হবে সাধুতার চিহ্ন, স্ত্রী-পুরুষ পরস্পরকে স্বীকার করে নিলেই তা বিবাহ বলে গণ্য হবে। দেহের শুচিতা কেবল স্নানেই পর্যবসিত হবে। কলিতে দূরবর্তী জলাশয় হবে তীর্থস্থল, মাথায় বেশী চুল রাখাই হবে সৌন্দর্যের চিহ্ন, নিজের উদরপূরণ হবে পুরুষার্থ এবং ধৃষ্টতা বা বাচালতাই হবে সত্যবাদিতার লক্ষণ। লোকে পরিজন পোষণ করবে শুধু বাহবার জন্য আর ধর্মানুষ্ঠান করবে কেবল যশের জন্য। পৃথিবী এই রকম নানা দোষে দুষ্ট প্রজাদের দ্বারা পরিব্যাপ্ত হলে ব্রাহ্মণ; বৈশ্য, ক্ষত্রিয় ও শূদ্রদের মধ্যে যিনি বলবান, তিনিই রাজা হবেন। ১-৭

লুব্ধ, নিষ্ঠুর, দস্যুপ্রকৃতির রাজারা জোর করে প্রজাদের স্ত্রী ও ধন-সম্পত্তি অপহরণ করবে, আর প্রজারা পর্বতে ও বনে গিয়ে আশ্রয় নেবে। তারা শাক, মূল, আমিষ, মধু, ফল, ফুল ও বীজ ভক্ষণ করবে। অনাবৃষ্টির জন্য দুর্ভিক্ষ ও রাজকরে নিপীড়িত হয়ে তারা বিনষ্ট হবে। শীত, ঝড়, রোদ, বর্ষা ও হিমে, পরস্পর কলহে, ক্ষুধা-তৃষ্ণায়, নানাবিধ রোগে এবং চিন্তায় প্রজারা সন্তপ্ত হবে। মানুষের আয়ু হবে পঞ্চাশ বছর মাত্র। কলিতে কালের দোষে দেহধারীদের দেহ ক্ষীণ ও দুর্বল হবে; বর্ণাশ্রমী লোকদের বেদনির্দিষ্ট ধর্ম লোপ পাবে। এসময় ধর্মাচারে বেদবিরুদ্ধ মতই খুব বেশী চলবে। রাজারা দস্যুতুল্য হবে। লোকের আচরণে চৌর্য, মিথ্যা, বৃথা হিংসা প্রভৃতি নানাপ্রকার কুকর্ম দেখা যাবে। ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণের লোকেরা শূদ্রতুল্য হবে। গাভীরা ছাগের ন্যায় ক্ষুদ্রাকার হবে। সন্ন্যাসীদের আশ্রমগুলি গৃহীদের ঘরের মত হবে। বিবাহসূত্রে যাদের সঙ্গে সম্বন্ধ আছে, কেবল তারাই বন্ধু হবে। ওষধিগুলির গুণ কমে যাবে। সব গাছ শমীগাছের মত ক্ষুদ্র হবে। মেঘে খুব বেশী বিদ্যুৎ থাকবে। লোকের ঘরবাড়ী শূন্যপ্রায় হবে। এভাবে কলিযুগ যখন প্রায় শেষ হবে এবং লোকেরাও গর্দভের মত আচরণ করবে, তখন ধর্মের পরিত্রাণের অর্থাৎ পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য ভগবান সত্ত্বগুণ অবলম্বন করে আবির্ভূত হবেন। ৮-১৬

সাধুদের ধর্মরক্ষা ও কর্মের নিবৃত্তি দ্বারা মোক্ষের জন্য চরাচরসকলের গুরু, সর্বাত্মা ও পরমেশ্বর বিষ্ণুর আবির্ভাব হবে। তিনি শম্ভল নামক গ্রামের

সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ মহাত্মা বিষ্ণুযশার গৃহে কল্কিরূপে অবতীর্ণ হবেন। অণিমাদি অষ্টবিধ ঐশ্বর্যযুক্ত এবং সত্যাদি গুণসম্পন্ন, অতুল্যকান্তি জগৎপতি সেই ভগবান বিষ্ণু অসাধুদের দমন করবেন। দ্রুতগামী দেবদত্ত নামক অশ্বে আরোহণ করে পৃথিবীতে বিচরণ করে তিনি রাজবেশী কোটি কোটি দস্যুকে খড়্গাঘাতে বধ করবেন। দস্যুদল নিহত হলে বাসুদেবের অঙ্গরাগের অতি পবিত্র গন্ধদ্রব্যাদির দ্বারা সুরভিত বায়ুর স্পর্শে পুরবাসী ও জনপদবাসীদের চিত্ত নির্মল হবে। সত্ত্বমূর্তি ভগবান বাসুদেব তাদের হৃদয়স্থ হলে তারা বহু সন্তান-সন্ততি লাভ করবে। যখন ধর্মরাজ শ্রীহরি কল্কিরূপে অবতীর্ণ হবেন, তখনই সত্যযুগ আরম্ভ হবে এবং প্রজাদের সন্তানগণ সত্ত্বপ্রধান হবে। যখন চন্দ্র, সূর্য, পুষ্যানক্ষত্র ও বৃহস্পতি সম্মিলিতভাবে একরাশিতে (কর্কট রাশিতে) প্রবেশ করবেন তখন সত্যযুগ আরম্ভ হবে। মহারাজ, চন্দ্র ও সূর্যবংশীয় যে সকল রাজা অতীতকালে ছিলেন, যাঁরা এখন বর্তমান আছেন এবং ভবিষ্যতে যাঁরা থাকবেন সংক্ষেপে আমি তাঁদের কথা আপনার কাছে বর্ণনা করলাম। ১৭-২৫

মহারাজ, আপনার জন্ম থেকে আরম্ভ করে নন্দের রাজ্যাভিষেক পর্যন্ত এক হাজার একশত পনের বছর হয়। সপ্তর্ষিগণের মধ্যে রাত্রিতে প্রথম যে দুই ঋষিকে (পুলহ ও ক্রতুকে) আকাশে উদিত দেখা যায়, তাঁদের মধ্যে (অশ্বিনী প্রভৃতির) যে নক্ষত্রকে সমদেশে অবস্থিত দেখা যায়, ঋষিগণ মানুষের পরিমাণে একশ বছর সেই নক্ষত্রে থাকেন। আপনার কালে এখন সেই ঋষিরা মঘা নক্ষত্র আশ্রয় করে রয়েছেন। যখন ভগবান বিষ্ণুর অবতার কৃষ্ণ নামক সূর্য স্বধামে প্রস্থান করলেন তখনই পৃথিবীতে কলি প্রবেশ করল। ঐ সময় থেকেই জনগণ পাপকার্যে রত হচ্ছে। যতক্ষণ লক্ষ্মীপতি শ্রীকৃষ্ণ চরণকমলযুগলের দ্বারা পৃথিবীকে স্পর্শ করে বর্তমান ছিলেন, ততক্ষণ কলি পৃথিবীকে আক্রমণ করতে সক্ষম হয় নি। যখন ঐ সপ্ত দেবর্ষি মঘা নক্ষত্রে বিচরণ করছিলেন, তখনই দিব্য পরিমাণে বারশত বছরের কলিযুগ আরম্ভ হয়। মহর্ষিগণ যখন মঘা নক্ষত্র থেকে পূর্বাষাঢ়া নক্ষত্রে যাবেন, তখন নন্দরাজার কাল থেকে কলির প্রতাপ বাড়তে থাকবে। যেদিন শ্রীকৃষ্ণ স্বর্গে গমন করলেন ঠিক সেই দিনই কলিযুগের আরম্ভ হয়েছে, একথা পুরাবিৎ পণ্ডিতগণ বলেন। দিব্য পরিমাণে এক হাজার (কলির উভয় সন্ধ্যার জন্য আরও দুশ) বছরের চতুর্থ যুগ কলির অবসানে আবার সত্যযুগ আসবে; তখন মানুষের মন আত্মার প্রকাশক হবে। পৃথিবীতে মনুর এ-বংশের কথা যেরূপ বর্ণনা করা হল, যুগে যুগে বৈশ্য শূদ্র ও ব্রাহ্মণগণের অবস্থাও সে প্রকার হয়, এটা বুঝতে হবে। পূর্ববর্ণিত মহাপুরুষের নাম মাত্রই তাঁদের পরিচয়জ্ঞাপক হয়েছে—তাঁরা নিজেরা এখন গল্পের বিষয় হয়েছেন। তাঁদের কীর্তিই কেবল এখনও পৃথিবীতে বিদ্যমান রয়েছে। ২৬-৩৬

শান্তনুর ভাই (চন্দ্রবংশীয়) দেবাপি এবং ইক্ষ্বাকুর বংশে জাত (সূর্য বংশীয়) মরু—এ দুজন মহাযোগবলে বলীয়ান হয়ে এখন কলাপ গ্রামে আছেন। কলিযুগের অবসানে তাঁরা দুজন বাসুদেবের উপদেশ পেয়ে লোকসমাজে এসে পূর্বের ন্যায় বর্ণাশ্রম ধর্মের প্রবর্তন ও বিস্তার করবেন। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি—এই চারটি যুগ ক্রমানুসারে পৃথিবীতে প্রাণীদের জগতে প্রবর্তিত হয়। মহারাজ, আমি এখানে যে সকল রাজার এবং অন্য যাদের (ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ও শূদ্রদেরও) কথা বর্ণনা করেছি, তাঁরা সকলেই মমতার বন্ধন স্থাপন করে পরিশেষে এ পৃথিবী পরিত্যাগ করেছেন। জীবনকালে যিনি রাজা তাঁর দেহও অবশেষে কৃমি, বিষ্ঠা বা ভস্মেই পরিণত হয়। এই দেহের জন্য যে প্রাণিহিংসা

করে, সে কি প্রকৃত স্বার্থ জানে ? কারণ, প্রাণিহিংসার ফলে তো মানুষ নরকগামীই হয়। 'এ অখণ্ড পৃথিবী আমার পূর্বপুরুষগণের অধিকারে ছিল, এখন আমার অধিকারে আছে, এরপর কিভাবে এ আমার পুত্র, পৌত্র ও বংশধরগণের অধিকারে থাকবে'—বিবেকহীন রাজাগণ এইরকম চিন্তায় অগ্নি, জল ও অন্নময় এ দেহকেই আত্মা এবং পৃথিবীকে আপন বলে বিবেচনা করে অবশেষে উভয়কেই পরিত্যাগ করে অদৃশ্য হয়েছেন। মহারাজ, যে সকল রাজা পরাক্রম দ্বারা পৃথিবী ভোগ করেছিলেন, কালক্রমে তাঁরা সকলেই কেবল গল্পের কথায় পর্যবসিত হয়েছেন। ৩৭-৪৪

তৃতীয় অধ্যায়

যুগধর্মের বর্ণনা

শুকদেব বললেন, এই পৃথিবী জয়লোভী রাজাদের দেখে হাসতে হাসতে নিজের মনে বললেন, দেখ, যমরাজের খেলার পুতুল এ-সব রাজা আমাকে জয় করতে চায়। সে সকল রাজা ফেনতুল্য অনিত্য দেহে অত্যধিক বিশ্বাস স্থাপন করেন, বিদ্বান হলেও তাঁদের এ কামনা ব্যর্থ হয়। প্রথমে ষড়্‌বর্গ (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ও ত্বক্, এ পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন) জয় করে রাজমন্ত্রী, অমাত্য, পুরবাসী, বিশ্বস্ত ব্যক্তিগণ ও হস্তিরক্ষকগণকে জয় করব। পরে কণ্টকতুল্য প্রতিপক্ষ রাজাদের জয় করব। এভাবে ক্রমশ সাগরমেখলা পৃথিবীকে জয় করব। এরকম আশার ডোরে যাঁদের হৃদয় বদ্ধ হয়েছে সেই রাজারা নিকটে অবস্থিত যমকে দেখতে পান না। অনেকে সাগরবেষ্টিতা আমাকে জয় করে সবিক্রমে সমুদ্রে প্রবেশ করে দ্বীপান্তর জয়ে উদ্যত হয়, কিন্তু আত্মজয় অর্থাৎ ইন্দ্রিয়জয়ের তুলনায় এ জয় কতটুকু ? আত্মজয়ের ফল মুক্তি। হে কুরুবংশধর, মনুগণ ও তাঁদের পুত্রগণ যেমন এসেছিলেন, আবার তেমনি আমাকে পরিত্যাগ করে চলে গেলেন। এর পরও সেই শ্রেণীর নির্বোধ রাজারা যুদ্ধে আমায় জয় করতে চায়। যাদের চিত্ত রাজ্যের প্রতি মমতাবদ্ধ সেই রকম অসাধু পিতা ও পুত্রের মধ্যে এবং ভাইদের মধ্যেও আমার জন্য যুদ্ধবিগ্রহ হয়। 'এ সমগ্র পৃথিবী আমারই, তোমার নয়'—এ কথা বলে রাজারা আমার জন্যে স্পর্ধা করে পরস্পরকে হত্যা করে; এ ভাবেই তারা মারা পড়ে। পৃথু, পুরূরবা, গাধি, নহুষ, ভরত, কার্তবীর্যার্জুন, মান্ধাতা, সগর, রাম, খট্বাঙ্গ, ধুন্ধুমার, রঘু, তৃণবিন্দু, যযাতি, শর্যাতি, শান্তনু, গয়, ভগীরথ, কুবলয়াশ্ব, ককুৎস্থ, নৈষধ, নৃগ এবং হিরণ্যকশিপু, বৃত্র, লোক-ভীতিপ্রদ রাবণ, নমুচি, শম্বর, নরক, হিরণ্যাক্ষ, তারক এবং অপরাপর আরও যে সকল দৈত্য ও রাজারা আমার অধিপতি ছিলেন তাঁরা সকলেই সর্বজ্ঞ, বীর, সর্বজেতা ও অপরাজিত ছিলেন। তাঁরা আমার প্রতি বিশেষ মমতাবশে জীবনধারণ করেছিলেন। ১-১২

মহারাজ, তাঁরা কিন্তু সকলেই মরণশীল। কালের প্রভাবে তাঁরা সকলেই অকৃতার্থ হয়ে কথামাত্রে পর্যবসিত হয়েছেন। পৃথিবীতে যশ বিস্তার করে এই যে সকল মহান পুরুষেরা পরলোকগত হয়েছেন তাঁদের কথাই এখানে বর্ণনা করা হল। এ সকল কথা বিজ্ঞান (বিষয়ের অসারতা বোধ) ও বৈরাগ্য (বিবেকিতা) প্রতিপাদক বাক্যবিলাস মাত্র; এতে কোনরূপ পরমার্থসিদ্ধি হয় না। ভগবান

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি নির্মল ভক্তিলাভের অভিলাষী হয়ে মুনিগণ অনবরত অমঙ্গলনাশক অতি মধুর যে ভগবৎকথা কীর্তন করে থাকেন, প্রত্যহ তাই শোনা উচিত। ১৩-১৫

রাজা পরীক্ষিৎ বললেন, ভগবান, কলিকালে লোকেরা কি উপায়ে পাপরাশি দূর করবে, তা যথাযথ আমাকে বলুন। যুগ ও যুগধর্ম, প্রলয় ও স্থিতিকালের পরিমাণ, ঈশ্বররূপী কালের এবং মাহাত্মা বিষ্ণুর গতি বর্ণনা করুন। ১৬-১৭

শুকদেব বললেন, মহারাজ, সত্যযুগে চতুষ্পাদ ধর্ম প্রবর্তিত হয়। সে যুগের মানুষেরা তাই অবলম্বন করে। সত্য দয়া, তপস্যা ও দান—ধর্মের এ চারটি পাদ। তখন লোকেরা সর্বদাই সন্তুষ্টচিত্ত, দয়ালু, মৈত্রীভাবাপন্ন, শান্ত, দান্ত, ক্ষমাশীল, আত্মারাম, সমদর্শী এবং তত্ত্বজ্ঞান অর্জন করবার জন্য শ্রমশীল ছিল। ত্রেতায় মিথ্যা, হিংসা, অসন্তোষ ও কলহরূপ অধর্মের চারটি পাদের দ্বারা যথাক্রমে ধর্মের পূর্বোক্ত সত্য, দয়া, তপস্যা ও দানরূপ চারটি পাদের প্রত্যেকটির এক-চতুর্থাংশ ক্রমে ক্রমে হ্রাস পায়। তখন লোকেরা যজ্ঞাদি ক্রিয়ায় ও তপস্যাচরণে নিষ্ঠাবান হয়; তারা খুব বেশী হিংসাপরায়ণ বা লম্পট হয় না। তারা ত্রিবর্গপরায়ণ অর্থাৎ ধর্ম অর্থ ও কাম এই তিন বিষয়ে সবিশেষ মনোযোগী হয়। তারা ঋক্‌, সাম ও যজু এই তিন বেদবিদ্যায় নিপুণ হয় এবং সে কালে ব্রাহ্মণেরই সংখ্যা বেশী। দ্বাপরযুগে হিংসা, অসন্তোষ, মিথ্যা ও দ্বেষ—অধর্মের এ চারটি লক্ষণের দ্বারা ধর্মের চার পাদ তপস্যা, সত্য, দয়া ও দান—এদের প্রত্যেকটির অর্ধেক হ্রাস পায়। তখন সমাজে ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণেরই সংখ্যাধিক্য ঘটে। সে সময়ে লোকেরা যশোলোভী, সচ্চরিত্র, বেদাদি শাস্ত্রপাঠে আগ্রহশীল, ধনী, বহুকুটুম্ব-যুক্ত ও হৃষ্টপ্রকৃতি হয়। কলিতে ধর্মের তপস্যা, সত্য, দয়া ও দানরূপ চাবপাদের প্রত্যেকের এক-চতুর্থাংশ মাত্র অবশিষ্ট থাকে। তাও আবার বৃদ্ধিপ্রাপ্ত অধর্মের চার পাদ অর্থাৎ মিথ্যা, হিংসা, অসন্তোষ ও কলহের দ্বারা ক্রমে ক্ষয় পেয়ে পরিশেষে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়ে যায়। লোকেরা অতিলোভী, দুরাচার, নির্দয়প্রকৃতি, নিরর্থক কলহপরায়ণ, হতভাগ্য ও অত্যধিক কামাসক্ত হয়ে থাকে, সমাজে শূদ্র ও কৈবর্ত জাতিরই তখন প্রাধান্য ঘটে। মানুষের মধ্যে সত্ত্ব, রজ ও তম—এ তিনটি গুণ দেখা যায়। এরা কালপ্রেরিত হয়ে কালের গতিতে জীবের মনে প্রবর্তিত হয়। মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়সমূহ যখন সত্ত্বগুণে প্রতিষ্ঠিত থাকে, তখন সত্যযুগ বুঝতে হবে। কারণ সে সময়ে লোকের জ্ঞান ও তপস্যার প্রতি রুচি হয়। মহারাজ, আপনি বুদ্ধিমান। যখন ধর্ম, অর্থ ও কাম এ সকল কাম্যকর্মের প্রতি লোকের আসক্তি বাড়ে, তখন রজোগুণ-প্রধান ত্রেতাযুগ চলছে, জানবেন। যে কালে লোভ, অসন্তোষ, অভিমান, গর্ব ও মাৎসর্য এবং ধর্ম, অর্থ ও কামনা এ-সব কাম্যকর্মে লোকের আসক্তি বাড়ে, সে কালকে দ্বাপরযুগ বলে জানবেন। সে সময়ে রজ ও তম এই উভয়গুণের আধিক্য ঘটে। আর যখন লোকের মনে ছলনা, মিথ্যা, তন্দ্রা, হিংসা, বিষাদ, শোক, মোহ, ভয়, দীনতা আসে তখন তা কলিযুগ বলে জানবেন। কলিযুগে তমোগুণেরই প্রাধান্য। কলির প্রভাবে লোকেরা নীচদৃষ্টিসম্পন্ন, মন্দভাগ্য, অত্যধিক ভোজনশীল, কামুক ও দরিদ্র হবে এবং স্ত্রীলোকেরা হবে স্বেচ্ছাচারিণী ও অসতী। দেশে চোর-ডাকাতের সংখ্যা বাড়বে, ধর্মধ্বজী পাষাণ্ডগণ বেদসমূহ দূষিত করবে, রাজারা প্রজাদের শোষণ করবে এবং ব্রাহ্মণগণ পেটুক হবে। ব্রাহ্মণবালকেরা উপনয়ন ও ব্রতহীন হবে, তাদের শুচিতা থাকবে না। বহুপরিজন বিশিষ্ট গৃহস্থগণ ভিক্ষাদাতা না হয়ে ভিক্ষাজীবী হবে; তপস্বীরা বন ছেড়ে গ্রামে বাস করবে এবং সন্ন্যাসীরা হবে অত্যন্ত অর্থলোভী। ১৮-৩০

তখন স্ত্রীলোকেরা খর্বাকৃতি, অত্যধিক ভোজনপটু হবে; তারা বহু সন্তান

প্রসব করবে, নির্লজ্জ হবে এবং সর্বদা কুকথা বলবে। তারা চোরস্বভাব, প্রবঞ্চক ও দুঃসাহসী হবে। নীচমনা ও প্রতারক ব্যবসায়ীরা কেনাবেচা করবে। বিপদ উপস্থিত না হলেও লোকেরা নিন্দিত জীবিকাকে উত্তম বলে মানবে। প্রভু সর্বগুণে শ্রেষ্ঠ হয়েও নির্ধন হলে ভৃত্যেরা তাকে পরিত্যাগ করবে; আর পুরুষ-পরম্পরা আগত ভৃত্য বৃদ্ধ কিংবা রুগ্ন হয়ে কর্মে অশক্ত হলে প্রভু তাকে ত্যাগ করবে। মানুষ দুগ্ধহীনা গাভীকেও ত্যাগ করবে। কলিকালে লোকেরা নীচাশয় ও স্ত্রীর বশীভূত হবে। তারা স্ত্রীর আত্মীয়স্বজনকে সুহৃদ বলে মনে করবে এবং পিতা, ভ্রাতা প্রভৃতি স্বজন, বন্ধু ও জ্ঞাতিগণকে বর্জন করে যা কিছু আলাপ,আলোচনা পরামর্শ শ্যালিকা ও শ্যালক প্রভৃতির সঙ্গে করবে। শূদ্রগণ তপস্বীর বেশ ধারণ করে দান গ্রহণ করবে। ধর্মজ্ঞানহীন ব্যক্তিরা উত্তম আসনে বসে ধর্মবিষয়ে উপদেশ দেবে। কলিতে পৃথিবী শস্যহীনা হলে লোকে অনাবৃষ্টির আশংকায় সর্বদা উদ্বিগ্ন থাকবে এবং দুর্ভিক্ষ ও রাজকরে নিপীড়িত হবে। এসময় লোকে বস্ত্র, অন্ন, পান, শয্যা, পত্নীসুখ, স্নান ও ভূষণ প্রভৃতির ভোগ থেকে বঞ্চিত হবে এবং ফলে তাদের পিশাচের মত চেহারা হবে। কলিকালে লোকে মাত্র পাঁচগণ্ডা কড়ির জন্যেও ঝগড়া করে পারস্পরিক বন্ধুতা বর্জন করবে, স্বজনবর্গকেও হত্যা করবে। এমনকি নিজের প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দেবে। নীচপ্রবৃত্তি ও কামুক লোকেরা বৃদ্ধ মাতা-পিতা, পুত্র বা সদ্‌বংশজাতা পত্নীরও ভরণ-পোষণ করে তাদের রক্ষা করবে না। ৩৪-৪২

মহারাজ, ব্রহ্মাদি ত্রিলোকাধিপতিরা যাঁর পাদপদ্মে প্রণাম করেন, কলিযুগে মর্তবাসী লোকেরা পাষণ্ডদের চক্রান্তে বিভ্রান্তচিত্ত হয়ে জগতের পরমগুরু সেই ভগবান অচ্যুতকেও পূজা করবে না। মুমূর্ষু, বিপন্ন, পতিত, স্খলিত বা বিবশ হয়েও মানুষ যাঁর নাম উচ্চারণ করলে কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে পরমগতি লাভ করে, তাঁর পূজা তারা করবে না। ভগবান পুরুষোত্তম মানুষের হৃদয়ে অবস্থান করে কলিকালে সমুৎপন্ন দ্রব্য, স্থান ও আত্মবিষয়ক যাবতীয় দোষ নাশ করেন। ভগবানের নাম ও কথা শুনলে, সংকীর্তন করলে, অন্তরে তাঁকে ধ্যান করলে, তাঁর পূজা করলে, অথবা মনে-প্রাণে তাঁর সমাদর করলে, তিনি ভক্তজনের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত থেকে তাঁদের দশ হাজার বৎসরের পাপরাশি মুহূর্তে বিনাশ করেন। আগুন যেমন সোনায় খাদের মালিন্যাদি দোষ নাশ করে, তেমনি ভগবান বিষ্ণুও যোগিগণের অন্তঃকরণে থেকে তাদের সকল অশুভ বাসনা দূর করে দেন। ভগবান অনন্ত হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হলে অন্তরাত্মা যতখানি পবিত্র হয় শাস্ত্রাদি পাঠ, তপস্যা, প্রাণায়াম, মৈত্রী, তীর্থক্ষেত্রে স্নান, ব্রত, দান ও জপের দ্বারাও ততখানি হয় না। অতএব, মহারাজ, সর্বান্তঃকরণে ভগবান কেশবকে হৃদয়ে ধারণ করুন। মুমূর্ষু ব্যক্তিও তাঁতে (শ্রীহরিতে) মন স্থাপন করে পরমগতি লাভ করে। আসন্নমৃত্যু লোকেরা সকলের আত্মস্বরূপ, সকলের কারণ পরমেশ্বর শ্রীহরির ধ্যান করলে তিনি তাঁদের নিজ স্বরূপ প্রদান করেন।[1] কলিকাল সকল দোষের আকর। কিন্তু তার একটি মহান গুণ আছে। তা হল—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নাম সংকীর্তন করলেই মানুষ সংসারবন্ধন থেকে মুক্তিলাভ করে পরমগতি লাভ করবে। সত্যযুগে ভগবান বিষ্ণুর ধ্যান করে মানুষ যে ফল পায়, ত্রেতায় যজ্ঞাদি দ্বারা তাঁর উপাসনা করে যে ফল পায়, দ্বাপরে তাঁর পরিচর্যা করে যে

১ তুলনীয়ঃ অন্তকালে চ মামেব স্মরন্ মুক্ত্বা কলেবরম্।
যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ।। গীতা, ৮।৫

সুফল লাভ করে, কলিতে একমাত্র হরিনাম কীর্তন করেই মানুষের সেই ফল লাভ হয়। ৪৩-৫২

চতুর্থ অধ্যায়

প্রলয়কাল, স্থিতিকাল ও প্রলয়াদির বর্ণনা

শুকদেব বললেন, মহারাজ, পরমাণু থেকে আরম্ভ করে দ্বিপরার্ধকাল পর্যন্ত আপনার কাছে বর্ণনা করেছি; যুগের পরিমাণও বলেছি।[১] এখন কল্পকাল (স্থিতিকাল) ও প্রলয়কাল (সংহারকাল)-এর পরিমাণ শুনুন। মানুষের চার হাজার যুগ ব্রহ্মার এক দিন। ব্রহ্মার ঐ এক দিনেই এক কল্প। ঐ সময়ের মধ্যে চৌদ্দজন মনু ক্রমে ক্রমে উৎপন্ন হন। তারপর প্রলয়। তার পরিমাণও চার হাজার যুগ। তা হল ব্রহ্মার এক রাত্রি। যে প্রলয়ে স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল এ তিন লোকই লীন হয়ে যায়, তাকে নৈমিত্তিক প্রলয় বলা হয়েছে। এ সময়ে বিশ্বকে নিজের মধ্যে উপসংহার করে বিশ্বস্রষ্টা নারায়ণ অনন্তশয্যায় শয়ন করে থাকেন, আর সে সময়ে ব্রহ্মাও নিদ্রামগ্ন হয়ে পড়েন। পরমেষ্ঠী ব্রহ্মার পরমায়ু দ্বিপরার্ধ বৎসর অতিক্রান্ত হলে সপ্ত প্রকৃতি (মহৎ, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র) লয়-প্রাপ্ত হয়। এর নাম প্রাকৃতিক প্রলয়। এতে বিনাশের কারণ উপস্থিত হলে পূর্বোক্ত মহৎ প্রভৃতি সাতটি প্রকৃতির কার্যস্বরূপ ব্রহ্মাণ্ড মূল প্রকৃতিতে লয় পায়। প্রাকৃতিক প্রলয়কালে একশ বছর অনাবৃষ্টি হয়, ফলে পৃথিবী অন্নহীন হয়। কালের দ্বারা উৎপীড়িত প্রজাগণ তখন ক্ষুধায় কাতর হয়ে একে অন্যকে খেতে থাকে এবং ক্রমশ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। তখন সংবর্তক নামে রবি সমুদ্রস্থিত, দেহস্থিত ও পৃথিবীস্থ সমস্ত রস প্রখর কিরণজালে শোষণ করে নেয়, মোটেই বর্ষণ করে না। তারপর সঙ্কর্ষণের মুখ থেকে উৎপন্ন সংবর্তক নামে অগ্নি বায়ুবেগে প্রদীপ্ত হয়ে পৃথিবীর শূন্য বিবরগুলিকে পোড়াতে থাকে। তখন উপরে, নীচে ও চারদিকে সূর্য আর অগ্নির তাপে ব্রহ্মাণ্ড দগ্ধ হতে থাকে এবং একটি দগ্ধ গোময়পিণ্ডের মত দেখায়। তারপর সংবর্তক নামে অতি প্রচণ্ড বায়ু একশত বৎসরেরও বেশী সময় যাবত প্রবাহিত হয়। তাতে আকাশ ধূলায় আচ্ছন্ন হয়ে ধূসর হয়ে যায়। এরপর নানা রকমের আর নানা রঙের মেঘ শত বৎসর ধরে বর্ষণ করতে থাকে ও ঘোর গর্জনে চারদিক পূর্ণ করে। তখন ব্রহ্মাণ্ডের গহ্বরে প্রবিষ্ট এই বিশ্ব এক-হয়ে-যাওয়া সাগরের জলে ডুবে যায়। এভাবে জলে প্লাবিত হলে পৃথিবীর গন্ধগুণ জলরাশিতে বিলুপ্ত হয়। গন্ধহীনা পৃথিবী তখন নিজ কারণ জলে বিলীন হয়ে যায়। ১-১৩

তারপর তেজ জলের গুণ রসকে গ্রাস করে ফেলে; রসহীন জল নিজ কারণ তেজে বিলুপ্ত হয়। আবার বায়ু তেজের গুণ রূপকে গ্রাস করে এবং রূপহীন তেজ তার কারণ বায়ুতে বিলীন হয়। তারপর বায়ুর স্পর্শগুণ আকাশে মিশে গেলে স্পর্শগুণহীন বায়ুও আকাশে বিলুপ্ত হয়। ভূতাদি তামস অহংকার আকাশের গুণ শব্দকে গ্রাস করে; আর শব্দগুণহীন আকাশ তার কারণ সেই তামস অহঙ্কারে লোপ পায়। এরপর তৈজস অর্থাৎ রাজস অহংকার গুণবৃত্তিগুলির সঙ্গে

১ তৃতীয় স্কন্ধের ১১শ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

ইন্দ্রিয়সমূহকে গ্রাস করে এবং বৈকারিক অর্থাৎ সাত্ত্বিক অহংকার ইন্দ্রিয়দের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণকে গ্রাস করে। তারপর মহৎ-তত্ত্ব অহংকার-তত্ত্বকে গ্রাস করে এবং সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিনগুণ মহৎ-তত্ত্বকে গ্রাস করে। পরে কালপ্রেরিত প্রকৃতি সত্ত্বাদি তিনটি গুণকে গ্রাস করে। তখন এই গুণসমূহের সাম্যাবস্থা আসে। কালের অবয়বসমূহ দ্বারা (দিন-রাত্রি-মাস-বর্ষাদি দ্বারা) তার মূল পরমতত্ত্বের পরিণামাদি বিকার হয় না। সেই পরমতত্ত্ব অনাদি, অনন্ত, অব্যক্ত, নিত্য, অব্যয়, সকল কারণেরও কারণ। সেই পরমকারণে বাক্য ও মন প্রবর্তিত হয় না। তাতে সত্ত্ব নেই, তম নেই, রজ নেই, মহৎতত্ত্বাদিও নেই। তখন প্রাণ, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতাসকল কেউই থাকে না। তখন বিভিন্ন লোকের অস্তিত্বও নেই; সে অবস্থায় স্বপ্ন, জাগরণ, সুষুপ্তি, আকাশ, জল, পৃথিবী, বায়ু, অগ্নি, সূর্য কিছুই নেই। তখন সেই পরম কারণ যেন ঘোর নিদ্রায় নিদ্রিত শূন্যের মত যুক্তি-বিচারাদি তর্কের দ্বারা নিরূপণের অতীত।[১] এই অবস্থাই সবকিছুর মূলীভূত লয়স্থান বলে শাস্ত্রে অভিহিত হয়েছে। এরই নাম প্রাকৃতিক প্রলয়। এতে পুরুষ ও প্রকৃতির শক্তিসমূহ কালের তাড়নে অবশ হয়ে নিজ নিজ কারণে বিলুপ্ত হয়ে যায়। ১৪-২২

জীবগণের ভোগ ও তা থেকে মোক্ষের জন্য বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়াদি ও শব্দাদি ভোগ্য বিষয়রূপে ব্রহ্মই প্রকাশ পান। যার আদি ও অন্ত আছে, তা দৃশ্য এবং তা কার্য থেকে ভিন্ন নয়; এ দুটি কারণ থাকায় এ জগৎ অবস্তু, সুতরাং অনিত্য। ২৩

দীপ, চক্ষু ও রূপ যেমন তেজ থেকে পৃথক নয়, সে রকম বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়সমূহ ও শব্দাদি বিষয় আলাদা আলাদা রূপে প্রকাশ পেলেও পরমকারণ ব্রহ্ম থেকে পৃথক নয়। জাগরণ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি—এ তিনটিকে বুদ্ধির তিন অবস্থা বলা হয়। চেতনস্বরূপ জীবাত্মায় যে অবস্থাত্রয়ের ধারণা হয় অর্থাৎ এই যে নানাত্ব, তা মায়ামাত্র। যেমন মেঘরাশি আকাশে কখনো কখনো থাকে বা বিলীন হয়ে যায়, তেমনি অবয়বের উদয় ও বিনাশ হেতু এই বিশ্ব আত্মাতেই প্রকাশ পায় আবার তাতেই লয় পায়। সংসারে সব দেহীর কারণই সত্য বা ব্রহ্ম। বস্ত্রের কারণ তন্তু যেমন সত্য বলে প্রতিভাত হয়, সে রকম দৃশ্য বিশ্বের কারণও ব্রহ্ম। দেহ ছাড়া দেহী না হওয়ার মত ব্রহ্ম ছাড়া জগৎ উৎপন্ন হতে পারে না। কার্যকারণ রূপে যা পরস্পর সাপেক্ষ বলে মনে হয় তা ভ্রম মাত্র। যার আদি ও অন্ত আছে সে সবই অবস্তু। বিশ্ব প্রকাশ পেলেও জীবাত্মার প্রকাশ ছাড়া কিছুই নির্ণীত হয় না। যদি কিছু প্রকাশিত হয়েছে এরকম স্পষ্ট বোধ হয় তাহলেও সে আত্মসদৃশ আত্মার সঙ্গে অভিন্ন বলেই তাকে বোঝা যায়। সত্যের নানা রূপ নেই, তা এক। অজ্ঞ জীব যদি আত্মার বিভিন্ন স্বরূপ কল্পনা করে তবে তা ঘটাকাশ বা গৃহাকাশের মত, ঘট বা সরোবরের জলে প্রতিবিম্বিত সূর্য অথবা বাইরের ও গৃহের বায়ুকে আলাদা ভাবার মত ভ্রান্তিমাত্র হবে। ব্যবহার অনুসারে সোনা মানুষের হাতে বিশেষ বিশেষ আকার ও রূপের অলংকারে পরিণত হয়। সেরকম ইন্দ্রিয়জ্ঞানের অতীত ভগবান লৌকিক ও বৈদিক ব্যবহারে নানা রূপে বর্ণিত হন। যেমন সূর্য থেকে উৎপন্ন ও সূর্য দ্বারা প্রকাশিত মেঘ সূর্যেরই আবরক হয়, সেরকম ব্রহ্মের কার্যের ফলে জাত ও ব্রহ্মের দ্বারা প্রকাশিত অহংকার ব্রহ্মের অংশীভূত জীবাত্মার স্বরূপ প্রকাশের বাধা হয়ে থাকে। মেঘ সরে গেলে চোখ সূর্যের স্বরূপ দেখতে পায়, আত্মার উপাধিভূত অহংকার ব্রহ্মজ্ঞানবলে নষ্ট হলে পর তখনই জীব আত্মাকে স্মরণ করতে পারে।[২] ২৪-৩৩

---

১ তুলনীয়: মাণ্ডুক্য উপনিষৎ-৭ ২ মানুষের হৃদয়স্থিত কামনারাশি যখন বিনষ্ট হয়, তখন মরণশীল মানুষ অমৃতত্ব লাভ করে ইহজীবনেই ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করেন। —কঠ উপ: ২।৩।১৪

মহারাজ, যখন বিবেকরূপ অস্ত্রের সাহায্যে মায়াময় অহঙ্কাররূপ আত্মবন্ধন ছিন্ন করে আত্মস্বরূপ অচ্যুতকে অনুভব করা যায়, তখন সেই অনুভবই আত্যন্তিক প্রলয় নামে অভিহিত হয়ে থাকে। কোন কোন সূক্ষ্মদর্শী পণ্ডিতের ধারণা যে ব্রহ্মা থেকে স্থাবর পর্যন্ত সমস্ত ভূতেরই প্রতিক্ষণে সৃষ্টি ও লয় হয়ে থাকে। কালের স্রোতে অবিরত পরিবর্তনশীল ভূতমাত্রের বিশেষ বিশেষ অবস্থা দেহের ক্ষণে ক্ষণে জন্ম ও নাশের হেতু; অথচ কাল অনাদি অনন্ত ঈশ্বরস্বরূপ।[১] কালই ক্ষণে ক্ষণে দেহ প্রভৃতি পদার্থের পরিবর্তন ঘটাচ্ছে। কিন্তু আকাশের জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর গতির মত ঐ পরিবর্তিত অবস্থা অদৃশ্য। মহারাজ, আমি নিত্য, নৈমিত্তিক, প্রাকৃতিক ও আত্যন্তিক প্রলয় বর্ণনা করলাম। কালের গতিই এরকম জেনো। অখিল জীবের আশ্রয় জগৎস্রষ্টা নারায়ণের এইসব লীলাকথা সংক্ষেপে বললাম, কেন না স্বয়ং ব্রহ্মাও এই লীলা সম্পূর্ণভাবে বর্ণনায় অক্ষম। যে পুরুষ নানা রকম দুঃখের দাবানলে দগ্ধ হয়ে সুদুস্তর সংসার-সাগর পার হতে ইচ্ছা করেন তাঁর পক্ষে পুরুষোত্তম ভগবানের লীলাকথা-রূপ রসসেবা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। আগে অব্যয় ঋষি নারায়ণ দেবর্ষি নারদকে এই পুরাণ-সংহিতা বলেছিলেন। মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন তাঁর মুখে এই পুরাণ শুনেছিলেন এবং সন্তুষ্ট হয়ে সেই ভাগবত সংহিতা আমাকে বলেছিলেন। হে কুরুশ্রেষ্ঠ, নৈমিষক্ষেত্রে দীর্ঘকাল-ব্যাপী যজ্ঞে সূত-শৌনকাদি ঋত্বিকদের প্রশ্নের উত্তরে এই সংহিতা প্রকাশ করবেন। ৩৪-৪৩

পঞ্চম অধ্যায়

সংক্ষিপ্ত ব্রহ্মোপদেশ

শুকদেব বললেন, যাঁর প্রসন্নতা থেকে ব্রহ্মা এবং ক্রোধ থেকে রুদ্র আবির্ভূত হয়েছেন সেই ভগবান শ্রীহরির স্বরূপ এখন বিশেষভাবে বর্ণনা করছি। মহারাজ, তুমি শ্রীমদ্‌ভাগবত শ্রবণ করলে, কাজেই 'মরিতে হইবে' এই অবিবেকী জনোচিত পশুবুদ্ধি ত্যাগ কর। এই দেহ আগে ছিল না, সম্প্রতি উৎপন্ন হয়েছে এবং শীঘ্রই নষ্ট হবে। তুমি দেহ নও; দেহহীন তুমি আগে ছিলে না বা সম্প্রতি জন্মেছ তা নয়, আবার তুমি ভবিষ্যতে থাকবে না তাও নয়।[২] বীজ থেকে অঙ্কুরের মত পুত্র থেকে পৌত্রাদি রূপেও বার বার উৎপন্ন হবে না। কাঠ যেমন অগ্নির থেকে ভিন্ন সে রকম তুমিও দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি থেকে ভিন্ন। জীব স্বপ্নে নিজের শিরশ্ছেদ এবং জাগ্রত অবস্থায় দেহাদির পঞ্চত্ব প্রাপ্তি দেখে থাকে। তাই দেহাতিরিক্ত আত্মা নিজে অজ, অমর, চিরবিরাজমান। ঘট ভেঙ্গে গেলে ঘটাকাশ আগের মতই আকাশে মিশে যায়; দেহ নষ্ট হলে জীবও সেরকম ব্রহ্মে বিলীন হয়ে থাকে। সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণ, দেহ এবং সমস্ত কর্মের সৃষ্টিকর্তা মন। মায়া (প্রকৃতি) এই মনের সৃষ্টিকর্ত্রী। এই মায়া প্রভৃতি নিখিল উপাধি থেকে জীবের সংসার। যতক্ষণ তেল, দীপ, সলতে

১ তুলনীয়: পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।। ঈশ, শান্তিবচন

২ তুলনীয়: ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ।
ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্বে বয়মতঃপরম্।। গীতা, ২।১২

ও আগুন পরস্পর সংযুক্ত থাকে ততক্ষণই দীপ জ্বলতে থাকে। সেরকম দেহ প্রভৃতির সংযোগেই জীবের জন্ম। জীব ত্রিগুণের ধর্ম বা বৃত্তির বশেই জন্ম লাভ করে এবং তাতেই মৃত্যুগ্রস্ত হয়। জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মা জন্মহীন, তিনি সূক্ষ্ম-স্থূল দেহ থেকে স্বতন্ত্র, আকাশের মত দেহ প্রভৃতি সব কিছুর আধার, বিকারহীন; তিনি অনন্ত অনুপম।[১] ১-৮

মহারাজ, তুমি বিচারসম্পন্ন বুদ্ধিদ্বারা বাসুদেবের চিন্তা করে নিজেই অন্তর্যামী আত্মার বিচার কর। ব্রাহ্মণের আদেশ পেয়েও (তোমার প্রতি অভিশাপে) তক্ষক তোমাকে দগ্ধ করবে না, শুধুমাত্র তোমার দেহকে দগ্ধ করবে আর মৃত্যুর কারণ-গুলিও তোমাকে দগ্ধ করবে না। তুমি মৃত্যুরও ঈশ্বর হবে। আমি পরমধাম ব্রহ্মস্বরূপ এবং পরমপদ ব্রহ্মই আমি'[২]--এই চিন্তা করতে করতে আত্মাকে নিরাকার ব্রহ্মে যুক্ত কর। তাহলে দেখতে পাবে বিষমুখ তক্ষক, এমনকি এই বিশ্ব পর্যন্ত আত্মা থেকে স্বতন্ত্র নয়। বৎস পরীক্ষিৎ, তুমি আত্মার কথা জিজ্ঞাসা করেছিলে; তোমাকে তা বললাম। বল, আর কি শুনতে ইচ্ছা করছ। ৯-১৩

ষষ্ঠ অধ্যায়

বেদ-শাখা প্রণয়ন

সূত বললেন. ব্যাসপুত্র শুকদেবের মুখে এসব শুনে বিষ্ণুভক্ত পরীক্ষিৎ তাঁর চরণে প্রণত হলেন। কৃতাঞ্জলিবদ্ধ হয়ে বললেন, প্রভু, আমি কৃতার্থ ও অনুগৃহীত হলাম। আপনি করুণা করে আমায় অনাদি অনন্ত সাক্ষাৎ শ্রীহরির কথা বললেন। সংসার-তাপে তাপিত অজ্ঞ জীবদের প্রতি কৃষ্ণভক্ত মহাত্মাদের যে অনুগ্রহ তা আমি আশ্চর্যের বিষয় বলে মনে করি না। ভগবানের লীলায় পবিত্র গাথাপূর্ণ পুরাণ-সংহিতা আমি আপনার কাছে শুনলাম। ভগবান, আমি আর এখন তক্ষক থেকে মৃত্যুর ভয় করি না। আমি আপনার বর্ণিত অভয় ব্রহ্মে প্রবেশ করেছি। ব্রাহ্মণ, আদেশ করুন, এখন আমি বাক্‌সংযম করে মুক্তি-কামনায় সমস্ত বাসনার আশ্রয় শ্রীকৃষ্ণে চিত্ত সমর্পণ করে প্রাণ ত্যাগ করি। অজ্ঞান এবং অজ্ঞানতা-জনিত সংস্কার জ্ঞান-বিজ্ঞান-নিষ্ঠায় অপসারিত হয়েছে, মঙ্গলরূপী ভগবানের পরমপদ আপনিই আমায় দর্শন করিয়েছেন। ১-৭

সূত বললেন, ব্যাসপুত্র শুকদেব রাজা পরীক্ষিতের এই কথা শুনে তাঁকে অনুমতি দিলেন ও পরম পূজা লাভ করে ভিক্ষুকদের সংগে প্রস্থান করলেন। তারপর রাজর্ষি পরীক্ষিৎ বুদ্ধি দ্বারা মনকে পরমাত্মাতে যুক্ত করে বায়ুশূন্য নিস্পন্দ বৃক্ষের মত হয়ে পরমাত্মার ধ্যান করতে লাগলেন। গংগাতীরে পূর্বাগ্র কুশে উত্তর দিকে মুখ করে বসে মহাযোগী রাজা নিঃসংশয়ে ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হলেন। ৮-১০

[illegible] ক্রুদ্ধ ব্রাহ্মণপুত্র প্রেরিত তক্ষক রাজাকে দংশন করার জন্য অগ্রসর হলেন। পথে বিষহারী কাশ্যপকে দেখতে পেয়ে বহুরূপ ধারণে

১ তুলনীয় [illegible] ২,৩৯

২ তুলনীয়: [illegible] সোঽহমস্মি। ঈশ ১৬

স যশ্চায়ং পুরুষে যশ্চাসাবাদিত্যে স একঃ॥ তৈত্তিরীয় ২।৮।৫

সমর্থক তক্ষক কাশ্যপকে প্রচুর অর্থ দিয়ে সন্তুষ্ট করে তিনি যেন রাজার কাছে না যান সেই ব্যবস্থা করল। তারপর সে ব্রাহ্মণবেশে লুকিয়ে গিয়ে রাজাকে দংশন করল। তক্ষকের দংশনের পর রাজর্ষি'র ব্রহ্মভাবপ্রাপ্ত শরীর দর্শকদের সামনে তৎক্ষণাৎ বিষাগ্নিতে দগ্ধ হয়ে গেল। পৃথিবী, আকাশ, স্বর্গ, মর্ত্য সমস্ত দিকে হাহাকার ধ্বনি উঠল। দেব, অসুর, মানুষ, সকলে বিস্মিত হলেন। দেব-দুন্দুভি বেজে উঠল, গন্ধর্ব অপ্সরারা গান শুরু করল এবং সাধুবাদসহ দেবতারা পুষ্পবৃষ্টি করলেন। ১১-১৫

পিতা পরীক্ষিৎকে তক্ষকে দংশন করেছে শুনে জনমেজয় ক্রোধে ব্রাহ্মণদের সহায়তায় যথানিয়মে যজ্ঞ করে তাতে সাপদের আহুতি দিলেন। সর্পযজ্ঞে সর্পকুল জ্বলন্ত আগুনে দগ্ধ হচ্ছে দেখে তক্ষক ভয়ে ইন্দ্রের শরণাপন্ন হল। তক্ষককে দেখতে না পেয়ে রাজপুত্র যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণদের বললেন, সর্পাধম তক্ষককে কেন দগ্ধ করা হচ্ছে না? ব্রাহ্মণরা বললেন, রাজেন্দ্র, সে ইন্দ্রের শরণ নিয়েছে। ইন্দ্র তাকে রক্ষা করে নিজের আশ্রয়ে রেখেছেন বলে এখনও সে অগ্নিতে এসে পড়ছে না। পরীক্ষিৎপুত্র বললেন, ঋত্বিক্‌ ব্রাহ্মণ, ইন্দ্রের সংগেই কেন তক্ষককে যজ্ঞে নিয়ে আসছেন না? এই কথায় ব্রাহ্মণরা 'তক্ষক, তুমি ইন্দ্রের সংগেই এই অগ্নিতে পতিত হও' বলে যজ্ঞে আহুতি দিলেন। ব্রাহ্মণদের এরকম পরুষ বাক্যে ইন্দ্রের বুদ্ধি বিচলিত হল এবং তিনি তক্ষকের সংগে বিমান সহ নিজ স্থান থেকে ভ্রষ্ট হলেন। ইন্দ্র ঐ ভাবে তক্ষককের সংগে যজ্ঞাগ্নিতে পড়তে যাচ্ছেন দেখে অংগিরার পুত্র দেবগুরু বৃহস্পতি জনমেজয়কে বললেন, মহারাজ, এই সর্পরাজ অমৃত পান করেছেন, তুমি এঁকে বধ করতে পার না, আর ইন্দ্রও অজর এবং অমর। মহারাজ, নিজ কর্মফলে জীবের জীবন, মরণ ও পরলোক হয়ে থাকে। সুখ বা দুঃখদাতা অন্য কেউই নেই। সর্প, চোর, অগ্নি, জল, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, রোগ প্রভৃতিতে যে জীবের মৃত্যু হয় তা শুধু তার প্রারব্ধ কর্মের ফলেই হয়ে থাকে। মহারাজ, এখনি এই হিংসাত্মক যজ্ঞ সমাপ্ত কর। এতে নির্দোষ সর্পকুলই দগ্ধ হয়েছে। সকলেই পূর্বকৃত কর্মের ফল ভোগ করে। ১৬-২৭

সূত বললেন, বৃহস্পতির বাক্যের সম্মান রক্ষা করে রাজা জনমেজয় সর্পযজ্ঞ বন্ধ করলেন এবং তারপর বৃহস্পতির পূজা করলেন। যাঁকে তর্ক দিয়ে বোঝা যায় না, যাঁর দ্বারা বশীভূত হয়ে বিষ্ণুর আত্মভূত জীবসমূহ ক্রোধ প্রভৃতি গুণ-বৃত্তির প্রভাবে 'এ বধ্য', 'ও ঘাতক' এরকম মোহগ্রস্ত হয়ে থাকে, তা বিষ্ণুরই মহামায়া। আত্মবিৎ পণ্ডিতের কাছে যদি জীব আত্মতত্ত্ব-বিচার শোনে তবে সে দম্ভরূপিণী মায়ার হাত থেকে নিষ্কৃতি পায়। আত্মাতে মায়ার আশ্রয় নেই, তাই সেখানে বিভিন্ন বিবাদও নেই। যে মন সংকল্প-বিকল্পের প্রভাবযুক্ত অর্থাৎ অশুদ্ধ তা পরমাত্মচিন্তায় বিনষ্ট হতে পারে না। পরমাত্মায় প্রবৃত্ত হলে স্রষ্টা ও সৃষ্টির বিষয়ের ভেদ—এই দ্বৈত বোধই লোপ পায়। এরই নাম আত্মস্বরূপ। মুনিরা অহঙ্কারাদি শূন্য হয়ে এই আত্মস্বরূপে লীন হন। যাঁরা যোগী তাঁরা 'এ নয়, এ নয়' এভাবে সমস্ত কিছু পরিত্যাগ করেন[১] এবং দেহাদিতে অহংজ্ঞান বিসর্জন দিয়ে সমাধিযোগে হৃদয়স্থ আত্মস্বরূপের আলিঙ্গন করে থাকেন। এই আত্মস্বরূপই বিষ্ণুর পরমরূপ, একথা তাঁরা বলে থাকেন। যাঁদের দেহের এবং গৃহের জন্য 'আমি' ও 'আমার' এইরকম অভিমান নেই তাঁরা বিষ্ণুর এই পরম রূপ জানেন। বিষ্ণুপদ লাভে অভিলাষী মানুষ পরের পরুষ বাক্য সহ্য করবে,

১ প্রকৃতপক্ষে এই আত্মা 'এ নয়, এ নয়' এইরূপ…।—বৃহদারণ্যক উপ, ৪।২।৪

কাউকে অপমানিত করবে না, কারও সঙ্গে কলহ করবে না। যাঁর চরণকমল ধ্যান করে আমি এই ভাগবতী সংহিতা লাভ করেছি সেই অমিতপ্রভাব ভগবান কৃষ্ণকে আমার প্রণাম নিবেদন করি। ২৮-৩৫

শৌনক বললেন, সৌম্য, বেদাচার্য পৈলাদি মহাত্মা ব্যাসশিষ্যরা বেদকে কত ভাগে ভাগ করছেন, বল। ৩৬

সূত বললেন, ব্রহ্মন্, পরমেষ্ঠী ব্রহ্মার হৃদাকাশ থেকে শব্দ উৎপন্ন হয়েছিল। ইন্দ্রিয়বৃত্তিগুলি রুদ্ধ করলে ঐ শব্দ আমাদের হৃদয়ে অনুভূত হয়। যোগীরা এরই উপাসনাবলে আত্মার আধিভৌতিক, আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক মলরাশি প্রক্ষালিত করে মুক্তিলাভ করে থাকেন। ঐ শব্দ থেকেই ত্রিমাত্রাযুক্ত (অ, উ ও ম্) ওঙ্কার আবির্ভূত হয়। স্বতঃই প্রকাশমান এই শব্দ পরমাত্মা ব্রহ্মের বোধক। ইন্দ্রিয়বৃত্তি রুদ্ধ হলেও যে অপ্রতিহত জ্ঞান এই ওংকার শ্রবণ করেন, তিনি পরমাত্মা। যার দ্বারা বেদবাক্য অভিব্যক্ত হয় এবং হৃদয়াকাশে আত্মা থেকে যা প্রকাশিত হয়, তা স্ফোটরূপ ওংকার। ইনি সাক্ষাৎ স্বপ্রকাশ পরমাত্মা, ব্রহ্মের বাচক। উপনিষদ, বেদ ও সমস্ত মন্ত্রের ইনি নিত্য বীজ।[১] এই ওংকারের অকার, উকার ও মকার বর্ণ তিনটি সত্ত্ব, রজ ও তমোরূপ গুণত্রয় ; ঋক্, যজু, সাম রূপ নামত্রয়, ভূলোক, ভুবর্লোক ও স্বর্লোকরূপ লোকত্রয় এবং জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তিরূপ তিন বৃত্তির ধারক। ঐ ওংকার থেকেই অন্তঃস্থ, উষ্ম, স্বর, স্পর্শ, হ্রস্ব, দীর্ঘ প্রভৃতি বর্ণ ব্রহ্মা কর্তৃক সৃষ্ট হয়েছিল। পরে ব্রহ্মা হোতা চতুষ্টয়ের দ্বারা সাধ্য যজ্ঞাদি কর্ম সম্পাদনের জন্য ব্যাহৃতি ও ওংকার সহ নিজ চতুর্মুখ থেকে চতুর্বেদ সৃষ্টি করেন। তিনি বেদ উচ্চারণে পটু নিজের পুত্র মরীচি প্রভৃতি মহর্ষিদের সে সব বেদ পড়ান। ঐ মহর্ষিরা আবার কাশ্যপাদি নিজ পুত্রদের বেদ অধ্যয়ন করান। ৩৭-৪৫

তাঁদের শিষ্য-প্রশিষ্য পরম্পরায় চারযুগেই ঐ বেদ অধীত হতে থাকে। দ্বাপর যুগের প্রথমে মহর্ষিরা মানুষের অল্পায়ু, মেধাহীনতা ও মন্দমতি দেখে হৃদয়স্থিত অচ্যুতের প্রেরণায় বেদসকলকে বিভক্ত করেন। ব্রহ্মাদি লোকপালরা ধর্মরক্ষার জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানালে লোকভাবন ভগবান সত্যের অংশে পরাশরের ঔরসে সত্যবতীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করে বেদকে চার ভাগে ভাগ করেছিলেন। যেমন মণিময় খনি থেকে লোকে নানা মণি উদ্ধার করে, বেদব্যাসও তেমনি সমস্ত বেদের মন্ত্ররাশি থেকে উদ্ধার করে ঋক্, অথর্ব, যজু ও সাম এই চার সংহিতা প্রণয়ন করলেন। মহামতি ব্যাসদেব চারজন শিষ্যকে ডেকে এক একটি সংহিতা প্রদান করলেন। বহ্বৃচ নামক আদ্য সংহিতা অর্থাৎ ঋগ্বেদ শিষ্য পৈলকে উপদেশ করলেন। নিগদ নামক যজুঃসমূহ শিষ্য বৈশম্পায়নকে, ছন্দোগ নামক সাম সংহিতা জৈমিনিকে এবং আঙ্গিরসী অথর্বসংহিতা সুমন্তুকে উপদেশ করলেন। এরপর পৈলমুনি নিজ সংহিতা ইন্দ্রপ্রমতি ও বাষ্কলকে দেন। আবার সেই বাষ্কল নিজ সংহিতা চারভাগে ভাগ করে নিজ শিষ্য বোধ্য, যাজ্ঞবল্ক্য, পরাশর ও অগ্নিমিত্রকে উপদেশ করলেন। আত্মজ্ঞ ইন্দ্রপ্রমতি পণ্ডিত মাণ্ডূকেয় ঋষিকে নিজ সংহিতা অধ্যয়ন করালেন। মাণ্ডূকেয়ের শিষ্য বেদমিত্র সৌভরি প্রভৃতি মুনিগণকে সেই সংহিতার উপদেশ দেন। ৪৬-৫৬

মাণ্ডূকেয়ের পুত্র শাকল্য নিজ সংহিতা পাঁচভাগে বিভক্ত করে বাৎস্য, মুদ্গল,

১ এই প্রণব (ওঁকার) এর আধ্যাত্মিক তত্ত্ব মাণ্ডূক্য উপনিষদে ব্যাখ্যাত হয়েছে।

শালীয়, গোখল্য ও শিশিরকে পড়ালেন। শাকল্যের শিষ্য জাতুকর্ণ নিরুক্তের সঙ্গে নিজ সংহিতাকে বলাক, পৈল, জাবাল এবং বিরজকে দিলেন। আবার বাষ্কলের পুত্র ঐ সব শাখা থেকে বালখিল্য সংহিতা প্রণয়ন করলেন। বালায়নি, ভজ্য এবং কাশার নামে তিন দৈত্য এই সংহিতা অধ্যয়ন করলেন আগে যে সব ব্রহ্মর্ষিদের কথা বলা হল তাঁরা এই সব ঋগ্‌বেদীয় সংহিতা ধারণ করেছিলেন। বেদ-সমূহের এই বিভাগ শুনলে মানুষ সর্বপাপ থেকে মুক্ত হয়ে থাকে। বৈশম্পায়নের শিষ্যদের নাম অধ্বর্যু ও চরক। তাঁরা গুরুর অনুষ্ঠেয় ব্রহ্মহত্যা জনিত পাপনাশক ব্রত আচরণ করেছিলেন বলে চরক নামে অভিহিত হন। সেই বৈশম্পায়নের শিষ্য যাজ্ঞবল্ক্য বলেছিলেন, ভগবান, এই সব অল্পসার শিষ্য ব্রতাচরণ করে আপনার কি করবে? আমি অতি কঠিন ব্রতাচরণ করে পাপক্ষয় করব। এই কথা শুনে গুরু সক্রোধে বললেন, চলে যাও, তোমার আর প্রয়োজন নেই। তুমি আমার শিষ্য হয়ে ব্রাহ্মণের অপমান করলে; তাই আমার কাছে অধীত বিষয় সব পরিত্যাগ কর। দেবরাতের পুত্র যাজ্ঞবল্ক্য সমস্ত যজুঃ বমন করে চলে গেলেন। তখন মুনিরা সেই যজুঃগুলি দেখে লুব্ধ হয়ে তিত্তিরিরূপে গ্রহণ করলেন। তা থেকেই তৈত্তিরীয় শাখার সৃষ্টি হল। তারপর যাজ্ঞবল্ক্য গুরুর অজ্ঞাত বেদ অধ্যয়নে অভিলাষী হয়ে সূর্যদেবের স্তব করতে লাগলেন। ৫৭-৬৬

যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, ভগবান আদিত্য, আমার প্রণাম নিন। আপনি একা হয়েও আত্মরূপে ব্রহ্ম থেকে তৃণগুচ্ছ পর্যন্ত সকলের এবং জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ এই চতুর্বিধ প্রাণীদের এমন কি সমগ্র জগতের অন্তঃস্থলে এবং বহির্ভাগে আকাশের মত কোন উপাধি দ্বারা আবৃত না হয়ে বিরাজ করছেন।[১] আর ক্ষণ, লব ও নিমেষরূপ অবয়বগুণে বর্ধিত বৎসরসমূহ দ্বারা জল গ্রহণ ও বর্ষণ করে আপনি লোকযাত্রা নির্বাহ করছেন। হে দেবশ্রেষ্ঠ সবিতা, আপনি নিত্য ত্রিসন্ধ্যা বেদবিধিবলে ভক্ত স্তবকদের নিখিল দুষ্কৃতি-দুঃখের বীজ বিনাশ করে থাকেন। হে তপনদেব, আপনার ঐ তাপপ্রদ মণ্ডলীকে আমি ধ্যান করি। এ জগতের অন্তর্যামী আপনি নিজের আশ্রিত চরাচর জগতের মন, ইন্দ্রিয় ও প্রাণরূপে জড় বস্তুদের কার্যে প্রবৃত্ত করছেন। অন্ধকাররূপ করালবদন অজগর এই নিখিল লোককে গ্রাস করছে এবং মৃতবৎ অচৈতন্য করে ফেলছে দেখে আপনি দয়া করে তাদের জাগরিত করে প্রতিদিন ত্রিসন্ধ্যায় স্বধর্ম পালনরূপ মঙ্গলকাজে প্রবর্তিত করছেন। আপনি রাজার মত অসাধুদের ভয় সঞ্চার করে চতুর্দিকে ভ্রমণ করছেন। যে যে দিকে আপনি যাচ্ছেন, সেই সেই দিকের দিক্‌পালরা পদ্মকোরকের অঞ্জলি দিয়ে আপনাকে অর্চনা করছেন।[২] ভগবান, আমি আপনার কাছে এমন যজুঃ প্রার্থনা করি যা অন্য কেউ জানে না। এই জন্য ত্রিভুবনের গুরুগণ কর্তৃক পূজিত আপনার চরণকমল ভজনা করি। ৬৭-৭২

সূত বললেন, জ্ঞানী যাজ্ঞবল্ক্য এই রকম স্তব করলে পর ভগবান সূর্য সন্তুষ্ট হয়ে ঘোড়ার রূপ ধরে অপরের অবিজ্ঞাত যজুঃসকল মুনিকে দিলেন। যাজ্ঞবল্ক্য সেই সকল যজুঃদ্বারা পনেরটি শাখা প্রণয়ন করলেন। কাণ্ব আর মাধ্যন্দিনাদি ঋষিরা সেই ঘোড়ার 'বাজ' অর্থাৎ কেশর থেকে (বা বেগের সঙ্গে) নিঃসৃত শাখাসকল গ্রহণ করলেন। 'বাজ' থেকে নিঃসৃত বলে ঐ শাখাগুলির নাম বাজসনী হল। সামবেদজ্ঞ জৈমিনি মুনির পুত্রের নাম সুমন্তু। সুমন্তুর পুত্র সুত্বান। জৈমিনি

১ তুলনীয়: শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ, ৩।৯।

২ উপনিষদেও এরূপ সূর্যস্তুতি আছে। দ্রষ্টব্য, ঈশ-১৫ ও ১৬ এবং শ্বেতাশ্বতর, ৫।৪ ও ৫।৭

সেই পুত্র আর পৌত্রকে এক একটি সংহিতা পড়ালেন। জৈমিনির অতি মেধাবী শিষ্য সুকর্মা সামবেদ-বৃক্ষের হাজার সংহিতারূপ শাখা বিভাগ করলেন। কোশল-দেশজাত হিরণ্যনাভ এবং পৌষ্যঞ্জি নামে সুকর্মার দুই শিষ্য এবং ব্রহ্মবিদ্ অবন্ত্য সামসকলের বিভিন্ন সংহিতা গ্রহণ করেন। পৌষ্যঞ্জি, আবন্ত্য আর হিরণ্যনাভের উত্তরদেশীয় পাঁচশ সামবেদজ্ঞ শিষ্য ছিলেন ; তাঁরা উদীচ্য নামে প্রসিদ্ধ। তাঁদের কাউকে কাউকে পূর্বদেশীয় বলা হয়। লোগাক্ষি, মাঙ্গলি, কুল্য, কুশীদ ও কুক্ষি—পৌষ্যঞ্জির এই কয়জন শিষ্য শত শত সংহিতা গ্রহণ করেছিলেন। কৃত নামে হিরণ্যনাভের শিষ্য নিজের শিষ্যদের চব্বিশটি সংহিতা উপদেশ করেছিলেন। সামবেদের অন্যান্য যে সমস্ত শাখা আছে, সে সকল আত্মজ্ঞানী আবন্ত্য নিজ শিষ্যদের উপদেশ করেন। ৭৩-৮০

সপ্তম অধ্যায়

পুরাণ-লক্ষণ বর্ণনা

সূত বললেন, অথর্ববেদবিদ্ সুমন্তু তাঁর শিষ্য কবন্ধকে নিজ সংহিতা শিক্ষা দিয়েছিলেন। তিনি আবার পথ্য ও বেদদর্শকে শিক্ষা দেন। শৌক্লায়নি, ব্রহ্মবলি, মোদোষ ও পিপ্পলায়নি বেদদর্শের শিষ্য। বেদদর্শ অথর্ব সংহিতাকে চারভাগ করে এই শিষ্যদের অধ্যয়ন করিয়েছিলেন। ব্রাহ্মণ, আপনি পথ্যের শিষ্যদের কথা শুনুন। পথ্য স্ব-সংহিতাকে তিনভাগ করে কুমুদ, শুনক ও জাজলি তাঁর এই তিন শিষ্যকে শিক্ষা দেন। শুনক নিজ সংহিতাকে দুভাগ করে নিজশিষ্য বভ্রু ও সৈন্ধবায়নকে উপদেশ দেন। এছাড়া সাবর্ণ প্রভৃতি মুনিরা, নক্ষত্রকল্প, শান্তিকল্প, কশ্যপ ও আঙ্গিরস এঁরা অনেকেই অথর্ব বেদাচার্য হয়েছিলেন। মুনি, এখন আপনি পৌরাণিকদের নাম শুনুন। ত্রয্যারুণি, কশ্যপ, সাবর্ণি, অকৃতব্রণ, বৈশম্পায়ন এবং হারীত, এই ছয়জন হলেন পৌরাণিক। এঁরা আমার পিতা ব্যাসশিষ্য রোমহর্ষণের কাছ থেকে এক পুরাণ-সংহিতা অধ্যয়ন করেছিলেন। আমি এঁদের ছয়জনেরই শিষ্য, সুতরাং সমস্ত পুরাণ-সংহিতাই অধ্যয়ন করেছি। কশ্যপ, আমি, সাবর্ণি আর রামের শিষ্য অকৃতব্রণ—আমরা চারজন আমার পিতা রোমহর্ষণের কাছে চার মূল সংহিতা অধ্যয়ন করেছি। ব্রহ্মন্, বেদের শাখা অনুসারে ব্রহ্মর্ষিরা পুরাণের যে লক্ষণ ঠিক করেছেন তা মন দিয়ে শুনুন। সর্গ (সৃষ্টি), বিসর্গ (উৎপত্তি-প্রলয়), বৃত্তি (স্থিতি), রক্ষা, মন্বন্তর, বংশ, বংশানুচরিত, সংস্থা, হেতু আর আশ্রয়—এইগুলি পুরাণের লক্ষণ। কোন কোন পুরাণবিদ পুরাণকে এই দশলক্ষণযুক্ত বলে থাকেন। আবার সংকীর্ণ সংজ্ঞা অনুসারে কেউ কেউ পুরাণের লক্ষণ পাঁচরকমও বলে থাকেন ; গুণত্রয়ের ক্ষোভ থেকে মহৎ, মহৎ থেকে সাত্ত্বিকাদি তিন রকম অহংকার জন্মে। অহংকার থেকে পঞ্চতন্মাত্র, প্রাণীদের সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়সমূহ ও তাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতারা আর স্থূল পদার্থের উৎপত্তি হয়। এই উৎপত্তি ব্যাপারকে সর্গ বলে। বীজ থেকে যেমন বীজ, তেমনি জীবের পূর্বকর্মের বাসনার থেকে চরাচরের উৎপত্তির যে এক অক্ষুণ্ণ প্রবাহ বয়ে চলেছে তার নাম বিসর্গ। এ সংসারে চর প্রাণীসকল আর অচর ভূতসমূহের যে জীবিকা নির্দিষ্ট করা হয়েছে, তা বৃত্তি নামে কথিত। এই বৃত্তির প্রতি মানুষের প্রবৃত্তি আসক্তির থেকেও হয় অথবা শাস্ত্রবিধি অনুসারেও হয়ে থাকে। ১-১৩

যুগে যুগে পশু, পাখী, মানুষ, ঋষি আর দেবগণের মধ্যে ভগবান অবতীর্ণ হয়ে দেববিদ্বেষিগণকে বিনাশ করেন। ভগবানের এই রকম লীলাকেই বিশ্বের 'রক্ষা' বলা যায়। মনু, দেবতাসকল, মনুর পুত্রেরা, সুরেশ্বরগণ, ঋষিগণ আর শ্রীহরির অংশাবতারগণ যে অবস্থায় নিজ নিজ অধিকারে বর্তমান থাকেন, তাই মন্বন্তর নামে প্রসিদ্ধ। মন্বন্তর ছ'রকম হতে পারে। ব্রহ্মা থেকে যাঁদের উৎপত্তি সেই সমস্ত রাজাদের ত্রৈকালিক (ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান) বংশকে 'বংশ' বলে। ঐ সকল রাজার আর তাদের বংশধরদের চরিত্র হল 'বংশানুচরিত'। এই বিশ্বের স্বভাব বা ঈশ্বরের মায়া থেকে নৈমিত্তিক, প্রাকৃতিক, নিত্য আর আত্যন্তিক এই যে চার প্রকার লয় হয়, পণ্ডিতদের মতে তাই হল 'সংস্থা'। অজ্ঞানের বশে জীবেরা কর্ম করে বলেই এই বিশ্বের সৃষ্টি প্রভৃতি ঘটে থাকে, একেই 'হেতু' বলা যায়। জাগৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি এই তিন অবস্থায় জীবনরূপে যিনি বর্তমান, যিনি মায়াময়, সাক্ষিরূপে সকলের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত, অথচ স্বরূপত সম্বন্ধহীন তিনিই ব্রহ্ম; তাঁকেই অপাশ্রয় বলা যায়। যেমন বৃক্ষাদি পদার্থসমূহে বীজ প্রভৃতি নাশ পর্যন্ত অবস্থার সঙ্গে মৃত্তিকাদি দ্রব্য রূপে ও নামে সত্তামাত্র থাকে, তেমনি যিনি দেহের গর্ভাধান থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যাবতীয় অবস্থাতে যুক্ত এবং অযুক্তও আছেন, তিনিই ঐ অপাশ্রয়। চিত্ত যখন নিজেই অথবা যোগের শক্তিতে বৃত্তিত্রয় পরিত্যাগ করে শান্ত হয়, তখনই সে আত্মাকে জানতে পারে আর তখন অবিদ্যা নিরস্ত হওয়াতে সমস্ত সাংসারিক চেষ্টারও নিবৃত্তি ঘটে। পুরাবিদ্ মুনিরা এই রকম লক্ষণ দ্বারা বিচার করে ছোট বড় মিলিয়ে পুরাণের সংখ্যা আঠারো বলে গণনা করেছেন, যথা—ব্রহ্মা, পদ্ম, বিষ্ণু, শিব, লিঙ্গ, গরুড়, নারদ, ভাগবত, অগ্নি, স্কন্ধ, ভবিষ্যৎ, ব্রহ্মবৈবর্ত, মার্কণ্ডেয়, বামন, বরাহ, মৎস্য, কূর্ম আর ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ। ব্রহ্মন্, ব্যাসঋষির শিষ্যের শিষ্য আর প্রশিষ্যদের বেদশাখা প্রণয়ন আমি সবিস্তার বললাম। একথা শুনলে আর কীর্তন করলে শ্রোতা ও বক্তার ব্রহ্মতেজ বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। ১৪-২৫

অষ্টম অধ্যায়

নারায়ণের স্তব

শৌনক বললেন, বাগ্মিবর সাধু সূত, তুমি চিরজীবী হও। অপার সংসারে যে মানুষেরা ঘুরে মরছে তুমি তাদের পথপ্রদর্শক। লোকে বলে, মৃকণ্ডুপুত্র ঋষি মার্কণ্ডেয় চিরজীবী। এও বলে যে কল্পের শেষে তিনিই অবশিষ্ট ছিলেন। কিন্তু তখন সমস্ত জগতেরই তো নাশ হয়েছিল, তবে কিভাবে তাঁর থাকা সম্ভব? তিনি বর্তমান কল্পে ভৃগুসন্তানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এখন তো প্রাণীদের কোন প্রলয় হয় নি; তবে প্রলয়ে অবশিষ্ট ছিলেন, এ কথাকে ঠিক বলা যায় কিভাবে? আবার তিনি একা একমাত্র সাগরজলে ঘুরতে ঘুরতে বটপত্রে শয়ান এক অদ্ভুত বালক-পুরুষকে দেখেছিলেন। এই বিষয়ে আমাদের মহা সন্দেহ রয়েছে, তাই প্রকৃত ব্যাপার জানতে খুব কৌতূহল হচ্ছে। তুমি আমাদের সন্দেহ দূর কর। তুমি মহাযোগী আর পুরাণে তোমার অভিজ্ঞতা আছে। ১-৫

সূত বললেন, মহর্ষি, আপনি এই যে প্রশ্ন করলেন, এতে লোকের ভুল ভাঙ্গে। এই প্রশ্ন আর তার উত্তরের মধ্যে নারায়ণের কলির কলুষনাশিনী নানা কথা আছে।

গর্ভাধান থেকে শুরু করে পিতার কাছ থেকে দ্বিজাতির অনুষ্ঠেয় সব সংস্কার লাভ করে মার্কণ্ডেয় বেদসকল অধ্যয়ন করলেন। তারপর তিনি ধর্মনিষ্ঠ হয়ে ধর্ম সহকারে তপস্যায় নিযুক্ত হলেন। তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে ব্রহ্মচর্যব্রত পালন করতে লাগলেন এবং শান্ত ও জটাধারী হয়ে বল্কল পরলেন আর কমণ্ডলু, দণ্ড, উপবীত, মেখলা, কৃষ্ণসারচর্ম, যজ্ঞসূত্র ও কুশ ধারণ করলেন। ধর্মবৃদ্ধির জন্য তিনি দুই সন্ধ্যা আগুন, সূর্য, গুরু, ব্রাহ্মণ ও আত্মাতে শ্রীহরির অর্চনা করতে লাগলেন। সন্ধ্যায় আর প্রাতে গুরুর জন্য ভিক্ষান্ন এনে গুরুর আদেশ নিয়ে মার্কণ্ডেয় মৌনী হয়ে একবার মাত্র খেতেন, গুরুর অনুমতি বা ভিক্ষা না পেলে উপোস করতেন। এইভাবে তপস্যায় ও বেদপাঠে নিযুক্ত থেকে তিনি অযুত বছর হৃষীকেশের পূজা করে দুর্জয় মৃত্যুকে জয় করলেন। ব্রহ্মা, শিব, ভৃগু, দক্ষ, ব্রহ্মার অন্যান্য পুত্রেরা আর নরগণ, অমরবৃন্দ, পিতৃগণ ও ভূতসমূহ মার্কণ্ডেয়ের মৃত্যুজয় দেখে অতিশয় বিস্মিত হলেন। ৬-১২

মার্কণ্ডেয় তপস্যা পালন আর বেদ অধ্যয়ন দ্বারা এইভাবে মহাব্রতের অনুষ্ঠান করেও রাগ-ক্লেশ বর্জন করে পরমাত্মা পরম পুরুষকে ধ্যান করতে লাগলেন। মহাযোগে মনকে এই রকম অধিষ্ঠিত করে যোগীর ছয় মন্বন্তর পরিমিত কাল কেটে গেল। ইন্দ্র এই তপস্যার কথা শুনে সপ্তম মন্বন্তরে ভয় পেয়ে গেলেন এবং তাতে নানা ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে লাগলেন। তিনি মার্কণ্ডেয়র তপস্যা ভঙ্গের জন্য গন্ধর্ব, অপ্সরা, মদন, বসন্ত, মলয়ানিল, লোভ আর মদকে পাঠালেন। তাঁরা সব হিমাদ্রির উত্তরভাগে মুনির আশ্রমে গেলেন। সেখানে পুষ্পভদ্রা নামে নদী আর চিত্রা নামে এক শিলা ছিল। মুনির আশ্রমস্থান অতি পবিত্র, নানা বৃক্ষলতায় ও ব্রাহ্মণগণের সমাবেশে পরিপূর্ণ। পবিত্র পরিষ্কার জলাশয় সেখানকার শোভা বর্ধন করছে। ভ্রমরবৃন্দ গুনগুন করছে, কোকিলেরা মত্ত হয়ে কূজন আর ময়ূরেরা নটবেশে সগর্বে নৃত্য করছে। চারিদিক অজস্র পাখির গানে ঝংকৃত। সেখানে হিমকণা আর ঝরনার জলবিন্দুর স্পর্শে শীতল বাতাস পুষ্পগুচ্ছ আলিঙ্গন করে ও কাম উদ্দীপিত করে বইতে লাগল। ১৩-২০

তখন বসন্ত পরস্পর দেখা দিলেন, রাত্রে চাঁদের উদয় হল। বৃক্ষলতাগুলি কুসুমস্তবক ধারণ করে পরস্পরকে আলিঙ্গন করতে লাগল। স্বর্গীয় কামিনীদের দলপতি রতিপতি দেখা দিলেন। নানা বাদ্য সহকারে ও গান করতে করতে গন্ধর্বরা তাঁর পেছনে চললেন। দেবরাজের অনুচরেরা দেখলেন যে মুনি আগুনে হোমকার্য শেষ করে চোখ বুজে মূর্তিমান দুর্ধর্ষ অনলের মত বসে আছেন। স্ত্রীলোকেরা তাঁর সামনে নাচতে নাচতে আর গায়কেরা মধুর গান গাইতে গাইতে মৃদঙ্গ, বীণা আর পণবাদি যন্ত্রসকল বাজাতে লাগলেন। কাম নিজের শরাসনে শর যোজনা করলেন। তখন বসন্ত, মদ, লোভ—ইন্দ্রের এই সমস্ত অনুচর মুনিকে বিচলিত করতে চেষ্টা করলেন। পুঞ্জিকস্থলী নামে অপ্সরা কন্দুক (বল) নিয়ে খেলা করছিল। কুচযুগলের ভারে তার কটিদেশ দুলছিল, কেশ থেকে মালা খসে পড়ছিল আর কন্দুকের অনুসরণ করতে করতে তার চোখ চারদিকে ঘুরছিল। এই সময় পবন তার কটিবন্ধন মেখলা স্খলিত করে সূক্ষ্মবাস অপহরণ করলেন। মুনি তাঁর আয়ত্ত হয়েছেন এ মনে করে কামও তীর ছুঁড়লেন। কিন্তু তা শক্তিহীনের উদ্যমের মত ব্যর্থ হল। তাঁরা এইভাবে মার্কণ্ডেয়র অপকার করতে গিয়ে তাঁর তেজে পুড়ে যেতে লাগলেন। বালকেরা যেমন সাপকে জাগিয়ে দিয়ে তারপর ছুটে পালায়, তাঁরাও সেইভাবে মুনিকে ছেড়ে পালাতে লাগলেন। ইন্দ্রের অনুচরবর্গ এইভাবে আক্রমণ করলেও মুনি অহঙ্কার-বিকারগ্রস্ত হলেন না। মহৎ ব্যক্তিদের পক্ষে এ বিচিত্র

নয়। ইন্দ্র অনুচরদের সঙ্গে মদনকে প্রভাহীন দেখে আর মহর্ষির তেজের কথা শুনে অতিশয় আশ্চর্যান্বিত হলেন। ২১-৩১

মার্কণ্ডেয় মুনি তপস্যা, বেদাধ্যয়ন আর সংযমের দ্বারা চিত্তকে এইভাবে পরমাত্মায় যুক্ত করায় তাঁকে অনুগ্রহ করবার জন্য নর-নারায়ণ শ্রীহরি প্রকাশিত হলেন। তাঁদের একজন শুক্ল, অন্যজন কৃষ্ণ। অভিনব পদ্মের মত তাঁদের চোখ, তাঁরা চতুর্ভুজ, তাঁদের পরনে অজিন ও বল্কল আর হাতে কুশ। তাঁরা নবগুণ যজ্ঞোপবীত ধারণ করেছিলেন। তাঁদের হাতে কমণ্ডলু, বংশদণ্ড, পদ্ম, চামর ও অক্ষমালা। স্ফুরিত বিদ্যুতের মত পিঙ্গল প্রভায় তাঁদের সাক্ষাৎ মূর্তিমান তপস্যা বলে মনে হচ্ছিল। ভগবানের অবতার সেই দুই মূর্তি নর-নারায়ণ ঋষিদ্বয়কে দেখেই মুনি উঠে সমাদরে দণ্ডবৎ প্রণাম করলেন। তাঁদের দেখে তাঁর ইন্দ্রিয়, আত্মা ও চিত্ত আনন্দে পরিপূর্ণ হল, গায়ের রোম পুলকিত, নয়ন আনন্দাশ্রুতে আপ্লুত হল। এই অবস্থায় তিনি যেন আর তাঁদের দুজনকে দেখতে পেলেন না। মুনি উঠে হাতজোড় করে নম্রবচনে গদ্‌গদ-কণ্ঠে দুই ঈশ্বরকে বললেন—'নমস্কার, নমস্কার'। তিনি তাঁদের দুজনকে আসন দান করে, পা ধুয়ে অর্ঘ্য, চন্দন, ধূপ আর মালা দ্বারা অর্চনা করলেন। ৩২-৩৮

সেই পূজ্যতম নর-নারায়ণ ঋষি অনুগ্রহ করে সামনে এসে আরামে বসলে মার্কণ্ডেয় আবার তাঁদের প্রণাম করে নম্রভাবে বললেন, বিভু, আপনার স্বরূপ আমি কিভাবে বর্ণনা করব? সমস্ত দেহধারী প্রাণীর, ব্রহ্মার, শিবের এবং আমার নিজেরও প্রাণ আপনার প্রেরণায় স্পন্দিত হয়ে থাকে; তাতেই বাক্য, মন আর ইন্দ্রিয় নিজ নিজ কার্যে প্রবর্তিত হয়।[১] যদিও কারও স্বাধীনতা নেই, তবুও আপনার প্রবর্তিত বাক্য দ্বারাই যাঁরা আপনাকে ভজনা করেন, আপনি তাঁদের আত্মার বন্ধু হয়ে থাকেন। ভগবন্, আপনার এই দুই মূর্তি ত্রিলোকের মঙ্গলজনক, দুঃখনিবারক এবং মুক্তির কারণ। আপনিই এই জগৎকে রক্ষা করবার জন্য মৎস্য, কূর্ম প্রভৃতি নানা দেহ ধারণ করেন। আপনিই মাকড়সার মত সমস্ত সৃষ্টি করে আবার সেই সব আপনাতে সংহার করেন। আপনি সেই পালনকর্তা, স্থাবর-জঙ্গমের ঈশ্বর। আপনার চরণ ভজনা করি। যিনি ঐ পদ আশ্রয় করেন, কর্ম, গুণ, কাল, পাপ এবং পূর্বকথিত সংসার-তাপাদি তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। বেদ যাঁদের অন্তরে আছে, সেইসকল মুনি ঐ পদ পাবার জন্য তাঁকে বারবার স্তব, নমস্কার আর পূজা করে থাকেন। হে ঈশ্বর, মানুষের সর্বত্রই ভয় রয়েছে। মুক্তিপ্রদ আপনার পদপ্রাপ্তি ছাড়া তার আর উপায় নেই। ব্রহ্মার অবস্থিতি দ্বিপরার্ধকাল। সেই ব্রহ্মাও কালস্বরূপ আপনাকে ভয় করেন, ব্রহ্মার সৃষ্ট প্রাণীরা যে ভয় পাবে, তাতে আর সন্দেহ কি? এই জন্যই আমি নিষ্ফল, অনিত্য অকিঞ্চিৎকর, আত্মার আবরক দেহাদি সকল বস্তু পরিত্যাগ করে সত্যজ্ঞানরূপ জীবনিয়ন্তা আপনার এই পরম পদই ভজনা করি, আর তা ভজনা করলেই মানুষ সমস্ত অভীপ্সিত লাভ করে। হে আত্মবন্ধু, আপনার সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণ এই জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ। আপনি মায়াময় ও লীলাময়। আপনার সত্ত্বময়ী লীলাই মানুষের মুক্তিসাধন করে থাকে, অপর রজোগুণ আর তমোগুণ থেকে দুঃখ, মোহ আর ভয় উৎপন্ন হয়। ভগবন্; পণ্ডিতেরা আপনার আর আপনার ভক্তবৃন্দের নারায়ণ

---

১ তুলনীয়: যাঁর শক্তিতে কর্ণ শ্রবণ করে, মন মননকার্য করে, বাগিন্দ্রিয় বাক্য উচ্চারণ করে, তাঁরই শক্তিতে প্রাণ প্রাণন কার্য করে এবং চক্ষু দর্শন করে।—কেন উপ, ১।২

নামে রূপের পূজা করেন। ভক্তেরা সত্ত্বকেই পুরুষস্বরূপ বলে মানেন, অন্যকে নয়। সত্ত্ব থেকে লোক অভয় আর আত্মসুখ পায়। সেই অন্তর্যামী ভূমা, বিষ্ণুরূপ বিশ্বগুরু, পরমদেব নরোত্তম ঋষি আর শুক্লরূপ নারায়ণ, সংযতবাক্, পরমদেবতা ভগবানকে নমস্কার করি। আপনার মায়ায় যার বুদ্ধি অভিভূত আর সেইজন্য যার চিত্ত কপট ইন্দ্রিয়মার্গে বিক্ষিপ্ত হয়েছে, সেই সব পুরুষ আপনাকে জানতে পারে না। অধিক কি, ব্রহ্মাও আপনাকে জানতে পারেন না। কিন্তু যে আগে জানত না, সেই আবার যদি অখিলগুরু আপনার প্রবর্তিত বেদ জানতে পারে, তাহলে সে সাক্ষাৎ আপনাকে জানতে সমর্থ হয়। আপনার জ্ঞান দেহাদি সংঘাত দ্বারা লুক্কায়িত। সাংখ্য প্রভৃতি শাস্ত্রের মতবাদের যে সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন বিষয় আছে, আপনার স্বভাব সেই সকলেরই অনুরূপ ; এই জন্যই ব্রহ্মা প্রভৃতি জ্ঞানীরা বিশেষ চেষ্টা করেও আপনাকে জানতে পারেন না। আপনি বেদে প্রকাশিত হন, ঐ প্রকাশ আপনার গূঢ় স্বরূপকে জানিয়ে দেয়। আমি সেই মহাপুরুষকে বন্দনা করি। ৩৯-৪৯

নবম অধ্যায়

ভগবৎ-মায়া দর্শন

সূত বললেন, ধীমান মার্কণ্ডেয় যখন এই রকম স্তব করলেন, তখন নর-সহচর নারায়ণ সন্তুষ্ট হয়ে ভৃগুকুলশ্রেষ্ঠ মার্কণ্ডেয়কে বললেন, ব্রহ্মর্ষিবর, তুমি তপস্যা, বেদ অধ্যয়ন, নিয়ম, আমাতে অচলা ভক্তি এবং মনের একাগ্রতা দ্বারা সিদ্ধিলাভ করেছ। তোমার সুমহান ব্রতাচরণ দেখে আমরা তোমার উপর সন্তুষ্ট হয়েছি। তোমার মঙ্গল হোক, এবার তুমি বাঞ্ছিত বর প্রার্থনা কর। তোমাকে বর দান করব। ঋষি বললেন, হে দেব-দেবগণের ঈশ্বর, হে অচ্যুত, আপনার পাদপদ্ম দর্শনই আমার পক্ষে যথেষ্ট বর ; অন্য বরে আমার প্রয়োজন কি ? যোগপক্ক মন দ্বারা যাঁর শ্রীচরণকমলের দর্শন লাভ করে নিকৃষ্ট জনেরাও ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণের স্বরূপ লাভ করে সেই আপনি আমার সামনে উপস্থিত। হে পুণ্যশ্লোক কমললোচন, তবুও আপনার যে মায়ার দ্বারা ব্রহ্মাদি লোকপালদের সঙ্গে সমস্ত লোক বস্তুতে বস্তুতে ভেদ দেখেন, আপনার সেই মায়া দেখতে ইচ্ছা করি। ১-৬

•সূত বললেন, মুনি, মার্কণ্ডেয় ঋষি এইভাবে শ্রীভগবানে স্তব এবং পূজা করলে তিনি একটু হেসে 'তাই হবে' বলে বদরিকাশ্রমের পথে চলে গেলেন। এরপর মুনি মার্কণ্ডেয় সেই চিন্তা করতে করতে নিজের আশ্রমে থেকেই আগুন, চন্দ্র, সূর্য, জল, পৃথিবী, বায়ু, আকাশ আর আত্মা প্রভৃতি সর্বত্র শ্রীহরির চিন্তা করলেন আর সুন্দর দ্রব্যসকল দিয়ে তাঁর পূজা করতে লাগলেন। কখনও কখনও তিনি প্রেমভাবে বিগলিত হয়ে পূজাও ভুলে যান। একদিন সন্ধ্যাকালে সেই মুনি পুষ্পভদ্রা নদীর তীরে বসে আছেন, এমন সময় প্রবল ঝড় উঠল আর ভয়ানক বাতাস বইতে লাগল। তার পরেই ভীষণ মেঘ দেখা দিল আর বিদ্যুতের সঙ্গে মিলিত হয়ে বিপুল গর্জন করতে করতে রথচক্রের মত স্থূলধারায় চারদিকে বৃষ্টি বর্ষণ করতে লাগল। ৭-১১

পরক্ষণেই ভয়াবহ জলজন্তুপূর্ণ প্রচণ্ড গর্জনে মুখর চতুঃসমুদ্র বায়ুবেগে

তাড়িত ঢেউসমূহ দ্বারা পৃথিবীকে গ্রাস করতে লাগল। মুনি নিজের সঙ্গে চাররকম জীবকে (জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ) আকাশপ্লাবী জলরাশি, প্রচণ্ড বায়ু আর বিদ্যুৎ দ্বারা প্রপীড়িত এবং পৃথিবীকে জলমগ্ন দেখে ব্যাকুল ও ত্রস্ত হলেন। তখন প্রচণ্ড বায়ুর বিক্ষোভে ভয়ংকর মহাসমুদ্রের জলরাশি যেন ঘুরতে লাগল। ধারাবর্ষী মেঘগুলি আস্তে আস্তে পূরিত হয়ে দ্বীপ, বর্ষ আর পর্বতসকলের সঙ্গে পৃথিবীকে ঢেকে ফেলল। তখন আকাশ, স্বর্গ, তারকাপুঞ্জ আর দিঙমণ্ডলের সঙ্গে ত্রৈলোক্য জলে ডুবে গেল, কেবল সেই মহামুনি একা বাকী রইলেন। তিনি তাঁর জটা ছড়িয়ে জড় আর অন্ধের মত জলের মধ্যে ঘুরতে লাগলেন। তিনি ক্ষুধাতৃষ্ণায় ব্যাকুল, হাঙ্গর ও কুমীরের উপদ্রবে ব্যতিব্যস্ত, ঢেউ ও বাতাস দ্বারা উৎপীড়িত, আর পরিশ্রমে কাতর হয়ে অপার অন্ধকারের মধ্যে পরিভ্রমণ করতে লাগলেন। ঋষি দিক্‌সকল, আকাশ, পৃথিবী কোথায় যে কি কিছুই জানতে পারলেন না। তিনি নিজে কখনও মহাসাগরে মগ্ন, কখনও ঢেউ দ্বারা তাড়িত, কখনও বা হাঙর, কুমীর দ্বারা ভক্ষিত হন; কখন দুঃখ, কখন সুখ কখনও বা ভয় এবং ব্যাধি দ্বারা পীড়িত হয়ে মৃত্যুযাতনা ভোগ করছিলেন। বিষ্ণুর মায়ায় মুগ্ধ হয়ে সেই সাগরে ভ্রমণ করতে করতে মহর্ষি মার্কণ্ডেয়র শত-সহস্র-অযুত বছর কেটে গেল। তারপর একদিন ঘুরতে ঘুরতে তিনি সেই সাগরের মধ্যে পৃথিবীর উপরদিকে ফল-ফুলে শোভিত ছোট একটা বটগাছ দেখলেন। তিনি দেখলেন—সেই গাছের ঈশানকোণের শাখায় পর্ণপুটে এক শিশু শুয়ে আছেন; কিন্তু তিনি নিজের প্রভায় অন্ধকার দূর করছেন। তাঁর গায়ের রঙ মহামরকতের মত শ্যাম, মুখ শ্রীসম্পন্ন, গলা শঙ্খের ন্যায়, বক্ষঃস্থল বিস্তৃত, নাক ও ভ্রূযুগল সুন্দর। নিশ্বাস দ্বারা কম্পমান কেশগুচ্ছে তাঁর সুন্দর শোভা হয়েছে। তাঁর কানদুটি ডালিম ফুলে শোভমান। তাঁর হাসি শুভ্র, প্রবালের মত অধরের দীপ্তিতে ঈষৎ অরুণবর্ণ। তাঁর নয়নপ্রান্ত পদ্মগর্ভের মত রক্তবর্ণ। তাঁর দৃষ্টি সুন্দর, অশ্বত্থপাতার মত বলিরেখাঙ্কিত উদরে গভীর নাভি নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে কম্পমান। শিশুটি সুন্দর অঙ্গুলিযুক্ত হাত দুটি দিয়ে নিজের পা আকর্ষণ করে মুখে দিয়ে চুষছিল। মুনি সেই বালককে দেখে আশ্চর্য হলেন। তাঁকে দেখে যে আনন্দ জন্মাল, তাতে তাঁর পরিশ্রম দূর হল। হৃৎপদ্ম ও লোচনপদ্ম বিকশিত হয়ে উঠল, তাঁর রোমাঞ্চ হল। শিশুর সেই অদ্ভুত ভাব দেখে শঙ্কিত হয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করবার জন্য মার্কণ্ডেয় ঋষি তাঁর সামনে গেলেন। ১২-২৬

অমনি ভৃগুসন্তান মার্কণ্ডেয় শিশুর নিঃশ্বাসের সঙ্গে মশার মত তাঁর শরীরের ভিতর প্রবেশ করলেন। সেখানেও তিনি দেখতে পেলেন যে, প্রলয়ের আগের মত এই বিশ্বসমুদয় বিন্যস্ত আছে। তা দেখে তিনি খুবই আশ্চর্য ও মুগ্ধ হলেন। দেখলেন—আকাশ, অন্তরীক্ষ, তারাগণ, পর্বতমালা, সাগর, দ্বীপসমূহ, বর্ষ ও দিকসকল, দেবতা ও অসুরগণ, বন ও খনিসমূহ, ব্রজ, আশ্রম, বর্ণ ও বর্ণানুযায়ী বৃত্তি, মহাভূতগণ, ভৌতিক পদার্থসমূহ, গ্রাম, নদী, নগর, যুগকল্পাদি নানা ভেদে ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞাক্রান্ত কাল আর অন্য যা কিছু লোকযাত্রার নির্বাহকারী তা সবই সেখানে রয়েছে। সমস্ত বিশ্বই সেখানে সত্যপদার্থের মত প্রকাশিত হয়েছে। ঋষি দেখলেন—সেই তিনি, সেই পুষ্পভদ্রা নদী আর যেখানে নর-নারায়ণ ঋষিকে দেখেছিলেন, সেই তাঁর আশ্রম। ঋষি মার্কণ্ডেয় বিশ্বকে দেখছেন, এমন সময়ে শিশুর শ্বাসযোগে বাইরে নিক্ষিপ্ত হয়ে প্রলয়-সাগরে পড়লেন। ঋষি সেই বটগাছকে ও তার পত্রপুটে শয়ান বালককে দেখে আর সেই শিশু কর্তৃক দৃষ্ট হয়ে অতিশয় সন্তুষ্ট হলেন। দর্শনযোগে শিশুর অন্তরে প্রবেশ করে সেই শিশুকে আলিঙ্গন

করবার জন্য কাছে যেতেই শিশুরূপী ভগবান দৈবকৃত কর্মের মত নিমেষের মধ্যে ঋষির কাছ থেকে অন্তর্হিত হলেন। ব্রহ্মন্, ভগবানের অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে সেই বটগাছ, জল আর লোকপ্রলয় কিছুক্ষণের মধ্যেই মিলিয়ে গেল। ঋষি আগের মত নিজের আশ্রমে অবস্থান করতে গাগলেন। ২৭-৩৪

দশম অধ্যায়

মার্কণ্ডেয়কে শিবের বরদান

সূত বললেন, এই বিশ্ব নারায়ণের রচিত জেনে আর যোগমায়ার প্রভাব বুঝে মহর্ষি মার্কণ্ডেয় বিষ্ণুর শরণাগত হলেন। মার্কণ্ডেয় বললেন, শ্রীহরি, আমি দুঃখীজনের আশ্রয় আপনার শ্রীচরণের শরণ নিলাম। আপনার যে মায়ায় পণ্ডিতেরাও মোহিত হন, আমি তাঁর প্রভাব কি বর্ণনা করব? সূত বললেন, তিনি এই রকম সংযতচিত্ত হয়ে কাল কাটাচ্ছেন, ইতিমধ্যে অনুচর সহ ভগবান রুদ্র ষাঁড়ের পিঠে চড়ে রুদ্রাণীর সঙ্গে আকাশে ভ্রমণ করতে করতে তাঁকে দেখতে পেলেন। উমা সেই ঋষিকে দেখে মহাদেবকে বললেন, ভগবন্, দেখুন যেমন ঝড়ের পরে সমুদ্রের জল স্থির হয় আর মাছেরা নিশ্চল থাকে, এই ঋষিও সেই রকম আত্মা, ইন্দ্রিয় ও মনকে সংযত করে রয়েছেন। এঁকে তপস্যার ফল দিন; আপনি সাক্ষাৎ ফলদাতা। ভগবান রুদ্র বললেন, এই ব্রহ্মর্ষি অব্যয় পুরুষ ভগবানের ভক্তি লাভ করেছেন। ইনি কোনও ফল, এমনকি মুক্তিও চান না। তবুও আমি এ সাধুর সঙ্গে কথা বলব, সাধুসঙ্গই মানুষের পরম লাভ। ১-৭

সূত বললেন, সর্ববিদ্যার নিয়ামক, সর্বদেহীর ঈশ্বর, সাধুদের গতি ভগবান রুদ্র এই কথা বলে ঋষির কাছে গেলেন। ঋষির অন্তরের বৃত্তিসকল রুদ্ধ হয়েছিল, তিনি জগতের আত্মা সেই সাক্ষাৎ ভগবান ও ভগবতীর আগমনের কথা, সমস্ত বিশ্বের কথা, এমনকি নিজেকেও জানতে পারলেন না। ভগবান ঈশ্বর গিরিশ তা জেনে যোগমায়াবলে বাতাসের মত তাঁর হৃদয়াকাশে প্রবেশ করলেন। বিদ্যুতের মত পিঙ্গল-জটাধারী, ত্রিনেত্র, দশহাত, উদয়োন্মুখ সূর্যের মত উন্নত, ব্যাঘ্রচর্মধারী, শূল-শরাসন-বাণ-খড়্গ-ঢাল-অক্ষমালা-ডমরু-কপাল-পরশুধারী শিবকে শরীরের মধ্যে আর হৃদয়মধ্যে হঠাৎ আবির্ভূত দেখে মুনি 'একি, কোথা থেকে এ হল?' এই ভেবে সমাধি থেকে ক্ষান্ত হলেন। তিনি চোখ খুলে রুদ্রগণ ও উমার সঙ্গে ত্রৈলোক্যগুরু মহাদেবকে দেখতে পেলেন। অমনি তিনি মাথা নীচু করে তাঁকে নমস্কার করলেন। তারপর তাঁকে স্বাগত জিজ্ঞাসা করে আসন, পাদ্য, অর্ঘ্য, চন্দন, মালা, ধূপ, দীপ দিয়ে অনুচরদের আর উমার সঙ্গে তাঁর পূজা করলেন। তারপর বললেন, বিভু, ঈশান, আপনি আত্মানুভব দ্বারা পূর্ণকাম; জগৎ আপনার দ্বারাই সুখলাভ করে থাকে। আমরা আপনার কোন কাজ করব? আপনি নির্গুণ, শান্ত আর সত্ত্বগুণের অধিষ্ঠাতা, অতএব সুখপ্রদ, আবার আপনি রজ ও তমোগুণসেবী, সুতরাং আপনি ঘোররূপী; আপনাকে নমস্কার। ৮-১৭

সূত বললেন, সাধুদের গতি সেই ভগবান মহাদেবের এই রকম স্তব করলে মহাদেব যারপরনাই তুষ্ট ও প্রসন্ন হলেন আর তাঁকে বললেন, আমার কাছে যেমন ইচ্ছা বর নাও। আমরা তিনজন বরদাতাদের অধীশ্বর, আমাদের দর্শন

বিফল হয় না ; মানুষ আমাদের কাছে মুক্তিলাভ করে। যে সকল ব্রাহ্মণ সদাচারী, নিরহঙ্কার, নিষ্কাম, দয়ালু, আমাদের একান্ত ভক্ত, শত্রুতাহীন, সমদর্শী, সমুদয় লোক ও লোকপালরা তাঁদের উপাসনা করে থাকেন। কেবল এঁরাই নন, আমি, ভগবান ব্রহ্মা ও স্বয়ং ঈশ্বর শ্রীহরি—আমরাও করে থাকি। তাঁরা আমাতে, শ্রীহরিতে, ব্রহ্মাতে, আত্মাতে আর অন্যান্য জনেও কিছুমাত্র ভেদ দেখে না। জলময় নদনদী তীর্থ নয়। শিলা বা দারুময় শালগ্রাম প্রতিমাদি দেবতা নয়। তাঁরা দীর্ঘকাল সেবাদ্বারা সেবকগণকে পবিত্র করতে সক্ষম। কিন্তু আপনাদের ন্যায় সাধুগণকে দেখামাত্রই পবিত্রতা লাভ হয়। ব্রাহ্মণদের নমস্কার করি ; তাঁরা চিত্তের একাগ্রতা, আলোচনা, অধ্যয়ন ও বাক্যের সংযম করে আমাদের বেদময় রূপ ধারণ করে থাকেন। আপনাদের নাম শুনলে বা আপনাদের দর্শন করলে মহাপাতকী অন্ত্যজরাও শুদ্ধ হয় ; আপনাদের সঙ্গে সম্ভাষণ প্রভৃতি করে মানুষ যে শুদ্ধ হয়, তাতে আর সন্দেহ কি ? ১৮-২৫

সূত বললেন, চন্দ্রশেখর শিবের এই ধর্মরহস্যযুক্ত অমৃতময় কথা কানে শুনেও ঋষির পিপাসা মিটল না। বিষ্ণুর মায়া অনেকদিন ধরে তাঁকে ভ্রমণ করাচ্ছিল আর কষ্ট দিচ্ছিল ; শিবের অমৃতবাক্য শুনে তাঁর সমস্ত ক্লেশ দূর হল। মার্কণ্ডেয় তাঁকে বললেন, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই ঈশ্বরদের লীলা দেহীদের চিন্তার অতীত। তাঁরা নিজে যাঁদের শাসন করবেন, তাঁদেরই স্তব করে থাকেন। এই লীলা, কেউ বুঝতে পারে না। ব্রাহ্মণের প্রতি ভগবানের নমস্কারাদি আচরণ লোকশিক্ষার জন্য। তাঁরা লোকের ধর্মশিক্ষা দেবার জন্য ধর্মের প্রবক্তা হয়েও প্রায়ই নিজেরা ধর্ম আচরণ, ধর্মের অনুমোদন আর প্রশংসা করে থাকেন। যেমন মায়াবী ব্যক্তির কুহক তার নিজের শক্তিকে ব্যাহত করতে পারে না, সেই রকম ভগবানের এই সকল মায়াময় আচরণে তার মহিমা খর্ব হয় না। আপনি সংকল্প দ্বারা এই বিশ্ব সৃষ্টি করে আত্মস্বরূপে এর মধ্যে প্রবেশ করেছেন।[১] যে স্বপ্ন দেখে সে যেমন ভুলবশত স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থের কর্তা বলে প্রতিভাত হয়, সেই রকম সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণ দ্বারা দেব, মানুষ প্রভৃতি বিষম সৃষ্টি সম্পাদিত হলেও ভগবানই বিষমসৃষ্টিকারী কর্তা বলে প্রতীত হয়ে থাকেন। ত্রিগুণের সম্বন্ধরহিত, অথচ তিনগুণের নিয়ামক অদ্বিতীয় গুরু ব্রহ্মমূর্তি সেই ভগবান আপনাকে নমস্কার। আপনার দর্শনই বর, অতএব অন্য আর কি বর প্রার্থনা করব ? আপনার দর্শনে পুরুষের বাসনা চরিতার্থ ও সঙ্কল্প সত্য হয়ে থাকে। তবু আপনার কাছে এই বর প্রার্থনা করি—ভগবান শ্রীহরি, তাঁর ভক্তগণ ও আপনাতে যেন আমার অচলা ভক্তি থাকে। ২৬-৩৪

সূত বললেন, মুনি এইভাবে পূজা এবং বেদবাক্যের দ্বারা স্তব করলে ভগবান শঙ্কর তাঁকে বললেন, মহর্ষি, অধোক্ষজ শ্রীহরির প্রতি তুমি ভক্তিমান, তোমার হরিভক্তি লাভের কামনা পূর্ণ হোক। এর উপরেও কল্পশেষ পর্যন্ত ব্রহ্মতেজোময় তোমার কীর্তি, পুণ্য, অজরতা, অমরতা, ত্রৈকালিক জ্ঞান ও বৈরাগ্যযুক্ত বিজ্ঞান লাভ হোক। তুমি পুরাণের আচার্য হও। সূত বললেন, ত্রিলোকের ঈশ্বর মুনিকে এই বর দিয়ে তাঁর কাজ আর ইতিপূর্বে অনুভূত ভগবানের মায়ার কথা দেবীকে বলতে বলতে চলে গেলেন। সেই মুনিও মহাযোগের মহিমা পেয়ে ভাগবত-দের মধ্যে প্রধান হলেন। সাক্ষাৎ শ্রীহরিতে একান্ত ভক্তি লাভ করে তিনি এখনও

১ তুলনীয় : তিনি তপস্যা করে এ যা-কিছু সে সমস্তই সৃষ্টি করলেন। এ-সমস্ত সৃষ্টি করে তিনি তাতে অনুপ্রবিষ্ট হলেন।—তৈত্তিরীয় উপ: ২।৬।৩

জগতে বিচরণ করছেন। শৌনক, ধীমান মার্কণ্ডেয় মুনির অনুভূত শ্রীহরির অদ্ভুত মায়া-বৈভব এই আজ আপনার কাছে বর্ণনা করলাম। যাঁরা মানুষের সৃষ্টি ও প্রকৃতিস্বরূপা জগন্মায়া না জানেন, তাঁরা বলেন, মার্কণ্ডেয়র অনুভূত এই মায়া বহুকাল ধরে বার বার দেখা দেয়। যাঁরা জানেন, তাঁরা কিন্তু মনে করেন, এ কোন এক সময়ে প্রবর্তিত। ভৃগুশ্রেষ্ঠ, যিনি চক্রপাণির প্রভাবের মহিমা-জ্ঞাপক এই উপাখ্যান শোনেন বা বলেন, তাঁর কর্মবাসনাজনিত চিত্তবন্ধন ও সংসার হয় না। ৩৫-৪২

একাদশ অধ্যায়

ভগবানের উপাসনা ও সূর্যব্যূহ বর্ণন

শৌনক বললেন, সূত, তুমি সমস্ত তন্ত্রসিদ্ধান্তের তত্ত্বে অভিজ্ঞ। এখন একটি বিষয় জিজ্ঞাসা করি। তান্ত্রিক উপাসকেরা উপসনাকালে বিরাটপুরুষ শ্রীপতি নারায়ণের হাত-পা অঙ্গ, গরুড়াদি উপাঙ্গ, সুদর্শন প্রভৃতি অস্ত্র আর কৌস্তুভ প্রভৃতি আভরণসকল যে যে তত্ত্বের দ্বারা কল্পনা করেন, তা আমার কাছে বল। আমার ক্রিয়াযোগ জানতে ইচ্ছা করছে। তাই যে ক্রিয়া-নিপুণতায় মানুষ মুক্তিলাভ করে, তাও বর্ণনা কর। ১-৩

সূত বললেন, ব্রহ্মাদি আচার্যেরা বেদ ও তন্ত্রে বিষ্ণুর যে বিভূতি বর্ণনা করেছেন, গুরুদেবকে প্রণাম করে তা বলছি। প্রথমত প্রকৃতি, সূত্র, মহৎ, অহংকার ও পঞ্চতন্মাত্র, এই নয় তত্ত্ব এবং একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ মহাভূত, এই ষোলটি বিকার দ্বারা বিরাট মূর্তি তৈরী হয়েছিল। সেই চেতন বিরাট মূর্তিতে ত্রিভুবন দেখা যায়। এই বিরাট পুরুষের রূপ এইরকম—পৃথিবী এঁর পা, স্বর্গলোক মাথা, আকাশ নাভি, সূর্য চোখ, বাতাস নাক আর দিক্ এঁর কান, প্রজাপতি এঁর মেঢ্র, কাল অপান বায়ু, লোকপাল বাহু, চন্দ্র মন, যম ভ্রূ, লজ্জা ও লোভ যথাক্রমে এঁর উত্তর ও অধর ওষ্ঠ, জ্যোৎস্না এর দাঁত, বিভ্রম হাসি, বৃক্ষসকল রোম আর মেঘ হল এঁর চুল।[1] এই ভূলোকস্থ মানবদেহ নিজের পরিমাণে যতখানি, এই বিরাট পুরুষও তাঁর অবয়বস্বরূপ পৃথিবী প্রভৃতি লোকের দ্বারা নিজের পরিমাণে ততখানি। জন্মরহিত বিভু ভগবান কৌস্তুভমণিচ্ছলে বিশুদ্ধ জীবচৈতন্য আর তার প্রভারূপে সাক্ষাৎ শ্রীবৎস হৃদয়ে ধারণ করে থাকেন। ৪-১০

তিনি বনমালারূপিণী নানাগুণময়ী নিজের মায়াকে কণ্ঠে ধারণ করেন আর ছন্দোময়, পীতবাস ও ব্রহ্মসূত্ররূপ ত্রিমাত্র প্রণব ধারণ করেন। তিনি মকর-কুণ্ডলরূপ সংযোগ আর শিরোভূষণরূপ, সর্বলোক-নমস্কৃত ব্রহ্মপদ ধারণ করে থাকেন। যাতে তিনি বসে আছেন, সে আসনপদ্ম অনন্ত নামে ধর্মজ্ঞানযুক্ত সত্ত্বগুণ বলে কথিত। তিনি ইন্দ্রিয়ের তেজ, মনোবল আর দৈহিক বলযুক্ত প্রাণতত্ত্বরূপ গদা, জলতত্ত্বরূপ শঙ্খ, তেজস্তত্ত্বরূপ সুদর্শন, শরীরস্থ নির্মল আকাশতত্ত্বরূপ অসি, তমোগুণময় চর্ম, কালরূপ শার্ঙ্গধনু আর কর্মরূপ তূণীর ধারণ করে আছেন। ইন্দ্রিয়গণ এঁর শর, ক্রিয়াশক্তিযুক্ত মন এঁর রথ, শব্দাদি পঞ্চতন্মাত্র এই মনোরথের অভিব্যক্তি। মুদ্রা দ্বারা ইনি বরদ ও অভয়প্রদ সব রূপ ধারণ করেন। সূর্যমণ্ডল

---

১ এ-প্রসঙ্গে তৈত্তিরীয় উপনিষৎ (ব্রহ্মানন্দবল্লী, ২য়-৫ম অনুবাক) দ্রষ্টব্য।

এই দেবের পূজার স্থান দীক্ষাসংস্কার আর ভগবানের পরিচর্যায় পাপক্ষয় হয়। ঐশ্বর্যাদি ছয় গুণ এঁর হাতের লীলাকমল, ধর্ম আর যশ এঁর চামর ও ব্যজন। বৈকুণ্ঠধাম এঁর ছত্র, যা অকুতোভয় কৈবল্যধাম, দেবত্রয় এঁর গরুড়রূপ বাহন; যিনি যজ্ঞরূপ পুরুষকে বহন করে থাকেন। সাক্ষাৎ জ্ঞানরূপা শ্রী এই আত্মরূপে নারায়ণের নিত্যমিলিতা লক্ষ্মী। পঞ্চরাত্রাদি আগমই এঁর শ্রেষ্ঠ পার্ষদ বিশ্বক্‌সেন, অণিমাদি অষ্টগুণ এঁর দ্বারপাল নন্দ প্রভৃতি। ১১-২০

হে ব্রহ্মন্, বাসুদেব, সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ এই চার পুরুষমূর্তি এঁর চার মূর্তিব্যূহ। সেই নারায়ণ বাহ্য পদার্থ, মন, সংস্কার আর এই তিনের অনুগত জ্ঞান-উপাধিযুক্ত জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই সমস্ত বৃত্তি দ্বারা আত্মার বিশ্ব, তৈজস, প্রাজ্ঞ ও তুরীয় এই চার অবস্থারূপে কল্পিত হয়ে থাকেন। সেই সেই মূর্তিস্থিত ভগবান শ্রীহরি হাত-পা অঙ্গ, গরুড়াদি উপাঙ্গ, অস্ত্র-শস্ত্র ও ভূষণ দ্বারা যুক্ত হয়ে ঐ ব্যূহমূর্তি চতুষ্টয় ধারণ করেন আর উপাসকরা তাঁর ধ্যান করেন। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ, ভগবান বিষ্ণু বেদরাশির কারণ, সর্বদ্রষ্টা আর নিজ মহিমাতে পরিপূর্ণ। ইনি নিজ মায়া দ্বারা এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার করেন বলে ব্রহ্মাদি নামে প্রকাশিত হয়ে থাকেন, কিন্তু ভক্তজনেরা তাঁকে অনাবৃত জ্ঞানরূপে আত্মাতে উপলব্ধি করেন। কৃষ্ণ, তুমি পৃথিবীর বিঘ্নকারক ক্ষত্রিয়বংশ নাশ করেছ। গোবিন্দ, গোপবনিতারা আর নারদাদি ঋষিরা তোমার নির্মল যশ সর্বত্র গান করেন। তোমার নাম শুনলেই মঙ্গল হয়; তুমি তোমার ভক্তদের রক্ষা কর। যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে উঠে তন্ময় হয়ে এই বিরাট পুরুষস্বরূপকে জপ করেন, তিনি সকলের অন্তরে স্থিত ব্রহ্মকে জানতে পারেন। ২১-২৬

শৌনক বললেন, সূত, বিষ্ণুভক্ত পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করাতে ভগবান শুকদেব যা বলেছিলেন, মাসে মাসে সূর্যের ভিন্ন ভিন্ন যে যে মূর্তিব্যূহ সপ্ত সংখ্যায় উদিত হয়, সূর্যাত্মক শ্রীহরির সেই সকল মূর্তিব্যূহের নাম ও কর্ম আমাদের কাছে প্রকাশ করে বল। সূত বললেন, সর্বদেহীর আত্মা বিষ্ণুর অনাদি অবিদ্যা থেকে উৎপন্ন এই সূর্য লোকযাত্রা প্রবর্তন করতে গিয়ে এই লোকেই বর্তমান আছেন। সমস্ত জগতের আত্মা ও সৃষ্টিকর্তা স্বয়ং শ্রীহরিই সূর্য।[১] তিনি এক হলেও কালের উপাধিবশত সমস্ত বেদোক্ত কর্মের মূলরূপে ঋষিগণ কর্তৃক বহুরূপে কীর্তিত হয়ে থাকেন। সেই নারায়ণরূপী সূর্য মায়াদ্বারা প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন প্রভৃতি কাল, সমতল দেশ, অনুষ্ঠান, ব্রাহ্মণাদি কর্তা, স্রুক, স্রুব প্রভৃতি কারণ, যাগাদি কার্য, আগমাদি মন্ত্র, ব্রীহি-যবাদি দ্রব্য আর স্বর্গ প্রভৃতি ফলরূপে কীর্তিত হয়ে থাকেন। ২৭-৩১

কালরূপী ভগবান আদিত্য লোকযাত্রা নির্বাহের জন্য চৈত্র প্রভৃতি দ্বাদশ মাসে পৃথক পৃথক দ্বাদশগণের সঙ্গে বিচরণ করে থাকেন। ধাতা (সূর্য), কৃতস্থলী (অপ্সরা), হেতি (রাক্ষস), বাসুকি (নাগ), রথকৃৎ (যক্ষ), পুলস্ত্য (ঋষি) আর তুম্বুরু নামে গন্ধর্ব—এই সাতগণ চৈত্রমাস নির্বাহ করে থাকেন। অর্যমা (সূর্য), পুলহ (ঋষি) ওজা (যক্ষ), প্রহেতি (রাক্ষস), পুঞ্জিকস্থলী (অপ্সরা), নারদ (ঋষি); আর কচ্ছনীর নামক নাগ—এঁরা বৈশাখ মাস নির্বাহ করে থাকেন। মিত্র (সূর্য), অত্রি (ঋষি), পৌরুষেয় (রাক্ষস), তক্ষক (নাগ), মেনকা (অপ্সরা), হাহা (গন্ধর্ব) আর রথস্বন নামে যক্ষ—এঁরা জ্যৈষ্ঠমাস

১ তুলনীয়: ঈশ উপনিষদ্‌-১৬ মন্ত্র। এ-প্রসঙ্গে এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। অতুলচন্দ্র সেন, উপনিষদ, ১ম খণ্ড, হরফ প্রকাশনী, পৃ ২৭-২৮

নির্বাহ করেন। বরুণ (সূর্য), বশিষ্ঠ (ঋষি), রম্ভা (অপ্সরা), সহজন্য (যক্ষ), হূহূ (গন্ধর্ব), শুক্র (নাগ) আর চিত্রস্বন নামে রাক্ষস—এঁরা আষাঢ় মাসের নির্বাহক। ইন্দ্র (সূর্য), বিশ্বাবসু (গন্ধর্ব), শ্রোতা (যক্ষ), এলাপত্র (নাগ), অঙ্গিরা (ঋষি), প্রম্লোচা (অপ্সরা) আর বর্য নামে রাক্ষস—এঁরা শ্রাবণ মাস নির্বাহ করেন। বিবস্বান (সূর্য), উগ্রসেন (গন্ধর্ব), ব্যাঘ্র (রাক্ষস), আসারণ (যক্ষ), ভৃগু (ঋষি), অনুম্লোচা (অপ্সরা) আর শঙ্খপাল নামে নাগ—এঁরা ভাদ্র মাস নির্বাহ করে থাকেন। পূষা (সূর্য), বাত (রাক্ষস), ধনঞ্জয় (নাগ), সুষেণ (গন্ধর্ব), সুরুচি (যক্ষ), ঘৃতাচী (অপ্সরা) আর গৌতম নামে ঋষি—এঁরা মাঘ মাস নির্বাহ করেন। পর্জন্য (সূর্য), ক্রতু (যক্ষ), বর্চা (রাক্ষস), ভরদ্বাজ (ঋষি), সেনজিৎ (অপ্সরা), বিশ্ব (গন্ধর্ব) আর ঐরাবত নামে নাগ—এঁরা ফাল্গুন মাস নির্বাহ করেন। অংশু (সূর্য), কশ্যপ (ঋষি), তার্ক্ষ্য (যক্ষ), ঋতসেন (গন্ধর্ব), উর্বশী (অপ্সরা), বিদ্যুচ্ছত্রু (রাক্ষস), আর মহাশঙ্খ নামক নাগ—এঁরা অগ্রহায়ণ মাস নির্বাহ করেন। ভগ (সূর্য), অরিষ্টনেমি (গন্ধর্ব), স্ফূর্জ (রাক্ষস), ঊর্ণ (যক্ষ), আয়ু (ঋষি), কর্কোটক (নাগ) আর পূর্বচিত্তি নামে অপ্সরা—এঁরা পৌষ মাস নির্বাহ করেন। ত্বষ্টা (সূর্য), জমদগ্নি (ঋষি), কম্বল (নাগ), তিলোত্তমা (অপ্সরা), ব্রহ্মাপেত (রাক্ষস), শতজিৎ (যক্ষ) আর ধৃতরাষ্ট্র নামে গন্ধর্ব—এঁরা আশ্বিন মাস নির্বাহ করেন। বিষ্ণু (সূর্য), অশ্বতর (নাগ), রম্ভা (অপ্সরা), সূর্যবর্চা (গন্ধর্ব), সত্যজিৎ (যক্ষ), বিশ্বামিত্র (ঋষি) আর মখাপেত নামে রাক্ষস—এঁরা কার্তিক মাস নির্বাহ করে থাকেন। ৩২-৪৪

ভগবান বিষ্ণুরূপ আদিত্যের এই সকল বিভূতি যিনি প্রতিদিন দুই সন্ধ্যায় স্মরণ করেন, দিনে দিনে তাঁর পাপ নষ্ট হতে থাকে। সূর্যদেব এইভাবে গন্ধর্ব প্রভৃতি অপর ছয় জনের সঙ্গে বারো মাসে এই লোকের চারদিকে বিচরণ করার সময় মানুষের ইহ-পরলোকে শুভবুদ্ধি দেন। ঋষিরা সাম, ঋক্, যজুর্মন্ত্রসমূহ দ্বারা এঁর স্তব করেন ; গন্ধর্বেরা এঁর গুণগান করেন। এঁর আগে আগে অপ্সরারা নৃত্য করেন। নাগরা এঁর রথ দৃঢ়ভাবে বেঁধে রাখেন, যক্ষরা এঁর রথ যোজনা করেন আর বলশালী রাক্ষসেরা পেছনে থেকে এঁর রথকে পরিচালিত করে থাকেন। বালখিল্য নামে ষাট হাজার নিষ্পাপ ব্রহ্মর্ষি তাঁর অভিমুখ হয়ে রথের আগে স্তব করতে করতে যান। অনাদি অনন্ত জন্মরহিত ভগবান পরমেশ্বর শ্রীহরি কল্পে কল্পে নিজের আত্মাকে এইভাবে বিভাগ করে লোকসকলকে প্রতিপালন করছেন। ৪৫-৫০

দ্বাদশ অধ্যায়

ভাগবতোক্ত প্রধান বিষয়সমূহের সূচী

সূত বললেন, মহান ধর্মকে, বিধাতা শ্রীকৃষ্ণকে আর ব্রাহ্মণদের নমস্কার করে সনাতন ধর্মসমূহ বলছি। বিপ্রগণ, পুরুষদের শোনার যোগ্য যে সমস্ত বিষয় আপনারা আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ভগবান বিষ্ণুর সেই অদ্ভুত চরিত্র আমি আপনাদের কাছে বর্ণনা করলাম। এই শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে সর্বপাপহারী শ্রীহরি, নারায়ণ ও

হৃষীকেশরূপে সাক্ষাৎ ভগবান সাত্বতপতি শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপও আমি আপনাদের কাছে বললাম। এই গ্রন্থে জগতের উৎপত্তি, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্তা পরমব্রহ্মের স্বরূপ এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানে সম্বন্ধ তাঁর নানা আখ্যানও বর্ণিত হয়েছে। ভক্তিযোগ আর তার আশ্রয়স্বরূপ বৈরাগ্য বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথম স্কন্ধে বলা হয়েছে রাজা পরীক্ষিতের উপাখ্যান, নারদের উপাখ্যান। তার সঙ্গে ব্রহ্মশাপের ফলে রাজা পরীক্ষিতের প্রায়োপবেশনকালে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ শুকদেবের সঙ্গে রাজা পরীক্ষিতের সংবাদও বলেছি। ১-৬

দ্বিতীয় স্কন্ধে যোগদ্বারা যোগীদের জ্যোতি প্রভৃতি মার্গে ঊর্ধ্বগতি, ব্রহ্মা-নারদ সংবাদ, ভগবানের লীলাবতার কথা আর প্রাকৃত সৃষ্টি বর্ণনা করা হয়েছে। তারপর প্রাকৃত সর্গ, বিদুর আর মৈত্রেয়ের সংবাদ; মহৎ, অহংকার ও পঞ্চতন্মাত্র এই সপ্ত-সৃষ্টি এবং একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চমহাভূত এই ষোড়শ বিকারের সৃষ্টি, পরে ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি ও ব্রহ্মাণ্ডে বিরাট পুরুষের স্বরূপ বর্ণনা করেছি। স্থূল-সূক্ষ্ম কালের গতি, নাভিপদ্ম থেকে ব্রহ্মার উৎপত্তি, সমুদ্র থেকে পৃথিবীর উদ্ধার ও হিরণ্যাক্ষবধও এখানে বর্ণিত হয়েছে। স্বর্গ-মর্ত-পাতাল সৃষ্টি, স্বায়ম্ভুব-মনুর সৃষ্টি ও শতরূপা আদ্যা প্রকৃতির কথা বলেছি। কর্দম-প্রজাপতির ধর্মপত্নীদের সন্তান-বর্ণন, ভগবান কপিল মহামুনির অবতার ও তাঁর সঙ্গে দেবহূতির কথোপকথন এই সবই তৃতীয় স্কন্ধে বর্ণনা করা হয়েছে। তারপর চতুর্থ স্কন্ধে মরীচি প্রভৃতি নয়জন ব্রাহ্মণের উৎপত্তি, দক্ষযজ্ঞ বিনাশ, ধ্রুবচরিত, প্রাচীনবর্হি ও পৃথুর চরিত্র এবং নারদ-সংবাদ বর্ণিত হয়েছে। তারপর পঞ্চম স্কন্ধে প্রিয়ব্রত চরিত, নাভিরাজার চরিত ও ভরতচরিত বর্ণনা করেছি। এই স্কন্ধে, দ্বীপ, সমুদ্র, পর্বত, বর্ষ ও নদনদীর বর্ণনা, জ্যোতিশ্চক্রের সংস্থান ও পাতাল-নরকের স্থান বর্ণনাও করা হয়েছে। ষষ্ঠ স্কন্ধে প্রচেতাগণ থেকে দক্ষের জন্ম, দক্ষকন্যাদের সন্তান-উৎপত্তি, তাঁদের বংশ থেকে দেব, অসুর, নর, তির্যক, নাগ ও খগাদির উৎপত্তি এবং বৃত্রাসুরের জন্ম ও বিনাশ বর্ণিত হয়েছে। সপ্তম স্কন্ধে দিতির পুত্র হিরণ্যকশিপু হিরণ্যাক্ষের জন্ম ও নিধন আর দৈত্যেশ্বর মহাত্মা প্রহ্লাদের চরিত বর্ণিত হয়েছে। অষ্টম স্কন্ধে মন্বন্তরসমূহের বিবরণ, গজেন্দ্র-মোক্ষণ, মন্বন্তরে বিষ্ণুর হয়গ্রীবাদি অবতারসকল, জগৎপতি ভগবানের মৎস্য, কূর্ম, নরসিংহ ও বামনাদি অবতার আর দেবতাদের অমৃতলাভের জন্য ক্ষীরোদ-সমুদ্র মন্থন ও দেবাসুরের মহাযুদ্ধ বর্ণিত হয়েছে। নবম স্কন্ধে রাজবংশ-কীর্তন, ইক্ষ্বাকুর জন্ম ও বংশ-কথন, মহাত্মা সুদ্যুম্ন রাজার বংশ-কথন, ইলার উপাখ্যান, তারার উপাখ্যান, সূর্যবংশ, শশাদ ও নৃগ প্রভৃতির বংশ বিস্তার কথন আর সুকন্যার চরিত্র, শর্যাতি, ধীমান, ককুৎস্থ, খট্বাঙ্গ, মান্ধাতা, সৌরভি, সগর, কোশলপতি রামচন্দ্র প্রভৃতির পাপহারী চরিত্র বর্ণনা, নিমির অঙ্গ পরিত্যাগ, জনকদের উৎপত্তি, ভার্গবশ্রেষ্ঠ পরশুরামের নিঃক্ষত্রীকরণ প্রভৃতি বর্ণনা করেছি। সোমবংশীয় ইক্ষ্বাকু, বুধ, নহুষ-পুত্র যযাতি, দুষ্মন্ত, ভরত, শান্তনু ও তাঁর পুত্রের চরিত এবং যযাতির জ্যেষ্ঠ পুত্র যদুর বংশবিস্তার কীর্তন করা হয়েছে। এই যদুবংশ ভগবান জগদীশ্বরের বসুদেবের গৃহে শ্রীকৃষ্ণ-অবতার গ্রহণ ও তাঁর গোকুলে বৃদ্ধি দশম স্কন্ধের প্রথমে বলেছি। ৭-২৭

তারপর ঐ দশম স্কন্ধে অসুরঘাতী কৃষ্ণের অশেষ কর্ম—শিশুকালে পূতনার প্রাণের সঙ্গে স্তন্যপান, শকটভঞ্জন আর তৃণাবর্তের শিলায় নিষ্পেষণ, বক ও বৎসাসুরের নিধন, অঘাসুর বধ, ব্রহ্মা কর্তৃক গোবৎস ও গোপবালকদের অপহরণ, সখার সঙ্গে ধেনুকাসুর ও প্রলম্বাসুরের নিধন, দাবাগ্নি থেকে গোপদের পরিত্রাণ,

মহানাগ কালিয়সর্পের দমন, নন্দমোক্ষণ, কন্যাদের কাত্যায়নী ব্রতের অনুষ্ঠান, যজ্ঞে দীক্ষিত ব্রাহ্মণদের পত্নীদের প্রতি অনুগ্রহ আর বিপ্রগণের অনুতাপ বর্ণনা করেছি। তারপর গোবর্ধনপর্বত ধারণ, ইন্দ্র আর সুরভি কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের পূজা ও অভিষেক, রাত্রে গোপস্ত্রীদের সঙ্গে রাসক্রীড়া, দুর্বৃত্ত শংখচূড় ও অরিষ্ট-কেশীর নিধন, অক্রুরাগমন, রাম-কৃষ্ণের মথুরায় প্রস্থান, ব্রজাঙ্গনাদের বিলাপ, মথুরাদর্শন, গজ, মুষ্টিক, চাণূর ও কংসাদির বধ, সান্দীপনি গুরুর মৃতপুত্রের পুনরানয়ন প্রভৃতি বর্ণিত হয়েছে। ২৮-৩৪

দ্বিজগণ, মথুরায় বাসকালে শ্রীহরি রাম ও উদ্ধবের সঙ্গে যদুবংশীয়দের যে যে প্রিয় কাজ করেছিলেন, তা হল বারংবার জরাসন্ধের সৈন্যদের বধ, যবনরাজবধ, দ্বারকাপুরীতে বাস ও স্বর্গ থেকে পারিজাত ও সুধর্মা নামে দেবসভা আনয়ন। শত্রুদের মর্দন করে রুক্মিণী হরণ, যুদ্ধে বাণপক্ষীয় শিবের পরাজয়, বাণ-বাহুচ্ছেদ, প্রাগ্‌জ্যোতিষপতিকে হত্যা করে তাঁর কন্যাহরণ, চৈদ্য, পৌণ্ড্রক, শাল্ব ও দুর্মতি দন্তবক্র, শম্বর, দ্বিবিদ, পীঠ, মুর ও পঞ্চজনাদির বিক্রম ও নিধন, বারাণসীপুরী দাহ এবং পাণ্ডবদের নিমিত্ত করে পৃথিবীর ভারহরণ প্রভৃতি বর্ণিত হয়েছে। তারপর একাদশ স্কন্ধে বিপ্রশাপচ্ছলে নিজের কুলের সংহার, উদ্ধব ও বাসুদেবের কথোপকথনে যে আত্মজ্ঞানের বর্ণনা ও ধর্ম-নির্ণয় করা হয়েছে তা এবং আত্মযোগ প্রভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মর্ত্যলীলা পরিত্যাগ বর্ণনা করেছি। তারপর এই দ্বাদশ স্কন্ধে যুগলক্ষণ, কলিতে মানুষদের মতিভ্রম, চতুর্বিধ প্রলয়, ত্রিবিধ উৎপত্তি, রাজা পরীক্ষিতের দেহত্যাগ, বেদশাখা-প্রণয়ন, মার্কণ্ডেয় সৎকথা, মহাপুরুষ-অবয়ব-বিন্যাস ও জগদাত্মা সূর্যের দেবব্যূহ কীর্তন করেছি। ৩৫-৪৪

দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ, আপনারা আমাকে যা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, সে সমস্তই আপনাদের কাছে ব্যক্ত করলাম। এখানে ঈশ্বরের লীলা-অবতার ও কর্ম কীর্তন করেছি। পতিত, স্খলিত, পীড়িত আর ক্ষুধার্ত হয়েও যদি কেউ উচ্চস্বরে 'হরয়ে নমঃ' এই শব্দ উচ্চারণ করে, তাহলে সে সর্বপাপ থেকে মুক্ত হয়ে থাকে। যে ব্যক্তি ভগবানের প্রভাব শোনেন আর নামকর্মাদি কীর্তন করেন, ভগবান অনন্ত তাঁর চিত্তে প্রবিষ্ট হয়ে, সূর্য যেমন অন্ধকার ও প্রবল বায়ু যেমন মেঘসমূহকে দূর করে, সেভাবে তাঁর অশেষ দুঃখ বিনাশ করে থাকেন। যে কথাতে ভগবান অধোক্ষজের প্রসঙ্গ নেই, সে সকল কথা অসৎ ও মিথ্যা, আর যাতে ভগবানের গুণকীর্তন আছে তাই সত্য, তাই মঙ্গল আর পুণ্যজনক। যে বাক্যে শ্রীকৃষ্ণের যশোগাথা বারবার গীত হয় তাই রমণীয় ও চিরনূতন, তাই মহোৎসব, তাই মানুষদের শোকসাগর শোষণে সমর্থ। জগতের যে সকল বাক্য শ্রীহরির যশোবিস্তার করে না, অথচ নানা বিচিত্র শব্দে গ্রথিত, তা কাকতুল্য নরের প্রীতিস্থান, হংসতুল্য জ্ঞানীরা তা সেবন করেন না। যে বাক্যে ভগবানের কীর্তন করা হয়, তাতেই নির্মলচিত্ত সাধুরা আসক্ত হয়ে থাকেন। বর্ণনীয় বিষয় পরিস্ফুট করা অনাবশ্যক হলেও যে বাক্যের প্রতিশ্লোকে ভগবান অনন্তের যশঃপ্রকাশক নামসকল বিদ্যমান থাকে, সেই বাক্যের প্রয়োগই লোকের পাপনাশক। সাধুরা সেই বাক্য শোনেন, গান ও কীর্তন করে থাকেন। ৪৫-৫১

ব্রহ্মপ্রকাশক সম্যক নির্মল জ্ঞানও অচ্যুত ভক্তিবর্জিত হলে বা অনুষ্ঠানকালে অর্পিত না হলে শোভা পায় না। বর্ণাশ্রমাচার, তপস্যা ও বেদ অধ্যয়নে যে মহান পরিশ্রম হয়, সে কেবল যশোযুক্ত সম্পদেই চরিতার্থ হয়ে থাকে। আর শ্রীহরির গুণানুবাদ শোনা আর কীর্তনাদি দ্বারা ভগবান শ্রীধরের চরণকমল চিত্তে অম্লান হয়ে থাকে। শ্রীকৃষ্ণের পদারবিন্দ যে বিস্মৃত না হয় তার অশুভের অবসান ঘটে;

কল্যাণ বৃদ্ধি পায়, সত্ত্বশুদ্ধি, পরমাত্মভক্তি আর বিজ্ঞান ও বৈরাগ্য সম্পন্ন জ্ঞান বিস্তৃত হয়ে থাকে। দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ, আপনারা অখিলের আত্মভূত সর্বউপাস্য ঈশ্বর নারায়ণ দেবকে অন্তঃকরণে স্থাপিত করে নিরন্তর ভজনা করে থাকেন, সেইজন্য আপনারা পরম সৌভাগ্যশালী। আমারও আপনাদের দ্বারা পরমাত্মতত্ত্ব স্মৃতিপথে এল ; তা রাজা পরীক্ষিতের প্রায়োপবেশনের সময়ে মহর্ষি শুকদেবের মুখ থেকে আমি পূর্বে শুনেছিলাম। ৫২-৫৬

বিপ্রগণ, যিনি সকল অমঙ্গল বিনাশকারী ও যাঁর বিপুল কর্ম কীর্তনীয়, সেই ভগবানের মাহাত্ম্য প্রকাশক এই পুরাণ আমি আপনাদের কাছে বর্ণনা করলাম। যে ব্যক্তি এক প্রহরকাল বা কিছুক্ষণও অনন্যমনা হয়ে তা শোনেন, আর যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাবান হয়ে এই গ্রন্থের এক শ্লোক বা অর্ধেক শ্লোক, এক পাদ বা পাদার্ধ মাত্রও শোনেন, তাঁদের আত্মা পবিত্র হয়ে থাকে। দ্বাদশীতে বা একাদশীতে এই পাঠ শুনলে আয়ু বৃদ্ধি হয়। উপবাস করে যত্নসহকারে পাঠ করলে সর্বপাপ থেকে মুক্তিলাভ হয়। পুষ্করতীর্থে, মথুরায় বা দ্বারকায় উপবাস করে সযত্নে এই সংহিতা পাঠ করলে ভয় থেকে মুক্ত হওয়া যায়। যিনি এই সংহিতা বলেন, তাঁর কাছে শুনে দেবতা, মুনি, সিদ্ধ, পিতৃগণ, মানুষ ও রাজারা তাঁর কামনা পূর্ণ করেন। ব্রাহ্মণ এ অধ্যয়ন করলে ঋক্‌, যজুঃ ও সামবেদপাঠের ফল লাভ করেন। মধুকুল্যা, দুগ্ধকুল্যা ও ঘৃতকুল্যা দানের যে ফল, যত্নবান হয়ে এই পুরাণ-সংহিতা অধ্যয়ন করলেও সেই ফল পাওয়া যায়, আর এ গ্রন্থ পাঠ করলে মানুষ ভগবানের পরমপদও লাভ করে থাকে। ৫৭-৬৩

ব্রাহ্মণ অধ্যয়ন করলে জ্ঞান, ক্ষত্রিয় অধ্যয়ন করলে সাগরবেষ্টিতা পৃথিবী, বৈশ্য নিধিপতিত্ব লাভ করেন এবং শূদ্র পাপমুক্ত হয়ে থাকেন। কলি-পাপনাশক অখিলেশ্বর শ্রীহরির নাম অন্য শাস্ত্রে প্রতিপদে উচ্চারিত হয় নি, কিন্তু এই পুরাণ-সংহিতাতে প্রতিকথা প্রসঙ্গে, প্রতিপদে অশেষমূর্তি ভগবানের নাম বিশেষরূপে গ্রথিত হয়েছে। স্বর্গপতি ব্রহ্মা, ইন্দ্র, শংকর প্রভৃতি দেবতাগণ যাঁর স্তোত্র সম্যক্‌রূপে কীর্তন করতে অক্ষম, সেই অজ, অনন্ত, অচ্যুত ও জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কারী শক্তিশালী নারায়ণকে আমি নমস্কার করি। প্রকৃতি, পুরুষ, মহৎ, অহংকার ও পঞ্চতন্মাত্র এই উদ্দীপ্ত নবশক্তি দ্বারা নিজ আত্মায় রচিত স্থাবর-জঙ্গম যাঁর আবাস, যিনি মাত্র উপলব্ধিস্বরূপ আমি সেই সনাতন নারায়ণকে প্রণাম করি। নিজ আনন্দে চিত্ত পূর্ণ বলে অন্য বস্তুতে যাঁর রতি নেই, তবুও ভগবান নারায়ণের মনোহর লীলা যাঁর চিত্তকে আকৃষ্ট করেছে, যিনি এই পরমার্থ প্রকাশক পুরাণ-সংহিতা ব্যক্ত করেছেন সেই অখিল পাপনাশক ব্যাসপুত্র ভগবান শুকদেবকে প্রণাম করি। ৬৪-৬৮

ত্রয়োদশ অধ্যায়

পুরাণসমূহের শ্লোকসংখ্যা নির্ধারণ

সূত বললেন; ব্রহ্মা, বরুণ, ইন্দ্র, মরুৎ, রুদ্র প্রভৃতি দেবতারা দিব্য স্তোত্রসমূহ দ্বারা যাঁর স্তব করেন, সামবেদীয় শিক্ষা, কল্প প্রভৃতি অঙ্গ, পদক্রম ও উপনিষদের সঙ্গে বেদবাক্যে যাঁর স্বরূপ গান করে থাকেন, ধ্যানাবস্থায় তদ্গতচিত্ত হয়ে যোগীরা

যাঁকে দর্শন করেন এবং দেবাসুরেরা যাঁর অন্ত জানতে পারেন না সেই দেবদেবকে প্রণাম করি। সমুদ্রমন্থনের সময়ে নিজ পিঠে গুরুভার মন্দরপর্বতের ভ্রামণে পাষাণময় অগ্রভাগ দ্বারা কণ্ডূয়ন হেতু নিদ্রাসুখে নিমগ্ন কূর্মাকৃতি সেই ভগবানের দীর্ঘ নিঃশ্বাস-বায়ু তোমাদের পালন করুক। ঐ নিঃশ্বাস-বায়ুর প্রভাবে সমুদ্রে জলস্রোতের আজও বিরাম নেই। ১-২

মুনিগণ, এখন পুরাণসংখ্যা বলছি এবং এই মহাপুরাণ গ্রন্থ শ্রীমদ্‌ভাগবত গ্রন্থের বিষয়, প্রয়োজন, দান, দান-মাহাত্ম্য এবং পাঠাদি মাহাত্ম্য আপনারা শুনুন। ব্রহ্মপুরাণে দশ হাজার, পদ্মপুরাণে পঞ্চান্ন হাজার, বিষ্ণুপুরাণে তেইশ হাজার, শিবপুরাণে চব্বিশ হাজার, শ্রীমদ্‌ভাগবতে আঠারো হাজার, নারদপুরাণে পঁচিশ হাজার, মার্কণ্ডেয়পুরাণে নয় হাজার, অগ্নিপুরাণে পাঁচ হাজার চারশ, ভবিষ্য পুরাণে চৌদ্দ হাজার পাঁচশ, ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে আঠারো হাজার, লিঙ্গপুরাণে এগারো হাজার, বরাহপুরাণে চব্বিশ হাজার, স্কন্দপুরাণে একাশি হাজার একশ এক, বামনপুরাণে দশ হাজার, কূর্মপুরাণে সতেরো হাজার, মৎস্যপুরাণে চৌদ্দ হাজার, গরুড়পুরাণে ঊনিশ হাজার এবং ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে বারো হাজার শ্লোক আছে। এইরূপে উক্ত পুরাণগুলিতে মোট চার লক্ষ শ্লোক আছে। তার মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবতে আছে আঠারো হাজার। ৩-৯

পূর্বে ভগবান নারায়ণ করুণাবশে নাভিকমলে অবস্থিত ভব-ভীত ব্রহ্মাকে এই ভাগবতের সম্যক্ উপদেশ দিয়েছিলেন। এর আদিতে, মধ্যে আর অন্তে বৈরাগ্য বর্ণনের সঙ্গে শ্রীহরিলীলাকথামৃতের প্রাচুর্য থাকাতে তা সাধুদের ও দেবতাদের আনন্দকর। সর্ববেদান্ত-সার, আত্মার একত্বরূপ, অদ্বিতীয় বস্তুই এই পুরাণের বিষয় আর কৈবল্যলাভই এর ফল। ভাদ্র মাসের পূর্ণিমাতে সোনার সিংহাসনে স্থাপন করে এই ভাগবত গ্রন্থ যিনি দান করেন, তিনি পরমগতি লাভ করে থাকেন। যে পর্যন্ত সুধাসাগর এই ভাগবত শ্রুতিগোচর না হয়, ততকাল পর্যন্ত সাধুসমাজে অন্যান্য পুরাণ সমাদৃত হয়ে থাকে। ১০-১৪

এই শ্রীমদ্ভাগবত সর্ববেদান্তের সার, যে ব্যক্তি এর রসামৃতে তৃপ্ত, তাঁর আর কখনও অন্য কোন শাস্ত্রে প্রবৃত্তি হয় না। নদীর মধ্যে যেমন গঙ্গা, দেবতার মধ্যে যেমন বিষ্ণু, ভক্তগণের মধ্যে যেমন মহাদেব, সমস্ত ক্ষেত্রের মধ্যে যেমন কাশী, পুরাণের মধ্যে তেমনি এই ভাগবতপুরাণ শ্রেষ্ঠ। এই নির্মল শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ বৈষ্ণবদের অতি প্রিয়। এতে পরমহংস প্রাপ্য নির্মল অদ্বিতীয় পরম জ্ঞান গীত হয়েছে আর জ্ঞান, বৈরাগ্য, ভক্তির সঙ্গে বন্ধনপ্রদ সর্বকর্মের পরিত্যাগ উপদিষ্ট হয়েছে। এ গ্রন্থ ভক্তির সঙ্গে শ্রবণ, অধ্যয়ন ও বিচার করলে লোক মুক্তিলাভ করে। পুরাকালে যিনি এই অতুল জ্ঞানপ্রদীপ ব্রহ্মার কাছে প্রকাশ করেছেন, পরে ব্রহ্ম-স্বরূপে নারদ মুনিকে, নারদরূপে কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে, কৃষ্ণদ্বৈপায়নরূপে যোগীন্দ্র শুকদেবকে, আর শুকদেবরূপে বিষ্ণুভক্ত পরীক্ষিৎকে কৃপা করে উপদেশ দিয়েছেন, সেই শুদ্ধ, নির্মল, শোকরহিত অমৃতময় পরম সত্যকে আমরা ধ্যান করি। যিনি কৃপা করে এই পরমজ্ঞান মুমুক্ষু ব্রহ্মাকে উপদেশ দিয়েছেন, সেই সর্বসাক্ষী ভগবান বাসুদেবকে নমস্কার করি। আর যিনি সর্পদষ্ট বিষ্ণুভক্ত রাজা পরীক্ষিৎকে সংসারতাপ থেকে মুক্ত করেছেন, সেই ব্রহ্মরূপী যোগীন্দ্র মুনি শুকদেবকে নমস্কার করি। হে দেবেশ, হে প্রভু, যাতে জন্মে জন্মে আপনার পাদপদ্মে আমাদের ভক্তি জন্মে; আপনি সেই কৃপা করুন, কারণ আপনিই আমাদের নাথ। যাঁর নাম সংকীর্তনে সর্বপাপ দূর হয় আর যাঁর প্রণামে সর্ব দুঃখ প্রশমিত হয় সেই পরমাত্মা শ্রীহরিকে প্রণাম করি। ১৫-২৩

দ্বিতীয় খণ্ড : পরিশিষ্ট

শ্লোকসংগ্রহের পদ্যানুবাদ

[ভাই মহিমচন্দ্র সেন কৃত 'ধর্মশাস্ত্র-সমন্বয়' গ্রন্থ থেকে গৃহীত]

তমক্ষরং ব্রহ্ম পরং পরেশ-
মব্যক্তমাধ্যাত্মিকযোগগম্যম্ ।
অতীন্দ্রিয়ং সূক্ষ্মমিবাতিদূর-
মনন্তমাদ্যং পরিপূর্ণমীড়ে ॥ ৮।৩।২১

অতীন্দ্রিয় পরমেশ সূক্ষ্ম অতিশয় ।
এ হেতু যাঁহাকে সদা দূরে মনে হয় ।
সকলের আদিভূত অনন্ত অক্ষর ।
পূর্ণ পরব্রহ্ম সেই অব্যক্ত ঈশ্বর ।
আধ্যাত্মিক যোগে শুধু লাভ হয় যাঁর ।
নিয়ত করিব স্তব আমরা তাঁহার ॥

*

অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ ।
সাধুভির্গ্রস্তহৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিয়ঃ ॥ ৯।৪।৬৩

পরাধীন জন হেন, ওহে দ্বিজবর ।
ভকত-অধীন, মোরে জান নিরন্তর ॥
সাধুরা হৃদয় মম করে অধিকার ।
ভকত আমার প্রিয় আমি প্রিয় তার ॥

*

যে দারাগারপুত্রাপ্তান্ প্রাণান্ বিত্তমিমং পরম্ ।
হিত্বা মাং শরণং যাতাঃ কথং তাংস্ত্যক্তুমুৎসহে ॥ ৯।৪।৬৫

দারা, পুত্র, গৃহ, বিত্ত, আত্মীয় স্বজন ।
ইহলোক পরলোক (সুমিষ্ট) জীবন ।
ত্যাগ করি' যারা মোর লয়েছে শরণ ।
কিরূপে তাজিব হেন অনুগত জন ?

*

ময়ি নির্বন্ধহৃদয়াঃ সাধবঃ সমদর্শনাঃ ।
বশে কুর্বন্তি মাং ভক্ত্যা সৎস্ত্রিয়ঃ সৎপতিং যথা ॥ ৯।৪।৬৬

এ সংসারে সমদর্শী সাধু যারা হয় ।
নিবন্ধ সতত রাখি' আমাতে হৃদয় ॥
সতী যথা সৎপতি প্রেমে বশ করে ।
সেরূপ ভকতি যোগে বশে রাখে মোরে ॥

*

সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম্ ।
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি ॥ ৯।৪।৬৮

সাধুগণে জানিবেক আমার হৃদয় ।
সাধুর হৃদয় আমি না কর সংশয় ॥
আমা বিনা অন্য কিছু না জানে তাহারা ।
আমিও জানি না কিছু সাধুগণ ছাড়া ॥

*

সত্যব্রতং সত্যপরং ত্রিসত্যং
সত্যস্য যোনিং নিহিতঞ্চ সত্যে ।
সত্যস্য সত্যমৃতসত্যনেত্রং
সত্যাত্মকং ত্বাং শরণং প্রপন্নাঃ ॥ ১০।২।২৬

সত্যব্রত, সত্য শ্রেষ্ঠ, সত্য তিন কালে ।
সৃজিলে জগৎ তুমি একাকী বিরলে ॥
অন্তর্যামী রূপে তুমি আছ সব ভূতে ।
মূলাধার হ'য়ে স্থিতি করিছ তাহাতে ॥
নেতা তুমি সত্য বাক্যে, সম দরশনে ।
লইনু শরণ মোরা তোমার চরণে ॥

*

স্বয়ং সমুত্তীর্য সুদুস্তরং দ্যুমন্
ভবার্ণবং ভীমমভদ্রসৌহৃদাঃ ।
ভবৎপদাম্ভোরুহনাবমত্র তে
নিধায় যাতাঃ সদনুগ্রহো ভবান্ ॥ ১০।২।৩১

স্বপ্রকাশ, পাপীজন বন্ধু সাধুগণ !
তোমার চরণ-তরী করি' আরোহণ,
পার হ'য়ে ভবার্ণব তরঙ্গ ভীষণ,
রাখিয়া গেলেন উহা পাপীর কারণ ॥

ন নামরূপে গুণকর্মজন্মকর্মভি-
র্নিরূপিতব্যে তব তস্য সাক্ষিণঃ ।
মনোবচোভ্যামনুমেয়বর্ত্মনো
দেব ক্রিয়ায়াং প্রতিযন্ত্যথাপি হি ॥ ১০।২।৩৬

দিয়া নাম, রূপ, গুণ, করম, জনন ।
নাহি হয়, সাক্ষীরূপী, তব নিরূপণ ॥
অনুমেয় মাত্র কার্য-প্রণালী তোমার—
মনোবাক্যে ; তুমি যে অতীত সবাকার ॥
উপাসনা যোগে শুধু হয় দরশন ।
(সাধিয়া তোমার কাজ সবে ধন্য হন) ॥

কায়েন বাচা মনসেন্দ্রিয়ৈর্বা
বুদ্ধ্যাত্মনা বানুসৃতস্বভাবাৎ ।

করোতি যদ্‌যৎ সকলং পরস্মৈ
নারায়ণায়েতি সমর্পয়েত্তৎ ॥ ১১।২।৩৬

দেহ, মন, বাক্য, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় সকল।
আপনার আত্মা আর যে আছে সম্বল।
স্বভাবতঃ ব্যবহার করি' সাধু জন।
জীবনে যে সব কাজ করে সম্পাদন ॥
সবার আশ্রয় যিনি, নাম নারায়ণ।
করেন চরণে তাঁর সকল অর্পণ ॥

*

এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্যা
জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়-
ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ ॥ ১১।২।৪০

এরূপে সাধক, নাম ইষ্ট দেবতার ;
কীর্তন করিয়া চিত্ত বিগলিত তাঁর ॥
প্রেমভরে, তারস্বরে, হাসেন কাঁদেন।
জীবন সখায় পুনঃ নিয়ত ডাকেন ॥
অলৌকিক বাক্য সব করি' উচ্চারণ।
পুনঃ পুনঃ যশ তাঁর করেন কীর্তন ॥
ভাবেতে বিবশ তাঁর হয় দেহ মন।
বাহিরের জ্ঞান আর না থাকে তখন ॥
ভকত এরূপে হ'য়ে উন্মাদের প্রায়।
ভাবাবেশে মত্ত হ'য়ে নাচে আর গায় ॥

*

ইষ্টং দত্তং তপো জপং বৃত্তং যচ্চাত্মনঃ প্রিয়ম্।
দারান্ সুতান্ গৃহান্ প্রাণান্ পরস্মৈ চ নিবেদনম্ ॥ ১১।৩।২৮

তপ, জপ, দান, বৃত্ত, ইষ্ট, যাহা প্রিয়।
অর্পিবে ঈশ্বরে, গৃহ, সুত, স্ত্রী, আত্মীয় ॥

*

পরস্পরানুকথনং পাবনং ভগবদ্যশঃ।
মিথোরতির্মিথস্তুষ্টির্নিবৃত্তির্মিথ আত্মনঃ ॥ ১১।৩।৩০

হরিকথা সুধা দান কর পরস্পরে।
আত্মার সন্তোষ, শান্তি, অনুরাগ তরে।

*

ক্বচিদ্রুদন্ত্যচ্যুতচিন্তয়া ক্বচি-
দ্ধসন্তি নন্দন্তি বদন্ত্যলৌকিকাঃ।
নৃত্যন্তি গায়ন্ত্যনুশীলয়ন্ত্যজং
ভবন্তি তুষ্ণীং পরমেত্য নির্বৃতাঃ ॥ ১১।৩।৩২

অবিনাশী ঈশ্বরের করিয়া চিন্তন।
রোদন করেন কভু হাস্য সাধুগণ॥
আনন্দিত হন কভু বলেন বচন।
যেরূপ না কহে কথা জন-সাধারণ॥
নৃত্য, গীত করে, হরিলীলা বার বার,
আলোচনা করে, কভু হৃদয়ে তাহার॥
হরিপদ লাভ করি' আনন্দে অপার।
তূষ্ণীম্ভাব প্রাপ্ত হয়, থাকি' নির্বিকার

*

শশ্বৎ পরার্থসর্বেহঃ পরার্থৈকান্তসম্ভবঃ।
সাধুঃ শিক্ষেত ভূভৃত্তো নগশিষ্যঃ পরাত্মতাম্॥ ১১।৭।৩৮

অপরের হিত তরে সতত যতন।
অপরের তরে শুধু জীবন ধারণ।
হেন পরাত্মতা শিখে ভকত যে জন।
শিষ্যত্ব করিয়া নগ-তরুর গ্রহণ॥

*

মুনিঃ প্রসন্নগম্ভীরো দুর্বিগাহ্যো দুরত্যয়ঃ।
অনন্তপারো হ্যক্ষোভ্যাস্তিমিতোদ ইবার্ণবঃ॥ ১১।৮।৫

সাগর সমান যোগী গম্ভীর অক্ষয়।
প্রশান্ত দুরবগাহ্য অক্ষুভিত হয়॥

*

সমৃদ্ধকামো হীনো বা নারায়ণপরো মুনিঃ।
নোৎসর্পেত ন শুষ্যেত সরিদ্ভিরিব সাগরঃ॥ ১১।৮।৬

নদীজলে হ্রাস বৃদ্ধি না পায় সাগর।
সেইরূপ ভগবত ভকত অন্তর।
কাম্যবস্তু লাভ করি' নহে হরষিত।
বঞ্চিত হইলে দুঃখ না হয় কিঞ্চিত॥

*

অণুভ্যশ্চ মহদ্ভ্যশ্চ শাস্ত্রেভ্যঃ কুশলো নরঃ॥
সর্বতঃ সারমাদদ্যাৎ পুষ্পেভ্য ইব ষট্পদঃ॥ ১১।৮।১০

ভৃঙ্গ যথা ফুলে ফুলে করিয়া গমন।
নিয়ত ফুলের মধু করে আহরণ।
ধীরজন সেইরূপ করিবে গ্রহণ।
সকল শাস্ত্রের সার করিয়া শ্রবণ॥

*

সায়ন্তনং শ্বস্তনং বা ন সংগৃহ্নীত ভিক্ষিতম্।
পাণিপাত্রোদরামত্রো মক্ষিকেব ন সংগ্রহী॥ ১১।৮।১১

প্রকৃত ভকত জন না রাখে সঞ্চয়।
পরাহ্নে বা অপরাহ্নে কি খাব ভাবিয়া ॥
সঞ্চয় না করে যথা মক্ষিকা সকল।
সেরূপ ভিক্ষার ভাণ্ডে না রাখে সম্বল ॥
করমাত্র পানপাত্র সঙ্গে সদা তাঁর।
উদর তাঁহার ভাণ্ড ভিক্ষা করিবার ॥

*

সংসারকূপে পতিতং বিষয়ৈর্মুষিতেক্ষণম্।
গ্রস্তং কালাহিনাত্মানং কোহন্যস্ত্রাতুমধীশ্বরঃ ॥ ১১।৮।৪১

বিষয়ে আসক্ত হ'য়ে অন্ধ যেইজন।
গভীর সংসার-কূপে হয়েছে পতন।
সমুদ্যত কালসর্প করিতে দংশন।
পরমেশ বিনা তারে কে করে রক্ষণ ॥

*

তাবৎ স মোদতে স্বর্গে যাবৎ পুণ্যং সমাপ্যতে।
ক্ষীণপুণ্যঃ পতত্যর্বাগনিচ্ছন্ কালচালিতঃ ॥ ১১।১০।২৬

যাবত না মানবের পুণ্য হয় ক্ষয়।
তাবত সে স্বরগের সুখ প্রাপ্ত হয় ॥
পুণ্য ক্ষয় হ'লে তার অবশ্য পতন।
অনিচ্ছায় কাল বশে না হয় খণ্ডন ॥

*

কৃপালুরকৃতদ্রোহস্তিতিক্ষুঃ সর্বদেহিনাম্।
সত্যসারোহনবদ্যাত্মা সমঃ সর্বোপকারকঃ ॥ ১১।১১।২৯

অদ্রোহী, কৃপালু, হিতকারী, ক্ষমাবান্।
সত্যনিষ্ঠ, সুখে দুখে থাকেন সমান ॥
অসূয়াবিহীন সদা সাধু যিনি হন।
সংক্ষেপে শুনহে এবে সাধুর লক্ষণ ॥

*

অপ্রমত্তো গভীরাত্মা ধৃতিমান্ জিতষড়্গুণঃ।
অমানী মানদঃ কল্যো মৈত্রঃ কারুণিকঃ কবিঃ ॥ ১১।১১।৩১

অপ্রমত্ত, গম্ভীরাত্মা আর ধৃতিমান্।
অমানী, মানদ মৈত্র, দক্ষ, জ্ঞানবান্ ॥
ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শোক, মোহ, জরামৃত্যু ভয়।
বশীভূত সদা তাঁর, সাধু কৃপাময় ॥

*

কথং বিনা রোমহর্ষং দ্রবতা চেতসা বিনা।
বিনানন্দাশ্রুকলয়া শুধ্যেদ্ভক্ত্যা বিনাশয়ঃ ॥ ১১।১৪।২৩

হৃদয়ে না হয় যদি ভকতি সঞ্চার
না দেখে ভকত দেহ রোমাঞ্চিত তার।
নয়নে না বহে বারি চিত্ত আর্দ্র নয়,
আনন্দ না পায়, মন শুদ্ধ নাহি হয়॥

*

যদৃচ্ছয়োপপন্নান্নমদ্যাচ্ছ্রেষ্ঠমুতাপরম্।
তথা বাসস্তথা শয্যাং প্রাপ্তং প্রাপ্তং ভজেন্মুনিঃ॥ ১১।১৮।৩৫

আপনি আসে, যে অন্ন সাধক সম্মুখে।
ভালমন্দ না বিচারি খাইবেক সুখে॥
সেরূপ যে পরিচ্ছদ শয্যা লাভ হয়।
গ্রহণ করিবে থাকি' প্রসন্ন হৃদয়॥

*

তাপত্রয়েণাভিহতস্য ঘোরে
সন্তপ্যমানস্য ভবাধ্বনীশ।
পশ্যামি নান্যচ্ছরণং তবাঙ্ঘ্রি-
দ্বন্দ্বাতপত্রাদমৃতাভিবর্ষাৎ॥ ১১।১৯।৯

পরমেশ! ভয়ঙ্কর পথে সংসারের।
ত্রিতাপ অনলে দগ্ধ মানবগণের
অপর আশ্রয় আর কিছুই দেখি না।
অমৃতবর্ষিণী তব পদ-ছায়া বিনা॥

*

ভিদ্যন্তে ভ্রাতরো দারাঃ পিতরঃ সুহৃদস্তথা।
একাস্নিগ্ধাঃ কাকিণিনা সদ্যঃ সর্বেঽরয়ঃ কৃতাঃ॥ ১১।২৩।২০

অর্থ হয় মানবের অনর্থ কারণ।
পাঁচ গণ্ডা কৌড়ী করে বিচ্ছেদ সাধন॥
ভ্রাতা, দারা, পিতা, মাতা, আত্মীয়, স্বজন
অতিপ্রিয়, একপ্রাণ, আছে যত জন॥
তাঁহাদের মাঝে অর্থ বিবাদ ঘটায়।
সুহৃদ বান্ধব যত বৈরি হ'য়ে যায়॥

*

নূনং মে ভগবাংস্তুষ্টঃ সর্বদেবময়ো হরিঃ।
যেন নীতো দশামেতাং নির্বেদশ্চাত্মনঃ প্লবঃ॥ ১১।২৩।২৮

সর্বদেবময় হরি করুণা নিধান।
প্রসন্ন আমার প্রতি, নাহি সন্দিহান॥
যেহেতু ঈদৃশী দশা আমার ঘটেছে।
আত্মার উদ্ধার-ভেলা নির্বেদ এসেছে॥

সোঽহং কালাবশেষেণ শোষয়িষ্যেঽঙ্গমাত্মনঃ।
অপ্রমত্তোঽখিলস্বার্থে যদি স্যাৎ সিদ্ধ আত্মনি॥ ১১।২৩।২৯

মরণের যে সময় আছে অবশেষ।
সত্বর না হ'লে মম সেই কাল শেষ।
আত্মাতে সন্তুষ্ট থাকি' অপ্রমত্ত মনে।
সকল ধরম আমি সাধিব যতনে।
তপস্যার ব্রত নিত্য করিব পালন।
যাবত না হয় এই দেহের পতন॥

*

সঙ্কীর্ত্যমানো ভগবাননন্তঃ
শ্রুতানুভাবো ব্যসনং হি পুংসাম্।
প্রবিশ্য চিত্তং বিধুনোত্যশেষং
যথা তমোঽর্কোঽভ্রমিবাতিবাতঃ॥ ১২।১২।৪৭

রবির প্রকাশ যথা তম নাশ করে।
ঝঞ্ঝাবাতে মেঘ যথা দূরে যায় সরে।
অনন্ত ঈশ্বর কৃপা জানিবে এমন।
মহিমা শ্রবণ তাঁর নাম সঙ্কীর্তন;
করিতে করিতে তিনি প্রবেশি' হৃদয়ে।
অশেষ মানব দুঃখ দেন বিনাশিয়ে॥

*

তদেব রম্যং রুচিরং নবং নবং
তদেব শশ্বন্মনসো মহোৎসবম্।
তদেব শোকার্ণবশোষণং নৃণাং
যদুত্তমশ্লোকযশোঽনুগীয়তে॥ ১২।১২।৪৯

পুণ্যময় মহেশের মহিমা কীর্তন।
নিত্যকাল করে মনে আনন্দ বর্ধন।
নবীন নবীন, সদা রুচির রুচির।
শুকায় শোকের সিন্ধু বিতত গভীর॥

[শ্রীদুর্গাদাস লাহিড়ী প্রণীত 'পৃথিবীর ইতিহাস' (১ম খণ্ড) থেকে গৃহীত]
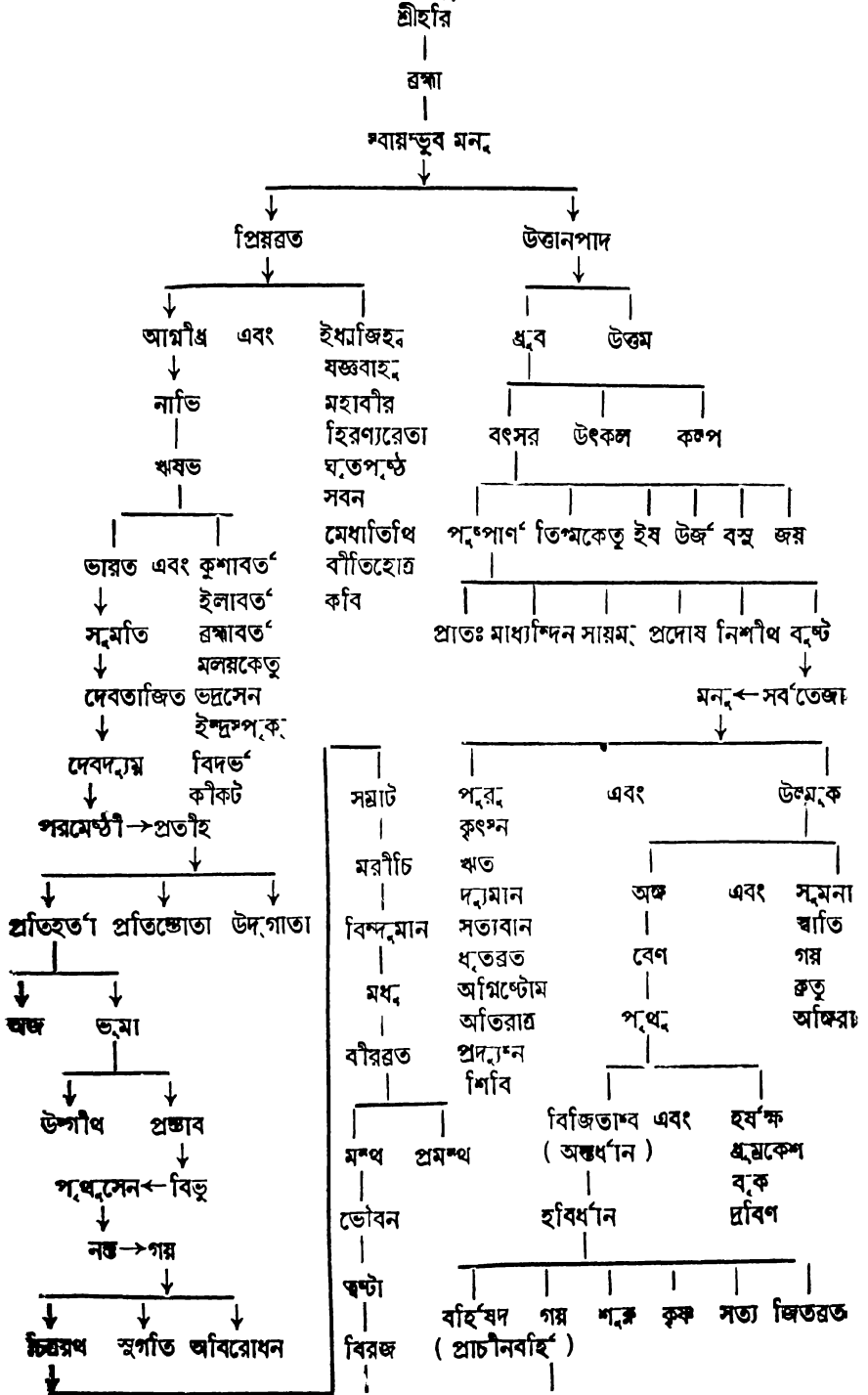
পরিচিতিপঞ্জী

টীকা, শব্দার্থ ও প্রাচীন স্থানের বর্তমান পরিচয়*

অক্ষৌহিণী—২১৮৭০ রথ; ২১৮৭০ গজ, ৬৫৬১০ অশ্ব ও ১০৯৩৫০ পদাতিক সেনাবিশিষ্ট সেনাবাহিনী।

অঘ—পাপ।

অঙ্গন্যাস—দেহের বিভিন্ন অঙ্গে বিভিন্ন মন্ত্রের সংস্থাপন।

অজগর-ব্রত—অজগরের মত জীবনধারণের জন্য অঙ্গচেষ্টা না করার ব্রত।

অণিমা-লঘিমাদি—অণিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি, প্রকাম্য, মহিমা, ঈশিত্ব, বশিত্ব এবং কামাবসায়িত্ব—এই অষ্টসিদ্ধি।

অধ্বর্যু—বৈদিক যজ্ঞের চারি পুরোহিতের মধ্যে একজন, যিনি যজ্ঞস্থান মাপিয়া বেদী তৈয়ারি করেন, যজ্ঞপাত্রগুলি ঠিক করেন, যজ্ঞাগ্নি জ্বালেন, জল, কাঠ এবং বলির পশু নিয়া আসেন, বলি দেন এবং এইসব কাজে যজুর্বেদীয় মন্ত্র উচ্চারণ করেন।

অনঘ—নিষ্পাপ।

অনপেক্ষ—উদাসীন।

অপান—দেহস্থ পঞ্চবায়ুর একতম, অধোবায়ু; প্রশ্বাস-বায়ু।

অপ্সরা—অন্তরিক্ষবাসিনী গন্ধর্বপত্নী, যাঁহারা রূপ পরিবর্তন ও অমানুষিক কাজ করিতে পারেন।

অবন্তী দেশ—নর্মদা নদীর উত্তরতীরস্থ দেশ, মালবের পশ্চিমাংশ।

অবভৃথ—প্রধান যজ্ঞের সমাপ্তি বা তাহার পর কৃত স্নান।

অভিচার—দুষ্ট উদ্দেশ্যমূলক তান্ত্রিক প্রক্রিয়া।

অভিমান- 'আমিই এই' বা 'আমিই প্রধান' এইরূপ ভাবনা।

অর্বুদ দেশ—আরাবল্লী পর্বত সন্নিহিত স্থান।

অলকনন্দা—হিমালয়ে ভাগীরথীর একটি উপনদী।

অলাতচক্র—ঘূর্ণমান জ্বলন্ত কাষ্ঠখণ্ড।

অষ্টনিধি—যক্ষরাজ কুবেরের ভাণ্ডারের আটটি মহামূল্য দ্রব্য (মতান্তরে নয়টি—মহাপদ্ম পদ্ম শঙ্খ মকর কচ্ছপ মুকুন্দ কুন্দ নীল ও খর্ব)।

অষ্টাঙ্গযোগ—যম নিয়ম আসন প্রাণায়াম প্রত্যাহার ধারণা ধ্যান ও সমাধি—এই আট প্রক্রিয়া বিশিষ্ট যোগ।

অস্তেয়—পরদ্রব্য অপহরণ না করা।

অহংকার—সৃষ্টির পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের একটি (নিজেকে পৃথক বলিয়া মনে করা)।

অহৈতুকী ভক্তি—উদ্দেশ্য বা কামনা-বিহীনা ভক্তি।

আঙ্গিরসগণ—বৃহস্পতির পিতা মহর্ষি অঙ্গিরার বংশধরগণ।

আচ্ছিন্ন—ছিঁড়িয়া আলাদা করা হইয়াছে এমন।

---

* ৺ গুণদাচরণ সেন সম্পাদিত শ্রীমদ্‌ভাগবত (সংক্ষিপ্ত আখ্যানভাগ) গ্রন্থের পরিশিষ্ট থেকে সংগৃহীত।

আত্মানাত্মবিবেক—আত্মা কি এবং কি নয় এই বিবেচনা।
আত্মারাম—অধ্যাত্মজ্ঞান লাভের জন্য সচেষ্ট ; আত্মাই যাহার অবলম্বন।
আনর্তদেশ—সৌরাষ্ট্র, বর্তমান কাঠিয়াবাড়।
আপ্তকাম—বাসনাকামনামুক্ত ; অভীষ্টলাভ করিয়াছে এমন।
আস্তিক্য—ঈশ্বরে বিশ্বাস।
ইন্দ্রপ্রস্থ—দিল্লীতে অবস্থিত।
ইন্দ্রসেন—ইন্দ্রের প্রভু, ইন্দ্রের রাজ্যবিজেতা, ইন্দ্রের দর্পহারী।
উত্তমঃশ্লোক—(তমোগুণবিহীন ব্যক্তিগণ কর্তৃক কীর্তিত, কিংবা, যাঁহার কীর্তি তমঃ অতিক্রম করিয়াছে) ভগবান্।
উপাধি—জাতি রূপ ক্রিয়া সংজ্ঞা—এই চারি বৈশিষ্ট্য (মতান্তরে জাতি-গুণ-ক্রিয়া সদৃচ্ছা-স্বরূপ)।
উপায়ন—উপঢৌকন।
উরুগায়—মহৎ ব্যক্তিগণ কর্তৃক স্তুত।
ঋত্বিক্—যজ্ঞের পুরোহিত (চারি শ্রেণী : হোতা, উদ্‌গাতা, অধ্বর্যু ও ব্রহ্ম)।
ঋষভদেশ—(১) সরস্বতী নদীস্থিত দ্বীপ, (২) পাণ্ড্যদেশীয় পর্বত, (৩) কোশলদেশ।
ঐকাত্ম্য—আত্মার মিলন, একাত্মতা।
ঐলরাজ—ইলার পুত্র পুরূরবা রাজা।
ঔত্তরেয়—উত্তরার পুত্র পরীক্ষিৎ।
কপিধ্বজ—(বানর-আঁকা নিশান যাঁহার) অর্জুন।
কব্য—যজ্ঞে পিতৃগণকে দেয় ঘৃত ('হব্য' দ্রষ্টব্য)।
করূষ—আধুনিক বিহারের শাহাবাদ জেলার অংশ।
কর্ণাটক—মহীশূর।
কর্মবাদী—যাগযজ্ঞ করিলে স্বর্গলাভ হয়, এই মতে বিশ্বাসী।
কলিঙ্গ—বর্তমান দক্ষিণ উড়িষ্যা ও উত্তর অন্ধ্রপ্রদেশ।
কল্প—জন্ম ; সৃষ্টি ; কালের বিভাগবিশেষ, ব্রহ্মার দিন।
কাঞ্চী—বর্তমান তামিলনাড়ুতে।
কাবেরী—দক্ষিণ ভারতের নদীবিশেষ।
কামদুঘা—সকল ইচ্ছা পূরণ করে এমন গাভী।
কালঞ্জর—আধুনিক বুন্দেলখণ্ডে।
কাষ্ঠা—সীমা।
কিন্নর—ঘোড়ার মাথা ও মানুষের দেহ বিশিষ্ট প্রাণী।
কিম্পুরুষ—মানুষের মাথা ও ঘোড়ার দেহ বিশিষ্ট প্রাণী।
কুণ্ডিনপুর—বিদর্ভ দেশের রাজধানী।
কুম্ভক—নিশ্বাস লইয়া আঙুল দিয়া নাক চাপিয়া ধরার পর দমবন্ধ অবস্থা।
কুরু—আধুনিক দিল্লীর সান্নিহিত প্রদেশ।
কুরুক্ষেত্র—বর্তমান থানেশ্বরের দক্ষিণের স্থান।
কুরুজাঙ্গল—কুরুক্ষেত্র।
কুলাচল—সাতটি প্রধান পর্বত, যথা : মহেন্দ্র, মলয়, সহ্য, শুক্তিমান্, ঋক্ষ, পারিযাত্র, বিন্ধ্য (মতান্তরে, হিমালয় সহ আটটি)।
কুশস্থলী—দ্বারকা, আনর্তের রাজধানী।
কূটস্থ—শিখরস্থ ; সকলের ঊর্ধ্বে যিনি।

কৃতমালা—দাক্ষিণাত্যের প্রাচীন নদী বিশেষ।
কৃত্যা—মায়া, ভেল্‌কি ; ঐন্দ্রজালিক নারীমূর্তি।
কৃষ্ণাজিন—কাল লোমবিশিষ্ট চামড়া (বিশেষত হরিণের)।
কেকয়—শতদ্রু ও বিপাশা নদীদ্বয়ের মধ্যবর্তী দেশ।
কৈবল্য-নির্বাণ—পাতঞ্জলমতে পরমাত্মায় আত্মার বিলীন হইবার অবস্থার নাম কৈবল্য, এবং বৌদ্ধমতে জীবের অস্তিত্বের চরম বিলোপের নাম নির্বাণ।
কোঙ্ক—সহ্যাদি ও সাগরের মধ্যবর্তী দেশ, কোঙ্কন।
কৌশারব—মৈত্রেয় মুনি।
কৌশিকী—আধুনিক কোশী নদী (বিহারে)।
খাণ্ডবপ্রস্থ—কুরুক্ষেত্রের দক্ষিণে অবস্থিত বনবিশেষ।
গণ্ডকী—বর্তমান গণ্ডক নদী, (শালগ্রামশিলার প্রাপ্তিস্থান)।
গন্ধর্ব—দেবগণের গায়ক উপদেবতা জাতিবিশেষ।
গাণ্ডীব—অর্জুনের ধনু (ইহা সোম বরুণকে দেন, বরুণ অগ্নিকে দেন, অগ্নি অর্জুনকে দেন)।
গায়ত্রী—'তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ' এই মন্ত্র (ঋগ্বেদ ৩।৬২।১০)।
গান্ধর্ব—একপ্রকার বিবাহ যাহা শুধু নরনারীর পূর্বরাগের ফল।
গিরিব্রজ—আধুনিক রাজগীর (বিহারে)।
গুহ্যক—কুবেরের অনুচর উপদেবতা জাতিবিশেষ।
গোকর্ণ—দক্ষিণভারতের শৈব তীর্থবিশেষ।
গোপুর—নগরের বা মন্দিরের সিংহদ্বার।
গ্রাম্য বিষয়—মৈথুন ব্যাপার।
গ্রাহ—কুমীর হাঙ্গর ইত্যাদি।
চক্রায়ুধ—(সুদর্শন চক্র যাঁহার অস্ত্র) বিষ্ণু।
চতুরঙ্গিণী সেনা—রথ, হস্তী, অশ্ব ও পদাতিক : এই চারি অঙ্গ বিশিষ্ট সেনা।
চতুর্বর্গ—ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ : এই চারি বর্গ বা পুরুষার্থ।
চন্দ্রভাগা দেশ—দক্ষিণভারতে।
চাতুর্মাস্য—আষাঢ়, কার্তিক বা ফাল্গুন মাসে আরম্ভ করিয়া চারিমাস-ব্যাপী যজ্ঞ বা ব্রতানুষ্ঠানবিশেষ।
চারণ—দেবগায়ক জাতিবিশেষ।
চেদি—বৎস ও অবন্তী রাজ্যের মধ্যে নর্মদাতীরস্থ দেশ।
চৈদ্য—চেদি দেশের রাজা শিশুপাল।
জগন্নিবাস—জগতের আশ্রয়স্বরূপ ভগবান্‌।
জীবোপাধি—জাগরণ, স্বপ্ন ও নিদ্রা : এই তিন অবস্থা।
তাম্রপর্ণী—দক্ষিণ-ভারতের মলয় পর্বতে উদ্ভূত নদীবিশেষ।
তুম্বুরু—একপ্রকার বীণা।
তুরীয়—চতুর্থ ; বেদান্তে বর্ণিত আত্মার চতুর্থ অবস্থা, যখন উহা পরব্রহ্মে লীন হয়।
ত্রিকূট—যে পর্বতের উপর রাবণের লংকা স্থাপিত ছিল তাহা।
ত্রিগর্ত—আধুনিক জলন্ধর (পাঞ্জাবে) বা লুধিয়ানা অঞ্চল।
ত্রিগুণজ—(বেদান্তমতে) মায়া হইতে উদ্ভূত।
ত্রিদণ্ড—একত্র বাঁধা তিনটি দণ্ড (সন্ন্যাসীদের ব্যবহার্য)।
ত্রুটিকাল—$\frac{1}{4}$ ক্ষণ বা $\frac{1}{2}$ লব পরিমিত অতি ক্ষুদ্র সময়বিভাগ, $\frac{1}{2}$ সেকেন্ডের সমান।

দক্ষিণ মথুরা — আধুনিক মাদুরাই।
দাক্ষায়ণী—দক্ষের কন্যা সতী।
দামবন্ধ—দড়িতে বাঁধা।
দায়যোগ্য সম্পত্তি—বিভাগযোগ্য সম্পত্তি।
দাশার্হ—যদুবংশীয় (বিশেষত শ্রীকৃষ্ণ), দশার্হের বংশধর।
দিগ্‌গজ—আট দিক রক্ষাকারী আটটি হাতী (ঐরাবত বা ঐরাবণ, পুণ্ডরীক, বামন, কুমুদ, অঞ্জন, পুষ্পদন্ত, সার্বভৌম ও সুপ্রতীক)।
দুন্দুভি—জয়ঢাক।
দুরিত—দুর্গতি, পাপ।
দৃষদ্বতী—অধুনালুপ্ত প্রাচীন নদী যাহা আর্যাবর্তের পূর্বসীমান্ত ছিল।
দেবযাত্রা—শকটে দেবমূর্তি লইয়া যাওয়ার উৎসব, রথযাত্রা।
দ্রবিড়, দ্রাবিড়—দাক্ষিণাত্যের পূর্বাঞ্চল।
দ্বারকা—আধুনিক মধুপুরা (গুজরাটে)।
দ্বৈপায়ন—(দ্বীপে যাঁহার জন্ম) ব্যাসদেব।
নাভি প্রভৃতি ছয়টি—ষট্‌চক্রের ছয়টি স্থান, যথা : পায়ু, উপস্থ, নাভি, হৃদয়, কণ্ঠমূল ও ভ্রূমধ্য।
নিরয়—নরক।
নিরুপাধি স্বরূপ—('উপাধি' দ্রষ্টব্য) নাই এমন সত্তা।
নির্বৃতি—শান্তি ; মোক্ষ ; মুক্তি ; মরণ।
নিষ্কল—অখণ্ড, পূর্ণ।
নৈমিত্তিক প্রলয়—সহস্র চতুর্যুগে ব্রহ্মার এক দিন বা কল্প হয়। কল্পের অবসানে ত্রৈলোক্যের বিনাশকে নৈমিত্তিক প্রলয় বলে। ইহাকে খণ্ডপ্রলয়ও বলা হয়। অন্য তিন প্রকার প্রলয়—নিত্য, প্রাকৃত ও আত্যন্তিক।
নৈমিষারণ্য—আধুনিক নিমসার (উত্তরপ্রদেশে) লখনউ হইতে ৪৫ মাইল।
নৈষ্ঠিকী ভক্তি—চরম ভক্তি, দৃঢ় ভক্তি।
পক্ষ্ম—চোখের পাতার লোম।
পঞ্চাগ্নি—দক্ষিণ, আহবনীয়, গার্হপত্য, সভ্য ও আবসথ্য—এই পঞ্চাগ্নি।
পঞ্চাপ্‌সরস্‌—ঋষি মন্দকর্ণি কর্তৃক সৃষ্ট হ্রদবিশেষ।
পঞ্চাল—গঙ্গা ও যমুনার অন্তর্বর্তী প্রাচীন দেশ।
পম্পা—দণ্ডকারণ্যস্থ হ্রদবিশেষ।
পরমহংস—সকল রিপুজয়ী শ্রেষ্ঠ স্তরের সন্ন্যাসী।
পরমেষ্ঠী—সর্বশ্রেষ্ঠ ; ব্রহ্মা বা বিষ্ণু বা মহেশ্বর।
পরা ভক্তি—চরম ভক্তি।
পাণ্ড্যদেশ—বর্তমান দক্ষিণভারতে তিনেবেল্লী জেলা।
পিণ্ডারক তীর্থ—দ্বারকার কাছে তীর্থবিশেষ।
পিতৃগণ—প্রজাপতির পুত্রদিগের কয়েকজন।
পিতৃপক্ষ—ভাদ্রমাসের কৃষ্ণপক্ষ।
পুক্কশ—নিষাদ ও শূদ্রীর মিলনে জাত সঙ্করজাতি।
পুরুষ-প্রকৃতি—(সাংখ্যোক্ত) সৃষ্টির নিষ্ক্রিয় নির্গুণ কারণ এবং সক্রিয় সত্ত্বরজস্তমোময় কারণ।
পুরুষসূক্ত—ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ৯০তম মন্ত্র, যথা—'সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ। স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্‌॥' ইত্যাদি

পুষ্কর—আজমীরের নিকটস্থ তীর্থবিশেষ।
পূরক—ডান নাক টিপিয়া বাঁ নাক দিয়া শ্বাসগ্রহণ (প্রাণায়ামের অঙ্গ)।
পূর্বাশা—পূর্ব দিক।
প্রত্যুদ্গমন—(অভ্যর্থনার্থ) উঠিয়া (অতিথির দিকে) গমন
প্রদক্ষিণ—কাহাকেও ডানপাশে রাখিয়া তাহার চারিদিকে হাঁটা।
প্রপঞ্চ—মায়া ; মায়াময় জগৎ।
প্রভাস—গুজরাতে ভেরাভলের কাছে।
প্রয়াগ—গঙ্গা-যমুনা নদীদ্বয়ের সঙ্গম (আধুনিক এলাহাবাদ)।
প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর—আধুনিক গৌহাটি।
প্রাণবায়ু—দেহস্থ পঞ্চবায়ুর প্রথম বায়ু।
প্রাণায়াম—প্রাণবায়ুকে সংযতকরণ।
ফল্গু—গয়ার পার্শ্ববর্তিনী নদীবিশেষ, নৈরঞ্জনা।
বটু—বালক।
বদরিকাশ্রম, বদরীধাম—আধুনিক বদরীনাথ।
বর্ণাশ্রম—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ঃ এই চারি বর্ণ এবং ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস ঃ এই চারি আশ্রম।
বাদরায়ণি—বাদরায়ণ বা ব্যাসের পুত্র শুক।
বিদর্ভ—আধুনিক বেরার।
বিদেহ—মিথিলা।
বিদ্যাধর—উপদেবতা জাতিবিশেষ।
বিন্দুসরোবর—কৈলাসপর্বতের উত্তরে।
বিপাশা—আধুনিক বীয়াস নদ।
বিবিক্ত—নির্জন।
বিম্ব—মূল বস্তু।
বিলোমজ—নিম্নবর্ণের পুরুষ ও উচ্চতর বর্ণের নারীর মিলনে জাত।
বিশালা—উজ্জয়িনী নগরী।
বিশ্বস্রষ্টাগণ—প্রজাসৃষ্টির জন্য ব্রহ্মার সৃষ্ট মরীচি আদি প্রজাপতিগণ।
বেণা—কৃষ্ণানদীর একটি উপনদী।
বৈজয়ন্তীমালা—বিষ্ণুর গলার মালা।
বৈতালিক—গায়ক।
ব্রহ্মতীর্থ—(তর্পণক্রিয়ায়) অঙ্গুষ্ঠের মূলদেশ ; পুষ্করতীর্থ ; হরিদ্বার।
ব্রহ্মসূত্র—(১) বাদরায়ণকৃত বেদান্ত-গ্রন্থ। (২) যজ্ঞোপবীত।
ব্রহ্মাবর্ত দেশ—সরস্বতী ও দৃষদ্বতী নদীদ্বয়ের অন্তর্বর্তী দেশ (হস্তিনাপুরের উত্তর-পশ্চিমে)।
ভামিনী—(দীপ্তিময়ী) নারী।
ভীমরতি—জীবনের ৭৭-তম বর্ষের ৭ম রাত্রি।
ভূমা—বহুত্ব ; পরিপূর্ণত্ব।
ভূরাদি লোক—ভূঃ ভুবঃ স্বঃ মহঃ জন তপঃ ও সত্য এই সপ্ত লোক।
ভূর্ভুবাদি ত্রৈলোক্য—ভূঃ ভুবঃ ও স্বঃ এই তিন লোক।
ভৃগুকচ্ছ—আধুনিক ব্রোচ বা ভরোচ (সুরাটের কাছে)।
মগধ—আধুনিক দক্ষিণ-বিহার।
মৎস্যদেশ—আধুনিক জয়পুর ও আলোয়ার (রাজস্থানে)।

মদ্রদেশ—ইরাবতী-চন্দ্রভাগা নদীর মধ্যবর্তী দেশ।
মধুপর্ক—দুগ্ধ, ঘৃত, জল, মধু ও চিনির মিশ্রণ যাহা অভ্যর্থনার্থে দেওয়া হয়।
মধুপুর—মথুরা (মধু দৈত্যের পুর)।
মধুবন—(মধু দৈত্যের বন) আধুনিক মথুরা।
মলয়—দক্ষিণ-ভারতের পর্বতমালা যাহার উত্তরাংশ শ্রীশৈল।
মহত্তত্ত্ব—সাংখ্যোক্ত পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের দ্বিতীয় তত্ত্ব।
মহর্লোক—সপ্তলোকে চতুর্থ লোক (ভূরাদি দ্রষ্টব্য)।
মহানুভব—অতি হৃদয়বান।
মহেন্দ্রপর্বত—গোদাবরী হইতে মহানদী পর্যন্ত বিস্তৃত পর্বত।
মাতৃষ্বসেয়—মাসতুত ভাই।
মালব—মধ্য-ভারতের দেশ (আধুনিক রাজস্থান-সংলগ্ন)।
মিথিলা—বর্তমান তিরহুত বিভাগ (উত্তর বিহার)।
মেখলা—কটিবন্ধ।
মৈরেয়—মদ্যবিশেষ, 'ধাতকীপুষ্পগুড়ধান্যাম্লসংহিতম্‌'।
যক্ষ—কুবেরের অনুচর উপদেবতা জাতিবিশেষ।
রহস্য উপাসনা—গোপন উপাসনা।
রাক্ষস—যজ্ঞনাশকারী জাতিবিশেষ।
রাস—কোলাহল।
রেচক—প্রাণায়ামের (অঙ্গ), বাম নাক টিপিয়া ধরিয়া ডান নাক দিয়া শ্বাসত্যাগ।
রেবা—নর্মদা নদী।
রৈবতক—দ্বারকার নিকটবর্তী পর্বতবিশেষ, বর্তমান গির্নার পর্বত।
লিঙ্গদেহ—(বেদান্তমতে) নশ্বর স্থূল দেহের কারণস্বরূপ অবিনাশী সূক্ষ্ম শরীর।
শম্যাপ্রাস—সরস্বতী নদীর তীরস্থ স্থানবিশেষ।
শরণাগতি—শরণ লওয়া।
শূরসেন—ইন্দ্রপ্রস্থ হইতে মৎস্য দেশ পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল।
শোণ—গঙ্গার উপনদীবিশেষ।
শোণিতপুর—আধুনিক তেজপুর (আসামে)।
শ্রীনিবাস—(লক্ষ্মীদেবীর আশ্রয়) বিষ্ণু।
শ্রীবৎস—বিষ্ণুর বুকে লোমের চিহ্নবিশেষ।
শ্রীশৈল—বর্তমান অন্ধ্রপ্রদেশের পর্বতবিশেষ।
সত্তম—শ্রেষ্ঠ।
সনাথ—সহিত।
সমানশীল—একরূপ আচরণ সম্পন্ন।
সমাবর্তন—ব্রহ্মচর্য পালনের পর গুরুগৃহ হইতে নিজগৃহে ফিরিয়া আসা।
সরযূনদী—বর্তমান গোগরা বা ঘর্ঘরা নদী।
সরস্বতী নদী—(১) লুপ্ত নদীবিশেষ। (২) কাঠিয়াবাড়ের নদীবিশেষ।
সহ্যাদি—আধুনিক পশ্চিমঘাট পর্বতমালার একাংশ।
সাংখ্য—কপিল-প্রবর্তিত দার্শনিক মতবিশেষ।
সাযুজ্য—ঈশ্বরে লীন হওয়ার অবস্থা (মুক্তির চার অবস্থার এক)।
সারূপ্য—ঈশ্বরের সহিত একরূপ হওয়ার অবস্থা (মুক্তির চার অবস্থার একটি)
সাবিত্রীমন্ত্র—গায়ত্রী মন্ত্র।

সিদ্ধ—অষ্টসিদ্ধিসম্পন্ন ধার্মিক উপদেবতা জাতিবিশেষ।
সুতল—সপ্ত অধোলোকের মধ্যে তৃতীয় (অতল, বিতল, সুতল, রসাতল, তলাতল, মহাতল, পাতাল)।
সুদর্শন—মেরু পর্বত।
সুযোধন—দুর্যোধনের অপর নাম (আদরের ডাক)।
সূক্ত—(উত্তম বাক্য) বেদের মন্ত্র।
সূত—ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণের মিলনে জাত সংকর জাতি।
সৈরিন্ধ্রী—অন্তঃপুরের পরিচারিকা (দস্যু ও আয়োগবীর মিলনে জাত সংকর-জাতীয়া)।
সৌভ—ঐন্দ্রজালিক, মায়া-সৃষ্ট।
সৌরাষ্ট্র—আধুনিক গুজরাতের অংশ (সুরাট ও তৎসন্নিহিত অঞ্চল)।
সৌবীর—আধুনিক রাজস্থানের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশ।
সমন্তপঞ্চক—কুরুক্ষেত্রের নিকটবর্তী স্থানবিশেষ।
স্বাধ্যায়—(নিজের মনে মনে পড়া) বেদপাঠ বা শাস্ত্রপাঠ।
হব্য—দেবগণের উদ্দেশে যজ্ঞে দেয় দ্রব্য ('কব্য' দ্রষ্টব্য)।
হস্তিনা, হস্তিনাপুর—আধুনিক দিল্লী হইতে ৫৬ মাইল উত্তর-পূর্বে নগরবিশেষ (মীরাটের কাছে)।
হিরণ্যগর্ভ—(স্বর্ণডিম্বজাত) ব্রহ্মা।
হৈহয়—পশ্চিম-ভারতের দেশবিশেষ।

নির্দেশপঞ্জী